বিংশ শতাব্দী

আষাঢ় (১৮৮৫ শকাব্দ)

ফোন ২২-২২২৫
৮-এ
লাল বাজার স্ট্রীট
বোটনা

বিশুদ্ধ

আয়ুর্ব্বেদীয়

বটিকাদি

রসায়ন ঔষধ

ধাতু ভস্ম

ইত্যাদি পাইবার

একমাত্র নির্ভরযোগ্য

প্রতিষ্ঠান

ভূদেব আয়ুর্ব্বেদ ভবন

২০, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫

ফোন : ৫৫-৪৪২৫

বিংশ শতাব্দী

অষ্টম বর্ষ, প্রথম খণ্ড

১ম সংখ্যা আষাঢ় ১৮৮৩ হইতে ৬ষ্ঠ সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৮৮৩ পর্যন্ত

বর্ণানুক্রমিক বিষয়-সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অ		
অনেকা লাবণ্যময় চিত্র (চিত্রসহ)	রজনী বসুমদার	
অমর কথাশিল্পী হেমন্ত (বিশ্ব-সাহিত্য)	অমল হালদার	
আত্মপ্রকাশিত সংবাদ (কবিতা)	কৃষ্ণ ধর	
আলোময় চতুর্দশপদী (কবিতা)	অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়	
আবহাওয়া (নকশা)	সাধারণ চক্রবর্তী	
আবহাওয়া (কবিতা)	প্রীতম দেবগুপ্ত	
আর এক বৃষ্টির কথা (খেলাধুলো)	বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়	
আলোকিত (কবিতা)	অনুরাধা মৈত্র	
আ		
আকাশের কথা	সম্পাদকীয়	১, ১১০, ২৩, ২১৯, ১৬১, ৮১৩
আরোগ্য (গল্প)	বীরেশ্বর বসু	৫০
আত্মবিশ্বাসীদের কথা (প্রবন্ধ)	অমিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়	৫৫
আত্মরক্ষা (গল্প)	সত্যেন দাস	
আঁধারে আলোয় (উপন্যাস)	সাধারণ গঙ্গোপাধ্যায়	
আশ্বিনের বা কার্তিকের মা (কথা-চরিত্র)	চিত্তরঞ্জন ঘোষ	
আরশী (গল্প)	আশাপূর্ণা দেবী	
আর এক বৃষ্টিদিন (বিশ্ব সাহিত্য)	অমল হালদার	
আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রে ভারতের সৃষ্টিভঙ্গী (চিত্রসহ)	রজনী বসুমদার	
আন্তর্জাতিক বাংলা ছড়ার ছের (প্রবন্ধ)	গৌরচন্দ্র চক্রবর্তী	
ই		
ইসলামী গজল (কবিতা)	নাসরুল হক	

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
	ক	
কবি টলস্টয়ের গোপন কাহিনী (বিশ্বসাহিত্য)	অরুণ সান্যাল	
	এ	
এ্যাবসিডেন্ট (গল্প)	দেবব্রত দত্ত	১৮৪
এ তার নিয়তি (গল্প)	সচ্চিদানন্দ চট্টোপাধ্যায়	২৪১
এই শহরে (কবিতা)	প্রেমেন্দ্র মিত্র	৭৩৩
একটি রাত্রিকে (কবিতা)	অরুণ মিত্র	৭৩৬
একটি ঘটনার বিস্মৃতি (গল্প)	হেমন্ত লাহিড়ী	৮৪৪
এখানে অনেক ভ্রান্তি (কবিতা)	পাঞ্চজন্য ঘোষ	৯৯২
	ক	
কাত্তির উপন্যাস বা নকল চাঁদ (গল্প)	অর্ণব সেন	
কবি ভবভূতি ও বাংলা সাহিত্য (প্রবন্ধ)	দুর্গা ভট্টাচার্য	
কর্তব্য (গল্প)	বিশ্ববন্ধু সান্যাল	
	খ	
খবরের কাগজ ও দুটি পাখি (বিশ্ব সাহি	অরুণ সান্যাল	২৭৪
খেলাধুলো প্রসঙ্গে (খেলা ধুলা)	অমিত রায়	৮৬১
	গ	
গানের (প্রবন্ধ)	দেবব্রত মুখোপাধ্যায়	
গোপনচারিণী (উপন্যাস)	নীহার রঞ্জন গুপ্ত	
	ঘ	
ঘুম (গল্প)	সন্তোষ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	
	চ	
চতুরঙ্গে মুক্তি ভাবনা (প্রবন্ধ)	শক্তিপ্রসাদ পাত্র	
	ছ	
ছবির প্রতিচ্ছবি (ইতিহাসের ছেঁড়াপাতা)	অরুণ ঘোষ	
	জ	
জর্জ ওয়াশিংটন কাভার (বিজ্ঞান)	সুশীল সান্যাল	১৫
জীব বিজ্ঞানী আইনেস্তো (বিজ্ঞান)	অরুণ চট্টোপাধ্যায়	৬১৩
জলতরঙ্গ (কবিতা)	অমৃত চট্টোপাধ্যায়	৬৫৪

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
	ভ	
ব্রাহ্মেভির আত্মকথা (প্রবন্ধ)	জীবনকৃষ্ণ শেঠ	
ব্রাহ্মেভির ত্রিবিধ ঐক্য (প্রবন্ধ)	জীবনকৃষ্ণ শেঠ	
টপসিক্রেট (রস রচনা)	অরুণ বাগচী	
	ঠ	
ঠিক তখনই (কবিতা)	ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়	
	ড	
ডাকবাবু ও কাকের চিঠি (উপন্যাস)	বরেন্দ্র বসু	
ডি, এইচ লরেন্স ও কয়েকখানি চিঠি (প্রবন্ধ)	অজিত দে	
	ত	
তারকনাথ গুপ্ত প্রণীত 'সুহাসিনী' (সংকেতিত)	অমলেন্দু ঘোষ	
	থ	
থুচি কবিতা (কবিতা)	পার্থ রায়	১০৬
থারকা নাথ গুপ্ত প্রণীত 'লেখপ্রভা' (সংকেতিত)	অমলেন্দু ঘোষ	১৮৭
দুই পাখি (গল্প)	প্রবোধ কুমার সান্যাল	১৮৯
দিবা স্বপ্ন (ছোট গল্প)	সবিতা অধিকারী	১১০
	ন	
নূতন অবলম্ব (উপন্যাস)	নরেন্দ্রনাথ মাইতি	৬৭, ১৫১, ২৭৭, ৭১৪, ৯১৭
নূতন কাওয়া (গল্প)	শম্ভু গুহ	১৭১
নিশি বিহঙ্গ (উপন্যাস)	বীরেন্দ্রপ্রসন্ন চক্রবর্তী	১২৫, ২৫৭
নূতন বই (পুস্তক সমালোচনা)	—	৪২২, ৮৪৭
নদী বহে যায় (রাইফ)	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	৪৪২
নিঃসঙ্গতায় (কবিতা)	শ্যামসুন্দর দে	১৮৪
নাট্য মুল (কবিতা)	চন্দ্রশেখর রায়	৮৯০
	প	
পারস্যসীমের আলোর নীচে (জীবনী)	শ্রীযাদ	৩৬
পশ্চিম স্বর্গ (নাট্য জগৎ)	চিত্রগুপ্ত	২৩১
প্রেম (উপন্যাস)	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৯০, ৭৬১, ৮১৫
পরদেশ (উপন্যাস)	সমরেশ বসু	৩৭৬
পত্রিকা বিচার (কার্টুন)	বেবতীভূষণ	৪২৩
প্রবাসে স্বাস্থ্য (গল্প)	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৬০২
প্রোসপেক্ট কেবেডি (জীবনী)	—	৮৩৩

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
	ক	
কুলের মৃত্যু (কবিতা)	গোবিন্দ গোস্বামী	
	খ	
খাসপার্শ্বে বেগম (ভ্রমণ)	খাম বসু	২৭, ১৩৭, ৩১১
খুমেরাং (গল্প)	জীবনময় দত্ত	১৯৩
খিন্নশ্রী কবিতাগুচ্ছ (কবিতা)	—	৩২৫
বাংলা সমালোচনা ও রবীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ)	আদিত্য ওহদেদার	৬৪৩
বাজারুর সাহেব কবিতা (কবিতা)	মিহির সেন	৯৪৯
ব্যক্তিগত দর্পণ (চিঠিপত্র)	রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৯৬৯
বিজ্ঞান বিচিত্রা (বিচিত্রা)	—	৯৯৮
	ভ	
ভালবাসা, ঘাতকের রক্তহাতে (কবিতা)	কুঞ্জ ধর	১০৫
ভি. আই. পি (রম্য রচনা)	কুমারেশ ঘোষ	৬৪১
ভুবনডাঙার তীরে (ভ্রমণ)	পার্থ চট্টোপাধ্যায়	৬৭৩
ভেট (গল্প)	হিমাদ্রী	৯০৭
	ম	
মোরাভিয়ার দুটি উপন্যাস (বিশ্বসাহিত্য)	অমল হালদার	৯৭
মুক্তদণ্ড (ছড়া)	শশীভূষণ দাশগুপ্ত	২৯৮
মরুভূমি (গল্প)	আশা দেবী	৬৭৫
মুখে তার লোধ্ররেণু (উপন্যাস)	প্রিয়দর্শিনী	৬৮৩
"মোসলেম ভারতে"র নজরুল (প্রবন্ধ)	আবদুল আজীজ আল্-আমান	৭৭০
মধ্য বিংশ-শতক ও বাংলা ছোটগল্প (প্রবন্ধ)	প্রণব সেন	৮২৯
মেঘ তবু মেঘ নয় (কবিতা)	পরিমল চক্রবর্তী	৮৫৯
যাদবযাত্রী (কবিতা)	গুণেশ্বর হাজরা	৮৫৯
যাদবিকা তোমাকে মনে পড়ল (কবিতা)	ধর দত্ত	৯৮০
	র	
রূপনারায় ও কল্পনাবতী (গল্প)	অর্ণব রক্ষিতরায়	৮০
রূপ (গল্প)	জয়দীপ্ত বসু	৯৩০
রং বদল (গল্প)	কৃষ্ণা রায়	৩০৭
রাতের পাখীরা (উপন্যাস)	শক্তিপদ রাজগুরু	৫৬১
	ল	
লাল রং পলাশ (ঐঃ ঘটনা)	তা সেন	৯৯৫

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
	ল	
শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে (আলোচনা)	—	৮৯
শরদাগমন (গল্প)	সন্তোষকুমার ঘোষ	৯১৯
শিল্প (প্রবন্ধ)	কমলকুমার সান্যাল	৮৫৫
শ্বেতকীর সমাচার (চিঠি)	অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়	৯৩৩
শেষ প্রার্থনা (কবিতা)	ওয়াল্ট হুইটম্যান	৯৯০
	স	
স্বাধীন ধারা (প্রবন্ধ)	এম, জুবুরুহা	৪১
সেই অচেনা মানুষটি (উপন্যাস)	সন্তোষ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০, ১২১, ২৮২, ৭৯১	৮৮৮,
সাহিত্য ও শিল্পকলায় ভাবাবেগের ভূমিকা (প্রবন্ধ)	তরুণ চট্টোপাধ্যায়	৭৭
স্মৃতির অতীত (কবিতা)	পঞ্চানন মজুমদার	১০৬
সন্দেহ (গল্প)	রঘুনাথ রায়	১১৩
সিংহলে বৌদ্ধ সংস্কারতার (প্রবন্ধ)	সুরেন্দ্রনাথ কর	১৪৮
সাহিত্যে সাম্প্রতিকতা (প্রবন্ধ)	সুধাংশু গুপ্ত	২৯৭
সাজেরা এখন (কবিতা)	রাম বসু	৭০০
সন্ধ্যাসী প্রভাত (কবিতা)	জগদীশ ভট্টাচার্য	৭০৪
সেণ্ট আমব্রোজের সাম্যবাদ (প্রবন্ধ)	মলয় রায়চৌধুরী	৮৪১
স্পোর্টস কণ্ট্রোল বোর্ড বা কংগ্রেস সংগঠন (প্রবন্ধ)	ধনি চৌধুরী	৮৬২
স্বামী বিবেকানন্দ (প্রবন্ধ)	—	৮৮০
সাহিত্যে অতিপ্রাকৃত (প্রবন্ধ)	শীতল ঘোষ	৮৯৭
সবজি ক্ষেতের প্রহরী (গল্প)	মিখাইল সলোকভ	৯৮১
সংস্কৃত সমবয় ও সমরসুল (প্রবন্ধ)	আবদুল আজীজ আল-আমান	৯৯৩
সেদিন আমার হাতে ছিল একতারা (কবিতা)	শক্তি চট্টোপাধ্যায়	৯৯৫
সাহিত্য ও সমাজ (প্রবন্ধ)	অমিতকুমার সরকার	৯৯৬
	হ	
হিমালয় অভিযান (প্রবন্ধ)	দুঃসাহসী	
হাতের তালু (কবিতা)	হেইন্যার ম্যারিয়া রিলকে	
	ক্ষ	
ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী প্রণীত 'মধুযামিনী' (সংক্ষেপিত)	অমলেন্দু ঘোষ	
ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'চণ্ডালিনী' (সংক্ষেপিত)	অমলেন্দু ঘোষ	
ক্ষুধিত পাষাণ ক্ষুধিত নয় (প্রবন্ধ)	বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য	

বর্ণানুক্রমিক লেখক সূচী

১ম সংখ্যা আষাঢ় ১৮৮৫ হইতে ৬ষ্ঠ সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৮৮৫ পর্য্যন্ত।

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	অ	
অর্ণব সেন	কৃত্রিম উপগ্রহ বা নকল চাঁদ (গল্প)	৯
অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়	আদিবাসীদের কথা (প্রবন্ধ)	৫৪
ঐ	শ্বেতদ্বীপ সমাচার (চিঠি)	৩৬৩
অমল ঘোষ	ছবির প্রতিচ্ছবি(ইতিহাসের ছেঁড়াপাতা)৪৮,৩১৬,৮০১,৯১৭,	
অর্ণব মজুমদার	রূপেরাম ও কল্পনাবতী (গল্প)	৮০
অমল দাশদার	মোরাভিয়ার দুটি উপন্যাস (বিশ্বসাহিত্য)	৯৭
ঐ	ঋষি টলস্টয়ের গোপন দলিল (বিশ্বসাহিত্য)	৯১০
ঐ	অমর কথাশিল্পী চেকভ্ ঐ	১৪৫
ঐ	খবরের কাগজ ও ফ্লীটস্ট্রীট ঐ	২৭৪
ঐ	আর এক মস্তিষ্ক ঐ	৮১২
অমলেন্দু ঘোষ	দ্বারকনাথ গুপ্ত প্রণীত "হেমপ্রভা" (সংক্ষেপীত)	১৮৭
ঐ	তারকনাথ গুপ্ত প্রণীত "সুধাসিনী" ঐ	২৬৫
ঐ	ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী প্রণীত "মধুযামিনী" ঐ	৮৩৭
ঐ	ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "চন্ডালিনী" সংক্ষেপী	৯১৪
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	প্রাণারম্ভবাহা (গল্প)	৬০১
অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়	জলতরঙ্গ (কবিতা)	৬২৪
অরুণদাশগুপ্ত	টপসিক্রেট (কবিতা)	৬৩০
অরুণ মৈত্র	একটি রাত্রিকে (কবিতা)	৭৩৬
অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়	অদাধারণ চতুর্দ্দশ পদী (কবিতা)	৭৫৬
অজিত দে	ডি. এইচ. লরেন্স ও কয়েকখানি চিঠি (প্রবন্ধ)	৭৭৮
অমিত রায়	খেলাধুলো প্রসঙ্গে (খেলাধুলো)	৮৬১
অসিত কুমার সরকার	সাহিত্য ও সমাজ (প্রবন্ধ)	৯৯৬
	আ	
আশা দেবী	মরুভূমি (গল্প)	৬২৫
আশাপূর্ণা দেবী	আকাশমাটি (গল্প)	৬৩৩

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	আ	
আদিত্য ওলদেসাই	বাংলার সমালোচনা ও রবীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ)	
আবদুল ব্যারীষ খান খাঁজান	মোসলেম ভারতের নজরুল (প্রবন্ধ)	
ঐ	সংস্কৃত সমবর্ণ ও নজরুল (প্রবন্ধ)	
	এ	
এম ওয়াহেদ	স্বাধীন বাংলা (প্রবন্ধ)	
	ও	
ওয়াল্ট হুইট ম্যান	শেষ প্রার্থনা (কবিতা)	
	ক	
কৃষ্ণ ধর	ভালবাসা, ঘাতকের রক্ত হাতে (কবিতা)	
ঐ	অপ্রকাশিত সংবাদ ঐ	
কৃষ্ণা দাস	রংবদল (গল্প)	
কুমারেশ ঘোষ	ভি আই পি (রম্য রচনা)	
কমল সাম্যাল	শিল্প (প্রবন্ধ)	
	গ	
গৌর চন্দ্র চক্রবর্তী	আধুনিক বাংলা রচনা প্রেম (প্রবন্ধ)	
গোবিন্দ গোস্বামী	কুলের মৃত্যু (কবিতা)	
	চ	
চিত্রগুপ্ত	পশ্চিম স্বর্গ (নাট্য জগৎ)	
চিত্তরঞ্জন ঘোষ	আশ্বিনের মা কার্তিকের মা (রম্য রচনা)	
চন্দ্রশেখর রায়	নাট্যরূপ (কবিতা)	
	জ	
জগদীন্দ্র বসু	রূপ (গল্প)	

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	ঙ	
জীবনকৃষ্ণ শেঠ	ট্র্যাজিডির আদিকথা (প্রবন্ধ)	
ঐ	ট্র্যাজেডির ত্রিবিধ-ঐক্য (প্রবন্ধ)	
জীবনময় দত্ত	বুমেরাং (গল্প)	
জগদীশ ভট্টাচার্য	সন্ন্যাসী প্রভাত (কবিতা)	
	ত	
তরুণ চট্টোপাধ্যায়	সাহিত্য ও শিল্পকলায় ভাবাদর্শের ভূমিকা (প্রবন্ধ)	৭১
ঐ	জীব বিজ্ঞানী, লাইসেংকো (বিজ্ঞান)	৬১৩
তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়	প্রস্থ উপন্যাস	৩৬০, ৭৬২, ৮৫৪
তা-সেন	লাল রং পলাশ (ঐতিহাসিক ঘটনা)	৯৪৫
	দ	
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়	গাল্পেয় (প্রবন্ধ)	
দুঃসাহসী	বিদ্যালয় অভিযান (প্রবন্ধ)	
দেবব্রত দত্ত	এ্যাকসিডেন্ট (গল্প)	
দুর্গা ভট্টাচার্য	কবি জয়দেব ও বাংলা সাহিত্য (প্রবন্ধ)	
	ন	
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	আঁধারে অম্বরে (উপন্যাস)	
নীহাররঞ্জন গুপ্ত	গোপনচারিণী (উপন্যাস)	
নারায়ণ চক্রবর্তী	অনুরাগ (গল্প)	
	প	
পঞ্চানন মজুমদার	স্মৃতির অতীত (কবিতা)	১০৬
পার্থ দাশ	দুটি কবিতা (কবিতা)	১০৬
প্রবোধকুমার সান্যাল	দুইপাখী (গল্প)	৪৮৯
পার্থ চট্টোপাধ্যায়	ভূমধ্যসাগরের তীরে (ভ্রমণ)	৬৭৩
প্রিয়দর্শিনী	মুখে তার লোহরেণু (উপন্যাস)	৬৮৬
প্রেমেন্দ্র মিত্র	এই শহরে (কবিতা)	৭৩০
প্রণব সেন	মধ্যবিংশ শতক ও বাংলা ছোট গল্প (প্রবন্ধ)	৮২৯
পরিমল চক্রবর্তী	মেঘ, তবু মেঘ নয় (কবিতা)	৮৫৯

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	ব	
বীরেশ্বর বসু	আরোগ্য (গল্প)	
বিশ্ববন্ধু সাম্যাল	কর্তব্য (গল্প)	
বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়	অথ যন্ত্র মৃত্তিকা কথা (খেলাধুলা)	
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য	ক্ষুধিত পাষাণ ক্ষুধিত নয় (প্রবন্ধ)	
ব্রতীন্দ্র মজুমদার	ঠিক তখনই (কবিতা)	
	ভ	
ভূপেন্দ্রনাথ মাইতি	নতুন জনপদ (উপন্যাস)	৬৭, ১৫১, ২৭৭, ৭০৫, ৯১৭
ঐ	অপরাজিত (কবিতা)	৯৮০
ভবেশ রায়	সন্দেহ (গল্প)	১৩৩
ভবেশ বসু	ডাকবাক্স ও কাকনের চিঠি (উপন্যাস)	৪২৪
ভরত দাশগুপ্ত	একটি ঘটনার বিস্মৃতি (গল্প)	৮৪৪
ভরত রায়চৌধুরী	সেন্ট আমব্রোজের সাম্যবাদ (প্রবন্ধ)	৮৫২
মণি চৌধুরী	স্পোর্টস কন্ট্রোলবোর্ড না কংগ্রেস সংগঠন (প্রবন্ধ)	৮৬১
মিহির সেন	বাহাদুর শাহের কবিতা (কবিতা)	৯১৯
মিখাইল শলোকভ	শরৎ ক্ষেতের প্রহরী (গল্প)	৯৮১
	য	
যাদু বসু	যাদুর দেশে (ভ্রমণ)	২৭, ১৩১, ৩১১
ঐ	দাওনা এখন (কবিতা)	৭৩৩
যুগল মজুমদার	অনন্য সাধারণ চিত্র 'পলাতক' (রঙ্গজগৎ)	
ঐ	'ছায়াসূর্য' ঐ	২২৫
ঐ	আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রে নবতর দৃষ্টিভঙ্গী(রঙ্গজগৎ)	৮৬১
যোগেশ্বর হাজরা	পত্রিকা বিভ্রাট (কার্টুন)	৪২৩
যোগেশ্বর হাজরা	যাদব যাত্রী (কবিতা)	৮৫৯
রেইল্যার ম্যারিয়া রিলকে	হাতের তালু (কবিতা)	৯৬০
রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	ব্যক্তিগত দর্পণ (পত্রাবলী)	৯৬৯
	শ	
শ্রীবাস	পাদপ্রদীপের আলোয় নীচে (জীবনী)	
শক্তিপ্রসাদ পাত্র	চতুরঙ্গে বুদ্ধি ভাবনা (প্রবন্ধ)	

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	ক	
অমন্তু গুহ	নূতন হাওয়া (গল্প)	১৭১
অক্লিলব রায়চৌধুরী	রাতের পাখীরা (উপন্যাস)	৪৭৪
অশিতুবরণ লাহিড়ী	মুক্ত দশক (ছড়া)	৪৭৪
শৈলানন্দ মুখোপাধ্যায়	নদী বয়ে যায় (নাটক)	৪৪২
শ্যামসুন্দর দে	নিঃসঙ্গতায় (কবিতা)	৭৩৪
শ্রীপদ সেনগুপ্ত	অনন্যা (কবিতা)	৮৬০
শীতল ঘোষ	সাহিত্যে অতিপ্রাকৃত (প্রবন্ধ)	৮৯৭
শান্তনীল দাশ	এখানে অনেক ক্লান্তি (কবিতা)	৯৯২
শক্তি চট্টোপাধ্যায়	সেদিন আমার হাতে ছিল একতারা (কবিতা)	৯৯৪
	স	
সম্পাদকীয়	অন্যান্যদের কথা ১, ১১৩, ২৩৩ ৩৪৯, ৭৬১, ৮৭৩	
সুনীল সান্যাল	জর্জ ওয়াশিংটন কারভার (বিজ্ঞান)	১৫
সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়	সেই অচেনা মানুষটি(উপন্যাস)৪৩, ১২১, ২৮২, ৭৯১,৮৮৮	
সত্যেন সাহা	আয়নামীনা (গল্প)	১০১
সামসুল হক	ইদানীং কুকু (কবিতা)	১৫৫
সুরেন্দ্র নাথ কর	সিংহলে বৌদ্ধ সঙ্ঘাবতার (প্রবন্ধ)	১৪৮
সদানন্দ চট্টোপাধ্যায়	এ ভার নিয়তি (গল্প)	২৪১
সুধাংশু তুলসী	সাহিত্যে সাম্প্রতিকা (প্রবন্ধ)	২৯৭
সমরেশ বসু	পদক্ষেপ (উপন্যাস)	৩৭
সন্তোষ কুমার ঘোষ	পথানুগমন (গল্প)	৬১৯
সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	ঘুম (গল্প)	৭৪৬
সবিতা অধিকারী	দিবাস্বপ্ন (গল্প)	৯১৩
	হ	
হরিপ্রসন্ন চক্রবর্তী	মিশি বিহঙ্গ (উপন্যাস)	১৯৫, ২৪৭
হিমাদ্রি	ভেট (গল্প)	৯৩৭
হর দত্ত	বালবিধবা তোমাকে মনে পড়ল (কবিতা)	৯৮০

'বিংশ শতাব্দী'র গ্রাহক হইবার আবেদন পত্র

কর্মাধ্যক্ষ মহাশয়,

আমাকে.....মাস হইতে 'বিংশ শতাব্দী'র বার্ষিক/ষান্মাসিক গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইয়া সভ্য কার্ড পাঠাইয়া দিবেন আমি এই সঙ্গে নয় টাকা/পাঁচ টাকা ক্রস পোস্টাল অর্ডারে পাঠাইতেছি। পাণ্ডুলীর সংখ্যা রেজেস্ট্রি করিয়া পাঠাইবার জন্য অতিরিক্ত পঞ্চান্ন নয়া পয়সা পাঠাইলাম।

নাম..... স্বাক্ষর

ঠিকানা.....

তারিখ.....

যাঁহারা মনিঅর্ডারে টাকা পাঠাইবেন তাঁহারা উপরোক্ত ফর্মে কুপনে নাম ঠিকানা ও কোন মাস হইতে সভ্য হইতে চান তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিবেন। যাঁহারা পাণ্ডুলীর সংখ্যা চাহে লইবেন তাঁহাদের পঞ্চান্ন নয়া পয়সা রেজেস্ট্রি খরচ পাঠাইবার প্রয়োজন নাই. কুপনে বা উপরের ফর্মে "পত্রিকা চাহে যাইবে" এই কথাটি লিখিয়া দিবেন।

পাকিস্তানের ক্রেতারা নিউজ কর্পার, কে. পি. দে রোড, চট্টগ্রাম এবং নবকুল চ্যাম্বার্স ৩০, হরিকেশ দাস রোড, ঢাকা—১। এই ঠিকানায় অর্ডার জানাইবেন।

'বিংশ শতাব্দী'র এজেন্ট শ্রেণীভুক্ত হইবার আবেদন পত্র

কর্মাধ্যক্ষ মহাশয়,

প্রতি সংখ্যা 'বিংশ শতাব্দী'র প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমাকে.....কপি ভি. পি. পি./ রেজেস্ট্রি যোগে পাঠাইয়া দিবেন।

আমি এই সঙ্গে অগ্রিম .....টাকা পাঠালাম। অবশিষ্ট টাকা দিয়া ভি. পি. পি. ছাড় করাইয়া লইব। ভি. পি. পি. ফেরৎ আসিলে আমার জামানত বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে। আমার অর্ডার গ্রহণ করিয়া পাকা রসিদ পাঠাইয়া দিন।

নাম..... স্বাক্ষর

ঠিকানা.....

প্রতি সংখ্যার মূল্য পঞ্চাশ নয়া পয়সা। এজেন্সী কমিশন ২৫%। পাঁচ কপির কম এজেন্সী দেওয়া হইবে না। পত্রিকা এজেন্টদের নির্দেশমত ভি. পি. পি/রেজেস্ট্রি যোগে যাইবে। ডাক খরচ সম্পূর্ণ আমাদের।

পত্রিকা প্রকাশের পূর্বে সম্পূর্ণ মূল্য অগ্রিম পাঠাইয়া রেজেস্ট্রি যোগে পত্রিকা লওয়াই সুবিধাজনক। কারণ ভি. পি. পি. অপেক্ষা রেজেস্ট্রি দ্রুত বিলি হয়।

আহারের পর দিনে দু'বার..

সব ঋতুতে স্বাস্থ্য লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়

সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান

দু' চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহা-দ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) সেবনে আপনার স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহা-দ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দ্দি, কাসি, শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক ফলপ্রদ। মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্দ্ধক ও বলকারক টনিক। দু'টি ঔষধ একত্র সেবনে আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলব্ধ স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে।

সাধনা ঔষধালয় • ঢাকা

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্ব্বেদ-আচার্য্য, ৩৬, সো আ ন পা তা রোড, কলিকাতা-৩১

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন), এম,সি,এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

পরিবারের কর্তা হিসেবে আপনাকে আপনার স্ত্রী ও সন্তানদের নিরাপত্তার এবং স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কঠিন সংগ্রাম করতে হয়। ভবিষ্যতের দুর্যোগময় ও অভাবের দিনে পরিবারকে রক্ষা করতে আপনার সেই সংগ্রামে জীবন বীমার পলিসির স্থান আপনার ঠিক পেছনেই। একজন জীবন বীমার এজেন্টের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করুন; আপনার প্রয়োজনমতো একটি বীমার প্ল্যান নিতে তিনি আপনাকে সাহায্য করবেন।

জীবন বীমার

কোন বিকল্প নেই

সূচীপত্র

বিংশ শতাব্দী

অষ্টম বর্ষ : ১ম সংখ্যা

আষাঢ় ১৮৮৪

লেখক		বিষয়
সম্পাদকীয়	১	আমাদের কথা
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়	২	গাঙ্গেয় (ভ্রমণ)
অর্ণব সেন	৯	কৃত্রিম উপগ্রহ বা নকল চাঁদ (গল্প)
সুনীল সান্যাল	১৫	জর্জ ওয়াশিংটন কারভার (বিজ্ঞান)
বীরেশ্বর বসু	২০	আরোগ্য (গল্প)
রাম বসু	২৭	বাদশা বেগমের দেশে (ভ্রমণ)
দুঃসাহসী	৩৩	হিমালয় অভিযান (প্রবন্ধ)
শ্রীবাস	৩৬	পাদপ্রদীপের আলোর নীচে (জীবনী)

'বিংশ শতাব্দী'র নিয়মাবলী

- 'বিংশ শতাব্দী' বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা (সডাক) নয় টাকা। শারদীয় সংখ্যা রেজেষ্ট্রি সমেত ৯·৫০ টাকা।
- আষাঢ় মাসে পত্রিকার বর্ষারম্ভ কিন্তু বছরে যে কোন সময় থেকে গ্রাহক হওয়া চলে।
- সাড়ে চার টাকা পাঠিয়ে ছয় মাসের গ্রাহক হওয়া চলে কিন্তু অতিরিক্ত মূল্য ছাড়া তাঁদের শারদীয় সংখ্যা পাঠান হয় না। শারদীয় সংখ্যা প্রকাশের পূর্বে যাঁরা পর পর দুবার ষাণ্মাসিক চাঁদা পাঠিয়ে বার্ষিক গ্রাহক হয়েছেন তাঁরা অতিরিক্ত মূল্য ছাড়াই শারদীয় সংখ্যা পাবেন।
- গ্রাহক ইংরেজি ৮ তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পেলে স্থানীয় পোস্ট অফিসে খোঁজ নিয়ে চিঠি দিলে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
- এজেন্টদের শতকরা ২৫% কমিশন দেওয়া হয়। অবিক্রিত সংখ্যা ফেরৎ নেওয়া হয় এবং পত্রিকা পাঠাবার ডাক ব্যয় কর্তৃপক্ষ বহন করেন।
- লেখা পাঠাবার কোন নিয়ম নেই। যে-কেউ লেখা পাঠাতে পারেন। মনোনীত হলে জানানো হয়। অমনোনীত রচনা ফেরৎ পেতে হলে ঠিকানা লেখা ষ্ট্যাম্পযুক্ত খাম রচনার সঙ্গে দেওয়া অত্যাবশ্যক অন্যথায় অমনোনীত রচনা নষ্ট করে ফেলা হয়। লেখা হাতে হাতে ফেরৎ দেওয়া হয় না বা লেখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের জবাব দেওয়া হয় না।

লেখক		বিষয়
এম. সুরুয়া	৪১	স্বাধীন ঘানা (প্রবন্ধ)
সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৩	সেই অচেনা মানুষটি (উপন্যাস)
অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়	৫৪	আদিবাসীদের কথা (প্রবন্ধ)
অমল ঘোষ	৫৮	কবির প্রতিচ্ছবি (ইতিহাসের ছেঁড়াপাতা)
মৃত্যুঞ্জয় মাইতি	৬৭	নতুন জনপদ (উপন্যাস)
তরুণ চট্টোপাধ্যায়	৭৭	সাহিত্য ও শিল্পকলায় ভাবাদর্শের ভূমিকা (প্রবন্ধ)
অর্ণব মজুমদার	৮৪	রূপরাম ও কল্পনাবতী (গল্প)
	৮৯	শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে (আলোচনা)
জগদীন্দ্র বসু	৯৩	রূপ (গল্প)
অমল হালদার	৯৭	মোরাভিয়ার দুটি উপন্যাস (বিশ্ব-সাহিত্য)
সত্যেন সাহা	১০১	আত্মনীনা (গল্প)
কৃষ্ণ ধর	১০৫	ভালবাসা, ঘাতকের রক্তহাতে (কবিতা)
সামসুল হক	১০৫	ইদানীং কৃষ্ণ (কবিতা)
পঞ্চানন মজুমদার	১০৬	স্মৃতির অতীত (কবিতা)
পার্থ রাহা	১০৬	দুটি কবিতা (কবিতা)
রঞ্জন মজুমদার	১০৭	অনন্য সাধারণ চিত্র 'পলাতক' (রঙ্গজগৎ)

অঙ্গসজ্জা

নীতিশ মুখোপাধ্যায়

সাম্যবাদ সম্বন্ধে নতুন পুস্তিকা

নিম্নলিখিত বইগুলি বাংলা, অসমীয়া এবং ওড়িয়া ভাষায় পাইবেন

১। কমিউনিজমের মর্মবাণী স্বাধীনতা

২। কমিউনিজম নিয়ে আসে সুখ—সমৃদ্ধ

৩। কমিউনিজমের মর্মবাণী ভ্রাতৃত্ব

৪। কমিউনিজমের মর্মবাণী সাম্য

৫। কমিউনিজমের মর্মবাণী শান্তি

৬। শ্রমের বিজয়কেতন কমিউনিজম

: যোগাযোগ করুন :

সোভিয়েত দেশ কার্যালয়

১১১, উড স্ট্রীট

কলিকাতা-১৬

ন্যাশনালের প্রকাশিত লোকবিজ্ঞানের বই

ইয়াকভ পেরেলম্যান

অঙ্কের খেলা

অঙ্কের নানা ধরনের ধাঁধা, বুদ্ধির অঙ্ক, জ্যামিতি, ভূগোল, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি সম্পর্কে আমাদের অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস শেখান হয়েছে খেলার মধ্য দিয়ে।

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত এল. লান্দা
সহলেখক ওয়াই রুমার

আপেক্ষিকতার তত্ত্ব

জটিল গণনার আশ্রয় না নিয়ে আপেক্ষিকতা তত্ত্বের মূল কথা কটি সহজ ও সরলভাবে বিবৃত। জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন বসুর ভূমিকা সম্বলিত। ১·৫০

। লোকবিজ্ঞানের অন্যান্য কয়েকটি বই।

অধ্যাপক এ. কাবানভ	**মানবদেহের গঠন ও ক্রিয়াকলাপ**	৭·০০
ইলিন	**শত সহস্র জিজ্ঞাসা**	২·২৫
তিয়ের ওগানিয়েক	**সূর্যগ্রহণ**	১·২৫
লিয়াপুনভ	**মহাবিশ্বের রহস্য**	৩·০০

ইয়াকভ পেরেলম্যান

জ্যোতির্বিদ্যার খোশখবর ২·০০

আলেকসান্দ্র ভলকভ

পৃথিবী ও আকাশ ৩·৫৬

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
১৭২ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর-৪

নিজের পড়ার

উপহার দেবার মত

একখানি বই

—সদ্য প্রকাশিত—

বিমল করের গল্পপ্রবাহ

দাম : ৫৲ টাকা

●

বিংশ শতাব্দী প্রকাশনী
২০, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৫
ফোন : ৫৫-৪৪২৫

স্বপ্নের মোহজাল রচে . .

হিমকল্যাণ

আয়ুর্বেদীয় হিমমিশ্রিত সুরভিত কেশতৈল।

পামিকোকো

মৃদু সুরভিত নারিকেল তৈল।

হিমকল্যাণ ক্যাষ্টর অয়েল

বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিশোধিত ও সুগন্ধিত কেশতৈল।

ভৃঙ্গামলা

ভৃঙ্গরাজ ও আমলা সহযোগে প্রস্তুত মহোপকারী কেশতৈল।

যোজনগন্ধা

অনুপম সুরভি নির্য্যাস।

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস্ লিঃ

কলিকাতা-৪

নিত্য উন্নয়নের পার্থক্যতায় ব্রেটিটি অপরিহার্য . .

UPCO

মহাকাশের রোমঞ্চকর কাহিনী

যুরি গ্যাগারিন — নক্ষত্রলোকের পথ ৪৲

গেরমান তিতোফ — মহাকাশে সাতলক্ষ কিলোমিটার ৩৲

নিকোলায়েফ ও পপোভিচ — মহাকাশের বক্ষপটে ১৲

★

একাধারে দুঃসাহসিক অভিযান ও মহাকাশের বিচিত্র বিবরণ। গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে পাড়ি দেবার ঠিক পূর্ব যুগে এ বইগুলি আপনাকে এক অপরিচিত জগতে নিয়ে যাবে। শোভন সচিত্র সংস্করণ।

★

ছাত্র, কিশোর, তরুণ-তরুণী, চিন্তাশীল পাঠক একাধারে সকলের পক্ষে উপযুক্ত এমন বই কদাচিৎ পাওয়া যায়।

মহাকাশ সম্পর্কে কিছু জানতে হলে এ বইগুলি আপনার

—: সদ্য প্রকাশিত আরো কয়েকটি বই :—

জেঙ্গিস আইৎমাতভ — জামিলা ১৲

ইমানুয়েল কাজাকেভিচ — নীল ডায়েরী ৩৲

সার্গেই এ্যান্টনফ — পেনকোভোতে যা ঘটেছে ৩৷৷০

তিনজন বিখ্যাত নাট্যকারের — তিনটি সোভিয়েত নাটক ৪৲

এন. এস. ক্রুশ্চেফ — শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে ৫০ নঃপঃ

বিংশ শতাব্দী : বিদেশী সাহিত্য প্রকাশ ২০, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫

'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'

বিংশ শতাব্দী

আষাঢ়
১৮৮৫
অষ্টম বর্ষ
১ম সংখ্যা

আমাদের কথা

এই আষাঢ় মাসে 'বিংশ শতাব্দী' অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করল। বাংলাদেশের সাহিত্যজীবনে এ ঘটনা নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য। সাহিত্য পত্রিকার শিশু মৃত্যু এদেশে প্রায় নিয়মের মত। অনেক ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যে দিয়ে 'বিংশ শতাব্দী'র পাদ পরিক্রমা অক্ষুণ্ণ আছে এ ঘটনা আরো আনন্দের।

সংবাদপত্র জগৎ সম্পর্কে মন্তব্য করে রোঁমা রঁলা বলেছিলেন যে চতুর্দিকেই বৃহৎ পুঁজির লীলাক্ষেত্র। রঁল্যা যেদিন এই মন্তব্য করেছিলেন সেদিন পশ্চিমী সংবাদপত্র জগৎ সম্পর্কে এ বক্তব্য যথার্থ হলেও ভারতীয় সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের চরিত্র ছিল অন্যরকম। ত্যাগ, নিষ্ঠা, সেবা ছিল সেদিন পত্র পত্রিকা জগতের মূলমন্ত্র।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকেই চাকা ঘুরতে লাগল। ব্যবসায়িক সাফল্য সংবাদপত্র জগতের কেন্দ্রবিন্দুরূপে পরিণত হল। কোটিপতি মালিক সম্প্রদায় সংবাদপত্রের অতুলনীয় ক্ষমতার সঙ্গে পরিচিত হলেন— এবং, সাহিত্যেও টাকার খেলা সুরু হল।

সাংবাদিকদের স্বাধীনতা বিপন্ন হলো। কলমের জোরে সম্পাদক হওয়ার দিন ফুরিয়ে এলো— মালিক-সম্পাদকরা মাথা তুললেন, সাহিত্যিকরাও একই সঙ্গে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বরপুত্র হয়ে উঠলেন।

ছোট ছোট মাসিকপত্র, সাপ্তাহিক পত্রিকার দিন ঘনিয়ে এলো। প্রতিদ্বন্দ্বিতার—পুঁজিবাদের ধর্মই হল প্রতিদ্বন্দ্বিতা—পাল্লায় তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হল। দৈনিক পত্রিকার সাময়িক সংস্করণ এবং দৈনিক পত্রিকা পরিচালিত সাপ্তাহিকের সঙ্গে সাহিত্য সাধক ছোট ছোট পত্র পত্রিকা পেরে উঠবেন কেন? লাইনোটাইপ ও রোটারি মেশিনের শব্দে তাদের কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে গেল।

এই বিষম প্রতিযোগীতার মধ্যেও 'বিংশ শতাব্দী' তার অস্তিত্ব শুধু যে অক্ষুণ্ণ রেখেছে তাই নয়—সাময়িক পত্র জগতে সে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নিতে পেরেছে—এটাই আমাদের কাছে সবচেয়ে আনন্দের কথা।

'বিংশ শতাব্দী'র নিজস্ব কৃতিত্ব এর কারণ নয়, বাংলাদেশের পাঠক ও লেখকের সুস্থচেতনাই এর মূল কারণ। বহু ত্রুটি সত্বেও তারা 'বিংশ শতাব্দী'কে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন—যা না হলে এর অস্তিত্ব বহু পূর্বেই বিপন্ন হত।

তাদের সমর্থনের প্রতিদানে 'বিংশ শতাব্দী'র কাছে তারা অনেক কিছুই দাবী করতে পারেন।

'বিংশ শতাব্দী'ও তাদের প্রত্যাশা পূরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

সগর রাজার বংশ উদ্ধারে প্রবাহমানা গঙ্গা ছুটে চলেছেন সাগর দ্বীপের খোঁজে। ভগীরথের পিছু পিছু এগিয়ে এসে নিজের পলি দিয়ে গড়া শ্যামল সবুজ বাংলা দেশের বুক চিরে ছুটে চলেছেন উচ্ছ্বাসে আবেগে চঞ্চল হয়ে দিগন্তের পানে, সাগরের ঈপ্সায় ভাগীরথী। এমনি আর এক উচ্ছ্বাসেই সেদিনের যাত্রা শুরু হোলো। ভোরের পাখির ঘুম জাগানো চোখে যখন নীল আকাশের ধারা লাগে, হাওয়ার দোলায় ডানা মেলে দিয়ে যেমন প্রথম ওড়ার সুখ লাগে আর এগিয়ে চলার গতির ছন্দে যেমন জাগে রোমাঞ্চ, তেমনি যাত্রার দিন প্রথম উদার মনের সাথে রোমাঞ্চ অনুভব করি, বুঝি সেই অসীমের পরশ পেয়ে।

সহরের নাগপাশে বাঁধা ভাগীরথীর লৌহ জাংগাল, যেন বন্দিনীকে বেড় দিয়েছে লোহার শেকল। যানবাহনের আর্তনাদে কাঁপিতে কাঁপিতে আসে তারই ঝংকার। নীচে জগন্নাথ ঘাটের অপরিচ্ছন্ন আবহাওয়ার ক্লীব মনে সন্তর্পণে ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে একাকে এসে আশ্রয় নিলাম স্টীমারের ছাদের কোণে। সহযাত্রীরা আপন সুবিধার সজাগ-সচেতনতায় নিজ নিজ সুবিধা মত আশ্রয়ে গদিয়ান, তাই স্নেহগত স্বাচ্ছন্দ্যের প্রত্যাশা ছেড়ে মনোগত মাধুর্যের আশ্রয় খুঁজলাম উন্মুক্ত আকাশতলে, আলোঝলমল সোনায় মোড়া ভাগীরথীর বুকে ঢেউয়ের দোলায় দোলন লাগা নারেঙ্গের ঘরের সামনে। গঙ্গা—গঙ্গা, ঢেউয়ের পর ঢেউ, দোলার পর দোলা, ঝোটির পর ঝোটি, বাড়ির পর বাড়ি, সৌধের পর প্রাসাদ, তারপর গাছ, মাঠ, ময়দান, কেল্লা, কলকারখানা পেরিয়ে বন্দরের আকাশে ঝোঁক কপিকলের বেড়াজালের রাঁধন ছাড়িয়ে, নৌকা, স্টীমার, লঞ্চ, জাহাজের পাশ কাটিয়ে বয়ার নিশানায় নির্দেশ নিয়ে চলেছি তো চলেইছি।

আমরা যারা কোলকাতার পুব পাড়ার ছেলে, সেই খালধারে বাস, তাদের সাথে জলের পরিচয় ঘনিষ্ঠ। আজ যে খালকে বুজিয়ে দিয়ে রাস্তা তৈরীর পরিকল্পনা করেছেন বিধান সভার মণ্ডলী, সেই খালই সেদিন পর্যন্ত অন্যতম প্রধান জলপথের ভূমিকা পালনের সাথে সাথে শহর শহরতলীর রূপ বৃদ্ধি করেছিল অলংকারের মত। পৃথিবীর বহু প্রাচিনতম বন্দরের চুলেও আজ এমন যে

জলপথ, সে যেমন প্রাক্ত ব্যবসায়ের সহযোগিতায় অপরূপ হয়ে দুনিয়ার সবখান থেকে রসিক পরিব্রাজক টেনে এনে দেশের অর্থ লাভের করতে পারে, তেমনি কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগপতি কলকব্জাী কোলকাতাকে তার আজকের এই ভীড়ের চাপে নাভিশ্বাসগ্রস্ত অবস্থা থেকে মুক্তি দেবার স্পর্ধা রাখে। এমন সম্ভবনা পূর্ব জল পথের রূপবৃদ্ধি না করে, কর্ম ক্ষমতা চিন্তা না করে নিরাময়ি দক, মটরবোট সার্ভিস চালু না করে শহর ও শহরতলীর পরিবহন চিন্তা-করে একে বুঝিয়ে দেওয়ার কল্পনাকারী ব্যক্তিবিশেষদের প্রতিপতি কালিদাসের আদি যুগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

তবু পূব পাড়ার এই খালের সাথে জড়িয়ে আছে, সুন্দর বনের কোল ছেঁড়া নগর কোলকাতার আদি যুগের ইতিহাস। বেলগাছিয়া, উল্টোডিঙ্গি, বাঘমারি, কাঁকুড়গাছি, মানিক(পীর)তলা, কাদা পাড়া, ধারকেল-ডাঙা, মুঘল বাগান, শুড়াগ্রাম, বেলেঘাটা, ভাটিখানা বাগা পাগলাডাঙা, ধাওডাঙা, তপসে, গোবরা, চিংড়ি হাটা, ট্যাংরা, ইণ্টালি (হিন্তাল-ই), তালতলা, পদ্মপুকুর, কড়েয়া, কসবা। পূব অঞ্চলের সীমানা ধরে এই যে সব নাম এরই মাঝে লুকিয়ে আছে কোলকাতা-পত্তনের আদি পর্ব ও তার প্রকৃতি পরিবেশের ভয়ালভীষণ ঠিকানা।

বেলেঘাটার খালে খালে ঘুড় ঘওয়া বাদি নৌকোর যোগাযোগের সাথী ছোট ডিঙি নৌকো বেয়ে সেই যে দিন আমরা ক'জন কিশোর জলের সংগে পরিচিত হয়ে ছিলাম তখন কিন্তু আজকের খাল-ভরাটের দলের মতই আমরাও বুঝিনি, এখন খালের পরিচয়, প্রয়োজন, ইতিহাস। প্রাণ ভয়ে ভীত ইংরেজের মারাঠা ডীচ খোড়ার অনেক অনেক দিন আগে প্রকৃতি দেবীর নিজের গড়া জলপথ প্রবাহিত হতো বেলেঘাটার বুক দিয়ে। জোড়া মন্দির ছাড়িয়ে, চিংড়িহাটার সীমানায় পূব উত্তরে বয়ে যাওয়া নতুন খাল আর পূব পশ্চিমে বয়ে যাওয়া পুরোন খালের সাথে ঐ যে পূব দক্ষিণে বয়ে যাওয়া নিস্তরঙ্গ জলাধার, একদিন ওরই চলচাপল্যে আর কামটি কুমিরের ভয়ে বুক কাঁপতো আশেপাশের বাসিন্দাদের। কালবৈশেখীর দোলন লাগা ওর ভয়াল, ভয়ঙ্কর প্রকোপে ভীত সন্ত্রস্ত ছিল, এ পথের নিত্য পথিক পাকা গোঁফ দাড়ি মাঝির দল। সুন্দর বনের চমক দেওয়া ভয় দেখান নদ বিদ্যাধরীর মুখ এইটি।

কেরীর যুগেও শ্রীরামপুরের পাদ্রীরা দক্ষিণ বা উত্তর

চন্দননগরের 'গ্রীও'

বণিক (মালদহ) যাতায়াত প্রয়োজনে এই নৌকা ব্যবহার করতেন। তাছাড়া আদিগঙ্গা দিয়ে যখন ভাগীরথী প্রবাহিত হত তখন হেমন গঙ্গা বেয়ে গেলে সাগর সঙ্গমে সাগর দ্বীপে পৌঁছান যেত তেমনি বিদ্যাধরীর সংযোগ ছিল আদি গঙ্গার সাথে. সে পথ গিয়ে উঠতো মাতলায়। এই মাতলা বিদ্যাধরীর মোহনায় পোর্ট ক্যানিং এর উত্তর দিকে ছিল প্রতাপাদিত্যের দুর্গ হাজরার গড়। এখন সেখানে বহুত খানার উঁচু ঢিপি. কাছের প্রতাপ নগর গ্রাম, রাজার খাল এই নামের হাজরার আবাদ তার কের টানছে আজও এই সেদিনও নৌকা বেয়ে সুন্দরবন যাওয়ার শর্টকাট ছিল বেলেঘাটার খাল। পুরোন খাল বেয়ে মাইল তিনেক এগিয়ে বিদ্যাধরীতে ধপার লক গেটে টোল দিতে হত। তারপর নাওডাঙা গ্রাম ছুঁয়ে, এগিয়ে গিয়ে জোয়ারের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে হত বসিরহাট চরে। জোয়ার এলে সোডা বাঁশের নিশানা ধরে সন্তর্পণে বসিরহাট চরের পাশ কাটিয়ে চলতে চলতে সুন্দর বনের কোলে একেবারে মাতলা মাতলায় গিয়ে পড়তো। সে নদী পথ আজ মজে গেছে, বুজে হয়েছে স্রোত, তাই আজ কোলকাতা থেকে সুন্দর বনে যাওয়ার একই রাস্তা শ্যামবাজার থেকে কেউ পুরের খাল।

নদী মাতৃক বাংলা দেশে এমন মজে যাওয়া প্রাচীন নদীপথ বা নদীর চলচাঞ্চল্যে ভাঙন ধরা নতুন পথ সৃষ্টির খেলা চলেছে তো চলছেই। এই সেদিন পঞ্চদশ শতাব্দীর ষাঠোর্ধ্বি বিপ্রদাস পিপিলাই তাঁর "মনসা মঙ্গল"তে গঙ্গার এক প্রবাহ পথের নিশানা দিয়েছেন। বিপ্রদাসের চাঁদ সওদাগর তার বাণিজ্য তরি রাজঘাটে ভাসিয়ে সুখে মুখে এগিয়ে চলেছেন রায়েশ্বর পার হয়ে, একে একে পেরিয়ে গেলেন অজয় নদী, উজানী, শিবা নদী. বা শিবাল নালা, কাটোয়া, ইন্দ্রানী নদী, ইন্দ্রঘাট, নবদ্বীপ, কুলিয়া.গুপ্তিপাড়া, মিরাঁপুর, ত্রিবেণী গঙ্গা-সরস্বতী-যমুনা সঙ্গমে সপ্তগ্রাম, কুমার ঘাট স্তারপর ডাইনে হুগলি, বামে ভাটপাড়া. পশ্চিমে সোরো, পুবে কাঁকিনাড়া, মুলাজোড়, গাড়ুলিয়া, পশ্চিমে পাইকপাড়া, ভদ্রেশ্বর, ডাইনে চাঁপদানি, বামে ইছাপুর, বাঁকবাজার, ডাইনে বদ্যিবাটি ও নিমাই তীর্থ, বামেশ খিদড়া, কোন্নগর, কোতরঙ, উত্তরপাড়া, বেতোড়, বামে চানক. খড়দহ, শ্রীপাট, দুখচর, কামারহাটি ও এড়িয়াদহ, চাঁদপুর, কোলকাতা, কালীঘাট, চুড়াঘাটি, বারুইপুর তারপর ছাতভোগ, বোদাখিকাণ্ড, হাতিগড়, চৌমুখি, শতমুখি, সাগরদলপ পেরিয়ে, চাঁদ সওদাগরের মেলানী সঙ্গমে প্রবেশ করলো।

হুগলী—'ইমামবাড়া'

বিপ্রদাসের নদী বর্ণনার সংগে ১৬৬০ খৃস্টাব্দের ফানডেনব্রোক-এর নক্সার অনেক মিল আছে। নদীয়া, মির্জাপুর, ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম, হুগলী, কোলকাতা ও কালিঘাট প্রভৃতির লক্ষণীয় ঘনিষ্ঠতা সেদিনের গঙ্গার ভিন্ন পথ প্রবাহ ইঙ্গিত দেয়। সেদিন পর্যন্ত ভাগিরথী কোলকাতা বেতোড় কালিঘাট পর্যন্ত এসে আজকের শীর্ণকায়া আদি গঙ্গার প্রশস্ত বুকুবেয়ে সমুদ্রে মুখে বয়ে গিছলো। তাই সেদিন সমুদ্র ছিল এ পথে প্রবাহিত আদি গঙ্গার প্রশস্ত দুই কূল। চরম উন্নত হয়েছিল বেহালা, বাঁড়িশার পল্লী ও সমাজ। তাই সেদিন এখানেই রাজধানী স্থাপন করেছিলেন প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য বসন্ত রায়। তিনিই প্রথম কালী মন্দিরের পত্তন করেন। কারণ সিদ্ধসাধক ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠ ছিল। সম্ভবত ব্রহ্মচারীর অনুরোধে বেহালা বাঁড়িশার মাঝামাঝি সরশুনা গ্রামে রাজধানী স্থাপন করে রায় গড় দুর্গের প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। আজকে এ দুর্গ প্রায় নিশ্চিহ্ন। কেবল মাঝে মাঝে জায়গায় জায়গায় মেঠোজমির হঠাৎ গভীরতা বা উচ্চতা স্মরণ করায় দুর্ভেদ্য পরিখা বা প্রাকারের স্মৃতি।

একদিন হয়তো রায়গড়ের কোল ছুঁয়ে বয়ে যেত প্রবলা আদিগঙ্গা। এখন তা হেজে মজে দূর থেকে দূরান্তে সরে গিয়ে প্রায় তিন চার মাইল দূরে পুরোন স্মৃতির রোমন্থন করছে আজকের আদিগঙ্গার শীর্ণ বুকে। এ রায়গড়ের পাশেই ছিল রায়দিঘি। আজও আছে, গড়ীঘ দিঘী। আগের মত এখনো সে কৃষ্ণ কালো অনন্ত গভীর জলে পরিপূর্ণ থাকে বার মাস। আজকের এই পরিষ্কার কালো জলে দু'পাশের কল কারখানার, ইস্ট ইণ্ডিয়া ফারমাসিউটিক্যাল কোম্পানীর চিমনির ছায়া যেখানে কাঁপছে। একদিন সেই জলে প্রতিবিম্বিত হতো রায়গড়ের অপরাজেয় প্রাকার বা প্রাসাদ। ৭০।৭৫ বছর আগে এ দিঘি একেবারে চাকা পড়ে গিয়েছিলো দামদলে। দু-একটা ছোট্ট কুমীর ছিল তখন এবং ২০।২৫ বছর আগের কথায় জানা যায় সেদিন এ দিঘির মাপ ছিল দৈর্ঘে প্রস্থে ১০০০-৬০০ফুট অর্থাৎ প্রায় ৬ বিঘার জলা। সেদিন এর উত্তর পাড়ের বাসিন্দা ছিল কূল চাষী কৈবর্ত্তরা। আর হোগলা নলখাগড়া গাছে পূর্ণ ছিল তীরের দিক। সেদিন যেমন লোভাতুর মানুষের জমীর ক্ষুধা মিটিয়ে ক্রমে ক্রমে শীর্ণ হচ্ছিল রায় দিঘি—আজও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। সেদিনের বাসিন্দা কৈবর্তদের স্থান দখল করেছে পরিবর্তিত অবস্থার আজকের বাস্তুহারা মিশ্র মধ্যবিত্তরা, তবে তার চেয়ে অনেক বেশি লোভী ও অনেক বেশি বিত্তবান ধনিককুল ধ্বংস করেছে আজকের রায়দিঘিকে।

বেহালার চৌমাথা পেরিয়ে বজবজের রাস্তায় একটু এগুলে, সরশুনার উত্তরে প্রাচীন বাসুদেবপুর গ্রামের গায়ে কুড়ে ঘর ও চালা দোচালার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দেয় রায়দিঘি। চলতে গিয়ে থমকে গিয়ে হঠাৎ যদি

গঙ্গাতীর—চুঁচুড়া

এ পথের পথিক ভাবতে থাকে সেদিনের আর এদিনের কথা, তবে নিশ্চয় সে বিস্মিত হবে—আপন কালের অর্বাচীনতায়। আজ যখন দিকে দিকে, দেশে ভ্রমণ কারীর জয়যাত্রা, প্রত্নজ্য যখন ব্যবসায়ী পণ্য তখন ভারত সরকারের দুয়োরাণী, কোলকাতার বুকেও এমন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানগুলির এমন অপরূপ অপব্যবহার, দেখে বিমোহিত হবে সে। তাতে যদি পথিকের মনে হয় হবু রাজার গবু মন্ত্রীদের দেশের বাসিন্দা সে, তবে নিশ্চয় বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই তাতে। করের বোঝায় বিপর্যস্ত দেশবাসী ভিক্ষার কুলি সম্বল করে দারা পৃথিবী ভ্রাম্যমাণ উজির ওমরাহ, তখনও কিন্তু ছিঁটে ফোঁটা বুদ্ধি ব্যবহারে নারাজ কর্তৃপক্ষ। তাই আজ কোলকাতার পুরপাড়ায় রূপবতী, অর্থ সংগ্রহ সম্ভাবা জলপথ বোজান হতে যাচ্ছে। পশ্চিম পাড়ার এ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান গুলিতে চিন্তাহীনভাবে কল-কারখানার অবাঞ্ছিত প্রসার আবলাতন্ত্রের দুর্বিনিদ্রা ব্যাহত করছে না!

এখানে ঐ আদি গঙ্গার ঘাটেই ছিল কলুপাড়ার কালীর মন্দির। আজও দূরে সরে যাওয়া আদি গঙ্গার কলুপাড়ার ঘাট তারই স্মৃতি বহন করছে। সরশুনা থেকে আদি গঙ্গা পর্যন্ত, প্রশস্ত রাজপথের হদিস এখনও চেষ্টা করলে খুঁজে পাওয়া যায়। সেদিন এর নাম ছিল ধারীর জাঙ্গাল সুরশুনার ঘোষ বংশের স্থনামধন্য পুরুষ এবং এশিয়াটিক সোসাইটির সহকারী সম্পাদক প্রতাপ চন্দ্র ঘোষের বঙ্গাধীপ পরাজয়। এই গ্রন্থ থেকে জানা যায়, বর্দ্ধমান মহারাজাদের এখানে একটি রাজধানী ছিল এবং গঙ্গা তীরে আনন্দ ও পুণ্য অর্জনের জন্যে এখানে ছিল তাদের এক বাই মহল সেই বাই মহলের পরিবর্তিত নাম বেহালা আর "বাইদের" সে সখের বাজার আজ সাধারণ বেহালা বাসীদের সখের বাজার এই বাই মহলের একজন ছিলেন ধারী বাই, তাঁরই অর্থে এ জাঙ্গাল তৈরি হয়ে ছিল বলে এর নাম হয়েছে ধারীর জাঙ্গাল। বলস্ত রায়ের সময় এ জাঙ্গাল সংস্কৃত হয়ে ও বর্ধিত হয়ে সড়কে পরিণত হয়েছিল মনে হয়। আদি গঙ্গার পূব মুখে বহু দূর পর্যন্ত গিয়েছিল এ পথ। আজও এদিকে ওদিকে মাঠে-ঘাটে, উঁচু চিপিরূপে ধারীর জাঙ্গাল তার স্মৃতি বহন করে।

সুরশুনার বলস্ত রায়ের এ নতুন রাজধানী বলস্তপুর পেরিয়ে কালিন্দীর পাড় পর্যন্ত উঁচু পাড় বা জাঙ্গাল ছিল বোঝা যায় এমন চিপির হদিস দেখে। এই গড়ের উপর দিয়েই রায়গড় থেকে ধুমঘাট যাতায়াতের পথ ছিল। খুলনার সাতক্ষীরা থেকে ৪০ মাইল দূরে

ঈশ্বরপুর, সেখান থেকে ৮।১০ মাইল দক্ষিণে যমুনা ও ইছামতির সঙ্গমের কাছে ধুমঘাট। এবং এ সব মিলে গৌড়ের দশহারী যশোহর। এই সেদিন হিজলুল গঞ্জের ঘাটের উত্তর দিকে বহুদূর পর্যন্ত পশ্চিম মুখী গড়ের চিহ্ন দেখা যেত—এখন সেখান দিয়ে হাসনাবাদের খাল কাটা হয়েছে। রায় গড়ের সাথে যশোর দুর্গের যোগা-যোগ ছিল, যাতায়াতের সুবিধা ছিল সেদিন।

সেদিনের জাঙ্গালের পরিচিতি আজ গড় নামে। নিম্ন বঙ্গে পুরাতন জাঙ্গাল বা গড়ের চিহ্ন এখন অনেক দেখতে পাওয়া যায় এবং গড় নির্মাণ আজও চালু প্রথা। এখনও লোকে গড়ের বেষ্টনী তুলে বাড়ি করে। আপন জমির সীমানা নির্দেশ করে পগার কেটে এবং তার মাটি তুলে প্রাচীরের মত ঢিপি তৈরি করে গড় বানায়। সেদিনের গড়খাই বা পরিখার নাম আজ পগার আর তার উপরের প্রাচীরের নাম গড়। এই গড়েরই আর এক রূপ জাঙ্গাল। গড়ের ব্যবহারও অনেক বন্যা নিবারণ, কারণ বাঁধ পেরিয়ে জল গ্রামে ঢুকতে পারতো না। উপর দিয়ে স্বাচ্ছন্দ গমনা গমনের পথ, ও বিপদ কালে পণ্য, রসদ, সৈন্য চলাচলের সহজ ব্যবস্থা। তারপর গড়ের উপর বা আড়ালে থেকে শত্রুর গতিরোধ করা।

সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় তাঁর "যশোহর-খুলনার ইতিহাস"-এর দ্বিতীয় খণ্ডে এ সব অঞ্চলের উপর যথেষ্ট আলোচনা করেছেন।

বালুঘাটা এড়াইল বেনের নন্দন,
কালীঘাটে গিয়া ডিঙ্গা দিল দরশন।
তীরের প্রমাণ যেন চলে তরিবর
তাহার মেলানী বয়ে যাহিন-নগর।

সেদিনের কোলকাতার প্রসার প্রতিপত্তি অনেকটা নির্ভর করেছিল কালীঘাটের উপর। আজও ভারতের দিগ্‌দিগন্ত থেকে সমাগত যাত্রী কণ্ঠে আর মা কালী, কোলকাতাওয়ালী ধনী দেবী মাহাত্ম্যের প্রচার ও প্রসার করে চলেছে। এ কালীঘাটের শুরু আর গোড়ার কথা লুকিয়ে আছে লোক গাথার মাঝে, ভক্তি বিশ্বাসের আশ্রয়ে। অনেক অনেক দিন আগে দক্ষিণ ভারতের নীল গিরি পর্বতে এক নিভৃত পরিবেশে, পরম শান্ত ব্রহ্মানন্দ গিরি সিদ্ধি কামনায় আমৃত্যু সাধন প্রতিজ্ঞায় অটল হয়ে বসে সিদ্ধ লাভ করলেন। করাল বদনা কালী রূপে আবির্ভূতা হয়ে শক্তি তাকে বর দিলেন, আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তি। এ বিশ্বব্যাপী মোল জিহ্বা ভয়ঙ্করী করাল মূর্তি, ভক্তের মনে ভীতি বদলে আবেশ ঘটাল। বহুস্তবে শক্তিকে শান্ত করে, আপন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন তিনি। দেবীকে অনুরোধ করলেন আপন আসনের সামনে অধিষ্ঠিত শিলাস্তম্ভে চির অধিষ্ঠান করতে। দেবী ভক্তের বাসনা পূরণের ইচ্ছায় দশবর্ষীয়া কুমারী মূর্তিতে শিলাস্তম্ভে আবির্ভূতা হলেন এবং স্তম্ভ মধ্যে বিলিন হয়ে ভক্তির আতিশয্যে বন্দিনী হলেন।

মুলাজোড়ের শিবমন্দির

দিন যায়-কাল কাটে, ব্রহ্মানন্দ পরম সন্তোষে, বিবিধ উপচারে দেবীর অর্চনা ও দর্শন লাভে কাল কাটান। হঠাৎ একদিন ব্রহ্মানন্দের আশ্রমে উপস্থিত হলে পরিব্রাজক সন্ন্যাসী আত্মারাম ব্রহ্মচারী। ইনিও শঙ্করাচার্যের দশনামী সম্প্রদায়ের একজন। আলাপ আলোচনার পরিশেষে ব্রহ্মচারী বললেন, আমি দেবী ভাগবত, লিঙ্গ পুরাণাদি পাঠে জেনেছিলাম, দক্ষ-যজ্ঞ সাহিত্য সতী-শব বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিতা হয়ে আসমুদ্র-হিমাচলে ৫১টি মহাপীঠ ও বহু উপপিঠ সৃষ্টি করেছে। এবং সাগর সঙ্গম নিকটে মরার পূজিত দেবীর দক্ষিণ পদাঙ্গুলি পতিত হয়ে মহাপীঠ কালীঘাট সৃষ্টি হয়েছে। ঐ মহাপীঠে দেবাদুর খুঁজে বিচলিত পদ্মযোনী ব্রহ্মা বহুকাল তপস্যা করে অভিলাষিত বরলাভে সফল হয়েছিলেন। ব্রহ্মচারী বলে চলেন প্রব্রজ্যা অনুসরণে এ মহাপীঠে উপস্থিত হয়ে সাধন ভজনে রত হলাম। এমন এক সাধন রাত্রি শেষে মহামায়া দশ বছরের কুমারী রূপে আবির্ভূতা হয়ে আমাকে আদেশ দিলেন আপনার কাছে আসতে। দেবী বললেন : আমি জনমানবহীন নীল গিরি পর্বতে কঠোর তাপসী ব্রহ্মানন্দ গিরির তপস্যায় আকৃষ্ট হয়ে বহুকালাবধি একশীলা স্তম্ভে আবদ্ধ হয়ে রয়েছি। তুমি সেখানে গিয়ে ব্রহ্মানন্দকে অনুরোধ করো, সেই শীলাস্তম্ভ সহ এখানে আসতে এবং তুমি যে আসনে বসে সাধন করছো সেই ব্রহ্মবেদীর উপর তার ঐ শীলা স্তম্ভ থেকে কালীমূর্তি নির্মাণ ও স্থাপন করে জনমনে আমার মাহাত্ম্য প্রচার করো। নিকটে ঐ হ্রদের নৈঋতকোণে আমার দক্ষিণ পদাঙ্গুলি চতুষ্পাদ পাষাণ রূপে নিমজ্জিত রয়েছে সেগুলি উদ্ধার করে বেদী মূলে প্রতিষ্ঠিত করো। ঈষাণ কোণের গভীর অরণ্যে পীঠ-ভৈরব নকুলেশ্বর লিঙ্গ রয়েছেন, তাকেও যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করো।

[ক্রমশঃ

রোদ যেন পলাতক চরিত্র। এই আলো, এই ছায়া। হিমালয়ের পায়ের কাছে এই ছোট্ট মফঃস্বল জায়গায় শেষ শীতের এক বিকেলে দাঁড়িয়ে আছে সমীর। ট্রেনটা লেট আছে এক ঘণ্টা। এই লাইনে গাড়ি প্রায়ই লেট থাকে এটুকু জেনেও সে আধ ঘণ্টা আগেই এসেছিল স্টেশনে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে যে আন্দাজটা হয়েছে অর্থহীন। কিন্তু তার বিরক্তিবোধ হয়নি এভাবে অপেক্ষা করতে। বরং ভালই লাগছিল এই শীতের আমেজটুকু উপভোগ করতে, এই রোদের হাসি-হাসি লুকোচুরি খেলা দেখতে। স্টেশনের উল্টোদিকে দুটো প্রকাণ্ড গাছে বেগুনী অর্কিড দুলছে। উত্তরে পাহাড়টার মাথায় জমছে মেঘগুলো। গাছপালা, চা বাগান, মেঘটির দিকে

চাইলে বোঝা যায় বসন্তের সূচনা। কিন্তু শীতের শেষ এখনও হয়নি। তাই বসন্ত এখানে উদ্দাম হয়ে ওঠেনি। তবে কলকাতায় নিশ্চয় এখন গরম পড়তে আরম্ভ করেছে। তাইতো লিখেছিল জয়ন্তী। যাক শীতটা বাচ্চাদের পক্ষে অনেক সময় ক্ষতিকর হয়ে পড়ে। হ্যাঁ জয়ন্তী লিখেছে বাচ্চাটা ভাল আছে।

ওয়েটিং রুমটার দরজা দিয়ে সমীর খালি চেয়ারটা দেখে এগিয়ে এসে বসল। সঙ্গে জিনিসপত্র বিশেষ নেই। একটা চামড়ার সুটকেশ আর হাত-ব্যাগ। ওয়েটিং রুমের কোণে আগেই রেখে গেছে কুলি। একটা সিগারেট বের করে দুবার ঠুকে সে দেশলাই জ্বেলে এক মুহূর্ত দেরী করল ধরাতে। এখানে এসে পর্যন্ত তৃতীয়। জয়ন্তী চলে···মনে হাসল সমীর। তারপর সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল। অর্থহীন। কেন মনে হয় না জয়ন্তীর ঐ নিষেধের। তবে জয়ন্তী রাগ করত প্রথম প্রথম, অভিমান করত, উল্টোদিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে থাকত। উল্টোদিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে থাকা এবং ডাকলে সাড়া না দেওয়া মেয়েদের অভিমানের মহৎ লক্ষণ। কিন্তু এরও ওষুধ আছে রোদের মতো। প্রতিজ্ঞা, স্বীকারোক্তি, এবং অনুনয় অথবা অপরাধ স্বীকার। তাছাড়াও অন্য প্রতীকার ব্যবস্থা আছে। জয়ন্তীর খুশিভরা আবেগের ছবি একবার মনে পড়ল।

পীর তিন মাস দে নেই এখানে। এই স্টেশনেই সে তুলে দিয়েছিল কলকাতার ট্রেণে। ট্রেনটা ছাড়বার পরও জয়ন্তীর হাত ধরে জানালার পাশে পাশে এগিয়ে গিয়েছিল। শেষ মুহূর্তে জয়ন্তী চোখে রুমাল দিয়েছিল। কল্পনা পড়েনি। তার আগের রাতেও জয়ন্তী কেঁদেছিল। তবে এর জন্যে সে দায়ী নয়। জয়ন্তীকে তো বিয়ের ক'দিন পরই বুঝিয়েছিল। বাচ্চা সে চায়, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি সে চায়নি। তবে জয়ন্তী বলেছিল, 'না' ওসব এখন না। পরে হবে।' প্রথমবার, এই প্রথম, একে সে চায়। সমীর সিগারেটের ধোঁয়া ছড়িয়ে দিয়ে হাসল,

জয়ন্তী আসলে আদিম নারীর মতো মাতৃত্বকে পেতে চেয়েছে তার সাধ্যমতো সময়ের সংক্ষিপ্ত পরিসরে। তবে হাঁ এই প্রথম বারের মতই আমি তার দাবী মেনে নিয়েছি। কিন্তু আর নয়। মূল্যহীন যুক্তি, অর্থ সংস্কার আমি ভালোবাসি না। আমি জয়ন্তীকে ভালোবাসি। তাকে নিবিড় করে পেতে চাই শীতে ও বসন্তে।

জয়ন্তীর এই দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে কেমন যেন অনাসক্তি বৈরাগ্য দেখা দিয়েছে। আগে তো এমন মনে হতো না। চাবাগানের চাকরির সারাদিন খাওয়া আসার ফাঁকে ফাঁকে জয়ন্তী যেন এই ঘোরের লুকোচুরি খেলা। চাবাগানের ডিউটি সত্যি অদ্ভুত। ভোরবেলা অফিসে ছোটা, নটায় একবার বাড়ি আসা, আবার গিয়ে বারোটায় ফেরা। তোর তিনটের গিয়ে পাঁচটায় ফেরা। জয়ন্তী খুশি ছিল, তার কারণ দুপুর-বেলা একসঙ্গে খাওয়া হতো। আর মেয়েরা খাওয়াতে ভালবাসে, অন্তত জয়ন্তীর মতো সাধারণ মেয়েরা। সমীর ভেবে দেখেছে সত্যিই জয়ন্তী একটি সাধারণ মেয়ে। আর তাই তাকে বেশী ভালোলাগে। জয়ন্তীকে প্রথম দেখে কিন্তু এমন মনে হয়নি। কে জানত মেয়েটা এত চঞ্চল, এত ছেলেমানুষ, এত……। আবার হাসল সমীর। কলকাতায় মাসিমার বাড়ির নিচেতলার ভাড়াটে জয়ন্তীরা। দেবার কলকাতায় গিয়ে মাসিমার ওখানে উঠতে যাওয়ার সময়ই মাসিমা বলেছিলেন, 'ওরে এবার বিয়ে কর। একা থাকিস, কে দেখবে তোকে? সমীর হেসে উত্তর দিয়েছিল, আমি কি ছেলেমানুষ যে আমাকে দেখাশোনা করতে হবে?' মাসিমা বলেছিলেন, 'হাঁ বাপু, ছেলেমানুষ নও বলেই তো বলছি। নিচেতলার জয়ন্তীকে একটু দেখিস। মন্দ নয় মেয়েটি।'

জয়ন্তীকে সমীর দেখেছিল বিকেলে। পরের দিন মাসিমাই ডেকে আলাপ করিয়ে দিলেন। তৃতীয়দিন দুপুরে মাসিমাকে ব্যস্ত দেখে জয়ন্তী ফিরে যাচ্ছিল সমীরই ডেকে এনে বসিয়েছিল তার ঘরে। দুপুর বেলা বাড়ীটা স্বভাবতই নির্জন থাকে। তাছাড়া সে ভীরু নয় এবং এক্ষেত্রে তার অধিকারও ছিল। তাই জয়ন্তীর হাত ধরতে সে একটুও দ্বিধা করেনি। কিন্তু জয়ন্তীর ছেলেমানুষী তাকে অবাক করেছিল। এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে জয়ন্তী পালিয়েছিল। বিয়ের কথাবার্তা ঠিক হবে যাবার পর সমীর যেদিন চলে আসে কলকাতা ছেড়ে তার আগের দিন দুপুরে অবশ্য জয়ন্তী নিজেই এসেছিল। সেদিন তার দ্বিধা ছিল না। আসলে মেয়েটা নির্ভরতা চায়, ঘামখেয়ালিপনা। ভালোবাসে না, সুতরাং একে বিশ্বাস করা গেলেও যেতে পারে। সেদিন সে নিরাশ হয়নি।

মাসিমা ভুল বলেননি। তার বিয়ে করা দরকার ছিল। চাবাগানের নির্জন একাকিত্ব তার ভালো লাগছিল না। জয়ন্তী তার ভালোবাসা, কথা, হাসি চলাফেরা, দারিদ্র্য, স্পর্শ—সব কিছু দিয়ে কয়েকমাস তাকে পরিপূর্ণ করেছিল। আমি চাই দুরন্ত চঞ্চল কিন্তু বাধ্য নারী—জয়ন্তী ছিল তাই।

ঘন্টার ঢং ঢং শব্দ শুনে সমীর কুলীর খোঁজে এদিক ওদিক চাইল। এই মুহূর্তে ভালোলাগার চৈতন্যে সে যেন পরিপূর্ণ। কলকাতার দিনগুলো এবার সুন্দর করে কাটাবে। আর জয়ন্তী, তার ভালো-বাসার ঘরে উত্তপ্ত একটি নারী ও শিশু। একটি পরিতৃপ্ত সুখ। কোমল আনন্দের ছোঁয়ায় সে যেন দাঁড়িয়ে। তার হাত পা শিরশির করে উঠল। কত দিন তার আদর, ভালোবাসা, উত্তপ্ত কোমল উষ্ণতা সে পায়নি। নিবিড় করে জড়িয়ে ধরবে। তিনমাসের দীর্ঘ বিচ্ছেদ আবার সমীরের মনে পড়ল। আবার তখনি মনে হলো জয়ন্তী ঠিক আগের মতো আছে তো? বদলে যায়নি তো? তার বন্ধু শম্ভু বলে বাচ্চা হলো ভালবাসার শত্রু। না, সে ভাবে না। তবে জয়ন্তী নিশ্চয় বদলাবে না। তবে এখন ও মা হয়েছে, কত কাজ তার, কত দায়িত্ব। সে যদি আমার উপস্থিতি আমার অস্তিত্ব ঠিক আগের মতো বড় করে না দেখে তাহলে কি আমি দোষ দিতে পারি? অন্ধকার মেঘের ছায়া পড়ল স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা সমীরের মুখের ওপর। না, পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে মানিয়ে না নিতে পারলে তুমি সুখী হবে না। নিজের পরিচিত মতবাদটি মনে করল সমীর। আমি পিতা হিসেবে নিজেকে গৌরবান্বিত ভাবতে পারি না কি?

দ্বিতীয় ঘণ্টার শব্দ শুনে সে ব্যস্ত হলো। ট্রেণ আসছে জিনিসপত্র নিয়ে কুলি তৈরী। ট্রেনে বেশ ভিড় থাকে সে জানত। ভিড় থাকাটাই এলাইনের স্বাভাবিক নিয়ম। তাই মোটামুটি একটা ভালো জায়গা ট্রেন থামতেই দেখে নিতে হবে। ট্রেনটার ইঞ্জিন দেখা যাচ্ছে।

ট্রেনটা তখনও থামেনি একেবারে। একটা চুড়ি পরা ফর্সা। নিটোল হাত, নীল শাড়ী তার পাশ দিয়ে যেন বিলিক দিয়ে গেল। সমীর চোখ ফেরাল। হাতখানি তাকে উপলক্ষ্য করেই এটুকু বুঝতে তার দেরি হয়নি।

'ওমা আপনি! উঠে পড়ুন, উঠে পড়ুন। থাক, ভালোই হল। মজা করে গল্প করা যাবে।' উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল রত্না।

'আশ্চর্য! আপনার সঙ্গে দেখা হবে স্বপ্নেও ভাবিনি। কোত্থেকে আসছেন?'

'কুচবিহার। আপনি?'

'আমি এখান থেকেই। কলকাতা যাচ্ছি ছুটিতে।'

রত্না হোল্ডল খুলে পা ছড়িয়ে বসেছিল। পা গুটিয়ে নিয়ে বলল, 'বসুন, কে বলবে দেকেণ্ড ক্লাস! যা হয়েছে'—সমীর বসল রত্নার বিছানার এক পাশে।

'ভাগ্যিস, আপনি ছিলেন, তাই এমন ভালো জায়গাটা পেলাম।'

'সবই কপাল। থাক কতদিন পর দেখা হল বলুনতো! সেই কলেজ ছাড়ার পর একবার কলকাতায় দেখা হয়েছিল। তার পর এই। আপনি কিন্তু আগের চেয়ে অনেক ফর্সা হয়ে গেছেন। একটু মোটাও হয়েছেন। আমাকে কিরকম দেখছেন?'

ট্রেনটা ছেড়েছে। চাবাগানের পাশ দিয়ে ছুটেছে ট্রেন।

রত্না দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে বসল। সমীর মৃদু হেসে রত্নার দিকে চাইল। রত্নার মাথার কয়েকটা অবাধ্য চুল বাতাসে উড়ছে। একটু রুক্ষ লালচে আভা ঈষৎ ক্লান্তি কিংবা আলতো সুর্মার টানে চোখ দুটি ভারি। কলেজে পড়ার সময় রত্না রোগা ছিল একটু। এখন গালে স্বাস্থ্যের আভা। গলার কোমলতায়, বাহুর নিটোল ভঙ্গিতে পরিপূর্ণতা। সাদা সিঁথির শেষে সুক্ষ রেখা।

'বলব?' মৃদু স্বরে সমীর বলল ট্রেণের শব্দের সঙ্গে গলার স্বর মিশিয়ে দিয়ে, পাছে অন্য যাত্রীদের কানে যায়।

'বলুন না?'

'আগের চেয়ে সুন্দর।' আরও মৃদু স্বরে কিন্তু সহজ ভাবে বলল সমীর।

রত্না হেসে উঠল সশব্দে। 'আর আপনি আগের চেয়ে অনেক বেশি সাহসী হয়েছেন। বিয়ে করেছেন বুঝি?'

'যা তো!'

'ও!' রত্না জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চাইল।

শীতের ছোট্ট বিকেল কখন বিলিয়ে গিয়েছে। ঝোপে ঝাড়ে গাঢ় অন্ধকার, এক টানা শোঁ শোঁ আওয়াজ গাড়ির দোলা। সমীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে গাড়ির অন্যান্য যাত্রীদের পর্যবেক্ষণ করতে করতে ভাবল, আমি মিথ্যে বললাম কেন? রত্নাকে মিথ্যে বলে কি লাভ হল? ওর কপালেও তো সিঁদুর। তবে আমি কি নিজেকে বিবাহিত বলতে লজ্জা পেয়েছি? আমি সত্যিই ভাবিনি এমন ভাবে দেখা হবে রত্নার সঙ্গে। এই দীর্ঘ ট্রেনযাত্রার ক্লান্তি আমি কেমন করে কাটাব ভাবছিলাম। এখন আমার ভালো লাগছে। রত্নার শরীরের মৃদু সুবাস, তার শরীরের ছোঁয়া, শাড়ির খস খস শব্দ, ভালো লাগছে। মিথ্যে বলে কি লাভ হল? একেবারেই হল না কি? বিবাহিত বললে রত্না এত ঘনিষ্ঠ হতো কি? কিন্তু রত্নার তো বিয়ে হয়েছে। বিবাহিত বলেও তো আরও দুঃসাহস।

'কি ভাবছেন?' সমীর বলল, 'তার কথা নিশ্চয়।'

'কার?' রত্না একটু সরে এল।

'যার জন্যে কপালে সিঁদুর তার।'

'ও। না, ওতো আত্মরক্ষা।'

'তার মানে?' সমীর বিস্মিত হলো।

রত্না মাথা নিচু করে শাড়ির আঁচল জড়াল আঙুলে।

'কর্তব্য হিসেবে বাবা বিয়ে দিয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু সকলের সঙ্গে তো সকলের বনে না।' এবার মুখ তুলে রত্না হেসে বলল, 'কাজেই ও সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছি অনেক দিন। সিঁদুরটা ছাড়িনি এখনও। পথে ঘাটে

একা যাতায়াতের আত্মরক্ষার।' রত্না আবার মাথা নিচু করল।

সমীর তার দিকে চাইল। আশ্চর্য! এমনটি সে ভাবতেও পারেনি। ছি ছি, কি দরকার ছিল জিজ্ঞেস করার? অনর্থক একটা বেদনা একটা আঘাতকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। মানুষকে বাইরে থেকে দেখলে চেনা যায় না। রত্নাকে তো নয়ই। কলেজে থাকতেও নানা ব্যাপারে রত্নার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। রত্নাকে ঠিক সাধারণ মেয়ে বলা চলে না। জলস্রোতের মতো নয়। জলের মতো যে পাত্রে রাখা যায় তার আকার ধারণ করে, এই হলো মেয়েদের উপমা। কিন্তু রত্না সম্পর্কে বোধহয় একথা ঠিক খাটে না। তবু রত্নাকে তার ভালো লাগত। ভালোলাগত তার সহজ, সুন্দর মেলামেশার জন্য। সে স্বভাবটি এখনও রত্নার আছে। রত্না স্বাধীনা, অপদার্থ স্বামীকে সে ত্যাগ করেছে।

'কি হলো, কথা বলছেন না যে!' রত্না বলল।

'ভাবছি, আপনার কথা।'

'আমার কথা? কি সৌভাগ্য!'

'হঠাৎ কুচবিহার গিয়েছিলেন যে!' সমীর জানতে চাইল।

'কুচবিহার? ওখানেই চাকরি করতাম একটা স্কুলে। ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছি। কলকাতায় একটা চাকরি পেয়েছি। আপনি কোথায় কাজ করছেন।

'আমি? চা বাগানে।'

'আমার খুব ভালো লাগে। কি সুন্দর পাহাড় নিচু পরিবেশ।

একটা স্টেশনে ট্রেনটা দাঁড়িয়েছে।

'দেখুন না, একটু চা পাওয়া যায় কিনা।' অনুরোধ করল।

সমীর অনেক খুঁজে একটা চাওয়ালাকে ডাকল। কিন্তু চায়ের চেহারা দেখে সে হতাশ হল।

রত্নাকে বলল, 'উপায় কি? এই চাই যান। আর তো নেই।'

অনেকগুলো স্টেশনে বসে সময়ও পেরিয়ে গেছে অনেক। গাড়ির দোলায় তন্দ্রার আবেশ। ওদিকের বেঞ্চের হিন্দুস্থানী মেয়েটা, তার দুটো বাচ্চা আর স্বামী কাত হয়ে পড়েছে। জানালার পাশে বৃদ্ধ ভদ্রলোক ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। বাঙ্কের ওপর যুবকটি ঘুমিয়েছে ঘণ্টা দুই আগে। ভিড় আজ কিছুটা কম। রত্নার সঙ্গে গল্প করতে করতে, কখন জীবনের স্মৃতি, নানা জনের কথা আলোচনা করতে করতে এক সময় তন্দ্রা এল। রত্নাই জোর করে ওকে জানালার ধারে সরিয়ে দিয়েছে।

'ও দিকে বসুন, তবু ঠেস দিয়ে ঘুমতে পারবেন।'

'না, আপনাকে শুতে হবে।'

'ইস দাবী দেখছি।' রত্না হেসেছে, 'কিন্তু আমাকে বোকা ভাববেন না। শোবো ঠিকই। নাতো কি আপনার জন্যে জেগে বসে থাকব?'

বেঞ্চের শেষ প্রান্তে জানালার ধারে বসল সমীর। রত্না বাকিটুকুতে শুয়ে পড়ল। কিন্তু তাও হলো না, একেবারে গুটিয়ে কুঁকড়ে শুতে হলো ওকে। বেশ শীত করছে। তবু এভাবে শোয়া যায় না বেশিক্ষণ।'

'এদিকে আসুন না একটু।' সমীর মৃদুস্বরে বলল।

'অসুবিধে হবে না তো?'

'না না, আমার দিকে মাথাটা সরিয়ে আনুন।'

রত্না সরে এল। মাথা খানিকটা ভার পড়ল সমীরের কোলে।

সমীর বলল, 'আমার কিছুমাত্র অসুবিধে হবে না। আপনি বরং ভালো করে কম্বলটা চাপা দিন। ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে।'

'শুধু আমি নয়, আপনিও।'

শীতের মধ্যে রত্নার শরীরের ছোঁয়া একটা উষ্ণতার আমেজ। এই শীতের রাত, গাড়ির চলন্ত গতিবেগ, ঘুমন্ত যাত্রীদল। পাশে শুয়ে থাকা নীরব কোমল উষ্ণতা, গাড়ির শব্দের সঙ্গে মিলে মিশে গিয়েছে অন্য সবকিছু, সমস্ত পৃথিবী।

'শুনছেন?' কোমল আবেদনের সুরে ডাকল রত্না। জন্তুরা ঠিক এমন ভাবে গভীর অন্ধকার রাতে ডাকে, যখন সময়ের হাতে মানুষ অসহায়, যখন নিয়তির কাছে সে বন্ধ পশুর মতো।

'কিছু বলছেন?'

'হ্যাঁ, ঘুম আসছে না। মাথা ধরেছে। ফ্লাস্ক থেকে একটু জল দেবেন?'

সমীর উঠে ফ্লাকস থেকে জল ঢালল গ্লাসে।

জলটুকু খেয়ে রত্না বলল, 'আপনাকে কষ্ট দিলাম। ভাগ্যিস আপনি ছিলেন!'

'না না, কিছুই করিনি আমি।' সমীর চোখ দিল জানালার দিকে। ভালোলাগার মুহূর্তগুলো ক্ষণস্থায়ী উল্কা। ইঞ্জিন থেকে এক-রাশ জলন্ত অগ্নিকণা মাঝে ছুটে যাচ্ছে শূন্যে বাতাসের মধ্যে ক্ষণস্থায়ী অস্তিত্ব। অস্তিত্বকে বহন করে বেঁচে আছি আমরা এই চৈতন্যের আলোয়েরা দীপে।

'আপনি ঘুমোবেন না?' রত্না জিজ্ঞেস করল।

'না, ট্রেনে আমার ঘুম আসে না। মাথাধরাটা কমল?

'আমারও ঘুম হয় না! মাথাটা ছাড়েনি।'

সমীর এক মুহূর্ত দ্বিধা করেই রত্নার কপালে হাত রাখল।

'দেখুন, আমি ঠিক করে দিচ্ছি।'

কপালের ওপর আঙুল দিয়ে টিপতে টিপতে সমীর দেখল রত্না চোখ বন্ধ করল। হয়ত একটু আরাম পেয়েছে। জয়ন্তীকেও ও মাথা টিপে দিয়েছে এমন ভাবে। আদর করলে মেয়েরা ঠিক এমনি কিমিয়ে থাকে, আদর পাওয়া বেড়ালের মতো। কিংবা হয়ত আদরের স্বভাবেই এই।

'থাক আর লাগবে না।'

সমীর থেমেছে, কিন্তু হাত সরিয়ে নেয়নি অনেকক্ষণ। তারপর রত্নার কানের পাশের চুলগুলো ধরে আলতো করে টেনে পিছন দিকে সরিয়ে দিয়েছে। কম্বলটা বুকের ওপর আর একটু টেনে দিয়েছে। রত্না ডান হাতটা ঠিক ওর কোলের ওপর ছড়িয়ে দিয়েছে। তারপর এক সময় সমীরের হাতটা ধরেছে। 'আপনি অনেক করলেন আমার জন্য।'

'না, কিছু না।' সমীর বলেছে।

'এবার বিয়ে করবেন না?' রত্না জিজ্ঞেস করল হাতের ওপর চাপ দিয়ে।

'ভাবিনি এখনও। কাকে করব?' সমীর হাওয়ার স্বরে যেন কথা বলল।

'যাকে ভালো লাগে। মনের মতো মেয়ে।'

সমীর উত্তর দিল না। একটা সিগারেট ধরাল।

'সিগারেটের গন্ধটা আমার ভালো লাগে। কিন্তু এত সিগারেট খাবেন না। বেশি কোন কিছুরই ভালো নয়।'

ঘুমের আবেশ। ট্রেণের শব্দের সেতারগতিক এক ঘেয়েমিতে স্নায়ুগুলো অবশ হয়ে আসছে। কাঁচের জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে শুধু নিছক অন্ধকারের চলমান পর্দা। আর মাঝে মাঝে ইঞ্জিন থেকে উঠে আসা আগুনের ফুলকি। এই মিথ্যে খেলাটা কি সুন্দর জমে উঠেছে কাল সকালেই এটা ভেঙে যাবে। কাল সকালে না হোক বিকেলে ভাঙবে। রত্নাকে দোষ দেওয়া যায় না, আমি নিজেই দোষী নই। এ শুধু ঘটনা চক্র এবং সময়ের খেলা। পরিবেশ এবং পরিস্থিতিকে মানিয়ে না নিতে পারলে তুমি সুখী হবে না। আমি কি এখন সুখী? ভালোলাগার সংক্ষিপ্ত মুহূর্তগুলো কী উজ্জ্বল! মুহূর্তের উধাও ছবি। রত্না আজ রাতে আমার পাশে শুয়ে আছে। কাল থাকবে না। আর কোনদিন না। আমার শরীরে তার উষ্ণতার আবেশ মিলিয়ে যাবে। সুন্দর শুধু টানা চোখ, রক্তাভ ঠোঁট, বুকের ওঠানামা, ক্ষণস্থায়ী রাত্রির নাটক। রত্না জয়ন্তীর চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর নয় কি? এই রাত্রির বেশিদূর এগোবার সাহস আমার নেই, আমার সীমারেখা জয়ন্তী। আমি এগোতেও পারি, সন্তর্পণে, খোয়ানো ঝিঁঝির বাঁকে বাঁকে সতর্কতার ঘেরাটোপ পেরিয়ে। সমীর সন্তর্পণে ওর হাত রেখেছে রত্নার গায়ের ওপর। রত্না হাতটা ধরে ঘুমিয়ে পড়েছে এক সময়।

ভোরবেলার রোদ গঙ্গার জলের ওপর পড়ে চিক চিক করছিল। মনিহারী ঘাট সকরিগলিঘাট স্টীমার ফেরীর ডকের রেলিংএর পাশে ওরা দাঁড়িয়েছিল পাশাপাশি। স্টীমারের লোকজন ওদের নিশ্চয় স্বামী স্ত্রী ছাড়া অন্য কিছু ভেবে ভুল করেনি। এই নিয়ে ওরা নিজেদের মধ্যে হাসিঠাট্টা করেছে। রত্নার চোখ দুটো একটু ফোলা চোখের কোলে কালিমা। সমীরের ডান চোখটা একটু লাল হয়েছে এখবরটা জানিয়েছে রত্না। রত্নার হাসি যেন পাহাড়ী ঝর্ণার হঠাৎ উচ্ছ্বাস! ওপারে এসে বড় ট্রেণে উঠল ওরা। গোটা দুই মাসিক পত্রিকা কিনেছিল রত্না। রামপুরহাটে ওরা ভাত খাবে, প্যাসেঞ্জার গাইডকে বলে দেওয়া হয়েছিল।

'আর আপনার ঠিকানা?'

সমীর তার চাষাপাড়ের ঠিকানাটা বলে বলল, 'কলকাতায় তো আমি ক'দিন থাকব মোটে। ওখানেই চিঠি দেবেন।'

বেশী কথা বলতে ভাল লাগছিল না। রাতটা দিনের উল্টো পিঠ, মনেরও কি তাই?

'সুন্দর কাটল দীর্ঘ পথটা। ভাগ্যিস আপনি ছিলেন তাই বিরক্তি আসেনি মনে।' তার চোখকে আড়াল করে।

'আমি ঠিক একই কথা বলতে পারি।'

'আমাদের ওখানে একদিন যাবেন নিশ্চয়।'

'নিশ্চয় যেতে চেষ্টা করব।' সমীর বলল।

শিয়ালদা স্টেশনে গাড়ী থামতেই উঠে দাঁড়াল সমীর। রত্নার জিনিষপত্রও আগে গোছানো ছিল। স্টেশনে ওকে নিতে লোক আসবে। প্রয়োজন বোধে সমীরও পৌঁছে দিয়ে আসতে পারে। রত্না প্লাটফর্মের ওপর গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সমীরই জিনিষপত্রগুলো কুলি দিয়ে নামাচ্ছে।

'ওই যে! এসে গেছে!' হাত তুলে হুমড়ি খাচ্ছে রত্না। তারপর সমীরের দিকে ফিরে বলল, 'কাল একটা মিথ্যে কথা বলেছিলাম।' এই বলে কপালে সিঁদুরের ইঙ্গিত করল।

সমীর ঠিক বুঝতে পারল না। বুঝল একটু পরেই।

নিখুঁত সাহেবী পোষাকপরা ভদ্রলোককে দেখিয়ে রত্না বলল, 'ইনি আমার স্বামী, এই, নামটা বলো না?'

ভদ্রলোক লজ্জিত হয়ে হেসে বললেন, 'সলিল বসু।'

'আর ইনি সমীর রায়। আমাদের কলেজে পড়তেন আমার চেয়ে এক ইয়ার ওপরে। হঠাৎ ওঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল গাড়িতে। ট্রেনে একেবারে নিজের স্ত্রীর মতো যত্ন করে নিয়ে এসেছেন। তুমি এক কাজ করো এগিয়ে গিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরো। আমরা আস্তে আস্তে যাচ্ছি।'

ভদ্রলোক যে রত্নার যথেষ্ট বাধ্য তাতে সমীরের সন্দেহ রইল না। কারণ রত্না বলামাত্র ভদ্রলোক এগিয়ে গেলেন।

রত্না এবার হেসে সমীরের দিকে চাইল।

'মিথ্যে বলেছিলাম বলে রাগ করলেন নাকি?'

'না।' সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল সমীর।

'সুন্দর লেগেছে ট্রেন জার্নিটা।' প্লাটফর্মের বাইরে এসে দাঁড়াল রত্না, পাশে সমীর। একটু গম্ভীর হলো রত্না। অন্যদিকে মুখ ফেরাল। তারপর বলল, শুধু একদিনের জন্যে আমরা অনেক মনের কাছাকাছি পৌঁছেছিলাম আবার দূরে সরে যাব। এই নিয়ম তাই না? বলুন আপনার ভাল লাগেনি কলিকের দিনটা?'

'হ্যাঁ, ভালোই লেগেছে। তবে নিছক ভালো-লাগার কিইবা দাম?'

'সমীরবাবু, আমরা কেউই ঠকিনি, আমরা দুজনে দুজনকে ঠকাতে চেয়েছি, কিন্তু দুজনেই বুঝেছি। জয়ন্তী আপনার কে? স্ত্রী নিশ্চয়। অত ঘটা করে নাম লেখা আংটি পরে মিথ্যে কথা বললে কি বিশ্বাস হয়? খিল খিল শব্দে হেসে উঠল রত্না। কিন্তু তার হাসি সমীরের কাছে তখন বিস্বাদ এবং বিরক্তিকর মনে হলো। বিকেলের শেষ আলোটুকুতে আর এখন রত্নাকে ততখানি সুন্দর মনে হলো না। বরং মনে হলো কৃত্রিম। আমারই মতো।

একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। রত্নার স্বামী ভেতরে বসে। রত্না উঠে বসল। ওরা দুজনে নমস্কার করল। রত্না ওর স্বামীর গায়ের কাছে সরে বসল। ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিল। সমীর তখনও দাঁড়িয়েছিল।

শেষ শীতের বিকেলে কলকাতা তার কাছে বিরক্তিকর গরম, ধুলিধূসর, নোংরা বিশৃঙ্খল বলে মনে হলো। দীর্ঘ ট্রেন জার্নি করে আসা যাত্রীদের কালি পড়া ফ্যাকাসে মুখ, রুক্ষ চুল, নোংরা কলার গুঁড়ো লাগা পোশাক, প্রাণহীন যৌবনহীন আবেগহীন মুখ। আমি তো তাদের দর্পণেই নিজের মুখ দেখছি। দীর্ঘ রেল ভ্রমণের সমস্ত ক্লান্তি, গ্লানি, নৈরাশ্য ঠিক এই মুহূর্তে তাকে একযোগে আক্রমণ করল।।

জর্জ ওয়াশিংটন কারভার

সুশীল সান্যাল

অজস্র রং-বেরঙের ফুলে সমস্ত জায়গাটা ছেয়ে গেছে। সবগুলি পাহাড়ী ফুল। চারপাশের গাছগুলো খুব উঁচু উঁচু, তার মাঝে খানিকটা পরিষ্কার জায়গা। ছোট্ট দোচালা একটা স্কুল রয়েছে এক-পাশে। সুন্দর করে সাজানো কয়েকটা ফুলের টব রয়েছে এদিকে ওদিকে। স্কুল সবেমাত্র সুরু হয়েছে ক্লাশ চলছে। ছাত্র, শিক্ষকের গলার স্বর বাতাসে ভেসে আসছে। দূরে বারান্দার কোল ঘেঁসে একটা ছোট্ট ছেলে বসে। সে বাইরে বসে সব শুনছে। তারি ইচ্ছে ওদের মত সেও লেখাপড়া শেখে। আর আবছা আবছা চোখে ভবিষ্যতের পানে তাকায়। জানে বড় হলে কত বই সে পড়বে। চারপাশের ফুলগুলোকে সে খুব ভালবাসে। আস্তে আস্তে হাত বুলোয় নরম পাপড়িতে। ভাবে এমন সুন্দর পাপড়ি কে তৈরী করেছে; এমন গন্ধ আর রঙ কেমন করে হল। ছোট্ট প্রাণে অনেক কথাই মনে হয় তার। উত্তর পায় না। এমনিভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে পড়ে সে। আবার শিক্ষকের গলার স্বর বাতাসে ভেসে আসে। মনটা বেশ চঞ্চল হয়ে ওঠে। কাউকে বলার উপায় নাই যে সে লেখাপড়া শিখতে চায়। গুমরে গুমরে কাঁদে। সে যে কালো; তার ওপর বাবা মা দুজনেই ক্রীতদাস জন্মসূত্রে সে বোধহয় এ বিষয়ে কিছুই জানবার অধিকারী নয়। বড় হলে তাকেও ক্রীতদাস হতে হবে। এছাড়া আর অন্য কোন পথ নেই তার। এ স্কুল হল শ্বেত-কায়দের। তাদের গায়ের চামড়া সাদা। তার চামড়া কালো। তাই তারা সবকিছু পাবে এ পৃথিবীতে। আর

সে—সব কিছু থেকে বঞ্চিত হবে, সব কিছু থেকে দূরে থাকবে। এমন কি বিশাল বিচিত্র জগত থেকেও। দুচোখ বেয়ে অঝোরে জল নামে তার।

১৮৬০ থেকে ১৯২১। দুদীর্ঘ ৬০ বছরের ব্যবধান। ইতিমধ্যে চারিদিকের কত কিছু পরিবর্তন হয়ে গেছে। সেদিনকার সেই শিশু ক্রমে যুবক থেকে বার্ধক্যের সীমায় এসে পৌঁচেছে। আমেরিকার কংগ্রেসের তরফ থেকে রাজধানীতে তার ডাক পড়েছে। বহু জ্ঞানী গুণী মানুষের সামনে আজ তাঁকে তাঁর গবেষণার পরিচয় দিতে হবে। অসীম আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ওয়াশিংটন স্টেশনে এসে নামলেন। মাঝে মাঝে সংশয় আসছে মনে। সব কিছু ঠিকমতো প্রমাণ করতে পারবেন তো। সমস্ত জীবন ধরে রসায়ন ও উদ্ভিদের সাধনা নিষ্ফল প্রমাণিত হবে না তো। আবার পর-মুহূর্তেই সাফল্য সম্পর্কে সুনিশ্চিত হন। সভাকক্ষের দরজায় যখন এসে পৌঁছলেন বেলা তখন গড়িয়ে গেছে। চারটের মধ্যে সভা শেষ হয়ে যাবে। পেছনের দিকে একপাশে বসলেন তাঁর যন্ত্রপাতি নিয়ে। অন্যান্য বক্তারা তাঁদের মৌলিক গবেষণা সম্পর্কে আলোচনা করছেন। শ্রোতারা সবাই অধীর হয়ে উঠেছেন। অবশেষে তাঁর ডাক পড়লো। মাত্র পনের মিনিটের মধ্যে সব কিছু দেখাতে হবে। এতক্ষণ পর্যন্ত শ্রোতারা গুরুগম্ভীরে বক্তৃতা শুনে এসেছেন। ধীরে ধীরে পরীক্ষাগুলো দেখিয়ে যেতে লাগলেন বিজ্ঞানী। শ্রোতারা নিবিষ্ট মনে দেখেছেন উদ্ভিদবিদের অদ্ভুত আবিষ্কার। দুহাতে আইন প্রচলিতাদের বন্ধ করে রাখলেন তিনি এবং দেখিয়ে দিলেন চীনাবাদাম থেকে খাদ্য, রঙ, কাগজ, দুধ এবং আরো কত জিনিস তৈরী করা সম্ভব। সদ্যো-জাত চীনাবাদাম শিল্পের মূল্য নির্ধারিত হল। ব্যবসায়ীরা যথেষ্ট উৎসাহ পেল এ ব্যবসায়ে। বহু মানুষের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা হল। সমস্ত সভাকে স্তব্ধ করে গেলেন বিজ্ঞানী জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার।

বিজ্ঞানী কার্ভারের পরিচয় এতেই সীমাবদ্ধ নয়। বর্তমান কালের কৃষি-বিজ্ঞানের তিনি ছিলেন প্রথম চিন্তানায়ক। কার্ভার যে যুগে জন্মেছিলেন, সে যুগে বিজ্ঞানের বিশেষ উন্নতি হয়নি। বিজ্ঞান চর্চা সুরু হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান তখনও আবিষ্কারের অপেক্ষায়। কৃষি-বিজ্ঞান গবেষণা তখন হয় না বলেই চলে। কি ভাবে জমির উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করা যায়, কিভাবে অধিক ফলন সম্ভব হয়, কোন পথ অবলম্বন করলে উন্নত জাতের চাষ সম্ভব হয় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কোন মানুষই তখন ভাবে না। এ অচলাবস্থার পরি-বর্তন চলে। একই জমিতে একই ফসল বার বার চাষ করার ফলে, ফলন দিন দিন কমে আসছে; জমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে; দেশের অর্থনৈতিক অবস্থায় বেশ একটা বিপর্যয় দেখা দিতে সুরু করেছে। গাছপালার নানা-রকম রোগ হচ্ছে। চাষীরা নিরুপায়। অদৃষ্টের উপর নির্ভরশীল ভাগ্যের ফলা অপেক্ষা করছে।

এসব কথা সর্বপ্রথম ভাবেন কার্ভার। ১৮৬০-৬১ সালে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের মূল কারণ তুলা চাষের সঙ্গে জড়িত। প্রত্যক্ষ কারণ ছিল অবশ্য ক্রীতদাস-প্রথার স্থায়িত্ব অথবা বিলোপ সাধন। দক্ষিণ আমে-রিকার কার্পাস সে সময়ে জগতপ্রসিদ্ধ ছিল। সস্তায় মজুর পাওয়ার জন্য ক্রীতদাসপ্রথার স্বপক্ষে বহু যুক্তি দেখানো হয়। আপাতদৃষ্টিতে তুলাচাষকে কেন্দ্র করে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আমেরিকায় তুমুল বিবাদবিসম্বাদের সৃষ্টি হয়। আর তারই ফল কুখ্যাত গৃহযুদ্ধ।

কার্ভার তাঁর গবেষণাকার্য সুরু করেন তুলো-চাষকে কেন্দ্র করে। ১৮৯৬ সালে তিনি দক্ষিণ আমেরিকায় যান গুরুত্বপূর্ণ কর্মভার নিয়ে। টাস্কেগী প্রতিষ্ঠানের কৃষি বিভাগের দায়িত্বপূর্ণ পদে তাঁকে নিযুক্ত করা হয়েছে। দেশময় খাদ্যসঙ্কটের কথা তাঁর কানে এসে পৌঁছতে থাকে। কার্ভারের আজীবন সাধনা ছিল কিভাবে পুঁথির বিদ্যাকে ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগানো যায়। বিভিন্ন জায়গা থেকে মাটি আনিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন। নিরন্তর গবেষণা চলতে থাকে রাতের প্রহরে প্রহরে। চাষীদের বোঝালেন যে, অবিরাম তুলোচাষের ফলে জমির প্রাণশক্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। রাঙাআলু, সোয়াবিন, চীনাবাদাম লাগাতে বললেন চাষীদের। এসব চাষের ফলে মাটির নাইট্রো-জেনের ভাগ বৃদ্ধি পাবে। চাষীরা তাঁর কথা প্রথম

মানতে রাজী হয়নি। পরে, তিনি যখন চাষ করে প্রমাণ করলেন তখনই তারা বিশ্বাস করল তাঁর কথা।

কৃষি বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য তিনি কতকগুলো নতুন পথ বেছেনিলেন। নিয়মিতভাবে পত্রিকা প্রকাশ করতে লাগলেন; পত্রিকাগুলিতে তিনি কৃষিবিদকে বিভিন্ন সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত সমাধানের প্রয়াস পেয়ে ছিলেন। সেই সব প্রবন্ধে কোন জমির কি ধরনের সার প্রয়োগ করতে হবে, বারে বারে কোন ফসল বুনতে হবে ইত্যাদি বিশদভাবে সহজ করে বলেন। কাপাসে জাতীয় রোগের কিরকম চিকিৎসা হবে সে কথাও তিনি চাষীদের কাছে বেশ সহজ করে মনোজ্ঞভাষায় লিখলেন। দেশ বিদেশ থেকে মাটির নমুনা আসতে লাগল তাঁর কাছে। অত্যন্ত উৎসাহ ও আনন্দের সঙ্গে তিনি যে সব মাটি পরীক্ষা করে যথাযথ উত্তর পাঠিয়ে দেন। কিছু উৎসাহী কর্মী নিয়ে কৃষি প্রচারের জন্য তিনি এক ভ্রাম্যমাণ কৃষিবিদ্যালয় স্থাপন করলেন। তাদের কাজ ছিল দূরের গ্রাম গ্রামান্তর ঘুরে কৃষির বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা। মিঃ ক্যাম্বেল এই ভ্রাম্যমাণ কৃষিসংস্থার মূল তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। কার্ভারের এই প্রচেষ্টা পরবর্তীকালে সার্থক হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র সরকার এই কাজের পুরস্কারস্বরূপ তাঁকে আরও দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দিলেন। আমেরিকার সমস্ত সংবাদপত্রে তাঁর সাফল্যের কথা প্রচারিত হতে লাগল। সমগ্র বিশ্ববাসী জানল যে একজন অবহেলিত, নিপীড়িত ও অনাদৃত ক্রীতদাসের পক্ষে বিজ্ঞান-জগতে কি আমূল পরিবর্তন আনা সম্ভব। ভারতবর্ষে তখন অসহযোগ আন্দোলন চলছে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে শত কাজের মাঝেও গান্ধীজী সেদিন তাঁকে অভিনন্দন জানাতে ভোলেননি।

সাম্প্রতিককালে আফ্রিকার কৃষ্ণকায় জাতিগুলির জীবন চেতনার ইতিহাস অনুসন্ধান করলে বহুদিনের নিরন্তর সাধনার গৌরবদীপ্ত ইতিহাস উদ্ঘাটিত হবে। আজ যে জাতির বলদৃপ্ত হুঙ্কারে সমগ্র সভ্যজাতির হৃদস্পন্দন তরঙ্গায়িত সে জাতিকে বিশ্বে আপন স্থান করবার জন্য যে সংগ্রাম করতে হয়েছে তা ইতিহাসের

যে কোন রোমহর্ষক কাহিনী অপেক্ষা কোন অংশে কম আকর্ষণীয় নয়। আমেরিকা ও আফ্রিকার অসভ্য কৃষ্ণকায় জাতিগুলি আজ স্বাধীনতা, বিদ্যাশিক্ষা ও কর্মের পুরোভাগে। এই প্রগতির ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গিয়ে সবার প্রথমে যার মনে আসে বরেণ্য বুকার টি. ওয়াশিংটনের! আমেরিকার ক্রীতদাস সম্প্রদায়-এর শিক্ষা দীক্ষা ও সর্বপ্রকার প্রগতির জন্য আজও বিশ্বের অনুন্নত কৃষ্ণকায় জাতিগুলি কার্ভার ও বুকার টি ওয়াশিংটনের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানায়। এ কথা অবিশ্বাস্য হলেও নির্মমভাবে সত্য যে আজ যে এই দুই মনীষী বিশ্বের জাতিনির্বিশেষের স্মরণীয় তাঁদের জীবনধারার প্রতিটি ধাপ সভ্য শ্বেতকায় জাতিগুলির বিরুদ্ধতা ও বঞ্চনায় রচিত।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ আমেরিকার কোন এক ক্রীতদাসের ঘরে বুকার, টি, ওয়াশিংটনের জন্ম হয়। অদৃষ্টের পরিহাস। অল্প ক'দিন পরেই বাবা মারা

গেলেন। মা আবার বিয়ে করলেন। নতুন বাবা তাকে বিশেষ সুনজরে দেখলেন না; তার অভিপ্রায় বুকার লেখাপড়া না শিখে ক্রীতদাস হয়। মা, কেন কাগজেন দক্ষিণ ভার্জিনিয়ার খামার বাড়ীতে কাজ করেন। সামান্য আয়। মা'র দুঃখ বুঝলেন বুকার। মাত্র ন'বছর বয়সে সংসারের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। প্রথম কাজ জুটল কয়লা খনিতে। সমস্তদিনের অমানুষিক পরিশ্রম। মাঝে মাঝে ভারের বোঝায় কাঁধ ভেঙে পড়ে প্রায়ই একটু দাঁড়ান। অমনি অকথ্য ভাষায় গালি দিয়ে ওঠে সর্দার। এরপর পড়াশুনা বোধহয় পাগলেও ভাবতে পারে না। তবু তিনি এসব কাজের পর পড়াশুনায় বসতেন। ভাগ্য সুপ্রসন্ন। খনি মালিকের স্ত্রী তাঁকে পড়াশুনার সমস্ত সুযোগ করে দিলেন। বুকার বাবাকে হারিয়েছিলেন; কিন্তু মা বোধহয় সে অভাব পূরণ করেছিলেন। দুঃখের মধ্যেও বার বার উৎসাহ জানিয়েছেন। এই বুদ্ধিমতী মহিলার অদম্য প্রেরণা ও চেষ্টার ফলে বুকার সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। পরিণত বয়সে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি মা'র কথা বার বার স্মরণ করেছেন।

স্কুলের পড়া শেষ হল। কলেজ। সে তো বহু দূরে প্রায় তিনশো মাইল। হেঁটে পাড়ি দিলেন এই দীর্ঘ পথ। হ্যামটন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে স্নাতক হলেন। চারিদিকে বেশ একটু হৈ চৈ পড়ে গেল। সাফল্যের আনন্দে নয়। তবে, একজন ক্রীতদাস—কালো চামড়ার মানুষের মাথায় এত বুদ্ধি আছে এই ভেবে। জীবিকা খুঁজতে লাগলেন। মজুরের কাজ জুটল। বুকার এ নিয়ে কোন দুঃখ করেন না। কেবলমাত্র ভাবেন সাফল্যের পথ কি এতই দুস্তর!

শিক্ষা জীবনে তাঁর যে কথা বার বার মনে হয়েছে তা হল নিগ্রো জাতির সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা। সভ্য মানুষরা একটা মাত্র পথই খুলে রেখেছে তাদের জন্যে তোমাকে ক্রীতদাস হতে হবে মজুর হতে হবে। লেখাপড়া, সভ্য জীবন তা তোমার জন্য নয় তুমি তার অযোগ্য। সম্ভবতঃ এই দুনিয়ায় বাসেরও অনুপযোক্ত। বৃত্তি হিসেবে শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করলেন। তাঁর গির্জার আইনে জনকয়েক ছাত্র নিয়ে সুরু হল তাঁর ভবিষ্যত পরিকল্পনার বাস্তব প্রয়াস।

১৮৮৫ সালের মাঝামাঝি। ইতিমধ্যে কার্ভার আমেরিকার সেরা কৃষিবিজ্ঞানীরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। অনাথ অবস্থায় শতবাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে তিনি শিক্ষা পেয়েছিলেন। তাই তাঁর একান্ত কামনা স্বজাতির সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা, জীবন পথের সন্ধান দেওয়া ও সর্বোপরি আত্মবিশ্বাসে বলদৃপ্ত করা। স্বপ্ন একদিন সত্যে পরিণত হল। বুকার, টি, ওয়াশিংটন টাস্কেগী ইন্সটিটিউট স্থাপন করেছেন। বিভিন্ন বিভাগ স্থাপিত হচ্ছে একে একে। কারিগরি শিক্ষার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হল। তিনি তখনই উপলব্ধি করেছিলেন যে কৃষির উন্নতি না হলে সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবে। যথার্থ গুণীর সমাদর হল। কার্ভার এই প্রতিষ্ঠানের কৃষি-বিভাগের সর্বময় কর্তারূপে নিযুক্ত হলেন। তবে তার বিনিময়ে কোন প্রকার অর্থ গ্রহণে অসম্মত হলেন। বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত কামনা আজ বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে। গবেষণাগার নেই, যন্ত্রপাতি নেই, প্রয়োগাগার নেই পর্যাপ্ত অভাব। তবে সমস্ত অভাবই মানিয়ে নেওয়া যায় যদি স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী আর চেষ্টা থাকে। ধীরে ধীরে বহু যত্নে গড়ে তুললেন তাঁর জীবন-সাধনার বিদ্যামন্দিরকে। দেশ বিদেশ থেকে প্রচুর টাকা আসতে লাগল। বিভিন্ন বিভাগ গড়ে উঠল। সমগ্র নিগ্রোজাতির তীর্থস্বরূপ হয়ে উঠল এই প্রতিষ্ঠান।

আত্মবিস্মৃত জাতির অন্ধকার জীবন-মুহূর্তে যাঁরা আবির্ভূত হন তাঁরা নমস্য। নিগ্রোজাত ক্রীতদাসের স্নাত এই ছিল সমগ্র আমেরিকা ও আফ্রিকার কৃষ্ণ-কায়দের বিশ্বাস, সম্ভবত বিশ্ববাসীরও বিশ্বাস। কৃষির সর্বপ্রকার উন্নতি ছাড়াও অবহেলিত, বিগৃহীত ক্রীতদাস-সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করা কার্ভারের অন্যতম মহৎ প্রচেষ্টা। আলবামার শিক্ষক-তার সময়ে তাঁর সম্ভবত একমাত্র সাধনা ছিল কি ভাবে নিগ্রো সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা যায় যে, বুদ্ধি, বৃত্তি, উৎকর্ষতা ও জীবন

সংগ্রামের ক্ষেত্রে তারা কোন অংশে কম নয়। নবজাগ্রত আফ্রিকার আজ তাঁর সে প্রচেষ্টা সফল হতে চলেছে। এক এক করে সাম্রাজ্যবাদীর অধিকার শেষ হয়ে যাচ্ছে। সমগ্র সভ্য-জগতের সামনে আজ তারা তাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করছে। বিশ্বে আজ নবজাগ্রত আফ্রিকা এক নতুন শক্তি।

তৎকালীন আমেরিকাবাসী কার্ভারকে যোগ্য সম্মান দিয়েছে। অসাধারণ মনীষা ও কর্মক্ষমতার জন্য প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে অশেষ সম্মানে ভূষিত করেন। তবে তিনি এ সমস্ত সম্মানের অনেক উর্ধ্বে ছিলেন। বহুবার তিনি সম্মান প্রত্যাখ্যান করেছেন। ১৯২৩ সালে স্পিনগার্ন ও ১৯৩৯ সালে তাঁকে রুজভেল্ট পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়।

সেরা চিত্রাঙ্কন শিল্পীরূপেও কার্ভার শিল্পীমহলে সুপরিচিত ছিলেন। ১৮৯৩ সালে চিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্বমেলায় তাঁর ছবি প্রদর্শিত হয়। কেবল মাত্র তেল, জল তুলি নিয়ে নাড়া-চাড়া নয় সত্যিকার শিল্পের সমঝদার ছিলেন তিনি। পরিণত বয়সেও মাঝে মাঝে দেখা যেত তিনি ল্যাবরেটরীতে নিপুণ শিল্পীর মত রেখায় ছবি ফুটিয়ে তুলছেন।

জন্মসূত্রে কার্ভার ক্রীতদাস। তাঁর বাবা মা দুজনেই ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁর জন্ম তারিখ এখনও সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায়নি। যতদূর জানা যায় যে সম্ভবতঃ ১৮৬০ সালের আমেরিকার এক নগণ্য গ্রাম ডায়মণ্ড গ্রুভে তাঁর জন্ম হয়। মা মেরী তের বছর বয়স থেকেই মুদান কার্ভার এর বাড়ীতে কাজ করতেন। এই কার্ভার পরিবার ও তদানীন্তন উগ্র শ্বেত প্রভু সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক তফাৎ ছিল। জন্মের অল্পকাল পরেই কার্ভার বাবাকে হারালেন। প্রভুর কাজ করবার সময় কাঠের গুঁড়ি চাপা পড়ে তার মৃত্যু হয়। পরবর্তী কি হবে। মেরী মা কার্ভার এর পরবর্তী অনুসারে তাঁর ছেলের পরবর্তী রাখলেন কার্ভার। এই কার্ভার পরিবার তাঁকে খুব ভালবাসতেন। সুশিক্ষা পেয়ে সে যাতে মানুষ হয় তার সমস্ত রকম ব্যবস্থা করে ছিলেন। এই পরিবারের আন্তরিকতা ও যত্ন ব্যতিরেকে কার্ভার কোন দিনই সফল হতে পারতেন না। এই দিক থেকে এই পরিবারের গুরুত্ব যথেষ্ট।

জর্জ-কার্ভারের সুশিক্ষার ব্যবস্থা হল না। গ্রামের স্কুলের পড়া শেষ হল। আর কি ঐ যথেষ্ট অনেকেই একথা বলেন। তাঁর আগ্রহ দেখে উন্নাসিকের দল কম উপহাস করেননি। পরের বাড়ীতে রান্না করে, মজুরের কাজ করে, ছাত্রাবস্থায় ধোপার কাজ করে তিনি যে প্রচণ্ড জীবন সংগ্রাম করেছেন তা আজকের দিনে অনেক মানুষের কাছে প্রেরণাস্বরূপ। যে বার তিনি প্রথম স্কুলে ভর্তি হতে যাচ্ছেন। সবাই কিন্তু অপরিচিত। অসীম বিশ্বাস আর আশা নিয়ে সহরে এলেন। কোথাও আশ্রয় পেলেন না। নিরাশ্রয়ের আশ্রয় জুটল আস্তাবলে। প্রচণ্ড আঘাতে মাঝে মাঝে বিভ্রান্ত হয়েছেন, কিন্তু দুর্জয় বিশ্বাস কখনো হারাননি। অধ্যক্ষ ডানকান যখন তাঁকে কর্কশ ভাষায় বললেন "এখানে নিগ্রোদের স্থান হবে না" তখনও তিনি লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হননি। তবে এ ঘটনাকে উল্লেখ করে তিনি পরবর্তী জীবনে বলেছেন যে এমন অহঙ্কার মূলক উক্তি তাঁর জীবনে আর কখনো আসেনি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ সীমা অতিক্রম করে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন। বিজয়লক্ষ্মীর বরমাল্য লাভ করেছেন প্রতিটি পদক্ষেপে। চিরকুমার কার্ভার জীবনের সমস্ত সঞ্চিত অর্থ (আনুমানিক তেত্রিশ হাজার ডলার) মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে দান করে গেলেন নিগ্রো জাতির শিক্ষাবিস্তারের জন্য।

কয়েক বছর আগে কার্ভার শত বার্ষিকী উপলক্ষে সমগ্র আমেরিকায় বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠান হয়। বিভিন্ন দেশেও তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন হয়। নিষ্কম্প দীপ শিখার মত সুদীর্ঘ তিরাশি বছর তিনি বিশ্বের মানব সমাজকে আলোকিত করেছেন। প্রচণ্ড ঝটিকার মত তাঁর কর্মচঞ্চল জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে ঘোষিত হয়েছে চেষ্টা আর আন্তরিকতার ফলে মানুষ কি অসাধারণ উন্নতি করতে পারে। আজও বিশ্বের প্রতিটি মানুষ কেবলমাত্র বিজ্ঞানীরূপেই তাকে স্মরণ করে না, অক্লান্ত যোদ্ধারূপে আজও তিনি প্রতিটি মানুষের অন্তরে প্রতিধ্বনিত হন।

হাতের কলমটা হাতেই রয়ে গেছে। টেবিলের উপরের সাদা কাগজের টুকরোটাও যেমন তেমনই পড়ে আছে। একটা কালির আঁচড়ও পড়েনি তাতে। মেলিং তন্ময় হয়ে ভাবছে। কি যে ভাবছে কি জন্য তার সূত্র জানা নেই তার। তবু সে জানে চিন্তা নিশ্চয়ই কোন সূত্র ধরেই আসে। এর কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম নেই, সময় নেই। তবে মনের সঙ্গে এর একটা যোগাযোগ আছে। মনের রঙেই চিন্তার রূপ প্রতিফলিত।

ধর্ম বলে যে কোন কিছু আছে এ কথা মেলিং কোন দিনই বিশ্বাস করেনি। সে জানে জীবনদর্শনই মানুষের সব। এই দেখা, অনুভব ও উপভোগ করাই জীবন। আর এই জীবনই ধর্ম। সকলে বলে ট্যাও নাস্তিক। এর অর্থ খুঁজে পায় না সে। অবশ্য এ কথা সত্য যে ধর্মের বুলি আওড়াতে জানে না। বুলি আওড়াতে জানে না বলা ঠিক হবে না, সেদিকে তার প্রবৃত্তি নেই। বাইবেল পড়তে ভালবাসে সে কিন্তু তা ধর্মগ্রন্থ বলে নয়। এর মধ্যে যেন সে দৈনন্দিন জীবনের পূর্ণরূপ দেখতে পায়। এ যে শুধু তার নিজের জীবনের বেলাতেই প্রযোজ্য তা নয়—সমগ্র জগতের, সমস্ত মানুষের। কিন্তু আজকাল বাইবেলে যেন সে অন্য একটা রস পায়। কেন, কি জন্য তা সে জানে না। তবে বুঝতে পারে মনটা যেন কেমন অন্য ধরনের হয়ে গেছে। মাঝে মধ্যে মনে হয় চাকরি-বাকরি ছেড়ে ছুড়ে কোন মিশনারীতে যোগ দেয়। বাকী জীবনটা আত্মদর্শনে কাটিয়ে দেয়। জীবনদর্শনের সমস্ত পালা যেন শেষ হয়ে গেছে তার। জল সমুদ্রগামী। একটা লাল কিম্বা নীল পদ্মকে আঁকড়ে ধরে ক্ষুদ্র পঙ্কিল জলাশয়ে আবদ্ধ থাকা কি সমীচীন? এই পদ্মের পাপড়ি তো দুদিন বাদেই খসে পড়বে জলে। তখন জলটাই কলুষিত হবে—আবার ফুলের সুরভিও থাকবে না। কেমন একটা তিক্ত কটু স্বাদ আর বিষাক্ত বাতাসের গন্ধ পায় মেলিং।

অফিস প্রাঙ্গণে একটা সুবৃহৎ কৃষ্ণচূড়ার গাছ। সারা গাছ ভর্তি ফুল। লাল ফাগুনে ফুল। সমস্ত প্রাঙ্গণ আর তার আশপাশের গলোয়. অফিস বরবাড়ী

সবই যেন রঙিন স্বপ্নময় হয়ে উঠেছে। লাল ফুলের ফাঁকে ফাঁকে অল্প দু'একটা সবুজ পাতার উঁকিঝুঁকি ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। সকালের শান্ত আকাশের রোদ পড়েছে। রাতের জড়তা বা অবসাদ নেই কোথাও। ফুলে পাতায় একটা নতুন জীবনের স্বাদ, উৎসাহ ও চঞ্চলতা। আগেকার দুঃখ দৈন্য বেদনা ও নিঃসঙ্গতা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। ফুল আর সবুজ পাতার বাতাস যেন একটা নরম মিষ্টি হাতের স্পর্শ। মেলিং মনে মনে অনুভব করে তা। সঙ্গে সঙ্গে আয়নাদর্শনের সমস্ত ভূমিকা খসে পড়ে। আবার সেই জীবনদর্শন। বাইবেলের সমস্ত অর্থ বা রূপ যেন বদলে গেছে। হঠাৎ শান্ত মনের একটা কোণে ছোট্ট একটা লাল শিশুর কান্নার মত বেদনা অনুভব করে। দেহটা নড়ে ওঠে। নজর পড়ে অফিসের মেঝের দিকে। মেঝেটার জায়গায় জায়গায় কতকগুলো ফুল গড়াগড়ি যাচ্ছে। মনটা বিষিয়ে ওঠে অফিসের চৌকীদারের ওপর। ব্যাটা কিছুই দেখে না। সারাদিন শুধু বিড়ি ফোঁকে আর জড়ভরতের মত বসে থাকে বারান্দায়। সবকিছুই মনে করে—ওর দোষ কি? এ সবই তো বাতাসের কাজ। কী দুরন্ত এই বাতাস! বড় কঠিন নির্মম। এমনি করেই কত জীবনের ছেদ টানে সে, বুক থেকে ছিনিয়ে নেয় কত আকাঙ্ক্ষিত প্রিয়বস্তু।

নিকটের লোহারকারখানা থেকে হাপরের সোঁ সোঁ আর লোহার মিস্ত্রির হাতুড়ী পেটার দুমদাম শব্দ ভেসে আসছে। এই শব্দেরও একটা অর্থ আছে, কথা বা ভাষা আছে। এখানেও ভাল্যাগড়ার কাজ চলছে? আর এই জন মাটির দেশে ভাঙাগড়া থাকবেই। এই নিয়েই তো জগতের সৃষ্টি, সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনা। আজ ওঠা কাল নামা এই হলো কালের খেলা।

আজ দুশো বছর আগের কথা। এখানেই বা ছিল কি? পাহাড় জঙ্গল ঘেরা একটা আঁধার পুরী। কোন আলো বাতাসের গন্ধ ছিল না, ছিল শুধু ঝরা মরা পচা পাতার সোঁদালো গন্ধ। এখন তৈরী হয়েছে কত ঘর বাড়ী, বসেছে কত কলকারখানা, হয়েছে চাষের চাষ। এই ভাঙাগড়ার মধ্যেই অতীতের অনেক আনন্দ বেদনা হারিয়ে ফেলায় মেলিং। জীবনে অনেক কিছু পেয়েছে, অনেক কিছু হারিয়েছে। যতটুকু পেয়েছে তার চেয়ে হারিয়েছে অনেক বেশী। পাওয়াটা আনন্দের হারানো বেদনার। মিলিয়ে ওজন করে মেলিং। পাওয়ার আনন্দের চেয়ে হারানোর বেদনা যেন অনেক বেশী। পাওয়াটা হালকা কিন্তু হারানো ভারী। হয়ত আবার অনেক পাবে কিন্তু হারানোর কথা মনে হতেই মনটা খিঁচিয়ে ওঠে। তবু এই কঠোর নির্মমতার মধ্যে একটা কোমলতার স্পর্শ অনুভব করে। এই স্পর্শ যেন ভোলাবার নয়। হয়ত জীবন থাকতে ভুলতেও পারবে না কোন দিন।

এরপর মেলিং-এর তন্ময়তা ভাঙে। একজন মজুর গিয়ে সেলাম ঠুকে দরজার সামনে দাঁড়ায়।

মেলিং বিরক্তভাবে জিজ্ঞেস করে—হোয়াট ইউ ওয়ান্ট? কী যাওতা হায়?

বকটু বললে—কাল রাতে আমার স্ত্রী ঝিনুয়াকে ফুসলিয়ে নিয়ে গেছে রাইমটাং বাগানের একজন মজুর। সেখানকার ম্যানেজার সাহেবের কাছে আপনি যদি একটা চিঠি দিতেন তাহলে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারি।

—শুনতে পেলাম সে নাকি কোন লোহারের সঙ্গে ভেগে গেছে? লোহার না চিকবরাকের চেয়ে অনেক ছোট জাত। তাহলে কেমন করে ফিরিয়ে আনবি তাকে? তার চেয়ে আর একটা বিয়ে কর।

বকটুকে কথা কটি বলার পর হঠাৎ মেলিং-এর সমস্ত মুখটা কেমন থমথমে হয়ে যায়। অনেক প্রশ্ন, অনেক জিজ্ঞাসা ঝড় এসে মনের মধ্যে ভীড় জমিয়েছে। মেলিং একদৃষ্টে বকটুর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তার সমস্ত মুখ খানা কেমন যেন শুষ্ক, রুক্ষ ও বিবর্ণ হয়ে গেছে। হয়ত মেলিং-এর কথাগুলো আদৌ মনঃপুত হয়নি তার। অথবা সে পূর্বস্মৃতি মন্থন করছে। মেলিং-এর মনে হয় মুখ খানা যেন একটা মেঘে ঢাকা আকাশ। এই আকাশে মেঘ আছে, আলো আছে। এই মেঘের মধ্যে আলোর ঝলকানি দেখতে পায় সে।

বকটু বললে—না, হুজুর, তা হয় না। আর

একটা বিয়ে করলে সে কেমন হবে কে জানে? তবু জিয়ুধাকে আমি জানি। ভাল করেই জানি। তাকে বিয়ে ও করেছি পুরো পাঁচটি বছর। এই সময়ের মধ্যে একটাও ভুল করেনি সে। না হয়, একটা ভুল এবারে করে বসেছে। এ ভুলতো সবাই করে। আপনি আমিও করে থাকি। জানেন কি অচেনা অজানার চেয়েতে চেনা জানার ধারাপও ভাল। তারপর জাতের কথা বলছেন—জাততো মানুষের তৈরী। সমাজের লোকগুলোকে একটু মাংস হাড়িয়া খাইয়ে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

জানা চেনা অনেক জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে মেলিং। সত্যিই, সমস্ত জীবনগুলোই ভুলে ভরতি। ভুল সবাই করে আবার সংশোধনও হয়। ভুল না করলে আর ভুলের অর্থ বুঝা যায় না। জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা, অনুভূতি সবই এই সত্যমিথ্যা ভুল আর অভুলের মধ্যে। বড় অলের মধ্যেও রোদ আছে। ভুলের মধ্যে মঙ্গল আছে।

প্রতিদিন দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে জীবনের অনেক হিসাব নিকাশ করে, বাগান পরিচালনার অনেক কথা ভাবে। অনেক অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। বেয়ারা বেতের সাইড টেবিলটাতে টেস্ট-ব্যান খানা রেখে দেয়। ভাবতে ভাবতে খেয়ালা টেনে নেয়। চোখের সামনে ধরে দু'একটা লাইন পড়তে না পড়তেই চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসে তার। কাগজটা বুকের ওপর রেখে চোখ বুজে পড়ে থাকে। ঘুম আসেনা শিগগির। আসে অনেক পরে। ঘুম থেকে উঠে দেখতে পায় কাগজখানা হয় বুকের ওপর নাতো পিঠের তলে কুঁচকে পড়ে আছে।

যে বাড়িটাতে মেলিং থাকে সে একটা বিরাট দোতালা বাংলো। এর চারপাশে চায়ের চাষ। মাঝখানে বাংলো। দোতালার বারান্দায় দাঁড়ালে সুদূর বিস্তৃত চায়ের চাষ আর তার মধ্যে সারিবদ্ধ শিরীষ ঝাঁকর গাছ ও বড় সড়কের দুধারেও যেন ছাঁ ছাড়া অন্য কিছু দেখা যায় না। আর এরও দূরে উত্তর ও পূর্বে দেখা যায় পাহাড়। আকাশ পাহাড়ে নেবে এসেছে। এরপর আর কিছু নেই। এখানেই ভৌগলিক পরিসীমার শেষ।

প্রতিদিনের মত সেদিনও দুপুরে বিছানায় গিয়ে শুয়েছে মেলিং। হাতে সংবাদপত্রখানা। মনটা যেন কেমন উদাস, অলস। কতকটা সুখ দুঃখ আশা হতাশা। ক্ষণিক কর্কশ, নির্মম আবার পরক্ষণেই সহজ সরল মাখানোর মত। এই নরম গরম দুইয়ের সংমিশ্রণে এক তীব্র জ্বালাময় অনুভূতি জাগে। বাইরে বারান্দায় গিয়ে চা শিরীষের গাছের দিকে তাকায়। প্রাণের মধ্যে কেমন যেন একটা বিষফোড়ার তীক্ষ্ণ কনকনানি অনুভব করে। বুকটা ধড়ফড় করতে থাকে। সদ্য কলমকরা চায়ের ছুঁচলো ডাল-গুলো বুকে বিঁধছে।

জ্যৈষ্ঠমাস যায় যায় অথচ মেঘের বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই। আর দু'চার দিনের মধ্যে জল না হলে বাগান জঙ্গলপুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। একটা নতুন পাতাও গজায়নি চা গাছে। শিরীষ গাছেও না। শুধু দুএকটা শুকনো সুঁটি ঝুলছে। তাদের বেতাল ঝাজনা শোনা যাচ্ছে। কেমন যেন একটা নৈরাশ্য, বেদনা মাখা কান্নার সুর। কেমন কাটাছাটা, নিরাভরণা বিধবা বিধবা ভাব।

ভাবতে পারে না মেলিং। সমস্ত মনটা রুক্ষ ও রুচতায় পরিপূর্ণ। আবার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে বিছানায়। হঠাৎ নজরে পড়ে দেয়ালে টাঙানো ফটোটা। কী বিশ্রী কদাকার ঐ ফটোটা! রঙ চটে গেছে, ফ্রেমে কালচে দাগ পড়েছে। ধারালো দাঁত আর নখ। অসভ্যের মত হাসছে। তবু এই হাসির মধ্যে অট্টহাস আছে, পরিহাস আছে! সারা ঘরটিকে কী বীভৎস দেখাচ্ছে। মনটা মুহূর্তের মধ্যে তিতিয়ে ওঠে। পরক্ষণেই দয়া, মমতা, করুণা, দাক্ষিণ্য দেখা যায়। অনেক কথা, রূপ, রস গন্ধের ঢেউ বইতে থাকে। রাগটা গিয়ে পড়ে বেয়ারার ওপর। বেটার একটু যদি রুচি থাকে।

মনটার মধ্যে যেন শোকা আছে। এই শোকাই মনটার পরিবর্তন ঘটায়। সমস্ত রূপ রস গন্ধ চুষে

খেয়ে একটা তিক্ত কষ্টু স্বাদের মত তরল কিছু ঢেলে দেয়। আবার বেপরোয়া হয়ে ওঠে মেলিং। কী করে বিছানা থেকে নেমে আসে সে। ঘরের কাগজখানা আগেই হাত থেকে অলক্ষ্যে মেঝের পড়ে গেছে। সেগুলো এলোমেলো ভাবে পায়ে বেধে খস্ খস্ শব্দ করে ওঠে। পর পর চার পাঁচ লাথি মেরে সরিয়ে দেয় সেগুলো। একটা হেঁচকাটানে দেয়াল থেকে ফটোটা পেড়ে গিয়ে বারান্দায় ছুঁড়ে ফেলে। দেয়ালের বেশ খানিকটা জায়গার রঙ চটে যায়। গ্লাসটা ভেঙে চুরমার হয়ে সারা বারান্দায় ছড়িয়ে পড়ে আর ফ্রেমটা গিয়ে বারান্দার রেলিং-এ আটকে যায়।

একটুক্ষণ বাদেই নীচে থেকে বেয়ারা ওঠে আসে। বিস্ময়ের চোখে মেলিং-এর দিকে তাকায়।

ভৈরবনাদে গর্জে ওঠে মেলিং ব্লাডি, বিলি ব্যাস্ট, হু টোল্ড ইউ টু কিপ দ্যাট দেয়ার? ফটোঠো কোন্ তোমুকো হোয়া পর রাখনে বোলা?

বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি বেয়ারার। খানিক-ক্ষণ চুপ থেকে বলল হুজুর, ঐ ফটোটা তো আজ পনর বছর ঐখানেই টাঙানো আছে! দার্জিলিং থেকে এনেছিলেন। শুধু সেদিন ঘরে রঙ ফেরানোর সময়ে কিছুক্ষণের জন্য খুলে রেখেছিলাম তা ছাড়া ওটা তো বরাবরই ঐখানে।

নিজের এই অপ্রত্যাশিত আচরণে বেশ একটু অপ্রতিভ হয় মেলিং। শুধু মাত্র একটা হুঁ শব্দ করে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে আবার। মনের অঙ্কুরন্ত অলিগলি তাতে অঙ্কুরন্ত ভাব ভাবনার চলা ফেরা। এক ফাঁকে বকটুর কথা মনে পড়ে ভুল সবাই করে। সত্যি কথা বলেছে বকটু। ভুল সবাই করে। মেলিংও অনেক করেছে, আবার আজ একটা ভুল করে বসলো।

অনেক অপরিণত, অপকৃষ্ট চিন্তা এসে ভীড় জমিয়েছে মনে। অনেক পথ ঘাট, নদ নদী, দার্জিলিং-এর বড় সাহেবের বাংলো, ঘুড়ে আরো কত কি। ঘুম নেই চোখে। হঠাৎ কানের কোড়ায় টাঙানো দেয়ালে ঘড়িতে তিনটে বাজার ঠং ঠং আওয়াজে মেলিং-এর তন্দ্রা ভাঙে। তার কামরায় যায়। টেবিলের ওপর একগাদা চিঠি। পূর্ব অভ্যাস মতো এক লহমায় সব চিঠিগুলোর শিরোনামার লেখাটাতে চোখ বুলিয়ে নেয়। মুখটা বাঁকা বিকৃত ভঙ্গি করে একখানা চিঠি ছুঁড়ে ফেলে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে। কী মোংরা হাতের লেখা! দামী ইনভেলাপটাতে কালি লেপটে আছে। দেহ ও মন ঘিন ঘিন করে। হাতের আঙুলগুলোর দিকে তাকায় মেলিং। না, বহলা লাগেনি। কি ভেবে অন্যমনস্কভাবে চিঠিটা বাস্কেট থেকে উঠিয়ে নেয় আবার। অনেক নাড়া চাড়া করতে করতে হাত থেকে কখন খসে পড়ে সেটা।

বকটুর কথাটা মনে পড়ে। আবার সেই ভুলে চিঠিটা তুলে নেয় পায়ের তলা থেকে। বড় অস্পষ্ট লেখা। পড়া যায় না। অনেক কষ্টে, এদিক সেদিক ঘুরিয়ে, কাছে দূরে, উপর নীচ করে করে শেষ পর্যন্ত চিঠিটার পাঠোদ্ধার করে। হাঁ, চোখের জলেই এমনি হয়েছে। লেখাটা তো খারাপ নয়, ছাপার অক্ষরের মত লেখা।

ঠং ঠং ঠং। ঘড়িতে চারটে বাজার শব্দে ধ্যান ভাঙে মেলিং-এর। অফিসে অনেক কাজ। সকালের কাজটাও শেষ করা হয়নি। দু'বেলার কাজের কথা চিন্তা করতেই কেমন যেন বিচলিত হয়ে ওঠে সে।

সন্ধ্যা ঘন হয়ে আসছে। রাতের দ্রুত পদক্ষেপে সমস্ত ঘর বাড়ি, গুদোম পথে আঁধার জমছে। বাংলোয় ফিরছে মেলিং। টেবিল লনটার দক্ষিণপ্রান্তে অস্পষ্ট কি যেন একটা টিপি করা দেখা যাচ্ছে। মালিটার ওপর বিরক্ত ও রাগ হয়। ওঠোনের সমস্ত আবর্জনা জমা করেছে ওখানটায়। কেন, কি জন্য? কেউ কি দেখাশুনা করবার নেই তার? বড় বে-আক্কেলে এই লোকগুলো। এদের সঙ্গে আর পেরে উঠছেনা সে। মন খারাপ হলে যেমন ইন্দ্রিয়গুলিও সেই সঙ্গে বিকল, নিষ্ক্রিয় হয় এ যেন ঠিক তাই। একের অভাবে সবকিছু বিকল।

তার কামরায় গিয়ে ড্রয়ার খুলে চিঠিটা বের করে মেলিং। একবার দুইবার তিনবার করে করে অনেকবার পড়ে। অদ্ভুত সুন্দোট। গা ঘেমে উঠেছে। চিড়বিড়

করছে। মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে ভোঁ ভোঁ ভন্ ভন্ করে। ফ্যানের হাওয়া যেন আরো গরম। গায়ে টপটপে ঘাম তেল ছিটিয়ে দিচ্ছে।

আজ যেন সমস্ত জীবনটা কেমন শূন্য, নিঃসঙ্গ ও অসহায় বলে মনে হয় মেলিং-এর। চিন্তায় ভাবনায় বুকে প্রশ্নে ও জিজ্ঞাসায় বেশ রাত হয়েছে। আকাশে ফুটি-ফাটা চাঁদ উঠেছে। তার কাঁচা সবুজ মিহি আলোর ফাঁক দিয়ে বাংলোর রাস্তার সাদা কুচি কুচি পাথরগুলো দেখা যাচ্ছে। রুপোর মত চকচক করছে। বাতাস বইছে ঝির ঝির করে। বাগানের ও টবের ফুলগুলো থেকে থেকে সবুজপাতার ওড়নার আড়ালে লুকিয়ে যাচ্ছে আবার পরক্ষণেই পাশ কেটে মুখ বাড়িয়ে চুমকি চুমকি হাসি হাসছে। খুব ভাল লাগে মেলিং-এর। দেহ ও মনে কোন উত্তাপ নেই। ঠাণ্ডা, বটবৃক্ষ তল! ড্রেসিং পাওয়ারের বাতি জ্বলে ঘরে। চোখে লাগছিল খুব। এত আলো, এত রূপ সৌন্দর্য, রূপ যেন সহ্য হয় না। সেটাকে নিভিয়ে নীল বালবটি জ্বেলে দেয় মেলিং। নীলাভ আলোতে সারা ঘরটি নীল হয়ে ওঠে। দৃষ্টি পড়ে কাচঘেরা মাছের দিকে। রঙ বেরঙের সামুদ্রিক ছোট ছোট মাছগুলোর দেহ বড় সুন্দর হয়ে ফুটে বেরুচ্ছে সবুজ ঘাস আর নীলাভ আলোর মধ্যে দিয়ে। এগিয়ে যায় তাদের দিকে। চমকে ওঠে মেলিং। এ-কি? কী বিশ্রী শ্রী হয়েছে মাছগুলোর? নিটোল মাংসল দেহ অনাচর ও অবহেলায় শুকিয়ে ক্ষয়-রোগীর মত হয়েছে। চলতে পারছে না। ঘাসের গোড়ে রুপো রঙের বালির সঙ্গে মিশে আছে নিঃসহায় নিজীব অবস্থায়! হয়ত অল্প কিছুদিনের মধ্যে রক্তবমি করে মরবে!

দূরে গীর্জার ঘণ্টা বাজে। ন'টা বেজেছে। নিচে ডাইনিং হলে খেতে যায় মেলিং। কেমন যেন নিঃসঙ্গ নিস্তব্ধ লাগে তার। সব শূন্য, চেয়ার খালি, ঘর খালি। শূন্য প্লেটে সে একা। মন্থর ধীর করছে। একটুও ক্ষুধা পায়নি। পেটটা ঢোক ভরে আছে বায়ুতে বায়ুতে বর্ষাকালের পেটের রোগীদের মত। সামনের দেয়ালের দিকে নজর পড়ে। দুটো টিকটিকি মুখোমুখি হয়ে টি টি শব্দ করছে, কথা কইছে আর লেজ নাড়ছে। পরস্পরের কী নিবিড় ভাব প্রণয়! লেজনাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের দেহ স্ফীত ও চঞ্চল হয়ে ওঠে। কী ভাববিহ্বল চাউনি একটা আনন্দ উচ্ছল তরঙ্গের তরঙ্গায়িত লীলা ভঙ্গিমা!

ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে মেলিং। চোখে শুধু দিগন্ত-ব্যাপী কালো কালো ছায়া! ঘুম নেই। হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই টিকটিকি দুটো। মনে জাগে তের বছরের কত মধুর কত কথা, কত গান।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তোড়জোড় চলছে। তৈরি হচ্ছে চাসিমারা এয়ার ফিল্ড, ঘর বাড়ি, অফিস গুদোম। আণ্ডারগ্রাউণ্ড অয়েল ট্যাঙ্ক বসানো হচ্ছে। অসংখ্য মিলিটারী ফোর্স, অফিসার, কেরানী ও শ্রমিকে থই থই করছে সেই অনুর্বর প্রান্তর। মাটি হারছে কিন্তু আকাশটা কেমন ঘোলাটে হয়ে গেছে। পাহাড় কাঁপছে। সমস্ত কোম্পানী থেকে আদেশ আসে—ইউরোপীয়ান এসিস্টাণ্টরা যেন যুদ্ধে যোগদান করবার জন্য প্রস্তুত থাকে।

এই যুদ্ধ কখন যে তিল তিল করে রোগের বীজাণু ছড়িয়ে দিয়েছে, সংক্রামিত করেছে মেলিংকে তা টের পায়নি। সে বিষয় চিন্তা বা ভাববার অবকাশ দেয়নি বিলি তাকে। তার উজ্জ্বল হাসি আর চোখের অনুরক্ত বিলোল ভাব সারাক্ষণই মেলিং এর মনে প্রাণে একটা গানের কলি অনবদ্য বেজে ওঠে।

"আমি সব পেয়েছি, সব ভুলেছি
তোমায় ভালবেসে"

বিলি এ-দেশে নূতন এসেছে। এখানকার গরম আবহাওয়া সহ্য করতে পারছে না সে। নিটোল দেহ অনেকটা শুকিয়ে গেছে। মেলিং তাকে নিয়ে দার্জিলিংএ যায়। কোম্পানীর বড় সাহেব কেনিংস্ দার্জিলিংএ থাকেন। তাঁর সঙ্গে ওদের দেখা হওয়ায় তিনি তাদের

চিন্তায়, বাক্যে ও কার্য্যে
ভারতের সেবা করুন

তাঁর বাড়িতে আসতে অনুরোধ করেন। মেলিং ও বিলির মন খুশীতে ভরে ওঠে। ওরা উভয়েই দুঃখগত একটা স্বপ্নের আলো দেখতে পায়। ধুন্ধু, ধুন্ধুর ঘন অন্ধকার যেন তাদের থেকে অনেক দূরে সরে গেছে।

দার্জিলিং-এর আবহাওয়ার পরিবর্তন হচ্ছে। বর্ষা এসে পড়েছে। রাস্তাঘাট হারিয়ে পড়ছে, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে অন্য দেশ, অন্য মন থেকে। আর এক মনের জন্ম হচ্ছে।

আবার সেই ভুলের কথা। ভুল যখন আসে তখন মানুষের অজ্ঞাতসারেই আসে। মানুষ টের পায়নি। মেলিংও না। হয়ত মেলিং তা টের পেয়েছিল কিন্তু স্বার্থের গন্ধে ভুল ফুল হয়ে ফুটে উঠেছিল!

সেই নিস্তব্ধ ঘনান্ধপুরী। সড়কে জন মানবের চিহ্ন নেই, কোলাহল নেই। দার্জিলিংএর মিউনিসিপ্যালিটির লাইটপোস্টের ক্ষীণ আলোর আবছা আবছা রেখা আসছে। মটর থেকে থেকে নেমে দু'পা সিঁড়ির দিকে এগিয়ে থমকে দাঁড়ায় মেলিং। একটা মোটা ও চিকন গলার ফিসফিস চি চি আওয়াজ আর চাপা খিস্টি হাসি শুনতে পায়। অল্পক্ষণ চুপ থেকে অতি সন্তর্পণে দরজার কড়া নাড়ে।

বিলি দরজা খুলে দিল বেশ কিছুক্ষণ বাদে। তার চোখে মুখে অন্য একটা রক্তের ঢেউ দেখতে পায় মেলিং। সে বুঝতে পারে এ ঢেউ স্বচ্ছলের নয়, কেমন যেন অস্বস্তি, ভয়ের!

ধুন্ধে যাওয়ার আতঙ্ক কেটে গেছে মেলিংএর।

হাসিমারা এবার ফিল্ড থেকে এক মাইল উত্তরে তুরমা-জিরমানা ক্লাব। সাহেব মেম সকলেই সেই ক্লাবের মেম্বর। মেলিংরাও। এই ক্লাবেই অনেক মিলিটারি অফিসারের সঙ্গে পরিচয় হয়ে ওঠে। দুষ্প্রাপ্য চিনি, ময়দা, সিগারেট, সাবান, মটরপার্টস, টায়ার টিউব আরো অনেক জিনিষপত্তরে ভরাট হয়ে যায় মেলিংএর বাংলো।

মেলিং সুখী। সারা বাড়িটি মুখর করে রাখে বিলি। কোন কিছুই ভাববার ফুরসৎ দেয়না মেলিংকে। মেলিং জানতো বাঘে একবার রক্তের স্বাদ পেলে লোকালয় ছাড়তে পারে না।

পরিবর্তন অনিবার্য। ভাঙাগড়া নিয়েই এই জগত। মেলিং সব জানে। তবু সে আশা করতে পারেনি তার মত নিরোগ, নিরেট পাথরপেটা দেহে রোগের বীজাণু ঢুকতে পারে। এ-বিশ্বাস হয়ত বিলিরও ছিল না।

মেলিংএর হাতে পায়ে মুখে কি একটা উৎকট চর্মরোগ দেখা দেয়। বাগানের ডাক্তারেরা কেউ ধরতে পারে না সেই রোগ। ফলে তাকে কলকাতা নার্সিংহোমে থাকতে হয়। বিলি বাগানেই থাকে। তার খোঁজখবর নেয় মেলিংএর বন্ধু চার্মিং।

দুমাস বাদে মেলিং ফিরে আসে বাগানে। নিরানন্দ বাড়িটি আবার আনন্দ মুখর হয়ে ওঠে। কিন্তু এই আনন্দের মধ্যে যে একটা বেদনার সুর বেজে উঠেছে তা টের পায়নি মেলিং। একটা বিরাট মেঘ সমস্ত আকাশ জুড়ে বসে আছে। ঝড় আসবে, শিলাবৃষ্টি হবে। শিরীষের ডালগুলো ভেঙে পড়বে মড় মড় করে। কলম করা চা গাছের নতুন সবুজ লকলকে ডালগুলো শিলার আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে। চমকে উঠবে মাটি, ঘর বাড়ি, গাছপালা। আর মেলিং—!

তিন মাস বাদেই চার্মিং হোম লিভে যাবে। বিলি মেলিংকে বলে—আর তো ছয়মাস পরেই তুমি বিলেত যাচ্ছ। আমি না হয় চার্মিংএর সঙ্গে আগেই যাই।

মেলিং আপত্তি করে এতে। কিন্তু বিলির আবদার উপেক্ষা করতে পারেনি মেলিং।

ধিক্কার হয় নিজের জীবনের ওপর। যে জীবনকে এতদিন মূল্যহীন বলে মনে করেছিল আজ তাকে কাচঘেরা একটা স্থবির জড়পদার্থ বলে মনে করে মেলিং। জীবন মিথ্যা, মৃত্যু সত্য। সমুদ্রে ঝড় উঠেছে। পারা-পারের সমস্ত কিছু বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সমস্ত জাহাজ ডুবে গেছে। উড়ো জাহাজগুলো পাহাড়ে গুতো খেয়ে ভেঙে খান্ খান্ হয়ে গেছে।

এর মধ্যে আবার অসুখ বাড়ে মেলিংএর। কলকাতার হাসপাতালে যায়। ইতিমধ্যে জার্মান থেকে নতুন একটা ভ্যাকসিন আমদানি হয়। এই ওষুধ ব্যবহার করে মেলিং সম্পূর্ণভাবে নিরাময় হয়।

আবার চিঠিখানা পড়ে মেলিং। একবার, দুইবার,

তিনবার করে করে অনেকবার। মনের ভুতে কে যেন ঠাণ্ডা হাত বুলিয়ে দেয়। মনে করে তাহলে মা ও মামী যা লিখেছে তা সবই ঠিক। একটা লাড়লার কংকাল দেখতে পায় চোখের সামনে। করুণা ও দাক্ষিণ্যে সমস্ত মনটা ভরে ওঠে। নিশ্চয়ই এবারে ভুল বুঝতে পেরেছে। চোখ ঘোলাতে বসেছে কেঁদে কেঁদে। চোখের জল অমনি অমনি আসে না। চোখের জল আসে অনুশোচনায়। আবার এই অনুশোচনাই অন্তর শুদ্ধি হয়। এই তো প্রায়শ্চিত্ত।

মুহূর্তের মধ্যে আবার সেই কথা, লাক্ষিণ্য কোথায় যেন কর্পূরের মত উবে যায়। মেলিং অস্বস্তি, অসুস্থতা অনুভব করে। মনটা রুক্ষ ও রূঢ় হয়ে ওঠে। আবার সঙ্কুচিত ও হয়ে পড়ে। কতকটা ভয় ও লজ্জায়। ঠিক ভয় নয়, লজ্জায়। লজ্জায়ই ভয়ের ছোঁয়াচ দিয়েছে। কানে কানে শুনতে পাচ্ছে অনেক গুঞ্জন, দেখতে পাচ্ছে অনেক তির্যক হাসি।

চারদিন বাদে একখানা বিলিতি তার আসে মেলিংএর। তার করেছেন মিসেস ওয়াকার, মেলিংএর মামী। আশ্চর্য হবার কিছুই নেই তার। কারণ তাঁরা আগে এ দেশেই থাকতেন। এখানকার মায়া এখনো ছাড়তে পারেননি তাই মাঝে মধ্যে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখাশুনা করতে আসেন।

সকালে ছ'টার প্লেন। প্লেন ইন হওয়ার অপেক্ষা আগেই বিমান ঘাটিতে গিয়ে হাজির হয় মেলিং।

প্লেন এলো। পনের মিনিট লেট। কুয়াশাভরা আকাশে বিমানঘাটি নির্ণয় করতে পারেনি পাইলট।

প্লেন থেকে নামলেন মিসেস ওয়াকার। তাঁর পিছু পিছু এক কৃশাঙ্গী। দেহের রক্ত খসখসে, অবসন্ন। চোখ দুটো যাদে নিষ্প্রভ।

মেলিং একবার কিন্ডের চারপাশটা একবার ভাল করে দেখে নেয়। না, কেউ কোথাও নেই। প্লেন থেকেও কেউ জানাশোনা নামছে না। নিজেকে কেমন যেন অপ্রস্তুত, অপ্রতিভ মনে করে। চোর চোর ভাবে।

মিসেস ওয়াকার হেসে বললেন একটা রোগী নিয়ে এলাম স্ট্যান। বিলেতের হিমেল আবহাওয়া সহ্য হচ্ছে না এর।

সাকে ছ'টায় বাংলোতে আসে ওরা। সূর্য উঠছে পূবদিকে। একটা নূতন আশা আকাঙ্ক্ষা ও জীবন নিয়ে। রাতের অন্ধকার কোথায় যেন তলিয়ে গেছে। মেলিং ভাবে রাত হয়ত আবার আসবে কিন্তু পরক্ষণেই দেখতে পায় সমস্ত বাংলোটাতে সোনারোদের ঝলকানি চুরে পড়ছে। না, রাত আর আসবে না। দিনের আলোতে, উত্তাপে তা জমে ছারখার হয়ে গেছে।

বিকেল বেলা। সূর্য তখন ডুবু ডুবু। তার শেষ রশ্মি পড়েছে দারা পৃথিবীর ওপর। অফিস থেকে ফিরছে মেলিং। দূর থেকে দেখতে পায় মিসেস ওয়াকার আর বিলি ফুলবাগিচার মধ্যে পায়চারি করছে। সূর্যের রশ্মি ফুলে, পাতায়। সেই ফুলপাতার মধ্যে ফুলের পরী। তার স্বচ্ছ সুন্দর আয়নার মত মুখে প্রতিফলিত হয়েছে তাদের সেই বিচিত্র রূপ ও লাবণ্য। মন ও দেহ নেচে ওঠে! হঠাৎ ফুল বাগানটার মধ্যে তিনটি চেয়ার আর ছোট একটা টেবিল দেখতে পায় মেলিং। আশ্চর্য হয়। সে আজ তিন বছর আগের কথা। সে সব কথাই এখন বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জিত। মুহূর্তের মধ্যে দুটি পাখীর অতীত জীবনের অনেক রঙিন স্বপ্ন, দুরেলা গুঞ্জন তার মনের তারে বেজে ওঠে। আগে সে আর বিলি ঠিক এই জায়গাতে বসে মুখোমুখি হয়ে চা পান করতো। অনেক স্বপ্নের জাল বুনতো।

মিসেস ওয়াকার বললেন স্ট্যান, তোমার সারা বাড়িটাই একটি হাসপাতাল হয়েছিল। হাসপাতালে যেমন নার্সের প্রয়োজন, প্রতি সংসারেও নার্সের দরকার। হেসে ওঠেন মিসেস ওয়াকার।

মেলিং একটু হেসে অন্য দিকে তাকায়। সন্ধ্যার আবছা আলোতেও দেখতে পায় সে উঠোনের সেই চিপিকরা আবর্জনা আর নেই। কী সুন্দর। রঙিন মাছগুলো মুখে আহার নিয়ে কিলবিল করে সাঁতার কাটছে। সবুজ ঘাসগুলো দুলছে, হেলছে, হাসছে। ঘরের দেওয়ালে ঝুলছে নূতন করে নূতন সেই কটোটা। অন্য চোখ অন্য মন, আর এক নূতন জীবন!

বাদশা বেগমের দেশে

রাম বসু

[জন লিনসেট হলেন ওলন্দাজ পর্যটক ও ভৌগলিক। অল্প বয়সে তিনি স্পেনে এসেছিলেন। এখানে স্পেনীয় ভাষা শিখে প্রধান যাযকের অধীনে কাজ নিয়ে আসেন গোয়ায়। ১৫৮৩ সালে তিনি আসেন গোয়ায় এবং ফিরে যান ১৫৮৭ সালে। এই সময় তিনি এই স্মৃতিকথা লেখেন।]

। এক ।

। যাত্রারম্ভ ।

যেতে হবে মাদুরা।

১৫৮০ সালের ৮ই আগস্ট মাদুরা উদ্দেশ্যে পাড়ি জমালাম। লিসবন নদী থেকে আমাদের জাহাজ যাত্রা দরিয়ার দিকে চলল।

জাহাজটা আমাদের বড়ই। প্রায় শ' চার পাঁচ লোক ধরে। এই সব জাহাজে যায় সৈন্য আর নাবিক। যে বার এই সব লোকজন বেশি যোগাড় করা যায় সেবার জাহাজে আর পা' ফেলবার ঠাঁই থাকে না। যেবার লোকজন কম যোগাড় হয় সেবার মহা আরামে যাওয়া যায়।

এই সব জাহাজে মালপত্র বেশি থাকে না। পণ্য থাকে খুবই কম। থাকার মধ্যে বেশি করে থাকে তেল আর মদের পিপে। যাত্রীদের সঙ্গে পর্তুগীজ মুদ্রা থাকে। বেশ বেশি করে এই মুদ্রা রাখতে হয়। কারণ ভারত থেকে এই মুদ্রায় তাদের মরিচ কিনতে হবে। মরিচই পর্তুগীজ বণিকদের কাছে দামী পণ্য। তাই ভারত থেকে এই মাল কিনে পাঠাবার জন্য পর্তুগীজ মুদ্রা জাহাজে করে ভারতে পাঠান হয়ে থাকে।

নদীর মুখ ছাড়িয়ে জাহাজ পড়ল সাগরে। আর কোন যাত্রীর আসার সম্ভাবনা নেই। এইবার যাত্রীদের মাথা গোনার পালা। উদ্দেশ্য হল জাহাজে যে ক'জন যাত্রী যাবে বলে ঠিক হয়েছিল শেষ পর্যন্ত তারা সবাই উঠতে পারলে কি না!

মাথা গোনা হল। যদি কোন যাত্রী শেষ অবধি জাহাজে না ওঠে, তবে তার নাম লিখে রাখে বকসী। অনুপস্থিত যাত্রীর মাল যদি জাহাজে থাকে তবে সেই মালের মোটামুটি একটা দাম ধরে নিয়ে সেই নামের সঙ্গে লিখে রাখা হয়। এই মালের মালিকানা এবার জাহাজের ক্যাপটেনের। দরকার পড়লে ক্যাপটেন সেই মাল বিক্রি করতে পারেন। যেতে যেতে কোন যাত্রী যদি মারা যায় আর জাহাজে যদি তার কোন মাল থাকে তবে এই মালেরও মোটামুটি একটা দরদাম ঠিক করা হয়। অবশ্য মৃত যাত্রীর ওয়ারিশ সেই দাম হয় একটা পায় না। জাহাজের খালাসী বকসীরা নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে নেয়।

জাহাজে নানা কর্মী থাকে। মাঝি মল্লা, পাইলট, বকসী ক্যাপটেন প্রভৃতি কর্মি ও পদমর্যাদা অনুসারে তাদের মাইনে দেওয়ার ব্যবস্থা।...

। গোয়া ।

ভারতে পর্তুগীজদের সব কিছু আছে ওই গোয়াতে। গোয়াই হল প্রাণকেন্দ্র। এখানে থাকে পর্তুগীজদের প্রধান শাসন কর্তা, প্রধান ধর্ম যাজক। প্রধান বিচারপতি ও পর্তুগালের রাজপ্রতিনিধিরও বাস এখানে। গোয়া থেকে এশিয়ার পর্তুগীজ উপনিবেশগুলি শাসিত হয়।

নানা প্রকারে পণ্য পাওয়া যায় এখানে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই পণ্য আমদানী হয়। ক্রেতার সংখ্যাও বহু। তারা হরেক রকম জাতের মানুষ। এখানে আসে আরব, আবেসিনিয়া, পারশ্য, শ্যাম, মালাক্কা, যবদ্বীপ ও চীনের বণিক। বাঙলা দেশের বণিকদেরও দেখা

যায় গোয়ার বাজারে। বিভিন্ন জাতি ও পণ্যের সমাবেশে গোয়া অপরূপ হয়ে ওঠে।

তবু পর্তুগীজদের প্রাণকেন্দ্র এই গোয়া আদপে একটা দ্বীপ। এর পরিধি মাত্র তিন মাইল। চার দিক থেকে নদী এসে ঘিরে ধরেছে ভারতের উপকূলের এই অপরূপ দ্বীপটিকে। উত্তর দিক থেকে নদী প্রবাহিত হয়ে বেষ্টন করেছে দক্ষিণ দিক। দেখতে হয়েছে যেন জল-পথের আধখানা চাঁদ। নগরীর মাঝখান দিয়েও বয়ে গেছে ছোট ছোট নদী। তবে এই সব নদীর গভীরতা নেই। বর্ষা কালেও হেঁটে পারাপার করা যায়। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর গতিপথে উৎপন্ন হয়েছে কতকগুলি দ্বীপ। গোয়ার আদিবাসীরা বাস করে এই দ্বীপগুলিতে। নগর রক্ষার জন্য পর্তুগীজরা নির্মাণ করেছে এক প্রকার দুর্গ।

॥ বার্দেস ও সালিসিট ॥

গোয়ার উত্তরে বার্দেস দ্বীপ। পর্তুগালের জাহাজ মেরামত করা হয় এখানে। এই দ্বীপটাও পর্তুগীজদের। কানারীন নামে এক উপজাতি এই দ্বীপে বাস করে। কিন্তু তারা প্রায় সকলেই খৃস্ট বিশ্বাসী। তবে খৃস্টান হলেও কি হবে এরা দেশীয় আচারব্যবহার বিসর্জন দেয়নি। এদেশের অধিকাংশ লোকের মত এরাও সংক্ষিপ্ত পোশাক পরে থাকে। অর্থাৎ শরীরের অন্যান্য অংশকে অনাবৃত করে। এই দ্বীপ তাল আর নারকেল গাছে ভর্তি। তবে তালের সংখ্যাই বেশি।

॥ সালিসিট ॥

গোয়ার দক্ষিণ দিকে সালিসিট নামে আর একটা দ্বীপ আছে। এটিও পর্তুগালের অধীন। বাসিন্দাও খৃস্টান মতাবলম্বী কানারীন উপজাতির লোক। তবে সালিসীটকে দ্বীপ না বলে বলা যায় তালকুঞ্জ। গোয়া এবং সালিসীটের মাঝখানে আরও কতকগুলি দ্বীপ আছে। তালগাছ এই দ্বীপের বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন গোয়া নামে আর একটা দ্বীপ আছে। তবে প্রাচীন গোয়ার বিশেষ খুব বেশি নেই। অনুর্বর এই দ্বীপটিতে লোক বসতি খুবই সামান্য।

বার্দেস এবং সালিসীট দ্বীপ থেকে খাজনা আদায় করা হয় এবং এই খাজনার টাকায় গোয়ার প্রধান শাসক, ও অন্যান্য কর্মচারী ও শাসকদের ব্যয়নির্বাহ হয়।

এই সব দ্বীপের মাঝে মাঝে কোথাও কোথাও পাহাড় মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। কোন অংশ একেবারে মরু-ভূমির মত। তবে ভূমিতট সর্বত্র অসমান। তাই দেখা যায় লোক বসতি সমুদ্রের তটভূমিতে বেশ ঘন! অধ-জমাট গ্রামগুলি এখানেই—সমুদ্রের ধারে তালকুঞ্জের নীচে। সমুদ্রের ধার ছাড়া আর কোথাও যে গ্রাম নেই এ কথা তবু বলা চলে না। কারণ হ্রদ বা নদীর ধারেও মানুষের বসতি আছে!

বার্দেস-এর তিন মাইল দূরে জাহাজ মেরামত করা হয়। বড় বড় জাহাজ পণ্য ও নামায়ই। অন্যান্য জাহাজও নামায়। কারণ পণ্য সমেত আসতে বিশেষ অসুবিধা হয়।

॥ সজ্জিতা নগরী এই গোয়া ॥

গোয়া শহর একেবারেই পর্তুগীজদের শহর। এর সব কিছুই রুচির সঙ্গে মিলে যায়। নগরের মধ্যে গড়ে উঠেছে বড় বড় বাড়ি; রাস্তাগুলো খুব চওড়া। বলা যায় গোয়া হল সজ্জিতা নগরী।

গরম দেশ বলে বাড়ির ভিত নিচু করতে হয়েছে। প্রত্যেক বাড়ির পিছনে আছে চমৎকার বাগান। বাগানে থাকে হরেক রকম ফুলের গাছ; নানা রকমের ফলের গাছ। ফুলে ফলে পরিপূর্ণ বাগানে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা খেলা করে বেড়ায়। রুক্ষ ও কর্কশ গোয়ায় তাই ফুল আর ফলের বাগান মোটেই বিরল নয়। ভারতীয় মেয়েরা এই সব বাগানে বেড়াতে এসে খুব খুসি হয়। পুরুষেরা আসে খেলা করতে। প্রাসাদ পুরী গোয়াতে মঠ মন্দিরও আছে প্রচুর। এই সব দেখে লিসবনের কথা মনে পড়ে যায়। কিন্তু গির্জাতে আমি কোন যাজিকা দেখিনি। হয়ত, দেশ ঘর ছেড়ে এতদূরে আসতে তাদের আপত্তি আছে।

গোয়া পর্তুগালের উপনিবেশ; তাই পর্তুগালের আইনকানুন, রীতিনীতি এখানে চলে। এখানে বাস করে ব্রাহ্মণ, গুজরাটি, ইহুদি। ভারতের প্রত্যেক জাতির লোক দেখা যায় শহরে। তাদের অনেকেই পৌত্তলিক। পর্তুগীজরা পৌত্তলিকতার বিরোধী। তবু পর ধর্ম

সম্পর্কে তারা সহিষ্ণু। প্রত্যেকেই তার নিজস্ব বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্ম আচরণ করতে পারে। শাসকদের তরফ থেকে কোন বিধি নিষেধ আরোপ করা হয় না।

কয়েকটা আচরণের ওপর নিষেধ আছে অবশ্য। অর্থাৎ কুসংস্কারপূর্ণ আচরণ প্রকাশ্য ভাবে এই দ্বীপে অনুষ্ঠিত হতে পারবে না। যেমন, শবদাহ করা চলবে না। ভারতীয় মতে বিবাহ হতে পারবে না। কিন্তু গোয়ার খৃস্টান অধিবাসীদের বিরক্তির কারণ না হয়ে যদি কেউ এই সব আচরণ করে তবে শাসন কর্তা তা মেনে নেন। অর্থাৎ কতকগুলো আবার অনুষ্ঠান প্রকাশ্যে হতে পারবে না; তবে গোপনে চলে আপত্তি নেই।

এ ছাড়া ভারতীয় এবং পর্তুগীজদের মধ্যে কোন বৈষম্য নেই। তারা সবাই একই আইনের অধীন। আইনের চোখে কোন ভেদাভেদ নেই। ভারতীয়দের ক্ষেত্রে একটা বাড়তি আইন আছে। যে সব ভারতীয় খৃস্টান হয়েছে তাদের মধ্যে যদি কুসংস্কার পূর্ণ আচার ব্যবহার দেখা যায় তবে তাদের অপরাধী বলে গণ্য করা হয় এবং শাস্তি দেওয়া হয়।

ফুল ফলের বাগান থাকলেও গোয়া দ্বীপটি অনুর্বর; পাহাড়ী অঞ্চল। তাই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্তর আমদানী করতে হয়। যেমন ভারত থেকে আসে চাল, গম ইত্যাদি। বার্মা ও শ্যামদেশ থেকে আসে ডিম, মুরগী ইত্যাদি। গোয়ায় যা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় তা হল তাল গাছের রস থেকে তৈরি করা মদ;—যাকে বলা হয় তাড়ি। এ বস্তুটি এত প্রচুর যে গোয়া তার নিজস্ব চাহিদা মিটিয়েও বাইরে চালান দেয়।

খাওয়ার জলের খুবই অভাব এখানে। নগরের বাইরে কুয়ো। ক্রীতদাসেরা নগরের বাইরের কুয়ো থেকে জল এনে শহরে বিক্রি করে। এই কুয়োর জল খুব ভাল, মিষ্টি। তাই এই জল শুধু মাত্র খাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। আর ঘরের কুয়োর জল সংসারের অন্যান্য কাজ, যথা স্নান করা, বাসন মাজা ইত্যাদি সারা হয়।

গোয়ায় এক ধরনের লাল মাটি দেখতে পাওয়া যায়। ইতালির বিজ্ঞানীদের ধারনা এই যে গোয়ার এই লাল মাটি থেকে পাওয়া যাবে সোনা আর তামা। এ বিষয়ে পরীক্ষা ও খনন কাজ চালাবার জন্য তারা পর্তুগালের রাজ প্রতিনিধির কাছে অনুমতি চেয়েছিল। কিন্তু রাজ প্রতিনিধি অনুমতি দেননি। কারণ, এতে পরিণামে দুই জাতির মধ্যে বিরোধ ঘটতে পারে।

মাষ্টিকোস

পর্তুগীজরা এদেশে এসে এদেশের মেয়ে বিয়ে করে। এই ধরনের বিয়ে থেকে যে সন্তান জন্মায় তাদের বলে মাষ্টিকোস। এদের গায়ের রঙ একটু পীতাভ। তাছাড়া অন্য সব দিক থেকে এই মাষ্টিকোসরা পাকা পর্তুগীজদের সমান। তবে মেয়ে মাষ্টিকোসরা সব দিক থেকে অপূর্ব সুন্দরী।

কিন্তু মাষ্টিকোসদের ছেলে মেয়েরা অনেকটা ভারতীয়দের মত। অর্থাৎ অধস্তন তিন পুরুষে এসে পর্তুগীজরা হয় ভারতীয় ঘোঁষা। আর এই সব লোকেরাই যায় বাণিজ্যে। বাংলা, পেগু, মালাক্কা। চীন প্রভৃতি দূর দূর দেশে বাণিজ্য করতে যাবার জন্য এরাই দেয় সাগর পাড়ি।

গোয়ার হাট বাজার

রোজ সকাল বেলা গোয়ায় হাট বসে। শহরে বড় রাস্তার ধারে এই হাট। সকাল সাতটা থেকে ন'টা অবধি চলে। রোদ চড়া হলে হাট বন্ধ হয়। গোয়ার সাধারণ নাগরিক, বিদেশী ও স্বদেশী বণিক সবাই নিয়ম করে এই হাটে হাজির হয়। কতকগুলো লোক চিৎকার করে জিনিষের দর বলতে থাকে। এদের বলে চোপদার। চিৎকার করে দাম জানানো তাদের কাজ।

হাটে এরা নিয়ে আসে সোনার জিনিষ, মুক্তো, আংটি। থাকে নানা প্রকারের দামী দামী পাথর। বিক্রির জন্যে আসে ক্রীতদাস। এই ক্রীতদাসেরা হয় ক্রীতদাস ক্রীতদাসীর সন্তান, না হয় যুদ্ধবন্দী। এদের মধ্যে আছে বুড়ো বুড়ী, যুবক যুবতী। আমরা যেমন বাজারে গিয়ে পরু ছাগল দরাদরি করি, নানা ভাবে দেখে শুনে পছন্দ করি এই হাটে ক্রীতদাসদের ঠিক সেই রকম দেখে শুনে পছন্দ করে, দরদস্তুর করে ক্রেতারা।

তাছাড়া আসে বাংলা দেশ এবং চীন থেকে নানা রকমের আশ্চর্য জিনিস। আসে আরব দেশের ঘোড়া, বিভিন্ন মসলা আর মিষ্টি মদ। কাপড় ও সিল্কের পণ্যও এখানে বহু-প্রচুর।

জিনিষ পত্র কেনা বেচা এই নগরের অধিবাসীদের একমাত্র পেশা। এক সময় কেনে, অন্য সময় বিক্রি করে। মৃত ব্যক্তির পণ্যও বাজারে আসে। এমন কি রাজ প্রতিনিধি যদি মরে তবে তার পণ্যও এই ভাবে বিক্রি হবে। মৃত ব্যক্তির পণ্য এমন ভাবে বিক্রি করার মধ্যে একটা উদ্দেশ্য আছে। মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ যাতে ন্যায্য দাম পান, যাতে তারা প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত না হন, তার জন্যেই এই প্রথার সৃষ্টি। এর থেকে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ বাজারদরই পেয়ে থাকেন। উশৃঙ্খল জীবন-যাত্রা, অনিয়ম, অত্যাচার এবং দারুণ গরমের জন্য প্রত্যেক বছর বেশ কিছু লোক মারা যায়। তাই এই সব মৃত-ব্যক্তির জিনিস পত্র বাজারে বিক্রি হয়। ভারতে পর্তুগীজদের প্রত্যেক ক্রীতদাস ক্রীতদাসীদের অভিজাত অর্থে জীবন যাপন করতে দেখেছি। এদের বিশ ত্রিশটা করে ক্রীতদাস ক্রীতদাসী থাকে। ক্রীতদাসরা অন্য লোকের কাজ করে। এই কাজের জন্য তারা মজুরী পায়। কিন্তু তারা সেই মজুরী তাদের মালিকের হাতে তুলে দেয়। শহরের কুয়ো থেকে খাওয়ার জল আনার কাজ পাওয়া যায় সব সময়। ক্রীতদাসীরা করে হাল্কা কাজ। কেউ কেউ মিষ্টি তৈরি করে বিক্রি করে। কেউ কেউ করে চাটনী। যাদের হাতে সেলাই ফোড়াই চলে ভাল তারা করে সূচের কাজ। মালিক তার সব চেয়ে সুন্দরী ক্রীতদাসীকে দিয়ে এই সব জিনিস বাজারে বিক্রি করার জন্য পাঠায়। উদ্দেশ্য হল, সুন্দরী হাতে সুন্দর জিনিস দেখলে ক্রেতা না কিনে থাকতে পারবে না।

কেউ কেউ টাকার ব্যবসা করে। পর্তুগাল থেকে আসার সময় জাহাজে করে প্রচুর পরিমাণে পর্তুগীজ মুদ্রা আনা হয়। জাহাজ ঘাটে ভিড়লে এই সব ব্যবসাদাররা সেই টাকা কিনে চুপ করে বসে থাকে। এপ্রিল মাসে গোয়া থেকে জাহাজ যায় চীনে। তখন বাজারে পর্তুগীজ মুদ্রার টান থাকে এবং এই টানের মুখে ব্যবসাদাররা শতকরা কুড়ি কি পঁচিশ টাকা লাভে পর্তুগীজ মুদ্রা বিক্রি করে। কোচিনে মরিচ কেনার জন্যে দরকার পড়ে পারশ্য দেশের মুদ্রার। কোচিনে আবার পারসী মুদ্রার কদর খুব বেশি। প্যাগোডা এবং অন্যান্য রকমের মোহরের কেনা বেচা চলে গোয়ার বাজারে। বেশ কয়েক ঘর আছে যাদের টাকার কেনা বেচাই একমাত্র পেশা। তারা সবাই সম্মানীয় এবং অসম্ভব রকমের ধনী। টাকার কেনা বেচা করতে দেখেছি গোয়ার পাদ্রীদেরও তবে তারা এ কাজ অতি গোপনে ও সাবধানে করে থাকে। কেউ কেউ আবার তাল গাছের আয় থেকে সংসার চালায়। তাল গাছ থেকে মদ আয় হয় না।

পর্তুগীজের রকম ফের

গোয়ায় দু'জাতের পর্তুগীজ আছে। বিবাহিত পর্তুগীজরা হল এক জাতের। আর অ-বিবাহিত থাকা মানেই সৈন্য হওয়া; এ একেবারে বাধ্যতামূলক। কিন্তু এরা নিয়ম মাফিক সৈন্যদলের সেনা নয়। তাই তাদের না থাকে কোন নির্দিষ্ট রেজিমেণ্ট না থাকে কোন সেনাপতি। তবু প্রয়োজন এলেই এই অ-বিবাহিতদের এগিয়ে যেতে হবে যুদ্ধক্ষেত্রে। ভারতে প্রত্যেক পর্তুগীজ স্বাধীন। এখানে এসে তারা যা ইচ্ছে তাই করতে পারে, যেখানে ইচ্ছে সেখানে যেতে পারে। পর্তুগাল থেকে আসার সময় সরকারের কাছে একবার নাম লিখিয়ে আসতে হয়। ভারতে পৌঁছে রাজ প্রতিনিধির কাছে লেখাতে হয় আর একবার। বোঝাতে হয় যে, যে পর্তুগীজ 'ভারতে যাচ্ছি' বলে ঘর ছাড়ল সে সত্যি সত্যিই শেষ অবধি ভারতে এসেছে।

পর্তুগীজ, খ্রীষ্টিকোস আর ভারতীয় খৃষ্টান—এই নিয়েই গোয়া শহর। এদের প্রত্যেকের বাড়ি সুসজ্জিত এবং রুচিসম্মত। প্রত্যেকটি ঘরই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কোথাও মলিনতা দেখা যায় না। বেশভূষার পরিপাটির অন্ত নেই। অবস্থা অনুযায়ী প্রত্যেকের ক্রীতদাস আছে। এই ক্রীতদাসের সংখ্যা পাঁচ থেকে ত্রিশ।

এখানে পর্তুগীজরা সম্মানীয় জাত। রাস্তায় চলা-ফেরা করার সময় এই গৌরব আর অহংকার ফুটে ওঠে সাধারণ নাগরিক, ব্যবসায়ী, সৈনিক, সবাই এই গৌরবের অধিকারী। এখানে পর্তুগীজদের এই আভিজাত্য যেন প্রাপ্য এ যেন তাদের অধিকার।

তাই পর্তুগীজ সাহেব রাস্তায় বার হলে ক্রীতদাস তালপাতার ছাতা প্রভুর মাথায় ধরে পিছনে পিছনে চলে। গরমে বা বর্ষায় প্রভুর যাতে বিন্দুমাত্র কষ্ট না হয় সেদিকে তাদের কড়া নজর। বর্ষাকালে থাকে আর একটা বাড়তি জিনিস। প্রভু যাতে ভিজে না যান সেজন্য অপাবরণ নিয়ে তৈরী থাকে বালক ক্রীতদাস। দুপুরে সাহেব যান গীর্জায়। বালক ক্রীতদাস ছোটে প্রভুর জন্যে তাকিয়া নিয়ে। তলোয়ার নিয়ে বেড়ান কষ্টকর।, তাই চাকর চলল প্রভুর তলোয়ার নিয়ে। কারো পদমর্যাদায় যাতে কোন হানি না হয় সে দিকে সকলে বড়ই সজাগ।

অভিবাদন করার রীতি সব সময় মেনে চলতে হয়। রাজপথে হয়ত দুজন সাহেবের দেখা হবে। তখন দুজনেই এক পা এগিয়ে দিয়ে মাথা থেকে টুপি খুলে পরীর মত করে টুপি মাটিতে ছোঁয়াবে। এই-ই হোল গোয়ার অভিবাদনের রীতি। গীর্জাতে দেখা হলেও ঠিক এই ভাবে অভিবাদন করতে হবে। আবার সাহেবের গীর্জায় আসার আগেই সাহেবের ক্রীতদাস গির্জায় এসে প্রভুর বসার আয়োজন ঠিক করে রাখে।

গির্জায় দেখা হলে অথচ কেউ হয়ত এমন ভাবে অভিবাদন জানাল না। তখন প্রলয় কাণ্ড হয়। কারণ এত সোজাসুজি অপমান। তাই অপমানিত ব্যক্তি এবং তার বন্ধুরা একসঙ্গে মিলে অপমানকারীর কাছে যায় এবং বলে যে সে সম্মান পাবার আদৌ যোগ্য নয়। তখন তারা সবাই মিলে সেই ভদ্রলোকের মাথা থেকে টুপি তুলে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দেয়।

প্রকাশ্যে এমনভাবে অপমানিত হওয়ার পর ভদ্রলোকও চুপ করে থাকে না। সেও যায় তার বন্ধুদের কাছে, প্রতিহিংসার ফন্দি আঁটে। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার রীতিও সহজ। সে এবং তার বন্ধুরা হয় প্রতিপক্ষকে মেরে আধমরা করে ছেড়ে দেয়, না হয় ক্রীতদাস দিয়ে খুন করায়। খুন করার ইচ্ছে না থাকলে প্রতিপক্ষকে লাঠি পেটা করা হয়। পাঁজরে আঘাত করা হয় আট দশদিন শয্যাশায়ী করে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার নিম্নতম বিধি।

অনেকে আবার প্রতিশোধ নেবার জন্যে বালি ভর্তি পলে ব্যবহার করে। এই ধরনের প্রতিশোধ নেওয়ার হাত পা ভেঙ্গে যায়, কেউ কেউ আজীবন পঙ্গু হয়ে পড়ে। এই আচারব্যবহার গোয়ার স্বীকৃত বিধি। সবাই মেনে নিয়েছে। কেউ কোন প্রতিবাদ করে না। তাই এই ধরনের ব্যবহার বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনাও দেখা যায় না।

কেউ যদি কারো বাড়িতে যায় তবে তাকে নানাভাবে অভ্যর্থনা জানাতে হয়। এখানে পদমর্যাদার কোন বেছাই নেই। একজন সাধারণ নাগরিকের বাড়ি আর একজন সাহেব নাগরিক বেড়াতে গেলে যে ধরনের অভ্যর্থনা জানাতে হয় ঠিক সেই ধরনের অভ্যর্থনা জানাবেন স্বয়ং রাজ প্রতিনিধি তাঁর বাড়িতে নিম্ন কর্মচারীর প্রতি।

কেউ এলে গৃহস্বামী মাথার টুপি খুলে দরজায় দাঁড়িয়ে বিনীতভাবে অভ্যাগতকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসতে হবে। তারপর গৃহস্বামী অভ্যাগতকে বসার জন্য আসন বাড়িয়ে দেবেন। অভ্যাগত আসনে বসলে গৃহস্বামী বসবেন। তার আগে তিনি কিছুতেই বসতে পারবেন না। কথাবার্তা শেষ হলে গৃহস্বামী আসন ছেড়ে উঠে অভ্যাগতকে নিয়ে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বিদায় জানাবেন। এই হল রীতি। অভ্যাগতকে বসতে দিতে হবে সব চেয়ে ভাল আসনে। গৃহস্বামী যদি প্রথা অনুযায়ী অভ্যর্থনা না করেন এবং তিনি যদি সব চেয়ে ভাল আসনটিতে অতিথিকে বসতে না দেন তবে তার অর্থ হবে অতিথিকে অপমান করা এবং এই গর্হিত আচরণের জন্য তিনি হবেন সকলের ঘৃণার পাত্র। অপমানিত ব্যক্তি হয়ত এই ঘৃণার প্রতিশোধও তুলতে পারে।

। বিয়ে ।

গোয়ায় বিবাহ অনুষ্ঠান এক দর্শনীয় ব্যাপার। তার সাজ পোষাক, উৎসব আনন্দ আলাদা ব্যাপার। বর কনে বিয়ে করতে যাবে, নিমন্ত্রিত বন্ধু বান্ধব বিয়ের দিন ঘোড়ায় চড়ে সাজ সজ্জা করে হাজির। ঘোড়ায় চড়ে তাদের সেদিন আসতেই হবে। যাদের ঘোড়া নেই তারাও সেদিনের মত অন্য কারো কাছ থেকে [illegible] নি

আসবে ঘোড়া। দাম সওয়ার যাহার যেমন বেশি। মাথায় থাকবে টুপি। সঙ্গে আসবে তাদের ক্রীতদাস। তারা প্রভুর মাথা রোদ ঝড়ের হাত থেকে বাঁচাবে। এই ভাবে পঞ্চাশ কি একশ' নিমন্ত্রিত ব্যক্তি শোভাযাত্রা করে যাবে গির্জার দিকে। শোভাযাত্রার শেষ দিকে থাকবে বরকনের বাবা মা, আত্মীয় পরিজন। এবং সব চেয়ে শেষে থাকবে বর। বরের দুই পাশে দুই বন্ধু। এই ভাবে বর যাবে গীর্জায়।

বরের ঠিক পিছনে দামী পালকী চড়ে দুই বান্ধবী নিয়ে আসবে কনে। তার পিছনে ক্রীতদাস ক্রীতদাসীর দল। বর কনের বিয়ে হবে রোমান ক্যাথলিক মতে।

বিয়ে হয়ে যাবার পর ঠিক সেইভাবে শোভাযাত্রা করে দলবল যাবে বরের বাড়ি। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা বসবেন কার্পেটের ওপর। আর জানলার ওপর বসবেন বর ও কনে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা তখন বর কনের গায়ে ছিটিয়ে দেবে অত্তর জল, পান গন্ধ। ক্রীতদাস ক্রীতদাসীরা বাজাবে বাজনা। যারা ঘোড়ায় চড়ে এসেছিলেন তাদের কাজ তখনও বাকি। তারা শেষ করে বর কনেকে নিয়ে যাবেন ঘোড় দৌড়। এই ভাবে বেশ কিছুক্ষণ আনন্দ অনুষ্ঠানের পর সবাই বর কনেকে আশীর্বাদ করে বাড়ি ফিরে যাবে। থাকবে মাত্র দু'চার জন বন্ধু বান্ধব। তারা বর কনের সঙ্গে আহারপর্ব সেরে বাড়ি যাবে। স্ত্রী ভোজের অনুষ্ঠানটা অনাড়ম্বর হয়ে থাকে।

ঃ শিশুর নামকরণ ঃ

শিশুর নামকরণের উৎসবও হয় বেশ আড়ম্বরপূর্ণ। এ ক্ষেত্রেও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা ঘোড়ায়চড়ে আসেন শিশুর পিতৃব্যর বাড়ি। সেই শোভাযাত্রার পিছনে আসেন শিশুর পিতা। তাঁর সঙ্গে থাকে তাঁর দু'জন বন্ধু। এরা হেঁটে আসেন। এক জনের হাতে থাকে রুপো কিংবা সোনার বিরাট থালার একখানা রুটি এবং নানা রকম কারুকার্য করা একটা মোমবাতি কয়েকটি গোলাপ ফুল। মোমবাতি তৈরী করতে বেশ শিল্প বুদ্ধির দরকার। কারণ এ তো আর বাজারের সহজলভ্য মোমবাতি নয়। এই মোমবাতিতে সোনার কাজ করা। মোমবাতির মধ্যে থাকে একটা হীরের এবং একটা রুপোর টাকা। যে পাদ্রী নামকরণ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করবেন এই মোমবাতি হবে তাঁরই প্রাপ্য। অন্য বন্ধুর হাতে থাকে রুপোর থালা। তাতে থাকে নুনের পাত্র এবং রুপোর প্রদীপ। দু'জনেরই কাঁধে থাকে তোয়ালে। শোভাযাত্রার পিছনে পালকী করে আসেন শিশুর ধর্ম মা' ও তার দাই মা।

অনুষ্ঠানের পর শোভাযাত্রা বাড়ি ফিরে আসে। এবারও ঘোড়ায় চড়ে আসা বন্ধুরা ঘোড় দৌড় দেখান। শিশুকে বসান হয় জানালার ওপর। তারই চোখের সামনে হয় ঘোড় দৌড়। কিন্তু এই ঘোড় দৌড়ে একমাত্র বিবাহিত নিমন্ত্রিতরাই যোগ দেয়।

অবিবাহিতরা, অর্থাৎ সৈনিকেরা থাকে অন্যত্র। এদের জীবন যাত্রা আলাদা ধরনের। সাগরের মধ্যে জাহাজে বাস। জাহাজ বাসটা সাময়িক। শুধু মাত্র গ্রীষ্মকালের জন্য। গ্রীষ্মকালের পর যে যার ঘর নিজের বাড়ি ফিরে আসে।

এদের সাজ খুবই আড়ম্বরপূর্ণ। এদের আভিজাত্য বড় স্পষ্ট। রাজপথে এরা যখন যায় তখন এদের রাজকীয় আড়ম্বর দর্শনীয় বস্তু। এদেরও সঙ্গে থাকে ক্রীতদাস। রোদ ঝড়ের হাত থেকে মাথা বাঁচানোর জন্য ক্রীতদাসদের হাতে থাকে নানা সরঞ্জাম। যাদের ক্রীতদাস রাখবার ক্ষমতা নেই তারা রাজপথে বার হওয়ার সময় ভারতীয়দের ভাড়া করে।

এক এক বাড়িতে দশ বারো জন সৈনিক বাস করে। তাদের দেখা শোনা করবার জন্য থাকে দু'জন ক্রীতদাসী। তারাই ঘরের কাজ করে। জামা কাপড় পরিষ্কার করে। আহার বিহারের ব্যবস্থাও করে।

[ক্রমশঃ]

হিমালয় অভিযান ও স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজ্‌ব্যাণ্ড্‌

দুঃসাহসী

১৯০৩ সালের ১৯শে জুন। সারাদিন অবিরাম—ধারায় ঝরে পড়ছে বৃষ্টি। আকাশটা যেন ফুটো হয়ে গেছে কোথাও। পাহাড়ের গা বেয়ে মুখর নৃত্য ছুটে চলেছে পুকিয়ে যাওয়া ঝরনাধারা। দার্জিলিং থেকে দু'শো জনের এক অভিযাত্রী দল যাত্রা সুরু করলো। পাহাড় পর্বত পেরিয়ে তারা যাবে আরো উত্তরে। নিষিদ্ধ দেশে। লামাতন্ত্র তিব্বতে।

সে দিনের সেই অভিযান ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। মানুষের সাফল্যের আর সংঘাতের দ্বিমুখি ধারা। এদেশে আজকের মানুষ আমরা এই দ্বিমুখী ধারার দুটোকেই প্রত্যক্ষ করেছি।

দুশো জনের সেই অভিযাত্রী দল, পিচ্ছল পাহাড়ী পথে একে একে দুরে-দুরে পার হলো তিস্তা উপত্যকা। খরস্রোতা তিস্তায় তখনো দুকূল প্লাবী ঢল নামেনি। বরফ্যে তারা সিকিমের মধ্য দিয়ে তিব্বতের পথ। বেশ কয়েকদিন কেটে গেল, প্রকৃতির প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করতে। তারা এসে থামলো গ্যাংটকে। অবসন্ন দেহগুলোকে একটু চাঙ্গা করে নেওয়ার জন্যে। তারপর আবার সুরু হলো চড়াই উৎরাই। —ওঠা নামার শেষ নেই যেন। অবশেষে একদিন ক্যাম্প ফাটানো হলো। তিব্বত সীমান্তের কোল ঘেঁষে, সিকিমের তংগু অঞ্চলে সমতলের বারো হাজার ফুট উঁচুতে।

খবর গেল সীমান্তের অপর পারে লামাদের দেশে। কিন্তু ওপারে খাম্বা জং থেকে কোন জবাব আসেনা তার। অভিযাত্রীদের সঙ্গে বাক্যালাপ করবে না লামাতন্ত্র। প্রতীক্ষায় দিন কাটে। কিন্তু নিশ্চেষ্টভাবে বসে থাকার যুগ সেটা ছিল না। ভারতে তখন কার্জনী আমল। এগিয়ে যেতে হবে বড়লাটের আদেশ। যদি শুধু কথায় কাজ না হয়, তাহলে যাতে কাজ হয় তাই করা হোক। খবর বিনিময় হলো অভিযাত্রীদলের সঙ্গে লাট দপ্তরের। আরো লোক চাই রসদ চাই, না হলে দুর্গম পথে, অনিশ্চয়তার মধ্যে এই মাত্র দুশো জন শিখ পাহারাদার নিয়ে যাওয়া যায় না। এদিকে তিনমাস ততো দিনে পার হয়ে গেছে।

অভিযাত্রী দলের নেতা অস্থির হয়ে উঠলেন। অপেক্ষা করতে না পেরে একাই ফিরলেন রাজধানীতে। কার্জন সাহেব তখন সিমলায় শৈলাবাসে। গেলেন সিমলায়। অনেক আলাপ আলোচনা চলো। লণ্ডনে হোয়াইট হলে খবর গেল। কিন্তু ১০নং ডাউনিং স্ট্রীটের কর্তা কিছুতেই হঠাৎ কিছু করবার পক্ষপাতী নন। অনেক যুক্তি-তর্কের পর নিমরাজী হলেন তিনি। তবে একটাই শর্তে, বাড়াবাড়ি যেন না হয় কোথাও। বেশি দূর এগিয়ে যাওয়া যাবে না। বড়ো জোর চুম্বি উপত্যকা পর্যন্ত। বড়লাট তাতেই রাজী। এবার যাওয়ার সংকেত পাওয়া মাত্র অভিযাত্রীদল দু' হাজার সৈন্য আর হাজার চারেক লোক-লস্কর যাত্রা সুরু করলো। কিন্তু ততো-দিনে শীত এসে গেছে হিমালয়ে। তবু যেতে হবে। অভিযানের নেতা দমে যাওয়ার লোক নন। আর চাল ছাড়ার পাত্র বড়লাট কার্জন তো কোন মতেই নন।

এবারেও তিব্বতী লামাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা চলতে লাগলো। কিন্তু তাদের যেন আলাপ আলোচনার কোন উৎসাহ দেখা গেল না। ১১ই এপ্রিল ১৯০৪ অভিযাত্রী দল পৌঁছলো গিয়াংৎসেতে। খণ্ড যুদ্ধও হয়ে গেল একটা। অপটু, অশিক্ষিত তিব্বতী সৈন্যই মরলো বেশি আর বাকীরা প্রাণভয়ে পালিয়ে গেল। লামাতন্ত্র এতোদিনে বুঝতে পারলো আলাপ আলোচনা না করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি। কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। ইংরেজ বাহিনী কার্জনের প্রেরণায় আর তাদের নেতার নেতৃত্বে রাজধানীর স্বপ্ন দেখছে। ভারতে ইংরেজের বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য ভৌগলিক সীমা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে আশে পাশে।

তাই অভিযাত্রী দল থামলো না। হোয়াইটের অনুমতি নিয়ে ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে ঢুকে পড়লো তিব্বতের প্রাণকেন্দ্র লাসায়। পোতালা প্রাসাদের সোনায় মোড়া ছাদের দৃশ্য দূর থেকে তাদের মনে কি ভাবের উদয় হয়েছিল, তা নিয়ে গবেষণা করে লাভ নেই। কিছু খুন-খখম করে ভয় দেখিয়ে তিব্বতী লামাতন্ত্রকে ভারতের ইংরেজ সরকারকে কতগুলো সুযোগ সুবিধা-

দিতে বাধ্য করা হলো। সেই সব সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করা হলো ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯০৪। অভিযাত্রী দলের বিজয়ী নেতা ফিরলেন ভারতে।

এই অভিযানের সাফল্য কেবল সামরিক কারণেই তাঁর নাম স্মরণীয় করে রাখেনি। এই অভিযানের রাজনৈতিক তাৎপর্য আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম স্বীকৃতি পায়, এই ঘটনার দশ বছর পরে ১৯১৪ সালের ত্রিপক্ষীয় সিমলা সম্মেলনে, আর অস্বীকৃত হয় অভিযানের ৪৮ বছর পরে ২০শে অক্টোবর ১৯৬২ সালে। সিমলা সম্মেলনে ১৯১৪ স্বীকৃত হয় ম্যাকমেহন সীমারেখা তিব্বত ভারতের সীমান্ত চিহ্নিত করে আর শেষের তারিখে চীনা সৈন্য সেই সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের মাটিতে পা দেবে। এই ঘটনার যিনি নায়ক, যাঁর নাম আজ বিস্মৃতপ্রায়। অভিযাত্রী দলের সেই নেতা হলেন স্যার ফ্রান্সিস্ ইয়ংহাজব্যাণ্ড্।

কিন্তু এই পটভূমিতে প্রায় ষাট বছর পূর্বে হিমালয়ের দারুণ শীতে ১৯ হাজার ফুট উপত্যকা অতিক্রম করার সামরিক ও রাজনৈতিক গুরুত্বের প্রসঙ্গ আপাততঃ মুলতুবী রেখে, এই অভিযানকে আরেকটি কারণে দুঃসাহসিক ঘটনার পথ প্রদর্শক বলা যায়। সামরিক অভিযানের নেতৃত্ব করতে গিয়েও সেই সম্ভবনার কথা ইয়ংহাজব্যাণ্ডের মনে এসেছিল।

দুঃসাহসী পর্যটক ছিলেন ইয়ংহাজব্যাণ্ড। ভারতের মাটিতে জন্মেছিলেন তিনি মুরীতে। অল্প বয়সে বিলতের স্যাণ্ডহার্স্ট থেকে সামরিক শিক্ষা নিয়ে তিনি ফিরে আসেন ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগদান করার জন্যে কিন্তু হঠাৎ তিনি বেরুলেন ঘর ছেড়ে দেশ ছেড়ে অজানার উদ্দেশে। একেবারে নিঃসঙ্গ অবস্থায়। সেটা ১৮৮৬ সালের কথা। ১৮৮৬ থেকে ১৮৯১ সাল এই ছয় বছরে তিনি ঘুরলেন চীনদেশ হয়ে মাঞ্চুরিয়া, তারপর কারাকোরাম পর্বত পার হয়ে পামীর মালভূমি ভিক্টোরিয়ে ফিরে এলেন ভারতে। তখন বয়স তাঁর তিরিশেরও কম। আর সেই অল্প বয়সেই যখন তিনি মাঞ্চুরিয়ার পাহাড়ে পর্বতে গভীর অরণ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সেই সময়েই ১৮৮৮ সালে বিখ্যাত রয়াল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি তাঁকে সদস্যপদ দান করলো। এই পর্যটকের মনই তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল সামরিক চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পর হিমালয়ের রহস্য উদ্ঘাটন করতে।

১৯০৩-১৯০৪ সালের দুঃসাহসী সামরিক অভিযানের সময়, দারুণ শীতের রাতে ১৯ হাজার ফুট উঁচুতে গিরিখাত পার হওয়ার সময় তুষার মৌলি হিমালয়ের উজ্জ্বল চূড়া দেখে তাঁর মনে হয়েছিল, এরাই হল পৃথিবীর স্বাভাবিক গির্জার চূড়া—"দি ন্যাচারাল ক্যাথিড্রলস্ অব দি ওয়ার্ল্ড"।

তুষারমৌলি গিরিরাজ হিমালয়। ভারতের কোটি কোটি মানুষের কাছে দেবতাত্মা। দিনান্তদৈনিক ঘরছাড়া জীবনে তাই সকলের মনে লুকিয়ে থাকা একটা বাসনা, হিমালয় দর্শন। সদাগরী আপিসের কনিষ্ঠ হরিপদ কেরানী থেকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত, এই বাসনার বিস্তৃতি। যুগ যুগ ধরে দেবতাত্মা হিমালয়ের এই ঘরছাড়া টানে অসংখ্য মানুষ পাড়ি দিয়েছে দুর্গম পার্বত্য পথে। সঙ্কা কারো কেদারবদ্রি, কারো কৈলাস মানস সরোবর। হিমালয়ের চূড়ায় নাম না জানা ফুলের দেশে, ভারতীয় সভ্যতার অসংখ্য দেবদেবী স্বর্গীয় বাসস্থান গড়ে তুলেছেন, যা দেখে, যার কথায় কল্পনা স্তব্ধ, শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়েছে কোটি মানুষের মন। এই সুষমা, স্বর্গীয় পরিমণ্ডল যে একজন ইংরেজের মনেও অপার্থিব প্রেরণা দেবে, সেটা ইয়ংহাজব্যাণ্ডের এই বিখ্যাত উক্তিটির আগে দি ন্যাচারল ক্যাথিড্রলস অব দি ওয়ার্ল্ড—বোঝা যায়নি। তিনি কিন্তু বিমুগ্ধ হয়েই থেমে গেলেন না। ইংরেজ জাতির স্বধর্ম, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী, দুর্বার সংকল্প জাগলো তাঁর মনে। হিমালয়কে দেখতে হবে। অনাদিকালের যে অসীম রহস্য তাকে কেন্দ্র করে ভারতীয় জীবনে প্রাণপ্রবাহ এনে দিয়েছে, সেই রহস্যকে মুখোমুখি প্রত্যক্ষ করতে হবে। সুরু হলো হিমালয় জয়ের স্বপ্ন আর সাধনা।

১৯১০ সালে স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যাণ্ড ইংলণ্ডের বিখ্যাত রয়েল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটীর সভাপতি নির্বাচিত হলেন। যে দুঃসাহস তাঁকে শান্ত জীবন থেকে টেনে পথে বের করেছিল, সেই মনই সেদিন

কল্পনা করেছিল এমন একটি দিনের সম্ভাবনার কথা যে দিন মানুষ তার শ্রেষ্ঠত্বের দাবীকে জোরদার করে দাঁড়াবে হিমালয়ের সর্বোচ্চ চূড়ায়। তিনি বলে ছিলেন : আমরা আশা করি, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এমন কথাও শুনবো যে একজন মানুষ গিয়ে দাঁড়িয়েছে পৃথিবীর চূড়ায়। এটি যেদিন ঘটবে সেদিন মানবজন্মের শ্রেষ্ঠত্ব শ্রেষ্ট মানে পৌঁছে যাবে।" তাঁর আশা অহেতুক ছিল না। শীতের রাতে উনিশ হাজার ফুট উঠতে লড়াই করে, অভিযান চালিয়ে, এ ধারণা যে কোন দুঃসাহসী মানুষের পক্ষেই স্বাভাবিক যে হিমালয়ের শ্রেষ্ঠ চূড়াও অগম্য নয়। তাঁর এই ধারনাকে সফল করার জন্যই বোধ হয় তিব্বত অভিযানের শেষে, লামাতন্ত্রের সঙ্গে চুক্তি করার সময় এই শর্ত আদায় করেছিলেন যে তিব্বতে হিমালয়ের বিভিন্ন অংশে পর্বতারোহী দলের কাজে কোন বাধা তিব্বতী শাসনব্যবস্থা দেবেন না।

কিন্তু এতো আশা করলেও ইয়ংহাজব্যাণ্ড আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও সোসাইটীর অর্থাভাবের জন্যে কোন অভিযাত্রীদল গঠন করতে পারলেন না। তবু হাল ছাড়েননি তিনি। কিন্তু তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টাই হঠাৎ থেমে গেল। পৃথিবীতে নেমে এলো অভিশাপ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। তাও শেষ হলো একদিন অনেক ক্ষয়ক্ষতির হিসেব নিকেশ করে। আবার উৎসাহের সঙ্গে কাজে লাগলেন স্যার ফ্রান্সিস। একটা দল গঠন করতে হবে, হিমালয় অভিযাত্রীদের যারা একেবারে না হোক, বারেবার এগিয়ে যাবে এই কঠোর সংকল্প সাধনে। অবশেষে সফল কিছু পাওয়া গেল। রয়েল জিও গ্রাফিক্যাল সোসাইটি, সুইজারল্যাণ্ডের সুইস অ্যালপাইন ক্লাবের মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠলো লণ্ডনের মাউন্ট এভারেস্ট কমিটি। আর এই কমিটির প্রথম সভাপতি হলেন স্যার ফ্রান্সিস ইয়ং হাজব্যাণ্ড। সেটা ১৯২০ সালের কথা।

কিন্তু তা সত্ত্বেও অভিযান সুরু করার ব্যাপক প্রস্তুতি যেন কিছুতেই আর শেষ হতে চায় না। এর মধ্যে একটি সুখবর পাওয়া গেল, লাসার ইংরেজ রেসিডেন্ট স্যার চার্লস বেল স্বয়ং দালাই লামার সঙ্গে দেখা করে মাউন্ট এভারেস্ট কমিটির তরফ থেকে হিমালয় অভিযানের অনুমতি সংগ্রহ করেছেন। দেখতে দেখতে একটা দুটো করে আরো বারোটা বছর কেটে গেল। ইয়ংহাজব্যাণ্ডের হিমালয় অভিযানের স্বপ্ন বুঝিবা স্বপ্নই থেকে যায়।

অবশেষে ১৯৩৩ সালে একটা সুগঠিত সুশিক্ষিত দল নিয়ে এভারেস্ট কমিটি এক অভিযানের আয়োজন করলেন। এই দলেরই ম্যালোরি আর আরভিং এভারেস্টের প্রায় দেড়শ ফুটের মধ্যে গিয়ে পড়েছিলেন কিন্তু তুষার ঝড়ে তাঁরা হারিয়ে গেলেন চিরদিনের মতো। এই অভিযাত্রীদলের অধিনায়ক স্যার হিউবার্ট-লেজ মন্তব্য করেছেন যে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শীর্ষে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার যে সংকল্প ব্যর্থ হয়ে গেল সেটাই একমাত্র লক্ষণীয়। মানুষ তার সফলতার মুখোমুখি এসেও প্রকৃতির প্রতিকূলতায় জয়ের মালা গলায় পরতে পারেনি। তবু স্বীকার করতেই হবে এই সাফল্যের যা কৃতিত্ব তার বেশীর ভাগটাই স্যার ফ্রান্সিসের প্রাপ্য। যে অদম্য আগ্রহ নিয়ে তিনি হিমালয় অভিযানের পরিকল্পনা করেছিলেন কোন বাধা কোন বিপত্তি তাঁকে সেই সংকল্প থেকে এক ইঞ্চিও বিচ্যুত করতে পারবে না।

সেই সংকল্প ইয়ংহাজব্যাণ্ড আমরণ বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। এই ঘটনার ঠিক কুড়ি বছর পরে আরেক ইংরেজ অভিযাত্রীদল যে দিন প্রথম হিমালয়ের চূড়ায় মানুষের বিজয় পতাকা প্রোথিত করে আসলো, সেদিন আর ইয়ংহাজব্যাণ্ড জীবিত নেই। ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে মৃত্যুর মুহূর্তেও তিনি বিশ্বাস করতে পেরেছিলেন, মানুষের এই চরম সাফল্যের দিন আগত ওই। তাই হিলারী ও তেনজিংয়ের যৌথ প্রচেষ্টায় যেদিন এভারেস্টের পর্বত চূড়া মানুষের কৃতিত্বের উদারের কাছে পরাজিত হলো, সেদিন অভিযানের নেতা কর্নেল হাণ্ট প্রথমেই যাঁর প্রশস্তি রচনা করেছিলেন, তিনি হলেন স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যাণ্ড। কারণ তাঁর ধৈর্য ও ইচ্ছাশক্তিই হিমালয় অভিযানের সাফল্যকে সম্ভব করেছিল।

পাদপ্রদীপের আলোর নীচে ঃ—

দাদাভাই নাওরোজী—গ্র্যাণ্ড ওল্ড ম্যান অব ইণ্ডিয়া

শ্রীবাস

পাদপ্রদীপের আলোয় যে মানুষের ছবি ভাস্বর হয়ে ওঠে, তাঁর সেই পরিচয়টাই সম্পূর্ণ নয়। এমনকি জীবনের বেশীরভাগ সময় যে কাজে কাটলেও নয়। কারণ জনচিত্তে ঠাঁই করে নিতে যে বিরাট প্রেরণা, উদ্যম পিছনে রয়ে গেল, তাদের কথা পাদপ্রদীপের আলোয় দাঁড়ানোর মুহূর্তে থাকে বিস্মৃত। সমকালের মানুষ সম্পর্কে যদি একথা যথার্থ হয়, তাহলে যাঁদের পিছনে রেখে জীবন এগিয়ে গেছে মহাকালের দিকে তাঁদের ক্ষেত্রে বেশীর ভাগটাই তো অন্ধকার।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অনিবার্য পরিণাম স্মৃতি, তারপর বিস্মৃতি। তাই পাদপ্রদীপের আলোয় যে মুখ একদিন নিয়ত উদ্ভাসিত, তাও একদিন হয়ে যায় স্মৃতি। তারপর হারিয়ে যায় বিস্মৃতিতে। কিন্তু কিছুই যায় আসে না তাতে পরবর্তী যুগজীবনের। এমন কতো ঘটনাইতো ঘটছে প্রতিনিয়ত। কে তাদের খবর রাখে মনের মণিকোঠায় সঞ্চয় করে। কিন্তু চিরকালই মানুষের সভ্যতায় এমন কিছু মানুষ থাকেন যাঁদের প্রতিভার, প্রেরণার, সাফল্যের, বিফলতার পরিমাপ শুধু একটা জীবনের সীমানাতে সম্ভব নয়। সমকাল থেকে তাঁরা ছড়িয়ে পড়েন অনাগত কালের দিকে, অন্ধকার ভবিষ্যতের বুকে নিষ্কম্প। দীপশিখার মতো। ইতিহাসের পাতায় তাঁরা কেবল নিছক কয়েকটা নামের তালিকা নন। সেখানে নামের আড়ালে মানুষটিকেও সহজে চেনা যায়, তাঁর স্বকীয়তায়, বৈশিষ্ট্যে। জাতির জীবনে যাঁরা মানুষ হওয়ার স্বপ্ন সৃষ্টি করেছেন, অমরত্বের সন্ধান দিয়েছেন জাতিসত্তাকে তাঁদের ঋণশোধ শুধু সমকালের মানুষ করতে পারেনা। অনাগত কালকেও করতে হয় সেই স্মৃতিতর্পণ।

পাদপ্রদীপের আলোয় এদেশে যাঁদের মুখ উদ্ভাসিত হয়েছিল তাঁদের সফলতার চিত্ররচনা এ আলোচনার উপজীব্য নয়। প্রদীপের আলোয় যতটা দেখা যায় স্পষ্ট ভাবে, তার বাইরে যা পড়ে থাকে সেখানে বিরাজ করে আলো-আধারির লীলা। কীর্তিমান, বিরাট মানুষের জীবনের অনেকখানি অংশ জুড়ে থাকে সেই আলো-আধারের রাজত্ব। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে নেমে আসে জমাট অন্ধকার।* সেই অন্ধকারের

---

* সন্ধানী মনের আলোয় সেই অন্ধকারের বাধা অপসারিত করতে না পারলে কোন জীবনই সম্পূর্ণ নয় মহত্ত্বের, বিরাটত্বের পরিচায়ক নয়।

অবগুণ্ঠন খুলে আমরা উঁকি দেব এখানে মহা-জীবনের দিকে।

• •

দাদাভাই দাওরোজী। গ্র্যাণ্ড ওল্ড ম্যান অব্ ইণ্ডিয়া। একথা তাঁর কৃতজ্ঞ, গুণমুগ্ধ দেশবাসী তাঁকে ডাকতো এই নামে। আর শুধু দেশবাসী কেন, গুণ-মুগ্ধ ইংরেজ সহকর্মী বিরুদ্ধবাদী, সেণ্ট্রাল ফিনান্স-কারীর নির্বাচক মণ্ডলীর কাছেও তিনি গ্র্যাণ্ড ওল্ড ম্যান অব ইণ্ডিয়া। গোপালকৃষ্ণ গোখলে, মহাদেও গোবিন্দ রানাডে, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী তরুণ ভারতীয় সত্যাগ্রহী ব্যারিস্টার মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর তিনি "দাদা"। পার্শী সমাজে তিনি "দাদাভাই প্রফেসার" কিম্বা "প্রফেসার দাদাভাই।"

৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৮২৫। বোম্বাইয়ের খাদাক অঞ্চলে এক দরিদ্র পার্শী দস্তুরের নগণ্য বাড়ীতে জন্মিষ্ট হলো এক দেবোপম শিশু। পিতা নাওরজী পালানজী দস্তি পুরোহিতের, দপ্তরের কাজ করে জীবিকা অর্জন করেন। মা মানেকবাঈ প্রায় নিরক্ষরা ঘরসংসারের কাজ করেন। কিন্তু নবজাতকের ভাগ্যনিয়ন্তা তাকে টেনে আনলেন পার্শী সমাজের ক্ষুদ্র গণ্ডী থেকে ভারতীয় গণজাগরণের পুরোভাগে। বাবা মা নাম দিলেন দাদাভাই। দাদা অর্থে ঠাকুরদা, দাদু আবার ভাই। তাঁর সুদীর্ঘ প্রায় শতাব্দীব্যাপী জীবনে—৯৩ বছরে, তিনি ছিলেন অগণিত মানুষের দাদা এবং ভাই।

শৈশবেই পিতৃহারা হলেন দাদাভাই। মা মানেকবাঈ একমাত্র সন্তান নিয়ে ভাইয়ের বাড়ীতে আশ্রয় নিলেন। পার্শী সমাজের নিয়মানুসারে আবার বিয়ে করে ঘর সংসার করার সুযোগ ছিল তাঁর। কিন্তু সে পথে না গিয়ে তিনি ছোট্টছেলে দাদাভাইকে নিয়ে মেতে উঠলেন, তাকে মানুষের মতো মানুষ করতে হবে। দস্তুর বা পুরোহিতের জীবনে ছেলেকে আবদ্ধ করবেন না। ইস্কুলে ভর্তি হলেন তিনি। এই ছোট্ট ছেলেটির সুন্দর লালিত্যময় চেহারা দেখে সকলেই আকৃষ্ট হলো তাঁর প্রতি। কিন্তু রূপে তিনি কারো মন ভুলাতে চাননি। তাঁর অসাধারণ বুদ্ধি, ধীশক্তি ও মৌলিকতা সকলকে চমৎকৃত করলো। নিজের ইস্কুলে, আশে-পাশের ইস্কুলে সমাজের উৎসবে অনুষ্ঠানে, দাদাভাই বৃদ্ধ বয়সে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন, তিনি হয়ে উঠলেন একটা "প্রদর্শনী" বস্তু। তাঁর নাম রটে গেল "একজিবিশন বয়।"

ছেলেবেলার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, আত্মীয়স্বজন সুন্দর ইংরেজদের মতো পোষাকে আশাক পরিয়ে কোথাও নিয়ে গিয়ে, তাঁকে আদর করে "জংলু" বলে ডাকতো। পার্শীদের কথায় "জংলু" শব্দের মানে "ইংরেজ"। দাদাভাই বলেছেন "তখন স্বপনেও ভাবতে পারিনি আমাকে জীবনের অর্ধেকেরও বেশী সময় কাটাতে হবে ইংরেজদের দেশে, এই রকম পোষাক পরে।.....কমিটি অব ইম্পিরিয়াল ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে আরো কয়েকজনের সঙ্গে যেদিন ইংরেজের দরবারী পোষাক পরে মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে স্বাগত জানালাম, তখন আমার কেবলই মনে পড়ছিল, আমি এখন একেবারে খাঁটি জংলু হয়ে গেছি।"

ইংল্যাণ্ডে জীবনের বেশীরভাগ সময় কাটালেও, মানসিকতা আচার আচরণে, আদবকায়দায় খাঁটি ইংরেজের মতো হলেও ইংল্যাণ্ড সমাজের কোন কলুষ তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। ছেলেবেলার পর থেকে কোনদিন মদ খাননি তিনি। ধূমপান করেননি কখনো। অথচ নিজের বাড়ীতে রাতে খাওয়ার আগে রোজই একটু মদ খাওয়ার রেওয়াজ ছিল তাঁর। কিন্তু একটা অতি সাধারণ ঘটনা থেকে তাঁর মন একেবারে বিমুখ হয়ে গেল। তিনি নিজেই সেকথা বলেছেন : "একদিন বাড়ীতে যাওয়ার আগে দেখা গেল মদ নেই এক ফোঁটাও। বাড়ীর উল্টোদিকে একটা মদের দোকান ছিল। আমায় বলা হলো ওখানে গিয়ে অভ্যাস মতো খেয়ে আসতে। দোকানে গিয়ে সেদিন যে লজ্জা ও অপমানবোধ আমায় অভিভূত করেছিল, তারকথা সারা জীবন আমি ভুলতে পারিনি। আমার পক্ষে তাই যথেষ্ট হয়েছিল বলতে হবে। তারপর থেকে কোন মদের দোকান আমার মুখ আর দেখতে পায়নি।"

ইস্কুলের ছাত্র দাদাভাইয়ের একটা সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন শ্রীমতী পলটানস তাঁর "ওয়েস্টার্ন ইণ্ডিয়া"

পেছেন ছোট ছোট ছেলেদের
দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। একজন ইংরেজ ভদ্র
ছেলেদের এক একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন
প্রশ্নকর্তার সময় দাদাভাইয়ের দিকে চোখ পড়ে
উপায় নেই। সুন্দর ছেলেটি, চওড়া কপাল,
তার নীচে একটু ছোট উজ্জ্বল চোখের চঞ্চল দৃষ্টি।
প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা মাত্র ভুরু কুঁচকে গভীর চিন্তার মধ্যে
মুখটা তলিয়ে গেল। তারপর মুহূর্তেই
ঈষৎ ফাঁক হয়ে গেল। মন থেকে
এসে হাত তুলে দাঁড়ালো ছেলেটি।
নয়, বারে বার। বুদ্ধি দীপ্তিতে
যেন সভা সদস্যদের দৃষ্টি
সদা ব্যস্ত এই প্রতিভার পুরস্কার পেয়েছিলেন
দাদাভাই। বোম্বাই প্রদেশে কেন, বোধ হয় সমগ্র
ভারতেই বলা যায়, ইংরাজ প্রতিষ্ঠিত শিক্ষায়তনে তিনি
নিযুক্ত হয়েছিলেন প্রথম ভারতীয় অধ্যাপক। আর
সেই থেকেই দাদাভাই প্রফেসর
তাঁর বিষয় ছিল গণিত।

নামের আগে এই কথাটি যোগ করার যে গর্ব তিনি অনুভব করেছিলেন সারা জীবনে আরও অনেক সম্মান পেয়েও তিনি তা ভুলতে পারেননি। তাঁরই কথায় শোনা যায়: জীবনে কতো সম্মানইতো আমি পেয়েছি, কিন্তু অধ্যাপক বলে পরিচিত হয়ে যে গর্ব অনুভব করেছিলাম, অন্যকোন নামে কোনদিন পাইনি।"

অধ্যাপকের পদ দাদাভাইকে বৃহত্তর জগতের আহ্বান থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারল না। নানা কারণে বিশেষ করে পারিবারিক প্রয়োজনে শিক্ষাব্রতীর জীবন ছেড়ে দাদাভাই চল্লেন ইংল্যাণ্ডে। উদ্দেশ্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা। সহকর্মীরা হতবাক। দাদাভাইও কম বিস্মিত হননি, এই কাজের ভার হাতে নেওয়ার প্রস্তাব পেয়ে। খবর শুনে অধ্যক্ষ হার্কনেস্ সাহেব তো একবারে আকাশ থেকে পড়লেন। কিন্তু দাদাভাই মন ঠিক করে ফেলেছেন। হার্কনেস সাহেব কেবল বলেছিলেন, দাদাভাই এ কি অধোগতি!"

বোম্বাইয়ের বিখ্যাত ব্যবসায়ী পরিবার কামাদের একটি শাখা খোলা হবে লণ্ডনে। কামা পরিবারের সঙ্গে দাদাভাইয়ের বহুদিনের ঘনিষ্টতা। তিনি সেই কামা এণ্ড কোম্পানীর প্রতিনিধি হয়ে এলেন ইংল্যাণ্ডে সেটা ১৮৫৫ সালের কথা। সঙ্গে কামা পরিবারের আর দুজন সহকর্মী। পরমুসজী কামা আর রুস্তমজী কামা। স্থির হলো তিন জনে একমত হয়ে যা ঠিক করবেন তাই করা হবে। নতুবৈকা হলে বোম্বাইয়ের নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

কাজ তো সুরু হলো। কিন্তু দাদাভাইয়ের আদর্শবাদী মনের সঙ্গে কামা সহকর্মীদের কারো না কারো গোলমাল বাধে। এর মধ্যে রুস্তমজী কামার সঙ্গে তাঁর মতের মিল বেশি। আদর্শবাদের ছোঁয়া তাঁর মনে কিছুটা লেগেছে। কিন্তু হরমুসজী কামা ব্যবসাটাই বোঝে ভালো করে। আদর্শের

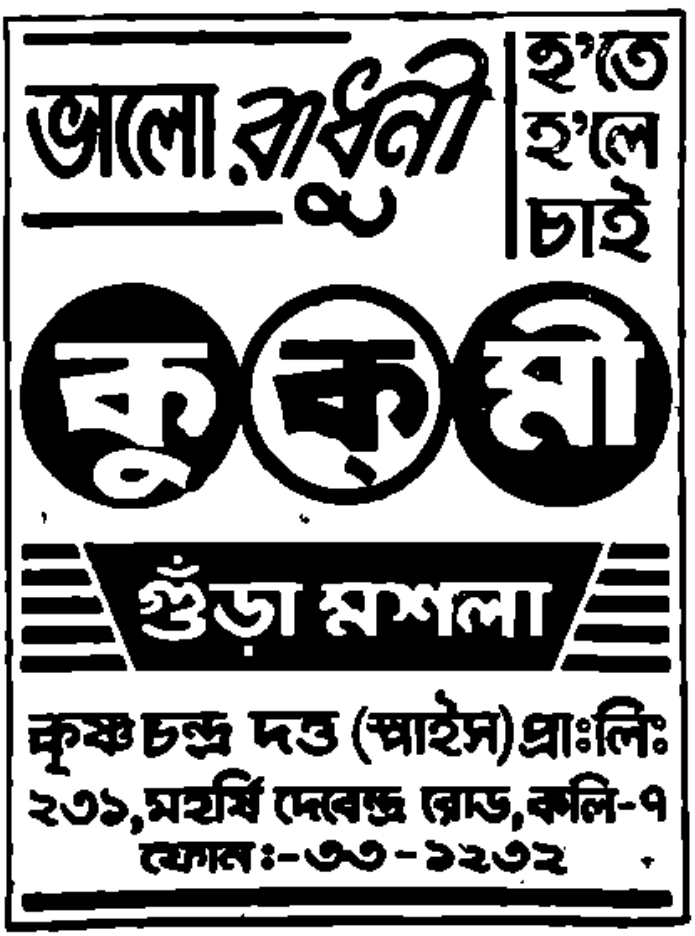

মাথাব্যাথা তার খুব নেই। একবার হলো কি বোম্বাইয়ের কোন প্রতিষ্ঠান, কামাদের মাধ্যমে ইংল্যাণ্ডের কোন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে রীলের সুতো কিনছে। বিলাতী প্রতিষ্ঠানটি যে নমুনা দেখিয়ে বিক্রির ব্যবস্থা করেছিল, জিনিস দেওয়ার সময় নমুনা মাফিক তা সরবরাহ করলো না। দাদাভাইয়ের জিনিসটা দেখেই কেমন খটকা লেগেছিল। সারারাত ধরে ঘরে বসে তিনি রীলের নমুনা ও সরবরাহ করা রীলের সুতো যাচাই, মাপজোক করে বিলাতী কোম্পানীর অসাধুতা ধরে ফেলেন। হরমুসজীকে ব্যাপারটা জানালেন তিনি জোচ্চুরী কোথায়। খাঁটি ব্যবসায়ী হরমুসজীর সাফ কথা নমুনা মতো জিনিস না দিয়ে থাকে তো বোম্বাইয়ের প্রতিষ্ঠান বুঝবে। তারা না হয় খেসারত চাইবে। কামা কোম্পানীর মাথা ব্যাথা কিসের! কিন্তু দাদাভাই অন্য। জেনেশুনে একটা অন্যায়, প্রতারণায় তিনি কিছুতেই মন থেকে সায় পাচ্ছেন না। বুদ্ধিমতী দাদাভাইয়ের পক্ষ সমর্থন করলেন। অগত্যা ব্যাপারটা জানানো হলো কর্তৃপক্ষের কাছে বোম্বাইয়ে। সেখান থেকে নির্দেশ এলো কামা কোম্পানীর এ নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। যা দিয়েছে তাই পাঠাও।

এ রকম ঘটনা এক আধবার নয়, মাঝে মাঝেই হতো। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বোম্বাইয়ের নির্দেশ আসতো হরমুসজীর পক্ষে। ধীরে ধীরে কামাদের সঙ্গে মনের যোগটা কমে আসতে লাগলো দাদাভাইয়ের। তবু কাজ করে যাচ্ছেন এক সঙ্গে। এই সময়েই আরেকটি ব্যাপারে দাদাভাই মনস্থির করলেন, না আর নয়, ব্যবসা করেই যদি যেতে হয়, তাহলে রুচিতে না বাধে এমন কোন জিনিস নিয়ে স্বাধীন ভাবে ব্যবসা করবেন তিনি।

ইংল্যাণ্ডে কামা এণ্ড কোম্পানী এ সময়ে যে জিনিসের কারবার সুরু করে তাদের মধ্যে অন্যতম হলো আফিম, মদ ও অন্যান্য মাদক দ্রব্য। দেশে থাকতে দাদাভাই দেখেছেন স্বল্প আয়ের মানুষ কেমন করে যথাসর্বস্ব খুইয়ে বসে এই সব সর্বনাশা নেশার ঝোঁকে। গোটা সংসারের মুখের অন্ন নেশার পরিতৃপ্তি গলে যায়! মনে ঘা লাগলো দাদাভাইয়ের। দেশের দুঃস্থ, হতভাগ্য, দরিদ্রমানুষের মুক্তি কামনায় যিনি নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন পরবর্তী কালে, তাঁর পক্ষে সেই সর্বনাশের ব্যবসা করা কোনমতেই সম্ভব নয়। প্রতিবাদ করলেন তিনি। কিন্তু ফল হলো না তাতে। তখন পার্টনার প্রস্তাব করলেন যে আফিম, মদ ও অন্যান্য মাদক দ্রব্য বিক্রি করে যে মুনফা হবে তার থেকে কোন অংশই তিনি গ্রহণ করবেন না। ব্যবসার ক্ষেত্রে আদর্শকে আঁকড়ে থাকার চেষ্টায়, কামা পরিবারের বড় কর্তাও যথেষ্ট রুষ্ট হয়েছিলেন দাদাভাইয়ের উপর।

খুরশেদজী কামা বেশ কড়া ভাষায় লিখলেন: "সরকারী কলেজের অধ্যাপক ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতনের টাকা সরকার কোথা থেকে সংগ্রহ করে, তুমি জানো? আফিম ও মদের আমদানী করে সরকারের মুনফা থেকে অধ্যাপক হিসেবে তুমি কি মাইনে নাওনি এ ব্যবসা ছেড়ে আবার যদি আজ সরকারী কাজে ফিরে যাও, তাহলে এই নোংরা ব্যবসার মুনফা থেকে মাইনে নিতে কি তোমার হবে না! নাকি এদের দুর্গন্ধ তখনো তোমার নাকে গিয়ে লাগবে? যদি আমাদের প্রতিষ্ঠান আফিম মদ নিয়ে কারবার না করে তাহলেই কি এদেশে এদের খানদানীর কারবার বন্ধ হয়ে যাবে? তুমি যাকে অস্পৃশ্য মনে করছো সেটা নিয়ে আর কি কেউ কখনো কারবার করবে না?"

সেদিন এ কথার পুরো জবাব দাদাভাইয়ের জানা ছিল না। কিন্তু এটুকু বুঝেছিলেন যে কামাদের সঙ্গে আর না। বনিবনা হওয়ার কোন সুযোগ আর নেই। কামা এণ্ড কোম্পানী ছেড়ে বিলেতে স্বাধীন ব্যবসা সুরু করলেন এবার। কিন্তু ব্যবসায় বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার অভাবেই তাঁর প্রতিষ্ঠান অনেকদিন টিকে থেকেও শেষ পর্যন্ত উঠে গেল। কারণ ব্যবসা তিনি করতে বসেননি। ইংল্যাণ্ডে বসে ভারতীয় জনচিত্তে মুক্তির আগ্রহকে প্রোজ্জ্বল করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তাই তিনি হয়ে পড়েছিলেন সুদিনে দুর্দিনে, দারে অদারে প্রবাসী ভারতীয়দের আশ্রয়স্থল। মহাত্মা গান্ধী তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন, "বাস্তবিকই প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের কাছে তিনি ছিলেন পিতৃতুল্য। তাঁর কাছে ভারতীয়দের জাতি ও ধর্মের বিচার ছিল না। তাদের অসময়ে তিনি পরামর্শদাতা। পথ প্রদর্শক।"

বাঙ্গালীর কাছে বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তি তুলনা-বিহীন। বর্ষার খরস্রোতা নদীকে অবহেলা করে তিনি

ঝাঁপ দিয়েছিলেন মায়ের ডাকে সাড়া দিতে। দাদাভাইয়ের জীবনেও আছে প্রায় অনুরূপ এক কাহিনী। তবে তিনি মনীতে ঝাঁপ না দিলেও মায়ের দুশ্চিন্তার অবসানের জন্যে হাজার মাইল পাড়ি দিয়েছিলেন, অনেক ব্যাথা অনেক ত্যাগ স্বীকার করে।

সেকালে পার্শী সমাজে বালাবিবাহের রীতি ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে বিয়ে না হলেও জন্ম মুহূর্তেই কোন কন্যা বাগদত্তা হয়ে যেতো। দাদাভাইয়ের জীবনে উভয় ঘটনাই ঘটেছিল। ফলে মাত্র এগারো বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়ে গেল, পড়শী সোরাবজী প্রকের মেয়ে গুলবাইয়ের সঙ্গে। কিন্তু এ বিয়ে সুখের হয়নি। দুজনের মনের মতের কোথাও মিল ছিল না। দাদাভাই তা জানতেন আর জানতেন বলেই নিজে সব সময়ে চেষ্টা করতেন মানিয়ে চলতে।

পার্শীদের মধ্যে তখন একাধিক বিবাহের প্রথা ছিল। দাদাভাই যখন জীবনে ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠিত হতে আরম্ভ করেছেন, তখন মা মানেকবাঈ অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করলেন ছেলের আবার বিয়ে দেবেন। পাত্রীর খোঁজ চলতে লাগলো। তারপর একদিন সময় উপস্থিত বুঝে করে মানেকবাঈ কথা পাড়লেন ছেলের কাছে। দাদাভাই মায়ের মন জানতেন। ধীরভাবে সব কথা শুনে তিনি শুধু বলেছিলেন, "মা, আমি যদি ছেলে না হয়ে তোমার মেয়ে হতাম, আর···"

শোনা যায় মা মানেকবাঈ দীর্ঘশ্বাস চেপে সরে এসেছিলেন। আর কোনদিন ছেলের কাছে এ কথা তোলেননি।

কালাপানি পাড়ি দেওয়া সেকালে প্রায় সমস্ত ভারতীয় সমাজেই একটা ভয়ের ব্যাপার ছিল। হিন্দুর ছেলের কালাপানি পার হলে ফিরে এসে প্রায়শ্চিত্ত করতে হতো। পার্শীদের ধর্মচ্যুত হওয়ার ভয় ছিল না। তাদের আশংকা ছিল অন্যরকমের। পার্শী যুবক ইংলাণ্ডে গেলে প্রায়ই মিশনারীদের পাল্লায় পড়ে নানা প্রলোভনে খৃস্টান হতো। তারপর সে দেশেই বিয়ে থা করে ঘরসংসার পেতে বসতো।

দাদাভাইয়ের মানসিক অশান্তি ও পার্শী যুবকদের খৃস্টান হওয়ার প্রবণতা উভয় ব্যাপারেই মানেকবাঈয়ের মনে যথেষ্ট ভয় ছিল। লণ্ডনে যে পাড়ায় দাদাভাই থাকতেন, সেখানে তাঁর পড়শী ছিলেন জনৈক ডাক্তার আর্চার। তিন কন্যা তাঁর। সকলেই সুন্দরী, শিক্ষিতা ও রুচিসম্পন্না। দাদাভাইয়ের আর্চার পরিবারের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। হঠাৎ বোম্বাইয়ে গুজব রটে গেল, দাদাভাই খৃস্টানধর্ম গ্রহণ করেছেন। আর জনৈকা ইংরেজ রমণীর পাণিগ্রহণ করেছেন। মিস আর্চারদের নামের সঙ্গে জড়িত হয়ে খবরটা রীতিমতো মুখরোচক হয়ে উঠলো পার্শী সমাজে। মানেকবাঈ এই আশংকা করছিলেন। আর পুত্রবধূ গুলবাইয়ের মনের অবস্থা বলাই বাহুল্য।

শংকিতা মানেকবাঈ কাতর অনুনয় করলেন দাদাভাইয়ের কাছে। গুজবে শুধু তিনি বিশ্বাসই করেননি, অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। চিঠি পেয়ে দাদাভাই কর্তব্য স্থির করে ফেললেন। মায়ের অশ্রুসজল মুখের ছবিটা তাঁর মুখে ভেসে উঠলো।

১৮৬৩ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর। রাত প্রায় বারোটা। খাদাকের বাড়িতে মানেকবাঈ ও পুত্রবধূ গুলবাঈ দিন রাত দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনায় অভিভূত, ও পরিশ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। দরজায় কড়া নড়ে উঠলো। অনেকক্ষণ পরে ঘুম চোখে একজন ভৃত্য দরজা খুলতে এসে জিজ্ঞেস করলো কে? কে ওখানে?

দরজা খোল, আমি দাদাভাই, উত্তর হলো।

"কি", ভৃত্য কেপে ওঠে, "শয়তান কোথাকার। দাদাভাইয়ের নাম নিচ্ছিস আবার। দাদাভাই কোথায়, তিনি তো বিলেতে। ভাগ শিগগির না হলে মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেবো।"

"সাকু" আগন্তুক শান্ত মিষ্ট স্বরে ডেকে ওঠেন, "দরজা খোল, আমি।" নিজের নাম, আর গলার মিষ্ট সুরের ডাক আর ভুল নেই। সাকু সমস্ত ইতস্ততঃভাব কাটিয়ে উঠে দরজা খুলে দেয়। আর সঙ্গে সঙ্গেই আগন্তুক দৃঢ় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে ভৃত্য সাকুকে। তারপরে উষ্ণ আর দুশ্চিন্তার মেঘ কাটতে লেগেছিল মাত্র কয়েকটি মিনিট। বিস্মিতা মা মানেকবাঈ আর পুত্রবধূ গুলবাঈ যে মুখের ডাক শোনার আশা প্রায় ছাড়তে বসেছিলেন, সেই ডাক আজ মাঝরাতে একান্ত পরিচিত পরিবেশে আবার সুরেলা হয়ে উঠেছে, খাদাকের এই ছোট্ট বাড়ীতে।

স্বাধীন ঘানা

ঘানাবাসীদের জীবনের ইতিহাসে রহিয়াছে বহু দুঃখকষ্টের যুগের অভিজ্ঞতা—ইহার মধ্যে কঠোরতম যুগ হইল গত দেড়শত বৎসরের ব্রিটিশ শাসকদের প্রভুত্ব। ব্রিটিশ শাসকেরা এই উপনিবেশকে বলিত গোল্ড কোস্ট। সত্যসত্যই এই দেশ ছিল তাহাদের কাছে একটি স্বর্ণখনি বিশেষ—ইহারই দৌলতে তাহারা বিরাট ধনী হইয়া উঠিয়াছে, আর ঘানার অধিবাসীরা দরিদ্রই রহিয়া গিয়াছে, অনাহারে অর্ধাহারে রাখিয়া তাহাদের ব্রিটিশের দাসে পরিণত করা হইয়াছে।

…কিন্তু ১৯৫৭ সালের ৬ই মার্চের রাত্রে এই প্রথম ঘানার স্বর্ণ তাহার প্রকৃত মালিকদের চোখের সম্মুখে ঝক্‌মক্‌ করিয়া উঠিল।

উত্তরাধিকার হিসাবে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ঘানা পাইল তাহা ছিল এক ভয়ঙ্কর অবস্থা। দেশের না ছিল জাতীয় শিল্প, না ছিল শিল্পোন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় কর্মীদল। লণ্ডনের ধনিক গোষ্ঠী আর অক্সফোর্ডের অধ্যাপকের দল জোড়গলায় প্রচার করিতেন যে, ঘানা এখনও স্বাধীনতা লাভের জন্য উপযুক্ত হয় নাই। তাঁহাদের এই গালভরা কথার যোগ্য জবাব দিলেন ঘানার প্রথম রাষ্ট্রপতি ক্বোয়ামে নক্রুমা। তিনি ঘোষণা করিলেন, "এরিস্টটলের একটি কথা আছে; সেইটি হইল যে, বাঁশী বাজানো শিখিবার সব চেয়ে ভালো উপায় হইল বাঁশী বাজানো। কিভাবে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হইতে হয় তাহা শিখিবারও সর্বোৎকৃষ্ট পথ হইল স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র হওয়া।"

ঘানার স্বাধীনতা ঘোষণা করিবার পর যে ছয় বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে সেই ছয় বছরে উপরে বর্ণিত কথাগুলির সত্যতা চমৎকারভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। ইতিহাসের এই অল্প সময়ের মধ্যে

ঘানা এক গৌরবময় অতিক্রম করিয়াছে। রাষ্ট্রের গঠনকার্যে, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নির্মাণ কার্যে ঘানার সাফল্য, জনগণের মুক্তি আন্দোলনে এবং শান্তি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা দৃঢ় করার কাজে তাহার গুরুত্বপূর্ণ অবদান স্বাধীনতাপ্রিয় জাতিসমূহের পরিবারে তাহার যোগ্য আসন সুনিশ্চিত করিয়াছে।

বিংশ শতাব্দীর কলঙ্ক—উপনিবেশবাদকে নির্মূল করার সংগ্রামে ঘানা রহিয়াছে যোদ্ধাদের প্রথম সারিতে। তাহারই রাজধানী আক্রা নগরীতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল আফ্রিকার দেশগুলির প্রথম সম্মেলন। সেই সম্মেলন হইতেই আহ্বান আসিয়াছিল: "আফ্রিকাকে মুক্ত করিতে হইবে! এক্ষুনি স্বাধীনতা চাই, বর্তমান-পুরুষের জীবনকালেই স্বাধীনতা চাই।"

উপনিবেশগুলিকে আর তাহাদের জনগণকে স্বাধীনতা দিবার যে দাবি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ঘোষণায় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে তাহাকে যতশীঘ্র সম্ভব কার্যকরী করার জন্যই ঘানার সরকার কাজ করিয়া চলিয়াছেন।

স্বাধীনতার সকল যোদ্ধাদের, দাসত্বের বিরুদ্ধে যাঁহারা সংগ্রাম করিতেছেন তাঁহাদের সকলেরই প্রকৃত বন্ধু হইল ঘানা। এই তো সেদিন ঘানার সরকার দীর্ঘকালের নির্যাতিত কঙ্গোর মহান সন্তান প্যাট্রিস লুমুম্বার হত্যাকারীদের শাস্তি পুনরায় দাবি করিয়াছেন।

আমাদের এই যুগে জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম অপ্রতিরোধ্যভাবে শান্তির অভিযানের সঙ্গে গ্রথিত হইয়া গিয়াছে। ঘানাই ইহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। ঘানাই ছিল "বোমাহীন দুনিয়ার" আন্তর্জাতিক পরিষদ গঠনের উদ্যোক্তা। আফ্রিকায় শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রস্তাব, বিশেষ করিয়া বিদেশী সামরিক ঘাঁটি ও পারমাণবিক অস্ত্র বিবর্জিত শান্তির এলাকায় আফ্রিকাকে পরিবর্তিত করার প্রস্তাব ঘানাই উত্থাপন করিয়াছিল। "জাতিতে জাতিতে শান্তি স্থাপনের জন্য" প্রেসিডেন্ট নক্রুমাকে আন্তর্জাতিক লেনিন পুরস্কারে ভূষিত করা হইয়াছে—ইহা বিশ্বশান্তির আদর্শের জন্য ঘানার অবদানের সার্বজনীন স্বীকৃতির অভিব্যক্তি বিশেষ।

নিজেদের স্বাধীনতার জন্য ঘানার জনগণের সংগ্রামকে এবং স্বাধীন প্রজাতন্ত্রের উন্নতির জন্য তাহাদের সৃজনশীল কর্মপ্রচেষ্টাকে সোভিয়েতের জনগণ সর্বদাই গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে, ইহার প্রতি রহিয়াছে তাহাদের গভীর সহানুভূতি। সোভিয়েত ইউনিয়ন আর ঘানার সম্পর্ক হইল প্রকৃত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির বাস্তব রূপায়নের ইহা দৃষ্টান্তস্বরূপ। ঘানার জাতীয় অর্থনীতি ও সংস্কৃতির বিকাশে এবং তাহার অধিবাসীদের শিক্ষিত করিয়া তোলার কাজে ঘানাকে সোভিয়েত ইউনিয়ন নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করিতেছে। মস্কোতে স্থাপিত লুমুম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার ঘানার পুত্র কন্যাদের জন্য সর্বদাই উন্মুক্ত—সেখানে তাহারা সাদরে অভ্যর্থিত। সেখানে তাহারা জ্ঞান অর্জন করিতে পারে এবং সকলের সাথে নিজেদের সমান মনে করিতে পারে।

...অল্প কিছুদিন আগে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমিলান যখন ঘানায় গিয়াছিলেন তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে, আফ্রিকায় মধ্য দিয়া "পরিবর্তনের বাতাস" বহিয়া যাইতেছে। প্রেসিডেন্ট নক্রুমা তাঁহার উক্তি সংশোধন করিয়া বলিয়াছিলেন: "আফ্রিকার মধ্য দিয়া যে পরিবর্তনের বাতাস বহিয়া যাইতেছে তাহা আজ ঝড়ের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।"

ঘানা প্রজাতন্ত্রের কর্মপ্রবাহ এই ঝড়ের তরিয়া উঠিতেছে—দৃঢ়পদক্ষেপে দ্রুতগতিতে আগাইয়া চলিয়াছে তাহার অগ্রগতি।

"ঘানা, তোমার যাত্রা সফল হউক, সার্থক হউক"—আফ্রিকার ঐ প্রজাতন্ত্রের জাতীয় পর্বদিনে ইহাই সোভিয়েতের জনসাধারণের কামনা।*

—ইজভেস্তিয়া, সামান্য সংক্ষেপিত

* লেখক—এম. তুমুম্বা।

৫ চার ।

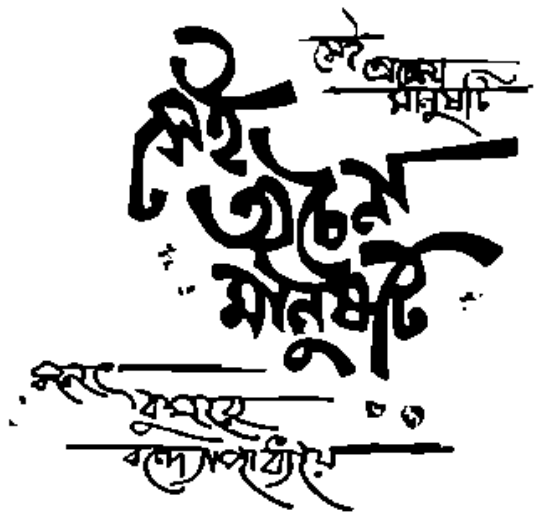

তিন সপ্তাহ পর।

এর মধ্যে সাড়ে তিনশো ফ্যান বাজারে ছাড়া হয়েছিল। মুকুন্দবাবু সোৎসাহে সংবাদ এনে দিলেন বাজারে ছাড়ার তিন দিনের মধ্যে সমস্ত ফ্যান বিক্রি হয়ে গিয়েছে।

দুজনে কথা হচ্ছিল শংকরের ল্যাবরেটরীর মধ্যে। মুকুন্দবাবু ঘরে ঢুকে বললেন—কি শংকরবাবু, আপনার ঘরে আজ বসতে পারি? এখনতো আপনার হাতে আর কোনও কাজ নেই।

শংকর হাসল। যেন কোন বরদান করছে এমনিভাবে সে বললে—বসুন। আজ আমার হাতে কোন কাজ নেই। বলে সে হাতের বইখানা বন্ধ করে টেবিলের উপর রেখে দিলে।

মুকুন্দবাবু রহস্য করে বললেন—আপনাকে একটা জিনিষ আমি উপহার দিতে চাই শংকরবাবু!

শংকর হেসে বললে—আর কি দেবেন আমাকে। আর যা যা দরকার তাও না চাইতে দিয়েছেন, আবার যা যা দরকার নয় তাও দিয়েছেন। নতুন আর কি দেবেন?

মুকুন্দবাবু কথাটাকে সজোরে ঝেড়ে ফেললেন যেন অপ্রস্তুতের মত—কি যে বলেন আপনি? ও ধরনের কথা আপনার মুখে মানায়ও না, আর আমি নিজেও পছন্দ করি না। যা বলছি শুনুন। আমি আপনাকে একটা ফ্যান উপহার দিতে চাই। এই ল্যাবরেটরীতে। আমার খুব সখ!

তার শেষের কথাগুলি আবেদনের মত শোনাল।

শংকর হেসে বললে—আপনি যখন চাইছেন দেবেন! কিন্তু আমার দরকার হয় না ফ্যানের। কোনকালেই আমার ফ্যানের বাতাস খাওয়া অভ্যাস নেই। বরং পাখা চালালেই আমার অসুবিধা হয়। আর তাছাড়া এইতো আগষ্ট মাস চলছে। এখনতো বর্ষা! বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গিয়েছে। এখন আর এমনিই পাখার দরকার হয় না। তবে আপনি যখন চাইছেন দেবেন!

—ভাল. ভাল! কিন্তু কই আপনার পাখা বাজারে ছাড়লাম. কি হল তার কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না তো? রহস্যময় হাসি হেসে মুকুন্দবাবু প্রশ্ন করলেন।

শংকর হাসল। বললে—পাখা তৈরী করে দেবার পর আমার তো আর কোন কৌতূহল নেই। এখন চলে ভাল, না চললে আমি নাচার। আমার কাজতো আমি করে দিয়েছি।

—বেশ লোক যাহোক আপনি! তারপর বললেন—জানেন বাজারে ছাড়ার তিন দিনের মধ্যে সাড়ে তিনশো ফ্যানের সবগুলো বিক্রী হয়ে গিয়েছে। আর আমার হোলসেল এজেণ্ট আমাকে ফোন করেছিল।

শংকরের মুখের দিকে তাকালেন তিনি। শংকর হাসছে বটে, কিন্তু সে হাসিতে বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য নাই। যেন ব্যাপারটা সে জানত আগে থেকেই। ওতে আর নতুন করে জানার কি আছে?

—জানেন, হোলসেল এজেণ্টের অফিসে যেতেই সে আমাকে কি খাতির! অথচ কাজটা করবার আগে ভদ্রলোক আমাকে কিছু টাকা অগ্রিম দিতে কি যে

মুখ ভার করেছিলেন! আমি যাবার সঙ্গে সঙ্গে খুব আদর আপ্যায়ন করে বললে—মশাই, আপনার চেক রেডি করে বসে আছি আর আপনার পাত্তা নেই। নিয়ে যান আপনার চেক।

বলতে বলতে পকেট থেকে একটি চেক বের করে টেবিলের উপর রাখলেন তিনি একটা লোহার টুকরো চাপা দিয়ে। মুকুন্দবাবুর উৎসাহ দেখে শঙ্কর একবার নিরুৎসুক, নিস্পৃহ দৃষ্টিতে চেকখানার দিকে তাকিয়ে দেখলে। একটু হাসল সে। একটা পাঁচ অঙ্কের ভারী টাকার চেক। সে চোখ ফিরিয়ে নিলে। তার কাছে পাখা তৈরী করা, টাকা এল কিনা এল তাতে তার কি এসে যায়?

সে মৃদু হাসি হেসে জিজ্ঞাসা করলে—নতুন অর্ডার পেয়েছেন নাকি?

—হ্যাঁ পেয়েছি। আরও শত খানেক চেয়েছে।

—মোটে শত খানেক? কেন? তিন দিনে গাড়ে তিনশো পাখা বিক্রি হল। তারপর মোটে আর একশোর অর্ডার কেন?

—আমিও তাই জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ভদ্রলোক বললেন—একশো দিন, তারপর আবার নেব। এখন তো গরম প্রায় যায় যায়!

শঙ্কর চুপ করে গেল।

তারপর বললে—তাহলে এখন আর একশো তৈরী করেদি?

—আর 'করে দি' নয়, এবার 'করিয়ে দি' হোক। এবার কারখানার মেকানিকরা করুক!

—তা কি হয়? প্রত্যেকটি পাখা আলাদা আলাদা করে টেস্ট না করিয়ে ছাড়ব কি করে?

তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে মুকুন্দবাবু প্রশ্ন করলেন—কি ভাবছেন বলুনতো শঙ্করবাবু?

শঙ্কর একটু হেসে বললে—না কিছু না! এমন কিছু না!

—এমন কিছু না হলেও কিছু ভাবছেন আপনি তা হলে। কি ভাবছেন?

শঙ্কর একটু হাসল, বললে—এই চুপচাপ করে থাকতে আমার ভাল লাগছে না। ভাবছি এখন কি করব! কিছু একটা না করতে পারলে ভাল লাগবে না আমার।

—আবার কি করবেন?

—কি করব জানি না। তবে কিছু করতে চাই। কিছু করতে গেলে কি আপনার আপত্তি হবে?

হাঁ হাঁ করে উঠে মুকুন্দবাবু বললেন—সে কি কথা? আপনার যা খুশী করুন না!

বিচিত্র মানুষ শঙ্কর। তার 'যা খুশী' টা একটা বিচিত্র রাস্তা ধরলে পরদিন থেকেই।

তার হাতে তখন তৈরী পাখার মধ্য থেকে দু চার খানা পরীক্ষা করা ছাড়া অন্য কাজ নেই। সে এক বিচিত্র ব্যাপারে নিজেকে ব্যস্ত করে তুললে।

এই দীর্ঘদিন সে এসেছে কলকাতায়। আসার পরদিন নিজের গাড়ীতে চড়িয়ে মুকুন্দবাবু তাকে সহরের মধ্যে নিয়ে গিয়েছিলেন জিনিষপত্র কিনবার জন্যে। সেই যে সে কারখানায় এসে ঢুকেছে আর বের হয়নি কারখানা থেকে। পরদিন সকাল বেলায় রামসুহাসকে দিয়ে এক রিক্সা আনিয়ে সে সহরের মধ্যে এক বাজারে গেল। কিনল এক খাঁচায় দু' জোড়া বদরিকা পাখী আর এক পা-খোঁড়া লেড়ী কুত্তাকে নিয়ে।

রামসুহাস দাঁড়িয়েছিল গেটের মুখে। তারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল। একে খোঁড়া মানুষ, তার উপর কলকাতা সহরের সঙ্গে কোন পরিচয় নেই বলে রামসুহাস তার সঙ্গী হতে চেয়েছিল। কিন্তু শঙ্কর তাকে সঙ্গে নেয়নি কেবল যাবার সময় তার কাছ থেকে তিরিশ টাকা চেয়ে নিয়ে গিয়েছিল। রামসুহাসই তার ক্যাশিয়ার এবং এ্যাকাউন্ট্যান্ট।

তাকে একা যেতে দিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে গেটের মুখে দাঁড়িয়েছিল রামসুহাস।

তাকে রিক্সার উপর খাঁচা হাতে বসে থাকতে দেখে একান্ত কৌতূহলী হয়ে রিক্সার কাছে এগিয়ে গেল। হাসি মুখে প্রশ্ন করলে—কিরা লায়া চাচাজী? চিড়িয়া?

তারপর ভাল করে খাঁচার ভিতরের সুপর, বর্ণাঢ্য,

ছোট ছোট মাছগুলো পাখী কটিকে দেখে ভারী খুশী হয়ে বললে—আঃ, বড়ত আচ্ছা, বড়ত সুন্দর চাচাজী। দাও, হমারা ডিব্বে দাও।

সে হাত বাড়িয়ে দিলে।

তার হাতে থলিটা দিয়ে খিল্লা থেকে নামল শঙ্কর। তার হাতে একটা মস্ত বড় ঠোঙা। সেটাও তার হাত থেকে নিয়ে নিলে রামদুলাস এক রকম জোর করেই।

আগে আগে চলেছে শঙ্কর। তার পিছনে রামদুলাস। সে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে কাকে ধমক দিতে লাগল—আরে, ই কাঁহাসে আয়া? ভাগ, ভাগ বেটা ল্যাংড়া! ভাগ। নেহি তো ইঁটা সে আউর দুসরা পা খারাব কর দেগা!

যেতে যেতে ফিরে তাকাল শঙ্কর। সে হাঁ হাঁ করে উঠল—আরে, আরে কি করছ কি দুলাস?

অবাক হয়ে রামদুলাস বললে—ই কুত্তা বেটা কাঁহাকে সে আয়া তুমহারা পিছে পিছে। ইসকো ভাগা দেতা হ্যায়!

—ভাগিয়ে দেবে কি? আমি ওকে ডেকে নিয়ে এসেছি। আদর করে নিয়ে এসেছি।

রামদুলাস অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। এ পাগল বলে কি? এই ল্যাংড়া, খিয়ে-ভাজা কুকুরটাকে ডেকে নিয়ে এসেছে?

শঙ্কর হাসতে হাসতে বললে—বাজারে ঢুকবার মুখে খিল্লা থেকে নামবার সময় ও আবার খিল্লার কাছে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে দাঁড়াল। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে লেজ নাড়তে লাগল। কি করি, ওকে বললাম, তুই এখানে বসে থাক, আমি ফিরে আসছি। যাবার সময় চার পয়সার বিস্কুট কিনে ওকে দিয়ে গেলাম। ভাবলাম ঘেরে ঘেরে সংসারের পাঁচটা মানুষের মত কেটে পড়বে। পাখী কিনে ফিরে এসে দেখি ব্যাটা তখনও চুপ করে খিল্লার কাছে বসে। আমি কাছে যেতেই ও খোঁড়া পা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার লেজ নাড়তে লাগল। বুঝলাম এ ওর কৃতজ্ঞতা।

রামদুলাস অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। কথাগুলো তার কাছে কতকগুলো শব্দসমষ্টি মাত্র। তার অতিরিক্ত কোন অর্থ বহন করে না। সে তাই শঙ্করের মুখের দিকে তাকিয়েই রইল।

শঙ্কর বললে—তাই কি করে আর ওকে ছেড়ে আসি! খিল্লায় উঠলাম তো খিল্লা থেকেই দেখছি—কেমন করে ব্যাটা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে আর লেজ নেড়ে যাচ্ছে। খিল্লা চলতে লাগল, ব্যাটাও আসতে লাগল সঙ্গে সঙ্গে। কি করি! আবার নামলাম খিল্লা থেকে। আবার চার পয়সার বিস্কুট কিনলাম; কিনে আর খানা করে বিস্কুট ভেঙে ভেঙে ফেলতে লাগলাম খিল্লা থেকে। ও খেতে খেতে, লেজ নাড়তে নাড়তে চলে এল আমার সঙ্গে। এখন ওকে আমি তাড়াই কি করে বল!

তারপর দুলাসের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললে—উ ভি তো হমারা মাফিক ল্যাংড়া হ্যায় দুলাসজী! একটু থেমে আবার বললে আজ থেকে তোমার খানিকটা কষ্ট বাড়ল। তোমাকে দুবেলা দুজনের জায়গায় তিনজনের ভাত রান্না করতে হবে। তবে ভয় নাই, তোমাকে ওর জন্যে অন্য কিছু করতে হবে না। ওকে ধোওয়া-মোছা সব আমিই করব।

কুকুরটা গেটের মুখে ভয়ার্ত্তের মত দাঁড়িয়েছিল ওদের মুখের দিকে চেয়ে। করুণ চোখে তাকিয়ে আছে যাতে ওর দ্বিধাগ্রস্ত ভয়ার্ত্ত মনের ভাবটি প্রকাশিত হচ্ছে; আর অন্য দিকে লেজ নেড়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে যা থেকে বোঝা যাচ্ছে এটা করছে ও ওদের মনোরঞ্জন করে কৃপা লাভের জন্যে।

শঙ্কর একটু হেসে ডান হাত খানা বাড়িয়ে ডাকল—চু, চু, আয়! আয় আমার সঙ্গে।

বলে সে অগ্রসর হবার সঙ্গে সঙ্গেই সেও পিছন ফিরে লেজ নাড়তে নাড়তে অগ্রসর হল খোঁড়া পা ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে।

দেখে শঙ্কর বললে—ওর নাম হল ল্যাংড়া। বুঝলে দুলাসজী!

কোন কথা না বলে প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে রইল রামদুলাস। নিজের সুপুষ্ট গোঁফ জোড়ায় সে একবার আঙুল বুলিয়ে নিয়ে নিজের বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করলে নিঃসন্দেহে।

শংকর বুঝলে ব্যাপারটা। হেসে বললে—তোমার সোদা হচ্ছে নাকি?

রামসুহাস চুপ।

শংকর বললে—ল্যাংড়ার চেহারা দেখে তোমার গোসা হচ্ছে? কিন্তু রাগ না হয়ে মায়া হচ্ছে না কেন? ওর হালটা ভাল করে ভেবে দেখ তুমি। ওর বাবার ঠিক নাই; মাও ছিল রাস্তার কুকুর। জন্মে কিছুদিন হয়তো ছিল মায়ের কোলের কাছে। তারপর থেকে তো লোকের লাথি ঝাঁটা খেয়ে সামান্য যা এঁটো কাঁটা মরলা ফেলে দেওয়া আবর্জনা খেয়ে বেড়ে উঠেছে। মানুষের হাতে মার খেয়ে একটা পা খোঁড়া হয়ে গিয়েছে বেচারার। না খেতে পেয়ে হাড় পাঁজরা কিরকির করছে। গলুয়ে গায়ের রোঁয়া উঠে গিয়েছে। ওর চেয়ে দয়া মায়া পাবার কে বেশী হকদার? বল, তুমিই বল।

এবার কথা বলতে হল রামসুহাসকে। গম্ভীর হয়ে বললে—ই তো সাচ বাত। বাকী—

—বাকী আর কিছু নেই। ওর অবস্থা আমারই মত। আমারই মত খোঁড়া ও। আমি যখন প্রথম এসেছিলাম আমার কি রকম দশা ছিল। আর দেখ এখন খেতে পেয়ে কাজ পেয়ে কেমন সুন্দর আছি আমি। তেমনি ও আবার কিছুদিন খেতে পাক, আদর পাক, আরাম পাক তখন দেখবে ও-ও আবার কেমন সুন্দর হয়ে উঠবে!

ওর এসব কথা ভাল লাগল না রামসুহাসের। নিজের সঙ্গে কুকুরের মিল দেখিয়ে কথা বললে সে সব কথা কি ভাল লাগে? অন্তত রামসুহাসের মত সাদাসাটা মানুষের ভাল লাগে না। রামসুহাস গম্ভীর হয়ে থাকল। অনেকক্ষণ পর বললে—ঠিক হ্যায় চাচাজী! তোমার যখন এতো সখ ই ল্যাংড়াকে রাখবার তখন রাখ আর কি!

দুহাত তুলে নাটকীয়ভাবে চীৎকার করে উঠল শংকর—ব্যস, চলরে ব্যাটা ল্যাংড়া আমার গার্ডেনের কুকুর মিলেছে, এবার ভেতরে চল। গেটপাশ পেয়ে ছিস তুই, চল।

কুকুরার দিকে তাকিয়ে কথা বলতেই রোঁয়া-ওঠা খোঁড়া কুকুরটা তার মুখের দিকে সতৃষ্ণভাবে তাকিয়ে নিজের অভ্যাস মত লেজ নেড়ে মনের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলে। তারপর শংকর পা টেনে চলতে আরম্ভ করতেই ল্যাংড়া কুকুরটাও খোঁড়াতে খোঁড়াতে তার পিছন পিছন চলতে আরম্ভ করলে।

কুকুর আর পাখী নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল শংকর।

পাখীদের জায়গা হোল মালতী লতায় ঢাকা বকুল গাছের ডালে আর রাত্রিতে তাদের আস্তানা হল ল্যাবরেটরীর ভিতরে। ল্যাংড়া সারাদিন যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায় কারখানার ভিতরে। তবে অধিকাংশ সময়, অন্তত যতক্ষণ শংকর ল্যাবরেটরীতে কাজকর্ম পড়াশুনা করে ততক্ষণ ল্যাংড়া চুপ করে দরজার পাশে বসে থাকে। শংকর যখনই তাকায় ওর দিকে তখনই দেখতে পায় ল্যাংড়া সতৃষ্ণ নয়নে তারই দিকে তাকিয়ে আছে।

রাত্রিতে ল্যাংড়া থাকে ল্যাবরেটরীর মধ্যে তালা বন্ধ হয়ে। ল্যাংড়ারও আশ্রয় হয়, পাখীগুলোকেও সে পাহারা দেয়।

কাজকর্ম এখন সে প্রায় কিছুই করে না। ল্যাবরেটরীতে দুপুরে কিছুক্ষণ পড়াশুনো করে। মধ্যে মাঝে নতুন তৈরী পাখাগুলো একটু দেখেশুনে দেয়। বাকী সময়টা থাকে বকুল গাছের কাছে বদরিকা গুলোর দেখাশোনা করতে।

বদরিকাগুলোর দেখাশোনা করতে গিয়ে তার কেমন করে কতকগুলো চড়াই, কয়েকটা শালিক আর একটা কাকের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। আগস্ট সেপ্টেম্বর মাসের নিদারুণ তাতে কি ভাপাসী গরমে যখন বিশ্বসংসারের প্রাণ যাবার অবস্থা সে তখন একান্ত নিবিষ্টতার সঙ্গে বকুল গাছ তলায় দাঁড়িয়ে কিছু বিস্কুটের গুঁড়ো চীনেবাদামের দানা ছড়িয়ে দিচ্ছে গাছতলায়। ছড়িয়ে দিয়ে দুটো হাত মুখের কাছে এনে নানান বিচিত্র শব্দ আরম্ভ করে। দেখতে কতকগুলো চড়াই, কয়েকটা শালিক আর একটা কাক এসে পরমোৎসাহে বসে যায় গাছতলায় খাদ্যের সন্ধানে। সে বসে থাকে একেবারে গাছের গোড়ায় আর পাখীগুলো নিঃশঙ্কচিত্তে তার চারপাশে ঘুরে ঘুরে খুঁটে খুঁটে খায় খাবারগুলো।

মুকুন্দবাবু প্রথম প্রথম তার এইসব বিদঘুটে খেয়ালগুলো সরল কৌতুকের সঙ্গে লক্ষ্য করছিলেন। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতে তাঁর সে সরল কৌতুক চলে গেল। তার যেন কেবল মনে হচ্ছে শঙ্করবাবু অকারণ সময় নষ্ট করছেন। হয়তো তাঁর এও মনে হয়ে থাকবে যে এ মানুষটা প্রায় কিছু না করে টাকা নিচ্ছে। সেই মনের চেহারাটা একদিন প্রকাশও হয়ে পড়ল।

অথচ প্রথম প্রথম এই সব নিয়ে কত ঠাট্টা করেছেন তিনি।

যেদিন পাখী আর কুকুর নিয়ে এল শঙ্কর সেদিন সকৌতুক বিস্ময় প্রকাশ করে তিনি বলেছিলেন—এ সব কি করছেন শঙ্করবাবু? দায়েদ্দ ছেড়ে পশু পালন?

শঙ্কর হেসে বলেছিল—এখনতো হাতে কাজ নেই কিছু দিন খেলা করি। আমি সে লোক নই যার কাজ থাকলে খেলা করবে কিম্বা কাজ না থাকলে কাজ করবে! এখন কাজ নেই। কাজেই এখন আমার খেলার সময়। কিছু দিন এখন এই চলুক।

হেসে মুকুন্দবাবু বলেছিলেন—তা নয়তো চলবে। কিন্তু ঐ পা ভাঙ্গা নেড়ী কুত্তাটা আনলেন কেন?

সহজ হৃদ্য হাসি হেসে শঙ্কর বলেছিল—আমিও তো খোঁড়া!

মুকুন্দবাবু বিব্রত ও অপ্রস্তুত হয়েপড়ে কিছুক্ষণ কোন কথা খুঁজে পাননি। তারপর হেসে বলেছিলেন—আপনি যে কি বলেন শঙ্করবাবু? আপনার কথার ধাক্কা সামলানো বড় কঠিন মশায়। করুন, আপনার যা খুসী করুন খোঁড়া কুকুর আর বাজে পাখী নিয়ে।

এরই কিছুদিন পর।

শঙ্কর একদিন দুপুরে মুকুন্দবাবুকে বললে—আমি আজ একটু বাইরে যাব।

শঙ্কর সাধারণত কোথাও যায় না। তাই তিনি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন—কোথায়?

—সে যাব এক জায়গায়।

কিছুক্ষণ পর রামদুলালকে দিয়ে একখানা ট্যাক্সি আনিয়ে শঙ্কর বেরিয়ে গেল। কোথায় গেল কিছু বলে গেল না। যাবার সময় ল্যাংড়াকে ডেকে গাড়ীতে তুলে নিলে। ল্যাংড়া তিনপায়ে লাফাতে লাফাতে গাড়ীতে উঠে গেল।

ফিরল সে সন্ধ্যের সময়। মুকুন্দবাবু তখনও যাননি। অপিসেই রয়েছেন।

তাকে গাড়ী থেকে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা ল্যাংড়াকে কোলে করে নামতে দেখে রামদুলাল ছুটে এসে কাছে দাঁড়াল। বললে—তুমি কাঁহা গিয়োসলে চাচাজী? মালিক বাবু তো 'ভাবসে' খুব। বহুত রঙ ভি চটিয়েছে। বোলে কি—কাজ কাম ছোড়কে কাঁহা গিয়া!

শুনে সঙ্গে সঙ্গে ভ্রু কুঁচকে উঠল তার। কিছু না বলে ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে সে ল্যাংড়াকে কোলে করে সোজা চলে গেল ল্যাবরেটরীতে। সেখানে গলায় বকলস বেঁধে ভারী টেবিলের পায়ার সঙ্গে চেনের অপর প্রান্ত বেঁধে দিয়ে তার খোবার চটটি ছেড়ে পেতে তাকে শুইয়ে দিলে।

দরজার কাছে শব্দ শুনে সে ফিরে তাকাল। মুকুন্দবাবু দাঁড়িয়ে আছেন।

তার চোখে চোখ পড়তেই তিনি বিরক্তির সঙ্গে বললেন—কোথায় গিয়েছিলেন শঙ্করবাবু কুকুরটাকে নিয়ে?

—ভেটিনারী কলেজে।

—কেন?

—ওর পা'টা সারছিল না দেখে ওকে দেখিয়ে নিয়ে এলাম। ডাক্তাররা ওদের দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলে। তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলেন মুকুন্দবাবু। শঙ্কর লক্ষ্য করলে তাঁর ছোট ছোট চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টি যেন রাগে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। তিনি বললেন—জন্তু-জানোয়ারের ওপর দেখছি আপনার অগাধ মায়া-মমতা! এই মায়া-মমতার খানিকটা যদি আশপাশের মানুষের জন্যে দেখাতেন তা হলে তারা বর্তে যেত।

কিছুক্ষণ আগেই রামদুলালের কথা শুনে তার মনটা উত্তপ্ত হয়েই ছিল। সেই উত্তাপে যেন এই কথাগুলি দেশলাইয়ের কাঠির কাজ করলে। সে তীক্ষ্ণ স্বরে বললে—তার মানে?

এবার রুদ্ধ কণ্ঠে মুকুন্দবাবু বললেন—তার মানে

আপনাকে বুঝিয়ে না দিলে আপনি বুঝতে পারবেন না তো! তার কারণটা তো আগেই বললাম। আমার কথাটা যে ঠিক তা তো দেখতে পাচ্ছেন! কথাটা কি জানেন? আপনার অপটু শরীর। আপনি বাইরে যান না। আপনি আমাকে বলে আমার সঙ্গে গাড়ীতে যেতে পারতেন। তাতে আপনার সম্মানে আটকাত। যাক, তা নিয়ে আমার বলার কিছু নেই। আপনি বাইরে গেলেন। ফিরে এলেন এই মাত্র, রাত্রি করে। আমি আপনার জন্যে অফিস ঘরে বসে আছি, ভাবছি, আপনারই জন্যে বাড়ী যেতে পারিনি। আর আপনি গাড়ী থেকে নেমে আমার সঙ্গে একবার দেখা না করে সোজা চলে এলেন ল্যাংড়া কুকুরটাকে কোলে করে। কাজ-কর্ম্ম সব ছেড়ে দিয়েছেন—

শেষ কথাটা তার মাথায় আগুন ধরিয়ে দিলে। এতক্ষণ যে মমতার অভিমান নিয়ে মুকুন্দবাবু তাকে অভিযুক্ত করছিলেন তার সামনে সে যেন কেমন বোধ করতে লাগল। যে কথাগুলি বলে তিনি অভিযোগ করলেন তা যে সত্যি তা তো সে নিজের মনেই জানে! অথচ এ ধরনের অভিযোগ কেউ তাকে করেনি কখনও। কারণ এমন করে তার জীবনের সঙ্গে কারও জীবন জুড়ে যায়নি! তার ভালও লাগছিল আবার কেমন একটা অসহায় যন্ত্রণার আস্থর চরে যাচ্ছিল সে মনে মনে। শেষ কথাটা বলা যাক সে নিজের মনের অসহায় যন্ত্রণাটাকে রাগের আকারে প্রকাশ করার সুযোগ পেলে। সে রেগে বললে—আপনার যদি মনে হয় আমি আপনার কাছে মাইনে নিয়ে কাজকর্ম কিছুই না করে বসে আছি তা হলে আমি চলে যাব!

মুকুন্দবাবু যেন পাথর হয়ে গেলেন। তাঁর চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টি যেন স্তিমিত হয়ে গিয়ে কাঁচের চোখের মত লাগতে লাগল। শঙ্কর দেখলে গোঁফ দাড়ির আড়ালে তাঁর ঠোঁট দুটো কাঁপছে যেন। মুখখানা কেমন হয়ে গিয়েছে। তিনি শান্ত হয়েই আস্তে আস্তে বললেন—কথাটা আপনার মতই বলেছেন বটে! চার মাস আগে যেদিন এখানে সোজা এলাহাবাদ থেকে এসে চাকরী চেয়েছিলেন সেদিন কিন্তু এই মানুষটা কথা বলেনি। ভাল! আপনার ধর্ম আপনার কাছে! আপনার যা ইচ্ছা হয় করবেন।

বলে মুকুন্দবাবু আর অপেক্ষা করলেন না, চলে গেলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই শঙ্কর দেখলে মুকুন্দবাবুর গাড়ীখানা বেরিয়ে চলে গেল। সে বুঝল তিনি চলে গেলেন।

কেমন একটা অবসন্নতায় তার মনটা ভরে গেল। সে বুঝতে পারছে না কেন ঘটল এটা। সে তো ঠিকই যা বলবার তাই বলেছে মুকুন্দবাবুকে।

ল্যাবরেটরীর দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সে এগুতে লাগল ধীরে ধীরে। রামসুহাস এসে দাঁড়াল তার সামনে। কতকগুলো কাগজ এগিয়ে দিলে তার দিকে।

সে চমকে উঠে বললে—কি এগুলো?

—বাবু দিয়ে গেলেন আপনাকে দিতে।

একটা খামের মধ্যে কিছু কাগজ সে বের করে দেখলে একান্ত কৌতূহলের সঙ্গে। পোস্টাপিসের পাশবই আর একখানা খাতা। তার মনে পড়ল সে আজার কয়েক দিনের মধ্যে মুকুন্দবাবু তাকে দিয়ে পোস্টাপিসে

একটা কথা সই করিয়ে নিয়েছিলেন। তারপর সে সম্পর্কে তিনিও আর কিছু বলেন নি, তারও আর কিছু মনে নাই। পোস্টাপিসের পাশ বইয়ে তার নামে সাতশো কুড়ি টাকা জমা পড়েছে চার মাস। প্রতি মাসে একশো আশী টাকা হিসেবে। জমা পড়েছে প্রতি মাসের ঠিক একই দিনে চার তারিখে। অন্য খাতা খানি খুলে দেখলে তার মাস মাইনের হিসেব। মাইনে মাসে আড়াই শো টাকা। তার মধ্যে পোস্টাপিসে প্রতি মাসে গিয়েছে একশো আশী টাকা করে। সত্তর টাকা করে প্রতি মাসে মুকুন্দবাবু রামসুহাসের হাতে দিয়েছেন তার খরচের জন্যে। ঐ সত্তর টাকা রামসুহাসের কাছে থাকে। তার থেকেই ওর খাওয়া দাওয়ার জন্যে খরচ করে। তার কখনও সখনও কিছু দরকার হলে সে চেয়ে নেয় রামসুহাসের কাছে।

খাতাগুলো হাতে করে সেই শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে সে চুপ চাপ বসে রইল। কিছু সে ভাবছে না, কিছু মনেও আসছে না। কেবল বুঝতে পারছে রামসুহাস তার মুখের দিকে তারই মত বোকা হয়ে তাকিয়ে আছে।

মনের মধ্যে কেবল মাঝে মাঝে এক একবার ভেসে উঠছে মুকুন্দবাবুর বিস্মিত মুখ আর আহত দৃষ্টি। মনে পড়লেই সঙ্গে সঙ্গে মনটা বড্ড খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

—চাচাজী! মৃদু স্বরে ডাকল রামসুহাস।

সে মুখ তুলে তাকিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে শুধু বললে—উঁ!

—কিয়া হুয়া চাচাজী? ইসব খাতা-উতা কিয়া হ্যায়? পোস্টাপিস কা কিতাব না হ্যৈ? কিসকা?

—দেখছি তো আমার। তোমার মালিকবাবুর কাছে ছিল। ফেরৎ দিয়ে গেলেন।

—কাহে? হুয়া কেয়া?

সব ঝেড়ে ঝুড়ে পরমোৎসাহে শঙ্কর উঠে দাঁড়াল জোর করে খুশী হবার চেষ্টা করে। অত্যন্ত লঘুভাবে একটা আড়ামোড়া ছেড়ে, চেষ্টা করে অনেক খানি হেসে সে বললে—কুছ নহি হুয়া! তুমি তাড়াতাড়ি রোটি বানাও দেখি। বেশ ঘিউ মাখিয়ে। দু' তিনখানা খেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ি। খুব ঘুম আসছে।

তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ঘরের মধ্যে শুয়ে পড়ল শঙ্কর। পাশ বই আর পাতাখানি খামের মধ্যে পুরে টেবিলের দেরাজে রেখে দিলে।

সে ভেবেছিল সারাদিন অনেক ঘোরাঘুরি করেছে, শোবা মাত্র ঘুম এসে বসবে দু চোখের পাতায়, পাতা ভারী করে। কিন্তু কি আশ্চর্য ঘুম আসার আর নাম নাই।

মনটা সে বেশ হাল্কা করার চেষ্টা করলে। কি হয়েছে কি? কিছুই হয়নি! সে তো পারতপক্ষে কারখানা থেকে বাইরে যায় না। একবার যদি গিয়েছিল তার জন্যে অত মনোকষ্ট কেন? উৎকণ্ঠা? তার জন্যে অত উৎকণ্ঠা কিসের ভদ্রলোকের?

মায়া-মমতা? ও মায়া মমতা তিনি তাঁর সন্তান সন্ততিদের করুন। তাঁর সেই শ্যামা, ক্ষীণাঙ্গী কন্যাকে করুন। তাকে করার দরকার হবে না। ও তার কাছে দস্তরমত সামিল। সে একা মানুষ, তার অন্য মানুষের, অনাত্মীয় কারো মায়া মমতা না হলেও চলবে। আর মায়া মমতা মানে তো করুণা! সে যেমন ঐ ল্যাংড়াকে দয়া করে, এ তো তাকেও তেমনি দয়া করা।

আর এ যদি মায়া মমতাই হয় তাও যে কেন তা সে ভালই জানে! আজ এই ছোট্ট উৎপাদন কেন্দ্রে তার মূল্য যে কি তা তো সে না জানা নয়। সে আজ এই পরিসরটুকুর মধ্যে বিশ্বকর্মাতুল্য। তাকে মায়া দেখানো মানে তোয়াজ করা। তার বুঝতে কিছু বাকী নাই!

কিন্তু এতে চল না! এমনি করে মনকে হাজার রকমে হাজার বার বুঝিয়েও যেন মনকে বুঝানো যাচ্ছে না। মন বুঝতে চাইছে না। মন যে বুঝতে চাইছে না তার প্রমাণ সে পাচ্ছে নিজের মন থেকেই। মন যে হাল্কা হচ্ছে না কিছুতেই। মনে হচ্ছে তার মনের উপর বিপুল গ্লানির এক ভারী বোঝাকে যেন চাপিয়ে দিয়ে গিয়েছে। হাজার চেষ্টা করেও তাকে এক চুল সরাতে পারছে না।

তারই ফলে ঘুম কোথায় পালিয়েছে তার দুই চোখ ছেড়ে। খোলা জানলা দিয়ে একটা পামগাছের কাণ্ডটা একটা পেট মোটা লোকের মত মনে হচ্ছে। তারই ফাঁক

দিয়ে দিয়ে আকাশের তারা দু'চারটে নজরে পড়ছে। নজরে পড়ে বিরক্ত লাগছে। তারাগুলো যেন কট কট করে লাগছে চোখের উপর। তারাগুলোকে যদি না দেখতে হত তা হলে হয়তো ঘুম আসত কোনক্রমে।

এই ভাবনা ভাবতে ভাবতেই কখন ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে।

সে উঠল খানিকটা বেলা করে। শরীরটা যেন কেমন ম্যাজ ম্যাজ করছে, মনটাও তার ভার। সেদিন আর কুকুর আর পাখী নিয়ে ব্যস্ত না হয়ে কানগুলো টেস্ট করবার কাজে লেগে গেল।

কাজ করতে করতে মনটা কখন কাজেই বসে গিয়েছে। কতটা বেলা হয়েছে তার খেয়াল ছিল না।

এমন সময় রামদুলাল এসে দাঁড়াল। তাকে ডেকে বললে—চাচাজী, আজ মালিকের তবিয়ৎ খারাব। উনি আজ আসতে পারবে না।

হেসে উঠল শংকর—আমাকে বলছ কেন? আমি শুনে কি করব?

একটু থেমে সে আবার বললে—উনি আপনাকে বলতে বললেন না কি?

কেমন যেন একটু বিরক্ত হয়ে রামদুলাল বললে—নহি। মালিক কুছ বহি বোলা। বলে সে আর দাঁড়াল না সেখানে। চলে গেল।

মনটা আবার খারাপ হয়ে গেল শংকরের। কাজ কর্ম ছেড়ে সে বকুলগাছ তলায় গিয়ে বসল। বসেই দেখলে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা পাটা নিয়ে ল্যাংড়াও তার পিছনে পিছনে এসে তার আগেই বসে গিয়েছে।

কিছুই ভাল লাগছে না তার। মনে হচ্ছে ভাল লাগার মত কোন কিছু নাই সংসারে। যে কাজ নিয়ে সে মেতে থাকে সে কাজেরও কোনও দাম নাই। করে তো মেকানিকের কাজ। তার কাজ বিক্রী করে বাজার থেকে মুকুন্দবাবু কিছু অর্থ উপার্জন করেন। তার বেশী আর কি?

সে চারিটা পাশে চাইল শূন্য দৃষ্টিতে। ভাঙ্গা ঘাস চলছে, গাছ রৌদ্র তত তাপসহ গরম। গাছের তলাটা তবু একটু ঠাণ্ডা। গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে সে চুপ করে বসে রইল নিঃসহায়ের মত। যার কোন আশা নাই, প্রয়োজন নাই, বন্ধু নাই।

কারখানার মধ্যে লোহা পেটার কি কলকব্জা জোড় দেবার ঠক ঠক ঠং ঠং শব্দ ওঠে অবিরত যতক্ষণ কারখানা চালু থাকে। দুটো লেদ মেশিনে কাজ চলে। তারও শব্দ থাকে। এসব জানা চেনা শব্দ। এরা ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিকের মত বেজেই যায়। কানে লাগে না।

কিন্তু এরই মধ্যে হঠাৎ যেন একখানা গাড়ী আসার শব্দ হল। গাড়ীখানা দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু শব্দ শুনে সে বুঝলে যে একখানা গাড়ী এসে থামল।

তা হলে কি মুকুন্দবাবু আসব না বলেও এসে গেলেন?

নাঃ। এ তো ওর সেই বিচিত্র বাহনের বহেংবি নয়। এর শব্দ ভিন্ন রকমের। সে কিন্তু মোটেই চঞ্চল হল না। যাই হোক, কেউ এসে থাকবে। তার জন্যে সে চঞ্চল হয়ে কি করবে? সে যেমন চুপ করে বসেছিল তেমনই বসে রইল।

কিন্তু অবাক হতে হল তাকে। সে দেখলে মুকুন্দবাবুর মেয়ে অলকা অফিস ঘরের বারান্দা থেকে নেমে মাঠ পার হয়ে ল্যাবরেটরীর দিকে চলে আসছে দ্রুত পায়ে। কালো মেয়েটির পোষাক-আশাক কিন্তু বড় ভাল, বড় পরিচ্ছন্ন, ছিমছাম। মেয়েটি লাল পাড় সাদা শাড়ী পড়েছে, চুলগুলি বেণী করা। দুপুরের তীব্র আলোতে ধোপভাঙা শাড়ীর লালপাড়টি জ্বলছে যেন আগুনের মত।

কিন্তু মেয়েটি যাচ্ছে কোথায়? কেনই বা যাচ্ছে? সে কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে রইল।

অলকা হন হন করে লম্বা পা ফেলে ল্যাবরেটরীতে তার কামরার দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। সে দেখতে পাচ্ছে এখান থেকে। খোঁড়া পা-টা টান করে বাড়িয়ে সে

স্বাধীনতার জন্য লক্ষ্মী করুন
প্রতিরক্ষা বণ্ড কিনুন

গায়ের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসেছিল আরাম করে। সে উঠে দাঁড়াল। একবার ভাবলে এইখান থেকে গলা তুলে সে একবার ডাকে অলকাকে। কিন্তু ডাকলে না, চুপ করেই তার দিকে তাকিয়ে রইল।

মেয়েটি কিন্তু তাকে দেখতে পেয়েছে সে উঠে দাঁড়াতেই। ল্যাংড়াও উঠে দাঁড়িয়েছে তার সঙ্গে। তাকে দেখতে পেয়েই মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে নিজের চলার গতি পরিবর্তন করে তারই দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। একটু অবাক হল সে। তা হলে অলকা এই দুপুর রৌদ্রে তার কাছেই এসেছে? মুকুন্দবাবুও এসেছেন তা হলে। সে এগিয়ে গেল একটু।

কাছাকাছি আসতেই সে একটু হেসে বললে—আপনার বাবা এসেছেন?

সে ভদ্রতার হাসির বিন্দুমাত্র ছায়া পড়ল না অলকার মুখে। সে গম্ভীরভাবে বললে—না, বাবা আসেন নি।

শঙ্কর বুঝতে পারলে তার কণ্ঠস্বরের থমথমে গাম্ভীর্যের আড়ালে তীব্র ক্ষোভ রণ রন করছে। সে একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল মেয়েটির মুখের দিকে।

অলকা তীব্রভাবে বললে—বাবা আসেননি। আসেন নি বলেই আমাকে আসতে হল।

তারপর তার মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে তীব্র স্বরে বললে—আচ্ছা, আপনি কি বলুন তো?

শঙ্কর অবাক হয়ে গেল। তাকিয়ে রইল তার মুখের দিকে।

তীব্রতর কণ্ঠে মেয়েটি বললে—আপনি বাবাকে কাল অমন করে আঘাত করেছেন কেন? আপনি কি ভাবেন আপনি একজন অসাধারণ বুদ্ধিমান, ভয়ঙ্কর কাজের মানুষ, যে কাজ করে বাবার অনেক টাকা লাভ করিয়ে দিয়েছে, বাবার ব্যবসায় খুব উন্নতি করিয়ে দিয়েছে? আপনি কি ভাবেন তারই জন্যে তিনি আপনার কাছে কেনা হয়ে আছেন? আপনি বোধহয় ভাবছেন আপনি চলে গেলে বাবার খুব ক্ষতি হয়ে যাবে? যে লাভ আজ হচ্ছে তা হবে না? আপনি ভুলেও ভাববেন না সে কথা।

বলে বিস্মিত বিভ্রান্ত শঙ্করের মুখের দিকে চেয়ে অলকা হাসল একটু। একান্ত স্নেহের হাসি। তারপর আবার বলতে লাগল—আপনি আপনার জীবনে এমন মানুষের সংস্পর্শে আসেননি কখনও। ওঁকে আপনি বুঝবেন কি করে? ঐ ব্যাঙ্ক পাগল, রগচটা, পাগলা মানুষকে বুঝতে হলে বুকে একটু ভালবাসা আর চোখে একটু সহানুভূতির রঙ চাই। না হলে ওঁকে বোঝা যায় না।

বলতে বলতে থামল অলকা। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললে একবার। ঠোঁট দুটো কাঁপতে কাঁপতে থেমেছে তখন। চোখে জলের একটা পাতলা ছিলকে পড়েছে।

শঙ্কর ওদের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে আবার মুখ ফিরিয়ে নিলে। আশ্চর্য ব্যাপার! এই তিরস্কার আর অভিযোগ তো খারাপ লাগছে না তার! খারাপতো লাগছেই না, উপরন্তু মনের মধ্যে যে বোঝাটা চেপে ছিল সেটাই যেন কেমন হাল্কা হয়ে আসছে।

কিন্তু অলকার ক্ষোভ তখনও শেষ হয়নি। সে আবার তীব্রভাবে বলতে লাগল—আপনি ওঁকে কাল ভয় দেখিয়েছেন—আপনি চলে যাবেন! আপনার ধারণা উনি খুব ভয় পেয়েছেন? ভয় পেয়েছেন আপনি চলে গেলে ওঁর অনেক লোকসান হয়ে যাবে বলে, নয়? অন্য মানুষ হলে বোধহয় অনেক আগেই ওঁর মনটা বুঝতে পারত। উনি অকারণে আপনাকে প্রয়োজনের অনেক বেশী ভালবাসেন সেটা বুঝত। আপনিতো লেখাপড়া জানা বুদ্ধিমান লোক, বুদ্ধির অনেক অহঙ্কার আপনার। সেই অহঙ্কারের ধোঁয়াতে আপনি বুঝতে পারেননি। বুঝতে পারেননি বুঝতে চাননি বলে। কি বলব আপনাকে?

বলে ইতঃস্তত করে একটু থেমে অলকা বললে—সেই কথাটাই বলতে এসেছি আপনাকে। আমার এক বড় দাদা ছিল। আপনার বয়সী, মানে বেঁচে থাকলে

দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে কাজ করুন
জাতীয় দক্ষতা বাড়িয়ে তুলুন

সে আজ আপনারই বয়সী হত। সে সাত বছর বয়সে মারা গিয়েছিল। আপনাকে দেখে ওঁর সেই ছেলের কথা মনে হয়েছে। আপনি আসার পর আমাকে অনেকবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছেন—সেই আবার নতুন হয়ে ফিরে এসেছে। সেই জন্যই আপনার সম্পর্কে ওঁর এমন দুর্বলতা। তাই আপনার কথায় এত দুঃখ পেয়েছেন যে কাল রাত্রিতে কিছু খাননি আজ কারখানায় আসতেও ইচ্ছে হল না। চুপচাপ বিছানায় শুয়ে আছেন।

থামল অলকা। তার মুখের দিকে বেশ স্থির দৃষ্টিতে খানিকটা সময় চেয়ে থেকে অলকা বললে—এই সব শোনার পর আপনি চলে গেলেও চলে যেতে পারেন। অনায়াসে পারেন। সে ক্ষেত্রে বাবা খুব দুঃখ পাবেন, তবে আমি এই ভেবে সান্ত্বনা পাব যে একটা নিষ্ঠুর হৃদয়হীন লোককে ভালবাসার হাত থেকে বাবা তাড়াতাড়ি নিষ্কৃতি পেয়েছেন। আর যদি থাকেন তা হলে বাবা খুসী হবেন, ছেলেমানুষের মত। সে ক্ষেত্রে দুটো কথা আপনাকে বলে যাই। বাবা আপনাকে কাল আপনার পাওনাই আর হিসেবের খাতা দিয়ে গিয়েছেন। সেগুলো উনি এলেই ওঁর হাতেই ফেরৎ দিয়ে দিবেন। আর যদি আপনার সম্মানে না বাধে তাহলে ওঁকে বলবেন আপনাকে 'তুমি' বলে ডাকতে। উনিতো আপনার চেয়ে অনেক বড় বয়সে ; আর, আপনাকে খানিকটা ভালও বাসেন।

বলে আর এক মুহূর্ত দাঁড়াল না অলকা। তার মুখের দিকেও আর একবার ফিরে তাকাল না সে। পিছন ফিরে সে চলে গেল দ্রুত পায়ে।

গাছতলাতেই চুপ করে বসে রইল শঙ্কর।

তার মনে হল মেয়েটি যেন তার চিত্তের সমস্ত গ্লানির বোঝাটা নামিয়ে তিরস্কারের জল দিয়ে তার চিত্তটিকে ধুয়ে দিয়ে গেল। সে শূন্য দৃষ্টিতে রৌদ্রতপ্ত মাঠের দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

মনটা কেমন খালি হয়ে গিয়েছে। বসে থাকতে থাকতে সে গাছের গোড়াতেই ছায়ায় শুয়ে পড়ল। চোখ দুটি মুদে এল আস্তে আস্তে।

আবার চোখ খুলল সে এক সময়। রামসুহাসের ডাকে। রামসুহাস ডাকছে—চাচাজী, মাটিতে শিদ যাচ্ছ ? চল, খাবে চল বাবা !

চোখ কচলাতে কচলাতে সে উঠে বসল। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে—তোমার মালিকবাবু এসেছেন নাকি ?

—নেহি। আজ তো নেহি আয়েগা !

মুকুন্দবাবুর সঙ্গে দেখা হল তারপরের দিন। দুপুর বেলা।

স্যাবরেটরীতে কাজ করতে করতে সে দেখলে মুকুন্দবাবুর রাজহস্তী এসে পৌঁছল কারখানায়। প্রচণ্ড শব্দ এবং অনেক ধোঁয়ার গন্ধ থেকে সেটা মালুম হল।

কাজ করতে করতে সে প্রত্যাশা করে রইল মুকুন্দবাবু কখন এক সময় এসে তার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছেন। এখন কথা বলার দায়টা তার। সেই প্রত্যাশাতেই বার বার দরজার দিকে তাকাল সে। নাঃ মুকুন্দবাবু আজ এদিকে আসবেন না। আজ তাকেই যেতে হবে।

সে এক সময় খামখানি হাতে করে লেবরেটরী থেকে বেরিয়ে অফিস ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। চেয়ারে বসে কি লিখছিলেন মুকুন্দবাবু। তিনি গম্ভীরভাবে মুখ তুলে তাকালেন। কথা বললেন না।

আজ শঙ্কর মানুষটিকে পরিষ্কার বুঝতে পারছে।

● অভিজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসক
● রকমারী ফ্রেম
● বিদেশী লেন্স্
● সুলভ মূল্য

স্বাগত জানাই

১৭২এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড
(সাদার্ণ এ্যাভেনিউর মোড়)
কলিকাতা-২৬

একটি বয়স্ক শিশু অভিমান করে কথা বন্ধ করে রয়েছে। প্রথম প্রথম কথা বলার এবং কথা বলানোর দায়িত্ব তার। সে হেসে বললে—কাল এলেন না কেন?

শুধু মুখ তুলে তার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মুকুন্দবাবু। কথা বললেন না।

শঙ্কর আবার বললে—শরীর খারাপ হয়েছিল না কি?

এবার গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন তিনি।

শঙ্কর এগিয়ে দিলে খামখানি—এটা দিয়েছিলেন।

এতো আপনার জিনিস আপনার কাছে রেখে দিন।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে খামখানা নেবার জন্যে হাত বাড়ালেন তিনি।

হাত বাড়িয়ে ও নিলেন মুকুন্দবাবু। কিন্তু হাতটা গুটিয়ে নিলেন না। বললেন আমি রেখে দেব? আপনি রাখবেন না? আপনারই তো জিনিস!

না আমার নয়, আপনার। আপনি করে দিয়েছেন, আপনার কাছেই থাকুক। আর আপনি আমাকে 'আপনি' বলেন কেন? এর পর থেকে আমাকে আপনি 'তুমি' বলে ডাকবেন।

কথাটা শুনে তার মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মুকুন্দবাবু।

শঙ্কর বুঝতে পারছে তার মনের মধ্যে একটা বিচিত্র ধরনের আবেগ স্ফুরিত হয়ে উঠছে। এ ধরণের আবেগ সে এর আগে কখনও অনুভব করেনি। একটি নম্র মমতায় মনটি যেন চন্দন প্রলেপের স্নিগ্ধতায় স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে। সে বললে—আর একটা কথা বলি আপনাকে। আপনি আমাকে আপনার এখান থেকে যতদিন না চলে যেতে বলবেন আমি যাব না, আমি এখানেই থাকব।

অকস্মাৎ যেন নিজের মধ্যে ধরে রাখা গাম্ভীর্য অসহ্য হয়ে উঠল বয়স্ক মানুষটির কাছে। তিনি গাম্ভীর্যের মহার্ঘ বেশ পরিত্যাগ করে ছুটে বেরিয়ে এলেন সহজ চাঞ্চল্যের রাজ্যে। ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বললেন—আচ্ছা, আচ্ছা ও সব কথা পরে হবে। থাক। এখন শোন। আরও শত খানেক ফ্যান চাই। দু চার দিনের মধ্যেই দিতে হবে। পারবে দিতে?

অত্যন্ত সহজে 'তুমি'তে অবতরণ করে এসেছেন মুকুন্দবাবু। শঙ্করের মনে হল তিনি যেন মনে মনে এতদিন তাকে তুমিই বলে এসেছেন। যে 'আপনি'টা বাইরে বলেছেন সেটা যেন বলতে হয়েছে অনেক ক্লেশ করে। সেইটা অনুভব করেই শঙ্কর হাসল একটু। তার সঙ্গে জুড়ে দিলে—ও আর এমন কঠিন কি? করে দেব কিন্তু—

—কি কিন্তু? আবার শিশুর চাঞ্চল্য নিয়ে বললেন মুকুন্দবাবু।

—কিন্তুটা বুঝতে পারছেন না? সেপ্টেম্বর মাস শেষ হতে চলেছে। পাখার বাজার আর ক'দিন? এই তো অক্টোবরের পনরটা দিন গেলেই বাজার শেষ। এ সময় আপনার 'হোলসেলার' আবার পাখা চাইছে কেন? আপনার এ হোলসেলার বেশ সুবিধের নয়। আসছে বছর বদলে ফেলবেন ওকে। এ বছর আমাদের ফ্যান যা বিক্রি হয়েছে তার ডবল বিক্রি হওয়া উচিত ছিল।

তাই করা যাবে।

পরক্ষণেই কি মনে পড়াতে তিনি বললেন—ওই দেখ তোমার একখানা চিঠি রয়েছে। আজকের ডাকে এসেছে। দিতে ভুলে গিয়েছি। এই নাও!

বলে তিনি এক খানা খামের চিঠি তার হাতে তুলে দিলেন।

শঙ্কর মনে মনে একটু বিস্মিত হয়েই চিঠিখানা নিলে। সে ভেবে পেলেনা তাকে কে চিঠি লিখবে! খামের উপরের লেখাটাও অপরিচিত। চিঠি খানা হাতে নিয়ে একবার মনে হল খুলে পড়ে সেইখানেই। পরক্ষণেই বুকটা একবার ধক ধক করে উঠল। যদি সুনির্মলা লিখে থাকে!

মুকুন্দবাবু শুভার্থীর মত বললেন—এখনও খাওনি? যাও যাও গিয়ে। বেলা হয়েছে, আর দেরী করো না।

[ক্রমশঃ]

আদিবাসীদের কথা

অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতবর্ষে নৃতত্ত্ববিদদের সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত রকমের সমালোচনা হয়েছে তাহ'ল তারা আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকদের চিড়িয়াখানায় বা যাদুঘরে রাখতে চান তাদের নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। আমার যতটা মনে হয় এই প্রস্তাব প্রথমে করা হয়েছিল ১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলীতে, যখন ভারতে সাধারণ এলাকা বহির্ভূত স্থানগুলো সম্পর্কে একটি বিতর্কের অবতারণা করা হয়, এ বিতর্কের অধিবেশনে বেশ কিছু পরিষদ সদস্য নৃতত্ত্ববিদদের বিরুদ্ধে এইভাবে অভিযোগ করেন যে নৃতত্ত্ববিদরা হ'ল এমন এক ধরনের পণ্ডিত সম্প্রদায় যারা ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদের অসভ্য হিসেবে দেখতে চান এবং তারা চান যে আদিবাসীরা কেন এমন একটি বর্বর যুগে অজ্ঞানতার অন্ধকারের মধ্যে বাস করে যাতে তাদের সম্বন্ধে কিছু জানতে পারলে আদিবাসীদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানেরই পরিধি বাড়বে। আর যদিও আজকের দিনে ভারতবর্ষ নৃতত্ত্বের গুরুত্বকে স্বীকার করে নিয়েছে, আদিবাসী সম্প্রদায়ের জনসাধারণের যে কোন রকমের বুদ্ধি প্রণোদিত ও সুপরিকল্পিত অগ্রগতির জন্য, তবু এখনও অনেকলোক রয়েছেন যারা ছেলেমানুষের মত সেই প্রশ্ন করেন যে আদিবাসী সম্প্রদায়ের উন্নতি সাধনের যথার্থ প্রয়োজনীয়তা কি? বাস্তবিক পক্ষে যে কোন ধরনের, যে কোন মতবাদসম্পন্ন রাজনীতিবিদের অভিমতের প্রতিক্রিয়াসূচক কোন কথার উল্লেখ করলে বলতে হয় যে 'নৃতত্ত্ববিদদের' মতে চিড়িয়াখানাই হ'ল আদিবাসীদের উপযুক্ত স্থান।

এ কথা সত্য যে এমন অনেক লোক রয়েছেন যারা মনে করেন যে আদিযুগের মানুষেরা আমাদের চাইতে সকল দিক থেকে শ্রেষ্ঠতর কাজেই তারা আমাদের চাইতে অনেক ভালোভাবে বসবাস করতে অভ্যস্থ। সেই আদিম যুগের মানুষেরা নিজেদের সভ্যতার আলোক স্পর্শ থেকে অনেক দূরে রাখতে চায় বাইরের জগতের প্রভাব থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে ইচ্ছুক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে বাইরের জগতের শোষণ থেকেও নিজেদের মুক্ত রাখতে চায়।

কিন্তু এই মনোবৃত্তির সঙ্গে নৃতত্ত্বের কোন সম্পর্ক নেই এবং খুব অল্প সংখ্যক নৃতত্ত্ববিদই আছেন যারা এই ভাবধারা পোষণ করে থাকেন। আজকের দিনে নৃতত্ত্বের মূল বিষয়বস্তু হ'ল ক্রমবর্ধমান সমাজজীবনকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা, যা সমাজকে নিয়ে আজকের দিনের নৃতত্ত্ব বেশী অনুশীলন করে না, আর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পরিপূর্ণ

সম্পদ আজকের দিনে আরও বেশী কার্যকরী হবে যখন চিড়িয়াখানার দরজা আর বন্ধ করে রাখা হবেনা, চিড়িয়াখানার জীবজন্তু যখন আমাদের বাগানের মধ্যে এসে গিয়েছে।

কয়েকশত বছর আগেই আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকদের সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে জানবার ও বুঝবার জন্য গবেষণামূলক কাজ সুরু হয়। তখনকার কালে বিজ্ঞান-সম্মত নৃতত্ত্ববিদের কেউ জানতো না এবং আজকের দিনের আদিবাসীদের গোষ্ঠী বিচারের জন্য যেই যুক্তির অবতারণা করা হয় যথার্থই সেই সব যুক্তিও তখনকার কালেও অবতারণা করা হত প্রকৃতির আবাসস্থলে মানুষকে কি অপেক্ষাকৃত ভাল দেখায়, শিল্পের আশ্রয়ে যে মানুষ গড়ে উঠেছে তার চাইতে কি প্রাকৃতিক বর্ব মানুষিক শ্রেষ্ঠতর? আধুনিক জগতের শিক্ষিত সভ্য ও শহুরে মানুষিক কোনক্রমে 'শ্রেষ্ঠতর জীব' তাদের নীতিবোধ কি অধিকতর সচেতন সেই সব লোকদের তুলনায় অশিক্ষিত বনা এবং পৃথিবীর আদিম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত? কে বেশী সুখী এখানকার কালে সভ্য সমাজের শহুরে মানুষ না আদিমযুগের বন্য মানুষ।

ঠিক এই প্রশ্ন নিয়ে বসওয়েল এবং জনসন বেশ কয়েকবার আলাপ আলোচনা করেছেন। বসওয়েল ব্যক্তিগতভাবে অনেকবার রুসোর মতো উঁচুদরের দার্শনিকের সঙ্গে অনেকবার সাক্ষাৎ করেন, রুসো ছিলেন একজন আদিম প্রকৃতির মহামানব। কিন্তু জনসন তা ছিলেন না। জনসন বলেছিলেন 'আদিম জাতির মানুষদের হয়ে ওকালতি করো না'—তারপরে বসওয়েল যখন আদিম বর্বর জীবনের অন্তরালে উৎকৃষ্টতর আনন্দের যে আস্বাদ পাওয়া যায় তার উল্লেখ করেন, এবং তার উত্তরে জনসন বলেন, 'আদিম জীবনের মতো মিথ্যা আর কিছু নেই, আদিম মানুষদের সভ্য মানুষদের চাইতে বেশী দৈহিক সুবিধা অর্জনের আর কিছু নেই, শিক্ষিত মানুষের দৈহিক সুবিধা-অসুবিধা যা রয়েছে, অশিক্ষিত বর্বরদেরও ঠিক তাই আছে। আদিম মানুষদের শরীরের বাধন বা স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ্য এমন একটা কিছু উল্লেখযোগ্য নয় এবং মানসিক অনুভূতির দিক থেকেও আদিম মানুষেরা সভ্য মানুষদের চাইতে কোন অংশে উন্নত নয়, বরং তারা তাদের চাইতে অনেক হীন, বাঁদর ভালুকের মতই তারা অস্বস্তিকর বন্য জীবনযাপন করে থাকে। জনসনের ধারণা ছিল যে, কেউ ইতিহাসবিদের মনে কোন প্রকার সন্দেহ, দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই, তিনি যদি কেউ ইতিহাস লিখে ফেলতেন তবে তিনি অনেক আগেই মারা যেতেন কারণ তার চোখ দিয়ে তিনি খাদ্য সংগ্রহ করা ছেড়ে করতে পারতেন না। একদিন সন্ধ্যাবেলা তিনি সেই সব লোকদের নিন্দে করে বললেন, যারা আদিবাসীদের মধ্যে বসবাস করতে চায়, 'তিনি বলেছিলেন, 'কি নিদারুণ দুঃখের কথা যে মানুষ এই সমস্ত বন্য আদিম লোকদের বিষয়েও আলাপ আলোচনা করে শান্তি পায়।'

কিন্তু এই সব ঘটনার অনেককাল পূর্বে আমেরিকা যখন আবিষ্কৃত হল সেই সময়ে আমেরিকার শত শত উত্তেজনা, উদ্রেক আদিম জনসাধারণ সমস্ত পৃথিবীতে একটি বিশেষ সমস্যা নিয়ে ভাবিয়ে তুললো, সেই সময়ে মতের বিরোধ ছিল, যেমন মতের বিরোধ আজকের দিনে রয়েছে। সেই সময়ে এক শ্রেণীর লোক আদিবাসীদের পুরোপুরি ভাবে বর্জন করতে চেয়েছিলেন এদের মধ্যে মন্টেনের উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি মনে করেছিলেন যে, প্যারাগুয়ে পর্বত এবং অরণ্য প্রান্তরের মতো 'অসংস্কৃত ও নিরীহ' স্থানের অধিবাসী আদিম জনসাধারণ অবশ্যই সভ্য মানুষদের তুলনায় অনেক বেশী ধর্মপ্রাণ ও সত্যনিষ্ঠ মানুষ। তাঁর বিখ্যাত রচনায় তিনি বলেন যে, বেড ইণ্ডিয়ানরা চাঁদ বন্য ঘোর অর্থে বনজঙ্গলের ফুল ফল বন্য কিন্তু তাদের মধ্যে জীবন্তভাবে রয়েছে মানুষের সেই সত্য-নিষ্ঠা সেইসব আশ্চর্য গুণ এবং সহজাত শক্তি যা খুবই জীবন্ত এবং শক্তিশালী। অতএব এই সমস্ত সত্য গুণকে বিনষ্ট করে দিয়েছে, আমাদের বিকৃত রুচি অনুযায়ী বিভিন্ন আনন্দ উপভোগ করার প্রবৃত্তির সঙ্গে বিজড়িত হয়ে এই সব শক্তি নষ্ট করে দিয়েছে। তিনি দুঃখ করে বলেন যে আদিম আমেরিকার আবিষ্কার পনেরোর জীবিত কালে হয়নি, যদি তাই

হত তবে তিনি স্বর্ণ যুগের একটি উৎকৃষ্টতর ছবি আঁকতে পারতেন।

আরও অন্যান্য লেখকরাও এই রকমের ধারণা পোষণ করেন। সুপেনসারের লেখা 'দি ফেয়ারী কুইন' নামক বইয়ে একজন ভদ্র ও উদার রুচি সম্পন্ন আদিবাসীর কথা আছে, ড্রেটন আমেরিকা থেকে প্রাপ্ত বিবরণী নিয়ে খুব উৎসাহ প্রকাশ করেছেন, রেলেট ও কুলেচার তার লেখায় উল্লেখ করেছেন এমনতর লোকদের কথা, যারা হ'ল রৌদ্রদগ্ধ রেড ইণ্ডিয়ান জাত যারা শান্তি ও আনন্দ ভিন্ন আর কোন সম্পর্ক সম্পর্কে কিছুই জানেনা। আরও অনেক লেখক প্রথমে যারা উপনিবেশ স্থাপন করে নানারকম চাষবাসের কাজ সুরু করে তাদের বিষাক্ত প্রভাবের উল্লেখ করে তাকে খুব শোচনীয়ভাবে নিন্দা করেন, কুলার খৃস্টান সম্প্রদায়ের বর্বর জাতের উল্লেখ করেন যারা পৌত্তলিক বর্বরদের স্বর্গে রূপান্তরিত করতো।

অন্যান্য বিবরণেও এর চেয়েও অপেক্ষাকৃত হতাশ-পূর্ণ মতবাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। আমরা দেখতে পেয়েছি যে রেড ইণ্ডিয়ানদের 'মনুষ্য দেহধারী জীব' বলে আখ্যা দেওয়া হত, তারা হ'ল নৃশংস অমানুষ ও পুরোপুরি বর্বর: দ্যানডিস বলেছেন যে, রেড ইণ্ডিয়ানরা সাইকলোপসদের মতো সম্পূর্ণভাবে 'অসামাজিক জীব এবং অপরিচিত মানুষদের নিকট তাদের মানবতাসুলভ বোধও নেই।' এই যে দুইটি বিপরীত ভাবধারার মধ্যে যে বৈষম্য তা সেক্সপীয়ারের টেম্পেস্ট নাটকে যেমন চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে তেমন বোধ হয় আর কোনও বইয়ে সুন্দরভাবে উল্লিখিত হয়নি।

সমস্ত সপ্তদশ শতাব্দী ধরে এই বাস্তব ভাবধারা একটি ব্যাপক অনুভূতির দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল যেই অনুভূতি নিরীহ মেষপালক, সুখী পুরুষের মতো ও পরিপূর্ণ স্বাধীন মতো যে তাকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে।

সেক্সপীয়ারের নাটকে আদিবাসীদের বহু বিবরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। মনে হয় সেক্সপীয়ার ছিলেন জনসনের চাইতেও উদারপন্থী এবং তিনি আরও একটি দিকের উল্লেখ করেছেন। ক্যালিবান যে সম্পূর্ণভাবে নিগৃণ ছিলেন তা নয় ক্যালিবানের সংগতিবোধ আছে এবং আরও অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকদের মতো সে অনেক কিছু সম্বন্ধে সচেতন ও সবল দিক থেকে সুরুচিক। সেক্সপীয়ার ক্যালিবানের চরিত্র মারফত দেখিয়েছেন যে এই আদিম সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষটি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকদের মতই রুচি ও বুদ্ধির দিক থেকে উন্নত। সেক্সপীয়ার তার বিভিন্ন নাটকে আদিবাসীদের সমাজ ও জীবন সম্বন্ধে যে ছবি আঁকতে চেষ্টা করেছেন তাতে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে যদিও আদিমকালের মানুষেরা খুব সুসভ্য ছিল না তবু তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের ভাবধারা এসে তাদের জীবনকে বিপন্ন ও বিপর্যস্ত করেছে।

সমস্ত সপ্তদশ শতাব্দীকাল ধরে এই বাস্তববাদী ভাবধারা একটি ব্যাপক অনুভূতির দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। য়ুরোপীয় কাব্যের মধ্যে একটি গ্রামীন সুর জীবন্তভাবে পাওয়া যায় এবং অনেক সুপ্রসিদ্ধ লেখক কৃষক সমাজ ও পল্লী অঞ্চলের চাষবাস সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট সব জিনিস রচনা করেছেন। তারা যে জীবনকে নিয়ে প্রশংসা করেছেন সে জীবন শুধুমাত্র 'আদিম' জীবন নয় তার মধ্যে সুখ স্বাচ্ছন্দ ও সমৃদ্ধির অনেক উপাদান পাওয়া যায়, এ জীবন সকল দিক থেকে শান্তিপূর্ণ ও সহজ, সরল, আত্মতৃপ্ত এবং সুষমামণ্ডিত শহরের অবনতা অস্বাস্থ্যকর এবং ব্যবসায়ী জীবনের চাইতে গ্রামীন জীবনের মহিমা অনেক বেশী।

গৃহযুদ্ধ এবং রাউণ্ড হেড আন্দোলনের পিউরিটানিজমের প্রভাবের ফলে 'প্রকৃতি' এবং পল্লী জীবন ধীরে ধীরে আদর্শ জীবন বলে পরিকল্পিত হয় এবং এই পল্লীর পরিবেশের মধ্যেই মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক লাভ করতে পারে, পল্লী পরিস্থিতির মধ্যেই শ্রেষ্ঠতম গুণ মানুষ অভ্যাসের দ্বারা সাধনের দ্বারা অর্জন করতে পারে। প্রাচীনকালের স্বর্ণ যুগের যে মহান আদর্শ যে লেখক সবচেয়ে বেশী করে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তিনি হলেন, বিখ্যাত পোলিস কবি সার্ভান্তেস। তার মতে স্বর্গের পবিত্র জীবন হল একটি আদর্শ বাস্তব জীবন।

প্রাকৃতিক জীবনের এই শান্ত ও সুন্দর পরিবেশ সম্পর্কে আমাদের যে বিশ্বাস তার সঙ্গে বিজড়িত হয়ে রয়েছে আদম এবং ইভের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে প্রাচীন ধর্মীয় সংস্কার, আদম এবং ইভ হল সমস্ত আদিম মানুষদের আদিমতম পুরুষ ও নারী। ডারউইনের পূর্বে আমাদের সমস্ত সংস্কার ও বিশ্বাস ছিল যে, পৃথিবীর সমস্ত মনুষ্যজাতির জনক জননী হল আদম এবং ইভ।

এর একটি ফল হ'ল এই যে মানুষের আদিমতা সম্বন্ধে আমাদের মনে একটি ভাবধারা গড়ে উঠেছে এবং আমেরিকার বহু পণ্ডিত ব্যক্তি এই সম্বন্ধে অনেক পড়াশুনা করেছেন। এর ফলে সাংস্কৃতিক আদিম জীবন এবং ঐতিহাসিক ভিত্তিতে আদিম জীবন দুইটি ভাগে বিভক্ত হয়ে আধুনিক কালের অশিক্ষিত সমাজকে ভাবা হয়েছে যে, সেই প্রাচীনতম কালে সভ্যতার পূর্ববর্তী যুগে মনুষ্য জীবন অনেক সুখের ছিল এবং সকল দিক দিয়ে সেরা ছিল। আদম এবং আরও অন্যান্য আদিবাসী অন্যান্য লোক আরও সুখী ছিল কিছুটা এই কারণে যে তারা সৃষ্টির প্রথম যুগের মানুষ আর কিছুটা এই কারণে যে তারা একেবারে সৃষ্টির প্রথম অধ্যায়ে জীবন্তভাবে গড়ে উঠেছিল।

সপ্তদশ শতকে আদিম মানুষদের সম্পর্কে যেই ভাবধারা গড়ে ওঠে তাতে প্রাগ্ ঐতিহাসিক যুগের মানুষদের সম্বন্ধে আমাদের অনেক উৎসাহ বেড়ে যায় এবং এমন একটি নৈতিকবোধের মান স্বীকৃত হয়, অনুকম্পা, দয়া ও আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি উৎকৃষ্টগুণের এমন সমস্ত ভাব সৃষ্টি হয় যা অর্ধ শিক্ষিত অথবা সম্পূর্ণ বর্বর মানুষদের বেলায় কার্যকরী হ'তে পারে। প্রকৃত আদর্শবাদী মানুষ অতি সহজেই নিজের মনে এমন বিশ্বাস জন্মাতে পারে যথার্থ মহৎ ও সৎ জীবন শুধুমাত্র শহরে ও নাগরিক পরিবেশের মধ্যে যাপন করা যেতে পারে না তারজন্য আমেরিকার বনাঞ্চলে অথবা দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপে যে নির্জনতা আছে তার মধ্যে যেতে হবে।

এর একটি খুব আকর্ষণীয় ফল হ'ল যে প্রথমে গিয়ে যে সব লোক উপনিবেশ স্থাপন করেন, তারা আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলের লোকদের নতুন করে উপনিবেশ স্থাপন করার কাজে নানানভাবে লোকদের উৎসাহিত করেন, এবং তারা শ্বেতাঙ্গ জাতির লোকদের আদিম সংস্কারের বোঝা বহন করার ব্যবস্থাকে সকল দিক থেকে উপযুক্ত বলে বিবেচনা করেন। তখনকারকালে অনেক লেখক ও সাংবাদিক আদিবাসীদের জীবন নিয়ে অনেক প্রবন্ধ রচনা করেন।

আদিমকালের অধিবাসীদের প্রথমে কঠিন প্রকৃতির ও নরম প্রকৃতির এই দুইভাবে ভাগ করা যায়। মাত্র অল্প কিছুদিন পূর্বেও তাহিতি অথবা বলিদ্বীপ অঞ্চলের নরম প্রকৃতির ভাব প্রবণ এবং মার্জিত রুচি সম্পন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়কে উপলক্ষ্য করে অনেক শিল্পী ও কবি উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনা করেছেন, তাদের সমাজ অনেক ভাল চিত্র শিল্প ও কথাশিল্পের খোরাক জুটিয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের দুর্ধর্ষ আদিবাসীরা সৈনিক জীবন অবলম্বন করার জন্য ভাল ভাবেই গৃহীত হয়েছে।

আজকের দিনের অপেক্ষাকৃত প্রাথমিক যুগেও নরম প্রকৃতি আদিবাসী সমাজের লোকদের উপরে বহু লোকের আকর্ষণ রয়েছে তাদের স্বাধীনতাচেতা মন, তাদের সরল সহজ নিরীহ স্বভাব তাদের অজ্ঞানতা প্রভৃতি সভ্য সমাজের অনেক মনীষীকে মুগ্ধ করেছে।

বর্তমান শতাব্দীর অনেক ভাল ভাল কবিও আদিম বর্বর যুগের আদিবাসীদের অবলম্বন করে কবিতা রচনায় মুখর হয়ে উঠেছেন। এই দিক থেকে টমাস হেডিক-এর 'দি সাবমেরিন ভয়েজ' দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপ-পুঞ্জের আদিবাসীদের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছে, ওয়ালার বলে আর একজন কবি তার বই ব্যাটল অব দি সামার আইল্যাণ্ডস নামক বইয়ে আদিবাসীদের সমাজ জীবনের চমৎকার এক ছবি এঁকেছেন, কলাগাছের ছায়ায় ছোট ছোট কুটিরে অধিবাসী অনুভূতিশীল সৌন্দর্য পিপাসুক সহজ মানুষদের নিয়ে তিনি কাব্য রচনা করেছেন। ড্রাইডেনের মতো বিখ্যাত কবিও আদিবাসীদের জীবন নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন।

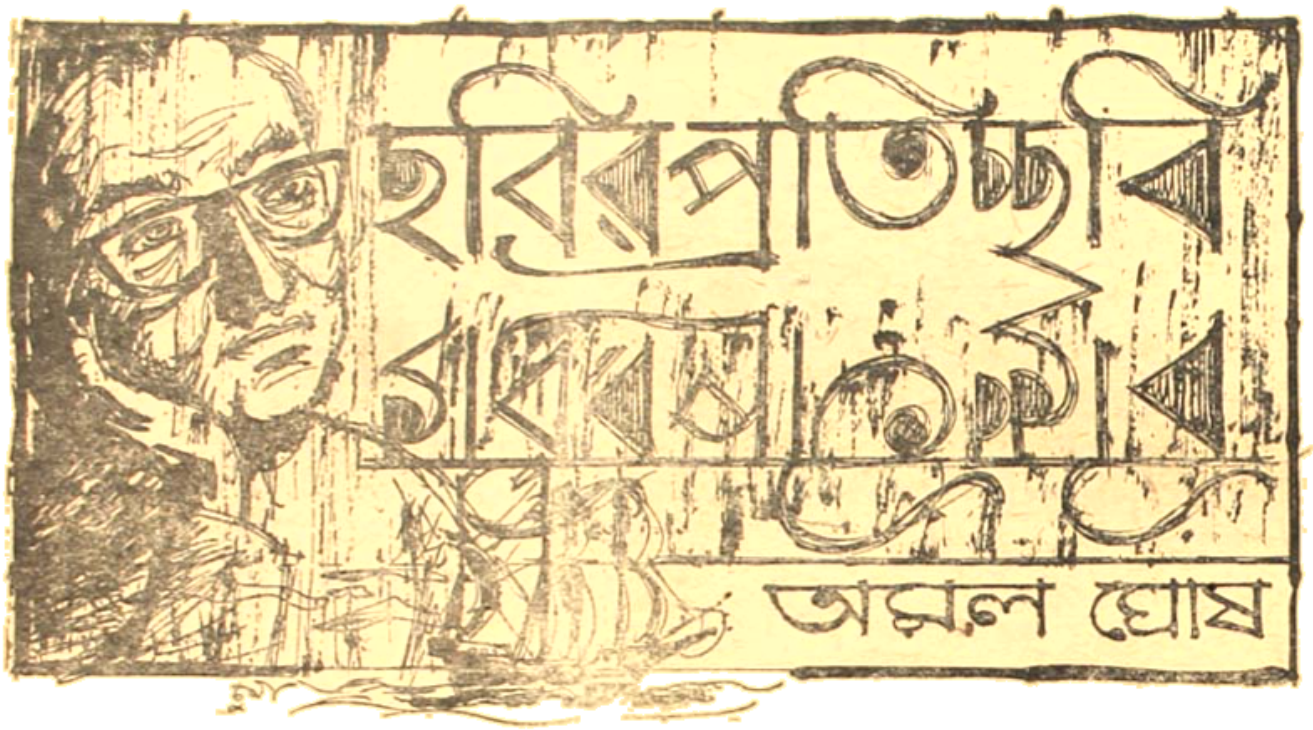

কল্যাণীয়

সমুদ্রপ্রিয়,

তোমার চিঠি পেয়েছিলাম গতমাসের ২৫শে। আর তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছি এ মাসের আজ ২৬শে।

মাঝে অনেকগুলো দিন কেটে গেছে। কেমন করে কেটেছে, সে-ইতিবৃত্তে তোমার মনকে ভারাক্রান্ত করতে চাই না। তবে তোমাকে না বললে, কাকেই বা বলি আমার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার কথা। কেই বা বুঝতে চায়—সমুদ্রের সহস্র সহস্র অনুভব অনুভূতির অন্তর্হিত মর্মকথা।

যাইহোক, আপন কথা বলে আর কি হবে। তার চেয়ে অপরের কথাই তোমাকে জানাই বন্ধু।

একদিন আমার বুকে এক রণতরী বহর মোলার করেছিল। সেকালের নয়, একালের রণতরীবহর। যার জঠরে বিংশ শতাব্দীর অসংখ্য মারণাস্ত্র ঠাসা। আর অন্দরকন্দরে নরঘাতী, শিশুঘাতী, বিষবাষ্পের সমারোহ।

ওরই এক জাহাজে একজন তরুণ যুবক প্রতিক্ষণে প্রতীক্ষা করছিল তীরে যাবার। সেখানে তার আকর্ষণ আর কিছুরই নয়, একমাত্র এক বান্ধবীর সঙ্গে মুখোমুখি বসে দুটি কথা বলা।

দিন দুপুরে তরুণ যুবা তীরে যেতে ছাড়া পায়। সে তীরে পৌঁছেই সামনে দাঁড়ানো যানে চড়ে বান্ধবীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। যান যেন চলতেই চায় না। তরুণ যুবক ভাবে—ভগবান তাকে পাখা দেয়নি কেন?

ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুর ভেঙ্গে ভেঙে পুড়ে যায়ে মেয়ে তরুণ যুবক বান্ধবীর দরজায় যখন পৌঁছুল, বেলা তখন সবে দুটো। ঐ দীর্ঘ ধড় দুপুরে আমার অশান্ত বুকের নিঃশ্বাস তপ্ত হয়ে উঠেছিল। সেই নিঃশ্বাস হু হু করে আমার তটভূমির আশেপাশের ঘরে ঘরে কি যেন খুঁজে ফিরছিল।

এমন সময় তরুণ যুবকের সামনে এসে দাঁড়ালো তার বান্ধবী—কোলে তার টুকটুকে এক বছরের শিশু।

বুক হাওয়ার দুঃখ যেন উবে গেল। তরুণ যুবকের চোখে মুখে বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা রইল না।

বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে সে একলয় সঙ্গীতের মত কানে শুনল, কদিন থাকবে?

তাড়িয়ে দেবার ইচ্ছে বুঝি?

খুব বুঝেছ দেখছি! আমি ভাবছি—সময় পাবত সকল কথা বলবার।

তাই বুঝি, বলো তাহলে বাসন্তিকা।

আগে তুমি ভাল হয়ে বসো।

তোমার মেয়ের নাম রেখেছ ত দীপান্বিতা?

তাহলে, আমার চিঠি তুমি পেয়েছিলে, বাসন্তিকার চোখে মুখে আশ্চর্য দীপ্তির ছটা।

চটপট করে তরুণের বান্ধবী দুঃখিনের তৃপ্তিদানে এক গ্লাস শীতল পানীয় এগিয়ে ধরে বললে, কতদিন তুমি চিঠি লেখ না, বিলোজ।

সে কথার উত্তর না দিয়ে বিলোজ বলে, কই তোমার কথা কিছু ত বোলছ না?

এই বলি। বাসন্তিকা বলতে থাকে—ছোটছোট তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা সব। তোমার ভাল লাগবার কথা নয়। কিন্তু আমার সেইত সম্বল। এই যেমন, দীপান্বিতার বাপের কথাই বলি, বিয়ে করলাম ত এক ব্যবসাদারকে। রাতদিন যে ব্যবসা ছাড়া কিছুই জানে না। মধ্যে মধ্যে রাগ ধরে যায়। গত পৌষ মাসে আমাকে সঙ্গে নিয়ে ব্যবসা করতে ছুটল পুর্ণিয়াতে। সেখানে সে কি শীত। রাত বাড়বার আগেই গায়ের হাড় ঠকঠক করে কাঁপতে লাগে। তার উপরে আবার ওর ঘরে ফিরতে রোজই রাত দশটা বেজে যায়। যত বলি, অত দেরী আর যেন না হয়—ফল হয় ততই বিপরীত। শেষটা সেদিন রাতে দেয়াল ঘড়িতে বারটা বাজতেও যখন ঘরে ফিরলে না, গোঁ গোঁ করতে করতে আমি ত বিছানায় গেলাম। কিন্তু ঘুম কি আর আসে! একে একে সময়ের সংকেত বেজে চলে। মিনিটের পর মিনিট শ্লথ গতিতে বর্তমান থেকে অতীতে পাড়ি জমায়। রাত একটা বেজে যখন পনর মিনিট, তখন মশারের পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। মা ছিলেন ছেলের জন্যে জেগে বসে। তিনিও গরগর করতে করতে মৃদু ভৎর্সনায় অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, তোমার এমন ব্যবসা না করলেই নয়। ঐ কচি বৌমা আবার, তার দিকে ত একবারটি তাকাতে হয়।

সে রাতে ভীষণ পরিশ্রম করে এসেছিল। তাই শুতে না শুতে ঘুমিয়ে পড়ল। তখনও আমার ঘুমের ভাব চলছে। কি মনে করে একবারটি গায়ে হাত দিয়ে দেখি—সর্বনাশ সর্বাঙ্গ বরফের মত।

আমার মনের বরফ গলতে আর দেরী হলনা। তৎক্ষণাৎ সকল মান অভিমান ভুলে ব্যবসায়ী বুদ্ধির প্রতি যত আক্রোশ, এমন লোককে বিয়ে করেছি বলে জীবনের যত ক্ষোভ, সমস্ত অনায়াসে ছুঁড়ে ফেলে লেগে গেলাম তার বরফ শীতল শরীরকে বিদ্যুতের তাপে তাজা করে তুলতে। কি করলাম শুনবে—কাপড় ছাড়া পাটে করবার বৈদ্যুতিক যন্ত্রটাকে উত্তপ্ত করে ওর সর্বাঙ্গে কম্বল চাপা দিয়ে খুব করে ডলতে লাগলাম। আস্তে আস্তে এক সময় ওর শরীর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলে পরে "ও-মুখে" আর ওর কথাটি ফুটল না।

এমনিতর অপ্রয়োজনীয় টুকরো টুকরো ঘটনার পর ঘটনা অনায়াস স্বাচ্ছন্দে বাসন্তিকা অকৃপণভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে বলে গেল। তার তরুণ বন্ধুটি ঐ সকল ঘটনা কেবল তন্ময় হয়ে শুনছিল না, বিশেষভাবে ভাবছিল যে সংসারে কত সামান্যতেই মানুষের মন অসামান্যের সোনার কাঠির স্পর্শে অপরূপ সৌন্দর্যে ভরপুর হয়ে ওঠে।

দিনান্তিকা এগিয়ে আসছিল। বাসন্তিকা এরই মাঝে দীপান্বিতাকে একবার দূর থাইরে জমাটি হয়ে বসেছিল। তার মনের সকল দুয়ার আজ আপন আনন্দের আবেগে আলগা হয়ে গেছে। নিজের অনুপরমাণুকে মাধুর্যের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে সে যেন আনন্দের চরমতম উপভোগে মেতে উঠেছে।

বাইরে সন্ধ্যা নেমেছে। ঘরের মধ্যে ম্লান সন্ধ্যার মৃদু বাতি আলো দিচ্ছে। এই আলোতে বিলোজ তার প্রিয় বান্ধবীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে: ঐ মুখে আরেক দিব্যদ্যুতির ঝিলিমিলি।

উঠবার মুখে বাসন্তিকা বললে, বিলোজ আমার সব চেয়ে আনন্দের কথা কি জানো? আমি মেয়ে হয়ে জন্মেছিলাম, স্ত্রী হয়ে স্বামীর ঘর করেছি, নারীরূপে জননী হয়েছি—সংসারে কোনো কিছুতে আমার আর কোনো ক্ষোভ নেই।

স্মিত হাসিতে বিলোজ এতক্ষণে এই প্রথম প্রাণখুলে বলে ওঠে—বাসন্তিকা, সংসারের কতটুকুই বা জানি! নৌবাহিনীতে কাজ করি। সবার মুখেই শুনি—শুধু লম্বা লম্বা বাণী। বিবিরাণীরা ত ককটেল পার্টিতে অন্যান্য পরিবেশে গর্ব করে ফেরেন, কেউ বড় একটা স্বামীকে গ্রাহ্যই করেন না। কেউবা দিনরাত পতিভাবে পৃথিবী কাঁপিয়ে ঘোষণা করে ফেরেন—রমণী হয়ে জন্মেছি, দুনিয়ার কার তোয়াক্কা রাখি! বাঁদী নই, দাসী নই, স্ত্রী হলেও স্বাতন্ত্র্যে মহারাণী। কিন্তু তোমাকেই

কেবল দেখলাম—প্রকৃত নারীর মতন। রমণী হয়ে তুমি রমণীর, তুমি মানবী অথচ মোহনীয়! আচ্ছা, আজ আসি।

দেখ দেখি সমুদ্রপ্রিয়, কতক্ষণ তোমাকে পরের কথায় জ্বালাতন করলাম। কি করি বল, আমার দীর্ঘশ্বাস বহে বহে মর্ত্যের ঘরের দরজা জানালা থেকে যে সকল স্মৃতি বিস্মৃত ঘটনার রেণু বয়ে আনে তাদেরকে অকারণে বাতিল করেও আর দিতে পারি না।

তুমি হয়ত বলবে, "আমার আসল কথাই শোনা হল না। "কিন্তু মাঝে মাঝে একটু আধটু এসব কথা না শুনলে তোমার মনটাও যে রসের অভাবে শুকিয়ে যাবে। ইতি—

তোমার সমুদ্র

সুপ্রিয়—

সমুদ্র,

কি মিষ্টি তোমার চিঠি। তারচেয়ে মিষ্টি তোমার মন। বলে উইচসমুদ্র।

তোমার চিঠি পেয়েই ইচ্ছে করছিল চিঠি লিখি। কিন্তু মানুষের সমাজে একালে চিঠি লেখার মনটাকে বাঁচিয়ে রাখাটাই দায়! কেমন যেন সমস্ত সংসারটা সারাক্ষণ বিরক্তিকর পরিস্থিতিতে ভরা। তাছাড়া আধুনিক সমাজের সেরা জীব যারা—জনে জনে তারা এক একটি দস্তা মার্কা বেরসিক, চারপাশে এমন সব লোকজনের ভিড়; ক্ষমা কোরো—এরা যেনতেন প্রকারেণ স্বার্থসিদ্ধিতেই সকল সময় ব্যস্ত। আমার এক সুধী বন্ধু। এদের বলে, স্বার্থপর বাঁড়! কিন্তু ঐ বন্ধুটিকে অত্যাধুনিক সমাজ যেমন সহ্য করতে নারাজ তেমনি বন্ধুটিও উপেক্ষাভরে এদেরকে সাদর আপ্যায়নে অভিসিক্ত করে "বেরসিক মোষ" বলে।

এদের ব্যাপারে আমি তেমন বিচলিত হই না। কিন্তু সমাজে থাকতে গেলে হয় কচু বারমাস সমানে চোখ বুজে ত আর বাস করা চলেনা। কাজেই দিন রাত্রি যা কিছু অসহ্য চোখে পড়ে, তার তোপাস্তি অস্বীকার করবে কে।

এই ত সেদিন খুব সুখ্যাত এক ঐশ্বর্যশালী হুস করে মোটর থেকে নেমে আমার পড়বার ঘরের দরজায় এমন জোরে আঘাত হানতে লাগলেন, মনে হলো যেন তিনি পৃথিবীটাকে কিনে বসেছেন। সে সময় আমি পৃথিবীর একজন সেরা কবির কাব্যপাঠে ডুবেছিলাম। কাব্যের সমুদ্র থেকে মুখ তুলে ভদ্রতারীতি বিরক্তি গোপন করে বললাম আসুন বসুন।

আমার অভ্যর্থনায় তুষ্ট হওয়া দূরে থাক, রুষ্ট হয়ে তিনি বললেন, আজে বাজে কি সব পড়ে সময় নষ্ট কোরছো—

কাব্যখানি তাঁর চোখের সামনে তুলে ধরে বলতে বাধ্য হলাম, কার সম্বন্ধে মন্তব্য করছেন জানেনত? ইনি সমগ্র জাতিকে তার জাতীয় সঙ্গীত উপহার দিয়েছেন বিশ্ব জয় করে পৃথিবী খ্যাত হয়েছেন।

তিনি উপেক্ষা করে দুপাটি দাঁত মেলে ধরে কি যেন বলতে গেলেন—

আমার ধৈর্যের শেষ বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় আমি যে কি করতে বসেছিলাম, এখন কল্পনা করতেও ভয় হয়। ঈশ্বরের অশেষ কৃপায় সে যাত্রায় নিজেকে কেমন করে সামলে নিয়েছিলাম—আজ আর তা মনে নেই। শুধু মনের আগুনটুকু এখনও অনির্বাণ জ্বালায় দগ্ধে দগ্ধে প্রতি ক্ষণে জানিয়ে দিচ্ছে—অমন ঐশ্বর্যবান বেপরোয়া বেরসিকের চাঁদা মাড়ানোও পাপ।

দেখ দেখি বন্ধু, কি আনন্দেই না এই পৃথিবীতে আমি বাস করেছি। এর মধ্যে একমাত্র শান্তি তোমার মনের স্পর্শে সুধাক্ষরা চিঠির প্রাপ্তি।

সত্যি বলতে কি, আমিও মন খুলে, প্রাণের পরিতৃপ্তি ঢেলে অন্তরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতির রঙে রাঙিয়ে বড় মিষ্টি মধুর চিঠি লিখতে চাই। আমার চিঠিতে উজাড় করে দিতে চাই চাওয়া পাওয়া, হারিয়ে যাওয়া স্মৃতির সুরভিকে। কিন্তু এ দুর্ভাগ্য পৃথিবীতে যে ঘুস-ঘন্ত্রণার তপ্ত কটাহে প্রতিমিয়ত আমাকে টগবগ করে জ্যান্ত সেদ্ধ হতে হচ্ছে—তার কল্যাণে একলব্য দিয়ে মনোরম কিছু বেরুবে কি করে। তবে একথাও ঠিক—মহৎ সৃষ্টির প্রসব যন্ত্রণা সীমাহীন।

বন্ধু বেদনাতিক্ত মনের তীব্র হলাহল তুমি কি পান করতে পারবে। না পারলে জানিও, তোমার মনের তিক্ত স্বাদ উপহার দিয়ে কখনও আর বিরক্ত কোরব না। ইতি—

তোমারই সমুদ্রপ্রিয়।

কল্যাণীয়—

সমুদ্রপ্রিয়,

সেদিন চৈত্র মাসের সন্ধ্যায় আমার কটভূমিতে আমারই চেউ খেসে বসেছিল, দুটি মানুষ। তাদের কথাবার্তা শুনে অনুমান হলো—একজন তার রীতিমত নাম করা, বুদ্ধি রাখা চিকিৎসক। সে লোকটি কথায় কথায় বোলছিল একই লতার মূলে বিষ, পাতায় ও ফলে অমৃত।

তাই বন্ধু, আমার কি মনে হয় জানো, জীবন ও জগৎ জুড়ে আছে—হলাহল আর অমৃতে। এ যেন দিন আর রাত্রি—জন্ম আর মৃত্যু! অভিন্ন হয়েও এরা ভিন্ন নয় বরং একেকে ছেড়ে অন্যকে মেলাই দায়!

তোমার সংসারময়, অসংখ্য বিরক্তিকর পরিস্থিতির ছড়াছড়ি। এতে এত ক্ষুব্ধ হলে চলবে কেন? একটু —একটু করে সব কিছুকে মানিয়ে নিতে হবে। যতই দিন যাবে, ততই দেখবে জীবনে মানিয়ে নেওয়া ছাড়া চলার পথে এগিয়ে চলা প্রায় অসম্ভব।

তাই বলে চরমতম অন্যায়কে মানিয়ে নিতে বলি না। মহাপাপীদের পদলেহনে সমাজে মানিয়ে চললে তাকে "চলা" বলি না। কেবল এইটুকু চাই শুধু অকারণে অহেতুক সংঘর্ষে জড়ানো নয়।

বন্ধু তুমি ত্রিকালজ্ঞ হলেও বয়সে আমার তুলনায় অনেক তরুণ। তোমার অভিজ্ঞতালব্ধ জীবন দর্শন এখনও কচিপাতার মত। আশা করি, দুনিয়ার যত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বন্ধুর পথ চলতে চলতে এমন একদিন আসবে—যেদিন তোমার দর্শন খাদ বিহীন খাঁটি সোনায় রূপান্তরিত হবে আরো অনেক উজ্জ্বল দীপ্তিতে।

আপাততঃ আর কি লিখি। যুবরাজ হেনরীর শোকাতুর পিতা রাত্রিদিন অব্যক্ত বেদনায় গুমরে গুমরে মরছেন। আমার উন্মুখর তরুণের হাতছানি তাঁকে বারে বারে শোকের রাজ্য থেকে ভুলিয়ে সমুদ্রের নেশায় বুঁদ করে ফেলতে চাইছে। দেখি, রাজা জন—নতুন অভিযানে না মেতে কতদিন আর থাকতে পারেন!

কি আশ্চর্য! একালের কথা বলতে বলতে কখন সুদূর অতীতে ফেলে আসা ঐতিহাসিক বর্তমানের বুকে জেগে উঠেছি। বন্ধু এই জাগরণ স্মৃতি তোমার মনকে নবানন্দে অভিসিক্ত করলেই আমি খুশী। অনেক স্নেহাশীষ সহ—তোমারই

সুপ্রিয়—

সমুদ্র,

তোমার আন্তরিকতা ভরা জীবন দর্শনের নতুন দিগ্‌দর্শন নির্ণয় করা লিপি পেয়ে পরম আনন্দ লাভ করেছি। চিঠিতে তুমি যে পথ ধরে এগিয়ে যেতে বলেছ এখন থেকে সেই পথে চলবার যথাসাধ্য চেষ্টা করব। কেবল ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটলে নয়ো নয়ো শুধরে দিও।

অথবা এবার আর তোমার সময় নষ্ট করব না। কথামতে আমার অন্যান্য কথা জানাবার ইচ্ছে রইলো। তার আগে তোমার অসমাপ্ত কাহিনী জানতে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি।

আশাকরি, যুবরাজ হেনরীর মৃত্যুতে রাজা জনের রাজ্যে যে অবস্থার বৈগুণ্য দেখা দেয়, তার কল্যাণে অতিমন্দে শুভ যোগের মত পর্তুগালের সব কিছু ভেস্তে না দিয়ে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়ে থাকবে। তাছাড়া তোমার উদ্দাম তরুণের উৎসাহপূর্ণ হাতছানিকে অস্বীকার করবে কে? আর যদি কেউ করে, তার লজ্জা লুকবার ঠাঁই জুটবে কোথায়!

তুমি আমার প্রাণ উজাড় করা সস্নেহ প্রীতি নিও।

ইতি—

সমুদ্রপ্রিয়,

কল্যাণীয়—

সমুদ্রপ্রিয়,

আমার অসমাপ্ত কাহিনীর কথা তুমি ভোলোনি কেনে পরম প্রীতিলাভ কোরলাম। আগেই ঐতিহাসিক বর্তমানের প্রতি তোমার সহজাত অনুরাগের কিছুটা ইঙ্গিত পেয়েছিলাম। ফ্রান্সিস ড্রেক-এর মুখে তোমার সম্পর্কে মন্তব্য শুনে বুঝেছিলাম, একালের সবজান্তাদের মত অতীতের সকল কিছুকে অকাতরে নস্যাৎ করতে তুমি কখনই প্রস্তুত নও। তোমার মত পৃথিবীর পুরাতন কথা, পুরাতনের ঐতিহ্যকে এ কালের প্রতিকূল পরিবেশের তাড়নায় অস্বীকার না করে, জানতে বুঝতে এবং তার থেকে সভ্যতার বিচিত্রতর অগ্রগতির ইতিহাসকে

অনুসরণ করতে তেমন বড় একটা কাউকে ত দেখিনা। তাই তোমার কাছে গল্প বলার আনন্দ থাকাতে আমি নারাজ।

তুমিও হয়ত ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাবে—যথার্থই রাজা জনেরও শেষ পর্যন্ত সাধ্যে কুলায়নি আমার তরুণ ভাগ্যবান মৃত্যু লোকে অস্বীকার করবার। নিঃসন্দেহ, যুবরাজ হেনরীর মতো বহৎ ও মহান পুত্রকে হারিয়ে রাজা জন কিছুকাল থেকে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। কেবলই তাঁর মনে পড়ছিল, পরমপ্রিয় পুত্রকে হারিয়ে : কি হবে—প্রাচ্যের জলপথ খুঁজে বের করে। দুঃখ বেদনায়, শোকে তাপে সারাক্ষণ তাঁর মনে এমন এক পাষাণভার চেপে ছিল যে কিছুতেই তিনি মনটাকে চাঙ্গা করতে পাচ্ছিলেন না।

কিন্তু, রাজা হওয়ার ভীষণ দায়। পুত্রশোক পেলেও প্রতিবেশীর করুণা মেলে না। বরং সুযোগ মত প্রবল প্রতিবেশীতে প্রভাব ও পসার প্রসার করে নিতে চায় আর আনন্দ পায় শোকের উপরি নতুন লাঞ্ছনা উপঢৌকন দিতে পারলে।

পর্তুগালের প্রতিবেশী স্পেন। দে-কালের অন্যতম প্রবল নৌশক্তিধর। যুবরাজ হেনরীর ভারতবর্ষের জলপথ অন্বেষণের প্রেরণা স্পেনকে অনিন্দ্য আনন্দ জোগানো ত দূরে থাক, রীতিমত আতঙ্কিত করে রেখেছিল। সাফল্যের সম্ভাবনার মুখে অকস্মাৎ যুবরাজের মৃত্যুতে ঐ আতঙ্কের সাময়িক অবসান ঘটায় স্পেন কেবল যে অপার্থিব আনন্দে বিভোর হবার সুযোগ পেয়েছিল তাই নয়, পর্তুগালের জাতীয় দুর্দিনে নিজেদের আধিপত্যকে সমুদ্রের বুকে আরও প্রবলভাবে চাপিয়ে দেবার অভিলাষে দ্বিগুণ উল্লসিত হয়ে উঠেছিল।

স্পেনের উন্মত্ত উল্লাসের ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি ক্রমে রাজা জনের কানে অসহ্য হয়ে বাজতে থাকায় একদিন তিনি হুকুম করলেন, রাজ্যের সেরা মহীরুহের মধ্য থেকে বিরাট জাহাজ তৈরীর উপযোগী কাঠ সংগ্রহ করে আনতে। রাজার হুকুম পেয়ে পর্তুগালের বিশিষ্ট পোত-নির্মাণ-কারীগণ দলে দলে অরণ্যে গিয়ে আকাশস্পর্শী মহীরুহের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাণ্ডগুলিকে কেটে এনে রাজধানী লিসবনে হাজির করল।

তারপর মাসের পর মাস ধরে দিন রাত্রি সমানে চলল জাহাজ তৈরীর ক্রিয়াকাণ্ড। হাতুড়ী বাটালির উদ্ধত আওয়াজে মিশে গেলো কর্মরত মজুরের প্রাণের উল্লাসে বেরিয়ে আসা উদ্দাম কণ্ঠের বিজয় গান। দেখতে দেখতে সমস্ত দেশময় ছড়িয়ে পড়লো নতুন এক উদ্দীপনা-নরনারীর যৌবনছন্দে মেতে উঠলো বিজয় অভিযানের তরুণ কল্পনা। গোটা জাতির চেতনায় প্রমূর্ত হলো এক জাতি, একপ্রাণ, একই অন্বেষণা!

কর্পূরের মত শূন্যে বিলীন হয়ে গেল রাজা জনের পুত্রশোকজনিত বার্ধক্যের জড়তা, শিথিলতা।

যুবরাজ হেনরীর অকাল মৃত্যুর অমোঘ আঘাতে যে জাতি নির্জীব হয়ে রোমন্থনরত গাভীর মত বিমোচ্ছিল, ক্রমে ক্রমে নিজেদের অজানিতে আলস্য যে জাতিকে অকর্মণ্য অপদার্থ করে তুলছিলো তারই জীবনে বজ্রদীপ্ত চেতনার কশাঘাতে অভিযানের উদ্দীপনা উন্মুখর হয়ে উঠলো।

অভিযানের পর অভিযান বেরোয় আর ব্যর্থ হয়ে ফেরে। আমি যে সমুদ্র অশ্বিন! সহজে কি আমি হার মানি।

সেকালের সুবিশাল নৌবহর বন্দর ছেড়ে বেরিয়ে যতই আফ্রিকার শেষবিন্দু খুঁজতে চায় ততই আমি তরঙ্গে তরঙ্গে ভয়ংকর হয়ে উঠি। আমার ঢেউগুলিকে বিদ্রোহের ধ্বজায় সুসজ্জিত করে পাঠিয়ে দিই নৌবহরের মোকাবেলা করতে। বিদ্রোহীর নিদারুণ সংঘাতে দুঃসাহসী নাবিকেরও মন ভয়ে ঘন ঘন কেঁপে উঠে। মনে মনে বলি, সার্বভৌম আমি, অশ্বিন সাগর! আমার নির্দিষ্ট সীমা লংঘনকারীকে আমি এমন শাস্তি দেব, ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে চিরকাল তার করাল রূপরেখা আঁকা থাকবে!

কিন্তু বন্ধু, কালের কুটিল চক্র বড় অদ্ভুত গতিতে মহাকাশের অসীম সীমা পরিক্রমা করে ফেরে। সময় সঞ্চয় সংসারে এমন মানুষও জন্মায় যারা সার্বভৌম সমুদ্রকে সানন্দে লংঘন করে সভ্যতার পর্বে পর্বান্তরে উত্তীর্ণ করবার দুঃসাহসী ভূমিকায় অভিনয় করতে একটু-ও ইতস্তত করে না।

পর্তুগালের জীবনে একদিন এমনি একটি মানুষ.

এসেছিলেন, যাঁর বুকে ছিল বেপরোয়া সাহস, চোখে ছিল সূর্যের দীপ্তি দুটো আদবার অভিলাষ। মনে ছিল, চার-না-পাবার অন্তর বাসনা। তিনি একদিন পর্তুগালের পতাকা উড়িয়ে নৌবহর নিয়ে সমুদ্র অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন পৃথিবীতে নতুন কীর্তি প্রতিষ্ঠার আশা নিয়ে। সঙ্গে তাঁর সহযাত্রী নাবিকের দল, নৌবহর বোঝাই প্রয়োজনীয় মালপত্তর, অস্ত্রশস্ত্র অজস্র।

রাজা জনের একমাত্র কামনা, এই নৌ-বীর যেন ভারতবর্ষের জল পথ খুঁজে পেয়ে পর্তুগালের মুখ উজ্জ্বল করে ফেরে।

বন্ধু, পুরানো কথার পুনরাবৃত্তি হলেও না বলে পারি না, আজকালকার দিনে তোমরা যখন মানুষের প্রতিনিধিদের দুই পৃথিবীর দুদিক থেকে চন্দ্র বৃহস্পতিতে চালান করবার চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগেছো —তখন শুনতে কতই না আশ্চর্য লাগে যে এমন একদিন ছিল যেদিন আফ্রিকার শেষ বিন্দুতে সমুদ্র পথে পৌঁছুবার পরিশ্রমটা এতবার এই সমুদ্র নাজেহাল করে ছেড়ে ছিলো যার তুলনায় বুধ বৃহস্পতির বুকে পতাকা উড্ডীন করা তেমন কিছু কঠিন নয় একালে।

এখন তোমরা যাকে বিষুবরেখা বলে জান, ঐ অতি নগণ্য বিষুবরেখা কোনোদিন কোনো নাবিক যে অতিক্রম করতে সক্ষম হবে—এই ধারণাটুকু একালের মানুষের সেকালের পূর্বপুরুষেরা কল্পনাতেই কেবল আনতে পারতেন।

কিন্তু আমাদের সকল কল্পনাকে রঙীন করে, মানুষের জয়যাত্রার নব নব দিগন্ত উন্মোচন করতে এই সেকালের অজেয় সমুদ্রের সকল গর্বকে খর্ব করে চৌদ্দ-শত একান্তর খৃষ্টাব্দে পর্তুগালের এক নৌ-বীর তার সহযোগী নাবিকদের সঙ্গে ভয়ঙ্কর অজানিত অবস্থায় একদিন ভয়াবহ বিষুবরেখা অতিক্রম করে মানুষের সভ্যতার কপালে যে সোনার টিপ এঁকে দিলেন, সেই টিপই আজকার দিনে মানুষকে জলপথ থেকে শূন্যপথে সমুজ্জ্বল দীপ্তিতে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

সেকালের সীমিত জ্ঞানের জগতে বিষুবরেখা মানুষের চোখে এক চরম বিস্ময় রূপেই প্রতিভাত হতো। বন্ধু, বিষুবরেখার দুপাশে রাত্রির আকাশ দুই ভিন্ন মূর্তিতে দেখা দেওয়ার রহস্য সুদূর অতীতে কারই বা জানা ছিলো। বিষুবরেখার এপাশে পর্তুগালের নাবিকদের সেই সুপরিচিত নক্ষত্রখচিত আকাশ বিষুবরেখার ওপাশে সম্পূর্ণ নতুন। সেকালে নাবিকেরা পরিচিত নক্ষত্রের গতিপথ লক্ষ্য করে দিক নির্ণয়ে অভ্যস্ত ছিল। বিষুবরেখা পেরিয়ে চিরপরিচিত নক্ষত্ররাজির স্থানে হঠাৎ অপরিচিত নক্ষত্রলোকের দর্শনে আত্মবিশ্বাস না হয়ে পারেনি তখন পর্তুগালের দুঃসাহসী নাবিকেরাও। সহসা তাদের সকল বিশ্বাসকে গ্রাস করেছে অভাবনীয় সন্ত্রাস।

যেদিকে দৃষ্টি যায়, কেবল আকাশই অপরিচিত নয়, সমুদ্র; সে-ও অপরিচিত। যেমন ভয়ঙ্কর ভয়াবহ, তেমনি শীতল তরঙ্গ সংকুল। কে জানে, হয়ত ভয়াবহ ভয়ঙ্করের অবতার বিষুবরেখার পরপারের সমুদ্রের পরাক্রমে মুহ্যমান হয়ে চিরপরিচিত তারকারা আত্মহত্যা করে বসে আছে। এ হেন অঘটন সংঘটন যে-সমুদ্রে সম্ভব, তার বুকে আর ভেসে ভেসে মরা কেনো। ভীতি বিহ্বল নাবিকেরা এর পর যত তাড়াতাড়িতে পারে জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে ফিরে গেছল ঘরে।

ঐ বিষুবরেখা পেরোবার এক যুগ এক বছর বাদে পর্তুগীজ নাবিকেরা আরেক দিন একালের রঙ্গমঞ্চ কংগোতে পৌঁছায়।

তখনও আফ্রিকার শেষ বিন্দু পেরিয়ে প্রাচ্যের জলপথ ধরে ভারতবর্ষে পৌঁছানো অদূরের স্বপ্ন, আর ঐ স্বপ্নকে বাস্তবে সার্থক রূপায়ণের পথে যে নৌবীর অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছিলেন, বন্ধু, তার কথাই বলতে বলতে মাঝখানে একটু বিষুবরেখার স্বরূপটাকে দেখেনিলাম।

আফ্রিকার উপকূল পথে ভারতের সোনার রাজ্যে পৌঁছুবার জলপথ আবিষ্কারের ইতিহাসে বিষুবরেখা অতিক্রমের পরেই অন্যতম উল্লেখযোগ্য বিজয় অভিযান উত্তমাশা অন্তরীপ উত্তীর্ণ হওয়ার ঘটনা।

উত্তমাশা অন্তরীপ! নামটি শুনতে কি মিষ্টি! এমন মিষ্টি নাম থেকে ঐ জায়গায় সমুদ্র প্রকৃতিকে বুঝতে যাওয়া চরম ভুল।

তুমি হয়ত বলবে বন্ধু, সে কেমন কথা। মানুষের সমাজে যেমন কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন হয়, অথবা

কনার

তেমনি

আমাদের নৌবীর দিয়াজ একবারে লক্ষ্যে পৌঁছতে না পেরে পর পর কয়েকবার সমুদ্রে যাত্রার পর দেবার আরও এগিয়ে চলেছিলেন তার নৌবহর নিয়ে, আগে নৌ অভিযানে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সহযাত্রীদের তাড়নায় তাকে বাধ্য হয়ে লিসবনে ফিরে যেতে হয়েছিল। কিন্তু কোনো বারই তিনি অন্তর থেকে ভারতবর্ষের জলপথ খুঁজে বের না করে দেশে ফিরতে ইচ্ছুক ছিলেন না। নাবিকদের অধৈর্য, মরু তাকানে অনন্ত ভীতিবিহ্বলতা, ঘরে ফেরার সময় সব কাপুরুষোচিত কাতরতা দিয়াজকে কোনো বেদনাহতই করেনি, ক্রমে ক্রমে ব্যর্থতার বিরুদ্ধে নব নব উদ্যমে নব অভিযানে সমুদ্র পথে জয়ী হতে অনন্ত প্রেরণাও জুগিয়েছে।

নইলে এবারেও ব্যর্থলোমিও দিয়াজ হয়ত পরাজয়ের কাল কলঙ্কিকার কীর্তিট মাথায় করে ঘরে ফিরতেন।

পুনঃ পুনঃ অসীম লাবণিক সমুদ্রে অভিযানে দিয়াজের মনে এমন এক দৃঢ় সংকল্প জেগেছিল যার তুলনা নৌ-অভিযানের ইতিবৃত্তেও দুর্লভ। তিনি বার বার অনেক দূর সমুদ্র পথ পরিক্রমা করে রাজধানী লিসবনে ফিরে প্রতিবারই নব প্রেরণায় নতুন কল্পনায় নবোদ্যমে ভারতের পথ খুঁজে বের করতে নতুন অভিযানে বেরিয়ে পড়তেন।

সেকালের লিসবন বিলাসব্যসনে কোনো বিরাট সহরের তুলনায় কোনো অংশে কম যেত না। অভিজাত সমাজের বেহায়াপনা নষ্টামী অকল্পনীয় রূপকথার রাজ্যে নিজেদের বিলিয়ে দিয়ে জীবনের পঙ্কিল স্রোতকে পঙ্কিলতর সৌন্দর্যে (?) চিহ্নিত কোরে আনন্দে নারকীয় মত্ততা আহরে মেতে উঠতো। ঐ সমাজে দিয়াজের মত নৌবীরের অভ্যর্থনা ছিলো অবধারিত। অথচ দিয়াজ রাজধানীর বিলাস ব্যসনের পিছল পথ মাড়াতে মোটেই উৎসুক ছিলেন না। বরং আরো শক্তিশালী নৌবহর নিয়ে, আরো বলিষ্ঠ নাবিকদের সঙ্গে করে আরো বেশী রসদ সমুদ্রে হয়ে কতদিনে তিনি যে সমুদ্রের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বেন এই ছিল তার কল্পনার রঙীন স্বপ্নের দেশ। সমুদ্রের মধ্যে পায় বিলাস।

সে-বছর দিয়াজ অনেক পরিশ্রমেও পরিকল্পনার যে বিরাট নৌবহর প্রস্তুত করলেন, সে কালে তেমন বহর মোটেই দুর্লভ ছিল না। ছেলো না বন্ধু, ঐ সময়ে দিয়াজের নৌবহরে ছিল দু'খানি পঞ্চাশ টনের ভারী জাহাজ এবং আরেক খানি রসদ বোঝাই জাহাজ আরো ছোট। তখনকার অবৈজ্ঞানিক কালের সেই পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে দিয়াজের ঐ বহরই ছিল দুনিয়ার দৃষ্টিতে প্রায় অসামান্য।

তিন জাহাজের অসামান্য বহর নিয়ে দিয়াজ চললেন আফ্রিকার সমুদ্র পথে ভবিষ্যতের সুদূর সম্ভাবনাকে অবশ্যম্ভাবী সাফল্যের অংগীকারে সুলক্ষণীয় কোরতে।

রাজা জন সমুদ্র পথে অভিযান পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি স্থল পথে আফ্রিকার নানা দেশে চর পাঠিয়ে ঐ মহাদেশের শেষে সমুদ্র পথের উপস্থিতির সন্ধান নেবার চেষ্টায় ছিলেন। তাঁর চরেরা ঘুরতে ঘুরতে আবিসিনিয়াতে পৌঁছে গেছল, সেখান থেকে যে সকল সংবাদ তারা পাঠাতে পেরেছিল তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংবাদ ছিল এই যে—আফ্রিকার সমুদ্র পেরিয়ে প্রাচ্যের সমুদ্র পথ ধরতে হলে প্রচণ্ড ঝড়ের অন্তরীপ না পেরিয়ে কোনো উপায় নেই। অথচ এই ঝড়ের আন্তরীপে সমুদ্র পথের মুখোমুখি হতে ভয় পায় না এমন নাবিক কোথায়!

পর্তুগালের প্রবীণ রাজা জন তাই ব্যর্থলোমিও দিয়াজকে নৌ অভিযানে পাঠিয়ে কেবলই ভাবছিল, দিয়াজ কি সকল ভয়কে উপেক্ষা করে ঝড়ের অন্তরীপ পেরিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে পারবে? একবার যদি পারে, কল্পনায় রাজা জন পাল তুলে দিয়ে ভেসে যান; ভারতের বুকে পর্তুগালের পতাকা একদিন উড়বেই উড়বে। আর সোনার দেশের পণ্য সম্ভার জাহাজ ভরে পর্তুগালের নাবিকেরা এনে লিসবনের বন্দরে নামিয়ে দিয়ে পর্তুগীজের ডাক লাগিয়ে দেবে। শুধু কি পর্তুগীজদের। স্পেন, জার্মান, ফ্রেঞ্চ, ইংরেজ ইতালীয়দের চোখও বলসে উঠবে ভারতীয় পণ্য সম্ভারের জৌলুসে। গজদন্ত, হীরা, পান্না, মণিমুক্তো, রেশম ও কার্পাস বস্ত্র, রকমারী মসলা ধরে ধরে ইউরোপের বাজারে পর্তুগালের পতাকার তলে সুসজ্জিত দেখে প্রতিবেশীর অন্তর্দাহ তীব্রতর হয়ে উঠবে

অথচ নিজের দুঃখ জিবকে এত জোরেই কামড়ে দিক, কিছুতেই যেমন সে যন্ত্রণার কথা ভুলেও কাউকে বলা চলেনা ; ঠিক তেমনি ঈর্ষান্বিত প্রতিবেশীরা কোনোক্রমে মনের জ্বালা মুখ ফুটে প্রকাশের সুযোগ প্রাপ্তাতেও পাবে না।

কল্পনার পালে পুবালি হাওয়া লেগে রাজা জনের মনের নৌকাখানা আপন আনন্দে অবাধে ভেসে চলে।

ভারতের গজমতি হার কোন রমণীর চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করতে অক্ষম হবে। পর্তুগীজ মহিলার কণ্ঠ অলংকৃত প্রাচ্যের সেরা অলংকার চোখ মেলে দেখে স্পেনের রাজমহিষীর পিত্তচাঞ্চল্য না জাগলে, নারী চরিত্র পালটে যাবে। পোষাক পরিচ্ছদের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া যাক। ভারতীয় মশলার সংযোগে রান্নার ভুরভুরে স্বাদ পেতে কে না চাইবে ? ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান, ইতালী, স্পেনবাসী সবাইকে এই মসলার লোভে পর্তুগালের কেনা হয়ে থাকতে হবে। শুধু এক টবার···

দিয়াজের নৌবহর আফ্রিকার উপকূলে দেশের পর দেশ ছাড়িয়ে মহাসমুদ্রের পথে পাড়ি ধরে চলে। মাসের পর মাস যায়, পরিচিত পথ পেছনে পিছিয়ে পড়ে। কখনো সমুদ্র শান্ত কখনো বা উন্মত্ত ঝড়ে। পথ যত দীর্ঘতর হয় নাবিকদের অন্তরে অন্তরে ততই ঘরে ফেরার তাগাদা দেখা দেয়। তবুও কিন্তু দিয়াজ ঘরে ফিরতে নারাজ।

ঋতুর রূপান্তর পথ ঘেরে বর্ষ ঘুরে আসে। সামনে যতদূর দেখা যায়—জলের তাথৈ তাথৈ নাচের উৎসব। কোথাও ডাঙ্গা নেই—পাখী নেই—কোথাও নেই সবুজ ঘাস। কে জানে এই জলের শেষ আছে কিনা ? কে বলতে পারে—এই জলেই সকল নাবিকের অতল শয্যাপাতা হবে কিংবা হবে না।

ভীত নাবিকেরা ক্রমশঃ ভীতিবিহ্বল হয়ে পড়তে থাকে। নিজেদের মধ্যে ওদের কানাকানি চলে—দিয়াজকে খতম করতে পারলে হয়। নইলে পরিত্রাণের পথ কোথায় !

দৃঢ় প্রতিজ্ঞ দিয়াজ মনে মনে সংকল্পে অটল। আফ্রিকার শেষ বিন্দু না দেখে প্রত্যাবর্তন অসম্ভব। তা করলে মৃত্যুই আসুক, কিংবা আসুক সাফল্যের সাথে অভ্যর্থনা।

সমুদ্রের বুকে ভাসতে ভাসতে এক সময় দিয়াজের নৌবহর ভলটাস অন্তরীপ পেরিয়ে গেল। তবুও নৌবহরের মুখ ঘোরাবার নামটি একবারও মুখে আনলেন না অনমিত দিয়াজ। তিনি তরঙ্গসংকুল বুক ফুলে ফুলে সমুদ্রের শেষ দেখে নেবার জন্যেই যেন এগিয়ে চলতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের ভয়ঙ্কর শ্রী আরো নিষ্ঠুর তরঙ্গের ঝাপটে ঝাপটে ভয়ংকরতর হয়ে উঠতে লাগলো।

যত দূরে নৌবহর ভেসে চলে ততই সমুদ্র পরমোল্লাসে প্রমত্ত প্রলয় নাচে অট্টহাসে বিধ্বংসী হয়ে গড়িয়ে পড়ে। এক একটি তরঙ্গ পর্বতপ্রমাণ—তার বিকাশ ভঙ্গিমা নিষ্ঠুর ভয়াল—বিচূর্ণ হাসির উল্লাস প্রেতাত্মার হাড় কাপানো শক্তিতে সমৃদ্ধ।

নাবিকেরা কেঁপে কেঁপে উঠে আর কুটিল মনে কাপুরুষের মত ভাবে—"প্রাণ নিয়ে দেশে ফিরতে হলে আর দেরী নয়। কি হবে আরো এগিয়ে ? জীবন নিয়ে দেশে ফেরাই যদি না যায়—ভারতবর্ষের জল পথ আবিষ্কারে কি লাভ। তাছাড়া "আপনি বাঁচলে তবেই না বাপের নাম ! জানই যদি গেল—স্বদেশ হোলো কি না হোলো আমাদের তাতে কি !"

সে রাত্রিতে সমুদ্রে প্রচণ্ড ঝড় উঠলো। রসদবাহী ছোট জাহাজখানা আগের ঝড়ের মুখে কোথায় যে নিরুদ্দেশ হোলো—তার সন্ধান কোনোদিন কি আর হবে। এই আবার অতি ভয়ংকর ঝড়। নৌবহরের বাকী দুখানি জাহাজ এবারে অসীম অতল সমুদ্র পাতালে ডুবে গেলেই সব ল্যাঠা চুকে যায়।

নাবিকদের এমনিতর মনের মলিন আকাশে প্রাণভয়ে আবার অনাভাবের মেঘ ভেসে উঠে—এ যাত্রায় রক্ষা পেলে আর একতিলও সামনে চলা নয়।

সেই মুহূর্তে সারা আকাশ কাঁপিয়ে মেঘের বুকে চিরে অদূরে বাজ পড়ে। অশনির আলোকে জাহাজের মাস্তুল যেন জ্বলে উঠে। মৃত্যুভয়ে পালগুলো ডানা ভাঙ্গা পাখীর মত ছটফট করতে থাকে।

তবুও দিয়াজ দৃঢ়চেতা। তাঁর চোখ পুরু-অন্ধকার ভেদ কোরে সুদূরে সমুদ্রের ইশারা সন্ধান কোরে ফেরে। পাছে সামান্য একটুর জন্যে শেষে না সাফল্যের নিশানা আলেয়ার মত মিলিয়ে যায়।

পর্বত প্রমাণ ঢেউ ভেঙে মৃত্যুর তরঙ্গের ফুঁটি করে ঝড়ের সঙ্গে লড়তে লড়তে দিয়াজের জাহাজ দুখানি ঝড়ের প্রতাপ সীমার বাইরে পড়তে না পড়তে সারা আকাশ, অনন্ত সমুদ্র নিস্তব্ধ কুয়াশায় ঢেকে গেলো। নিয়তির নির্মম পরিহাসের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দিয়াজের তখন দুঃসাহসের চরমতম পরীক্ষার-ক্ষণ। সেই ক্ষণেও দিয়াজ দমলেন না, হার মানতে চাইলেন না।

কিন্তু তাঁর সহযোগী নাবিকেরা তাঁর মতন শক্ত ধাতুতে গড়া ত আর ছিল না। তাই তাদের ক্ষিদের মুখে দিয়াজকে আর সামনে আগানো সম্ভব হোলো না।

যে পথ দিয়ে দিয়াজ এসেছিলেন, সেই পথেই ফিরে চললেন তিনি। পরাজয়ের গ্লানি ভারে, চিত্ত বিকারে নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে দিনের পর দিন তাঁর প্রত্যাবর্তন পথ যেন বিষময় হয়ে উঠলো। শরীর শীর্ণ হতে লাগলো। চোখ দুটি প্রভাহীন। বুকের বল সংকুচিত হয়ে এলো। তার উপর প্রবল আশংকা দেখা দিলো, রাজা জন এত চেষ্টার পরেও এত বড় অসাফল্যে তাঁর অনুরক্তের প্রতি রুষ্ট না হয়ে কি আর থাকবেন! রাজরোষে প্রাণ যাওয়ার চেয়ে সমুদ্রের বুকে প্রাণ যাওয়াই যে ছিল ভাল।

নাবিক-নাবিক দুশ্চেতা, দুরাকাঙ্ক্ষী দিয়াজ মনে মনে গুমরে গুমরে মরতে লাগলেন। তিল তিল করণে তাঁর বলিষ্ঠ জীবনের অরোহত স্বপ্ন শূন্যে বিলীন হবার পথে হঠাৎ একদিন ধরমুখীন নাবিকেরা দূরের পানে অঙ্গুলি নির্দেশে চীৎকার করে উঠলো—আমাদের সেই রঙ্গ-জাহাজ—ঐ—ঐ যে!

ক্রমশঃ দিয়াজের জাহাজ দুখানি রঙ্গ জাহাজের কাছাকাছি এগিয়ে যেতে লাগলো আর নাবিকদের উল্লাস উন্মাদ চীৎকার প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠলো।

ওদিক থেকে রঙ্গ জাহাজের এক নাবিক সহযাত্রীদের দীর্ঘ বিচ্ছেদ অন্তে সাড়া পেয়ে প্রাণের আনন্দে উল্লাসের আবেগে থর থর কাঁপতে কাঁপতে লুটিয়ে পড়লো জাহাজের পাটাতনের উপরে। এও যেন নিয়তির নির্মম এক পরিহাস!

বন্ধু সংসারে শত বিচিত্র ঘটনার মধ্যে এমন কত ঘটনাই ঘটে, যার রহস্য যবনিকা উন্মোচন হতে বড়ই বিলম্ব হয়ে যায়। হয়ত অত বেশী বিলম্বে ঐ যবনিকা উন্মোচিত না হয়ে কিছু আগে হলে পৃথিবীর কারও কোনো ক্ষতি হবার আশংকা ছিল না। অথচ তা যেন হবার নয়। তাই সকলের অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই সত্যে অনেক সময় অনেক শুভ ঘটনাও অশুভ আবরণে আবৃত হয়ে বড্ড দেরীতে আত্মপ্রকাশ করে।

এই যেমন পরাজয়ের ভাবনাগ্রস্ত, অভিযান ব্যর্থতার বিষাদ পর্যুদস্ত দিয়াজ লিসবনে প্রত্যাবর্তনের সময়ে পর্যন্ত ভুলেও কল্পনা করতে পারেননি যে তাঁর অভিযান ব্যর্থ হওয়া দূরে থাক, তিনিই সর্বপ্রথম নৌবীর যিনি আফ্রিকার শেষ বিন্দুতে ভারতের পথে জলযাত্রার চরমতম প্রতিবন্ধক যে "ঝড়ের অন্তরীপ" এক রাত্রিতে কুয়াশার আবরণে সেই অন্তরীপ তিনি তাঁর সহকর্মীদের ভীতিবিহ্বল মানসিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে নিজেদের অজ্ঞাতে কখন অতিক্রম করে গেছেন ফেরবার পথেও সে ঘটনা যথার্থ জানতে পারেনি।

অজানা আশংকায় দুরু দুরু বুকে, গ্লানিভারে অবনত মস্তকে একদিন পর্তুগালের গর্বের নৌবীর বার্থে লোমিও দিয়াজ লিসবনে রাজসভায় যখন তাঁর পরিত্যক্ত নৌ-অভিযানের ইতিবৃত্তের মাঝপথে ঝড়ের অন্তরীপের প্রতিকূলতার কথা বুকের ব্যথায় ধুকে ধুকে বলতে চেয়েছিলেন, অমনি রাজা সানন্দে সিংহাসন ছেড়ে এগিয়ে এসে সোল্লাসে দিয়াজকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, ধন্য ধন্য হে নৌ বীর কে বলে সেই তোমার "ঝড়ের অন্তরীপ। ও যে "উত্তমাশা অন্তরীপ!" ঐ ও সোনার ভারতে পৌঁছুবার সমুদ্র পথের শেষ প্রতিরোধ পরাভূত।...

দিয়াজের দুচোখে তখন আনন্দের তুফান দেখে কে!

বন্ধু বর, আজ এই খানেই শেষ করি। আবার যদি সুযোগ আসে কের আরম্ভ করতে কতক্ষণই বা তার আগে জানাই তোমাকে, যে-জীবন হার মানে না, সেই অমৃতময় জীবনের অশেষ ভালবাসা। ইতি—

তোমার সমুদ্র

[ক্রমশঃ

॥ ১১ ॥

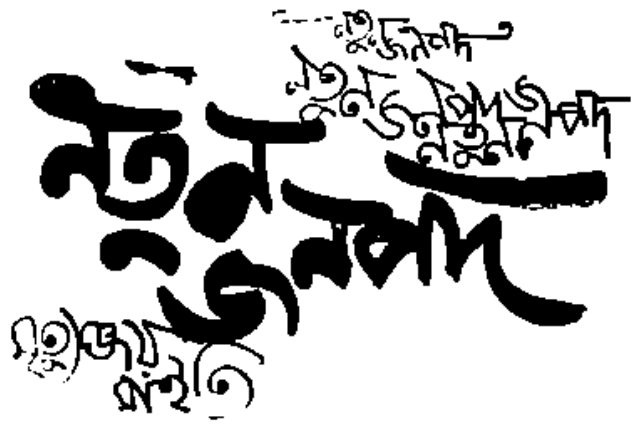

জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ হতে চলেছে। মাঠে মাঠে তখন ভর চাষের সময়। জল হয়ে গেছে। লাঙ্গল দিয়ে সেই জলের নিচের মাটিকে নরম করতে হবে, লাঙ্গলে-উপড়ানো ঘাস, আগাছাকে সেই মাটিতে পুঁতে দিতে হবে। ওগুলো পচবে পচে সার হবে, সেই সারে ধানগাছের গোড়া মোটা হবে। দূরে দূরে বীজ ধানের তলা পড়েছে। এখন ঠিক রুইবার মত বড় হয়নি। আর কয়েক দিনের মধ্যেই হবে। এখন কেবল জমি তৈরীর মরশুম।

প্রথম বর্ষার সকালে চষা ক্ষেত আর বীজ ধানের তলা কেমন যেন ঘুমিয়ে থাকে ছায়ার কাঁথা গায়ে দিয়ে। চাষীরা ভোরে উঠে চাষ করতে চলেছে, হাতে হুঁকা, কল্কে, 'বেনিয়া' নিয়ে। খড় জড়িয়ে জড়িয়ে তাতে যে আগুন রাখা হয় এ অঞ্চলের লোকে তাকে 'বেনিয়া' বলে।

মরা নদীর পাড়ে উঁচু সোনা মাটির পথ দিয়ে নগেন আর হরিপদ সেদিন জলপাই মহালে চাষ করতে যাচ্ছিল। ঐ দূরে যেখানে কয়েকটা তালগাছ উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঐখান থেকে জলপাই মহাল শুরু। আসলে এই মহাল এই নদীর চর। তখন নদীতে প্রবল স্রোত ছিল, তার বিস্তার ছিল। ক্রমে ক্রমে মজে গেছে নদী। মরা নদীর সেই চরে এই জলপাই মহাল গড়ে উঠেছে।

নগেন আর হরিপদ যখন নীলাপুরের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল তখন নদীতে ভরকোটালের জোয়ার। জল, চরের উপর উঠে গিয়ে এই মুহূর্তে নদীটাকে খুব বড় বলে মনে হচ্ছে। সূর্য তখনো ওঠেনি।

নগেন বলল, 'এই খানটায় একটা পুল হবে। লোহার পুল। নয়ঘাট থেকে বরাবর সাঁকো নীলাপুরে আসবে। কাঁসাই আগে জরীপ হয়ে গেছে। রাস্তাটা কোন দিক দিয়ে যাবে। পাঁচ রাস্তাও হবে। বুঝলি। তোর নীলাপুর শহর হয়ে উঠেছে রে!'

'কি বললি?' হরিপদ নদীটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখল। কোটালে জোয়ারের নদীটার বিস্তৃতি এখন জলে টলমল করছে।

'কত বড় পুল হইবে রে বাবা। কে তৈয়ী করবেরে নগেন!'

'এত বড় পুল। তুই একটা অকাট মুখ্যু। হাবড়ার পুল দেখেছিস। দেখিসনি তবে তুই একটা আস্ত গোঁয়ো। এখান থেকে দূরে ঐযে বাবলা বনটা ঝিরি করছে হাবড়ার পুল ঐখান পর্যন্ত লম্বা। তার উপর দিয়ে তোর লোক চলছে, বাস চলছে, ট্রেরাম চলছে, আর ঘোড়ার গাড়ী চলছে—কী না চলছে। আর জানিস্? নিচে থাম নেই। পুলটা শূন্যে ঝুলে আছে। বুঝলি।'

—'শুনো স্কুলে আছে।' হরিপদ অবাক হয়ে গেল।

—'হাঁ, হাঁ, শুনো স্কুলে আছে। সেকি আমাদের দেশের লোক তৈরী করেছে রে! সাহেব লোক করেছে। সাহেব লোক!'

কথা বলতে বলতে ওরা জায়গাটা পেরিয়ে কলপাই মহালের দিকে চলে গেল।

তা, খবরটা সত্যি। নয়ঘাট থেকে বরাবর 'বাস' আসছে নীলাপুরে। এখন নীলাপুরে সেটেলমেণ্ট অফিস, এম, ই, এস ব্লকে, গার্লস হাই স্কুল, বয়েজ হাই স্কুল, আরও নাকি একটা সমবায় ব্যাঙ্ক হবে বলে শোনা যাচ্ছে। একটা হাটও আছেই! ধানের মরশুমে আবার এ হাটটা জমে ওঠে। চারিদিকের গ্রাম থেকে নৌকায় করে, মাথায় করে, কেউবা গরুর পিঠে 'ছালা'য় চাপিয়ে বাজারে ধান নিয়ে আসে। পূর্বদিকের 'খাউরী'রা অর্থাৎ খাওয়ার জন্য যারা ধান কেনে, তারা এই সময় ভীড় করে। বড় বড় পানসী বোট এই মরাবন্দীতে তখন পাল টাঙানোর লম্বা বাঁশটা সোজা দাঁড় করিয়ে রেখে, বাজারে ধান কেনে। ধান কিনে রসুলপুর হয়ে, বাহির গাং দিয়ে কলতা, বা হাওড়ার মিলগুলিতে ধান নিয়ে যায়। নীলাপুরের নির্জন জীবনে এই ক'মাস ভীড় লেগে ওঠে। কত দূর দেশের নৌকা, কত দূর দেশের অপরিচিত মানুষ এই নীলাপুরের ঘাটিতে ক'দিনের জন্য বাসা বাঁধে। হাট-বাজার করে, নৌকাতে রান্না চাপিয়ে বনটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হয়তো বাড়ীর ছেলেমেয়ের কথা ভাবে। এই মরা নদীর ইতিহাসের ধূসর পাণ্ডুলিপি তখন বিকেলের আকাশে কে যেন ছড়িয়ে দেয়।

তারপর গভীর রাত্রিতে নদীতে জোয়ার হলে,—নির্জন নদীতীরের এই নীলাপুরের মাটি থেকে নিঃশব্দে নোঙরটা তুলে নেয় তারা। ধীরে ধীরে অন্ধকারে, বাবলা বন, আর উঁচু লোনা মাটির পথটাকে ডাইনে রেখে পানসিটা রসুলপুরের দিকে চলতে থাকে। তখন এই ক'দিনের আতিথ্যের উপর যবনিকা নেমে আসে। হয়ত সেই দূর দেশের অপরিচিত মানুষগুলি নীলাপুরে আর কখনো ফিরে আসবে না। আর এই মরা নদীর তীরে, বাবলা বনটার ধারে নোঙর ফেলবে না কখনো। এবার আর হয়ত নৌকাও আসবে না। কারণ পাঁচ রাস্তাটা হয়ে গেলে ট্রাকে করে ধান যাবে। তাছাড়া কালিনগরের কাছে দুটো বড় বড় রাইস মিল বসছে। তারা ধান কিনে ট্রাকে করে বয়ে নিয়ে যাবে। নীলাপুরের ইতিহাসের প্রাচীন অধ্যায়গুলো পেরিয়ে একেবারে নতুন যুগের দরজায় এসে দাঁড়াবে।

খবরটা রটল রটে গেল নীলাপুর ও পাশের গ্রামের পাঁচরাস্তা হচ্ছে, পুল হচ্ছে নীলাপুরের নদীর ওপর।

স্কুলের ছেলেমেয়েরা, সেটেলমেণ্ট অফিসে কাজে যারা আসে তারা, এবং নীলাপুরের অধিবাসীরা একদিন বিস্ময়ের সঙ্গে দেখল প্রায় পঁচিশ' সাঁওতাল পুরুষ-স্ত্রী ভীড় করে এল নীলাপুরে। সঙ্গে ঘরকন্নার জিনিসপত্র বাঁকের দু'পাশে বাঁধা। অনেকের পিঠে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে। পুরুষদের হাতে তীরধনুক। একবেলার মধ্যে তারা নদীর ধারে হোগলা দিয়ে ঘর বানিয়ে ফেলল। তারপর নীলাপুরের বাজার থেকে চালডাল কিনে নিয়ে গেল যারা বসিয়ে দিলে।

স্কুলে যেতে ছেলে মেয়েরা এই বিচিত্র লোকগুলিকে দেখছিল। সাঁওতালরা আরও পশ্চিমে থাকে, ছোট ছোট ঘরে। পুরুষেরা শিকার করে দিনের বেলা। একটা খরগোস, কয়েকটা সাপ, কয়েকটা বুনো ইঁদুর মিলে গেল সেদিনের মত শিকার শেষ। সাপ হলে ভালই হয়। সেটাকে পুড়িয়ে টুকরো টুকরো করে ছেলেদের হাতে দিলে তারা বেশ খুশি হয়। আর মেয়েরা সারাদিন মাটি কাটে।

এই সব গল্প ছেলেমেয়েরা মা দিদিমাদের কাছে শুনে আসছিল। এখন একসঙ্গে এতগুলি সাঁওতাল দেখে তাদের চোখে বিস্ময় দেখা দিল। সেদিন শনিবার। নীলা হোস্টেল থেকে বাড়ি যেতে সেই সাঁওতালদের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। 'গৌরী জানিস, ঠাকুমা বলছিলরে, সাঁওতালদের বিয়ে হয়ে গেল বরটা একটা খুব উঁচু গাছে চড়ে বসে থাকে। আর বৌটা জানিস, সেখানে গিয়ে কেবল কাঁদতে থাকে। বলে, তুই নেমে আয়, তোকে আমি খেটে খাওয়াব। তোকে কিছু কাজ করতে হবে না। এই রকম বলার পর বরটা

মেয়ে আসে। তাইত পুরুষগুলো শিকার করে, আর মেয়েরা মাটি কাটে। ঘরের কাজ করে, ছেলে মানুষ করে। পুরুষগুলোর কোন ঝামেলা নাই। কেমন মজা না-রে!

নীলার সহপাঠিনী সৌরী বলল, 'আজকাল তোর কি হয়েছে বলত। কেবল বিয়ের কথা ভাবিস! চুরি করে করে দেখিস একজনকে।'

'আরে কি করছিস আবার। ছাড়, চুল ছাড়!—বলবি। আর বলবি এ কথা।'

'না বলবো না। এই দিব্যি করছি। কিন্তু তুই রাস্তায় এই সব করছিস। দাঁড়া, বড়দিমণিকে বলে দেব। বড়দিমণি বলেনি রাস্তায় কখনো বেশি কথা বলবে না, কারুর দিকে তাকাবে না। দুষ্টুমি করবে না।'

'দেখনা এখন কেউ কোথাও নেই। কিন্তু তুই কেন আমাকে নিয়ে যা তা বলবি।'

'কই যা-তা বললাম। সেদিন অসিত বাবুকে তুই চুরি করে দেখেছিলি। যাঁ রে, তোর খুব ভাল লাগে দেখতে! কী সুন্দর না।'

—নীলা বলল, 'আমাকে কি বলেছিল জানিস, বলেছিল লুকিয়ে লুকিয়ে আবার পেটভরে কাঁচা তেঁতুল খাচ্ছ না ত। কী লজ্জা না লাগছিল। মনে মনে বললাম, বেশ করব খাব। জব্দ হলে আবার দেখতে আসবে।'

আশ্চর্য! নীলার এই ষোল বছরের জীবনের প্রথম ঘুম ভাঙছে। আর এই ঘুম ভাঙা আলোয় সে প্রথম দেখেছে অসিতকে। তার বাবার অনেক টাকা। জমিদারী ছিল। সে সোপনে শুনেছে, বাবা বাকি অসিতকে বিলেত যাবার টাকা দেবে বলে।

নীলা, এবার ম্যাট্রিক দেবে। সাধারণ মেয়েদের চেয়ে তার স্বাস্থ্য ভাল। যা বয়স তার চেয়ে বড় বলেই মনে হয়। দেখতে শ্যামল, কিন্তু সুন্দর। তার সুদীর্ঘ চুলে চোখে দেহের প্রতিটি অঙ্গে, এই নদীপারের শ্যামল মাটির লাবণ্য যেন মিশে আছে।

কেবল মেয়েদের চোখে নয়, নীলাপুরের সমস্ত মানুষের চোখে এই নতুন পথ নির্মাণের উপক্রমণিকাটুকু বিস্ময় এনেছে। এখন তারা ভোর না হতেই প্রায় আড়াইশ কোদাল মাঠে শান্তভাবে মাঠের মাটি কেটে চলেছে। আর নাওতাল মেয়েরা ঝুড়ি নিয়ে সেই মাটি ফেলছে একটা দূরে যেখানে পাঁচ রাস্তাটা হবে।

বুড়ো বাবাজী নিমাই হাজরা পড়ন্ত বিকেলবেলা বসে বসে আলুক্ষেতের কাজ দেখছিল। প্রায় এক বিঘার মত ক্ষেতে আলু হয়েছে গোঁসাইজীর। বন সবুজ মোটা ডাঁটা হয়েছে আলুর। সাদা ফুল ঝেকে গেছে পাতার।

তা চাষটা ভালই হয়েছে দেখা যাচ্ছে। পাশের গোপাল আর দুজন মজুর গাছের গোড়া আস্তে আস্তে কোপাচ্ছিল। ওতে আলু বড় হবে। এখনও গাছ মরতে আরও একমাস। দুটো সেচ আরও দরকার লাগবে।

গোঁসাইজী হুঁকো টানছিল। ছায়া নেমেছে ক্ষেতে। গাছ গাছালির পাখীর ডাক থেমে গেছে সন্ধ্যা আসার আগের আলো-অন্ধকারের মুহূর্তে।

হুঁকো টানা বন্ধ রেখে, নিমাই বললো, 'বুঝলি গোপাল—এবার একটা মাথা যাবে! আস্ত ভ্যাস্ত মাথা! বুঝলি?'

গোপাল কিছু বুঝতে পারল না। বললো,—'কোথা মাথা যাবে গোঁসাইজী।'

—'হে' হে' কোন খবরত আর রাখিস না। নীলাপুরের লোহার পুল হবে যে। নদী বাঁধা হবে গেছে। আর পুল হলেই অমাবস্যার গভীর রাতে একটা মানুষ মাথা দিতে হবে। এত বড় পুল, নইলে ভেঙে পড়ে যাবে না! বাবা, এ হল শাস্ত্রের কথা।'

গোঁসাইজীর যখনি কিছু গুরুতর সংবাদ পরিবেশনার দরকার হয়, তখনি শাস্ত্র এসে পড়ে। গোপালের মনে বিশ্বাস জন্মাবার পক্ষে এই উল্লেখটি অপূর্ব কাজ করে।

কল্কেতে আগুন নিভে আসছিল। গোঁসাইজী সেটা একবার টিপে দেখল। নাঃ কিছু নেই। তাই রেখে দিয়ে আবার নিমাই বলতে লাগল 'তোরা যখন ছেলেমানুষ গোপাল। ইসলামপুর জানিস? চৌধুরীদের নাম শুনেছিস? সেই চৌধুরীদের পাকা বাড়ী যখন তৈরী হয় তখন বাড়ীর ছাদ কেবল ফেটে পড়ে যায়। কত মিস্ত্রি এল কেউ ছাদ ঠিক করতে পারে না।

বাড়ী আর হয় না। দেয়ালগুলো তেমনি পড়ে রইল কিন্তু, দিন যায় করে। আর বাড়ী নয়তো যেন রাজ-প্রাসাদ। চৌধুরী বাড়ীর তখন কী নাম ডাক। বড় কর্তার নাম শুনলেই লোক ভয়ে কাঁপে। এই লম্বা এই চওড়া ইয়া ছাতি, ইয়া গোঁফ, গায়ের রং ধবধবে ফর্সা। বুঝলে না গোপাল? তা বড় বাবু হাটে ঢোল পেটাবার দিয়ে দিলেন, যে মিস্ত্রী ছাদ ঠিক করে দিতে পারবে তাকে পাঁচশ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

যায়, যায় কিছুদিন যায়। একদিন যমদূতের মত কালো, লম্বা, চোখ দুটো লাল যেন জবা ফুল এক জন মিস্ত্রী এসে বাড়ীটা অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে দেখল। তারপর বলল, সে ছাদ ঠিক করে দেবে। কিন্তু বড় কর্তার সংগে সে গোপনে একটা কথা বলবে।'

'তারপর বড় কর্তাকে মিস্ত্রী কানে কানে চুপি চুপি বলল, মাথা চাই, বামুনের মাথা। অমাবস্যার রাত্রে পুজো দিতে হবে। তবেই ছাদ খাড়া হবে। নইলে কারুর সাধ্যি নেই কর্তা।' বড়বাবু গোঁফে তা দিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে। মিলেগা।'

সেই অমাবস্যার দিনটা ঘনিয়ে এল। টিপ টিপ করে সেদিন বৃষ্টি পড়ছিল। বড়বাবুদের নায়েব খানার ঘরে বন্দী একটা সুন্দর বামুন ছেলেকে সেই গভীর রাতে স্নান করানো হ'ল। ছেলেটি কিছু বুঝতে পারে নি? কী ভয়ংকর রাত্রি তার সামনে ঘনিয়ে আসছে।' এদিকে মিস্ত্রী আগে থেকে ঘরের মেঝের মধ্যে অনেক গভীর করে গর্ত কেটেছে। ইট দিয়ে বাঁধিয়েছে নীচটা। তলার একজনের বসার মত যায়গা। অমাবস্যা রাত্রি ক্রমশঃ গভীর হয়ে এল। বৃষ্টি আর বাতাস ক্রমশঃ বাড়ছে। বড়বাবু টেনেছেন। চোখদুটো লাল টক টক করছে। মিস্ত্রী ব্যাটাও খেয়েছে খুব। তারপর সেই গভীর রাত্রে ছেলেটিকে মেঝের সেই গর্তের কাছে নিয়ে এসে মিস্ত্রী বলল, নিচে বসে তোমায় পুজো করতে হবে। ঐ প্রদীপ জ্বলছে। এ পুজো গভীর রাত্রে একা ছাড়া হয় না। ছেলেটির ভয়ে মুখ শুকিয়ে আসছিল। চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল পড়ছিল, তার। বলছিল, বাবু আমি পারবনা পুজো করতে, আমাকে বাড়ী পৌঁছে দাও। আমার ভয় করছে।—কী? বাড়ী যাবি! বড়বাবু ধমকে উঠলেন। মিস্ত্রী বলল, কোন ভয় নেই, তোমার। ভয়ে ভয়ে ছেলেটি সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। গর্তের শেষ প্রান্তে একটা প্রদীপ জ্বলছে। হঠাৎ সিঁড়িটা তুলে নেওয়া হল। তারপরই অজস্র ইট পড়তে লাগল। সেই গর্তে। পাঁচজন জোগাড়ে লুকিয়ে ছিল কোথায়! একটা কান্না ভেসে এল। মিস্ত্রী বলল, শালারা শুনিস কি? জলদি ইট ফেল। হঠাৎ একটা প্রবল ঘূর্ণি বাতাস ইশান কোন দিয়ে সারা বাড়ীর ওপর দিয়ে বয়ে গেল। তারপর সেই রাত্রে চুন সুরকি দিয়ে মেঝেটা গেঁথে দেওয়া হ'ল। আর সেই অন্ধকারে ইটের ঘা খেয়ে খেয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে বামুনের ছেলেটা চির-দিনের মত থেমে গেল সেই কবরের অন্ধকারে।'

বিস্মিত গোপাল আর মজুর দুজনের হাতের কাজ বন্ধ হয়ে গেছল। গোঁসাইজী থামতে তিনজনেই এক সংগে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

গোপাল বলল, 'তা এবার ছাদ দাঁড়াল!'

'হাঁ। দাঁড়াল। আর ভেংগে পড়েনি। দেখিস্ কখনও যদি ঐ দিকে যাস্ দেখে আসিস বাড়ীটা, যে, হেঁ, নদীতে লোহার পুল হচ্ছে ও একটা মাথা পাবেই। তুই দেখিস গোপাল আমার বাক্যি সত্যি হয় কি না?'

গোপাল গোঁসাইজীর কথা অবিশ্বাস করতে পারল না। তার মনে হল সে শুনছে, এই অন্ধকারে আলু-খেতের ওপারে সেই বামুনের ছেলেটা অন্ধকারের কবর থেকে উঠে পড়ে কাঁদছে। আর তার সেই কান্নার শব্দ এই আদর রাত্রির ভিজে বাতাসে ভেসে ভেসে আসছে।

স্কুল ছুটির পরে সন্ধ্যাবেলা নমিতা, উমা এবং নন্দিতা নদীর ধারে একটু বেড়িয়ে এসে যে যার ঘরে চলে যাচ্ছিল। এমন সময় ভুবনবাবু ডাকলেন।

নমিতা নেমে এল।

ভুবনবাবু বললেন, 'একজন সন্ন্যাসী ডাকছেন।'

'সন্ন্যাসী! সে কি?'

'হাঁ সন্ন্যাসী!'

উমা নন্দিতা ও নমিতার সংগে নিচে নেমে এল।

সত্যি একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী লাইব্রেরী ঘরে বসে আছেন। নমিতা, উমা, নন্দিতা ঢুকতেই উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

ওরা তিনজনেই নমস্কার করল।

সন্ন্যাসী হাত তুলে কি যেন বললেন। সেই অস্পষ্ট শব্দগুলি বোঝা গেল না। তারপর তিনি নিজেই তাঁর পরিচয় দিলেন, বললেন, 'তিনি ইউনিভার্সিটির ছাত্র। এই অঞ্চলে এসেছেন 'টাডি টুরে'। থাকার দারুণ কোথায় পাওয়া যাবে জিজ্ঞেস করতে, একজন ভদ্রলোক এই স্কুলে হেড মিস্ট্রেসের কাছে আসতে বললেন। একটা ব্যবস্থা তিনি করে দেবেন।'

নমিতা খুশী হয়ে বলল, 'আপনি আমাদের স্কুলেই থাকবেন। আপনাকে কোথাও যেতে হবে না। ভুবনবাবু!'

'দিদিমণি।'

'গেস্টরুমটা ঠিক করার ব্যবস্থা করুন ইনি এই খানেই থাকবেন।' তারপর সন্ন্যাসীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার জিনিসপত্র'—

—'সবই সংগে আছে।' দূরে একটা সুটকেস আর কম্বল জড়ানো ছোট্ট একটা বিছানা দেখা গেল।

—'আপনার খাওয়া দাওয়ার কিছু বাধা আছে নাকি?

—'আমরা একবেলাই খাই এবং আমীষ জাতীয় কিছু খাই না।'

—'আজ রাত্রে তাহলে কিছু খাবেন না?'

—'না, সূর্য অস্ত গেছে। আজ কিছু খাব না।'

—নন্দিতা বলল, 'একটু দূরে? কতদূর থেকে এসেছেন?'

—সন্ন্যাসী ওর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন না, আমাদের এইটিই নিয়ম।'

দেরি হচ্ছে দেখে নমিতা, উমা, নন্দিতা নিজেরাই ঘরটা ঠিক করতে লেগে গেল।

উমা, ঝাঁটা দিয়ে ঘরটা পরিষ্কার করল। নমিতা আর নন্দিতা খাটটা জানলার কাছে সরিয়ে এনে তার ওপর একটা বাদুর পেতে দিল। নন্দিতা জানলার ধারে চেয়ার টেবিল পাতল। নিজের ঘর থেকে একটা সুন্দর টেবিলক্লথ এনে টেবিলটা ঢেকে দিল।

আবার কোথা যাচ্ছিস?

নন্দিতা বলল, 'দাঁড়াও না আসছি।' এবার নিজের ঘরের ফুলদানিটা নিয়ে এসে নন্দিতা বাগান থেকে কয়েকটা গন্ধরাজ ফুল তুলে এনে তাতে সাজিয়ে টেবিলে রেখে দিল। তিনজন শিল্পীর হাতের ছোঁয়ায় গেস্টরুমটা একটা সুন্দর পড়ার ঘরে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

সন্ন্যাসী হাত মুখ ধুয়ে ঘরে এলেন। 'বাঃ সুন্দর ব্যবস্থা!' তারপর নমিতার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কোথায় গাছতলায় থাকব তা নয়, একেবারে রাজপ্রাসাদে এসে গেলাম।'

নন্দিতা বলল, 'আপনি কি নিয়ে এম, এ, পড়েন?

—'পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে।'

'কিন্তু আমাদের সকলের খাওয়া লাগছে আপনি কিছু খাবেন না জেনে।'

'কিন্তু সন্ন্যাস নেবার পরে আমাদের এই সব মেনে চলতে হয়। আপনারা কিছু মনে না করলেই আমি খুশী হব।'

—'বেশ তাই হবে।' নমিতা বলল, এই হল নন্দিতা আর এই হল উমা। নন্দিতাই আপনার দেখাশোনা করবে।

আলো দিয়ে ওরা তিনজন ঘরে চলে এল। বারান্দায় দাঁড়াল কিছুক্ষণ। তিনজনের মনের মধ্যে কি করে যেন একটি অপরিচিত আনন্দ ধারা বইছে। কোথাকার এক সন্ন্যাসী অতিথি হয়ে এসেছেন। এই গার্লস স্কুলের জীবনে এমন বিচিত্র অতিথি এসেছে কি?

নন্দিতা ভাবছিল, এ কেমন সন্ন্যাসী। কী অপরূপ রূপ। এই হলদে পোষাক যেন সেইরূপকে আরও উজ্জ্বল করেছে। টানা টানা চোখ, যেন তুলি দিয়ে আঁকা। কী অপূর্ব মুখশ্রী, মুণ্ডিত কেশ। শান্ত। ধীরে ধীরে কথা বলেন। সে যেন কথা নয়, গান।

উমা ভাবছিল সন্ন্যাসীর কথা নয়, নন্দিতার কথা। কেন এই সন্ন্যাসী মুহূর্তের মধ্যে নন্দিতার চোখে এত অধীর অচেনা আনন্দ এনেছে। নন্দিতা সহজে কোন ছেলেকে দেখে চঞ্চল হবার মেয়ে নয়। সাধারণ

ছেলে, ওর মনে ও সব
সহজেই অনাসক্তের পত্তার সংস্কৃত
গভীর বিরাগী মনের অস্তঃ কাছে পৌঁছতে পারে,
এমন ছেলেকে উমা নিজে কখনও দেখেনি। এই সন্ন্যাসী
কী করে সেই ঘর খোলার চাবিকাঠি পেল। উমা
বিস্মিত হল, সে কেবল নন্দিতাকে দেখতে লাগল। যে
নন্দিতা অন্যমনস্ক, যে নন্দিতা গম্ভীর, যে নন্দিতা
অনেক দূরের।

নমিতা ভাবছিল, আশ্চর্য জীবন এই সন্ন্যাসীর।
বেশ সুন্দর বলছিলেন, কোথায় গাছতলায় থাকবে, তা নয়
রাজপ্রাসাদ। কোথায় দেশ ছিল সন্ন্যাসীর। নিশ্চয়ই
চট্টগ্রাম। কথায় উচ্চারণ তেমনি।

নমিতা ভাবছে, আচ্ছা কাল ওঁকে দিয়ে ছাত্রীদের
কাছে কিছু বলার ব্যবস্থা করলে হয়। যৌতুকম্
সম্পর্কে উনি যদি কিছু বলেন। কোথায় ইতিহাসের এক পাতার লেখক যৌতুকম্ সম্পর্কে দুলাইন
বলেছেন। কিন্তু এইচ জি, ওয়েলস পৃথিবীর ইতিহাস
লেখার শেষে যাঁকে "গ্রেটেস্ট ম্যান ওবদি ওয়ার্ল্ড"
বলেছেন, তাঁকে একপাতার মধ্যে ছাত্রীরা জেনে ফেলবে
এ ভাবতেও নমিতার হাসি পায়। আশ্চর্য এই গ্রন্থ-
কাররা।

নমিতা, উমা, নন্দিতা তিনজন যে যার ঘরে ঘরে
চলে গেল।

—উমা বলল, তুই 'অন্যমনস্ক হয়ে উঠেছিস কেনরে?

—'কোথায়? তুই কি আজকাল 'ফটগ্রিডিং' অভ্যাস
করছিস পার্টনার।'

—উমা আর বেশি কিছু বলে নন্দিতাকে তার
চিন্তার ব্যাঘাত ঘটাতে চাইল না। সে একটা বই খুলে
নিয়ে বসল।

নন্দিতা তেমনি বিছানায় শুয়ে আছে। আলোটাতে
একটা বইয়ের আড়াল দিয়ে। খাওয়ার ডাক এল। নন্দিতা
বলল, 'নতিতা একজন অতিথি অভুক্ত রইলেন আর
আমরা খেতে যাচ্ছি, খারাপ লাগছে পার্টনার।'

—'কিন্তু ওটা যে ওঁদের ধর্ম। তুই কি করবি বল?'

—'কি আর করব, চল খেতে চল। আচ্ছা দাঁড়া, উমি
কি করছেন দেখে আসি, যদি কিছু দরকার হয়। তুই
গিয়ে বেসে যাস্। নন্দিতা চলে গেল। মেসটরুমের
কাছে গিয়ে দেখল, স্বল্প আলোয় সন্ন্যাসী প্রার্থনায়
বসেছেন। চোখ দুটি মুদ্রিত। দেহ স্থির, উন্নত। যেন
জীবনের স্পন্দন পাওয়া যাচ্ছেনা।

নন্দিতা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল সেই অপূর্ব ধ্যান-
মূর্তি। কে যেন তাকে সেই মূর্তির দিকে টেনে
রাখছে, যেমন করে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের
অনন্ত জলস্রোত অদৃশ্য অজানা আকর্ষণে উদ্বেল হয়।

ভোরে উঠে সন্ন্যাসী নমিতাকে বললেন, 'আমাকে
এবার এখানকার একটু পরিচয় বলুন। এবং যাঁর
কাছে গেলে এই অঞ্চলের ইতিহাস, তার আর্থিক
কাঠামো, তার সামাজিক আচার বিচার, এসব জানতে
পারব, এমন একজন লোকের নাম করুন।'

নমিতা বলল, 'এখানে একজন প্রবীণ দেশসেবক
আছেন। তাঁর কাছে গেলে আমার মনে হয় আপনি
সবদিক দিয়েই সাহায্য পাবেন। তাঁর ছেলে একজন
ডাক্তার। তিনিও হয়ত আপনাকে এব্যাপারে সাহায্য
করতে পারবেন।'

—'কদ্দুর এখান থেকে?

—'মাইল দু'তিন হবে। এই বরা নদীটার পাশে
একটি বেসিক স্কুল আছে। সেইখানেই স্বদেশবাবু
থাকেন।'

সন্ন্যাসী, উমা, নমিতা, নন্দিতা সকলে মিলে চা
খেতে বসেছিল। সন্ন্যাসী চা খান না। একটু ফল
আর একটু দুধ খেলেন।

নন্দিতা জিজ্ঞেস করল, আপনার নিশ্চয়ই একটা
নাম আছে?

—'হাঁ, তা অবশ্য আছে।'

—'কে কে ছিলেন বাড়ীতে?'

সন্ন্যাসী একটু চুপ করে রইলেন। তার পর
ধীরে বললেন, 'সন্ন্যাস নেবার আগের জীবনের দিকে
আমাদের সাধারণতঃ তাকাতে নেই। তবু আপনি জানতে
চাইছেন, আমার বাবা, মা, আর একটি বোন ছিল।'

—'সব ছেড়ে চলে এসেছেন?'

—'হাঁ, কেবল বোনের স্মৃতিটুকু ছাড়া।'

নন্দিতা যেন চট্টগ্রামের সমুদ্রোপকূলের নারকেল বীথি ঘেরা কোন এক সুদূর নির্জন গ্রামের বেড়া দেওয়া একটি কুটিরে যেন জন্ম নিয়েছে। সেখানে তার দাদার সংগে ধুলো খেলে সে, বড় হয়ে উঠেছে। সেই দাদা একদিন সব ছেড়ে চলে গেল। একবারও পেছন ফিরে তাকাল না।

নমিতা বলল, 'বোনটি খুব আদরের ছিল?'

'হাঁ, আমাকে খুব ভালবাসত। সংসারে আমি যেন তার সব ছিলাম। চলে আসতে হল একদিন। ছোট স্নেহের আশ্রয়কে পেরিয়ে না এলে, বড় স্নেহের আশ্রয় যে পাওয়া যায় না! বাবাকে যাকে বললাম আমি চলে যাব, ভিক্ষু হব। তাঁরা শুনলেন, দুঃখ পেলেন, কিন্তু বাধা দিলেন না। কারণ আমাদের দেশে এই ঘটনা নতুন নয়। কিন্তু ছোট বোন, সেত কিছু বোঝে না! তার কাছে পৃথিবীর পথ যে পরিচিত নয়। তার কান্না থামান গেল না। যে দিন আসব, তার আগের সারাটা রাত সে কেঁদেছে। অভিমান করে কথা বলেনি। সূর্য ওঠার আগে আমাকে আমার গ্রাম ছেড়ে চলে আসতে হবে। আমি চলে আসছি। বোনটি কিছুদূরে এসে কেঁদে কেঁদে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। আমি একবার ফিরে তাকালাম। যদিও আমাদের পেছনে ফিরে তাকাতে নেই। সামনের পথ আমার কাছে তখন আবছা হয়ে উঠেছে।

—আশ্চর্য নন্দিতার চোখে জল এসেছে। কোনভাবে সে নিজেকে সংযত করে বলল 'আর কখনও বাড়ী ফিরে যাননি?

'না, যাইনি। কোন স্নেহে কোন মায়ায় আমাদের আবদ্ধ হতে নেই। সব সময় যেন আমাদের চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে হয়। আপনাদের দর্শনে একটি সুন্দর কথা আছে। গীতায় স্থিত প্রজ্ঞতার লক্ষণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে সেই মন স্থিতপ্রজ্ঞ, "যঃ সর্বত্র অনভি স্নেহঃ" যে মন কোথাও বদ্ধ হয়ে থাকে না, কোন মায়ার জালে নিজেকে জড়ায় না। সন্ন্যাস ধর্মেও এই কথা মেনে চলতে হয়। কোথাও বেশীদিন সন্ন্যাসীদের থাকতে নেই। তাদের কেবল চলতে হয়। এক বৃক্ষ ছায়া থেকে আর এক বৃক্ষ-ছায়ায় এক পথ থেকে আর পথে। এক নদীতীর থেকে আর এক নদীতীরে। বন থেকে বনান্তরে। কোথাও থামতে নেই। থামলেই ভাল লেগে যাবে, মায়া আসবে, বন্ধন গড়ে উঠবে।'

সন্ন্যাসীর জীবন যেন কেবল অবিরত পথ চলার আনন্দ।

ভিক্ষু থামলেন। সকলের এই মেলা নিস্তব্ধ ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশ টুকু, করুণ হয়ে উঠল।

মরা নদীটার তীর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সন্ন্যাসী স্বদেশবাবুর বেসিক স্কুলে পৌঁছলেন। দূর থেকে স্কুলটিকে ছবির মত মনে হয়। নারকেল আর সুপুরি আর নিম গাছের আড়ালে বিচ্ছিন্ন অনেকগুলি খড়ের ঘর। সামনে একটি খুব বড় পুকুর প্রশস্ত পাড়। ঘাট বাঁধানো। গেটের কাছে একটি ছেলে বসে ছিল। সন্ন্যাসী যেতেই উঠে দাঁড়াল।

'নমস্কার।'

সন্ন্যাসী আশীর্বাদের ভঙ্গিতে হাত তুলে অনুচ্চস্বরে কি বললেন।

—'স্বদেশবাবু আছেন?'

'হাঁ, আছেন, আসুন আমার সংগে।

ছেলেটির পেছন পেছন সন্ন্যাসী, চললেন।

স্বদেশবাবু চরকায় সুতো কাটছিলেন। সন্ন্যাসীকে দেখে, উঠে দাঁড়ালেন।

সেই ছেলেটি একটি মোড়া এগিয়ে দিল।

—'বসুন আপনি!'

সন্ন্যাসী ও স্বদেশবাবু উভয়ে বসলেন।

'আমি এখন নীলাপুর গার্লস স্কুল থেকে আসছি। আমি ইউনিভার্সিটির একজন ছাত্র। একটা স্টাডিটুরে এসেছি এ অঞ্চলে। আপনার একটু সাহায্য চাই।'

—'বলুন, আমার যেটুকু সাধ্য আপনাকে সাহায্য করব।'

—'আমি এই অঞ্চলের লোকের আচার বিচার, ইতিহাস, এখানকার লোকের জীবিকা বা আর্থিক কাঠামো, এইসব তথ্য একটু সংগ্রহ করতে চাই।'

—একটি মেয়ে এসে নমস্কার করে দাঁড়াল।

—সন্ন্যাসী ছেলে বললেন, 'বল! কি বলবে?'

'আমি এখানকার অতিথি মন্ত্রী। আপনাকে আজ এখানে থাকতে হবে 'আমাদের সংগে।'

—'তাই নাকি? তা মন্ত্রীর কথার অবাধ্য হই কি করে।'

একটি ছেলে এক গ্লাস সরবৎ নিয়ে এল। আর প্লেটে একটু ফল।

—স্বদেশবাবু হেসে বললেন, 'এই এখানকার নিয়ম। সমস্ত কিছুর ভার ছেলেমেয়েদের ওপর।'

—একটু পরে মেয়েটি এসে বলল, 'আপনার জিনিস পত্র দিন আপনার ঘরে নিয়ে যাই।'

—'জিনিসপত্র কিছু নেই ত!'

'সে কি? স্নান করবেন না?

—'স্নান করে বেরিয়েছি।'

—'তবে আপনার ঘরটা দেখে আসবেন চলুন।'

সন্ন্যাসী মেয়েটির সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চললেন।

—'তোমার নাম কি!'

'হাসা।'

—তা তোমার মন্ত্রিত্ব কদিনের জন্য?

'এই এক মাসের জন্য। তারপরে আবার ভোট হবে, ভোটে আবার নতুন মন্ত্রী হবে।'

হাসা তার অসংকোচ পদক্ষেপে, সাদা খদ্দরের শাড়ীতে অজস্র কালোচুলে একটি পরম প্রত্যহ নিয়ে এগিয়ে চলল।

'এই আপনার ঘর। এই বিছানা। এই দড়িটা টানলে কেউ না কেউ আসবে আপনার কাছে, আপনার কি দরকার জানতে।'

বাঃ সুন্দর ব্যবস্থা ত। তোমাদের সরকার দীর্ঘ জীবী হোক্। কিন্তু কত মন্ত্রী আছে তোমাদের?'

'অনেক মন্ত্রী, যেমন শিক্ষা মন্ত্রী, স্বাস্থ্য মন্ত্রী, হাসা মন্ত্রী, অনুষ্ঠান মন্ত্রী। স্কুলের সব বিভাগের ভার একজন মন্ত্রীর ওপর। চলুন এখন অধ্যাপকবাবুর ঘরে আপনাকে পৌঁছে দিই।'

হাসা সন্ন্যাসীকে নিয়ে স্বদেশবাবুর ঘরে এল।

স্কুলটির তিনদিক বাগান। সামনে দীঘির পাড়ে তরিতরকারীর ক্ষেত। স্বদেশবাবু সন্ন্যাসীকে নিয়ে বাইরে এলেন।

ছায়াচ্ছন্ন সকালের আলোয় সারা বেলিক স্কুলটি কেমন যেন নিঃস্তব্ধ বলে মনে হচ্ছিল।

একটু এগিয়ে এসে স্বদেশবাবু বললেন, 'এইটিই আমাদের প্রার্থনা ঘর। ওর সামনেই মন্দির।'

'কি দেবতা থাকেন?'

'না, কোন দেবতা থাকেন না। গান্ধীজী একবার এসেছিলেন এখানে। ঐ ঘরে একটি সন্ধ্যা ছিলেন। এই খানেই তিনি প্রার্থনান্তিক সভায় ভাষণ দিয়েছিলেন। সেই স্মৃতি শুধু এ ঘরের মধ্যে আছে। আর কোন দেবতা নেই।'

সন্ন্যাসী স্তব্ধ চক্ষে সেই ঘরের সম্মুখে একটু দাঁড়ালেন। যেন প্রাচীন অতীত থেকে তিনি শুনতে পেলেন কে একটি শীর্ণ মানুষ সম্মুখের দূরের আকাশের দিকে চোখ রেখে একটি দীর্ঘ শীর্ণ আঙুল প্রসারিত করে বলছেন "আই ডু নট কিয়ার ডেথ— বাট আই কিয়ার গড এলোন।" এই মন্দিরে তাঁরই পদচিহ্ন পড়েছিল। অন্য দেবতার প্রতিমূর্তি এখানে বসিয়ে রেখে লাভ কি?

স্বদেশবাবু বললেন, 'ঐ আমাদের প্রার্থনা হচ্ছে।'

সন্ন্যাসী দেখলেন, ছেলে মেয়েরা মেঝেতে মাদুর পেতে বসেছে। যিনি পড়াচ্ছেন তাঁর জন্য একটা শুধু একটা জলচৌকী আছে।

একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে বলল,—'নমস্কার। আপনি কি বলবেন?

সন্ন্যাসী স্বদেশবাবুর দিকে তাকালেন।

—'তোমাদের অসুবিধা হবে না?'

আপনার যা কিছু প্রিয়
সেগুলি বাঁচানোর জন্যই
আরও বেশী সঞ্চয় করুন।

—বাঃ অসুবিধা কেন?'

সন্ন্যাসী মাদুরের একধারে বসে পড়ান শুনতে লাগলেন। বাংলা পড়ান হচ্ছে।

একটি ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা সোমাদা, আমরা যে ভাষায় কথা বলছি; এই ভাষায় কত লোক কথা বলে?'

—'এই ভাষায় প্রায় সাড়ে সাত কোটি লোক কথা বলে। জানো? পৃথিবীতে মাতৃভাষা হিসেবে বাংলা সপ্তম স্থান অধিকার করে।'

একজন বলে উঠল, হলে প্রথম স্থান কোন ভাষার।

'চীনা ভাষার।'

ওধার থেকে একজন বলে উঠল, কেন, ইংরেজী ভাষায় পৃথিবীর বেশি লোক কথা বলে না?'

'না, ইংরেজী দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে।'

'তারপর?'

'রুশীয় ভাষা। আচ্ছা তোমরা বলতে পার? ভারতবর্ষে কোন ভাষায় বেশী লোকে কথা বলে?'

—সকলে বলে উঠল, 'হিন্দুস্থানী ভাষায়।'

—'তা' হলে এই ভাষাটা তোমাদের শিখতে ইচ্ছে করে না?'

—'আমরা বলিত, 'কাঁহা যাতা হ্যায়'' ইহার আও 'নাই হোগা'—এই'ত বলি আমরা।'

সোমাদা হেসে বললেন, 'না ওরকম বলা নয়। শুদ্ধ করে নির্ভুল করে বলতে হবে। আর শুদ্ধ করে বলতে হ'লে, পড়তে হবে!'

শেষের দিকের একটি মেয়ে বলে উঠল, 'আচ্ছা সোমাদা, এই আমরা যেমন করে কথা বলি, আমাদের সেই অনেক অনেক আগের লোকেরা এমনি করে কথা বলত?'

সোমাদা হাসলেন। বললেন, 'খুব ভাল কথা জিজ্ঞেস করছ ত? অনেক অনেক আগের লোকেরা বললেত ঠিক বোঝা যাবে না। আসলে ভাষাটা এইরূপ ছিল না। প্রথমে ছিল বৈদিক ভাষা।'

—'ওই যে আমরা খাবার সময়, প্রার্থনার সময়, যে মন্ত্র বলি। সেই ভাষা? না?'

হাঁ, প্রায় ওই ভাষা। ওই বৈদিক ভাষায় আর্যরা কথা বলতেন। আচ্ছা কে বলতে পার—আর্যরা কখন ভারতে এসেছিলেন।'

—একজন বলল, 'খৃস্টপূর্ব ১৪০০ অব্দে।'

সোমাদা বলে যেতে লাগলেন, 'আর্যদের আসবার পরে অনার্যদের সংগে যুদ্ধ হয়েছিল। অনার্যরা হেরে গেল। এই অনার্যদের সংগে মেশবার ফলে ওদের ভাষাটা নানাভাবে বিকৃত হয়ে উঠল। এই বিকৃত ভাষাকে ঠিক রাখবার জন্য অনেক নিয়ম কানুন তৈরী হল, ভাষার সংস্কার হ'ল। তখন তার নাম হল সংস্কৃত ভাষা। যে ভাষায় তোমরা মন্ত্র বল। সেই ভাষা নানা ভাবে বিশ্লিষ্ট হ'তে হ'তে প্রাকৃত হ'ল অর্থাৎ সাধারণ লোক যে ভাষায় কথা বলে। প্রাকৃত থেকে ভেঙে ভেঙে আদি বাংলা ভাষা গড়ে উঠল। তার অনেক পরে বৈষ্ণব সাহিত্যের যুগ এল। পদাবলীর কথা তোমরা শুনেছ?

—একজন বলল, 'সেই যে ভোরের সময় কীর্তনিয়ারা গান করে, রাই জাগ রাই জাগ শারী শুকে বলে—'

সকলে হেসে উঠল। একজন বলল, 'সোমাদা, হরি ভাই কীর্তন গায়।'

—'ও তুমি কীর্তন গাও। অনুষ্ঠান মন্ত্রীকে বলে দিও, ওর গান একদিন শুনব।'

—সন্ন্যাসী বললেন—'হাঃ সভাদের ব্যবস্থাতো আপনাদের।'

'আমাদের কোন বই নেই। এমনি পড়ান হয়। ওঁরা বেরিয়ে এলেন ক্লাশ থেকে।

সূর্যাস্তের পূর্বেই এই স্কুলের খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে যায়। তারপর সমবেত প্রার্থনা। প্রার্থনার পরে ছেলে মেয়েরা পড়াশোনা করে। প্রার্থনা সভায় সন্ন্যাসী ও স্বদেশবাবু এলেন। অনুষ্ঠান মন্ত্রী ওঁদের সাথে নিয়ে এল। মঞ্চটি স্থায়ী।

ঘরের আলোগুলো কমিয়ে রেখে, তাতে বই খাতা ঢাকা দেওয়া হয়েছে। সকলেই বসেছে নিঃশব্দে। তিনটা ঘন্টা পড়ল। সংগে সংগে সকলেই গীতার শ্লোক আবৃত্তি করতে লাগল স্থিতপ্রজ্ঞতার লক্ষণ বর্ণনাকারী

সেই মৃত্যুহীন শ্লোকগুলি অনুচ্চ শিশু কণ্ঠের সংগীতে সারা ঘর ভ'রে তুলেন। শ্লোক আবৃত্তির পর অধিক নিঃস্তব্ধতা। তারপর একটি ছেলে হারমোনিয়াম নিয়ে ধীরে ধীরে গাইতে আরম্ভ করল 'যদি তোমায় দেখা না পাই, প্রভু এবার এ জীবনে, তবে তোমায় আমি পাইনি যেন সে কথা রয় মনে।'

সন্ন্যাসী বিস্মিত হয়ে এই প্রার্থনা এই সংগীত শুনতে লাগলেন।

চারধারে রাত্রির প্রথম অন্ধকার জড়ো হয়েছে।

—আবার খানিক স্তব্ধতা।

—অনুষ্ঠান মন্ত্রী দাঁড়িয়ে বলল। আমাদের পরম সৌভাগ্য আজকের এই প্রার্থনা সভায় একজন সন্ন্যাসী এসেছেন। আমাদের ছাত্রজীবনে এই দিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমরা তাঁর মুখ থেকে কিছু শুনতে চাই।

—যুক্ত সন্ন্যাসী উঠে দাঁড়ালেন।

পরদিন সন্ধ্যায় সন্ন্যাসী ফিরে এলেন। সেদিন না আসার জন্য নমিতা, উমা, নন্দিতা অভিযোগ করল।

সন্ন্যাসী বললেন—'আমার কাজ ছিল। কাজ শেষ হয়ে গেছে ভোরেই চলে যাব আমি।'

—'ভোরেই চলে যাবেন? এখানে একদিনও খেলেন না কিন্তু, নন্দিতা বলল।'

—'যা পাই একটু খেয়েনি। খাওয়া নিয়ে ব্যস্ত হওয়া আমাদের ধর্মে বারণ আছে।'

—'কিন্তু আমরা গৃহী মানুষ। আমাদের যে খারাপ লাগে।'

—উমা বলল, 'ভোরে কখন যাবেন।'

—সূর্য ওঠার আগে।

সন্ন্যাসী প্রার্থনায় বসবেন। ওরা ঘর ছেড়ে চলে এল।

নন্দিতার ঘুম আসছে না। অনিদ্র রাত্রিতে সে কেবল বিচ্ছিন্ন ভাবে কি সব ভেবে চলেছে। সে কি কোন জন্মে এমনি সন্ন্যাসী ছিল, এমনি পথকে সঙ্গী করে চলে গেছে অজানা গ্রামে, নদী, বন পেরিয়ে কোনো সমুদ্রের উপকূলের উদ্দেশ্যে যেখানে জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, দুঃখ নাই সুখ নাই যেখানে নির্বানদীপ্ত আলোকে নতুন জগৎ উদ্ভাসিত।

কোন জন্মে সেকি ভিক্ষু ছিল? নারকেল সুপারী বীথি ঘেরা কোন গ্রামের নিঃশব্দ অপরাহ্নে সে কি চলে এসেছে সকল কান্নাকে পেছনে ফেলে রেখে? সে কি নিজের ছোট গৃহ পেরিয়ে পৃথিবীর বিরাট গৃহের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে, কোন জন্মে!

ভোর হয়ে আসছে। মরানদীর আর বাবলা বনের ওপরের আকাশটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। সন্ন্যাসী চলে যাবে। না, তাঁর যাবার সময় নন্দিতা সেখানে যাবে না। জীর্ণ বস্ত্রের মত, এই দু'দিনের ছোট ঘরটা, যে ঘরটা নন্দিতা নিজের হাতে সাজিয়ে ছিল গন্ধরাজ ফুল দিয়ে, তা পড়ে থাকবে একটা বিষাদের কান্না নিয়ে। নন্দিতা যাবে না সেখানে। এই আসন্ন রাত্রিশেষের প্রশান্তিতে সন্ন্যাসী চলে যাক।

কেউ ওঠেনি। তবু নন্দিতা নিঃশব্দে দরজাটা খুলে চুপিচুপি বারান্দায় এসে দাঁড়াল। দেখা গেল, ঐ সন্ন্যাসী চলে যাচ্ছেন মাথা নিচু করে উঁচু সোনা-মাটির পথটা দিয়ে। তখনো আলো ভোরে ওঠেনি, ছায়াচ্ছন্ন নির্জন পথে রাত্রির বিশ্রামগুলি বিছিয়ে আছে।

সন্ন্যাসী দেখতে দেখতে আরো দূরে চলে গেলেন। সেই হলদে রঙের উত্তরী আর দেখা যাচ্ছেনা পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেছেন তিনি। সন্ন্যাসীকে পেছন ফিরে তাকাতে নেই। তিনি তাকাননি। "যঃ সর্বত্র অনভিস্নেহঃ" কোথাও স্নেহ না, কোথাও মনকে বাঁধা পড়তে দিও না।

নন্দিতার চোখ ধীরে ধীরে আবছা হয়ে এল। সেই পথ, প্রান্তর আর প্রভাতের পূর্ব দিগন্ত, সে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। সব যেন এক ধূসর অন্ধকারের বেদনায় কখন ঢেকে গেছে।

নন্দিতা চমকে উঠল।

পার্টনার এসে তার পাশে দাঁড়িয়েছে।

—'তুই ঘরে চল নন্দিতা।'

আশ্চর্য! নন্দিতা দেখল, পার্টনারের চোখে কখন জলে ভরে এসেছে।

(ক্রমশঃ)

সাহিত্য ও শিল্পকলায় ভাবাদর্শের ভূমিকা

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্যিক নই সাংবাদিক। সাংবাদিকতায় রাজনৈতিক ভাবাদর্শের যে একটা স্থান আছে এটা স্বীকৃত। কিন্তু সাহিত্য ও শিল্পকলা সাধনায় কোনো রাজনৈতিক মতের প্রতি পক্ষপাতিত্ব নিয়ে বাকযুদ্ধ ও মসীযুদ্ধ চলে আসছে পৃথিবীতে পুঁজিবাদের অখণ্ড সাম্রাজ্য খণ্ডিত হবার দিনটি থেকে অর্থাৎ ১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর থেকে। অবশ্য মার্ক্স ও এঙ্গেলস্ সাহিত্য ও শিল্পকলা সম্পর্কে তাঁদের বস্তুবাদী বক্তব্যকে প্রয়োগসিদ্ধ করেন। তারপর স্তালিনীয় যুগে দেশে দেশে বলশেভিকবাদীরা মার্ক্স-লেনিনবাদের শিক্ষা অনুযায়ী সাহিত্য ও শিল্প-সৃষ্টি ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির পথ নির্দেশ করার অধিকার ও যৌক্তিকতা স্বীকার করে নেন এবং ভবিষ্যবাদ, স্বাভাবিকতাবাদ ইত্যাদি বাস্তবতাবাদ বিরোধী ধারাগুলি প্রত্যাখ্যান করেন। তবে কোনো ক্ষেত্রে মার্ক্সবাদী চিন্তাধারার প্রয়োগের মধ্যে গলদ যে হয়নি তা নয়, অতিপ্রচারও ঘটেছিল। যাইহোক স্তালিনোত্তর যুগে তাজা বাতাসে আগেকার কড়াকড়ি ও গোঁড়ামির সেরোগুলি আলগা হয়ে যেতেই কিছু কিছু সাহিত্যিক ও শিল্পী পুরাতন পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে ভাবাদর্শগত সংগ্রামের গুরুত্ব তুচ্ছ করে আওয়াজ তুলতে আরম্ভ করলেন যে শিল্প ও সাহিত্যে ষোল আনা ব্যক্তি-স্বাধীনতা চাই, কমিউনিস্ট পার্টি রাজনীতিতে নেতৃত্ব করুক কিন্তু শিল্প ও সাহিত্যের মৌকায় তার মাঝিগিরি বরদাস্ত করা আর সম্ভব নয়। সাহিত্য ও শিল্পকলার রাজ্যে স্তালিন-জ্দানভের যুগের মত পার্টির মোড়লী আজকের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের যুগের সঙ্গে বেমানান। স্রষ্টার নিজেদের রুচি মর্জি মত সৃষ্টি করার পূর্ণ অধিকার থাকবে। এই ধরণের কথাবার্তা বিশেষভাবে আসর জাঁকিয়ে বসেছে মিঃ ক্রুশ্চেভ সেদিনকার বক্তৃতার পর যেখানে তিনি বলেছেন ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চলবে না এবং কমিউনিস্ট সাহিত্যিক ও শিল্পীদের আজকের বিশ্বব্যাপী ভাবাদর্শের সংগ্রামে যোদ্ধা হিসেবে নামতে হবে নিরপেক্ষ দেশে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদকে জয়যুক্ত করার সেই জীবন মরণ সংগ্রাম থেকে দূরে থাকা আদর্শদ্রোহিতা ছাড়া আর কিছু নয়। সেই যুদ্ধে জয়ী হবার প্রধান রাস্তা হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা দেখানে পথনির্দেশ করবার দায়িত্ব কমিউনিস্ট পার্টির। মিঃ ক্রুশ্চেভের এই স্পষ্ট কথা শুনে কমিউনিস্ট পার্টির কিছু কিছু সাহিত্যিক ও শিল্পীর "পূর্ণ স্বাধীনতার" স্বপ্ন ভেঙ্গে গিয়েছে। তাঁরা বলেছেন সোভিয়েতের শিল্প ও সাহিত্যের ঘাড়ে আবার স্তালিন যুগের পাথর চাপানো হচ্ছে। তাঁরা রাজনীতিতে পার্টির ভূমিকা মানেন, সাহিত্য ও শিল্পকলায় মানেন না অথচ তাঁরা কমিউনিস্ট। কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী পার্টি। মার্ক্সবাদ কোনো অন্ধ বিশ্বাস নয় কিংবা মার্ক্সবাদ সমাজের কোনো একটি বিশেষ ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধভাবে প্রযোজ্য নয়। মার্ক্সবাদ সমাজের প্রত্যেকটি কর্ম-ক্ষেত্রে কাজ করার পথনির্দেশক। সাহিত্য ও শিল্পকলার ক্ষেত্র যখন সামাজিক কর্মক্ষেত্রের বাইরে নয় তখন মার্ক্সবাদ সেখানেও সমানভাবে প্রযোজ্য এক মার্ক্সবাদী পার্টি হিসেবে একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টিই সে ক্ষেত্রে পথ নির্দেশ করার অধিকারী। স্তালিনের আমলে সেই পথনির্দেশের ক্ষেত্রে কিছু কিছু অপপ্রয়োগ হয়ে থাকলে তার জন্যে মূলনীতিটি ভুল হবে কেন?

সাহিত্য ও শিল্পকলার সমাজে স্থান কোথায়? সাহিত্য ও শিল্পকলা হচ্ছে মানুষের সৃজনী শক্তির ও কল্পনা শক্তির এক সামাজিক পরিপ্রকাশ। মানব মনের মধ্যে অনুরাগের অনুসৃষ্টির রশিপাত করে সাহিত্য ও শিল্প বাস্তবকে গভীরতরভাবে ফুটিয়ে তোলে। শিল্প হচ্ছে জীবনেরই প্রতিচ্ছবি কিন্তু সে প্রতিচ্ছবি জীবনের শুধু দৃশ্যমান দিকটির নয়, দৃষ্টির অগোচর দিকটিও তার মধ্যে নিবিড়তর হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। যে শিল্পীর সৃষ্টির মধ্যে মানবাত্মার এই নিবিড়তর পরিচয় তিনিই হন দেশ ও কালজয়ী। এই কথাটিই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তাঁর আত্মপরিচয়ে। তিনি বলেছেন:

"দেশ যার মধ্যে আপন ভাষারূপ প্রকাশ অনুভব

করে তাকে সর্বজন সমক্ষে নিজের বলে চিহ্নিত করবার উপলক্ষ্য রচনা করতে চায়। যেদিন তাই করে, যেদিন কোন মানুষকে আনন্দের সঙ্গে অঙ্গীকার করে, সেদিনই মাটির কোল থেকে দেশের কোলে সেই মানুষের জন্ম।"

"সুন্দরের অন্তরে আছে একটি রসময় রহস্যময় আত্মত্বের অতীত সত্তা, আমাদের অন্তরেরই সঙ্গে তার অনির্বচনীয় সম্বন্ধ। তার সম্পর্কে আমাদের আত্ম-চেতনা হয় মধুর গভীর উপলব্ধি। আমাদের ভিতরের মানুষ বেড়ে ওঠে, বাড়িয়ে ওঠে, বসিয়ে ওঠে। আমাদের সত্তা যেন তার সঙ্গে রঙে, রসে মিলে যায়—একেই বলে অনুরাগ। কবির কাজ এই অনুরাগে মানুষের চেতনাকে উদ্দীপ্ত করা, ঔদাসীন্য থেকে উদ্বোধিত করা। সেই কবিকেই মানুষ বড় বলে যে এমন সকল বিষয়ে মানুষের চিত্তকে আকৃষ্ট করেছে যার মধ্যে নিত্যতা আছে, মহিমা আছে, মুক্তি আছে, যা ব্যাপক এবং গভীর। এই বিশাল ভুবনে বিশেষ দেশের মানুষ বিশেষ কাকে ভালবেসেছে তার সাহিত্য দেখলেই বুঝতে পারি। এই ভালোবাসার দ্বারাই তো মানুষকে বিচার করা।"

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথের মতে দেশ ও মানুষ, নিত্যতা ও মহিমা এদের নিয়ে শিল্প ও সাহিত্য।

এবার মার্কসবাদের বক্তব্য দেখা যাক।

মার্কসবাদের মতে শিল্প মানব চেতনার ও বুদ্ধি-বৃত্তির এক বিশেষ ধরনের পরিপ্রকাশ এক বিশেষ ধরনের উপলব্ধি, যার উদ্ভব ইতিহাসের কোলে, যার ক্রমবিকাশ কালের গতিধারায়। শিল্প ও সাহিত্যের কাঁচা উপাদান ও উপকরণগুলির একমাত্র উৎস হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতি। শিল্প ও সাহিত্যপটে প্রকৃতি ও মানব সমাজের যে সুনিবিড় প্রতিফলন হয় তার সার্থকতা তার সামাজিক ব্যবহারে, তার বাস্তব সত্যনিষ্ঠায়। লেনিন বলেছেন যে শিল্প যে জ্ঞান প্রতিফলিত করে তা "কোনো বস্তুনিষ্ঠ সত্যের প্রতিচ্ছবি হয়ে দাঁড়ালে তবেই তা মানুষের উপকারে আসে।" অনাগত কালে শিল্প সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এঙ্গেলস্ লিখেছেন যে সেই শিল্প হবে মহৎ আদর্শে উদ্বুদ্ধ, তার শৈলী হবে নিখুঁত, সেই শিল্পের মধ্যে মহামিলন হবে মহান ধ্যানধারণা ও ঐতিহাসিক চেতনার যেমন আমরা দেখি শেক্সপীয়ারের মধ্যে। কথাশিল্পের রাজ্যে এঙ্গেলস্-এর এই অভিমতকে প্রথম পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন গোর্কি।

শিল্পকলা যদি মানবচেতনা ও বুদ্ধিবৃত্তির পরিপ্রকাশ হয় তাহলে মার্কসবাদ অনুসারে শিল্পকলা হচ্ছে সমাজের বহির্গঠনের (Superstructure) অংশবিশেষ।

মানুষ বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদন করে জীবনধারণের জন্য। সেটাই তার বুনিয়াদী কাজ। ইতিহাসের যুগ বিশেষে মানুষের বৈষয়িক—উৎপাদনগত সম্পর্কই তখন-কার সমাজের ভিত্তি বা বুনিয়াদ যার উপর গড়ে ওঠে যার বহির্গঠন সেই ভিত্তির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে। উঠতি বুনিয়াদ মানুষের চেতনার ভিতর দিয়ে গজায় না কিন্তু বহির্গঠন গজায়। মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন অর্থনৈতিক সম্পর্ককে বলছেন সমাজের নির্ধারক ভিত্তি এবং ভাবাদর্শীয় সম্পর্ককে বলছেন সেই ভিত্তিরই প্রতি-ফলন যার উৎপত্তি সেই ভিত্তি থেকেই। তার মানে, সামাজিক সত্তা হচ্ছে সামাজিক চেতনার নির্ধারক। আরো তার মানে, ভিত্তি বদল হলে বহির্গঠনও বদল হবে। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার জায়গায় সমাজবাদী উৎপাদনব্যবস্থা কায়েম হলে পুঁজিবাদী ভাবাদর্শগত বহির্গঠনের জায়গায় সমাজবাদী ভাবাদর্শগত বহির্গঠন এসে বসবে।

শিল্প ও সাহিত্য, বহির্গঠনের সৌন্দর্যবুদ্ধিগত অংগ হিসেবে অর্থনৈতিক ভিত্তির বাস্তব চরিত্রকে রূপায়িত করে। তার মানে সমাজের অর্থনৈতিক ও উৎপাদিকা ব্যবস্থাকে বাস্তবভাবে প্রতিফলিত করার মধ্যেই তার সার্থকতা। ইতিহাসের কোন একটি অধ্যায়ে সমাজের বহির্গঠনের কোনো অংশের পক্ষে তখনকার অর্থনৈতিক ভিত্তি ও বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে নিরপেক্ষ বা নির্লিপ্ত থাকা সম্ভব নয়। ভাবাদর্শ ইতিহাসের এক প্রচণ্ড শক্তিশালী হাতিয়ার। অরাজীর্ণ ও ক্ষয়িষ্ণু শাসকশ্রেণী সেই হাতিয়ার ব্যবহার করে পুরাতন অর্থনৈতিক ভিত্তিকে যতদিন সাধ্য টিকিয়ে রাখার জন্য কিন্তু সেই হাতিয়ার প্রগতিশীল শক্তির হাতেই আবার পুরানো ভিত্তি ভেঙ্গে নতুন ভিত্তি গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে। পচনশীল পুঁজিবাদী শাসকশ্রেণী আজ তাদের পত্রপত্রিকায়, বিদ্যুৎবাদ, আকারবাদ, অস্পষ্টতাবাদ

ইত্যাদির মারফৎ যে ভাবাদর্শের প্রচার চালায় তার কারণ রয়েছে এইখানে। শ্রেণীসংঘাতক্ষুব্ধ সমাজে বন্ধনমুক্তির রাজ্যে তথাকথিত "স্বাধীন" লেখক ও শিল্পীরা মোটেই নিরপেক্ষ নন। স্বাধীনতার নামে আসলে তাঁরা পুরানো অর্থনৈতিক ভিত্তিকে ঠেকা দিয়ে খাড়া রাখতে সাহায্য করেন মাত্র। তাঁদের গজদন্তমিনারীর নিরপেক্ষতার নেহাৎ আহম্মক ছাড়া কেউ ভুলবে না।

১৯০৫ সালে সামন্তযুগীয় সেন্সর ব্যবস্থা, রাজনৈতিক দলীয়তা-সম্ভাতাদুলভ তথাকথিত "সংবাদপত্রের স্বাধীনতা" এবং বুর্জোয়া নৈরাজ্যবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে লেনিন "পার্টি সংগঠন ও পার্টি সাহিত্য" সম্পর্কে এক প্রবন্ধে শিল্পে রাজনৈতিক দলীয়তা সমর্থন করেন এবং আত্মমুখী স্বেচ্ছাচারিতা ও বস্তুনিষ্ঠ উদাসীনতার তীব্র সমালোচনা করেন। সেই দলীয়তার তাৎপর্য এইখানে যে সত্য ও জনগণের সেবক হিসাবে শিল্পীর পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে কিন্তু শোষকশ্রেণীর সেবা করার স্বাধীনতা থাকবে না, সেই দলীয়তার অর্থ মানুষের মুক্তিসংগ্রামকে সেবা করার মহান ঐতিহ্যবাহী বিস্মৃতীকৃত কালজয়ী শিল্প ও সাহিত্যের উত্তরসাধক হবার পূর্ণ স্বাধীনতা। শিল্প-সাহিত্যক্ষেত্রে পার্টির পথনির্দেশক ভূমিকার চমৎকার উদাহরণ আমরা লেনিনের কাজের মধ্যে পেয়েছি। কি করে এবং কোথায় বাস্তব সত্যের সন্ধান করতে হবে, কি করে সামগ্রিক ভুল ধারণা ভাঙতে হবে সে বিষয়ে তিনি গোর্কি লেনিনগ্রাদ বেদনি ও মায়াকভস্কিকে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেন।

শিল্পসৃষ্টির পূর্ণ স্বাধীনতার উপাসকরা শিল্পে দলীয়তার বিরুদ্ধে খাড়া করেন প্রতিভাকে। প্রতিভাকে কেউ তুচ্ছ করে না, লেনিনও করেননি। লেনিন লিখছেন ঃ "প্রতিভা জিনিসটা দুর্লভ। প্রতিভাকে নিশ্চয়ই আদর করতে হবে, সমর্থন করতে হবে। কিন্তু শুধু প্রতিভাই যে একমাত্র জরুরী নয়, সেই প্রতিভার গতি কোন দিকে সেটাও জরুরী। এঙ্গেলস বলছেন : "এই লেখকের বা ঐ লেখকের কিছু প্রতিভা আছে তাতে সাহিত্যের কি আসে যায় যদি তার সাহিত্যের কোক, তার সাহিত্যচিত্রায়ণের সামগ্রিকভাবে কোনো মূল্য না থাকে।" গোর্কি স্বয়ং শিল্পীর এই তথাকথিত স্বাধীনতার বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন : "একটা সীমারেখার পার হলে স্বাধীনতা যখন যথেচ্ছাচারে দাঁড়ায় সেই স্বাধীনতার আমি বিরোধী। কোন মানুষ যখন নিজের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যের কথা খেয়াল না করে পাশ্চিমের বাঁধা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ভাবভঙ্গী নিয়ে আস্ফালন করে বলে : "আমি এমন একজন মৌলিক গুণসম্পন্ন অনন্য সুন্দরীয় লোক হওয়া সত্ত্বেও আমার উচ্চেশ্রেণীর লোকে চলতে দেয় না। তখনই স্বাধীনতা হয় যথেচ্ছাচারের নামান্তর।" তারপর সোভিয়েত লেখক সম্মেলনে গোর্কি দ্বিধাহীনকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে কমিউনিস্ট পার্টির সত্যাদর্শই সোভিয়েত লেখকদের কাছে একমাত্র সত্য।

আধুনিকতাবাদীরা সাহিত্য ও শিল্পক্ষেত্রে "নতুন কিছু" উদ্ভাবন করে অমর হতে চান তা সেই "নতুন কিছু যতই কিম্ভূতকিমাকার হোক। তাঁদের কেউ কেউ মনে করেন যে টলস্টয়, পুশকিন, ডিকেন্সের ঐতিহ্যের উত্তরসাধন করা রক্ষণশীলতামাত্র। এই প্রাচীন ঐতিহ্য-যা সেকালের মানুষ ও সমাজের জীবন্ত ছবি এঁকে কালে কালে মানুষকে উচ্চাদর্শের জন্য সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েছে—বর্জন করে জেমস জয়েস, প্রাউস্ট প্রমুখ লেখকদের আত্মনিষ্ঠ চিন্তাধারার মোহমুগ্ধ হয়ে যাচ্ছেন। বাস্তবতাবাদীরা সমাজের স্বরূপ বোঝবার চেষ্টা করেন, আধুনিকতাবাদী সমাজ থেকে পালিয়ে বাঁচতে চান অন্তর্মুখ কিছু উদ্ভাবনের আড়ালে। কিন্তু লেনিন এই নতুনের পূজারীদের ঠাট্টা করে বলেছেন : "আরম্ভ করার সময় যা সুন্দর তা পুরাতন হলেও তাই থেকেই আরম্ভ করতে হবে। নতুনকে দেবতা বানিয়ে শুধু নতুন বলেই তাকে গ্রহণ করব কেন? এতো আহাম্মকী, আগাগোড়া আহাম্মকী। অভিব্যক্তিবাদ ভবিষ্যবাদ, ও ঐ ধরণের অন্যান্য যত বাদ আছে সেগুলিকে আমি শিল্পপ্রতিভার পরাকাষ্ঠা বলে মানতে পারি না। সেগুলি আমি বুঝিও না, সেগুলির মধ্যে কোনো আনন্দও খুঁজে পাই না।"

এই কারণে লেনিন বিপ্লবের ঠিক পরে যে "সর্বহারা সংস্কৃতি" বা "প্রোলেটকাল্ট" আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল তার বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন গোর্কি'র "মা" বা

মায়াকভস্কির "দি লং লিটাস" আঙ্গিকের দিক থেকে চিরাচরিত ঐতিহ্য মেনেই লেখা। কিন্তু লেনিনের কাছে এই লেখাটির মূল্য ছিল অসাধারণ। কারণ জীবনের নিয়মাবলী প্রতিফলিত হয়েছিল সেগুলির মধ্যে। তথাকথিত উদ্ভাবকরা প্রধানত নিজেদের অভ্যন্তরীণ ধারণা প্রতিফলিত করবেন এবং দ্বিতীয়টি দুনিয়াটাকে কোনো নিয়মের অতীত হিসেবে বর্ণনা করে মানুষকে অসহায় বোধ করতে সাহায্য করেন। আমাদের রবীন্দ্রনাথও এই ধরণের তথাকথিত নতুনের সমর্থন করেননি। "আত্মপরিচয়ে তিনি লিখেছেন :

"এখন ওকে (অর্থাৎ গ্রন্থকে) বাস্ত লোকেরা ধমক দিয়ে বলে, রেখে দাও তোমার সুন্দর। সুন্দর পুরানো, সুন্দর দেকেলে। আনো একটা যেমন তেমন করে পাক দেওয়া পদের পঙ্ক্তি—সেটাকে বলব বিয়ালিজম—স্বপ্নায়ু ফ্যাশন হঠাৎ-নবাবের মত উদ্ধত—তার প্রধান অহংকার এই যে সে অধুনাতন, অর্থাৎ তার বড়াই গুণ নিয়ে নয়, কাল নিয়ে।.....

"কবি যদি হাল মনে এমন কথা মনে করে যে কবিত্বের চিরকালের বিষয়গুলি আধুনিক কালে পুরানো হয়ে গেছে তাহলে বুঝব আধুনিক কালটাই হয়েছে বৃদ্ধ ও রসহীন। চিরপরিচিত জগতে তার সহজ অনুরাগ রস পৌঁছচ্ছে না, তাই জগৎটাকে আপনার মধ্যে নিতে পারল না।.....রসনায় যার রুচি মরেছে, চিরদিনের অন্নে সে তৃপ্তি পায় না, সেই একই কারণে কোনো একটা আজগুবি অন্নেও সে চিরদিন রস পাবে এমন সম্ভাবনা নেই।"

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে কবির মত জগৎটাকে যিনি আপনার মধ্যে অনুভব করতে পারেন, চিরকালের বিষয়গুলি যিনি চির নতুনভাবে গ্রহণ করতে পারেন তিনিই শিল্পি। শিল্প বাস্তবতার সার কথা এইখানে। কিন্তু চিরপুরাতন সত্যকে চির নতুন আঙ্গিক ও উপকরণের দ্বারা প্রকাশ করতে হবে রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্র নাথ হতেন না যদি তিনি শুধু চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি প্রমুখ কালজয়ী কবির প্রতিবিম্ব হতেন। ভারতের চিরকালের ঐতিহ্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট মেলাতে পেরেছিলেন বলেই তিনি অনন্যতা লাভ করেছেন। পাথরের ওপর বীজ ফেললে অংকুর গজায় না যদি সেই পাথরে মাটি না থাকে। শতাব্দী সঞ্চিত মাটিতের উর্বর ভূমির বুকেই নতুন বীজের অংকুরোদ্গম হয়। ঐতিহ্য ছাড়া কোন সাহিত্য বা শিল্প সৃষ্টি হতে পারে না। আধুনিকতাবাদী যে কোনো প্রতিভার জন্ম দেবার তার প্রয়াসের অভাব নেই। মায়াকভস্কি গোড়ার দিকে যখন ভবিষ্যবাদী ছিলেন সে সময় তিনি উল্লেখযোগ্য কিছুই সৃষ্টি করতে পারেননি পেরেছেন যখন তিনি সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার পথ গ্রহণ করেছেন। সেই রকম লুই আরাগঁর যখন সুরিয়া-লিস্টিতার মোহভঙ্গ হল তখনই তার কর্মক্ষেত্রের পরিধি বিস্তৃত হল কারণ মার্কসবাদ শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাপক ও বস্তুনিষ্ঠ করে তোলে। আলেকসি টলস্টয় যখন সম্রাট পিটারের যুগের মালমশলা সংগ্রহ করছিলেন তখন অগাধ পড়াশুনা করেও সে যুগের তাৎপর্য ধরতে পারেননি। কিন্তু যখনই তিনি মার্কসবাদের দৃষ্টি নিয়ে সেই যুগের গভীরে প্রবেশ করলেন তখনই তাঁর সামনে ইতিহাসের নিয়মাবলীর প্রধান ধারাগুলি ধরা পড়ল। কিন্তু তাই বলে একথা কি কেউ বলতে পারেন যে, আলেকসি টলস্টয় বা মায়াকভস্কির সৃষ্টির মধ্যে শিল্পী হিসাবে তাঁদের পূর্ণ স্বাধীনতা ও অনন্যতার পরিচয় নেই ?

শিল্পের বিকাশ ও ব্যবহার শ্রেণীসংঘাতসম্পন্ন সমাজে নির্ভর করে সেই সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তির স্তর ও অবস্থার ওপর, শাসকশ্রেণীর রীতিনীতির ওপর। পচনশীল সমাজের পক্ষেই ভিতরের পচ ঢাকবার জন্য আঙ্গিক প্রধান হয়ববরল শিল্প সৃষ্টি করা সম্ভব, ভুয়ো স্বাধীনতার হাতুতাশ দিয়ে শোষিত মানবের হাহাকার ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করা সম্ভব। কিন্তু বিজ্ঞানের মত শিল্পের ক্ষেত্রেও মূলনীতিগুলির মধ্যে এমন কিছু বস্তুনিষ্ঠ সত্য আছে যা অর্থনৈতিক ভিত্তির রদবদলের সঙ্গে বদলে যায়না। সেই শাশ্বত সত্যগুলি ঊদীয়মান নবীন সমাজব্যবস্থার স্বার্থে ব্যবহার করা দরকার। রামায়ণ মহাভারতের মত মহাকাব্য বা কোনার্ক মন্দিরের মত কালজয়ী ভাস্কর্য যে মনুষ্যত্বের উদারতম আদর্শের ধারক ও বাহকরূপে সমাজের বিভিন্ন অর্থ-

নৈতিক ভিত্তির ভাঙন শুরু হয়ে যুগে যুগে টলস্টয়, পুশকিন, রবীন্দ্রনাথ ও রোলা, রেপিন, পিকাসো ও নন্দলাল বীথোফেন, চাইকোভস্কি ও চোপিনের মত শিল্পীদের মানবসেবাকর্মী শিল্পসৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত করেছে, ভবিষ্যতেও করবে। এরেনবুর্গ বা ইভ্যান্ত-শেংকো, দুদিনতসেফ বা বুল্গাকভের বদলে সেখানে কোনদিন স্থান হবে না। স্থান হবেনা কারণ বাস্তব জীবনের মানুষের দুঃখসুখ আশাআকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তাদের সৃষ্টির কোন যোগ নেই, বালজাকের "হিউম্যান কমিডি" মধ্যে এপেলদ্ ফ্রান্সের ইতিহাসকে যেমন জীবন্তভাবে দেখতে পেয়েছিলেন এরেনবুর্গের "থ"এর মধ্যে বা দুদিনতসেফের "মটরাই ব্রেড আন্দোলনের" মধ্যে সাম্যবাদী সমাজনির্মাতা সোভিয়েত সমাজের সেই জীবন্ত চিত্র নেই। গোর্কি বলেছেন, "প্রকৃত শিল্পের সবসময়েই লোকশিল্পের সঙ্গে যোগ থাকে, সে শিল্প জনগণের কাছ থেকে প্রেরণা লাভ করে।..... ইস্কিলাস সেভ্যান্তে বাগেটের বহু পূর্বেই জনমনের কল্পনাপটে প্রমিথিয়ুস, ডন কুইসোটও কাউন্ট জীবন্ত ছিলেন.....কোন বিরাট প্রতিভাই এমন কিছু সৃষ্টি করতে পারেননি যার ভিত্তি জনগণের সৃজনমূলক আয়াসপ্রয়াসের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।

বাঁদরের হাতে তুলি দিলে সে কাগজে নানারকমের পোঁচ দেবে, যেন ছবি আঁকছে। কিন্তু সেই দাগগুলি পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে তার সেই ছবি আঁকার সঙ্গে তার বাহুর পেশী ও গ্রন্থিগুলির গঠনের সঙ্গে তথাকথিত আধুনিকতাবাদী, ভবিষ্যবাদী, ও অস্পষ্টতা-বাদীদের সৃষ্টিগুলি অনেকটা সেইরকম। শরীরবিজ্ঞানী পাভলফ সেগুলিকে "মানুষের সাধারণ বুদ্ধির পক্ষে অপমানসূচক" বলে বর্ণনা করেন কারণ সেগুলি স্রষ্টার মনের ট্যারা চোখের ও অহংগত অনুভূতির ফল, বাস্তবের সঙ্গে তাদের কোনই সম্পর্ক নেই। প্রকৃতশিল্পী কখনই তাঁর অহংগত অনুভূতির দাস হতে পারেন না। যিনি পরিদৃশ্যমানের অন্তর্নিহিত বস্তুনিষ্ঠ সত্য দেখতে পান, যিনি প্রাথমিক ভাবাবেগের স্তর ভেদ করে বাস্তবের অন্তরঙ্গ হতে পারেন প্রকৃত শিল্পী তিনিই। এই অন্তর্দৃষ্টি না থাকলে তার সৃষ্টি স্বাভাবিকতাবাদের সীমারেখা পার হয়ে যেতে পারে না বলে ফটোগ্রাফধর্মী হয়ে পড়ে। স্বাভাবিকতাবাদীর কাছ থেকে মানুষ কোন সার বস্তু লাভ করতে পারে না, মনের কোন খোরাক পায় না, জীবনের কোন সত্য উপলব্ধি করতে পারে না। জীবন থেকে যা বিচ্ছিন্ন তার মধ্যে সৌন্দর্য কিছু নেই। সমাজের বাস্তব জীবনই মানুষের চেতনা নির্ধারিত করে তার মস্তিষ্ক ও ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। প্রকৃত শিল্প সেই চেতনারই প্রতিফলন। কোন আধিভৌতিক প্রেরণা (অহংগত অনুভূতিমাত্র) কখনই কোন কালজয়ী শিল্প সৃষ্টি করতে পারে না।

সামাজিক চেতনা বস্তুনিষ্ঠ হলে যে শিল্প সৃষ্টি করবে তা হচ্ছে অর্থনৈতিক ভিত্তি বিশেষের বহি-র্গঠনের একটি অঙ্গ। সুতরাং সেই বহির্গঠনের মধ্যে সমাজের অর্থনৈতিক চরিত্র ও উৎপাদন সম্পর্ক প্রতি-ফলিত হবেই এবং সেক্ষেত্রে বহির্গঠন কখনই ভিত্তি সম্পর্কে উদাসীন বা নিরপেক্ষ হতে পারে না ঠিক যেমন বিজ্ঞানও বাস্তব অবস্থার প্রতিভূ হিসেবে নিরপেক্ষ হতে পারে না। এইখানে বিজ্ঞান ও শিল্পকলার অন্তর্নিহিত শাশ্বত সত্যের মধ্যে একটা আত্মীয়তা আছে। উভয়ক্ষেত্রেই বিভিন্ন মতবাদের মৃত্যু হয় অর্থ-নৈতিক ভিত্তির পতনের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু শাশ্বত সত্য মৃত্যুঞ্জয় হয়ে থাকে। তাছাড়া বিজ্ঞান ও শিল্প-কলার মাঝখানে কোন চীনের প্রাচীর নেই। তারা পরস্পরের সহযোগী। কোনার্কের সূর্যমন্দিরের শিলা-নির্মিত রথচক্রের দিকে তাকালে দেখা যায় সেই অপূর্ব ভাস্কর্য আতিথ্যকর্ত্রী হিসেবে কিভাবে বিজ্ঞানকে সমাদরে এনে বসিয়েছে নিজের বসবাসে, কিভাবে কারীগরের ভাবাবেগের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে গিয়েছে তার নির্মাণনৈপুণ্য, কিভাবে শিল্পের মিলন ঘটেছে বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের সঙ্গে, মিলন হয়েছে দৃশ্যের সঙ্গে অদৃশ্যের, পূর্বাভাসের সঙ্গে উপলব্ধির! কোনার্ক সূর্যমন্দিরের স্রষ্টারাও বাস্তব জগতকে উপলব্ধি করেছিলেন, আজকের ভবিষ্যবাদী, আণ্বিক-প্রাধান্যবাদী, দৃষ্টিবিলাসী ইত্যাদি গোষ্ঠীর স্রষ্টারাও তাঁদের "স্বাধীন" সৃষ্টি দিয়ে জগৎ উপলব্ধি করেন।

কিন্তু এই দুই ধরনের উপলব্ধির মধ্যে কোথাও কোন মিলনক্ষেত্র নেই। তবে হাঁ "স্বাধীনতা" অবশ্যই আছে তাঁদের, যে স্বাধীনতা জগৎটাকে বিকৃত দৃষ্টি দিয়ে দেখবার স্বাধীনতা, পুঁজিবাদীদের জরাজীর্ণ দেহের বিকৃত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি নিয়ে কাব্য ও কলা সৃষ্টির স্বাধীনতা, জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা সাধ ও সাধনা এবং মানুষের অন্তর্লোকের উপেক্ষা করে কিম্ভূতকিমাকার জিনিস সৃষ্টি করার স্বাধীনতা সেই স্বাধীনতা পুঁজিবাদের রাজ্যে শোষিত জনগণের শ্রেণী চেতনাকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করে শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে তাদের শ্রেণী সংগ্রামকে দুর্বল করে।

"প্রত্যেকটি জাতীয় সংস্কৃতির মধ্যে দুটি করে জাতীয় সংস্কৃতি আছে।" একটি প্রগতিবিরোধী অন্যটি প্রগতিশীল। আমাদের দেশে প্রগতিবিরোধী সংস্কৃতির ধারক ও বাহক বিদ্যাসাগরের আমলের ভূদেবচন্দ্র তর্কবাগীশ থেকে আরম্ভ করে আজকের দিনের বুদ্ধদেব বসু প্রভৃতি এক কারাকা প্রমুখ "সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা সংস্থার" ও সমগোত্রীয় সংগঠনগুলির পুরোধারা। আর প্রগতিশীল সংস্কৃতির ধারক ও উত্তরসাধক চণ্ডীদাস, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, প্রেমচাঁদ, বিবেকানন্দ, সুকান্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পীর প্রগতিশীল শিল্পকে প্রতিক্রিয়াশীল শিল্পের বিরুদ্ধে পদে পদে সংগ্রাম করতেই হবে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শোষকশ্রেণীর অত্যাচার সম্পর্কে নিরপেক্ষ থাকার অধিকার কারো নেই। শোষক শ্রেণীর ভাবাদর্শ যা আজ চরম সংকটে পড়ে ফ্যাসীবাদের আশ্রয় নিয়ে শোষকরাজ কায়েম রাখার চেষ্টা করছে তার সম্পর্কে উদাসীন থাকা বা তাকে প্রেমের বাণী শোনাবার কোন যৌক্তিকতা নেই। ব্রিটিশ কবি উইলিয়াম ব্লেক লিখছেন।

He who loves his enemies hates his frend
This is surely not what Jesus intends.

শিল্পীর পূর্ণ স্বাধীনতা আছে আঙ্গিকের মধ্যে নিজের ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলবার। শিল্পের পরিপ্রকাশ ফুলের মত বিচিত্র ও বিভিন্ন রূপে হবে। প্রত্যেক শিল্পীর হাতের লেখায় স্বাতন্ত্র্য থাকবে' স্বাতন্ত্র্য থাকবে শৈলীর মধ্যে। সোভিয়েতের প্রথম যুগে গোর্কি একবার লেনিনকে বলেছিলেন যে সোভিয়েতের শিল্পীদের শৈলী একরকম হওয়া দরকার যার মধ্যে সারবস্তু হবে বীরত্ব। লেনিন জবাব দিলেন : "না শুধু বীরত্ব নয়, লালিত্যও চাই, চেখভের মত লালিত্যের সঙ্গে জীবন সত্যের যোগসাধন চাই। মারাভস্কি একবার বলেছিলেন "আঙ্গিক হবে স্বতন্ত্র কিন্তু মক হবে এক।"

তাই বলে সমস্ত শিল্পীর কাজ কি একই মানদণ্ড দিয়ে বিচার হবে? কখনই না। মানব মস্তিষ্কের সীমাহীন চিন্তাসম্পদ হাজারো রকমের আঙ্গিকের মাধ্যমে বাস্তব সত্যকে প্রতিফলিত করবে এবং যিনি সেই সত্য তাঁর নিজস্ব অনন্য ঢঙে প্রতিফলিত করবেন তাঁর পক্ষে সমাজ ও মানুষের আচরণের নিয়মাবলী আরত্ত করা আবশ্যিক।

শিল্পীর রচনা শৈলীর সার্থকতার মূল পূর্বশর্ত হচ্ছে প্রথমত তাঁর শিল্পে বাস্তব দুনিয়া সম্পর্কে জ্ঞান ও চেতনার প্রতিফলন দ্বিতীয়ত তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ ও প্রতিভা এবং তৃতীয়ত শতাব্দী—সহস্রাব্দীর শিল্পসৃষ্টির ঐতিহ্যের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে তাঁর নিজস্ব নতুন আঙ্গিক আবিষ্কার। এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে রয়েছে এক অচ্ছেদ্য দার্শনিক একতা। সেই একতার বিভেদ ঘটালে, যে কোনো একটিকে অত্যধিক প্রাধান্য দিলে শিল্পের সার্থকতা ক্ষুণ্ন না হয়ে পারে না।

কেউ কেউ তর্ক তোলেন যে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসম্পন্ন সাহিত্য বা শিল্প নিরস হয় কারণ সেগুলি হুকুকাটা রাস্তায় চলে। একথা কেউ অস্বীকার করেন না যে রাজনৈতিক উপন্যাস বিশেষ রসোত্তীর্ণ হয় না বা চিত্রবিশেষ কটোগ্রাফধর্মী হতে পারে। কিন্তু এই দোষটা কি অবশ্যম্ভাবী? যদি অবশ্যম্ভাবীই হত তাহলে গোর্কির, "মা", রবীন্দ্রনাথের "গোরা", শরৎচন্দ্রের "পথের দাবী" কিংবা প্রেমচাঁদের "গোদান" এত রসোত্তীর্ণ হয়েছে কি করে? রাজনীতি কি একটা সৃষ্টি ছাড়া ব্যাপার? মানব সমাজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই রাজনীতির উৎপত্তি। জীবন ও রাজনীতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে। প্রকৃত শিল্পী সেই দুটিকে সাবলিলভাবে যুক্ত করতে পারেন। সে জন্যে তাঁকে শুধু কলকারখানায় বা গ্রামে গিয়ে কিছুদিন কাটিয়ে এলেই হবে না গোটাকতক রঙ্গার [illegible]

লিখে এলেই হয়ে যা কারণ সারবস্তু সেগুলির মধ্যে নেই। সারবস্তু হচ্ছে জীবন্ত মানুষ এবং তাদের জীবনের মধ্যে।

সোভিয়েত সাহিত্যের বর্তমান যুগে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা কারো কারো মতে বাকি নেতিবাচক। উদাহরণস্বরূপ তাঁরা "দ", "নট বাই ব্রেড অ্যালোন" ইত্যাদি বই-এর নাম করেন। কিন্তু এই সব বই-এর লেখক সোভিয়েত সংস্কৃতির কর্ণধার নন। গোর্কি, শোলোখভ, ফেদিন, শোলেভভ, এঁরাই হচ্ছেন প্রকৃত প্রগতিশীল বাস্তবতার পুরোধা। প্রাক্‌যুদ্ধকালীন সোভিয়েত সমাজের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলিকেই প্রধান বিষয়বস্তু হিসেবে নিয়ে যাঁরা শিল্প সাহিত্য রচনা করেন তাঁরা প্রকৃত বাস্তবকে প্রতিফলিত করেন না। তাঁরা গোটা স্তালিন নেতৃত্বের যুগকে তুলনা করতে চান "ইভান দেনিসভিচের জীবনের একটি দিনের" অন্ধকারের সঙ্গে। কিন্তু ভুলে যান যে সেই একই সময়ে লেখা হয়েছিল শোলোখভের "তাজিন সয়েল অপটার্নড্" এবং শোলেভভের "স্টোরি অফ এ রিয়েল ম্যান।" সোভিয়েতের মানুষ সাময়িক বাধা অসুবিধাকে বড় করে দেখেনা সেগুলিকে পরাজিত করে জীবনকে জয়যুক্ত করে। সেই বিজয় সংগ্রামের অধ্যায়ে সাময়িক অবিচার তাদের হতাশ করতে পারেনা। আলোককে জয়যুক্ত করবে এই তাদের পণ।

মার্কসবাদ হচ্ছে সেই শ্রমিক শ্রেণীর বিশ্ব দর্শন ইতিহাস যাকে দায়িত্ব দিয়েছে পুঁজিবাদের শোষণের ভিত্তি ধ্বংস করে সেখানে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা তাই লেনিনের ভাষায় বলতে গেলে "মার্কসবাদী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির ইস্পাত গলিয়ে সেই দৃষ্টিভঙ্গির উপযুক্ত বহিসংগঠন গড়ে তোলা।" পুরোধা বিপ্লবী শ্রেণী হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীকেই সজ্ঞানে পুরাণো ভাবাদর্শরূপ বহিসংগঠন ধ্বংস করে সেই নতুন বহিসংগঠন নির্মাণ করতে হবে যার উপাদানগুলি পুরাণোর গর্ভেই ভ্রূণ হয়ে জন্মগ্রহণ করে। এই মহান কর্তব্য পালন করার ক্ষমতা বা যোগ্যতা মার্কসবাদী পার্টি অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া আর কারো নেই। কমিউনিস্ট পার্টি কখনো আকস্মিক কোন উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে সামাজিক বিকাশের নিয়মাবলীর দ্বারা পরিচালিত হয় সঙ্গে একমাত্র সেই শিল্প-সাহিত্যের প্রগতিশীল ধারা নির্ধারণ করতে সক্ষম।

যে শিল্প মানুষের সেবায় নিযুক্ত হতে চায় তাকে স্থান ও কালবিশেষের পটভূমিতে সেই সময়কার সমাজের সংঘাতগুলির সারবস্তু পরিস্ফুট হয়ে ওঠা চাই। পুঁজিবাদের রাজ্যে প্রগতিশীল স্রষ্টার কর্তব্য শুধু মানুষের দুঃখকষ্ট ঘাত-প্রতিঘাত বর্ণনা করা নয়, সঙ্গে সঙ্গে যে সব নতুন মৌলিক উপাদান একত্রিত হয়ে সেই সমাজের পতন ঘটাবে সেগুলিও তুলে ধরা তাঁর অপরিহার্য কর্তব্য। সেই দায়িত্ব অবহেলা করে যাঁরা পুঁজিবাদী শাসকগোষ্ঠীর "শিল্পীর স্বাধীনতার" বুলির প্রতিধ্বনি করেন তাঁদের জন্য বার্নার্ডশ-এর কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করে বলব :

"ওরা তোমার ঘাড়ে দায় চাপিয়ে তার নাম দেয় স্বাধীনতা। ভল্টেয়ার রুসো, টমপেন, মার্কস, লাসেল বা লেনিনের মত লেখকেরা যখনই প্রতিবাদ করেন তখনই তোমায় শেখানো হয় যে তাঁরা সব নিরীশ্বরবাদী, বর্বরতা-দুরাত্মা ইত্যাদি। এই সব বিদ্রোহীর অনুগামী কোথাও বিপ্লব করলেই ইংল্যাণ্ড তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বিপ্লবীদের আবার দাসব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে বাধ্য করার জন্য। ওয়াটারলুতে যখন এই নীতি সফল হোল তখন সেই যুদ্ধে জয়লাভকে প্রচার করা হোল ব্রিটিশ স্বাধীনতার জয়বার্তা হিসেবে। আর ব্রিটিশ মজুরীর দাসেরা এই ব্যাপারে লর্ড বায়রনের মত দুঃখ প্রকাশ করা দূরে থাক, সবাই মিলে বেশ উৎসাহের সঙ্গে বাহবা দিতে লাগল কিন্তু যে ক্রীতদাসেরা এই ব্যাপারে সম্রাটকে বাহবা দিল তারা ব্যালট পেপারে একটা "ক্রস" এঁকে দিতে পেরে ভাববে তারা স্বাধীন। যতদিন আমরা এইভাবে ভোট নিয়ে সন্তুষ্ট থাকব ততদিন আমরা পরস্পরকে শেক্‌সপীয়ারের ইয়াগোরতে পরামর্শ দিয়ে বলতে পারি : ভবিষ্যতে টাকা রাখ। কিন্তু আমরা যখন বেতনের তারিখে আমাদের ভবিষ্যতে সামান্যই টাকা রাখতে পারি এবং সপ্তাহের অন্য দিনগুলিতে অন্যেরা সেই ব্যাগ থেকে আমার টাকা হাতিয়ে নেয় তখন ইয়াগোর পরামর্শও বিশেষ কাজে লাগেনা সুতরাং আমাদের স্বাধীনতা নিয়ে গর্ব্যাজানো শোভা পায় না।"

রাত্রির কালো অন্ধকারটা যখন ছিঁড়ে ছিঁড়ে মাটিতে ঝুলে পড়ে। আকাশের গায়ে যখন অস্পষ্ট আলোর ছোঁয়া লাগে : ঠিক তখনই শিশির ভেজা ঘাসের উপরে বিস্তৃত প্রান্তরের একপাশে চুপি চুপি এসে দাঁড়ায় একটি মেয়ে। তারপর ত্বরিতপায়ে হেঁটে চলে যায় প্রান্তরের দক্ষিণ প্রান্তে ভাঙ্গা মন্দিরের পাশে নিস্তব্ধ অশথের কাছাকাছি। তার একটু পরে শ্রীরাম-

পুরের পথের বাঁকে ভেসে ওঠে একটি পুরুষ ছায়া। ধীরে ধীরে উষার আলোকে চলমান ছায়াটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তারপর দ্রুত পায়ে এসে দাঁড়ায় সেই সাংকেতিক অশথের ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকারে।

এমনি হয়। প্রতিদিন ঠিক এমনি সময়ে মিলিত হয় একজোড়া যৌবন।—বর্ষীয়সীর কবি—"দ্বিধ

পুরুষ রূপরাম" আর একটি মেয়ে যার নামটুকু পর্যন্ত হারিয়ে গেছে কালের অতল গর্ভে।—সে আজ কল্পনাথ—কল্পনাবতী।

কল্পনাবতী আর রূপরাম।

আজ থেকে আড়াইশো বছর আগের সে এক জীবন্ত ইতিহাস। যার মন নরম অশথের মত রঙীন সাদৃশ্যে লুপ্ত দুটি পাতা—রূপরাম আর কল্পনাবতী।

—বলিষ্ঠ জীবনবোধে অতিক্রান্ত একজোড়া প্রেমিক-হৃদয়ের উদ্দাম বাসনা কামনার সে এক বিচিত্র কাহিনী। ভোরের আকাশে আজো অপসৃয়মান পুঞ্জ পুঞ্জ তারকার পাশে শুকতারা ওঠে! যেন সে আজো চেয়ে থাকে মাটীর বুকে একজোড়া পদধ্বনির আশায়।

যেন প্রত্যক্ষ বাসনার উত্তপ্ত এক জোড়া অভিসারধন্য আকুলতার বেলাভূমিকে।

কিন্তু, না। আজ আর সে কাহিনীর কোনো অভিজ্ঞান টিকে নেই বর্ধমানের সবুজ মাটীর আস্তরণে।

সব সুরে সুরে শেষ হয়ে গেছে কবে।

প্রতিজ্ঞা আর প্রতীক্ষা—সফলতা আর সংগ্রামকে বুকে নিয়ে সেই বিশাল অশথ গাছটাও আজ আর পাতা কাঁপায় না। জীবন্ত ভালবাসার উত্তপ্ত উত্তাপে কোন বসন্তে আর তার শাখায় শাখায় কচুরাজের সমারোহ দেখা যায় না। আড়াইশো বছর পূর্বের স্মৃতির সুরভীকে বুকে নিয়ে আজ আর সে দাঁড়িয়ে নেই পৃথিবীর কঠিন মাটিতে।

তথাপি স্মৃতির মাটিতে সে আজও অমর। কলঙ্কী রূপরামের কবিকৃতি হতে কলঙ্কিনী কল্পনাবতী যেমন হারিয়ে গিয়েও বেঁচে আছে, তেমনি বেঁচে আছে সেই অশথ গাছটি।

আজ হয়ত সেই স্মৃতিধন্য মাটিতে স্বচ্ছন্দ বিচরণের সময় তাদের কোন উত্তর-পুরুষের চোখে ভেসে ওঠে একজোড়া মুখ। —না। মুখোমুখি একজোড়া জীবন। জীবন আর যৌবনের অভ্রভেদী প্রেম তৃষ্ণা যেন উভয়ের মদিরারুণের অমৃত নিবেকে উভয়কে ডুবিয়ে ভাসিয়ে নদী হয়ে ওঠে।……তথাপি সে কাহিনী সহজলভ্য নয়। আর পাঁচটা কিংবদন্তীর মত একাহিনী ছড়িয়ে পড়েনি দিক হতে দিগন্তরে। ছড়িয়ে পড়েনি কাব্যে সাহিত্যে ইতিহাসে।—কেন? কবি রূপরাম কি লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন এ কাহিনীকে?

—হ্যাঁ, তাইই। রূপরামের ধর্মমঙ্গলের পাতা খুললে প্রথমেই চোখে পড়বে এক সুদীর্ঘ আত্ম-কাহিনী।—না। আত্মকাহিনী নয়, আত্মবিলাপের সকরুণ আর্তি। কিন্তু কি আশ্চর্য! সেখানে কল্পনাবতী নেই। ছায়া আছে কায়া নেই। নক্ষত্র আছে আকাশ নেই।—আশ্চর্যইতো।

অনেক ব্যথা বেদনার অশ্রুসজল কাহিনী লিখে রেখেছেন কবি রূপরাম। শ্রীরামপুরের কথা। কল্পনাবতীর কথা। দুরোদর হীরা আর সোনার কথা। সব আছে। শুধু নেই সেই ভিনগাঁয়ের মেয়েটির কথা, তাকে বাদ দিয়ে রূপরামকে কল্পনা করা যায় না। যে তার জীবনের সিন্ধি। যেন মাণিকজোড়ের মাণিক। নদীর জল, কুলের যেমন মন—তেমনি। তবু কেন তাঁকে কাব্যের আধারে স্পষ্ট করে তোলেননি কবি রূপরাম?—হয়ত পৃথিবীর সমস্ত কিছু থেকে তাঁকে সরিয়ে নিয়ে শুধু একান্ত করে নিজের বুকে গোপনে একটি চাঁই করে দিয়েছিলেন চুপি চুপি। তাইত দেখি অনেক ঘটনার বিক্ষিপ্ত ছবি ছন্দবদ্ধ হয়ে আশ্রয় পেয়েছে তার কাব্যে। অনেক মুহূর্ত মুখর তার আত্মপরিচিতির অধ্যায়ে। কিন্তু রহস্য সমাচ্ছন্ন প্রেমিক কবি নীরব থেকেছেন সেই দিনগুলির কথায়।—যে দিনগুলি তার জীবনের অনন্য দিন। যে মুহূর্তগুলি একটি সুস্মিত কাহিনীর এক একটি পত্রাঙ্ক।

সে এক কাহিনী।

শ্রীরামপুর হতে পায়ে হেঁটে পাঁচড়া গ্রামের রঘুনাথ ভট্টাচার্যের টোলে পড়তে যেতো যুবক রূপরাম। শেষরাত্রে ঘুম থেকে ওঠে ঘরের কাজকর্ম সেরে দাদা রত্নেশ্বর ওঠার আগেই বার হয়ে যেতো পুঁথিপত্র নিয়ে। প্রতিদিন ঠিক এমনি নিয়মেই চলছিল তার অধ্যয়ন। তারপর কখন, কেমন করে যে সেই ভিনজাতের মেয়েটির সঙ্গে তার জীবন জড়িয়ে পড়লো —সে কথা ইতিহাস বলতে পারে না। ইতিহাস বলে, সেই হাড্ডিপ কন্যার জন্য একদিন রূপরামকে ছাড়তে হয়েছিল, ঘর বাড়ী আত্মীয় স্বজন যার জাতকুল পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হয়েছিল তাকে।—না ব্রাহ্মণ ত্যাগ করেননি রূপরাম। চিরশুচি রূপরামকে পেঁড়ো ব্রাহ্মণ সমাজ পতিত করলেও তিনি ব্রাহ্মণই ছিলেন। পতিত ব্রাহ্মণ।—আজ যাঁরা হাড্ডিপ জাতির যাজন করেন কিংবদন্তী বলে তাঁরা সেই প্রেমিক রূপরামের বংশধর।

মেয়েটি ছিল পাশের গ্রামের এক গরীব কিষাণের। শ্রীরামপুর পার হয়ে এখন যে জায়গাটা সবুজ শস্যক্ষেত্র সেখানে ছিল একটি ছোট গ্রাম। আর সেই গ্রামের পাশে ছিল এক বিরাট ডাঙ্গা। ডাঙ্গার কোল ঘেঁষে এক ভাঙ্গা মন্দিরের সামনে ছিল সেই অশথ গাছটি।

—যেখানে এসে অপেক্ষা করতো নাম না জানা একটি যৌবনী মেয়ে।—যার চোখের গহন অন্ধকারের অতলে পাহাড় হয়ে থাকতো অভিসারের আকুতি।

ছুটে আসত রূপরাম। ভোরের কাকুলি ফুটে উঠবার আগেই ফুটে উঠতো তাদের নিবিড়তর কূজন। তারপর মেঘের আয়নায় যেন সূর্যের ছায়া স্পষ্ট হয়ে উঠতো তখন চুপি চুপি সরে আসতো অপরের তল থেকে।

—কিন্তু এ অভিসার গোপন থাকল না।—একদিন প্রকাশ হয়ে পড়ল সব। আরম্ভ হল কবি রূপরামের জীবনের আর এক অধ্যায়। সমাজের কাছে চরমভাবে লাঞ্ছিত হয়ে—রঘুনাথের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন একদিন। কিন্তু না, সেখানে আশ্রয় মিললো না—মিললো কটাক্ষ আর ব্যঙ্গ। রঘুনাথ জানালেন—"তুমি ব্যাভিচারি—অধ্যয়নের অধিকার নেই তোমার। প্রজ্ঞা থেকে উদ্ভূত সাহিত্য—জীবনের প্রতীক—তাকে তুমি স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারবে না।"

—"কেন"?

—তর্ক করোনা। এই নিয়ম। তুমি শূদ্রসুলভ ব্যবহার করেছ। তোমার কাছ কবি—পাঠ নয়।

চরমভাবে আহত হল রূপরাম। আর মনের অভ্যন্তরে তখনি যেন এক আশ্চর্য শপথ কথা কয়ে উঠল —"না পাঠ নয়—সৃষ্টি করবো আমি। সৃষ্টি—নয় সৃজনই হবে আমার অনাগত জীবনের ব্রত।"

ফিরে এল রূপরাম।

সন্ধ্যার আকাশে তখন অসংখ্য তারার ঝিলিমিলি মাটির গায়ে অন্ধকারের প্রলেপ।

—কে?

—আমি রূপ।

—তুমি?

—হ্যাঁ।.....পাষণ্ডা থেকে আসছি।

—দাঁড়াও।—সামনে এসে দাঁড়িয়েছে দাদা রত্নেশ্বর।

অবাক চোখে তাকায় রূপরাম। রত্নেশ্বর বলে—এখানে তোমার ঠাঁই নেই। তুমি বংশের কলঙ্ক। জাতিভ্রষ্ট তুমি। তোমাকে ঘরে ঠাঁই দিয়ে পতিত হতে পারবো না। খুশি চলে যেতে পারো তুমি।

পা থেকে মাটি খসলো। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন চলো। কিন্তু মনে থেকে এক চুলও নড়লো না। ধীরে ধীরে রাত্রির অন্ধকারে আকাশের তলে এসে দাঁড়াল রূপরাম। মনের সঙ্কল্পকে দৃঢ় করে এক ছাদিম ছায়ার বসে অপেক্ষা করতে লাগলো ভোরের জন্য।

একটি সান্ত্বনার ঘটনা।

যে ঘটনার ফলশ্রুতিতে রূপরাম চক্রবর্তী—"কবি রূপরামে" রূপান্তরিত হয়েছিল একদিন।

রূপরামের বুকে মাথা রেখে শুয়েছিল কল্পনাবতী। সুনিবিড় রোমাঞ্চে উচ্ছ্বসিত হচ্ছিল একজোড়া যৌবন।

—কি দেখছো রূপ?

—তোমাকে।—সবুজ ঘাসের উপর উঠে বসল রূপরাম। হাত দিয়ে টেনে নিল কল্পনাবতীকে। নির্বাক মনের গভীর উপলব্ধিতে ওরা জীবনের অর্থ খুঁজে পেল।

রূপের বুকে উপত্যকার ঢল। আরো···আরো নিবিড়ভাবে টেনে নিল কল্পনাবতীকে। চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়ে দিল অভিসারিকা কল্পনাবতীর আকুলিত ওষ্ঠ জোড়াকে।

—একি করলে রূপ! আবেশের তীব্র দ্যুতিতে একটা প্রচণ্ড ভয়ের ছায়া কাঁপে।—বলে, এ কি করলে তুমি!

—কি? শিথিল কবরীতে হাত রাখে রূপ। বলে কী—কী করলাম?

—তুমি যে ব্রাহ্মণ!

নিঃশব্দে হাসে রূপ। হাসিতে কথা বলে যেন। মনের কথা। যৌবনের কথা।

কথা বলতে পারে না কল্পনাবতী। শুধু রূপের বুকে মাথা রেখে ভোরের অস্পষ্ট মেঘের দিকে চেয়ে থাকে। আবেশের রোমাঞ্চে দু'চোখ জলে ভরে ওঠে তার।

এর পরে আমি কি করে বাঁচবো রূপ?—বলতে গিয়েও বলতে পারে না। শুধু দুরু দুরু দুরু বুকের

অতলে একটি ভীষণ নারীকণ্ঠ মাতাল হয়ে ওঠে নীরবে।

আর ঠিক সেই সময় সামনে এসে দাঁড়ায় মশলা সর্দার। রুদ্র কর্কশ স্বরে চীৎকার করে ওঠে—"কলঙ্কিনী কল্পনাবতী।" জীবনের এক রোমাঞ্চিত সন্ধিক্ষণ মুহূর্তে বজ্রপতন হয় যেন। চমকে ওঠে কল্পনাবতী। গুনছেঁড়া ধনুকের মত ছিটকে সরে যায় রূপরাম। পৃথিবীর সব রঙ নিমেষে হারিয়ে যায় মশলা সর্দারের রক্ত চক্ষুর ভয়ালতায়। পাথর হয়ে যায় কল্পনাবতী।

মশালের রাঙা আলোতে দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলে ছিল বিচার সভাটা। সন্ধ্যাবেলায় গ্রামের সবাই ভীড় করেছে মশলা সর্দারের উঠানে। একটা চরম কিছু ঘটবার অপেক্ষায় বিদ্যুতিয়াসের গহ্বরের মত গর্‌ গর্‌ করছে সভাটা।

এক পাশে চুপ করে বসে আছে কুমারী কল্পনাবতী। তার চোখে মুখে দারুণ উৎকণ্ঠা।

—তোমার অপরাধ পঞ্চায়েতের কাছে স্বীকার করে কৃত পাপের শাস্তির জন্য প্রস্তুত হও কলংকিনী। মশলা সর্দারের কণ্ঠে আদেশের কর্কশ ব্যঞ্জনা।

মুহূর্তে গুঞ্জনরত সভাটা উৎসুক হয়ে উঠে—স্তব্ধ হয়ে যায়। কান পাতে উত্তরের দিকে।

চোখ তুলে তাকায় কল্পনাবতী। মনের সমস্ত উৎকণ্ঠা আর ভয়কে জয় করে উঠে দাঁড়ায়। তার কৃষ্ণকাজল চোখের গহনতায় ভরাট হয়ে ওঠে পাষাণের নীরবতা। তীক্ষ্ণ অথচ স্পষ্ট বলে—আমি নিরপরাধিনী। আমি নিষ্পাপ।

—নিষ্পাপ! গর্জন করে ওঠে মশলা সর্দার। নিষ্পাপ তুমি? কলংকিনী!—কাল তুমি উধাও হবে। অন্ধকারে রূপেঠাকুরের বুকে লুটিয়ে ছিলে না?

—ছিলাম। তবু আমি নিষ্পাপ।

—না তুমি পাপিষ্ঠা। তুমি ভ্রষ্টা।—ভ্রষ্টা—কলংকিনীর যে শাস্তি, তাই তোমাকে নিতে হবে।

—না। আমি কলংকিনী নই। আমি বাকদত্তা।...

হো হো করে হেসে ওঠে পঞ্চায়েত। সর্দার বলে, প্রমাণ দিতে পারবে তুমি?

উত্তর দিতে পারে না কল্পনাবতী। ভাবে, ঠিক এই মুহূর্তে যদি রূপরাম ছুটে এসে তার হাত ধরে

সুন্দর ও দীর্ঘস্থায়ী লেখায়

রেনবো

ফাউন্টেনপেন কালি

তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় ● সাবলীল গতিতে কালি নামে

রেনবো ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিমিটেড

২।২এ, আর্মেনিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

বলে—"ওঠে এস কল্পনাবতী"...কিন্তু রূপরাম আসেনা। পরক্ষণেই চিন্তার বর্ণালী মোহজাল ছিঁড়ে যান যান হয়ে যায় মশলা সর্দারের কথায়।

তবু চমকে ওঠে না কল্পনাবতী। চমকে ওঠার মত কোন অনুভূতিই আর নেই তার মানসিকতায়। পাথরের মত নিথর হয়ে বসে থাকে মাটির দিকে চেয়ে।

—"কাল প্রভাতেই গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে তোমাকে।" পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে মশলা সর্দার।

সভার গুঞ্জন কমে আসে। বিচারের এই চিরাচরিত নিয়মে চমকে ওঠেনা কেউ। তারা জানে, কাল সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কলংকিনীর চিকন অঙ্গে প্রযায়ত উত্তপ্ত লৌহ শলা দিয়ে এঁকে দেওয়া হবে কলংকের স্থায়ী চিহ্ন। তারপর নাগরা আর মাদল বাজিয়ে খেদিয়ে খেদিয়ে নিয়ে যাবে গ্রামের বাইরে। সেখানে তাকে ঘিরে তারা বীভৎস পৈশাচিক উল্লাসে নাচবে। তারপর স্নান করে রাস্তার উপরে একটি করে কাঁটা বিঁধিয়ে দিয়ে চলে যাবে। দূরে বহুদূরে—সবীনালা খাল বিল পার হয়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাবে দিকচক্রবালে ঢাকা কোন এক নাম না জানা গ্রামের উপান্তে। আর ফিরবে না। না, কোনো দিন ও না।

সেই দিন শেষ রাত্রে।

পলাতকা কল্পনাবতী শেষ বারের মত এসে দাঁড়ালো সেই সাংকেতিক অশ্বত্থের ছায়ায়। রহস্য ঘন রাত্রির যৌনতায় তার উষ্ণ নিঃশ্বাস প্রেতের মত ভয়াল হয়ে উঠেছে তখন। অন্ধকার। সেই অন্ধকারে পথ হাতড়ে হাতড়ে ভাঙ্গা মন্দিরের পাশে এসে দাঁড়ালো কল্পনাবতী। সমস্ত কিছুকে ত্যাগ করে চলে যাবার আগে তার সাধের স্মৃতিঘন ছলনাকে একবার অন্তর্দাহ করে যেতে চায় সে।

চোখ তুলে তাকালো কল্পনাবতী। শ্রীরামপুরের দিঘি পথের দিকে নিষ্পলকে চেয়ে রইলো অনেকক্ষণ। না, কেউ নেই। শুধু বাতাসের সঙ্গে একটা হাহাকার রাত্রির অন্ধকারে থর থর করে কাঁপছে।

সেই কালগোলা অন্ধকারের গভীরে নিজেকে ঢেকে হেঁটে চললো কল্পনাবতী। গ্রামের পর গ্রাম পার হয়ে নীরবে এগিয়ে চললো সে। ক্রমে, আরো অনেক—অনেক দূরে যেতে হবে তাকে। অ-নে-ক দূরে। যেখানে কেউ তাকে চিনবে না। কেউ জানবে না তার পরাজয়ের কাহিনী। সেখানে ধিক্কার আর ব্যঙ্গের কশাঘাত রক্তাক্ত করবে না তার পোড়া মনের শান্তিকে।

চলতে চলতে ভাবছিল কল্পনাবতী। ভাবছিল, এত বড় ছল প্রণয়ের চাতুর্যকে কি করে এতকাল বিশ্বাস করে এসেছে সে? মিথ্যা! সব মিথ্যা।

চলতে চলতে এক সময় এই বিশাল পৃথিবীর মনো হারিয়ে গেল একটি আহত যৌবন।

কল্পনাবতী চলে যাওয়ার অনেক পরে, উষার আবছা অন্ধকারে সেই সাংকেতিক অশ্বত্থের তলে এসে দাঁড়ালো একটি পুরুষ ছায়া।

রাত্রির অন্ধকারেই ছুটে এসেছে রূপরাম। চির দিনের মত ঘর বাঁধবার স্বপ্ন নিয়ে ছুটে এসেছে সে।

প্রতীক্ষাকুল চোখে গ্রামের দিকে উদগ্রীব হয়ে চেয়ে থাকে রূপরাম। প্রতীক্ষা করে একটি নিশ্চিত পদধ্বনির। কিন্তু অন্য দিনের মত দূরে, বহু দূরে কোনো অঞ্চল-পট সংকেতে মুখর হয়ে ওঠে না আজ। অন্ধকার ক্রমে অপসৃত হয়ে যায় পৃথিবীর বুক থেকে। চঞ্চল হয়ে ওঠে রূপরাম। বারবার চোখের দৃষ্টিকে স্থির করে দেখতে চেষ্টা করে। সেই আবছায়ায় বুক চিরে তীক্ষ্ণ ব্যাকুল দৃষ্টি বার বার আছাড় খায় গ্রামের উপান্তে।

না, কেউ নেই। নিস্তব্ধ। যেন সারা পৃথিবীটা এক কোড়া প্রেমিক প্রেমিকার বুক ফাটা আর্তনাদে মূর্ছা গেছে চির দিনের জন্য।

একি!

হঠাৎ পিছনে চোখ পড়ে রূপরামের।

সবুজ ঘাসের উপর পড়ে আছে কয়েকটি রজনীগন্ধা। বিগত উষায় কল্পনাবতীর কবরীতে পরিয়ে দিয়েছিল সে।

অভিসারমুগ্ধ সেই অর্ধশুষ্ক ফুলগুলির কাছে আস্তে আস্তে এসে দাঁড়ালো রূপরাম। তারপর পরম মমতায় একটি একটি করে সযত্নে কুড়িয়ে নিতে লাগলো গন্ধহারা বিবর্ণ ফুল গুলিকে।

আলোচনা

শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে

গত সপ্তাহে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির যে পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন হয়ে গেছে, তাতে কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সম্পাদক সিওনিদ ইলিচেফ পার্টির মতাদর্শগত ও তত্ত্বগত কর্মকাণ্ড সম্পর্কে এক বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্টে তিনি বলেন: বর্তমান অবস্থায় পার্টির আদর্শগত কাজের প্রকৃতি ও দিক নির্ধারিত হচ্ছে এই দুটি প্রধান উপাদান দিয়ে: (১) আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সর্বাত্মক কমিউনিস্ট গঠনকার্য; পার্টির তত্ত্বগত ও সাংগঠনিক কাজের ব্যাপকতর পরিপ্রেক্ষিত; মানুষের মন থেকে পুরাতন মূল্যবোধের জেরগুলির বিলুপ্তি-সাধন; নতুন মানুষের শিক্ষা; এবং (২) বাহিরের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুকূল আন্তর্জাতিক শক্তি-গুলির পারস্পরিক সম্পর্কের মূলগত পরিবর্তন; সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার আরও সংহতি ও উন্নয়ন; শ্রমিক আন্দোলনের ও জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের প্রসার; দুই সমাজব্যবস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত গুরুত্ব-সম্পন্ন পর্ব: বুর্জোয়া ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

ইলিচেফ বলেন, মতাদর্শের ক্ষেত্রে গত দশ বছরে কতকগুলি বড়ো সাফল্য অর্জিত হয়েছে। পৃথিবীতে শ্রেণী-শক্তিগুলির অবস্থান ও বিন্যাস যথেষ্ট পরিমাণে পরিবর্তিত হয়েছে। তত্ত্বগত ও প্রয়োগ সংক্রান্ত যেসব প্রশ্ন আগে ওঠেনি কিংবা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মূল-গ্রন্থগুলিতে যেগুলির রূপরেখা মাত্র ছিল, সেইসব প্রশ্নের সৃজনশীল সমাধান বর্তমানের নতুন অবস্থায় সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি সাফল্যের সঙ্গেই করছে।

ইলিচেফ এই কথাটির ওপরে বিশেষ জোর দেন যে বর্তমান অবস্থায় যুদ্ধ ও শান্তির সমস্যার সৃজনশীল সমা-ধান হল মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্ব ও প্রয়োগের এক অমূল্য অবদান। কমিউনিজম আর শান্তি যে অবিভাজ্য, এই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে দেশে দেশে মানুষের মনে। সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে সর্বাধিক গুরুত্বসম্পন্ন একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হল শান্তির জন্য সংগ্রাম। ইলিচেফ বলেন—ইতিমধ্যেই, যেমন তত্ত্বক্ষেত্রে, তেমনি কার্যক্ষেত্রেও, প্রমাণিত হয়ে গেছে যে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী আন্দোলন আর জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সমস্যাবলীকে শান্তির জন্যে সংগ্রাম থেকে হাইড্রোজেন-বোমার বিস্ফোরণ রোধ করবার প্রশ্ন থেকে পৃথক করে দেখা যায় না।

ইলিচেফের এই রিপোর্টের উপরে আলোচনায় কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বহু বিশিষ্ট সোভিয়েত শিল্পী, লেখক, বিজ্ঞানী ও সংস্কৃতিকর্মী যোগদান করেন।

শিল্পী ভ্রাদিমির সেরফ

অগ্রণণ্য সোভিয়েত চিত্রকর ভ্রাদিমির সেরফ বলেন, জনসাধারণের কাছে, সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের মধ্যে ভাবাদর্শগত সংগ্রামে সাহিত্যের ও শিল্পের কর্মীদের বিরাট দায়িত্ব আছে। সোভিয়েত শিল্পীরা সর্বদাই

তাঁদের সৃষ্টির ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার পথ বেছে নিয়েছেন কারণ তাঁরা সর্বদাই জনজীবনের অংশীদার হিসেবে রয়েছেন, তাঁদের রচনার মধ্যে দিয়ে গণশক্তিকে, সমাজজীবনের অন্তর্নিহিত ক্রিয়া-বিক্রিয়াকে তুলে ধরেছেন। অগ্রগণ্য সোভিয়েত শিল্পীদের আঁকা বহু চিত্র সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার পদ্ধতির শক্তির প্রমাণ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের কিছুসংখ্যক শিল্পী ও শিল্প-সমালোচক ভাবাদর্শহীন কর্মসর্বস্ব শিল্পের টোপ গিলে বিভিন্ন ভাবাদর্শের সহ-অবস্থানের তত্ত্ব প্রচারের চেষ্টা করছেন। সোভিয়েত জনগণ কখনই এটা মেনে নেবে না। সোভিয়েত শিল্প-সাহিত্যের আরও প্রগতি সাধনের দিকে পার্টি যে কতোদূর মনোযোগী, তার প্রমাণ হিসাবে সেরফ পার্টি ও গভর্নমেন্ট নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সোভিয়েত সাংস্কৃতিক কর্মীদের সাম্প্রতিক আলোচনা-বৈঠকগুলির কথা উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন যে সোভিয়েত শিল্পে পার্টি-আদর্শের লেনিনীয় নীতিটি সম্প্রতি-অনুষ্ঠিত সোভিয়েত শিল্পী-দের দ্বিতীয় কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলিতে প্রকাশ পেয়েছে।

পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে সেরফ জানান যে আগামী বছরে সোভিয়েত শিল্পীরা অনেকগুলি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করবেন। মস্কো ফেডারেশনে দশটি আঞ্চলিক চিত্র-প্রদর্শনীর প্রস্তুতি চলেছে। "সোভিয়েত রাশিয়া" নামক দ্বিতীয় প্রদর্শনীটি হবে দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সোভিয়েত সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ৫০তম বার্ষিকী ও লেনিনের জন্ম-শতবার্ষিকী পালনের জন্যেও সোভিয়েত শিল্পীরা তৈরি হচ্ছেন।

গীতাকার তিখন খ্রেনিকফ

কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বিশিষ্ট সোভিয়েত গীতিকার তিখন খ্রেনিকফ বলেন: আমাদের সংগীত-সম্পদের ভাণ্ডারে এমন বহু রচনা আছে যাতে মূর্ত হয়েছে সোভিয়েত জনসাধারণের বীরত্বপূর্ণ ইতিহাস। লেনিনের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত শোস্তাকোভিচের স্বাদশ সিমফনি, মায়াকোভস্কির রচনার খ্রিনিকফ-কৃত সুরারোপ, মাতৃ-ভূমিরক্ষার সংগ্রামে শহীদদের উদ্দেশ্যে রচিত কাবালেভ-

স্থির সংগীত পৃথিবীজুড়ে জনপ্রিয় হয়েছে। সোভিয়েত জনগণের গৌরবোজ্জ্বল কীর্তিকাহিনী নিয়ে, কমিউনিস্ট সমাজ গড়ে তোলার জন্যে তাদের বিপুল কর্মকাণ্ড নিয়ে, রচিত হচ্ছে গীতিনাট্য প্রযোজনার আয়োজনে ব্যস্ত আছে সোভিয়েত রঙ্গমঞ্চগুলি।

ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড সংগ্রাম চালানোর কথা আমরা কখনই ভুলে থাকি না। সংগীতে কর্মকৌশলিক বিকৃতি, আদিমতাবাদ ও মামুলির পুনরাবৃত্তির বিরুদ্ধে আমরা সর্বদাই আমাদের সর্বশক্তিকে নিয়োগ করেছি।

যেহেতু জনসাধারণের নন্দনতাত্ত্বিক শিক্ষার বিরাট ভূমিকার ওপরে গুরুত্ব আরোপ করে খ্রেশিকফ বলেন যে কমিউনিস্ট সমাজে মানুষকে সুসমঞ্জস রূপে বিকশিত করে তোলার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল এই নন্দনতাত্ত্বিক শিক্ষা। রুশ ফেডারেশনে স্কুলের ছেলেমেয়েদের মধ্যে সাংগীতিক-নন্দনতাত্ত্বিক শিক্ষার ওপরে যে তেমন জোর দেওয়া হচ্ছে না তার জন্যে তিনি শিক্ষা-মন্ত্রণালয়ের সমালোচনা করেন। রাষ্ট্রীয় সংগীত প্রকাশালয় এই প্রথম সংগীতের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করতে সুরু করেছেন; কিন্তু শিক্ষা-মন্ত্রণালয় এখনও মনে করেন যে এই ধরনের বই প্রকাশ প্রয়োজনাতিরিক্ত। এদিক থেকে এস্তোনিয়ার উদাহরণ প্রশংসাযোগ্য। সেখানকার ইস্কুলগুলিতে সংগীত-নন্দনতত্ত্বের শিক্ষার ওপরে অনেকদিন থেকেই বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে এবং তার ফলে এস্তোনিয়া আজ হয়ে উঠেছে গানের দেশ। কমিউনিজমের দিকে জনগণ যতো এগিয়ে যাবে, শিক্ষা-সাহিত্য-সংগীতের দিকে তাদের আগ্রহ ও তৃষ্ণা ততোই বাড়বে। কিন্তু জনগণের ভাবাদর্শগত শিক্ষার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা এ সম্পর্কে সচেতন নন বলে মনে হয়। ক্লাব ও সংস্কৃতি-ভবনগুলিতে কোনো কোনো কর্মকর্তা উচ্চাঙ্গ সংগীতের চেয়ে হালকা গান ও নাচ পছন্দ করেন বেশি।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের সমস্ত কর্মীদের নিয়ে সৃজনশীল বুদ্ধিজীবীদের একটি একক ইউনিয়ন গড়ার যে প্রস্তাব উঠেছে, খ্রেশিকফ তা সমর্থন করেন, "এই ধরনের একটি সৃষ্টিশীল ফেডারেশন দেশের জীবনের মঞ্চে শিল্পীদের সংযোগকে শক্তিশালী করবে, আমাদের এই অতি-উল্লেখযোগ্য কালের উপযোগী নতুন নতুন সৃষ্টির অনুকূল হবে।"

বিজ্ঞানী মস্তিস্লাভ কেল্‌দিশ

নিখিল সোভিয়েত বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি ও বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী মস্তিস্লাভ কেল্‌দিশ বলেন, "পার্টি-পরিচালিত লেনিনীয় নীতিকে ও মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতির উন্নয়ন সাধনকে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করেন।" বিজ্ঞানীদের কাছে ভাবাদর্শগত ও তত্ত্বগত সমস্যাগুলি যারপরনাই তাৎপর্যপূর্ণ কারণ বিজ্ঞানের উন্নয়নের ভিত্তি হল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। কমিউনিজম গড়ে তোলার কাজে সমাজ-বিজ্ঞানগুলির—বিশেষত দর্শনের—অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, কমিউনিজম-নির্মাতাদের ভাবাদর্শগত, রাজনৈতিক, নৈতিক ও নন্দনতাত্ত্বিক সমস্যাগুলির তত্ত্বগত সমাধান ও ব্যাখ্যার দায়িত্ব প্রধানত বর্তায় এই সব বিজ্ঞানের ওপরেই।

শিল্প-সাহিত্যের কর্মীদের ভাবাদর্শগত মানকে প্রতিনিয়ত উন্নত করে তোলার জন্যে এই ক্ষেত্রের সমালোচকদের মনোযোগ সংহত করার প্রয়োজনীয়তার ওপরে গুরুত্ব আরোপ করে কেলদিশ বলেন: প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলি একদিকে যেমন প্রযুক্তিগত প্রগতির নতুন নতুন সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করে দিচ্ছে এবং জাতীয় অর্থনীতিক্ষেত্রে সমৃদ্ধি আনছে, অন্যদিকে তেমনি মানুষের বিশ্বদৃষ্টিকে রূপ দেবার ক্ষেত্রেও বিরাট এক ভূমিকা নিয়েছে। "যেমন, ইতিমধ্যেই সাইবারনেটিকস ও স্বয়ংক্রিয়করণ মানুষের সমগ্র জীবন-যাত্রার ওপরে, কর্মপদ্ধতির ওপরে, যে প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছে, তার কথা উল্লেখ করতে পারি। অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক সৃষ্টির ক্ষেত্রে সাইবারনেটিকস্ ও স্বয়ংক্রিয়করণ বুদ্ধিগত বৈজ্ঞানিক উপলব্ধির এক বিরাট ধাপকে চিহ্নিত করেছে।"

"বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে সঠিক পথনির্দেশের এবং গবেষণালব্ধ ফলগুলির সঠিক প্রয়োগের ভিত্তি স্থাপন করার উদ্দেশ্যে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারগুলির এক দার্শনিক-বস্তুবাদী বুনিয়াদ রচনা করার

জন্যে" প্রকৃতি-বিজ্ঞানের কর্মীদের কেলদিশ অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, "আপেক্ষিক তত্ত্ব, কোয়ান্টাম তত্ত্ব ও নাইট্রোজেনেটিক্স্-এর মতো বিজ্ঞানের মূলগত বিষয়গুলির প্রতি সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা সঠিক দৃষ্টি-ভঙ্গী গ্রহণ করেছেন—যদিও জনকতক ব্যক্তিবিশেষ এখনও মাঝে মাঝে ভ্রান্ত মত প্রকাশ করেছেন।"

সোভিয়েত বিজ্ঞানের সাম্প্রতিকতম সাফল্যগুলি সম্পর্কে কেলদিশ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনকে জানান যে খাদ্যদ্রব্য, চর্বি, ভিটামিন ও অ্যামিনো অ্যাসিড সংশ্লেষিক (সিন্থেটিক) পদ্ধতিতে উৎপাদন করার পথে সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের গবেষণা অনেক দূর এগিয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে প্রাথমিক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। পেট্রোলিয়ম ও অন্যান্য অথাদ্য কাঁচা মাল থেকে অণুবৈজ্ঞানিক সংশ্লেষণের দ্বারা ব্যাপক প্রোটিন উৎপাদনের খুব ভালো রকম সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষণাগুলিকে সরাসরি পরিচালিত করার জন্যে সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদমি বিশেষ বিশেষ কতকগুলি শাখা স্থাপনের প্রস্তাব দিয়েছে। পৃথক পৃথক ভাবে পরিচালিত এই সব গবেষণাগুলির ফলগুলিকে সমন্বিত রূপে প্রয়োগ করার জন্যে আকাদমির অধীনে যে বৈজ্ঞানিক কো-অর্ডিনেশন কমিটি থাকবে, তার ফলে "সোভিয়েত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি মিলিত ফ্রন্ট গড়ে তোলা সম্ভব হবে—যার ফলে বিজ্ঞান-কর্মীদের ও বৈষয়িক সম্ভাবনাগুলিকে অনেক ভালো ভাবে কাজে লাগানো যাবে।"

সিনেমা-পরিচালক গ্রিগরি চুখরাই

খ্যাতনামা চলচ্চিত্রশিল্পী, "ব্যালাড অফ এ সোলজার," "ক্লিয়ার স্কাই" ইত্যাদি বিশ্ববিখ্যাত সোভিয়েত চলচ্চিত্রের পরিচালক গ্রিগরি চুখরাই বলেন: "বিদেশীরা রুশদের অঘটন-ঘটনপটু কৃতিত্বের কথা প্রায়ই বলে থাকে, তাদের রহস্যজনক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তারা নানা তত্ত্ব তৈরি করেছে। বুর্জোয়ারা খুব ভালো করেই জানে—সোভিয়েত জনগণের এই বৈশিষ্ট্যের, এই অঘটন-ঘটনপটুত্বের আসল রহস্যটা কি, কিন্তু সে কথা তারা কাউকে বলতে চায় না। এই রহস্যটা হল—আমাদের ধ্যান-ধারণা-ভাবাদর্শের শক্তি. আজকের দিনে সব চেয়ে মানবিক. সবচেয়ে সুন্দর আদর্শগুলির সর্বজয়ী শক্তি।" সোভিয়েত সিনেমার বিপ্লবী ঐতিহ্যের কথা উল্লেখ করে এবং গত এক দশকে সিনেমা যে বহু অবিস্মরণীয় সৃষ্টির কৃতিত্ব অর্জন করেছে, সে কথা উল্লেখ করে চুখরাই বলেন, সাধারণ ভাবে সোভিয়েত শিল্পে যুদ্ধপরবর্তী কালে বিরাট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে—যদিও কিছু সংখ্যক শিল্পী তাঁদের রচনায় স্পষ্ট ভাবাদর্শগত উপলব্ধির পরিচয় দিয়েছেন এবং বুর্জোয়া ভাবাদর্শের প্রতি আপস-মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন।

সোভিয়েত সমাজে শিল্পীর কর্তব্য হল "আমাদের মহান আদর্শ সাধনের কাজে লাগা, কমিউনিস্ট সমাজের মানুষকে—এক নতুন মানুষকে—শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষিত করে তোলা।" কাজটা খুব সহজ নয়। এর জন্যে প্রয়োজন জীবন সম্পর্কে, মানুষের মন সম্পর্কে আর শিল্পের কলাকৌশল সম্পর্কে সুগভীর জ্ঞান এবং "সর্বোপরি প্রয়োজন কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের প্রতি, নীতির প্রতি আনুগত্য আর সাহস।

এই প্রসঙ্গে চুখরাই বলেন, সোভিয়েত শিল্পে কোথাও কোথাও রূপের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করার প্রবণতা যেমন দেখা যাচ্ছে, তেমনি আবার কর্মকে একেবারেই অস্বীকার করা কিংবা তার গুরুত্ব কম করে দেখার প্রবণতাও যে নেই, তা নয়। এই শেষেরটারও এক ধরনের কর্মসর্বস্বতা। কর্মের প্রতি উদাসীন এই কর্ম-সর্বস্ব শিল্পীরা অত্যন্ত ভোঁতা আর নিরস এক ধরনের ফিলিস্ তৈরি করছেন যা দর্শকদের হৃদয়কে অনুভূতিকে স্পর্শ করে না। মানুষের সৌন্দর্যবোধকে, মনন-অনুভূতিকে, পরিতৃপ্ত করে না বলেই এ সব চলচ্চিত্র নিতান্তই ব্যর্থ। কোনো বক্তব্যই রসোত্তীর্ণ না হলে শিল্পের মর্যাদা পেতে পারে না।

চুখরাই বলেন, "শিল্পে কমিউনিস্ট ভাবাদর্শকে উপস্থিত করতে হবে অত্যন্ত শিল্পদক্ষতার সঙ্গে, ঐকান্তিক আবেগের সঙ্গে, নিজের সমস্ত সত্তাকে এই লক্ষ্যে সংহত করে এনে—যেমন করতেন তলস্তয়ের মাতাকোভস্কি।"

রূপ

জগদীন্দ্র বসু

পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে একটু অপ্রস্তুত হল চিরঞ্জীব। প্রণাম সে কারও নেয় না। হাত তুলে নমস্কার করাটাই পছন্দ করে। কাজেই প্রণামের কারণটা জিজ্ঞেস করার কুন্তলা একটু হেসে বলে—আজ যে নববর্ষ। বাংলা মাসের প্রথম দিন। পয়লা বৈশাখ। ভুলে গেলেন।

'ও' বলে একটু হাসলে চিরঞ্জীব। নববর্ষ সে সত্যি ভুলে গেছে। বাংলা মাস সে মনে করতে পারেনা ইংরেজী তারিখের সংগে রোজ তার সম্পর্ক। ক্যালেণ্ডারে বড় বড় করে লাল আর কালো কালিতে লেখা ইংরেজী তারিখ দেখে দেখে সে অভ্যস্ত। বাংলা তারিখ কালে-ভদ্রে তার কাছে আসে মনে করিয়ে দেয় সে আমাকে তুমি ভুলো না। আমি আছি। থাকবো। চিরঞ্জীব আজ যন্ত্রচালিত কলের পুতুল। ন'টা বাজতে না বাজতেই অফিসে যায়। ফেরে রাত ন'টায়। সব ভুলেছে সে। সব ভুলেছে।

চাকরী জীবনে নতুন এসেছে কুন্তলা। পথ ঘাট চেনে না। আট ঘাট সে জানে না। কাকে কি বলে ডাকবে। কাকে কোন কথা বলবে ভেবেই ঠিক করতে পারে না। সর্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকে। কি জানি কি হয়। কখন কে ডাকে। কে কোন কাজ দেয়। সুতরাং যে যা বলে তাই করে সে। মাঝে মাঝে চিরঞ্জীবের দিকে তাকায়। দেখে দেখে মুগ্ধ হয়। তেজোদীপ্ত চেহারা তার। গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। বড় বড় ভাসা ভাসা দুটি চোখ। প্রশস্ত কপাল। কপালের মাঝখানে একটা কালো তিল। চোখে উদার দৃষ্টি। কি অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব লোকটার! শিশুর মত সরল। মাখনের মত কোমল। পাথরের মত কঠিন।

কুন্তলার সর্বাংগে অঢেল রূপ নেই। কালো কুৎসিত চেহারা তার। প্যাকাটির মত দেখতে। গায়ে গায়ে নেই। মুখটা লম্বা। নাক সরু হলেও কেমন যেন দেখতে। দাঁতের ঠোঁটিটা ছোট। নীচের ঠোঁট একটু বড়। দাঁতগুলি ছোট ছোট। হাসলে কালো কালো মাড়ি বেরিয়ে পড়ে। মাথায় কালো কুচ কুচে পাতলা চুল। খোঁপা বাঁধে না সে। এক বেণীতে চুল বাঁধে। বেণীর নিচে অল্পদামী, রঙ ওঠা গোদাপী ফিতা ফুলের মত করে ঝুলিয়ে দেয়। হাতে সোনার আংটি। দুহাতে চার গাছা করে ব্রোঞ্জের চুড়ি। বাঁ হাতে একটা লোহা। শাঁখা পরেনা সে। কপালেও সিঁদুর দেয় না। সিঁথিতে দেয়। গলায় কিছু নেই। কানে এক জোড়া পাখীর পাখার মত দেখতে কানপাশা। পরণে নীল রংয়ের সাধারণ আটপৌরে শাড়ী। গায় সবুজ রংয়ের ব্লাউজ। পায় অল্পদামী ছোঁড়া তালিমারা স্যাণ্ডেল। সব মিলিয়ে দেখতে গেলে তাকে কুৎসিতই বলতে হয়। কিন্তু তার চোখ দুটি বড় বড় আর টানাটানা সে চোখের দৃষ্টিতে হরিণীর চকিত চাহনি। প্রাণচঞ্চল জীবনের অশান্ত আহ্বান। তার ঐ জোড়া চোখের শান্তিত দৃষ্টি একদিন জীবনসমুদ্রে প্লাবনের ঢেউ আনতো। মুকুলিত বসন্তের নিস্তব্ধ মুহূর্তে জীবন পেয়ালাকে ছাপায় ছাপায় পূর্ণ করে দিতে

চাইতো। তোদন ভয় কম বলতে তা
বড় মান—বড় আপনা।

ক'দিন থেকেই কুন্তলাকে লক্ষ্য করছিল চিরঞ্জীব। মনের কোথায় যেন কি একটা কাঁটা আছে কুন্তলার। সে কাঁটা তাকে সর্বদাই খচ্ করে বেঁধে। কিন্তু কি সে কাঁটা? অনেকদিন পাশে পড়ে জিজ্ঞেস করতে গিয়েও পারেনি চিরঞ্জীব। আজ কুন্তলা একটু সকাল সকাল এসেছে। তারা দুজন ছাড়া অফিসে আর কেউ আসেনি। সমস্ত চেয়ার টেবিলই ফাঁকা। সুযোগ বুঝে চিরঞ্জীব একটু ইতস্তত: করে বলল—আপনার কি হয়েছে বলুন তো!

কিছু না তো! আচমকা প্রশ্নে একটু চমকে উঠলো কুন্তলা। এ সময়ে ঠিক এ ধরনের একটা জটিল প্রশ্নের জন্য তৈরী ছিল না সে

—না না। আপনি লুকাচ্ছেন। একটা কিছু আপনার গোলমাল আছে। অফিসে কারো সংগে বেশী কথা বলেন না। সর্বদাই একটা ভয় সন্ত্রস্ত ভাবে থাকেন। মাঝে মাঝে টেবিলের উপর দু'হাতে মুখ ঢেকে কি যেন ভাবেন। চেয়ে থাকেন তো চেয়েই থাকেন। কাজকর্মে মন নেই। জিজ্ঞেস করলে ঠিক ঠিক উত্তর দেন না। থেকে থেকে বড় বড় নিঃশ্বাস ছাড়েন। কখনো কখনো শাড়ীর আঁচলে চোখ মোছেন। এ সবের অর্থ কি? সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চিরঞ্জীব তাকায়।

—ও কিছু নয় বলে কুন্তলা প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যায়। চিরঞ্জীবের উপর মনে মনে ভীষণ রাগ হয়। কাজ নিয়ে তার সংগে সম্বন্ধ। কাজটা ঠিক মত পেলেই হল। সে কি করছে আর না করছে তা নিয়ে তার অতটা মাথা ব্যথা কেন? মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেও মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না সে। একেতো দুর্বলতা আছে, তাছাড়া চিরঞ্জীবকে সে ভয় করে।

চিরঞ্জীব বুঝলো—কুন্তলা নিজেকে অশ্রদ্ধেয় ভাবে লুকিয়ে রাখতে চায়। কেউ তাকে চিনুক, জানুক, ভাবুক, এ সে চায় না। কোলাহলে মুখরিত পৃথিবীর এক কোণে নিজের অতীত স্মৃতির বেদনাময় চিত্র নিয়ে সে বেশ আছে। কুন্তলাকে তাই সে আর প্রশ্ন করে বিব্রত করল না। তার মনের আয়নায় বারবার প্রতিফলিত হতে লাগল কুন্তলা। অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে সে তার মুখটা ভাল ভাল করে খুঁটে দেখল। কুন্তলার মুখে সমুদ্রে ডুবুরীর মত ডুব দিয়ে খুঁজে পেল সে রত্ন-ভাণ্ডার। অন্ধকার সাঁতসেতে মনের দুর্গ দুয়ারে কল্পনার পথ বেয়ে টোকা মারল চিরঞ্জীব। নিঃশব্দে খুলে গেল দুর্গ দুয়ার। হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে সে অনেক কিছুই দেখে ফেলল। মনকে বিশ্লেষণ করলে সে। কুন্তলা জানলো না। বুঝলো না। টের পেলো না।

সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক চিরঞ্জীব। সে সাহিত্যিক। মানুষের মনকে সে বোঝবার চেষ্টা করে। কল্পনার সুড়ংগ পথে মনের মধ্যে প্রবেশ করে সে নিজে ভাবে মিশে যায়। হাসে, কাঁদে, কথা বলে। মনে মনে বিচরণ করে সে আনন্দ আহরণ করে। দুঃখের অনুভূতি তাকে বেদনা দেয়। আনন্দঘন মুহূর্তকে সে চেনে। অশ্রু ভারাক্রান্ত চোখকে সে বোঝে। তার বিশ্লেষণী চোখ দিয়ে কুন্তলাকে সে কতদিন ধরে দেখেছে। প্রাত্যহিক কাজ কর্মের ফাঁকে এটা ওটা জিজ্ঞেস করে অনেক তথ্য জেনে নিয়েছে। কুন্তলার জীবন যেন একটা রহস্য-ঘন কুয়াশা।

অনেকক্ষণ থেকেই কি একটা বলার জন্য ইতস্তত: করছিল কুন্তলা। চিরঞ্জীবের টেবিলের কাছে ভিড় লেগেই আছে। একটা মুহূর্তও তাকে একা পাবার উপায় নেই। মুখ চোখ সমানে চলছে। এতও পারে লোকটা তবুও এর মধ্যে একটু সুযোগ বুঝে কুন্তলা বললে—আজ আমার একটু সকাল সকাল ছেড়ে দেবেন!

—কেন? মাসের মধ্যে পনেরো দিন আপনাকে সকাল সকাল ছেড়ে দেবো কেন? ভ্রু কুঁচকে চিরঞ্জীব প্রশ্ন করে।

—সেন্স এসিস্ট্যান্ট হিসেবে একটা জেনারী কাজে কিছুদিন কাজ করেছিলাম। সামান্য কয়েকটা টাকা পাওনা আছে। দুটোর মধ্যে না গেলে পাওয়া যাবে না এখন বারোটা বাজে। যেতে প্রায় দুটোই বাজবে। টাকাটা আমার দরকার। এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলে মাথাটা নীচু করল কুন্তলা। অনাবশ্যক হাতের নখ খুঁটতে লাগলো।

—কাল যান না। দেখছেন তো আজ প্রবধ, সুনন্দা কেউ আসেনি। এ অবস্থায় আপনিও যদি চলে যান, তা'হলে ওখানে কে কাজ করবে? অফিসে একদম না আসতেন আমি অন্য ব্যবস্থা করতাম। এসে রোজ রোজ

চলে যাওয়াটা আমি পছন্দ করি না। এতে ডিসিপ্লিন থাকবে না। একটু বিরক্ত হলেই কথাগুলি বলল চিরঞ্জীব। তারপর কি মনে করে আবার বললে—কত টাকা আপনার দরকার বলুন, আমি দিচ্ছি। পরে আমার সুবিধে মত দিয়ে দেবেন।

—না না। শুধু টাকাই নয়, আমার আরো দরকার আছে। কিন্তু—কথাটা শেষ করতে পারলো না কুন্তলা। চিরঞ্জীবের দিকে তাকিয়ে মাথাটা নীচু করল।

চিরঞ্জীব বুঝল। মনের গোপন রহস্যকে এত সহজেই ফাঁস করতে চাইছে না কুন্তলা। বলতে সে চায় কিন্তু সদ্যজাত সংস্কার তাকে বাধা দেয়। দুরন্ত লজ্জা তার গলা চেপে ধরে। চোখ দুটি তার জল জল করে। কান্না পায়। চিরঞ্জীব আর কথা না বাড়িয়ে বলে—বেশ, যান।

কুন্তলার বাইশ বছরের ইতিহাস ধীরে ধীরে জেনেছে চিরঞ্জীব। স্কুলে ফাইনাল পাশ করে সে কলেজে ভর্তি হয়েছিল। সে যে দেখতে শুনতে ভালো নয় তা সে জানতো। কাজেই লেখাপড়া শিখে একটা চাকরী বাকরী করে জীবিকা অর্জন করার স্বপ্নই সে দেখেছিল। বিয়ে করে সুখ সংসারী হবার কল্পনা সে কখনো করেনি। কিন্তু জীবনের প্রথম বসন্ত তাকে দূর থেকে মোহনীয়া বাঁশীর সুরে ডেকেছিল। সে ডাকে সাড়া দিয়েছিল কুন্তলা। কলেজ প্রাঙ্গণে দেখা হয়েছিল শৌভনিকের সঙ্গে। রূপবান না হলেও স্বাস্থ্যবান শৌভনিককে দেখে সে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারেনি। তন্ময় হয়েছিল শৌভনিকও। কি দেখেছিল সে? কালো কুৎসিত চেহারা দেহ না রূপ, জীবন না যৌবন। কুন্তলা জানে না। সেই প্রথম দর্শনে প্রেমের পাত্র পূর্ণ হয়েছিল কুন্তলার। তারপর থেকে ভালোবাসা, অবাধ মেলামেশা চলেছে দীর্ঘদিন। কেউ কাউকে না দেখে থাকতে পারেনি। কারো অনুপস্থিতি কেউ সইতে পারেনি। ক্রমে ক্রমে উত্তেজনা কমে এল। চোখের নীচে কালি পড়ল কুন্তলার। কপালের উপর ভাঁজ পড়ল কয়েকটা। শরীরটাও ভারী হতে লাগল দিন দিন। কলেজ ছাড়তে হল তাকে। বড় একটা ঘর কাটা কাটা মোটা বাঁধানো খাতায় কত কি লিখে নাম সই করে মালা বদল করল তারা। শাখা সিঁদুর পরল কুন্তলা। রক্ত রঞ্জিত হল সিমন্তনী। বৌ হল সে। কুলবধূ হয়ে শ্বশুর বাড়ীতে চট করেই স্থান পেলনা। রূপ অসবর্ণ বিয়েতে তাদের আপত্তি ছিল। তাছাড়া তাদের মতে বিয়ে একটা পুতুল খেলা। সামাজিক আচার অনুষ্ঠান ছাড়া সে কাজ কখনো পুত হতে পারে না। সুতরাং কুলবধূর মর্যাদা সে পেল না। বৌ হয়ে দুজনের ছোট সংসার গুছাতে না গুছাতেই শিশুর কান্না শুনলো সে। মেয়ের মা হল।

জীবনকে উপভোগ করতে চেয়েছিল শৌভনিক। এমন করে জড়িয়ে পড়তে চায়নি। কুন্তলা কুৎসিত, কুরূপা হলেও তার যৌবন ছিল। দেহের মাধুরি ছিল। তার সঙ্গ চেয়েছিল সে। জীবন সঙ্গিনীরূপে সে তাকে পেতে চায়নি। কিন্তু কুন্তলা তাকে বিশ্বাস করে দেহ, মন, প্রাণ সব উৎসর্গ করে ছিল। তাকে দেখলে তার প্রাণ জুড়িয়ে যেত। বান্ধবীদের কাছে সে তার স্বামীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠতো। অনেকদিন তারা ঠাট্টা করে বলতো—দেখিসরে কুন্তলা আঁচলে সেরো দিয়ে রাখিস। তোর যা রূপের বহর। শেষ পর্যন্ত পালিয়ে না যায়। বান্ধবীদের এসব হাসি ঠাট্টার কান দেয়নি কুন্তলা। সে নিজেকে উজাড় করে দিয়ে যা পেয়েছে, তাকেই আঁকড়ে থাকতে চেয়েছে। কিন্তু এত করেও সে শৌভনিকের মন পায়নি। পাবে কি করে? সেতো মাখাল ফলের রং দেখে ভুলেছিল। তার ভিতরটাতো যাচাই করে তো দেখেনি। উত্তেজিত মুহূর্তকে উপভোগ করে ক্লান্ত হয়েছে শৌভনিক। তারপর হারুল ঘুণার ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিয়েছে কুন্তলাকে। অনাদর আর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়েছে কুন্তলা। অপমানের বিষে জর্জরিত হয়েছে তার দেহ। দিনের পর দিন অভুক্ত রয়েছে সে। খেতে দেখনি শৌভনিক। ক্ষুধার যন্ত্রণায় সে পেটের নীচে বালিশ রেখে কেঁদেছে। একরত্তি মেয়েটাকে একটু দুধতো দূরের কথা এক কৌটা বার্লি পর্যন্তও দেবার সামর্থ তার ছিল না। তবু সে নড়েনি। তার স্বরে পাওয়া স্বামীর সংসার থেকে সে কোথাও যায়নি। নির্বিবাদে সব অপমান, সব অত্যাচার সহ্য করেছে। কিন্তু গলা ধাক্কা দিয়ে যেদিন

শৌভনিক তাকে ঘরের বার করে দিয়েছে, সেদিন আর করতে পারেনি। বুকের ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে শুধু অস্ফুট আর্তনাদ করে বলেছে—কি দেখছিস মা? আমাকে? আমার রূপ নেইরে—রূপ নেই। বীভৎস, কুৎসিত আমি ঘরেরও অরুচি। তাই আজ গলা ধাক্কা খেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি। চল্ মা চলে যাই—চলে যাই। দু চোখ যেদিকে যায়—চলে যাই।

সেই থেকে পথে পথে ঘুরছে কুন্তলা। বোধ জ্ঞান বড়, কিছুই হারায় করেনি। চলতি পথে সে অনেক উপঢৌকন পেয়েছে কিন্তু নেয়নি। অসভ্য চোখের দৃষ্টিকে এড়িয়ে চলতে বার বার নিরাশ্রয় হয়েছে সে। পথ তাকে আশ্রয় দিতে পারেনি।

চাকরীর জন্য দুয়ারে দুয়ারে ধন্যা দিয়েছে সে। ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসেছে। সাধারণ শিক্ষা তার আছে কিন্তু রূপ নেই। ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে বার্থ হয়েছে সে। চিঠি লিখে জবাব পায়নি। না খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে যখন কাঠ হতে চলেছিল তখন নেহাৎ বুকে করে একদিন কাগজের সম্পাদক হল সে। দেখা হল এক বৃদ্ধ প্রাণের সংগে। সে প্রাণ বড় কঠিন। বড় কোমল। সে প্রাণের দরজায় এসে ফিরে যায়নি কুন্তলা। সে তাকে সান্ত্বনা দিয়েছে। কাগজ অফিসেই চাকরী দিয়ে বাঁচবার পথ করে দিয়েছে। চিরঞ্জীবকে সে সেই থেকেই চিনেছে।

কুন্তলার মনে তবু শান্তি নেই। শৌভনিকের জন্য অহরহ তার প্রাণ কাঁদে। তাকে দেখতে বড় ইচ্ছে করে। কিন্তু, সাহস পায় না। দূরে থাক শৌভনিক। তবু, সুখে থাক থাকতে থাক।

কলম হাতে একটানা ভেবে চলছিল চিরঞ্জীব। কোনদিকে তার লক্ষ্য ছিল না। ভাবপ্রবণ্যে ভরে ছিল তার সংবেদনশীল মন। কখন এসে কুন্তলা তার পাশে দাঁড়িয়েছে সে টের পায়নি। হঠাৎ চুড়ির ঠুং ঠাং শব্দে তার চমক ভাঙ্গলো। কিরে তাকাতেই চোখাচোখি হল কুন্তলার সঙ্গে। চিন্তাস্রোত বাধা পেয়ে একটু বিরক্ত হল চিরঞ্জীব। কিন্তু মুখে কিছু বলল না। কুন্তলা একটু ইতস্তত করে চিরঞ্জীবের কানের কাছে মুখ নিয়ে ছোট করে বললে—আমায় একটু ছেড়ে দেবেন?—কেন? চিরঞ্জীব কৌতূহলে ভরে প্রশ্ন করল। প্রশ্ন করা তার চিরাচরিত অভ্যাস।

—বাইরে আমার স্বামী আমায় ডাকছেন! আর বলতে পারে না কুন্তলা। লজ্জায় মাথা নীচু করে সে, যদি কেউ শুনে ফেলে। কেউ জেনে ফেলে।

আপনার স্বামী! তা বাইরে কেন? ডাকুন, ডাকুন, ভেতরে ডাকুন। চিরঞ্জীব ব্যস্ত হয়ে বলে।

—না না। থাক। ব্যস্ত হবেন না। আপনি আমার সব কথাই জেনে ফেলেছেন। নিজে আমি বলতে পারিনি তবু আপনি সব জেনেছেন। বুঝতেই পারছেন আমাদের পারিবারিক কোন অসুবিধা আছে যার জন্য ওঁকে ঠিক এখানে আনাটা সম্ভব হচ্ছে না। আপনি বরং আমায় ছুটি দিন। কত দিন তো দিয়েছেন, আর একটি দিন না হয় দিন। অনেক অনেক দিন পরে আমার স্বামী আমায় ডাকছেন। কুন্তলার গলা ধরে আসে।

—যান! চিরঞ্জীব আর কিছু বলতে পারে না। সহসা গম্ভীর হয়ে যায়।

কুন্তলা শুধু এই অনুমতিটুকুর অপেক্ষায় ছিল। ছুটি পেয়ে ড্রয়ার থেকে তার নিত্য সঙ্গী পুঁতির ব্যাগ আর গল্পের বই খানা নিয়ে ত্রস্ত পদে ছুটে যায়। মনের মধুর তার আনন্দে পেখম তুলেছে। যে স্বামী তাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছিল সে আজ কাগজ অফিসের দরজায় দাঁড়িয়ে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে। সে তাকে ডাকছে। ভুল বুঝেছে সে। অনুতপ্ত হয়েছে। কলেজ প্রাঙ্গনের সেই শান্ত শিষ্ট, শৌভনিক আজ তাকে আবার দূর থেকে কাছে এসে ডাকছে। সে কি আর থাকতে পারে?

কুন্তলার চলার পথের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থেকে একটা নিঃশ্বাস ফেলল চিরঞ্জীব। সে নিঃশ্বাসের বাতাসে যদি শৌভনিকের মনের ধুলোবালি উড়ে যায় তবে চিরঞ্জীব সুখী হবে। শূন্যতার হাহাকারের মধ্যে পূর্ণতার কোলাহল সঞ্জীবিত হবে কুন্তলার বাধাবন্ধহীন বুকে। শৌভনিক বুঝবে যে রূপের চোখ ঝলসানো আগুনে মানুষ পতঙ্গের মত জ্বলে পুড়ে মরে কিন্তু রূপের পোড়া গন্ধ মানুষকে বিমোহিত করে। রূপ আর রূপ কখনো এক নয়।

আলবার্তো মোরাভিয়ার ছটি উপন্যাস

অমল হালদার

বিশ বছরের ক্যাসিস্ত জঙ্গীবাদের শাসনে পর্যুদস্ত ইতালীতে যে কজন লেখক গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতি আস্থা কখনো হারাননি আলবার্তো মোরাভিয়া তাদের অন্যতম। তিনি আধুনিক ইতালীয় সাহিত্যের নেতা।

১৯০৭ খৃস্টাব্দের ২৮শে নভেম্বর রোমে তাঁর জন্ম। ধনিক স্থপতির পুত্র মোরাভিয়া শৈশবে কেবল ইতালীয় নয়, ফরাসী ইংরেজ ও জার্মান এই তিন ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। ১৯২৭-এ তাঁর প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয়। তখন তাঁর বয়স মাত্র আঠারো। এ সময় তিনি ইংল্যাণ্ডে ও ফ্রান্সে গ্রাসের বিদেশী সংবাদদাতারূপে দ্বিতীয় বিশ্বসমরের আগে মুসোলিনীর ফ্যাসীবাদী শাসনে তাঁর বইগুলি বাজেয়াপ্ত হয়। তিনি ছদ্ম নামে লিখতে বাধ্য হন। তাঁর আসল নাম আলবার্তো পিচ-চেলী। কিন্তু ছদ্ম নামে তিনি পরিচিত, তাঁর পিতৃদত্ত নাম খুব কম মহল ছাড়া কারও জানা নেই। নয় থেকে কুড়ি বৎসর পর্যন্ত ক্রমাগত তাঁকে অসুখে ভুগতে হয়েছে। স্বাস্থ্য এত খারাপ ছিল যে তারপক্ষে বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া কখনো সম্ভব হয়নি, ষোলবৎসর বয়সে রোগ খুব বৃদ্ধি পাওয়ায় মোরাভিয়াকে স্বাস্থ্যাবাসে পাঠানো হয়েছিল।

সেখানে একটি ভাল লাইব্রেরী ছিল। মোরাভিয়া বিছানায় শুয়ে শুয়ে বই পড়তেন। ছয় বছর তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন। চিত্রনাট্য সমালোচনা সংবাদপত্রের প্যারা রাইটিং ও আরো পাঁচটি লেখার কাজ করে তাঁকে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। সংগ্রামের ফলে মোরাভিয়া জেনেছেন; তাঁর মতো ইতালীতে কেবল সৃষ্টি-ধর্মী সাহিত্য রচনা করে জীবিকা নির্বাহ হয় এর থেকেই তিনি জীবনের বহুৎ শিক্ষা পেয়েছেন "আত্মপ্রত্যয়ের" পরে নির্ভর করতে শিখেছেন। মোরাভিয়া বলেছেন, মাত্র গত বারো বছর হল তিনি স্বাচ্ছন্দের মুখ দেখেছেন।

মোরাভিয়ার স্ত্রী এলসা মোরান্তেও ইতালীর একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন লেখিকা। মোরাভিয়া প্রত্যহ নিয়মিতভাবে দুতিন ঘণ্টা লিখে থাকেন। দুঘণ্টার কম কখনো নয়। তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস "দি উওম্যান অফ রোম (The Woman of Rome) দৈনিক পাঁচ পৃষ্ঠা করে লিখে একশ দিনে শেষ করেছেন। মোরাভিয়া বলেন,

"মানুষের কাজ ও জীবন দুই থাকা চাই। তা না হলে সে সম্পূর্ণ হতে পারে না। জীবন অর্থ তার কাছে অবসর। অবসর না পেলে কোন মানুষেরই নিজস্ব চরিত্র গড়ে উঠতে পারে না, এবং মানুষের পরিচয় পাওয়া যায় তার অবসর যাপনের পদ্ধতি থেকে।"

রোমের নাগরিক পটভূমিকায় মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ত আমলের রোম। শহরের এক বস্তিতে বাস করে আন্দ্রিয়ানা ও তার মা। আন্দ্রিয়ানা মায়ের অবাঞ্ছিত সন্তান। সেলাই করে যে মজুরি পায় তাই দিয়ে মা কষ্টে সংসার চালায়। মেয়ে বড় হওয়ায় এখন খরচ বেড়েই শুধু সেলাইয়ের আয়ে আর চলে না। আন্দ্রিয়ানার বয়স যখন ষোল, তখন মা ওকে নিয়ে গেল এক স্টুডিওতে, আর্টিস্টের মডেল হবে। আন্দ্রিয়ানাকে দেখে শিল্পী বিস্মিত হল। এমন রূপ আজকাল দেখা যায় না এখন সুন্দরী হতে হলে ক্যালোরী সুপরিপুষ্ট। তাই তার দেহ একটু ভারী, চলাফেরাও মন্থর, শিল্পীর মনে হল, যেন মধ্যযুগের রোমের কোন দেবী আন্দ্রিয়ানার মধ্যে পরিগ্রহ করেন। মেয়ের রূপ সম্বন্ধে··· যা সচেতন ছিল। কিন্তু শুধু রূপ থাকলে কি হবে? সামাজিক মর্যাদা তো নেই। সুতরাং ভালো ঘরে বিয়ে হবার আশা করা যায় না। সুখে থাকবার একমাত্র পথ রূপ বিক্রয় করা। এপথে আন্দ্রিয়ানাকে বেশী প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হতে হবে না, টাকা আসবে প্রচুর; কত বড় বড় লোক পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়বে, মেয়ে সুখে থাকবে।

আন্দ্রিয়ানা কিন্তু ভবিষ্যৎ জীবনের অন্য ছবি দেখে। বিয়ে হবে স্বামী ও সন্তান নিয়ে ঘর সংসার করবে এই তার স্বপ্ন। স্টুডিও যাবার পথে একদিন পরিচয় হল মোটর ড্রাইভার গিনোর সঙ্গে। গিনো দেখতে সুপুরুষ নয়, তার আরও সামান্য। কিন্তু বিয়ে করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার স্বপ্নের সমর্থন করেছে বলে আন্দ্রিয়ানা নিজেকে সম্পূর্ণরূপে গিনোর হাতে সমর্পণ করল।

এদিকে স্টুডিওতে তার সহকর্মিণী ও বন্ধু গিসেলার চক্রান্তে আন্দ্রিয়ানা ফ্যাসিস্ত সরকারের উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারী আন্তারিতার কবলে পড়ল। দেহদানের মূল্য-স্বরূপ কতকগুলি নোট আন্তারিতা যখন তার হাতে গুঁজে দিল তখন হাত জ্বালা করলেও আন্দ্রিয়ানার মনে জাগল এক নতুন অনুভূতি। কত সহজে প্রচুর টাকা উপার্জন করা যেতে পারে। দারিদ্র্য থেকে মুক্তিলাভের এমন সহজ উপায় আর নেই।

কিন্তু আন্দ্রিয়ানার ও সব কথা ভেবে আর লাভ কি? গিনোর সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেছে। দিন পর্যন্ত স্থির। আন্দ্রিয়ানার মা এ বিয়েতে সুখী নয়, মেয়ের বিয়ে সে চায়নি। আর সন্তুষ্ট নয় আন্তারিতা। সে বুঝল বিয়ের স্বপ্নে মগ্নগুল হয়ে আছে বলেই আন্দ্রিয়ানা তাকে প্রত্যা-খান করেছে। আন্তারিতা খবর সংগ্রহ করে জানলো, গিনো বিবাহিত; দেশের বাড়িতে আছে তার স্ত্রী ও সন্তান।

এতবড় প্রতারণায় একেবারে ভেঙ্গে পড়ল আন্দ্রিয়ানা। গিনোকে সে কিছুই দিতে বাকি রাখেনি। এখন আর কোনো অবলম্বন রইল না। মায়ের অভিপ্রায় অনুযায়ী সন্ধ্যার পর রোমের রাজপথে দাঁড়িয়ে আন্দ্রিয়ানা নতুন ব্যবসা আরম্ভ করল। কিন্তু প্রথম যেদিন রাস্তা থেকে

ঘরে লোক নিয়ে এল, সেদিন যা খুশী হল না। নিজেই মেয়েকে এ পথে আসবার জন্য প্ররোচিত করেছে। সত্যি যেদিন আগ্রিপ্পিনা সে পথ বেছে নিল সেদিন মা কেবল কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল, এখন আমার মরণ হলেই বাঁচি।

তারপর একে একে কত লোক আসতে লাগল। কেউ অনভিজ্ঞ তরুণ, কারও বা জীবনের কোনো অভিজ্ঞতাই বাকি নেই। কেউ মুখ ফুটে কথা বলতে পারে না, কেউ পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে প্রেম ভিক্ষা করে, কেউ বা অর্থের পূর্ণ বিনিময় আদায় করে নিতে বদ্ধপরিকর। আগ্রিপ্পিনার অতিথিদের মধ্যে কেউ তরুণ ছাত্র, কেউ উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, কেউ বা খুনের কেরানী আসামী। পুরুষের বিচিত্র কামনার স্রোত প্রতিদিন তার দেহের উপর দিয়ে বয়ে যায়। বর্ষার নদীতে পশের খুঁটির মতো সে থর থর করে কাঁপে, কিন্তু ভেঙে যায় না।

আগ্রিপ্পিনা নিজেকে হারালো গিয়াকোমোর কাছে। গিয়াকোমো ফ্যাসি বিরোধী ছাত্র, গিয়াকোমোর আত্মপ্রেমিক এবং গভীর নিরাশাবাদী। নীটশের প্রতিধ্বনি করে সে বলে, ভূ-পৃষ্ঠের আচিলের মতো এই মানুষ, পৃথিবীতে তাদের কোনো মূল্য নেই। এই নিরাশাবাদ গিয়াকোমোকে আগ্রিপ্পিনার প্রেমে আত্মহারা হতে দেয়নি। আকর্ষণ বিকর্ষণের দ্বন্দ্ব ছিল তার মনে। একবার কাছে আসত, আগ্রিপ্পিনাকে বিয়ে করবার প্রতিশ্রুতি দিতে, আবার হঠাৎ যেন দূরে সরে যেত। আগ্রিপ্পিনাকে প্রতারণা করবার উদ্দেশ্য ছিল না; তার মানসিক গঠনের মধ্যে ছিল দ্বন্দ্বের বীজ। আগ্রিপ্পিনা যখন মিথ্যা করে বলল যে গিয়াকোমোর সন্তান এসেছে তার গর্ভে, তখন সে আত্মহত্যা করল।

গিয়াকোমোকে বাঁধবার জন্যই আগ্রিপ্পিনা হয়তো মিথ্যা কথা বলেছিল। প্রকৃতপক্ষে এক কেরানী খুনী আসামীর সন্তান আগ্রিপ্পিনার ভবিষ্যৎ জীবন দুর্বিষহ করে তুলবে, এমনি একটা আশঙ্কার মধ্যে কাহিনী শেষ হয়েছে।

আগ্রিপ্পিনার চরিত্র মোরাভিয়া এঁকেছেন আশ্চর্য মুন্সীয়ানার সঙ্গে। ঘটনার নাটকীয়তা এবং মনের সংযত কাহিনীকে কোথাও শিথিল হবার অবকাশ দেয়নি। পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করা সত্ত্বেও সে হারায়নি তার মনুষ্যত্ব। অশান্তির জীবনের মধ্যেও গিয়াকোমোর প্রতি তার প্রেমকে সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেছে। এই জন্যই আগ্রিপ্পিনাকে ঘৃণা করে দূরে সরিয়ে রাখা পাঠকের পক্ষে অসম্ভব।

মোরাভিয়া রোমের বাসিন্দা, রোমের প্রতি তাঁর প্রতি গভীর আসক্তি। তাঁর প্রায় সকল গল্প উপন্যাসের পটভূমিকা রোম এবং পাত্র পাত্রীরাও রোমের নাগরিক। বিকেলবেলা নাগরিকেরা কেউ ঘরে বসে থাকে না। রোমের রাজপথই নাগরিকদের বিকেলবেলার ড্রইং রুম। মোরাভিয়া পথে পথে রেস্তোরাঁর ঘুরে ঘুরে রোমের জীবনকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জন্য মোরাভিয়ার উপন্যাসে রোমের জীবনের একান্ত বাস্তব ছবি পাওয়া যায়। কোনো সময় কিন্তু মোরাভিয়া কখনো যৌনলালসায় সমর্থন করেননি। বরং তাঁর রচনা থেকে দেখা যাবে, জীবনে এই একটি অনুভূতিকে যারা প্রাধান্য দিয়েছে তাদের দুঃখের শেষ নেই। আগ্রিপ্পিনার জীবনে পরিণতি দেখে কোন্ মেয়ে পতিতার ঐশ্বর্যের লোভে লালায়িত হবে? তবু যে আগ্রিপ্পিনা একেবারে তলিয়ে যায়নি, তার কারণ গিয়াকোমোর প্রতি তার গভীর ভালবাসা। এই প্রেম তার মনুষ্যত্বকে রক্ষা করেছে।

কোনো কোনো বাস্তবপন্থী লেখকের রচনায় নিখুঁত ছবিটাই মূল্য, কাহিনী গৌণ হয়ে পড়ে। কিন্তু মোরাভিয়ার রচনায় নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাত এবং গল্পের আকর্ষণ দুই-ই আছে। তাঁর গল্প বলবার রীতি এবং সাবলীল সংযত ভাষা পাঠকদের প্রথম থেকেই আকৃষ্ট করে রাখে। মোরাভিয়া তাঁর পাত্র-পাত্রীর সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ করেছেন; কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক বৈজ্ঞানিকের মতো করেননি। আপাতদৃষ্টিতে যাদের ঘৃণা করা স্বাভাবিক, তাদের উপরও মোরাভিয়ার গভীর সহানুভূতি। উচ্ছৃঙ্খল তরুণ, ঈর্ষাকাতর স্বামী, বলপ্রয়োগী হতাশ লেখক এবং পতিতার অন্তরে প্রবেশ করে পাঠকরা এদের একটি নতুন রূপ দেখতে পায়। লেখকের এই দরদ পাঠকদের সহানুভূতিশীল করে তোলে।

আলবার্তো মোরাভিয়ার শেষতম উপন্যাসের বিষয়-বস্তু নারী ও যুদ্ধ। দুটি নারী পঁইত্রিশ বছরের সিসিরা আর অষ্টাদশী রোসেত্তা। মা আর মেয়ে। রোমের এক গলি পথের ধারে মা দোকান চালায়, মেয়ে সংসার চালায়। সিসিরা আর রোসেত্তার সংসার দুঃখের না হলেও শান্তির সংসার।

সহসা এলো যুদ্ধ। কালোবাজারের কাঁপা পয়সা হাতে নিয়ে দোকানী সিসিরা সাময়িক সাচ্ছন্দ্যকে ভুল করলো সুখ বলে। যুদ্ধের ভয় তার বিন্দুমাত্র নেই। সে জানে না একদিন তার মেয়ের যুবতীত্বকেও তাকে জোগাড় করতে হবে কালোবাজার থেকেই। সুতরাং লড়াইকে আশীর্বাদ বলে অভিনন্দন জানালো সিসিরা 'আমুক ওরা যাকে খুশি এরোপ্লেন দিয়ে, ট্যাঙ্ক দিয়ে।'

"I thought any shop and my flat were all I needed to be happy."

অচিরেই এ ভুল ভাঙলো তার। দুর্বিষহ নগর জীবন থেকে মা আর মেয়ে পালিয়ে বাঁচতে চাইলেন। তাদের ধারণা গাঁয়ে এখনও শান্তি আছে, স্বাচ্ছন্দ্য আছে। রোমের দক্ষিণে পাহাড়িয়া এলাকায় একটি গ্রামে এসে আশ্রয় নিলো দু'জন। সিসিরার জন্ম এ গাঁয়ে। কিন্তু একি? শান্তি কোথায়? ক্ষুধার্ত চাষী, আর উদ্বাস্তু মানুষ নিঃশেষ করে দিলো সিসিরার শান্তির শেষ সম্বলটুকু কালোবাজারের পয়সা কটি। তার উপর জার্মান সৈন্যরা আছে, আছে ফ্যাসিস্ত গুণ্ডারা। দ্বিতীয়বারের মতো ভুল ভাঙলো সিসিরার। এখন তার একমাত্র কামনা কবে ইংরেজরা আসবে, কবে এ যুদ্ধ শেষ হবে, তারা রোমে ফিরবে মিত্রপক্ষ এলোও কদিন। দু'হাতে বিস্কুট ছড়ালো, সিগারেট ছড়ালো দু'দিন ধরে, তারপর তৃতীয় দিনে আবার যেন চলে গেল কোথায়। চলে গেল, কিন্তু সিসিরার জন্যে রেখে গেল তার জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা।

মিত্রপক্ষের সৈন্যদের হাতেই ধর্ষিতা হলো সিসিরার নিষ্পাপ কুমারী রোসেত্তা গাঁয়ের চার্চে ম্যাডোনার চোখের সামনেই সম্পূর্ণ নগ্নভাবে কয়েকটি নরকের বাহিনী কেড়ে নিয়ে গেল রোসেত্তার কুমারী জীবনের গৌরব।

আর কি রইলো। মায়ের জীবনে। রোসেত্তা এখন উন্মাদ। যে কেউ পিস দিলে সে এখন হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। আর পাপ বোধ নেই, ধর্মবোধ নেই। সিসিরা জানে তার কারণটি কি।

Having endured what she had endured under the very eyes of Madona, without the Madona doing anything to Prevent it, she is now felt that, nothing in this world mattered, noteven religion.

সে এক মর্মান্তিক উপলব্ধি। লেখক এখানেই ছেড়ে দেননি কিন্তু রোসেত্তা কিংবা তার মাকে। যুদ্ধাপরাধের আবর্জনায় এদের হারাতে দেননি তিনি। শেষ দৃশ্যে রোসেত্তাকে দেখতে পাই, লরীর উপর উঠে সে নাচছে, গান গাইছে, কাঁদছে। ঠিক যেমন একদিনে বাচ্চা মেয়ে রোসেত্তা নাচতো, কাঁদতো তেমনি। এই লরীটি চলেছে রোমের দিকে। আশায় সহসা কেন জানি তার ভরে উঠলো বুক। তাহলে, তাহলে মেয়েকে ফিরে পেয়েছেন তিনি, তাহলে রোমের সেই দোকানটি, সেই ফ্ল্যাটটি ও হয়ত ফিরে পাবেন তিনি।

সিসিরার মুখে যেন কথা বলছেন স্বয়ং লেখক :

I owed this newborn confidence to Rosetta and to her singing and her tears had it not been for the sorrow on Rosetta's part there would have arrived in Rome, not the two unoffending women who had left it a year before, but the thief and the prostitude which they become during the war and because of the war.

মোরাভিয়ার এই উপন্যাসটি মানবতার এই জায়গাতেই মূল্যবান। Woman of Rome—Conjugal love, এর জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকের এই গান দুটি মেয়ের জীবনে এবং কণ্ঠে যেখানে এসে পৌঁছেছে তাতে যদি বইটি যুদ্ধ উপন্যাসের জগতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা বলে নাও হয়, মোরাভিয়ার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস অবশ্যই।

হাতে কোন কাজ নেই। অলস মধ্যাহ্নে সুস্মিতার মুখখানা কেমন করুণ মায়ায় মনে হয়। তবু কিছুদিন আগে কলেজটা ছিল। বি, এ, পাশ করার পর সুস্মিতার লেখাপড়ার পাট চুকেছে। এমন কর্মহীনতা জীবনে যেন এই প্রথম। এই দিনগুলোকে আগে কতই না সুখকর বলে মনে ভেবেছে। অথচ আজ হাতের কাছে সেই আকাঙ্ক্ষার দিনগুলো হাজির। আগে ভেবেছে এই দিনগুলো কী মধুমাখাই না হবে। আশ্চর্য এই মুহূর্তে সুস্মিতার মনে হল সেই আগের কলেজ জীবনটাই ভাল ছিল। সেই হাসিখুশী দিনগুলি।

শীতের দুপুর। ছাদের ওপর একফালি রোদ পড়েছে। সুস্মিতা ছাদের আলসেটায় দেহটা এলিয়ে দেয়। বড় আরামের রোদ। তবু মনটা খুশীর আমেজে আসে না। কেমন যেন একটা বিষণ্ণতা ওকে ঘিরে রেখেছে। কেমন নিস্তব্ধ হয়ে আছে কোলকাতার এই পাড়াটা। যারা কাজের মানুষ তারা সবাই কাজে গেছে বাড়িগুলো ফাঁকা। বুড়ো বুড়ি আর বৌগুলো দুপুরে ঘুম দিতে ব্যস্ত। সুস্মিতার দুপুরে ঘুম আসে না অভ্যাস নেই। এতদিনের অভ্যাস অনুযায়ী দু'এক খানা বই নিয়ে মন দিতে চেষ্টা করেছে। মন বসেনি

সুস্মিতার এখন বিয়ের বয়স হয়েছে। বাবা মা সবাই উঠে পড়ে লেগেছেন। দু'একটা সম্বন্ধ আসছে। স্পষ্টই বলেন। "সুমির বিয়েটা দিলেই আমার সব ভাবনার শেষ।" সুস্মিতা দেখতেও খারাপ নয়। খুব

সুন্দরী না হলেও সুন্দরী বললে দোষ হয় না। আয়নায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুস্মিতা ঘুঁটিয়ে ঘুঁটিয়ে নিজেকে দেখেছে। দেহের তুলনায় মুখখানা ওর সত্যিই সুন্দর। বুক যদি আরো চওড়া হতো তাহলে সুস্মিতা নিঃসন্দেহে অপরূপ সুন্দরী হয়ে উঠত। তবে ওর সম্বল ঐ চোখ জোড়া। বড় বড় ভাগর ভাগর যেন দুটো কালো ভ্রমর ভ্রূর নীচে বসে আছে। রমেন বলত, "তোমার চোখ জোড়া কী চমৎকার!" তারপর কেমন যেন হয়ে যেত। চোখের দিকে চেয়ে ওর দৃষ্টি আরো গভীর হয়ে আসত। আরো অর্থময় হত। সুস্মিতা ভয়ানক লজ্জা পেয়ে ওর সামনে থেকে উঠে যেত।

শীতের রোদ। সুস্মিতা গভীর আলস্যে নিজের পা দুটো গুটিয়ে আরামের ওপরে বসে। দূরে একজন পথিক নির্জন পথে একা হেঁটে চলেছে। ওর যেন কোন কাজ নেই। কেমন নিশ্চিন্তে ভাবতে ভাবতে চলেছে। দেখে দেখলে মনে হয় লোকটার চলবার ক্ষমতা নেই। সুস্মিতা মাথার উপরে আকাশের দিকে তাকাল। ঘন নীল এক টুকরো মেঘের চিহ্নও নেই কোনখানে। আমাদের দেশের আকাশটা এমন ঘন নীল এ যেন ওর কাছে অজানা ছিল। তবে বর্ষার আকাশটা ওর মনে গেঁথে আছে।

সুস্মিতা ভাবতে চেষ্টা করে। বর্ষার ঝির ঝির বৃষ্টি। তখন এমন হাসি হাসি নীল আকাশ উধাও হয়ে যায়। এমনি এক বর্ষার দিনের কথাই মনে পড়ে। রমেন সেদিন বিকেলে হঠাৎ এসে হাজির। সুস্মিতা অবশ্য জানত রমেন কার কাছে এসেছে। রমেনের বন্ধু সুস্মিতার দাদা। কিন্তু দাদাতো বাড়িতে নেই।

"শুভ বাড়ি নেই?" বলেই রমেন উত্তরের অপেক্ষা না করে সামনের চেয়ারটায় বসে পড়েছিল।

"চা আনব?" বলে সুস্মিতা পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। রমেন ওর হাত দুখানা নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে বলেছে—না না—আমার পাশে এসে বোস।

সুস্মিতা তাড়াতাড়ি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। তারপর যতক্ষণ না দাদা এসেছে ততক্ষণ আর রমেনের কাছে আসেনি। রমেন যাবার আগে এমন বিষণ্ণতা বয়ে নিয়ে ফিরেছিল সে ব্যথা আজও বাজে।

তারপর সম্পর্কটা কেমন যেন দূরের হয়ে গেল। সুস্মিতাই ইচ্ছে করে রমেনকে এড়িয়ে চলত। রমেন আসত। বাইরের ঘরে বসে শুভর সঙ্গে গল্প করে চলে যেত। ক্রমে ও আসাও কমিয়ে দিল।

সেই শেষ দেখা হয়েছে কলেজ স্ট্রীটে। রমেন ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরছিল। সুস্মিতা চলছিল এক বান্ধবীর বাড়ীতে। রমেন ছাড়ল না। জোর করে নিয়ে গেল এক রেস্তোরাঁয়। বলল, "আমাকে তোমার ভাল লাগে না।"

সুস্মিতার সেদিন কেমন যেন রাগ হল। বলল, "জানেন যখন তখন আর নতুন করে জানার কী প্রয়োজন।" রমেন একটি কথাও বলেনি। শুধু যাবার আগে বলেছে, "সুমি, আমি আর তোমাকে বিরক্ত করব না—কোলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছি।" সেদিন সুস্মিতা জিজ্ঞাসাও করেনি, রমেন কোথায় যাবে। ছাড়া পেয়ে কেমন যেন নিষ্কৃতি পেয়েছিল। এক মুহূর্তও দেরী না করে রমেনকে বিদায় না জানিয়েই সাধনের ট্রামখানায় উঠে পড়েছিল। সেদিন রমেনকে ভাল লাগেনি। ও যেন কেমন নেতিয়ে পড়া স্বভাবের। মেয়েরা পুরুষের এমন অসহায় ভাব কখনোই দেখতে পারে না। সুস্মিতার মনে হয়েছে রমেনের মধ্যে যেন পৌরুষের অভাব ছিল।

তারপর আরো খারাপ লেগেছে সুস্মিতার। রমেন পরীক্ষায় ফেল করেছে। সুস্মিতার দাদা পাশ করেছে। মফঃস্বলের একটা কলেজে প্রফেসর হয়ে সেখানেই আছে এখন। রমেনের খবর রাখেনি। তবে রমেন আর পড়ছে না শুনেছে। কোথায় আছে সঠিক জানে না।

সুস্মিতা মাথার চুলগুলোয় হাত বুলিয়ে ভাবছে। তবে রমেন তো বেশ বড়লোকের ছেলে। দাদা বলেছিল ওদের বংশে ওই নাকি এখন বকে গেল। ওর দাদারা সবাই এক একটা কেউকেটা। রমেনের চেহারা ভাবতে চেষ্টা করে। লম্বা রোগা। ধবধবে ফরসা গায়ের রঙ। নাক মুখ চোখ কোথাও খুঁত নেই। তবে পোশাক পরিচ্ছদে মনোযোগী নয়। খুব সাদাসিধে।

প্রথম প্রথম যখন আসত ভয়ানক মুখচোরা। সুস্মিতার সামনে কথা বলতে যেমে উঠত। শুভ এই নিয়ে ঠাট্টা

করত। শুভটা অবশ্য সুস্মিতার সঙ্গে দিয়েছিল।

সেই লাজুক মানুষটা একদিন কেমন যেন দাম্ভিক হয়ে উঠেছিল। স্বল্পভাষী রমেন কেন জানি সুস্মিতার কাছে মুখর হয়ে উঠেছিল। সুস্মিতার—অবশ্য সেদিন এটা ভাল লাগেনি। মনে মনে ও পুরুষের একটা বলিষ্ঠ আর তীক্ষ্ণ মূর্তি ভেবে রেখেছিল। রমেনের মধ্যে সেই তেজদীপ্ত পুরুষের কোন সন্ধানই যেন ও পায়নি। বরং মনে হয়েছে মান পরাজিতের ব্যর্থতাই যেন রমেন বাচনভঙ্গিতে জানিয়েছে।

সুস্মিতা শুনেছিল রমেন কবিতা লিখত। দু'একখানা পত্র পত্রিকা ওকে অবশ্য ফেরিয়েছিল। কিন্তু তাতে সুস্মিতা সন্তুষ্ট হয় নি। বরঞ্চ মনে মনে বিদ্রূপ করেছে। পুরুষ মানুষের অমন সেন্টিমেন্টাল ব্যাপার সুস্মিতার দুই চোখের বিষ। সব সময়েই যেন পরাজিতের ভাব। তাছাড়া অতখানি কোমলতা পুরুষের মধ্যে বড় বিসদৃশ্য। সুস্মিতার মনে আছে। একদিন ও স্পষ্টই বলেছিল, "রমেনদা আচ্ছা আপনি ঐ সব সেন্টিমেন্টাল কবিতাগুলো লেখেন কেন?"

সাহিত্য রমেনের জীবনে অবজ্ঞার বস্তু ছিল না। তাই ও ভয়ানক ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। মুখে অবশ্য বলেছিল। "কিছুটা শান্তি পাই।"

—"আপনার অশান্তির কি কারণটা ঘটল।" প্রশ্নটা নিজের কানেও সেদিন রূঢ় শুনিয়েছিল তবু একটা মানুষের দুঃখ দৌড়ঝাঁপে ছাপিয়ে তোলাই যেন সেদিন সুস্মিতার কর্তব্য ছিল। রমেনের মুখেচোখে সেদিন কালির ছোপ ফেলা দিয়েছিল

সুস্মিতা সুযোগ পেলেই রমেনকে আঘাত করতে ছাড়তো না। জিজ্ঞেস করেছে, "রমেনদা ফুটবল খেলতে জানেন?

রমেন বলেছে, "ও সব সাঁঘাতিক খেলায় আমার আগ্রহ নেই।"

সুস্মিতা বলেছে, "সেই জন্যেই এত কমজোর মনের দশা হয়েছে। যদি একটু সাঁতরাবার চেষ্টা করতেন তাহলে মানুষ হতেন।"

রমেন সেদিন কোন কথা না বলে উঠে চলে গেছে।

সুস্মিতা জানতো এ ধরনের কথা রমেনের ভাল লাগে না। অথচ রমেন এলেই এ ধরনের কথা তুলত ফলে রমেন বেশীক্ষণ টিকতে না পেরে চলে যেত।

তবুও ভিতরে ভিতরে সুস্মিতা রমেনকে কিছুটা প্রশ্রয় দিয়েছিল। ফলে রমেন সুস্মিতাকে ছাড়তে পারত না।

মামা চিন্তার ফাঁকে কখন দুপুরটা কেটে গেছে। সুস্মিতার চমক লাগলো নীচে সরভাই কড়ানাড়ার শব্দে। ছাদের কার্নিশে ঝুঁকে দেখল। শুভ এসেছে আজ শনিবার ওর মনে মনেই ছিল না। প্রতি শনিবারেই দাদা বাড়িতে আসে। বোবাবারটা কাটিয়ে আবার সোমবারে সকালে চলে যায়। তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

শুভ বললো, "মা কোথায় রে?"

—"বোধ হয় পাশের বাড়ির কিছু।"

—"ও!" শুভ ছোট্ট ব্যাগটা সুস্মিতার হাতে দিয়ে ঘরে গেল জামা কাপড় বদলাতে।

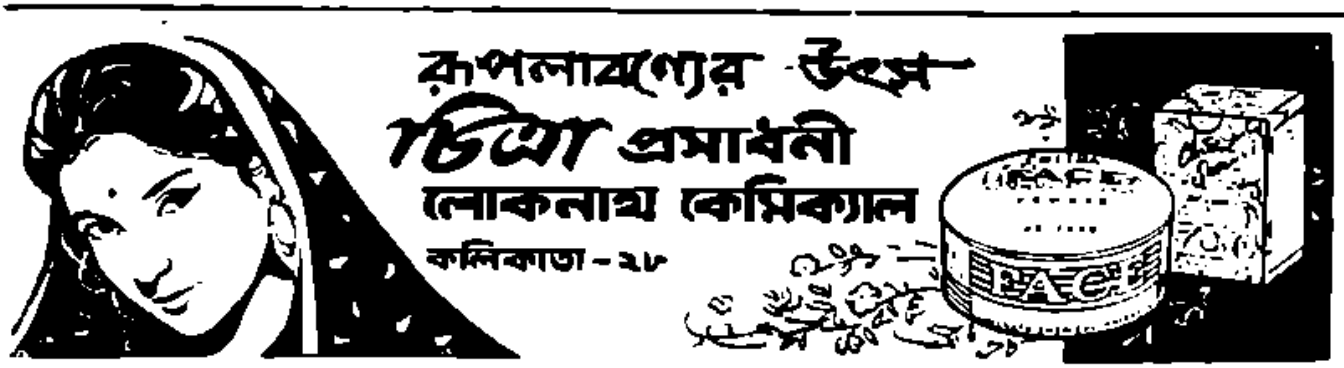

আজকে দাদাকে দেখে সুস্মিতার কেন জানি বার বার ইচ্ছে হল রমেনের কথা জিজ্ঞেস করতে। বলি বলি করেও ওর মুখে এল না। চা জলখাবার খেয়ে শুভ নতুন প্রিন্সিপালের গল্প, ছাত্রদের গল্প, হুমায়ুনের গল্প—বলে চলল। কিন্তু সুস্মিতার মনে বার বার রমেনের কথাটাই ভীড় করছে। জিজ্ঞাসা করতে আজ কেমন যেন লজ্জা করছে। অথচ এর আগে তো অবাধাসেই রমেনের সম্বন্ধে কথা বলেছে দাদার সংগে।

কথাটা বলতে না পেরে সুস্মিতা পুরানো বইগুলো নাড়াচাড়া করছিল। দৃষ্টি পড়ল অনেক দিন আগেকার একখানা পত্রিকার উপরে। পাতা উল্টে সূচীপত্রে নাম পড়তেই নজরে পড়ল কবিতা। সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। কবিতাটি বের করে দেখতেই শুভর নজরে পড়তেই সে বললো।

"ওহো—ভাল কথা—রমেনের কাও শুনেছিস? সুস্মিতা নিজেকে লুকিয়ে রেখে সহজেই বললো।

'কেন কি হয়েছে?'

—'বাড়ীতে কোন খোঁজ খবর দেয়না। চাকরী নিয়ে কোথায় আসামে না দার্জা পাহাড়ে চলে গিয়েছে। ওর সেজদার সংগে সেদিন দেখা। বলছিলেন—'রমেনটার কি হয়েছে বলতে পার?

সুস্মিতা কিছু না বললেও মনে মনে যেন বুঝলো জগতের আর কেউ না জানুক সুস্মিতা জানে রমেনের কি হয়েছে।

রাত্রে শুয়ে সুস্মিতা ভাবে। রমেন এমন অভিমানী সে তো তার জানা ছিল না! মানুষ একজনের উপরে অভিমান করে এমন দূরে সরে যেতে পারে। আশ্চর্য সেই ধীর, স্থির, লাজুক মানুষটা এতখানি আঘাত পেয়েছে তার কাছ থেকে! সুস্মিতা ভাবতে চেষ্টা করে নিঃসঙ্গ মানুষটির কথা। দূরে কোন অজানা অচেনা পরিবেশে পড়ে আছে কে জানে। এখনও হয়ত প্রতিদিন প্রতিক্ষণ তাকেই ভাবে। সুস্মিতার মনটা আনন্দে নেচে ওঠে। এমন আনন্দ কটা মেয়ের জন্যে জোটে!

সুস্মিতা আর ভাবতে পারে না। তারই জন্য একজন মানুষ সব কিছু ত্যাগ করে নীরবে অশ্রুপাত করে চলেছে! একথা ভাবতেও গর্বে বুক ভরে ওঠে। রাত্রির অন্ধকারে সুস্মিতার কামনার রংগগুলো দপ্ দপ্ করে জ্বলে ওঠে। আলো জ্বালিয়ে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায়। কপোলের রাঙ্গা ছোপ ওকে আবেশে বিহ্বল করে তোলে। রমেন তাকে এত ভালবাসে! সে রমেনের এত প্রিয়। তাকে না পেয়ে রমেনের কাছে জগত তুচ্ছ হয়ে গেছে।

আলো নিভিয়ে দিয়ে সুস্মিতা আবার শুয়ে পড়ে। ঘন অন্ধকার সংগে সংগে সস্মিতাকে যেন ঢেকে ফেলে। কেমন যেন একটা ভয় ভয় ভাব মনের মধ্যে উঁকি দেয়। আলোচীন ঘরে সুস্মিতা অজানা আশংকায় শিউরে ওঠে। এতক্ষণের ভাবনাগুলো যদি ভুল হয়? কিছুক্ষণ আগে রমেনের প্রতি ভালবাসার যে ফুলঝুরিটা ফুটে উঠেছিল—সে যেন হৃদয়ের দারুণ তাপে দগ্ধ হয়ে গেল। রমেন কি আজও সুস্মিতাকে মনে রেখেছে? রমেন কেন তুচ্ছ একটা মেয়ের জন্য এতখানি ব্যথা পাবে? সামান্য একটা মেয়ের জন্য সুন্দর পৃথিবীর সমস্ত আনন্দকে অস্বীকার করতে পারে। নিজেকেও কেন হারিয়ে ফেলবে। সুস্মিতা রমেনের কাছে মূল্যহীন। তাছাড়া সেই প্রত্যাখানের পরও কি রমেন তাকে আপন বলে ভাবতে পারছে। অসম্ভব—সুস্মিতার সংখচিন্তার সবই ভুল।

শীতের রাত্রেও ঘাম দেখা দেয় সুস্মিতার কপালে। যদি ঘরে আলো থাকতো দেখা যেত রক্তহীন পাণ্ডুর মুখখানাকে।

এতক্ষণে যে পাশ বালিশকে পরম নিশ্চিন্তে নিজের বুকে টেনে নিয়েছিল—সে বাহু শিথিল হয়ে পড়েছে। সব হারিয়ে বিরুক্ততার গভীর খাদেও যেন তলিয়ে যাবে।

মাকে একবার প্রাণপণে বালিশটাকে আঁকড়ে ধরে ভাবতে চেষ্টা করে—মা সে কিছুই হারায়নি। কিন্তু পরক্ষণেই হতাশায়, নিরাশায় ভেঙ্গে পড়ে। ক্লান্ত শ্রান্ত দেহটাকে অসহায়ভাবে এলিয়ে দিয়ে চাপা কান্নায় কেঁদে ওঠে। রাত্রির অন্ধকার অতীতের সব স্মৃতির ছবিকে কুয়াশার জালে জড়িয়ে ফেলে। সব হারিয়ে গেল। যা রইল তা—হাহাকার, তা শূন্যতা সুস্মিতা অন্ধকারে দিশে হারিয়ে ফুঁপে কেঁদে ওঠে।

ভালবাসা, ঘাতকের রক্তহাত | কৃষ্ণ ধর

ধন্যবাদ দিই কাকে, এত উপহার কাহারা
প্রত্যহ আনে, অন্ধকার ঘরে ঘাতকের রক্তহাত
ফিরে গেছে বহুবার, পায়নি নাগাল তাই
আশ্চর্যরকম বেঁচে আছি। কাকে দিই ধন্যবাদ।

একদিন ভালোলেগেছিলো, আজ যদি সেই কথা
বলি, তাহলে দস্যুরা শাসায়, ভাড়াটে প্রেমিক
তারা সব, দেহটাকে তারা নাকি কিনেছে অনেক
দামে, হায়রে রমণী, তুমি ব্যর্থ শুধু কাঁদো।

আরেক প্রেমিক মরেছিল, অরণ্যের তৃণগুলি
সে খবর রাখে, এখনও সেখানে ফোটে অনেক
সুদৃঢ় ফুল, ডালপালা রক্তের স্মৃতি নিয়ে দোলে
যেহেতু সে ভালোবেসেছিল,
ভালবাসা কখনো মরে না।

ধন্যবাদ দিই কাকে, এখনও মরেনি ভালবাসা
(যদিও ঘাতক ফেরে অন্ধকারে, যদিও ঘাতক)
অন্ধকারে ঢেউ ওঠে, মুখ তার ভাসে অহরহ
উজ্জ্বল তাহার মুখ, উজ্জ্বল, উজ্জ্বলতর মুখ।

ইদানীং কৃষ্ণ | শামসুল হক

কোনো রাধা রাত জেগে বসে নেই ব্যর্থ কৃষ্ণ
নৌকোর মাস্তুলে
প্রাণপণে দড়ি টানে কাকদ্বীপ সাগরদ্বীপের
প্রাগৈতিহাসিক জলে বাহুড়ের মতো আছে ঝুলে
ছেঁড়া পাল ঠিক যেন রাস্তায় উপুড় করে ফেলে
আসা তার সাত মাসের
নামহীন শিশুপুত্র

পূর্ণিমা এসেছে তবু আজ কোনো চন্দ্রাবলী আসে
নাই আর
অনেক সংক্ষেপে কৃষ্ণ বাঁক ঘুরে চলে যাবে
এসেছে জোয়ার
নৌকা বাঁধা খুঁটি ধরে চেয়ে আছে চিরআয়ুষ্মতী
বধূ অর্ধ নগ্ন বুকে
দেড় সের চাল বাঁধা পুটুলিটা পড়ে আছে নৌকোর
গলুইয়ের পাশে মাথা ঝুঁকে
পরাজিত সৈনিকের মতো

স্মৃতির অতীত | পঞ্চানন মজুমদার

সেই নিশীথ রাত্রির স্মৃতিরা যদি ভিড় করে,
মনের গহন কোণে
কিংবা কোন লগ্নে
স্বপ্নের মতো মুছে দিও অন্তর হতে।

তুমি কি জানো না? পৃথিবীর ইতিহাসে
কত শত প্রীতি
মরে গেছে যুগে যুগে
আজও যদি মনে নূতন করে
যুগান্তরের চক্র সেতো।
আমি কি কেড়েছি তোমায়?
কিংবা কোন মুহূর্তে
তুমি কি আমারে?

তোমার সুরের মূর্চ্ছনায় কি
আকুল করেছ কারো হৃদয়?
তাই যদি হয় ব্যাকুলতায় আর অশ্রুতে
গোপনের কেন ব্যর্থ প্রয়াস—।
নক্ষত্রের একটি মালা যদি দেখে থাকে
সেই রাত্রির স্মৃতি
তারে তুমি মুছে দিও অন্তর হতে।

আমি শুধু দূর হতে তোমার সুরের মূর্ছনায়
বারে বারে ফিরে যাবো দূরে
আরও দূরের সীমানায় সীমাহীন পারাবারে।

আজও মনে পড়ে তোমার সেই গান
সুর তার মরে গেছে
অতীত স্মৃতির গহ্বরে
মরেনি তার সেই সুমধুর ঝঙ্কার।

দুটি কবিতা | পার্থ রাহা

কে আমায় ডাক দেয়?
তার মুখ দেখিনি কখনো
অথচ সে দীর্ঘ হাতে
চূর্ণ করে আলোর ইসারা।
মনে হয়, এইমাত্র শবের বুকে হাত দিয়ে
স্পর্শ পাইনি।
তারপর, হাতও না।
অন্ধকার লাগে॥

॥ ২ ॥

যে কান্না আমি কাঁদতে চাইনি
তাই আজ বৃষ্টি হয়ে এলো।
চোখের জলে, কুয়াশায় আবছা হল
তোমার মুখ।

যখন কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হল চোখ
তখন তুমি চোখ মুছিয়ে দিলে
আর নিষ্ঠুর মনে হল না তোমাকে॥

অনন্য সাধারণ চিত্র কাহিনী 'পলাতক'

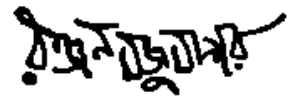

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—ধারিক। কাহিনী—মনোজ বসু। প্রযোজক—ভি, শান্তারাম। সঙ্গীত পরিচালনা—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। আলোকচিত্র—সৌমেন্দু রায়। শিল্প নির্দেশ—বংশীচন্দ্র গুপ্ত। সম্পাদনা—দুলাল দত্ত। শব্দ যোজনা—সোরেন চট্টোপাধ্যায়। নৃত্যনির্দেশনা—প্রভাত ঘোষ। ব্যবস্থাপনা—ভানু ঘোষ। গীতরচনা—মুকুল দত্ত এবং গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। রূপদানে—অনুপকুমার, সন্ধ্যা রায়, অনুভা গুপ্ত, রুমা গুহঠাকুরতা ভারতী দেবী, অমিতবরণ, অহর রায়, অহর গাঙ্গুলী, রবি ঘোষ, জাবেদ মুখার্জি, হরিধন মুখার্জি, শিবতা সিংহ প্রভৃতি।

বাংলা দেশের চলচ্চিত্র বর্তমান দশকে স্বভাবতই নব নব পরীক্ষা-নিরিক্ষার উদ্বুদ্ধ। ইদানিংকালে এ দেশের চলচ্চিত্রে এমন এক নব চেতনার উন্মেষ হয়েছে যার শিল্পনিরিখ খুবই উন্নত মানের। দেশের শিক্ষা সংস্কৃতির, প্রগতিমনা শিল্প বিকাশে মুকুমার শিল্প চর্চার অন্যান্য বিভাগের ন্যায় চলচ্চিত্রের দান তাই আজ একান্তই অনস্বীকার্য হয়ে উঠেছে। সুরুচী প্রবণতা আজকের দিনের চলচ্চিত্র নির্মাতাদের মধ্যে এমন এক দায়িত্বশীলতার সঞ্চার করেছে যে মাত্র আট দশ বছর আগেও যে টাপ্‌শ্রেণীর শুধুমাত্র কমার্শিয়াল চিত্র প্রস্তুতির ঝোঁক দেখা দিয়েছিল তা আজ নিতান্তই হাস্যকর বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী নিরন্তর পরিবর্তনশীল, এবং অদ্যকালীন চলচ্চিত্র শিল্প বিকাশে সেই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গীই লক্ষ লক্ষ দর্শককে সুরুচী-সম্পন্ন ও শিল্প সৌকার্যমণ্ডিত চিত্রের দর্শকে রূপান্তরিত করেছে। আশা করা যায় এমনই ভাবেই বাংলাদেশের সাংস্কৃতিকঐতিহ্য বরাবরই অধঃপাতের হাত হতে রক্ষিত হবে।

এবং তারই কিঞ্চিৎ দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন বাংলাদেশের চলচ্চিত্র জগতের কতিপয় আদর্শনিষ্ঠ তরুণ কলাকুশলী যাঁরা আত্মপ্রচারে কুণ্ঠিত এবং শুধুমাত্র 'ধারিক' গোষ্ঠীর অন্তরালেই নিঃশব্দে সেই মহান ব্রত উদ্‌যাপনে উদগ্রীব। অগণিত সাধুবাদ সেই তরুণ পরিচালক গোষ্ঠীকে যাঁরা আমাদের ইতিপূর্বে 'চাওয়া পাওয়া,' 'স্মৃতিটুকু থাক' ও 'কাঁচের স্বর্গ'র মত সুন্দর তিনটি নাটকীয় চিত্র উপহার দিয়েছেন এবং বর্তমানে তাঁরাই 'পলাতক' এর মত এমন এক ঘনেবিকআবেদন সম্পন্ন নাটকীয় রসঘন চিত্র উপহার দিয়েছেন। মৌলিক ভঙ্গি প্রধানতার মধ্যে দিয়ে এবং সামান্য সামান্য পরীক্ষার ক্ষেত্রেও এক বিশেষ আঙ্গিক-

প্রয়োগ কুশলতা সাফল্য মণ্ডিত আলোচ্য চিত্রটি বলিষ্ঠ উপস্থাপনের গুণে মুহূর্ত মুহূর্ত এক অন্তরঙ্গ নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি করেছে। চিরাচরিত নাটকীয় চড়োন্ত উত্তরণের বিশেষ ফর্মুলা ব্যবহার সম্পূর্ণ অনুপস্থিত রেখে এক আশ্চর্য হৃদয়াবেগের মধ্যে শেষ পর্যন্ত নাটকীয় তীব্রতা যে কী করে বজায় রাখা যায় 'পলাতক' চিত্রে তা দেখতে পাওয়া গেলো। এতে আমাদের মন পরিপূর্ণ হয়েছে। অনিবার্য নৈরাশ্যকর অবস্থার সম্পূর্ণ অব্যাহতির মধ্যে দিয়ে এক অনাবিল বেদনাঘন পরিপূর্ণতা নিয়ে দর্শকেরা যখন ছবির শেষদৃশ্য দেখে রুমালে বা শাড়ীর খুঁটে চোখ মুছতে মুছতে প্রেক্ষাগৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছেন তখনই ছবির সাফল্য সম্পর্কে সর্বশ্রেণীর দর্শক সমালোচককে একমত হতে হয়েছে।

পলাতক চিত্রে বর্ণিত কাহিনীতে আমরা প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার আংটী চাটুয্যের ভাই বসন্তকে দেখতে পাই ঘর ছেড়ে পথে পথে পরিক্রমাশীল, গৃহে তার মন নেই, বিপুল জমিদারীতে তার আসক্তি নেই, প্রিয়জনের স্নেহে তার বন্ধন নেই, কেবল আছে পথের টান। বাল্যকাল হতে সংসারে নিষ্ঠাদাক্ষি তাকে বারংবার নিরুদ্দেশের পথে পথিক করেছে। আপন খেয়াল খুশীতে সেই নিরুদ্দেশের পথে চলতে চলতে কখনও বা দুদিন কোথাও বাসা বেঁধেছে এবং সেই দুদিন উচ্চকিত এবং প্রাণবন্ত হৈ হট্টগোল আর আনন্দ কলকলে একাকার হয়ে আবার অপরিচিত অজানা পথের টানে বেরিয়ে পড়েছে। চলার পথে ভ্রান্তি বিনোদনের জন্য বাউণ্ডুলে বসন্ত যখন পাগল করে দেওয়া সুরেলা কণ্ঠে অকস্মাৎ গেয়ে ওঠে—'জীবনপুরের পথিক যে ভাই, কোন জন্মেই সান্ত্বনা নাই, কোথাও আমার মনের মতন খেলার সাথী পেলাম না—।'

এমনই এক নিরুদ্দেশ যাত্রার অবসরক্ষণে স্বভাব-বাউণ্ডুলে এসে বাসা বাঁধে নীলকান্ত কবিরাজের গৃহে। পেশায় কবিরাজ হলেও বিলাসী নীলকান্ত একমাত্র আদরের অনূঢ়া কন্যা রত্নিবতীকে নিয়ে পলাশী, পেশায় ঝিনুকুমার আগ্রহ নেই, এত আসক্তি তার অন্তরঙ্গ যাত্রাদল গঠনে। নিজে সেই যাত্রাদলের অধিকারী, গ্রামের উৎসাহী যুবকদের নিয়ে মোসাহেবখানার প্রায় দিবারাত্রই বসলা এলে বিভিন্ন নাটকের।

বসন্ত এসে পড়ে কবিরাজের কাণ্ডকারখানা দেখে স্তম্ভিত। এমন হয় মানুষ? এই নীলকান্ত কবিরাজের মত মানুষ ঘরে যার অনূঢ়া অরক্ষণীয়া কন্যা, সে কিনা দিবারাত্র যাত্রার মহড়া দেয় আর গাঁজা টানে? একরোখা রগচটা বাউণ্ডুলে হলেও বসন্তের বাস্তব বিবেচনা বুদ্ধি মাথা চাড়া দেয়। সে কবিরাজকে নিরস্ত করার চেষ্টা করে। কিন্তু ফল হয় উল্টো। গানের সুরেলা গলা শুনে স্বয়ং কবিরাজই তাকে তার যাত্রাদলে যোগদানের আমন্ত্রণ জানায়। বসন্ত বলে যাত্রাদল তো তুচ্ছ, পৃথিবীর কোন কিছুতেই তার আসক্তি নেই। রগচটা বাউণ্ডুলে বসন্তকে তখন আর চিনতে কারও ভুল হয় না। রাশভারী জমিদার আংটী চাটুয্যে যার দশ আঙুলে দশটি মণি খচিত আংটী তারই সম্মানিত ভ্রাতা স্বয়ং বসন্ত চাটুয্যে। নীলকান্ত কবিরাজের অনূঢ়া কন্যা বসন্তের হৃদয়ের সন্ধান পেয়েছিল কোন গতিকে এই ঘর পালানো পুরুষ মানুষটিকে সে অকস্মাৎ কখন যে মনে মনে ভালোবেসেছিল তা সে নিজেও জানতো না। জানতে পারলো তখনই যখন একদিন বসন্ত আলোচ্য গ্রাম ছেড়ে আবার নিরুদ্দেশের পথে বেরিয়ে পড়বার উদ্যোগ করলো।

কিন্তু বসন্তর যাওয়া আর হয়ে উঠলো না শেষ পর্যন্ত। পোঁটলাটি বগলদাবা করে খোঁড়া ঘাটে পৌঁছে থমকে দাঁড়াতে হলো তাকে। নীলকান্তর যাত্রাদলের ছোকরাবাদক তখন মরমী সুরে একান্তে বসে বসে বাজাচ্ছিল তার প্রিয় বেহালাটি। বসন্তর ঘর পালানো মন উদাস হলো। সে তৎক্ষণাৎ স্থির করে বসলো বেহালার ছড়টানার কায়দাটি তাকে রপ্ত করতেই হবে। আর যেমন সিদ্ধান্ত, তেমনই কাজ। বেহালাটি কিনে বসলো সে।

রত্নিবতী তার মনের গোপন আকাঙ্ক্ষাটুকু খুলে বলতে পারেনি। সে চেয়েছিল বসন্তকে ঘরে রাখতে। সেই আপন ভোলা মানুষটিকে ভালোবেসে আপন করে নিজের ঘরে বাঁধতে চেয়েছিল। বসন্তর সুরেলা গলা আর কিন্তুত বাদ্যযন্ত্রে মজেছিল সে, কিন্তু বসন্ত কারও মনের খবর পেতে চায় না। তাই সে বেরিয়ে পড়েছিল আপন খেয়াল খুশীতে। সেই বসন্তকে বেহালা

হাতে আবার ফিরে আসতে দেখে হরিমতীর চোখে মুখে খুশীর আবেশ ছড়িয়ে পড়লো। সে আবার নতুন ভাবে বাঁচলো।

তারপর চললো নাটকীয় কাহিনীর ঘটনা। বসন্ত গায়ছাকোমরগাছী করে বেহালা মকুলো করে আর দুবেলা নীলকান্ত কবিরাজের বাড়িতে অতিথি হয়। এমন সময় গ্রামে এলো এক যুযুরের দল। নাচে গানে লাস্যে মন মাতিয়ে কিছুদিন অন্তর অন্তর এ গ্রাম সে গ্রাম ঘুরে বেড়ানোই তাদের পেশা। সেই দলেরই এক লাস্যময়ী মেয়ে গোলাপ। অঙ্গে যার জ্বালাধরা যৌবন, কটাক্ষে যে ধ্বংসলীলা, নৃত্যগীতে যে মেয়ে সহস্রজনের আকাঙ্ক্ষিতা সেই মেয়ের চোখে চোখ রেখে বসন্ত হঠাৎ যেন মনে মনে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলো তারপর একান্ত অচিন্তিতেই গিয়ে জুটে গেলো সেই যুযুরের দলে। গিয়েই তর্জার লড়াই। দলের অপর একটি মেয়ে, নাম যার ময়না প্রথম সাক্ষাতেই বসন্তকে খোঁচা দিয়ে বসলো। ময়নার এই অপ্রত্যাশিত আক্রমনের জন্য প্রস্তুত ছিল না তাই আঘাতের প্রথম ধাক্কা সামলে সেও আক্রমণ করলো। গোলাপ দুজনের কাণ্ডকারখানায় বিস্ময়ে হতবাক হলেও বসন্তকে গুনীমানুষ হিসাবে মেনে নিয়ে রক্ষা করলো।

কিছুদিনের মধ্যেই গোলাপ ও বসন্তর সম্পর্কটা গ্রামের অন্যান্য মানুষের মত নীলকান্ত ও হরিমতীর কাছে বিষদৃশ্য করে তোলা হলো। হরিমতী সব শুনে মনে মনে স্বভাবতই আঘাত পেলো এবং নীলকান্ত সরেজমিন তদন্তে এসে বসন্তকে যুযুরদলের মেয়েদের সাথে প্রকাশ্যে আসর করতে দেখতে পেলো। এই নিয়ে নীলকান্ত বসন্তকে খুব করে শুনিয়ে গেলো দুকথা। বসন্ত তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে নিরাশ হলো।

কিছুদিন পর গোলাপ নিজে হঠাৎ বসন্তকে বিয়ের প্রস্তাব করলো। বসন্ত এই প্রস্তাবে বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হলো। গোলাপ অশ্রুজলের মধ্যে দিয়ে জানতে পারলো যে বসন্ত তাকে মায়ের চোখে দেখে। বাল্যকালে মাতৃহারা বসন্ত হঠাৎই গোলাপের চোখে নিজের মাকে আবিষ্কার করেছিল। গোলাপ নির্বোধের মত তাকে ভুল বিবেচনা করেছে। এরপরই বসন্ত যুযুর দলের সংস্রব ত্যাগ করে পূর্বের আশ্রয়ে ফিরে গেলো।

ইতিমধ্যে এক নাটকীয় ঘটনাচক্রে কাহিনী অন্য পথে বাঁক নিলো। বসন্ত হরিমতিকে বিয়ে করে বসলো। বিয়ের কিছুদিন পর স্বস্ত্রীক সে নিজের বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করলো। জমিদার আংটি চাটুয্যে ভাইকে যৎপরনাস্তি তিরস্কার করে দংশনের দায়িত্ব গ্রহণ করবার জন্য নির্দেশ দিলেন। হরিমতী বসন্তের মাতৃসম অপত্যস্নেহ বৌঠানের স্নেহে ভালোবাসায় দিনাতিপাত করতে লাগলো। ঘরে ফিরে এসে বসন্তর মধ্যে অবশ্য কোন ভাবান্তর হলো না। সে যথারীতি তার বাল্যকালের বন্ধু ডোম চাঁড়াল পাড়ায় ঘুরে ঘুরে গান গেয়ে বেড়াতে লাগলো।

যখন সুখে শান্তিতে হরিমতি নিজের মধ্যে স্বামীর সংসারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে আছে এমন সময় আবার কপাল ভাঙ্গলো তার। বসন্ত বুঝতে পেরেছিল যে এই জমিদারীর দলিল দস্তাবেজ আর সেরেস্তায় তাকে বেঁধে ফেলবার ষড়যন্ত্র চলছে। তাই সে একদিন সকলকে ফাঁকী দিয়ে আবার সরে পড়লো নিরুদ্দেশের পথে। স্ত্রীর চোখের জল এবং এই নিরুদ্বিগ্ন শান্ত নিরাপদ জীবন-কিছুই তার পলায়নের অন্তরায় হলো না। হরিমতী তখন সন্তান সম্ভবা।

কাহিনীর শেষে আমরা দেখতে পাই এই স্বভাব-পলাতক বাউণ্ডুলে মানুষটি জরুথ অবস্থায় এক উৎসবের দিনে সকলের মায় নিজেরও অজ্ঞাতসারে সমুদ্রে ফিরে আসে। কিন্তু ঘর এবার তার উপর অভিমানে ভরপুর। যে ঘরকে সে বারংবার তাচ্ছিল্য করে তার স্নেহ ভালোবাসাকে আঘাত দিয়ে বারংবার পলাতক হয়েছে এবং যে ঘরে সে যতবারই ফিরেছে অবারই তাকে দুহাত বাড়িয়ে সাদর স্নেহে শুশ্রূষায় গ্রহণ করেছে, এবার কিন্তু আর সে ঘর তার দিকে ফিরে তাকাতে পারাজ। একমাত্র পুত্রকে জন্ম দিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে হরিমতী আর আজকের এই উৎসব সেই মাতৃহারা পুত্রের জন্মদিন উপলক্ষেই আয়োজিত। রোগে জর্জরিত দেহে সে আঘাত আর সহ্য করতে চাইলো না বসন্ত। স্ত্রীর অবর্তমানে সমস্ত পৃথিবীটাই তার কাছে অর্থশূন্য বলে মনে হলো। বসন্ত পুনরায় পলাতক হলো। এবং এবারের যাত্রাই তার জীবনের শেষযাত্রা। এমন এক জায়গায় বসন্ত

পলাতক চলো যেখান থেকে কেউ আর কোনদিনও ফেরেনি।

অশ্রুসিক্ত বেদনাময় দৃশ্যের উপসংহারে কাহিনীর এখানেই সমাপ্তি।

এই ছবির বিস্তৃতি হবার মুখবন্ধে আমরা ক্রেডিট টাইটেলের গোড়াতেই দেখেছি এক সতর্কবাণী। পরিচালক গোষ্ঠী এক অবাস্তব এবং অতি নাটকীয় কাহিনী'র মাধ্যমে তাঁদের ত্রুটীর কথা স্বীকার করেছেন। খানিকটা কৌশলের আশ্রয় নেওয়ার ভঙ্গী থাকা সত্ত্বেও সমগ্র ছবিটি দেখার পর মুক্তকণ্ঠেই তাঁদের আন্তরিকতার কথা স্বীকার করতে হয়। এমন এক দুর্বল কাহিনী কেন যে তাঁরা বেছে নিলেন জানিনা কিন্তু এমনই এক দুর্বল কাহিনীকে চিত্রনাট্যের শক্ত বাঁধুনীতে ফেলে কেমনভাবে যে এক বলিষ্ঠ চিত্রায়ণ সম্ভব তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তাঁরা আলোচ্য চিত্রে দেখাতে আশ্চর্য রকম সফলকাম হয়েছেন। আগাগোড়া ছবিটিতে এক সুচীবান পরিচ্ছন্ন পরিচালকমন কাজ করেছে এবং নাটকীয়ত্ব আরোপে ক্ষেত্রবিশেষ তাঁরা যে মুহূর্তগুলি সৃষ্টি করেছেন তাকে সাধুবাদ না জানিয়ে পারা যায় না। তাঁদের নাট্যবোধ যেমন সংযত তেমনই নিপুন। দর্শকমণ্ডলীর নার্ভকে বিচক্ষণতার সাথেই তাঁরা ধরে ফেলেছেন ফলে সমকালীন চলচ্চিত্রে তাঁদের পরিচালনার সুস্থিরতা অনেক পারদর্শী প্রবীনতাকেও ছাপিয়ে উঠেছে বলে অনুমিত হচ্ছিল। অসাধারণ পরিমিতি বোধের জন্যই বোধহয় যেখানে নায়ক কুমুদদলের মেয়ে গোলাপের চোখে নিজের মা'কে আবিষ্কার করে বসে সেই রকম এক অতিনাটকীয় মুহূর্তটি চিত্রে আদৌ বেমানান লাগছিলো না। ছোট্ট একটি বাপ মা হারা মেয়ের মেয়ে কাতর বাউণ্ডুলে বসন্তর হৃদয়ের ক্ষণমুহূর্তগুলি কিম্বা শেষের দৃশ্যে স্ত্রীর তৈলচিত্রের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে কেঁদে ফেলার মুহূর্তগুলি 'পলাতক' চিত্রে সুকৌশলেরা হয়ে আছে তা শুধুমাত্র পরিচালনা নৈপুণ্য ও দরদী অভিনয়ের জন্যই।

অভিনয় 'পলাতক' চিত্রের এক অনন্যসাধারণ উজ্জ্বল ঐশ্বর্য। প্রথমেই নায়ক বসন্ত রূপী অনুপকুমার তার আশ্চর্য সাবলীল অভিনয়ে দর্শকের হৃদয় কেড়ে নেন। অনুপকুমারের এই প্রাণবন্ত অভিনয়টি দর্শকদের বহুদিন মনে থাকবে। কি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চালনা, গান গাইবার ভঙ্গীমা, কি বাচন ভঙ্গী—সর্বত্রই তিনি সফলকাম হয়েছেন। মনে হয় পলাতক চিত্রে অনুপকুমারের জীবনে শ্রেষ্ঠতম অভিনয়। এর পরই আসে চরিমতী রূপী সন্ধ্যারায়ের কথা। তাঁর প্রাণবন্ত অভিনয় দর্শনীয় হয়েছে আগাগোড়া। কবিরাজ নীলকান্তরূপী জহর রায়ের অভিনয় স্মরণীয়। রবি ঘোষ-এর করণীয় কিছুই ছিল না, কিন্তু তারই মধ্যে তিনি দর্শকের হৃদয়ে ছাপ রেখে যেতে সক্ষম হয়েছেন। এছাড়া জহর গাঙ্গুলী, অসিত-বরণ, জ্ঞানেশ মুখার্জি, হরিধন প্রভৃতি প্রত্যেকের অভিনয়ই প্রশংসনীয়। আর প্রশংসা পাবেন অনুভা গুপ্তা। আলোচ্য চিত্রে তাঁর অভিনয় দেখতে দেখতে আমার বারংবার অনুভা গুপ্তা অভিনীত 'কবি' চিত্রে তারই কৃত ঠাকুরঝি চরিত্রের কথা মনে হয়েছে। গোলাপের চরিত্র সৃষ্টিতে তিনি দীর্ঘকাল বাঙ্গালী দর্শকের মনে জাগরুক হয়ে থাকবেন। ঘরনা চরিত্রে প্রশংসা পাবেন রুমা গুহ ঠাকুরতা, এমন স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল অভিনয় করেছেন তিনি। এক কথায় অভিনয়ের টিম ওয়ার্ক হয়েছে অপূর্ব ফলে ছোটখাটো কোন ত্রুটী বিচ্যুতিও কারও চোখে ধরা পড়েনি এমন কি ছিদ্রসন্ধানীদের চোখেও।

টেকনিক্যাল বিভাগে আলোকচিত্র গ্রহণে অপূর্ব সুস্থিরতা দেখিয়েছেন তরুণ ক্যামেরা কুশলী সৌমেন্দু রায়। এই চিত্রের সাফল্যের অন্যতম প্রধান অবদান তার চমৎকার সুন্দর ও দৃষ্টিগ্রাহী আলোকচিত্র। ক্ষেত্র-বিশেষ মুভ-ফটোগ্রাফীতে তিনি অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন। শিল্প নির্দেশনায় বংশী চন্দ্রগুপ্তের কাজ অভিনন্দনযোগ্য। নৃত্য পরিকল্পনায় প্রভাত ঘোষ প্রশংসনীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন।

আলোক চিত্রের মতই এই চিত্রের অন্যতম অবদান স্বয়ং সঙ্গীত পরিচালকের বরণীয় কাজটি। হেমন্ত মুখার্জি সুরারোপিত গানগুলি প্রত্যেকটিই সুখশ্রাব্য এবং হৃদয়গ্রাহ্য। গানগুলি ইতিমধ্যেই মুখে মুখে ফিরছে এবং সে দিক দিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। মন যে আমার কেমন কেমন করে ও 'চিনিতে পারিনি বঁধু' শীর্ষক গান দুটি। আবহ সঙ্গীত ও নাটকীয় প্রকৃতির

সাথে একাত্ম হয়ে যাওয়ার ফলে গতিবেগকে স্থানে স্থানে আরও দ্রুততর করেছে। সাধুবাদ পাবেন সঙ্গীত পরিচালক।

এ ছাড়া শব্দ গ্রহণ, লেবরেটারির কাজ, সম্পাদনা ও রূপসজ্জার কাজ সত্যই আন্তরিকভাবেই অভিনন্দন যোগ্য।

পরিশেষে 'পলাতক' এর মত এমন হৃদয়াবেগমথিত নাট্যশ্রী মণ্ডিত চিত্র উপহার দেবার জন্য বোম্বের প্রখ্যাত প্রযোজক পরিচালক ভি. শান্তারাম বাঙ্গালী দর্শকবৃন্দের অকুণ্ঠ অভিনন্দনের পাত্র হলেন।

•

সংবাদ পরিক্রমা

সম্প্রতি বার্লিনে অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'দুই কন্যা' (তিন কন্যা চিত্রের একাংশ) চিত্রটিকে বিশ্ববিখ্যাত 'সেলজনিক' পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত করা হয়েছে। শ্রীসত্যজিৎ রায় স্বয়ং অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে নিজে এই পুরস্কারটি গ্রহণ করেছেন। এই পুরস্কার বিতরণ উৎসব উপলক্ষে ভারতীয় চলচ্চিত্রের এই গুরুত্বপূর্ণ দানটি গত ছাব্বিশে জুন বার্লিন উপস্থিত হয়েছেন। সঙ্গে রয়েছেন স্ত্রী শ্রীমতী বিজয়া রায় ও একমাত্র পুত্রসন্তান। এখান থেকে শ্রীরায় সপরিবারে যাচ্ছেন মস্কো। সেখানে এক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে তিনি বিচারক হিসাবে উপস্থিত থাকবেন।

• • •

প্রখ্যাতনামা প্রযোজক, পরিবেশক ও প্রদর্শক আর. ডি, বনশল গত ৪ঠা জুলাই দমদম বিমান বন্দর থেকে মস্কো যাত্রা করেছেন। মস্কোতে আসন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে আর. ডি, বনশল প্রযোজিত 'সাতপাকে বাঁধা' চিত্রটি ভারতীয় চিত্রের প্রতিনিধিত্ব করবার ভারত সরকার কর্তৃক নির্বাচিত হয়েছে। রাশিয়ান ভাষায় সাবটাইটেল সহ চিত্রটি উৎসবে প্রদর্শিত হচ্ছে। (সেই উপলক্ষে সঙ্গীতকার বনশল, পরিচালক অজয় কর, আর. ডি, বনশলের সর্বাধ্যক্ষ বিমল দে ও বনশল পরিবারের আরও একজনসহ মস্কো যাত্রা করেছেন। এই মাসের শেষ সপ্তাহে তাঁরা কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করছেন বলে জানা গেল।

• •

'অবশেষে' চিত্রের পর পরিচালক মৃণাল সেন বর্তমানে স্বরচিত চিত্রনাট্যে অচিন্ত্য সেনগুপ্তের ছোটগল্প অবলম্বনে 'প্রতিনিধি' চিত্রের নিয়মিত শুটিং করে যাচ্ছেন। নায়ক ও নায়িকার চরিত্রে রূপদান করছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। চিত্রের সঙ্গীত পরিচালনা সম্পাদনা ও শিল্প নির্দেশনা করছেন যথাক্রমে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, গঙ্গা নস্কর ও বংশী চন্দ্রগুপ্ত।

• •

পরিচালক রাজেন তরফদার শুটিং করছেন রাধা ফিল্ম স্টুডিওতে। শক্তিপদ রাজগুরুর কাহিনী অবলম্বনে স্বরচিত চিত্রনাট্যে তাঁর 'জীবন কাহিনী' চিত্রের কাজ দ্রুত শেষের দিকে এগিয়ে চলেছে। এক নাটকীয় কাহিনী সমৃদ্ধ এই চিত্রে প্রধান চরিত্রগুলিতে বিকাশ রায়, অনুপ কুমার, সন্ধ্যা রায়, তরুণকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় রেণুকা রায় প্রভৃতি রূপদান করছেন। আলোকচিত্র গ্রহণ করছেন প্রখ্যাত ক্যামেরা কুশলী অনিল গুপ্ত ও তাঁর সহকারী জ্যোতি লাহা। সম্পাদনা, শিল্প নির্দেশনা ও সঙ্গীত পরিচালনার আছেন যথাক্রমে তরুণ দত্ত, রবি চট্টোপাধ্যায় ও প্রবীর মজুমদার।

• • •

প্রখ্যাত দলিল চিত্র নির্মাতা হরিসাধন দাশগুপ্ত বর্তমানে সঙ্গীত নাট্যকলা অকাদমীর হয়ে ন্যাশনাল সঙ্গীতের জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত গায়ক ও বাদ্যযন্ত্রীদের জীবনমূলক দলিল চিত্র প্রস্তুতে ব্যস্ত আছেন। এই সূত্রে তিনি ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ সাহেবের উপর শুটিং করেছেন এবং বর্তমানে কলকাতায় উপস্থিত ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খান্ সাহেবকে নিয়ে শুটিং করছেন। দলিল চিত্র ছাড়া হরিসাধন দাশগুপ্ত মহাশয় স্বয়ং এক কাহিনী চিত্র পরিচালনার কাজেও হাত দিয়েছেন সম্প্রতি। অচিন্ত্য সেনগুপ্তের 'জন্মান্ধ' গল্প অবলম্বনে ও স্বরচিত চিত্রনাট্যে

'একই অঙ্গে এত রূপ' চিত্রের মুহূর্ত শুরু করেছেন ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে। রাধেরী মুখার্জি রূপ দিচ্ছেন নায়িকার ভূমিকায় আর অপর দুটি চরিত্রে রয়েছেন সৌমিত্র ও বসন্ত চৌধুরী। আলোক চিত্র, সম্পাদনা, শিল্প নির্দেশনা এবং রূপসজ্জায় রয়েছেন যথাক্রমে দীমেন গুপ্ত, তরুণ দত্ত, প্রীতিধর সেন ও সুখময় সেন।

* * *

বর্তমানে মুক্তি প্রতীক্ষারত বাংলা চিত্রগুলির মধ্যে যে সব ছবি আগামী দু'এক সপ্তাহের ব্যবধানে মুক্তিলাভ করছে তাদের মধ্যে রয়েছে আর, ডি, বনশল প্রযোজিত ও পার্থপ্রতিম চৌধুরী পরিচালিত 'ছায়াসূর্য' প্রযোজক কনক মুখোপাধ্যায় কর্তৃক স্বয়ং পরিচালিত 'আকাশ প্রদীপ' চিত্রগুলিই প্রধান। উপরোক্ত ছবিগুলিতে অভিনয় করেছেন শর্মিলা ঠাকুর, সুপ্রিয়া চৌধুরী, সুমিতা সান্যাল, নির্মলকুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও বিশ্বজিৎ।

* * *

উত্তমকুমার এত দিন নায়করূপে অভিনয়ে লক্ষ লক্ষ দর্শকের হৃদয় রঞ্জন করে এসেছেন। এবার তিনি স্বয়ং চিত্র প্রযোজনার ক্ষেত্রে অবতরণ করছেন। উত্তমকুমার ফিল্মসের ব্যানারে ইতিমধ্যেই 'ভ্রান্তিবিলাস' চিত্রটি মুক্তিলাভ করেছে এবং প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে উত্তমকুমার ফিল্মসের ব্যানারে আরও তিনটি মূল্যবান চিত্র নির্মাণ হচ্ছে। প্রথমোক্ত ডাক্তার নীহাররঞ্জন গুপ্তের কাহিনী অবলম্বনে পরিচালক অজিত সেন-মুহূর্ত করছেন 'উত্তর ফাল্গুনী' চিত্রের। চিত্রনাট্য করেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ভূমিকালিপিতে রয়েছেন প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী শ্রীমতী সুচিত্রা সেন। এই চিত্রে তিনি এক দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় করছেন। অন্যান্য প্রধান পার্শ্ব চরিত্রগুলিতে রয়েছেন বিকাশ রায়, দিলীপ মুখার্জি ও ছায়া দেবী।

* * *

ইউ-কে ফিল্মসের দ্বিতীয় চিত্রটি পরিচালনা করছেন তপন সিংহ মহাশয়। স্বরচিত চিত্রনাট্যে সুবোধ ঘোষের 'জতুগৃহ' চিত্রের নিয়মিত মুহূর্ত এর কাজ শুরু হয়েছে সম্প্রতি এন-টি বাংলার ওয়ান স্টুডিওতে। উত্তমকুমার নিজে এই চিত্রের নায়কের চরিত্র রূপায়িত করছেন এবং নায়িকার চরিত্রে রয়েছেন শ্রীমতী অরুন্ধতী দেবী, অন্যান্য পার্শ্ব চরিত্রগুলিতে রয়েছেন বিকাশ রায়, বিনতা রায়, অনিল চ্যাটার্জি ও কামল গুপ্ত। আলোকচিত্র, সম্পাদনা ও শিল্পনির্দেশনায় রয়েছেন যথাক্রমে বিমল মুখার্জি, সুবোধ রায়, সুনীত মিত্র মহাশয়।

পরিচালক হরিদাস ভট্টাচার্য করছেন ইউ-কে ফিল্মসের তৃতীয় চিত্রটি, অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের কাহিনী 'গৃহদাহ' অবলম্বনে চিত্রনাট্য প্রস্তুত করছেন স্বয়ং পরিচালক মহাশয়। আলোচ্য চিত্রটিই ইউ-কে ফিল্মসের ব্যানারে বিভিন্ন কারণে সর্ববৃহৎ প্রোজেক্ট। 'গৃহদাহ' চিত্রের ভূমিকা লিপিতে থাকছেন সুচিত্রা সেন ও উত্তম কুমার। বাংলা চিত্র জগতের এই জনপ্রিয় জুটি আবার একত্রিত হলেন 'গৃহদাহ' চিত্রে। সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের নাম শোনা যাচ্ছে। এ সম্বন্ধে অবশ্য এখনও পাকাপাকিভাবে কিছু স্থির হয়নি। আগামী আগস্ট মাসের মাঝামাঝি ছবিটি ফ্লোরে যাবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আলোকচিত্র গ্রহণ করবেন প্রখ্যাত ক্যামেরা কুশলী কানাই দে।

উপরোক্ত ইউ-কে ফিল্মস চিত্রগুলির পরিবেশনা করছেন অজিত চৌধুরী মহাশয় তাঁর ছায়াবাণী রিলিজের মাধ্যমে।

* * *

কমার্শিয়াল আর্টের জগতে সুপরিচিত অন্যতম শিল্পী শ্রী ও, সি, গাঙ্গুলী এবার চিত্র পরিচালনায় ব্রতী হয়েছেন। গত মাসে ইণ্ডিয়া ফিল্ম লেবরেটরীতে শ্রী গাঙ্গুলী পরিচালিত সন্তোষ ঘোষের কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্যায়িত 'কিনু গোয়ালার গলি' চিত্রের সঙ্গীত গৃহিত হয়েছে। সঙ্গীত পরিচালনা করলেন সলিল চৌধুরী। কণ্ঠ দিলেন গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও বোম্বের সবিতা ব্যানার্জি। 'কিনু গোয়ালার গলি'র বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সুমিত্রা দেবী ও শর্মিলা ঠাকুর। শীঘ্রই চিত্রটির নিয়মিত মুহূর্ত এর কাজ শুরু হচ্ছে ক্যালকাটা মুভীটোন স্টুডিওতে।

বিংশ শতাব্দী

সপ্তম বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড

৭ম সংখ্যা পৌষ ১৮৮৪ হইতে ১২শ সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৫ পর্যন্ত

বর্ণানুক্রমিক বিষয়-সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
	অ	
অনুবাদক মোহিতলাল (প্রবন্ধ)	বীরেন্দ্রনাথ প্রতিহার	
অন্তরায় (কবিতা)	তারকেশ্বর চট্টোপাধ্যায়	
অপসারী বিনিময় (সংক্ষেপীকরণ)	অমলেন্দু ঘোষ	
	আ	
আমাদের কথা	সম্পাদকীয়	
আনন্দ (গল্প)	জন্‌ গল্‌টাইবেক	
আমেরিকার কবি রবার্ট লি ফ্রস্ট (বিশ্ব-সাহিত্য)		
আলবাট্রাস ও কালের নাবিক (গল্প)	অর্ণব সেন	
	ই	
ইতালীয় কবি লুদো ভিকো (বিশ্ব সাহিত্য)	মলয় রায়চৌধুরী	
	এ	
এই মাটির মানুষ (জীবনী)	মণি গঙ্গোপাধ্যায়	
একটি কবিতা (কবিতা)	উৎপল কুমার বসু	
একে একে নিভেছে দেউটি (খেলাধুলা)	অজয় বসু	
	ক	
কিরিচ (গল্প)	জীবনময় দত্ত	
কুন্তলার প্রেম (গল্প)	মিহির দাশগুপ্ত	
ক্রিকেটের চিরায়ু যৌবন (খেলাধুলা)	অজয় বসু	
কবিতায় (কবিতা)	আলতাফ হোসেন তালুকদার	
কবি ও তরজা গান (সংগীত)	চিত্তরঞ্জন দেব	
	গ	
গোপাল ভট্ট গোস্বামী (প্রবন্ধ)	রবীন্দ্রনাথ মাইতি	
গুপ্তযুগের ইতিহাস—শিলালিপি ও মুদ্রা (প্রবন্ধ)	শশাঙ্ক শেখর পাড়ুই	

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
	চ	
চীনের ভারত আক্রমণের কাহিনী (প্রবন্ধ)	অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়	১৩৮, ১০৩৮
চলচিত্রে শিল্পে সংকট (রংগরগং)	রঞ্জন মজুমদার	১১৩২
চলচিত্রে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার ও বাংলা ছবি (রংগরগং)	বাদল কুমার	১৩৬১
	ছ	
ছবির প্রতিচ্ছবি (ভ্রমণ)	অমল ঘোষ	
	জ	
ডাঃ জন ফ্রাঙ্কলিন এনড়ার্স (বিজ্ঞান)		১৪১
জার্মান কবি ফ্রেডরিক ফন শীলার (প্রবন্ধ)	সুধাকর রাজে	১৪০৪
	ত	
তুষার জল (গল্প)	ব্রজেন সাহা	১৪৮
তুষার পুরস্কৃতা (গল্প)	তা সেন	১০০৭
	দ	
দুর্গার অসুর বধ (রম্যরচনা)	প্রণব কুমার কুণ্ডু	
দার্শনিক কার্ল জাসপারস (বিশ্বসাহিত্য)	অমল হালদার	
দুঃখ (কবিতা)	পরিমল চক্রবর্তী	
	ধ	
ধূসর সন্ধ্যায় (কবিতা)	শ্রীপদ সেনগুপ্ত	
ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধত্ব ও পাণ্ডুর দুষ্ট ব্যাধি (প্রবন্ধ)	মনোনীত সেন	
	ন	
নীল ভাবেরী (উপন্যাস)	ই, কাজাকেভিচ	১১৩, ১০৫৭
নৈশ (কবিতা)	রাখী চট্টোপাধ্যায়	১০২৪
নট বাই ব্রেড অ্যালোন (বিশ্ব-সাহিত্য)	অমল হালদার	১১৪৭
নিরুদ্দিষ্টের প্রতি পত্র (গল্প)	সুধীন্দু চৌধুরী	১১৫৩
নূতন জনপদ (উপন্যাস (	মৃত্যুঞ্জয় মাইতি	১১৬০, ১২৬৩, ১৪১০, ১৪২৩
নূতন বই (পুস্তক সমালোচনা)		১১৭২
নোভাতি প্রেস এজেন্সির আদর্শ (প্রবন্ধ)	ভি, এ, বাখোতিন	১২৪৫
নীল আকাশের স্বাদ (গল্প)	কার্তিক ভদ্র	১২৮৪
নিঃস্বার্থ জীবন (প্রবন্ধ)	অরুণ দাশগুপ্ত	১৩৮৫
নজরুল জীবনের এক অধ্যায় (প্রবন্ধ)	আবদুল আজীজ আল আমান	১৪৬৯
নীলা (নাটক)	মনোজ মিত্র	১৪৭৭
নায়িকা (নাটক)	সুবন্ধু ভট্টাচার্য	১৫৬৩

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
	প	
পালক (গল্প)	জিতেন্দ্রনাথ বসু	
পল্লীগীতি মেহনীর গান (সঙ্গীত)	চিত্তরঞ্জন দেব	
পল্লীগীতি বারমাস্যা (ঐ)	ঐ	
পশ্চিমে বৈশাখ (কবিতা)	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	
প্রতিশ্রুতি (কবিতা)	মানিক মুখোপাধ্যায়	
	ব	
বাঙলা ছন্দের ত্রিধা (সঙ্গীত)	সুরঞ্জন স্যান্যাল	
বাংলাভাষা বিজ্ঞান চর্চা ও পরিভাষা (প্রবন্ধ)	বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য	
বিনোদ বিহারী গোস্বামীর পুনর্শশী (সংক্ষেপিকরণ)	অমলেন্দু ঘোষ	
বন্ধুদের প্রতি (কবিতা)	শ্যামসুন্দর দে	
বিবেকানন্দ প্রশস্তি (কবিতা)	কালিদাস রায়	
বাদশার দেশে বিদেশী (ভ্রমণ)	রায় বসু	
ব্রার্ট্রাণ্ড রাসেলের চোখে বিশ্ব-শান্তি (প্রবন্ধ)	অমিয় মজুমদার	
বধূমন (কবিতা)	মোহিত চক্রবর্তী	
বিজ্ঞানের টুকিটাকী (বিজ্ঞান)		
বাঙ্গালীদের বিবাহপদ্ধতি (প্রবন্ধ)	সুভাষচন্দ্র বসু	
চিত্রের বিস্ময় লিউইস (খেলাধুলা)	বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়	
বোধ (গল্প)	সুশান্ত চক্রবর্তী	
	ভ	
ভাঙ্গনের পাড়ে (উপন্যাস)	রমণীরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়	
	ম	
মাঠকন্যা (গল্প)	সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ	
মঙ্গল গ্রহের সেই মেয়েকে (কবিতা)	অপূর্ব মজুমদার	
মানবের দুটি স্থান—ধর ও মাণ্ডু (প্রবন্ধ)	মঞ্জুলিকা মুখোপাধ্যায়	
মোহিত লালের কবি মানস (প্রবন্ধ)	অমরেন্দ্র গনাই	
	য	
যন্ত্র ও জীববিজ্ঞান (বিজ্ঞান)	তরুণ চট্টোপাধ্যায়	
	র	
রাজেশ্বরী (কবিতা)	সজল বন্দ্যোপাধ্যায়	
রঙ্গজগৎ (চিত্র সমালোচনা)	রঞ্জন মজুমদার	
রোমান্টিক কবির সমাজ (প্রবন্ধ)	শীতল ঘোষ	

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
	ল	
লেখা দেশা ও দেশা (প্রবন্ধ)	সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়	
	শ	
শান্তিনিকেতনের পথে (কবিতা)	শক্তি চট্টোপাধ্যায়	
	স	
স্বাধীনতার কবি শবের (প্রবন্ধ)	এম, গুইয়ান	১০২৮
স্বামী বিবেকানন্দ (প্রবন্ধ)	সুচরিতা সেনগুপ্তা	১০৩৩
স্তানিস্লাভস্কির জন্ম শতবার্ষিকী (প্রবন্ধ)	রবিন মজুমদার	১০৫০
সব কিছুর আড়ালে (কবিতা)	সমীর ঘোষ	১১৮৬
সে ও আমি (কবিতা)	শান্তশীল দাস	১৩২৮
সামাজ (কবিতা)	মানিক মুখোপাধ্যায়	১৩২৮
সামাজিক সংযোগ ও নিয়ন্ত্রণ (প্রবন্ধ)	কালিদাস বসু	১৩২৯
সমাহিত (কবিতা)	দুর্গাদাস সরকার	১৩৪৬
স্বর্ণরেণু (কবিতা)	অভিশ্যামল	১৩৪২
সেই অচেনা মানুষটি (উপন্যাস)	সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৫৪, ১৪১৭
সে (গল্প)	অচ্যুত গোস্বামী	১৪৩১
সাম্রাজ্যহীন উপনিবেশবাদ (প্রবন্ধ)	কে ব্রুস্তেভস	১৪৪০
স্বর্গ (গল্প)	মনীষা বিশ্বাস	১৪৪৫
সমুদ্র হৃদয় (নাটিক)	গিরিশঙ্কর	১৫১৩
স্টোরি অব দি ক্লেমিং ইয়ার্স (চলচ্চিত্র)		১৫৮০

বর্ণানুক্রমিক লেখক–সূচী

৭ম সংখ্যা পৌষ ১৮৮৪ হইতে ১২শ সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৫ পর্যন্ত

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	অ	
অমল ঘোষ	ছবির প্রতিচ্ছবি (ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা)	৯০৭,১১৭৩,১৩৭৩
অমলেন্দু ঘোষ	বিনোদবিহারী গোস্বামীর পূর্ণশশী (সংক্ষেপিকরণ)	১০০১
অর্ণব মজুমদার	মঙ্গলগ্রহের সেই মেয়েকে (কবিতা)	১০২৪
অজয় বসু	একে একে নিভেছে ছেউটী (খেলাধুলো)	১১২৯
ঐ	ক্রিকেটের চিরায়ু যৌবন (ঐ)	১২৩৯
অমল হালদার	নট বাই ব্রেড অ্যালোন (বিশ্বসাহিত্য)	১১৪৭
ঐ	দার্শনিক কার্ল জাসপারস (ঐ)	১৩৮৯
অমিয় মজুমদার	ব্রার্টাণ্ড রাসেলের চোখে বিশ্বশান্তি (প্রবন্ধ)	১১৭৯
অর্ণব সেন	আলবাট্রাস ও কালের নায়িকা (গল্প)	১২৭৪
অভিশ্যামল	স্বর্ণ রেণু (কবিতা)	১৩৫২
অরুণ দাশগুপ্ত	নিঃস্বার্থ জীবন (প্রবন্ধ)	১৩৮৫
অচ্যুত গোস্বামী	সে (গল্প)	১৪৩১
অমরেন্দ্র গণাই	মোহিতলালের কবিমানস (প্রবন্ধ)	১৪৮৮
অমলেন্দু ঘোষ	অপূর্বীয় বিনিময় (সংক্ষেপিকরণ)	১৪১০
	আ	
আলতাফ হোসেন তালুকদার	কবিতায় (কবিতা)	
আবদুল আজীজ আল আমান	নজরুল জীবনের এক অধ্যায় (প্রবন্ধ)	
	ই	
ই তাজাকেভিচ	নীলডায়েরী (উপন্যাস)	

	বিষয়	পৃষ্ঠা
	উ	
উৎপলকুমার বসু	একটি কবিতা (কবিতা)	
	ক	
কালিদাস রায়	বিবেকানন্দ প্রশস্তি (কবিতা)	
কার্তিক ভদ্র	নীল আকাশের স্বাদ (গল্প)	
কালিদাস বসু	সামাজিক সংযোগ ও নিয়ন্ত্রণ (প্রবন্ধ)	
কে. ত্রুক্কেতস	সাম্রাজ্যহীন উপনিবেশবাদ (প্রবন্ধ)	
দুর্গাদাস সরকার	সমাহিত (কবিতা)	
গিরিশঙ্কর	সমুদ্র হৃদয় (নাটক)	
	চ	
চিত্তরঞ্জন দেব	পল্লীগীতি—মেহনীর গান (সঙ্গীত)	
	পল্লীগীতি 'বারমাস্যা' "	
	কবি ও তরজা গান	
	জ	
জীবনময় দত্ত	কিরিচ (গল্প)	১৯৩
জিতেন্দ্র নাথ বসু	পালক (গল্প)	১১১৭
জন স্টাইবেক	আনন্দ (গল্প)	১২৩৪
	ত	
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	পঁচিশে বৈশাখ (কবিতা)	১৩৪৯
তারকেশ্বর চট্টোপাধ্যায়	অন্তরায় (কবিতা)	১৩৫১
তরুণ চট্টোপাধ্যায়	বন্ধ্য ও জীববিজ্ঞান (বিজ্ঞান)	১৩৮৩
	প	
প্রণবকুমার কুণ্ডু	দুর্গার অনুভব (গল্প)	১২৪৮
পরিমল চক্রবর্তী	দুঃখ (কবিতা)	১২৭৮

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	ব	
ব্রজেন সাহা	তৃষ্ণার জল (গল্প)	১৮৫
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য	বাংলার বিজ্ঞান চর্চা ও পরিভাষা (প্রবন্ধ)	১৮৯
বরিস মদভেদভ	ন্যানিগ্রা ভস্কির জন্ম শতবার্ষিকী (প্রবন্ধ)	১০৫৭
বীরেন্দ্রনাথ প্রতিহার	অনুবাদক মোহিতলাল (প্রবন্ধ)	১১৫৮
বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়	বিশ্বের বিস্ময় লিওইস (মেলাবুলা)	১৩৩৯
বাদলকুমার	চলচ্চিত্রে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার ও বাংলা ছবি (রঙ্গ জগৎ)	১৪৬১
	ভ	
ভি এ মাখোতিন	মোভোস্তি প্রেস এজেন্সির আদর্শ (প্রবন্ধ)	
	ম	
মলয় রায়চৌধুরী	ইতালীয় কবি লুদোভিকো (বিশ্ব সাহিত্য)	
মণি গঙ্গোপাধ্যায়	এই মাটির মানুষ (জীবনী)	
এম পুইয়ান	স্বাধীনতার কবি শবরী (প্রবন্ধ)	
মিহির দাশগুপ্ত	কুসুমদার প্রেম (গল্প)	
মৃত্যুঞ্জয় মাইতি	নূতন জনপদ (উপন্যাস)	
মোহিত চক্রবর্তী	বধূবরন (কবিতা)	
মঞ্জুলিকা মুখোপাধ্যায়	মালদহের দুটি স্থান—গৌড় ও পাণ্ডুয়া (প্রবন্ধ)	
মানিক মুখোপাধ্যায়	সামাল (কবিতা)	
"	প্রতিশ্রুতি "	
মনীষা বিশ্বাস	স্বর্গ (গল্প)	
মনোনীত সেন	ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধত্ব ও পাণ্ডুর দুষ্ট ব্যাধি (প্রবন্ধ)	
মনোজ মিত্র	মীলা (নাটক)	
	র	
রবীন্দ্রনাথ মাইতি	গোপাল ভট্ট গোস্বামী (প্রবন্ধ)	১০১২
রমেন চট্টোপাধ্যায়	নৈশ (কবিতা)	১০২৪
রঞ্জন মজুমদার	চলচ্চিত্র শিল্পে সংকট (রঙ্গ জগৎ)	১১৩২
ঐ	চিত্র সমালোচনা "	১৩৪৫
রমণীরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়	ভাগনের পাড়ে (উপন্যাস)	১১৮৭, ১২৮৯
রাম বসু	বাদশার দেশে বিদেশী (ভ্রমণ)	১১০৯, ১২৯৮, ১৩৯৭, ১৪৪৯

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	অ	
শ্যামসুন্দর দে	বন্ধুদের প্রতি (কবিতা)	
শক্তি চট্টোপাধ্যায়	শান্তিনিকেতনের পথে (কবিতা)	
শ্রীপদ সেনগুপ্ত	ধূসর সন্ধ্যায় (কবিতা)	
শান্তশীল দাশ	দে ও আমি (কবিতা)	
শীতল ঘোষ	রোমান্টিক কবিসমাজ (প্রবন্ধ)	
শশাঙ্কশেখর পাকড়াই	গুপ্তযুগের ইতিহাস—শিলালিপি ও মুদ্রা (প্রবন্ধ)	
	স	
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ	মাঠকন্যা (গল্প)	৯৬৯
সুরঞ্জন সান্যাল	বাংলাছন্দের ত্রিধা (সম্পাদিত)	৯৭৭
সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়	লেখা—বেশা ও পেশা (প্রবন্ধ)	৯৯৮
সুচরিতা সেনগুপ্তা	স্বামী বিবেকানন্দ (প্রবন্ধ)	১০৩৩
সুধীন্দ্র চৌধুরী	নিরুদ্দিষ্টের প্রতি পত্র (গল্প)	১১৫৩
সমীর ঘোষ	সবকিছুর আড়ালে (গল্প)	১১৮৬
সজল বন্দ্যোপাধ্যায়	রাজেশ্বরী (কবিতা)	১৩২৮
সুভাষচন্দ্র বসু	বাঙ্গালীদের বিবাহ পদ্ধতি (প্রবন্ধ)	১৩৩৭
সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	সেই অচেনা মানুষটি (উপন্যাস)	১৩৫৪,১৪৭৭
সুবন্ধু ভট্টাচার্য	নায়িকা (নাটক)	১৪৬৩

নির্ভরযোগ্য—

আসব,

অরিষ্ট,

ঘৃত,

তৈল,

চ্যবণপ্রাশ

ইত্যাদি পাইবার

একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

★

ভূদেব আয়ুর্ব্বেদ ভবন

২০, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫

ফোন : ৫৫-৪৪২৫

Regd. No. C—3903 • BINGSHA SHATABDI (Ashar) • Price 75 nP. • Phone 55-4425

লিলির

রিচ

নোনতা

বিস্কুট

25 1963

লিলি বিস্কুট কোং.প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-৪

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ২০, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৪ হইতে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক দি এরাউ কার্ড-বোর্ড বক্স ফ্যাক্টরী প্রাইভেট লিঃ, ২০, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

বিংশ শতাব্দী

শ্রাবণ ১৩৭০ (১৮৮৫ শকাব্দ)

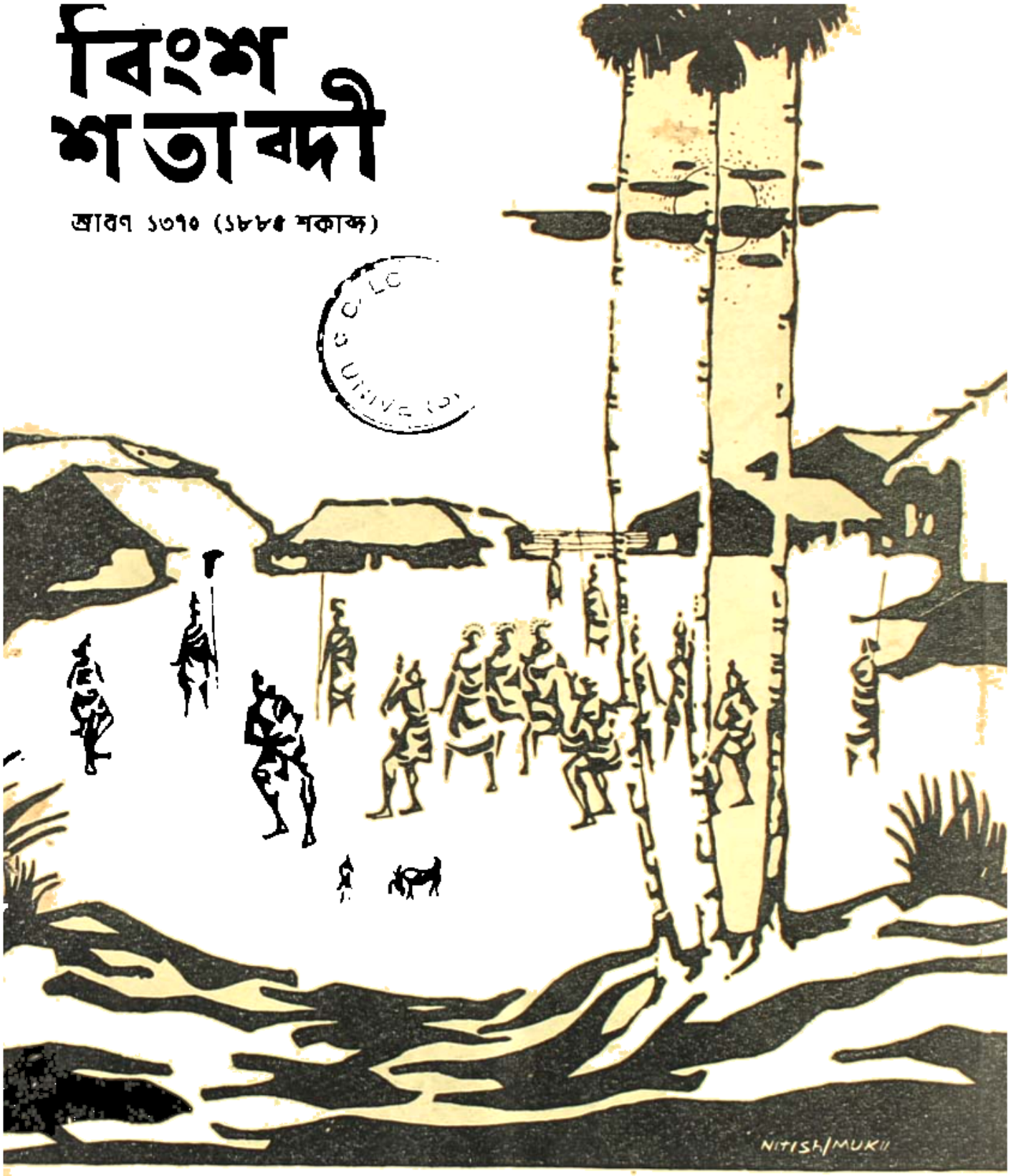

ঘটনা
ফোন ২২-২২২৫
৮-১ লাল বাজার ষ্ট্রীট

নির্ভরযোগ্য—

আসব,

অরিষ্ট,

ঘৃত,

তৈল,

চ্যবণপ্রাশ

ইত্যাদি পাইবার

একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

★

ভূদেব আয়ুর্ব্বেদ ভবন

২০, ক্লে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪

ফোন : ৫৪-৪৪২৭

শারদীয়

বিংশ শতাব্দী

এ বছরের বৃহত্তম শারদীয় সংখ্যা মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হবে।

—: এই সংখ্যায় লিখবেন :—

- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
- নীহাররঞ্জন গুপ্ত
- ডা: শশিভূষণ দাশগুপ্ত
- প্রেমেন্দ্র মিত্র
- শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
- বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
- অন্নদাশঙ্কর রায়
- অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
- স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
- বিমল কর
- শিবতোষ মুখো
- সুবোধ ঘোষ
- নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
- মনোজ বসু
- বিষ্ণু দে
- আশাপূর্ণা দেবী
- জরাসন্ধ
- অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়
- সুভাষ মুখোপাধ্যায়
- তরুণ চট্টোপাধ্যায়
- নৈত্রেয়ী রায়চৌধুরী
- আরো অনেকে
- সমরেশ বসু
- বিমল মিত্র
- হরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
- সন্তোষকুমার ঘোষ
- কৃষ্ণ ধর
- শিবরাম চক্রবর্তী
- রমা বসু
- চিত্তরঞ্জন ঘোষ
- শ্যামসুন্দর দে
- আশা দেবী

:: এই সংখ্যায় থাকবে ::

। ছয়খানি সম্পূর্ণ উপন্যাস । একটি বড় গল্প । অদ্ভুত বাস্তব অভিনব গল্প
। মনোজ্ঞ প্রবন্ধ । সুন্দর কবিতা । বহুচিত্র সমৃদ্ধ রঙ্গজগৎ ।
। বিশিষ্ট শিল্পীর স্নিগ্ধ বর্ণ চিত্র । বহু আলোকচিত্র । অসংখ্য স্কেচ
। তীব্র কটাক্ষপূর্ণ কার্টুন । শুভারম্ভের কাকাতুক
এ ছাড়া নানা বিষয় ।

:: অত্যন্ত জ্ঞাতব্য বিষয় ::

পৃষ্ঠা সংখ্যা পাঁচশত। দাম তিন টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা। রেজেষ্ট্রি ডাকে চার টাকা চল্লিশ নয়া পয়সা। নয় টাকার বার্ষিক গ্রাহকদের এবং পাঁচ টাকার ষান্মাসিক গ্রাহকদের কোন অতিরিক্ত মূল্য লাগবে না। রেজেষ্ট্রি খরচ ৫৫ নঃ পঃ স্বতন্ত্র। কোন ধারাবাহিক লেখা থাকবে না।

॥ আজই গ্রাহক হোন ॥
॥ এজেন্টগণ অগ্রিমসহ অর্ডার দিন ॥

বিংশ শতাব্দী :: ২০, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫ ॥ ফোন : ৫৫-৪৪২৫

আহারের পর দিনে দু'বার..

সব ঋতুতে স্বাস্থ্য লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়

দু' চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহা-দ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) সেবনে আপনার স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহা-দ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দ্দি, কাসি, শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক ফলপ্রদ মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্দ্ধক ও বলকারক টনিক। দু'টি ঔষধ একত্র সেবনে আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলব্ধ স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে।

সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান

সাধনা ঔষধালয় • ঢাকা

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্ব্বেদ-আচার্য্য, ৩৬, গোয়াল পাড়া রোড, কলিকাতা-৩৭

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন), এম,সি,এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

বিংশ শতাব্দী গ্রাহকদের জন্য

একটি জরুরী ঘোষণা

প্রতি সংখ্যা 'বিংশ শতাব্দী'র মূল্য ৭৫ নয়া পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা **নয় টাকা** (সডাক) ষান্মাসিক **সাড়ে চার টাকা** (সডাক)। প্রতি সংখ্যা 'বিংশ শতাব্দী'র আনুমানিক পৃষ্ঠা সংখ্যা একশ আঠাশ। এছাড়া শারদীয় সংখ্যা ও অন্যান্য বিশেষ সংখ্যাগুলি আয়তনে যথেষ্ট বর্ধিত হয়ে থাকে। শুধু আয়তনেই নয়, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, চিত্র সর্বদিকেই এই পত্রিকার মান যথেষ্ট উন্নত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া পাঠক ও গ্রাহকবর্গের সুবিধার জন্য আমরা একটা বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। বিংশ শতাব্দীর যাঁরা **বার্ষিক গ্রাহক** কেবল তাঁরাই **অতিরিক্ত মূল্য ছাড়া শারদীয় সংখ্যা** সমেত অন্যান্য বিশেষ সংখ্যাগুলি পাবার অধিকারী। আমরা যে নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করছি সেই অনুসারে **আগামী মহালয়ার মধ্যে যাঁরা বিংশ শতাব্দীর গ্রাহক হবার জন্য মাত্র পাঁচ টাকা পাঠাবেন তাঁদের ষান্মাসিক গ্রাহক হিসাবে গণ্য করা হবে** এবং কোন অতিরিক্ত মূল্য ছাড়া শারদীয় সংখ্যা সমেত ছয় মাসের পত্রিকা পাঠান হবে। শারদীয় সংখ্যার রেজেস্ট্রি খরচ এর মধ্যে ধরা হয়নি। **শারদীয় সংখ্যা যাঁরা ডাকে নেবেন শারদীয় সংখ্যার রেজিষ্ট্রী খরচ ৫৫ নঃ পঃ এই সঙ্গে তাঁদের পাঠাতে হবে।** যাঁরা শারদীয় সংখ্যা **হাতে নেবেন** তাঁরা **নয় টাকা বা পাঁচ টাকা পাঠাবেন।**

কেবল মহালয়ার মধ্যে যাঁরা গ্রাহক হবেন তাঁদেরই এই সুবিধা দেওয়া হবে। কারণ ষান্মাসিক গ্রাহকেরা বর্ধিত মূল্য ছাড়া শারদীয় সংখ্যা পাবার অধিকারী নন। মহালয়ার মধ্যে যাঁরা গ্রাহক হবেন তাঁরা পাঁচটি সাধারণ সংখ্যা, যার দাম ৩'৭৫ নয়া পয়সা এবং **প্রায় পাঁচ শত পৃষ্ঠার শারদীয়** সংখ্যার মূল্য ৩'৭৫ নয়া পয়সা—একত্রে ৭'৫০ নয়া পয়সার পত্রিকা **পাঁচ টাকায় পাবেন।** রেজেস্ট্রিযোগে শারদীয়া সংখ্যা পেতে হলে একত্রে **পাঁচ টাকা ৫৫ নঃ পঃ** পাঠাতে হবে। **যাঁরা বার্ষিক গ্রাহক হবেন তাঁরা ৯৲ টাকা এবং রেজিষ্ট্রী খরচ ৫৫ নঃ পঃ পাঠাবেন।**

আষাঢ় মাসে 'বিংশ শতাব্দী'র বর্ষ সুরু। ঐ সময় থেকে গ্রাহক হওয়া সুবিধাজনক। কিন্তু গ্রাহকেরা বছরের যে কোন সময় থেকে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হতে পারেন। মণি অর্ডার, চেক বা ক্রশ পোস্টাল অর্ডারে চাঁদা পাঠাতে পারেন। চাঁদা পাঠানোর সময় পরিষ্কার হরফে নাম ও ঠিকানা এবং কোন মাস থেকে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হতে চান তার স্পষ্ট উল্লেখ থাকা দরকার।

॥ অবিলম্বে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হোন ॥

নিবেদক—
প্রচার সচিব।

টাকা পাঠাবার ঠিকানা :—
বিংশ শতাব্দী
২০, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫
ফোন—৫৫-৪৪২৫

'বিংশ শতাব্দী'র গ্রাহক হইবার আবেদন পত্র

কর্মাধ্যক্ষ মহাশয়,

আমাকে.....মাস হইতে 'বিংশ শতাব্দী'র বার্ষিক/ষান্মাসিক গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইয়া লজ্জা কার্ড পাঠাইয়া দিবেন। আমি এই সঙ্গে নয় টাকা/পাঁচ টাকা ক্রস পোস্টাল অর্ডারে পাঠাইতেছি। পারদীয় সংখ্যা রেজেস্ট্রি করিয়া পাঠাইবার জন্য অতিরিক্ত পঞ্চান্ন নয়া পয়সা পাঠাইলাম।

নাম..... স্বাক্ষর

ঠিকানা.....

তারিখ.....

যাঁহারা মনিঅর্ডারে টাকা পাঠাবেন তাঁহারা উপরোক্ত ফর্মে কুপনে নাম ঠিকানা ও কোন মাস হইতে লজ্জা হইতে চান তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিবেন। যাঁহারা পারদীয় সংখ্যা হাতে লইবেন তাঁহাদের পঞ্চান্ন নয়া পয়সা রেজেস্ট্রি খরচ পাঠাইবার প্রয়োজন নাই, কুপনে বা উপরের ফর্মে "পত্রিকা হাতে যাইবে" এই কথাটি লিখিয়া দিবেন।

যাঁহারা কেবল পারদীয় সংখ্যা লইবেন তাঁহারা রেজেস্ট্রি খরচ সমেত চার টাকা চল্লিশ নয়া পয়সা পাঠাইবেন। পাকিস্তানের ক্রেতারা নিউজ কর্পার, কে. সি. দে রোড, চট্টগ্রাম এবং নূরুল হাসান ৩০, হৃষিকেশ দাস রোড, ঢাকা—১। এই ঠিকানায় অর্ডার জানাইবেন।

'বিংশ শতাব্দী'র এজেন্ট শ্রেণীভুক্ত হইবার আবেদন পত্র

কর্মাধ্যক্ষ মহাশয়,

পারদীয় সংখ্যা 'বিংশ শতাব্দী'র প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমাকে.....কপি ভি. পি. পি./ রেজেস্ট্রি রেল যোগে পাঠাইয়া দিবেন।

আমি এই সঙ্গে অগ্রিম.....টাকা পাঠালাম। অবশিষ্ট টাকা দিয়া ভি. পি. পি. ছাড় করাইয়া লইব। ভি. পি. পি. ফেরৎ আসিলে আমার জামানত বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে। আমার অর্ডার গ্রহণ করিয়া পাকা রসিদ পাঠাইয়া দিন।

নাম..... স্বাক্ষর

ঠিকানা.....

তারিখ.....

পারদীয় সংখ্যার প্রতিটির মূল্য তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা। এজেন্সী কমিশন ২৫%। এজেন্টরা প্রতিটি পারদীয় সংখ্যা দুই টাকা ৬২ নয়া পয়সায় পাইবেন। পাঁচ কপির কম এজেন্সী দেওয়া হইবে না। পত্রিকা এজেন্টদের নির্দেশমত ভি. পি. পি/রেজেস্ট্রি বা রেল যোগে যাইবে। ডাক খরচ সম্পূর্ণ আমাদের।

পত্রিকা প্রকাশের পূর্বে সম্পূর্ণ মূল্য অগ্রিম পাঠাইয়া রেজেস্ট্রি যোগে পত্রিকা লওয়াই সুবিধাজনক। কারণ ভি. পি. পি. অপেক্ষা রেজেস্ট্রি দ্রুত বিলি হয়। যাঁহারা ভি. পি. পি. তে বই লইবেন প্রতিটি বইয়ের জন্য অন্যূন পঁচিশ নয়া পয়সা না পাঠাইলে অর্ডার গ্রহণের নিশ্চয়তা নাই।

সূচীপত্র

বিংশ শতাব্দী
অষ্টম বর্ষ : ২য় সংখ্যা
শ্রাবণ ১৮৮৫

লেখক		বিষয়
সম্পাদকীয়	১১৩	আমাদের কথা
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়	১১৪	গাঙ্গের (ভ্রমণ)
সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১১১	সেই অচেনা মানুষটি (উপন্যাস)
মন্মথ রায়	১৩৩	সন্দেহ (গল্প)
রাম বসু	১৩৭	বাদশা বেগমের দেশে (ভ্রমণ)
অমল হালদার	১৪৭	অমর কথাশিল্পী চেকভ (বিশ্ব-সাহিত্য)
সুরেন্দ্রনাথ কর	১৪৮	সিংহলে বৌদ্ধলঙ্কাবতার (প্রবন্ধ)
মৃত্যুঞ্জয় মাইতি	১৫১	নতুন জনপদ (উপন্যাস)
শক্তিপ্রসাদ পাণ্ডা	১৬০	চতুরঙ্গে মুক্তিভাবনা (প্রবন্ধ)
শম্ভু গুহ	১৭১	নতুন হাওয়া (গল্প)
জীবনকৃষ্ণ শেঠ	১৭৭	ট্র্যাজিডির আদিকথা (প্রবন্ধ)
দেবব্রত দত্ত	১৮৪	এ্যাকসিডেন্ট (গল্প)
অমলেন্দু ঘোষ	৫৮	দ্বারকানাথ গুপ্ত প্রণীত 'হেমপ্রভা' (সংক্ষেপীকরণ)
হরিপ্রসন্ন চক্রবর্তী	১৯৫	নিশি বিহঙ্গ (উপন্যাস)
	২২২	নতুন বই (পুস্তক সমালোচনা)
রঞ্জন মজুমদার	২২৫	অনন্য সাধারণ চিত্র 'ছায়াসূর্য' (রঙ্গজগৎ)
চিত্র গুপ্ত	২৩১	পশ্চিম স্বর্গ (নাট্যজগৎ)

অঙ্গসজ্জা
নীতিশ মুখোপাধ্যায়

পরিকল্পিত উন্নয়ন

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ব্যয়ের ৮০ ভাগেরও বেশী কর্মসূচী, প্রতিরক্ষার পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় অংশ এবং পরিকল্পনার অবশিষ্ট অংশও প্রতিরক্ষার সঙ্গে পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট।

শিল্পোন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা এবং প্রতিরক্ষা শক্তির উৎসগুলি সুসংহত করার জন্য পরিকল্পনাকে এখন যথেষ্ট সুসংহত করা হয়েছে।

ইস্পাত এবং মেশিন টুল, ধাতু এবং কাঁচামালের উৎপাদন বাড়ানো হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারীং এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলির উৎপাদন—ক্ষমতা পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগানো হবে।

পরিকল্পিত উন্নয়ন হ'ল প্রতিরক্ষার মূল ভিত্তি। আরও দ্রুততা এবং দক্ষতার সঙ্গে এই পরিকল্পনা রূপায়িত করার অর্থ হ'ল—আপনি একদিকে যেমন প্রতিরক্ষা গড়ে তুলবেন তেমনি দেশকে প্রকৃত শক্তিশালী ক'রে তুলবেন।

জাতীয় প্রতিরক্ষার জন্য

All rights reserved

এখন থেকে লীটার

এখন থেকে সমগ্র দেশের ব্যবসা বানিজ্য পরিমাণমূলক মেট্রিক ওজন ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক ● গত বছর কিলোগ্রাম ও মীটার বাধ্যতামূলক হয়েছে ; কাজেই মেট্রিক পদ্ধতির ওজন ও পরিমাপ এখন ভারতে একমাত্র বৈধ ওজন পদ্ধতিতে পরিণত হ'ল ● মেট্রিক এককগুলির অন্তর্নিহিত গুণ অনুযায়ী সেই রকম ভাবেই (লীটার, মীটার, কিলো) যদি এগুলি ব্যবহার করেন তাহ'লে মেট্রিক পদ্ধতির সরলতা, আপনার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে ● পুরাণো সের, ছটাকের অনুপাতে মেট্রিক ওজন ব্যবহার করবেন না।

তাড়াতাড়ি কেনাকাটা এবং ন্যায্য লেনদেনের জন্য

পূর্ণ সংখ্যার

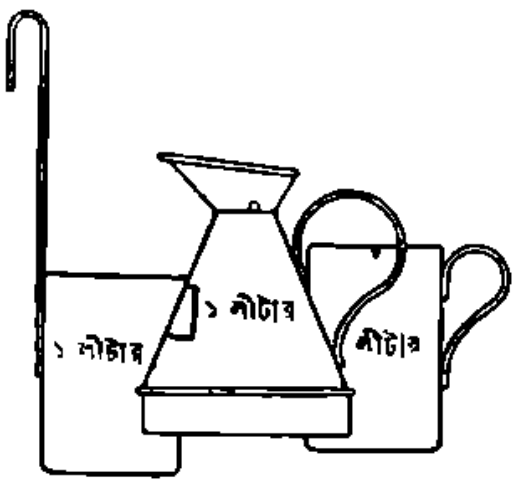

মেট্রিক একক

ব্যবহার করুন

স্বপ্নের মোহজাল রচে . .

হিমকল্যাণ

আয়ুর্বেদীয় হিমসিদ্ধ
সুরভিত কেশতৈল।

পাম্মিকোকো

খুব সুরভিত
নারিকেল তৈল।

হিমকল্যাণ ক্যাস্টর অয়েল

বৈজ্ঞানিক উপায়ে
পরিশোধিত ও
সুগন্ধিত কেশতৈল।

ভৃঙ্গামলা

ভৃঙ্গরাজ ও আমলা
সহযোগে প্রস্তুত
কেশপরিচর্যা
কেশতৈল।

যোড়শগন্ধা

স্নানের
সুগন্ধি বিলাস।

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস্ লিঃ
কলিকাতা-৪

নিত্য ব্যবহারে সার্থকতার গ্যারান্টি আপনারই . .

UP60

'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'

বিংশ শতাব্দী

শ্রাবণ
১৮৮৫
অষ্টম বর্ষ
২য় সংখ্যা

আমাদের কথা

যে গাছে বসিয়া আছি সেই গাছের শাখা ছেদনকে বিজ্ঞতার পরিচয় বলিয়া মনে করা কঠিন। মহাকবি কালিদাস নাকি বাল্য বয়সে ঐরূপ 'নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়াও পরবর্তী জীবনে সার্থক কবি হইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ কালিদাসের দেশ—সুতরাং আমরা রাষ্ট্রনীতিবিদরাও যদি মহাকবিকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেন তবে তাহাদের নিন্দা করা যায় না বরং বিদেশের দিকে না তাকাইয়া তাহারা যে যথার্থ দেশীয় আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন তাহার জন্য তাহারা ধন্যবাদ দাবী করিতে পারেন।

রাজনীতির গূঢ় তত্ত্বের সহিত আমাদের পরিচয় নাই, তথাপি আমরা এ কথা জানি জনসাধারণের সমর্থন ভিন্ন কোন সরকার দীর্ঘদিন টিঁকিয়া থাকিতে পারে না। জনসাধারণের সমর্থনে পুষ্ট হইয়াই কংগ্রেস একদিন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়াছিল আজ যে সেই জনসমর্থন কংগ্রেস সম্পূর্ণরূপে হারাইয়াছে একথা আমরা বলিতেছি না। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে যে, যে জনসাধারণের শক্তিতে তাহারা প্রতিষ্ঠা সেই জনসাধারণ আজ কংগ্রেসের হাতে নির্মমভাবে নিপীড়িত হইতেছে।

আমরা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কথাই বলিতেছি। যে হারে জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি হইতেছে তাহাতে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত জনসাধারণের নাভিশ্বাস উঠিতেছে। চীন আক্রমণকে কেন্দ্র করিয়া দেশে জরুরী পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে সেই জরুরী পরিস্থিতিতে সাড়া দিবার জন্য দেশবাসী যে সর্বক্ষণে প্রস্তুত আছে এবং যত দিন প্রয়োজন প্রস্তুত থাকিবে গত কয়েক মাসে তাহা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু দেশবাসীর এই আত্মত্যাগের ইচ্ছাকে মুনাফাখোর, কালোবাজারীরা নিজেদের মুনাফা অর্জনের পন্থা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে আর সরকারও সে ব্যাপারে চরম ঔদাসীন্যের পরিচয় দিতেছেন।

বিলাসদ্রব্যের দাম বাড়ে বাড়ুক—সিগারেট, মদ, মোটর গাড়ী বা এথার-কণ্ডিশনারের মূল্য বৃদ্ধিতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু ভাত কাপড়ের দাম যদি গগনস্পর্শী হয় তবে যে জাতির প্রাণসত্তায় আঘাত পড়ে একথা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হয় না।

কলিকাতায় বর্তমানে চাউলের দর ৩২ টাকা হইতে ৩৬ টাকার মধ্যে। কাপড়েরও মূল্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। চাউলের সর্বোচ্চ দর ২২ টাকায় বাঁধিয়া দিবার প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া পশ্চিমবঙ্গের সরকার-পক্ষ বলিয়াছেন যে, যেখানে ১৯ টাকায় চাউল মিলিতেছে সেখানে ২২ টাকায় চাউলের দর বাঁধিয়া দিবার প্রস্তাব অর্থহীন।

যে গাছে সরকার বসিয়া আছেন তাহার শাখা ছেদনে তাহারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলে আমাদের কিছু বলিবার নাই। কিন্তু একটি অসহায় জাতিকে লইয়া উনিশ টাকার চাউলের 'রগড়' না করিলেই বোধ হয় ভাল হইত।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ব্রহ্মানন্দ, ব্রহ্মচারীর কথায় বিচলিত হয়ে দেবীর সাধনায় লিপ্ত হলেন। দেবী ভক্তের আকুলতায় আবির্ভূতা হয়ে বললেন : ব্রহ্মচারীর কথা শুনে, তোমার ও সাধন-ভূমি শীঘ্রই সমুদ্রে বিলীন হয়ে যাবে তাই ব্রহ্মচারীর উপদেশ পালন করো। ব্রহ্মানন্দ তখনও আরাধনায় নিমগ্ন, অকস্মাৎ সমুদ্রে মহা ঘূর্ণিঝড় উত্থিত হয়ে উত্তাল তরঙ্গমালা বিক্ষুব্ধ করে, বেলাভূমি প্লাবিত করে, যেন মহা-প্রলয়ের সূচনা করল। মহা ভয়ে বিভ্রান্ত বনচর, যেচরের ভীত আর্তনাদ ও সমুদ্র গর্জন সহযোগে ভয়ংকর শব্দ সৃষ্টি করে সন্ন্যাসীবরকে বিপর্যস্ত করল। ভীত ভক্তদের দৈববাণী শোনালেন দেবী মা ভৈঃ, তোমরা চোখ বুজে ঐ শীলাস্তম্ভের উপর উঠে বস। তারপর ধ্যানে পদ্মা কুলের কালী হ্রদ তীরের ব্রহ্মবেদী চিন্তাকর নিমেষে সেখানে পৌঁছবে তোমরা। গিরি ও ব্রহ্মচারী মুহূর্তে উপস্থিত হলেন কালীঘাটে। তারপর দেবীর আদেশ অনুযায়ী বার হাত লম্বা পুঁহাত চওড়া দেড়হাত বেদী কালীকা মূর্তি নির্মাণ করে ব্রহ্মার আরাধনা-সিদ্ধ বেদীর উপর প্রতিষ্ঠা করলেন তাঁকে।

তারপর চৈত্র মাসের এক প্রভাতে পুণ্যতোয়া ব্রহ্মানন্দ গিরি গভীর অরণ্যের মধ্যে দেখলেন এক পাল হরিণী গাভী আপন ক্ষীরধারায় প্লাবিত করছে একটি বিশেষ স্থান। বিস্মিত সন্ন্যাসী সে স্থান অনুসন্ধানে খুঁজে পেলেন এক কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর। তারপর তিনি ধ্যানে জানলেন প্রস্তরটি শিলারূপী ভৈরব নকুলেশ্বর।

দেবী মন্দিরের মত আর এক পর্ণ কুটীর নির্মাণ করে তাঁরও পূজা অর্চনা শুরু করলেন সন্ন্যাসীবর। চৈত্রের পর বৈশাখমাসের শুক্লা চতুর্দশীতে আর এক বিচিত্র ঘটনায় সম্ভব হল সতীর দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠ সংরক্ষণ। দূরদেশাগত এক পুণ্যকামী তীর্থযাত্রী ব্রাহ্মণ দম্পতী। রাত্রে কালী হ্রদের তীরে উপাসনায় মগ্ন দেবী বিভূতি প্রত্যক্ষ করলেন। ভক্তিমতী ব্রাহ্মণী স্বামীকে আহ্বান করে দেখালেন। রাতের অন্ধকারে গভীর কালীহ্রদের কালজল পূর্বকোণ ঘেঁষে অরুণ আভায় উদ্ভাসিত। ব্রাহ্মণ সে জ্যোতিপুঞ্জ দেখতে না পেলেও সন্ন্যাসীবরের চোখে তা প্রত্যক্ষ হলো এবং দেবীর নির্দেশ স্মরণে এলো। হ্রদ মধ্য থেকে পদাঙ্গুলী চতুষ্টয়

সংগ্রহ করে পরদিন স্নানযাত্রার পূর্ণিমা তিথিতে নির্দেশিত বৃক্ষবেদীর অধিকোণে যথারীতি প্রতিষ্ঠা করলেন। আজও ঐ পবিত্র দেবীঅঙ্গ ছোট লোহার সিন্দুকের মধ্যে সেখানেই রয়েছে এবং এখনও প্রতিষ্ঠা দিবস স্মরণে স্নান যাত্রার দিন তাকে স্নান করান হয়। এবং সেবাতে শ্রী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সার্বভৌম রচিত 'কালীঘাট ইতিবৃত্ত' অনুসারে ঐ পাথরের আড়াই চারটির ওজন সাড়ে ছয় সের।

এই মহাভাগ্রত মা কালীর প্রসাদেই ডিহি কলকাতার প্রসার ও প্রতিপত্তি। কাদি "দেহ" অর্থাৎ গ্রাম সমষ্টি, কথাটি থেকেই বাংলায় এসেছে ডিহি। ডিহি শ্রীরামপুরের নাম বালীগঞ্জ গার্ডেন্স এ পরিবর্তিত হয়েই সুতানুটি কলকাতা থেকে ডিহির প্রচলন উঠে গেল। এই কলকাতার আদি যুগে সেই কোম্পানীর আমলে মা কালীর পায়ে নজরানা পেশ করত স্বয়ং কোম্পানী এবং তার সাহেবরা। দিল্লীশ্বর সাহ আলমের দরবার থেকে দেওয়ানির পাট্টা লাভ করেই সপেপাই ক্লাইভ মহাড়ম্বরে কালী ঘাটে পূজা দিয়েছিলেন এবং আনন্দ মুখর সেপাইরা সে দিন ফেরার ফিরতে ফিরতে গান গেয়ে ছিল :

'কালী গৈয়ে কলকত্তাকি, দিনকে পূজা
ফিরিঙ্গি কিনু,
বাঙ্গালিকো মুলুক ধনদৌলত দখল করলিনু।'

এমন ঘটনা আরো আছে যেমন, কোম্পানী দেওয়া ৫০০০৲ টাকার পূজা ও নৈবেদ্য দানের কাহিনী লেখা আছে 'লাইফ এণ্ড টাইমস অব কেরী, মার্শম্যান এণ্ড ওয়ার্ড' বইতে। এ জাগ্রত তীর্থ কাহিনী তখন সর্বজন পরিচিত ছিল, তাই কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সে দিন নিশ্চিন্তে লিখেছিলেন :

'এই কলিকাতা কালিকা ক্ষেত্র কাহিনী ইহার
নবার শ্রুত
বিষ্ণুচক্র ঘুরেছে যেথায়, মহেশের পদধূলে এ পূত'

প্রতাপাদিত্যের হঠকারিতায় বসন্ত রায় হত হলেন। স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষী প্রতাপ মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর-এর সংগ্রামে পরাভূত ও নিহত হয়ে যশোরের পরিণতি টানলেন। বিজয়ী মোঘল সেনাপতি মানসিংহ তাঁর গুরু বাংলার গোপাটা গোপালপুরে নিবাসী শক্তি সাধক কামদেব গঙ্গোপাধ্যায় ও পদ্মাবতী দেবীর পুত্র লক্ষ্মীকান্তকে খাসপুর, বড়িশা প্রভৃতি জমিদারী দান করে বাংলায় আর এক প্রতিপত্তিশালী জমিদার বংশ বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরীদের প্রতিষ্ঠা করলেন। উর্দু বড়হীয়া বা বড় অংশ কথা থেকেই নাকি বড়িশা নামের সুত্র। বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে এই সাবর্ণ চৌধুরীরাই ছিলেন গোটা বাংলার বৃহত্তম অংশের জমীদার। আবার একদিন এই সাবর্ণ

চৌধুরীই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে মাত্র ১২০০৲ টাকায় কলিকাতা, গোবিন্দপুর ও সুতানুটি বিক্রয় করে বণিকের মানদণ্ডকে রাজদণ্ডে পরিণত সুযোগ করে দেন। এ বংশের কীর্তিমান পুরুষ সন্তোষকুমার নবাব আলিবর্দিকে খুশি করে ছিলেন নিজের ভোজন পারদর্শী দেখিয়ে, মাত্র আধ মন মাংসের একটি গোটা পাঁঠা হজম করে নবাবের কাছ থেকে শুধু খাজনা মকুব করিয়েছিলেন নয় সেই সঙ্গে খোরাকি মহল হিসাবে একটা জায়গীরও পেয়ে ছিলেন ডায়মণ্ডহারবারের কাছে। এ বংশের স্মৃতি এখন জড়িয়ে আছে আজকের বড়িশার জরাজীর্ণ, বংশ বৃদ্ধিতে অংশে অংশে বিভক্ত বংশধরদের। উঁচুদের মাঝে স্থির গাম্ভীর্যে দাঁড়িয়ে আছে আকাশ মুখি স্তম্ভ শ্রেণী। ওখানেই নাকি উৎসব মুখর আমন্ত্রণে ভর চার্চকে বসিয়ে ছিলেন সে দিনের গৃহ কর্তা। এখন ঐ স্থানীয় ছেয়ে স্কুলের উঠোন ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে রাজা সন্তোষ কুমারের তৈরি শিব মন্দির শ্রেণী, অঙ্গে অঙ্গে জীর্ণতা ও পোড়া মাটির অলংকরণ ও পুতুল পাটা ধারণ করে।

সন্তোষ কুমার রায়চৌধুরী বা শিবদেব ছিলেন সারদা চৌধুরী বংশের লক্ষ্মীকান্তের প্রপৌত্র ও কেশব রায়ের পুত্র বা ১৭১১ সালে একদিন তিনি সস্ত্রীক নৌকা ভ্রমণের সময় আদি গঙ্গার তীরে ঐ স্থানের নিকুঞ্জ গভীর সন্ধ্যারতি শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনি শুনে কৌতূহলী পূজা স্থানে উপস্থিত হয়ে দেবীর আরাধনারত এক তান্ত্রিক ব্রাহ্মণকে। তাঁর কাছে স্থান মাহাত্ম্য শুনে শাক্ত সন্তোষ রায় ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে বর্তমান কালী মন্দিরের নির্মাণ শুরু করে বিগত হলেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর আত্মীয়দের দ্বারা মন্দিরের নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়।

অসাধারণ বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন সন্তোষ কুমার অবশ্য এটাকে সংগ্রহ করেছিলেন সমকালীন সমাজে প্রচলিত জমিদারী আত্মম্ভরীতার সুযোগে। সেদিনের কলকাতার অন্যতম উপভোগ্য রস ছিল পোড়াবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণদেব ও চূড়ামণি দত্তদের রেষারেষি। এদের এই আত্মসংলগ্ন কলহের নানা গল্প প্রচলিত আছে। একদিন এক গরীব ব্রাহ্মণ ছেলের কানের অসুখে ব্যবহারের জন্য আতর ভিক্ষা করতে দেবেদের বাড়ী এলেন, এক বৃহৎ পাথরের বাটী হাতে। নবকৃষ্ণের ছেলে গোপী কৃষ্ণ ধামুনের হাতে পাথরের বাটির মাপ দেখে ঠাট্টা করে চূড়ামণি দত্তের বাড়ি থেকে আতর সংগ্রহ করতে

শিল্প নগরী—টিটাগড়

বল্লেন। স্বপ্ন চূড়ামণির বাড়ি গিয়ে সব কথা বলে আশ্বস্ত করতে চাইল। বিক্ষুব্ধ চূড়ামণি চিৎপুরের ফৌজদারী বালাখানা থেকে বাদশাহী আমলের ডেকে দুহাজার টাকা দিয়ে এক কলসী আতর কিনে ব্রাহ্মণকে দিলেন। নির্দেশ দিলেন নবকৃষ্ণ আর গোপীকৃষ্ণকে দেখিয়ে ফিরে আসতে। তারপর বামুনের কাছ থেকে পুরো টাকা দিয়ে সে আতর আবার কিনে মান রক্ষা করলেন চূড়ামণি। আড়াআড়ির মাঝে হঠাৎ একদিন নবকৃষ্ণ প্রচলিত গঙ্গাযাত্রার নিয়ম লঙ্ঘন করে আপন গৃহে বিগত হলেন, সে দিনের বিচারে এ প্রায় অপঘাত মৃত্যুতুল্য। এ যাত্রার এ মৃত্যু প্রতিযোগিতায়ও চূড়ামণি হার মানলেন না, কদিনের মধ্যেই কঠিন রোগাক্রান্ত হয়ে মরণাপন্ন হলেন তিনি। তখন আর দেখে কে, নামাবলীর চাদোয়ার তলায়, চাঁদির চতুর্দোলায় শুয়ে চুয়া চন্দনের ফোঁটা কেটে তুলসী পাতার মালা পরে ঢাক ঢোল কীর্তন, নিশান নিয়ে গঙ্গা যাত্রায় বেরোলেন তিনি। কীর্তনের পদ ছিল :

'আরে আয় নগরবাসী কে দেখবি আয়,
জগৎ জিনিয়া চূড়া যম জিনিতে যায়।
যম জিনিতে যায়রে চূড়া যম জিনিতে যায়,
জপ তপ কর কিন্তু মরতে জানলে হয়।

বিবেচনা হীন নবকৃষ্ণের কাছে এবং চূড়ামণির বিজয়ে ক্ষুব্ধ গোপীকৃষ্ণ এবার চূড়ামণি পুত্র কালীপ্রসাদের সঙ্গে মুখল বাইজীর ঘনিষ্ঠতা, খবর রটিয়ে চরম প্রতিশোধ নিলেন। ফলে ব্রাহ্মণ পরিত্যক্ত হয়ে পিতৃকার্য দুরূহ হয়ে উঠল। নিরুপায় কালীপ্রসাদ রামদুলাল সরকারের শরণ নিলেন (ছাতু ও লাটুবাবুর পূর্ব পুরুষ)। রামদুলালের নির্দেশে দক্ষিণ বিভাগের সমাজপতি সন্তোষকুমার তাকে আশ্রয় দিলেন। তারপর সমাজপতিকে ২৪০০০৲ টাকা সামাজিয়ানা দিয়ে এবং বামুনদের প্রচুর দান ও দক্ষিণা দিয়ে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন তিনি। পরাজিত গোপীকৃষ্ণ এবার সন্তোষকুমারের স্বপক্ষে লেগে রটিয়ে দিলেন টাকা খেয়ে এমন অপকর্মের প্রশ্রয় দিয়েছেন তিনি। এমন ভয়াবহ বদনাম থেকে বাঁচার তাগিদে ঐ টাকা দিয়ে পরের বছর আট কাঠা জমির ওপর ভিত্তি স্থাপন করে বর্তমান কালীমন্দির সুরু করলেন সন্তোষকুমার।

নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতই ভক্ত সমাগম বাড়তে থাকে। সৃষ্টি হয় নব জনপদ এবং নিবন্ধিত ভক্ত মণ্ডলীর সমাগমে ক্রমে বিকাশের কেন্দ্র হিসেবেও প্রতিষ্ঠা লাভ করে এ পরিবেশ মন্দিরে সমাগত ভক্তমণ্ডলী পরম্পরাগত ভারতীয় প্রথা অনুসরণে সংগ্রহ করে নিয়ে যেতেন তীর্থ স্মৃতি। আজও এ প্রথা প্রচলিত তীর্থে বিরল নয়। পূর্ববঙ্গের বামরাই মাধবের মাটির মূর্তি বা জগন্নাথের কাঠের মূর্তি ও পট সংগ্রহের প্রচলন ছিল ও

HOOGLY BRIDGE

এখনও আছে এমনকি ক্যানিংহাম-সংস্কৃত বুদ্ধ গয়ার বুদ্ধ মন্দিরের আকার পত প্রমাদ প্রকাশিত হয়েছে ডাঃ ভি. বি. স্পুনারের পাটলীপুত্র খননের সময় (১৯০৪ খৃঃ) একটি বৃহৎ মৃত্তিকা-ফলকে বুদ্ধগয়া মন্দিরের মূল প্রতিকৃতি আবিষ্কারের ফলে। ডাঃ স্পুনার ধারণা করেছিলেন বুদ্ধগয়া মন্দিরের প্রতিকৃতিসহ এ মৃৎ-ফলকটির পাটনায় অবস্থিতির কারণ ভক্তজনের তীর্থ স্মৃতি সংগ্রহ।

কালীঘাটের পটশিল্পীদের অবস্থানের কারণ সম্ভবত এরূপই প্রয়োজন। ভক্তজনের কালীঘাট স্মৃতি সংগ্রহের গরিমা মেটাবার জন্য হয়তো সমবেত হয়েছিলেন এই সব পটুয়া। তাই কালিঘাটের পটের প্রাথমিক পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয়েছে ১৯শ শতকের গোড়ার দিকে।

তাই কালীঘাটের পটের প্রাথমিক রূপ দেখা যায় অনেক সূক্ষ্মতর ও অলঙ্করবহুল সুনিপুণ চিত্রকর্ম। সেদিনের সে কাজগুলিতে যতটা দরবারী শৈলী প্রকাশ পেত পট চরিত্র ততটা অনুপস্থিত থাকত। এবং তার বিক্রয়মূল্যও সেদিন যথেষ্ট ছিল। কোলকাতার ভারতীয় সংগ্রহশালা প্রকাশিত ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে টি, এন মুখার্জি' রচিত আর্ট' ম্যানুফ্যাকচারাস' অব ইণ্ডিয়া গ্রন্থে এমন কথার উল্লেখ আছে। কিন্তু এই প্রাথমিক পটের অলঙ্করণ ও সূক্ষ্মতা ক্রমে কোলকাতার চিত্র বিদ্যালয়ের ছাত্রদের অঙ্কন ও বিদেশে মুদ্রিত এচিং লিথো ও ওলিওগ্রাফের সঙ্গে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়ে ১৮৯০ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত কাজগুলি রঙে ঢঙে সরল ও কম রেখায় দুঃসাহসী হয়ে বাঁচার শেষ চেষ্টা করে। তখন এ পটগুলির দাম দশটাকা থেকে নেমে এক আনা ও পরে এক পয়সায় দাঁড়ায়। শেষের দিকের এ দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় নিয়োজিত শিল্পীদের কয়েক জনের নামও জানা যায় শ্রীঅজিত ঘোষ মহাশয়ের আলোচনায়। যেমন নীলমণি দাস, গোপাল দাস, বলরাম দাস প্রভৃতি। এই সব প্রতিভাবানের শেষ বংশধররা এখন অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে আপন বৃত্তি পরিবর্তনে বাধ্য হয়েছে এবং কালীঘাটের পটের দুই অবিনশ্বর শিল্পী নীরবরণ চন্দ্র ঘোষ ও তার ভ্রাতা কালীচরণ ঘোষ ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে প্রায় ৭০ বছর বয়সে বিগত হয়ে কালীঘাটের পটধারার সমাপ্তি ঘটায়

কালীঘাটের চিত্রশৈলীও একটি সংশ্লেষণজাত পরিণতি। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা লাভের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় উদ্ভিদতত্ত্ব চিত্রণের প্রয়োজনে তাঁরা বিহারী কায়স্থ শিল্পী এবং মুর্শিদাবাদী মুসলমান দরবারী শিল্পী কোলকাতায় আনিয়ে পাশ্চাত্যের সৌখীন শিল্পীর সহযোগিতায় ওই সব বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের চিত্ররূপ সৃষ্টি করেন। এ প্রয়োজনে ভারতীয় মোটা রঙের ব্যবহারের বদলে কিরিঙ্গি নির্দেশে ক্রমে ক্রমে পাশ্চাত্যের জল-রঙের ব্যবহার সুরু হয়। এই সব

দরবারী ঘরোয়ানার শিল্পীদের কোলকাতা অবস্থানের সুযোগই সম্ভবত কালীঘাটের পটেও এমন জল-রঙের ব্যবহার সংক্রামিত করেছে। তবু কালীঘাটের পটে যেমন অপরূপ সরল ও কমনীয়তার প্রকাশ বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তেমনি ঘন রঙের ব্যবহার দুর্লক্ষ্য নয়। মূলত কালীঘাটের পট বর্ণবিন্যাসে, অনুষঙ্গসাধনে বিশেষ করে অসাধারণ শৃঙ্খলাবোধের বন্ধনে একক ও মহান।

আজ কালীঘাটের পট বা পটুয়া নেই, তাদের স্মৃতি বহন করছে ভবানীপুরের পোটোপাড়া। যেমন কোলকাতার পোটুয়াটুলী আজ দপ্তরির পাড়ায় পরিণত হয়েছে। যন্ত্রযুগের প্রতিযোগিতায় যেমন পোটুয়ারা পরাভূত ও নিশ্চিহ্ন তেমনি ভাগিরথী গঙ্গার প্রবাহ পরিবর্তনে আদি গঙ্গার প্রতিষ্ঠা বিলুপ্তপ্রায়। আজ তা গল্প কাহিনী। আদি গঙ্গা আজ তার প্রয়োজন ফুরিয়ে জীর্ণা শীর্ণা টালি সাহেবের নালায় পরিণত। মঙ্গল কাব্যের নায়িকা ভাগিরথী প্রবাহের সেই আদি গঙ্গাকে প্রত্যক্ষ করতে গেলে আজ সপ্তদশ শতকের কানা ডেনা ব্রকের নকশাই সম্বল। শোনা যায় আলীবর্দির নবাবীতে কোলকাতার খিদিরপুরের ওপারে চাওড়ার দক্ষিণে ভাগিরথী প্রবাহকে পরিবর্তন করা হয়েছিল। কারণ আদি গঙ্গা পলির প্রাবল্যে নৌপথের অযোগ্য হয়ে পড়ায় সম্ভবত নবাব আলীবর্দি আজকের এই সোজা দক্ষিণ বাহী খাল বা কাটি গঙ্গা তৈরী করে প্রাচীনতর সরস্বতী নদীর দক্ষিণতম খালের সংগে সংযুক্ত করেন। নতুন পথের সন্ধান পেয়ে উর্মি উচ্ছলা ভাগিরথী আজ পুরাতনকে পরিত্যাগ করেছে। ভাগিরথীর এ পরিবর্তনের সংগে সংগে যুগ পরিবর্তন অনুসরণে আদি গঙ্গা আজ খাল, আর তার স্থান কাল পাত্র সবই ভিন্ন। তাই ভিন্নতর পথে বিভিন্ন রস অনুসন্ধানী পথিক ঢেউ-এ ঢেউ-এ এগিয়ে যায়।

কলকাতার পর খিদিরপুর, তারপর মেটিয়াবুরুজ। মাটিয়াবুরুজ তার নামের মাঝেই ধরে রেখেছে বাংলার প্রতাপের স্মৃতি। মুঘলদের সংগে যুদ্ধের প্রয়োজনে গঙ্গা, বিদ্যাধরী, মাতলা, ইছামতী প্রভৃতির পাড়ে পাড়ে যেসব ছোট বড় দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন তিনি, এই মুচি খোলায় তেমনি এক মাটির দুর্গ বানিয়ে মেটিয়া বা মাটিয়াবুরুজ নামের সৃষ্টি করে গেছেন প্রতাপ। এখানে শুধু নামটুকুই জেগে থাকলেও বাঁড়াপর দ্বারগড় থেকে মুলাজোড়ের কাছে সেই জগদ্দল পর্যন্ত এমন দুর্গের শেষ চিহ্ন ছড়িয়ে আছে চার দিকে। খুড়া বসন্ত রায়ের সংগে জমিদারী দ্বন্দ্বে জয়ের পর বসন্ত রায়ের মত প্রতাপেরও প্রয়োজন হল গঙ্গাবাসের

KHARDAHA

খড়দহ-এর গঙ্গার ঘাট

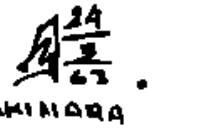

উপযুক্ত স্থানের। তাই খুড়ার বাহাদুরের মত প্রতাপ বাঘে গরুতে থাকতেন অযোধ্যার দুর্গে। ভাটপাড়ার কাছে দুটি শুষ্কপ্রায় পরিখা এবং ভরাট চওড়া গড়-খাই থেকে তৈরী পুকুর আর দুর্গের প্রায় মাঝামাঝি ভাগোর ঘাট বাঁধান বিস্তৃত রাজার পুকুর ইত্যাদি এখনো সেখানে প্রতাপের স্মৃতিবহন করছে। এই মেটেবুরুজেই একদিন জব চার্ণক হঠাৎ আক্রমণে অধিকার করেন বাদশাহী মুখওয়া খানা ও নিমক মহল, নবাব সায়েস্তা খাঁর সপ্তম কষ্টি চেষ্টায় বিফল হয়ে। মুঘল রাজত্বে নবরত্নের মধ্যে লাভজনক ছিল, এবং মোদিনীপুরের ছিজলীতে নুন তৈরী হয়ে গুদাম জাত হত এই মেটে-বুরুজের নিমক মহলে। চার্ণক প্রতিহিংসায় ছিজলীও জয় করেন।

কুচক্রি ইংরাজের হাতে মাল মুল্লুক সব ফেলে দিয়ে একদিন এখানেই শেষ আশ্রয় নিয়েছিলেন লক্ষ্ণৌ-এর রঙ্গিলা নবাব ওয়াজেদ আলিশাহ। বন্দি নিমন্ত্রিত রঙ্গিলা নবাব তাই আশ্রয়দাতা কলকাতাকে দিয়েছেনও যথেষ্ট। বড়ার সহবাসে সহবৎ শিক্ষা পেয়েছে কলকাতা, দেখেছে, উপভোগ করেছে নবাবী মহফেল, মজলিস। আসলী লক্ষ্ণৌই বাইদের কণ্ঠে মোহিত হয়ে শুনেছে ভারতীয় সংগীতে রঙ্গিলার অনবদ্য দান খাঁটি লক্ষ্ণৌই ঠুংরী। রাতভোর মুশায়েরা শুনে উর্দুশায়েরের রস বুঝেছে. ফৌজদারী বালাখানা সুবাসিত হয়েছে আতর আরকে। হেকমান পরিতৃপ্ত হয়েছে লাক্ষ্ণৌই বাবুর্চির হাতে রাঁধা কোপ্তা কাবার পরোটা বিরিয়ানি পালি-দার আস্বাদে। কলকাতার খানদান সুস্বাদুতর হয়েছে লাক্ষ্ণৌ চিকনের স্পর্শ পেয়ে। সেই সুবাদেই লাক্ষ্ণৌকে ছাড়িয়ে আজও মেটেবুরুজের চিকনের কাজ জগৎ বিখ্যাত। কলকাতা ঠেঁট উর্দু শুনে শ্রুতিসুখ পেয়েছে, বে আদবি ছেড়ে আদব শিখেছে লাক্ষ্ণৌ-এর কাছেই। তারপর ১৮৮৭ খৃঃঅব্দের একদিন এখানে রঙ্গিলা তাঁর অভিশপ্ত জীবনের সীমা টানলেন, হয়ত তাঁর হৃদয় ছোঁড়া পাখির ঠুংরি তালে গাইতে গাইতে—

"কোন্দামি বাহাদুর ক্যাজুলুম কিয়া,
মেরে মাল মুল্লুক সব ছিনলিয়া।
অন্দর রোয়ে খানম বেগম,
বাহার রোয়ে সাহেলিয়া।"

[ক্রমশঃ

॥ পাঁচ ॥

চিঠিখানা খুলতে গিয়েও খুলতে ভয় হতে লাগল তার।

খামের লেখাটা অপরিচিত।

নিজের ঘরে বসে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খামখানা সে দেখলে ভাল করে। পোস্টমার্কও দেখলে। কলকাতার কোন পোস্ট অফিসের ছাপ চিঠিতে।

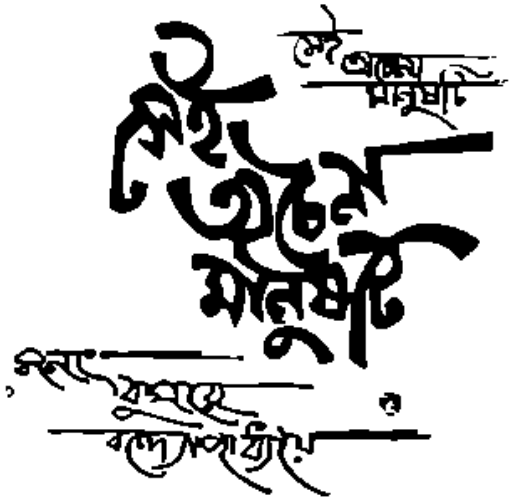

যদি সুনির্মলা লিখে থাকে সে ভেবেও বুক কাঁপল আবার সুনির্মলা লেখেনি এটা ভাবতে গিয়েও বুক কাঁপল। ভাবতে ভাবতেই টিনের ভিজহোল্ডারটি নিয়ে খামখানি সে যত্নে কেটে ফেললে তারপর ভিতর থেকে চিঠিখানি বের করে নিয়ে এল।

অবাক কাণ্ড। ইংরিজীতে লেখা চিঠি। ঝরঝরে কাগজ, কাগজের মাথায় থরু করে বারাকপুরের একটি ঠিকানা লেখা। 'চিঠিখানার মাথায় ইংরিজীতে লেখা 'ব্যক্তিগত ও গোপনীয়।' তারপর দু পাতা টানা ইংরিজী হাতের লেখা। চিঠির নীচে সই করেছেন জনৈক জেমস নর্থ।

চিঠিখানা আদ্যোপান্ত দুবার পড়ল শংকর। মিঃ জেমস নর্থ প্রথমেই অনুরোধ জানিয়েছেন যেন চিঠির বিষয়বস্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করা না হয়। চিঠির বিষয়বস্তু হল উমাশংকরবাবু যদি একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন অথবা উমাশংকরবাবুর অসুবিধা থাকলে তিনিই উমাশংকরবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেন। তাঁকে যদি উমাশংকরবাবু দেখা করতে বলেন তা হলে কলকাতার কোথায় কবে সাক্ষাৎ হতে পারে তাঁকে জানালে সেইমত দেখা করবেন তিনি। অন্যথায় যদি উমাশংকরবাবুই তাঁর সঙ্গে দেখা করেন, কবে কখন দেখা করতে পারবেন জানালে তিনি দেখা করার জায়গা জানাবেন। তাড়াতাড়ি পত্রের উত্তর পেলে পত্র লেখক বিশেষ বাধিত হবেন।

চিঠিখানা পড়ে অবাক হয়ে গেল শংকর। বিস্ময় বৈকি! এ চিঠি কেন এল তার কাছে, জেমস্ নর্থ'ই বা কে তাও ভেবে কূল কিনারা পেলে না।

একবার প্রাণভরে হেসে নিলে সে।

ভাবল সে নিজেকেই ঠাট্টা করে। এ নিয়ে তার এত ভাবনাই বা কি? শ্রীযুক্ত জেমস্ নর্থ কে তা সে ভেবে সে কূল কিনারা পাচ্ছে না। কূল কিনারা পাবার তার দরকারটাই বা কি? শ্রীযুক্ত জেমস নর্থ নর্থের বা ওয়েস্টের কোন একজন ভদ্রলোক, যিনি ব্যারাকপুরে থাকেন। তিনি শ্বেতবর্ণ শ্বেতদ্বীপবাসী অথবা কৃষ্ণবর্ণ ভারতবাসী তা ভেবে তা দরকারটা কি? তিনি তাকে দেখা করতে বলেছেন, সে দেখা করবে। ব্যস, তা হলেই চুকে গেল। এ নিয়ে বেশী ভাবনাচিন্তা করার দরকারটা কি তার?

যাক্, এখন চিঠিখানার জবাব দিলেই ব্যাপারটা এখনকার মত চুকে যায়।

সে খানিকটা কাগজ টেনে নিয়ে চিঠি লিখতে গেল। হাতের কাছে টেবিলের উপর পেন্সিলটা টেনে

নিলে। কিন্তু পেন্সিলটা আবার রেখে দিলে সে। নাঃ, পেন্সিলে লেখাটা ঠিক হবে না। কালিতেই লেখা উচিত! উচিত? কিসের উচিত? পেন্সিলে লিখলেই বা ক্ষতি কি? নাঃ থাক। পেন্সিল থাক। কলম তো আছে তার।

মনে পড়তেই মনটা এক মুহূর্তের জন্যে কেমন হয়ে গেল। কিন্তু সে এক মুহূর্তেরই জন্য। পর মুহূর্তেই আপন মনে একটু হাসল সে। ছেলে চামড়ার সুটকেশটা খুলে ফেলে তার ভিতরের জিনিসপত্র হাঁটকে কলমটা বের করে আনলে।

আরে কলমটায় কালি লিক করছে! তা চলে? খানিকটা ব্লাকডা চাই মুছবার জন্যে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল সুটকেশের মধ্যে তো রুমাল আছে। সুটকেশ খুলে একখানা নতুন রুমাল বের করে বেশ যত্নের সঙ্গে কালিটা মুছে ফেলে কলমের প্যাঁচটা চেপে বন্ধ করে দিলে। তারপর চিঠি লিখতে বসল।

চিঠি শেষ করে সেল কয়েক ছত্রের মধ্যে। চিঠিতে জানানো হল শ্রীযুক্ত কেদার নর্থের চিঠি পেয়ে সে বিশেষ আপ্যায়িত হয়েছে এবং তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। শ্রীযুক্ত নর্থের অনুরোধ মত সে তাঁর সঙ্গে দেখা করবে। তাতে তার কোন অসুবিধা হবে না। সে ব্যারাকপুরেও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারে। এখন শ্রীযুক্ত নর্থ কিন ও সময় জানালেই হয়। ধন্যবাদান্তে পত্র শেষ হল।

ব্যস, চিঠি লেখা হয়ে গেল। এইবার চিঠি পোস্ট করতে হয়। একখানা খাম চাই।

মুকুন্দবাবুকে বলবে না কি চিঠিটার কথা? নাঃ, বলা ঠিক হবে না। ভদ্রলোক চিঠি খামের মাথায় 'ব্যক্তিগত ও গোপন' মার্কা দিয়ে যে অনুরোধ করেছেন সেটা না রাখা অভদ্রতাসঙ্গত হবে না। আর ওটা এমন একটা কি কথা যে ওঁকে বলতে হবে!

সে অফিস ঘরের দরজার গিয়ে দাঁড়াল।

তাকে দেখেই মুকুন্দবাবু তার দিকে তাকালেন। এ সেই প্রথম দিনের চাউনি। কঠিন খটখটে চাউনি। একটু তাকিয়ে থেকে শক্ত ভাবে বললেন—আরে, তুমি এখনও স্নান করনি? তার মানে খাওয়াও হয়নি এখনও! কি হে কর! তা এখন ব্যাপারটা কি বলে ফেল! আমি বেলা দেড়টা পর্যন্ত না খেয়ে থাকা, দেরী করে কি যখন তখন খাওয়া পছন্দ করি না।

সেই পুরনো স্পর্শটি আবার অনুভব করতে পারলে শঙ্কর কথাগুলির মধ্যে। একটু হেসে বললে—এই এখুনি গিয়ে স্নান করব। আমাকে একখানা খাম দেবেন? চিঠি পাঠাব।

এক মুহূর্ত তার মুখের দিকে তাকিয়ে মুকুন্দবাবু দেরাজ থেকে একখানি খাম বের করে তার হাতে দিয়ে বললেন—যাও, স্নান করে খেয়ে নাও গিয়ে।

শঙ্কর সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত বাধ্য শিশুর মত ঘাড় নেড়ে চলে গেল।

খামখানার ভিতরে চিঠিখানি পুরে, বন্ধ করে, ঠিকানা লিখে সে চীৎকার করতে লাগল—সুহাসজী! সুহাসজী! এ সুহাস!

ছুটে এল সুহাস।

—এই চিঠিখানা পোস্ট করে দিয়ে এস। এসে আমাকে বল ফেলে দিয়ে এসেছি। দেখো যেন রাস্তায় ফেলে দিয়ে এসো না। পোস্ট বাক্সেই ফেলে এসো।

এমনি ধরণের রসিকতা সে মধ্যে মধ্যে করে রামসুহাসের সঙ্গে। রামসুহাস তার এ রসিকতা-গুলিকে চিনতে পারে, বুঝতেও পারে। তাই তার কথাগুলি শুনে হেঁকে হাত বুলিয়ে হেঁকের আড়ালে একটু হেসে নিয়ে চলে গেল রামসুহাস।

রামসুহাস চলে যেতে শঙ্কর আবার চীৎকার করতে লাগল—ল্যাংড়া! এ ব্যাটা ল্যাংড়া!

বার কয়েক ডাকতে ডাকতেই ল্যাংড়া ছুটে এল লেজ নাড়তে নাড়তে।

ল্যাংড়াকে স্নান করিয়ে সে স্নান করতে চুকল। ল্যাংড়া সারা মাঠে পরমানন্দে ছুটে বেড়াচ্ছে। মধ্যে মধ্যে মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে পরম কৌতুকে।

স্নান শেষ করে এসে সে আর দেখতে পেলে না ল্যাংড়াকে। ব্যাটা কোথায় গিয়ে পড়েছে আর কি?

কাপড় ছেড়ে মাথার চুলে আঙুল চালিয়ে চুল আঁচড়ানো শেষ করে সে বেরুল বারান্দায়।

রামদুলাল এসে দাঁড়াল তার সামনে। মুখখানা তার খুব গম্ভীর।

—চিঠি ফেলে এসেছ সুহাসজী?

—হাঁ। বলে ঘাড় নাড়ল রামদুলাল বেশ গম্ভীর ভাবেই।

—বেশ! রাস্তায় ফেলো নি তো? পোস্টবাক্সেই তো ফেলেছ?

—হাঁ, হাঁ, সো কি করিয়েছি।

—চল, এবার খেতে দেবে।

এবার তার দিকে তাকিয়ে বেশ গম্ভীর ভাবে রামদুলাল বললে—কি খেতে দিব চাচাজী! আজ শিউজীর নাম দিয়ে উপবাস কর।

—উপবাস করব? কেন? তাও আবার শিউজীর নাম নিয়ে? আমি উপোস-টুপোস করতে পারি না বাপু! আর শিউজীর সঙ্গেও আমার কোন সম্পর্ক নাই!

রামদুলাল গম্ভীর ভাবে ঘাড় নেড়ে বললে—উ তো সাচ বাত। কিন্তু খাবে কি? আজ কুছু নেহি হ্যায় খানেকো।

—কেন? খানিকটা বিস্ময়ের সঙ্গে খানিকটা কৌতুক মিশিয়ে প্রশ্ন করলে শঙ্কর।

—তুমহারা ল্যাংড়া আজ সব খা লিয়া।

এবার বিস্ময়ের সঙ্গে হাসি এল তার। হাসতে হাসতে বললে—সে আবার কি কথা?

—হাঁ, ওহি তো বোলসি। তুমি হামারে পোস্টাপিস ভেজলে আর ইধর ল্যাংড়া চৌকাসে ঘুস কর সব খা লিয়া। হাম লৌটকে আ কর দেখে কি ল্যাংড়া চৌকাসে নিকলতা হ্যায়। হমকো দেখ কর দোষ—কিয়াবালা বাচ্চাকে মাফিক দৌড় কে ভাগ গিয়া!

কিছুক্ষণ সবিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে হাসিতে ভেঙে পড়ল শঙ্কর। যেন একটা মারাত্মক কৌতুকের কথা শুনেছে সে।

তার হাসি দেখে রামদুলাল তার মুখের দিকে চাইল অবাক হয়ে। কিন্তু সব বিস্ময়টা এক মুহূর্তে ক্রোধে রূপান্তরিত হয়ে গেল। রাগটা ছিলই, বিস্ময়টা তার সঙ্গে যোগ দিলে।

তার রাগটাতে চিনতে ভুল হল না শঙ্করের। সে হাসতে হাসতেই বললে—কি হল তাতে?

—দেখো চাচা, উ তুমারা ল্যাংড়া নহি হোতা তো উসকো আজ হম খতম কর দেতা।

তার ক্রুদ্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে হাসি থামিয়ে সে কোমল স্বরে প্রশ্ন করলে—তোমার খুব খিদে পেয়েছে নয় সুহাসজী?

তার কথা বলার ভঙ্গিতে বোধহয় রামদুলাল একটু কেমন হয়ে গেল। এমন কোমল ভাবে, সহানুভূতির সঙ্গে শঙ্কর কদাচিৎ কথা বলে। তার কথাগুলো শুধু কথাই। তাতে যেন মনের কোন স্পর্শ থাকে না। সে যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললে—নহি। ক্ষুধা কা বাত নহি। বাকী সব তো কুটা কর দিয়া। সব বর্তন-উর্তন তো আভি মোলনে হোগা।

—আহা, ল্যাংড়ার ওপর রাগ করো না! বেচারার স্নান করেই খিদে পেয়েছিল। সেই সময় খেতে পায়নি। তুমি বেরিয়ে গিয়েছিলে। ও বেচারার তো আর আমার মত বুদ্ধি শুদ্ধি নেই যে ভাবে—একটু অপেক্ষা করি, তুমি এসে খেতে দেবে। ও নিজের খাবার নিজে নিয়েই খেয়ে ফেলেছে। খেতে খেতে বেতো পোড়ে পড়েই হোক, আর খিদের জ্বালায় হোক সব খেয়ে ফেলেছে।

—সব নহি খায়া! বাকী—

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে শঙ্কর বললে—এই দেখ ওর সে জ্ঞান আছে যে সব খেতে নাই। এ তিন জনের খাবার, একা আমি খেয়ে দেব? সে বুদ্ধিটা ওর ঠিক আছে, কিন্তু আর একটা বুদ্ধি নাই। ওর এঁটো যে আমরা খাই না এইটা জানে না ব্যাটা। তবে ও তো দেখে আমাদের এঁটো ও খায়! তাই ওর এঁটো আমাদের খেতে দোষ কি? আমরা যে সেটা দোষ মনে করি সেইটা ও জানে না। এইটাই ওর দোষ হয়েছে। দোষ নয়, ভুল হয়েছে।

তার কথার ভঙ্গি দেখে হাসতে লাগল রামদুলাল।

শঙ্কর বললে—এই দেখ তুমি হাসছ! কথাটা আমি কিন্তু বেঠিক বলেছি, বল? তা থাক, এখন এক কাজ

কর। তুমি তোমার বস্তু-উস্তু নেড়ে দাও, চিঁড়ে চিনি সব নিয়ে এস। শিউকীর নাম করে ওই সবই খাওয়া যাক আজ।

রামসুহাস একটু হেসে, ঘাড় নেড়ে তার কথা মেনে নিয়ে চলে গেল।

শঙ্করও হাসল একটু। অর্থহীন হাসি। যে হাসি আলো, বাতাস, আকাশ, গাছের পাতা অবিরাম অকারণে নিঃশব্দে হেসে চলেছে সেই হাসি।

তারপর চীৎকার করে সে ডাকতে লাগল—ল্যাং এ ল্যাংড়া!

ল্যাংড়া দুট করে কোথায় কাছ থেকেই তার কাছে এসে দাঁড়াল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে লেজ নাড়তে লাগল অভ্যাস মত।

তাকে কোলে তুলে নিলে শঙ্কর। সঙ্গে সঙ্গে আবার নামিয়ে দিলে। তার পাশে বসে পরম যত্নে তার পায়ের বালি ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বললে—এঃ, করেছিস কি? গোটা গায়ে ধুলো মেখেছিস!

ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে তার হাতখানা থেমে গেল। একটা কুকুরকে ভালবাসা আর একটা মানুষকে ভালবাসায় কত তফাৎ! একটা মানুষকে ভালবাসলে তার কত দুশ্চিন্তা, কত তার বেদনা। সব সেই ভালবাসার পাকে পাকে জড়িয়ে থাকে! কেন থাকে?

কেন থাকে সে তা জানে! মানুষকে ভালবাসার প্রতিটি সুতোর টানায় অন্তত একটিও প্রত্যাশা থাকলেই হয়ে পড়েনের সুতো হয়ে জাল বোনে! কিন্তু এখানে তো তার কিছুই নেই। এখানে প্রত্যাশা নাই। পাবার কামনা নাই। এ শুধু দেবার খেলা, বেহিসাবী খেলা। যদি কিছু আসে সে বেহিসেবী খেলায় তবে সেইটাই লাভ।

খিদে পেয়েছে বেশ। কিন্তু কি আর করা যাবে? খিদে মেটাবার জন্যে যাই হোক কিছু পেতে এখনও অনেক দেরী। সে বকুল গাছটার তলায় গিয়ে বসল এখনও বকুল ফুল ঝরছে, এখনও মালতী ফুটছে দুচারটে। কটা বকুল ফুল কুড়িয়ে নিয়ে শুঁকতে লাগল। মিষ্টি গন্ধে খালি পেট গুলিয়ে উঠছে। ফুলগুলো সে পাশে রেখে দিলে।

ল্যাংড়া লেজ নাড়তে নাড়তে তার কাছে বসল।

একটা কাকও এসে বসল একটু দূরে। সেই কাকটা যে প্রতিদিন সকালে আসে খাদ্যের প্রত্যাশায়। সে আবার এসে বসেছে একই প্রত্যাশা নিয়ে।

সে হাতটা তুলে খালি হাতটা নেড়ে হেসে তাকে বললে···নাই, নাই, কিছু নাই।

হাত তুলতেই কাকটা উড়ে গিয়ে একটু দূরে বসেছিল, হাতটা নামাতেই আবার সে বসল খানিকটা সরে এসে। কা কা শব্দে নিস্তব্ধ জায়গাটায় সোরগোল তুলে ফেললে যেন।

পিছন থেকে কে ধমকে উঠল যেন—আরে তুই এখনও খাওনি? কি ছেলেরে তুমি! এস উঠে এস।

কণ্ঠস্বর থেকেই বুঝতে পেরেছে সে, মুকুন্দবাবু আবার এসে দাঁড়িয়েছেন তার কাছে। সে ফিরে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল। এই একটি সংসারী, সংগ্রামী মানুষের মধ্যে যে পাগলামির ছিটে ফোঁটা ছিল সে যেন তার জীবনকে ঠিক সেই জায়গাটিতে স্পর্শ করে তার সেই তিল প্রমাণ পাগলামিকে তাল প্রমাণ করে তুলেছে। আর সেই পাগলামির দরুণই স্নেহের সমাদরের উত্তাল প্লাবন হয়ে এসে মুহূর্তে মুহূর্তে আকস্মিকভাবে তাকে ভাসাতে চাইছে।

অথচ—। থাক সে অথচর কথা থাক।

মুকুন্দবাবু চলতে লাগলেন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সেও হাঁটতে লাগল।

ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে গেল সে। টেবিলের উপর ভাত, ডাল, মাংস সাজানো রামসুহাস।

—এসব এল কোথা হতে? সে প্রশ্ন করলে অবাক হয়ে—

—আসমান থেকে। ধমকের সুরে বলে মুকুন্দবাবু হাত ইশারা করে চেয়ার দেখিয়ে দিলেন—এখন বসে পড় চেয়ারে। খাও।

চেয়ারে বসবার আগে সে একবার জিজ্ঞাসু হয়ে তাকাল মুকুন্দবাবুর দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে আবার মুকুন্দবাবু ধমকে উঠলেন—তুমি খেতে বস দেখি হে! হয়েছে, সব ব্যবস্থা হয়েছে।

রামদুলালের ব্যবস্থা কি আর না করেছি আমি? যাও হে রামদুলাল যাও গিয়ে।

টিফিন কেরিয়ার গুটিয়ে তুলে নিয়ে চলে গেল।

শঙ্কর খাচ্ছে আর সামনের চেয়ারে বসে দেখছেন মুকুন্দবাবু।

চুপ করে দেখতে দেখতে মুকুন্দবাবু হঠাৎ বললেন—শঙ্কর, এই কারখানাটা আমি অনেক বড় করে তৈরী করব। আমার অনেক দিনের কল্পনা! তুমি সঙ্গে থাকলে আমি একে খুব শিগগিরই বাড়িয়ে তুলতে পারব। তুমি থাক আমার সঙ্গে। এক সঙ্গে একে নতুন করে তৈরী করব দুজনে। আমি ঠিক করে রেখেছি তোমাকে এই কারখানার একআনা অংশ দেব।

খেতে মুখ তুলে তাঁর দিকে তাকাল শঙ্কর।

মুকুন্দবাবু বললেন—আমি আমার উকিলকে টাকা মেটাই বলে রেখেছি দলিল তৈরী করার জন্যে।

সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিয়ে শঙ্কর হেসে উঠল—সে কি কথা? আমাকে এক আনা শেয়ার দেবেন কেন?

আর আমিই বা কি করব শেয়ার নিয়ে?

বাধা পেয়ে রেগে উঠলেন মুকুন্দবাবু—কেন? বাধা কি?

হাসতে হাসতে শঙ্কর বললে—আপনি কারখানার সবটাই আমাকে অধিকার দিতে চান শুধু এক আনার ওপরেই আমার হুকুম খাটবে। আমার 'ইন্টারেস্ট' মাত্র এক আনা?

মুকুন্দবাবু তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন বিঃশব্দে। মুখে তার রাগের ভান নাই, বিস্ময় নাই। মুখ খানি যেন কেমন একরকম হয়ে গিয়েছে। কেমন যেন কান্না কান্না।

শঙ্কর বললে—আপনি আমাকে যা দিয়েছেন তার বেশী কিছু লাগবে না আমাকে বাঁধতে। ওই রকম টাকা, বাড়ি, সম্পত্তি দিয়ে বাঁধতে গেলে বাঁধনটা বড় শক্ত লাগবে। সে বাঁধন আমার সহ্য হবে না। আমাকে প্রাণভরে আমার পছন্দ মত কাজ করতে দেবেন, তাহলেই হবে। আর কিছু লাগবে না আমার। আমার নিজের দরকার খুব কম। আর কিছু দরকার হলে আপনার কাছে চেয়ে নেব হাত পেতে। আপনাকে একটা কথা বলি—আমার জীবনে আমি এত সুখে থাকিনি কখনও। আমি এ সুখ ছেড়ে কোথাও যাব না কোন দিন। আপনি আমাকে চলে যেতে বললে আলাদা কথা!

তার মুখের দিকে তাকিয়ে তার কথা শুনে ছিলেন মুকুন্দবাবু। হঠাৎ তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন। শঙ্কর বুঝতে পারল তাঁর চোখের জল লুকোবার জন্যই তিনি সরে গেলেন!

কেন যে কেও অবাক হল শঙ্কর। এ মানুষগুলো কেমন ধাতুতে তৈরী কে জানে! জীবনের কোন কিছুকে এত বেশী করে কি করে গ্রহণ করতে পারে মানুষ যাতে চোখে জল আসে, রাগে আগুন জ্বলে যায় সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠে, খুশীতে মনটা এমন ভরপুর করে যাতে বিশ্ব সংসারের চেহারা বদলে যায়! এত রাগ, এত অনুরাগ, এত সুখ, এত বেদনা এত আবেগ মানুষের মনে কোথায় থাকে? কই তার তো তেমন কিছু ঘটনা! তার কাছে কথাগুলো তো শুধু কথাই। মনের চিন্তার বাহন মাত্র। তার বেশী কি?

সেও একটা হাত নিয়ে বেরিয়ে এল।

হাত ধুতে ধুতে নজর পড়ল বকুল গাছটার দিকে। রামদুলালের কি খেয়াল হয়েছে যাওয়ার পর বোধ হয় একটা কাঠিগুলি নামিয়ে দিয়েছে গাছতলায়। সে বালি পাত্র হাতে চলে আসছে। আর উচ্ছিষ্টের প্রত্যাশায় চারিদিক থেকে উড়ে এসেছে কাক, শালিক আর চড়াইয়ের দল।

সেই এক কথা। প্রত্যাশা!

হাসি এল তার। প্রত্যাশা কি তার নেই?

ছিল বৈকি! আছে, এখনও আছে, বুকের ভিতরে কোথায় যেন সাপের মত লুকিয়ে থেকে এখনও আশা-ভঙ্গের নিঃশ্বাস ছাড়ছে! তারই জ্বালায় বাকী সব কিছু হারিয়ে গিয়েছে। এইমাত্র।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে সে যেন নিজেকে ধমক দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। থাক, সব হারিয়ে থাক। জ্বালা যা আছে তাকেও তাড়াবে সে। তার কাজ চাই। একটা নতুন কিছু করা চাই আবার।

দিন পনেরোর মধ্যেই মিঃ জেরল্ড নর্থের সঙ্গে দেখা হল তার। ব্যারাকপুরে।

সবটাই ঘটল মুকুন্দবাবুর অগোচরে।

মিঃ নর্থের চিঠি এসেছিল তাড়াতাড়ি। তিনি ব্যারাকপুরে নিজের বাংলোতে দেখা করতে সম্মত হয়ে সময় এবং দিন জানিয়েছিলেন।

একখানা ট্যাক্সি আনিয়ে শঙ্কর চলে গেল।

মুকুন্দবাবুকে বলার প্রয়োজন হয়নি রবিবার বলে। কেবল রামসুহাসকে বলে গেল—সে বালিগঞ্জে যাচ্ছে। এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। বন্ধু এসেছে এলাহাবাদ থেকে।

মিথ্যা কথাটা বলতে তার এতটুকু আটকাল না। অসঙ্কোচেই বলল সে। কারণ এ মিথ্যাবলায় জন্য বিন্দুমাত্র গ্লানি সে বোধ করলে না মনে মনে।

এই ব্যাপারটার সবটাই তার কাছে একটা মজার এ্যাডভেঞ্চারের মত। তার বেশী কিছু নয়। ভাবটা এই দেখাই যাক না ব্যাপারটা কি। ব্যাপারটা দাঁড়ায় কোথায় গিয়ে!

খুঁজতে খুঁজতে সে গিয়ে পৌঁছাল ব্যারাকপুরে গঙ্গার ধারে একখানি মস্ত বাড়ীর সামনে। মস্ত কম্পাউণ্ড। কম্পাউণ্ডের ভিতরে মস্ত বাগান। গেট দিয়ে বাগানের ভিতর দিয়ে গাড়ীর ড্রাইভ। গেটের গায়ে লেখা—দি লুক।

এই পা খোঁড়া, সাধারণ সস্তা জামা কাপড় পরা, অতি সাধারণ আরোহীটিকে নিয়ে ট্যাক্সিওয়ালা গেটের বাইরেই গাড়ীখানা দাঁড় করালে।

শঙ্কর বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করলে—দাঁড়ালেন কেন? ভিতরে চলুন!

—ভিতর যায়েগা? ই দোকানকে অন্দর? সভয়ে প্রশ্ন করলে ট্যাক্সিওয়ালা।

হঠাৎ একটা কথা মনে হল শঙ্করের। তার সস্তা পোষাক আষাক, চলাফেরা, খোঁড়া পা সব মিলে তাকে বোধ হয় অত্যন্ত তুচ্ছ একটা মানুষ মনে হয়। নিশ্চয়ই হয়! এমনিই বোধ হয় মনে হয়েছিল সুনির্মলার। মনে হয়েছিল বলেই তার কাছে আসতে তার ভাল লাগে নি।

—কিয়া বাবু ভিতর যায়েগে? আবার বিশ্বাসঘাত প্রশ্ন এসে তাকে সচেতন করে তুললে।

সে বিরক্ত হয়ে বললে—জরুর! চলিয়ে!

সে নামল গাড়ী থেকে!

নামতেই দেখলে বারান্দায় অন্তত ছ ফুট লম্বা, দীর্ঘকায় সুপুরুষ একটি শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। বয়স কত ঠিক ধরা যায় না। হয়তো চল্লিশ পঁইতাল্লিশ হবে। কিন্তু পরিপূর্ণ যৌবনের শোভায় ঝলমল করছেন ভদ্রলোক। বিস্মিত দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে আছেন শঙ্করের দিকে।

তাঁর দৃষ্টিতে সেই এক বিস্ময় যার পরোক্ষ অর্থ তার চেহারার তুচ্ছতা। মনে হতেই তার ভ্রূ কুঁচকে উঠলো। ওদিকে ভদ্রলোকের চোখের অকপট বিস্ময় ভদ্র হাসির চেহারা নিয়ে চোখ থেকে ঠোঁটে জড়িয়ে পড়ল সেই মুহূর্তেই। ঠোঁটের থেকে পাইপটা বাঁহাতে নিয়ে তিনি ডান হাত বাড়িয়ে বললেন—আপনি মিঃ চৌধুরী? উমাশঙ্কর চৌধুরী?

সেও নিজের ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিলে।

তার সঙ্গে করমর্দন করতে মিঃ নর্থ প্রায় কুঁকে পড়লেন—ভেরি গ্ল্যাড টু মিট ইউ!

তারপর পরম সমাদরে আহ্বান করে তাকে নিয়ে গেলেন ড্রয়িংরুমে। সব চেয়ে বড় সোফাটা দেখিয়ে দিলেন বসবার জন্যে।

সে বসল। মিঃ নর্থ বললেন—আপনার কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো?

কথাটা শুনে হাসল সে। তিক্ত হাসি। সে ভুলতে চাইলে কি হয়, সবাই মুহূর্তে মনে করিয়ে দেয় যে সে খোঁড়া! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে তিরস্কার করলে সে। সামাজিক ভদ্র মানুষ ভদ্রতা করবে বইকি! তারমধ্যে ওই ইঙ্গিতের দুষ্ট বাষ্পকে আবিষ্কার করলে চলবে কেন?

তিক্ততা ঘুচে গেল। মিষ্টভাবে সে হেসে বললে—না কোন অসুবিধা হচ্ছে না আমার।

হঠাৎ তার চোখ আটকে গেল ঘরের কোণে।

একটা নতুন সিলিং ফ্যান রাখা ঠেস দিয়ে। তারই তৈরী সিলিং ফ্যান।

দেখতে দেখতে তার চোখে নিষ্কপ বিস্ময় ফুটে বেরিয়েছিল। সেই বিস্ময় অনুসরণ করেই মিঃ নর্থ হেসে বললেন—কি দেখছেন? পাখাটা?

বলে একটু হাসলেন তিনি। পাইপে একটু টান দিয়ে বললেন—ওই পাখাটার জন্যেই আপনাকে ডেকেছি। পাইপে গোটা কয়েক টান দিয়ে তিনি টেবিলের ওপর একটু ঝুঁকে পড়ে বললেন—পাখাটা আপনি তৈরী করেছেন?

—না। আমাদের কারখানায় তৈরী হয়েছে।

—বুঝলাম। কিন্তু ওর ডিজাইন, স্কেচিং এগুলো প্রথম কে করেছে? আপনি?

—হ্যাঁ।

—কি ভাবে করলেন?

একটু হেসে শংকর বললে—ওটা করা কি এত কঠিন।

—না, তা নয়। তবে যন্ত্রপাতিগুলি ঠিকমত সাজিয়ে বসিয়ে 'ফিনিশ' করাই কঠিন। তা ছাড়া ও পাখার কার্বন হোল্ডারটি বড় সুন্দর। কমিউটেটরও প্রেস করা হয়েছে বড় চমৎকার। ওসব আপনিই করেছেন?

—হ্যাঁ তা করেছি।

—কত দিনের মধ্যে করেছেন?

খুব বেশী দিন না! মাস খানেক লেগেছে।

—কিছু মনে করবেন না। আমি আই ই সির এক জন ডিরেক্টার, তা ছাড়া ইণ্ডিয়া অফিসের এ্যাপিলট্যান্ট ম্যানেজার। আমার কোম্পানীও পাখা তৈরী করে। সেই হিসেবে কিছু কথা জিজ্ঞাসা করছি আপনাকে। সেই জন্যই ডেকেছি।

—বলুন।

—আপনি এ

কি করে?

—আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়তে পড়তেই এ সম্পর্কে ইন্টারেস্টেড হই। এই নিয়ে সামান্য সামান্য কাজ করেছি ল্যাবরেটরীতে।

—তারপর? পাইপটা নতুন করে জ্বালিয়ে কৌতূহলে টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়লেন তিনি।

—তারপর এম এস সি পাশ করলাম।

—ক্ষমা করবেন আমাকে, কেমন ফল করেছিল পরীক্ষায়?

—ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছিলাম।

—ভাল। তারপর?

চুপ করে রইল শংকর। এরপর জবাব দেওয়া দুষ্কর তার পক্ষে।

মিঃ নর্থই জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কোন কলেজে প্রফেসারের চাকরী নেননি কেন?

একটু তিক্ত হাসি হেসে শংকর বললে—আমার এই জখমি খোঁড়া পা আমাকে চাকরী নিতে দেয়নি। আর তাছাড়া পড়াতে আমার ভালও লাগত না। মানুষের সঙ্গ আমার কাছে ভাল কি মূল্যবান দুটোর কোনটাই লাগে না। নিজের পড়াশুনো আর এই ধরনের কাজকর্ম নিয়ে থাকতে পারলেই আমি সব চেয়ে খুসী।

পাইপটা ঠুকে মিঃ নর্থ বললেন—আপনি যেখানে কাজ করছেন সেখানে কত দিন আছেন?

—মাস পাঁচেক।

—কত মাইনে পান?

মিঃ নর্থের মুখের দিকে চেয়ে সে একটু চুপ করে রইল। তারপর বললে—মাসে আড়াইশো টাকা। আর তিনি কোম্পানীর এক আনা অংশ দিতে চেয়েছেন।

মিঃ নর্থ অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন—কারখানার তো আর শেয়ার হয় না, শেয়ার হয় লাভের। সে আর কত হবে? আমি কারখানাটির সব খবরই জানি। সে যাইহোক। বলে মিঃ নর্থ একটু চুপ করে থেকে বলেন—আচ্ছা মিঃ চৌধুরী, আমি যদি আপনাকে আমার আই. ই. সিতে নিয়ে আসি আপনি আসবেন?

তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল শংকর। কোন জবাব দিলে না।

মিঃ নর্থ বললেন—আপনাকে আমি মাসে হাজার টাকা করে মাইনে দেব। এর ওপর কোম্পানীর প্রফিট বোনাস পাবেন। তাছাড়া আপনাকে একটা ফ্রি ফ্ল্যাট

আর একখানা গাড়ী দেব আপনি আমাদের ল্যাবরেটরীতে আমাদের চীফ ইঞ্জিনিয়ারের এ্যাসিস্টাণ্ট হয়ে কাজ করবেন। আরও বেশী মাইনে আপনাকে 'অফার' করতে পারতাম ইঞ্জিনিয়ারের যোগ্যতা থাকত আপনার। আপনি তো শুধু থিয়োরী জানেন, প্র্যাকটিক্যাল হাতে কলমে কাজের কোন ডিগ্রী নেই আপনার। যাইহোক ল্যাবরিটরীতে হাতে কলমে কাজ করবার সুযোগ পেলে সেটাও হয়ে যাবে আপনার। যাই হোক আপনেন আপনি আমার কাজে?

বলে উঠে দাঁড়ালেন মিঃ নর্থ। না—আপনাকে কয়েক মিনিট সময় দিলাম। ভেবে তারপর বলুন আমাকে। আমি আপনি ছেড়ে যোগ করে গেলেন আপত্তি হবে না আপনার।

মিঃ নর্থ তাকে ভাববার সময় দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

একটু হাসি এল শঙ্করের। সে আবার ভাববে কি? এতে ভাববার কি আছে?

এর জন্যে ভাবনা খরচ করবার দরকার নাই, কাজেই নিশ্চিন্ত চিত্তে সে টেবিলের উপর থেকে একখানা রঙীন সচিত্র পত্রিকা টেনে নিয়ে অলস ভাবে পাতা ওল্টাতে লাগল।

পাতায় পাতায় শুধু ছবি। উৎকৃষ্ট কাগজ, উৎকৃষ্ট ছাপা, তার উপরে ঝলমলে ছবিতে বইয়ের পাতা গুলো আলো হয়ে আছে। চোখ পড়তেই চোখ জুড়িয়ে যায়। রক্তের এক অদ্ভুত পুলক যেন। সে অলস দৃষ্টিতে পাতাগুলো উল্টে চলছিল একে একে।

হঠাৎ।

একটা পাতায় তার চোখ আটকে গিয়ে দুই চোখ জ্বলে উঠল যেন। শুধু চোখ নয়, সমস্ত চেতনাই যেন বলিয়ান হয়ে উঠল। সেই ইলেকট্রিক ক্যান তৈরী হয়ে হওয়ার পর থেকে যে শক্তি আলস্যে অন্তরশায়ী হয়ে ছিল সে যেন কোন অদৃশ্য আহ্বানে নিজের অলস শয্যা ত্যাগ করে এক মুহূর্তে উঠে দাঁড়াল।

কিন্তু যেটা এই ঘটনা ঘটাল সেটা আর কিছু নয়, একটা বিজ্ঞাপনের পাতা। একটি সুন্দরী সুসজ্জিতা বিদেশিনী আধুনিকার কাছে তাঁর গৃহ-সজ্জার ও আধুনিক জীবন যাত্রার প্রয়োজনে নীচের উপকরণগুলি অপরিহার্য। সেগুলি তিনি যেন অবিলম্বে সংগ্রহ করে তাঁর আধুনিকতা সম্বন্ধে রাখেন।

সবগুলিই বিদ্যুৎ-সংক্রান্ত উপকরণ। রেডিও, হিটার আর কি সব যেন। পাশে ছবি দেওয়া। সে প্রচণ্ড আগ্রহে ঝুঁকে পড়ল ছবির উপর।

এরই মধ্যে মিঃ নর্থ কখন আবার ঘরে ফিরে এসেছেন সে লক্ষ্য করেনি। তাঁর উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হতেই সে তাড়াতাড়ি বইটি বন্ধ করে টেবিলের উপর সেটি সরিয়ে দিয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

তার সামনের সোফায় বসতে বসতে মিঃ নর্থ হাসি মুখে বললেন তা হলে কি ঠিক করলেন? আমাদের কাজে যোগ দিচ্ছেন তো?

তাঁর মুখের দিকে পরিপূর্ণ ভাবে চেয়ে শঙ্কর বললে—আপনি আমাকে যে প্রস্তাব দিয়েছেন তা আমার পক্ষে শুধু গৌরবের নয়, অকল্পনীয়ও বটে। কিন্তু আমাকে মার্জনা করবেন: আমাকে একান্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে আমি যোগ দিতে পারব না।

তার কথা শুনে একান্ত বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন মিঃ নর্থ। তিনি এটা যে প্রত্যাশা করেননি তা আগের কথাতেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। একটুক্ষণ পরে তিনি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলেন—কেন যোগ দিতে পারবেন না সে কারণটা জিজ্ঞাসা করতে পারি?

—আমিই আপনার অনুমতি নিয়ে বলবার কথা-গুলো। এখন আপনি আমাকে অনুমতি দিলেন, বলতে পারব স্বচ্ছন্দে। মাস পাঁচেক আগে আমি একদিন সোজা হাওড়া ষ্টেশন থেকে আমার 'এম্প্লয়ারের' কারখানায় এসেছিলাম। সেদিন আমার পকেটে পয়সা ছিল না, এখানে আশ্রয় পর্যন্ত ছিল না। উনি আমার সম্পর্কে কিছু না জেনেই আমাকে চাকরী এবং আশ্রয় দুইই দিয়েছিলেন। উনি আমাকে ভালই বাসেন না শুধু এক ধরণের বিশ্বাস ও নির্ভরও করেন আমার উপর।

আপনাকে তো আগেই বলেছি উনি আমাকে নিজে থেকে কারবারের অংশ দিতে চেয়েছেন! কাজেই ওঁকে ছেড়ে আমি কি করে? আর তা ছাড়া—

বলে একটু থেমে গিয়ে মৃদু হাসল শঙ্কর।

মিঃ নর্থও তাকালেন ওর মুখের দিকে ওর কথা প্রত্যাশা করে।

শঙ্কর সসঙ্কোচে বললে—তা ছাড়া আমি একা মানুষ, আমার প্রয়োজনও খুব সামান্য। আমার খরচের জন্যে একশো টাকাও লাগে না মাসে।

মিঃ নর্থ চোখ দুটো একবার ছোট করে নিয়ে যেন খানিকটা দুষ্টুমির হাসি হেসে বললে—ঠিক কথা আজ তোমার একশো টাকাও লাগে না, তোমার প্রয়োজন সামান্য। কিন্তু একদিন তো থাকবে না! তখন তোমার অনেক বেশী প্রয়োজন হবে। বেশী প্রয়োজন না হলে তোমার জীবন তোমার কাছেই মূল্যবান মনে হবে না। তা ছাড়া তুমি এখানে অনেক বড় ল্যাবরেটরীতে কাজ করার সুযোগ পেতে!

শঙ্কর ম্লান হাসি হাসল, বললে—এখানে আসতে চাওয়ার এইটাই লোভ ছিল আমার কাছে। কিন্তু কি করব? সব কিছু তো সবারই ভাগ্যে থাকে না। তবে আপনি যে সম্মান আমাকে করলেন এ সম্মান আমার এমপ্লয়ার ছাড়া কেউ কখনও করেনি। এ আমি চিরকাল গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে রাখব।

তার পিঠে সস্নেহে চাপড় মেরে মিঃ নর্থ বললেন—তুমি এ চাকরী নিলে তোমাকে যে সম্মান করতাম এ চাকরী না নিয়ে তুমি আমার কাছ থেকে দ্বিগুণ সম্মান আদায় করেছ। কাজেই অঙ্কের হিসেবে বুঝতে পারছ—তোমাকে পেলে যে পরিমাণ খুশী হতাম না পেয়ে তার দ্বিগুণ দুঃখিত হচ্ছি। তবে তোমাকে বলে রাখি তোমার জন্যে আমার কোম্পানীর দরজা সব সময় খোলা থাকল। তোমার জন্যে আমি কিছু করতে পারলে খুশী হব। দরকার হলে আমাকে বলতে তুমি কোন সঙ্কোচ করো না।

মাথা হেঁট করে সসম্ভ্রমে কথাগুলি শুনল শঙ্কর যে ধরনের আবেগকে সে অপছন্দ করে, তার দুর্ভাগ্য সেই ধরনের আবেগই কার্য কারণে আজকাল তার জীবনে এসে অনধিকার প্রবেশ করছে। তার হাত থেকে সে যত ছাড়া পেতে চাইছে ততই ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে এসে তারা আক্রমণ করছে তাকে। তেমনি এক অবাঞ্ছিত আবেগের ভারে যেন তার মাথাটা নেমে পড়েছিল।

সে সটান সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল এক মুহূর্তে। জোর করে হেসে বললে—আজ তাহলে আসি!

মিঃ নর্থও উঠে দাঁড়ালেন। হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—আচ্ছা এস। আমার দরজা তোমার জন্যে সব সময় খোলা রইল!

করমর্দন শেষ করে শঙ্কর সসঙ্কোচে বললে—আমাকে একটা জিনিস দেবেন?

একান্ত বিস্মিত কৌতূহলের সঙ্গে মিঃ নর্থ বললেন—কি চাই তোমার বল!

আরও সসঙ্কোচের সঙ্গে টেবিলের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে—এই কাগজখানা!

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলেন না মিঃ নর্থ। মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন—তোমাই? শঙ্কর যে একখানা পত্রিকার মত তুচ্ছ জিনিস এমন সঙ্কোচ করে ও সবিনয়ে চাইতে পারে এটা তিনি যেন বুঝেও বুঝতে পারছিলেন না।

শঙ্কর পত্রিকা খানা হাতে তুলে দেখিয়ে বললে—এই কাগজখানা!

মিঃ নর্থ প্রায় মুখ হাঁ করে তারদিকে রইলেন। তারপর সবিস্ময়ে বললেন—ইউ মিন জার্নাল? এই পত্রিকাখানা চাইছ তুমি?

শঙ্কর ঘাড় নেড়ে জানালে—হ্যাঁ!

সঙ্গে সঙ্গে অট্টহাসো ফেটে পড়লেন মিঃ! সে কি হাসি! ভারী গলার হো হো করে হাসি গোটা বাড়ি খানাকে গমগমে করে তুললে। অনেক হেসে হাসি থামিয়ে, চোখের জল মুছতে মুছতে শঙ্করের পিঠে চাপড়ে বললেন—ইউ আর এ কুথ্যার এণ্ড ম্যাড ফেলো! তুমি শুধু বিচিত্র মনুষ্য নও তুমি একটা আস্ত পাগল। ইউ হ্যাভ সো লং ড্রম মাই এ্যাডমিরেশান, বাট নাউ

ইউ হ্যাভ গট মাই লভ। একথা তুমি আমায় প্রথম আদায় করেছ, তাই তোমায় ভালবেসে ফেললাম। নাউ হ্যাভ দেম—হ্যাভ দেম অল। নাও সবগুলো নাও তুমি।

বলে টেবিলের ওপর যতগুলো পত্র পত্রিকা ছিল সব গোছ করে মিঃ নর্থ তুলে দিলেন তার হাতে।

শঙ্কর সবিস্ময়ে বলতে গেল, আমার এতগুলো চাই না, কেবল ওই একখানা কাগজ চাই।

কিন্তু তা আর বলা হল না। মিঃ নর্থ ততক্ষণে সবগুলো কাগজগুলো ওর দুহাতে সজোরে তুলে দিয়েছেন মুখে বললেন—নো, ইউ হ্যাভ হ্যাভ দেম অল। এগুলো সব নিতে হবে তোমাকে।

তারপর তার পিঠে আবার দুটো আদরের চাপড় মেরে তাকে টানিতে তুলে দিয়ে এলেন। এক বোঝা পত্রিকা কোলের উপর নিয়ে সে বোকার মত উঠে বসল গাড়ীর পিছনের সিটে।

গাড়ীতে তাকে তুলে দিয়ে গাড়ীর দরজা বন্ধ করে মিঃ বললেন—ইউ হ্যাভ মাই লাভ। রিমেম্বার মি সে'ফে-নেভার ইউ বিকম্যার! তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি। তোমার যখন দরকার হবে এস আমার কাছে।

আজব কাণ্ড শঙ্করের।

যে পত্রিকাখানি নিয়ে এত কাণ্ড সেখানি পরম আদরে কোলের উপর রেখে গাড়ীতলায় বসেছিল শঙ্কর। সেটি খুলে দেখতে তার মন কেমন করছিল। ছোট ছেলে যেমন মিষ্টি পেলে একটু একটু করে খায় লোভীর মত তেমনি করে কাগজখানি সে রেখেছে কোলের উপর। সেই বিজ্ঞাপনের অনুপম পাতাটিতে মন আটকে আছে, অথচ খুলে দেখতেও পারছে না। শেষ পর্যন্ত আর না থাকতে পেরে সেই পাতাটি খুলে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে লোভীর মত চোখ দুটো আটকে গেল বাঞ্ছিত জায়গায়। রেডিও আর টিটারের ছবি।

অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সে দেখলে ছবি দুটি ছবির নীচে ছোট ছোট অক্ষরে তাদের যে পরিচয় দেওয়া আছে সেগুলি সে পড়ল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। পড়েও চিত্ত তৃপ্ত নয়। আরও জানতে হবে। অনেক জানতে হবে। তার একটা রেডিও চাই, টিটার পাওয়া যায় না এখানে তা না পাওয়া যাক, সে তৈরী করবে রেডিও আর টিটার।

শূন্য দৃষ্টিতে সে সামনে চেয়ে রইল।

বিদ্যুৎ শক্তির সঙ্গে তার অতি ঘনিষ্ঠ পরিচয়। বহুদিন থেকে সে এই পরমাশ্চর্য শক্তির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে রয়েছে। তার রীতি প্রকৃতি সে জানে। তাকে ঠিক মত ধরবার আধার তৈরী করতে পারলেই হল। সে এসে ঠিক সেবিকা নায়িকার মত তার সমস্ত ভার নিজে গ্রহণ করে সেবা করবে। মানুষী নায়িকার মত চপলা নয় সে। সেবা করে, ভালবেসে চোখের জল ফেলে পায়ে গড়াগড়ি দিলেও যার পাওয়া যায় না এমন অকৃতজ্ঞ নয় সে। এ শক্তির আরাধনা করে সে পরম সেবিকা রূপে ধরা দেবে। কত রূপে তার তাকে চক্রাকারে গতিরূপিণী রূপে আবাহন করে সে বাতাস হবে তোমাকে বাধ্য নায়িকার মত স্নিগ্ধ করবে, তৃপ্ত করবে। সেই আবার দীপ্তিরূপে তোমার মুখের দিকে চেয়ে চাইবে তোমার আঁধার ঘর আলো করে। আবার তাকে ভিন্নরূপে ভজনা কর সে শব্দ তরঙ্গ হয়ে বাণীবাহিনী হয়ে গুঞ্জন করবে তোমার কানে। আবার অন্যরূপে সে উত্তাপময়ী হয়ে উত্তাপ বিতরণ করবে শুধু শ্রদ্ধার সঙ্গে, প্রেমের সঙ্গে তার যে মূর্তি ধ্যান করবে তারই মত বেদী এবং আধার রচনা কর; সেই অদৃশ্য কৌতুকময়ী পরমা শক্তি তোমার কাছে দৃশ্যমান হয়ে ধরাই শুধু দেবেনা, সেবার পরম আগ্রহে এগিয়ে আসবে তোমার কাছে।

তারই সেবা সে করে আসছে এতদিন ধরে। তাকে সে জানে খুব ভাল করে। সে কখনও স্থিতিতে কূটস্থ, কখনও বা গতিরূপিণী হয়ে নানারূপে প্রকটিতা। প্রেমের বাধ্য অনুরাগী যেমন বিভিন্ন সময়ে সঙ্গিতা প্রেয়সী আবির্ভূতা হয়ে প্রিয়ের মনোরঞ্জন করে, সেবা করে তেমনি সেও সেবক তাপসের কাছে তার সাধনা অনুযায়ীরূপে ধরা দিয়ে তাকে কৃতার্থ করে, নিজেও কৃতার্থ হয়।

কিন্তু সাবধান! সে ক্ষণিকের অবহেলা সহ্য করে না। এক মুহূর্তের এক ভগ্নাংশের বিচ্যুতিতে সে সঙ্গে সঙ্গে আঘাত করে নিঃশব্দ কঠিন অট্টহাস্যে।

সে অট্টহাস্যকে সে চেনে।

কলেজের ল্যাবরেটরীতে এক দিন তার নিষ্ঠুর আঘাতের স্পর্শ পেয়েছিল। সে আঘাতের চিহ্ন তার দেহে সে অক্ষয় করে দিয়ে গিয়েছে। সেদিন এক মুহূর্তের জন্য তার সম্পূর্ণ মনোযোগ একবার স্খলিত হয়েছিল। সেই শক্তির নিরঙ্কুশ যাত্রাপথে ব্যাহত হয়ে যেন তারমধ্যে ক্ষোভ সঞ্চারিত হয়েছিল। সেই ক্ষোভ সন্ধান পেয়ে তার যাত্রাপথকে মসৃণ করবার জন্যেই কাজ করছিল সে, সেবকের মত। অকস্মাৎ এক মুহূর্তের অমনোযোগ। ব্যস, সঙ্গে ডান তালুর খানিকটা পুড়ে গেল কালো হয়ে, বগলের কাছে হাড়ের জোড়ের মুখে একটা কঠিন আঘাত লাগল; এবং সঙ্গে সঙ্গে দুষ্টা শক্তি তাকে ঘাটিতে আছড়ে ফেলে দিলে।

ঐ এক দিন। নিষ্ঠুর নিঃশব্দ হাসিতে তার দ্বিধা-বিভক্ত দংষ্ট্রাপংক্তিকে সে যেন একবার দেখতে পেয়েছিল সে দিন।

আর কখনও ভুল হয়নি! প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ প্রেমে ও সেবায় এবং পরোক্ষ চিন্তায় ও কল্পনায়, যে চিন্তা তার কাছে অবিচ্ছিন্ন ধ্যানের মত, এই দুইয়ের মিলন করে সেই শক্তি যেন তার সঙ্গে কথা কয়। কোন অবস্থায় অথবা অতি শক্তিতে প্রত্যক্ষ হবার পূর্বে শঙ্কর যেন নিজের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অতীত এক দিব্য-দৃষ্টি দিয়ে তার সক্রিয় পথকে অনুভব করতে পারে অভ্রান্তভাবে।

তার এই বিচিত্র অখণ্ড, অমনোযোগের ও প্রেমের সংবাদ জানত দু একজন। জানতেন তার অধ্যাপক। জানতেন বলেই মাত্রাতিরিক্ত ভালবাসতেন তাকে। আর খানিকটা জানত সুনির্মলা। অধ্যাপক বুঝতেন তার খণ্ডিত বুদ্ধির সাধ্যাংশ যে প্রজ্ঞা, সেই প্রজ্ঞা দিয়ে; আর সুনির্মলা বুঝত তার সহজাত বোধ দিয়ে। তাকে যতখানি ভাল বাসত সুনির্মলা, ঠিক ততখানিই বুঝত। সে সময়টায় তার সম্পর্কে সুনির্মলার মানসিক আবেগ অত্যন্ত গাঢ় হয়েছিল,—সেটা বোধ হয় এম এস সি দিয়ে প্রথম বছরে—সেই সময় মধ্যে মধ্যে সে দুষ্টুমির অভিযোগ করে বলত তুমি কিন্তুনো আমার দিকে তাকাও উষানাথ (সে অন্তরালে একান্তে এই নাম ধরে ডাকত তাকে)? আমি তো তোমার উষা নই, তোমার আসল উষা ল্যাবরেটরীতে ব্যাটারী সেলের মধ্যে রয়েছে, প্লাগ পয়েন্টের মাথায় তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

সে দুঃখিতও হত আবার অহঙ্কারও বোধ করত মনে মনে।

সে যতটুকু দুঃখিত হত ততটুকুই খুশী হত সুনির্মলা। আর তার অহংকৃত তৃপ্তি তার মনে তেমনি বিরাগ সৃষ্টি করত। সেই বিরাগই একদিন বড় হয়ে উঠল।

যাক, ও কথা থাক।

ওসবতো চুকেই গিয়েছে।

নিজের শূন্য দৃষ্টিতে সে আবার নিজের চেতনাকে ফিরিয়ে নিয়ে এল। নড়ে চড়ে সচেতন হয়ে বসল সে কোলের উপর থেকে পত্রিকাখানিকে মাটিতে নামিয়ে রেখে দিলে।

ভাল লাগছে না! আজ যে কি হচ্ছে! কাজের কথা, প্রয়োজনীয় কল্পনা কিছু করতে গেলেই আজ কেবল সুনির্মলার কথা এসে যাচ্ছে।

দেখ, দেখ কাণ্ড দেখ! কাকটা এসে বসেছে খানিকটা দূরে, ডাকতে আরম্ভ করেছে কা কা করে। ডেকে তার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করছে।

হঠাৎ কি মনে পড়তেই সে হাত দিলে জামার পকেটে। জামার পকেটে তো খান কয়েক বিস্কুট রেখে ছিল সে। ব্যারাকপুর যেতে যেতে তার মধ্যে এক আধখানা খেয়েছিল। আছে, এখনও আছে ক'খানা। একখানা সে পকেট হতে বের করে গুঁড়ো করতে লাগল। গুঁড়ো ঠিক হলো না, কতকগুলো টুকরো হয়ে দাঁড়াল। সে গুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে ছড়িয়ে দিলে সে। ব্যস, কাকের ডাক থেমে গেল। সে লাফিয়ে লাফিয়ে খেয়ে বেড়াতে লাগল সেগুলো।

সে নিশ্চিন্ত হয়ে বর্ষা সাহেবের কাছ থেকে আনা কাগজগুলো থেকে একখানা কাগজ তুলে নিলে কোলের উপর। আমাদের দেশী কাগজ, ইংরেজী! বোম্বে থেকে বের হয়। কলেজে পড়তে এ কাগজখানার উপর খুব ঝোঁক ছিল তার। সে কাগজ খানা খুলে পড়তে লাগল।

এই কাগজে দুটো পাতায় নববিবাহিতদের ছবি ছাপা হত। এখনও হয় নাকি? সে আর সুনির্মলা এই পাতা দুটো নিয়ে খুব হাসাহাসি করত নিজেদের মধ্যে। বলত—সুখী মানুষদের পাতা।

সেই সুখী মানুষদের পাতা দুখানা খুঁজে খুঁজে সর্বপ্রথমে বের করলে সে। এ সুখী মানুষদের বিশেষ কোন কাজ নেই, এদের মধ্যে হিন্দু বৌদ্ধ শিখ, পৈঠন পারসিক, মুসলমান, খৃষ্টান সব আছে। সারা ভারতেই ছড়িয়ে আছে এই সুখী মানুষরা। মধ্যে মধ্যে নিজেদের সুখের পসরা নিয়ে হাত ধরাধরি করে, হাসিমুখে দুজনে এসে দাঁড়ায় পৃথিবীর মানুষের সামনে।

সে সেই পাতা দুটি কৌতুকের সঙ্গে দেখতে লাগল।

কিন্তু একি, একি! মাথাটা ঘুরে গেল যেন। নাঃ, মাথা ঘুরবে কেন, মাথা ঠিকই আছে।

কিন্তু এ কার ছবি? সুনির্মলা না? সুনির্মলাইতো!

সুনির্মলা তার পাশ থেকে সরে গিয়ে ঐ সুখী মানুষদের পাতায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে!

সুনির্মলা আর মিঃ শতদল বোস, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। পাশাপাশি ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে তাকিয়ে আছে। তাকিয়ে আছে তারই দিকে চেয়ে।

সামনের পৃথিবীটা চোখের সামনে থেকে কালো হয়ে মুছে গেল এক মুহূর্তের জন্য। কালো রঙটা আবার সরে গিয়ে পৃথিবীটা আবার ফুটে উঠতে আরম্ভ করেছে অমনি মাথার নিদারুণ যন্ত্রণা পেয়ে সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। এক সঙ্গে যেন অনেকগুলো জীবন্ত আলপিন ফুটতে আরম্ভ করেছে তার মাথায়। সঙ্গে কানের কাছে কা কা ডাক।

আঃ কি হল কি?

অকস্মাৎ একটা অতি উচ্চ শব্দ শুনে সে সামনে তাকালে।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! রামসুহাস অট্টহাস্য করছে। হাসির তোড়ে তার গোঁফ জোড়া লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে উপর দিকে। মুখ বিবর হাঁ হয়ে গিয়ে বিকট হাস্যধ্বনি বেরিয়ে আসছে সেই পথে। চোখ দুটোও নাচছে যেন, তার সঙ্গে নাচছে দুই ভ্রূ। তাতেও হাসির অভিব্যক্তি সম্পূর্ণ হয়নি। সে একটা তর্জনী তারই দিকে বেঁকেছে স্থির করে। আর সেই সঙ্গে তার সারা শরীর হাসির বেগে মুচড়ে মুচড়ে যাচ্ছে।

তার মানে সেই এ হাসির লক্ষ্য।

কিন্তু ব্যাপারটা ঘটল কি? তার মাথাতেই বা এ কিসের যন্ত্রণা?

সে মাথার হাতটা বাড়াতেই একটা কাক কা কা করে উড়ে গেল। উড়ে পালাল না সেটা। খাবার সময় তার হাতথেকে পড়ে যাওয়া একখানা বিস্কুট মুখে করে নিয়ে একটু দূরে গিয়ে বসল।

রামসুহাস হেসে ভেঙে পড়ছে। হাসতে হাসতেই ছুটে আসছে তার দিকে।

সে কি হাসি! তার হাসি দেখে এক সময় শঙ্করও হাসতে আরম্ভ করলে। অতি উচ্চ কণ্ঠে হাসতে হাসতে সে এক সময় গড়িয়ে পড়ল মাটিতে।

অনেক হেসে যখন সে উঠে বসল তখন সে সমানে হেসে চলেছে।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে রামসুহাস নিজের হাসি কমিয়ে বললে—আউর বৎ হাসো চাচাজী। আব যোহ। আরে বাবা, হাসতে হাসতে ডুবার সো আঁখসে পানি নিকালতা হ্যায় দরিয়াকা পানিকে মাফিক।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে সমানে হাসতে হাসতে জামার হাতা দিয়ে চোখ মুছতে লাগল শঙ্কর।

কোলের কাগজগুলো তখন মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে আর কাকটা একটু দূরে বসে বিস্কুট খাচ্ছে নিশ্চিন্ত চিত্তে।

(ক্রমশঃ)

সন্দেহ

মন্ময় রায়

সুলতা বৌদির চিঠিখানা পেয়েছিলাম তার মৃত্যুর দু'বছর বাদে।

নীলমণিদা ইহ সংসারে নেই এই সন্দেহ ততদিনে প্রত্যয়ে এসে ঠেকেছে। আমার ঘরে পুরো একটি বছর কাটিয়ে গেছেন নীলমণিদা। সুলতা বৌদির মৃত্যুর একমাস না যেতেই এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

চুলগুলি এলোমেলো। সমস্ত মুখ জুড়ে বিষাদ-নির্যাতন মাখানো। মানুষের বেশ পরিপাটী, কৌতুক-স্মিত স্বচ্ছ দৃষ্টি কত দ্রুত গতিতে বদলে যায়, সেদিন এই প্রথম অনুভূতিকে নাড়া দিয়েছিল।

নীলমণিদাকে বিমুখ করতে পারিনি।

সুলতা বৌদির মৃত্যুর পর মাস চারেক অফিসে বেরিয়েছিলেন নীলমণিদা। কামাই করতেন প্রায়শঃ। কিন্তু চাকুরীটা ছিল।

নীলমণিদা অফিসে চলে যেতেন। বাইরের ডিসপেন-সারি ঘরে রোগীর প্রত্যাশায় একেলা বসে রাস্তার লোক চলাচলের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। ভাবনা কিন্তু দৃষ্টির সহগামী হত না। অন্যকোন পথ ধরে সুলতা বৌদির কাছে পৌঁছাত। কোন নিঃসংশয় সিদ্ধান্তে আসবার বিন্দু-মাত্র চেষ্টা না করেও ভাবতাম। সুলতা বৌদির মৃত্যুর জন্য মমতাবোধের আর নিঃশ্বাস করুণও বাতাসে মিশে যেতো।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মৃত্যুর জন্য তাকে কৃপা করা হত না। আত্মহত্যা উন্মাদ মানসিক আঘাত অসুস্থ সিদ্ধান্ত। কিন্তু এই যুক্তির পশ্চাতে অনেকগুলি প্রশ্ন সারি দিয়ে দাঁড়াত। সুলতা বৌদির মানসিক বিপর্যয় কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। বহু দিনের ক্রমপরিণতির চূড়ান্ত উপসংহার। দীর্ঘকাল ধরে সুলতা বৌদি যে ধারায় জীবন প্রবাহিত করে ছিলেন, অন্ততঃ এই সহরের লোকের তাই বিশ্বাস, অন্তর্দ্বন্দ্ব নিয়ে দিনের পর দিন এতটা পথ কোন এগিয়ে যেতে পারে না।

চিঠিটার কথা মনে হতেই সুলতা বৌদির মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠে। তার টানা টানা ভ্রূযুগলের নীচে গভীর কালো চোখ দুটির রহস্য আমার কল্পনার বর্ণচ্ছটায় অনুভূতির স্তরে স্তরে মনের নেশার মতো ছড়িয়ে যায়। মনে হয় মুখখানা সুন্দর। আরও সুন্দর হতে পারত। সেই মুখের স্নিগ্ধ হাসিতে চোখের কম্পিত অনুভাব তার পরিপূর্ণ কমনীয়তা জননী ও প্রেয়সীর মহিমায় যদি কোনদিন প্রকাশ পেত।

অথচ ঐ মুখখানার সৌন্দর্য তার জীবদ্দশায় আমার মুগ্ধ দৃষ্টিতে কোনদিন আপ্লুত হয়নি। আমার পুরুষত্বকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি।

নীলমণিদা আমার জ্ঞাতি এবং এখানে একমাত্র আত্মীয়। চিকিৎসাক্ষেত্রে আমার পসার নীলমণিদার প্রতিপত্তির উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল।

সুলতা বৌদির উঁচু মহলে চলাফেরা। ছোট্ট মহকুমা সহরে তিনি এক বিশিষ্ট হ্যামাধিকারিণী। হাকিমদের টেনিস কোর্টে শোভাবর্ধন করেন। ডাবল দেটে ব্যাডমিন্টন খেলতে নেমে লঘু অঞ্চলের আন্দোলনে দেহের হিল্লোলে নাটকীয় চমৎকারিতা সৃষ্টিতে তিনি অদ্বিতীয়। এবং নীলমণিদার গৌরবান্বিত গৃহলক্ষ্মী।

আমার নূতন প্র্যাকটিস। এক দরিদ্র ডিসপেনসারির নগণ্য ডাক্তার আমি। আত্মীয় হলেও সুলতা বৌদিকে পরিহার করেছি।

পরিহার করেছি অপরিহার্য কারণে। নীলমণিদার বাড়ীতে তাসের আসরে মহকুমা সদরের লোকেও অফিসার মিঃ ধ্রুবপদ চৌধুরী বড় জল যাবার নিয়ে হাজির হতেন। ব্যাডমিন্টন আইনজ্ঞ মজুমদার দশার আসতেন রাত দশটার পর। শহরের আরও দু একজন বিত্ত ও প্রতিপত্তিশালী লোক সময়ে অসময়ে আসতেন। সুলতা বৌদি আবির্ভূতা হতেন ছোট্ট একটি নায়িকা। নায়িকা সেজে থাকতেই ভালবাসতেন। হাতকাটা 'ভি'লেক ব্লাউজ। নীচের অংশ কেটেছেটে ফেলা। Ribsএর শেষ তিনটে হাড় ঢাকা পড়ে না। আঁচলটা বুকের একটি প্রান্ত আলতো ছুঁয়ে গেছে। চোখে ঠোঁটে গালে কৃত্রিম রঙ্গাচ্য।

এই আসরে আমি অপাঙ্‌ক্তেয়। অন্তত নিজে তাই মনে করতাম। এরাও প্রচ্ছন্ন উপেক্ষায় এমন বাঁকা চোখে তাকাতেন তাদের দৃষ্টির বিষে ঐ বাড়ীর আবহাওয়ায় যেন আমার দম আটকে আসত।

তাহলেও সুলতা বৌদি অসুস্থ হলে আমাকে যেতে হত। আত্মীয়ের কর্তব্যে এবং ডাক্তার হিসাবে বাধ্যবাধকতা।

সুস্থ হলেই সুলতাবৌদি অসুখের কথা ভুলে যেতেন। ডাক্তারের প্রতি কৃতজ্ঞতার প্রয়োজন হত না। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার প্রতি কখনও অবজ্ঞা প্রকাশ করেননি। হয়ত এইটুকু তার দয়া।

নীলমণিদার গৃহে মাসে অন্তত দু একবার তার বন্ধু-চক্রের পার্টি হোত। সেখানে কোনদিন নিমন্ত্রণ পাইনি শুনেছি খাদ্য ও পানীয়ের প্রচুর সমারোহ হতো। বিলেতী লেবেল আঁটা খালি বোতল তার বাড়ীতে যত্রতত্র গড়াগড়ি দিতে দেখেছি।

মৃত্যুর বছরখানেক আগে অসুখে ভুগে উঠে সুলতা বৌদি দুদিন আমাকে নিমন্ত্রণ করে পরম সমাদরে খাইয়েছিলেন। না খাওয়ালেও আমার কৃতজ্ঞতাবোধের অভাব ঘটত না। প্যারাটাইফয়েডে হপ্তা দুই ভুগে ছিলেন সরকারী ডাক্তারকে ডেকে চিকিৎসা করাতে উপদেশ দিয়েছিলেন ধ্রুবপদ চৌধুরী। আরও দু একজন পরম হিতৈষী চিকিৎসার ত্রুটি হচ্ছে অভিযোগ করে ডাক্তার পাল্টাতে তাড়া দিচ্ছিলেন। সুলতা বৌদি রাজী হননি। আমার চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে কৃতজ্ঞতা জানাননি। ঠাট্টা করে বলেছিলেন, "তোমার অপযশ হবে ভেবে অন্য ডাক্তার আনতে দেইনি। অবশ্য বেঁচে গেলাম নেহাৎ ইচ্ছাশক্তির জোরে।"

আপনি থেকে তুমি সম্ভাষণের ঘনিষ্ঠতায় অনায়াসে তিনি আমাকে নিয়ে গেছেন। এর বাঞ্ছনীয়তা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করবার সুযোগ পর্যন্ত আমাকে দেননি। তবু তার ঠাট্টায় আমি ক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম। অভিমান-মিশ্রিত স্নেহে বলছিলাম, এই আধ্যাত্মিক শক্তি যখন আপনার আয়ত্তাধীন কোন ডাক্তারেরই তো প্রয়োজন নেই। অনর্থক আমাকে কেন দুবেলা ভোগালেন।"

"তোমাকে ভোগাতে আমার খুব মজা লাগে।"

আশ্চর্য কৌতুকে চোখ নাচিয়ে বলেছিলেন সুলতা বৌদি। তার হাসি এবং উক্তির প্রচ্ছন্ন সংঘাত ঘরখানা জুড়ে বোবা সঙ্গীতে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল।

সুলতা বৌদির উক্তির যে তাৎপর্য আমার কাছে প্রতিভাত হয়ে উঠেছিল সংশয়ায়িত কুণ্ঠাও তাতে আমার কম ছিল না। তবু নেহাৎ জবাব দিতে হয় ভেবেই বলেছিলাম, "সে আমার দুর্ভাগ্য।"

"তুমি আর না, আমিওতো মনে করতে পারি

আমার দুর্ভাগ্য। অফিসে তো যেতে চাই না। ইচ্ছা করলেই দুপুরের দিকে আসতে পার।"

আমার সেই চোখ ঝাঁচানো হাসি। সে হাসির আবেদন অত্যন্ত স্পষ্ট। এক মুহূর্ত প্রত্যাশা যেন সুলতা বৌদির দুচোখ ছাপিয়ে উঠছে। কৃত্রিমতার লেশ মাত্র নেই। ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করতে পারিনি। বলেছিলাম, "আমার সময় নেই।"

সুলতা বৌদি বিশ্বাস করেননি।

তারপরই দুদিন নিমন্ত্রণ করে আমাকে খাইয়েছিলেন। প্রসন্নতা হয়ে উঠতেন। হাসতেন। তার প্রায় গত যৌবন দেহবল্লরী আবেগে উত্তেজনায় দুলিয়ে দুলিয়ে গভীর ঘনিষ্ঠতার প্রত্যাশা সুস্পষ্টব্যক্ত করতেন। আমি ডাক্তারী গাম্ভীর্যে অন্যমনস্কতার ভাণ করে স্বাস্থ্য রক্ষার সদুপদেশ বিতরণ করে তাকে অধিক কথা বলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছি। শেষ পর্যন্ত অছিলা করে তার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছি।

হয়ত হতাশ হয়েই আমার সম্বন্ধে আগ্রহের অবসান ঘটেছিল। আমার ভিজিটেনসারীর দিকে আর কখনও আসেননি। কিম্বা তার স্বাভাবিক জীবনের ব্যস্ততায় ফিরে গেছেন। মেয়েদের জাংশান, টেনিসক্লাব, এদিক ওদিক চায়ের নিমন্ত্রণ, পার্টী। তার ঘরোয়া মজলিস।

তবু পুনরায় অসুস্থ হয়ে আমাকেই ডাকলেন সন্তানের জননী হতে যাচ্ছেন শুনে স্মিত খুশিতে মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

নীলমণিদা কিন্তু গম্ভীর হয়েছিলেন। তার মুখে একযোগ কালি ঢেলে দিয়েছে কে যেন। চিন্তান্বিত। তবু কয়েক সেকেণ্ড নিজেকে গুছিয়ে নিলেন নীলমণিদা বললেন, "এতদিন বাদে। বড় ভয়ের কথা জানু—"

হ্যাঁ, অনেকদিন বাদে। প্রায় নয় বৎসর বিয়ে হয়েছে সুলতা বৌদির। এই প্রথম সন্তানের জননী হতে যাচ্ছেন। নীলমণিদাকে আশ্বাস দিতে গিয়ে মনে হয়েছে কিছুই তিনি শুনছেন না।

সুলতা বৌদির মুখে খুশির আভাস ঐ একদিন মাত্র দেখেছিলাম। প্রায় সময় বিছানায় শুয়ে থাকতেন। মনমরা—উদাসীন। আর কখনও হাসেননি। হাসতে প্রয়াস পেলে ওষ্ঠদ্বয় বিস্ফারিত করতেন। কিন্তু তার মধ্যে খুশির চেয়ে বেশী বেদনার ছাপ। স্বাস্থ্য ক্রমে ভেঙ্গে যাচ্ছে। আমার দেওয়া ঔষধগুলো তাকের উপর সাজানো রয়েছে। কোনটাই খেতেন বলে মনে হতো না।

শেষ দেখতে গিয়েছিলাম মৃত্যুর দুদিন আগে। ওষুধ না খেলে শরীর কেমন করে সারবে অনুযোগ করেছিলাম। জবাব না দিয়ে ম্লান হাসির চেষ্টা করেছিলেন।

বলেছিলেন, "দাদাকে লিখেছিলাম কিছুদিন তার ওখানে গিয়ে থাকব। রাজী হননি।"

"এ সময় গিয়ে গেলেই ভাল হত।"

"আকীমাকে লিখব না। কিছুদিন তার ওখানে ঘুরে আসি।"

আকীমা অর্থাৎ আমার মা! বড়ো মানুষ তাকে দেখবার লোক নেই। ওতে আমি রাজী হইনি।

সুলতা বৌদি একটি দীর্ঘনিশ্বাস যেন চেপে গেলেন। আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। মানুষটা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। আগেরও ছাউনি নেই। চোখ দুটি করুণ।

আমি আশ্বাস দিয়ে বলেছি, "নীলমণিদা রয়েছেন, আমি রয়েছি। এত ভয় পাচ্ছেন কেন?"

সুলতা বৌদি জবাব দেননি। নিঃশব্দে সামনে থেকে সরে গেছেন।

তিন দিনের মাথায় সকাল বেলা চেম্বারে বসেই খবর পেয়েছিলাম। সুলতা বৌদি ইহ জগতে নেই। অবিশ্বাস্য। মরবার মতো এমন কিছু অসুখ তার হয়নি। আমি সুলতা বৌদির চিকিৎসক। তেমন কিছু হলে আমাকে নিশ্চয় খবর দিতেন নীলমণিদা।

বিশ্বাসের মুখে মানুষের ভুল ত্রুটি অনেক ঘটে যায়। কিংবা আমার চিকিৎসায় নীলমণিদা আস্থা স্থাপন করতে পারেননি। অভিমান করে বসে থাকতে পারিনি।

যখন শ্মশানে শেষশয্যার চিতার আগুন নিভে এসেছে।

নীলমণিদার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ডাক্তার মিত্র শেষ মুহূর্তে দেখেছিলেন সুলতা বৌদিকে। 'ডেথ সার্টিফিকেট' দেখবার সুযোগ হয়েছিল। 'এপিল্যাপসি'।

খবরটা যেকোন সূত্রেই হোক ছোট শহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি ছড়িয়ে পড়েছে। সুলতা বৌদি আত্মহত্যা করেছেন। নীলমণিদাও আমার কাছে স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু কেন, সে কথা স্পষ্ট করতে পারেননি। বলেছিলেন, "নিশ্চয় অপ্রকাশিতরা কোন কারণ ছিল অনু……।

সুলতা বৌদির বেপরোয়া জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অস্পষ্টতা ও সংশয় আমারও কম ছিল না। প্রশ্ন করে কুৎসা শুনে মৃতের অসম্মান করতে চাইনি।

মাস চারেকে মধ্যে ব্যাঙ্কের চাকুরী খুইয়ে আমার কাঁধে চেপে বসলেন নীলমণিদা। পৈতৃক বাড়ীতে তালা ঝুলছে। সেখানে যান না। ভয় করে। একেলা ঘরে ঘুমোতেও তার ভয়। আজন্ম সংস্কার চরম নীলমণিদার দুর্বল মনকে গ্রাস করেছে।

মদ খেতেন। পয়সা পেলেই মদ খেতেন। তারও সুলতাবৌদির দামী জামা কাপড়গুলো পর্যন্ত মদের পয়সার জন্য বিক্রয় করেছেন। আমি টের পেয়েছি, অনুরোধ জানিয়েছি, পাসিয়েছি। কোন ফল হয়নি। শেষ পর্যন্ত চাল ছেড়ে দিয়েছি।

তবু মানুষটাকে তাড়াতে পারিনি। নিকট জ্ঞাতি বলেই নয়। একটা জীবন কেমন করে পর্যুদস্ত হয়ে গেল সেই মমতাবোধে। সুলতা বৌদির অনুসন্ধিৎসার শাস্তি ভুগেছেন নীলমণিদা।

আমার ঘরে এসেও দৈবাৎ তার সুনিদ্রা হত। স্বপ্নের মধ্যে কাঁদতেন, চেঁচিয়ে উঠতেন। ভয় পেয়ে গোঁ গোঁ করতেন। কি বলতেন বুঝা যেত না।

সেদিন আমি জেগেছিলাম। বাইরে ফুটফুটে জোৎস্না। ঘরের মধ্যে প্রতিটি জিনিস বর্তমান। ঘুমোচ্ছেন। তার নাসিকা গর্জনে ঘরের বাতাস কাঁপছে বিশ্রী চিৎকারে সচকিত করে বিছানার উপর উঠে বসলেন চারিদিকে কি যেন খুঁজলেন। ধীরে ধীরে আমাকে ডাকলেন। সাড়া পেয়ে বললেন, "ঘরের মধ্যে কে এসেছিল অনু……।

"কেউ আসেনি —" জবাব দিয়েছিলাম।

"এসেছিল। তুই ঘুমোচ্ছিস, দেখতে পাসনি।"

"আমি জেগে আছি। কেউ আসেনি। বেসার বৌকে রাতে স্বপ্ন দেখেছেন। মদ খাওয়া কমান।"

শাসনের সুরে বলেছিলাম। নীলমণিদা জবাব দেননি।

ধীরে ধীরে রাতারাতি সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে উঠলেন। সর্বতোভাবে মানুষের সাহচর্য পরিহার করতেন। তন্ময় হয়ে ভাবতেন। তার হাতের কুঞ্চিত অঙ্গুলিগুলি খাবার মতো হয়ে উঠতো। চোখের সম্মুখে এসে একান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন। অপরিসীম ক্রুরতা চারোখে বিলিক দিয়ে উঠতো। জোরে নিঃশ্বাস নিতেন। কিন্তু আমাকে দেখতে পেলেই চোরের মত কুণ্ঠিত হয়ে যেতেন।

আমার ঘরে প্রায় তেরমাস বাস করেছেন। উদ্ভ্রান্ত স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। কঙ্কালসার চেহারা নুয়ে পড়েছিলেন। কথা বলতেন না। স্নানাহার করাতে হতো জোর করে। উন্মাদের লক্ষণ ধীরে ধীরে প্রকট হয়ে উঠলো। আমার ওপরে কাজ চলেনি। কখনও মদ খাবার জন্য আমার কাছে পয়সা চাইতেন। শেষের দিকে তাও চাইতেন না। রাত্রে খুব কম সময়ই ঘুমোতেন। কাঁদতেন, গোঁ গোঁ করতেন, ঘুমের মধ্যে নিজের টুঁটি চেপে চেঁচিয়ে উঠতেন।

তারপর একদিন তিনি চলে গেলেন। অনেক খুঁজেও সন্ধান পাওয়া যায়নি। হয়ত তিনি বেঁচে নেই।

নীলমণিদার বিছানাপত্র সমস্তই বিলিয়ে দিয়েছি। কোণে একটা ট্রাঙ্ক মাত্র পড়ে আছে। প্রায় শূন্য, ছেঁড়া ন্যাকড়া আর কিছু বাজে কাগজ ছাড়া ওতে আর কিছু নেই। সেই কাগজ পত্রের মধ্যেই দুমড়ানো খামে সুলতা বৌদির চিঠিখানা পেয়েছিলাম।

আমাকেই লিখেছিলেন।

সুলতা বৌদি লিখেছেলেন এই তার প্রথম সন্তান নয়। এর আগেও দুটিকে ভ্রূণে হত্যা করা হয়েছে। হয়ত একেও তাই করা হবে। সন্তানের নিরাপত্তার জন্যই মার কাছে তিনি আশ্রয় চেয়েছেন। তাকে যেন বিমুখ না করি।

সুলতাবৌদি কি আত্মহত্যা করেছিলেন ??

বাদশা বেগমের দেশে

রাম বসু

। দুই ।

। ঘরের ভিতর ।

এদের বাড়িতে আসবাবপত্রের বাহুল্য-বড় নজরে পড়ে না। ঘরের মধ্যে থাকে পচিটা কি ছ'টা টুল, একটা টেবিল এবং একটা বিছানা। আহারের ব্যাপারেও রাজকীয় আড়ম্বর নেই। ভাত আর মাংস হল তাদের খাদ্য। খাওয়ার জন্যও কুয়োর নয়; নদীর। কিন্তু এই ধরনের জীবনযাত্রায় এরা খুশি।

বাড়িতে হয়ত থাকে একটা কি দুটো রেশমী পোশাক তাই কেউ যদি সেই রেশমী পোশাক পরে বার হয়ে যায় তবে বাড়ির অন্য সৈনিকরা বন্ধুর না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। সে ফিরে এসে এই পোশাক ছেড়ে দিলে তবে অন্য বন্ধু এই পোষাক পরে বেড়াতে যাবে। রেশমী পোশাক হল বাইরে যাবার পোষাক। বাইরে যেতে হলে এ পোষাক পরতেই হবে। বাড়িতে সৈনিকেরা সাধারণত প্যান্ট ও সার্ট পরে থাকে।

বিত্তবানের অনুগ্রহ

গোয়ার বিত্তবানরা সৈনিকদের হাতে রাখার খুব চেষ্টা করে। এর পিছনে অবশ্য উদ্দেশ্য থাকে। পরম কালে যখন এই সব বিত্তবানেরা ব্যবসার জন্য জাহাজে চড়ে নানাদেশে যাবে সেই সময় এই সৈনিকেরা তাদের সঙ্গে যেতে পারে।—এই আশা দিয়ে তারা সৈনিকদের তোয়াজ করে, পোষাক-আশাক জামা কাপড় কিনে দেয়, নানা রকম উপহার দিয়ে হাতে রাখে।

আরও একটা উদ্দেশ্য থাকে। যে অ-সামরিক লোকের যত বেশী সৈনিক বন্ধু থাকবে সে হবে সমাজের ততবেশী সম্মানীয় ব্যক্তি। সকলে তাকে তত বেশি ভয় করবে। প্রতিহিংসা বা প্রতিশোধ তোলা তারপক্ষে হবে তত সহজ।

বিত্তবানদের অনুগৃহীত করার পিছনেও সৈনিকদের যতলব থাকে। কারণ এই অবিবাহিত সৈনিকজীবন ত কোন সামাজিক জীবনযাত্রা নয়। বিত্তবানদের বন্ধু হয়ে তারা ক্রমে সমাজে পরিচিত হয়। এইভাবে বন্ধুর সঙ্গে মিশে তার মালপত্র বেচাকেনা করে ব্যবসায় রপ্ত হয়ে ওঠে। কালক্রমে তারা বিয়ে করে, সমাজে প্রবেশ করে, বিত্তবান হয়।

বিত্তের নেশা গোয়ায় সব চেয়ে বড় নেশা। এর হাত থেকে নিষ্কৃতি কেউ বড় একটা পায় না। ধর্ম-যাজকদের দেখেছি এই নেশায় মত্ত হতে, স্বয়ং রাজ-প্রতিনিধিকে দেখেছি বিত্তের জন্যে দিশেহারা হতে। গোয়ায় রাজপ্রতিনিধিদের চাকরির মেয়াদ মাত্র তিন বছরের। এই তিনবছরে কত রোজগার করা যায়—এই তাদের একমাত্র চেষ্টা। এ ছাড়া তাদের অন্য কোন ভাবনা নেই, অন্যকোন আকর্ষণ নেই। কথা উঠলেই তারা উত্তর দেন,—আমি আর কি করলাম! আমার আগে যিনি ছিলেন তিনি আমার চেয়ে ঢের ঢের বেশী টাকা রোজগার করতেন। আর এই টাকা রোজগার করাই ত তাদের কাজ। এই কাজের জন্যই রাজা তাদের এখানে পাঠিয়েছেন। আগে রাজার সেবা করে রাজার অনুগ্রহ লাভ করেছেন বলেইত রাজা তাদের পাঠিয়েছেন গোয়ায়। এত চাকরী নয়, এহল সেবার পুরস্কার।

গোয়ার মহিলা সমাজ

গোয়ার সব মহিলারাই পর্দানশীন,—তা হোক সে পর্তুগীজ, খ্রীষ্টিকোল কি ভারতীয়। বাড়ির বাইরে মেয়েদের বড় একটা দেখা যায় না। যাওয়ার মধ্যে যায় তারা বন্ধুর বাড়ি, না হয় গির্জায়। তাও কচিত কখন। কিন্তু তখন তারা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে পারবে না। তাদের যেতে হবে খুব ভাল করে ঢাকা পাল্কীতে।

পর্তুগীজ, খ্রীষ্টিকোল বা ভারতীয় খ্রীষ্টান মহিলারা মোটামুটি একই ধরনের জামা কাপড় ব্যবহার করেন। গোয়ার এরা সবাই বিত্তবান। কোন কিছুরই অভাব এদের নেই। বাড়িতে এই মহিলাদের সাজপোষাক

অন্য রকম গলা থেকে পেট অবধি একটা জামা পরেন। কিন্তু জামার কাপড় খুব দামী ও খুব সূক্ষ্ম অর্থাৎ এই জামা পরা ও জামা না পরাও তাই এক কথা। জামার ভিতর দিয়ে মহিলাদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য ঢাকা ত পড়েই না, বরং ফুটে ওঠে। আর থাকে ঘাঘরা। এই ঘাঘরা একেবারে পায়ের গোড়ালি অবধি নেমে এসেছে। নানা রকমের কাজ করা থাকে ঘাঘরায়। থাকে নানা রকমের ফলকুলের ছবি: নানা প্রকারের মূর্তি। অবশ্য এই সমস্ত কাজই হাতে সুচ সুতো দিয়ে করা হয়। বৃদ্ধা, যুবতী বা বালিকা সবাই এই ধরনের পোষাক পরে ঘরে থাকে।

কিন্তু ঘরের বাইরের যেতে হলে এদের আলাদা হয়ে যায়। তখন আর ঢিলে ঢালা পোষাক থাকবে না। গায়ে উঠবে নানান ডেলভেটের সোনার কাজ করা গাউন। ঘরের অনাবৃত মাথা বাইরে যাওয়ার সময় শোভিত হবে টুপিতে। কিন্তু রেশমী কাপড়ের ওপর এই সব প্রসাধনের প্রবল অনীহা।

এঁরা রুটি খান না। রুটি দুষ্প্রাপ্য বা দুর্মূল্য বলে নয়। কারণ এঁরা বিত্তবান। কোন কিছুই এদের কাছে দুষ্প্রাপ্য নয়। বিত্তবান বলেই মূল্যের কথা মনে আসে না। রুটি এঁরা খান না; কারণ রুটি খেতে এদের ভাল লাগে না। গরম ভাত আর মোলতা মাংস এবং কাঁচা ফল মূল নুন সহযোগে খেতে এঁরা ভালবাসেন কখন কখন মাছের সংগে মাংস মিশিয়ে হয় এক রকম তরকারী।

চামচের চলন এখানে নেই। দেখলাম এখানে সবাই হাত দিয়ে ভাতের সঙ্গে তরকারী সাপটে মেখে পরম আনন্দে ভোজন করে। কারো কোন বিকার নেই এতে। কাদো কুজোর মধ্যে থাকে জল। কুজোর মুখে থাকে নল। যার যখন জল খাওয়ার দরকার হয় সে নল সমেত কুজোটা উঁচু করে তুলে আলগোছে জল খায়। মুখ দিয়ে জল খেলে পানপাত্র অপরিষ্কার হবে বলে পর্তুগীজরাও এই প্রাকৃত পন্থার স্মরণ নিয়েছে।

নবাগতের প্রাপ্তি

নবাগত পর্তুগীজদের প্রচুর অসুবিধে। তারা গোয়ার পর্তুগীজদের জীবন যাত্রা, আচার ব্যবহারের সঙ্গে পরিচিত নয়। হাঁ করে আলগোছে জল খাওয়া তাদের কাছে অচিন্তনীয় ব্যাপার। এইভাবে জল খেতে গেলে জল পড়ে জামা ভিজে যায় এবং নবাগতের এইরূপে হেসে ফেটে পড়ে এদেশের পর্তুগীজরা। পর্তুগীজরা এদেশে এসে সবাই গুরুগম্ভীর হয়ে ওঠে। নবাগতেরা তা পারে না। তাই অভ্যস্ত না হওয়া অবধি প্রতি পদে নবাগতদের হাসি ঠাট্টা সহ্য করতে হয়।

রুচি ও সংস্কার

স্ত্রীদের প্রতি গভীর সন্দেহ ও সংশয় নিয়ে বাস করেন ভারতীয় পর্তুগীজরা। পর্তুগালে এমন সন্দিগ্ধতা তাদের থাকে না। ভারতের মাটিতে পা দিয়ে এই সন্দেহ ও সংশয় তারা অর্জন করে। তাই বাড়ির ভিতরে কেউ ঢুকতে পায় না। কেউ হয়ত কারো বাড়ি গিয়ে গৃহস্বামীকে ডাকল। দরজা খোলার আগে মহিলারা প্রথমে পালাবেন। তারপর দরজা খোলা হবে। একমাত্র বিবাহিত লোক সঙ্গে তার স্ত্রী থাকলে অন্দর মহলে আসতে পারে। তা ছাড়া আর কেউ স্ত্রীদের মহলে আসতে পারে না। মহিলারা যখন বেড়াতে যান অথবা কারো বাড়ি যান তখন তাদের ক্রীতদাস ক্রীতদাসীর কড়া পাহারায় ঢাকা পাল্কীতে করে যেতে হয়।

বাড়ির মধ্যে মহিলাদের থাকার তাই আলাদা মহল আছে। এই মহিলা মহলে কোন পুরুষ পদার্পণ করতে পারে না। ছেলের বয়স পনেরো পার হওয়ার পরই মায়ের সঙ্গ তাকে ছাড়তে হয়। মহিলা জগৎ থেকে নির্বাসিত এই বালক এইবার পুরুষদের সঙ্গে থাকবে। সেও যেতে পারবে না মায়ের কাছে।

কেন জানি না এদেশের পর্তুগীজ রমণীরা এত কঠোর বিধান সত্ত্বেও কলাবতী। এই বিলাসীনিরা সঙ্গে বিষ রাখে। হাসতে হাসতে এবং স্বামীকে হাসাতে হাসাতে তাকে বিষ প্রয়োগ করে থাকে।

স্ত্রীকে খুন করা গোয়ায় একটা ঘটনার মধ্যে গণ্য হয় না। স্বামীর সন্দেহ হলেই হল। তখন স্ত্রী বেচারীর এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার সব আশাই ত্যাগ করতে হয়।

এদিকে স্ত্রীরাও হয়ে ওঠে বিষ প্রয়োগে পটু। চরম-

কার কার্যকরী বিষ তৈরি করতে তারা সুদক্ষ। খুব সুক্ষ্ম চুলের মতো প্রয়োগ করতেও তারা সিদ্ধহস্ত। এমন এমন বিষের কথা মহিলাদের জানা আছে যা সত্যিই বিস্ময়কর। ধরা যাক, স্বামীকে ছ'বছর পরে মারতে হবে—কোন মহিলা এই সিদ্ধান্ত করে বসলেন। কোন এক মুহূর্তে তিনি তার স্বামীকে বিষ খাওয়ালেন। সেই বিষের ক্রিয়া ঠিক ছ'বছর পরে গিয়েই পাওয়া গেল। আবার কোন কোন বিষ আছে যার ক্রিয়া এক বছর, দু'বছর বা তিন বছর পরে পাওয়া যাবে। এই ধরনের আশ্চর্য বিষ সম্পর্কে পর্তুগীজ ও মাস্টিকোর রমণীরা পরস্পরের দৃষ্টির বাইরে থাকেন।

ফাঁদ পাতা ভুবনে ভুবনে

কিন্তু দৃষ্টি পড়েই। স্ত্রী কখন কখন পরপুরুষে আসক্ত হয়ে পড়েন। স্বামী এই ব্যাপার জানতে পারলে স্ত্রীকে খুন করে ফেলেন। অবশ্য স্পেন ও পর্তুগালে অন্য পুরুষ-নিরত স্ত্রীকে হত্যা করার আইনগত বিধান আছে।

রূপ চর্চা

এদেশের মহিলারা সব সময় পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন থাকেন। এদেশের সাজসজ্জা যেমন পরিষ্কার, তেমনি ঝকঝকে তাদের বাড়িঘর। প্রতিদিনই তারা জামা কাপড় কাচে। তাই মলিন বসন কখনও অঙ্গে উঠতে পায় না। দু'বেলা স্নান করা ত আছেই। তাছাড়া রোজ দু'বারের বেশিও স্নান করতে হয়। পায়খানা থেকে এসে কিংবা সঙ্গমের পরে স্নান করা এ দেশীয় মহিলাদের রীতি।

পর্তুগীজ মহিলাদের বিলাসীনি বলা চলে। ঘরের কাজ তাদের করতে হয় না। রূপচর্চা করেই দিন কাটাতে হয়। চন্দন মাখা এখানকার রীতি। শুধু চন্দন নয়, তাছাড়াও আছে নানা প্রকারের সুগন্ধি নির্যাস। রূপ চর্চা ছাড়া আর একটা বড় কাজ হল পান খাওয়া। এই সব মহিলারা দিন রাত পান খেয়ে ঠোঁটদুটোকে লাল টুকটুকে করে রাখে। এও রূপ চর্চার অন্তর্গত।

অবশ্য পান খাওয়ার স্বাস্থ্য তত্ত্বগত বাধাও আছে। বলা হয় পান খেলে হজম শক্তি বাড়ে, দাঁতের গোড়া শক্ত হয়, মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট করে।

ভারতীয় রমণীদের কাছ থেকে পর্তুগীজ রমণীরা এই অভ্যাসটি রপ্ত করেছে। পান ছাড়া ভারতীয় রমণীরা এক দণ্ড থাকতে পারে না। তারা যেখানেই থাক না কেন, যা খুশি তাই করুক না কেন, হাতের গোড়ায় পানের বাটাটি থাকা চাই। পান খাওয়ার অভ্যাস থেকে ক্রীতদাসীরাও মুক্তি পায়নি। তারাও পান খায়। পান না খেলে প্রাণ আই ঢাই করে, ঘন ঘন হাঁই ওঠে। আর স্বামী বাইরে গেলে মহিলাদের পান খাওয়া ছাড়া আর কোন কাজও থাকে না। পান তৈরিরও নানা-রকমের প্রক্রিয়া আছে। পানের সঙ্গে চুন, সুপুরি মশলা ত আছেই। এ ছাড়া থাকে নানা রকমের আনুষঙ্গিক উপকরণ। যথা লবঙ্গ, এলাচ, মরিচ, আদা প্রভৃতি। পানের সঙ্গে মাংসও দেওয়া হয়। কয়েক প্রকার মশলা দিয়ে মাংস সিদ্ধ করা হয়। এই সিদ্ধ মাংস খেলে নাকি কাম প্রবৃত্তি জেগে ওঠে।

যাই হোক গরুরা যেমন ভাবে ঘাস খায়, মহিলারাও ঠিক তেমনি পান চিবায়। পার্থক্য এই যে পানের রস খাওয়ার পর ছিবড়ে ফেলে দেওয়া হয়। পানের সঙ্গে যে সুপারি ব্যবহার করা হয় তার স্বাদ অনেকটা কাঠের মতন। কিন্তু সুপারির মাদকতা আছে। সুপারির রসে মাথা ঘোরে। ভারতীয় মহিলাদের কাছ থেকে পর্তুগীজ রমণীরা যে আচারগুলি পেয়েছে তা হল প্রতিদিন স্নান করা, গন্ধতেল ও সুগন্ধি উপকরণ ব্যবহার করা এবং চন্দন মাখা।

স্নান করা ত মহিলাদের একটা খেলা। বহুক্ষণ ধরে স্নান করা চলে। কারো কারো বাড়ির স্নানের ঘরে সাঁতার কাটার জন্যে চৌবাচ্চা করা আছে। এই চৌবাচ্চায় সাঁতার কেটে তারা যে খুবই আনন্দ পায় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

রাজ কর্ম

পর্তুগালের রাজপ্রতিনিধি তিনবছরের মেয়াদে এদেশে আসেন। তিনবছর পার হলে তাকে পর্তুগালে ফিরে যেতে হয়। রাজার আদেশ পেলে প্রতিনিধিরা তিন বছরের বেশী থাকতে পারেন। কিন্তু এমন অভেল রাজানুগ্রহ রাজপ্রতিনিধিরা সাধারণত পান না। খুব কম রাজপ্রতিনিধির ভাগ্যে এই দুর্লভ সুযোগ জুটেছে।

রাজপ্রতিনিধিকে রক্ষা করার জন্য সৈন্য সবসময় তৈরি। মন্ত্রণা ঘরটি বিরাট। এই ঘরে রাজপ্রতিনিধির প্রতিকৃতি শোভা পায়। ভারত আবিষ্কারের পর থেকে গোয়ার আজ পর্যন্ত যত রাজপ্রতিনিধি এসেছেন তাদের সকলেরই ছবি টাঙানো আছে দেওয়ালে।

বিত্তের অন্ত নেই রাজপ্রতিনিধির। কোষাগার তাঁর জন্যে উন্মুক্ত। যা খুশী তাই করা যায়। রাজ প্রতিনিধির ব্যয়ের ওপর কথা বলতে পারে না কেউ। যা খুশী তাই ব্যয় করতে পারেন। যাকে ইচ্ছে হয় তাকেই দান করতে পারেন। কারণ রাজপ্রতিনিধি স্বয়ং রাজার প্রতিনিধি এবং রাজাই প্রতিনিধিকে এই সব ক্ষমতা দিয়েছেন।

মোটা মাইনে ছাড়া উপঢৌকন আর নজরানার অন্ত নেই। গোয়ার আশেপাশে বিস্তর ছোট ছোট রাজ্য আছে। নানা বিষয়ে তাদের সঙ্গে সন্ধি চুক্তি আছে রাজপ্রতিনিধির মাধ্যমে পর্তুগালের রাজার সঙ্গে। এক রাজপ্রতিনিধির বদলে অন্য প্রতিনিধি এলে নূতনভাবে সন্ধি করতে হয়। তাই রাজারা দূত মারফৎ রাজপ্রতিনিধির কাছে পাঠান বহু দামী উপহার। এইভাবে বিত্তবান হয়ে ওঠেন রাজপ্রতিনিধিরা।

জিসুইট পাদ্রী

আগে জিসুইট পাদ্রীরা রাজাদের এই সব উপহার গ্রহণ করতেন। কিন্তু ডন লোরেন্স ডি টেভ রাজ প্রতিনিধি হয়ে গোয়ায় এসে আদেশ জারী করলেন যে এবার থেকে রাজাদের উপহার গ্রহণ করবেন রাজ প্রতিনিধি স্বয়ং, পাদ্রীরা নয়। প্রতিনিধির এই অশোভন আদেশে পাদ্রীরা উঠল তেলেবেগুনে জ্বলে। ঝগড়াঝাটি হল। কিন্তু তাতেও কিছু সুফল হল না দেখে পাদ্রীরা বলে উঠলেন—এই প্রতিনিধি বিদেশী। সেই থেকে রাজ প্রতিনিধিই উপহার নিয়ে আসছেন।

প্রতিনিধিদের নিয়ে মজার মজার গল্প চালু আছে। শোনা যায় ভারতে এসে প্রতিনিধির পুরো একটা বছর কাটে এই দেশের হালচাল, আচার ব্যবহার বুঝতে। তিন বছরের একবছর এইভাবে গেল। হাতে থাকল মাত্র দু'বছর। দ্বিতীয় বছরে রাজপ্রতিনিধি ভাবতে বসেন কোন পথে গেলে মোটা টাকা পাওয়া যাবে, কি করলে আসবে থোক মোটা টাকা। এই বিষয় ভেবে চিন্তে আটঘাট বাঁধতে কেটে যায় দ্বিতীয় বছর। থাকে পড়ে তৃতীয় বছর। এবছরও দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। কখন যে নূতন প্রতিনিধি এসে পড়ে তার ঠিক নেই। তাই প্রাণপণ চেষ্টা চলে টাকা হাতাবার এবং প্রতিনিধি আসার আগেই বাড়ি পাঠাবার আয়োজন। এই করতেই প্রতিনিধির তিনবছর কেটে গেল! অবশ্য সেনাবাহিনীর লোকেরা এবিষয়ে আরও অনেক কথা বলতে পারে।

এদেশের লোক

গোয়া এবং তার পাশের দ্বীপ হিন্দু মুসলমান এবং ইহুদীরা বাস করে। এদের প্রত্যেকের ধর্ম মত আলাদা, আচার ব্যবহার স্বতন্ত্র। মুসলমানেরা শুয়োরের মাংস ছাড়া আর সকল জন্তুর মাংস খেয়ে থাকে। হিন্দুদের মাংস সম্বন্ধে বাছ বিচার আছে। গরুর মাংস এরা খায় না। কারণ গরু এদের পূজ্য। গুজরাট এবং কাশ্মের ব্রাহ্মণরা আবার নানা বিষয়ে খুঁতখুঁতে। যে সব জিনিস কাটলে জল জাতীয় পদার্থ বার হয় এদের কাছে সেই জিনিসগুলি খাদ্য হিসাবে গ্রহণীয় নয়। কারণ ওদের মতে ওটা নাকি রক্ত।

মুসলমানেরা ইহুদীদের মত মৃতদেহ কবর দেয়, হিন্দুরা দাহ করে। অনেক সময় স্ত্রীরা জীবন্ত অবস্থায় স্বামীর চিতায় প্রাণ বিসর্জন দেয়। ব্রাহ্মণদের মধ্যে এই প্রথার প্রচলন খুব বেশী।

সৌত্তলিকতা হিন্দুদের মধ্যে আবদ্ধ। ভগবানকে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে স্বীকার করলেও বহু দেবদেবী আছে যা এদের আরাধ্য। এরা সূর্যকে পুজো করে, পুজো করে চাঁদকে। জন্মান্তরে এরা বিশ্বাসী। এদের মতে পূর্বজন্মের কর্মফল এই জীবনে ভোগ করতে হয়। এদেশে এক ধরনের সাধু দেখতে পাওয়া যায়। এই সাধুরা নাকি অলৌকিক ক্ষমতাবান পুরুষ। ঈশ্বরের সঙ্গে নাকি এরা নিত্য যুক্ত এবং মাঝে মাঝে ঈশ্বরের সঙ্গে এদের আলাপ আলোচনাও হয়ে থাকে।

যোগী সন্ন্যাসীদের ভক্তি করে সবাই। এই যোগীরা জাগতিক ব্যাপারে নিস্পৃহ। সাধারণের বিশ্বাস এই

সন্ন্যাসীরা দৈবজ্ঞ, ভূলোক জ্ঞানের অধিকারী অলৌকিক ক্ষমতা আছে এদের।

যাদুকরদেরও সুনাম খুব। নানারকমের ভৌতিক দেখিয়ে লোক ভুলাতে পারে এরা। সাপুড়েদের প্রভাবও খুব। এরা সাপের খেলা দেখিয়ে বেড়ায়। বেতের ঝুড়িতে সাপ নিয়ে বাঁশি বাজিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। খেলা দেখাবার সময় বেতের ঝুড়ি খুলে দেয় আর ফণা তুলে বেরিয়ে আসে সাপ। সাপুড়ে তখন বাঁশি বাজায়। বাঁশির সুরের তালে তালে সাপ নাচতে থাকে। সাপের খেলা দেখানোই সাপুড়েদের পেশা; এই তাদের জীবিকা। তাই গলায় হাতে বা বুকে সাপ জড়িয়ে, সাপের গালে চুমু খেয়ে বিমোহিত দর্শকদের কাছ থেকে তারা পয়সা উপার্জন করে। সাপের মুখ থেকে সাপের বিষ তারা বার করতে পারে। তাছাড়া আরও নানারকমের বিষ তারা তৈরি করতে খুবই ওস্তাদ। এই বিষ দিয়ে আবার একে অন্যকে মারে।

ভারতীয়দের ঘরগুলো খুব নিচু; বড় অন্ধকারময়। এদের ঘরের জানালা নেই। দরজা ছোট। ঘরে ঢুকতে হলে প্রায় হামাগুড়ি দিতে হয়। খড়ের ছাউনি দেয়া এই ঘরগুলি খুবই অপরিসর। মাদুর হচ্ছে এদের শয্যা। এরা শোয় মাদুরে। আবার কেউ এলে বসতেও দেয় মাদুরে। মাদুর গুলো ভুঁয়ের পাতার। এক কথায় মাদুরই হল এদের টেবিল চেয়ার চাদর।

পাতা দিয়ে এরা দোনা তৈরী করে। দোনা হল পাতার তৈরী বাটি। তেল মাখন বা এই ধরনের জলীয় পদার্থ দোনায় রাখা যায়। এমনভাবে দোনা তৈরি হয় যে এই সব পদার্থ মাটিতে পড়ে না। ভারতীয়রা দোনা পরম স্বচ্ছন্দ্যে ব্যবহার করে থাকে।

মাটির পাত্রে রান্না হয় মাংস; মাটির পাত্রে দই ভাত। জল রাখে তারার ঘড়ায়। এই ঘড়ার সঙ্গে নল যোগ করা থাকে। এই নল দিয়ে তারা আলগোছা জল খায়। পাত্রে মুখ দিয়ে জল খাবার রীতি এদেশে নেই। মাটি খুঁড়ে তৈরি করা হয় উনান। এরা সবাই বড় গরীব। অনেক সময় তারা খুদ কিনে খায়। এদের বাড়ি সোবর নিকানো। এরা বলে গোবরের গন্ধে নাকি মাছি মরে যায়।

সমুদ্র যাত্রা

গোয়া এবং আসপাশের দ্বীপের অধিবাসীদের জীবনে সমুদ্র যাত্রা নৈমিত্তিক ব্যাপার। তবু এই সমুদ্র যাত্রা নিয়ে ঘটা কম হয় না। সমুদ্র যাত্রার আগে জাহাজটিকে নানাভাবে সুসজ্জিত করা হয়। পতাকায় ছেয়ে যায় জাহাজ। জাহাজ ছাড়ার পনেরো দিন আগে থেকে দিনরাত তুরী ভেরী বাজতে থাকে। দিনরাত জ্বলতে থাকে আগুন। এই লোকাচারের পিছনে স্থানীয় বিশ্বাস হল যে এইভাবে পূজা অর্চনা করলে দেবতা তুষ্ট হন এবং যাত্রা হয় শুভ।

যাত্রা মঙ্গল হল। জাহাজ গেল সাগরে। সাগর ঘুরে কিছুদিন বাদে জাহাজ ভিড়ল ঘাটে। আবার সেই উৎসব আরম্ভ হল। সেই আগুন আর তুরী ভেরী। এক নাগাড়ে পনেরো দিন ধরে এই পূজা পার্বণ। সাগর থেকে ভালয় ভালয় ফিরে এসেছে জাহাজ! তাই দেবতাকে জানানো হচ্ছে কৃতজ্ঞতা!

রাজপথ

গোয়ার মধ্যে যে ভারতীয় হিন্দুরা বাস করেন তাঁরা সকলেই ধনী। গোয়ার একটা রাস্তা শুধু এদের জন্য। এই রাস্তায় শুধু ভারতীয় হিন্দুদের দোকান নজরে পড়ে। বেসন, পাটনি, টিন, পোর্সলেনের নানারকম জিনিসে এদের দোকান ঠাসা। এই তাদের প্রধান বিক্রি। আর পর্তুগাল থেকে জাহাজ যখন আসে তখন তারা কেনে দামী ভাল ভেলভেট। ভারতের বাজার এই ভেলভেট খুচরো বিক্রি করে। এরা খুবই বুদ্ধিমান ও চতুর।

কাশ্মের বণিকদের জন্য আছে আর একটা রাজপথ। এখানে শুধু কাশ্মের বণিকদেরই দোকান। হীরে মুক্তো প্রভৃতি দামী ও কঠিন পাথর কুটো করার বিশেষ পদ্ধতি এদের জানা। এই রাজপথের শেষের দিকে কাঠের দোকান। খাট, পালঙ্ক, চেয়ার টেবিল ইত্যাদি জিনিস পাওয়া যায় এই অঞ্চলে। এরা ওস্তাদ কারিগর। চমৎকার পালিশ করে। রং করে ভাল। রঙ করার কাজে লাল ব্যবহার করা হয়।

জহুরীদের রাজপথ যেমন আছে, তেমনি আছে স্যাকরাদের রাজপথ। বলা বাহুল্য স্যাকরা পাড়া।

সোনা রূপোর দর দোকান এই রাজপথের আশেপাশে। এরা সবাই ভারতীয় হিন্দু।

জীবিকা

এ ছাড়া আছে আরও নানা রকমের ব্যবসা, বিচিত্র রকমের জীবিকা। কেউ কেউ আবার পাইকারী কারবারী। ভারত থেকে আনে ধান, চাল, কাঠ। পাইকারী ভাবে গোয়াতে বিক্রি করে ভারতে ফিরে যায়। গোয়ার বাজারে দেখা যাবে বারোটা ভারতীয় দালাল। সর্বত্র-চারী দালালরা খুবই বুদ্ধিমান লোক।

ভারতীয় ডাক্তার আছেন এখানে। এ দেশের নাম কবিরাজ। পশার এদের খুবই ভাল। অর্থোপার্জনও প্রচুর। গোয়াতে পর্তুগীজ ডাক্তার আছে। কিন্তু তাদের তুলনায় ভারতীয় ডাক্তারদের পসার ঢের বেশি। গোয়ার সম্ভ্রান্ত লোক, যথা রাজপ্রতিনিধি, মন্ত্রী, ধর্ম-যাজক প্রভৃতি পর্তুগীজ ডাক্তারের চেয়েও ভারতীয় কবিরাজদের ওপর অনেক বেশি নির্ভরশীল গণ্যমান্য লোকের বাড়ি চিকিৎসার জন্য এদের ডাক পড়ে বলে সাধারণ লোকের মধ্যেও এই সব কবিরাজদের খুবই নাম ডাক। তাই এরাও দু'হাতে পয়সা রোজগার করে। জীবনযাত্রার মানও এদের কিঞ্চিৎ আলাদা। এরা যখন যায় তখন পর্তুগীজদের মতো বাঘাম্বর ছাতা ধরে যায় ক্রীতদাস। এই বিলাস ভোগ করে বিদেশী দূত এবং কয়েকজন বিশেষ বিত্তবান ভারতীয় বণিক।

খৃস্টান হবে অ-খৃস্টীয় আচরণের জন্য শাস্তি পেতে হয়। গোয়া দ্বীপের মধ্যে এই ধরনের আচরণ একেবারে নিষিদ্ধ। কিন্তু ভারতীয় খৃস্টানরা কিছুতেই পূর্বপুরুষের সংস্কার ছাড়তে পারে না। তাই সাধারণ ব্যবহারের মধ্যে ভারতীয় খৃস্টান এবং ভারতীয়দের পার্থক্য নজরে পড়ে না। দেখা যায় যে খৃস্টে বিশ্বাস করেও ভারতীয়দের পক্ষে সংস্কারগুলি ছাড়া অসম্ভব। তাই যাজকরা নির্দেশ দিয়েছেন যে ভারতীয় অচরণবিধি বজায় রেখেও খৃস্টান হওয়া যায়। তারই এই নির্দেশ দেওয়া ছাড়া গতি নেই। তা ভিন্ন কেই খৃস্ট ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হবে না।

প্রত্যেক রাজপথে একদল সার্ক বা বাদুটার দেখা যাবে। টাকার লেনদেন এদের কারবার। বিভিন্ন দেশের টাকা এদের ঘরে মজুত থাকে। সকল দেশের টাকা এদের চেনা। তাই এক দেশের টাকার সঙ্গে অন্য দেশের টাকার বিনিময় করে এরা প্রচুর লাভ করে। হিসাব রাখতেও এদের সমান দক্ষতা। এ দেশে কাল টাকার প্রচলন খুব বেশি। তাই প্রতিপদে এই সার্কদের সাহায্য নেওয়া ছাড়া চলে না। এরা টাকা দেখে এক নজরে বলে দেয় কোনটা ভাল টাকা আর কোনটা আসল টাকা। সার্করা অধিকাংশ ইহুদী।

হিন্দু

ভারতীয় হিন্দুদের কারো ব্যবসা হল জাত ব্যবসা। অর্থাৎ পূর্বপুরুষ যে ব্যবসার পত্তন করে গেছে অদ্যতন পুরুষে এই ব্যবসার ঢের চলছে। এই জাত ব্যবসা সহজে পরিত্যাজ্য নয়। পরিত্যাগও কেউ একটা করে না। বিয়ের ব্যাপারেও দেখা যায় যে এরা ব্যবসার কুল রক্ষা করে চলে। পাত্র পক্ষ যে জিনিসের ব্যবসা করে কন্যা আসবে ঠিক সেই জিনিসের ব্যবসাদারের ঘর থেকে। একজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে অন্য কোন অপরিচিত লোকের পরিচয় হলেই প্রথম প্রশ্ন করা হয়, তিনি কোন ব্যবসা করেন।

বিয়েতে যৌতুক দেবার রীতি এ দেশে আছে। তবে সেই যৌতুক প্রধানত অলঙ্কার। পাত্রীপক্ষকেই যৌতুক দিতে হয়। মেয়ের পক্ষ বিয়ের যাবতীয় খরচা দেয়। কিন্তু সম্পত্তির অধিকারী পুত্রের পিতা।

শীত ও গ্রীষ্ম

শীত গ্রীষ্ম, এই ঋতুই এখানে আছে। এপ্রিল মাসের শেষ থেকে শীতের হাওয়া বইতে সুরু করে। তখন নামে বর্ষা। আকাশে গাঢ় মেঘ, বিদ্যুৎ আর বজ্রপাত চারিদিকে। বর্ষা নামল ত নামলই। এক নাগাড়ে মুষলধারে বৃষ্টি পাত। ঘর থেকে বার হওয়ার উপায় নেই। জাহাজগুলো থাকে লাগরে। বর্ষার সময় আনা হয় নদীতে। সাজ সরঞ্জাম খুলে নিয়ে জাহাজগুলোকে পাতার মাদুর দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়। জল খেয়ে খেয়ে জাহাজ নষ্ট হয়ে যেতে পারে—তাই এই ব্যবস্থা। বর্ষা পার হলে শীতের সুরুতে নদীর বুকে বালি জমতে থাকে। নদী থেকে জাহাজ বার করা তখন ভয়ানক মুস্কিল। তাই বর্ষা শেষ হতে না হতেই জাহাজ আবার আসে লাগরে। পাহাড় থেকে নামে প্রবল জলস্রোত। নদীর জল হয়

গেরুয়া রঙের। স্রোতের তীব্রতা বাড়ে। কিন্তু এই জল খেতে মিষ্টি। এক দিকে নদীর কল্লোল অন্যদিকে অশান্ত সাগরের দূরত্ব গর্জন। কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার উপক্রম। কথা বললে কথা শোনা যায় না।

পর্তুগীজ আর মাস্টিকোশদের কাছে এই কাল আবার সুখের কাল। প্রচুর পরিমাণে খাবার আর ক্রীতদাস ক্রীতদাসী নিয়ে এরা তখন যায় বাগান বাড়িতে। চৈ-চৈ করে দিন কাটায়। মেয়েরা সাঁতার কেটে মজা পায়।

সেপ্টেম্বর থেকে এপ্রিল মাস হল গরম কাল। গরম কাল মানে বর্ষার শেষ। এই সময় জাহাজ যায় সাগরে। ব্যবসা বাণিজ্যের জোয়ার আসে। সৈনিকরা তৈরি হয়। উপকূল রক্ষার দিকে নজর পড়ে।

গোয়াতে কেন, সারা ভারতে, ঋতু পরিবর্তনের সময় নানা রকমের রোগব্যাধি দেখা দেবেই। তাই এই সময়টা থাকতে হয় খুবই সাবধানে। প্লেগ অবশ্য এ দেশে নেই। কিন্তু আছে রক্ত আমাশা আর সবিরাজ জ্বর। এগুলো বড় বিশ্রী রোগ। একবার হলে আর সারতে চায় না। মাঝে মাঝে প্রাণসংশয়ও হয়ে ওঠে। ভারতীয়রা নানা প্রকার ওষুধ ব্যবহার করে এই রোগের হাত থেকে মুক্তি পায়।

কিন্তু বিপদ পর্তুগীজদের। এদের সারে না। বেশি করে মাংস খেতে পায় না এরা। অতিমাত্রায় যৌন আসক্তিতে দেহও তাদের দুর্বল। তাই রোগ হলে মুক্তি নেই।

হাসপাতাল

পর্তুগালের রাজ প্রতিনিধি এখানে দাতব্য হাসপাতালের ব্যবস্থা করেছেন। প্রতি বছর অন্তত পাঁচশ লোক এই সব রোগের জন্য হাসপাতাল থেকে ওষুধ নিয়ে যায়। ভারতীয়দের জন্যও আলাদা হাসপাতাল আছে।

জিসুইট পাদ্রীরা এই সব হাসপাতালের রোগীদের দেখাশুনো করে থাকে। রাজ প্রতিনিধিও একজন কর্মচারী নিযোগ করেন। জিসুইটরা নিজেদের সংগঠনের পক্ষ থেকে রোগীদের জন্য বছরে চার পাঁচশ ডুকাট ব্যয় করে থাকেন।

অর্শ আর যৌন ব্যাধির প্রকোপ এখানে খুব বেশি। যৌন ব্যাধি যে দোষের এ ধারণাও কারো মধ্যে নেই।

ভারতীয় জনসাধারণ

ভারতীয় পুরুষরা দেশান্তরে যাওয়ার পর কাপড়ের খুঁট খুলে দিয়ে দিব্যনিদ্রা যায়। এ সময় একজন ক্রীতদাস পা টেপে, একজন মাথায় হাত বুলোয়, আর একজন পাখা নিয়ে বাতাস করে। দুপুর বেলা এইভাবে ঘুমিয়ে কাটায় বলে তাদের অনেকের ভুঁড়ি বেশ অতিকায় হয়ে ওঠে।

ব্রাহ্মণ

ব্রাহ্মণেরাই বর্ণ শ্রেষ্ঠ ও বিদ্বান। সমস্ত রকম দায়িত্বপূর্ণ পদে এঁরাই প্রতিষ্ঠিত। সমাজের মধ্যে ব্রহ্মণ্যের অপ্রতিহত ক্ষমতা। এঁদের পরামর্শ না নিয়ে কোন কাজ ভারতীয়রা সাধারণত করে না। যজ্ঞ উপবীত ধারণকারী এই ব্রাহ্মণেরা পূজা অর্চনা করে থাকেন। ঘরের মধ্যে সাধারণ পোষাকেই এরা থাকেন। বাইরে যাওয়ার সময় বেশভূষার পরিবর্তন হয়। তখন তাঁরা কাবা পরেন এবং পাগড়ী ধারণ করেন।

ব্রহ্মণ রমণীরা কেশ বেণী রাখেন। কানে পরেন নানা রকমের অলংকার। হাতে থাকে সোনার আংটি। এরা আমিষ আহার করেন না। ভাত এবং নানাবিধ ফল মূলে এঁদের প্রধান আহার্য। পূজা অর্চনা ছাড়া মশলা এবং ওষুধ বিক্রি করা হল ব্রাহ্মণদের প্রধান উপজীবিকা। এরা হিসাব রাখতেও খুব পটু।

ভারতীয় নারী হলেন অবগুণ্ঠনবতী। নাকে কানে গলায় এবং পায়ের আঙুলে অলংকার দেখা যায়। বাল্যবিবাহ এ দেশের প্রথা। সাধারণত নয়বছরের ছেলের সঙ্গে সাত বছরের মেয়ের বিয়ে হয়। কিন্তু তখন তারা এক সঙ্গে থাকে না ছেলে মেয়ে যৌবনে পা দিলে তাদের রাত্রিবাস করতে দেওয়া হয়।

গুজরাটী

গুজরাটী বেনিয়ানরা বাণিজ্যের লোক। ব্যবসা করার জন্য তারা ছড়িয়ে পড়েছে দিউ, কোচিন, চোল প্রভৃতি জায়গায়। ভারতের নানা জায়গায় তাদের কারবার। ধান চাল ইত্যাদি নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য ছাড়া দামী পাথরের ব্যবসা এরা করে থাকে। খুবই পটু ব্যবসায়ী এরা। কিঞ্চিৎ ধূর্ত বলা যেতে পারে। হিসেবের জ্ঞান প্রখর। অর্থের প্রতি আসক্তি প্রবল। এই দিক

থেকে এরা কখনও ইঁদুরকেও রক্ষা দিতে পারে। জাতি ধর্মে এদের প্রগাঢ় বিশ্বাস এবং এখনও জীব হত্যা করে

জীব প্রীতি এদের এত বেশি যে অনেক সময় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে প্রাণী কিনে তাদের মুক্তি দেয়।

এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। কারণ কাম্বের অধিবাসীদের এই রীতি। তাই কাম্বের রাজপথের নানা জায়গায় দেখা যাবে যে পশু পাখিদের খাবার দেবার ব্যবস্থা রয়েছে, তাদের জন্যে আছে জলপাত্র। পশু পাখীদের চিকিৎসার জন্য আছে হাসপাতাল। বৃদ্ধ জীব জন্তুকে ওষুধ দিয়ে সারিয়ে মুক্তি দেওয়া হয়। পিঁপড়েদের প্রতি এদের অগাধ মমতা। পেঁয়াজ রসুন ডিম প্রভৃতি খাদ্য এদের অস্পৃশ্য। মদ কখন ছোঁয় না। নানা রকমের বাস্তবিচার এদের আছে। ব্যবসার কাজে অনেক সময় এদের জাহাজে করে গোয়া থেকে কোচীন যেতে হয়। সে সময় তারা জাহাজের কোন জিনিস খায় না। তাদের খাবার তারা সঙ্গে করে আনে। পথে খাবার যদি ফুরিয়ে যায় তবে তারা বরং না খেয়ে থাকবে কিন্তু বিজাতী খৃস্টানদের ছোঁয়া খাবার তারা কখন দাঁতেও কাটবে না।

অন্যান্য আচরণের দিক থেকে এরা ব্রাহ্মণদের মত। তাদের মতই মলমূত্র ত্যাগ করার পর স্নান করতে হয়। নাগরা জুতো এদের পায়ে থাকে। এই জুতো হল লাল ; সামনের দিকটা সুচোল। দীর্ঘ দেহ উজ্জ্বল বর্ণ এই গুজরাটীদের দেখতে অনেকটা ইয়োরোপীয়দের মত। তুর্কীদের মত এদের দাড়ি গোঁফ কামান। ব্রাহ্মণদের মত এদেরও মাথায় থাকে পাগড়ী। অঙ্গে অগুরু, চন্দন প্রভৃতি ব্যবহার করা এদের রীতি।

গুজরাটী মহিলারা ব্রাহ্মণদের চেয়ে খুব বেশি আলাদা নয়। একই আচার ব্যবহার সদ্ভাবের মধ্যে এরাও বন্দী। বেশভূষার পরিপাট্যের দিক থেকে এরা ব্রাহ্মণদের অনুগামী। অন্যান্য ভারতীয় ও মুসলমানদের মত এরা মাটিতে বাদুর বা কাপেট বিছিয়ে বসে। জুতো পরে ঘরে ঢোকা নিষিদ্ধ। বাইরে জুতো খুলে আসতে হয়।

এরা এল দক্ষিণ থেকে

ভারতের দক্ষিণ প্রদেশের কিছু কিছু লোকও গোয়ায় আছে। আচার ব্যবহারের দিক থেকে এরা গুজরাটীদের মত। কিন্তু নাগরা জুতো এরা পরে না। এদের জুতো আলাদা রকমের। দাড়ি গোঁফ এরা কামায় না। আমিষ আহারে এদের অরুচি নেই কিন্তু জীব পূজা যেমন গরু ষাঁড় প্রভৃতি এদের মধ্যেও প্রচলিত। এরা নিজেরা যা খায় এই জীবদেরও তাই খেতে দেয়।

ছেলেমেয়েদের সাত বছর যখন বয়স তখন বিয়ের পাকা কথা হয়ে থাকে। কিন্তু এগারো বছর বয়স না হলে বিয়ে হয় না। বিয়ের পনেরো দিন আগে থেকে ঢাক ঢোল বাজতে থাকে। নাচ গান হয়। অবিরাম বাজনা কানে তালা ধরে। পনেরো দিন পরে সমবেত বাদ্যধ্বনির মধ্যে বর কনে অগ্নি সাক্ষী করে বিয়ে করে ও সাতপাক ঘোরে।

বিয়ের জন্য যৌতুক দেন কন্যার বাবা। পাত্রপক্ষ এতেই খুসি। কারণ মেয়েরা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারে না। সুতরাং পুত্র সম্পত্তিই বরের। বোনদের বিয়ে দেওয়া ভাই-এর কর্তব্য। এদের মধ্যে সহমৃতা হওয়ার রীতি আছে।

যে যার জাত ব্যবসা নিয়ে থাকে। সহজে কেউ জাত-ব্যবসা ত্যাগ করে না। একই ধরনের ব্যবসায়ীদের মধ্যে ছেলেমেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা হয়ে থাকে। এদেরও গলায় উপবীত দেখেছি।

এরা পর্তুগীজদের কাছ থেকে জমি ভাড়া নেয়। পর্তুগালের অধিনস্থ দ্বীপ যথা বাসেঁন, সালসীট গোয়া দ্বীপের রাজস্ব সংগ্রহের ভারও এরা রাজপ্রতিনিধিদের কাছ থেকে নিয়ে থাকে। মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়লে নিজেই নিজেদের মামলা পরিচালনা করে। আইন-জীবী নিয়োগ করতে খুব কমই দেখেছি। এদের বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার তারিফ না করে পারা যায় না।

শপথ করা বা হলপ করার রীতিও অদ্ভুত। এই সময় তারা ক্রাই-এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে মাথায় একটা হাত আর বুকে অন্য হাত রেখে শপথ কিংবা হলপ করে। ওদের ধারণা ক্রাই-এর ওপর দাঁড়িয়ে মিথ্যা কথা বললে মহা-পাতকী হতে হয়।

[ক্রমশঃ

অমর কথাশিল্পী চেখভ

অমল হালদার

আমেরিকার প্রথম শ্রেণীর সমালোচক আলেকজাণ্ডার উলকট একবার প্রশ্নোত্তরে বলেছিলেন—"প্রথমে সেক্সপীয়ার তারপরই চেখভ তারপর আর সব!"

আন্তন পাভলোভিচ চেখভের জন্ম হয় টাগানরগ্‌ বলে একটা জায়গায় ১৮৬০ সালের ২৯শে জানুয়ারী। তাঁর শৈশবও কাটে সেইখানেই তাঁর পিতা ছিলেন জীবন যুদ্ধে ব্যর্থ এক দরিদ্র মুদি। চেখভের কথায় বলতে গেলে বলতে হয়—আমার শৈশব বলে কোন জিনিষই অনুভব করি নি। বাড়ীর প্রধান কথা ছিল শুধু টাকা আর টাকা। ছেলেরা শাস্তি পেতো নির্দয়-ভাবে পশুর মতো।" তারপর তার পিতার মৃত্যু হলে চেখভের স্কন্ধে সংসার চেপে বসে। অসহ্য দারিদ্রের মধ্যে তার প্রথম জীবন কাটে।

কুস্তিগীর এক গোঁয়ো মাষ্টারের কাছে তাঁর প্রথম শিক্ষা। সাহিত্য জীবনেও তাঁদের প্রভাব দেখা যায় খুব বেশী। চেখভের লেখার মধ্যে সেই সমস্ত মাষ্টার বেঁচে থাকবেন। মস্কো হাসপাতালে ভর্তি হওয়াই তাঁর সাহিত্যে জগতে প্রবেশের ভূমিকা। প্রথম জীবনে তিনি হাসির গল্প লিখতেন ছদ্মনামে। হটচেডট তখন চেখভের খ্যাতি অপহরণ করতো। Satientless Doctor, His brother's brother ইত্যাদি হচ্ছে তাঁর কৌতুক রচনা। দারিদ্রই চেখভকে সংখ্যাতীত লেখা লিখিয়েছে। বেশী পরিমাণে দ্রুত লেখার তাগিদ পান তিনি শূন্য পেটের কাছ থেকেই। অবশ্য পরে এসব ব্যাপার সহজ হয়ে আসে! "আমি তখন পাখীর কাকলীর মতো লিখতে পারতাম সহজেই" বলতেন চেখভ বললেই কিছু না কিছু লেখা আসতোই!

"I was a young calf or a colt let out in the green open spaces. I jumped and leaped, neighed shook my tall and my head! I laughed myself and made my oudience. I took life without thinkking and bustled here and there." এই হলো চেখভের প্রথম জীবনের ট্রাজেডীর কথা।

চেখভের লেখনী ছিল অস্ত্রের মত দ্যুতিমান। আর সেই দ্যুতিমান লেখনী ঝলসিয়ে ওঠে রাজনৈতিক মহাচেতনার যুগে। তাঁর রচনা আনলো নবযুগ। তাঁর রচনা হলো সমস্ত মানুষের জন্য, বিশেষ করে

একবারে

ক্ষুধিতের জন্য কোন জায়গায় থাকলেও ছেড়ে এসে
হেতের চেহারাকার আদি বাড়িঘর নয় সাইবেরিয়ার
তার চৈতন্যোদয় হয় মাঝেমাঝের
কবেকী শেষ ছাড়াছাড়ি

'হল

পূর্ণ হয়ে ওঠে। তিনি জীবনাদর্শ খুঁজে পান যেন ঠাঁই।

১৮৯২ সাল হচ্ছে বিখ্যাত মড়ক বৎসর। লোক মারা যাচ্ছে কলেরায় চতুর্দিকে অশ্রুর প্লাবন। সেই সময় চেখভ নামলেন ভগবানের মত কর্মক্ষেত্রে। দুঃখকে দুঃখ মনে না করে অক্লান্তভাবে চিকিৎসা করে গেলেন জীবনকে তুচ্ছ করে। গ্রামের হাসপাতালে কাজ করলেন। তারপর বহু চেষ্টায় একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন সেলেকোভাতে মস্কোর কাছে।

চেখভের গল্পের প্রাণ ছিল বাস্তবতা ও সজীবতা। তিনি বিশ্বাস করতেন আর্ট সৌন্দর্যের প্রতীক। সেখানে কুৎসিত লোভী মনের স্থান নেই। কতবার বলেছেন—'মানুষ কোনদিন সুন্দরের চৌকিদার বা দারোগার নয়, সে হচ্ছে কর্তব্য সজাগী, ন্যায়পরায়ণ সুন্দর মানুষ।"

চেখভ ছিলেন গভীরভাবে জাতীয় সাহিত্যিক। লিও টলস্টয়ে তাঁকে—আলিঙ্গন করে একবার বলেছিলেন :—You all Russian ! Yes very, very Russian" তাঁর সাহিত্যে হচ্ছে উনবিংশ শতাব্দীর রাশিয়ান সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি। বিভিন্ন ভাষায় তাঁর রচনা—

অনূদিত হয়েছে। লণ্ডন, প্যারী, নিউইয়র্ক, পীটার্সবুর্গে প্রভৃতি দেশে তাঁর নাটক এনেছে প্রচুর চাঞ্চল্য। তাঁর নাটক Cherry orchard আর Uncle vanya লণ্ডন রঙ্গমঞ্চে এনেছিল বিরাট সাফল্য। একজন বিশিষ্ট ইংরেজ সমালোচক সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—Uncle vanya unforgetable Good Play" মস্কো থিয়েটারে ১৯০১ সালে তাঁর 'সীগাল' নাটক অভিনীত হয়। প্যারীতে হয় 'দি থ্রি সিস্টারস্'। প্যারীর বিদগ্ধ সমাজ উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় ফেটে পড়েছিলেন নাটকটি দেখে।

চেখভের প্রভাব বিরাট পক্ষ বিস্তার করে বিভিন্ন ইংরেজ সাহিত্যিকের রচনাকেও আচ্ছন্ন করেছে। অনেক বিশিষ্ট সাহিত্যিকই তাঁর প্রভাবে প্রভাবান্বিত। আমরা সেই প্রভাব দেখি গলসওয়ার্দির মধ্যে সমারসেট মমের মধ্যে ক্যাথরিন ম্যান্সফিল্ডের মধ্যে তা ছাড়া কম বেশী প্রভাব দেখা যায় শুধু কেবল্ ব্যাসারস্টিক ই. এম. ফস্টার এবং বার্নাট হিচেন্সের রচনার মধ্যেও।

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ছিলেন চেখভের ভক্ত এবং চেখভের প্রভাব যে তাঁর গল্প গুচ্ছের মধ্যে পড়েছে, সে কথা তিনি নিজেই স্বীকার করে গেছেন। কাজেই রুশ সাহিত্যের ও বাংলা সাহিত্যের মধ্যে আত্মীয়তা আছে।

"চেখভ সারাজীবন তাঁর নিজের আত্মার প্রাচুর্যের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, নিজের সম্পত্তির ওপরেই বিশ্বাসী ছিলেন"—গোর্কি বলেছিলেন একবার,—নিজের সঙ্গেই থাকতেন সর্বদা, অন্তরে অন্তরে আশ্চর্য রকম মুক্ত ছিলেন, কখনো কোন বিষয়ে বাধ্যে পড়েন নি বা অন্যকে পড়তে দেন নি। সবাই সুন্দর হোক, সচ্ছ হয়ে উঠুক এই ছিল তাঁর কামনা।"

রাশিয়ার বিখ্যাত সাহিত্যিক ভ্লাডিমার কোরোলেনকো চেখভ সম্বন্ধে বলেছেন—"চেখভ ছিলেন যেন আনন্দে মোড়া এক পরিপূর্ণ মানুষ, জীবনের বেগে চলেছেন। সামনের দিকে।"

মস্কো আর্ট থিয়েটারের প্রতিষ্ঠার দিনে কনস্টানটাইন স্টানিস্লাভস্কী "রাশিয়ার সেক্সপীয়ার" চেখভ উদ্দেশ্যে বলেন আন্তন্ প্যাভলোভিচের মত হেঁয়ালী আশাবাদী আর আমি দেখেনি। সর্বদাই মুখে আশার দীপ জ্বলতো যেন। তাঁর প্রত্যেকটি লেখা আমাদের আদর্শ গঠনে, জীবনকে সংঘবদ্ধ করে সাজিয়ে তুলতে শিক্ষা দেয়। তিনি শিখিয়েছেন কেমন করে জীবনকে নৃত্যের মত ছন্দোময় করা যায়।"

চেখভের আবির্ভাবে রাশিয়ান সাহিত্যে আসে একটা নতুনের স্রোত। তাঁর সময় থেকেই রাশিয়ার ঐতিহ্যের অগ্রসর। "চেখভ হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ শিল্পী, অন্য কোন সাহিত্যের সঙ্গে তুলনাই করা চলে না, না টুর্গেনিভের সঙ্গে, না আমার সঙ্গে"—লিও টলস্টয় বলেছেন চেখভের এক জন্মদিনে। "চেখভ শুধু চেখভই, ইমপ্রেশনিস্টরা যেমন একটা আলাদা জাত। প্রকৃত শিল্পী রঙের বিচার করেন না, হাতের কাছে যে রঙ পান তাই ব্যবহার করেন, চেখভও তেমনি করেছেন। লোক তাঁকে যতো বোঝে ততই হতবাক—হয় বিস্ময়ে। গভীর বেদনাবোধই চেখভ সাহিত্যের উৎস।"

সিংহলে বৌদ্ধ লঙ্কাবতার

সুরেন্দ্রনাথ কর

আজ সিংহল বা লঙ্কা জগতের চক্ষে চীন-ভারত সীমান্ত শান্তি কামনার অগ্রদূত হয়েছে। চীনের ভারত আক্রমণ পৃথিবীর শান্তি ধ্বংসের একটি ভেরীভক্কার Challange মাত্র। প্রাচীনকালে বহুদূরের শতাব্দীর সে একদিন এই সিংহলেই ভারতের ধর্মাশোক তাঁর প্রাণ প্রিয় পুত্র মহেন্দ্র ও বিদুষী কন্যা সংঘ মিত্রকে সংসারধর্ম ত্যাগে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত করে চির শান্তিপূর্ণ বৌদ্ধনীতি প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। এখন সেখান হতেই শ্রীমতী বন্দরনায়েক ও তাঁর লোষ্ঠীনিরপেক্ষ সুহৃদ শক্তিবৃন্দ শান্তিপ্রিয় ভারত আক্রমণকারী চীনাদের সংগে সম্ভাব্য সন্ধির মত কিছু কথাবার্তা নিয়ে কলম্বো প্রস্তাব করেছেন। আমাদের সম্মান মর্যাদা, নীতি বীরত্বের গৌরব ও আধুনিক সমরোপকরণে প্রস্তুতি নিয়ে আমরা শান্তি কামী। অবান্তর হলেও এই সংগে মনে আসে নেপোলিয়নের কথা If you want peace you must de prepared for War এই আপ্তবাক্যের নিরপীড়ন বিপক্ষী অবিরোধী ভারতের প্রায় দশ দিকেই আজ প্রাণবন্ত।

সিংহলের নামে কবেকার শৈশবের কথা পুরাণতাক্ত ধনপতির বাণিজ্য নৌকা গোলা পায়রার মত মাস্তুলে উঠে সে তখন সাধারণের মধ্যে চলিত কথা ছিল যে লঙ্কায় সোনা সস্তা, তাই বলে মনে পড়ে না কেউ বলেছে যে সেখানে El derados মত রাস্তা ঘাট ঢালাই সোনার আর নুড়িগুলি ছিল জহরতের।—

অতঃপর অনেক ধারণার মত এ ধারণাও শিক্ষার আলো অন্ধকারে ভ্রষ্ট হয়েছে বা পরিণতি লাভ করেছে। ভারতের চিরবিকাশশীলতার সীমাহীন মানবিকতার ধারা ধারণ বহন হয়েছে পুরাতন ঐতিহ্যে, সংস্কৃতিতে, ধর্মে নীতিতে তারই ইতিহাস তারই বাস্তব চিহ্ন ছড়ান আছে গ্রামে নগরে স্থানীয় গল্পে মন্দিরে আর লোকসেবায়। ইতিহাসের অমর পৃষ্ঠা অলংকৃত করে আছে ভারতের জগতকে শ্রেষ্ঠ অবদানে, সে হচ্ছে শান্তিনিকেতন।

রামায়ণে লঙ্কেশ্বর রাবণ দুরাচার চরিত্রে চিত্রিত হয়েছে। "মুখার্জির ম্যাগাজিনে" র বয়োদা প্যানেলে লঙ্কায় দেখেছিলাম, দশানন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিল। ম্যাগাজিনখানি Reis & Rayget পক্ষাহিক পত্রিকার

সম্পাদক পণ্ডিত চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদন করতেন সে সময় হতেই মনে জাগল যে ধুরন্ধর-চিত্র এ ধারনার রেখাপাত ছিল।

রামায়ণের গল্প রচনা এমন সাবলীল গতিতে অগ্রসর হয়েছে আর আমরা এতবার তা শুনেছি, মাইকেল মধুসূদনের কথায় রামায়ণ "তেতলায় ও পড়ছে, পাঁচতলাতেও পড়ছে"—তাতে রাবনকে ভিন্নরূপে চিন্তা করবার অবসর হয়নি। রাবনের ভগ্নি সূর্পনখা অতি সাধারিকা বৃত্তির প্রেরণায় শ্রোবেনাতে দণ্ডকারণ্যে রূপশ্রী লক্ষণকে দেখে মোহিত হয়েছিল। সম পর্যায় মহাভারতে হিড়িম্বা ভগিনীও ভীমসেনকে দেখে সম অনুভূতিতে আকৃষ্ট হয়। ভীমসেন সংগতবোধে তাকে পরিত্যাগ করে কিন্তু লক্ষণ সূর্পনখার প্রস্তাব ঘৃণ্য বিবেচনায় তার নাসিকা ছেদন করে তাকে হতশ্রী করে। তাদের উপর এই ইতরজনোচিত অত্যাচারের প্রতিশোধ কামনায়—নারীর প্রতি অত্যাচারের পরিবর্তে রমনীর উপর প্রতিহিংসায় রাবণ সীতা হরণ করে। এ অবস্থায় নিপীড়িত সীতার প্রতি আমাদের সংবেদনা স্বতঃস্ফূর্ত, আর সূর্পনখা অনাচারী রাক্ষসী সুতরাং ভারতীয়দের নিকট ঘৃণ্য। অন্যদিকে যদিও সীতাকে নানা প্রকার প্রাক সম্মতি গ্রহণের জন্য চেষ্টা সমাবৃত করে জয় দেখান হয় তথাপি লক্ষণীয় যে দশমৌলি সীতার নৈতিক স্বাধীনতা অবদলিত করে নাই। রামায়নে চরিত্রহীন-রূপে গ্রথিত রাক্ষস রাবণের এ একটি নূতন ব্যক্তিত্বের বিশেষত্ব।

সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত ১৩০৭ সনের "সাহিত্য" নামক মাসিক পত্রখানি হাতে আসায় পরম চন্দ্র দাসের 'লঙ্কাবতারে'র উল্লেখ চক্ষে পড়ে তিনি তিব্বত পর্যটন করেছিলেন। ভারতের উত্তরের বহুল অংশে তিব্বত বিরাজমান। সম্রাট অশোক এই হিমবন্তে বুদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য ভিক্ষু প্রেরণ করেন। তিব্বতবাসীদের সহিত প্রাচীনকালে ভারতবাসীদের ব্যবসাদি সূত্রে মত অভিমত বিনিময় ঘটেছে। কৈলাস পর্বত, মানস সরোবর ভারতবাসীর নিকটের পুণ্যতীর্থ স্থান, তিব্বতীয় বৌদ্ধদের সেই রকম ছিল-ভারতের বুদ্ধ গয়া, সারনাথ, সাঞ্চী প্রভৃতি। উভয় দিকেই তীর্থ যাত্রীদের ছিল মেলা ও মেলা। সেই সংগে শোনা গেছে ওষুধি মণিপদ্মের কথা। "লঙ্কাবতার" গ্রন্থখানি বৌদ্ধ সংস্কৃত পুস্তক। "রাবণের ধর্ম দীক্ষা" সম্বন্ধে লঙ্কাবতার সূত্রের কিছুমত গ্রহণ করে লেখক শরৎ চন্দ্র উল্লেখ করেন যে রাবণ ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। এই পুস্তকের অংশ বিশেষ নিম্নে দেওয়া হল। প্রথমেই এখানে বলা হয়েছে যে লঙ্কাবতার সূত্রে রাক্ষসীকির রাবণ অন্য বর্ণে চিত্রিত হয়েছেন।

"এক সময়ে ভগবান বুদ্ধ লঙ্কা নগরীর মলয় শিখরে বিহার করেন। সেই সময়ে রাবণ তাঁর নিকট ধর্ম জিজ্ঞাসু হলে ভগবান বুদ্ধ ধর্ম ও অধর্মের সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা দেন। সে তত্ত্ব শ্রবণ করে রাবণ কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বলেন "ভগবন পূর্ব বৌদ্ধ গণের নিকট আমি উক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু তাঁরা এ বিষয়ে কোন উত্তর প্রদান করেন নাই। আপনার এই সুধাময় ব্যাখ্যা শ্রবণ করে আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হল। আমি আপনার শরণাগত হলাম। আজ হতে আমি বুদ্ধধর্ম ও সংঘের আশ্রয় নিলাম।" অতঃপর রাবণ ভগবানের অনুমতি গ্রহণ করে ১০৮টি প্রশ্ন করেন।

রাবণের প্রশ্ন মধ্যে দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, ধর্মনীতি, রাজনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি সমস্ত বিষয় অন্তর্নিহিত ছিল। রাবণের প্রশ্ন সমূহ ও ভগবানের উত্তর পরম্পরা পাঠ করে প্রাচীন ভারতের অনেক বিষয় অবগত হওয়া যায়।

বৌদ্ধগণ বিশ্বাস করেন যে খৃঃ পূঃ দশম শতাব্দীতে ভগবান বুদ্ধ রাবণকে যে সকল উপদেশ দেন সে সকলের সহিত লঙ্কাবতার সূত্র বিরচিত হয়।

প্রাচীনত্ব প্রমাণে অনেক সময় চীনা গ্রন্থের উল্লেখ হয়। তখন চীনারা ভারতীয়দের মিত্র ছিল, ভারতের বৌদ্ধ শিক্ষণ প্রনাম গ্রহণ করেছিল। ভারতবর্ষীয়েরা জলে ও স্থলে দৈনিক ব্যবসায়ে সংযুক্ত ছিল। চীনা পরিব্রাজক ফা হিয়ান, হোয়েন সাং প্রভৃতি বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে ভারতে এসেছেন। তাদের লিপিবদ্ধ বিবরণ হতে সে সময়ের ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা

জানা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২৪ খৃঃ চীনা রাজ্যে

বিশ্বভারতীতে তিনি চীনা ভবন প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। উভয় জাতির সম্বন্ধ ঘনিষ্ট হয়েছে উভয় জাতির স্বাধীনতার পর। আজকের হলদেহ চীনা মার্ক্স লেনিনের নব ব্যাখ্যা দিয়ে রাজ্য সম্প্রসারণে অগ্রসর। ভারতের সঙ্গে সে মৈত্রীর হস্তাতা ত্যাগ করেছে। Giate fulness is a Slave Sentiment নীটশের এ উক্তির শক্তিপ্রিয় ভারতকে কৌশলে আলোচনায় ব্যাপৃত রেখে রক্তক্ষয়ী আক্রমণ করেছে। দুই উগ্র চীনার বাক্যভংগী শক্তি প্রয়াসী হবটি নিরপেক্ষ জাতিকে মনে হয় স্তম্ভিত করে দিয়েছে, ভারতের কাছে চীনার দুর্জ্ঞেয় কূটনৈতিক সত্তাবলী chinese riddle.

তথাপি অতীত তার পুরাতনের পুটুলী ভস্মীভূত করেনি। প্রাচীন মিত্র চীন দেশের ইতিহাস হতে জানা যায় যে লংকাবতার গ্রন্থ তিনবার চীন ভাষায় অনূদিত হয়। ৪৪৩ খৃষ্টাব্দে গুণভদ্র, ৫১৩ খৃঃ অব্দে বোধি রুচি আর ৭০৪ খৃঃ অব্দে শিক্ষানন্দ নামক পণ্ডিত সংস্কৃত "লংকাবতার" চীন ভাষায় অনূদিত করেন।

খৃঃ সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে চীন পরিব্রাজক হোয়েন স্যাং ভারত ও সিংহল দেশ ভ্রমণের পর লেখেন যে পুরাকালে লংকা মলয় শিখরে আসীন হয়ে ভগবান বুদ্ধ লংকাবতার সূত্রের উপদেশ দেন।

ভারতবর্ষে ৮ শতাব্দীর শেষভাগে ভগবান শংকরাচার্য বেদান্ত ভাষ্যে লংকাবতার সূত্রের মত উদ্ধৃত ও খণ্ডিত করেন।

৯ম শতাব্দীতে মাধবাচার্য সর্ব দর্শন সংগ্রহের বৌদ্ধ দর্শন পরিচ্ছেদে লংকাবতার সূত্রের উল্লেখ ও ভগবান বুদ্ধের বচন উদ্ধৃত করেন।

এরপর রাক্ষসদের প্রকৃতির কথা মনে হয়। রামায়ণ মহাভারতে রাক্ষসেরা যাগ যজ্ঞ নষ্ট করে আর সে যজ্ঞাদির সংরক্ষণে সনাতন ধর্মী বীর পুরুষদের ঋষিরা সাহায্য নিতেন। অবান্তর হবে না এখানে বললে যে বৌদ্ধরা বেদ অবিশ্বাসী-ও যজ্ঞাদি বিরোধী ছিলেন। কারণের মধ্যে সেই জন্যও হয়ত ব্রাহ্মণেরা এদের রাক্ষস আখ্যা দেন। কথিত আছে যে দুর্যোধনকে অন্যায় যুদ্ধে হত্যা করার জন্য চারবাকেরা যুধিষ্ঠিরকে এ হিংস্র জাতি হত্যার জন্য ভর্ৎসনা করায় যুধিষ্ঠির উহার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করে অনুশোচনা করেন। তখন ব্রাহ্মণেরা সকলে সমবেত হয়ে চারবাকদের রাক্ষস প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করে তাদের হত্যা কার্য সম্পাদন করেন? মতবিরোধীদের রাক্ষস জ্ঞান করা তখন সমীচীন ছিল। মহর্ষি বাল্মীকি বেদ বিশ্বাসী সে কারণ সে সময়ের বিখ্যাত বৌদ্ধ রাবণকে রামায়ণে বর্ণিত বিবিধ অনুলেপনে রঞ্জিত করে রঘু কুলতিলক রামচন্দ্রের দ্বারা স্বর্ণ লংকা ও বীর শ্রেষ্ঠ রাবণকে সবংশে কাব্যে "ধর্ম সংস্থাপনার্থ" বিনাশ করে আদর্শ রচনা করেছেন? রামায়ণে বর্ণিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "পিতার প্রতি পুত্রের বশ্যতা, ভ্রাতার জন্য ভ্রাতার আত্মত্যাগ, পতি পত্নির মধ্যে নিষ্ঠা ও প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য কতদূর পর্যন্ত যাইতে পারে প্রবানত ঘরের সম্পর্কগুলি"।

আধুনিক কালে লংকা বা সিংহলের অধিকাংশ অধিবাসীই বৌদ্ধ মতাবলম্বী, সাধারণের ভিতর এখানে রাম রাবণের যুদ্ধের কথা বিশেষ কিছু বলতে পারে না। তথাপি টেনে বুনে কেহ কেহ অনুমান করেন সে অনুরাধাপুরে বা উহার পূর্বদিকে রাবণের বাটি ছিল। এইখানে মারিচ 'চুক্কাবি' নামে স্থানটি হয়ত স্বর্ণমৃগরূপে রামকর্তৃক নিহত মারিচের নামে অনুমিত হয়ে থাকবে। রাবণের প্রাসাদ এখন সমুদ্র কোলে।

রমেশচন্দ্র দত্ত I.C.S. তাঁর "ইউরোপে তিন বৎসর" পুস্তকে লিখেছেন সিংহলে সীতাপুরা নামক একটি স্থান এখনও বর্তমান আছে, প্রবাদ যে এ স্থানে লংকাধিপতি রাবণ সীতাদেবীকে আটক করে রেখেছিলেন। সেইটিই আশোক কানন। রাবণের বাটি ঘর সবই সমুদ্র গর্ভে।" —সুতরাং অনুমান এখন অর্ণবও অভ্রভেদী।

"রামায়ণ" আজ বুকে করে রেখেছে কোন ইতিহাসের ইংগিত।

॥ ১৩ ॥

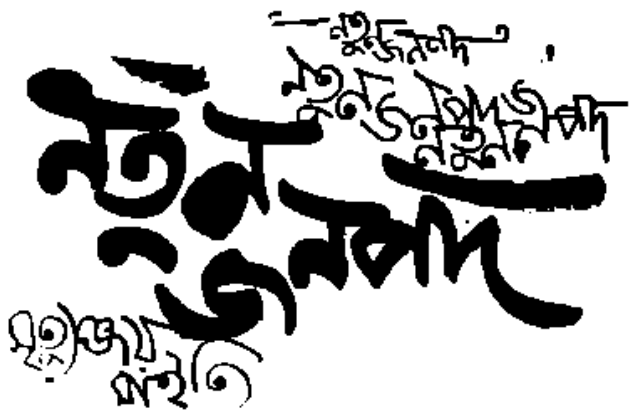

নীলাপুরের ব্লক অফিসটা দেখতে দেখতে জমে উঠল। এখন আর এটাকে ব্লক অফিস বলে না, বলে বি, ডি, ও অফিস। অর্থাৎ ব্লক ডেভলপমেণ্ট অফিসারের অফিস।

তা সরকারী অফিসের আড়ম্বর আছে। চেয়ার টেবিল, টানা পাখা নব একটা জীপ পর্যন্ত এসেছে। এতগুলো গ্রাম নিয়ে ব্লক তৈরী হয়েছে। যোগাযোগ রাখতে হবে। তাইতেই জীপ চাই।

নীলাপুরের হাটের আর মরা নদীর ধারের চায়ের দোকানে আড্ডা মারা ছেলেদের চোখে, কিংবা স্টেটেল-মেণ্ট—অফিসের কেরানীদের চোখে, এই জীপটা ঠিক

না, জীপ বস্তুটার ওপর তাদের কোন আক্রোশ নেই। আক্রোশ তার আরোহীদের প্রতি। দিনরাত এই জীপটা নদীর ধার দিয়ে বা লোনা মাটির উঁচু পথটা দিয়ে ধুলো উড়িয়ে দৌড়ুচ্ছে। আর তাতে সামনের সিটে একজন রঙিন প্রজাপতি থাকবেই।

অবশ্য 'রঙিন প্রজাপতি' নামটা চায়ের দোকানের রসময় দিয়েছিল। আবার রসময় নামটাও তার পৈত্রিক নয়। আড্ডার বন্ধুরাই দিয়েছিল তার অন্তরের রসের সন্ধান পেয়ে।

নীলাপুর হাইস্কুলে রসময় 'ক্লাস এইট' পর্যন্ত পড়েছিল। তারপর আর অগ্রসর হতে পারেনি। ওই ইংরাজী ভাষাই যত ঝামেলা বাধিয়েছিল। 'থার্ড পার্সোন সিংগুলার নাম্বার, আর প্রেজেণ্ট-টেন্স এই এতগুলি দিকে নজর রেখে ভার্বের শেষে 'এস' বসান, যেন-তেন কর্ম নয়। রসময় ও তা পারেনি। হেডমাস্টার মশায় একদিন বলে দিলেন, 'দাও বাবা, চষে খাবে। কিছু হবে না তোমার, তখন এখানে জ্বালাতে এসেছ কেন?'

রসময় গুরুবাক্য লঙ্ঘন করেনি। পরদিন থেকে আর মাস্টার মশায়কে জ্বালাতে স্কুলে যায়নি।

রসময়ের খাওয়া পরার প্রাচুর্য না থাকলেও অভাব নেই। বাবার রিয়ে সরেস জমি, আলু, বেগুনের ক্ষেত। কিছু ধান চাষও হয়। তাতেই একরকম চলে যায়।

রসময় চায়ের টেবিলে ত্রিতালের বোল বাজাতে গ্রাম সেবিকাদের এই প্রজাপতি নামটা দিয়েছিল। পরণে সর্বদাই দামী রঙিন শাড়ী, হাতকাটা পেটকাটা এবং পিঠকাটা ব্লাউজ, জীপের ছুটে বাতাসে প্রায়শই দেহের উপরিভাগ অনাবৃত। মরা নদীর হাওয়ায় অকুণ্ঠিত কুন্তল দোলায়মান। মুখে প্রচুর পাউডার, ঠোঁটে লিপস্টিক এবং চোখে কাজল।

গ্রাম সেবিকাদের এই রূপের প্রতি যদি নীলাপুরের ছেলেরা না তাকায়, তবে তাদের জীবন ও যৌবনের প্রতি রীতিমত অশ্রদ্ধা দেখান হয়।

আকর্ষণের আর একটা কারণও আছে। জীপে প্রায়ই

ট্রাউজার আর হাওয়াই শার্ট' পরা আর ভান হাতে ঘড়ি বাঁধা কোন না কোন 'হিরো'কে দেখা যায়। মেয়েগুলি হেসে তাদের ওপর ঢলে পড়ে। নীলাপুরের যে মানুষ আছে, এটা যেন তারা গ্রাহ্যই করে না।

বস্তুতঃ নীলাপুরের প্রতি এই অপমানের প্রতিশোধ চায়ের দোকানের ছেলেরা নিজেদের মধ্যে গালাগালি আর খিস্তি করেই তুলে নেয়।

সেদিন সন্ধ্যায় আড্ডাটা জমেছিল ভালই। রসময়, পল্টু, ও পাড়ার কেষ্টা, ফটকে সবাই জুটেছিল বসীর দায়ের চায়ের দোকানে। একটা ভাঁড় ধুলো উড়িয়ে ছুটে চলে গেল সামনে দিয়ে।

রসময় চায়ে পড়ায় চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, 'আঃ'। তার এই পরিতৃপ্তি চায়ে না আর কিছুতে তা বুঝতে কারুর দেরি হল না।

পল্টু বলল, আচ্ছা রসদা, এই প্রজাপতিরা দিনরাত গ্রামের সেবা করেন না কার সেবা করেন সেটা একবারটি ভেবে দেখেছ কি?

রসময় চায়ের কাপ থেকে মুখ না তুলে বলল, 'শালা বার গাট্টা'।

'শালা বার গাট্টা' শব্দটা রসময়ের একটা মুদ্রা দোষ। যখনি অতি মাত্রায় কোন রসঘন বস্তুর কথা বলতে হয়, তখনি রসময় শালা মার গাট্টা শব্দটা প্রয়োগ করে।

রসময় বলল, 'গ্রামসেবিকারা? ধুর! ধুর! গ্রামের লোকেদেরই ওদের সেবা করতে হবে। আর ওদের চর্চ্চিটা কি জানিস ঘাটা? এই এন্দুরে সরকারী বাবুরা এসেছেন। এখানে সিনেমা নেই, গল্পের মাঠ নেই, কেউ রোড নেই লাভার্স লেন নেই, গল্পার ঘাট নেই। আছে শালা কেবল এই ধরা বাঁধা ভীত আর বাবলা বন। তা বাবুদের এই একটু আধটু...বুঝলি না!' 'একটু আধটু' জিনিসটা রসময় চোখ টিপে ঘুরিয়ে দিল।

ফটকে বলল, 'এদের দেশ কোথায় রে রসা? কোন কিষ্কিন্ধ্যা থেকে এল এরা? সেইত গালস' স্কুলের নন্দিতাদি, উমাদি। উমাদি না'কি দেশের মেয়ে। নন্দিতাদি? তারা কেউত এরকাট নয়। কী হট। কথাবার্তায়, চালে, চলনে।'

কেষ্ট বলল, 'চলে না? পেটে বিদ্যে আছে দু'অক্ষর। বি. এ, পাশ করেছে।'

'কেন এদের পেটে বিদ্যে নেই বুঝি? এরাও বাকি আই. এ, বি. এ. পাশ করেছে।'

রসময় আর স্থির থাকতে পারল না। টেবিলে ত্রিতালের একটা জোর তেহাই দিয়ে বলল, 'আই, এ, বি, এ, পাশ করেছে? ওরা যদি ক্লাশ এইটে পাশ করেছে, তখন তোরা আমার নাক কেটে দিস।'

রসদা আরো বলল, 'তোরা লেখাপড়া জানা লোক চিনিস না। ও শালা, আমি দেখেই চিনতে পারি। ফটকেটাই ঠিক বলেছে। নন্দিতাদি, নন্দিতাদি এরা সত্যি লেখাপড়া জানা মেয়ে। এই আর এক বাপ চা দে বাবা! শালা তোরা কি বুঝবি। সেদিন মিটিংয়ে নন্দিতাদি কি গাইল! তোর এ ভল্লাটে কেউ এমনি গায়? শালা তালে লয়ে একদম পাক্কা। একচুল এদিক ওদিক নেই। কী গলা! কি কাজে সেদিন সকালে ঐদিকে গেছলাম। বাবলা বনটার দিকে, দেখলাম নন্দিতাদি এমনি জানলায় দাঁড়িয়ে ভৈরবী আলাপ করছে। শালা-মার গাট্টা, সে কি আলাপ। আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল। আমি শালা দাঁড়িয়ে রইলাম হাঁ করে। তা এরা চল শিক্ষিতা। বুঝলি? আর গ্রাম সেবিকারা এসেছেন 'দুঃখীন প্রজাপতি' হয়ে। কেবল ফুলে ফুলে উড়ে বেড়াবেন, ফর ফর করে।' কথাটা সমর্থন করে ফটকে বলল, তা শুধু উড়েপুড়ানো নয় রসদা একটু পাপড়ির ওপর বসতেও শিখেছে। আমাদের বাড়ির ঐ যে ছেলেটা কাঁথিতে আছে, পল্টু, নামটা কি যেন? অমল? হাঁ অমল। বুঝলে না রসদা। এখন একটু আধটু মধু আস্বাদন করছে। পরে শালা কেবল কাঁটা হলে হবে কি তখন সেই কাঁটা বুকে বিঁধে গেছে!'

রসদা বলল, 'অমলার তা হলে ত তাগর আছে বলতে হবে। শালা যেমন জিনিষ তার তেমন ব্যবহারটা পাওয়া ভাল। তাদের কারুর ত একফোঁটা তাগর নেই। কেবল দেখে দেখে জিভের জল ফেলা। অমলা তবু ছেখে দেখল।' রসময় পুনরায় স্ত্রি তা সে র ঘোল বাক্যব্যয় মন দিল।

অমলদের বাড়িটা নীলাপুর থেকে মাইল তিনেক পশ্চিমে। গ্রামসেবিকাদের গ্রামে কোথাও ত থাকতে হবে। মলি সেনগুপ্তা অমলদের বাড়িতেই অতিথি হয়েছিল, কয়েকদিন। গ্রামের মধ্যে ওদেরই অবস্থা একটু ভাল। তা, মলি দিনকতকের মধ্যে মালীমা, মেশো-মশায়, অমলদা ইত্যাদি বানিয়ে ফেলে তার জন্যে আতিথ্যের পাকা ব্যবস্থা করে ফেলেছে। অমলদা বলতে হবে অজ্ঞান। সে কেবল অপেক্ষা করে অমলদা কবে কলেজ থেকে ফিরবে। বেড়াবে, ফেরার পথে একসঙ্গে। মলি সেনগুপ্তা কুমারী মেয়ে। এই কুমারিত্ব না থাকলে মফঃস্বলের স্কুলে চাকরী করতে আসা যায় না।

অমল কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। সবেমাত্র ছন্দ মিলিয়ে দু'একটা কবিতা লিখতে আরম্ভ করেছে। নতুন বাংলা কবিতার এই পাঠে অন্য মনস্কতাই মলি সেন-গুপ্তার আকর্ষণ। মলির সবচেয়ে বড়গুণ সে হার-মোনিয়াম বাজিয়ে সিনেমার আধুনিক গান গাইতে পারে। অমল এই প্রথম মফঃস্বল শহরে এসেছে। সেখানে দুটো সিনেমা চলে আছে। তার উপর কো-এডুকেশনের কলেজ। অমল শুনেছে সহপাঠিনীরা নাকি আধুনিক গান বলতে পাগল। এবং তাই নিয়ে অমলের বন্ধুরা রাতারাতি নিজি বাঁড়ের সস্তা হারমোনিয়াম কিনে তারস্বরে আধুনিক গানের অনুশীলন আরম্ভ করেছে।

অমল এসব দেখছিল। সে পাড়াগাঁ থেকে এসেছে। আধুনিকা তরুণীদের সম্পর্কে তার ভাল লাগার অন্ত নেই কিন্তু ভীতিও নেই, একথা বলা যায় না।

যে মহীয়সী অমলকে এই ভীতির অন্ধকার থেকে নির্ভয় আলোকে নিয়ে এল, সে মলি সেনগুপ্তা।

গ্রামসেবিকা মলি সেনগুপ্তার বয়স বছর পঁচিশ। অতি ছিপ ছিপে রোগা পাতলা গড়ন। চোখে মুখে পরিচ্ছন্ন দীপ্তি আছে। সুন্দর মুক্তোর মত দু'পাটি দাঁত নিয়ে মলি যখন ধীরে ধীরে কথা বলে, তখন তরুণ চিত্তে চমক লাগবেই। মলির তীক্ষ্ণ শিকারী চোখে এ চাঞ্চল্য আড়াল পড়ে না।

গ্রীষ্মের ছুটি অমলের। বাইরে প্রখর রৌদ্র। কিন্তু অমলের এই বাটির দোতলা ঘরটা অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা। মলিকে পরদিন বি. ডি. ও অফিসে রিপোর্ট দিতে হবে। কাজের রিপোর্ট। সপ্তাহে কি কি গ্রামসেবা করেছে সে। রিপোর্টের ভিত্তির অনুযায়ী মলির সপ্তাহের প্রতিদিন চব্বিশ ঘণ্টা খাটা উচিত। কিন্তু মলি সেনগুপ্তা অত বোকা নয়। তাকে সাতদিনে সাত ঘণ্টার বেশী খাটতে হয় না। আর সাত ঘণ্টার দু'গুণ ঘণ্টা রিপোর্ট লিখতেই।

অর্থাৎ একটা কাজ মলি সেনগুপ্তা করে থাকে সেটা রিপোর্ট লেখার কাজ। অফিসের তরুণ হেডক্লার্ক তাকে শিখিয়ে দিয়েছে, গভর্নমেন্ট চায়েই রিপোর্ট আর রিটার্ন। কাজেই রিপোর্টটা ঠিক রাখতে হবে। প্রমোশন বলুন, পার্লামেন্টারি বলুন সবই এই রিপোর্টের ওপর।'

কিন্তু মাঝে মাঝে ঝামেলা হয় ইংরেজীতে রিপোর্ট লেখায়। মলি বড় কষ্টে তৃতীয় বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেছিল। এই বিদ্যে নিয়ে ইংরেজীতে বানিয়ে বানিয়ে রিপোর্ট লেখা একটু কষ্টকর বইকি? আর ইংরেজী না লিখলে মান থাকে না। বি. ডি. ও সাহেব বাংলা ভাষাটা ঠিক পছন্দ করেন না। যত হোক্ গেজেটেড অফিসার ত?

মলি রিপোর্টের নকলটা নিয়ে অমলের ঘরে আস্তে আস্তে চলে এল। দুজনে মিলে লিখবে বলে। অমল কলেজে পড়ে, লেখাপড়াতেও ভাল।

অমল একমনে কবিতা লিখছিল। চোখে তার সহপাঠিনী আরতির ছবি। আরতি পাস। তার সঙ্গে আই, এ, পড়ে। রং তার উজ্জ্বল বর্ণের। মাথার অজস্র ঢেউ খেলানো কালো চুল। একটি পবিত্র কুমারী মূর্তি। কলেজের উঠোনে সে ধীরে ধীরে হাঁটত। অমল তার নিটোল পা'দুটি কতবার ফিরে ফিরে দেখেছে। আশ্চর্য, সেই আরতিই কমনরুম থেকে একদিন অমলকে ডেকে তার ক্লাসের নোটখাতা চেয়েছিল।

ক্লাসের সবচেয়ে বখাটে ছাত্রটি রসিকতা করল, 'হে, ওর মধ্যে একখানা চিঠি গুঁজিয়ে দে। তোর কপাল খুলে যেতে পারে। আরে ওই প্রফেসারেরা আরতির জন্য পাগল, চালে পানি, পাবনা। আর তুই গ্রামের ছোঁড়া। আরতির তোকে ভাল লেগে গেল?'

অমল চিঠি লেখেনি কেবল খাতাটা অমল অবাক হয়ে দেখছিল, আরতির দেওয়া দাগগুলো আরতির মত সুন্দর কিনা।

'ওকি অমলদা! কি লিখছ একমনে?' নিরুপম দোতলার ঘরে ঢুকেই মলি বলল।

'একটু লিখছি!'

'সেত দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু কি লিখছ তাই জিজ্ঞেস করছি।' অমল তাড়াতাড়ি খাতাটা লুকিয়ে ফেলল। নাঃ মলি সেনগুপ্তার কাছ থেকে কিছিনি লুকানো অত সহজ নয়। মলি ধরে ফেলল, 'দাও! দেখতে দাও!'

'আঃ ছাড়ো, ছাড়ো।'

'কেন ছাড়ব?' মলি খাতা টানতে গিয়ে নিজেকেই অমলের কোলের দিকে টেনে আনল। অমল মলির গোল খোপা থেকে কি একটা মধুর গন্ধ পাচ্ছিল। ওঁর চুলগুলো একটুও আরতির মত নয়। এই জন্যই এত কবরী বাঁধার কায়দা। না। পাদুটোও আরতির পায়ের মত সুন্দর নয়। মাটিতে না হাঁটলে বোধহয় পা সুন্দর হয় না, তবে চোখ দাঁত আরও সুন্দর তীক্ষ্ণ। কিন্তু আরতির চুল, পা, সুন্দর হলে তার লাভকি? সে কখনো সে চুল স্পর্শ করতে পারবে না। কিন্তু মলিকে স্পর্শ করতে পারে। মলি বুকে জ্বালা ধরিয়ে দেয়।

মলির জয় হোলো।

'সে রজনী গন্ধা আজো থেকে গেল চেনার বাহিরে।'

মলি পড়তে লাগল। বাঃ সুন্দর হয়েছে। মলি তার তার আশ্চর্য বুদ্ধি দিয়ে বুঝল, এ রজনীগন্ধাটি বাগানে ফোটা নয়, কলেজে ফোটা, নিশ্চয়ই সুন্দর। আঃ কী দুঃখ অমলদার চেনার বাইরে থেকে যাচ্ছে! মলি সেনগুপ্তা হেসে অমলের গায়ে লুটিয়ে পড়ল। 'অমলদা, প্রীতি বল না, তুমি প্রেমে পড়েছ?'

মলি সেনগুপ্তার মুখে এসব কথা একটুও বাধে না। অমল কিন্তু লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

'কই বললে না ত? প্রেমে পড়েছ কিনা? পড়েছ? না পড় পড় হয়েছ?'

'কী যে বল তুমি। ও এমনি একটি কবিতা।'

'আমাকে ফাঁকি দিতে চাচ্ছ! দেশদ্রোহী বলি! এই দুপুর বেলা নিরুপম ঘরে বসে রজনীগন্ধা চিন্তা করা হচ্ছে। আর কি না প্রেমে পড়নি। ও সব কাকে বোকাতে চাচ্ছ? আচ্ছা অমলদা তোমার রজনীগন্ধা আমার চেয়ে সুন্দরী?' মলি সেনগুপ্তা এমন করে হেসে তাকাল যে, অমল বরফের মত গলতে আরম্ভ করল। বলল, 'না, না কোথায় তুমি? আর কোথায় আরতি!'

'তবে আমাকে নিয়ে একটা কবিতা লেখনা কেন?'

'লিখব। কলেজ হোস্টেল থেকে পাঠিয়ে দেব।'

অমল কবিতা পাঠায়নি, পত্র পাঠিয়েছিল এবং সে পত্রটি ঠিক শারীরিক ও মানসিক কুশল-জিজ্ঞাসার মধ্যে আবদ্ধ ছিল, একথা হলপ করে বলা যায় না।

মলিও তার উত্তর দিয়েছিল।

এমনি করেই দিনে দিনে ঋতুতে ঋতুতে রজনীগন্ধার অর্ঘ পালটে গেল। দূরপাঠিনী আরতি, সে কেবল চেনা শোনার বাইরে, না পাওয়ার জগতে ছিল. মলি সেখানে নিজেকে ঠেলে দিল। প্রতিদিনের জগতে, স্পর্শে, ব্যবহারে।

বি ডি ও অফিসে কাজকর্ম এমনি করেই হয়। রিপোর্ট আর রিটার্ন। জীপটা কেবল মরা নদীটার পাড় আর উঁচু সোনামাটির পথটা দিয়ে পথিকের গায়ে ধুলো ছুঁড়ে দিয়ে দৌড়ায়। ওতেই বোঝা যায় দেশে কি ভাবে কাজ এগুচ্ছে। মন্ত্রীমশায় বলেছিলেন গ্রামের সর্বাঙ্গীন উন্নতি হবে এই ব্লক হলে। কৃষি উৎপাদন বাড়বে, পথঘাট হবে, খালখোঁড়া হবে, পুল হবে, গ্রামের চেহারা যাকি পাল্টে যাবে।

সেদিন পাশের গ্রামের চাষীরা বি ডি ও অফিসে এসেছিল। তারা বলল, চাষ এসে গেল, আমাদের বীজধান দিবার ও সার কেনার টাকার ব্যবস্থা করে দিন বাবু।

'তা, আপনারা একটা একটা কাজ করুন, দরখাস্ত দিয়ে যান।'

'সে আবার কি?'

'ওতে চাষের জন্য ঋণ,.....বীজধান সার, পাওয়া

'ধন পাওয়া যাবে ?'

'হুঁ, তবে চাষের জমি বন্ধক দিতে হবে।'

'তা হোক। জমিত আর সরকার নিয়ে নিচ্ছে না।' পাড়াগাঁয়ে এই চাষের সময়টা টাকা পাওয়া কঠিন। বেশী সুদে চাষীদের টাকা সংগ্রহ করতে হয়। চাষ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে ফসল বিক্রি করে ওরা দেনা শোধ করে ঘর গৃহস্থালীর জিনিসপত্র কেনে। ধানের দাম তখন খুব সস্তা থাকে। এইভাবে চাষের সময় আসার আগেই চাষীদের অবস্থা খারাপ হতে থাকে। বীজ ধান থাকে না, খাবার থাকে না। গ্রামের চাষীদের মাতব্বররা মিলে দালালকে ঘিরে এক একটা দরখাস্ত লেখাল। আর চাষীরা তাতে বামহাতের টিপসই দিয়ে দিল।

'তোমার কি হয়েছে গো ?' একটি গরীব লোককে অফিসে চুপ করে মনের দুঃখে বসে থাকতে দেখে, ওদের চাষীদের একজন জিজ্ঞেস করল।

'আমার ঘরটা পুড়ে গেছল, তাই রিলিফের জন্য আসছি। তা চার পাঁচমাস হয়ে গেল কেবল আমাকে ফিরাচ্ছে।'

'ঘর পুড়ে গেলে এখানে রিলিফ দেয় নাকি গো ?'

'হুঁ। দেয়বাবু তবে যার জমি নাই তাকে দেয়।'

'তুমার কত জমি আছে গো ?'

'বিঘাটাক আছে।'

'তোমাকে টাকা দেবে বলেছে ?'

'হুঁ। তবে নাকি উপর থেকে আসেনি।'

একজন দালাল বলে উঠল, আনতে হলে খরচ করতে হয়। বুঝলে বাবা খরচ করতে হয়।'

যার ঘর পুড়ে গেছল সে লোকটা হাঁ করে তাকিয়ে রইল। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারল না। দালালটা এবার চুপি চুপি পরিষ্কার করে বলল, সোজা কথা বাবা—যা টাকা পাবে, তার পাঁচভাগের একভাগ হেডক্লার্ককে দিতে হবে। একশত টাকা পাইলে কুড়ি টাকা। এত সোজা হিসাব।'

'তা হইলে কবে পাব বাবু। পাই না। বৌ ছেলেপুলে সব গাছতলায়।'

দালালটা জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, তোমার নাম কি ?

'গঙ্গাধর দলুই।'

'দাঁড়াও আসছি।'

গঙ্গাধর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবল।' 'তা হোক, আদৌ দিবে বলে ত মনে হয় না। তার চাইতে যা পাওয়া যায় তাই নই।'

দালালটা ফিরে এল। 'এস আমার সংগে।' গঙ্গাধর তার সংগে অফিসে চলল। একটা কাগজে বড়বাবু টিপসই করিয়ে নিলেন। দালালটা বলল, 'বাইরে চল।'

'এই নাও টাকা। একশ টাকা উপর থেকে মঞ্জুর হয়েছে। বড়বাবু কুড়ি টাকা নিয়েছে। আর আমি পাঁচ টাকা। এই রইল তোমার পঁচাত্তর টাকা।'

গঙ্গাধর নির্বোধের মত বোবা চোখ মেলে তাকিয়ে রইল। দালালটা ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছে। অফিসের দিকে একবার করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে গঙ্গাধর দলুই ঘরের দিকে চলল। সন্ধ্যা হয়ে আসছে যা হোক এই টাকা দিয়ে সে একটা কুঁড়ে ঘর তুলবে নইলে এ বৃষ্টিতে বৌ, ছেলেমেয়ে নিয়ে সে কোথায় থাকবে !

গঙ্গাধর কাপড়ের এককোণে টাকাগুলোকে বেঁধে ট্যাঁকে বারকয়েক জড়িয়ে মরা নদীটার ধার দিয়ে হন্ হন্ করে হেটে চলল।

দেখতে দেখতে চাষের দিন এসে গেল। কয়েক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় মাঠের জমি সরস হয়ে উঠেছে। এদেশের লোক একে 'বতর' বলে। এবার লাঙ্গল নামবে মাঠে। দেখতে দেখতে প্রকাণ্ড মাঠটা চষা হয়ে যাবে।

যারা বি ডি ও র অফিসে চাষের ঋণের টাকার জন্য দরখাস্ত দিয়ে এসেছিল, তাঁরা ঘন ঘন অফিসে যাতায়াত আরম্ভ করেছে। রেজেস্ট্রী অফিসে গিয়ে আগেই তারা জমি রেজিস্ট্রি করে দিয়ে এসেছিল। সেও এক ঝামেলার ব্যাপার। বাঁধা খুদের রায়ত্ব দেখানো। দাম রেজিস্টার থেকে কেরানী, পিয়ন পর্যন্ত রেট তৈরী আছে। ভুল থাকবে না এমন দলিল লেখা সম্ভব নয়। কোথায় বানান ভুল হয়েছে, 'র'এর নীচের শূন্যটা ঠিকভাবে পড়েনি, কোথায় কালিটা যেন ঘু-

রকম মনে হচ্ছে ইত্যাদির জন্য টাকা চাই। স্বয়ং ভূমি-রাজস্ব দপ্তরের মন্ত্রী দলিল লিখলেও তারা মধ্য থেকে ভুল বেরবে। এবং যদি মন্ত্রি বলে না জানা যায়, তবে তাঁকেও ঘুষ দিতে হবে।

তা, এ রাত গ্রামের মুখ্যু মানুষ। দালালের পেছনে মাথাপিছু চারটাকা করে চলে গেল। তার উপর যাই খরচ আছে, পরিশ্রম আছে।

কিন্তু কপাল খারাপ এই গ্রামবাসীদের। জমি রেজিস্ট্রি হল, ঘুষ দিতে হল, চাষের সময়ও এসে গেল কিন্তু যার জন্য এত করা সেই চাষের ঋণ, বীজ ধান আর তার দেখা নাই।

গ্রামের সুধীর বাকি জমি রেজিস্ট্রি করে এসেছিল। চাষের মরশুমে টাকাটা পেলে বড় উপকার হবে তার। শেষে একদিন গ্রামসেবকের কাছে গেল সে। গ্রাম সেবকটি বসে বসে তাস খেলছিল। সুধীর নমস্কার করে দাঁড়াল।

গ্রামসেবক ধমকে উঠল, কি চাই তোমার?

'বাবু আমার চাষের টাকা?'

'চাষের টাকার আমি কি জানি?'

—আপনি যে বললেন বীজধান পাওয়া যাবে, সার পাওয়া যাবে টাকা পাওয়া যাবে, তা আমরা জমি রেজেস্ট্রি করিয়ে দিয়ে এসেছি কবে।'

'তা, টাকা এলেই পাবে!'

'না, বলছি কি চাষের মরশুম এসে গেল। এখন না পেলে বড় কষ্ট হবে বাবু।'

'কষ্ট হলে আমি কি করব? এলেই পাবে।'

সুধীর ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল। মাঠে অনেকেরই লাঙ্গল নেমে গেছে। কয়েকদিনের বৃষ্টিতে মাঠের ভাল 'বতর' এসেছে। গ্রামের ভাল চাষী সুধীর। কিন্তু তার গরুটা কয়েকমাস আগে মারা গেছে। ঘরে খাবারের ধান নাই, বীজ ধান নেই, অথচ বীজ তলা ফেলানোর সময় এসে যাচ্ছে। যেটুকু জমি ছিল সরকারকে রেজেস্ট্রী করে দিয়ে এসেও সে সার, টাকা ধান কিছুই পেলনা। এ কেমন সরকার।

সুধীর সেই নতুন চষা ক্ষেতের দিকে একবার শূন্য দৃষ্টি মেলে তাকাল। এই বুড়ো বয়সে সে এখনও মুঠি ধরলে একটানা গভীর হয়ে লাঙ্গলের ফাল মাটি বিদীর্ণ করে চলবে। কিন্তু বি ডি ও অফিসের লাল ফিতে বাঁধা ফাইল। তার সব আশাকে গলা টিপে হত্যা করেছে। ওরা চাষের কি বুঝবে? চাষের বতর চলে গেলে চাষীর কি দুঃখ হয় সে ওরা জানে না। সুধীর আর দাঁড়াল না। বাবু জমিটা বন্ধক দিয়ে মহাজনের বাড়ির দিকে টাকা কর্জ করতে চলল।

॥ ১৪ ॥

বাড়ির চিঠিটা হাতে নিয়ে নমিতা চুপ করে লাইব্রেরী ঘরে বসেছিল। এই নীলাপুরে চলে আসার পর, নমিতার সংগে তার বাড়ির যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে আসছে। সে ভেবেছিল যে পরিবারের সংগে তার কোন আত্মিক যোগ নেই, যে পরিবেশ তাকে পীড়িত করে সেখানে সে আর ফিরে যাবে না। একটি ভাল স্কুলের চাকুরী, একটি কোয়াটার এই পেলেই তার চলে যাবে। অবসর নেবার পর কোথাও একটা ছোট বাড়ি করে সে জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে।

কিন্তু বাড়ি থেকে চিঠি আসায় তার মনে হল, সব সম্পর্ক ছিন্ন করা সম্ভব রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করা সহজ নয়।

নমিতার বাবা খুব অসুস্থ। পত্রে চিঠি লিখেছে, বাবার অবস্থা ভাল নয়।

পীরিয়ড শেষ হতে শিক্ষক শিক্ষিকারা লাইব্রেরী ঘরে ফিরে এসেছেন। একটু গল্প গুজবের পরে আবার সকলেই ক্লাসে চলে গেছেন।

কেবল উমা যায়নি।

নমিতাদিকে এমনি করে বসে থাকতে সে কখনো দেখেনি। তাই জিজ্ঞেস করল, 'চিঠি কোত্থেকে এল নমিতাদি?'

'বাড়ি থেকে।'

'সব ভাল ত?'

'না, বাবার খুব অসুখ লিখেছে?'

'কি রকম অসুখ?' উমা ব্যাগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'তা ঠিক লেখেনি, তবে বাবার লিভারের ট্রাবল ছিল। কি জানি, তাই থেকে কিছু হবে হয়ত।'

'বেশত, তবে ভাবছেন কি অত ?'

'ভাবছি, যাব কি না ? এখানেও অনেক কাজ।'

'থাক কাজ। বাবার অসুখ, অত কাজের ভাবনা পরে ভাববেন।' উমা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল ? 'এক্ষুণি বেরিয়ে পড়ুন রাত ন'টা নাগাদ হাওড়া পৌঁছে যাবেন। উঠুন।'

উমা, নমিতার জামা কাপড়, সব গুছিয়ে দিল। নমিতাকে ডেকে পাঠাল ক্লাশ থেকে।

নমিতা চুপ করে ঘরে বসেছিল।

উমা বলল, 'ব্যাগটা দেখি।'

ব্যাগে একশত টাকা রেখে দিয়ে উমা বলল, 'গিয়ে অবশ্যই চিঠি দেবেন।'

ওরা নিচে নেমে এল।

কালাচাঁদ বাবুকে নমিতা বলল, 'স্কুলটা এ ক'দিন দেখবেন। আমি একটা ছুটির দরখাস্ত রেখে যাচ্ছি। ফিরতে দেরি হতে পারে।'

কালাচাঁদ বাবু বললেন, 'অসুখ কি বাড়াবাড়ি ?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না।'

টীচার্স'রা সকলেই এসে গেছেন।

নমিতা উমাকে চুপি চুপি বলল, 'অসিত বাবুকে খবর দিতে পারলাম না।'

'আমি দিয়ে দেব।'

রিক্সাটা গেটের সম্মুখে এসে দাঁড়াল।

রাত্রি দশটা নাগাদ নমিতা আবার তার পুরাতন পরিবেশে ফিরে এসেছে। সেই মুলি বাঁশের বেড়া দেওয়া টিনের ঘর, পরমেশ্বরের উদ্বাস্তু কলোনীর পরিচিত পারিপার্শ্বিক। বৌদির ছেলে হয়েছে, দাদার চাকুরী এখনও হয়নি।

নমিতা বাবার বিছানায় গিয়ে বসল। কেন যেন তার মনে হল বাবার সেবা যত্ন ঠিক হয়নি।

অতি কষ্টে ফিরে তাকাল বৃদ্ধ পরমেশ্বর।

তারপর থেমে থেমে অসুখের কাহিনীটা বলে গেল।

নমিতা বলল, 'ভোর হোক বাবা, কলকাতা থেকে বড় ডাক্তার নিয়ে আসব।'

নমিতার মুখে 'বাবা' ডাক কতকাল বৃদ্ধ পরমেশ্বর শোনেনি। একটা অব্যক্ত বেদনায় সে নমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। নমিতা তার মেয়ে ? সে যে নিজে কে, এই অসুখের শেষের দিনগুলিতে সে ভাল করেই ভেবে দেখেছে। কিন্তু তার মেয়ে এমন সরস্বতীর মত রূপে, গুণে, কি করে হয় ? বংশের একটিও ছেলের ত কই কিছু হল না !

পহরতলীর রাত্রিটা বেড়ে উঠছে।

দাদা ফিরে এসে দু'একটা মামুলি কথা বলার পর শুয়ে পড়ল।

পাশের বাড়ির আলো নিভে গেছে। শুধু পরমেশ্বরের মাথার কাছে একটা হ্যারিকেন টিমটিম করে জ্বলছে।

পরমেশ্বরের মনে পড়ল, নমিতা তার মার মত হয়েছে। তেমনি লেখাপড়ায় ঝোঁক, এক গুঁয়েমিটা তেমনি আছে। নমিতার দাদু স্কুল মাষ্টার ছিলেন। লোকে ঋষির মত মান্য করত।

'হারে, তর মার কথা মনে পড়ে ?'

'পড়ে বাবা।'

পরমেশ্বর আবার চুপ করে রইল কিছুক্ষণ, তার-পর বলল, 'কতদূরে যাইক্যা আইছস, শুইতে যা মা।'

'না বাবা, আজ তোমার কাছে থাকব !'

'অসুখ হইলে তর মাও এই কথা কইত। কোথা দিয়া কি হইয়া গেল। সব চইল্যা গেল, সব বিষ, সব বিষ হইয়া গেল। দেশ ভাগ হইয়া সব সর্বনাশ হইয়া গেল।'

দেশ ভাগ বাঙালী জাতির মেরুদণ্ডটিকে ভেঙে দিয়েছে। অর্থনৈতিক জীবন একদিন গড়ে উঠবে কিন্তু নৈতিক জীবন ? সে আদৌ আবার গড়ে উঠবে কি না ? উঠলে কত শত বছর পরে ?

নমিতা আর ভাবতে পারে না। অথচ জনসাধারণ এই দেশ বিভাগ একদিন চেয়েছিল একমাত্র গান্ধীজী চাননি। কিন্তু জনমত ? জনমতকে নেতারা ঠেকিয়ে রাখতে পারল না, সে ক্ষমতা, ব্যক্তিত্ব তাদের নাই।

রাজনীতির সর্বনাশের খেলায় সাহস করতে পারে কজন।

পহর তলীর অন্ধকার রাত্রিটা গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে।

একবার বাবার মুখ ভাসিয়ে, ঔদন দিল নমিতা।

পরমেশ্বর কেমন যেন অসহায় শিশুর মত পড়ে আ.

* * *

হাসপাতাল থেকে নমিতা সন্ধ্যার একটু আগেই ফিরেছে। কলকাতা থেকে বড় ডাক্তার সে আনিয়েছিল। হাসপাতালে নিয়ে যাবার পরামর্শ তিনিই দিলেন। সেই পরমেশ্বর যারা গেলেন। দাদা, পরেশ, পাড়ার অনেক পরলেহ শ্মশানে নিয়ে গেছে।

আশ্চর্য! এই ঘরে, পাড়ার, কোথাও শোকের গভীর ছায়া নেই।

মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, স্নেহ, ভা শিথিল হয়ে গেছে এখন।

বৃদ্ধ পরমেশ্বরের মৃত্যু, তাই, একটি প্রত্যাশিত ঘটনা মাত্র। আর সংসারে যার প্রয়োজন ফুরিয়ে আসছে, তার মৃত্যুতে কান্না একটা অপব্যয়।

নমিতা কেবল ভাবছিল, জীবন কেমন করে পাথরের মত হয়ে গেল, এই ক' বছরের মধ্যে! অথবা এই হয়ত আধুনিক জীবন।

অথচ বাবার কথা ভাবতে গিয়ে নমিতার চোখে জল এল যে সংসারের তার সবচেয়ে আপন ছিল। কালরাত্রে মার কথা বাবার মনে হয়েছিল। নমিতার হাত নিয়ে নিজের কপালে রেখেছিল পরমেশ্বর—সমস্ত না বলা বেদনার অপরূপ'তা পরমেশ্বর এমনি করেই প্রকাশ করেছিল।

বাবার সংগে অনেক বিরোধ, অনেক বিবাদ—তবু দাওয়ার এই শূন্য কোণটার দিকে নমিতা তাকাতে পারছেনা কেন?

বিছানায় চুপ করে শুয়ে রইল নমিতা।

তার জীবন থেকে, এ জীবনের মত কেউ হারিয়ে গেল।

কখন সে ক্লান্ত হয়ে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। সাইকেলের ঘন্টির শব্দ পেয়ে উঠে বসল। 'টেলিগ্রাম। নমিতা দাশগুপ্তা।'

নমিতা দৌড়ে গেল। সই করে, ছিঁড়ে ফেলল খামটা।

টেলিগ্রাম করেছে অসিত।

এই মুহূর্তে সকল বেদনার উর্ধ্বে, কে যেন তাকে একটি গোপন আনন্দলোকের স্পর্শ দিয়ে গেল। অসিত চিঠি লিখবে, নমিতা তাই ভেবেছিল। এ কথাও ভেবেছিল, অসিত যেমন পাগল সে হিল্লেই না আবার এসে বসে। নিজে ডাক্তার, হয়ত এলে সুবিধা হবে ভেবে। না এসেই ভাল হয়েছে।

নমিতা বাইরে উঠোনে এসে সেই আতা গাছটার নিচে এসে দাঁড়াল।

উঠোনে এলেই নমিতার ভাল লাগে। সারা খোলা আকাশটা তার চোখে পড়ে। এখন নমিতা তাকিয়ে দেখল, সেই প্রসারিত বিরাট আকাশে কোথাও মৃত্যু-বেদনার ছায়া নেই।

এই মুহূর্তে নমিতার ভাল লাগল। অসিতের সংগে মনে মনে যে সম্পর্ক বেড়ে উঠেছিল, অসিতের কোন আচরণে তার কোন প্রকাশ নমিতা দেখেনি। এ যেন একটা চরভূমি, বাইরের স্রোতের অন্তরালে পড়ে উঠছে।

নমিতার বাবার মৃত্যুতে, এই প্রথম সেই চরটা জলের সীমারেখা ছেড়ে আলোর স্পর্শ পেল। অসিতের টেলি-গ্রামের ভাষাটা সেই আলোর স্পর্শ।

ভাল লাগল নমিতার, এই প্রকাশ টুকুর প্রয়োজন ছিল। বস্তুতঃ এই প্রকাশ টুকুই নমিতার জীবনের সুন্দরতমক্ষণ। সব ভালবাসাই কোন না কোন মুহূর্তে, নিজেকে প্রকাশ করে ফেলে। কিন্তু জীবন যত জটিল হবে, মন যত পরিপক্ক হবে, যত হিসেবী হবে, এই প্রেমের প্রকাশ তত অবরুদ্ধ হয়ে ওঠে কেন? নমিতা ভাবছে, সে নিজে এবং অসিত, বয়সের এমন এক স্তরে এসেছে যেখানে কেউ নিজের ভালোলাগার, ভালোবাসার মধুর দুর্বলতা-টুকু প্রকাশ করতে চায় না।

ওরা ভাবে, জীবনের পাত্র যেন কোথাও কখনও উপচে পড়ে না যায়।

আজ অসিতের টেলিগ্রাম, সেই অভিজাত সংযমের সৌরভ নিয়ে এসেছে। পরমতলীর এই ছোট, টিনের আর খুলি বাঁশের বেড়া দেওয়া ঘর, এই উঠোন, সব যেন তার কাছে সুন্দর হয়ে উঠেছে আজ।

এখন নমিতা ভুলে গেছে। এই অনুপস্থিতিটুকু সবচেয়ে ভাল লেগেছে অপর্ণার। অপর্ণা পাশের কোয়ার্টারে বিপত্নীক গৌরীশংকর বাবুর জন্য একটু

বিশেষ ঘর নেবার চেষ্টা করে আসছে। নমিতা আসায় তাতে বাধা পড়ছে।

নমিতার বাবার মৃত্যু সংবাদটা অপর্ণাই গৌরীশংকর বাবুকে দিয়েছিল। রবিবার সন্ধ্যাবেলা গৌরীবাবু ঘরে বসে বসে বই পড়ছিলেন। অপর্ণা ঘরে এল। বই থেকে মুখ তুলে গৌরীবাবু বললে, 'অসময়ে এত করুণা?'

অপর্ণা একবার দেখল, কেউ কোথাও নেই।

অন্ধকার হয়ে আসছে ঘরের মধ্যে। অপর্ণা বইটা কেড়ে নিয়ে বলল, 'বলেছিনা সন্ধ্যাবেলা ঘরের মধ্যে বসে বসে পড়বে না?'

'তবে কি বাইরে বসে বসে পড়ব?'

'কথার ঢং দেখনা, অঙ্কের মাস্টারের অত রস ভাল না?'

'রস কি মিস্টেদের এক চেটিয়া নাকি?'

'অপর্ণা আরো কাছে সরে এসে, বলল, 'ডাক্তার, টেলিগ্রাম করেছে নমিতাদিকে।'

'সুখবর।'

'তুমিত সুখবর বলেই খালাস। আমি বলছি, কেমন দুজনে জড়িয়ে পড়ছে দেখ।'

'আমরা যে জড়িয়ে আছি সেইটেই বা কে দেখছে বল?'

'না, কেউ দেখছে না! এইত তোমার কাছে এলাম। সব সময় আসতে পারি না, জান, নমিতাদিকে ভয় করে।'

'বুঝতে পারি, সেই জন্য আমি অন্য স্কুলে চলে যাব।'

'আর আমি? আমি বোধহয় ঐখানে ইতিহাস ভূগোল পড়াবার জন্য পড়ে থাকব।'

গৌরীশংকর, অপর্ণাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'না তখন তোমার নতুন ছাত্র জুটবে।.

'হেঁয়ালি ছেড়ে বল, অত ঘোরালো এত ভাল লাগছেনা শুনতে।'

গৌরীশংকর বাবু বললেন, সোজা কথা, গেলে দুজনেই যাব।

অপর্ণা সেই অন্ধকারে আস্তে আস্তে বলল, 'কি করে যাবে?'

এই উত্তর শোনবার জন্য অপর্ণা কতদিন থেকে ব্যাকুল হয়ে আছে।

এক সময় সে বলল, 'আশ্চর্য কতদিন হয়ে গেল। জীবন যদি এমনি করে চলে যায়, তবে বাকি রইল কি? তুমি কেন ভয় পাও বুঝি না।'

গৌরীশংকর বাবু, অপর্ণাকে নিবিড় করে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, 'অংক পড়াই। পড়াতে পড়াতে হিসেবী হয়ে উঠছি বড়। তোমার, আমার স্কুলের দুর্নাম?'

'দুর্নাম?' অপর্ণা ধাক্কা হয়ে বলল. বলল, দুর্নাম? ভালবাসার মধ্যে দুর্নাম কোথাও নেই।

'তা নয়, তুমি আমাকে ভালবাস না, ভাল বেসে পাগল হতে পার না। অমিত যেদিন বুঝবে নমিতাকে তার চাই, জানবে, সেদিন সে পৃথিবী এলট পালট করে দেবে। এ-ই যৌবন।'

'আমি যৌবন পার হতে চলেছি অপর্ণা—' গৌরীশংকর বাবুর গলাটা কান্নার মত শোনাল। অপর্ণা সংযত করল নিজেকে। একটি অসতর্ক মুহূর্তে বিপর্যস্ত গৌরীশংকরকে সে আঘাত দিয়েছে। বলল, 'তবু তোমাকে চাই, এ চাওয়া আজকের নয়। তোমার কান্না, উপবাসী যৌবনের কান্না এ ছোঁয়া আমাকেও লাগছে। চল, এবার আমরা চলে যাই। সময় আর নাই।' ঘরে তখন রাত্রি হয়ে গেছে। সেই রাত্রির অন্ধকারে দুটি মানুষ মুখোমুখি বসে রইল।

একটু পরে কারা যেন খুব আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে।

নন্দিতা চুপি চুপি বলল, 'পার্টনার কে যেন কথা বলছিল রে ঐ ঘরে?'

'তোর কি? আস্তে আস্তে চল, শব্দ করিস না।'

'কেন রে?'

'ওদের অসুবিধা হবে।'

[ক্রমশঃ]

'চতুরঙ্গ' মুক্তিভাবনা

শক্তিপ্রসাদ পাণ্ডা

'চতুরঙ্গ' রবীন্দ্রনাথের একটি বহুপঠিত বহুআলোচিত উপন্যাস। উপন্যাসের নামকরণের মধ্যেই এর চারটি অংশের পরিচয় পাওয়া যায়। এই চারটি অংশের চারটি অধ্যায়ে বর্ণিত চারটি জীবনের ব্যক্তিগত কাহিনী, স্বতন্ত্র সমস্যা ও অভিনব জীবন-দর্শন একই-অখণ্ডতার সূত্রে গ্রথিত। এ যেন চারটি ভিন্ন বস্তুর অখণ্ড ঐক্যতান। যে কোনটির অভাবে তালকাটার সম্ভাবনা, সুরে ছেদ পড়বার সংশয়। চারটি জীবনই অবিরাম গতিতে ছুটে চলেছে মুক্তি-তীর্থের দিকে। চারজনের পথও ভিন্ন, চলার পথে চারজন পথিকের ঠোকাঠুকিরও বিরাম নেই, তবুও চলা থামেনি, গন্তব্য এক কিন্তু গতির রীতি স্বতন্ত্র; সকলে মিলে এক অখণ্ড বৃত্ত, কিন্তু তার মধ্যে প্রত্যেকেরই স্থান স্বতন্ত্র। 'চতুরঙ্গের' মধ্যে দিয়ে যে মানুষের মিছিল চলেছে, তার মধ্যে বিশেষ স্থান করে নিয়েছে চারজন—জ্যাঠামশাই, শচীশ, দামিনী ও শ্রীবিলাস। যে মুক্তি তীর্থের দিকে এই চারজন ছুটে চলেছে তার আবেদন ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের কাছে বিভিন্ন, কিন্তু চলার আনন্দটি সকলের ক্ষেত্রে সমান। এখন আলোচ্য, কেমন ভাবে তারা এগিয়ে চলেছে মুক্তির দিকে, এ মুক্তির স্বরূপ কি, এই মুক্তিযাত্রায় কার কি ভূমিকা কেমন।

প্রথম অঙ্ক : মুক্তপুরুষ জগমোহন।

'চতুরঙ্গের' প্রথম অংশটি শচীশের জ্যাঠামশাই জগমোহনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। জগমোহনের রূপে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে এইভাবে—

"তিনি তখনকার কালের নামজাদা নাস্তিক। তিনি ঈশ্বরে অবিশ্বাস করিতেন বলিলে কম বলা হয়, তিনি না ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন।" তিনি কেবল এই অবিশ্বাসটুকু নিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি, বিশ্বাসীকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করে তাঁর নাস্তিকতাবাদের জয় গৌরব প্রচার করার দায়িত্ব সম্বন্ধেও তিনি সচেতন ছিলেন। কারো কাছে তাঁর বিন্দুমাত্র প্রত্যাশা ছিল না। দেবতার প্রতি তাঁর অবিশ্বাসও ঐ একই কারণপ্রসূত। "লৌকিক অলৌকিক কোনো শক্তির কাছে তিনি হাত জোড় করিতে নারাজ।" জগমোহনের এই অভিনব নাস্তিকতার মূলে কোন রক্ষণশীলতা বা উগ্র একগুঁয়ে মনোভাব ছিল না, ছিল নিজের আত্মবিশ্বাস ও জীবন-নীতির উপরে সুদৃঢ় আস্থা। ঈশ্বরের কাছে তাঁর যেমন প্রত্যাশা ছিল না, তেমনি কোনো মানুষের কাছেও কোনকিছুর জন্য বিন্দুমাত্রও প্রত্যাশা করতে তাঁকে দেখা যায়নি। বরং যেটুকু তিনি দিয়েছেন, নিঃস্বার্থভাবেই দিয়েছেন। অপরে প্রত্যাশা করেছে বলে তিনি দিতে চাননি, অপরের

প্রয়োজন হয়েছে বলে তিনি শচীশকে সাহায্য হিসেবে বাড়িতে নিয়েছেন। বিনিময়ে শুষ্ক মনোযোগ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাও তাঁর মধ্যে ছিল না।

তাইতো শচীশের শিক্ষার ভার নেবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাকে নিজের মত করে গড়তে চাইলেন। এ ধরনের ইচ্ছা জগমোহনের মত মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। সলিতার কাছে আগুন আনলে প্রদীপ জ্বলে উঠবেই। এতো কার্যকারণের স্বাভাবিক ফল। সলিতার ইচ্ছা বা আগুনের কর্তব্য সেখানে কাজ করে না, অবশ্যম্ভাবী কার্যকারণে প্রদীপের জ্বলে ওঠার মধ্যেও কোনো দ্বিধা থাকে না। ঠিক কথা জগমোহন শচীশকে হাতের কাছে পাওয়া মাত্র তাঁর মধ্যে এক অভিনব শিল্প-চেতনা জেগে উঠল। কাঁচা মাটিতে ছাঁচের রূপটি খোলে ভাল। নিপুণ শিল্পীর মতো জগমোহন শচীশের মধ্যে তাঁর অন্তরের চিন্তাধারাকে রূপ দিতে বসে গেলেন। তাঁর 'শামুকের খোলার মত' 'ইংরেজি বই দিয়া ঘেরা' চিন্তার জগতে এক নতুন বিলাসের লীলা তাঁকে আনন্দিত করে তুললো। নিজের মনের তন্ত্র ও তর্কের দুর্জ্ঞেয় জগৎ থেকে সত্যকে মুক্তি দিতে চাইলেন তিনি শচীশের মাধ্যমে। তাই শচীশ তার কাছে সমবয়সীর মতো। "গুরুজনকে ভক্তি করাটা তাঁর মতে কুটা সংস্কার।" কতকগুলো নীরস কর্তব্যে মোড়া ত্যাগিয়ে ঘেরা বিধিনিষেধের মধ্যে তিনি তথাকথিত গুরুলঘুর ভেদাভেদকে বড় করে দেখতে চাইলেন না। তাই অন্তরের সহজ আনন্দের সরল ক্ষেত্রে শিশু শচীশকে প্রবেশাধিকার দিতে তিনি দ্বিধা বোধ করেননি, বরং সঙ্কোচের খোলস ভেঙে মুক্তি দিতে চেয়েছেন তার অন্তরের সহজ সত্যটিকে। "বোলতার বাসা ভাঙিয়া দিলেই বোলতা তাড়ানো যায়। .....লজ্জা করাটা ভাঙিয়া দিলেই লজ্জার কারণটিকে খেদানো হয়; শচীশের মন হইতে আমি লজ্জার বাসা ভাঙিয়া দিতেছি।" —এই বাসা-ভাঙা মুক্তির উল্লাসেই জগমোহনের জীবন আবর্তিত। সহজ সত্যের সুদৃঢ় প্রকাশে, বলিষ্ঠ আত্মবিশ্বাসের সার্থক রূপায়নে ও অন্তর্নিহিত অনমনীয় দৃঢ়তার প্রকাশে তিনি কোনদিন দ্বিধাগ্রস্ত মন, এই দ্বিধাহীন সত্যের প্রকাশেই তাঁর মুক্তির পথ। জীবনের স্বল্প দৃষ্টিতে চেনা সহজ সরল সত্যবিশ্বাসের সার্থক মর্যাদা রক্ষাতেই তাঁর অভিলাষিত মুক্তি। 'প্রচুরতর লোকের প্রভূততম সুখ সাধনই' তাঁর নাস্তিকতার অর্থ। নির্মল নিষ্কলঙ্কতাই তাঁর সেই নাস্তিকতাধর্মের গৌরব।

চামারদের নিয়ে ভোজের আয়োজনে জগমোহনের অভিনব জীবনদর্শনের সার্থক স্বরূপটি প্রতিফলিত।

'আমার ঠাকুরের ভোগ আমি একদিন দিব, ইহাতে বাধা দিও না।'

'তোমার ঠাকুর?'

'হাঁ আমার ঠাকুর।'

'তুমি কি ব্রাহ্ম হইয়াছ?'

'ব্রাহ্মরা নিরাকার মানে, তাহাকে চোখে দেখা যায় না। তোমরা সাকারকে মানো, তাহাকে কানে শোনা যায় না। আমরা সত্যকে মানি, তাহাকে চোখে দেখা যায়, কানে শোনা যায়—তাহাকে বিশ্বাস না করিয়া থাকা যায় না।'

'তোমার এই চামার মুসলমান দেবতা?'

'হাঁ আমার এই চামার মুসলমান দেবতা। তাহাদের আশ্চর্য এই এক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে, তাহাদের সামনে ভোগের সামগ্রী দিলে তাহারা অনায়াসে সেটা হাতে করিয়া তুলিয়া খাইয়া ফেলে। তোমার কোন দেবতা তাহা পারে না। আমি সেই আশ্চর্য রহস্য দেখিতে ভালোবাসি, তাই আমার ঠাকুরকে আমার ঘরে ডাকিয়াছি।'

—হরিমোহন ও জগমোহনের এই কথোপকথনে কেবল জগমোহনের যুক্তিজাল-বয়নের কৌশল স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি, এর মধ্যে তাঁর জীবনের সহজ সরল মুক্ত দৃষ্টিটিই প্রকাশ পেয়েছে। কোন অন্ধ আচারের মোহ, গতানুগতিক রক্ষণশীলতার কোন বিধিনিষেধ বা সামাজিক কোন নির্যাতনের ভয় তাঁর মনুষ্যত্বের পূজায় বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। মানুষের মনুষ্যত্বের পূজায় তিনি যে সত্যজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন, তা শুষ্ক আচারের কৃত্রিম বন্ধনের মায়াজাল থেকে তাঁর মানসমুক্তির পথটিকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

জগমোহনের বিরুদ্ধে হরিমোহনের মামলায় বিধর্মী আচারভ্রষ্ট নামে কথিত জগমোহন বিন্দুমাত্রও চিন্তিত

তেমনি বরং আরাধনাতে স্পষ্ট করে বলেছেন—"তিনি জাতি মানেন না, হিন্দু দেবদেবীর প্রতি তাঁর হিন্দুমতেও আস্থা নেই। আপিলের উপসংহারে জগমোহনের সেই অমরণীয় মনোভাবটিই প্রকাশ পেয়েছে—"আমি আপিল করিব না, যে ঠাকুরকে আমি মানি না, তাহাকে আমি ফাঁকি দিতে পারিব না।" জগমোহনের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ সত্ত্বেও একটি কথা আমরা না মেনে পারি না যে তিনি তথাকথিত ধর্মচারীদের তুলনায় অনেক বেশি ধার্মিক। যে ধর্ম ঠুনকো নয়, যে ধর্ম সহজ সত্যের পথ ধরে চলে, যে ধর্মে ফাঁকি নেই, যে ধর্ম মানুষকে ঠকায় না, তিনি সেই ধর্মেরই পূজারী। আর এই ধর্মের পূজার মন্ত্র—মুক্তির মন্ত্র। এ মুক্তি সহজ প্রাণের উদার মুক্তি, প্রাণের সরল সত্যের নিস্বরূপ প্রকাশ।

মনিবালার প্রসঙ্গে জগমোহনের মনস্তাপের চরম প্রকাশ ঘটেছে, এক অবহেলিতা নারীকে যোগ্য মর্যাদা দিতে সর্বনাশের অতল কূপ থেকে তাকে রক্ষা করবার আন্তরিক প্রচেষ্টার সেই বহু মনস্তাপের উদ্বোধন ও পরিশুদ্ধি প্রকাশ ঘটেছে। মনিবালার নারীত্ব রক্ষায় এমন প্রবল নিষ্ঠা জগমোহন ছাড়া বোধ হয় আর কোন চরিত্রের পক্ষে দেখানো সম্ভব হত কি না সন্দেহ। মনিবালার প্রতি তাঁর প্রথম আপ্যায়ন ও মাতৃসম্বোধনের মধ্য যে সহজ জড়তা-মুক্ত কুণ্ঠিতকুলের আত্মীয়তার পরিচয় পাই তাকে মুক্ত মনের স্নিগ্ধ প্রকাশ ছাড়া আর কি বলতে পারা যায়? একটু একটু করে মনিবালার সমস্ত সংকোচ দূর করে তার মধ্যে আত্মবিশ্বাসের পূর্ণ সুপ্তায়ন প্রচেষ্টায় জগমোহনের অসামান্য নিষ্ঠা ও ধৈর্য দেখি। এই অসহায়া নারীটিকে কেন্দ্র করে তাঁর অন্তরে কল্পধারার মতো যে অনাবিল স্নেহপ্রীতিটি প্রবাহিত হচ্ছিল, আশীর্বাদের ইচ্ছা প্রকাশে তার আভাস পাই। মনে হয় মুক্তিতীর্থে পৌঁছবার আর দেরি নেই। কর্তব্যের কঠোর পথ ও সংসারের মরুকান্তার পার হয়ে তিনি এসে পড়েছেন মুক্তির সিংহদ্বারে। তাঁর পথের সাথের জুটিয়েছে স্নেহের ধন। তাকে সাতখানি দিয়ে ডাকছে অভিনব এক মুক্তির জগৎ; যা সফলতার সবাসা, আনন্দে সার্থক।

প্লেগের সেবা করতে গিয়ে জগমোহনের মৃত্যু-দৃশ্যটিতে দেখতে পাই, মৃত্যুর ছায়া তাঁর মনে এতটুকুও মালিন্য এনে দিতে পারেনি। "সারাদিন যে ধর্ম মানিয়াছি, আজ তার শেষ হরিদ্দি চুকাইয়া লইলাম—কোনো দ্বেষ রহিল না।"—শচীশের প্রতি এই তাঁর শেষ উক্তি। সত্যিই জগমোহন কোনো দ্বেষ রেখে যাননি। দেনাপাওনার হিসাব তিনি সুষ্ঠুভাবে চুকিয়ে দিয়ে গেলেন। তাঁর মৃত্যুতে তাই রইলো না কোনো খেদ, কোনো বাদ। কর্মের ধর্মে, সহজ জীবনদর্শনে, মনুষ্যত্বের সার্থক উদ্বোধনে জগমোহনের জড়তাহীন-দৃষ্টিই তাঁকে দিয়েছে সফলতার আস্বাদ। এই সাফল্যেই জগমোহনের মুক্তি। মানুষের জীবনের এই সহজ পথটিই মুক্তির পথ। আর এই পথেরই পথিক ছিলেন মুক্তপুরুষ জগমোহন।

দ্বিতীয় অঙ্ক : মুক্তিপাগল শচীশ

হেডমাস্টারের মৃত্যুর পর শচীশের কথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে—"এক ফুঁয়ে প্রদীপ নিবিলে তার আলো যেমন সব চঠাৎ চলিয়া যায়, জগমোহনের মৃত্যুর পর শচীশ তেমনি করিয়া কোথায় যে গেল, জানিতেই পারিলাম না। শচীশের এই নিরুদ্দেশ-যাত্রার মধ্যে এক ভয়াবহ শূন্যতাবোধের পরিচয় আছে। সেই অসহ্য শূন্যতার হাত থেকে নিষ্কৃতির আশায় শূন্যতার 'না' থেকে সত্যতার 'হাঁ' এর মধ্যে সে পাগলের মত ছুটে চলেছে। "সেই অসহ্য যন্ত্রণার দায়ে শচীশ কেবলই বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিল যে, শূন্য এতো শূন্য কখনোই হইতে পারে না; সত্য নাই এমন ভয়ংকর ফাঁকা কোথাও নাই।"—এই সত্যানুসন্ধানের প্রবলতাই শচীশকে জীবনের এক ক্ষেত্র থেকে অপর ক্ষেত্রে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। তার কার্যকলাপে, জীবনদর্শনে ও চিন্তাধারায় নতুনতর মুক্তির রাজ্যে ছুটে চলার মনোভাবটি বিশেষভাবে কাজ করেছে। কর্মবাদ থেকে ভক্তিবাদে, রসের রাজ্য থেকে আত্মশীল জ্ঞানের সমুদ্রে সত্যানুসন্ধানের দুর্নিবার উদ্দীপনাই এগিয়ে চলতে সাহায্য করেছে।

তাই দেখি, জগমোহনের হাতে গড়া নাস্তিকতাবাদের পূজারী কর্মবাদী শচীশ "লীলানন্দ স্বামীর সঙ্গে

কীর্তনে মাতিয়া করতাল বাজাইয়া পাড়া অস্থির করিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে," কর্মের জগৎ থেকে ভক্তির জগতে তার মনের মুক্তি ঘটেছে। এই অভিনব মুক্তির ব্যাখ্যা শচীশের নিজের মুখে শুনতে পাওয়া যায়—"বিশ্রী, জ্যেঠামশায় যখন বাঁচিয়া ছিলেন তখন তিনি আমাকে মুক্তি দিয়াছিলেন. ছোটো ছেলে যেমন মুক্তি পায় খেলার আঙিনায়; জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পরে তিনি আমাকে মুক্তি দিয়াছেন রসের সমুদ্রে, ছোট ছেলে যেমন মুক্তি পায় মায়ের কোলে, দিনের বেলাকার সে মুক্তি তো ভোগ করিয়াছি, এখন রাতের বেলাকার এ মুক্তিই বা ছাড়ি কেন?" —শচীশের কাছে মুক্তির দুটি রূপ—দিনের মুক্তি ও রাতের মুক্তি। দিনের মুক্তি কাজের, আর রাতের মুক্তি রসের। দিনের চঞ্চল আকুতি আশ্রয় পায় রাতের গভীর নির্বাসনে, তাই শচীশের অসহিষ্ণু মুক্তিপিপাসা রসের সন্ধানে ব্যাকুল।

শ্রীবিলাস যখন অনুযোগ করে—"যাই বলো, এই তামাক সাজানো পা টেপানো এ সমস্ত উপসর্গ জ্যেঠামশায়ের ছিল না—মুক্তির এ চেহারা নয়"—তখন শচীশ প্রতিবাদ করে—"সে যে ছিল তাহার উপরকার মুক্তি, তখন কাজের ক্ষেত্রে জ্যেঠামশায় আমার হাত পাকে চলে করে দিয়েছিলেন. আর এ যে রসের সমুদ্র, এখানে নৌকার বাঁধনই যে মুক্তির রাস্তা।" রসের সমুদ্রে নির্ভরতার নৌকাটি ধরে নিয়ন্ত্রণের পারাপারের এই সহজ পথটিকেই শচীশ বেছে নিয়েছে। এই পথ ছেড়ে অন্য কোন আধারের পথ ধরতে সে বর্তমানে নারাজ। এই নবমুক্তির রসে সে মাতোয়ারা; এই পথের প্রেমে সে পাগল। তাই তার আলিপনের মধ্যে শ্রীবিলাসের আলাদা কোন অস্তিত্ব থাকে না, শ্রীবিলাস তার কাছে হয়ে ওঠে একটা 'সর্বভূতে' একটা 'আইডিয়া'।

কিন্তু মুক্তির পথ এতটা নিরুপদ্রব নয়, রসের সমুদ্রে নৌকাটি ছেড়ে দিলেই তা সহজে চলে না। প্রতিকূল বাতাসের ভয় থাকে, সন্দেহ থাকে বিরুদ্ধ স্রোতের। অজানা সমুদ্রে ডুবো পাহাড়ের ধাক্কাটিকেও অস্বীকার করা চলে না। রসের সমুদ্রে ভাসমান শচীশের মুক্তির নৌকাটি তাই বোধ হয় প্রথম বাধা পেলো দামিনীর কাছে। "একদিন শীতের দুপুরে গুরু যখন বিশ্রাম করিতেছেন এবং ভক্তেরা ক্লান্ত, শচীশ কী একটা কারণে অসময়ে তার শোবার ঘরে ঢুকতে গিয়া চৌকাঠের কাছে চমকিয়া দাঁড়াইল। দেখিল দামিনী তার চুল এলাইয়া দিয়া মাটিতে উপুড় হইয়া পড়িয়া মেজের উপর মাথা ঠুকিতেছে এবং বলিতেছে, 'পাপের ওগো পাপের, দয়া করো, দয়া করো, দয়া করো, আমাকে মারিয়া ফেলো।" ভয়ে শচীশের সর্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল; সে ছুটিয়া ফিরিয়া গেল।" ধাক্কা লাগলে নৌকা কাঁপবেই। পিছিয়ে পড়াও অসম্ভব নয়। দামিনীরূপ ডুবো পাহাড়ের ধাক্কায় শচীশের মুক্তির নৌকাটিতে প্রথম চিড় ধরল। দ্বিতীয় ধাক্কাটি যে আরো গুরুতর হয়ে দেখা দিয়েছিল, তার পরিচয় পাই গুহা বর্ণনার মধ্যে—

"ভয়ে ঘৃণায় আমার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। আমি দুই পা দিয়া তাহাকে ঠেলিতে লাগিলাম। মনে হইল সে আমার পায়ের উপর মুখ রাখিয়াছে—ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে—সে যে কী রকম মুখ জানি না। আমি পা ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া দাপি মারিলাম।

অবশেষে আমার জোরটা ভাঙিয়া গেল। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, তার গায়ে রোঁয়া নাই; কিন্তু হঠাৎ অনুভব করিলাম, আমার পায়ের উপর এক রাশি কেশর আসিয়া পড়িয়াছে। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম।

অন্ধকারে কে চলিয়া গেল! একটা কী যেন শব্দ শুনিলাম। সে কি চাপা কান্না?"—শচীশের সুখের রসের সমুদ্রকে দামিনীর চোখের জল লবণাক্ত করে তুললো। মুক্তি পাগল শচীশের মনে দামিনীর কান্নার শব্দ এনে দিল ক্ষণিক বিহ্বলতার ছায়া। এই বিহ্বলতা শচীশকে বিব্রত করল বটে, বিরত করতে পারলো না। ব্যাঘাতের বাধা তার হাত থেকে মুক্তি নৌকার হালটি ছাড়িয়ে নিতে পারলো না। সে জ্যাঠামশায়ের হাতে গড়া মাঝি, রসের সমুদ্রে ঢেউয়ের ধাক্কায় ভয় পেয়ে পিছিয়ে আসার পাত্র নয়। তাই অসহিষ্ণু দামিনী যখন প্রশ্ন করে—"তোমরা আমাকে শাস্তি দিবে? দিনরাত্রি মনের মধ্যে ঢেউ তুলিয়া তুলিয়া পাগল করিয়া আছ, তোমাদের শাস্তি কোথায়?" তখন পাকা মাঝিটির মত শচীশ সান্ত্বনা দিতে এগিয়ে আসে—"উপরে ঢেউ দেখিতেছ বটে কিন্তু

ধৈর্য ধরিয়া ভিতরে তলাইতে পারিলে দেখিবে, লবণ নাই।" উপরের ঢেউকে অগ্রাহ্য করতে পেরেছে বলেই শচীন দেখতে পেয়েছে গভীর শান্ত মুক্তির রূপকে। তার বহু আকাঙ্ক্ষিত মুক্তিতীর্থের দিকে সে তার মনটিকে করে রাখতে পেরেছে একাগ্রমুখী। তাই শচীন সার্থক নায়ক। এই অবিচল দৃঢ়তার পেছনে রয়েছে অধ্যাপকের শেখানো বিদ্যা। শত যামিনীর সহস্র আকুতিতে যে মুক্তি পাগল শচীনকে সহজে টলাতে পারবে না—এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। শ্রীবিলাসের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমরাও বলতে পারি—...."চির বসন্তবাতীরের চিরন্তন সমীরের বাণি যারা শুনিতেছে তারা যে আশেপাশের অনিত্য ব্যাপার চোখে কিছু দেখে বা কানে কিছু শোনে হঠাৎ তাহা মনে হয় না।"

কিন্তু মানি যতই শক্ত হোক না কেন, প্রকৃতির তাণ্ডবকে উপেক্ষা করতে পারলেও অস্বীকার করতে পারে না। যামিনীর আত্ম-উপচারকে গুহার মধ্যে প্রত্যাখ্যান করে এলেও তাই শচীনের নিষ্কৃতি নেই। যামিনীর সংসর্গ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সে যামিনীকে তাড়াতে চেয়েছে। কিন্তু যামিনীর স্পষ্ট অনিচ্ছা তার এই সংকল্পকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। যামিনী বলেছে—"আমাকে তোমাদের ভালো লাগিতেছে না বলিয়া তোমাদের ইচ্ছায় আমি নড়িব না" যামিনীকে এড়াতে না পেরে শচীনের মনে জেগে উঠেছে এক কঠিন দ্বন্দ্ব, সহজ পথে যে মুক্তিকে সে পাওয়ার ইচ্ছা করেছিল তা যেন ক্রমশঃ বক্র পথ অবলম্বন করে তাকে বিব্রত করে তুলেছে। তার এই বিব্রত মনোভাবটি শ্রীবিলাসের চোখে ধরা পড়েছে—"জলে তলে অর্চনায় আলোচনায় শচীনের কামাই নাই, কিন্তু চোখ দেখিলে বোঝা যায় ভিতরে ভিতরে তার পা টলিতেছে।"

নবীনের মৃত্যু শচীনের মনের উপর আর এক প্রবল আঘাত। এই উপর্যুপরি তিনটি আঘাতের ফলে মুক্তির এক নতুন স্বরূপ চোখে পড়ল শচীনের। জীবনকে অস্বীকার করে রসের জগতে সহজ মুক্তির পথ নেই, জীবনকে বাদ দিয়ে যে পথ, অন্তরকে উপেক্ষা করে যে আকুতি, কৃত্রিম, অসহনীয়, তাই যামিনী যখন আবেদন জানায়—"তুমিই আমার গুরু হও। আমি আর কাহাকেও মানিব না। তুমি আমাকে এমন কিছু মন্ত্র দাও যা এ-সমস্তের চেয়ে অনেক উপরের জিনিস—যাহাতে আমি বাঁচিয়া যাইতে পারি. আমার দেবতাকেও তুমি আমার সঙ্গে মজাইয়ো না।" শচীন তখন বলতে বাধ্য হয়—"তাই হবে।" এই স্বীকারোক্তির মধ্যে তার অভিলাষিত শান্ত নিরুপদ্রব মুক্তি পথের প্রতি তার স্বীকৃতি সুস্পষ্ট। এই একলা পথের পথিক হিসেবে সে একাই চলতে চাইলো। নিজের অন্তরের গভীরে ডুব দিয়ে অভিনব মুক্তির মুক্তোরেণুতে মগ্ন হয়ে থাকতেও চাইলো শচীন। "একটা যেন কিনারার মতো দেখিতেছি, এখন যদি তার দিশা হারাই তবে আর খুঁজিয়া পাইব না।" এই অন্বেষণেই শচীনের সাধনা সীমার মধ্য দিয়ে অসীমকে পাওয়ার প্রস্তুতি; অন্তরের মধ্যে পরম সত্যকে লাভ করবার প্রয়াস। শচীনের এই আন্তর সাধন সম্পর্কে শ্রীবিলাসের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—

"আর ভাবসেঁতাগে তলাইয়া যাওয়া নয়, এখন উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য ভিতরে এমন লড়াই চলিতেছে যে তার মুখ দেখিলে ভয় হয়।" এই অন্তর্লীন ব্যক্তিগত মুক্তি সাধনাকেই শেষ পর্যন্ত শচীন পরম বিশ্বাসের সঙ্গে আঁকড়ে ধরেছে, কর্মের জগতে নয়, রসের সমুদ্রে নয়, নিজের মধ্যেই যে প্রেয়কে পাওয়া যেতে পারে এই সত্যটিই শেষ পর্যন্ত শচীনের কাছে জয়ী হয়ে উঠেছে। তাই একদিন গুরুর পা ধরে সত্যকে লাভ করবার বাসনা প্রকাশ করলেও শচীন কখন বলতে বাধ্য হয়—"আমার অন্তর্যামী কেবল আমার পথ দিয়াই আমাগোনা করেন, গুরুর পথ গুরুর আঙিনাতেই যাওয়ার পথ।" এই সত্যই শেষ পর্যন্ত শচীনকে চালিত করেছে. প্রেয়কে পাওয়ার সহজ মুক্তির পথটিই সে শেষ পর্যন্ত নিজের মধ্যে খুঁজে পেয়েছে। রূপের গ্রন্থি খুলেই ছুটতে হয় অরূপের দিকে। প্রতিটি গ্রন্থিমোচনেই সেই পরম মুক্তির অনাবিল আনন্দ। শচীনের সাধনার মন্ত্রই শেষ পর্যন্ত মুক্তির আনন্দকে অবলম্বন করে ধ্বনিত হয়েছে—"তিনি মুক্ত তাই তাঁর লীলা বন্ধনে আমরা বদ্ধ সেই জন্য আমাদের আনন্দ মুক্তিতে।"

কর্মের ধুলোমাটি গায়ে মেখে নয়, রসের সমুদ্রে

ভাবনুভবে নেয়েও নয়, সহজ আনন্দের বন্ধন মোচনের সরল পথটি ধরেই অভিলাষিত মুক্তির স্বাদ পাওয়া যায়। আনন্দে মুক্তিতে সেইতো পরম প্রাপ্তি!

শচীশের এই মুক্তি সাধনার পথটি অত্যন্ত দুরূহ। এই জটিল সাধনার পথে ক্ষতবিক্ষত হতে হতে এগিয়ে চলতে হয়েছে শচীশকে। সমগ্র 'চতুরঙ্গে' উপন্যাসটির মধ্যে শচীশের সাধনা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। 'চতুরঙ্গে'র প্রতিটি অঙ্গই সেই সাধনাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। তাই উপন্যাসটি শচীশের সমগ্র জীবনের সাধনার ইতিহাস বললে অত্যুক্তি হয় না। এক দুর্দমনীয় মুক্তির আবেগে সারা উপন্যাসের মধ্যে শচীশের গতি পরিবর্তিত হয়েছে। আর মুক্তি পাগল শচীশের আকুলঅন্তর নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অভিলষিত আনন্দময় পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে।

তৃতীয় অঙ্ক : মুক্তিকামি দামিনী।

দামিনীর সম্বন্ধে শচীশের ডায়েরীতে লেখা আছে—"সে নারী মৃত্যুর কেহ নয়, সে জীবন রসের রসিক। বসন্তের পুষ্পবনের মতো লাবণ্যে গন্ধে হিল্লোলে সে কেবলই ভরপুর হইয়া উঠিতেছে; সে কিছুই ফেলিতে চায় না; সে সন্ন্যাসীকে ঘরে স্থান দিতে নারাজ; সে উত্তুরে হাওয়াকে সিকি পয়সা খাজনা দিবে না পণ করিয়াছে।" দামিনী সম্পর্কে শ্রীবিলাসের উক্তিটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—"দামিনী যেন শ্রাবণ মেঘের ভিতরকার দামিনী। বাহিরে সে পুরা পুরা যৌবনে পূর্ণ; অন্তরে চঞ্চল আগুন ঝিকমিক করিয়া উঠিতেছে।"

দামিনীর পূর্ণ যৌবনের অন্তরালে এই চঞ্চল আগুনটি ছিল বলেই সে নবিবালা বা নবীনের স্ত্রী হয়ে ওঠেনি, যথার্থই দামিনী হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের অভিনব ভাব ও ভাবনার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে দামিনীর মধ্যে, অনেকের কাছে দামিনী চরিত্রটি বিশেষ গুরুত্ব না পেলেও, সমালোচকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দামিনীর শেষ পরিণামের প্রশ্নটি ধরা না পড়লেও এ কথা বলতে ভুল হবে যে 'চতুরঙ্গে'র মূল বক্তব্যের অখণ্ড ঐকতানটি দামিনীর প্রশ্নকে বাদ দিলে খণ্ডিত হয়ে পড়তে বাধ্য। তাই দামিনীর অন্তরের কামনা যে মুক্তির পথ ধরে বরাবর শচীশও শ্রীবিলাসকে 'পাশ' করতে করতে অগ্রসর হয়েছে তার আলোচনার প্রয়োজন আছে।

সাধারণ নারীর অন্তরের মুক্তি কামনা যে স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষার পথ ধরে চলে, দামিনীর মুক্তি কামনাও সেই পথ ধরে চলেছে। প্রিয়ার নারীর প্রকাশ, গৃহিনীরে প্রতিষ্ঠা আর মাতৃত্বে পূর্ণ পরিণতি। প্রিয়া থেকে জননীর পর্যায় পর্যন্ত নারীর অন্তরের মুক্তি কামনা ঐ তিনটি স্তরকে অতিক্রম করে অগ্রসর হয়। দামিনীর মুক্তিও ঐ স্বাভাবিক সহজ পথ ধরে অগ্রসর হতে চেয়েছিল। সে মুক্তির জন্য কামনা করেছে, মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, কিন্তু মুক্তির পথ সহজে খুঁজে পায়নি। তাই তার মুক্তি-কামনা নানা ঘাত প্রতিঘাতে বিব্রত, দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ব্যতিব্যস্ত। স্বামী শিবতোষের কাছে প্রিয়া হিসাবে তার নারীত্বের প্রার্থিক মুক্তি ঘটেনি। কারণ,—"শিবতোষের সংসারে মন ছিল না। একজন গণৎকার তাহাকে একদিন বলিয়া দিয়াছিল, কোন এক বিশেষ যোগে বৃহস্পতির কোন এক বিশেষ দৃষ্টিতে সে জীবন্মুক্ত হইয়া উঠিবে। সেইদিন হইতে জীবন্মুক্তির প্রত্যাশায় সে কাঞ্চন এবং অন্যান্য রমণীর পদার্থের লোভ পরিত্যাগ করিতে বসিল।" কাজেই কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী স্বামীর কাছে প্রিয়ার মর্যাদা পাওয়া দামিনীর কাছে অসম্ভব হয়ে উঠেছে। তাছাড়া তার বাসনা কামনাকে অপরিতৃপ্ত রেখেই 'সমস্ত সম্পত্তি সমেত স্ত্রীকে বিশেষভাবে গুরুর হাতে সমর্পণ করে' শিবতোষ তাকে চরম দণ্ড দিয়ে গেছে। তাই 'অবিশ্রাম ভক্তির ঢেউ' উঠলেও দামিনী তাতে চুব দিতে চায়নি। অপরিতৃপ্ত কামনার উপরে এই জোর করে চাপানো সংযমের বিরুদ্ধে বার বার তার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। কেবল বিদ্রোহ করেই দামিনী ক্ষান্ত থাকেনি, তার মনের গোপন মুক্তির আকাঙ্ক্ষা শচীশকে অবলম্বন করে বিকশিত হয়ে উঠতে লাগলো। তার অন্তরের 'আত্মোৎসর্গের কুঁড়িটি'কে সে ফুটিয়ে তুলতে চাইল সহজ সেবার মাধুর্যে। নির্বিকার শচীশের অটল গাম্ভীর্যের দোরগোড়ায় তাই তার মাথা ঠুকে বলা—"পাথর, ওগো পাথর, দয়া করো, আমাকে

মারিয়া কেলো স্রোতের মুখে পাথর বাধা আনে তাকে ঘিরেই উচ্ছ্বাসিত হয়ে ওঠে স্রোতের ঊর্মিমুখর চঞ্চলতা। হয় সে ভাঙবে পাথরকে নয়তো ডুবিয়ে দেবে উচ্ছলতায় এই তো স্রোতের পণ। গান্ধীজীর পুরোধিগমের প্রতি তাই মানুষের এত আকর্ষণ। সহজ-লভ্যকে নিয়ে কোন আনন্দ থাকে আইশোরে শাড়ীর মত তার প্রয়োজনীয়তা থাকলেও ব্যবহারের গৌরব তাতে থাকে না। দুর্লভতা বেনারসী শাড়ির মত। দৈনিক প্রয়োজনে তার স্থান নেই, কিন্তু তার মহার্ঘ মূল্যের আকর্ষণ অস্বীকার করবার মত নয়। দুর্লভ শচীশের প্রতি দামিনীর আকর্ষণ তার নির্বিকারত্বের দোরগোড়ায় মাথা ঠুকেই ফেরে যায়নি, রাতের অন্ধকারে গুরুর 'ভক্তের তা অনুসরণ করে চলেছে শচীশকে। এক নিরুদ্ধ মুহূর্তের আত্মদানে সে বিলিয়ে দিতে চেয়েছে নিজেকে, বিলিয়ে দেওয়ার আবেগের ভিতর খুঁজেছে আকাঙ্ক্ষিত মুক্তির পথ। বিনিময়ে সে পেয়েছে শচীশের পদাঘাত, নির্বিকারত্বের কঠোর অস্বীকার। দামিনীর মনে হয়েছে, শচীশের এই গুরুত্বের কাঠিন্যের খোলসটি ভাঙতে না পারলে শচীশ দুর্লভ থেকে যাবে চিরদিন। তাই পদে পদে সে গুরুর অবাধ্য হয়ে উঠতে চায়। গুরুদেবের গুরুত্বকে খর্ব করার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

এক দিকে দামিনী অন্তরে যতখানি মুক্তির ব্যাকুলতা অনুভব করেছে, অপরদিকে তার ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা নানা পথ ধরে ঠিক ততখানি প্রকাশ পাওয়ার চেষ্টা করেছে। সেই আকাঙ্ক্ষা কখনো গুরুর উপরে বিক্ষোভ হয়ে, কখনো শচীশের প্রতি অবহেলা হয়ে, কখনো পশুপতীর প্রতি মমতায়, কখনো বা শ্রীবিলাসের অকারণ প্রলাপে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এক অজ্ঞাত আকর্ষণে সে লীলানন্দের ভক্ত সমাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে।

শচীশ বলিল, 'আমরা ঠিক করিয়াছি তুমি যদি কোন আত্মীয়ার কাছে গিয়া থাক তবে আমরা খরচ পত্রের বন্দোবস্ত করিয়া দিব।'

'তোমরা ঠিক করিয়াছ?'

'হ্যাঁ।'

'আমি ঠিক করি নাই।'—শচীশের কথার উত্তরে দামিনীর এই দুটি প্রতিবাদের মধ্যে তার প্রশ্নের আকর্ষণটিই প্রতিভাত হয়েছে। যখনই জোর করে দামিনীর উপরে কঠোর বিধিনিষেধকে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে, সবলে দামিনী তাকে ভেঙে বেরোতে চেয়েছে। শ্রীবিলাসের আনীত বইগুলির উপরে গুরুর নির্দেশাজ্ঞার বিরুদ্ধে দামিনীর অন্তরের বিদ্রোহ প্রবল প্রতিবাদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। কারণ, আয়াসসাধ্য ভক্তির পথে সে মুক্তির পথ খোঁজেনি, সহজ জীবনের সরল বাসনা কামনার মধ্য দিয়ে সে মুক্তি পেতে চেয়েছে। তাই শচীশ যখন তার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য এগিয়ে এসেছে, মুহূর্তের মধ্যে ক্রুদ্ধা ফণিনী তার ফণা গুটিয়ে শান্ত হয়ে বসেছে শচীশের দেওয়া মুহূর্তের দাক্ষিণ্যকে দামিনী পেয়েছে অসীম শান্তি, শচীশকে সে যে মীমাংসার দিকে টেনে আনতে পেরেছে, এতেই তার আনন্দ।

শচীশ বলিল, আমাদের সঙ্গে তুমি যোগ দাও, অমন করিয়া তফাত হইয়া থাকিয়ো না।'

দামিনী কহিল, 'তাই যোগ দিব, আমি কোনো অপরাধ করিব না।' শচীশের মীমাংসার প্রস্তাবে দামিনীর শান্ত প্রতিপ্রশ্নটি এই উক্তির মধ্যে স্পষ্ট।

নবীনের স্ত্রীর মৃত্যুতে দামিনীর উক্তি তার অন্তর্নিহিত মুক্তির স্বরূপটাকে ফুটিয়ে তুলেছে স্পষ্টভাবে—"আমি তোমার গুরুর কাছ হইতে কিছুই পাই নাই। তিনি আমার উতলা মনকে এক মুহূর্তে শান্ত করতে পারেন নাই। আগুন দিয়া আগুন নেভান যায় না। তোমার গুরু যে পথে সবাইকে চালাইতেছেন সে পথে ধৈর্য নাই, বীর্য নাই, শান্তি নাই।" মুক্তির নতুন পথটিকে দেখতে পেয়েছে দামিনী। রক্তের উত্তরে কামনার আগুন সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠে, তাতে বড় করে দেখা দেয় জ্বালা আর দাহ। প্রেমের স্নিগ্ধ প্রকাশে, ভালবাসার পরম মাধুর্যে তা ভরে উঠতে পারেনা। তাই সে পথ দামিনীর কাছে বিভীষিকা বয়ে আনে। নারী হিসেবে মুক্তি পেতে গিয়ে অপরিতৃপ্তির আগুনে সে জলতে মরতে চায় না। আজ তার যে পথের প্রয়োজন, তাতে চাই শান্তির মন্ত্র, নিবেদনের মাধুর্য, বিলিয়ে দেওয়ার আনন্দ। তার

বিশ্বাস সে মন্ত্র দিতে পারে একমাত্র শচীশ, যে শচীশের সে অন্তরের প্রেমের ডালাটি ছিন্ন মাধুর্যে ভরিয়ে রেখেছে। সে উপকারকে অপরিতৃপ্তির আগুনে ইন্ধন হিসাবে পুড়িয়ে দেওয়া যায় না তাকে ব্যবহার করা যায় পূজার অর্ঘ্য হিসেবে, সমর্পণের আনন্দে। তাই শচীশকে গুরুর আসনে বসাতে দামিনীর দ্বিধা নেই—"তুমি আমার গুরু, তুমি আমার গুরু, আমাকে সকল অপরাধ হইতে বাঁচাও, বাঁচাও, বাঁচাও।"

লীলানন্দ স্বামী প্রদর্শিত ভক্তির দলাদলির মধ্যে তার আকাঙ্ক্ষিত মুক্তি নাই, সে মুক্তি খোঁজে শচীশের কাছে, যে শচীশকে সে অন্তরে ভালবাসে পূজা করে, প্রেমের এই মাদকতাময় অনুভূতি দামিনীকে নব জন্ম দান করে, এখন সে আর শ্রীবিলাসের চোখে দেখা 'শ্রাবণ মেঘের ভিতরকার দামিনী' নয়, সে শচীশের ভাষায় লেখা 'জীবন রসের রসিক' বসন্তের পুষ্পবনের লাবণ্যে গন্ধে হিল্লোলে ভরা দামিনী, আষাঢ়ের লাবণ্যে শান্তির গন্ধে পরিপূর্ণা, মুক্তিকামী দামিনী। 'চতুরঙ্গে'র চতুর্থ অঙ্কে শ্রীবিলাসের আত্মজবানীতে এই দামিনীর ছবিটিই ফুটে উঠেছে, 'চতুরঙ্গে'র তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীবিলাসের সঙ্গে দামিনীর বিবাহের যে রহস্যটি ঢেকে রাখা হয়েছে, শেষ অধ্যায়ে সেই রহস্যটিই দামিনীর মুক্তিকামনার মধ্যে পরম মহিমায় প্রকাশিত দামিনীর মনের মুক্তির যথার্থ স্বরূপটিকে শ্রীবিলাস দেখতে পেয়েছিল, তাই দামিনী তার কাছে 'পদ্মের পাতায় শিশিরের ফোঁটা ধরে থাকেনি, সত্য হয়ে উঠেছে। শ্রীবিলাস স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে—"তাই আমি যাকে কাছে পাইলাম সে গৃহিনী হইল না, সে মায়া রহিল না সে সত্য রহিল। সে শেষ পর্যন্ত দামিনী। কার সাধ্য তাকে ঢাকা বলে।"—দামিনী ছায়াতো নয়ই, কোনদিন ছিলও না। বরং শচীশরূপ কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত হয়ে তার অন্তরের স্বর্ণরূপটি আরও স্পষ্ট সত্যের রূপ ধরেছে। আগুনের দাহটি অন্তর্হিত হয়েছে, আলোর স্নিগ্ধতা বড় হয়ে উঠেছে। শ্রীবিলাস প্রথমে দামিনীর এই নবরূপটিকে বুঝতে পারেনি। দামিনীর মধ্যে যেটা ছিল নবপ্রাপ্তির ঔজ্জ্বল্য, শ্রীবিলাস সেটাকে মনে করেছিল 'প্রলয়ের আগুন' "দামিনীর মধ্যে একটা প্রলয়ের আগুন জ্বলে উঠেছে, কলিকাতা আসিবার পথে তাহা যেন বুঝিতে পারিলাম।" বাহ্যিক দৃষ্টিতে 'প্রলয়ের আগুন' মনে হলেও এর মধ্যেকার আলোটুকুকে অস্বীকার করা যায় না। এটি দামিনীর মুক্তির আলো, এরই মধ্যে সে পেয়েছে পূর্ণতার স্বাদ।

শচীশের সম্পর্কে দামিনী শ্রীবিলাসকে বলেছে—"তিনি আমাকে কী বাঁচান বাঁচাইয়াছেন, তুমি তার কি জানো?... সুন্দরকে মারিতে গিয়াছিল, তাই অসুন্দরটা বুকে বাজিয়া বাঁচিয়াছে।" দামিনীর অসুন্দরটা উপেক্ষার পদাঘাতে সুন্দরের পথ দেখতে পেয়েছে। পথই দামিনীর মুক্তির পথ। আত্মবোধের আনন্দে, উপলব্ধির পরিচিতায় সে পথ সত্য, শাশ্বত, এই পথটিকে দেখতে পেয়েছিল বলেই চঞ্চল দামিনী শ্রীবিলাসের গৃহিনীত্বে এসে স্থির সৌদামিনীতে পরিণত হতে পেরেছে; জীবনরসের রসিক দামিনী জীবনের উচ্ছলতাকে বাদ দিয়ে শান্ত জীবনের সহজ মুক্তিকে বেছে নিয়েছে।

মামীর বাড়িতে যার স্থান চলনা, শচীশকে যে প্রেমের বন্ধনে বন্দী করতে পারল না, দামিনী বলেই সে শ্রীবিলাসের গৃহিণীর পদে অধিষ্ঠিত হল। নবীনাল। হলে সে আত্মহত্যা করে প্রেমকে অক্ষয় করে রাখত, নবীনের স্ত্রী হলেও সে আত্মবিসর্জনের মধ্যদিয়ে জীবন সত্যের করুণতর দিকটি দেখিয়ে দিয়ে যেত। মৃত্যুর মধ্যে সে চরিতার্থতা খোঁজেনি, খুঁজেছে জীবনের মধ্যে, সেই জীবনের আস্বাদ দিতে এগিয়ে এসেছে শ্রীবিলাস, তাই দামিনী তাকে ফিরিয়ে দিতে পারেনি। প্রিয়া হয়ে যে মুক্তিকে সে প্রকাশিত করতে চেয়েছিল, নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে শ্রীবিলাসের গৃহিনীত্বে তা প্রতিষ্ঠা পেল। মুক্তির দ্বিতীয় ধাপে উত্তীর্ণ হল দামিনী। শ্রীবিলাসের কথায়—বাহিরে আমার কাজ আর ভিতরে দামিনীর কাজ, এই দুইয়ের যেন গঙ্গা যমুনার স্রোত মিলিয়া গেল।"

কিন্তু এই মিলনস্রোতের মধ্যে অসময়ে ছেদ আনল দামিনীর আকস্মিক মৃত্যু। দামিনীর এই মৃত্যু সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক—কেন উপন্যাসের শেষ অংশে দামিনীর মৃত্যু ঘটানো হল? এটা কি কেবল উপন্যাসের

প্রয়োজন ঘটানো হয়েছে ! না
প্রণোদিত হয়ে উপন্যাসিক এই কাজ করতে
বসেছেন ! এ সব প্রশ্ন নিয়ে কোন সমালোচক উচ্চবাচ্য
করেননি। তবে রবীন্দ্রনাথের মত কুশলী শিল্পী অকারণে
এতটা করতে পারেন বলে মনে হয় না. মৃত্যুর
আলোকে বৃহৎ সত্যকে মুক্তি দেবার দৃষ্টান্ত রবীন্দ্র
সাহিত্যে একেবারে বিরল নয়। আলোচ্য উপন্যাসে
দামিনীর আগে দুটি নারী চরিত্রের (বিনিবালা ও নবীনের)
স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটানো হয়েছে। বিনিবালার মৃত্যুর মধ্য
দিয়ে প্রেমের সত্যটি প্রকাশিত হয়েছে। নবীনবালা না
মরলে তার নারীহৃদয়ের অক্ষয় প্রেমের সৌন্দর্যটি এত
উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারতো না। নবীনের স্ত্রীর মৃত্যু
না ঘটলে জীবনের কঠোর সত্যের চিত্রটি চির
কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে থাকতো, নবীনের স্ত্রীর মৃত্যু কেবল
রসের জগতে জীবন সত্যটিকেই প্রকাশ করেনি, উপ-
ন্যাসের বিশিষ্ট চরিত্র—দামিনী ও শচীশের জীবন
দর্শনের উপরেও প্রভাব বিস্তার করেছে।

দামিনীর মৃত্যুর মধ্যেও এক মহৎ সত্যের প্রকাশ
দেখতে পাই। মুক্তিকামী দামিনীর নারীত্বের পূর্ণ
প্রকাশ ইহজীবনে ঘটেনি। মাতৃত্বের পূর্ণতম মুক্তির
স্বরূপটি তার কাছে অনাস্বাদিতই থেকে গিয়েছে।
কিন্তু মৃত্যুর আলোকে তার অন্তর সত্তার দুটি দিগন্ত
উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এক তার গোপন ব্যথার ঐশ্বর্য
আর অপরটি শ্রীবিলাসের প্রতি কৃতজ্ঞতা।

শচীশের কাছ থেকে পাওয়া পদাঘাতের ব্যথাটি
তার কাছে ঐশ্বর্য তো বটেই, বেদনা. এই ব্যথাই তাকে
কামনার পঙ্ক থেকে তুলে পঙ্কজার পরিণত করেছে।
তাইতো সে শ্রীবিলাসের কাছে গৃহিনীর প্রতিষ্ঠা
পেল। জীবনের পথ তার কাছে সহজ সুন্দর ও লালসা-
মুক্ত হয়ে দেখা দিয়েছিল বলেইতো সে স্বচ্ছন্দভাবে
শ্রীবিলাসের আমন্ত্রণে সাড়া দিতে পারল। তা না
হলে হয়তো অন্তরের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে
হত তাকে। কামনার দাহে দগ্ধ হতে হতে তার
দিন যেত।

দ্বিতীয়ত শ্রীবিলাসের স্বামী সত্তার মূল্যটিও তার
কাছে কম নয়। শ্রীবিলাসের স্বামীত্ব তার নারীত্বের
মুক্তি এনেছে। শ্রীবিলাসের কাছে সে ধনী
বা যশ আরো কিছু। ইহজীবনে যে মাতৃত্বের মুক্তি
সে পায়নি, তারজন্য পরজীবনেও সে শ্রীবিলাসকে
স্বামী হিসাবে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেছে। ইহজীবনের
কলুষ মৃত্যুর মধ্যে দিয়েও সে এগিয়ে চলেছে পর-
জীবনের বাকী মুক্তিটুকুর আশা নিয়ে। তাই
শ্রীবিলাসের পায়ের ধুলো নিয়ে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে
দামিনীর শেষ নিবেদন—"সাধ মিটিলনা, জন্মান্তরে
আবার যেন তোমাকে পাই।" এই অন্তিম আকাঙ্ক্ষায়
দামিনীর বহুস্তর মুক্তির ব্যাকুলতাটি প্রতিধ্বনিত।

দামিনী মরলেও তার অন্তরের আলোটি মরেনি।
সে আলো শচীশের প্রতি তার মনোভাব আর
শ্রীবিলাসের প্রতি তার কৃতজ্ঞতাকে উদ্ভাসিত করে
তুলেছে। রবীন্দ্রনাথ কুশলী শিল্পী। তাই মৃত্যুর
কালো আঁচড় দিয়ে তিনি দামিনীর বিশ্বরূপকে ফুটিয়ে
তুলতে পেরেছেন অন্ধকারের কালোটা কেমন করে
প্রত্যাখ্যানের বর্ণাদিয়ে সুন্দরের আলো হয়ে ফুটে
ওঠে, প্রেমের জীবনকাঠি কেমন করে শুচিশুভ্র
নারীত্বের পুনর্জীবন ঘটায়, নিবেদনের পরিতৃপ্তি
কেমন করে নারীর অন্তরকে মহনীয় করে তোলে,
গৃহিনীত্বের গৌরব কেমনভাবে তাকে কৃতজ্ঞতায় নম্র
করে—সব কিছুই দামিনীর মৃত্যু দৃশ্যে স্পষ্ট হয়ে
উঠেছে। মৃত্যু না ঘটলে তার গোপন ব্যথাটি এমন
পরম ঐশ্বর্য হয়ে উঠতে পারতো না বা শ্রীবিলাসের
প্রতি তার মধুর কৃতজ্ঞতাটিও তার পরজীবনের মুক্তি
ব্যাকুলতাকে এত সুন্দরভাবে ব্যক্ত করতে পারতো না।

৪র্থ অঙ্ক : মুক্তিরসিক শ্রীবিলাস

চতুরঙ্গ উপন্যাসের চতুর্থ অংশটির কেন্দ্র শ্রীবিলাস।
এই উপন্যাসে শ্রীবিলাসের ভূমিকা কেবল দ্রষ্টার নয়,
স্রষ্টারও, নিছক দ্রষ্টার ভূমিকা নিয়ে থাকলে তার
বর্ণনা কয়েকটি জীবনের ও ঘটনার ইতিহাসে পরিণত
হত, জীবনরসে রসায়িত হয়ে সেগুলি এতখানি জীবন্ত
হয়ে উঠবার সুযোগ পেত না। 'চতুরঙ্গে'র প্রতিটি
অংশের সঙ্গে শ্রীবিলাসেরও জীবনের যোগ আছে।
জীবনের মধ্যে বুঝতে পারা অভিজ্ঞতাগুলি তার

বর্ণনার উপরে সুন্দর ভাবে সৃষ্টির তুলিটি বুলিয়ে দিয়েছে। এই জন্যই তার বর্ণনায় কঠোর সমালোচকের নীরস বিচার পদ্ধতি প্রকট হয়ে ওঠেনি, জীবন দর্শনের সার্থক রূপায়ণে সহজ হতে পেরেছে।

শ্রীবিলাসকে এখানে মুক্তিরসিক আখ্যা দিলে অন্যায় হয় না। সে উপন্যাসের প্রত্যেক অংশে সকলের সঙ্গে মুক্তির রস আস্বাদন করতে করতে অগ্রসর হয়েছে। জগমোহনের কর্মে মুক্তির আনন্দ, শচীশের মুক্তি সাধনার ব্যাকুলতা ও দামিনীর বিচিত্র মুক্তি আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ—সমস্ত কিছুর সঙ্গে সে জড়িত সব কিছুর সে দ্রষ্টা। বিভিন্ন ধরনের মুক্তি চেতনার সঙ্গে সে পরিচিত। প্রত্যেক মুক্তির ভাবনা তার চেতনার রাজ্যে নিজ নিজ রূপে রসে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। সেই বিচিত্র মুক্তির রস অনুভব করতে করতে শ্রীবিলাসও এগিয়ে চলেছে নিজের মুক্তির দিকে। তাই রবীন্দ্রনাথ তার উপরে তুলে দিয়েছেন বর্ণনার গুরু দায়িত্ব। এ দায়িত্ব জগমোহনের গ্রহণ করবার ক্ষমতা ছিলনা। কারণ জগমোহনের স্বকীয় পথটি ছিল তার ব্যক্তিচেতনাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। সে পথের বাইরে এসে জীবন দর্শকের ভূমিকা নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিলনা। শচীশের বেলাতেও দেখি, আসল মুক্তিকে খুঁজতে গিয়ে এক পথ থেকে আর এক পথে পাগলের মত ছুটে চলেছে। তার চলার পথ এতই আত্মকেন্দ্রীয় যে সেখানে দ্রষ্টার মুক্ত দৃষ্টি লাভ করা সম্ভব নয়। দামিনীও তার নারীত্বের মুক্তি আকাঙ্ক্ষায় এতই বিব্রত যে তারপক্ষেও দ্রষ্টার চক্ষু নিয়ে লিপিকরের দায়িত্ব গ্রহণ করা অসম্ভব। একমাত্র এ দায়িত্ব নেওয়ার যোগ্যপাত্র নিঃসন্দেহে শ্রীবিলাস। কারণ, সে জগমোহনের মতো মুক্তি কেন্দ্রীক, শচীশের মতো মুক্তি পাগল বা দামিনীর মতো মুক্তি ব্যাকুল নয়, সে মুক্তিরসের রসিক; একাধারে দ্রষ্টা ও স্রষ্টা।

শচীশের প্রতি আন্তরিক আকর্ষণে প্রথম থেকেই শ্রীবিলাস চালিত হয়েছে। চলার পথে যে বিচিত্র জীবনগুলির সঙ্গে শ্রীবিলাসের পরিচয় ঘটেছে সেগুলির সঙ্গে ঘটনাচক্রে জড়িয়ে পড়লেও কোন প্রকারের ভগ্ন ব্যাকুলতা বা মানসিক বিকারে তার দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়নি। তাই শ্রীবিলাসের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জগমোহন শচীশ বা দামিনীর মত বাঁধা সড়ক ধরে অগ্রসর হয়নি। বিচিত্র অভিজ্ঞতা, অভিনব জীবন দর্শন তার মনের খোলসকে ভাঙতে ভাঙতে তাকে ধাপে ধাপে মুক্তির দিকে এগিয়ে দিয়েছে। প্রথমে সে ছিল আস্তিকতার বিশ্বাসী তাই ছাত্রজীবনে শচীশকে নাস্তিক জেনে তার অন্তরে ঘা লেগেছে। "শচীশ বলিল, 'হাঁ, আমি নাস্তিক।' আমার মাথা নীচু হইয়া গেল। আমি মেসের লোকের সঙ্গে ঝগড়া করিয়াছিলাম যে, শচীশ কখনোই নাস্তিক হইতে পারে না।"

শচীশের প্রতি ভালোবাসা ও সেই সূত্রে জগমোহনের সঙ্গে পরিচয়ে তার এই আস্তিকতার খোলস একদিন ভেঙে যেতে বাধ্য হয়েছে। শ্রীবিলাসের স্বীকারোক্তিটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—"আমি যে দুরন্ত নাস্তিক এবং ঘণ্টায় বিশ-পঁচিশ মাইল বেগে আশ্চর্য কারদায় ইংরেজি বুলির চৌঘুড়ি চাঁকাইয়া চলিতে পারি, এ কথা ছাত্রসমাজ হইতে শুরু করিয়া ছাত্রদের পিতৃসমাজ পর্যন্ত রাষ্ট্র হইয়াছিল।"

কিন্তু এই নাস্তিকতার খোলসটিও বেশি দিন টিকতে পারেনি। প্রবল অবিশ্বাস আর প্রচণ্ড বিদ্রূপ নিয়ে সে লীলানন্দ স্বামীর সম্মুখীন হয়েছিল। তখন তার সামনে ছিল জগমোহনের প্রদর্শিত পথের প্রেরণা। লীলানন্দ স্বামী তাকে মুক্তির নতুন পথ দেখাতে গিয়ে বলেছিলেন—"ভবঘুরি মুক্তা তুলতে সমুদ্রের তলায় গিয়া পৌঁছায় কিন্তু সেখানেই যদি টিঁকিয়া যায় তবে রক্ষা নাই—মুক্তির জন্য তাকে উপরে উঠিয়া হাঁফ ছাড়িতে হয়।" কিন্তু এ পথকেই শ্রীবিলাস মনেপ্রাণে গ্রাহ্য করতে পারেনি। শচীশ তাই সে প্রশ্ন করে—"শচীশ, জন্মকাল হইতে তুমি মুক্তির মধ্যে মানুষ, আজ তুমি এ কি বন্ধনে নিজেকে জড়াইলে! জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যু কি এতো বড় মৃত্যু?" মুক্তির চেহারা সম্পর্কে তখন শ্রীবিলাসের অন্যরকমের ধারণা ছিল, জগমোহনের প্রদর্শিত মুক্তিরসের আস্বাদনে সে তৃপ্ত ছিল। তাই গুরু সেবা তার কাছে উপসর্গ বলে মনে হয়েছে। শচীশের পথকে ভুল পথ ভেবে সে অনুযোগ করেছে—"যাই বলো, এই তাহাকে লাজানো, পা টেপানো, এ

সমস্ত উপসর্গ ছিল না—মুক্তির এ চেহারা নয়।"

কিন্তু আদর্শের চাঁদের চেয়েও শচীনের টান তার কাছে বড়ো হয়ে উঠেছে। শচীনকে ত্যাগ করতে না পেরে তার ভক্তির নেশা শ্রীবিলাসকেও পেয়ে বসেছে। বাস্তিকার খোলস থেকে মুক্ত করে তাকে আবার ভক্তির খোলস পরতে হয়েছে। যে শ্রীবিলাস এতদিন বাস্তিকতার পথে মুক্তির রসাস্বাদনে ব্যস্ত ছিল, ভক্তির পথে সে নতুন রসের আস্বাদনে লুব্ধ হয়ে উঠল। এতদিন সে 'রস জগমোহনের জীবনের দ্রষ্টা, এখন নতুন করে তার চোখে পড়ল শচীন আর দামিনী। শচীনের মত সে ভক্তির স্রোতে ভেসে চলেনি, সে ভক্তির রূপটি নিরীক্ষণ করে চলেছে। তাই দামিনীর অন্তরকে বুঝে নিতে তার কষ্ট হয়নি। ভক্তির পথে জীবনরসের আস্বাদনে তাই সে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। "যেখানে সেই রাশির ভাঁচলে ঘর করার চাবির গোছা বাজিয়া ওঠে, যেখানে রান্নার গন্ধ উঠিতেই থাকে, যেখানে ঘর ঝাঁটি দিবার শব্দ শুনিতে পাই—যেখানে সব তুচ্ছ কিন্তু সব সত্য, সব মধুরে তীব্রে-ঝালে-মুখে মাখামাখি, সেইখানেই রসের স্বর্গ।"

এই তুচ্ছ সত্যটুকুকে সার্থক ভাবে উপলব্ধি করার কাহিনীই শ্রীবিলাসের মুক্তি-কাহিনী, 'ভক্তির পথে রসের স্বর্গলোকের সন্ধান। এই সন্ধানের পথ দিয়েই শেষ পর্যন্ত শ্রীবিলাসের মুক্তি এগিয়ে এসেছে। ভক্তির বাস্তিক খোলসটি অবান্তর হয়ে পড়েছে। 'মধুর তীব্র-ঝালে-মুখে মাখামাখি' রসের স্বর্গসন্ধানে উন্মুখ হয়ে উঠেছে তার জীবন-প্রেমিক মুক্তি-রসিক মনটি।

তাই গুহা থেকে ফিরে আসার পর ভক্তবৎসলীর মাঝে দামিনীর অনুপস্থিতি শ্রীবিলাসের কাছে অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে। "গুরুজি তার অনুপস্থিতিটাকে অহংকার বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, সুতরাং সেটা তাঁর অহংকারে কেবলই ঘা দিতে থাকিত। আর, আমি—আমার কথাটা বলিবার প্রয়োজন নাই।"

দামিনীর সঙ্গে ক্রমিক ঘনিষ্ঠতা ও তার প্রতি দামিনীর পক্ষপাতিত্ব শ্রীবিলাসকে যেমন আনন্দিত করেছে, অপরদিকে শচীনের প্রতি দামিনীর একাগ্রতা তাকে ক্ষুব্ধ করেছে। শ্রীবিলাসের বুঝতে বাকি থাকে না—শচীনের জন্য দামিনীর আকুলতাটিই সত্য, তার প্রতি পক্ষপাতিত্বটুকু নিছক অভিনয়। তবু শ্রীবিলাস দামিনীর হৃদয়কে সম্পূর্ণ বঞ্চনা করতে পারেনি। কারণ, রসের আর্তি থেকে নিষ্কৃতি লাভের উপায় নাই।

এই আর্তি থেকেই শ্রীবিলাসের মধ্যে জন্মলাভ করল এক নতুন দৃষ্টির চেতনা। সেই চেতনা আবর্তিত হয়ে উঠলো একটি গৃহ রচনার স্বপ্নকে কেন্দ্র করে। লীলানন্দ-স্বামীর ভক্তির জগতের বাইরে এসে এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য সে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। আর সেই কল্পিত সংসারে সাজানো বেদীতে শ্রীবিলাস প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলো দামিনীকে। তার এই স্বপ্ন রচনায় সাড়া দিতে হল দামিনীকে। নবজীবনের আনন্দে নতুন সংসার রচনায় মেতে উঠলো শ্রীবিলাস। তার কাছে—"যেখানেই ওই বাড়িগুলো চারিদিকে যেন পারিজাতের মতো ফুটিয়া উঠিল।" শ্রীবিলাসের মুগ্ধ আকাঙ্ক্ষা মুক্তি পেল প্রেমের জগতে মিলনের রোমাঞ্চের মধ্য দিয়ে। এখন শ্রীবিলাসের চোখে— "কলিকাতার এই শহরটাই যে বৃন্দাবন, আর প্রাণপণ খাটুনিটাই বাঁশির তান।" জগমোহনের কর্মবাদ ও লীলানন্দ-স্বামীর ভক্তিবাদ থেকে মুক্ত হয়ে শ্রীবিলাস একটি নতুন সত্য উপলব্ধি করল;—মানুষের জগতে নতুনতর মানুষ সংসার রচনাতেই অপার আনন্দ, তার মধ্যেই আছে সার্থক মানুষের ঐহিক সার্থকতা। এই সার্থকতার মধ্য দিয়েই শ্রীবিলাস দেখতে পেয়েছে আকাঙ্ক্ষিত মুক্তিকে। প্রেমের পথই মুক্তির পথ।

'চতুরঙ্গে'র মুক্তি ভাবনায় এই চারটি জীবনের বিচিত্র মুক্তি-চেতনা চারটি বিশেষ পথ ধরে অগ্রসর হয়েছে। জগমোহনের মুক্তির পথ কর্মে, শচীনের মুক্তির পথ আত্মলীন সাধনায়, দামিনীর মুক্তির পথ নারীত্বের সফলতায় আর শ্রীবিলাসের মুক্তির পথ ঐহিক সার্থকতায়! চারজনের পথ আলাদা হলেও যে অখণ্ড সত্যের দিকে তারা অগ্রসর হয়েছে সেটি হল, জীবনের মধ্য দিয়েই মুক্তি আসে, জীবনের পথই যথার্থ সাধনার পথ।

নতুন হাওয়া

শম্ভু গুহ

ব্যবসা ভালোই বোঝে গোপীচাঁদ। বাবা মারা যাবার পর থেকে এই কটা বছর তো বেশ চালিয়ে আসছে, লোকসানও দেয়নি কোন দিন, অথচ আবার লোকের সাথে চটাচটিও হয়না মোটেই। মা মারা গিয়েছিল আগেই, ছেলে বেলায়। এক বিধবা পিসি সংসার পরিচালনা করতেন কিন্তু কিছুদিন হল তিনিও ভবলীলা সাঙ্গ করেছেন। ফলে এখন সে একা আর একা। দোকানের সঙ্গেই বসতবাড়ী অর্থাৎ রান্না খাওয়া ও সোবার ঘর। দোকানের ঝাপ ফেলে সেখানে ঢুকে নিজের হাতেই রান্না চড়িয়ে দেয় গোপীচাঁদ। রান্নায় হাত মোটেই তৈরী নয় ওর, তাই অধিকাংশ দিনই নিত্যভাত গ্রহণ করে উনন ঠাণ্ডা রাখে, আর যেদিন ঝোল বা তরকারী হয় সেদিন তার অবস্থা দেখে নিজেই যেন আতকে ওঠে। এগুলো যে কোন মানুষ খেতে পারবে এ কথা ভেবে সে নিজেই আশ্চর্য হয়ে যায়।

শীতকালের সন্ধ্যেটা রাত সাতটার পরে আর বিশেষ খদ্দের হয় না দোকানে। যারা একটু আড্ডাবাজ তারাও শীতের ভয়ে ওর পরে আর বাইরে আসতে চায় না বিশেষ করে ওর দোকানের ঐ খোলা জায়গাটায়, তবে হাটবারের দিন ওর পরেই বেশ লোক হয় দোকানে। পাশের গাঁয়ের হাটুরেরা আসে, তারা একটু রাত করেই শেষ হাট করে ফেরে। গোপীচাঁদের দোকানে তাদের তেলের শিশি বোতল জমা থাকে ফেরার পথে সেগুলো নিতে আসে। সবাই চলে গেলে ঘরে ঢুকে রান্না চাপিয়ে দেয় গোপীচাঁদ। একটু দূরে বসে তখন কুপির আলোতে দিনের হিসেব করতে বসে ও। এক নম্বা দুই নম্বা, পাঁচ-দশ সব আলাদা আলাদা করে রাখে। লাল কভারে ঢাকা মোটা খাতায় লেখে সেগুলো, পাশে পাশে আবার আলাদা কাগজে লেখে সপ্তাহের শেষে শহর থেকে কোন কোন জিনিসগুলো আনতে হবে অর্থাৎ নিঃশেষিত হয়ে এসেছে যেগুলো তারই নাম। খাওয়া হয়ে গেলে আলোটা নিবিয়ে শুয়ে পড়ে বিছানায়,—কিন্তু কদিন

থেকে কেন জানি বুকটার মধ্যে বড্ড ফাঁকা ফাঁকা লাগছে ওর। সিঁড়ি ভাঙা যাবার পর প্রথম প্রথম ভালই একা একা লাগত কিন্তু কিছুদিন যাবার পর সব ঠিক হয়ে গেছে, সন্ধ্যের মধ্যে এসে গেছে দল, কিন্তু এখনকার এই ফাঁকা ফাঁকা ভাব তো সে জিনিস নয়, একটা ছবি বার-বার উঁকি দিয়ে যায় মনের কোণে,—দিন কয়েক আগে সকালের দিকে দোকানের মাল আনতে যাচ্ছিল সহরে, নতুন সরকারী রাস্তার পাশের আমবাগানটার কাছে আসতেই হঠাৎ খেঁদির সাথে দেখা হয়ে গেল,—অনেক দিন বাদে দেখা হোল, বছর খানেক তো হবেই কিন্তু কি রূপান্তর হয়েছে ওর! সেঁচিড়ে কতকগুলি কলমি শাক, হাতে কতকগুলো শালুক বোধ হয় খাবার জন্যে নিয়ে যাচ্ছিল. চোখে চোখ পড়তেই এক ঝলক হেসে উঠল খেঁদি, গোপীচাঁদের বুকের রক্ত কেন জানি হঠাৎ চলকে উঠল। বলল—তোকে তো একদম চেনাই যায় না,—বেশ—

খেঁদি সে কথার জবাব দিল না, শুনলও না শেষ পর্যন্ত। লঘু পদে দৌড়ে বাগানের ভিতর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। সারাটা পথ তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে কেটে গেল গোপীচাঁদের। পরের দিন আবার এলো সেই বাগানের পথে ঠিক সময়ে, তার পরের দিন আবার, পর পর বেশ কয়েকটা দিন ঐ পথে, পসরা যাবার জন্য নয়, খেঁদির জন্য,—ওর সেই মিষ্টি হাসিটা দেখার জন্য, কিন্তু এর আগেও তেমনি কোন দিন দেখা পায়নি একদিনও তেমনি বুঝা গেল। বহুক্ষণ সাইকেল নিয়ে রাস্তার এ মাথা ও মাথা করার পরও নিরাশ হয়ে ফিরে এসে বসতে হয়েছে দোকানে।

আরো দিন কয়েক বাদে একদিন সন্ধ্যের পর দোকান বন্ধ করে উনুনের উপর ভাতের হাঁড়িটা বসিয়ে দিয়ে নিত্যকার মত টাকা পয়সার হিসাব লিখছিল গোপীচাঁদ হঠাৎ দরজায় শব্দ হোল।

ঠক্—ঠক্—ঠক্।

গোপীচাঁদ গ্রাহ্য করল না। একবার কান খাড়া করে কিছু না শুনতে পেয়ে আবার কাজে মন দিল, কিন্তু আবার সেই শব্দ।

ঠক্—ঠক্—ঠক্।

উঠে দাঁড়িয়ে টাকা পয়সাগুলো সরিয়ে রাখল গোপী-চাঁদ, তার পর দরজাটা খুলতেই অবাক হল, একি খেঁদি! বিশ্বাস হল না প্রথমে। একি সম্ভব! এত দিনে আগের সেই ঘটনার কথা গোপীচাঁদ প্রায় ভুলেই গিয়েছিল কিন্তু এই মুহূর্তে আবার ঝঙ্কার দিয়ে উঠল মনের তারে। বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেলে আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে বলল—কিরে অবাক করলি তুই—।

কথা শেষ হতে দিল না খেঁদি বলল—বড্ড বিপদে পড়ে এসেছি গুঁপিদা একটা উপকার করবে?

—কি বল নিশ্চয় করব!

—এই ঠোঙা কটা রাখতে হবে।

পৌষ মাসের দারুন শীতে বুকে আঁচল চাপা দিয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছিল খেঁদি, এতক্ষণে সেদিকে নজর পড়ল গোপীচাঁদের। বলল—আর ভিতরে আয় যা শীত পড়েছে বাবুবা!

খেঁদি ঘরে ঢুকলে গোপীচাঁদ বিস্মিত হয়ে বলল—তুই আবার ঠোঙা বাঁধিস নাকি?

—হ্যাঁ নইলে যে খাওয়া জুটবে না।

—কেন ষষ্ঠীদা তো শুনি আজকাল ভাল আয় করেন।

—করলে কি হবে আবার যে বে' করেছে নইলে—.

—ও তোর নতুন মা বুঝি ভালো নয়?

—তা হলে কথাই ছিল মা ওর জন্যেই আমাদের এই দশা,—ওর জন্যেই দাদা বাড়ী ছেড়ে পালিয়েছে, এখন আমিই ভুগছি, এই পয়সা দিয়ে দিতে হবে তবেই খাওয়া নইলে কপালে অশেষ দুর্গতি, গোপাল কাকুর দোকানে গিয়েছিলাম সেখানেই দিই কিন্তু বললে যে আমার আর লাগবে না তাই।—

—ও তা ঠিক আছে দে, গোপীচাঁদ হাত বাড়িয়ে ঠোঙাগুলো নিয়ে ওজন করে দাম দিয়ে দিলে পয়সা হাতে পেয়ে খেঁদি আর দাঁড়ায় না মোটেই, অন্ধকারে পিছনের দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো মুহূর্তে। গোপীচাঁদ অপলক নেত্রে চেয়ে থাকে সেদিকে, এদিকে

উনুনে যে কাঠের জ্বালানী পুড়ে শেষ হয়ে নিভে গেছে সেদিকে কোন খেয়াল নেই।

কালের নিয়মে সকাল হয়, দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা নামে ধরাতলে গোপীচাঁদ বসে থাকে পথ চেয়ে এই বুঝি এলো ও, ডাকল আবার আঙ্গুলের ইশারায় ঠক-ঠক-ঠক, কিন্তু না, সবই গোপীচাঁদের কল্পনা, সে আসে না. ডাকে না 'গুপিদা' বলে, দিন চলে যায় গড় গড়িয়ে আঁধারের অন্তরালে। শান্তি পায় না গোপীচাঁদ। দোকানে বসে কেবল উসখুস করে, ভুল হয় বারবার পদে পদে, কিন্তু বৃথা হয় না গোপীচাঁদের পথ চাওয়া, খেঁদি আসে ঠিকই তবে সেটা অনেক দেরীতে নয়ন কি দশম দিনে, না ঠিক দিনেও নয়—রাতে। ঠিক আগের রাতের মত। তবে এবার ডেকে ঘরে তুলতে হল না ওকে, দোর খোলার সঙ্গে সঙ্গে সে ঘরে ঢুকে বসল। অনন্ত আশা গোপীচাঁদের মনে। এবার সে কিছুতেই অতো সহজে ছেড়ে দিতে পারবে না ওকে। তার যে অনেক কথা আছে। খেদির হাত থেকে ঠোঙাগুলো নিয়ে পয়সা গুনতে আরম্ভ করল গোপীচাঁদ। খেদি দাঁড়িয়ে রইল পাশে। গোপীচাঁদ সুযোগ খুঁজতে খুঁজতে খেঁদির হাতের উর্ধদেশে গোটাদুই কালোমত দাগ লক্ষ্য করে হঠাৎ যেন আঁৎকে উঠল ;

—ওগুলো কি করেছেরে খেদি ?

খেদি লজ্জা পেয়ে ঢেকে নিয়ে বলল—ও কিছু নয়।

—কিছু নয় কিরে এই তো আরো ! গোপীচাঁদ এবার ঘাড়ের কাছে আরো একটা দৃশ্য লক্ষ্য করে প্রায় চিৎকার করে উঠল।

ক'কিয়ে কেঁদে উঠল খেঁদি—মরে গেলুম গুপিদা, মরে গেলুম নতুন দার অত্যাচারে। পান থেকে চুন খসলেই এমনি ছ্যাঁকা দেবে—সারা দেহ কাঁঝরা হয়ে গেছে দাগে।

গোপীচাঁদ ক্রোধ জড়িত কণ্ঠে বলে—কেন তুই কিছু বলতে পারিস না, কেবল বোকার মত সহ্য করিস জানিস প্রতিবাদ না করলে পেয়ে বসে !

—কি করব বল ? সেটা যে একটা দস্যি !—কোথাকার কোন দালালের মেয়ে, বাবাকে সুদ্ধু তাড়া করে।

গোপীচাঁদ আর কিছু বলে না। সমবেদনায় ওর সারা অন্তরটা ভরে ওঠে। হাত বাড়িয়ে পয়সা কটা দিয়ে বলে—আবার আসিস।

খেঁদি কোন সাড়া দেয় না, আঁচল দিয়ে ভেজা চোখের পাতাদুটোকে মুছতে মুছতে অদৃশ্য হয়ে যায় অন্ধকারে।

আবার এল খেঁদি দিন তিনেক বাদে। এবারো সেই একই চেহারা, হাতে কতকগুলি ঘরের কাগজের ঠোঙা কড়ের পরের কাশফুলের মত কেশ, পরনে শতছিন্ন বস্ত্র যার সাহায্যে দেহের এক অংশ আবৃত করতে গেলে অন্য অংশ হয়ে ওঠে বিকশিত। এসেই কেঁদে ফেলল, যেন কতদিনের হারিয়ে যাওয়া স্নেহের আশ্রয় পেয়েছে ও—মেরে ফেললে গুপিদা, মেরে ফেললে আমার দেহ চুলগুলো পুড়িয়ে কি করেছে !'

গোপীচাঁদ ক্যাল ক্যাল করে চেয়ে রইল ওর দিকে, —সত্যি মাথার এক পাশ থেকে কতকগুলো চুল পুড়ে গেছে। সমস্ত মাথাটা এখন ভীষণ বেমানান লাগছে। একপাশে কোমর পর্যন্ত ব্যপ্ত দীর্ঘ চুল আর অন্য পাশের গুলো প্রায় ঘাড়ের কাছাকাছি উঠে গেছে। হাত বাড়িয়ে গায়ে হাত দিয়ে সান্ত্বনা দিতে পারল না গোপীচাঁদ, একটু সামলে নিয়ে বলল—কাঁদিসনি খেঁদি চুল তোর আবার হবে, ওকি আর চিরকালই ছোট্ট থাকবে, তুই কাঁদিস নি।

খেঁদি সান্ত্বনা পায়। চোখ মুছে বলে—ওকি আর এক দুদিনে বড় হবে, কত বছর লেগে যাবে এমনিতে তো তেলই পড়ে না মাথায়।

প্রসঙ্গ চাপা পড়ে যায়। এক সময় গোপীচাঁদ পয়সা-গুলো মিটিয়ে দিতে দিতে বলে—আচ্ছা খেঁদি তুই যে রাতে আসিস তোর নতুন মা কিছু বলে না ?

—বলবে কি সেইতো পাঠায় বলে যেমন করে পারিস পয়সা আমার চাই-ই।

—কিন্তু কেউ যদি দেখে ফেলে ?

—কে দেখবে ?

—কেন মোড়ের ক্লাব ঘরের ছেলেগুলো ?

—অতোই সোজা আসিত' ওদিকে থেকে আসিই না পিছনের আমবাগানটা আমার পথ।

—ইস্! ঐ জঞ্জালের মধ্য দিয়ে আসিস কোন দিন সাপের ছোবলেই বেঘোরে প্রাণটা যাবে!

খেঁদি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাতের পয়সাগুলো নাড়তে নাড়তে বলে ঘাই গুণিনা ওদিকে আবার হাঁড়ি চাপাতে হবে উনুনে।

গোপীচাঁদ বাধা না দিয়ে চোর খুলে ঘরে ঢোকায়।

এর পর থেকে প্রায় রোজই আসত খেঁদি। কোনদিন ঠোঙা থাকত কোন দিন বা থাকত না। এসে কাঁদত গোপীচাঁদের কাছে। শোনাত নতুন আর নিত্য নতুন উৎপীড়নের কাহিনী। গোপীচাঁদ সান্ত্বনা দেয় রোজ নানা কথায়, পয়সাও দেয় ঐ সঙ্গে প্রতিদিন বিদায়ের মুখে।

এমনি এক রাতের সুযোগ নিয়ে গোপীচাঁদ জিজ্ঞাসা করল—আমার কেমন লাগেরে খেঁদি?

খেঁদি ফিক করে একটু হেসে লজ্জায় মুখ ঢাকে।

গোপীচাঁদ আবার বলে—চল আমরা এ গাঁ ছেড়ে চলে যাই।

খেঁদি অবাক হয়,—কোথায়?

—শহরে! জবাব দিয়ে গোপীচাঁদ ক্ষুপির স্বল্প আলোয় আলোকিত খেঁদির মুখখানার দিকে তাকিয়ে থাকে।

—সেখানে নাকি অনেক লোক, অনেক গাড়ী ঘোড়া —সব নাকি কেমন।

—হ্যা হ্যা। গোপীচাঁদের প্রত্যক্ষ কথা জগতের সঙ্গে মিলে যাওয়ায় ও আর তর সইতে পারে না, বলে—যাবি? সে তারি সুন্দর জায়গা।

খেঁদি ভীত কণ্ঠে বলে.—কিন্তু আমি যে একা—যদি হারিয়ে যাই অতো লোকের ভীড়ে।

—একা কেন রে আমিও ত থাকব।

—তুমি তো দোকানে থাকবে।

—ও সেই কথা। গোপীচাঁদ হেসে উড়িয়ে দেয় ওর ভয়ের কারণ।—সব ঠিক হয়ে যাবে দেখবি একবার গেলে আর ফিরে আসতে ইচ্ছে করবে না এই গাঁয়ে। এমনি আরো কত কথা হয় দুজনার মাঝে প্রায় রোজই। গোপীচাঁদ যেন আর কোন কারণেই অপেক্ষা করতে রাজি নয়।

ওরা নতুন জীবন সুরু করেছে শহরে। ছোট্ট দুখানা ঘর, গড়ে তুলেছে একটা সুখের নীড়। গোপীচাঁদের যেন আনন্দ ধরে না, গাঁয়ের ব্যবসা আবার নতুন করে সাজিয়েছে এখানে। খেঁদিকে কিনে দিয়েছে স্নো, পাউডার, সাবান, এসেন্স আর দিয়েছে সাধ্যমত গয়না গড়িয়ে। প্রায় নিত্য-নতুন সাজ এনে সাজায় খেঁদিকে। গ্রামে ছেঁড়া কাপড়, রুক্ষ কেশ আর অনাহার অর্ধাহারের মাঝে যে রূপ চাপা পড়ে ছিল তা যেন আজকাল উপচে পড়ছে। গোপীচাঁদ তাকিয়ে দেখে আর নিজেকে হারিয়ে ফেলে ওর মধ্যে। কোন কোন দিন গাড়ী ভাড়া করে বেড়াতেও যায় শহর ছাড়িয়ে দূরে যায়ে, কোন দিন বা ওকে নিয়ে যায় সিনেমায়। রাস্তায় এক সঙ্গে চলতে চলতে কখনো অন্য মেয়েদের সঙ্গে খেঁদির তুলনা করে দেখে।

কিছু দিন হল শহরে একটা নতুন সার্কাস এসেছে। বেশ সাড়া পড়ে গেছে লোকজনের মাঝে অল্প জানোয়ারের এমন কতকগুলো খেলা দেখাচ্ছে যা দেখতে

দেখতে সত্যিই গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে। সেদিন ওরা দুজনে চলেছে সার্কাস দেখতে। রাস্তায় রাস্তায় আলো জ্বলে উঠেছে। ঝলমল করছে চারদিক। দেয়ালে দেয়ালে পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে গেছে সব, শুধু সার্কাস আর সিনেমার ছবি। নতুন বইয়ের একটা ছবি দেখতে গিয়ে একটু দেরি হয়ে গেছে গোপীচাঁদের। রাস্তায় দারুণ ভীড়। চেয়ে দেখে খোঁদি পাশে নেই, হন্‌ হন্‌ করে হেঁটে চলেছে একটু দূরে। গলাটা একটু চড়িয়ে গোপীচাঁদ ডাক দিল—এই খোঁদি,—খোঁদি।

খোঁদি সে ডাক শুনেও শুনল না, পা যেমনি চলছিল তেমনই চলতে লাগল। গোপীচাঁদ তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে ওর ডান হাতটা ধরল—কিরে হারিয়ে যাবি যে!

খোঁদি মুহূর্তে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ভ্রূকুটি হানল—অতো বোকা নই, খবরদার আমায় ও নামে যেন ডাকা না হয়, লোকেরা কি মনে করে বলত; অমন রূপ যার তার নাম কিনা খোঁদি! ছি! অতো ন্যাংলামিই বা কেন? সবার মাঝে হাত ধরে হয় যে! এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে ঘুরে দাঁড়াল খোঁদি।

গোপীচাঁদ থমকে যায়,—কি নামে ডাকব রে তবে!

—যা। খোঁদির কণ্ঠে বেশ গাম্ভীর্য। আর অমনি চোরাবী ভাবে তুই তোর বোল না কথা যদি বলতে হয় তবে একটু কষ্ট করে তুমি বলবে।

—তুই অতো কথা শিখলি কোথারে! গোপীচাঁদের কণ্ঠে চরম বিস্ময়।

খোঁদি ওর কথার কোন জবাব দেয় না।

গোপীচাঁদ যতো ভাবে ততোই অবাক হয়। ওর মধ্যে এতো পরিবর্তন এলো কেমন করে! ওর দিকে একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখে,—সত্যিই বেশ সুন্দরী মেয়ে ও; চাল চলনেও কেমন একটা চটুল ভাব এসেছে। দেখলে কে বলবে যে এ লেখাপড়া জানে না। নিজের দিকে একবার তাকিয়ে দেখল গোপীচাঁদ, না একই রকম আছে সে। এতটুকু পরিবর্তন হয়নি কোথাও। ভেবে কূল কিনারা পায় না এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে সহরের আবহাওয়া যেন ওকে করে ফেলেছে খোঁদি। না, এবার ওর সংশোধন করে নিতে হবে, খোঁদি যেন আর কখনো এ ব্যাপারে চমকে দিতে না পারে। ভাবতেই ভাবতেই পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করে ধরাতে গেল, হঠাৎ খেয়াল হল ছি! বিড়ি খাওয়া তো চলবে না—সিগারেট চাই যে। সঙ্গে সঙ্গে দোকান থেকে এক প্যাকেট কিনে ঘরের দিকে পা বাড়াল।

খোঁদি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘুরে ঘুরে দেখছিল খাঙের কাছ থেকে কাপড়ের ভাঁজটা আগাগোড়া ঠিক আছে কিনা। গোপীচাঁদ নিজের সদ্যে স্টাইল দেখাবার জন্যে সিগারেটটা ঠোঁটে চড়িয়ে ঘরে ঢুকে খোঁদির পিঠে আদর করে আস্তে একটা চাটি দিয়ে বলল—বাঃ বেশ মানিয়েছে তো এই শাড়ীটায়।

আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিল বাধা পড়ল খোঁদির কণ্ঠ ঝঙ্কারে—ধ্যাৎ কি যে ইয়ার্কি কর! এতো কষ্টে ভাঁজটা ঠিক করলাম নষ্ট করে ফেললে তো!

গোপীচাঁদ ভড়কে গেল। উত্তর জোগাল না মুখে, অপরাধীর মত চুপ করে একবার কাপড়ের ভাঁজটার দিকে নজর ফেলে পাশের ঘরে চলে গেল।

আরো কয়েক দিন পরের ঘটনা। গোপীচাঁদ দোকান থেকে একখানা পছন্দ মত কাপড় কিনে বাড়ী ফিরছিল। মনের মাঝে আনন্দ হিল্লোলিত হচ্ছে। কাপড় পেয়ে খোঁদি নিশ্চয় মহাখুসী হবে। হাসি মুখে ওর পছন্দের তারিফ করবে,—নতুন জিনিস পেলে মেয়েটি ও বরাবর করে থাকে।

ঘরে ঢুকে কাপড়খানা খোঁদির হাতে তুলে দিল। খুসির প্লাবন বয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। গোপীচাঁদ দিল ধরিয়া মেজাজে একটা বেতের মোড়া দখল করে সিগারেট ধরাল, কিন্তু অকস্মাৎ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত হোল। খোঁদি প্যাকেটটা খুলে কাপড়খানা দেখেই চেঁচিয়ে উঠল—এই কাপড়। মোটা!—আর একি ছিচ্ছিরি ছুঁচি,—আমি পরব না এ কাপড় ভদ্র সমাজে এসব অচল আজকাল!

—আচ্ছা রেখে দাও বদলে আনব্‌খন। নিতান্ত বিরস ভাবে কথাকটি গোপীচাঁদের স্বর যন্ত্র থেকে বেরিয়ে এল।

—কাপড় ছেড়ে যখন তখন টাকাটা আমার হাতে দিলেই তো কিনে নিতে পারতুম। আরও কি যেন বলার ইচ্ছে ছিল খেঁদির! কিন্তু বেগুলো ছিতের গোড়ায় এসে আটকে গেল, বাইরে কার যেন পায়ের শব্দে।

বলা বাহুল্য এই দমদমের মধ্যে অনেকের সাথেই পরিচয় হয়েছিল গোপীচাঁদের। অবসর সময়ে অনেকে আসত। গল্প সল্প হোত। বেশ ভালোই লাগে এদের কথাবার্তা আচার আচরণে। এদেরই একজন উপেনবাবু।

গোপীচাঁদ বাইরে দৃষ্টি ফেলতেই নজরে পড়ল উপেনবাবু নতুন ঝকঝকে কোটপ্যান্ট পড়ে হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকছেন। হাতে ঝোলা মত ওটা কি! ও ভ্যানিটি ব্যাগ, মনে পড়ল একটু চেষ্টাতেই। ঘরে পা দিয়েই উপেন বাবু এগিয়ে গেলেন খেঁদির কাছে,—এই যে তোমার ব্যাগ বৌদি, পছন্দ হয়েছে তো?

খেদি হেসে সম্মতিসূচক মাথা হেলাল।

গোপীচাঁদের পাশের আসনটার জায়গা নিয়ে উপেনবাবু হাসলেন—কেমন আছেন গোপীচাঁদ বাবু?

—এই এক রকম। গোপীচাঁদ একমুখ হোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে এবার একটা মামুলি প্রশ্ন করে—আপনার কারখানা আজ বন্ধ নাকি?

—না।

—তবে এত তাড়াতাড়ি ছুটি যে?

—আজ যে শনিবার।

—'ও'। লজ্জা পেল নিজের বেহিসেবীতার জন্য গোপীচাঁদ, বারের বারটাও খেয়াল নেই। মোড়া ছেড়ে পাশের ঘরে ঢুকে টিনের বাক্সটা থেকে কটা টাকা বের করল। নিজের পোষাকের একটা চেহারা বদলান দরকার। উপেনবাবুর বেশই তার আর একটা ভুল ধরিয়ে দিয়েছে। কল্পনায় একবার নিজের গায়ে কোট প্যান্ট চড়িয়ে দেখল। বাঃ! বেশ দেখাচ্ছে তো। পাশে খেদি এসে দাঁড়িয়েছে সেই হাসি হাসি খুসি খুসি চেহারা নিয়ে।—কিনতেই হবে কোটপ্যান্ট, দৃঢ় সঙ্কল্প করে উঠে দাঁড়াতেই কপালোকের ঘুমপতন হল। খেঁদি আঁচল দুলিয়ে ঘরে ঢুকল। হাতের ভ্যানেটি ব্যাগটা দোলাতে দোলাতে হাসি মুখে আপনারের সুরে ডাকল—'ওগো।'

গোপীচাঁদ পেছন থেকে মুখ তুলে কিরে চাইল।

—কাপড়টা পছন্দ হয়নি বলে রাগ করেছ! খেঁদি গোপীচাঁদের গা ঘেসে এসে দাঁড়াল। গোপীচাঁদ নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে রইল খেঁদির চাঁদ মুখের দিকে।

—কি অমন করে দেখছ?

—'রূপ'. গোপীচাঁদ রসিকতা দাবলাতে পারলনা।

—এখন নয় আগে মুচকি হাসল খেঁদি।—রূপের আলো আঁধারে কোটে ভালো। খেঁদি গোপীচাঁদ দুজনেই এবার চোখে চোখ রেখে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল যেন ওরই মাঝে খেঁদির কথাটার অর্থটা বুঝে নিল দুজনে। হাসতে হাসতে খেঁদি হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলল—আমি একটু উপেনবাবুর সাথে বাইরে যাচ্ছি। খেঁদি আবার হাসতে লাগল আর ওটুকু মিলিয়ে যাবার আগেই বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। উত্তরের জন্য এক মুহূর্তও নষ্ট করল না। গোপীচাঁদ অবাক হয়ে গেল। কিছু বলতে পারল না মুখে। বাকহীন হয়ে ওদের চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ তারপর দৃষ্টিপথের অন্তরালে চলে গেলে নিজেও ঘর ছেড়ে বাইরে এল।

নিজের জন্য কোট প্যান্ট আর খেঁদির শাড়ীখানা নিয়ে যখন বাড়ী ফিরল তখন সন্ধ্যা উৎরে গেছে অথচ খেদি তখনো ফেরেনি। ঘরে ঢুকে আলো জ্বালিয়ে কোটপ্যান্ট পরে অপেক্ষায় রইল গোপীচাঁদ কিন্তু কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে টেরই পায়নি। যখন ঘুমভাঙ্গল তখন বাইরে বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। বিছানা ছেড়ে উঠে ডাকল গোপীচাঁদ—স্বপ্না! স্বপ্না! শূন্য ঘর সে ডাক আবার ঘুরিয়ে দিলে ওর কানেই। ঘর ছেড়ে বাইরে এল পথে, কিন্তু উপেন বাবুর বাড়ী কোথায়? কাকে জিজ্ঞাসা করবে, কোন কারখানাই বা সে কাজ করে। কিছুইতো জানা নেই। ঘরে ফিরল আবার। বুক ভাসাল চোখের জলে। রাত এগোল, চারদিক নিঝুম হলো, গোপীচাঁদ আবার পথ ধরল—সেই আঁকা বাঁকা ধূলি ভরা পথ।

ট্র্যাজেডির আদিকথা

জীবনকৃষ্ণ শেঠ

গ্রীক প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান নাট্যকলা, বিশেষ করে ট্র্যাজেডি কিন্তু, এই নাট্যকলা আকস্মিক-ভাবে একদিনে গড়ে ওঠেনি। বিবর্তনের বিচিত্রপথে তার পূর্ণায়ণ। প্রকৃতি ক্রমবিকাশের মুখে ক্ষুদ্রকে বৃহৎ তুচ্ছকে মহৎ এবং কুৎসিতকে সুন্দর করে গড়ে তুলেছে. ঠিক তেমনি করে সামান্য উৎসবগীতি কালান্তরের পথ বেয়ে নাট্যকলার পরমরূপ ট্র্যাজেডিতে পরিণত হয়েছে।

ট্র্যাজেডি শব্দের আভিধানিক অর্থ ছাগসঙ্গীত। ('Its proper sense is goat-song, because in early times a goat was the prize or because the actors were clothed in goat-skins' It was 'invented by the Dorians and at first of lyric character; then transplanted to Athens, where it assumed its dramatic from"—G. K. Eng. Lexicon Liddell of Scott.) সংক্ষেপে প্রাচীনকালে অভিনেতাদের একটি ছাগ উপহার দেওয়া হতো বা তাঁরা ছাগচর্মাবৃত হয়ে অভিনয় করতেন। এর থেকেই ট্র্যাজেডি বা ছাগসংগীত এই অভিধা। প্রথমে ডোরিসের অধিবাসীগণ এই সংগীত আবিষ্কার করেন। পরবর্তীকালে এ সংগীত এথেন্সে আনীত হয় এবং নাটক রূপ ধারণ করে।

আরও গোড়ার কথায় আসা যাক। প্রায় সব দেশেই শিল্প সূচনা ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত এবং ভক্তবৃন্দের ধর্মোন্মাদনাই শিল্পসৃষ্টির মূল প্রেরণা। গ্রীসে তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। যে দেবতার উদ্দেশে এই শিল্পার্ঘ্য রচনা, যাঁর উৎসবকে কেন্দ্র করে বা যাঁর পূজারতির উন্মাদনা থেকে এই নাট্যশিল্পের

It is certain that in Gracco-Roman tradition generally the goat was especially associated with Dionysus and almost certain that the dismembered kid or goat of which we hear so often, was the representative or the embodiment of the God (L. R. Farnell—The cults of the Greek State-Encyclopaedia Britannica.)

উদ্ভব বিকাশ এবং পরিণতি তিনি বলেন দায়োনিসাস। গ্রীক দেবসংঘে তিনি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন। অনেক পরে অভিজাত দেববর্গের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। প্রথমযুগে এই সম্মানের তাঁর ছিল না। হোমারের মহাকাব্যে তাঁর কথা মাত্র কয়েকবার (চারবার) উল্লিখিত। সেখানে তিনি নিষ্পদস্থায়ী অলিম্পীয় এপিয়া মাইনরের ফ্রিজিয়া ও লিডিয়া দেশবাসী অর্ধ গ্রীসীয় সম্প্রদায় থেকে এসেছেন।২

দায়োনিসাস প্রধানতঃ গ্রাম্যদেবতা—তরুলতা ফল ফসলের অধিকর্তা। তাঁর নামের সংগে জড়িত দ্রাক্ষা ফলই তাঁর একমাত্র দান নয়। সকল প্রকার কোমল রসাল ফলও তাঁর সৃষ্টি। তাই তাঁকে বলা হয়েছে ফলদান (the Fruitful) পত্রল (the leafy) অথবা প্রস্ফুটন (the Flowering)। আবার তিনি উপকারক (the Benefactor) ও উপদেষ্টা (the Councelor) তিনি মানবজাতিকে দ্রাক্ষা এবং অন্যান্য ফলের চাষ শিখিয়েছেন। বসন্ত ঋতু তাঁর প্রিয়। তিনিই বসন্তকালে শীতের জাড্য এবং নিদ্রা থেকে পৃথিবীকে জাগিয়ে তোলেন—সজীব সতেজ ও শস্যশ্যামল করে তোলেন। তাই তাঁকে সৃজনীশক্তির দেবতারূপে গ্রহণ করা হয়েছে আর সৃজনী শক্তির প্রতীক ফলনেন্দ্রিয় (Phallus) তাঁর পূজার বিশেষ উপকরণ।৩

"The phallus as symbol of reproduction, appears in the rites of Demeter, Dionysus, Hermes, even of the chaste Artemis—The Gods of Greece—Ch. III. Page 178. The life of Greece—will Durant.)

প্রধানতঃ তিনি সুরার আবিষ্কর্তা। দ্রাক্ষারসের দেবতা। তাঁর অমূল্য দান দূর করে দুঃখ যন্ত্রণা—জাগিয়ে তোলে সতেজ উল্লাসতা ও আনন্দ তাই তিনি ত্রাতা (The Deliveror)। তিনি মুক্তিদাতা (The Liberator)। তাঁর মদের প্রভাবে বনাপ্রকৃতি পোষমানে—কাঠিন্য ও বিদ্বেষভাব শিষ্টতা এবং বন্ধুতায় মসৃণ হয়। তাঁর বিষ টেনে নিয়ে চলে নিংস্ব নেকড়ের দল। বনেরা করে রসাস্বাদন। তাদের প্রকৃতি মৃদুতা প্রাপ্ত হয়—তারা উচ্ছৃংখলতা ত্যাগ করে।

সুরা প্রেরণা আনে নৃত্য ও গীতের তাই দায়োনিসাস ও এ্যাপোলোর মত সংগীত ও কবিতার প্রেরণাদাতা। কিন্তু দায়োনিসাস ও এ্যাপোলোর অনুপ্রেরিত কবিতার মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে। এ্যাপোলো আনে শুভ্র রচনার প্রেরণা যা বীণার গভীর সুরে বেজে ওঠে শান্ত এবং সংযত যার মহিমা। আর দায়োনিসাসের সংগীত বাঁশির সুরে সুরের বাধাহীন বিচিত্র লহর তোলে। অনুদাত্ত উদাত্ত স্বরিতে বিভিন্ন অনুভূতি—আনন্দ থেকে বেদনা, আকাঙ্ক্ষা থেকে কামনায় ও আবেগ শত ঝংকারে ফেটে পড়ে দুর্বার এর প্রবাহ। তাই দায়োনিসীয় যৌথ সংগীত নবতর

---

২. It is generally recognised that Dionysus was not one of Homer's aristocratic olympious, but an aboriginal Thracian or Thraco—Phrygian God whose worship stole in early times into Greece and found response among the village population.

(Encyclopaedia Britannica.)

Only late in his career was Dionysus received into olympus. In Thrace he was the God of liquor brewed from barby and was known as Sabazius, in Greece he became a God of wine, the nourisher and guardian of vine ; he began as a Goddess of fertility, became a God of intoxication and ended as a son of God dying to save mankind.

Ch. VIII, The Gods of Greece—The life of Greece will Durant—Page 186.

৩. Ch I—The Tragic Drama of the Greeks : A. E. Haigh. M. A. Pages—56

বিচিত্র শিল্পকে সম্ভব করে তুলেছে, সৃষ্টি হয়েছে ট্র্যাজেডি, কমেডিও স্যাটায়রিক নাটক।

দায়োনিসাসের বিচিত্র স্বরূপ ও অভিধানের কথা বলি। সেখানে দেখা যায় যে তিনি বহুবর্ণ পরিচ্ছদ পৌরাণিক জীববারা পরিবেষ্টিত—তারা প্রকৃতির সতেজ সত্তার ও মানব মনের বিভিন্ন ভাব ও আবেগের সজীব প্রতীকা—সুরা, শস্য ও সংগীত দেবতার যোগ্য পরিচয়। তাদের মধ্যে প্রধান হলো বনপর্বতবাসী সাটার (Satyr) অদ্ভুত পশুমানব। তাদের দেহের নিম্নার্ধভাগ ছাগ বা অশ্ব সদৃশ। তারা ভীষণস্বভাব কামার্ত, কিন্তু সতেজ, চঞ্চল প্রকৃতি ও আমুদে—তাদের নাম আইভি, রেবেল, ফান, লাস্টফুল ডিথিরাম্ব (Ivy, Rebel Fun Lustful and Dithyramb) থেকে তাদের প্রকৃতির পরিচয় সহজেই পাওয়া যাবে।

উপাসিকার দলও (Baccranles) তাদের সংগে আছেন। পোশাক তাঁদের মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে আর কেশ তাদের এলায়িত। করতাল বাজিয়ে নেচে চলেছেন বীথির তালে তালে। আরও আছেন সাইলেনি (Sileni) তাঁদের স্থূল এবং লোমশ দেহ নিয়ে —মদ্য এবং কামার্ত মূর্তি নিয়ে। তাঁরা প্রবীণের দল—বয়োবৃদ্ধ স্যাটার। আসব শক্তির রূপ নিয়ে আছেন ম্যাণ্টার, অরণ্যদেব প্যানও সেখানে অনুপস্থিত নন। বিবাহিতা নারী পরম প্রভু তাঁকে ফলোপহার দিচ্ছেন। শান্তি দেবী আছেন হাতে নিয়ে প্রাচুর্যের পানপাত্র। শিরোদেশে পাখা মেলে দিয়েছেন প্রেম ও বাসনার যুগলমূর্তি। মাঝে মাঝে দলের মধ্যে দেখা যায় সংগীতের দেবীকে (Muses) ঋতুর অধিষ্ঠাত্রীকে (Hours) আর সৌন্দর্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীত্রয়কে (Graces)

এই হল দায়োনিসাসদেবের লোকায়ত সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এবার দায়োনিসীয় উৎসবের কথা বলা যাক। এথেন্সে যে উৎসব অনুষ্ঠিত হতো তার রূপ ছিল বিবিধ: বসন্তোৎসব ও শীতোৎসব। বিগত বৎসরের ফলপাকের উপযুক্ত হয়েছে—ধরণী জাগছে নূতন প্রাণের জীবনে—কূলের ভারে অবনমিত তরুলতা। দেবতো এই দেবতারই প্রসাদে—এল বসন্তোৎসব। তারপরে শীতোৎসব। পরিশ্রমের কাল হলো শেষ—দ্রাক্ষা-চয়ন করে শেষ হয়ে গিয়েছে। কলভারও তো লক্ষিত। তাই এল শীতের মেলা। এথেন্সের গ্রামে গ্রামে এই যে উৎসবের আয়োজন ছিল এ সবই গ্রীক নাটকের মূলাধার। গ্রামের মেলার মতো এখানে নরনারীর সমাবেশ হতো। যে দেবতা ধরণীকে পর্যাপ্ত পুষ্পা-ভরণা করেছেন,—করেছেন উর্বরা, শস্য শ্যামলা, প্রমত্ত করেছেন সকল এ উৎসব তাঁকে ঘিরেই অনুষ্ঠিত। সমবেত যাত্রীদল দেবতার বেদীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করে—বেদীমূলে ছাগ বলি দেওয়া হবে। স্বর্ণাভরণভূষিতা একটি কিশোরী পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে মাথায় তার পবিত্র পাত্র তাতে আছে পিষ্টক, বলির ছাগের জন্য মালা আর ছুরিকা। আর আর যাত্রী চলেছে বন্য উপচার নিয়ে। তাদের কাছে আছে দ্রাক্ষা, উদুম্বর আর মদ্যের কলস। দায়োনিসাস দেবের প্রতীক জনমেদ্বির বহন করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।[৪] বলিদানের সময় দেবোদ্দেশে নৃত্য গীতের অর্ঘ্য দেওয়া হল—তারপর সুরু হল গ্রাম্য নৃত্য, ক্রীড়া কৌতুক তৈলাক্ত ছাগ চর্মের উপর। সুরাপান আর উল্লাস মত্ততার মধ্যে উৎসব হল শেষ।

Will Durant তাঁর The Life of Greece গ্রন্থে একটি বর্ণনা দিয়েছেন: বৎসরের নবম মাসে (Elaphebolion) দায়োনিসিয়া মহোৎসব অনুষ্ঠিত হতে ৫৩৩ খৃঃ পূর্বাব্দে পিসিস ট্রেটাস এর প্রবর্তন করেন। এই বৎসরেই মেলপিস উৎসবের অংগস্বরূপ নাট্য-

৪. Even the Great Dionysia, the religious festival at which the Greek drama was played, was introduced by phallic processions to wheel Athenian colonies piously sent phalli. An inventory of the Gods - The Gods of Greece—The life of Greece—will Durant Page 178

ভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। মার্চের শেষ—আমাদের দেশে চৈত্র মাসের মাঝামাঝি বাতাসে বসন্তের আমেজ—শান্ত সমুদ্র নাব্য—নৌযাত্রার উপযোগী। উৎসব এবং নাট্যাভিনয় দেখবার জন্য দেশ বিদেশ থেকে বণিকবৃন্দ—নানাজাতীয় দর্শক এথেন্স নগরীতে ভিড় জমিয়েছে। দোকান-পাট বন্ধ—আদালতও বন্ধ হলো। কয়েদীরা মুক্তি পেয়েছে, উৎসবে তারা যোগদান করবে। শোভাযাত্রা সুরু হলো। বিচিত্র সমৃদ্ধ তার রূপ—সকল বয়সের সকল শ্রেণীর সুসজ্জিত নর-নারীর দল চলেছে, দায়োনিসাস দেবের মূর্তি এনে তাঁদের স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ধনী চলেছে রথে—দরিদ্র পায়ে হেঁটে চলেছে। দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত পশুর দল চলেছে অনেক দূর পর্যন্ত এই পশুযাত্রা। এ্যাটিকা থেকে যৌথ সংগীতকারের (chorus) দল এসে পৌঁছিল। গানের আসর জমাতে হবে গানের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হবে। (Ch VII Festivals—The Life of Greece P. 203)

এবার দায়োনিসাসের মূর্তির কথায় আসা যাক। নানা পরিবর্তনের ধাক্কা দিয়ে এ মূর্তি পুরোপুরি রূপ পরিগ্রহ করেছে। প্রথম যুগের মূর্তি স্মশ্রুমণ্ডিত মুখ পাশ্চাত্যসম্ভ্রান্ত। প্রাচীন আংগিকে রচিত। আইভি এবং দ্রাক্ষাপত্রের—ফলের অথবা কৃষিজাত নানাদ্রব্যের মালা দিয়ে সাজানো। বোঝা যায় তিনি গ্রাম্য-কৃষি দেবতা। কিছুকাল পরে যে মূর্তি রূপান্তরিত হয়েছে হস্তপদসমন্বিত পরুষ মূর্তিতে। তাতেও-স্তরে যে পুরুষ মূর্তি দেখা যায় সেখানে পরুষ কঠোরতা নেই আছে নারীদেহের লাবণ্য অবশ্য মুখমণ্ডল সশ্মশ্রু। কেশরাশি বেণীবদ্ধ—অঙ্গ সুগঠিত। প্রাণবন্ত এবং লাবণ্যময় মূর্তি। শেষস্তরে যে মূর্তি দেখা দিল তা শিল্পোৎকর্ষের চরম—তিনি যেন যৌবনের পাত্রে রূপের অমৃত। লাবণ্যের বন্যা বয়ে গিয়েছে। মুখখানি স্বপ্নময়—মদালস। সুরা ও কবিতার যথার্থ প্রতিমা। পরুষ কঠোরতা থেকে কান্ত কোমলতার এই পরিবর্তন এ—যেন গ্রাম্য রুচসংগীতের ট্র্যাজেডি—কমেডির শিল্পোৎকর্ষ পরিণতি কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে এথেন্সে দায়োনিসাসকে ঘিরে দু'রকমের উৎসব অনুষ্ঠিত হতো—একটি শীতোৎসব অন্যটি বসন্তোৎসব। শীতোৎসবের সংগে কমেডির জন্ম কথা জড়িয়ে আছে। বলি-উৎসর্গের ব্যাপারে একদল উল্লাসমত্ত নরনারী (comus) শিশ্নমূর্তি বহন করে দেবতার উদ্দেশে গান গাইতে গাইতে শোভাযাত্রা করে বেরিয়ে পড়তো—এই গানগুলিকে সেইজন্যে বলা হয়েছে phallic songs যৌথ সংগীতের কাঁকে কাঁকে শোভাযাত্রার নেতা উপস্থিতমতো ভাঁড়ামো করে দর্শকদের আনন্দবর্ধন করতেন—কখনও তাঁর ভাষণ হতো একোক্তি, আবার কখনও তিনি অন্যান্য গায়কের সংগে সংলাপ চালাতেন। এই সংগীত ও সংলাপ থেকেই কমেডি জন্মলাভ করেছে।[৫] অবশ্য পরবর্তীকালে এর শিল্পরূপের উৎকর্ষ ঘটেছে। আরিস্ততলও বলেছেন—

It certainly began in improvisations—as did also Comedy, the one (tragedy) originating with the authors of dithyramb, the other with those of the phallic songs, which are still in use in many of our countries

—Poetics IV 12, Butcher.

ট্র্যাজেডির জন্ম হয়েছে বসন্তোৎসবে। এই উৎসবে নূতন মদের পিপে খোলবার জন্যে জনগণ সমবেত হয়েছে তা ছাড়া প্রকৃতির নূতন উর্বরা শক্তিকে নানাভাবে উল্লাসসহকারে অভ্যর্থনা করতে হবে।

৫. Ch I. Early History of Greek Tragedy. The Tragic Drama of the Greeks—A. E. Haigh Page—13.

তাঁদের পরম উপকারক দেবতা ও উৎপাদনের দেবতার উদ্দেশে স্তবগান রচিত হলো—এই স্তব গানের নাম dithyramb।৬ আর এই dithyramb থেকেই ট্র্যাজেডির উদ্ভব। আদি ডিথিরাম্বের সম্ভবত ফ্রিজিয়ার আমদানি। এর সুরের ধরানা ফ্রিজিয়া দেশের এবং বাঁশির সুরে সুরেই এর বিচিত্র লহর।

ডিথিরাম্বের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বা আদির অর্থ জানা যায়নি তবে এটুকু বলা যায় যে এই জাতীয় সংগীত প্রাচীনকাল থেকেই ডায়োনিসাসের সমবেত পূজার সংগে জড়িত। প্রথমদিকে ভাবে ডিথিরাম্বের ল্যাকসোস উপদ্বীপে প্রচলিত ছিল। সেখান থেকে বাঁশরীর সুরে এথেন্সে আসে। বলা হয়েছে যে এ্যারিয়ন এই সংগীতকে করিন্থে আনেন। সমালোচকপ্রবর গিলবার্ট মারে বলেন—

"It was thus merged into the satyr choir of wild mountain goats out of which sprang the earliest from of tragedy"

ডিথিরাম্বে সেই ধরনের অনুষ্ঠান থাকে গোষ্ঠীনৃত্য (choral dance) বলা যায় অথবা সেই ধরণের স্তবগান যা নৃত্যসহ সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হতো (that their poetry was Satyric and more connected with dancing than it is now—Poetics—IV—14) ডায়োনিসাসের বিচিত্র অভিযান-কথা গানের মাধ্যমে বর্ণনা করা এবং নির্বাক অভিনয়ের দ্বারা তাকে প্রাণবন্ত করে তোলাই এর উদ্দেশ্য। গায়কেরা ডায়োনিসাসের সংগী ম্যাটারের (ছাগমানব) বেশে সুরাধরান বেদিতলকে বেষ্টন করে দেবতার অভিযান কথা এমন ভাবে গান করতেন এবং আবেগোত্তোজিত অংগভংগী সহকারে প্রত্যেকটি ঘটনা এমন দারুণভাবে প্রদর্শন করতেন যে মনে হতো শুধু অভিনয় নয়—এ প্রত্যক্ষ সত্য।

ডিথিরাম্বে আসলে লোক সংগীত। কুলদেবতা নিজেদের খুশিমতো এই গান রচনা করতো এবং তারা উৎসবানুষ্ঠানে গেয়ে বেড়াতো। ডোরিয়ার অধিবাসীদের কল্যাণে এর শিল্প সমুন্নয়ন ঘটে। সম্ভবত প্রাক্তকাল থেকে ডোরিয়ার অধিবাসিগণ ডিথিরাম্বে রচনায় বিশেষ দক্ষ ছিল। খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে কবি এ্যালকম্যান (Alcman) এবং ষ্টেসিকোরাস-এর প্রতিভা (Stesichorus) এই শিল্পের পূর্ণতা সাধন করে। আর যে কবি এর সমুন্নতির পথ প্রশস্ত করেন

৬. It remains quite uncertain what the derivation or even the primitive meaning of the Greek word DIQUPAUBOS (dithyrambos) is. It was however connected from earliest times with the choral worship of Dionysu. The earliest dithyramabic poetry was probalely improvised by priests of Dionysus at solemn feash and expressed in disordered numbers, the excitement and frenzy felt by the worshippers. The dithyramb was traditionally first practised at Naxos, it spread to other islands, to Bocotia and finally to Athens. Arion is said to have introduced it at Corinth, and to have allied it to the worship of Pan. It was thus "merged" as Professor Gilbert Murray says "into the satyr choir of the wild mountain goats, out of which sprang the earliest from of tragedy. It flowrished it Athens until after the age of Aristotle."

Dithyrambic Poetry Encyclopaedia Britannica. Page 443-44.

But Plato's description of the dithyramb as the birth of Dionysus is apparently derived from the fancyful etymology which connected the word dithyramb with "two doors" and referred it to the double birth of Dionysus from semele and from Zens.—

(ch I—The Tragic Drama of the Greeks—A. E. Haigh Page 16.

Ibid. Page 16.

তিনি হলেন এ্যারিয়ন। (The author to whom it owed its advancement was Arion—ch I The Tragic Drama of the greeks page—17)। তিনি তাঁর এই জাতীয় কবিতার নামও দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সেকালের বিখ্যাত বীণাবাদক। খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতকের শেষভাগে অথবা ষষ্ঠ শতকের সূচনায় লেসবসে (Lesbos) তাঁর জন্ম হয়। কেউ কেউ বলেন যে তিনিই ডিথিরাম্বের আবিষ্কর্তা। বলা বাহুল্য এ-উক্তি সমর্থিত হয়নি। আবার কারও কারও মতে চক্রাকারে যৌথ সংগীতের প্রচলন তিনিই করেন। এ-কথা সত্য না হলেও বলা যায় যে তিনিই এই সংগীতের মধ্যে নিয়ম-শৃংখলা এনেছিলেন। তিনিই বোধহয় নৃত্যক সংখ্যা পঞ্চাশ জনে নির্দিষ্ট করে দেন আর যৌথ-সংগীতে উত্তর পক্ষ (Antic srophic) সৃজন করেন। এক দলের পরে আর একদল নির্দিষ্ট পালা বা পর্যায়ক্রমে নৃত্যগীতে অংশ গ্রহণ করবে। ডিথিরাম্বের মধ্যে এই বিধান তিনিই প্রবর্তিত করেন। প্রাচীন কালের সংগীতে এ-বিধান ছিল না। তাঁর চেষ্টায় এই সংগীতে নানা দিকে উৎকর্ষ সাধিত হয়। তিনি নাকি ফ্রিজীয় আবেগময় সংগীতে ডোরীয় গাম্ভীর্যের সংমিশ্রণ ঘটান এবং শুধু বাঁশি নয়, বীণাও ব্যবহার করতেন। অবশ্য এ-সব কথা সমর্থিত হয়নি।

নাটকীয়তার দিক থেকে ডিথিরাম্বে তিনি যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করেছিলেন তা হচ্ছে যে ডিথিরাম্বের মধ্যে কথ্যভাষার রচিত কবিতার (Spoken Verse) প্রয়োগ।৮ এটি তাঁর অপূর্ব কৃতিত্ব। অনেকটা আমাদের দেশের কবিগানের মতো। উপস্থিত-বুদ্ধি মত সেখানে পূর্বকল্পিত নয় এমন সব কবিতা মুখে মুখে রচনা করা হয়ে থাকে। আরিস্ততলের উক্তি থেকে আমরা জানতে পারি যে ডিথিরাম্বের মূল গায়েনের ভাবনের মধ্যেই ট্র্যাজেডির বীজ নিহিত ছিল।

(Be that as if may, Tragedy—as also comedy—was at first mere improvison – Poetics VI – 12

প্রথম ভাগে, স্যাটার (ছাগমানব) বেশী পঞ্চাশজন গায়ক বজ্রবেদীকে বেষ্টন করে দায়োনিসাস দেবের পূজোর উদ্দেশে যে গান করতো, যে অভিনয় করতো তার মূল সূত্রটি কেমন ছিল? কোন কোন সমালোচক মনে করেন যে যে সংগীতের পরিণতিরূপ একদিন ট্র্যাজেডির বেদনা ও ভীতি অথবা নিদারুণ শোচনীয়তা সৃষ্টি করবে তা গভীর ও গম্ভীর ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। অতএব অনুমান করা হয় যে এই সময়কার ডিথিরাম্বে দায়োনিসাসের দুঃখ বেদনাকেই (Sorrows of Dionysus) প্রকাশ করতো। যে ভাব ও বেদনা স্যাটারদের বিচলিত করতো তা হলো দেবতার সংগে একাত্ম হয়ে যুদ্ধ করা, জয় করা এবং দুঃখ সহ্য করার তীব্র আকাংক্ষা ("Intense desire to fight, to conquer and to Suffer in common with the God—Muller's Greek Literature P.P.258—259.)

কিন্তু এ-বক্তব্য সমর্থিত হয়নি। অবশ্য থীবস এবং ডেলফিতে আবেগোন্মত্তা মীনাডগণ (ব্যাকাসের উপাসিকা উত্তেজনায় আত্মহারা নারী) যে গুপ্ত পূজানুষ্ঠানের (orgiastic worship) ব্রত হতো তার প্রধান সুর ছিল দেবতার দুঃখে বেদনাময় সহানুভূতি। কিন্তু স্যাটারদের যৌথ সংগীতে এই আত্মোৎসর্গ বা দুঃখ বোধ আশা করা যায় না। এ-প্রসংগে আরিস্ততলের সিদ্ধান্ত ভিন্ন প্রকার। তিনি বলেন ট্র্যাজেডির গাম্ভীর্য এসেছে পরবর্তী কালে, প্রাচীন ডিথিরাম্বে তা ছিল না।

(Moreover, it was not till late that the short play was discarded for one of greater compass and the grotesque diction of the earlier satyric from for the stately manners of Tragedy – (Poetics Ch VI—14) এ-কথা মেনে নিয়েও বলা যায় যে ডিথিরাম্বের মধ্যে গভীর ভাবের বীজ নিহিত ছিল। অস্বীকার করা যাবে না যে মদমত্ততা যে সংগীতের প্রেরণা তা সাধারণত লঘুচপলই হয়ে থাকে। কিন্তু ডিথিরাম্বের মধ্যে চপল-গভীর বিচিত্র ভাবের সমাবেশ ছিল। লঘু চপলতা থেকে তা বেদনা গভীরতায়

৮. Ibid. Page 19.

মগ্ন হতো। তার গুরুত্বপূর্ণ ভাব এবং রোম্যান্সের আভাস ছিল। চটুলতার নিম্নগ্রাম থেকে বিষাদের উচ্চগ্রামে তার যাত্রা ছিল অবাধ। ডিথিরাম্বের এই স্বতঃস্ফূর্ত বীক্ষণ-ছায়া দূরপ্রসারেই ট্র্যাজেডির দার্ঢ্য কণ্ঠস্বরকে সম্ভব করে তুলেছে। কালক্রমে চটুলতা খসে পড়ে গিয়েছে—ডিথিরাম্বের নবরূপ হয়েছে—এসেছে ট্র্যাজেডির গভীর অনুভূতি।

The dithyramb, it is true, was the off spring of wine and merriment at the rustic festivals of Dionyn, and it prevalent sentiment was one of joyfulness and gaiety. But like most Doinysiac poetry and music, it may have been susceptible of a great variety of emotion—Ch I The Tragic Drama of the Greeks – Page 21.)

এই সময়েই সম্ভবতঃ 'ট্রাগিক' এবং 'ট্র্যাজেডি' শব্দদ্বয়ের ব্যবহার শুরু হয়েছে। যদিও ট্র্যাজেডির পূর্ণব্যঞ্জনা তখনও উপলব্ধ হয়নি তবু এ্যারিয়ন এবং তাঁর পরবর্তী কবিগণের ডিথিরাম্বকে ট্র্যাজেডিই বলা হয়েছে। এবং বলা হয়েছে যে এ্যারিয়ন ট্র্যাগিক রীতির আবিষ্কর্তা—তাঁর যৌথ সংগীত ট্র্যাজেডি এবং তিনি ট্র্যাজেডি রচয়িতাদের সগোত্র।৯

পূর্বেই বলা হয়েছে যে ট্র্যাজেডি শব্দের অর্থ ছাগ সংগীত। ডিথিরাম্বের সঙ্গে এর যোগাযোগ কেমন করে এলো তা বলা সহজ নয়। ছাগবলির পরে ডিথিরাম্বের অনুষ্ঠান হতো অথবা সার্থক কবিকে ছাগ উপহার দেওয়া হতো অথবা ছাগের মধ্যে দেবতার আবির্ভাব অপরোক্ষ করা যেতো।১০ তাই এই অভিধা দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ঘাসের টীকাকার দা বুটি (da Buti) ট্র্যাজেডি শব্দের ভিন্নতর ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন—

Tragedy (goat song) derives its name from being, like a goat, prosperously shaggy before and miserably bold behind'—Definition of Tragedy—Tragedy F. L. Lucas Page 14 foot note ১১ তাঁর বক্তব্যের সার কথা বোধ করি এই যে ট্র্যাজেডির প্রথম দিকের ঐশ্বর্য সমারোহ এবং বিপুল ধ্বনিপ্রবাহ পরিণামে চরম 'বক্তব্যে পর্যবসিত (Full of Sounds and fury signifying nothing) আবার এ-কথাও বলা হয়েছে যে সাটারদের যৌথ-সংগীত (choral ode) ট্র্যাজেডি তাঁরা আকৃতি এবং প্রকৃতিতে ছাগল তাই এর নাম ছাগসংগীত। এমন অর্থ করলে কমেডির বুৎপত্তিগত অর্থ বিপরীত সংগে এর একটি সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। কমেডি১২ কোমাস অর্থাৎ উল্লাস কারিগণের যৌথ সংগীত আর ট্র্যাজেডি ট্রাগি অর্থাৎ ছাগ-মানব সাটারদের গান।*

Ch I The Tragic Drama of the Greeks—A. E. Haigh P. 32

১০. The height and center of their ceremong was to seize upon a goat, a bull, sometimes a man (seeing in them incarnation of the god).

Ch VIII The Gods of Greece—The life of Greece—Will Durant Pages 186-187.

১১. Tragedy – any grave, serious poetry—Phato. (G. K. Eng. Lexicon—Liddel Scott) In the middle ages, curiously enough, instead of meaning a drama, not necessarily with an unhappy ending, 'tragedy' has come to denote any marrative with an unhappy ending, not necessarily a drama.'

—Definition of Tragedy—Tragedy—F. L. Lucas Page 14

১২. KWM—wdia (comedy) Two derivations are suggested : one form KWMOS wdy the revel song, the other from KWMY wdy the village song (G. K. Eng. Lexicon—Lidden Scott)

*মূল বক্তব্য A. E. Haigh-এর The Tragic Drama of the Greeks—গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত।

এক্সিডেন্ট

দেবব্রত দত্ত

আজ সকালে মারা গেল লোকটা।

পথের উপরেই মারা গেল জীবেন সান্যাল।

এসপ্লানেড ছাড়িয়ে যারা রোজ ডালহৌসীর দিকে যাতায়াত করেছেন তারা দেখেছেন জীবেন সান্যালকে। একটি পাগল। আপন মনেই কখনো এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে। কখনো পেছিয়ে আসছে। আপন খেয়ালেই উঁকি দিচ্ছে খেয়ে থাকা বাসের জানালা কাউকে খুঁজছে সে। ছেড়ে দিলেই সে আবার ফিরে এসেছে ফুট পাথের উপর। কখনো মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিড় বিড় করেছে আপন খেয়ালেই।

আমি চিনতাম ওকে। কিন্তু এমন পরিণতি ঘটবে, আমার জানা ছিল না।

মনে পড়ল অনেক দিন আগের সেই জীবেন সান্যালকে। কলেজ জীবনেই সুচিতার সাথে আলাপ ওর। একই ক্লাসে পড়ত ওরা। সুচিতা আসত উত্তর কলকাতা থেকে। শৈশব কলকাতার ভবানীপুরে বাড়ী ছিল জীবেন সান্যালের।

প্রথম দর্শনেই জীবেন সান্যালকে ভাল লেগেছিল সুচিতার। কিন্তু এ সম্পর্কের কোন কিছুই জীবেন সান্যালের মনে রেখাপাত করেনি কখনও, এটাই ছিল আশ্চর্য। রোগা ছিপ ছিপে, গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ ঘটকের ভালাদ এই ছিল সুচিতার দৈহিক পরিচয়। কিন্তু এই ক্ষীণ কায়া দেহের ভেতরেও যে একটা কোমল প্রেমিক মন নিরন্তর তাকে নাড়া দিয়ে যাচ্ছিল সে খবর রাখা ছিল না সুপুরুষ জীবেন সান্যালের।

ক্লাসে বসে অবসর সময় ওরা গল্প করে কাটিয়েছে অনেক, কিংবা বাইরে সবুজ ঘাসের লনের উপর।

অনেক ধনিকই হয়ে উঠেছিল ওরা দুজনে
সুচিত্রা। কিন্তু এর ভেতরেও কোথাও
লীনা রেখা টানা ছিল জীবনে সান্যালের। এ-খবর জানা
ছিল না সুচিত্রার। আর জানা ছিল না বলেই
সরলভাবে ধরা দিয়েছিল তার কাছে

তারপর অনেক দিন পার হয়ে গেছে। জীবনের অধ্যায়ের পাট ওরা চুকিয়ে দিয়েছে দুজনেই। কর্মক্ষেত্রে অধ্যাপক হয়েছে জীবন। সুচিত্রা চাকরি নিয়েছে কলকাতার অফিস পাড়ার কোন এক অফিসে

জীবনের অনেক স্মৃতিকে পার হয়ে এসেছে জীবন। কলেজে পড়া মেয়ে সুচিত্রাও হারিয়ে গিয়েছে সেই ভীড়ে। কিন্তু সুচিত্রার জীবন তার স্মৃতি মুছে যাওয়া সহজ নয়।

কলেজের দিনগুলোর কথা মনে হলে হত
জীবনকে দেখানে একান্ত তারই কাছে

পেয়েছিল অনেক দিন
সুচিত্রা। মনে পড়ে সুদূর
সভার দিনে উৎপল। মনে পড়ে জীবনে সান্যালের কথা

তারপর একদিন দেখা হয়েছিল পথে। প্রথমে
মনে জীবন চিনেই উঠতে পারে
সুচিত্রাই প্রথম ডাক দিয়েছিল তাকে নাম
এসপ্লানেডের পথ ধরে ডালহৌসীর দিকে যা

প্রথমে একটু ধরকে দাঁড়াল
করে মনে পড়ল অনেক দিনের
মিতের মুখ। কোন দরদ
কিন্তু একি চেহারা হয়েছে সুচিত্রার।
আরও রোগা হয়ে গেছে। গালের হাড়
বোধ হয় শরীরে রক্তহীনতা ঘটেছে
ভেতর মাংস ঝরে গিয়েছে অনেকখানি

এ সুচিত্রা যেন সেই সুচিত্রা
করা অন্য কোন মেয়ে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল জীবনে
সুচিত্রাই কথা বলল প্রথম
যেন শরীরে ফিরে এল

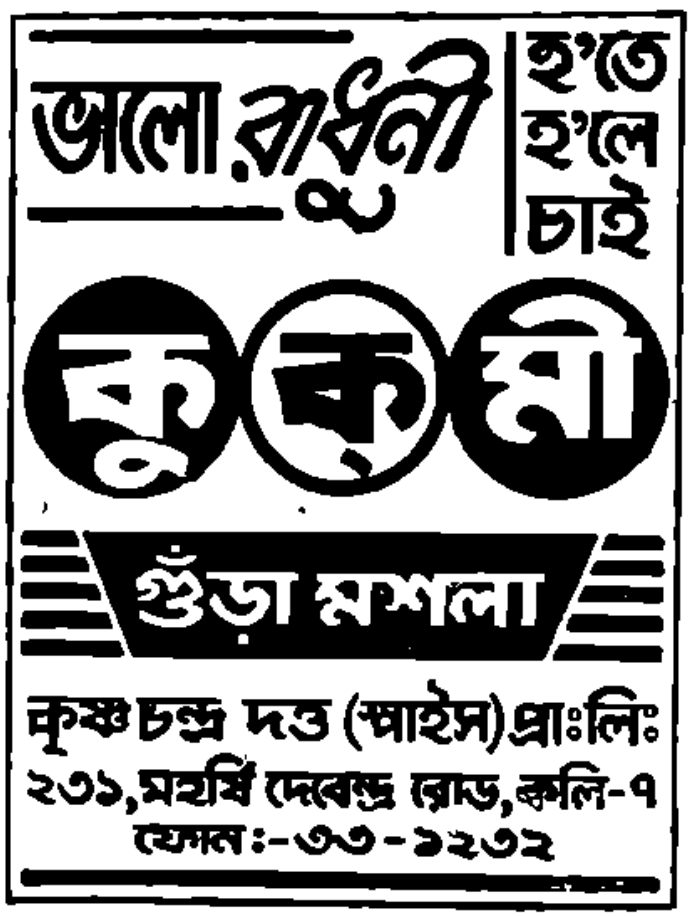

পাশে পাশে পথ হেঁটেছে ওরা। কখনও ক্যাফের আড্ডায় বসে চলে গেছে জীবেন। কথা চলেছে অনেক।

একদিন শরৎ কালের বিকেলে গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়ে সুচিতার হাতে হাত রেখে বসল জীবেনের। খানিকটা ঘুরে বেড়িয়ে শেষে পাশাপাশি বসল ওরা।

এত দিন অনেক কষ্টেও সে কথাটা জমিয়ে রেখেছিল ভেতরে, সেদিনের সেই খোলা গঙ্গার ধারে বসে কিছুতেই যেন চাপা থাকল না সেই কথাটা। এক সময় বলেই ফেলল সুচিতা।

চমকে উঠল জীবেন। এমনি করে শেষ পর্যন্ত সুচিতা নিজেকে তুলে দিতে চাইবে ওর হাতে—এ ভাবতে পারেনি কখনও। ভেতরে যেন কেমন এক অদ্ভুত বোধ চঞ্চল তার মনে হল পৃথিবীটা যেন খুব তোরে ঘুরছে। বাড়ি ফিরবার জন্য উঠে দাঁড়ালো সে।

সুচিতা একখানা হাত ধরে ফেলল তার।—যাচ্ছ কোথায়? বলল সুচিতা।

এ কথার কোন উত্তর দিল না জীবেন। তার ভেতরে তখন একটা বিষক্রিয়া চলেছে। চুপ করে রইল সে।

খানিক কি ভাবল সুচিতা। তারপর হাত ছেড়ে দিয়ে বলল,—তোমারই জন্য আমি সারা জীবন অপেক্ষা করে থাকব জীবেন। ভেবে দেখ একবার।

সুচিতার সামনে দিয়ে হন হন করে এক রকম ছুটে পালিয়ে এল সে। সেই মুহূর্তে যেন এক অভ্রান্ত জন্মাল সুচিতার উপর।

এরপর অনেক দিন পার হয়ে গেছে, সুচিতার সাথে আর দেখা হয়নি জীবেনের। ডালহৌসীর সেই পথ দিয়ে কখনও যেতে হলে সন্তর্পণে পার হয়ে গেছে পথটুকু। সুচিতার বাড়ি এড়িয়ে।

একদিন একটি চিঠি এল তাকে। লিখেছে সুচিতা,—ডালহৌসীর সেই জায়গাটায় অপেক্ষা করো আজ।

একবার পড়েই টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছে জীবেন। আশ্চর্য হয়েছে সুচিতার বোকামোপনা দেখে।

যায়নি সে। ডালহাউসির পথ দিয়ে তারপর অনেক দিন যায়নি কোথাও। ক্রমে একদিন সুচিতাকে ঠিক তেমনি করেই ভুলে গেল সে, যেমনি করে ভুলে গিয়েছিল কলেজ ছেড়ে দেবার পর।

আবার একদিন সুচিতার একখানা চিঠি এল তাকে। যেন আর একবার চাবুক মারল সুচিতা। লিখেছে,—ভীষণ অসুখ নিয়ে শুয়ে আছি আমি। তোমাকে একটিবার দেখতে ইচ্ছা করি। আসবে একবার?

বিরক্তে মুখটা রক্তিম হয়ে উঠল জীবেনের। মেয়েদের এ সব চালাকি বোঝে সে। ছিঁড়ে ফেলে দিল চিঠিটা।

এ সব ঘটনা যেন কিছুই নয়। জীবেনকে বারংবার উত্যক্ত করবার জন্যই যেন এত সব আয়োজন।

বাইরের বাতাস এসে উড়িয়ে নিয়ে গেল ছেঁড়া চিঠির টুকরো গুলো।

এ ঘটনার দুদিন বাদেই একটি অপরিচিত ছেলে এসে ডাক দিল জীবেনকে। এগিয়ে দিল একটি চিঠি। লিখেছে সুচিতা,—এ চিঠি গিয়ে যখন পৌঁছবে তোমার হাতে, তখন হয়ত আমি সব যন্ত্রণার পারে চলে যাব। আমার শেষ অনুরোধ তুমি আমার মুখাগ্নি কর, লক্ষীটি! নইলে আমার মৃত আত্মাও শান্তি পাবে না যে।

কয়েকটি আঁকা বাঁকা অক্ষরে লেখা চিঠি।

সমুদ্রের বাঁধে যেন কাটল ধরল কোথায়।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল জীবেন। চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলল না সে সুচিতার জীবনের ভালবাসার শেষ নিদর্শন।

এরপর কয়েকদিন আর দেখা যায়নি জীবেনকে। শেষে একদিন দেখা গেল এসপ্লানেড থেকে ডালহৌসী যাবার পথের ধারে পায়চারি করছে সে। একদিন চিঠি লিখে যেখানে অপেক্ষা করতে বলেছিল সুচিতা। আপন মনে কি বকছে বিড় বিড় করে। কখনও বাসের জানালায় উঁকি দিয়ে যেন খুঁজছে কাউকে।

আজ ভোরে সেই জীবেন সান্যাল মারা গেল। এসপ্লানেড থেকে ডালহৌসী যাবার সেই পথের উপর। একটা গাড়ীর চাকায় গুড়িয়ে গেল দেহটা। মরবার আগে সে একবার একটু কেঁপে উঠেছিল। তারপর শান্ত হয়ে গেল এক সময়।

দ্বারকানাথ গুপ্ত প্রণীত "হেমপ্রভা"

(সংক্ষেপিত)

শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ

॥ প্রসঙ্গ কথা ॥

আধা ঐতিহাসিক ও আধা পৌরাণিক কাহিনী এই 'হেমপ্রভা' উপন্যাসের অবলম্বন। লেখক দ্বারকানাথ গুপ্ত তাঁর এই রচনার জন্যে বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের কাছ থেকে ৫০ টাকা পুরস্কার পান। উপন্যাসের প্রকাশকাল বাংলা ১২৬৬ আশ্বিন, [১৮৫৯ ইংরেজি]; পৃষ্ঠাঙ্ক ৬৪। উপন্যাসের নায়ক নায়িকা যথাক্রমে অযন্তী নগরের রাজা জয়েশ্বরের পুত্র জয় দত্ত এবং হেমন্তপুর নিবাসী বণিক হেমচন্দ্রের কন্যা হেমপ্রভা। উপন্যাস একাধিক অপুত্রক রাজা ও বণিকের কাহিনী, দৈব অভিশাপ, নিয়তির প্রভাব, পুত্রবর প্রদানকারী সন্ন্যাসী ও দেবদুর্লভ ফলের কথা, সাবিত্রী-সত্যবানের কথা, গান্ধর্বমতে যুবক ও যুবতীর বিবাহ ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। আদি যুগের উপন্যাসের এগুলি স্বাভাবিক লক্ষণ। মূল কাহিনীর মধ্যে একাধিক উপকাহিনীর সংস্থাপনে আরব্য রজনী, বেতাল পঞ্চবিংশতি, বত্রিশ পুত্তলিকা প্রভৃতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তা ছাড়া, উপন্যাসের মধ্যে বিমলেন্দু বিদ্যুল্লতার উপকাহিনীতে রামায়ণের প্রভাব সুস্পষ্ট। পিতার নির্দেশ মতো বিমলেন্দু কর্তৃক স্ত্রী বিদ্যুল্লতাকে বনবাসে নির্বাসন দেবার উপকাহিনীটির সঙ্গে রামায়ণে বর্ণিত রামচন্দ্রের নির্দেশ মতো লক্ষ্মণ কর্তৃক সীতাকে বনবাসে পাঠানোর কাহিনীটির মধ্যে একেবারে হুবহু মিল লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসে নানা ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতের শেষে নায়ক নায়িকার মিলন দেখানো হয়েছে। এই ধরণের মিলন কাহিনীও তৎকালীন উপন্যাসের একটি সাধারণ লক্ষণ। প্রথম যুগের বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে 'হেমপ্রভা', বিশেষত বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের কাছ থেকে পুরস্কার পাওয়ায় উল্লেখযোগ্য বটে। এই উপন্যাসে শিল্পকর্মের উৎকর্ষের তুলনায় ঐতিহাসিক রোমাঞ্চধর্মী উপকাহিনী গ্রন্থনের কৃতিত্বই লক্ষ্য করা যায় সহজেই।

অনেক পূজা-অর্চা করে ভগবানের কৃপায় শেষ বয়সে অযন্তী নগরের রাজা জয়েশ্বর এক পুত্র সন্তান লাভ করলেন। ছয় মাসে ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে রাজা ব্রাহ্মণ-পুরোহিত এবং গরীব দুঃখী সবাইকে সন্তুষ্ট করলেন। ছেলের নাম রাখলেন জয় দত্ত। জয় দত্তর হাতে খড়ি হল এবং লেখাপড়ায় তার বেশ কৃতিত্ব দেখা গেল। এখন সে যুবক।

শিকারের নাম করে বাবা-মার কাছে বিদায় নিয়ে জয় দত্ত ঘোড়ায় চড়ে একাকী চললেন দেশভ্রমণে। পথে এক সরোবরের কাছে ঘোড়া রেখে জয় দত্ত স্নান ও খাওয়া সারলেন। এমন সময়ে সর্বাঙ্গসুন্দরী এক বণিক কন্যা সেই সরোবরের অপর পারে এলেন সখিদের নিয়ে স্নান সারতে। যথাসময়ে বণিক কন্যা সখিদের নিয়ে চলেও গেলেন। এদিকে বণিক কন্যার রূপ-লাবণ্যে জয় দত্ত মুগ্ধ ও অভিভূত। নিকটেই এক গৃহস্বামীর কাছে গিয়ে জয় দত্ত জানতে পারলেন সেই সুন্দরীটি হেমন্তপুর নিবাসী ধনী বণিক হেমচন্দ্রের কন্যা হেমপ্রভা।

জয় দত্ত তখন আশ্রয় খুঁজে বেঁধে বণিক হেমচন্দ্রের বাড়ি গিয়ে হাজির হলেন। হেমচন্দ্র জয় দত্তকে যথোচিত অভ্যর্থনা করলেন। জয় দত্ত নিজের পরিচয় দিয়ে আপন অভিপ্রায় জানালেন। জয় দত্তকে হেমপ্রভার পাণিপ্রার্থী জেনে হেমচন্দ্র খুশি হয়ে তাকে এক মনোরম ও নানা ফুলফলে সাজানো উপবন দিলেন থাকতে। পাখির গানে আর ফুল ফলের শোভা সৌন্দর্য দেখে জয় দত্ত খুব সন্তুষ্ট। হেমচন্দ্র জয় দত্তকে নিয়ে সেই বাগানের এক সরোবরের ধারে হাজির হলেন। সেখানে জড় পাথরের মতো একটি মানুষ গাছের তলায় পড়ে আছে, আর ক্ষণে ক্ষণে "যেমন কর্ম তেমন ফল" কথাটি বলছে। হেমচন্দ্র বললেন জয় দত্তকে —এই মানুষটি কেন জড় পাথরের মতো পড়ে, এবং এর মুখে থেকে যে কথাটি শোনা যাচ্ছে—তার কারণ যে বলতে পারবে তার হাতেই আমি কন্যা দান করবো—এই আমার প্রতিজ্ঞা।

জয়দত্ত জ্যোতিষবিদ্যার প্রভাবে সব কথা জানতে পারলো। তারপর হেমচন্দ্রকে বললেন—এই রহস্য কথা আমি বলছি, শুনুন।

"প্রাচীনকালে শ্রীদ্বারকা নগরে শ্রীবৎসল নামে এক প্রজাবৎসল এবং বিক্রমশালী রাজা ছিলেন। রাজা শ্রীবৎসল একদিন জানতে পারলেন তাঁর রক্ষীরা শত্রুপক্ষের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছে তাঁকে মেরে ফেলবার জন্যে। রাজা তখনই বিশ্বাসঘাতকদের যথোচিত শাস্তি দিয়ে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলেন এবং তাঁর শরীররক্ষী পদে নিযুক্ত করলেন তাঁরই তিন পুত্রকে। রাজপুত্রগণ পালা করে ঠিক ঠিকভাবে তাদের কাজ করতে লাগলেন।

"এক রাত্রে শেষ প্রহরে ছোট রাজপুত্রের পালা। রাজা পালঙ্কে শুয়ে আছেন। এমন সময় এক বিষধর সাপ ঘরে ঢুকে ফণা বিস্তার করে চললো রাজার খাটের দিকে। ভীত রাজপুত্র তখনই তাঁর তরবারি খুলে সাপটাকে মারতে চললেন পালঙ্কের দিকে। সাপ পালিয়ে গেল, কিন্তু রাজার ঘুম ভেঙে গেল। খোলা তরবারি হাতে ছোট রাজপুত্রকে দেখে রাজার সন্দেহ হল, রাজপুত্র তাঁকে হত্যা করতে চায়। রাজা তখনই ঘাতকদের আদেশ দিলেন ছোট রাজকুমারকে শেষ করে ফেলতে। বড় রাজকুমারেরা খবর পেয়ে করজোড়ে রাজার কাছে জানতে চাইলেন প্রকৃত ঘটনা। বড় রাজকুমার রাজার কাছে প্রার্থনা জানালেন, ছোট-রাজ কুমারের প্রতি যেন কোন অবিচার না হয়। কারণ পূর্বকালে এক ব্রাহ্মণ অন্যায়ভাবে একটি পোষা প্রাণীকে মেরে ফেলেছিল ফলে ব্রাহ্মণ সবংশে ধ্বংস হয়েছিল। তার বিবরণ এইরকম"—

"একদিন এক ব্যাধের জালে ধরা পড়লো এক হাজার বাচ্চা শুক এবং একটি শুকরাজ। শুকরাজের মুক্তি প্রার্থনার জবাবে ব্যাধ বললো, এক হাজার শুকের দাম হিসাবে যদি হাজার টাকা দিতে পারো তবে ওদের ছেড়ে দেব। শুকরাজ হাজার মুদ্রার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় ব্যাধ সেই এক হাজার শুকবাচ্চা-গুলোকে মুক্ত করে দিল। তখন ব্যাধ শুকরাজকে নিয়ে শ্বেতকুষ্ঠ নামে এক ব্রাহ্মণের বাড়ী গেল। ব্রাহ্মণ শুকরাজের দাম জিজ্ঞাসা করায় পাখিটি বাচ্চাগুলোর মুক্তি পণের কথা মনে করে নিজের দাম হিসেবে হাজার মুদ্রা চাইলো। ব্রাহ্মণ পাখিটিকে মূল্যবান মনে করে হাজার টাকাই দিয়ে কিনলেন। কিছুদিন বাদে শ্বেত কুষ্ঠ কঠিন এক অসুখে পড়লো। কোন চিকিৎসায় ফল হল না। তার আর জীবনের আশা নেই। শুক তার প্রতি ব্রাহ্মণের দয়ার কথা চিন্তা করে ব্রাহ্মণকে বললো—আমাকে যদি বনে যেতে দেন তবে আমি মূল্যবান গাছগাছড়ার শিকড় এনে আপনার রোগ মুক্তির চেষ্টা করতে পারি। ব্রাহ্মণ ভাবলেন পাখি পালাতে চাইছে। তবু নিজের রোগযন্ত্রণার কথা মনে করে তিনি শুকরাজকে ছেড়ে দিলেন।

শুকরাজ বহু দিন বাদে আবার তার বনের স্বাধীন রাজ্যে আপনজনের সঙ্গে মিলিত হল, আমোদ আহ্লাদ করলো। তারপর ফেরবার সময় ব্রাহ্মণের জন্যে ওষুধ এবং ব্রাহ্মণীর জন্যে একটি দুর্লভ লাসফল নিয়ে শ্বেত-কুষ্ঠের কাছে হাজির হল। পাখিকে ফিরতে দেখে সবাই খুশি। পাখির ওষুধে শ্বেতকুষ্ঠ শরীর আরোগ্য

লাভ করলেন। আর দেবদুর্লভ অমৃতময় সুন্দর ফলটি পেয়ে এবং তার গুণাগুণ শুনে ব্রাহ্মণী সেটিকে না খেয়ে এরকম আরো অনেক ফল পাবার আশায় ফলটিকে একটি গোপন জায়গায় পুঁতে রাখলেন। গাছও ক্রমে বড় হয়ে ফলে ভর্তি হল। এই ফল খেলে কুরূপা সুরূপা হয় এবং বয়স্কা নারী যুবতী হয়। ব্রাহ্মণী একদিন দেখলেন একটি ফল গাছতলায় পড়ে আছে। তিনি সেটিকে নিয়ে তাঁর উপপতিকে খেতে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই সেই লম্পট ব্রাহ্মণীকে গালাগালি দিতে দিতে যন্ত্রণায় ছটফট করে মরে গেল। ব্রাহ্মণী কিছুই না বুঝতে পেরে দুঃখে হতভম্ব হয়ে গেল। সে তখন মনে মনে শুকুকে গালাগালি দিতে লাগলো। ব্রাহ্মণ শ্বেতকুশেরও একটি উপপত্নী ছিল। সেও একদিন সেই গাছতলায় পাওয়া একটি ফল নিয়ে তার উপপত্নীকে বড়ো সাধ করে দিল খেতে। উপপত্নীটি ফল খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলো এবং ব্রাহ্মণকে গালাগালি দিতে দিতে মারা গেল। ব্রাহ্মণ ব্যাপার কিছু না জানতে পেরে দুঃখে রাগে শুকপাখিটিকেই অনর্থের মূল বলে ভাবলো। শুকরাজ যখন ব্রাহ্মণীকে ফলটি দেয় তখন সে বলেনি যে, এই ফল গাছ থেকে মাটিতে পড়লেই বিষাক্ত হয়ে যায়। অবশেষে ব্রাহ্মণ রাগের বশে শুক পাখিটিকে আছড়ে মেরে ফেললো। সেই গাছ ক্রমে বিষবৃক্ষ নামে পরিচিত হল।

এ দিকে ব্রাহ্মণের চাকর ভদ্রদাস তার স্ত্রী মোহিনীকে মারধোর করায় অসহ্য হয়ে মোহিনী মরবার জন্যে সেই গাছ থেকে একটি ফল খেল। কিন্তু মরবার পরিবর্তে দেখা গেল মোহিনী ক্রমে অপরূপ সুন্দরী হয়ে উঠলো পরদিন সকালে সুন্দরী মোহিনী যখন ব্রাহ্মণের বাড়ির উঠান ঝাঁট দিচ্ছিলো তখন ব্রাহ্মণ তো দেখে অবাক! চিনতেই পারে না। শেষ পর্যন্ত মোহিনী তার ঘটনা সবিস্তারে বললো। তখন ব্রাহ্মণ বুঝলেন মাটিতে পড়া ফল খাওয়ার ফলেই তাঁর উপপত্নী এবং ব্রাহ্মণীর উপপতিটির মৃত্যু হয়েছে, এবং গাছের পাড়া ফল খাওয়ার ফলেই মোহিনী এই সুফল লাভ করেছে। ব্রাহ্মণ শ্বেতকুশ তখন শুকপাখির প্রতি অবিচারের কথা স্মরণ করে ক্ষোভে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। জ্ঞান হওয়ার পর ব্রাহ্মণ দুঃখে অনুতাপে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মরলেন। ব্রাহ্মণীও এই শোকে প্রাণত্যাগ করলেন। প্রভু ও প্রভু-পত্নীর মৃত্যুতে তাদের দাসদাসী ভদ্রদাস ও মোহিনীও সেই আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যু বরণ করলো।

সত্ত রাজকুমার ব্রাহ্মণ ও শুকপাখীর এই কাহিনী শেষ করে রাজাকে অনুনয় করলেন ছোট রাজকুমারকে প্রাণে না মারতে। রাজা সে কথায় কান না দিয়ে ঘাতকদের আদেশ দিলেন ছোট কুমারকে শেষ করে ফেলতে। তখন মেজ রাজকুমারও রাজাকে ছোটকুমারের পক্ষ হয়ে অনুনয় করে বললেন, অবিচারের পরিণাম খুবই খারাপ। প্রাচীনকালে এক বণিক কিভাবে অবিচার করে তার পুত্রবধূকে মেরে ফেলেছিল সেই কাহিনী বলতে লাগলো।

ভবতীপুরে ভদ্রাবল নামে এক বণিক এবং বৎসলতা নামে তাঁর এক স্ত্রী ছিলেন। বণিকের অর্থ ছিল কুবেরের মতো কিন্তু সন্তানাদি না থাকায় মনের দুঃখে সংসার ছেড়ে পুত্র কামনায় বনে গিয়ে মহাদেবের তপস্যা করতে লাগলেন। তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব একটি ফল দিলেন ভদ্রাবলকে। বাড়ি ফিরে ভদ্রাবল সেই ফলটি মহাদেবের নির্দেশমতো খেতে দিলেন স্ত্রী বৎসলতাকে। ফল খাওয়া মাত্রই বৎসলতা গর্ভবতী হলেন এবং যথা সময়ে তিনি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। আনন্দে অভিভূত বণিক ভদ্রাবল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের অকাতরে দান করতে লাগলেন। ব্রাহ্মণেরা সন্তুষ্টচিত্তে নবজাতককে আশীর্বাদ করে ঘরে ফিরলেন।

যথাসময়ে বণিকপুত্রের অন্নপ্রাশন হল। ভদ্রাবল তার নাম রাখলেন বিমলেন্দু। বিমলেন্দু সর্ববিদ্যায় পারদর্শী হল এখন সে যুবক। বণিক তখন তার পুরোহিতকে ডেকে বললেন বিমলেন্দুর জন্যে উপযুক্ত একটি পাত্রীর সন্ধান করতে। পুরোহিত তখন— প্রভাবতী নগরবাসী ধনী বণিক প্রভাকরের পরমাসুন্দরী কন্যা বিদ্যুল্লতার নাম প্রস্তাব করলেন। প্রস্তাব অনু-যায়ী পরদিনই পুরোহিত প্রভাবতী নগরে প্রভাকর

বণিকের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত। প্রভাকর যথাযোগ্য সমাদরে পুরোহিতকে আপ্যায়িত করলেন। তারপর প্রভাকর জিজ্ঞাসা করায় বণিক ভদ্রাবলের পুরোহিত তাঁর অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। ভদ্রাবল তাঁর কন্যাকে পুত্রবধূ করতে চান জেনে প্রভাকর খুশীই হলেন। প্রভাকরের স্ত্রীও এই বিয়েতে তাঁর সমর্থন জানালেন। পুরোহিত প্রভাকরের সম্মতি নিয়ে চলে গেলেন। প্রথামতো পরদিনই প্রভাকরের পুরোহিত গিয়ে ভদ্রাবলকে তাঁদের সম্মতি জানিয়ে এলেন। অবশেষে শুভলগ্নে বিমলেন্দুর সঙ্গে বিদ্যুল্লতার শুভ পরিণয় সম্পন্ন হয়ে গেল। পুত্র ও পুত্রবধূর বাসের জন্যে ভদ্রাবল পৃথক একটি সুন্দর অট্টালিকা তৈরী করিয়ে দিলেন।

বিমলেন্দু ও বিদ্যুল্লতা মহাসুখে দিন কাটাতে লাগলো। গ্রীষ্মকালে হরিণ হরিণী, নানারকমের ফুল, বর্ষাকালে হাস, চখাচখি, ডাহুক প্রভৃতি পাখি এবং পদ্ম প্রভৃতি ফুল, শরৎকালে পূর্ণ চাঁদের আলো এবং শেফালিকা প্রভৃতি ফুল, হেমন্তকালে শস্য এবং মূলাফুল শীতকালে মাছের সন্ধানেরত পাখির ঝাঁক এবং জবা অপরাজিতা প্রভৃতি ফুল, বসন্তকালে নব কিশলয় এবং অলিকুলের গুঞ্জন—প্রভৃতি নবদম্পতিকে আনন্দে মাতিয়ে রাখলো। বসন্তকালের চন্দ্রালোকিত একরাত্রে বিমলেন্দু ও বিদ্যুল্লতা পাশাপাশি শুয়ে আছে। এমন সময়ে দূরে একটি শিয়াল ডেকে উঠলো। শিয়ালটি বলছে—"যদি নিকটে কোন সতী স্ত্রী থাকো তবে এখানে এসে নদীতে ভাসমান মৃতদেহে রক্ষিত পাঁচটি মূল্যবান মণি নিয়ে যাও। মণিগুলি নিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আমি আমার আকাঙ্ক্ষিত গলিত শবদেহ আহার করতে পারছি না।"—বিদ্যুল্লতা পশুপাখির ভাষা জানতো। তাই শিয়ালের ডাক অনুযায়ী নদীতীরে গিয়ে এক গলিত শবদেহ দেখতে পেলো। নদীতে সাঁতার দিয়ে সেই শবদেহটিকে নদীতীরে এনে সত্যই সে পাঁচটি মূল্যবান মণি পেলো। মণিগুলি নিয়ে বিদ্যুল্লতা বাড়ি ফিরলো। তখন রাত প্রায় ভোর। বিমলেন্দু কিছুই জানে না।

বণিক ভদ্রাবল তখন প্রাতঃকৃত্য সারবার জন্যে নদীর ঘাটে গিয়েছিলেন। এমন সময়ে পুত্রবধূকে ওই অবস্থায় পথে দেখে বণিক তাকে দুশ্চরিত্রা বলে সন্দেহ করলেন। কিভাবে তাকে নির্বাসন দেবেন এই চিন্তায় তিনি মুষড়ে পড়লেন। পরদিন সকালে বিমলেন্দু পিতার বিমর্ষ মুখ দেখে কারণ জানতে চাইলো। পুত্র হয়তো তার স্ত্রীর নির্বাসন সমর্থন করবে না এই মনে করে তিনি তাকে কিছু বলতে পারলেন না। বিমলেন্দুর মা স্বামীর এই বিমর্ষভাবের সঠিক কারণ কিছুই বলতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত মাতা ও পুত্রের অনেক পীড়াপীড়িতে ভদ্রাবল একটি শর্তে বলতে রাজী হোলেন। ভদ্রাবলের কথামতো বিদ্যুল্লতাকে বনবাসে নির্বাসন দিতে হবে—এই শর্ত। বিমলেন্দু এই শর্তেই রাজী। তবু সে পিতার বিমর্ষভাব সইতে পারবে না। প্রতিজ্ঞামতো কাজ করবার জন্যে বিদ্যার আশ্রয় নিয়ে সে বিদ্যুল্লতার কাছে তার বাপের বাড়ি যাবার প্রস্তাব করলো। বিমলেন্দুও যাবে শুনে বিদ্যুল্লতা রাজী হলো। সারথী এসে জানালো রথ প্রস্তুত। তখই তাঁরা রওনা হলেন এবং সন্ধ্যার সময়েই এক গভীর বনের সামনে এসে পৌঁছলেন। বিমলেন্দু সেখানেই রথ সহ সারথীকে বিদায় দিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে বনের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে সুরু করলেন স্বামীর কথামতো বিদ্যুল্লতার তার গায়ের অলঙ্কারগুলি খুলে একটি পুটলিতে রাখলো। কিছুদূর চলার পর বিশ্রামের জন্য বিমলেন্দু এক জায়গায় শুয়ে পড়লো এবং বিদ্যুল্লতা তার পদসেবা করতে লাগলো। বিমলেন্দু ভাবতে লাগলো এমন পতি পরায়ণা স্ত্রীকে পরদিন কিভাবে নির্বাসন দেবেন। এই চিন্তা করতে করতে বিমলেন্দু ঘুমিয়ে পড়লো।

বিদ্যুল্লতা ভাবছে স্বামী যদি তাকে বাপের বাড়ীই নিয়ে যাবেন তবে তাঁকে এত বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন? তবে কি শিয়ালের ডাক শুনে মণিগুলি আনবার সময়ে যে স্বশুর মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল—তাতে কি তিনি আমার দুশ্চরিত্রা বলে সন্দেহ বশে নির্বাসন দিচ্ছেন? আর, সেই কথাই বুঝি স্বামী আমাকে বলতে

না পেয়ে এত কষ্ট পাচ্ছেন? এই কথা মনে হওয়াতেই বিদ্যুল্লতা তার অদৃষ্টের কথা চিন্তা করে কাঁদতে লাগলো। বিদ্যুল্লতা যখন এইভাবে বিলাপ করছে ঠিক সেই সময়ে দূরে একটি কাক বলছে—"যদি নিকটে কোন সতী স্ত্রী থাকো, তবে এখানে এসে মরা সাপটার মাথার মনি দুটো নিয়ে যাও।"—কাকের কথা বিদ্যুল্লতা বুঝলো এবং নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে মরা সাপটিকে দেখতে পেয়ে তার মাথা থেকে মণি দুটো নিয়ে এলো এবং আগের মণি পাঁচটির সঙ্গে এই মনি দুটি এক সঙ্গে বেঁধে রাখলো। কাকটি যাবার সময় বিদ্যুল্লতাকে আশীর্বাদ জানিয়ে বলে গেল—"আজ তোমার আগমনে আমি জন্মান্তরীণ শাপ থেকে মুক্ত হলাম। স্বামী সঙ্গে ও মণি নিয়ে তুমি সুখে থাকো।" বিদ্যুল্লতা কাকের ব্যবহারে বিস্মিত হয়ে তার পরিচয় জানতে চাইলো। কাকরূপী গন্ধর্ব বলতে লাগলেন—

হিমালয় শিখরবাসী গন্ধর্ব কলিঙ্গদ আমার পিতা আমি তাঁর অবাধ্যপুত্র অরিন্দম। শাস্ত্র চিন্তা ও সৎকর্মের পরিবর্তে সর্বক্ষণ কুকর্ম, শিকার এবং খেলায় মত্ত থাকতাম। তাই পিতা আমার বিষয়ে হতাশ হয়ে আর আমার মুখ দেখবেন না বলে আমাকে দূর করে দিলেন। এই সময় একদিন আমি অনেক শিকার করে ফিরবার সময় একটি হরিণশিশু দেখতে পেয়ে তার ছুঁড়লাম। কিন্তু তার গায়ে লাগলো না, সে ভয়ে পালাতে লাগলো। আমি তার পেছনে ধাওয়া করলাম হরিণ শিশুটি কোথায় গেল আমি তার হদিশ পেলাম না। ওই পথে এক মুনির কুঠিরের সামনে দিয়ে আসছি। মুনি ঘরে নেই, মুনিপত্নী ঘুমিয়ে। এই সুযোগে মুনির কুঠির থেকে মূল্যবান মনি চুরি করতে গিয়ে মুনি পত্নীর হাতে ধরা পড়লাম। মুনি পত্নী অভিশাপ দিলেন—"সুন্দরবনে অবস্থান করে তুই ব্রাহ্মণের জিনিস চুরি করেছিস, তাই পৃথিবীতে তুই মণিধারী ফণী হয়ে থাকবি।"—মুনি পত্নীর পায়ে ধরে অনেক কাকুতিমিনতি করাতে তাঁর মন নরম হল। তিনি বললেন—"যা বলেছি তার অন্যথা হবে না, তবে তুই দিনে সাপ এবং রাত্রে কাক হয়ে সতী নারীর সন্ধান করে বেড়াবি। যে দিন আমার মতো পতিব্রতা নারীকে তোর মাথার মণি দান করতে পারবি সেই দিন শাপমুক্ত হবি।"—বিদ্যুল্লতা কাকের এই পরিচয় পেয়ে অবাক হয়ে স্বামীর কাছে চললো। কাকও শাপমুক্ত হয়ে উড়ে গেল।

এদিকে বিমলেন্দু ঘুম থেকে জেগে বিদ্যুল্লতাকে না দেখে ভাবলো হয়তো বন্য জন্তু তাকে খেয়ে ফেলেছে। এই সব ভাবছে আর দুঃখ করছে চারিদিকে পাগলের মত খুঁজে বেড়াচ্ছে, এমন সময়ে বিদ্যুল্লতা মুখ টিপে হাসতে হাসতে আসছে। বিমলেন্দু তখনই সন্দেহ করলো নিশ্চয়ই সে তার উপপতির কাছে গিয়েছিল, এবং বিদ্যুল্লতা ভ্রষ্টা চরিত্র। অতএব প্রাণদণ্ডই তার উপযুক্ত শাস্তি। বিদ্যুল্লতা কাছে আসতেই বিমলেন্দু কঠোর ভাবে তার সন্দেহের কথা বললো। বিদ্যুল্লতা তখন ক্ষোভে দুঃখে সাতটি মণির কথা সবিস্তারে বললো। বিমলেন্দু মণিগুলি নিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে বললো। কারণ সে আর বাড়ি ফিরে যেতে চায় না মণিবৃত্তান্ত শুনে বিমলেন্দুও অনুতপ্ত হল এবং বিদ্যুল্লতাকে বাড়ি ফিরে যেতে অনেক অনুনয় করলো। কিন্তু বিদ্যুল্লতাকে সংকল্পে অচল অটল দেখে বিমলেন্দুও স্ত্রীর সঙ্গে বনবাসে থাকতে ইচ্ছা প্রকাশ করলো। তখন স্বামী স্ত্রী মিলে এই নশ্বর জগতের সুখ দুঃখের তুচ্ছতার কথা, স্বামী-স্ত্রীর আদর্শের কথা প্রভৃতি আলোচনা করতে লাগলো। সাধ্বী স্ত্রী যে কখনও কোন অবস্থাতেই স্বামী পরিত্যাগ করে না, তার উল্লেখ করে বিমলেন্দু একটি কাহিনী সুরু করলো বিদ্যুল্লতাকে শোনাতে।—

অবন্তীনগরে অশ্বপতি নামে এক অপুত্রক রাজা ছিলেন। দেব আরাধনা করে শেষ বয়সে তিনি রূপ লাবণ্যে বিমুগ্ধকর এক কন্যা লাভ করলেন। তার নাম রাখলেন সাবিত্রী। সাবিত্রী ক্রমে প্রাপ্তবয়স্কা হয়ে উঠলো। বিবাহের উপযুক্ত বয়স হওয়ায় রাজা সাবিত্রীর উপযুক্ত বর সন্ধান করতে লাগলেন। একদিন সাবিত্রী সমবয়স্কা পরিচারিকাদের সঙ্গে তপোবনে মহর্ষিদের সঙ্গে শাস্ত্রালাপ করতে এবং তাঁদের আচার ব্যবহার

কাঠ সংগ্রহ করে এবং সেই কাঠ

শ্রাদ্ধাচ্ছাদনের ব্যবস্থা

এই ভাবে এক বছর কাটলো। এখন আর

সঙ্গে ছাড়া উচিত মনে করে সাবিত্রীও

আজ সত্যবানের সঙ্গে কাঠ সংগ্রহে বনে চললো। বনে

গিয়ে কিছুক্ষণ কাঠ কুড়োনোর পর সত্যবান মাথার

যন্ত্রণায় বিশ্রাম করবার জন্যে সাবিত্রীর কোলে মাথা

রেখে শুয়ে পড়লেন। ক্রমে সত্যবানের শরীর অবশ

হয়ে এলো। এমন সময় যমদূত এলো সত্যবানের

প্রাণ নিয়ে যেতে সতী সাবিত্রীর কাছ থেকে সত্যবানের

প্রাণ নিতে করুণায় ধর্মরাজ যে স্বয়ং এলেন।

তিনি সত্যবানের প্রাণ নিয়ে চললেন। আর পিছনে

চললেন সাবিত্রী স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে দেবার

জন্যে করতে। ধর্মরাজ বললেন যত

সত্যবানের প্রাণ ছাড়া সাবিত্রীর অন্য যে কোন প্রার্থনা

তিনি পূরণ করবেন। সাবিত্রীর প্রার্থনা মতো যমরাজ

সত্যবানের পিতার রাজত্ব ও দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলেন

সাবিত্রীর অনুরোধে পিতাকে পুত্রের দিলেন। ক্রমে

সাবিত্রী পৌঁছলে তাঁকে সতপুত্রের জননী

হওয়ার বর প্রার্থনা করলেন। যমরাজ 'তথাস্তু' বললেন।

এবং সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলেন তিনি সাবিত্রীকে

সত্যবানের প্রাণ ভিক্ষাই দিয়েছেন। অগত্যা যমরাজ

সত্যবানের প্রাণ ফিরিয়ে দিয়ে এবং সতী সাবিত্রীকে

আশীর্বাদ করে চলে গেলেন। তখন সাবিত্রী ও

সত্যবান ঘরে ফিরে দেখলেন ধর্মরাজের আশীর্বাদে

সত্যই সত্যবান ও সাবিত্রীর পিতার দৃষ্টি ফিরে এসেছে।

সত্যবানের পিতা রাজা দ্যুমৎসেন পুত্রবধূ সাবিত্রীর কাছে

সাবিত্রী মনে মনে সত্যবানকে স্বামী রূপে

ও বরণ করলেন হাত ফিরে সাবিত্রী তাঁর মাকে

এই ঘটনা জানালো যে উপযুক্ত পাত্রেই

সমর্পণ করেছে এই

এমন সময়ে নারদমুনি রাজার কাছে এসে হাজির।

তখন তখন নারদ সাবিত্রী ও সত্যবানের বিবাহ প্রসঙ্গে

বিনাদৃষ্টি ও দৃষ্টিলাবণ্য ক

যে আর মাত্র এক বছর এক্ষণ

তাঁর জ্যোতির্বিদ্যা বলে জানিয়ে দিলেন

অন্যদিকে একথা মাত্র রাজা ও রাণী

দুজনে অভিভূত হয়ে পড়লেন পরে তাঁরা সাবিত্রীকে

এই মুনির গণনার ফলাফল জানিয়ে অনুরোধ করলেন

অন্য কোন পুরুষকে

কিন্তু সাবিত্রী বললেন সত্যবানকে

তাঁকে পতিরূপে বরণ করেছেন, এখন

বিবাহের কথা তাঁর পক্ষে

বাগ্‌ভিচারিণী হওয়ার সামিল।

তখনই রাজা পুরোহিত

ডেকে সত্যবানের সাবিত্রীর বিবাহ দিলেন।

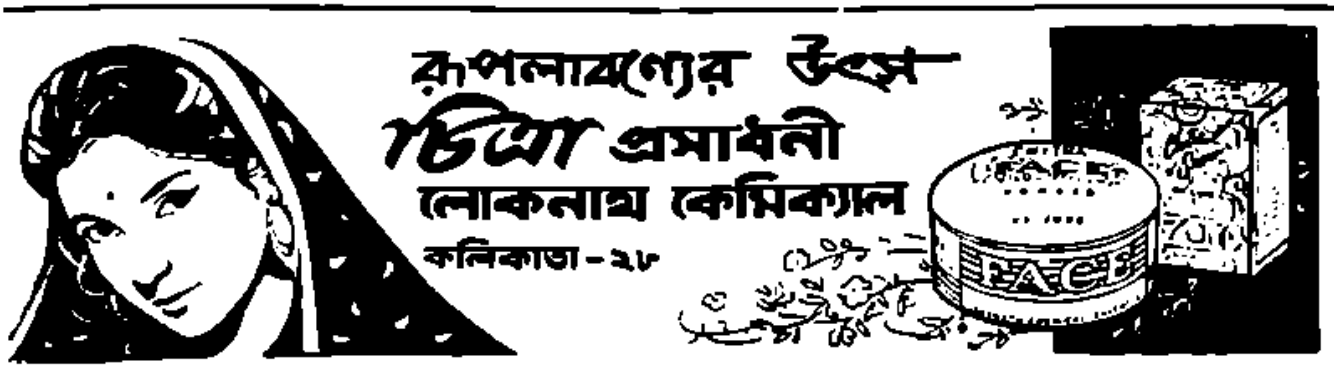

এই ঘটনার বিবরণ শুনে আনন্দে মত্ত হলেন উপযুক্ত পুত্র সত্যবানের হাতে রাজ্য-শাসনভার তুলে দিলেন। সাবিত্রী সত্যবানের সুখে দিন কাটতে লাগলো।

সাধ্বী স্ত্রীর এই কাহিনী বিমলেন্দুর মুখে শুনে বিদ্যুল্লতা ঘরে ফিরে যেতে রাজী হল। ক্রমে রাত পোহালো। বিমলেন্দু বিদ্যুল্লতাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি চললো। বাড়ির বাইরে বিদ্যুল্লতাকে দাঁড় করিয়ে রেখে বিমলেন্দু বাড়ির ভিতরে চললো পিতাকে খবর দিতে। বণিক ভদ্রাবল তখন বাড়িতে ছিলেন না। সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরবার পথে বিদ্যুল্লতাকে একাকী দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পুত্র বিরহী ভদ্রাবল ভাবলেন পুত্রবধূ নিশ্চয়ই বিমলেন্দুকে প্রাণে মেরে এখন তাঁকেও শেষ করতে এসেছে—এ নিশ্চয়ই শয়তান। এই মনে করে ভদ্রাবল তাঁর হাতের লাঠির আঘাতে পুত্রবধূকে মেরে ফেললেন। পরে গোলমাল শুনে বিমলেন্দু বাইরে এসে ব্যাপার দেখে দুঃখে শোকে হাহাকার করতে লাগলো। তখন সে পিতাকে বিদ্যুল্লতার পতিপরায়ণতার কথা এবং সেই সাতটি মণির কথা বলতে বলতে মণিগুলি দেখালো। তারপর বিমলেন্দু আগুনে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ ত্যাগ করলো। সেই শোকে বণিক পত্নী বন্ধুলতা, বণিক ভদ্রাবল, এবং তাঁদের বন্ধুবান্ধবও দাসদাসীরাও আগুনে পুড়ে মরলেন।

মেজ রাজকুমার এই কাহিনী শেষ করে রাজাকে বললেন অবিচারে কাজ করলে পরিণামে অনেক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। অতএব ছোটকুমারের প্রতি যেন অবিচার না হয়। রাজা সে কথায় কান না দিয়ে এবং ঘাতককে তার কর্তব্যে অবহেলা করতে দেখে রাজা তখন নিজেই ছোট কুমারকে বধ করতে উদ্যত হলেন। ছোট কুমার তখন রাজাকে বললেন, আপনি যেমন পাষাণের মতো নির্দয়ভাবে সন্তানের প্রতি আচরণ করলেন তেমন আপনি পাষাণদেহে পরিণত হয়ে মহাপাপের শাস্তি ভোগ করবেন। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে রাজা খড়্গের আঘাতে কুমারের জীবন শেষ করলেন। ছোট কুমারের শোকে বড়ো ও মেজকুমারদ্বয়ও খড়্গের আঘাতে মৃত্যু বরণ করলেন। রাজপরিষদরা ভয়াবহ এই দৃশ্য দেখে অভিভূত হোলেন। কথায় বলে অসৎকর্মের বিপরীত ফল। ক্রমে রাজার শরীর পাষাণের মতো হয়ে গেল। আর তার মুখদিয়ে অনবরত "যেমন কর্ম তেমন ফল" শব্দ বেরোতে লাগলো। পাত্রমিত্রগণ রাজাকে এই অবস্থা থেকে মুক্ত করতে অপারগ হয়ে তাঁর পাষাণ দেহটিকে এই বনের মধ্যে রেখে গেল।

আনুপূর্বিক এই কাহিনী বর্ণনা করে ভরদ্বাজ নগরের রাজা ভবেশ্বরের পুত্র ভরদত্ত তাঁর প্রণয়ী হেমপ্রভার পিতা হেমস্থপুরের বণিক হেমচন্দ্রকে বলতে লাগলেন—এই সেই শ্রীধর নগরের রাজা শ্রীবৎসল: অবিচারে পুত্রহত্যা জনিত পাপের ফলে পাষাণদেহে হয়ে শাস্তি ভোগ করছেন। ভরদত্তর মুখে এই প্রকৃত ঘটনা শুনে বণিক হেমচন্দ্র খুশি হলেন এবং কন্যা হেমপ্রভার সঙ্গে ভরদত্তর বিবাহ স্থির করলেন পুরোহিত ডেকে। বিবাহের দিন হেমচন্দ্র লগ্নের প্রতীক্ষায় বসে আছেন সভামণ্ডপে। এমন সময় ইন্দ্রজিৎ নামে এক গন্ধর্ব মায়াবলে হেমপ্রভাকে অন্তর্ধান করে নিয়ে পালিয়ে গেল। পরিচারিকাদের মুখে এই খবর শুনে হেমপ্রভার মা বাবা আত্মীয়স্বজন সকলেই দুঃখে অভিভূত হলেন। আর শোকে ক্ষিপ্তপ্রায় ভরদত্ত সন্ন্যাসী বেশে হেমপ্রভার সন্ধানে হেমচন্দ্রের বাড়ি এবং পরে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ালেন।

একদিন ঘুরতে ঘুরতে পরিশ্রান্ত হয়ে ভরদত্ত পথের ধারের এক পুকুর থেকে জল ও নিকটের গাছ থেকে

দেশপ্রেমের প্রমাণ দেবার
সময় এসেছে আজ,
স্বাদেশ রক্ষা পণ করে
সবাই করুন কাজ।

সুস্বাদু ফল খেয়ে ক্লান্তি নিবারণ করলেন। তারপর আবার যখন ঘুরছেন সেই সময় জয়দত্ত দেখতে পেলেন তাঁর প্রিয়তমা হেমপ্রভার মূর্তি বনের একপ্রান্তে আরও কয়েকটি পাখির সঙ্গে পাখার ঝাপ্টা করে পড়ে আছে। এটা কোন দৈব ঘটনা মনে করে তার রহস্য জানবার জন্যে বনের মধ্যে অবস্থিত মহামায়ার মন্দিরে গিয়ে হাজির হোলেন। একমনে ভক্তিভাবে মহেশ-মনোমোহিনীর পূজা করলেন। সন্তুষ্ট হয়ে দেবী বর দিলেন নির্দেশ মতো দেবীর চরণামৃত সেই পাখামূর্তির উপর জয়দত্ত ছিটিয়ে দিতেই তারা প্রাণ পেয়ে জীবন্ত হল। পাখিরা আকাশে উড়ে গেল। আর হেমপ্রভা এবং এক গন্ধর্ব কন্যা যেন ঘুম থেকে উঠে উদ্ভ্রান্ত এদিক ওদিক দেখতে লাগলেন। জয়দত্ত হেমপ্রভার হাত ধরতে যাবেন এমন সময় সেই গন্ধর্ব কুমারী এসে যোড় হাতে জয়দত্তর কাছে বিবাহ চাইলেন। জয়দত্ত তার পরিচয় জানতে চাইলেন। গন্ধর্বকন্যা তখন তার পরিচয় ও শাপ বৃত্তান্ত বলতে লাগলো।

বিন্ধ্যাচল শিখরবাসী গন্ধর্ব ইন্দুহেম এবং তাঁর কন্যা তরঙ্গললনা। কন্যাকে একমুহূর্তের জন্যেও চোখের আড়াল করেন না ইন্দুহেম। তরঙ্গললনা একদিন সখিদের সঙ্গে খেলা করে দেরী করে বাড়ি ফেরাতে ইন্দুহেম কন্যাকে অভিশাপ দিলেন। দেখতে দেখতে তরঙ্গসেনা পাষাণমূর্তি ধারণ করলো। ইন্দুহেম সেই মূর্তিকে এই বনের প্রান্তে রেখে গেলেন। তাকে স্পর্শ করার ফলে কয়েকটি পাখিও পাথরের মতো হয়ে গেল। ইন্দুহেম মনের দুঃখে এই বনে অবস্থিত দেবী মহামায়া মহাকালীর স্তব করতে লাগলেন। স্তবে তুষ্ট মহামায়া বললেন—জয়ন্তীনগরের রাজা জয়েশ্বরের পুত্র জয়দত্ত যখন তার প্রণয়ী হেমপ্রভার সন্ধানে এসে মহামায়ার চরণামৃত ছিটিয়ে দেবে তখনই ইন্দুহেমের কন্যার পাষাণমূর্তির প্রাণ সঞ্চার হবে। আজ জয়দত্তের আগমনে এবং দেবীর নির্দেশ মতো কাজ করাতে তরঙ্গ সেনা প্রাণ ফিরে পেলেন। জয়দত্ত এই কাহিনী শুনে মুগ্ধ হলেন।

জয়দত্ত এবং গন্ধর্বকন্যা তরঙ্গসেনা এই রকম কথাবার্তা বলছেন এমন সময় জয়দত্ত-প্রণয়ী হেমপ্রভা তাঁকে চিনতে না পেরে তাঁর পরিচয় জানতে চাইলেন। জয়দত্ত কিন্তু প্রথম দর্শনেই চিনেছেন। তাই এদের এই ছদ্মবেশে তরঙ্গসেনা আসল ব্যাপার অনুমান করলেন এবং গন্ধর্বমতে উভয়ের বিবাহ দিবার ইচ্ছায় ফুল সংগ্রহ করতে চললেন। এই অবসরে হেমপ্রভা জয়দত্তকে বললেন কিভাবে তাঁদের বিবাহের দিন মায়াবলে ইন্দুহেম তাঁকে এখানে নিয়ে আসেন। হেমপ্রভা বললেন দেবী মহামায়ার নির্দেশেই ইন্দুহেম তাঁর কন্যা তরঙ্গ সেনার প্রাণ ফিরে পাবার জন্যই হেমপ্রভাকে চুরি করে আনেন। তারপর ইন্দুহেম তরঙ্গসেনার অঙ্গ স্পর্শ করানো মাত্র হেমপ্রভাও পাষাণময় হয়ে গেল। তারপর আর হেমপ্রভা কিছুই জানে না। আজ জয়দত্তের আগমনে তারা সব প্রাণ ফিরে পেল। এই সমস্ত বিবরণ জানার পর জয়দত্তও হেমপ্রভার গান্ধর্বমতে বিবাহ হল।

জয়দত্ত হেমপ্রভাকে নিয়ে দেশে ফিরতে চাইলেন। তখন ইন্দুহেমের কন্যা তরঙ্গসেনা হেমপ্রভাকে একটি গুটিকা উপহার দিলেন। তরঙ্গসেনার নির্দেশমতো সেই গুটিকাটি মুখে রেখে হেমপ্রভা পথ চলতে লাগলেন ঠিক যেন কুণ্ডিনরাজের যুবতীর মতো। পথে অনেক কষ্ট সহ্য করে অবশেষে তাঁরা হেমপুরে হেমপ্রভার পিতার কাছে গিয়ে হাজির হোলেন। তখন আবার শাস্ত্রমতে তাঁদের বিবাহ হল। মহাসুখে তাদের দিন কাটতে লাগলো। কিছুদিন পর হেমচন্দ্রের কাছে বিদায় নিয়ে জয়দত্ত তাঁর স্বদেশ জয়ন্তীনগরে চললেন হেমপ্রভাকে সঙ্গে নিয়ে। জয়দত্তর পিতা রাজা জয়েশ্বর বহুদিন পর পুত্র ও পুত্রবধূকে ফিরে পেয়ে আনন্দে অভিভূত হোলেন। পরে উপযুক্ত পুত্র জয়দত্তের হাতে রাজ্যশাসন ভার দিয়ে নিজে অবসর নিলেন। জয়দত্ত পরমসুখে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করে সুখে দিন কাটাতে লাগলেন।

নিশি বিহঙ্গ

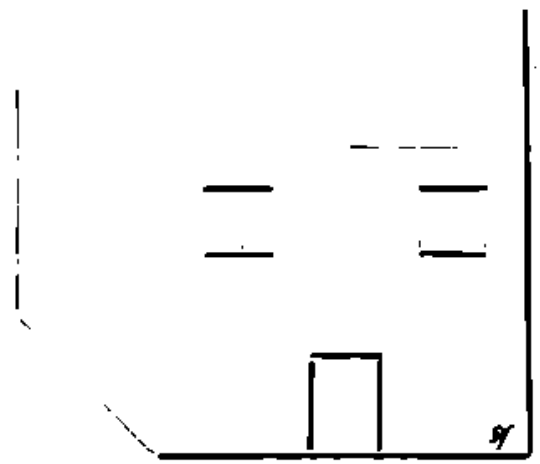

হরিপ্রসন্ন চক্রবর্তী

পশ্চিম দিকে কালো দৈত্যের মত মেঘ সূর্যকে গ্রাস করে ফেলেছে, শুধু কতকগুলি ক্ষীণ রশ্মিরেখা মেঘের বুক চিরে বেরিয়ে আসবার জন্য সংগ্রাম করছে।

চৌরাস্তার প্রকাণ্ড তেতুঁল গাছটার তলায় এসে দাঁড়াল রঞ্জনা। এখানেই বাস এসে থামবে অনেক যাত্রী বাসের জন্য অপেক্ষা করছে। প্লাস্টিকের বর্ষাতিটা একটু ভাঁজ করে বাঁ কাঁধের উপর ফেলে রাখল রঞ্জনা, ঘড়ি দেখল পাঁচটা বাজতে মিনিট তিনেক বাকি।

তাড়াতাড়ি আসতে গিয়ে রঞ্জনার ডান পায়ের স্যাণ্ডেলের স্ট্র্যাপটা ছিঁড়ে গেছে. শাড়ীর প্রান্তভাগ সায়ার উপর উঠে গেছে বলে সায়ার নিচের দিকে কাদার ছিটে লেগেছে. সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই রঞ্জনার, হাত দুটো নিরাভরণ, গলাতে একটু লিকলিকে হারও দেখা যাচ্ছে না, খোঁপাটা ভাল করে বাঁধেনি সে, শাঁখ-সাদা ঘাড় ছাড়িয়ে খোঁপাটা পিঠের উপর একটু হেলে পড়েছে।

রঞ্জনার দেহের উপর দিকের তুলনায় মধ্যমাংশ বেশ ভারি ভারি, প্রচণ্ড গরম বলে সে ব্লাউজ পরেনি, তাই পাঁজরের নিচে সরষরে খানিকটা অংশ বেরিয়ে আছে। আবার ঘড়ি দেখল রঞ্জনা, ঠিক পাঁচটা।

হাঁকাতে হাঁকাতে বাস এল বটে তবে ওঠে কার সাধ্য। কতক যাত্রী হুড়মুড় করে উঠে পড়ল, যারা নামছিল তাদের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি হতে লাগল, কেউ আবার অদ্ভুত ধরনের মন্তব্য করে বসল, বচসার সূত্রপাত হল, রঞ্জনা সেই ফাঁকে ভিতরে ঢুকে গেল।

তিল ধারনের স্থান নাই ভিতরে। বড় ঘরে যাত্রীরা গাদাগাদি ঠেলাঠেলি করে দাঁড়িয়ে আছে। তার উপর প্রাণান্তকর গুমোট। বিংশশতাব্দীর জীবনযাত্রা যেন অসহনীয় হয়ে উঠেছে। ঠেলাঠেলি করে এগিয়ে গিয়ে একটা সীটের পেছনে হাত রেখে দাঁড়াল রঞ্জনা ? পিছনে এবং দুপাশে পুরুষ তার গায়েঁসে দাঁড়িয়ে আছে। বাস ছুটে চলল। আর এক সেকেণ্ড সে দাঁড়াতে পারবে না এখানে, নির্দিষ্ট তিন মিনিট তার শেষ হয়ে গেছে। রঞ্জনাকে বেশ স্পষ্ট দেখতে না পেলেও এক ভদ্রলোক সীটে বসে তাকে লক্ষ্য করছিলেন. এবার সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনি আমার সীটে বসুন।

বাধা দিয়ে রঞ্জনা বলল, ঠিক আছে, আপনি বসুন, সামনেই বাস অনেক খালি হয়ে যাবে। ভদ্রলোক কিন্তু রঞ্জনার কথা না শুনে একটু সরে এলেন, তখন বাধ্য হয়ে রঞ্জনা আর এক ভদ্রলোকের ডান পাশে গিয়ে বসল।

যে ভদ্রলোকটি উঠে দাঁড়িয়ে রঞ্জনার বসবার জায়গা করে দিলেন তাঁর বয়স খুব বেশী নয়, ত্রিশের একটু উপরেই। দীর্ঘ সুঠাম দেহ, গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যাম, টৌসি মোটা ক্রেনের ধুসর চশমা, পরনে খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি, হাতে এ্যাটাচি। ভদ্রলোকের চোখে-মুখে বেশ একটি শিক্ষাজাত আভিজাত্যের ছাপ।

তীক্ষ্ণ এবং কৌতূহলী রঞ্জনা মুখের দিকে বার বার চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন। তপতী? সেই মন যেন তার বিস্ময় আর আনন্দে দুলে দুলে উঠতে লাগল। সেই মুখ, সেই চোখ; আগের চেয়ে গায়ের রঙ অনেক কর্সা হয়েছে, বেশ একটু লম্বা হয়েছে বলে শোনা, মনে হচ্ছে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন ভদ্রলোক? দশ বছর পরে তিনি কি আজ সত্যই তপতীকে দেখতে পেলেন? তিনি তো প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন তপতীকে খুঁজে বার করবার জন্য কিন্তু তপতীর যে কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। বড় ঘরে দাঁড়িয়ে রঞ্জনার মুখের দিকে পলকহীন চোখে চাইতে চাইতে তিনি সাত-পাঁচ ভেবেছিলেন আর কপালের ওপর কৌতূহলের কুঞ্চন রেখা পড়ছিল, অথচ সাহসে ভর করে তিনি তাকে কিছু জিজ্ঞেস করতেও পারছিলেন না। যদি তপতী না হয়, যদি অন্য কেউ হয়, একজনের সাথে অন্যের চেহারার মিলও তো থাকতে পারে। সিঁথিতে সিঁদুর নেই, বাঁ হাতেও নোয়া নেই? তা হলে তপতী নিশ্চয় এখনও অবিবাহিত। এক দুর্নিবার আশায় ক্ষীণ তরঙ্গ তাঁর মনকে নাচিয়ে দিয়ে চলে গেল। আর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন ভদ্রলোক? নিজেকে মনে মনে প্রশ্ন করে নিজেই উত্তর দিতে লাগলেন: আজকাল বিয়ের পর অনেক মেয়ে শাঁখা সিঁদুর পরে না, যেমন তাঁর বাড়ীর পাশে নার্স অহিতা আর তার বৌদি। দু'জনেই বিবাহিতা, বাচ্চা-কাচ্চার মা, কিন্তু কখনোই শাঁখা-সিঁদুর ব্যবহার করে তারা। সে দিন বিজয়ের বোনের সঙ্গে দেখা হল, অবশ্য সে পার্টির মেয়ে, এক পাঞ্জাবীকে বিয়ে করেছে, তারও তো শাঁখা-সিঁদুরের বালাই নেই। তাহলে—তাহলে তপতী কি বিবাহিত? এত বছরের মধ্যে তপতীর জীবনে কি কোন পরিবর্তন আসেনি? আর কোন ভালবাসার ঘটনা কি ওর জীবনে ঘটেনি? জীবন কি ওর রিক্ত, শূন্য? কিংবা ওকি বিধবা? মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠল ভদ্রলোকের।

চুপ করে বাইরের দিকে চেয়ে বসেছিল রঞ্জনা। বাঁ দিকের বুক থেকে কাপড় খসে পড়ছে সে দিকে তার খেয়ালই নেই, বাতাসে চুল এসে তার চোখের উপর পড়ছে তাও সে হাত দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে না, নির্নিমেষ নিষ্পলক নয়ন মেলে চুপ করে বসে আছে রঞ্জনা। অনেকের ভরে সে একটি বারের জন্যও ভদ্রলোকটির দিকে চেয়ে দেখছে না।

বাস তীব্র বেগে ছুটে চলেছে। রাস্তা ফাঁকা।

মিনিট কয়েক পরে এক চৌরাস্তার কাছে বাস এসে থামল। মিনিট পাঁচেক গাড়ী এখানে বিশ্রাম করবে। অনেক যাত্রী ওঠা-নামা করল। যে ভদ্রলোকটি রঞ্জনার বাঁ পাশে বসেছিলেন তিনি এই স্টপে নেমেগেলেন। রঞ্জনা তখন জানালার দিকে সরে গিয়ে ভদ্রলোকের মুখের দিকে আলতো ভাবে চেয়ে বলল, আপনি বসুন। রঞ্জনার পাশে বসলেন ভদ্রলোক দ্বিরুক্তি না করে। এ্যাটাচিটা রঞ্জনার ডান হাঁটুর উপর একটু মৃদু ধাক্কা খেল। রঞ্জনা ভদ্রলোকের মুখের দিকে না তাকিয়ে আরও একটু সরে গেল জানালার দিকে। ভদ্রলোক কিন্তু রঞ্জনার পাশে বসে স্বস্তি পেলেন না, ক্রমাগত তাকে নিরক্ষণ করতে লাগলেন। এবার যেন তিনি নিঃসন্দেহ হলেন, তপতী ছাড়া আর কেউ হতেই পারে না। ডান কানের নীচে সেই তিলটি পর্যন্ত সুস্পষ্ট।

তুমি তপতী, না? একেবারে সরাসরি প্রশ্ন করে বসলেন ভদ্রলোক।

চমকে উঠল রঞ্জনা। ভদ্রলোকের মুখের দিকে গভীর অথচ স্থির দৃষ্টিতে সে চেয়ে রইল মিনিট খানেক কোন উত্তর খুঁজে পেল না সে, তার কণ্ঠনালী যেন রুদ্ধ হয়ে আসছিল।

তুমি—তুমি—অনুনয়, না?

অনুনয় কোন উত্তর দিল না, নির্বাক হয়ে শুধু রঞ্জনার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। বুড়ী গঙ্গার তীরে একটি নির্জন পল্লীর দুটী প্রাণী—তপতী আর অনুনয়, অনুনয় আর তপতী।

আবেগচঞ্চল হয়ে উঠল অনুনয়ের মন, নিজেকে রীতিমত সংযত করে বলল, কোথায় চলেছ?

বাড়ি।

পার্টি থেকে আসছ?

না, ইস্কুলের মিটিং ছিল, একটু থেমে রঞ্জনা বলল।

ইস্কুলের মিটিং? তুমি কি টিচারি কর?

হুঁ, অনুনয়ের দিকে না তাকিয়ে বলল রঞ্জনা।

বাস এখন স্টপে এসে থামল। দুজনেই চুপচাপ।

অনুনয় জিজ্ঞেস করল, বাড়ি কোথায়?

বালীগঞ্জ স্টেশনের কাছে।

নিজেদের বাড়ি?

নিজেদের বাড়ি! একটু হাসল রঞ্জনা, না, দিদির বাড়িতে থাকি। অনুনয়ের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বাইরের দিকে চাইল রঞ্জনা। আবার দুজনে চুপ চাপ।

আকাশে নিকষ কালো মেঘ। বিদ্যুৎ চমকে উঠছে মুহুর্মুহু। বৃষ্টি আসবার আর বিলম্ব নেই। বাস ধর্মতলার কাছে এসে পড়ল।

অনুনয় রঞ্জনাকে বলল এইবার তো নামতে হবে।

কেন? বাস বালীগঞ্জ অবধি যাবে না? কত নম্বর বাসে তবে উঠলাম?

যত নম্বরই হোক, হেসে বলল অনুনয়, এখন চল নেমে একটু চা খাওয়া যাক, বৃষ্টি এল বলে।

ও-সব কেন আবার? আমার যে দেরী হয়ে যাবে।

কোন জরুরী কাজ আছে?

রঞ্জনা কোন উত্তর দিল না। দুজনের চোখাচোখি হল।

চল, একটু চা খেয়ে যাওয়া যাবে। তোমাকে বেশীক্ষণ আটকাবো না। এসো। বৃষ্টি পড়ছে।

কি যেন একটু ভেবে নিল রঞ্জনা, বাইরের দিকে একবার তাকিয়ে দেখল, সত্যই বৃষ্টি পড়ছে, বলল চল।

বাস থেকে নেমে বড় রাস্তা পার হয়ে ওরা রেস্টুরেন্টে ঢুকল, দোতালায় উঠে কোণের দিকে কেবিন দখল করে বসে পড়ল।

বয় এসে দাঁড়াল। অনুনয় অর্ডার দিল। পর্দাটা ফাঁক ছিল বলে বাইরে থেকে কেবিনের ভিতরের কিছু অংশ দেখা যাচ্ছিল, অনুনয় উঠে গিয়ে স্ক্রীনটা দরজার সঙ্গে ভাল করে লাগিয়ে দিল।

রঞ্জনা হাসল।

হাসলে যে?

কোন উত্তর দিল না রঞ্জনা।

কাটলেট কাটতে কাটতে অনুনয় বলল, তারপর কোথায় ছিলে এত দিন? তোমার চিঠি কিন্তু আমি হারাইনি, এখনও সযত্নে রেখে দিয়েছি। তোমাকে দেখে আমার বিস্ময়ের সীমা নেই।

রঞ্জনা গম্ভীর, নিরুত্তর। একটুকরো কাটলেট কেটে মুখে দিল।

বল।

মাসীমা কেমন আছেন।

যার কথা বলছ? দীর্ঘশ্বাস ফেলল অনুনয়। কলকাতায় পালিয়ে আসবার বছর তিনেকের মধ্যেই তো মা মারা গেলেন। তুমি জানতে না?

মারা গেছেন! আহারে, এক মুহূর্ত চুপ করে, অনুজা কোথায়?

অনুজা? তোমার তো দেখছি বেশ মনে আছে!

রঞ্জনা এক পলক তাকাল অনুনয়ের মুখের দিকে।

বিএ পাশ করে এম এ পড়ছিল অনুজা। গত বছর বিয়ে দিয়েছি।

কোথায়?

আলম বাজারের কাছে, ছেলেটি ভাল, ইঞ্জিনিয়র, সরকারী চাকুরে, অনুজার খোকার আজ অন্নপ্রাশন ছিল, তার বাড়ি থেকেই আসছি।

রঞ্জনা কাটলেট খাওয়া বন্ধ করে চায়ের কাপ তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, তোমার নিজের খবর?

কি শুনতে চাও! অনুনয়ের মুখখানা বেশ গম্ভীর গম্ভীর হয়ে উঠল, সেটা লক্ষ্য করল রঞ্জনা।

কি করছ—চাকরি, না, প্রফেসারি?

প্রফেসারি।

কিসের?

কিলসফির।

একটু হাসল রঞ্জনা অনুনয়ের মুখের দিকে চেয়ে।

কোথায় আছ এখন?

সোনারপুরে।

কে থাকে তোমার সংসারে?

দুটোন অন দুঃস্থ কলেজের ছাত্র আমার ওখানে থেকে পড়াশুনা করে, তাদের সংগেই থাকি।

চায়ের কাপ রেখে দিল রঞ্জনা, কাটলেট কাটবার ছুরি তুলল, ভারী গলায় বলল, বেশ ভাল কাজ করেছ, কিন্তু তোমার বিয়ে করা উচিত।

অনুনয় কোন উত্তর দিল না, শুধু রঞ্জনার মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসল।

মিনিট খানেক চুপ করে থেকে রঞ্জনা বলল, তুমি আগের মত এখনও ভাবপ্রবণ আছ দেখছি, একটুও বদলাওনি। জগৎটা যে দিন দিন কত নীরস হয়ে আসছে, সে দিকে বোধহয় তোমার খেয়াল নেই। তোমাকে দেখে হিংসা হয়। কেতাবী আদর্শের ঘোরে বিভোর হয়ে বেশ আছ।

কথাগুলো বলেই গম্ভীর হয়ে গেল রঞ্জনা। মনে হল সে যেন কার মনের গভীরে ডুব দিয়ে কি খোঁজ করছে। অনুনয় রঞ্জনার মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য করল।

আর কিছু আনতে বলব?

আর কি বলবে? রাত্রি হচ্ছে, আটটা বোধ হয় বেজে গেছে।

কি এমন রাত্রি। সবে আটটা।

একটু চা আনতে বলি।

বৃষ্টি পড়ছে। এখন বেরোন যাবে না।

রঞ্জনা কিছু বলল না। অনুনয় বয়কে চায়ের অর্ডার দিল।

অনুনয় বলল, তোমার খাম পেয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিলাম না। তোমার অনেক খোঁজ করেছিলাম। তোমার কাকার বাসায় গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম তোমার কাকাকে, তিনি কোন সঠিক উত্তর দেননি। পুষেছিলাম তোমার ছোট ভাই বিবেকও কোথায় চলে গেছে, তার সন্ধান পেয়েছ কি না জানি না।

অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠল রঞ্জনা। চেয়ার ছেড়ে উঠে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

বয় চায়ের ট্রে এনে টেবিলের উপর রেখে দিয়ে চলে গেল।

রঞ্জনা চেয়ারে বসল।

অনুনয় বলল কোথায় ছিলে, কি করছিলে এতদিন, বল, শুনি।

ছোট কেবিনটির মধ্যে দুজনেই চুপচাপ, শুধু দুজনের চোখ পরস্পরের মুখের দিকে, এতদিন তারা যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে একে অপরকে।

মিনিট দুয়েক কেটে গেল।

রঞ্জনা অনুনয়ের মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসল টি পট থেকে কাপে চা ঢালতে ঢালতে বলল, কি হবে? আমরা তো আগের জীবনে আর ফিরে যেতে পারব না। চা খাও।

তা সত্যি, চা খেতে খেতে অনুনয় বলল, পিছনের দিকে তাকান যায়, ফেরা যায় না। তা হলে মানুষের মন যে কৌতূহলী, সে যে সব কিছু জানবার জন্য ব্যস্ত হয়ে থাকে।

ঠিক বলেছ, তোমাকে দেখে আমারও ঠিক সেই ইচ্ছাই হচ্ছে। এই বলে চায়ের কাপে চুমুক দিল রঞ্জনা। অনুনয় সিগারেট ধরাল, সে তো তুমি এই কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রায় সব জেনে নিয়েছ। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে অনুনয় বলল, আমি বিয়ে করিনি, মা মারা গেছেন, বোনের বিয়ে দিয়েছি আর একটু যোগ করছি, মামার বাড়ীতে থেকেই এম এ পরীক্ষা দিয়েছিলাম, ফার্স্ট ক্লাস পেলাম, চাকরিও জুটে গেল একটা, কিন্তু মনে বড় আক্ষেপ রয়ে গেল মা দেহ রাখলেন। মার মৃত্যুর বছর খানেক পরে মামা মারা গেলেন। মামী এবং মামাতো ভাইদের মনের কথা বুঝতে আমার দেরী হল না, আমাকে যেন তাঁরা আর সহ্য করতে পারলেন না। বোনকে নিয়ে চলে এলাম বিডন স্ট্রীটে এক বন্ধুর বাড়ীতে, দু'খানা ঘর ভাড়া নিয়ে সেখানে কয়েক বছর রইলাম তারপর আজ চার বছর হল সোনারপুরে একখানা ছোট পুরোনো দোতলা বাড়ী কিনে সেখানেই বাস করছি। এই আমার জীবনের গত বছরের ঘটনা। আর সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, অনুনয় হাসতে হাসতে বলল, আমি আর কারুকে প্রেমে পড়িনি।

অনুনয়ের মুখের দিকে চেয়ে রঞ্জনা জোরে হেসে, উঠল, বলল, এমন সোনার দিনগুলি অযথা নষ্ট করলে? কিন্তু কেন? রঞ্জনা তাকাল, সে জানে, কেন, কিন্তু তবু সে ওর চোখে স্বীকৃতি খোঁজে।

তোমার কথা বল, তপতী।

রঞ্জনা একটু হাসল, চাই তুলতে তুলতে বলল, আমার জীবন কাহিনী অতি তুচ্ছ, অতি নীরস, অনুনয়। তোমাদের আধুনিকা মনের কাছে সে সব কাহিনী ধৈর্যতে পারবে না? কি হবে জেনে?

অনুনয় কোন উত্তর করল না। তার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। রঞ্জনার দিকে চেয়ে থাকে দেখল। উঠবে এইবার?

না, তোমার যদি কোন তাড়া না থাকে তাহলে আরও খানিক থাকি। বৃষ্টিও আসেনি এখনও।

আমি ও একটু পরেই যাব, দিদির বাড়ীতে আজ যেন কিসের চিড়িক আছে।

চিড়িক?

এই সব তোমাদের পুজো-টুজোর ব্যাপার, সংক্রান্তি, সত্য-নারায়ণ, ব্রাহ্মণ ভোজন। এই বলে হেসে ফেলল রঞ্জনা।

ওঃ, তোমার বুঝি আর ওসব ভাল লাগে না?

চিরকাল কি সব জিনিস ভাল লাগে?

অনুনয় রঞ্জনার কথার কোন জবাব দিল না, জোরে জোরে সিগারেট টানতে লাগল।

রঞ্জনা বলল, মনকে গতিশীল করতে হয়, নইলে মনের কোন প্রাণ থাকে না।

ঠিক বলেছ তবে জোর করে মনকে গতিশীল করতে গিয়ে যদি জীবনের ধারা উলটে পালটে যায়, জীবন থেকে যদি আনন্দ চলে যায়, সে দিকেও তো দৃষ্টি রাখতে হবে।

চমকে উঠল রঞ্জনা। শুদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল অনুনয়ের মুখের দিকে।

পাকে প্রকারে জেনে নিতে চাইল অনুনয় রঞ্জনার গত দশ বছরের ইতিহাসের কিছুটা, কিন্তু ব্যর্থ হল সে তার মুখ থেকে বিশেষ কিছু সে বার করতে পারল না। অনেকক্ষণ এ-কথায় সে-কথায় কেটে গেল। অনুনয় ঘড়ি দেখল, ন'টা বাজতে মিনিট কতক বাকি। তখনও বৃষ্টি পড়ছে। অনুনয় বলল, বৃষ্টিতে বেরুবে কি করে? এসো, এক পেয়ালা করে কফি খাওয়া যাক।

দু'কাপ চায়ের ওপর আবার কফি? মাথা যে গরম হয়ে উঠবে, রাত্রে ঘুমাতে পারবে না। হাসল অনুনয়, কিন্তু চলে না, এমনিতেই তো একটা দেড়টা অবধি জেগে থাকি, আজ না হয়, রঞ্জনার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল তোমাকে স্মরণ করেই সারা রাত কাটিয়ে দেব। কিন্তু না খেয়ে কেবিন দখল করে বসে থাকাটাও ঠিক নয়, বিশেষ করে এই অভিজাত্য রেস্টুরেন্টে।

বয়কে ডাকল অনুনয়।

রঞ্জনা দাঁড়িয়ে জানালার কাঁচ দিয়ে দেখল বৃষ্টি পড়ছে বটে তবে তেমন জোরে নয়। কফি খেতে আরও খানিকক্ষণ সময় কাটাল, কিন্তু কিছুই এগোল না, এতদিন পরে ওরা কি বলতে চায়, কি জানতে চায়, কি যাচাই করে দেখতে চায় সময়ের ধুলো সরিয়ে?

হঠাৎ রঞ্জনা বলে উঠল, আর দেরী নয়, এইবার যেতে হবে। তোমার তো আবার পথ অনেকটা। বালীগঞ্জ থেকে ফিরে যাও?

ট্রেনেও যাওয়া যায়, বাসেও যাওয়া যায়। আমি বাসেই যাই, একেবারে বাড়ীর সামনে নামি। একদিন এসো না আমার ওখানে।

যাব, নিয়ে যেয়ো সঙ্গে করে।

দু'জনে উঠে পড়ল। দাম চুকিয়ে বদলা চিবুতে চিবুতে ওরা নীচে এসে ফুটপাথের উপর দাঁড়াল।

অনুনয় বলল, চল, ট্যাক্সি করে যাই।

ট্যাক্সি কেন?

তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছবে।

অনুনয়ের কাছ থেকে একটু দূরে সরে দাঁড়াল রঞ্জনা। অনুনয় লক্ষ্য করল তপতীর মুখখানি লজ্জা-ভীরু হয়ে উঠেছে, কেবিনের ভিতরে বসে তার মুখোমুখি হয়ে যে তপতী এতক্ষণ সহজ ভাবে গল্প করছিল, এ সে তপতী নয়, আর একজন। অনুনয় আর একবার তার মুখের দিকে তাকাল।

কতদিন মাষ্টারি করছ?

প্রায় দু'বছর।

মাইনে কি রকম?

সাধারণ। ইস্কুলটা নতুন। যা পাই তার বেশীর ভাগ দিদির হাতে দিই, অবশ্য দাদাবাবু আগে আগে খুব আপত্তি করেছিলেন, কিন্তু রাখি নিজের জন্য।

দু'একটা টিউশনি করলে তো পার।

কি দরকার? বলল রঞ্জনা, কি হবে ট্যাক্সি নিয়ে, ছুটে, আমার কোন রকম চলে গেলেই হল।

এত তাড়াতাড়ি বৈরাগ্য? ব্যাপার কি বলত?

ঝির ঝিরে বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে ওরা দুজনেই দুজনের দিকে চেয়ে হেসে ফেলল। ট্যাক্সির ভিতর অনুনয়ের পাশে বসল রঞ্জনা একটু ব্যবধান রেখে। অনুনয় দিদারেই ধরাল। ট্যাক্সি ছেড়ে দিল।

ট্যাক্সিতে বসে হঠাৎ অনুনয় খুব গম্ভীর হয়ে পড়ল। তার চোখে সব অস্পষ্ট ঠেকতে লাগল আজ। তপতী তার হারিয়ে যাওয়া তপতী কোথা থেকে এসে তার সামনে দাঁড়াল আজ? অনুনয় মুখ ফিরিয়ে দেখল তপতী তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি।

ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে খুব, পাঞ্জাবীর বোতামগুলো ভাল করে এঁটে দাও।

অনুনয় ঈষৎ হেসে রঞ্জনার কথা মত কাজ করল।

মিনিট পনেরর মধ্যেই গাড়ি গড়িয়াহাট মোড়ের কাছে এসে পড়ল। এখান থেকে রঞ্জনাদের বাড়ি মিনিট কয়েকের পথ। গাড়ি রঞ্জনার নির্দেশে আরও একটু এগিয়ে গিয়ে থামল।

গাড়ীতে বসেই সে অনুনয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, সামনেই লাল রঙ-এর দোতলা বাড়ি, দেখতে পেয়েছ?

একবার চেয়ে দেখল বাড়িখানার দিকে অনুনয়, কোন উত্তর দিল না।

অনুনয়কে নির্বাক দেখে রঞ্জনা আবার বলল, কি উত্তর দিচ্ছ না যে? বাড়িটা দেখছ তো? সামনেই, নম্বর আটের বী:

দেখেছি।

ও, বুঝেছি, রঞ্জনা হাসতে হাসতে বলল, আসতে বলছি না বলে কিছু মনে করলে বুঝি?

অনুনয়ের বাঁ হাতের উপর হাত রেখে রঞ্জনা বলল, কাল আসবে। কেমন? কাল আমার ছুটি, অনেক গল্প করব।

অনুনয় রঞ্জনার মুখের উপর গভীর দৃষ্টি মেলে দিয়ে বলল, চেষ্টা করব।

চেষ্টা নয়, ঠিক আসবে, এখন আসতে পার, তবে রাত্তির হয়ে গেছে, দিদি জামাইবাবুরা তোমাকে অনেক দিন পরে দেখবেন, ছেড়ে দেবেন না। তা হলে কথা রইল। হেসে।

অনুনয় বলল, বিকেলের দিকে আসব।

তাই এসো।

রঞ্জনা গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। রাস্তার উপর অনেক দাঁড়িয়ে অনুনয়ের মুখের পানে চাইল, দেখল সে তার দিকেই নিরঞ্জনদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। একটু হাসল রঞ্জনা। গাড়ি বালীগঞ্জ স্টেশনের দিকে ছুটে চলল।

•

অনুনয় যখন বাড়ি ফিরল তখন প্রায় এগারোটা। রাস্তায় জল জমেছিল, স্থানে স্থানে বাস পাল্টাতে হয়েছে, বাসও অনেক জায়গায় থেমে থেমে আসছিল, তাই এত দেরি। অনুনয় দেখল ছাত্ররা সব জেগে আছে, কেউ কেউ পড়াশুনা করছে, সামনে পরীক্ষা।

অনুনয়কে দেখে রমেন এগিয়ে এল।

এত দেরী হল, দাদা?

এক জায়গায় থেতে বসেছিল জরুরী কাজে, তোমরা সব খেয়ে নিয়েছিস? পাঞ্জাবি খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করল অনুনয়।

সামনেই তো পরীক্ষা কলেজের, তাই একটু বেশী করে পড়ছি আমরা। তার ওপর আজ একটা ব্যাপার হয়েছে।

কি হল?

দিবাকর, সুখেন, অসিত হাসতে হাসতে এসে অনুনয়ের সামনে দাঁড়াল।

কি হয়েছে রে, বল? কৌতূহলী হয়ে উঠল অনুনয়ের মন।

সুখেন বলল, আজ একটা সের পাঁচেক দুই মাছ পাওয়া গেছে।

দুই মাছ? কোথেকে পেলি?

দিবাকর নিয়ে এসেছে।

দিবাকরের দিকে চেয়ে অনুনয় বলল, কোত্থেকে আনলি? চুরি-টুরি করিস নি তো? বল্, তা হলে কাল দাম দিয়ে আসিস।

চুরি করব কি, দাদা? সামান্য তিনিস, আমরা কি মাছ খেতে পাই না? চাল নিয়ে আসছিলাম বংশী ধোপার বাড়ির পাশ দিয়ে দেখলাম দত্তা গাংগুলীর পুকুর থেকে মাছটা উঠে রাস্তার ওপর এসে পড়েছে, আর আমি ধরে ফেললাম।

দিবাকরের হাত পা নেড়ে কথা বলার ভংগী দেখে হেসে উঠল সকলে।

কে রান্না করল?

সুখেন আর অসিত।

এখনও উনুন জ্বলছে, রান্না হয়নি?

ঘি ভাত হচ্ছে, আর সামান্য একটু দেরি আছে, আপনি হাত মুখ ধুয়ে আসুন, নীচে একটু দেখে আসবেন, টর্চটা নিয়ে নিন।

কেন রে?

গেটের বাঁদিকে সাপ দেখা গিয়েছে, সুখেন ছুটে ছিল লাঠি নিয়ে মারতে, পালিয়ে গেল সাপটা।

তাই নাকি? ওখানে কি অ্যাসিড ছড়িয়ে দিয়েছিস?

হ্যাঁ।

তাই গন্ধ পেলাম আসবার সময়।

অনুনয় লুংগি পড়ল, টর্চ হাতে নিয়ে নীচে নামল। আকাশের দিকে চেয়ে দেখল, আকাশখানা লাল হয়ে রয়েছে।

রাতের খাওয়া শেষ করে অনুনয় যখন তার শোবার ঘরে ঢুকল তখন রাত বারোটা বেজে গেছে। ছাত্ররা তাদের ঘরে চলে গেছে, কোন শব্দ আসছে না তাদের ঘর থেকে, বোধহয় তারা শুয়েছে, ঘুমিয়েছে? হ্যারিকেনের বর্ধ খুব কমিয়ে দিয়ে ওটা দরজার পাশে রাখল অনুনয়, বেশ একটা আলো আঁধারীভাব হল ঘরের ভিতর, সিগারেট ধরিয়ে তক্তপোষের উপর এসে বসল সে।

অন্যদিন সিগারেট খেতে খেতেই ঘুম আসে তার, অনেকদিন এমনও হয়েছে কোন রকমে সিগারেটটা ছাইদানীতে নিভিয়ে দিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়েছে, আজ আর ঘুম এল না অনুনয়ের, ঘুমোবার চেষ্টাও করলা না সে, চুপ করে খাটের উপর বসে সিগারেট খেতে লাগল। শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের থমথমে রাত্রি, আকাশে জমাট মেঘ থাকলেও বৃষ্টি হবার বিশেষ সম্ভাবনা নেই, বাইরে কি কি আর ভেকের একঘেয়ে নীরস ডাক, তবু অনুনয়ের বেশ ভাল লাগল রাতটি। তপতীর মুখচ্ছবি তার চোখের সামনে বার বার ভেসে উঠতে লাগল। যে স্মৃতি তার মনের গভীরে প্রায় লীন হয়ে গিয়েছিল, আজ আবার সেটি জেগে উঠল ধীরে ধীরে। এক অস্বাভাবিক চঞ্চলতায় অনুনয়ের মন দুলে দুলে উঠতে লাগল। অথচ অনুনয় তপতীকে ঠিক বুঝতে পারল না, এত দিন সে কোথায় ছিল, কি কাজে নিজেকে লিপ্ত রেখেছিল তাতো সে তাকে স্পষ্ট করে বলল না। তবে? কলকাতাতে যখন সে রয়েছে মাস্টারি করছে, তখন সে কি অনুনয়ের একটু খোঁজ নিতে পারত না? সেতো তার মামার বাড়ি চেনে, তবু সে তার খোঁজ নেয়নি কেন? অনুনয়ের মন অভিমানে ভরে উঠল। কিন্তু তবু সে যে তপতী, তার—। অনুনয় আর ভাবতে পারল না, ভাবাটা বোধ হয় ঠিক হবে না বলে মনে লাগাম কষে দিল সে। মিনিট দুয়েক চুপ করে বসে সিগারেট শেষ অনুনয়, তারপর খাট থেকে নেমে জানলার কাছে এসে দাঁড়াল। মনে করল আর মিছামিছি রাত জাগবে না সে, শরীরেও খুব ক্লান্তি, এইবার শুয়ে পড়বে। তপতীর সংগে যখন তার দেখা হল এত বছর পরে আর কাল যখন সে তার সামনে মুখোমুখি হয়ে বসবে তখন নিশ্চয়ই সে অনুনয়কে অনেক কিছু বলবে। আজ রেস্টুরেন্টে সে কিছুই বলতে পারল না, বলা সম্ভবও হয়নি তার পক্ষে, অনুনয়ের কেতাবী মন বলে উঠল: নারীর মন যে বড় দুর্জ্ঞেয়, বড় স্পর্শকাতর, মাত্র কয়েক ঘন্টা সময় করে থাক, কাল সব শুনবে, সব জানবে, তপতী তার দশ বছরের ইতিহাস তোমার কাছে উজাড় করে দেবে, এখন ঘুমোও।

অনুনয় খাটের উপর চুপ করে বসে আছে আকাশের দিকে চেয়ে, মন তার কল্পনায় রাঙ্গা হয়ে উঠছে, কিসের কি রাগিনী বেজে বেজে উঠছে সেখানে সেই রাগিনীর মূর্চ্ছনায় বিভোর হয়ে উঠছে সে, নেশাবিষ্ট হচ্ছে, তন্দ্রাচ্ছন্ন হচ্ছে। সময় যে তার হাত থেকে ধীরে ধীরে পিছলে যাচ্ছে আর রাত যে আরও গভীর হচ্ছে, নিথর হচ্ছে পৃথিবী সে দিকে অনুনয়ের খেয়ালই নেই।

রঞ্জনা বাড়ি ফিরল, দেওয়াল ঘড়িতে দশটা বাজল। ছেলেমেয়েদের খাওয়া শেষ হয়ে তারা যে যার বিছানায় শুয়েছে, অতিথি অভ্যাগতের দলও চলে গেছে, শুধু, একজন তখনও নেমনি। রঞ্জনা উপরে উঠে দেখল যে তার জামাই-বাবুর ঘরে পুরোহিত মশাই আহারে বসেছেন আর বাড়ির কর্তা গিন্নী দুজনাই তাঁর খাওয়ার তদারক করছেন। বারান্দার ধারের পথে রঞ্জনার সঙ্গে অনিল বাবুর চোখাচোখি হল, একটু হাসল রঞ্জনা, অনিল বাবু স্ত্রীর কানে ফিস ফিস করে বললেন, তোমার বরেড বোন এখন ফিরলেন, জিজ্ঞেস করতো এত দেরি হল কেন। বিমলা একটু গম্ভীর ভাবে বাইরে এল, রঞ্জনাকে জিজ্ঞেস করল, আজ এত দেরি হোলো, তপু? একটু হেসে রঞ্জনা বলল, সামনে হরতাল বলে ভর পাচ্ছিলে বুঝি? দেরী হল অন্য কারণে, হঠাৎ বাদে দেখা হয়ে গেল অনুনয়ের সঙ্গে এতদিন পরে।

তাই নাকি! বিস্ময়ের বিদ্যুৎ খেলে গেল বিমলার মুখের উপর দিয়ে।

আষাঢ়ের অনুনয়, রঞ্জনার আরও কাছে সরে কৌতূহলী কণ্ঠে বিমলা জিজ্ঞেস করল, আষাঢ়ের অনুনয় আষাঢ়ের গায়ের অনুনয়?

হাঁ।

এখানে নিয়ে এলি না কেন? অনেকদিন দেখিনি, দেখতাম।

কাল যাবে।

আসবে? কে যা করেছে!

অতো জিজ্ঞেস করিনি, বোধ হয়, না।

কোথায় থাকে, কি করে?

প্রফেসারী করে, সোনারপুর না কোথায় একখানা বাড়ি কিনেছে, সেখানেই নাকি গরীব ছাত্রদের নিয়ে থাকে।

ওর বোন কোথায়?

শ্বশুর বাড়ি।

আর একটা কি জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল বিমলা, কিন্তু পারলনা সে, প্রশ্ন তার কণ্ঠেই থাক যেতে লাগল। অখিল বাবু স্ত্রীকে ডাকলেন, পুরোহিত মশাইয়ের আহার শেষ হয়ে গেছে, এইবার তিনি বিদায় নিবেন।

• •

স্বাধীনতা বিপন্ন, আপনার
সমস্ত শক্তি দিয়ে তা রক্ষা করুন
জওহরলাল নেহরু

সম্পদসমূহ সংরক্ষণ করুন

আমাদের সম্পদগুলি মূল্যবান। দেশকে শক্তিশালী করার জরুরী প্রয়োজনে সেগুলি সমস্ত কাজে লাগাতে হবে। আমাদের স্বাধীনতা যে সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে হয়েছে তা চরিতার্থ করবার এইটেই একমাত্র উপায়। কালোবাজারী এবং অসৎ ব্যক্তির অস্তিত্ব করে স্বাধীনতার একটা মূল্য আছে এবং আমাদেরই তার মূল্য দিতে হবে।

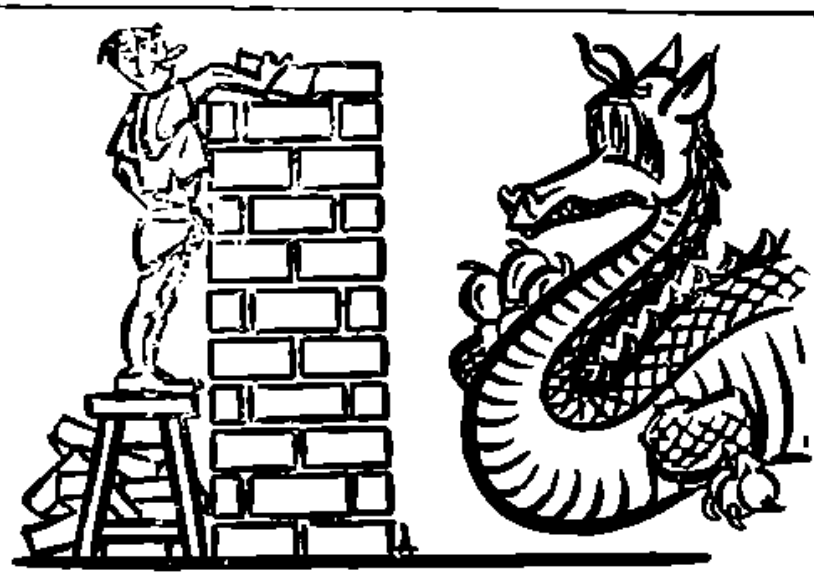

আপনার সমস্ত শক্তি দিয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করুন

DA 67 FF

যে ঘরে রঞ্জনা শোয় সে ঘরে দুখানি ছোট ছোট খাট, একখানি খাট রঞ্জনার রাস্তার দিকে জানালার কাছে, আর একখানি খাট ঘরে ঢুকেই ডান দিকে ও খাটে শোয় রঞ্জনার বোনঝি মঞ্জু, সে সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে বি এ পড়ছে। মঞ্জু বিছানায় বালিশের পাশে কি একটা সিনেমার মাসিক পত্রিকা পড়ে রয়েছে। রঞ্জনা মঞ্জুর বিছানার দিকে একবার তাকাল, এক গ্লাস জল খেল, বাতি নিভিয়ে দিয়ে নিজের খাটে এসে চুপ করে বসল। বারোটা বাজল।

রঞ্জনার ঘুম এল না। বাইরে একটা বিশ্রী জোলো হাওয়া বইছে। রঞ্জনা ওঠে শার্সিগুলো বন্ধ করে দিল, দেখল সারা আকাশখানা মেঘে থম থম করছে, সারা পাড়াটা আজ যেন তাড়াতাড়ি নিঝুম হয়ে পড়েছে, রঞ্জনা বেশ ভেবে দেখল, এরকমতো কোনদিন হয়নি। তার কি চোখের ভ্রম, মনের ভ্রম! তার মনে হল অস্পষ্ট অন্ধকারে পাড়ার বাড়িগুলোও যেন দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে, রঞ্জনার ঠিক ভাল লাগছে না আজ কোথায় যেন সব বেসুরো ঠেকছে তার অথচ সে বেশ অনুভব করছে তার মনের ভিতর কিসের যেন নাচন শুরু হয়েছে, সমস্ত স্নায়ুগুলো শিরশির করে উঠছে। একখানি মালগাড়ি ভোঁস ভোঁস করে শব্দ করতে করতে বালীগঞ্জ স্টেশনে এসে লাগল। রঞ্জনা বাতি জ্বালল, নিদ্রিতা মঞ্জুর নিষ্কলুষ কুমারী মুখের পানে একবার তাকাল, তারও মঞ্জুর মত কোঁকড়ান চুল ছিল, যৌবনে মঞ্জুর চেয়ে সে অনেক বেশী সুন্দরী ছিল, অনেক বেশী লোভনীয় ছিল। রঞ্জনা আর ভাবতে পারল না, সে যেন চমকে উঠল, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে সিনেমার বইখানা তুলে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই পাতাগুলো উল্টে দেখতে লাগল সে, নায়িকাকে আলিঙ্গনে-বদ্ধ করে চুম্বনে উদ্যত নায়ক। দৃশ্য দেখে মনে মনে হাসল রঞ্জনা, বড় আয়নায় তার শরীরের প্রতিবিম্ব পড়েছে, সে দিকে একবার চেয়ে দেখল, তারপর বই খানা মঞ্জুর বালিশের পাশে রেখে দিয়ে বাতি নিভিয়ে পাখার স্পীড একটু বাড়িয়ে দিয়ে রঞ্জনা খাটে এসে বালিশে ঠেসান দিয়ে বসল চুপ করে।

রঞ্জনার মনে হল তার বুকের ধরা ধুয়ে-তন্ত্রীগুলো একসঙ্গে কিসের এক অস্পষ্ট করুণ ঝংকার তুলল, তারপর সেটি আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল তার বুকের ভিতরেই। অনুনয়! অনুনয় অনুনয়! কোথা থেকে অনুনয় এসে দাঁড়াল তার সামনে আবার! এতদিনতো তার সঙ্গে দেখা হয়নি, বিশেষ তো কোন ক্ষতি হয়নি তার। অত্যন্ত সরল মানুষ অনুনয়, এখনও বুঝি সে তাকে তপতী ভেবেই ভালবাসে; বিয়ে করেনি, হেস্টু হেস্টে যেতে যেতে কেমন বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলল অনুনয় যে তার জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল যে সে কারুর প্রেমে পড়েনি। আপন মনে খিল খিল করে করে হেসে উঠল রঞ্জনা। মঞ্জু যে কাছে ঘুমোচ্ছে সেদিকে খেয়াল নেই তার। বেচারা অনুনয়! রঞ্জনা মনের নিভৃতে বলতে লাগল: অনুনয় কি মনে করে যে সে আজও ঠিক আগেকার মতই আছে? রঞ্জনা আবার হাসল তবে এবার তত জোরে নয়; বডিস খুলে ফেলল, আবছা অন্ধকারেই নিজের দেহখানার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল, বুক দুটোয় মৃদু আঘাত করল। রাত্রি আরও গম্ভীর হল, টিপি টিপি বৃষ্টি পড়তে লাগল।

• •

কিন্তু অনুনয়ের ঘুম এল না। অনেক চেষ্টা করল সে ঘুমোবার জন্য, কিন্তু কোথায় ঘুম! গ্রামের কথা সে আর ভাবত না, ইচ্ছা করেই সে তার গ্রামকে ভুলতে চেয়েছিল কিন্তু আজ একেবারে তার অজ্ঞাতসারে মন ছুটে গেল ছেড়ে আসা গ্রামের দিকে, বুড়ী গঙ্গার তীরে সেই ছোট্ট পরিচ্ছন্ন শান্তিময় পল্লীটি, অনুনয়ের বাড়ি থেকে মিনিট দশেকের পথ তপতীদের বাড়ি। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল অনুনয়। স্মৃতি তার মনের মধ্যে মোহ ছড়িয়ে দিয়েছে, অনুনয়কে ভাবতে লাগল।

দুটি ছোট ছোট পরিবার, পরস্পরে কি মধুর সম্প্রীতি! অনুনয় আর তপতীর বাবা দুজনেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, বাড়িতে টোল, অনেক ছাত্র বাড়িতে থেকে শাস্ত্রচর্চা করে। অনুনয়ের মা আর তপতীর মা পরস্পরে সখীত্বে আবদ্ধ, দুজনেরই ইচ্ছা অনুনয় আর তপতীর বিবাহ হোক, একথা তপতীও জানে, অনুনয়ও

জানে। অনুনয়ের এক বোন, তপতীর এক ভাই। স্নেহ, প্রীতি আর সৌহার্দ দিয়ে যেরা দুটি পরিবার যেন এক হয়ে গিয়েছে।

অনুনয় ভাবছে, ঘাটের উপর বসে চুপ করে ভাবছে, এতো সেদিনের কথা। আই-এ-তে স্কলারশিপ নিয়ে সে বি এ পড়ছে, তপতীও ম্যাট্রিক পাশ করেছে, স্কলারশিপ পেয়েছে; সে দিন কি আনন্দ আর হাসি মাখানো মুখ তপতীর! অনুনয়ের বাবা আর মাকে প্রণাম করতে এসেছে তপতী, অনুনয় পাশের ঘরে পড়ছিল, তপতীর কণ্ঠস্বর শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে অনুনয় বলল, আমাকেও প্রণাম কর, আমি না তোমার গুরুজন। হো হো করে হেসে উঠেছিল ছিল তপতী, অনুনয়ের মায়ের সামনেই তার গালে আঘাত করে বলেছিল, ভারি আমার গুরুজনরে! অনুনয় আর দাঁড়ায়নি সেখানে, ঘরে চলে এসেছিল। মিনিট কয়েক পরে তপতী অনুনয়ের কাছে গিয়ে তার মানভঞ্জন করে বলেছিল, রাগ করলে? আচ্ছা প্রণাম করছি। অনুনয় তপতীকে প্রণাম করতে দেখনি তাকে জড়িয়ে ধরে অজস্র চুমু খেয়ে ছিল তার, তপতী বাধা দেয়নি। অনুনয় জিজ্ঞেস করেছিল কি নেবে? সায়েন্স না আর্টস? তুমি যা নিয়েছ, অংক আমার ভাল লাগে না।

অনুনয় বলেছিল, সংস্কৃত আর বাংলায় যখন লেটার পেয়েছ, তখন লজিক হিস্ট্রি আর সংস্কৃত নাও, বি-এ-তে সংস্কৃত কিংবা ফিলসফিতে অনার্স নিবে। তপতী বলেছিল, তাই নেব ঠিক করেছি; অনেকক্ষণ বেরিয়েছি, এখন যাই, তুমি কাল বাবার সংগে আর একবার দেখা করো, ভুলোনা, অনেক করে বলে দিয়েছেন।

হেসে জিজ্ঞেস করছিল অনুনয় কেন?

তপতী বলেছিল, আমি জানি না।

অনুনয় হেসেছিল তপতীর মুখের দিকে চেয়ে, বুঝতে পেরেছি, তিনি তাড়াতাড়ি কাজ সারতে চান।

তপতী ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলেছিল ইস্! এম-এ পাশ না করে ও সব চিন্তাই করব না।

ধীরে ধীরে তপতীর চিন্তায় এমন মশগুল হয়ে উঠল অনুনয় যে তার ঘুমতো এলোই না, উপরন্তু সময়টা দিন কি রাত তাও সে ভুলে গেল। দেওয়াল ঘড়িতে দুটো বাজার সংকেত হলো, অনুনয় উঠল, বাইরে গেল, বাইরে থেকে এসে সিগারেট ধরাল। জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, টিপি টিপি বৃষ্টি পড়ছে, ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে, জানালা বন্ধ করে দিয়ে খাটে এসে বসল সে।

আর এক দিনের কথা। সে দিনও অনুনয় ঘরে বসে পড়ছিল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। তপতীর বাবা এলেন অনুনয়ের বাবার কাছে। তপতীর বাবা বললেন, হরীশ, আমার শরীরের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হয়ে আসছে, বহুমূত্র রোগ কারুর কারুর সারে না ভাই, তাই বলি কি, ছোট মেয়েটির বিবাহ দিয়ে নিশ্চিন্ত হই, তুমি আর অমত করোনা?

অনুনয়ের বাবা উত্তরে বলেছিলেন, সে কথা আজও স্পষ্ট মনে আছে তার, কি বলছ, কামাখ্যা দা, আমি অমত করব কি; পঞ্জিকা দেখ, যদি দিন থাকে তো আগামী কালই বিবাহ হোক।

আমি সে কথা বলছি না, হরীশ, শুধু তুমি একটু ভেবে দেখ, বিবাহ করে আমরাও তো সংসার করেছি।

আমাদের কথা আজকাল ছেলেমেয়েরা শোনে? তার ওপর আমরা হলাম টুলো পণ্ডিত, আমাদের কেউ শ্রদ্ধাই করে না, বলে আমরা নাকি কুসংস্কারাচ্ছন্ন, প্রগতি-বিরোধী রক্ষণশীল কূপমণ্ডুক। সে দিন তপুকে জিজ্ঞেস করলাম, কিরে, এইবার আমার ঘরে আয়? তোমার মেয়ে কি উত্তর করল জান? বলল, বোজই তো আপনার বাড়ি যাচ্ছি, বিএ পাশটা করি, তারপর একবারে যাব। তপু-মার কথা শুনে আমি হেসে ফেললাম। আমার পুত্রেরও সেই এক কথা। ওর গর্ভধারিণীকে সেদিন বলেছিল এম-এ পাশ করে চাকরি নিয়ে তবে বিয়ে করব। এইতো অবস্থা, দুজনেরই এক মত। চিন্তার কোন কারণ নেই, বিবাহ ওদের হবেই। ভাল করে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসো। আদার রস দিয়ে চা করতে বলি, ততক্ষণ তামাক খাও। ঘাটের উপর বসে অনুনয় যেন সেদিনকার দৃশ্য স্পষ্ট দেখতে পেল। দুটি

সরল নিরহংকার শান্ত প্রৌঢ় দাওদার বলে তামাক খেতে খেতে সংসারের কথা ভুলে গিয়ে শান্ত চ'লে যেতে উঠেছিল। ফেলে আসা পল্লী ভিটার কথা মনে পড়ে গেল অনুনয়ের, বুকের ভিতর আকুলি বিকুলি করে উঠল তার, অনুনয়ের চোখ দুটো জলে ভেসে এল।

তার পরের দৃশ্য অত্যন্ত নাটকীয়, অত্যন্ত মর্মান্তিক, বিশ্বাস করতেও ইচ্ছা হয় না ; ঠিক যেন রুপালী পর্দার উপর সে দৃশ্য। অনুনয়ের চোখের সামনে ধীরে ধীরে ফুটে উঠল। চমকে উঠল অনুনয়, জ্বলন্ত সিগারেটটা খসে পড়ে গেল তার হাত থেকে, তাড়াতাড়ি সেটা তুলে ছাইদানীতে ফেলে দিয়ে আর একটা ধরাল সে।

ইংরেজী উনিশো ছেচল্লিশ সাল। ভারতে ইংরাজ শাসন শেষ হয়ে এসেছে, বাংলার মসনদে তখন মুসলমানের জয়জয়কার। ঠিক এই সময়ে একটি ঘটনা ঘটল যা সভ্য মানুষের ইতিহাসে অভাবনীয়, অপ্রত্যাশিত। বাংলার এক প্রান্তে সম্প্রদায়বিশেষের মাথায় খুন চাপল, হিংসায় উন্মত্ত হয়ে উঠল, চড়াও, লুটতরাজ, গৃহে অগ্নিসংযোগ চলল অবাধে, মানুষ মনুষ্যত্ব হারাল তামস দেবতার হাতছানিতে, নারীত্বের উপর আঘাত হানল শয়তানের দল, মনে হল চামুণ্ডা যেন উন্মাদিনী হয়ে রক্তের লোভে ছুটে বেড়াচ্ছে হাতে অসি নিয়ে। সারা বাংলা ত্রাসে কেঁপে উঠল, কেঁদে উঠল, কোন দিক থেকেই মাইভঃ এল না। যে পল্লীতে অনুনয়রা বাস করত সেখানে এল দাঙ্গার বীভৎসতা, গ্রামবাসীরা স্বপ্নেও ভাবেনি যে তাদের পল্লীতে নেমে আসবে অমানিশার অন্ধকার, হবে মনুষ্যত্বের অপঘাত মৃত্যু। কিন্তু হায়রে ? সরল পল্লীবাসীরা তখন জানত না জানত না রাজনীতির চক্রান্ত কত নিষ্করুণ, কত বিষময়, কত মর্মচ্ছেদী। দাঙ্গার সর্বগ্রাসী রূপ দেখে তপতীর বাবা হরীশ বেদান্ততীর্থের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হল, তিনি দেহ রাখলেন। অনুনয়ের বাবার হার্ট ফেল করল না বটে তবে তিনি বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন শয়তানদের সামনে, বুকে ছোরা এসে পড়ল তাঁর, চারদিন পরে তিনি মারা গেলেন। মা আর ছোট ভাইটিকে নিয়ে ঘরে তালাচাবি লাগিয়ে তপতী চলে এল অনুনয়দের বাড়ি, পরের দিন গিয়ে দেখল জিনিষপত্র একটিও নেই, শালগ্রাম শীলা মাটিতে লুটোচ্ছে, আর্তনাদ করে কেঁদে উঠল তপতী, কান্না তার যেন থামতে চায় না, কেঁদে কেঁদে বুঝি পাগল হয়ে যাবে মেয়েটা।

অনুনয় আর তপতীর মার অবস্থা করুণ হয়ে উঠল, দুজনেরই মুহুর্মুহু ফিট হতে লাগল। কিন্তু আশ্চর্য, এই নিদারুণ দুঃসময়ে অনুনয় আর তপতীর মনের উপর যেন দেবতা ভর করল, কোথা থেকে যে অফুরন্ত আলো দেখানো সাহস তাদের বুকে এসে বাসা বাঁধল তা তারা বুঝতে পারল না। অনুনয় আজ তার ঘরের জানালার ধারে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট যেন শুনতে পেল, তপতী তাকে বলছে, ভয় করলে চলবে না, আমাদের বাঁচতে হবে, মা দুটীকে দেখতে হবে, আমার ছোট ভাই রয়েছে, তোমার ছোট বোন রয়েছে।

অনুনয় কাঁপা গলায় বলেছিল, কিন্তু এখন কোথায় যাব, এ-দুর্যোগে বেরুলেই তো জানি মারা পড়ব, আর কলকাতা ছাড়া আমরা যাবই বা কোথায় ?

তপতী বলেছিল, তাই চলো, কলকাতাতেই চলো। যা পাঁই, টাকাকড়ি সোনা দানা সঙ্গে নিয়ে, চলো, এ গ্রাম ত্যাগ করে চলে যাই, শান্ত হলে আবার ফিরে আসব।

আবার ফিরে আসবে ? কোথায় তপতী ?

এইখানে ? আমাদের বাপ-ঠাকুরদার বাস্তুতে।

অনুনয় গম্ভীর হয়ে পড়েছিল। তপতীর মতের সংগে তার মত মেলেনি।

সে বলেছিল, কিন্তু তপতী, এখানকার বাড়িঘর ফেলে রেখে চলে যাওয়া কি ঠিক হবে ? প্রাণ বড়, না, বিত্ত বড় অনুনয় ? আর দেরী নয়, বাইরে আল্লাহু-হো আকবর ধ্বনির সংগে সংগে মিলিটারি ভ্যান ঘুরছে, শুনতে পাচ্ছনা ? তাদের কানে চলো, বলো, আমরা সাহায্য চাই। কি এখনও ভাবছ দাঁড়িয়ে ? বাইরে যেতে ভয় পাচ্ছ ? তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অনুনয়ের মুখের পানে তাকিয়ে তপতী বলেছিল, একি ! তুমি এত ভীতু ? বিপদের সময় ভেংগে পড় ? তুমি না যাও, আমি যাচ্ছি।

অনুনয় তপতীর হাত ধরে বলেছিল, তুমি রাস্তায় এ-বেশে বেরিয়ো না, আমিই যাচ্ছি।

তারপর এল দুটি মুসলমান তাদের সাহায্য করতে,

মুসলমান দুটি তপতীর বাবার প্রজা, এরা অনেক নিমক খেয়েছে তার বাবার। তাই বুঝি কৃতজ্ঞতা দেখাতে এল তারা। এক হাতে মুসলমান দুটির নির্দেশে অনুনয়রা বেরিয়ে পড়ল গ্রাম ছেড়ে বাস্তুভিটার দিকে চেয়ে কাঁদতে কাঁদতে। কতক পথ পায়ে হেঁটে গেল তারা, কতক পথ নৌকার মধ্যে বসে। পরের দিন বেলা প্রায় বারোটার সময় অনুনয়রা এসে পড়ল অপেক্ষাকৃত নিরাপদস্থানে, অনুনয় টেলিগ্রাম করল কলকাতায় তার মামার বাড়িতে, তপতীর কাকার বাসায় কলকাতায়, দেও তার কাকাকে টেলিগ্রাম করল। তপতীর চন্দ্রীপতি দেরাদুনে বদলি হয়ে গেছেন সম্প্রতি, তাঁকেও একটা তার করে দিল সে।

ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে উঠল অনুনয়ের। চা খাবার ইচ্ছা হল তার। কোন যাত্রীকে বিরক্ত না করে সে নিজেই বারান্দার এক কোণে স্টোভে চায়ের জল বসিয়ে দিল। আকাশে পাতলা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে ক্ষীণ চন্দ্র দেখা যাচ্ছিল।

চা খেয়ে খাটের উপর বসে সিগারেট ধরাল অনুনয়। তার মনে হল যেন তপতী কিশোরীর বেশে, তন্বী ষোড়শীর বেশে স্মিত মুখে তার চারিপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ প্রেম জেগে উঠল অনুনয়ের মনে, যে প্রেম মাঝপথে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল দশ বছর আগে, আজ আবার সেই প্রেম-মন্দাকিনী শতধারায় প্রবাহিত হল তার দেহমনকে অভিসিক্ত করে দিল। তপতী—তপতী তো তারই। তপতী নিষ্কলুষ, এতটুকু মালিন্য তাকে স্পর্শ করেনি, করতে পারে না, তপতীর চিত্তবল যে অসীম, কোন পুরুষের সাধ্য নেই তাকে স্পর্শ করে। অনুনয় স্বীকার করে নিল এতদিন অভিমান করে তপতী তার কাছ থেকে শুধু সরে গিয়েছিল তাকে পরীক্ষা করবার জন্য, সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে অনুনয়। তপতী বেশ বুঝে নিয়েছে অন্য কোন নারীর প্রভাব পড়েনি অনুনয়ের মনের উপর, অনুনয়ের প্রেম নিষ্কলঙ্কিত প্রেম, সে যেমন পুড়ে পুড়ে খাঁটি হয়েছে, তপতীও ঠিক তাই হয়েছে, দীর্ঘদিনের বিরহ তাকে আরও মধুর আর কমনীয় করে তুলেছে, তাই সে অনুনয়ের কাছে আজ ধরা দিতে ছুটে এসেছে। একথা ঠিক তপতীর উপর তার প্রচণ্ড অভিমান হয়েছিল, শুধু তাই নয়, অশ্রদ্ধাও যে তার মনে জন্মায় নি তাও নয়। তবে? অনুনয় বেশ বুঝতে পারল দশ বছরের পঞ্জীভূত অভিমান তোষারের বাঁধের মত তার মন থেকে কে যেন সরিয়ে নিয়ে গেল। স্বস্তি বোধ করল অনুনয়, নিজেকে খুব স্বাভাবিক মনে হল তপতীকে দেখবার জন্য তার মন আকুলি-বিকুলি করে উঠল। হঠাৎ ট্রেনের শব্দে তার চমক ভেঙে গেল।

তার পরের দৃশ্য বৈচিত্র্যহীন। নিরাপদ স্থানে এসে পৌঁছে ওরা। কাতারে কাতারে সন্ত্রস্ত নর-নারীর দল চারিদিক থেকে পালিয়ে এসে সেই স্বল্প পরিসর স্টেশনে জমা হয়েছে, উদ্দেশ্য কলকাতায় পালিয়ে আসা। বেশ স্পষ্ট ছবির মত দেখতে পেল অনুনয়, দশ বছর আগে ভাদ্র মাসের এক বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় পূর্ববঙ্গ থেকে একখানি গাড়ি এসে পৌঁছল শিয়ালদহ স্টেশনে। তৃতীয় শ্রেণীর একখানা কামরা থেকে নামল কতকগুলো অভিশপ্তপ্রাণী; তাদের মধ্যে ছিলেন অনুনয়ের মা, তপতীর মা, দু'জনকে যেন কারা জোর করে বিধবা করে দিয়েছে, মহিলা দুটি স্তব্ধবাক হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চারিদিকে তাকাচ্ছেন; আর রয়েছে অনুনয়, তপতী, অনুনয়ের কিশোরী বোন অনুভা আর তপতীর ছোট ভাই বিবেক, আরও অনেকে। অনুনয়দের সংগে বিশেষ মালপত্র ছিল না, প্লাটফরমে ওরা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, আশা করেছিল অনুনয়ের মামার বা তপতীর কাকার বাড়ি থেকে কেউ না কেউ আসবে, সংগে করে ওদের বাড়ি নিয়ে যাবে, কিন্তু কেউ এল না, একটি চেনা মুখকেও দেখতে পেল না ওরা। মিনিট কতক অপেক্ষা করে কুলির মাথায় মালগুলি তুলে দিলে স্টেশনের বাইরে এসে ট্যাক্সিতে উঠল ওরা। অনুনয় যাবে তার মামার বাড়ি, বালীগঞ্জে; তপতী যাবে তার কাকার বাসায় বেলেঘাটায়। অনুনয় তপতীদের কাকার বাসায় পৌঁছে দিয়ে সে তার মামার বাসায় বালীগঞ্জে চলে গেল।

• •

রঞ্জনা বালিশে মাথা দিয়ে চোখ বুজে মিনিট

কতক চুপ করে শুনে রইল কিন্তু আশা করেছিল খুব তার আসবেই, অনুনয়কে কেন্দ্র করে আর সে কোন চিন্তাই করতে চায় না. চিন্তা করেই বা লাভ কি? কাল যদি একান্তই অনুনয় আসে তার সংগে দেখা করতে, তখন অতি সাধারণভাবেই দু'চারটে কথা বলে তাকে বিদায় দেবে। আর অনুনয় যে কাল আসবেই তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। যে অভিমানী অনুনয়! সুতরাং আজ বাজে চিন্তা না করে একবার ঘুমোনো যাক? রঞ্জনা দেহখানা বিছানার উপর বেশ ভালভাবেই ছড়িয়ে দিল, ঘুম তার একান্ত প্রয়োজন, তার দেহ মন ক্লান্ত। প্রায় আধঘণ্টা কেটে গেল, রঞ্জনার কিন্তু ঘুম এল না। তখন উঠে বসল সে বিছানার উপর, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল, শুধু তাই নয়, চোখে বুঝি তার জল এল। একি! এসে পাখর কেটে জল বেরুল? আশ্চর্য!

* * *

মা আর ছোট ভাইটিকে নিয়ে তপতী গিয়ে উঠল কাকার বাসায় বেলেঘাটায়। ত্রিলোচনবাবু সংগতিসম্পন্ন ব্যক্তি, নিজের প্রকাণ্ড বাড়ি, বিরাট ব্যবসা, ভদ্রলোকের পুত্রকন্যার সংখ্যা যা একটু বেশী, তেরটি। ত্রিলোচন বাবু খুব সহানুভূতি দেখিয়ে বড় ভাইয়ের স্ত্রীকে অভ্যর্থনা করলেন নিজের গৃহে, পায়ের ধুলো নিয়ে সজল চোখে বললেন, এ বাড়ী আপনারই বৌদি, তপতীর মা-ও কেঁদে ফেললেন। তপতীকে কলেজে ভর্তি করে দিলেন ত্রিলোচনবাবু, বিবেকও ইস্কুলে পড়তে লাগল তাঁর ছেলেদের সংগে। ভদ্রমহিলার প্রাণে একটু ক্ষীণ আশা এল, তিনি পতিশোক একরকম ভুলে গিয়ে ছেলে-মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে দেবরের বাড়ির কর্ত্রীত্ব নিলেন নিজের হাতে। মাসকতক পরে, রঞ্জনার বেশ মনে আছে, একদিন ত্রিলোচনবাবু হাসতে হাসতে এসে ভাণ্ডারঘরের চাবিকাঠিটি তার মার হাতে তুলে দিলেন. তার পরেই পাচক বিদায় নিল। আরও কিছুদিন পরে, তপতী পরীক্ষার পড়া প্রস্তুত করছিল নিবিষ্ট মনে, হঠাৎ ত্রিলোচনবাবু ঘরে ঢুকে বললেন, মাস্টারটা কমবিনিষ্ট, ওকে জবাব দিলাম আজ. তুমি মা, রাত্রে আর খোকনকে আজ থেকে একটু করে দেখ নইলে ওরা পাশ করতে পারবে না। রঞ্জনার সে দৃশ্য আজও মনে আছে, তপতী তৎক্ষণাৎ বই বন্ধ করে বলেছিল. আচ্ছা কাকু, পড়াটি ওদের পাঠিয়ে দিন, আমি রাত্রে পড়ব। সংগে সংগে রঞ্জনার চোখের সামনে আরও একটা ছবি ফুটে উঠল। মাস দুয়েক পরের ঘটনা। ত্রিলোচনবাবুর বাড়িতে দুটো চাকর ছিল। একটাকে মিছামিছি চোর অপবাদ দিয়ে একদিন তাড়িয়ে দিলেন তিনি, আর দেখা গেল তার জায়গায় বাহাল হল বিবেক, সে প্রতি সকালে অপর চাকরটিকে সংগে বাজারে যেত। মাত্র একটি দিকে তপতীরা নিশ্চিন্ত ছিল, সে দিকটা হচ্ছে ত্রিলোচনবাবুর স্ত্রীর দিক। ভদ্রমহিলা সংসারের দাতপাঁচে থাকতেন না, বৈষয়িক অনেক ব্যাপার তিনি বুঝতেন না, হিংসা-দ্বেষ স্বার্থ প তার দিল থেকে সদা মুক্ত ছিল তার মন. নিজের ছেলে আর পরের ছেলের মধ্যে কি প্রভেদ তা তিনি বুদ্ধি দিয়ে ঠিকমত বুঝতে পারতেন না, হিসাবে প্রায়ই ভুল করতেন। তাই বাড়ির লোকেরা এমন কি তাঁর নিজের ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত তাঁকে পাগল বলে উপহাস করত। রঞ্জনা তার কাকীকে বড় শ্রদ্ধা করত, ভদ্রমহিলা আজ মৃতা, তার কথা স্মরণ করে রঞ্জনার চোখে জল এল।

এক সন্ধ্যায় অনুনয় আর তপতী দেশপ্রিয় পার্কের পূর্বকোণের বেঞ্চিতে বসে নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করছিল। এই দৃশ্যটি রঞ্জনার মনে পড়ে গেল সে মনে হেসে উঠল। অনুনয় বলেছিল, চল দেশে ফিরে যাই কাগজে তো পড়েছ দাঙ্গা-হাঙ্গামা আর হবে না। উত্তরে তপতী বলেছিল. তুমি কি পাগল হলে অনুনয়? দেখগে বাড়ির একখানা ইটও আমাদের আর নেই। তার ওপর দেশতো ভাগ হয়ে গেল। ছেলের আশা ছেড়ে দাও। অনুনয় কোন জবাব দেয়নি. চুপ করে বসেছিল।

তপতী বলেছিল. আরও কিছুকাল পরের বাড়িতে থেকে পাশ করে চাকরির চেষ্টা করতে হবে, ওখানে আর কতকাল থাকব?

কেন, তোমার কাকুতো বেশ ভাললোক।

তপতী হেসেছিল. বাইরের রূপ দেখে মানুষকে বিচার করতে যেও না।

অনুনয় তপতীর মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

তপতী বলেছিল, আমি তো বি এ ক্লাসে ভর্তি হলাম, তুমি একবছর ড্রপ দেবে কেন?

এম এ তে ফার্স্ট ক্লাস পেতেই হবে, নইলে ভাল চাকরি পাব না। তুমিও চেষ্টা কর যাতে বি এ পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট পেতে পার।

তপতী হাসতে হাসতে বলেছিল, আমার আবার ভাল রেজাল্ট! হুঁহ, যদি বাড়িতে একটু বেশী করে পড়বার সময় পেতাম।

তার মানে? সময় পাও না?

না। সকাল বিকাল কাকুর দুটি ছেলে-মেয়েকে পড়াতে হয়।

তাই নাকি? টিউশনি নেই?

আগে ছিল, আমরা আসাতে আর নেই।

সে কি? একথা তো আগে বলোনি।

কি হবে বলে তোমাকে? তুমিও তো পরাধীন।

অনুনয় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিল।

তপতী অনুনয়ের হাতের উপর হাত রেখে বলেছিল শুধু আমি একলা নই, মা রান্নাঘরের ভার নিয়েছে, আর বিবেক হয়েছে কাকুর বাজার সরকার।

সবিস্ময়ে অনুনয় বলেছিল, বলো কি?

বড় কঠোর জগৎ। তাই বলি তাড়াতাড়ি পাসটাস করে বেরিয়ে পড়ে নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়াই এস। তোমার মামা মামী কি রকম? মামাতো আদর্শ চরিত্রের মানুষ দেবতা; মামীও তো খুব খারাপ নন, অন্ততঃ নীচ নন।

তুমি ভাগ্যবান। আচ্ছা, এইবার ওঠ। তোমার কাছেই বাড়ি, আমাকে অনেক দূরে যেতে হবে।

দুজনে বেঞ্চি ছেড়ে উঠে পড়েছিল।

* * *

রঞ্জনার ভাল লাগল না খাটের উপর বসে থাকতে খাট থেকে নেমে জানালার ধারে এসে দাঁড়াল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, একগ্লাস জল খেল রঞ্জনা, ঘড়ির দিকে একবার চেয়ে দেখল, সে অকাতরে ঘুমোচ্ছে, ঘড়ি দেখল দুটো বেজে গেছে, বাতি নিভিয়ে খাটে এসে শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুম তার এল না, উপরন্তু মাথা গরম হয়ে উঠল, ছটফট করতে লাগল সে বিছানার উপর। তার চোখের সামনে মাদুরোদ বিল্ডিং, সিনেট হল, কলেজ স্কোয়ার, আর কতকগুলো রেস্টুরেন্টের ছবি একে ফুটে উঠল। সে পোস্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসের ছাত্রী, ভালভাবে বিয়ে পাশ করে বেদার গ্রুপ নিয়ে ফিলসফিতে এম এ পড়ছে। তপতীর মনে এখন নূতন আশা, নূতন আনন্দ, নূতন নূতন বন্ধু বান্ধবীর সংস্পর্শে এসে সে তার বিগত জীবনের দুঃসহ দিনের কথা ভুলে গেছে। আর তো কয়েকটা মাস মাত্র, এম এ পাশ সে করবেই এবং ভালভাবেই করবে। তারপর সে তার নিজের পথ ঠিক করে নেবে। মা আর ভাইটিকে নিয়ে সে অন্যজায়গায় বাসা করে থাকবে। তার অনেক বান্ধবী তাকে নানাভাবে সাহায্য করবে বলে আশ্বাস দিয়েছে। অনুনয়ও এম-এর কোর্স শেষ করেছে তবে পরীক্ষা দেবে আগামী বৎসর, যাতে ফল খুব ভাল হয় এই আশায় আর সে জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করছে, শুধু তাই নয়, স-ক্লাশে যাওয়াও সে সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিয়েছে।

কিন্তু বিছানার উপর চমকে উঠল রঞ্জনা? কি হল তার? সারা দেহ যে তার কাঁপছে। অস্পষ্ট হায়ার অশোক সেন কি খাটের কাছে তার সামনে এসে দাঁড়াল? ইকনমিকস ক্লাসের ছাত্র অশোক সেন, আস্তিন ওটানো শার্ট, ব্যাকব্রাশ করা চুল, ধবধবে লম্বা চওড়া চেহারা উপর বুকের বোতাম খোলা, পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি, চোখ দুটো থেকে বিদ্রোহের আগুন ঠিকরে আসছে। মনে জোর আনবার চেষ্টা করল রঞ্জনা, সে অতীতকে ভুলে যাবে, সে পিছনের দিকে চাইবে না, চাইবে না কিন্তু রঞ্জনা পারল না, তার চেষ্টা ব্যর্থ হল, পিছনের দিকে তাকে তাকাতে হল অনিচ্ছা সত্ত্বেও। অশোক সেন, তখন নামটি তার কাছে কত মধুর বলে মনে হয়েছিল। নোয়াখালির অশোক সেন যার বাপ ঠাকুরদাদা দেশের নাম করা কবিরাজ ছিলেন; রিক্ত সর্বহারা হয়ে তখন অশোক সেনও তপতী আর অনুনয়ের মত আত্মীয়ের বাড়িতে একমুঠো ভাত খেয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ক্লাশ শেষ হয়ে গেছে, প্রায় চারটে বাজে, করিডোর দিয়ে একা একা আসছিল তপতী,

শুধু চোখের দেখা ছাড়া অশোকের সঙ্গে তার মৌখিক কোন আলাপ পরিচয় হয়নি, তবু অশোক যেন একটু কাছে এসে স্বাভাবিক কণ্ঠে তপতীকে ডাকল, মিস্ চক্রবর্তী, একটু শুনবেন কথা আছে।

থমকে দাঁড়াল তপতী। অশোকের দিকে তাকাল, অশোকই তো তাকে ডাকছে। কিন্তু কেন? তপতীর সামনে আরও একটু এগিয়ে এল অশোক, দুজনের বেশ ভাল করে চোখাচোখি হল। অশোক বলল, আমি অনুভবাবুর কাছে সব শুনেছি, আমিও আপনাদের মতই একজন, হেসে বলল অশোক, একেবারে যাকে বলে সর্বহারা ভাই।

সহানুভূতি মাখানো দৃষ্টিতে তপতী তাকাল অশোক সেনের মুখের পানে।

চলুন একটু চা খেয়ে আসি, এখন তো ক্লাস নেই।

তা নেই বটে, তবে আমার যে একটু দরকার ছিল।

আসুন চা খেতে খেতে আর কতক্ষণ লাগবে। আসুন।

আর কোন কথা বলেনি তপতী, মন্ত্রচালিতের মত অশোক সেনকে অনুসরণ করেছিল সে।

চা খেয়ে ওরা মশলা চিবুতে চিবুতে কলেজ-স্কোয়ারের ভিতরে এসে দাঁড়াল।

তপতী জিজ্ঞেস করল, কোথায় থাকেন?

ভবানীপুরে দিদির বাড়ীতে।

কে কে আছেন আপনার?

মা নেই, বাপ নেই, শুধু একটি ছোট বোন, সেও দিদির বাড়ীতে থাকে।

একটু হাসল অশোক সেন। তপতী স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল অশোকের মুখের পানে।

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে তপতী জিজ্ঞেস করল, আপনার হাতে ওখানি কি বই?

এখানি? এ বড় সাংঘাতিক বই। ইনি আপনাদের হেগেলের এককালে প্রধান ভক্ত ছিলেন তারপর গুরুর মতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ছিলেন, বলেছিলেন হেগেলের দর্শন ভুল।

দেখি বইখানা।

অশোক বইটি তপতীর হাতে দিয়ে সিগারেট ধরাল।

বইখানা পড়বেন? তপতীকে নীরব দেখে অশোক বলল, নিতে পারেন, লাইব্রেরীর বই দিনকতক পরে ফিরলেও চলবে।

আপনার কোন অসুবিধা হবে না তো?

কিছু না, অশোক সিগারেট খেতে খেতে বলল।

নিশ্চয় পড়ব।

এই ম্যাগাজিনখানাও নিতে পারেন, আমরা কয়েকজন মিলে বার করছি।

ম্যাগাজিন খানা হাতে নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগল তপতী।

আপনি সম্পাদক, আপনিই তো অশোক সেন?

ঠিক ধরেছেন তো। এ অধম ছাড়া আর কে অশোক সেন হবে বলুন। হাসল অশোক।

তপতী অশোকের মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেলল।

নিশ্চয় পড়ব, ভাল করে পড়ব, দিন পনর রাখব। অসুবিধা হবে না তো?

না। একমাস রাখুন না, তাতেও কোন ক্ষতি নেই।

পাঁচটা বাজল, অশোক ঘড়ি দেখল। অগ্রহায়ণ মাস। রোদের আলো ফিকে হয়ে এল। সন্ধ্যা নামল কলেজ স্কোয়ারে। ওরা উঠে পড়ল বেঞ্চি ছেড়ে।

•

রঞ্জনা আর পারল না, সে অনেক চেষ্টা করল পিছনের দিকে ফিরে চাইবে না, এইবার একটু ঘুমোবে সে, কিন্তু সে ভেসে চলল, তার স্মৃতিতে বান ডেকেছে, কার সাধ্য তাকে প্রতিরোধ করে ঘুম পাড়িয়ে দেয়।

* • •

রঞ্জনার বেশ মনে আছে পনর দিন তো দূরের কথা তিন দিনের মধ্যেই বইখানি শেষ করে ফেলেছিল। একদিন কলেজ কামাই করে সারাদিন বাড়ীতে বসে শুধু ভেবেছিল সে। ম্যাগাজিনখানিও তো চমৎকার। অনেক ভাল ভাল প্রবন্ধ রয়েছে। অশোক সেনের প্রবন্ধটি অন্ততঃ বার দশেক পড়েছিল তপতী। কি ঝোরালো লেখা। অথচ চেহারা দেখে মানুষটিকে বোঝাই যায় না যে ওর ভেতরে এত আগুন, এত জ্বালা।

তারপর?

রঞ্জনার মনে হল সে যেন দশ বছর আগে ফিরে গেছে।

এক সপ্তাহের মধ্যেই তপতী দেখা করল অশোকের সঙ্গে। অশোক হাসল তপতীর মুখের দিকে চেয়ে।

চা খেয়ে ওরা আজ আর কলেজস্কোয়ারে গেল না, বড় ভীড়, ওরা গেল বাদুঘাটের দিকে। একটি বেঞ্চি দখল করে বসল ওরা, সামনেই তিন চারখানা বড় বড় জাহাজ গঙ্গার উপর ভাসছে, একখানা থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে, বোধ হয় জাহাজখানি কলকাতা বন্দর থেকে বিদায় নেবে আজ রাত্রে।

কোন রকম ভূমিকা না করে অশোক বলল, পুরোন সংস্কার সব ভেঙেই চুরমার করে যাচ্ছে, দেখছেন তো।

তপতী তাকাল অশোকের মুখের পানে।

অশোক হাসল, বলল, মিস চক্রবর্তী, একটি কথা জিজ্ঞেস করব, কিছু মনে করবেন না।

বলুন।

বিংশ শতাব্দীতে কয়ে বিশেষ করে এই বিজ্ঞানের যুগে, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা এই শাস্ত্রীয় বচনকে জীবনের ধ্রুবতারা করে বেঁচে থাকতে চাইছেন বুঝতে পারছি না।

কি করে বুঝলেন ঠিক বেঁচে থাকতে চাইছি? পড়তে হয় পড়ছি, যদি ভালভাবে পাশ করি তা হলে চাকরি পাব, তাছাড়া সংস্কারের প্রভাবও বেশ খানিকটা রয়েছে।

আপনার সংস্কারে ধাক্কা লাগেনি?

লেগেছে। সেটা আগে ঠিক বুঝতে পারি নি, আপনার দেওয়া বই আর ম্যাগাজিন পড়ে মনের মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। আগে যে সব জিনিষ বুঝতাম না, ঝাপসা বলে মনে হত আজ ক'দিন দেখছি যেন সেগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

অশোক তপতীর মুখের দিকে মিনিট খানেক চেয়ে রইল।

সিগারেট ধরাতে ধরাতে অশোক বলল, হিন্দুস্থানের কোথাও নেই যে তরুণ তরুণীরা বেদান্ত উপনিষদ পড়ে সময় নষ্ট করুক। তাদের যদি ঐদিকে মাতিয়ে রাখা হয়, তাহলে সমাজের দিকে দেখবে কারা? কারা দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন করবে। সেদিন কালীঘাটে গিয়েছিলাম শিলিগুরি যাবার। দেখলাম দেওয়ালে বিজ্ঞাপন লটকানো রয়েছে, কালীঘাটের বুড়োকর্তৃক কর্তৃক মাতা ধনদার পূজা। হাসি পেল। একটু থেমে অশোক বলল, সেদিন অনুময়বাবুর সঙ্গে প্রায় ঘণ্টা তিনেক ধরে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হল, দেখলাম, এত বড় কাণ্ডটা যে মাথার উপর দিয়ে চলে গেছে তাতে ওঁর মনকে বিশেষ নাড়া দেয় নি, পুরোন সংস্কার আঁকড়ে ধরে বসে আছেন, বললেন কার্পণ্যিকী ভাগীতে, জীবনে দুঃখ কষ্ট তো আছেই, অদৃষ্টকে তো মেনে নিতেই হয়।

তপতী কোন উত্তর দিল না।

কিন্তু কি আশ্চর্য দেখুন তো মিস চক্রবর্তী, যে মাটির ওপর আমরা দাঁড়িয়ে শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ে বেঁচে আছি, হাঁটছি, কাঁদছি, তাকে কি করে অস্বীকার করি বলুন তো? আমার তো মনে হয়, বিজ্ঞান মনে করবেন না, অনুময়বাবু এখানে থাকলে তাঁর কাছ থেকেও ক্ষমা চেয়েনিতাম, যেদিন জন্মান্তরবাদের ধ্বংসাবশেষ ভারতের আকাশে বাতাসে খেলা করে বেড়াতে লাগল, সেদিন থেকেই আমাদের জীবনে নেমে এসেছে অমানিশার অন্ধকার, মানবতা চলে গিয়েছে আমাদের সমাজ থেকে, আমরা ধরের লোককে ঘৃণা করতে শিখেছি, হয়ে উঠেছি নীচ স্বার্থান্বেষী, মানুষের দুঃখকষ্টকে দূর করতে চেষ্টা না করে জন্মান্তরবাদের দোহাই দিয়ে চোখ বুজে বসে থাকতে শিখেছি। রোগগ্রস্ত হলে রোগের চিকিৎসা না করে এক কাল্পনিক ভগবান খাড়া করে তাঁর কাছ থেকে রোগ-মুক্তি কামনা করেছি। অদ্ভুত, সৃষ্টিছাড়া মনোবৃত্তি! তাই বলি এগিয়ে আসুন, পাঁচজনকে নিয়ে আসুন সংঘে করে, আসুন এক নূতন জগৎ রচনা করি, যেখানে কোন জাতিভেদ থাকবে না, মানুষ মানুষকে ভালবাসবে, দুটো শাক অন্ন নিয়ে যে রাষ্ট্রে ধনী গরীবের রক্ত শোষণ করবে না, যেখানে মানুষের সংজ্ঞা হবে সে মানুষ, তবেই তো পৃথিবী থেকে স্বার্থ যেন ধুলো চলে যাবে, মাটির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে স্বর্গরাজ্য। আসুন, আমরা সেই সমাজ গড়ে তুলি। শুনতে পাচ্ছেন না দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সেই বাণীই দিকবিদিকে বিঘোষিত হচ্ছে?

সামনের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে চেয়ে রইল তপতী। হাঁ-না কিছুই বলল না।

অশোক সেন আবার বলতে লাগল, আপনাকে আমরা

চাই, আপনাকে আমরা আদর্শ কর্মী করে নেব। আমি দেখতে পাচ্ছি যতই আপনি সংস্কৃত আর বেদ-বেদান্ত পড়ুন না কেন, আপনার চোখে বিদ্রোহের পদসঞ্চারে আগুন, আপনার ভিতরে একলা রয়েছে, আপনি ভিতরে ভিতরে জ্বলছেন। যে মানুষের অন্তরে জ্বালা নেই, সে নিজে কোন দিন কল্যাণের পথ খুঁজে পায় না। অপরকেও কিছু দিতে পারে না। আমি আপনাকে অনেক দিন থেকে লক্ষ্য করছি, আপনি আমাদের পার্টির সভ্য হোন।

মুখ ফিরিয়ে তপতী দেখল অশোক সেনকে দীপ্ত বিজলীর বাতির আলোয়।

একখানি স্টীমার বাঁশী বাজাতে বাজাতে গঙ্গার বুকের ওপর দিয়ে চলে গেল।

রঞ্জনার বেশ মনে পড়ল, তখন সে শুধু বলেছিল, কিন্তু—।

এতে কোন কিন্তু নেই, সিগারেট খেতে খেতে অশোক বলেছিল, আমাদের একেবারে নির্মাণিক ভাববেন না, এখন বাপ মা না থাকলেও একদিন তো সবই ছিল আমার, জানি. আপনি অনুপম বাবুর মত না মিশে কিছু করতে পারবেন না, আপনার ছোট ভাই আছে, মা রয়েছেন সবই ঠিক। আপনাকে বিশেষ কিছু করতে হবে না, শুধু মাসিক দেবেন আর অফিসে যাবেন মাঝে মাঝে, আর চিন্তার ধারাটি ধীরে ধীরে বদলে ফেলুন। আচ্ছা, এইবার ওঠা যাক, রাত্রি হচ্ছে। আপনাকে আবার যেতে হবে।

আপনি থাকেন কোথায়?

এখান থেকে বেশীদূর নয়, হরিশ মুখার্জী রোড একদিন নিয়ে যাব, যাবেন তো?

হেসে বলল তপতী, কেন যাব না। নিয়ে যাবেন।

আমার দিদির শ্বশুর বাড়ী. আপনাদের পাড়ের দিকেই।

তাই নাকি? তাহলে নিশ্চয়ই আলাপ করে আসব।

ওরা দুজনে উঠে পড়ল।

পথ হাঁটতে হাঁটতে অশোক বলল, আরও ভাল ভাল বই আপনাকে দেব, মন দিয়ে পড়বেন।

দেবেন, নিশ্চয়ই পড়ব।

তপতী যখন বাড়ী ফিরল তখন প্রায় সাড়ে আটটা। ত্রিলোচন বাবু বাইরের ঘরে বসেছিলেন বন্ধুদের নিয়ে। মনে একটু খটকা লাগল তাঁর, তপতী তো সাড়ে আটটা পর্যন্ত বাইরে কখনও থাকে না, বোধহয় কলেজের কোন ব্যাপারে আটকে পড়েছিল। তিনি এর বেশী আর কিছু ভাবেননি আর তপতীকেও কিছু বলেন নি।

কিন্তু রঞ্জনার বেশ মনে আছে সে রাত্রিটাও সে এমনি বিছানায় বসে আর বারান্দায় পায়চারি করে কাটিয়ে ছিল।

মাঝে মাঝে অশোক সেন আসত তপতীর কাছে, তপতীও তার সঙ্গে বেরুত, বসত কেবিনে ঢুকত, চা টোস্ট খেয়ে কলেজ স্কোয়ারে গিয়ে বসত গাছের তলায় মিসিবিলিতে, রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করত, আবার এসে ক্লাশ-রুমে ঢুকত।

• •

মাস তিনেক পরে একদিন অনুপম তপতীকে বলল, কি হয়েছে তোমার? অনেক দিন দেখা নেই। শরীর ভাল আছে তো?

হেসে বলল তপতী, ভালই আছি।

তোমার বাড়ীতে গেলে দেখা পাওয়া যায় না, চিঠি দিলেও উত্তর দাও না...এ রকম তো কখনও হয়নি।

তপতী কোন উত্তর করল না।

অনুপম বলল, আজকাল তুমি অশোক সেনের সঙ্গে খুব মিশছো, ব্যাপার কি বলতো?

ব্যাপার? ব্যাপার আবার কি? ছেলেটি আমাদের মতই গোড়া খাওয়া, আমাদের মতই ভিরু, তবে ওর ভিতরে আগুন রয়েছে। মেরুদণ্ডটি এখনও ভেঙ্গে যায়নি। আমার বেশ ভাল লাগে ওর কথা শুনতে।

ভাল লাগে? তপতীর মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে অনুপম বলেছিল, কি বলছ? ও যে কমিউনিস্ট, ওর সংস্কার আর আমাদের সংস্কার এক নয়।

তার মানে?

তার মানে ও জোর করে ভিতরকার সংস্কারগুলোকে রাতারাতি বদলে ফেলে নিজেকে এক অদ্ভুত জীবে পরিণত করে ফেলেছে। আমি শুনেছি ওর কথা, অনেক দিন অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনাও হয়েছে।

দেখেছি ও অন্তঃসারশূন্য. শুধু চটকদার চেহারা আর চটকদার কথা ওর সম্বল। সেদ কালে তুমি ওকে দেখে ভুলে গেলে ?

তপতীর মুখখানা ক্রোধে গম্ভীর হয়ে উঠল।

কি বলছ তুমি, অনুনয় ? তোমার মুখ থেকে আমি এ ধরণের কথা আশা করিনি। জীবনে আমি যেন খানিকটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, সে দিক থেকে বোধ হয় আমি তোমাকে ছাড়িয়ে গেছি, তোমার মনে এত হিংসা ? আমি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হলাম তোমার কথা শুনে।

অনুনয় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল তপতীর কথা শুনে। তপতী এত কথা বলতে পারবে তা অনুনয়ের ধারণার অতীত। পাছে তিক্ততার সৃষ্টি হয় তাই সে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল।

সেদিনকার মত অনুনয় তপতীর মধ্যে বিশেষ আর কোন কথা হয়নি। দু'জনেই ক্ষুণ্ণ মন নিয়ে যে যার বাড়ী চলে গিয়েছিল।

•

রাত্রে তপতীর ঘুম হল না। কয়েক মাস ধরে সে রাত্রি একটা দুটো পর্যন্ত চুপ করে বসে কাটিয়ে দেয়, নানা বিষয় নিয়ে চিন্তা করে সে, অশোক সেনকে কেন্দ্র করে তার মধ্যে যে আর একটি জীবন, আর একটি তপতী ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে তা সে অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু অনুনয় ? আজ সে মনে বড় ব্যথা পেয়েছে। তপতী মনে মনে বলল : অতটা না বললেই ভাল হত, একটু যেন অনুতপ্ত হল তপতী।

কিন্তু দুটি পুরুষ তপতীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আজ অনুনয়কে সে ভুলবে কেমন করে ? অনুনয়ের স্মৃতি যে তার জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে। তপতী মনে মনে একটু কেঁপে উঠল, বলল : অনুনয়কে ভোলা যায় না, ভুলতেও পারবে না সে ; কিন্তু অশোক সেন ? সারা শরীরে তার কে যেন একটা ইলেকট্রিক শক দিয়ে চলে গেল। তপতী খাটে আর চুপ করে বসে থাকতে পারল না, জানালার কাছে এসে দাঁড়াল, দেখল নক্ষত্রখচিত আকাশপটে কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার দিকে চেয়ে স্মিতমুখে বলছে, চলে এসো, তপতী, সংকীর্ণতা পরিত্যাগ করে বৃহৎ বিশ্বের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে ফেল। তপতী আপন মনে বলল, অনুনয় তো তারই, তার জীবনমরণের সাথী, তাকে ছেড়ে সে কোথায় যাবে ? অশোক সেন। অশোক সেন তার জীবনকে একটু নাড়িয়ে দিয়েছে বটে, তা বলে সে তপতীর কাছে অনুনয়ের আসন দাবী করতে পারে না। জীবনে চলার পথে তপতী অশোক সেনকে দেখতে পেয়েছে, ভাবের আদান প্রদান হয়েছে, নানা বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা হয়েছে দু'জনের মধ্যে, এতে এমন আর কি অভিনবত্ব আছে, এতো যে কোন সময়ে যে কোন নর-নারীর জীবনে ঘটতে পারে বিশেষ করে এই বিংশ শতাব্দীতে। তপতী জানালার গরাদ ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ভাবল, ঠিক করে ফেলল, অশোক সেন তার জীবনে গৌণ আকর্ষণ, থাকুক সে, তাকেও তার প্রয়োজন. সে তার জীবনের আর একটি দিক, অনুনয়ই তার জীবনের মুখ্য আকর্ষণ, তাকেই কেন্দ্র করে সে এতদিন জীবনের পথে অগ্রসর হয়েছে, গ্রামের কথা মনে পড়ে গেল তপতীর, অনুনয়ের বাবা-মাকে মনে পড়ল, নিজের বাবার স্নেহময় মুখখানি তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। না, তপতী পারবে না, তপতী তার হৃদয় থেকে অনুনয়কে সরিয়ে দিয়ে সেখানে অশোক সেনকে বসাতে পারবে না, অশোক সেন তার বন্ধু, বন্ধুর জীবনের সঙ্গী এই পর্যন্ত। এর বেশী আর সে কিছুই নয়, তপতী বেশ জোর দিয়ে মনে মনে বলল, এর বেশী কিছুই হতে পারে না। সকাল হলে সে অনুনয়ের কাছে গিয়ে তার ক্ষমা চেয়ে আসবে।

এক গ্লাস জল খেয়ে খাটে এসে শুয়ে পড়ল তপতী।

* * •

মাস দুয়েক কেটে গেছে।

রাজনীতিতে যখন তপতীর মন ধীরে ধীরে বেশ মেতে উঠেছে, তখন ত্রিলোচন বাবুর বড় মেয়ের বিবাহ হয়, মেয়েটি বয়সে তপতীর চেয়ে ছোট। খুব জাঁকজমক করে বিয়ে দিলেন ভদ্রলোক, পয়সা জলের মত খরচ করলেন। তপতী নির্বাক হয়ে সব দেখল। বিয়ের অনেক খাটা-খাটুনি বাকি এসে পড়েছিল তপতীর মার ঘাড়ে। বিয়ের পরের দিন মেয়ে জামাই চলে যাবার পর তপতীর মার ভেদ-বমি শুরু হল, ডাক্তার ডাকা হল অনেক পরে, তিনি

এসে বললেন কলেরা, হাসপাতালে পাঠান হল রোগিনীকে, তিনি সেখানে সেই রাত্রেই মারা গেলেন।

রঞ্জনার বেশ মনে আছে তার মার মৃত্যুর দু'দিন পরে এক রাত্রে ত্রিলোচন বাবু তাঁর বড় ছেলেকে বলছিলেন, হরিষে বিষাদ, শশাংক, কোথা থেকে অপরা লক্ষীছাড়ার দল এসে ঢুকল আমার বাড়ীতে, দেশেতে মরলে না কেন তারা? আমাকে জ্বালাতে এলি কেন? তপতী আড়াল থেকে দাঁড়িয়ে কথাগুলো শুনছিল আর তার চোখ দিয়ে দর দর করে জল পড়ছিল।

শশাংক বলল, আমি আর একটা দিক ভাবছি বাবা।

কি? বল।

সেটা বড় সাংঘাতিক দিক। যদি এখনই কিছু প্রতিকার করা না হয়, তাহলে সরকারের রোষদৃষ্টি পড়বে আমাদের ওপর।

কি রকম?

সেদিন বিবেককে দেখলাম লাল ঝাণ্ডাদের দলে, হাতে ঝাণ্ডা নিয়ে মিছিল করে চলেছে।

বলো কি? তাহলে?

শুধু তাই নয়, আপনি বোধ হয় জানেন না, তপতীও ঐ দলে মিশেছে। ওর টেবিলে দেখবেন লাল ঝাণ্ডাদের বই, অশোক সেন বলে এক কমিউনিস্ট হয়েছে এখন ওর বন্ধু সঙ্গী। কত রকমের চিঠি পত্র আসে তপতীর নামে।

ত্রিলোচন বাবুর চোখদুটো ক্রোধে লাল হয়ে উঠল। কাঁপা গলায় বললেন, আমার বাড়ীতে তো এ-সব চলবে না। তাহলে ওদের অন্য ব্যবস্থা দেখতে হবে। অনুনয় ছোকরাকে তো আর দেখি না।

শশাংক বলল, প্রায় মাস চারেক আমিও দেখি না। আগে কত ঘন ঘন আসত। আমার মনে হয় তপতীর সংগে তার ঝগড়া হয়ে গেছে।

চিন্তাকুল হয়ে পড়লেন ত্রিলোচন বাবু অথচ কি করবেন কিছুই ঠিক করতে পারলেন না। ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়ালেন তিনি।

দিন পনের পরে একদিন ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে এসে তপতী দেখল বাড়ীতে ভীড় জমেছে, পাড়ার ছেলেরা জমা হয়েছে বাড়ীর সামনে, তপতী দেখল উঠোনে বিবেক খালি পায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর ত্রিলোচন বাবুর বেজ ছেলে তপেন অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিয়ে মারতে মারতে বলছে, চোর হয়েছ? আমার ঘড়ি চুরি করে কোথায় বেচেছিল বল, নইলে তোকে পুলিশে দেব। তপতীকে দেখে বিবেক ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরেছিল, কিন্তু তপেন তাকে রেহাই দেয়নি, সে তার চুলের ঝুঁটি ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে আবার মারতে শুরু করেছিল, মেসো ভাত তো বেশ চালিয়েছ, লাল ঝাণ্ডাদের দলে মিশেও ভাই বোনে, আমরা সব শুনছি, সব দেখছি, কিন্তু ভেবে রেখো চোর আর চরিত্রহীনের স্থান হবে না এ-বাড়ীতে।

গৃহস্বামীর চোখের সামনেই এই নির্যাতন-পর্ব চলছিল, তিনি নির্বিকার হয়ে শুধু দেখছিলেন। তাঁর স্ত্রী চেষ্টা করলেন বিবেককে তপেনের কবল থেকে রক্ষা করবার, কিন্তু ছেলের কাজ থেকে ধাক্কা খেয়ে ভদ্রমহিলা সরে গেলেন, আর দাঁড়ালেন না সেখানে।

রাত্রে তপতী বিবেককে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিল সব খুটিয়ে খুটিয়ে, তপতীর পা ছুঁয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল বিবেক সে ঘড়ির ব্যাপার বিন্দুবিসর্গ জানে না, ঘড়ি নিয়েছে বাড়ীর চাকর প্রকাশ, সেই তপেনের কাজ করে। নিরুপায় তপতী, সে কার কাছে গিয়ে নিরপরাধ ভাইয়ের পক্ষ নিয়ে কথা বলবে। অঝোরে তার চোখ দিয়ে কেবল জল বেরুতে লাগল। চরিত্র বস্তুটি কি সেটি ভাল করে বোঝবার আগেই চরিত্রহীন আখ্যা পেয়ে গেল বিবেক। সে টিকতে পারল না কাকার বাড়ীতে, নিরুদ্দেশের যাত্রী হল সে, আজও তার কোন সন্ধান মেলেনি। রঞ্জনার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল বালিশের উপর, ছোট্ট ফুলের মত ভাইটি তার, কোথায় হারিয়ে গেল যে।

বিবেক চলে যাওয়ার পর তপতীর মাথায় যেন বাজ ভেঙ্গে পড়ল। এ রকম পরিবেশের মধ্যে তো আর থাকা যাবে না, খুব শীঘ্র তাকেও এ বাড়ী ছাড়তে হবে, যদি সে না যায়, তাহলে জোর করে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে, কেন না, তার ওপর বাড়ীর সকলেই রুষ্ট, একমাত্র বাড়ীর গৃহিণী ছাড়া। কিন্তু সে যায় কোথায়? অনুনয়ের কথা মনে পড়ল তার। অনুনয়ের কাছে গিয়ে কি সে সব ব্যাপার খুলে বলবে। কিন্তু সেই বা কি

করবে? সেও তো তার মতই নিরুপায়। তাছাড়া কয়েক মাস ধরে তার সংগে তপতীর মন কষাকষি চলছে, বিশেষ করে অশোক সেনকে সে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না তপতী ভাবল অনুনয়কে বললে ফল বা প্রতিকার কিছুই হবে না, উপরন্তু সে তাকে ভর্ৎসনা করবে, হয়ত সে বলবে, তা-ও বলবে কি না সন্দেহ, অশোক সেনের সংগে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে তপতী তুমি আমার মামার বাড়ীতে চলে এসো কিন্তু তপতী কি পারবে? তপতী যখন অনুনয় আর অশোক সেনকে নিয়ে মনে এই সব জল্পনা কল্পনা করছিল, তার মনে হল যেন অশোক সেন হাসতে হাসতে তার সামনে এসে বলছে, ভয় কি? আমি তো রয়েছি, যখন কোন বিপদ হবে, আমাকে স্মরণ করবেন।

আর অনুনয়? অনুনয়কেও মনশ্চক্ষে দেখতে পেল তপতী। দেখল সে এক গাদা বই হাতে নিয়ে তার দিকে চাইতে চাইতে চলে যাচ্ছে অনুনয়, চোখে মুখে ফুটে উঠেছে হিংসা আর ক্রোধ। অনুনয়ের সে রূপ ভাল লাগল না তপতীর, সে মুখ ফিরিয়ে নিল।

রঞ্জনা ঘাটের উপর বসে ঠিক যেন পর্দার উপর দৃশ্যের পর দৃশ্য দেখে চলেছে, কখনও মনে মনে হাসছে সে, কখনও বা শিউরে উঠছে ভয়ে, কখনও বা চোখে জল বেরিয়ে আসছে দুঃখে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বাগান থেকে অশোক আর তপতী ধীরে ধীরে গঙ্গার দক্ষিণ দিকে এসে দাঁড়াল।

অশোক সেন বলল, কাকার বাড়ীতে আর তোমার স্থান হবে না, একথা তুমি ঠিক জানবে, স্থান হবে না মানে ওরা তোমাকে নির্যাতন করে তাড়িয়ে দেবে আমি বলি, আমাদের কাছে চলে এস দেখবে তো বাসন্তী, উমা, হৈমন্তী, শীলভদ্রা, রাণী আরও কত মেয়ে রয়েছে ওখানে এস, সম্মান পাবে, আনন্দ পাবে, মনুষ্যত্ব ফুটে উঠবে তোমার। এস, আর দেরি করো না। কিংবা আর এক কাজ করতে পার

বল।

তোমার বোন-ভগ্নিপতিকে একবার জানাতে পার।

তপতী ক্ষণকাল গম্ভীর হয়ে থাকার পর বলল, পারতাম, তবে এখন আর পারব না।

কেন?

তপতী হাসল।

সিদি জামাই বাবু তো বলেছিলেন কাকার বাড়ীতে

স্বাধীনতা বিপন্ন, আপনার সমস্ত শক্তি দিয়ে তা রক্ষা করুন—রক্তচরলাল নেহেরু

যাঁরা সঞ্চয় করেন তাঁরাও দেশেরই সেবা করেন

জাতীয় প্রতিরক্ষা সার্টিফিকেট কিনুন

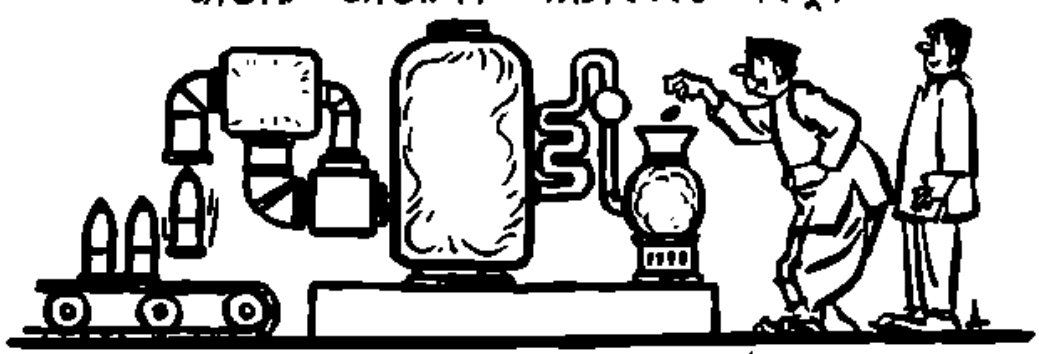

আমাদের দেশকে শক্তিশালী করতে হবে এবং স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য আমাদের সমস্ত শক্তি ও সম্পদ নিয়োজিত করতে হবে। অতি সাধারণ অর্থও যদি সঞ্চয় করে সরকারের প্রতিরক্ষা সিকিউরিটিগুলিতে লগ্নী করা যায় তাহলে তা অস্ত্রশস্ত্রের মতোই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান যোগাবে।

স্বাধীনতা রক্ষার জন্য লগ্নী করুন

DA 4778

না উঠে তাঁদের কাছে চলে যেতে, কিন্তু মা যে রাজী হন নি। এখন এতদিন পরে বিশেষ করে এ রকম অসহায় অবস্থায় কি করে যান?

এ রকম অবস্থা মানে?

মা মারা গেছেন, তার এখন বিবেক কোথায় চলে গেছে সে সম্বন্ধেও আমি কিছু বলতে পারবনা। জামাইবাবু বলবেন, মা মারা যাবার পর আমি বিবেককে নিয়ে তাঁর কাছে চলে গেলাম না কেন, বিবেকের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী করবেন আমাকে, আরও নানান কথা বলবেন।

অশোক গম্ভীর হয়ে তাকিয়ে রইল তপতীর মুখের পানে। তাহলে? সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, তাহলে কি অনুময় বাবুর কথা ভাবছ?

আমি কারুর কথা ভাবছি না। সংসারে আমি আজ একা, মা নেই, বাপ নেই, ভাইটি ছিল সে কোথায় চলে গেল।

তোমার সব আছে তপতী। দাদা দুনিয়ার লোক তোমার আত্মীয়। নিঃস্বার্থ ভালবাসা দিয়ে মানুষের সেবা করতে হবে। অদূর ভবিষ্যতে সেই ভালবাসার রাখীই আমরা সারা দুনিয়ার গলে তুলব। তখন আমেরিকাকে ভাবতে হবে রাশিয়ার কথা, ভারতকে ভাবতে হবে ইংলণ্ডের কথা। বিজ্ঞানের ধ্বংসবীণা সে দিন নীরব হয়ে যাবে সেই দিন নেমে আসবে আমাদের মাঝে প্রেমের ধারা, তাছাড়া মানুষের আর বাঁচবার কোন পথ নেই, তপতী আর বেশী দেরিও নেই, দিন আগত ঐ।

মন্ত্র মুগ্ধের মত তপতী চেয়ে রইল অশোক সেনের মুখের দিকে।

আরও কিছুক্ষণ ওরা হয়ত ওখানে দাঁড়িয়ে থাকত, কিন্তু পারল না, একখানি প্রাইভেট মোটর ওদের সামনে এসে দাঁড়াল। ওরা তখন ট্রাম লাইনের দিকে এগিয়ে চলল।

সেদিন একটু দেরি করেই বাড়ী ফিরেছিল তপতী, তখন দশটা বেজে গিয়েছিল। ত্রিলোচনবাবু রাতের খাওয়া শেষ করে সারান্দায় পায়চারি করছিলেন, তপতীকে দেখলেন, বিশেষ কিছু বললেন না। বিবেক বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার পর তপতীর ব্যাপারে তিনি চুপচাপ থাকেন, পাড়াতে একটু বদনাম হয়েছে তার, অনেকেই বিশেষ করে বিবেকের বন্ধুরা বলে বেড়াচ্ছে চারিদিকে যে ত্রিলোচনবাবু এবং তাঁর দুইছেলে মিলিতভাবে বিবেককে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে এবং তার প্রতিফল তাদের ভোগ করতে হবেই। ভদ্রলোক বেশ একটু ভয় পেয়েছেন পাড়ার ছেলেদের সামনে তিনি আর বেরোন না।

রঞ্জনার হাসি পেল। একবার ইচ্ছা হল তার সে খিল খিল করে হাসে, কিন্তু রঞ্জনা যে সম্বলের খাটে শুয়েছে: তার উপর রাত দুটো। চিঠির কথা মনে পড়ে গেল তার, সেই চিঠি, যে চিঠি সে অনুময়কে লিখেছিল। আবার হাসি পেল রঞ্জনার, রেস্টুরেন্টে অনুময় বলল তার চিঠিখানি সে এখনও সযত্নে রেখে দিয়েছে। রঞ্জনা একটু অন্তরঙ্গভাবে বলেছিল অনুময় একেবারে ছেলে মানুষ, অত্যন্ত বোকা আর সরল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিল রঞ্জনা। সে রাত্রে চিঠিতে কি লিখেছিল তপতী। রঞ্জনার আজ আর মনে নেই অক্ষরগুলি কিন্তু অনুময়ের মনে আছে। সে আস্তে আস্তে আলমারী খুলল, বালিকের ড্রয়ার টেনে বুলোর একটি কৌটো থেকে খামখানি বের করে পড়তে লাগল একমনে, অন্য মনের মনে হল চিঠিখানি তপতীর আবেগভরা লেখা নয়: অক্ষরগুলি এখন যেন সজাগ হয়ে উঠেছে এক একটি অক্ষর এক একটি তপতী, অনুময় চিঠি খানি আবার পড়তে লাগল।

অনুময়,

বেশ কিছুদিন আমাদের দেখা হয়নি। আমি বেশ বুঝে নিয়েছি অশোক সেনকে কেন্দ্র করে তোমার মন বিষিয়ে উঠেছে। তুমি অত্যন্ত অভিমানী, বিশ্ব সংসারকে নিজের সংকীর্ণ স্বল্প পরিসর মানদণ্ড দিয়ে মেপতে চাও, কোন পরিবর্তন তুমি ভালবাস না, বা অপরের পরিবর্তনকেও তুমি সহ্য করতে পার না। সে দিক থেকে দেখলে, সত্যি করে বল, তুমি আমাকেও সহ্য করতে পাচ্ছ না, অশোক সেনকেও না। আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, এতগুলো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঝড়ঝঞ্ঝা যে তোমার মাথার উপর দিয়ে চলে গেল, তাতে তোমার মনের এতটুকু পরিবর্তন হল না! অবশ্য এ বিষয়ে আমি

তোমাকে কোন উপদেশ দিতে চাইছি না, কারণ অধিকার আমি হারিয়েছি, তা ছাড়া তুমি আমার চেয়ে অনেক বেশী পড়েছ, তোমাকে আমি কি বলতে পারি বল।

এই কয় মাসের মধ্যে আমার জীবনে অনেক পরিবর্তন হয়েছে, কি হয়েছে বিস্তারিত করে বলা নিষ্প্রয়োজন। কাকার বাড়ায় একঘরা নির্যাতন আর সহ্য করতে পারছি না। তুমিও নিরুপায়, আমার মতই অসহায়। একটা কথা সত্যি করে বলে যাই। আমার সংস্কারে প্রচণ্ড ধাক্কা লেগেছে। আমার মনে হচ্ছে আমি এতদিন ধরে যা পড়েছি সব ভুল, ওদিয়ে মানুষ জাতির মঙ্গল হয় না, হতে পারে না।

তুমি মনে মনে বড়বাহা পাবে, জানি। কিন্তু, কি করব—উপায় নেই। আমার পথ আমি বেছে নিয়েছি আমি কোথায় যাচ্ছি জানতে চেয়ো না। শুধু এই টুকু জেনে নিশ্চিন্ত থেকো বুড়ী গঙ্গার তীরে যে তপতীর বসতি ছিল সে আর এ জগতে নেই, এখন তার স্থান পূর্ণ করেছে আর এক তপতী যার সঙ্গে অনুমানের কোনদিনকালে কোন মিল হবে না। সুতরাং আমি তোমার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। তুমি একজন নিষ্ঠাবান রবীন্দ্রভক্ত, তাই রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতার লাবণ্যের মত কাব্যি করে বিদায় নিলাম।

মোর তরে কবিও না শোক,
আমার রচিল বিশ্বলোক;

হে বন্ধু, বিদায়।

ইতি—তপতী

এই চিঠি খানি লেখার দুদিন পরেই, তপতী চক্রবর্তী হয়েছিল রঞ্জনা সেন।

রঞ্জনা মনে জোর আনল, প্রতিজ্ঞা করল সে আর ভাববে না, এর পরের ঘটনাগুলিকে সে ভুলে যাবে। মিছামিছি বিগত জীবনের কতকগুলো স্মৃতি টেনে এনে মনকে অযথা ভারাক্রান্ত করার কোন অর্থই হয় না। রাতও তো প্রায় শেষ হয়ে এল, কাল রবিবার, ইস্কুল নেই, একটু বেলা অবধি ঘুমোলেও বিশেষ ক্ষতি হবে না।

রঞ্জনা খাট থেকে নামল দরজা খুলে বাইরে এল, দেখল আকাশ অনেক পরিষ্কার। বৃষ্টির কোন সম্ভাবনা নাই, তবে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। রঞ্জনা বাথে কপালে জল দিল একগ্লাস জল খেল তারপর বিছানায় এসে চুপ করে শুয়ে পড়ল। এবার রঞ্জনা ঘুমুবেই।

কিন্তু অনেকক্ষণ কেটে গেল, রঞ্জনার ঘুম এল না। তার মাথা আরও গরম হয়ে উঠল, সে আর বালিশে মাথা রাখতে পারল না, উঠে বসল।

তারপর? তারপর কি দেখল রঞ্জনা।

রঞ্জনা দেখল রাস্তে অশোক সেন এল তার কাকার বেলেঘাটা বাড়ীর সামনে,

রঞ্জনা আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এল।

অশোক সেন বলল, এস।

কলকাতা ছেড়ে তারা চলে গেল।

অশোককে সঙ্গী করে রঞ্জনার জীবনে এক নূতন অধ্যায় শুরু হল। গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে কাজ করতে লাগল সে। কি আনন্দ আর উদ্দীপনা রঞ্জনার জীবনে! নিজেকে ধন্য মনে করল সে। অন্যদের সঙ্গে জীবন কাটাতে হলে তার মনের অপঘাত মৃত্যু হত। পল্লীগ্রামের মেয়ে হয়েও বাংলার পল্লীকে এমন দরদ দিয়ে সে কখনও দেখেনি, দেখবার সুযোগও তার হয়নি। তাছাড়া সে চোখও তার ছিল না। অশোক সেন তাকে নূতন চক্ষুদান করেছে, নূতন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে জগৎকে দেখতে শিখিয়েছে আর রঞ্জনা সেই নূতন চক্ষু দিয়ে বাংলার পল্লীবাসীদের জীবনের রূপ দেখে শিউরে উঠছে, মনে মনে প্রশ্ন করছে সে: এরা বেঁচে আছে কি করে? নৈরাশ্যে তার মন ভরে উঠল কিন্তু সে আবার আশাবাদী হয়ে উঠল: ভয় কি দেশ তো স্বাধীন হয়েছে, এইবার সকলের দুঃখ দুর্দশা, শাসনেই স্বাধীন ভারতের প্রথম গণভোট বিশ্বের দরবারে আমাদের অস্তিত্ব স্বীকৃতি লাভ করবে।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কাজ করে চলেছে রঞ্জনা। কত লোকের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে,

কাজের মধ্যে একেবারে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে রঞ্জনা। পদদলিত সর্বহারাদের তুলতে হবে মাথা এই স্বাধীনতা।

কিন্তু অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অনিয়মিত আহারের ফলে রঞ্জনার শরীর খারাপ হল।

মালদহের পার্টি অফিসের ছোট ঘরখানিতে রঞ্জনা শুয়ে আছে, মুখখানি রোগক্লিষ্ট, রক্তমাংসে ভুগছে রঞ্জনা, তবে রোগের তীব্রতা অনেক কমে গেছে।

এক বিকেলে বিরেশ সরকার এসে উপস্থিত। সকলের বীরেশ দা। যে সব কর্মী হতাশ হয়ে পড়েছে আত্মবিশ্বাস হারাতে বসেছে বা অন্য যে কোন কারণে মনের মধ্যে দ্বিধা এসেছে তাদের মনকে আবার চাঙ্গা করে কাজে লাগিয়ে দেওয়া এই হচ্ছে বীরেশ সরকারের কাজ এবং এ কাজটি এত সুষ্ঠুভাবে করতে পারতেন বীরেশ দা যে লোকে তাঁকে আকুণ্ঠ প্রশংসা না করে থাকতে পারত না। রঞ্জনা এই বীরেশ সরকারকে একদিন খুব শ্রদ্ধা করত। তাঁর ত্যাগে আর আদর্শে মুগ্ধ হয়েছিল সে।

বড়লোকের ছেলে বীরেশ সরকার, বাবার জমিদারি, তেজারতি কারবার, ডুয়ার্সে চায়ের বাগান, সব ছেড়ে দিয়ে বীরেশ সরকার চলে এসেছে পার্টিতে। বাপ যে তাকে ত্যাজ্যপুত্র করল সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। দীর্ঘ সুঠাম শক্ত সমর্থ দেহ, চল্লিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি, ইয়া গালপাট্টা, লোহার মত শক্ত হাতের কব্জি, মুখে হাসি লেগেই রয়েছে, এক জোড়া স্বপ্নাতুর চোখ, মনে হচ্ছে কিসের যেন স্বপ্ন দেখছে বীরেশ সরকার। অশোকের চেয়ে বয়স একটু বেশী, কিন্তু চলনে বলনে কত গম্ভীর, কত সংযত, যেন আদেশ করবার জন্যই সে জন্মেছে।

ডেকচেয়ারখানা রঞ্জনার শিয়রের কাছে টেনে এনে তার কপালে হাত দিয়ে বীরেশ সরকার জিজ্ঞেস করল, কেমন আছ বোন?

এখন একটু ভাল, তবে খুব দুর্বল।

তাতো হবেই। সাবধানে থাকতে হবে। অশোক কোথায়?

আজ দুদিন হল বাইরে। বোধহয় কাল ফিরবে।

পার্টির একটি মেয়ে চা খাবার এনে বীরেশ সরকারের সামনে রাখল।

চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে বীরেশ সরকার বলল, আমি আর একটু পরেই চলে যাব অন্য জায়গায়। তোমাকে একটা কথা বলতে এসেছি, অশোককে ঘর্ঘরিয়া থেকে হাঙারতে হবে, তার সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

রঞ্জনা বীরেশ সরকারের মুখের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাল।

ভাবছ কেন বোন: তুমি সেরে উঠবে তার আগেই, এখন তো অনেক সময় আছে। যদি মনে কর শরীর ঠিকমত সারছে না তাহলে কলকাতার ঠিকানায় আমাকে পত্র দেবে, আমি হাসপাতালে তোমার থাকবার ব্যবস্থা করে দেব। তুমি হচ্ছ অশোকের শক্তি, তুমি যদি ওর পাশে দাঁড়িয়ে ওকে সাহায্য করতে না পার, তাহলে কিন্তু খুব ক্ষতি হয়ে যাবে, কিষেল ভোটগুলি তাহলে আমাদের অধিকাংশ হারাতে হবে।

রঞ্জনা উঠে বসল, বলল, আমি এক সপ্তাহের মধ্যেই সেরে উঠব।

বীরেশ সরকার বলল, এক কাজ কর, নিজের কাছে কিছু টাকা রেখে দাও।

টাকা? টাকা কি হবে? আমার কাছে যা আছে তাতেই চলে যাবে, আর যদি দরকার পড়ে তো এখানেই পাব।

চুরুট টানতে টানতে বীরেশ সরকার বলল, তবুও রাখ। এই বলে একশো টাকার একখানা নোট রঞ্জনার হাতে দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বীরেশ সরকার, আচ্ছা, আসি বোন, আমাকে আজ আর এক জায়গায় যেতে হবে।

এই বলে বীরেশ সরকার চলে গেল।

খাটে বসে চুপ করে ভাবছে রঞ্জনা, নিঝুম রাতে আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে সে ভাবছে, মাত্র কয়েকটা মাস পরের কথা, এইবার রঞ্জনা রীতিমত কেঁপে উঠল। রাত্রি কি শেষ হবে না?

খাটে আর বসে থাকতে পারল না, জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, দেখল বসাক গিন্নী বিছানা ছেড়েছেন,

একটু পরেই ভদ্রমহিলা পাশের ঘরে ঢুকলেন। বডিগার্ডটা ভাল করে গুঁটে নিল রঞ্জনা, তারপর মশারি তুলে নিয়ে আস্তে খাটের উপর এসে চুপ করে বসল।

সেই দিনটির কথা স্পষ্ট মনে আছে রঞ্জনার, বিকেল বেলা, তিন চার জন মহিলা কর্মীর সঙ্গে বসে গল্প করতে করতে চা খাচ্ছে রঞ্জনা, হঠাৎ ব্যস্তসমস্ত হয়ে অশোক এসে বলল, এই ব্যাগ টেলিগ্রাম, আমাকে বর্ধমান থেকে দাঁড়াতে হবে সেটিলা পর্যন্ত বাঁধ, আমাদের কালই যেতে হবে।

কোন উত্তর দিল না রঞ্জনা, শুধু দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল অশোকের মুখের পানে। মহিলা কর্মীরা চলে গেলে পর সন্ধ্যার অন্ধকার যখন আরও গাঢ় হয়ে এল, রঞ্জনা চাতুরানি দিয়ে ডাকল অশোককে।

কি বলছ, রঞ্জনা?

আমার দিকটা ভেবেছ?

আমি সব দিক ভেবেছি, রঞ্জনা, তোমার কোন ভয় নেই সংকোচ নেই। ইলেকশনে আমি জিতবই, তারপর তোমাকে একেবারে জীবন-মরণের সাথী করে আমৃত্যু দেশের সেবা করে যাব, এই আমার আদর্শ এই আমার প্রাণের কথা।

আমি ঠিক সেকথা বলছি না, অশোক, আর একটা বাস্তব দিক রয়েছে। এইবার অশোক সেন অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে দেখল রঞ্জনাকে, গম্ভীর হয়ে উঠল তার মুখমণ্ডল, শান্ত কণ্ঠে সে বলল, ভয় কি? বাচ্চা হবে এই তো? ওখানে সব ব্যবস্থা করে দেব, কিছুদিন তো তুমি ইলেকশন ক্যাম্পেনে খেটে আমাকে সাহায্য করতে পারবে, তারপর যখন অসমর্থ হবে তখন বাড়ী ভাড়া করে তোমাকে অন্য জায়গায় রাখব কত কর্মী তোমার সেবা করবে, তাছাড়া ওখানে বড় হাসপাতাল রয়েছে।

রঞ্জনা বলল, বেশ চল, কালই যাব।

এরপর অনেকগুলি ছোটখাট দৃশ্য থাকলেও রঞ্জনার চোখের সামনে ভেসে উঠল সদ্যস্নান সবুজের মহাজন টুলির সেই বস্তিটা, একটা টিনের ঘরে শুয়ে রয়েছে সে, গায়ে তার পুটি বেরিয়েছে। একশো তিনের উপর জ্বর, মাথার অসহ্য যন্ত্রণা, ঘন ঘন ইলেকশনের স্লোগান দিয়ে চলেছে বিভিন্ন পার্টির কর্মীরা। রঞ্জনার মনে হচ্ছে তার বুকি জ্ঞান লোপ পাচ্ছে, পরক্ষণেই বাইরের চীৎকারে সে চমকে উঠছে, তার তন্দ্রাভাব ছুটে যাচ্ছে, জ্ঞান আবার ফিরে আসছে। সন্ধ্যা হয়ে এল, রঞ্জনা বিছানায় উঠে বসল, মাথাটা টলে গেল, আস্তে আস্তে তক্তপোষ থেকে নেমে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খেল। গায়ের ভিতরটা পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে ব্লাউজটা খুলে ফেলল, খালি গায়ে টলতে টলতে ছেঁড়া থলে দেওয়া ঘেরা বস্তির সরকারী বাসরুমে ঢুকল অশোকের সংগে প্রায় দিন পনেরো দেখা হয়নি রঞ্জনার, সে যে গুরুতর পীড়িত তা অশোক ঘুনাক্ষরেও জানে না, আর জানলেই বা সে কি করতে পারে এখন? পাগলের মত হলহল নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরছে আর ভাষণ দিয়ে বেড়াচ্ছে সে, কাল বাদে পরশু ইলেকশন, স্বাধীন ভারতের প্রথম গণভোট একটা দল লাউড স্পীকারে চীৎকার করতে করতে চলে গেল।

চা খাবার ইচ্ছা হোল রঞ্জনার, কিন্তু কে চা এনে দেবে? একটি ছোট্ট মেয়ে চারিকেন কেরোসিন তক্তপোষের তলায় রেখে রঞ্জনার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়াল। রঞ্জনা তাকে একটা কাঁচের গ্লাস দিল আর পয়সা দিল চা আনবার জন্য।

ইলেকশন আরম্ভ হয়ে গেছে, রঞ্জনার বস্তির কাছে

● অভিজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসক
● রকমারী ফ্রেম
● বিদেশী লেন্স্
● সুলভ মূল্য

দৃষ্টি
স্বাগত জানাই

১৭২এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড
(সাদার্ণ এ্যাভেনিউর মোড়)
কলিকাতা-২৬

চাইছে, সোলিং বুধ, রঞ্জনার শরীর আজ খুব খারাপ, তাহলেও তার মনের জোর এতটুকু কমেনি, অশোক যে জয়লাভ করবে সে বিষয়ে রঞ্জনা নিঃসন্দেহ। গায়ে জ্বর আর গুটি নিয়ে ঘন্টায় ঘন্টায় সে বাইরে এসে দাঁড়াচ্ছে, তার যে পা টলছে গা থেকে কাপড় খসে যাচ্ছে, জ্বর যে একশো তিন ছাড়িয়ে গেছে সে দিকে তার খেয়ালই নেই। কংগ্রেস লিডিং কংগ্রেস লিডিং—রঞ্জনা আবার টলতে টলতে তার টিনের ঘর থেকে বেরিয়ে এল, তল পেটে ব্যথা বোধ করল সে, ব্রণটা বুঝি নড়ে উঠল। অশোক সেন লিডিং অশোক সেন লিডিং—তরুণের দল চীৎকার করতে করতে চলে গেল, মিনিট পাঁচেক পরে একখানা জিপ গাড়ী ছুটে গেল রঞ্জনার সামনে দিয়ে—অশোক সেন লিডিং, জয় অশোক সেনের। রঞ্জনার বুকখানা আনন্দে নেচে উঠল। বিকেলের দিকে আরও চঞ্চল হয়ে উঠল রঞ্জনা, তার দলের একটি ছেলে এসে খবর দিল অশোকদা খুব সম্ভব জয়লাভ করবে, কিন্তু রঞ্জনার মুখের দিকে চেয়ে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

একি চেহারা হয়েছে রঞ্জনাদি? গায়ে বসন্ত আর জ্বর, চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে! আর ছেলেটির বুঝতে বিলম্ব হল না যে তাদের রঞ্জনাদি মা হতে চলেছে।

ছেলেটি বলল, আপনাকে কাল সকালেই হাসপাতালে দিয়ে আসব, এখানে আপনার আর থাকা চলবে না। আপনি কি বুঝতে পারছেন না আপনার কি হয়েছে?

রঞ্জনার যেন চমক ভাঙল, বলল ও কিছু নয় রয়েন অশোক কোথায়? আমার জন্য ভেবনা, ওসব ঠিক হয়ে যাবে।

অশোকদা কোথায় আছেন সঠিক বলতে পারি না। যতদূর মনে হয় তিনি বর্ধমানের আশে পাশে কোথায় আছেন। অশোকদার সংগে আপনার কত দিন দেখা হয়নি।

সে প্রায় দিন পনের।

দিন পনর? তা হলে তিনি তো আপনার অসুখের কথা কিছুই জানেন না।

না।

কিন্তু আমি আপনার এ অবস্থা দেখে তো চলে যেতে পারি না। পরে অশোকদাই বা আমাকে বলবেন কি?

রঞ্জনা শুধু একবার রাজেনের মুখের দিকে তাকাল, কিছু বলল না। তার শরীরটা কি রকম করে উঠল, তাড়াতাড়ি বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল সে।

মিনিট খানেক পরে রঞ্জনা অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

অত্যন্ত বিব্রত বোধকরল রাজেন। শ্যামপাড়ার কাছে রাজেনের এক বন্ধু ছিল, তার কাছে ছুটে গেল সে। রাজেনের মনে পড়ে গেল তার বন্ধুর হাসপাতালের ডাক্তার, মনে মনে আশা এল রাজেনের।

হাসপাতালের গাড়ী এসে দাঁড়াল রঞ্জনার বস্তির সামনে, রাজেন আর তার বন্ধু রঞ্জনাকে ধরে আনবার জন্য ঘরে ঢুকল। ঘরে ঢুকেই তারা আর্তনাদ করে উঠল, তক্তপোষের উপর থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে রক্ত পড়ছে মাটিতে, রঞ্জনা সংজ্ঞাহীন, একটা মাংসপিণ্ড যেন রক্তের সংগে লিপটে রয়েছে। হাসপাতালের লোকেরা কিছু বলতে পারল না, বস্তির লোকেরা ছুটে এল, পাড়ার একজন ডাক্তারকে ডেকে আনল রাজেন, তিনি বললেন ব্রণটি পেট থেকে বেরিয়ে গেছে একুণি রোগীকে হাসপাতালে পাঠাও, এক মিনিট দেরী করো না সংজ্ঞাহীন অবস্থায় রঞ্জনা হাসপাতালে চলে গেল।

হাসপাতালে তিন চারদিন রঞ্জনার জীবন খুব সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছিল, তারপর সে ধীরে ধীরে সুস্থ হতে লাগল। গায়ের গুটি গুলো মারাত্মক হয়ে ওঠবার আশংকা আর নেই, ডাক্তাররা বললেন ঠিক বসন্ত নয়, পাম বসন্ত তবে খুব বেশী বেরিয়েছিল। যাহোক হাসপাতালে এসে দেরী হয় এবং চিকিৎসার গুণে রঞ্জনার জীবন রক্ষা পেয়ে গেল।

রঞ্জনার বেশ মনে আছে তখন সে অত্যন্ত দুর্বল ইলেকশন শেষ হবার চার পাঁচ দিন পর, হঠাৎ একটি ছেলে এসে তার খাটের সামনে দাঁড়াল, অশোক সেন পাঠিয়েছে কলকাতা থেকে রঞ্জনা কেমন আছে জানবার জন্যে, রঞ্জনা মুখে কিছু বলল না, চিঠিতে দুকলম লিখে দিল, ছেলেটি চলে গেল। রঞ্জনা বেশ ভাল

ভাবেই জানে অশোক এখন অত্যন্ত ব্যস্ত সে জন্য তার উপর কোন ক্ষোভ বা অভিমান রঞ্জনার থাকতে পারে না।

আজ অশোক সেনের ভোট গণনার দিন। রঞ্জনা ছটফট করতে লাগল। মাঝে মাঝে আশা এসে তার রোগক্লিষ্ট দেহমনকে আনন্দে মাচিয়ে দিয়ে চলে যেতে লাগল, অশোক সেন জিতবেই আর সন্ধ্যার পর সদলবলে হাসপাতালে এসে রঞ্জনাকে জানিয়ে দিয়ে যাবে হয়ত তাকে হাসপাতাল থেকে মুক্ত করেও নিয়ে যেতে পারে, কারণ এখন সে প্রায় রোগমুক্ত। রঞ্জনা আকুল আগ্রহে সেই ক্ষণটির জন্য অপেক্ষা করে বসে রইল।

সন্ধ্যার অনেক পরে খবর এল, তখন রাত্রি প্রায় ন'টা। হাসপাতাল বন্ধ হয়ে গেছে। কোন রকমে সংবাদটা রঞ্জনার কাছে পৌঁছে দেওয়া হল। প্রথমে রঞ্জনা বিশ্বাস করতে পারেনি, মিনিট কতক পরে তার শীর্ণ দেহখানা কাঁপতে লাগল, তারপর সে জ্ঞান হারাল।

অশোক সেন সামান্য ভোটের মার্জিনে হেরে গেছে। সকলে তো স্তম্ভিত, এযে একেবারে অবিশ্বাস্য। অশোক সেনের পরাজয়। ব্যালট বক্সের রহস্য কেউ বুঝতে পারলনা।

তারপরের দৃশ্যগুলির কথা রঞ্জনার স্পষ্ট মনে নেই, আবছা মনে আছে। রঞ্জনা হাসপাতালের জানালার পরদা ধরে রাস্তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকত, ভাবতো ঐ বুঝি অশোক আসছে তাকে নিয়ে যাবার জন্য, ইলেকশনে পরাজয় হলেকি মানুষ বাঁচে না অশোক আবার দাঁড়াবে, সে জিতবেই, তার মত দেশপ্রাণ কর্মী কয়টা মেলে? রঞ্জনা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল, সে নিজেকে মনে মনে দোষী করতে লাগল, অশোকের পরাজয়ের জন্য সে আংশিক দায়ী, সে অসুস্থ ছিল বলে অশোকের জন্য যতটা তার করা উচিত ছিল তা রঞ্জনা করতে পারেনি। অশোক হয়ত আজই এসে তাকে নিয়ে যাবে, মনে বড় ব্যথা পেয়েছে সে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে তার বুকে বিশ্বাসঘাতকের দল। রঞ্জনা আশা করল অশোক না আসুক সে হয়ত লজ্জা পাবে এখানে আসতে, অন্য কেউ আসবে, নিশ্চয় আসবে।

কিন্তু কেউ এলনা, অশোক তো দূরের কথা, তার কোন তরুণ সহকর্মীর চিঠিটি পর্যন্ত দেখা গেল না।

সাত দিন গেল, আরও সাত দিন গেল, কোন সংবাদই এলো না অশোক সেনের কাছ থেকে।

হাসপাতালের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট একদিন এসে বলেই বসলেন, আপনি সেরে গিয়েছেন মিসেস সেন, এইবার সীট ছেড়ে দিতে হবে, আমাদের ছোট হাসপাতাল।

রঞ্জনা শুধু তাঁর মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে ছিল।

আপনার কোন আত্মীয়ের ঠিকানা দিন, মিসেস সেন।

আত্মীয়? চমকে উঠে ছিল রঞ্জনা।

রঞ্জনা জানে তার বিশেষ কোন আত্মীয় অশোক সেন ছাড়া।

বলুন।

রঞ্জনার হঠাৎ মনে পড়ে গেল তার বোন ভগ্নীপতির কথা। তাঁরা তো পাটনায় বদলি হয়ে এসেছেন। তাঁদের ঠিকানা জানে রঞ্জনা, ডাক্তার সাহেবকে জানিয়ে দিল সে।

কিন্তু অশোক? কোথায় সে? সে এতদিন তাকে ভুলে আছে কি করে?

এক গভীর রাত্রে হাসপাতালের খাটে বসে বিকট চীৎকার করে উঠে ছিল রঞ্জনা। রোগীরা ভয় পেয়ে গিয়েছিল, চারিদিক থেকে নার্স, ডাক্তার ছুটে এসেছিল রঞ্জনার রুমে? রঞ্জনা তখন তাদের দিকে চেয়ে হেসে ছিল, কখন-ও বা কেঁদেছিল, ছুটে বাইরে যাবার চেষ্টা করেছিল, বেশ মাসের ঠিক ছিল না তার, কোথায় অশোক সেন? তাকে সে খুঁজে বার করবেই।

কিন্তু তখনই সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল মাটির উপর।

তারপর? রঞ্জনাকে একটি ঘরে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল, রঞ্জনার বেশ মনে আছে, হাসপাতালের বুড়ী নার্স আসত খাবার নিয়ে, রঞ্জনা তার সংগে বেশ ভাল ভাবেই কথা-বার্তা বলত। রঞ্জনা মনে মনে যেন লজ্জা পেত, কেন তাকে আটক করে রাখা হয়েছে একখানি ঘরে? তবে কি তার মাথার কোন গোলমাল হয়েছে? রঞ্জনা তখন চেঁচিয়ে বলত, আমাকে ছেড়ে দিন, আমি সেরে গেছি, আমি কলকাতায় যাব।

তখনই ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে যেত।

হাসপাতালে আর বেশী দিন থাকতে হয়নি রঞ্জনাকে। তার বোন-ভগ্নী এসে তাকে মোটরে নিয়ে গিয়ে ছিলেন পাটনায়, কারণ তখন রঞ্জনা জ্বরে প্রায় অচৈতন্য। ভোর হয়ে এসেছে, পূবদিকে কমনীয় হয়ে উঠেছে উষার স্নিগ্ধ আলোকে।

রমেন ঘুম থেকে উঠল, পাঁচুর মা নীচে দরজার কড়া নাড়ল, অনুনয় উপর থেকে দেখল রমেন গিলা খুলে দিল আর পাঁচুর মা তার হাতে এক ভাঁড় গোময় নিয়ে রান্না ঘরের দিকে গেল। অনুনয় ঘড়ি দেখল পৌনে পাঁচটা। রাতের তমিস্রা ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে, তপন দেব মাটির মানুষকে আবার বাস্তবমুখী করবেন বলে মেতে উঠেছেন।

ঘর থেকে বেরিয়ে এল অনুনয়, ছাত্ররা সব উঠে পড়েছে, শিবালয় লোকালয়খানা চলে গেল ছুটতে ছুটতে? রমেন চা এনে টেবিলের উপর রাখল, সিগারেট ধরিয়ে চায়ের কাপে হাত দিল অনুনয়, হঠাৎ আপন মনে বলে উঠল সে: কুরু পরোয়া নেই, গত কাদা ই লেগে থাকুক না তার গায়ে, তাপতী আমার-ই, আজ বিকেলে তপতীকে এই কথাটাই ভাল করে বলব।

রঞ্জনা দেখল, যন্তু উঠল, তার দিকে একটু তাকিয়ে সিনেমার মাসিকখানা তোষকের তলায় গুঁজে রাখল। রঞ্জনা টের পেল তার দিদি উঠেছেন, জামাইবাবু খুব ভোরে ওঠেন, তিনি আগেই বেড়াতে বেরিয়েছেন, ফিরে কোঠা থেকে কি পরতের মা নেমে এল, এক ঝলক বাতাস এসে লাগল রঞ্জনার কপালে? পূবদিক আর-ও কর্সা হল, বসাক গিন্নী পুজোর ঘর থেকে বেরুলেন। আজ বিকেলে অনুনয় আসবে, রঞ্জনার মনের ভিতরে বিদ্যুৎ খেলে গেল, উঠে পড়ল সে বিছানা ছেড়ে, যন্তু তার আগেই উঠে গেছে?

চারটে বেজে মিনিট কতক হয়েছে অনুনয় এসে দরজার কড়া নাড়ল। রঞ্জনা ড্রয়িংরুমে সোফায় বসে একখানি বিলিতি ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছিল। জানালার ফাঁক দিয়ে অনুনয়কে দেখতে পেয়ে সে তাড়াতাড়ি উঠে এসে দরজা খুলে দিল।

দু'জনেই পরস্পরের মুখের দিকে চাইল, রঞ্জনা হেসে ফেলল।

সোফায় বসল অনুনয়, রঞ্জনা দাঁড়িয়ে রইল।

অনুনয় রঞ্জনার দিকে চেয়ে বলল, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বস।

ওপরে চল।

ওপরে? এখানেই তো বেশ।

না? দিদির হুকুম। তুমি এলেই তোমাকে একেবারে ওপরে নিয়ে আসতে হবে। আচ্ছা, বস, একটু ভেবে নিয়ে বলল রঞ্জনা, আমি দিদিকে একটু খবর দি।

রঞ্জনা উপরে উঠে গেল।

মিনিট দু'তিক পরেই বিমলা, যন্তু আর রঞ্জনা এসে অনুনয়ের সামনে দাঁড়াল। অনুনয় বিমলার পায়ের ধুলো নিল, বিমলা অনুনয়ের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে বলল, কত দিন পরে দেখা হল, বিয়ের সময় তোকে কতটুকু দেখেছিলাম? অনুনয়ের মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল বিমলা, তার গায়ে মাথায় হাত বুলোতে লাগল ভদ্রমহিলা, অনুনয়ের মনে হল যেন অনেকদিন পরে সে আজ আবার মাতৃস্পর্শ পেল।

ওপরে আয়, উনি তোকে দেখবেন।

দালানে দাঁড়িয়েছিলেন অখিলবাবু, অনুনয় তাঁকে প্রণাম করল? অখিলবাবু অনুনয়কে তাঁর শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে চেয়ার দেখিয়ে বললেন, বস। বিয়ের সময় অনুনয় দু'চার বার দেখেছিল অখিলবাবুকে, তখন ভদ্রলোকের স্বাস্থ্য ছিল লোহার মত মজবুত, যেমন গায়ের রঙ তেমনি লম্বা-চওড়া মাংসল দেহ, এখন শির দাঁড়াটা বেঁকে গেছে, অনেক কৃশ হয়ে গেছেন ভদ্রলোক, বয়স অবশ্য ষাটের কাছাকাছি, সম্প্রতি পেনসন নিয়েছেন।

অনুনয়ের সঙ্গে অখিলবাবুর মামুলি কথা-বার্তা হাত লাগল, আলাপ যখন বেশ জমে উঠেছে তখন বিমলা ঘরে ঢুকল।

স্ত্রীকে দেখে অখিলবাবু বললেন, তারাকে একটু চা খাইয়ে দাও, আমাকে-ও সেই সঙ্গে।

[ক্রমশঃ

নতুন বই

অর্কিড :—সুবোধ প্রকাশক—আনন্দধারা প্রকাশন, ৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—২·৫০

বাংলা সাহিত্যের পাঠকের কাছে সুবোধ ঘোষের পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। সুবোধ ঘোষ তাঁর নিজস্ব লেখনীর বৈশিষ্ট্যতায় সাহিত্যের আসরে, বিশেষ করে ছোট গল্পের ক্ষেত্রে কৌলিন্য দাবি করতে পারেন। অর্কিড সুবোধ বাবুর ছয়টি গল্পের সংকলন।

অর্কিড গল্পটি রোটারিয়ান পি. বসু তাঁর স্ত্রী করুণা আর নানা জাতের অর্কিডকে কেন্দ্র করে। ঘটনা প্রবাহে একটি প্রধান চরিত্র হয়ে আসে করুণাদের পূর্ব পরিচিত গুণাকর। আশুতোষ পি বসু তাঁর গবেষণার মধ্য দেশ বিদেশ থেকে সংগ্রহ করে আনেন নানাজাতের অর্কিড। নিরন্তর তাঁর সাধনা এই সব গাছের বর্ণ পরিবর্তন, ফুল ফোটাবার। গাছপালাই তাঁর জগৎ। এদিকে অর্থকরী কোন কিছুই তিনি করেন না। ফলে সংসার ক্রমে রিক্ততার আসে। সমস্ত কিছু ঘুচে এখন শুধু বহুপুরের গ্রীন হাউসটা আছে। এদিকে সংসারের সমস্ত কিছু দায়-দায়িত্ব সামলাতে হয় করুণাকে। তার সঙ্গে সহ্য করতে হয় তার বাবা, ভাইদের তা স্বামীর প্রতি অবজ্ঞা; তাঁর বাবা যতদিন ছিলেন রাগের মাঝে মধ্যে মধ্যে আশা ভঙ্গের কথাও বলতেন। এই আশা ভঙ্গের বেদনাটা আরো প্রকট হল যখন তিনি দেখলেন যে তাঁর পূর্ব-পরিচিত গুণাকর সাত বছর আগে ছিল একজন কেরানী আজ সে একজন বিশিষ্ট কনট্রাকটর।

করুণার বাবা প্রতুল বাবু মারা গিয়েছেন, আর এদিকে এক বছরের মধ্যে রোটারিয়ান পি. বসুর গ্রীন হাউসের অনেক অর্কিডের ফুল ফুটেছে লিলিপুট নতুন-লিলিতে ছেয়ে গিয়েছে দু একজন জার্মান ট্যুরিস্ট ডাক্তার পি. বসুর চারবেরিয়ান দেখে খুশী হয়েছেন চারাগাছ নিয়ে গিয়েছেন এক পাল। তারা টাকা দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু পি. বসু বলেন তাঁর টাকার দরকার নেই। করুণা শুনে হাসে, কিন্তু সে হাসি যেন আগুনে পোড়া জ্বালা।

কিন্তু পি. বসু
আবিষ্কারের নাম
করুণাইনা"।

এদিকে অবস্থা পৌঁছয় চরমে। ঘরের সমস্ত কিছু শেষ হয়ে যায়। শেষ রাতে করুণার ঘুম ভাঙিয়ে পি বসু জিজ্ঞেস করে যে কাল সে ভাত খেয়েছিল কি না? নিষ্করুণ মিথ্যে কথায় করুণা চেঁচিয়ে বলে সে খেয়েছে তাতেই শান্ত হয়ে ঘুমোয় পি বসু।

এদিকে গুণাকর আসে তাকে অভ্যর্থনা করে সে সাহায্য দিতে চায়। চোখ তার জলে ভরে করে। করুণা একদিন তাকে টাকার দরকারের কথা বলে। কিন্তু টাকা দিতে গুণাকরকে আসতে দেখে সে আশ্রয় নেয় পি বসুর

সাহেব সবজেক্টরে।

এতদিন বলনি কেন?

গুণাকর বলে করুণা বলে টাকার দরকার নেই। গুণাকর যাবার সময় করুণাকে বলে—আপনি শান্তাই একটি চমৎকার অফিস।

জয়ন্তী : বিলেতে গিয়ে রাজীব মুক্তিকে নিয়ে নতুন করে ঘর বাঁধে। রাজীব তখন কথাবার্তায় চালচলনে নিখুঁত সাহেব আর মুক্তি করে তোলে একটু ভাঙা ভাঙা বাংলা বলতে শিখেছিল। সুন্দরী প্রাণোচ্ছল মুক্তির অবাধ স্বাধীনতা, তার বাঙলা মুক্ত পক্ষে অবাধে উন্মুক্ত আকাশ পরিক্রমা করে। মুক্তি চেয়েছিল একটি সুন্দর শিশুর মা হতে, রাজীবও তাতে সম্মতি জানায়। উভয়ে ডাক্তার সুকোমের সকল প্রাণীবীজ প্রবাতার ক্লিনিকে যায়—রাজীব সম্মতিপত্রে সই করে।

কিন্তু রাজীবের আর একটা অতীত ইতিহাস আছে। বাবা মারা যাবার পরে গরীব কাকা ষোল বছরের রাজীবের সঙ্গে বিয়ে দেয় 'সউডীর এক চাল কলের কেরানীর কুৎসিতা মেয়ের সঙ্গে। কিন্তু এই বিয়েকে রাজীব মেনে নিতে পারেনি। বিলেতে যাবার আগে জয়ন্তী চেয়েছিল অন্তত একটা বন্ধন রাখতে। রাজীবের ছেলের মা হবার পরিচয় চেয়েছিল, কিন্তু সে অনুরোধ রাজীব হেসেই প্রত্যাখান করে। জয়ন্তী রাজীবকে বলে তোমার ছেলে তোমার চেয়েও সুন্দর হবে।

রাজীব বিলেত চলে যাবার পাঁচ মাস পরে সিউডি থেকে অনেক ঘুরতে ঘুরতে একটা চিঠিতে রাজীব জানতে পারে যে জয়ন্তী মারা গিয়েছে।

মুক্তির ছেলে অত্যন্ত সুন্দর হয়েছে। রাজীবকে অভিনন্দন করে সকলে। রাজীবও ছেলেটিকে ভালবাসে আদর করে। কিন্তু ছেলেটা ঘুমলে তার মুখের দিকে তাকালে রাজীব মনে মনে একটা জ্বালা অনুভব করে। এদিকে মুক্তির উদ্দাম স্বাধীনতার প্রশ্ন তোলাতে মুক্তি তার ছেলেকে নিয়ে চলে যায়। মুক্তির সঙ্গে ডিভোর্সের জন্যে সলিসিটরকে ফোন করতে রাজীবের মনে পড়ে জয়ন্তীর কথা, আর তার সেই কথা যে তোমার ছেলে তোমার চেয়েও সুন্দর হবে।

এছাড়া 'নিশিচক্রবাকী' 'সিন্ধু নিকটে যদি' 'রিতা' 'একতীর্থা' প্রভৃতি গল্পগুলিকে মনস্তাত্ত্বিক গল্প বলা যায় এবং লেখক সবকটি গল্পেই মানুষের মনের জটিল অলিগলির সন্ধান অতি সার্থকতার সঙ্গে করেছেন। সমস্ত গল্পগুলিই পাঠককে চিন্তার খোরাক দিবে।

পত্রোপন্যাস পত্রীর আঁকা প্রচ্ছদপটটি সুন্দর।

দ্বিরাগমন—মিহির আচার্য। প্রকাশক—আনন্দধারা প্রকাশন, ৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—৩·০০ টাকা।

পূর্বাভাসে লেখক লিখেছেন "শহরবাসী মনে গ্রাম সম্পর্কে আবহমান কাল ধরে সংস্কারের আকারে একটি ভাবঘন মেদুর কল্পনা জড়িয়ে আছে। কিন্তু বাস্তবে সে গ্রাম কোথাও আছে! শহরের সংস্পর্শে গ্রাম জীবনের মূল্যের আদল না গ্রাম না শহুরে কাঠামোয় উদ্‌ভ্রান্ত। এমনি একটি আধুনিক গ্রাম্যজীবন এই উপন্যাসে বিধৃত।"

এদেশে কোম্পানীর রাজত্বের গোড়াপত্তনের সময় থেকে কাহিনী শুরু হলেও মূল কাহিনী ইলাসিং কালের। গ্রাম্য জীবনের সামাজিক আচার ব্যবহার আদিবাসীদের জীবনযাত্রা, নিম্নবর্গ বর্ণবৈষম্য দলাদলি, নীতিহীনতা তথাকথিত আলোক প্রাপ্ত পরিবারের তমসাবৃত নগ্নতা সবকিছু রূপায়িত হয়েছে লেখকের সরল লেখনীতে। ছাপা ও প্রচ্ছদ সুন্দর।

জাপানী কবিতা : অমিত সরকার। কারেন্ট বুক এজেন্সি। বিধান রোড-১। দাম—দুই টাকা।

অনুবাদ, বিশেষ করে কবিতার নিঃসন্দেহে দুঃসাধ্য। কারণ প্রতিপক্ষ জ্ঞান কবিতায় ভাষান্তরে বিস্তর যোগ্য বাদন বয়। কবিতার ভাষা স্বতন্ত্র—তার দৃষ্টি ও সৃষ্টি রসিকজনের অন্তর্দৃষ্টির রূপকল্পে পরিণত। সুতরাং সব হাতের স্পর্শ কবিতায় অপ্রয়োজনীয়।

অমিত সরকারের অনূদিত 'জাপানী কবিতা' অন্য অনেক অনুবাদের মধ্যে বিশেষত্ব পাবার যোগ্য। স্বচ্ছন্দ শব্দ ব্যবহার, ভাষার মাত্রাবোধ ও ইমেজের পরিপূর্ণ আবশ্যিকরণ প্রথম থেকে শেষ অবধি মৌলিকতার পরিচায়ক, এবং অনুবাদতার চিহ্ন অনুপস্থিত। অনায়াস ভাবে পাঠের উপযুক্ত। যেমন দু'একটি উদাহরণ দিলেই অনুবাদ সম্পর্কে সন্দেহমুক্ত হওয়া যাবে :

"By way of Pretext
I said, I will go
And look at the condition
of the Bamboofence
but it was realy to see you."

ছল করে বলেছিলাম
যাব,
তোমার তৈরী
বাঁশের বেড়াটা দেখতে
কিন্তু আসলে
সে শুধু
তোমাকে দেখারই জন্যে।

(ইয়াকোমচি)

যেমন :

Giddy grasshoper
Take care
Dont leap
And crush these pearls of dew drops.

অনুবাদটি—

আস্তে···গঙ্গা ফড়িং আস্তে
অমন করে লাফিওনা
নষ্ট করো না
মুক্তোর মত ভোরের শিশির গুলোকে

(ইসা : অষ্টাদশ)

বইটি 'জাপানী কবিতার' স্বয়ংসম্পূর্ণ বৃহৎ সংস্করণ নয়। আটচল্লিশ পাতার মধ্যে প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত টেনে আনা হয়েছে। আধুনিক যুগের শুধু মাত্র একজন কবির কবিতা দিয়ে অনুবাদক বইটি শেষ করেছেন। আধুনিক যুগের আরো দু'চার জন কবির কবিতা এই সংকলনটি পূর্ণাঙ্গপ্রাপ্তির সহায়তা করতো।

ভূমিকায় অমিত সরকার জাপানী কবিতা সম্পর্কে অল্পকথায় অনেক বাদানুবাদকে এড়িয়ে গেছেন। কবিগুরুর বক্তব্য উপস্থিত করে তিনি নিজের ভূমিকা—অনেকটা সহজ করেছেন।

বাঁধাই ছাপাই ভাল হয়েছে—দু' একটি ভুল মুদ্রণ ছাড়া। তরুণ বাংলার আঁকা প্রচ্ছদটি বিশেষভাবে অভিনন্দনযোগ্য।

—কমলেশ সেন

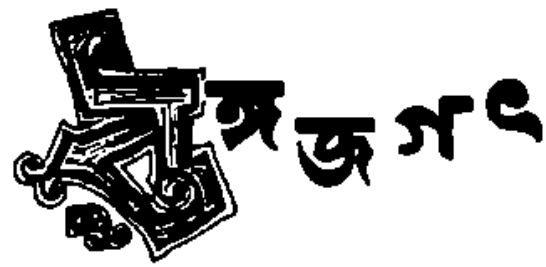

অনন্যসাধারণ চিত্র কাহিনী 'ছায়াসূর্য'

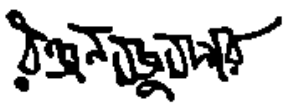

কাহিনী—আশাপূর্ণা দেবী। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—পার্থপ্রতিম চৌধুরী। সংগীত পরিচালনা—হিমি বালসরা। শব্দগ্রহণ—অতুল চ্যাটার্জি ও মৃণাল গুহঠাকুরতা। আলোকচিত্র গ্রহণ—বিশু চক্রবর্তী। সম্পাদনা—তরুণ দত্ত। রূপসজ্জা—অনন্ত দাস। শব্দানুলেখন—শ্যামসুন্দর ঘোষ। ব্যবস্থাপনা—সুবীর মজুমদার। দৃশ্যসজ্জা—বিমল দে। প্রযোজনা—আর, ডি, বনশাল। পরিবেশনা—আর, ডি, বনশাল এণ্ড কোং।

চরিত্র চিত্রণে—পদ্মিনী ঠাকুর, কল্যাণী ঘোষ, ছবিনা দেবী, অনুভা গুপ্তা, ইরা চক্রবর্তী, মিতা চ্যাটার্জি, নির্মলকুমার, পাহাড়ী সান্যাল, বিকাশ রায়, তরু ব্যানার্জি, চারুপ্রকাশ ঘোষ, অরুণ মুখার্জি, বিনীত রায়, রবি ঘোষ, প্রভৃতি।

বর্তমান দশকের বাংলা চলচ্চিত্র এক নতুন সম্ভাবনার উদ্দীপ্ত। এক্কালের তরুণ পরিচালকদের চলচ্চিত্রায়নের ধারা, কাহিনীর নির্বাচন, অভিনয় পদ্ধতির ক্রমাবয় পরিবর্তন এবং নবতর দৃষ্টিভঙ্গীতে উৎসাহীত পরিচালনগত মুন্সিয়ানা বর্তমান দশকের বাংলা চলচ্চিত্রের এক অভূতপূর্ব আশা ও আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার করেছে।

আলোচ্য ছায়াসূর্য চিত্রটিতে সেই মনোভাবেরই এক অপূর্ব প্রতিফলন। বাংলাদেশের সর্বকনিষ্ঠতম পরিচালক পার্থপ্রতিম চৌধুরী এই চিত্রের মাধ্যমেই পরিচালক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেন। তাঁর এই প্রথম ছবিতেই তিনি যে আশ্চর্য সংবেদনশীল হৃদয় ও পরিণত-বুদ্ধির পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছেন, আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে বাংলা চলচ্চিত্রের সৌখার্থ বৃদ্ধির কাজে তাঁর অবদান অন্যান্যের অপেক্ষায় কম হবে না। আমার ধারণা বহুস্তর চিত্রসৃষ্টির তাগিদ তাঁর অন্তরেই রয়েছে—পরিচালক পার্থপ্রতিমের শিল্পকর্মের মধ্যে তা সোচ্চারিত সুতরাং আশা করা অন্যায় হবে না নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে নাটকের আসল বক্তব্যটুকুকে তিনি কোন দিনই হারিয়ে ফেলবেন না এবং সুরুচিসম্পন্ন শিল্পশ্রী মণ্ডিত চলচ্চিত্র সৃষ্টির কাজে তিনি বরাবরই অবিচলিত থাকবেন।

'ছায়াসূর্য' আশাপূর্ণা দেবীর একটি ক্ষুদ্র গল্প। এই গল্পে বর্ণিত হয়েছে এমনই এক পরিবারের কথা যে পরিবারটি বাংলা দেশের শতকরা নব্বুইটি ক্ষেত্রেই দেখা যায়। সেই পরিবারের সমস্যাকুল একটি মেয়ে যার নাম 'বেঁটু'—তাকে নিয়েই গল্পের নাটকীয় অংশ বিবৃত হয়েছে চলচ্চিত্রে।

মধ্যবিত্ত একটি পরিবার। বড়কর্তার দুটি মেয়ে মাত্র। মেজকর্তার কোন সন্তান নেই আর ছোটকর্তা সাহিত্যিক সুরেন অবিবাহিত সুতরাং পরিবারের সন্তান বলতে বড় মেয়ে মল্লিকা আর ছোট মেয়ে ঘেঁটু। ফুলের নামে নাম। ছোটটির নামকরণে বাড়ীর মেজ বউ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন। নামকরণ হয়েছে ঘেঁটু। ঘেঁটু ফুলে শিব পুজো হয় না। ঘেঁটুকে দেখতে কালো, সে খুব দুষ্টু—মেজকাকীর হঠাৎ খেয়ালখুশীতে সে নামাঙ্কিত হলো ঘেঁটু হিসাবে।

স্বভাবচরিত্রে পরিবারে সকলেরই প্রিয় মেয়ে মল্লিকা। যেমন তার রূপ তেমন তার গুণ। লেখাপড়ায়, গান বাজনায়, ছবি আঁকায় এবং সুললিত কণ্ঠে আবৃত্তি ইত্যাদিতে তার জুড়ি খুঁজে পাওয়া ভার। মল্লিকা প্রিয়ভাষিণী ধীর স্থির সকলেরই অনুগত এবং নম্র প্রকৃতির মেয়ে, ফলে বাড়ীর সকলেরই প্রিয় সে।

আর ঘেঁটু ঠিক তার বিপরীত। যেমন বিদ্‌ঘুটে কালো দেখতে, তেমনই তার দুরন্তপনা। বাড়ীর সকলে তার ভয়ে সদাসন্ত্রস্ত। মেয়ে হয়ে জন্মেও প্রকৃতিটি তার সোলআনা পুরুষালী খেলা ধুলা বলতে ড্যাং গুলি, ফুটবল আর ক্রিকেট। পাড়ার যত রাজ্যের ছেলেদের সঙ্গে তার অবাধ মেলামেশা। তাদের সঙ্গে জুটে দলবেঁধে সরস্বতী পুজো থেকে সুরু করে পাড়ার কাংশান অবধি করে বেড়াচ্ছে অহর্নিশি। পড়াশুনায় বিন্দুমাত্র মনোযোগ নেই—মেয়েদের স্বভাবধর্মের লেশমাত্র নেই তার সেই উদ্ভট চরিত্রে। এ নিয়ে বাড়ীতে এক মহা অশান্তি। মা, কাকী আর দিদি ঘরে ঘরে উপদেশ অনুরোধ করছে, কিন্তু ঘেঁটু সে সব কথা এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে তৎক্ষণাৎ বার করে দিচ্ছে। রাতদিন শতেক বকাঝকা—গালিগালাজ হচ্ছে, কিন্তু ঘেঁটুর তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই বিন্দুমাত্র।

এই মেয়েকে নিয়ে সবের অশান্তি। বিরক্ত হয়ে মেজ কাকী বলেন ঘেঁটুকে কোন বোর্ডিংএ পাঠিয়ে দিতে। কিন্তু সাহিত্যিক ছোটকাকার সেলাতিশয্যে তা আর সম্ভব হয় না। গোটা পরিবারে ঘেঁটুর সত্যিকারের আশ্রয় হচ্ছে ছোটকাকা, যত বিপদ আপদ আর অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে হয় সুরেনকেই।

সবাই ভেবেছিল মেয়ে বড় হলে সব শুধরে যাবে। কিন্তু সকলের অনুমান মিথ্যা প্রমাণিত করে ঘেঁটু বরাবরই একরকম রয়ে গেল। একই রকম রয়ে গেল তার ছেলেদের সাথে আড্ডা দেওয়া ক্লাবে গিয়ে ক্যারাম খেলা এর ওর বাড়ীর কাজকর্ম করে দেওয়া এবং পড়াশুনায় অপরিসীম অমনোযোগ ইত্যাদিতে ঘেঁটু যথাপূর্বম রয়ে গেল।

মা এসে সাহিত্যিক ঠাকুরপোকে বলেন—'সারা বাড়ীতে একমাত্র তোমার কথাই শোনে। তুমি ওকে একটু বুঝিয়ে বললে হয়তো শোধরাতে পারে। ধিঙ্গি মেয়ে, সারাদিন রাজ্যের বকাটে ছেলেদের সাথে আড্ডা দিয়ে বেড়াচ্ছে এর একটা প্রতিকার করো—'

ছোটকাকার চেষ্টার ত্রুটি নেই। অসীম মমতা তাঁর এই পুরুষালী প্রকৃতির দুরন্ত ভাইঝিটির প্রতি: তবুও কড়া হয়ে শাসন করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু উদ্ভট মেয়েটির অবাক্‌করা আচরণে শেষপর্যন্ত ক্ষান্ত হতে হয়।

বিধাতার অপূর্ব অবদান এই ঘেঁটু আর মেজকাকীর অনিন্দ্য নামকরণে সাহিত্যিক সুরেন অবাক হয়ে ভাবেন এই কথা। এই সৃষ্টিছাড়া মেয়ের প্রতি তাঁর অগাধ স্নেহকে তিনি সকলের অজ্ঞাতসারে হৃদয়ে লালন করেন। ঘেঁটু এসে বলে—'ছোটকাকা, তুমি তো কত গল্প লেখ, আমায় নিয়ে একটা গল্প লিখবে?—তার উত্তরে সাহিত্যিক মৌন থাকেন। মিথ্যে মানুষের মিথ্যে কাহিনী লিখে লিখে তিনি শ্রান্ত এবং বিষণ্ণ। তাই তাঁর নিজের চোখে দেখা সত্যিকারের মানুষের কথা আর লেখা হয়ে ওঠে না।

সেবার স্কুলের রেজাল্ট বেরুবার দিন। মা বলেছিল অফিস ফেরতা, মেয়েদের বাৎসরিক পরীক্ষার ফলাফল জেনে আসতে। একটু আগেভাগে অফিস থেকে ছুটি নিয়ে কর্তা গিয়েছিলেন মেয়েদের রেজাল্ট জানতে। সেখান থেকে সোজা বাড়ী ফিরলেন রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে। বড় মেয়ে মল্লিকা লেটার মার্কস পেয়ে

পাশ করেছে আর ছোট মেয়ে ঘেঁটু সব বিষয়েই ফেল করে বসে আছে।

বাড়ী ফিরে দেখেন ছোট মেয়ে সদ্য ঘুড়ি ওড়ানো শেষ করে বাড়ী ফিরছে। পরীক্ষার ফেলের ব্যাপারে তিরস্কার করাতে বাবার বুকের উপর মেয়ে বলল—আমি তো পড়তে চাই না! আর না পড়লে কি করে পাশ করবো—তোমরা আমাকে জোর করে পড়াচ্ছ—

বাবা বলেন—'জানিস তুই কত নম্বর পেয়েছিস?

মেয়ে বলে—জানি,—দুই, তিন, পাঁচ, দশ, ষোল···

এবার আর সহ্য হল না বাবার। দুষ্টতার সীমা ছাড়াচ্ছে মেয়ে। সপাটে ঠাস করে একটি চড় কষিয়ে দিলেন গালে। মেয়ের চোখে তখনি শ্রাবণের ধারা বর্ষণ আর বিস্ময়ে উদ্ভাসিত দৃষ্টি। খানিকক্ষণ বিরতির পর ঘেঁটু বললে—'বাবা, আজ যদি তুমি আমার এই চড়টা না মারতে তাহলে চিরদিন আমার মনে থাকতো যে আমার বাবা আমায় কোনদিন মারেনি—কোন দিনও না—

সাহিত্যিক সুরঞ্জন প্রকাশকদের তাগাদায় অস্থির হয়ে রাঁচির দিকে পাড়ি দিচ্ছিলেন একটু নিভৃতে বসে হাতের উপন্যাসটি লিখে শেষ করে আসবার জন্য। ঘেঁটুর নিগ্রহে তিনি ব্যথিত হলেন। দলে নিলেন তাকে।

রাঁচীতে গিয়ে চতুর্দিক খোলামেলা উদাত্ত প্রকৃতির কোলে ঘেঁটু যেন তন্ময় হয়ে গেল। সেখানে প্রকাশ পেলো ঘেঁটু সকলের অজ্ঞাতসারে একটি ছেলের প্রেমে পড়েছে। অসভ্য মেয়ে ছোটকাকার প্রশ্রয় পেলো বটে ঘেঁটু কিন্তু বাড়ীর কারও কাছে সে তার গুপ্তপ্রেমের কথা প্রকাশ করলো না।

এদিকে মল্লিকার বিয়ের সম্বন্ধ দেখা হচ্ছে। মেজবৌর এক মামাতো ভাই বিলেতে ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে সেখানেই চাকরীতে ঢুকে পড়েছে। ঘটনাচক্রে তার সঙ্গেই যোগাযোগ হল। ছেলের পছন্দ হল মল্লিকাকে। মল্লিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, সুন্দরী এবং সুগায়িকা—সৎপাত্রে বিবাহযোগ্যা, সুতরাং যোগাযোগ আকস্মিক হলেও এ বিবাহে বিস্ময়ের কিছু ছিল না।

ওদিকে ঘেঁটুকে দেখা যায় প্রতিদিনই বেলা ঠিক পাঁচটার সময় বাড়ী থেকে বেরিয়ে কোথায় যেন কয়েক ঘন্টার জন্য নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। একবার ছোটকাকা মেয়ের গন্তব্যস্থলটি জানতে গোপনে শিষ্য অনুসরণ করেছিলেন কিন্তু ঘেঁটু এক বড় রাস্তার মোড় থেকে জনারণ্যে কোথায় যে হারিয়ে গিয়েছিল সুরঞ্জন তার হদিশ করতে পারেন নি।

আসলে ঘেঁটু যায় তার প্রেমাস্পদের কাছে। এক শ্রীহীন বস্তি বাড়ীর জীর্ণ ঘরে সেই যুবকটি থাকে যার কোন চালচুলো নেই—চাকরী নেই—আত্মীয় স্বজন বা বিষয় আশয় নেই। কেবলমাত্র সে এক গোত্রহীন যুবক যে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট এবং আধুনিক কালের সামাজিক বৈষম্যের এক চিন্তান্বিত শিকার।

এক অদ্ভুত যোগাযোগের মধ্যে দিয়ে এই ভানপিটে মেয়েটির সাথে তার প্রণয়ের সূত্রপাত। আর এই দুর্ঘটনাকে ঘিরে ঘেঁটু তার ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময় রঙীন স্বপ্ন দেখে।

এই সব ঘটনাচক্র উপলক্ষ করে চিত্রের নাটকীয় গতি-স্রোত ক্রমাগত চূড়ান্ত উত্তরণের দিকে এগিয়ে চলে এমন সময় ঘেঁটুর প্রেরণাস্পদ দুর্ঘটনাটি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে! বিশ্বস্তহীন অসহায় এই ছেলেটির পরিচর্যা করবে তেমন কেউ না থাকায় রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করে চলে। এদিকে মল্লিকার বিয়ের দিন স্থির হয়ে যায়। বাড়ীর সকলে এই বিবাহের উদ্যোগে মেতে থাকেন। মানসিক-ভাবে ঘেঁটুর কথা সকলে ভুলে যান।

বিয়ের দিন রাত্রে হঠাৎ মেজবৌ আবিষ্কার করেন যে তাঁর পার্স থেকে একশোটা টাকা নিরুদ্দেশ হয়েছে। তৎক্ষণাৎ খোঁজাখুজি পড়ে যায়। বাড়ী ভর্তি আত্মীয় স্বজন। সকলে সন্দেহ করে চাকর বংশী-ই টাকা সরিয়েছে। ক্রুদ্ধ মেজকর্তা অবিলম্বে বংশীকে পাকড়াও করলেন। বংশী তখন বাজার করবার জন্য বাড়ীর বাইরে যাচ্ছিল। তাকে ধমক দিয়ে যখন বিশেষ সুবিধা করা যাচ্ছে না তখন ক্রুদ্ধ মেজকর্তা তাকে প্রহার দিতে উদ্যোগ করেন। এমন এক নাটকীয় মুহূর্তে' একগুচ্ছ রজনীগন্ধা ফুল সহ ঘেঁটুর আবির্ভাব।

ছোটকাকার মুখে সব শুনে ঘেঁটু বলে যে বংশী টাকা চুরি করেনি, টাকা সে নিজে নিয়েছে মেজকাকী-মার পার্স থেকে। বিস্ময়ে হতবাক মা, বাবা, কাকার ও কাকীমার কিছুক্ষণ মুখ দিয়ে কথা সরে না। তারপর রাগে, ক্ষোভে আত্মরাম ভেঙ্গে পড়েনা মা। তিনি বলেন—হতভাগা মেয়ে, তুই শেষ পর্যন্ত চোর হলি।

মেয়ে বলে—'আমি আমার বাবার টাকা নিয়েছি—'

মা গর্জন করে ওঠেন—'সে, কেরত দে টাকা, বল কি করেছিস টাকা দিয়ে—'

দৃপ্তকণ্ঠে মেয়ে বলে—'টাকা নেই, আর কি করেছি তা আমি বলবো না—।

মায়ের এতক্ষণে সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত হয়। নিজেকে সামলাতে পারেন না আর রাগে, দুঃখে ও অভিমানে মেয়েকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দেন মেঝেয় এবং নিজেকে অভিসম্পাত দেন।

এরপর ছোটকাকার ঘর। যে ছোটকাকার কাছে ঘেঁটু চির ধন হারার দুঃস্বপ্নের ও শতেক তিরস্কারের প্রশ্ন পেয়েছে—সেই ছোটকাকার কাছে এসে দাঁড়ায়

ঘেঁটু। কত মিনতি ছোটকাকা এলেন। বললেন—আমি তোকে বকতে আসিনিরে ঘেঁটু—'

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ঘেঁটু বলে—'ছাড়ি ছোটকা—।

—আমি বলছিলাম টাকাটা কি কেউ তোকে ধোঁকা দিয়ে নিয়ে গেছে—'স্নেহার্দ্র' কণ্ঠে কাকা বলেন—'না সেই ছেলেটার অসুখে খরচ করেছিস—!

ঘেঁটু বলে—'সে সময় আর পেলাম কোথায়, আজই তো···শুধু পোড়াবার কাঠ আর অন্যান্য কি কি বিবিধ কিনতে সব খরচ হয়ে গেল

ছোটকাকা শিউরে ওঠেন, এ খবর তাঁর অজানা ছিল।

—'আমাকে আগে বললি না কেন ঘেঁটু?'

ঘেঁটু অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলে—'দিদির বিয়ের ব্যাপার নিয়ে তুমি এত ব্যস্ত ছিলে যে তোমাকে একবারও একলা পাইনি।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ঘেঁটু বলে—'এ বরং ভালোই হল। পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করতে হলো না—'

নীরবে মাথা হেঁট করে করে শুনেছিল সর্বজ্ঞ ছোটকাকা সুরঞ্জন। আনাড়ী বিধাতার হাতে গড়া এই বিটকেল ছোট ভাইঝিটি যে কখন সকলের অজ্ঞাতসারে বয়সের পরিপূর্ণতার সুযোগে প্রেমে, আনন্দে, উচ্ছ্বাসে, জীবনের চরম সত্যটুকুর উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে অন্তরের দীপ্যমান পবিত্র আলোয় নিজেকেই উদ্ভাসিত করে উঠেছে সে খবর রাখতেন না তিনি। আজ তাঁর চোখের সামনে আর এক পৃথিবী নিতান্তই অকস্মাৎ তার বন্ধ অর্গল খুলে দিয়ে বহির্ভাণ্ডার অন্ধকার ও আলোর বন্যায় ভাসিয়ে একাকার করে 'দহে গেল কাকে।

'হারানুর' চিত্রটি পরিচালনা কৃতিত্ব বাংলা দেশের সর্বকনিষ্ঠতম পরিচালক পার্থপ্রতিম চৌধুরী। বাংলা চলচ্চিত্রের শুভবুদ্ধি ও বিবেকসম্পন্ন কয়েকজন চিত্র কারের সারীতে তাঁর এই অনন্য যোগদান আমাদের চলচ্চিত্রের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের আর এক পক্ষপাতী সংযোজন হিসাবে অনুমিত হচ্ছে। চিত্রটি দেখতে দেখতে পরিচালন নৈপুণ্যের জন্য ক্যামেরাম্যানের ট্রিটমেন্ট যে কোন পরিণতমনা চলচ্চিত্রকারের তুলনীয় বলে মনে হচ্ছিল। কনফিডেন্স ও ডিটারমিনেশন—এই দুটি অর্থবোধক শব্দ এ ছবির চিত্রায়নের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে আছে। ডিটারমিনেশন লক্ষিত হয়েছে চিত্রনাট্য গঠনের ক্ষেত্রে এবং সেই চিত্রনাট্যকে খুব দুঃসাহসের সঙ্গে চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এবং সব চেয়ে আনন্দের কথা পরিচালন ও চিত্রনাট্য নির্মাণ এই দুটি গুরু প্রয়াসের দায়িত্ব এককভাবে পরিচালক পার্থপ্রতিম চৌধুরীর। তাঁর সংযত নাট্য-বোধ, ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে পরিমিত এবং সংবেদনশীলতা ইত্যাদি 'হারানুর' চিত্রের এক অমূল্য সম্পদ।

সাম্যবাদ সম্বন্ধে নতুন পুস্তিকা

নিম্নলিখিত বইগুলি বাংলা, অসমীয়া এবং ওড়িয়া ভাষায় পাইবেন

১। কমিউনিজমের মর্মবাণী স্বাধীনতা
২। কমিউনিজম নিয়ে আসে সুখ—সমৃদ্ধি
৩। কমিউনিজমের মর্মবাণী ভ্রাতৃত্ব
৪। কমিউনিজমের মর্মবাণী সাম্য
৫। কমিউনিজমের মর্মবাণী শান্তি
৬। শ্রমের বিজয়কেতন কমিউনিজম

: যোগাযোগ করুন :

সোভিয়েত দেশ কার্যালয়

১১১, উড স্ট্রীট

কলিকাতা-১৬

ন্যাশনালের প্রকাশিত লোকবিজ্ঞানের বই

ইয়াকভ পেরেলম্যান

অঙ্কের খেলা

অঙ্কের নানা ধরনের ধাঁধা, বুদ্ধির অঙ্ক, জ্যামিতি, ভূগোল, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি সাধারণ জ্ঞানের অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস পেখান হয়েছে খেলার ছলে দিয়ে।

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত এল. ল্যান্দাউ ও সহলেখক ওয়াই রুমার

আপেক্ষিকতার তত্ত্ব

জটিল গণনার আশ্রয় না নিয়ে আপেক্ষিকতা তত্ত্বের মূল কথা অতি সহজ ও সরলভাবে বিশ্লেষিত। আইনস্টাইন অধ্যাপক সত্যেন বসুর ভূমিকা সম্বলিত। ১·৫০

। লোকবিজ্ঞানের অন্যান্য কয়েকটি বই ।

অধ্যাপক এ. কারানভ	**মানবদেহের গঠন ও ক্রিয়াকলাপ**	৭·০০
টমসন	**শত সহস্র জিজ্ঞাসা**	২·২৫
তত্ত্বের ওগানিয়েসক	**সূর্যগ্রহণ**	১·২৫
লিয়াপুনভ	**মহাবিশ্বের রহস্য**	৩·০০

। মস্কো থেকে প্রকাশিত ।

ইয়াকভ পেরেলম্যান

জ্যোতির্বিজ্ঞার খোলখবর ২·০০

আলেকসান্দ্র ভলকভ

পৃথিবী ও আকাশ ৩·৫৬

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

১২ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

১৭২ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর-৪

এই নবাগত প্রযোজনাগুলির
চলচ্চিত্রে এই অভ্যুত্থানকে
আমরা স্বাগত করছি।

ছায়াসূর্য চিত্রের অভিনয় এ ছবির সাফল্যের অন্যতম কারণ। সুচরিতার চরিত্রে বেবী মিতা ও মিলন ঠাকুরের অভিনয় অনবদ্য। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শর্মিলাঠাকুরের অভিনয়। সত্যজিৎ রায়ের হাতে এক পেশে শর্মিলা তাঁর পরপর দুটি ছবিতে অভিনয় করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। কিন্তু তারপরের ছবিগুলিতে তেমন বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি। কিন্তু ছায়াসূর্য চিত্রে তিনি তাঁর প্রাক্তন গৌরবের পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন। আশ্চর্য দায়িত্বপূর্ণ অভিনয়ের দ্বারা প্রথম হতে ছবির শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত তিনি দর্শকের হৃদয়ে গভীর ছাপ রেখে যেতে সক্ষম হয়েছেন। কি ছুটোছুটি, দুষ্টুমী, হাসি কান্না,—প্রতিটি মুহূর্তের অভিনয়ে তিনি এত মর্মস্পর্শী চরিত্র চিত্রন করেছেন যে ছবি দেখে বেরিয়ে এলেও তাঁকে ভোলা যায় না।

এরপর উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন নির্মলকুমার। ছোট কাকার ভূমিকায় দীর্ঘদিন মনে রাখবার মত-অভিনয় করেছেন তিনি। মা'র চরিত্রে মলিনা দেবী এক ব্যতিক্রম, দুঃখভুরা জননীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন স্বচ্ছন্দ গতিতে। পাহাড়ী সান্যাল ও বিকাশ রায় চিত্রনাট্যের দাবী যথাযথ মিটিয়েছেন। একটি পার্শ্বচরিত্রে চারুপ্রকাশ ঘোষ ও রবি ঘোষের অভিনয় অনবদ্য হয়েছে।

সম্পাদনা ও আলোকচিত্র গ্রহণের কাজ প্রশংসনীয় হয়েছে। ছবিতে দুটি রবীন্দ্র সঙ্গীত জনপ্রিয়তার দাবী রাখে। হেমন্ত মুখার্জির গাওয়া 'এসো এসো আমার ঘরে এসো' ও সুচিত্রা সেনও চিন্ময় চ্যাটার্জীর যুগ্ম কণ্ঠে গীত 'মনে কি দ্বিধা রেখে গেলে চলে' এই দুটি গান চিত্রের পরিবেশের সঙ্গে চমৎকার মানিয়ে গেছে।

এমন একটি সুন্দর চিত্র উপহার দেওয়ার জন্য প্রযোজক পরিবেশক আর ডি বনশল বাংলাদেশের অগণিত দর্শকের প্রশংসার্হ হলেন।

সংবাদ পরিক্রমা—

মস্কোতে অনুষ্ঠিত তৃতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্রীমতী সুচিত্রা সেন এবারের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী নির্বাচিত হয়েছেন। আর ডি বনশল প্রযোজিত ও অজয় কর পরিচালিত দাতপাকে বাঁধা চিত্রে অভিনয়ের জন্য তাঁকে এই সম্মান দেওয়া হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে মস্কোতে সাত পাকে বাঁধা চিত্রের পরিচালক প্রযোজক ও আর ডি বনশলের কর্মাধ্যক্ষ বিমল দে উপস্থিত ছিলেন। মস্কো ফেস্টিভ্যালে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে ইতালীর বিখ্যাত পরিচালক ফেলেরীর 'এইট এণ্ড এ হাফ' চিত্রটি। সত্যজিৎ রায় এই প্রতিযোগিতায় অন্যতম জুরী হিসাবে উৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

"পশ্চিম স্বর্গ"

গত ১৭ই জুলাই মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ (দীমান্তিক শাখা) প্রযোজিত পশ্চিম স্বর্গ অভিনীত হয়।

মন বিশ্লেষণের উৎসাহ ও মিত্রো নির্দোভনের মার্কিনী নমুনা এ নাটকের মুখ্য বিষয়বস্তু-এতে উদ্ঘাটিত হয়েছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শ্বেতাঙ্গ সমাজের নিগ্রোদমাজের উপর হিংস্র, বিষেষ। নাট্য কাহিনীর স্বাভাবিকতা ও বাস্তবিকতার সুদৃঢ় ভিত্তি না থাকলে সঙ্কর এবং ইংগিতাত্মক উচ্চ শ্রেণীর অভিনয় সম্ভব নয়। অভিনয় কোন প্রকারেই কাহিনী নিরপেক্ষ বা অর্থনিরপেক্ষ নয়। এ জাতীয় নাটক বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে নয়া পদক্ষেপ। ভাব ও আঙ্গিকের দিক থেকেও অভিনব। তবে একথা ঠিক পেশাদার রঙ্গমঞ্চে এই শ্রেণীর নাটক অভিনয় করানো শক্ত। কারণ সাফল্য নৈশ্চিত্য সংশয়াতীত নয়। এই কারণে এই জাতীয় নাটকের প্রযোজনার জন্য বিশেষ ধরণের মঞ্চ গড়ে তোলা দরকার।

নাটকে প্রধানতঃ একটি চরিত্র "এমিল" নাটকটি তার স্বপ্ন, এ স্বপ্নের মূলে আছে আজকের জগৎ। এমিল বাড়ীর নিগ্রো ভৃত্য পল-এর প্রতি অনুরক্ত, শ্বেতাঙ্গসমাজের বিধি লঙ্ঘন করে যে পলকে প্রশ্রয় দেয়।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, দীমান্তিক শাখা প্রযোজিত 'পশ্চিম স্বর্গ" নাটকের একটি দৃশ্য। বাম থেকে—চিররঞ্জন দাস, আশীষ মুখোপাধ্যায়, মণি বন্দী, সীমা চক্রবর্তী, সুনীল মিত্র। নাটক ও নির্দেশনা : চিররঞ্জন দাস।

বার্লিনাস্থ চলচ্চিত্র উৎসবে বাংলা শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী শ্রীমতী সুচিত্রা সেন।

নাটক চরিত্রে যে যেমন কথা বলে এর কথার মধ্যে তার সামঞ্জস্য নেই। বস্তুতান্ত্রিক তথ্য মানুষকে সংঘত করেছে কিন্তু মানসলোকে যে বাস্তবতা নেই সেখানে তার গতি অবাধ, তাই উচ্ছ্বাসে আশ্চর্য হবার নয়। তাই সংলাপে উচ্ছ্বাস এসেছে।

একমাত্র এমিলির চরিত্র ছাড়া আর কোন চরিত্রেরই ঘাত-প্রতিঘাত এবং প্রতিক্রিয়া পরিবর্তন তীব্র বা নাটকীয় নয়। এমিলির চরিত্রায়ণ ও মানসিক উত্তাপ উত্তেজনার সঙ্গে সংগতি নয়। তাই এমিলির পরিবর্তন দর্শকদের কোন প্রকারে বিচলিত করে না। অথচ নাট্য-বস্তুর কণ্ঠ হতে দর্শককে বিচলিত করা, দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ অচলায়তন থেকে বিচলিত করা! দু একটি দৃশ্যের ব্যতিক্রম ছাড়া অভিনয় নিরানন্দময়।

অন্যান্য চরিত্রে মিঃ জেমস এর চরিত্রে নাট্যকার ও পরিচালক চিত্তরঞ্জন দাস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম দিকে একটু জড়তা থাকলেও পরবর্তী ক্ষেত্রে অভিনয় সাবলীল গতিতে এগিয়ে গেছে। দ্বিতীয় অঙ্কে বার্ড এর ভূমিকা আশীষ মুখোপাধ্যায় ক্ষণিকের জন্য দর্শক মনকে আকৃষ্ট করেছেন।

একটি ঘরের ফ্রেমে দুই দৃশ্যের রসঘন জমাট নাটক। অবশ্য এধরনের নাটকে সব ঘটনা চোখের উপর ঘটাবার কোন চেষ্টা নাট্যকারের থাকে না। নাট্যকার তার ছবির ফ্রেমটা বেঁধে নেন বর্তমানের এই মোডে যেখানে অতীত বর্তমানের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে আর ভবিষ্যতের ইংগিত আস্তে আস্তে জানা যাবে। "পশ্চিম স্বর্গ" এ অবশ্য দু এক জায়গায় বাক্যের গঠনে আড়ষ্টতা লক্ষণীয়—আর ঘরোয়া পরিবেশ সৃষ্টির জন্য স্বামী স্ত্রীর 'বস' এবং "এ্যাম", কথাটির বাড়াবাড়ি শ্রুতিকটু। নাটক সম্পর্কে আর একটা কথা, বক্তব্যের দিক থেকে এ নাটক যতই উপযুক্ত হোক না কেন চরিত্রের নামকরণ অনুযায়ী পরিবেশ সমকরণ হয়ে উঠেনি। প্রথম দৃশ্যে দেখা যায় মিঃ উইলসন পলকে গুলি করে বেরিয়েছেন। এমিল কোনে পুলিশকে ঘটনা জানাতে যায়। ওর মা এবং মিঃ জেমস বাধা দেয়। শেষ দৃশ্যে একই দৃশ্য দর্শকমনকে বিশেষ ভাবে নাড়া দেয় না। একই দৃশ্য দুবার দেখানোর কোন অর্থ হয় না। মঞ্চ পরিকল্পনা ও আবহ সংগীত সাধারণ। আলোক সম্পাতনা মোটামুটি ভালই। —চিত্রগুপ্ত

বিশুদ্ধ

আয়ুর্ব্বেদীয়

বটিকাদি

রসায়ন ঔষধ

ধাতু ভস্ম

ইত্যাদি পাইবার

একমাত্র নির্ভরযোগ্য

প্রতিষ্ঠান

ভূদেব আয়ুর্ব্বেদ ভবন

২০, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫

ফোন : ৫৫-৪৪২৫

লিলির

রিচ নোনতা বিস্কুট

লিলি বিস্কুট কোং.প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-৪ •

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ... কার্ড-বোর্ড বক্স ফ্যাক্টরী প্রাঃ ... প্রকাশক ও ... ৯৩, ... ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত

বিংশ শতাব্দী

ভাদ্র ১৩৭৩ (১৮৮৫ শকাব্দ)

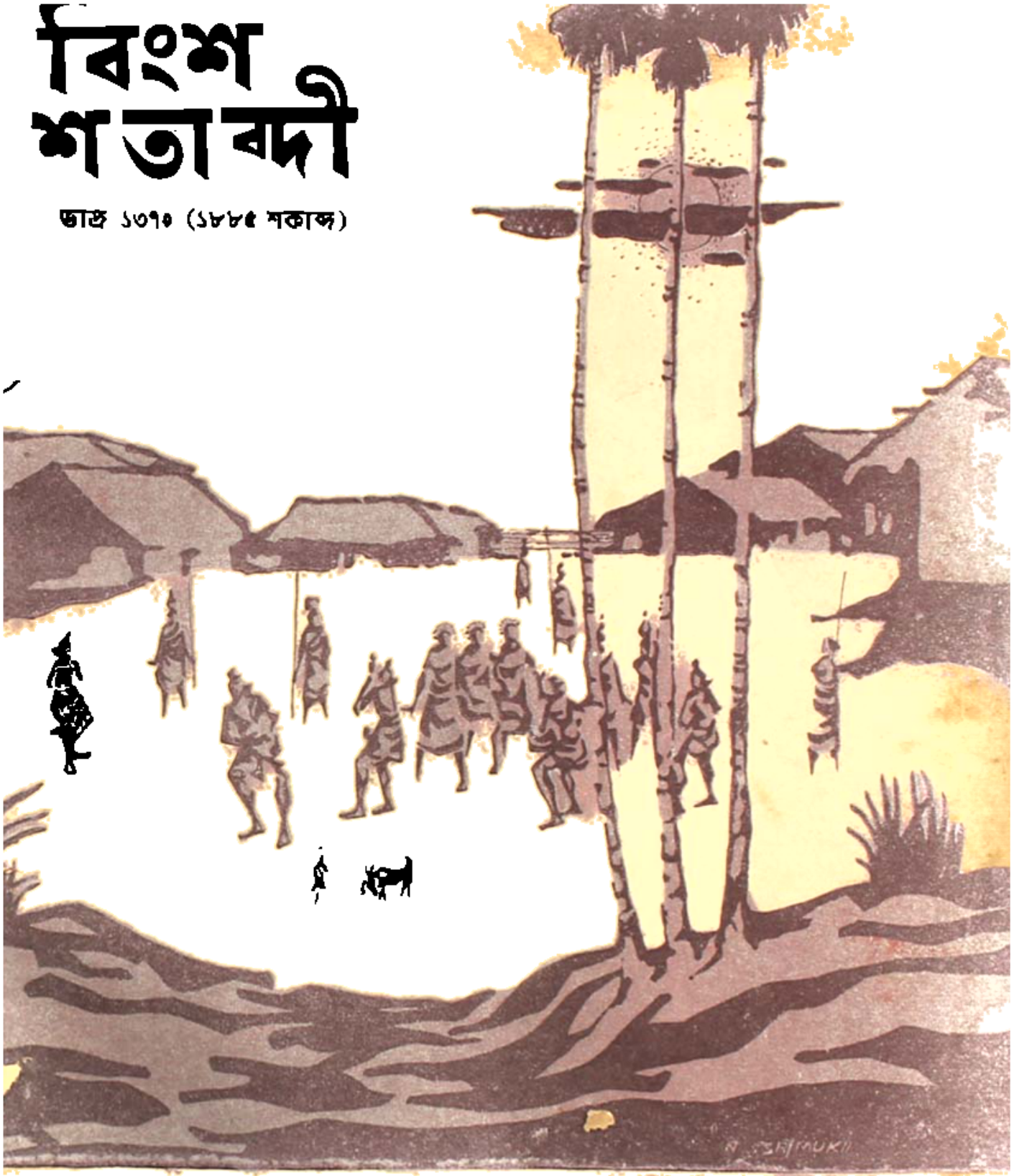

রেটিনা

ফোন ২২-২২২৫

৮-এ লাল বাজার স্ট্রীট

এ বছরের সর্ববৃহৎ শারদীয় সংখ্যা

বিংশ শতাব্দী

মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হবে।

—: এই সংখ্যায় ছয়খানি প্রত্যাসিত উপন্যাস :—

- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
- সুবোধ ঘোষ
- সমরেশ বসু
- নীহাররঞ্জন গুপ্ত
- নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
- মনোজ বসু

গল্প লিখবেন

- শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
- অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
- প্রবোধকুমার সান্যাল
- আশাপূর্ণা দেবী
- বিমল মিত্র
- বিমল কর
- কুমারেশ ঘোষ
- শিবরাম চক্রবর্তী
- সন্তোষকুমার ঘোষ
- আশা দেবী
- চিত্তরঞ্জন ঘোষ

এবং আরও অনেকে

অন্যান্য বিষয় লিখবেন

- ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত
- বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
- পার্থ চট্টোপাধ্যায়
- শিবতোষ মুখোপাধ্যায়
- স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
- জগদীশ ভট্টাচার্য
- তরুণ চট্টোপাধ্যায়
- প্রেমেন্দ্র মিত্র
- ডাঃ ধীরেন্দ্র নাথ সেন
- কৃষ্ণ ধর
- সুভাষ মুখোপাধ্যায়
- অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়
- রাম বসু
- শ্যামসুন্দর দে

এবং আরও অনেকে

ঃঃ এই সংখ্যায় থাকবে ঃঃ

মনোজ্ঞ প্রবন্ধ। সুন্দর কবিতা। বহুচিত্র সমৃদ্ধ রচনাগুলি।
বিশিষ্ট শিল্পীর ত্রিবর্ণ চিত্র বহু আলোকচিত্র। অসংখ্য স্কেচ
তীব্র কটাক্ষপূর্ণ কার্টুন ছড়া
এ ছাড়া নানা বিষয়

অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় ঃঃ

পৃষ্ঠা সংখ্যা পাঁচশত। দাম তিন টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা। রেজেষ্ট্রি ডাকে চার টাকা চল্লিশ নয়া পয়সা। নয় টাকার বার্ষিক গ্রাহকদের এবং পাঁচ টাকার ষান্মাসিক গ্রাহকদের কোন অতিরিক্ত মূল্য লাগবে না। রেজেষ্ট্রি খরচ ৫৫ নঃ পঃ স্বতন্ত্র। কোন ধারাবাহিক লেখা থাকবে না।

॥ আজই গ্রাহক হোন ॥
এজেন্টগণ অগ্রিমসহ অর্ডার দিন

বিংশ শতাব্দী ঃঃ ২০, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫ :: ফোন : ৫৫-৪৪২৫

বিস্তৃত বিবরণ আনন্দ বাজার, যুগান্তর, দেশ, অমৃত পত্রিকার বিজ্ঞাপনে জানান হবে।

১০ বছর মেয়াদী প্রতিরক্ষা ডিপোজিট সার্টিফিকেট

হেড পোষ্ট অফিসগুলিতে এবং
সাব পোষ্ট অফিসগুলিতে
এবং

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ষ্টেট ব্যাঙ্ক
ও এর সহযোগী ব্যাঙ্কগুলিতে
ট্রেজারি ও সাব ট্রেজারিগুলিতেও
এই সম্পর্কে আবেদন গ্রহণ করা হয়।

এই সার্টিফিকেট কিনে বার্ষিক শতকরা
সাড়ে চার টাকা কর বিহীন সুদ অর্জ্জন করুন

জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা

DA 63/2.7 (Beng)

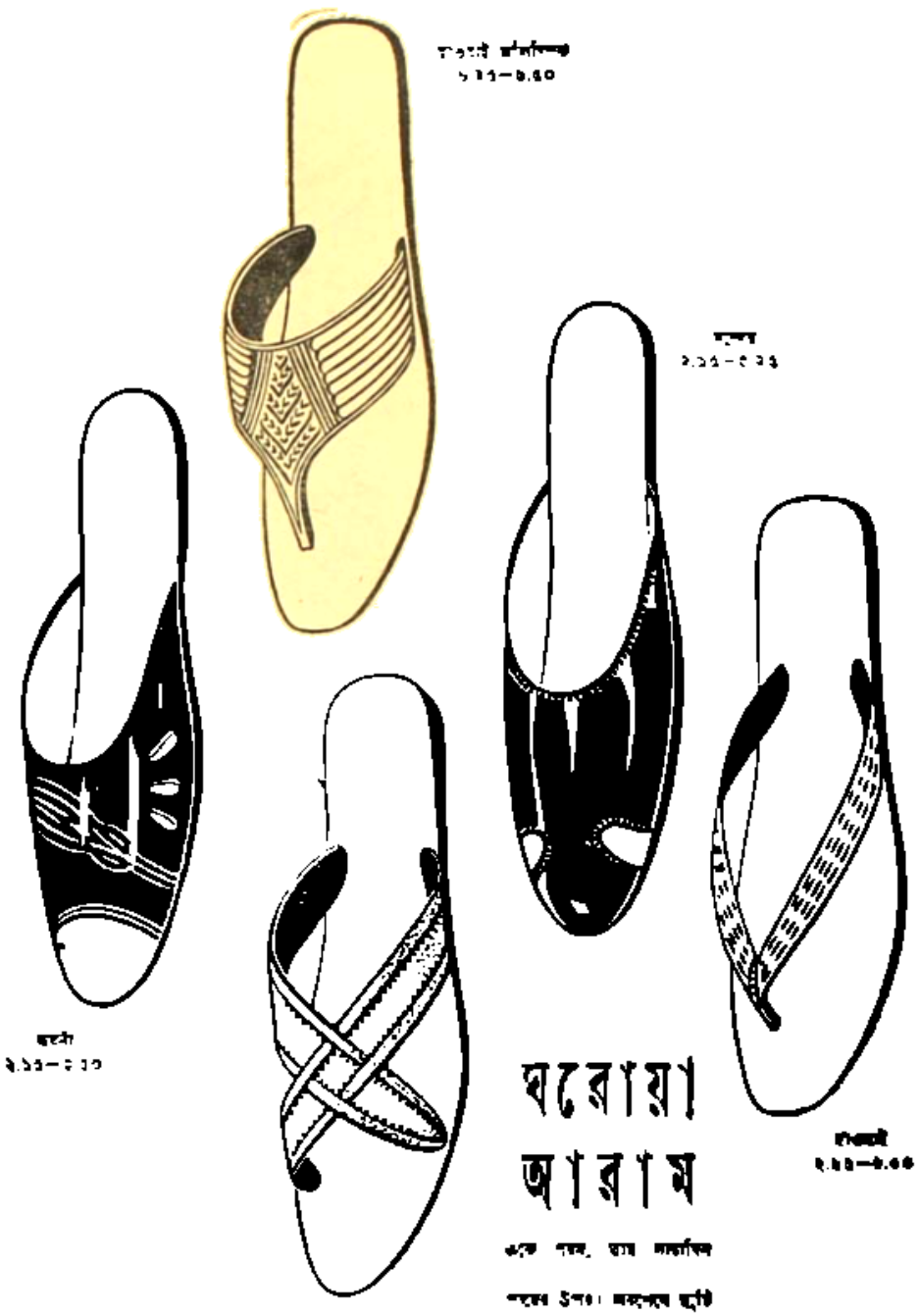

ঘরোয়া আরাম

এক পায়ে, তার সারাদিন পরের উপর। অবসরে ছুটি বদল নিলেন, অফিসের ড্রেস সন্ধ্যে সময় এক জোড়া হাল্কা চটি—পা ঘরের পরম হাওয়া খেলানো নরম, নিশ্চিন্তে চলাফেরা, একদম ঘরোয়া আরামের।

Bata

স্বপনের মোহজাল রচে

হিমকল্যাণ

আয়ুর্বেদীয় হিমসিদ্ধ সুরভিত কেশতৈল।

পামিকোকো

শুদ্ধ সুরভিত নারিকেল তৈল।

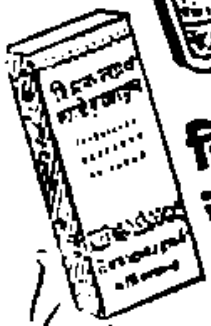

হিমকল্যাণ ক্যাস্টর অয়েল

বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিশোধিত ও সুগন্ধিত কেশতৈল।

ভৃঙ্গামলা

ভৃঙ্গরাজ ও আমলা সহযোগে প্রস্তুত মহোপকারী কেশতৈল।

যোডনগন্ধা

বহুগন্ধ সুরভি নির্য্যাস।

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস্ লিঃ
কলিকাতা-৪

নিত্য ব্যবহারে সার্থকতায় ভেটিটি অপরিহার্য

UPCO

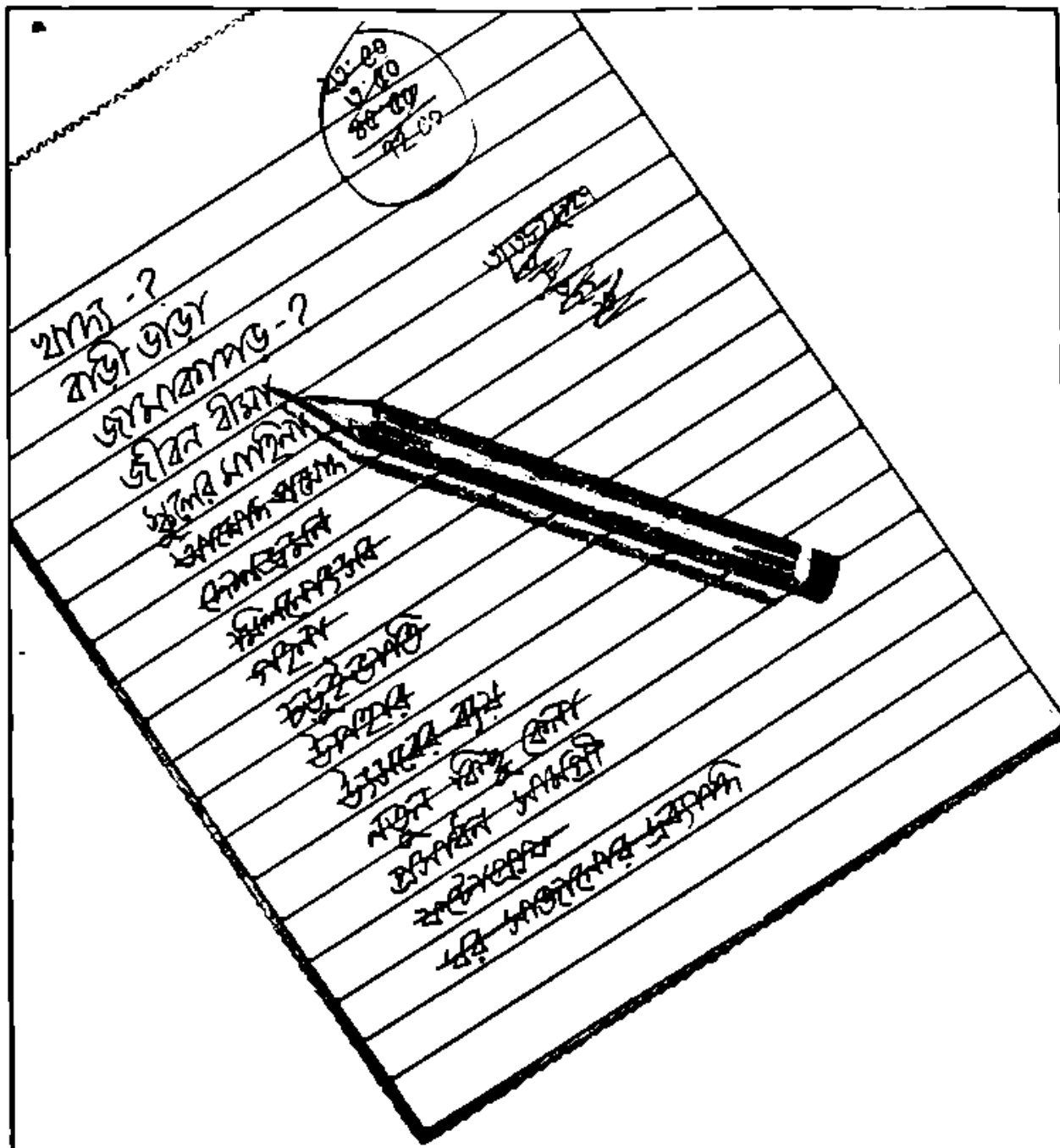

আপনি কি আপনার ব্যয়ের কথাটা দ্বিতীয়বার ভেবেছেন? বাড়ী ভাড়া, জীবন বীমা বা স্কুলের মাইনার মতো অপরিহার্য বিষয়ে ব্যয় সংকোচ করা সম্ভব নয়, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে আপনি যথেষ্ট ব্যয় সংকোচ করতে পারেন। আপনার ব্যয়ের একটি তালিকা প্রস্তুত করে আপনি নিজেই দেখুন।

জীবন বীমার কোন বিকল্প নেই

ASP/LIC E-3 BENG

সূচীপত্র

বিংশ শতাব্দী

লেখক	
সম্পাদকীয়	আমাদের কথা
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়	গাঙ্গেয় (ভ্রমণ)
সনানন্দ চট্টোপাধ্যায়	এ তার নিয়তি (গল্প
হরিপ্রসন্ন চক্রবর্তী	নিশি বিহঙ্গ (উপন্যাস)
অমলেন্দু ঘোষ	তারকনাথ গুপ্ত প্রণীত 'সুহাসিনী' (সংক্ষেপীকরণ)
অমল হালদার	খরদের কাগজ ও ফ্লাট স্নীট (বিশ্ব-সাহিত্য)
মৃণ্ময় মাইতি	নতুন জনপদ (উপন্যাসে)
সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	সেই অচেনা মানুষটি (উপন্যাস)
জীবনময় দত্ত	বুমেরাং (গল্প)
	সাহিত্যে সাম্প্রতিকতা (প্রবন্ধ)
	রংবদল (গল্প)
	বাদশা বেগমের দেশে (ভ্রমণ)
	ছবির প্রতিচ্ছবি (ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা)
	বিদেশী কবিতা গুচ্ছ

অঙ্গসজ্জা
নীতিশ মুখোপাধ্যায়

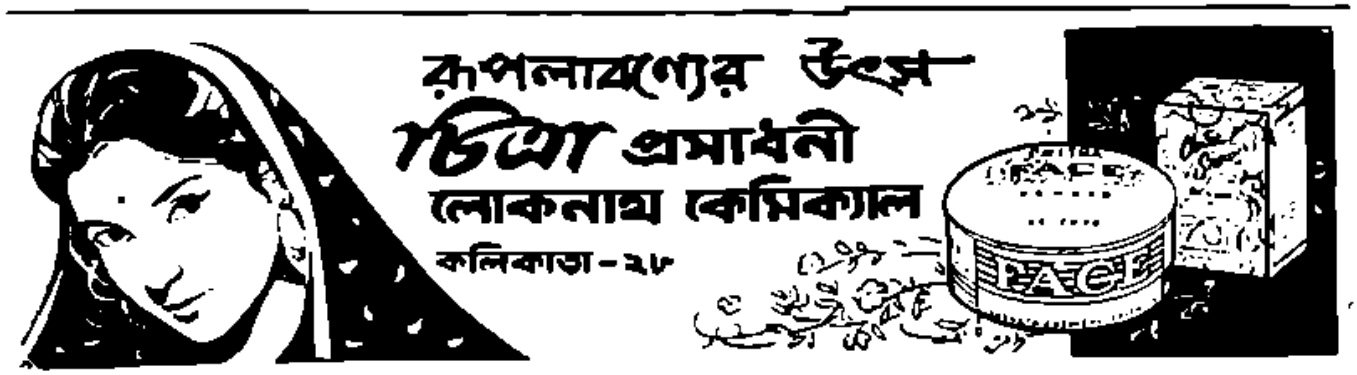

বিংশ শতাব্দী গ্রাহকদের জন্য

একটি জরুরী ঘোষণা

প্রতি সংখ্যা 'বিংশ শতাব্দী'র মূল্য ৭৯ নয়া পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা **নয় টাকা (সডাক)** ষান্মাসিক **সাড়ে চার টাকা (সডাক)**। প্রতি সংখ্যা 'বিংশ শতাব্দী'র আনুমানিক পৃষ্ঠা সংখ্যা একশ আঠাশ। এছাড়া শারদীয় সংখ্যা ও অন্যান্য বিশেষ সংখ্যাগুলি আয়তন যথেষ্ট বর্ধিত হয়ে থাকে। শুধু আয়তনেই নয়, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, চিত্র সর্বদিকেই এই পত্রিকার মান যথেষ্ট উন্নত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া পাঠক ও গ্রাহকবর্গের সুবিধার জন্য আমরা একটা বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। বিংশ শতাব্দীর যাঁরা **বার্ষিক গ্রাহক** কেবল তাঁরাই **অতিরিক্ত মূল্য ছাড়া শারদীয় সংখ্যা সমেত** অন্যান্য বিশেষ সংখ্যাগুলি পাবার অধিকারী। আমরা যে নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করছি সেই অনুসারে **আগামী মহালয়ার মধ্যে যাঁরা বিংশ শতাব্দীর গ্রাহক হবার জন্য মাত্র পাঁচ টাকা পাঠাবেন তাঁদের ষান্মাসিক গ্রাহক হিসাবে গণ্য করা হবে** এবং কোন অতিরিক্ত মূল্য ছাড়া শারদীয় সংখ্যা সমেত ছয় মাসের পত্রিকা পাঠান হবে। শারদীয় সংখ্যার রেজেস্ট্রি খরচ এর মধ্যে ধরা হয়নি। **শারদীয় সংখ্যা যাঁরা ডাকে নেবেন শারদীয় সংখ্যার রেজিষ্ট্রী খরচ ৫৫ নঃ পঃ এই সঙ্গে তাঁদের পাঠাতে হবে।** যাঁরা শারদীয় সংখ্যা **হাতে নেবেন তাঁরা নয় টাকা বা পাঁচ টাকা পাঠাবেন।**

কেবল মহালয়ার মধ্যে যাঁরা গ্রাহক হবেন তাঁদেরই এই সুবিধা দেওয়া হবে। কারণ ষান্মাসিক গ্রাহকরা বর্ধিত মূল্য ছাড়া শারদীয় সংখ্যা পাবার অধিকারী নন। মহালয়ার মধ্যে যাঁরা গ্রাহক হবেন তাঁরা পাঁচটি সাধারণ সংখ্যা, যার দাম ৩'৯৫ নয়া পয়সা এবং **প্রায় পাঁচ শত পৃষ্ঠার শারদীয়** সংখ্যার মূল্য ৩'৭৫ নয়া পয়সা—একত্রে ৭'৭০ নয়া পয়সার পরিবর্তে **পাঁচ টাকায় পাবেন।** রেজেস্ট্রিযোগে শারদীয়া সংখ্যা পেতে হলে একত্রে **পাঁচ টাকা ৫৫ নঃ পঃ** পাঠাতে হবে। **যাঁরা বার্ষিক গ্রাহক হবেন তাঁরা ৯ টাকা এবং রেজিষ্ট্রী খরচ ৫৫ নঃ পঃ পাঠাবেন।**

আষাঢ় মাসে 'বিংশ শতাব্দী'র বর্ষ সুরু। ঐ সময় থেকে গ্রাহক হওয়া সুবিধাজনক। কিন্তু গ্রাহকেরা বছরের যে কোন সময় থেকে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হতে পারেন। মণি অর্ডার, চেক বা ক্রশ পোস্টাল অর্ডারে চাঁদা পাঠাতে পারেন। চাঁদা পাঠানোর সময় পরিষ্কার হরফে নাম ও ঠিকানা এবং কোন মাস থেকে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হতে চান তার স্পষ্ট উল্লেখ থাকা দরকার।

॥ অবিলম্বে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হোন ॥

নিবেদক—
প্রচার সচিব।

টাকা পাঠাবার ঠিকানা :—
বিংশ শতাব্দী
২০, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫
ফোন—৫৫-৪৪২৫

'বিংশ শতাব্দী'র গ্রাহক হইবার আবেদন পত্র

কর্মাধ্যক্ষ মহাশয়,

আমাকে.....মাস হইতে 'বিংশ শতাব্দী'র বার্ষিক/ষাণ্মাসিক গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইয়া সত্বর কার্ড পাঠাইয়া দিবেন। আমি এই সঙ্গে নয় টাকা/পাঁচ টাকা ক্রস পোস্টাল অর্ডারে পাঠাইতেছি। পারদর্শীর সংখ্যা রেজেস্ট্রি করিয়া পাঠাইবার জন্য অতিরিক্ত পঞ্চান্ন নয়া পয়সা পাঠাইলাম।

নাম.....

ঠিকানা.....

যাঁহারা মনিঅর্ডারে টাকা পাঠাবেন তাঁহারা উপরোক্ত মর্মে কুপনে নাম ঠিকানা ও কোন মাস হইতে সংখ্যা হইতে চান তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিবেন। যাঁহারা পারদর্শীর সংখ্যা হাতে লইবেন তাঁহাদের পঞ্চান্ন নয়া পয়সা রেজেস্ট্রি খরচ পাঠাইবার প্রয়োজন নাই, কুপনে বা উপরের ফর্মে "পত্রিকা হাতে যাইবে" এই কথাটি লিখিয়া দিবেন।

যাঁহারা কেবল পারদর্শীর সংখ্যা লইবেন তাঁহারা রেজেস্ট্রি খরচ সমেত চার টাকা চল্লিশ নয়া পয়সা পাঠাইবেন। পাকিস্তানের ক্রেতারা নিউজ কর্পার, কে. পি. দে রোড, চট্টগ্রাম এবং নূরুল হাসান ৩০, হৃষিকেশ দাস রোড, ঢাকা—১। এই ঠিকানায় অর্ডার জানাইবেন।

'বিংশ শতাব্দী'র এজেন্ট শ্রেণীভুক্ত হইবার আবেদন পত্র

কর্মাধ্যক্ষ মহাশয়,

পারদর্শীর সংখ্যা 'বিংশ শতাব্দী'র প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমাকে.....কপি ভি. পি. পি./ রেজেস্ট্রি রেল যোগে পাঠাইয়া দিবেন।

আমি এই সঙ্গে অগ্রিম .....টাকা পাঠালাম। অবশিষ্ট টাকা দিয়া ভি. পি. পি. ছাড় করাইয়া লইব। ভি. পি. পি. ফেরৎ আসিলে আমার জামানত বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে। আমার অর্ডার গ্রহণ করিয়া পাকা রসিদ পাঠাইয়া দিন।

নাম স্বাক্ষর

ঠিকানা.....

তারিখ...

পারদর্শীর সংখ্যার প্রতিটির মূল্য তিন টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা। এজেন্সী কমিশন ২৫%। এজেন্টরা প্রতিটি পারদর্শীর সংখ্যা দুই টাকা ৮১ নয়া পয়সায় পাইবেন। পাঁচ কপির কম এজেন্সী দেওয়া হইবে না। পত্রিকা এজেন্টদের নির্দেশমত ভি. পি. পি/রেজেস্ট্রি বা রেল যোগে যাইবে। ডাক খরচ সম্পূর্ণ আমাদের।

পত্রিকা প্রকাশের পূর্বে সম্পূর্ণ মূল্য অগ্রিম পাঠাইয়া রেজেস্ট্রি যোগে পত্রিকা লওয়াই সুবিধাজনক। কারণ ভি. পি. পি. অপেক্ষা রেজেস্ট্রি দ্রুত বিলি হয়। যাঁহারা ভি. পি. পি. তে বই লইবেন প্রতিটি বইয়ের জন্য অনূন্য পঁচিশ নয়া পয়সা না পাঠাইলে অর্ডার গ্রহণের নিশ্চয়তা নাই।

"সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"

বিংশ শতাব্দী

ভাদ্র
১৮৮৫
অষ্টম বর্ষ
৩য় সংখ্যা

আমাদের কথা

ভারতীয় পার্লামেণ্টের বর্তমান অধিবেশনে এক বিচিত্র বিতর্ক অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। সমাজতন্ত্রী নেতা ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া বলেন যে, স্বাধীনতার পনের বৎসর পরেও ভারতের শতকরা ষাট ভাগ নরনারীর দৈনিক আয় মাথা পিছু মাত্র তিন আনার অধিক নহে।

জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ক্ষিপ্ত হইয়া বলেন যে ঐ ষাট ভারতীয় জনগণের মাথা পিছু আয় তিন আনা নহে, পনের আনা। শ্রীনেহরুর উক্তির প্রতিবাদ করেন স্বয়ং কংগ্রেস দলের মন্ত্রী ও পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য গুলজারীলাল নন্দ। তিনি ঐ সংখ্যা সাড়ে সাত আনা বলিয়া ধার্য করেন।

বিতর্কটি উপভোগ্য যে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভারতীয় সংসদের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে এই বিতর্ক মন্দ জমিবার কথা নহে।

ইংরাজ আমলে ভারতীয় জনসাধারণের মাথা পিছু আয় ছিল দৈনিক দশ পয়সা। যে ক্ষেত্রে জীবনযাত্রার ব্যয় অন্তত পক্ষে পাঁচগুণ বাড়িয়া গিয়াছে সে ক্ষেত্রে মাথা পিছু পনের আনা আয়ের জন্য পণ্ডিত'রা অবশ্যই গর্ববোধ করিতে পারেন। লজ্জার মাথা খাইয়া গুলজারীলাল নন্দকে স্বীকার করিতে হইয়াছে জনসাধারণের দৈনিক আয় পণ্ডিত নেহরু প্রদত্ত সংখ্যার ঠিক অর্ধ। অর্থাৎ পণ্ডিতজী মিথ্যাবাদী নহেন, অর্ধ-সত্য বলিয়াছেন।

আমরা আশ্চর্য হইয়া ভাবিতেছি ভারতের দরিদ্রতম জনসাধারণকে পণ্ডিত নেহরু কি শুধু হিসাবের কারচুপির সাহায্যেই ধনী বানাইয়া ছাড়িবেন।

পরিকল্পনার পর পরিকল্পনায় দেশ সরগরম, কিন্তু জনসাধারণের নাভিশ্বাসও বহিতেছে কিনা সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ডাঃ লোহিয়া আমাদের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুখচরা থানা মেটেবুরুজের আর পারেই কোম্পানীর বাগান বা ইণ্ডিয়ান বোটানিক্যাল গার্ডেন, ঐখানে ছিল মাগুরা কেল্লা। এপারে মেটেবুরুজ আর ওপারে মাগুরা দুর্গের সংযোগ ছিল গঙ্গাবক্ষের এপার ওপার জোড়া লৌহশৃঙ্খলে। ফর্ গ্রামাদ (Arinadh) দস্যুদের গুপ্ত আক্রমণ রোধ করার জন্য গঙ্গার বুকে প্রলম্বিত ছিল লোহার শেকল। অনেকের মতে এই দু'কূল জোড়া কেল্লা দুটি পঞ্চদশ শতকের বাংলার স্বাধীন সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের রক্ষিবাহিনী ছিল। কোম্পানীও পরে তাকে অনুসরণ করে তারই পন্থা অবলম্বন করেন।

গার্ডেনরীচ পেরিয়ে রাজগঞ্জ, মুন্সি, বজবজ, তারপর আচিপুরে কোম্পানীর আমলের প্রাচীন প্রবাদী চীনে টং আচুর সমাধি পেরিয়ে উলুবেড়ের পর ওপারে কলতা। সেই যেখানে নবাব সিরাজের তাড়া খেয়ে পলাতক ইংরেজ আশ্রয় নিয়েছিল, শক্তি সংগ্রহ করে কোলকাতা পুনরুদ্ধার করেছিল, আচার্য জগদীশচন্দ্রের লাম্রিধান্য 'মায়াপুরী' বাগান ও গবেষণা গৃহ আজো দাঁড়িয়ে আছে গঙ্গার ওপর, তাকে ছাড়িয়ে সেই কলতা দুর্গের ভগ্না ছিরে বয়ে চলে গঙ্গা, বেয়ে যাই আমরা। তারপর দামোদর, হুগলীনারায়ণ—দিকহারা মোহনা। অপার জলের দোলায় দোলায় এগিয়ে চলে আমাদের পথ, আস্তে আস্তে পেরিয়ে যায় একের পর এক নদীর ভয়াবহ চর—কোলকাতার মৃত্যু বিভীষিকা। এই তো সেদিন কলতার মুখে দামোদরের চড়ায় বিদেশী এক জলপাগরের এক বোঝা মাটি কাটা জাহাজ এখানে 'ঠিকাদারী করতে এসে চারশো একটিকে গঙ্গার তোড়ার মাতন ধারা উল্লাসে, দেশী বিদেশী নাবিক খালাসী সহ টুপ করে ডুব দিলো একটি। এ আন্তর্জাতিক জলপথকে খোলা রাখতে, কোলকাতার বন্দরকে চালু রাখতে এমন বিদেশী আত্মদান এই প্রথম নয়। খৃষ্টীয় ১৬৯৪ সালেও এমন এক ভয়াবহ দুর্ঘটনায় বিদেশী বাণিজ্যতরীর এমন এক আত্মবলি ঘটেছিল এখানে। রয়াল জেমস্ যারে জাহাজ হুগলীনারায়ণের মোহনার বুকেরাপট্টীর চড়াতে ধাক্কা লেগে ধ্বংস হল। সেই সেদিন থেকে বুকেরাপট্টির নাম জেমস্মারের চর হয়ে এ পথের নাবিক মনে সন্ত্রাস জাগায় আজও।

এবার এ পথ বামপন্থী চলো। পূবে মুখে মোড় নিয়ে হুগলীনারায়ণের মুখ পেরিয়ে হুগলী পয়েন্টের সীমা ছাড়িয়ে এগিয়ে চলে গঙ্গা। কোম্পানির আমলে, যার মনে হীরক দ্যুতির আশা জাগিয়ে হীরের পরশ পেয়েছিল

ডায়মণ্ডহারবার। কলকাতা পত্তনের পর ইংরাজ তাই একদিন পরিত্যক্ত চিংড়িখালির সড়ককে অবলম্বন করে চাঁদপুরকে ডায়মণ্ডহারবার করে। কোলকাতার বন্দরের প্রবেশদ্বার এটি। স্থান সংকুলানের নির্দেশ না আসা পর্যন্ত অপেক্ষারত থাকে জাহাজগুলি এখানকারই সীমান্ত ছোঁয়া জলের মাঝে। কোলকাতাবাসী অনেকের মনে সাগরের প্রথম পরশ জাগায় ডায়মণ্ডহারবার। জালে জালে ঘেরা জল, পালে পালে ছাওয়া আকাশ, মাঝে মাঝে ভরা গঙ্গায়, মাছরাঙা নৌকার আলগলি পেরিয়ে এগিয়ে চলে পথ, পশ্চিম থেকে দক্ষিণ ঘুরে, চেউয়ে চেউয়ে, দোলায় দোলায় এগিয়ে চলে ডিঙা। ঝুলপি পেরিয়ে মনিবিবির আকাশমুখী কবরের তলা দিয়ে, কয়রালির পথ বেয়ে।

এই ডায়মণ্ডহারবার থেকেই জগৎ-বিখ্যাত হয়েছে "দি রয়েল বেংগল টাইগার" এখানেরই এক বাড়িঘরের চূড়ায় বসে একদিন এক ইংরাজী 'প্রিন্স অব ওয়েলস' হঠাৎ শিকার করে বসলেন সুন্দরবনের এক ভয়াল ভয়ংকর কেঁদো বাঘ। তার ভয়ানক সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে আর হলুদ বরণ দেহে মিশকালোর ডোরার বৈচিত্র দেখে এবং খোদ রাজবংশীর হাতে খুন হয়ে বেংগল টাইগার 'রয়েল' হল।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার এদব অঞ্চল যে একদিন ঘন বসতি পূর্ণ এলাকা ছিলো তার সাক্ষী ছড়িয়ে আছে আশপাশের প্রত্যক্ষ বংশাবশেষ আর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মাঝে। পাল দেবদের তাম্রশাসন, আর শিলাফলকে লেখা ব্যাঘ্রভটী মণ্ডলকে আজকে অনেকে মনে করেন ব্যাঘ্র অধ্যুষিত সমুদ্রতট অঞ্চল বা সুন্দরবনের এই সব আবাদী এলাকা। ডোমন পালের বাড়ি মণ্ডল ও বাড়ি বিষয়ের স্থান নির্দেশও হয়েছে এখানে। ডায়মণ্ডহারবারের আশেপাশে ষোল মাইল দক্ষিণপূর্বে মদন গাঁয়ে জয়নাগের তাম্র শাসন (৭ম খৃঃ) ঐ দিকেই আরো প্রায় কুড়ি মাইল ঘুরে বারুইপুর স্টেশনের কাছে গোবিন্দপুর গ্রামে আবিষ্কৃত লক্ষ্মণসেনের তাম্র পট্টলী (১২ খৃঃ) থেকে জানা গেছে তাঁর রাজত্বের দ্বিতীয় সংবতে বাৎস্য-গোত্রের সামবেদী ব্রাহ্মণ উপাধ্যায় শ্রীব্যাদদেব শর্মাকে 'বিড্ডার শাসন' গ্রাম দান করেছেন, সেটি শ্রীবর্ধমান ভুক্তির অন্তঃপাতী পশ্চিমখাটিকায় বেতড় চতুরঙ্ক বা আজকের হাওড়ার বেতড়ে অবস্থিত ছিল। তাছাড়া রাক্ষস খালী দ্বীপে ডোমরপালের পট্টলী ও লিপিযুক্ত বেশ কিছু মাটির সীলমোহর আর বাড়ি অঞ্চলে পাওয়া পাথরের মূর্তি যেমন ভবনগর থানার কাশীপুর গাঁয়ের দুর্গা ষোড়ালের বিষ্ণুমূর্তি (১১-১২শ খৃঃ), মাহী নগরের শিব ও বিষ্ণুমূর্তি, লক্ষ্মীকান্তপুর মধুরাপুরের কাছে ভটার দেউল, (১১৬ নং লাট) অল্পে অল্পে জীর্ণতা বহন করে সহকালকে পরিহাস করছে পর্যটন ব্যবসায় সম্ভবনাকে অনব্যবহারের জন্য এমন প্রাচীন রেখ দেউল কলকাতার আশ পাশে বা দক্ষিণে আর কোথাও নেই। পোড়া ইটের তৈরী ৫০।৬০ হাত উচু এ মন্দির অনেকের অনুমানে বৌদ্ধ চৈত্য বা শিবমন্দির। এমন দেউল গোটা বাংলায় গুটি কয়েকই আছে. বর্ধমানের বরাকরের বৈগুনিয়া, দেউলিয়া বা দাত দেউলিয়ার মন্দির। বাঁকুড়ার বাহুলাড়া গ্রামে সিদ্ধেশ্বর. দোহার গ্রামের বাড়েশ্বর ও মল্লেশ্বর মন্দির, পুরুলিয়ার ভরপুরের কাছে বড়াম বা দেউল ঘাটায়—তেলকুপিতে ড্যামের জলে ডুবে যাওয়া দেউল গুলি, সাকরিড়ড্যার মন্দির। তাছাড়া কংসাবতী প্রকল্পে নিমজ্জনোন্মুখ দেউলগুলি। রেখ বা শিখর দেউলে গর্ভগৃহের ছাদ ক্রম বক্র রেখায় শিখর রূপে নিচে উর্ধ্বে উঠে আমলক ও কলসে শেষ হয়। এই ভটার দেউল ঘিরেই ছড়িয়ে আছে তার প্রাচীনত্বের ইতিহাস। ১২৭ ও ১২৮ নং লাটে রয়েছে কাল-বিধ্বস্ত ভরতরাজের মন্দির, ভিত্তিকির মন্দির ভরতগড়, হাতিয়া গড় প্রভৃতি। বৌদ্ধযুগে এখানে একটি প্রসিদ্ধ বিহার ছিল বলে অনেকে অনুমান করেন। এই 'হাতোঘরে'ই অম্বুলিঙ্গ শিব পূজা করেন ধনপতি সদাগর। কবি কঙ্কণ তাঁর চণ্ডিতে একথা বলেছেন আজকের বিখ্যাত বেড়াচাঁপা চন্দ্রকেতুর গড়ের রাজা চন্দ্রকেতুর কাছে পরাজিত হয়ে গোড়াই গাঙ্গী এখানের এই হাতিয়া গড়ে এসেই ঠাঁই গাড়েন। হাতিয়া গড়ে তখন রাজা মহীদানন্দের রাজত্ব। মহাবীর দুই রাজ পুত্র অকানন্দ আর বকানন্দের সঙ্গে যুদ্ধ বাধল গোড়াই গাঙ্গীর। যুদ্ধে বকানন্দ মারা গেলেও গাঙ্গীকে তিনি মরণাঘাত হেনে গেলেন। আঘাতের স্থানে পান লাগিয়ে ওষুধ দেবার অছিলায় পাশ খুঁজতে খুঁজতে

চলেন পাড়ী।

কালিঘাটে পাওয়া পুপ্ত যুগের মুদ্রা এবং ডায়মণ্ডহারবার কাকদ্বীপের রাজপথে কয়েকটি, কাঁটাবেনিয়া দায়োদরপুর গ্রাম অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা পাথুরে দেবদেবীর মূর্তি চৌকাট স্তম্ভ প্রভৃতির মাঝেই ফের টানছে পাল ও সেন রাজত্বের সন্ধান। এখানে প্রায় সব মূর্তিই বাসুদেব, বিষ্ণু, গণেশ। কাঁটাবেনিয়াতে চতুর্ভুজ মূর্তিও আছে একটি পাড়ী এখানকার জনবহুল প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন। সম্ভবত

১০ম শতাব্দী থেকেই অঞ্চল বিশেষ বসতি হতে আরম্ভ করে কৃষিতে বৈদেশিক অথবা রাজনৈতিক কারণে। জনবহুল স্থানের নাম রাজত্বটীতে পরিবর্তনের মধ্যেই হয় সম্ভাবনার ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে। সেই থেকে ক্রমে ক্রমে এ অঞ্চল গভীর থেকে গভীরতর জঙ্গলে পরিণত হয়ে বিস্মৃতির অবগুণ্ঠনে আবৃত হয়ে যায়। তারপর আর এক নব জাগ্রত বিজাতীয়

স্পর্শ পেয়ে এ বনবাদাড়ে আবার প্রাণের স্পন্দন জেগে উঠে। সুরু হোলো আবাদ, বাংলার সুলতান-নবাবী আমলে। সে আবাদ আবার ধ্বংস হোলো পর্তুগীজ হার্মাদের অত্যাচারে। গঙ্গা সাগরের এ মিলন মেলায়, পুরুষ ও প্রকৃতির এ লীলাক্ষেত্রে মানুষের মঙ্গল হয়তো তারা পছন্দ করেন না, তাই দুরন্ত মানুষ যতবারই ঘর বেঁধেছে সেখানে নির্মম প্রকৃতি ততবারই নির্দয়ভাবে তাকে ভাঙিয়েছে, উড়িয়েছে, ভাসিয়েছে, ডুবিয়েছে বার বার।

দক্ষিণে সোজা সাগর দ্বীপের পশ্চিম পাশ দিয়ে বয়ে গেছেন গঙ্গা, বহু গাঙের দ্বীপকে পুবে ফেলে কাকদ্বীপের কোল দিয়ে বয়ে গেছে তার আর এক শাখা। এই পথেই আজ আমাদের পাড়ি। ছোড়ামারা দ্বীপ ছাড়িয়ে কালী নগরের নীচে দিয়ে কাকদ্বীপের মুখ ছুঁয়ে নামখানার পথে চলে পাড়ি। কাকদ্বীপের বড় গাঙের সামনেই কাকদ্বীপ। তার পরেই গঙ্গা হয়েছেন সমুদ্র মুখে প্রবেশ। দোল খাইল বিস্তৃতি এর পারাপার, এ সাগর দ্বীপই হিন্দুদের আর একটি পবিত্রতম তীর্থ। ভাগ্যবানের হয় কি পাউডিতে যে সুরু, সাগরদ্বীপের এই শেষ কোথায় তার শেষ। হিমাদ্রির দুলালী মেয়ে—উত্তরাখণ্ডের বরফগলা জলে গা ডুবিয়ে গাঢ় ঘুমে অচেতন সে। গঙ্গোত্রীর হিম শীতল কুহেলিকার আড়ালে ঘুমন্ত গঙ্গার ঘুম সাগরের ডাকে হঠাৎ কখন ভেঙে গেল। পিতার সোহাগের শৈশব চমকে ভেঙে হিমালয়ের স্নেহধন্যা শীর্ণকায়া এ রোমাঞ্চিত মায়া, হঠাৎ জাগা যৌবনের আলোড়নে কখন যেন উচ্ছল হয়ে বাধার পর বাধা ঠেউয়ের পর ঠেউয়ে ভাসিয়ে দিয়ে উধেল উন্মাদনায় ছুটে এসে মিলিয়ে গেছে মিশিয়ে গেছে চিরইপ্সিতের সঙ্গে, এই গঙ্গা সাগর মোহনায়। এইখানে ধ্যানমগ্ন কপিল মুনির অভিশাপে ভস্মীভূত হয় সগর রাজার ষাট হাজার সন্তান পুত্র। সম্ভবত প্রকৃতির নির্জলা অভিশাপে তিল তিল মৃত্যুমুখী সগর রাজার প্রজাকুল, তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলেন

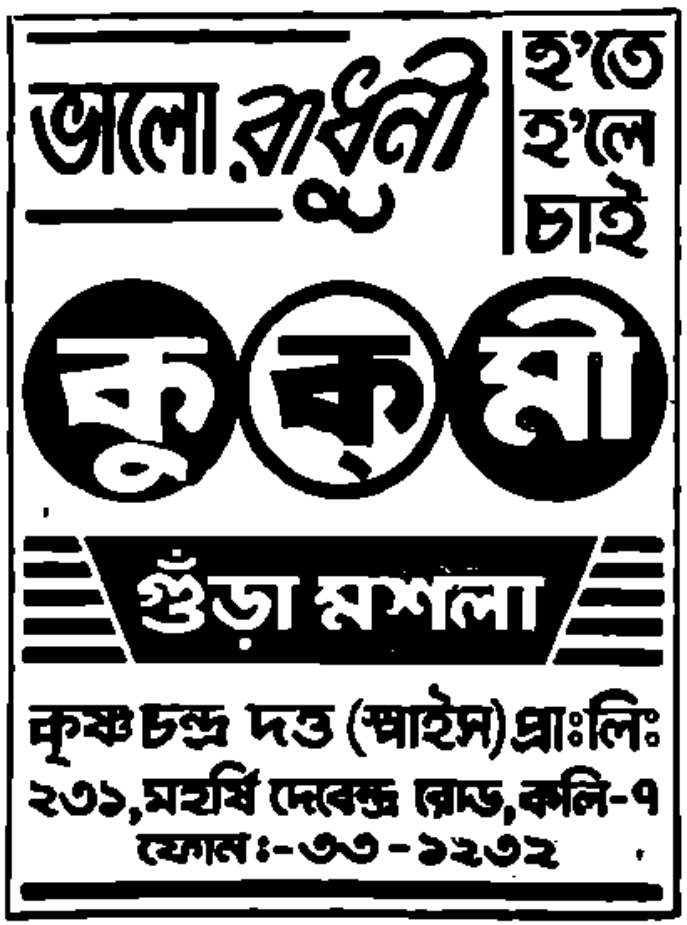

সগর বংশধর ভগীরথ। দেবী ভাগীরথীকে পৃথিবীতে আনলেন। হিমালয়ের বরফ গলা জলধারা পৃথিবীতে বয়ে যাবার পথ সুগম করলেন। ভাগীরথীর স্পর্শে মুক্ত হোলো সগর বংশ, ভারতবর্ষ সুফলা হোলো।

বাংলা দেশের নদনদীর গড়ন পেটন আকার প্রকার দেখে অনেকে ভাবেন এ বুঝি আর এক যুগের যন্ত্র-বিজ্ঞানের বিস্ময়। আজকের দায়োদর পরিকল্পনার খাল বিল অপ্রয়োজনে বন্যা ও প্রয়োজনের সময় শুকিয়ে থাকলেও সেদিনের এই সব বিস্ময়কর সেচ ব্যবস্থা আজও বিগলিত করুণার প্লাবিতা। তাই সেই মহৎ স্থপতি বিরাট প্রতিভা ভগীরথ, যিনি আসমুদ্র হিমাচল জোড়া গঙ্গার মতো একটি খাল কেটে দেশকে উর্বর করেছেন, সভ্যতাকে সার্থক করেছেন, বুঝি তার সেই মহৎ সৃষ্টিকে স্মরণ করে বছর বছর সাগর দ্বীপে সাগর মেলার অনুষ্ঠান চলে। পশ্চিমের এক সেচ বিশেষজ্ঞ স্যার উইলিয়ম উইল কক্স্ যিনি মিশরে নীল কারি সেচ-বিভাগে কর্মরত থেকে বিখ্যাত নীল নদের আসোয়ান বাঁধের পরিকল্পনা ও নির্মাণে সহযোগিতা করেন, এবং ১৯২৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে কলকাতা এসে আলোচনায়, এবং তাঁর এনসেন্ট রিগেশন অফ্ ইরিগেশন ইন বেঙ্গল বইয়ে এমনি এক সম্ভাবনার সূচনা করেছেন অনেকদিন আগেই। সারা ভারতের সব কোণ থেকে এসে জড়ো হয় ভারতের মুক্তি-প্রেমিক মানুষ। দুস্তর দুর্গম এ তীর্থ, তাই বুঝি এ আকর্ষণ ওদের। সর্বতীর্থ বার বার সাগর তীর্থ একবার।

সেকালে এখানে মানুষের বসবাস ছিলো এবং বার বার মানুষ চেষ্টা করেছিল এখানে আস্তানা গাড়বার। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পোতাশ্রয় এবং দুর্গ ছিলো এখানে। কিন্তু বারে বারে প্রলয়ে ঝড়ে জলোচ্ছ্বাসে ধ্বংস হয়েছে সে বসতি। গঙ্গাসাগরের সঙ্গম লীলায় মানুষের দৃষ্টিপাত বুঝি অসহ্য তাই নির্মম শাসনে, ক্ষমাহীন ধ্বংস। আশীর্বাদ মানুষকে ভাসিয়ে দিয়েছেন বারে বারে। খৃস্টীয় ১৬৮৮তে, ১৮৩৩এ আর ১৮৬৪তে।

কাকদ্বীপ কোলকাতার রসনায় লালা ঝরায়। বাটা পাসে, ট্যাংরা, ভাঙড়, চিংড়ি কত কত মাছ লরি লরি

ন্যাশনালের প্রকাশিত লোকবিজ্ঞানের বই

ইয়াকভ পেরেলম্যান

অঙ্কের খেলা

অঙ্কের নানা ধরনের বাঁধা, বুদ্ধির অঙ্ক, জ্যামিতি, ভূগোল, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি সাধারণ জ্ঞানের অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস শেখান হয়েছে খেলার মধ্য দিয়ে।

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত এল. লাণ্ডাউ ও সহলেখক ওয়াই রুমার

আপেক্ষিকতার তত্ত্ব

জটিল গণনার আশ্রয় না নিয়ে আপেক্ষিকতা তত্ত্বের মূল কথা অতি সহজ ও সরলভাবে বিশ্লেষিত। জার্মান অধ্যাপক সতোন বসুর ভূমিকা সম্বলিত। ১·৫০

। লোকবিজ্ঞানের অন্যান্য কয়েকটি বই।

অধ্যাপক এ. কাবানভ	**মানবদেহের গঠন ও ক্রিয়াকলাপ**	৭·০০
ইলিন	**শত সহস্র জিজ্ঞাসা**	২·২৫
ভিয়ের ওগানিয়েক	**সূর্যগ্রহণ**	১·২৫
লিয়াপুনভ :	**মহাবিশ্বের রহস্য**	৩·০০

। মস্কো থেকে প্রকাশিত।

ইয়াকভ পেরেলম্যান

জ্যোতির্বিদ্যার খোলখবর ২·০০

আলেকসান্দ্র ভলকভ

পৃথিবী ও আকাশ ৩·৫৩

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

১২ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

১৭২ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর-৪

বোম্বাই হয়ে দিনের পর দিন রাতের পর রাত পাড়ি দিচ্ছে কোলকাতার পথে। ক্যানিং ডায়েণ্ডহারবার ফলতার মতো কাকদ্বীপও কোলকাতাকে মাছ জোগায়। এমনকি বিদেশী মুদ্রাও সংগ্রহ করে দেশের হয়ে, এখানের পলদা, বাগদা চিংড়ি জগৎ বিখ্যাত। তাই রাজ্য সরকার কাকদ্বীপের পাশ ঘেঁষে ঠাণ্ডাঘর বানাবার মতলব ফেঁদেছেন বেশ কয়েক দিন আগে। তবে লালফিতের বাঁধন কেটে তার বাস্তবে রূপ নিতে এখন অনেক দেরী। চাঁটাপথের সাগর যাত্রীদের কাকদ্বীপ খুবই পরিচিত জায়গা। ভক্তির আবেগে সমুদ্রের বেলায় উত্তর ভারতের সেই পাহাড়িয়া প্রৌঢ় প্রৌঢ়া সাধু অসাধু, হাঁটতে হাঁটতে চলতে চলতে চটিতে চটিতে বিশ্রাম নিয়ে কিংবা আরাধ্য দেবতার আশীর্বাদে রেলকে ফাঁকি দিয়ে বিনা টিকিটে উথান পতনের ছন্দে এসে হাজির হয় একেবারে ডায়মণ্ড হারবার স্টেশনে। তারপর হেঁটে হেঁটে পঁচিশ ত্রিশ মাইল পথ পেরিয়ে আসে কাকদ্বীপে। এখান থেকে শেষ পাড়ি সাগর। ঐতো ঐ বড় গাঙের কোণে ছোটনদীর মোহনার নালার পুল পেরিয়ে ডাক বাংলোর নীচে কাকদ্বীপের পার ঘাট। স্থলচর মানুষ এত করে জল ডাঙাকে ফাঁকি দিয়ে এবার আর পার নেই। ওপারে যেতে গেলে, সাগরে পৌঁছতে হলে, তীর্থস্নানের অশেষ পুণ্য সঞ্চয় করতে হলে এখানে জলে নাবতেই হবে।

এপার কাকদ্বীপ ওপার সাগর, মাঝে দিক হারানো বড় গাঙের অকূল পাথার। তবু এপার ওপার। পার ঘাটে দাঁড়িয়ে ছোট নদীর ওপারের দ্বীপগুলো ছাড়িয়ে নজর মেললেই কিংবা বিচক্ষণ মাঝির নির্দেশে দিগন্তে চোখ মেললে পরিষ্কার নজরে পড়ে সাগর দ্বীপের সীমানা। এইটুকু জল না ডিঙোলেই নয়, এ জলটুকুর অকূল পাথারে ডিঙা হয় উথালপাথাল। উত্তরে হাওয়ায় স্বভাবশান্ত গাঙের জলে নৌকো নামাতেই থৈ থৈ জলে হিলহিলে ঢেউ মন কাঁপিয়ে, বুক কাঁপিয়ে

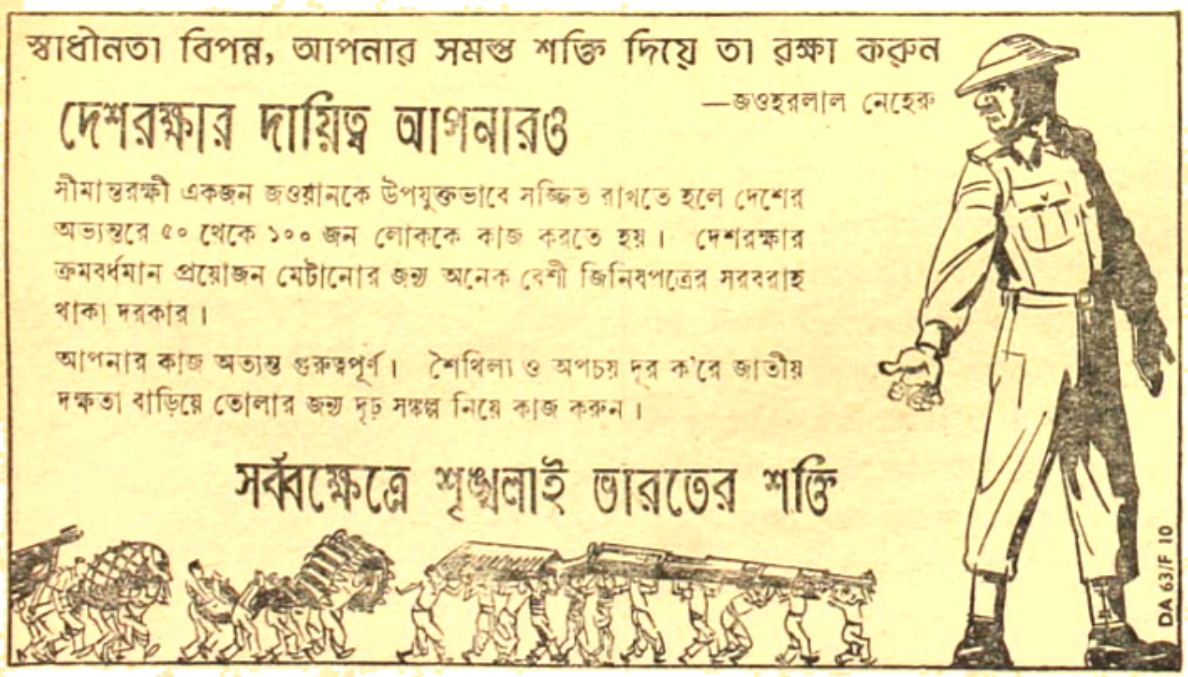

দোদোলায় দুলুদুলু। ফুরফুরে হাওয়া গায়ে অফিস গাঙের উদার তরঙ্গের সাক্ষ্য খুব কম লোকেই তাদের ফিরে প্রকাশ করবার সুযোগ পায়। তবু বছর বছর লোক আসে, লোক যায় ধর্মের টানে, ভক্তির আবেগে প্রকৃতির মোহে সৌন্দর্য সম্ভোগে। কাকদ্বীপ সমুদ্র থেকে সমুদ্রতর হয় এ জনারণ্য সঙ্গ সৌভাগ্যে। তাছাড়া ঐ ওপারে। পনেরো কুড়ি মাইল গাং পেরিয়ে পুবে পার থেকে পশ্চিমের ওপারে বেদিনীপুর। ওখানেই আবার নতুন করে তৈরি হচ্ছে হারিয়ে যাওয়া তাম্রলিপ্ত। জগৎ খ্যাত সৌদাগরের এ বিস্মৃত বন্দর নতুন প্রকল্পে হলদিয়ার নামে রূপ নিচ্ছে, অবশ্য শুধু নামেই, যেমন নাকি আর পাঁচটা প্রাচীন প্রতীক ভারত আবার নতুন করে কাজে লাগিয়েছে নামেই। ওখানে গেঁওখালী, তেরপখিয়া হলদি ও আসে পাশের নদীনালার দুর্গমতার যাতায়াতের অসুবিধায় সংযোগহীন অঞ্চল। তাকে বন্দর যোগায় কাকদ্বীপ! তাই আজকের কাকদ্বীপ সুন্দরবনের ভয়াল ভয়ঙ্কর পরিবেশ কাটিয়ে সচ্ছলে হচ্ছে, নতুন পাঠ নিচ্ছে কোলকাতার বাবুদের কাছে। ছুটিতে ছুটিতে, রবিবারে রবিবারে পাড়িতে পাড়িতে, লরীতে লরীতে দলে দলে আসেন তাঁরা। ডায়মণ্ড হারবার পুরানো হয়ে গেছে, তাই আরো দূরে, আরো ইন্টিরিয়রে ছুটে সুন্দরবন করে এখান থেকেই ফিরে যান কোলকাতায়। তারপর ক্লাবে ক্লাবে, টেবিলে টেবিলে, পাতায় পাতায়, ব্লকে ব্লকে বাঘ মারার গল্প চলে। পথ এগিয়ে যায়—নামখানার পথ।

গাঙ্গেয় দ্বীপের দশবারো মাইল দক্ষিণ-পুবে সাগরের কোলে নায়াবলতাল দ্বীপ। জলপথে যেতে হলে যাত্রা থানা থেকে নৌকোয় পেরিয়ে যায় মাঝের গাংটুকু। নির্মিয়মান সেতুটি শেষ হলেই সরাসরি পথের যোগ হবে কলকাতা আর নায়াবলতালার। বালি বিছানো সাগর বৈকতের বনরাজি নীলা নারকেল কুঞ্জ কেবল বৈকতের পরশ নিয়ে শুধু আজকের পরিব্রাজকের মনোহারীই নয়, একদিন বাংলার ছোটলাট স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজারেরও মন হরণ করেছিল এ প্রকৃতি। এখানে বেড়াতে এসে তিনি মজে ছিলেন তাই তিনি চেষ্টা করে ছিলেন একে একটি স্বাস্থ্যনিবাসে পরিণত করতে। আশ পাশের বহু গ্রাম

সাম্যবাদ সম্বন্ধে নতুন পুস্তিকা

নিম্নলিখিত বইগুলি বাংলা, অসমীয়া এবং ওড়িয়া ভাষায় পাইবেন

১। কমিউনিজমের মর্মবাণী স্বাধীনতা
২। কমিউনিজম নিয়ে আসে সুখ—সমৃদ্ধ
৩। কমিউনিজমের মর্মবাণী ভ্রাতৃত্ব
৪। কমিউনিজমের মর্মবাণী সাম্য
৫। কমিউনিজমের মর্মবাণী শান্তি
৬। শ্রমের বিজয়কেতন কমিউনিজম

: যোগাযোগ করুন :

সোভিয়েত দেশ কার্যালয়

১১১, উড স্ট্রীট

কলিকাতা-১৬

ছেড়ে গেল, এ নির্মম নৈসর্গে তিনি রোপণ করে গেল বিদেশ থেকে সংগৃহীত নারকেল গাছ, তৈরী করেছিলেন মিশনারী কলের কিল, যার বাড়ি ডাকবাংলো-পথ ঘাট ডাক্তারখানা প্রভৃতি। অধিকাংশই আজ তার ধ্বংস হয়েছে, যেমন ধ্বংস হয়েছিল এখানে এর আগের সভ্যতা। ফ্রেজার সাহেবের রাস্তাঘাট তৈরী করতে গিয়ে সেই সব প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ও ইট খোলা প্রভৃতির হদিশ পাওয়া যায় এখানে। নারায়ণতলা ছোট লাটের কৃপায় ফ্রেজারগঞ্জ হোল। লাট-বেলাটের এত দয়াতেও, কার্পণ্যহীন এত অর্থ ব্যয়ে এবং কলকাতার সঙ্গে জলপথে ও কিছুটা স্থল পথে যাতায়াতের এত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সেদিন এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে ছিল উপযুক্ত বাসাবাসের অভাবে। যেমন নাকি আর এক নাবালী খেয়ালের ব্যর্থ পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে আর একবার দীর্ঘ পরিকল্পনাতে-সরাসরি যোগাযোগ ও উপযুক্ত বাসাবাসের অভাবে। নতুন প্রকল্পে ফ্রেজারগঞ্জ কলকাতার নৈকট হতে চলেছে, তার প্রচার শুরু হয়েছে কিন্তু পর্যটন ব্যবসায় অপরিহার্য পথ, ঘাট, আহার বাসস্থানের সুখ সুবিধা এখনও সুদূর পরাহত। এ সবের ব্যবস্থার আগেই আর এক প্রকল্পে ফ্রেজারগঞ্জ মেছোহাটা হতে চলেছে, গভীর জলে মৎস্যশিকার প্রচেষ্টার পরাভূত সরকার এখানে এবার চাষের ধরার চেষ্টা করতে চলেছেন। সে চাষের থেকে নাকি তেল বেরোবে আর তাই দিয়ে নাকি দেশে বিদেশি কড়লিভার অয়েলের দুর্ভিক্ষ মেটাবে। কাথির জুনপুট বা মহাদেশের এমন প্রচেষ্টার সফলতা হয়তো আমলাতন্ত্রকে লোভাতুর করে তুলেছে।

সভ্য মানুষের পেশ পরশ পাওয়া মুক্ত সমুদ্র লালিতা ফ্রেজারগঞ্জ, তারপর সমুদ্রের দক্ষিণ প্রান্ত। সামনে জল, পেছনে জল, দুপাশে জল। সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে ফেনের দোলায় দোলায় পুবে—আরো পুবে এগিয়ে গেছ ডিঙা উত্তর পার ঘেঁসে। ডাইনে মৃত্যু। পার হীন, ক্ষমা হীন নির্মম সমুদ্র, অসীম অনন্তের পরশ সেখানে। বাঁয়ে অতি ঘনিষ্ঠা ধরিত্রীর অফুরান এক ভরাল কোল—সেই প্রাচীন, অবাচীন নির্মম। বাঁয়ে আরো পুবে একের পর এক দ্বীপের পর দ্বীপ, মোহনার পর মোহনা—ব্যাকলেবরগঞ্জ ডালহাউসি গোনা, টেংরাখালি, ভরকাতা প্রভৃতি নদী—হোগলা, মাতলা, গোসাবা, গোপা, চাঁড়িয়া ভাঙা বা রায়মঙ্গল—এমন কত। এর যে কোনো নদী ধরে উজান ঠেলে উত্তরমুখে এগোলে সুন্দরবন। সুন্দর কিন্তু ভয়াল, অপরূপ, মৃত্যুশীতল। সমুদ্রের এই উত্তর পারে দক্ষিণের যত দ্বীপ, যত নদী, যত নালা এসে মিশেছে এখানে। গোটা বাংলাদেশের এই চব্বিশ পরগণা থেকে সেই বাখরগঞ্জ বা বরিশাল ছাড়িয়ে প্রায় সন্দীপ পর্যন্ত এ সবই ছিল সুন্দরবনের নিষ্ঠুর প্রকৃতি সুন্দরীর লীলাভূমি। অবাধ্য মানুষ বারে বারে প্রকৃতির নির্দেশ লঙ্ঘন করেছে। ভয়কে জয় করেছে সে। ক্ষুধায়। লোভে। প্রয়োজনে দুঃসাহসী হয়ে বারে বারে ছিনিয়ে নিয়েছে সুন্দরবনের অংশ। বনবাদাড়কে আবাদ করেছে, প্রকৃতিকে জয় করেছে। তাই বুঝি শুভ গৌরবে রিক্তা প্রকৃতি তার শেষ ঘাঁটিটুকু রক্ষায় এত ব্যাকুল, এত হিংস্র। তাই এর নদীর জলে কীমট বা হাঙর, খালের জলে কুমীর, ডাঙায় বাঘ, জমিতে শুলো, গাছে সাপ, জলে ঢেউ, আবহাওয়ায় তুফান, বন্যা ধ্বংস। এই রায়মঙ্গলের মোহনায় আরও প্রায় পনেরো মাইল দক্ষিণে পঞ্চাশ ষাট ফুট গভীর সমুদ্রতল যেখানে হঠাৎ দুহাজার ফুট গভীর হয়ে অতলতলের ফাঁদ পেতেছে। সেই ফাঁদে ঢেউয়ে, ঢেউয়ে, সংঘাতে সংঘাতে রচিত হয়েছে মৃত্যুকরাল ঘূর্ণিপাক। বুকি সাগরও শাসিত হয়েছে সেখানে। নদীতে বয়ে আনা পলির টান, মাটির কান্না অতলতলের এই সীমানায় ঘূর্ণপাক খেয়ে আবার ফিরে যায় সুন্দরবনের দ্বীপে দ্বীপে, চড়ায় চড়ায়। দুরন্ত সাগরের গ্রাস থেকে মাটি মায়ের প্রাণ জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে সুন্দরবনের নির্মম নিষ্ঠুর প্রকৃতি মানুষকে, সাগরকে মুহুর্মুহু সাবধান করে 'গৈরী' আওয়াজের বজ্রনির্ঘোষে—সাবধান, সাবধান।

[ক্রমশঃ

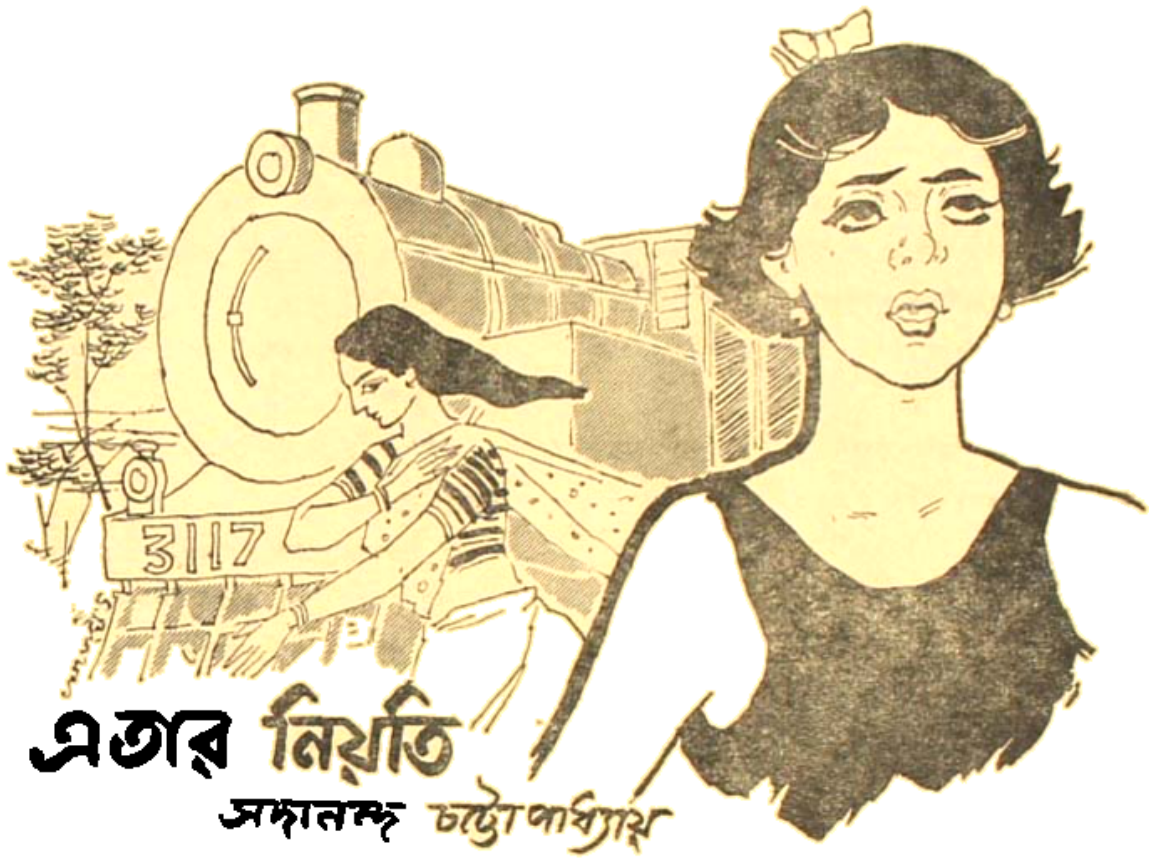

এতার নিয়তি

সন্ধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

"করুণা—"

ঘরে ঢুকেই নীরেণ শুনেছিল ব্যাপারটা। একি! এ যে তার স্বপ্নেরও আগোচর।

'…বল্ কেনো তুই অশুচি হলি।'

'শুনছো', করুণাই নীরেণকে ঠেলে তুলে দিল। কিন্তু নীরেণ কিই বা করতে পারে তার।

'তবু একবার যাওয়া দরকার। শেষ পর্যন্ত না বৌটাকে মেরে ফেলে।' তারপর অবশ্য দুজনেই তারা গিয়েছিল। ঘরের চারিদিকে সব কিছু এলোমেলো ছড়ান। সীমা নিস্পন্দ। মুখটাকে নীচু করে সে দাঁড়িয়েছিল। চোখে তার জল নেই। নেই মনে কোনো অনুশোচনা, বা কোনো অনুতাপ। যেন এক কঠিন ভাবলেশহীন মুখ। চঞ্চলের মুঠোর মধ্যে ধরা ওর চুলের গোছা। চঞ্চল গোছা ধরে জোরে জোরে টানছে আর হাঁপাচ্ছে আর থেকে থেকে বিকৃত গলায় প্রশ্ন করছে। 'বল্'…

কিন্তু তুমি কেন এ ভুল করতে গেলে করুণা। তুমি কি জানতে না যে এ পাপ। এ অন্যায়। এর কি জবাব আছে তোমার।

তোমার কি উচিৎ ছিল না এ প্রলোভনকে জয় করা। আজ তুমি একটা গোটা সংসারকে জ্বালিয়ে দিয়ে নিজে বিশ্বাসঘাতক হলে শেষে। কিন্তু কেন?

'…বল্ কালামুখি, বল।' চঞ্চলের সারা চোখে আগুন। সীমার অশুচি রেহটাকে যেন ও পুড়িয়ে ফেলতে পারলে তবেই স্বস্তি পায়।…

হয়তো তোমার ধারণা কিছু অন্য ছিল করুণা। যে কটি কথা তোমার ভেতরকার মনে গাঁথা হয়ে রয়েছে তারাই হয়তো তোমার এই ধারণাকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। কিন্তু এই ক্ষণিকের প্রলোভনে পড়ে তুমি নিজে তো নিঃস্ব হলেই আর অপরকেও রিক্ত করে তবে গেলে।

না-না আমাকে ছেড়ে দিন। ছেড়ে দিন আমাকে।'

'চঞ্চল বাবু! আপনি কি সত্যি সত্যিই পাগল হলেন নাকি। আসুন! আসুন তো এদিকে।'

'পাগল ! পাগল হওয়ার কি আর কিছু বাকী আছে আমার ।' চন্দনের বুকের হাহাকার দূর থেকে ওঠে ।

'আসুন !'—

'না না আপনি ছেড়ে দিন । আমাকে ছেড়ে দিন ।' চন্দন আর কিছু বলতে পারে না । নীরেনের জামার আস্তায় মুখ রেখে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে ।

এ তুমি কি করলে করুণা । তুমি না একদিন অগ্নি-সাক্ষী করে শপথ করেছিলে ? কিন্তু আজ তুমি নিজেই কি তার কোনো মূল্য রাখলে !

'...নীরেনবাবু—'

একটু সান্ত্বনার ছোঁয়া পেয়ে চন্দন হয়তো বাস্তব জগতে ফিরে এলো আবার ।

'নীরেনবাবু—'

চন্দন কিছুটা প্রকৃতিস্থ ফিরে পেল এবারে ।

'নীরেনবাবু—'

চন্দন কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল এতক্ষণে । নীরেনবাবু—'

'আপনিই বলুন এই ফুলটাকে নিয়ে আমি এখন কি করি ।'...

করুণা আর ভেবে কি হবে বল । এর আর অন্য কোনো প্রায়শ্চিত্ত নেই । ওই একটি মাত্র রাস্তা খোলা রয়েছে তোমার এখন ।

'...নীরেনবাবু এ্যাডজাস্ট করে নাও বললেই কি এ্যাডজাস্ট করে নেওয়া যায় ।'

'কেন নয় ! মনে করুন আপনি এখন একজনকে বিয়ে করেছেন যার আগে একবার বিয়ে হয়েছিল । পরে যে কোনো কারণে তার আগের সে বিয়ে নাকচ হয়ে গিয়েছিল । অথবা কোনো বিধবাকে ।'

'নীরেনবাবু—'

'শুনুন একজন শিক্ষিত ছেলে হয়ে কি আপনার কাছ থেকে এ উদারতাটুকু প্রত্যাশা করা যায় না ।'

'নীরেনবাবু—'

'ভুল কি আপনার স্ত্রীরই শুধু । আর যাকে আপনি ঘরে এনে উঠালেন ?'

'——'

'তবেই এই অবিশ্বাসের মূল্য আপনাকে কিছু দিতে হবে বৈকি ।'

'স্কাউণ্ড্রেল । জানেন ও আমার বন্ধু হলেও ওকে আমি নিজের ভায়ের চেয়েও বেশী ভালবাসতাম । জানেন ও আমাদের খেয়েছিল এতদিন ।'

'এ তারই প্রায়শ্চিত্ত

কি চমকে উঠলে যে বড়ো ! এতোবড়ো একটা ভুল করে বসলে অথচ তার কোনো প্রায়শ্চিত্ত করবে না । এও কি হয় । তুমি তো জানতেই সব : তবে ?

শুনে শুনে—

হ্যাঁ, আমি জানতাম । আমি জানতাম !—করুণা ফুঁপিয়ে ওঠে ।

*

"ক্ষমা—"

নীরেন তখন কাঁপছিল । 'না না এ ক্ষমা-র ও-জ-যো-গ-গ-ও কথা আর শেষ করতে পারল না । পাও আর সরিয়ে নিতে পারল না । তার আসেই চোখে নীরেনের অন্ধকার ঠেকল । বুক ও কেমন গুলিয়ে উঠল । তাই শেষদিকের কথাগুলো তার ওই ভাবে জড়িয়ে গেল । আর সঙ্গে সঙ্গেই সে তখন জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল ।

'বাবা' ঝুমা তাড়াতাড়ি ছুটে এলো । এই একটিই মাত্র কথা তার মুখ দিয়ে বের হলো । তা ছাড়া সব একেবারে চুপচাপ । যেন এক কঠিন নিস্তব্ধতায় ঘেরে রয়েছে সারা ঘর । আর ঝুমেশ ?

কোণে সেই ভাবেই মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল । যেন কোনো স্ট্যাচু সে । এতটুকু নড়ছে না, এতটুকু হেলছে না ? মুখ তুলেও একবার তাকিয়ে দেখছে না । অথচ করুণা উঠে দাঁড়িয়েছে । ভাবলেশহীন মুখ তার । কোথায় তার কি একটা জ্বালা । বুক তার আগাগোড়া জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে ।

'উঃ ভারুণ ভেন্টা । একটু জল ।'

'ও জলে কিছু হবে না । বিষ খেলে তবে ও ভেন্টা মিটবে ।'

করুণা স্থির চোখে ঝুমাকে দেখে । বড়ো পানানো, বড়ো চকচকে ওর চোখ । ঠিক সাপের মতো যেন জ্বলছে ।

যারা বাইরে ছিল তারা ততক্ষণে ভেতরে ঢুকে পড়েছে : কিন্তু আশ্চর্য কেউ বলছে না তবু তাদের

ভীড় না করে চলে যেতে। অথচ সীমার বেলাই কিন্তু করুণা বলেছিল।

না বলুক। তাতে করুণার আর কিইবা আসে যায়। অনুভূতির তো তার অনেক আগেই মৃত্যু হয়েছে। এখন তো সে সব কিছুরই বাইরে। সব কিছুরই! তবে আর তার এখন লজ্জা করার কি আছে। রুমা যা বলেছে ওই ঠিক। হ্যাঁ ওই তার একমাত্র পথ খোলা এখন। সে ওই পথেই এগিয়ে যাবে। ওই পথেই।

• • •

না, করুণার কোনো দোষ নেই। আমিই করুণাকে এই পথে নামিয়েছি। আমি, আমিই করুণার শেষ সর্বনাশ করলাম।

আমার মান সম্মান—না-না সে সব খুব বড়ো কথা হয়। তার চেয়ে বড়ো আমি ওর জীবনকে ব্যর্থ করে দিয়েছি। ওর দোষ কোথায়। কতটুকু ওর দোষ। দোষ তো সব আমারই। কিন্তু সে কথা এখন কে বুঝবে। কেই বা ওকে ক্ষমা করবে। না, ওর আর দাঁড়াবার জায়গা নেই। আমি, আমি দায়ী এর জন্য।

প্রথম প্রথম রুমাই জলখাবার নিয়ে এসে দিত। তারপর একদিন করুণা নিয়ে এলো।

আমি আড় চোখে চুরি করে দেখেছি এর আগে করুণাকে। সেদিন সামনা সামনি স্পষ্ট ভাবে দেখলাম। ও আমার দিকে তাকাল আমি ওর দিকে তাকালাম। কিন্তু মনের ভাব ওর কিছুই টের পেলাম না। শুধু হাতে বাড়িয়ে প্লেটটা নিলাম। এইভাবে এক একদিন নেওয়ার সময় আঙুলে আঙুলে ঠেকে যেত আমার। আমি ইচ্ছে করেই ঠেকাতাম। স্পর্শের ভেতর দিয়ে ওর মনের পারদাটা ঠিক কোথায় তা বোঝবার চেষ্টা করতাম। কখনও বা বলতাম বসুন! দাঁড়িয়ে কেন বসুন। করুণা বসত না। অল্প একটু হাসত। বল ত না খাই। উনুন খালি যাচ্ছে কাজ পড়ে আছে খুব।

করুণা চলে যেত। কিন্তু তবু যেন মন আমার ওকে চাইত। ওকে চাইত। ও তা মনে মনে অনুভব করত।

শেষে আমার আকর্ষণই ওকে বারে বারে আমার কাছে টেনে নিয়ে আসত। রুমা তখন পড়ত আর আমরা দুজনে বসে বসে ইনিয়ে বিনিয়ে অর্থহীন নানা গল্প করতাম। রুমা তা লক্ষ্য করত। এ তার মোটেই ভাল লাগত না। সহ্য হতো না। বিশেষ করে তার মার এই নিলর্জ্জ ব্যবহার তার ভাল লাগত না। শেষ পর্যন্ত তার মনের মধ্যে ধীরে ধীরে কোথায় যেন একটা ছেদ পড়ে গেল। তারপর থেকে রুমা তার মাকে মা বলে ভাবতে পারে না। তাই গল্পের মাঝখানে সে চুপ করে শক্ত হয়ে বসে থাকে। আমরা ভাবতাম রুমা ছোটো। রুমা কিছু বোঝে না। কিন্তু রুমা বোঝে। অনেক কিছুই বোঝে। স্বাভাবিক লালের চেয়েও রুমার কানের লতি বেশী লাল দেখাত। রুমা শুধু চুপেই বসে থাকত।

একদিন করুণা এটা লক্ষ্য করল। আড় চোখে তাই সে প্রথমে মেয়ের মুখের দিকে তাকায়। তারপরে মেয়েকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। শেষে এক সময় মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করে—পড়া হয়ে গেল তোর? পড়া! মুখটা কঠিন আর লম্বা দেখায় রুমার। রুমা চেঁচায়। ওর গলার দুপাশের রগ দুটো তাতে বিশ্রী ভাবে ফুলে ওঠে। যেন তা কোনো শক্ত পাকান দড়ি। আর স্বরটাও গলা চিরে তীক্ষ্ণ বাঁশীর মতো বেজে ওঠে। যেমন ও রোজ যেমন সুরে চেলে বলে সাধারণ ত সেই ভাবেই বলল—হ্যাঁ, মুখের সামনে বসে বসে গল্প করলে পড়া হয় কৈকি!

'রুমা।'

'মা'—নাকের পাটা দুটো ফুলে ওঠে রুমার। রুমা হাত-পা ছোঁড়ে। বই ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে। শেষে উঠে চলে যায়। আর আমরা দুজনে মাথা নীচু করে বসে থাকি।

হয়তো করুণা তখন রুমার কথাই ভাবে। রুমা তাকে ভয় পায় না আর। রুমা তার শাসন মানে না আর। রুমার চোখভরা অবিশ্বাস। রুমার চোখে ঘৃণা জ্বালা। সে রুমার কাছে হেরে গেছে। এখন রুমাই তার যেন অভিভাবিকা। আর সে রুমার কৃপাপ্রার্থিনী।

আশ্চর্য মেয়ে রুমা তবু করুণা মা হয়ে ও ওর চোখে

অপরাধিনী ঝুমা ছোটো
ওর মনে অবিশ্বাস।
করুণাকে। ওর মাকে

* *

'আমি কি করব! আমি কি করব!'

করুণা বোঝই তো তুমি যাতে সেদিনই পালে পুড়ে
পুড়ে চিন্তা করতে না আর নয় এ পাপ।
আমার মেয়ের চোখে পড়েছে। তবু ও
আমার ভেতর পাপ ঢেকে আগুন নিয়ে
খেলা আর বেশী উচিৎ পুড়তে
হবে। কিন্তু পারলে কি তুমি। তাহলে একদিন আলা
মিটিয়ে দুবেলের নিজেকে কিন্তু
পারলে কৈ। এতো সব
তোমার মাটি হয়
মৃত্যু পরোয়ানা নিয়ে এলো।

কিন্তু ও-ও কি জানত যে তোমার নিয়তিই ওকে এই ভাবে নিয়ে আসবে। না ও জানত না এ ওর ছলও নয়, চাতুরীও নয় ও সত্যি কথাই বলেছিল। কিন্তু ওই যে কথাতেই বলে নিয়তি। না হলে কেন ঠিক যাবার আগ মুহূর্তেই হঠাৎ ঘটবে ওই বিপত্তি। মেয়েটি মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। তারপর আর উঠবে আর সাধারণের মতো চোখ মেলে তাকাবেও না। বল এরপর আর দাঁড়াই যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না করেও তা ভাল লাগে।

ভাল লাগে কিছুই ভাল লাগে না কারো। বন্ধুরা বলে চলবে ঝুমা চল। একটু ঘুরে আসি। কিন্তু ওর ভাল লাগে না। ও যায় না। সোজা বাড়ী চলে আসে।

কিন্তু পথে আসতে আসতেই ওর চাপা পড়া সেই সন্দেহটা আবার মনে জেগে ওঠে। এই সময়ই না মাস্টার মশাই রোজ আসে। নিশ্চয় আজও এসেছে। নিশ্চয় এসেছে।—ঝুমা তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে আসে —স্যার এসেছে। না হলে এতো কড়া নাড়া সত্ত্বেও কেন দরজা খুলে দিচ্ছে না মা?

ঝুমা ভুলে যায় তার সেই স্কুলের স্মৃতি। এই কিছু আগেই যে ক্লাস নাইনের একটি তলতাস্ত মেয়ে পড়ে মরে গেছে সেই করুণ স্মৃতিও ঝুমার মন থেকে মুছে কপালের রগ দুটো তার আবার দপ্ দপ্

করতে থাকে। নাকের পাতা দুটো আরো ফুলে ফুলে ওঠে। যেন কোনো বিষাক্ত সাপ তার শরীরের ভেতরে তীব্র ভাবে দংশন করে চলেছে। বাড়ীর পেছনের যে অপরিসর জায়গাটুকু ভাঙা কাঁচ আর আবর্জনার স্তূপে ভর্তি রুমা তখন সন্তর্পণে—অতি সন্তর্পণে সেই পথ ধরে বেড়ালের মতো সাবধানে ধাপ্পা পারে ধীরে ধীরে গিয়ে শেষে জানলার নীচে দাঁড়ায়। তারপর শিক ধরে উঁচু হয়ে পাল্লার দুই ফাঁকে চোখ রাখে। আর সঙ্গেই ওর হাতের মুঠো দুটো শক্ত হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই ও রাত পাখীর মতো বিশ্রীভাবে চেঁচিয়ে ওঠে—কি হচ্ছে।—

তারপরের ব্যাপার তো সবই তোমার জানা। দুজনে ভীষণ ভাবেই চমকে উঠলে এবারে। তুমি তাড়াতাড়ি করে ছুটে গেলে। গিয়ে পাল্লা দুটো মেলে ধরে তখনই রুমার হাত দুখানি চেপে ধরলে। কিন্তু রুমা আরো চেঁচিয়ে ওঠে। তুমি মিনতি করলে, অনুনয় করলে। বললে আর কোনোদিন এ কাজ করব নারে রুমা। তুই—

না-না। ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও বলছি আমার হাত। তুমি আমার কেউ নও। তুমি যা নও। তুমি রাক্ষুসী। ছেড়ে দাও বলছি। জ্যেঠিমা—

ওপরের জানলা ততক্ষণে খুলে গেছে। একখানি মুখ সেখানে ভেসে ওঠে। 'কে, রুমা! ওখানে কি করছিস তুই।'

'জ্যাঠিমা শিগগীর করে আপনি নেবে আসুন নীচে।'

এরপর বাড়ী-ওয়ালা-গিন্নী তরতর করে নেবে এলেন। কি হয়েছে কি?'

'দিদি আমি একটা অন্যায় করে ফেলেছি। আপনি আমাকে বাঁচান।'

করুণার কথায় গিন্নীর মুখের রেখা কঠিন হয়ে ওঠে। বললেন—বাঁচাবার মালিক যিনি তিনিই বাঁচাবেন। আপাততঃ দুজনে ঘরের ভেতরেই থাক।

•

এবারে তুমিই বল করুণা তোমার শেষ ভরসাও তো চলে গেল। 'এ্যাডভান্টেজ কর' কথাটা অন্যকেই বলা যায়। আর তা শুনতেও বেশ শোনায়। কিন্তু যাদের যখন নিজের ওপরে এসে পড়ে তখন বুঝি হৃদয়টাই ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। তাই বুঝি ক্ষমা আর করা যায় না কাউকে।···

কি, অন্ধকার দেখে ভয় পেলে নাকি? কেন অমাবস্যার এই অন্ধকার কি আর জীবনে দেখনি কোনোদিন? একি তোমার জীবনের চেয়ে আরো বেশী ভয়ঙ্কর! আরো বেশী অন্ধকার!

···মনে করুন আপনি কোনো বিধবাকেই না হয় বিয়ে করেছেন···

না-না ও কিছু নয়। ও ভুল। ও ভুল। মনে কর ও কোনো কথার কথা। কোনো মরীচিকা। ও তোমাকে শেষে টানবে শুধু। হয়রান করাবে শুধু। ও আলো নয়। ও আলেয়া। তোমার জীবনের অন্ধকার ওতে কিছু কাটবে না। কিছুই কাটবে না। শুধু হয়রানিই হতে হবে তোমার। বরং তুমি এগিয়ে যাও। আরো এগিয়ে যাও।—

হ্যাঁ আরো কিছু পথ যেতে হবে তোমার। শেষ কালে দেখবে একটা গুমটি। সেই গুমটি ছাড়িয়ে হাত কয়েক গেলেই তখন দেখতে পাবে চারিদিকে ঝোপ-ঝাড় আর তার মাথার মাথায় কালো অন্ধকার। তুমি ওই-খানেই অপেক্ষা করবে। আর শুনতে চেষ্টা করবে কোনো শব্দ শুনতে পাও কিনা।—পাবে। প্রথমে সোঁ সোঁ। তারপর ঝিক ঝিক ঝিক। আওয়াজ তখন স্পষ্ট হয়ে উঠবে—

'ইঃ বড্ডো অন্ধকার।'

শোনো এক বুক কাঁপান শব্দ। ও! বুঝি আলো চাও তুমি? কিন্তু জাননা সে এ অন্ধকারের চেয়ে আরো ভীষণ, আরো ভয়ঙ্কর। প্রথমে আলো বিন্দুর মতন সামান্য সামান্য কাঁপতে থাকবে। তারপর কাঁপতে কাঁপতে ভাসতে ভাসতে সেই বিন্দুই ক্রমশ বড়ো হতে হতে এগিয়ে আসবে। তারপরে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। তখন পারবে তুমি সেই তীব্র আ সহ্য করতে?

'বাপো।'

কি, অন্ধকারে বুঝি ঠোকর খেলে? বড়ো কষ্ট না? কিন্তু কি করবে বল। ধৈর্য না হয় কিছু চড় চাপড় খাবে, কিছু অপমান সহ্য করবে, তারপর আবার নতুন

জীবন যাপন করবে। কিন্তু তুমি? পারবে নীরেশ ও রুমার কাছে আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে? না, পারবে না।

'না-না আমিও আর চাই না, আমিও আর ফিরে যেতে চাই না। এ আমার প্রায়শ্চিত্ত।'

হ্যাঁ, আমিও তাই বলি। কি হবে ফিরে গিয়ে আর। যখন সামনে তোমার খোলা রয়েছে পথ।—

'আর যে পারি না আমি।'

পারবে! পারবে! আর একটু। এই তো! আর একটু। এসে গেছ। আর কয়েক পা মাত্র ওই দেখ ওই সেই আলো। দেখ কেমন দুলছে। আর কিছুক্ষণ। তারপরেই শুনতে পাবে সেই কিকির কিকির কিক কিক শব্দ।

'না না আর আমি কিছু শুনতে চাই না।'

কেন?

'ওই হিস হিস শব্দ ও কোনো শব্দ নয়।'

তবে?

'ও সরীসৃপ। ভীষণ প্রতিহিংসা-পরায়ণ এক সরীসৃপ। উঃ আমি আর পারছি না।'

'সেকি! এই বিশেষ সময়-মুহূর্তে তুমি বিচলিত হলে?'

'না-না ওই আলো আমি আর সহ্য করতে পারছি না। ও কোনো আলো নয়। ও ওই সরীসৃপেরই কুটিল চোখ। হিংসায় আগুনে জ্বলছে। ও বড়ো চক চকে। ও বড়ো উজ্জ্বল। আমার চোখকে ধাঁধিয়ে দিচ্ছে।'

'তাই কি?'

'না-না ভুল। ও আমারই ভুল। ও কোনো সরীসৃপের নয়, ও কোনো দানবের নয়। ও চোখ রুমারই। রুমার ঘৃণা মেশান চোখ ও। দৃষ্টির সার্চলাইট ফেলে ফেলে ও আমার ভেতরটা দেখে নিচ্ছে। তাই ওর ওই অন্তর্ভেদী দৃষ্টি আর আমি সহ্য করতে পারছি না। কিছুতেই পারছি না।'

…ভুল কি আপনার স্ত্রীরই শুধু…

'হ্যাঁ শুধু আমারই। ভুল শুধু আমারই।'

…একজন শিক্ষিত ছেলে হয়ে কি আপনার কাছ থেকে এ উদারতাটুকু প্রত্যাশা করা যায় না…

'না যায় না। সংসারে কোনো কিছু প্রত্যাশা করা যায় না। কোনো কিছুরই ক্ষমা নেই সংসারে।'

…এই ফুলটাকে নিয়ে কি করব এখন…

…"ক্ষমা—"…

'না-না কিছুই করতে হবে না। কিছুই করতে হবে না। আমি ক্ষমা চাই না…'

•

কিকি কিকি কিকি কিকি…

অন্ধকারের বুক চিরে একবার তীব্র ভাবে বাঁশী বেজে উঠল।

বকাবক বকাবক বকাবক বক—।

ইঞ্জিনের চাকা ঘসড়াতে ঘসড়াতে কিছুদূরে গিয়ে শেষে থেমে গেল। কামরার জানলায় জানলায় শুধু যাত্রীদের ব্যাকুল মুখ। আর এক অস্পষ্ট গুঞ্জন। —র‍্যাকসিডেন্ট। বোধহয় কোনো র‍্যাকসিডেন্ট হয়েছে।

বাঁশী আবার বেজে ওঠল। গার্ডের হাতে সবুজ আলো। আলো জোরে জোরে দুলতে লাগল। সকলকে সতর্ক করে দিয়ে গাড়ী আবার ধীরে ধীরে পেছুতে লাগল।—কিক কিক কিক কিক…

সার্চলাইটের আলো ঝোপ থেকে ঝোপে সরে সরে যেতে লাগল। সাদা আলো। এক সময় শেষে স্থির হয়ে আশ-পাশ ভরিয়ে তুলল। আলোর পাশেই লাইনের দুধারে কালো কালো ঝোরা আর কিছু গড়িয়ে পড়া রক্ত।

ঝোপ-ঝাড়ের মাথা স্থির। পাতা কাঁপছে না। আলো ছড়াচ্ছে না। নিষ্ফল আলোকিত লাইন স্থির। কাঁপছে না। শব্দ ছড়াচ্ছে না।

সব কিছুই স্থির। সব কিছু নিশ্চুপ। শুধু বিস্ফারিত কতোগুলো বোবা চোখ ভীড় করে দেখছে রক্তাপ্লুত শ্বেতলান বিধ্বস্ত দেহ। রক্তাক্ত অবস্থায় যা পড়ে রয়েছে লাইনের দুধারে কালো ঝোরার ওপর।

নিশি বিহঙ্গ

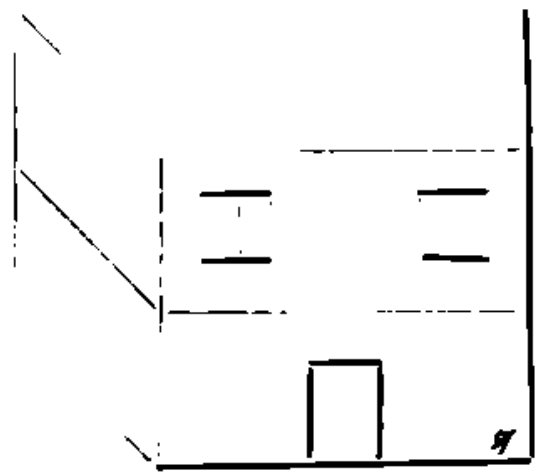

হরিপ্রসন্ন চক্রবর্তী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তোমার আর না, ডায়বিটিস রোগী বেশি চা খায় না?

অখিলবাবু অনুনয়ের দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন, ভায়া কি আমাদের তপুর মত কমরেড?

আজ্ঞে না, অনুনয় সহাস্যে বলল, আমি একজন দেশী বামুন পণ্ডিতের ছেলে, সম্প্রতি অধ্যাপনা-কর্মে লিপ্ত আছি।

অনুনয়ের কথা বলার ভঙ্গী দেখে অখিলবাবু এবং বিমলা দু'জনাই হাসি সামলাতে পারল না।

অখিলবাবু তারিফ করে বললেন, খাসা ছেলে।

মন্তু চা-খাবার এনে টিপয়ের উপর রাখল। বিমলার নির্দেশে মন্তু অনুনয়ের পায়ের ধুলো নিল, অন্য ছেলেমেয়েরাও এসে অনুনয়কে প্রণাম করল। বিমলা ছেলে মেয়েদের দিকে চেয়ে বলল, ইনি তোমাদের মামা হন, তোমাদের দেশের মামা, মস্ত বিদ্বান। নিজের ছোট ভাইটির কথা স্মরণ করে বুঝি বিমলার চোখে জল এল। অশ্রু বেগ দমন করে অনুনয়ের আরও কাছে সরে এসে পিঠে হাত দিয়ে বলল, আজ রাতে যেয়ে যাবি, আর প্রতি রবিবার সকালে আমার কাছে আসবি, সমস্ত দিন থাকবি, খাওয়া-দাওয়া করে রাত্তিরে যাবি, বুঝলি। এই তোর দিদির আদেশ।

বিমলা কক্ষান্তরে চলে গেল।

অনুনয় অখিল বাবুর সঙ্গে আরও খানিক গল্প করল, হাত ঘড়িটার দিকে একবার আড়চোখে তাকাল, পাঁচটা বাজতে মিনিট কয়েক বাকি। শ্রাবণ বর্ষণের আজ আর কোন সম্ভাবনা নেই।

প্রস্তুত হয়ে এসে দরজার সামনে দাঁড়াল রঞ্জনা, অনুনয় অখিল বাবুকে নমস্কার করে উঠে পড়ল। সিঁড়ির মুখের কাছে দাঁড়িয়েছিল বিমলা, বলল, বেড়িয়ে ফেরবার সময় অনুনয়কে যেন নিয়ে আসিস, তপু; ওর সঙ্গে আমার কোন কথাই হল না, কত কথা মনের মধ্যে জমা হয়ে আছে, বেশী দেরি করো না, আটটার আগেই ফিরবে বুঝলে?

রঞ্জনা সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়ল।

ওরা দু'জনে নিচে নেমে এল। একটু হেঁটে আসার পর রঞ্জনা হঠাৎ থেমে বলল, কোথায় যাবে?

চল, লেকেই যাওয়া যাক, একটু নিরালায় বসা যাবে। কিসে যাবে ট্যাকসি করব?

আবার ট্যাকসি কেন? শুধু শুধু পয়সা খরচ করে কি হবে? কাছেই তো লেক। হেঁটে গেলে আধ ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাব।

আধ ঘণ্টা? অত হাঁটতে পারব না। তাহলে একটা ট্যাকসিই করি।

একখানা রানিং ট্যাকসিকে থামিয়ে ওরা দু'জনে ভিতরে ঢুকে গেল। মিনিট দশেকের মধ্যেই লেকের

দক্ষিণ দিকে গিয়ে পৌঁছল ওরা। একটু হেঁটে রেল লাইনের ধারে একটা গাছের তলায় দুজনে বসল। স্থানটি একেবারে নির্জন, এদিকে কেউ আসে না।

সন্ধ্যা হতে বেশ খানিক সময় বাকি আছে, দুজনেই দুজনের মুখ বেশ স্পষ্টভাবেই দেখতে পাচ্ছে।

কে আগে কথা বলবে এবং কোন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা শুরু হবে তা নিয়ে বোধহয় একটু গোল বাধল। দশ বছর পরে তপতীর মুখোমুখি বসে অনুনয় বুঝি একটু ঘাবড়ে গেল। রঞ্জনা বসে কচি কচি ঘাস ছিঁড়তে লাগল।

মিনিট তিনেক কেটে গেল।

অনুনয়কে নির্বাক দেখে রঞ্জনাই কথা কইল।

কাল রাতে ঘুমিয়েছিলে?

উত্তরের অপেক্ষা করেই সে আবার ঘাস ছেঁড়ার মন দিল।

অনুনয় যেন আরও অপ্রস্তুত হয়ে গেল, মুখখানা আরক্ত হয়ে উঠল যেন নিজেকে সহজ করবার জন্য একটু হাসল অনুনয়, তারপর সিগারেট কেসটা পকেট থেকে বার করে বলল, কেন বলত?

এমনি জিজ্ঞাসা করছি, একটু হেসে অনুনয়ের চোখ-মুখের দিকে ভাল করে চেয়ে রঞ্জনা বলল।

তুমি ঘুমিয়েছিলে? অনুনয় জিজ্ঞাসা করল রঞ্জনাকে।

আমি? নিশ্চয়ই। আমি ও রকম ছেলেমানুষী করি না, আগে খাওয়া, তারপর অন্য কিছু। এগারটা থেকে ছটা পর্যন্ত প্রাণখুলে ঘুমিয়েছি।

এই বলে চাদর রঞ্জনা, অনুনয়ের আরও কাছে সরে এসে একেবারে তার গা ঘেঁসে বসে বলল, সত্যি বলত, রাত্রে তোমার ঘুম হয়েছিল?

সন্দেহ হচ্ছে তোমার? এক পলক চোখের পাতা পড়ে নি।

কিন্তু কেন বল ত? কি ভেবেছিলে?

সে কথাও জিজ্ঞাসা করছ? তবে শোন। শুধু তোমাকে ভেবেছি।

তপতীকে ভেবেছি, আর ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর হয়েছি।

ইস। আমাকে নিয়ে তুমি ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছ? পাগল! রঞ্জনা উপহাস করে উঠল।

দোষ কি? স্বপ্ন ত।

রঞ্জনা একটু গম্ভীর হয়ে গেল, বলল, আমিও কাল সারারাত ঘুমোইনি, অনুনয়।

তুমিও কি স্বপ্ন দেখছিলে?

না? আমার স্বপ্ন দেখা শেষ হয়ে গেছে।

হেসে উঠল অনুনয়, বল কি? স্বপ্ন দেখা কি মানুষের শেষ হয়। মৃত্যুর সময়েও স্বপ্ন দেখবে, তপতী!

তপতী? আমি তপতী নই, আমি রঞ্জনা।

রঞ্জনা? রঞ্জনা কে? তাকে তো আমি চিনি না। আমি চিনি তপতীকে আর সে তপতী আমার চোখের সামনে।

একটু থেমে রঞ্জনার মুখের দিকে চেয়ে অনুনয় বলল, একটা কথা বলছি, শুনবে?

বল।

তোমার অতীত যাই থাকুক না কেন, এস, আমরা ঘর বাঁধি।

রঞ্জনার হাতের উপর হাত রাখল অনুনয়। উদাসীন ভাবে একবার অনুনয়ের মুখের পানে চাইল রঞ্জনা, তারপর মুখ ফিরিয়ে নিল। ঈষৎ খিল খিল করে হেসে উঠল রঞ্জনা, তোমরা পুরুষ, না? জীবনে তোমাদের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের দরকার হয় মাঝে মাঝে, তাই তোমাদের নারীর এত প্রয়োজন।

তার মানে? তুমি বলতে চাও নর-নারীর সম্বন্ধ নিছক যান্ত্রিক, একেবারে যৌন, এতে আর কিছুর নেই!

একটু হাসল রঞ্জনা, একটু ভেবে দেখ, আমরা সকলেই ঘুমোবার পরে ঘুমুই; কি? বিশ্বাস কর না?

অনুনয় নিরুত্তর।

আর, রঞ্জনা বলতে লাগল, ঘুমোবার্টি বসে পড়লেই আমাদের ভিতর যে প্রাগৈতিহাসিক গুহা মানব বাস করছে সেটি বেরিয়ে পড়ে, দুস্থ্র বেলভূমি আর দুধে আলতা চামড়ার তলে যে অবচেতন মন রয়েছে সেখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বিষধর সাপ ঘুমিয়ে আছে; একটু স্বার্থ চ্যুতি হলেই ওরা ফোঁস করে ওঠে, ফণা তোলে। প্রেম,

প্রণয়, প্রীতি, ভালবাসা—এগুলো সব কেতাবী বুলি। কি চুপ করে রইলে কেন? জবাব দাও।

তোমার কি হয়েছে আমি ঠিক জানি না। আগে তো তুমি এরকম ছিলে না। আগে যখন আমি ভ্রিয়মাণ হয়ে পড়তাম তখন তুমি আমার কাছে কানে প্রেমের কত মহিমা শুনিয়ে চাঙ্গা করতে। আজ এত বদলে গেছ?

রঞ্জনার কানে অনুনয়ের কথাগুলি বিদ্রূপের মত শোনাল।

তখন অন্য রকম পরিবেশ ছিল, অনুনয়। তখন মানুষকে, জগৎকে যে চোখ দিয়ে দেখেছিলাম, আজ আমার সে চোখ নেই।

কিন্তু কেন? নিবন্ত সিগারেটটা ফেলে দিয়ে আর একটা সিগারেট ধরাল অনুনয়।

সে কথাও তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে? তুমি না প্রফেসর!

আর একটু ভাল করে বল, শুনি।

আরও ভাল করে বলব? আমি জগৎকে দেখেছি, পুরুষকে দেখেছি, পুরুষ আমার কাছে মরে গেছে।

ভুল কথা, তপতী। মানুষের দেখা শেষ হয় না। তোমার দেহে এখনও পরিপূর্ণ যৌবন রয়েছে, কি করে তুমি ও কথা বলছ বুঝতে পারছি না। ওটা তোমার পুরুষ সম্বন্ধে সাময়িক বিতৃষ্ণা ছাড়া কিছুই নয়।

ঠিক তা নয়, অনুনয়। ঠিক বলেছ, আমার দেহে পরিপূর্ণ যৌবন রয়েছে। হেসে উঠল রঞ্জনা। নারীর যৌবনকে তোমরা খুব ভালবাস, না? আবার হাসল রঞ্জনা।

অনুনয় কোন উত্তর দিল না।

রঞ্জনা বলল, আমি তোমার কথাকে আরও একটু বিস্তারিত করে বলি। হেসো না যেন। একটু কাব্য করেছি। আমি জানি আমার এই দেহখানা তোমাদের কাছে কত সুন্দর, কত মধুর। আমার আবরণ, আমার প্রসাধন, আমার কেশরাশি, আমার কটাক্ষ, স্তন, কটি, নিতম্ব তোমাদের কাছে কত লোভনীয়। ওকি ও-রকম করে চেয়ে আছ কেন আমার মুখের দিকে? আশ্চর্য হচ্ছ বুঝি আমার কথা শুনে?

অনুনয় মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকাল।

আরও একটু শোন এখনো আসল কথা বলিনি। বল।

যখন আমার গায়ে বসন্ত বেরিয়েছিল আর সারা গা থেকে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছিল, তখন বেঘোর বিকার-জ্বরের মধ্যে বুঝতে পেরেছিলাম আমি কে আর আমার দেহটাই বা কি। তারপর সেরে উঠে পাটনায় দিদির বাড়িতে কিছুদিন থাকার পর একদিন হঠাৎ ভাল জামা-কাপড় পরবার ইচ্ছা হল, পরলাম ভাল শাড়ী ব্লাউজ, গায়ে দুচার ফোঁটা গন্ধ ছিটিয়ে নিলাম, হাতে একটা কুইন্স সোলাপ নিয়ে পার্কে বেড়াতে গেলাম, বেশ লক্ষ্য করলাম পুরুষের দল আমার পিছু নিয়েছে, হাসি পেল, ভাবলাম এই পুরুষ জাত এত নির্বোধ, এত দুর্বল চিত্ত এরা।

তোমার বসন্ত হয়েছিল? তাই কপালে গালে এক আধটা দাগ দেখছি।

অনুনয়ের কথা ঠিক কানে এল না রঞ্জনার, সে ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, আমি একেবারে উলঙ্গ হয়ে এখানেই তোমার সামনে দাঁড়াতে পারি। তাতে আমি কোন লজ্জা পাব না, বরং তুমিই সংকুচিত হবে। দাঁড়াব? দেখতে চাও আমার সেই রূপ?

ভয় পেল অনুনয়, রঞ্জনার হাত চেপে ধরল।

আমি তোমাকে ঠিক বুঝতে পারছি না, তপতী। কি বলছ তুমি? তোমার মনের এত পরিবর্তন হল কি করে? আমার কাছে তুমি আগের মত সহজ হও। আমি তোমার সেই রূপ দেখতে চাই।

হাসল রঞ্জনা।

সে রূপ কোথায় পাব অনুনয়? তোমার মনের বিশেষ কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করছি না, কারণ তুমি চিরাচরিত সংস্কার থেকে বিচ্যুত হওনি, তোমার মনোজগতে বিশেষ কোন সংঘাত লাগেনি। তাই তুমি নারী চিন্তা কর, নারীকে নিয়ে ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দেখ।

অনুনয় আকাশের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইল।

কৃষ্ণপক্ষের সন্ধ্যা আরও গাঢ় হল, লেকের জলে লক্ষ তারা ঝলমল করে উঠল, সারা পরিবেশ আরও রহস্যময় হয়ে উঠল।

রঞ্জনাও স্থির হয়ে বসে রইল।

দিগারেট খেতে খেতে অনুনয়
ওপর বিশেষ করে নিজের ওপর এত রাগে,
চলে কি করে?

তুমি আমায় আমাকে ভুল বুঝলে, অনুনয়। আমি কারুর ওপর রাগ করিনি, আমি শুধু একটু বদলে গেছি, জগৎকে আমি একটু অন্যদৃষ্টিতে দেখছি আর এটাই হয়ত প্রাকৃতিক নিয়মে আমার মনের স্বাভাবিক পরিণতি। একটু থেমে আবছা অন্ধকারে অনুনয়ের মুখের উপর ভাল করে দৃষ্টি মেলে রঞ্জনা বলল, দাদা-বৌদিদা, বাবা-মার মৃত্যু বা দেশভাগ আমাকে খুব বেশী বিচলিত করতে পারেনি, অনুনয়। জীবনে চলার পথে ও-রকম আপদ বিপদ আসবেই। ভূমিকম্প, মহামারীতে কত দেশ যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তাতো আমরা জানি, মানুষ আবার মাটি কে উঠেছে, ঘর বেঁধেছে, হাসি কান্নার ভিতর দিয়ে জীবন কাটিয়েছে।

তবে? সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অনুনয় তাকাল রঞ্জনার মুখের পানে। আমার জীবনে সত্যিকারের প্রথম পরিবর্তন এল অর্থাৎ মানুষ সম্বন্ধে চিন্তা করতে শিখলাম কাকার বাড়িতে এসে।

কি রকম?

তবে শোন। অনেক কথা তুমি জানতে না চাইও তোমাকে বিশেষ বলিনি। প্রথমে কাকা আমাদের তিন জনকে খুব আন্তরিক ভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। বাবার ঐ রকম অপঘাত মৃত্যুর কথা শুনে তিনি আমাকে আর বিবেককে জড়িয়ে ধরে ছেলে মানুষের মত কেঁদে ফেলেছিলেন। আমার বেশ ভাল লেগেছিল কাকাকে। তারপর ধীরে ধীরে তাঁর স্বরূপটা ফুটে উঠতে লাগল। রাত্রীর অবাধ জল তুচ্ছ কারণে, তার জায়গায় যাকে তিনি সসম্মানে নিয়ে গিয়ে বসালেন, ছেলেমেয়েদের জন্য একজন টিউটর ছিল, কমিউনিস্ট বলে তাকে তাড়ালেন, আমি নিজের পড়া ক্ষতি করে তাদের পড়াতে লাগলাম, যা এক রকম বিনা চিকিৎসায় কলেরায় মারা গেলেন, সেটা চোখের সামনেই দেখলাম, সবচেয়ে বুকে ব্যথা পেলাম যে দিন আমার ছোট্ট নিরপরাধ ভাইটিকে চোর অপবাদ দিয়ে খড়তুতো ভাইটা নির্মমভাবে প্রহার করল। সেদিন বুঝেছিলাম আমি কত অসহায়। সেই রাত্রেই ভাইটি যে কোথায় চলে গেল তার সন্ধান আজও পাইনি। বোধ হয় মনের দুঃখে সে আত্মহত্যা করেছে।

বলতে বলতে রঞ্জনার চক্ষুদুটি অশ্রুসজল হয়ে উঠল, কণ্ঠস্বর আরও গম্ভীর হল। অনুনয় বলল এত ব্যাপার হয়ে গেছে, আমাকে তো তখন কিছুই জানাওনি।

তুমি কি করতে? হেসে বলল রঞ্জনা।

কি করতাম অবশ্য এখন বলতে পারি না, আর বলেও কোন লাভ হবে না, তবে চেষ্টা করতাম কিছু করবার, আমি জানতে পারলে তোমার জীবনের রূপ আজ অন্য রকম হয়ে যেত।

তুমি কিছুই করতে পারতে না, অনুনয়, তুমিওতো তখন পরাধীন ছিলে।

পরাধীন ছিলাম নিশ্চয়ই, তবে আমার মামা মামী বিশেষ করে আমার মামা দেবতা ছিলেন তপতী। ওরকম অদ্ভুত চরিত্রের লোক আমি আজও দেখিনি।

ভাগ্যবান তুমি, জীবনে দেবতার দর্শন পেয়েছ, হাসল রঞ্জনা, সেইজন্যই বোধ হয় তোমার মানসিক স্থৈর্য এখনও অটুট আছে, আমি কিছুই দেখলাম না, অনুনয়।

ওসব বিগত দিনের আক্ষেপের কথা ভেবে এখন দুঃখ করে কোন লাভ হবে না, মনের দিক থেকে আমারও অনেক পরিবর্তন হয়েছে, নইলে কাল তোমাকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতাম।

রঞ্জনা অনুনয়ের মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলল, নিজের জন্য দুঃখ হয় না, দুঃখ হয় শুধু এই জন্য যে যারা অস্বাভাবিক প্রাচুর্যের মধ্যে বসে রয়েছে তারা এত নীচ, এত অমানুষ হয় কি করে? আমার কাকার তো পয়সার অভাব নেই অথচ দেখলাম পয়সার প্রতি তার কি আকর্ষণ, ইরানী কারপেট-ওয়ালাদের চেয়েও লোকটা এককাঠি ওপরে যায়, আবার গলায় তৈতে, পরণে গরদ আর হাতে মালা নিয়ে কি ভণ্ডামিটাই না করে বেড়াচ্ছে। এ দেশটার কি হবে বলতে পার? সময় সময় ভাবি, বেদ-বেদান্ত উপনিষদের বেড়া দিয়ে ঘেরা এ দেশের এত অধঃপতন হল কি করে?

রুমাল দিয়ে কপালে মুহূর্তে মুহূর্তে অনুনয় বলল, বুঝতে পারছি, নানা কারণে তোমার মন বিষিয়ে উঠেছে, তপতী বড় বেশী অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছ, নিজেকে সহজ করবার চেষ্টা কর। কি করবে, জগতের বোধহয় এই নিয়ম, তবে ভালমানুষও আছে, তাদের দেখাও মেলে।

অনুনয়ের কথা শুনে ব্যঙ্গ মেশান হাসি হাসল রঞ্জনা, সেটা লক্ষ্য করল না অনুনয়।

অনুনয় সহজ গলায় বলল, ওসব চিন্তা ছেড়ে দাও, ওতে তোমার মনের আরও অধঃপতন হবে। তুমি এত দিন নোঙর ছেঁড়া নৌকোর মত দিশেহারা হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছিলে।

আর এইবার আমি কাণ্ডারী পেয়েছি, হেসে হেসে বলল রঞ্জনা, অতএব আমার আর কোন চিন্তা নেই। এইতো বলবে?

অনুনয় কোন উত্তর দিল না রঞ্জনার কথার। গম্ভীর হয়ে সিগারেট খেতে লাগল। রঞ্জনা আরও সরে এল অনুনয়ের কাছে, তার হাতের উপর হাত রাখল, অনুনয়ের মুখের পানে চেয়ে আস্তে আস্তে বলল, আমাকে নিয়ে তুমি ঘর বাঁধতে চাও?

হ্যাঁ, চাই, অবশ্য তুমি যদি রাজী থাক।

তুমি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, কি মতে বিবাহ করবে?

আমাদের দেশী মতে।

আমি যদি বলি ও মত আমার পছন্দ হয় না।

তাহলে বিলিতি মতে, রেজেস্ট্রী করে।

তার মানে তুমি একান্তই আমাকে বিয়ে করে ঘর বসবার করতে চাও?

সেকথা তো বললাম, যদি তোমার দিক থেকে কোন আপত্তি না থাকে।

বেশতো আছ, কতকগুলি দুঃস্থ ছাত্রকে লেখাপড়া শিখাচ্ছ, তাদের চলার পথে এগিয়ে দিচ্ছ, আমি তোমার বাড়ীতে গেলে সব ওলট পালট হয়ে যাবে না?

কিছু না, বরং আরও ভাল হবে, আমার আদর্শ আরও ফুটে উঠবে।

অনুনয়ের কথা শুনে গম্ভীর হল রঞ্জনা নিস্তব্ধ পরিবেশ, নক্ষত্র খচিত আকাশের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইল সে।

হঠাৎ রঞ্জনা বলে উঠল, আমার অতীত শুনে তুমি শিউরে উঠবে না?

আমি শুনতে চাই না তোমার অতীত, তোমাকে যখন পেয়েছি এতদিন পরে, এই বলে অনুনয় রঞ্জনাকে জড়িয়ে ধরল। রঞ্জনা চুপ করে বসে রইল কোন বাধা দিল না অনুনয়কে বা তার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করবারও চেষ্টা করল না সে।

অনুনয় বলল, আমার নিষ্কলুষ প্রেম দিয়ে তোমাকে পবিত্র করে নেব, তপতী: যেটুকু খাদ তোমার চরিত্রে এসে জমেছে সব ধুয়ে মুছে নেব আমি, তুমি চল আমার কুটীরে।

অনুনয় রঞ্জনার মুখের কাছে মুখ আনল, মুখ সরিয়ে নিল রঞ্জনা, নিজেকেও মুক্ত করে নিল সে অনুনয়ের কাছ থেকে।

অনুনয়ের মুখের দিকে শান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রঞ্জনা বলল, দশ বছর পরে তোমাকে দেখতে পেয়ে আর তোমার কথা শুনে আমার বড় লোভ হচ্ছে, অনুনয়, কিন্তু··· কিন্তুর জালে আর নিজেকে জড়াচ্ছ কেন, তপতী? কোন সংশয় কোন সন্দেহ আর মনের মধ্যে পোষণ করো না। রঞ্জনার হাত দুটি ধরে অনুনয় বলল, চল এই মুহূর্তে চল আমার সোনারপুরের বাড়ীতে অনেক দুঃস্থ সর্বহারা ছেলের দেখা পাবে সেখানে, তাদের পড়াবে, তাদের জীবন পথে এগিয়ে দেবে, তারা তোমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করবে, তপতী, চল।

কিন্তু, অনুনয়, তুমি আমার কাছ থেকে কি পাবে আশা কর।

মানুষ তুমি, তোমার কাছ থেকে আমি সব পাব।

আমি মানুষ? উচ্চহাস্য করে উঠল রঞ্জনা।

নিশ্চয়।

না, অনুনয়, গম্ভীর গলায় রঞ্জনা বলল, আমি একটা শ্বাসপ্রশ্বাসের যন্ত্র, সৃষ্টির আদিতে মানুষ যে শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকত আমার মধ্য দিয়ে তারই পুনরাবৃত্তি চলছে। সেটাকে কোন রকমে টেনে নিয়ে

চলছি, নইলে আমার আর কিছু নেই, অনুনয়, আমার মন নেই, আমার কোন অভীপ্সা নেই, প্রতিবাদ নেই, হেসে বলল রঞ্জনা, এক কথায় আমি এক তাল ঔদাস্য আর বাৎসল্য ছাড়া কিছু নই।

ভুল, তপতী, ভুল। ওটা তোমার মনের দুর্বলতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

ঠিক তা নয়, অনুনয়। আমি অনেক চেষ্টা করেছি মনকে আবার বাঁচিয়ে তুলতে। আমি রাতে লুকিয়ে লুকিয়ে কালী মন্দিরে গেছি, নাটমন্দিরে ছেলেবেলায় ঠাকুর ঘরে বাবার কাছে বসে যেমন শুব পাঠ করতাম সেইভাবে বসে শুব পাঠ করেছি, মনের মধ্যে কণামাত্র ভাবোদ্রেক হয়নি আমার, দক্ষিণেশ্বরে গেছি, শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়েছি, বসেছি, হেসেও উঠে গেছি, বিবেকানন্দের মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকেছি, রবীন্দ্রনাথ পড়েছি, কার্ল মার্কস, লেনিন আর হাজারো বিপ্লবীর কটোর দিকে একমনা হয়ে দাঁড়িয়েছি যদি আবার হারিয়ে যাওয়া বিশ্বাস ফিরে পাই কিন্তু সব চেষ্টা আমার ব্যর্থ হয়েছে অনুনয়। পার্টি আপিসের পাশ দিয়ে গেছি, একটু উঁকি মেরে দেখবারও আমার ইচ্ছা হয়নি, দিদি সেদিন কীর্তন শোনাতে নিয়ে গেলেন এক বড়লোকের বাড়ীতে, গেলাম বসলাম সকলের সঙ্গে কিন্তু মনে হল সব হিপক্রেসি, যিনি গাইছেন তিনি আর আমরা নিজেরাও সব মুখোস পরে বসে আছি। আমার কাকাও তো কীর্তন ভালবাসে। উঠে এলাম দিদিকে না বলে। এই বলে হাসল রঞ্জনা।

মনে প্রচণ্ড আঘাত পেলে ঐ রকমই হয়, তপতী। মনস্তত্ত্বে তাই বলে। কিন্তু তাতে হয়েছে কি? আমার সঙ্গে দেখা হবার পর তোমার মনের কি এতটুকু পরিবর্তন হয়নি?

নিশ্চয় হয়েছে, তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না। রঞ্জনার কাছে আরও সরে এসে বলল অনুনয়।

আমার মধ্যে কোন লেন্স নেই, অনুনয়।

অসম্ভব হেসে বলল অনুনয়, তোমার স্বাস্থ্য রয়েছে, যৌবন রয়েছে পূর্ণমাত্রায়, তোমার কথা কি করে বিশ্বাস করব? ওসব পাগলামি ছাড়। তুমি বলতে পার আমি নিজেই আজ তোমার দিদি জামাইবাবুকে বলে সকালে গাড়ী নিয়ে এসে তোমাকে আমার বাড়ী নিয়ে যাব। তাঁরা তো আমাদের ব্যাপার সবই জানেন, খুব খুশীই হবেন।

রঞ্জনা অনুনয়ের কথা শুনে শুধু একটু হাসল, সে হাসির ব্যঞ্জনা যে কেত গভীর তা অনুনয়ের কেতাবী মন বুঝতে পারল না।

তবে শোন, অনুনয়। আমার দেহ মন নিয়ে একজন পুরুষ যথেচ্ছভাবে খেলা করে গেছে। তোমাকে আমি মন দিয়েছিলাম, আমার পবিত্র নিষ্কলুষ কুমারী মন, তখন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়লে তুমি আমার সব পেতে।

তাতো আমি জানি। তোমাকে তো প্রথমেই বলে দিয়েছি আমি তোমার অতীতকে নিয়ে কখনও মাথা ঘামাবো না, তুমি আমার কাছে সেই গাঁয়ের তপতী-ই আছ, এর বেশী আর কি শুনতে চাও?

তবে আর একটু শোন।

বল।

শিউরে উঠবে না।

না।

আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে না।

না।

তোমার সংসারে আঘাত লাগবে না?

না। সব নিঃসংকোচে বল।

আমি মা হয়েছিলাম।

সেই স্পষ্ট অন্ধকারে রঞ্জনা অনুনয়ের মুখের দিকে চেয়ে দেখল, কিন্তু কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করল না।

পারবে?

পারব।

অনুনয়ের কণ্ঠস্বর যেন একটু বেসুরো ঠেকল রঞ্জনার কাছে।

পারবে? খুব চিন্তা করে বল।

পারব, তপতী, পারব; আর কতবার বলব।

একটা পাখী ওদের মাথার উপর দিয়ে ডেকে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। মিনিট পাঁচেক নিস্তব্ধতা, দু'জনেই

চুপচাপ। অনুনয় সিগারেট কেস থেকে একটা সিগারেট বার করে ধরাল। একখানা মালগাড়ি ভোঁস ভোঁস শব্দ করতে করতে তাদের পিছন দিয়ে চলে গেল।

রঞ্জনাকে নিরুত্তর দেখে অনুনয় বলল, বল, মত দাও।

ক্ষীণ হাসি হাসল রঞ্জনা, বলল, তুমিও আমাকে অশোক সেনের মত পুরোন ফার্নিচার মনে করবে। তারপর ফেলে রেখে পালাবে।

অনুনয় একটু হাসল, তুমি কি আমাকে সেই অশোক সেনের সংগে তুলনা কর? আমি তোমাকে হাজার বার নিষেধ করেছিলাম ওর সংগে মিশোনা।

এখন ও-সব কথা তুলে কোন লাভ হবেনা। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল রঞ্জনা?

তার সংগে আর দেখা হয় না?

সেদিন রাইটার্স বিল্ডিংসের কাছে দেখা হল, একটা ভজ মোটরে বসে ছিল, আমার সংগে চোখাচোখি হওয়াতে ডাকল, গেলাম, দেখলাম দেহখানা মেদে টলটল করছে, মনে হল লোকটার সারা গা থেকে লোভ আর লালসার দুর্গন্ধ বেরিয়ে আসছে, আমি সহ্য করতে পারলাম না, চলে এলাম।

কিন্তু তুমি আমাকে সেই অশোক সেনের সংগে তুলনা করলে?

আবার ও-কথা বলছ কেন? আমি ঠিক তুলনা করিনি, অনুনয়; আর আমার সে অধিকারও নেই? আমি বলছি তোমার মোহ দিন কতক বাদে কেটে যাবে, আর কেটে যাওয়াই স্বাভাবিক?

তার মানে তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না, একজন পুরুষ তোমাকে বিশ্রাস্ত করেছে বলে, একজন পুরুষের কাছ থেকে বাধা পেয়েছ বলে সমস্ত পুরুষের উপর খাপ্পা হয়ে উঠেছ?

আমি কি বলছি বা বলতে চাইছি তুমি এখনও ঠিক বুঝতে পারছ না।

বেশ? তুমি তাহলে আমাকে ভাল করে বুঝিয়ে দাও।

আদিম কুয়াশা পিছনে ছোটা আমার শেষ হয়ে গেছে; ভিতরের পশুটা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, যদি সে কখনও জেগে ওঠে তাকে দিনের পর দিন অভুক্ত রেখে গলা টিপে মেরে ফেলব, কিন্তু তোমার কথা আলাদা, তুমি অভুক্ত, অতৃপ্ত, তুমি নারীর পরিপূর্ণ দেহ চাও, তার মন চাও, ভালবাসা চাও।

তুমি আমাকে দিতে পারবে না?

না। আমি ফুরিয়ে গেছি, আমি নিঃস্ব, আমি রিক্ত। তোমার প্রেমের প্রতিদান আমি দিতে পারব না, অনুনয়। অনুক্ষণ মনে হবে আমি তোমাকে ঠকাচ্ছি, অন্তর্দ্বন্দ্বে জ্বলে পুড়ে মরব, তুমি তখন নিশ্চয়ই সব বুঝতে পারবে, আমার তখন কোথায় স্থান হবে বলতে পার?

দামনের দিকে পা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে অনুনয় বলল, যদি এতদূর আমার সম্বন্ধে বুঝে থাক তাহলে আর কি বলব? সময় নাও, তার আমি অপেক্ষা করব।

আমি ভেবেই বলেছি, অনুনয়; কাল রাত্রেই আমি ভেবে সব ঠিক করে রেখেছি, তুমি কি বলবে বা বলতে পার এবং আমি তার কি জবাব দেব সব আমার ঠিক করা আছে, আমার আজকাল ভেবে নিতে সময় লাগে না অনুনয়। আমি জানি তুমি ব্যথা পেয়েছ আমার কাছ থেকে। রঞ্জনা লক্ষ্য করল অনুনয়ের চোখ দুটো যেন হল হল করে উঠল। কিন্তু কি করব, তখন আমার কোন উপায় ছিল না, অনুনয়।

আমার ভালবাসা তোমার মনঃপূত হয়নি, আমার ওপর তুমি আস্থা হারিয়েছিলে সেটা আমি বুঝেছিলাম।

আজ সে সব কথা তুলে বা মনে করে কোন ফল হবে না, তখনকার সব কথা আমার মনেও নেই।

আমাকে দোষ দিয়ো না, সিগারেট খেতে খেতে অনুনয় বলল, আমার ওপর কখনও অভিমান ক'রো না, আমি তোমার সব শুনেও তোমাকে বুকে নিতে চাইছি?

কিন্তু রঞ্জনা হেসে বলল, তোমার বুক যে আমি কোন দিন পাব না।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল অনুনয়, রঞ্জনার মুখের পানে তাকাল? ঘড়ি দেখল আটটা বেজে গেছে?

রঞ্জনা বলল, এবার ওঠ, রাত্তির হচ্ছে, দিদি বলে দিয়েছে আটটার আগেই ফিরে আসতে।

দু'জনে উঠে পড়ল? খানিক ইটার পর দু'জন দু'জনের মুখ ভাল করে দেখতে পেল, রঞ্জনার মুখ অনেক হাল্কা, অনুনয়ের মুখ গম্ভীর, ব্যথাহত, ম্লান।

হঠাৎ রঞ্জনা অনুনয়ের হাত ধরল।

যদি কথা দাও, একটি সর্তে যেতে পারি তোমার কাছে, কিন্তু তুমি তা পারবে না।

তুমি আসবে? আমার কাছে আসবে? বল কি সর্ত?

অনুনয়ের দেহ-মন আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠল, রাস্তার উপর থমকে দাঁড়াল, স্থান কাল ভুলে গেল সে।

বল।

যেতে তোমার

রূপে নয়।

তবে?

তোমার সহকর্মী হয়ে।

অর্থাৎ

এক সংগে থাকব, দুঃস্থ ছেলে-মেয়েদের লেখা পড়া শেখাব, যারা নিচে নেমে গেছে তাদের হাত ধরে তুলব।

বেশ, এই মুহূর্তে এসো, তোমার দেহ আমি কোন দিন স্পর্শ করব না, এক সংগেও থাকতে হবে না, তোমার বাসস্থান আমি অন্য জায়গায় ঠিক করে দেব। এসো।

এখুনি? পাগল। হাসল রঞ্জনা।

আমার দিক থেকে কোন আপত্তি নেই, আমার দ্বার তুমি সর্বদাই খোলা পাবে।

গম্ভীর হল রঞ্জনা।

এখন নয়, কিছু দিন অপেক্ষা করতে হবে, অনুনয়।

কত দিন?

আমার দারুণ দুঃখের দিনে দিদি-জামাইবাবু আমাকে স্থান দিয়েছেন, কিছুদিন আগে দিদির বড় ছেলে বিলেত ফেরত ডাক্তার হঠাৎ মারা গেছে একটি বাচ্চা রেখে, দিদির তো তো প্রায় মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, জামাইবাবুর দেহে নানা রোগ, দু'বার স্ট্রোক হয়ে গেছে, কিছু কিছু বিষয়ে ওরা আমার ওপর নির্ভর করে, আমার কাছ থেকে সাহস পায় এখন হঠাৎ যদি চলে যাই, ওরা মনে প্রচণ্ড আঘাত পাবে, হয়ত দু'জনেই—

বুঝলাম? বেশ, তোমার যখন খুশী, এসো, আর তুমি যে সর্ত বললে তা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।

রঞ্জনা মৃদু হাসল অনুনয়ের মুখের দিকে চেয়ে। মিনিট খানেক কেটে গেল।

বিজলী বাতির নিচে লেকের জনহীন দক্ষিণ দিকে স্তব্ধ হয়ে ওরা শুধু পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে রইল, ধীর, প্রশান্ত, নিস্পৃহ চাহনি, তার পর ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে বড় রাস্তার উপর দাঁড়াল।

কিন্তু, বড় রাস্তার উপর ওরা বেশীক্ষণ দাঁড়াল না, নিঃশব্দে এগিয়ে যেতে লাগল। প্রশান্ত প্রকৃতি, নিস্তব্ধতা লেকের জল, তবু কোথায় যেন ঝড় বইছে। ওদের সামনে দিয়ে কেবল মোটর ছুটে চলেছে আর অদূরে সিনেমা হাউসের চোখ-ধাঁধানো লাল আলোর ছটা অন্ধকারকে পীড়া দিচ্ছে। তবু ঝড় বইছে—সেই ঝড় অনুনয়ের বুকের গভীরে বার বার নাড়া দিয়ে যাচ্ছে, আর রঞ্জনার? রঞ্জনা অনুনয়ের চোখে খুঁজছিল মাঝে মাঝে। আলোর কাছে আসতে সে দেখতে পেল অনুনয়ের কপালে কয়েকটি রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, কি যেন ভেবে চলেছে সে, বড় গম্ভীর অনুনয়। রঞ্জনার মনের মধ্যেও কি এমনি ঝড়? এই ঝড়ের শেষে কি তার মনে প্রশান্তি দেখা দেবে? ভাবছিল অনুনয় দুটি মনের মাঝখানে এক অন্তরঙ্গ সেতু নির্মাণ করে ফেলেছে সে।

আর রঞ্জনা? সে-ও অশান্ত হয়ে উঠেছে, কি যেন ধরতে চায় রঞ্জনা, স্পর্শ করতে চায়, অনেক দিন পরে আজ তার হৃদয়ের গভীরে কে যেন বার বার নাড়া দিয়ে যাচ্ছে। এক মুহূর্ত থামল সে, এক মুহূর্তের দ্বিধা; অনুনয় খেয়াল করল না।

আরও মিনিট দশেক ওরা দুজনে নীরবে হেঁটে চলল। অনুনয় সিগারেট ধরিয়ে ঘড়ি দেখল ন'টা বেজে গেছে। তপতীদের বাড়ী যেতে হবে, সেখানে তার নিমন্ত্রণ। মোড়ের কাছে এসে ওরা ট্যাক্সি করল।

তপতীর দিদি বিমলা ওদের জন্য অপেক্ষা করে বসেছিল, রাত্রি বেড়ে যাচ্ছে দেখে সে আশঙ্কা করছিল অনুনয় বুঝি আর এল না, কিন্তু অনুনয়কে দেখতে পেয়ে বিমলা আশ্বস্ত হল, ঠাকুর আর বন্ধুকে খাবার ঠিক করতে নির্দেশ দিল।

আয়োজন এমন বিশেষ কিছু উল্লেখযোগ্য নয়, সাদাসিদে খাবার, কিন্তু খেতে খেতে একটি জিনিস লক্ষ্য করল। মঞ্জু আর বিমলা তার পাশে বসে, সে ধীরে ধীরে খাচ্ছে, তপতী সামনে নেই, অখিলবাবুর কাছে বসে আস্তে আস্তে কথা কইছে সে, তবু অনুনয়ের দুঃখ মন যে কোন আনন্দের ছোঁয়া পেয়ে নেচে উঠছে তা সে ঠিক বুঝতে পারছে না। অনেকদিন পরে তপতীর দেখা পেয়েছে বলে কি সে আত্মহারা হয়ে উঠেছে? তাই কি? না, ঠিক তো, তা নয়। বহু দিন সে নারীর আদর-যত্ন থেকে বঞ্চিত, বিশেষ করে খাবার সময় কোন স্নেহশীলা নারী তার পাশে জোর করে তাকে বলেনি এই খাবারটি আর একটু খাও? মানুষের মন যে কত ক্ষুধা, এতটুকু স্নেহ-করুণা পাবার প্রত্যাশায় সে যে উন্মুখ হয়ে বসে থাকে এবং যখন সে সে-বস্তুটি লাভ করে পরিতৃপ্ত হয়, তখনই সে বুঝতে পারে স্নেহ প্রীতি—ভালবাসার স্পর্শ মানুষকে কোথায় টেনে নিয়ে যায়, কত উদার, কত আনন্দঘন করে দেয় তার মন। অনুনয় খেতে খেতে আজ সেই অপার্থিব বস্তুটি উপলব্ধি করল, অনুনয়ের কেতাবী মন আজ এক প্রায়-নিরক্ষরা নারীর সেবা-যত্নের কাছে মাথা নোয়াল, তার ভিতরটা পূর্ণ হয়ে উঠল, একটি মাতৃহারা শিশু মাকে ফিরে পেয়ে যেন আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

অনেকক্ষণ বসে বসে খেল অনুনয়, বিমলা তার পাশে, একটু ক্ষণের তরেও সে কোথাও উঠে যায়নি।

খাওয়া শেষ করে অনুনয় অখিলবাবুর ঘরে চেয়ারে বসে তাঁর সংগে গল্প করতে লাগল। দেওয়াল ঘড়িতে এগারোটা বাজল। আর আধ ঘণ্টা পরেই তো শেষ ট্রেন। ইচ্ছা থাকলেও অনুনয় আর থাকতে পারল না, চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল।

অখিলবাবু চুরুট টানতে টানতে অনুনয়ের পিছু পিছু এসে সিঁড়ির মুখের কাছে দাঁড়ালেন?

বিমলা বলল, আসছে রবিবার সকালেই চলে আসবি, ওদিন মঞ্জুর জন্মতিথি। আসবি তো? না কি, বাড়ী গিয়ে নিমন্ত্রণ করে আসতে হবে।

আসব, দিদি।

এর পর আমরা একদিন তোর বাড়ীতে বেড়াতে যাব।

সে তো আমার সৌভাগ্য, কবে যাবেন, বলুন।

আসছে রবিবার বলব। আসিস যেন, না এলে মনে বড় দুঃখ পাব।

নিশ্চয়ই আসব, নামতে নামতে বলল অনুনয়।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাল অনুনয়, রঞ্জনা তার পিছনে দাঁড়িয়ে, আপাত অন্ধকারেও সে বুঝতে পারল রঞ্জনা হাসছে। সাজ বদল করেছে সে, দুতীয় মিহিপার শাড়ী, পাতলা লংক্লথের ব্লাউজ, খালি পা। অনুনয় হাসি ফিরিয়ে দিল, ভাল করে চেয়ে দেখল রঞ্জনাকে, এ আর এক রূপ তার, স্নিগ্ধ, কোমল, লাবণ্য ভরা একখানি মুখ।

রঞ্জনা বলল, ট্রেনের সময় হয়ে এল যে, আসছে রবিবার আসছ তো?

আসব নিশ্চয়ই দিদি যখন এত করে বললেন।

বিশেষ কিছু নিয়ে এসো না।

কেন?

এমনি বলছি। আচ্ছা, এসো।

তবু যেতে পারল না অনুনয়, বার বার দেখতে লাগল রঞ্জনাকে, পকেটে হাত ঢুকিয়ে সিগারেট বার করল সে, দেশলাই জেলে সিগারেট ধরাল, খানিকটা ধোঁয়া বার করে তাকাল পাশে। রঞ্জনা নেই, চলে গেছে।

রবিবার। আজ মঞ্জুর জন্মতিথি। খাবার আয়োজন দুপুরেই। বিশেষ কোন আড়ম্বর নেই। অখিলবাবু তাঁর নিমন্ত্রিত দুচার জন প্রতিবেশী এবং আত্মীয়ের সংগে বসে গল্প করতে করতে চা খাচ্ছেন। এখন সবে দশটা, খাবারের অন্ততঃ এখনও তিন ঘণ্টা দেরি। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা খুব বেশী না হলেও খাদ্যবস্তুর সংখ্যা অনেকগুলিতে দাঁড়িয়েছে। অনুনয় আজকের উৎসবে যেন একটু অভিনবত্ব এনে দিয়েছে, তার জন্যই যেন সকলে উন্মুখ হয়ে বসে অপেক্ষা করছে।

প্রায় এগারোটার সময় একখানি বাল্লালোর সিল্কের

গাড়ী নিয়ে অনুনয় রঞ্জনাদের বাড়ী এসে উপস্থিত হল। অখিলবাবু সকলের সঙ্গে অনুনয়ের পরিচয় করিয়ে দিলেন। অনুনয় চেয়ারে বসল, মঞ্জু এসে অনুনয়ের পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করল, মঞ্জুর হাতে সিল্কের শাড়ীখানি দিয়ে তার মস্তক স্পর্শ করে তাকে আশীর্বাদ করল।

কিন্তু অনুনয় বেশীক্ষণ বসতে পারল না অখিলবাবুর কাছে, মঞ্জু এসে তাকে ভিতরে ডেকে নিয়ে গেল।

বিমলা সামনে দাঁড়িয়ে ছিল, মুখে হাসি, অনুনয় বিমলাকে প্রণাম করল। বিমলা বলল, খাবার এখনও বেশ একটু দেরি আছেরে, এখন কিছু খেতেনে। এই বলে নিজেই পাশের ঘর থেকে এক প্লেট নোনতা আর মিষ্টি এনে অনুনয়ের সামনে রেখে বলল, খা, চা করে আনছি।

চা খেতে খেতে অনুনয় এদিক ওদিক তাকাতে লাগল, কিন্তু তপতীকে দেখতে পেল না? কাজের বাড়ী, সকলেই রয়েছে অথচ তপতী নেই কেন? চা খাওয়া শেষ করে সিগারেট ধরাল অনুনয়, ঘড়ি দেখল বারোটা বাজতে আর মাত্র মিনিট কতক বাকি।

হাসতে হাসতে বিমলা এসে অনুনয়ের সামনে দাঁড়াল।

আয়, একটা দৃশ্য দেখবি।

কি দৃশ্য, দিদি? কৌতূহল ফুটে উঠল অনুনয়ের কণ্ঠে। উঠে দাঁড়াল সে।

আয় আমার সঙ্গে?

অনুনয় বিমলাকে অনুগমন করল।

তিন তলায় একখানি ঝাকঝকে আকারের ঘর? ঘরের ভিতরে ধোঁয়া, দরজার পাশে বিমলা আর অনুনয় চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছে। অনুনয় লক্ষ্য করল অস্পষ্ট আলোয় তপতীর দু'পাশে খাবারের মত কি যেন সাজান রয়েছে আর তপতী প্রাণপণ চেষ্টা করছে তোলা উনুনটি জ্বালাতে, কিন্তু পারছে, না, ধোঁয়ায় ঘর ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। অনুনয় চুপ করে দাঁড়িয়ে তপতীকে দেখতে লাগল, এ যার এক রূপ তার, স্নানান করা দেহ, পরণে সাদা শাড়ী, সাদা ব্লাউজ, চুলগুলো এলো করে পিঠের উপর ফেলে দিয়েছে তপতী, অনুনয় সেই ধোঁয়ার ভিতর দিয়েই তপতীকে বার বার দেখতে লাগল।

বিমলা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না, হেসে ফেলল। বিমলার হাসির শব্দ পেয়ে রঞ্জনার চমক ভেঙে গেল, সে পিছন ফিরে দেখল সিঁড়ির পাশে অনুনয় তার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে আর মিটি মিটি হাসছে। একটু লজ্জিত হল রঞ্জনা। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তোমরা এখানে?

বিমলা চোখ রগড়াতে রগড়াতে বলল, তোমার কীর্তি দেখতে এসেছি, এখনও যখন উনুন ধরাতে পারছ না, ঠাকুর তো রয়েছে, দু'টো ঝি রয়েছে, তাদের একজনকে ডেকে আনলে চপ কাটলেট ভাজা কোন কালে শেষ হয়ে যেত?

রঞ্জনা কোন উত্তর দিল না, সে উনুনের পাশে বসে হাওয়া করতে লাগল পাখা দিয়ে।

বিমলা ধোঁয়ার ভিতর আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না, যাবার সময় সে রঞ্জনাকে উদ্দেশ্যে করে বলল, তোকে আর কষ্ট করতে হবে না তপু, আমি ঠাকুরকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, এদিকে যে একটা বাজে, সেদিকে খেয়াল আছে?

বিমলার শেষের দিকের কথাগুলি রঞ্জনার কানে গেল না।

অনুনয় রঞ্জনার সামনে এসে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে বলল, ব্যাপার কি?

উনুন ধরাতে পারছ না, আমি সাহায্য করব?

তোমাকে কিছু করতে হবে না, আমি একাই করব। অনেক দিন এসব ছেড়ে দিয়েছি, তাই একটু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। তুমি নীচে যাও।

তা নয় যাচ্ছি, কিন্তু তোমাকে এ-অবস্থায় ফেলে রেখে যেতে যে মন সরছে না।

রঞ্জনা হেসে ফেলল অনুনয়ের কথা শুনে।

অনুনয় বলল, দেখেছো তো, একলা উনুন ধরান যায় না, লক্ষ্মীর দরকার, সাহায্যের দরকার। ওঠ, আমি অনেকদিন এই কাজটি করেছি।

অনুনয় উনুনটি দু'চারবার নাড়াচাড়া করল, কতকগুলো কয়লা ফেলে দিল, মিনিট খানেক পাখা দিয়ে বাতাস করল, ধোঁয়া অনেক কমে গেল, উনুন জ্বলে উঠল।

তখন সে রঞ্জনার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, বল, আর কি করতে হবে ?

হেসে ফেলল রঞ্জনা, বলল, তুমি নীচে যাও, আর কিছু করতে হবে না, অনেক করে দিয়েছ যাও, লোকে কি বলবে ? আবার হাসল রঞ্জনা।

ঠিক সেই সময় ঠাকুর এসে দাঁড়াল ওদের সামনে। অনুনয় রঞ্জনার মুখের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে নীচে নেমে গেল।

ঠাকুরেরও সাহায্য নিল না রঞ্জনা, সে নিজেই চপ-কাটলেটগুলি ভাজতে লাগল। রঞ্জনা জানে অনুনয় এই খাবারগুলি খেতে খুব ভালবাসে, দেশে থাকতে কতদিন সে এই খাবারগুলি নিজের হাতে তৈরী করে অনুনয়কে খাইয়েছে। কিন্তু আজ যেন রঞ্জনার কাছে সব বেসুরো ঠেকতে লাগল, কোথায় যেন সুর কেটে গেছে ; রঞ্জনা আধ ঘন্টার মধ্যেই খাবারগুলি ভেজে নিয়ে নীচে নেমে এল।

সন্ধ্যা পর্যন্ত অনুনয় রঞ্জনাদের বাড়ীতে থাকল, পরমানন্দে কয়েক ঘন্টা তার কেটে গেল, ভীড়ের মধ্যে রঞ্জনার সংগে দুটি বিনিময় ছল বার করেছে, কিন্তু কথা বলবার সুযোগ পেল না।

মাস খানেক পরে এক রবিবারের বিকালের দিকে সকলকে নিয়ে অনুনয়ের সোনাই পুরের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলেন অখিলবাবু। অনুনয় সাদর অভ্যর্থনা করল অখিলবাবু আর বিমলাকে, রঞ্জনা ঘুরে ঘুরে অনুনয়ের উপর নীচের ঘরগুলি দেখতে লাগল। ছাত্রদের সংগে আলাপ করল রঞ্জনা, সবলেই দুষ্টু, এক-রকম অনুনয়ের দয়াতেই যেরেপরে লেখা-পড়া শিখছে তারা। সব দেখেশুনে গম্ভীর হয়ে উঠল রঞ্জনার মুখ, ছাত্ররাও বুদ্ধিদীপ্ত মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

• •

বছর খানেক কেটে গেছে, কখনো, দৈবাৎ রঞ্জনাদের বাড়ী যাওয়া ঘটে উঠত অনুনয়ের। মাঝে মাঝে ইচ্ছা করেই সাক্ষাতের দিন পিছিয়ে দিত সে। লোক মারফত বিমলার কাছ থেকে চিঠি আসত, অনুনয় আকাশের দিকে তাকাত, সবুজ পাতার দোলা দেখত, একটা ভাল দিনের জন্য অপেক্ষা করত সে, একটা দিনের মত দিন। তারপর অখিলবাবুর আবির্ভাব হত অনুনয়ের বাড়ীতে। চুরুটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলতেন তিনি, তোমার কি আমাদের ওপর অভিমান হয়েছে ?

হেসে বলত অনুনয়, বড় ব্যস্ত, পরীক্ষা চলছে যে, খাতা দেখে আর সময় করে উঠতে পারছি না, সব ভাল তো ?

তা এক রকম চলেছে, রঞ্জুর পরীক্ষা সামনে, তোমার কাছে সে কিছু পড়া বুঝে নিতে চায়, বলেছে তোমাকে সংগে করে নিয়ে যেতে।

অনুনয় অখিলবাবুর সংগে চলে আসত রঞ্জনাদের বাড়ীতে। অনুনয় ভাবত মনে মনে : কিন্তু আজও তো সে সময় নয়, সে আকাশ কৈ ? তপতী কৈ ? রঞ্জুকে পড়া বুঝিয়ে দিয়েই সে বাড়ী ফিরে আসত।

বিমলা অখিলবাবু আশা করছেন, বিশেষ করে বিমলা অনুনয়-তপতীর পুরোন ভালবাসা আবার নতুন রূপ নিয়ে জেগে উঠবে, ওদের মিলন হবে, ওদের মিলনই তো বাঞ্ছনীয়। তাই বিমলা প্রথম থেকে চেষ্টা করে আসছে ওদের মিলন ঘটাবার জন্য, অনুনয়ের মন বুঝে নিতে বিমলার বিলম্ব হয়নি, অনুনয়কে সে তপতীর অগোচরে জিজ্ঞেস করেছে, অখিলবাবুও অনুনয়কে বলেছেন, চাড়া এসেছে অনুনয়ের কাছ থেকে, কিন্তু তপতীর মন যে একেবারে উদাসীন, হিমশীতল। তবুও আশা ছাড়েনি বিমলা, নারীর মন দিয়ে সে বিচার করে দেখেছে এবং বিশ্বাসও করে তপতীর নারী-মন একদিন মোমের মত গলবেই, ওদের মিলন অবশ্যম্ভাবী !

হঠাৎ পর পর দুটো ছুটির দিন এগিয়ে এল, অনুনয় ভাবতে ভাবতে একটা চিঠি লিখে বসল : আসবে ? হাতে সময় নিয়ে এস, অন্ততঃ একটা দুপুর আর বিকেল। কয়েকটা কথা যায়ামারি করছে মনের মধ্যে, একটা মীমাংসা হওয়া দরকার ; যদি না আস, বুঝব আমার চিঠির উত্তর দিলে না।

রঞ্জনাও কি মনে মনে কোন উত্তর খুঁজছিল ? হাল্কা চিঠি, খাম ছিঁড়ে সাদা কাগজে কয়েকটা পংক্তি অনেক

অন্যমনস্ক ভাবে বিকেল, রাস্তার ধুলোতে চড়ুইরা উলঙ্গ হয়ে আছে, উন্মুক্ত আকাশের দিকে একা মনে তাকিয়ে আছে রঞ্জনা, এমন রূপের, সুদূরপ্রসারী আকাশ সে কলকাতায় বসে দেখতে পায় না, বেশ ভাল লাগছিল তার।

চা খেতে খেতে অনুনয় বলল, তোমার জন্য একটা কাজ ঠিক করে ফেলেছি, তপতী করবে তো?

কি কাজ? চোখে কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞেস করল রঞ্জনা।

এখান থেকে মাইল তিনেক দূরে একটি গার্লস হাই স্কুল হয়েছে, আমি তার সেক্রেটারি। তোমার জন্যে শিক্ষিকার একটি আসন খালি রেখেছি। আজই দরখাস্ত দিয়ে যাও। এই বলে ভিতর থেকে টাইপ রাইটার এনে রঞ্জনার সামনে রাখল অনুনয়।

মুখে মৃদু হাসির রেখা টেনে রঞ্জনা বলল, ঠাট্টা করে ফেলেছ? অনুনয় বলল, তোমার কোন অসুবিধে হবে না, ইস্কুলের কাছেই শিক্ষিকাদের কোয়ার্টার, ইচ্ছা করলে সেখানেও থাকতে পার, খরচও কম। বি.টি পরীক্ষাটা দিয়ে ফেল, একটু পরিশ্রম করলেই পারবে তা হলে হেড মিস্ট্রেস হতে পারবে ভবিষ্যতে এম-এ পরীক্ষার জন্যও তৈরী হও এখন থেকে, আমি বই জোগাড় করে দেব।

এই বলে অনুনয় রঞ্জনার দরখাস্ত টাইপ করতে লাগল আর রঞ্জনা নির্বাক হয়ে অনুনয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

টাইপ করতে করতে অনুনয় জিজ্ঞেস করল, তুমি যে ইস্কুলে কাজ করছ কি নাম তার?

নাম বলল রঞ্জনা।

কত বছর কাজ করছ?

তা প্রায় দু'বছর হল।

আগে আর কোথাও কাজ করেছ?

না।

তুমি কি এম-এ কোর্স কমপ্লিট করেছিলে?

না।

রঞ্জনা যেন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল, মনে হল একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল সে।

অনুনয়ও একটু ভেবে নিল, তারপর আবার টাইপ করতে লাগল। মিনিট পাঁচেক পরে টাইপ কপিখানা রঞ্জনার হাতে দিয়ে অনুনয় বলল, পড়ে দেখ, ঠিক আছে কিনা।

রঞ্জনা মন দিয়ে পড়ল, হেসে বলল ঠিক আছে।

তাহলে সই করে দাও। অনুনয় উঠে ভিতর থেকে কলম এনে রঞ্জনার হাতে দিল।

রঞ্জনাকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে অনুনয় বলল, ওকি! ভাবছ কি? সই কর। অনুনয়ের মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেলল রঞ্জনা!

ও বুঝতে পেরেছি অনুনয় হাসতে হাসতে বলল, কি নাম লিখবে তাই ভাবছ? ঠিক আছে—তোমার আসল নাম লেখ—তপতী চক্রবর্তী আর ঠিকানা দাও তোমার জামাইবাবুর বাড়ীর।

দ্বিরুক্তি না করে রঞ্জনা তাই লিখে কাগজখানি অনুনয়ের হাতে দিল। অনুনয় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, আজ থেকে তুমি আবার তপতী চক্রবর্তী নামে সকলের কাছে পরিচিত হবে বুঝলে? সকাল বেলার চায়েলী আর রাত্রিবেলার মল্লিকা হয়ে বেড়ালে আর চলবে না। বুঝলে?

তপতী খিল খিল করে হেসে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল।

সন্ধ্যা হয়ে এল, অনুনয় বেশ বদল করতে ঘরে ঢুকল, তাকে আজ আবার তপতীদের বাড়ী যেতে হবে, রঞ্জুর পরীক্ষা, তার উপর সে প্রায় মাস খানেক ওখানে যায়নি, অখিলবাবুও অসুস্থ।

তপতী নিচে নেমে এসে রমেন আর তার সঙ্গীদের সঙ্গে আলাপ করছিল। অনুনয় এসে তপতী বলল, চল।

রাস্তায় অনুনয়ের হঠাৎ মনে পড়ে গেল কিছুই তো বলা হয়নি তপতীকে।

কি বলতে চেয়েছিল অনুময় ? হঠাৎ সে তপতীর চাকরির জন্যেই বা এত ব্যস্ত হয়ে উঠল কেন ? নিজেকে একটু সময় দিল অনুময়, কিংবা তিরস্কার কি ?

ধরানগরের কাছে যে ইস্কুলে কাজ করত তপতী, সেখানকার কাজে ইস্তফা দিয়ে অনুময়ের ইস্কুলে যোগ দিল, বেতনও একটু বেশী হল তার, অনুময়ের উপদেশ মত সে বি টি পড়তে লাগল, বি টি পরীক্ষার পর এম এ প্রাইভেটে পড়ে ফেলবে তাও ঠিক করে ফেলল সে। তপতী যেন আবার নূতন উদ্যম ফিরে পেল, হতাশ ভাব তার মন থেকে দূরে সরে গেল, তার চেহারাও বদলে যেতে লাগল ধীরে ধীরে। মুখে লাবণ্য এল, স্নিগ্ধতা এল, কাজের মধ্যে ডুবে গেল তপতী, ছাত্রীপক্ষ বিশেষ করে কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষিকার দল তার নির্ভীকতা এবং কর্মনৈপুণ্য দেখে বিস্মিত হল।

আগে তপতীর সঙ্গে অনুময়ের মাসে একবার কি দুবার দেখা হত, অনুময়কে যেতে হত বালীগঞ্জে অখিলবাবুর বাড়ী, তবে সে তপতীর দেখা পেত : এখন তপতীকে প্রায় আসতে হয় অনুময়ের সোনারপুরের বাড়ীতে ইস্কুলের কাজে, শুধু সে একাই নয়, হেড মিস্ট্রেস আসেন, আরও অনেকেই আসেন, যাতে বছর দুয়েকের মধ্যে ইস্কুলেটিকে মাল্টিপারপাস করা যায় তার প্রাণপণ চেষ্টা চলেছে। ইস্কুলের শিক্ষকতা ছাড়া তপতীকে আর একটা বাড়তি কাজ দিয়েছে অনুময়।

দেখতে দেখতে দুটি বছর কেটে গেছে, বি টি পাশ করে ফেলেছে তপতী, ইস্কুলের সে এখন একজন নাম করা শিক্ষিকা, মেয়েদের আদরের তপতীদি।

কর্তৃপক্ষ তপতীর কর্মশক্তি দেখে বিস্মিত। মানুষের তো এত কর্মশক্তি হতে পারে না। তপতী চক্রবর্তী কি একটি যন্ত্র ? কাজ হাতে এলে তপতীদি সব ভুলে যান, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, দিন-রাত্রির কথা তাঁর মনেই থাকে না। অদ্ভুত চরিত্রের মেয়ে তপতী চক্রবর্তী। সকলের শ্রদ্ধা আর বিস্ময়ের পাত্রী হয়ে উঠল তপতী।

কিন্তু একটি দিকে গোল বাধল ; যতই দিন চলে যেতে লাগল ততই অনুময় আর তপতীকে কেন্দ্র করে নানা রকমের গুঞ্জন শুরু হতে লাগল, বিশেষ করে ইস্কুলের অনূঢ়া শিক্ষিকাদের মহলে। হাসাহাসি হত, তপতীর সঙ্গে রসিকতা চলত, তপতী অবশ্য বিশেষ কিছু বলত না, অনুময়ের কানেও আসত, সব চাইতে বেশী কলরব উঠত সোমবার যদি রবিবার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অনুময়ের সোনারপুরের বাড়ীতে তপতী থাকত।

কিন্তু গুঞ্জন থামল না, আরও বেড়ে গেল, ইস্কুলের সেক্রেটারি আর শিক্ষিকার মধ্যে প্রেম, শত্রু পক্ষ এদের নামে কুৎসা রটিয়ে বেড়াতে লাগল দুজনেই অবিবাহিত, দুজনেই ইস্কুলের সঙ্গে নিবিড় ভাবে জড়িত, একটু সংযত না হয়ে পারল না ওরা, তপতী ভয় পেল।

এতদিন ধরে যা সে তৈরী করেছে তা কি এমনি করে নষ্ট হয়ে যাবে ? আবার কি তার জীবনে বিপর্যয় এল ? জীবনে একবার সে কোন কিছুকে অবলম্বন করে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছে, তখনই সে ব্যর্থ হয়েছে, কোথা থেকে এক রাশ কালো মেঘ এসে তার জীবনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। নৈরাশ্যের সুর বেজে উঠল তপতীর মনে।

দিন কতক পরে।

সোনারপুরের বাড়ীতে

তপতী চা খাচ্ছিল।

অনুময় বলল, তপতী, বিপদ ঘনিয়ে এসেছে

অনুময়।

কি রকম ?

কি রকম ! বুঝতে পারছ না, শুনতে পাচ্ছ না ? আবার হাসল অনুময়। তার মানে ? কি বলতে চাইছ।

লোকের মুখে মুখে অনেক মিথ্যে ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। একটা কিছু করা দরকার, আর তো ভাববার সময় নেই।

এতদূর ? কিন্তু কি করবার আছে ? হেসে বলল তপতী।

আছে, আমি তোমাকে বিয়ে করব, তপতী।

তপতী চমকে উঠল, একটু নয়, আমূল চমকে উঠল সে। এ মন দেয়া নেয়া খেলা নয়, কঠিন বাস্তব। মনের আকাশ থেকে এক ধাক্কায় অনুরাগের লাল মেঘ উড়ে গেল ? বদনামের ভয়ে বিয়ে ?

হঠাৎ হল কি তোমার? অধীরকণ্ঠে গলার অনন্যুর বলল।

তপতী অন্য দিকে মুখ ফিরাল? ভালবাসা? আজ-ও সে ভালবাসার খোঁজ করবে না কি? তবে কেন সে পাখা নাচিয়ে উড়ে এসেছিল সেই আলোর দিকে, যে আলোয় একদিন পুড়ে গিয়েছিল তার পাখা?

আজ যেন নূতন করে পোড়া-ঘা ব্যথায় টন টন করে উঠল?

বিকেলের আকাশে কোথা থেকে উড়ে এল এক টুকরো হালকা মেঘ। এক ঝলক হাওয়ায় দুলে উঠল আমের পাতা? ঐ হাওয়া এসে লাগল তপতীর মুখে, চুলে, শাড়ীর আঁচলে? অনুনয় তার চিবুকে আঙুল দিয়ে মুখ ফিরিয়ে দিল।

হঠাৎ আবার তোমার এ খেয়াল হল কেন অনুনয়? বেশ তো আছ?

তুমি কি ভেবে দেখেছ? না—

ভাববার আর কিছু নেই তপতী? অনুনয় হাতের সিগারেটটা ঘষিয়ে নিল? মনে করো না বদনামের ভয়ে বিয়ে করছি তোমায়, ওটা একটা উপলক্ষ্য মাত্র? আজ মনে হচ্ছে সত্যিই তোমাকে চাই, আমার নিজেরই প্রয়োজনে? আরও শুনতে চাও?

কি? তপতী একদিন ভেবেছিল তার জীবনে সমস্ত বিস্ময়ের শেষ হয়ে গেছে।

অনুনয় বলল, আমি তোমাকে ভালবাসি বলেই বিয়ে করতে চাই।

তপতী কথা বলল না? বসে রইল চুপ চাপ? সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল।

এক সময় তপতী বলল, এবারে যাই।

অনুনয় নীরবে সিগারেট টানতে লাগল?

বিমলা-অখিলবাবু সত্যিই নিশ্চিন্ত হয়েছেন, বিশেষ করে বিমলা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে? মা বাপ-মরা ছন্নছাড়া বোন তার: সে যে আজ সংসারী হবে, সমাজের দশজনের মাঝে একজন হয়ে বেড়াবে স্বামী-পুত্রের হাত ধরে এতো পরম আনন্দের কথা। সত্যিই বিমলার মন আনন্দে নেচে উঠল, তার ওপর অনুনয়ের মত পাত্র কে-কোন অনূঢ়া মেয়ে না তাকে স্বামী রূপে নিতে চাইবে? বিমলা মনে মনে ভগবানকে প্রণাম করল, তপতী যে শেষকালে এ বিবাহে সম্মতি দিয়েছে তাতে একটু আশ্চর্য হবার আছে বৈকি? যে একরোখা মেয়ে তপতী!

বিবাহের দিন স্থির হয়ে গেছে, জ্যৈষ্ঠের প্রথম সপ্তাহে। তখন ইস্কুল গ্রীষ্মাবকাশের জন্য বন্ধ থাকবে, অনুনয়ের সোনারপুরের বাড়ীতে কোন ঝামেলা থাকবে না, ছাত্ররা যে যার বাড়ী চলে যাবে।

অখিলবাবুর ইচ্ছা বিবাহ হিন্দু মতেই হোক, বাড়ীতে পুরোহিত এনে, একটু ঘটা করে, কিন্তু অনুনয় আর তপতীর দিক থেকে একটু আপত্তি এল বলে অখিলবাবু আর বেশী পীড়াপীড়ি করলেন না।

বুড়ো বুড়ীর বিয়েতে আবার ঘটা কিসের? রেজেস্ট্রী অফিসে আধ ঘণ্টার ঝামেলা, সেই তো ভাল। আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদের নিমন্ত্রণ? সে সব তো দিন কতক পরে করলেই চলবে, ইস্কুল কলেজ খুললে, তাতে অনুনয় আর তপতীর দিক থেকে একটু ভালই হবে। রেজেস্ট্রী অফিসে ওদের নাম লটকে দেওয়া হয়েছে।

বিবাহের আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি। সন্ধ্যার কিছু আগেই বাড়ী ফিরেছে অনুনয়। খুব গরম পড়েছে আজ অনুনয়কে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। পাঞ্জাবী খুলে স্নান ঘরে ঢুকল অনুনয় মিনিট কতক পরেই স্নান করে বেরিয়ে এল। কিছুদিন আগে বাড়ীতে ইলেকট্রিক এসেছে, হিটারে চায়ের জল বসিয়ে দিল অনুনয়।

মিনলা একখানি নূতন খাট কিনে পাঠিয়ে দিয়েছে, তার সংগে শয্যাও। অনুনয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল খাটখানিকে। খানিক পরে এগিয়ে এসে সে বসল খাটের নরম বিছানায় পা ঝুলিয়ে যেন কেউ রয়েছে খাটের উপর ঘুমন্ত; একটু খড়লেই তার ঘুম ভেঙ্গে যাবে।

হঠাৎ অনুনয়ের দৃষ্টি পড়ল সিঁড়ির দিকে। ধীরে ধীরে স্মিত মুখে উপরে উঠে এল তপতী।

তুমি! এসো। এসো। অনুনয় এগিয়ে গেল তপতীর কাছে।

হঠাৎ এলে না—বলে—কয়ে, ব্যাপার কি বল তো।

কেন, আমাকে কি এখন আসতে নেই? তোমাদের শাস্ত্রে বুঝি নিষেধ আছে?

দু'জনের চোখোচোখি হল, দু'জনেই হেসে ফেলে।

চা খাবে?

বেশ তো।

সংগে আর কিছু?

সামান্য কিছু যা হোক। তুমি বস, আমি চা করছি।

আবার দু'জনে হাসল।

অনুনয়ের শোবার ঘরের ঠিক পাশেই বসবার ঘর, সোফার উপর ওরা দু'জনে পাশাপাশি বসে গল্প করতে করতে চা খাচ্ছিল। বাড়ী নিস্তব্ধ ছাত্ররা যে যার বাড়ী চলে গেছে, কি কাজ সেরে চলে গেছে।

জানালার ফাঁক দিয়ে দেখল অনুনয় হঠাৎ সারা আকাশ মেঘে ভরে গেছে, এখনই বোধহয় কাল বৈশাখীর প্রলয় নৃত্য সুরু হবে। হঠাৎ এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস তপতীর মুখের উপর এসে ভেঙে পড়ল। তপতী উঠল জানালাগুলো বন্ধ করে দিয়ে অনুনয়ের পাশে এসে বসল।

বাইরে ঝড় সুরু হল তবে খুব তীব্র বেগে নয়।

ঘরের মধ্যে মৃদু বাতি জ্বলছে, আধো অন্ধকার।

অনুনয় তপতীর পাশে বসে আছে, বারবার খুব বেশী নয়, এত কাছাকাছি তারা বোধহয় কখন বসেনি, বিশেষতঃ এই রূপ নির্জন আরামদায়ক পরিবেশে। অনুনয়ের হঠাৎ মনে হল তার দেহ থেকে যেন আর একটি অনুনয় বেরিয়ে এল, অনুনয় বুঝে নিল এ অনুনয়কে, এ অনুনয়ের সংগে তার খনিষ্ঠ সম্বন্ধ এক আর দিনের নয়, বহু জন্মের বহু যুগযুগান্তের। অনুনয় চুপ করে বসে দেখতে লাগল। তপতীও নিশ্চুপ হয়ে সামনের দিকে চেয়ে বসে কি যেন ভেবে চলেছে, গম্ভীর মুখ তার।

এ অনুনয় তপতীকে ইঙ্গিত করল, তপতীও অনুনয়ের ইঙ্গিতে একটু সাড়া দিল। দু'জনেরই যেন বাস স্খলিত অনুনয়ের সামনে এসে দাঁড়াল আর একটি তপতী, আদিম দুটি নর নারী।

অনুনয় তপতীর কোমর বেষ্টন করে ওকে আরও কাছে টানল। আকর্ষণ যেন একটু অতর্কিত, তাই তপতী ঝুঁকে পড়ল তার বুকের উপর। ইচ্ছা সত্ত্বে তখনই সোজা হয়ে বসল না তপতী, একটু সময় নিল।

তপতীর চেহারা যেন বদলে গেল।

তার ব্লাউজের বোতাম খুলে ফেলল অনুনয়।

আর তপতীর কোথায় যেন একটা পুরানো ক্ষত টন টন করে উঠল। তীব্র দৃষ্টিতে অনুনয়ের মুখের পানে তাকাল তপতী, দেখল অনুনয়ের সারা মুখ কামনায় লাল হয়ে উঠেছে, ভয় পেল তপতী আবার তার চেহারা বদলে গেল, অনুনয়ের হাত সরিয়ে কটকা মেরে তার কাছ থেকে একটু দূরে সরে এল দেখল অনুনয় এক দৃষ্টে তার দিকে চেয়ে আছে। তপতী বলল, দাঁড়াও বাতিগুলো জেলে দি, কেমন যেন বিষণ্ণ মনে হচ্ছে চারিদিক।

ঘরের বাতি জ্বালল সে, গেল অনুনয়ের শোবার ঘরে, বাতির সুইচ নামিয়ে বক বকে বিছানাটার দিকে একবার তাকাল সে।

অনুনয় কখন তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে? দুহাত দিয়ে তপতীকে বেষ্টন করল অনুনয়? অনুনয়ের নিশ্বাস

লাগল তপতীর কানের কাছে কঠিন বাহু বন্ধন, তপতীর নিশ্বাসটা ও ভারী হয়ে এল? শিউরে উঠল তার সমস্ত শরীরটা, কিন্তু এখন এক অব্যক্ত চেতনার শিহরণ? অনুনয় তাকে মৃদু ধাক্কা দিয়ে নিয়ে গেল খাটের কাছে।

অনুনয় অস্ফুট কণ্ঠে ডাকল, এসো তপতী।

তপতী বার বার কাঁপতে লাগল। এ ডাক সে শুনেছে, মনে আছে তার কিন্তু এমন ডাক নয়? অনুনয়ের ঠোঁটের স্পর্শ—তার ঠোঁটটা পুড়ে গেল যেন।

বেদনার অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল তপতী, অনুনয়ের মুখটা জোর করে সরিয়ে দিয়ে বলল, থাক থাক, আজ তুমি আমায় ক্ষমা কর।

অনুনয় ওকে মুক্ত করে দিল, বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইল সে তপতীর মুখের দিকে, এতদিন যাকে দেখে এসেছে, জেনে এসেছে, আজকের এই প্রাক সন্ধ্যার এই নারীর সঙ্গে সে তপতীর কোন মিল খুঁজে পেল না অনুনয়। হঠাৎ ওরা দুজনে কোথায় মিলিয়ে গেল। দর্শনের অধ্যাপক সোফায় বসে চমকে উঠল, আর মনোরমা বালিকা বিদ্যালয়ের ভাবী প্রধান শিক্ষয়িত্রী হেসে হেসে বলল, এতক্ষণ কি করছিলো? স্বপ্ন দেখছিলে?

অনুনয় যেন একটু লজ্জা পেল, বলল, স্বপ্ন! তা একটু দেখছিলাম বৈ কি। তপতীর মুখের দিকে বেশ ভাল করে তাকাল অনুনয়।

স্বপ্ন দেখা ভাল নয়। সোফা থেকে উঠে তপতী, বৃষ্টি থেমে গেছে, আমি আসি আজ।

যেয়ো না এখন, একটু বস। তপতীর হাত ধরে অনুনয় আবার তাকে বসিয়ে দিল সোফার উপর।

অনুনয় বলল, এসো, একটু কফি খাওয়া যাক। এখনও টিপি টিপি বৃষ্টি পড়ছে।

আমার কফি? বাড়ী গেতে যে রাত্তির হয়ে যাবে।

বাড়ী? তোমার বাড়ী তো এখন এই খানে। এখনও মনের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব!

তপতী হেসে বলল, মমনি বাবুর প্রাণে লাগল, আচ্ছা আর বলব না।

কফি খেতে খেতে অনুনয় বলল, তপতী।

বল।

দিদি কি সুন্দর খাট-বিছানা দিয়েছেন পাঞ্জ তো।

নিশ্চয়? আমরা তিন জনে এক সঙ্গে পছন্দ করে কিনে এনেছি।

তুমিও তাহলে ছিলে? তাই এত সুন্দর হয়েছে, হাসল অনুনয়, সিগারেট ধরাল।

তপতী বলল, বৃষ্টি একেবারে থেমে গেছে, আমি উঠি, আমাকে আর আটকে রেখো না।

অনুনয় ঘড়ি দেখল, আচ্ছা চলো, তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

মিনিট পাঁচেক পরে বেল বাজল করে তপতীর সামনে এসে দাঁড়াল অনুনয়। তপতীর মুখের দিকে তাকাল অনুনয়, পাঞ্জাবির পকেট থেকে একখানি চিঠি বার করে বলল, এটার আর কোন প্রয়োজনে আছে, তপতী?

কোনটির?

এই চিঠিখানির? তুমি প্রায় বছর পনর আগে পাগলামি করে আমাকে লিখেছিলে, রবীন্দ্রনাথের লাবণ্যর ভাষায় বলেছিলে—

মোর তরে করিয়ো না শোক।
আমার রহিল বিশ্বলোক।

• •

● অভিজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসক
● রকমারী ফ্রেম
● বিদেশী লেন্স
● সুলভ মূল্য

স্বাগত জানাই

১৭২এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড
(সাদার্ণ এ্যাভেনিউর মোড়)
কলিকাতা-২৬

হে বন্ধু, বিদায়।

মনে পড়ে?

ভুলে গেছি। হাসল তপতী।

তাহলে ছিঁড়ে ফেলি?

না, ছিঁড়ো না, থাক না চিঠিখানা, মাঝে মাঝে দেখব, আর দুজনে হাসব।

কোন দরকার নেই আর এই চিঠির। এই বলে চিঠি খানা ছিঁড়ে ফেলল অনুনয়।

তপতী যেন থমকে উঠল, ছিঁড়ে ফেললে? ছিঁড়ে ফেললে? রাখলেই পারতে।

অনুনয় তপতীর কথার কোন উত্তর দিল না। শুধু তাপতীকে উদ্দেশ্য করে বলল, চল। ওরা দুজনে নিচে নেমে এল। বাড়ীর সামনেই বাস এসে থামবে।

কথা আছে অনুনয় তার এক মামাকে একদিনের নোটিশ থেকে তুলে নিয়ে অখিলবাবুর বাড়ী আসবে? সেখান থেকে এক সংগে সবাই যাবে রেজিষ্ট্রারের বাড়ী? বিমলাও থাকবে।

বিকেল প্রায় চারটে? অখিলবাবু তৈরী, সকালের বাসি কাগজ দেখতে দেখতে ঘড়িটা আর একবার দেখলেন তিনি, চারটে দশ; তাহোক, সাতটা—সাড়ে সাতটায় রেজিষ্ট্রারের বাড়ী পৌঁছবার কথা চুরুটে টান দিলেন একটা বেশ বড় করে।

তপতী দোতলায় তার ঘরে এই তৃতীয়বার শাড়ী বদলাল। বেনারসী ছেড়ে মুর্শিদাবাদ পরেছিল, ঘন নীল, সোনালী কুলের শাড়ী। সেটা ফেলে পরল লাল-কমলা-টাংগাইল, রঙীন ব্লাউজ খুলে পরল সাদা ব্লাউজ, ঘড়ি দেখল চারটে পনের, জানালার কাছে গিয়ে রাস্তা দেখল, ঐ একটা ট্যাক্সী দেখা যাচ্ছে, বুকের মধ্যে ধক ধক করে উঠল তার, মাটিতে যেন পা আটকে রইল। ট্যাক্সী চলে গেল, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল তপতী, মুখ থেকে স্নো আর পাউডার বেশ ভাল করে মুছে ফেলল।

কট করে হাত ব্যাগটা তুলে সে দরজার বাহিরে এসে দাঁড়াল পা টিপে টিপে নামল সিঁড়ি দিয়ে, ঘাড় উঁচু করে তাকাল এদিক ওদিক; তারপর আস্তে আস্তে বারান্দা পেরিয়ে পাশের দরজা দিয়ে পথু গলিটায় নেমে এল। এ-গলিতে ট্যাক্সী ঢোকে, বড় রেহাই করে ফেলেছে সে। ক্ষিপ্র পায়ে এগিয়ে গেল সামনের বড় রাস্তার দিকে। বড় রাস্তা। ভাগ্যক্রমে খালি ট্যাক্সী যাচ্ছিল, হাত দিয়ে থামাল সে, উঠে পড়ল। পিছনে হেলান দিয়ে কয়েক মুহূর্ত বুকের ধুকপুকি-পিটা শুনল।

কোন্ দিকে যাব? জিজ্ঞেস করল ড্রাইভার।

কোন দিকে? তপতী মুখ তুলল, গাড়িতে তেল আছে আপনার?

কতদূর যাবেন আপনি?

সোনার পুর।

আছে, চলুন।

অনুনয়ও তপতীদের বাড়ী আসবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে: শান্তিপুরী ক্রিপার ধুতি পরেছে, গায়ে দামী ঘটকার পাঞ্জাবী, পায়ে কালো পাম্প শু। দীর্ঘ স্বাস্থ্য-কমনীয় গৌরবর্ণ দেহ অনুনয়ের, বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি চলেও আজ তাকে মনে হচ্ছে বিশ বছরের এক যুবক। বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘড়ি পরতে পরতে অনুনয় নিজের চেহারাটা একবার ভাল করে দেখে নিল, মনে মনে একটু গর্ব বোধ করল, সে তার মনে হল যেন সারা বাড়ীটা কারাময় হয়ে উঠছে; আর তো মাত্র ঘণ্টা কয়েক বাকি, তারপর তপতী এসে সত্যিই তো এ-বাড়ীর সব কিছুকে কারাময় করে তুলবে। মনে মনে রবীন্দ্র সংগীতের একটি পংক্তি আওড়াতে লাগল অনুনয়।

ড্রয়ার খুলে শ' খানেক টাকার নোট বার করে অনুনয় মনিব্যাগে রাখল, ঘড়ি দেখল পাঁচটা বাজে, আর দেরি করা উচিত নয়, অখিলবাবুর বাড়ীতে অনেকেই তার জন্য অপেক্ষা করছে।

বিবাহোৎসবের কয়েকটা দিনের জন্য বিমলা অনুনয়ের বাড়ীতে একটি ঠাকুর আর একটি চাকর পাঠিয়ে দিয়েছে। অনুনয়ের সম্পর্কের এক খুড়তুতো বিবাহিতা বোন এসেছে, সে অবশ্য এখন বাড়ীতে নেই অখিলবাবুর বাড়ীতে, সেও রেজিষ্ট্রারের বাড়ী যাবে, সে ওদের বিবাহ দেখবে, ও রকম বিবাহ জন্মে কখনও দেখেনি, তবে শুনেছে, আজ সে দু'চোখ দিয়ে দেখবে।

অনুনয় তার শোবার ঘর বন্ধ করে বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। চাকরকে ট্যাক্সি আনতে বলল।

মিনিট পাঁচেক পরেই ট্যাক্সি এসে অনুনয়ের বাড়ীর দরজার সামনে দাঁড়াল।

অনুনয় নিচে নামবার জন্য সিঁড়িমুখের কাছে এগিয়ে গেল।

কিন্তু একি! এ যে তপতী! বিবর্ণ পাংশু বর্ণ মুখ? তপতীকে দেখে অনুনয় একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল? অনুনয়ের মন সংশয়ে পূর্ণ হয়ে উঠল. তাহলে অখিলবাবু কি তাদের এ বিবাহে সম্মতি দেননি, বাড়ীতে কি কোন অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে তাদের কেন্দ্র করে তাই কি তপতী তার কাছে চলে এসেছে?

কি হয়েছে, তপতী? তুমি এমন এলে কেন?

তপতী কোন কথা বলল না, শুধু ইঙ্গিত করল।

অনুনয়ের শোবার ঘর।

অনুনয় চেয়ারে বসে আছে, বিষাদ আর সংশয়ে মুখখানা যেন কালো হয়ে গেছে তার, অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সে তপতীর মুখের দিকে; তপতী খাটের পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, উদাসীন দৃষ্টি তার।

কি হয়েছে মুখফুটে সব বল, কেউ কি আমাদের এ বিবাহে বাধা দিয়েছে?

তপতী নিরুত্তর।

বল, তপতী, সারা পৃথিবী বেঁকে দাঁড়ালেও আমাদের এ-বিবাহ হবেই। চল, এখনই চল, ট্যাক্সি বোধহয় এখনও দাঁড়িয়ে আছে, ভয় কি!

তপতী অনুনয়ের মুখের দিকে চাইল, ঠোঁটের কোণে যেন একটু হাসি ফুটে উঠল তার।

অনুনয় যেন বুকে বল পেল, তপতীর মৃদু হাসি তাকে আরও মুখর করে তুলল। মিনিট পাঁচেক আপন মনে কথা বলে গেল অনুনয়, তপতী নিরুত্তর, স্থির। কথা কও, তপতী, কথা কও, আমাকে আর অন্ধকারে রেখো না। বল। তপতী অনুনয়ের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে রইল। অনুনয় চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে দাঁড়াল তপতীর সম্মুখে।

বল, কি হয়েছে।

অনুনয় লক্ষ্য করল তপতীর চোখ দুটো অত্যন্ত স্থির, বুকখানি কেবল ওঠা-নামা করছে ধীরে ধীরে।

বল, তপতী, বল। অনুনয় তপতীর বাঁ হাত স্পর্শ করল ডান হাত দিয়ে। একি। এত ঠাণ্ডা কেন? অনুনয় আশ্চর্য বোধ করল। তারপর সে তপতীর উপর বুঁকে, গলা আর কপালে হাত রাখল, দেখল সব ঠাণ্ডা, নাকের কাছে হাত দিয়ে দেখল নিঃশ্বাস পড়ছে, অতি ক্ষীণ ভাবে।

একি! তুমি যে পাথরের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেছ, তপতী। কি হয়েছে তোমার? আমাকে বলবে না?

তপতী তাকাল অনুনয়ের মুখের পানে, অনুনয়ের মনে হল তপতীর চোখ দুটো আজ রক্ত মাংসের নয়, চোখ দুটো যেন পাথর দিয়ে তৈরী।

অনুনয় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল, সে-ও স্থির হয়ে গেল তপতীর অদ্ভুত ভাবান্তর দেখে। অনুনয়ের মনে পড়ে গেল তপতীর কথা, লেকের ধারে বসে সে বলেছিল, ফুরিয়ে গেছি, আমি রিক্তা, আমি একটি শ্বাস প্রশ্বাসের যন্ত্র আর কিছু নই, অনুনয়।

অনুনয় আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

মিনিট পাঁচেক চুপচাপ কেটে গেল।

অনুনয় তপতীকে বলল, তাহলে স্পষ্ট করে তুমি আমাকে কিছুই বলবে না?

মনে হল তপতীর দেহখানা ঈষৎ নড়ে উঠল।

অনুনয় বলল, তাহলে ধরে নিলাম আমাদের বিবাহে কেউ বাধা দেয়নি, তুমি নিজেই চাও না আমাদের এ বিবাহ হোক। অনুনয়ের কণ্ঠস্বর গম্ভীর হয়ে উঠল।

এবার তপতী তাকাল অনুনয়ের মুখের পানে, ভাবব্যঞ্জক রহস্যঘন সে চাহনি। তারপর সে মাথা নিচু করল।

অনুনয়ের কাছে এইবার স্পষ্ট হয়ে উঠল।

অনুনয় বলল, বেশ, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

অনুনয় পাশের ঘরে গিয়ে বিবাহের সাজ খুলে ফেলল। তপতী পাথর-মূর্তির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

— শেষ —

তারকনাথ বিশ্বাস প্রণীত "সুহাসিনী"

(সংক্ষেপিত)

শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ

॥ প্রসঙ্গ কথা ॥

[দুই জ্ঞাতিশত্রুর পুত্রকন্যার প্রেম এবং পলাশীর যুদ্ধে লম্পট সিরাজের অনিবার্য পতন প্রভৃতি ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত রোমান্টিক ও মিলনান্ত উপন্যাস এই 'সুহাসিনী'। নায়িকার নামে উপন্যাসের নামকরণ। লেখক—তারকনাথ বিশ্বাস। প্রেমিক যখন তার নায়িকাকে নিয়ে দেশান্তরে যাবার ব্যবস্থা করলো প্রতিনায়িকা তখন ঈর্ষাভরে নায়িকাকে বঞ্চনা করে প্রেমিকের প্রেরিত পালকিতে চড়ে বসে। সুদূর বিন্ধ্যাচল শিখরে গিয়ে পরে টাকা পালকি খুলে প্রেমিক তার ভুল বুঝলো এবং প্রতিনায়িকার প্রেম প্রত্যাখ্যান করলো। প্রথমে কমল শেঠ ও পরে নবাব সিরাজদ্দৌলার হাতে প্রতিনায়িকার নারীত্বের চরম লাঞ্ছনা ঘটে প্রতিহিংসায় প্রতিনায়িকা সিরাজের সাহায্যে নায়িকার লাঞ্ছনা করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত সিরাজের কাছে তার স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ায় অনুতপ্ত সিরাজের হাতেই তার মৃত্যু হয়। উপন্যাসের কাহিনীভাগে লম্পট নীচ ও পাপাসক্ত সিরাজের ভূমিকাই প্রধান। উপন্যাসে আগাগোড়া সিরাজের স্বাভাবিক হীনচরিত্র ফুটেছে স্পষ্টভাবে। পলাশীর যুদ্ধে কামনাসক্ত সিরাজের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা, অনিবার্য পতন ও বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের ধরাশায়ী হওয়া প্রকাশিত। উপন্যাসের নায়ক নায়িকা যথাক্রমে বিপিন ও সুহাসিনী, প্রতিনায়িকা মীরজা; অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে লম্পট সিরাজ ও কমল শেঠ, সিরাজের পাপাচারে সহায়ক এক বৃদ্ধা দাসী, সিরাজের এক ধোবা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য]

সুখসন্ধ্যা। সন্ধ্যাকাল। সূর্যের স্তিমিত কিরণ বৃক্ষশাখা, গৃহচূড়া, আকাশ প্রাঙ্গণ থেকে ক্রমে ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হয়ে যেন অনন্তে মিশে যাচ্ছে। হরিহরপুরের ফুলবাগানে তখন অপূর্ব সুন্দরী এক যুবতী একের পর এক ফুল তুলে মালা গাঁথছিল। কন্যার নাম সুহাসিনী। বয়স অনুমান পনেরো, কিন্তু রূপে গুনে পূর্ণ যুবতী। সুহাসিনী যখন একাকী মালা গাঁথছিল, এমন সময় সুহাসিনীর প্রণয়ী সেখানে এসে হাজির। নাম তার বিপিন, বয়স অনুমান বাইশ, হরিহরপুরের ধনী শঙ্করাচার্য চট্টোপাধ্যায়ের একমাত্র সন্তান। উভয়ে প্রণয়-বিস্মিত হাসি তামাশায় মেতে উঠলো। নিজের হাতে গাঁথা মালা নিয়ে সুহাসিনী বিপিনের গলায় দিল। পরক্ষণে বিপিন সেই মালা সুহাসিনীর গলায় দিয়ে মালা বদল করলো। কিন্তু তারা দুশ্চিন্তায় বিব্রত হয়ে পড়লো। তাদের উভয়ের পিতা উভয়ের ঘোর শত্রু। বাগানে তারা যখন প্রণয়খেলায় মত্ত এমন সময় সুহাসিনীর পিতা সুহাসিনীকে ডাকতে ডাকতে সেখানে এসে মেয়ের কাছে শত্রুপুত্র বিপিনকে দেখে রাগে একেবারে অগ্নিশর্মা। চেঁচামেচি করে পাড়া প্রায় মাথায় করে তুলেছেন, বিপিনকে গালিগালাজ করে তাকে অপমানের একশেষ করেছেন, এমন সময় সুহাসিনী মা সেখানে এসে পড়লেন। বিপিনকে শান্ত কথায় বাড়ি যেতে বলে তিনি তাঁর স্বামী ও কন্যাকে শান্ত করে ঘরে নিয়ে চললেন

[১ম পরিচ্ছেদ]

নদী-সকাশে । গত রাত্রের ঘটনার পরদিন বেলা দ্বিপ্রহর । সুহাসিনী তার বাসরসখী নীরজার আশায় বসে আছে অনেকক্ষণ । কিন্তু নীরজা এখনও এলো না । সুহাসিনী তার পিতা কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় পক্ষের কন্যা । কৃষ্ণধনের প্রায় আট নয় শত বিঘা নিষ্কর জমি, ২০।২২ টি পুকুর, বাগান এবং টাকা ছিল প্রচুর । কৃষ্ণধনের আশা ছিল একটি সচ্ছিন্ন পাত্রের সহিত সুহাসিনীর বিবাহ দিয়ে তাকে ঘরজামাই রাখবেন । কিন্তু গত রাত্রের ঘটনায় তিনি অত্যন্ত মুষড়ে পড়েছেন । তাঁর ঘোর শত্রু শঙ্করাচার্যের পুত্রের সহিত তাঁরই কন্যা সুহাসিনীর প্রণয়—এ তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না । শঙ্করাচার্য হয়তো তাঁকে একঘরে করতে পারে, এই দুশ্চিন্তাও কৃষ্ণধনকে পেয়ে বসলো । সারা রাত তিনি ঘুমোতে পারেননি—সুহাসিনী একদৃষ্টে দরজার দিকে তাকিয়ে আছে । এমন সময় সুহাসিনীর মতো অপূর্ব সুন্দরী নীরজা অপরূপ বেশে সজ্জিতা হয়ে সখির কাছে এলো । তখন দুই সখি মিলে সুখ দুঃখের নানা কথা হোল । তারপর নীরজা সুহাসিনীর প্রণয় নিয়ে হাসি তামাসা করলো । শেষ পর্যন্ত নীরজা আপাতত বিপিনকে দেখা পাবার ব্যবস্থা করে ফেলবে বলে সুহাসিনীকে আশ্বাস দিলো । সুহাসিনী নীরজার অনুগামিনী হোল । [২য় পরিচ্ছেদ]

সংবাদ । নীরজা সুহাসিনীকে সঙ্গে নিয়ে আইর বাড়ি গেল । নীরজাকে আই সত্যিই খুব স্নেহ করতো । নীরজার মতো দামী অথচ রূপে গুণে মধুর মেয়ে আইর খুব ভালো লাগতো । নীরজাও আইকে খুব ভালো বাসতো । নীরজা আইর কাছে প্রস্তাব করলো আইর বাড়িতেই বিপিনের সঙ্গে সুহাসিনীর একবার সাক্ষাৎ করিয়ে দিতেই হবে । নীরজা আইকে দশ টাকা দিল পারিশ্রমিক হিসাবে । টাকার লোভে আই তখন বিপিনের বাড়ির উদ্দেশে রওনা হোল । [৩য় পরিচ্ছেদ]

আইর সুসংবাদ । আই বিপিনের বাড়ির দিকে রওনা হোলে নীরজা নানা মিষ্টি কথায় সুহাসিনীর মন শান্ত করতে চেষ্টা করলো । মানসিক যন্ত্রণাকাতর সুহাসিনীর জন্যে একখানা গানও গাইলো । এমন সময়ে আই এসে নানা ছলাকলার পর বললো বিপিন সুহাসিনীকে সন্ধ্যার পর রাজেদের বাগানের বটতলায় দেখা করতে বলেছে । আই আরো বললো—সুহাসিনীর কাকাকে কে যেন গলা টিপে মেরেছে । কিন্তু অপরাধ পড়েছে বিপিনের ঘাড়ে । সুহাসিনী একই সঙ্গে আনন্দে ও দুঃখে অভিভূত হলো । সুহাসিনী এবং সখি নীরজা কেউই বিপিনের এই অপরাধ মেনে নিতে পারলো না । সুসংবাদ দেওয়ার জন্যে সুহাসিনী আইকে আরও পাঁচটি টাকা দিয়ে তাকে বাড়ির দিকে ফেরালো । [৪র্থ পরিচ্ছেদ]

দেশান্তর । সন্ধ্যা হবার আগেই সুহাসিনী নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে বিপিনের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো । বিপিনের দেরি দেখে সুহাসিনী অধীর হয়ে উঠলো । পূর্ণচন্দ্র সেদিন সুহাসিনীর বিরহ জ্বালা যেন আরও বাড়িয়ে দিচ্ছিলো । এমন সময় ঘোড়ার চড়ে যে স্বার বেশে হাজির হোল বিপিন । বিপিন বললো দেশান্তরে যেতে হবে এখনই । কেননা, এখানে থাকলে মিথ্যা অভিযোগের দায়ে নবাবদ সিরাজউদ্দৌলার নিষ্ঠুর শাস্তির হাত থেকে সে রেহাই পাবে না । সুহাসিনী এই অভিযোগে বিপিনকে সন্দেহ করে না কেনে বিপিনের মন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো । পরদিন বিপিন এই স্থান থেকেই সুহাসিনীকে নিয়ে বিদেশে যাবে স্থির করে চলে গেল । সুহাসিনী বিপিনের যাত্রাপথের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ক্রমে অজ্ঞান হয়ে পড়লো । কে এক রমণী সুহাসিনীর চোখেমুখে জল দিয়ে তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনলো । সুহাসিনীকে সুস্থ হোতে দেখে সে চোলে গেল । বিপিন তাকে মুক্ত করেছে মনে করে সুহাসিনী সাহসে ভর করে বাড়ির দিকে রওনা হোল ।

[৫ম পরিচ্ছেদ]

নীরজা ও সুহাসিনী । সুহাসিনী ও নীরজা এক সঙ্গে বসে বিপিনের প্রসঙ্গে নানা কথা আলোচনা করছিল । সুহাসিনী বিপিনের প্রেমে অটল আস্থা রাখে । বিপিনের ভালোবাসার কথা স্মরণ করে সে মরতেও প্রস্তুত । নীরজা কিন্তু তাকে বিপিনকে এতখানি

বিশ্বাস করতে নিষেধ করতে করলো। সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এলো। এমন সময় নীরজা অন্যমনস্কভাবে হাত ধরে সুহাসিনীর কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেল। নীরজা বাড়ি এসে তাড়াতাড়ি সাজগোজ করে চললো রায়েদের বাগানের ধারে। গিয়ে দেখলো বিপিনের প্রতিশ্রুতি মতো একখানি পালকি ও চারজন বাহক অপেক্ষা করছে সুহাসিনীকে নেবার জন্য। নীরজাকে তারা চিনতে না পেরে সুহাসিনী মনে করে তাড়াতাড়ি পালকিতে উঠতে বললো। নীরজা কোন কথা না বলে উঠে বসলো, বাহকেরা পালকি নিয়ে রওনা হয়ে গেল।

[৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ]

আষাঢ়ের ৫ চার পাঁচদিন পথ চলার পর নীরজা বিন্ধ্যাচলে গিয়ে পৌঁছলো। পালকি বাহকের দেখে বিন্ধ্যাচলের শিবমন্দির পূর্ব নির্দিষ্ট কুটীর থেকে স্বয়ং বিপিন বেরিয়ে এলো। পালকির কাছে এসে বিপিন বললো "তুমি কুটীরে যাও"। তারপর পালকি বাহকদের উপযুক্ত বকশিস দিয়ে বিপিন তাদের বিদায় করলো। কুটীরে এসে বিপিন দেখলো সুহাসিনী নয়, নীরজা এসেছে। এই প্রথম সে জানলো নীরজাও তাকে ভালবাসে। নীরজাও তার প্রেম নিবেদন করলো। কিন্তু বিপিন তার প্রেম প্রত্যাখ্যান করলো। বললো নীরজাকে সে ছোট বোনের মতো দেখে, নীরজাও যেন তাকে ভাই এর মতো দেখে। আশাহত নীরজা সেই রাত্রে বিপিনের অনুরোধ তার কুটীর ত্যাগ করে একাকী রাস্তায় বেরুলো আশ্রয়ের সন্ধানে। সুহাসিনীর চিন্তায় বিপিনের চোখে জল এলো। ক্রমে সে চিন্তায় ডুবে গেল। —[৭ম পরিচ্ছেদ]।

আশার ছলনা ৫ অতি সাহসী পুরুষও সেখানে রাত্রি যাপন করতে ভয় পায় নীরজা প্রাণের আশা ত্যাগ করে সেখানেই রাত কাটালো। পরদিন সকালে নীরজা ভাবলো, পরাজয় নয়, বিপিনকে জয় করতেই হবে— নারীর অমোঘ অস্ত্র বলে। ভাবতে ভাবতে কিছু ফলমূল খেয়ে গাছতলায় ঘুমিয়ে পড়লো। এমন সময় ফলমূল সংগ্রহ করতে বিপিন সেখানে এসে পড়ায় নীরজার ঘুম ভেঙ্গে গেল। পূর্বের মতোই নীরজা বিপিনকে প্রেম নিবেদন করলো। কিন্তু বিপিন আবার তা প্রত্যাখ্যান করলো। বিপিনের দেওয়া কিছু ফল খেয়ে স্নান সেরে নীরজা ঝরণার ধারে বসে ছিল। এমন সময় পঁচিশ বছরের এক সুদর্শন যুবক নীরজার রূপে মুগ্ধ হয়ে তার পরিচয় চাইলো। নীরজা পরিচয় দিল না, দেশে ফিরেও যেতে চাইলো না। মুর্শিদাবাদে যেতে চায় কিনা জিজ্ঞাসা করায় নীরজা বললো— নরপিশাচ সিরাজদ্দৌলার দেশে সে যেতে চায় না। যুবকটি আশ্বাস দেওয়ায় নীরজা তার অনুসরণ করে চললো এক শিবিরে। আহারাদির পর সন্ধ্যায় তারা মুর্শিদাবাদের দিকে চললো। —[৮ম পরিচ্ছেদ]।

ঘোর পরিবর্তন ৫ কয়েকদিন পরেই নীরজা ও সেই যুবক ঝলমলে মুর্শিদাবাদে পৌঁছলো। যে প্রাসাদে এসে নীরজা প্রবেশ করলো সেখানকার চাকচিক্যময় লোক লস্কর দাস দাসী প্রভৃতি দেখে বিস্মিত ও কৌতূহলী হয়ে গেল। নীরজা মুগ্ধ নয়নে শুধু কিছু দেখছে। এমন সময় সেই যুবক এসে নীরজার কাছে প্রেম নিবেদন করে প্রণয় প্রার্থনা করলো। এই যুবক জগৎ শেঠের ভাইপো কমল শেঠ। নীরজা তার প্রেম প্রত্যাখ্যান করলেও কমল নানা কথায় নীরজার মন ভুলে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে এক বৃদ্ধা দাসী এসে নীরজাকে আর একটি ঘরে নিয়ে গেল। দাসীর দেওয়া খাবার খেয়ে নীরজার মাথা ঘুরে উঠলো। দাসীর মুখে হাসি ফুটছে দেখতে দেখতে নীরজা সেখানেই ঘুমিয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়লো। —[৯ম পরিচ্ছেদ]

অবলার প্রাণ ৫ সকাল হোতে আর বেশি দেরি নেই। এমন সময় নীরজা জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখলো সে কমল শেঠের আলিঙ্গনে আবদ্ধ। নীরজা তাকে নরপিশাচ, পামর প্রভৃতি ভাষায় গালাগালি দিল, প্রাণে মারবার ভয় দেখালো। পরক্ষণেই আপন অদৃষ্টে ধিক্কার দিয়ে ভগবানের উদ্দেশে ক্ষোভ প্রকাশ করে কাঁদতে লাগলো। কমল শেঠ মনে করছিল নীরজার সতীত্ব নষ্ট করলে তাকে রক্ষিতা হিসাবে পাওয়া যাবে। কিন্তু তার সে আশা

ব্যর্থ হোল। কমলের অনুনয়, বিনয়, প্রলোভন, ভয় প্রভৃতি কিছুই নীরজাকে শান্ত করতে পারলো না। নীরজা কেবলই কাঁদতে লাগলো। এমন সময় সেই বৃদ্ধা দাসী এসে নানা কথায় নীরজার মন বুঝে চলে গেল। —[১০ম পরিচ্ছেদ]।

পরিত্রাণ। নবাব সিরাজদ্দৌলার আমল অর্থাৎ ত্রাস ও অনাচারের কাল। সুন্দরী নারী মাত্রেরই বিপদের অন্ত ছিল না। ভয়ে তারা রাস্তায় বেরুতে পারতো না। এমনই এক সময়ে নীরজা এসে পড়েছে মুর্শিদাবাদে। নীরজার পরিচর্যায় নিযুক্ত বৃদ্ধা দাসীর একটি সতেরো বৎসর বয়স্ক রূপবতী বিবাহিতা কন্যা ছিল। মেয়েটির স্বামী রঘুনাথ জগৎ শেঠের বাড়ীতে খাতা লেখার কাজ করতো মাসিক আট টাকা মাহিনায়। তাদের একটি কন্যাসন্তানও ছিল। বৃদ্ধার চরিত্র দোষ থাকায় কন্যার কাছে থেকে পৃথক ভাবে বাস করতো। জগৎ শেঠের বাড়ির পশ্চিম দিকে সে থাকতো। এই বৃদ্ধ বয়সে সে যে কতো স্ত্রীলোকের সর্বনাশ করেছে তার সীমা সংখ্যা নেই। এত পাপ বোধ হয় সইলো না। বৃদ্ধা দাসী একদিন কমল শেঠের প্রমোদ কাননের ঘর পরিষ্কার করছে, এমন সময় একটি স্ত্রীলোক এসে খবর দিল বৃদ্ধার মেয়েকে নবাব বাহাদুর ধরে নিয়ে গেছে। খবর পেয়ে বৃদ্ধা পাগল কি-রকম করে মেয়ের বাড়ি ছুটলো। গিয়ে দেখলো নাতিটি কাঁদছে, জামাই রঘুনাথও কাঁদছে। বৃদ্ধা ঘটনা শুনে কপালে চাপড়াতে লাগলো। দুই একটি প্রতিবেশি বয়স্কা স্ত্রীলোক এসে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে গেল। কিন্তু সে শান্ত হোতে পারলো না। এখন এই মুহূর্তে সে বুঝলো যেমন সে পরের সর্বনাশ করেছে—সর্বনাশ তেমন তার ঘরেই এসেছে এবার।

অনুশোচনায় বৃদ্ধা নারায়ণ নাতি কোলে নিয়ে কাঁদতে লাগলো আর ভগবানকে ডাকলো।

[১১শ পরিচ্ছেদ]

উপায়। আবার সন্ধ্যা হল। নীরজা ভাবছে কিসে পরিত্রাণ পাবে। চারিদিকে উঁচু প্রাচীর এবং অসংখ্য প্রহরী। কোন উপায় নেই। আর ভাবছে—হরিহরপুর, পিতা, মাতা, ভাই, বোন, সুহাসিনী, বিপিন প্রভৃতির কথা। এমন সময় দরজার কাছে দেখা গেল দুধমুখের মতো কমল শেঠ। নির্লজ্জ কমল আবার নীরজাকে প্রণয় সম্ভাষণ জানালো। নীরজা ঘৃণাভরে তার প্রেম প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলো এবং তাকে মুক্তি দিতে অনুরোধ জানালো। কমল অনেক অনুনয় বিনয় করলো, অঝোরে কাঁদলো; শেষ পর্যন্ত নীরজার পায়ে ধরে সাধলো। তবু নীরজার মন টলসো না। কমল আবার নীরজাকে প্রণয় সম্ভাষণ করে চলে গেল।

[১২শ পরিচ্ছেদ]।

পরিত্রাণ ॥ এমন সময়ে সেই কন্যাহারা দাসী এসে উপস্থিত। নীরজা দেখলো দাসীর মুখের সে ক্রুরভাব আর নেই। নীরজা তার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই বুড়ি কেঁদে ফেললো। এবং নবাব কিভাবে তার মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে সেই কাহিনী সবিস্তারে বললো। নীরজা মুখে সহানুভূতি প্রকাশ করলেও মনে ভাবলে এ তার উপযুক্ত প্রতিফল। ভগবান আছেন। পরক্ষণেই মনে হল সেও সুহাসিনীর প্রতি অন্যায় করেছে, তাই তারও এই দুর্দশা। নীরজা দাসীকে 'মা' বললো, দাসীও নীরজাকে মেয়ের মতো মনে করলো। নীরজার অনুরোধে দাসী তাকে এই প্রাসাদপুরী থেকে পালাতে সাহায্য করবে বললো। রাত তখন প্রায় এগারোটা। তারা বেশ পরিবর্তন করে গুপ্ত পথ দিয়ে রাস্তায় পড়লো।

[১৩শ পরিচ্ছেদ]

ঘোর বিপদ ॥ কিছুদূর চলার পর তারা দাসীর বাড়ীর কাছে এলো। নীরজাকে অনাহারী জানতে পেরে দাসী তার বাড়ী থেকে কিছু খাবার এনে দিল। খাবার খেয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে তারা পথ চলতে লাগলো পথের মধ্যেই দাসী তার পরিশ্রমের পুরস্কার চাইলো। নীরজা তৎক্ষণাৎ তার বহুমূল্য হার দুছড়াটি গলা থেকে খুলে দিলে খুশি হবে। কিন্তু দাসীর মনে রয়েছে কুমতলব। কিছুদূর চলার পর দাসী এক জায়গায় থামলো এবং "কে আছে" বলে ডাকলো। অন্ধকারের

মধ্যে এসে উপস্থিত হল এক যোদ্ধা পুরুষ। দাসীর ইঙ্গিতে নীরজাকে দেখামাত্রই তাকে কাঁধে করে নিয়ে চললো। যোদ্ধাপুরুষ নীরজাকে চিৎকার করতে নিষেধ করলো। নীরজা অজ্ঞান হয়ে গেল। জ্ঞান ফিরে পেয়ে নীরজাকে একটি ঘোড়ার গাড়ীতে তুলে নেওয়া হল। বৃদ্ধা দাসী সেই পুরুষকে বললো সে তার কন্যাকে আজই ফিরে পেতে চায়। পুরুষটি তখন বৃদ্ধাকে এই সঙ্গে আসতে বললো। দাসী উঠতেই গাড়ি তীব্র-বেগে ছুটলো। [১৪শ পরিচ্ছেদ]

সুহাসিনী ।। নীরজা গৃহত্যাগিনী হওয়ার পর হরিহরপুরে মহা হোরগোল পড়ে গেল। নীরজার নিরু-দ্দেশের কারণ কেউই বুঝতে পারলো না। তার বাবা মা দুঃখে শোকে কাল কাটাতে লাগলো। আর সুহাসিনী একে তো বিপিনের অভাবে হরষে মরে ছিল ; তারপর আবার এই বড়ার পরে ঘাড়ার ঘা। তার মনের কথা বলার মতো একটি লোকও আর রইল না। তার বাবা মা দেখেন সুহাসিনী কেবলই কাঁদে আর বাগানে নিঃশব্দে উদাসভাবে ঘুরে বেড়ায়। মেয়ের দুঃখে তারাও কাঁদেন। [১৫শ পরিচ্ছেদ]

হাতে সময়ীপে ।। সুহাসিনী কাঁদে আর বিপিনের কথা ভাবে। নীরজার কথা ভাবে। ভাবে আর কাঁদে। একদিন মা তার মন বোঝার জন্যে এসে বললেন, বিপিন অনেকদিন যাবৎ দেশান্তরী সে জীবিত মৃত তাও বলা মুশকিল। এরকমাবস্থায় সুহাসিনী কি আর বিয়ে করবে না? সুহাসিনী মাকে বললো, বিপিনের যদি কোন খবর না পাওয়া যায়, তার যদি মৃত্যু হয়ে থাকে, তবে সুহাসিনী বিধবা হবে। তবু দ্বিতীয় কোন পুরুষকে সে বিয়ে করবে না তার প্রাণ থাকতে। বিপিনের সে বাগদত্তা—সে জানে বিপিনই তার স্বামী। বাগদানের সঙ্গেই বিয়ে হয়ে গেছে বলে সে বিশ্বাস করে। বলতে বলতে সুহাসিনী কাঁদতে কাঁদতে জ্ঞান হারিয়ে ফেললো জ্ঞান ফিরে পেয়ে সুহাসিনী পাগলিনীর মতো কেবলই 'বিপিন বিপিন' বলতে লাগলো। বিপিন তাকে ডাকছে ভেবে সে তখনি মায়ের কাছ থেকে ছুটে সামনের দিকে গেল। তখনি আবার সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। মা তাকে আবার শুশ্রূষা করতে লাগলেন।

[১৬শ পরিচ্ছেদ]

নূতন লোক ।। সুহাসিনীর জ্ঞান ফিরলে তাকে নিয়ে মা বাড়ি ফিরলেন। সুহাসিনী পাগলিনীর মতো কখনো হাসে কখনো কাঁদে শোয় আবার কখনো সুস্থ মানুষের মতোই কথা বলে। অনেকেই বললেন, সুহাসিনীকে ডাইনীতে পেয়েছে, ইত্যাদি। রোগ ভালো হওয়ার কোন লক্ষন নেই। সুহাসিনীর সেই সৌন্দর্য আর শ্রী তেমন নেই সুহাসিনীর বাবা মা দুঃখে ম্রিয়মান হয়ে পড়লেন। একদিন রাত্রিতে দাসী এসে মাকে খবর দিল—একটি স্ত্রীলোক এসেছে, সে এখানে রাতটুকু থাকতে চায়। সুহাসিনীর মা রাজী হলে দাসী স্ত্রীলোকটিকে নিয়ে এলো। তাকে যথোচিত আদর আপ্যায়ন করলেন সুহাসিনীর মা। পরিচয়ে জানা গেল, স্ত্রীলোকটি মুর্শিদাবাদ থেকে আসছে ; যাবে তার বাপের বাড়ি হরিপুরে। আহারাদির পর কথায় কথায় সুহাসিনীর মা তার দুঃখের কথা বললেন সুহাসিনীর মা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কিন্তু স্ত্রীলোকটি আড়ালে মৃদু হাসলেন। পরদিন যাবার সময়ে দেখা করে যাবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে স্ত্রীলোকটি ঘুমুতে গেল। [১৭শ পরিচ্ছেদ]

নূতন বিপদ। স্ত্রীলোকটি শুয়ে আছেন। সুহাসিনীকে নিয়ে তার মাও শুয়ে আছেন। নিস্তব্ধতার মধ্যেই মনে হল সুহাসিনীর ঘরের দরজায় কুঠারাঘাতের শব্দ। সত্যই তাই। অস্ত্রধারী কয়েকজন ডাকাত ঘরে ঢুকে পড়লো। এই স্ত্রীলোকটি তখন তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল সুহাসিনীর কাছে। ডাকাতরা একখানা পালকি সুহাসিনীর সামনে রাখামাত্র বৃদ্ধা তাকে পালকিতে উঠতে বললেন। বিস্মিত সুহাসিনীকে বৃদ্ধা বললেন—এখানা বিপিনের পালকি, বিপিনের কাছেই তাকে নিয়ে যাওয়া হবে। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে সুহাসিনী পালকিতে উঠে বসতেই ডাকাতরা পালকি নিয়ে চলে গেল। সুহাসিনীর মা ও বাবা অসহায়।

কিছুই করতে পারলেন না তাঁরা। ক্রমে প্রতিবেশীদের ভিড় জমলো। কেউ বললো এরা ডাকাত, কেউ বললো বিপিনের কারসাজি। কেউ বললো ওরা মুসলমান নবাবের লোকেরাই সুহাসিনীকে ধরে নিয়ে গেল। কিন্তু কেউই আসল ব্যাপার বুঝতে পারলো না।

[১৮শ পরিচ্ছেদ]

বিপিনের সংবাদ। বিন্ধ্যাচলের শিবির থেকে নীরজা সেই রাত্রেই বেরিয়ে যাওয়ার পর বিপিন সেখানে থাকা আর নিরাপদ মনে করতে পারলো না। বিপিন তখন কুঠির থেকে বেরিয়ে পথে পথে সুহাসিনীর সন্ধান করে ফিরতে লাগলো। সুহাসিনীর দুঃখে বিপিন কাঁদতে লাগলো, আর নীরজাকেই তার দুঃখের মূল বলে মনে করলো। তারপর সে তার অদৃষ্টের দোষ ও ভগবানের অবিচারের কথা মনে করে পাহাড়ী পথ বেয়ে পাহাড়ের উপর দিকে উঠতে লাগলো। তীর্থ ভ্রমণে বেরুবে মনস্থ করে বিপিন আবার নিচের দিকে তার কুঠিরের কাছে এসে পড়লো।—[১৯শ পরিচ্ছেদ]

নবপ্রহরী। নীরজা কমল শেঠের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে নরপিশাচ সিরাজদ্দৌলার হাতে পড়লো। সিরাজদ্দৌলার হাতে সে তার সতীত্ব হারিয়েছে। পরিবর্তে নবাব তাকে বেগমের মর্যাদা দিয়েছে। পরদিন। একদিন প্রায় দুটোর সময় নীরজাকে নিয়ে নবাব প্রণয়ালাপে মত্ত হোলেন। সিরাজ বললেন, তিনি নীরজাকেই সব চেয়ে বেশি ভালোবাসেন। নীরজা বেহালা বাজিয়ে সিরাজকে গান গেয়ে শোনালো সিরাজ সেই দণ্ডে তরলা সংগত করে আসর জমিয়ে তুললেন। "প্রেম, সুধা না গরল" গানটি শুনে সিরাজ একেবারে মোহিত হয়ে গেল। সিরাজ দাসীদের নির্দেশ দিলেন তিনি আজ নীরজার ঘরেই রাত কাটাবেন। এমন সময় দাসী এসে খবর দিল—হরিহরপুর থেকে একটি স্ত্রীলোককে আনা হয়েছে এখন নবাবের আদেশের অপেক্ষায় তাকে পালকিতেই রাখা হয়েছে। এই পালকিতেই সুহাসিনীকে আনা হয়েছে এই সংবাদ দিয়ে সিরাজ নীরজাকে খুশী করবার চেষ্টা করলেন। নীরজা লম্পটকে মুখ দেখাবে না বলে অন্য ঘরে গেল। নীরজার কথামতো সিরাজ চলবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। নবাবের আদেশে সুহাসিনীকে তাঁর কাছে আনা হল। সুহাসিনীর রূপে সিরাজ মুগ্ধ হয়ে নীরজার কথা, তাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা সবকিছুই ভুলে গেলেন। দাসীদের বললেন, তিনি সুহাসিনীকে নিয়ে তাঁর নতুন ঘরে আজ রাত কাটাবেন। একথা শুনে নীরজা নবাবকে তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দিলো। সিরাজ ঘৃণাভরে তাঁর প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করলেন। নবাব মনে করিয়ে দিলেন নীরজাকে, তিনি কখনো রমণীকে ভালোবাসেননি—ভালোবাসতে পারেন না, তিনি পাষাণ। তিনি আরও বললেন, নীরজা যেন নবাবের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানোর চেষ্টাও না করে—তাহলে বেগমের মর্যাদা থেকে তাকে নামিয়ে দেওয়া হবে। নবাব মনে করিয়ে দিলেন, নীরজা ছিল কমল শেঠের রক্ষিতা, সিরাজ দয়া করে তাকে বেগম বলে স্বীকার করেছেন। আর, কমল শেঠের প্রমোদ কুঞ্জের চেয়ে সিরাজের প্রাসাদ অনেক বেশি সুরক্ষিত।—নবাব আর কিছু না বলে সেখান থেকে চলে গেলেন। নীরজা শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে হতাশভাবে সে বসে পড়ে চিন্তায় ডুবে গেল। [২০শ পরিচ্ছেদ]

আত্মরক্ষা। নীরজার ঘর থেকে বেরিয়ে সিরাজদ্দৌলা সুহাসিনীর ঘরের দিকে চললেন। পথের মধ্যে সেই বৃদ্ধাকে দেখে খুশী হয়ে তার কাজের জন্যে সিরাজ তাঁর গলা থেকে বহুমূল্য মুক্তার হার খুলে দিলেন। নবাব তাকে আবার কাল সন্ধ্যায় আর একটি কাজের জন্যে আসতে বললেন। শয়তান কৃতজ্ঞভাবে যে আজ্ঞে বলে চলে গেল। সিরাজ সুহাসিনীর ঘরে গিয়ে দেখল একজন দাসী সুহাসিনীর জ্ঞান ফিরিয়ে আনবার জন্যে চেষ্টা করছে। সুহাসিনী জ্ঞান ফিরে পেয়ে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো সে কোথায় এখন? কিভাবে সে এখানে এলো...ইত্যাদি। দাসী বললো এটা মুর্শিদাবাদের নবাব সিরাজদ্দৌলার প্রাসাদ। তারপরই নবাব নিজেকে বাংলা বিহার উড়িষ্যার অধীশ্বর এই পরিচয় দিয়ে শয়তানের মতো এগিয়ে গেল সুহাসিনীকে

আলিঙ্গন করতে। মুহাসিনী সিরাজের পায়ে ধরে কতো কাঁদলো, পিতা বলে সম্বোধন করে কলঙ্ক থেকে রক্ষা করতে মিনতি করলো ভগবানের দোহাই দিয়ে কতো কাকুতি মিনতি করলো কিন্তু নির্লজ্জ শয়তান পাপী লম্পট সিরাজের মন তাতে এতটুকু টললো না। সতীর অঙ্গ স্পর্শ করলে সিরাজের রাজ্য ছারখারে যাবে বলে ভয় দেখানোতেও কামান্ধ সিরাজ যখন নিরস্ত হোলেন না তখন মুহাসিনী তার ঘরের দেওয়ালে ঝোলন্ত উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে সিরাজের মুণ্ডচ্ছেদ করতে উদ্যত হল। কুকুরের মতো কাপুরুষ সিরাজ ভয়ে পিছিয়ে গেলেন এবং কি করবেন ভাবছেন এমন সময়ে দাসী এসে খবর দিলো দ্বারে মোহনলাল উপস্থিত। নবাবের সঙ্গে দেখা করতে চান তিনি। নবাব চমকে উঠলেন। তাঁর মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি মোহনলালের সঙ্গে দেখা করতে চললেন। এদিকে মুহাসিনী আহত ফণিনীর মতো গর্জাতে লাগলো। [২১শ পরিচ্ছেদ]

মন্ত্রণা। মোহনলালকে চিন্তামগ্ন দেখে সংবাদ জানতে চাইলেন। মোহনলাল বললেন, মীরজাফর, শেঠ পরিবার, এমনকি রাণী ভবানী ও কৃষ্ণনগরের রাজা প্রভৃতি সকলেই সিরাজের বিরুদ্ধে। অতএব ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধজয়ের কোন আশা নেই। সিরাজ মোহনলালকে বললেন মীরজাফরকে নিহত করে তুমিই সেনাপতি হও। মোহনলাল বললেন, তাতে অনেক বাধা আছে: তার চেয়ে নবাব স্বয়ং অশ্বপৃষ্ঠে যুদ্ধক্ষেত্রে চলুন। সিরাজ পাপাচারে এতই মত্ত যে যুদ্ধক্ষেত্রেও যেতে চাইলেন না। মোহনলাল নানাভাবে বোঝানোর পর সিরাজ রাজী হলেন। মোহনলালের অনুরোধে সিরাজ সেই রাত্রেই যুদ্ধযাত্রার নির্দেশ দিলেন। সিরাজের মনে কখনো মুহাসিনীর রূপের কথা, কখনো তার নিদারুণ অভিশাপের কথা একের পর এক মনে কিছুক্ষণের জন্যে তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন। তারপর মুহাসিনীর কথা ভুলে গিয়ে যুদ্ধযাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। [২২শ পরিচ্ছেদ]

সূর্য ডুবিল ।। পলাশির প্রান্তরে সারি সারি নবাবের শিবির স্থাপিত হয়েছে। সিরাজ একটি শিবিরে আছেন। মনে তাঁর রাতিমতো ভয়। শত শত সুন্দরীর নৃত্যগীতে সিরাজ মত্ত হয়ে আছেন। এক সময় মুহাসিনীর রূপের কথা মনে পড়ায় তিনি নর্তকীদের আরও উৎসাহভরে নৃত্যগান করতে বললেন। ভাগিরথী নামে এক নর্তকীর গান শুনে তাকে পুরস্কার দিলেন। আবার নাচ সুরু হতেই বাইরে হঠাৎ 'হুম হুম' শব্দ হল। নর্তকীরা প্রাণভয়ে যে যেদিকে পারলো পালালো। আর বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব সিরাজদ্দৌলা তখন নিজেই বিপদ বুঝতে পেরে নিজের অদৃষ্টের কথা স্মরণ করে কাঁদলেন আর ভগবানকে ডাকছেন। এমন সময় সেখানে এলো মীরজাফর। সিরাজ তখনি তার পায়ে পড়ে কতো কাঁদলেন শুধু প্রাণভিক্ষা চেয়ে। মীরজাফর স্পষ্টই বললো দেশের লোক এই লম্পট ও পাপাচারী সিরাজের রাজ্যচ্যুতিই কামনা করে। সিরাজ দেশের চরম সর্বনাশ, সতীর সতীত্ব, মানীর মান নষ্ট করেছে—আজ তাকে প্রতিফল নিতেই হবে। তবু সিরাজের কাতর আবেদনের জবাবে মীরজাফর সিরাজদ্দৌলাকে মুর্শিদাবাদে পালিয়ে যেতে সাহায্য করলো।

[২৩শ পরিচ্ছেদ]

পরিণাম ।। সিরাজ মুর্শিদাবাদ প্রাসাদে পৌঁছে পরিবর্তন দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। দেখলেন লুৎফা বিবী নেই, নীরজা নেই, তার ডাকে সাড়া দেবার জন্যে কোন বান্দা তটস্থ হয়ে নেই। কেউই তাঁকে দেখে দেখছে না—নবাবের সম্মান দেওয়া তো দূরের কথা। এক খোজা ক্রীতদাস সিরাজের এই অবস্থা দেখে কেঁদে ফেললো। সিরাজও কাঁদলেন। ক্রীতদাসের অনুরোধে সিরাজ বেশ পরিবর্তন করলে সে তাঁকে নিয়ে গুপ্ত পথ দিয়ে বাইরের দিকে চললো। পথে নীরজার সঙ্গে দেখা। নীরজা আজ মনোহর বেশে সজ্জিত হয়ে কোথাও যাচ্ছিলো। এমন সময় সিরাজকে দেখে প্রথমে নীরজা ভীত হোলেও মনের ভাব গোপন করে নবাবের প্রতি সহানুভূতি দেখালো। সিরাজ নীরজাকে আলিঙ্গন করলেন। নীরজা সম্রাটের সঙ্গে যেতে চাইলো। সিরাজ তাকে সঙ্গে নিয়ে

জাহেরীর তীরে গিয়ে এক নৌকোয় উঠলেন। নৌকো ছেড়ে দিয়ে নদী পথে যেতে যেতে নবাব মাঝে মাঝে ভয়ে চমকে উঠলেন। নিজের পাপের ও অদৃষ্টের কথা মনে করে ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন ভীত সিরাজ নীরজার কোলে মুখ ঢাকলেন। সিরাজের এই দশা পাপের প্রায়শ্চিত্ত। [২৪শ পরিচ্ছেদ]

সুহাসিনীর আশা ।। ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে নবাবের পরাজয়ের সংবাদে মুর্শিদাবাদে মহা হোরগোল পড়ে গেল। প্রাণভয়ে যে যার মতো পালাচ্ছে। সুহাসিনী তার একটি বিশ্বস্ত দাসিকে সঙ্গে নিয়ে নৌকায় উঠে পালালো। আধঘণ্টা পার হয়ে কিছু দূর আসার পর দূরে গঙ্গাতীরে এক ব্রহ্মচারীকে দেখে সুহাসিনী সেখানেই নৌকো বাঁধতে বললো। নৌকো তীরে ভিড়তেই সুহাসিনী জ্ঞান হারা হল। ব্রহ্মচারী এসে সুহাসিনীর জ্ঞান ফিরিয়ে আনলেন। সুহাসিনী ব্রহ্মচারীকে বিপিন বলে চিনতে পেরেছে। উভয়ে আনন্দে অভিভূত হোল। দীর্ঘ বিরহের পর মিলনের আনন্দে কেউ কোন কথা স্পষ্ট বলতে পারলো না। কথা যেন আর ফুরোয় না। সুহাসিনী তার মুর্শিদাবাদ আগমনের ইতিহাস সবিস্তারে বললো। তার মুখে স্পষ্ট সিরাজের পতন সংবাদ শুনে বিপিন ভগবানকে ধন্যবাদ দিল। তারপর বিপিন সুহাসিনীকে নিয়ে গেল তার কুটিরে। পরদিন অন্য কোথাও যাবে ঠিক করলো তারা। দাসীও তাদের সঙ্গে রইলো। তখন বেলা প্রায় ন'টা। বিপিন তাদের কুটিরে রেখে নিজে গেল আহারাদির ব্যবস্থা করতে। সুহাসিনী ও দাসী কুটিরের বাইরের চারিদিক দেখতে লাগলো।

[২৫শ পরিচ্ছেদ]

সুখে দুঃখে। আহারাদির ব্যবস্থা করতে বনে ঘুরতে ঘুরতে সুহাসিনীর চরিত্রের পবিত্রতা নিয়ে মনে মনে আলোচনা করছিল বিপিন। সম্প্রতি সিরাজের হাতে সুহাসিনীর সতীত্ব নষ্ট হয়েছে কিনা এই চিন্তা বিপিনকে পেয়ে বসলো। সুহাসিনীর সম্বন্ধে এই সন্দেহ কিছুতেই তার মনে ঠাঁই পেলো না। এমন সময় সেখানে বিপিনের সঙ্গে দেখা হল নীরজার। নীরজা আবার পূর্বের মতোই বিপিনকে প্রেম নিবেদন করলো। বিপিন দৃঢ়ভাবে তা প্রত্যাখান করলো। নীরজা তখন সুহাসিনীকে নবাবের হারেমবাসী অসতী বলে বিপিনের কাছে মিথ্যা পরিচয় দিল। কিন্তু সে জানতো না যে বিপিন সত্য-সত্যই সুহাসিনীকে ফিরে পেয়েছে। বিপিন তার পায়ে ধরে কতো কাঁদলো এই জঘন্য মিথ্যা কথা আর মুখে না আনবার জন্যে। কিন্তু বিপিনের কাছে প্রত্যাখাত নীরজা তখন সাপের মতোই ক্রুর হয়ে উঠেছে। সে তখন তার কথার প্রমাণ দিতে নবাবের নাম করলো। নবাবের সঙ্গেই নীরজা পালাচ্ছে একথাও বললো। আর বললো সুহাসিনীকে একবার ডেকে দিতে। ঘটনাক্রমে সুহাসিনী ও দাসীও তখন সেইটিকে আসছিল। সুহাসিনীকে দেখিকে আসতে দেখে, সুহাসিনীর সম্পর্কে নীরজার কথাই সত্যি হবে কিনা—এইসব ভেবে বিপিন সেইখানেই জ্ঞান হারিয়ে ফেললো।

[২৬শ পরিচ্ছেদ]

প্রতিহিংসা ।। যে নীরজা একদিন সুহাসিনীর সখি ছিল সেই নীরজাই আজ সুহাসিনীর সর্বনাশ করতে ব্যস্ত। নারী হৃদয় এমনই ক্রুর ও সাংঘাতিক। নীরজাকে দেখা মাত্রই সুহাসিনী তার গলা জড়িয়ে ধরে আগের মতো সখি ভাবে কথা বলতে লাগলো। কিন্তু নীরজার মনে ছিল কু-মতলব। বিপিনকে শুনিয়ে শুনিয়ে সে সুহাসিনীকে বলতে লাগলো—সিরাজউদ্দৌলার কাছে তুমি সুখে ছিলে এজন্যে আমিও সুখী। সুহাসিনী নবাবের অঙ্কশায়িনী ছিল—এমন ভাহা মিথ্যা অপবাদও নীরজা দিল তার চরিত্রে। একথা শুনে বিপিন ও সুহাসিনী কাঁদতে লাগলো। নীরজার উদ্দেশ্য কিছুটা সফল হল। কিন্তু সুহাসিনীর দাসীই একমাত্র জানে সুহাসিনী কতো পবিত্র চরিত্র। তাই নীরজার মিথ্যা ভাষণের জবাবে দাসী বললো—নীরজা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলছে, কারণ নীরজাই ছিল নবাবের অঙ্কশায়িনী, আর, এখনও নবাবের সঙ্গিনী। দাসীর কাছে মিথ্যা ধরা পড়ে গেল। নীরজা দাসীকে ডেকে একপাশে নিয়ে কিছু আলোচনা করতে লাগলো।

[২৭ পরিচ্ছেদ]

দুঃখের শেষ ।। দাসীকে নিয়ে নীরজা একপাশে গিয়ে কথাবার্তা বলছে। এই অবসরে সুহাসিনী নিজের

অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে বিপিনের কাছে কাঁদছে, আর বিপিনের প্রতি তার আন্তরিক প্রেমের কথা জানাচ্ছে। সুহাসিনীর বিরুদ্ধে নীরজা যে সমস্ত মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল বিপিন তা অবিশ্বাস ভরে উড়িয়ে দিয়ে সুহাসিনীকে প্রেমভরে আলিঙ্গন দিল। বিপিন সুহাসিনীকে দোকানঘরের বাইরে ঘর বাঁধবে বললো। প্রকাশ্যে বিপিন নীরজাকে অভিসম্পাত করতে লাগলো —কারণ মিথ্যাবাদী ও পাপাসক্ত নীরজাই তার যতো দুঃখের মূল। সুহাসিনী বিপিনকে শান্ত করতে চেষ্টা করলো। এমন সময় দাসী ফিরে এসে বললো নীরজা তাকে ঘুষ দিয়েছে সুহাসিনীকে অসতী বলবার জন্যে। তখন বিপিন ও সুহাসিনী নীরজার স্বরূপ স্পষ্ট বুঝতে পারলো। সুহাসিনী দেখলো নবাব সিরাজউদ্দৌলা তাদের দিকেই এগিয়ে আসছেন। ঘোমটা টেনে সে একপাশে সরে দাঁড়ালো।

[২৮শ পরিচ্ছেদ]

দুঃখের উষা। সিরাজকে ফকিরের বেশে আসতে দেখে সুহাসিনীর দাসী সিরাজের কুশল জিজ্ঞাসা করলো। সিরাজ তার কৃতকর্মের জন্যে দাসীর কাছে অনুতাপ করতে লাগলো। এমন সময় নীরজা বললো তার সঙ্গে সে আর যেতে চায় না। নবাব যেন তাঁর 'প্রিয় বেগম' সুহাসিনীকে সঙ্গে নেন—এই বলে সে সুহাসিনীর নামে পরোক্ষ ভাবে অপবাদ দিতে চেষ্টা করলো। সিরাজ সুহাসিনীর নাম শুনে এবং সেখানেই তাকে দেখে তার কাছে নতজানু হয়ে ক্ষমা চাইলেন। সিরাজ বললেন, সুহাসিনী তার সতীত্ব রক্ষা করতে সিরাজকে পিতা বলেছিল, পরে তরবারি নিয়ে মুণ্ডচ্ছেদ করতে আসে, পরে অভিশাপ দেয়। তার সেই সাহস নবাব আর কোন নারীতে দেখেননি। আজ তিনি সুহাসিনীকে মা বলছেন, সুহাসিনী যেন তাঁকে অবোধ সন্তানের মতো ক্ষমা করে, সে ঈশ্বরের কাছে সিরাজের হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে। তবেই সিরাজ একটু শান্তি পাবে।—এই সব কথা শুনে দাসী বিপিনকে বললো সুহাসিনী যে নবাবের হাতেযে সতীত্ব খোয়াইনি এই তার অকাট্য প্রমাণ। নিশ্চয়ই কোন ষড়যন্ত্র আছে মনে করে সিরাজ তা জানতে চাইলেন। দাসী তখন সমস্ত ঘটনা বললো। সিরাজ তখন বিপিন ও সুহাসিনীর উদ্দেশ্যে সুহাসিনীকে সতীত্বের প্রতিমূর্তি' বলে বর্ণনা করলেন। সিরাজ নিজেকে পশুচরিত্র বলে স্বীকার করে বিপিনকে ভাই সম্বোধন করলেন। বললেন সুহাসিনীর মতো সতীর স্বামী এ জগতে সত্যই ভাগ্যবান। বিপিন যেন ভগবানের কাছে তাঁর নামে ক্ষমা প্রার্থনা করেন—এই বলে সিরাজ কাঁদতে লাগলেন। দাসীর কাছে নীরজার সড়যন্ত্রের কথা শুনে নীরজাকে বললেন সেই যতো অনর্থের মূল। তারই কথামতো তিনি সুহাসিনীকে চুরি করে আনেন! আর সেই সতী সুহাসিনীর অভিশাপেই তাঁর আজ এই দুর্দশা। এখনও নীরজা তারই সখি সতী সুহাসিনীর সর্বনাশের চেষ্টা করছে জেনে সিরাজ নীরজার বুকে বসিয়ে দিলেন ধারালো ছুরি। নীরজা তার পাপের উপযুক্ত শাস্তি মনে করে এবং সিরাজের সুখের জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলো।

[২৯শ পরিচ্ছেদ]

সকলের শেষ ।। নীরজার দেহ ক্রমে নীলাভ হয়ে আসতে লাগলো। নীরজা সুহাসিনীর কাছে নিজেকে পাপীয়সী বলে ক্ষমা চাইলো। অনুশোচনায় সে তখন বলতে লাগলো, কিভাবে সে তাকে বঞ্চনা করেছে। বিপিন যেদিন রায়েদের বাগানে সুহাসিনীকে নিতে পালকি পাঠিয়েছিল সেদিন নীরজাই তাকে মিথ্যা সংবাদ দিয়েছিল। সুহাসিনীর প্রেমে আসক্ত বিপিনের কাছে সে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, কমল শেঠ ও সিরাজের কাছে সে তার অমূল্য সতীত্ব হারিয়েছে। আজ সিরাজের হাতে তার উপযুক্ত শাস্তিই হয়েছে। তার কাতর প্রার্থনায় বিপিন—ও সুহাসিনী তাকে ক্ষমা করলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই নীরজার মৃত্যু হল। ভাগীরথী তীরে তার সৎকার করা হোল। তারপর দাসীকে নিয়ে তারা দেশে গিয়ে পৌঁছুলো। তাদের বাবা-মা ছেলে মেয়ে ফিরে পেয়ে সুখী হয়ে তাদের বিয়ে দিলেন মহা সমারোহে। দুই বংশের শত্রুতার শেষ হল এতদিনে। যথা সময়ে সুহাসিনীর একটি ছেলে হল। মহা সুখে তাদের দিন কাটতে লাগলো।

[৩০ পরিচ্ছেদ]

খবরের কাগজ ও ফ্লিট স্ট্রীট

অমল হালদার

খবরের কাগজ—'ফোর্থ এস্টেট' ক্ষমতার চতুর্থ শক্তি। শক্তির চতুর্থ শিবির। প্রথম শক্তি উর্ধ্বলোকে, দ্বিতীয় হাউস অব লর্ডস্-এ তৃতীয় কমনস্-এ, আর চতুর্থ এই 'ফ্লিট স্ট্রীট'। খবরের কাগজে।

এধরণটা সর্বপ্রথম শুনে গিয়েছিল ম্যাকুলের মুখে। বার্ক'ও কোন এক দিয়েছিলেন মাথা নেড়ে। তবে বিদ্রূপের সঙ্গে খবরের কাগজের ঠকবাজিতা তাঁর মতো কবনারের পছন্দ ছিল না।

লর্ডরা আরও ঘৃণা করতেন। 'টাইম্স' আচরণে ক্ষুব্ধ লর্ড ডার্বি খবরের কাগজওয়ালাদের সম্পর্কে বলেছিলেন: ক্ষমতা জিনিসটা খুব সহজ জিনিস নয়, তার সঙ্গে দায়িত্ব বলে আরও একটা জিনিস আছে। খবরের কাগজ যদি বৃটিশ মন্ত্রীসভার মতো ক্ষমতা পেতে চায়, তবে তার উচিত হবে বৃটিশ মন্ত্রীসভার মতোই কম কথা বলা, ভেবে চিন্তে কথা বলা। বিশেষতঃ সব কথা যে বলার কথা নয়, সেটি মনে রাখা।

তার উত্তরে সেই আঠারো শ' বাহান্ন সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যে কথাগুলো লিখেছিল লণ্ডনের 'দি টাইমস' আজও দেশে দেশে খবরের কাগজের কাছে তা বাণী। চিরকালের মন্ত্র। টাইম্স সেদিন ঘোষণা করেছিল:

The Press lives by disclosure, whatever passes into its keeping becomes a part of the knowledge and history of our times··· ।

খবরের কাগজের দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পাদক ডিক্সন আর লর্ড ডার্বি একমত। খবরের কাগজের দায়িত্ব অবশ্যই আছে। থাকবেও। তবে ডিক্সনের মতে সে দায়িত্ব অর্থনীতিবিদ কিংবা আইনজীবীর মতো। তার রাষ্ট্রকে খুঁটিয়ে দেখবে দেখাবে। আসলে খবরের কাগজের কাজ ঐতিহাসিকের কাজ। সাংবাদিক ও ঐতিহাসিক। তার দায়িত্বও "to seek out the truth, about all things and to present to his readers not such things as the state crafts would wish them to know, but the truth as near as he can attain it."

বৃটিশ সাংবাদিকের কাছে এই সত্য অনেক দিন ছিল কপাট রুদ্ধ। পার্লামেন্ট সাংবাদিকের প্রবেশাধিকার ছিল না। কফি হাউসে হাউসে ঘুরে বেড়াতেন তাঁরা খবরের সন্ধানে। খবর চাই, সত্য খবর। 'জেন্টল ম্যানস' ম্যাগাজিনের (১৭৩১) এডোয়ার্ড কেভকে ঠেকিয়ে রাখতে পারলো না কুইন এ্যানির গভর্ণমেন্ট। রিপোর্টার গাথরি পাহারাওয়ালার হাতে পয়সা গুঁজে দিয়ে ঢুকে বসলেন পার্লামেন্টে। সর্টহ্যাণ্ডের লিটম্যান সাহেব তখনও জন্মাননি। গাথরি মনে মনে জাবার টুকে নেন। আপিসে এসে কাগজে লেখেন। 'জেন্টলম্যানস ম্যাগাজিনে' বিবিধ ছাপা হয় পার্লামেন্টারী রিপোর্ট। ডাঃ সামুয়েল জনসন তা সাধু ভাষায় লেখেন। মেম্বাররা সব ছদ্মনামের আড়ালে। জনসনের পার্লামেন্টের নাম সিনেট অব লিলিপুটিয়া।'

ডিফো সুইফট, স্টীল এডিসন, জনসন খবরের কাগজের লেখক। সাংবাদিকতা এঁদের হাতে শুরু হয়েছিল ইংলণ্ডের খবরের কাগজের স্বর্ণযাত্রা সত্যের

বাহে ক্রুসেড। কুইন এ্যান সিংহাসনে বসার সময়ে এ যুদ্ধের কোন চিহ্ন পড়েনি তাঁর চোখে। বরঞ্চ, বৃটিশপুত্রের প্রথম সৈনিক ডেলিকুরাণ্টের পাতা ভরা খবর তিনি পড়তেন। সবাই কন্টিনেন্টাল জার্নালের বাসি খবর। কোন মতামত নেই, সমালোচনা নেই, উদ্ভাস নেই।

শুধু খবর। 'ডেলিকুরাণ্টে' পরিষ্কার লেখা থাকতো : কোন গোপন খবর এতে নেই। অনুমান কিংবা সমালোচনা থাকবে না। পাঠকদের নিজেদের তা করার আছে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

সুইফটরা তা বিশ্বাস করতেন না। তাঁদের সাধনা ছিল জনমত গঠন। এই সুসংগঠিত জনমতকে যে এড়িয়ে যাওয়ার সাধ্য কারও নেই তা প্রমাণ করলেন পিট। দশ বছরে ৫০ হাজার পাউণ্ড খবরের কাগজওয়ালাদের ঘুষ দিয়েছিলেন ওয়ালপোল। ইতিহাস বিলের সমর্থনের দাম দিয়েছিলেন কম এবং নথের কোয়ালিশন মন্ত্রীসভাও। কিন্তু পিটের মতো নয়। জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী পিটের এই বাবদে বার্ষিক খরচ ছিল—১২৩৮ পাউণ্ড!

শুধু কি টাকা? লর্ড জন রাসেল কেপে গিয়ে বলেছিলেন : আমার জীবন তো কেটেই গেলো, ইংলণ্ডে যদি ইংলণ্ড থাকতে হয় তবে 'টাইমস' নিধন অবশ্য কর্তব্য। (this vile tyranny of the Times must be cut off.)

কিন্তু 'টাইমস' জনতার কাগজ। মন্ত্রীরা এসে তার হাতে গোপন খবর দিয়ে যান। যদিও কুইন ভিক্টোরিয়া স্থির করেছেন—রাজভোজে খবরের কাগজওয়ালাদের বাদ দেওয়া হবে। অভদ্র আচরণে যদি উদ্ধত অভদ্রদের শিক্ষা হয়। ভিক্টোরিয়া জানতেন না টাইমসের শক্তি কি, কিংবা কোথায়। মন্ত্রীরা তা জানতেন। জানতেন বলেই প্রচারের লোভে ফ্লিট স্ট্রীটের দ্বারস্থ হতেন। অবশ্য গিহন দরজায়। কিন্তু তাও খোলা পাওয়া যায় না সব সময়ে। লণ্ডনের কাগজ ডিলেনদের হাতে গড়া। ডিলেন মন্ত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া গোপন দলিলটা অবহেলায় ছুঁড়ে ফেলে দিতেন টেবিলে। কেন মিছি মিছি ঝামেলা করেন আপনারা? এ সব আমরা চাইনে। আমি এর আগেই পেয়ে গেছি আপনার দলিল।

I don't care to have confidential papers sent to me, at anytime, because the possession of them prevent me using the information which from one source or another is sure to reach me!

খবর? কতো খবর চাই? আব্রাহাম লিংকন নিজে এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন 'রিপোর্টার' রাসেলকে। রাসেল ক্রিমিয়ার যুদ্ধের রিপোর্ট করেছেন ভারতবর্ষের মিউটিনির রিপোর্ট লিখেছেন, আমেরিকার গৃহযুদ্ধের খবরও তাঁরই কলমে শুনেছে ইংলণ্ডবাসী। লিংকন নিজে লিখেছিলেন তাঁর হাতে গৃহযুদ্ধের খবর কারণ :—

In fact I don't know any thing which has such more power than "London Times"; except perhaps Missippi.

মিসিসিপির চাইতেও লণ্ডন টাইমস এর শক্তি

খবর বৃটিশ প্রেসের সমস্যা তো সবরকম

চা পরিবেশন।

বছরে তখনকার দিনে দশ হাজার পাউণ্ড শুধু ভারতবর্ষের খবরের জন্যে খরচ করতো টাইমস তাতেও ১৮২৪ সালে কোলকাতা থেকে কালাসাউথে রিপোর্ট পৌঁছতে সময় লাগতো চারমাস। জনৈক জার্মান ইহুদি পল জুলিয়াস রয়টার পায়রার ডাক চালাতেন। তাতে চোদ্দ ঘণ্টার কাজ চার ঘণ্টায় হয়। তবুও পাঠকেরা খুশী নয়। সংবাদিকরা মনমরা আরও তাড়াতাড়ি চাই। অবশেষে এলো টেলিগ্রাফ। রয়টার পায়রার খোপের দরজা খুলে দিয়ে তার বসালেন টেলিগ্রাফের তার। ফলে ১৮৫৮ সালে টাইমস অফিস ঘটালো। ভিক্টোরিয়ার দ্বিতীয় পুত্রের জন্মের খবর চার ঘণ্টার মধ্যে তারা জানিয়ে দিল লণ্ডনে।

ফ্লিট স্ট্রীট এখন যাদুকর। আরও ভোজবাজী ছিল তার। ১৮১৪ সাল থেকে ছাপার কাজ করছিল বদলে বাষ্প। প্রিন্টিং হাউস স্কোয়ারের ছাপাখানা মালিকরা এর আরও উন্নতি চান। এদিকে

আটলান্টিকের ওপরে ফিলাডেলফিয়াতেও চলেছে তারই সাধনা। অনেকের মতো মার্কটুয়েনও তার একজন পৃষ্ঠপোষক। অবশেষে এলো রোটারী মেশিন, এলো লিউফপ্রিণ্ট।

ফ্লিট স্ট্রীটের সাধনা আজ শেষ।

১৭০২ সাল থেকে ১৯৫২ সাল একটানা লড়াই করেছে তারা এর জন্যে। খবরের জন্য লড়াই। স্বাধীনতার জন্য লড়াই, জনমতের নামে লড়াই। আজ সব তার হস্তগত। ১৮০০ সালে সব চেয়ে চালু দৈনিকের প্রচার সংখ্যা ছিল ৫ হাজার ১৮০০ সালে ৫০ হাজার ১৯০৫ সালে ৭ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার : '৫৫ তে ৫০ লক্ষ। আজ ডেলি মিরারের প্রচার সংখ্যা ৫০ লক্ষ, 'ডেলি এক্সপ্রেসের ৪০ লক্ষ এবং রবিবাসরীয় কাগজ 'নিউজ অব দি ওয়ার্ল্ড' প্রতি রবিবারে বিক্রি হয় ৭০ লক্ষের ওপর। আজ বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের বয়স্ক লোকদের শতকরা অন্ততঃ ৯০ জন এদের পাঠক। গেল পঁচিশ বছরে এখানে লোক সংখ্যা বেড়েছে দশ গুণ, কিন্তু খবরের কাগজের পাঠক শতকরা ৯০ জন। দেশের শতকরা ৯০ জনের ভোটে হাউস অব কমন্স তৈরি হলেও, হাউস অব লর্ডস হয় না।

সুতরাং চতুর্থ পরিস্থিতি থেকে ফ্লিট স্ট্রীট আজ আরও আগে আসার দাবী তুলতে পারে বৈকি। জনতা আজ ফ্লিট স্ট্রীটের মুঠোয়। এর পাতায় পাতায় তারা কথা বলে,হাসে কাঁদে।

তবু এই ফ্লিট স্ট্রীট বিপজ্জনক এস্টেট। রাষ্ট্র-শক্তির কাছে তো বটেই, নিজেদের কাছেও। মোটামুটি চার ঘর এই বিরাট এলাকার মালিক আজ। নেপোলিয়ান বর্ণ ক্লিফের ক্ষমতার সঙ্গে ডেলি মিরারের রূপে রদারমিয়ারের এসোসিয়েটেড নিউস পেপারস বিভারব্রুক গোষ্ঠী বহুত কেমসলে গোষ্ঠী এই চার ঘরের হাতে আজ সাকুল্য ফ্লিট স্ট্রীট। ইংলণ্ডের শতকরা ৬০ ভাগ কাগজের মালিক তারা। এঁরা প্রেস লর্ড। ফোর্থ এস্টেটের মালিক।

পাঠকেরা কি এদের প্রজা? তার উপর খুব্‌ছে ফ্লিট স্ট্রীট। ডেলি এক্সপ্রেসের পরামর্শ: Whenever possible print a woman's age.

ডেলি মিরারের হেড লাইন: কিংবা

"Saved by strong corsets" can a woman batch Egges?"

অথবা···"Bored in Bed?"

এস্টেট নিয়ে খুনোখুনি করবে নাকি ফ্লিট স্ট্রীট? প্রজা খেপিয়ে? নর্থ ক্লিফ বিভারব্রুক এই ব্যবসাকে নানা লোভের দামে কিনতে চেয়েছিলেন। আজ 'ডেলি মিরার' বা 'এক্সপ্রেসের' তা কেনা হয়ে গেছে লক্ষ লক্ষ পাঠক তাদের নামে পাগল।

কিন্তু এটাই কি জনমত? এর জন্যেই কি ডিজরেলি স্কট, এডিসন লড়েছেন আজও ডেলি হেরাল্ড, নিউ স্টেটস্‌ম্যান লড়ছেন? এটাই কি টাইমস, 'মানচেস্টার গার্ডিয়ানের' সাধনা? ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন জাগবে পাঠকের মনে—'কোর্থ' এস্টেটের' পুরো কাহিনী শুনতে শুনতে সাংবাদিক ফ্রান্সিস উইলিয়মের কথিত এবং লিখিত 'ডেনজারাস-এস্টেট'—এ জাতীয় হাজার প্রশ্ন বোঝাই। তবে লেখক প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক। একবালের 'ডেলি হেরাল্ডের সম্পাদক সুতরাং প্রতিটি প্রশ্নের সঙ্গত উত্তরও তাঁর জানা। বস্তুত, তিনি শ' পাতার একখানা বইয়ে সম্পূর্ণ বৃটিশ সংবাদপত্র জগতের ইতিহাসের সঙ্গে, এর নায়কদের আশ্চর্য অদ্ভুত কাহিনী এবং তদুপরি—আজিকার জনমতের সমস্যার বিশদ আলোচনা কোনটাই বাদ দেননি তিনি। এবং উদ্দেশ্যপোষা এই এমন জটিল কাহিনীটিও তিনি বলেছেন আজকের খবরের কাগজের ভাষায় ডেলি এক্সপ্রেসের মেজাজে। এক্সপ্রেস বলেন:—

"There is no subject no abstract thing can not be translated into term of People.

লেখক ফ্রান্সিস উইলিয়ামস-এরও বোধহয় তাই মত। 'ডেনজারাস এস্টেট, জনমতের এই জটিল ইতিহাসকে তাই অতি সার্থকভাবে বলতে পেরেছেন তিনি জনতার ভাষায়। গল্পের ভাষায়।

(ডেনজারাস এস্টেট—বাই ফ্রান্সিস উইলিয়াম)
(সংক্ষেপিত গ্রীন-এণ্ড-কো)

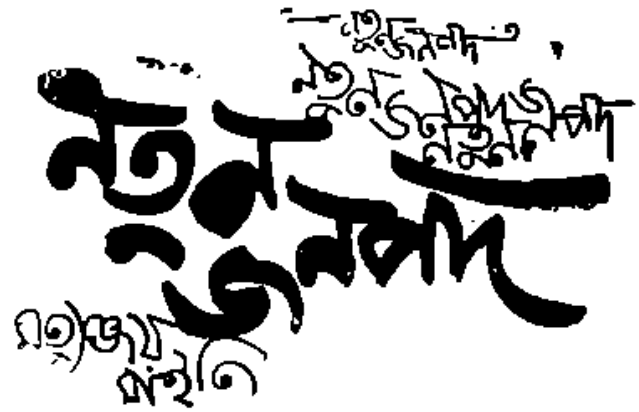

বর্ষাকাল চলেছে। এখন মাঠে মাঠে ধান চারা রোয়ার সময়। বীজতলা থেকে যে বড় চারা নিয়ে এসে মাঠে রোপন করা হয় তাকে এদেশে 'রোয়া' বলে। সেই রোয়া চাষের সময় এল। মাঠে মাঠে জল ভরে গেছে। কোথাও ধান চারা জলের ওপর মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে।

সেই বিস্তীর্ণ মাঠ মাঝে মাঝে ধান চারার সবুজ সাম্রাজ্য, আষাঢ়ের মেঘাচ্ছন্ন সকাল। চারপাশে ছড়ানো নীল নীর্জন গ্রাম। সে এক নতুন স্বাদ জীবনের!

অরবিন্দ গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে গ্রামের শেষের সরু পথটা দিয়ে যাচ্ছিল। এই ছায়াচ্ছন্ন সকালে নিজের দেশের ছবি মনে আসে তার। বাঁকুড়ার সেই কাঁকর ছাওয়া লাল মাটির পথে এই সকাল কি ছায়া ফেলেছে সেখানে। 'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ' —সত্যি কেন যেন মন ভুলোয়।

'এই যে, তোমরা কি করছ' গো—। কয়েকজন চাষী মাঠে চাষ করছিল। তাদের জিজ্ঞেস করল অরবিন্দ।

'আজ ধান রোয়া হবে'।

'কী ধানের চারা?'

একজন মজুর বলল 'দুধকলম'।

'জমিটা ঠিক করেছ?' অরবিন্দ বসে পড়ল রাস্তার উপর। পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করল। 'নাও তোমরা!' সকলকে এক একটা বিড়ি দিয়ে নিজেই একটা ধরাল সে। 'তা কি সার দিচ্ছ?'

'কি আর দোব? এই গোবর আর ছাই সার।'

'কেন, বি, ডি ও আফিস থেকে সার পাওনি?'

জমির মালিক সদয় এবার বলল, 'সা বাবু দেয়নি। আগে যে বাবু ছিল সে বলল, বীজ, সার ঋণ সব পাওয়া যাবে। আমরা জমি রেজেস্টারি করেছিলাম। তা, চাষের জো শেষ হতে বসছে কিছু নাই। যেমন সরকার, তেমন বাবু হবে ত?

অরবিন্দ নতুন এসেছে এখানে।

কিছু না বলে, সে জুতো খুলে মাঠে নেমে পড়ল, দেখতে হবে জমিটা ঠিক নরম হয়েছে কিনা? হেঁটে হেঁটে একটু দেখল, পায়ের তলায় নরম ঠেকছে।

সদয় অবাক!

মজুরেরা তখন ধানচারা গুলে বুইতে সুরু করেছে মাত্র। তারাও বাবুর কাণ্ড দেখে চেয়ে রইল।

অরবিন্দ বলল, 'এক কাজ কর তোমরা। চারা গুলোকে সমান সমান দূরে লাগাও। আর এক সারিতে লাগাও।'

সদয় ক্রমশ অবাক হচ্ছিল। সে বলল 'কি করে হবে?'

আচ্ছা বুঝিয়ে দিচ্ছি। দেখ, এই মাটি থেকেই সার নিবে, চারাগুলো বড় হবে ত? যদি চারাগুলো এলো মেলো করে লাগাও তবে, কোন গাছটা কাছে, কোনটা দূরে চাষ যাবে? কেমন না? তাতে সব গাছ সমান সার পাবে না। আর দেখ, সার করে লাগালে ধান কাটার কত সুবিধা? বুঝেছ?

সদয় মাথা নেড়ে বলল, 'কথাটা অবিশ্যি মন্দ নয়। কিন্তু কেমন করে বুইতে হবে?'

'দাঁড়াও আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। হাত কয়েক দড়ি পাওয়া যাবে?'

একজন মজুর একটা লম্বা দড়ি এনে দিল।

অরবিন্দ জমির এ মাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত দড়িটা টান করে বেঁধে দিল। এখন সহজ হয়ে গেল, ঠিক লাইন পাওয়া যাচ্ছে।

সদয় দেখে বলল, 'ঠিক বটে ত?'

অরবিন্দ বলল, 'এবার বুঝে যাও? দেখ, চারার এ-ই এতটা যেন মাটির ভেতরে যায়। হাত দিয়ে অরবিন্দ দেখিয়ে দিয়ে, কয়েকটা চারা নিজেই বুঝে দিল।'

মজুররা অরবিন্দের কাজ দেখে অবাক হচ্ছিল।

একজন জিজ্ঞেস করল, 'আপনার দেশ কোথায়?'

সদয়ের বড় আনন্দ হল ছেলেটিকে দেখে। বয়স মাত্র বছর পাঁচেক। শ্যামল রং, ছিপছিপে। ভারি মিষ্টি মুখ।

সদয় ভাবছে, এর বাবার বয়স, নিশ্চয়ই তার বয়সের মত। এই বয়সে ছেলেকে চাকুরী করতে পাঠিয়েছে? বেশ ছেলে। সরকারী চাকুরিয়া বলে অহংকার নাই। আগে যে বাবু ছিল, যা ফর্সা, সে যেন সাহেব! প্যান্ট জামা, হাতে ঘড়ি, মুখে সিগারেট।

'বাবা, তোমাদের খাবার নিয়ে এসেছি!'

একটি ষোল সতের বছরের মেয়ে বাঁধের ওপর খাবারটা রেখে দিয়ে বলল। বলেই নতুন লোক দেখে থমকে দাঁড়াল।

সদয় বলল, 'মুড়ীর সংগে কি আছে রে?'

রেখা, আস্তে আস্তে বলল, 'আখের গুড়।'

'তা, তুমি বাবা চাট্টি মুড়ি খাও না,' অরবিন্দের দিকে তাকিয়ে সদয় বলল।

অরবিন্দ হাসতে হাসতে বলল, 'এখন কি মুড়ি খাবার সময়? সকালে চায়ের সংগে খেয়ে বেরিয়েছি। না, খাব না। আজ থাক।'

রেখা বাবাকে বলল, 'এখানে মাঠের ধারে বসে কেউ আবার খায় নাকি?'

কথাটা সদয়ের মনে লাগল। বলল, তুই 'এঁকে বাড়ী নিয়ে যা, আমি পরে আসছি।'

সদয়ের অনুরোধ এড়াতে পারলনা অরবিন্দ। আসলে সরল মানুষ এরা, মানুষকে আপন করে নেয় সহজেই।

অরবিন্দ রেখার সংগে যাচ্ছিল, গ্রামের লোক আঁকা বাঁকা রাস্তাটা দিয়ে, বেগুনের ক্ষেত ডাইনে রেখে, কোথাও শুধু শালুক ফুলে ভরা পুকুরকে বাঁকে রেখে। একটা বাঁশ বাগান ওরা পেরিয়ে গেল।

'তোমার বাড়ী কদ্দুরে?'

'এই, এসে গেলাম।'

'আচ্ছা এটা কি গাছ?' একটা সোজা, দীর্ঘ, প্রকাণ্ড, মোটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে অরবিন্দ জিজ্ঞেস করল। ঘন সবুজ পাতায় গাছটা ছেয়ে আছে।

অরবিন্দের অজ্ঞতা দেখে রেখা হাসি চাপিতে পারল না, বলল, 'সে কি? আপনি এই গাছের নাম জানেন না?'

'না, জানলে আর তোমাকে জিজ্ঞেস করি? আর তুমি সেই কথা শুনে হাস আর কি?'

'না, হাসলাম আবার কোথায়? আচ্ছা হয়েছে বাবা হয়েছে, আর হাসব না।'

এখন বলুন কোন দেশ থেকে এসেছেন?

অরবিন্দ ছেলার নামটা বলল, বলেই রেখাকে জিজ্ঞেস করল, 'এরপর পিতার নাম, কি করা হয় ইত্যাদি জিজ্ঞেস করে বসবে না ত?'

রেখা এই সুন্দর দুপুরটাকুতে হেসে উঠে, বলল, 'এর নাম অর্জুন গাছ, চলতি কথায় 'অজুনি' গাছ বলে।'

'নাম কি করে জানব বল? এ গাছ আমার দেশে নাই?'

'নেই? তবে কি গাছ আছে আপনার দেশে?'

'পাম, দেগুন, শিরীষ। তুমি শালবন দেখেছ?'

রেখা উচ্ছল হয়ে উঠল, বলল, 'খুব সুন্দর বুঝি শালবন?'

'খুব সুন্দর। সেই ছোট ছোট পাহাড়, শালবন, আর টেউ খেলানো মাঠ। ছবির মত সুন্দর। বনের ভেতর দিয়ে লাল মাটির রাস্তা চলে গেছে কতো দূরে!'

রেখা থমকে দাঁড়াল।

সে যেন সেই মাঠ, শালবন, আর ছোট ছোট পাহাড় দেখছে কোন অজানা গ্রামের ধারে দাঁড়িয়ে।

মুড়ি খেতে খেতে কথা হচ্ছিল।

অরবিন্দ বলল, 'রেখা স্কুলে যায় না?'

'না, আগে স্কুলে পড়ত, আর এখন পড়তে দিইনি, মেয়ে বড় হয়ে উঠছে।'

'সেই জন্যই ত পড়ান উচিত,' অরবিন্দ বলল।

'পড়াশুনায় অবশ্য মেয়েটা ভাল ছিল।'

রেখা বলল, 'ক্লাশ এইট থেকে সেকেণ্ড হয়ে নাইনে উঠে ছিলাম।'

অরবিন্দ অবাক হয়ে বলল, 'আপনি এই মেয়ের পড়া বন্ধ করে দিলেন?'

সদয় একটু সময় চুপ করে থেকে বলল, 'পাড়ার লোকে দু'কথা বলে বাবা। মেয়ে বড় হয়েছে, কি করব বল?'

'পাড়ার লোকে যদি বলে, এই জমিতে আপনি চাষ করবেন না, শুনবেন সে কথা ?'

'তা কি হয় বাবা, চাষ বন্ধ করতে নাই।'

'তেমনি পড়াও বন্ধ করতে নাই। ওটাও এক রকমের চাষ, জ্ঞানের চাষ। লেখাপড়া শিখলে কত জিনিস জানবে, কত দেশের কথা শুনবে, কত জ্ঞান বাড়বে! বেখাকে আবার ভর্তি করে দিন স্কুলে।'

সদয় চুপ করে রইল।

মাটির সরু রাস্তা। দুপাশে বাঁশবন, মাঝে মাঝে নিম আর সজনে গাছ। রাস্তাটা শেষিয়ে সেদিন বিকেলে অরবিন্দ একটা ছোট ঘরের কাছে এসে দাঁড়াল।

দামনের একটি জমিতে বেগুন আর লঙ্কা চারা রোপণ হয়েছে। দূরে একটা প্রকাণ্ড আম গাছ, শাখা প্রশাখা মেলে উঠোনটাকে ছায়াচ্ছন্ন করে তুলেছে। কবে কোন কালে এক পুষ্পবিলাসী একটি শিউলি ফুলের চারা এনে সেই উঠোনের একধারে লাগিয়ে ছিল। সেই চারা কবে বড় হয়েছে, প্রতিটি শরতের সকালে ঘাসে ও মাটিতে কত ফুল বিছিয়ে রেখেছে। এই বর্ষায় সেই শিউলি গাছের পাতায় কোন সমারোহ আসেনি। শুধু শীর্ণ মৃতপ্রায় কয়েকটা শাখায় বিগত যৌবনের স্মৃতিচিহ্ন, আদর যখন প্রায় অপরাহ্নে নিঃশব্দে জেগে আছে।

অরবিন্দ ঘরটির কাছে এসে দাঁড়াল।

'ওস্তাদজী ঘরে আছেন নাকি ?'

'কে ?' একটি বৃদ্ধ কাশতে কাশতে অন্ধকার ঘরের ভেতর থেকে জবাব দিলেন।

'আমি অরবিন্দ।'

লাঠি ঠুকতে ঠুকতে আস্তে আস্তে বুড়ো বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। শীর্ণ কঙ্কালসার দেহ। গৌরবর্ণ গায়ের চামড়া কালে পড়েছে। মাথার চুল একেবারে ধবধবে সাদা। কিন্তু চুলগুলি দীর্ঘ। যৌবন কালে ওস্তাদ মাথায় চুল রাখতেন।

সারা শরীরে একটি প্রাচীন নিষ্প্রভ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ যেন ছড়িয়ে আছে।

বৃদ্ধ বললেন, 'বোসো, বাবা বোসো'।

অরবিন্দ, ঘড় দিয়ে বোনা একটি পিঁড়িতে বসে পড়ে জিজ্ঞেস করল, 'শরীর কেমন আপনার ?'

'ভাল নয়, ভাল নয় বাবা বড় কফ-কাশিতে বড্ড ভুগছি। হাত পা গুলোও ফোলা ফোলা মনে হয় ?'

'ভাল ওষুধ খান না।'

'খাচ্ছি, অসিত দিচ্ছে। কিন্তু ওতে কি শুনবে বাবা ? যাবার সময় এসেছে, এ চলে তারি আগায় ঘণ্টা, যাত্রার দল আরম্ভ হবার আগে যেমন 'সীন' নাচে।'

ওস্তাদ মহেন্দ্র অধিকারী তাঁর ক্ষীণ দৃষ্টি নিয়ে, মৃতপ্রায় শিউলি গাছটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কথাগুলো বলছিলেন।

'কিন্তু ওস্তাদজী,' আমি বলছিলাম কি, আপনি যাবার আগে কাউকে কিছু দিয়ে যান, আপনার এসব মহাবিদ্যা, আপনি চলে গেলে সব হারিয়ে যাবে যে !'

ওস্তাদজী তেমনি গাছটার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'কাকে দিয়ে যাব বাবা ! ছেলে নাই, মেয়ে নাই, আর এসব জিনিস লম্পটকে দেওয়া যায় না। তা তোমার মধ্যে লক্ষণ আছে, তোমার কপাল চোখ, মুখ দেখলে বোঝা যায়। কিন্তু আমারও আর সময় নেই।'

'না, না, আমার কথা আমি বলছি না' অরবিন্দ বলল, 'আমার নেবার সাধ্য নেই, তা ছাড়া আমাদের সরকারী চাকুরী করতে হয়, আজ এখানে কাল সেখানে। আমি বলছিলাম, এই গ্রামের ছেলেরা যদি এক আধটু চর্চা করে ? সন্ধ্যাবেলা ক্ষেতের কাজ টাজ শেষ করে একটু বসে তাহলে কেমন হয়। সব যে ওস্তাদ হবে এমন নয়, কিন্তু সকলে বসে একটু আনন্দ করবে, একটু আড্ডা দেবে ক্লাব করবে—গ্রামে থাকতে হলে এগুলোও দরকার, নয় কি ?'

ওস্তাদজী বললেন, গ্রামের দু'একটি ছেলে একটু শিখেছিল, অভয় বলে একটি ছেলে উঠেছিল ভাল। তা বাবার কাছে থাকে। ওতে কি হয় বাবা ? এই আমার জীবনের কথাই ধর না, ঘর বাড়ী জমি জায়গার দিকে তাকাইনি। এই গান নিয়েই পড়ে রইলাম। স্ত্রী চলে গেল, এখন একা। এখন দেখছি, ভাবছি, কি পেলাম জীবনে কোনোদিন দারিদ্র্য ঘুচল না, একদিনও দুদিনের মুখ দেখলাম না। তা না ঘুচুক কিন্তু এত যে সাধ-সাধনা করলাম কিন্তু ভগবানের

খবর কানে ত এল না বাবা, কষ্ট কোন দূর ও আমাকে তার পাশের কাছে পৌঁছে দিল না।

শেষ অপরাহ্নের দীনতে আলো অন্ধকারে বসে ওস্তাদজী যেন কার চরণ ছুঁয়ে যাবার প্রতীক্ষা নিয়ে ঘাটের ধারে বসে আছেন।

একটু পরে ওস্তাদজী বললেন, নীলাপুর স্কুলে একটি মেয়ে সেদিন গান গাইছিল। বড় ভাল লাগছিল। গুণী মেয়ে গুরুর আশীর্বাদ পেয়েছে মেয়েটি লক্ষণ-যুক্তা, কি গলার কাজ বড় ভাল লাগছিল বাবা। বড় ভাল লেগেছিল, তা এলের ত অন্য কাজের মিটিং, আর গান শুনতে চাইলেও শোনা যাবে না। বরা নদীটার ধারে বটগাছের তলায় বসে বসে একা সেই গান শুন-ছিলাম। এমনি একটু ঠেকা দিয়ে বেহালায়, ও বাবা, তালে লয়ে একেবারে পাকা। মেয়েটি কোথাকার জান

'মেয়েটি নীলাপুর গার্লস স্কুলের মিসট্রেস।'

'ওর গান একদিন শোনাতে পারবে বাবা? এই বুড়ো বয়সে বড় গান শুনতে ইচ্ছে করে। নিজের গলার সুর ত ফুরিয়ে আসছে।'

একটু পরে দূর থেকে একটি সাইকেলের ঘণ্টির আওয়াজ শোনা গেল। অসিত সাইকেল থেকে নামল। তারপর উঠানে সাইকেলটি দাঁড় করিয়ে রেখে একেবারে দাওয়ায় উঠে এল।

'কেমন আছেন বাবা?'

ওস্তাদজী বয়সে অসিতের বাবার চেয়ে কিছু ছোট।

'ভাল নেই, কফ কাশি আদৌ যাচ্ছে না।'

অসিত ততক্ষণে স্টেথিস্কোপটা ওস্তাদজীর বুকে লাগিয়ে দিয়েছে।

'জোরে জোরে নিশ্বাস নিন ত? হুঁ, কফ আছে। ওষুধ খেয়েছিলেন?'

'খেয়েছি ত।'

'কেবল ওষুধের চাঁই ত করেছেন। শরীর চর্চাও এক আধটু করতে হয়। আচ্ছা, আর একটা নতুন

মাঝখান দিয়ে পথটা যেখানে নদী ধারের দিকে চলে যাওয়ার জন্য গাছ পালার আড়াল হয়েছে। অসিত একদৃষ্টে শূন্য চোখে পড়ছিল মুসলমানের কবরখানার পাশ দিয়ে নদী ধারের দিকে চলে যাওয়ার পথটা।

পাকুড় ফুল ভরা পুকুরটার সোনা মাটির পাড় দিয়ে অসিত আসছে।

ওস্তাদজীর বাড়ীর সামনে এসে অসিত সাইকেল থেকে নামল। তারপর উঠানে সাইকেলটি দাঁড় করিয়ে রেখে একেবারে দাওয়ায় উঠে এল।

'কেমন আছেন বাবা?'

ওস্তাদজী বয়সে অসিতের বাবার চেয়ে কিছু ছোট।

'ভাল নেই, কফ কাশি আদৌ যাচ্ছে না।'

অসিত ততক্ষণে স্টেথিস্কোপটা ওস্তাদজীর বুকে লাগিয়ে দিয়েছে।

'জোরে জোরে নিশ্বাস নিন ত? হুঁ, কফ আছে। ওষুধ খেয়েছিলেন?'

'খেয়েছি ত।'

'কেবল ওষুধের চাঁই ত করেছেন। শরীর চর্চাও এক আধটু করতে হয়। আচ্ছা, আর একটা নতুন

স্বাধীনতা বিপন্ন, আপনার সমস্ত শক্তি দিয়ে তা রক্ষা করুন
—জওহরলাল নেহেরু

জাতির শক্তিবৃদ্ধির জন্য ব্যয়বাহুল্য বন্ধ করুন

দেশবাসী যদি সদাসতর্ক থাকেন এবং স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকেন তাহলেই শুধু দেশের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা রক্ষা করা যায়।

সমস্ত রকম ব্যয়বাহুল্য এবং অযথা ব্যয় বর্জন ক'রে দেশের দ্রুত উন্নয়নের পক্ষে প্রয়োজনীয় সম্পদ সৃষ্টিতে আপনিও সাহায্য করতে পারেন।

আপনার সঞ্চয় থেকে জাতি তার প্রয়োজনীয় জিনিষ কেনে

ঔষধ পাঠিয়ে দেব ঠাণ্ডা জলে জামটা কয়েকদিন বন্ধ রাখুন।'

একটি ছেলে তিন কাপ চা দিয়ে গেল।

'আপনাকে নতুন দেখছি,'—অসিত, অরবিন্দের দিকে তাকিয়ে বলল।

'আমি এখানকার গ্রামসেবক, নমস্কার।'

'নমস্কার। বেশিদিন আসেন নি বোধ হয়।'

'না, আপনার নাম খুব শুনেছি, এ অঞ্চলে এসে।'

অসিত দুষ্টুমি করে বলল, 'দুর্নাম নয় ত?'

ওরা সকলে হেসে উঠল।

ওস্তাদজী বললেন, 'অসিত তুমি বাবা, নীলাপুরের স্কুলের সেই মেয়েটিকে জান, যে গান গায়?'

'ও, নন্দিতাকে? খুব ভাল করে জানি।'

'একদিন ওর গান শোনাবে? বড় গুণী মেয়ে।'

'আচ্ছা একদিন শোনাব। নিয়ে আসব এখানে। খুব ভাল মেয়ে নন্দিতা। আমার পেসেণ্ট। আমি এখন আসি। ওই মুসলমান পাড়ায় একটা রোগী আছে। দেখতে যাচ্ছিলাম। তাই আপনাকে দেখে গেলাম একবার।'

'অরবিন্দবাবু, আসি ভাই।'

'বাবু নয়, কেবল ভাই—' অরবিন্দ উঠে দাঁড়িয়ে বলল।

'তবে দাও, হাতটা দাও।' অসিত জোরে হ্যাণ্ড শেক করে হাসতে হাসতে সাইকেলে উঠে পড়ল।

কয়েকটি আনন্দময় মুহূর্ত সঙ্গে করে নিয়ে অসিত আবার সেই পুকুর পাড়, আর গাছ গাছালির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। কথা বলতে বলতে কখন অন্ধকার হয়ে গেছে। সেই শিউলি গাছ, বেগুন আর লঙ্কা গাছের ছোট ক্ষেতটা এখন আর ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। খঞ্জনী বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে একটি লোক নদীর ধার দিয়ে চলে যাচ্ছে।

অরবিন্দ বলল, আচ্ছা ওস্তাদজী, আপনার গুরু কে ছিলেন।'

'আমার গুরু ছিলেন বাবা, পশ্চিমের এক ওস্তাদ পঁচেটাগড়ের নাম শুনেছ ত? শোনোনি? তুমি বেশিদিন আসনি এদেশে। সে ত শুধু একটা যায়গা নয়, সে যেন একটা তীর্থক্ষেত্র। কত গুণীর পায়ের ধুলো পড়েছে সেখানে। কত সুরে বেজেছে তার আকাশে। কত বার ধ্রুপদী এসেছেন সেখানে। একবার তাঁর নিজের হাতের লেখা একটি মূল্যবান গানের খাতা সেখানে ফেলে গেছলেন। এখনও সেটা আছে বোধ হয়। তা, সেই পঁচেট গড়ের চৌধুরীরা পশ্চিম থেকে ওস্তাদ নিয়ে এসে দেশের ছেলেদের খাওয়া পরা দিয়ে গান বাজনা শেখাতেন। সব রকম বাজনা শেখানোর ব্যবস্থা ছিল। সেতার, সুরোদ, এসরাজ, সেহেলা, জলতরঙ্গ। অমন দুটি তীর্থ ক্ষেত্র এদেশে আর নাই। কিন্তু লোকে বুঝল না বাবা, সে দুঃখ। দেশ ভুলে গেল।'

তারপর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে আবার বললেন 'যাক, ওতে দুঃখ নেই। তা সেইখানে গান শিখেছিলাম। ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর গুরু ভাই ছিলেন, যাদবেন্দ্র চৌধুরী। ওস্তাদজী, 'যাদবেন্দ্রবাবু' এই মহান নামটি স্মরণ করে তাঁর উদ্দেশ্যে হাত জোড় করে প্রণাম করলেন, বললেন, তিনিই ওস্তাদ আনাতেন পশ্চিম থেকে।

এই গুরুর পায়ের ধুলোর জোরে বাবা, বুক ফুলিয়ে গান গেয়েছি, কোন ভয় পাইনি, কোথাও গাইতে। যত বড় আসর হোকনা কেন? লোকে হাঁ করে থাকত, ওস্তাদ মহেন্দ্র অধিকারী কখন গান গাইবে।

সেবার কি ব্যাপার হল শোনো। ওস্তাদজী হঠাৎ থামলেন তারপর সেই ঘরের দাওয়ার বসে জীবনের একটু উৎফুল্ল পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছেদের পাতা খুলে ধরলেন। না, এখন যেন তার অক্ষরগুলো দেখা যাচ্ছে না, সব পর্দাগুলো যেন গলায় লাগছে না তার। অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে, মৃত্যুর মত ধূসর নির্জন, অস্পষ্ট, অন্ধকার। সেই বিস্তীর্ণ অস্পষ্টতার ওস্তাদ মহেন্দ্র অধিকারী যেন বড়ো কণ্ঠে একটি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ধীরে ধীরে নিচু পর্দার পড়ে যেতে লাগলেন।

[ক্রমশঃ

॥ ছয় ॥

পরদিন মুকুন্দবাবুর চৌরিঙ্গীর সামনে শঙ্কর গিয়ে হাজির হল দুপুর বেলায়।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে মুকুন্দবাবু বললেন—কি ব্যাপার, আজ যে না হাজির? কি ব্যাপার?

—ব্যাপার একটা আছে বলে হাতের কাগজখানা খুলে তাঁর চোখের সামনে ধরল শঙ্কর।

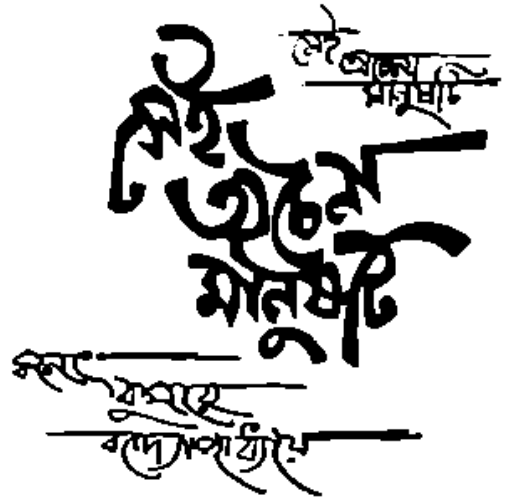

চোখেই কটমট করে তার দিকে চাইলেন মুকুন্দবাবু সামনের খোলা পাতায় তো এক আধুনিকা বিবস্ত্রা যুবতীর ছবি এই ছবিই কি সে তাঁকে একটু রহস্যভরেই তিনি বললেন—কি?

শঙ্কর বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটা তার ভুল ভেঙে দিলে না। মৃদু মৃদু কৌতুকের হাসি হাসতে হাসতে বললে—দেখুন না ভাল করে?

—কি দেখব কি?

—আমি আপনাকে যা দেখতে দিয়েছি তা দেখছেন কই? যা দেখতে দিইনি তাই দেখে রাগ করছেন! মেম সাহেবের ছবির পাশে যে সব ছবি রয়েছে সেগুলি দেখুন।

তার মুখের দিকে আবার একবার তাকিয়ে তিনি কাগজখানার উপর ঝুঁকে পড়লেন। ঝুঁকে পড়লেন শুধু নয়, দেখতে যদি আরম্ভ করলেন তো দেখা আর শেষই হয় না! অনেকক্ষণ দেখে শঙ্করের মুখের দিকে মুখ তুলে চাইলেন।

হেসে বললে শঙ্কর।

—দেখলাম। কিন্তু দেখে কি করব।

কি করবেন? খিল খিল করে হাসতে লাগল শঙ্কর। হাসতে হাসতেই বললে—এখন আমাকে অনুমতি দেবেন।

—কিসের অনুমতি? অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন মুকুন্দবাবু।

তাঁর চেয়েও আরও বেশী বিস্মিত হয়ে শঙ্কর বললে—এগুলো কি তা হলে আপনাকে মিছিমিছিই দেখালাম? আপনি অনুমতি দেন আমাকে আমি এগুলো তৈরী করবার চেষ্টা করি।

আকাশ থেকে পড়লেন মুকুন্দবাবু। বললেন—বল কি, এই সব জিনিস এখানে তুমি তৈরী করবে? তা কি হয়?

—কেন হবে না?

—অত টাকা কোথায় পাবে? সেডিও তৈরী করা কি সোজা কথা?

—টাকার কথা তুললে কি বলব? কিছু বলার নেই আমার। তবে ফিটারটা দেখি চেষ্টা করে।

—ও তৈরী করে কি হবে? ও কি আমাদের দেশে চলবে?

—চলবে না? কেন চলবে না? এক মুহূর্তে উষ্ণ ও উত্তপ্ত হয়ে উঠল শঙ্কর।

তার উত্তাপ দেখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে

আহারের পর দিনে দু'বার..

সব ঋতুতে স্বাস্থ্য লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়

সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান

দু' চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহা-দ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) সেবনে আপনার স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহা-দ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দ্দি, কাসি, শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক ফলপ্রদ। মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্দ্ধক ও বলকারক টনিক। দু'টি ঔষধ একত্র সেবনে আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলব্ধ স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে।

সাধনা ঔষধালয় • ঢাকা

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্ব্বেদ-আচার্য্য, ৩৩, মো হা ন পা ড়া রোড, কলিকাতা-৩৭

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন), এম,সি,এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

অসহায়ভাবে তাকালেন মুকুন্দবাবু। বললেন—এই দেখ তুমি রাগ করছ! কিন্তু যদি চলত তা হলে আর কেউ না-জানুক আই ই সি কি এখানে মাল আনত না মনে কর?

এমনভাবে তিনি কথাগুলি বললেন যে মনে হল তাঁর কথাই নয়। তাঁর গলা দিয়ে অন্য কেউ কথা বললে যেন!

সে সব কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করলে না শঙ্কর। উত্তেজিতভাবে বললে—আপনি একথা বলবেন এ আমি কল্পনাই করতে পারি না!

হঠাৎ সঙ্গে সোঁচা খেয়ে যেন জেগে উঠলেন মুকুন্দ বাবু। যেন ডুবে জলে সাঁতার কেটে ডুবতে ডুবতে পায়ের তলায় শক্ত কিছু ঠেকেছে পায়ে। তিনি বেঁকে উঠে বললেন—কেন? আমার বলতে কি বাধা আছে?

ও পক্ষেও উত্তেজনা কম নয়। উত্তেজিত শঙ্কর বললে—আপনি যেদিন এ কারখানা তৈরী করেছিলেন পাখা তৈরী করার জন্যে সে দিন কি সন্দেহ করেছিলেন পাখার বাজার নেই বলে? আর সেদিন কি আজকের মত পাখার বাজার ছিল?

থতমত খেয়ে গেলেন মুকুন্দবাবু।

কিন্তু মুকুন্দবাবুকে শঙ্করের আক্রমণ তখনও শেষ হয়নি। সে সমান উত্তেজনার সঙ্গে বললে—বাজার ছিল কি না সে কথা ভাববার মত মন সেদিন আপনার ছিল না! বাজার হয়তো ছিল না, হয়তো ছিল! তাতে আপনার কিছু যায় আসেনি। সেদিন পাখার বাজার না থাকলেও আপনি পাখা তৈরী করতেন। না করে থাকতে পারতেন না। থাকতে পারতেন না বলেই করতে পেরেছিলেন।

তার কথা শুনে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন মুকুন্দবাবু। বললেন—তা কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ। তা না করে সে দিন থাকতে পারতাম না! তা কর তুমি কর।

শঙ্কর জোর দিয়ে বললে—হ্যাঁ করবই তো! ফিউজ তৈরী করব, আলোর বাল্ব তৈরী করব।

—পারবে করতে? আবার সেই মুহূর্তেই সব ভুলে গিয়ে ছোট ছেলের মত কৌতূহলী হয়ে উঠলেন মুকুন্দবাবু!

—নিশ্চয় পারব। তবে করার পর টাকা লাগাবার কথা উঠবে। যখন আমরা লাইসেন্স মাল তৈরী করে বাজারে ছাড়তে যাব তখন টাকা লাগবে।

একটু থেমে শঙ্কর বললে—টাকার যদি আপনার অভাব হয় আমাকে বলবেন আমি ব্যবস্থা করব। আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না!

এবার অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকালেন মুকুন্দবাবু। বললেন—তুমি টাকার ব্যবস্থা করবে? তুমি টাকা পাবে কোথা থেকে?

শঙ্কর হেসে বললে—সে পাব। আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না।

হাত নেড়ে একান্ত তুচ্ছ মানুষের মত তিনি—বললেন—তবে আর কি? কাজে লেগে যাও তা হলে!

আবার মেতে উঠল শঙ্কর।

মেতে উঠল বই নিয়ে। শুধু মেতেই উঠল না তার স্ফূর্তি যেন আর বাঁধ মানে না।

আবার নিজের ঘর ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছে ল্যাবরেটরীতে। তবে আজকাল অবিরাম পড়াশুনো করে না। পড়াশুনো করতে করতে ক্লান্ত লাগলে বাইরে বেরিয়ে এসে সে বসে বকুল তলায়। সার্টের পকেটে থাকে সস্তা বিস্কুট। বিস্কুটগুলো গুঁড়ো করে ছড়িয়ে দেয় একখানা দুখানা করে। সঙ্গে সঙ্গে সেই কাকটা এসে লাফিয়ে পড়ে সর্ব প্রথম। আর আসে শালিক গুলো আর চড়াইয়ের দল।

কাকটা কোন কোন দিন কোথায় থাকে! আসে দেরীতে। এসেই পাখীর দলের মধ্যে পড়ে ঝপ করে। তার পাইয়ে দের শালিক আর চড়াইগুলোকে কা কা শব্দ করে। তারা সরে গেলেই বিস্কুটের বড় বড় টুকরোগুলো মেরে বেড়ায় লাফিয়ে লাফিয়ে। মধ্যে মধ্যে শালিকগুলো তাকে রেহাই দেয় না, তাড়া করে যায় তাকে। তবে যুদ্ধে জয় হয় কাকটারই।

কাকটার স্বভাবের জন্যে বিশেষ কৌতুক বোধ করে শঙ্কর। ওর এই স্বভাবের জন্যেই শঙ্কর ওর নাম দিয়েছে 'কেড়েখেগো' মানে যে অন্যের খাবার কেড়ে খায়।

ওকে ভালবাসে শঙ্কর। আবার ভয়ও করে। মধ্যে মধ্যে ও আবার তার ঘাড়ে মাথায় উড়ে এসে বসে তাকে জ্বালাতন করে। আবার ওর সম্বন্ধে বিশ্বস্ততাও অনুভব করে। মনে হয়—সে যদি একদিন ওকে পেত হাতের কাছে তাহলে দেখতো ওকে একবার!

সেই মতলবটাই ওর মাথার মধ্যে পেলছিল করেক দিন ধরে।

কাজের জন্যে ল্যাবরেটরীতে নানান রকমের তার কিনে এনেছে শঙ্কর বাজার থেকে। তাছাড়া তার লোহার তার তো আছেই। তাছাড়া লোকানার কাছ থেকে ধার চেয়ে অতি সরু রুপোর তারও তৈরী করিয়ে এনেছে।

সেই রুপোর তারের খানিকটা টুকরো টুকরো করে পকেটে পুরে সে এসে গাছতলায় সেদিন বসল। একখানা বিস্কুট গুঁড়ো করে ছড়িয়ে দিলে কাছাকাছি। সঙ্গে সঙ্গে যারা আসবার ছুটবার তারা এসে জুটে গেল। কেড়েখেগো শালিক চড়াই তাড়িয়ে ধমকাধমকি অগ্রভাগ গ্রহণ করলে। তারপর আবার আরম্ভ করলে কা কা করতে।

শঙ্কর কিন্তু চুপ করে বসে রইল। আর বিস্কুটের গুঁড়ো ছড়াল না অন্য দিনের মত।

বসে একটা কিছু প্রত্যাশা করতে লাগল সে। তার ধারণা সব কাকের চরিত্র সে না বুঝুক এই কেড়ে-খেগোর চরিত্রটা সে ঠিক বুঝেছে।

সে পকেট থেকে কিছু বের করে একটা হাতের ভিতর রাখলে মুঠো করে, অন্য হাতটা তুলে গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে রাখল, তারপর চোখ মিটি মিটি করে বসে রইল।

সেই মুহূর্তেই ঘটল প্রত্যাশিত ঘটনাটি।

কাকটা কা কা করতে করতে উড়ে এসে বসে তার মাথার উপর নখগুলো দিয়ে সে তার মাথার চুল আঁচড়ে নীচে মাথার চামড়ার আশ্রয় খুঁজছে। যন্ত্রণা হচ্ছে শঙ্করের। এক সঙ্গে যেন অনেকগুলো পিন ফুটছে মাথার চামড়ায়।

মাথার উপরে কাকটার দুই পায়ের নখ যেন তীক্ষ্ণ সুড়সুড়ি দিচ্ছে মাথায় নড়া চড়া করে। তার সাথে পাখও উঁকি মেরে তার হাতের মুঠোয় বিস্কুট আবিষ্কারের চেষ্টা করছে।

শঙ্কর সেই মুহূর্তে উঁচু করে ঠেসান চাড়খানা বজ্রের মত নামিয়ে এনে চেপে ধরলে তার বস্তুকিন্তু শয়তানকে। শঙ্কর বুঝতে পারছে সে তার একখানা পাখা চেপে ধরেছে। কাকটা কা কা শব্দে আকাশটা মুখর করে তুলেছে আর ছটফট করছে প্রাণপণে।

উঃ, ঠুকরে দিচ্ছে তার হাতে! কিন্তু যে পাখও শয়তান, তাতেও তোমার পরিত্রাণ নাই। আপন মনে বিড় বিড় করে বলতে বলতে তাকে মাথা থেকে নামিয়ে নিয়ে এল সে। এসে কোলের উপর ফেললে।

কাকটা ভয়ে ত্রাহি চীৎকার করছে! ছটফট করছে সেই দলে।

শঙ্কর তাকে ভাল করে চেপে ধরে উঠে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে, ছুটতে ছুটতে গিয়ে ল্যাবেটরীতে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলে। সে জানে ওর ত্রাস্ত ডাকে এখনি ঝাঁকে ঝাঁকে কাক এসে হাজির হবে। কাকের স্বজাতিপ্রীতি বড় ভয়ানক।

ল্যাবরেটরীতে ঢুকে সর্বপ্রথমে ওর পায়ে দড়ি বাঁধলে সে, তারপর চৌরাইন সুতো দিয়ে বেঁধে ফেললে ওর মুখটা। তারপর আরম্ভ করলে আপনার পরিকল্পনা মত কাজ। অনেক যত্ন করে ওর দুই পায়ে দুই রুপোর আংটা তৈরী করে পরিয়ে দিলে। তারপর আস্তে আস্তে ওর সব বাঁধন খুলে দিয়ে একখানা বিস্কুট ধরলে ওর মুখের সামনে খা এইবার! দেখতো তোকে কেমন গয়না পরিয়ে দিলাম।

খাবারের দিকে তখন আর মন নাই ওর। সে পালাবার জন্যে ব্যস্ত। দরজা খুলে তাকে ছেড়ে দিলে শঙ্কর। প্রথমে সে ধপ করে একবার মাটিতে পড়ে, পরমুহূর্তেই আবার কা কা করতে করতে উড়ে পালাল।

সকৌতুক দৃষ্টি ফেলে শঙ্কর দেখলে সে কারখানার কোথাও বসল না, সোজা উড়ে একেবারে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল।

চোখ নামিয়ে আনতেই চোখ পড়ল রাখহরির দিকে।

—আরে কি করছো তুমি চাচাজী? কিরা, তুম কৌয়া পাকড়া থা?

—জান আমার কোথাটাকে গজনা পরিয়ে রংপোর মল।

—তুমি ছোটা বাচ্চা আছ চাচাজী!

চোখ পাকিয়ে শঙ্কর বললে—ছোট বাচ্চা আছি আমি? জান হমি তুমসে কি বুড্ঢা।

হঃ হঃ করে হাসতে লাগল রামসুহাস। হাসতে হাসতে গোঁফে হাত বুলোতে লাগল। বললে-ঠিক বাত। ইতো ঠিক বাত। ইসি লিয়ে তো হম আপকো চাচাজী বলতে হেঁ। বড়া চাচাজী হয়কো তো দেশ যানে হোগা একদফে!

—তুমি দেশে যাবে? অকস্মাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল শঙ্কর।—তুমি গেলে আমি থাকব কার কাছে? কে খেতে দেবে আমাকে?

—সে বেবস্থা হজুর কুছ হোবে! বাবুকে বলতে হোবে! বোলনেসে কুছ ব্যবস্থা তো হোগা হজুর! হুকো তো যানেই হোগা। দেশমে তো বাবাকো বেধার হুঁয়া!

রামসুহাসের যে দেশ আছে, সেখানে তারও যে ঘর আছে, সে ঘরে তারও যে বাপ, ভাই, স্ত্রী ছেলে আছে এ কথাটা যেন কোনও দিন খেয়ালই করেনি শঙ্কর। সে যেন এই ক'মাসে ধরে নিয়েছিল রামসুহাস শুধু তারই লোক। তার যেমন রামসুহাস ছাড়া কেউ নেই, রামসুহাসের তেমনি কেউ নেই সে ছাড়া। রামসুহাস তারই একক সম্পত্তি যেন।

খানিকটা ভেবে ব্যাপারটাকে ঠিক চোখে দেখতে অসুবিধা হল না শঙ্করের। তাতাই তো, সুহাসের দেশ আছে, ঘর আছে, আত্মীয়-স্বজন আছে। আত্মীয়-স্বজন যখন আছে তখন কারও অসুখ করতেই পারে! অসুখ করলে যেতে হবে বৈ কি তাকে! তা যাক, সুহাস দেশে যাক!

ভাবতে গিয়েই আবার কৌতুক-বোধ ফিরে এল শঙ্করের। সে গম্ভীর ভাবে বললে—কিন্তু তোমার তো যাওয়া হবে না! তুম তো হামার পরিবকে বুড্ঢা! হম মানে সে মানা করতা! মৎ যাও!

—নাহি চাচাজী, যানেই হোগা একদফে।

রোজ কে দিনে!

—আচ্ছা, কাল সবেরে ভগবান তুমকো বোল দেগা—সুহাস দেশ যাও মৎ!

—কেইসে? অবাক হয়ে তাকাল রামসুহাস তার দিকে।

—কেইসে? কাল ভগবান সমঝা দেগা সবেরে! গম্ভীরভাবে বললে শঙ্কর।

রামসুহাস তার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। কিন্তু যখন লক্ষ্য করলে শঙ্করের ঠোঁটে ও চোখে সকৌতুক হাসি প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে তখন হেসে রামসুহাস বললে—তুম মজাক্ করতা হ্যায়!

কিন্তু পরদিন সকালে শুকনো মুখে রামসুহাস এসে দাঁড়াল তার কাছে।

সে তখন অফ করছিল শেভিংক্রীমটা। তাকে দেখে বিস্মিত হয়ে বললে—কি হল সুহাসজী?

—কিয়া কিয়ে বাবুজী আপ? আর তার সরল 'চাচাজী' সম্বোধনটি বেরুল না তার মুখ দিয়ে।

—কিয়া কিয়া? একান্ত বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে শঙ্কর। তারপর তার মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে সে যেন নিজের বিস্ময়কে আরও বাড়িয়ে তুলে বললে—কি ব্যাপার কি? একেবারে গামছা পরে, লোটা হাতে? এঁ্যা? ব্যাপার কি?

সঙ্গে সঙ্গে রামসুহাস কিছু বলবার আগেই সে যেন সব বুঝে নিয়ে বললে—ও, আচ্ছা! তব্ ভগবানকা হুকুম মিল গয়া? কেইসে মিলা?

শঙ্কিত রামসুহাস শুকনো মুখে বললে—আস্নান করনে কো লিয়ে যা কর চৌচ্চাকা পানিমে যেইসে হাত লাগায়া কি ঐ সে কটসনি কিয়া লাগা! হাত তো কটা গিয়া সাথ সাথ। কিন গিয়া তো কিন ঐসি বাত!

গম্ভীর ভাবে শঙ্কর বললে—অব সমঝা, ঘর মৎ যাও! ভগবানকা হুকুম!

শুকনো মুখে চুপ করে স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে রইল রামসুহাস।

গভীরতর ভঙ্গিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে শঙ্কর বললে—আচ্ছা দাও, স্নান করে নিচ্ছি। আর আমি তোমার ভগবানকে রাগ করতে বারণ করে দিচ্ছি। তুমি আমাকে ফেলে দিয়ে বাড়ী গেলে তিনি রাগ করবেন না। বলে দেব। কোন ভয় নাই তোমার। স্নান করে আমার সঙ্গে দেখা কর একবার!

রামদুলাল দ্বিধাগ্রস্ত পদক্ষেপে বেরিয়ে গেল।

সে বেরিয়ে যেতেই তার লোটা-ধরা হাত আর গামছা পরা কোমরের দিকে তাকিয়ে সে অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল। হাত বাড়িয়ে একটা সুইচ 'অফ' করে দিলে। যে সহস্র ভাবটা তড়িৎ বহন করে চৌবাচ্চার জলে গিয়ে জলকে বিদ্যুৎ তাড়িত করেছিল সে ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেল।

হাসতে হাসতে পকেটে এক গোছা বিস্কুট নিয়ে, কাগজ পেন্সিল বই নিয়ে সে বেরিয়ে গিয়ে বসল বকুল গাছতলায়। ক'খানা বিস্কুট ভেঙে ছড়িয়ে দিলে গাছতলায়। প্রতীক্ষা করতে লাগল তার নিমন্ত্রিত সঙ্গীদের।

অনেকগুলি চড়াই আর শালিক এসে জুটল। কিন্তু সে কই?

এদিক ওদিক চাইতে চাইতে নজর পড়ল তার উপর। ঐতো লাবণ্যেরা টিনের চালার উপর বসে আছে পাখে রুপোর চিকচিকে মল পরে। মধ্যে মধ্যে ডাকছে কা কা করে। কিন্তু নেমে আসছে না।

ভয়ে আসছে না। ভাবতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। ওকে আদর করতে গিয়ে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। আগেও এমনি ঘটেছে। দুর্নিবার্লাকেও বোধহয় বেশী ভালবাসতে গিয়েই পর করে দিয়েছে সে।

সঙ্গে সঙ্গে মাথার ঝাঁকড়া চুলগুলোকে ভাল করে ঝাঁকি দিয়ে মাথাটা নাড়লে সে বার কয়েক। এসব কি ভাবছে সে? কেন ভাবছে? এ সব ভাববার তার সময় নেই। কাজ, অনেক কাজ আছে তার।

সে ঝুঁকে পড়ল কাগজের উপর পেন্সিল হাতে।

পূর্ব দিক থেকে শীতের রোদ এসে পড়েছে গাছের গোড়ায়। রোদটা বেশ লাগছে। কাজের মধ্যে ডুবে গেল সে।

রামদুলাল স্নানের পর একবার ডাকতে এসেছিল তারই হুকুম মত। প্রথম বার কয়েক দেখে পাখীর পার্শ্বদৃষ্টি যার থাকতে সে মুখ তুলে একবার শূন্যদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে পরক্ষণেই কাগজের মধ্যে মুখ নামিয়ে নিয়েছিল সে। যে শঙ্কর রসিকতা করেছিল এই একটু আগে, সে এখন কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। আর এক জন শঙ্কর তখন নিজের স্বপ্নের মেঘে দাঁতার কাটছে যেখানে তার কোন সঙ্গী নেই, যেখানে সে একক, তার কোন সঙ্গী নাই, এবং যেখানে কাউকে সে সহ্য করবে না।

কিন্তু সে স্বর ভাঙল আর ও উচ্চতর গ্রামে।

তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে মুকুন্দবাবু বলছেন—কি হে ছোকরা, সেই সকাল থেকে এই গাছতলায় বালির মধ্যে বসে আছ? অবিশ্যি তোমাকে বলে কিছু লাভ নেই। তোমার মাথার দু একটা স্ক্রু একটু আলগা আছে। কি আর করা যাবে। তা এখন ওঠ। অফিসে এস একবার।

—কেন?

—আরে তোমার ওই এক স্বভাব! কথায় কথায় খালি প্রশ্ন এর! এস আমার সঙ্গে।

দু জনে পাশাপাশি যেতে যেতে মুকুন্দবাবু বললেন—রামদুলাল তো কাল বাড়ী যাচ্ছে!

খোঁড়াতে খোঁড়াতে যেতে যেতেই শঙ্কর বললে—হ্যাঁ।

—তোমার কাছেও তো ছুটি নিয়েছে বললে!

হেসে শঙ্কর বললে—হ্যাঁ, তা নিয়েছি।

—তা হলে তুমি এখন কি করবে?

তার প্রশ্ন ঠিক বুঝতে না পেরে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল শঙ্কর।

মুকুন্দবাবু বললেন—তোমার তো এখন খাওয়ার অসুবিধা হবে। একেই তো খাকা খাওয়ার দিকে তোমার চোখ থাকে না। রামদুলাল বোঝে তোমাকে। যাই হোক করে দেখে শুনে খাওয়ায়। সে না থাকলে তো তুমি উপোস করে মারা যাবে। তার চেয়ে তুমি আমার ওখানে চল। রামদুলাল যতদিন না আসছে ততদিন থাকবে আমার ওখানে।

এক মুহূর্তে শঙ্করের মনে হল যে ঘরটা দিয়ে

মুকুন্দবাবু তাকে আগলে আগলে রেখেছিলেন সেই মমতার বেষ্টনী হেন তিনি সংকীর্ণতর করে গুটিয়ে নিয়ে তাকে কাঁদ দিয়ে বেঁধে ফেললেন তাই সেই মমতাময়ী, যাকে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না, সে মমতার জল ঢালবে ঘড়া ঘড়া। কখনও সেবায় কখনও তিরস্কারে। সে হয় না, তা সে হতে দেবে না।

কথাগুলো সব এক মুহূর্তেরও স্বল্পতর সময়ের মধ্যে খেলে গেল। সে সজোরে মাথা ঝাঁকি দিয়ে বললে—না, সে হয় না!

সপ্তে সপ্তে রুখে উঠলেন মুকুন্দবাবু। তার দিকে রাগতভাবে তাকিয়ে বললে—কেন সে হয় না?

আরও জোরে ঘাড় নাড়ল শংকর—না সে সম্ভব নয়।

এবার বেশ চটে উঠে মুকুন্দবাবু বললেন—আরে কেন সম্ভব নয় তাই তো জিজ্ঞাসা করছি।

—জিজ্ঞাসা করলেই কি বলা যায়? আমার নিজেরই ভাল লাগবে না।

—সে আবার কি কথা?

—আমার একা একা থাকা অভ্যেস। তা ছাড়া একা থেকে থেকে আমার সব 'হ্যাবিট' খুব নোংরা। ওতে কোথাও অন্য লোকের সঙ্গে থাকতে গেলে আমার অস্বস্তি হবে, আর যাদের কাছে থাকব তাদেরও ভাল লাগবে না।

—তুমি বলছ কিহে শংকর? আমার নিজের বাড়ীতে কি ছেলে-পিলে নেই নাকি মনে কর? আমার ছোট বাচ্চাগুলো তো বাড়ীকে হাট বানিয়ে রেখেছে। অহরহ হৈ হৈ চীৎকার করছে, মারামারি করছে, কান্নাকাটি করছে আর সেই সঙ্গে সমানে ভাঙছে জিনিষ-পত্র। তুমি গেলে বরং সে হৈচৈটা আর জোড়ালো হবে।

আবার ঘাড় নাড়ল শংকর সমান জোরে।

কি, তুমি যাবে না?

—না। সোজা স্পষ্ট উত্তর দিলে শংকর।

মুকুন্দবাবু তার মুখের দিকে রাগ করে তাকিয়ে থেকে গট গট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

শংকর একটু অপ্রস্তুত হাসি হেসে নিজের মাথার বিশৃঙ্খল চুলে হাত চালাতে লাগল। মুকুন্দ বাবু তার উপর রাগ করে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু রাগ করলে সে কি করতে পারে? মমতার ফাঁদে আটকা পড়তে সে রাজী নয়

সেও আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বিকেলে আবার তাকে ডাকলেন মুকুন্দবাবু। তার উপর রাগ করে তিনি তখনই গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। আবার ফিরে এসেছেন একটু আগে।

সে ঘরে ঢুকতেই রাগতভাবে তিনি বললেন—দয়া করে বস চেয়ারটায়।

চেয়ারে বসবার আগেই সে দেখেছিল রামদুলাল আর একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে মুকুন্দবাবুর টেবিলের পাশে।

বসার সঙ্গে সঙ্গে মুকুন্দবাবু বললেন—এই নাও রামদুলালের জায়গায় এই লোকটি থাকবে। এখানে দারোয়ানের কাজ করবে আর তোমাকে রান্না করে খাওয়াবে।

বলে রামদুলালের দিকে তাকিয়ে মুকুন্দবাবু বলে —আচ্ছা যাও তোমরা।

তারা চলে যেতে মুকুন্দবাবু তাকে বললেন—খাও ওর হাতে যেমন পার। তোমার যেমন নসীব। আর শোন আমি বাড়ী থেকে আসবার সময় কাল থেকে তোমার জন্য খাবার নিয়ে আসব টিফিন কেরিয়ারে করে। সেটা দয়া করে গ্রহণ করে আমাকে কৃতার্থ করো।

এটাতে আর আপত্তি করা ঠিক হবে না বুঝে সে মুখে শুধু বললে—আচ্ছা!

—আমার একটা কথা! সহরে খুব বসন্ত হচ্ছে। আমাদের কারখানার দু'জনের বসন্ত হয়েছিল। সেই বসন্ত নিয়েই কাজে এসেছিল আজ। আমি তাদের বাড়ী দিয়ে এসেছি গাড়ী করে। কর্পোরেশনে আমি আজ বলেও এসেছি টিকে দেবার লোক পাঠাবার জন্যে। দয়া করে কাল টিকেটা নিও, বুঝলে?

শংকর হেসে বললে—আমার বসন্ত হবে না। বসন্ত কেন কোন অসুখই হবে না আমার।

—বুঝলাম তুমি অশ্বত্থ অমর। বিভীষণ অশ্বত্থামা আর হনুমানের সঙ্গে তোমার নামও লিস্টিতে উঠবে। তবে আমার উপর অনুগ্রহ করে টিকেটা নিও কাল। আমি থাকলে তো আমিই ব্যবস্থা করব। যদি না থাকি সেই জন্যে তোমাকে বলে রাখছি। তুমি যা ছেলে!

'তুমি যা ছেলে!' কথাটা বড় চমৎকার লাগল তার কানে। অসতর্ক মন যেন এলিয়ে পড়ল কথাটায়। চোখে যেন হঠাৎ জলও এসে গেল কেমন করে।

সঙ্গে সঙ্গে সচেতন হয়ে উঠে সে মাথাটায় একটা ঝাঁকি দিলে। মনে মনে নিজেকে ঠাট্টাও করল একবার! তার পরই উঠে দাঁড়াল সে।

—কি হল, উঠলে যে?

—যাই কাজ করি গিয়ে।

তার মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে মুকুন্দবাবু বললেন—আচ্ছা এস।

কয়েকটা দিন গেল।

নূতন সেবককে দু চোখে দেখতে পারে না শঙ্কর। দুটো অভিযোগ তার বিরুদ্ধে। প্রথমত সে বোকা, তার উপরে মাদ্য বলে রান্না করে সে যা দেয় তা অখাদ্য। এর ফলে সে প্রায় খাওয়াই ছেড়েছে। দিনের বেলা মুকুন্দবাবু অফিসে আসবার সময় তার জন্যে টিফিন-ক্যারিয়ার ভর্তি করে খাবার নিয়ে আসেন। প্রথম দু' একদিন নিজের ঘরের টেবিলে খাবার নিজে সাজিয়ে রেখে তাকে ডেকে খাওয়াতে চেয়েছেন। কিন্তু তাতে তার খাওয়া হয়নি। সে খেতে বসেছে, সব খাবার একটু একটু চেখে ফেলে রেখে উঠে পড়তে চেয়েছে। উঠে পড়বার উপক্রম করতেই মুকুন্দবাবু তাকে ধমক মেরে বসিয়েছেন আবার। এটা খাও, ওটা খাও করে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছেন। সেদিন বললেন—উঠে যাবে কি? কই মাছ দুটো খাও। আমি তোমার জন্যে বাজার খুঁজে মাছ কিনেছি যে নিজে। ফেলে যাবে কি? খাও!

মাছ খেতেও ভাল লাগেনি, এই পাকা পড়া সমাদরও ভাল লাগেনি। তবু সমাদরও সহ্য করতে হয়েছে, মাছও খেতে হয়েছে তাকে।

তারপর খাওয়াতে আরম্ভ করে মুকুন্দবাবু সস্নেহে বলেছেন—তুমি কি হে? এমন উৎকৃষ্ট মাছ, যে কোনো লোক পেলে পোলাও-মাংস ফেলে খেত। আর তুমি এমন মুখ করে খাচ্ছ যে যেন তোমাকে কি যাবজ্জীবন শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

শুনে খেতে খেতেই সে বিরস মুখে হেসেছিল একটা ভাসনার টেউও লেগেছিল মনে কথাটা শুনে।

'তুমি কি হে!' কথাটা খানিকটা সত্যিই বটে। নিজেকেই সে অনেকবার এমনি ধরণের প্রশ্ন করেছে। তার নিজেরই তো নিজের কথা মনে পড়ছে। বি.এস.সি পড়বার সময়। আই.এসসিতে সে সেকেণ্ড হয়েছিল। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি আর অঙ্কে প্রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ড নম্বর পেয়েছিল সে। পরীক্ষায় উৎকৃষ্ট ফল, এবং তার চেয়েও বেশী নম্বর নিয়ে সে বি.এস সি ক্লাসে ভর্তি হল ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে।

সুনির্মলাও ফিজিক্সে অনার্স নিয়েছিল।

অনার্স ক্লাসে তাকে দেখেছিল শঙ্কর। কিন্তু একান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই দেখেছিল, লক্ষ্যই করেনি তাকে। পটকে, কর্সা, বড় বড় চোখ একটি মেয়ে, বেণী দুলিয়ে সামনের বেঞ্চে এক কোণে বসত। সে জানত ভাল করে মেয়েটা অনেক সময় বক্তৃতারত অধ্যাপকের মুখের দিকে না তাকিয়ে, তাকিয়ে থাকত তার মুখের দিকে। না তাকিয়েও সে তা বুঝতে পারত। বড় বড় চোখ আরও বড় বড় করে তাকে দেখত সবিস্ময়ে, সসম্ভ্রমে। তার সঙ্গে আলাপ করতে ভরসা করত না, সাহস হত না মেয়েটির।

তার কৌতুক বোধ হত, হাসি পেত। পরে আবার বিরক্তিও লাগত খানিকটা।

মেয়েটি একদিন অনেক সাহস করে, ভুতো নাতা করে আলাপ করেছিল তার সঙ্গে।

একদিন ফিজিক্সের প্রধান অধ্যাপকের ঘর হতে সে বেরিয়ে আসছে এমন সময় দেখলে কাচুমাচু মুখে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে সুনির্মলা। তাকে পা টেনে খোঁড়া পায়ে বেরুতে দেখে সসম্ভ্রমে তার কাছে এসে নিম্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছিল—প্রফেসার ঘোষ আছেন?

আজ তার ভেবে আশ্চর্য লাগে তখন সে তার এই খোঁড়া পায়ের জন্যেও গৌরব বোধ করত। মনে হত তার পা'টা যদি খোঁড়া না হত তা হলে ছাত্রদের এই উচ্ছলতা তাকে যেন পীড়া দিত না। সেদিনও মেয়েটির কথা শুনে এমনি ধরণের কোন একটা গৌরব-বোধ তার মনে এসেছিল নিশ্চয়। না হলে একান্ত

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে অমন করে হেসে কথাটা সে নিশ্চয়ই সুনির্মলাকে বলতে পারত না। তার প্রশ্ন শুনে অমনি হাসি হেসে সে বলেছিল—প্রফেসর ঘোষ যদি ঘরে না থাকবেন তো আমি এতক্ষণ ঘরে ছিলাম কি করে? থাকবই বা কি করে? আমি যখন ঘরে ঢুকি তখনও তো আপনি দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন এই এখনও যেমন রয়েছেন!

তার সমস্ত স্নেহটুকু যেন সে সসম্ভ্রমে মাখা সেতে নিয়েছিল মেয়েটি। তার মুখের দিকে সসম্ভ্রমে ও সতর্কভাবে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করেছিল—আমি একবার যাব ওঁর ঘরে?

অবলীলাক্রমে হেসে শঙ্কর বলেছিল—আপনি যাবেন কিনা তা আমি বলব কেমন করে? সে আপনি নিজেই ভাল বুঝবেন!

তাও মেনে নিয়ে আরও কাতরভাবে সে তাকে প্রশ্ন করেছিল—গেলে উনি রাগ করবেন না তো?

এবার হা হা করে অট্টহাসি করেছিল শঙ্কর। তাকে বরদানের মত উদারতায় হেসে বলেছিল—না, না, যান আপনি। উনি কিছু বলবেন না। এখন উনি কাজও করছেন না। বসে আছেন। কফি খাচ্ছেন। এতক্ষণ তো আমার সঙ্গে গল্পই করছিলেন।

বলে সে ছোট্ট পা টেনে লিপিবদ্ধতীর মত তার দিকে আর না তাকিয়ে সেখান থেকে চলে গিয়েছিল। মেয়েটি অধ্যাপক ঘোষের ঘরে ঢুকল কিনা তা আর ফিরে তাকিয়েও দেখেনি।

মেয়েটির কথা আর একবার মনেও পড়েনি তার।

সে সোজা চলে গিয়েছিল লাইব্রেরীতে। লাইব্রেরীতে কিছুক্ষণ পড়াশুনো করে বাগানে গিয়ে বসেছিল।

হঠাৎ আবার তার দৃষ্টির সামনে এসে পড়েছিল মেয়েটি। দূর থেকে দেখেও তার মনে হয়েছিল মেয়েটি যেন তার কাছেই আসছে। তার চোখের দৃষ্টি শঙ্করের উপরেই নিবদ্ধ অত দূর থেকেও।

হঠাৎ কানের পাশে ডাক উঠল—বাবু!

সঙ্গে মনের রাস্তা বেয়ে যে আসছিল তার কাছে, সে অকস্মাৎ কোথায় ছুটে পালাল, মিলিয়ে গেল এক মুহূর্তে। মনের ছবি তাড়িয়ে দিয়ে বর্তমানটা আবার ফুটে উঠল।

নূতন লোকটি তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

মেজাজ খারাপ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। খিঁচিয়ে উঠে সে বলল—কি?

লোকটি ভয়ে কুঁচকে গেল। আর কোন কথা না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল তার সামনে।

তার তখন আঁচানো হয়ে গিয়েছে। তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে একান্ত অসহিষ্ণু হয়ে বলে উঠল—কি বলছ কি? খাতা কিস লিয়ে?

—আপকো খানা?

আবার ভয়ে কুঁচকে গেল তার। সমান অসহিষ্ণুতার সঙ্গে বললে—কি খানা আবার?

একান্ত দীনের মত লোকটি বললে—আপকো খানা তো হো গিয়া। আভি কুটা উঠা লে?

চটে ঘটে সে বললে—কুটা উঠিয়ে নেবে না তো কি করবে?

ঘাড় নেড়ে লোকটি বললে—উঠাকে কিয়া করে?

এবার রাগে অবাক হয়ে গেল শঙ্কর। বললে—ফেক দেগা। আউর কিয়া করেগা কুটা লে কর? আচ্ছা, হমারা যো কুত্তা হ্যায়, ল্যাংড়া, উসকো দে দেনা!

লোকটির দীন মুখে বিমর্ষ দৃষ্টি ফুটে উঠল। তা আর শঙ্করের চোখে পড়ল না। শঙ্কর নিজের কাপড়ের কোঁচায় হাত মুছতে মুছতে চলল আপনার ল্যাবরেটরীর দিকে।

ল্যাবরেটরীতে বসতেই আবার কেমন করে মিলিয়ে গেল সামনের বর্তমানটা, বাঞ্ছিত অতীত না চাইতেই আবার কেমন ফুটে উঠল চোখের সামনে!

ঐ তো খাতা হাতে মেয়েটি এখনও হেঁটে আসছে তারই মুখের উপর দৃষ্টি রেখে।

এসে দাঁড়াল তার সামনে।

আজও সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে মেয়েটির হাসবার ইচ্ছা ছিল, হাসি বোধহয় সে ফুটিয়ে তুলতেও চেয়েছিল তার দুই ঠোঁটে, তার চোখে। কিন্তু বোধহয় ভরসা করলে না।

শঙ্কর নিজের মুখখানাও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে।

তার দার্শনিক মন কথা তো তাকে বলতে দিলেই না, উপরন্তু চোখেও কোন আবেগের প্রকাশও হতে দেয়নি। সে কাঁচের চোখের মত দৃষ্টি নিয়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইল।

এবার একটু নার্ভাস হয়েই হাসল মেয়েটি। হাসতে বাধ্য হল। কথা বলার আগে হাসি দিয়ে নিজের কথা গুলোকে যেন সে বন্ধুতর, হৃদ্যতর করে নিতে চাইলে। বললে—বাবা, আপনাকে অনেক খুঁজে হায়রান হয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত পেলাম এখানে!

সে এবার ছোট্ট দুটো কথা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ছুঁড়ে দিলে। শুধু কিছু বলতে হয় বলেই যেন বললে মৃদু স্বরে—কি ব্যাপার?

এবার একটু হেসে মেয়েটি বললে—ব্যাপার একটু আছে।

তারপর আবার একটু নার্ভাস হাসি হেসে চারিটা পাশ দেখে নিয়ে সে বললে—আপনাকে খুঁজতে ঘুরে ঘুরে টায়ার্ড হয়ে গিয়েছি। একটু বসব এখানে?

তাতেও বিন্দুমাত্র নাড়া জাগেনি শঙ্করের মনে। সে বেঞ্চের অন্য প্রান্তে পিছু হটে সরে গিয়ে বললে—এই তো অনেক জায়গা রয়েছে, বসুন না! বসার আর অসুবিধা কি?

মেয়েটি তাতেই পরম আপ্যায়িত হয়েছিল। যে বেঞ্চে শঙ্কর বসে তার ক্লাসের শ্রেষ্ঠতম ছাত্র সে আছে সেই বেঞ্চে তারই সঙ্গে একাসনে বসতে পেয়ে ধন্য হয়ে গিয়েছিল মেয়েটি। নিজের হাতের ছোট্ট পাট-করা রুমালটি দিয়ে নিজের ছোট্ট কপালটি মুছে সে বললে—বাবাঃ, যা গরম!

বলে একটু হেসে, বোধহয় কোন উত্তর প্রত্যাশা করেই সে শঙ্করের দিকে তাকিয়েছিল।

কিন্তু শঙ্কর কোন উত্তর দেয়নি। এ বাজে কথার কি উত্তর দেবে সে? শুধু তাকিয়ে থেকেছিল তার মুখের দিকে।

এবার মেয়েটি আসল কথায় এল, বোধহয় আসতে বাধ্য হল। একটু নার্ভাস হাসি হেসে বললে—আমি প্রফেসর ঘোষের কাছে গিয়েছিলাম। আজকে বেটা পড়ালেন ওটার নোট আমি ভাল করে নিতে পারিনি! তাই ওঁকে বলছিলাম।

এবার শঙ্কর তার কথাকে মাঝখান থেকে কেটে দিলে। বললে—আপনি লেকচার-নোট নিতে পারেন নি ওঁর কাছে গিয়েছিলেন? ওঁর কি সেই সময় আছে যা ওঁর কাছে এই চাইতে যাচ্ছ? কত বড় মানুষ উনি! ওঁকে কি এই সব নিয়ে "ডিসটার্ব" করে?

তিরস্কারটুকু যাথা পেতে নিলে মেয়েটি। হাসি মুখে, লজ্জিত ভাবে বললে—সে তো আমিও বুঝি?. কিন্তু আমি কি করব?

অসহায় ভাবে বলে সে বললে—প্রফেসার বিদ্যার্থী ওঁর কাছে বলেছিলেন। উনিও এই কথা বললেন। তারপর বললেন তুমি বরং তোমাদের ক্লাসের উমাশঙ্করকে গিয়ে বল। ওর খাতা থেকে কপি করে নাও!

শঙ্করের মুখের রেখার ভাবান্তর হল না, মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

মেয়েটি তার মুখের দিকে তাকিয়ে যেন ভরসা পেলে না। তাই ভরসা পাবার জন্যেই যেন একটু হেসে বললে—প্রফেসার বিদ্যার্থীর কথা শুনে প্রফেসর ঘোষ বললেন—বিদ্যার্থী ঠিকই বলেছেন। উমাশঙ্কর মোটামুটি নোট ভালই নেয়। তুমি ওর খাতা থেকে নকল করে নিও।

বুদ্ধিমতী মেয়ে শেষে আর একটি কথা জুড়ে দিলে। হেসেই বললে—তুমি আমার নাম করে বলো তা হলে তোমাকে নোট দিতে উমাশঙ্কর আর আপত্তি করবে না।

এইবার মুখ খুললে উমাশঙ্কর—আপত্তি করব কেন? কবেকার নোট চাই আপনার?

—আজকে পড়াতে একটু দেরী হয়েছিল আমার। তাছাড়া আজকের পড়ানো আমি একেবারে ধরতেই পারিনি, লেখা তো দূরের কথা।

উমাশঙ্কর হেসে বললে—কেন, এমন কি কঠিন ছিল আজকের লেকচারে?

মেয়েটি আবার হাসলে। এবার হাসিটি ভিন্ন রকমের। যেন একটু সকৌতুক ভাবকতা করেই বললে

—বাবা, আপনার কথা আলাদা! আপনার আর বুঝতে অসুবিধা হবে কেন?

উমাশঙ্কর একটু হাসল। হেঁসে যেন মেয়েটির সপ্রশংস স্তাবকতা অকপট পূজার মতই গ্রহণ করলে অসংকোচে। উৎকৃষ্ট ছাত্র হিসেবে এতো প্রাপ্যই তার। এ কথা এমনি করে তো মেয়েটি বলবেই। সে হেসে বললে—থাক আমাকে আর প্রশংসার ঘুষ দিতে হবে না আপনাকে! আমি আজকের নোটটা কাল দেব আপনাকে!

মেয়েটির যেন তর সয় না। সে বললে—আবার কাল কেন? লেকচার নোট-নেওয়া খাতা তো আপনার কাছেই রয়েছে। আজ আমাকে দিন! আমি বাড়ীতে আজ নকল করে নিয়ে কাল আপনার খাতা আমাকে ফিরিয়ে দেব তাহলেই তো হবে?

—তা হলে হবে না। আমার নোট আপনি ধরতে পারবেন না।

—কেন? তা হলে খাতা আমাকে দেবেন না বলুন!

উমাশঙ্কর বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না। সে বললে—খাতা আমি আপনাকে দেব না কারণ আমার খাতা আমি কাউকে দিই না। তবে আজকের লেকচার-নোট আপনি পাবেন। কাল সকালে আমার কাছ থেকে পাবেন।

বলে সে মেয়েটিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই ঘোঁড়াতে ঘোঁড়াতে সেখান থেকে চলে গেল। যাবার সময় একবার যেতে যেতে ফিরে বলে গেল—কাল ফার্স্ট পিরিয়ডের পর যখন এখানে বসব সেই সময় আমার কাছে চেয়ে নেবেন।

পরদিন সে আসবার আগেই এসে বসেছিল মেয়েটি।

সে ক্লাস শেষ করে এখানে যেতেই মেয়েটি উঠে দাঁড়াল। সে তখনও বেঞ্চটার কাছে পৌঁছয় নি। তাকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসতে দেখেই মেয়েটি হাসি মুখে উঠে দাঁড়িয়েছে।

দেখে শঙ্করের একটু বিরক্তিই লেগেছিল। তার বোধ হয় মনে হয়েছিল তার চলার ভঙ্গিটি লক্ষ্য করেই যে হাসি তার মুখে এসেছে তাকেই আপ্যায়ন ও সম্ভ্রমের চেহারা দিয়ে যেন ও ব্যঙ্গ করে দিয়েছে।

সে বেঞ্চটার কাছে গিয়ে বসতে বসতে বললে—কি এসে গিয়েছেন দেখছি!

—হ্যাঁ, অনেকক্ষণ এসে বসে আছি। ক্লাস শেষ হতেই চলে এসেছি।

—কাল রাত্তিরে বুঝি আপনার ঘুম হয়নি?

মেয়েটি অপকট বিস্ময়ে প্রশ্ন করলে—কেন?

শঙ্করও অকপট বিরক্তিতে বললে—এই নোটটা পাবেন কিনা তাই ভেবে!

মেয়েটি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে—আপনি নোট দিয়ে যেটুকু উপকার করলেন খারাপ খারাপ কথা বলে তার অনেক গুণ দুঃখ দিলেন!

—দুঃখ দিলাম? হেসে উঠল শঙ্কর। হাসতে হাসতেই বললে—না দুঃখ কি সুখ কিছুই দিতে চাইনি আপনাকে। আমি শুধু প্রফেসার ঘোষের আদেশ পালন করবার জন্যেই নোট দেব বলেছি। নইলে আমার নোট আমি কাউকে দিই না! সে যাক! এই নিন আপনার নোট।

বলে দু তিনখানি কাগজ খাতার ভিতর থেকে বের করে তার হাতে ধরিয়ে দিলে শঙ্কর।

—এই নোট?

—হ্যাঁ, আমার খাতা থেকে নকল করে দিয়েছি।

কাগজ ক'খানি হাতে নিয়ে মেয়েটি তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বললে—আপনি আপনার খাতাখানা দিতে হবে বলে বুঝি নকল করে দিয়েছেন?

শঙ্কর শুধু হাসল।

এরপর আর মেয়েটি দাঁড়াল না। দাঁড়াবার কথাও নয়।

শঙ্কর হাসল—যাক মেয়েটির উৎপাতের হাত হতে পরিত্রাণ পেলে সে!

[ক্রমশঃ

রাতের খাওয়া শেষ করে এসে সবে বারান্দায় আরামকেদারায় কোলে গা আলগা করে দিয়েছি। সুমিতার তখনও খাওয়া শেষ হয়নি।

ঠিক তখনই গোটাকয়েক মিলিত কণ্ঠের কান্নার রোল অনেক দূর থেকে বাতাসের বুকে ভর করে এসে কানের গোড়ায় আছড়ে পড়লো।

রাত কম হয়নি। প্রায় এগারটা। পাড়াটা নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছে এর মধ্যেই। তাই কান্নার সুরটা স্পষ্ট ভেসে আসছে।

সুমিতা খাওয়া ফেলে উঠে এসেছে। চোখে মুখে কি একটা অজানা আশঙ্কার ছাপ।

—যাও সুমি, খেয়ে নাও। আমি দেখছি। বলে উঠলাম কেদারা ছেড়ে।

—না না তোমার এখন যেতে হবে না। বাড়ীর সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার কেমন যেন ভয় ভয় করছে। সুমিতা আমার হাতটা চেপে ধরলো।

আবার আমি বসে পড়লাম।

—কার আবার কি যে হলো.....

—কার আবার কি হবে! সে রকম কিছু পাড়ার কোন বাড়ীতে আছে বলে তো জানি না। থাকলে...

সুমিতার কথা শেষ হবার আগেই বাইরের দরজার কড়া নড়ে উঠলো সজোরে। অসহিষ্ণু আঙুলের তাড়নায় কড়া দুটো যেন ব্যথায় ককিয়ে ককিয়ে উঠছে।

উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম। ঝড়ের বেগে ভেতরে ঢুকলো অহীন। আমার বন্ধু বহীনের ছোট ভাই।

—হিমাংশুদা আপনি এখুনি আমাদের বাড়ী চলুন। হাঁফাচ্ছে অহীন। বোধ হয় সারা রাস্তা দৌড়ে এসেছে।

—কেনরে কি হলো আবার। প্রশ্ন করলাম।

—দাদা, দাদা আত্মহত্যা করেছে। এতক্ষণের নিরুদ্ধ কান্নার বেগটাকে কিছুতেই সামলাতে পারলো না। অহীন। হাত দিয়ে মুখ ঢেকে অসহায় কান্নায় ভেঙে পড়লো।

—এ্যাঁ। গলার ভেতর থেকে বিকৃত উচ্চারণের ঐ শব্দটা ছাড়া আর কিছুই বলতে পারলাম না। খবরটা শুনে।

—কী বললে! সুমিতার আর্তচীৎকার।

কখন যে আমার পেছন পেছন বারান্দা থেকে নেমে এসেছে টের পায়নি। চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে আমার হাতটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরলো। সম্বিত ফিরে পেলাম।

—সুমি, তুমি ভেতরে গিয়ে খাওয়া দাওয়া সেরে ফেল। আমি যাই।

—না না তুমি আমায় একা ফেলে যেওনা। আমার

ভীষণ ভয় করছে। কান্না যেখানো সুরে বললো সুমিতা। টের পেলাম আমার হাতটা ও আরো শক্ত করে চেপে ধরেছে।—ছিঃ সুমি, ছাড় এটা ছেলেমানুষি করার সময় নয়। চল তোমার ভেতরে রেখে আসি।

—না আমি যাব না। কিছুতেই না। তুমি আমায় একা রেখে কোথাও যেওনা। তোমার দুটি পায়ে পড়ছি। কেঁদে ফেললো সুমিতা।

অহীন চোখ তুলে চাইলো। সে চোখে বিস্ময়, কিছু জিজ্ঞাসা। হয়ত বা কিছু ক্রোধ।

—অবুঝ হয়ো না সুমি। ভেতরে চল। ওকে ধরে ভেতরের দিকে পা বাড়ালাম।

—না না না. বলছি তো আমি যাবো না। তুমি শুধু আমায় একা রেখে.....

—আঃ কি হচ্ছে এসব। ধমকে উঠলাম কঠিন গলায়। আকস্মিক শোকের আঘাতের ক্ষতচিহ্নটা এখনও বুকের ভেতরে দগদগ করছে। মনের ভারসাম্য টলায়মান। এই অবস্থায় সুমিতার ব্যবহারটা হঠাৎ অসহ্য বলে মনে হলো।

নিজের কানেই কেমন যেন বিশ্রী শোনালো গলার আওয়াজটা। লজ্জিত হলাম।

—না না না আমি যাব না। ভীতা হরিণীর দৃষ্টি ফুটে উঠলো সুমিতার চোখে। মুহূর্তের মধ্যে পাণ্ডুর হয়ে গেল ঠোঁটের রক্তিমাভা। থরথর করে কাঁপতে লাগলো ফ্যাকাশে ঠোঁটদুটো।

—তাহলে ভেতরে যাও। আমি যাচ্ছি। সময়ের বৃথা অপচয়ে নিজের অজান্তে এবারও গলার স্বরটা কর্কশ শোনালো। আমার কথা শুনে সুমি আমার মুখের দিকে অপলক দুটি চোখ তুলে তাকালো। অদ্ভুত সে দৃষ্টি। বারান্দার স্বল্প পাওয়ারের তির্যক আলোয় সে চোখের চাহনিতে অসীম বেদনার একটা ম্লান ছায়া দেখে চমকে উঠলাম। সে দৃষ্টিতে কি একটা হারিয়ে যাওয়ার রিক্ততা।

—বেশ যাও। আমার হাত ছেড়ে দিল সুমি। অদ্ভুত শান্ত আর নিস্তেজ গলার আওয়াজ। যেন বরফ-ঠাণ্ডা কোন মৃতের দূরাগত কণ্ঠস্বর।

বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারায় সুমিতার এই ব্যবহারের কারণ খুঁজতে আমার তখন সময়াভাব! সামান্য চমকালেও বিচলিত হলাম না। ছুটে বেরিয়ে এলাম।

সুমিতার এই ধরণের আচরণ ব্যবহার দেখে অহীন আগেই কোন সময় যে আমাদের অলক্ষ্যে চলে গিয়েছিল টের পাইনি।

যেতে যেতে অনুভব করলাম মনের মধ্যে এলোপাথাড়ি চিন্তার ঝড় দাপাদাপি করছে। একবার সুমি আর একবার অহীন।

আশ্চর্য। অহীন কেন করলো আত্মহত্যা?

সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যত বিদ্বান-রূপবান। ভাল চাকুরে। কোন কিছুরই তো অভাব নেই অহীনের তবে?

আমার একমাত্র বন্ধুর করুণ বিয়োগান্ত পরিণতির কারণ খুঁজতে গিয়ে এখানেই যেই হারালাম।...তবে?...

কিন্তু সুমি ওরকম করলো কেন অহীনের মৃত্যুর খবর পেয়ে।

একটুতেই নেতিয়ে পড়ার মতো মেয়ে তো সুমি নয়। আজ প্রায় পাঁচ বৎসর পার হয়ে গিয়েছে বিয়ে হবার পর। কোন সন্তান আসেনি সুমির কোল জুড়ে। আত্মীয়-অনাত্মীয়া সকলের মুখেই এই অক্ষমতার নীরব অভিযোগ—বাঙ্গের কটাক্ষপাত। জানাশোনা সহানুভূতি। সুমিতো কোনদিন এ নিয়ে কোন অঘটন ঘটায়নি। অসহ্য লাগলে সেই না পাওয়ার বেদনা কান্নার গলে গিয়ে অশ্রুধারায় ঝরে পড়েছে আমার বুকে। কারো বিরুদ্ধে কোন ফরিয়াদ ওর ছিল না।

কিন্তু একটু আগের এই অভাবনীয় ব্যবহারের অর্থ কি!

কেন, কেন সুমি...

হোঁচট খেলাম একটা। ভাবনার গতি বাধা পেল। সামলে নিয়ে চলতে শুরু করেছি।

আবার অহীন।

হাসি-খুশী-ভরা মুখখানা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। শিউরে উঠলাম।

আজ বিকেলেও আমাদের বাড়ী এসেছিল। চা খেয়েছি এক সঙ্গে বসে। তারপর আমি বাইরের ঘরে চলে এসেছিলাম। ও আর সুমি ভেতরের ঘরে গল্প করছিল। থাকে থাকে ওদের কলকণ্ঠের হাসি ভেসে

আসছিল। মহীনই আমার একমাত্র বন্ধু আজও বিয়ে করেনি। তবে কি কোন মেয়ে-ঘটিত ব্যাপার। যা না তা কি করে হবে? ভাবনার গতি মোড় ঘুরবার আগেই রাশ টেনে ধরলাম।

ওই একমাত্র অনাত্মীয় পুরুষ যার অবাধ যাতায়াত ছিল অন্দরে। মা বা বাড়ীর অন্য কেউ কিছু বলতেন না। আর বলারও কিছু ছিল না। অনেকদিনের বন্ধুত্ব। এরকম ছোটবেলা থেকেই। সুমিও খুব স্নেহ করে ওকে। তবে কি কোন পূর্বরাগের ব্যাপার? না, তাও হতে পারে না। হলে আমি না বুঝি নিশ্চয়ই জানত। আজ ভেতর থেকে বেরিয়ে আসার সময় মহীনকে একটু গম্ভীর দেখেছিলাম। তা ওরকম প্রায়ই হয়। সুমির সঙ্গে মান-অভিমান। আজও বোধহয় হয়েছে। জিজ্ঞেস করায় জবাব দিয়েছিল—না কিছু নয়।

পথ চলার ক্ষণিক ব্যবধানে এরকম চিন্তা এসে মনের মধ্যে জড়ো হচ্ছিল। মহীনদের বাড়ী এসে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে সব উধাও হলো।

খবর পেয়ে অনেক আত্মীয়-অনাত্মীয় এসেছে। মহীনের দেহটা সাদা চাদরে ঢাকা। গলায় দড়ি দিয়েছিল। পুলিশ এসে নামিয়েছে। সঙ্গে ডাক্তারও ছিল। কিন্তু অনেক আগেই সব শেষ হয়ে গিয়েছে। চেনাশোনা থাকায় আমাদেরই পুলিশী ঝঞ্ঝাট মিটে গিয়েছে।

মহীনের মা খবর শুনেই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। এখনও জ্ঞান ফেরেনি। মহীনের বাবা এতক্ষণ পাথরের মতো চুপচাপ বসেছিলেন। আমায় দেখার সঙ্গে সঙ্গেই হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। অপ্রস্তুত হলাম। নিজেকেই কেমন যেন অপরাধী মনে হলো।

এক ফাঁকে অহীন এসে একপাশে ডেকে নিয়ে গেল।

—হিমাংশুদা এই চিঠিটা।

—চিঠি?

—হ্যাঁ। দাদার টেবিলে ছিল। আরো একখানা ছিল। তাতে শুধু লেখা—আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। সে চিঠি পুলিশ নিয়েছে। এটায় আপনার নাম দেখে আমি লুকিয়ে রেখেছি।

—এ চিঠি···

—মা অন্য কেউ পড়েনি দেখেই লুকিয়ে রেখেছি।

—বেশ করেছ। বললাম বটে। কিন্তু মনের মধ্যে যেন একটা পাথর এসে চেপে বসলো। কি আছে চিঠিতে। কোন অন্ধকারের আলোক সঙ্কেত?

সে চিন্তা আপাতত চাপা পড়লো মহীনের শেষ কাপড়িক যাত্রার ব্যস্ততায়।

হাউ হাউ করে জ্বলে উঠলো আগুন। লেলিহান জিভ্রা মেলে মহীনের নশ্বর দেহটা টেনে নিল নিজের লোল গহ্বরে। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল আমার বুক চিরে। একটা জীবনের ইতি হয়ে গেল। মহীনের হাসি কান্না, সুখ-দুঃখের দোলায় কেউ আর দুলবে না। একটা খাতা যেন চুপ করে বন্ধ হয়ে গেল। পৃথিবীর বুক থেকে একটা দাগ চিরতরে মুছে গেল।

সকলের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে একপাশে চলে এলাম। চিতার লকলকে আলোয় মহীনের লেখা চিঠিটা মেলে ধরলাম।

—হিমাংশু, পারিস যদি ক্ষমা করিস। জানি—এ বিশ্বাস-ঘাতকতার ক্ষমা নেই। তবুও লিখছি ক্ষমা করিস। এক মুহূর্ত থামলাম। কি এমন হয়েছে যার জন্যে এমন আকুতি! আবার শুরু করলাম।

···একদিনের কথা মনে পড়ে? অনেক চিন্তা আর আলোচনার পর আমি আর তুমি ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম। তোমার নতুন বংশধর এখনও এলো না কেন পরীক্ষা করাবার জন্যে। মনে পড়ে? ডাক্তারের সেই কথাগুলোও নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি।

—মিঃ ঘোষ, ডাক্তার হিসেবেই অপ্রিয় সত্য কথা আমাদের প্রকাশ করতে হয়। আপনি কিন্তু শুনে নার্ভাস হয়ে যাবেন না।

—না না তা কেন। আপনি বলুন।

তুমি ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে কাঁপা গলায় উত্তর দিয়েছিলে।

—পরীক্ষা করে দেখলাম। কোনদিনই আপনার বংশধর আসবে না। কারণ তার বীজ আপনার মধ্যে

—ডাক্তার বাবু! একটা ছোট্ট মেয়ে আর্ত, চীৎকার করে উঠেছিলো ওখান থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম।

—মহীন কি হবে। বিহ্বল আর কান্না জড়ানো সুর তোমার।

—যাবড়িও না হিমাংশু। চিকিৎসা করাও ভাল করে। আজকালকার দিনে এসব কিছুই নয়। সান্ত্বনা দিয়েছিলাম। কিন্তু গলায় যেন তেমন জোর পাইনি সেদিন।

আবার ডেকেছিলে তুমি—মহীন।

আমি বুঝেছিলাম সে ডাকের অর্থ। বলেছিলাম—তুমি ভরসা রাখতে পার হিমাংশু। কেউ জানবে না এ কথা। গোপন কথা গোপনই থাকবে।

কিন্তু আমি পারিনি হিমাংশু—আমি পারি নি। আমার প্রতিজ্ঞা আমি ভেঙে ফেলেছি। সুমিতাকে বলে ফেলেছিলাম সে কথা। শুনে সে আঁতকে উঠেছিল। প্রথমে তো বিশ্বাস করতেই চায়নি। কিন্তু গত ক-বৎসরের নিরুক্তাই শেষ পর্যন্ত ওর মনে বিশ্বাস জন্মালো। তখন সুমিতার অন্তরের চিরকালের স্থিতিশীল নারীসত্তা হাহাকার করে উঠেছিল—কিন্তু ঠাকুরপো আমি যে মা হতে চাই। আমি যে মা হতে চাই। কান্নার দমকে সুমিতার দেহটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল। আমি ওর পিঠে হাত দিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম। সেই প্রথম।

তারপর?

তারপরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। বিবেকের চাবুক সামলাতে পারলো না। এক চরম দুর্বল মুহূর্তে অঘটন ঘটে গেল।

বিশ্বাস কর হিমাংশু, তখনই মরতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সুমিতা, সুমিতার জন্যে পারিনি।

আজ বিকেলেই প্রথম জানতে পারলাম সুমিতার এতদিনের স্বপ্ন সত্যে পরিণত হতে চলেছে। সে মা হবে। থাকতে পারিনি ওখানে। শুনেই ছুটে চলে এসেছিলাম। বন্ধুত্বের এতবড় অপমান যেন আর সইতে পারছিলাম না। বিদায় নেবার আগে সব জানিয়ে গেলাম। শেষ অনুরোধ সুমিতাকে ক্ষমা করো। ওর কোন দোষ নেই আমিই দোষী। সব দোষই আমার। সব পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত হয়। কিন্তু জানি না আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে কিনা। ইতি…

—মহীন· মহীন…মহীন·· চীৎকার করে ছুটে গেলাম নিভন্ত চিতার দিকে। সবাই এসে ধরে ফেললো।

না না এর ক্ষমা নেই। না কাউকে না। কেউ ক্ষমা পাবে না আমার কাছে। মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছে। না সুমিকেও নয়।

ততক্ষণে মহীনের দেহ পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। তারপরের কাজগুলোও যথারীতি শেষ হলো।

স্নান করার জন্যে গঙ্গায় নামতেই কথাটা হঠাৎ মনে এল। একেবারে বিদ্যুৎচমকের মতো। সঙ্গে সঙ্গে শ্রান্তি আর অবসাদে শরীরের প্রতিটি কোষ ঝিমিয়ে পড়লো। কে, কে দায়ী এর জন্যে। আমি, হ্যাঁ আমি। আমার অক্ষমতার জন্যেই আজ সুমি…হ্যাঁ তাকে আমি ক্ষমা করব। তার ছেলেকে বুকে টেনে নেব। পরিচয় দেব নিজের ছেলে বলে। কথাটা ভাবতেই মনটা অদ্ভুত শান্ত হয়ে গেল।

বাড়ী এলাম। ফর্সা হয়ে উঠে। ভোর হয়ে এসেছে।

মা উঠেছেন। বিষাদ মলিন গলায় জিজ্ঞেস করলেন —কিরে হয়ে গেল?

—হ্যাঁ। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকতে যেতেই মা বাধা দিলেন।

—দাঁড়া, আগুন আর লোহা ছুঁয়ে নে।

আমার যেন আর সহ্য হচ্ছিল না। ঘুমন্ত সুমিতাকে বুকের মধ্যে পাবার জন্য মনটা আকুলি বিকুলি করছে।

শোবার ঘরের দরজা খুলতেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠলাম।

সুমিতার দেহটা কড়ি কাঠ থেকে ঝুলছে।

—সুমি দুনিয়ায় তোমরা আমার জন্যে কি রেখে গেলে! আর একটুও কি অপেক্ষা করতে পারলে না? আমি যে…আর কোন কথা বলতে পারলাম না।

জ্ঞান হারাবার পূর্ব মুহূর্তে মায়ের বুকফাটা আর্ত চীৎকার শুধু কানে এল।

সাহিত্যে সাম্প্রতিকতা

সুধাংশু গুহ

আধুনিকতা কথাটা এখন একটু বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। সাহিত্য বা শিল্পের অনেক শ্রেণীগত বিভাগ আছে। আধুনিকতা ঐরূপ একটি বিভাগের সঙ্গে জড়িত, কোন কালের সঙ্গে নয়। এইজন্যে আধুনিক সাহিত্য বলতে আমরা বুঝি একটি বিশেষ শ্রেণীর সাহিত্য চলতি কালের সাহিত্য নয়। চলতি কালে একই সঙ্গে অসংখ্য সাহিত্যিক সাহিত্য রচনায় রত কিন্তু তাঁদের সকলেই আধুনিক নন; কেউ কেউ আধুনিক, কেউ কেউ মধ্যযুগীয়, আবার কেউ বা অন্য কোন রকম। এই কারণে আজকের সব কিছুকেই আধুনিক বলে শ্রেণীভুক্ত করা চলবে না। এই সূত্রে আমি সাম্প্রতিক কথাটা ব্যবহার করতে চাই।

সাম্প্রতিক মানেও আধুনিক, কিন্তু ঠিক আধুনিক নয়। বর্তমানের সমস্ত কিছুকে সাম্প্রতিকের শিরোপা দেওয়া যায়, আধুনিক আখ্যা দেওয়া যায় না। কিন্তু সাম্প্রতিক কথাটার অর্থও বিশেষ ভাবে খুঁটিয়ে দেখা দরকার।

স্যাজানৎজাকিস বর্তমান গ্রীসের একজন কালজয়ী সাহিত্যিক। মহাভারতের মত বিরাট আয়তনিক মহাকাব্য লিখেছেন তিনি। সে কাব্য মহাভারতের মত সর্বজনস্বীকৃত না হোক গ্রীস দেশের অন্যান্য কাব্যগুলোর মত সমান। কিন্তু স্যাজানৎজাকিস আধুনিক নন; তিনি সাম্প্রতিকতারও বাইরে। সাম্প্রতিক কালের সাহিত্যে মহাকাব্য বলে কিছু নেই। স্যাজানৎজাকিস মহাকাব্য লিখে সাম্প্রতিকতাকে অস্বীকার করেছেন। হতে পারে তিনি ব্যক্তিগত পরিচয়ে এই কালের মানুষ, কিন্তু সাহিত্যিক বা শিল্পী হিসাবে অনেক হাজার বছরের আগেকার লোক।

মেকলে বলেছেন: সভ্যতা যতই এগুচ্ছে কবিতা ততই পিছুচ্ছে। কি দেখে মেকলে কথাটা বলেছিলেন জানি না, তবে তিনি যে গদ্যের অপলাপ করেছেন তাতে দ্বিমত নেই। আধুনিক কালের সাহিত্যে মহাকাব্য বা অন্য কিছু, কবিতা যে বিদায় নিয়েছে এমন কথা বলা সম্ভব নয়। বরঞ্চ আধুনিককালের সাহিত্যে কবিতা একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

অবশ্য সেকালের কবিতা আর একালের কবিতায় ঢের তফাৎ। কৃত্তিবাস ওঝা কাব্যে লিখতেন চরণ মিলিয়ে, অক্ষর গুনে। মধুসূদন লিখলেন কেবল অক্ষর গুনে, তাঁর কবিতায় অন্ত্যানুপ্রাস ছিল না। আজকের কবিরা লিখেছেন যে কবিতা তাতে চরণে চরণে মিল নেই, অক্ষর সমতাও না। গদ্য লিখবার সময় আমাদের কলম যেমন আপনা হতে স্বচ্ছন্দ গতিতে চলতে থাকে, বিংশ শতকের এই অর্ধের কবিতাতে তেমনি অব্যাহত গতি পেয়েছে। এদেশ ওদেশ সব দেশের কবিরা আজ গদ্যের মত সাবলীল কবিতা লিখতেই অভ্যস্ত।

কিন্তু একটা বিশেষ কিছু লিখবার এই রীতিটাই যে সাহিত্যে সাম্প্রতিকতার বিচারে গ্রহণযোগ্য তা নয়। রীতি আধুনিক হতে পারে, সাহিত্যিককে তবু সহজেই সেকালের কোঠায় ঠেলে দেওয়া যায়। আসল কথা রীতিতে (Style) যেমন সাহিত্যিককে তেমনি দীক্ষিতেও (School of Philosophy) আধুনিক হতে হবে। আধুনিকতা বা সাম্প্রতিকতা সম্পর্কে এই School of Philosophy টাই মনে হয় খাঁটি কথা।

Philosophy School নিয়ে সাহিত্য বা শিল্পের বাজারে যত বাদ বিবাদ হয়ে গেছে এমন আর কিছুতে নয়। একদিন ছিল ক্লাসিক সাহিত্যের কাল।

[illegible] হতে পারে জানি না
[illegible] কথাটা ব্যবহার
[illegible] শ্রেষ্ঠ
[illegible] এই শ্রেণীর একটি বিশেষ গুণ ছিল।
[illegible] গুণের পরেই এর সূত্রপাত। পরে ক্লাসিক
[illegible] ঠেলে সরিয়ে নিজে সামনে এগিয়ে
[illegible] এক কথায় বাংলাও
[illegible] রোমান্টিক সাহিত্যিক আজকের যুগে কিংবা ক্লাসিক
[illegible] কোন কিছুকেই স্বীকার করে না। আজ
[illegible] কিছুতে।
[illegible]
[illegible]
[illegible]

লোক। তখন কার্লমার্ক্স সবে পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছেন, কিন্তু মার্কসবাদ জন্ম নেয়নি। ক লেং দিক দিয়ে এঁরা কেউই আধুনিক নন, কিন্তু শ্রেণী বিচারে এঁরা প্রত্যেকেই আধুনিকতার অগ্রদূত।

প্রথম মহাযুদ্ধ আর অক্টোবর রিভলুশন একই কালের একই সময়ের ঘটনা। প্রথম মহাযুদ্ধের কারণ রাজনৈতিক। অক্টোবর রিভলুশনের কারণ রাজনৈতিক নয়, কার্লমার্ক্স নামক ঐ ব্যক্তিটি। প্রথম মহাযুদ্ধের ফল বিশ্বব্যাপী ব্যক্তি চেতনা, অক্টোবর রিভলুশনের ফলও ব্যক্তি চেতনা। ঘটনা দুটো দুরকম, কিন্তু ফলশ্রুতিতে কোন পার্থক্য নেই। রাহুর ছেলের নাম যেমন হয় শ্যাম, তেমনি রাজনীতির ছেলের নাম কিন্তু রাজনীতি হয় না; এ পর্যন্ত হয়নি। আগামী কালে হতে পারে।

অক্টোবর রিভলুশন জগতকে একটা নতুন জিনিস উপহার দিয়েছে। কম্যুনিজম। প্রথম বা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এরকম কোন জিনিস দেয়নি; ডেমোক্রেশি যুদ্ধের আগেও ছিল। আজকের রাষ্ট্রতত্ত্বগত বিচারে তাই এই দুটো জিনিসের সমান মূল্য।

কম্যুনিজম শুধু রাজনীতিতে নয়, শিল্পে আর সাহিত্যেও স্থান পেয়েছে। রাশিয়া ও চীনের সাহিত্য ত অন্য কোন নীতিকে আমলই দেয় না। ইউরোপে এক সময়ে যেমন ক্লাসিসিজমের যুগ ছিল, আজকের ইউরোপ ও এশিয়ার অর্ধেক পরিমাণ ভূমিতেই তেমনি কম্যুনিজমের যুগ। বাকি অর্ধেকটাকে যে কিসের যুগ তা নিরূপণ করাই আমাদের লক্ষ্য। কোন একটা বিশেষ সংজ্ঞায় আধুনিক ভারতীয় এবং দক্ষিণ পশ্চিম ইউরোপের সাহিত্যকে বিশ্লিষ্ট করা যায় না, যা গেলেও এই সব ভূখণ্ডের সাহিত্য যে সাম্প্রতিক তাতে সন্দেহ নেই।

সাম্প্রতিক সাহিত্যের (এবং শিল্পেরও) আবির্ভাব যুদ্ধের টোপর মাথায় দিয়ে। এদেশে যুদ্ধ যা হয়েছিল সে রামায়ণ আর মহাভারতের যুগে; তারপর থেকে যুদ্ধ বলতে যা বোঝায় তা আমরা পুঁথিতেই পড়েছি কেবল, চাক্ষুষ দর্শন লাভ করার সৌভাগ্য কারো হয়নি (হাল আমলে অবশ্য উত্তর সীমান্তে একটা যুদ্ধের হাঙ্গামা বাজছে বলে খবর পাওয়া গেছে, সে কথা যথা সময়ে আলোচনা করা যাবে)। ইউরোপে কিন্তু এমনটি নয়। আধুনিক যুগের যা কিছু বৈশিষ্ট্য সবই যুদ্ধের দৌলতে। তাই দেখি ওদেশে যুদ্ধ নিয়েই এক শ্রেণীর সাহিত্য আছে। যুদ্ধ সাহিত্য War literature। স্টীফেন ক্রেন একজন নামকরা সাহিত্যিক যুদ্ধ সম্পর্কে তার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না তবু, তার কাল পর্যন্ত যুদ্ধ নিয়ে ইউরোপের সাহিত্য আর কেউ লিখতে পারেনি। স্টীফেন ক্রেনের কাল প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী। যুদ্ধ তখনো মাতৃগর্ভে। আসল যুদ্ধ বলতে আমরা বুঝি প্রথম ও মহাযুদ্ধ। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই সাম্প্রতিক সাহিত্যের জন্ম হয়েছে

যুদ্ধ মানুষকে শেখায় সব মানুষই এক রাজারা শ্রেণীর লোকেরা মহাযুদ্ধে প্রভুত্ব বেশ। কিন্তু মহাযুদ্ধ পরবর্তীকালে তাঁদের সাধারণ মানুষের আর কোন ভেদ রইল হাজার বছরের মানব সভ্যতায় 'ভদ্রতর মানুষ' বলে স্বীকৃতি পেল।

মধ্যযুগে রাজা ছিলেন মাত্র কয়েকজন, আর সব দাস। তাই রাজনীতি সম্পর্কে জ্ঞানও ছিল কয়েক জনের। সাধারণ দাস শ্রেণীর লোকেরা গাধার মত কেবল মোট বইত, অথবা বলদের মত চিনি, কিন্তু মোটের ভিতর যে কি আছে বা চিনির স্বাদ তেতো না মিষ্টি সে সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। মধ্যযুগের সাহিত্যে এই কারণে রাজনীতি নামক বস্তুটার প্রবেশ হয়নি।

মহাযুদ্ধ পরবর্তীকালে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ কেবলমাত্র কয়েকজন লোকেই যে রাজ্য শাসন দুনিয়ার সব লোকেই তাদের শাসনের ধারাকলে পেতে দেবে সে সুযোগ আর রইল অর্থাৎ তখন সকলেই রাজা—সাধারণ গরিব মানুষ থেকে অসাধারণ বড় মানুষ পর্যন্ত সকলেই রাজনীতির এক অংশীদার। সাহিত্যেও তাই রাজনীতির প্রবেশ অনিবার্য হয়ে উঠল। জগতে আজ পর্যন্ত যতগুলো বড় ঘটনা ঘটেছে এটা তার মধ্যে একটা।

আজকের সাহিত্য মানেই রাজনীতি নিয়ে প্যাঁচ-কষা সাহিত্য। সাম্প্রতিক সাহিত্যের একটা বৈশিষ্ট্য হল এই।

নীতিগত বিচারে রাজনীতি আজ দুটো শিবিরে বিভক্ত হয়েছে: ধনতন্ত্রী আর কম্যুনিস্টিক। রাশিয়া চীন পোলাণ্ড হাংগেরি প্রভৃতি মাত্র কয়েকটা দেশ কম্যুনিজমকে ধ্রুব বলে মেনে নিয়েছে। আর বাকি দুনিয়া ধনতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

রাজনীতির খেলা বড় সাংঘাতিক খেলা। সাহিত্য এখন অনেকটা পরিমাণে এই খেলার ক্রীড়াঙ্গন। রাশিয়ার বা চীনে মানুষের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ তার individualism অস্বীকৃত। একজন মানুষ যে আরেকজন মানুষের চেয়ে কিছুটা পৃথক একথা রাশিয়া বা চীনের সমাজব্যবস্থায় কেউ মানবে না, তাদের মতে সব মানুষই এক, একের সঙ্গে আরেকের কোন প্রভেদ নেই। এবং সেই মানুষটি স্টেটের একটি দক্ষ বিশেষ। স্টেটের বাইরে কোন মানুষেরও অস্তিত্ব নেই। অতএব স্টেটকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে সমস্ত মানুষকে একভাবে চলতে হবে, খেতে হবে শুতে হবে। রাশিয়ার কৃষিব্যবস্থা যৌথ খামারের উপর প্রতিষ্ঠিত। সাহিত্যের কৃষিও দেখছি যৌথ মানুষ খামারের উপর দাঁড়িয়ে। সাম্প্রতিক কালের যা কিছু ঘটনা যৌথ কৃষির পক্ষে কল্যাণজনক তা সরকারী তত্ত্বাবধানে সাহিত্যিকের কাছে পৌঁছে যাবে এবং সাহিত্যিকও ফরমাসমাফিক সাহিত্য রচনা করবেন ছাঁচে ঢালাই করে যেমন ইট কাটা হয় তেমনি। আর যদি কোন ঘটনা কৃষি ব্যবস্থার পরিপন্থী ও কম্যুনিস্ট সরকারের প্রতিরোধী বলে বিবেচিত হয় তাহলে সে ঘটনা জানানোমাত্র তার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ প্রচারিত হবে। সাহিত্যিকও সে কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করবেন। ধনতন্ত্রী দেশের সাহিত্যে দেখা যাবে ঠিক এর উল্টোটাই। কেনেডি দ্যগল ম্যাকমিলান প্রভৃতি বাদু রাজনৈতিকরা দুনিয়া থেকে কম্যুনিজম লোপাট করবার সাধনায় রত। তাঁদের দেশের সাহিত্যিকরা তাই স্বাধীনভাবে যে কম্যুনিজমের পোষকতা করবেন সে সুযোগ নেই। সরকার বা চক্র সাহিত্যিককে সেই-ভাবে চলতে হবে। সরস্বতী বা দুর্গাপ্রতিমার আগে আমাদের দেশে পাড়ার ছেলেরা পটুয়ার বাড়ি গিয়ে প্রতিমা কেমন হবে তার নির্দেশ দেয়—বিজ্ঞ পর্যবেক্ষক নিশ্চয়ই হাল আমলের প্রতিমা শিল্প নিয়ে চর্চা করছেন সরস্বতী কিম্বা দুর্গাদেবী যে সদা হাস্যময়ী কোন প্রিয়চিত্র তার মুখসংস্কৃতে তা তাঁকে স্বীকার করতেই হবে। ঠিক এমনি ব্যাপারটাই আজ চলছে দুনিয়ার সাহিত্যে। প্রতিমার ছিরি দেখে রুচিবান দর্শক চোখে আঙুল চাপা দেন, আজকের সাহিত্য ফরমাসের চকা-নিনাদ শুনে রুচিবান পাঠক কিম্বা বিজ্ঞ সমালোচক চোখে ও কানে হাত চাপা দিয়ে থাকবেন তা সহজে অনুমান করা যায়।

ক'বছর আগে বোরিস পাস্তেরনাককে নিয়ে যে কাণ্ডটা হয়ে গেল তা বিশ্ববাসী আশা করি এত শিগ্‌গির ভোলেননি। পাস্তেরনাক কম্যুনিস্ট রুশ সরকারের হুকুম তামিল করতে অস্বীকৃত হয়েছিলেন বলেই তাঁর স্থান হয়েছিল জেলে। এবং জেলে বসেই তিনি লিখলেন যে ডক্টর জিভাগো তা সরাসরি কম্যু-নিস্ট সরকারের বিরোধিতা না হোক, তার কাছাকাছি কিছু। তাই তাকে ইয়োরোপের ধনতন্ত্রী দেশরা বরমাল্য যৌতুক দিলেন—তিনি নোবেল পুরস্কার পেলেন। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর পৃথিবীর মানুষের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল তাঁর উপর বিশ্ববাসীর ঘৃণা আর ধিক্কার সইতে হবে ভেবে ভয়ে রুশ সরকারও তাঁকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হলেন। সরকারের কাছে সাহিত্যের জয় হল। কিন্তু ঐ রুশ দেশেই আরো কজন জগৎজোড়া নামকরা সাহিত্যিক আছেন। তাঁদের ভাগ্য অন্য রকম। তাঁরা সরকারের দাসরূপে কম্যু-নিজমের ধারা জলে চলেছেন। তাই বিশ্ববাসীর কাছে প্যারীর পতনের পর এলিয়া এরেনবুর্গের পতন হয়েছে, দি ডন ফ্লোজ হোম টু দি সি র পরও শলোকভের সম্মুখে প্রাপ্তি ঘটেছে; এবং বেচারা নভোকভ এখন কি করছেন কেউ জানে না। তাঁর লোপিতা যে এতখানি প্রচার ও প্রসারের দ্বারা সামনে দিয়েছে তার কারণ অন্যত্র অনুসন্ধানযোগ্য। হাল আমলের রুশ সাহিত্য হল এই। এর আগেও কমবেশি এমনটি ছিল। রাষ্ট্রতন্ত্রীয়

উপর হুকুম হয়েছিল কম্যুনিজমের তাবেদারি করবার। তিনি যে পর্যন্ত আত্মহত্যা করে সে হুকুম নাকচ করছিলেন।

ধনতন্ত্রীদেশের সাহিত্যে প্রচারের এতখানি উগ্রমূর্তি হয়ত নেই। কিন্তু তাই বলে যে রাজনীতি চুপ করে বসে আছে তা নয়। দু গলের ফরাসীতে আজ শিল্পীর স্বাধীনতা নেই। সর্তর আজ ক্লান্ত, অথবা সাহিত্যের প্রতি তিক্ত বিরক্ত। তার জাতিগোষ্ঠীদেরও একই হাল। নাৎসী আমলে জার্মানির সাহিত্যেও ছিল এমনিভাবে সরকারি হুকুম নামার আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। ইতালি নাৎসী শাসনমুক্ত। কিন্তু একদিন ধড়িবাজ মুসোলিনীও আমাদের রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে চাল খেলতে গিয়েছিলেন। আজ তা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। সাহিত্যের উপর শিল্পের উপর এই গুরুগিরি আরম্ভ হয়েছে বহু আগেই, কিন্তু এতখানি দাপট আর ত্রাসের সঞ্চার আগে কখনো ছিল না।

আধুনিক সাহিত্যে রাজনীতির অনুপ্রবেশ হয়ত ততটা নয়, কিন্তু সাম্প্রতিক সাহিত্যের প্রায় সবটাই রাজনীতি দিয়ে ভরা। আমেরিকায় আজ একদল নব্য সাহিত্যিক রাজনীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করছেন। তাদের নামকরণ তাঁরা নিজেরাই করেছেন। Beat generation। কিন্তু বিট জেনারেশনের কবি ও লেখকগোষ্ঠী যে সম্পূর্ণরূপে রাজনীতিমুক্ত এমন কথা বলা চলে না। বরঞ্চ এক ছদ্মবেশী রাজনৈতিক বিশ্বাস ও মতাদর্শ দ্বারা তাঁরা পরিচালিত। প্রমাণ কম্যুনিজমের প্রতি তাঁদের ঘোরতর বিরোধিতা। ইউরোপেও অনুরূপ একটি গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়েছে বেশ কিছুকাল আগেই। তাঁরা হলেন Angry young men! অ্যাংগরি ইয়ংমেনরা কেবল যে প্রচলিত রীতি নীতি ও নিয়মে (things in the existing order) বিশ্বাসী নন, তা নয়, তাঁরা কোনকিছুই স্বীকার করতে চান না। কিন্তু তাঁরাও রাজনীতির দাবাখেলায় বড়ে ছাড়া আর কিছুই নন। পশ্চিম বঙ্গদেশের ওই দুই গোষ্ঠীর দেখাদেখি আমাদের দেশেও সম্প্রতি একটি গোষ্ঠীর অভ্যুদয় হয়েছে। তাঁদের নাম এখনো সরকারিভাবে ঘোষিত হয়নি এই যা তফাৎ, তবে ভবিষ্যতে যে তা আইনে পরিণত হবার সম্ভাবনা রাখে তা বলা বাহুল্য মনে করি।

এইসব নতুন কবি ও লেখকরা একটা দিকে ইউনানিমাস। এঁরা কেউই ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না। কম্যুনিজমও করে না। কিন্তু কম্যুনিজমকে এঁরা সকলেই অবিশ্বাস করেন। ব্যাপারটার মধ্যে কিন্তু তেমন কিছু থাকা অসম্ভব নয়।

মানুষ আজ ক্লাব গড়ছে, শিবির গড়ছে। সাহিত্য করতে গিয়েও যে এমন করে দল গড়ার কথা উঠবে তাতে সন্দেহ নেই। তবে কোন যাদুকরের আমলে একদল মানুষ একত্র হয়ে অরণ্য থেকে বেরিয়ে এসেছিল সভ্যতার সুরু সেই থেকেই। তারপর আজ পর্যন্ত দল গড়ার বিরাম নেই। সাহিত্যেও এখন তাই নানা দলের দলাদলি। যেমন রাজনীতিতে। এই দল থেকেই ইজমের উদ্ভব। ইজম যে কেবল দর্শনের কথা তা নয়, আমাদের ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গেও ইজমের যোগসূত্র আছে সাহিত্য আজকের সাহিত্য, সেই থেকে সূত্রকে দৃঢ়তর করবার চেষ্টা করছে।

সাহিত্যে রাজনীতি ও ইজমের অনুপ্রবেশ ঘটেছে বস্তুতন্ত্রতার (reality) সুবাদে। ক্লাসিক যুগের সাহিত্য সম্পূর্ণরূপে বস্তুনির্ভর ছিল না, রোমান্টিক যুগের সাহিত্যও না। আজকের সাহিত্যের মুখ্য কথাই কিন্তু বস্তুতন্ত্রতা। জীবন যে ভাবে চলছে সাহিত্য যদি সেইভাবে না চলল, যদি সাহিত্যে জীবনের স্থান না হল, তাহলে মানুষের কাছে সাহিত্যের প্রয়োজন কোথায়? অতএব সাহিত্যকে জীবননির্ভর হতে হবে। যুগে যুগে জীবনের ধারা বদলায়। সাহিত্যও নানা ধারা বদল করে আজকের যুগে এসে উপস্থিত হয়েছে।

দুটো মহাযুদ্ধ বর্তমানের জীবনধারাকে নানাদিক দিয়ে ভেঙ্গে চুরে নতুন করে গড়েছে। এমনকি মধ্যযুগ হতে মানুষ আধুনিক যুগে প্রবেশ করেছে মহাযুদ্ধের সিঁড়ি বেয়েই। আবার এই মহাযুদ্ধের ভিতর শক্তির ছিল অনেক তিক্ততা, অনেক ব্যথাবেদনা। সুতরাং মহাযুদ্ধ পৃথিবীর অগণিত মানুষের কাছে ঘৃণা আর ধিক্কার কুড়োলেও সাহিত্যিকেরা তাকে অভ্যর্থনা জানালেন। কোথাও কোন ব্যক্তি মহামারীরূপে দেখা

বিলে স্থানীয় জনসাধারণের ত্রাসের অন্ত থাকে না। কিন্তু ডাক্তারদের তখন হয় পোয়াবারো, চিকিৎসার নামে লোকের পলাকাটার এমন অফুরন্ত সুযোগ যে স্বরাচর মিলে না, এবং সন্ধানে মৃত দেহ কি মতে পাওয়া যায় বলে মেডিক্যাল কলেজের ডিসেকশান বিভাগ অনারেরিটর দিনের জন্যে মৃতদেহ সঞ্চয় করে রাখে। এদের কাছে বহামারী পরম আশীর্বাদের রাত্রিবহ। যুদ্ধও এমনি করে সাহিত্যিকদের কাছে আশীর্বাদ বহন করে এনেছিল।

শুধু মহাযুদ্ধ নয়, সাম্প্রতিককালের সমস্ত যুদ্ধই পশ্চিমদেশের ভিত আলগা করে দিয়েছে। এইজন্য দেখতে পাই যুদ্ধ নিয়ে ওদেশে যত সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে এখন আর কিন্তু নিত্যে নয়। নোবেল প্রাইজ পাওয়া বেস্টসেলার বইগুলোর ঠিকুজি আওড়ালে ধীরে ধীরে যুদ্ধের মুখোশ বেরিয়ে আসবে। অথচ যুদ্ধ মানে রাজনীতি। রাজনীতির চালবেচালে দুপক্ষের মধ্যে লড়াই বাধে। তার নামই যুদ্ধ। অবশ্য সব সাহিত্যিকই ব্যক্তিগতভাবে যুদ্ধকে সমর্থন করেন না; কিন্তু তাঁদের সৃষ্টির মূলে এই যুদ্ধের ভূমিকা অনেকটা এ কথা তাঁরা নিজেরাও স্বীকার করবেন। বর্তমান দুনিয়া যে দুটো মস্ত বড় রাজনৈতিক শিবিরে বিভক্ত হয়েছে তার মূলেও আছে যুদ্ধ এবং ছায়ভিৎ। নইলে সাধারণ মানুষমাত্রই একে অপরকে ভালবাসে, সকলের ধমনী দিয়ে একই লাল রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে এ কথা স্বীকার করে। কিন্তু যেখানে আছে তার বিশ্বাস সেখানে আলাদা; বিশ্বাসে বিশ্বাসে গরমিল দেখা দিলে মানুষ মানুষের থেকে বিভক্ত হয়ে পড়ে, শিবিরের পর শিবিরের জন্ম অবশ্যম্ভাবী হয়ে দেখা দেয়।

যুদ্ধের স্রোত আজ আমাদের দেশের উপর দিয়েও বইছে। ভারতের উত্তর সীমান্তকে নিয়ে চীন ভারত মনকষাকষি ত লড়াইয়ের নামান্তর। চীন পোড়া কম্যুনিস্ট মাও সে তুং ঘোষিত যুদ্ধবাদী, ভারতবর্ষ কম্যুনিজমে বিশ্বাস করে না, দু'হাজার বছরের ভিতর তার দৃষ্টি কখনো পররাজ্যের উপর গিয়ে পতিত হয়নি। তবু আজ ভারত চীনে যুদ্ধ বেধেছে। রাজনীতিকদের ধারণা চীন তার পোড়া কম্যুনিজমকে লম্বরাদিত করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। কিন্তু ভারতবর্ষকে বগলে পুরতে না পারলে এশিয়ায় কম্যুনিজমের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ নয়—এ কথা চীন ভাল করেই বুঝছে। অতএব সীমান্তে অনুপ্রবেশ দেখিয়ে কোন একটা যুদ্ধে ভারতকে ব্যাপৃত করে রাখতে পারলে ধীরে ধীরে এখানে কম্যুনিজম প্রসারিত হবে, মাও সে তুং ও চু এন লাইয়ের বিশ্ব জোড়া কম্যুনিস্টরাজ্য গড়ার স্বপ্নও ক্রমে ক্রমে বাস্তবায়িত হতে থাকবে।

আমরা ভারতের মানুষ অবশ্য এখনো কম্যুনিজমের মার খাইনি। যুদ্ধটা ঠিকমত বাধতে না বাধতেই ত থেমে গেল। অন্তত এখন থেমে আছে। ভবিষ্যতে কী হবে না হবে বলা যায় না। কিন্তু ভারতের মানুষ আজ কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে মারমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাহিত্যিকরাও কম্যুনিজমের স্বপ্নাবেশটা খুলে দিয়ে জনসাধারণকে তার আসল মূর্তিটা দেখাবার সাধনায় ব্যস্ত, যাতে জনসাধারণ কম্যুনিস্ট হয়ে চীনকে না সমর্থন করে বসে।

সাহিত্যের উপর রাজনীতির খিদমদগারি যে মনগড়া কথা তা নয়। দেশে দেশে সরকারি আকাদমি গঠিত হয়েছে। আমাদের ভারত সরকারও প্রচুর টাকা দিয়ে সাহিত্য আকাদমি গড়েছেন। সাহিত্যের রাজপথে সহজে যাতে হেঁটে বেড়ানো যায় সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী আকাদমির তা-ই লক্ষ্য। কিন্তু নতুন কালের মানুষ যাতে আপনার গলাটা একবারের জন্যও বাইরে বার করে দুনিয়ার আসল চেহারাটা দেখতে না পায় সে ব্যবস্থা আকাদমি খুব কৃতিত্বের সহিতই করে রেখেছে। ভারত চীন লড়াইয়ের সময়ে আকাদমির ভূমিকা বেড়ে গিয়েছে, আকাদমির পিছনে স্বয়ং সরকার এসে দাঁড়িয়েছেন, অর্থের পাহাড় মাথায় নিয়ে। শরৎচন্দ্রের পথের দাবী বেরবার পর বইটির প্রচার নিষিদ্ধ হয়ে যায়, কিন্তু গোপনে হাজার হাজার কপি ক্রেতার হাতে ঠিক গিয়ে পৌঁছে, পথের দাবী জনসাধারণের সামনে অসম্ভব রকম আশা উদ্দীপনা বয়ে আনে। ঘটনাটার উল্টোপাল্ট আন্দাজ করে তখনকার বৃটিশরাজ শরৎচন্দ্রকে বলেছিলেন: এইরকম একটা বই যদি তুমি আমাদের কেতাবে লিখে দাও তাহলে অনেক টাকা আর রাজ সম্মান দেব তোমাকে। আজ বৃটিশরাজ নেই, ভারত

বর্ম স্বাধীন হয়েছে, সরকারের সঙ্গে জনসাধারণ একমত তবু আজ ভারত সরকার কার বিরুদ্ধে সাহিত্যিকদের সঙ্গে গোপন আলোচনা করে চলেছেন ?

রাজনীতি যে খারাপ এমন কথা বলি না। রাজনীতি আজ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এসে ঠাঁই নিয়েছে। কোন মানুষ, সে ছোট হোক বড় লোক, রাজনীতির থেকে আজ নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে না। কিন্তু তাই বলে সাহিত্যকে রাজনীতির খামারবাড়িতে পরিণত না করলেই কি নয় ?

আজকের সাহিত্য রাজনীতি নির্ভর, তার কারণ সাহিত্যিকেরা প্রায় সকলেই কমবেশি রাজনীতির ভক্ত এবং বস্তুবাদে বিশ্বাসী। বস্তুবাদ জিনিসটা খারাপ নয়। কিন্তু বস্তুর তাঁবেদারি রীতিমত খারাপ ; যেমন রাজনীতির ঠুলি পরা থাকলে মানুষ অন্য কোন নীতিকে দেখতে পায় না, বস্তুবাদের ঠুলিপরা থাকলেও তার চোখে অন্য কোন রঙের স্থান নেই। সাম্প্রতিক সাহিত্যের যতকিছু মারপ্যাঁচ তার মূলে আছে এই বস্তুবাদ, শুধু বস্তুবাদ নয়, অতিবস্তুবাদ (Near-realism)। বস্তুবাদের দোহাই পেয়ে সাহিত্য আজ এমন একটা কিম্ভূতকিমাকার রূপ পেয়েছে যার কোন তুলনা নেই। খবর কাগজে প্রতিদিন যে খবর বেরয়, তার মধ্যে অবস্তুর মিশেল নেই ! কিন্তু খবর কাগজ কি সাহিত্য ? কথা উঠতে পারে মানুষের জীবনে আজ নানাবস্তুর প্রয়োজনীয়তা নানাভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। দারিদ্র্য, অর্থাভাব, রোগ, ব্যাধি, যন্ত্রণা, অতৃপ্তি, অশান্তি, নিঃসঙ্গতা ইত্যাদি নানাবিধ উপসর্গ মানব-জীবনের নিত্যসঙ্গী। কিন্তু শুধুই যদি দারিদ্র্যের আর অশান্তির চিত্রই আঁকা যায় তাহলেই কি তা সাহিত্য হবে ? তা যদি হয় যে-জীবনে সুখ আছে, শান্তি আছে, হাসি আনন্দ আছে, সে জীবনের কি হবে ? সে-জীবন কি সাহিত্যের জীবন নয় ? অন্ধরা যদি হাতি দেখতে যায়, তাহলে তাদের দেখা হাতি কি আমার আপনার দেখা হাতির মত হবে ? আমরা যখন থিয়েটার দেখতে যাই, মঞ্চের উপরকার ঘরের তিনটে দেয়ালই কেবল দেখি। কিন্তু আসল ঘরের চারটে দেয়াল থাকে। অথবা কোন অবস্থাতেই একসঙ্গে আমরা চারটে দেয়াল দেখতে পাই না, কেননা আমাদের চোখ দুটো রয়েছে কেবল সামনেই সাহিত্য যদি বস্তুতন্ত্রতার নামে আমাদের চারটে দেয়ালই দেখতে চায় তাহলে তা আসল বস্তু থেকে অনেক দূরে সরে পড়বে। কেননা চার দেয়ালের সামখানে বাধা পড়লে বাইরের থেকে আর কিছু চোখে পড়বে না।

একটা গোটা মানুষকে দেখা যায় তার উপর চোখ ফেলে। মেডিক্যাল কলেজের ছেলেরা দেখে ডিসেক-শান ঘরে গিয়ে ছুরি কাঁচি দিয়ে চিরে ফেড়ে। অনেকে বলবেন তারা অনেক মেহনত করেই দেখে। তাই বলে তাদের দেখাই সত্যিকারের মানুষ দেখা অন্ধরাও ত বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে হাতি দেখে।

মানুষের জীবনে বস্তুর মূল্য অনেকখানি। এমন কি তার দেহটাই বস্তু দিয়ে গড়া, তার চারপাশের পরিবেশ সবই বস্তুময়। কিন্তু মানুষ ভাবে চিন্তা করে স্বপ্ন দেখে। ভাবা চিন্তা করা ও স্বপ্ন দেখার সঙ্গে বস্তুর তেমন যোগ নেই। মানুষের জীবনে এইটেই সত্য। এই সত্যকে আবিষ্কার করতে না পারলে মানুষের পরিচয় পাওয়া যাবে না। এখানে প্রশ্ন উঠবে মনস্তাত্ত্বিকের (কিম্বা যৌনশাস্ত্রবিদের) মারফতে জানা গেছে মানুষের এবংবিধ চিন্তার মূলে আছে তার পরি-পার্শ্বিকের প্রভাব। ব্যবহারিক জীবনে যা সে পায় না, তা পাওয়ার জন্য সে ভাবে, চিন্তা করে এবং যা কোন মতে পাওয়া যাবে না, তার জন্য সে স্বপ্ন দেখে। কিন্তু ব্যবহারিক মানুষ আর বস্তুবাদের নামে সাহিত্যের ফলে তৈরী মানুষ কি এক ? সব মানুষের নিজস্ব একটা সত্তা আছে। সাহিত্যের মানুষের তা নেই।

এ যুগের এক বিখ্যাত সাহিত্যিকের একটি উক্তি উদ্ধৃতি করি :

"Art is never realistic though sometimes it is tempted to be To be realistic a description would have to be endless the realistic artist aught Logically, to fiill several volumes with descriptions of character and settings, stil without exceeding in exhausting every detail. Realistic is indefinite enumeration."

একজন মানুষের পরিচয় দিতে গিয়ে তার সম্বন্ধে যদি হাজার হাজার পাতার বর্ণনা দেওয়া যায়, তা হলেও কি তাতে কারো চেহারা ফুটে উঠবে? আর যে মনকে দেখা যায় না অথচ মানুষের সম্বন্ধে সেটাই বড় কথা সে মনের কি হবে?

যুধিষ্ঠিরকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: যুধিষ্ঠির তুমি ত মস্ত পণ্ডিত বলো ত পৃথিবীর অন্যান্য সব মানুষেরা কি রকম? জবাবে যুধিষ্ঠির যা বলে ছিলেন মহাভারত পাঠক মাত্রেই জানা আছে। তিনি বলেছিলেন: সবাই আমার মত ধার্মিক। এতে বক্তার অসাধারণ বিশ্বপ্রীতিবোধের পরিচয় পাওয়া গেলেও তার উত্তরটা যে মূর্খের মত তা সকলেই স্বীকার করবেন কেননা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ কোন কালেই যুধিষ্ঠিরের মত ধার্মিক ও মূর্খ ছিল না।

এবং কোন কালেও হবে না। আজকের কম্যুনিজম সেই চেষ্টা করছে বলেই যুধিষ্ঠিরের মত কম্যুনিজমকেও আমরা আমল দিই না। আর যে তরুণ সম্প্রদায় পৃথিবী ব্যাপী এক বিরাট ব্যাধি মন্দির আবিষ্কার করে তাকে ম্যাটকো আক্রালেসিসের বটিকা দ্বারা রোগ মুক্ত করার সাধনায় রত, তাদের প্রতিও আমাদের বিশ্বাস অপরিসীম নয়। তার কারণ সমস্ত পৃথিবীটা ব্যাধি মন্দির নয়। এবং যে তা নয় তাকে তাই বলে কল্পনা করলে কর্তার অসাধারণ কল্পনাবোধের পরিচয় পাওয়া যায় ঠিকই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার অজ্ঞতা প্রমাণিত হয়।

আজকের পৃথিবীতে সমস্যা অনেক। মানুষের জীবন নানা দিক দিয়েই এখন জর্জরিত। কিন্তু এমনও ত হতে পারে এইসব সমস্যা থেকে ভবিষ্যতের পৃথিবী মুক্ত হবে অনেকখানি, মানুষের দুঃখ দুর্দশারও লাঘব হবে। আজকের সাহিত্য সে দিনকার পাঠকের কাছে কী আবেদন জানাবে? আমরা আশাবাদী। একদিন ছিল যখন মানুষকে বনেবাদাড়ে পশুর মত থাকতে

স্বাধীনতা বিপন্ন, আপনার সমস্ত শক্তি দিয়ে তা রক্ষা করুন

—জওহরলাল নেহেরু

দেশরক্ষার জন্য অবিরাম সতর্কতা প্রয়োজন

আজ আমরা বাইরের যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছি তা একদিনেই শেষ হবেনা। এই বিপদ বহুদিন থাকতে পারে। কাজেই জাতিকে সব সময়ের জন্য সতর্ক থাকতে হবে। এই কাজে আত্মপ্রসাদের স্থান নেই, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সর্বতোভাবে শক্তিশালী করার জন্য আমাদের প্রচেষ্টাকে একটুও শিথিল করা চলবে না।

দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে কাজ করুন

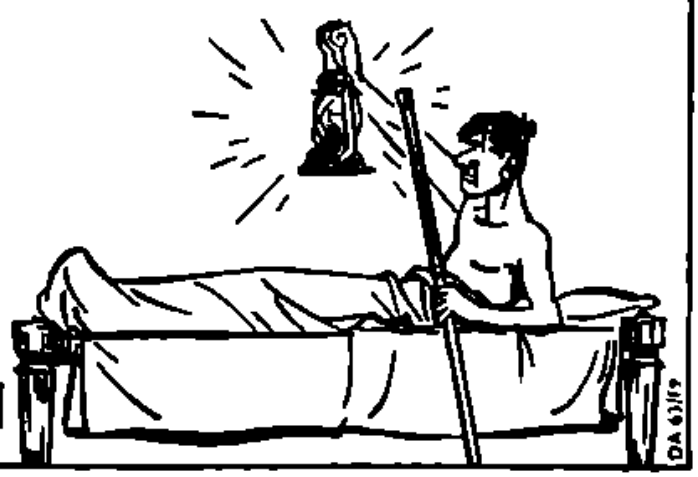

হত, তারপর আরেক দিন সে ক্ষেত খামার বানিয়ে গ্রাম শহর গড়ল, আজ তার লক্ষ্য মহাকাশের দিকে। কোন কোন দেশ আজ দারিদ্র্য হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। অর্থের অভাব আমেরিকা আর রাশিয়ার নেই। একদিন আমেরিকা ও রাশিয়ার মত পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চলেই স্বাস্থ্য সম্পদ ও শ্রীবৃদ্ধির জোয়ার বইবে।

বিট জেনারেশনের লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে অনেকের ব্যক্তিগত জীবনচর্যা আমাদের দৃষ্টিতে সুস্থ ও সাবলীল নয়। আমরা তাঁদের এইদিক দিকে অভিযুক্ত করি। অবশ্য ব্যক্তিগত জীবনের উপর কারো এক্তিয়ার নেই। তা আমরা জানি। কিন্তু শিল্পের সাজিমাটি দিয়ে সেই ব্যক্তিগত জীবনকে যখন কাচা হয় এবং তার উপর ইজমের কড়া ইস্তিরির চাপ পড়ে, তখন আমরা কিছু না বলে স্থির থাকি কি করে? তাঁরা বলবেন: জীবনের যে-যন্ত্রণায় আজকের মানুষ কাতর সেই যন্ত্রণার স্বরূপ আবিষ্কার করতে হলে লোক না সাহিত্যিককেও সুস্থ স্বাবলীলতা ত্যাগ করে অসুস্থ অন্ধকারময় জীবনের সঙ্গে মুখোমুখি পরিচিত হতে হবে। নইলে, সাতমহলা ইমারতের উপরতলার ফ্ল্যাটের বাতি জেলে বসে থাকলে নিচের তলার অন্ধকারের খবর কারো কানে আসবে না। কথাটা একদিক দিয়ে ঠিক। সহজেই সকলে বিশ্বাস করবেন। কেননা লজিকের প্রথম শ্লোকটাই যে এর মধ্যে রয়েছে। কিন্তু জীবন কি শুধু নিচের তলার জীবন? আর নিচের তলার জীবন মাত্রই কি পূতিগন্ধময়? সেখানে কি রজনী গন্ধার পাপড়ি মেলে না? সূর্যের আলো কোনদিন কোন কাটলফোকর দিয়েও কি অকস্মাৎ গিয়ে হাজির হয় না? ভিকটর হুগো কুব্জ পৃষ্ঠ কোয়াসিমোদোর স্রষ্টা। কিন্তু তাই বলে কি তিনি মিস্ত্রি ডেকে তাঁর নিজের পিঠটা কুঁজো করে নিয়ে দিবারাত্রির ঘরে ঘরে প্রেতরাত্রির গীর্জার ঘণ্টা বাজাতেন আর তাঁর প্রভুর সাকরেদি করতেন?

বাধ্য হয়ে অনেক সময় অনেককে অন্ধকারের মধ্যে বাস করতে হয়। সে অভিজ্ঞতা খুবই বেদনাদায়ক, খুবই ভয়াবহ। কিন্তু কেউ যদি শখ করে নিজের চারধারে চারটে কৃত্রিম দেখলে গেঁথে অন্ধকার বানিয়ে বাস করে তাহলে তার অভিজ্ঞতা কি সমান গুরুত্বপূর্ণ হবে? সে কি জীবনের আর সবকে বুঝতে পারবে? ছেলেদের বইতে একটা ছড়া আছে:

আকাশে উঠেছে সূর্য টকটকে লাল।
যেন এক প্রকাণ্ড বগুরির ডাল।

সূর্যের সঙ্গে প্রকাণ্ড এক বগুরির ডালের তুলনা ছেলেদের কাছে মনোরম মনে হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু যদি কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি সূর্যের কথা বলতে গিয়ে ঐ উপমাটির পুনরাবৃত্তি করেন, তাহলে তাঁর বিজ্ঞতার সম্বন্ধে কি আমাদের সন্দেহ উপস্থিত হবে না?

প্রত্যেক মানুষেরই দুইটি জীবন: একটি ব্যক্তিগত অন্যটি আত্মগত। ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে আত্মগত জীবনের যোগ যে সব সময় খুব গভীর তা নয়, বরঞ্চ অনেক সময় তা আকাশের সঙ্গে পাতালের যোগাযোগের মতই। শিল্পী ও সাহিত্যিকেরও এই রকম দুইটি জীবন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অন্য সকলের মত— দৈনন্দিনতার নবেদন পতন ত্রুটিতেই সীমাবদ্ধ, সেটা তাঁর আসল পরিচয় নয়; আসল পরিচয় তাঁর আত্মগত জীবনে, যেখানে তিনি শিল্পী। কিন্তু কেউ যদি ব্যক্তিগত ও আত্মগত জীবনকে এক করে রচনা করার প্রয়াস পান শিল্প ও সাহিত্যের দোহাই পেড়ে, তবে তাঁর দুঃসাহসের জন্যে প্রশংসা করা যায়, কিন্তু বোকামির জন্যে তাঁকে সমাজভাবে সাধারণের হাস্যাস্পদ হইতে হবে। সাম্প্রতিককালের কবি সাহিত্যিকেরা অনেকটা ব্যক্তিগত সাধন ও আত্মগত জীবনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে নিছক শিল্পী সাজতে প্রয়াসী হয়েছেন বলে সাহিত্যের মধ্যে আজ অনেক জটিলতা প্রবেশ করেছে। অনেকের আবার ধারণা; শিল্পীর জীবনে নিতাচার নেই। এ ধারণাও ভুল। আত্মগত জীবনে সব মানুষই নিতাচারী। এবং নিতাচারী বলেই তিনি শিল্পী। প্রচলিত রীতিনীতিকে বিশ্বাস করা না করা অন্য কথা। আজ কেন, আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগেকার মানুষ বুদ্ধদেবও ত প্রচলিত নিয়মে বিশ্বাস করেন নি। ভগবানে বিশ্বাস রাখা না রাখাও ব্যক্তির নিজস্বাধীন। বুদ্ধদেব ভগবানে বিশ্বাস করতেন না, শঙ্করাচার্য

করতেন। করতেন বলেই শঙ্করাচার্য বুদ্ধদেবের চেয়ে বড় নন, কিংবা করতেন না বলেই বুদ্ধদেব শঙ্করাচার্যের চাইতে একঠাঁই হয়ে গেলেন নন। সুতরাং সাম্প্রতিক সাহিত্যিকেরা শিল্পরুচিবোধ ও আধুনিকতার প্রতি বিশ্বাস কোথায় দেখাতে পেরেছেন?

মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ—একথা নানা দেশের নানাশাস্ত্রে হাজার বার উল্লেখ আছে। এর চেয়ে বড় কথা মনে হয় আর কোথাও নেই। রাজনীতির ভাবক যাঁরা তাঁরা কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছেন, কেননা তাঁদের একমাত্র বিশ্বাস রাজনীতিকে: সাম্প্রতিককালের নব্য কবি লেখকগোষ্ঠীরও এ বিশ্বাস নেই, কেননা তাঁরা তাঁদের ইচ্ছামত একটা জগত গড়ে বাস করছেন (এককালে Plato এরূপ একটি জগত গড়েছিলেন: ইংলণ্ডের লেক পোয়েটসরাও (Lake Poets) অনুরূপ জগত গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন) সেখানে অন্য মানুষের স্থান নেই। অথচ সাহিত্য মানেই হল মানুষের কথা। ত্রেতা যুগে কবিগুরু বাল্মীকি যে রামায়ণ রচনা করেছিলেন তাতে অনেক রাক্ষসখোক্ষস অহিরাবণ মহিরাবণ থাকলেও মানুষের অভাব ছিল না। আজ বিশ শতকি যুগে আমরা সে রামায়ণ পাঠ করে আর রাক্ষসখোক্ষসদের দেখতে পাই না, কেবল মানুষকেই দেখি। সাম্প্রতিককালের সাহিত্যে কি এরকম ভাবে চিরকালের মানুষের দেখা মিলবে? দূর আগামীকালের কোন পাঠক কি আজ আমরা যে ভাবে রামায়ণ পড়ি সেইভাবে পড়ে দেখবেন এইসব সাহিত্য কর্ম?

রাজনীতির ভীমের হাতে সাহিত্যকে যে কী প্রচণ্ড ভাবে মার খেতে হয় তার একটা নমুনা দেওয়া যাক। কিছুদিন আগে খবরের কাগজে বেরিয়েছিল, রেলিয়ান্স কাঁপো সরকার তাঁদের দেশে সেক্সপীয়রের পঠন পাঠন বন্ধ করে দিয়েছেন, এমন কি তাঁর কোন নাটকের অভিনয় পর্যন্ত করাও চলবে না। কথায় বলে যারা খোঁড়া তারা কিছুতে সোজা উঠান দেখতে পারে না। রাজনীতির আর পাততে গিয়ে যারা পা ভাঙে তারা সাহিত্যের সোজা উঠানকে দিনরাত গালি পাড়ে। তাই তাদের কাছে বেচারা সেক্সপীয়রদের এরূপ দুরবস্থা।

কিন্তু সবদেশের সরকারই আর কন্সোর মত নয়। আর যদি বা হয় তাতে এমন কি ক্ষতি। সত্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে অসত্যের জিৎ হয়েছে কবে? দুর্যোধনের একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা ছিল, আর পাণ্ডবদের মোটে সাত অক্ষৌহিণী, তবু ত শেষ পর্যন্ত হার হয়েছিল দুর্যোধনেরই।

ইজমের দাসত্ব হতে সাহিত্যকে আজ মুক্ত করা দরকার হয়ে পড়েছে, মানুষের কল্যাণের জন্যে, ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্যে। কিন্তু আজ পৃথিবীতে এমন কি অস্ত্র আছে যে এত বড় দৈত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়ী হওয়া যাবে?

যুদ্ধে জয় পরাজয় দুইই আছে। একপক্ষ হারলে তবে অন্য পক্ষ জেতে। কিন্তু এ যুদ্ধে হারবার ভয় নেই। আগেই যারা হেরে আছে, তাদের আবার হার কি? কষ্ট করলে কেষ্ট পাওয়া যায়, যুদ্ধ করলেও জয় পাওয়া যাবে। কিন্তু কে যাবে যুদ্ধ করতে? সে সাহস আছে কার?

শুনতে অবাক লাগলেও এ কথা অতীব সত্য যে যে-নব্য লেখকগোষ্ঠী আজ দুনিয়া জোড়া নানা আন্দোলনের হোতা অথচ গ্রহের ফেরে যাঁদের বইতে হচ্ছে রাজনীতির তল্পি, তাঁরাই এই সংগ্রাম করবার ইমামদার সৈনিক। আপনি কেবল ঘর পোড়ার না, ঘর আলো করবার ইন্ধনও জোগায়। কিন্তু তার যথাযোগ্য ব্যবহার জানা চাই। আর চাই অশেষ কল্যাণবোধ। নতুন কালের লেখকগোষ্ঠী তাঁরাই আপনি। তাঁদের শিক্ষা ও বুদ্ধিও সংস্কারাচ্ছন্ন নয়। তাঁরাই পারবেন রাজনীতির ভূতটাকে ঘাড় থেকে নামিয়ে সুস্থ সাবলীল জীবনের ছবি আঁকতে, কেননা ভূত তাড়াবার যাদুমন্ত্র বিপ্লবের গরবে যে কেবল তাঁদের জিম্মাতেই আছে।*

---

* এই প্রবন্ধের বহু ভুল তথ্য সংশোধিত হয়েছে। তা ছাড়া প্রবন্ধের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গেও আমরা একমত নই। প্রবন্ধটির উপর আলোচনার আহ্বান করা হচ্ছে। —সম্পাদক।

কর্তা মেয়ে মানুষের ভীড়টা পাতলা হল। বিপিন-বাবু ডান হাতখানা উঁচু করে বললেন,—সরে যাও। ছাড়ো, আজকের দিনে গায়ে হাত দিয়ে দরকার নেই, যথেষ্ট হয়েছে।

বলে, দারুনের অপরাধী লোকটির দিকে তাকালেন। ছিঃ মতি, ছিঃ, সামান্য কটা টাকার জন্যে তুমি এত ছোট কাজ করবে। আমি কখনও ভাবতে পারিনি। আমি তোমায় বিশ্বাস করেছিলাম। সেই বিশ্বাসের চাইতে টাকার মূল্য কি তোমার কাছে বেশী মনে হয়েছিল।

চারদিক থেকে ঘিরে জনতার রোষ ফেটে পড়ছিল প্রায়। কেউ কেউ গায়ে হাত দিতেও কসুর করেনি, কিন্তু বিপিনবাবুর দুটো কথায় বুকের ভিতরটা এলো-মেলো হয়ে গলার কাছটা রুদ্ধ হয়ে এল। মতি কথা বললো না। ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়াল।

কিন্তু অপরাধী কথা না বললেও আর পাঁচজন ছাড়বে কেন? এটা কাজের বাড়ী, বিপিনবাবুর একমাত্র ছেলের বিয়ে উপলক্ষে অনুষ্ঠান। আত্মীয় স্বজন অতিথি অভ্যাগতে বাড়ী সরগরম—আর তারই মধ্যে চোর ধরা পড়েছে। মানুষজন উত্তেজিত হয়েছে স্বাভাবিক নিয়মেই। এক জন বললো,—দরকার পড়লে চেয়ে নিলেই পারতো।

আর একজন বললো,—বলাবলির ধারধারি না। চোরের শাস্তি এখানেই হয়ে যাক।

সে শাস্তি দেবার সাধ সকলেরই ছিল, শুধু কর্তার জন্যেই শেষ রক্ষা করতে পারলো না। বিপিনবাবু শেষ অবধি দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন,—যাও আর কোনদিন আমার চৌকাঠে মাথা গলাবে না তুমি। আর যদি পার এ বদ অভ্যাস ছাড়তে চেষ্টা করো।

উপদেশ দিয়ে জীবন চালান যায় না বিপিনবাবুও জানতেন। মতিও জানে। তবু একটা ভদ্রবংশের সন্তান, রক্তটা সেই ধারাতেই প্রবাহিত, অপমানটা সারা শরীরে তাই আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। সমস্ত শরীর

কাঁপছে, ঘেমেছে প্রচুর, কর্তার কথায় কেউ আর পিছন থেকে টেনে ধরবে না, ভীড় কাটিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

বেরিয়ে এল সোজা, আলো ঝলমল, লোকে লোকারণ্য গহনার অলঙ্কার বাড়ীখানার ঠিক পিছন দিকে মানুষের আলোর বিন্যাস পিছন দিকে ঘন অন্ধকারে ঢাকা। মতির সুবিধেই হল। জোয়ারের কলিতে হাতখানা অনিবার্য ভাবেই পড়ছে। বস বস করে হাতে ঠেকছে কিন্তু সেই সুখে স্পর্শটুকু স্পষ্ট অনুভব করার জোরেই আজ সব অপমানও সহ্য করতে পারলো।

এই দণ্ডে আরও এক জনের মুখ মনে পড়ছে, সে পুষ্প। আজ দুপুরেও ঝগড়া হয়েছে চুড়ান্ত। সে চোখে আগুন নিয়ে বলেছে,—আপনি পার না খেতে তাকে শংকরাকে।

বলার কারণ ছোট ছেলেটার আজ কঠিন জ্বর, ডাক্তার দেখান হয়নি। সেই কথাতেই এত কথার সূত্রপাত। পুষ্প প্রায়ই বলে,—যে মানুষের নিজের পেটের ভাতের যোগাড় নেই, তার বিয়ে করার আগে গলায় দড়ি জোটে না কেন?

বিয়ে। পুষ্পর জিদে এত দিন বিধাতা পুরুষ ঠেকে দিয়েছে—মাঝে মাঝে মতির একবার ভাল করে দেখতে সাধ যায়। তাই কথার পিঠে জবাবও দিয়েছে মাঝে মাঝে।—বলেছে ঐ গলায় দড়ি দেওয়াই কপালে নাচছে,

বুঝলে? ঐ বুদ্ধের বিশ পাঁচজনকে আঁকড়া করতে কি আর তোমার বেগে যায় মনে কর? লড়িটা বুঝবেই এক সঙ্গে বাঁধবো।

বলে আবার নিজেই ভুলে পড়ে যায়। কতদিন বুঝিয়ে বলেছে,—এভাবে কথা বলো না। ভগবান কিন্তু বিয়েছে কি মানুষকে বিঁধিয়ে যাবার জন্যে?

কিন্তু দুটো ভাল কথা শুনে শুল্প গলে যাবে, এত ভাল মানুষ সে কোন কালে নয়, তাই মনটাটা আজকাল বিষ্ণু খিল্প হয়ে পড়েছে।

অতি অভাবের সংসার। আয়ের পথ একমাত্র রেলবিং অফিসের একটি কেরানীর চাকরী। মাইনের টাকায় মাসের পনেরোদিন ভালভাবে চলে যা তারই মধ্যে আছে ঘর ভাড়া, ছেলের মাইনে। আত্মীয় স্বজন।

তাই সোজা পথে সহজ উপায়ে যে কিছু আসে নি, অতি প্রয়োজনে তাকে বাঁকা পথ ধরতে হয়েছে।

মানুষের কাছে বিশ্বাসী বলে সুনাম আছে মতির। ছেলেবেলা ভাল। ভদ্র ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান। তার উপর কথায় যাদুমাখা মিষ্টি মুখে মানুষকে খুশী করতে পারে প্রচুর। আর তাইই জোরে মানুষের মনে নিজের আসন খাসা ভাল ভাবেই পাকতে পারে মতি। পাতেও।

কাজে কর্মে উৎসবে ব্যসনে মানুষের দরবারে মতির ডাক পড়ে। কাজারে যাদের ব্যাজার নেই—সাধারণত তারাই তাদের কাছে থেকেই আসে।—মতি বিশ্বাসী। মতি কর্মী, বাজার হাট সোনার পসার মতির মোহ লাগবে। সুতরাং মতি ছাড়া গতি কোথায়। কর্তা বড় ভোর ইতি চেয়ারে শুয়ে কষ্ট করে কর্ম খানা পড়ে শেষে। বাস্। সব হাঙ্গামা চুকে গেল। তারপরের ভার মতির। কোন দরকার কই সম্পেশ রাবড়ি সব মাইতে উৎকৃষ্ট—মতি জানে। কোন ছেলের মাস্ সর্ব মাইতে দরকার তাজিজাতক, সেও মতির সব জানে,—কোন বাজার থেকে কোন বস্তুটি আনতে পারলে বিশ্বাসী মানুষের কাছ থেকে পত যুদ্ধে সাবাস পাওয়া যায় সেটুকুও মতিই জানে। সুতরাং তার মতির।

আর এই যে তাজা মাল যাওয়া এটাও কিন্তু যেন স্বার্থে হয় না। কারবার এই মতির পটিলের ভাড়ার সাতশো খরচ করতে পারে এমন মানুষের সঙ্গে। পটিটা বড় বড় মানুষের সঙ্গে মিশে দেখেছে মতি, সংসারে এমন লোকও আছে, টাকাটা যাদের কাছে নিজেদের বাইরের জিনিস। তাই দেখে শুনে মনে হয়েছে এত বেহিসেবী বস্তু থেকে কিছু, এদিক ওদিক করতে পারলে ক্ষতি কোথায়?

এর মধ্যে কোথাও পাপ অর্থ আছে মতির কখনও মনে হয়নি। তাই এত যে বই সম্পেশ, দোকান পসার, মাছ মাংসের বেলা কাটিতে হাত লাগাল,—এটাও কিন্তু ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের মত সম্পন্ন করতে পারেনি মনোভাবের সঙ্গে চক্রান্তটা তাই টাকায় আনা যাবে মধ্যে দু আনা তিন আনাতে সিকেও ঠেকেছে।

এ যাবৎ এই ভাবেই চলছিল। কেউ কিন্তু ধরতে পারেনি। কিন্তু আজ কার মুখ দেখে উঠেছিল কে জানে মতো বইগুলা ব্যাটা এমন করে ধরে বসবে?

অবিশ্যি টাকার ভাগটা আজ কিছু বেশী হয়ে গেছে। লোভটা ক্রমশঃ উর্ধ্বমুখী হবার জন্যই এ অবস্থা। আগে তিন টাকায় আনা যাবে, আজ সিকি। ফলে বইয়ের ভাগে অবিচার ভাবে চিনির ভাগ কম, ফলের পরিমাণ বেশী হয়ে গেছে।

টাকার মূল্যমান চাইতেও জিনিসের কদর যায়। বেশী বোঝে তাদের বলেই বলেছেন বিপিনবাবু। তবু বিপিনবাবু মানুষটি সরলতা হয়তো ছেড়ে দিতেন। কিন্তু অতিশান্ত মানুষটি সরলা বসুন্ধরার দলিলা। স্বাগলায় বলে, সরাজের যেটা ওঁর বড় সুনাম—তার সবটুকুই উনি আর্থিক প্রতিপত্তি আর উপর মহলে সততা দেখিয়ে ধরিয়ে রাখতে চান, রাখেনও।

ঠিক এই মুহূর্তে বিনোদ বিনোদের কথা ক্লান্তি তাই ওঁর চমটাসিয়ে উঠেছিল। বলেছেন,—তাক বইগুলাকে।

অতিশান্ত অর্থকোটির মালিক, বিপিনবাবু তার চাইতে বেশ কিছু বিনোদ। সুতরাং ওঁর গলার আওয়াজ কেউ শোনে নি। বইগুলা করতোড়ে এসেছেন এবং কলাও করে টাকার ঝিকির উপত্যানও পুরিয়ে গেছে।

ফলে—যাও, যাও, যাও পালাকে। পালা ভঙ্গ

ঘরে সাজাতে বাস করতে এসেছে? "খুব তো দেখছ কাঁচ দেখনি?" একবার বাবা পুলিসের হালদারা করতে গালা খুকতো কত ধানে কত চাল হয়।

টাঁকের টাকায় আবার হাত পড়লো। রাত হলেও দোকান পসার বন্ধ হয়নি। অনেকদিন আগের লাইনার সরু গলীর ঘর জুড়ে থাকলেও একজনের হাসোচ্ছল ঘুরঘারা বার বার ঘরের পর্দা ভেদে বেড়াতে লাগলো। সব কিছু ভুল ঘরে গেল মতির।

পাশের মোড় ছাড়িয়ে বড় রাস্তা। সারি সারি দোকানে সাজান শাড়ী। দেখতে দেখতে একখানা ঘন সবুজ রংএর জড়িপাড় শাড়ীই পছন্দ করে বললো মতি। পুষ্প কলী মানুষের ভাল।

বাজার হাট, অপর দিকে দই বাস্ত মিস্টি থেকে ম্যানেজ করেছে আজ সব। ছেলেটার জন্য জামার চাই। সেটা কাল বললেও চলবে। উপস্থিত অপরাধাহত মনে কিছু উচ্চ পরপকারীর জন্য আকুল হয়েছে। সব ভোলার একখানা শাড়ী চাই, সেই সঙ্গে কিছু খাবার দাবার ও।

বিপিনবাবুর বাড়ীর চপ কাটলেট বাদ দোলাও এর পর দুর থেকেও থাকে যেন বাকা যাচ্ছে,—অতিপতি হারাধনরা এ এলে আজ পাওনা পত্তা সব দিক দিয়েই মোটা হওয়ার কথা।

খাবারের ঠোঙ্গা শাড়ীর প্যাকেট নিয়ে মতি যখন বাড়ী ফিরে পৌঁছলো। মোড়ের মাথায় বিপিনবাবুর উৎসব মুখরিত বাড়ী, গলির পাশ বাতাসকেও ভারী করে তুলেছে, মতি খুট খুট করে দরজায় কড়া নাড়া দিল,—পুষ্প ও পুষ্প।

সাড়া নেই। মতি কড়ার আওয়াজ আরও বেশী করলো।—পুষ্প, এই পুষ্প। আরে বলা, দুয়োর খুলি?

আবলা দিয়ে শাড়ীর প্যাকেট ঠোঙ্গা দেওয়া পর্দার কিছু অংশ ফাঁক হয়ে রয়েছে। এদিকেই নজর পড়ে গেল,—ও হরি, পুষ্প ঘুমিয়ে পড়, তক্তাপোষের উপর আড়া বসে। সবটা ব্যাপার আন্দাজ দিকেই। হোয়াচুখী হয়ে গেল।

হেসে ফেললো মতি।—এই বয়সে খুলবে না?

না মাজা না পদ্ম না পাতখান? দুপুরের ঘামটা এখনও যায় নি দেখা যাচ্ছে। মতি আবার ডাকলো—ঘিনঘিন পদ্ম নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবো নাকি? যেন তো বলা—।

সাড়া নেই—কি এমেছি একবার দরজা করে দেখ না গো মাসিমী—

ছেলে বেলার মাস্টার বলে মতি কিছুদিন নিয়মিত পাঠ করেছিল। সে আজ বহুকালের কথা। সেই অনেক কালের কথা বলতে গেলেই মিতের উপর ভারী শ্রদ্ধা জাগলো মাতর। কিন্তু বাহার বর্ষা দিয়েও পুষ্পকে আজ বিদ্ধ করা গেল না পুষ্প অনড় হয়ে বসে রইলো।

আরও কিছুক্ষণ নীরব কাকুতির পর তক্তোপোষ থেকে নেমে এসে দরজা খুলে দিল পুষ্প। দুচোখে আর দৃষ্টি, চেখার ঘরে যতক্ষণ যেতে হয়,—জ্বালা যে জ্বালা, ও ভাবে তাকাবার মানেটা কি পুষ্প?

মানে না থাকলে দেখবো কেন?

দুঠোটে কাঁক দিয়ে দুটো কথার টুকরো ছুড়ে সবেগে ঘরের ভেতর ঢুকে গেল পুষ্প। যে শক্তে মাতও বাঁচলো। যে হলে কি হয়—ভিতরের হাল যখন দুচোখ দিয়ে ঝরে পড়ে, তখন যে কি ছিন্নভিন্ন বোঝা ভার। নিজের থেকে চোখের দৃষ্টি না পুকোলে মতির নিজেই সরে আসতে হত।

কিন্তু ঘিনঘিনটা নিয়ে বাইরেই বা কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায়। তাই অনেকক্ষণ পর নিজের সাহসে ভর করেই হাসি হাসি মুখে ঘরে ঢুকল মতি। কি ব্যাপার, বেজায় কিসের?

পুষ্প ধরাশায়ী তক্তাপোষে আসীনা দুচোখে সেই তীব্র দৃষ্টির দাহিকা। ব্যাপার কিছু বোঝা যাচ্ছে না ঠিক। মতি নিজেকে কাকুতি দিয়ে সোজা করতে চাইলো,—বলি ব্যাপারখানা কি? ছেলে ছেলে খেললেই হবে?

—খেলবার ঘিনঘিন না দেখে করবো কি?

যাক, বাক্যস্ফুরণ কিছু যোগিয়েছে। মতি একবার সাহস করেই শাড়ীর প্যাকেট আর খাবারে ঠোঙ্গাটা

বৌ-এর সামনে এগিয়ে ধরলো। ইচ্ছে ছিল বেরিয়ে সেই যাত্রার চঙে,—"লহ লহ পরাণ সখী," গোছের কিছু একটা বলবে,—কিন্তু তার আগেই এক কাণ্ড,—পুষ্প সামনে ধরা জিনিষগুলো এক ঝটকায় হাতে তুলে নিয়ে ঘরের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে,—লাজ লজ্জার মাথা একেবারে খেয়েছ?

খাবারগুলো ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে একাকার। হতভম্বের মত মতি বললো,—এটি কেমন হল?

—কেমন হল বুঝতে পারছো না? দুটি আগুন চোখে জ্বল উঠে এল পুষ্পর।—আস্তাকুড়ের জিনিষ রোজ রোজ তুমি ঘরে বয়ে আনবে কেন?

—আস্তাকুড়ের জিনিষ? ঘুরিস্টিরপনা দেখে মেজাজ ঠিক রাখা দায়। অল্পকাল আগের চাপা অপমান মাথার মধ্যে যেন তালগোল পাকিয়ে উঠলো মতির। মনে হল পুষ্পর ঐ চুপসানো গাল দুখানা চড়িয়ে ভেঙ্গে দেয়। বললো—আস্তাকুড়ের জিনিষ কেন?

—কেন, সে আমার চাইতে তুমি অনেক বেশী জান। রোজ রোজ অমন জিনিষ আমার চাইতে ছেলে বৌ-এর মুখে ছাই তুলে দিতে পার না?

—এবার থেকে তাই দোব। খেও তাই।

ঘর ছেড়ে মতি বাইরের রোয়াকে চলে এল। মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছে। অপমান আর লাঞ্ছনাহত মনে কারো স্নেহসিক্ত পরশ, দুটো সান্ত্বনাময় কথা যখন বড় বেশী প্রয়োজন ছিল ঠিক সেই মুহূর্তে এ ধরনের উল্টো কাণ্ডে নিজেকে সোজা করে রাখা যেন বড় বেশী কঠিন হয়ে উঠলো। কিন্তু কোন উপায় নেই। বরং একাধিক ক্ষোভ অপমান আর দুর্নিবার ক্রোধের কোন প্রতিকার করতে না পেরে নিজেকে বড় শ্রান্ত আর অবসন্ন বলে মনে হল মতির। জ্বালাময় চোখ দুটো এক সময় জলে ভরে উঠলো।

রাত কত ঠিক নেই, ঠেলা খেতে ঘুম ভাংলো মতির। পুষ্প ডাকছে, ঘরে চল, হিম পড়ছে যে।

ঘুমের চোখে ধড়মড়িয়ে উঠে বসতে গিয়েও পুষ্পর কথায় আবার শুয়ে পড়তে গেল মতি। পুষ্প তাড়াতাড়ি হাতখানা ধরে ফেললো,—তেজ করে যে বাইরে শোওয়া হল, বলি রোগ হলে শুশ্রূষা কে? আমি?

কথা বললো না মতি। মুখ টিপে হাসলো পুষ্প—সেই কথায় আছে না, সতীন না পেয়ে মুখ ঘরের কাকে ঠেলায় যেন, তোমার দশাও তাই। নাও, খুব হয়েছে—

পুষ্প জোর করে হাত ধরে তুলে দিল। বাইরে ঘন অন্ধকার। ছোলের মানুষ মানুষ হয় না ভাল। কিন্তু তা হোক, তরল কণ্ঠস্বর আর কালো চোখের অতল গভীর দৃষ্টি—ওখানে বিভ্রম হবার কোন উপায় নেই। মতি বৌএর মুখের দিকে চাইলো,—তখন অমন করলে কেন?

—তুমিই বা অমন কর কেন? কাজে কর্মে লোকের বাড়ী যেতে তোমায় মানা করি নি?

বোঝা গেল বিপিনবাবুর বাড়ীর খবর কানে গেছে। কিন্তু অন্যদিনের মত মুখ সিঁচু করলো না মতি, কাঁদাল গলাতে বললো,—সেজি, আবার যাব। একজনরা ফেলে ছড়িয়ে খায়, আর একজন যদি তার থেকে নিয়েই খাকে, তাতে হয়েছে কি? বলি তাতে তো তাদের কম পড়ে না কিছু?

—তা হোক,—পুষ্প মতির কাছে ঘন হয়ে বললো। অল্পকাল আগের সমস্ত অপমানের দাগ যেন দুহাত দিয়ে তুলে নিতে চায়। বললো—কার কিসে কম পড়লো না পড়লো সে জেনে আমার লাভ কি? দুনিয়ায় ছোট মানুষ বড় মানুষ চিরকালই থাকবে,—তা ছোট হয়ে জন্মেছি বলে ছোট কাজ করবো কেন?

পুষ্প বহুদিন এমন সস্নেহ ব্যবহার করেনি। দুহাত দিয়ে নিবিড় করে ধরলো মতি। বললো,—তোমায় যে আমার কিছু দিতে ইচ্ছে করে। ভাল একটু খাওয়া ভাল একটু পরা—

নিতান্ত তাচ্ছিল্য করে পুষ্প বললো,—দূর বাপু, অমন জিনিষ চায় কে? তুমি ভাল থাকলেই আমার সব ভাল হল।

বাদশা বেগমের দেশে

রাম বসু

। তিন ।

। আদিবাসী ।

সমাজের নীচু শ্রেণীর লোক হল এই আদিবাসী কারারীন রা। এরা যেমন গরীব তেমন অজ্ঞ। সমাজের উঁচু শ্রেণীর লোক এদের ঘৃণা করে এড়িয়ে চলে। সামান্য চাষবাস এদের জীবিকা। কোন মতে দিনযাপন করেই এরা খুসি। এত গরীবলোক খুব কম দেখা যায়। তাই এমন জিনিষ নেই যা এরা খায় না। গরু, ঘাড় মহিষ প্রভৃতির মাংস এদের চাই। সমুদ্রের ধারে তালকুঞ্জ রয়। এই তাল তাদের ভোগ্য। নীচু জমিতে হয় ধান। এই ধান তাদের মহার্ঘ সম্পদ। তাছাড়া ফল ডিম দুই প্রভৃতি পোষার অভিজাত বাড়িতে সরবরাহ করেও এদের কিছু রোজগার হয়।

বলা যায় কারারীনরা নগ্ন থাকে। পরনে থাকে সামান্য কাপড়ের টুকরো বিশেষ স্থানটি ঢেকে রাখার জন্য। কারারীন রমনীদের অবস্থা এদের চেয়েও ভাল হয়। তাদের বড় জোর হাঁটু অবধি ঢাকা থাকে। ওপরের দিকটা থাকে সম্পূর্ণ অনাবৃত। আচার অনুষ্ঠানে দাক্ষিণাত্যের লোকদের অনুগামী হলে কি হবে এই কারারীনরা সবাই খৃস্টান।

পাতার খুদে খুদে কুঁড়ে এদের আছে। তাকেই এরা বলে থাকে ঘর। এই ঘরগুলো এত নীচু যে হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হয়। জানালার বালাই নেই। আলো বাতাসের সম্পর্ক নেই ঘরে। এরা মাদুরে শোয়। ঢেঁকিতে ধান ভানে। জিনিষপত্রের মধ্যে আছে ভাত সিদ্ধ করার হাঁড়ি। এরা যে কেমন করে বাঁচে তা আমি ভেবেই পাই না।

দেখেছি এদের ঘরে মা ষষ্ঠীর কৃপার অন্ত নেই। উলঙ্গ এই সব ছেলেমেয়ে ঘুরে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। দশ বছর বয়স অবধি এরা সম্পূর্ণ ভাবে নগ্ন ঘরেই থাকে।

একবার আমি আর আমার কয়েক জন বন্ধু বেড়াতে বেড়াতে কারারীনদের পাড়ায় গিয়ে হাজির হলাম। এতখানি পথ আসতে আমার কণ্ঠ শুষ্কিয়ে, তেষ্টাও পেয়েছিল খুব তাই বাধ্য হয়ে আমি এক কারারীনের কুঁড়ের মধ্যে মাথা গলিয়ে বললাম—একটু জল দেবে? খাব।

আবছা অন্ধকারে দেখলাম ঘরের মধ্যে এক মহিলা খুব আট করে কাপড় পরিধান করে শুয়ে। ঘরে আর কেউ নেই। তার সামনে রয়েছে এক শ্যামলা জল।

এই মাত্র মেয়েটি প্রসব করেছে। প্রসব করার সময় কেউ তাকে সাহায্য করেনি। মেয়েটি একমনে শ্যামলা থেকে জল নিয়ে সদ্যজাত শিশুকে ধুইয়ে পরিষ্কার করল। তারপর শিশুটিকে তালের পাতার মাদুরের ওপর শুইয়ে দিয়ে আমাকে বললে, দিচ্ছি, দাঁড়ান।

চোখের সামনে এই অবস্থা দেখবার পর সেই মহিলার কাছ থেকে সেই অবস্থায় জল খাওয়ার প্রবৃত্তি রইল না। আমি অন্য এক কুঁড়েতে জল খাওয়ার জন্য গেলাম।

আমি যখন জল খাচ্ছি তখন দেখলাম সেই মহিলাটি আমার পাশ দিয়ে চলে গেল। তাকিয়ে দেখলাম। মনে হল ওর যেন কিছুই হয়নি। কেমন সুস্থ, স্বাভাবিক ভাবে হেটে গেল আমার চোখের ওপর দিয়ে!

অথচ দেখেছি এদের স্বাস্থ্যবতী ছেলেমেয়ে। রোগ-বালাই-এর চিহ্ন নেই। কত দীর্ঘ আয়ু এদের। এক দিনের জন্যও এদের সামান্য অসুখ করেনি। কারো দাঁত পড়েনি, চুল পাকেনি। ঈর্ষা করার মত অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী এরা।

এদের মাথার মাঝখানে থাকে টিকির মত এক গোছা চুল। মাথার চারপাশে কামিয়ে ফেলে মাথার মাঝখানে

থাকে ওই চুলের গুচ্ছ। এরা সবাই ওস্তাদ সাঁতার। নদীতে নেমে চলা ফেরা করবার জন্য থাকে এদের ডিঙ্গা বা আমদিয়া। এই ডিঙ্গাগুলো খুব লম্বা। অতি সাবধানে বসতে হয়। তবু নদীতে প্রায়ই ডিঙ্গা উলটে যায়। কিন্তু সাঁতার জানে বলে কিছু হয় না। নদীতে নেমে ডিঙ্গা সোজা করে নিয়ে আবার চলে স্রোতের মুখে।

আত্মসম্মান বোধ এদের নেই। একটা পয়সার জন্য বেত খেতে পারে। তবু অনাহারে এদের থাকতে হয়। খাদ্য জোটে না। অনাহারে থেকে থেকে এরা হয়ে পড়েছে কৃশ ও দুর্বল। পর্তুগীজরা এদের সঙ্গে কুকুর বেড়ালের মত ব্যবহার করে। এইভাবে ঘৃণিত জীবনযাপন করে কারানীরা।

হাবসী

আরববাসী ও হাবসীদের দেখেছি এখানে। আরব বাঙ্গালীরা মুসলমান, হাবসীদের কেউ কেউ মুসলমান, কেউ কেউ খৃস্টান। খৃস্টান হাবসীদের বেহে থাকে চারটে ক্রুশের চিহ্ন।

পর্তুগীজরা নাবিক হয়েই এদেশে আসে। কিন্তু এদেশে আসার পর তারা নাবিকের কাজ আর করতে চায় না। তারা তখন কেউ হয় জাহাজের ক্যাপটেন, কেউ বা অন্য জীবিকা বেছে নেয়।

স্বাধীন হাবসী ও আরববাসীরা তখন জাহাজে খালাসীর কাজ করে। বাইনে তাদের যৎসামান্য। কিন্তু পীড়ন অমানুষিক। মনে হয় পর্তুগীজরা কুকুর বিড়ালের প্রতি এদের চেয়েও ভাল ব্যবহার করে। তবু এই জীবনই বেছে নেয় স্বাধীন আরব বাসী ও হাবসীরা। শুধু বেছে নেওয়া নয়, বিনা প্রতিবাদে বেছে নেওয়া। কারো মুখে প্রতিশোধের রেখা ফোটে না।

যে জাহাজে তারা থাকে সেই জাহাজেই থাকে তাদের পরিবার। ক্রীতদাসের মতন জীবন যাপন করে এই স্বাধীন খালাসিরা। খেতে পায় ভাত, মাংস আর নুন। জাহাজের ক্যাপ্টেন হলেন পর্তুগীজ। তাছাড়া তাঁকে সাহায্য করার জন্য থাকে তিনচার জন পর্তুগীজ। ক্যাপ্টেনের অধীনে থাকে আরব বেনীয় "মোকাদ্দম" এবং তার অধীনে থাকে খালাসীরা।

জাহাজের মালিক কিংবা ক্যাপ্টেনের সঙ্গে খালাসীদের আদৌ সম্পর্ক নেই। মালিক ব্যবস্থা করে মোকাদ্দমের সঙ্গে। এই মোকাদ্দমই খালাসীদের সঙ্গে মাইনে রুজি ইত্যাদি বিষয়ে ব্যবস্থা করে।

মালাবারের মানুষ

সোহা ও কোঙ্কণের মাঝামাঝি অঞ্চলে বাস করে মালাবারবাসী। এদের ভাষা আলাদা। কতকগুলো ছোট ছোট রাজা সমস্ত অঞ্চলটা ভাগ করে নিয়েছেন তাদের মধ্যে। অধিবাসীদের আচারব্যবহার অন্যান্য ভারতীয়দের মতো হলেও এদের বৈশিষ্ট্য সহজ নজরে পড়ে। এরা খুব উদ্ধত, ও অহংকারী। গায়ের রং কালো, কিন্তু উজ্জ্বল। এরা তেল মাখে এবং মাথায় বড় বড় চুল রাখে।

এদের মধ্যে দুটো জাতি আছে, নায়ার আর পলিয়ন।

নায়াররা বীর। অস্ত্র চালনাই তাদের প্রধান কাজ। এদের হাতে থাকে সব সময় থাকে ঢাল তলোয়ার। ঢাল গুলো খুব পাতলা। এর এই ঢাল দিয়ে সমস্ত শরীর ঢাকা সম্ভব। এইভাবে তারা প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করে। রাস্তা দিয়ে যাবার সময় তারা তলোয়ার দিয়ে ঢালের ওপর বাজাতে বাজাতে যায়। উদ্দেশ্য হল লোক জানানো। কারো কারো হাতে থাকে বিষ-মাখানো তীর আর ধনুক। এরা ওস্তাদ তীরন্দাজ। বর্শা ছুঁড়তে পারদর্শী। বন্দুক চালাতে পারে চমৎকার। পর্তুগীজরাও নায়ারদের মতো বন্দুক চালাতে পারে না। এরা সব সময় অস্ত্র নিয়ে চলাফেরা করে। যেখানেই যাক না কেন অস্ত্র তাদের থাকবেই। এরা হল যোদ্ধা এবং একমাত্র রাজার আজ্ঞাবহ। রাজার আদেশ পাওয়া মাত্রেই নায়াররা যে যেমন অবস্থায় থাকুক না কেন যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়বেই। পথ দিয়ে যাবার সময় নায়াররা মুখ দিয়ে এক রকম শব্দ বার করতে থাকে। উদ্দেশ্য হল লোককে সাবধান করে দেওয়া। নায়ারদের পথ পরিষ্কার করে দেওয়া। কেউ যদি পথ থেকে সরে না দাঁড়ায়, কেউ যদি কোন ভাবে নায়ারদের ছুঁয়ে দেয়, তবে তার আর রক্ষে থাকবে না। নায়ার তাকে সেই অবস্থায় খুন করে ফেলবে এবং রাজারও এ বিষয়ে কিছু

সঙ্গে থাকবে না। তারপর নামাজ পড়ার জন্য শুচি হওয়ার জন্য স্নান করবে। তাই নাপিতদের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলে সবাই, এমন কি খৃস্টানরাও।

পর্তুগীজরা ভারতে আসার পর নাপিতদের সঙ্গে তারা কিছুতেই বন্ধুত্ব করতে পারেনি। যুদ্ধ হতই। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তখন এক উপায় ঠিক করা হল। দুইপক্ষই মেনে নিল যে নাপিতদের পক্ষ থেকে একজন এবং পর্তুগীজদের পক্ষ থেকে একজন যুদ্ধ করবে। এই যুদ্ধে যে ভিতরে তারই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে এই অঞ্চলে। এই যুদ্ধে নাপিত হেরে যায় পর্তুগীজরা জয়ী হয়। তারপর থেকে নাপিতরা পর্তুগীজদের দলা ত্যাগ করে এবং রাস্তায় দেখা হলে পথ করে দেয়।

নাপিতদের রাজা আছে, আছে দলপতি ও দূত। এরা হাতে সোনা বা রুপোর বালা এবং আংটি পরে। এই হল তাদের আভিজাত্যের চিহ্ন। এই চিহ্ন থেকেই বুঝে নিতে হয় যে ইনি সাধারণ নাপিত নন।

দলপতির সঙ্গে সঙ্গে যায় নাপিতরা। এটা দলপতির সম্মান। তাঁকে রক্ষা করার জন্যও যেতে হয়। নাপিতরা খুবই সাহসী বলবান ও যোদ্ধা হিসাবে তাদের হারানো যায় না। বর্শাবিদ্ধ হয়েও তারা যুদ্ধ করে। নিজের শরীরে বেঁধা বর্শা নিজের হাতে টেনে বার করে ছুঁড়ে মারে শত্রুকে। প্রতিহিংসাপরায়ণতা এদের মধ্যে খুবই প্রবল।

কোন অপরাধী নাপিতকে রাজাও প্রকাশ্যে শাস্তি দিতে পারেন না, এমন কি বিচার করতেও অধিকার। রাজা শাস্তির আদেশ দেন অন্য নাপিতকে এবং সেই রাজ আজ্ঞা পালন করে।

রোজ স্নান করা নাপিতদের অভ্যাস। কিন্তু নদীর জলে স্নান এরা করতে চায় না। এরা স্নান করে পুকুরের জলে। ছেলে মেয়ে রাজা দলপতি সবাই এক সঙ্গে স্নান করে। এই পুকুর মন্ত্রপূত। ব্রাহ্মণ শাস্ত্রপাঠ করে ও পূজা করে এই পুকুর মন্ত্রপূত করেন এবং এই মন্ত্রপূত পুকুরের জলে স্নান করলে সমস্ত কলুষ থেকে এরা মুক্ত হতে পারবে। অন্তত, এই-ই তাদের বিশ্বাস।

পলিয়ন্না হল কৃষিজীবী। এরা খুবই পরিশ্রমী। সমাজের নীচু স্তরের মানুষ এরা। অস্ত্র শস্ত্র এদের কাছে থাকে না। নাপিতদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলে। তা ছাড়া আচার অনুষ্ঠানের দিক থেকে এরা হিন্দু। কুলবৃত্তি এরাও সহজে ত্যাগ করে না।

ইহুদী

ইহুদীদের বাস আছে গোয়া ও কোচিনে। ভারতের অন্যান্য জিনিসও তারা ছড়িয়ে পড়েছে। ভারতে এসে এরা নিজেদের গির্জা তৈরি করেছে এবং নিজেদের ধর্মানুষ্ঠান বিনা প্রতিবাদেই করে থাকে। অবশ্য গোয়া এবং পর্তুগীজদের অধিকৃত এলাকায় তার ব্যতিক্রম। এখানে প্রকাশ্যে তারা নিজেদের ধর্মানুষ্ঠান করতে পারে না। সে অধিকার তাদের নেই। এমন কি গোয়ার মধ্যে ভারতীয়রাও তাদের ধর্মাচরণ প্রকাশ্যে করতে পারে না। তারা তাদের বাড়ির মধ্যে নিজের ইচ্ছে মতো ধর্ম পালন করতে পারে। কিন্তু প্রকাশ্যে তারা পারে না। মাঝে মাঝে প্রকাশ্যে ধর্মাচরণ করার জন্য জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয় বা খুন করে ফেলা হয়। ইহুদীরা এসেছে জেরুজালেম ও প্যালেস্টাইন থেকে। এদের দেখতে ইউরোপীয়দের মতো এবং ইহুদী মহিলা দেখতে খুবই সুন্দরী। এরা স্পেনীয় ভাষায় চমৎকার কথা বলে।

মুসলমান

মুসলমানদের মসজিদ আছে এবং এদের উপাসনার রীতিও আলাদা। ছোটবেলা থেকে মুসলমান বালকদের ধর্ম শিক্ষা করতে হয়। পা না ধুয়ে মসজিদে ঢোকার উপায় নেই। এই জন্যে মসজিদে চৌবাচ্চা ও ব্যবস্থা আছে। জুতো খুলে পা ধুয়ে মসজিদে উঠে প্রার্থনা করতে হয়। শূয়োরের মাংস এরা কখনও স্পর্শ করে না এবং মৃত দেহ কবর দেয়।

আমি ও কয়েক জন বন্ধু মিলে একদিন নগরের বাইরে এক মসজিদ দেখতে গেলাম। আমাদের পায়ে জুতো ছিল। তাই ঢুকতে দেওয়া হল না। আমরা জানতে চাইলাম যে মন্দিরের মধ্যে কোন বিগ্রহ নেই। তাই আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, বিগ্রহ নেই অথচ ঢুকতে বাধা কিসের? উত্তরে আমাদের জানান হল যে তারা স্বর্গের ঈশ্বরকেই পূজা করে। পাথর পূজা তারা করে

না। পাথর পুজো করে
সবাই পৌত্তলিক।

এই উত্তরে আমার বন্ধুরা রেগে আগুন। তখুনি একটা রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে যেত। আমি কোনমতে বন্ধুদের শান্ত করে বাইরে নিয়ে এলাম।

একটি উৎসব

করোমণ্ডল উপকূলে নরসিং বলে একটি রাজ্য আছে। সেই রাজ্যে আছে এক বিখ্যাত মন্দির। এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এক তীর্থক্ষেত্র। আশ-পাশের রাজ্য থেকে লোক ছুটে আসে তীর্থ করতে।

প্রতি বছর এই উপলক্ষে মেলা বসে। লোকে লোকারণ্য হয়ে ওঠে। মেলায় তিন মন্দিরের রথ টানা হয়। প্রকাণ্ড বড় রথ। এত বড় যে তিন চারটে হাতি টানতে পারে কি না সন্দেহ। রথের আছে মোটা মোটা রশি।

রথটা দোতলা। দোতলায় থাকে দেবমূর্তি আর নিচের তলায় নরসিং রাজ্যের রাণী বসে আশ্চর্য বাজনা বাজান। ভক্তরা তখন রথের রশি টানতে থাকে। রথ চলে, রাণীর বাজনা থাকে। ভক্তদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। কেউ কেউ শরীর থেকে মাংস কেটে রথের তলায় ফেলে দেয় মানত হিসাবে। কেউ কেউ ভক্তির প্রাবল্যে রথের চাকার তলায় প্রাণ বিসর্জন দেয়।—অবশ্য এই মৃত্যুকে পুণ্যস্নানের মৃত্যু বলে গণ্য করা হয়।

কিচের কথা

১৫৩৮ সালের ডিসেম্বর মাস। আমি তখন গোয়ায়। তখন আলেপ্পা থেকে আর্মাজ দীপে এলেন চারজন ইংরেজ। এরা এসেছেন ইংলণ্ড থেকে জীব্রালটার ঘুরে ত্রিপোলী পেরিয়ে আলেপ্পায়।

খুব বড় বাণিজ্যকেন্দ্র হল আলেপ্পা। ইংরেজ, ফরাসী, ইতালীয় তুর্কী প্রভৃতি নানা জাতের বণিক ভিড় করে থাকে আলেপ্পায়। এখান থেকে প্রতি বছর বহু দল বণিক আসেন ভারতে ব্যবসা করতে। আরব পারস্য প্রভৃতি দেশেও তারা যান।

এই ইংরেজ দলটাও বেরিয়ে পড়েছে। তিন জনের উদ্দেশ্য ছিল চাকরী করা। তাদের কোম্পানীর অধীনে তারা চাকরী পেতে পারে কি না এই কথা তারা জানতে চায়। কোম্পানীর ব্যবসা আছে আর্মাজে। এই তিন জনের একজন এর আগে আর একবার এসেছিলেন। বাণিজ্য সংক্রান্ত নানারকমের তথ্যও যোগাড় করেছেন।

যাই হোক, এই দলটার কাছে কাপড়, আফরাস, ছুরি নানা রকমের কাঁচ প্রভৃতি ছিল। এই সব জিনিষের দাম খুব কম নয়। কিন্তু এই দলের আসল উদ্দেশ্য ছিল অন্য রকম। তারা হীরে জহর, মুক্তা ইত্যাদি দামী দামী পাথর কিনতে চান। সেই জন্যে তাদের কাছে টাকাও ছিল প্রচুর। চুরি ডাকাতির ভয়ে এই টাকা তারা সব সময় লুকিয়ে রাখত। আর্মাজে তারা একখানা ছোট-খাট দোকান করে জিনিষপত্র সাজিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করে দিল।

ইতালির বণিকরা ইংরেজদের একেবারে সহ্য করতে পারত না। আবার, তারা দেখলে যে নূতন প্রতিদ্বন্দ্বী এসেছে তাই ইংরেজদের আর্মাজ থেকে তাড়াবার চেষ্টা তারা করতে থাকল।

আর্মাজের শাসনকর্তা তখন ডন গঞ্জালো ডি সিনিসিস। ইতালীয়রা শাসন কর্তার কান ভারী করে তুলল। তারা বললে যে ইংরেজরা ব্যবসাদার নয়; ওরা আসলে গুপ্তচর। ওরা বিদ্রোহী। ওদের পরীক্ষা করে দেখা দরকার। ওরা যাতে পালাতে না পারে তার জন্যে তাই কড়া পাহারা।

শাসনকর্তার তা মনে হয়নি। বরং তিনি ইংরেজদের ভালই বাসতেন। একজন ইংরেজ আবার শাসনকর্তার কাছে এসে নানা উপহার দিয়ে গেছে। তাই তিনি নিজে বুঁকি নিতে চাইলেন না। এই সময় একটা পর্তুগীজ জাহাজ যাচ্ছিল গোয়ায়। শাসনকর্তা ইংরেজদের সেই জাহাজে তুলে পাঠিয়ে দিলেন গোয়ায়। গোয়ায় আছে পর্তুগালের রাজ প্রতিনিধি। শাস্তি যা দিতে হয়, তিনিই দিন।

গোয়ায় পা দেবার পরে ইংরেজদের পাঠান হল জেল খানায়। এরা খৃস্টান কি না এই হল প্রথমে পরীক্ষার বিষয়। প্রমাণ হল যে এই বন্দীরা সবাই খৃস্টধর্মে

বিশ্বাসী। তবু এরা ত ইংরেজ! রাজ প্রতিনিধির সন্দেহ থেকেই গেল।

জিসুইট পাদ্রীরা রাজপ্রতিনিধিকে পরামর্শ দিলেন যে এদের এখানে বিচার না করে পর্তুগালে পাঠিয়ে দেওয়া ভাল আর ওদিকে তারা ইংরেজদের জিসুইট হওয়ার জন্য তাড়া দিতে থাকল। তার কারণও ছিল। পাদ্রীরা জানতে পেরেছিল যে ইংরেজদের কাছে আছে প্রচুর টাকা। জিসুইট হলেই এই টাকা ওদের হাতে এসে পড়বে।

কিন্তু ইংরেজরা জিসুইট হবে না কিছুতেই। বন্দীত্বও ঘুচল না তাদের। দলের মধ্যে একজন ছিল চিত্রকর। ব্যবসা করতে সে আসেনি। দেশ দেখাই তার ইচ্ছা। আর, সেও শুনেছে যে ভারতে চিত্রকরের বড় অভাব। তাই সে দলে মিশে ভারতে এসেছে। জেলে ভয়ে ও অভাবে সেই চিত্রকর অবশেষে ঠিক করল যে সে জিসুইট হবে। পাদ্রীরা খুশি। তবু মুক্তি হল না তার। পাদ্রীদের ধারণা চিত্রকরের দেখা দেখি সবাই হবে জিসুইট। কিন্তু তা হয় না। ওরা জেলে থাকে।

বন্দীরা কোথা থেকে শুনেছে যে প্রধান যাজকের বাড়ি কয়েকজন ওলন্দাজ থাকে। আমরা সেখানেই ছিলাম অবশ্য। ইংরেজেরা আমাদের কাছে এসে তাদের কাহিনী বলে। তারা যাতে মুক্তি পায় আমরা সেই চেষ্টা করি—এই ভাবে তারা আমাদের অনুরোধ জানাল। বললে যে তারা গুপ্তচর নয়, বণিক। যদি প্রমাণিত হয় যে তারা গুপ্তচর তবে যে কোন শাস্তি তারা মাথা পেতে নেবে।

কথাগুলো আমাদের অবিশ্বাস্য মনে হয়নি। আমরা প্রধান যাজকের কাছে ইংরেজদের মুক্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করলাম। আমাদের অনুরোধ যাজক ফেলতে পারেননি। তিনি সেনকালে রাজ-প্রতিনিধিকে মুক্তির জন্য অনুরোধ জানালেন।

মুক্তি তারা পেল। কিন্তু নজরবন্দী থাকল। কেউ তাদের হয়ে জামীনদার না হলে তারা গোয়া ছাড়তে পারবে না।—এই হল রাজ-প্রতিনিধির হুকুম।

জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তারা মালপত্র নিয়ে বিক্রি করতে সুরু করল। টাকা পয়সা এল। আমাদের সঙ্গে তাদের বন্ধুত্ব জমে উঠেছে। প্রধান যাজককে তারা সমীহ করে। এর সবটাই কৃতজ্ঞতা। কারণ আমাদের জন্যেই ওরা মুক্তি পেল।

ওরা প্রধান যাজককে অনেক উপহার দিত। কিন্তু যাজক তা নিতেন না। সত্যিই তিনি কখনও উপহার নেননি। আবার ইংরেজদের ধার্মিক আচরণে খুশি হয়েছিলেন প্রধান যাজক। কিন্তু অন্য পাদ্রীরা কিছুতেই ইংরেজদের সহ্য করতে পারত না। প্রতি পদে তাদের অপমান করা ছিল এই সব পাদ্রীদের কাজ ভাবে ভয় দেখাতেও তারা কসুর করত না।

অষ্ট প্রহর ভয়ের মধ্যে বাস করা অসহ্য। ইংরেজরা তাই বন্ধু বান্ধবদের সাহায্যে চীনে মুক্তো ইত্যাদি দামী পাথর কিনতে আরম্ভ করে দিল। উদ্দেশ্য একদিন সুযোগ মত অল্প জিনিষ নিয়ে গোয়া থেকে কেটে পড়বে। চীনে মুক্তো ইত্যাদি বেশী ভরে না, খরচ লাগও তাদের বেশি। এই ভাবে একদিন বন্ধু বান্ধবদের সাহায্যে গোয়া থেকে বাদেঁদ পৌঁছাল তারা। পাছে লোকে ইংরেজরা পালিয়েছে বলে সন্দেহ করে, তাই দোকানের জিনিষ দোকানেই পড়ে থাকল।

কিন্তু পালানোর খবর চাপা থাকে না। গোয়ার রাষ্ট্র হয়ে গেল যে ইংরেজরা পালিয়েছে। সবাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল।

এদিকে চিত্রকর জিসুইট ইংরেজ বিব্রত হল। আগে জিসুইটরা এই চিত্রকরকে খাতির করত। তার প্রতি নজর ছিল। অন্যায়ের ত্রুটি হত না। কিন্তু এই তিনজন ইংরেজ পালাবার পর জিসুইটরা বুঝল যে শিকার পালিয়েছে। তাই তারা আর চিত্রকরকে গ্রাহ্য করে না। বিরক্ত চিত্রকর জিসুইটদের সঙ্গে কথা বন্ধ করে, ওদের সঙ্গে সব সংস্রব ত্যাগ করে একজন খ্রীষ্টি কোনের মেয়েকে বিয়ে করে গোয়াতেই সাধারণ ব্যবসায়ীর হিসাবে থেকে গেল।

এর পর গোয়ায় আর কখনও ইংরেজ আসেনি।

[ক্রমশ :]

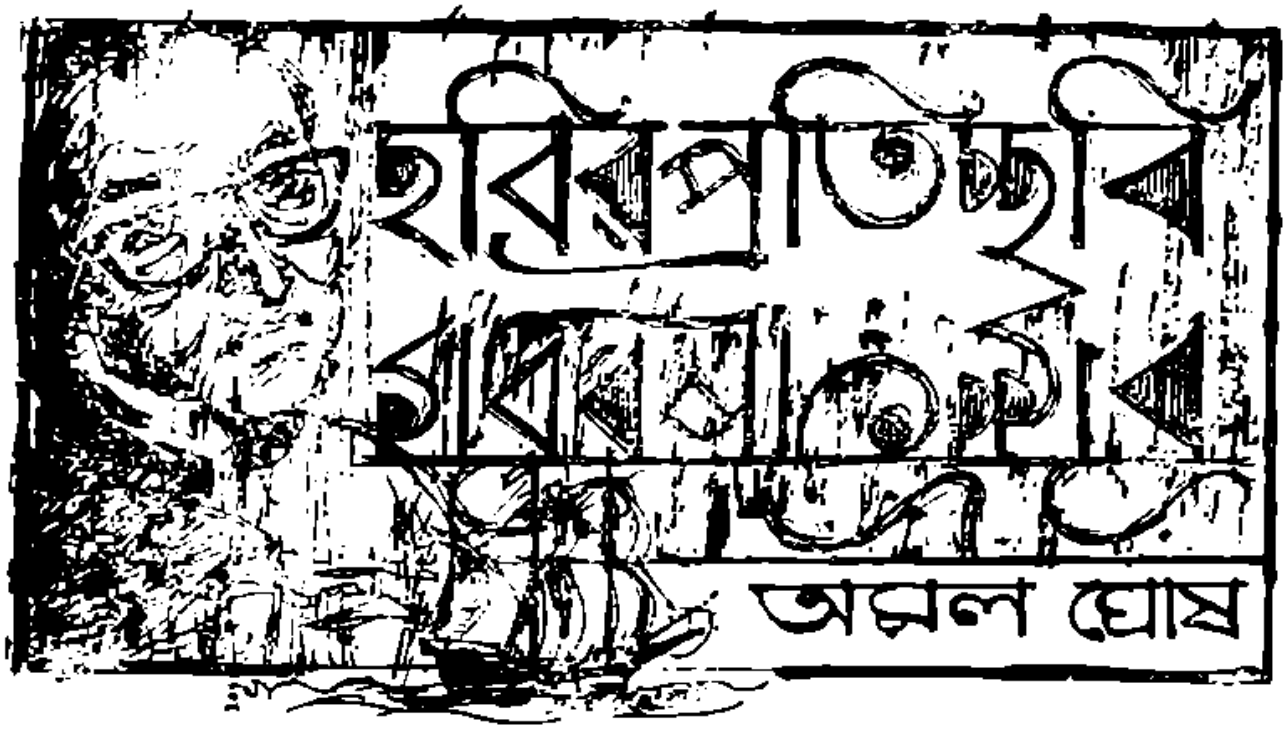

সুপ্রিয়—

সমুদ্র,

তোমার চিঠি পাওয়ার বেলা আমাকে অস্থির করে তুলেছে। এই ক'দিনের বেশ বড় রকমের চিঠি পেলাম। বারবার কয়েকবার পড়েও আশ মিটল না। একটুখানি অবসর পেলেই ভাবি কবে না জানি তোমার চিঠি পাব। মনেই যেন থাকে না—আমারও চিঠি দেওয়া দরকার।

সত্যি কথা বলতে কি তোমার চিঠি পেলে আমাদের ভুলে কর্মে ও ধর্মের এই পৃথিবীটার ক্রেদাক্ত পারিপার্শ্বিক থেকে যেন একটুখানি মুক্তি পেতে পারি।

কিন্তুই ত তোমার অজানা নয়। হাসিমুখে সারাদিন রাত এ সংসারে আমরা যে বেসাতি খেটে মরি—আমাদের হাসিমুখ দেখে যেন কেউ ভুল না করে, ঐ-হাসি আমাদের মনেরই হাসি। হাসিটুকু আমাদের মুখোস মাত্র।

একালে আমরা হাসব কি করে বলতে পার? পৃথিবীটাকে সংকীর্ণ করতে করতে বলের ধাপটে যেমন একদল মানুষ প্রায় মুঠোর মধ্যে এনে ফেলেছে—তেমনি আমাদের পৃথিবী বৃহত্তর মানব সমাজের কাছে একান্ত ভাবেই অপরিচিতজনের মত অজ্ঞাত রয়ে গেছে।

এই পৃথিবীতে আমরা যে কেনো বেঁচে আছি, কি উদ্দেশ্য আমাদের জীবনের, কেনই বা দিন রাত্রি ভূতের বেগার খেটে মরছি—আমাদের এ সকল প্রশ্নের উত্তর কে দেবে।

প্রাণে শান্তি নেই, বিশ্রামে ব্যাঘাত, জ্ঞানে ভেজাল, দৃষ্টিতে বৈকল্য, রসানুভূতিতে বিরাগ, কাপুরুষতায় অকৃপণতা, লোভে অস্বাভাবিক আসক্তি, ভোগে বিকৃতি, যৌবনে বার্ধক্য নিয়ে যে জীবন, তার অর্থ কি?

নিষ্ঠা ও বিশ্বাস গতিল করে উন্মাদিকতা ও বাহবার বেলুন ফুলে আমরা সব সুন্দরের মুখে নিজেদের বাতুলতার তুলিতে বীভৎস বিকার ফুটিয়ে তুলতে চাইছি।

আমাদের অজস্র অপগুণের বিজয় ধ্বজা তুলে আমরা কাপুরুষোচিত দম্ভে ক্লীবের উদ্দীপনায় বসন্তের জয়-গানের নামে কলঙ্কিত নোংরামীর বাহবার চীৎকারে নিজেদের মাংস ছিঁড়ে রক্তোৎসব জুড়ে দিয়েছি।

কেউ যদি আজ আস্পর্ধাভরে আমাদের নরকের পথ থেকে ফেরবার কথাটি বলে, আমরা বলদর্পীদের ইস্পিতে তার মাথাটি ধুলায় লুটিয়ে দিতে কুণ্ঠিত নই। আমরা

মাটি, কাঁদি, চাঁচি ছইলা আর খোটলায় জীবনকে সঁপে দিয়ে বাঁচাই করে রেখেছি—দুনিয়ার বলদর্পী যত অমুক আমার ভাই অমুক আমার বৈরী। যখন মনে সুবিধামত সম্বোধনটা জুৎসই ভাবে পালটাতে পারলেই পরমার্থ পাই।

রত্নাকর, গ্লানি ও ঘৃণাকে চিরকাল দূরে রেখে এসেছিলাম। এই যে এতক্ষণ আবোলতাবোল যা কিছু বললাম, এর এক বিন্দুও যদি অসত্য হয়, তুমি আমায় ঘৃণা কোরো। কিন্তু সত্য বলে, আশীর্বাদ দিও—গ্লানি ও ঘৃণাকে যুগে যুগান্তরে কখনো যেন বরণ করে না নিতে হয়।

ইতি—

তোমারই সমদুঃখিত

কল্যাণীয়—

সমদুঃ প্রিয়,

ঘৃণায় মরণ, ভালবাসায় জীবন!

বেঁচে থাকতে হলে, বন্ধু, ভালবাসতে হয়। কেউ ভালবাসে রূপ, কেউ বা গুণ। আবার কেউ ভালবাসে বিরাট ক্ষমতা, প্রচণ্ড প্রতাপ, কেউবা ভালবাসে ভোগকে, কেউ আবার ত্যাগকে সঁপে দেয় সর্বমনপ্রাণ। মোটের উপর মাটির পৃথিবীতে মানুষের দোষগুণের একটা কিছুকে ভাল-না-বেসে পরিত্রাণ নেই। মানুষের মধ্যে যারা শেষকথাটী তারা খুঁজে ফেরে অন্ধকার। আর যারা দুঃখের আরো কাছে পৌঁছুতে চায় তাদের জীবন সাধনার লক্ষ্য হয়, আলো আরো আলো!

জ্ঞানের আলো, আবিষ্কারের আলো, সৃষ্টির আলো—আরো কত কত আশ্চর্য সুন্দর আলোক বন্যা সারা পৃথিবীতে অফুরন্ত ছড়িয়ে আছে। ঐ আলোকে আয়ত্ত করে যতের মানুষের ঘরে ঘরে অক্লান্তভাবে বিলিয়ে দেবার অলৌকিক আনন্দভারে যাদের হৃদয় ঐশ্বর্যময়, ত্রিভুবনে তাদের সংখ্যা একান্তে নগণ্য হলেও তারা চির দুর্লভ কখনই নয়।

তাই বন্ধু, আমার মনে হয়, পৃথিবীর দুর্দশা দেখে বিমর্ষ হবার কিছু নেই। এই যতের মাটিতে আগামীতে এমন একদিন আসবে, যেদিন অভিনব সৃষ্টির পুলকে তোমার যত মন মধুমাসের পুষ্পহাসে হেসে উঠবে।

তার আগে অতীতের পাতাগুলো একবার উল্টে দেখতে বাধা কি?

ইতি—

তোমার সমদুঃ,

সুপ্রিয়—

সমদুঃ,

এ কদিন খুবই ব্যস্ত ছিলাম। নাভিশ্বাস ফেলবার সময় ছিল না। তার উপরি যে গরম। তোমার তটভূমিতে একদিন গিয়ে বসেছিলাম। সেখানেও এর আটকানো পরিবেশ দেখে বেশীক্ষণ থাকতে পারিনি।

আমার সঙ্গের বন্ধুটি প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন অত্যাধুনিক হলিউডকে লজ্জা দেওয়া একটি নারীর দিকে। তার অল্প সজ্জা নগ্নতাকে ও লজ্জা দেয়। সে কেবল একলাই নয়, চোখ ফেরাতেই দেখি চারদিকে ঐ নারীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রতিযোগিতায় কে কাকে ছাড়িয়ে যাবে তারই বিপুল আয়োজনে ব্যস্ত।

নগ্নতা বলতে তুমি আবার ভেবোনা যেন তাদের অঙ্গে পোষাক পরিচ্ছদের নাম মাত্রও ছিল না। বরং যে-পোষাকী নগ্নতায় তারা দাপ্তা লাগিয়ে দিয়েছিল সভ্যতাকে লজ্জা দিতে, তার তুলনা মেলা ভার।

শুধু কি নারী! ইউরোপ আমেরিকার সর্বশেষ মডেলের মোটর গাড়ী থেকে নেমে যে নরবৃন্দ আমাদের পুরাণে বর্ণিত পার্বতী নন্দনের বৃহদাকার ভুঁড়িকে অবহেলায় টেক্কা দিয়ে মিস্তু মাতলের মত হেলতে দুলতে যতই পূর্বোক্ত নারীদের কাছে আসছে ততই চিত্তবিকারের উত্তেজনায় বার বার বিশৃঙ্খল অঙ্গভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গে লোলুপ লালসায় লালায়িত জিহ্বা লেহনে সমস্ত সুশ্রীতাকে সুতীব্র বিদ্রূপে তারা বিদ্ধ করছে।

বন্ধুবর বললেন কুরুচির-ও একটা সীমা থাকে বলে জানতাম, এখন দেখছি, অত্যাধুনিকতা কুশ্রীতার সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে, চলো এবারে অন্য কোথাও—

"হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনোখানে।"

ফেরার পথে তখন মনের মধ্যেয় মানুষটি কেমন যেন হয়ে গেছল। বারবার তাকে দিক-দিগন্তরে হারিয়ে

হাওয়ার পাখীর পাখা দিয়ে তেই আকাশের নানারংগের মুক্তাংশুনের দিকে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করছিলাম, ততবারই চোখের পলকে নগ্ন কুশ্রীতার স্পর্শে সে বিপর্যস্ত হয়ে ফিরে আসছিল ভয় ভয়ে। কোনো বিস্তৃত সুশ্রীতার শান্ত পরিবেশে এইক্ষণে নিঃশ্বাসে একটু বিশ্রাম পেলে হয়ত মনের ভারসাম্য ফিরে লাভ করত। কিন্তু, সারা পৃথিবীর নিঃসঙ্গতা একালে মানসিক কুশ্রীতায় বিপর্যস্ত পর্যুদস্ত হইতে নয়।

বন্ধুবরের মানসিক অবস্থাও তেমন কিছু ভাল ছিল বিকৃত বিলাসের দর্শনে লালসার হিংস্রতা কথার আঘাতে তার মন বিক্ষত হওয়ায় সেও পরিত্রাণের পথ খুঁজছিল।

তাই একসময় যে যার পথে যার যার মতো প্রস্থান না করে উপায় ছিল না।

ঘরে ফিরে মুখোমুখি হয়ে গেল বনহুর গুপ্তর সংগে। এ সময়ে ইনি কখনো আসেন না। এ সময়ে কেন, প্রায় কখনই আসেন না তিনি। কেনই বা আসবেন? তেরটা কারখানার মালিক। সম্প্রতি আবার এক চোট্টিয়ার সহযোগিতায় মশক দমনের তেল বিদেশ থেকে আমদানী করার লাইসেন্স পেয়েছেন। তাছাড়া গণতান্ত্রিক মন্ত্রীদের সংগে গুপ্তজীর চলন মহলম সকলেরই জানা আছে। গুপ্তজীর মুখেই শোনা পর পর কয়েকবার তাকে বিদেশে দূতালীর জন্য মনোনয়নের প্রস্তাব ছাড়াও প্রদেশপাল হবার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছে, কারণ হিসেবে তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন, দেখুন ব্যবসা বাণিজ্যে যত পয়সা আছে, যে রকম ক্ষমতার কলকাটি ইচ্ছে মত নাড়া ছাড়ার সুযোগ হয়েছে; দূত কিংবা প্রদেশপালের ক্ষমতা তেমন কি আর! বিদেশে শীত গ্রীষ্মে দিনরাত কেবল পোর্টে আর এয়ারপোর্টে প্রোটকল অনুসরণ করা ছাড়া দূতের আবার কাজটা কি!

গুপ্তজীর যুক্তি শুনে 'ঁ' বনে গেছি। অথচ এ কথা কি কল্পনা করতে পেরেছি, সেই গুপ্তজী এমন অযাচিতভাবে আমারই দোরগোড়ায় এসে অপেক্ষা করবেন।

কি খবর গুপ্তজী?

এমনি এলাম।

রহস্যের হাসি হেসে বলি, এমনি আসবার লোক কিনা আপনি!

তা যা বলেছেন, গুপ্তজী হো হো পড়ার অবস্থায় বিচিত্র হাসিতে বললেন, একটা বিরাট পরিকল্পনা নিয়ে এসেছি। আপনি ত সকল সময় লেখা নিয়েই ব্যস্ত। তাই বেশী সময় নেবনা, সংক্ষেপে বললে হবে ত।

নিশ্চয়।

একটা বিরাট এলাহি কাণ্ড আরম্ভ করব ভাবছি। কাউকে বলবেন না যেন, গুপ্তজী মুখের হাসি পেটের মধ্যে টেনে নিয়ে গুরুগম্ভীরভাবে বলতে লাগলেন, পরিকল্পনা, পরিকল্পনা, শুধু পরিকল্পনা—রূপান্তরের মধ্য দিয়ে আমাদের অনগ্রসর দেশটাকে পৃথিবীর সবচেয়ে অগ্রণী দেশগুলোর পুরোভাগে পৌঁছবার পথে টেনে নিয়ে যেতে হবে। তার জন্যে আপনার মতন মানুষের মদত চাই।

গুপ্তজীকে থামিয়ে দিয়ে করজোড়ে নিবেদন করলাম অজ্ঞাতজনের প্রতি মহাজনের এত দয়া, এ-ভার বইবার শক্তি থাকলে কি আর কথা ছিল। কমপক্ষে কবেপাসের মতন গবেষণার স্কলারশিপটাও মিলে যেত।

বিনয়ের বৈফল্যহীনতার দেখে গুপ্তজী বলে উঠলেন, কি যে বলেন! আপনি চাইলে কয়েকটা স্কলারশিপ পেতে পারেন, তা কি আর জানি না। সে কথা থাক, এখন কথা দিন, আমার পরিকল্পনায় থাকবেন কিনা?

এহেন নাছোড়বান্দা গুপ্তজীর হাত থেকে প্রতিবারে পরিত্রাণ নেই জেনে বললাম, পরিকল্পনাটা কি সেটাই আগে না হয় শুনি।

গুপ্তজীর মুখে এবারে হাসি ফুটল, সোৎসাহে অথচ অনুচ্চকণ্ঠে তিনি তার বিশাল পরিকল্পনার কথা বলতে উদগ্রীব হয়ে উঠলেন।

রহস্যভরা কণ্ঠে গুপ্তজী বলতে লাগলেন, আপনি ত জানেন, মা ষষ্ঠীর কৃপা আমার প্রতি মা'লক্ষ্মীর চেয়ে তেমন কিছু কম নয়। তাই পাঁচ পাঁচটি কন্যারত্ন আর মাত্র আর ডজন তীরের টুকরো পুত্র নিয়েও আবার সংসারে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের নীতি শিক্ষার বালাই নেই। থাকবার প্রয়োজনটাই বা কি। কন্যারত্নের

খুঁজে পেতে এখন সব পা ত্র ছাড়ে সহযোগিতা করেছি, যাদের দেহভার মাথার ভারকে অনেক গুণে ছাড়িয়ে গেছে। কাজেই কারখানার কারখানায় তাদের যেমন উল্লাসে বিচিত্র ম্যানেজারের পদে বহাল করে দিয়েছি তারাও তেমনি বিপুল উচ্ছৃঙ্খলতায় বিকট আনন্দে লক্ষ্মীর আশীর্বাদকে সহস্রবাহু কার্তবীর্যার্জুনের মত উৎপাটন করে চলেছে। আমার একটুও আপত্তি নেই তাতে। যারা আপনি তুলে না খোকেন, সেই জন্যে বিচিত্র উচ্ছৃঙ্খলতার সঙ্গে সঙ্গে "উড়িয়ে দেওয়া" না-বলে—বলছি, উৎপাটন। সাধারণ অনুমানে ধরতে পাচ্ছেন নিশ্চয়। আসলে আমাদের কারখানার ত আর মার নেই। ফলে পরাক্রমে বিদেশীদের তাড়িয়ে এখন স্বদেশের স্বদেশী মালিকানায় সতেজ বিদেশী বাজারকে ত তাড়াতে হবে। আর প্রয়োজন যখন রয়েছে, তখন নেই মামার চেয়ে কানামামার মত; যা মেলে নির্বিচারে তাই না-মিলে কে কতদিন পারবে বলুন।

কাজেই তেরটি কারখানার দুর্দিন ফুরোতে তেরশ বছর না লাগুক, একশ বছর ত লাগবেই। তারপর দুঃসময় যদি আসেই তখন গুণের বিচার, নীতিগত ব্যবসা, অর্থনৈতিক সুনীতি দুর্নীতির বিচার, আত্মার শুদ্ধি নিয়ে লাভ লোকসান অভিনব এক আন্দোলন পরমানন্দে গড়ে তোলা যাবে।

আমার চাঁদের টুকরো পুত্রগণ নিশ্চিন্ত ভরসায় আছে, অশেষ চেষ্টা করেও আমার তেরটা কারখানার অত্যধিক মুনাফার অংকটাকে জীবন সেলে-ও নিঃশেষ করতে পারবে না।

একটুখানি চিন্তায় কুঞ্চিত কপালেও গুপ্তজীর বুদ্ধির দীপ্তি পদ্ম পাতায় শিশিরের মত টলমল করছে।

তিনি বলে চলেছেন—গলার স্বর একান্ত গোপন কথা বলার আবেগে ভরপুর তার। তিনি বলছেন, কথার কথা নয়, এমন একটা বিরাট মহাকাণ্ডের পরিকল্পনায় ডুবে যেতে চাইছি, যার কল্পনাতেও অনাস্বাদনীয় আনন্দ। কি ভাবছি জানেন, আমাকে উত্তর দেবার সুযোগ না দিয়ে গুপ্তজী বলে উঠেন, ভারত মহাসাগরের অজানা এক দ্বীপের সন্ধান দিয়েছে আমাদের একজন গুপ্তচর। সেখানে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে মহাদেহ তলে অগাধ ধনভাণ্ডারের নিরাপত্তার জন্যে এক সুবিশাল গুপ্ত গুহাগার গড়ে তুলে পৃথিবীর সবচেয়ে বিশাল বিত্তবানদের ধনপতি ঐশ্বর্য আকর্ষণ করে অদূর ভবিষ্যতে বিশ্ববিখ্যাত হতে চাই আমি।

বাধা দিয়ে বলি, গুপ্তজী বিপুল বিত্তবানদের ধনপতি ঐশ্বর্য আকর্ষণ করবেন কেমন করে?

বলার আবেগে অকস্মাৎ বাধা পড়ায় গুপ্তজী একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে উঠেন, এই না হলে লেখককে অর্বাচীন বলি সাধে। আগে না হয় কল্পনাটাই শুনুন—না শুনেই অধৈর্য কেন।

মনে মনে বিরক্ত হলেও চেপে যাই। সত্যিই ত এমন কথা শুনতে কেনই বা অধৈর্য হওয়া। বিদ্যাকে পড়ে বুদ্ধিমান যেমন বোকাদের মুখের হাসি সঙ্গীর রাখতে চেষ্টা করি, ঠিক তেমনি আমিও ধার করা হাসি হাসতে অনুরোধ জানাই, থামলেন কেন বলুন না গুপ্তজী।

অনুরোধের ছাওয়ায় গুপ্তজীর মনের আবেগে অকস্মাৎ এক বিপুল নাড়া লেগে। তিনি আক্ষেপ হাসিতে বলতে লাগেন, পৃথিবীতে পারমাণবিক প্রলয় হয়ত ঘটবে, নয়ত ঘটবে না। কিন্তু পারমাণবিক প্রলয়ের আশংকায় আমরা অনেকেই যে ভীতগ্রস্ত, এ কথা ও মিথ্যে নয়! তা ছাড়া পরে পস্তানোর চেয়ে আগে থাকতে সতর্ক হওয়া অনেক ভাল জেনে কলতের জিলেল যত "জনবুল থার "জগৎশেঠে"র দল স্বাই এগিয়ে আসবে ভারত মহাসাগরের পাতাল তলে গুপ্ত যোগাযোগে তাদের ধনপতি ঐশ্বর্য নিরাপদে সংরক্ষণ করতে। মাত্র একবার কোনো যোগী মুখে দেশ বিদেশের বিত্তবানদের কানে গুপ্ত ধনসংরক্ষণাগারের সংবাদটা ছড়িয়ে দিতে পারলেই হলো। আপনি আবার বোকার মত বাধা দিয়ে বলে বসবেন না যেন, যোগীমুখে কে কবে জগতের দিকে দুটি চোখ খুলে দৃষ্টিসুখ তাকাতে পারে সেই জানে যোগীমুখে সত্যই বটে! তা ছাড়া আমাদের ধন বিতরণে কিসের কার না জানা!

বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে ধনপতি গুপ্তের দিকে তাকাতে গিয়ে অজ্ঞাত এক প্রচণ্ড আঘাতে দৃষ্টিহীনের মত হয়ে

গেলাম। তবু জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না, গুপ্তজী আপনার পরমাণবিক পরিকল্পনার পরিবর্তনে আমার উপস্থিতির অত্যাবশ্যকতা ত দেখতে পাচ্ছি না।

গুপ্তজী উদ্দাম হাসিতে আশেপাশের স্তব্ধতা বিচূর্ণ করে অসীম উল্লাসে হঠাৎ উন্মত্ত হয়ে উঠলেন যেন। এক সময় ঐ হাসির শেষ রেশটুকু মিলিয়ে যেতে তিনি পরিকল্পনার গুরুত্বানুরূপ গাম্ভীর্যে বললেন, আপনাকে আমার বড়ই প্রয়োজন। যেন বলতে কইতে পারেন, আপনাকে যোগী হতেই হবে। কেবল প্রয়োজন বুঝে বাক্‌সংযম অবলম্বন করলেই দারা পৃথিবী আপনার এই পরিকল্পনা সম্রাট ধনরত্ন গুপ্তের গুপ্ত-ধনাগারে লেখাপড়া না নিয়ে যাবে কোথায়! বলতে বলতে গুপ্তজীর চোখ দুটি বিষাক্ততম সাপের জিবের মত লক্‌ লক্‌ করতে লাগলো। আমি ঐ দৃষ্টির সম্মুখে আর সামান্যক্ষণ থাকলে পাছে অসুস্থ হয়ে পড়ি, সেই আশংকায় ভীত কণ্ঠে জানালাম, গুপ্তজী আমায় ক্ষমা করতে হবে। আমি যা নই, তার অভিনয়ে অক্ষম জেনে আমায় অপরাধ নেবেন না।

অতৃপ্তির জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে গুপ্তজী উঠবার মুখে বললেন, দায়ে কি আপনার লক্ষ্মীভাগ্যে এত দুর্গতি। তিনি আর বাক্য ব্যয় না করে সম্ভবতঃ অভিনেতা যোগীর সন্ধানে ছুটলেন।

সেই থেকে কেমন যেন অদ্ভুত অসুস্থতায় ভুগছি। জানি না, কবে আমার পরিপূর্ণ সুস্বাস্থ্য ফিরে পাব, তার আগে তোমায় এমন এক চিঠি চাই, যার জ্যোতিতে আমার সর্বদেহের অনুপরমাণু নিশ্চিন্ত নীরোগ হবে।

ইতি—

তোমারই সুবুদ্ধিপ্রিয়

পরমকল্যাণীয়

সুবুদ্ধিপ্রিয়,

সেদিন পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জায় সুসজ্জিত হয়ে আণবিক শক্তিচালিত একখানি অসীম শক্তিশালী ডুবোজাহাজ আমার বুকে শক্তি পরীক্ষায় উদ্যত হয়ে ভাব দেবার পর অস্বাভাবিক আকস্মিকতায় নিজের সুস্থ ভারে অতল জল তলে আত্মনিমজ্জন করেছে। ঐ আণবিক ডুবো জাহাজের গর্ভে উৎকট ক্ষমতাদম্ভী শক্তিমানদের যে সকল পরিচিতি নিজেদের ক্ষমতাজাল পাতাল দেশে বিস্তার করবার নিমিত্তে ছিল তারা কোনদিনই আর পৃথিবীর আলো দেখতে পাবে না। ঐ সকল দুর্ভাগাদের জন্য এসো, বন্ধু, আমরা অল্পকাল চোখের জলে অনুশোচনার নিবিয়ে দেই। কারণ আমাদের আর কিছু করার যে ক্ষমতা নেই আপাততঃ।

তরুণ বন্ধু, শঠতা ও চতুরতার জাল পৃথিবীর একদল মানুষ আরো পাতালতর বিস্তার করতে চাইছে। তাদের দুরভিসন্ধির নির্বাক নিষ্ঠুর সাক্ষী থেকে থাকি,—তুমি, আমি, আমাদের মত আরো কটি কোটি প্রাণী। আমি অবশ্যি সন্তান, সদ্যতন সাক্ষীর কথাই বলছি, অজ্ঞান, অচেতন কোটি কোটি আরো সাক্ষীর সম্মুখে যে পরমাণবিক শক্তির রহস্য উদ্ঘাটনের নামে অতিমানবীয় দাঁড়ার ফট পাকানো হচ্ছে—তার যাঁরা নটের গুরু তাঁরা দুই অতিমানব মহা অতিমানব সৎ ও ভাল মানুষের বেশে এমন নিখুঁত অভিনয় করে চলেছেন—যে অভিনয়ের দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে কোটি কোটি মন্বন্তর নতুন জন্ম নিতেই কেবল বাকিমাত্র। সুতরাং আমাদের চোখের জল ফেলা ছাড়া আর ত উপায় দেখি না।

তবুও বন্ধু, মধ্যে মধ্যে মনে হয়, প্রলয় গর্জনে গর্জে উঠে যখনি ভাঙতে দেওয়া ভয়ঙ্কর শক্তিমানদের টুঁটি চেপে ধরে বলি, নিজের জালে একদিন এমন ভাবে জড়াবে তোমরা, সেই আপৎকালে আপন আপন প্রাণ বাঁচাতে প্রাণান্ত চেষ্টাও পথ পাবে না।

কিন্তু, কি ক্ষমতা আছে আমার। অত্যধিক জ্বালায় জর্জরিত হয়ে অতীতে একদিন আমিই না ভাস্কোডা-গামাকে আমার বুকের উপরে তোলোবার আর তোপের আস্ফালনের সঙ্গে অকথ্য অনাছায় উৎপীড়নের নারকীয় লীলায় মাতবার সুযোগ দিয়েছিলাম। সেই যে সভ্যতার সর্বাঙ্গে ঐশ্বরাচারী শক্তির নবরূপের উদ্ঘাটন, তারপর থেকে তারই স্বরূপ রূপে যুগে যুগে শতাব্দীতে শতাব্দীতে জটিলতর রূপান্তরের মধ্য দিয়ে সমগ্র পৃথিবীতে আত্ম-প্রকাশে অধীর! এ যেন এক অবিশ্বাস্য কাহিনী, যে-কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু যন্ত্রার বীজাণুর মত ভয়ঙ্কর কুৎসিৎ ক্ষমতা লোলুপতার গূঢ়তম রহস্যের জটিলতর ধাঁধার ঘেরা।

আজ আর কথা নয় বন্ধু ! আজ শুধু অব্যক্ত বেদনার গভীর স্তব্ধতার উপলব্ধি !

ইতি—

তোমারই সমুদ্র ।

সুপ্রিয়—

সমুদ্র,

অনেক দুঃখে অনেক কেঁদে কেঁদে কত যুগ যুগান্তরে বেদনার চোখের জলে তোমার বুকের জল নোনা হয়ে গেছে। একালে আমার মত মানুষের চোখের জল ঝরতে ঝরতে চোখ এখন যেন পাথর। খুব বেশী জ্বালা যন্ত্রণায়, শক্তি মত্তের অবিবেকী হামলায় আজকাল ঐ পাথরের গা বেয়ে যে বস্তু গড়ায়, সেই বুঝি সভ্যতার চিতাভস্ম।

কি নিদারুণ দহনে দহনে মানুষের আত্মা ও মন ভস্ম হয়ে গেলো, কারো কি সুযোগ হল না একবার ফিরে তাকিয়ে নিষ্ঠুর দহন জ্বালার প্লাবন হামলাকে রুখে দাঁড়াবার ?

সভ্যতার চিতা ভস্ম হয়েও জ্বালা যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ ত পেলাম না। কোথায় ডুবো জাহাজ ডুবি হলো, কোথায় চন্দ্রগামী আণবিক যান পথ হারালো, কোথায় কোন স্বর্গকার জীবিকা হারিয়ে পথে ভাজা ভাজা কেরী করতে করতে ক্লান্ত পদে ভাতা রোদে মুখ থুবড়ে পড়ে আর মুখ তুলল না, কোথায় কোন ধর্মগুরু অভিনব নীতির অভিশাপে প্রতিবেশীর ভালো অসম্মানের কালো তিলক এঁকে দিলো—এ সবে ভূমের কেন চিত্তবিচলিত হবে ? তবু হয়—বোবার যেমন স্বপ্ন দেখে, হাবার যেমন কাঁদে, কাণার যেমন আলো খুঁজে মরে তেমনি মানবিক বেদনায় সভ্যতার ভস্মরাশি অশ্রু বিসর্জন না করে যে পারে না।

সমুদ্র,

তুমি আমার পরমপ্রিয় ভাই তোমার কাছে মন খুলে সকল কথাই বলি। পৃথিবীতে যেদিন সভ্যতার ভস্মরাশি আর থাকবে না, বেদনার আঘাতে পাথর হয়ে যাওয়া চোখগুলো যখন সভ্য নামে, সভ্যতা ও মানবতা, সৃষ্টি ও সুন্দরের প্রতি অবমাননার জ্বালা-যন্ত্রণা আর অনুভব করবে না—তখনই পৃথিবীর অন্তিম দিন ঘনিয়ে আসবে। সেদিন আসবার আগে আমরা

অগ্রণী হতে পেরলাম না বই।

এবারে বলো শুনি তোমার সেই অবিশ্বাস্য কাহিনী—

তোমারই—

সমুপ্রিয়

পরম কল্যাণীয়,

পর্তুগালের রাজা জনকে তোমার হয়ত মনে আছে। তাঁর উদ্দেশ্য প্রায় সফল হয় হয়, এমন সময় প্রতিবেশী স্পেনের সঙ্গে দেখতে দেখতে সংঘর্ষ বেধে উঠল। একে প্রতিবেশী, তায় উভয়েই চায় সাগরের পৃথিবীর উপরে প্রকাণ্ড এক সাম্রাজ্য বিস্তার করতে। কাজেই সংঘর্ষটা চরম প্রাণঘাতী সংগ্রামে রূপ নিতে বেশী দিন লাগেনি।

তারপর, বাধানো যেমন সোজা, থামানো তেমনি কঠিন। একবার যুদ্ধ লাগলে সে আর থামতেই চায়না। এ যেন দাবানল, যত জ্বালে তত বাড়ে ক্ষুধা। মানুষ মরে, সংসারে হাহাকার পড়ে যায়, বিধবা যুবতী স্ত্রী মৃত স্বামীর শোক বিহ্বলপ্রায়—তারই পাশে বীরজননী অঙ্গের অলঙ্কার খুলে দিয়ে আহ্বান জানায়, এগিয়ে যাও। ক্রমে একদিন রাজকোষ শূন্য হয়, তরুণ যৌবনের তরঙ্গ নিঃশেষিতপ্রায়—এরই পর জাতির জীবনে অমানিশা ঘনিয়ে আসার অশুভ লগ্নে সন্ধি হয়—এ সন্ধির লাভ লোকসান হারজিতের হিসাবের খাতায় মানুষের নিদারুণ মূর্খতার ইতিবৃত্তে রচিত বই ত নয় !

দেখ দেখি বন্ধু, কোথা অন্য সব কথা ভুলে এক নিশ্বাসে বলে চলেছি ইতিবৃত্তের এক অধ্যায় যা ফেরী করে ফেরা আমার তোমার কাজ নয়।

কিন্তু কথা আরম্ভ করলে কথা না-ফুরিয়ে থামি কেমন করে ! অফুরন্ত কথার সংকোচে ত্রিভুবন আজকাল যখন গম গম করে তখন অতীত দিনের কথা অকারণে উজাড় করতে কৃপণতা না-থাকাই ভাল।

যে কাহিনী বলছিলাম, স্পেনের সঙ্গে নিদারুণ সংগ্রামে পর্তুগালকে ভীষণ ভাবে পর্যুদস্ত হতে হয়েছিল। রাজা জন প্রবীণ বয়সে এত প্রচণ্ড ধাক্কা সামলে নিতে পারবেন কিনা, অনেকেরই সন্দেহ ছিলো। তবে ঝানো লোক সহজে নিস্তেজ হতে চায় না। দীপ নিবিবার আগে শেষবারের মত যেমন শেষ জ্বালা জ্বলে উঠে—রাজা জনও

বহু কাল ধরে একটি সুখের ঘর [illegible] কলম্বসকে দেশের দেশে ভাসিয়ে তার চারপাশের পথ খুঁজতে পাঠিয়েছিল, নেহাৎ প্রতিবেশী পর্তুগালের উপরে একান্ত নেহাৎ ঈর্ষা না থাকলে সমুদ্রে ইসাবেলা কখনই নারীর প্রাণপুরুষ [illegible] অন্যদিকে বিরুদ্ধে ওরে কলম্বসের বন্দর যোগাতে প্রস্তুতে আসতেন না। তরুণী যৌবনস্পৃহা সম্রাজ্ঞীর পক্ষে সাম্রাজ্য বিস্তারের দুরাশায় সেতুরে অগ্রসর [illegible] ওরা সহজ হয়েছিল, যৌবনবিরক্ত পরোপেক্ষ রাজা জনের পক্ষে তেমনটা সহজ না হওয়াই স্বাভাবিক।

সফলতার কয়েক বছর পর
মনে হয় পর্তুগালের
বন্দরগুলো,
জানা,

কিন্তু এক জায়গাতে রাজা জন থেকে যেতেন। যাদের বল ভাষা শ্যাম রাখু মধু, আমরা যাদের বলি ইম ভিক-টোরী সবাই সমান। আসলে প্রতিবেশীর প্রতিষ্ঠা চেহারেই পা ছি ছি করে না, এমন মহামানব মর্ত্যলোকে মেলা ভার। তাই, যেই না স্পেনের পক্ষ থেকে কলম্বসের বিজয় অভিযানের [illegible] এতটুকুনি মাত্রা ছাড়িয়ে

পর্তুগালের কানে এসে পৌঁছুল. অমনি সারা দেশের সঙ্গে স্বয়ং রাজা জন প্রদীপ্ত হয়ে উঠলেন। বার বার মনে হতে লাগলো, কি মারাত্মক ভুলই না হয়ে গেছে। পরক্ষণেই রাজা জন ভাবলেন, এভাবে পর্তুগালের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নেবার অধিকার স্পেনের কেন সমাগরা পৃথিবীতে কারো নেই।

ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা সঞ্চার হতে থাকায় বৃদ্ধ রাজা জন যৌবনের পুনঃস্পর্শে যেন নতুন মানুষ হয়ে উঠলেন। স্বদেশের সৌভাগ্য লক্ষ্মীকে ভারতবর্ষের স্বর্ণ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠার অর্ধ-সমাপ্ত প্রচেষ্টাকে তিনি পরিপূর্ণ সাফল্যের জয়মাল্যে বিভূষিত করবার জন্যে সর্বস্ব পণ করে এগিয়ে যাবেন বলে স্থির করলেন।

ইতিমধ্যে পর্তুগালের অরণ্যে মহামহীরুহদের সন্ধানে লোক পাঠিয়েছিলেন রাজা জন। রাজনির্দেশ ছিল; এমন মহীরুহ সংগ্রহ করে আনতে হবে যাদের পরিবহন ক্ষমতা অসীম। যাদের সমুদ্রের ঢেউ কেটে চলবার শক্তি সব চেয়ে বেশী।

কলম্বসকে নিয়ে স্পেনের ঘাতামাতি কেমন যেন ঘিরে আসছিলো। অনেকের মনেই কেমন খানিকটা সন্দেহ—কলম্বস যদি পশ্চিম সমুদ্র পথে সোনার ভারতেই পৌঁছে থাকবেন. তাহলে তাঁর সঙ্গে পৃথিবীর সেরা সম্পদশালী রাজা মহারাজার সাক্ষাৎ হলো না কেনো? কেনই বা ভারতের সভ্য মানুষদের সম্বন্ধে তিনি সঠিক কোনো সংবাদ সংগ্রহ করে আনতে পারলেন না? তাহলে কি কলম্বস আদপেই ভারতবর্ষের জল-খুঁজে পাননি।

পেলেই বা—আফ্রিকার সমুদ্র পথে প্রাচ্যের স্বর্ণ-ভূমিতে পৌঁছুবার পথ আবিষ্কার অসম্ভব নাও ত হতে পারে। সুতরাং পর্তুগালের নূতনতর প্রচেষ্টা পুরোদমেই আরম্ভ হয়ে গেছুলো।

অরণ্যের বৃক্ষ সম্রাটদের সুবিশাল দেহ রাজধানীর অদূরে স্তূপীকৃত করা হলো এমন সময় বৃদ্ধ রাজা জনের এমন জগৎ থেকে ডাক এলো, যে ডাকে সাড়া না দেওয়া সম্রাটেরও অসাধ্য। আর একবারটি সাড়া দিলে জীবনে কখনো পৃথিবীর বুকে পুনরায় চোখ মেলা অসম্ভব।

সমুদ্রের জোয়ার ভাটার মত রাজা যা রাজা আসে। পৃথিবী কারে জন্যে ত আর বসে থাকে না। পর্তুগালের বয়োবৃদ্ধ সর্বজনপ্রিয় রাজা জনের মৃত্যুতেও জগৎ যেমন ছিলো, তেমনি চলতে লাগলো। কেবল যারা ভেবেছিল, জনের পরে পর্তুগালের প্রাচ্যের জলপথ আবিষ্কারের প্রচেষ্টায় ভাটা নামবে তাদের সকল ভাবনাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করে নতুন ও তরুণ রাজা ইমানুয়েল সিংহাসনে বসেই সাজ সাজ রব তুলে দিলেন। দশ দিকে দ্বিগুণ উদ্যমে সমুদ্র অভিযানের তোড়জোড় লেগে গেলো। এক দিকে জাহাজ তৈরীর ধুমধাম, অন্যদিকে নবীন রাজা ইমানুয়েলের রাত দিন নৌ অভিযানের চরম সাফল্যের জন্য বিরামবিহীন প্রস্তুতির ব্যস্ততা। যেমন বয়সে তরুণ তেমনি উচ্চাভিলাষে অনন্য রাজা ইমানুয়েল তাঁর স্বদেশের সুদীর্ঘ কালের মনোবাঞ্ছা সফল করতে এতদিনে এমন আয়োজন করতে চাইলেন যার কল্যাণে সাফল্য হবে সুনিশ্চিত।

পূর্ববর্তীদের অভিজ্ঞতা থেকে প্রতিটি তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহ করে নবীন রাজা অভিযানের পরিকল্পনাকে রীতিমত নিখুঁত ভাবে গড়ে তুলবার সংকল্প করলেন। আগের আগের বারে যেসকল নাবিকেরা অভিযানে বেরিয়েছিলো তাদের মধ্যে থেকে প্রকৃত নৌবীরদের ডাকিয়ে এনে তিনি অভিযানের যতরকমের প্রতিবন্ধক, সম্ভব অসম্ভব সকল কিছুই জেনে নিলেন। তৎপরি আফ্রিকার সমুদ্রপথের উত্তমাশা অন্তরীপ পর্যন্ত পর্তুগীজদের যতগুলি অভিযান এতকাল পরিচালিত হয়েছিল তার পরিচিতি ও মানচিত্র সংগ্রহ করে আগামী অভিযানের কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে যা কিছু প্রয়োজন তার প্রত্যেকটি পূর্ণাঙ্গ করতে তিনি কোনরূপ কার্পণ্য করলেন না।

দেখতে দেখতে অনতিকাল মধ্যে তিনখানি তিনশত টনের অতিকায় জাহাজ তৈরী সম্পূর্ণ হলো। পর্তুগালের অভিযাত্রীরা এই তিন জাহাজে যাতে নিজেদের দীর্ঘকালের অত্যাবশ্যকীয় রসদাদি বহন করতে পারেন সেই মত সুবিশাল রসদাগার জাহাজগুলিতে স্থাপনের পর জরুরী অবস্থার প্রয়োজনে ছোট একখানি পালবাহী বোট অভিযানের সহযাত্রীরূপে পাঠানো সাব্যস্ত হলো।

কোনো ক্রমেই এরাকার অভিযানে কোনদিক দিয়ে কোনোরূপ ত্রুটি রাখা যাতে না হয়, সেদিকে নবীন রাজা ইমানুয়েল বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বন করতে অগ্রণী হলেন। নাবিকদের পেটের সমস্যার যাতে ব্যতিব্যস্ত না হতে হয়, তার পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থার পর রাজা ইমানুয়েল স্থির করলেন সেই সকল অপরাধীদের অভিযানের দলে ঠেলে পাঠাতে যাদের জীবনের মূল্য আইনের কাছে এক কপর্দকও নয়। উদ্দেশ্য মহৎ! পালাতে চায় পালাক। মরে—অপরাধী মরুক! অভিযানের সাফল্যে স্বদেশে ফেরে—অপরাধ মুকুব তথা মুক্তি। পুরস্কার প্রাপ্তিও ঘটে! অপরাধ ছাড়াও ডাকসাইটেদেরও রুদ্ধ করলেন সম্রাট ইমানুয়েল। দুঃসাহসিক কাজে যাদের আনন্দ সেই ডাকসাইটে দলের সঙ্গে অপরাধীদের সমাবেশ ঘটলো যেমন, অতীতের বৈশ-অভিযাত্রীদের নতুন অভিযাত্রীদের পথ প্রদর্শক করে পাঠানোরও হলো তেমনি ব্যবস্থা। আর নবম দলটির নেতৃত্ব দেওয়া হোলো এমন এক জনের উপরে, তার তাবার যাকে বলা চলে দুঃসাহসিকার ডানপিটে সর্দার। তাঁর নাম ইতিহাসের পাতায় গাঢ় কালো কালিতে লেখা রয়েছে: ভাস্কো ডা গামা! সঠিক বলতে, বীরা ভাস্কো ডা গামা!

পর্তুগালের জীবনে চোদ্দ শত সাতানব্বুই খৃষ্টাব্দের পাঁচ-ই জুলাই একটি দিনের মতন দিন। ওই দিন সারা পর্তুগালে সেই দর্প প্রথম ছুটি ঘোষিত হোলো। দলে দলে হাজারে হাজারে নরনারী, শিশু বৃদ্ধ, যুবক যুবতি আবীর ওরফাহ, মজুর চাষী সকলে মিলে বন্দরের পথে ভিড় করে দাঁড়ালো বেশ-বাহিত সদ্য অভিযাত্রীদের দর্শন প্রত্যাশায়। সেদিন তাদের উৎসাহ উদ্দীপনা, তা বলা দেখে কে। কেই বা কম যায় তার থেকে। স্বয়ং সম্রাট ইমানুয়েলই ত আগামী সৌভাগ্যের স্বপ্নে আনন্দে উল্লাসে বুঁদ!

ভাস্কো ডা গামার নেতৃত্বে একশত ষাট জন ভাগ্যবান পর্তুগীজ নতুন ও মনোরম পোষাক পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হয়ে ভরসা সাগরের তীরে সুন্দর লোকল রোদ্দুরের পথ ভেঙে বন্দরের বহুই কাছে এগিয়ে আসতে লাগলো। ততই জনতা উল্লাস উন্মত্ত আবেগে ভেঙে ভেঙে পড়ছিল। সকলেরই ভাবখানা এমন যেন, বিজয়লক্ষ্মী ও হাতের মুঠোয় এসে পড়লো বলে!

সুন্দর, সত্য কথা বলতে কী, পর্তুগীজ জনতা ঠিকই ভেবেছিলো, কিন্তু ভাস্কো ডা গামা আমার বুকের উপর ভেসে ভেসে যে অকথা নির্যাতনে সারাপথের জলস্থল রক্তাক্ত করে কুৎসিত কোরে একদিন প্রাচ্যের তটে কোনো এক একুশে মের সোমবারে শান্ত স্নিগ্ধ সুশীতল শ্যাম সমারোহ ঘেরা কালিকটের অদূরে San Gabriel" নোঙর কোরেছিলো, সেদিন, ইতিহাসের সেই যুগ-সন্ধিক্ষণে ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ভার এমন সব লোকের হাতে যেতে বসেছিলো যাঁরা মনুষ্যত্বের চেয়ে মণি মুক্তার প্রতি আসক্ত অধিক, মানবতার চেয়ে বাণিজ্যের পক্ষপাতী খুবই বেশী—তারও চেয়ে মারাত্মক: অমৃতের চেয়ে যারা মহামারী, পোষণ বাসন মরণ মহোৎসবের আয়োজনেই যাদের ধর্ম ও মোক্ষ!

তারপর কেটে গেছে কত কাল। কত জল আমার বুকের স্নেহ ভাণ্ডার থেকে বাষ্প হয়ে উড়ে গেছে মহাশূন্যে। ওই বাষ্পরাশির কাবে কাবে বেদনার গান ভরে দিয়েছে এই বিক্ষুব্ধ রত্নাকর! সেই গানের আত্মা মর্তভূমিতে লুটিয়ে পড়েছে বৃষ্টি ধারায়! ভরে দিতে চেয়েছে পৃথিবীর অপূর্ণতা প্রাণের প্রাচুর্যে। কিন্তু মানবের মূঢ় অপব্যয় কাল-কালান্তর ব্যাপী প্রাণের প্রাচুর্যকে যে ভাবে কোরে চলেছে নিঃস্বে বঞ্চিত।

তবুও আমার স্নেহ ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়নি, সে-যে হবার নয়! দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত মানবের মূঢ় অপব্যয় কিংবা স্নেহরাশির জয় হয়!

ইতি—

তোমারই সমুদ্র।

[ক্রমশঃ

বিদেশী কবিতাগুচ্ছ

রুশ কবিতা

দরজায় কড়া-নাড়া | ইভগেনি ইভতুশেংকো

"কে ?"
"আমি বান্ধবী,
আমি তোমার কাছে এলাম।"
"পরে এসো !
আমি এখন ব্যস্ত।
অনেক কাজ বাকি !"
"আচ্ছা, বৎস
কিন্তু মনে রেখো
আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি দরজার
আড়ালে।"
আমি লিখলাম।
ফোন করলাম।
খেলাম একটি ডিম-ভাজা।
তারপর দরজা খুললাম
কিন্তু সেখানে কেউ নেই।
হবেওবা বন্ধুরা
রসিকতা করেছিল ?
কিংবা হয়তো
নামটি শুনতে ভুল করেছি।
আমাকে যে ডাকতে এসেছিল সে বান্ধবী নয়
পরিণত বয়স।
সে অপেক্ষা করতে পারল না,
এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলে
চলে গেল।

অভিযোগ | ইভগেনি ভিদুকুরভ

প্রত্যেক রেলষ্টেশনে একটি অভিযোগের খাতা থাকে
এবং, আপনি চাইলে, তারা খাতাটি দিতে বাধ্য।
আমার মনে হয়, ব্যাপারটা মন্দ হতো না
যদি অনন্তকালের থাকত এমন একটি খাতা।
তাহলে মানুষ চুপ থাকতো না তাদের দুঃখ নিয়ে।
ভীরুপায়ে, প্রথমটায় কিছু সন্তর্পণে, তারা আসত
সকলেই, আসত
তাদের দুঃখের বোঝা, যে অন্যায় তাদের সইতে হচ্ছে,
তুলে ধরতে বিশ্বের মনোযোগে, বিচারের সামনে।
এর মধ্যে কীরূপ চকিত হস্তক্ষেপ, আমি জানি
খাতার অর্থতন্ত্রের একটি অভিযোগ দেখে
লিখেছে
সেই রমণীটি যে রেলিং-এ ঝুঁকে পড়ে
কাঁদছিল পার্কে কাল রাত্রিতে।

অনু :—কৃষ্ণ ধর

শেক্‌স্‌পীআরের সনেট ঃ ৭১

আমার মৃত্যুর পরে ততক্ষণ করো তুমি শোক
যতক্ষণ ম্লান ঘণ্টা চতুর্দিকে ক্রোধরুক্ষ স্বরে
ঘোষণা করবে মোর পলায়ন ঘৃণ্য মর্ত্যলোক
হতে আরও ঘৃণ্যতর সাহচর্যে, কীটের গহ্বরে।
না, যদি দৈবাৎ পাঠ করো এই কবিতা কখনো
স্মরণ করো না কে যে রচয়িতা, কারণ তোমাকে
এতই নিবিড় আমি ভালোবাসি বিস্মৃতিতে কোনো
খেদ নেই, যদি তা তোমাকে তার দুঃখে পরিতাপে।
আমার এ কথা রেখো, মৃত্তিকায় লীন আমি যবে
তোমার দৃষ্টিতে যদি আসে এ কবিতা সে-সময়
এমনকি আমার নাম গুচ্ছরণ করো না নীরবে
আমার মৃত্যুর সঙ্গে লুপ্ত হোক তোমার প্রণয়।
না হলে তোমার শোক বিশ্লেষণ অভিযুক্ত সংসার
বিদ্রূপ রটাবে, হবো মৃত্যুর পরে দায়ী আমি তার।

অনু :—আলোক সরকার

নিগ্রো কবিতা | লিউই আলেক্সজাণ্ডার

এলাম আমি মাত্র একটি ছায়া,
দাঁড়ায়ে দেখি এখন আমি আলো ;
এবং গভীর আমার অন্ধকার
ঘোরায় তোমার ব্যাপ্ত রাত্রি কালও।

হৃদয়ে আমি রাত্রি বা, নক্‌টান
প্রতিটি মিড় তারার গানে দীপ্ত
এ উজ্জ্বলে লাগবে নাক ধাঁধা
বরং জ্বালাও আপন দৃষ্টিরত।

কোমল খুশি ছড়ায় বিকীরণ
আলোয় বাজে উত্তাপেরই কথা,
এলাম আমি মাত্র একটি ছায়া
তোর রাত্রে দিলাম কী দাপ্রতা।

অনু :—অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

স্প্যানিশ কবিতা | সালভাদর মিরো

রাস্তার উপরে, কোনো এক অলম্ভব সাক্ষ্য বহন
করে দোলকের মতো দুলছিলো, গাছের গুঁড়ির
কাছাকাছি ডালটা থেকে ঝুলছিলো একটা বীভৎস
ফলের মতো, পচে ওঠা লাসটা।

তার অশ্লীল নগ্নময়তা, তার ঠেলে-আসা জিভ, আর
মাথার ডগা থেকে মোরগ ঝুঁটির মতো এক গুচ্ছি
চুলের জন্য সেটাকে একটা ভাঁড়ের মতো দেখাচ্ছিল :
আর আমার ঘোড়াটার পায়ের পাশে দাঁড়িয়ে এক-
দঙ্গল লোচ্চা ছোঁড়া তামাশা চালাচ্ছিলো।

এবং সেই শ্যামলহরিৎ ফাঁসিকাঠে, ঝুলে পড়া মাথায়,
সজ্ঞাতিক কিন্তু ভীত তার শোকময় অবশেষ, দমকা
হাওয়ায় তার নষ্টকরুণ গন্ধ সঞ্চার করছিলো,

ধুনুচির পবিত্র গম্ভীর বেগ ধারণ করে দুলছিলো।
আর
রৌদ্র উঠলো আকাশের অকলঙ্ক নীলে, আর সারাটা
প্রান্তরভূমি যেন উত্থিত হয়ে এলো ভিবুলোর গানে।

অনু :—অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

ব্রিটিশ কবিতা

এখন অন্ধকার সময় প্রিয়তমা | মার্টিন কার্টার

প্রিয়তমা আমার এখন অন্ধকার সময়
সারাটা দেশ জুড়ে গুড়ি মেরে চলে
গোবরে পোকা
উজ্জ্বল সূর্য আকাশে লুকোলে
বিষণ্ণতার গভীরে লাল ফুলের মাথা নত।
আমার প্রিয়তমা এখন দুঃখের প্রহর
অশ্রু নিপীড়ন আর অন্ধকারের কাল
বন্দুকের অবাধ মৃগয়া- যন্ত্রণার উৎসব
মানুষের মুখগুলোয় বেদনা আর কষ্টের ছায়া।
রাত্রির আঁধারে কে আসে হেটে হেটে
কোমল ঘাসগুলো দলে যায়
লোহার নাল লাগানো কার জুতোর
প্রিয়তমা আমার ও মৃত্যুর দূত
তোমার ঘুম আর স্বপ্ন লক্ষ্য যার
সেই অদ্ভুত আক্রমণকারী।

অনু :—শ্যামসুন্দর দে

সোভিয়েত ইউনিয়ন

আমি তোমার কথা ভাবি | রসুল গ্যামজাটভ

তোমার কথা ভাবছি আমি বৃষ্টিঝরা ক্ষণে
কাননখানি ঢাকল যখন তুষার কণা এসে
তোমার কথা ভাবছি আমি নীরব গোধূলীতে।
সূর্য যখন উঠল হেসে, চড়ুই এসে মেলে
তোমার কথা ভাবছি আমি জেনো।
দূরের পানে যখন তারা মেলে ধরে পাখা
তখন জেনো তোমার কথা জাগছে আমার মনে।
গাছের সবুজ পাতা যখন উঠল মর্মরি
হিমেল বাতাস আসে যখন প্রবল কশাঘাতে
তোমার কথাই পড়ে আমার মনে।
ভাবনা আমার দিবা নিশি থাকে তোমায় ঘিরে
জানি তবু আসবে না আর কখনো ফিরে।

অনু :—শ্যামসুন্দর দে

আমেরিকান কবিতা

কালো ঘোড়ার সওয়ারেরা | টিকেন ক্রেন

কালো ঘোড়ার সওয়ারেরা
সাগর থেকে উঠে এল।
শব্দ আর শব্দ করে
তাদের বর্শা আর ঢাল
ঝন ঝন করে বেজে উঠলো।
ঘসড়ানি লাগল তাদের
গোড়ালির সঙ্গে ঘোড়ার ক্ষুরের সঙ্গে।
উদ্ধত হাওয়ায় ঘোড়াগুলোর বন্য চিৎকার,
তাদের কেশরের চুল ঢেউয়ের মতো
কেঁপে উঠলো—

পাপ ঘোড়ায় চড়ে রওনা হল।

অনু :—সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

স্প্যানিশ

কৃষাণ | রামন সিটার

সারাদিন আমি আমার সামনে বেঁকে যাওয়া
কৃষ্ণবর্ণ হলরেখায় ঘুরে বেড়াই।
দেখিনা আকাশ অথবা ঊর্ধ্বমুখী পুষ্প,
শুধু মাঠের সীমান্তে দাঁড়িয়ে তৃপ্তিহীন
ফিরে তাকাই।
পাথর, আগাছা এবং একটি বিক্ষিপ্ত চিন্তা।
কর্ষিত সেই চিহ্নটাকে ঢেকে দিয়ে
হালের অশ্ব দুটিকে আবার ফিরে ডাকে।

কখনো কখনো আবর্ত শেষ হতে না হতেই
পিছন ফিরে তাকাতে হয়, কেন না
সীমানায় আসতে আসতে কখন যেন বাঁক নিয়েছি।
অতৃপ্ত আমি ক্ষেত থেকে আসি,
প্রত্যাশায় আবার ফিরে যাই।

স্নায়ুরা খুব সহিষ্ণু, আমি স্বগত বলি :
এই সময়
আমার সামনে নিখুঁত এবং চরম একটি পরিবর্তন,
আরাম তাদের অবশ্যই বর্জনীয়
একদিন, কোন একদিন, নিশ্চিত কোনো
আমি আমার আশার সব চিহ্নগুলোকে ঘুরিয়ে দেবো,
কিন্তু তারপর আর পিছন ফিরে তাকাবো না।

অনু :—রফেশ্বর হাজরা

কোন ছায়াই না | ওয়ারিং কোলি

মেয়েটা জানতো না
তার সৌন্দর্যের কথা,
ভাবতো
বুঝি কোন দীপ্তিই নেই
[redacted]র কৃষ্ণাঙ্গে।

নগ্নদেহে
তাল-বীথির ছায়ায়
যদি সে নাচতো,
আর
ছায়া দেখতো
নদীর জলে

হয়তো জানতে পারতো।

কিন্তু
কোন তাল-বীথিই
নেই যে পথের ধারে,
কোন ছায়াই
যে প্রতিফলিত হয় না
সীমিত জলের হৃদয়ে।

অনু:—অজিত সরকার

একটি আফ্রিকান কবিতা

ক্লাডিস্ আর্মেস্ট কৌবিনা পার্কস্

আমাকে সেই কালো আত্মাগুলো দাও,
হোক তারা কালো,
কিংবা চকোলেট রং,
কিংবা ধূলিধূসর—
ধূলিধূসর।

কিংবা ধূসরতর বালুকার চেয়ে।

পারলে তাদের কিন্তু দয়া করে কালো করে রেখো,
কা···লো।
আমাকে কতকগুলো ড্রাম দাও,
তিনটে চারটে যা খুশী,
হোক তারা কালো—
কালো আর কুচ্ছিৎ।
হোকনা তারা কাঠের তৈরি,
হোক না তারা শুকনো মেষচর্মে বানানো।
খুশী হলে তাদের তুমি বাজিয়ো,
বাজিয়ো।
জোরে বাজিয়ো,
ভয়ঙ্কর জোরে,
বাজিয়ো,
জোরে,
বেজায় জোরে।

অনু: —সুভাশীস মোখার্জী

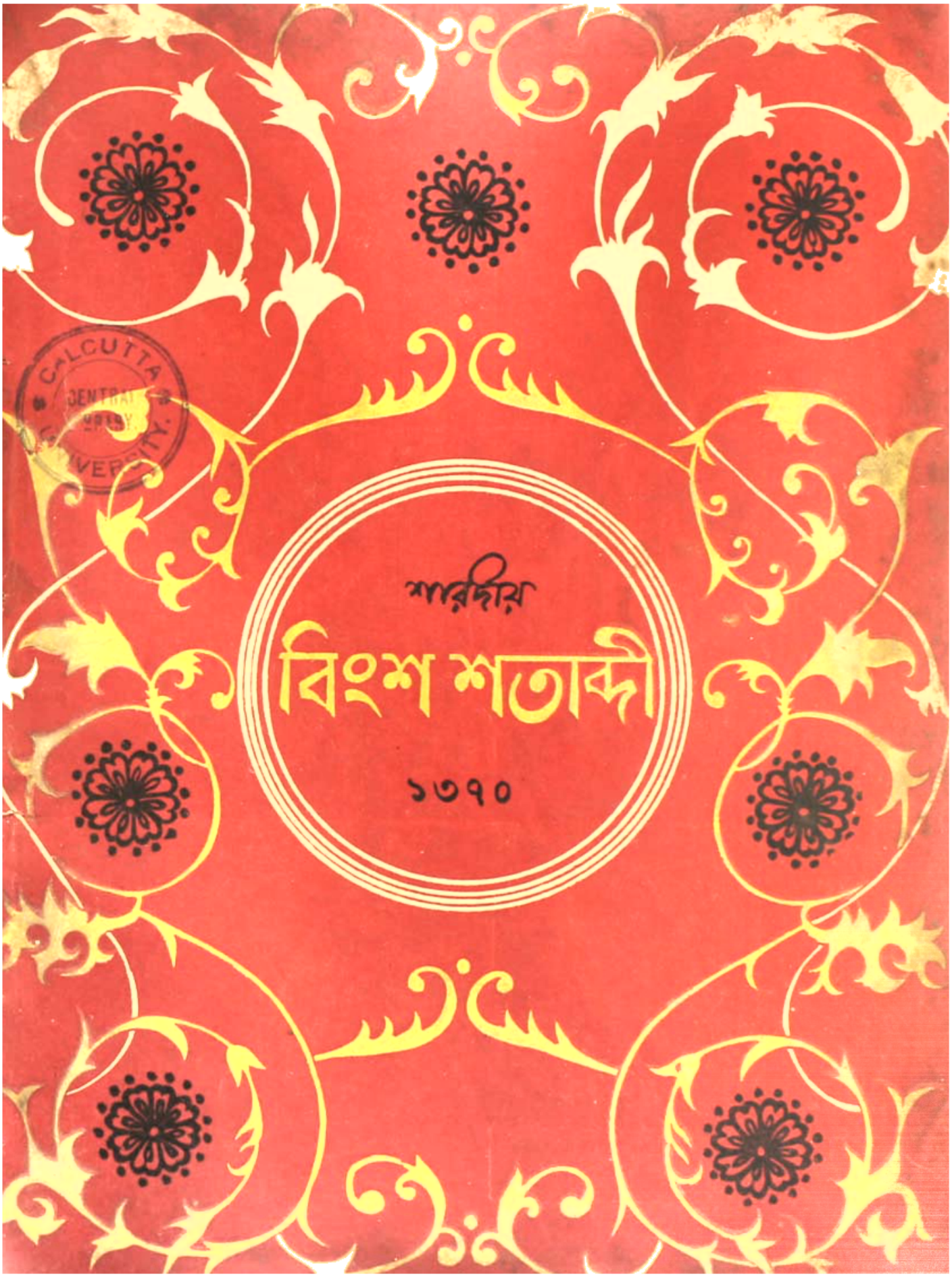

CALCUTTA
CENTRAL
UNIVERSITY

লিলির

রিচ

নোনতা

বিস্কুট

লিলি বিস্কুট কোং.প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-৪ •

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ২০, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক লিওনার্ড কার্ডবোর্ড বক্স ফ্যাক্টরী প্রাইভেট লিঃ, ২০, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

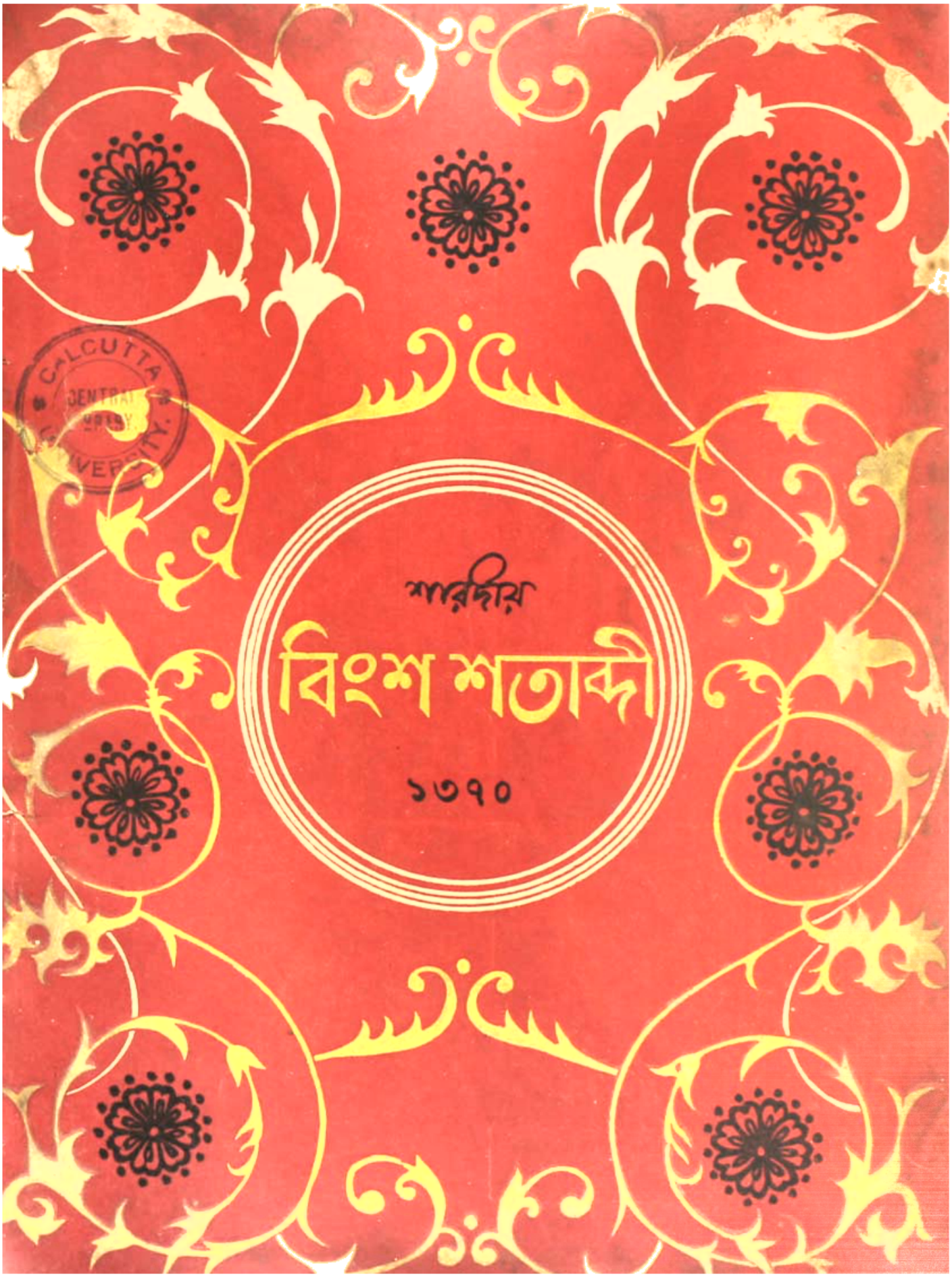

CALCUTTA
CENTRAL
UNIVERSITY

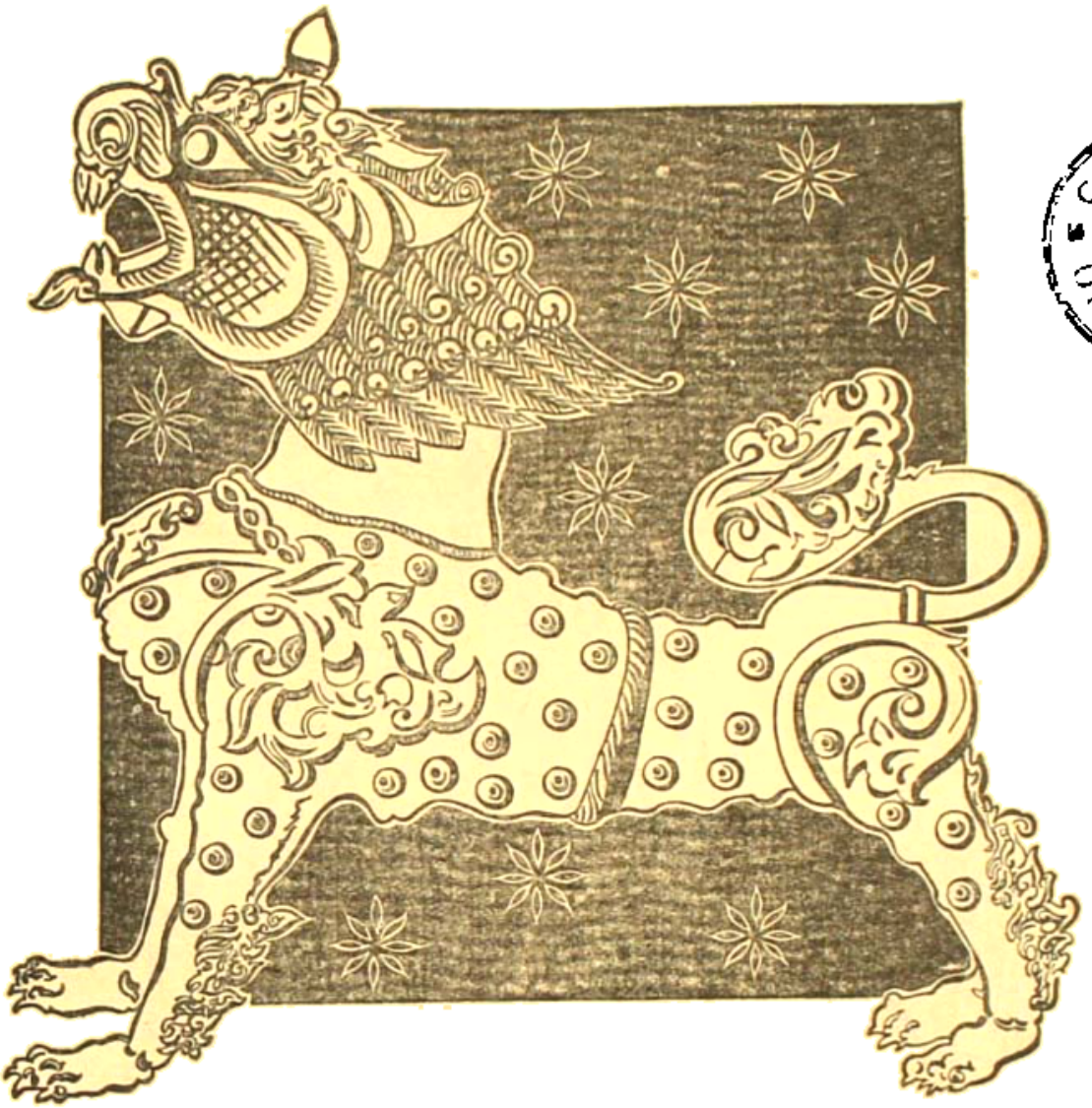

পুজোয় চাই নতুন জুতো

Bata

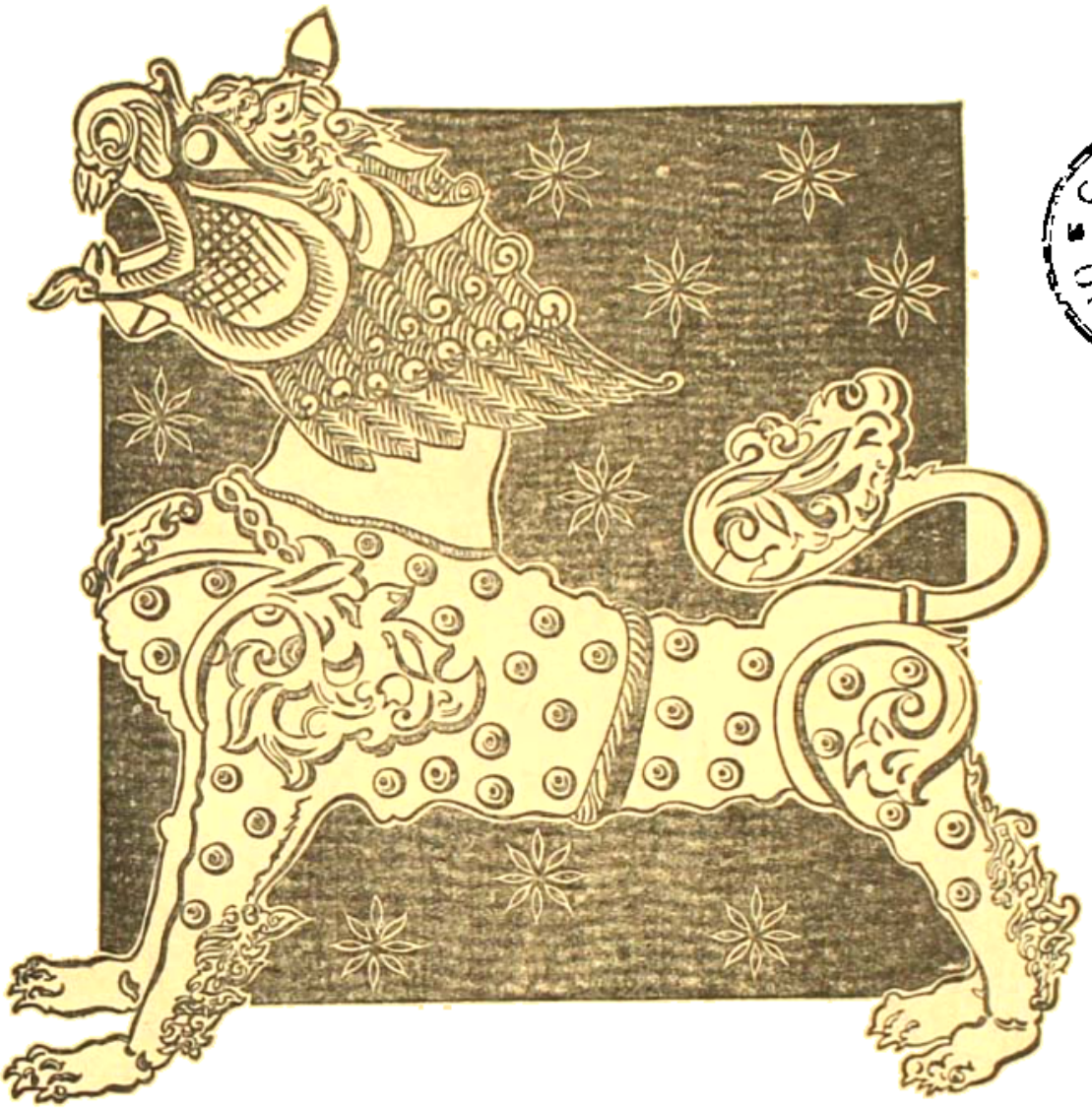

পুজোয় চাই নতুন জুতো

Bata

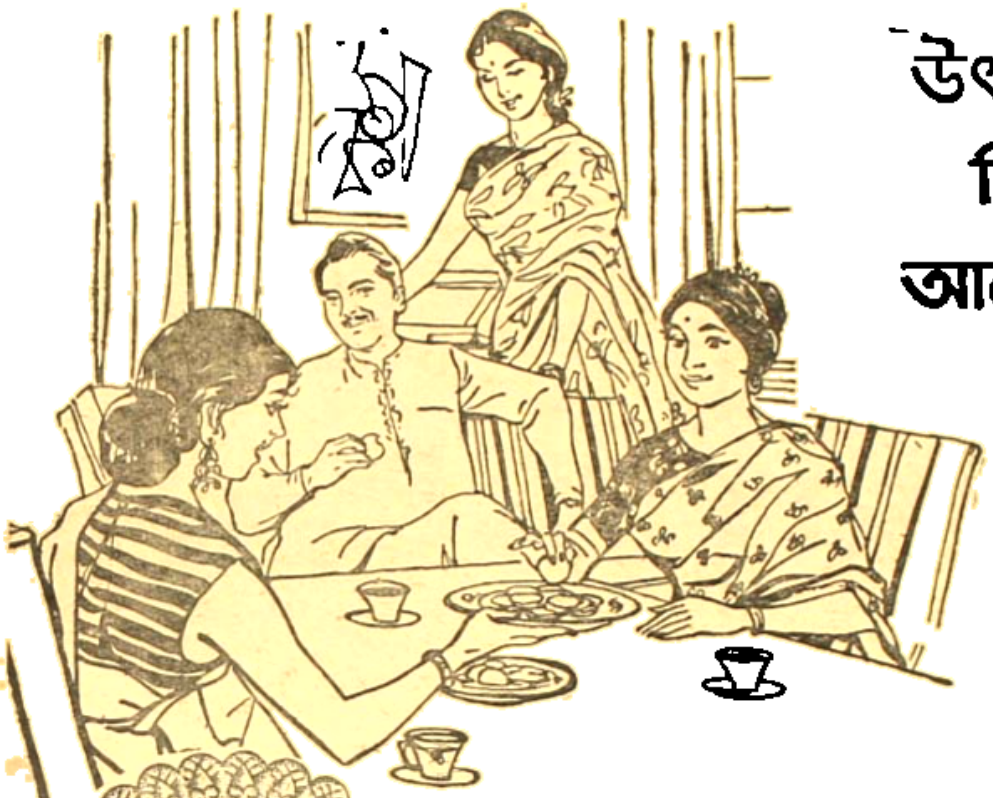

উৎসবের
দিনগুলি
আনন্দমুখর
করে

লিলি বিস্কুট

দুইটি জনপ্রিয় বিস্কুট

কার্নিভ্যাল
ও
থিন এরারুট

লিলি বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিঃ • কলিকাতা-১

আহারের পর দিনে দু'বার..

সব ঋতুতে স্বাস্থ্য লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়

দু' চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) সেবনে আপনার স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহাদ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দ্দি, কাসি, শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক ফলপ্রদ। মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্দ্ধক ও বলকারক টনিক। দু'টি ঔষধ একত্র সেবনে আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলব্ধ স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে।

সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান

সাধনা ঔষধালয় • ঢাকা

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য, ৩৬, সোনাগাছা রোড, কলিকাতা-৩৭

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন), এম,সি,এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

আহারের পর দিনে দু'বার..

সব ঋতুতে স্বাস্থ্য লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়

দু' চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) সেবনে আপনার স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহাদ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দ্দি, কাসি, শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক ফলপ্রদ। মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্দ্ধক ও বলকারক টনিক। দু'টি ঔষধ একত্র সেবনে আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলব্ধ স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে।

সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান

সাধনা ঔষধালয় • ঢাকা

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য, ৩৬, সোনাগাছা রোড, কলিকাতা-৩৭

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন), এম,সি,এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

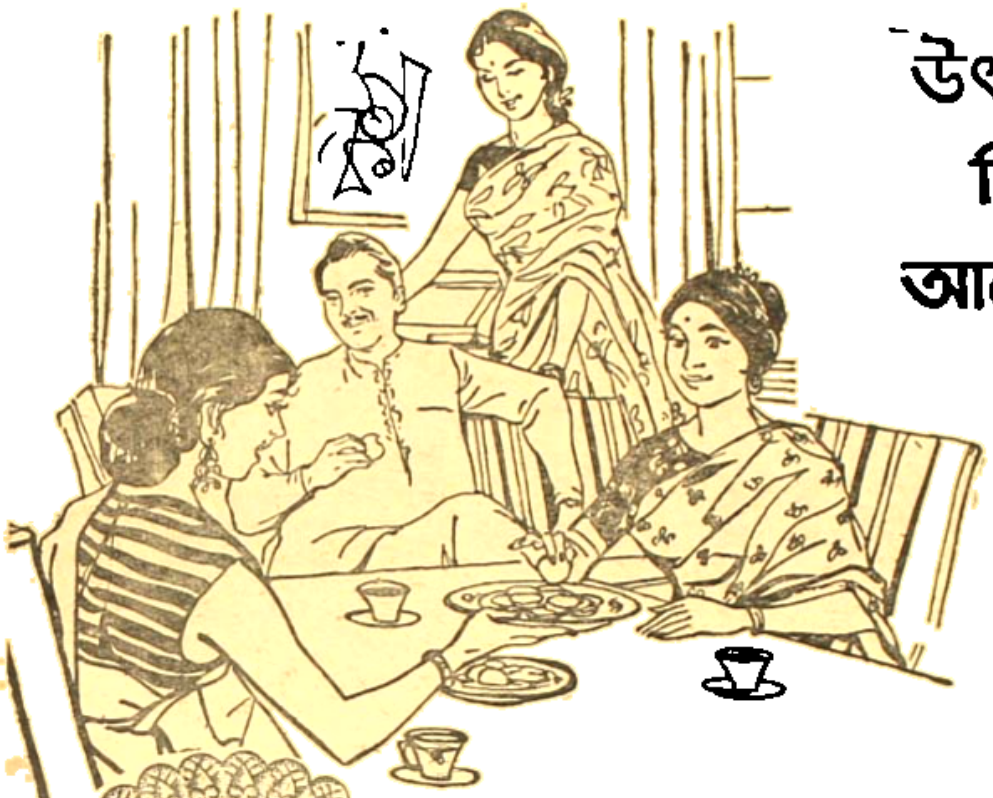

উৎসবের
দিনগুলি
আনন্দমুখর
করে

লিলি বিস্কুট

দুইটি জনপ্রিয় বিস্কুট

কার্নিভ্যাল
ও
থিন এরারুট

লিলি বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিঃ • কলিকাতা-১

স্বপনের মোহজাল রচে..

হিমকল্যাণ
আয়ুর্বেদীয় হিমসিক্ত
সুরভিত কেশতৈল।

পামিকোকো
শুদ্ধ সুরভিত
নারিকেল তৈল।

হিমকল্যাণ ক্যাস্টর অয়েল
বৈজ্ঞানিক উপায়ে
পরিশোধিত ও
সুগন্ধিত কেশতৈল।

ভৃঙ্গামলা
ভৃঙ্গরাজ ও আমলা
সহযোগে প্রস্তুত
মহোপকারী
কেশতৈল।

যোডানগন্ধা
অনুপম
সুরভি নির্য্যাস।

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস্ লিঃ
কলিকাতা-৪

নিত্য ব্যবহারের সার্থকতায় বেটার্ড এভরিহোয়ার্ড...

UPCO

পুজোর প্রীতি সম্ভাষণ

স্টোভ জ্বলছে

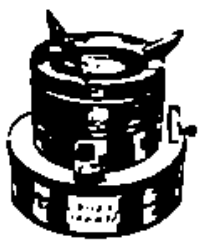

প্রীতি স্টোভ

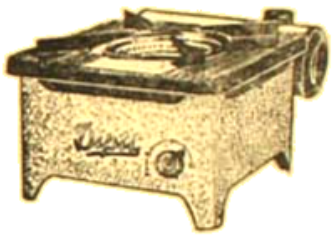

প্রীতি লণ্ঠন

এনামেলের বাসন

শরতের মেঘমুক্ত নীল
আকাশ, বিমল বিশুদ্ধ
জ্যোৎস্না, ভরা বর্ষের
ফুলের সৌরভে ভরা স্নিগ্ধস্নিগ্ধ
বাতাস সারাটা বছর আর
বিশ্বি রোদের স্পর্শ
ভারতীয় প্রাণের পরতে
পরতে আনন্দের ভাবকে
জাগিয়ে দেয়। উৎসবের
দিনগুলি যাতে বড়ো রূপে
ভরে ওঠে—সার্থক
হোক তার ফুল।

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল
ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

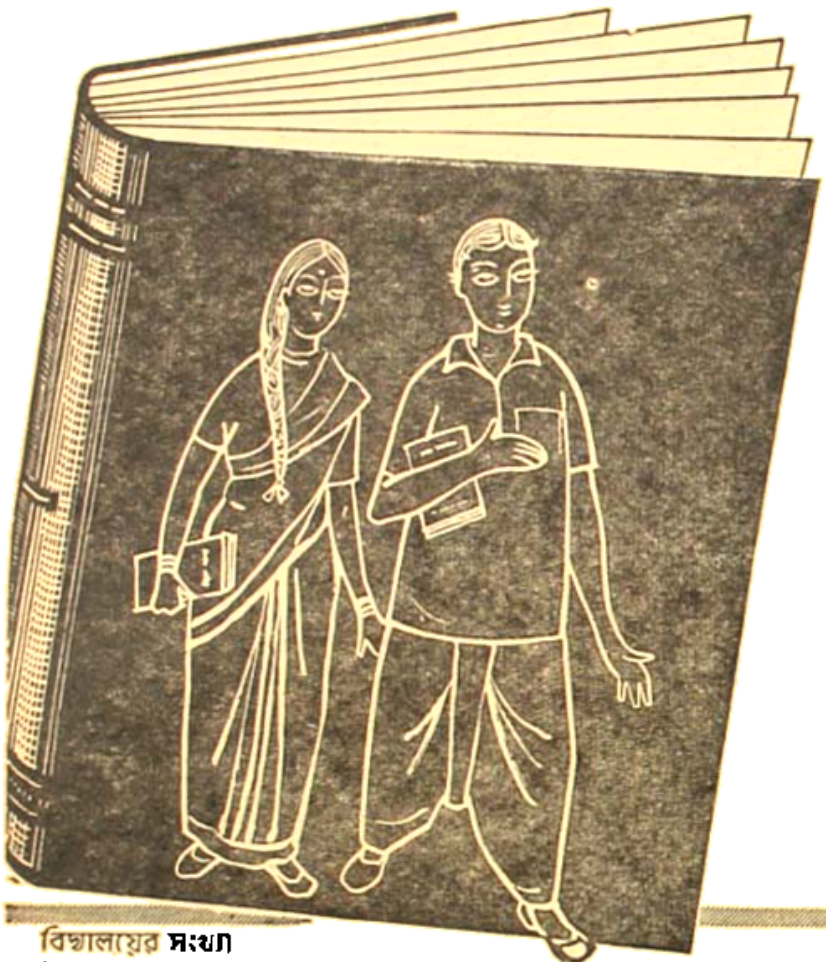

শিক্ষার সম্প্রসারণই জাতীয় শক্তির উৎস

পশ্চিমবঙ্গের সকল ক্ষেত্রে সংগঠন ও উন্নয়নের যে-পরিকল্পিত প্রয়াস চলেছে, সেই মৌল লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তিনটি পরিকল্পনা-তেই শিক্ষার সম্প্রসারণ গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে স্বীকৃত। পশ্চিমবঙ্গে বুনিয়াদী, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরী, চিকিৎসা—শিক্ষার সকল স্তরেই আজ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি।

বিদ্যালয়ের সংখ্যা
(সাধারণ শিক্ষা)
১৯৪৭-৪৮ = ১৩,৮৫০
১৯৬১-৬২ = ৩৩,২০৮

শিক্ষিতের সংখ্যা (শতকরা)
১৯৫১ = ২৪·৫৪
১৯৬১ = ২৯·৩

বিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যা
১৯৪৭-৪৮ = ১৫,৬৬,৬১১
১৯৬১-৬২ = ৩৯,৫২,৩৪৯

শিক্ষা-খাতে খরচ
(কোটি টাকার হিসাবে)
১৯৪৭-৪৮ = ৫·৪৯
১৯৬০-৬১ = ৩৪·০৮

কারিগরী বিদ্যালয়ের সংখ্যা
১৯৪৭-৪৮ = ১৩
১৯৬১-৬২ = ৪৮

কারিগরী বিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যা
১৯৪৭-৪৮ = ১,১৩৫
১৯৬১-৬২ = ৬,৫২৫

পশ্চিমবঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৪৭ = ২
১৯৬৩ = ৭

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

THERMO POWER GAS PLANT

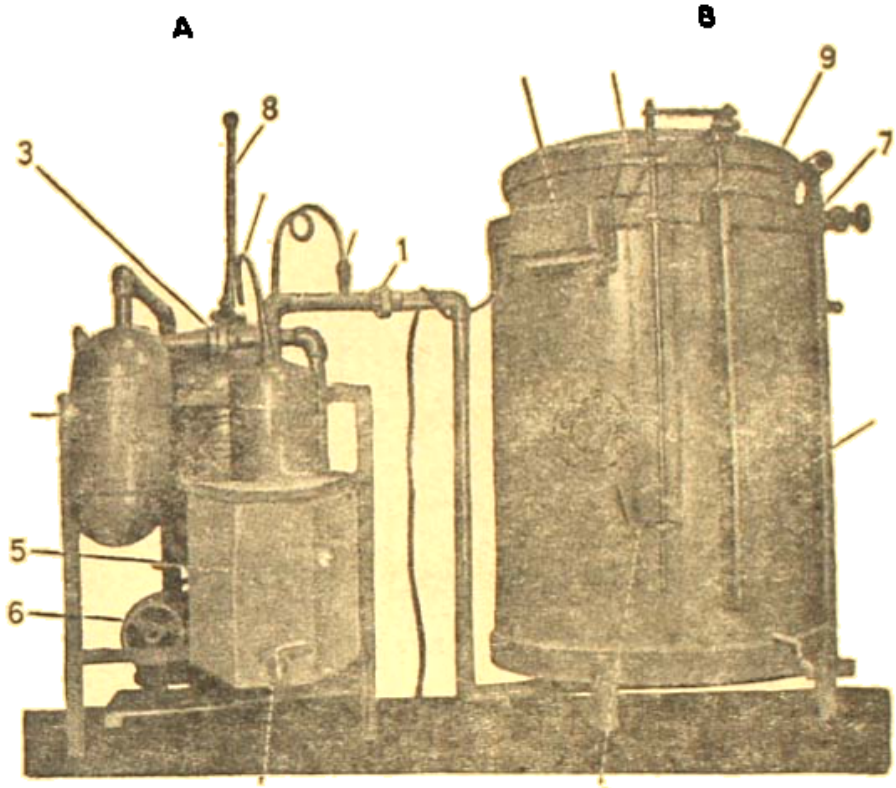

Gas generator from 'THERMO POWER' Plants are suitable for use in Laboratory, Industry and Domestic Kitchen—heating purposes.

They are being used successfully in :—

Laboratories for science teaching and analytical tests and Assay work : *Hospitals* for clinical tests Autoclaving and Sterilization, Heating etc. : *Pharmaceutical Laboratories.*

Industries—Heat treatment of metals, Brazing, Soldering, Type melting, Process printing Lead foundry, Battery manufacture.

Glass cutting Edging, Ampoule making and sealing ; all kinds of Glass blowing.

Coffee Roasting Tea Drying Sugar Refining and Food Canning etc.

Homes or large Kitchens for all cooking and domestic purposes : Canteens, Hotels, also in Hospitals for diet preparations.

Manufacturers "JANTRAM" Brand Scientific & Technical Laboratory Equipments. "AUDIOVIS" Brand Audiovisual Instruments and "ULTIMATE" Brand Temperature Control Equipments.

Suppliers of Scientific Instruments & Apparatus and Laboratory Chemicals to Educational Institutions : Entire furnishing & fitting of new Physical & Chemical Laboratories – our speciality.

EDUCATION EMPORIUM

Office & Show-room
115A CHITTARANJAN AVENUE
CALCUTTA-7
Phone : 34 1949

Factories
EDUCATION EMPORIUM HOUSE, CAL 32
188/77, PRINCE ANWAR SHAH ROAD
CALCUTTA-31
Phone : 46-6573 (3 Extns)

ভেষজ বিজ্ঞানে 'ষ্ট্যাডমেড'

শক্তি শেলাহত লক্ষ্মণকে সুস্থ করে
বৈদ্যরাজ সুষেন ব্যবস্থা দিয়েছিলেন নানা ভেষজ ওষধি
আর তা আহরণ করতে নগাধিরাজ হিমালয়ে পৌঁছুতে হয়েছিলো
পবননন্দন মহাবল মারুতিকে।

শতাব্দীর বেদনা আজ রোগ আর শোকের রূপে
পুঞ্জীভূত হয়েছে মানুষের জীবনে
অমঙ্গল রূপ ধরেছে স্বাস্থ্যহীনতা আর বলহীনতায়,
ভারতের শক্তি-উপাসনা এক হয়েছে স্বাস্থ্য-উপাসনার সাথে,
রোগ প্রতিষেধক তাই সঞ্চয় করে রাখতে হয় ঘরে ঘরে।

মনুষ্য তার সাধনায় আহরণ করেছে
নতুন এক জ্ঞান,
ব্যাধি, জরা, রোগ, শোক দমনের ভেষজ বিজ্ঞান,

ঘরে ঘরে খাঁটি আর সর্বাধুনিক ওষুধ
পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিয়েছে

HOUSE OF AMINOZYME

ষ্ট্যাডমেড প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা-২০

PUJA & DEWALI

Greetings

to our numerous Patrons

SOOR NEOGI COOMER & CO.,

PRIVATE LIMITED.

The premier dealers in Sanitary wares & Pipes

Head Office
39, COLLEGE STREET
CALCUTTA-12.
Phone : 34-1114
***Gram* : STEAM**

Branches
4, RAJA WOODMUNT STREET,
CALCUTTA-1.
Phone 22-5292
&
MANGLABAG, CUTTACK
Phone : 586

In the Service of the nation Since 1908.

মুক্ত হস্তে সাহায্য করুন

ষ্টুডেণ্টস হেলথ হোম

৪৪।১, ক্রীক রো, কলিকাতা-১৪

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্রদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের জন্য ষ্টুডেণ্টস হেলথ হোম যে পরিকল্পনা করেছেন আপনার সাহায্যে তা সার্থক হয়ে উঠুক।

রাণার সাইকেল

সাইকেল রিক্সা

ও

রাণার সাইকেল মার্ট

সারা ভারতের পরিবেশক

কমলা সাইকেল মার্ট

২এ, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

ফোন : ২২-১৮৮৩

৩, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

ফোন : ২৩-৭১২৮

Before you go for purchase of

SCIENTIFIC & LABORATORY APPARATUS

Please contact

Progressive Scientific Concern

Specialist in Honours Course Instruments.

21, Gour Laha Street, Calcutta-6.

Phone : 55-1336

শারদীয়ার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন—

ব্যাস্‌মাক এণ্ড কোং

সকলপ্রকার জব ও বই বাঁধাই করা হয়।

২।এ, নবকুমার যাহা লেন, কলিকাতা-৪।

৺শারদীয়ার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন—

ইউরেকা টাইপ ফাউণ্ড্রী লিমিটেড

২১, গিরিবাবু লেন ঃঃ কলিকাতা - ১২

ফোন : ৩৪-৩৩৫৬

Subhas Book Binding

QUALITY BINDERS

51, GIRISH PARK NORTH

CALCUTTA-6.

৺পূজার অভিনন্দন গ্রহণ করুন—

বাইণ্ডিং হাউস

সুন্দররূপে সর্বপ্রকার জব ও বাইণ্ডিং এর

কাজ করা হয়।

৪৫, শ্যামপুকুর স্ট্রীট, কলিকাতা-৪

সুপ্রিয়া চৌধুরীর সৌন্দর্য্যের গোপন কথা...

‘লাক্সের মধুর পরশ আমায় সুন্দর রাখে’

রূপসী সুপ্রিয়া চৌধুরীর স্নিগ্ধ লাবণ্যময় রূপ, সবার মুগ্ধ দৃষ্টির জিজ্ঞাসা। আর বিশুদ্ধ, কোমল লাক্সের মধুর পরশে তাঁর বিশ্বাস। লাক্স আপনার রূপেরও গোপন কথা হোক! লাক্স মাখুন... লাক্সের ভুমুল কোমল ফেনার পরশে চেহারায় নতুন লাবণ্য আনবে! সুবাসভরা লাক্সের মধুর গন্ধ আপনার চমৎকার লাগবে! লাক্সের রামধনু রঙের বিচিত্র মেলা থেকে মনের মতো রঙ বেছে নিন। আপনার প্রিয় সাবানটিও পাবেন। লাবণ্যশ্রীর জন্য লাক্স ব্যবহার করুন।

চিত্রতারকাদের বিশুদ্ধ, কোমল
সৌন্দর্য্য-সাবান

সুপ্রিয়া চৌধুরী বলেন –‘সাবানটিও চমৎকার, আর রঙগুলোও কত সুন্দর!’

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

LSL.110-BEN.BG

Consult :

Cosmos Printers

1968, Bepin Behari Ganguly Street,
Calcutta-12.

For :

ORIYA, ENGLISH, HINDI, BENGALI
& ASSAMEESE PRINTING

For Accuracy in Weighing
BUY ASW" BRAND

Manufactured by :

Physical & Chemical
BLANCES
&
WEIGHT BOXES

Sens —1 10 mgm **Cap —200 grams**

Asia Scientific Works

78, Salkia School Road,
Salkia, Howrah.

An institution of :

BENGALI LABOUR AND BENGALI CAPITAL

পাঠক মুগ্ধ হয় শুধু বক্তব্যে নয়
মুদ্রণ পরিপাট্যেও তাকে আকৃষ্ট করে

- বাংলা
- ইংরাজী
- অসমীয়া
- ওড়িয়া

চারিটি ভাষাতে নিখুঁত ছাপার কাজ

তরুণ প্রেস

১১, অক্রুর দত্ত লেন, কলিকাতা-১২।

আধুনিক পরিবারে অভিনব সার্ফ

'আমাদের আজকের জীবনে...'

বোম্বের গৃহিণী প্রেমা সুন্দরজী বলেন

'আমাদের আধুনিক এই জীবন যাত্রার সঙ্গে যে যোগই রাখুন জিনিষটাই, আর কাপড়ের ভোরে আরও ভাল জিনিষ চাই'—বোম্বের ওয়ালকেশ্বর রোডের ছিমছাম ফ্ল্যাটে শ্রীমতী প্রেমা জি. সুন্দরজীর অভিমত। তিনি বলেন, 'আজ এ ধরনের বহু আধুনিক, উন্নত জিনিষ বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। এই ধরুন সার্ফ, ব্যবহার করে সত্যিই আনন্দ হয়। কাচা সার্ফের কাপড় কতার গুণ অতুলনীয়!'

'সার্ফের ফেনায় ফেনায় ময়লা কাপড় চুবিয়ে তুলে নিন, দেখবেন সাদা কাপড়জামা কেমন ধবধবে ফরসা হয়েছে!' তাই সুন্দরজীদের বাড়ীর কাপড়চোপড়—শাড়ী, প্যান্ট সার্টস, পাঞ্জাবী, তোয়ালেচাদর, ওয়াড়কাভার সবই বাড়ীর গৃহিণী সার্ফে কাচেন।

আপনি সার্ফ ব্যবহার করেছেন তো? সার্ফ আপনার কাপড় কাচার ঝামেলা অর্ধেক কমিয়ে দেবে—অথচ সার্ফে কাচা কাপড় আগের চেয়ে অনেক ভালো, অনেক বেশী ফরসা হবে। তাইতো ঘরে ঘরে আজ সার্ফের কদর। আপনিও এবার সার্ফ ব্যবহার শুরু করুন।

সার্ফে কাপড়জামা সবচেয়ে ফরসা করে কাচে

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

HLL 16-XSS BG

Phone : 47-2932

Happy Puja & Dewali greetings from

S. C. DEY & CO.

Expert Electrical Engineers, Government Contractors
& Suppliers of all kinds of electrical goods, fittings & accessories
17, SARAT BOSE ROAD, CALCUTTA-20.

EXPERTS IN ALL KINDS OF ELECTRICAL JOBS

Our House-wiring & electrical fittings absolutely safe & leak proof.
We serve mercantile concerns, educational institutions, homes and public organisations.

বিংশ শতাব্দী প্রকাশনীর কয়েকখানি বই

	—উপন্যাস—	
সমরেশ বসু	রাণীর বাজার (২য় সংস্করণ)	
চিত্তরঞ্জন ঘোষ	পিপাসা	
চিত্তরঞ্জন ঘোষ	দুই দ্বীপ	
বিমল কর	গল্প প্রবাহ	
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়	আপনার মুখ আপনি দেখ	
	—প্রবন্ধ—	
মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ	কাজী নজরুল প্রসঙ্গে	
চিত্তরঞ্জন ঘোষ	বিভূতিভূষণ	
	—নাটক—	
অবধূত	উদ্ধারণপুরের ঘাট (নাটক)	৩·০০
	—কবিতা—	
শ্যামসুন্দর দে	কথা· নীরবতা	১·৫০

বিংশ শতাব্দী প্রকাশনী :: ২০, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ :: ফোন :: ৫৫-৪৪২৫

ক্রীড়া-সাহিত্যে বৃহত্তম প্রয়াস

শারদ সংখ্যা

মহালয়ার দিন বের হবে

দাম ২·০০ নঃ পঃ· রেজিষ্ট্রি ডাকে ২·৭০ নঃ পঃ

সার্কুলেশন ম্যানেজার, স্টেডিয়াম

২০এ, বৃন্দাবন সেন স্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২।

স্বাধীনতা বিপন্ন, আপনার সমস্ত শক্তি দিয়ে তা রক্ষা করুন

—জওহরলাল নেহেরু

দেশরক্ষার দায়িত্ব আপনারও

সীমান্তরক্ষী একজন জওয়ানকে উপযুক্তভাবে সজ্জিত রাখতে হলে দেশের অভ্যন্তরে ৫০ থেকে ১০০ জন লোককে কাজ করতে হয়। দেশরক্ষার ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন মেটানোর জন্য অনেক বেশী জিনিষপত্রের সরবরাহ থাকা দরকার।

আপনার কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শৈথিল্য ও অপচয় দূর ক'রে জাতীয় ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে কাজ করুন।

সর্ব্বক্ষেত্রে শৃঙ্খলাই ভারতের শক্তি

শারদীয় বিংশ শতাব্দীর আকর্ষণ

উপন্যাস

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় — প্রসন্ন

O

সুবৃহৎ রাজনৈতিক উপন্যাস

সমরেশ বসু — পরিক্ষেপ

O

আরও পাঁচখানি সম্পূর্ণ উপন্যাস

মনোজ বসু — ডাকবাংলো ও কাঞ্চনের চিঠি

O

পোধ্যায় — আঁধার অন্তরে

O

নীলারঞ্জন গুপ্ত

O

শক্তিপদ রাজগুরু — রাতের পাখির

O

O

সম্পূর্ণ নাটক

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় — নদী বহে যায়

O

গল্প

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধকুমার সান্যাল, আশাপূর্ণা দেবী,
আশা দেবী, সন্তোষকুমার ঘোষ, সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

এ ছাড়া

প্রবন্ধ, ছড়া, ধাঁধারচনা, ধাঁধারচনা, কার্টুন, ভ্রমণ কাহিনী, কবিতা, স্কেচ ইত্যাদি।

For all sorts of fertilisers

for

TEA GARDENS

Please Contact

Ghosal Banerjee & Co.,

Approved Distributors of Govt. of India.

23, Strand Road, Calcutta-1.

Gram : PIANFERT **Phone : 22-7737**

শান্তির গেঞ্জী

রোজ বিউটি
বেবী ডগ
সভারীণ
এ্যাক্টিভ

শান্তি হোসিয়ারী মিলস্
ক লি কা তা - ১০

সূচীপত্র

বিংশ শতাব্দী

অষ্টম বর্ষ : শারদীয়া সংখ্যা

আশ্বিন

		বিষয়
	৩১১	আনন্দের কথা
	৩৯০	গ্রন্থ উপন্যাস)
সমরেশ বসু	৩৭৭	পরিক্ষেপ উপন্যাস
বেবতীভূষণ		পত্রিকা বিচিত্রা (কবিতা)
মনোজ বসু	৪১৪	ডাক্তারের ও কম্পাউণ্ডারের চিঠি
শক্তিপদ রাজগুরু	৪২৪	রাতের পাখিরা উপন্যাস
প্রবোধকুমার সান্যাল	৪৮১	দুই পাখি গল্প
শশিভূষণ দাশগুপ্ত	৪৯৮	মুক্ত দলক (ছড়া)
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৫০৪	আঁধার অথরে (উপন্যাস)
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	৫৪২	নদী বহে যায় (নাটক)
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৬০১	প্রণাম যাত্রা (গল্প)
চিত্তরঞ্জন ঘোষ	৬০৮	অশ্বিনের মা কার্তিকের মা কবিতা
তরুণ চট্টোপাধ্যায়	৬১৩	জীব-বিজ্ঞানী লাইসেংকো (বিজ্ঞান

"আনন্দলোক আজ খুলেছে, আকাশ পুলকময়,
জয় ভূলোকের, জয় দ্যুলোকের, জয় আলোকের জয়।"

—রবীন্দ্রনাথ।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিমিটেড, কলিকাতা-২৬

লেখক		বিষয়
সন্তোষকুমার ঘোষ	৬১১	স্বাধীনতা (গল্প)
অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়	৬২৪	জলতরঙ্গ (কবিতা)
আশা দেবী		মরুভূমি (গল্প)
অরুণ দাশগুপ্ত	৬৩০	টপ্ সিক্রেট (রসরচনা)
আশাপূর্ণা দেবী	৬৩৭	আকাশ মাটি (গল্প)
কুমারেশ ঘোষ	৬৫১	ভি. আই. পি. (রম্য রচনা)
আদিত্য ওহদেদার	৬৪৩	বাংলা সমালোচনা ও রবীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ)
নীহাররঞ্জন গুপ্ত	৬৪৮	গোপনচারিণী (উপন্যাস)
পার্থ চট্টোপাধ্যায়	৬৭৩	ভূমধ্যসাগরের তীরে (ভ্রমণ)
প্রিয়দর্শিনী	৬৮৬	মুখে তার লোহ বেণু
প্রেমেন্দ্র মিত্র	৭০৩	এই শহরে (কবিতা)

এবার পূজায় সিমেন্সের SIEMENS INDIA অনবদ্য ৪টি প্রীতি উপহার

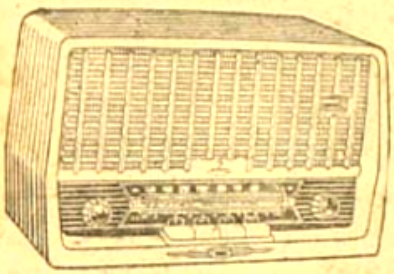

সুপার আর. এ-১০১ এসি ও এসি/ডিসি, ৬ ভালব, ৩ ওয়েভব্যাণ্ড ট্রানজিস্টর মডেল

মূল্য ২৭০৲ ও স্থানীয় কর

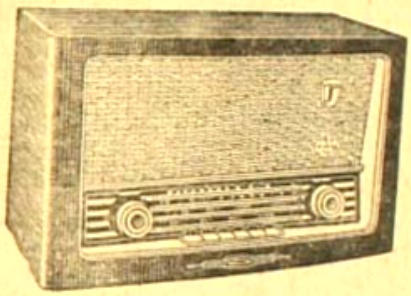

স্ট্যাণ্ডার্ড সুপার ৬৯১ ডব্লিউ ও এসি ও এসি/ডিসি, ৬ ভালব, ৪ ওয়েভব্যাণ্ড, ৬টি পুশ বাটন

মূল্য ৪১৫৲ ও স্থানীয় কর

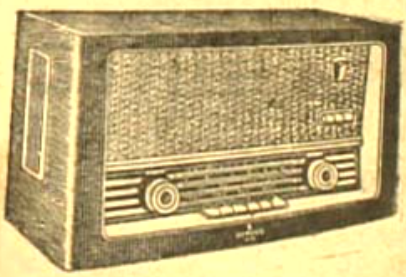

স্পেশাল সুপার ৬৯২ ডব্লিউ ও এসি ও এসি/ডিসি, ৬ ভালব, ৪ ওয়েভব্যাণ্ড, ৬+৩ পুশ বাটন, ৩টি লাউড স্পীকার

মূল্য ৫১৫৲ ও স্থানীয় কর

গ্র্যাণ্ড সুপার ৭৯০ ডব্লিউ (এসি) ৭ ভালব, ৬ ওয়েভব্যাণ্ড। ৮+৫ পুশ বাটন ৫ লাউড স্পীকার

মূল্য ৯৯৩৲৩৩ ও স্থানীয় কর

নিকটবর্তী অনুমোদিত ডিলারের নিকট অনুসন্ধান করুন—

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও আন্দামানের পরিবেশক :

মান এণ্ড কোং

১এ, ডালহৌসি স্কোয়ার, ৩২বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা

লেখক	বিষয়
বেনু কর	সাম্প্রতিক প্রবন্ধ ও কবিতা
জগদীশ ভট্টাচার্য	সন্ন্যাসী প্রভাত (কবিতা)
দুঃখ ধর	অপ্রকাশিত সংবাদ (কবিতা)
শ্যামসুন্দর দে	নিঃসঙ্গতা (কবিতা)
অরুণ মৈত্র	একটি রাত্রিকে (কবিতা)
অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়	অসমাপ্ত চতুর্দশপদী (কবিতা)
সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	ঘুম (গল্প)

সম্পাদক
প্রসাদ মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদপট
শচীন বিশ্বাস

অলঙ্করণ
প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শচীন বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ দত্ত

Gram WATERTIGHT

Office : 22-7330
22-3883
Resd : 46-8015

With best compliments of—

RAUNAQ & CO., PRIVATE LIMITED

Importers & Stockists of :

GALVANISED BLACK & STEAM PIPES & FITTINGS AND SLUICE VALVES

on Approved list of :

D. G. S. & D., AND RAILWAYS

85, NETAJI SUBHAS ROAD,
CALCUTTA-1.

Regd. Office
Church Building,
Hauz—Qazi
Delhi-6.

Bombay Office :
101, Nagdevi Street,
Bombay-3.

লক্ষ্মীবিলাস

জনপ্রিয়তায় শীর্ষস্থানীয়

লক্ষ্মীবিলাস পারফিউমারী কর্ত্তৃক প্রস্তুত এই অদ্বিতীয় ভেষজ সমন্বিত সুগন্ধি কেশ তৈল আপনিও ব্যবহার করুন।

লক্ষ্মীবিলাস
কেশ তৈল

ট্রেডমার্ক
"শ্রী ভরত মূর্ত্তি"
বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবেন।

ব্যবহারে ভালো
লক্ষ্মীবিলাস
"স্নো"

প্রস্তুতকারক ঃ

লক্ষ্মীবিলাস পারফিউমারী প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা

শারদীয় অভিনন্দন গ্রহণ করুন—

সুর

ফ্রিজ

রেফ্রিজারেটর্স • ওয়াটার হিটারস্ • এয়ার কণ্ডিসনারস্ • কুকিং রেঞ্জেস্

অপচয় রোধ করুন, জাতিকে শক্তিশালী করুন।

পরিবেশক ঃ—

রেফ্রিজারেটর্স (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা ঃঃ পাটনা ঃঃ লক্ষ্ণৌ ঃঃ দিল্লী

"সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"

বিংশ শতাব্দী

আশ্বিন
১৮৮৫
অষ্টম বর্ষ
শারদীয় সংখ্যা

বাংলাদেশ ও বাঙালীর কাছে শরৎকালের [illegible]

প্রাণের সাড়া মতটা না পাওয়া যায় তার চেয়ে অনে

শারদোৎসব বাঙালীর

উৎসবের মধ্যে এক স্বতন্ত্রভাবে জড়িয়ে আছে

বাঙালীর এক সাহিত্যপ্রেমিক বিশেষ [illegible] বেশে মাথা পিছ

বৈষয়িক ঝড়পড়তা আয় পাওয়ার [illegible] বেশের মানুষ

নিঃশব্দে তাঁরের কঠোর একটি

তা জানলেও বিশ্ব সীমা ছাড়ায়।

মানুষ কেবল রুটি খেয়ে বাঁচে না

কথা উপলব্ধি করে বলেই বাঙালী ক্ষুধার গ্রাস সরিয়ে রেখেও সাহিত্যের জন্য এত অর্থ ব্যয় করে।

গত বিশ বছরে বাঙালীর জীবন আবর্তিত হয়েছে। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশবিভাগ উদ্বাস্তু, মূল্য বৃদ্ধি—আঘাতের পর আঘাত এসেছে তার [illegible] জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে যায়

এত দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের মধ্যেও সাহিত্যের এই শারদোৎসবকে সে অভ্যর্থনা জানিয়েছে।

আমরা বিশ্বাস করি, বর্তমান দুর্যোগের রাতদুপুর যখন লুপ্ত হয়ে যাবে, তখনও সাহিত্যের ঘুঁই দুলোবে আসন থাকবে। তাই সীমাবদ্ধ সামর্থ্য নিয়েও সাহিত্যের এই শারদোৎসবে সাধ্যমতো অংশ নিতে আমরা অগ্রসর হয়েছি। কাঠবিড়ালের সাগর বন্ধনের প্রচেষ্টা যদি ক্ষমার্হ হতে পারে তবে আমাদের ত্রুটি বিচ্যুতি ও অক্ষমতা সহৃদয়রা ক্ষমা করবেন এ ভরসা আমাদের আছে।

পরিশেষে, আমাদের এ বছরের শারদীয় সংখ্যা প্রকাশ-প্রচেষ্টায় বাংলা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ থেকে সর্বকনিষ্ঠ প্রায় সকল সাহিত্যিকই আমাদের যে ভাবে সাহায্য করেছেন, তার তুলনা হয় না। তাঁদের আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

'বিংশ শতাব্দী'র সমস্ত লেখক, গ্রাহক, পাঠক, এজেন্ট, বিজ্ঞাপনদাতা ও পৃষ্ঠপোষকদের শারদীয় শুভেচ্ছা।

সেই সঙ্গে কামনা করি বাঙালী মাত্রের জীবনে শারদোৎসব যথার্থ উৎসব হয়ে উঠুক।

কবি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

কাজ করছিলাম। বই ওল্টাচ্ছিলাম ডিক্টিওনারি গেজেটিয়ার। জেলার ইতিহাসের অধ্যায় খুঁজছিলাম, একটি কাহিনীর উপাদানের জন্য। টেলিফোনটা বেজে উঠল। তিক্ত মনেই টেলিফোন তুললাম। একটি কাহিনী যেন মনে মনে বীজ ফেটে অংকুরের মত দুটি দল মেলছিল। বিবর্ণ দুটি দল তাও মাটির তলায়।

—হ্যালো!

—ফাইভ সিক্স থ্রি জিরো সেভেন সিক্স?

—হ্যাঁ!

—.....এঁর সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?

—আমি কথা বলছি।

—দেখুন আমি.....হাসপাতাল থেকে কথা বলছি!

একটু চমকে উঠলাম। হাসপাতাল থেকে কথা বলছে? কই পরিচিত আত্মীয়রা কেউ হাসপাতালে যে আছেন বলে তো জানি না! একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় মনটা ছায়াচ্ছন্ন হয়ে গেল। এ্যাকসিডেন্ট? এ্যাকসিডেন্ট কথাটাই স্বাভাবিকভাবে মনের মধ্যে একটা নখওয়ালা ছোট জন্তুর লাফিয়ে পড়ার মত যেন বুক করে লাফিয়ে পড়ল! নখ ফুটে গেল। পরক্ষণেই মনে হল—না—। এতো টি বি হসপিটাল। আবার মন চঞ্চল হয়ে উঠল। আমার আপনজনের মধ্যে কেউ—? চিন্তাটা শেষ হবার আগেই ওদিক থেকে কথা ভেসে এল—আপনি কি সুরূপা ব্যানার্জীকে জানেন?

—সুরূপা ব্যানার্জী? কে?

—ফিল্ম এ্যাকট্রেস!

—ফিল্ম এ্যাকট্রেস—সুরূপা ব্যানার্জী? হ্যাঁ—একবার তিনি আমার কাছে একটা গল্প লেখাবার জন্যে কয়েকদিন এসেছিলেন!

—হ্যাঁ; তিনি মৃত্যুশয্যায়। বাঁচবার আশা নেই। তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন—বারবার বলেছেন। আমরা ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি। ঘুম ভাঙলেই বলছেন—আপনার কথা। ঘণ্টা দুয়েক পর মোরটা কাটার সম্ভাবনা আছে। আপনি কি আসবেন?

ফোনটা ধরেই চিন্তা করে নিলাম। বছর দুয়েক আগে সুরূপা এসেছিল আমার কাছে। কয়েকদিনই এসেছিল। একটু চেষ্টাও করেছিল আত্মীয় বা অন্তরঙ্গ হবার জন্য। কিন্তু আমার নিষ্পৃহতার জন্য সেটা সম্ভবপর হয়নি, উৎসাহ সে বজায় রাখতে পারে নি।

—আপনি কি আসবেন? ফোনের ওদিক থেকে প্রশ্ন ভেসে এল।

—দু ঘণ্টা পর?

—হ্যাঁ। অবশ্য আড়াই ঘণ্টাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে একটু বলতে হবে। উনি খুব ব্যগ্র কিন্তু দ্বিধার মধ্যেই বললাম—আচ্ছা যাব!

মৃত্যুশয্যায় শুয়ে সুরূপা ফিল্ম অভিনেত্রীর কি কথা আমার সঙ্গে থাকতে পারে? ভেবে পেলাম না। সে আমার কাছে এসেছিল গল্প কিনতে নয়, বরাত মত গল্প লেখাতে। আমি লিখিনি। কয়েক দিনই এসেছিল সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিল—কিন্তু সে অনুরোধ রাখা তো সম্ভবপর হয়নি আমার পক্ষে। প্রত্যাখ্যান করেছিলাম প্রথম দিন সস্নেহ মিষ্ট কথায়। তবু সে নিরস্ত হয়নি। একটু আবদারের সুরেই বলেছিল—না, না বললে আমি শুনব না। সম্ভবত সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র—এই সত্যটা সম্পর্কে সে নিঃসন্দেহে বিশ্বাসী ছিল।

•

QUALITY
INK
for
FOUNTAIN PEN
Shamal
Manufactured by :-
D. J. M. PRIVATE LTD.
CALCUTTA
Shamal
Shamal
BLUE-BLACK
Sole Selling Agents :-
STEELVERSE & Co. (1960) Pvt. Ltd.
CALCUTTA-1

সুগন্ধি
বাসমতী চাউলের
পোলাও

উৎসবে অপরিহার্য্য
পশুপতি দাস
এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
৩১এ ও ৪১ ই সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড, কলিকাতা ১৩
ফোন : ২৩-৪৩৯১, ৮২ গ্রাম : "রাইসকিং"

বছর দুয়েক আগে—যথানিয়মে সকালবেলা লিখতে বসেছি—এমন সময় ছোট নতুন একখানা মোটরকার এসে থামল বাড়ীর সামনে দেবদারু গাছটার ছায়ায়। জানালাটার মধ্য দিয়ে তাকিয়েছিলাম মোটর থামার শব্দে। কে এল?

দেখলাম দুটি পুরুষ একটি তরুণী সুন্দরী। তরুণী পুরুষদের মধ্যে একজন প্রবীণ একজন তরুণ। মেয়েটির বেশভূষার প্রসাধনে পারিপাট্যে একটা ঝলমলে দীপ্তি রয়েছে, যা সচরাচর বা সাধারণ নয়। সব থেকে যেটা বেশী আকর্ষণ করলে দৃষ্টি—সেটি তার শ্যাম্পু করা বেণীর মত চুল একটা এলোমেলো অবিন্যস্ততার পরিপাটি বিন্যাসে বিন্যস্ত। এবং তার চোখ ও নাক। নাকটির গড়ন বাঁকা। যেটা রূপের ব্যাকরণশাস্ত্রে মস্ত একটা খুঁত। এবং ও নাকের বাঁকা ভাবের জন্যই চোখ দুটি ডাগর। টানা নয়—গোলালো। এটাও খুঁত। কিন্তু এই দুটো তাকে যেন অধিকতর আকর্ষণীয়া করে তুলেছে। কিকে নীলরংয়ের পাড়হীন পাতলা মিহি শাড়ী ছিল পরণে, আধুনিক ছাঁদে পেঁচিয়ে পরা শাড়ীর আঁচলখানি। পিঠের দিকে কোলে এখন ব্রোচ বা পিন ব্যবহার উঠে গেছে—ফলে আঁচল কাঁধ বেয়ে খসে বসে পড়ে কিন্তু, এর শাড়ীর আঁচল বাঁয়া কোমরে বেড় দিয়ে সামনে এনে গোঁজা বা পিঠে দিয়ে বাঁধা। যাতে মেয়েটিকে একটু শক্তপোক্ত কাজের মেয়ে বা একটু উদ্ধত মনে হচ্ছিল।

পুরুষদের দুজনেই প্যান্ট এবং সার্ট পরা। এক জনের হাফসার্ট অন্য জনের হাওয়াই সার্ট। তাও বেশ জাঁপজোপ দেওয়া। এসে বাড়ীর ফটকে ঢুকলেন। আমার ঘরের সামনে বসবার ঘর। মাঝে একটা দরজা বন্ধই থাকে। ভাইপো এসে খবর দিলে কিন্তু ডিরেক্টর মহিমবাবু আর সুরুপো ব্যানার্জী কিনে এ্যাকট্রেস এসেছেন। দেখা করবেন।

বললাম—ভিতরে নিয়ে এস।

বাইরের ঘর আর আমার লেখবার ঘরের মধ্যের দরজাটা খুলে দিলে ভাইপো এবং ওঁদের বললে—আসুন ভিতরে।

তাঁরা দরজার মুখে থমকে দাঁড়ালেন। আমার ঘরের

ভিতরের ব্যবস্থাটা আধুনিক নয় পুরোনো কালের মত। আমি নিজে আসনে বসে ডেস্কের উপর লিখি। সামনে গদীর উপর চামড়ার পেতে ফরাস করা আছে। সামনের দেওয়াল ঘেঁসে একখানা বেঞ্চির মতও আছে—কোট প্যাণ্ট ধারীদের জন্য। কিন্তু তার জন্য বোধ হয় তাঁরা থমকে দাঁড়ান নি; দাঁড়িয়েছিলেন ওই মেয়েটির জন্য। মেয়েটিই দরজার মুখে থমকে দাঁড়িয়ে আমাকে একদৃষ্টে দেখছিল।

আমার মধ্যে দেখবার কিছু নেই। আমি প্রায় বৃদ্ধ তার উপর শীর্ণদেহ কালো মানুষ। তবে দেখার যদি কিছু থাকে তবে আমার আসল চেহারা আর তার মনে মনে গড়ে নেওয়া চেহারার মধ্যে যেটা গরমিল-সেইটে যাচাই করে দেখা। এমন হয়। অনেকের আশাভঙ্গ হয়ে থাকে। চুরি করে পেয়েই থাকি আর সত্য প্রাপ্য হিসেবে পেয়েই থাকি—প্রতিষ্ঠা তো কিছুটা পেয়েছি। তার ফলে অনেকেই নামের মোহে মুগ্ধ হয়ে থাকেন। এবং একটা ছবিও কল্পনায় তৈরী করে নেন। কাগজে পত্রে যে সব ছবি বেরিয়ে থাকে—সেগুলিও এই ভুল ছবি গড়তে সাহায্য করে। কারণ ফটোগ্রাফ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অঘটন ঘটাতে পারে। সত্যকে সে বিকৃত করে না কখন ওই কিন্তু সত্যকে রেখায় রেখায় ঠিক রেখেও রূপে লাবণ্যে সুন্দর করে তুলতে পারে। মানুষেরও মোহ আছে। তারা কাগজে ছাপবার জন্যে ছবি দেবার সময় বেছে বেছে লাবণ্যময় ছবিগুলিই দিয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়ে থাকবে।

আমি অস্বস্তি বোধ করছিলাম। বললাম—আসুন ভিতরে আসুন।

মেয়েটি চাপার খুলে আমার দিকে তাকাতে তাকাতেই ঘরের ভিতরে এসে সামনের ফরাসে বসল। তার পিছন পিছন ভদ্রলোক দুটি।

প্রবীণ ব্যক্তিটিই পরিচয় করে নিলেন, বললেন—নমস্কার। আমার নাম—মহিমচন্দ্র বোস কিন্তু ডিরেক্টারী করি। আমার ছবি···

আমি প্রতিনমস্কার আগেই করেছিলাম—বললাম—হ্যাঁ কয়েকখানা ছবি আপনার দেখেছি।

—হ্যাঁ। আগে ছবি দেখবার সময় একবার আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

—হ্যাঁ।

DAS GUPTA & CO.
PRIVATE LIMITED
BOOKSELLERS SINCE 1886
54/3, College Street, Calcutta-12
PHONE 343875 & 346547

—ইনি হলেন—বিশ্ব ওটার মুখোপাধ্যায়। উনিই ডাক্তার। মেয়েটি কখন মুখ নিচু করে বসে আছিল চাদরের সুতোর ছকে ছকে তর্জনী বুলিয়ে যাচ্ছিল। লক্ষণটা নার্ভাসনেসের। যেন আমার দিকে তাকাতে অস্বস্তি বোধ করছিল। সে এবার মুখ তুলে তাকালে—একটু হাসলে। কিন্তু যেটা করা উচিত সেটা করলে না —অর্থাৎ নমস্কারটা করলে না আমিই নমস্কারটা করলাম—বললাম—নমস্কার।

মেয়েটির মুখ কেমন হয়ে গেল। সে চঞ্চল হয়ে উঠল। চঞ্চলতার মধ্যেই উঠে দাঁড়িয়ে বললে আমি আপনাকে প্রণাম করব।

বয়স হয়েছে, প্রণাম নেওয়া বয়সের একটা ধর্ম। দণ্ডতঃ ওটা কালের অধিকার। তার উপর কালের দণ্ডে প্রতিষ্ঠা যোগ হলে ও অভ্যাসটা খানিকটা কামেমী স্বার্থভোগীদের পর্যায়ে গিয়ে পড়ে। আমি বললাম কেন—প্রণাম কেন?

কিন্তু মেয়েটি এসে আমার ডেস্কের পাশে দাঁড়াল। চাতখানি উঁচাতে হল সেখানি নত হল। আমিও পা না বাড়িয়ে পারলাম না।

সে প্রণাম করে যেন খানিকটা সহজ এবং স্বচ্ছন্দ হয়ে সামনে গিয়ে বসল। তারপর বললে—কতদিন থেকে যে আপনাকে দেখতে প্রণাম করতে আমার ইচ্ছে। কিন্তু আসতে পারি নি! কেমন ভয় হয়েছে লম্বা হয়েছে।

আমি বললাম ভয়ের বা লজ্জার তো কিছু নেই। অন্য দাবী নেই আমার, বয়সের দাবীই আমার দাবী। তুমি ছোট বয়সে সেই দাবীতে এলেই পারতে।

আমি আপনাকে কিন্তু দাদা বলবো।

মনটা খুব প্রসন্ন হল না। কারণ প্রথমেই যেন একটু বেশী এগিয়ে অন্তরঙ্গ হতে চাচ্ছে বলে মনে হল। বোধ হয় সেটা ভ্রূভঙ্গীতে এবং মুখভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। সে বলেছিল রাগ করবেন না তো।

—না না। রাগ করব কেন। আমার ছোট মেয়ে তোমার থেকে অনেক বড়। আমার বড় মাতনী খুকু

KESORAM INDUSTRIES & COTTON MILLS LTD.

(Formerly : Kesoram Cotton Mills Ltd.)

LARGEST COTTON MILLS IN EASTERN INDIA

Manufacturers & Exporters of :

QUALITY FABRICS

AND

HOSIERY GOODS

Managing Agents :

BIRLA BROTHERS PRIVATE LIMITED

15, India Exchange Place, Calcutta-1.

Phone : 22-3411 (16 lines) Gram : COLORWEAVE

Mills at : 42, Garden Reach Road, Calcutta-24.

Phone : 45-3281 (4 Lines) Gram : SPINWEAVE

পুজোয়
আমার
প্রিয় স্কিন্ ক্রীম বোরোলীন কে
ভোলা অসম্ভব!

তার বয়স আঠারো হল। সুতরাং দাদা থেকে দাদু পর্যন্ত যা বলবে তাতে আপত্তির অধিকারই নেই আমার।

পরিবেশটা সহজ হয়ে উঠেছিল এবার।

সে বলেছিল আমি মনে মনে অনেকদিন থেকেই আপনাকে দাদা বলি।

বেশ ভাই বলো। কথা বলতে বলতে কখন যে তাকে তুমি বলতে সুরু করেছি সে খেয়াল আমার ছিল না। খেয়াল যখন হল তখন আপনি আজে ফিরিয়ে এনে দুজনের ব্যবধানটা বাড়িয়ে দুস্তর করে রাখবার উপায় ছিল না আর।

মহিমবাবুর হাতে সিগারেটের টিন ছিল সেটা খুলে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন আর ইনি হলেন সুদীপ ঘোষ। ইনিও ফাইন্যাল ইয়ার।

সুদীপ নমস্কার করলে।—আমিও প্রতি নমস্কার করলাম।

মহিমবাবু বললেন আপনার সময়ের অনেক দাম। বেশী নেব না। আসল কথা বলি। সুরুপা দেবী একখানা ছবি করতে চান। ওঁর মেয়ে আপনার গল্প নেবেন। আমারও অনেক দিন থেকে ইচ্ছে আপনার গল্প নিয়ে ছবি করি।

আমি বললাম কোন গল্প বলুন?

সুদীপ এবার বলল—মানে;—গল্প একটা লিখে দিতে হবে।

লিখে দিতে হবে?

হ্যাঁ। সুরুপা আইডিয়াটা বলবে। বা মহিমবাবুই বললেন—

আমি বাধা দিয়ে বললাম

করিনে।

সুরুপা ওই গদীর উপরেই দুখানা হাত একটু বাড়িয়ে বললে—এটা আপনাকে আমার জন্যে করতেই হবে!

—না। তা আমি করিনে—করব না!

কণ্ঠস্বর আমার একটু বেশী কঠিন হয়েই বোধ হয় উঠেছিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে ভঙ্গিতেও প্রকট হয়েছিল—মাথা নেড়েও অস্বীকারও করেছিলাম। যার ফলে অস্বীকৃতিটুকু একটা আঘাতের মত হয়ে উঠেছিল যার

Manufacturers of :

ENAMELLED HOUSEHOLD, KITCHEN & HOSPITAL WARE, SIGNS,

REFLECTORS OF ALL KINDS, CHEMICAL VATS ETC., ETC.

SUR ENAMEL & STAMPING WORKS PRIVATE LTD.

24, MIDDLE ROAD, ENTALLY,

CALCUTTA-14.

Phone :

24-4368, 4369, 4370

Gram :

"SURNAMEL" Calcutta.

গা ম্যাজম্যাজ • খিটখিটে • ক্ষুধামান্দ্য • মাথাধরা • গা ম্যাজম্যাজ • খিটখিটে • ক্ষুধামান্দ্য • মাথাধরা

কোষ্ঠকাঠিন্য?

ফিলিপ্‌স্ মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়া চমৎকার কাজ দেয় ফিলিপ্‌স্ মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়া চমৎকার

পাকস্থলীকে সুস্থ করে • নিঃশ্বাস সুগন্ধ করে পাকস্থলীকে সুস্থ করে • নিঃশ্বাস সুগন্ধ করে

গা ম্যাজম্যাজ • খিটখিটে • ক্ষুধামান্দ্য • মাথাধরা • গা ম্যাজম্যাজ • খিটখিটে • ক্ষুধামান্দ্য • মাথাধরা

ফিলিপ্‌স্ মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়া চমৎকার কাজ দেয় ফিলিপ্‌স্ মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়া চমৎকার

পাকস্থলীকে সুস্থ করে • নিঃশ্বাস সুগন্ধ করে পাকস্থলীকে সুস্থ করে • নিঃশ্বাস সুগন্ধ করে

গা ম্যাজম্যাজ • খিটখিটে • ক্ষুধামান্দ্য • মাথাধরা • গা ম্যাজম্যাজ • খিটখিটে • ক্ষুধামান্দ্য • মাথাধরা

ফিলিপ্‌স্ মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়া চমৎকার

পড়বার ও রাখবার মতো কয়েকটি বই

। রাজনীতি ও সমাজনীতি ।

কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেল্‌স্

প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ (১৮৫৭-১৮৫৯)

কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেল্‌স্ — **উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে** ১·৫০

ভি. আই. লেনিন — **প্রাচ্য জনগণের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন** ১·১২

সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ০·৮১

। সাহিত্য ।

রুশ গল্প সঞ্চয়ন
(রুশ সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ লেখকদের গল্প)
৬·০০

আধুনিক রুশ গল্প
(বিপ্লবোত্তর কালের সোভিয়েত লেখকদের গল্প)
৫·০০

ইলিয়া এরেনবুর্গ :
পারীর পতন ৮·০০
নবম তরঙ্গ ১ম খণ্ড ৪·৫০
২য় খণ্ড ৬·০০
৩য় খণ্ড ৭·০০

মিখাইল শলোহফ
ধীর প্রবাহিনী ডন ৯·০০
সাগরে মিলায় ডন
১ম খণ্ড ৬·০০
২য় খণ্ড ৭·০০

নরবুলিন আইনী
সেকালের বুখারায় ৪·০০
আমার স্মৃতিকথা ০·৫৬
সোভিয়েত প্রাচ্যের দশটি গল্প ০·৮৭

ইভান ইয়েফ্রেমভ
গল্প সংকলন ২·১৯

। বিজ্ঞান ।

আলেকজান্দ্র ভলকভ
পৃথিবী ও আকাশ ৩·৫৬

ভি. আই. গ্রমভ
অতীতের পৃথিবী ১·৬২

ইলিন ও গোপল
মানুষ কি করে বড়ো হল ৩·৫০

এ. কাজানভ
জানবদেহের গঠন ও ক্রিয়াকলাপ ৭·০০

ভি. ভি. লিয়াপুনভ
মহাবিশ্বের রহস্য ৩·০০

রুশ বিজ্ঞানকাহিনীকারগণ
চাঁদে অভিযান ৩·০০

লান্দাউ ও রুমার
আপেক্ষিকতার তত্ত্ব ১·৫০

ইয়াকভ পেরেলম্যান
অঙ্কের খেলা ৩·০০

শারদীয় বিক্রয় অভিযান উপলক্ষে মূল্য হ্রাস

আলেক্সি তলস্তয়ের উপন্যাস ত্রয়ী : **অগ্নি পরীক্ষা** : তিন খণ্ড একত্রে : ৫·০০

পিতের পাভলেংকো — **জীবনের জয়গান** ১·০০
আলেকজান্দার কুপরিন — **রত্নবলয়** ২·৭৫
লিওনিদ সলোভিয়েভ — **বুখারার বীরকাহিনী** ২·০০

ম্যাকসিম গর্কি : **নানা লেখা** ২·৫০

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

১২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
১৭২ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ । নাচনরোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর-৪

।। প্রগতি সাহিত্যের তালিকা ।।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তর কালের গল্প সংগ্রহ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষের দিকের পঞ্চাশটি সুনির্বাচিত গল্পের সংকলন।

অমরেন্দ্র ঘোষ

চরকাশেম

সুদিন কুটিল পল্লীর পটভূমিকায় জটিল উপন্যাস।

অরুণ চৌধুরী

সীমানা

পূর্ববঙ্গের মানুষের শাশ্বত পরিচয়ের পাঁচটি গল্প সংকলন। ১·৭৫

নবী ভৌমিক

চৈত্রদিন

দশটি গল্পের সংকলন।

বনফুলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

ক'টি কবিতা ও একলব্য

সাম্প্রতিকতম কবিতার সংকলন।

নরহরি কবিরাজ

স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা

পরিবর্ধিত ৩য় সংস্করণ ৫·০০

প্রমোদ সেনগুপ্ত

নীল-বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ভারতীয় দর্শন

মুজফ্ফর আহমদ

প্রবাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন

২·০ ।২·৫০

Our English Publications

Maurice Cornforth

Dialectical Materialism

Vol I	Materialism the Dialectical Method	2·75	Vol II	Historical Materialism	3·50
			Vol III	The Theory of Knowledge	3·75

Hiren Mukerjee

Gandhiji—A Study	5·00	India's Struggle for Freedom	8·00

Muzaffar Ahmad

The Communist Party of India And Its Formation Abroad 3·50

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

১২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

১৭২ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ ॥ নাচনরোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর-৪

কুশানু বন্দ্যোপাধ্যায়

অভ্র রোদ শুভ্র বিতান ৪·০০

শৈলেশ দে

নোঙর ৪·০০

হংস মিথুন ২·৫০

সুবোধ ঘোষ

বর্ণালী ৩·০০

(সিনেমায় রূপায়িত হচ্ছে)

জলকমল ৩·০০

চিরঞ্জীব সেন

মহাযুদ্ধের অন্তরালে ৪·০০

শৈলানন্দ মুখোপাধ্যায়

কনে চন্দন ২·৫০

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

পূর্ব পাড়ার মেয়ে ৩·৫০

নাগরী ৪·০০

কালোঘোড়া ৪·০০

বিমল কর

রৌদ্রছায়ায়

প্রভাতদেব সরকার

সায়াহ্নের সানাই

শক্তিপদ রাজগুরু

অনেক বসন্ত

একটি ভ্রমর ২·৫০

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বৌ ২·৫০

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

তারুণ্যের কাল ২·০০

রম্য-রচনা

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

লণ্ডন-প্যারিস ৫·০০

বাংলা উপন্যাসে

নতুন যুগ ●

● নতুন পটভূমি

নতুন ভঙ্গী ●

হলুদ পাখির ডাক

ফণিভূষণ আচার্য

বাতাসী পরাণের বউ। কিন্তু ঘর করে বংশীর সঙ্গে। আবার বংশী যে জমিন চাষ করে, তাও তার নিজের নয়। অথচ মাটির প্রতিরোধকে চুরমার করে সে ফসল ফলাবে—এই তার প্রতিশ্রুতি। তার সংগ্রাম মানুষের সঙ্গে নয়, মাটির সঙ্গে। এমন সময় হলুদ পাখিটা ডাক দিল। কিন্তু কেন?

বংশী, বাতাসী, পরাণ, মধুয়ার বউ—এদের কি পাঠক কোনদিন ভুলতে পারবেন?

দাম: তিন টাকা

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের

সুনন্দা

বঞ্চনা ও দম্ভের কুটিল জগতে প্রেমের রূপ রূপকারের জন্যে সংকীর্ণ হলেও হঠাৎ একদিন নিয়তির কঠিন আবরণ উন্মোচন করে চিরন্তন প্রেমের স্বাভাবিক গতিতেই সুনন্দা উত্তীর্ণ হয়েছিল বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে। আধুনিক বাংলার শক্তিশালী কথাশিল্পী সুধীরঞ্জন সে প্রত্যয়ের উজ্জ্বল চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন এই উপন্যাসে।

দাম: তিনটাকা

নতুন উপন্যাস

শক্তিপদ রাজগুরু

আকাশের রঙ

রাতের অন্ধকারে যারা রাজা উজীর সাজে, কর্ণের ভূমিকায় দর্শকদের চোখ অশ্রুসজল করে তোলে, অথচ বাস্তব জীবনে নিদারুণ হতাশার বোঝা বয়ে চলে সঙ্গোপনে।

যাত্রার দলের এমনি বহু বৈচিত্র্যময় ভ্রাম্যমাণ জীবনের একটি সার্থক রূপায়ণ।

দাম: তিন টাকা

রবীন্দ্র লাইব্রেরী : ১৫।২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

আঘাতে ওরা সকলেই একটু চমকে উঠে নির্বাক হওয়ার মত চুপ করে গিয়েছিল।

সুদীর এবং মহিম এ-ওর কানের কাছে ফিস ফিস করে কথা বলেছিল কিছুক্ষণ। সুরুপা জানলের ছকের উপর দৃষ্টি রেখে বসেছিল।

সুদীর এবং মহিমের পরস্পরের মধ্যে কথা শেষ হ'লে মহিম বলেছিল আমরা কোন হিরোইন প্রধান বই খুঁজছি। সে রকম বই আপনার—

—আছে। পড়ে দেখতে পারেন।

—আপনি একখানা পছন্দ ক'রে দিন।

আমি দু তিন খানা বইয়ের নাম করলাম। সুরুপা অকস্মাৎ মাথা তুলে বলে উঠল—না। উঠুন। আচ্ছা আসি।

বলে কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলেছিল—প্রণাম করব।

—আবার কেন?

—এইটেই তো নিয়ম। আর আমার ইচ্ছেও বটে। নইলে মনে হবে আপনিও রাগ ক'রে রইলেন। আমিও রাগ ক'রে চলে গেলাম।

—বেশ প্রণাম কর।

প্রণাম ক'রে চলে গিয়েছিল। জানলা দিয়ে দেখছিলাম সুরুপা নিজেই মোটরখানা ড্রাইভ ক'রে চলে গেল।

এইখানেই শেষ নয়। আরও দিন দুয়েক সে এসেছিল। টেলিফোনও করেছিল।

কথা সেই এক কথা। গল্পটা লিখে দিতে হবে।

আমি "না" বলে থাকি, এমন ক্ষেত্রে ধরেও থাকি, ধরেই ছিলাম। "না"ই বলেছিলাম।

টেলিফোনে শেষ পর্যন্ত বলেছিল—আপনি অন্তত: শুনুন।

—না।

—কেন? একটা কাহিনী শুনে লিখবেন—। লেখেন না?

—লিখি। শোনা কাহিনী নিয়ে নিশ্চয় লিখেছি। কিন্তু ছবির জন্যে লিখি না—লিখব না।

—শুনবেনও না?

—না।

আপনি যা—। থেমে গেল সে।

বঙ্গীয় যক্ষ্মা হাসপাতালে
সাহায্য করুন

প্রেসিডেন্সী টাইপ ফাউণ্ড্রী
পি-১৪, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১।

সকল রকম বস্ত্র, পোষাক, বেনারসী শাড়ী,
শাল, আলোয়ান, গেঞ্জি, সোয়েটার,
গরদ, তসর, ইত্যাদি বিক্রেতা

রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল
প্রাইভেট লিমিটেড
২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, বড়বাজার, কলিকাতা-৭
ফোন: ৩৩-২৩০৩

আমাদের প্রকাশিত কয়েকখানি উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থ

সুবোধ ঘোষের
নিকষিত হেম

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের
চেনা অচেনা মুখ ২·৫০
যে রাঙে আকাশ রাঙা ২·৫০

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর
পান্থ নিবাস ৩·০০

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
সীমা স্বর্গ ২·৫০

ঔপন্যাসিক রমেশ দত্তের
সংসার ৩·০০

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের
গোধূলি লগ্ন ৩·০০

সমরেশ বসুর
ছোট ছোট ঢেউ ২·০০

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের
মানসী ৪·০০
বসুধারা ৪·০০
নূতনের অভিষেক ২·০০
প্রিয়তমা ২·০০
পাথর আলো ২·০০
সোহাগ প্রদীপ ৩·০০
রায় পাড়ার রোম্যান্স ২·৫০
আগমনী ২·০০

বেলা দেবীর
দ্বিধারা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
নবনীতা ৩·০০

বিমল করের
জননী

শক্তিপদ রাজগুরুর
অঙ্গরাগ ২·০০

শৈলেশ দের
স্বপ্নবাসর

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের
হলুদ শ্যামল ২·০০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
বিদ্যুৎলতা ২·৫০

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অমৃতস্য পুত্রাঃ ২·৫০

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের
চক্রবাক ২·৫০
কাঁচের পুতুল ২·৫০
অন্তরময়ী ২·৫০
অনুরাগিনী ১·৫০
রূপ ও রূপা ২·৫০

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নববধূ ২·৫০

মহাকবি সেক্সপীয়রের
কয়েকখানি নাটকের
উপন্যাস রূপ

প্রতি খণ্ডের দাম—
দুই টাকা মাত্র

ওথেলো
ম্যাকবেথ
হ্যামলেট
সিম্বেলিন
কিং জন
দি টেম্পেষ্ট
কিং লিয়ার
কোরিওলেনাস
রিচার্ড দি থার্ড
রোমিও জুলিয়েট
জুলিয়াস সীজার
দি উইন্টার্স টেল
টেমিং অব্ দি শ্রু
মার্চেন্ট অব্ ভেনিস
টুয়েলফথ নাইট
মেজার ফর মেজার
টিমন অফ্ এথেন্স
হেনরী দি এইটথ
কমেডী অফ্ এরর্স
অ্যাজ ইউ লাইক ইট
অ্যান্টনী এণ্ড ক্লিওপেট্রা
মাচ অ্যাডো অ্যাবাউট নাথিং
টু জেন্টলমেন অফ্ ভেরোনা
এ মিড সামার নাইটস্ ড্রিম

বিমল দত্তর
নায়ক নায়িকা ২.৫০

অপরিচিতা ২·৫০

মহাকবি কালিদাসের
ত্রিবেণী ৩·০০

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস
৫।১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

পৃথিবীতে মানুষ যখন প্রথম আসে, তখন হইতেই সে তাহার চারিপার্শ্বের দৃশ্যাবলী অঙ্কন করিয়া রাখিতে সচেষ্ট হয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগে কাষ্ঠফলকের উপর মানুষ কর্তৃক খোদিত ছবি ও লেখার বহু নমুনা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ আবিষ্কার করিয়াছেন।

প্রস্তরযুগে এই অসংস্কৃত সহজাত শিল্পটি সুস্পষ্ট এবং বস্তুতান্ত্রিক হইয়া উঠে, যাহা হইতে ইহা ধারণা করা যাইতে পারে যে, মানুষ খোদাই-শিল্পকার্যে সেই সময়েই কতকটা ব্যবহারিক জ্ঞানলাভ করিয়াছিল।

সেই যুগে মানুষ তাহার পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন সম্বন্ধে কিছু লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিল কিনা তাহা বুঝা যায় না, এবং আজ পর্যন্ত তাহার কোন প্রমাণও পাওয়া যায় নাই।

আধুনিক যুগে মুদ্রণ-শিল্প যেমন উন্নতি লাভ করিয়াছে তেমনি ইহা তীব্র প্রতিযোগিতারও সম্মুখীন হইয়াছে। এখন কাজ কেবল সুন্দর ও পরিপাটী হইলে চলিবে না, অধিকন্তু কাজ যথা সম্ভব দ্রুত সম্পন্ন করাও চাই।

○ নিখুঁত মুদ্রণ

○ সুন্দর ডিজাইন

○ সময় সরবরাহ

লিওনার্ড কার্ড-বোর্ড বক্স ফ্যাক্টরী প্রাইভেট লিঃ

প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড কার্ড-বোর্ড বক্স মেকার্স

১/১, গ্যালিফ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৩ ফোন ৫৫-১৮৬১

For High Class

PAINTS : PIGMENTS : VARNISHES

Rely on :

UNACCO PRODUCTS

UNITED ANILINE & CHEMICAL CO.

HOWRAH

Telephone : 66-2475

—কি? যা চাই তা দেবে? অর্থ তোমার হয়েছে—রাখ। আমি চাইনে। তুমি আর টেলিফোন করো না।

আর টেলিফোন সে করেনি। দেখাও করেনি। আমিও সুরূপার কথা মনে রাখিনি। সুরূপা ছবির ক্ষেত্রে এমন কিছু করতেও পারেনি—যাতে সে তার কথা আমাকে মনে করাতে পারে। তবে মধ্যে মধ্যে কাগজে সিনেমা পত্রিকায় সাপ্তাহিকে সুরূপার ছবি দেখেছি। অনেক ছবি বেরিয়েছে। কিন্তু তা নিয়ে তার সঙ্গে সেদিনের কথাগুলি কোনক্রমেই জেগে উঠেনি। মনেও হয়নি—সেদিন তার অনুরোধটা রাখলেই হত।

আজ দু-আড়াই বছর পরে টেলিফোন পেয়ে একটু চকিতই হলাম। এই দু আড়াই বছরের মধ্যে মেয়েটির নিশ্চয় খুব জোর দৌড়েছে জীবনে। জুয়ো খেলতে যে সব ঘোড়া রেসে দৌড়োয় তাদের মত। অনেক যত্ন অনেক পরিচর্যা অনেক খরচ করেও এই ভাগ্যবান ভাগ্যবতী অশ্ব ও অশ্বিনীকুল যেমন রেসে নেমে—মুখ থুবড়ে পড়ে মরে—তেমনি ভাবেই দৌড়ুতে গিয়ে সুরূপা মুখ থুবড়ে পড়েছে। টি বি হয়েছে। হাসপাতালে মরছে। সুরূপাও ওই রেসের ঘোড়া। টি বি অনাহারের রোগ, অনাচারের রোগ। অনাহার সুরূপার নিশ্চয় ছিল না।

কিন্তু আশ্চর্য! আমাকে স্মরণ করেছে শেষ সময়ে।

কেন?

মেয়েটিকে মনে পড়ছে। রূপশাস্ত্রের যে ব্যাকরণ সে অনুযায়ী মেয়েটি সুন্দরী নয়; কিন্তু একটি শ্রীময় ক্লান্ত লাবণ্য আছে। রঙটি উজ্জ্বল শ্যাম। মাথায় মেয়েটির লাবণ্যের সব থেকে বেশি মাধুর্য তার সর্বাঙ্গব্যাপী একটি বিষণ্ণ ক্লান্তিতে।

চোখ দুটি আশ্চর্য স্বচ্ছ।

টি বি হয়েছে। তবে কি বীজ তখনই তার মধ্যে প্রবেশ করেছিল? করে থাকলেও তা মনে হয়নি। কোন সন্দেহ হয়নি।

গত দুবছরের মধ্যে খবর আমি না রাখলেও কিছু কিছু খবর আপনি আপনি কানে এসে পৌঁছেছে। ওই রেসে দৌড়ুনোর মত দৌড়ুনোর খবর। কিন্তু মৃত্যুশয্যায় সে আমাকে স্মরণ করলে কেন? বিস্ময়বোধ করছি। সঙ্গে সঙ্গে তার সেই বিষণ্ণ ক্লান্তিটুকু স্মরণ করে বেদনাও অনুভব করছি।* (ক্রমশঃ)

* উপন্যাসটি বৃহদাকার হওয়ায় শারদীয় সংখ্যায় একত্রে প্রকাশ করা সম্ভব হল না। 'বিংশ শতাব্দী'তে ধারাবাহিক ভাবে এটি প্রকাশিত হবে।

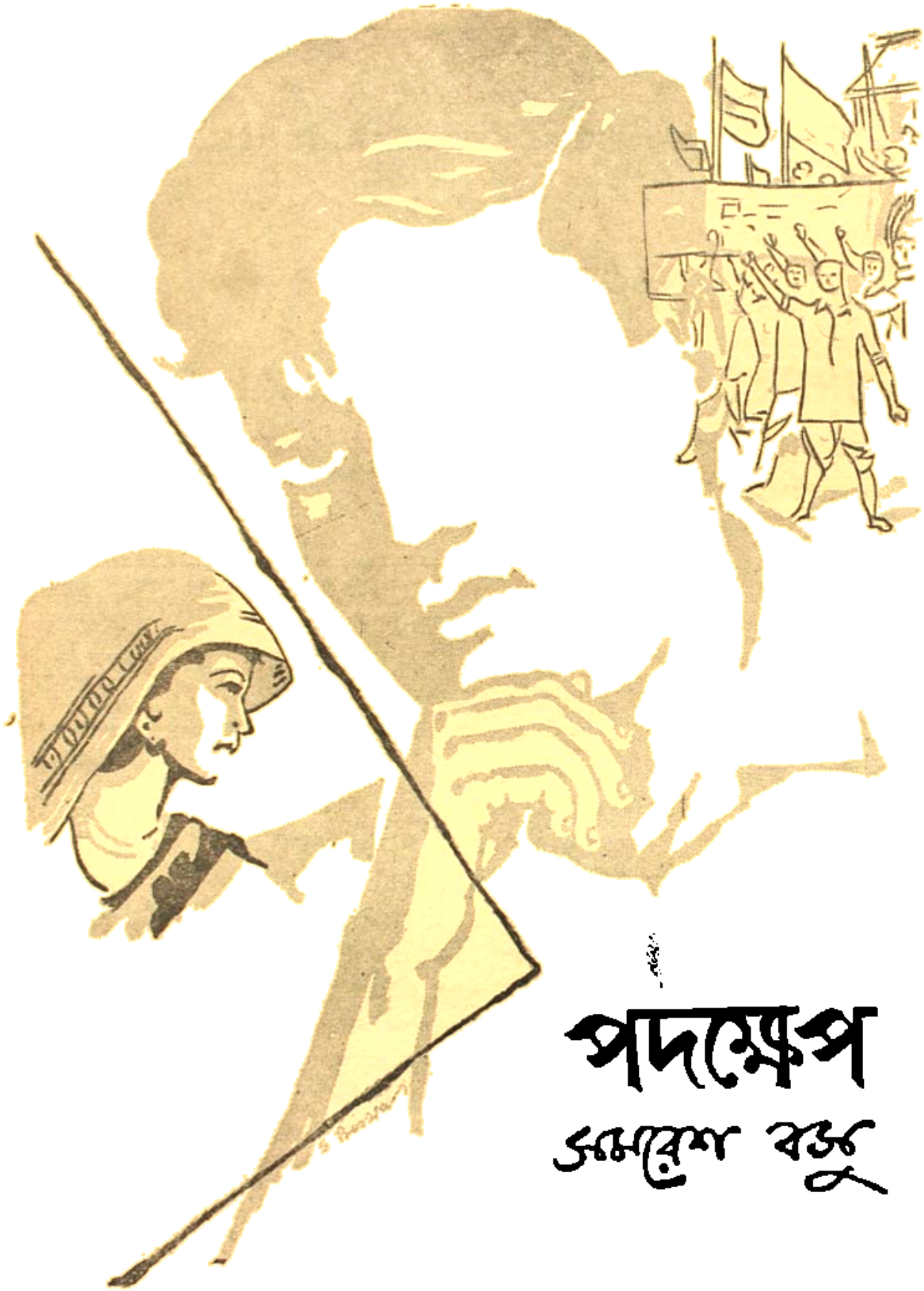

পদক্ষেপ

সমরেশ বসু

—এক—

উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালের নভেম্বরে কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরবেলা।

একটু একটু শীত পড়তে শুরু করেছিল কিছুদিন আগে থেকেই। হেমন্তের প্রান্তে এসে বেশ জোরেই ধাক্কা দিচ্ছে শীত। শীতের আমেজ লেগেছে মানুষের দেহে। সকাল সন্ধ্যায় গায়ে জড়ানো কাপড় গরম হয়ে না উঠলে কেমন একটা অস্বাস্থ্যকর আমেজে জড়ো ভাব লাগে। এলিয়ে পড়তে চায় গা' হাত পা'। পরিশ্রমের ক্লান্তিকে মনে হয় নেশার খোয়ারীর মতো।

সেদিন ভোরবেলা বাতাসের পথ বন্ধ করে ছড়িয়ে পড়েছে কুয়াশা। সূক্ষ্ম বৃষ্টির ছাটের মত অবিরল ধারে ঝরে পড়ছে। উত্তরে হাওয়ার গতিকে রুদ্ধ করে ক্রমশঃ যেন ভারী হয়ে আসছে।

রাস্তাঘাট ভিজে উঠেছে, প্যাচ প্যাচে হয়ে গেছে। জল ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়ছে টালি টিনের শেড্, বেয়ে, গাছের গা পাতা বেয়ে, পুত্র শোকাতুরার নীরব কান্না—ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুর মত।

উত্তরে হাওয়া নেই, শীত নেই, আছে শ্রাবণের মৃদু ধারার মত তমসাচ্ছন্ন—মেঘ মুদুর ঠাণ্ডা ভাব।

বিরক্তিকর প্যাচ-প্যাচানি, স্যাঁত-স্যাঁতে অন্ধকার কাদাময় রাস্তা। ধুলো ভিজে ভিজে রাস্তা হয়ে উঠেছে কাদাময়। তেরশ' পঞ্চাশের শিশু ভিখারির মত আঁচলে কাদা জড়িয়ে পড়ে পায়ে পায়ে।

উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালের নভেম্বরের কুয়াশা ভেজা ভোরবেলায় রাস্তার কয়েকটা লাইটের আলো তখনো নেভেনি। যেন জাগেনি সকালবেলার মানুষেরা, যেন রাত্রির হয়নি শেষ। সাড়া দেয়নি—ঘুম ভাঙানিয়া পাখীর দল।

প্রাণহীন নিস্তব্ধ রাস্তা আর বাড়িগুলি যেন, আচ্ছন্ন হয়ে আছে তমসাবৃত রহস্যের মধ্যে। নিস্তব্ধ হয়ে আছে গায়ে গায়ে ঘেষা সারি সারি চটকলগুলি, নিঃশেষে ছাই হয়ে গেছে বয়লারের গনগনে অনির্বান আগুন। তার সোঁ সোঁ নিঃশ্বাস শুনা পড়ছে না।

মৃত গতায়ু অগ্নি দানব। মৃত সাপের মত গা' এলিয়ে দিয়ে পড়ে আছে সুদূর প্রসারি রেললাইন—স্পন্দন-হীন শিরা উপশিরা। কুয়াশায় ভিজে গেছে পাথর, স্লীপার, লৌহ অজগরের সর্বাঙ্গ। ঘুমন্ত লৌহ অজগর। ইঞ্জিনের শব্দ নেই, ধোঁয়া নেই, রেল পথ পড়ে আছে অসীম তেপান্তরের চক্রবাল অবধি। এ যেন এক তমসাচ্ছন্ন ঘুমের দেশ, কুয়াশা কুহক স্বপ্নপুরী। জীবন কাঠি পায়ে রেখে মরণ কাঠি শিয়রে নিয়ে ঘুমিয়ে আছে তার রাজকুমারী। তবু স্বপ্নপুরীর অনুতে অনুতে রয়েছে প্রতীক্ষা—কখন আসবে পক্ষীরাজের সওয়ার। জীবন কাঠি ছোয়াবে মাথায়। জাগরনের চুম্বন রেখা গভীর করে এঁকে দেবে রাজকুমারীর চোখে। তারপর জাগবে স্বপ্নপুরী, জাগবে ঘুমের দেশ, কল কোলাহলে উঠবে ভরে, অফুরন্ত জীবনের সাড়ায় পাবে প্রাণ!

পায়চারি করা ছেড়ে দিয়ে এবার নেমে এল সে স্টেশনের প্লাটফরম্ থেকে। মোংরা শার্টের গলার বোতামটা দিল বন্ধ করে। লম্বা লম্বা চুলগুলি-দু'হাত দিয়ে টেনে দিল পিছনে। সামনেই মিউনিসিপালিটির কলে এসে হাতল ঘুরিয়ে দেখল জল নেই।

রাত্রি জাগা ক্লান্ত মুখের ওপর ফুটে উঠল বিরক্তি হতাশা। স্টেশনের কলেও জল নেই, নেই রাস্তার কলেও! ব্যাপারটা কি! জিব দিয়ে ঠোঁটটা চেটে ঢোঁক গিলল সে। তেষ্টা পেয়েছে তার।

আমেরিকান খাকী রং প্যান্টের পকেটে দু'হাত ঢুকিয়ে সে তার অনুসন্ধানী দৃষ্টিটা তুলে ধরল শুন্য নির্জন রাস্তার দিকে। হাঁ—আছে জল। এগিয়ে গেল সে ঘোড়ার গাড়ীর ষ্ট্যাণ্ডের দিকে: ঘোড়ার জল খাওয়ার পাত্রটা

বেশ ভরে উঠেছে কানায় কানায়, পরিষ্কার টলটলে জল—স্বচ্ছ সাদা। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে জামার আস্তিনটা গুটিয়ে ভাল করে চোখ মুখ ধুয়ে নিল সে। ঘোড়ার জল বলে কেমন একটা ঘেন্না হল তার খেতে। কিন্তু তেষ্টা পেয়েছে অসম্ভব। সেই কাল মাঝ রাত্রি থেকে তেষ্টা চেপে রেখেছে সে।

ঘোড়ার জলটা খেতে একটু লজ্জাও করছিল। লোকে দেখলেই বা কি-ভাববে!

কিন্তু লোকজন রাস্তায় ছিলই না বলতে গেলে। রিকশা স্ট্যাণ্ডের কাছে দুটো রিকশার উপর বসে বসেই দু'জন কথা বলছে, আর একজন মুখে গামছা চাপা দিয়ে ঘুমচ্ছে ঘোড়ার আস্তাবলের শেডটার নীচে। আরও খানিকটা দূরে এক বোপা দম্পতি ঘরের বারান্দায় উনুন ধরিয়ে দিয়ে কথা বলছে। ধোপানীর কোলের ভিতর থেকে মাঝে মাঝে একটা কচি ছেলে হাত উঠছে। আবার গিয়ে পড়ছে তার বুকের উপর।

মোড়ের মাথায় পুলিসটাও অন্যদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে লক্ষ্য করছে না কেউ।

খাব না খাব না করেও আঁজলা আঁজলা খেয়ে নিল সে। ঘোড়ার জলদানটা থেকে বেশ পেট ভরে জল খেয়ে একটা ঠাণ্ডা নিশ্বাস ফেলল, আঃ।

জামা দিয়েই মুখ হাত মুছে আবার সে ফিরে গেল ষ্টেসনে। ধূমায়িত কুকারের হাতা ধোঁয়া চা ষ্টলটাকে কেমন যেন মায়া দিয়ে ভরে দিয়েছে। পকেটে পয়সাও আছে কয়েক আনা। এক কাপ চা আর একটা নোনতা বিস্কুট হয়ে যাবে নিঃসন্দেহে।

—একটা চা দাও তো! ষ্টলের বেঞ্চিটায় বসে পড়ল সে।

গতকাল রাতে ঢাকা মেলে এসেছে নৈহাটি পর্যন্ত। শ্যামনগরে গাড়ী দাঁড়ায় না বলেই নৈহাটিতে নামতে হয়েছে তাকে। সকালের কোন লোকাল গাড়ীতে যাবে শ্যামনগর—এই কথাই এঁচে রেখেছিল মনে মনে।

কিন্তু গাড়ী বন্ধ। গাড়ী চলছে না। কলকাতায় গোলমাল। ছাত্ররা নাকি ধর্মঘট করেছে সেখানে। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের কাকে নাকি বন্দী করে রাখা হয়েছে, তারই মুক্তির দাবীতে—সারা কলকাতাই নাকি

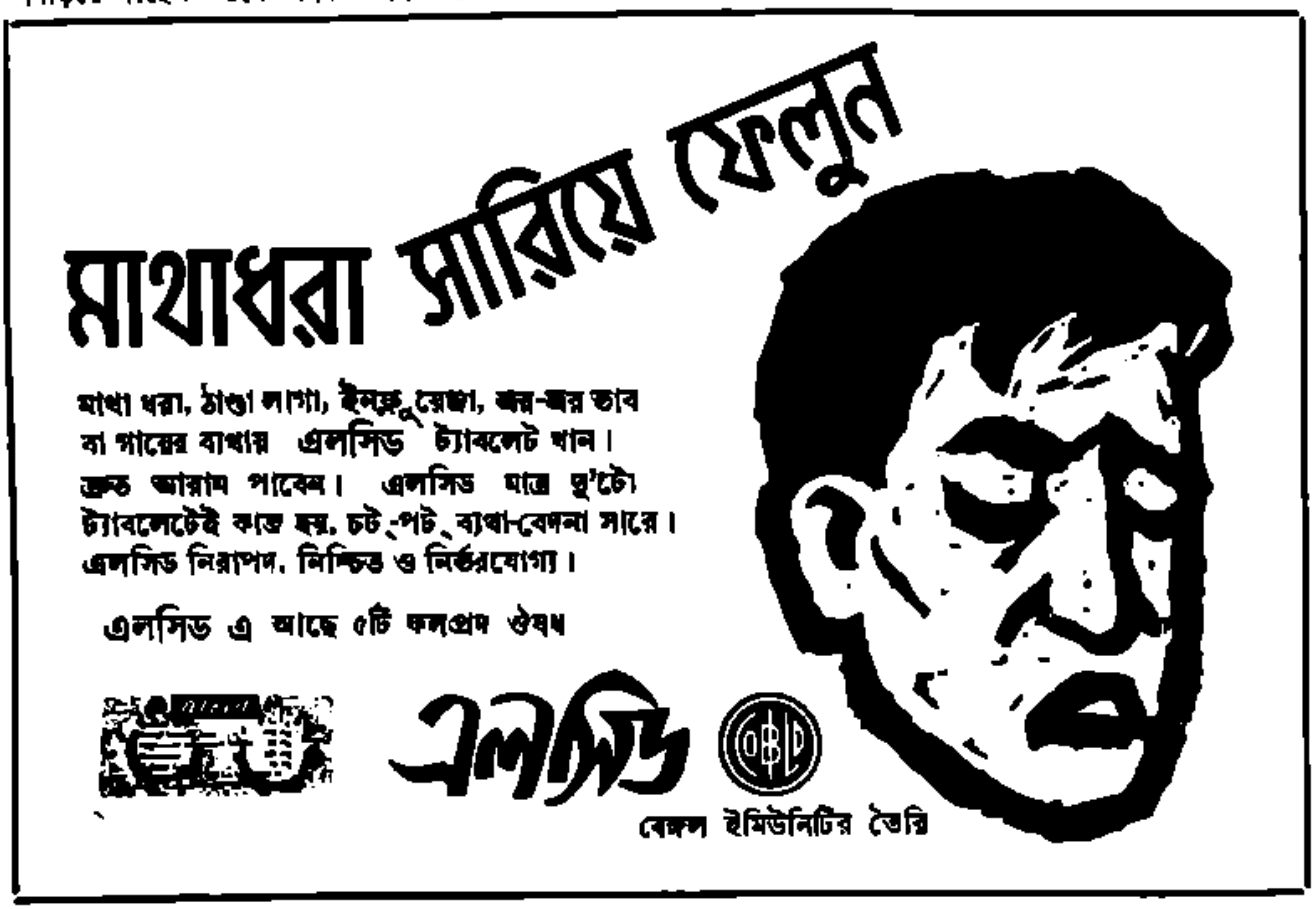

ছেলে সাইকেল
সবাইকে নয়—সমস্ত
বন্ধ করে দাও।
শুনে তার বুকের ধড়ফড়ে
কেন উঠেছিল—সে
বলেছিল—ঠিক আছে।
এসেছিল ষ্টেশন থেকে ধরে হাঁটতে শুরু
করেছিল গ্রামের ধারের উদ্দেশ্যে। কিন্তু কবিনাড়ায় এসে—
তার মনটা খিঁচিয়ে গেল, কেমন একটা দুশ্চিন্তায়
অবসন্নতায় বসে পড়ল সে অভিমানে
বুকের ভিতরটা টন্ টন করে উঠল কোথায়
যাবে—কেন
তার কাছে

নয়—আর সেটা

অতবড়
সংকেতে বার খিঁচিয়েছিল
নয়—একেবারে অপ্রস্তুত কিছু
করেছিল —নানান কাছের কথা
আসতে চাবে, ওটা আসতে চাবে—এটা শেষে—

সে চল প্রথম পক্ষের একমাত্র
দিয়াছে দ্বিতীয় পক্ষ পেয়েছি অবকাশে একলেমিছাড়া
এবার চল তৃতীয় পক্ষ ভয় এটা
কাছে বড় কঠিন নিছক বলে মনে চল
ব ব ব আবার দিয়ে

একটি আশ্চর্য ঘটেছিল
চোখে আমার মাঝে
হয়েছে—বয়েস হয়েছে এখন
হয়েছে সে এবং তার চোখে কালো
কাকের মতো কালো
চটকলে কাজ করে
ঘোঁকরা করে নিয়েছিল

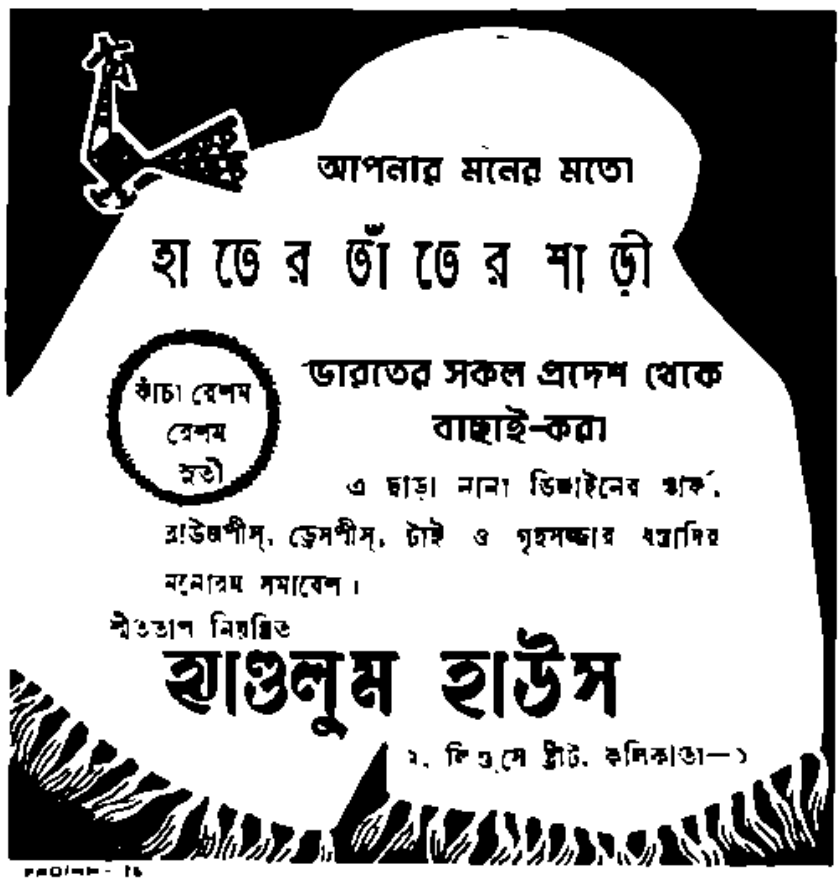

সকলেই উৎসুক হয়ে চেয়ে আছে—দিকে
কোলাহল।

তার পাশ দিয়ে একটা মিলিটারী ট
—গোঁ গোঁ করতে করতে ঢুকে পড়ল

সে এগিয়ে চলল—যেদিক থেকে সে
ইনকিলাব—জিন্দাবাদ!

শব্দটার মধ্যে যেন কী এক মাদকতা আছে, আছে রোমাঞ্চ, আছে রক্ত-দাহী জোয়ারের কলরোল।

—একলো: দুয়োরিল ধারে
আর ভাড় করো না বাপু।
চলেছেন হন্ হন্ করে।
ভদ্রলোকের কথা শুনে।

কোলাহল ভেঙে পড়ল তার কানের কাছে যেন মোড়ের মাথায় দেখা দিয়েছে মানুষের মাথার ঢেউ। মানুষ—মানুষ আর মানুষ। এত মানুষ এল কোত্থেকে! মানুষের ঢেউ এগিয়ে আসছে—উত্তাল তরঙ্গের মত, আসছে যেন বক্তাক্ত সমুদ্রের মন্থনের

ঢেউ আসছে—বিপুল বেগে
আর কাছে।

সে চেনে এ পতাকাগুলি—পরিচয় আছে পতাকা গুলির সঙ্গে—কিন্তু একসঙ্গে কোনদিন বাঁধা নতুন ব্যাপার মনে হল তার।

—বসির আলীকো—ছোড়
ক্রুদ্ধ সমুদ্রের গর্জন ঢেউয়ের আসাতে
তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল ক্রমশ
কেল্লা—ছোড়

গানের যেন শব্দ করে চলতে লাগল কথাগুলি। একটা আবেগে উত্তেজনায় তার বিশুষ্কপ্রায় ঠোঁটের কাঁকে হাসি উঠল কেঁপে কেঁপে। তারপরে ক্লান্ত নিষ্প্রভ চোখ চকচকিয়ে মনে হইল বাবার কথা—তার বিয়ের কথা। তারপর সেই কথা গেল ভুলে। এগিয়ে গেল সে আরও কয়েক পা।

—হট্ যাও ভাই, পুলিশ মারপিট করেগা তো....
দুরন্ত দুর্ভাবনায় বাপ—দুশ্চিন্তায় সাবধানে

...ঘেয়ে—বুড়ো ...ঘোড়াটা
...—বোধ হয় পেছনের পা'
মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে চোখের দৃষ্টিটা তার ঘোলাটে হয়ে
দেখল—সওদাই তার মনিব ইসাক চলেছে,
চারধার করছে ওই ভিড়টার মধ্যে সে ভাবলো বুঝি
তাকেই ডাকছে—গলাগাল দিচ্ছে। দৃষ্টিটা আর একটু
হয়ে গেল তার সে তো আর এখন গাড়ী টানে
না—তবে তাকে ডাকবে কেন। এ রাগ কিসের জন্য?
চাইতে না চাইতে দু' পা এগিয়ে এল সে।

তার সামনে এসে
অস্পষ্ট হয়ে গেছে—শুধু ধূসর
মেঘের মত পাগলো কানে।
হাতে আর একটা পা বাড়িয়ে
সেই উত্তাল জল স্রোতের সঙ্গে ভেসে
গেল, ভেসে গেল যেন কুল-কিনারাহীন অকূল সমুদ্রের
ঢেউতে। অজস্র ঢেউয়ের ধাক্কায় ভেসে গেল।
বিধা প্রশ্ন নেই,
চলেছে সওদের সঙ্গে
ভেসে নিতে
চলো চলো।
সাইরেন মেনে এল যেন কাঁকিনাড়ার ছোট্ট ষ্টেশনটায়
নেমেছে। মাটি নড়ে উঠল, গাছের পাতা
ষ্টেশনের ওভার ব্রীজের টিনের শেড ঝন্ ঝন্ করে
প্রতিধ্বনিতে।

...কে ঝাঁকে ছুটে আসছে

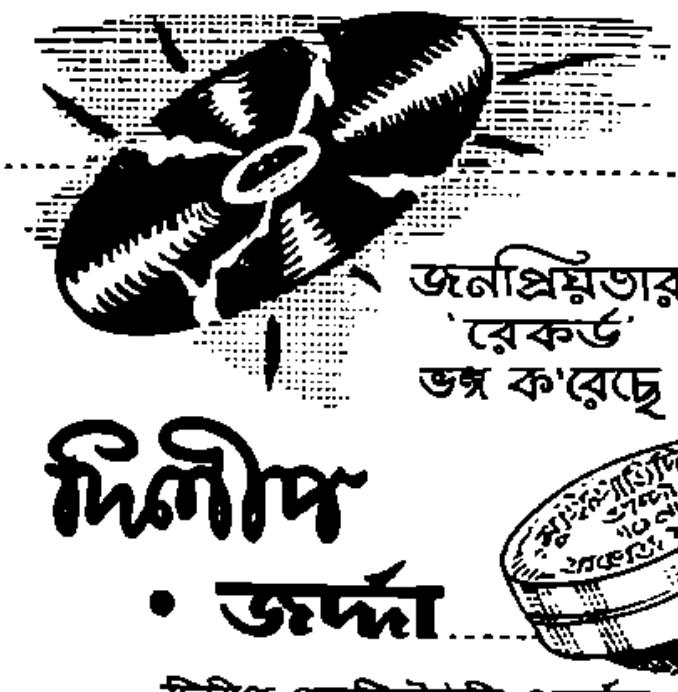

জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

এক, দুই, তিন, চার...বন্দুকের চারটে গুলি। জন উড়িয়া, একজন হিন্দুস্থানী...

সেই ছেলেটিও পড়েছে মুখ গুঁজে।

চেপে—দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে চাটুই লং প্যান্টটা রক্তে ভিজে উঠেছে।

হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠল—সাউ সাউ করে উঠল লেলিহান শিখা ষ্টেশনের ইমারতে।

—তোমার নাম কি ভাই?

ঘাড়ে তুলে নিল তাকে

ব্যথায় দম আটকে—তার চোখ ফেটে দু' ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল মাটিতে—রক্তের উপর। চেষ্টা করল সুস্থ গলায় বলতে, মহিম!

দাঁতে দাঁত চেপে দম নিয়ে, আবার জিজ্ঞেস করল মহিম, আগুন লাগালে কারা?

—আমরা লাগাইনি। পুলিশ গুলি চালাবার সাথে সাথেই জ্বেলে রাখছে আগেই।

ঘাড় এলিয়ে দিয়ে বেহুঁস হয়ে পড়ল চিন হল অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে গেল তার কান থেকে।

দূরে—বহুদূরে চলে যাচ্ছে জনতার তরঙ্গায়িত গর্জন।

মুক্তার নিস্তব্ধতা এসে অধিকার করে নিল তাকে। অন্ধকার পাতালের বিরাট গহ্বর যেন গ্রাস করে নিচ্ছে যেন

—দুই—

ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে এক রবিবারে মহিমের বড় কাকা সন্তোষ এল হাসপাতালে মহিমকে নিতে। আজ প্রায় একমাস পরে মহিম ছাড়া পাচ্ছে হাসপাতাল থেকে। পাটা সেরে গেছে প্রায়। তবু একেবারে কোন ভরে চলতে পারে না। প্লাষ্টার জড়ানো আছে আর অন্ততঃ মাসখানেক রাখতে হবে প্লাষ্টারের একটু রেশ হয়ে গেছে মহিম তাই একটু চোখের কোল দুটো বসা, দৃষ্টিটা গভীর হয়ে

THE INRUPEXCO

The Agents for

RUSSIAN PRINTING MACHINERY

P-16, BENTINCK STREET,
CALCUTTA-1.
Phone : 23-5198

উঠেছে। উদাসীনতায় ঢেকে আছে দুখটা
বিশেষ-কিছু দুখে—তবু অভিমানের
ছড়ানো রয়েছে—শান্ত গম্ভীর।

এইবার নিয়ে তৃতীয় পক্ষ এবং এল তার
কাকা। এসে বসল তার বিছানার কাছে, সাদা ধবধবে
টুলটায়। বসে তাকাল মহিমের দিকে। তাকাল
আড়চোখে—যেন মহিম দেখতে না পায়।

মায়া হল মহিমের দিকে চেয়ে। মমতা হল
সন্তোষের। মনে পড়ছে মহিমের মাকে। তার প্রথম
বউদিকে। সন্তোষ তখন ছোট, এখনকার মহিমের চেয়ে
কিছু ছোট। সব থেকে ছোট ভাই প্রাণতোষ বেঁচেবর্তে
ছিল না সংসারে—তাই সেটা সংসারই ছিল না, ছিল
একটা হোটেলবাড়ী। দুর্ভিক্ষী লক্ষ্মীর মত মহিমের মা
এসে পুনরুদ্ধার করল সংসারের অতীতের শ্রী—লক্ষ্মীশ্রী।
বাড়ীঘর হয়ে উঠল ঝকঝকে তকতকে সাজানো গুছানো।
গোবর দিকানো উঠোনে—আঁটালে মাটী প্রলেপ বুলোন
দাওয়া। মড়া তুলসী গাছটায় এল প্রাণ, বাড়ি পড়তে শুরু
করল প্রতি সন্ধ্যায়। একটি মেয়েমানুষ যেন ঘাড় ঘুরিয়ে
দিল বাড়ীটার। এই উলটপুরাণ সংসারটার আমূল দিল
বদলে।

আর সেই তিন ভাইয়ে মিলে নাকের জলে চোখের
জলে ধোয়া করবার জন্য ঘা ঘরে ঢুকতে হয়নি কোনদিন।
আরাম করে দাওয়ায় বসে বসেই অলস হাওয়ার গায়ে
গন্ধ পেত ঘণ্টা-চারেক আগে। ক্ষিদে না থাকলেও সেই বউদির
রান্নাই ক্ষিদের উদ্রেক করত। সে ক্ষিদেও আবার
একেবারে অসহ্য ক্ষিদে। প্রাণতোষ তো মায়ের শোকটা
বউদিকে পেয়েই ভুলেছিল।

শুধু তাই নয়। মহিমের মা আসার কিছুদিন পরেই
মহিমের বাবার চাকরী হল। ভাগ্যবতী ছিল তার বউদি।
মহিমকে ষোল বছরেরটি রাখি বউদি চোখ বুজল।

সেই মহিম। অভিমান ক্ষুব্ধ রোগা মুখখানি। কি
ভাবছে মহিম! এত করুণ এত চিন্তিত কেন ও!

সন্তোষের মনে পড়ল দাদার তৃতীয় বিবাহের কথা।
তার তরুণী বউদির ব্যবহার তার মোটেই ভাল লাগে

না। হলই বা সে যুবতী, হিন্দুর ঘরের মেয়ে যখন, বিয়ে যখন হয়ে গেছে, তখন আর আকথা-কুকথা, চমক নিশ্বাস ফেলে দুঃখ করে কী হবে। তা' হলে তোমার বিয়ে না করাই উচিত ছিল। সামাজিক সম্মান, লোক-চক্ষে একটা মান অপমান জ্ঞান সকলেরই থাকে। সন্তোষেরও আছে। ঘরের বউ বলে বেড়াবে, জীবনের আস্বাদ পেলাম না? কী কুৎসিৎ! অপমানে কালো হয়ে ওঠে সন্তোষের মুখ। ঘরের বউ বলবে; যৌবন কি বুঝলাম না। এর চেয়ে তার মৃত্যু শতগুণে ভাল। হ্যাঁ সন্তোষ জানে—দাদার বয়স হয়ে গিয়েছে, চুল পেকে গিয়েছে, বার্ধক্যের রেখা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে চোখে, মুখে, ভাবে, ভঙ্গীতে। বউদির অনুপাতে তার বয়সটা বেশীই হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কি হবে। বিয়ে হয়ে গিয়েছে—এখন সে হিন্দুর ঘরের বউ, যাকে বলে গিয়ে কুলবধূ। তার কি এখন এসব সাজে!

তৃতীয় পক্ষের বউদির সঙ্গে তাই সদ্ভাব নেই সন্তোষের। নেই তার নিজের বউয়ের সঙ্গেও। ঝগড়া-ঝাঁটি লেগেই আছে। এই ক'মাসের মধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। একত্র বাস করা হয় তো সম্ভব হয়ে উঠবে না, এরকম কথাও এর মধ্যে ভাবতে আরম্ভ করেছে সন্তোষ।

ওকথা ভেবেই মহিমের দিকে চেয়ে সন্তোষের মায়া হয়। মহিমের ব্যথা—তারও ব্যথা। মহিম হয় তো একথা ভেবেই দুঃখ পাচ্ছে।

মহিম ভাবছে, আবার যেতে হবে—সেইখানে, তৃতীয় পক্ষের মায়ের কাছে। এতদিন সে ভাল ছিল—খুব ভাল। হাসপাতালের নিয়ম-কানুন—শুয়ে থাকাটাই যা একটু কষ্টের। তবু এ যন্ত্রণা তার অনেক ভাল সেখানকার চেয়ে। জীবনকে তার নতুন করে ঢালাই করতে হবে হয়তো সেখানে, এবং তৃতীয় পক্ষের মা এসেই হয় তো আবহাওয়াকে সম্পূর্ণ অন্যরকম করে নিয়েছে যার সঙ্গে মহিম নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারবে না।

এমনি সব নানান কথা এলোমেলো ভাবে ভাবছিল সে। ভাবছিল—আর ক্রমেই বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল তার

For Artistic Floors
&
Mosaic Tiles

47-6660

Calcutta Floors & Tiles (P) Ltd.
1/1/1, Sashi Sekhar Bose Row, Bhowanipur, Calcutta-25.

প্রবন্ধ পত্রিকা

শারদীয় সংখ্যার সূচী

রামমোহন রায় : শরদী বিপ্লব প্রসঙ্গে
বুদ্ধদেব মুখোপাধ্যায় : সত্যেন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা
বিজেন্দ্রলাল রায় : নাটকের
হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ বিজেন্দ্রলাল
সত্যজিৎ রায় : উপেন্দ্রকিশোরে
আশা দেবী : উপেন্দ্রকিশোরের সাহিত্য
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : সাহিত্যকথা
হরপ্রসাদ মিত্র : কবি বাঙ্কিম
অশোক মিত্র : রবীন্দ্রনাথের ছবি
সুরেশ মৈত্র : মাইকেলের তিনটি নিরুদ্দিষ্ট কবিতা
আদিত্য ওহদেদার : আধুনিক ভারতের প্রথম নাটক
অজিত গঙ্গোপাধ্যায় : থিয়েটারচিন্তা
সুনীল ভট্ট : সার্ত্রের দর্শন
সলিল গঙ্গোপাধ্যায় : বাংলা কবিতার ছন্দ মুক্তি
অরুণ বসু : রাখালরাজের প্রত্যাবর্তন
রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত : বীরবল ও বিমু
অশোক মুস্তাফি : টম্ পেন্ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য
সমীক বন্দ্যোপাধ্যায় : বর্ণবিদ্বেষের সমাজতত্ত্ব
শঙ্খ ঘোষ : রবীন্দ্রচিন্তা
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত : রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ
অমলেন্দু ঘোষ : 'রামায়ণিকা'
এস. তুলিয়াইয়েক : অবনীন্দ্রনাথ

॥ দাম ঃ দুই টাকা ॥

প্রবন্ধ পত্রিকার অতিপ্রশংসিত বিবেকানন্দ সংখ্যা এখনও সামান্য অবশিষ্ট আছে। দাম এক টাকা

২০, গ্রে ষ্ট্রীট। কলিকাতা-৫

দুপুর। নিজের ভবিষ্যৎটাকে একবার ভাবতে চেষ্টা করল সে। অন্ধকার ভবিষ্যৎ। কি আছে—কে জানে!

এমন সময় এল নার্স। উনিশ কুড়ি বছরের—ফর্সা রোগা মেয়েটি। কালো ভাসা ভাসা হাসিমুখ চোখ নিয়ে ঢুকলো মেয়েটি মহিমের কাচা কাপড় জামা নিয়ে। ওদের দু'জনকে ওভাবে বসে থাকতে দেখে সে বলে উঠল, কি ব্যাপার, আপনারা ঘুড়ো ভাই পো ঝগড়া করে বসে আছেন নাকি!

সন্ধ্যের হাসিতে ভরে উঠল সন্তোষের মুখ! তাকালো মহিমের দিকে।

মহিম চকিতে একবার কাকার দিকে চেয়ে বলে উঠল : না না—ঝগড়া করিনি তো।

—তবে এমন চুপচাপ বসে আছেন?

সেকথার কোন জবাব দিল না মহিম। হাসল একটু। কাকার সামনে দ্বিধাহীন ভাবে কথা বলতে পারছে না। কেমন একটা সঙ্কোচ এসে জিভটাকে আড়ষ্ট করে ধরেছে তার।

—নিন জামা-কাপড় পরে নিন—ওগুলো ছাড়ুন। নার্সটি এগিয়ে দিল তার জামা কাপড়।

—ডাক্তারবাবু আসবেন এখুনি আপনার সেই বন্ধুটির সঙ্গে।

কে! অনিল! সেই জোয়ান ছেলেটি, যে তাকে কাঁধে করে তুলে নিয়ে এসছিল রাস্তার উপর থেকে। কৃতী ছেলে অনিল—এম, এ, পাশ। মহিমের বন্ধু অনিল। গর্বিত মহিমের দৃষ্টি আর একবার চকিতে স্পর্শ গেল কাকার মুখের উপর দিয়ে।

অনিলের মত ভদ্রলোকের ছেলে, ব্রাহ্মণ শিক্ষিত স্বাস্থ্যবান ছেলেটি এই তুচ্ছ মহিমের বন্ধু! নিজেকে খুবই ছোট মনে হয় মহিমের। অনিলের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব সে কল্পনাও করতে পারে না। আরো কয়েকদিন এসেছে অনিল, এসেছে অনেক ফল খাবার ইত্যাদি নিয়ে। লজ্জা করত মহিমের, কিন্তু গর্ব বোধও করত। অনিল তার বন্ধু।

সে জানে কাকার চোখে ফুটে উঠেছে প্রশংসমান দৃষ্টি—মহিমের দিকে চেয়ে। বিস্মিত প্রশংসা।

আপনাদের খুবই কষ্ট দিলাম এ ক'দিন। তা পরতে মহিম বলল নার্সের দিকে চেয়ে:

—কষ্ট বই কি, মেয়েটি হাসল। দেখবেন, আবার যেন বাহাদুরী করে গুলীর মুখে গিয়ে হাজির হবেন না। তাহলে—

হাসতে হাসতে থেমে গেল মেয়েটি। আলমারির ভিতর থেকে চিরুনিটা বাড়িয়ে দিল মহিমের দিকে।

মহিম তাকাল।—তা'হলে?

—তা'হলে আর কি, ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকতে হবে। গুলীটা গায়ে না লেগে বুকে লাগলে তো আর বাঁচতে হত না। তখন কী করতেন?

—মরে যাবার পর আবার কেউ কিছু করে নাকি? লাঠা চুকে গেছে। আপনাদের ভোগান্তি পোয়াতে হত না, আর

মহিমের গলার কাছে কি যেন ঠেলে এল। ফিরিয়ে নিল সে, মুখ মেঘে ওয়ার্ডের দিকে।

নার্সের মনে পড়ল—প্রথম রাত্রিতে মহিমের বাপ-বিকারের প্রলাপগুলি। মহিমের সম্বন্ধে অনেক কিছুই সে জেনে নিয়েছে মহিমের অজ্ঞাতে। বাড়ী যেতে মন নেই মহিমের—ফিরে যেতে ইচ্ছে নেই আর বাপ মার কাছে।

মহিমের কাকা সন্তোষ হঠাৎ বলে উঠল, যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেছে এমন ভাবে বলে উঠল, দেখুন মা—।

নার্সকে বলছে বোঝা গেল। মেয়েটি ফিরে তাকাল।

—আমাকে বলছেন?

—হ্যাঁ। বিধায় সঙ্কোচের হাসিতে ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল সন্তোষের। চোখে কৃতজ্ঞতা। তার মোটা মোটা আঙুলের ফাঁকে চক্ চক্ করে উঠল একটা দশ টাকার নোট।

—যদি কিছু মনে না করেন,—সাধারণ মজুরের মত কৃতজ্ঞতায় ভেঙে পড়ল সন্তোষ। দশটাকার নোটটা বাড়িয়ে দিল নার্সের দিকে।

—আপনিই তো মহিমকে বাঁচিয়ে তুলেছেন। এই কটা টাকা—কিছুই না, তবু আপনাকে দিতে হবে মা।

Hearty Greetings to our patrons

SHIVMONI & CO.

FOR EVERYTHING GENUINE IN PIPES OF ALL DESCRIPTIONS

29, STRAND ROAD, CALCUTTA-1.

66-3855

—না না না—ও কি করছেন আপনি!

দরকার নেই, আমি ও নেব না। কিন্তু মনে করবেন না, ওটা নিতে নেই!

খোকনের আপত্তি জানিয়ে হেসে আবার বলল সে, প্রাণ কেউ কাউকে দেয় না। আমার মনে থাকবে আপনাদের কথা। আপনার ভাইপোকে বরং চিকিৎসা করাবেন ওই টাকা দিয়ে।

আশে পাশে কয়েক জন প্রায় সুস্থ রোগীও হেসে উঠল। সে হাসিটাও খুশি ও কৃতজ্ঞতার। তাদের সকলের চোখেই মহিমের আসন্ন বিদায়ের ব্যথা। মহিমের জন্যে সবটুকু নয় নিজেদের অনাগত বিষাদের দিনটির কথা ভেবেও।

ডাক্তারবাবু এলেন অনিলকে সঙ্গে করে।

—কেমন আছেন আপনি? মহিমের কাছে এসে দাঁড়ালেন তিনি।

ভাল। মহিম হাসল অনিলের দিকে চেয়ে।

শারদীয়ার
প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

পি. শেঠ

প্রসিদ্ধ প্রিন্টিং টাডেন ও
মেটাল ফার্নিচারের জন্য
একমাত্র নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান

১১০, আনন্দ পালিত রোড
কলিকাতা-১৪ • ফোন ২৪-১৪৮১

ডাক্তারবাবু বললেন তার পায়ের দিকে চেয়ে, ঘা-টা শুকোতে একটু সময় লাগবে। হাড়ের ব্যাপার কিনা। প্লাস্টারও রাখতে হবে কিছুদিন। আবার আসবেন দু সপ্তাহ বাদে, দেখে নেব—মাসখানেক বাদে নেব প্লাস্টার খুলে কেমন?

—আচ্ছা।

—হাঁটতে পারবেন?

—পারব বোধহয়। হেঁটেছি তো একটু একটু।

মহিম নেমে এল বিছানা থেকে একটা কাঠের লাঠি বাড়িয়ে দিল নার্স সেই লাঠিতে ভর দিয়ে ওয়ার্ডের মেঝেয় কয়েক পা পায়চারী করল মহিম।

—That's all-right ঠিক আছে। রোজ রোজ একটু হাঁটবেন—একেবারে বসে থাকবেন না। দেখি নার্স—মহিমবাবুর report-গুলি।

কুপীর ডেইলী চার্ট আর দুটো কাগজ বাড়িয়ে দিল নার্স ডাক্তারের দিকে। ডাক্তারবাবু দেখলেন। দেখে একটা কাগজে খস্ খস্ করে কি লিখে দিলেন মহিমের হাতে। পায়ের প্লাস্টারে তারিখ লিখে দিলেন। বললেন, এই তারিখে ওই কাগজটা নিয়ে হাসপাতাল ডিসপেন্সারিতে আসবেন, বুঝেছেন?

—আজ্ঞা!

—আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। চলি অনিলবাবু। নার্স—এঁদের যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিও।

ডাক্তারবাবু বেরিয়ে গেলেন।

—ইনি তোমার কাকা নাকি?

সন্তোষকে দেখিয়ে অনিল জিজ্ঞেস করল মহিমকে।

—হ্যাঁ।

অনিল বলল সন্তোষকে, চলুন তাহলে মহিমকে নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ি।

—আজ্ঞে হ্যাঁ—চলুন।

সমীহ করে বললে সন্তোষ। শুনে মহিমের লজ্জা হল। যেন কত ছোট, অবাচীন—তার কাকা। অনিলকে বলছে আজ্ঞে। অনিলের দিকে চোখাচোখি হতেই সে একটু হাসল। হেসে এগিয়ে গেল নার্সের দিকে লাঠি ভর করে।

—আচ্ছা, চলি তাহলে।

মেয়েটির ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল করুণ হাসি, কালো চোখে এল ছায়া ঘনিয়ে। বোম্বাইদের হাসি মুখে বিদায় দিতে এখনো অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি সে। পাকা নার্স বলতে যা বোঝায়—তার অন্তঃকরণটা এখনও তেমন ঝানু হয়ে ওঠেনি। বললে, আবার আসুন। আবার যেদিন আসবেন—দেখা করবেন।

—নিশ্চয়ই!

তারা বেরিয়ে গেল দরজাই। খানিকটা গিয়ে মহিম ফিরে দেখল মেয়েটি চেয়ে আছে। তাকে করল ওর কথা দাঁড়িয়ে আর দু'চারটে কথা বলে আসে—কিন্তু লজ্জা করল। আরও রুগীরা চেয়ে দেখছে। এগিয়ে চলল সে অনিলের পাশে পাশে। এগিয়ে চলল—মেয়েটার কথা ভাবতে ভাবতে।

রাস্তায় এসে অনিল একটা রিকশা ডেকে—মহিমকে আর সন্তোষকে উঠিয়ে দিয়ে বলল, তোমরা যাও, উল্টাডাঙ্গা থেকে ট্রেনে করে চলে যাও, আমি যাব একটু ধর্মতলার দিকে। পরে দেখা করব তোমার সঙ্গে।

অন্য ফুটপাত ধরে চলে গেল সে।

চলেছে মহিম আর সন্তোষ।

পাশি বসে। রিকশা চলছে টুন টুন ধীরে ধীরে এখান থেকে অনেকটা দূর উল্টাডাঙ্গা।

সন্তোষই প্রথম বললে, তোর সে চাকরীটা আর সন্তোষের ভিতর থেকে ক্রমশ চাপ ছেড়ে বেরিয়ে এল—স্বাভাবিক খাঁটি মানুষটা। বলল, ও শালা চটকলের চাকরীই ওরকম—আজ আছে কাল নেই সরকারি তো নয়। তা তুই কাজ যদি করিস—।

—তাছাড়া আর কি করব বল? কারখানা অঞ্চলে এসে মহিমের ভিতর থেকেও আধা শহরে আধা গাঁয়ে মিস্তিরিদের সাকরেদ ছেলেটা আত্মপ্রকাশ করল।

—বসিয়ে আর খাওয়াবে কে। তবে পাঁচটা বছরদিন সংসারে ততদিন বসে ওই অপেক্ষার ভাতই খেতে হবে

—তা তো খেতেই হবে। তবে চাকরীর অভাব হবে না হয়তো। ছুটাই যেমন হচ্ছে, নতুন কারখানাও কিছু তৈরী হচ্ছে। কাজ কিছু শিখে নিবি তের বাপের কাছ থেকে, না হয় আমার কাছ থেকে। ইস্তিরির ছেলে বসে থাকে না।

বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সোভিয়েত মতামত জানিতে হইলে পড়ুন:

১। চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির নিকট "খোলা চিঠি"

২। ২১শে সেপ্টেম্বরের সোভিয়েত সরকারের বিবৃতি

"সোভিয়েত দেশ"এর বার্ষিক গ্রাহক সংগ্রহ অভিযান এই বৎসর ১লা নভেম্বর, ১৯৬৩ আরম্ভ হইবে।

এবারে বিশেষ কনসেশন:	ভারতীয় ভাষায়	ইংরেজি ভাষায়
বাৎসরিক	৪ টাকা	৫ টাকা
দ্বিবার্ষিক	৬ টাকা	৭·৫০ টাকা
ত্রিবার্ষিক	৮ টাকা	১০ টাকা

গ্রাহক—সংগ্রহ এজেন্সির জন্য আবেদন করুন।

যোগাযোগের ঠিকানা:

"সোভিয়েত দেশ কার্যালয়"

১/১, উড ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৬

চুপ করে থাকে

থাকে রাস্তার দিকে

—আরে এমনিতেও শাশুড়ীর মান-সম্মান কিছুই রইল না মুখ পুড়িয়ে দিতে বসেছে দাদা জেলখানা বউ ঘরে এনে আবার আরম্ভ করল সন্তোষ মহিমের দিকে চেয়ে। শোনবার আগ্রহ থাকলেও মহিম রাস্তার দিকেই মুখ করে বসে রইল। শ্রু দুটো কুঁচকে উঠল শুধু

—কেলেঙ্কারির যারো দশা। আবার চুপ করে গেল সন্তোষ।

একটু পরে আবার বলল, ওদিকে হাওড়া থেকে প্রাণতোষের চিঠি এসেছে, চাকরি নাকি নাও থাকতে পারে। একেবারে সুখের ছেঁদ পোড়া চা, তানিল তো, প্রাণতোষের দাদার বিয়েতে আসে নি।

মহিম বলল, তাই নাকি? মনে মনে খুশি হল সে।

ছোট কাকার প্রকৃতিটা একটু ভিন্ন ধরনের বোঝা চোখা লোক। এখনো বিয়ে করেনি। বয়স বছর বত্রিশ তেত্রিশ হল। ছোটকাকা নাকি হাওড়াও পার্টি করে অর্থাৎ বামপন্থী। ছোটকাকা বেশ ভাল লোক।

শীতের দিন। পাঁচটার সময়েই ঘনিয়ে এল সন্ধ্যা।

উল্টাডাঙায় এসে ট্রেনে উঠল তারা।

বাড়ী পৌঁছুল প্রায় সাড়ে সাতটায়।

ঘরে ঢুকে মহিম দেখল তক্তাপোষটার উপরে। সন্তোষ ডাকল, ওই বউদি—তোমার ছেলে এসেছে, দেখে

সাড়া পেয়ে এল কাকী সন্তোষের মহিম মাটিতে ভর দিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল কাকীকে।

—থাক থাক। বস তুমি।

কাকীর ছেলে মাথা দাঁড়িয়েছিল সামনে। কাকী বলল তাকে, যা তো মাথু তোর ছোটমাকে ডেকে নিয়ে আয় গিয়ে, বল দাদা এইছে।

মিনিট দুয়েক আর দেরী হল না কাকীর। যশোদের মেয়ে সে। নাম প্রমীলা। মহিমের দিকে ফিরে বলল, পায়ে ওদি লেগেছিল তাই—নইলে কি বাঁচতে! দুদ্দুড়ে মানুষ বাপু তুমি—ওসবের মধ্যে কি মানুষ যায়! ভাসুর-কেমন বাস করতে লাগল

অস্বস্তিতে ভরাট বেধে উঠছে মহিমের মনটা। সে উঠে গিয়ে দাঁড়াল জানালার কাছে সুভাষ বসুর ছবিটার সামনে।

—রাগ করবার কি আছে। ওলিটাতো তার গায়ে লাগেনি। স্পষ্ট বিদ্রূপে ধ্বনিত হয়ে উঠল মহিমের গলায়।

বিস্মিত হয়ে বলল কাকী, ওমা—সেকি কথা? তুমি চলে ছেইলে—রাগ যেমন করেছে দুখুও করেছে তেমনি। আর সত্যিই তো বাপু—বাড়ি না এসে ওখানেই বা গেল কেন তুমি।

মহিম নিরুত্তর।

বাক্স টানতে টানতে নিয়ে এল ছোটমাকে। মহিমের তৃতীয় পক্ষের মা।

বিরাট ঘোমটা দিয়ে ঢেকে রেখেছে সারা মুখটা। লজ্জায় যেন ভেঙে পড়ছে এইটুকু আসতে।

মহিমের কাকী প্রথমেই লক্ষ্য করল তার সস্তা বদলানো ধোপ দেওয়া পাতলা মিলের শাড়ীটা। ঠোঁট দুটো বেঁকে উঠল কাকীর। সে হাত বাড়িয়ে ঘোমটাটা টেনে খুলে ফেলল জায়ের। বলে উঠল, ওরে আমার লজ্জাবতী। এখানে তোমার শ্বশুর ভাসুর নেই কেউ, তোমার পেরথম সতীনের ছেলে।

বয়েসে ছোট বলেই বোধ হয় তাকে মানিগণ্যি করে না মহিমের কাকী। মহিমের দিকে ফিরে বলল, নেও—তোমার মাকে পেন্নামকর গো!

অবহেলা আর অশ্রদ্ধা ঝরে পড়ল প্রমীলার গলায়। আবহাওয়াটা যেন কেমন বিশ্রী অস্বস্তিকর হয়ে উঠল।

কৌতুকের বাঁধ ভেঙে উঠল প্রমীলার
কৌতুকের জন্য অনেকদিন সে প্রতীক্ষা করেছিল।

মহিম ফিরে তাকাল মায়ের দিকে। তার তৃতীয় পক্ষের মা—আঠারো উনিশ বছরের একটি মেয়ে। নতুন বউয়ের মত লজ্জায় মাটির দিকে চেয়ে আছে। যৌবন ভাঙা সমুদ্রের মত যৌবন উপচে পড়ছে। একহারা দীর্ঘ চেহারার মেয়েটির দেহে যেন একটা ঔদ্ধত্য বাঁকিয়ে রয়েছে। কপালে জ্বল জ্বল করছে সিঁদুর। মহিমের মা।

লাঠিতে ভর দিয়ে মহিম এগিয়ে এল। কষ্ট করে নুয়ে পড়ে অনভ্যস্ত বাধাবন্ধিত পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল সে।

প্রণাম করল আর তার গলার কাছে কি যেন এল ঠেলে। চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে কেঁপে কেঁপে উঠল সদ্য পরিহিত মায়ের ঝকঝকে ঝিনঝিনে শাড়ি, রঙীন পাড়।

অপমান অভিমানের গাঢ় ছায়া নিয়ে আবার সে মুখটা ফিরিয়ে নিল সুভাষচন্দ্রের ছবিটার দিকে।

—তিন—

হঠাৎ ডুকরানো কান্না শুনে মহিম চমকে পিছন ফিরল।

কাঁদছে তার দিদিমা—আপন দিদিমা। বয়স হয়েছে প্রায় পঞ্চান্ন। চোখে ছানি পড়েছে, ভাল দেখতে পায় না। হাঁপানি ধরেছে আজ প্রায় দশবছর। রাত্রিদিন ওই বারান্দাটিতে বসে—ঝাপসা চোখের দৃষ্টি দিয়ে এদিক ওদিক দেখে আর বুকের কাপড়টা ফেলে দিয়ে হাঁপায়। হাড় পাঁজরাগুলি ঢেউ খেলে হাঁপের সঙ্গে। দাঁতহীন মাড়ির আনাচে কানাচে কেয়ার ভরতি হয়ে উঠলে সেইখানেই ফেলে, ফেলে তারই উপর বসে বসে আবার হাঁপায়।

কোঁচকানো ঝোলা চামড়া দিয়ে বুড়ির হাড় কখানা শুধু জড়ানো। হাড় জড়ানো চামড়ার উপর ফেলা থাকে একটা নোংরা ন্যাকড়া। সেই একফালি ন্যাকড়ার মধ্যে ঢোকান থাকে সারাক্ষণ লিকলিকে একটা হাতের মধ্যে জপের মালা। জপের মালা অবশ্য থাকাই সার। স্মরণ-শক্তি নেই বালাইও নেই গোনা-গুনতির। উদ্‌ভ্রান্ত শুনেই চলে। হাঁপ ধরা কম্পিত ঠোঁটের ফাঁকে ফিস ফিস শব্দ হয় অনবরত। অনবরতই চলেছে জপ। তারই মধ্যে ফোকলা দাঁতে দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার করে মুহুর্মুহু কাননা। গালাগালি দেয় যমকে। যমের চোখধুলোকে খেয়ে সে বসে আছে কি 'ড্যাকরা যম'ই তার চোখ নিজেই খেয়ে বসে আছে—সে সম্বন্ধে গবেষণা তার নিরন্তর জপের মালা গোনার মত। এত মানুষকে যম নেয়, এত মানুষ মরে, কত কিছুতে মরে; রোগ শোক—ওলাই শেতলার দয়ায়—মড়ক মহামারীতে, কিন্তু 'ড্যাকরা যম' তাকে চোখে দেখতে পায় না। তার চরম এবং প্রধান অভিযোগ এইটাই।

কিন্তু অভিযোগটা ওঠে তখনই যখন সকলের অনাদরটা তার বেশী করে ঠেকে। তাকে জল দিতে দেরী হলে, খেতে দিতে দেরী হলে কিম্বা কেউ কিছু বললে তো রক্ষাই নেই। আরম্ভ হল তো ঠেকল গিয়ে সেই মাঝ রাত্রি পর্যন্ত যতক্ষণ ঘুম না আসে। কিংবা যতক্ষণ মনতোষ—মহিমের বাবা চিবিয়ে চিবিয়ে গালাগাল দিয়ে না ওঠে।

মনতোষের এই তৃতীয় বিবাহোৎসবের দিনই সে কেঁদে পাড়া মাৎ করে দিয়েছিল। তারপর চুপ করেছিল কিছুদিন। চুপ করেছিল মহিমের জন্য। মহিম না এলে না শুনলে তার সমস্ত কান্নাই নিরর্থক। নিরর্থক এই জন্য মনতোষের দ্বিতীয় বিবাহের সময়ও সে এমনি করে কেঁদেছিল, আর সে বউ মরে যাওয়ার সময়ও কেঁদেছিল। কিন্তু মরার পর সে কান্নার মধ্যে ছিল, মনের জোর দূর হওয়ার উচ্ছ্বসিত কান্না। ভেবেছিল—মহিম তার আবার শক্তহীন হয়েছে, সতাতো ভাই-বোনের কাঁটা নেমে গেছে গলা থেকে। তখন থেকে বুড়ি হাঁপাতে হাঁপাতে জপতে জপতে ওই এক কথাই রাত্রিদিন বলেছে, এক কামনাই করেছে, মাগী মরুক মরুক, শেতলার মুখে যাক—ওলাইয়ের মুখে যাক, বুড়ো ভাতারি মরুক। মনে মনে গোপনে বলেছে।

মরেছিল মনতোষের দ্বিতীয় পক্ষের বউ—তবে বুড়িকে অনেক ভাবিয়ে। মরেছিল একলেমসিয়ায়, পেটে ন' মাসের সন্তান নিয়ে। বুড়ির হাড় পাঁজরা জুড়িয়ে। দুশ্চিন্তায় দুর্ভাবনায় এমন মৃত্যুর আবির্ভাবেই বুড়ি

কেঁদেছিল সেদিন, কেঁদেছিল মহিমের কাঁটা মাসের সন্তান নিয়ে বউটি যখন। মনতোষের না পুষে উপায় ছিল না। শাশুড়ির দেশের বাড়ির সমস্ত সম্পত্তি সেই ভোগ করছে। মহিমের মা, বুড়ির একমাত্র সন্তান ছিল। কিন্তু মহিমের মা মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে বুড়ি শাশুড়িরও যত্নের দিন ফুরিয়েছে।

মনতোষ যেদিন কৃতার পক্ষকে নিয়ে এল—সেদিনও বুড়ি কেঁদেছিল, গভীর নিরাশায়। তিক্ত হতাশায়! আজও সে কেঁদে উঠল মহিমকে শুনিয়ে মহিমের মায়ের নাম নিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে।

এখনটা মহিম বিব্রত হল। এগিয়ে এল সে দিদিমার কাছে। দেখল অন্ধকার বারান্দার রেলিঙে উপর দু'পা ছড়িয়ে দিদিমা কাঁদছে। জপের মালাটা পড়ে আছে কোলের উপর। দু'হাত দিয়ে বুক চাপড়াচ্ছে আর কাঁদছে। রান্না ঘরে হলুদ বিচ্ছুরিত মন্নালোকে দেখল, শীর্ণ কোঁচকানো গাল বেয়ে নেমেছে জলের ধারা।

কি হল? হাত দিয়ে একটু ঠেলা দিয়ে বলল মহিম; হল কি তোমার, আবার কাঁদছ কেন?

বুড়ির কান্না আরও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। কান্না নয় সুর করে করে তার সমস্ত অভিযোগ ব্যক্ত করতে লাগল সে, ওরে আমার বিনি রে, কোথায় গেলিরে তুই আজ। দেখে যারে—।

রাগ হয়ে গেল মহিমের। ধমকে উঠল সে, থামো দিকি বাপু। থামাও তোমার বিনিয়ে কান্না।

মহিমের কাকী তার ঘর থেকে বলে উঠল, ওই এক হয়েছে ঝঞ্ঝাট। মাথা নেই মুণ্ডু নেই এখন তোমার কান্না কিসের বাপু। নাতী এইল রোগে ব্যামোয় ভুগে হাসপাতাল থেকে, কাঁদবার আর তোমার সময় হল না?

—হ্যাঃ! ওইটুকু বলেই সন্তোষ থেমে গেল।

বুড়ি নাকি কালা। কিন্তু এসব কথা সে শুনতে পায় বেশ পরিষ্কার শুনতে পায়। এবার সে শুরু করল সকলের মৃত্যু কামনা, তৎসঙ্গে নিজেরও। আরম্ভ হল তার দৈনন্দিন অভিযোগ, তার প্রতি সকলের অবহেলা অত্যাচার নানান কিরিস্তি।

মহিমের ইচ্ছে হল ছুটে সে এখান থেকে পালিয়ে যায় যেতোও হয়তো, কিন্তু খোঁড়া ঠ্যাংটা নিয়েই হয়েছে মুশকিল। অন্ধকারের মধ্যে বেরুতে ভরসা হল না তার। লাঠি হড়কে পড়ে যাওয়ার ভয় আছে। উঠোনটাও ভেজা স্যাঁতসেঁতে? বর্ষার শেওলা জমে জমে পিছল হয়ে উঠেছে উঠোন। বারান্দার ছাড়া নর্দমার বালাই নেই বলে উঠোনে হাত ধোয়া থুতু ফেলা চলেছে অনুক্ষণ।

লাঠি ঠক ঠক করে আবার সে ফিরে গেল ঘরে। কিছু করবার নেই তার।

চুপ হয়ে বসে রইল সে।

তরকারি কুটতে কুটতে মহিমের কাকীও আরম্ভ করল বুড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। দুপক্ষ থেকে সমান ভাবে চলল শাপ শাপান্ত বেটাবেটির মাথা খাওয়া।

ঘরে ঢুকল মহিমের মা, হাতে একটা ধার ভাঙা চায়ের কাপ নিয়ে। মহিমের সামনে চায়ের কাপটা রেখে এধারে ওধারে তাকিয়ে যেন কি খুঁজতে লাগল সে।

মহিম চকিতে একবার চেয়ে দেখল। সেই নতুন বউয়ের ভাব সে ইতিমধ্যেই কাটিয়ে উঠেছে। ঘোমটা খোঁপার কাছে গেছে পড়েছে এবার। জড়োসড়ো ভাব নেই, সপ্রতিভ সাবলীল গতিতে সে চলে ফিরে বেড়াতে লাগল সারা ঘরটায়।

চায়ের কাপটার দিকে একবার তাকিয়ে মহিম সোজাসুজি জিজ্ঞেস করল চা-টা কি আমার।

নাগালের বাইরে উপরের তাকের দিকে হাতটা বাড়াতেই অবধিই ঘোমটাটুকুও খসে গিয়ে বোড়শীর খোঁপায় জল জল করে উঠল কয়েকটা রূপোর কাঁটা এদিকে না তাকিয়েই সে বলল, হ্যাঁ।

মুহূর্তখানেক বোড়শীর দিকে ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে রইল মহিম। কিছু একটা বলতে ইচ্ছে হল তার। রাগ হল বোড়শীর উপর ভীষণ। ভুরু তাবিলা করে এমন চা না দিলেই হয়। চা'টা দিয়ে খেতে বলতে কি মুখটা খসে যাচ্ছিল তার!

কিন্তু বোড়শীর সেদিকে খেয়াল নেই। উপরের তাক থেকে বহু কষ্টে কি একটা পেড়ে নিয়ে সে বাইরে অন্ধকারে মিশে গেল।

সেদিকে একবার দেখে আস্তে আস্তে হাত বাড়িয়ে মহিম

চায়ের কাপটা তুলে নিল।

বৃষ্টি ততক্ষণে ঝড়ের সাথায় হাত হয়ে কাপতে কাঁপাতে শুরু করেছে। অনন্ত তার ঠাকে ঠাকেও ঘরে পড়ছে 'বেটার মাথা খা' গোছের দু'চারটে বুলি।

বাকীও হঠাৎ অভিমানে ভেঙে পড়েছে সমস্ত সংসারটার উপর। তার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়েছে তখন সন্তোষের উপর—নিজের জীবনের উপর। বিচিত্র এ ঝগড়ার গতি। আর ঝগড়ার সাঁড়াশী আক্রমণ ঘনিয়ে এল সন্তোষকে কেন্দ্র করে।

সেই সঙ্গে মানুষ চলেছে একঘেয়ে কিলের কাজ। কয়েকবার সামনে থেকে নাদুকে সরিয়ে দিল তার মা। শেষটায় তার আক্রমণের বেধরক মারটা ঝড়ের মত পড়তে লাগল নাদুর পিঠে।

—আমার কাছে কিরে হারামজাদা আমার কাছে কি? হেঁসেল নিয়ে বসে আছি আমি—বড়া কমলেকার। জেঠির কাছে যা না—যা।'

আরও কয়েক ঘা দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে ঠেলে দিল সে নাদুকে। এই উত্তেজে ষোড়শী হয়তো মানুকে টেনে নিয়ে যাবে নিজের কাছে? নিয়ে গিয়ে খেতে দিয়ে শান্ত করবে নাদুকে। কিন্তু ষোড়শী সেই সময়েই তাড়াতাড়ি ঢুকল আবার মহিম যে ঘরে বসেছিল। একটা ছোট রেকাবে করে দু'খানা সন্দেশ মহিমের সামনে ধরে দিয়ে আবার বেরিয়ে এল। কিন্তু একেবারে চলে গেল না। বারান্দায় মহিমের চোখের আড়ালে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল। দরজার পাশ থেকে কৌতূহলিত চোখে তাকিয়ে রইল মহিমের দিকে।

চাপা বিস্ময়ে মহিমের ভ্রূ কুঁচকে উঠল। সে তাকালে বাইরের অন্ধকার উঠোনের দিকে। চলে গেছে ষোড়শী। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে এল সে সন্দেশের রেকাবটার দিকে। দু'খানা সন্দেশ। কেন? কি দরকার মহিমকে সন্দেশ দেওয়ার! সতীনের ছেলের প্রতি এত দরদ কেন? আর দরদই যদি হবে তো এমন নিস্পৃহ নীরবতাই বা কেন?

যদি বারা বাড়ি থাকতে আজ? না কি অমন চুপি চুপি সতীনের ছেইলে দেখলেই পেট ভরবেনে আঁ?'

অন্ধকার উঠোন থেকে আওয়াজটা দিয়ে উঠল নাদুর মা।

নাদু তখনও কেঁদে চলেছে একটানা বিরামহীন। বিরাম-বিহীন ভাবে চলেছে বৃষ্টির পাগল তাণ্ডব কাঁপানি কান্না। ষোড়শী তাড়াতাড়ি মেমে গেল অন্ধকারের মধ্যে। হঠাৎ খানিকটা অপ্রতিভতায় তার গলার কথা আটকে গেল। অসহ লজ্জায় আর অপমানে ঠোঁটটা কামড়ে ধরলে সে। ঘরের দিকে কান পেতে রাখল সেখান থেকে কোন কথা আসে কিনা শুনতে। সেদিক থেকে কোন কথা এল না।

হঠাৎ রাগ হয়ে গেল ভাতের এই আচরণে আক্রমণে। রান্নাঘরে ঢুকে ভাতের হাঁড়ির ঢাকনাটা খুলে গেল জোরে ঠক করে বসিয়ে রাখল নীচে। একটা হাতায় করে ভাত তুলে দু'একটা ভাত একটু টিপে দেখলে নরম হয়েছে কিনা। হয়েছে ঘটি থেকে খানিকটা জল হাঁড়িতে ঢেলে দিয়ে ঢাকনাটাকে আবার বসিয়ে দিল শব্দ করে। শব্দটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে নাকের পাটা দুটো ফুলে উঠল তার। অপমানে বুকটা জ্বলে উঠল।

হঠাৎ বলে উঠল সে: দেখছি তার তোমার কি? আমার খুসি হয়েছে তাই দেখছি। তোমাকে দেখছি, না তোমার ব্যাটাকে দেখছি।'

এঁটো হাতটা ধুয়ে আঁচলে মুছতে মুছতে আবার বলল সে, আর বাঁধব কি আমার মুণ্ডু না মাথা।

গেছে তো সেই কোন্ বেলায় এখন অবধি মাজার কোনোদিন নেই দেখা। তা রান্না হবনি সে খোব কি আমার?

নাদুর মায়ের গলা দেওয়া গলা ঝড়ের চেয়ে উঠল সপ্তমে এ তুমি আর মুখ মেলে কথা বল না। তোমার মুখ ফটানি জানতে কারুর বাকী নেই।

রোরুদ্যমান নাদুকে কোলে তুলে নিয়ে সদর দরজা অবধি এগিয়ে গেল সে। ফিরে এসে আবার বলতে যেন খানিকটা নিজের মনেই, 'মরুক, সোহাগ দেখিয়ে উনি গেছে সতীনের ছেলের মা হতে। তবু যদি হত নিজেরটা বাছা।'

মহিম ভেবেছিল কিছু বলবে না। সে এদের কোন কথায় এমন জীবনে সে অনভ্যস্ত নয় মোটেও, তবু বড় অপ্রস্তুতের মধ্যে ফেলে তাকে। এর মাঝখানে থেকেও এই পরিবেষ্টনী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা

করে রাখবে নিজেকে এই কথাই এতদিন সে বসে বসে ভেবেছে হাসপাতালে, বাড়ী আসার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত। থাকতে হয় থাকবে, খেতে হয় খাবে, অন্য কোন সম্বন্ধ নয়। কিন্তু এমনধারা ঝগড়া বিবাদ যদি লাগে দিনের মধ্যে দশবার করে তবে তো না বলে সে পারবে না। আর বলে যদি না হয় কিছু, বেরিয়ে পড়তে হবে তাকে বাইরে, ঘুরে বেড়াতে হবে বাইরে বাইরে দোকানে দোকানে রাস্তায় রাস্তায়।

চকিতে একটা বিস্মিত প্রশ্নও তার মাথায় খেলে গেল। কেন বোড়শী দাঁড়িয়েছিল দরজার আড়ালে অন্ধকারে। কি দেখছিল সে? মহিমকে?

তাই হবে। হয়তো দেখছিল মহিম সন্দেশ খায় কি না। কৌতূহল, ষোড়শীর মেয়েমানুষ কৌতূহল ছাড়া এ আর কিছু নয়। কিন্তু এতেও মহিমের আপত্তি অস্বস্তি। কি ক্ষতি ছিল সামনে দাঁড়িয়ে দেখলে। অন্য কেউ নয় শত হলেও সে তো ছেলেই। নিজের ছেলে না হোক সতীনের ছেলে, তবু সে তো ছেলে।

তবে হ্যাঁ দুঃখ হয় মহিমের। রাগ হয়, অভিমান হয় বুড়ো বয়সে বাবাকে আবার বিয়ে করতে দেখে। কেমন যেন সম্পর্কহীন নিষ্ঠুর লোক বলে মনে হয় বাবাকে। নিজেকে মনে হয় একলা, বঞ্চিত, অপমানিত। সংসারের মধ্যে থেকেও মনের আড়ালে বঞ্চিত হয়ে ওঠে দূর ব্যবধান। এ অভিজ্ঞতা সে সঞ্চয় করেছে তার দ্বিতীয় পক্ষের মা ঘরে আসতেই। মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে স্নেহহীন রূঢ়তা ক্রমবিলীয়মান নিকটত্ব, পলে পলে মুহূর্তে মুহূর্তে।

লুকিয়ে কেঁদেছে মহিম, রাত্রে হাঁপানি রোগী দিদিমার কাছে শুয়ে শুয়ে কেঁদেছে, কেঁদেছে জোপে মায়ের আঁচলে কাঁচাকে বসে। কেঁদেছে পাড়া-পড়শীদের সহানুভূতিসূচক কথা শুনে নিজের মায়ের কথা মনে করে। দূরে সরে যাওয়া বাবাকে দেখে কেঁদেছে, সৎ মায়ের রূঢ়কথায় টনটনিয়ে উঠেছে বুকের মধ্যে। তার কিশোর হৃদয়ে মস্তিত হয়ে উঠেছে, কেউ নেই সে একলা। তারপর চার বছর পেরিয়ে দ্বিতীয় পক্ষের মা মরে গেছে, আবার এসেছে তৃতীয় পক্ষ। সেদিনের মত কাঁদবার মনোবৃত্তি আজ তার আর নেই। এই স্নেহহীনতাই স্বাভাবিক, রূঢ়তাই সত্য, এইটাই সে বুঝেছে। এরই মধ্যে দিয়ে জীবন চলবে। চলবে, তাই চলুক, তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু এর মধ্যে যেন না আসে সংশয়, এর মধ্যে যেন না ধরে কোন কাটল। অনাড়ম্বর স্বাভাবিক ষোড়শীর এই সামান্য রহস্যটুকুও নয়। এ রহস্য মিথ্যে, স্নেহ হবে অভিনয়। আদর সোহাগ—সে হবে মহিমের প্রতি বঞ্চনা—মিথ্যা। চিরাচরিত সৎমা সতীনের ছেলের সম্পর্ক—দূরগামী সম্পর্কহীন বাবা—এইটাই সত্য। অনাদর, দুর্ব্যবহার—বাস্তব এটাই। তাই বিনা সঙ্কোচে সন্দেশ দুটো আর চা খেয়ে লাটি ভর দিয়ে সে এসে দাঁড়াল বারান্দায়। বললে, তোমরা আরম্ভ করলে কি কাকী? চুপ থাক দিকি। এসে পর্যন্ত তোমাদের ঝগড়াই শুনছি, কেমন ধারা তোমরা?

কাকী তার পানানো গলায় কি একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল রুখে-মুখে। ঠিক সেই সময়েই সদর দরজার বাইরে অতি পরিচিত ভাঙা গলায় উচ্চারিত বিলম্বিত খাঁকারি শোনা গেল।

মহিমের বাবা মনতোষ আসছে।

মহিমও চেনে এই গলা, এই ভদ্রলোকী বিশুদ্ধ সঙ্কেত ধ্বনি। চকিতে তারও মনটা যেন কেমন বিকল হয়ে গেল। আসন্ন বিপদ নয়, অশান্তির গন্ধ যেন পেল সে। আতঙ্ক নয়, অস্বস্তি ঘনিয়ে এল তার মনে। নিস্পৃহ ভাবে দাঁড়িয়ে রইল সে দরজার পাশে।

কাকী নাতুকে নিয়ে গিয়ে ঢুকল ঘরে। দিদিমাও চুপ হয়ে গেছে—সেই ষোড়শী আর কাকীর ঝগড়ার আভাস পাওয়া যাচ্ছে মাত্র। কোন পক্ষ নিয়ে সেও হাসবে উঠবে হঠাৎ—জানি পড়া পুস্তু দুটি নিয়ে সে কথাই সে ভাবছিল বোধ হয়।

নাতুর তখনও চলেছিল একঘেয়ে খানখানানি নরম সুরে। চালু কলেরগানের শিস ভুলে নেওয়ার মত বন্ধ হয়ে গেল তা। ওই ভাঙা গলার খাঁকারিটুকু তার পরিচিতই নয় শুধু, ভীতিজনকও বটে।

মনতোষ ঢুকল সালামের ব্যাগ নিয়ে—গম্ভীর ভাবে। বাড়ীর বড়কর্তা, সন্তোষের দাদা, মহিমের বাবা, ভাগ্যের স্বামী সবকিছু মিলে সে প্রমাণিত বড়কর্তা। প্রমাণিত বড়কর্তা সে—আশেপাশের চটকলের মধ্যে একটা বড় চটকলের একটি সেকশনের বড় মিস্ত্রী মনতোষ লাহা সবকিছু মিলিয়ে সে একজন কর্তা—শাসন কর্তা।

বাড়ী ঢুকলেই তার কোটের বোতাম পকেটে হেলমাই

আর টিনের বাড়ির বাসি ঠোকাঠুকির শব্দ সকলের পরিচিত। হপরিচিত তার সিভিল পোষাকের সঙ্গে মানানসই চটির সলাপ সলাপ শব্দ।

সে শব্দ থেমে গেল। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে পড়ে ছেলে উঠল মনোতোষ তার ভাঙা মাস্কারি গলায়,—বাতি দাতি দেখাবে, না এখানে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকব?

অন্ধকারে এগিয়ে আসতে পারতো হয়তো মনতোষ। নেহাৎ অন্ধকার তো নয়, ঘরে একটা আলো জলছে। রান্নাঘরের আলোও এসে খানিকটা পড়েছে উঠোনের উপর। এমন কিছু লম্বা চওড়া উঠোনও নয়। কিন্তু মনতোষ বোঝে সেটা বোড়শীর কর্তব্য বিমুখতা ও অবহেলাকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে। স্বামীর প্রতি এ উদাসীনতা অন্যায়। আলো দেখানোটা তার কর্তব্য, খাকারিটুকু তার কান পেতে শোনা উচিত।

কিন্তু বাতি এল না, এল না কোন সাড়াশব্দ। কান গলার শব্দটুকু শোনা গেল মাত্র।

নাছুর মা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে আলোটা নিয়ে বারান্দায় বসিয়ে দিল। সেই আলোয় পথ দেখে মনোতোষ রান্না-ঘরে গিয়ে ব্যাগটা রাখল। রেখে তাকাল বোড়শীর দিকে। পাথরের মূর্তির মত বসে আছে বোড়শী শিছন ফিরে।

তোবড়ানো লম্বাটে মুখের রুক্ষ ভাবটা মিলিয়ে গেল। মনতোষের, কোচকানো ভুরু দৃষ্টিটা সহজ হয়ে এল। শ্রান্ত ভঙ্গিতে খিঁচনো নকল দাঁতগুলি গেল ঢেকে। ঝুলেপড়া গোঁফ জোড়াকে একটু উঁচিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল সে। গলাবন্ধ ধূসর রঙের কোটের পকেট থেকে বের করল দেশলাই আর বিড়িকেস।

মাঝারি গোছের চেহারাটা মনতোষের, তবে পিঠটা বেঁকে গেছে একটু—বেঁকে ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে।

—আর পালা পারা যায় না। বলতে বলতে বসল মনতোষ। বসে একটা বিড়ি বের করে টিপে মুঁ দিয়ে কামড়ে ধরল দাঁত দিয়ে।

আবার কি মনে করে বিড়িটা হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, ওরা কখন এল?

নিরুত্তরে বোড়শী ব্যাগটাকে উলটে আনাজপাতি ঢেকে ফেলল সব নেবের। তরকারির চুবড়িটা নিয়ে তার মধ্যে রাখতে লাগল সব—উঠিয়ে রাত্রির রান্নার জন্য কিছু কিছু রেখে।

জবাব না পেয়ে মনতোষ উঠে দাঁড়াল, দাঁড়িয়ে বিড়িটা ধরালো। তারপরে হঠাৎ কেঁজে উঠল কি হয়েছে তা বলবে তো? এতো শালার বড় মুসকিল দেখছি আমি। 'কিছু হয় নি তো কি বলব?' অনুরূপ ভাবে ঝেঁজে উঠল বোড়শীও। বটি পেতে তরকারি কুটতে বসল সে।

বোড়শীর কর্মব্যস্ত হাত দুটোর দিকে একবার কটাক্ষ করে বিড়বিড় করতে করতে বেরিয়ে এল মনতোষ। বারান্দায় দেখল বহিম দাঁড়িয়ে আছে লাঠি ভর দিয়ে।

—কেন, যাও? বহিমকে দেখেই বলে উঠল সে। গুলীর সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়াও গে। বাহাদুর। বছরখানা দেখলে খা জলে যায়। কোন্ কাম ছিল তোমার কাঁকনাড়ায়? কেন গেছিলি? সাতদিনের জামাই বাবু এলেন একদাল দেরী করে। তা রসুলানি করে আবার কাঁকনাড়ায় পেছলে কেন?

বহিমের অবশ্য কোন বাছবিচার নেই। ঝগড়া করতে সেও কম ওস্তাদ নয়। বাপের অবাধ্য ছেলে বলে অখ্যাতি আছে তার। মুখের উপর জবাব সে নিঃসঙ্কোচেই দেয় কিন্তু কিছু না বলে ঘরে ঢুকে গেল সে।

মনতোষও ঢুকল ঘরের মধ্যে। মেজাজটা তার চড়ে উঠল একটু একটু করে। বললে, ওসব চলবে না এখানে; বুঝেছ, যা খুশী তাই করতে পারবে না। পা ভেঙে এসেছ—এখন পেল কিছুদিন বসে বসে—ওই করতে তো আছ। পাজী কোথাকার!

বিশ একুশ বছরের ছেলে বলে ওসব 'অ্যাজদাস্ট'র ধার ধারে না মনতোষ।

বহিম ফিরে তাকালো বাপের দিকে। গালাগাল শোনা অভ্যাস আছে বহিমের। মারতে অবশ্য মনতোষ আজ-কাল আর সাহস করে না। তবু সে বললে, কি হয়েছে তোমার গালাগালি দিচ্ছো কেন?

—মাঃ পুজো করব তোমাকে, শুশ্রূষা করতে গিয়ে পা ভেঙে এসেছে আমার ব্যাটা, এবার তাকে আদর করতে হবে।

—শুশ্রূষা!

—না কোলে করে নিয়ে গিয়েছিল তোকে সেখানে গুলি খাওয়ার জন্যে।

অনিচ্ছায় অভ্যাসবশতঃ একটা অশ্রাব্য কথা বেরিয়ে গেল ঠিক পিছনে। পরমুহূর্তে উঠানে রাখার কয়লা-কয়লানিতে গাঁটা একটু কুঁচকে বকতে বকতে আবার চলে গেল রান্নাঘরে।

দিদিমা ডাকছে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে; আমাকে ঘরে তোলে না গো!

সে কথা বোধহয় শুনতেই পেল না কেউ।

অবসন্নের মত মহিম বসে পড়ল তক্তপোষের উপর। অর্থহীন প্রলাপের মত এসে তার কানে বাজতে লাগল মনতোষের বকবকানি। শীতের হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে আসতে লাগল পুলিশ ফাঁড়ি থেকে রাত্রির ঘণ্টার শব্দ। মহিমের ঘুম পাচ্ছে।

॥ চার ॥

পাশের প্রাচীরের সঙ্গে আঘাত লাগতেই ঘুম ভেঙে গেল মহিমের।

মিনিটখানেক বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে অন্ধকারের দিকে। পর মুহূর্তেই বুঝতে পারল সে বাড়ীতে আছে। মনে পড়ল কালকের রাত্রের কথা।

বারান্দায় টিনের শেডের সঙ্গে চটের পর্দা ফেলে বারান্দার দু'পাশে দুটো বিছানা করেছে। একটায় দিদিমা আর একটায় মহিম।

বিছানাটা বয়সের মত ন্যাড়া হয়ে গেছে। গায়ের কাঁথাটা একটু গরম গরম হয়েছে দেহে জড়ানো ছিল বলে। দিদিমার বিছানা থেকে কাঁপানো গলায় একটা দুর্বোধ্য শব্দ আসছে। বোধ হয় জপ করছে দিদিমা—বাসি শয্যায় শুয়ে শুয়ে।

চটকলের দ্বিতীয় বাঁশি বেজে উঠল।

যত বিশ্রী এ শব্দ। ঘুমুতে দেবে না কিছুতেই। লেপের তলায় দিয়ে কানে আঙুল দিয়ে থাকলেও ঠিক কানে গিয়ে ঢুকবে। এ শব্দে ঘুমিয়ে থাকতে পারে না মানুষ বিশেষ করে মজুরেরা। এ শব্দের চুম্বক টেনে তোলে তাদের—শক্ত ঈষদোষ্ণ বিছানা থেকে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত এলানো দেহ বন্ধের মত সাড়া দেয়, টান হয়ে ওঠে। ভাটা পড়া রক্তে যেন উলটো জোয়ারের বেগ আসে। জাগরণের সাড়া পড়ে সারা এলাকায় এলাকায় বস্তিতে বস্তিতে, লাইনে লাইনে পশু-মহাপেষণার শুরুগম্ভীর বিলাপের শব্দ, নির্মম তাল, ক্ষুধার্ত যন্ত্রের আস্ফালন! জগৎ নয়—এক্তের টান আছে এ শব্দে। ভুল মানুষের কটির ডাক। মজুরি মজুরি বিশেষ আছে—এ যান্ত্রিক ডাকের সাড়া।

—কই চল নাকি? পরের ভিতর বিরক্ত গলায় বলল সন্তোষ।

—ছুটি: বাঁশী যে হয়ে গেল—শুনতে পাচ্ছো না, রান্নাঘরে ঘুমিয়ে পড়লে চা করতে গিয়ে।

ষোড়শী চুকল চটের পর্দা উঠিয়ে—এক গেলাস চা দিয়ে। চকিতে অন্ধকারের মধ্যে মহিমের আপসা মূর্তিটার দিকে একবার তাকিয়ে ঘরে ঢুকে গেল।

নেবি' বাতিটা উস্কে দাও, আর বাটি দাও একটা ঢেলে ঢেলে খেয়েনি। নানান্ রকম আরামধ্বনির শব্দ উঠতে লাগল মনতোষের গলা দিয়ে চা খেতে খেতে।

—সন্তোষ উঠেছে? চা খেতে খেতেই জিজ্ঞেস করল সে।

—হ্যাঁ। ষোড়শীর ছোট জবাব।

—চা দিয়েছ ওকে?

—দিয়েছি।

চায়ের বাটিতে শেষ চুমুক দিয়ে—একটা বিলম্বিত আওয়াজ করে আবার বলল সে, বিড়ি আর দেশলাইটা দাও দি নি বালিশের তলা থেকে।

ষোড়শী বিড়ি দেশলাই বাড়িয়ে দিল তার দিকে। একটা বিড়ি ধরিয়ে বাস্ত ভাবে উঠে দাঁড়াল সে। কন্ফর্টারটা বেঁধে নিল তাড়াতাড়ি—কান দুটো আর মাথায় জড়িয়ে। গলাবন্ধ কোটের উপর জড়িয়ে নিল চাদর। হাল প্যাণ্টটা নেমে এসেছে হাঁটুর নীচে, পায়ে আছে হাঁটু পর্যন্ত মোজা আর কালো চামড়ার জুতো।

—দেখি বাতিটা দেখাও।

ষোড়শী বাতি তুলে দেখাল। সেই আলোয়—বারান্দার দুটো বিছানার মাঝখানে—স্বল্প পরিসর জায়গাটুকু পার না হতেই চোখে পড়ল—মহিম গায়ে কাঁথা জড়িয়ে হাঁটুতে মাথা গুঁজে বসে আছে। একটু কুঞ্চিত কটাক্ষের ছোবল দিয়ে চটের পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে গেল সে। ষোড়শীও আলো নিয়ে গেল পিছন পিছন। সন্তোষ বেরিয়ে গেছিল। উঠানে দাঁড়িয়ে একবার জিজ্ঞেস করল সে। সাড়া পেল না।

ফিরে দেখল সদর দরজাটা বোকা
গেল বেরিয়ে গেছে সে।
ধক্ ধক্ করে কাঁপতে কাঁপতে বোড়শীকে বলল ; দরজাটা
বন্ধ করে দাও।
বলে প্রতিদিনের মত একবার ফিরে তাকাল বোড়শীর
দিকে। দেখল আপাদ-মস্তক একবার তার ক্ষুব্ধ দৃষ্টি দিয়ে
লেহন করে। বাসি তন্দ্রালস মুখ—স্থির এক জোড়া
ভুরুর মাঝখানে জ্বল জ্বল করছে উজ্জ্বল টিপ। উদ্ভিন্ন
যৌবনা দৃপ্ত ভঙ্গি, লীলায়িত ভাঁটো বোড়শী। কচি শ্যামবর্ণ
চক্ চক করছে
গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল মনতোষের—বোধ হয় শীতে হঠাৎ
মেজাজটা চড়ে গেল তার কেমন। ঘুমে পড়া চোখ তোড়ার
ডগায় ফুটে উঠল তা। বড় বিসদৃশ লাগে তার বোড়শীর
সারা শরীরটা, ওই উদ্ধত উচাটন ভাব। কপালে ওই
টিপটা না পরলে কি ক্ষতি ছিল! কি ক্ষতি ছিল চেহারাটা
আর একটু কুৎসিত হলে! অবশ্য বিয়ে করবার সময় দেখে
পছন্দ করেই সে বিয়ে করেছে। সে বিষয়েও একটা কথা
ভেবে দেখেছে সে। ভেবে দেখেছে গান্ধারীর কথা—
ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধতার জন্য সতী নারী নিজেও অন্ধ হয়েছিলেন
চোখ বেঁধে। তবে সে ছিল এক কাল আর এ এক কাল।
দীর্ঘনিশ্বাসটা আর চাপা থাকে না মনতোষের। বেরিয়ে
যাবার আগে আবার বললে সে ; এদিকে ভদ্দরলোক তো
নেই রাতদিন কুলি মজুর খাতায়াত করে। রাস্তার দিককার
জানালা দুটো বন্ধ করে দিও, বুঝেছ? শান্তশীলা বালিকার
মত ঘাড় কাৎ করে সম্মতি জানালো বোড়শী।
মনতোষ বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে গেল সেই চির পরিচিত
ভঙ্গিতে। দূর থেকে দেখলেই সবাই চিনতে পারে—
আসছে 'টরুন্' ঘরের মিস্তিরি।
বোড়শী বাতি নিয়ে ঢুকল রান্না ঘরে। থালা চাপা দেওয়া
একটা গ্লাসে চা ছিল, রেখে দিয়েছিল সে। হাত দিয়ে
একবার দেখল চা'টা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে কি না। ঠাণ্ডা
হয়নি, গরমই আছে। গেলাসটা আর বাতিটা নিয়ে—
রান্নাঘরের শিকল তুলে দিয়ে আবার এল সে এ ঘরের
দিকে। পর্দা উঠিয়ে ঢুকল বারান্দায়। দেখল—মহিম
আবার শুয়ে পড়েছে।
দ্বিধা সঙ্কোচ নিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল বোড়শী চায়ের
গেলাস নিয়ে। মানুষটা এর মধ্যে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।
বিরক্তির ভঙ্গিতে তার শিয়রের জটা ভাব নেচে উঠল,
পাতলা ঠোটের কোণ দুটোর বাঁকম হাসিতে মনে একটা
ঢোল পড়ে ক্ষণিকের মধ্যেই মিলিয়ে গেল তা। এত ঘুম?
বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করল না বোড়শীর যে মানুষ ঘুমুচ্ছে।
একটু কাশল সে, কেশে, ছারিকেন বাতিটা বসিয়ে দিল ঠক্
করে—বারান্দার উপর। আবার তাকাল চাপা ঠোঁটে
চোরা চোখে।
মহিম নিথর।
—দাঁড়িয়ে কে?
অবোধ্য বকবকানিটা থেমে গিয়ে হঠাৎ শীতার্ত কম্পিত
গলায় প্রশ্ন এল বুড়ির বিছানা থেকে।
সে কথার জবাব না দিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে গেলাস-
টাই ঠক্ করে বসিয়ে দিল মহিমের শিয়রের কাছে।
—চা রইল। বলে সে বাতিটা নিয়ে ঘরে ঢুকতে যাবে,
এমন সময় মহিম মুখের উপর থেকে কাঁথাটা সরিয়ে
জিজ্ঞেস করল, কার? আমার?
তার হাসি মুখটা খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল
বোড়শী চোখের পাতার আড়ালে দিয়ে যেন এক-
বার দেখতে চেষ্টা করল মহিমের মুখটা। বাতিটা
দরজার সামনে রেখে ঘরের ভিতর দিয়ে জবাব দিল,
হাঁ।
একটু থেমে শোনাল বোড়শীর গলা। তক্তপোষের
বিছানার উপর পা'টা এলিয়ে দিয়ে, বারান্দার দিকের
দেয়ালটার গায়ে তাকিয়ে রইল কোণ কটাক্ষে! ফাঁকা
তুমি, কিস্যু জানো না, ঘুমিয়ে একেবারে স্বর্গে যাচ্ছিলে।
মনে মনে রাগ করে ক্ষুব্ধ ভঙ্গীতে ঘাড়টাকে ফিরিয়ে
নিল সে অন্যদিকে। পর মুহূর্তেই লেপের তলায় মুখটা
ঢুকিয়ে দিয়ে হেসে উঠল নিঃশব্দে, কেঁপে কেঁপে উঠল
গায়ে জড়ানো লেপটা।
ছেলেমানুষ! নিতান্ত ছেলেমানুষ তার এই তৃতীয়
পক্ষের জোয়ান পাঁঠার মত ছেলেটা। বোকাটে-
হাব ভাব—বোধ পশুর মত চাউনি।
তবু লেপের ভিতর খুশীতে জ্বল জ্বল করে উঠল তার
মুখখানা। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে চোখ বুজে
রইল সে। তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখে এল চোখ দুটো ঘুমে জড়িয়ে

আসছে যেন। পাশ বালিশটা জড়িয়ে—মাড় কাৎ করে পড়ে রইল। প্রচ্ছন্ন হাসির রেখাটুকু মিলিয়ে আসতে লাগল আস্তে আস্তে।

মহিমের চোখে মুখে কৃতজ্ঞতা। সাগ্রহে গেলাসটা নিয়ে মুখে তুলে ধরল। এক এক চোক গরম চা—তার শীত-কুঞ্চিত ঘুমন্ত স্নায়ুগুলিকে জাগিয়ে গরম করে দিতে লাগলো। আঃ! মনটা ভারী প্রফুল্ল হয়ে উঠল তার। চা খাওয়া শেষ করে বিছানা ঝাড়তে লাটিটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে।

বিড়ি খায় মহিম। একটা বিড়ির জন্ম প্রাণটা হাঁসফাস করে উঠল তার। বিড়ি কোথায় পাওয়া যাবে? লাঠি ভর দিয়ে ঘরে ঢুকল সে। চারদিক তাকিয়ে, একটা তাকের দিকে এগিয়ে গেল। ভাবল বোড়শী ঘুমুচ্ছে।

তাকটা হাতিয়ে দেখল, বিড়ি নেই। হতাশায় আর প্রবল নেশায় একটা চোক গিলল মহিম। আগে মাঝে মাঝে তার বাবা এখানে বিড়ি রাখত। সকালে বেলা পাঠশালায় যাওয়ার আগে এখান থেকে বিড়ি নিয়ে যেত, কোন কোন সময় খেকেও যেত এক আধটা। এখন নেই। হয় তো রাখে না আর এখানে। মনে পড়ল বালিশের তলার কথা। কিন্তু সেখানে যমদূতীর মত ঘুমুচ্ছে বোড়শী। এখুনি টের পেয়ে যাবে। মুখ দিয়ে একটা হতাশা সূচক শব্দ করে বারান্দায় চলে এল সে। চাদরটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে চটের পর্দা উঠিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

নাক কান দিয়ে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকে চকিতে যেন জমিয়ে দিল তাকে শীতে। বাইরে তখনো হাল্কা অন্ধকার। পাতলা কুয়াশার আড়ালে প্রকাণ্ড শুকতারাটা যেন জলে ভেজা চোখে চেয়ে আছে। ম্লান হয়ে ফুটে আছে আরও কয়েকটা ছোট ছোট নক্ষত্র।

মহিমের মনে পড়ল সেদিনের ঘটনা—কাঁকিনাড়ার কথা। কেমন করে সেদিন এগিয়ে গিয়েছিল। বুক পেতে দিয়েছিল গুলীর সামনে। কিন্তু বুক মহিম পেতে দেয়নি। এমন কি ভাবেও নি যে গুলী চলতে পারে। সেবটায় অবশ্য তার কেমন খুন চেপে গিয়েছিল। যখন দেখল চোখের সামনে উড়িয়াটা ছিটকে পড়ল গুলী খেয়ে। পিস্তল দিয়ে বেরুল ধক্, তখন—তখন সেই ধক্ খেয়েই হঠাৎ খুন চেপে গিয়েছিল তার মাথায়। গুনেছিল সে এক—দুই—তিন ···এগিয়ে যাচ্ছিল তাদের দিকে—ঠিক সে সময়েই—হঠাৎ মনে হল চাটুর উপরে কে যেন লাঠি মারলে এক ঘা। ভেঙ্গে দিল হাঁটুটা। পর মুহূর্তেই বুঝতে পেরেছিল—তারও গুলী লেগেছে। রক্ত দেখে বুঝতে পারছিল। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছিল সে, পারেনি। হাঁটু গেড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল মাটিতে সেই উড়িয়াটার রক্তের উপরেই। সেই উড়িয়ার রক্ত লেগে গিয়েছিল তার জামায়। তখুনি আগুন জলে উঠল চেতনে, কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠল আকাশে।

যন্ত্রণায় যখন মহিম হাঁপাচ্ছিল তখন এল অনিল, সেই ছেলেটি, কাঁধে করে তুলে নিয়ে গিয়েছিল তাকে। অনিল সেদিন তুলে নিয়ে না গেলে আজ হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে তাকে জেলের গরাদে গিয়ে আটকা পড়তে হত। ব্যাপার মন্দ নয়, এ এক বিরাট রসিকতা। গুলীও করবে আবার জেলেও ধরে নিয়ে যাবে।

কিন্তু মহিম ভুলতে পারে না তার গৌরবের কথা। বিস্মিত সশ্রদ্ধ প্রশংসা দিয়ে সেদিন কত নরনারীর কৌতূহলী চোখ তাকে জানিয়ে ছিল অভিনন্দন। অনিলের সঙ্গে কতদিন কত ছেলে এসেছে হাসপাতালে তাকে দেখতে; এসেছে অজস্র কৌতূহল, প্রীতি নিয়ে। এসেছে হৃদয় ভরা স্নেহ নিয়ে। মহিম সঙ্কুচিত হয়েছে, লজ্জা পেয়েছে, মনে মনে ভেবেছে, এসব তার জন্ম নয়। কি করেছে সে। কিছুই তো নয়। বুকটা তার কেমন করে উঠেছিল তখন—সেই বিশাল বিক্ষুব্ধ নিভিক জনসমুদ্র দেখে। তার রক্তের মধ্যে যেন নেচে উঠেছিল, আলোড়িত হয়ে উঠেছিল সারা বুকটা। সে আবেগে রুখতে পারেনি বলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল—সেই উত্তাল সমুদ্রের বুকে।

তার জন্ম এত ভালবাসা, স্নেহ, শ্রদ্ধা!···একটা সূক্ষ্ম আত্মগর্বে মনটা আলোড়িত হয়ে ওঠে তার। গভীর ভাবোচ্ছ্বাসে—সে আকাশের দিকে তাকিয়ে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে। চিকচিকিয়ে ওঠে একটু শান্ত হাসি তার ঠোঁটের কোণে।

অথচ বাবা—এটাকে একটা নিছক গুণ্ডামি বলে অপমান

করল তাকে। আশ্চর্য! কালসা অন্ধকারে উঠোনে দাঁড়িয়ে হেসে উঠল সে। সে ভোলেনি হাসপাতালে কাকার সেই বিস্মিত-প্রশংসা ভরা চোখ দুটির কথা।

ভোলেনি কাকার সেই দশ টাকার নোটটা বের করার কথা। এ একটা চরম বিস্ময় বৈ কি! কাকার মত লোক, তার জীবনের দাম, বাঁচিয়ে তোলার মূল্য স্বরূপ, দশটা টাকা দিতে চেয়েছিল নার্সকে! গর্ব বোধ করেছিল তার কাকা। কিন্তু মহিমের সবচেয়ে আনন্দ হয়েছিল, যখন নার্স মেয়েটি টাকা নিলে না, উপরন্তু বলেছিল; আপনার ভাইপো'র চিকিৎসা করাবেন।

মহিমের দাম দেওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল সবাই। ফেলনা নয় সে—নেহাৎ মূল্যহীন নয়, এটা যেন তারা অনুভব করেছিল। সমস্ত কিছু মিলে কাল বিকেলবেলা অবধি যেন মহিম এক অপরূপ গাম্ভীর্যে প্রত্যেক ছিল সকলের কাছে—তার কাকার কাছেও।

কিন্তু তার বাবা···স্পষ্ট জানিয়ে দিল মহিম গিয়েছিল গুণ্ডামি করতে, বদমাইসি করতে। বলে দিল—শয়তানই তার নিছক উদ্দেশ্য। অবহেলা, অশ্রদ্ধা, ঘৃণা; পায়ের বোঝার মত—যেন মহিমকে নামিয়ে দিতে চাইল একেবারে নরকে।

সদর দরজাটা খুলে বেরিয়ে গেল সে। কুয়াশা গলা জল পড়ছে গাছের পাতা বেয়ে। দু' একটা ফোঁটা পড়ল মহিমের মাথায়।

পূবের আকাশ ফরসা হয়ে এসেছে। কুয়াশা মাখানো সাদা আকাশের গায়ে সামান্য লালের আভাস। কাক ডেকে উঠল দু' একটা মন্দিরে ঘুম ভাঙানিয়া আরতি শুরু হয়েছে সামনেই কোথায়, তার কাঁসর ঘন্টার শব্দ সুস্পষ্ট।

॥ পাঁচ ॥

বাড়ি থেকে বেরিয়ে, রাস্তাটা খুব ছোট নয়। মিউনিসিপালিটির সদিচ্ছার চিহ্নও আছে। একদা পাথরের কুচি ঢেলে, আলকাতরার প্রলেপ পড়েছিল। এখন নানা রকম খানা খন্দের সৃষ্টি হয়েছে। এবড়ো খেবড়ো, ছাল চামড়া ওঠা রাস্তাটার দু পাশে, কাঁচা নর্দমা। পাড়াটায় বড় বড় সেকালের কয়েকটা পুরণো বাড়ি আছে। এলোমেলো কয়েকটা প্রাচীন মন্দির। অনুমান করা যায়, হয় তো তখন ইলেকট্রিকের পোস্ট, পীচের রাস্তা, এসব ছিল না। কিন্তু কাঁচা রাস্তা, গাছপালা ছাওয়া একটি গ্রামীন নিরালা সৌন্দর্য ছিল। এখন বড় বড় বাড়িগুলির চারপাশ ঘিরে, টালি খোলার চালে ছাওয়া ঘিঞ্জি বাড়ি উঠেছে। মাটি বা ইঁটের দেওয়াল বড় বা ছোট, সমস্ত বাড়িগুলি, মোষের খাটাল, কাছেই গঙ্গার ধারে ইঁটের ভাঁটা, কেওড়াদের গুয়োরের খাওড়া, সব মিলিয়ে পাড়াটা দারিদ্র ও দুর্ভাগ্যের ছায়ায় ঢাকানো। বড় বড় বাড়িগুলোর বড় বড় মানুষেরা এখন নেই। নিম্নবিত্ত কেরানী বা মাড়োয়ারী ব্যবসাদীদের নানান ধরণের গুদাম ঘরে পরিণত হয়েছে। যত্ন নেই, পলেস্তারা খসে গেছে, ঘুঁটের ছাপে দেওয়াল ভরতি।

মহিম একটু এগিয়ে রামকানাইয়ের চায়ের দোকানে গেল। রাস্তার বাতিগুলি সদ্য নিভেছে। রামকানাই বোধ হয় একটু হাঁপ ছাড়ছিল মিলের লোকেরা চা খেয়ে বিদায় নিয়েছে। ছোকরা চাকরটা শীতের মধ্যে ছরছর করে জল ঢেলে গেলাস ধুচ্ছে। গায়ে সামান্য একটা জামা। যেন ওর গায়ে শীত নেই। রামকানাই স্বয়ং উনুনের কাছে বসে, এলুমিনিয়ামের প্রকাণ্ড মগ ভরতি চা নিয়ে বসেছে। আর দু' চারজন যারা বসেছিল, তারা কারখানার বদলী মজুর। নিশ্চয় বদলী কাজ পায় নি। ধারে চা খাবার জন্যে বসে আছে। রামকানাইয়ের চা খাওয়া হয়ে গেলে জুটবে, আশা আছে।

মহিমকে দেখে রামকানাই কয়েক মুহূর্ত হা করে তাকিয়ে রইল। গেলাস ধুতে ধুতে ছেলে চাকরটা বলে উঠল, মহিমদা।

রামকানাই মগ নামিয়ে বলল, সেই রকমই তো দেখাচ্ছে। কবে এলি? পা দুটোই তো রয়েছে দেখছি। তবে যে শুনেছিলাম, একখানি পা খাঁচ হয়েছে?

মহিম পকেটে হাত দিয়ে বলল, শুনেছিলে বুঝি?

—মাইরি।

রামকানাই দিব্যি গালল। মহিম পকেট হাতড়ে দুটি পয়সা বের করে বললে, দেখি আগে দু' পয়সার বিড়ি দাও দিকিনি। পা যে খাঁচ হয় নি, তা তো দেখতেই পাচ্ছ।

রামকানাই তাড়াতাড়ি বিড়ি দিয়ে বলল, তা তো দেখছিই। লাঠি ভর দিয়ে চলছিস, ওটা কি চিরকালই না কি?

উপরের জলন্ত কয়লার বিড়ি ঠেকিয়ে বলল, না। কদিনের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে। প্রস্তাব লাগান হয়েছে।

রামকানাই বলল, বস্ বস্, সব শুনি তোকে নিয়ে রোজ কথা হয়। চা খাবি নাকি একটু?...আরে, ওই ছোঁড়া, একটু চা কর।...তো লড়লি পুলিশের সঙ্গে? আমরা তো প্রথমে শুনলাম, তুই মরে গেছিস।

মহিম জানে, রামকানাই তাকে খুব পছন্দ করে না। বাধার বন্ধু সে। বন্ধু এবং উপদেষ্টা। মনতোষের ধারণা রামকানাইয়ের মত সংসার অভিজ্ঞ লোক খুব কম আছে। হতে পারে সে রাজপথের ধারের আকাট মূর্খ, হতে পারে নিতান্ত চা-ওয়ালা, কিন্তু এই শয়তানদের সংসারে কী ভাবে চললে সব দিক রক্ষে হবে, তার প্রতিটি পদক্ষেপ নাকি তার জানা আছে। এ সংসারটা যে শয়তানে ভরতি, তাতে তার গভীর বিশ্বাস। হয়তো, এই বয়সে মনতোষের আর একটা বিয়ে করার সাহসও রামকানাই যুগিয়েছে। অথচ রামকানাইয়ের নিজের সাহস কম। সে একটি বিয়েও করে নি। সেটা শুধুমাত্র সাহসের অভাব কিংবা আর কিছু, কে জানে। কিন্তু পদ্মপুকুর পাড়ায় যে তার যাতায়াত আছে, এটা সর্বজনবিদিত। নেশা ভাং তো করেই।

মহিমকে পছন্দ না করার কারণ বিবিধ। বোধ হয় মনতোষের প্রথম পক্ষের সন্তান হওয়াটা তার একটি কারণ। দ্বিতীয়, মহিমকে ভয়। মহিমের সমবয়সী একটি দল আছে এ পাড়ায়, যাদের প্রায় সকলেই একটু আধটু মানে। তার সবটাই যে ভয়, তা নয়। কিছু প্রীতিও আছে। অপরের প্রয়োজনে কাজ করে দেওয়া ঘড়া সোড়ামো, বারোয়ারী পূজায় আয়োজন, সব মিলিয়ে পাড়ায় তাদের একটা নেতৃত্ব আছে। কিন্তু কারুর কারুর কাছে ওরা অবাধ্য, দুর্বিনীত। রামকানাই সেই কারুর কারুর মধ্যে পড়ে। এবং কারুর কারুর সে-ই দলের সেই বোধ হয় পাণ্ডা। মনতোষ সহধর্মী।

মহিম বিড়ি ধরিয়ে বলল, পুলিশের সঙ্গে লড়তে যাব কেন?

রামকানাই হেসে হেসে বলল, তা হলে পুলিশ মিছিমিছি গুলি করবে কেন?

বলে সকলের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নেড়ে নেড়ে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করল। সমর্থন যে সে পাবে, তাও জানা কথা। কারণ যে কথা তিনেক বলেছিল, তারা সকলেই ধারের উমেদার। সকলেই ঘাড় নেড়ে নেড়ে সায় দিল।

মহিম বলল, তা দেশের নেতাদের তুমি জেলে আটকে রাখবে, আর লোকেরা মিছিল করে বলতে পারবে না, তাদের ছেড়ে দাও?

রামকানাই ঘাড় নেড়ে, তেমনি হেসে বলল, তা গবরমেন্ট যদি মনে করে নেতাদের আটকে রাখা দরকার, তবে তুমি আমি কে? না কি বল হে?

সকলেই ঘাড় দুলিয়ে সায় দিল। চাকর ছেলেটা চা তৈরী করে দিল। মহিম চায়ের গেলাস হাতে নিয়ে, আগে একটা চুমুক দিল। বাড়ির চায়ের থেকে ভাল নয়। কিন্তু রামকানাইকে জবাব দেওয়া উচিৎ হবে কি না, বুঝতে পারছে না। লোকটার ভাবভঙ্গি খুব সুবিধের লাগছে না মহিমের কাছে। পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া বাধাতে চাইছে। না কি লোকটা সত্যি মূর্খ? ইংরেজ গভর্নমেন্ট দেশের আটকে নেতাদের রাখবে, আর দেশের লোকেরা কিছুই বলবে না, কখনো সম্ভব?

রামকানাই তখনো বলে চলেছে, আরে বাবা, তুমি আমি তো চুনোপুঁটি হে। নেতাদের কথা আমরা কী করে জানব। তারা হলেন গিয়ে সব জজ ব্যারিষ্টার লোক। তাদের ধরুক মারুক, তাঁদের ব্যবস্থা ঠিক তারা করবেন। আমরা মিছিমিছি রাস্তায় দল বেঁধে হাক ডাক করে কী করব বল? না কি বল হে? ওরে, ওই ছোঁড়া, আর তিনটে চা বানিয়ে ফ্যাল্।...বড়লোকদের সবই বানায়। তাঁরা দু দশ দিন জেলে থাকলেও ক্ষতি নেই। আমরা তো তা নই। গবরমেন্ট যখন দেশটাকে চালাচ্ছে, তখন তাকে তো সব দিক দেখতে হবে। না কি বল হে?

সকলেই ঘাড় কাত করে সায় দিতে লাগল। মহিমের চা তখন প্রায় শেষ। মনে মনে রাগও চড়ছে উঠেছে সে বলল, তোমার গবরমেন্টগিরিই যদি আমি মানতে না চাই, তা হলে কথা বাড়ল কি। হয় তুমি এদেশ ছেড়ে যাবে, না তো আমি প্রতিবাদ করব।

রামকানাই বলে উঠল, তা হলেই হল, লড়াই করতে যাওয়া আর লড়াইয়ের জন্য পায়ে গুলি লেগে, খোঁড়া হয়ে এলি। আর তিনটে না কটা তো শুনছি ওখানেই সাবাড়।

ঠিক কী জবাব দিলে রামকানাইয়ের মুখের মতো হয়, মহিমের জানা নেই। কিন্তু বুকের মধ্যে ফুঁসতে লাগল।

কেবল বলল, তার মানে তুমি ইংরেজের দালাল?

—এই ভাখো, আমি দালাল হতে যাব কেন?

—তুমি তো তাই বলছ, ইংরেজরা থাক।

রামকানাই হেসে বলল, আমি চাইলেই থাকবে, আর না চাইলেই চলে যাবে, ইংরেজ কি ভাই?

ওসব তোরা ভাবিস, আমি ওসব ভাবি না। কাজ কী ভাতীর এঁড়ে কিনে।

মহিম বলল, সেই, চাওয়ালা আছ, তাই থাক, মদ ভাং খাও, পদ্মপুকুর পাড়ায় যাও, তোমার ওসব দেশবিদেশ ভেবে কিছু বুঝবে না।

রামকানাই কিন্তু চটে না। হেসে হেসে বলে, কেন কেন, চটকলের কুলি মজুরেরা বুঝি ওসব বোঝে! চাওয়ালাদের থেকে তারা বুঝি বেশী বুঝি রাখে!

তোমার থেকে বেশী রাখে। আজকে দেশের কী অবস্থা, তাই তুমি জান না। দেশ যে শীগ্‌গিরই স্বাধীন হবে, তাও বোঝ না। নেতাদের বিষয় যা বললে, তখন বললে, এ পাড়ার লোকেরাই তোমার জিভ ছিঁড়ে নেবে।

রামকানাই হেসে বলল, তখন বলব না।

এসব বৃথা তর্ক করতে আর ভাল লাগল না। মহিম জানে, রামকানাই এই বৃথা তর্ককে অনেকদূর টেনে নিয়ে যেতে পারে। তার মাথা খুব ঠাণ্ডা। চটলেও ধরা দেয় না। লোককে উস্‌কে তুলতে সে খুব পটু। যে প্রসঙ্গ আলোচিত হচ্ছে, মহিম সে বিষয়ে কিছু বলতে পারছে না। কিন্তু যেখানে অনিলের মতো ছেলেরা আছে, সেখানে রামকানাই চাওয়ালার এসব কথা শুনতে তার ঘৃণা হয়, রাগও হয়। এবং রামকানাই যা বলছে, তাতে তার কিছুই যায় আসে না। মহিমকে বিরক্ত করতে পারলেই সে খুশি। সে উঠে দাঁড়াল।

রামকানাই বলল, বস্‌ বস্‌, যাচ্ছিস কেন? সব শুনি আগে। আমি তো বললাম এইজন্যে যে, তোর বাবা এসে রোজ দুঃখু করে, তুই সংসারী হলি না, কোথায় কোন দলে টলে গিয়ে ভিড়ছিস। তাই বলছি, আমাদের এসবে কী যায় আসে। আর একটু চা খাবি? এই মহিমকে চা দে আর একটু।...হ্যাঁ, নতুন মায়ের সঙ্গে আলাপ-টালাপ হল?

রামকানাইয়ের কথা শেষ হবার আগেই, দুটি ছেলে এল। মহিমের সমবয়সী, বন্ধু। ভেলকালি মাখা প্যান্ট সার্ট ওদের গায়ে। কাজ করে ইলেকট্রিকের তার তৈরীর কারখানায়। মহিমকে দেখেই দুজনে চীৎকার করে উঠল, এসে পড়েছিস্‌।

স্বভাবতই রামকানাইয়ের কথা বলার সুযোগ গেল। এখন তার শুধু শোনার পালা। ওরা তিন বন্ধুতে পাশাপাশি গায়ে গা দিয়ে বসে, দুবছরের বিরহের খোয়ারী কাটাতে লাগল।

॥ ছয় ॥

শীত প্রায় শেষ হয়ে এল। বাতাসে হিমের নরম তেমন ধারালো নয় আর। মাঝে মাঝে দুপুরবেলার মধ্যে বাতাস একেবারে থমকে যায়। একটু গরম লাগতে আরম্ভ করে। হঠাৎ দক্ষিণ থেকে এক ঝলক হাওয়া এসে পড়ে। গাছে গাছে পাতা গজাতে আরম্ভ করেছে এর মধ্যেই। কোনো কোনো আম গাছে ইতিমধ্যেই বোল ধরেছে। কাঁটালের জালি ঝুলছে। ইটের ভাঁটা-গুলো এখনো শূন্য। ঠিকাদারের চুক্তি করা কুলি কামিনেরা গঙ্গার ধারে, তাদের খোড়ের ঘাউড়ার মতো নিচু নিচু কাঁচা ঘরগুলোতে ভিড় করে আছে এখনে। বর্ষা নামার আগে পর্যন্ত তাদের কাজ চলবে। এই চটকল এবং অন্যান্য কারখানার বিস্তৃত অঞ্চলে, এতদিন ধোঁয়া আর ধুলোর তাণ্ডবটা বোঝা যায় নি। এখন উড়তে আরম্ভ করেছে। শীতের পর এই প্রথম কাঁচা নর্দমাগুলি থেকে গন্ধ বেরুচ্ছে। তবু, গঙ্গার ধারের এই বিস্তীর্ণ শিল্পাঞ্চলের মানুষেরা এখন, শুকনো, শীত গ্রীষ্ম সমান আবহাওয়ায় বেশ ঝরঝরে আছে।

মহিম হাসপাতালে গিয়ে প্লাস্টার খুলে এসেছে। এখন আর ওকে লাঠি নিয়ে চলতে হয় না। কিন্তু ডান পা-টা ঈষৎ টেনেই চলতে হয়। তবে, ওর না একটা ধারণা ছিল, উরুতের কাছেও গুলির বদলে যা গুলা একটা আঘাত আছে, তা নয়। ওকে কেউ কোনোদিন হাসপাতালে বলেও নি, নিজেও কাউকে জিজ্ঞেস করে নি। আসলে, হাঁটুর নিচেই, গুলি লাগা স্নায়ুর ওপর, একটুখানি মাংসের দরকার ছিল বলে, উরুত থেকে কেটে নিয়েছিল। ব্যাপারটা ভারি আশ্চর্যের মনে হয়।

এখন মহিমের দিনগুলো বড় দীর্ঘ মনে হয়। এখনো তার কোনো কাজ জোটে নি। বাবার বিয়ের আগে, কিছুকাল

বাবার গলা, যোয়ান ছেলে, বেলা অবধি ঘুমোবে। ফরবেই বা কি উঠে। হুঁ, গুলি খেয়ে গেছলেন। এখন এসে দিব্যি খাচ্ছেন দাচ্ছেন, ঘুমোচ্ছেন। ছেলেকে একটু বলো টলো। বত হলেও ছেলে তো; বাবা-বাছা করে একটু কাজ কম্মের কিছির দেখতে বে

তারপর নানান রকম শব্দ করতে করতে বিড়ি ধরিয়ে বাবা বেরিয়েছিল। বলেছিল, 'বাতিটা একটু দেখাও।'

বাবা বেরিয়ে গিয়েছিল। কাকাও বেরিয়ে গিয়েছিল আগেই। কাকীমার দরজা বন্ধ করার শব্দ শুনেছিল মহিম। বাইরের দরজা বন্ধ করে, বোড়শী এসে ঘরের দরজার সামনে একটু দাঁড়িয়েছিল। পাতলা চটের আড়াল থেকে আলোর আভাস দেখতে পাচ্ছিল মহিম। তারপরেই ঘরে ঢুকে গিয়েছিল। মহিমও উঠে পড়েছিল। বিড়ির দরকার। বড় খারাপ অভ্যাস করে ফেলেছে। কিনে রাখার মতো পয়সাও থাকে না। সে আস্তে আস্তে পা টিপে উঠে, ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল প্রথম দিন ভোর রাত্রের মতো। গতকাল ভোররাত্রে একটা নতুন বুলবুলিতে বিড়ি খুঁজে পেয়েছিল সে। সেটা প্রথম দিন পায় নি। দরজাটা ভেজানো ছিল। সে জানতো, বোড়শী শেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে।

আস্তে আস্তে দরজাটা ঠেলেছিল সে। দেখছিল ঘরে আলো জ্বলছে। বোড়শী সামনে। লেপটা কোমর অবধি টানা। চোখ দুটি কি বোজা নয়? মনে হয়েছিল বোজা নেই। ভেবেছিল, নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে। না পড়লেই বা ক্ষতি কী। বোড়শীর তো জানতে বাকী নেই। মহিম তক্তপোষের কাছাকাছি গিয়ে কলুলিতে হাতড়েছিল। বিড়ি ছিল না। হতাশায় বিমর্ষ হয়ে উঠেছিল। কাল ছিল, তার পরদিনই আবার কোথায় রাখা হয়েছিল? সম্ভাব্য আরো দু একটা জায়গা খুঁজেছিল প্রায় নি। হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার তৃতীয় দিন সেটা। একটি পয়সাও হাতে ছিল না। নিরুপায় হয়ে, রামকানাইয়ের দোকানে যাবার মনস্থ করেছিল। সেখানে কেউ না কেউ একটা দিতে পারে। সে বেরিয়ে যাবার জন্যে সবে পা বাড়িয়েছিল। আর তখনি বোড়শীর নিচু গলা শোনা গিয়েছিল, 'এ ভাবে কত দিন চলবে?'

প্রায় চমকেই উঠেছিল মহিম। তার গলা দিয়ে প্রশ্নসূচক শব্দ বেরিয়ে গিয়েছিল, 'মা?'

পুনরুক্তি করেছিল বোড়শী, 'এ ভাবে কতদিন চলবে?'

মহিম তাকিয়েছিল। হারিকেনের আলোর একটি রেশ পড়েছিল বোড়শীর গায়ে। মুখটা তার বালিশের ওপর কাত অবস্থায় মহিমের দিকে তাকাল। ঘোমটা স্বভাবতই ছিল না। লম্বা বেণী সাপের মতো এলিয়ে পড়েছিল ঘাড়ের পাশ দিয়ে। গায়ে শুধু জামাটাই দেখা যাচ্ছিল। ঠোঁটের কোণ দুটি বেঁকেছিল হাসির ছোঁয়ায়। মহিমের দিকে স্থির নিবদ্ধ চোখের তারা দুটি চকচক করছিল। কপালে সিঁদুরের দাগ ঘষে বেঁকে অস্পষ্ট দেখাচ্ছিল।

কোনো কিছুর মধ্যেই ঘাড়ভাবের একটু ছায়াও ছিল না। মহিম চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। বলেছিল, 'একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

'—কী ব্যবস্থা?'

সে কৈফিয়ৎ বোড়শীকে দিতে ইচ্ছে করে নি মহিমের। শুধু বলেছিল, 'দেখি।' বলে বেরিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই, বোড়শী জিজ্ঞেস করেছিল, 'কোথায় যাওয়া হচ্ছে?'

কী বিশ্রী কথা বলার ধরণ! কিন্তু মহিমের কী যায় আসে বলেছিল, 'দোকানে।'

'রামকানাইয়ের?' উচ্চারণ করে, বোড়শীর ঠোঁট দুটি হাসিতে আরো বেঁকে উঠেছিল। রাত্রের পানের বাসি রক্তাভায় ঠোঁট তীব্র দেখাচ্ছিল। আবার বলেছিল, 'বাপের বিয়ের বরকর্তা!

বোড়শী কাত হয়ে, পুরোপুরি মহিমের দিকে ফিরেছিল। গলার চিকচিকে সোনার হারটা ও সঙ্গে সঙ্গে পাশে এলিয়ে পড়েছিল। যদিও এক্ষেত্রে প্রয়োজন ছিল না, তবু বিবাহে বাঙালীর স্বভাববশতই হয়তো বোড়শীর বয়স দু এক বছর কমিয়ে বলা হয়েছিল। সে বোধহয় মহিমেরই সমবয়সী। সমবয়সী ছেলেটির দিকে তাকিয়ে, তার চোখে নানান আলো ছায়া খেলা করছিল। বাসনা এবং ঘৃণা, হতাশা ব্যথা, বিদ্রূপ ও যাতনা, সব মিলিয়ে তার দৃষ্টি তীব্র হয়ে উঠেছিল। বলেছিল, 'তবে কী শুনতে ভাল লাগে।'

মহিম বলেছিল, 'কিছুই না।'

'তা বললে কী হয়। এই যুগের সংসারেই যখন থাকতে হবে, তখন কিছু কিছু শুনতে হবে বৈকি। আমি তো

এখানে তোর দাবে ধরা পড়িনি। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচা করেও আমার বিয়ে হয় নি। বরং টাকা দিয়েই আমাকে আনা হয়েছে। চুপ করে থাকব কেন?

মহিম অনর্থক কথার মধ্যে যেতে চাইছিল না। বলেছিল, 'কে বলেছে চুপ করে থাকতে।'

'কথা শুনতে ভাল না লাগলে তো চুপ করেই থাকতে হয়।'

'কথা বলার তো অনেক লোক আছে।

কী সুন্দর লোক সব। জা'টি তো ভাবছে, আমি তার জন্মের ধন কবলে নিতে এসেছি। মরণ! এ সংসারের আছে কি যে কবলে নেব। দেওরটি তো বুঝেই নিয়েছে, আমার চরিত্র খারাপ। আর বড় মিস্তিরির তো কথাই নেই। মেয়ের বাপ ও মেয়ের পেছনে অত ট্যাক ট্যাক করে না। বাকী রইল···

কথার মাঝ পথেই মহিম দরজার দিকে পা বাড়িয়েছিল। ষোড়শীর কথার মধ্যে সত্যি ছিল। কিন্তু মহিমের শুনে কোনো লাভ ছিল না। ষোড়শী বলে উঠেছিল, 'কী হল?'

'আমি বাইরে যাচ্ছি।'

'বিড়ি খাবার জন্যে তো!'

'হ্যাঁ।'

'এই যে এখানে রয়েছে।'

বলে, হাত বাড়িয়ে বালিশের পাশ থেকে কয়েকটা বিড়ি নিয়ে তক্তপোষের উপরেই রেখেছিল ষোড়শী। আসলে, বিড়িগুলো সে মহিমের জন্যেই মনতোষের কেস্ থেকে সরিয়ে নিজের কাছে রেখেছিল। তার সতীন পুত্রটি জানে না, পুত্রের বাপ বিড়ি চুরি সম্পর্কে খুব সচেতন। আজ এক জায়গায় রাখে তো, কাল আর এক জায়গায়। পারতপক্ষে রাখেই না। নিতান্ত ভুলে গেলে আলাপ কথা।'

মহিম বলেছিল, 'থাক, আমি বাইরে দেখি পাই কি না।'

'কেন, বেচে দিলে নিতে নেই! বাইরের লোকের কাছে চেয়ে, নয় তো চুরি করেই খেতে হবে!'

ষোড়শীর কাছ থেকে নিতেই আসলে আপত্তি ছিল মহিমের। দ্বিধা আর সঙ্কোচও ছিল। পরে মনে হয়েছিল, কতক্ষণ বসে থাকতে হবে হা করে, কে জানে। বিড়ি কটা সে হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। আর এক মুহূর্তও দাঁড়ায় নি।

ষোড়শী এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল মহিমের ভেজিয়ে রেখে যাওয়া দরজাটার দিকে। তার বাঁকানো ঠোঁট দুটি আস্তে আস্তে সরল হয়ে এসেছিল। চোখ দুটি শান্ত, এবং এক গভীর ভাবে যেন তন্ময় হয়ে গিয়েছিল। একটি দীর্ঘ শ্বাস পড়েছিল। তারপরে হঠাৎ দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরেছিল। চোখের দুটি শক্ত হয়ে উঠেছিল। লেপটা টেনে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে সে রুদ্ধশ্বাসে অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল।

পরদিনই সকালবেলা কাজের খান্দায় বেরুবার আগে, মাথাটা একটু আঁচড়ে নিচ্ছিল মহিম। ষোড়শী রান্নাঘর থেকে হঠাৎ এসেছিল। খোলা চুল, ঘোমটা ছিল না। সিঁথের সিঁদুর না থাকলে আইবুড়ো মেয়ে বলা যেত। সেইদিনই প্রথম সম্বোধন করে বলেছিল, বাইরে যাচ্ছ?

'হ্যাঁ।'

'এই নাও।'

আঁচলের গিট খুলে, একটি সিকি বাড়িয়ে ধরেছিল মহিমের দিকে। মহিম অবাক হয়ে বলেছিল, 'কী হবে?'

ষোড়শী বলেছিল 'পয়সার দরকার আছে তো। বাইরে চাটা আসটা। বিড়িও তো কিনতে হবে। রোজ রোজ তো আর পকেট মেরে চলবে না।'

মহিম থমকে গিয়েছিল। একবার চোখাচোখি হয়েছিল ষোড়শীর সঙ্গে। তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিল, না, আমার পয়সার দরকার নেই।'

'সত্যিই?'

মহিম চুপ করে গিয়েছিল সত্যি যে নয়, সে জানা কথা। কিন্তু ষোড়শীর পয়সা, ওরকম একটা অকল্পিত ব্যাপারে কী যে করা উচিত, কয়েক মুহূর্ত কিছুই স্থির করতে পারে নি। বাকী যদি সেই পয়সাটা দিত, তাহলে কোনো দ্বিধাই হত না।

ষোড়শী আবার বলেছিল, 'আমার পয়সা বলে নিতে ইচ্ছে করছে না?'

মহিম বলেছিল, 'আমি তো এখন শোধ দিতে পারব না!'

ষোড়শীর চোখ দুটি বারেক কুঁচকে উঠেছিল। বলেছিল, যখন পারবে, তখনই না হয় দিও। এখন তো কাজ চালাও।'

তবু সিদ্ধান্তে আসতে পারে নি। ব্যাপারটার মধ্যে

বোধহয় যেন একটা গোপন অন্যায় দেখতে পাচ্ছিল মহিম। এতটা হওয়া উচিত ছিল, ব্যাপারটা জানাজানি হলে, কেউই ঠিক ভাল বলে দেখবে না। একটা বিশ্রী কেলেঙ্কারি ঘটে যাবে। বলেছিল, 'থাক।'

ঘোড়শী টুক করে সিকিটা মহিমের জামার পকেটে ফেলে দিয়েছিল। বলেছিল, 'রইল তা হলে। ইচ্ছে হলে খরচ করো, নয় তো নয়।'

বলে সে আর এক মুহূর্ত দাঁড়ায় নি। চলে যেতে যেতে বলেছিল, 'তোমার তরকারি পুড়ে যাচ্ছে। দাঁড়াবার সময় নেই।'

মহিম কয়েক মুহূর্ত নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এতটা ঘনিষ্ঠতা যেন তাকে আড়ষ্ট করে তুলছিল। পকেটে হাত দিয়ে পয়সা তুলতে গিয়ে, থেমে গিয়েছিল। আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ছিল।

কিন্তু দুপুরবেলা বাড়ি ফিরে, ঘোড়শীর হাসি চাউনি, সমস্ত কিছুই ভীষণ খারাপ লেগেছিল মহিমের। চোরা কটাক্ষ, টিপে টিপে হাসা, সবই। বেলা তিনটে নাগাদ, বাড়িতে যখন কেউ ছিল না, মহিম যখন চটের ছাউনি খোলা বারান্দায় রোদে পিঠ দিয়ে শুয়ে ছিল, তখন ঘোড়শী তাকে ঘর থেকে নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করেছিল, পান খাবে নাকি?' ভীষণ রাগ হয়েছিল মহিমের। কী ভাবছে তাকে ঘোড়শী? কী মনে করছে তাকে? ভিতরে ভিতরে একটা রুষ্ট ঘৃণাবোধ ফেপে উঠছিল। ইচ্ছে করছিল, ঘোড়শীর পয়সা ছুঁড়ে ফেলে দেয় মুখের ওপর। কিন্তু তখন আনা দুয়েকের মতো খরচ হয়ে গিয়েছিল। সে কেবল গম্ভীর গলায় বলেছিল, 'আমি পান খাই না।' বলে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। কেমন যেন একটা অসহায় ক্ষোভে সে জ্বলছিল।

কিন্তু ক্ষোভও সঞ্চিত হল, অথচ ঘোড়শীর সাহায্য ও নিয়মে দাঁড়িয়ে গেল। আর সে কথাটা কাউকে বলাও গেল না। চার আনা পয়সা প্রায় প্রতিদিনই ঘোড়শী দিতে লাগল। মহিম নিতে লাগল। ঘোড়শী ঘনিষ্ঠ হবার নানান ফাঁদ রচনা করতে লাগল।

সাধারণতঃ যারা কাকার খাওয়া হয়ে যাবার পর মহিম খেতে বসে। কাকী সামনে থাকলে ঘোড়শী এমন অভ্রান্ত করে খেতে দেয়, যেন মহিম সত্যি আপন। কাকী না থাকলে দু'হাতাহাতি করে এত বেশী দেয় যে, মহিম শিউরে ওঠে। বলে, 'এ কি, এত কেন?'

ঘোড়শী খুব স্বচ্ছন্দে বলে, 'যা দিয়েছি খেয়ে নাও।'

প্রথম প্রথম দু'একদিন বাড়তি মাছ তরকারি ফেলেই চলে গিয়েছিল। একজন বড় মিস্তিরির জীবনধারণের গঠন, সামাজিক মর্যাদা, পারিবারিক চেহারা যতই বিবর্ণ হোক, রুচিহীন বেখাক, আসলে তেমন দারিদ্র-পীড়িত হবার কথা নয়। একজন কেরানীর থেকে মিস্তিরির আয় বেশী। অতএব মোটামুটি মাছ, নিরামিষ তরকারি, ডাল, এগুলো হয়েই। এবং যথাবিত্ত জীবনের ছাঁচে গড়া সংসারে, বন্টনের ভারসাম্যটা এমন' বড় ব্যাপার। বিচিত্র তো বটেই। অনেক সময় লজ্জাকর! মহিমের ক্ষুধা ও রুচি যাবা কাকার থেকে কম নয় কিন্তু সে বাড়ির কর্তাদের মধ্যে পড়ে না। রোজগার করলে অবিশ্যি কিছুটা পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।

এরকম ক্ষেত্রে লুচিতে বেশী ঘেতে দিলে, চুরি করে খাওয়ার মতো মনে হয়। মনটা ছোট হয়ে যায়। তাই প্রথম প্রথম প্রতিবাদ না করে পারেনি মহিম। ছলটা অবশ্য বোধ হয়েছিল। খাবার ফেলেই উঠে পড়ছিল, কিন্তু যেটুকু যার প্রাপ্য, সেটুকু ছাড়ে নি। কাকী পাতে পড়ে থাকা খাবার দেখে ধরে নিয়েছিল, ঘোড়শীর পরিবেশনে এমন কোনো নির্দয় ব্যবহার করেছে, যার জন্যে সে খাবার ফেলে চলে গেছে।

জিজ্ঞেস করেছে, 'কী রে অ মহি, মাছ ফেইলে রেখেছিস কেন?'

মহিম জবাব দিয়েছে, 'ভাল লাগে না।'

কাকী একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলেছে, 'তোকে আমি খেতে দেব এর পর থেকে।'

কিন্তু মহিমকে একলা খেতে দেবার সময় সত্যি হয়ে ওঠে না কাকীর। মহিম সত্যি কথা কাকীকেও বলতে পারে না। বলতে গিয়েও থেমে যায়। তা হলে সমস্ত ব্যাপারটা যে রকম লজ্জাজনক অবস্থায় গিয়ে দাঁড়াবে, ভাবতেও গা ঘিনঘিন করে। সঙ্গে সঙ্গে সবাই ঘোড়শীকে চেপে ধরবে। ঘোড়শীও যে পেছিয়ে থাকবে, এমন মনে হয় না। হয়তো বলবে, 'দিয়েছি বেশ করেছি। আমার ইচ্ছে হয়েছে, তাই দিয়েছি।' আর এ ব্যাপারটা এমনিই একটা ফাঁদের

মতো, কলঙ্ক অশান্তির হাত থেকে তখন মহিমও রেহাই পাবে না। তা ছাড়া, পরশাটা যখন গ্রহণ করতে পারছে, তখন খাবার বেলায় বোড়শীকে কাঁসরায় তোলাটা দৃষ্টি-কটু। অতএব এ লড়াইটা বোড়শী আর মহিমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

কিন্তু কী চায় বোড়শী। বন্ধু বিপিনের ঠাট্টাটা মনে পড়ে যায়। যে-কারণে বিপিনের সঙ্গে বিবাদই বেধে উঠেছিল। গঙ্গার ধারে কোনো পুণ্যবান একদা একটি মুমূর্ষু ঘর তৈরী করেছিল। হয়তো গঙ্গাপ্রাপ্তির আশায় সেখানে কোনো এক কালে মুমূর্ষুরা এসে থাকতো। অন্তত গত কয়েক দশকের মধ্যে গঙ্গাপ্রাপ্তির পুঁজি সঞ্চয়ে মুমূর্ষুরা আসেনি। ভিটিমাটি, হারিয়ে যাওয়া গরু, আর কুকুরদের আস্তানা হয়ে উঠেছিল। মহিমরা সেটাকে পরিষ্কার করে নিয়ে তাদের শ্রাবণঘরে পরিণত করেছে। শ্রাবণঘর বলতে, সকলে একত্র হয়ে কিছু লগ্ন কাটানো। সেখানেই বিপিন কথায় কথায় একদিন বলে উঠেছিল, 'যার সঙ্গে তোর বিয়ে দেওয়া দরকার ছিল, তোর বাপ তাকে নিজেই বিয়ে করে এনেছে।'

মহিম রুষ্ট হয়ে বলেছিল, 'বাজে কথা বলিস না।'

বিপিন হেসে বলেছিল, 'বাজে কথা হল? একটা আনকোরা ছুঁড়ি ধরে নিয়ে এসেছে, তা বলতে পারব না? কোনদিন তোকেই না চার করে টোপ ফেলে দেখিস।'

বলে হা হা করে হেসে উঠেছিল বিপিন। মহিম রেগে গিয়ে হাত তুলে মারতে উঠেছিল বিপিনকে। বিপিন ছুটে পালিয়েছিল হাসতে হাসতে। মহিম গম্ভীর হয়ে যাবে, এটা ভেবেছিল হয় তো বিপিন। মারতে উঠবে, এতটা ভাবতে পারেনি। তাই দূর থেকে হাত জোড় করে বলেছিল, 'মিছিমিছি বলেছি রে। তুই মারতে আসছিস মাইরি!'

মহিম খেঁকিয়ে উঠে বলেছিল, 'মিছিমিছি করে বলার আর কথা নেই? খচ্চর! বা টোপ ফেলবে ছেলেকে? জিব ছিঁড়ে ফেলব তোর।'

অবিশ্যি সেদিন পর্যন্ত রাগ পড়েছিল মহিমের। এবং তার আড়ালে যে বন্ধুরা সবাই বোড়শীকে নিয়ে নানানরকম কথা বলে, এটা বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু বিপিনের কথার মধ্যে কি কিছু সত্যি ছিল? বোড়শীর ব্যবহারগুলো কি তারই ইঙ্গিত দেয়? পর পর আরো কতগুলো দিনের কথা মনে পড়ে যায়। বোড়শীর এক একটা ব্যবহার এবং কথা।

একদিন দুপুরে ঘরের দরজা খোলাই ছিল। স্বভাবতই ঢুকতে কোনো বাধা ছিল না! বাবার ক্ষুরটা কোথায় আছে, তাই দেখতে গিয়েছিল। মনস্তোষ নিজের হাতে ক্ষুর দিয়ে দাড়ি কামায়। মহিমও সেটাই রপ্ত করেছিল। ক্ষুর খুঁজে পেয়ে, ঝুনুঝি থেকে ছোট আয়নাটা নিয়ে, বারান্দায় বসে কামাবে বলে বেরিয়ে আসছিল। ভেবেছিল, বোড়শী পাশ ফিরে শুয়ে দিবানিদ্রা দিচ্ছে। হঠাৎ শুনতে পেয়েছিল, 'ও বাছা, শুনছ?'

বোড়শীর মুখে 'বাছা' শব্দটা ঠাট্টার মতোই শুনিয়েছিল। মহিম বলেছিল, 'কী?'

'আমার পা দুটো বড্ড কামড়াচ্ছে।'

মহিম ক্রুদ্ধবিস্ময়ে ফিরে তাকিয়ে দেখেছিল বোড়শীর চোখ বোজা। মুখটি ভাল মানুষের মতোই।

মহিম জিজ্ঞেস করেছিল, 'তা কি করতে হবে?'

অত্যন্ত যেন সহজ নিচু সুরে বোড়শী বলেছিল, 'একটু টিপে দেবে?'

মহিমের এক মুহূর্ত কথা জোটেনি মুখে। হাঁটুর কাছাকাছি শাড়ি তোলা, শক্ত পুষ্ট গোছাওয়ালা, আলতা পরা পা দুটি চোখে পড়েছিল। মহিম প্রায় ক্ষ্যাপা স্বরে বলেছিল, 'আমি পা টিপে দেব?'

বোড়শী পান খাওয়া ঠোঁট দুটি এবারে টিপে, ঝুঁকড়ে, গম্ভীরভাবেই বলেছিল, 'ক্ষতি কী। তোমার গুরুজন তো বটি, না কী গো?'

বোড়শী সত্যি বলছে না ঠাট্টা করছে, মহিম বুঝতে পারে নি। আরো কয়েক মুহূর্ত তাকিয়েছিল বোড়শীর দিকে। বোড়শী দুটি পা পরস্পরে ঘষছিল। পরমুহূর্তেই তার মনে হয়েছিল, সত্যি হোক, ঠাট্টা হোক, ওটা একটা দুরূহ ব্যাপার। সে বাইরে চলে যেতে যেতে বলেছিল 'আমি কারুর পা টিপে দিতে পারব না।'

বোড়শীর যেন হতাশায় হস্ করে একটা নিঃশ্বাস পড়েছিল। বলেছিল, 'তা হলে দিও না।'

আর একদিন, সকাল নটায় ঘটনা। কারখানার লোকেরা

করেছে। কাকী গিয়েছিল গঙ্গায় স্নান করতে। মাদুও সঙ্গে গিয়েছিল। মহিম প্রত্যহের মতোই কারখানার এ ঘরে সে ঘরে ঢু দেবার ভঙ্গে বেরুবার উপক্রম করছিল। দেখেছিল আগেই, ঘোড়শীর বেশবাস একটু শিথিল, চুল রুক্ষ। হঠাৎ রান্নাঘরের দরজাটা বন্ধ করে, ঘরে এসে ঢুকেছিল। উঃ শব্দ করে, তক্তপোষের বিছানার ওপর এলিয়ে পড়েছিল। মহিম দেখেছিল। কিছু জিজ্ঞেস করবে কি না বুঝতে পারেনি। তবু শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস না করে পারে নি, 'কী হল ?'

প্রায় আর্তনাদ করেই বলেছিল ঘোড়শী, 'ভীষণ মাথা ধরেছে। মনে হচ্ছে, রগের পাশে শির দুটো ছিঁড়েই পড়বে। বসে রাঁধতে পারছি না।

মহিম নিবিষ্ট চোখে একটু তাকিয়ে দেখেছিল ঘোড়শীকে। দু হাতে মাথা টিপে ধরে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে। জামাটা পিঠের কাছে ছেঁড়া। কাপড়টা ছোট আর ময়লা। মহিম বলেছিল, 'মাথাধরার ওষুধ কিছু এনে দেব ?'

ঘোড়শীর চেপে রাখা মুখ থেকে অস্পষ্ট শোনা গিয়েছিল, 'ওষুধে কিছু হবে না।'

'তবে ?'

'রগ দুটো চেপে ধরে টিপে দিলে একটু আরাম হবে।'

মহিম মনে মনে ভেবেছিল, 'সে কি করে সম্ভব। টিপে দিলেও একটা লোক কতক্ষণ টিপে দিতে পারে। ওষুধ তো খেতেই হবে। বলেছিল, 'টিপে কতক্ষণ রাখা যাবে। তার চেয়ে ওষুধ এনে দিচ্ছি, একেবারে সেরে যাবে।'

প্রায় কাঁদো কাঁদো স্বরে বলেছিল ঘোড়শী, 'উঃ, দাও না বাপু একটু চেপে। তোমার হাতে তো বেশ জোর আছে। একটু চেপে চেপে টিপে দিলে আরাম হবে।'

মহিম কয়েক মুহূর্ত আবার ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে দেখেছিল। তারপরে বলেছিল, 'আচ্ছা নাও দেখি, চিত হয়ে শোও।'

বেশ কষ্ট করেই চিত হয়েছিল ঘোড়শী। মহিমের মনে একটু ক্ষীণ সন্দেহ যে না হয়েছিল তা নয়। সকাল থেকেই এত মাথা ব্যথার কথা জানা যায়নি। কাকী স্নান করতে চলে গিয়েছিল, ব্যথাও চড়ে উঠেছিল। কিন্তু সম্পর্কের কথাটা ভেবে, অন্যরকম কিছু বিশ্বাস করতে পারে নি। তক্তপোষের নিচে দাঁড়িয়েই এক হাত বাড়িয়ে ঘোড়শীর মাথা স্পর্শ করেছিল। এক হাত দিয়েই, কপালের দুপাশে টিপে দিয়েছিল। কিন্তু ঘোড়শীর বিস্রস্ত বেশ শরীরের দিকে তাকাতে তার লজ্জা করছিল। জামাটা শুধু ছেঁড়া নয়, বোতামও কি নেই ?

বিরক্ত বোধ করছিল মহিম। ঘোড়শী এক আধবার একটু চোখ খুলেছিল।

বলেছিল, 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ দেবে। বস না !'

মহিম কোনো জবাব দেয় নি। কারণ বসার কথায় সে আরো বিরক্তবোধ করছিল। আর দেখছিল শীতের মধ্যেও ঘোড়শীর কপাল ঘেমে উঠেছে। চটচট করছিল তার হাত।

হঠাৎ ঘোড়শী হাত বাড়িয়ে মহিমের হাতটা ধরে টেনে বলেছিল, 'বসই না, চাত যাবে না।'

মহিম হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে, বাইরে চলে যেতে যেতে বলেছিল, 'নিকুচি করেছে, আর টিপতে পারব না আমি। পারতো ওষুধ আনিয়ে খেও,-আমি চললাম !'

চলে গিয়েছিল মহিম।

আজকাল আরো লক্ষ্য করে, ভোরবেলার চা দেবার সময়, ঘাড়ে বা বুকে খোঁচা মারে ঘোড়শী। এবং আর কিছু না বলে চলে যায়। কিছু বলার থেকে, এই খোঁচাটা মহিমকে বেশী রাগিয়ে দেয়। পাল্টা একটা থাপড় মারতে ইচ্ছা করে। পারে না। প্রথম প্রথম, 'চা রইল' বা 'ঘুমিয়ে যে একেবারে কাদা !' ইত্যাদি কথা বলে চা দিয়ে যেত, সেটা তবু এরকম ছিল। এবং আশ্চর্য লাগে মহিমের, ঘোড়শী একেবারে প্রথম দিন থেকেই এরকম ব্যবহার করে চলেছে। একটা মানুষের সঙ্গে ভাল করে পরিচয় হওয়ার তো দরকার। নাকি নিজের ইচ্ছে মতো চললেই হল ! কী চায় ঘোড়শী ? বিপিনের ঠাট্টাটাই সত্যি নাকি ? কী অদ্ভুত। একথা কি কেউ কখনো ভাবতে পেরেছে ? এত দূর চিন্তা করতে পারে কেউ ? মহিমের এই রকম ধারণা। ওর এতো বছরের জীবনে অভিজ্ঞতা কম। বিশ্বাসগুলো কোনোরকম নড়চড় হবার উপায় নেই। গর্ভধারিণী মা, কিন্তু ঘোড়শী যে সম্পর্কে ওর মা, এবং মা হয়ে ও-রকম চিন্তা যে একটা ভয়ংকর পাপ, এ বিশ্বাস থেকে ওকে কেউ এক বিন্দুও টলাতে পারবে না। তাই ঘোড়শীর প্রতি অপরিসীম ঘৃণায় মহিম দুর্বার হয়ে ওঠে।

একদিকে অপরিসীম ঘৃণা, আর একদিকে নির্বস্ত্রতা, এ দুয়ের দ্বন্দ্বে একুশ বছরের মহিম অশান্তি বোধ করে।

শীত চলে গেল। বসন্তও যায়। তাপমাত্রা প্রতিদিনই বাড়ছে। চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহে দিদিমা মারা গেল। সকলেরই প্রাণের মধ্যে যে একটা পরম সহিত শান্তি নেমে এল, তা অনুভব করা গেল। মৃত্যুই যেখানে একমাত্র সমাধান ছিল, সেই পরম আনন্দ এসে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল। মহিমের বাবা, টার্ন ঘরের বড় মিস্তিরি, নকল দাঁতে বিড়ি চেপে ধরে, মুখে একটা শোকের ভাব নিয়ে, নিবিড় শান্তিতে সন্তোষের সঙ্গে শ্রাদ্ধের বিষয় আলোচনা করল। বলল, 'ছেলেবেলায় মা হারিয়ে ছিলাম, পেরথম থাওড়াই আমার জান চোখে দেখা মা। সন্তোষ, ছেরাদ্দটা আমি একটু ভাল করে করতে চাই।'

কাকা বলল, 'ভালই তো।'

অতএব মনতোষ ঘুরে ঘুরে তার খাতকদের মুখে মুখে নোটিশ দিতে লাগল। বাকী পড়া সুদ তার পক্ষে আর ফেলে রাখা সম্ভব নয়। সুদের কারবারটা তার খারাপ নয়। চটকলের বড় মিস্তিরি তো বটেই। মেজ ছোটরাও অনেক সময় কম বেশী সুদের কারবারী হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খাতকের দল নিজেদের ডিপার্টমেন্টের কম মাইনের মেয়ে পুরুষ শ্রমিকেরা। মিস্তিরিরা কাবুলীওয়ালাদের মতো নিষ্ঠুর কর্কশ নয় ব্যবহারও নয়। বরং ক্ষেত্র বিশেষে সুদের মাত্রাটা কিঞ্চিৎ কমই। মিস্তিরিদের সঙ্গে কাবুলী ওয়ালাদের একটা প্রতিযোগিতা আছে। কাবুলীদের টাকায় দু আনা সুদ। মিস্তিরিদের ছ পয়সা। আফিসের বাবুরাও খাতক। তাদের জন্যে সুদ টাকায় চার পয়সা। বাবু তো শত হলেও। হাজিরা খাতা, হপ্তার বিল, সবই তাদের হাতে। একটু কম না করলে চলবে কেন।

মহিম অবাক হয়। অনিলেরা, যারা এ অঞ্চলে শ্রমিকদের স্বার্থের জন্য লড়াই করে, সংহতি গড়ে তোলার জন্যে পরিশ্রম করে, শ্রমিকদের ভাবনাই দিন রাত্রি ভাবে, বড় বড় বই পড়ে, তারা কেউ এসব খবর রাখে না। তাদের সংস্থার মধ্যে মিস্তিরিদের আনবার জন্যে তারা সদাই ব্যস্ত। অবিশ্যি তাতে একটা সুবিধে হয়। একে কণ্ঠদাতা, তায় বড় মিস্তিরি, সে যদি একটা দিকে ঝোঁকে, তবে শ্রমিকেরাও সেদিকেই পা বাড়াবে। কিন্তু এ বিষয়ে কিছু বলতে তার দ্বিধা হয়। অনিল এম, এ, পাশ করা ছেলে সারাদিন বস্তিতে বস্তিতে ঘুরছে, শ্রমিকদের সঙ্গে থাকছে। তার মতো লোককে কিছু বলার সাহস যেন মহিমের কখনো না হয়। কিন্তু কোনো বড় মিস্তিরি যখন অনিলদের আলোচিত সভায় দাঁড়িয়ে শ্রমিকদের দুঃখের জন্যে কথা বলে, তখন মহিম হাঁ করে থাকে।

যাই হোক, বৈশাখের শেষে শ্রাদ্ধ হল। লোক জন খেল কম নয়। রামকানাই শ্রাদ্ধ বাড়ির কর্তা হয়ে উঠেছিল। বোড়শীকে বউদি বউদি করে ডেকে ডেকে, ছুটোছুটি করে, গোটা আসরটাকে মাত করে ফেলেছিল। বোড়শীকেও দেখা গিয়েছিল, গাছ কোমর বেঁধে, ঘোমটা খাটো করে ঘেমে, কপালে রুক্ষ চুল নিয়ে, হেসে লুটে খুব খাটাখাটুনি করছে। বাবার মনটাও বেশ প্রফুল্ল ছিল। কিন্তু কাকা কাকী যেন একটু ঝিম মেরেই ছিল।

মহিমকেও নানান কাজে কর্মে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। তবু সারাদিনই দিদিমার কথা মনে পড়েছিল। সেই ছেলে-বেলায়, দিদিমা যখন পড়ন্ত বেলায়, পা ছড়িয়ে বসে মায়ের চুল বেঁধে দিত। তখন অন্য একটা বাসা ছিল তাদের। ছোট কাকা প্রাণতোষ তখন লুকিয়ে বিড়ি খাওয়া শিখছে। মেজ কাকা, সন্তোষ বাবার সঙ্গে যেত কারখানায় মিস্তিরি-গিরির তালিম নিতে। বাবাকে তখন হাফ প্যান্ট, বুক খোলা জামায় বেশ দেখাতো। মাঝে মাঝে দেশের বাড়িতে যাওয়া হত। মাঝদিয়ার নেমে, মাথাভাঙা নদী পার হয়ে। শিবনিবাসের ওপর দিয়ে তাদের গাঁয়ে যেতে হত। বাবাকে তখন মাঝে মধ্যে গান গাইতেও দেখেছে। 'বঁধু চরণ ধরে বারণ করি, টেনো না আর চোখের টানে।' ...এ বাবা আর সে-বাবা কত তফাত। আজ যদি বাবার সেরকম গান আসত, তা হলে কেমন শোনাত, কে জানে। হয় তো, তার এই নতুন মা শুনে খুশী হত, হেসে গাপিয়ে একাকার করত। কিন্তু মহিমের মা, বাবার গান শুনে, শুধু বাবার দিকে চোখ তুলে তাকাত। ঠোঁট দুটো টিপে থাকত। এক আধবার বলত, 'মা শুনতে পাবে।' অর্থাৎ দিদিমা। মহিমের মা ছিল অল্প ভাষিণী, শান্ত, কিন্তু হাসি খুশি। অথচ হঠাৎ মনে হত রাশভারী। মা চোখ পাকালে ভীষণ ভয় করত। আর হাসলে মনে হত, মা যেন কখনো

চোখ পাকায় নি।

শ্রাদ্ধের দিন সব থেকে বেশী মনে পড়ছিল, কাকের আসরে মা আর দিদিমার পা ছড়িয়ে বসে গল্প করার ছবি। ঠিক যেন দুই বোন, গল্প করতে করতে হেসে গড়িয়ে কী যেন করত। অথচ দু জনের বয়সের কত তফাত।

শ্রাদ্ধের দিন এই সব ছবিগুলো ভেসে উঠে। কেমন একটা অসহায় ব্যথায় মনটা ভরে উঠছিল মহিমের। বারেবারেই মনে হচ্ছিল, আর সেই দিনগুলো কখনো ফিরে আসবে না। এ বাড়িটা বাড়ির মানুষগুলো সব অন্যরকম হয়ে গেছে। সকলেরই চেহারা মন, সব বদলে গেছে। আর সে পরিবর্তনটা কষ্টের বলে মনে হয়।

কিন্তু কাজ ও স্মৃতিচারণের মধ্যেও, বোড়শী যতবারই আড়ালে আবডালে পেয়েছিল, কী বাড়াবাড়িই না করেছে। গায়ে ধাক্কা তো দিয়েছিলই। একুশ বছরের মহিমের বিস্ময়ের সীমা ছিল না, যখন দেখেছিল, তার সৎ মা, তাকে দূর থেকে জিভ ভেংচাচ্ছে। ওর কি লজ্জা বলে কিছু নেই? মহিমকে জিভ ভেংচায়। আবার বলেছিল, 'তোমার বাপের বন্ধু রামকানাইয়ের প্রাণে যে রস আর ধরছে না গো।' মুখের মতো কোনো জবাব দিতে পারেনি মহিম। কারণ সুযোগ বা সময়, কিছুই ছিল না।

গ্রীষ্মের শেষে, সন্তোষ একদিন বলল, মহিমের কাজ করেছে। সন্তোষের 'বয়' হিসাবেই এখন তাকে কাজে লাগতে হবে। ভাল করে কাজ শিখে নিতে পারলে, মিস্তিরি বলে গণ্য হতে দেরী হবে না।

বাবার ধৈর্যের প্রায় শেষ মুহূর্তেই কাজটা জুটল। নইলে মহিমকে ছুতোরের যন্ত্রপাতির বাকসটা ঘাড়ে করে, কাঠের কাজের ফেরী করতে হত। তাতে যে শুধু কষ্ট হত, রোজগারের অনিশ্চয়তা থাকত তা নয়, সবেরই এমন পরিবর্তন হয়েছে, রাস্তায় রাস্তায় 'ছুতোরের কাজ হবে' বলে ফেরী করার চিন্তাতেই নিজেকে বড় বেশি ছন্নছাড়া, হীন বলে মনে হচ্ছিল। কারখানার কাজ কিছুটা তো শিখেছিল মহিম। সে সবই তার নষ্ট হয়ে যেত।

জীবনধারণের এই রূঢ় বাস্তব দিনগুলো মানুষ মাত্রের জীবনেই অপ্রতিরোধ্য। কিন্তু আর একদিকে, জীবনের গভীরতর স্তরে, মহিমের একটি নতুন মন জন্ম লাভ করছিল। এক নতুন চিন্তা, নতুন আবেগ উৎসাহ ও উদ্দীপনা সঞ্চারিত হচ্ছিল। সম্ভবতঃ এই নতুনের ভ্রূণ জন্ম নিয়েছিল রসিদ আলী দিবসের বিদ্রোহের দিনে, নভেম্বরের এক সকালে, কাঁকিনাড়ার মিছিলে। ক্রমে সেই ভ্রূণ পরিপূর্ণ দেহ নিয়ে তৈরী হচ্ছে অমিলদের সংস্পর্শে এসে। মহিম এখন টি, ভব্লিউ, পি, আই-এর সভ্যপদ প্রার্থী। টিলার্স এণ্ড ওয়ার্কার্স পার্টি। মহিম জানে, কৃষক ও শ্রমিকদের রাজনৈতিক দল সেটা। শ্রমিক বিপ্লব তাদের লক্ষ্য। ইতিমধ্যেই অমিল তাকে কিছু বাংলা বই পড়তে দিয়েছে। বইগুলোর সব কথা সে বুঝতে পারে নি। কিন্তু পার্টির উদ্দেশ্য ও বক্তব্য সে বুঝতে পেরেছে। দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষকে শোষণের, এবং তাদের প্রতি অত্যাচারের একটা অস্পষ্ট ধারণা তার ছিল। তবু শোষণ আর অত্যাচারের পৃথিবীব্যাপী বিশাল ও ভয়ংকর যন্ত্রটার কোনো পরিচয় তার জানা ছিল না। সেটাই একটু একটু করে সে জানতে পারছে। যতোই জানতে পারছে, ততোই সংগ্রামের চিন্তা ও স্পৃহা প্রবল হয়ে উঠছে তার মধ্যে। মনের মধ্যে একটা তীব্র বিস্ময়, ঘৃণা এবং প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষায় দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলছে। চারপাশের সমস্ত জীবনের একটা অর্থ যেন অস্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে। এই চিন্তাগুলোর সঙ্গে, একটা রোমাঞ্চও সে অনুভব করছে। রুশ বিপ্লব, লেনিন, স্তালিন, ফরাসী বিপ্লব, বাংলা দেশের গুপ্ত বিপ্লবী দলের সমস্ত আন্দোলনের, রক্তে আগুন লাগানো রোমহর্ষক কাহিনী, সব মিলিয়ে, মহিম এক নতুন জগতের দিকে ছুটেছে। যে জগতটা ওদের সংসার পরিবারের মধ্যে কখনো কোনোরকমে ছায়া ফেলে নি। কেবল জানত, ছোটকাকা প্রাণতোষ হাওড়ায় মজুর আন্দোলন করে। এবং সেটা খারাপ। কারণ, যে কোনো-দিনই নাকি তাকে জেলে নিয়ে যেতে পারে। ছোট কাকার প্রকৃতি একটু ভিন্ন। বাবার সঙ্গে চিরকালই বিবাদ। মহিম দেখেছে, ছেলেবেলায় ছোটকাকা প্রচণ্ড মার খেত বাবার হাতে। লেখাপড়া মহিম যতটুকু করেছে, তাও করেনি। মহিম শুধু ক্লাস এইট অবধি পড়েছিল। ছোট-কাকা প্রাইমারী পর্যন্ত। বিদ্রোহ সে অল্প বয়সেই করেছিল বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে অনেকবার। ষোল সাতের বছর।

বয়সে দেখবার পেছে, আর কখনো ফেরেনি। কখনো সখনো দেখা সাক্ষাত করতে এসেছে, এক সঙ্গে বাস করতে আসেনি। মহিমের মা বেঁচে থাকতে, মাঝে মধ্যে ছোট-কাকাকে সংসারী করা, ফিরে যা দেওয়া ইত্যাদি কথাবার্তা আলোচনা হত। তারপরে সে সবও ঘুচে গেছে।

এখন মহিম অনুমান করতে পারে, ছোটকাকা কী করে। যদিও জানে না, ছোট কাকা কোনো দলে আছে কি না। এখন জানতে ইচ্ছে করে।

কিন্তু ছোট কাকার কোনো ছায়াই এ পরিবারে পড়েনি। তা সত্ত্বেও মহিম ক্রমে রাজনৈতিক জীবনের দিকে এগিয়ে গেল। টিলার্স এ্যাণ্ড ওয়ার্কার্স পার্টির অত্যন্ত বিশ্বাসী ও কর্মঠ কর্মী বলে। একটা নতুন পরিচয়ে ও চিহ্নিত হয়ে উঠতে লাগল এ অঞ্চলে। শ্রমিকদের কাছে কিছুটা সম্মান ও শ্রদ্ধা পেয়ে নিজের প্রতি ওর একটা আস্থা গড়ে উঠল এবং তার সঙ্গেই একটা অচেনা অচিন্ত্যনীয় বিপদও ওর ভিতরে চুঁইয়ে ঢুকতে লাগল! ও গম্ভীর হয়ে উঠল। নিজের প্রতি কতগুলো এমন বিধর আরোপ করতে লাগল, যাতে হাসি, প্রাণচঞ্চলতা, জীবনের স্বাভাবিক প্রবনতাগুলো আড়ষ্ট হয়ে উঠতে চাইল। অনেকটা ব্রহ্মচর্যের প্রাথমিক অবস্থার মতো। আসলে ও যা নয়, তাই হয়ে উঠতে চাইল। রাজনৈতিক জগতে প্রকাশের প্রথম লক্ষণ এগুলো। সাহস দেখানো, বিবাদে জড়িয়ে পড়ার একটা উন্মাদনা ওর ভিতরে সর্বক্ষণ যেন ধপধপ করে। ও দেখেছে, ওর এই ধরনের চরিত্রকেই অনিলেরা বেশী প্রশংসার চোখে দেখছে।

অথচ, অনিলদের বাড়িতে যখন যায়, তখন ওর দুটি চোখেই ব্যাকুল হয়ে নীলিমাকে খোঁজে। অনিলের বোন নীলিমা, কলেজে পড়ে। হাসপাতালে একবার তাকে দেখতেও গিয়েছিল। ভিতরে একটা আনন্দ টলটলিয়ে ওঠে, যখন শোনে, নীলিমা তাকে মহিমদা বলে ডাকছে। বোধহয় বছর উনিশ বয়স হবে। ষোড়শীর থেকে এক আধ বছরের ছোট। কিন্তু অনিলদের বাড়ির মেয়েরা, মহিমকে দাদা বলে ডাকবে। এটা আগে কখনো ভাবা যায়নি, জানাও যায়নি। হাসপাতালে তার চুলে হাত দিয়েছিল নীলিমা কী আশ্চর্য অসঙ্কোচ, কত পরিচ্ছন্ন। পার্টির ছাত্রফ্রন্টে নীলিমা কলেজে আন্দোলন করে। সে হিসেবে, সকলেই এক দলের মানুষ। এখন নীলিমাদের বাড়ি গেলে, অনিল না থাকলেও সামনে বসে গল্প করে। চা এনে দেয়। মহিম বুঝতে পারে, নীলিমার সঙ্গে কথা বলে আলোচনা করার যোগ্যতা তার নেই। তবু কী নিরহঙ্কার, কত অমায়িক ব্যবহার। ঠিক বন্ধুর মতো কথা বলে। তাতে মহিমের নিজেকে খাটো মনে হয় না। নীলিমার কাছে বসে দেশ ও বিদেশের অনেক রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস সে শোনে। নীলিমা ওকে নির্দেশ করে, কী বই পড়লে ভাল হয়। নীলিমাই তো বলেছে, বংশ পরিচয়, ইস্কুল কলেজের বিদ্যাই সব নয়। মানুষ নিজের চেষ্টায় অনেক বড় হতে পারে। কথাগুলো অনিলের মুখেও শুনেছে মহিম। আর দেখেছে, অনিল যা বলে, নীলিমা তাই বলে। এমন কি অনিলের মতোই কথার সুর করে, হাত নাড়ে। অনিলকে কথা বলার সময় দেখতে ভাল লাগে। নীলিমাকে তার চেয়ে আরো বেশী ভাল লাগে। ঠিক যেন বায়স্কোপের ছবিতে কাউকে দেখছে।

আরো, আরো গভীরে নীলিমা কি নতুন কোনো প্রতিক্রিয়া ঘটাচ্ছে? হয় তো। কিন্তু সে প্রতিক্রিয়া মহিমের অজানা। অবচেতনের গভীরতর অন্ধকারে যে প্রতিক্রিয়া একটা অসম্ভবের প্রতি ভয়ে এবং সংকোচে মাথা নত করে থাকে। পার্টির আলোক নামে ছেলেটি, অনবরত সিগারেট খায়, এক মাথা রুক্ষ চুল, বাংলা কথাই বলে, কিন্তু শোনায় যেন কোন বিদেশী ভাষায় জোর দিয়ে দিয়ে কথা বলছে, এবং ঠোঁটের কোণে একটু বাঁকা বিদ্রূপের আভাষ লেগেই আছে, প্রায় সেবার অফিসারের মতো মনে হয়। সেই আলোকের সঙ্গে নীলিমার বন্ধুত্ব একটু অন্তরঙ্গমের মনে হয়। আলোকের ঠোঁটে সিগারেট, হাতে ইংরেজী বই এবং কাগজ থাকবেই থাকবে। আলোককে কেন যেন একটু ভয় ভয় লাগে মহিমের। আর মনে হয়, আলোকও তা জানে, জেনে বেশ তৃপ্ত। এবং আলোকই একমাত্র লোক, যে কথায় কথায় অনিলের কথার প্রতিবাদ করে। কথার ওপরে কথা বলে।

মহিমের মধ্যে পরিবর্তনগুলো সকলেরই লক্ষণীয় হয়ে উঠল। তার কারখানার কাজ, কাজের শেষে পার্টির

কর্তব্য, রাত্রে বই পড়া, সপ্তাহান্তে, মুমূর্ষু ঘরে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা, সব কিছুর মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে উঠল, ওর স্বাতন্ত্র্য।

মনতোষ হুংকার দিয়ে উঠল, ওসব গুণ্ডাবাজী আমার বাড়িতে থেকে চলবে না ওসব মজুর আন্দোলনগিরি। আর হপ্তায় হপ্তায় সকলের কাছ থেকে ইউনিয়নের চাঁদা আদায়ের ফন্দী, আমার ছেলে হয়ে করা চলবে না। যত পয়সা মারার ফিকির, আর বড় বড় লেকচার মারা বকলমা করা, ঢের দেখেছি। শালারা সুখ শুনতে পারে না, পার্টিকে চাঁদা দিতে যাচ্ছ! যতো ফেরেববাজ এসে জুটেছে। তবে মনতোষ যতোটা হাঁকে, ততোটা কাজে নয়। চীৎকার চেঁচামেচিগুলো মহিমের আড়ালেই সে বেশী করে। সামনে করলেও মহিম জবাব দেয় না শুধু, মনতোষের সামনে দিয়েই বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে যায়। এই নিরিবিলি মিলিটি যে মনতোষের মনে একটু ভয়ের সঞ্চার না করে তা নয়। কিন্তু তা সে জানতে দিতে চায় না। আরো আশ্চর্য, তার মনের গভীরে হাতড়ালে টের পাওয়া যায়, মহিম সম্পর্কে একটা নিগূঢ় সজাগ বিস্ময়বোধও তার আছে। কোথায় যেন একটু সমীহও আছে।

সন্তোষ কিন্তু ভাইপোর ওপর খুশি। শুধু খুশি নয়। যেন একটু শ্রদ্ধাও আছে। মহিম যে শুধুমাত্র একটা মিস্তিরি বাড়ির ছেলে মিস্তিরি নয়। খেয়েদেয়ে তাস খেলে মদ ভাং খেয়ে, যাত্রার দল করে বেড়ায় না, বরং বেশ নাম করা স্থানীয় ভদ্রলোকদের ছেলেদের সঙ্গে রাজনীতি করে, সম্মান বোধ করে। স্বভাবতই, কাকী, অর্থাৎ প্রমীলাও তার ভাসুরপোর উপর বেশ সদয়। এমন কি, মুরুব্বির মতই মানে।

পরিবর্তন নেই বোড়শীর। তার ব্যবহার সেই একই রকম। উপদ্রবগুলো কিছু মাত্র কমেনি, বরং বেড়েছে। ঠোঁট উল্টে বলে, একেবারে মহাত্মা গান্ধী হয়ে যেওনা যেন। তা হলে আমরা যাব কোথায়।

চাকরি পাবার পর আস্তে আস্তে বোড়শীর ঋণ শোধ দেবার জন্য মহিম চেয়েছিল, সপ্তাহে এক টাকা করে দেবে। বোড়শী বলেছে, হপ্তায় হপ্তায় নিতে পারব না। জমিয়ে একসঙ্গে দিও, সুদও চাই।

অতএব মহিম আর না করেনি। টাকা যে শোধ দিতে হবে না, এটা বুঝে নিয়েছিল। মাঝে মাঝে প্রায়ই মহিমের বই উধাও হয়ে যায়। বোড়শীই নিয়ে যায়। বলে, দেখি কোনো খারাপ বই টই পড়ছ নাকি। বয়স তো এখনই হয়েছে, বই পড়ে আরো হবে।

রাত্রে, মহিম যখন বই পড়ে, বোড়শী কখন কোথা দিয়ে এসে, হ্যারিকেনের কল ঘুরিয়ে অন্ধকার করে দিয়ে যায়। মহিম ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, কিন্তু চিৎকার করতে পারে না। তা হলে সাংঘাতিক গোলমাল লেগে যাবে। বাবা টের পেলে তো কথাই নেই। ব্যাপার যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে, ভাবতেও ভয় লাগে। তাই মহিম বোড়শীর এই সব উপদ্রবকে একরকম মেনেই নিয়েছে। অন্যথায় তাকে এই বাড়ি ছাড়তে হয়। কিন্তু বাড়ির পরিবেশ ছেড়ে, বাইরে একলা কোনো বস্তিতে গিয়ে থাকা, নিজের হাতে রেঁধে, বা হোটেলে খাওয়া, তার মানসিক গঠনের মধ্যে খাপ খায় না। ছেলেবেলা থেকে একটি নিটুট পারিবারিক জীবনের মধ্যে লালিত হয়ে, একলা ছন্নছাড়া জীবনে সে সহজে যাবে না। যদিও এক এক সময় মনে হয়, তার বর্তমান জীবনে সেটাই উচিৎ।

এ রাস্তিতে এখনো কাকা কাকীমা আছে। তা ছাড়া, বোড়শীর উপদ্রবের মধ্যেও, নীতিবিহিত ব্যবহার ও বাড়াবাড়ির মধ্যেও, সাংসারিক প্রয়োজনের ব্যাপারগুলো সুচারু ভাবেই পালন করে। বাইরের কাজের মানুষদের পক্ষে সে সব সুযোগ সুবিধাগুলো সহজে ত্যাগ করা সম্ভব নয়।

এইভাবেই প্রায় চলল ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়া, পরবর্তী গান্ধী হত্যার সময় পর্যন্ত। মহিমের রাজনৈতিক জীবনে উত্থান ছাড়া, আর সবই একরকম রইল। টিলার্স এ্যাণ্ড ওয়ার্কস পার্টির স্থানীয় শাখায়, অনিল ও আলোকের পরেই মহিমের স্থান। মহিমের পুরনো বন্ধুরা সকলেই প্রায় পার্টির আওতায় এসে গেছে। কতগুলো বড় বড় সভা, কয়েকটি ক্ষেত্রে আন্দোলনের সাফল্য। পার্টিকেও বেশ শক্তিশালী এবং জনপ্রিয় করেছে। কোনো কখনো সভায় মহিম বক্তৃতা করেছে। কখনো পার্টির লোকাল বিষয়ে মতবিরোধ ঘটেছে। যেমন চরিত্র বাছাই। মিস্তিরিরা নিশ্চয়ই বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু সে সুযোগ মহাজন

হলে কিছুতেই তা প্রশ্রয় দেওয়া যেতে পারে না। অথচ পার্টির নির্দেশ হচ্ছে, কাজের মধ্যে দিয়ে এসে তাদের চরিত্র সংশোধন করতে হবে। নির্দেশ অমান্য কিছুতেই চলতে পারে না। কিন্তু মহিম অন্তর থেকে চরিত্র সংশোধনে বিশ্বাস করে না। সেটা এখনও হতে পারে। একই পেশার লোক বলে, তার বিশ্বাস কম। যদিও, তেমন উদাহরণ একটিও প্রায় নেই। তবে সন্তরণ দুরূহ আছে। কথাটা প্রায় সোনার পাথরবাটির মতো হলেও, আন্দোলনের মধ্যে এসে কেউ কেউ লোভ কমিয়েছে।

সব থেকে দুঃসহ বোধ হচ্ছে আলোককে। সে মহিমের কাছে কেবলি কাজের হিসাব চায়, নির্দেশ দেয়, নতুন নতুন কাজ চাপিয়ে দিতে চায়। সে নাকি পার্টি ইনটেলেক্‌চুয়েল, বিপ্লব সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান। সে প্রায় ইস্কুলের হেড পণ্ডিত। এবং পার্টির উচ্চ মহলে অনিলের থেকেও কোনো কোনো ব্যাপারে বেশী খাতির। সে এখানকার লোক নয়, কলকাতা থেকে পাঠানো হয়েছে। তার প্রতি নির্দেশ আছে, পার্টির কাজে অংশ গ্রহণ, এবং ক্যাডেটদের শিক্ষাদান। কী কাজে সে অংশগ্রহণ করে, মহিম জানে না। তার শিক্ষাদানকে মনে হয় কাণ্ডজ্ঞে। শুনতে ভাল লাগে, অথচ আদপেই কোনো কাজে লাগানো যাচ্ছে না। তার থেকে, অনিল অনেক বেশী ভালো বোঝায়। সে এখানকার মানুষদের কিছুটা বোঝে, শিক্ষার পদ্ধতিটাও তাই সহজ বলে মনে হয়। মাঝে মাঝে মহিম ভাবে, আলোককে শুধু মেয়েদের শিক্ষিত করার দায়িত্ব দিলেই ভাল হয়। ও তো আসলে নীলিমাকেই শেখাতে পারলে আর কিছু চায় না।

এরকম ভাবার পরেই, নিজের প্রতি বিরক্ত হয়ে ওঠে মহিম। অনুতপ্ত হয়। ভাবে, আমি হিংসে করছি আলোককে। অথচ কোনো যোগ্যতাই আমার নেই। 'আমাকে মাপ করুন আলোকবাবু, আমাকে মাপ করুন।' ...মনে মনে বলে সে। তবু আলোক সম্পর্কে তার কিছু আপত্তি সম্পূর্ণ ঘোচে না। তার কথাবার্তা, এবং একেবারে না হাসা, সব সময় ভ্রূ কুঁচকে থাকা, কাজের হিসেব নেওয়া, আর তার নিজের কিছু না করা। ও নাকি লেখা পড়াও তেমন করেনি। কথায়কথায় বি, এ, ফেল করেছে, ছাত্রফ্রন্ট থেকে, বস্তুর আন্দোলন করতে এসেছে।

মহিম ওর সীমিত জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে আলোককে ঠিক আলোয় টেনে নামাতে পারে না। কিন্তু ওর সহজ স্বাভাবিক মনটা বলে, আলোক সৎ লোক নয়। হিংসে করবার মতো নেতৃত্বের মোহ ওর নেই। তবে, অনিলের ওপরে যদি কেউ যেতে চায়, অনিলকে যদি কেউ ছোট করতে চায়, হিংসে করে, তবে তার যোগ্যতা যাচাই না করে পারে না মহিম। সেই যাচাইয়ে, আলোক অনেক ছোট হয়ে যায়, অথচ সে নিজেকে নেতা মনে না করিয়ে ছাড়বে না। অনিলের ডিপার্টমেণ্টের সাহেব যেমন করে মিস্তিরির কাছে কাজের হিসেব চায়, আলোক ঠিক সেই ভাবেই বলে, 'গতকাল বুড়িটা হাতে লেখা পোস্টার মারবার কথা ছিল, কিন্তু তা মারা হয় নি কেন?'

'বুড়িটা লেখা যায়নি, বারোটা হয়েছে।'

'কিন্তু বুড়িটার কথা ছিল। এ ধরনের অমান্য করার অর্থ পার্টিকে অবহেলা করা। আজকের মধ্যে আরো আটটা আপনাকে মারতে হবে।'

তাকে বোঝানো যায় না যে, লেখবার লোকের অভাব হয়েছিল, বেয়ালে দেখালে মারতে যাবার সময় পাওয়া যায় নি, কারণ সকলেই কলে কারখানায় কাজ করে। আলোক কোনোদিনই অবশ্য পোস্টারে লেখে না, মারেও না। প্রত্যেক মাসের প্রোগ্রাম করা স্ট্রীটকর্নার মিটিং, পোস্টার, চাঁদা আদায়, সব ব্যাপারেই সে কিছু বেশী চাপিয়ে দেবেই! তাকে বোঝানো যায় না, যারা সব করবে, তাদের জীবনে কী কী সমস্যা আছে। তারা কারা, তাদের জীবনধারণের পদ্ধতি কী, তাদের পারিবারিক জীবনটা কেমন। তার চোখের সামনে আছে শুধু একটা যন্ত্র, কিন্তু তার অভিসন্ধিকে কিছুই জানে না। যন্ত্রটা তার ইচ্ছে মতো কাজ না করলেই, সেও বিগড়ে যায়। অবিশ্যি, এটাও ঠিক, আলোককে প্রাদেশিক কমিটিকে একটা করে রিপোর্ট পাঠাতে হয় মাসে মাসে। যতো ভাল রিপোর্ট যাবে, তার কৃতিত্ব ততোই বেশী।

মহিম ভাবে, আমরা তো ফাঁকি দিই না। কারখানার কাজে ফাঁকি দিতে পারি, পার্টির কাজে কখনো ফাঁকি দিতে পারি? তা হলে পার্টিতে এসেছি কেন? অথচ আলোক অম্লান বৈরীকে প্রায়ই গম্ভীর গলায় বলবে, 'ফাঁকি

দিচ্ছেন আপনারা। কিন্তু ফাঁকি দিয়ে কাজ হবে না। পার্টি তা সহ্য করবে না।

একমাত্র অনিলই হেসে বলে, 'কেউ ফাঁকি দিচ্ছে, আমার তেমন মনে হয় না। বরং, কাজের গুরুত্বটা ঠিক আমরা সবাই বুঝতে পারছি না। পারলে, আমরা আরো বেশী কষ্ট করব। আলোচনাটা সেভাবে হলেই বোধহয় সুবিধে হয়।'

আলোকের একটিই তখন বুলি, 'মানতে পারি না।'

এসব যা-ই থাকুক, পার্টি নিশ্চিতরূপেই অগ্রসর হয়ে চলেছে। মহিমও সেই সঙ্গেই, তার পার্টির প্রতি অনেক বেশী বিশ্বাস স্থাপন করেছে। পার্টির কাজে অনেক বেশী অংশ গ্রহণ করছে, অনেক দায়িত্ব পালন করছে, আভ্যন্তরীণ দৃষ্টি অনেকখানি প্রসারিত হয়েছে।

গান্ধীহত্যার পর, প্যাটেলের যুগ যখন শুরু হল, এমনি একটা সময়ে প্রাণতোষ এখানে চলে এল। হাওড়ায় যে কোম্পানীতে সে কাজ করত, তাদের চটকল এখানেও আছে। তাকে অনেকবারই কোম্পানী সিফার করতে চেয়েছে পারেনি। শেষপর্যন্ত প্রাণতোষ নিজেই বদলী চেয়ে নিয়ে এখানে এসে পড়েছে। সে বুঝতে পারছিল, ওখানে বেশীদিন থাকলে, সরকার কর্তৃপক্ষের একটা না একটা আক্রমণ হঠাৎ এসে পড়বেই। প্রতিমুহূর্তে নিয়ম ভঙ্গের ভয় করে মিস্ত্রিরির কাজকরা যায় না।

প্রাণতোষ, মহিমের ছোট কাকা এখানে আসা মাত্রই জানা গেল, সে শুধু ব্যবসায়ী হেডকোয়ার্টার্স নিয়ন্ত্রণ করে না। টি, ডব্লিউ পার্টির সেও একজন সভ্য। মহিম খুশি হয়ে উঠল।

প্রথমেই প্রশ্ন উঠল, প্রাণতোষ কোথায় থাকবে। প্রাণতোষই প্রথমে প্রশ্নটা তুলল। খুব সোজাসুজি মনতোষ আর সন্তোষকে বলল, 'তোমরা চাপাচাপি করো না। ভেবে দেখ, আমার পক্ষে বাড়িতে থাকা চলবে কি না। কারখানার কাজ ছাড়াও আমার পার্টি আছে। দুপুরে আমি খাব না-ও সবও না। রাত্রে খাব আর থাকব। খরচ যা লাগবে দেব।

তার কথা বলার মধ্যে এমন একটা গাম্ভীর্য আর স্পষ্টতা যে, জবাব দেবার আগে দুবার ভাবতে হয়। মহিমের বেশ ভালই লাগল ছোট কাকাকে। হঠাৎ দেখলে, চটকলের মিস্ত্রিরি বলে মনেই হয় না। যেন ইঞ্জিনীয়ারিং ফ্যাক্টরীর শিক্ষিত মেকানিক। ফুল প্যান্ট, হাফ সার্ট আর মোটা সোলের জুতোয়, শক্ত মজবুত চেহারার ছোট কাকার ভঙ্গিটাও রীতিমতো কেতাদুরস্ত। চুলের একটা গুচ্ছ কপালের ওপরে সব সময়েই পড়ে আছে অবিন্যস্ত হয়ে। অধিকাংশ সময় দাঁড়িয়েই কথা বলে। কোমরে হাত থাকে, আর জুতোর টো দিয়ে মাটিতে কেবলি ঠোকে। চোখ দুটি প্রায়ই কুঁচকে ওঠে, থেকে থেকে ঠোঁট কামড়ানো অভ্যাস আছে। সরু এক জোড়া গোঁফ থাকার দরুন, ঠোঁট কামড়ানোটা দেখতেও বেশ ভাল লাগে। বয়সের থেকেও কিছু কমই দেখায় ছোটকাকাকে।

বাবা কাকাদের মাঝখানে সাধারণত মহিম কথা বলে না। এ ক্ষেত্রে না বলে পারল না, এখানেই থাকবে, কোথায় যাবে আবার। বড় চাকা বারান্দায় আমি আর দিদিমা তো থাকতাম। কোন অসুবিধে হত না। এখন তুমি থাকবে।'

মহিমের অবিশ্যি একটু ভয় ছিল, ছোটকাকা বারান্দায় থাকতে রাজী হবে কি না। আপত্তি করল না। বলল, 'তা থাকতে পারি, একটু মাথা গোঁজা নিয়ে কথা। কিন্তু বড়লাদার যদি অসুবিধে হয়। বেজদাদারই বা কী মতামত···।'

সন্তোষ সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি দিয়ে দিল, আমার কোন আপত্তি নেই। ভাইয়েরা এক সঙ্গে থাকবে, সেটা দেখতেই তো ভাল। তা ছাড়া, তোর কারখানাও এখান থেকেই কাছে। না থাকবার কোন কারণ তো আমি দেখি না।

তবুও কয়েক মুহূর্ত মনতোষের কথা বলতে দেরী হল। মনতোষ এখন আর গম্ভীর না, বরং প্রাণতোষের সামনে একটু যেন বিব্রত হাসি নিয়েই বসে আছে। অনেকটা দাদে পড়া মেয়ের বাপের মতো। মহিম তৎক্ষণাৎ মনে মনে ভাবল, ছোটকাকাকে যদি আলাদা বাসায় চলে যেতে হয়, তবে সেও সঙ্গে যাবে। তার থেকে বেশী আনন্দ এখন আর সে চিন্তা করতে পারছে না।

মনতোষ বলল, দুপুরবেলা বাইরে খাবি কেন?

প্রাণতোষ বলল, আবার আসব খাব। তার থেকে একটা বেলা বাইরে খেয়ে নিলেই হবে। বাড়ির কাজের

যত কমানো যায়।

সন্তোষ বলে উঠল, বাড়িতেই যখন থাকবি, তখন আর ঝামেলা কিসের। নেহাত তোর কাজেকর্মে আটকে যাস আসবি না। একেবারে রাত্রেই আসবি। এমন তো নয় যে, খাবার দাবার ফেলা যাবে।

প্রাণতোষ চোখ কুঁচকে, ঘাড় নেড়ে জানাল, তা অবশ্য হয়। মনতোষ তখনো হাসি হাসি মুখ নিয়ে, যেন নিবিষ্ট মনে, মুখের সামনে হাত তুলে নখ খুঁটছে। সবাই তার দিকেই তাকিয়ে আছে। ওদিকে, রান্নাঘরের জানালা থেকে কাকীও দেখছে।

মনতোষ বলল, আপত্তি আর কী, তবে ওই সব ইউনিয়ন টুইনিয়নের ব্যাপার, কখন পুলিশের হামলা হবে কি কী হবে, কে জানে। তোর ভাইপোটিও ওসবে গিয়ে জুটেছে। আমরা ছা পোষা লোক, আমি নিই খাই, এই সব ভেবেই চুপ করে আছি।

প্রাণতোষ বলে উঠল, তা হলে অন্য ব্যবস্থা দেখতে হয়।

মনতোষ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, না না অন্য ব্যবস্থা আবার কী দেখবি। তুইও তো বড় হয়েছিস, মনের কথাটা বললাম আর কি। একটু বুঝে শুনে চলবি। ছেলেবেলা থেকেই আমাদের ছেড়ে ছেড়ে রইলি। ভাখ প্রাণতোষ, মন কি সত্যি চায় ভাইদের ছেড়ে থাকি।

মহিম একটু অবাকই হল। বাবার গলাটা প্রায় ধরা ধরা শোনাচ্ছে। সেটা সত্যি ভাইয়ের প্রতি মমতায় কিংবা নিজের অসহায় অবস্থায়, বুঝতে পারল না।

মনতোষ আবার বলল, এসেছিস, থাক। তোদেরই সংসার, তোরা নিজেরা সব দেখেশুনে চল্, সে, তো খুব ভাল কথা। আমি তো তাই চাই। এতখানি বয়স হল, বৌ থা করলি না, বাউণ্ডুলের মতন ঘুরে ঘুরে জীবনটা কাটালি।

সন্তোষ তার দাদাকে সমর্থন করে বলল, সে তো ঠিক কথাই।

প্রাণতোষ কিন্তু একটু হেসে, গম্ভীর হয়ে বলল, দেখ দাদা, জীবনে সবাই বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে ঘর করবার জন্যে জন্মায় নি। কারুর কারুর অন্য কাজও আছে। তারা হয়তো সারা জীবন দেশের জন্যে জেলেই পচে মরে, পুলিশের গুলিতে প্রাণ দেয়। তা নইলে, ভারতবর্ষ স্বাধীন না হলেও, এই যে, স্বাধীনতার ভাগ করে পনেরই আগষ্টে এত হইচই হল, তাও হত না।

মহিমের বুকটা ধক করে উঠল ছোটকাকার কথাটা শুনে। আলোকের সঙ্গে অনিলের সম্প্রতি এই তর্কই চলেছে। এবং টি. ভ্রিউ, পার্টির ভিতরেও এই আলোচনাকে কেন্দ্র করেই, পার্টির আন্দোলনের পথ বদলাবার সম্ভাবনা রয়েছে। আলোক যা বলে, ছোটকাকাও তাই বলছে। অনিল তা এখনো মানতে পারছে না। ওর বিশ্বাস, ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পেয়েছে, কিন্তু কোথাও কোথাও পুরনো শাসকদের সঙ্গে আপোষ করতে হয়েছে। তার অর্থ এই নয় যে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পায়নি। আলোক বলে, এ কথা বলাও যা, মিথ্যে কথা বলাও তাই। শাসকদের চেহারাটাই বদলেছে, দেশ স্বাধীন হয়নি।

মনতোষ কিংবা সন্তোষ, তারা ব্যাপারটা তলিয়ে দেখল না, দেখতে পারেও না। তারা দু জনেই বলল, তা তো বটেই, তা তো বটেই।

প্রাণতোষ বলল, সংসার কথার থেকে এ কাজটাকে ছোট বলতে পারবে না।

মনতোষ বলল, তা বলব কি করে। এ তো খুব বড় কথা। মানের কথা। তবে, আমরা তো সেকালের মানুষ। ছেলেদের বয়স হলে কাজ কর্ম করবে, সংসারী হবে, এই সব ভাবি। তা সে থাক, একটু সাবলে সুমলে থাকিস।

প্রাণতোষের থাকা স্থির হয়ে গেল। মনতোষ বাজারের থলি নিয়ে বেরিয়ে গেল। প্রমীলা তাড়াতাড়ি রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে বলে উঠল, তা ঠাকুর পো বিয়েই বা করবে না কেন। একটা বংশরক্ষাও তো করতে লাগবে, নাকি?

প্রাণতোষ কিন্তু গম্ভীর গলাতেই বলল, কেন, বংশধরের অভাব কি। তোমার ছেলে রয়েছে, দাদা বড়দাদারও রয়েছে। আর তোমাকে দেখে তো মনে হচ্ছে, আর একটি আসছে।

প্রমীলা লজ্জা পেয়ে বলে উঠল, ধুর ছাই। তোমার দাদা রয়েছে যে দাঁড়িয়ে।

সন্তোষ কিন্তু হ্যাঁ হ্যাঁ করে হেসে উঠল। প্রমীলা আবার গর্ভবতী হয়েছে, মাস তিনেক দেরী আছে আর বাচ্চা

তেমন ভাল নয় বলে, পেটের অংশটা বেশ বড়ই দেখায়।

প্রমীলা বলল, তোমার বড় বউদিকে দেখলে না? ও মা, বাড়ির বড় গিন্নিই যে আড়ালে রয়ে গেল। কই গো, বাইরে এস, ইনি তোমার ভাসুর নন, দেওর, একটু দেখা দাও।

ঘরের ভিতর থেকে জবাব হল, আগে থাকতেই দেখে নিয়েছি।

প্রমীলা ঠোঁট বাঁকাল, আর সেই বাঁকানোটুকু প্রাণতোষকে দেখাতে চাইল। কিন্তু প্রাণতোষ দেখল বলে মনে হল না। সন্তোষ গম্ভীর হয়ে উঠল। মহিমের মনে পড়ে গেল, হাসপাতাল থেকে আসার পর, বোড়শীর সঙ্গে প্রথম দেখার কথা। তখন সে লজ্জাবতীর মতো ব্যবহার করেছিল। কাকীর কথায় চৈর পেয়েছিল, কাপড় বদলে এসেছিল সতীনের ছেলেকে দেখতে। আজ সে লুকিয়ে দেখছিল, কিন্তু কথা তার স্বাভাবিক বেশ সরবেই বলল, কাপড় বদলাচ্ছে কি না জানে।

প্রমীলা আবার বলল, তা ঘরে ডাক দিয়ে তোল, দেওরকে একটু ভালমন্দ খাওয়াও। তোমার বিয়ের সময় আসতে পারেনি, তার শোধ দাও।

মহিমের মনে হয়, কাকী একটা কটকট করে না বললেই পারে। ঝগড়া তো দুজনের লেগেই থাকে। কত কারণে যে ঝগড়া লাগে। যেন দুজনেই ঝগড়ার ফিকির খুঁজে বেড়ায়। কেন? কী নিয়ে এত ঝগড়া?

বোড়শীর জবাব এল, ঘর কি একটা? তোমার ঘরটাও তো ঘর, সেখানেও তো ডেকে বসাতে পার। আর বিয়ে তো তোমরাই দিয়ে এনেছিলে, তোমাদের সুখ তোমরাই খাওয়াও। আমি একেবারে ছেরাদ্দের নেমন্তন্ন করব।

ছোটকাকা নতুন লোক, তার সামনেই যে বোড়শী চিবিয়ে চিবিয়ে এরকম বলবে, মহিম, ভাবতে পারেনি। প্রাণতোষ মহিমের দিকে তাকাল। মহিমই যেন বিব্রত হয়ে উঠল।

প্রমীলা হেঁকে উঠল, কার ছেরাদ্দে নেমন্তন্ন করবে তুমি শুনি?

তৎক্ষণাৎ জবাব এল, তোমার নয়।

ঠিক সেই মুহূর্তেই সন্তোষ হাঁক দিয়ে লাফিয়ে উঠল প্রমীলাকে, চুপ করবে তোমরা একটু? চুপ করবে?

ইকী বানচতের সংসার মাইরি, জানটা কালা করে দিলে। বাড়িতে একটা ছেলে এল এতদিন বাদে, তা কোথায় সবাই একটু সভ্যি সভ্যি হয়ে বসবে কথা বলবে, তা না পাড়া মাথায় করে ঝগড়া আরম্ভ করল।

যা, তুই ঘরে যা।

প্রমীলাকে হাত তুলে ঘরের দিকে নির্দেশ করল সে। কিন্তু কটমট করে তাকাল বোড়শীর দরজার দিকে। প্রমীলাও তাই তাকিয়েছিল। তাকিয়ে তাকিয়েই ঘরে গিয়ে উঠল। ঘর থেকে ডেকে বলল, এস ঠাকুরপো, ঘরে এস বসবে এস।

প্রাণতোষ বলল, না; বাইরেই বসি একটু, গরম লাগছে।

সন্তোষ বক বক করতে লাগল, আর শালা এবাড়িটায় থাকতে ইচ্ছে করে না। সংসার করা যে কী ঝঞ্ঝাট।

প্রাণতোষ নির্বিবাদে সন্তোষের সামনে একটা সিগারেট ধরিয়ে একটু হেসে বলল, আর আমার ঘাড়েও এই ঝঞ্ঝাট চাপাবার তাল তোমাদের। বাব্বা। বেশ আছি।

মহিম ঘরে ঢুকে একটা সতরঞ্চি নিয়ে বসে, বারান্দার সিঁড়ির কাছে পেতে দিল। বলল, ছোটকাকা বস।

প্রাণতোষ তার বিছানা বাক্সের দিকে চেয়ে বলল, আগে এগুলো তুলতে হবে।

মহিম তাড়াতাড়ি বলল, আমি তুলে দিচ্ছি। তুমি কোন দিকটায় শুতে চাও বল, সেদিকেই তোমার বিছানাটা তুলে দিচ্ছি। এদিকটায় একটু হাওয়া আসে।

মহিম নিজে যেখানে শোয়, সেখানটাই দেখাল।

মহিম ওর নিজের জায়গায় প্রাণতোষের বিছানা তুলে দিল। বাক্সটা তুলে নিয়ে গেল ঘরে। ঢুকিয়ে দিল চৌকির তলায়। বোড়শী চৌকিতে বসে, পা দোলাতে দোলাতে, চুপ করে দেখছিল নিচু গলায় বলল, ভাইপোর চেয়ে ভাই লক্ষণ হলেই ভাল মানাত। ভক্তি যে একটু বেশী দেখছি।

বোড়শী বলে যায়। মহিম শোনে। হাজারে একটাও জবাব দেয় কি না সন্দেহ। এটাও তার এখন রীতিমতো অভ্যাস হয়ে গেছে। শুধু করল, হুঁ!

বেরিয়ে আসছিল মহিম। বোড়শী সাটের কলারটা চেপে ধরল, শোন না।

—যেতে।

হাত দিয়ে প্রায় একটা ঝাপটাই মারল মহিম, এবং এরকম মেরেই থাকে। মারতে হয়। বলল, বস না কী বলবে। বোড়শীও অদ্ভুত। তারও এসব গা সহা হয়ে গেছে। বলল, মুড়োকে কি দোকানের খাবার টাবার এনে খাওয়াতে হবে নাকি এখন? তা হলে বিয়ে এস সে।

মহিম কোন জবাব না দিয়ে বেরিয়ে গেল। ইতিমধ্যে প্রাণতোষ আর সরোষ, কারখানার কাজের বিষয় আলোচনা আরম্ভ করেছে। কোন কোম্পানী মিস্ত্রিদের কী রকম বেতন দেয়। প্রাচুয়িটি, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, নানান বিষয়। মহিম কাছে বসল। বোড়শী তাদের সামনে দিয়ে, সন্তর্পণে পা টিপে রান্না ঘরে গিয়ে ঢুকল। শব্দে টের পাওয়া গেল, চায়ের কেটলি বসাচ্ছে সে উনুনে। একবার বলে উঠল, কে কে চা খাবে?

কেউ জবাব দিল না। মহিমই বলল, তিন চার জনের মত হোক না, সবাই একটু একটু খাবে।

প্রাণতোষের দিকে ফিরে বলল, ছোটকাকা তুমি কিন্তু খাবে?

প্রাণতোষ তার অনিচ্ছাটাকে একটা জোর দিয়ে বলল, নাঃ।

রাতে ঢাকা বারান্দায় শুয়ে ছোটকাকার সঙ্গে মহিমের কথাবার্তা হল। প্রাণতোষ প্রথমেই জিজ্ঞেস করল, তুই কি পার্টি মেম্বারশিপ নেবেছিস নাকি?

—হ্যাঁ।

—কত দিন?

—এই বছর দেড়েক হয়ে গেল।

—ও। লোকাল কোনো কমিটি টমিটিতে আছিস?

—হ্যাঁ, আমি লোকাল কমিটির মধ্যে আছি।

—আচ্ছা! তা হলে তো বেশ ভালই বলতে হবে। সেক্রেটারী কে?

প্রাণতোষের প্রশংসায় মহিমের মনটা ভরে উঠল। বলল, অনিল, অনিল ভট্টাচার্য।

প্রাণতোষ বলল, নামটা শোনা শোনা লাগছে। পার্টির কাগজে নামটা দেখেছি বোধ হয়।

মহিম বলল, আর একজন আছে এখানে, কলকাতার লোক, আলোক মুখার্জি।

প্রাণতোষ বলে উঠল, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই কেবলি ভাবছি, কে একজন চেনা শোনা যেন এখানে আছে বলে শুনে ছিলাম। আলোক আছে তা হলে? অনেকদিনের চেনা।

—তোমার পুরনো বন্ধু বুঝি?

—হ্যাঁ। ও তো হাওড়াতে আমাদের এলাকারই কিছু দিন ছিল। মাঝে তো একবার ওর এম্প্লয়েড্ হয়ে যাবার কথা উঠেছিল।

—কেন?

কলকাতার হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গার পার্ট নিয়েছিল। তবে, পার্টি সেটা পারেনি।

ছোটকাকার কথা শুনে বোঝবার উপায় নেই যে ও ৫৫ বিঘে প্রাইমারী পর্যন্ত। বলল, কিন্তু টি ভক্সিউ পার্টির লোক দাঙ্গা করেছে? সত্যি নাকি?

প্রাণতোষ বলল, শুনেছি। হতেও পারে। ওই সময়টাতে অনেক শক্ত মানুষও একটু আধটু কাম্যুনাল হয়ে পড়েছিল। চোখের সামনে খুন টুন দেখে, মাথার ঠিক ছিল না।

মহিম যেন একটু দমে গেল প্রাণতোষের কথা সাম্প্রদায়িকতা যেখানে পার্টির মধ্যে কখনও অন্যায় ভাবে দেখা হয়, সেখানে আলোককে পরিবেশের শিকার বলে ক্ষমা করা হয়েছে। কথা শুনে তাই মনে হল মহিমের। তা বলে আলোকের হাতে রক্তের দাগ আছে? আর টি, ভক্সিউ পার্টির মতো এত বড় পার্টি সেটা প্রমাণ করতে পারেনি? যাদের সম্পর্কে বলা হয়, বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা করে থাকে। কোনো সংবাদ পেতেই যাদের এক মুহূর্ত দেরী হয় না।

প্রাণতোষ আবার বলল, তবে খুব আলোকে। প্রচুর পড়াশোনাও করেছে।

মহিমের মনে হল, আলোকের দিকে টান আছে ছোট কাকার। মনটা খারাপ হয়ে যেতে লাগল। তার পার্টি চর্চার কতখানি দাঁড়ি, হয়তো বুঝতে পারে না সে। কিন্তু একজন মানুষ হিসাবে সে কখনই ভাল নয়। অনিল মাঝে মাঝে বলে, 'পার্টি সভ্য মানে, পার্টির ঠিক সে রকম যন্ত্র নয় যে, নাটবোল্টের মতো তাদের কাজে লাগানো যায়। আগে

মনে করতে হবে, তারাও মানুষ। সহৃদয় এবং শক্তিশালী মানুষ ছাড়া কখনো একটা বড় সংগ্রামী পার্টি তৈরী করা যায় না। সভাপদের পরীক্ষাটাই তো সেখানেই। তাকে আমি যন্ত্র হিসাবে ভাবব কেন? তা হলে তো আমি তার সীমা নির্দেশ করে ফেলেছি। যে শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্বের অধিকারী, সেই-ই তো বিপ্লবী হবে। তার নতুন নতুন বিকাশের কথাই ভাবতে হবে। তারা কারা? বিপ্লবী: একটা বিপ্লব করতে চায় তারা দেশ জুড়ে, সুবিচারের প্রতিষ্ঠার জন্য, অন্যায় আর পাপ দূর করার জন্যে। যে- মহত্ত্ব আর সৌন্দর্য সব ঢাকা পড়ে আছে, তাকে খুলে দেবার জন্য। তার বোধশক্তি যদি তীব্র না হবে, গভীর না হবে তা হলে সে বিপ্লবের কথা চিন্তা করবে কেন? বিপ্লব কি এই নতুন করতে যাচ্ছি নাকি আমরা? যুগে যুগেই অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে অনেক বিপ্লব হয়েছে। এমন কি এই ভারতবর্ষে একই বংশের ছেলেরা লড়াই করেছে। কুরুক্ষেত্রর লড়াইটা বিপ্লব নয় কেন? বিপ্লব বলেই তার নাম হয়েছে ধর্মযুদ্ধ। অন্যায়, অবিচার আর অধর্মের বিরুদ্ধে শ্রেষ্ঠ সব মানুষেরা সংগ্রাম করেছিলেন। বিপ্লব আমার কাছে ধর্মযুদ্ধ, কোনো পৈশাচিক যান্ত্রিক ব্যাপার নয়। সুতরাং আমার সহ-যোদ্ধাদের আমি কখনো যন্ত্র হিসাবে চিন্তা করতে পারি না।'

কথাগুলো শুনলে অনিল যে একজন সৎ মানুষ, তা তার প্রতিটি ব্যবহারের মধ্যেই পরিস্ফুট। কিন্তু আলোককে কোনো রকমেই তা মনে হয় না। সেই আলোককে ছোট কাকা ভাল বলছে। মনটা বিষণ্ণ হয়ে যাচ্ছে। আরো মনে পড়ল, ভারত স্বাধীন হয়েছে কি হয় নি, পার্টির অভ্যন্তরে এই যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে, তাতেও ছোট কাকা আলোকের পক্ষে, বোঝা যাচ্ছে। অথচ নির্বাচন এবং পার্লামেন্ট গঠনের অধিকার সম্বেত, কনষ্টিটিউশনে যা কিছু গ্রহণ করা হয়েছে, তাতে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়নি, এ কথা বলা যায় না। কমনওয়েলথ্-এর প্রশ্ন তোলা হয়েছে। তার জন্যে সংগ্রাম নিশ্চয়ই করতে হবে। দক্ষিণপন্থী গভর্নমেন্ট তার ঘাঁটি শক্ত রাখার জন্যে এগুলো তো করবেই। ওটাকে তারা এক ধরনের রক্ষাকবচ ভাবছে।

প্রতুল বিষয়ের গতিপ্রকৃতির কথা তুলল প্রাণতোষ।

মহিম বলল, সংসারের কথা আর বলো না। সন্ধেবেলার ব্যাপার তো সব নিজের চোখেই দেখলে, কানেও শুনলে। মা আর কাকীর ঝগড়া তো রোজ লেগেই আছে।

প্রাণতোষ বলল, ওইটুকু মেয়েকে মা বলিস নাকি তুই?

মহিম সহজ রোষেই বলল, না ওকে আমি কোনদিন মা বলে ডাকতে পারি নি। মায়ের মত কী আছে ওর যে মা বলে ডাকব!

—সেই কথাই তো বলছি।

—তবে, লোকজনকে বলবার সময় অবিশ্যি মা-ই বলি, কী আর বলব।

—এমনি কী বলে ডাকিস?

—কিছুই না। আমার ডাকবার দরকারই হয় না।

—ও তোকে কী বলে ডাকে?

মহিম রুষ্ট বিদ্রূপের সুরে বলল, ওর আবার ডাকাডাকি, একটা যাচ্ছেতাই। অনেকদিন নাম ধরে ডাকতে বলেছি, ডাকে না। ঠাট্টা করে যখন যা খুশি তাই বলে, রাগে আমার গা হাত পা জ্বলে যায়। কী করব, বুড়ো বয়সে বাবার শখ হয়েছে, তো শখ মিটছে।

প্রাণতোষ খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপরে বলল, দাদার সঙ্গেও ঝগড়া টগড়া করে নাকি!

—ঝগড়া শুধু?

মহিম বলল, কী না বলে। বুড়ো, ঘাটের মড়া, ফোগলা দেঁতো, যখন যা মুখে আসে।

প্রাণতোষ যেন একটু হাসল। তারপরে জিজ্ঞেস করল, তোর সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করে?

মহিম হঠাৎ কথা বলতে পারল না। ছোট কাকাকে সব কথা বলা উচিত কিনা একবার ভাবল। এবং মনে মনে স্থির করল, ছোটকাকাকে বলা যায়। শুধু ছোট কাকা তো নয়, তার পার্টির লোক, সে সম্পর্কটা অনেক বড়। বলল, সুবিধের নয়।

—মানে?

—খারাপ।

—কী খারাপ।

—এই চাল চলন কথাবার্তা। মতিচ্ছন্ন যাকে বলে, বুঝলে না?

—ও।

খানিকক্ষণ চুপচাপ। প্রাণতোষ বলে উঠল, তা দোষ দেওয়া যায় না। ওর দিকটাও দেখতে হবে। মহিম যেন একটু খতিয়ে গেল। বলল, তা দেখুক সে না, আমার কী। আমার সঙ্গে কেন?

—কেন, দোষ কী?

মহিম কষ্ট ও বিস্মিত হল। বলল, হাজার হোক, সম্পর্কে আমি ছেলে তো না, কী?

প্রাণতোষ বলল, তুই একেবারে সেকেলে কথা বলছিস। তুই কি ওর পেটের ছেলে? ও তোকে তা কখনো ভাবতে পারে? এই যুগ ধরা সমাজ ওর ওপরে একটা অবিচার করেছে, তুই সেটা মানবি কেন? ওর একটা দাবী আছে।

মহিমের মাথার প্রায় রক্তই উঠে গেল। বলল তা আমার কাছে দাবী কেন।'

—তোকে হয় তো ভালবাসে।

—মার ঝাড়ু।

মহিম প্রায় ক্ষেপেই উঠল। বলল, ওসব আমার ভাল লাগে না। ভালবাসার আর লোক পেল না, সতীনের ছেলে নিয়ে টানাটানি!

প্রাণতোষ বলল, কিন্তু তুই যখন বিয়ে করবি, ওর বয়সী একটা মেয়েকেই হয়তো বিয়ে করবি।

—তা করতে পারি।

—তবে তো তোর এটা কুসংস্কার।

—তা হলে কুসংস্কার।

—পার্টিতে এ ধরনের কুসংস্কার তো থাকা উচিত নয় কারুর।

—তবে কি সৎ মাকে বিয়ে করতে হবে?

—যদি ভাল লাগে—?

—লাগে না বলছি তো। ওর ওসব কথায় আমার ঘেন্না হয়।

—তুই যে ভাবে বলছিস, তাতে মনে হয় ব্যাপারটা খারাপ। কিন্তু তা তো নয়। এ রকম বিয়ে হলে, তাকে আমাদের সমর্থন করা উচিৎ।

মহিম কোনো জবাব দিল না। কথা বলতে ইচ্ছে করছে না তার। মনে হল, তার মাথার মধ্যে দপ্‌দপ্‌ করছে। ভাবছে, ছোটকাকাকে খুলে বলাটা ওর ঠিক হয়নি। শুধু ক্ষোভ নয়, একটা বিমর্ষ যাতনায় মনটা ভরে উঠছে। একই পার্টির লোক তারা, কিন্তু ছোট কাকার সঙ্গে তার অনেক বিষয়ে যেন অনেক তফাত। সন্ধ্যাবেলার আনন্দটা আর তেমন ঝলকাচ্ছে না।

কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল, আলোকের সঙ্গে প্রাণতোষের বন্ধুত্ব জমে উঠেছে। পুরনো পরিচয় ছিলই। নতুন জায়গায় দেখা হয়ে, পরস্পরের মধ্যে, পুরনো টান যেমন ভাতে বাড়ে, তেমনি ওদের ঘনিষ্ঠতাও বেড়ে উঠল। এবং দেখা গেল, যেকোন ব্যাপারেই, ওরা পরস্পরকে সমর্থন করছে।

সম্প্রতি একটি সংগ্রাম কমিটি তৈরী হয়েছে এ অঞ্চলে। সংগ্রাম কমিটিতে বানপন্থী ট্রেডইউনিয়নের লোকেরাই আছে। তার মধ্যে প্রধানতঃ রাজনৈতিক দল হিসাবে টি. ডব্লিউ পার্টির সভ্যদেরই সংখ্যা বেশী। সংগ্রাম কমিটি তৈরী করার প্রয়োজন হয়ে পড়ল তিনটি প্রধান কারণে। যদৃচ্ছা ছাটাই, বিশেষ করে মেয়েদের। ট্রাইবুনালের রায় অনুযায়ী দেখা গেল, অন্তঃসত্ত্বা মেয়েদের দীর্ঘ দিনের জন্য ছুটি দিতে হচ্ছে, বেতনসহ। এটাকে ক্ষতি হিসাবে দেখিয়ে, কোম্পানীগুলো এক ধার থেকে মেয়েদের সরাতে আরম্ভ করেছে। গ্র্যাচুয়িটির ফাঁকি। ব্যক্তিবিশেষকে বরখাস্ত। সস্তা রেশন বন্ধ করে দেওয়া। একটা সর্বাঙ্গীন আন্দোলনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

সকলেরই মোটামুটি ধারণা ছিল, আঞ্চলিক সংগ্রাম কমিটির সেক্রেটারি মহিমই হবে। নির্বাচনের দিন, আলোক প্রাণতোষ সম্পর্কে এমন বক্তৃতা দিল, শেষ পর্যন্ত প্রাণতোষই সেক্রেটারি হয়েছে। প্রাণতোষ যে বহু সংগ্রামের অংশীদার, বিজয়ী এবং নেতৃত্বের অধিকারী এ কথা বলবার জন্যে আলোককে বাড়া এক ঘণ্টা বলতে হয়েছিল। সত্যি বলতে কি, ছোটকাকার সংগ্রামী-সত্তার কথা শুনতে শুনতে মহিম আবেগে উত্তেজনায় প্রথমেই বলে উঠেছিল। হ্যাঁ এমন লোককেই আমরা কমিটির নেতা করতে চাই।

প্রথম ভোট মহিমের। তারপরের অধিকাংশেরই তাই মতামত হল, কয়েকজন ছাড়া। সেই কয়েকজনের মধ্যে অনিল ছিল। তার বক্তব্য ছিল, 'এ অঞ্চলে প্রাণতোষ নতুন, সে হিসেবে আমি মহিমের নামটাই প্রস্তাব করব।

বসাবাহুল্য সে প্রস্তাব খাটেনি। বরং আলোক বলেছিল, আপনার প্রস্তাবিত নাম যার, সেই প্রাণতোষকে ভোট দিচ্ছে এতে বোঝা যাচ্ছে, আপনি মিথ্যে অবাস্তব ধারণা নিয়ে বসে আছেন।'

সেই দিনই একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল। রবিবারের ছুটির দিনে, বিকালে সংগঠন কমিটি নির্ধারিত হয়েছিল। তার আগে মহিম বাজারের একটা চায়ের দোকানের পিছনের আড্ডাতে গিয়ে বসেছিল। বাজার বন্ধুরা যখন তখন দোকানে আসতে পারে, তাদের সামনে বিড়ি সিগারেট মুখে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসা যায় না।

সে গিয়ে বসবার একটু পরেই আলোক আর প্রাণতোষের গলা শুনতে পেয়েছিল মহিম। প্রাণতোষ বলেছিল, 'তা হলে সিক্রেটারি আমার নামই যাচ্ছে তো?

আলোক—নিশ্চয়ই। তুমি সেক্রেটারি, নাম যাবে তার। খুব জোর দিয়েছি আজ, না?

দু জনেই হেসে উঠেছিল। প্রাণতোষ বলেছিল, 'অনিলকে খুব বকুনি দেওয়া গেছে। ও ঠিক করছিল, আমাকে কিছুতেই পাত্তা দেবে না। হালদা বলেছে। ও নিশ্চয়ই ভাগাভাগি খেয়ে গেছে।

আলোক বলেছিল, 'ইউনিভার্সিটির সোনার টুকরো ছেলে হলেই হয় না। মহিমকেও খুব জব্দ করা গেছে।'

প্রাণতোষ বলেছিল, 'ওটা একটা উল্লুক, কিছুই বোঝে না, খালি অনিলের দালালী করে। আচ্ছা, লিফলেটের টাকা কবে কে? অনিল তো?

'হ্যাঁ। তবে আমার মনের মত না হলে সব কেটে দেব। সবটাকে বোঝাবার দায়িত্ব আমার।'

ওরা চা খেয়ে চলে গিয়েছিল। মহিম অনেকক্ষণ পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না, কথাগুলো সে শুনেছে। ভেবেছিল, প্রথমেই অনিলের বাড়ি যাবে। কিন্তু তাও যেতে পারে নি। তার মন বলছিল, অনিলকে এ সব কথা বলা ঠিক হবে না। তখনকার মতো থেমে গিয়েছিল। পরে অবশ্য না বলে পারে নি।

অনিল বলেছিল, 'তুমি না বললেও আমি এটা আন্দাজ করতে পেরেছিলাম। কিন্তু আর কাউকে বলো না। তাতে সাধারণ সুতোরা যাবড়ে যাবে। তাছাড়া আমাদের মধ্যেই ঝগড়া রয়েছে। আর যাই হোক, সেটা আমরা ঘটতে দিতে পারি না। মতভেদ এক কথা, রেষারেষি আর এক কথা। যা বিশ্বাস করব, তাই বলব। কিন্তু রেষারেষিতে যাব না।'

মহিমের সব থেকে বেশী কঠিন হয়ে উঠেছিল, ছোটকাকার সঙ্গে মানিয়ে চলা। সে জানত, ছোটকাকার কাছে সে একটা উল্লুক মাত্র, অনিলের দালাল। আর ছোটকাকা তাই পাল্টা মহিমকে তার এবং আলোকের পক্ষে টেনে নিতে চাইছিল। কিন্তু মহিম তো দলের পক্ষেই থাকতে চায়। একই দলের মধ্যে বিভিন্ন গ্রুপের অস্তিত্ব সে মানতে পারে না। তখন সেটাই বেড়ে উঠছে, অপ্রতিরোধ হয়ে উঠছে। আর যে উদ্দেশ্য নিয়ে পার্টি গঠন! সেই মহৎ উদ্দেশ্যই পড়ে পড়ে মার খাবে? এ কি আশ্চর্য জটিলতা?

তা ছাড়া আর একটা বিষয় একেবারে বোকা করে দিচ্ছে মহিমকে। সেটা হল ছোটকাকার সঙ্গে সংসারের সম্পর্ক। প্রথম প্রথম কিছুদিন বোড়শী একটা নৈর্ব্যক্তিক ভাব নিয়েছিল। একটু বা আড়ষ্টতা ছিল প্রাণতোষের সম্পর্কে। নতুন মানুষ একজন এসে যা হয়।

প্রাণতোষের সঙ্গে প্রথম রাত্রি কথা বলার পর বোড়শীর প্রতি যেন আর একটু বেশী কঠিনই হয়েছিল মহিম। বোড়শী কাকে ভালবাসে, ভালবাসতে পারে, এ চিন্তাটাও যেন তার কাছে, অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। বোড়শী তার ব্যবহারের তারতম্যটা বুঝতে পেরেছিল। তাই ঠোঁট উল্টে বলেছিল, 'কী হল একটু যেন বেশী রাগ রাগ ভাব দেখতে পাচ্ছি? ছোট খুকী এসে কানে নতুন মন্ত্র দিল নাকি?'

মহিম ঝেঁজে বলেছিল, 'এরকম বাজে কথা বলবে না। তোমার কি একটু লজ্জা করে না?'

'না। লজ্জা আর তোমরা আমায় রাখলে কোথায়?' এ কথাটা অনেকবার বলেছে বোড়শী।

তার পরেই আস্তে আস্তে বোড়শী উদাসীন হয়ে যাচ্ছিল মহিমের বিষয়ে। ওর সামনেই প্রাণতোষকে চা দেয়, নিয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলে। মহিমকে চা দিতে ভুলে যায়। মহিমকে বলতে হয় 'এই আমাকে চা দিলে না!'

'ও ভুলে গেছি।'

বলে ঠোঁট টিপে, আস্তে আস্তে চা এনে দেয়। বোড়শীর স্বাভাবিক চরিত্রের সঙ্গে এটা এত বেমানান যে, মহিম মনে মনে অবাক না হয়ে পারে না।

আজকাল সে মহিমকে খেতে ডাকতে ভুলে যায়। অথচ প্রাণতোষকে ডাকতে ভোলে না। বরং প্রাণতোষই ডাকে, মহিম খেতে আয় রে।' খেতে গেলে ভাত দিতে মনে থাকে না। কখনো যা বলে নি, তাই বলে, 'ছকটা একটু গড়িয়ে নাও।' অথচ ঠিক তার পূর্ব মুহূর্তেই হয় তো প্রাণতোষকে জল গড়িয়ে দিয়েছে। এ সবই খুব তুচ্ছ, কিন্তু এ ই বিচিত্র ও আশ্চর্য যে, মহিম অবাক স্তব্ধ না হয়ে পারে না। একলা, বাবার এই বিরহের সময় যখন সে কেঁদে ছিল, তখন সে মায়ের এরকম ব্যবহারই প্রত্যাশা করেছিল। হাসপাতাল থেকে বাড়ি এসেও তাই। কিন্তু বোড়শী তখন অন্য রকম ব্যবহার করেছিল। সেটাও এক রকমের বাড়াবাড়ি। এবং সে-ব্যবহারের প্রতিবাদ করা যেত, এখনকার এ অবহেলারই বরং প্রতিবাদ করা যায় না। বোড়শীর যদি ইচ্ছে না করে, তবে কোনো অধিকারই মহিমের নেই যে, ওকে বাধ্য করা যায়। ছেলে হিসেবে তো নয়ই, অন্য কোনো সম্পর্কও তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে নি। তবু বোড়শীর ব্যবহারে বিস্ময়ের মধ্যেও কোথায় যেন একটা ব্যথার ছোঁয়া লেগে যায়। ছোট কাউকে যদি সে মা বলে ডাকে, তবে মহিম তাতে হিংসে করবে না। কিন্তু তাকে এমন অবহেলা কেন? এখন যে বড় বেমানান লাগে, প্রতি পদে পদে চোখে পড়ে।

কোনো কারণে, সাধারণতঃ খেতে বসেই এ রকম হয়। প্রাণতোষ হয় তো বেরী করে ফেলে, মহিম খেয়ে উঠে যায়। পরমুহূর্তেই ওরা দুজনে হেসে ওঠে। কী ওরা বলাবলি করে, কে জানে। হয় তো দুজনেই তাকে উল্লুক বলে খুশি হয়।

আস্তে আস্তে টের পায় মহিম, প্রাণতোষের সঙ্গে বোড়শীর একটা সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। একদিন, বাবা ওভারটাইম করতে গিয়েছিল। কাকাও গিয়েছিল। মহিমকে যেতে হয়েছিল পার্টির একটা কাজে। প্রাণতোষ বাড়ি ছিল না। পার্টির কাজটা হয় নি, মহিম তাই বাড়ি ফিরে এসেছিল। দেখেছিল, কাকীমার ঘরে শেকল লাগানো। বাবার ঘরে কথা হচ্ছে। ছোটকাকা আর বোড়শী কথা বলছিল। যদিও কথাগুলো কী প্রমাণ করে। মহিম সঠিক ধরতে পারে নি।

বোড়শী—হাতটা ছাড়ো না বলছি।

ঘরের মধ্যে তার চুড়ির শব্দ হয়েছিল। প্রাণতোষের গলা, না ছাড়লে কি চেঁচাবে?

বোড়শী—হাঁ।

প্রাণতোষ—সবই জানা দেখছি।

বোড়শী—সবই আবার কী। তোমার ইচ্ছে মতো হবে বুঝি!

প্রাণতোষ নিশ্চুপ। বোড়শীর একটু হাসি। কথা। হাসি হচ্ছে?

প্রাণতোষ—লাভ?

বোড়শী—তবে কি লোকসান!

প্রাণতোষ—বেলানো তোমার অভ্যাস।

বোড়শী—খেলা যেন? আঃ, আবার? ছাড়, ছাড়।

টানাটানির শব্দ হয়েছিল। চৌকির ওপরে কেউ ধপাস করে পড়ে গিয়েছিল। মহিম যে কী করবে ভেবে উঠতে

With Compliments from :

Nadia Scientific Company

19, Goabagan Street,
Calcutta-6.

Glass Blowers and Makers of Best quality Glass Apparatus and Instruments from Pyrex, Sicgol & other Heat Resistant Glasses.

Accuracy of graduations :

পারছিল না। ও ভাবে, উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে ধরা দিতে চায় নি।

ষোড়শীর গলায় আবার শোনা গিয়েছিল, তুমি তো নিজের তালে আছ, আমার কথা ভাববে কে?...কী হল?

কেটে গেছে? বেশ হয়েছে, যাই বাবা, নাস্থর মা আসবে এখুনি।

নাস্থর মা মানে, কাকী। মহিম তাড়াতাড়ি সদর দরজার দিকে চলে গিয়েছিল। কিন্তু ষোড়শী বাইরে আসেনি। আবার শুনতে পেয়েছিল, তুমি তো পার্টির কাজের নাম করে বেরিয়েছিলে। পালিয়েও এলে তাড়াতাড়ি। ভাইপোটি কোথায়?

প্রাণতোষ—জানি না।

আর একদিন রবিবারের দুপুরে, কাকী ঘরে ঘুমোচ্ছিল। বাবা আর কাকা রামকানাইয়ের সঙ্গে তাস খেলতে গিয়েছিল। মহিম একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। ছোটকাকা তার পাশেই শুয়েছিল। হঠাৎ নিজের নামটা কানে যেতেই জেগে উঠেছিল সে ছোট কাকা শুয়ে নেই। ঘরের ভিতরে ষোড়শীর গলা শুনতে পেয়েছিল সে, মহিমকে ডাকব কিন্তু।

প্রাণতোষ—কী বলে মহিমকে ডাকলে? মহিম তোমাকে মেসো বলে, তা জান?

ষোড়শী—জানি। তোমাকে খুব পেয়ার করে বুঝি?

প্রাণতোষ—আমাকে ও মানে।

ষোড়শী—কারণ তুমি ওর নেতা, তাই?

প্রাণতোষ—যে কারণেই হোক। কিন্তু সত্যি করে বল তো, আমি আসবার পর তুমিই আমাকে খেপিয়েছিলে কি না। সে সব হাসি ইশারাগুলোর মানে কি তা হলে?

ষোড়শীর নিস্প্রাণ গলা, তা তুমি জান।

পর মুহূর্তেই হাসি।

প্রাণতোষ বেরিয়ে এসেছিল ঘর থেকে। বারান্দায় বসে নি, একেবারে বাড়ির বাইরে চলে গিয়েছিল। মহিমকে বাধ্য হয়ে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকতে হয়েছিল। এ ঘুমের মানে কী? কী নিয়ে ওদের বিবাদ হচ্ছে। ছোট কাকার তো নিশ্চয় কোনো কুসংস্কার নেই। ষোড়শীরও নিশ্চয় নেই। তা হলে, তার ব্যবহার অন্যরকম হত। তবে ওদের পরস্পরের মধ্যে বনছে না কেন।

একথা ঠিক, ছোটকাকার এই প্রেমের ব্যাপারটা তার ভাল লাগছে না। তার কাছে ষোড়শী এবং প্রাণতোষ কেউই ভাল নয়। দু জনেই ব্যাভিচার করছে বলে তার বিশ্বাস। তাতে তার বিপ্লবী মর্যাদা ক্ষুণ্ন হলেও কিছু করার নেই। কিন্তু ওদের দুজনের বাধাটা কিসের? অথচ...অথচ, রান্নাঘরের মধ্যে, সে তো পরিষ্কার একদিন দেখেছিল, ছোটকাকা ষোড়শীর মুখখানি দু হাতে তুলে ধরেছে।

কিন্তু কী হবে এসব চিন্তা করে। মহিমের জীবনে এটা কোনো সমস্যা নয়। সমস্যা থাকলে ছোটকাকা আর সৎ মায়েরই আছে।

জীবনের আসল সমস্যা এল অন্যদিক থেকে। পার্টির নেতৃত্বের যেকটি ভারতের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করল। নেতৃত্বের রদবদলও হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, প্রতিটি ক্ষেত্রে আন্দোলনকে তীব্রতর করার নির্দেশ এল। যেখানেই বাধা, সেখানেই আঘাত করার অমনযীয় মাওপন্থী এল। প্রয়োজন হলে সশস্ত্র প্রত্যাঘাতও চালাতে হবে। কারণ গভর্নমেন্ট সম্পূর্ণ সশস্ত্র ও সক্রিয়।

আঞ্চলিক কমিটিগুলোর ও রদবদল হল। সারা ভারত গোপন সার্কুলার পাঠ করা হল সভায়। তবে স্পষ্টই লেখা ছিল, প্রদেশ এবং জেলাগুলোর অধিকাংশ নেতৃত্বই দক্ষিণপন্থী ভাবনায় চালিত। এই ভাবনাগুলোকে আমাদের আঘাত করতে হবে। আপোষের মনোভাব টের পেলেই ধিক্কার দিতে হবে। ভিতরের যা কিছু নোটানো ভাব, তাকে তীব্র আক্রমণ করতে হবে। গভর্নমেন্টের ওপর কারুর বিশ্বাস নেই। কতগুলো আন্দোলনে এবং গভর্নমেন্টের প্রতিশোধের বীভৎসতা দেখে, সাধারণ মানুষ স্তম্ভিত। অর্থনৈতিক দুরবস্থায় সকলেই অস্থির। এই সময়ে, প্রতিটি পার্টি সভ্যকে সক্রিয়, প্রয়োজন হলে সশস্ত্র ভাবেই এগিয়ে আসতে হবে। সাধারণ মানুষের যে দ্বিধা দোদুল্যমানতা তার আছে, তা আমাদের অগ্রগামী হয়েই কাটাতে হবে। প্রয়োজন হলে, প্রতিটি কমিটি নতুন নির্বাচন করুন। নির্দ্বিধায় অগ্রসর হন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

(৭৫৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)

পত্রিকা বিভ্রাট

শিল্পী—রেবতীভূষণ

ডাকবাক্স ৩ বাঙ্কুলের চিঠি

সমরেশ বসু

গ্রাম দুধেসর, পোস্টাপিস দুকুলপুর, থানা জাগুলগাছি।

গাঁ-গ্রাম তো কতই, আমাদের দুধেসরের মতো আর একখানা গ্রাম কোথায় আছে দেখান। নেই কি এখানে? ইস্কুলিবাবু আছেন, দারওয়ান আছেন, গায়নাহেব আছেন। ডাকসাইটে উকিলও ছিলেন একজন—মহামান্য হাইকোর্ট কাঁপিয়ে বেড়াতেন। রিটায়ার করে এখন ঘোরতর সাধু। এর উপরে আরও এক আজব বস্তু এসে পড়ল—

দু-দুটো পাশ-করা শিক্ষিত মেয়ে কাঞ্চনমালা। শৈলধর ঘোষের ছোটমেয়ে কাঞ্চন। মা নেই। মায়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে কলকাতা থেকে মামা এসে পড়লেন। শৈলধরকে বললেন, দিদি চলে গেলেন, আপনার তো এই অবস্থা ঘোরতর মশাই। কাঞ্চনকে দিন আমায়। তিনটে মেয়ের বিয়ে আপনারা দিয়েছেন, কাঞ্চনের দায়ভার আমার উপরে। বড়দড় ধরে ওখান থেকে বিয়েথাওয়া দিয়ে দেবো। আপনাকে ঝামেলা পোহাতে হবে না।

মামার ছেলেপুলে নেই। মস্তবড় কার্মের ক্যাশিয়ার তিনি, অঢেল রোজগার। খরচ করে হালকা হবেন, সেজন্য ছটফট করছেন। তারই একটা সুযোগ হবে মনে করে এই অবধি ছুটে এসে পড়েছেন।

কায়দায় পেয়ে শৈলধর একমাত্র ছেলে বেণুধরকেও ঐ সঙ্গে জুড়ে দিলেন: মেয়ে তো দুটিকে একসঙ্গে নিয়ে যাও। নয় তো থাক। যেই সেই ভিটে পাহারা দেবো, দুপুরে রাত্রে উনুনে হাঁড়ি চড়াবো, কাঞ্চন গিয়ে তবে আমার দুরাহাটা কি?

অতএব ভাইবোন উভয়ে চলে গেল মামার সঙ্গে। তিন-তিনটে মেয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘরের ঘর করছে, পিতা শৈলধরের ভাবনা কিসের? বড়মেয়ের বাড়ি একমাস, মেজমেয়ের বাড়ি একমাস, সেজমেয়ের বাড়ি একমাস—পালা করে এমনি চলল। বছরে মাস তো বারোটার বেশি নয়—চার বার এমনি গেলেই হল।

সেই নিয়মে চলে আসছিল। যে কথা বলে মামা নিয়ে এসেছেন, ঠিক ঠিক সেই রকম করে যাচ্ছেন। বড় ভালবাসতেন তিনি কাঞ্চনকে, সর্বক্ষণ যেন চোখে রাখতেন। কলকাতা গিয়েছিল বেণুধরের বয়স তখন পনের-ষোল, কাঞ্চন তার চার বছরের ছোট। রোগা পটকে মেয়েটাকে খাইয়ে দাইয়ে দিব্যি গায়ে-গতরে বানিয়েছেন মামা। বিয়ের ব্যাপারেও অন্যথা হত না—চাহিদা বাড়বে বলে ইস্কুল-কলেজে পাঠিয়ে দু-দুটো পাশ করিয়ে রেখেছেন। ঘটক লাগিয়ে রীতিমত তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছিলেন। আয়োজনে ত্রুটি নেই, কিন্তু হঠাৎ সব বরবাদ হয়ে গেল। এক কথায় মামার এত বড় চাকরিটা গেল। ক্যাশভাঙার জন্য একগাদা টাকার দায়ী। সর্বস্ব বিক্রি করে সেই টাকা শোধ করলেন। জেলে যেতে হত, সেইটে ঠেকালেন কোনক্রমে। কিন্তু পথের ভিখারি। কলকাতার বাসা ও সম্পত্তির চাটিবিক তুলে দিয়ে কোথায় এখন আত্মগোপন করে আছেন সঠিক জানা যায় না।

এ হেন অবস্থায় কাঞ্চনকে আবার এই দুধেসরে এসে উঠতে হল। বাবা শৈলধর আগে থেকেই এসে আছেন। বয়স হয়ে গরীর একেবারে ভেঙে গেছে—পালা বেঁধে মেয়েদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে পেরে ওঠেন না। তা ছাড়া মেয়ে-জামাইয়ের উপরে শ্বশুর-ভাসুরেরা থাকে, তারা নাকি বলাবলি করে এই নিয়মিত কুটুম্বিটির সম্বন্ধে। যাচ্ছেতাই করে বলে, মেয়েদেরই তাই আপত্তি। বাড়ি থেকে শৈলধর নিজের হাত পুড়িয়ে কোন রকমে দু-বেলা দু-মুঠো চাল সিদ্ধ করে নিচ্ছিলেন, তার উপরে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো শহুরে শিক্ষিতা মেয়ে ঘাড়ে চোপ পড়ল। বেণুধরের একটা চাকরি জুটিয়ে দিয়েছিলেন মামা। মামার বাসা ছেড়ে সে মেসে গিয়ে উঠেছে। বাপের হাতে মাসে মাসে যৎসামান্য পাঠায়। সম্বল সেই কুড়ি টাকা। ছিলেন একজন, আর একটি এসে জুড়ে বসল।

কত বয়স পুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে মেয়েটা এই অজপাড়াগাঁয় উঠেছে। রাজকন্যার বনবাসে আসার মতন। যে শোনে সে-ই হায়-হায় করে। গ্রামবাসী একজনের কেবল উল্লাস—সে হল নিরঞ্জন। আকর্ণ বিস্তার হাসি হেসে সর্বত্র নাকি বলে বেড়াচ্ছে: বাঃ, দিব্যি হল। ঘরদোর সেরেসুরে নিন শৈল-জেঠা। বাপে-মেয়ের মিলে সংসার জমিয়ে থাকুন।

নিরঞ্জনের পরম বন্ধুবর সাগরেদ নীলমণি। কাঞ্চনদের লাগোয়া বাড়ি। নীলমণিকে কাঞ্চন জিজ্ঞাসা করে: মানুষটা কে বলো দিকি? হৃদয় বলে কিছু নেই, পরের কষ্টে স্ফূর্তি পায়—মানুষ নয় সে পশু। চিনিয়ে দিও আমায় একদিন, আচ্ছা করে শোনাব।

নীলমণি বলে, স্ফূর্তি খুব হয়েছে দিদিমণি, সেটা মানি। মানুষ বাড়ল একজন দুধের গাঁয়ে—যেমন তেমন মানুষ নয়, পাশ-করা মেয়েমানুষ। সুজনপুরে নেই। বুক ফুলিয়ে দেমাক করবার জিনিস কিনা বলো তবে। এদ্দিন যে জায়গায় ছিলে, তারা করত না?

চিনিয়ে দিতে হল না। বাড়ির উপরেই দেখা ক'দিন পরে। কাঞ্চন কোন দিকে গিয়েছিল—উঠোনে পা দিয়েছে, নিরঞ্জনও সেই সময় বেরুচ্ছে ঘর থেকে।

কাঞ্চন বলে, আপনি নিরঞ্জন বাবু?

বাবু দেখলে তুমি কোনখানটা? জামা নেই, জুতো নেই, পায়ে একহাঁটু ধুলো, কৌরি হয়নি আজ দশ-বারো দিন। শহরে না থাকলেও বাবু কিছু কিছু দেখা আছে বই কি।

ফ্যা-ফ্যা করে হাসে নিরঞ্জন। কাঞ্চনের গা জ্বালা করে: এ-বাড়ি কোন মতলবে—কোন সুখে আছি তাই দেখতে? দেখে বুঝি বড্ড মজা—উঁ?

যাচ্ছিল নিরঞ্জন, মুখে ছাই মেরে দিল হঠাৎ। জবাবও দিতে যাচ্ছিল, শৈলধর বেরিয়ে পড়লেন: আমি খবর দিয়ে এনেছি। তুই ক্যাটক্যাট করবার কে? বাড়িটা আমার না তোর?

চুপ হয়ে গেছে কাঞ্চন। ফোস্কা যেমন টোকা পড়লে গুটিয়ে যায়। ঘাড় নেড়ে শৈলধরের কথায় সায় দিয়ে নিরঞ্জন তৃপ্তিতে উপভোগ করছে।

শৈলধর বলছেন, বেণু কোন মাসে পাঁচ টাকা পাঠাল, কোন মাসে বা ছয়। দুজন লোকের এ বাজারে চলে তাতে? তারই একটা ব্যবস্থা দেখছি। বুড়ো বয়সে না খেয়ে মরব, তাই চাস তোরা?

নিরঞ্জন একগাল হেসে সুসংবাদ দিল: বালিকা বিদ্যালয়ের হেডমিস্ট্রেস হয়ে যাচ্ছ যে তুমি—

অবাক হয়ে কাঞ্চন বলে, বালিকা বিদ্যালয়—এই দুধপুরে?

নেই এখনো। তুমি এসে পড়েছ, হতে কি আর বাকি থাকবে?

একটু হেসে সগর্ব কণ্ঠে বলে, তোমায় পেয়ে গেছি, দন্তে তৃণ ধারণ করিয়ে ছাড়ব এবার সুজনপুরকে। পোস্টাপিস নিয়ে বড্ড গরব, বালিকা-বিদ্যালয়ে আমরা তার শোধ তুলব।

কাঞ্চন ভ্রূভঙ্গি করে বলে, ক'দিন আছি দেখুন। কত জানাশোনা, কলকাতায় চিঠিপত্র কত লিখছি। কিছু না কিছু হবেই। বাবাকে নিয়ে দাদাকে মেস থেকে সরিয়ে একসঙ্গে বাসা করে থাকব। বাড়িঘরে তালা ঝুলবে আবার।

নিতান্ত ভয়-দেখানো কথা নয়, পিওনমশায়ের পেট-মোটা ব্যাগই তার প্রমাণ। বিটের দিন একগাদা চিঠি নিয়ে আসেন। আবার একগাদা চিঠি নিয়ে যান ডাকে ফেলবার জন্য। বলেন, অর্ধেকগুলোই ঐ মেয়েটার। চিঠি আসেও যেমন, লেখেও তেমনি। মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর এই বড় দোষ—কাজকর্ম নেই তো লেখ্ বসে বসে চিঠি। বিয়ে হয়ে ও-মেয়ে চিঠি লিখেই বরকে কাবু করবে।

পিওনমশায়ের কথাগুলো সেদিন নিরঞ্জন নিস্পৃহভাবে শুনে গিয়েছিল, আজকে আতঙ্ক রীতিমত। নিরীহ চিঠি নয় ওসব, পালানোর ষড়যন্ত্র চলছে চিঠিতে।

কাঞ্চন আরও স্পষ্ট করে বলে, গাঁয়ের নরককুণ্ডে পড়ে থেকে আমি জীবন খোয়াব? কখনো না, কখনো না। হেড-মিস্ট্রেস তো করেছেন, তার জন্য আমার একটা মত নিয়েছেন?

ও শৈল-জেঠা, আপনার মেয়ে বলেকি শুনুন। উনি একটা মানুষ,—ওঁরও আবার মতামত!

গ্রামের নিন্দের চটে গেছে, কৌতুক-হাসি হেসে নিরঞ্জন তারই শোধ নেয়। বলে, এদ্দিন মামার বাসায় ছিলে, মামা মতামত দিতেন। এখন বাবার কাছে আছ, মত তাঁরই কাছে নিতে এসেছি, ভাইয়ের কাছে যদি থাকতো থাক, সে মত দেবে। বিয়ে হওয়ার পরে শ্বশুরবাড়ির মতামত। মেয়েলোকের নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা থাকে নাকি যে তোমার কাছে মত চাইতে আসব?

বলতে বলতে অভিমান এইবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল: জানো না বলেই দুখেসরকে তুমি নরককুণ্ড বলে দিলে। এইটুকু গ্রাম অতবড় সুজনপুরের সঙ্গে সমানে টক্কর দিয়ে যাচ্ছে। ওদের দুসেক আছে, আমাদের দাবজজ। ওদের ডাক্তার, আমাদের তেমনি ইন্ডিনিয়ার। আমাদের রায়সাহেব তো ওদের দারোগা—কোনটা বড় তুমিই বিবেচনা করে দেখ। উকিল-মোক্তার দুরকম আছে সুজনপুরে। আমাদের ছিল শুধু উকিল—কিন্তু সে হল হাইকোর্টের উকিল, সুন্দরবনের আসল মানুষখেকো। এক পোস্টাপিস নিয়ে ওরা জিতে রয়েছে—পিওনমশায় শাপশাপান্ত দেবেন, সেই ভয়ে ওদিকটা কিছু করতে পারিনে। তারই শোধবোধ এবারে—বালিকা বিদ্যালয়। দুটো পাশ করা হেডমিস্ট্রেস তুমি—সুজনপুরে এ জিনিষ পাবে কোথায়? শিক্ষিত মেয়ে বললেই তো আর মেলে না।

একটু চুপ করে থেকে দম নিয়ে বলে, বলজাতি যে নেই তা নয়। পিওনমশায়ের মেয়েটাই সদরে থেকে ম্যাট্রিক পড়ছে। সে মেয়ে জানা আছে আমার, পিওনমশায়ের ছেলের সঙ্গে ষাতির এককোটা বয়স থেকে ভাইবোন দু'জনকেই জানি। মেয়েটার মাথার মধ্যে গোবর, ইহজন্মে পাশ হতে হবে না। আর হলে তখনো আমাদের নিচে। দুখেসরের মেয়ে দুটো পাশ, সুজনপুরের কুলো একটা। তার উপরে এই নতুন কল বানালে হল—বালিকা বিদ্যালয়। পাশ-করা মেয়ে এক জন তোমাতেই শেষ হয়ে যাচ্ছে না, ভবিষ্যতে আরও সব আসবে। বিদ্যালয়ে তার বীজ পোঁতা হল। আক্কেলগুড়ুম এবার সুজনপুরের, মাথায় হাত দিতে বসবে।

আপাতত এই পর্যন্ত। সাগরেদ নীলমণি বার দুই-তিন উঁকি ঝুঁকি দিয়ে গেছে। কী দরকার। বাইরে থেকে আবার এখন হাতছানি দিল। সাগরেদ বটে নীলমণি সেই সঙ্গে গুপ্তচরও। জরুরি খবর নিশ্চয় কোন রকম।

বিভূতে এসে নীলমণি বলে, এককাণ্ড হল নিরঞ্জন দা। বাঁশতলায় দাঁড়িয়ে উকিলমশায় ফটিক-বেহারার সঙ্গে ফুসফুস-গুজগুজ করছিল। আমায় দেখে চুপ। চোখ টিপে দিল বোধ হয় উকিলমশায়, ফটিক সর্দার হনহন করে বাঁশবন ভেঙে মাঠে পড়ল। উকিলে বেহারায় অত কি কথা, তখন থেকে তাই ভাবছি।

নিরঞ্জন বলে, বিজয়ের বিয়ের নাকি একটা ভাল সম্বন্ধ এসেছে। কনে নিজে দেখতে যাবেন, তাই বোধ হয় পালকি বেহারা ঠিক করছিলেন।

তা বাঁশতলায় দাঁড়িয়ে কেন? আমায় দেখে ছুটেই বা কেন পালায় ফটিক? ধরেছি তারপর ফটিককে তার বাড়ি গিয়ে। উকিলমশাই তোকে কি বলছিলেন? আমতা-আমতা করে জবাব দেয়: এই শরীরগতিকের কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন।

নিরঞ্জনের মনে এখন বালিকা-বিদ্যালয়ের সমস্যা। অন্যমনস্ক ভাবে বলল, তাই একটা কিছু হবে। নয়তো কি আর ফটিক-বেহারার সঙ্গে দেওয়ানি-ফৌজদারি আইনের বিচার হচ্ছিল?

ঘাড় নেড়ে নীলমণি বলে, তা বলে উকিলমশায় ডাক্তারও নন যে অতক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শরীর-গতিকের কথা হবে।

একটু থেমে আবার বলে, আমার সন্দ হয়, কনে দেখা টেখা নয়—উকিলমশায় কোন একখানে পাকাপাকি পালাবার তালে আছেন। চিরকাল শহরে কাটিয়ে গাঁয়ের মধ্যে আর টিকতে পারছেন না।

উকিলমশায় মানে পুরন্দর সরকার—ভূতপূর্ব হাই-কোর্টের উকিল। দুখেসর যাঁদের নিয়ে জাঁক করে, তাঁদের মধ্যে প্রধান একটি। রীতিমত পশারওয়ালা উকিল, দু হাতে রোজগার করতেন। বাড়ি দুখেসর তো বটেই—বাল্যকালটা নাকি এখানেই কাটিয়েছেন। কিন্তু কৃতি হবার পর গ্রামে কোনদিন আসেননি।

নিরঞ্জন তা বলে ছাড়বার পাত্র নয়। বিজয়া-দশমীর পর তাঁকে এবং অন্য সকলকে বরাবর প্রণাম জানিয়ে চিঠি লিখে এসেছে। জবাব আসেনি, অতবড় মানুষের কাছে প্রত্যাশাও নেই তার। কলকাতায় গেলে দুঃসময়ের গৌরব উকিলসাহেবের বাসায় যাবেই একবার। এককাপ চা হয়তো কখনো কখনো এসেছে, তার উপরে নয়। চলছিল এমনি। বছর তিনেক আগে অবস্থা একেবারে বিপরীত। বুড়ো হয়ে উকিলসাহেবের ঘোরতর বৈরাগ্য এসে গেল। চিরজীবন মিথ্যা আচরণে কত শত অসৎ মক্কেল বাঁচিয়েছেন, পাপের সাহায্যতা করেছেন। দিন ফুরিয়ে পারের ঘাটে বসেছেন এবার, অবশিষ্ট পরমায়ুর মধ্যে জীবনের পাপ-অন্যায় যথাসম্ভব ধোয়ামোছা করে নেবেন। প্রাকটিশ, মক্কেল-মুহুরি, কলকাতার বাসা ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে দুঃসময়ে এসে উঠেছেন, জপতপ ধর্মকর্ম ছাড়া কিছু জানেন না। অসুবিধা বিন্দুমাত্র নেই। মেয়েরা সুপাত্রে পড়ে পরমসুখে ঘরকন্না করছে। বড় ছেলে অজয়ের বিয়েথাওয়া হয়ে নাতি-নাতনি দেখা দিচ্ছে। ছোট ছেলে বিজয়ের বিয়েও এখনই হতে পারে—পিসির দাবিদাওয়ার জন্যে দাদাদ্য আটকে রয়েছে। দুঃসময়ের পৈতৃক বাড়ি আসেসোড়া মেরামত করে দোতলার উপর তিনটে নতুন কুঠুরি দিয়ে নিয়েছেন। নতুন সম্পত্তি কিনেছেন আরও কয়েকটা। নিলাম ডেকে খেয়া ঘাট ইজারা নিয়েছেন। এই সমস্ত নেড়েচেড়ে দিব্যি কেটে যাবে। ছেলে দুটির কিছু করবার আবশ্যক হবে না। হেন অবস্থায় যদি পুরন্ধর পরকাল নিয়ে যেতে পারেন কারো কিছু বলবার নেই। হচ্ছেও তাই। সর্বক্ষণ শাস্ত্র গ্রন্থ ও পুজোআচ্চা নিয়ে পড়ে আছেন তিনি। সংসারে সকলের মধ্যে থেকেও পুরোপুরি অধ্যাত্মরাজ্যে বাস। আবার ঈশ্বরে যদি কখনো অরুচি আসে, মুহূর্তে সংসারে চলে পড়বেন, সে ব্যবস্থাও হাতের কাছে রয়েছে। শুধু বাকি চলে যাওয়ার জন্য ফটিক-বেহারার সঙ্গে শলাপরামর্শ—

নিরঞ্জন খিঁচিয়ে উঠল: এবারে যেতে হলে শ্মশান ছাড়া অন্য কোথাও নয়। তার জন্য ফটিক-বেহারাকে বলতে হয় না—চালিতে শুয়ে লোকের কাঁধে চেপে চলে যাবেন, চিতের উপর উঠবেন। আর হতে পারে ভস্ম যেখে বিবাগী হয়ে শ্মশানে গিয়ে ওঠা। তাতেও পালকি লাগেনা, পায়ে হেঁটে চলে যাবেন।

নীলমণির বাজে সন্দেহ নিঃশেষে উড়িয়ে দিয়ে এবারে আসল সমস্যায় আসে: বালিকা বিদ্যালয়ের বন্দোবস্ত সারা। মাস্টার ঠিক হয়ে গেছে। আপাতত এক মাস্টার ঐ কাজন: শৈল জেঠার মত পেয়েছি।

নীলমণি বলে, জায়গার ঠিক হয়েছে? চেয়ার-বেঞ্চি? মেয়ে যারা সব পড়তে আসবে?

হাত নেড়ে অবহেলার ভঙ্গিতে নিরঞ্জন বলে, আসবে সব পরে পরে। ঘোড়া হলে চাবুকে আটকায় না। আসলটাই হয়ে গেল—মেয়ে ইস্কুলের মেয়ে মাস্টার। সুজনপুর আর সব পাবে, মাথা খুঁড়ে বের করুক দিকি এক মেয়েমাস্টার।

নীলমণি মনের পুলক ধরে রাখতে পারছে না। দু-মাইল দূরের সুজনপুরে তখনই চলে যেতে চায়, বলে ওদের বাজারখোলায় বসে গল্প করে আসিগে। এ-বছর চাউস হয়ে যাবে। বিংসের হটফট করবে।

ওসব পরে হতে পারবে। না বললেও টের পেয়ে যাবে তারা মাথায় যে মস্ত দায় নিয়ে এলাম, সেই ভাবনা ভাববে নীলমণি। মাস্টারের মাইনে পনের টাকা। শৈল জেঠা চুক্তি করে নিয়ে তবে মত দিয়েছে—ওর থেকে সিকিপয়সা গ্রামসেবার চাঁদা বলে কাটা চলবে না। কাটতে চাও তো বিশটাকা মাইনে—পাঁচটাকা তাই থেকে চাঁদা বাবদে বাদ। বোঝ ঘড়েল কি রকম। নিরোগ আজ বলে—কাটা ঘুরতে লেগেছে শাস্ত্রকের তারিখ থেকে। মাস গেলে নীট পনের টাকা কোথায় পাওয়া যায় বল্।

ভেবে নিয়ে আবার বলে, শানু-দি আছেন—তাঁর কাছে কর্জ চাওয়া যায়। আর আমার নিজের আছে দু-বিঘে ধান জমি—

নীলমণি ঘাড় নেড়ে প্রবল আপত্তি করে: সাবজজ উকিল রায়সাহেব দুঃসময়ের এতসব রয়েছে—বিধবা বেওয়া মানুষের ঘাড়ে গিয়ে পড়া কেন? তোমার দু-বিঘে নিয়েই বা উদ্বেগ কিসের? কতবার কত ধার ঠেকাতে হবে—

উপায় বাতলা তবে?

জানে না নীলমণি—পাকা উপায় ইতিমধ্যেই বাতলে দেওয়া হয়ে গেছে। ঐ পুরন্দর উকিলমশায়ের বৃত্তান্ত। নিরঞ্জন কানে শিলনা, কিন্তু নিজ চোখে ফিসফিসানির রকমটা দেখে নীলমণির ভাল ঠেকছে না। সে তকে তকে আছে। প্রহর খানেক রাত্রে কটিক সর্দারের বাড়ি উঁকি দিয়ে দেখল, উঠানে পালকি। পালকি এমনি থাকে না, কোন খানে রওনা হবার মুখে ভাড়া করে নিয়ে আসে। না, ঘুমিয়ে পড়ে থাকলে হবে না—ব্যাপার সুনিশ্চিত এই রাত্রের মধ্যেই।

ঠিক তাই। শেষরাত্রে নীলমণি নিরঞ্জনের দরজায় এসে পড়ল শিগগির ওঠো নিরঞ্জন-দা। সর্বনাশ হল, মানুষ পালিয়ে যায়—

নিরঞ্জন লাফিয়ে উঠে বলে, বলিস কি রে?

দেখ গিয়ে বাঁশবাগানে চালিতে চেপে যাচ্ছে, না পালকি বেহারা হাঁকিয়ে?

বুড়োমানুষ তার এত বড় সম্ভ্রান্ত মানুষ, কী তাঁর ষড়যন্ত্র দেখ। কটিক-বেহারার সঙ্গে বন্দোবস্ত—পালকি এনে তারা নামিয়েছে বাড়িতে রশিখানেক দূরে বাঁশবাগানের অন্ধকারে। বাড়ির লোকে ঘুণাক্ষরে যাতে টের না পায়, টের পেলে বাগড়া দেবে। পুবের দিককার সর্বশেষ কামরায় তিনি তাঁর পুঁথিপত্র পুজোর সরঞ্জাম এবং ঠাকুরদেবতা নিয়ে নিরিবিলি থাকেন—বোঁচকা বেঁধে তৈরি হয়েছিলেন। কটিক এসে বোঁচকা মাথায় তুলে নিল, হনহন করে পুরন্দর তার পিছনে পিছু চললেন। এই অবস্থায় আবছা মতন দেখতে পেয়ে নীলমণি ছুটতে ছুটতে নিরঞ্জনের কাছে এসেছে। এমন হাঁকডাকের মানুষটা গ্রাম ছেড়ে চলে যান—আটকানোর ব্যবস্থা লহমার মধ্যে করে ফেলতে হবে।

সেই বাঁশতলা হয়েই দুজনে পুরন্দরের বাড়ি ছুটল। বাঁশবাগান ছেড়ে পালকি সেই মুহূর্তে মাঠের উপর নামল, মাঠ ধরে তীরের বেগে ছুটেছে। ব্যবস্থা সেই রকম। একদল ডাকাত যেন অমূল্য ধনসম্পত্তি বগলদাবায় পুরে রাত্রিবেলা ছুটে পালাচ্ছে।

পুরন্দরের উঠানে এসে সর্বপ্রথম নজরে পড়ল, পুবের কামরার খোলা দরজা হাঁ-হাঁ করছে। গলা কাটিয়ে তখন চিৎকার: ঘুঘোচ্ছ তোমরা অঘর-বিজয়! সর্বনাশ হয়েছে তোমাদের—উকিলমশায় বিবাগী হয়ে বেরিয়ে গেলেন।

পুরন্দরের দুই ছেলে অজয় আর বিজয়। তারা এবং বাড়ি সুদ্ধ ঘুম ভেঙে বেরিয়ে পড়েছে। পাড়ার মানুষও ছুটোছুটি করে আসছে। বিষম হৈ-চৈ, ভিন্ন গ্রহবাসীর মতো। গিন্নি অরক্ষণীয়া পুবের কামরার শূন্য খাটে কাঠের উপরে মাথা আছাড়াআছাড়ি করছেন: ওরে নিমকহারাম মানুষটা সারা জন্ম এত সেবা করলাম, মুখের কথাটাও বলে যাওয়ার পিত্যেশ হল না? কুলপুঞ্জির শিবদুর্গা কেবল তোমার আপন হল—তাদেরই বোঁচকায় ভরে নিয়ে চোরের মতন সরে পড়লে?

স্বামী-বিচ্ছেদের হা-হুতাশে সকলের চক্ষু সজল হয়ে ওঠে। ছোটছেলে বিজয় কেবল বাপের হয়ে কথা বলে: যথার্থ মহাপুরুষ মা, কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা। এমন করে বলতে নেই। ধর্মের নামে বুদ্ধদেব গৃহত্যাগ করেছিলেন, বাবাও করলেন। সংসার অসার—বুদ্ধদেব সেটা সোজাসুজিই ধরে ফেলেছিলেন। এঁর কিন্তু সময় লাগল, সর্বরকম যোগাযোগ হয়ে যাবার পর। এই মাত্র তফাত।

এত লোকের এত রকম বাদবিতণ্ডার মধ্যে মাথা ঠাণ্ডা কেবল নিরঞ্জনের। বিচার করছে: দশঘে মাঠ ভেঙে পালকি-বেহারা উত্তর মুখো চলল। যেতে পারে কোথায়? খুব সম্ভব দোমোহনীর ঘাটে। সেখানে নৌকো ঠিক করা আছে।—কে করে দেয় এসব? ঐ কটকে বেটা ছাড়া কে আবার? পলাপরামর্শ হচ্ছিল, নীলমণি দেখেছে। নৌকা দোমোহনী থেকে রেলস্টেশনে তুলে দেবে। রেলে একবার চড়তে পারলে দুনিয়া তখন পায়ের তলায়—খুড়ি চাকার তলায়। দাগরদ্বীপে গিয়ে তপস্যায় বসেন কিম্বা হিমালয়ের গুহায় চলে যান, কেউ আর তখন পাত্তা পাবে না।

এবিচার সকলেরই মনে ধরল।

নিরঞ্জন বলে, আমি আগে আগে ছুটলাম। গিয়ে সামলাইসে। বাগদুহু হতে থাকবে খানিক। দল জুটিয়ে তার মধ্যে তোমরা সব এসে পড়ো। দেরি হয় না যেন, খবরদার। দোমোহিনীর ঘাটে অনেক নৌকো, বিস্তর মাঝিমাল্লা। মাঝিতে মাঝিতে লাঠি থাকে, ঠেঙাড়ে

উঁচিয়ে সব একসঙ্গে দাঁড়াতে পারে। খালি হাতে কেউ যাবে না, লাঠি নিয়ে জোয়ানমরদ যত চলে এসো।

পাথুরে জোয়ান নিরঞ্জন নিজেই, গায়ে অসুরের বল। দোমোহনী পর্যন্ত একটানা দৌড়েছে, মুহূর্তকাল জিরোয়নি। পালকি অপেক্ষণ ঘাটে পৌঁছেছে, পুরঞ্জয় তখনো নৌকোর মধ্যে জুত বসতে পারেননি। এমনি সময় ঝড়ের বেগে নিরঞ্জন গিয়ে পড়ল।

গাছের সঙ্গে কাছি দিয়ে নৌকো বাঁধা। নিরঞ্জন ছুটে এসে সর্বাগ্রে সেই কাছি এঁটে ধরল: কার ক্ষমতা কাছি খুলতে আসবে, রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে তার আগে। পুরঞ্জয়ের দিকে কটমট চোখে তাকায়। গ্রাম ছেড়ে যে মানুষ চলে যেতে চায়, হোন না হাইকোর্টের উকিল, তাঁর সঙ্গে আর খাতির কিসের?

বলে, রাতে রাতে বেরুনো হল, দুবেসরের কেউ টের না পায়। এর নাম চোরাই বুত্তি—ধর্ম-ধর্ম করা হয় তবে কি জন্যে?

পালকি থেকে বোঁচকাবিড়ে দু-হাতে ঝুলিয়ে কটিক বেহারা এই সময়টা নৌকোয় তুলছিল। নিরঞ্জন ছুটে গিয়ে ঠাস করে তার গালে এক চড়। আবার এসে যথাপূর্ব কাছি ধরেছে।

পুরঞ্জয় গর্জন করে ওঠেন: এই নিরঞ্জন, বড় যে আস্পর্ধা! সর্দার বেহারার গালে তুই হাত তুললি। আমারই চোখের উপর। ফৌজদারির কারণ ঘটেছে শ্রীনিবাস আমি সাক্ষি দিয়ে তোকে জেলে পুরতে পারি।

নিরঞ্জনও সমান তেজে জবাব দেয়: এই বেটাই আসল সিঁধেল। দুবেসরের মানুষ রাতের বেলা চুপি-সারে সরাচ্ছে। এদের মারলে ফৌজদারি হয় না। সরাচ্ছে তা-ও আপনার মতো মানুষ—হাইকোর্টের উকিল বলে যাঁর জন্যে এত জাঁক আমাদের। আমি একলা কি—গ্রামবাসী যে হাতের মাথায় পাবে সেই তো ওকে ঠেঙাবে।

রক্তের মুলুক পেরেছে না? ঠেঙাক না বুকি কত বড় সব বাপের বেটা! আমি যেন অস্বাবর মাল, একজন কেউ এসে সরিয়ে নিচ্ছে। সংসারের নরকগুতে থাকব না, মনের ইচ্ছেয় সংসার ত্যাগ করে যাচ্ছি।

নিরঞ্জন বলে, তা পালকি না চড়ে বুকি সংসার-ত্যাগ হয় না? গাঁয়ের উপর অত বড় মহাশ্মশান—জটাজুট ধারণ করে ভস্ম মেখে সেখানে বসে কত কত মহাপাতকী তরে গেল। আপনার পাপ কত বেশি যে দেশ-দেশান্তর না ঘুরলে তার ক্ষয় হবে না?

বাগ্‌যুদ্ধে ইচ্ছে করেই লম্বা করছে। বলছে, আর পথের দিকে ব্যাকুল হয়ে তাকায়। আগে কই নীলমণি দলবল জুটিয়ে নিয়ে, কী করে এতক্ষণ ধরে? তর্কাতর্কি থামলে তখনই তো জোর-জবরদস্তির কথা উঠবে। নিরঞ্জন একা, আর ও-তরফে কটিকেরা আট জন আর দাড়ি-মাঝিও জন দুয়েক। ঘাটের অন্য নৌকোর কথা ছেড়ে দাও।

পুরঞ্জয় বলেন, যাচ্ছি কাশীধামে। ওরে মূর্খ, যাদের ভাড়ার পয়সা জোটে না গোঁয়ো-শ্মশানে পড়ে তারাই গুলতানি করে। কাশী হল শিবস্থান—চোখ বুঁজলেই শিবলোক প্রাপ্তি। জপতপ কিছু লাগে না—স্রেফ গঙ্গাস্নান, ক্ষীর-মালাই সাপটানো, আর হল বা দাঁতের বেলা বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা দর্শন।

নিরঞ্জন বলে, বেশ। গ্রাম কানা করে চলে যাচ্ছেন, ক্ষতি পূরিয়ে দিয়ে যান। তখন আর কিছু বলব না।

ভোর হয়ে আসে, মানুষজন এক্ষুনি জেগে পড়বে। আশান্বিত হয়ে পুরঞ্জয় বলেন, কি চাস তুই বল্ তাড়াতাড়ি নিয়ে নে। নিয়ে কাছি ছাড়। পরমার্থিক কাজে বাগড়া দিতে নেই। ঈশ্বর চটে যান।

নিরঞ্জন বলে, আমার জন্যে কি—আমার নিজের কিছু নয়। দুবেসর গাঁয়ের দাবি। হাইকোর্টের উকিল আছেন এমন কথা আর বলতে পারব না। তার বদলে বলব বালিকা-বিদ্যালয় আছে। সেই বিদ্যালয়ের সাহায্য দিয়ে যেতে হবে আপনাকে। নইলে ছাড়াছাড়ি নেই।

পুরঞ্জয় অবাক হয়ে বলেন, বালিকা-বিদ্যালয় আবার কোথায়? আমি তো জানিনে—

আছে ঠিকই। আপনাদের জানবার অবস্থায় আসেনি। মাস্টারনি নিযুক্ত হয়েছে—একদিনের মাইনে আট আনা পাওনাও হয়ে গেছে তার।

একটু ভেবে নিরঞ্জন বলে, খেয়াঘাটের যে নতুন ইজারা নিলেন, তার উপস্বত্ব বালিকা-বিদ্যালয়ে দান করে

যান। মাসে মাসে মাস্টারনির মাইনে, আরও দশ রকমের খরচখরচা অনেক খানি সম্ভুলান হয়ে যাবে। খেয়া-ঘাট ছিল না তো আগে, ধরে নিন এখনো নেই।

দু'-চু গোছের অস্পষ্ট আওয়াজ পুরঞ্জয়ের মুখে, মানে তার কিছুই দাঁড়ায় না। নিরঞ্জন রেগে গেল: এই সামান্য মুনাফাটা ছাড়তে পারেন না, আপনি আবার সংসার ছেড়ে ভগবান নিয়ে থাকবেন! ফিরে তো এলেন বলে। ট্রেনে রিটার্ন-টিকিট কাটবেন, গাড়িভাড়ার দায় হবে। কিন্তু আমিও বলে দিচ্ছি, সাহায্য দিলেন আর না-ই দিলেন, পুরঞ্জয় বালিকা-বিদ্যালয় আমাদের চলবেই।

পুরঞ্জয় বিরক্ত কণ্ঠে বলেন, আবার পুরঞ্জয় জুড়েছিল বিদ্যালয়ের সঙ্গে। নামে ঘুস দিয়ে টাকা নেওয়ার কিকির। তবে আর এক পয়সাও দিচ্ছিনে। লোকে বলবে নামের লোভে দিয়েছে। ভবসংসারে বিতৃষ্ণা, নামের লোভ কি দেখান আমায়! নাম তুলে দে, বিবেচনা করে দেখব।

নিরঞ্জন বলে, নামও থাকবে, পয়সাও বেরুবে—

কলহ রীতিমত। ভোর হয়ে গেছে, বাদুর হাম্বা-হাম্বা করে কাদের সোয়ালে। নিরঞ্জন কাছি দু-হাতে ধরে বীরমূর্তিতে দাঁড়িয়ে। সহসা কলরব কানে আসে—এসে পড়ছে এইবার দুঃসময়ের দল। আর নিরঞ্জনকে পায় কে? গলার জোর আরও চড়িয়ে বলে, পুরঞ্জয় জোড়া হয়েছে আপনার খাতিরে নয়, গ্রামের গরজে। পুরঞ্জয়টা কী কে হে—এদেশ-সেদেশের মানুষ জিজ্ঞাসা করবে। কিম্বা, হাইকোর্টের উকিল—দুঃসময়ের মানুষ। কারখানাটা কি রকম—বালিকা-বিদ্যালয় হল, সেই সঙ্গে হাইকোর্টের উকিলও খেকে গেল।

দলবল ঘাটে এসে পড়ল। পুরঞ্জয়ের দুই ছেলে তার মধ্যে এবং তাদের মা অজয়শ্রীলাও। মেয়েলোক বলতে একমাত্র তিনি। মোটা থলথলে শরীর—পাকা চুলের মধ্যে সিঁথি-ভরা সিঁদুর। এই মানুষের পক্ষে এত দূরপথ পায়ে হাঁটা—দুই ছেলে দু-পাশ দিয়ে মায়ের হাত ধরেছে, কি ভাবে চলে এসেছেন নিজেও বলতে পারবেন না এখন। বারো বছর বয়সের সময় শ্বশুরঘর করতে আসেন, সেই থেকে একত্র স্বামীর সঙ্গে। অন্তিম বয়সে সেই স্বামী গাঁটছড়া খুলছেন—এত সহজে হবে না সে জিনিস। নিতান্তই ঈশ্বরে যদি টেনে থাকেন, যথোচিত ব্যবস্থা করে তারপরে যেতে বলবেন। ছেলে আর বউয়ের হাত তোলা হবে থাকবেন না। এমনিই তো তিলার্ধ বনে না সেই আবাল্যের বৈরীর সঙ্গে। এই চেপে বসলেন নৌকোর খোপে, কে নড়াতে পারে অজয়শ্রীলাকে দেখা যাক।

নিরঞ্জন ওদিকে কাছি ধরে চেঁচাচ্ছে: পুরঞ্জয় বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্যে খেয়াঘাটের ইজারা। দুঃসময়ে এত দরের এক বাসিন্দা হারাচ্ছে, তার ক্ষতিপূরণ।

বজ্রছেলে অজয় কেটে কেটে বলে, দরের মানুষ রাত্তিরবেলা পোঁটলা নিয়ে চিপিচিপি পেরিয়ে পড়ে, এমন তো দেখিনি বাবা। ধর্ম কেবল মুখে মুখে, মনের বজ্জাতি বুদ্ধি ঠিক আছে। একগাড়ি ভূসম্পত্তি যিনি বন্দোবস্তে পড়ে রইল, আবার এই খেয়াঘাটের এক আবদার উঠেছে—যদি আমরা হালামা হুজ্জুত করে, মামলা করে লড় শেষে যাই।

বিজয়ও বাপকে ফেরাতে চায়, কিন্তু তার উল্টো সুর: খেয়াঘাটের ইজারা তুমি বাবা ইস্কুলের নামে লেখাপড়া দিয়ে তবে যেও। নয়তো হাঙ্গামা হুজ্জুত হতে পারে। এবং মাথার মধ্যে এখনো বুদ্ধের কথা ঘুরছে। অজয়ের দিকে ভ্রূকুটি করে বলে, বুদ্ধদেব তো কত বেশি ধরের মানুষ। তাঁর গৃহ-ত্যাগটাও ভাবো। তিনি কি দিনদুপুরে যাত্রামঙ্গল পড়ে বেরিয়েছিলেন?

অজয় খিঁচিয়ে ওঠে: এই একটা তুলনা হল নাকি? বুদ্ধের মাথার উপরে ছিলেন শুদ্ধোদন—আমাদের বাবার উপরে আর একটা বাবা এনে দাও তাহলে। ধর্মপথে যাচ্ছেন, তাতে কেউ নারাজ নয়। তার আগে ঘরের ব্যবস্থা হোক, বোন-ভাগনে-ভাগনিরা এসে পড়বে, তাদের কি দেবেন দিয়ে যান। বউটা প্রাণপাত সেবাযত্ন করে, সেও কি আর ছিটেফোঁটার প্রত্যাশী নয়? এর পর সকলে আমাদের সন্দেহ করবে—বলবে, পালা করে দু ভাই আমরা সমস্ত হেরে দিয়েছি।

দোমোহনী থেকে পুরঞ্জয়ের এবার হাটাপথে

ফিরতে চল। পালকিতে জবরদস্তা। বিষয়ী মানুষের বিবাগী হতে গেলেও কষ্টটা বিস্তর। তারপর অভ্যাসের যাবতীয় বস্তুর বিলি ব্যবস্থা ও লেখাপড়ায় অনেক দিন কাটল। নিরঞ্জন মাঝে মাঝে শালিয়ে যায়: খেয়াঘাট ঠিক আছে তো? ঘাট থেকে নইলে কিন্তু আবার ফিরতে হবে।

এই নিয়ে অভয় বিজয়ে বিরোধ। বিজয় বলে দিয়ে যাও বাবা সংকাজে। বালিকা বিদ্যালয়ের অন্তু-হাতে একটা শিক্ষিত মেয়ে গ্রামে থেকে যাবে। সেই আদর্শে আরও দশটা মেয়ের চাড় হবে। কাজ কর্ম না পেলে কলকাতায় ফিরে যাবে আবার—গ্রাম অন্ধকার।

অভয়ের ঘোরতর আপত্তি: বাচ্চার পর বাচ্চা এসে খরচ বাড়ছে না! এখন আমার—বিয়ে হলে বিজয়েরও আসবে। খেয়াঘাটের উপস্বত্বে হাটবাজারটা তবু চলবে। নাম দিয়েছে বাবা, সেই তো ঢের। আর কিছু দিতে হবে না, নাম ভাঙিয়ে যা পারে করে নিক।

কিন্তু নিরঞ্জনের দলকে বড় ভয়। খেয়াঘাট দিয়ে দিতে হল—নয়তো কাশীবাসের পথ আটকাবে। মাস খানেক পরে পুরঞ্জয় দিন দুপুরে সমারোহ করে সকলের চোখের উপর দিয়ে কাশীবাসে চললেন। অভয়পলা চোখ মুছতে মুছতে বলেন, যেতে লাগো, আমিও আসছি পিছন ধরে। বিজয়ের ধিরে ধিরে খানিকটা গুছিয়ে গাছিয়ে চলে যাবো। এখন গেলে বিনি পয়সায় কোন হাভ ভাবাতের মেয়ে নিয়ে আসবে। বড়বউয়ের হাড় জ্বালানো কথা শুনেও পড়ে আছি তাই। বাসা ঠিক গঙ্গার উপরে চাই—রথাম্বনের ঘাটের আশেপাশে। ঘর যেন উপরতলায় না হয়, সিঁড়ি ভাঙতে কষ্ট হয় আমার। গোছগাছ করতে লাগো গিয়ে, বছর খানেকের বেশী দেরি হবে না।

মাস্টারনির মাইনের জোগাড় হল, এবারে ঘর। বালিকা-বিদ্যালয় বসবে সেখানটা। নিরঞ্জন বলে, সাবজজ আছেন দুপুরে, ইঞ্জিনিয়ার আছেন, রায়সাহেব আছেন—আমাদের আবার ঘরের ভাবনা! বাইরে বাইরে চাকরি, বাড়িতে ইঁদুর-চামচিকের আড্ডা। চামচিকে তাড়িয়ে ইস্কুল বসাব।

সাবজজ বাবুর দরদালানটা আয়তনে দিব্যি বড়, রাস্তের পথে ভালো। খালি বাড়ির পাহারায় একজন গোমস্তা—নীলমণি সকাল সকাল খেয়ে ছিপ-সুতো নিয়ে তার কাছে হাজির: বিলের কুয়োয় পুঁটিমাছ টানে টানে উঠছে। চলুন যাই গোমস্তামশায়।

মাছ মারায় গোমস্তার বড় পুলক। কাজও নেই। ধানের ধরশুলে ভাগচাষীর কাছ থেকে হিসাবপত্র বুঝে ধান আদায় করা, বাকি সময় শুয়েবসে কাটানো। ছিপ নিয়ে নীলমণির সঙ্গে গোমস্তা বিলে বেরিয়ে পড়ল।

থালুই-ভরা মাছ নিয়ে সন্ধ্যাবেলা মহা স্ফূর্তিতে ফিরেছে। বাড়ির দরজায় এসে অবাক—সাইনবোর্ড ঝুলছে: পুরঞ্জয় বালিকা-বিদ্যালয়। এর বাড়ি তার বাড়ি থেকে বেঞ্চি-চেয়ার এনে দরদালান ভরে ফেলেছে।

কী সর্বনাশ!

নিরঞ্জন ভিতরেই ছিল, হাসি হাসি মুখে বেরিয়ে আসে: ভালোই তো হল। বিদ্যাস্থান—পুণ্যের কারখানা।

বাবু কিছু জানলেন না—আমায় যে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়াবেন: মাইনে দিয়ে রেখেছি কি পুঁটিমাছ ধরে বেড়ানোর জন্যে?

নিরঞ্জন বলে, বাবু কি সেই জলপাইগুড়ি বসে থেকে দেখবেন? আসেন যদি কখনো সাইনবোর্ড খুলে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারের বাড়ি লটকে দেবো। তিনিও যদি আসেন, রায়সাহেবের বাড়ি। দুবেলায় বাড়ির কি অভাব? যদি বলেন এখনই কেন যাইনি? বড়বড় আপদবের দরদালান, বিদ্যালয় একটা ঘরেই কুলিয়ে যাবে। ঐ সব বাড়ি দুটো তিনটে ঘর লেগে যায়। এক মাস্টারের পক্ষে অসুবিধা হবে।

গোমস্তা বলে, দুপুরে আমি ঘুমোই। কানের কাছে ভ্যাজোর ভ্যাজোর করবে—

নিরঞ্জন অভয় দেয়: বালিকা কোথায়—ভ্যাজোর-ভ্যাজোর করছে কে শুনি? ইঁদুরেও তো কিচকিচ

করে বেড়াব, তার বেশি গোল হবে না আমি কথা দিচ্ছি।

বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী, ঘর, চেয়ার-বেঞ্চি সবই হয়ে গেল—বাকি রইল বালিকা। ঘরের কাজ কামাই করে মেয়ে কেউ ইস্কুলে দিতে চায় না। সে থাক সে, ইস্কুল তো চলতে থাকুক—সুজনপুরের আক্কেলগুড়ুম হয়ে থাক। সরকারি সাহায্য মিচ্ছি নে যে ইনস্পেক্টর পরিদর্শনে এসে পড়বে, হাজিরা-বইয়ে বালিকা দেখাতে হবে। গুচ্ছের বালিকা নিয়ে হাট বসানোর মানে হয় না—কাজ চলুক, বালিকা ধীরে-সুস্থে জমবে।

কিন্তু বিপদ দাঁড়িয়েছে শিক্ষয়িত্রী কাঞ্চনকে নিয়ে। লেখাপড়া-জানা ডবকা মেয়েকে বিশ্বাস নেই—চালচলন অতিশয় সন্দেহজনক। চাকরি নিয়েছে, তারই ভরসায় ইস্কুল—ছটফটানি তবু কিন্তু গেল না। চিঠিপত্র সমানে চলেছে, পিওনমশায় বয়ে বয়ে নাজেহাল। আর উনিও তেমনি—পথের ধারে নালার জলে কিছু হাল্কা করে এলেই তো পারেন। এক এক সময় নিরঞ্জনের দুর্বার ইচ্ছা জাগে, ডাকাতি করে পিওন মশায়ের চিঠির থলি ছিনিয়ে নেয়—নিয়ে দেখে কী রহস্য কাঞ্চনের ঐসব চিঠিপত্রে। দুধসরের নিন্দেমন্দ যদি থাকে, চিঠির লেখিকা ও বন্ধু পিওন কাউকে রেহাই করবে না। কিন্তু পোস্টাপিস হল গবর্মেন্টের, পিওন-মশায় সরকারি লোক—হাঙ্গামা করার উপায় নেই।

দুধসরে পোস্টাপিস নেই, বসানোর চেষ্টাও হয়নি কখনো। এই একটা ব্যাপারে সুজনপুরের কাছে হার। সুজনপুর সাব পোস্টাপিসের অধীনস্থ দুধসর গ্রাম। হপ্তার মধ্যে রবি, মঙ্গল আর বিষ্যুদ্বারে দুধসরের হাট। হাটের নামডাক আছে, মাছ-তরকারি বেশ ভাল আমদানি হয়। পিওনমশায় অটল হালদার হাট করতে এসে চিঠি বিলি করেন ডাকবাক্সে যত চিঠি পড়ে, ব্যাগে ভরে নিয়ে যান—পরের দিনের ডাকে যাবে। এবং খাম-পোস্টকার্ড-টিকিটও হাটে বসে বিক্রি করেন মাছ-তরকারির মতো।

এই অটল হালদার আজকের মানুষ নন। চিরকাল ধরে এই নিয়মে চিঠি বিলি হয়ে আসছে। হাটের তিন দিন ভোরবেলা সুজনপুর থেকে বেরিয়ে পড়বেন। পথ তিন ক্রোশ, কিন্তু পৌঁছুতে বেলা দুপুর। সোজাসুজি এসে গেলেই হল না, পথের এধারে ওধারে গ্রামগুলো বিটের মধ্যে পড়ে। উভয় দিকে সারতে সারতে এলেন। দুপুরবেলাটা দুধসরে স্থিতি, গ্রামের মেয়েপুরুষ সকলে সম্ভ্রম করে। এক একদিন এক বাড়ি নেবা। আগের তারিখে বলে গেছেন, মঙ্গলবারে তোমাদের ওখানে। রাঁধাবাড়া সেরে গামছা তেলের বাটি সাজিয়ে সে বাড়ির লোক বসে আছে। আকাশে বরঞ্চ সূর্য ওঠার ভুল হতে পারে, কিন্তু অটল পিওন যথাকালে বাড়ির সামনে এসে হাঁক দেবেন: এসে গেছি বউমা। কারো যদি খেয়াল না থাকে—পিওনমশায়ের গলা শুনে মনে পড়ল, দুধসরের হাট আজকে, সন্ধ্যায় হাটে যেতে হবে। এখন পিওনমশায়ের একতিল সময় নষ্ট করার জো নেই—মাথায় এক খাবড়া তেল দিয়ে পুকুরে পড়ে ঝুপকুস করে ডুব সেরে, নাকে-মুখে চাট্টি ভাত গুঁজে এক ছুটে গিয়ে পাশায় বসে পড়া।

আশ্চর্য পাশা খেলেন পিওনমশায়। পিকলিকে রোগা মানুষটি, কিন্তু গলায় শঙ্খের আওয়াজ। হাঁক দিয়ে পাশায় দান চাপলেন—শুকনো হাড়ের বস্তু হয়েও পাশা বুঝি ভয় পেয়ে যায়। কচ্চে-বারো বললেন তো পাশা ঠিক তাই পড়েছে, ছ-তিন নয় বললেন তো তাই। দুধসরেও মুরুব্বি পাশুড়ে আছেন ক'জন, এক সঙ্গে তাঁদের জমে ভালো। হাটবারের দুপুরের জন্য উভয় পক্ষ মুকিয়ে থাকেন।

গাছের আগায় রোদ উঠেছে, আসন্ন সন্ধ্যা। পাশার ছক-গুটি তুলে ফেলে এইবারে হাটে রওনা। দস্তুর-মতো বড় হাট, অমন বিশখানা গাঁয়ের মানুষ এসে জোটে। হাটে এসে অটলপিওন সকলের আগে নিজের হাটবেসাতি সেরে নেন। তারপর এক দোকানের ভিতর জায়গা ঠিক করা আছে—ল্যাম্পো জেলে সেখানে বসে পড়লেন। চারিদিক থেকে লোক এসে ভিড় করে: আমাদের কি আছে দিয়ে দাও

পিওনমশায়। মোটা গ্রামের চিঠি অটল হালদার একজনের হাতে দিয়ে দিচ্ছেন। সে কিছু ভারী জিনিস নয়—কোন গ্রামে হয়তো দারুণো একখানা চিঠি, কোন গ্রামে কিছুই নেই। ঐ সঙ্গে খাম-পোস্ট-কার্ডও পাতান দিয়ে রেখেছেন, যার যা দরকার নিয়ে নিতে পারো। ডাক বিলি ও খাম-পোস্টকার্ড বিক্রির কাজ শেষ করে সাথী খুঁজে নিয়ে দারাদিনের পর অটলপিওন এবারে দুজনপুর ফিরলেন। সাথী বিস্তর, হাট করতে সব এসেছে, খামা-ভরতি হাট-বেসাতি কাঁধে হাতে নিয়ে লণ্ঠন ঝুলিয়ে দল বেঁধে গল্প করতে করতে সব যাচ্ছে। পিওনমশায়ও তার মধ্যে ভিড়ে যান।

দুবেলায় প্রথম এসেই কলকাতার পড়ুয়া মেয়ে কাঞ্চন ভ্রু কুঁচকে বলেছিল, কী জায়গা রে বাবা! খবরের-কাগজ আসে তিন দিনের বাসিপচা খবর নিয়ে। একখানা পোস্টকার্ড কিনবে তো কবে হাটবার হা-পিত্যেশ করে থাকো। এই গ্রাম নিয়ে আবার দেমাক! তবু ভাগ্য, হাট হপ্তায় একদিন না হয়ে তিন দিন।

এ হেন অপমানের বাক্যে নিরঞ্জনের রোখ চেপে উঠল: তবে তো লাগতে হয় রে নীলমণি। বাঘাডালকো মানুষ সব আছেন দুবেলার, অঙ্গুলি-হেলনে যাঁরা পোস্টাপিস তো পোস্টাপিস লাট সাহেবের বাড়ি তুলে এনে বসিয়ে দিতে পারেন।

পিওনমশায়ের কানে উঠে গেল। নিরঞ্জনকে বললেন, কী কথা শুনতে পাচ্ছি বাবা? দু'দান পাশা খেলে যাই, সেই পণে কাঁটা দিতে চাও?

দুবেলায় পোস্টাপিস হলে আপনার আসতে বাধা কিসের? এসে খেলবেন পাশা।

অটলপিওন বলেন, কাজকর্ম না থাকলে চাকরিতে কি জন্যে রাখবে? ছেলেও সেইটে চায়। সদরের উপর বাসা করে বউমাকে নিয়ে গেছে, বোনকে নিয়ে পড়াচ্ছে। বুড়োবুড়ি আমরা ভিটের দিন পিদিম দিচ্ছি, সেটা চক্ষুশূল ভাই-বোনের। তক্কেতক্কে আছে, নিয়ে তুলতে পারলে হয়। চাকরি নেই শুনলে একটা দিনও আর গাঁয়ে তিষ্ঠাতে দেবে না।

এ মানুষের সর্বত্র খাতির। কাকুতিমিনতি করছেন, নিরঞ্জন অতএব চেপে গেল। চল্লিশ বছর ধরে এক নিয়মে চিঠি বিলি হচ্ছে—লোকে বলে, অন্তত আরও চল্লিশটা বছর পিওনমশায় চালিয়ে যাবেন। কাঞ্চন যা-ই বলুক, সেই ক'টা বছর সবুর না করে গত্যন্তর নেই।

কিন্তু ক্রমশ অবস্থা যে রকম দাঁড়াচ্ছে, মত না বদলে বোধ হয় উপায় নেই। পোস্টাপিস হাতের মধ্যে চাই। দিনের পর দিন মেয়েটা অত কি চিঠি লেখে—চিঠিতে থাকেই বা কি।

একদিন ভালমানুষের ভাবে নীলমণি কথাটা জিজ্ঞাসা করল। অশিক্ষিত ন্যাকাবোকা মানুষটাকে তাচ্ছিল্য করে যদি কিছু ফাঁস করে।

নীলমণি বলল, অত চিঠি কাকে লেখো দিদিমণি? অত মানুষ তোমার চেনা?

কোঁস করে গভীর এক নিশ্বাস ফেলল কাঞ্চন: কলকাতায় আমার বসি যত মেয়ে, তার অন্তত অর্ধেকগুলো বন্ধু আমার। লেখাপড়া করেছি, তার দুনো তেদুনো হৈ-হল্লা করেছি। তোমাদের এখানে তো জেলখানা—রাতদিন শয়নে স্বপনে আমি কলকাতার কথা ভাবি। চিঠি লিখি তাদের। তারাও জবাব দেয়। আজে বাজে কথা—তাই লিখেই আনন্দ আমার। কলকাতা শহরে চিঠির মধ্য দিয়ে খানিকটা ঘোরা হয়ে যায়।

একটা চিঠি দৈবাৎ একদিন নীলমণির হাতে পড়ে পিওনমশায়ের কাছ থেকে, যেমন হয়ে থাকে, একগাদা নিয়ে কাঞ্চন বাড়ি ফিরছে। পড়তে পড়তে যাচ্ছে একটা। সে চিঠি শেষ করে খামের মধ্যে ভরে আর একটা খুলল। পড়া চিঠিটা অসাবধানে রাস্তায় পড়ে গেছে। পড়বি তো পড় নীলমণির চোখের সামনে। টুক করে তুলে নিয়ে নিরঞ্জনের কাছে চলে যায়: দেখতো কী সব লেখা—আমায় কাঞ্চন সত্যি না মিথ্যে বলেছিল।

পয়লা নজরেই তো ভাহা মিথ্যে একটা ধরা পড়ে। যে মানুষ লিখেছে তার নাম সমর—রাণীশঙ্করী লেনের নম্বর গুহ, খামের উপরেই প্রেরকের নাম-ঠিকানা। কলকাতায় যে অর্ধেকগুলো মেয়ে কাঞ্চনকে চিঠি দেয়, এই ব্যক্তি তার বাইরে। সদরে মেয়েরা পারদর্শিনী বটে,

কিন্তু নাম কারো লেখা হয় না। চার পৃষ্ঠা ঠাসাঠাসি করে লিখেছে—লেখককে নাগালের মধ্যে পাওয়ার জন্য নিরঞ্জনের হাত নিশপিশ করে।

নমুনা দু-চার ছত্র : কী করে যে তোমার বনবাসের ঠিকানা জোগাড় করেছি—পাকা ডিটেকটিভ খোল খেয়ে যাবে। তোমার মামার বাড়ি গিয়ে দেখি, নতুন ভাড়াটে। কেউ কিছু বলতে পারে না। উদাস হয়ে পথে পথে ঘুরি। পথ কোথা, মরুভূমির তপ্ত বালুকা। একটা মানুষ বিহনে শহর কলকাতা সাহারা হয়ে গেছে। শুধুমাত্র একটি মেয়ে আলো-ঝলমল এত বড় কলকাতা ফুৎকারে নিভিয়ে অন্ধকার করে দিতে পারে, সে আজ চোখে দেখছি। দৈবক্রমে মঞ্জুলাকে পেলাম, তাকে তুমি চিঠি দিয়েছ। মঞ্জুলা চিঠি পায়, অথচ আমি পাইনে। জীবন এক মুহূর্তে অর্থহীন হয়ে পড়ল। গঙ্গার পুলের উপর দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ভাবলাম। বিষম শীত পড়েছে, হিমেল হাওয়া। কনকনে জলে ঝাঁপ দেওয়া হল না, বাড়ি ফিরে এই চিঠি লিখছি। জবাব পাই কি না-পাই দেখি—

দুখলর চর্চক্ষে দেখেনি, তবু তাকে বন বলেছে। এখানে থাকা মানে বনবাস। আরও নানান নিন্দেমন্দ। পড়তে পড়তে নিরঞ্জনের হাত নিশপিশ করে—হাতের মাথায় পেলে দিত পাজি মানুষটার গালে মহাথাপ্পড় কষিয়ে। সেই যখন, মানুষটার চিঠির উপরে শোধ তোলে। ছিঁড়ে কুচিকুচি করে। যেন লক্ষ গুহরই হাত ছিঁড়ছে, পা ছিঁড়ছে। এমনিই সামাল দেওয়া যায় না কাঞ্চনকে, তার উপরে যদি উড়ুউড়ু করা এই সব চিঠি।

কাঞ্চন কি জবাব দেয় পরোয়া না করে নিরঞ্জন নিজেই এক জবাব লিখে ফেলল। উঁহু, নিরঞ্জন নয়—লিখছেন শৈলধর ঘোষ, কাঞ্চনমালার বাবা : আমার কন্যার নামে বারংবার চিঠি পাঠাইলে তোমার নামে ফৌজদারি সোপর্দ করিব। অধিকন্তু এখান হইতে একদল ঠ্যাঙাড়ে পাঠাইব, তাহারা তোমাকে বস্তাবন্দি করিয়া পুলের উপর হইতে গঙ্গার কনকনে জলে নিক্ষেপ করিবে। বুঝিয়া কার্য করিবে। ইতি। নিত্যাশীর্বাদক শ্রীশৈলধর ঘোষ।

এর পর প্রতি হাটবারে নিরঞ্জন কড়া নজর রাখে। বুড়ো মানুষটা হন্তদন্ত হয়ে এসে তেল মাখতে বসেছেন, কাঞ্চন সেই মুখে চিঠি নিতে আসে। কোন দিনই পিওন-মশায় বঞ্চিত করেন না—খাম-পোস্টকার্ডে দেবেন কতকগুলো। খামই বোধ—না জানি কত বিষ ভরতি হয়ে এসেছে ঐসব আঁটা-খামের ভিতরে। দূর থেকে নিরঞ্জন দেখে, আর রাগে গরগর করে। দোষ গবর্নমেন্টের—একপয়সা কি দুপয়সা খরচায় কাঁহা-কাঁহা মুলুকের বৃত্তান্ত। দোষ ঐ অটলপিওনের—চল্লিশ বছরের মধ্যে একটা হাটও বোধহয় কামাই নেই, পাখার নেশায় এসে ঘরে ঘরে সর্বনাশ বিলি করেন। পোড়া রোগপীড়া এমন বুড়ো পুথুড়ে মানুষটা চোখে দেখতে পায় না। গতিক যে রকম দাঁড়াচ্ছে, ক্রোধে জ্ঞান হারিয়ে নিরঞ্জনই হয়তো ঠাঁয়ে বাড়ি মেরে পিওনকে শয্যাশায়ী করবে উঠে যাতে না আসতে হয় কাঞ্চনের চিঠিপত্র পৌঁছে দেবার জন্য।

বড় একান্ত মনে চেয়ে ছিল বোধহয়। চৈত্রমাসের এক দুপুরে পথের উপর মাথা ঘুরে পড়ে পিওন মশায় সত্যি সত্যি শয্যাশায়ী। দিন সাতেক পড়ে থাকতে হল। ডাক তার জন্য বন্ধ থাকে না, চিঠি জমে জমে স্তূপাকার। ছেলে আর মেয়ে শহর থেকে অবিরত লিখছে : ভারি তো চাকরি তোমার—ইস্তফা দিয়ে চলে এসো। সারা জীবন ধরে তো খাটলে, আর কেন? অটল স্ত্রীকে বলেন, দেখ ব্যাপারটা। কারো সর্বনাশ, কারো পৌষমাস। ওরা ভেবেছে, এই মওকায় বাবাকে বাসায় নিয়ে তুলি। গরম আর কদ্দিন, বর্ষা তো পড়ে গেল বলে।

বর্ষাতেও বিপদ। চিঠি বিলি করতে করতে একদিন তিনি পা পিছলে কাদায় মধ্যে পড়লেন। এইবারে অটল বাবড়ে যাচ্ছেন—আগে কখনো এমনধারা হয়নি। অতিরিক্ত বুড়ো হয়ে গেছেন বোঝা যাচ্ছে, দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চিরজীবন ভূতের খাটনি খেটে এসে এবারে জবাব দিচ্ছে।—যে ক'দিন জীবন আছে, ঘরে পড়ে থাকতে হবে—এ-গ্রাম সে-গ্রাম করা যাবে না।

দেহে যদিই বা কুলায়, করতে দেবে না আর এরা।

ছেলে রামাদরাজ বাড়ি এসে বসেছে। সদরের হেড-অফিসে ছিল, তদ্বির করে সে এখন সুজনপুর সাব-অফিসের পোস্টমাস্টার। আর একটা বছর হলে মেয়েটা পাশ দিতে পারে, তাকে হস্টেলে দিয়ে এসেছে সেজন্য। কষ্টেসৃষ্টে বোনের খরচ চালাবে। বাপকেও এদিকে আর চিঠির ব্যাগ ঘাড়ে তুলতে দেবে না। অবসরের দরখাস্ত রামাল নিজেই লিখে বাপের সই নিয়ে পোস্টাল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অফিসে পাঠাল। চল্লিশ বছরের পর বিশ্রাম—ঘুরে বসে থাকা ছাড়া অটল রামদাসের অন্য কোন কাজ নেই। তবি জায়গায় এক ছোকরা পিওন বহাল হল। তাকে নিয়ে আর এক মুশকিল—ইংরেজি পড়তে পারে না। ইংরেজি ঠিকানা হলে এখানকার চিঠি ওখানে নিয়ে হাজির করবে। তবে ভরসা দিয়েছে এ অবস্থা থাকবে না। কাউণ্টারে কিনে মুখস্থ করতে লেগেছে, চাকরি পাকা হবার মধ্যেই ইংরেজি রপ্ত করে নেবে।

পিওনমশায় যখন হইলেন না তবে আর খাতিরটা কিসের? লাগাও পোস্টাপিস। প্রয়োজনও বটে—যে দর্শনেশে চিঠি নীলমণি এনে দেখাল। বালিকা-বিদ্যালয় হয়েছে, এর উপর পোস্টাপিস বসে গেলে সাবরে পাঁচ কিল। কি বলিস রে নীলমণি? সুজনপুরের তখন তো মুখ ঢেকে বেড়াতে হবে দুধসরের কাছে।

নিরঞ্জনের অতএব আহার-নিদ্রা নেই। কাকে ধরলে কি হয়, সর্বক্ষণ সেই তদ্বির। পোস্টাপিসের প্রয়োজন জানিয়ে দরখাস্ত লেখা হয়েছে—দুধসর এবং আরও মোটা পাঁচেক গ্রাম ঘুরে ঘুরে পাঁ'আনাই সই জোগাড় করল। বাঁ-হাতে রকমারি কাগজপত্র নিয়ে সেই আরও পাঁচজনের দাওয়ানো গেল। দরখাস্ত চলে গেল উপরে। আশা পাওয়া গেল অলোইয়ের সোজা থেকেই মুখুজ্জে পোস্টাপিস।

এই বারে সকলের বড় বিপদ। সরকারে টাকা জমা দিতে হবে। দশ টাকা বিশ টাকা নয়, বহুরমতো মোটা অঙ্ক। লোকের দরখাস্তের উপর পোস্টাপিস বসানো যদি দেখা যায় লোকসান হচ্ছে, পোস্টাপিস তুলে দিয়ে জমা টাকা থেকে খরচখরচা কেটে নেবে। চালু হয়ে গেল তো দস্তুর টাকা ফেরত পাবে কোন একদিন।

গাঁয়ের লোকে কী আর দিতে পারে! তা-বড় বড় সৌখিনেরা সব বাইরে। নিরঞ্জন অতএব গায়ে জামা পায়ে জুতো হাতে ছাতা এবং মনিব্যাগে কলকাতার ট্রেনভাড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

কলকাতায় বেণুধরের মেসে গিয়ে উঠল। কাকনের বড় ভাই বেণু। মামার বাসায় যাওয়ার আগে নিরঞ্জনের সেরা সাগরেদ ছিল সে। বেণুধরের চেয়ে বেশী জোরের জায়গা আর কোথা?

সন্ধ্যাবেলা। অফিস থেকে ফিরে বেণু নিচের তলার স্যাঁতসেতে আধ-অন্ধকার ঘরে সিটের উপর বসে তেলমুড়ি খাচ্ছিল। নিরঞ্জনকে দেখে কলরব করে ওঠে: কী কাণ্ড, তুমি যে বড় কলকাতায়! গ্রাম ছেড়ে চলে এলে।

জুতোর উদ্দেশে হাঁক পাড়ছে: আমার ছাতা এনেছে, কাটলেট কচুরি আর রসগোল্লা নিয়ে আয়। ছুটে চলে যা। আর কি আনবে বলে দাও নিরঞ্জন-দা।

নিরঞ্জন খিঁচিয়ে ওঠে: আমি যেন মফস্বলের দেশ থেকে এলাম। বলতে ঘলতি নে, কেমন আছ ভাল আছি সে সব নয়, পথের উপর থেকেই কাটলেট—

বেণুও সমান তেজে বলে, তুমি যেন বাইরের মানুষ—পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়ে বসতে বলব! কেমন আছ, সে তো চোখেই দেখতে পাচ্ছি। আমি ভাল আছি, সে-ও দেখছ। অন্য সকলের কথা—আজকেই কাকনের চিঠি পেলাম। তোমার কাছে আলাদা করে কি শুনতে যাব?

বাইরের মানুষ না-ই যদি ভাববি, কাটলেট-কচুরির হুকুম কেন দিলি রে হতভাগা? তেল-মুড়ি আমার যেন মুখে ওঠে না। মুড়ি যা কাটলেট—কোনটা খেয়ে থাকি আমি? আসুক না তোদের চাকর, সঙ্গে সঙ্গে ছুঁড়ে ফেলব।

বেণু হেসে উঠল: ভাল হবে, আমি খেয়ে নেবো। মুড়ি খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে গেছে, ভাল জিনিসে লোভ হয়। কিন্তু বিবেক বাগড়া দিয়ে পড়ে: ওরে বেণুধর তোর বুড়ো বাপের এত কষ্ট, সোমত্ত বোনটার বিয়ে দিতে পারলি নে, তুই এখানে কাটলেট ওড়াচ্ছিস? আজকে অজুহাত আছে: দাদার জন্যে এনেছিলাম, না খেলে কি করব? পয়সার জিনিস ফেলে তো দেওয়া যায় না।

পরক্ষণে বলে, কাজের কথা হোক নিরঞ্জন-দা যিনি কাজে গ্রাম ছেড়ে আসার মানুষ তুমি নও। বলো।

নড়ে চড়ে চৌপায়ার উপর বেণু ভাল হয়ে বসল। নিরঞ্জন বলে, পোস্টাপিস হবে।

কাকও সেই রকম লিখছে। পিওনদাদার হিটারার করে চিঠির খুব গোলমাল হচ্ছে নাকি।

নিরঞ্জন রাগ করে বলে, চুলোয় যাক চিঠি। চিঠির জন্যে পোস্টাপিস নাকি? তোর বোন চিঠি লেখে না লেখে, ঘরে লেখে আমার। না লেখে বরঞ্চ ভালো। দুখনপুরের কাছে হেঁটিয়াখা হয়ে ছিলাম, এখিনে তার সুরোহা হচ্ছে। সাব-জজ আছেন রায়-সাহেব আছেন, ইঞ্জিনিয়ার আছেন—পোস্টাপিস দিয়ে আমাদের পক্ষে। তাঁদেরই কাছে যাবো বলে বেরিয়েছি। চাঁদা দেবেন—আর আছে চিঠির ব্যাপার। এমনি চিঠির গরজ নেই, কিন্তু বছরের মধ্যে দু-বার উপর থেকে চিঠি পুলিস করে—গাঁয়ের যে যেখানে থাকে, ঘরদোর সেই সময়টা চিঠি লিখবে।

কথার মাঝে বেণু একতরে বলে ওঠে, আমি সাব-জজ নই, ইঞ্জিনিয়ারও নই, পুঁচকে কেরানি। আমার তাই বুঝি চাঁদার কথা বললে না?

নিরঞ্জন বলে, বলা কি ফুরিয়ে গেল? দুখনের বাছিটা অবধি চাঁদা দেবে। কারো রেহাই নেই।

হাত বাড়িয়ে বলল, দে। তোর থেকেই চাঁদার বউনি হোক।

পুলকিত বেণু তাড়াতাড়ি বাক্স খুলে একখানা দশ-টাকার নোট নিরঞ্জনের হাতে দিল। নিরঞ্জন গর্জন করে ওঠে: দেখ, চাল দেখাতে আসবি নে। বাইরে যা পাস আমার জানা আছে।

বেণু জবাব দেয়, বাইরে কম, খরচা যে আরও কম। কাকনের কলেজের বাইরে দিতে হত, উল্টে সে-ই এখন রোজগার করে দিচ্ছে। বাবার হাত খরচা একমাস দু'মাস না পাঠাতে পারলেও বিনা আপিসে তিনি থাকবেন না।

তাই বলে দশ? দশটাকা চাঁদার খুশি মানুষ তুই?

এবারে বেণুর রেগে গেছে। কল করে নোট ঢিবিয়ে দিয়ে বাক্স খুলছে রেখে দেবার জন্য। বলে, অত কথার কি! আমি সামান্য মানুষ—গ্রাম আমার নয় পোস্টাপিসও নয়। আমি কেউ নই তোমাদের। একটা পয়সাও দিচ্ছি নে, হল তো?

অভিমানে বেণুর গলা ধরধর করে। নিরঞ্জন নরম হয়ে বলে, থাকলে, আধাআধিতে রফা হয়ে যাক—পাঁচ টাকা। বলি আমার একটা খাতির রাখবি তো!

ব্যথিত কণ্ঠে নিরঞ্জন আবার বলে, বিকালে এসে তেল-মুড়ি খেতিস, তাও বন্ধ হয়ে গেল। থাকলে, পুরনো যে যখন—

বেণু হেসে বলে, মুড়িওয়ালী বার দেয়। দায় দু-বার পরে দিলেও কিছু বলবে না। লম্বা পাড়ির মতলব যে তোমার, যাবে সাবজজ-সাহেব অবধি—

নিরঞ্জনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে মানিব্যাগ বের করে ফেলে। নিরঞ্জন চীৎকার করে: করিস কি, আমার ব্যাগে তোর কি দরকার?

ব্যাগ খুলে ততক্ষণে বেণু উপুড় করে ফেলেছে। একটাকা আর সোটা কতক পয়সা। হেসে উঠে বলে, কী রাজভাণ্ডার নিয়ে বেরিয়েছ সে তো জানা আছে আমার। টাকা দেবো না তো কি পায়ে হেঁটে যাবে সাবজজ-সাহেবের জলপাইগুড়ি অবধি?

দুখনদর গ্রামের পৌঁছয় সাবজজ-সাহেবের বাসাবাড়ি। সেলেই দেখা হয় না এসব মানুষের সঙ্গে, আসতে মাস-মাস ও প্রয়োজন লিখে অপেক্ষা করতে হয়। নিরঞ্জন দুখনদর বারটা খুব বড় করে লিখল। আরদালিকে বলে, নিয়ে যাও তো দেখি। এতেই হবে। গাঁয়ের নাম করে বছরের পর বছর বিজয়ার প্রণাম করে পাঠাচ্ছি—

মনের চাঞ্চল্য বসতে পারে না। ঘণ্টা দুই পরে ট্রেন, সেই ট্রেনে ফিরবে। অনেক কাজ, ফিরতি পথে তিন-চার জায়গায় নামবে। সাহেবগঞ্জে তো নিশ্চয়ই। রেলের কোয়ার্টারে থাকে তিন তিনজন—সামান্য লোক, তারা তবু গ্রামবাসী তো বটে। কেউ যদি পড়ে গেলে দুঃখ করবে পরে যখন দেখা হবে। ঐ বেণুধরের মতো।

আরদালি বেরিয়ে এলে নিরঞ্জন বলে, কি হল?

সাহেব কাজে ব্যস্ত। স্লিপ রেখে এসেছি, দেরি হবে। আপনি বসুন।

বসে গেছে নিরঞ্জনের বসতে। দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে গেল। চোখ তুলে সাবজজ সাহেব উচ্চকণ্ঠে বলে, কি চাও।

পোস্টাপিসের চাঁদা। দুধেসর থেকে আসছি। কী আশ্চর্য, আমায় যা-ই বা চিনলেন, নিজের গ্রামটা চিনবেন।

প্রণাম করবে, কিন্তু টেবিল ও সেলফের ব্যূহ ভেদ করে সাহেব অবধি পৌঁছানো বড় শক্ত। ফলাও করে পরিচয় দিচ্ছে: আমি নিরঞ্জন। কি বছর বিজয়ার পর চিঠি পেয়ে আসছেন। সেই মানুষটা আমি। আপনাকে নিয়ে দুধেসর গাঁয়ের কত দেমাক। সেই গাঁয়ের কাজ নিয়ে এসেছি।

বক বক করে নিরঞ্জন বলে চলেছে। সাবজজ ঘাড় গুঁজে পাতার পর পাতা লিখে চলেছেন—খুব সম্ভব এজলাসের কোন নামলার রায়। নিরঞ্জনের কথা দুটো কানে যায়, পাঁচটা যায় না। নিঃশব্দ শ্রোতা পেয়ে নিরঞ্জনের ভারি স্ফূর্তি, অনর্গল বলে যাচ্ছে। সাবজজ ইঞ্জিনিয়ার রায়সাহেব ইত্যাদি বাদিন্দা যে গাঁয়ের, তার সঙ্গে সুজনপুর পারবে কেমন করে? শেষ যায় হচ্ছে এইবারে, এই পোস্টাপিস।

আরও খানিক পরে চেয়ার ছেড়ে উঠে সাবজজ-সাহেব ভিতরে চললেন। নিরঞ্জন বলে, টাকাটা তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেবেন। বসে রইলাম। দুপুরের গাড়িতেই রওনা হবো। অনেক জায়গায় যেতে হবে তো—যাঁর কাছে না যাবো তিনিই চটে যাবেন: দেখেছ, আমায় হেলা করল, আমি যেন কেউ নই গ্রামের।

সাবজজ সাহেব কিন্তু দুধেসর গ্রাম কিছুতে মনে করতে পারছেন না। মা বেঁচে আছেন, একেবারে থুনথুনে বুড়ি। তাঁর কাছে গিয়ে বলেন, পল্লীগ্রামে কবে নাকি আমাদের বাড়ি ছিল, তুমি কিছু বলতে পারো মা? গিয়েছ সেখানে? সেই ঘাড়ধাড়া জায়গা থেকে চাঁদার জন্য চলে এসেছে—বোঝ একবার। বারো-য়ারিপুজোর চাঁদা থিয়েটারের চাঁদা দরিদ্রভাণ্ডারের চাঁদা নেয়, পোস্টাপিসের চাঁদা কখনো তো শুনিনি।

মা উদার ভাবে বললেন, পিরথিম-জোড়া নাম করে ফেলেছ, তোমার নাম শুনেই এত দূরে এসে পড়ল দাও কিছু এখন এসে ধরেছে। না হয় অপাত্রেই যাবে। দুঃসময়ে আমিও কখনো যাই নি, আমার শাশুড়ি থাকতেন শুনেছি। তোমার পিতৃপুরুষের গাঁ থেকে এসেছে—অত শত বিচার না-ই করলে। দিয়ে দাও দুটো টাকা।

সাবজজ-সাহেব মায়ের কথার আবার গিয়ে নিরঞ্জনকে দর্শন দিলেন। পৃথিবী-জোড়া নাম হয়ে বিপদ হয়েছে—দুটো টাকা হাতে করে দিতে শরম লাগল। পাঁচটাকার নোট দিয়ে দিলেন একটা। সে কথা বললেনও তিনি খুলেও মা দু-টাকা দিতে বললেন, কিন্তু গাড়িভাড়া করে তুমি অত দূরের জায়গা থেকে এসেছ—

কাজ করতে বেরিয়ে কিছুতে নিরঞ্জনের রাগ হয় না। সকৌতুকে বলে, সেই গাড়িভাড়াটা কত বলুন তো—

সাবজজ বলেন, আমরা কাস্টক্লাশে যাই, তোমাদের ক্লাসের ভাড়া কেমন করে বলি।

তর্কাতর্কি না করে টাকা পাঁচটা মনিব্যাগে ভরে নিরঞ্জন উঠে পড়ল এরপর কলকাতা ফিরে বেণুধরের মেসে এই প্রসঙ্গ উঠেছিল। বেণু বলল, টাকা মুখের উপর ছুঁড়ে বেরিয়ে এলে না কেন নিরঞ্জন-দা।

নিরঞ্জন বলে, তাঁর কিছু লোকসান ছিল না। বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে খুঁটে নিয়ে তুলে পেড়ে রাখতেন। মুশকিল আমারই হত—বিনা টিকিটে গাড়ীচেপে পথের মাঝ-খানে হয়তো নামিয়ে দিত। সাহেবগঞ্জে পৌঁছতেই কত দিন লেগে যেত ঠিক ঠিকানাতেই। ওদিকে জুলাইয়ের গোড়ায় পোস্টাপিস বসাব, সাব্যস্ত করে বেরিয়েছি।

সাবজজ-ইঞ্জিনিয়ার-কানুনগো এবং কেরানি-মাস্টার-মোটর-ড্রাইভার—চাঁদার জন্য বড়-ছোট বিস্তর জায়গায় ঘোরাঘুরি করে নিরঞ্জনের এবারে বুঝি খানিকটা দিব্যজ্ঞান লাভ হয়েছে। বেণুধরের মেসে দু-দুটো দিন বকল সামলাতে গেল। তিন সিটের ঘর—শনিবার বলে অপর দুই মেম্বার অফিস অন্তে সরাসরি দেশের বাড়ি চলে গেছে। পাশাপাশি দুই চৌপায়ায় দু-জনা। থেকে থেকে ধরজার খিল দিয়েছে।

এত বক বক করে বেণু, সন্ধ্যা থেকে আজ কথাবার্তা যেন গমে গমে বলছে। যে কটি কথা নিতান্ত নইলে নয়।

নিরঞ্জন বলে, বল কি তোর?

ধরেছ ঠিক নিরঞ্জন-দা। মন বড় খারাপ। বাবা গালমন্দ করে চিঠি দিয়েছেন। চিঠি যখনই দেন, তার মধ্যে গালি। আজকে একেবারে যাচ্ছেতাই করে লিখেছেন।

নিরঞ্জন অবাক হয়ে বলে, তোর মতন ছেলে হাজারে একটা হয় না। কোন হুতোম তোকে গালি দেন শুনি।

কাঞ্চনের বিয়ের কিছু করতে পারছি নে।

একটু থেমে আহত স্বরে বেণু বলতে লাগল, কী আমার রোজগার তুমি জানো সেটা। বাবারও অজানা নেই। মেয়ের বিয়ের মরশুম খরচ, অত টাকা পাই কোথা আমি।

নিরঞ্জন লজ্জিত হয়ে বলে, পেলেও দিবিনে বিয়ে। গাঁয়ের ঐ এক শিক্ষিত মেয়ে—আমাদের শিবরাত্তির সলতে। বিয়ে হয়ে ভাংড্যাং করে বরের ঘরে যাবে। এত কষ্টের বালিকা বিদ্যালয় সঙ্গে সঙ্গে উঠে যাবে মাস্টার বিহনে।

তাই বলে বোন আমার বিশ্রি হয়ে বেড়াবে ঐ রকম?

আলবৎ। দুশবছরের খাতিরে। শিক্ষিত মেয়ে আর একটা জুটে যাক, বিয়ের কথা তারপরে। আর হতে পারে, গাঁয়ের মধ্যে যদি পাত্র পাওয়া যায়। বিজয়ের সঙ্গেই তো দিতে পারিস হাইকোর্টের উকিল পুরন্দর সরকারের ছেলে, যার নামে আমাদের বালিকা-বিদ্যালয়!

বেণুধর বলে, বাবার কোঁক তো বিজয়ের উপরেই কিন্তু খাঁই বিস্তর—আমায় দশবার বিক্রি করলেও হবে না। সিঁড়ি ঠাকরুণ ওতপেতে রয়েছেন, পনের টাকা বাড়িয়ে নিয়ে তবে বউ ঘরে তুলবেন। টাকা থাকলেও কিন্তু অমন চশমখোরের ঘরে আমি বোনের বিয়ে দিতাম না। কাঞ্চন ওদের কাছে সুখী হবে না।

চুপ করে একটু খানি ভেবে নিয়ে আবার বলে একটা কথা বলি নিরঞ্জন-দা। হাসতে পারবে না কিন্তু।

হাসব না।

রাগ করতেও পারবে না। কথা দাও।

আচ্ছা, রাগ করব না।

কাঞ্চনকে তুমিই বিয়ে করো নিরঞ্জন-দা—

নিরঞ্জন বলে, তোকে ঠেঙাবো। হাসি নয়, রাগও নয়—এর অদ্ভুত হল ঠেঙানো।

বেণুও সমান তেজে বলে, অন্যায় কিছু বলিনি। বয়স হয়েছে, বিয়ে কেন করবে না শুনি? কাঞ্চনের বড়ভাই হিসাবে আমি মত দিয়ে দিচ্ছি। আমি জোর করে বললে বাবার অমত হবে না। আর কাঞ্চনও যাতে রাজি হয়ে যায়, আমি তার ব্যবস্থা করব। সে আমার অবুঝ বোন নয়।

নিরঞ্জন রাগ করে বলে, আমি রাজি নাই—

কেন, মেয়ে কি খারাপ? চোখের উপর এতদিন ধরে দেখছ, কি দোষ পেয়েছ বলো।

আমি চোখে ধরতে পারিনি, কিন্তু মারাত্মক দোষ আছে ঠিক—নয়তো তোদের বিধ নজর কেন এত? নয়তো গলায় পাথর বেঁধে ডুবিয়ে মারবার ষড়যন্ত্র কিজন্যে? কাঞ্চনের পাশে আমি বর হয়ে দাঁড়াব, গলায় পাথর বাঁধা ছাড়া কী সেটা?

বেণু কানেই নেয় না। বিনয় বশে লোকে নিজেকে ছোট করে বলে, নিরঞ্জনের কথা যেন তাই। আগের সুরেই বেণু বলে যাচ্ছে, বিয়ে হলে তোমার বালিকা-বিদ্যালয় নিয়েও চিরকালের মতো নিশ্চিন্ত। মাইনে দাও আর না দাও, বিদ্যালয়ের মাস্টারনী হাতছাড়া হবার ভো নেই।

নিরঞ্জন বলে, আমার সঙ্গে যদি বিয়ে দিবি বোনকে লেখাপড়া তবে কেন শেখাতে দিলি রে হতভাগা? ঐ মেয়ে বিয়ে করতে হলে ওর উপর নিয়ে যেতে হবে। দুটো পাশ করে বসে আছে, ওর যে বর হবে, তিনটে পাশ চাই অন্তত তার।

হেসে উঠে বলে, আজ থেকেই যদি লেগে যাই, তিন পাশে পৌঁছুতে চুল পেকে যাবে দাঁত পড়ে যাবে আমার। এই জন্মে তোর বোনাই হবার উপায় নেই। তার চেয়ে তুই বরঞ্চ একটা বিয়ে করে ফেল বেণু—

বেণু হেসে বলে, বলেছ ভালো। সেয়ানা বোনের বিয়ে হচ্ছে না, নিজের বিয়ের পুলক—কেপে

গিয়েছি লোকে বলবে। তখন আর বাবা চিঠির উপরে নয়—লাঠি হাতে আমার মেসে তেড়ে আসবে।

নিরঞ্জন বলে যাচ্ছে, দুটো পাসেরও কোন দরকার নেই, একটা পাসওয়ালা মেয়ে দেখে বিয়ে করে ফেল তুই। বিয়ে করে দুধসর পাঠাবি—সঙ্গে সঙ্গে বালিকা-বিদ্যালয়ের চাকরি। বিয়ে হয়ে কাঞ্চন তারপর হিলিদিলি যেখানে খুশি চলে যাক, তাকিয়েও দেখব না। তাকে আর গরজ নেই তখন।

সকৌতুকে বেণুধর বলে, তোমাদের গরজ না-ই থাকল হিলিদিলি বিয়ে যাবার মানুষটা পাচ্ছি কোথা? কে বিয়ে করছে?

আছে কত মানুষ! জলে পড়ে; আগুনে পোড়ে। এই কলকাতা শহরেই কত পড়ে আছে, খোঁজ নিয়ে দেখিস তখন। পোস্টাপিস ভালোয় ভালোয় হয়ে যাক, আমিও খোঁজ দিতে পারব।

চকিতে একটু ভেবে নিয়ে নিরঞ্জন আবার বলে, মাইনর-ইস্কুলের হেডমাস্টার মশায় কাজ ছেড়ে দেবেন বলছেন। বয়স হয়েছে, পেরেও ওঠেন না। উপযুক্ত হেডমাস্টার কেউ এসে কাঞ্চনকে বিয়ে করুক না কেন। বিয়ে করে দুধসরে থাকবে। মাইনর-ইস্কুল বালিকা-বিদ্যালয় দুটো ব্যাপারেই নিশ্চিন্ত। আচ্ছা, রানী-পঙ্করী লেন কোথায় কতদূরে ভাল করে বুঝিয়ে দে দিকি আমায়।

ঐ মতলব এখন মাথায় পাক দিচ্ছে! রাতটুকু পোহাতে যা দেরি। খুঁজে খুঁজে নিরঞ্জন অবশেষে রানীপঙ্করী লেনে সমর গুহর বাড়ি বের করল। চাকর দেখিয়ে দিল: ঐ যে দাদাবাবু। ইনিয়ে বিনিয়ে এই ছোকরা কাঞ্চনকে প্রেমের চিঠি লেখে। বেশ, হোক তবে প্রেমের পরীক্ষা।

চা ও সিগারেট সহ গুলতানি হচ্ছে সমবয়সি পাঁচ ছ'জন মিলে। অকুতোভয়ে নিরঞ্জন তার মধ্যে ঢুকে পড়ল।

বিরক্ত দৃষ্টি তুলে সমর বলে, কাকে চাই আপনার।

আপনাকেই। আড়ালে বলব।

সমর উঠে বাইরে এলো: কি?

একমুখ হেসে নিরঞ্জন বলে, চাকরির খবর নিয়ে এসেছি।

সমর বলে, আমি যে চাকরির জন্য উতলা হয়ে আছি, এ খবর আপনাকে কে দিয়েছে?

নিরঞ্জন সেকথায় ভ্রূক্ষেপ না করে বলে, দুধসর এণ্ড-ই ইস্কুলে হেডমাস্টারি।

আচ্ছা মানুষ তো মশায়? উপকার না করে কিছুতেই ছাড়বেন না? ইস্কুল-মাস্টারি আমি করব না।

কিছু থামতে গিয়ে নিরঞ্জন বলে, খেয়াল করেননি বোধহয়—জায়গাটা হল দুধসর।

দুধসর হোক আর দইকীর হোক, কলকাতা ছেড়ে একপা আমি কোথাও যাচ্ছিনে।

তিতবিরক্ত হয়ে নিরঞ্জন ফিরল। পচুরে প্রেমের এই নমুনা। বিরহে জ্বলে কাঁপ দিয়ে মরবে, কিন্তু সেটা কলকাতার গঙ্গার শহরের সীমানার বাইরে নয়।

আরও ক'দিন এখানে সেখানে ঘুরে নিরঞ্জন দুধসর ফিরল। ঘোরাঘুরি সার। চাঁদা যা উঠেছে, ট্রেন ভাড়াতেই খেয়ে গেল।

নীলমণি পুষ্করুষে বলে, টাকা জমা দেবার তারিখও তো এসে গেল। এখন উপায়?

উপায় মানু দি। ক-দিন ধরেই ভাবছি। বাইরের মানুষ বিস্তর নেড়েচেড়ে দেখে এলাম। গাঁয়েও বড় ইতরবিশেষ হবে না। মানুষ দেবার সই দিয়েছে, পোস্টাপিস চাই তাদের। পয়সা চাইতে যা, তখন আর কানেই শুনতে পাবে না তারা। যত ভাবছি, মানু-দি ছাড়া অন্য কাউকে মনে পড়ে না।

নীলমণি বলে, দুটাকা পাঁচ টাকার তেজারতি মানুদির—অত টাকা দিতে যাচ্ছেন উনি। পাবেনই বা কোথা।

দেবেন কি আর উনি? আমাদের দরকার—সেতে হবে কায়দাকানুন করে।

সেই কায়দাকানুনের আন্দাজ পেয়ে নীলমণি শিউরে উঠল। সকাতরে বলে, বিধবা বেওয়া মানুষ—তোমার জন্যে কিনা করেন নিরঞ্জন দা। ওঁকে বাদ দাও।

চটে গিয়ে নিরঞ্জন বলে, কুলে এসে ভরাডুবি হোক, সেইটে চাস তুই? বাদ দেবো বলেই তো দেশদেশান্তরে বেরিয়েছিলাম। বড় বড় মানুষ দেখে এলাম—মাথা নিয়ে

চাকা বাজাতেই ভালো। কাজে আসে না, তারা কথার সরবরাহ দিতে পারে শুধু।

পরক্ষণে দাদুনা দেয় নীলমণিকে: সানুদি'র টাকা যারা খাবে না পোস্টাপিস চালু হলেই তো জমা টাকা ফেরত দিয়ে দেবে। চালু না হয়ে যাবে কোথা? কোন দিন আমরা ঠেকেছি, বল্ নীলমণি?

নীলমণিও জোর দিয়ে বলে, চালু হবেই। এতখানি এগিয়ে এসে পোস্টাপিস যদি না হয়, সুজনপুরের লোক ঠাট্টা তামাসা করবে হতেই হবে চালু।

সানু-দি অনেক কাল থেকে নিরঞ্জনের সংসারে। বিধবা হয়ে শ্বশুরবাড়ি টিকতে পারছিল না। নিরঞ্জনের মা তখন আশ্রয় দিয়েছিলেন। আত্মীয় সম্পর্ক আছে কি না আছে, কিন্তু মেয়ে পরিচয় দিতেন তিনি সকলের কাছে। মা চলে যাওয়ার পর সানুদি সংসারের সর্বময়ী এখন। কুটোগাছটি ভাঙে না নিরঞ্জন—দশ কাজে সময় যেতো তার? সানুদি না থাকলে এতদিন ভেসে যেত কোথায়। অচিলে চাবি বেঁধে ঘরে বাইরে তিনি অহরহ চোখ ঘুরিয়ে বেড়ান। বর্গাদার ধান মেপে দেবার সময় চিটা মিশিয়েছে, তার জন্য ঝগড়া করছেন। আবার এদিকে নিরঞ্জনের কয়েকটা হেঁচকি উঠেছে···একটা হোঁড়াকে গাছে তুলে কচি-ডাব পাড়াচ্ছেন সে জন্য।

এই মানুষ সানুদি। মানুষের দুটো চোখ থাকে, সানু-দির বোধকরি পিছন দিকেও আর দুটো চোখ। সেই চোখের উপর দিয়ে বিধবার সম্বল ছেলেহার ছড়া পাচার করে নিরঞ্জন ভোরবেলা নীলমণিকে এসে ডাকছে: গঞ্জে চল যাই।

উঠে চোখ মুছতে মুছতে নীলমণি বলে, গঞ্জে কেন তখন?

টাকার জোগাড়ে যেতে হবে না কর্জ করব পোদ্দারের কাছে। জমা দেবার শেষ তারিখ আর তিনটে দিন পরে। খেয়াল রাখিস?

পোদ্দারের সঙ্গে নিরঞ্জনের কি খাতির—নীলমণি বুঝতে পারে না। পথেও নিরঞ্জন কোন কথা ভাঙল না। এমন একটা কাজ করে এসেছে, কী জানি কি বলে আবার নীলমণি! বিধবা মানুষের বাবে করুণাদ্র হয়ে পথের উপর যদি বেঁকে দাঁড়ায়।

গঞ্জে গিয়ে সোজা পোদ্দারের দোকানে। ন্যাকড়ায় বাঁধা ছেলেহার পোদ্দারের হাতে দিল: জিনিষ রেখে দেড়শটি টাকা দাও পোদ্দার মশায়। কারবারি মানুষ—মুখে না বললে মনে মনে বুঝল কী দামের জিনিষ। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কি দেখ—ঠুকনি পাথরে ঠোক্কর দাও, নিক্তিতে চড়াও।

নীলমণি অবাক হয়ে বলে, গয়না কে দিল নিরঞ্জন-দা।

কলিকালের মানুষ—ভালোকাজে আপোষে কে দেবে বল্। চুরি করেছি। চুরিতে যেমন পাপ, পরের কাজে তেমনি পুণ্য। পাপে পুণ্যে কাটাকাটি, লোকসান মোটের উপর নেই।

কৌতূহলী নীলমণি প্রশ্ন করে: গয়না কার?

কার আবার, সানুদি'র। বাড়ি ছেড়ে বাইরে চুরি করতে যাব, এত পাকা চোর ঠাউরেছিল আমায়! ধরলে যা ঠেঙানি দেয়!

নীলমণি বলে, ঠেলাটা সানু-দি'র বুকবে। সে জিনিষ ঠেঙানির বড় কম হবে না।

নির্ভয়ে হেসে নিরঞ্জন বলে, কিছু না কিছু না। দিদি মন তিনি আমার কিছু হবে না, দেখে নিস।

পোদ্দার ইতিমধ্যে ভিতরে গিয়ে গণেগেঁথে টাকা নিয়ে এলো। নিরঞ্জন বলে, বলতে ভুল হয়েছে পোদ্দারমশায়। আরও তিনটে টাকা দিতে হবে। দেড়শ নয়, একশ-তিপ্পান্ন।

বাড়ি ফেরে মা তারা। গঞ্জ থেকে ঐ পথে অমনি সদরে চলল। সদরের ডেড-অফিসে টাকা জমা দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত। দুপুরে ফিরল গভীররাত্রে। নিরঞ্জন চুপিসারে দাওয়ায় উঠেছে, নীলমণি উঠানের একদিকে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে গতিক বুঝে নিচ্ছে।

দরজায় ঘা দিতে হল না, পায়ের শব্দেই সানুদি-রে-রে করে উঠলেন: কে রে, কে তুই? এই রাত্রি অবধি জেগে বসে আছেন নিরঞ্জনের অপেক্ষায়। খিল খুলে বেরিয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন: তোরই কাজ—তুই ছাড়া অন্য কেউ নয়। ঘরের শত্রু ছাড়া কেউ এমন পারে না। মায়া নেই, দয়াধর্ম নেই—

নিরঞ্জন তাড়া দিয়ে ওঠে: হয়েছে কি বলবে তো সেটা—

সান্যাল বলেন, ক্যাশ বাক্স ভেঙে আমার টাকা বের করে নিয়েছিল। নিয়ে গুছিয়ে প্রস্তুত করতে সাত সকালে বেরিয়ে পড়েছিল।

নিশিরাতে চারিদিক নিঃসাড়। তার মধ্যে ভাক ছেড়ে কাঁদতে লাগলেন। পুত্রশোকেও এমন করে কাঁদে না লোকে: ওরে কতভাগা, টাকা না নিয়ে আমার মুণ্ডুটা ছিঁড়ে নিয়ে গেলিনে কেন।

মুণ্ডু বন্ধক রেখে কি টাকা দিত সান্যাল।

হাসছে নিরঞ্জন। সান্যালকে চিন্তা করার মস্ত জানে সে দস্তিা দস্তিা। তাচ্ছিল্যের সুরে বলে, বন্ধক দিয়েছি তোমার ছিনিস, বিক্রি করিনি। তাই নিয়ে কান্নাকাটির কি ছিল, বুঝতে পারিনে। জিনিসটা পড়ে ছিল বন্ধকে—বলি, পরশু কিছু আসতে না রোকগার করে। তোমার কারবারই ছিল, গিয়ে এখন পোদ্দারের আড়তদারিতে উঠল। পোদ্দার টাকা ধার দিল—তুমিও ধার নাও ছেলেদের ধার দিচ্ছ আমাদের। ধার আমি একলা নিইনি—পোস্টাপিস সর্বসাধারণের, গ্রামসুদ্ধ খাতক তোমার।

সান্যাল একেবারে চুপ। গ্রামসুদ্ধ মানুষের উত্তমর্ণ হবার আত্মপ্রসাদ উপভোগ করছেন বোধকরি মনে মনে। নিরঞ্জন আরও পুলকিত করে তোলে তাঁকে: পোদ্দার সুদ নেবে। তোমাকেও মাসে মাসে সুদ দিয়ে যাবো যতদিন না গয়না ফেরত নিতে পারছি। নিয়ে নাও আগাম একমাসের সুদ! কটা খাতক দেয় এমন?

দুটো টাকা বধে বাড়িয়ে টুং টাং আওয়াজ তুলে নিরঞ্জন সান্যালকে দিয়ে দিল। চোখে যে অশ্রুচিহ্ন ছিল, আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে সান্যাল আঁচলে মুছে ফেললেন। ভিন্ন সুরে বলেন দুটাকা সুদ বড্ড যে কম হয়ে যায়। ভারীদারি জিনিসটা আমার—চারটাকা। থাক সে থাক, সাধারণের কাজ—তিনটাকায় বন্ধে কিছুতে হবে না।

পোদ্দারের কাছ থেকে পরে আবার তিন টাকা চেয়ে নেওয়ার রহস্য এতক্ষণে বোঝা গেল। উঃ, কত বুদ্ধি ধরে নিরঞ্জন—ব্যাপারটা আদ্যন্ত কেমন মনে মনে ছকে রেখেছে।

এই এক স্বভাব—ভেজাবড়ির টাকা খাটাতে পারলে আর কিছু চান না। সুদের লোভ দেখিয়ে কত লোকে যে তাঁকে ঠকিয়ে নিয়ে যায়—

দুটাকা কর্জ দাও সান্যাল, দু-আনা সুদ মাসে মাসে।

দু-আনা নয়, চারআনা। পয়লা মাসের সুদটা আগাম।

উঁহু, চার আনা হলে যে গলায় ছুরি দেওয়া হয়। তোমার কথা থাক, আমার কথাও থাক—তিনআনা কেটে নিয়ে এক টাকা তেরআনা দাও আমায়।

সান্যালের মুখের চার গুণ চড়া। সুদ নিয়ে তর্কাতর্কি দর কষাকষিও করতে হয়। খাতককে তবু ছাড়ে না। গণেগেঁথে ঐ যে এক টাকা তেরোআনা নিয়ে গেল, আর কখনো এ-বাড়ি পা দেবে না পারতপক্ষে। সান্যালেরও সেজন্য মাথাব্যথা নেই। ঐ যে একবার আগাম সুদ পেয়ে গেছেন, তাতেই খুশিমনে।

দেখা চলে বিপদও আছে। খাতকের নয়, সান্যালের।

রাগ করে সান্যাল তেড়ে ওঠেন: সুদ-টুদ দিস নে, ভেবেছিস কি তুই। আজকেই চাই আমি।

খাতক বলে, কত?

এইখানে সান্যালের মুশকিল। হিসাবপত্র মাথায় ঢোকে না। কিন্তু নরম হয়ে বললেন, সে আমার খাতায় লেখা রয়েছে। কিন্তু তুই অন্যের টাকা খেয়েছিস, তোর তো বেশি করে মনে থাকবে। কত হয়েছে, তুই বল্ দেটা।

খাতক লোকটা অম্লানবদনে বলে, আটআনা—

আট আনা না আরো-কিছু। বারো আনার এক পয়সা কম নয়।

লোকটা চটে উঠল: হিসাবে আমি কারচুপি করছি বলতে চান? বেশ, আপনার খাতা তবে বের করে আনুন সান্যাল।

সান্যাল বলেন, তাই বলে এত কম কিছুতে হতে পারে না। কত মাস হয়ে গেল—বারো আনা না-ই দিস, নেহাত পক্ষে দশ আনা তো দিবি। দিয়ে দে তাই।

লোকটা আরও গরম হয়ে বলে, দেবো কি পাছ থেকে পেছে? কর্জ দাও, তবে তো দেবো। তিনটে

টাকা বের করো। সে টাকায় আসল সুদ যা হয়, আর পুরানো হিসাবের ঐ দশ আনা কেটে রেখে বক্রি আমায় দিয়ে দাও, উঃ, কাবুলিওয়ালা হার মানালে তুমি দানু-দি।

সুদ আদায়ের খাতিরে দানু-দিকে পুনশ্চ আবার কর্ম দিতে হল। তাহলেও সুদ পেয়েছেন, এই বড় তৃপ্তি। আজকেও নগদ তিন তিনটে সুদের টাকা পেয়ে আনন্দের অবধি নেই।

নিরঞ্জনকে বলেন, ভাত বাড়তে যাচ্ছি। হাত পা ধুয়ে তো পিগপির সেরে আয়। রাত কাবার হয়ে এলো।

উঠানের দিকে নজর পড়ল: ওটা কে রে—নীলমণি বুঝি? ভূতের মতন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কেন? আসতে বল্, ভাত কি ওখানে দাঁড়িয়ে যাবে?

গ্রামে দুবেসর, পোস্টাপিস দুবেসর, থানা জাপুলপাহি—

পোস্টাপিস বসে গেল গ্রামে। অস্থায়ী অফিস এখন—থাকবে না ভুলে দেওয়া হবে, এক বছর পরে বিবেচনা। ততদিন অতি-সতর্ক থাকতে হবে। নিরঞ্জনের আটচালা ঘরের একটা দাওয়া বাঁশের বেড়ায় মজবুত করে ঘিরে দিল—অফিস সেখানে। রানার নীলমণি, পোস্টমাস্টার নিরঞ্জন। জিনিষটা পুরোপুরি মুঠোর মধ্যে। এখন এই অবস্থা চলুক, পোস্টাপিস পাকা হয়ে গেলে তখন মুঠো ঢিলে করা যাবে। গ্রামের লোকেরও সেই মত। চার টাকা মাইনের পোস্টমাস্টার—চার টাকার জন্য কে অত কামেলা পোহাতে যায়!

প্রথম কয়েকটা দিন কী উত্তেজনা মেয়েপুরুষ সকলের! কাজের মতন কাজ দেখাদেখি বটে নিরঞ্জন—দুবেসর গ্রামে গভর্ণমেণ্টের খাস আপিস। বাংলা-গবর্ণমেণ্ট নয়—খোদ ভারত-গভর্ণমেণ্ট, আসমুদ্র-হিমাচলব্যাপ্ত যার শাসন। কত বড় ইজ্জত! সুজনপুরের ডাকঘর—দুবেসরের উপর শেষ মাতব্বরিটুকুও খসে গেল।

রাণার নীলমণি সিল-করা ডাকের ব্যাগ সুজনপুর সাব-অফিসে পৌঁছে দিয়ে সুজনপুরের ব্যাগ দুবেসর নিয়ে আসে। নিরঞ্জন আপিসের ভিতরে স্থির হয়ে থাকতে পারে না। আসে না কেন এখনো নীলমণি—না-জানি কী সব জিনিষ ব্যাগের ভিতরে রয়ে এনে আজ হাজির করবে! খামের চিঠি, পোস্টকার্ডের চিঠি, মণিঅর্ডার। দুপুরের কড়া রৌদ্রে হাঁটতে হাঁটতে নিরঞ্জন গ্রাম-সীমানার মাঠের ধারে দাঁড়ায়, দূরের পথে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। রানারকে এগিয়ে নিয়ে আসবে। অবশেষে এক সময় দেখতে পাওয়া গেল—মোড় ঘুরে নীলমণি দেখা দিয়েছে। সে নীলমণি আর নেই—সরকারি চাকরে, নতুন সজ্জা তার এখন। খাদামি চামড়ার চাপড়াশের মাঝখানে ঝকঝকে পিতলের পাতের উপর সোদাই-করা 'মেল-রানার'। রোদের জন্য গায়ের চেক-কাটা চাদর মাথায় জড়িয়ে দিয়েছে—যেন রাজ-মুকুট। খাটো আদ্দাড়ের খদ্দর কাঁধে, বল্লমের গলায় ঘুন্টি—অন্য প্রান্তে ডাকের ব্যাগ। ভারত-গবর্ণমেণ্টের মেল-রানার বীরমদে পা ফেলে মাটি কাঁপিয়ে দ্রুত চলে আসছে। ঘণ্টি বাজছে ঠুন্‌ঠুন করে—পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ান সব—সামাল, সামাল! পোস্টাপিসের দরজার সামনে সবসুদ্ধ ছুঁড়ে দিয়ে নীলমণি রানাঘরের দিকে চলে যাবে: জল দাও দানু-দি, বড্ড তেষ্টা পেয়ে গেছে।

পিওনগিরির আমলে দেখা গেছে—কারোহাতে চিঠি গুঁজে দিলেন, মানুষটা গল্প করছে তো করছেই, চিঠিখানা উল্টেপাল্টে দেখারও আগ্রহ নেই। গাঁয়ের নিজস্ব পোস্টাপিস হয়ে ক'দিন এই বিষম উৎসাহ সেই সব মানুষের—দরজা ঘিরে ভিড় করে দাঁড়ায়। চিঠিপত্র যদি থাকে, হাতে হাতে নিয়ে নেবে। চার টাকা মাইনের পোস্টমাস্টার নিরঞ্জনকে পিওনের কাজটাও সেরে দিতে হবে অবসর মতো, অস্থায়ী পোস্টাপিসের আলাদা পিওনের খরচ দেওয়া হবে না। এবং পোস্টাপিসের প্রয়োজনে যাবতীয় খরচ খরচার দায়িত্বও তার উপরে—ঐ চার টাকা মাইনের ভিতর থেকে। তাহলেও সরকারি চাকরি, সে যাচ্ছা যাবে কোথায়? মাটির মানুষ নীলমণি, চিরদিন আস্তে-আস্তে করে কথা বলে এসেছে, মেলব্যাগ ঘাড়ে তুললেই লম্বে লম্বে তার যেন দুনিয়া অগ্রাহ্য

করা ভার। নিরঞ্জনও তেমনি পোস্টাপিসের টুলের উপর বসলে ভিন্ন একজন হয়ে যায়।

কাকন এসেছে এই ডাকের সময়টা। অন্যদিন বালিকা-বিদ্যালয়ে থাকতে হয়, রবিবার বলেই আজ আসতে পেরেছে। সরে গিয়ে সকলে কাকনের জন্য দরজা খালি করে দিল। স্লিপারের আওয়াজ তুলে সে ঢুকে পড়তে যায়—কিন্তু সাধ্য কি পোস্টমাস্টারের হাজির থাকতে। নিরঞ্জন রুমকি দিয়ে ওঠে : নো, নো—নোটিশ তো পড়ে দেখবে আগে—

চৌকাঠের উপরে ইংরেজি ও বাংলায় লেখা সাইন-বোর্ড : নো অ্যাডমিশন—ভিতরে আসিও না। আঙুল বাড়িয়ে নিরঞ্জন সরকারি আদেশ দেখিয়ে দেয়। খাতির—উপরোধ নেই এ ব্যাপারে। কাকন মুখ লাল করে থমকে দাঁড়ায়, তারপর ফর ফর করে চলে গেল।

আপিসে না ঢোকা যাক, বাইরে দাঁড়াতে মানা নেই। চলাচল সিল পরে চিঠি উপর—এক দুই তিন চার··· বাইরে থেকে গণে যাচ্ছে। আঠারো হয়ে গেল। দুধেসর পোস্টাপিসে এত চিঠি—এত সব চিঠি লিখবার মানুষ কোথায় ছিল এতদিন ঘুমিয়ে।

চিঠিপত্র আসে, মণিঅর্ডারে টাকাকড়িও আসতে লেগেছে। ইংরেজি মাসের চার তারিখে বেলুবরের টাকা আসে বাপ শৈলধরের নামে। কোন মাসে পাঁচ, কোন মাসে সাত। আসবেই—এবং ছুটিছাটা না থাকলে চার তারিখেই সুনিশ্চিত। পুরা দমে চলে পোস্টাপিস। ঝুন ঝুন করে ঘণ্টি বাজিয়ে চতুর্দিকে জানান দিয়ে মেলব্যাগ কাঁধে নীলমণি সগৌরবে ছোটে। শ্রীপল্ল গ্রাম পার হয়ে মাঠে পড়ল এবার। চাষীরা মিতালি দিচ্ছে। নীলমণির খাতির সর্বত্র—আগেও ছিল, সরকারি লোক হয়ে আরও বেড়েছে। ক্ষেত থেকে ডাকছে : এসো নীলমণি ভাই, তামাক খেয়ে যাও। আলের উপর মেলব্যাগ নামিয়ে পা ছড়িয়ে বসে হাতের মুঠোয় কলকে নিয়ে তাড়াতাড়ি দু'টান টেনে দিল নীলমণি। পথ সংক্ষেপের জন্য এবারে মুচিপাড়ার পথ ধরে। দুর্ধর্ষ চোর-ডাকাত এই মুচিরা—সেই প্রসঙ্গ যদি উঠে পড়ে নীলমণি চাপড়াস দেখায় : রাজার মাথার মুকুট আর আমার কোমরের চাপড়াসে তফাৎ এমন কিছু নেই। দেখতে না না ছুঁয়ে। ভাগ্যলগ্নাহি থানা বলে নয়, কলকাতার লাটসাহেব অবধি টনক নড়ে যাবে। চাপড়াসের মহিমা এর ওর মুখে মুচিদের কানেও পৌঁছে গেছে—টাকাকড়ি কত চলাচল ব্যাগের ভিতরে—সাহস করে চোখ তুলে কেউ তাকাবে না রানার নীলমণির দিকে।

চাষীপাড়ার ভুবন সর্দার এসে বলে, পোস্টাপিস কত করে? পোস্টকার্ডে কথাবার্তা লিখে ডাকবাক্সে ছাড়লে কাঁহা-কাঁহা মুলুক চলে যায়, এ বিষয়ে সর্ব-শ্রেণীর মধ্যে আমোদর হয়েছে তবে বলতে গিয়ে মায়ের ছেরদের হয়ে যায়। পোস্টাপিস বলে বসে পোস্টকার্ডকে। দু-পয়সা দাম শুনে ভুবন বলে, আমি বাবু এক জোড়া নিচ্ছি, তিন পয়সায় বেশি দেবো না—

নিরঞ্জন বুঝিয়ে বলে, ভারত গবর্মেন্ট দর বেঁধে দিয়েছেন—

ভুবন সর্দার বিশ্বাস করে না। বেজার হয়ে বলে, দিন না দর বেঁধে—তাই বলে একটা খাতির হবে না! একসঙ্গে দু খানার বন্দোবস্ত—পাইকারি দরও তো থাকে সব জিনিসের—

নিরঞ্জন বলে, পোস্টকার্ডে কি লিখতে হবে, তাই বলো। আমি গুছিয়েগাছিয়ে লিখে দিচ্ছি। কিন্তু দামের কম-বেশি করবার উপায় নেই ভুবন। আমি কোন ছার—খোদ লাটসাহেব হলেও পারবেন না।

আংশটা ধরে তর্কাতর্কি, ভুবন কিছুতে বুঝল না। অবশেষে বলে, তিন পয়সার বেশি নেই আমার কাছে। এক পয়সা বাকি থাকল তবে। যখন পারি, দিয়ে দেবো।

একা ভুবন নয়, অনেকের সঙ্গেই ব্যবস্থা এমনি। পাকাখাতা তৈরি করতে হয়েছে ধারবাকি লিখে রাখবার জন্য। চার টাকার পোস্টমাস্টারের বাড়তি কাজ চিঠি বিলি শুধু নয়, খাতা ধরে হাটেঘাটে পাওনার তাগিদ করে বেড়ানো। দিতে চায় না, ওয়াদা করে ধোঁয়ায়। নিরঞ্জন এক একসময় হতাশ হয়ে পড়ে : নাঃ, হালখাতা করব এবার পোস্টাপিসে। গণেশপুজো বাজনাতাদ্যি হবে—ধারবাকি তখন যদি দিয়ে দেয়।

এ সমস্ত যা-হোক এক রকম চলে যাচ্ছে, যারাত্মক

কিছু নয়। ক্যাসাদ হয়েছে ইনস্পেক্টর নিয়ে। চরবর্ষত তিনি আসতে লেগেছেন। হাজির থেকে পলাপরামর্শ দেবেন, কাজকর্ম দেখবেন। দেখেন তো কচু। এসেই নিরঞ্জনের আটচালা ঘরে ঢুকে ধব ধবে তোষক-চাদরের বিছানায় গড়িয়ে পড়বেন। এটা খাবো ওটা নেবো, নিরন্তর বায়না। বেলায় জোর কমলে বেরিয়ে পড়েন, দ্রুতপায়ে গ্রাম চক্কোর দিয়ে বেড়ান। হাটবার হলে হাটে যান কখনোসখনো। দুপুরের সাংঘাতিক এক প্রস্থ আয়োজন নিঃশেষিত হবার পর সানু-দি এখন সান্ধ্য জলযোগের জন্য ক্ষীরের-ছাঁচ বানাতে বসে গেছেন। রান্নাঘর থেকে বেরুনোর ফুরসত হল না। সারা দিনমানের মধ্যে। নীলমণি ওদিকে গ্রামে গ্রামে ঘুরে পাঠা এনে হাজির করল। ভ্যা-ভ্যা করছে উঠানের উপর, কাঁঠালের পাতা এনে খেতে দিচ্ছে। রাত্রিবেলা আর হাঙ্গামার কাজ নেই, শুভ পদার্পণ যখন ঘটেছে তিনরাত্রি বাস তো নির্ঘাৎ। পাঠার ঘাড়ে কাল সকালে কোপ পড়বে।

সন্ধ্যাবেলা ঢেলতে ঢুলতে ইনস্পেক্টর ফিরে এলেন। নিরঞ্জন শুকিয়ে ছিল। বলে, কী জিনিষ নীলমণি জুটিয়ে এনেছে, একটি বার দেখে যান। একেবারে রাজপুত্তুর।

ইনস্পেক্টর উদাসীন। তাচ্ছিল্যের সুরে বলেন, পাঁঠা বই তো নয়। নিরামিষ পাঠা খাইয়ে খাইয়ে অরুচি ধরিয়ে দিলেন মশায়। পাখী মেলে না—আবার যখন আসব রামপাখীর ব্যবস্থা করবেন।

আবার যখন আসব—সে কিন্তু অনিশ্চিত দূর-ভবিষ্যতের ব্যাপার নয়। এই যাচ্ছেন—আবারতো এলেন বলে। এ মাসের ভিতর না-ই হল তো পরের মাসে। এসে রামপাখী অর্থাৎ রোগের সেবা নেবেন, কয়মাস হয়ে গেল। বড় একটা মানকচু দেওয়া হল এবারে, না-না করতে করতে সাইকেলের পেছনে বেঁধে নিলেন। বললেন, হাটে নলেন গুড় উঠছে, চিনি ফেলে লোকে নাকি সেই গুড় খায়। কিনে রাখবেন তো এক ভাঁড় দাম দিয়ে নিয়ে নেবো।

পোস্টাপিস বসানো চাট্টিখানি কথা নয়। এক মজব সারা হতে না হতে পরবর্তীর আয়োজনে লেগে যেতে হয়—ওরে নীলমণি, শুনলি তো সব নিজের কানে? লেগে যা। রামপাখী আর নলেন গুড়।

নীলমণিও তিতবিরক্ত হয়ে উঠেছে। বেজার মুখে বলে, নলেন-গুড় হাটে উঠছে, কোন চোখ দিয়ে উনি দেখলেন? কেতেলের ঘরেও নেই এখন, কড়েরা কিনে চালান করেছে। কারো গুদোমে দু-এক ভাঁড় পড়ে থাকতে পারে। পিলে-চমকানো দর হাঁকবে সে তো গুড় খাওয়া নয়, কড়মড় করে পয়সা চিবিয়ে খাওয়া।

পয়সা যে, পরের, গুড় তাই চিনি ফেলে খেয়ে নেবে। মুখ ফুটে বলেছে, দিতেই হবে। ওর এক কলমের খোঁচায় পোস্টাপিসের মরণ-বাঁচন।

নীলমণি গজর-গজর করে: এই তো চলেছে এক নাগাড়। এসেই মুখ ফুটে এক একখানা ছাড়বেন, আর আমি বেটা মুখপুড়ি চুঁড়ে মরি। ঐ যে মানকচু সাইকেলে তুলে নিলেন—গাঁয়ে মিলল না তো ন'পাড়ার হাটে গিয়ে মানকচু কিনতে হয়। আসতেও লেগেছেন চাঁদে চাঁদে। আরও তো কত পোস্টাপিস কত দিকে—ন-মাসে ছ-মাসে একবারে গেলেন কি না গেলেন। তোয়াজ নেই সে সব জায়গায়, কোন সুখে যাবেন? গেলে তো হা-পিত্যেশ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে কখন দশটা বাজবে, পোস্টমাস্টার এসে চাবি খুলবেন।

নিরঞ্জন বলে, যাদের পাকা পোস্টাপিস তাদের ভরটা কিসের, তারা কেন তোয়াজ করবে? দিন আসুক ঐ ইনস্পেক্টরকে পুরো বেলা উঠোনে দাঁড় করিয়ে রাখব। ঘড়ি ধরে আপিসের তালা খুলব তখন।

সে সৌভাগ্যের দিন কবে আসবে, ঠিকঠিকানা নেই। মরীয়া হয়ে নিরঞ্জন একদিন শুজনপুরে রাখালরাজের কাছে গিয়ে পড়ল। অটল পিওনের ছেলে রাখালরাজ সাব-পোস্টমাস্টার হয়েছে, সে হিসাবে উপরওয়ালা। আপৈশব অন্তরঙ্গও বটে। বলে, ইনস্পেক্টর শালাও তাই, তোমাদের সঙ্গে ধরহর মহরম—কায়দাকানুন করো একটা কিছু। আমি আর পেরে উঠছি নে, কড়ুর হয়ে যাবার জোগাড়।

সবিস্তারের শুনল রাখালরাজ। হাসছে টিপে টিপে, রঙ্গ দেখছে। বলে, দীনেশ পেটুক বড্ড, কিন্তু মানুষটি ভাল। পেটেই যাবে, ক্ষতির কাজ কিছু করবে না। অন্য লোক হলে গলদ বের করার জন্য উঠেপড়ে লেগে

যেত, ফিল্‌ফিকিরে যাতে নগদ রোজগারও হয়। নতুন আনাড়ি মানুষ তুমি—গলদ যে বেরুত না, তা ও নয়।

ঠিক বটে, এদিকটা নিরঞ্জন ভেবে দেখে নি। বলে, মেকানিক মানুষ উনি সত্যি। কাগজপত্র যেন বাঘ, তাকিয়েও দেখেন না। ঘুরে ঘুরে কিনে বাড়ান শুধু। ঘুমানো, খোরাকি আর খাওয়া। খাবার মুখে খান-কয়েক কাগজে সই মেরে খালাস।

তবে দেখ, সরকারের মানুষ হয়েও কতদূর ক্ষতিপন্থী। এমন অস্থায়ী-পোস্টাপিস পাড়াগাঁয়ে যে মানুষ আসবে, সে-ই যাবে। দীনেশ তো মাস-মাস মিস্টানঠাই খায়, অন্য কেউ এলে শকুনির মতো তোমার সর্বস্ব ঘুবলে ঘুবলে খেয়ে যাবে।

নালিশ করতে এসে নিরঞ্জন অপ্রতিভ হয়ে পড়েছে। তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, খাওয়ার জন্যে ঠিক নয়। যখনই আসবেন, যথাসাধ্য খাওয়াবো। মাইনে পাই সাকুল্যে চার টাকা, অত ঘন ঘন না যদি আসেন—

আসে কি পোস্টাপিস দেখতে? অন্য কারণে আসে। পোস্টাপিস যায় সরকার থেকে রাহা খরচ আদায় করবে বলে? বাইরে মানুষ আয়োজন দেখে লোভ ছাড়তে পারে না।

বোন ললিতা বাড়িতে। দাদার কাছে এই সবটা সে এসে পড়ল, কথাবার্তার মধ্যে একপাশে দাঁড়িয়ে গেছে। রাখালরাজ মুখ টিপে হেসে তাকে বলে, কাণ্ড শুনলি দীনেশের? দুধসরে গিয়ে ধুন্দুমার লাগায়। অমন হাউ-মাউ খাউ তো এ জায়গায় চলে না, আমাদের বাড়ি সেইজন্যে যেতে যায় না।

হেসে ললিতা মুখ ঘুরিয়ে নেয়। একক্ষণে নিরঞ্জন তাকে ভাল করে দেখল। দেখে চুক কপালে উঠে যায়। অনেক দিন দেখেনি ললিতাকে—এত বড়াট হয়ে গেছে। মেয়েরা যেন কি—একটা বয়সে এলে কলাগাছের মতন তাড়াতাড়ি বড় হয়ে ওঠে।

বলে, এ সময়ে বাড়িতে তুমি? ইস্কুল তো খোলা।

উত্তরটা দিল ললিতা নয়, রাখালরাজ। বলে, টেস্ট দিয়ে বাড়ি চলে এসেছে। মিছে হস্টেলের খরচ টানি কেন? বাড়ি বসে পড়াশুনো করছে, একমাস পরে ফাইন্যাল। কি রে ললিতা, দরকার আছে কিছু?

ললিতা বলে, দু-তিনটে অঙ্ক বুঝে নিতে এসেছিলাম। থাক এখন।

থাকবে কেন রে, কী রাজকার্যে আছি? লজ্জা হল নাকি তোর? কী সর্বনাশ, চিনতে পারিস নি—দুধসরের নিরঞ্জন।

ললিতা বলে, চিনব না কেন? তোমার যেমন কথা।

চেনার ব্যাপারে কিছু মুশকিল হয়ে থাকে, সে তো নিরঞ্জনেরই। বিধাতা যেন ভেঙে আবার নতুন করে গড়েছেন ক'বছর আগেকার ডিগডিগে মেয়েটাকে। একটা কথা সকলের আগে ছাঁৎ করে নিরঞ্জনের মনে ওঠে—দুধসরের প্রতিযোগিতায় এরাও যদি এক বালিকা-বিদ্যালয় বসায়, ললিতার মিস্ট্রেস হওয়া কিছুমাত্র হবে না।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করে: পাশ-টাশ করে কি করবে ললিতা? কলেজে পড়বে তো?

পরম শুভার্থীর মতো জোর দিয়ে বলে, নিশ্চয় পড়বে। তিনটে চারটে পাশ হয়ে থাক, তখন থামবে।

কেন আর ওকে ক্ষেপিয়ে দিচ্ছ? রাখালরাজ বিরস মুখে ঘাড় নাড়ল: কলেজে পড়ানোর অবস্থা কি আমাদের? বাপা পেয়ে সদরে থাকতে হল, কপালে ছিল একটু বিদ্যে—এই অবধি হয়েছে।

ললিতা জেদ ধরে বলে পড়বই আমি দাদা। যা পড়ে ছাড়াছি নে। কাজকর্ম নিয়ে নেবো একটা, প্রাইভেটে পড়াশুনো করব।

অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে নিরঞ্জনের। সেই কাজ কি হতে পারে? সুজনপুর বালিকা-বিদ্যালয়ে মাস্টারি—বাড়ি থেকে মাস্টারির সঙ্গে সঙ্গে দাদার কাছে পড়াশুনোও হতে পারবে। সুজনপুর কিছু তো খাটো হয়েছে—বিদ্যালয়ের মতলব বড় জয়ের মাথায় ঘুরছে, তৈরি মাস্টার হাতের কাছে পেলে কিছুমাত্র দেরি করবে না।

হেসে রাখালরাজ প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দেয়: কাজের ভাবনা কি ললিতা, কাজ তো যত্রতত্রই রয়েছে তোর জন্যে। কাজ দেবার মানুষ ঘুরঘুর করে বেড়ায়। বাবাও মুরুকে আছেন, পাশ-ফেল যা হোক একটা হেডমেস্ট হলে সঙ্গে সঙ্গে বিদায় করবেন। ভাত রাঁধবি

সেখানে গিয়ে, ছেলে ধরবি, বাদর বাজাবি—আর কি কি করতে দেবে, ভগবান জানেন।

মুখ ফিরিয়ে রাধানরাজ নিরঞ্জনের দিকে সকৌতুকে চেয়ে বলে, তোমরাও সোয়াস্তি পাবে তখন। পোস্টাপিসে ঘুরঘার এত চাড় তখন আর ইনস্পেক্টর বাবুর থাকবে না।

হুঁ, সিধাব করলে গেলাম আর কি! যতবার তাড়াবে, ফিরে ফিরে আসব দাদা।

বলতে বলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা লঙ্কা পেয়ে ভিন-গাঁয়ের মানুষটির সামনে থেকে পালিয়ে যায়।

একদিন এক দুরন্ত চাঁসির বদলায়—ডাকের ব্যাগের সিলমোহর করা দড়ি কেটে উপড়ে করতেই ছড়িয়ে পড়ল ডাঙ্গুর একটা।

ডাঙ্গুর কেন রে নীলমণি, চিঠিপত্তোর কোথা?

নীলমণি ছেলেমানুষটি খাচ্ছে: পোস্টমাস্টার মহাশয় করেছেন তোমার সঙ্গে। চিঠি একখানাও নেই। বললেন, এই কাঠ-ফাটা রোদ্দুরে খালি ব্যাগ বয়ে নিয়ে যাবি কেন রে, একটা ফল দিয়ে দিই। গাছ থেকে একটা ডাঙ্গুর ছিঁড়ে দিয়ে বললেন, চিঠির বদলে আজ কালো-ডাঙ্গুর। ভারি আমুদে মানুষ উনি।

নিরঞ্জন খিঁচিয়ে ওঠে: সর্বনাশের গোপাড়—আর দুই আমোদ পেলি এর মধ্যে। ইনস্পেক্টরের তোয়াজ কিসে করানো যায়—রাধানরাজের কাছে আমি সেই বাবস্থাই গিয়েছিলাম। তোয়াজ উল্টে এখন দুনো তেদুনো করতে হবে। ছ-মাইল পথ ভেঙে খালি মেল-ব্যাগ আনলি কেমন করে তাই নিয়ে হাসি আসে, বুঝতে পারিনে।

সদুঃখে বলে, যা কিছু আমি করতে যাই কোনটাই জমতে চায় না। বালিকা বিদ্যালয়ে গোড়ার কয়েকটা দিন মেয়ে কুড়ির উপর উঠে গিয়েছিল। বাস্তবে কোথায় দিনকে-দিন, দৃষ্টান্ত দেখে ঘরে ঘরে সবাই মেয়ে ইস্কুলে পাঠাবে—তা নয়, কমতে কমতে এখন ছ'সাতটায় ঠেকেছে। সেখানেও এমনি কালো-ডাঙ্গুরের দশা—হয়তো খালি বেকিগুলোকেই কাকনের পড়িয়ে যেতে হবে। পোস্টাপিস খুলে কতরও আশা, ধাম পোস্টকার্ডে পয়লা দিনই আঠারোখানা এলো—

সেই গৌরব-দিনের কথা নীলমণিরও সুস্পষ্ট মনে আছে: গিয়েছিল এখান থেকে বস্ত্রিশখানা। তার উপরে রেজেস্ট্রি দুটো, মনিঅর্ডার একটা দশটাকার—

নিরঞ্জন বলে, উঠে পড়ে না লাগলে উপায় নেই রে নীলমণি। এমন চললে পোস্টাপিস তুলে দেবে, সুজনপুরে বসল বাজারে স্ফূর্তিতে। চিঠির বদলে দু'এক দিন ডাঙ্গুর এলে তেমন মারাত্মক হয় না, কিন্তু রেজেস্ট্রি পার্সেল, মনিঅর্ডার এ সবের হিসাব থাকে। শ্রীগন্তের পোদের ধারে তরফদাররা এসে বাস করেছে, তাদের কাছে গিয়ে খবরাখবর দে নীলমণি। একশো টাকার চার আনা কমিশন।

মেজরগঞ্জের অঞ্চল—মেজরদের জ্বালে দেবার জন্য শীতকালে কাঠকুটোর প্রয়োজন পড়ে। প্রকাণ্ড আকারের কুড়াল নিয়ে এই সময়ে কটৈল ও সুরী ছেলে থেকে কাঠ চেলা করবার মানুষ আসে। তরফদার বলে তাদের। বিস্তর রোজগার করে তারা এক এক বরশুনে, দেশেঘরে টাকা পাঠায়। একশো টাকা পাঠাতে ডাকখরচা এক টাকা—নীলমণি গিয়ে তদ্বির করছে, টাকাটা সুরেনের পোস্টাপিসের মারফতে পাঠালে টাকার জায়গায় বারো আনা কমিশন নেওয়া হবে। বাকি চার আনার পুরো দেবে পোস্টমাস্টার নিরঞ্জন মাইনেটি ঐ চারের ভিতর থেকে। নতুন পোস্টাপিস ঠেকাবার এই সমস্ত প্রক্রিয়া।

শুধুমাত্র নীলমণির উপর নির্ভর না করে নিরঞ্জন নিজে চলল ভিন্ন এক খানে—কাবুলিওয়ালাদের ডেরায়। কম্বল-আলোয়ান নিয়ে কি বছর শীতকালে আসে তারা, গরম-কাপড় ধারে বিক্রি করে। ও-বছরের টাকা এ-বছর উসুল করে, আদায়ি টাকাকড়ি কলকাতার আত্মজনের কাছে পাঠিয়ে দেয়। সকলের সব টাকা একত্র করে তারা কাবুলরাজ্যে চালানের বন্দোবস্ত করে। জায়গাটা সুজনপুর পোস্টাপিসের এলাকা—নিরঞ্জন তাদের মধ্যে গিয়ে পড়ল: আবার ওখান থেকে টাকা

পাঠাও খাঁ সাহেব। সবই সরকারি আপিস—যেখান থেকে পাঠাও ঠিক গিয়ে পৌঁছবে। দুবলর পোস্টাপিস উপরন্তু এই চার আনার সুবিধা দিচ্ছে।

কোথাও কিছু নয়, হঠাৎ কাঞ্চন একদিন মনি-অর্ডারের ফরম পূরণ করে নিয়ে এলো। পনের টাকা পাঠাচ্ছে কলকাতার মঞ্জুলা নামে মেয়ের কাছে। আর এক খানের চিঠি ঐ মঞ্জুলার নামে। বলে, এই চিঠি অন্তত পাপ করবেন না। পাঠাবেন।

নিরঞ্জন আকাশ থেকে পড়ে: কোক্ চিঠি না পাঠাই? টিকিট মেরে ছাড়লেই বাপ-বাপ বলে পাঠাতে হবে। টিকিট না থাকলেও বেয়ারিং করে পাঠাই। আইনের দস্তুর।

তিক্তকণ্ঠে কাঞ্চন বলে, সে আইন দুবলর অবধি এসে পৌঁছয় নি। সে যাকগে—হাতে-নাতে কিছু ধরে ফেলি, তখন সে কথা। কিন্তু এই চিঠি ঠিক মতো যেন গিয়ে পৌঁছায়। পোস্টাপিসের স্বার্থে। এত করে কেনই বা বলি—সব চিঠি খুলে পড়েন, এ চিঠি পড়ে বুঝতে পারবেন।

নিরঞ্জন জিভ কেটে বলতে যায়, পরের চিঠি খুলে পড়ি—কী সর্বনেশে কথা বলছ তুমি? কিন্তু বলবে কার কাছে? জবাবের প্রত্যাশা না করে চিঠি ও মনি-অর্ডার রেখে কাঞ্চন ফরফর করে ইস্কুলের দিকে চলল। ইস্কুল করতে করতেই পোস্টাপিসের এই কাজে এসেছিল।

বলে আরও কৌতূহল বাড়িয়ে দিয়ে গেল। বাটি ভরা জল পাশে নিয়েই নিরঞ্জন পোস্টাপিসের কাজে বসে। খামের মুখে জল দিয়ে খুলতে হয়। রাস্তাপথে যেমন লোকের চলাচল, ডাকের পথে তেমনি মনের চলাচল। আজ এক ডাকঘর নিরঞ্জন আগলে বসে আছে, দারিদ্র বিষম বই কি। হাতের উপর দিয়ে কী ধরনের কথাবার্তা ভাবনাচিন্তা যায় আসে, দেখে শুনে বুঝেসমঝে তবে ছাড়তে হয়। এই দিক দিয়ে পোস্টাপিসের এমন বাহাদুরি, আগে কিন্তু মাথায় আসেনি—পোস্টমাস্টারের টুলে বসে এখন বুঝছে। গ্রামে গ্রামে পোস্টাপিস হওয়া উচিত, এবং দায়িত্বশীল একজনে পোস্টমাস্টার হবেন। আগেকার দিনের সমাজপতির মতন। অন্তর্যামী দেবতার কাজ—দেবতা গোটা বিশ্বভুবনের অন্তরের খবর রাখেন, পোস্টমাস্টার নিরঞ্জন শুধুমাত্র দুবলরের। অতএব ছোট মাপের দেবতা।

মুখে হরে যায় মঞ্জুলার নামের চিঠি পড়ে। বদমেজাজি মেয়েটা ভিতরে ভিতরে এমন, বাইরে দেখে কিছুমাত্র বোঝা যায় না। মঞ্জুলাকে লিখেছে, পনের টাকা হাতে পেয়েই দণ্ডে দণ্ডে সে আবার মনিঅর্ডার করবে কাঞ্চনের নামে। কমিশনের খরচা মঞ্জুলারই—দুবলর পোস্টাপিসের দরুন চাঁদা। টাকা পেয়ে কাঞ্চন আবার পাঠাবে, এবং তার পরে মঞ্জুলাও। অনন্তকাল ধরে চলল। টাকা ছুটোছুটি করছে, মনিঅর্ডার আসা-যাওয়ার হিসাব বাড়ছে পোস্টাপিসে। বড় সাক মাথা কাঞ্চনের। গ্রাম ছাড়ব-ছাড়ব করে, কিন্তু ভাবেও তো গ্রামের কথা। নিরঞ্জনের মতোই ভাবে। ভেবে ভেবে এই তাজ্জব বুদ্ধি বের করেছে।

না পড়ে চিঠি বিলি হয় না, ব্যাপার ক্রমশ চাউর হয়ে পড়ছে। তাই নিয়ে একদিন বিষম চৈ-চৈ।

সন্ধ্যার মুখে পুকুরপারের বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছে, অজয় ডাকে: কে যায়, পোস্টমাস্টার নাকি? শুনে যাও এদিকে।

ভারী গলা। নিরঞ্জনের মনে পাপ রয়েছে, ডাকের ধরনটা ভাল বলে মনে হল না। পায়ের জোর বাড়িয়ে দেয়। বিজয়ও সেখানে, সে হুঙ্কার দিয়ে উঠল: দাদা ডাকছেন, তোমার বুঝি কানে গেল না?

নিরঞ্জন বলে, চিঠি ক'খানা বিলি করে আসি। ফেরার সময় দেখা করে যাবো।

এক্ষুনি এসো বলছি। গোঁয়ার-গোবিন্দ মানুষ বিজয়—মুখের তাড়নায় শেষ হয় না, ছুটে বেরিয়ে পথ আটকে দাঁড়াল।

অজয়ও চলে এসেছে। দু-ভায়ের মধ্যে গলা কারো খাটো নয়। মানুষ জমেছে মজা দেখবার জন্য। এক কথায় দু-কথায় পথের উপরেই বেশ তুমুল হয়ে উঠল।

সকলের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে নালিশ জানাবার ভঙ্গিতে অজয় বলে, ভোররাত্রে হারাধন ধাড়ার বাড়ি পেয়াদা নিয়ে অস্থাবর ক্রোক করতে গিয়েছিলাম।

কি করব, আজ চার বছরের মধ্যে খাজনাকড়ি উপুড় হস্ত করে না।

নিরঞ্জন নিরীহ ভাবে মন্তব্য করে: ভারি অন্যায় তো!

তার দিকে দৃষ্টিমাত্র না দিয়ে অজয় বলছে, আদায় নেই এক পয়সা উল্টে একগাদা খরচা করে ডিক্রি করলাম, ডিক্রি জারি করে অস্থাবর ক্রোকের পরোয়ানা বের করলাম, পনের-বিশ জন লোক জুটিয়ে শীতের মধ্যে তুরতুর করে কাঁপতে কাঁপতে দাড়ার বাড়ি গিয়ে উঠলাম—

কৌতূহল আর দমন করতে পারছে না—তেমনি ভাবে নিরঞ্জন বলে, তারপর?

অজয় বলে যাচ্ছে, গিয়ে দেখি ভোঁ-ভাঁ। গোয়ালে গরু নেই, রান্নাঘরে থালা বাসন নেই, ঘরে চৌকি-তক্তাপোস অবধি নেই। থাকবার মধ্যে ছেঁড়া-মাদুর আর মাটির হাঁড়ি-কলসি গোটা কতক। জিনিষ পত্র এর বাড়ি তার বাড়ি সরিয়ে দিয়ে শ্মশানবাসী ভোলা-নাথ হয়ে আছে।

নিরঞ্জন বলে, ভারি শয়তান তো।

বিজয় এতক্ষণ চেপেচুপে ছিল, দাদা বলছে তার মধ্যে কিছু বলতে যায়নি। এবারে গর্জন করে উঠল: শয়তান তুমি—

হাত চেপে ধরল নিরঞ্জনের: আমাদের সঙ্গে কি শত্রুতা বলো। একবার বাবা খেয়াঘাট দান করে গেলেন, আমরা কেউ টুঁ শব্দটি করলাম না। তারই শোধ দিচ্ছ এমনি করে?

হাত বাড়িয়ে নিয়ে নিরঞ্জন বিস্ময়ের ভান করে বলে, কি করলাম, বলবে তো সেটা খুলে।

ক্রোকের পরোয়ানা বেরিয়েছে, পেয়াদা দু'এক দিনের মধ্যে গিয়ে হাজির হবে—মুহুরি চিঠি লিখেছিল আমাদের। সেই চিঠি খুলে পড়ে দাড়াকে তুমি বলে এসেছ। বাড়ি সে সাফসাফাই করে রেখেছে। তুমি ছাড়া অন্য কেউ হতে পারে না।

অজয়ের কি মনে হয়েছে, ছুটে গিয়ে মুহুরির সেই চিঠি এনে সকলকে দেখায়: ঠিক কিনা হাতে নিয়ে দেখুন। ডাকের সিলটা দেখুন একবার নিরিখ করে।

খামের এক পাশ ছিঁড়ে এরা চিঠি বের করেছে। কিন্তু তার আগে সন্তর্পণে খাম যে একবার খোলা হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। জোড়ের মুখে ডাকের সিল পড়েছে—সিলের দুই খণ্ড এক হয়ে মেলেনি, মাঝে কিঞ্চিৎ ফাঁক। অর্থাৎ পাঠাবে আটবার সময়টা অতদূর নিরঞ্জন খেয়াল করতে পারেনি।

এই তো সাংঘাতিক অবস্থা—তার উপর কাঞ্চন এসে পড়ল রঙ্গস্থলে। আগ বাড়িয়ে সাক্ষি দেয়: হ্যাঁ, পড়েন ইনি সমস্ত চিঠি। আপনাদের তবু তো এসে পৌঁচেছে, আমার চিঠির আধাআধি লোপাট হয়ে যায়। তাতু মাঝি গাঁয়ের পোস্টাপিসে—সুজনপুর থেকে চিঠি নিয়ে যেত, সে অনেক ভালো ছিল। আবার তাই হোক, উঠে যাক এ পোস্টাপিস।

নিরঞ্জন এবার রীতিমতো ক্রুদ্ধ হয়েছে। বলে, কোন চিঠি কবে লোপাট হল, বলো এই দণ্ডের মুকাবেলা। আজাবোজা কলঙ্ক দিলে হবে না।

কাঞ্চনও সমান তেজে বলে, অনেক অনেক। এক-খানা দু'খানা নয়। আমি সব টের পাই। রানীশঙ্করী লেনের একটা বাড়ি, আমাদের বন্ধু তাঁরা সব, আমি সে বাড়ি মেয়ের মতো—এত দিনের মধ্যে তাঁরা একখানা চিঠি লেখেননি, এ কখনো হতে পারে। না দুজন পুরের আমলে হপ্তায় হপ্তায় পেয়েছি। আপনি সমস্ত চিঠি নষ্ট করে ফেলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার হয়েছে, জায়গাটাও গাছতলা। চোখে জল এসেছে কিনা ঠাহর হয় না, কিন্তু ভিজে-ভিজে গলা।

ঘাড় নেড়ে নিরঞ্জন প্রবল প্রতিবাদ করে: লেখেনি তারা চিঠি। লেখেনি, লেখেনি। না লিখলে আমি কি নিজে লিখে বেনামিতে পাঠাব।

ঝগড়াঝাটি অন্তে নিরঞ্জন একসময় বাড়ি ফিরল। নীলমণি বলে, পরের চিঠি পড়া পাপ। কেন যাও নিরঞ্জনদা, ওইসব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে? যেমন যেমন চিঠি পত্তোর এলো, বিলি করে দিলে। ল্যাঠা চুকে গেল।

দেখব না শুনব না—যেন এক টিনের ডাকবাক্স আমি। নিরঞ্জন তদ্বি করছে: খুলে থাকি আমি চিঠি, বেশ করি। একশো বার খুলব। ছেলেপুলে নিয়ে হারাধন উপোস করে মরছে, পেয়াদা এনে ওরা তার

ঘটিবাটি গরুবাছুর নিয়ে নিদারুণ চড়াত। ভাগ্যিস খুলেছিলাম চিঠি, এ যাত্রা হাড়ার-পো বেঁচে গেল। লোকের ভাল করব, জুলুম ঠেকাবো বইলে এসব পাবলিক-কাজের মানেটা কি?

তারপর বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে, এমনি তো কাকন পোস্টাপিসের জন্য কত করে, কেপে গিয়ে সে-ই আজ দশের মধ্যে পোস্টাপিস উঠে যাওয়ার কথা বলল। মুখ দিয়ে বের হল এমন কথা! সমর গুহ চিঠিপত্তোর লেখে না, সে যেন আমার দোষ। তার বাড়ি অবধি চলে গিয়েছিলাম, দুবদর গ্রাম বলতে যে মানুষ চিনতে পারে না সে আবার লিখবে চিঠি!

নিজেরই মনে যেন সাহস সঞ্চয় করছে। বলে, মরুক গে থাক। দীনেশ যতদিন ইনস্পেক্টর, বেকাধন্দা করতে পারবে না। রাখালরাজের খাতিরের লোক—বোনাই হবে বলে মনে হয়। রামপাখী আর নলেন গুড়-তো সামান্য বস্তু, আকাশের চাঁদ চেয়ে বসলে তাই পেড়ে দিতে হবে রে নীলমণি। আষাঢ় কবে এসে পড়ে—ভাল মোরগ ঠিক করে রাখ, ছাগল-ভেড়ার উপর দিয়ে যায় এমনিধারা মোরগ। আর গুড়ের ভাঁড়ের কথা বলেছে ভাঁড় নয়, কলসি। স্বর্গ-মর্ত-পাতাল ত্রিভুবন খুঁজে নিয়ে আসবি দেখি কোন বেটা কি করতে পারে পোস্টাপিসের।

বেশি দেরি হল না। নতুন মাস পড়তেই খবর এসে গেল, ইনস্পেক্টর আসছেন পরিদর্শনে। সুজনপুর সাব অফিসে এসে গেছেন, সে খবরও এলো।

দেখবি রে নীলমণি, রামপাখীর কথাটা কোন ক্রমে চাউর না হয়। রান্নাঘরে ও জিনিষ উঠবে না। সান্দুনি টের পেলে রান্না-করা স্লেচ্ছ বস্তুতে গোবরের ভাল ছুঁড়ে দেবেন হয়তো বা।

মোরগ কেটেকুটে নীলমণি তৈরি মাংস নিয়ে এসেছে। সান্দুনিকে বলা হল, কড়া পেঁয়াজ-রসুনের কোরমা খেতে চেয়েছেন ইনস্পেক্টর, সে জিনিস তোমায় হাতে হবে না। আমি নিজে রান্না করব—জিজ্ঞাসাবাদ করে আর রান্নার বই পড়ে রপ্ত করে নিয়েছি।

বাড়ির বাইরে গোয়াল। গো-মাতারা থাকেন, সে জায়গা কোনক্রমে অশুচি হয় না। ইট সাজিয়ে উনুন বানিয়ে মাটির কড়াইয়ে সেই আশ্চর্য কোরমা চাপানো হয়েছে। কিন্তু শুরুতেই গোলমাল উনুনে ধোঁয়াতাপনা করছে। ফুঁ দিতে দিতে দু'চোখ জলে ভরে গেল। অতিথি কখন এসে পড়ে, ঐ বুঝি সাইকেলের কিড়িং—কিড়িং মনের উদ্বেগে প্রাণপণ শক্তিতে যত ফুঁ পাড়ে, ধোঁয়াই কেবল বাড়ছে, আগুনের চিহ্নমাত্র নেই।

পিছন তাকিয়ে দেখে কাকন। নিরঞ্জনের দুর্গতি মজা করে উপভোগ করতে এসেছে। হাসছে টিপিটিপি। শুকনো নারিকেল-পাতা আনা রয়েছে, সমস্তগুলো উনুনে ঠেসে দিল, যদি দয়া করে ধরে যায় এবার।

কাকন ভাল মানুষের ভাবে বলে, কাঠ-পাতা কেন। কাগজ তাড়াতাড়ি ধরে যায় চিঠি পত্তোর নেই?

চিঠি?

পুড়িয়েই তো থাকেন। জলেও ভাসান হয়তো।

কড়ার জন্য তৈরি হয়ে এসেছে। নিরঞ্জন ক্ষেপে গেল: ওঃ, কত চিঠি আসে কিনা তাকে! তাই মানুষকে দেবে, পোড়াবো, জলে ভাসাবো—

কথার মধ্যে কাকন একেবারে গায়ের উপর এসে পড়েছে। ধাক্কা দিল নিরঞ্জনকে: দরুন দিকি—

হটিু গেড়ে মাথা নিচু করে ফুঁ দিচ্ছে। এক ফুঁয়েই উনুন ধপ করে জ্বলে উঠল।

নিরঞ্জন অবাক হয়ে বলে, কী আশ্চর্য, যেন মন্ত্রের ব্যাপার। আমি এতক্ষণ ধরে এত চেষ্টা করছি—

সকলে সব জিনিষ পারে না, যার যে কাজ।

এর ভিতরেও খোঁটার কথা এসে পড়ল। কাকন বলে, ডাকের চিঠি যত আঁটাই থাক, আহ্নিক বুলিয়ে আলগোছে আপনি খুলে ফেলেন। তা-ও লোকে বলবে মন্ত্রের ব্যাপার।

কগড়াকাটির মধ্যে নিরঞ্জন যাবে না। বিশেষ করে এই সময়টা—ইনস্পেক্টর আসার মুখটায়। সহজ ভাবে বলে, শহরে ছিলে তো তুমি। এতসব কায়দাকানুন জানলে কি করে।

শহরের মানুষও উনুন ধরিয়ে ভাত রেঁধে খায় নিরঞ্জন-দা। শহরের ভাত আকাশ থেকে পড়ে না।

নিরঞ্জন নিরীহ ভাবে বলে, কী জানি। শহরে আলো দেশলাই জেলে ধরাতে হয় না, শহরের জল কলসি

ভরে আনতে হয় না কল টিপলে আপনাআপনি সব এসে যায়। আমি ভাবতাম, ভাতও বুঝি তেমনি আপনি উনুনে চাল জল কিছু লাগে না, কল টিপলেই থালায় উপর ঝুরঝুর করে পড়ে। শহরের মানুষও আমাদের মতন উনুনে ধরিয়ে রাঁধে, ভারি আশ্চর্য তো।

শহরের মানুষ রোয়াকের কোরমাও কেমন রাঁধে, দেখিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজ-রসুন কুচিয়ে রেখেছেন—এতে হবে না, বাটুন শিল পেতে।

তাই না হয় বাটছি—। বাড়ির ভিতরে ইঙ্গিত করে নিরঞ্জন চুপি চুপি বলে, রোয়াক নয় কিন্তু কাঞ্চন, খাসি-ছাগলের নামে চলছে।

চলুক তাই। রান্নার জন্য ইতর বিশেষ হবে না। কিন্তু এটা কি—খাসিছাগলের পাখনা দুটো একেবারে যে আস্ত রয়ে গেছে। পেঁয়াজ একেবারে চন্দনের মতো করে বেটেছেন বাঃ, বাটনায় দিব্যি হাত তো আপনার!

বলে, ধনে জিরেনরিজ বেটে দিন এইবার—

সেটা হতে না হতে—এই যাঃ, আদা বাটনাও নেই যে। বাটুন, বাটুন—ছিবড়ে থাকলে কিন্তু হবে না।

বলে, জল ফুরিয়েছে—জল আনুন এক ঘটি।

স্থির হবে এক লহমা বসতে দেবে না। বলে, কুচো কাঠ খানকতক কুড়িয়ে আনুন। মাংস ধীর জ্বালে হবে। বড়-কাঠ দাউ দাউ করে জ্বলে,—তাতে হবে না।

নিরঞ্জন বলে, আমিই বরঞ্চ রান্না করি। তুমি এই সময় জোগান দাও।

অত সহজ নয় রান্না—

এক জায়গায় বসে বসে হুকুমহাকাম ছাড়া—খুব বেশি কঠিন বলেও তো মনে হয় না।

বলতে বলতে নিরঞ্জন মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে পড়ে কাঞ্চনের দিকে। গাঢ়স্বরে বলে, এত ভালবাসা দুবেলার উপর—দায়ে- বেদায়ে কাঁপিয়ে এসে পড়ো ডাকতে হয় না। ছুট-ফটানি তবে আমার কি জন্যে? গ্রাম ছেড়ে কখনো যাবে না, এই রকমটা ভেবে নিয়ে মনেপ্রাণে কাজ কর্মে লেগে যাও।

আপনাকে বিয়ে করে—কেমন।

কাঞ্চনের কণ্ঠস্বর মুহূর্তে তীব্র তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। ঘুটের পদ্মের ভিতর থেকে ফোঁস করে সাপ বেরুনোর মতো। বলে, দাদার সঙ্গে সেই ষড়যন্ত্র। কলকাতায় গিয়ে দাদাকে জপিয়ে এসেছিলেন। প্রত্যেক চিঠিতে দাদার এখন ঐ কথা। আপনি ঠিক উসকে দিয়ে যাচ্ছেন।

আজকেই বেণুদের চিঠি দিয়ে এসেছে, কাঞ্চন ফস করে সেই চিঠি বের করল: চিঠি খুলে পড়ে খুশি হলে তবেই সে চিঠি বিলি হয়, নয় তো গাপ করে ফেলেন আপনি। জানেন যে দাদাকে কষ্ট দিতে চাইনে, দাদার কথা বড্ড মানি আমি—

গণ্ডগোলের মধ্যে এ সময়টা নিরঞ্জন কিছুতেই যাবে না। সহাস্যে বলে, তবে আর কি। যে রকম লিখেছে করে ফেল তাড়াতাড়ি। পাঁজি দেখে তুমিই না হয় একটা তারিখ ঠিক করে লিখে দাও। তোমার লজ্জা করে তো আমিও লিখতে পারি। ছুটি নিয়ে বেণু চলে আসুক।

কিন্তু আপনাকেই যে অপছন্দ আমার।

তাচ্ছিল্যের সুরে নিরঞ্জন বলে, অন্যায় কিছু নয়। গাঁয়ে পড়ে আছি, লেখাপড়া জানি নে, চাকরি-বাকরি করি নে—উঁহু, চাকরি বই কি। খোদ ভারত গবর্ণমেণ্টের চাকরি। তবে মাইনে হল চার টাকা। মাইনের কথা শুনে সব মেয়েই নাক সিঁটকে তুলবে। তা হলেও সাধুসন্ন্যাসী নই, বিয়ে কোন একটা মেয়েকে করতেই হবে—

কাঞ্চনও বুঝি হঠাৎ কৌতুক পেয়ে যায়। বলে, অপছন্দের বিয়ে—ঝগড়াঝাটি হবে, জীবনে শান্তি থাকবে না যে।

বিয়ে করব আর ঝগড়াঝাটি করব না, তাই কখনো হয় নাকি? পছন্দর বিয়েও দেখেছি। হাতের কাছে আমাদের কালী চক্কোত্তি মশায়ের ছেলে সমীরণ। বাপের অমত—বলে রেজেস্ট্রি বিয়ে করে এলো, নিয়ম রক্ষার দুজনের 'সখি আমায় ধরো ধরো' ভাব গোড়ায় কয়েকটা দিন তার পরেই নিজমূর্তি বেরুল। বউ কিল মারছে, বর ঘুসি মারছে। শেষটা আদালতে। কালী চক্কোত্তির বেটা এখন মাসে মাসে পনের টাকা খোরপোষ গুণে যাচ্ছে। আমাদের ঘরব্যাভারি অপছন্দের বিয়ের এতদূর শুনিনে কখনো।

একটুখানি থেমে আবার বলে, ঝগড়া হল তো বয়ে গেল। ও কাজটায় দুজনের কেউ আমরা অপারগ

নই। তুমি না, আমিও না। কিন্তু ঐ সঙ্গে লাভের দিকটাও খতিয়ে দেখতে হবে তো।

কি লাভ শুনি ?

রোজগার-করা মেয়ে তুমি। বালিকা বিদ্যালয় চিরকাল কিছু এমন থাকবে না, যে রকম চেষ্টা করছ তুমি তো বড় হয়ে গেল বলে ! হাজরী বাড়বে, তোমারও রোজগার বাড়বে। তার উপরে মাংস রান্নায় এমন ওস্তাদ তুমি। সামু-দি নিরামিষটা রাঁধেন ভালো। ছোট বয়সে বিধবা—মাছমাংস ক'দিন আর খেয়েছেন। ও জিনিষে বড় ঘৃণা। বেণুধর যেটা বলছে সে জিনিষ ঘটে গেলে যাওয়ার দিক দিয়েও জুত বড্ড।

কাঞ্চন বলে, রান্না করা আর মাস্টারি করা ছাড়া আর কিছু বুঝি দেখতে পেলেন না আমরা মধ্যে ?

নিরঞ্জন বলে, আছে নিশ্চয় অনেক। আপাতত এই দুটো মনে এলো। বাইরে বাইরে থাকতে—আমি আর কতটুকু দেখেছি বলো তোমায়।

নিরতিশয় তুচ্ছ এই গ্রাম্য মানুষটার সম্পর্কে অভিমান আসে বুঝি কাঞ্চনের। গায়ের রঙে নাকি তপ্তকাঞ্চনের আভা, ঠাকুরমা সেজন্য কাঞ্চন নাম রেখেছিলেন। একদিন কলেজ থেকে বাড়ি ফিরছে, সময় গুহ সেই সময় দেখে। দেখে পাগল হল। চোরের মতন অলক্ষ্যে পিছু নিয়ে মামার-বাড়িটা আবিষ্কার করল, আলাপ জমিয়ে নিল মামার সঙ্গে। সুযোগও জুটল। সময় যে অফিসে চাকরি করে, তাদের সঙ্গে মামার অফিসের ব্যবসায়িক লেনদেন। বিলের টাকার জন্য ধর্না দিতে হয় মামার কাছে। এরই মধ্যে সময় কাকাবাবু কাকাবাবু করে জমিয়ে নিল মামার সঙ্গে। কাকাবাবুকে বাড়িতে নেমন্তন্ন করে খাওয়ায়। বেশি রকম জমে যাওয়ার পর কাকাবাবুর সঙ্গে কাকীমা এবং তাঁদের ভাগনিটিকেও নিমন্ত্রণ করে। দীর্ঘকাল ধরে অতি দুষ্কর সাধনাই সময়ের মুখে সবই শুনেছে।

এবং শুধু মাত্র সময় একলা একজন নয়। মামা সম্বন্ধ জুটিয়ে আনতেন—পাত্রপক্ষ থেকে পাত্রীকে নিয়ে বক্তব্য কিছু নেই, পছন্দ অপছন্দ পাত্রেরই তরফ থেকে সম্পর্কে শুনছে। এতকাল পরে এই একটা মানুষ পাওয়া গেল, কাঞ্চনের গায়ের জলুস যে দেখেনি। তবে ভরসা করা যায়, দীর্ঘকাল থাকতে থাকতে কোন এক সময় নজরে পড়ে যেতেও পারে।

মাংস সম্বরা দিল কাঞ্চন এইবার। ঘি কড়া হয়ে গিয়েছিল, কড়াইয়ের উপর ঘন করে এক ঝলক আগুন। তারপর টসবগ করে ফুটতে লাগল। হঠাৎ কাঞ্চন বলে, একটা কথা বলি নিরঞ্জন-দা। দিনকে-দিন মর্মান্তিক হয়ে উঠছে। পোস্টাপিস টিকিয়ে রাখা কিন্তু মুসকিল হবে।

নিরঞ্জন বলে, অজয় বিজয় ওরা দু-ভাই বড্ড খেপেছে। তুমি থাকো এদিকে, কেউ কিছু করতে পারবে না।

আমিই তো বড় শত্রুর—

হেসে নিরঞ্জন বলে, তাই বুঝি। নয়নাও দেখছি বটে কলকাতায় মনিঅর্ডার করা, আজকে এই মাংস রাঁধতে এসে বসা—

সে কথা কানে না নিয়ে কাঞ্চন বলে চলেছে, সব চেয়ে বেশি লেগেছেন আপনি আমার সঙ্গে। দাদার চিঠিটা দিয়েছেন তবু শেষ পর্যন্ত। বিস্তর চিঠি গাপ করেন—সে সব চিঠি আপনার পছন্দসই নয় বলে।

নিরঞ্জন ঘাড় নেড়ে প্রবল প্রতিবাদ করে : মিছে কথা, প্রমাণ দেখাও।

পিওনমশায়ের আমলে কলকাতার কত জনের চিঠি আসত।

এখনো এসে থাকে। আজকেই দিয়েছি বেণু-ধরের চিঠি। কালও দিয়েছি। পরশুদিনটা বাদ গেছে, তার আগেও কত কত দিয়েছি। কিন্তু মনে কোরো না কাঞ্চন, তোমার লোভের অন্ত নেই। কিছুতেই যেন ক্ষোভ মেটে না।

কাঞ্চন বলে, চিঠি যেন দয়া করে দেন। দিচ্ছেন যেন আপনিই। যা আসছে, প্রায়ই তো আজেবাজে। দরকারি চিঠিগুলোই মারা যায়।

সে কি আর বুঝিনে চাঁদ, সময় গুহ ছাড়া তোমার কাছে কারও চিঠি দরকারি নয়। সে চিঠি কোনদিন আসবে না—অঙ্কুরে বিনাশ হলে ফল ধরবে আর কেমন করে।

নিরঞ্জনের হাসি পাচ্ছে কাঞ্চনের এই মনোভাব দেখে

সত্যি সত্যি হেসে না ফেলে। কাঞ্চন তো ইনিয়েবিনিয়ে কত লেখে—আগে বিস্তর লিখত, জবাব না পেয়ে পেয়ে এখন কমিয়ে দিয়েছে। কিন্তু গ্রামেরও অপমানবোধ আছে—দুঃখের নামটাই যে পাজি মানুষ কোনক্রমে মনে করতে পারল না, কাঞ্চন সেখানে রয়েছে সেই খাতিরেও নয়—তার নামের চিঠি কোনদিন গ্রামের পোস্টাপিস থেকে মেলব্যাগে উঠবে না। তা কাঞ্চনবালা, যতই তুমি কোমর বেঁধে ঝগড়া করো না কেন।

ঝগড়া অনেক দূর গড়াত, সাইকেল বাজিয়ে ইনস্পেক্টর এসে পড়তে কাঞ্চন সরে গেল। ছুটে গিয়ে নিরঞ্জন খাতির করল। সাইকেলটা নিয়ে দাওয়ার উপর তুলে রাখছে, দীনেশ না-না করে উঠল: উঠোনেই থাকুক। কাজ সেরে আবার তো এক্ষুনি চলে যাবো।

অবাক কাণ্ড। আসা-যাওয়া ইনস্পেক্টরের এই প্রথম নয়, এমন তো কোনদিন হয়নি। সাইকেল অন্ততপক্ষে এইদিনটা ছুটি ভোগ করবেই এই রীতি। ঠারে-ঠোরে নিরঞ্জন মনে করিয়ে দেয়: যা বলে গিয়েছিলেন, কোরমা রান্না হয়ে গেছে। গরম আছে, তাড়াতাড়ি চান করে নিন।

হেসে বলে, বুঝতেই পারছেন, রাঁধাবাড়া গোয়ালে। কাঞ্চন এসে রাঁধল। ওদের কলকাতার রান্নার কায়দাই আলাদা। ভাল হয়েছে, বড় সুন্দর বাস বেরিয়েছে।

কিন্তু দীনেশ রাতারাতি একেবারে নিলোভ পরমহংস হয়ে গেছে। বলে, আপনারা যাবেন, আমার সবর হবে না। তালা খুলুন অফিসের—কাজের জন্য এসেছি, তাই হোক।

তালা খুলতে গিয়ে ঠাহর হল, হাত কাঁপছে নিরঞ্জনের—চাবি ঠিক মতো তালার ভিতর ঢুকছে না। পা দুটোও কাঁপছে বোধহয়। অঞ্চলের প্রভাবপ্রতিপত্তি টাকাপয়সা আছে, হামেসাই সদরে যাতায়াত, পোস্টাপিসের বিরুদ্ধে তারা গোলমাল পাকিয়ে এসেছে। কোন এক সর্বনাশের কাজে এসেছে বলেই ইনস্পেক্টর আজ খাতিরে ভিড়ছে না।

না, মিথ্যা আশঙ্কা। খাতাপত্র এগিয়ে দিতে একটু খানি উলটেপালটে ঠিক অন্যান্য বারের মতোই দীনেশ খসখস করে সই মেরে যায়। মিনিট দশেকের মধ্যেই উঠে পড়ে বলে, চলনাম পোস্টমাস্টারবাবু।

নিরঞ্জন কুণ্ঠিতভাবে বলে, বেলা তো অনেক হয়েছে। বড্ড আশা করে খিচিমটা তৈরি করলাম। সবজি চড়ে গেছে ভাত বেড়ে দিতে সেটুকু দেরি।

দীনেশ অপাঙ্গে একবার গোয়ালঘরের দিকে তাকিয়ে বলে, উপায় নেই মাস্টারবাবু। রাখালদার নেমন্তন্ন ওঁদের ওখানে যেতে হবে।

এ বেলাটা কেন নেমন্তন্ন নিলেন? ভুলে গিয়েছিলেন বোধহয়। ওদের বাড়িতে খাওয়া রাত্রিবেলা না হয় হবে।

উঁহু, অপেক্ষা করেছেন তাঁরা—

হাতঘড়ির দিকে চেয়ে দীনেশ ব্যস্ত হয়ে সাইকেলে চাপল।

এখন বোঝা যাচ্ছে, রাখালরাজ আর ললিতা ভাই-বোন দুয়ে মিলে কারসাজি করেছে। নিরঞ্জন বলেছিল রাখালরাজের কাছে, রাখাল অত ঘোরপাঁচের মানুষ নয়—কিন্তু বোন এসে শুনে নিল। বাইরে মানুষকে মুখের সুধাদ্য থেকে বঞ্চিত করা—নরহত্যার পাপ এতে অর্শায়। পাষণ্ডী ললিতা সত্যি সত্যি তাই করল ভাইকে সামনে রেখে। ভাবী বর বলে বোধহয় প্রাণে অপমান বেজেছে—কতদূর কি বলেছে, কে জানে।

নিরঞ্জন সকাতরে বলে, ভাল নলেনগুড়েরও সন্ধান হয়েছে। ভাঁড় নয়, কলসি। নীলমণি আনতে গেছে। সুজনপুরে দুপুরে তো আছেন, গুড়ের কলসি নীলমণি ওখানে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

দীনেশ আকাশ থেকে পড়ে: সে কি কথা! জিজ্ঞাসা করেছিলাম গুড় পাওয়া যায় কিনা শুধু একটা জিজ্ঞাসা। আপনারা ধরলেন, গুড় ছেড়েছি আপনাদের কাছে। সরকারি কাজে আসি, সরকার মাইনে দিয়ে রেখেছে, কাজ সেরে চলে যাব। এর পর দেখছি একগ্লাস ডেন্টার জলও এখানে খাওয়া চলবে না। কিছু নেওয়া যেমন দোষ, কিছু দিতে চাওয়াও দোষ তেমনি আপনাদের পক্ষে। তার জন্যে প্রসিকিউশন হতে পারে।

বলতে বলতে দ্রুত সাইকেল চালিয়ে ইনস্পেক্টর চক্ষের পলকে অদৃশ্য হল।

একদিন সাংঘাতিক ব্যাপার। ঠুন ঠুন আওয়াজ তুলে নীলমণি ডাক এনে যথারীতি পোস্টাপিসে ফেলল। ব্যাগের সিলমোহর ভেঙে চিঠি বের করে পোস্টমাস্টার নিরঞ্জন উপাটপ সিল মেরে যাচ্ছে। তার পরেই একেবারে চুপ।

ডাকের ব্যাগ ফেলে নীলমণি বাড়িতে খাওয়াদাওয়া করতে গিয়েছিল। খাওয়া সেরে মাদুর পাতিয়ে বেশ খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে হেলতে দুলতে আবার পোস্টাপিসে এসেছে। দেখে নিরঞ্জন চুপচাপ একভাবে টুলের উপর বসে আছে। পাষাণ হয়ে জমে গিয়েছে যেন।

নীলমণি ডাকে: অমনধারা বসে কেন নিরঞ্জন-দা, কি হল?

নিরঞ্জন চোখ খুলে তাকাল। দু-চোখে জল টলমল করছে। কথা বলতে গিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

বলে, তুই ঠিক বলেছিলি নীলমণি, পরের চিঠি পড়া পাপ। পাপের শাস্তি পেতে হয়। আজকে আমার তাই হল। কিন্তু এত বড় শাস্তি আমি ভাবতে পারিনি রে!

স্তম্ভিত নীলমণি। হৈ-হল্লা হাসিফুর্তি করে বেড়ায় মানুষটা, সে আজ হাপুস নয়নে কাঁদছে। নীলমণি ভাবে অন্য কথা—কোন সাংঘাতিক গোলমাল উঠেছে পোস্টাপিস গিয়ে। সান্ত্বনা দিচ্ছে: ঘুমিয়ে গেলে কেন? যার যাবে পোস্টাপিস উঠে। আগে তো ছিল না, সে বরং নিষ্কণ্টকে ছিলাম। ভাল ভেবেই চিঠিপত্তোর তুমি পড়ো, মজা দেখবার জন্যে নয়। লোকে না বুঝল তো থাকগে থাক চুলোয়—

বলতে বলতে থমকে গেল। সে জিনিস বোঝবার নয়। চিঠি একখানা নিরঞ্জনের চোখের সামনে—একখানা পোস্টকার্ড। অত ছোট সামান্য জিনিসটা কোন শাস্তি বয়ে নিয়ে এলো যার জন্য নিরঞ্জন ছেলেমানুষের মতো কাঁদছে। উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখে—পড়বার বিদ্যে নেই, কুচি কুচি কালো লেখাগুলো শতপদ সরীসৃপের মতো বীভৎস দেখাচ্ছে।

কি লেখা আছে নিরঞ্জন-দা।

বেশি নেই। কলেরা হয়ে মারা গেছে।

চড় চড় করে আকাশ ফেটে বজ্রপাত যেন। আবার কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে নিরঞ্জন বলে, আসল এশিয়াটিক। শেষরাত্রে হয়েছিল, দুপুরের মধ্যেই শেষ। সংকার সমিতি ভেকে শেষকাজ করিয়েছে। মেস বদল করে ছিল—খুঁজে পেতে ঠিকানা জোগাড় করে তারা এই খবর দিয়েছে। তুই ঠিক বলেছিলি নীলমণি। পিওন-মশায়ের মতন যার নামের চিঠি তার কাছে ছুঁড়ে দিয়ে তো খালাস। তারপর যা ইচ্ছে করুকগে, আমি আর তাকিয়েও দেখব না।

এতদিন নীলমণি চিঠি পড়ার জন্য ঝগড়া করেছে, আজ কিন্তু যে উল্টো কথা বলে: সুজনপুরের লোক পিওনমশায় দুবেলা বলে মাহাদরা কিছু নেই, তাঁর ছিল কেবল চাকরি। তিনি যা করবেন, নিজের গাঁয়ের ব্যাপারে তুমি সে রকম হবে কেমন করে? হাতে করে গ্রামবাসীদের কোন জিনিসটা দিচ্ছ—বিষ কি অমৃত—না দেখে দেওয়া যায় নাকি?

দেখতে গিয়েই তো সর্বনাশ। হাঁপানির টান টানেন শৈল-জেঠা—যেন যমের সঙ্গে দড়ি-টানা টানি। আত্মরাম কোনরকমে বুকের মধ্যে ধরে রেখেছেন। চিঠি হাতে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘুরে পড়বেন। এই বিষ আমি কেমন করে দিই?

কেন দেবে?

দেশলাই-বিড়ি নীলমণি সর্বদা পাটে নিয়ে বেড়ায়। পোস্টকার্ডটা টেনে নিয়ে দেশলাই জেলে দিল।

বলে, চিঠি পোড়াও বলে তোমার বদনাম। আজকে সত্যি সত্যি তাই। ঠাকুর দেখছেন, কাজটা ভাল কি মন্দ। ছেলে গেছে—বাপ এমনিই যাবেন, সামনের বর্ষা কিছুতে কাটবে না। কিন্তু তোমার হাত দিয়ে কেন সেটা হবে।

অতএব পোস্টমাস্টার ও রানার সতর্ক হয়ে আছে, মৃত্যুসংবাদ চাউর না হয়। অন্তত বর্ষাকাল অবধি—যে সময়টা শৈলঘরের হাঁপানির অবসান আশা করা যাচ্ছে।

ক'দিন পরে একটা সমস্যা নীলমণির মনে উঠল : মাসে মাসে ছেলে যে বাপের নামে টাকা পাঠাত। তার কি উপায় হবে ?

নিশ্বাস ফেলে নিরঞ্জন বলে, বেণুর মতো ছেলে হয় না। মাসের চার তারিখ কি পাঁচ তারিখ—তার ওদিকে কিছুতে নয়। শৈল-জেঠা কত যে আহ্লাদ করেন টাকা ক'টা হাতে পেয়ে।

নীলমণি চিন্তিত ভাবে বলে, তা হলে ? টাকা বন্ধ হলে তখন বেশি করে খোঁজ পড়বে। কিছুতেই আর চেপে রাখা যাবে না।

টাকা বন্ধ হলে শৈল-জেঠারই বা চলবে কেমন করে ? তাঁর দুই আফিমের খরচা—আফিমের অভাবেই তো মারা পড়বেন। বর্ষাকাল অবধিও টিকবে না। বেণুর ঠিক ঠিক টাকা পাঠিয়ে যাবে। আমিও গিয়ে মণিঅর্ডার বিলি করব।

নীলমণি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে, নিরঞ্জন কলাও করে বুঝিয়ে দেয় : মনিঅর্ডারের অসুবিধা কি ? বুড়োমানুষ তাঁর তো মণিঅর্ডারে গরজ নেই, গরজ টাকার, আমাদের আপিস থেকে বেণুর নাম দিয়ে একটা ফরম পূরণ করে এদিক সেদিক পাঁচ সাতটা শিল মেরে আমিই বিলি করে আসব। কাকনটা শয়তান, তার নজরে না না পড়লেই হল।

বুঝেছি এইবারে। নীলমণি ঘাড় নেড়ে বলে, আহা-মরি চাকরি তোমার নিরঞ্জন-দা। এমনি তো শতেক দায় পোস্টাপিসের—খরচ-খরচার অন্ত নেই। তার উপর নতুন এই পাঁচটাকা এসে চাপল। মাইনের চারটাকা হাতে পড়তে না পড়তে পাঁচ টাকার মনিঅর্ডার মাসে মাসে বিলি করে আসবে।

নিরঞ্জন প্রবোধ দেয় : তিনটে চারটে মাস মোটে—শৈল-জেঠা শ্রাবণ-ভাদ্রের ওদিকে থাকবে না। তা ছাড়া উপায় কি বল্। পোস্টাপিসের ভার নিয়ে নিজ হাতে তো নরহত্যা করতে পারিনে।

কাকন যখন বালিকা বিদ্যালয়ে, ভাল রকম খোঁজ খবর নিয়ে নিরঞ্জন সেই সময় শৈলঘরের মনিঅর্ডার বিলি করে আসে। নির্বিঘ্নে চলছে। আফিম ও দুধের জোরে যমের সঙ্গে লড়ালড়ি করে শৈলঘর বর্ষাকালটা মোটামুটি বিনা বিঘ্নে উত্তীর্ণ হলেন। বিপদ বেধেছে দানু-দি'কে নিয়ে। নতুন এই খরচা বাড়ার দরুন তাঁর দুধের টাকা বাকি পড়ে যাচ্ছে। গোলার ধান বিনু বিক্রি করে সামাল দেবে, তা-ও হতে দেবেন না তিনি।

নীলমণিরও ঠিক সেই আপত্তি : উঃ, কত জমির জমিদারি তোমার ! সাকুল্যে দুই বিঘে। ধান বেচে কি উপোস করে মরতে চাও ? তুমি মরলে পোস্টাপিসও উঠে যাবে, সেটা কিন্তু খেয়াল রেখো। এ চাকরি অন্য মানুষে নেবে না।

নিরঞ্জন খিঁচিয়ে উঠল : ধান না-ই বেচলাম, উপায় একটা তো বলবি ?

উপায় নীলমণিও ভেবে পায় না : কামারের হাপরের মতো দিনরাত্তির তো শাঁ শাঁ করে শ্বাস টানেন—কোন সুখে বেঁচে থাকেন বুঝিনে। দেখা যাক পৌষ অবধি। শীতেও যদি না মরেন তো লাঠির ঘায়ে মাথা কাটিয়ে আসব। পুত্রশোকটা তবু তো পেতে হল না বুড়োমানুষের।

মাসে মাসে মনিঅর্ডার পেয়ে শৈলঘর পরম সোয়াস্তিতে আছেন—কুশলে না থাকলে ছেলে টাকা পাঠায় কি করে ? কিন্তু কাকনের উল্টো—তার চাই চিঠি। টাকা পাঠাক আর না-ই পাঠাক, দাদা তাকে চিঠি দেবে। দেখা হলেই ইদানীং সে বড় বড় চোখ দুটো তুলে নিরঞ্জনের দিকে কটমট করে তাকায় : দাদার চিঠি আসে না কেন ?

আমি তার কি জানি ?

আমি জানি, কেন আসে না। যা দাদা লেখে, সে জিনিষ আপনার পছন্দ নয়। চিঠি তাই পুড়িয়ে ফেলেন।

নিরঞ্জন রাগ করে বলে, আমার চেয়ে ঢের ঢের বেশি জানো দেখছি।

কি লেখে দাদা, তা-ও জানি। চিঠি দেখিনি, তবু বলে দিতে পারি। বিজয়ের সঙ্গে বিয়ের এক্ষুনি তার অমত ছিল। বাধাও ছিল পনের টাকার জন্য। সরকার গিন্নি কাশীবাসী হয়ে পনের বাধা চুকেছে। বাবার কাছে হত্যে দিয়ে পড়ে দাদার নামে বিজয় চিঠি লিখিয়ে নিয়েছে। আপনাকে বিশ্বাস নেই, সে

চিঠি সুজনপুরের ডাকে দিয়ে এসেছে। জবাব না পেয়ে পর পর তিন-চারটে চিঠি দিল। কিন্তু আপনি থাকতে জবাব পৌঁছবে কি করে? জবাব পাওয়া যায় না বলেই আরও নিঃসন্দেহ দাদার এখনকার মতটা কি।

নিরঞ্জন অবাক হয়ে শোনে। অজয়ের বউয়ের সঙ্গে তুমুল কাড়াকাটি হয়ে জয়মঙ্গলা কাঁদতে কাঁদতে কাশীধামে ঈশ্বর ও স্বামী সঙ্গ লাভের জন্য চলে গিয়েছেন, এই মাত্র জানা। তার পরেও ভিতরে ভিতরে এত কাণ্ড চলছে—মৃত বেপুধরের নামেও এত সব চিঠিচাপাটি—তবে খবর মোটের উপর খারাপ নয়—বিজয়ের বউ হয়ে কাঞ্চনকে দুধসরেই আটক থাকতে হবে, বালিকা-বিদ্যালয়ের পক্ষে ভালোই সেটা।

একেবারে নিঃসংশয় হবার জন্য তবু একটু বাজিয়ে দেখতে চায়: সকলের মত আছে বুঝলাম, তোমার নিজের মতটা কি কাঞ্চন? বলি, রানীশঙ্করী লেনের ভূত নেমেছে ঘাড় থেকে?

আর যাবে কোথা। কেউটেসাপের মতো ফণা তুলে ওঠে যেন কাঞ্চন। গর্জন করে উঠল: তবে, তবে? আপনি জানলেন কি করে সেখানকার কথা? তবে যে চিঠি খুলে পড়েন না, চিঠি পোড়ান না। বছর ধরে যত চিঠি এসেছে, আপনি সমস্ত গাপ করেছেন। ভেবেছেন কি মনে মনে—জেলের কয়েদির মতো আটক করে রেখে যা-ইচ্ছে তাই করবেন? তেমন প্যানপেনে মেয়ে পাননি আমায়।

বলতে বলতে কণ্ঠ রোধ হয়ে যায়—হয়তো বা কান্নায়। ঝড়ের মতো কাঞ্চন ছুটে বেরুল। ভূত ছাড়ে নি তা হলে। ভূতেই করাচ্ছে।

সুজনপুর পিওনমশায়ের বাড়ি মাস দুয়েক ধরে বড় বিপদ যাচ্ছে। মা-শীতলার অনুগ্রহ। প্রথমে রাখালরাজ পড়ল গোড়ায়। রাখাল শুয়ে শুয়ে করেকটা সই করে দিত, ভাইয়ের কাছে জিজ্ঞাসা বাদ করে সাব অফিসের কাজ-কর্ম ললিতা চালিয়ে যেত, চিঠিপত্র টাকাকড়ি ভিপি-রেজেস্ট্রির যাবতীয় বিলিবন্দোবস্ত। ক্ষয়তা ধরে বটে মেয়েটা। ফাইন্যাল পাশ করেছে, কলেজে পড়বার সুযোগ সুবিধা হয় নি। চুপচাপ বাড়িতে আছে—আগামী বছর আবার চেষ্টা দেখা যাবে, যদি না বিয়ে থাওয়া হয়ে যায় এর মধ্যে। কিন্তু সংক্রামক ব্যাধির যা নিয়ম—একজনে রেহাই হবে না, ললিতাও পড়ল ক'দিনের মধ্যে। এবং ক্রমশ বাড়ির সকলেই। এমন অবস্থা যে জলটুকু এগিয়ে দেবার মানুষ নেই। সদরের হেডঅফিস থেকে লোক এসে আপাতত পোস্টাপিসের ভার নিয়েছে। নীলমণির সঙ্গে সেই সময় বন্দোবস্ত হল, ডাকের ব্যাগ দুধসরে ফেলে দিয়েই আবার সুজন-পুর চলে যাবে। রাত্রে থাকবে সেখানে। সেই বড় দুঃসময়ের দিনে এরা বড্ড করেছে।

এখন মোটামুটি ভাল। সকলের আরোগ্য-স্নান হয়ে গেছে—কিন্তু মায়ের অনুগ্রহের ধাক্কা সামলানো সহজ নয়, শরীর ঠিক হতে এখনো দু'তিন মাস। রাখাল-রাজ এখন পোস্টাপিসে গিয়ে বসছে—কোন রকমে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, এই পর্যন্ত।

এমনি সময় নীলমণি একদিন ডাকের ব্যাগের সঙ্গে আলাদা এক খামের চিঠি এনে দিল নিরঞ্জনের হাতে। রাখালরাজ লিখেছে। সন্ধ্যার পর আজকে যেন সুজনপুর চলে আসে। বিষম বিপদ।

উদ্বিগ্ন হয়ে নিরঞ্জন বলে, আবার কাকে ধরল? সবাই তো ফুসে উঠেছে—বসন্ত একবার হলে সে-মানুষের আর হয় না।

নীলমণি ঘুষ্ট বুঝে বলে, হয়েছে তোমার এবারে। এত করে বলি, মাতব্বরি করে তো কেবল ঘরচান্ত—ছাড়ো ওসব। পিওনমশায় যেমন চল্লিশ বছর চালিয়ে গেলেন, সেই নিয়মে কাজ করে যাও। কানে নিলে না, সামলাও ঠ্যালা এইবারে।

ব্যাপার না বুঝে নিরঞ্জন সপ্রশ্ন চোখে তার দিকে তাকাল।

নীলমণি বলে, রানার মানুষ—আমার কি বলতে যাবেন তিনি? জরুরি চিঠি দিতে বলে দিলেন। তবে বোনটা বড় ভাল। আহা, মা-শীতলা কী চেহারা করেছেন—মুখের দিকে চাওয়া যায় না। চলে আসছি, হাতছানি দিয়ে ডাকল। বলে, তোমাদের পোস্টমাস্টার বাবুর যে চাকরি থাকে না। ঘরঘাস্ত পড়েছে।

নিরঞ্জন বিশ্বাস করে না : দুধসরের মানুষ আমার নামে দরখাস্ত করতে পারে—হতে পারে না।

নীলমণি বলে, ললিতা কি মিছে কথা বলল ? ভালো মেয়ে—সে এমন করবে না। তা হলেও সুজনপুরের মেয়ে যখন, আমি কেন খাটো হবো তার কাছে ? ডক্কা মেরে জবাব দিলাম : চাকরি না থাকে তো বয়ে গেল। নিরঞ্জন-দা পরোয়া করে না। বাইমে যা, চাকরির দরুন খরচখরচা তার তিন-চারগুণ।

নিরঞ্জনকে কিন্তু চিন্তান্বিত দেখাচ্ছে।

নীলমণি বলে, বড় মিথ্যেও বলিনি ভেবে দেখ। চাকরি গেলে আপদ যায়, ধান বিক্রি করে তখন আর সানুদির মুখঝামটা খেতে হবে না।

নিরঞ্জন বলে, কিন্তু নতুন পোস্টমাস্টার পাবি কোথায় তোরা ? পায়ে ধরে সাধলেও কেউ চাকরি নেবে না। পোস্টমাস্টার অভাবে তুলে দেবে আপিস। আমি কেবল তাই ভাবছি। দরখাস্তে পোস্টাপিস হয়েছে—দুধসরের মানুষ এত আত্মোন্নতিক কে আছে, দরখাস্ত করে সেই জিনিস আবার তুলে দিতে যাবে ?

সেইসব দেখাবেন হয়তো। সেই জন্যে ডাক পড়েছে। দেখে চক্ষু সার্থক করে এসো। কাকনে আর বিজয়ে বড় কিসকিসানি। আমার চোখ এড়ায় না। বিয়ে হবে নাকি দুটোর—ভাবলাম, তারই ফিস্টিনস্টি। পালের গোদা ওরাই, এবার বুঝতে পারছি। যাক্ যখন সুজনপুর দেখে এসো তাই কিনা।

রাখালরাজ বারান্দায় বসে পথ তাকাচ্ছিল। বলে, শরীর দুর্বল, অন্যদিন এতক্ষণ শুয়ে পড়ে বিশ্রাম নিই। তা হতে দেবে তোমরা ? আমার জীবন শেষ না করে ছাড়বে না। কী সব কাণ্ড করেছ—সুপারিনটেন্ডেন্টের কাছে দরখাস্ত করেছে তোমার গ্রামের লোক। একগাদা নালিশ।

নিরঞ্জন মরমে মরে যায়। দুধসরের মানুষ বিরুদ্ধে গেছে, এমন কথা শুনতে হল সুজনপুরবাসীর কাছে। লোক রাখাল পরম সুহৃৎ, কিন্তু সুজনপুরের লোক তো বটে।

রাখাল বলে, দীনেশ এসেছে, তার উপর এন-কোয়ারির ভার। কাল বিচার তোমার—দুধসর গিয়ে লোক-ডাকাডাকি হবে। বলি, মানুষটা তো চাঁদারায়—চটেমটে গিয়ে রসের মধ্যে কি বলতে কি বলে বসবে, রাত্রে নিরিবিলি একটু গড়েপিটে দেওয়া উচিত। দীনেশও বলল, হ্যাঁ। দিন্ যায় যায়, সন্ধ্যার পর সেই জন্য তোমায় আসতে লিখলাম।

নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করে, কোথায় ইনস্পেক্টরবাবু।

কাজে আছে। আবার কি ! বাবা উপস্থিত থাকতে সময়ের অপব্যয় হতে দেবেন না। এ ব্যাপারে বাবা বয়সেরও বাছবিচার করেন না।

দুজনে ঘরে ঢুকল। হ্যারিকেন পাশে রেখে কাজের মধ্যে ঘোরতর নিমগ্ন দীনেশ আর অটলপিওন। দাবার বলেছেন সূচীপতনও কানে শোনা যাবে, এমন নিঃশব্দ।

রাখালরাজ বলে, নিরঞ্জন এসে গেছে দীনেশ। ওঠো এইবার।

হুঁ—বলে ঘাড় তুলে দীনেশ একবার দেখে আবার চাল ভাবতে লাগল।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে রাখাল তাগিদ দেয় : একবার উঠে কাজটুকু সেরে দাও। ফিরে যাবে তো বেচারি এতখানি পথ।

বিরক্ত ভাবে দীনেশ এটাচিকেস ছুঁড়ে দিল : দরখাস্ত ওর ভিতরে। পড়ে নিয়ে ভালো করে। জবাব ভাকুন। যাচ্ছি আমি।

দরখাস্ত বের করে নিয়ে দুজনে আবার বারান্দায় সর্বাগ্রে নিরঞ্জন নামগুলো দেখে। প্রথম নাম কাঞ্চনমালা ঘোষ। ঠিক হয়েছে নীলমণি—লেখাপড়া না জানুক, হাবেভাবে মানুষ বুঝতে তার জুড়ি নেই। কাঁকনের নিচেই বিজয়চন্দ্র সরকার। তার নিচে অভয়। সরকারদের গোমস্তা ও মাহিন্দারগুলোর নামও পর পর চলল। জন চারেক অনুগত-আশ্রিতের নাম রয়েছে। সর্বশেষ খেয়াঘাটের মাঝি—

হি-হি করে হেসে ওঠে নিরঞ্জন : এই মাঝি বেটাকে হাজির করব কাল। ডাকের চিঠি কি রকম খেতে—মিষ্টি না ঝাল ? ইনস্পেক্টরের মুকাবেলা জিজ্ঞাসা করব। কী জবাব দেয়, শোনা যাবে।

সর্বসাকুল্যে তেরো জন। লিস্টি দেখে নিরঞ্জনের

সব দুঃখ জল হয়ে গেছে। বুকে থাবা মেরে বলে, তাই তো বলি দুঃসময়ের লোক হয়ে আমার পিছনে লাগতে যাবে? গোড়ার ঐ দুটো নাম—নীলমণি ঠিকই ধরেছে, পঞ্চতাপি ঐ দু-জনের। দুঃসময়ের আসল মানুষ ওরা নয়, বৈবাৎ উড়ে এসে পড়েছে। কলকাতার আমদানি।

ধাবলরাজ আপত্তি করে বলে, দুজন কেন বলো, করেছে এক জনেই। কাঞ্চনমালা ঘোষ। কাঞ্চনের বুশাবিদ্যা, লেখা আগাগোড়া কাঞ্চনের—ওর এই নাম-সইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখ না। এখন কিছু নয়—কণ্ঠাট চুকেবুকে গেলে এর শোধ নিও। বিয়ে দিয়ে ধুম-সিটাকে গ্রাম-ছাড়া কোরো। দেখবে, চতুর্দিক ঠাণ্ডা।

নিরঞ্জন বলে, বিয়ে তো হবেই—পরের নাম যার ঐ বিজনের সঙ্গে। ব্রাকেটে কাঞ্চনকর্ণ আগে থেকেই। কিন্তু গ্রামছাড়া হবে না—মেয়ে ছিল, বউ হয়ে আরও এঁটে বসবে। সেটা কিছু খারাপ নয়। এমনি ঘা-ই হোক, পড়ায় সত্যিই ভালো। চেষ্টা চরিত্র করে এরই মধ্যে বেশ খানিকটা জমিয়ে তুলেছে।

মূল-দরখাস্ত দেখছে এবারে। দফায় দফায় অভিযোগ। নতুন কোনটাই নয়। চিঠিপত্র ঠিক মতো বিলি হয় না, বহু চিঠি নষ্ট করে ফেলে (এই সেদিনও একটা নষ্ট করেছি কাঞ্চন বেণুর মেসের লোক শৈল-জ্যেঠার নামে যে চিঠি পাঠিয়েছিল)। যত চিঠি ডাকবাক্সে পড়ে, তার মধ্যেও বাছাই করে পাঠাব কী করি! (বালিকা-বিদ্যালয় অকূলে ভাসিয়ে কুড়ুত করে তুমি যে উড়ে পালাতে চাও)। একের চিঠি অন্যের ঠিকানায় বিলি করে যার জন্যে ক্ষতি-লোকসান হয়, মানুষের (ক্ষতি-লোকসান অজয়-বিজয়ের, হারাধন বাড়া রক্ষে পেয়ে গেল আমার এই ভুলের জন্য)। মানি-পোস্টকার্ড প্রায়ই থাকে না পোস্টাপিসে কুরিয়েছে জানালেই আগের মূল্য শোধ করে দিতে হবে, কিন্তু ক্যাশ ভাঙার দরুন মূল্য শোধের উপায় থাকে না (ক্যাশ ভাঙা নয়, ধারবাকি খদ্দেরের কাছে। যারে বেলাধে সব চিঠি পেলাতে আসে, শখের চিঠি একটাও নয়—নগদ পয়সা নেই বলেই ছাকিয়ে দিতে পারিনে দুঃসময়ের মানুষ)।

আরও আছে। নিতান্ত আজেবাজে সেগুলো। দরখাস্ত বড় করার জন্য লিখেছে। যেমন: পোস্টাপিস খোলার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই (ঘড়ি ধরে পোস্টাপিস কেন খুলিনে? ঘড়ির তোয়াক্কা রাখিনে আমরা পাড়া গাঁয়ের লোক। ঘড়ি ক'জনার আছে শুনি। কলকাতার বাবু-মেয়ে ছিলে কাঞ্চনমালা সেই আমলের পুরানো ঘড়ি তোমারই একটা থাকতে পারে)। যেমন: আলাদা ঘর নেই পোস্টাপিসের, সরকারি অফিস বলে চেনাই যায় না। পোস্টমাস্টার নিরঞ্জনের ঘরের দাওয়ায় অস্থায়ী বেড়া বেঁধে কাজ চলছে। চোর-ডাকাতে ইচ্ছে করলেই বেড়া ভেঙে ফেলতে পারে। (পারেই তো বেড়া ভাঙতে। ভাঙতে যাবে কোন লোভে—ভেঙে তো কুলো-ডুমুর। ব্যাগে ভরে পাঠিয়েছিলে, মনে নেই রাখাল?)

খেলা শেষ করে উঠে ইনস্পেক্টর দীনেশ এতক্ষণে বাইরে দেখা দিল। সে ও রাগে: ওরে বাবা, এখনো যে পাঠ চলেছে! চাকরি তো চারটাকার, তার বিরুদ্ধে আস্ত একখানা মহাভারত! যাদের নাম সই আছে, তদন্তের সময় কাল সকলকে ডাকব। দাবড়ি দিয়ে আসব আচ্ছা করে। চিঠি পড়ে তো কি হয়েছে—চোখ থাকলেই পড়ে থাকে, কানা আর মুখ্যুমানুষে

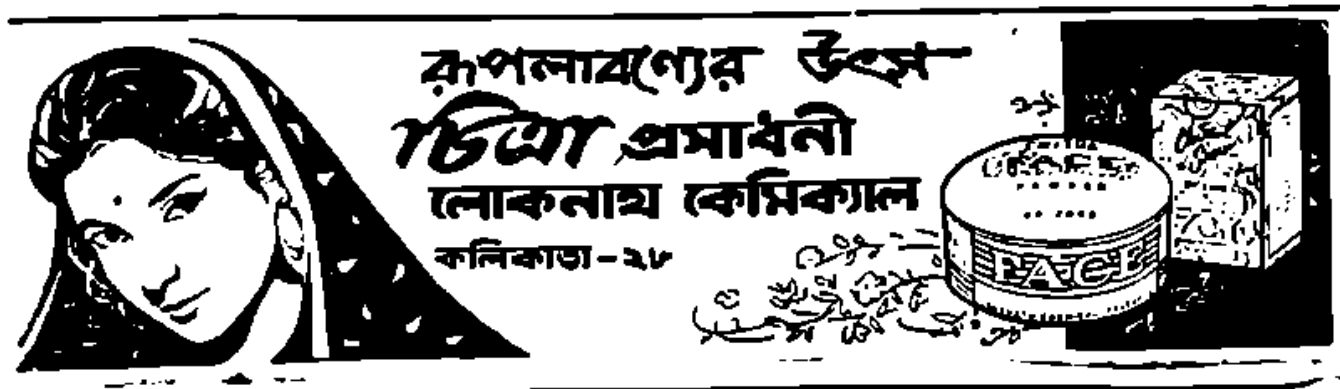

কেবল পড়ে না। হাতের উপর দিয়ে কোন জিনিসের চলাচল, উঁকি না দিয়ে পারা যায়? এতই যদি আত্মসংযম থাকবে, তবে তো পোস্টমাস্টার না হয়ে সাধু পরমহংস হবার কথা। চারটাকা বদলে খাটি পরমার্থ।

নিরঞ্জনকে বলে, খবরটা তো দেখলেন, এই জন্যে ডেকেছিলাম। চলে যান, গালে হাত দিয়ে ভাবনার কিছু নেই। মাকড় মারলে ধোকড় হয়। তেড়েফুঁড়ে সকলের সামনে বেকবুল যাবেন। কিছু দাকাই-দাকি ঠিক করে রাখবেন, যদি সম্ভব হয়।

নিরঞ্জন সগর্বে বলে, সম্ভব হবে না মানে? দুবেলের সবাই আমার পক্ষে। এরা ক'জন উড়ো আপদ।

ও বৌদি, ও ললিতা, সাড়াশব্দ পাইনে যে! রাগ করে শুয়ে পড়লেন! দাবা তুলে ফেলেছি, ভাতটাত দিন এইবারে—

বলতে বলতে দীনেশ পেয়ারাতলায় কুয়োর ধারে মুখ হাত ধুতে গেছে। বাড়ির ছেলে হয়ে গেছে একেবারে।

নিরঞ্জন বলে, বড্ড স্ফূর্তি দেখছি যে। দাবায় জিত হয়েছে ঠিক।

মুখ টিপে হেসে রাখালরাজ বলে, দাবায় চেয়ে ঢের ঢের বড় জিত। বিয়েটা অনেক দিন ধরে ঝুলছিল। দীনেশের মায়ের দজ্জাল বলে বড় বদনাম—বাবা সেজন্যে দোমনা ছিলেন। আজ বাবা সম্পূর্ণ মত দিয়েছেন। শুভকর্ম আসছে মাসে।

দুবেলের পরের দিন তদন্তে গিয়ে কিন্তু ইনস্পেক্টরের সম্পূর্ণ ভিন্ন মূর্তি। মুখ থমথম করছে। কারণে অকারণে ধমক দিয়ে ওঠে নিরঞ্জনের উপর। নিরঞ্জন ভ্রূক্ষেপও করে না। বাইরের মূর্তি এটা—অভিনয়। বিচারক হয়ে এসে আগামির সম্পর্কে এমনি ভাবই দেখাতে হয়, কারো মনে বিচার সম্পর্কে যাতে সন্দেহ না ওঠে।

প্রথম যার সই কাঞ্চনমালা ঘোষের ডাক পড়ল। অভিযোগ লিখে পাঠিয়েছেন, মুখে এসে বলে যাবেন। প্রমাণ হাতে থাকলে তাও নিয়ে আসুন।

কাঞ্চন নেই, কালই কলকাতা চলে গেছে। দোমোহনির ঘাট অবধি সঙ্গে গিয়ে বিজয় নিজে পেয়ারের নৌকোয় তুলে দিয়ে এসেছে। বলে, আপনি আসবেন ইনস্পেক্টরবাবু, কেউ তো জানে না। জানলেও থাকার উপায় ছিল না তার। এক বান্ধবীর বিয়ে, সেই উপলক্ষে কলকাতা গেল। কাঞ্চনকে যদি জিজ্ঞাসাবাদ করতে হয়, আপনাকে আবার একদিন পায়ের ধুলো দিতে হবে।

নিরঞ্জন স্তম্ভিত। ইস্কুল বন্ধ দিয়ে কলকাতা গিয়ে বেহুঁল, বালিকা-বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি—তাকে একটা মুখের কথা জানিয়ে গেল না। অরাজক অবস্থা একেবারে। আসুক ফিরে, কৈফিয়ৎ চাইবে।

নীলমণি বলে, ঘোড়ার ডিম, চাকরি ছেড়ে দেবে, বুঝো ঠেলা তখন। তোমার চাকরি আর কাঞ্চনের চাকরি একই রকমের নিরঞ্জন-দা। চাকরি কেঁদে কেঁদে বেড়ায়, তুলে নেবার লোক জোটে না।

কাঞ্চন অনুপস্থিত। অতএব পরের জন বিজয়কে নিয়ে পড়েছে ইনস্পেক্টর দীনেশ। বিজয় যা-খুশি তাই বলে যাচ্ছে, যত রাগের শোধ নিচ্ছে। নিরঞ্জন বাধা দিতে গেলে দীনেশ দাবড়ি দিয়ে তাকেই থামিয়ে দেয়: কথার মধ্যে কথা বলেন কেন, চুপ করে থাকুন আপনি।

আধখানা সত্যের উপর সাড়ে-পনের আনা রং ফলিয়ে বলে যাচ্ছে—ক্ষমতা আছে বটে বিজয়ের, দিব্যি গালগল্প বানাতে পারে তো! নিরঞ্জনের মতো দায়িত্বহীন নৃশংস মানুষ দ্বিতীয় নেই—দুবেলের গ্রামবাসী দু'কান পেতে অবাধে শুনে যাচ্ছে। নীরব থাকতে হবে শুধু নিরঞ্জনের—অথচ কাল রাত্রিবেলা ঠিক উল্টো রকমের কথা বলেছিল এই দীনেশ। যা-কিছু ওরা বলবে, দলে দলে তেড়েফুঁড়ে প্রতিবাদ করার উপদেশ।

হতভম্ব হয়ে যে দুহৃৎ রাখালরাজের দিকে তাকায়। তদন্তের ব্যাপারে রাখালও এসেছে—ব্রাঞ্চ-অফিসে আর

পূজার প্রীতি সম্ভাষণ

হরিপদ সামন্ত

ছাপাখানার যাবতীয় কাঠের আসবাবপত্র প্রস্তুতকারক।

১২৮।১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট।
কলিকাতা-১২

সাবজাক্সে অনিষ্ট লেনদেনের সম্পর্ক—সাব-পোস্টমাস্টার হাজির থেকে অনেক ব্যাপারের হদিস দিতে পারবে।

রাখালের দিকে করুণ চোখে চেয়ে নিরঞ্জন বলে, অমন মারমুখি কেন বলো তো? উনি নিজে কাল আমায় উল্টো রকম শিখিয়ে দিলেন।

তুমি চলে এলে—মানুষটাই তার পরে উল্টে গেল। বোন একেবারে সর্বনাশ করে দিয়েছে। রাত্রে কেউ আমরা ঘুমোই নি। বাবা তো অবিশ্রান্ত গালি পাড়ছেন ললিতাকে।

ঘরের গ্রাস থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে মেয়েটির সামনে অফুরন্ত উল্লাসের দিন। কতকাল ধরে প্রত্যাশা, সত্যি সত্যি তাই আসে তার জীবনে। ঠিক সেই মুহূর্তটায় কী পাগলামি মাথায় চাপল, সর্বনাশী নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারল।

তবুও ঘোর বেগে চলেছে যা হয় হোক গে, ললিতার কথা না শুনে নিরঞ্জনের স্বোয়াস্তি নেই।

কী করেছে ললিতা?

রাখাল বলে, বাড়িশুদ্ধ লোকের মাথা-ভাঙাভাঙি, একগুঁয়ে মেয়ে কানে নিল না। বলতে একটা চোখ নষ্ট হয়ে গেছে, বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না। বিয়ের কনে বলে আমরাও ঘুণাক্ষরে প্রকাশ হতে দিই নি। কিন্তু নিজেই সে উপযাচক হয়ে দীনেশের কাছে ফাঁস করে দিল: আমি কানা, এত বড় খুঁত গোপন করে জুয়াচোর হয়ে পরের ঘরে যাবো না। দীনেশের মা যা একখানা চিজ, কানা-বউ কখনো ঘরে নেবেন না। কে নিতে যাবে? দেবতারা অবধি খুঁতো-পাঁঠায় বলি নেন না। আইবুড়ো হয়ে চিরকাল বাপের ভাতে পড়ে থাকতে হবে। দীনেশের সেইজন্যে আজ মন মেজাজের ঠিক নেই।

এক পক্ষের কথাই দীনেশ অবিশ্রান্ত শুনে যাচ্ছে। ভিন্ন ঠিকানায় চিঠি বিলি সম্পর্কে হারাধন কি বলতে গিয়েছিল, তাড়া খেয়ে চুপ করল: ঢের হয়েছে, আর কিছু কাউকে বলতে হবে না। ঘাস খাইনে আমি, বুঝতে কিছু বাকি নেই। আমার যা লিখবার লিখে পাঠাই। উপরে তদ্বির করতে পারেন আপনারা। সুপারিনটে-

স্টেন্ট নিজেই হয়তো আসবেন, যা বলবার তাঁর কাছে বলবেন।

বিষয় রেগেছে, নিরঞ্জনের এত কালের তোরাজে ভস্মে ঘি ঢালা হয়েছে। বলে, এত সমস্ত সাংঘাতিক অপরাধের পর নিরঞ্জনবাবু কিছুতে আর পোস্টমাস্টার থাকতে পারেন না। এগ্রপেরিয়েন্টাল পোস্টাপিস আপনাদের —এমন গোলমেলে অবস্থায় পোস্টাপিস পাকা হতে পারে না, একথা রিপোর্টে আমি লিখব।

মুহূর্তে গ্রামবাসী সকলের দিবাস্বপ্ন এসে যায় সই যারা করেছে, তারা পর্যন্ত আঁতকে ওঠে। পোস্টাপিস দুধসরে ছিল না, সে একরকম। একবার বসে যাওয়ার পর সে জিনিষ টিঁকিয়ে রাখতে পারল না—এর পরে তো গায়ে থুতু দেবে সুজনপুর। পোস্টমাস্টারির বকল সওয়ার মানুষই বা কই নিরঞ্জন ছাড়া? এতখানি কেলেঙ্কারি যখন ঘটালে, কাজটা তুমিই তবে নিয়ে নাও গো বিজয়।

শতকণ্ঠে বিজয় দুষছে। নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে না নিয়ে সুপারিনটেণ্ডেন্ট অবধি দরখাস্ত ছাড়ার কি দরকার ছিল? এখন আর দলবেদল নেই, সবশুদ্ধ মিলে ইনস্পেটরকে ধরাপাড়া করছে কলম এবারটা চেপে নিল। আবার যদি কখনগণ্ডগোল হয়, তখন যেহাই করবেন না।

মুরুব্বিরা বলছেন, নিরঞ্জন ছেলেটা সত্যি ভালো। গ্রামের চূড়ামণি। বড্ড দরদি—বরফটাই কাল হয়েছে। এখন থেকে আমরা খুব নজরে রাখব। নিরঞ্জন, তুমি বাবা একবার গিয়ে হাও—এমন ধারা আর কখনো হবে না। দুধসরের মুখ চেয়ে করো এইটে বাবা।

নিরঞ্জন রাজি। জলচৌকিতে বসে ছিল, উঠে দাঁড়িয়ে গলা খাঁকারি দিল একবার। একউঠান মানুষের মধ্যে গলা তবু কেঁপে যায়। বলে, ভাই হবে। পোস্টাপিস বজায় থাকুক, আমিই না-হয়, আর মানুষ থাকলাম না। ডাকবাক্সে যা-কিছু পড়বে চোখ বুঁজে পাঠিয়ে দেবো। মেলব্যাগে যা-কিছু আসবে পৌঁছে দেবো আর শুনে রাখ সকলে, নগদ পয়সা ছাড়া খাম-পোস্টকার্ড বিক্রি বন্ধ। কেল কড়ি মাখ তেল। তাতে মামলা খারিজ হল কি ছেলের চিকিচ্ছা আটকে গেল, আমি কিছু জানিনে। পোস্টমাস্টারের জানার এক্তিয়ার নেই।

মিটমাট হয়ে গেল। দরখাস্তের পিঠে বিজয় নিজের হাতে লিখে দিল, নিরঞ্জন পোস্টমাস্টার থাকবে; গ্রামবাসী সকলে এ বিষয়ে একমত।

দিন আষ্টেক পরে কাঞ্চন কলকাতা থেকে ফিরে এলো। বন্ধুলার বিয়ের পিঁড়েছিল, এসেই তার শ্বশুর-বাড়ির ঠিকানায় দীর্ঘ এক চিঠি। কেমন আছিস ভাই বন্ধুলা? বর কী সব বলে এখন? কে কার কাছে জব্দ তোর কাছে বর, না বরের কাছে তুই? চিঠির মধ্যে এমনি হাসাহাসি বিস্তর। হঠাৎ তারপরে সুর পালটে যায়—হাসতে হাসতে কেঁদে পড়েছিল বুঝি কাঞ্চন, বিশ্বাস করে চিঠির পাতায় অশ্রুচিহ্ন ও বুঝি পাওয়া যাবে—

ভাই বন্ধুলা, কলকাতা গিয়ে এবারে একটি মানুষ চিনে এসেছি। পুত্রশোক থেকেআমার বাবাকে তিনি রক্ষা করেছেন। দাদা তাঁর বড্ড আপন ছিল—দাদার জায়গা নিয়ে মাসে মাসে ঠিক নিয়মে বাবার হাতখরচা পাঠিয়ে আসছেন। দাদা নেই, কলকাতা না গেলে কোন দিন হয়তো জানতে পারতাম না।

সেই মানুষকে অপদস্থ করলাম ভাকের চিঠি পড়েন বলে। অকূল জুড়ে জেনে গেল, অমন খারাপ মানুষ দুটি নেই। রানীশঙ্করী দেনের সঠিক খবর এতদিন না জানতাম, ওঁর উপরেই আক্রোশ পুষে বেড়িয়েছি। এবারে সমরের আসল মূর্তি বুঝে এলাম—মানুষ নয়, একটা গ্রামোফোন-রেকর্ড। একই কথা সকলের কাছে সুর করে বাজিয়ে যায়। মন বলে বস্তুই নেই—তাই কোন-টাই মনের কথা নয়, মিষ্টি কথা। তোকেও ঐ জিনিষ শোনাতে গিয়েছিল—বুদ্ধিমতী তুই বন্ধুলা, চালাকি ধরে ফেললি। আমিও বেঁচে গেলাম—মামার-বাড়ি ছেড়ে ভাগ্যিস এই গ্রামে আসতে হল। খুব সম্ভব চিঠিই আর লেখে নি সমর—আর যদি সত্যি সত্যি তার চিঠি নষ্ট করে থাকেন, কৃতজ্ঞ আমি ঐ মানুষের কাছে। রাক্ষসের কবল থেকে বাঁচিয়েছেন।

আচ্ছা বন্ধুলা, কী করি আমি বল্‌তো। মানুষটির দু পায়ে মাথা গুঁজে আজ কাঁদতে ইচ্ছে করছে। সত্যিই যদি তাই করে বসি, তিনি কি লাথি মেরে সরিয়ে দেবেন? না পারবেন না কিছুতে। মানুষকে কষ্ট দেবার ক্ষমতাই

ভাঁর নেই। সাহস আমারই হবে না—লোকে কি বলবে, তিনিই বা কি ভাববেন।

চিঠি লিখতে লিখতে আবোলতাবোল ভাবনা মনে আসে। ভাবনার মুখে লাগাম পরানো যায় না। ভাবতে ভালো লাগছে, এই চিঠি কোন ক্রমে পড়ে ফেললেন সেই মানুষটি। বাবার কাছে এসে বললেন, বেণুবনের মতন আর এক ছেলে হতে চাচ্ছি আপনার। কিন্তু অত ঘাপ্পামে কাজ কি—পুরুষ হলেও লজ্জা করে বই কি। কিছুই বলতে হবে না,—শুধু আসবেন বাবার কাছে, এসে প্রণাম করবেন। তাইতে আমি বুঝে নেবো—সমস্ত দায়ভার তারপরে আমার উপর। মনস্থির করে ফেলেছি তাই মঞ্জুলা। চিঠি এই ডাকবাক্সে ফেলছি—প্রত্যাশা করে থাকব, আজ কাল আর পরশু তিন দিনের মধ্যে কোন এক সময় তিনি বাবার কাছে এসে যাবেন।

মঞ্জুলার জবাব এসে পৌঁছাল। খাম উল্টেপাল্টে দেখে কাঞ্চন। খোলা হয়েছে তার চিহ্নমাত্র নেই। পড়েনি এ চিঠি নিরঞ্জন। গর্ব হওয়ার কথাই বটে—এক দরখাস্তে মানুষটার পাসন হয়ে গেল। পরের চিঠি পড়া সত্যিই তো অন্যায়—চুরি করে মানুষের গোপন কথা শোনার মতো।

মঞ্জুলার চিঠির মধ্যেও ঠিক এমনি ধরনের কথা। তোর কাছে শোনা ছিল কাঞ্চন—খাম খোলার আগে ভাল করে তাই দেখে নিলাম। কক্ষনো খোলেনি তোর চিঠি—মানুষটার নাম মিছামিছি তোরা বদনাম দিস। পায়ে ধরে ক্ষমা চাইবি। যে কথা তুই লিখেছিস—আলতা চুলের গোছা দিয়ে সত্যি সত্যি পোঁছে মানুষটার পায়ের কাদা মুছে দিবি। লাথির ভয় করিস নে, পুরুষ হয়ে তোর মতন মেয়েকে কেউ লাথি মারে না, বরঞ্চ অন্য রকম করে। কাঠ-পাথর হলে অবশ্য আলাদা কথা। আর সত্যি সত্যি মারেও যদি লাথি পাপমুক্ত হয়ে তুই তো উদ্ধার হবি ভাই।

চিঠি খামে ভরে রাগে গর গর করতে করতে কাঞ্চন নিরঞ্জনের কাছে গিয়ে পড়ে: মঞ্জুলার চিঠি কেন আপনি খুলে পড়লেন?

কে বলেছে, কেমন করে জানলে তুমি? আকাশ থেকে পড়ে নিরঞ্জন: কখনো না, কখনো না। অনেক তো হয়ে গেছে, রেহাই দাও এবারে। চিঠি পড়ি নি, কোন চিঠিই পড়ব না আর কোন দিন।

কাঞ্চন গর্জন করে উঠল: কেন পড়বেন না তাই জিজ্ঞাসা করি? ভয় পেয়ে? শরীরের রক্ত জল করে দু-হাতে পয়সা ছড়িয়ে কে গড়ে তুলেছে পোস্টাপিস? আজেবাজে লোকে কোথায় কি নিন্দেমন্দ করল, তার জন্যে হাত-পা গুটিয়ে অমনি ঠুঁটো-জগন্নাথ হয়ে গেলেন। ছিঃ ছিঃ—

মুখের নিন্দেমন্দই শুধু নয়, কাঞ্চন হেড-অফিসে দরখাস্ত পাঠিয়েছিল। তুমি ছিলে না সেদিন—পোস্টাপিস উঠে গিয়ে প্রায়ের বেইজ্জতির অবস্থা হয়েছিল।

অবাক হয়ে নিরঞ্জন কাঞ্চনের রোষরক্ত মুখের দিকে তাকাল। বলে, রাগ করছ, কিন্তু তুমিই তো পয়লা নম্বরের পাণ্ডা। দরখাস্ত সবাই দেখেছে। তোমার নাম সকলের আগে, হাতের লেখা তোমারই।

কাঞ্চন বিন্দুমাত্র লজ্জিত নয়। সমান তেজে বলে, হবেই তো! মানুষ চিনলাম কবে, ধারাগমতা আসবে কিসে? শহরের উপর মামার-বাড়িতে মামার টাকায় নেচেকুঁদে বেড়িয়েছি। আর ভালো ভালো বুলি শিখেছি কয়েকটা। কিন্তু গাঁয়ের মানুষ আপনি কেন শহুরে শুকনো-রং নিতে যাবেন? আমাদের সঙ্গে আপনার তবে তফাৎ রইল কোথা?

ম্লান হাসি হাসল নিরঞ্জন: রাগের মধ্যে বলে ফেলেছি, পোস্টাপিস বজায় থাকবে, আমিই আর মানুষ থাকব না।

ঠিক তাই। আপনি আর মানুষ নন নিরঞ্জন-দা, পোস্টমাস্টার—চার তক্তা বাইরে। হাত পেতে সেই বাইরে যেওয়া, আর দুবেলা পোস্টাপিসের গরব নিয়ে বুক ফুলিয়ে বেড়ানো—এ ছাড়া সমস্ত গেছে আপনার।

চোখে আঁচল দিয়ে কাঞ্চন ছুটে পালাল।

ঝগড়াঝাটি করে কাঞ্চন চলে গেল, ঘণ্টা দুই পরে আবার এসে হাজির। ডাক পাঠানোর সময় হয়ে এলো, পোস্টাপিসের ভিতরে নিরঞ্জন সেই ব্যবস্থায় আছে, দুমদুম করে ধরা কাঁপিয়ে সোজা সে ঘরে ঢুকে পড়ল। নো

এ্যাডমিশন, ভিতরে আসিও না—চৌকাঠের উপর নোটিশ। কিন্তু ঐ মহারাণীকে আটকাবে, কোন নোটিশের বাপের ক্ষমতা নেই।

একখানা আটা-খাম কাজন নিরঞ্জনের হাতে দিল। শিল মেরে যাবতীয় চিঠিপত্র মেলব্যাগে ঢুকিয়েছে, এ চিঠিতেও শিল মারতে গেছে—। মুখ তুলে নিরঞ্জন বলে, টিকিট দিয়েছ কই?

কাজন বলে, তাই তো বটে! ভুল হয়ে গেছে, টিকিট পাই কোথা এখন? আপনার তো সদর কাজ কারবার—কেস কড়ি রাখ তেল। রইল চিঠি, বাড়ি থেকে টিকিটের দাম দিয়ে আসি।

চৌকাঠ পার হয়ে হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে তীব্রকণ্ঠে বলল, বলেছিলাম মানুষ নন আপনি, পোস্টমাস্টার। বেশি মান দিয়েছিলাম—পোস্টমাস্টারও নন, ডাকবাক্স। চিঠি ডাকবাক্সে না ফেলে আপনার হাতে দিয়েছি—একই ব্যাপার। ডাকবাক্সের ভিতর সব চিঠি একাকার আপনার হাতেও তাই।

হনহন করে চলল। টিকিটের পয়সা না আরো-কিছু কাজন আড়াল হবার ছুতো। একটু পরে আবার এসেছে। মুখ টিপে হেসে বলে, টিকিট না দিয়েও চিঠি যায়—বেয়ারিং হয়ে ডবল মাশুল আদায় করে গ্রাহকের কাছে। তাই করবেন। কী আশ্চর্য, ঘাম ছিঁড়ে পড়তে লেগেছেন। আপনি গ্রাহক, বুঝে নিয়েছেন? ডাকবাক্স কিন্তু ঠিকানা পড়ে না—তার উপরে ভরে আপনি!

লজ্জার মাথা খেয়ে নিরঞ্জনকে এবার সোজাসুজি চিঠি লিখেছে। গভীর মনোযোগে নিরঞ্জন সেই চিঠি পড়ে—চিব চিব করছে কাজনের বুকের ভিতর। চুপ করে থাকলে বুকের শব্দ বুঝি বাইরের লোকের কানে যাবে—অসংলগ্ন অর্থহীন ভাবে তাই যে এত বকে যাচ্ছে।

চিঠি পড়া শেষ করে নিরঞ্জন চোখ তুলল কাজনের দিকে। অখিল ভাবে সে পায়চারি করছে, আর বকছে অবিশ্রান্ত। কিন্তু নিরঞ্জন দেখে এক নিঃশব্দ কাতর প্রার্থিনী অঞ্জলি জুড়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে। বেণুধরের আদরের ছোটবোন। শৈল-জেঠার সর্বশেষ মেয়ে—মেয়েটার ভালো ঘরবরের জন্য এই নিরঞ্জনকেই তিনি কত বার বলেছেন?

নিশ্বাস ফেলে গভীরকণ্ঠে নিরঞ্জন বলে, উপায় নেই কাজন। ললিতার সঙ্গে বিয়ে আমার—পিওনমশায়ের মেয়ে ললিতা। কথাবার্তা পাকা। কানা মেয়ে অন্য কেউ বিয়ে করবে না। অথচ দুটো মাস আগেও এই ললিতার জন্য দীনেশ পাগল হয়েছিল। বিজয়রা বড়লোক, অগাধ বিষয়সম্পত্তি। শৈল-জেঠার ইচ্ছে, বেণুরও শেষাশেষি মত হয়েছিল সেদিন তুমি বললে। পাগলামি ছেড়ে দাও, ঐখানে ভালো থাকবে তুমি কাজন।

একটু থেমে জোর দিয়ে বলে, ভাল সকল দিক দিয়েই। গ্রামের মেয়ে ছিলে কাজন, তার উপরে গ্রামের বউ হয়ে চিরকাল দুঃখসয়ে থেকে যাবে। তোমার শ্বশুরের নামের বালিকা-বিদ্যালয় দিনকে দিন জেঁকে উঠছে। তুমি হেডমিস্ট্রেস তো আছোই—ললিতা আর এক মাস্টার হবে, তোমার নিচে। একলা একজনে কতদিন আর সামলাবে?

হাসছে মৃদু মৃদু। হাসিমুখে আবার বলে, রাগ কোরো না কাজন, কিন্তু তোমার উপর পুরোপুরি ভরসা হয় না। বড্ড হটকটে স্বভাব। যদি কখনো জেদ করে দুবলর ছেড়ে বেরোও, আমার ঘরের মানুষ ললিতা কোথাও যেতে পারবে না। পুরন্দর বালিকা-বিদ্যালয় সে-ই চালাবে। একটা চোখ দিব্যি আছে—এক চোখ বলে পড়ানোর কোনরকম অসুবিধা হয় না।

— শেষ —

রাতের পাখিরা

শক্তিপদ রাজগুরু

নদীর দিক থেকে হু হু হাওয়া আসছে। ঠাণ্ডা হাওয়া। হাড় অবধি কাঁপিয়ে তোলে। পরিতোষবাবু ভাল করে গায়ের চাদরটা গলা অবধি টেনে নিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে।

বৃদ্ধ পরিতোষবাবু নড়তে গিয়েও পারেন না, পা দুটো কনকন করে ওঠে। ইজিচেয়ারেই শুয়ে শুয়েই হাঁক পাড়েন.—সতীশের মা।

কণ্ঠস্বর বোধহয় নীচু অবধি পৌঁছে না।

রাতের অস্পষ্ট অন্ধকারে সুরটা উঠছে। কি সুর না বেসুর ঠিক বোঝা যায় না. নিখিল গান গাইছে।

কিন্তু প্রতিবাদ করার উপায় নেই, তাছাড়া পরিতোষবাবু বিশেষ কিছুতে কোন রকম প্রতিবাদ করেন না, চুপ করে দীর্ঘদিন রোগ যন্ত্রণা সহ্য করে করে—সব কিছুই নীরবে সহ্য করা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

কয়েক বৎসর ধরেই এটা তিনি যেন চলেছেন, তবু মাঝে মাঝে শরীর ভেঙ্গে পড়ে বাতের ব্যাথায়। পা দুটো ফুলে ওঠে বুঝে চোখের অবস্থাও বদলে যায়।

—সতীশের মা!

বেদনাটা দাঁতের মত চামড়া ভেদ করে হাড়ে গিয়ে ঠেকছে। জানলা দিয়ে কনকনে হাওয়া ঢুকছে ওটা বন্ধ করা দরকার। কিন্তু নীচে থেকে কোন সাড়াই আসে না। নিখিল প্রাণপণে তখন গা থেকে নি অবধি গলা খেলাবার চেষ্টা করছে—ওই শব্দটার কোথায় কোন সুর আছে মিষ্টতা আছে কিনা জানে না পরিতোষবাবু, কান ঝালাপালা হয়ে ওঠে।

সতীশের মা নীচে রান্নাঘরে ছাতা খুন্তি নাড়ছে। গিন্নীমাও বাড়ীতে নেই সরে গেছে। আজ সন্ধ্যায় বাসে ফিরবে তাই সতীশের মায়ের কাজের চাপ বেড়েছে।

উপরের ঘরে শীতের হাওয়া আর ওই বাতের বেদনার পাল্লাপাল্লি খোঁচায় অসহায় পঙ্গু একটি লোক এ সংসারের বাতিল প্রাচীর মত পড়ে আছে।

কল্যাণীও জানে তার সংসারের অবস্থা।

ক'বছর থেকেই পরিতোষবাবু অথর্ব হয়ে পড়েছেন। এককালে ভাল চাকরীই করতেন তার স্বামী। বাংলো-চাকর-বাকর-অর্দালি সবই ছিল। কিন্তু ওই কালরোগের কবলে সব গেছে।

সামান্য যা প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আর সঞ্চয় কিছু ছিল, ভাড়িয়ে কোন রকমে টিপে টুপে চালাচ্ছে কল্যাণী। মার পেন্সনের টাকা তাও গোনাগুণতি। ভেবেছিল নিখিল পাশ করেছে। বি-এস-সি পাশ ছেলে তবু একটা কাজে লাগবে সংসারের হাল বদলাবে।

কিন্তু তাও হয়নি।

নিখিল যেন অন্য এক ধাতুতে গড়া। কল্যাণীর ভাবনা কিছুমাত্র কমেনি। তারপর, ক্রমশঃ দিন বদলাচ্ছে।

যে টাকায় তখন স্বচ্ছল ভাবে চলতো সে টাকায় এখন মাসের পনেরোটা দিনও চলে না। তারপরই প্রতিমাসের বাকী কটা দিন যেন আঁধার রাত্রির হতাশা আর আতঙ্ক নিয়ে কাটে।

গাড়ীটা সদর থেকে ফিরছে গণ্ডগ্রামের দিকে।

ঘোরা ঢাকা পথ কোথাও এক আধটু পিচের প্রলেপ আছে মাত্র। তাও ঠাঁই ঠাঁই ভেঙ্গে গেছে বন্যার প্রকোপে। সে ভাঙ্গা রাস্তাটুকু আর ভাল করে মেরামত হয়নি। কোন রকমে মাটি ফেলে তার উপর খোয়া বিছিয়ে রাস্তার মত করা হয়েছে।

তারই ওপর দিয়ে কোন রকমে ঝকর ঝকর শব্দ করে বাসখানা চলেছে চু চু হাওয়া ঠোকে।

ম্লান ফেডলাইটের একফালি আলোয় রাস্তার ধারে গাছগুলো কালো ছায়ামূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। ওদের মাথায় মাথায় পুঞ্জ পুঞ্জ জোনাকী জ্বলে—কি কি ডাকে।

—ভাল করে ঢাকা দিয়ে বস নমি!

কল্যাণীর ডাকে নমিতা মাসীমার দিকে চাইল। কালো ডাগর দুচোখে কেমন ভীরু অসহায় চাহনি। কল্যাণীই ওকে কাছে টেনে নিয়ে শালখানা ভাল করে জড়িয়ে দেয়।

একটা করোষ্ণ দেহের স্পর্শে কল্যাণীর অসহায় যেন একটু নির্ভর খুঁজে পায়।

আপন মাসীমা নয়, কোন রক্তের সম্পর্ক নেই নমিতার ওর সঙ্গে, তবু আজ আপন জন বলতে ওই কল্যাণীই আর পরিতোষ বাবু।

নমিতার বাবা নিরঞ্জনবাবু আর পরিতোষ বাবু একসঙ্গেই চাকরীতে ঢুকেছিল, সে প্রায় তিরিশ বছর আগে। দীর্ঘ এই কত বৎসরের পরিচয় আর যোগাযোগ দুটি পরিবারকে নিবিড় বাঁধনে বেঁধেছিল। কল্যাণীর মনেও গভীরভাবে বেজেছিল নমিতার মায়ের মৃত্যু, কতো বৎসর পরই মারা গেল নমিতার বাবা। অসহায় একটি মেয়ে।

কল্যাণী সেদিন ওর দুঃখে চোখের জল না ফেলে পারেনি। নিজের মেয়ে নেই। একটি মাত্র ছেলে ওই নিখিল। ক্রমশঃ অসহায় ওই মেয়েটিকে নিজের সংসারেই টেনে নিতে চায়; নিরঞ্জনবাবুও শেষ সময়ে মেয়েকে ওর হাতেই তুলে দিয়েছে,—বৌঠান, নমি রইল। ওকে দেখো।

কয়েকমাস আগেকার কথা। এখনও সেই দৃশ্যটা কল্যাণী ভুলতে পারেনি আজও।

পরিতোষ বাবু যেতে পারেনি। পঙ্গু অসহায় লোকটি নীরবে প্রিয় বন্ধুর শেষ দিনের খবরগুলো শুনেছিল কল্যাণী নিজেই।

নমিতা সবে কৈশোর উত্তীর্ণ হয়েছে, সংসারের কিছুই জানে না। বাবার দিকে চেয়ে থাকে, ডাগর দুচোখ জলে ভরে ওঠে। চোখের সামনে দেখেছে মা-ও তাকে ফেলে গেল। বড় ভালবাসতো মাকে। জীবনে প্রথম পৃথিবীর যে একটি মানুষকে ভালবাসতো সেও চোখের সামনে হারিয়ে গেল।

সে দুঃখ শোকও ভুলেছিল বাবাকে কেন্দ্র করে। ছোট্ট ঘরের ছোট কর্ত্রী সে। এই মধ্যে চাকর আদালী রাঁধুনী সকলের উপরই তার কর্তব্য একটা আছে এটা বুঝে নিয়েছিল। শাসনও করতো আবার ভালবাসার অভাব ছিল না। নিরঞ্জন বাবু হাসতেন ওর কথায়।

এমনি ছোট সংসারে হঠাৎ বাবার এই অসুখে ভেঙ্গে পড়েছিল নমিতা।

কল্যাণীও এসে পড়ে।

নিরঞ্জনবাবু যেন কিছুটা নিশ্চিন্ত হন।

—এসেছেন বৌঠান!

নমিতাও একটু বিশ্রাম পায়। ক'দিন তার খুব ধকল গেছে। এমন সুন্দর মেয়েটা যেন শুকিয়ে গেছে।

নিরঞ্জনবাবু কথাটা কল্যাণীকেই বলেন, কল্যাণীও অনেক আগে আবছা শুনেছিল কিন্তু দূর মফঃস্বল শহরে এ নিয়ে কোন আলোচনাই ওঠেনি। নিরঞ্জনবাবুর বিয়েকে কেন্দ্র করেই তার আত্মীয় স্বজনরা তাকে এরকম ত্যাগ করেছিল, স্বজাতি স্বগোত্রে বিয়ে তিনি করেননি। নিরঞ্জনবাবু বলেন।

—তবু ওকে আপনার হাতে দিয়ে গেলাম বৌঠান। আপনজন যারা আছে তাদের চেয়ে আপনাকেই বেশী বিশ্বাস করি। যা কিছু আছে তাতে ওর ভালভাবেই চলে যাবে, কিন্তু দেখবার লোক তো চাই।

কল্যাণী চুপ করে কি ভাবছে। ওকে আশ্বাস দেব!

—আমারও মেয়ে নেই, নমিতাই সেই ঠাঁই পাবে।

নমিতা বাবার দিকে চেয়ে থাকে। চোখের সামনে দেখতে পায় কি যেন একটা কালো ছায়া নেমে আসছে বাবার মুখে চোখে। সব যন্ত্রণা সহজ হয়ে আসে ওর।

এই নিস্তব্ধ আঁধার ঘেরা মৃত্যুকে সে আগেও প্রত্যক্ষ করেছে। মায়ের কথা মনে পড়ে, আবার বাবাকে দেখছে—

নমিতার চোখের সামনে আজও যেন সে নিরঞ্জন

অন্ধকার আবার ঘনিয়ে এসেছে পথের দুধারে গাছে গাছে তারই স্তব্ধ ছায়া। আকাশের বুকে দূরে জ্বলছে দু একটা তারা। ওই জ্বলন্ত বিন্দুগুলোর দিকে চেয়ে নমিতার কেমন মা—বাবার কথা মনে পড়ে ওদের।

…গাড়িখানা শহর থেকে দূরে গ্রামের দিকে এ চলেছে, পথ আর বেশী দূর নয়।

বাসটা থেমেছে।

—নামো, আমরা এসে গেছি।

কোথায় বা শহরের সেই আলো আর বাঁধানো পিচ ঢালা পথ। মাটির রাস্তা সামান্য খোয়া বিছানো। দু একটা চায়ের দোকানে হ্যারিকেন জ্বলছে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল নমিতা, নীরব নিস্তব্ধতার মাঝে একটা সুর ওই অন্তহীন অন্ধকার আর স্তব্ধতার মাঝে ওই দূর গ্রামের সাড়া আনে।

কারা আলো নিয়ে এগিয়ে আসছে।

…নতুন আশ্রয়ে পা দিল নমিতা।

পরিতোষবাবুকে প্রণাম করে।

পরিতোষবাবু কাছে টেনে নেন।…

—আয় মা।

নমিতা চুপ করে ওর পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল। মানুষটাকে দেখেছে—আগেকার সেই প্রাণবন্ত পুরুষ এ নয়, মুখে চোখে কেমন রোগের ছায়া।

…তবু মনটা বদলায়নি।

…কেমন আছেন কাকাবাবু।

নমিতার কথায় হাসেন পরিতোষবাবু।

—খুব ভাল মা। এবার তবু তুই এসেছিস তবু কথা কইবার লোক পাবো। এরা সবাই কাজের মানুষ বুঝলি? একটা মানুষ হয়ে পড়েছে কিনা—হঠাৎ বাতের বেদনাটা কেমন ঝিলিক মেরে ওঠে। সারা শরীর টনটন করছে, কপালে ফুটে ওঠে বিন্দু বিন্দু স্বেদরেখা এই ঠাণ্ডার রাত্রিতেও ঘাম ঝরছে।

নমিতার নজর এড়ায় না, ওর ব্যথাক্লান্তের মুখের দিকে অসহায় লোক নীরবে অন্তর্দ্বন্দ্বে সংগ্রাম করে চলেছে।

ওর হাতটা পরিতোষবাবুর কপালে নরম একটা নব-জীবনের উষ্ণ স্পর্শ, পরিতোষবাবু একটু চমকে নীরব প্রীতি আর সমবেদনার স্পর্শ কাছে পাঁচারনি ক্লান্ত বেদনাময় এই সন্ধ্যার মুহূর্তে।

আজ একটি পরিবর্তন ঘটেছে এ বাড়ীর জীবন যাত্রায়। চোখ দুটো নীরব তৃপ্তিতে বুজে আসে

হঠাৎ ওদিকে একটা শব্দ উঠতে চিৎকার চাইল নমিতা, এ বাড়ির নবাগত প্রাণীটির দিকে চেয়ে আছে আর একটি প্রাণী।

একটি বিড়াল বেশ গরমে এতক্ষণ যে কম্বলের নীচে ছিল সাড়া পেয়ে বের হয়ে, এসেছে। সামনের দুটো পা টান করে দেহটাকে একটা ঝটকা মেরে ঘুমের আবেশ ছড়াচ্ছে। খাবারএর গন্ধ নাকে এসেছে, তার

…নরম রোমশ তুলতুলে দেহ মুখটায় বেশ খানিকটা সাদা ছাপ। ঘুমের আবেশ কাটিয়ে কম্বলের উপর বসে ব্যস্তসমস্ত হয়ে রুপসী প্রসাধন করতে থাকে। জিব দিয়ে লেজটা চাটছে লেজ গা পিঠের চেটে প্রসাধন সেরে ভীরু পায়ে এগিয়ে এসে নমিতার পায়ে মাথা ঘসতে থাকে

—মেউ।

…অর্থাৎ ও যেন প্রশ্ন করে তুমি কোন জন?

মাথা ঘসে আর পুরুষ্টে লেজটা তুলে ঘুরপাক খায়। নমিতা ওটাকে কোলে তুলে নেয়। বিড়াল নন্দিনী খুশিতে ডগমগ হয়ে ওঠে।

গলা দিয়ে একটা শব্দ বড় শব্দ ওঠে। চোখ বুজে ওই স্পর্শ টুকু অনুভব করছে।

আর একটি প্রাণী তাকে দেখছে দরজার বাইরে থেকে সে নিখিল। গাল তার ভেজে গেছে। অনেকক্ষণ ধরে চীৎকার করার পর একটু ক্লান্তিই এসেছে।

কি খেয়ালবশে নীচে যাচ্ছিল বাবার ঘরে নমিতাকে দেখে দাঁড়াল।

নমিতা বিড়ালটাকে নিয়ে খেলা করছে বিড়ালটা লাফ দিয়ে এদিক ওদিকে যাচ্ছে হঠাৎ সামনেই নিখিলকে দেখে থামল। চেয়ে থাকে ওর দিকে।

ক'বছরেই নিখিল বেশ বড় সড় হয়ে উঠেছে। আর যেন চেনাই যায় না। দুজনের সর্বশেষ দৃষ্টিটির চোটে দারা পাড়া অস্থির হয়ে উঠেছে। আজ সেই নিখিল যেন অনেক বদলে গেছে।

—কখন এলে?

—একটু আগে।

পরিতোষবাবুর তন্দ্রা ভঙ্গ এসেছে। নমিতা সাবধানে গ্যাসটাকে ওর দেহে চাপা দিয়ে দেয়, জানলাটাও বন্ধ করে এল।

পরিতোষবাবু একটু বিশ্রান্ত হয়েছেন রোগীর সেবা যত্ন করা ওর বোধহয় অভ্যাস আছে, যা হয় নীরব যেন্না দিয়ে সবাইকে চিনতে পারে—ওই মেয়েটি।

নিখিল বাড়িয়েছিল এসব কৌতূহলী হবার কথা ও সে ভাবেনি। ওরা এসব ভাবে না।

নীচে থেকে সতীশের মায়ের চাঁছা গলা শোনা যায়।

—ওই গো বাছাবাবু, নোতুন নিখিরাণি—বাবার যে জ্বালিয়ে গেল।

পরিতোষবাবুই বলেন—যাও মা।

নমিতা বের হয়ে যাচ্ছিল—কি ভেবে বিড়ালটাকেও কোলে তুলে নেয়। হাসে নিখিল বলে ওঠে।

—ওকে নিয়ে যেতে হবে না, ওপর চেনে। আর এ বাড়ির ধুলো মাখা এর ভাগ ও জোর করেই ছিনিয়ে নেবে। বহা চোর ওটা।

ওর গায়ে হাত বোলায় নমিতা।

বিড়ালনন্দিনীও যেন বিদ্রূপক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে নিখিলের দিকে।

একটু বিরক্তিও যেন ফুটে উঠেছে ওই চাহনিতে। বলে ওঠে নিখিল।

—দেখ এইবার ধুয়ে করে, নদীর বাবে ডুবে মরবে।

নমিতা কথা কইল না। তারপর দুচোখ মেলে চেয়ে থাকে ওর দিকে।

হাসিটা মেটে যায় কোন দিকে। নতুন পরিবেশে এসে কেমন যেন নমিতাও বদলে গেছে। বারান্দার ওপাশেই তার শয়নাগার।

বুড়ো চাকর বনমালীই তাকে ঘর বাসা দেখিয়ে দেয়, ইতিমধ্যে এই ঘরে তার মাল বিছানাপত্র আসা হয়েছে। ওদিকে একটা টেবিল দুখানা চেয়ার। জানলার ধারেই পুরোনো আমলের একটা খাট। এতদিন বিশেষ কেউ থাকতো এ ঘরে।

বনমালীই বলে ওঠে—

—এ বাড়ীতে তুমিও এসে জুটলে দিদি?

—কেন?

নমিতার প্রশ্নে বুড়ো ওর দিকে চাইল ধরন্তরা চাহনিতে।

ওর প্রশ্নে আমতা আমতা করে বুড়ো।

—এমনিই বলছিলাম। সব থেকেও যার বাপ মা নেই, তার কিছুই নেই।

নমিতা ওকে তার জন্য দুঃখ করতে দেখে নিজের দুঃখটা নতুন করে মনে পড়ে। বাবাকে ভোলেনি সে।

দুচোখ জলে ভরে ওঠে। বনমালীই ব্যাপারটাকে সহজ করে নেয়।

—সব ঠিক হয়ে যাবে দিদি। সবই সইতে হবে।

যাও, রাত হয়েছে শুয়ে পড়ো।

মিউ!

হঠাৎ মিনি বেড়ালটাকে দেখে ফিরে চাইল। সে ও এসে আশ্রয় নিয়েছে এই ঘরেই।...নমিতা তাকে ডাকতেই বিড়ালটা এসে বেডের উপরই শুয়ে পড়ে।

সকালবেলায় খুব ভোরে একটু বেরোতে, ওটা নমিতার অনেক দিনের অভ্যাস।

কেমন যেন সব কিছুই মনে হয় স্বপ্ন। ধড়মড়িয়ে ওঠে নমিতা চারিদিকে কি যেন খুঁজছে।

সব নিখিলের মধ্যে হারিয়ে গেছে, জানলা দিয়ে ঘরের

ভিতর এসে পড়েছে এক ঝলক
ডাকছে
'কি দেখে খুব হেসেছিল সে।
সকালের সোনা রোদে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে, কালরাত্রে ঠিক দেখতে পায়নি, দিনের আলোয় নতুন দেশের পানে চোখ মেলে চেয়ে থাকে নন্দিতা
বাগানের পরই নদী মহুয়াক্ষীর বালচর শীতের রুক্ষতায় শীর্ণ জলধারার স্পর্শ বুকে নিয়ে বয়ে চলেছে, ওপারে ধানক্ষেতের ছিন্ন ছোয়া বুকে এসেছে সোনা হ'ওর ছোঁয়া। কোলে কোলে দু একটা গ্রামের ঘরবাড়ি দেখা ঢুকু আকাশ ছুঁয়ে রয়েছে।

ঘর থেকে বের হয়ে আসতেই দেখে ওপাশের ঘরের দরজাটা খোলা, নিখিল ঘুম থেকে উঠে কী দিচ্ছে।
কেমন বিশ্রী লাগে ওকে কালরাত্রে শুনে ছিল ওর মুখ
নিষ্প্রভ প্রাণহীন বাড়িতে ও এসেছিল প্রাণের সাড়া, সকালে আবার অন্য এক মূর্তি।
বনমালীর ডাকে ফিরে চাইল।
এতদেরী হল? চা খাবার জুড়িয়ে যাবে যে
চল যাচ্ছি।
মেয়ে গেল নন্দিতা।
শরিতোষবাবু কালকেই একটু ছোতনবিলাসী ছিলেন। অভ্যাসে বাওয়া অনিয়মের ফলেই বোধহয় রোগ ধরে ছিল। সেটা আজ পাকাপাকি ভাবে তাকে কাবু করেছে, তবু এখনও অভ্যাস যায়নি। কয়েকদিন কল্যাণী ছিল না বাড়িতে, সেই ফাঁকে সতীশের হাতে পায়ে ধরে বনমালী বিষের না খুলেই হাত দেখেছিলেন একটু বেশী পরিমাণেই বনমালী বাধা দিয়েছিল।
—ডাক্তারবাবু মানা করে ওসব বাই বা খেলেনা
শরিতোষবাবু জবাব দেন।
—তোর বিশ্বাস ডাক্তার জানে? না খেলে শরীর থাকবে কেন?
হাসতে হাসতে বলে
—শিগ্গীর আসুন ডাক্তারবাবু
—শিগ্গীর? একটু অপ্রস্তুত মন পরিতোষবাবু, পরমুহূর্তেই ভাবেন কে আবার কি করবে? যাবো তো আমি।
দেখেছিলেন, হাত কপালে রেখে চাদরটা দিয়ে উঠেছে বাপাটা। তার উপর আবার প্রচণ্ড শব্দে বাধা পড়েছে বাধা ও উন টন করে ওঠে সকাল থেকেই।
নাড়ীটা ওপরে টুকেই পরক্ষণে নড়িয়ে
অন্যহাত দোকটা ধরে আছে সাদা দুটো টান টান করে, বেরোবার কায়দাতে
—ডাক্তারবাবু!
শরিতোষবাবু ওর দিকে
ফেলে চাইলেন নন্দিতাকে
বনমালী পড়বার
—দাঁড়িয়ে রইলে কেন যাবার নাই
—তাই বলে কাউ পারের
বলে ওঠে
বনমালী ভাবার দিল না নিজের হাতেই ফেক দিয়ে সাদা দুটোর ফ্রেমের শক্তি করিয়ে দেয় নন্দিতা
বেরোটা করে আসছে নন্দিতাই করে
—বড় অনিয়ম করেন না ডাক্তারবাবু? ভয় মাখা—
হঠাৎ ডাক্তারকে চমকে দেখে
বলে ওঠেন।
—ভালো ডাক্তার, তোমার উপযুক্ত একটি নার্স

ফুটেছে ব্যথা অনেক কমে গেছে বুঝলে। তারপর ভিন্ন ধরণের এসব ব্যাণ্ডেজ হয়ে যাবে বুঝেছি নমিতার জ্বালায়।

হাসে বিমলবাবু, এ পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বয়সও হয়েছে তাঁর।

নমিতার দিকে চেয়ে থাকেন। কেমন একটা মায়ের ওর সারা মন ছাপিয়ে মুখে ফুটে উঠেছে, করুণার মুখশ্রী।

পরিতোষবাবু বলেন—

—এই নমিতা, নিরঞ্জনবাবুর মেয়ে। যার কথা বলছিলাম হে।

বিমলবাবু ওর দিকে চেয়ে থাকেন, নমিতাকে দেখছেন তিনি।

নমিতাও এগিয়ে এসে ডাক্তারবাবুকে প্রণাম করে।

বৃদ্ধ লোক মাথার চুলে পাক ধরেছে। সদাহাস্যময় একটি লোক।

—এসো মা!

নমিতাকে কাছে টেনে নেয় তিনি। বলে ওঠেন।

—তোমার কথা শুনেছি পরিতোষের কাছে, থাক ভালোই হয়েছে তুমি এসেছ।

হাসেন পরিতোষবাবু। বলেন একটু উৎফুল্ল স্বরে।

এইবার আবার সেরে উঠবো ডাক্তার। একটু দুঃখ করে বসি তারপর দেখা যাবে দাবার চালে আর কাপাও কোন ঘুঁৎ থাকে কেমন করে, ওদিকেও বেড়াতে যাবো এইবার উকিল পাড়ার দিকে।

গোবিন্দ উকিল নাকি আজকাল ভাল খেলছে।

পরিতোষবাবু আবার সেরে উঠে সুস্থ স্বাভাবিক ভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখেন। ওর দেহেমনে একটা পরিবর্তন এসেছে কি এক বিশ্বাসের আলো।

নমিতার দিকে চেয়ে থাকেন তিনি। নমিতাই প্রশ্ন করে—

আমাকে কাকাবাবু ওষুধপত্রগুলো দেখিয়ে দিয়ে যাবে। আর পথ্য—এইখানেই পরিতোষবাবুর যত আপত্তি।

—ওসব ঠিকই আছে। আমি সব জানি।

হাসতে থাকেন বিমলবাবু।

—এই বার আর ওটি চলছে না।

কল্যাণী এমনিতেই বেশ হিসেবী গিন্নী। এতদিন স্বামীর পেন্সন আর সংসারের কিছু আয় থেকেই সব দিক বজায় রাখতে হয়েছে। ঠাট বাটও চালিয়ে এসেছে।

নমিতার ভার নিতে সে চায়নি, কিন্তু এসে পড়েছে তার উপর। অবশ্য নমিতা এদের সংসারের বোঝা নয়। তার বাবা যা রেখে গেছেন তার আয়, মাসিক অন্তত পঁচিশো টাকা। সহরের বড় বাড়ীখানার ভাড়া আসে বেশ কিছু টাকা, তারপর নগদ ও ব্যাঙ্কে আছে হাজার তিরিশ, তাছাড়া কোম্পানীর কাগজ ক্যাশ সার্টিফিকেট এদিক ওদিক জড়িয়ে হাজার পঞ্চাশ টাকা।

এক কথায় নমিতা তাদের চেয়ে অনেক ধনী, তবে আজ সে অসহায়। কল্যাণী তবু সেদিন নমিতাকে সব কথাই বলে।

নমিতার মাথায় এসব আসে না। ওই টাকাকড়ি—ক্যাশ-সার্টিফিকেট চেক বই—বাড়ীর ভাড়ার বিলপত্র ঘিরে ভাবতে চায় না সে।

নমিতা কি ভাবছে।

টাকা পয়সা বাড়ী ঘর এসব তার আছে। কিন্তু এর বেশী কিছু জানার দরকার তার নেই।

—মাসীমা, ওসব আপনিই রাখার ব্যবস্থা করুন।

কল্যাণী ওর দিকে চাইল। মুখে একটু হাসির আভা ফুটে ওঠে।

বলে চলেছে কল্যাণী।

—বলছো যখন তাই রাখছি। তবে বাছা হিসেবপত্র বুঝিয়ে দিতে চাই। যা খরচা তোমার মাস মাস নেবে, সেটাও লিখে রেখো। টাকা পয়সার ব্যাপার যা।

কল্যাণী কি কাজে নেমে গেল। নমিতার ওসব দিকে কোন উৎসাহই যেন নেই। হঠাৎ একটা শব্দে ওদিকে ফিরে চাইল।

বনমালীর হাত থেকে একটা কুলদানী বেজেতে পড়ে ভেঙ্গে গেছে।

—ভেঙ্গে গেল?

বনমালী অপ্রতিভ হয়ে ওঠে।

—বয়স হয়েছে দিদি, চোখের জোরও কমে আসছে।

একটি মুহূর্ত যেন হঠাৎ ওই ভাঙ্গার শব্দে ভরে উঠেছে

এ বাড়ীর সদাজাগ্রত প্রহরী গিন্নীমার কানেও তা গেছে। এসে চাকির ওর। বেশ চড়া গলাতেই বলে ওঠে।

—ভাঙ্গলি তো? তোর জন্যলায় এ বাড়ীতে কিছুই থাকবে না?

বনমালী চুপ করে থাকে।

গিন্নিমার গলা। সপ্তমে চড়েছে। নমিতাই এগিয়ে আসে।

—ভেঙ্গে গেছে তো আর কি করবেন?

—তাই বলে কিছু বলবো বাছা? ওদের জানো না—কোন কিছুতেই ওদের হুঁস নেই, বলি তো, না, পোষায় অন্য পথ দেখ।

গজগজ করে নেমে গেল গিন্নীমা।

অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে থাকে বনমালী। আরও দুবার কথা শোনাতো এবং ঘাইনে কাটার ভয়ও দেখাতো। কিন্তু নমিতার কথাতেই বোধহয় থেমে গেলো গিন্নীমা।

নমিতাই ব্যাপারটা সহজ করে তোলবার জন্য বলে ওঠে।

—ও সব কথা কানে তুলো না, বনমালীদা,

বনমালীও অসহায় কণ্ঠে বলে, তুলে লাভ কি দিদি। সবে থাকতেই হবে।

নমিতা কথা বলে না। ওর দিকে চেয়ে থাকে।

মেঝেতে গুঁড়ি হয়ে বসে বনমালী ভাঙ্গা টুকরো গুলো তুলছে। নমিতা অসহায় বৃদ্ধের দিকে চেয়ে থাকে। ওর মত ও যেন কোনখানে অসহায় একক। জগতের অনেক আঘাত দুঃখ বেদনা তাকে সহ্য করতে হয়েছে নীরবে।

তাই ওর মাঝে নিজের একটু বেদনাকে খুঁজে পায়।

—তুমি সর বনমালীদা, ওগুলো আমি ফেলে দিচ্ছি।

বনমালীর হাত থেকে নিজেই টুকরোগুলো নিয়ে ফেলে দেয় বাইরে—বনমালী ওর দিকে চেয়ে থাকে।

অন্ধকারে সুরটা উঠছে।

নিখিল গাইছে।

গুরুতার পর মাধুর্যটুকু

ঝলসাবে।

নমিতা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, কি ভাবছে।

একটু আগেই মালীদার যে মূর্তি চকিতের জন্য দেখেছিল সেটা ঠিক ভুলতে পারেনি ওই সুরটা তেমনি একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছে এ বাড়িতে।

চুপ করে বের হয়ে গেল।

পুরুতে পারেনি পরিতোষবাবু, রাতের খাওয়া ইচ্ছে নেই, বেদনাটা বাজছে। সারা শরীর মুচড়ে ওঠে।

কলাপীর এসব আর ভাল লাগে না।

ঘরে অসুখ আর অভাব সুটোর চ্যাপ্টা হয়ে গেছে। একটার প্র

বিরক্তও হয়ে উঠেছে।

পরিতোষবাবুকে বলে ওঠে।

—পারি না বাবু আর। আর কোন ঝুলেপুড়েমলাম অসহায় দৃষ্টিতে তিনি চাইলেন কলাপীর দিকে।

এর সবটাই যেন তার ইচ্ছাকৃত ব্যাপার।

ওসুধটা ঢেলে এগিয়ে দেয়—না ও, ওসুধ খেয়েই বা কি হবে?

মডার্ণ ডেকরেটর্স
শুভ বিবাহ ও যে কোন উৎসবের
প্যাণ্ডেল ও গৃহসজ্জায়
৬৫এ, ডব্লু, সি, ব্যানার্জী ষ্ট্রীট • কলি-৬ • ফোন-৫৫-২৫৪৯

"ছাই পান খাওয়া তো বন্ধ হবে না, এত নোলাই বা কিসের বাবু!"

—তাই, তেমন অনিয়ম তো করিনি!

—বেদনায় মুখখানা বিবর্ণ হয়ে ওঠে। কল্যাণী তবু ধমকাতে ছাড়ে না।

—কর নি আবার!

বিরক্তি আর রাগে তার কণ্ঠস্বর বিকৃত।

কোন রকমে ওষুধটা খেয়ে শুয়ে পড়ার চেষ্টা করেন তিনি। কল্যাণীও বের হয়ে যায় গজ গজ করতে করতে। এ বাড়ির সবাই যে স্বাধীন, কেউ তাকে ভয় করতে পারলে ছাড়ে না, এইটাই তার যেন দৃঢ় বিশ্বাস।

নমিতাকে ঢুকতে দেখে পরিতোষবাবু ওর দিকে চেয়ে থাকেন। ঘুম আসছে না

—কাকাবাবু!

নরম হাতটা ওর বেদনাতপ্ত কপালে এসে লাগে। একটু তৃপ্তির স্পর্শ আনে।

—কষ্ট হচ্ছে?

—ঘুম আসছে না মা।

নমিতা ওর বেদনাভরা মুখের দিকে চেয়ে থাকে। ওর বেদনা যন্ত্রণার স্পর্শ তার মনেও সংক্রমিত হয়। অন্তরের প্রীতি আর অনুভূতির যাকে একটি সাড়া আনে।

—মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি কাকাবাবু, দেখুন ঠিক ঘুম আসবে।

হাসেন তিনি। ওই ঘুম আনাটা তার কাছে যেন আজ স্বপ্নাতীত কোন কামনা। ওই কটি আঙ্গুলের স্পর্শ যেন বেদনা ভরা চিত্তে একটি তৃপ্তির ইঙ্গিত আনে।

রাতের অন্ধকারে তবু ওই চীৎকার থামেনি। গান না আর কিছু ঠিক জানেনা সে, বেশ বিরক্তিকর এটা নিশ্চিত।

কালীমার ওদিকে যেন নজর নেই।

এবাড়ির আর সব দিকেই তার কড়া নজর। মাত্র একটু আগে কাকাবাবুর সঙ্গে তার কথাবার্তাগুলো শুনেছে, অসহায় একটি প্রাণীর জন্য তার মনের প্রীতির স্পর্শও যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে।

ওই চীৎকারে ঘুম আসা সম্ভব নয়।

কি ভেবে নিজেই বের হয়ে গেল সে।

দরজা ভেজিয়ে দিয়ে নিখিল চীৎকার করে চলেছে। অবশ্য তার মতে ওটা ঠিক চীৎকার নয় সুরের আলাপ প্রথম দিকটায় ওটা ঈষৎ আসুরিক পরে ক্রমশঃ তাতে সুরের মেজাজ ফুটে উঠবে।

বি-এস-সি পরীক্ষা দিয়ে ছিল কিন্তু পাশ করতে পারেনি। পড়াশোনায় এমনিতেই মাঠো, দু'একবার পড়াগড়ি ইতিপূর্বেও অন্য পরীক্ষাতেও দিয়ে ছিল তাতে অবশ্য নিখিলের বেশী দুঃখ নেই।

ইদানিং গান নিয়েই পড়েছে।

অনেকেই নাকি তাকে আশা দিয়েছে তার গানের গলা আছে।

জোর করে সাধলে ঠিক একজন কেষ্টবিষ্টু হয়ে যাবে।

তাই নিখিলের যেন রোখ চেপে গেছে, মা ও দু'একবার নিষেধ করে ছিল, পড়াশোনায় আবার মন দিতে বলে ছিল কল্যাণী, কিন্তু নিখিল জানে মায়ের দুর্বলতা। মা তার কথা কেন জানেনা শোনেনা। তাই জবাব দিয়ে ছিল।

—ওসব হবেনা মা।

—তবে কি করবি? মা প্রশ্ন করে।

—গান গেয়েই অনেকে অনেক রোজকার করে। শিল্পীর সম্মান সবচেয়ে বড় বুঝলে?

মা ছেলের দিকে চেয়ে থাকে। ঠিক কথাটা মানতে পারে না। ক্রমশঃ টাকার টান পড়তেও ছেলেকে আর চাপ দিতে পারেনি। হোস্টেল থেকে পড়ার অনেক খরচা আজ কল্যাণী অনুভব করে অভাবের কঠিন ছায়া। একমাত্র ছেলেকেও তাই পড়ার জন্য চাপ দিতে পারেনি।

নিখিলও ধ্যানস্থ হয়ে সুর আর অসুরের পালায় পড়েছে। আজও তাই চলেছে হঠাৎ এমন সময় দরজা খুলে কাকে ঢুকতে দেখে গান থামিয়ে চাইল ওর দিকে।

নমিতা আর থাকতে না পেরে নিজেই এসেছে।

বনমালীকে বলে ছিল কিন্তু বনমালী ঠিক যেন সাহস পায় না। বলে ওঠে।

—ও আমার কথা শুনবেনা দিদিমণি।

নমিতা একটু অবাক হয়।

—কেন?

—দাদাবাবুকে আমি কিছু

হয়তো বকবেন।

—অ নমিতা মনে মনে একটু আশ্চর্য হয়েছে নিখিলের এই ব্যবহারে।

একটা মানুষ, বাড়ির কর্তা অসুস্থ। তার এটুকু কর্তব্যবোধও নেই।

নিজেই এগিয়ে যায় নমিতা।

ওকে ঢুকতে দেখে চাইল নিখিল।

—হঠাৎ!

—গান থামাতে এলাম। নমিতা সোজা পরিষ্কার ভাবে কথাটা বলে।

কেন?

বাড়িতে একটা লোক অসুস্থ। রাতে ঘুমুতে পারছেন না আর আপনি এমনি চীৎকার করবেন?

নিখিলের কর্ণা মুখটা চকিতের জন্য রাঙ্গা হয়ে ওঠে।

একটি মেয়ে যে ঘর চড়াও হয়ে তাকে এই ভাবে কথা শোনাতে পারবে তা সে ভাবেনি। এবাড়িতে এমনি কথা হঠাৎ যেন আজ নতুন বলল সে। তাছাড়া একটা ধারণা ছিল গান সে ভালোই গায় কিন্তু সেই গানকে চীৎকার বলে বসবে এটা তার কল্পনাতীত।

তাই অতর্কিত আঘাতে কেমন হকচকিয়ে যায় নিখিল। হাতের তানপুরোটা নামিয়ে রেখে বলে।

চীৎকার বলছেন? আমি চীৎকার করছিলাম? বেসুরো? বেতালা—

নমিতা জবাব দেয়।

ওসব আমি জানিনা। ওটা যাই হোক আপাততঃ থামাতে হবে। দরজাটা জোরে বন্ধ করে দিয়ে বের হয়ে গেল সে।

চুপ করে বসে থাকে নিখিল; সুর তার বের হয় না। আনমনে তানপুরোর তারগুলোয় আঙুল চালাতে থাকে। মনে হয় এতদিনের সাধনা এক নিমিষে ওই একটি মেয়ের ধমকেই নিষ্ফল ব্যর্থ হয়ে গেছে।

…সুর আর বের হয় না।

…কেমন যেন এড়িয়ে চলে নিখিল সেই থেকে নমিতাকে।

…কদিনের বেরা মেঘে আর মিয়মিত ওষুধে পথ্যে পরিতোষবাবু অনেকটা সেরে উঠেছেন। পা দুটোর ফোলা কমে গেছে চলাফেরা করতে পারেন।

রোজ বৈকালে নমিতাই তাকে নিয়ে বের হয় বাগানে।

গ্রাম সহরের বাকাবাকি জায়গাটা। ছোট খাটো মহকুমা সহর। কোর্ট কাছারি বাজার থানা আছে। তবে যাতায়াতের তেমন সুযোগ নেই, তারপর ওই মরুরাক্ষীর দাপটে কেমন মুষড়ে কুঁকড়ে গেছে ওই জনপদ।

একদলে নদীর ধারের এই বাগানঘেরা বাড়িটার গুদিন ছিল, দীমানা প্রাচীর ঘেরা বাড়ি দু দশটা ভাল ফলের আমগাছও আছে নারকেল গাছগুলো দীর্ঘ কাণ্ড বেয়ে আকাশে মাথা তুলেছে ওর পাত্রবরণের আড়ালে ফুলছে পুরুষ্ট কাঁদি কাঁদি ডাব!

নমিতা কাকাবাবুর সঙ্গে ঘাসে ঢাকা বাগানে বেড়াচ্ছে—একদালে এখানে ওখানে ছিল কেয়ারি করা রকমারি ফুলের গাছ—আজ সেখানে গজিয়েছে আগাছা আপনা ওষ্ঠার জঙ্গল।

বৈকালের পড়ন্ত রোদে ঝিমিয়ে হয় একটি সুস্নিগ্ধময় কোন সংগীত, পাখি ডাকে, কলরব করে বাসায় ফেরা পাখির দল।

—সুন্দর না কাকাবাবু?

পরিতোষ কি ভাবছিলেন। বাগানের দৈন্যদশা আজ তার কাছে ফুটে উঠেছে। তার জীবনের মতই কি এক করুণ এ ইতিহাস। বলে ওঠেন আরও সুন্দর ছিল যা চারিদিকে ফুল ফুটতো, সবুজ আর নানা রং-এর মেলা বসতো। ঠিক আমাদের জীবনের মতই। একদিন সব ছিল। বন্ধু বান্ধব আপন জন, অর্থ সব কিছু সুখ-শান্তি সব কিছু। কিন্তু কি যেন হয়ে গেল—ঝরা-পাতার মত সব ঝরে গেল। সব পথ ঢেকে গেল ঘাস আর আগাছার জঙ্গলে। সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল।

নমিতা ওঁর দিকে চেয়ে থাকে। ওপাশে একটা বিশাল গাউগাছে ডালপালা শুকিয়ে গেছে, সবুজ চামর-এর মত পাতার গুচ্ছে আর দিকহারা সুর ওঠেনা। কাণ্ডটা শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে, পুরুষ্ট মধর গুড়ি থেকে চোকলা ছাড়ছে, শ্রীহীন একটি মহীরুহ ওর সঙ্গে কোথায় যেন মিল আছে ওই গাছটার।

ওরই মত আজ চতুর্থী হয়ে পড়েছেন পরিতোষবাবু জীবনের সব আশা আনন্দ থেকে নির্বাসিত একটি মানুষ, পরিতোষবাবুর মুখে এসে পড়েছে গাছের ফাঁক দিয়ে দিনশেষের আলোয় একটু লাল আভা, রোগক্লান্ত পাণ্ডুর মুখকে আরও করুণ করে তুলেছে, বলে চলেছেন তিনি।

—জীবনে অনেক আশাই ছিল যা ভেবেছিলাম নিজে একটু শান্তি পাবো শেষজীবনে। ছেলেটাও মানুষ হবে কিন্তু কই?

কতকগুলো পাখী কলরব করে ওঠে একটা গাছে। ওদিকে ঘাস ঢাকা একটা ফাঁকা জায়গায় মিনি বেড়ালটা সকলের অগোচরে দুটোপুটি খাচ্ছে। ওদের দেখে ওই আনন্দলীলায় তার বাধা পড়ে—লেজ তুলে দৌড়ে পালায় বাড়ির দিকে।

নমিতা বাগানের দিকে চেয়ে কি ভাবছে!

এই অনুন্দর পরিবেশটুকু সে সুন্দর করে তুলতে পারে, সুন্দর করার ক্ষমতা তার আছে।

পরিতোষবাবুর মনের ওই আঁধার তবু যেন ঘনিয়ে আসে, দিন শেষের আগত সন্ধ্যার অন্ধকারে মতই। তবু আকাশে তারা জ্বলে চাঁদ ওঠে।

রাত্রির অন্ধকারেও আলোর স্বাদ থেকে বঞ্চিত নয়। তারার স্বপ্ন বুকে নিয়ে সে দিনের তপস্যা করে, আলোর স্বপ্ন দেখে।

বিমলবাবুকে আসতে দেখে ওঁর দিকে চাইলেন পরিতোষবাবু।

—এসো ডাক্তার।

বিমলবাবুও রোগীর অস্বাভাবিক উন্নতিতে খুশি হয়েছেন।

—বা বেশ তো সেরে উঠেছেন!

—না খাইয়ে ভিলে ভিলে মেরে ফেলার আনন্দে তোমাদের কি লাভটি বলতে পারো?

বিমলবাবু জবাব দিলেন না। নমিতার দিকে চেয়ে থাকেন।

নমিতাই বলে ওঠে—ভিতরে চলুন ডাক্তারবাবু, দিব লাগাবেন না। ডাক্তারবাবু একটু চায়ের ব্যবস্থা করি?

—তা করোগে আমরা যাচ্ছি।

পরিতোষবাবু বলে উঠেন নমিতার উদ্দেশ্যে

—দুটো মামলেট হবে মা?

হাসে নমিতা—হবে, একটা। ডাক্তারবাবুর জন্য। আর আপনার চা নয়, হর্লিক্স করে আনি।

হাসতে থাকেন বিমলবাবু। পরিতোষবাবু গজগজ করেন।

—হেলোনা ডাক্তার। ব্যাভরোগ যেন শত্রুরও হয় না।

…নমিতা ক'দিন ধরে দেখছে নিখিলের ঘর থেকে আর সেই সুর ওঠে না। সন্ধ্যার পর থেকেই বাড়িটা কেমন স্তব্ধ হয়ে যায়। সেই রাত্রির কথাগুলো বলার পর নিজেরই কেমন বিশ্রী লেগেছে। ও সব কথা ও ভাবে না বললেই পারতো। গানও সে গায় না—তাকে চীৎকার করা বলে শাসন করাটা অন্যায় হয়ে গেছে। নিজের কাছেই ওটা বিশ্রী ঠেকে।

লক্ষ্য করেছে সেই ঘটনার পর থেকে নিখিল সন্ধ্যার দিকে বাড়ীতেই থাকে না। সাইকেল নিয়ে বৈকালেই কোন বন্ধুর ওখানে আড্ডা দিতে যায়, ফেরে যেন রাত্রিতে।

কল্যাণীও ছেলের এই দীর্ঘ অনুপস্থিতে তেমন খুশী নয়। একটা দুর্বলতা তার আছে ওই নিখিলের উপর, যা হয়েও ছেলেকে বিশেষ শাসন করতে পারে না, কোথায় বাধে তার। উল্টে নিখিলই যেন মাকে শাসন করে, এবং সেটা সহ্য করে কল্যাণী। নমিতা এ ব্যাপারটা দেখেছে, তার বিশেষ ভালো লাগেনি।

সন্ধ্যা থেকেই বৃষ্টি নেমেছে।

শীতের শেষ। একটা শুভ্র এখানে দেখেছে নমিতা। ধান উঠে গেছে ক্ষেত থেকে, প্রান্তরে সোনা ধানের আবেশ মিশিয়ে হয়ে গেছে উদাস বিরক্তা। দু'একটা গাড়ী কাটা সড়কটা দিয়ে ধুলো উড়িয়ে চলেছে কোন দূর গাঁয় না জানা পল্লীর দিকে।

তাদের সহরের বাড়ীর ছাদ থেকে এমনি চেয়ে থাকতো গঙ্গার দিকে। উদাও হয়ে যেতো গঙ্গার বাঁকের মত কত পালতোলা নৌকা।

ওরা বিরাট বিশ্বে সব হারিয়ে যায়।

একা সে, এই স্তব্ধ বিরাট অসীমে মনে হয় সেও

যে একা অমনি কোন অসীমে হারিয়ে গেছে, পথ খুঁজে ফিরছে।

বৃষ্টি নেমেছে সন্ধ্যার আঁধারে সব ডুবে যায়।

ওই গ্রামছায়া—ধুলো পথ—একটি নাম পরিচয়-হীন গাড়ীর সোয়ারীও মাসীমার ডাকে ফিরে চাইল।

—নিখিলকে দেখেছিস মা?

—কই নাতো?

কল্যাণী বলে ওঠে কোথায় যে গেল এই বৃষ্টিতে। বেশ হয়েছে যাহোক।

নমিতা কথা বলে না। কল্যাণী তাকে শুনিয়েই বলে।

—বেশ দিন কতক গানটান নিয়েছিল বাড়ীতে, তাও ঘুচে গেছে। পড়াশোনাও বন্ধ করেছে। অবশ্য ওর দোষ নেই।

মাসীমা চুপ করল। আবছা অন্ধকারে একটা রাতের পাখী ডেকে ডেকে থেমে গেল, কল্যাণী বলে চলেছে।

—টাকার জন্য পারিনি বাছা। নইলে ওর পড়বার ইচ্ছে খুবই ছিল।

একটা চাকরীবাকরীও যদি হতো তবু সংসারের সাহায্য হতো।

নমিতা চুপ করে বসে থাকে। কি যেন ভাবছে সে। মাসীমার বেদনাহত মুখের দিকে চেয়ে থাকে। জানলার ফাঁক দিয়ে তারাভরা আকাশটুকু দেখা যায়। এ বাড়ীর জীবনে সেও জড়িয়ে গেছে, জড়িয়ে গেছে ওদের সুখ, দুঃখের সঙ্গে। ওদের সংসারের করুণ অবস্থাটা ক্রমশঃ নমিতার চোখেও ফুটে উঠেছে।

বেশ জানে নমিতা আণ্ডার গ্রাজুয়েট কিই বা চান্স পাবে জীবনে। এই অল্প পুঁজি নিয়ে এতবড় জীবনের কঠিন পথে পাড়ি দেওয়া যায় না।

মাসীমা উঠে গেছে একাই বসে আছে নমিতা।

নিখিলের রাত্রি করে বাড়ী ফেরা —এই ঔদাসীন্যের জন্য নমিতাই নিজেকে কিছুটা দায়ী মনে করে। কল্যাণীর কথার আড়ালে চাপা বেদনা আর হতাশার অসহায় করুণ সুরটা তার মনে লেগেছে।

রাত্রি ঘন হয়ে আসছে।

মেঘে আবার ঢেকে গেছে আকাশ। তারাগুলো জেগে উঠেছিল ক্ষণিকের জন্য আবার তারা সব আঁধারে হারিয়ে গেছে।

বসে আছে নমিতা, তার ঘুম আসেনি। নিস্তব্ধ নিশুতি রাতের ওপারেই নদীর ধূসর বালুচরে পাখী ডাকছে। পাখীটা ডেকে ডেকে থেমে গেল।

বাইরে সাইকেলের শব্দ শোনা যায়।

এগিয়ে আসছে নিখিল। সাইকেলটা উপরে উঠে এল সে নিজের ঘরের দিকে নমিতাকে দেখে দাঁড়াল।

—এত দেরী হল যে!

নমিতার কথায় একটু কাঠিন্যের সুর ফুটে ওঠে। নিখিল থমকে দাঁড়াল, এবাড়ীতে তাকে এমনভাবে কেউ কৈফিয়ৎ তলব করে না। কঠিন হতে গিয়েও পারল না সে, শান্ত সুন্দর মেয়েটির মুখে এককালি আলো পড়েছে। ওর কালো চোখ দুটোয় একটা নম্রতা অথচ মুখে একটা সতেজ ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে। নিখিল চুপ করে থাকে।

বলে ওঠে নমিতা।

এত রাত্রে বাড়ী ফেরো এর জন্য আমাকেও কথা শুনতে হয়।

একটু অবাক হয়ে নিখিল বলে কেন?

নমিতা ওর মুখের দিকে তাকায় দুচোখ মেলে চাইল। একটু কি ভেবে জবাব দেয়—কেন তা জানি না। পড়াশোনা ছেড়ে দিলে, গানও বন্ধ করেছ, দিন রাত কেবল আড্ডা আর আড্ডা। কি করবে এর পর? চিরকালতো এমনি করে কাটবে না?

কথাটা শুনে একটু চমকে ওঠে নিখিল। সেও এসব ভেবেছে। বন্ধুবান্ধবদের অনেকেই গ্রাজুয়েট হয়ে, চাকরীবাকরীও করছে। কেউ কেউ এম এ পাশ করে প্রফেসারী করছে। নিখিল তাদের তুলনায় অনেক নীচে।

জীবনে আশাই ছিল পড়বে সে। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু তার কোনটাই হয়নি। কেন হয়নি তাও জানে।

তাই হয়তো এমনি করে নিছক নষ্ট করেই সময় কাটাতে হয় তাকে। বেদনাহত দৃষ্টিতে নিখিল ওর দিকে চাইল।

জানলার ফাঁক দিয়ে আঁধার আকাশ দেখা যায়. নিবিড় আঁধারে জেগে আছে তারার রোশনী।

নমিতা ওর বেদনাকরুণ অসহায় চাহনিটুকু ভুলতে পারে না। নীরব সহানুভূতি আর সমবেদনায় মন ভরে ওঠে।

—তোমাকে আবার পড়তে হবে।

নমিতার কথায় নিখিল মুখ তুলে চাইল। নমিতার মুখে ফুটে উঠেছে একটা নীরব ব্যক্তিত্ব। দুচোখে চাহনীতে সেই ক্ষণিকের লজ্জা আর অজানা মাধুর্যটুকু একটা নিষ্ঠি আবেশে পরিণত হয়েছে। নিখিল বলে ওঠে।

—পড়বো?

—হ্যাঁ, পড়বে, পাশ করবে।

নমিতার কণ্ঠে দৃঢ়তার সুর। নিখিল বলে ওঠে।

—সেতো অনেক টাকার ব্যাপার। মাসে মাসে হোস্টেলের খরচ, কলেজের মাইনে, আর বাড়ীর এই অবস্থা! কোত্থেকে আসবে সে টাকা?

নিখিলের কথায় একটা অসহায় ভাব ফুটে ওঠে, নমিতাই আশ্বাস দেয়।

—সে ভাবনা আমার।

তোমার! তোমার টাকা নিয়ে পড়বো?

নমিতা ওর কাছে এগিয়ে আসে দুচোখে নিবিড় প্রীতির স্পর্শ, নিখিলের হাতখানা নিজের হাতে তুলে নেয়। দোষ কি! আমার টাকাতো পরেই আছে তবু কাজে লাগুক। পাশ করে চাকরী করলে শোধ দিও।

নিখিল ওর দিকে চেয়ে থাকে, এতদিন নমিতার সম্বন্ধে একটা অন্য ধারণা ছিল তার মনে। কঠিন অন্যধাতের একটি মেয়ে।

সেদিন গান গাওয়া নিয়ে ধমক দেবার পর থেকেই দূরে দূরে থাকতো নিখিল ওকে এড়িয়ে চলতো। বড়লোকের মেয়ে পোষাকআষাকও একটু হিমছাম, এ বাড়ীতে এসে আশ্রয়ই নিয়েছে মাত্র, এ বাড়ীর ও কেউ নয়, বরং এরা সবাই যেন তার দয়ার পাত্র।

কিন্তু ওর অন্তরের পরিচয় পেয়ে আজ ওর ধারণা বদলে গেছে। —কি ভাবছো এতো?

নমিতার কথায় ওর দিকে চাইল। আনমনে জবাব দেয়—

—না।

—তা হলে ভর্তির চেষ্টা করো। সেসনের সময় এসে যাচ্ছে।

রাত হয়ে গেছে। নমিতা নিজের ঘরে এসে ঢুকেছে নিখিলও চিন্তিত মনে ওদিকে এগিয়ে যায়। কথাটা ভাবছে সে।

দয়ার দান এ নয়—প্রীতির পরিচয় যদি থাকে তা নিতে দোষ কি! তাকেও টিকে থাকতে হবে, এত বড় পৃথিবীতে টিকে থাকতে গেলে কিছু নেওয়া এমন কি দোষের। মনস্থির করে ফেলে সে।

কল্যাণী কথাটা শুনে খুশী হয় মনে মনে।

এমনিই একটা কিছু চেয়েছিল সে। নিখিলের ভবিষ্যতের কথা ভেবে সেও চিন্তায় পড়েছিল, হঠাৎ অযাচিতভাবে সেটা সমাধান করে দিয়েছে নমিতা।

কল্যাণী বলে ওঠে।

—তোর কর্তব্য তুই করেছিস মা, কিন্তু নিখিল কি রাজী হবে, যে একরোখা ছেলে সে।

নমিতা চা-এর পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বলে—

—তার মত আছে। তা ছাড়া কি করবে সে।

—তবু সুমতি হয়েছে তার, আমি তো পারিনি মা তুই বলে কয়ে দেখ যদি মানুষ হয় সে।

কল্যাণী খুশী হয়েছে, অনেকগুলো টাকার খরচ, নমিতাই দেবে এই কথাটা জেনে।

পরিতোষবাবুর বেদনাটা একটু কম। বৈকালে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে কথাটা শুনে নমিতার দিকে চাইল। ওর দৃষ্টিতে বেশ বিস্ময় আর নীরব প্রতিবাদ ফুটে ওঠে। এ বাড়ীর ধারায় সপ্তে বুঝের কোথায় একটা অমিল রয়ে গেছে।

বলে ওঠে, এটা কি ঠিক হবে?

কল্যাণী ওপাশে বসেছিল চাতালে, পরিতোষ বাবুর দিকে চাইল বিরক্তিভরা চাহনিতে। মানুষটাকে নিয়ে জ্বলে পুড়ে মরছে সে।

রোজকার নেই আজ ও যেন ওদের বোঝা, পায়ে পায়ে শুধু বাধাই দেয়। একুনি ছেলেটার সব ভবিষ্যৎ উল্টে দেবে। কিছু বলতে পারে না কল্যাণী স্বামীকে, বরং সায় দেবার চেষ্টা করে।—আমিও বলেছিলাম সেকথা নমিকে, কিন্তু ও মেয়ের জিদ চেপেছে কে থামাবে বল!

নমিতা হাসে।

পরিতোষবাবু আর কোন কথা বললেন না। চুপ করে গেলেন।

নমিতা ওর হরিণবদ-এর কাপটা নিয়ে ভিতরে চলে যেতেই কল্যাণী বিজয়মূর্তি হয়ে বলে ওঠে।

—সবতাতেই কথা বলা তোমার অভ্যাস!

পরিতোষবাবু ওর দিকে চাইলেন, কল্যাণীর মুখে চোখে অভাবের কাঠিন্য, মনের লোলুপতা মুখের রেখাগুলোকে কঠিন করে তুলেছে।

পরিতোষবাবু কথা বলেন না, চুপ করে সামনের কাঁঠালচাপা গাছটার দিকে চেয়ে থাকেন, ওখানে ঘন বিনধালো পাতার পুঞ্জ পুঞ্জ আঁধার রহস্যের মত ঘিরে উঠেছে।

দিন বদলাচ্ছে। শীতের রুক্ষতার পর এসেছে গ্রীষ্মের দিন। খর তাপ সন্তপ্তদিন। ধনুরাক্ষীর বালুচরে ধু ধু রোদ কাঁপে দিকজোড়া পদ্মাবিত্ত মাঠে এসেছে তাম্রাভ তীব্র দহনজ্বালা

গুলো শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে।

বাগানের আমগাছগুলোর এবার অজস্র আম এসেছে থলথল হয়ে উঠেছে আমগুলো।

নমিতা ক'মাসেই এ বাড়ীর ধরনে পড়া মুখ যেন বদলাতে চেয়েছে।

ভর্তির ব্যবস্থা হয়ে গেছে নিখিলের। কয়েকদিনের মধ্যেই সহরে চলে যাবে। নিখিল আর নমিতা বেড়াতে বের হয়েছে।

পরিতোষবাবু দেরে উঠেছেন। বৈকালে রোজ ছড়ি হাতে নিয়ে উকিলপাড়ার ওদিকে না হয় বিমলবাবুর ডাক্তারখানাতেই গিয়ে বসেন, পাশার ছকের সন্ধানে। নমিতার কাজ অনেকটা কমে গেছে। তাই বৈকালের দিকে মাঝে মাঝে বের হয় তারা নদীর এই বালুচরের দিকে। বালি আর পলিমাটী মেশানো ক্ষেতে আখ-এর গাছগুলো সবুজ প্রাণস্পর্শ নিয়ে মাথা তুলেছে। পাখী ডাকে বালুচরে কাদাখোঁচা তিতির করের পাখী। আকন্দফুলের মাথায় কালো ভ্রমরগুলো ঘুরে বেড়ায় গুণগুণিয়ে।

ওরা বাঁধ-এর উপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে, পড়ন্ত মিষ্টি রোদ লুটিয়ে পড়েছে চারিদিকে বালুর রুক্ষতাকে ও ঢেকে দিয়েছে খেড়ো কাকড়ি তরমুজের সবুজ লতাবেষ্টনী।

সোনা রোদ আরক্তিম হয়ে ওঠে, বালুচরে নেমে ওরা জলরেখার দিকে এগিয়ে চলেছে। কালো যমুনের চোখের মত রং ওর জলের, তাই ওর নাম যমুরাক্ষী।

দূরে পর্বত থেকে সবুজ স্বপ্ন নিয়ে নেমে এসেছে গ্রাম প্রান্তর শালবন সীমা পার হয়ে। দুপাশে সবুজ ধানক্ষেত, পাখী ডাকা প্রাণভরা পরিবেশ, নিঃশেষ রুক্ষতাকে সে তার প্রাণ প্রবাহ দিয়ে ফলবতী স্বপ্নময়ী সম্পূর্ণা শ্রীময়ী করে তুলেছে। নমিতার মনে এই কথাটাই বার বার ঘুরে যায়।

—বাদা!

নিখিলের ডাকে বসল ওরা দুজনে। বালির একটু উপমত তার নীচে দিয়ে জলরেখা বয়ে চলেছে

হাটু জল তাতেই ছোট ছোট মাছের ঝাঁক ঘুরে চলেছে।

নিখিল ক'মাসেই জীবনের একটা বৈচিত্র্যের সন্ধান পেয়েছে। একদিনের অভ্যস্ত বৈচিত্র্যহীন জীবনযাত্রার মাঝে আনন্দের স্বাদ খুঁজেছিল, মনে হয় সেটা তার ভুলই। জীবনকে একটা কঠিন বাঁধনে ফেলে চলাটার মাঝে একটা অর্থবহ সার্থকতা আছে। নমিতাও তাই যেন চায়।

নিখিল তবু নিজেকে বিশ্বাস করতে পারে না। বলে ওঠে—যদি পাশ করতে না পারি?

ও যেন ভরসা আশ্বাস খুঁজছে নমিতার কাছে। নমিতা ওর দিকে চাইল। নতুন করে নিখিলকে চিনেছে সে। অনেক সহজভাবেই মিশেছে তার সঙ্গে। বলে ওঠে—

—কেন পারবে না? পড়লেই সবাই পাশ করে।

হঠাৎ ওদিকে একটা শব্দ হতেই ফিরে চাইল নিখিল, একটা ছোট শিয়াল বালিয়াড়ির উপর দিয়ে আনমনে চলেছিল, এখানে আর কেউ যে বসে থাকবে কল্পনা করেনি, হঠাৎ সামনেই ওদের দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে। মেটে মেটে গায়ের রং, ছোট নীলাভ দুটো চোখ।

নিখিল লাফ দিয়ে ওঠে, নমিতাও।

—ধরো ধরো ওটাকে।

দুজনে ওটাকে ঘিরে জলের দিকে আনতে থাকে নরম বালি পা বসে যায়, সন্ধ্যার মুখে বালুচরে হাওয়া উঠেছে। বালুকণায় ঘর্ষণে হাওয়ার একটা ঝিন ঝিন সুর ওঠে। হাসছে নমিতা, হাটু অবধি দেবে যাচ্ছে বালিতে পড়ে যায় আবার ওঠে।

নিখিলও তাড়া করেছে শিয়াল শাবকের পিছু পিছু, কিন্তু ওদের দৌড় কাঁপই সার হয়। সে হাল্কা পায়ে দৌড়ে নিখিলের মধ্যে নিরাপদ দূরত্বে চলে যায়। জলের উপর নরম বালু স্তরে পা দিতেই নিখিল বালুর চাঁই সমেত ছিটকে পড়েছে নদীর জলে সশব্দে।

হাসিতে ফেটে পড়ে নমিতা।

—খুব বীর যা'হোক!

নিখিল অতর্কিতে জলে পড়ে হকচকিয়ে গেছে। ভিজে গেছে জামা কাপড় পা মাথা দিয়ে জল ঝরছে। জল আর কিচকিচে বালি।

নমিতা ওই দৃশ্য দেখে হেসে লুটিয়ে পড়ে। হাসতে হাসতে বসে পড়েছে বালিতে।

নিখিলও অপ্রস্তুত হয়।

সন্ধ্যা নামছে।

মুক্ত জনহীন প্রান্তরে নামছে ঝিকে আঁধার। গাছ গাছালির মাথায় জমাট বাঁধে, ঝিঁ ঝিঁ ডাকে। উদাস নিঃস্ব সন্ধ্যা এত বড় নির্জনতা।

দুটি মনকে কেমন নিঃসঙ্গ করে তোলে।

ওরা ফিরছে বাড়ির দিকে। নিখিলের মনে হয় হঠাৎ আজ যেন এই মাটি এই নদী ওই মুক্ত প্রান্তরের সঙ্গে তার নিবিড় একাত্মবোধ খুঁজে পেয়েছে সে। এই স্বল্প জগতের মাঝে সব আলো আঁধার আনন্দের মাঝে মিশিয়ে গেছে নমিতা ও।

…কালই চলে যাচ্ছে সে শহরে। এই সব কিছু ছেড়ে। অজানাতেই তাই মন কেমন করে।

—কথা কইছ না? নমিতাই প্রশ্ন করে, রাগ করেছ?

—কেন?

—হাসলাম বলে। যা দেখাচ্ছিল তোমায় উঃ।

আবার হাসির ভগ্নাংশটুকু আঁধারে সুর তোলে। নিখিল ওই রহস্যময়ীর দিকে চেয়ে থাকে। এক ফালি চাঁদের আলো বালুচরে মাঠে গড়িয়ে পড়েছে। কেমন সব অস্পষ্ট আবছা দেখায়, সব কিছুর রূপই একটা বিভ্রান্তি আর জটিলতায় অবার্ত মিলছে অসম্পূর্ণতার মাঝে, কতক দেখা কতক জানা বাকী অনেক অজানার হালকা ঔদাসীন্যে সব একাকার হয়ে গেছে।

নিখিলের হাতটা ধরে ঝাঁকানি দেয় নমিতা।

—এ্যাই।

আজ সে চঞ্চল প্রাণময়ী হয়ে উঠেছে। এই সাড়া তার মনে জাগে—সুর জাগে নমিতার মনে। জীবনের সুর।

নিখিল ওর দিকে চাইল। বলে ওঠে—

—না, না। রাগ করবো কেন?

—তবে মুখ ভেলো হাঁড়ি করে রেখেছ কেন? বেরে গেলে বলে? ধ্যাৎ।

হাসছে নমিতা, নিখিল ও।

শিরালনন্দন তাকে সত্যিই বিলক্ষণ ভারে ঠকিয়ে গেছে।

একজন এবাড়ির সব ব্যাপারটাই দেখছে সে বনমালী চাকর।

সকালে বাজার করতে যায়। কল্যাণীই টাকা পত্র দেয়।

মাসের মাঝামাঝি টাকাটা গিন্নীমা ঠিকই দেয় তারপর মাঝে মাঝে বলে।

—দিদিমণির কাছে যে গা।

কোন কোনদিন নমিতাই আগ বাড়িয়ে বাজারের খরচ করে টাকা দেয়।

বনমালী চুপ করে টাকাটা নিয়ে বাজারে যায়।

নিখিল সহরে, নমিতার একা একা যেন ভাল লাগে না। ঘর সংসারের কাজ নিয়েই থাকে। না হয় বিমল-বাবুর বাড়িতে বেড়াতে যায়। ওর মেয়ের সঙ্গেও ভাব হয়ে গেছে মাঝে মাঝে বৈকালটা কাটিয়ে আসে।

কল্যাণী প্রথমে আপত্তি করে নি।

পরিতোষবাবুই বলেন তবু মন ভাল থাকবে, থাক ও।

কিন্তু ওর এই বেড়ানো এখান ওখানে অনেক বন্ধুদের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়াটা ঠিক পছন্দ করে না কল্যাণী। মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না, তবু হাব ভাবে বেশ ফুটে ওঠে যে কল্যাণী এটা পছন্দ করে না। স্বামীকে বলে।

—তুমি বারো দিকি। সোমত্ত মেয়ে এখান ওখানে বেড়ানো এটা কেমন কথা?

পরিতোষবাবু আমতা আমতা করেন।

—বিমলের মেয়ের ওখানে যায়। একই বয়সী কিনা সুমিতা।

—হোক। এত মাখামাখি ভালো নয়।

কথার জবাব দিলেন না পরিতোষবাবু, চুপ করে থাকেন। কল্যাণী অখুশী ভরা সুরে বলে।

—সন্ধ্যা হয়ে গেল এখনও ফিরছে না। পরের মেয়ের দায় ঘাড়ে নেওয়া কি যে জ্বালা জলেপুড়ে মলাম।

বনমালীই জানে এসব গৃহতন্ত্রের খানিকটা।

এবাড়ির সংসার চালানোর ব্যাপারে নমিতা ক্রমশঃ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। বনমালী দেখে এ সব কিছু।

মাসকাবারী মুদির দেনাও মিটোবার সময় কল্যাণী কর্দটা নমিতার হাতে তুলে দেয়।

—টাকাটা দিয়ে দে মা। সুটকেসে আছে।

—চাবিটা কই?

নমিতার কথায় কল্যাণী এদিক ওদিক হাতড়াতে থাকে। চাবি আর পাওয়া যায় না অনেক খোঁজা খুঁজির পর। কল্যাণীই বিরক্ত হয়ে উঠেছে।

—কোথায় যায় জিনিসপত্র। ওকে ওবেলায় আসতে বল না হয়।

নমিতাই বলে।

—দিয়ে দিই এখন।

—দিবি! পরে নিয়ে মিস বলে করে বাছা।

কল্যাণী কারো রূপ দেখে যেন নিশ্চিন্ত হতে পারে না। নমিতাই টাকাটা দিয়ে দিল। মাস কাবারী সহরের বাড়ি ভাড়া এলে তার থেকে নিখিলের খরচ ও দেয়। তারপর সংসারে এদিকে ওদিকে ও যোগান আছে।

একটি প্রাণীর ভাল মানুষীর সুযোগ নিয়ে তাকে ঠকাতে সুরু করেছে তা যেন অনুমান করে শিউরে ওঠে বনমালী।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। নমিতার আজ ফিরতে একটু দেরিই হয়।

বিমলবাবুর বাড়িতে প্রাণী মাত্র তিনটি। স্ত্রী আগেই মারা গেছেন ও বাড়ির ভার এসে পড়েছে একমাত্র মেয়ে বিজলীর উপর।

বিমলবাবুর জীবনে ওই একটি মাত্র বিষাদের ছায়া। মেয়েকে ভাল ঘরেই বিয়ে দিয়ে ছিলেন তিনি। কিন্তু বরাতে সইল না, বিয়ের কয়েক বছর পরই বিজলীর স্বামী মারা গেল শ্বশুর বাড়ির অবস্থাও বেশ জমজমাট। বিজলীকে তবু বিমলবাবু নিজের কাছেই এনে রেখেছেন। স্ত্রী মারা যাবার পর সংসারের সব দায়িত্ব এসে পড়েছে বিজলীর উপর।

জীবনের সব দুঃখ ব্যর্থতাকে সে আবার কাজের মধ্যেই ভুলতে চায়।

বিমলবাবুর সংসারে আর একটি সোণা আছে সে ভক্তি কম্পাউণ্ডার; এক কালে কম্পাউণ্ডার ছিল এখন

সে ডাক্তারেরও বড়ো; বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখ বেড়েছে। বিমলবাবুর বাবার আমলের কম্পাউণ্ডার ওই বৃদ্ধ ভক্তিবাবু; তিন কুলে কেউ নেই—কবে কত বৎসর আগে ভক্তি এ বাড়িতে এসে জুটেছিল তা জানেনা কেউ, বিমলবাবুও না।

বাবার চিহ্ন হিসাবেই বুঝি ভক্তিচরণ রয়ে গেছে এ বাড়ীতে, হুঁকো টানে দিনরাত হাট বাজারে যায় ওই হুঁকো হাতেই। আর কি সব বকে চলে সেই সঙ্গে।

ওকে কেন্দ্র করেই আড্ডাটা জমে। নমিতার ভাল লাগে লোকটিকে। কোন কোনদিন বিমলবাবুও বসে যান।

রোগীর ভীড় সামলাবেন না কাকাবাবু!

নমিতার কথায় হাসেন বিমলবাবু।

—ওতো রোজই আছে মা।

ভক্তিচরণ হুঁকো টানা থামিয়ে বলে ওঠে···

—থাকবে না? সভ্যতা বাড়ছে আর রোগ বাড়ছে। আগে এই মদনপুরে কটা ডাক্তার ছিল? ডাক্তার ছিল ওই একজন তোমার বাবা।

আর সব হ্যাজার ব্রাণ্ড—এই আমার মত। আর রোগ তো ছিল দুটো, ম্যালেরিয়া আর আমাশয়। কোঁড় আর গেলাও!

আর এখন! কাঁড়ি কাঁড়ি রোগ আর বকমারি ওষুধ। পিণ্ডি কি গিলতে পার? দুধে গেছে—ঘাস গেছে—ঘি গেছে, আছে ওষুধ! সে বাবা! রোগী কমবে কোত্থেকে?

হাসেন বিমলবাবু। বিজলী খাবার নিয়ে এসে হাজির হয়।

নমিতা বলে ওঠে—তুমি আবার এসব কেন করলে বিজুদি?

ভক্তিচরণ হুঁকো নামিয়ে প্লেটে হাত লাগিয়েছে ইতিমধ্যে।

বিজলী অসময়ে যায় না কিছুই।

তবু অন্যের সুখ সুবিধার দিকে নজর তার সব সময়ই। মুখের হাসিটুকু লেগে থাকে।

ভক্তিচরণের কথায় হাসে। বিমলবাবু উঠে চলে যান ডিসপেনসারীর দিকে—কোথায় একটা কল এসেছে।

ভক্তিচরণ বলে ওঠে—

—দেখনা, বর্ষাকাল আসুক, তখন রকমারী অসুখ হবেন। আর যান দেখেছো এখানের যান!

মাথা নাড়ে নমিতা।

—না।

—দেখবে এইবার! তাও যদি বাঁধ ভাঙ্গে তো কথাই নেই।

ভক্তিচরণ উঠে পড়ল, সন্ধ্যার পর একটু ইষ্ট নাম জপ করে তারই সময় হয়ে গেছে।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার গাঢ়তর হয়ে ওঠে। পথে লোক চলাচল কমে এসেছে। বিজলী আর নমিতা বসে আছে।

নমিতার মনে একটা শূন্যতা জাগে। তাদের বাড়ীতেও কেমন একলা সে।

নিখিল আসেনি? বিজলীর কথায় নমিতা মুখ তুলে চাইল। ওর অজ্ঞাতেই মুখে একটা নীরব লজ্জার ছায়া খেলে যায়। বিজলী জানে নিখিলের পড়ার খরচ কে জোগাচ্ছে।

নমিতা বলে ওঠে—

—আসবার কথা ছিল রবিবার, পরীক্ষার পড়ার জন্য আটকে গেছে!

বিজলীর মুখে হাসির একটু আভা ফুটে ওঠে।

—তাই এত মন মরা, ঘরে মন বসে না?

নমিতার মনে পড়ে অনেকক্ষণই সে বাড়ী থেকে এসেছে, অন্ধকার হয়ে গেছে।···ফিরতে হবে। এক পাড়া থেকে অন্য পাড়ায় যেতে হবে, খোয়া চাকা রাস্তা, আলোও তেমন নেই।

—নমিতা উঠে পড়ে। রাত হয়ে গেল বিজুদি!

—একা যেতে পারবে?

—হ্যাঁ।

—বিজলী কি ভেবে বলে ওঠে—না, ভক্তিদা এগিয়ে দিয়ে আসুক।

ভক্তি চরণ একপায়ে খাড়া। বুড়োর চোখ দুটো যেন আঁধারে জ্বলে আর তেমনি শক্ত আছেও। সে ও হাজির হয়েছে।

—নাম জপ করা হয়ে গেল? নমিতা বলে ওঠে।

হাসে ভক্তি চরণ—ওসব সেই হাজিরা খাতায় নাম সই করা দিদি। চাকরী করা আর নাম সই করা দুটো আলাদা। বাবা নাম রেখেছিলেন ভক্তি চরণ। নামই ভক্তি চরণ ভক্তি আর হল কই। চলো।

দুজনে বের হয়ে গেল পথে।

ভক্তি চরণ গুণ গুণ করে গান গাইতে গাইতে চলেছে।

অন্ধকারে জোনাকী জ্বলে নদীর দিক থেকে ভেসে আসে বাতাসের সুর তাতে মিলেছে ভক্তি চরণের গলা।

ভাবের মানুষ হয় যে জনা—

তারে দেখলে যায় চেনা।

নমিতা হাসে এ যে দেহতত্ত্বের গান ভক্তিদা?

—যশোদা গায়, শোননি? নদীধারের সেই আশ্রমের যশোদা বাউল গো।

নমিতা দেখেছে তাকে মাঝে মাঝে গেরুয়া বস্ত্রবাস পরনে তালি দেওয়া আলখাল্লা হাতে একতারা। ভিক্ষা করতে যায় ওই গান শুনেছে তার মুখে ও।

ভক্তি চরণের সুর ওই রাতের অন্ধকারে কেমন বিচিত্র রহস্যময় বলে মনে হয়।

কল্যাণী ওকে ফিরতে দেখে মুখ তুলে চাইল মাত্র।

মুখে চোখে একটা থমথমে ভাব। পরিতোষবাবুই বলে ওঠেন। এত দেরী হল যে মা?

বিজলির সঙ্গে কথা বলতে বলতে দেরি হয়ে গেল।

কল্যাণী খুশী হয় না মুখের চাপা বিরক্তির রেখা প্রকট হয়ে ওঠে। এত কি কথা বাছা যে দিনরাতে ফুরোয় না। তাছাড়া ওপাড়াটা সুবিধের নয়। বিচ্ছীর পাড়া। নোতুন মেয়েদের ইস্কুলের মাস্টারনীরা তো শুনেছি রাস্তাতেই ঘুরে বেড়াচ্ছে সকাল বিকাল।

নমিতা কথাটা শুনে রাগ করতে পারে না। মনে মনে হাসে। প্রকাশ্যে হাসবার উপায় নেই, তাই হাসিটা চেপে থাকে।

ভক্তি চরণ দাঁড়িয়েছিল ওপাশে, জবাবটা সেই-ই দেয়।

দিন যে বদলাচ্ছে মাঠান তারারা যখন নিজের ভাত কাপড় নিজেরাই খেটে রোজকার করছেন তখন আর ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকলে কি চলে?

কল্যাণী বুড়োর দিকে চাইল।

—তবে আর কি! তুমি আর তোমার ডাক্তারবাবুও দুহাত তুলে ওদের কীর্তনের দলে নাম লিখিয়ে দেই দেই করে নাচো গে।

ভক্তি চরণ বেশ ঘাড় কাৎ করে হাসে সৌম্য শান্ত একটু হাসি।

কল্যাণী বলেছে।

—আমার তো বাউণ্ডুলের সংসার নয়, ওসব চলবে না।

নমিতা চুপ করে থাকে। ভক্তি চরণ চুপ করে বের হয়ে গেল, কথাটা যেন ঘরময় ঘুরছে বুকেছে সে।

নমিতাই বলে ওঠে ওকে এসব কথা বলা কেন মাসীমা?

—গায়ে লেগেছে বুঝি? তা বাছা সত্যি কথা বললে সবারই গায়ে লাগে।

কল্যাণী বের হয়ে গেল।

নমিতা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে এতদূর গড়াবে তা সে ভাবে নি। আর কোন অন্যায় তো করে নি সে। এসব কথা শোনানোর কি থাকতে পারে! বাবার কথা মনে পড়ে স্নেহময় একটি মুখ। চোখ দুটো জলে ভরে আসে।

বনমালীর ডাকে ফিরে ফিরে চাইল।

—রাত হয়ে গেছে খাবে না দিদিমণি?

নমিতা বলে ওঠে আজ আর খিদে নেই বুনুদা। তুমি খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়গে।

বনমালী তবু দাঁড়িয়ে থাকে। বুড়ো এসব ব্যাপার-টাই শুনেছে কর্তাবাবুর ঘর থেকে। গিন্নীমার এই বকুনিটা সেও কেমন ভালো চোখে দেখে না। নীরবে দেখে আসছে বুনু এবাড়িতে একটি প্রাণীকে ওরা নীরবে কেমন শোষণ করে চলেছে।

ক্রমশঃ দেখেছে বাজার খরচা এটা সেটা খরচ সবই চাপছে ওই নমিতার উপরই। কাপড়ের দোকানের বিল প্রায় বার'শো টাকা সেদিন নমিতার টাকা থেকেই দিতে হল। তার উপর মাসে মাসে এক'শো টাকা করে সুদতে হচ্ছে নিখিলের পড়ার খরচ। সংসার চালাচ্ছে ওই নমিতাই, অথচ তার এতটুকু বেড়াতে যাওয়া নিয়ে এমনি একটা কাণ্ড না বাধালেই পার তো।

—যাবে না? সারা রাত উপোসী থাকবে?

বুনোর কণ্ঠে একটা মমতার সুর। নমিতা বলে ওঠে।

—ডাক্তার ডাক্তার বাড়িতে খেয়ে এসেছি।

বুনো বলে ওঠে উপোস দিয়ে রাগ দেখানো মিছি। সারাদিন সারা রাত উপোসী থাকলেও কেউ ফিরে চাইবে না। সংসারের এই নিয়ম।

নমিতা কথা বলে না।

চুপ করে নিজের ঘরের দিকে চলে যায়। ও বাড়ির সব আলো নিভে গেছে। সদরের বারান্দার ধারের গায়ে একটা ফোরসি হারিকেন মিট মিট করে জ্বলে রাত। বাগানের আধারে তাও পথ হারিয়ে ফেলেছে।

চুপ করে বসে আছে নমিতা জানলার ফাঁক দিয়ে ওই আঁধারের দিকে চেয়ে। ফিকে আঁধারে দু'একটা তারার ঈষৎ অস্তিত্বটুকু যেমন ম্লান হয়ে যায়। চারিদিকে আঁধার ঘনিয়ে আসে রাতে নমিতার মত ভীরু অসহায় একটি মেয়ে যেন পথ খুঁজে চলেছে আকাশের অন্তরালে। তারার আলো নিভে গেছে রাতের বাতাসে মৃদু কম্পনের নিঃসঙ্গ প্রান্তরে কোথায় শিয়ালগুলো চাপা উল্লাসে কলরব করে ওঠে। ভীত আর্তরবে দূরে ডাকা একটা পাখি একবার ডেকেই চুপ করে গেল।

ওদের সব কলরবে তার ভীরু কণ্ঠস্বর হারিয়ে গেছে।

নমিতা কি ভাবছে। অন্তরে একটা নীরব জ্বালা কেমন করে করে চলেছে। মাকে মনে পড়ে না সে একটা আলো আঁধারে ঘেরা কেমন শান্তিস্পর্শ আনা অনুভূতি। ঘুমের আবেশের মত মন ছুঁয়ে ছুঁয়ে এসে চোখের পাতায় কেমন অলস জড়তা আনে।

এত অন্ধকারেও পথ নেই ঘুমের আবেশ শিথিলতায় তন্দ্রী স্নায়ুগুলোর উত্তেজনা হারিয়ে যায়।

পাখি ডাকছে। জানলার ফাঁক দিয়ে লুটিয়ে পড়েছে একফালি আলো। নারকেল গাছের সবুজ পাতা কাঁপছে।

—নমি!

কে যেন ডাকছে তাকে, নীল আলোর সঞ্চরণশীল একটা মুহূর্ত বৃত্তাকারে বৃহত্তর হতে থাকে। ডাকটা কেমন নদীর ওপারে কাশবনের মাথায় মধুর বাতাসের উন্মাদনা আনে।

—নমি।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল নমিতা। আঁধার নেই সেই নিবিড় অন্ধকার আলোয় আর পাখির গানে ভরে উঠেছে। ডাকছে তাকে নিখিল।

—তুমি! কেমন যেন স্বপ্ন বলে মনে হয় নমিতার।

বিশ্বাস করতে গিয়ে ওরম রোমাঞ্চ পায়ে না। নিখিল হাসি মুখে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। বলে ওঠে।

—কয়েকদিন ছুটি হয়ে গেল, চলে এলাম।

নমিতা ওকে দেখছে। সকালের চলছে সোনালী আলোর ছোঁয়া লেগেছে বাগানের গাছের মাথায়। ওই আলোকস্নান নিয়ে এসেছে নিখিল রাত শেষের একটি পাখির মত।

—চল, নিচে যাবে না? চা হয়ে গেছে।

নমিতা উঠে পড়ে।

কালরাতের সেই ঘটনাটা যেন ভুলে গেছে নমিতা।

পরিতোষবাবু ওকে দেখে কাছে ডাকেন। কাল খাদনি বুনু বলছিল?

আজ সব যেন ভুলে গেছে নমিতা গতরাতের সেই কয়েকটা মুহূর্তের দুঃস্বপ্ন। সহজ ভাবেই বলে ওঠে।

—কাল ডাক্তার কাকার ওখানেই খেয়ে এলাম কিনা?

—অ!

পরিতোষবাবু ওর দিকে চেয়ে থাকেন। নমিতা বলে ওঠে তোমার ওষুধটা দিই। ক'দিন একটু ভালো আছো আর অমনি অনিয়ম সুরু করেছ? জ্বিম দিয়েছে তোমার? এঁা—

হাসতে থাকেন পরিতোষবাবু—আবার না খাইয়ে রাখবি না?

ক'দিনেই নিজের মনে একটা পরিবর্তন অনুভব করে নমিতা। নিখিল যখন বাড়িতে ছিলনা এটা বুঝতে পারে নি। আজ যেন পারে। মনের ভিতর একটু ঠাঁই পেতে উঠেছে নীরব নিভৃতে একজনকে কেন্দ্র করে সে ওই নিখিলই।

তাই যোবনের চেয়েছে সে যত হোক তার জন্য নমিতার কোন ত্রুটি থাকবে না। নিখিলও কথায় কথায় বলে গেছে। সুন্দর হয়েছে তার চেহারা, মনের দিক থেকে বরণীয় কিছু

পেয়ে সেও খুশী হয়েছে, সেই খুশি আর তৃপ্তির স্পর্শ ওর মনে।

দুজনে বের হয়েছে অনেকদিন পর নদীর ধার দিয়ে বেড়াতে। অনেকদিন এদিকে আসেনি। মাটির রং বদলেছে রং বদলেছে আকাশের ওদের মনেরও সেই সঙ্গে।

—পড়াশোনা কেমন হচ্ছে?

নমিতার কথায় নিখিল ওর দিকে চাইল।

—এখানেও মাস্টারী করছ নাকি?

হাসছে নিখিল নমিতাও। নিখিল বলে ওঠে —পাশ করবই, হয়তো ডিস্টিংশন পাবো।

—তারপর?

নমিতা চায় না নিখিল এই খানেই থামুক। নিখিল বলে ওঠে পরের কথা পরেই ভাববো।

নিখিল সেটাও কিছুটা ভেবেছে। সহরের একটি অঞ্চলে ওর মামার এক বন্ধুর বিরাট কারখানা আছে সাবান ফেনাইল, আরও নানান জিনিষ তৈরি হয়, এখানে বাইরে কলকাতাতে চালান যায় তার মাল। পড়তে পারে না এত কাটতি, মামার বন্ধু গোবিন্দবাবুর সামান্য অবস্থাই ছিল, কোন রকমে দিন চালাতেন, সেই গোবিন্দবাবু আজ ওই কারখানা থেকে ফুলে উঠেছেন। ও অঞ্চলেই আছি বাস। এখানেও বাড়িটাড়ি আছে অনেক ধান জমিও রয়েছে। বেশীর ভাগ সময় থাকেন সহরে গাড়ী বাড়ি করেছেন ব্যাঙ্কেও মোটা টাকা পড়ে রয়েছে।

সেই গোবিন্দবাবুই তাকে আশ্বাস দিয়েছেন।

বি-এস-সি পাশ করলেই একটা ভালো ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কথাটা ঠিক করেনি এখনও নিখিল। তাছাড়া অন্য একটা কেমন আকর্ষণও রয়েছে সেখানে। ওর চঞ্চলমন হওয়ায় উড়ে যায় এখান ওখানে। জীবনের একটা বন্ধু, একটা আদর্শে একটি চিন্তার দৃঢ়তায় ওরা বহু থাকতে পারে না।

নিখিল নিজের মনের এই উদ্বেগ্য আর নীতি হীনতার খবরও জানে না।

বর্ষার ছায়া নামছে দূর প্রান্তরে।

নরম সবুজ ক্ষেতের বুকে সদ্যকর্ষিত মাটির মিষ্টি সোঁদা গন্ধ উঠছে। আখ এর বনের সবুজ আর কালো রং বেগুন পাতাগুলো বাতাসে অহেতুক আনন্দে কাঁপছে। সাদা মেঘের ঠাঁই নিয়েছে কালো পুঞ্জ মেঘ আউড়ি বাউড়ি বাতাস বইছে।

—বৃষ্টি নামতে পারে।

নিখিলের কেমন যেন ভালো লাগে না এই ঘুরে বেড়ানো। নমিতার মনে অন্য সুর বাজে। বেশ নিস্পৃহ নিরাসক্ত কণ্ঠে বলে।

—নামুক!

—ভিজবে যে!

—বেশ তো! না হয় ভিজলাম একটু।

নমিতা আজ সব আনন্দ সব মুক্তি বাঁধন ভেঙে ও অগ্রাহ্য করে পেতে চায়।

আকাশে আকাশে কিসের সাড়া, গুরু গুরু মেঘ ডাকছে দিক-দিগন্তরে। কাশবনের মাথায় মাথায় হাওয়ার সাপট ওদের নীচু করে দিয়ে ছুটে চলেছে কে যেন আকাশে বাতাসে দাবড়ে ফিরছে কালো ছমাট পুঞ্জমেঘ এর নদী রং মিলিয়ে যায় ক্যাকাসে বিবর্ণ মেঘ থেকে বৃষ্টি ঝরছে, অঝোর বৃষ্টি।

দুজনে ভিজছে নিখিল যেন আটকা পড়তে চেয়েছে ওই বৃষ্টির বেড়াজালে পিছল হয়ে গেছে নদীর বাঁধ এর উপরকার পথটা, কানে মুখে চোখে এসে লাগছে বৃষ্টির ঝাপটা, পৌঁ পৌঁ হাওয়ার বেগে যেন ছিটকে ফেলবে বাঁধ থেকে, এক একটা দমকা হাওয়ার বেগে ওদের দুজনকে যেন উড়িয়ে নিয়ে যাবে। নিখিল গজগজ করে।

—কি বিপদে পড়লাম বলদিকি!

নমিতার হাতখানা ওর হাতে, বলিষ্ঠ কঠিন একটা হাতের নির্ভর খুঁজছে যেন নমিতা, মাথার চুল মুখ গড়িয়ে বৃষ্টি নেমেছে, ভিজে গেছে কাপড় জামা সব কিছু।

দুজনে ছোটছে সেই ঝাপসা বৃষ্টি ধারার ধবনিকার মধ্য দিয়ে। নদীর জলে বৃষ্টির সুর ওঠে।

নমিতার হাসির সুর মিশেছে ওর সঙ্গে।

সামনেই বাঁধের নীচেই খানিকটা সুন্দর জায়গা বাগান মত, বেড়া দেয়া ঠাঁইটাতে কতকগুলো কলকে চামেলী গাছে ফুলে ভরে উঠেছে, দমকা বাতাসে উল্টে পড়া হলুদ রং ফুলগুলো মাটি বিছিয়ে রয়েছে ওখানেই একটু চালাঘর।

তবু খানিকটা আশ্রয় বলা যেতে পারে।

দুজনে ছুটে যায় সেই দিকেই। মাঠের ওপর চালায় চুকলো, নির্জন প্রান্তরে এই দুর্যোগ আর বৃষ্টির মাঝে তারা যেন পথ হারানো দুটি মানুষ। এতক্ষণে দুজনে দুজনের দিকে চাইতে সময় পায়। নিখিলের বলিষ্ঠ দেহে জামাটা ভিজে সেঁটে লেগে গেছে কোন রকমে সেটা খুলে ফেলে, নমিতার দিকে চাইতেই কেমন যেন চমকে ওঠে নিখিল।

নিটোল পুষ্ট দেহ বৃষ্টি ভেজা ফুলের মত সজীব শ্যামল স্পর্শ ওর মুখে চোখে, দেহের যৌবন স্পর্শ ফুটে ওঠে নদীর সজীবতায় এতদিন পর হঠাৎ যেন নতুন একটা রহস্যময়ী রূপে ওকে আবিষ্কার করে।

—নমিতা।

ওর কণ্ঠে সদ্য জাগর কোন অন্য মানুষের নব-জাগ্রত তৃষ্ণার স্পর্শ। চমকে ওঠে নমিতা!..... কোন রকমে ভিজে কাপড়খানা দিয়ে দেহ আবৃত করবার চেষ্টা করে।

.....এত বৃষ্টির মাঝেও সে নীরব কোন উত্তেজনায় কাঁপছে। .....ওদিক থেকে দুটো জাগর চোখ তাকায়।

কোথায় বাজ পড়ল আগুনের আভাস মেঘ ঢাকা আবছা অন্ধকার আকাশ কোন ক্ষণিকের জন্য উদ্ভাসিত করে যায় জীবনের কঠিনতম সত্যকে প্রত্যক্ষ করার চকিত আলোয়।

.....একটা সুর ওঠে.

.....এই বৃষ্টির মাঝেও সেই সুরটা জেগে ওঠে।

ওই সুরটুকু ওদের মনের সেই একক হারিয়ে যাওয়া নির্জনতার নিবিড় আবেশটুকুর স্পর্শ কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে।

যশোদা বাউল গাইছে না?

নিখিলের প্রশ্নে মাথা নাড়ে নমিতা হ্যাঁ।

বৃষ্টি ধরে আসছে। পাংশু জমাট আকাশের আবরণ সরে গিয়ে ঠাঁই ঠাঁই নীল আকাশ ফুটে উঠেছে। সন্ধ্যার আকাশ তারাফুলগুলো সন্ধ্যামালতীর মত ভীরু চাহনিতে ফুটেউঠেছে দু-একটা।

নমিতা নিখিল স্তব্ধ হয়ে শুনছে যশোদার গানটা।

ওই দিকে এগিয়ে যায়। কাদা জল জমে উঠেছে, বাগানের গাছগুলোর বৃষ্টি ধোয়া তারুণ্য, ফুলগুলো নীরব উল্লাস সজীব হয়ে উঠেছে।

শুনে মনভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে
প্রতি অঙ্গ মোর॥
রূপলাগি আঁখি ঝুরে—

যশোদা তন্ময় হয়ে গাইছে, কার পায়ের শব্দে মুখ তুলে চাইল। ওদের এ সময় এখানে দেখে অবাক হয়।

—দিদি যে! আরে দাদাবাবুও! এসো, এসো—

নিজেই অপ্রস্তুত হয় যশোদা—বসতেই বা দিই কোথায়, দাওয়া চালকুঁড়ে জল পড়ছে। তবু উঠে এসো দিদি—যা ভাগ্যি!

কোনরকমে উঠে গেল ওরা, জরাজীর্ণ চালা। খুঁটি গুলো নড়বড় করছে, তবু একটা শুভ প্রশান্তি ঠাঁইটাকে নীরব মাধুর্যে ভরে তুলেছে। অভাবের ছাপ সর্বত্র কিন্তু পূর্ণতার আনন্দে সে অভাবও অনর্থক বলেই বোধ হয়।

নমিতার মনে আনন্দের সেই সুরস্পর্শ।

যশোদা বলে ওঠে রাত্রি হয়ে আসছে, একদিন বেলা-বেলি এসো দিদি।

—আসবো।

নমিতা ওর চারিপাশে বাগানের দিকে চেয়ে থাকে।

—বেশ সুন্দর করে তুলছ ঠাঁইটাকে?

হাসে যশোদা।

—ঠাকুরের আশ্রম, তিনিই সাজিয়ে নিয়েছেন। শান্তিময়, তিনি—

প্রদীপটা জ্বলছে ঘরের এককোণে। নমিতা বলে ওঠে—ঠাকুর কইগো!

হাসে যশোদা, সহজ আনন্দধারার মত ফুটে ওঠে সেই হাসিটুকু। বলে ওঠে ঠাকুর—। ঠাকুর সব জায়গাতেই দিদি, তোমার আমার মনেই সব মানুষের অন্তরে।

ভাইতো মন্দির আর গতি না দিদি সব ঘরই তো মন্দির সব মানুষই যে দেবতা।

……নিখিলের এসব কেমন ভালো লাগে না।

—রাত হয়ে আসছে চল!

নমিতা উঠে পড়ল। যশোদা বলে ওঠে—

—তাই যাও দিদি। পথ ঘাট যা হয়েছে।

আবছা অন্ধকারে তারা আসছে দুজনে। নদীতে প্রথম বর্ষার জল নেমেছে, বাতাসে জলস্রোতের মৃদু শব্দ উঠছে, ওরা নদীর বাঁধ থেকে গ্রামের দিকে নেমে আসছে।

হঠাৎ টর্চের এক ঝলক আলো এসে পড়ে ওদের দুজনের মুখে। …অন্ধকারে কার কণ্ঠস্বর ভেসে ওঠে।

—হু ক্যাম দ্যার!

…ছায়া মূর্তিটা এগিয়ে আসছে। নমিতা চিনতে পারে।

—ভক্তি দা!

…ভক্তিচরণ এগিয়ে আসে। মাথায় ডাক্তারবাবুর একটা পরিত্যক্ত হ্যাট। মালকোচামারা ধুতি আর গলাবন্ধ কোট। হাতে ইট—একটা লাঠি।

—একি!

নমিতার কথায় বলে ওঠে ভক্তিচরণ।

দুবরা থেকে টেলিগ্রাম এসেছে, দারুণ বৃষ্টি হচ্ছে ওদিকে, এনি মোমেন্ট নদীতে হয়ত বা বান আসতে পারে। তাই পাহারা দিচ্ছি বাঁধে।

গো হোম।

নিখিল নমিতাকে ফেলে রেখে ওদিকে এগিয়ে যায়। আঁধারে ওদিক থেকে একটা হুইসেলের শব্দ উঠছে।

নিখিল হাসে—বেশ আছে হৈ চৈ করে ভক্তিদা। পাগল টাগল হবে বোধ হয়।

হাসে নমিতা।

সারা রাত কোনদিকে কেটে যায় জানে না নমিতা।

একটু দূরের স্মৃতি কুলগন্ধে মিশে রয়েছে তার মনে, নিখিলের দুচোখের চাহনিতে আজ নোতুন করে নিজেকে চিনেছে নমিতা। আঁধারে উদ্ভাসিত বিজলীর রেখার হঠাৎ কোন পরম সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছে সে।

ভোরের দিকে কি যেন স্বপ্ন দেখছে সে। নিখিলের স্পর্শটুকু, তাকে আনমনা করে দিয়েছে। দিশারী ভ্রমরের মত কোন এক অসীম নীল আকাশে সে উধাও হয়ে যায়।

…হঠাৎ কলরবে কোলাহলে ঘুম ভেঙ্গে যায়।

একটা টিকারা গুরুগম্ভীর শব্দ ওঠে, ঢিম ঢিম ঢিম। তাতে মিশেছে দুরাগত লোকজনের কলরব আর্তনাদ। বাঁধের দিক থেকে সেই আর্তনাদ ভেসে আসছে।

উঠে পড়ে নমিতা, ঘর থেকে বের হয়ে আসে। লোকজন ছুটেছে বাঁধের দিকে।

নীচে নামতে দেখে নিখিল সহরে যাবার জন্য তৈরী হয়েছে। একটু চমকে ওঠে নমিতা। ছুটি ওর আরও কয়েকদিন আছে। কিন্তু হঠাৎ চলে যাচ্ছে নিখিল। কারণটা ঠিক বুঝতে পারে না। চুপ করে চেয়ে থাকে ওর দিকে।

কল্যাণী বলে ওঠে নিখিলকে—

—গিয়ে চিঠিপত্র দিবি বাবা!

—হ্যাঁ।

নমিতার দিকে যেন চাইবার প্রয়োজনও বোধ করে না নিখিল। নমিতার অন্তরের মাঝে একটা নীরব অভিমান ফুটে ওঠে। বলে চলেছে সে,—আরও ক'দিন ছুটি ছিল বলে?

কল্যাণীই জবাব দেয়।

—থাক বাছা, কে জানে যদি বাঁধ ভাঙ্গে, নদীর যা অবস্থা তালে পথঘাট বন্ধ হয়ে যাবে, বাসও বন্ধ থাকবে।

নিখিল আমতা আমতা করে।

—তাই আগে থেকেই চলে যাই। পরীক্ষার পড়া রয়েছে।

নমিতা জবাব দিল না। কল্যাণীকে প্রণাম করে নিখিল বের হয়ে গেল, পেছনে চলেছে বনমালী সুটকেশটা নিয়ে বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে।… …নমিতা এ বাড়ীর যেন অবাঞ্ছিত কোন অতিথি, তার কাছে

ওদের অবাবদিহি করার কিছুই নেই। অভাবতের দায় দেওয়া তো দূরের কথা, বাবার সময় নিখিল একবার তার দিকে ফিরে চাবারও প্রয়োজন বোধ করে না।

হঠাৎ কল্যাণীর খেয়াল হয়। এগিয়ে এসে বলে নমিতাকে তাই তো মা! ওকে কিছু টাকা দিতে হবে এ দিকে খুচরা টাকা তো নেই। নমিতা অপরাধীর মত বলে ওঠে।

—সুটকেসে আছে বিনয়ে।

কল্যাণী উপরে ছুটলো। নিখিল তখনও বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে নমিতার দিকে ওর দৃষ্টি নেই। কি যেন ভাবছে।

নমিতা এগিয়ে যেতে গিয়েও পারলো না, পাদুটো কে যেন ওর আটকে দিয়েছে।

কল্যাণীর অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়েছিল নিখিল টাকার জন্য। নমিতার সঙ্গে নিভৃতে দাঁড়িয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানাবার প্রয়োজন তার নেই। ওদিকে বাঁধের দিক থেকে টিকারার শব্দ ওঠে, উঠছে কলরব কোলাহল।

সারা সহর যেন যুদ্ধনিষ্পেষণে কোন আগত বিপদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে প্রাণপণে। সেই বেঁচে থাকার সংগ্রামে যোগ দিয়েছে সারা শহরের আবালবৃদ্ধ বণিতা।

আর নিখিল এই সময় চলে গেল, সরে গেল ভীরু কাপুরুষের মত। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে নমিতা।

কল্যাণী একবার ওর দিকে চেয়ে ভিতরে চলে, ওর মনে যেন খুশীর আভাষ, নিখিলকে এই বিপদের মুখ থেকে যেন বাঁচাতে পেরেছে।

নমিতা দাঁড়িয়ে আছে।

হঠাৎ একটা আর্তনাদে কেমন চমকে উঠল।

পরিতোষবাবুর বাতের বেদনাটা আবার বেড়েছে, এই বর্ষার দিনে।

নমিতার মনে পড়ে এতক্ষণে এবাড়ির পরিত্যক্ত একটি মানুষের কথা, বিড়ালটা পায়ের কাছে এসে লেজ তুলে পায়ে মাথা ঘষছে ক'দিন তার দিকেও নজর দিতে পারেনি।

সন্তোষ না হয়েছে বিড়াল নন্দিনী সেই গর্বে যেন উৎফুল্ল হয়ে সগর্বে ঘোষণা করে।

—ম্যাও!

পিছনে কয়েকটা নরম তুল তুলে বাচ্চা দুটো চোখ মেলে চাইছে তার দিকে। নমিতা ওদের বুকে তুলে নেয়।

হঠাৎ কল্যাণীর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়।

—সাত সকালে আবার আন্তাকুড় ঘাটিলে? তোমাকে না বলে পারিনা বাছা আর সতীশের মাকেও বলি ওই আপদগুলোকে দূর করুক।

নমিতা ভয়ে ভয়ে ওদের বাহিরে দেয়।

কল্যাণীকে দেখে বিড়াল নন্দিনীও বেশ খুশী হয়নি। বাচ্চাগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে ওপরের দিকে চলে গেল।

পরিতোষবাবুর আর্তনাদ ভেসে ওঠে, কল্যাণী ভুলেও যেন ওদিকে কান দেয় না। এবাড়ির পাপ তাড়াবার জন্যই যেন ব্যস্ত সে।

নমিতা এগিয়ে যায় কাকাবাবুর ঘরের দিকে।

জানলাগুলো সব বন্ধ, দরজাটা ও ভেজানো। দিনের আলো বাতাসটুকুর প্রবেশ পথও এখানে সীমিত ওপাশে পুরোনো একটা খাট দুটো আলমারি কেমন পালিশ উঠে গিয়ে বিবর্ণ অতীতের ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছে।

নমিতা ঢুকে গিয়ে জানলাগুলো খুলে দেয়। আলোয় ভরে ওঠে ঘরখানা।

—কাকাবাবু!

নমিতার হাতের স্পর্শ ঠেকেছে ওর কপালে, ঘামছে পরিতোষবাবু কম্বল চাপা দিয়ে। ওর দিকে চাইল।

বেদনার ছায়া ওর বিবর্ণ মুখে পরিস্ফুট। বলে ওঠেন পরিতোষবাবু—নিখিল চলে গেল—না?

ঘাড় নাড়ে নমিতা।

পরিতোষবাবু ওর দিকে সন্ধানী দুচোখ মেলে চেয়ে থাকেন।

বলে ওঠেন বুঝলি মা, ওরা নিজের কথা ছাড়া অন্যের কথা ভাবে না, ভাবতেই পারে না।

নমিতা কথা বলল না, চুপ করে থাকে। বাতাসে

উঠছে নদীর দিকের কলকল্লোলের শব্দ, চিৎকার বাজছে।

পণ্ডিতোষবাবু বলে ওঠেন—নদীর বান খুব বেড়েছে মা?

—হাঁ!

পণ্ডিতোষবাবু চুপ করে থাকেন। কি ভাবছেন। বলে ওঠেন।

—দুঃখ কষ্টের আর শেষ নেই মা। বর্ষাকাল এলো তো—আকাশের জল নামল—ওদের চোখের জলও ঝরতে সুরু হল।

বনমালী টিফিনবাক্স বালতটপ থেকে ফিরেছে। কল্যাণী ওর জন্য অপেক্ষা করছিল।

—বাস চলে গেল তো?

—হাঁ! বনমালী জবাব দেয়।

—যাক, বাছা নিরাপদে সহরে পৌঁছাক সাবা। জাংগার দুখে ঝাটা, কতবার বাস সহরে চল, ওতবড় বাড়িটা ভাড়ায় রয়েছে।

কল্যাণী গজ গজ করে। নমিতাকে বের হয়ে আসতে দেখে মুখ তুলে চাইল। সহরের বাড়ি কল্যাণীদের নেই, ওই বাড়িটা নমিতারই, ভাড়ায় রয়েছে। সে টাকাতেই নিখিলের পড়ার খরচ চলছে, এতে ও যেন বেশ খুশী নয় কল্যাণী। নমিতাকে আসতে দেখে চুপ করল।

—কোথায় যাচ্ছো?

নমিতা বেরুচ্ছিল, ওর কথার জবাব দিতে হল। বলে ওঠে।

—একবার কাকাবাবুর ওখানে যাচ্ছি। ওষুধটা বদলানো দরকার।

বের হয়ে গেল নমিতা।

কল্যাণী ওর জবাবে যেন খুশি হয় না বলে ওঠে।

—হুতোর নাতার বেরুতে হবে। ঘরে কি আর মন বসে।

বনমালী জবাব দিল না। বেড়ালটার বোধ হয় খিদে লেগেছে, কল্যাণীর পায়ে এসে মাথা ঘষছে গলা দিয়ে ঘড় ঘড় শব্দে একটা আওয়াজ বের হয়, বাচ্চা দুটো দূরে থেকে ভয়ে ভয়ে চেয়ে রয়েছে।

কল্যাণীর গা জ্বলে ওঠে।

—বরণ! এগুলো দেখছি বাড়িতেই রইল। যতো কুকুর বিড়ালই পুষছে ঘুরজাত দিয়ে। সভীশের যাকে ও বলি দূর কর আপদ দিকে তা কে কার কথা শোনে।

বিড়ালটা সরে গেল।

ছোট সহরে চাঞ্চল্য পড়ে গেছে। স্কুল বন্ধ। ছেলের দল ছুটছে নদীর দিকে। কাছারীর কাজ ও বন্ধ—উকিল মহুরী মক্কেলরাও অনেকেই সেইখানেই, সহরের প্রবল পুরুষদের মধ্যে মুন্সেফবাবু দারোগা সাহেব বাসমালিক যতীনবাবু আড়তদার নবু পোদ্দার অনেকেই চাড়িয়ে রয়েছে যাঁদের উপর, এসেছে গ্রাম গ্রামান্তর থেকে মুনিষ চাষীর দল। ঝুড়ি ঝুড়ি মাটি পড়ছে পুরোনো বাঁধ সারা সহরের সীমানাকে চাঁদনির মত ঘিরে আছে দু'দিকে, ছোট খালটার জল আর নদী টানতে পারছে না ওদিকের বিলও জলে টই টুম্বুর হয়ে গেছে।

সেরাজুল আসরতের সৃষ্টি করে ঘুরতে ঘুরতে এসে জানা দিচ্ছে বাঁধে ঝুড়ি ঝুড়ি মাটি তালপাতা কইগাছের ডাল ফেলা হচ্ছে, যদি ওই মহুরাক্ষীর তোড় কিছুটা কমে কিন্তু তাতেও ফল হয়নি।

নদী যেন ক্ষেপে উঠেছে হারাল জিব বের করে লাফাতে সব কিছু পুরছে ওর অতল গহ্বরে ঘুর পাক দিয়ে ডালটাকে টেনে এনে স্রোতের আবর্তে যার কতক লোফা লুফি করে যেন ছিনিকে ফেলেদিল বাহুদী নদী।

ওরাও মাটি ফেলেছে। সারিবদ্ধী দাঁড়িয়ে দূর থেকে হাতে হাতে ঝুড়ি আসছে, মাটি ভর্তি ঝুড়ি গুলো। মাটি খালি হয়ে আবার মাটি আসছে।

.. বিমল ডাক্তার ও রয়েছে এদের মধ্যে। জলকাদায় ভিজে গেছে কাপড় বাঁধের এদিক ওদিকে লোকজন মোতায়েন, রাশি রাশি মুড়ি আর টিন বন্দী গুড় আসছে, মুনিষ কর্মীদের ওই খাবার ব্যবস্থা। এবদল খাচ্ছে অন্যদল কাজ করছে।

নমিতাও এসে দাঁড়িয়েছে। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে নদীর বিস্তারের দিকে, ওদিকের ঘোলাটে ঘেরা বহু। বিশীর্ণা নদী আজ উন্মত্তা—রুদ্রময়ী। বালুচর—কাশবন সব ডুবে গেছে—ওপরের সবুজ ধান ক্ষেতের পারে গ্রামগুলো যেন চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে আতঙ্কে ওরা বিবর্ণ নিষ্পন্দ।

মুখ বুজে সবই কোন সর্বনাশের প্রতীক্ষা করছে।

বাঁধের উপর সারি সারি তাল গাছের প্রহরা ওদের মাথার কালো মেঘগুলো যেন শুষে ঠেকেছে।

কর ঝরিয়ে বৃষ্টি নামে ওদের তবু বাঁধ ছেড়ে যাবার উপায় নেই ওরা প্রাণপণে বাঁধছে।

—মো চেক্স সার! ফিল রাইজিং!

হেঁকে ওঠে ভক্তি চরণ। জলের ধারে একটা বাঁশের ছোট লাঠি পুতে বসে আছে সে। পরনে ছেঁড়া কতুয়া মাথার সাদা চুলে পলিমাটির দাগ, কাপড়খানা তাতেই রঞ্জিত।

চোখমুখে কেমন বসে গেছে। তবু জল মাপার কামাই নেই তার।

জলের স্রোতে ভেসে আসছে বড় বড় কলার গুঁড়ি—একটা লম্বা পরু ভেসে চলেছে জলে ফোলা হয়ে গেছে। ওরই উপর একটা কাক বসে ঠোকর মারছে, আর স্রোতের আবর্তে টানাহ্যাঁচড়া খাওয়া সেই মাংসপিণ্ডের উপর বসে ডানা ঝাপটে টিক রাখছে।

…নমিতা সরে এল।

—কাকাবাবু!

বিমলবাবু ওকে এখানে দেখে অবাক হন।

—তুমি!

নমিতা এসেছিল পরিতোষবাবুর ওষুধের জন্য কিন্তু এতবড় বিপদের মুখে সেই কথাটা তুচ্ছ বলেই মনে হয়। বলে ওঠে—

সহরের সবাই এসেছে, ভাবলাম আমরা যদি কোন কাজে লাগি তাই।

হাসেন বিমলবাবু।

—পাগলী!

বৃষ্টি নেমেছে, খরস্রোতা জলের উপর ঝম ঝম শব্দে নির্মম তাণ্ডব করে চলেছে ওর অট্টহাসির সুর।

টিকারা বেজে চলেছে। ভক্তিভূষণ বাঁধের এদিকে ওদিকে দেখছে উদ্ধারের পথ আছে কি না। কাটাল দিয়ে যাতে নদীর ওই জল ছিটকে না আসে।

ওদের সবকিছু নির্ভর করছে ওই মাটির উঁচু বেষ্টনী-টুকুর উপরই।

—বাড়িযাও মা, বৃষ্টিতে ভিজোনা।

…একটা বট গাছের নীচে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির ছাটের হাত থেকে বাঁচবার চেষ্টা করছে নমিতা। হঠাৎ দেখে ওদিকে যশোদা বাউল ও হাত লাগিয়েছে। ঝুড়ি ভর্তি মাটি ফেলছে বাঁধে সে ও।

অবাক হয় নমিতা। বাউলও আজ একতারা ফেলে সুরে ভুলে এসে হাত মিলিয়েছে এদের সঙ্গে।

—যশোদা ঠাকুর তুমিও!

নমিতার কথায় যশোদা মুখতুলে চাইল। এই বৃষ্টির সঙ্গে ওর কপালের ঘাম মিশে রয়েছে। টপ করে, মুখে সেই চাসিটুকু মুছে যায় নি। বলে ওঠে।

—বাঁচার চেয়ে বড় ধম্মো আর নাই দিদি। সবাই যদি বাঁচে আমোও বাঁচবো, তাই এলাম এইখানে। এও তো ধম্মোই।

নমিতা কথা বলে না। বৃষ্টির তোড় করে আসছে ফিনফিন করে বৃষ্টি পড়ছে। নেমে আসছে বাড়ির দিকে।

হঠাৎ ওদিক থেকে কলরব আসে। সহরের অনেক উপরে স্কুলের মাঠের ওদিকে কারা চিৎকার করছে। এরা সচকিত হয়ে ওঠে।

…ভক্তি চরণ চীৎকার করে ওঠে।

—স্কুল পাড়ার বাঁধ ভেঙ্গে গেছে স্যার!

একটা কলকল্লোল ওঠে নদীর জল প্রচণ্ড উল্লাসে বাঁধের প্রহরা ভেঙ্গে কোন দিকে পড়েছে পলাপালন ক্ষেতে। অসহায় মানুষগুলোর কান্না আর আর্তনাদ ওঠে বর্ষণ সিক্ত বাতাসে কেঁপে কেঁপে ওঠে সেই আর্তনাদ।

—হুঁসিয়ার…বাঁধ ভেঙ্গে গেল! হুঁসিয়ার।

দূরে থেকে বাতাসে ভেসে আসে শব্দটা, অনেকে ওই দিকে ছুটেছে ঘরের দিকে। তবু যদি কিছু সামলাতে পারে গেরুয়া জল সহরের অন্যদিক দিয়ে ছুটছে। সহরের সামনাসামনি ভাঙ্গেনি খুব বেঁচে গেছে, কিন্তু অন্যদিক থেকে ও বিপদ আসছে।

…নমিতা ও ওই ভীত জনতার ভিড়ে মিশে ছুটেছে গ্রামের দিকে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে যেন পালাচ্ছে ভীরু সৈন্যদল পরাজিত ত্রস্ত সর্বহারা হয়ে দৌড়াচ্ছে ওরা প্রাণ ভয়ে।

(৭২৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)

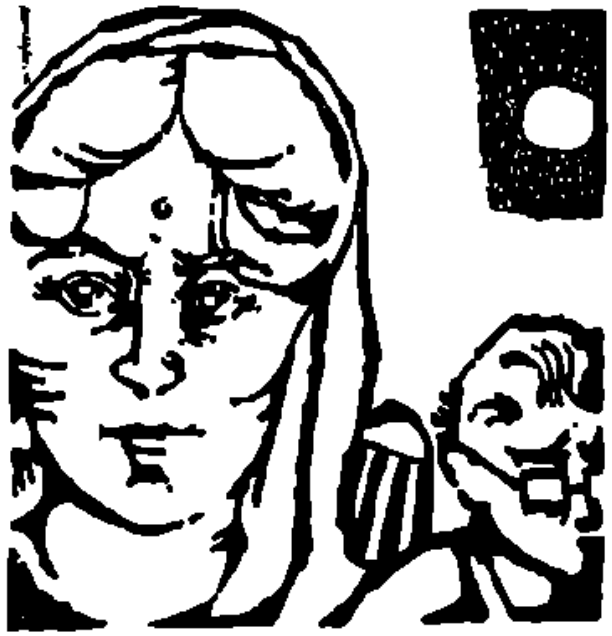

দুই পাখি

শরদিন্দুকুমার সান্যাল

বৃষ্টি একটু জোরেই এসেছিল।

কিন্তু অল্প বৃষ্টিতেই জল দাঁড়িয়ে যায় আমাদের এই গলিপথে। মাথা বাঁচাবার জন্য ছাতা নিতে আপত্তি নেই, কিন্তু জুতোর দাম বোধ হয় মাথার চেয়েও বেশি। মোড়ের মাথায় এসে জুতো জোড়াটা হাতে তুলে নিয়ে দুনিয়ার লোককে এই গলিপথটুকু পেরিয়ে যেতে হয়। এ পাড়ায় বর্ষাকাল ভীতিজনক। বৃষ্টি হলেই আমার প্র্যাকটিস বন্ধ।

বাড়িওলাকে সেদিন একটু রাগ করেই বললুম, চাটুয্যে মশাই, একটি সুসংবাদ দিচ্ছি! আমি ঘর ছেড়ে দিয়ে গেলে আপনি ভাড়া বাড়াতে পারবেন! হোক পুরনো, এ দুখানা ঘর এখন হেসে খেলে পঁচাত্তর টাকা।

চাটুয্যে মশাই ঈষৎ উৎসাহের সঙ্গেই বললেন, কথাটা মিছে বলেন নি! চুনকাম দেখাতে পারলে আশি থেকে নব্বই। কিন্তু আপনি কি ছেড়ে দিচ্ছেন সত্যি?

আশীর্বাদ করুন যেন সত্যি হয়। নয়ত কি, একটু বৃষ্টি হলে আপনাদের এই গলিতে এক হাঁটু জল। তারপর দেখুন, আপনার ওই ঢাকা বারান্দাটুকু।—আমি বললুম, ওই চেয়ে দেখুন একবার। ছাগল, গরু, নেড়িকুকুর—ওটি হয়েছে ওদের বিশ্রামের জায়গা। ভিখিরিরা শোয় রাত্রে এসে। পাড়ার বখা ছেলেদের নোংরা আলোচনা সব ওই বারান্দায়! আমাকে সব সময় দরজা জানলা বন্ধ ক'রে রাখতে হয়। দিনগিরিই আমি বিদায় নিচ্ছি মশাই।

চেয়ে দেখলুম, চাটুয্যে মশায়ের পরিতৃপ্তির ভাব হবেই ত, আগেকার দিনে ভাড়াটে পাবার জন্য বাড়িওলাদের প্রচুর ব্যাকুলতা ছিল। ঢাকা যখন ঘুরল, তখন ভাড়াটে তাড়াবার জন্য আকুলতা! বাড়ি ছাড়বার খালি হয় অবশ্যই ভাড়া চাটুয্যে মশাই তাঁর লুব্ধ মনের চেহারা বললেন, তা সত্যিই এসব দুঃখের কথা বৈ কি। কাছে রোগীরা আসে, তাদের বসতে দিতে হয়। বাড়লে অসুবিধে,—তা বটেই ত'। তবে দেনা পাওনা গেলে একজন নামজাদা ডাক্তারকে হারাবেন—এই যা দুঃখ। আচ্ছা বসুন, আপনার ত' আবার ঔষধ পত্তর আসবার সময় হল।

চাটুয্যে মশাই চ'লে যাবার পর একবার জানলা দিয়ে দেখলুম, না, কেউ আসছে না। কিন্তু কাপটা বৃষ্টির তাড়নায় ওই বারান্দাটুকু ভরে গেছে বাইরের লোকে। এ গলিতে এই বাড়িটিই একমাত্র মাথা বাঁচাবার জায়গা। মেয়েপুরুষ সবাই ওখানে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছে। রোগীপত্রের আশা ভরসা আজ একেবারেই কম।

বৃষ্টি থামবার আপাতত লক্ষণ নেই। তবু ওই বৃষ্টির মধ্যেই সহসা এক সময় ঠুকঠুক ক'রে দরজায় শব্দ শুনে সচকিত হলুম। কান খাড়া ক'রে ভাবলুম, এত বৃষ্টিতে রোগী? শক্ত কেস মনে হচ্ছে!

রাধাপদ, একবার দেখত যে ?

ভিতরের ঘরে রাধাপদ চা তৈরি করছিল। সে বেরিয়ে এসে ওধারে গিয়ে দরজাটা খুলল। কিন্তু তখনই আবার ফিরে এসে আমাকে বলল, বাবু, মেয়েছেলে।

বেশ ত, ভেতরে নিয়ে আয় !

সচরাচর যেমন হয়। রাধাপদ রোগীকে ঘরে এনে দিয়ে আবার নিজের কাজে গেল। যিনি এলেন তিনি বর্ষীয়সী একজন মহিলা। আমিও যথারীতি অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁকে মুখোমুখি বসতে বললুম।

আমার চোখে মোটা আতস কাঁচের চশমা থাকে। এমনতরো চশমার নিজেকে অত্যন্ত বীভৎস দেখায়, সেজন্য বছর তিনেক হতে চলল আয়নার সামনে দাঁড়ানো ছেড়েছি। যিনি এসে বসলেন, তাঁকে এই চশমাতেই দেখলুম বেশ সপ্রতিভ এবং সহজ। মহিলা ঈষৎ শীর্ণকায়, বয়সে যথেষ্ট প্রবীণা।

বললুম, হাঁ, বলুন এবার অসুখের ইতিহাসটি ? আপনিই কি রোগী ?

মহিলা বললেন, আজ্ঞে না —।

ও, তাহলে বোধ হয় আপনার ছেলেপুলের কেউ ?

তাও না, আমি অসুখের কথা নিয়ে আসিনি।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে আমি একবার মুখ তুলে আমার স্ফীতাকার বৃহৎ দুই চোখে মহিলার দিকে তাকালুম তিনি পুনরায় বললেন, বাইরে বৃষ্টিতে দাঁড়িয়েছিলুম। জানলা দিয়ে আপনাকে দেখে ঢুকলুম। আমাকে চিনতে পারেন নি ?

কই না ?

আমি তাহলে কেমন ক'রে আপনাকে চিনলুম তিরিশ-বত্রিশ বছর পরে ?

রাধাপদ চা এনে টেবিলের ওপর রাখল। আমি বললুম, আলোটা আন্ ত' রাধাপদ ?

রাধাপদ আলোটা জ্বেলে দিয়ে গেল। আমার বিস্ময়ের ঘোর কাটবার আগেই মহিলা হাসিমুখে পুনরায় বললেন, আমি কিন্তু ঠিক চিনতে পেরেছি আপনাকে। দেখতে পাচ্ছি চেহারা আপনার বদলে গেছে আগাগোড়া। মাথার চুল একদম পেকে গেছে ! বয়স কত হয়েছে আপনার ?

চশমা খুলে ওৎক্ষণাৎ আবার চোখে দিয়ে বললুম, আমি ঠিক চিনতে পারছিনে আপনাকে। ক্ষমা করবেন, আপনার স্বামীর নাম না বললে—

মহিলা এবার হাসলেন—অবাক করলেন যা হোক। বত্রিশ বছর আগে আপনি আমার স্বামীর মড়া নিয়ে নিমতলায় গিয়েছিলেন, মনে নেই ? আপনি থাকতেন তখন বাদুড়বাগানে—ভেবে দেখুন ত ?

হাঁ, তা থাকতুম। তবে মড়া পুড়িয়েছি অনেকের। আপনাকে এখনও চিনতে পারিনি ত !

আমি চিন্ময়ী ! মনে পড়েছে ?

যথেষ্ট গাম্ভীর্যের সঙ্গে এবার বললুম, চিন্ময়ী মানে ওই আমাদের হরি হালদারের মা ?

মহিলা এবার ঈষৎ অনুযোগ ক'রে বললেন, না মশাই, সব ভুলে গেছেন আপনি ! আমি চিন্ময়ী মিত্তির,—অম্বকেষ্ট বাবুর মেজবোন।

ওঃ তাই বলুন। দুপ বাবুর ভাগ্নি সেই চিনু !—এবার আমি হেসে বললুম, শুদ্ধ ভাষায় চিন্ময়ী বললে কি আর চট ক'রে মনে পড়ে ? বাস, আর কিছু বলতে হবে না। তারপর ? এত বৃষ্টি বর্ষা,—চারদিকে জলকাদা—এ পাড়ায় যে ?

চিন্ময়ী বললেন, আমি এদিকে আমি মধ্যে মাঝে। বৃষ্টির জন্যে এখানে দাঁড়িয়েছিলুম। দেখেছি আপনাকে অনেকক্ষণ আগে। ভাবলুম যদি এতকাল পরে চিনতে না পারেন ? চশমাটা আপনার ভারি বিশ্রী।

হেসে বললুম, সুশ্রী চশমা নেবার মতন চোখের অবস্থা রইল বৈ ? সময় আসে, যখন একে একে সবই যায়।

আপনি আবার ডাক্তার হলেন কবে, নিতাই বাবু ?

চট করে একবার পিছনে তাকালুম, রাধাপদ কাছাকাছি কোথাও আছে কি না। তারপর নিজেই একটু গলা নামিয়ে বললুম, এখানে সবাই জানে আমি ডাক্তার। বাইরেকেবিক নিয়ে চর্চা করি।

আমার ইঙ্গিতটি বোধ করি চিন্ময়ী অনুধাবন করেছিলেন। মৃদু হাস্যে গলা নামিয়ে তিনি বললেন, এ ত ভালই। কিছু একটা নিয়ে জীবন কাটানো ! বয়স যত বাড়ে, মানুষের পুরনো পরিচয় ততই ঢাকা পড়ে। আমি কিন্তু ভাবিনি আপনাকে কখনও এ চেহারায় দেখব।

ঝমঝম ক'রে আবার নতুন বেগে বৃষ্টি নামল। সন্ধ্যা

এখনও হয় নি, কিন্তু জানলার বাইরে দেখা যাচ্ছে ঘোলাটে মেঘে ও বর্ষার ধারায় অকাল সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। আমি বললুম, দু'জনে দু'জনকে আপনি ব'লে আর ডাকাডাকি কেন? এবার ওটা সহজ হোক।

চিন্ময়ী বললেন, অনেক বয়স হয়েছে আমাদের, কিন্তু সে জন্যে নয়। মাঝখানে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর দেখাশুনা নেই তাই আড়ষ্টতা কাটতে চায় না। তোমাকে আমি নিতুল বলতুম!

চিন্ময়ীর কপালের সামনেটা পেকেছে। তার ঠিক নীচে বলিরেখা। পাট পড়েছে চোখের কোলে। আমি বললুম, তোমার সেই ছেলেমেয়ে দুটি কোথায়? তারা ত' এখন সব অনেক বড় হয়েছে। নাতি পুতি নিয়ে এখন ঘর করছে, কেমন?

চিন্ময়ী ছোট্ট জবাব দিল, না।

না কেন?—

জীবনটা বোধ হয় সোজা পথে চলেনি তাই জন্যে।—অতি সহজ ভাবে চিন্ময়ী তাকাল আমার দিকে।

আমি মুখ তুললুম। আমার আতস কাচের অতি মোটা চশমার ভিতরে সে শুধু আমার বৃহৎ চক্ষু তারকা দুটো দেখছিল। এবার আমি চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়ালুম। তারপর কি যেন বলতে গিয়ে বললুম না, বরং চেঁচিয়ে রাধাপদকেই ডাকতে ডাকতে ভিতরের দিকে গেলুম। কিন্তু ভিতরে একবার থমকিয়ে দাঁড়িয়ে আবার এলুম চিন্ময়ীর সামনে। হাসিমুখে বললুম, ভাল ক'রে গুছিয়ে ব'সো চিনু। সত্যি, অনেকদিন পরে দেখা। কবে যেন ক'রে কাছে খবর পেয়ে তোমার খোঁজ খবরও করেছিলুম,—সেও বছর পনেরো আগে। হ্যাঁ, কী যেন বললে? জীবনটা সোজা পথে চলেনি! কিন্তু বাঁকাপথ কাকে বলছ? দাঁড়াও ওরে রাধাপদ—

রাধাপদ এতক্ষণ পরে এল,—আজ্ঞে, বলুন?

ওই আখ, চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। এবার ভাল করে দু' পেয়ালা চা দে দেখি? এঁকে তুই চিনতে পারিস নি, —ইনি আমার বিশেষ কুটুম্ব। উনি হরি হালদারের মা!

উসখুস করে উঠল চিন্ময়ী। আমি তাকে থামিয়ে বললুম, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই হল। কে কার সন্তান, কে কার মা,—থাকবে কি কেউ? পেন্নাম কর রাধাপদ।

রাধাপদ আভূমি নত হয়ে প্রণাম করল চিন্ময়ীকে। চিন্ময়ী বললেন, এসো বাবা, এসো। আশীর্বাদ করি গাছে-পত্তরে সুখ থাকো।

রাধাপদ বেরিয়ে যাবার পর চিন্ময়ী হাসল। বলল, সেই তোমার সেকালের অভ্যেস! তোমাকে সবাই ভাবতো গোবেচারী, কিন্তু মেয়েছেলে সামনে থাকলেই তুমি চতুর আর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠতে! ওকে অমনি বোকা বানালে ত?

ওটা করতে হয়! তুমি ঠিকই বোঝ!—বলে আমি আবার এসে মুখোমুখি বসলুম। বললুম, তুমি রুগী নয়, ওটা প্রকাশ থাকা দরকার। বসবে ত কিছুক্ষণ?

বসব বৈকি। এত দিন পরে দেখা—। আচ্ছা, তুমি কি এখানে একলা থাকো? সংসার করো নি?

ওটা আর হয়ে ওঠে নি! সময় পাই নি বিশেষ—

চিন্ময়ী হঠাৎ মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসল। পরে বলল, কেমন করেই বা পাবে? কিন্তু আমি ভাবছি তোমার শেষের সেই সেটি কোথায় গেল?

গম্ভীর বৃহৎ আমার দুই চোখ মেলে চিন্ময়ীর দিকে তাকালুম,—কোন্‌টির কথা বলছ?

কোন্‌টি? তবে কি অনেকগুলি?—চিন্ময়ী এবার একেবারে মনখোলা হাসি হেসে ফেটে পড়ল। নিজের সম্বন্ধে অতিশয় একটা তুষ্টি ও সন্তোষ ছিল তার উচ্ছ্বাসে।

আমি নামজাদা ডাক্তার এবং পঞ্চকেশ। গাম্ভীর্য হারাবার বয়স আমি পেরিয়ে এসেছি। শ্রীমতি চিন্ময়ী আমার সমকালীন। কিন্তু এই প্রবীণা নারীর মধ্যে হ্লাদিনীশক্তির অবশেষ হয়ত বা কিছু আছে, আমি জানি নে। আমার দৃষ্টি এখন বোধ হয় ভীষণ, চিন্তাধারাও বোধ করি ভীষণতরো—সেই কারণে গাম্ভীর্য হারালে আমার চলবে না।

বললুম, আচ্ছা ওসব থাক্। এবার তোমার ছেলে-মেয়ে সংসার-ঘাত্রার কথা শুনি! মেয়ে-জামাই নাতিপুতি ত আছে দুই, ছেলেটি কেমন কাজকর্ম করছে বলো। পুত্র-বধূ কেমন হল শুনি? শাশুড়ীকে ঘর খাটি করে ত? ছেলেপুলে কয়টি বৌমার?

চিন্ময়ী চেয়েছিল আমার দিকে। আমার সব প্রশ্নগুলি

সে একে একে শুনল। পরে বলল, এগুলো শোনবার জন্যে তুমি কি খুবই ব্যস্ত, নিতুদা ?

বিলক্ষণ! ব্যস্ত বৈকি। তোমার সঙ্গে সঙ্গেই ত এই প্রশ্নগুলো ঘুরছে! এই নিয়েই বাঁচা, এদের রেখেই চলে যাওয়া! লোকে এটাকেই বলে ব্যক্তিগত পরিচয়। জীবনের আর বাদবাকি যা কিছু অন্তরঙ্গ ইতিহাস,—সে গুলো সব মিথ্যে বলেই মাটি চাপা পড়ে!

কিন্তু আগেরগুলোকেই যদি মিথ্যে মনে হয় ?

দর্শনতত্ত্ব থাক্, চিনু।—আমি বললুম, স্বামী, সন্তান, নাতিপুতি, সংসার,—কোন্‌টা মিথ্যে নয়! এরা লোক সমাজে জলজল করছে। এদের নিয়েই আজ গল্প করা যাক। হ্যাঁ, এসব শোনবার জন্যে আমি ব্যস্ত বৈকি।

রাধাপদ চায়ের ট্রে এনে টেবিলের ওপর রাখল। আলাদা প্লেটে এনেছে কয়েকখানা নোনতা বিস্কুট। অতঃপর একে একে দুটো পেয়ালা সামনে ধরে দিয়ে সে বলল, আমাকে একবার বাজার যেতে হবে বাবু। উঁড়োরের জিনিস কটা এনেই রাখি। রুপী আর আসবে না, সাতটা বাজে।

সামনের জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে যা।

রাধাপদ জানালাটা বন্ধ করে এদিক ওদিক দেখে শুনে যাবার সময় বলে গেল, দরজাটা ভেজানো রইল, দেখবেন।

চশমাটা তুমি খুলে রাখো দেখি, নিতুদা ?

হেসে বললুম, তোমাকে যে দেখতে পাব না ভাল করে ? শুধু ওই তোমার ছায়াটা নড়বে ভূতের মতন।

চিন্ময়ী বলল, তা হোক, খুলেই রাখো। ভূত আমি নয়, তুমি! আমি পেত্নী।

জীবনের ওপর রাগ করতে নেই, চিনু। সব মিলিয়ে ওটা সত্য। ওটার ওপর দাঁড়িয়েই ত এতকাল দিলে আর নিলে! নিজেকে পেত্নী বলছ কেন ? কেন বলছ জীবনটা মিথ্যে ?

হাসিমুখে চিন্ময়ী বলল, তা হলে আমিও বলি, তোমার দর্শনতত্ত্বও রাখো। ভাবলুম এতকাল পরে দেখা, দুটো গল্প করে যাই। তুমি আওড়াতে বসলে হিতোপদেশ।

তোমারও চুল পেকেছে, চিনু! অনেক বয়স হয়েছে তোমার!

তাই বুঝি তোমার হিতোপদেশ!—চিন্ময়ী বলল, এসব নাই শোনালে ? এখনকার ছেলেমেয়েরা যদি জানত কী আমরা, তা হলে কেউ শুনতে চাইত তোমার এই সত্তা বুলি ? এর চেয়ে আমাকে মুখোশ খুলতে দাও, তুমিও তোমার গাম্ভীর্যকে সরিয়ে রাখো কিছুক্ষণ—দেখি আমরা দুজনে দুজনকে!

আমি হেসে বললুম, দুজন কেন বলছ ? আছে যে আরও অনেকে! আমার সঙ্গে বহু, তোমার সঙ্গে বহু, তোমার সঙ্গে অগণ্য! যারা একে এক সরে গেছে, অন্ধকারে হারিয়ে গেছে,—আগে তাদের ডাকো ? তারা যে সাক্ষী!

শান্ত কণ্ঠে চিন্ময়ী অন্যদিকে চেয়ে বলল, না, তারা কেউ নেই।

তবে ? তাই ত বলছিলুম এটা ঘরস্রোত! সব ভাসিয়ে ডুবিয়ে চলেছে, চিনু—কোথাও দাঁড়ায় নি, রাখে নি। তবে কেন ভাবছ ?

প্রবীণা নারী আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল, তাহলে ছেলেপুলে নিয়ে ঘরকন্নায় আমার মন বসল না কেন ? কেন পালিয়ে বেড়ালুম ?

আমি বললুম, মেয়েমানুষ মাত্রই বাসা বেঁধে থাকতে চায়! সম্ভবত তোমার মন ছিল বাসা ছাড়া! অসন্তোষের বীজ এনেছিলে সঙ্গে! অল্প বয়সে তুমি বিধবা হয়েছিলে। কিন্তু কোনও নিষেধ নিয়ম তুমি মানো নি। যেটাকে বলে ব্রহ্মচর্য, সেটার ত্রিসীমায় তুমি ছিলে না। শাস্ত্রে যেটাকে বলে সংযম, সেটাকে তুমি হেলে উড়িয়ে দিলে। একদিন তুমিই আমাকে বলেছিলে, ছেলেমেয়ে দুটো তোমার পক্ষে দুর্ঘটনা! তুমি ওদের চাও নি।

চিন্ময়ী একটু হেসে বলল, তোমার মনে আছে দেখছি। আমি কিন্তু কী চেয়েছিলুম, আমারও মনে নেই।

আমি বললুম, তা সম্ভব। অসন্তুষ্ট যৌবন অন্ধ আবেগে ছোটে! তুমি বোধহয় চেয়েছিলে বিদ্রোহ। কীসের বিরুদ্ধে, তুমিও জানতে না। কিছুদিনের জন্যে দেশের কাজে তুমি নেমেছিলে, মনে আছে ? সেই যে জেল্ খেটেছিলে মাস দুয়েক ?

চিন্ময়ী বলল, সব মনে আছে! তবে এখন ভাবি সত্যিই কি দেশের জন্যে আমার মন কেঁদে উঠেছিল ? কই, এখন আমার কিছু মনে পড়ে না।

মনে না পড়ার কারণটাই ওই! দেশ নয়, ভাল-বেসেছিলে নিজের প্রবৃত্তিকে। তারই জন্যে বিদ্রোহ, তারই জন্য তুলেছিলে ভাঙনের রব! মনে পড়ছে, তচনচ করেছিলে নিজের জীবনটাকে? বৈধব্য, সংযম, লোক-লজ্জা, নৈতিক কলঙ্ক—কোনটাকে মানো নি! চেয়ে দেখ, তোমার সেই বিদ্রোহ আজ ছড়িয়ে গেছে চারদিকে! কিন্তু প্রথম যারা পথ দেখায়, তাদেরকে কেউ মনে রাখে না।

ও ভাবনায় আমার আনন্দ নেই, নিতুদা।

আমি বললুম, কেমন করে থাকবে? তুমি অসীম বৈরাগ্য নিয়ে আছ, কেন না বুঝতে পারছি হয়ত তোমাকে সবাই ত্যাগ করেছে আগের ছিবড়ের মতন! তোমার ঐতিহাসিক প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, চিনু। একটা মস্ত সমারোহ ছিল তোমাকে ঘিরে, এককালে উৎসবের কেন্দ্র ছিলে তুমি! তারপর একে একে সব আলো নিবে গেছে। মনে রেখো, আনন্দের আসর বসে যৌবনে। আর যৌবনই হল জীবনের রাজবেশ!

চুপ করে রইল চিন্ময়ী কতক্ষণ। বাইরে বৃষ্টি পড়ছিল ঝরঝরিয়ে একটানা। বারান্দার দিককার জানালাটা বন্ধ, কেউ শুনছে না আমাদের আলাপ। পঁয়ত্রিশ বছর আগে আজকের এই সন্ধ্যাটির নিভৃত আলাপ কল্পনাও করতে পারতুম না। পারিপার্শ্বিক সমাজ কঠোর শাসন করত যৌবনকে, নিন্দা-কলঙ্ক কানাকানির দ্বারা সেই যৌবনকে নির্মমভাবে তারা নিয়ন্ত্রিত করত। আজ আবু-ভালের সায়হে এসেছি, এখন কেউ ফিরেও তাকায় না; উদ্বেগ বা উৎসুক্য কারও নেই! চিন্ময়ী এখন আর অশান্ত নয়। সে ফুরিয়ে গেছে। আরেকবার আমি কথা পাড়লুম। বললুম, এখন তুমি কোথায় আছ, চিনু? ছেলের কাছে?

চিনু জবাব দিল, না।

কিছুক্ষণ চেয়ে রইলুম চিন্ময়ীর দিকে। তারপর বললুম, আমার যতদূর মনে পড়ে, তোমার সংসার কিছু ছিল না। ভাইদের সঙ্গে তোমার বনিবনা হত না, সে ত' দেখতেই পেতুম একদিন! কেমন করে তোমার চলল এতকাল?

চিন্ময়ী বলল, কোনওকালেই চলে নি!—বলতে

—বলবে তো—

বলতে সে নিজেই হাসল,—কোন্ যুগের কথা শুনতে চাও তুমি?

আমিও হাসলুম,—আদি, মধ্য ও বর্তমান!

আদিযুগ তুমি জানো! ছেলেমেয়ে দুটোকে আমার বাড়িতে দিয়ে চলে গিয়েছিলুম চুনারে, মিঃ মৌলিক সেখানে আত্মহারা হয়ে পাথরের ব্যবসা করতেন! অথচ আমি যে তাঁরই জন্যে সব ছেড়ে এসেছি, সেদিকে তিনি ভ্রূক্ষেপও করতেন না। সে যাই হোক, চুনারের গঙ্গার ধারে ঘরকন্না পেতেছিলুম—সুখেরই ঘর। কিন্তু সেখানে আর ছেলেমেয়ে হতে দিই নি। তবু দেখতুম শুধু ফুল-বাগান নিয়ে জীবন কাটে না! ওখানে এক মারাঠি সাধু ছিলেন। তাঁর কাছে দীক্ষা নিলুম। মিঃ মৌলিক যখন

তাঁর কাছ কারবার নিয়ে খুবই ব্যস্ত, তখন আমার সেই দীক্ষাগুরু হয়ে উঠলেন পরমগুরু!—চিন্ময়ী ঈষৎ হাসল।

খুব স্বাভাবিক!—আমি মন্তব্য করলুম।

একদিন তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লুম নাসিকের দিকে। তিনি বললেন, গঙ্গা উপত্যকায় নয়, চলো দাক্ষিণাত্যে যাই—গোদাবরীর তটে বনের ধারে গিয়ে আশ্রম করব। তিনি তাঁর কথা রেখেছিলেন। গোদাবরীর এক নিরিবিলি জঙ্গলের ধারে সেই আশ্রম গড়ে উঠেছিল বৈকি! পরে খবর পেয়েছিলুম, মিঃ মৌলিকের পাথরের ব্যবসা বুঝি সব নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

খুব স্বাভাবিক। তারপর?

চিন্ময়ী নিজেই আমার আতস কাঁচের চশমাখানা তুলে আমাকে দিয়ে বলল, এখানা পরো, তোমার চোখ দুটো বড় বড় হোক। তাতেই তোমাকে মানায়, নিতুদা।

চোখে চশমা দিয়ে বললুম, হাঁ, তারপর?

চিন্ময়ী বলল, গোদাবরীর আশ্রমে একটি সন্তান আমার ভূমিষ্ঠ হয়েছিল।

আমার বীভৎস দুটো চোখ তুললুম চশমার ভিতর দিয়ে। প্রশ্ন করলুম, কেন? বেশ ত ছিলে, আবার ভূতে পেলো কেন?

চিন্ময়ী দীপ্তকণ্ঠে বলল, মুগ্ধ করেছিল সেই মারাঠি ব্রাহ্মণ! সেই রূপ, সেই বর্ণ, সেই আশ্চর্য স্বাস্থ্য,—তুমি বিশ্বাস করো নিতুদা—আমি ধ'রে রাখতে চাইলুম একটি সন্তানের মধ্যে! তুমি ত' জানো আমার স্বামীকে দু'চক্ষে দেখতে পারতুম না তার কুরুচি আর কুরূপের জন্যে। বোধ হয় সেই জন্যেই ছেলেমেয়ে দুটো আমার কখনও প্রিয় হয়নি। কিন্তু ঐ মারাঠি সাধু আমার জীবনকে পরম সার্থক করে তুলল! আশ্চর্য রূপবান সেই শিশুকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে কতদিন কেঁদেছি নিবিড় আনন্দে। আজও জানিনে কা'কে বেশি ভালবেসেছিলুম—সন্তানকে, না সাধুকে!

মিঃ মৌলিকের কথাটা যে বাকি রয়ে গেল?

ছি ছি ছি—বলোনা, তার কথা বলোনা। দেহ, মাংস, রক্ত, রস, এরা ছাড়া আর কিছু ছিল না ওই দু'বছরের জীবনে। গোদাবরীর ধারে বসে ভাবতুম, ফুলবাগান আর গঙ্গার ধারে ওই দুটো বছর আমার কদর্য বলতে ভরা! নিরানন্দের স্মৃতিমাত্রই ঘৃণা, নিতুদা! ওই মারাঠি আশ্রমে এসে প্রথম জানলুম, আমি শুচিস্নাতা! আমার চেয়ে পবিত্র, আমার চেয়ে সচ্চরিত্র কেউ নেই।

বললুম, একি আজও বিশ্বাস করো?

করি। মনে প্রাণে করি!—অশ্রুপ্লাবিত রোমাঞ্চ মুখ তুলে চিন্ময়ী প্রোজ্জ্বল গৌরবে আমার দিকে তাকাল। পুনরায় বলল, আমার চারিদিকে কোথাও পাপ, অন্যায় বা অসংযম বিন্দুমাত্র ছিল না, নিতুদা, বেশ মনে পড়ে ওই সদাচারী বিশুদ্ধ-চরিত্র ব্রাহ্মণ আমার শরীরের মধ্যে একটা নিবিড় মধুর আনন্দের বিহ্বল বিষক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, আর বাইরে আমাকে ব'সে ব'সে শোনাত তার উদাত্ত কণ্ঠে বেদমন্ত্রপাঠ! থেমে যেত যেন গোদাবরী, পাখী ভুলে যেত গান, রুদ্ধশ্বাস বিশ্বপৃথিবী যেন তন্ময় হয়ে থাকত আমাদের দিকে চেয়ে! দরদরিয়ে জল নামত পুরুষ আর প্রকৃতির দুই চোখ বেয়ে। সে-আশ্রম ছিল প্রাচীন মহাকাব্যের এক অমরাবতী!

ছেড়ে এলে কেন সেই আশ্রম?

ছেড়ে আসব?—হাসল চিন্ময়ী—এ তুমি কী বলছ, নিতুদা? সে আশ্রম আমার আনন্দের স্বর্গ! কোনও দিন ছাড়তুম না!

তবে? এলে কেন?

তাহলে শোনো। সেবার নাসিকে ছিল কুম্ভকর্ণের মস্ত মেলা। ব্রাহ্মণ সেই মেলায় গিয়েছিল বেদপাঠ করতে! খবর এল আমার কাছে, এক অদ্বৈতবাদী শিষ্যের হাতে সে খুন হয়েছে!

আমি তাকিয়ে রইলুম চিন্ময়ীর দিকে অনেকক্ষণ অবধি। তারপর এক সময় বললুম, ছেলেটা?

শান্ত কণ্ঠে চিন্ময়ী জবাব দিল, ব্রহ্মহত্যার খবর পেয়ে হঠাৎ আমার বুকের দুধ আটকিয়ে গিয়েছিল। সুস্থ সবল শিশুর বয়স তখন প্রায় ছয়মাস! অনেক চেষ্টা করেছিলুম, নিতুদা। কিন্তু মাসখানেকের বেশি ছেলেটাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলাম না। সেই সুন্দর আশ্রম সাংঘাতিক বিষধাপ্পে ভ'রে উঠল! সেখান থেকে একদিন বেরিয়ে পড়েছিলুম হাঁটতে হাঁটতে! সেই প্রথম জানলুম, আমি সর্বস্বান্ত।

ঝাঁপ দিলে না কেন গোদাবরীতে?

ওগো, নিজেকে ভালবাসতুম যে সবচেয়ে বেশি! বাচ্চা মেয়ে খেলাঘর সাজায় আর ভাঙে,—অরুচি তার আছে কি? কাঁচের পুতুল ভাঙলে সে-মেয়ে কান্না নেয় বৈকি। আবার আসে নতুন কালাচাঁদ, আবার সেই ঘরভাঙা, অজ্ঞান মেয়ে আবার ভুলে যায় পুরানো পুতুল। দেখতে দেখতে নতুন খেলাঘর আবার উঠে দাঁড়ায়। সুতরাং গোদাবরীতে ঝাঁপ দিতে যাব কেন? চেয়ে দেখলুম, মারাঠা ব্রাহ্মণের বাইরে পৃথিবী অনেক বড়! কেন বলব এ জীবনটা মিথ্যে? কেন ঘৃণা করব নিজেকে? কেন চেঁচিয়ে বলতে পারব না চিরকালের বিদ্রোহিনী আমি? কে বাধা দিচ্ছে আমাকে যদি বলি, মানবনা চলতি ব্যবস্থাকে, শুনবনা তোমাদের নীতি-উপদেশ, দেখবনা তাকিয়ে পিছন দিকে! উচ্ছৃঙ্খল জীবন ত আমার নয়? হ্যাঁ, অবিশ্যি, বলতে পার যথেচ্ছ জীবন! কিন্তু—স্বাধীনতা মানেই ত তাই!

ব্যাপারটা তা হ'লে ঠিক কেমন দাঁড়াল?—চোখ থেকে চশমাখানা খুলে আমি একবার মুছে নিলুম। তারপর চেয়ে রইলুম চিন্ময়ীর মুখের দিকে।

চিন্ময়ী বলল, নিতান্ত মূর্খ আমি ছিলুম না, তুমি জানো। গোটা তিনেক পাসও করেছিলুম। আমি চেয়েছিলুম নিজের মনের মতন ক'রে বাঁচতে! কেউ আমাকে পথ দেখাবে, এ আমি সইব না। কেউ আমার ওপর যেমন তেমন একটা ব্যবস্থা চাপিয়ে দেবে, এ অসহ্য। আমি খুঁজে বার করব আমার নিজের কল্যাণ—সেই আমার গৌরব। নিশ্চিন্ত অন্নবস্ত্র পেয়ে যদি খুশী থাকতুম, তবে মিঃ মৌলিককে ছেড়ে কেন যাব অনিশ্চয়ের দিকে? আসল কথা কি জান নিতুদা—শুধু দেহ নয়, মন! শুধু ওটা নয়, আরেকটাও। সকলের শেষে যেটা থাকে, সেইটেই সব চেয়ে দামী!

কী সেটা?

চিন্ময়ী একবার আমার পূবদিকের জানলার বাইরে তাকাল। তারপর মুখ ফিরিয়ে বলল, তুমি কি জানো না সেটা কী? নিজের কথা তুমি ভাবো ত? এককালে তুমিও ছিলে মস্ত বিদ্বান! কলেজে তুমি ইংরেজি পড়াতে। তারপর স্বদেশী আমলে ছেলেমেয়েদের ক্ষেপিয়ে বেড়িয়েছ! তারপর সেই বটু দত্তের বোন মীনাক্ষীকে নিয়ে চন্দননগরে ঘরকন্না পেতেছিল,—মনে পড়ছে, নিতুদা?

একটু ন'ড়ে বসে গলা ঝাড়া দিয়ে বললুম, হ্যাঁ, তা যাক্—সে কি যেন একটা ছেলেমানুষীর ব্যাপার! ওসব আবার তোমরা মনেও রেখেছ দেখছি!

মনে রাখব না? হেসে উঠল চিন্ময়ী,—শুধু আমার স্বীকারোক্তিই শুনবে? তোমার নিজের কেলেঙ্কারী শুনবে? সুবোধ তরফদারের স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়েছিল কা'র জন্যে, নিতুদা?

একটু চঞ্চল হয়ে বললুম, কিন্তু তোমার স্মরণশক্তি একটু প্রখর! আমার মাথার চুল একেবারেই শাদা,—কিছুই আমার মনে পড়ে না। তা ছাড়া কে কা'র স্বামী ছিল সেকালে, অত হিসেব আমি রাখিনি!

বড় বড় চোখ ক'রে চিন্ময়ী তাকাল। তারপর হাসল। বলল, হিসেব আমি রেখেছি প্রাণের দায়ে! অনেককে তুমি কাঁদিয়েছ সেকালে, নিতুদা। রূপে গুণে তোমার আকর্ষণ ছিল সর্বনেশে। সেই সেবার ২৮শে জানুয়ারীতে সবাই যেদিন ফ্ল্যাগ উড়িয়ে জেলে গেল, তুমি আমাকে ছুটিয়েছিলে তোমার পিছু পিছু, মনে পড়ে?

এ আবার কি সব বলছ সন্ধ্যেবেলায়?—চশমাখানা মুছে নিয়ে আমি বললুম, আমি আবার কবে তোমাকে—?

বটে? বেশ ত' তুমি? তোমাকে ধরবার জন্যে যাইনি আমি সেই বরাকর নদীর ধারের ডাক বাংলায়? কী দেখলুম সেখানে গিয়ে? সুরমা কাঁদছিল না তোমার কাছে ব'সে? আমার সঙ্গে সেদিন কেন ঝগড়া বেধেছিল সুরমার? ভুলে যাচ্ছ বুঝি চক্ষুলজ্জায়?

চিন্ময়ী মনের আনন্দে খুব হাসছিল। পরে বলল, একঘরে তিনজনে কী হৈচৈ সারারাত,—সব ভুলেছ তুমি!

আমি গম্ভীর হয়েছিলুম। বললুম, কি জানি—হয়ত ভুলতে বসেছি! হয়ত ভুলতে পারাই ভাল! ওসব বয়োধর্মের গল্পগুজব! কত বিড়াল কত ভারগায় ইঁদুর ধরেছে,—তার হিসেব তলিয়ে দেখা এখন বিরক্তিকর! শুধু মনে পড়ে সেটা বিশ্বাস নষ্ট হবার যুগ। ঘোরতর অসন্তোষ জমেছিল পারিবারিক আর সামাজিক জীবনে। বোধ হয় আমরা ভাঙতে চেয়েছিলুম ভালমন্দ সব একসঙ্গে।—

মেয়েরা সুযোগ পেয়েছিল জীবন যাপনার। নৈতিক শুচিতা সব জায়গায় থাকেনি, চারিত্রিক বিশুদ্ধতা অনেক স্থলে রক্ষা পায়নি। অনেক ক্ষেত্রে যৌনপ্রবৃত্তির রাশ আলগা হয়েছিল। তার লজ্জাও রটেছে অনেক। আজ নতুন যুগের ভিতের তলায় তখনকার বহু মেয়ে পুরুষের বহু চারিত্রিক কাহিনী চাপা পড়েছে। বহু নেতা ও নেত্রীর জীবন কাহিনী নৈতিক অশুচিতায় ভরো ভরো হয়েছিল তুলে যেয়ো না চিনু, কীর্তিই দাঁড়িয়ে থাকে,—কুকীর্তি ধীরে ধীরে চাপা পড়ে। হ্যাঁ, তুমি যা বলছিলে। শেষের কোনটা সবচেয়ে দামী তুমি মনে করো?

চিন্ময়ী বলল, সে হল মন-নেয়া-নেয়া, সেটা দেহ নয়। দেহ-যৌবন-বয়স-ইচ্ছা—সমস্ত নিংড়ে শেষ বিন্দুটি দিলেও যা বাকি থাকে, সেই হল পরম অমৃত! তাকে যদি বল নির্মল আনন্দ—মেনে নেবো! বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ মেয়ে স্বামীকে এবং লক্ষ লক্ষ স্বামী স্ত্রীকে—গভীরভাবে আজও অপছন্দ করে! সেখানে সন্তান, সংসার, সচ্ছলতা—কোনটাই আনন্দ দেয় না! আজ নিজের ছেলে মেয়েকে আমি চিনিনে, নিতুদা। ওরাও আমাকে সহ্য করে না!

সেজন্যে কি দুঃখ পাচ্ছ?

কৈ, না? যাদের কখনও আপন মনে করিনি, তারা আমাকে ত্যাগ করলে দুঃখ পাব কেন?

কিন্তু তুমি জননী!

হঠাৎ আবার হেসে উঠল চিন্ময়ী। বলল, এতক্ষণ পরে জানলুম, তুমি বুড়ো হয়েছ, নিতুদা! পাখির ছানা যতদিন না উড়তে শেখে, ততদিন জননীকে পায়! খোঁজ নিয়ে দেখ, পরবর্তী কালে কেউ কারোকে চেনেনা। আমি আমার বাৎসল্যের প্রথম সন্তান পেয়েছিলুম গোদাবরীর সেই আশ্রমে! বুকের রক্তের সঙ্গে চোখের জল আর কোনওদিন অমন ক'রে মেলেনি!

তারপর?

এমন সময় বাইরের দরজায় ঠকঠক ক'রে আওয়াজ হ'ল। চেয়ার ছেড়ে উঠে আমি গিয়ে দরজাটা খুললুম। দেখি রাধাপদ তার মোটঘাট নিয়ে বাজার থেকে ফিরেছে। আকাশ তখনও মেঘলা বটে, তবে বৃষ্টি কখন যেন থ'রে গেছে।

রাধাপদ বলল, মাছ পেয়েছি বাজারে, বাবু। রান্না চড়িয়ে দেবো?

আমি ফিরে এসে বললুম, চিনু, আজ তুমি এখানে খেয়ে যাও।

চিন্ময়ী বলল, খেয়ে যাব? ফিরতে যে রাত হয়ে যাবে?

তেমন যদি রাত হয়, থেকে যেয়ো!

জিনিষপত্র সঙ্গে নিয়ে রাধাপদ ভিতরে যাবার পর চিন্ময়ী একটু গলা নামিয়ে বলল, নেমন্তন্ন করছ, শোবার জায়গা দিতে পারবে?

বিলক্ষণ! আমি বললুম, নীচের তলায় দুটো শোবার ঘরই আমার। যেখানে খুশি তুমি পড়ে থেকো। আর যদি একখানা ঘরই হ'ত, তাতেই বা কি—তোমার জায়গা ঠিকই পেয়ে যেতে! যাই হোক, তারপর? কোথায় গেলে সেই আশ্রম থেকে? আবার কি ফুল করেছিলে কোথাও?

করেছি বৈ কি!—চিন্ময়ী বলল, তুমিইত' বলছ বয়োধর্ম। মেয়েমানুষ পুড়ে ছাই না হওয়া পর্যন্ত তার নাম থাকে কামিনী! ওটাই যে প্রকৃতির টান,—নিয়তির সাংঘাতিক নির্দেশ। এবার বুঝি তুমি সংযমের কথা বলবে, নিতুদা?

হেসে বললুম, এখনও বলিনি, তবে এইবার বলতে আরম্ভ করব!

বলো না! হাজার হাজার বছর ধরে ওটা শুনে আসছি, আর বলো না!—চিন্ময়ী বলল, উনুনে যতক্ষণ শেষ আগুন টুকু থাকে, মেয়েরা পাখার বাতাস দেয়। ছাই হয়ে গেলে তখন নিশ্চিন্ত! আশ্রম থেকে বেরিয়ে অনেক দেশ ঘুরেছি, অনেকের সংস্পর্শেই এসেছি! কিন্তু কি জান, নিতুদা? মানুষের খিদে পায়, তেষ্টা পায়—এগুলো প্রাকৃতিক! প্রকৃতির তাড়না আছে, কেমন করে অস্বীকার করবে? তবু সত্যিই বলব—অসহ্য সুখের মধ্যে যখন ধরা দিতুম, আত্মহারার মতন যখন নিবিড় আলিঙ্গনের তলায় চাপা পড়তুম, তখনও কাঁদতুম ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে! খরসূর্যের তাপে তুষারের স্তূপ যেমন গলে, তেমনি আমার বিহ্বল শিথিল অনুগতা যেন ধীরে ধীরে অশ্রু সম্ভারে পরিণত হত। প্রত্যেকটি ভুলের সঙ্গে থাকত আমার অঝোর ঝরে কান্না।

অপরাধে যদি আনন্দই পেতে, তবে আবার কান্না কেন?

না না, নিভৃদা—আনন্দ নয়!—চিন্ময়ী উত্তেজিত হয়ে বলল, পিশাচী মিলত পিশাচের সঙ্গে বারবার। কখনও অন্ধকারে কখনও গুহায়, কখনও অপমানে, কখনও বা নরকুণ্ডে,—শুধু দেহ ধারণের জন্য মিলত এরের সঙ্গে অন্ধ জন্তু। কিন্তু অপমরণের বিশেষ একটি লগ্নে আমার অখিল দৃষ্টির সামনে হঠাৎ আবির্ভাব ঘটত সেই জ্যোতির্ময় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের—সমস্ত পাপ, অন্যায়, দেহলালসা, অসংযম—সমস্ত-গুলোর ওপর মন্ত্রপাঠ করত সেই অশরীরী মহাপুণ্য ব্রাহ্মণ। আর আমি ওই অশুচি দুর্গন্ধময় নরকুণ্ডের মধ্যেও নিজেকে যেন পূত পবিত্র বলে মনে করতুম।

চুপ করে রইলুম দুজনে। ত্রিশ-চেত্রিশ বছর পরে আজ মাত্র ঘণ্টা তিনেক। আজ আগুন নেই উভয় পক্ষের। বাসনার শেষ বুঝা কবে যেন হয়ে গেছে! যৌবনের রসরক্ত কখন শুকোয়, ইচ্ছার অবসান ঘটে কবে,—তবে হঠাৎ ঘুম ভেঙে মনে হয়, ওটা শুধু সৃষ্টিতত্ত্বের খেলা, জৈব নিয়মের নিকট দাসত্ব মাত্র। আজ হাসি পায় পুরাতনের পর্যালোচনায়।

কতক্ষণ পরে প্রশ্ন করলুম, এখন কি প্রকার জীবন যাপন করছ?

চিন্ময়ী হাসল,—তুমি পুরুষ, তাই নোঙর করতে পেরেছ। আমি মেয়ে, তাই অকূলে ভেসেছি।

আরেকটু ভেঙে বল, চিনু।

ভেঙে বললে বুঝবে?—চিন্ময়ী আবার হাসল,—ভোজনং যত্র তত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে!

কিন্তু বসনং?

যদি গঙ্গার তীরে বুঝা হয়, তবে দুঃখ থাকবে, সোনাবরীর তীরে আমি পুড়ে ছাই হলুম না কেন!

চিন্ময়ীর হাসির ভিতর দিয়ে যে সুরের বিষাদের রেশ ধ্বনিত হয়ে উঠল, সেটি আমাকে স্থির থাকতে দিল না। চেয়ার ছেড়ে উঠে আমি তার কাছে এগিয়ে গেলুম। তার মাথায় হাত রেখে বললুম, শেষ জীবনের দুঃখতা দেখে ভয় পেয়ো না, চিনু। নৈরাশ্যই মানুষের সর্বাপেক্ষা শত্রু। একদিন সব শেষ হয়ে যায়, ভালবাসা পর্যন্ত মরে। কিন্তু মৃত্যুকাল পর্যন্ত যেটি কোনমতেই ছেড়ে দেওয়া যায় না, সেটি হ'ল আত্মসম্মানবোধ, তার দাম অনেক। সম্মান খোওয়ানোই সর্ববাস্ত হওয়া, চিনু।

চিন্ময়ীর বোধ হয় গলা ধ'রে এসেছিল। শুধু বলল, তুমি কি বলতে চাও, বুঝতে পারছি নে নিভৃদা।

বলছি, তোমার ইতিহাসের পরিসমাপ্তি ঘটুক আমার চোখের সামনে, চিনু।

কেমন ক'রে?—চিন্ময়ী মুখ তুলল আমার দিকে।

আবার আমি বললুম, যাদের ঘর ভেঙেছে, সংসার জলে পুড়ে গেছে, আশাহীন অন্ধকারে প্রেতছায়ার মতন যারা ঘুরে বেড়ায়, যাদের নৌকো কোথাও নোঙর বাঁধতে পারল না,—তার জীবনের শেষ প্রান্তে এসে কেবলমাত্র তিনটি বস্তুর জন্য হাহাকার করে। সে হ'ল অন্ন, বস্ত্র আর আশ্রয়।

নিখোঁ বলেছি, নিভৃদা।

শোন, শ্রীমতী চিন্ময়ী, আমি অতি প্রাচীন,—বোধহয় হাজার-হাজার বছর বয়স আমার। এই প্রাচীন তোমাকে আশা দিচ্ছে, ভয় পেয়ো না। জীবন অনেক বড়। এই জীবনের বিরাট শোভাযাত্রায় শুধু তুমি-আমি পিছিয়ে পড়েছি! বেশ তা, চলো—সকলের পিছনে-পিছনেই চলি। ওরা এসেছে সবাই আমাদের পরে, এবার ওরাই এগিয়ে যাক্। চিনু, এতকাল পরে যখন হঠাৎ আমাকে খুঁজে বার করেছ, তখন আমিই তোমার বাকি জীবনের দায়িত্ব নিলুম;—আমার নিজের গৌরব শুধু এইটুকু, একটি ভগ্ন ব্যর্থ প্রাণকে আমি কিছু সান্ত্বনা দিতে পারব।

চিন্ময়ী আমার হাতখানা ধ'রে রইল। তার দুই চোখ বেয়ে জল নেমেছিল।

মুক্তদশক

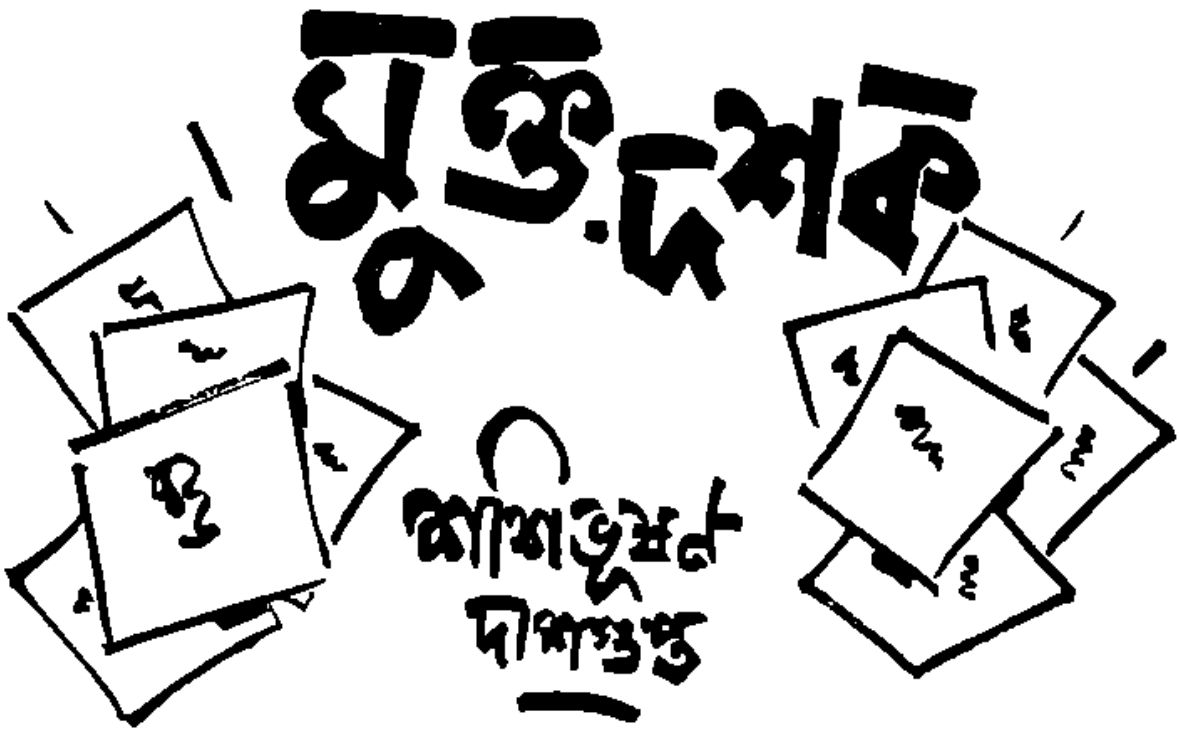

অশিভূষণ দাশগুপ্ত

ঘাঘরা-পরা পাহাড়ী মেয়ে জল তোলে ঐ ঝর্ণা থেকে—
আ মরি মরি, এমন দৃশ্য কলকাতাতে কোথায় পেতাম !
চড়াইটুকু বাইতে গিয়ে পুঁটলিটাকে নামিয়ে রেখে
ভাবছি বসে, একটা ছোট ট্যাক্সি পেলে বর্তে যেতাম !

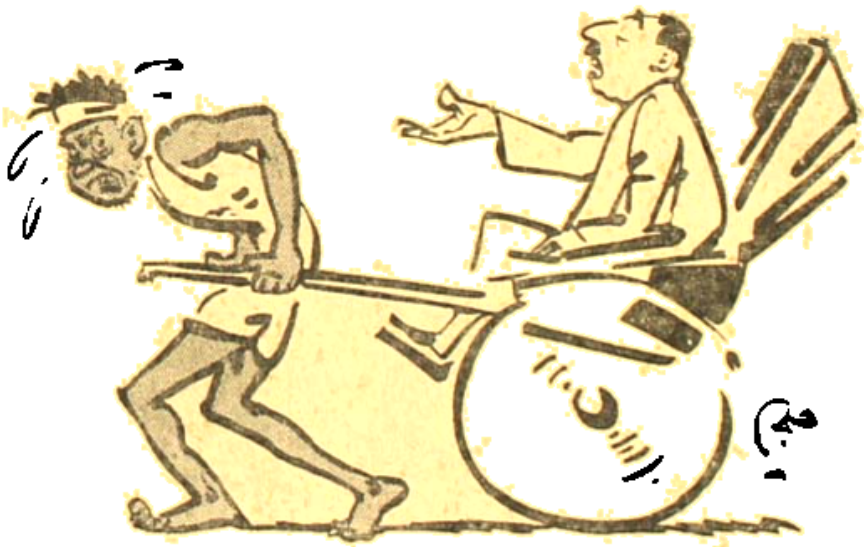

রিক্সা চেপে করুণ স্বরে বলছি, 'ও ভাই রিক্সাওয়ালা—
এ রোদ্দুরে টানতে মানুষ কতই না তোর কষ্ট যে হয় !'
মুখ খিঁচিয়ে খেঁকিয়ে উঠে লোকটা বলে,—'এ কোন্ জ্বালা—
টেনে কোথায় ? টানতে মানুষ না পেয়েই তো কষ্ট যা হয় !'

আন্না দিদির রান্না খেয়ে পান্নাবাবু মূর্ছাগত !
ভুঁড়ি হাতিয়ে খোশমেজাজে বলেন,—'বাহা, কেমন রাঁধিস্।'
আন্না দিদি ফিস্‌ফিসিয়ে 'মোয়াকে বলেন, কোঁপাস্ কত—
পেয়েছে খিদে ? মুড়ি খা গিয়ে—সয় না, নিত্য কেন কাঁদিস্।'

কাজল কালো নবীন মেঘে গগন অতি মেদুর হ'ল—
হৃদয় আজি কলাপী হয়ে রভসে শুধু নাচতে চায়।
হোগলাপাতার ছাউনি-নীচে বাচ্চাগুলো ভিজেই ম'ল—
দেখছি বুকে হাত জড়িয়ে ঠকঠকিয়ে বাঁচতে চায়।

ভক্ত বটেন গোষ্ঠবাবু !
বাত হবে ভয় ঠাণ্ডা লেগে—
অমাবস্যা, পূর্ণিমা সব
পাঁজি দেখেই যত্নে পালেন ;
মাঘ মাসেরি দ্বিপ্রহরের
আঁধার জমা রাত্রে জেগে
তুহিন-শীতল গঙ্গা-বারি
বুড়োশিবের মাথায় ঢালেন ।

চাকুরি যেটা দিলে গো দাদা,
কপালে সেটা জুটল না গো—
একটু বয়স বাড়িয়ে দিতে
কার বা ছেলে পেছোয় কবে ?
বুঝিয়ে কথা বলতে গেলাম,
বললে আমায়, 'হবে না, ডাগো'—
দাদা গো দাদা, ছেলেটা আমার
একটু কবে মানুষ হবে !

আত্মারামবাবুর সপ্তমে সুর,
বলেন চটে, 'ও দেহ ব্যাটা—
আর কতকাল জ্বালাবি মোরে
বল দেখি আজ হলফ করে—।'
দেহ বেচারি বলল, 'বাবু,
কত বা মার তত্ত্ব-ঝাঁটা—
খেটেও মরি, কথাও শুনি—
এইতো দেখি জীবন ভ'রে !'

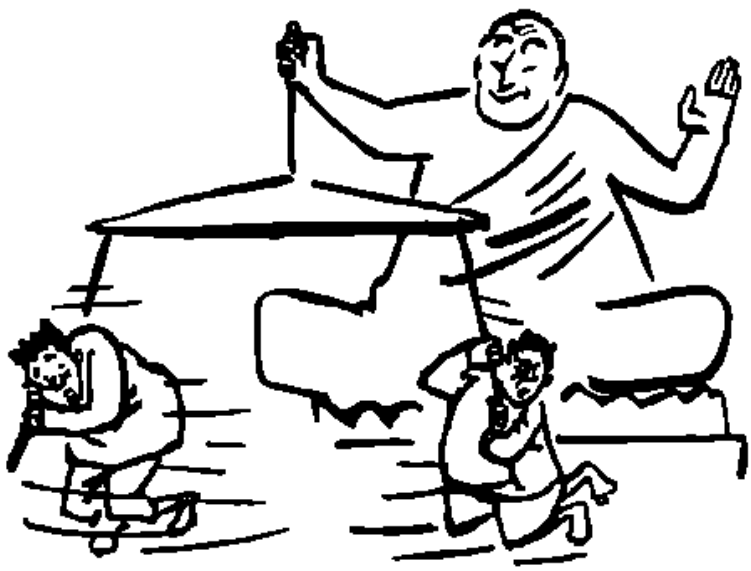

এক যে ছিলেন বৃদ্ধ মশাই, কোথায় ছিলেন কেই বা জানে !
সঙ্গোপনে কিঞ্চিৎ কোন্ নেশায় ছিলেন, ডালই ছিলেন।
খামকা কোন্ স্বপ্ন দেখে—দেখুন দেখি কি হয় মানে—
আপনাকে আর আমাকে এই চরকি পাকে ঘুরিয়ে দিলেন !

'বলছি কথা একশত বার, দুনিয়া নিয়ে খেলছি খেলা—
নিত্য তবু ঝামেলা এত, বিশ্রী এ-সব কেমন ল্যাঠা।'
ভক্ত বলে, 'প্রভু হে তোমায় আর কত কাল দেব গো পেলা—
ইদানীং-এর মানুষগুলো—যাচ্ছেতা সব—বিষম ঢ্যাটা।'

যার কথা হয়—অন্যে বলে,জানেন মশাই,—বদ্ধ পাগল!
অপারে বলে, ঐ লোকটা? বলব কি আর—আস্ত খ্যাপা!
এবড়ো পথে ভাঙল সেদিন আমার মনের ধন্ধা-আগল—
তুমিও ভাল, আমিও ভাল — বলল যখন বন্ধা-ন্যাপা।

আঁধারে অম্বরে

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

— এক —

সামনে মেহেদির বেড়া, মাথার ওপরে বোগেনভিলিয়ার ঝাড়—অজস্র লাল ফুলে তার পাতাগুলো পর্যন্ত আড়াল হয়ে গেছে। সামনের উঁচু ইউক্যালিপ্টাস গাছটার অনেক ওপরে একটা বুলবুল কিছুদিন ধরেই কোথা হয় তার সঙ্গীকে ডাকাডাকি করছিল। রাস্তার ওপরের জলা থেকে বাতাসে পানা, কলমী আর কাদার গন্ধ ছড়িয়ে দিচ্ছিল এক জোড়া মোষ—ওখানে স্নানপর্ব চলছে তাদের। ছাড়া-ছাড়া সাদা মেঘের ফাঁকে টুকরো টুকরো আকাশের রঙ ফুটে উঠছে—যেন ভুবারবর্ণা কোনো বিদেশিনীর অনাবৃত চোখের দৃষ্টি

বাংলা দেশ।

শোভন ব্যানার্জী মেহেদী বেড়ায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। কপালের সামনে চুলগুলো পাতলা হয়ে এসেছে, তার ওপরে বাতাসের ঢেউয়া যেন কার কোমল হাতের আঙুল বুলিয়ে দিতে লাগল। এক বারের জন্যে মা-কে মনে পড়ল, আর সঙ্গে সঙ্গে দু'চোখ ভরে তার জল আসতে চাইল।

প্রথম যখন এসেছিল, ভেবেছিল এখানে সে থাকবে না; এখানকার জমি-জমা, ঘরবাড়ী, শেয়ারটি ফার্ম—সব বিক্রী করে দিয়ে আবার আগ্রায় ফিরে যাবে। শোভনলাল অ্যাণ্ড কাম্পানি প্রসাদ কোম্পানির পেট্রোল পাম্প আর মোটর রিপেয়ারিংয়ের ব্যবসা এমন কিছু হয়তো লাভের নয়, কিন্তু যা আসে তা তার একার প্রয়োজনের পক্ষে ঢের বেশি। বাংলা দেশ তার চেনা নয়, জানা নয়, এমনকি বেশিক্ষণ ধরে বাংলা বলতে সে যে খুব আরাম বোধ করে তাও নয়। ক্রমাগত 'জী' আর 'মগর' তার নিজের কানেই বেয়াড়া শোনায়। এখানকার ভিজে জল-হাওয়া, এ-দেশের মানুষ আর তাদের চালচলন—এগুলো যে তার ভালো লাগে না—এ-কথা সে-ও জানত। কাজেই এখানকার বিষয় সম্পত্তির একটা বিলি ব্যবস্থা হয়ে গেলেই সে আবার তার চেনা জগতে ফিরে যাবে—এইটিই তার মনে ছিল।

কিন্তু—

—বাবু, চা কি এইখানেই দিয়ে আসব?

শোভনলাল ফিরে তাকাল। মনোহর মণ্ডল—তার চাকর। মনে পড়ল, একটু আগে এক পেয়ালা চা করতে বলেছিল মনোহরকে।

সামনে দিয়ে একটা বোঝাই বাস চলে গেছে একটু আগে—হাওয়ায় ধুলোর একটা সূক্ষ্ম আবরণ ভাসছিল, উঠছিল পোড়া গ্যাসোলিনের গন্ধ। শোভনলাল বললে, না, এখানে নয়। তুই বাইরের ঘরেই চা দে, আমি আসছি।

বাগানের ভেতর দিয়ে সে বাড়ীর ভেতরে ফিরে এল।

বাবাকে শোভনলাল শ্রদ্ধা করতে পারে না, শ্রদ্ধা করবার মতো কোনো কারণ নেই; এমনকি মৃত্যুর সময় যখন সমস্ত সম্পত্তি তিনি ছেলেকে লিখে দিয়ে যান, তখন তাঁর সেই প্রায়শ্চিত্তও শোভনলালের মনকে এতটুকু নরম করতে পারেনি। কিন্তু এই বাড়ীটার জন্যে ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিতে সে বাধ্য। কলকাতা থেকে চল্লিশ মাইল দূরে বাংলো ধরণের এই বাড়ীখানা শুধু সুন্দর নয়—আশ্চর্য রুচির পরিচয়। বাবা সৌখিন আর্টিষ্ট ছিলেন—ঘর ভরা তাঁর আঁকা ছবিতেই তার পরিচয় দিয়েছে; কিন্তু শুধু ছবিই নয়। এই ছিমছাম বাংলো বাড়ীটা, চারদিকে ঘিরে এই ফুলের বাগান, ফুলে পাতায় এই ঘন মেলানো—কী অপূর্ব মন আর দৃষ্টি ছিল এদের পেছনে। আর বাড়ীটা এমন সুন্দর না হলে কি এখানে এইভাবে মন বসত শোভন বাানার্জীর।

অথচ, কী কুৎসিত জীবন কাটিয়ে গেলেন এই আর্টিষ্ট ভদ্রলোক!

অন্যমনস্কভাবে চায়ে চুমুক দিতে দিতে আবার তার মাকে মনে পড়ল।

মার গালের ওপর সেই পোড়া দাগটা—বাবা জলন্ত টুকটে চেপে ধরেছিলেন সেখানে। ফর্সা পিঠের ওপর চাবুকের কালো কালো দাগগুলো এখনো তার চোখের সামনে কিলবিল করে একদল সরীসৃপের মতো। মাতাল—দুশ্চরিত্র লোক, এই কারণেই স্ত্রীর ওপর সন্দেহের তার আর অন্ত ছিল না। মাঝরাতে নেশার ঝোঁকে বাড়ী ফিরেই জিজ্ঞেস করত: এক্ষুনি—আমি সিঁড়িতে উঠতেই—আমার পাশ দিয়ে কে দৌড়ে পালিয়ে গেল, কে সে?

কেউ নয়। মাতালের মন গড়া ছায়ামূর্তি। কিন্তু স্ত্রীর ওপর চাবুক চালাতে তাতে বাধে না, লাথিতে লাথিতে তাকে জর্জরিত করে দিতে দ্বিধা হয় না বিন্দুমাত্রও। যার নিজের চরিত্রের কোনো পালাই নেই, স্ত্রীর সতীত্বের সন্দেহ করবার তারই সব চাইতে বেশি অধিকার।

কদর্য ইতিহাসের শেষ নেই। সেগুলো মনে করতেই সমস্ত শরীর কুঁকড়ে উঠে।

মা পারতপক্ষে কিছু বলতেন না। যেদিন ঝড় বৃষ্টির রাতে সাত বছরের ছেলেকে সুরু দামী তাঁকে বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছিলেন, সেদিন থেকে নিজের পথ তাঁর নিজের কাটতে হয়েছে, তিন বছর বাপের বাড়ীর অপমানের অন্ন গিলে কোনো মতে আই-এ পাশ করে যেদিন থেকে তিনি পশ্চিমের একটা মেয়েদের স্কুলে চাকরি নিয়ে চলে গিয়েছিলেন, সেদিন থেকেই অতীতের সব কিছু দু হাতে মুছে ফেলেছিলেন তিনি। শুধু মুছতে পারেননি থাবার সিঁদুর আর ভাঙতে পারেননি হাতের সেই দু-গাছা শেকল—তাঁর শাঁখা। ওইটুকুতেই তাঁর সংস্কারে বেধেছিল।

কুড়ি বছর বয়েস পর্যন্ত—বি এ পাশ না করা পর্যন্ত—একজন সাধারণ স্কুল মিস্ট্রেসের ছেলে শোভন ব্যানার্জি এ সব পর কিছুই জানত না! তারপর মা একবার অসুখে পড়লেন। সেই সময় তাঁর বিকারের ঘোরে প্রথম কিছু কিছু অস্পষ্ট ইতিহাসের টুকরো শোভন শুনতে পেলো। তারপরে নানাভাবে একটু একটু করে মার কাছ থেকে সব জেনেছে সে। ইচ্ছে করে মা বলেন নি, কিন্তু তাঁর এক একটা ছাপা মুহূর্তের ভেতর থেকে ধীরে ধীরে সমস্ত আবিষ্কার করেছে শোভন, যে অংশগুলো মা গোপন করেছেন, সে ফাঁকগুলো ভরে নেওয়াও অসম্ভব হয়নি তার পক্ষে।

আর বাপকে ঘৃণা করেছে। একটা দানবীয় মানুষের মূর্তি এঁকেছে কল্পনায়, অক্ষম প্রতিহিংসার জ্বালা ঘরে বেড়িয়েছে বুকের ভেতর।

মার মৃত্যুর পরে তাঁর বা.

বেরিয়ে এসেছিল।

খুব সম্ভব বিয়ের পরেই তোলা—তার মানে অন্তত পঁচিশ বছর আগেকার। একটা খামের ভেতরে পাওয়া গেল ছবিখানা: এতদিনে ছবির রঙ একটু লালচে হয়ে গেছে, তবু পরিষ্কার চেনা যায়। একজন তার মা—তরুণী; ছিপছিপে পাতলা চেহারা, মুখে সুখ আর লজ্জা জড়ানো, কপালের টিকলির নীচে বড়ো একটি সিঁদুরের ফোঁটা, গলায় ভারী নেকলেস—নববধূ বলে চিনতে দেরী হয় না! পাশে দাঁড়িয়ে দীর্ঘদেহ একটি পুরুষ, চওড়া কপালে, ওলটানো চুল, ভারী চোয়াল—চশমার নীচে জলজলে চোখ ব্যক্তির আর শক্তি যেন ঝকঝক করছে চেহারায়।

শোভন বুঝেছিল, তার বাপ!

কল্পনায় যে দানবকে সে এতদিন গড়ে উঠেছে, তার সঙ্গে কোনো মিল নেই। কিন্তু এই ভদ্র, এই দীপ্ত মুখোসের নীচে কী ভয়ঙ্কর একটা জানোয়ার বাসা বেঁধে ছিল! আর ভেতরকার সেই জন্তুটার মূর্তি তার মাও কি সেদিন ঘুণাক্ষরে বুঝতে পেরেছিলেন। যদি পারতেন, তাহলে ওই সুখ আর লজ্জার আলোটুকু তাঁর মুখে কোথাও থাকত না—একটা অমানুষিক আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে যেতেন তিনি!

ছবিটা দেখবামাত্র একটি ইচ্ছাই তার প্রবল হয়ে উঠেছিল। একটি আদিম, অন্ধ আকাঙ্ক্ষা।

মার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ওই মূর্তিটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দেয়, কিংবা কালি ঢেলে বীভৎস বিকৃত করে দেয়। কিন্তু পারে নি। ছবির ভেতরে যেন মা-র তরুণী চোখদুটি ছলছল করে

উঠেছিল, যেন একটা নিঃশব্দ আর্তনাদ ভেসে এসেছিল তার কানে : ও ছবি আমার। পঁচিশ বছর ধরে নিজের প্রাণের মধ্যে আমি ওকে লুকিয়ে রেখেছি। তোমার বাপকে তুমি ঘৃণা করতে পারো, কিন্তু কী অধিকারে আমার ছবি তুমি নষ্ট করতে চাও?

যেখানেকার ছবি, সেই খানেই আবার লুকিয়ে রেখেছে শোভনলাল। সেই লাল ফিতেয় বাঁধা চিঠির ছোট্ট তাড়াটি যেমন তার স্পর্শের বাইরে, এ ছবিও তেমনি করে যার গোপন বেদনার মধ্যেই লুপ্ত হয়ে থাকুক।

চা-টা শেষ হয়ে গিয়েছিল, শোভন ব্যানার্জি একটা চুরুট ধরাতে ধরাতে সামনের দেওয়ালের দিকে চোখ তুলে চাইল। অপূর্ব প্যানোরেমা একখানা। সারি সারি নারিকেল, সারেগাছ আর অগাধ সমুদ্রের ওপর রক্তলাল সন্ধ্যা; এখানে ওখানে নানা আকারের কালো কালো পাথরের ওপর ঢেউ ভাঙছে, ধাতা আলোর ফেনা ঠিকরে পড়ছে আকাশ ঝাঁঝরা করা বক্ত জবার মতো। অনেক দূরের পিঙ্গল দিগন্তে একটা জাহাজের ভুতুড়ে মূর্তি—কয়েকটা হলুদ আলোর জোনাকি ফুটে আছে তার গায়ে। ছবির বাঁদিকে ছোট একটুখানি স্বাক্ষর দেখা যায় : এস. ব্যানার্জি, অক্টোবর, ১৯৫২।

মা-র পাশে দাঁড়িয়ে যে লোকটা ফটো তুলেছিল—এই আশ্চর্য জীবন্ত ছবিটা যে তাঁরই আঁকা এ কথা ভাবতে কষ্ট হয় না। কিন্তু মাতাল হয়ে মাঝরাতে বাড়ি ফিরে যে মা-কে চাবুক মারত, তার চেহারা কী রকম? স্নেহ মমতায় ভরা তার এমন স্নিগ্ধ মা-কে ঝড়ের রাতে যে ঘর থেকে বার করে দিয়ে দরজায় খিল এঁটে দিতে পেরেছিল—সেই জানোয়ারটাকে কেমন দেখতে? ডক্টর জেকিল আর মিষ্টার হাইডের গল্প নিতান্তই তা হলে রূপকথা নয়!

এখানে আসবার পর এস. ব্যানার্জির আরো কাহিনী তার কাছে এসেছে। জমিদারী, বিষয় সম্পত্তি অনেক ছিল—ছাই হয়ে উড়িয়েছে দু'হাতে। তারপর একদিন—হয়তো নিজের উদ্দাম জীবনে ক্লান্ত হয়ে, অথবা কোনো একটা ঘা খেয়ে, কিংবা নিজের অতীতের হিসেব নিকেশ করে একটা দুরন্ত মানসিক অনুতাপে, এই লোকটা নোঙর ফিরল। গ্রামের অবশিষ্ট যা কিছু ছিল, সব বিক্রী করে দিয়ে এখানে এই বাংলো বাড়িটা তৈরী করল। গড়ে তুলল পোলট্রির ব্যবসা। শিক্ষিত লোক, বুদ্ধি ছিল, রুচি ছিল, ব্যবসটা দাঁড় করিয়ে ফেলল। তখন ডুবে গেল কাজের ভেতর, অবসর সময়ে বই পড়ত, আর—আর বই পড়ত। শোভন বইয়ের শেল্‌ফ নাড়াচাড়া করে দেখেছে। পোল্‌ট্রির ওপর কিছু বই ছাড়া বাকী সব কবিতা, রবীন্দ্রনাথের বই, শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী, ইংরেজ কবিদের অনেকগুলো কমপ্লিট ওয়ার্কস এবং কিছু জার্মান কবিতার বই। এস. ব্যানার্জি যে ভালো জার্মানও শিখেছিলেন, পাতায় পাতায় মার্জিনাল নোটই তার প্রমাণ।

তবু এই লোকটাই যে-কোনো তৃতীয় শ্রেণীর নভেলের মতো এক সময় বীভৎস জীবন কাটিয়েছে, চতুর্থ শ্রেণীর নাটকের মতো স্ত্রীর গায়ে হাত তুলেছে। কেমন করে এ হয়—কী করে এ সম্ভব!

হাতের চুরুটটা অন্যমনস্ক অবসাদে নিবে গেছে, অ্যাশট্রের ওপর সেটা নামিয়ে শোভন উঠে দাঁড়ালো, এগিয়ে গেল বইয়ের শেল্‌ফ্‌টার দিকে। টানতেই বেরিয়ে এল রবার্ট ব্রিজেস।

শোভন পাতা খুলল। দাগ দেওয়া একটি কবিতা। এস ব্যানার্জির খুব ভালো লেগেছিল।

"Awake, the land is scattered with
light, and see,
Unconspied sleep is flying from
field and tree :
And blossoming boughs of April in
laughter shake ;
Awake, O heart, to be loved,
awake, awake !"

প্রেম, প্রকৃতি, সৌন্দর্যের কবিতা। এপ্রিলের উজ্জ্বল পুষ্পিত সকালের অপরূপ উল্লাস।

"Lo all things wake and tarry and
look for thee :
She looketh and saith, 'O sun, now
bring him to me.
Come more adored, O adored—"

শোভন বইটা বন্ধ করল। দেওয়ালের ছবি, এই কবিতা, এই রুচির পরিচয় বাংলো বাড়ীটি, এমন কি মৃদুস্বর আসে সেই অনুতপ্ত চিঠিখানা—মা-র কথা মনে পড়লে সব একটা বিরাট প্রহসনের মতো মনে হয় যেন। ঘর্মাক্ত পিঠে কালো কালো সাপের মতো চাবুকের লাল, বাঁ গালে সেই পোড়া চিহ্নটা—যেখানে একটা জলন্ত চুরুটের মুখ চেপে ধরা হয়েছিল। আর মা! কী স্নেহ কী মমতা দিয়ে গড়া! এ—এই বাস্তবিক অপরাধের কোনো সীমা পরিসীমা নেই কোনো প্রায়শ্চিত্তই তার পাপের এতটুকুও মুছে দিতে পারবে না।

বইটাকে সেল্ফের যথাস্থানে রেখে শোভন নিজের চেয়ারে এসে বসে পড়ল আবার। সামনে সমুদ্রে রক্তসন্ধ্যা। জোর করে চোখ দুটোকে বন্ধ করে রেখেছে সে।

বাইরে থেকে সেই বাংলো সেল্সের গন্ধ বাগান থেকে ফুল, ভেজা মাটির গন্ধ। বাড়ীর সামনে রাস্তা দিয়ে নদী বাস-মোটরের চলা চলতিতে পোড়া পেট্রোলিন আর ধুলোর গন্ধ। পাখির ডাক, পাম্পের পাখার শব্দ, কোথায় একটা খোকা তার পালানো দুরন্ত বাচ্চাকে ডাকছে, ভেসে একটা ঘুঘুর গম্ভীর আওয়াজ। সব মিলে বেলা বাড়ায়। এই চাওা শান্ত ঘরটা যেন চেতনার ওপর ঘুমের মায়া ঘনিয়ে আনতে থাকে।

কিন্তু আবার ফিরে যাওয়া উচিত। কী হবে এখানে পড়ে থাক।

—বাবু!

চমকে চোখ মেলল শোভন। বনোহর।

—কী হয়েছে?

—এক বাবু দেখা করতে এসেছেন।

—কে বাবু?—শোভন ভ্রূকুঞ্চিত করল। এই ক'মাসের মধ্যেই এখানকার লোকের সঙ্গে তার যে-টুকু আলাপ-পরিচয় ঘটেছে তা আদৌ সুখের নয়। তাই কেউ দেখা করতে এলেই সে অস্বস্তি বোধ করে।

—ঠিক বলতে পারলুম না।

—গ্রামের লোক নয়?

—না। তবে আশপাশের কোথাও থাকেন বলে মনে হয়। মুখখানা এর অনেকবার দেখেছি।

—আচ্ছা, ডেকে আন।

লোকটি ঘরে আসবার আগে নিজেই যেন একটু তৈরী হয়ে নিল শোভন। যেন এখনি তার কেউ প্রতিদ্বন্দ্বী আসবে, সতর্ক হল তারই জন্যে। এখানে আসবার পরের দিনগুলো এখন সে ভোলেনি। মাঝ রাতে বাড়ীর দরজায় জানলায় ঢিল পাটকেল পড়ত, দুরন্তীর খেঁয়াড়ে চোরের আনাগোনা বেড়ে গিয়েছিল, পথে বেরুলে নানা রকম টীকা-টিপ্পনী যা কানে আসত তাদের কোনোটায় শরীর জুড়িয়ে দেয় না। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করতে হয়েছে তাকে। তারপর বিদ্বেষের ধার একটু একটু করে ভোঁতা হয়ে এসেছে, আরো অনেক উপদ্রবের মতো তার থাকাটাই সহ্য হয়ে গেছে গ্রামের লোকের। কিন্তু দু-চার জনের সঙ্গে সামান্য আলাপ ছাড়া এই সাত আট মাস ধরে সে এখনো নিঃসঙ্গ। ব্যবসার কাজে কলকাতা থেকে যে-সব লোক আসা-যাওয়া করে, তাদের সকলকেই চলনসই চেনে। কিন্তু মুখখানা যেন অনেকবার চেনা—তার অর্থ—আশপাশের কেউ হবে। আর তা যদি হয়—

বেশিক্ষণ ভাবতে হল না। লোকটি ঘরে ঢুকল।

মাঝারি ধরণের রোগা চেহারা, মাথায় ধূসর চুল, মুখে কাঁচা পাকা গোঁফ একজোড়া। লোকটির মধ্যে এমন কিছু নেই যে একবার দেখবার পর দ্বিতীয়বার দেখা হলে তাকে চিনতে পারা যাবে। গায়ে ময়লা গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবী, হাতে একটি রং-জলা সাদাটে ছাতা খুব যত্ন করে পাকানো।

—নমস্কার।

—নমস্কার।

—একটা নিবেদন আছে আপনার কাছে।

—বলুন

লোকটি সামনের কাউচে শোভনের মুখোমুখি বসল। একটু সংকুচিত—যেন এই ধরণের আসনে বসতে ঠিক সে অভ্যস্ত নয়। একবার বিব্রতভাবে ঘরটির চারিদিকে তাকিয়ে দেখল সে, তারপর দেওয়ালের গায়ে একটু দুঃসাহসিক একটি নারীমূর্তির দিকে চোখ পড়তেই যেন সভয়ে দৃষ্টি নামিয়ে নিলে।

শোভন নিজের চামড়ার কেস থেকে একটা চুরুট বাড়িয়ে ধরল তার দিকে। চলবে?

লোকটি ভদ্র গলায় বললে, না, না, থাক।

মৃদু হেসে আধপোড়া চুরুটটা ধরিয়ে নিলে শোভন। ন'সাত মাস আগে হলে কোনো অপরিচিত প্রৌঢ়কে সে এমনভাবে চুরুট এগিয়ে দিত না কিংবা তার মুখের সামনে চুরুটের ধোঁয়াও ছাড়ত না। কিন্তু এখন ইচ্ছে করেই সে এগুলো করে, জোর করেই উদ্ধত হয়ে ওঠে। অহেতুক বিদ্বেষ আর শত্রুতা ছাড়া যাদের কাছ থেকে সে কিছুই পায় নি, তাদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা দেখাবার প্রয়োজনও সে বোধ করে না।

লোকটি একবার গলা খাঁকারি দিলে।

আমার নাম অশ্বিনী হালদার। আমি পাশের গ্রাম ঘোষ দীঘি থেকে আসছি।

—বেশ, বলুন।

—ওখানকার ইশ্বর চাটুজ্জে মশায়ের নাম নিশ্চয় শুনেছেন আপনি।

শোভন হাসল : না,

কাউকেই চিনি না।

অশ্বিনী হালদার আশ্চর্য হল : চাটুজ্জে মশায়ের নাম আপনি শোনেন নি? ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন অনেককাল—এখন রিটায়ার করে গ্রামে আছেন। কিন্তু রিটায়ার করেছেন বলে বসে নেই মশাই। অমিজমা আছে—সেসবের তদারক করেন, তাছাড়া চালের কলও করেছেন একটা। আমি তাঁরই কর্মচারী।

—বেশ। কিন্তু আমি কি করতে পারি তাঁর জন্যে। তাঁর কি কিছু ডিম দরকার?

অশ্বিনী হালদার হাসল : না, ডিম নয়। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান তিনি।

—আমার সঙ্গে?—শোভনের ভুরু কুঁচকে উঠল আবার : কিন্তু আমি তো তাঁকে চিনি না।

—তিনি আপনাকে চেনেন—যদিও সামনা-সামনি কখনো দেখেন নি। আগে আপনার বাবার সঙ্গে তাঁর খুবই বন্ধুত্ব ছিল।

বাবার সঙ্গে! শোভনের বুকের ভেতর যেন চাবুকের ঘা পড়ল একটা। হাতের চুরুট থেকে মোটা একটা ছাইয়ের টুকরো পড়ল গায়ের জামাটার ওপর।

অশ্বিনী হালদার বলে চলল। অনেকবার বলেছেন নিজেই দেখা করতে আসবেন আপনার সঙ্গে আজকে আপনার জন্যে তৈরীও ছিলেন, কিন্তু সকাল থেকেই হাঁটুতে বাতের ব্যথা উঠে একেবারে অকেজো করে দিয়েছে। তাই আমায় বললেন, 'অশ্বিনী, তুমিই যাও, আর আমার নাম করে এই চিঠিখানা দিও।'

অশ্বিনী হালদার পকেট থেকে বড়ো একখানা চৌকো লেফাফা বের করে এগিয়ে দিলে শোভনের দিকে।

শোভন খাম খুলল।

ছাপানো লেটার হেড শ্রীধরচন্দ্র চাটার্জী, বি. এল, বি-সি-এস রিটায়ার্ড ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, লাংগুলর্ড, প্রোপ্রাইটার—চাটার্জী রাইস মিলস্ পোস্ট, ঘোষদীঘি, জেলা চব্বিশ পরগণা

তারপর আরেকদিন সরকারী চাকরি করা

টানা হাতের লেখায় চিঠি একখানা

মিষ্টার ব্যানার্জী—

হাল করলে যা দাঁড়ায় তা মোটামুটি এই।—যদিও আমরা সাক্ষাৎভাবে পরিচিত নই, তবু তুমি আমার বন্ধু-পুত্র এবং সে হিসেবে তোমাকে একান্ত আপনার জন বলে দাবি করি। তুমি অনেকদিন এখানে এসেছ, তবু আমি যে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি সে ত্রুটি আমারই এবং তার জন্যে আমি একান্ত দুঃখিত। যাই হোক, এজন্যে তুমি আমায় অবশ্যই ক্ষমা করবে এবং আগামী রবিবার মধ্যাহ্ন-ভোজনে আমার এখানে তোমার সঙ্গে মিলিত হলে আমি অতিশয় আনন্দলাভ করব। আমি নিজেই তোমার কাছে যেতাম, কিন্তু অতিশয় হাঁটুর ব্যথা আজ সকাল থেকে আমাকে অচল করে ফেলেছে। আশা করি, রবিবার দুপুরে তোমার সান্নিধ্য লাভের আনন্দে আমি বঞ্চিত হব না। তোমার বিশ্বস্ত—ইত্যাদি।

চিঠিটা পড়ে শোভন চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। প্রথমেই মনের ভেতর থেকে একটা ক্রুদ্ধ গর্জন সাড়া তুলল : আমি যাব না—আমি কিছুতেই যাব না। এখানকার মানুষগুলোকে চিনে নিতে অনেক দাম দিতে হয়েছে আমাকে। কে বলবে, এ-ও তাদের নতুন কোনো চক্রান্ত কিনা।

আর পিতৃবন্ধু! তার যে বাপ—

শোভন একবার কামড়ে ধরল চুরুটটা—দেওয়ালের সেই

একফোঁটা উচ্ছ্বসিত সমুদ্রের দিকে অপলক চোখে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। সামনের রাস্তা দিয়ে কখনো কখনো বাস জাতীয় কিছু একটা চলে গেল, তার শব্দ আর দুই কম্পন অনুভব করা গেল। বাইরে থেকে হাওয়ায় হাওয়ায় আসতে লাগল বাংলা দেশের গন্ধ, ঘরের ঘড়িটা টকটক করে বেজে চলল, আর অশ্বিনী হালদার দুই হাতের ভেতরে গোল করে পাকানো ছাতাটা চেপে ধরে, জড়ো-সড়োভাবে চেয়ে রইল শোভনের মুখের দিকে।

—আপনি আসছেন তো?

—অ্যাঁ? —শোভনের যেন চটকা

—আসবেন তো পরশু!

এক মুহূর্তের অনিশ্চয়তা। তারপর শোভন বললে, আচ্ছা যাব।

অশ্বিনী হালদার উঠে দাঁড়ালো।

—বাবু খুব খুশি হবেন। কিন্তু আমি কি নিতে আসব আপনাকে?

—দরকার নেই, ঘোষদীঘি কোনদিকে সে আমি জানি। আমার মটোর আছে, চলে যাব তাতে।

—দু'ছত্র যদি দয়া করে লিখে দেন বাবুকে—

নিমন্ত্রণ গ্রহণের লিখিত স্বীকৃতি নিয়ে বিদায় হল অশ্বিনী হালদার। আর ভ্রূকুঞ্চিত করে একভাবে বসে রইল শোভনলাল, কাজটা ভালো হল কিনা এখনো বুঝতে পারছে না সে।

— দুই —

জমিদারী হয়তো এস. ব্যানার্জি—অর্থাৎ শৈলেশ্বর ব্যানার্জির অনেক ছিল। জমিদারী আইন পাশ হওয়ার আগেই নিজের হাতে তার বারো আনা শেষ করেছেন শৈলেশ্বর. ভালোই করেছেন। মৃত্যুর ছ' সাত বছর আগে অনেকটা খাতস্থ হয়েছিলেন, তার ফল এই পোল্ট্রি ফার্ম, সঙ্গে লাগাও কিছু খামী জমি। পোল্ট্রি এখন কিছু বড়ো নয়—শ' পাঁচেক ডিম হয় দৈনিক, হাঁস-মুরগীও কিছু চালান যায়। জমিটা থাকায় ধান আসে, বছরের আলু আসে, তরি-তরকারীও পাওয়া যায়। আর এই ছবির মতো বাংলো ধরনের বাড়ীটি—শিল্পীর হাতে তৈরী। শোভন ব্যানার্জির প্রয়োজনের চাইতেও অনেক বেশি। কখনো কখনো আত্মতৃপ্তিতে মন ভরে যায়, এক-এক সময় অসহ্য আত্মগ্লানিতে বোধ হতে থাকে, একদিন কাউকে না জানিয়ে আবার আগ্রায় ফিরে যায় সে।

অশ্বিনী হালদার চলে যাওয়ার পর আরো কিছুক্ষণ একভাবে বসে রইল শোভন। বিটায়ার্ড বি-সি-এস শ্রীধর চ্যাটার্জির চিঠিটা টেবিলের ওপর চাপা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে—এগিয়ে গেল পোল্ট্রির দিকে।

তারের জাল দেওয়া ঘেরা জায়গায় একদল মুরগীর ছা'রা ছুটোছুটি করছে, চিলের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যেই এই ব্যবস্থা। মুরগী চরছে ইতস্তত—ছুটো বড় বড় লেগহর্ন মোরগ ঘুঁটি ফুলিয়ে শক্তি পরীক্ষার পায়তারা ভাঁজছে। পুকুরে সাঁতার দিচ্ছে হাঁসের পাল—তাদেরই একটি দল ছাড়া হয়ে একটা বেনা-ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে বসে আছে—সাপের মতো কেবল গলাটা বেরিয়ে আছে তার। শোভন পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ঠোঁট ফাঁক করে ক্যাস ক্যাস করে আওয়াজ করল—অর্থাৎ ডিম পেড়ে বসে আছে তার ওপর। সব মিলে একটা শান্তি আর বিশ্রাম চারদিকে। ঘাসে, গাছপালায় সব সবুজের রং, এক জায়গায় এক-গুচ্ছ কাশফুল ফুটে উঠেছে—যেন রাজহাঁসের বুকের খানিক নরম পালক কেউ ছড়িয়ে রেখেছে সেখানে।

লাল টালীর দু খানা ঘর একপাশে। অফিস। বারান্দায় একরাশ নতুন ঝুড়ি স্তূপাকার হয়ে আছে—সোনার মতো তাদের রং। ওদিকে একটা খড়ের গাদা। কয়েকটা মুরগী ধানের দানা সন্ধান করছে সেখানে।

শোভন অফিসে পা দিলে। দুজন কর্মচারী সেখানে। দুজনেরই বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে—তার বাবার আগের পুরোনো আর বিশ্বাসী লোক। একজন একটা কপিয়িং পেনসিল দিয়ে ডিমের গায়ে নম্বর দিচ্ছিলেন, আর একজন খাতাপত্র খুলে হিসেব দেখছিলেন। মুকুন্দ মাইতি আর বলাই দাস। শোভনকে দেখে দুজনেই উঠে দাঁড়ালেন।

শোভন একটা চেয়ার টেনে নিলে।

যিনি হিসেব দেখছিলেন তিনিই মুকুন্দ মাইতি। একটা চিঠি এগিয়ে দিলেন শোভনের দিকে।

—একটা নতুন পার্টি স্যার। ডেলি দেড়শো ডিমের সাপ্লাই চায়।

প্রসাদ চিঠিটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলে।

—কী করে দেবেন? আমাদের বাঁধা পার্টির চাহিদাই তো আমরা কুলিয়ে উঠতে পারি না।

—পারা যেত।—মুকুন্দ আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন: গত বছর সেই এপিডেমিকটা হয়েই সব গোলমাল হয়ে গেল। তা কী লিখব ওদের?

—কী আর লিখবেন? জানিয়ে দিন, আপাতত আমরা পারছি না, আসছে জানুয়ারী থেকে চেষ্টা করে দেখব।

বলাই দাস বললেন, কিন্তু স্টক এই সময় বাড়ান স্যার। আরো নানা জায়গা থেকে ডিমাণ্ড আসছে।

—ভাবছি।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল শোভন। কিন্তু স্টক বাড়ানোর কথা ভাবছে না, অন্য আর একটা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে তার মনে। হঠাৎ মুকুন্দবাবুর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, আপনি শ্রীধর চ্যাটার্জিকে চেনেন?

মুকুন্দ এবং বলাই এক সঙ্গেই উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন। মুকুন্দ বললেন, কোন্ শ্রীধর চ্যাটার্জি?

—ঘোষদীঘির। আগে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। এখন রাইস্ মিল করেছেন।

ওঃ, চ্যাটার্জি সাহেব!—মুকুন্দ আর বলাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন।

—চেনেন তাহলে?

—আজ্ঞে ওঁকে আর কে না চেনে বলুন!—বলাইবাবু কিনা করে হেসে ফেললেন: একটা খাকি হাফ প্যান্ট আর শোলার টুপি মাথায় দিয়ে, হাতে বেত নিয়ে গ্রামের ভেতর ঘুরে বেড়ান আর চাষা ভুষো সকলের সঙ্গে ইংরেজি বলেন।

গতবার ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয়ে ইলেকসনে দাঁড়িয়েছিলেন কিন্তু সবশুদ্ধ মোট পঁয়তাল্লিশটা ভোট—

শোভনের মুখে মেঘ ঘনাচ্ছে দেখে মুকুন্দবাবু বলাই-বাবুকে থামিয়ে দিলেন। বললেন, যেতে দাও, ওসব নিয়ে কথা বাড়িয়ে কী হবে? কিন্তু চাটার্জি সাহেবের খবর কেন জানতে চাইছেন স্যার। কিছু অর্ডার দিয়েছেন নাকি?

—না, অর্ডার নয়। আসছে রবিবার দুপুরে নেমন্তন্ন করেছেন আমাকে।

—নেমন্তন্ন!—এবার মুকুন্দ দত্তর মতো চমকালেন এবং সেটা বলাইয়ের মধ্যেও সংক্রামিত হল।

—এত আশ্চর্য হচ্ছেন কেন!—শোভনের ভুরু কুঁচকে এল।

ও-রকম কু—বলাইবাবু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে মুকুন্দবাবু বারণ করলেন তাঁকে। কথাটা তুলে নিয়ে বললেন, মানে ওঁর তো এ ধারণা, এ অঞ্চলে দেখবার মতো ভদ্রলোক একটিও নেই। তাই—

নেহাৎ অন্যায় ধারণা নয়—শোভন ভাবল। এই কয়েক মাসের অভিজ্ঞতা, শত্রুতা, বাপের সম্পত্তির দখল নিতে গিয়ে মানুষের নোংরামির বীভৎস পরিচয়—সব মিলিয়ে এ ছাড়া আর কী মনে হতে পারে? একটু চুপ করে থেকে বললে, আমার বাবার সঙ্গে ওঁর খুব বন্ধুত্ব ছিল, তাই নয়?

বলাইবাবুর চোখ দুটো চক চক করে উঠল। কয়েকটা রেখা ফুটল মুকুন্দবাবুর কপালে।

হিসেবের কাগজপত্রগুলো টেবিলের ড্রয়ারে পুরে রেখে মুকুন্দবাবু আস্তে আস্তে বললেন, কিছু মনে করবেন না স্যার। আমি পুরোনো লোক, অনেক কথাই জানি। বন্ধুত্ব ছিল ঠিকই, কিন্তু এক তরফা।

—এক তরফা? তার মানে?

—মানে কত টাকা যে কর্তাবাবুর কাছ থেকে নিয়েছেন তার কোনো হিসেব নেই। কর্তাবাবুর তো এক-সময়—কী বলে—মুকুন্দ একবার কাশলেন: মানে—মন মেজাজ খুব স্বাভাবিক ছিল না, কে যে কী বাগিয়ে নিত খেয়ালও করতেন না। আপনাদের বিষয় সম্পত্তিরও অনেকটাই উনিই জলের দরে কিনে নিয়েছেন। এদিক থেকে যদি ওঁকে বন্ধু বললে—

—হুঁ, বুঝেছি।

টেবিলের ওপর থেকে কাচের একটা কাগজ-চাপা টেনে নিয়ে শোভন তার শীতল মসৃণতার ওপর আঙুল বোলালো খানিকক্ষণ। না—সে আশ্চর্য হয় নি। এ অঞ্চলের মানুষের কাছ থেকে এই রকমই কিছু একটা সে আশা করেছিল। বিটায়ার্ড বি-সি-এস—মিলওনার—সব সমান।

পকেট থেকে চামড়ার কেস বের করে তা থেকে একটা চুরুট ধরালো শোভন। আস্তে আস্তে বললে, তা হলে—লেকিন—আপনাদের কী আইডিয়া? যাবেন বলছেন?

—না যাওয়াই উচিত—বলাইবাবুর জবাব দিলেন।

—কী ছেলেমানুষি করছ বলাই!—মুকুন্দবাবু অসন্তুষ্ট হলেন: না স্যার, নেমন্তন্ন করেছেন যখন, যাবেন বইকি: তবে একটু সতর্ক থাকবেন আর কি! স্বার্থ ছাড়া তো চাটার্জি সাহেব কখনো এক পা-ও চলেন না। তাই—

—হয়তো বিনি-পয়সায় ডিম মুরগী খাওয়াবার মতলব।

—আঃ বলাই!

বলাইবাবু বললেন, তোমার মতো আমার নিখোঁ চক্ষু লজ্জা নেই মুকুন্দদা। এ কথা তুলছ কেন, দু দিন বাদেই শীত পড়বে, তখন সাহেবের ক্রিসমাস কেক চাই, মুরগী চাই? তাই এখন থেকেই গুছিয়ে রাখছেন।

—ক্রিসমাস কেক?—শোভন চোখ তুলল।

জবাব বলাইবাবুই দিলেন: যাঃ—উনি তো ক্রীশ্চান।

ক্রীশ্চান! শোভন আশ্চর্য হল: ছাটস এ নিউজ! বাংলা দেশের এই অঞ্চলে যে ক্রীশ্চান ফ্যামিলিও আছে তা তো জানতুম না।

—ক্রীশ্চান ফ্যামিলি থাকবে কেন স্যার?—মুকুন্দবাবু বললেন, ওঁর বাবা ছিলেন হাই-স্কুলের পণ্ডিত—ছার তীর্থ স্মৃতিতীর্থ এইসব উপাধি ছিল, তখনো জামা-জুতো পরেন নি, চাদর আর চটি জুতো নিয়েই তো সারাটা জীবন কাটিয়ে গেলেন।

—তাঁর ছেলে ক্রীশ্চান?

—তাই তো হল স্যার। ছাত্র ভালো ছিলেন চাটার্জি সাহেব, স্কলারশিপ নিয়ে পাশ করলেন, সরকারী চাকরি পেলেন। তারপর রংপুর না বাঁকুড়া কোথায় থাকবার সময় সেখানকার ক্রীশ্চান ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের মেয়ের সঙ্গে ভাব হয়ে—সেই পুরোনো গল্প—চিরকালের ইতিহাস। অনেক কালাপাহাড় আর তাজসেনের কাহিনী। 'প্রীত না মানে জাত কুজাত, দুখ না মানে—' আশ্চর্য সেই সম্পংলালকে মনে পড়ল, কোন এক নবাবী বংশের মেয়ের জন্যে সে-ও নিজের ধর্ম ছেড়ে ছিল, উর্দু-শায়ের আউড়ে বলেছিল: 'একদিকে সাহী তখত, আর একদিকে হাসিনা মহবুবা। দুই কোনটা চাস?' কবি বলেন, ওরে মূর্খ—রাজার মাটির, রূপ তো বেহেস্তের। স্বর্গ ছেড়ে মাটি বেছে নিবি, তুই কি এমনিই কমবখত? শোভন হাসল। একটু পরে জিজ্ঞেস করল: গোলমাল হয়নি তা নিয়ে?

—হয়েছিল বইকি। পণ্ডিতমশাই যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন চাটার্জি সাহেব দেশে এলে বাড়ীর ত্রিসীমানাতেও যেতেন না। আমাদের কর্তাবাবুর এখানে এসেই উঠতেন। আর কর্তাবাবু তো কাউকে গ্রাহ্যই করতেন না, তাঁকে আর কে কী বলবে?

—বুঝেছি।—শোভন কাগজ-চাপাটায় আঙুল বুলোতে লাগল কিছুক্ষণ। তারপর সকৌতুকে জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা, আমি যদি ওঁর ওখানে খেতে যাই, তা হলে ক্রীশ্চানের নেমন্তন্ন খেয়েছি বলে জাত যাবে না তো আমার?

বলাইবাবু এবং মুকুন্দবাবু হেসে উঠলেন এবার।

মুকুন্দবাবু বললেন, না স্যার, যুদ্ধের পর ও-সব পাট মিটে গেছে। জাত নিয়ে এখন আর কেউ অত মাথা ঘামায় না। আজকাল তো বামুন বাড়ীতেই মুরগী পোষা চলছে—কে দেখতে যাচ্ছে ও-সব? এই তো সেদিন এক সদ্‌গোপের ছেলে কলকাতায় গিয়ে রেজিস্ট্রি করে এক বামুনের মেয়েকে বিয়ে করল—কে রুখতে পারল তাদের? দিনকাল একদম বদলে গেছে এখন।

অফিস ঘরের ঘড়িটায় টং টং করে এগারোটা বাজল।

শোভন উঠে দাঁড়ালো। মুকুন্দবাবু আর বলাইবাবু খেতে যাবেন এখন। তিনটে নাগাদ ফিরে আসবেন আবার। সে না গেলে তাঁরা খেতে পারছেন না।

—তা হলে যেতেই বলছেন ওঁর ওখানে?

—হ্যাঁ স্যার, কেন যাবেন না?—মুকুন্দবাবু উৎসাহ দিলেন: ডেকেছেন যখন, যাওয়াই উচিত। আরো বিশেষ করে কর্তাবাবুর সঙ্গে যখন এতটা জানাশোনা ছিল। কিন্তু ডাকে চিঠি লিখেছেন নাকি?

—না, এক ভদ্রলোক এসেছিলেন। অশ্বিনী হালদার।

বুঝেছি, ওর চালের কলের ম্যানেজার।

—ম্যানেজার? চেহারা দেখে তো—

বলাইবাবু বাজের হাসি হাসলেন: চাটার্জি সাহেবের ম্যানেজারের ওর চাইতে ভালো অবস্থা হয় না স্যার।

—আঃ কেন বাজে বকছ বলাই!—মুকুন্দবাবু ধমক দিলেন একটা।

একটু পরেই ওরা দু'জনে চলে গেলে শোভন এসে পুকুরের বাঁধানো ঘাটটায় বসল। গভীর নীল জল, হাঁসের পাল চরছে। জলটা দেখে ঝাঁপিয়ে পড়তে লোভ হয়, কিন্তু পুকুরটা গভীর, শোভন সাঁতার জানে না। ঘাটের দু' তিনটে জলে ডোবা স্যাওলা পড়া সিঁড়ির দিকে নজর পড়ল তার। দুপুরের রোদ পড়ে জলের তলার অনেকটা পর্যন্ত স্বচ্ছ হয়ে গেছে, দেখা যাচ্ছে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছোট ছোট মাছের ঝাঁক। একটা ছিপ নিয়ে বসলে মাছ ধরা যায়—কিন্তু শোভন কোনোদিন মাছ ধরেনি তার জীবনে।

অন্যমনস্কভাবে বসে থাকতে থাকতে তার আবার মা-কে মনে পড়ল।

মা দুঃখ করতেন: বাঙালীর ছেলে হয়ে তুই কখনো বাংলা দেখলিনে বাবা।

: কেন মা, এই তো সেদিন ঘুরে এলুম কলকাতা থেকে।

: দূর কলকাতা কি আর বাংলাদেশ রে! ওতো মস্ত একটা শহর। পাড়াগাঁয়ে না গেলে কি আর দেশ দেখা যায়?

: কী আছে বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ে? খালি পানা পুকুর আর ম্যালেরিয়া।

মা-র চোখ ছলছল করে উঠত।

: কে বলেছে তোকে এ-সব কথা?

: কেন সবাই তো বলে।

: ওরা না জেনে বলে।—মা একটু চুপ করে থাকতেন। ওদের বাসার ছাদের ওপর চাঁদ উঠত, হাওয়া দিত, গাছের পাতা কাঁপত, শব্দ উঠত তার। ঘুরে বেড়াটাকে দেখা যেত একটা দৈত্যপুরের প্রাচীর, কোর্ট স্টেশন থেকে গাড়ীর এঞ্জিনের আওয়াজ আসত। পথে 'পেঠাওলা' হাঁক ছেড়ে যেত—তার ঠেলাগাড়ীর ওপর কাচের বাক্সের ভেতর চিনির দানার চিকচিকে স্বচ্ছ নীল পেঠাগুলোকে অদ্ভুত সুন্দর দেখাত, একটা খোলা ঝুড়ির ওপর সোনার হরে আঠানো জন লোক হো-হো করতে করতে চারদিক কাঁপিয়ে চলে যেত। শ্যামলের হোটেলটার দরজায় দাঁড়িয়ে বুড়ো আতরওলা কাঁপা কাঁপা ভাঙা গলায় ডেকে বলত: 'গুলাবী আতর—রাত কী রাণী!' আর তারই মাঝখানে বসে মা বাংলাদেশের গল্প বলতেন।

যে দেশে মা-র ছেলেবেলা কেটেছিল সে এখন পাকিস্তান। সেখানকার নদী, ধানক্ষেত, পুকুর, নারকেল বন। ছেলেবেলায় মা কেমন করে পুকুরে কলসী ভাসিয়ে সাঁতার শিখেছিলেন তার কথা। শোভন রূপকথা শুনত।

সে দেশ নয়, শুধু বাংলা দেশ। ঐ পুকুর। জলের ভেতর, ঘোটোতে দেখা সেই কিশোরী মায়ের মুখ ফুটে উঠল। কলসী ভাসিয়ে সাঁতার দিচ্ছেন, পদ্মের পাপড়ির মতো দু-খানি পা জলের মধ্যে খেলে বেড়াচ্ছে।

শোভন দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মা-র কথা আর সে ভাববে না। সেই কর্সা ধবধবে পিঠের ওপর কালো কালো সাপের মতো কতগুলো চাবুকের দাগ। সে-স্মৃতি জেগে উঠলেই ঘৃণায় সারা গা জ্বলে ওঠে তার। এস বানার্জির এই অতিশপ্ত ঐশ্বর্য দুই পায়ে চটকে ফেলে তার আবার আগ্রায় পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। আর ইচ্ছে করে, যাওয়ার আগে বাড়ীর সমস্ত ছবিগুলো এক সঙ্গে জড়ো ক'রে আগুন ধরিয়ে দেয় সে।

শোভন আবার সিঁড়ির দিকে চোখ ফেলল। সূর্যের আলোয় স্বচ্ছ জলের ভেতর স্যাওলাধরা সিঁড়িতে কী যেন খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে মাছের ঝাঁক। রোদে গা জ্বলছে এখন। কী নীল পুকুরটার জল—ঝাঁপিয়ে স্নান করতে পারলে সারা শরীরের জ্বালা যেন জুড়িয়ে যেত।

কিন্তু শোভন সাঁতার জানে না।

তখন আবার ঈশ্বর চাটার্জীকে মনে পড়ল।

লোকটা তার মনে অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে একটা। অশ্রদ্ধার সঙ্গে মিশছে দারুণ কৌতূহল। এই বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ে একটা বেহাড়া লোক এবং বিধর্মী স্ত্রীকান, কিভাবে তার দিনগুলো কাটিয়ে চলেছে, সেটা চুরুটটাকে ঠোঁটের কোণে চেপে ধরে সেইটেই অনুসরণ করতে চাইল শোভন।

॥ তিন ॥

পরদিন স্যুটকেস নিয়ে শোভন গেল কলকাতায়।

শনিবারের বিকেল, পথে ছোটেরের ভিড়। বাসে ঝুলন্ত মানুষের শোভাযাত্রা। একধারে লোহা লক্কড় বোঝাই

একটা লরী কাত হয়ে পড়ে আছে, খুব সম্ভব কাল রাত কিংবা আজ সকালে অ্যাকসিডেন্ট—লোকের ভিড় নেই সেখানে, কৌতূহলও না। 'এই পথটায় কতগুলো প্রাণ যায় প্রতিবছর?

শোভন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। আগ্রা থেকে আলিগড়, আলিগড় হয়ে দিল্লী। সে পথেও অসংখ্য গাড়ী চলে কিন্তু এর সঙ্গে কোনো তুলনাই হয় না তার। ছবিটাই আলাদা ধু-ধু মাঠে মেঘবরণ গমের ক্ষেত। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ইঁদারা থেকে চাকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মাঠে জল সেচের ব্যবস্থা। কখনো কখনো নবাবী আমলের জমিদার বাড়ী সাবেকী দুর্গের ধরণে লাল ইটের মস্ত প্রাচীর আর উঁচু বুরুজ নিয়ে দাঁড়িয়ে। চোখ বুজে স্টীয়ারিং ছাড়িয়ে দিলে মাইলের পর মাইল। পথের ধারে বটের ছায়ায় কোনো হালুইকরের দোকান থেকে পুরী-সাব্জি কিনে খাওয়া। চলতে চলতে কত পীরের দরগা, ভাঙা মসজিদ, কত শ্যাওলা ধরা কবরের সার। দিল্লী এখন দূর অস্ত!' না—আর ঘুরে নেই, ওই তো শহরতলী ফুটে উঠেছে সামনে।

শোভন সজাগ হল। লেভেল ক্রসিং। মাল বোঝাই গাড়ী দাঁড়িয়ে গেছে।

কেমন কুশ্রী, কেমন খাসরোধী মনে হয়। ভিড়-ভিড়-ভিড়। লক্ষ্মীছাড়া চেহারার কতগুলো জীর্ণ বাড়ী। এক জায়গায় খানিকটা কাদা জলের মধ্যে একপাল শূয়োর। গাছের পাতা পর্যন্ত ধুলোয় বিবর্ণ। মা-র গল্পে শোনা বাংলা দেশ এ নয়। ধুলো আর ভিড়ে কলকাতার আগ্রা বাজারের সঙ্গে একাকার, শুধু তার সমৃদ্ধিটুকুই নেই এখানে।

শাঁখের আওয়াজ তুলে ছুটে বেরিয়ে গেল নীল রঙের ইলেকট্রিক ট্রেনটার কড়। গেট খুলল। আবার সেই পথ গাড়ী বাঁচিয়ে। এপথে স্টীয়ার চালিয়ে সুখ নেই। এখানে জীবনে বাধা—চলায় বাধা। কোন বাংলা দেশের কথা মা বলেছিলেন!

বাজার। ভিড়। কোথা থেকে মাইকে বক্তৃতার একটা টুকরো সমস্ত কোলাহল ছাপিয়ে কানে এল: 'ভাই সারা জীবন তিনি সৌন্দর্য আর মুক্তির তপস্যা করেছিলেন—সৌন্দর্য আর মুক্তি—'

সৌন্দর্য আর মুক্তি। দুইয়ের মধ্যে কি সম্পর্ক আছে কিছু! শৈলেশ্বর বানার্জী সৌন্দর্যের তপস্যাই তো করেছিলেন জীবন ভোর, কিন্তু মুক্তি কি তাঁর ছিল! কী কুৎসিত একটা বৃত্তের মধ্যে আবর্তিত হয়ে কাটিয়ে গেলেন লোকটি।

স্টীয়ার চলল। ভিড়—গাড়ী—কোলাহল। কোলকাতা।

হিরাপুর ষ্ট্রীটের মেসের সামনে, ফুটপাথে স্টীয়ার রেখে শোভন মেসটায় গিয়ে উঠল। নীচে মিষ্টির দোকান। পাশের অন্ধকার সিঁড়ি আর নোনাধরা দেওয়াল পেরিয়ে তেতলায় গিয়ে মামার ঘরে পৌঁছল। এই তার একমাত্র আত্মীয়—যার সঙ্গে আগ্রা থেকেও মা কিছু কিছু যোগ রাখতেন। শোভন জানত, এই একমাত্র বড়ো। ভাইটি ছাড়া ত্রি-সংসারে মা-র আর কেউ নেই।

তেতলার একটি মাত্র ঘর, ওপরে টালীর চাল। এই ঘরের এক বাসিন্দা মামা। ঘর খানা নেহাৎ যে ছোট তা নয়, কিন্তু প্রফেসার মামার বই পত্রেই বারো আনা ঠাসা। একটি তক্তপোশে আধখানা বিছানা, আলনায় কিছু জামা কাপড়, বই খাতায় উপচে পড়া টেবিল, দেওয়ালে ঝুলন্ত একটি সেতার। কুঁজোর ওপর কানাভাঙা একটি কাঁচের গ্লাস—একটা স্টোভ আর চায়ের সরঞ্জামও আছে। বিছানার ওপর সাদা এবং হলুদ রঙের দু'টি নিদ্রিত বিড়াল। মামার পোষ্য। মামার বয়েস বাহান্ন তিপান্ন হবে, ব্যাচেলার মন, উইডোয়ার। সাতাশ-আটাশ বছর আগে বাচ্চা হতে গিয়ে মামীমা মারা যান; তারপরে মামা বিয়ে করেননি।

মামা টেবিলে বসে কতগুলো কী খাতাপত্র দেখছিলেন, শোভনের ভারী জুতোর আওয়াজ শুনে মাথা না তুলেই বললেন, আয় শোভন।

শোভন দরজায় সোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়ল একবার। হালকা সন্ধ্যা ছড়িয়েছে। মামার ঘরের আলোটা একটা হলুদ বিষণ্ণতা বিছিয়েছে অনেকদিন চুন না পড়া কালচে দেওয়ালে। খাঁচার ফোঁড়া গেঞ্জীর ভেতর দিয়ে সাদা পিঠ আর পৈতের রেখাটা চোখে পড়ছে। হঠাৎ সব মিলে কি রকম অরূপ মনে হল।

—আর, দাঁড়িয়ে রইলে কেন দোর গোড়ায়?

—না দেখেই কী করে বুঝলে আমি এসেছি?

—ও রকম সিঁড়ি কাঁপানো পায়ের আওয়াজ তুলে

বাঙালী ভদ্রলোক আসে না—মামা মুখ ফিরিয়ে হাসলেন ও ডাল রুটির পদগুলি। ছাত্রদেরও অমন করে আসবার সাহস নেই। ডিডাকসন করে কী দাঁড়ায়?

মামা দর্শনের অধ্যাপক।

ছেলে শোভন ঘরে ঢুকল। বিছানায় বেড়াল দুটোকে তাড়া দিয়ে বললে, নাম—নাম শিগ্‌গীর বিল্লীকে বাচাও! কী আবদার! দু চক্ষে এই জীবগুলোকে দেখতে পারি না আমি।

অনিচ্ছাসত্ত্বে বেড়াল দুটো নামল। পিট বাঁকিয়ে আড়মোড়া ভাঙল, হাই তুলল, তারপর শোভনের দিকে বিরূপ দৃষ্টি ফেলে বেরিয়ে গেল বাইরে।

শোভন বিছানায় বসল। মামা চেয়ারটাকে ঘুরিয়ে নিলেন তার দিকে।

—কী করছিলেন মামা?

—আর বলিস কেন—ছেলেমেয়েদের এক পাল খাতা। সব বাংলা হয়ে কী কাণ্ড যে হয়েছে। এদের পরিভাষায় একটাও যদি আমার মাথা ঢোকে। সে যাক—তুই যে হঠাৎ?

খুঁটিনাটি জিনিসপত্র কিনব কতগুলো। কিন্তু সে কোনো কাজের কথাই নয়। আসলে একদম ভালো লাগছিল না, তাই চলে এলুম তোমার কাছে।

—বেশ করেছিস। তা হলে আজ থেকে যা এখানে। বলে আসছি ঠাকুরকে।

—না মামা, থাকবার জো নেই আজ। অনেকগুলো কাজ ফেলে এসেছি, সকালেই সেরে রাখতে হবে সে সব। একটু পরেই ফিরতে হবে আমাকে।

—রাস্তার যা ট্রাফিক আর সন্ধ্যের পরে যে রকম লরীর উৎপাত শুরু হয়—

—আমার জন্যে ভেবোনা মামা।—শোভন হাসল: অর্ধেক ভারতবর্ষ আমি স্কুটারে করে ঘুরে বেড়িয়েছি।

—হয়েছে, আর বাহাদুরী করতে হবে না। কী খাবি এখন? চা?

—চা তো খাবই, আর সেই সঙ্গে তোমার মুড়ি-আর ছোলে ভাজা। যাই বলো মামা, পশ্চিমের তেলে ভাজা অবিশ্যি খুবই ভালো, কিন্তু বাংলা দেশের মুড়ির সঙ্গে তুলনা হয় না।

—আনাচ্ছি—

মামা চেয়ার ছেড়ে উঠলেন, বারান্দায় গিয়ে তারস্বরে হাঁক ছাড়লেন: জনার্দন—জনার্দন—

সাড়া দিয়ে ফেলের চাকর জনার্দন এল। তাকে পয়সা দিয়ে মামা স্টোভের দিকে এগোলেন।

সরো সরো মামা—শোভন লাফিয়ে এগিয়ে আসছি চা করছি।

কেট্‌লি পরিষ্কার ছিল, কুঁজোয় জল ছিল। শোভন চায়ের জল বসিয়ে দিয়ে আবার বিছানায় এসে বসল।

—তোর ব্যবসা কেমন চলছে রে?—মামা জানতে চাইলেন।

ভালোই।—শোভনের গলায় অভিমান ফুটে বেরুল: কিন্তু এই দুমাসের ভেতর তুমি একদিন গেলে না পর্যন্ত।

—কি করে যাই বল? এক একটা রবিবারে বেরিয়ে পড়ব ভাবি,—কিন্তু অসহায়ভাবে মামা বলে চললেন, ঠিক কোত্থেকে একদল ছাত্র ছাত্রী এসে হাজির হয়। আর এসে যখন পড়েই, তখন একটু না দেখিয়ে দিলে কি চলে?

—পয়সা দেয়?

—আরে না-না! পয়সা-টয়সা—বাজে, ওসব কোশ্চেন ওঠেই না। কারুর আমিই নিই না। হাজার হোক আমার নিজের স্টুডেন্ট—দিতেও পারে না—

—খুব পারে মামা, খুব পারে।—শোভন উত্তেজিত হয়ে উঠল: তোমার এই কলকাতার বস্তি হাউসেই এদের যে আনন্দে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে দেখি আর এরা যেভাবে এত দামের সিগারেটের ধোঁয়া ওড়ায়, তাতে এদের তো গরীব বলে ভুল হয় না।

মামা হাসলেন: না-রে সবাই না। এক একজন ছেলে মেয়ে যে কী কষ্টে লেখাপড়া করে শুনলে তোর চোখে জল আসবে।

—সব তোমার বানিয়ে বলা মামা। তোমাকে ভাল মানুষ দেখে এক্সপ্লয়েট্ করে। এবার এলে স্রেফ তাড়িয়ে দেবে। আর তোমার যদি চক্ষুলজ্জার বাধে আমাকে বলো, এক এক রবিবার এসে আমি দারোয়ান হয়ে দাঁড়াব, হিন্দীতে কিভাবে লোক তাড়াতে হয় সে দেখিয়ে দেব তোমাকে।

মামা তেমনি মৃদু হেসে চুপ করে রইলেন, জবাব দিলেন

না। মুড়ি আর তেলে ভাজার ঠোঙা ঘরে নিয়ে ঢুকল জনার্দন, দুটো প্লেটে করে সাজিয়ে, দু জনের মাঝখানে একটা টিপয় এনে তার ওপর রাখল।

কেট্‌লিতে আওয়াজ উঠেছিল। জনার্দন বললে, চা-টা করে দেব বাবু?

—দে।

মামা ভাগ্নেতে মুড়ি আর তেলেভাজা চলতে লাগল।

—আচ্ছা শোভন!

—হুঁ।

—গ্রামের লোকে আর গোলমাল করে না তো কোন রকম?

যেমন মিশেছে আমাকে।

—তুই আলাপ করে নিয়েছিস তো সকলের সঙ্গে?

—আমি করিনি গায়ে পড়ে ভাব জমিয়ে গেছেন দু-চারজন। চাঁদা-টাঁদাও তো চাইতে হয়।—শোভনের হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল: আচ্ছা মামা শ্রীধর চাটার্জির সঙ্গে পরিচয় আছে তোমার?

না।—বেগুনী চিবুতে চিবুতে ভরা মুখে মামা জিজ্ঞেস করলেন।

—ঘোষ দীঘির লোক?

ক্রীশ্চান?

—ঘোষ দীঘির নাম শুনিনি কখনো। কেন রে?

একটু চুপ করে থেকে শোভন বললে, পরে বলব।

জনার্দন চায়ের পেয়ালা এনে রাখল। বললে আর কোনো দরকার আছে?

—কিছু না। যা তুই।

চায়ে চুমুক দিয়ে শোভন বললে, সত্যি, কবে যাবে বলো। একেই তো তোমার বাংলা দেশে আমি পরদেশী—তার ওপর ওই পাড়া গাঁ। কী যে একা একা লাগে কী বলব তোমাকে। কলকাতা হলে তবু বা কথা ছিল, যেন নির্বাসনে পাঠিয়েছ আমাকে।

মামা কিছু একটা ভাবছিলেন। বললেন, হুঃ।

—হুঁ কী? কবে যাবে?

মামা জবাব দিলেন না কথাটার। তার বদলে বললেন, খুব একা একা লাগে—নারে?

—লাগেই তো। ডিমের হিসেব করতে করতে মাথা খারাপ হয়ে যায়। একদিন তো স্বপ্নই দেখলুম, আমার হাত-পা নাক-মুখ, কিছুই নেই, আমিও একটা বিরাট ডিম হয়ে গেছি আর আমার গায়ে প্রকাণ্ড একটা লেবেল এঁটে দেওয়া হয়েছে—তাতে, লেখা কন্সিটিশন এগ্—মামার ফাইভ থাউজ্যাণ্ড্ ফাইভ হানড্রেড্ ফিফ্‌টি ফাইভ।

অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন মামা, এক কলক চা উছলে উঠল পেয়ালা থেকে। হাসি থামলে বললেন, মিথ্যে কথা—বানিয়ে বানিয়ে বলছিস এ-সব।

—না মামা, খোদার কসম।

—থাম্ তুই, খোদার কসম।—কোঁচার খুঁটে মুখের কোনা মুছে নিয়ে মামা বললেন, এইবার আমার যা কাজ সে আমি বুঝতে পারছি। তোর একটা বিয়ে দিতে হবে।

—বিয়ে!—শোভন বিষম খেলো।

—হ্যাঁ, বিয়ে। বৌমাকে ওখানে পাঠিয়ে দিতে পারলে আর একা একা ঠেকবে না—হু-হা!

মামা তাঁর ভাগ্নের উদ্দেশে রসিকতাটুকু করে পরমানন্দে হেসে উঠলেন। কিন্তু রাঙা হয়ে উঠল শোভনের মুখ।

মামা কী বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই আবার সিঁড়িতে পায়ের শব্দ বাজল। বেশ লঘু ছন্দিত আওয়াজ। মামা বললেন, কে যেন আসছে।

—নিশ্চয় তোমার কোন হতভাগা ছাত্র। আসবার পথে সঙ্গে যদি তাকে তাড়া না করেছি তো আমি—

মুখের কথা মুখেই রইল। একটি মিষ্টি সুরেলা গলার ঝঙ্কার উঠল দোরগোড়ায়: আসব স্যার?

মামার মুখ দরজার দিকে ফেরানোই ছিল, হেসে বললেন, এসো চিত্রা, এসো।—আর শোভন ঘাড় ফিরিয়েই একটা লাল শাড়ীর ঝলক দেখে মাথা নামিয়ে নিল।

মামা বললেন; চিত্রা, এ আমার ভাগ্নে শোভন ব্যানার্জি। এর কথা তো আগেই ব'লেছি তোমায়। আর এ হল চিত্রা কুণ্ডু—আমার ছাত্রী, ফোর্থ ইয়ারে পড়ে।

হাত তুলে নমস্কার করতে গিয়েই শোভনের চোখ চিত্রার মুখে আটকে গেল। সেই মেয়েটি। বাঁ গালে সেই বড়ো কালো জড়ুলটি, চোখে সেই ফিকে নীল কাচের

চশমার ওপর ঘরের হলুদ আলোটা জ্বলছে।

শোভন বলে ফেলল : আপনি!

চিত্রা হাসল : পৃথিবীটা যে গোল সেটা আর একবার প্রমাণ হয়ে গেল শোভন বাবু।

সব চাইতে চমকে উঠলেন মামা : সেকি আলাপ ছিল নাকি?

চিত্রা বললে, না স্যার—ঠিক আলাপ ছিল না। এপন সাড়ে ছ'টা—ঠিক সওয়া ঘণ্টার আগে রাস্তায় উনি আমাদের একটুখানি বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলেন।

—কি রকম?

ঘটনাটা এত ছোট যে তার অস্তিত্বও মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে গিয়েছিল শোভনের। আজই কলকাতা আসবার পথে একটা ফাঁকা মাঠের মতো জায়গায় একটি গাড়ীকে বিপদের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল সে। গাড়ীর ভেতরে বসে ছিল এই মেয়েটি আর বাইরে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক বনেট খুলে কী সব টানাটানি করছিলেন।

শোভন দাঁড়িয়ে পড়েছিল। এ-ভদ্রতাটুকু সবাই করে।

'আমি গাড়ীর কাজ জানি। কিছু সাহায্য করতে পারি কি?

ভদ্রলোক অসহায়ভাবে বললেন, 'স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল। কী যে হল বুঝতে পারছি না।'

'তেল ঠিক আছে?

'একটু আগেই দিয়েছি। পনেরো লিটার।'

শোভন জবাব দিয়েছিল, 'আমি একবার দেখতে পারি?'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভদ্রলোক বলেছিলেন, 'দেখুন না—দেখুন না।'

এইবার গাড়ী থেকে নেমে এসেছিল মেয়েটি। হেসে বলেছিল, 'হুঁম—সেই কথাই ভালো। দেখুন, বাবা কোনমতে চালাতে পারেন এই মাত্র—গাড়ীর কিছুই জানেন না। ড্রাইভারের অসুখ বলে আজ নিজেই গাড়ী নিয়ে বেরিয়েছিলেন। তুমি সরে এসো বাবা—এটা সেটা টানাটানি করে আরো বিগড়ে দেবে।'

শোভন এইবার ভালো করে চেয়ে দেখেছিল মেয়েটির দিকে। বিকেলের পড়ন্ত রোদে নীলচে চশমার কাচ যেন জলের ওপর আলোর বিন্দু। বাঁ গালে একটা কালো বড়ো তিল মুখখানাকে বিশিষ্টতায় স্বতন্ত্র করে তুলেছে।

তারপর গাড়ীর দিকে মন দিয়েছিল সে।

অভ্যস্ত চোখে দু-মিনিটেই ধরা পড়ল। এক টুকরো কাবনের মুখে কী যেন ময়লা জমেছিল, সামান্য ঘষে মেজে দিতেই ঠিক হয়ে গেল।

'নিন, স্টার্ট দিন গাড়ী।'

লক্ষ্মীছেলের মতোই গাড়ী স্টার্ট নিয়েছিল।

ভদ্রলোক এবং মেয়েটি একসঙ্গে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন : আপনি যে আমাদের কী উপকার করলেন—

'কিছু না—কিছু না আচ্ছা—নমস্কার—'

'নমস্কার—'

এই ছোট ইতিহাসটুকুই সংক্ষেপে জানাতে হল মামাকে। মামা হাসলেন।

চিত্রা বললে, আমি কিন্তু ওর সঙ্গে দেখা হওয়াটা এক্সপেক্ট করেছিলুম স্যার। রাস্তায় ওর লাল স্যুটারটা দেখেছি—আর সেই নম্বর।"

—বেশ, ভালো করে আলাপ করো এবার। কিন্তু তুমি দাঁড়িয়ে কেন চিত্রা? বোসো।

বসবার আর দ্বিতীয় জায়গা নেই, বিছানায় শোভনের পাশেই চিত্রা অসংকোচে বসে পড়ল। সামান্য একটু সরে গেল শোভন।

চিত্রা বললে, আজকে তা হলে পড়া থাক স্যার, আপনাদের আর ডিস্টার্ব করবনা। আমি বরং আর একদিন—

এবার শোভনই দাঁড়িয়ে পড়ল।

—না মামা, আমিই যাব এবার।

চিত্রা কুণ্ঠিত হল : সে কি, আমি এসব বলে চলে যাচ্ছেন নাকি! না—না শোভনবাবু, আপনি বসুন। স্যারের ওপরে উপদ্রব তো আমরা সব সময়েই করি, আমিই না হয় পরে—

শোভন হাসল : না, সেজন্যে নয়। এখন সাতটা বাজে—একটু পরেই দোকানগুলো সব বন্ধ হয়ে যাবে। কয়েকটা কেনাকাটা আছে আমার। তারপরে আবার পাড়ি দিতে হবে ত্রিশ মাইল রাস্তা। আমি আসি—নমস্কার।

—থেকে গেলে পারতিস আজকে—আর

মামার অনুরোধ শোনা গেল।

—বলনুম তো তোমায়, কাল সকালে বিস্তর কাজ আছে হাতে! চলি—

শোভন বেরিয়ে এল।

আরো ঘণ্টা তিনেক পরে, লরী বাস, মোটরের পাশ কাটিয়ে চলতে চলতে, কখনো খোলা মাঠ, কখনো বা গাছপালার ঠাণ্ডা ছায়ার ভেতর দিয়ে চলতে চলতে বাগানের ওপর বড়ো কালো অতুল সেই মেয়েটি বার বার ভেসে উঠতে লাগল চোখের সামনে।

এক ছবি থেকে আর এক ছবি।

সেই আগ্রার গ্রাম। স্বদেশী এক বন্ধুর বিয়ে। শোভন 'বরিয়াত' গিয়েছিল।

বিয়ের আসরে এবেলা বাইজীর নাচ গান গ্রাম অঞ্চলে অপরিহার্য আভিজাত্য ও দেশে। মধ্যবয়সী সুদর্শন মেয়েটি আসরের মাঝখানে কী ভেবে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল শোভনের সামনে।

'আভিতক্ শাদী নেহি কিয়া বাবু সাহাব?'

'নেহি।'

অ্যাইসা খুবসুরত্ নৌজোয়ান হে আপ—কোই বহুবুবা নেহি আয়ী?'

লাল হয়ে উঠে শোভন বলেছিল, 'নেহি। আসরে হাসির রোল উঠেছিল।

'সচ্?'

'সচ্'—এতক্ষণে সপ্রতিভ হয়ে শোভন জবাব দিয়েছিল: 'আপ মিলা দেউঙ্গী?'

উত্তরে গান গেয়ে উঠেছিল বাইজী। তার মূল কথা হল: এতদিন কেন দেরী করলে মুসাফির? আমি তো তোমারি আশায় 'রাহপর' চেয়ে বসেছিলুম, তুমি এলে না—মাঝপথ থেকে এক দিওয়ানা এসে আমার দিল ভিক্ষে চেয়ে নিলে। এখন আর তোমায় কি দেব।

আবার অট্টহাসি ভেঙে পড়েছিল সভায়। আর শোভন বলেছিল, যখন দিয়েই ফেলেছ, তখন তো কিছু আর করবার নেই: আমি বরং আরো কারো জন্যেই অপেক্ষা করব। খাঁর ইন্তজার কর রহনা।

যায় ইন্তজার কর রহনা।

সে আসবে শোভন জানে না। চলতি ট্রাকের হাওয়ার আঁচলা এসে মুখে চোখে আছড়ে পড়তে লাগল, ইলেকট্রিকহীন অন্ধকার পথে বার বার মনে জেগে উঠতে লাগল কোথায় যেন পড়া উর্দু শায়েরের দুটি লাইন:

"মেরী জিন্দগী আজ মেঁ তড়প রহি থি কিসিকে
মেরী শাখ্ তুমনে আকর মেরী রাহ্ কর দী রোশন—"

অন্ধকারে আমার জীবন ভয়ে চমকে উঠছিল, কিন্তু আশার সঙ্গে সঙ্গে তুমি এসে পথ আলো করে দিলে।

॥ চার ॥

অম্বিনী হালদার ঠিকই বলেছিল, চিনে নিতে কষ্ট হল না।

বড়ো রাস্তা থেকে বাঁ দিকে যে পথটা বেরিয়ে গেছে, সেখান থেকে আরো আধ মাইল এগিয়ে ঘোষ পীঠি, সব শুদ্ধ মাইল তিনেকের বেশী নয়। দূর থেকেই রাইস মিল চোখে পড়ল। বাঁধানো অনেকটা জায়গা জুড়ে ধান শুকোচ্ছে—কাক আর চড়ুইয়ের মেলা বসেছে সেখানে। এক জায়গায় খালি লরী দাঁড়িয়ে আছে একটা। লম্বা টিনের শেডের মাথায় কালো চিমনি। আজ রবিবার বলে কাজ বন্ধ, চিমনির মুখ থেকে ধোঁয়া উঠছে না। গেটের উপরে বড়ো বড়ো শাদা হরফে পড়া যাচ্ছে: 'জয়তারা রাইস মিলস্।'

শোভন ভ্রূকুটি করল। জয়তারা! ক্রীশ্চান ঐশ্বর চাটুজ্জে রাইস মিলের এমন হিন্দু পৌরাণিক নাম রাখবেন! জায়গাটি ভুল হল নাকি? তাতো নয়—পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে প্রোপ্রাইটার এস্ চাটার্জি!

রাইস মিল তো পাওয়া গেল—বাড়ী কোন দিকে? রবিবারের বেলা এগারোটার চারদিকে শান্ত নির্জনতা। রাস্তার এ-পারে একটু দূরে একজন ক্ষেতের মধ্যে কী যেন কাজ করছে, ওকেই ডাকবে নাকি একবার?

তার আর দরকার হল না। কোথেকে গোল করে পাকানো বেতটা হাতে নিয়েই ছুটে এল অম্বিনী হালদার।

আসুন, আসুন—এদিকে-এদিকে—

রাইস মিলের পাশ দিয়ে—একটা ছোট জলা বাঁয়ে রেখে, একটু এগিয়ে বাড়ী। নতুন ধরণের পৌঁছিন দোতলা, সামনে বাগান, কতগুলো বোগেনভিলিয়ার রঙের

বাহার। গেট থেকে বারান্দা পর্যন্ত লাল সুরকির পথ। দারোয়ান দাঁড়িয়েছিল একজন—মস্ত সেলাম করে গেট খুলে দিলে।

অশ্বিনী বললেন, বাবু কোথায়?

—বসবার ঘরে।

—আমার সঙ্গে আসুন স্যার। এই এ দিকে। হাঁ—হ্যাঁ। মোটর বাইকটা এখানেই থাক। এই লাল গাছের নীচে।

স্যুটার রেখে বারান্দায় উঠল শোভন। চকচকে কালো মেজে থেকে—কালো কালো গোল থাম—যেন গ্রানিট পাথরে তৈরী। ঢুকতেই বারান্দার দেওয়ালে একখানা রঙিন ছবি চোখে পড়ল। খ্রীষ্ট দাঁড়িয়ে আছেন, মাথায় তাঁর জ্যোতির মুকুট। তাঁর পায়ের কাছে ভারতীয়, চীনা, নিগ্রো, রেড্ ইণ্ডিয়ান, আরব, ইয়োরোপীয়—সব জাতের মানুষ নতজানু হয়ে বসেছে—খ্রীষ্ট আশীর্বাদ করছেন হাত বাড়িয়ে। খ্রীধর চ্যাটার্জী যেন সজোরে ঘোষণা করছেন, এ এক নিষ্ঠাবান ক্রীশ্চানের বাড়ী।

ওর বাপের আমলে—সেই চটি আর চাদর পরা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মুখে কি রকম ছিল, এই বাড়ীর চেহারা? ভাবতে চেষ্টা করল শোভন।

বোধ হয় মিনিট দেড়েক সময় কেটেছিল বারান্দায় দাঁড়িয়ে এই কটা কথা ভাববার ভেতরে। এর মধ্যে ডান পাশের একটা ঘরের মোটা সবুজ পর্দাটা সরিয়ে অশ্বিনী ডাকলেন: আসুন স্যার—

শোভন ঘরে ঢুকল। আর ভিতান থেকে উঠে দাঁড়িয়ে একজন সুলকায় বৃদ্ধ হাত বাড়িয়ে দিলেন শোভনের দিকে: কাম—কাম—মাই ডিয়ার বয়, হাউ ডু ইউ ডু?

—হাউ ডু ইউ ডু?—প্রতিধ্বনি করে কয় মুহূর্ত পালা সাধ করতে হল শোভনকে। মনে মনে ভেবেছিল, পিতৃ বন্ধু যখন একটা প্রণাম তাঁকে করতে হবে তার। কিন্তু খ্রীধর চাটুজ্জে নিজেই সে-পাট মিটিয়ে দিলেন।

দাঁড়িয়ে কেন? বোসো-বোসো। বী কমফরটেবল্।

—থাক, ভদ্রলোক তা হলে বাংলা জানেন, বলতেও পারেন। আরো কিছুক্ষণ টানা ইংরেজী চালালে শোভনকে তোত্ত মিরীর উর্দুর আশ্রয় নিতে হত।

সামনের লোকটার ভদ্রলোকের মুখোমুখি বসল শোভন। একটি শহরে ড্রইং রুমে যা-যা থাকা দরকার সব আছে দামিং ওল্ডম্যান, অদ্ভুত চেহারার স্পঞ্জ, টিপয়ের ওপর পোর্সিলেনের ভাস পর্যন্ত রয়েছে আর তাতে লম্বা লম্বা ডোবাওলা পাতা মেলেছে কী একটা নিরীহ ক্যাকটাস।

দেওয়ালে খ্রীষ্ট ঠিক আছেন। ও-পাশের চওড়া জেমে বাঁধানো তেলরঙের বিরাট আর একখানি ছবি—একটি কালো শাঁওতাল মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে ফুলে ভরা গাছে হেলান দিয়ে, সামনে পাহাড়ী নদী, ওপারে দূরে পাথরে বসে বাঁশি বাজিয়ে চলেছে কে এক কিশোর। পুরো রোমান্টিক ছবি—খ্রীষ্টের পাশে যেন একান্ত বেমানান।

কিন্তু শোভন চমকালো অন্য কারণে। লাল রঙের সইটা জ্বল জ্বল করছে। এস, ব্যানার্জি। তার বাবার আঁকা ছবি।

খ্রীধর চাটুজ্জে কথা কইলেন।

—ডু ইয়ু স্মোক?

একটা সিগারেটের টিন এগিয়ে দিলেন সামনে। লজ্জা পেয়ে মাথা নাড়ল শোভন: না।

না কি হে? অভ্যেস থাকে তো নাও। ও সব বাজে সেন্টিমেন্ট আমার নেই। রেসপেক্টটা সম্পূর্ণ মনের জিনিস—ইট ইজ নট মাটার টু ডু ইউথ এ স্মোক। নাও—নাও—

চক্ষু লজ্জার কোন অর্থ হয় না আর। অগত্যা জবাব দিতে হল আমি ছুটো একটা সিগার—

—হাউস্ অলরাইট।—টিনটা সরিয়ে নিয়ে খ্রীধর বললেন, মানে কড়া জিনিষের ভক্ত। তা হলে সিগারেট তো তোমার ভালো লাগবে না। বী হ্যাপি উইথ হোয়াট ইউ হ্যাভ।

—এখন থাক।—শোভন এড়িয়ে গেল। খ্রীধর চ্যাটার্জী যতই সংস্কারমুক্ত হোক, একজন বুড়ো মানুষের মুখের সামনে আধ হাত লম্বা একটা চুরুট ধরিয়ে নিতে কেমন যেন বাধো বাধো ঠেকল তার।

খ্রীধর সিগারেট জ্বালালেন, ধোঁয়া ছাড়লেন এক মুখ। কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন শোভনের দিকে।

—ইউ রিমাইণ্ড মী সৈলেশ—ইন্ হিজ ইয়ুথ্। ভেরি মিল আছে চেহারায়।

ভ্রূকুটি ঘনিয়ে এল শোভনের কপালে। বাপের কথা শোনামাত্র তার মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ চমকায়, একটা কটু আহ্লাদে যেন মুখটা পর্যন্ত-বিস্বাদ হয়ে ওঠে। সেই সুন্দর করে সাজানো বাংলো বাড়ীটিতে—সেই হাতের ছোঁয়াচ লাগা বাগানে, দেওয়ালের ছবিগুলোর মধ্যে একজন আর্টিস্ট্‌কে দেখতে পাওয়া যায়—যে ইম্‌পার্সোনাল, তার কোনো ব্যক্তির, কোনো সামাজিক রূপ নেই; বইয়ের শেল্‌ফে ইংরেজী কবিতার দামী সংগ্রহগুলো সেই মনটার আরো বিস্তৃত উদার পরিচয় বহে আনে। কিন্তু এস, ব্যানার্জী শৈলেশ্বর কিংবা শৈলেশ হয়ে উঠলেই মা-র নিবিড় চোখ দুটোতে জল ছল ছল করে ওঠে, কর্সা পিঠের ওপর কালো কালো চাবুকের দাগ গুলো লিক লিক করে সাপের মতো, একটা ঝড়-বৃষ্টির সন্ধ্যাকে মনে পড়ে—হিংস্র মাতাল নিজের স্ত্রীকে বাড়ী থেকে বের করে দিচ্ছে।

শোভন জবাব দিল না। নিজের ঠোঁটটায় দাঁতের একটা চাপ পড়ল কেবল।

শ্রীধর বললেন, একটু চা খাওয়া যাক—কী বলো?

—চা?

—ইট্‌স্ ইলেভেন নাউ। আরো ঘণ্টা খানেক দেরী হবে ঘোষ হয় খেতে। তোমার অসুবিধে হবে? তুমি কি তাড়াতাড়ি খাও?

—আজ্ঞে না। বেলা একটা দেড়টার আগে—

—তা হলে এক পেয়ালা চা নিশ্চয় চলতে পারে এখন।—শ্রীধর গলা চড়িয়ে ডাকলেন; অশ্বিনী—অশ্বিনী—

অশ্বিনী হালদার কাছাকাছিই অপেক্ষা করছিলেন কোথাও। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে এসে পা দিলেন। শোভন অবাক হয়ে ভাবতে চেষ্টা করল, অশ্বিনী বাবু শ্রীধরের রাইশ মিলের ম্যানেজার, না তাঁর বেয়ারা।

—কি বলছেন স্যার?

—দু পেয়ালা চা দিতে বলো অ্যানীকে।

—আচ্ছা স্যার—দ্রুত অদৃশ্য হলেন অশ্বিনী।

অ্যানী! নামটা কানে ঠেকল। শ্রীধর একজন ক্রীশ্চান মহিলাকে বিয়ে করেছেন শুনেছিল, কিন্তু তাঁর নাম কি অ্যানী? আর তিনি কি তাঁকে অশ্বিনীকে দিয়ে ও-ভাবে ডাকিয়ে পাঠাতে পারেন? কে জানে।

—তোমার বিজ্‌নেস্ কেমন চলছে?—শ্রীধরের জিজ্ঞাসা।

—ভালোই। একটু বাড়াতে পারলে সুবিধে হত।

—বাড়াও। ওয়েল এ্যাণ্ড্ গুড্। বাট্ বিফোর দ্যাট, হোয়াই ডোন্-চু গো টু ইয়োরোপ?

—ইয়োরোপ?—শোভন চকিত হল।

সেই কথাই বলছি। শৈলেশকেও বলেছিলুম আমি। বলেছিলুম, এ-সব জিনিস যদি বড়ো করে পড়তেই হয়, তাহলে ইয়োরোপ থেকে ট্রেনিং নিয়ে আসা দরকার—মডার্ন পোল্‌ট্রি কিভাবে চলছে তার একটা হাতে কলমে অভিজ্ঞতা দরকার। শৈলেশ স্বীকার করেছিল। কিন্তু তখন ওর শরীরটা ভেঙে পড়েছে অ্যাণ্ড্ হি ওয়াজ ভেরি আলোন। ওর তখন স্বপ্ন ছিল, কিন্তু সাধ্য ছিল না।

শ্রীধর চুপ করলেন। গলার ভারী মোটা আওয়াজটা একটুখানি ভিজে ভিজে মনে হল, চোখের ওপর ছায়া ঘনিয়ে এল। মুকুন্দ বাবু আর বলাই দাস বলেছিলেন, শ্রীধর তার বাবার অনেকগুলো টাকা ঠকিয়ে নিয়েছেন, হয়তো নিয়েছেন, কিন্তু বন্ধুকে যে ভদ্রলোক ভালোও বাসতেন সে-কথা শোভনের কাছে গোপন রইল না।

শ্রীধর আবার তেমনি ভিজে গলায় বললেন, তুমি হয়তো জানোনা, শেষ জীবনে কী ভয়ানক অনুতাপ হয়েছিল শৈলেশের। ড্রিংক করা একেবারে ছেড়ে দিয়েছিল। হি ওয়াজ ভেরি অ্যাংশাস্ টু গেট ইউ অ্যাণ্ড্ ইয়োর মাদার ব্যাক—কিন্তু ওর সাহস ছিল না। তোমাদের ঠিকানাও ও পেয়েছিল—কে ওকে খবর দিয়েছিল সিসেস ব্যানার্জি আগ্রার একটা স্কুলে চাকরি করছেন। বছর চারেক আগে আমি যখন রিটায়ার করে গ্রামে আসি, তখন দেখছিলুম, কী যন্ত্রণায় ও রাতদিন জ্বলছে। আমি ওকে বলেছিলুম, চলে যাও আগ্রায়, নিয়ে এসো ওদের—বিলেত পাঠাও ছেলেকে, ট্রেনিং দিয়ে আনাও—লিভ্ এ নিউ লাইফ। কিন্তু সাহস পায়নি। বলেছিলুম, তোমার যদি নার্ভে না কুলোয়, আমি যাচ্ছি। জবাব দিয়েছিল, না—দরকার নেই। ইন্দ্রানীর সামনে আমি মুখ দেখাতে পারব না।

শ্রীধর থামলেন। মৃদু বিষণ্ণতা ছড়িয়ে গেল ঘরময়। বাইরে থেকে পাখিদের ডাক আসতে লাগল, জানলা দিয়ে

চোখে পড়তে লাগল ব্যাগানের ঘন সবুজের ভেতর এক মুঠো বোগেনভিলিয়ার উচ্ছ্বসিত রক্তিমা। রবিবারের শান্ত স্তব্ধতা এই ঘরটার চারার ভেতর করুণ হয়ে ঘনিয়ে রইল। আর শোভন যেন নতুন করে শুনল তার মায়ের নাম—ইন্দ্রাণী। চোখের সামনে সেই ছবিটা ফুটে উঠল—তার কিশোরী মায়ের কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে সেই দীর্ঘকায় উজ্জ্বল পুরুষ—তার বাপ শৈলেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

তারপরের অংশটুকু বিদ্বেষ আর বিতৃষ্ণায় কুটীল—এই মুহূর্তে শ্রীধর চাটুজ্জের আত্মমগ্ন গভীর গলার স্বরে সেই অধ্যায়টা পার হয়ে আর একজন মানুষকে দেখতে পেল শোভন। ক্লান্ত, অনুতপ্ত। নিঃসঙ্গ সীমাহীন দিন। নিজের আঁকা ছবির ভেতরই হয়তো মুক্তি খুঁজছে সে। পাচ্ছে কি?

শ্রীধর গলাটা পরিষ্কার করে একবার। বললেন, আমার মনে হয়, একবার তোমার ইউরোপে ঘুরে আসা উচিত। অবশ্যি এক্ষুনি নয়—চারদিকটা খানিক গুছিয়ে নাও, তারপর। বাইরের ট্রেনিং হলে—মডার্ন ইকুইপ্‌মেন্টস্ থাকলে সাধনা ভালোও হবে—পড়াতেও পারবে।

—আগে ভেবে দেখব।

শ্রীধর আবার চুপ করলেন, পুরু লেন্সের চশমার ভেতর দিয়ে চেয়ে রইলেন শোভনের দিকে। মিনিট খানেক নিঃশব্দে লক্ষ্য করলেন তাকে, তারপর বললেন, হ্যাঁ, ঠিক শৈলেশের চেহারা। ইন্ হিজ ইয়ার্লি ডেজ। তবে শৈলেশের কনপ্লেক্সশন ছিল র‍্যাদার ডার্ক—তুমি তোমার মা-র উজ্জ্বল রংটা পেয়েছ।

মা। শোভন সেন্টিমেন্টাল্ নয়, কিন্তু মার কথা মনে হলেই একটা কান্নার ঢেউ উঠে তার গলার কাছে কাঁপতে থাকে। তখন তার আর কাউকে ক্ষমা করতে ইচ্ছে হয় না, এমনকি পিতৃবন্ধু শ্রীধর চাটার্জির ওপরেও একটি তীক্ষ্ণ ঘৃণা এসে উছলে পড়ে। শোভন-চোখ ফিরিয়ে ঘরের কোণের ক্যাকটাসটার দিকে চেয়ে রইল।

চা এনেছি।

একটি শান্ত মেয়েলি গলার স্বর। শোভন দরজার দিকে তাকালো।

চায়ের ট্রে হাতে একটি মেয়ে। শ্যামবর্ণ লম্বা চেহারা। পরনে কালো পাড়ের শাদা শাড়ী, গায়ে শাদা ব্লাউজ,

To Furnish or Replenish

Physics, Chemistry, Physiology, Pharmacology & Psychology & Electronic Laboratories

Please contact specialists :

CONTINENTAL TRADING AGENCY

P-27, PRINCEP STREET, CALCUTTA-13

Branch Office :

Terdhi Bazar

Darbhanga

Phone :
Residence : 47-5116
Office : 23-3129

Gram :
CONAGENCY
Calcutta-13

হাতে দু গাছা করে সোনার চুড়ি।

ঈশ্বর বললেন, চা-টা এখানে রাখো অ্যানী, এই টেবিলে।

এই তা-হলে অ্যানী! এই কুড়ি একুশ বছরের মেয়েটি ঝিলেন চাটার্জি নয় নিশ্চয়ই।

অ্যানী ট্রে রেখে চলে যাচ্ছিল, রূঢ় গলায় ডাকলেন শ্রীধর।

—যাচ্ছ কোথায়? চা-টা তৈরি করে দিয়ে যাও।

শ্রীধরের এতক্ষণের স্নেহভরা মার্জিত কণ্ঠস্বরে কোথায় যেন বেসুরো বাজল। নিঃশব্দে টি-পট থেকে অ্যানী পেয়ালায় চা ঢালল। একবার চোখ তুলে প্রায় নিঃশব্দ গলায় শোভনকে জিজ্ঞেস করলে, ক'চামচ চিনি আপনার?

—দু চামচ হলেই যথেষ্ট। ধন্যবাদ।

মেয়েটির কালো কালো শীর্ণ আঙুলগুলো চামচে দিয়ে চা নেড়ে চলেছে—মৃদু শব্দ উঠছে টিন-টিন। শ্রীধর আবার ভ্রূকুটি করলেন।

—এতদিনেও ম্যানার্স শিখলে না অ্যানী। কতবার বলেছি, পেয়ালায় কখনো চামচের আওয়াজ করবে না। কিছুই কি তোমার মনে থাকে না?

লম্বা মেয়েটি ঝুঁকে পড়ে চা তৈরী করছিল তার মাথাটা যেন নুয়ে পড়ল আরো খানিকটা। শোভন লক্ষ্য করল তার চোখের পাতা দুটো অল্প অল্প করে কাঁপছে, একটুখানি রক্তের উচ্ছ্বাস ফুটে উঠেছে শ্যামলা গালের ওপর। বাইরের একজন অচেনা লোকের সামনে এখন এই শাসনটুকু না করলে কী ক্ষতি হত শ্রীধরের? শোভনের ভালো লাগল না।

চা দিয়ে অ্যানী বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করতেই শ্রীধর আবার ডাকলেন: রান্নার কত দেরী?

—বেশি দেরি নেই।

মোটা কবজীতে বড়ো গোল ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখলেন শ্রীধর। বললেন, এখন ঠিক সাড়ে এগারোটা। ঠিক সাড়ে বারোটার মধ্যে যেন রেডি হয়ে যায়, বুঝেছ?

—আচ্ছা।

শ্যামলা দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটি নিঃশব্দে পর্দা সরিয়ে চলে গেল আবার। শোভনের মনে হল, আশ্চর্য ছায়ার মতো চলা-ফেরা করে অ্যানী, ওর পায়ে কোন শব্দ হয় না।

—নাও হে, চা খাও। এই যে বিস্কিট।

—মাপ করবেন, বিস্কুটে দরকার নেই। শুধু চা হলেই চলবে।

দুজনেই চায়ে চুমুক দিলেন। শ্রীধর বললেন, কিহে, চা ঠিক আছে তো? মানে অ্যানীর ওপর ঠিক ডিপেন্ট করা যায় না তো—মেয়েটা এত ক্যাড্ যে—

—আজ্ঞে না, চা ঠিক আছে আমার।

কিন্তু মেয়েটা ক্যাড্ কেন? দেখতে রূপসী নয় বলে? তাছাড়া শোভনের তো এমন কিছু অস্বাভাবিক বোধ হল না। অ্যানীর কালো নিবিড় চোখ দুটো, তার গালে এক ঝলক রক্তের উচ্ছ্বাস ভেঙে পড়া, সব মিলে—

শোভন বললে, অ্যানী বুঝি আপনার কুক?

—কুক?—একটু যেন তাকালেন শ্রীধর: হ্যাঁ-না, মানে—হ্যাঁ, কুকই বলতে পারো। আসলে অরফ্যান, আমি আশ্রয় দিয়েছি। বাড়ীর সব ওই দেখাশোনা করে—আমি উইডোয়ার ইউ নো। আমার ছেলে ইণ্ডিয়ার এমব্যাসিতে চাকরি করে জাপানে। মেয়ে পাঞ্জাবে স্বামীর ঘর করছে। বুঝতেই পারো, বাড়ীঘর দেখাশোনার জন্যে কেউ না থাকলে—নাউ—অ্যাট্ দিস এজ—

—সে তো ঠিক কথা।

তারপর নানা গল্প চলল। চাকরি জীবনের কথা—যত জায়গায় ঘুরেছেন, যত এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে তার কথা। মাঝে মাঝে শৈলেন ব্যানার্জির আলোচনাও টেনে আনলেন। প্রথম জীবনে—কী বলে—একটু যাত্রা ছাড়িয়েই গিয়েছিল। কিন্তু আশা মেটেনি—শেষের দিকে ওর মনে কি যে অনুতাপ এসেছিল সে আমি জানি।

অনুতাপ এসেছিল হয়তো। নইলে সেই চিঠিখানা কেনই বা লিখলেন শোভনকে—কেনই বা সব সম্পত্তি লিখে দিয়ে যাবেন ওর নামে! কিন্তু মা—

সত্যিকারের আর্টিস্ট ছিল লোকটা। ইয়োর অবন ঠাকুর একবার ওর একখানা কাজ দেখে বলেছিলেন, এ ছেলেটি খাঁটি সোনা। জানো, ওর ভারী স্বপ্ন ছিল কিছুদিন গিয়ে প্যারিসে বাস করবে—ছবি আঁকা শিখবে

সেখানে। সেই পারি আর্টিসদের প্যারাডাইজ। কিন্তু কিছুই করে উঠতে পারল না। এক একটা মানুষ কী অভিশাপ নিয়ে জন্মায় সংসারে।

শ্রীধরের কাছে এসে অন্তত একটা লাভ হয়েছে—এই সব আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে শোভন ভাবছিল। যে জমাট অন্ধকার দিয়ে শৈলেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা কদাকার বিকৃত মূর্তি সে গড়ে নিয়েছিল, তার ওপর যেন একটুখানি আলো পড়েছে এসে। বাপের লেখা সেই চিঠিখানার কয়েকটা লাইন যেন তার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে: 'আমাকে তুমি শ্রদ্ধা কোরো না, করবার কোনো দরকার নেই। কিন্তু আমার দিক থেকে সত্যিই আমি প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। তোমার মা আমাকে ক্ষমা চাইবার সুযোগ না দিয়েই চলে গেছে, কিন্তু—'

দরজার পর্দা নিঃশব্দে সরে গেল। অ্যানী। সেই ছায়ার মতো মেয়েটি। চলবার সময় যার পায়ে এতটুকুও শব্দ হয় না।

—খাবার তৈরী।

ঘরের ক্লকটায় ঢং করে সাড়ে বারোটা বাজল।

—পাঁচ—

ফিরে আসতে প্রায় চারটে পেরিয়ে গেল। প্রায়ই আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তবে মুক্তি।

শ্রীধরের গল্প আর শেষ হয় না। শোভনকে দেখে তিনি যে কত খুসি হয়েছেন এবং বাপের চেহারার সঙ্গে তার কী যে আশ্চর্য মিল, বার বার বলেও তা ফুরোতে পারেন না তিনি। একটা ভালো পোল্ট্রি আর ডেয়ারী এক সঙ্গে চালাতে পারলে তা থেকে যে কী পরিমাণ লাভ হওয়া সম্ভব, তারও নিখুঁত হিসেব যেন তাঁর নখদর্পণে। এত জেনেও শ্রীধর পোল্ট্রি আর ডেয়ারী ফার্ম না করে কেন রাইস মিল করতে গেলেন, সেইটেই শোভন ভেবে পেল না।

খাওয়ার আয়োজন করেছিলেন প্রচুর। বিলিতী কেতার সুপ্ থেকে দিশী রীতির পায়েস পর্যন্ত কোনো আয়োজনে ত্রুটি ছিল না। মাঝে মাঝে এক আধটু সমালোচনা করছিলেন শ্রীধর, অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন অ্যানীর দিকে আর নির্বাকপ্রায় মেয়েটি নিঃশব্দে এগিয়ে দিচ্ছিল ডিশগুলো।

এক সময় শোভনেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটে যাচ্ছিল। একবার বলেই ফেলেছিল, রান্না তো খুব ভালো হয়েছে কাকাবাবু।

—তুমি তো ভালো বলবেই হে—ভদ্রতা তো আছেই একটা। আসলে সি ইজ গুড ফর নাথিং।

ফিরে আসতে শোভনের মনে হচ্ছিল অ্যানী সম্পর্কে কোথাও একটা বিশ্রী বিতৃষ্ণা আছে শ্রীধরের। মেয়েটাকে একেবারে সহ্য করতে পারেন না, তাই তার প্রত্যেকটা জিনিসের খুঁত ধরা তাঁর অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। এতই যদি অসহ্য হয়ে থাকে, বিদায় করে দিলেই তো পারেন। আশ্রয় যদি দিয়েইছেন, তা হলে প্রত্যেকদিন এইভাবে অপমান করা কেন!

কিন্তু এ-সব ভাবনা শোভনের নয়। শ্রীধর তাঁর সঙ্গীকে নিয়ে যা খুশি করুন, তাঁর 'কুক্'কে তিনি যত ইচ্ছে গঞ্জনা দিন, তা নিয়ে মিথ্যে মাথা ঘামানোর কোনো দরকার নেই তার। শুধু আসবার সময় চোখে পড়েছিল, সেউ কালো লম্বা থামটায় হেলান দিয়ে অ্যানী দাঁড়িয়ে। দুটো অন্যমনস্ক চোখ মেলে বোগেনভিলিয়ার রক্ত কুসুম পুঞ্জের ভেতর সে মগ্ন; হঠাৎ মনে হল, শ্রীধরের বসবার ঘরে তার বাবার আঁকা যে মস্ত বড়ো ছবিখানা রয়েছে, তার সাঁওতাল মেয়েটির সঙ্গে কোথায় যেন মিল আছে অ্যানীর।

গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন শ্রীধর, তারপর বড়ো রাস্তায় রাইস মিল পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে এলেন অশ্বিনী হালদার। সেই বিনীত চেহারা, হাতে সেই গোল করে পাকানো পুরোনো ছাতাটি।

স্কুটারে ওঠবার আগে হঠাৎ কি একটা কথা মনে এল শোভনের।

—আপনার খাওয়া দাওয়া হয়েছে তো অশ্বিনী বাবু?

অশ্বিনী হাসলেন: হ্যাঁ-হ্যাঁ, সে বলতে হবে না। খুব যত্ন করে খাইয়েছে অনীতা মা।

—অনীতা মা!—শোভন একটু আশ্চর্য হল অ্যানী!

—হ্যাঁ, ওর নামই অনীতা। সাহেব আবার ইংরেজি করে ডাকে। সত্যি বলছি আপনাকে, বাঙালী মেয়েকে অমন বেয়ারা নামে ডাকাডাকি করা আমার একদম পছন্দ হয় না। মেয়েটি ভালো। শান্ত মিষ্টি স্বভাব, হাতের রান্নাটিও খাসা।

শোভন বললে, রান্নার আপনি তারিফ করলেন, আমারও তো বেশ ভালোই লাগল। কিন্তু আমি দেখলুম কাকাবাবু তাঁর এই রাঁধুনিটির রান্না একেবারে পছন্দ করেন না। আমার মনে হয়, কলকাতা থেকে ওঁর বাবুর্চি আনিয়ে নেওয়া উচিত।

শেষের কথাটার জবাব দিলেন না অশ্বিনী, তার আগেই বললেন—কী বলছিলেন—রাঁধুনি? কে রাঁধুনি?

—কেন, আপনার ওই অনীতা, যাকে কাকাবাবু অ্যানী বলে ডাকেন।

অশ্বিনীর মুখের রঙ যেন বদলে গেল। কয়েক সেকেণ্ড চেয়ে রইলেন শোভনের মুখের দিকে।

—সাহেব বললেন আপনাকে? বললেন, অনীতা তাঁর রাঁধুনি?

অশ্বিনীর গলার আওয়াজে শোভন কৌতূহলী হয়ে উঠল।

—ঠিক রাঁধুনী বলেন নি—মানে ওঁর আশ্রিতা, বাড়ির কাজকর্ম করে—

—ও।

অশ্বিনী চুপ করে গেলেন। শোভন অনুভব করল, এই নিরীহ প্রত্নতত্ত্ব লোকটির চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল একবারের জন্য, যেন কিসের একটা ছায়া পড়ল তাঁর মুখের ওপর। ঠোঁট দুটো বার দুই কেঁপে উঠেই থমকে গেল, যেন কী একটা বলবার চেষ্টা করেই অশ্বিনী সামলে নিলেন নিজেকে।

শোভনও আর কথা বাড়ালো না। যার সম্পর্কে তার কোনো দায় নেই, তা নিয়ে কৌতূহল জানানো নিরর্থক। শুধু ছুটারে স্টার্ট দিয়ে একবার জিজ্ঞেস করলে, একটা কথা বলব, অশ্বিনী বাবু?

কপালে ভ্রূকুটি ঘনিয়ে এসে কী যেন ভাবছিলেন অশ্বিনী। চমকে বললেন, অ্যাঁ!

—কাকাবাবু তো ক্রীশ্চান! তাঁর রাইস মিলের নামটা এমন পৌত্তলিক কেন?

—ও—ওটা?—অশ্বিনী যেন অস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। ওঁর মায়ের নাম।

বাপের ধর্ম বিসর্জন দিয়েছেন তবু মাকে ভোলেননি—শ্রীধর চাটুজ্যে সম্পর্কে এই কথাটা ভাবতে ভাবতেই ফটার ছুটল?

অশ্বিনী পেছন থেকে চেঁচিয়ে বললেন, নমস্কার স্যার—

পরদিন সকালে চায়ের পাট মিটলে বাগানের মধ্যে পায়চারি করছিল শোভন। সামনের রাস্তা দিয়ে বাস আর গাড়ীর আনাগোনা, মাঠের ভিজে ভিজে হাওয়ার এর মধ্যেই মবিলের গন্ধ এসে মিশতে শুরু হয়েছে। তবু বাগানের ফুলগুলো তারই মধ্যে প্রতিযোগিতার চেষ্টা করছিল; এত বেলাতেও একটু একটু ঝরছিল শিউলির অঞ্জলি। শোভনের মাথার ভেতরে শ্রীধরের ওই কথাগুলোই ঘুরছিল: যাও না ইয়োরোপে, ট্রেনিং নিয়ে এসো—শিখে এসো হাতে কলমে—

ঠিক এই সময় গেটের সামনে ক্রীম রঙের ভারী একটা গাড়ী এসে থামল। হর্নের শব্দ উঠল দু'তিনটে।

কেউ এসেছে এবং তারই এখানে। কিন্তু এত বড়ো গাড়ী করে কে এল? শ্রীধর? তাঁর তো গাড়ী নেই, রাইস মিলের জন্যে একখানা লরী আছে কেবল।

সন্দেহের নিরসন হল পরক্ষণেই।

—শোভন—ওরে এই শোভন—

মামার গলা। এক লাফে শোভন বেরিয়ে এল, আর বেরিয়েই থমকে দাঁড়ালো।

শুধু মামা নয়, আরো দু-জন মেমেছেন গাড়ী থেকে। একজনের স্যুটপরা লম্বা চেহারা, মাথায় ধূসর চুল চিক চিক করছে। দেখবার সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পারল শোভন—দু'দিন আগে এঁরই অচল গাড়ী সে চালু করে দিয়েছিল; আর তাঁর পাশে যার হালকা নীল শাড়ীর আঁচল বাতাসে উড়ছে, তার শাদা বাঁ গালের ওপর একটা বড়ো কালো জড়ুল।

চিত্রা কুণ্ডু।

মামা বললেন কিরে, বোকার মতো চেয়ে রইলি যে?

দেখছিস না, দু-জন গেষ্ট পর্যন্ত সঙ্গে করে এনেছি ? যে—ভালো করে আপ্যায়ন-টাপ্যায়ন কর।

ঘোর ভেঙে শোভন সজাগ হয়ে উঠলো।

—আরে কী কাণ্ড! আসুন—আসুন নমস্কার। এসো মামা—

এগোতে এগোতে মামা বললেন, কি রকম চমকে দিলুম তো তোকে।

—তা চমকে দিয়েছ বইকি।—শোভন হাসল : শনিবারে যখন গেলুম একটা কথাও তো বললে না তখন। তা ছাড়া একেবারে ওঁদেরও সঙ্গে করে আনবে ভাবতেই পারিনি।

চিত্রা বললে খুব বিপদে পড়ে গেলেন তো ?

—একেবারে না বলি কী করে! বিনা নোটিশে পাড়াগাঁয়ে এসে পড়লেন, খালি কষ্টই পাবেন খানিকটা।

—দেখা যাক।

বাগানে ঢুকে সবাই থেমে দাঁড়ালেন। মিষ্টার কুণ্ডু, যিনি এতক্ষণ নীরবে মৃদু মৃদু হাসছিলেন, উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ফেললেন লাভ্‌লি!

চিত্রার কলোচ্ছাস শোনা গেল : চমৎকার। কি মিষ্টি আপনার বাগানটা শোভন বাবু।

খুশি হতে গিয়েও সম্পূর্ণ হতে পারল না শোভন। এই বাগানটার সঙ্গে আর একজনের স্মৃতি জড়ানো। মানুষটা আর্টিস্ট। কিন্তু শোভন বললে, ভেতরে বসবেন, চলুন।

চিত্রা আপত্তি করল কী হবে ভেতরে বসে ? এই তো গাছের ছায়া রয়েছে, বাঁধানো বেদী রয়েছে, চারদিকে ফুল রয়েছে। এইখানেই বসা যাক। বাবা কী বলো ?

মিষ্টার কুণ্ডু বললেন খুব ভালো আইডিয়া।

তিন জনেই বসে পড়লেন বেদীতে। মাথার ওপর গাছের ছায়া। হাওয়ায় পাতার শব্দ—হারায় ঝাফরি। বাগানের একটা নারকেল গাছের মাথায় হলুদ পাখি বাসা করেছে, সেখান থেকে 'বৌ কথা কও' ডাকছিল।

মামা বললেন, আঃ। মীর্জাপুরের মেস থেকে এখানে এলে যেন পুনর্জন্ম হয়।

—তবু তো ওই ঘর থেকে বেরুতে চাও না।—শোভন অতিথিদের দিকে তাকালে : আপনারা বসুন, আমি এখনি আসছি।

ভেতরে গিয়ে মনোহরকে চায়ের ফরমাস দিয়ে, মুরগী তৈরী করতে বলে শোভন যখন ফিরে এল, তখন তিনজনে মিলে ফুল সম্পর্কে উত্তেজিত তর্ক চলছে। মিষ্টার মিলিঠী ফুলের গুণাগুণ নিয়ে আলোচনার ফাঁকে চিত্রা বলছে, যাই বলো বাবা ওটি বাংলাদেশের ফুল রজনীগন্ধা—ওর সঙ্গে কারো তুলনা হয় না।

অধ্যাপক মামা মাথা নাড়লেন : উঁহু একটু ভুল হল। রজনীগন্ধাও বাংলা দেশের নিজের জিনিষ নয়—ওর আদি বাস পারস্যে। সেখানে ওর নাম নার্গিস।

—হোক নার্গিস। ও আমাদেরই হয়ে গেছে।

মৃদু হেসে শোভন সামনের ঘাসের ওপর বসে পড়ল।

চিত্রা বললে, ওকি—মাটিতে বসলেন কেন ?

—মাটি নয় ঘাস। আমরা পাড়াগাঁয়ের ছেলে ঘাসে বসার অভ্যেস আছে, ভালোও লাগে।

—আমাদেরও খারাপ লাগবে না।—চিত্রাও নেমে এল শোভনের কাছে।

—কী করবেন শাড়িটা নষ্ট হবে যে।

—আপনার ট্রাউজার যদি অক্ষত থাকে, আমার শাড়িরও কিছু হবে না। কী বলো বাবা ?

—ঠিক কথা—মিষ্টার কুণ্ডু মাথা নাড়লেন। ভদ্রলোকের একটা গুণ আছে, বেশী কথা বলতে পারেন না বলে প্রায়ই মেয়ের সঙ্গে একমত হন আর সেইটেকেই সব চাইতে নিরাপদ বলে মনে করেন। একবার ভাবলেন, নিচে মেয়ের কাছে গিয়েই বসবেন কিনা, কিন্তু ট্রাউজারের মায়ায় শেষ পর্যন্ত সেটা আর সম্ভব হল না।

আবার আলোচনা চলল, ফুল থেকে গার্ডেনিং, গার্ডেনিং থেকে রুচি, রুচি থেকে দিল্লীর বর্ষা। শোভন একটা ঘাসের শিষ ছিঁড়ে নিয়ে নিজের আঙুলে জড়াতে জড়াতে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। গমের ক্ষেতের ভেতর দিয়ে, ভাঙা মসজিদ আর পীরের দরগার পাশ দিয়ে সেই পথটা। রাত হলে দরগায় মিটমিটে চেরাগ, হাওয়ায় পুরোনো সমাধির ভাঙলার গন্ধ—দূর থেকে গ্রামের ঢোল করতালের সঙ্গে গানের আওয়াজ।

মনোহর এল।

—বাবু, চা দেওয়া হয়েছে।

চিত্রা বললে, চা এখানেই আসুক না।

—না, ভেতরেই চলুন। সামনে রাস্তা, সব সময় গাড়ী ছুটছে, ধুলো এসে পড়বে। আসুন।

সেই বসবার ঘর। দেওয়ালে এস. ব্যানার্জীর আঁকা ছবি।

মিষ্টার কুণ্ডু ঘরের চার দিকে ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলেন। বললেন, অনেক ছবি আছে তো!

চিত্রা বললে, আর ছবিগুলো কি সুন্দর—দেখছ বাবা? সামনের এটা তো ওয়াল্টেয়ার—তাই নয়?

—তাই তো মনে হচ্ছে। হাঁ, তাই বটে। ঈষ্ট পয়েন্ট থেকে আঁকা। ওই তো ডল্‌ফিন্‌স্ নোজ। চমৎকার হয়েছে। এপাশে দেখছি মহাবলীপুরম্। লাভ্‌লি! কার আঁকা?

শোভন মাথা নামালো—আবার একটা বিষাদ অনুভূতি জেগে উঠছে ঘরের ভেতর। সবার মুখেও ছায়া পড়ে একটুখানি।

—শোভনের বাবার আঁকা ও সব।

—খুব ভালো আঁকতেন তো?—চিত্রা শোভনের দিকে তাকালো: আপনিও আঁকতে পারেন নিশ্চয়।

শোভন জোর করে হাসতে চেষ্টা করল: না, ওসব আমার আসে না। নিন—চা খান। ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

চা চলল, গল্প চলল। কিন্তু এই ঘরে পা দিয়ে, শৈলেশ্বরের অত্যন্ত স্পষ্ট স্মৃতির ভেতরে এসে মামা কেমন গম্ভীর হয়ে যাচ্ছেন বার বার। ছাত্রীজীবনের সেই দুর্দিনটা মনে পড়ছে—শোভনের হাত ধরে দিদি এসে পৌঁছেছিল তার মেসে। বলেছিল, কোনো একটা আশ্রয় টাশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দে রজত। আমার যদি জায়গা নাই হয়, রেলেটা অন্তত আশ্রয় পাক একটু।

শোভন একবার মামার দিকে চেয়ে দেখল। সবার মনের ভেতরটা যেন খানিটা আন্দাজ করতে পারছিল সে।

—আজ বুঝি তোমার কলেজ ছুটি মামা?

মামা যেন কথা খুঁজে পেলেন।

—আরে তাইতেই তো প্রশ্নটা এল। শনিবারে তুই বেরিয়ে যাওয়ার পরে চিত্রাকে বলেছিলুম, সোমবার ছুটি আছে, একবার শোভনের ওখানে বেরিয়ে এলে হয়। দিব্যি জায়গা, খুব ভালো পোলট্রিও করেছে একটা। চিত্রা খুশি হয়ে বললে, চলুন, আমিও যাব—বাবাকে টেনে নেব সঙ্গে। বেশ বেড়ানো হবে।

চিত্রা ছুড়ে দিলে: আর শোভন বাবুকেও খুব বিব্রত করা হবে।

শোভন হাসল।

—কেউ মাঝে মাঝে বিব্রত করলে তো বাঁচি। একেবারে নির্বাসনে থাকতে হয়।

—বেশি লোভ দেখাবেন না। হানা দিয়ে অতিষ্ঠ করে তুলব।

—বেশ তো চেষ্টা করে দেখুন।

মিষ্টার কুণ্ডু হাসিমুখে বললেন, সেটা খুব অসম্ভব ব্যাপার হবে না। বিজ্‌নেসের কাজে এ-পথে প্রায়ই আমার যাওয়া আসা করতে হয়। কখনো কখনো বেড়াতেও যাই এই রাস্তায়। তাইতেই তো আপনার সঙ্গে সেদিন দেখা হয়ে গেল।

চিত্রা বললে, তুমি কিন্তু সেদিন ভারী অন্যায় করেছিলে বাবা।

সবাই চোখ তুললেন চিত্রার দিকে। বিব্রত হয়ে উঠলেন মিষ্টার কুণ্ডু।

—অন্যায়—মানে—আমি—

—অন্যায় ছাড়া কী! তোমার বিপদ দেখে শোভন বাবু গাড়ীটা ঠিক করে দিলেন—চিত্রা একবার আড়চোখে চাইল শোভনের দিকে: কিন্তু একটা শুকনো ধন্যবাদ দেওয়া ছাড়া তুমি আর কিছুই বললে না ওঁকে। ওঁর পরিচয় জানতে চাইলে না, আমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করলে না—

—কী আশ্চর্য, কোনো মানে হয় না—লাল হয়ে প্রতিবাদ করতে গেল শোভন।

—মানে হয় বইকি—লজ্জিতভাবে মাথা নাড়লেন মিষ্টার কুণ্ডু: নিশ্চয় অন্যায় হয়েছে। কিন্তু চিত্রা, ওটা তো তুমিও করতে পারতে। আমি বুড়ো মানুষ, আমার ভুল হতেই পারে, কিন্তু তুমি—

মামা বাধা দিয়ে বললেন, ঠিক আছে—ও নিয়ে আর দুঃখ করে তো লাভ নেই এখন। এর পরে নিমন্ত্রণের পালা দু পক্ষেই চলতে পারবে। চা খাওয়া হয়েছে তো

মিস্টার কুণ্ডু? এবার চলুন—শোভনের পোল্ট্রি দেখে আসা যাক।

চিত্রা খুশি হয়ে উঠে দাঁড়ালো। আরে তাই তো। ভুলেই গিয়েছিলুম যে আসল কথাটা। চলুন—চলুন—

সবাই এগোলেন পোল্ট্রির দিকে। মুকুন্দবাবু আর বলাইবাবুকে খবর দেওয়া হয়েছিল, আগে বাড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন তাঁরা। মামা কয়েকবার এসে গেছেন—দুজনেই তাঁর পায়ের ধুলো নিলেন।

—ভালো আছেন স্যার?

—চলছে একরম। আপনাদের সব কুশল তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার আশীর্বাদে।

মুকুন্দবাবুর সঙ্গে মামাও যখন পরম উৎসাহে ইনকুবেটর-তত্ত্ব বোঝাচ্ছেন মিস্টার কুণ্ডুকে, তখন একটা চুরুট টানবার জন্যে বেরিয়ে এল শোভন। হেনার ঝাড়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে সে চুরুট ধরালো, তারপর পুকুরটার দিকে চেয়ে রইল অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে। নীল জলে চাঁদের ঝাঁক ভাসছে, ঘাটটার আশে পাশে শ্যাওলার ভেতরে কয়েকটা মাছের ছায়া। একটা মাছরাঙা পুকুরের ঠিক মাঝখানে এসে খানিকক্ষণ যেন শূন্যে দাঁড়িয়ে রইল—দ্রুত বেগে প্রপেলারের মতো নড়তে লাগল পাখা, তার পরেই সোজা ছোঁ দিয়ে ছোট একটা উজ্জ্বল মাছ তুলে নিয়ে উড়ে বসল শিমুল গাছের ডালে। দুপুরে ডাকাতি বোধ হয় একেই বলে!

পাশ থেকে চিত্রা বললে, বাঃ—বেশ পালিয়ে এসেছেন তো?

চমকে চুরুটটা আড়াল করতে গিয়েও শোভন সামলে নিলে। দরকার ছিল না। চিত্রা একাই।

—এখানে মামা আমার অভিভাবক। তিনিই আপনাদের দেখাবার দায়িত্ব নিয়েছেন বলে ফরাসী ছুটি ভোগ করছিলুম একটুখানি। তা ছাড়া চুরুটের নেশাও ছিল—শোভন হাসল: কিন্তু আপনিও দেখছি পালিয়েছেন। মুরগী-তত্ত্ব ভালো লাগল না?

—ভালো লাগবে না কেন, খুব ইন্টারেস্টিং। কিন্তু এত বড়ো পুকুরটা দেখে তার চাইতেও ভালো লাগল। অনেকদিন সাঁতার কেটেছি ছেলেবেলায়, ইচ্ছে হল ঝাঁপিয়ে পড়ি জলে।

—পুকুরটা কিন্তু খুব গভীর।

চিত্রা হেসে বললে, আপনি একেবারেই সাঁতার জানেন না—না শোভনবাবু?

—কী করে বুঝলেন?

—তা হলে গভীর জলের ভয় দেখাতেন না। হাঁটু জলে কি কেউ সাঁতার কাটে?

চিত্রার দিকে একবার চেয়ে দেখল শোভন। সুন্দরী কি না বলা শক্ত, কিন্তু উজ্জ্বল ধারালো শরীর, হাতের পুষ্ট হাড়ে শক্তির চিহ্ন, পাঞ্জাবী মেয়েদের মনে করিয়ে দেয়। চুলের রঙ লালচে, চোখের তারা একটু কটা। কী গালে কালো বড়ো জড়ুলটা অনেক মুখের ভিড়ে ওকে আলাদা করে রেখেছে।

বড়োলোকের সুখী স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। বেশ আছে। অকারণেই শোভনের অ্যানীকে মনে পড়ল।

চিত্রা বললে, কী ভাবছেন?

—কিছু না। কিন্তু সত্যিই আপনি স্নান করবেন পুকুরে?

—না, এ যাত্রা নয়। বাবা রাগ করবে। তাছাড়া আপনার চাকর-বাকর কর্মচারীরাই বা কী ভাববে? ওটা তোলা রইল ভবিষ্যতের জন্যে। আর যদি আপত্তি না থাকে—আপনাকেও সাঁতার শিখিয়ে দিয়ে যাব।

—সত্যি শেখাবেন?

চিত্রার কটা চোখের তারা দুটো শোভনের মুখের ওপর স্থির হয়ে রইল একটুখানি। সত্যি শেখাব।

গলার স্বরটা যেন একটু অন্যরকম কানে ঠেকল। শোভনের মনে পড়ল, সেদিন রাত্রে কলকাতা থেকে ফেরবার সময় অন্ধকার পথে বার বার স্মৃতিতে ভেসে ওঠা সেই কথাটা: 'বহুবুবা? ম্যায় তো ইন্তজার কর্ রহা হুঁ।'

মামার গলার আওয়াজ কানে এল। ওঁরা এদিকেই এগিয়ে আসছেন।

— ছয় —

খাওয়া-দাওয়া হল, গল্পগুজব চলল, চিত্রা শোনালো। শোভনের গান জানা নেই, এক প্যাকেট তাস নিয়ে দু-একটা ছোট খাটো ম্যাজিকের খেলা দেখালো, খুশির রোল উঠল, মামা আর মিস্টার কুণ্ডু ব্যবসায় বিমুখ বাঙালী জাতির তীব্র সমালোচনা করলেন অনেকক্ষণ ধরে। তারপর বিকেলে ওঁরা চলে গেলেন।

খাওয়ার আগে সেদিনের প্রায়শ্চিত্ত করলেন মিস্টার কুণ্ডু। পরের রবিবার দুপুরে খাওয়ার নেমন্তন্ন করে গেলেন শোভনকে। বললেন, গাড়ীও পাঠিয়ে দিতে পারেন।

শোভন হাসল : ত্রিশ মাইল উজিয়ে গাড়ী পাঠানোর দরকার নেই। আমার স্কুটার আছে। তাছাড়া স্কুটার অচল হলে বাস-সার্ভিস তো আছেই।

চিত্রা বললেন, নিশ্চয় আসছেন কিন্তু।

মামা বললেন, হ্যাঁ—হ্যাঁ, নিশ্চয়। ওর হয়ে আমিই কথা দিচ্ছি।

গাড়ী চলে গেল। শোভন এসে বসে পড়ল বাগানের বেঞ্চীটায়। একটা আশ্চর্য দিন কাটল। এই সাতটা মাসের সঙ্গে—নিজেকে নিয়ে এই নিঃসঙ্গতায় কাটানোর একটানা একঘেয়েমির ভেতর হঠাৎ যেন খুশি বয়ে গেল। শোভন তারই মধ্যে মগ্ন হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ।

বেঞ্চীটার নীচে, একফালি ইলেকট্রিকের আলোয় চোখে পড়ল ছোট একটি রুমাল। মেয়েলি জিনিস, নিশ্চয় চিত্রার ব্যাগ থেকে পড়ে গেছে। শোভন তুলে নিলে রুমালটা, মিষ্টি গন্ধের একটা উচ্ছ্বাস এসে স্পর্শ করল তাকে।

"মেরী জিন্দগী আন্ধেরমে তড়প্‌ থা, লেকিন—"

রুমালটা ফিরিয়ে দিতে হবে রবিবার। কিংবা—কিংবা—চুরি করে রেখে দিলে কেমন হয়?

ছি—ছি, এসব কী ভাবছে সে! মাত্র তিনটি দিন দেখা হয়েছে চিত্রার সঙ্গে, এর মধ্যেই এমন একটা নেশা ঘনিয়ে আসছে কেন? বার বার করে মনে হচ্ছে সেই বাঈজীর কথা, কেন ওই উর্দু কবিতাটা অ-দেখা মৌমাছির মত একটানা গুনগুনিয়ে চলেছে কানের কাছে?

না—একেবারেই ভালো লক্ষণ নয়।

মামা টের পেলে কী ভাববেন? চিত্রার চোখের দিকেই কি তাকানো যাবে আর? মামার মাসী—বড়লোক ব্যবসায়ীর মেয়ে।

এ সব আবোল তাবোল খেয়ালী ভাবনার কী মানে হয়? শোভনের ভুরু কুঁচকে এল। এতক্ষণের রোমান্টিক্ আবেশটা হঠাৎ যেন কেটে গেল তার, নতুন করে মনে পড়ল, শৈলেশ্বরের সম্পত্তির দখল নিতে এসে কী বাধাই এসেছিল গ্রাম থেকে। দূর সম্পর্কের দু-ঘর জ্ঞাতি বলেছিলেন শোভন ব্যানার্জি জানে—শৈলেশ্বরের কোনো উত্তরাধিকারী নেই। মামলার উদ্যোগ আয়োজনও ওঁরা করেছিলেন, কিন্তু মামা ছিলেন, উকিল ছিল, শৈলেশ্বরের চিঠি ছিল, প্রাক্ত বেশি দূর গড়ায়নি। কিন্তু তিন চার মাস উৎপাতের আর অন্ত ছিল না। ঢিল পড়ত, দূর থেকে অশ্লীল গালি-গালাজ আসত, মুরগী হাঁস খেত, আগুন লাগাবার চেষ্টাও করেছিল একবার।

কিছুদিন ধরে সেটা থেমেছে, কিন্তু ভেতরের চাপা বিষটা এখনো যায়নি। শোভন কারুর সঙ্গে মেশে না, সব কিছু উপেক্ষা করবার জন্যেই ভেতরে শক্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু আজকে চিত্রারা চলে যাওয়ার পর হঠাৎ নিজেকে ভারী নিঃসঙ্গ মনে হল তার—যেন চার দিক ঘিরে ঘিরে সেই কুশ্রীতাগুলো আবার ঘনিয়ে আসতে লাগল।

গোল একটা আলো এসে পড়ল গেটের বাইরে থেকে, সাইকেল থামল কার যেন। শোভন ভুরু কুঁচকে তাকালো সেদিকে।

—আসতে পারি স্যার?

আলো অন্ধকারে আবছাভাবে মানুষটাকে দেখা গেল, চেনাও গেল গলার স্বর। অশ্বিনী হালদার।

—আসুন।

সাইকেল বাইরে রেখে অশ্বিনী ভেতরে ঢুকলেন।

—এত রাত্রে বিরক্ত করলুম নাকি স্যার?

—কিছু না কিছু না। কী খবর?

—দু-একটা কথা ছিল আপনার সঙ্গে

—ভেতরে আসুন।

বসবার ঘরে গিয়ে আলো জ্বালল শোভন। মনোহরকে ডেকে দু পেয়ালা চা আনতে বলে দিলে।

তেমনি জড়োসড়ো হয়ে বললেন অশ্বিনী। বললেন, ধোপদস্ত বস্ত্র অসময়ে এসে পড়েছি স্যার।

—না, না, মোটে সাড়ে আটটা বেজেছে।

—পাঁড়াগাঁয়ে তো ন'টার পরেই মাঝরাত্তির, তার ওপর এদিকে সিনেমা টিনেমাও নেই।—অশ্বিনী একটু চুপ করে রইলেন, দেওয়ালের দিকে চাইলেন, আবার এস ব্যানার্জির সেই দুঃসাহসিক স্টাডিটার দিকে চোখ পড়তেই মাথা নামিয়ে নিলেন। শোভন চুরুট ধরিয়ে নিলে।

—সেদিন বিস্তর খেয়ে এসেছিলুম আপনাদের ওখান থেকে। খুব যত্ন করেছিলেন কাকাবাবু।

অশ্বিনী হাসলেন। হাসিটা বিষাদ। হাতের গোল করা ছাতাটা অল্প অল্প ঠুকতে লাগলেন মেজেতে।

—বলুন, খবর কী?

জবাব দেবার আগে অশ্বিনী ইতস্তত: করলেন একটু। একবার খাঁকারি দিয়ে পরিষ্কার করে নিলেন গলাটা।

—কথাটা—কী বলে— একটু ইয়ে—মানে সেই জন্যেই এত রাত্রে আসতে হল।

কিছু টাকা চাইবেন খুব সম্ভব। এ অভিজ্ঞতা আগেও হয়েছে কয়েকবার। বিরক্তি বোধ হল, কৌতূহলও জাগল তার সঙ্গে।

—বলুন না, এত সংকোচে করছেন কেন?

অশ্বিনী গলা নামালেন: একটা চাকরি দিতে পারেন?

—চাকরি? কাকে?—শোভন আশ্চর্য হয়ে গেল: আপনি কি আর কাকাবাবুর ওখানে কাজ করবেন না?

—আমার নিজের জন্যে নয়।—অশ্বিনী আবার গলা পরিষ্কার করে নিলেন: মানে, এই ধরুন পঞ্চাশ ষাট টাকার একটা কাজ—একটি মেয়ের যাতে চলে যায়—

চকিতে একটা সন্দেহ সাড়া দিয়ে উঠল শোভনের মনে: কোন মেয়ের কথা বলছেন আপনি?

—অনীতা মা। সায়েব যাকে অ্যানী বলেন।

—অ্যানী!—শোভন ঠোঁট থেকে চুরুট নামিয়ে অ্যাসট্রের ওপর রাখল: কী চাকরি করবে সে? তা ছাড়া কাকাবাবুই বা ছাড়বেন কেন ওকে?

—না ছাড়লেও ছেড়ে আসতে হবে। মেয়েটার বাঁচা দরকার।

কথাটা তীরের মতো কানে এসে বিঁধল।

—কী বলছেন অশ্বিনীবাবু? ঠিক বুঝতে পারছি না।

অশ্বিনী আবার বিষাদে হাসি হাসলেন: সব কথা আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারব না। বলবার সাহসও আমার নেই। কিন্তু দিতে পারেন মেয়েটাকে একটা কাজ? কলকাতায় তো আপনার অনেক জানাশোনা আছে—ব্যবসা করেন—

—জানাশুনো আমার বিশেষ কারুর সঙ্গেই নেই। সেটা বরং কাকাবাবুরই বেশী থাকা উচিত।

—বললুম তো, ওঁকে দিয়ে ঠিক সুবিধে হবে না—অশ্বিনী আবার একটু চুপ করে রইলেন: দেখুন, আমার ছেলে মেয়ে নেই, অনীতা মা-কে আমি মেয়ের চাইতেও বেশি ভালোবাসি। আমি আপনার হাতে ধরে মিনতি করছি, দয়া করে ওর একটা ব্যবস্থা করে দিন আপনি।

যেমন অদ্ভুত, তেমনি অস্বস্তিকর অবস্থা।

বিপন্ন হয়ে শোভন বললে, লেখাপড়া কিছু না জানলে কোনো চাকরি বাকরি—

—একেবারে জানে না তা নয়। স্কুল ফাইনাল পর্যন্ত উঠেছিল। সেই সময় টাইফয়েড হয়ে আর পরীক্ষা দিতে পারেনি। তারপর তিন চার বছর ধরে যা পড়ত কিছুই মনে রাখতে পারত না। কাজেই বাধ্য হয়ে ওখানেই শেষ করতে হল। নইলে অনীতা মা লেখা-পড়ায় খারাপ ছিল না, স্কুলে বছর বছর প্রাইজ পেত।

শোভন ভুরু কোঁচকালো: আপনি তো দেখছি অনেক খবর রাখেন ওঁদের সম্পর্কে।

—জানবারই তো কথা স্যার। বিশ বছরের সম্পর্ক।

—বিশ বছর? যতদূর শুনেছি কাকাবাবু তো মাত্র বছর চারেক হল রিটায়ার করেছেন।

—চাকরির আমলে আমি ওঁর স্টেনো ছিলুম। যেখানে বদলি হতেন, আমাকেও নিয়ে যেতেন সঙ্গে করে। খুব ভালোবাসতেন আমাকে। ওঁর দু'বছর আগে আমি রিটায়ার করি—দেশে কিছু জমি জমা আছে, চাষবাস দেখছিলুম। উনি আমাকে ছাড়লেন না, চিঠি দিয়ে ডেকে এনে এখানে ম্যানেজার করে নিলেন।—অশ্বিনী যেন অনেকক্ষণের আটকে রাখা নিঃশ্বাস এক সঙ্গে ছেড়ে দিলেন: মাঝে মাঝে ভাবি, ছেড়ে দিয়ে

আবার সেদিন চলে যাই—কিন্তু—সত্যি বলতে কি জানেন, অনীতা যার জন্যেই আমার এত খারাপ লাগে। ওর যদি একটা গতি করতে পারতুম, তাহলে আর ভাবনা থাকত না আমার।

শোভন কিছুক্ষণ চেয়ে রইল অশ্বিনীর দিকে। তাহলে মেয়েটিকে সে যা ভেবেছিল তা নয়। সারা জীবন সরকারী চাকরি করেছেন, স্টেনো ছিলেন, সুতরাং লেখা-পড়া কিছু জানেন, অভিজ্ঞ বিচক্ষণ লোক। তার চাইতেও বড়ো কথা—অনীতা সম্পর্কে ওঁর আশ্চর্য মমতা। চাটার্জি সাহেব তাঁর কুকুটিকে খুব প্রীতির চোখে যে দেখেন না, সেটা সেদিনই সে লক্ষ্য করেছিল, কিন্তু এর ভেতরে আর একটা কথা এনেছেন অশ্বিনী হালদার: মেয়েটার বাঁচা দরকার!

চুরুটটা তুলে নিয়ে আবার আগুন ধরালো শোভন।

—অনীতা মেয়েই বটে।—এবার তার আসল কথা বলতে কি রকম বাধল: শুনেছি অনাথ মেয়ে। চাটার্জি সাহেব দয়া করে নাকি ওকে আশ্রয় দিয়েছেন।

—অনাথ মেয়েই বটে।—অশ্বিনীর চোখ হঠাৎ ধক্ করে জ্বলে উঠল: দয়া করেই আশ্রয় দিয়েছেন! কী বলব তার, অনেকদিন ধরে নিমকহারামি, নইলে—একবার থেমে গিয়েই নিজেকে সামলে নিলেন: যাক সে সব কথা।

আমি শুধু এই নিবেদনটুকু করতে এসেছিলুম যে নার্স-টার্সের চাকরিও যদি একটা জুটিয়ে দিতে পারেন, তা হলে বেঁচে যায় মেয়েটা।

কিছুক্ষণ ঘর নিস্তব্ধ রইল। রাত্রির ফাঁকা রাস্তা দিয়ে কড় তুলে লরী ছুটে গেল একটা, কুকুরের চিৎকার কানে আসতে লাগল দূরে কাছে, শোভনের বাগানে কোথায় প্যাঁচা ডাকল আর চারদিকে বেজে চলল ঝিঁ ঝির আওয়াজ।

শোভন বললে, আমি চেষ্টা করব। চেষ্টা করব যথাসাধ্য।

—অনেক ধন্যবাদ স্যার। মাঝে মাঝে খবর নেওয়ার জন্যে আপনাকে বিরক্ত করবো হয়তো—কিছু মনে করবেন না। মেয়েটার জন্যে সত্যি ভারী দুশ্চিন্তায় আছি—নইলে—অশ্বিনী তাঁর গোল করে পাকানো ছাতাটি হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন: আর একটা কথা বলব স্যার আপনাকে?

—বলুন না?

—আমি যে এ ব্যাপার নিয়ে আপনার কাছে এসেছিলুম আপনি যেন সেটা আর চ্যাটার্জি সাহেবকে—

—বুঝেছি, আর বলতে হবে না।

নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে গেলেন অশ্বিনী। বাইরে তাঁর সাইকেল চলে যাওয়ার আওয়াজ শোনা গেল।

—খাবার তৈরী হয়েছে—এক ঘণ্টা পরে এই খবরটা জানাতে এসে মনোহর শোভনের ধ্যান ভাঙালো। আর এতক্ষণ ধরে শোভন শুধু একভাবে তাকিয়ে ছিল সামনের ল্যাণ্ড্ স্কেপটার দিকে—যেখানে পাথরের ওপর আছড়ে পড়ে সমুদ্রের সাদা ফেনাগুলো লালে লাল, যেখানে হাওয়ায় নুয়ে পড়া তাল নারকেলের বনে একটা মত্ত ঝড়ের গতি, আর দূরের কালো জলের ওপর একটা আবছা জাহাজের ছায়ামূর্তি অনেকগুলো ম্লান আলোর চোখ মেলে নিস্তব্ধ।

কৌতূহল? না—অবচেতন মনের তাগিদ? শোভন ঠিক বুঝতে পারল না।

পরদিন বিকেলে খানিকটা বেড়াবার জন্যেই সে স্কুটার নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। খানিক পরেই তার খেয়াল হল, যখন সে বড় রাস্তা ছেড়ে অন্যদিকে বাঁক নিয়েছে, তারপর সোজা রওনা হয়েছে ঘোষ দীঘির পথে।

স্কুটার থামিয়ে শোভন দাঁড়িয়ে পড়ল।

বিকেলের মাঠ। দূরে কাছে চাষীরা কাজ করছে। পড়ন্ত রোদে নানা জাতের পোকা উড়ছে চারদিকে। গোরুর পিঠে শোয়ার হয়েছে ফিঙে, একটা জলার ধারে কয়েকটা খঞ্জন নাচানাচি করছে। শোভন নিজেকে জিজ্ঞেস করল, কেন সে চলেছে শ্রীধর চাটুজ্যের ওখানে? কী দরকার আছে তার?

দরকার বলতে গেলে কিছুই নেই, চ্যাটার্জি সাহেব অনুরোধ করেছিলেন তাকে—মাঝে মাঝে এসে যেন খবর নেয়। কিন্তু তিনদিনও হয়নি। তাহলে কি কাল রাত্রে অশ্বিনী হালদার—

ফিরে যাবে? কিন্তু এতদূর এসে ফিরে যাওয়ারই বা কী দরকার? একবার দেখাই যাক না।

শোভন এগিয়ে চলল। 'জয় তারা রাইস মিলে'র সামনে জন কয়েক লোক কী সব কাজ করছে, কিন্তু অশ্বিনী হালদার কিংবা চ্যাটার্জী সাহেব কাউকেই চোখে পড়ল না। হয়ত ভেতরে আছেন ওঁরা। একবার ঢুকবে নাকি মিলের ভেতর? নাঃ, থাক—বাড়ীতেই আগে খবর করে আসা যাক।

গেট খুলে দিয়ে দরোয়ান সেলাম করল। সঙ্গের সুটকেস, সেদিন স্বয়ং সাহেবের আপ্যায়ন, সব মিলিয়ে শোভন সম্পর্কে কিছু একটা বুঝে নিয়েছে। সসম্মানে বললে, যাইয়ে।

শোভন এগোল। বাগানে বোগেনভিলিয়া লালে লাল। বারান্দায় কালো সিমেন্টের থামটাকে ঘিরে আইভি। সামনে করুণাময় খ্রীষ্টের মূর্তি। ড্রয়িং রুমের সামনে সেই দোলানো পর্দা।

একটু আগেই কানে এসেছিল, এখন স্পষ্ট হল: বসবার ঘর থেকে বেহালার সুর আসছে। মনে হল, রেডিয়ো।

শোভন গলা চড়িয়ে ডাকল: কাকাবাবু।

বেহালাটা হঠাৎ থেমে গেল।

—কাকাবাবু আছেন?

একটা হালকা পায়ের আওয়াজ। পর্দা সরিয়ে দেখা দিলে শ্যামবর্ণা দীর্ঘদেহিনী মেয়েটি। পরনে সেই কালো পাড়ের সাদা শাড়ী, সাদা ব্লাউজ, শীর্ণ হাতে ক' গাছা কাচের চুড়ি। অনীতা।

শান্ত শ্যামল মুখে এক টুকরো লজ্জার হাসি ফুটল: নমস্কার।

—নমস্কার। কাকাবাবু নেই?

—না।

—মিলে আছেন?

—কলকাতায় গেছেন সকালে। কাল ফিরবেন।

—ওঃ, জানতুম না।—শোভন অপ্রতিভ হল: আচ্ছা, আমি চলি তা হলে।

—এসেই চলে যাবেন কেন?—অনীতা আবার সংকোচের হাসি হাসল: বসুন, চা খান।

শোভন দ্বিধা করতে লাগল: আমি বরং আজকে—

—আপনি চা না খেয়ে চলে গেলে আপনার কাকাবাবু রাগ করবেন আমার ওপর। আসুন।

এরপরে আর ফেরা যায় না। শোভন ভেতরে পা দিলে।

বেহালার রহস্যটা ধরা পড়ল ঘরে পা দিয়েই। একটা সোফার ওপর পড়ে আছে বাজনাটা। অনীতাই বাজাচ্ছিল।

অনীতা বললে, বসুন।

—তা না হয় বসছি। কিন্তু বেহালা আপনিই বাজাচ্ছিলেন বুঝি? বেশ হাত তো আপনার।

শ্যামল মুখের ওপর রঙের উচ্ছ্বাস ফুটল। অনীতা যেন আরো শীর্ণ হয়ে দেওয়ালের গায়ে লুকিয়ে যেতে চাইল: ও কিছু নয়, বাজাতে আমি জানি না, মাঝে মাঝে এক আধটু চেষ্টা করি কেবল। আপনি বসুন, আমি চা করে আনি।

—চায়ের জন্যে আমার তাড়া নেই—অশ্বিনীবাবুর সমস্ত কথাগুলো শোভনের মনের ওপর দিয়ে যেন ভেসে চলে গেল: আপনি যদি না বসেন, তা হলে আমি এখুনি বেরিয়ে যাব এখান থেকে।

অনীতার চোখে যেন আতঙ্কের ছায়া পড়ল একটা। মনে হল, কেউ তাকে এমন একটা জটিল সমস্যার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে যে কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। শোভনের সঙ্গে দৃষ্টি লাগাতেই সে মাথা নামাল, ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল অল্প অল্প।

শোভন হাসল: আপনি সত্যিই কি বসবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন? বেশ, আমি তা হলে যাচ্ছি।

—না-না, বসছি আমি।

তবু সোফায় বসল না, একটা বেতের টুল টেনে নিয়ে এমন জড়োসড়ো ভঙ্গিতে আসন নিলে যে তার দিকে তাকিয়ে শোভনের অনুকম্পা হতে লাগল।

—আপনি এত নার্ভাস হচ্ছেন কেন?—ইচ্ছে করেই প্রশ্নটা এগিয়ে দিলে শোভন, এই মেয়েটির মনের জড়তা জোর করেই ভেঙে দিতে চায় সে: আমি হঠাৎ এসে পড়াতে নিশ্চয় খুব বিরক্ত হয়েছেন—না?

—কী আশ্চর্য, ছি—ছি—অনীতার মুখে আবার রক্তের রঙ দেখা দিলে : বিরক্ত হবো কেন ?

—নইলে আমাকে দেখে এ ভাবে ছটফট করতেন না। মনে হচ্ছে যেন হঠাৎ বাঘের মুখে পড়ে গেছেন।

লজ্জার ভেতরেও অনীতা হেসে ফেলল। সুন্দর কয়েকটি দাঁতের ঝিলিক উঠল, হাসলে এই কালো কুরূপা মেয়েটিকে বেশ ভালো দেখায়। বাইরে যার কিছু নেই, ভেতরে তারও কোথাও ঐশ্বর্যের সঞ্চয় আছে খানিকটা।

অকারণেই শোভন প্রগলভ হয়ে উঠল। একটা নিষ্প্রাণ মূর্তিকে যেন জাগিয়ে তুলতে চাইছে সে, এই মেয়েটির নিঃসঙ্গ বেদনাকে একটুখানি লঘু করবার দায়িত্ব যেন কে তার মনের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। শোভন বললে, এই তো বেশ খুশি হয়ে হাসতে পারেন দেখছি। তা হলে যা করছিলেন, তাই করুন। মানে বেহালাটা আবার বাজান।

আবার শীর্ণ হয়ে গেল অনীতা।

—মাপ করবেন, বাজাতে আমি জানি না।

—বাজাতে আপনি ভালোই জানেন। নিন, বেহালাটা ধরুন।

—আজ না, আর একদিন শোনাবো।

—না, আজকেই। আর যদি না বাজান—শোভনের চোখ দুটি নিমেষে চক চক করে উঠল : তা হলে কাকাবাবু ফিরে এলে আমি এই বলে নালিশ করব যে আপনি আমার সঙ্গে ঝগড়া করেছেন।

—ঝগড়া ?—অনীতা আশ্চর্য হল : কই, ঝগড়া করিনি তো ?

—ঝগড়া হয়ে যাবে। বাজনা না শোনালেই।

অনীতা চুপ করে রইল। একটা নতুন, অপরিচিত অভিজ্ঞতা। জীবনে এমন করে কেউ জোর দেখায়নি তার কাছে, কেউ দাবি করেনি কোনোদিন। যে বিষাদ আর ভয়ের নিঃসঙ্গ জগতে তার বাস, সেখানে মধ্যে মধ্যে অশ্বিনী কাকা এসে এক আধপশলা স্নেহ বৃষ্টি করেন, কিন্তু—

ধীরে ধীরে বেহালাটা তুলে নিলে সে। আস্তে আস্তে বললে, আমি কী বাজনা শোনাব আপনাকে ! ভালো করে শিখতেও পারিনি। বাড়ীর কুকের কি এসব বিলাস শোভা পায় ?

হঠাৎ অকারণেই শোভন বলে ফেলল : মিথ্যে কথা। আপনি 'কুক্' নন।

কোথা থেকে কী ঘটে গেল তৎক্ষণাৎ। মড়ার মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেল অনীতার মুখের রঙ, হাত থেকে বেহালাটা আছড়ে পড়ল মেজেতে—এক ছুটে পালিয়ে গেল অনীতা।

মিনিটখানেক বসে রইল শোভন। বেহালাটা তুলল মেজে থেকে—ভাঙেনি। সোফার ওপর সেটাকে রেখে দিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। কোথায় একটা মারাত্মক অন্যায় হয়ে গেছে, তার এখনই এখান থেকে চলে যাওয়া দরকার।

বাগানের মধ্যেই সে স্কুটারে স্টার্ট দিলে, বেরিয়ে পড়ল দ্রুতগতিতে। অভ্যাসে গেট খুলে দিয়ে সেলাম করল দারোয়ান।

সেই সময় পেছন থেকে চ্যাটার্জি সাহেবের ছোকরা চাকরটা ডাক দিল : বাবু—বাবু—চা খেয়ে যান, দিদিমণি ডাকছে—শোভন শুনতে পেল না।

'জয় তারা রাইস্ মিল' পেরিয়ে যাওয়ার সময় আর একজনের ডাকও কানে গেল না তার। তিনি অশ্বিনী হালদার—স্কুটারের আওয়াজ শুনে মিলের অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। মিলের কম্পাউণ্ডে দাঁড়িয়ে অশ্বিনী দেখলেন গোধূলির লাল আলোয় লাল স্কুটারের দীর্ঘ আরোহীটি মাঠের ওপারে মিলিয়ে যাচ্ছে।

—সাত—

তিন চারটে দিন কাটল বিশ্রী একটা অস্বস্তির ভেতর।

মামার সঙ্গে চিত্রারা বেড়াতে এসেছিল এখানে—একটা ক্লান্ত অলস দুপুরকে যেন সুধার ভরে দিয়ে গেছে। চিত্রার ছোট সেই নীল রুমালটি তার ড্রয়ারে যত্ন করে রাখা রয়েছে, সমস্ত ড্রয়ারটাই একটা মিষ্টি মেয়েলি গন্ধে একাকার হয়ে আছে। একা বসে বসে ওই মেয়েটির কথা ভাবতে তার ভালো লাগে, 'অকারণেই উর্দু শায়রটা ভেসে ওঠে মনের ভেতর : "মেরে জিন্দগী আন্দরে মেঁ—"

কিন্তু সুর কেটে যায়। একটি লম্বা, কালো মেয়ে। শাদা শাড়ী, শাদা ব্লাউজ। চোখের পাতা দুটো যেন

ক্লান্তিতে ভারী হয়ে আছে সব সময়। নিজের চারিদিকে একটা ভয়ের আবরণ গড়ে নিয়ে তারই মধ্যে বাস করছে সে ; শোভন তাকে সেই আড়ালের ভেতর থেকে একটু খানি বের করে আনতে চেয়েছিল, কিন্তু—

কী একটা আছে কোথাও। অম্বিনী হালদার বলতে বলতেও থেমে যান। 'আপনি 'কুকু নন'—এই ছোট্ট কথাটা শোনবার সঙ্গে সঙ্গে অনীতার হাত থেকে বেকাবাটা আছড়ে পড়ে যায়। যেন সামনে মৃত্যুকে দেখেছে এমনি ভাবে ছুটে পালায়।

মনের ভেতর মেঘ জমতে থাকে আস্তে আস্তে।

অথচ, কেন তার এ সব ভাবনা! শ্রীধর চাটার্জি তার পিতৃবন্ধু, ডেকে পাঠিয়ে আলাপ করেছেন, খাইয়েছেন —এইটুকুই যথেষ্ট তার পক্ষে। তাঁর বাড়ীতে যে আশ্রিতা মেয়েটি রান্না করে, সংসার দেখে—তার জন্যে কী তার এমন মাথাব্যথা?

মাথা ব্যথা থাকত না, যদি না অম্বিনী হালদার সেদিন এসে মেয়েটির একটা চাকরির জন্যে তার কাছে তদ্বির করে না যেতেন।

ওই ভদ্রলোকের ওপরেই এখন তার বিশ্রী একটা রাগ হতে লাগল। কোনো দরকার ছিল না, খামোকা এসে তার মনের শান্তি নষ্ট করে দিলেন ভদ্রলোক। আশ্চর্য উৎপাত যা হোক!

আর সেই যে অম্বিনীবাবু গেছেন, এর ভেতরে তাঁর আর দেখা নেই। অনীতার চাকরী সম্পর্কে খোঁজখবর নেবেন বলেও ছিলেন, চারদিনের মধ্যে সে খবর নেওয়ার তাঁর আর দরকার পড়ল না। কথাটা মনে হতে শোভন নিজেই লজ্জা পেল। বলবার সঙ্গে সঙ্গেই তিন চারটে দিনের ভেতরেই যে কেউ কাউকে আজকাল চাকরি করে দিতে পারে না, অম্বিনীবাবুর মতো একজন বিচক্ষণ লোক অন্তত সেটা জানেন!

সকালে শৈলঘরের শেলফ্ থেকে একটা ইংরেজী উপন্যাস নামিয়ে এনে শোভন পড়তে চেষ্টা করছিল, আর এইসব এলোমেলো ভাবনায় বারে বারে মনোযোগ ছিঁড়ে যাচ্ছিল তার। এমন সময় মুকুন্দবাবু এলেন।

বই নামিয়ে রেখে শোভন বললে, এই যে কী খবর?

মুকুন্দ মাইতিকে খানিকটা উত্তেজিত মনে হল। পার্চমেন্টের মতো একখানা মোটা লম্বা সাইজের পুরোনো কাগজ তিনি এগিয়ে দিলেন শোভনের দিকে অফিসের পুরোনো কাগজপত্রের ভেতর হঠাৎ পেয়ে গেছি স্যার। দেখুন।

—কী এ?

মুকুন্দবাবুর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করতে লাগল। ধরা গলায় বললেন, একবার চোখ বুলিয়েই দেখুন তাহলেই বুঝতে পারবেন।

শোভন কাগজটা খুলল। হাত চিঠি।

কিন্তু তলার সইটাই চোখ পড়তেই সে উঠে বসল সোজা হয়ে। পরিষ্কার পাকা হাতে নিজের পুরো নাম স্বাক্ষর করা হয়েছে, শ্রীধর চ্যাটার্জী। তারও নীচে লেখা আছে : প্রোপ্রাইটার, জয়তারা রাইসমিল পোস্ট অ্যাণ্ড ভিলেজ ঘোষদীঘি।

বক্তব্য পরিষ্কার। অমুক ঠিকানার, অমুক পোলট্রির মালিক শ্রীশৈলেশ্বর ব্যানার্জির কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা ধার নিচ্ছেন তিনি। সুদের পরিমাণ এত পার্সেন্ট

শোভন চমকে উঠল।

—কাকাবাবু ধার নিয়েছিলেন বাবার কাছ থেকে?

মুকুন্দ বললেন, টাকা অনেক নিয়েছেন সে আমরা জানি। সেদিন সে কথা বলেওছিলুম আপনাকে। কিন্তু কর্তা যে, রসিদ নিয়েছেন শেষ পর্যন্ত তা আমরা কেউ জানতুম না। কতগুলো পুরোনো ধুলোভরা ফাইল ফেলেই দিতে যাচ্ছিলুম, হঠাৎ তার ভেতরে এটা পেয়ে গেলুম।

শোভন চুপ করে রইল।

মুকুন্দ বলে চললেন, কর্তা পয়সার দিকে কখনো ফিরেও চাননি। কিন্তু শেষ জীবনে যখন মতিগতিটা একটু—একবার থেমে গিয়ে আবার বলতে লাগলেন : মানে, অনেকটা সাবধানে হয়ে গিয়েছিলেন। বন্ধুটিকেও চিনে নিয়ে ছিলেন আশা করি। তাই রসিদ না নিয়ে আর টাকা দেননি। কিন্তু ভুলো মানুষ, আয়রণ সেফে তুলে রাখার কথাটাই আর মনে ছিল না।

—হুঁ।

মুকুন্দ উৎসাহিত হয়ে বললেন, খুঁজে দেখতে হবে ভালো করে, আরো কাগজপত্র কিছু যদি পাওয়া যায়—একটা অভিজ্ঞ হাসির রেখা ফুটে উঠলো ঠোঁটে, অত আদর করে নেমন্তন্ন করবার মানে বুঝতে পারছেন এবার।

শোভন জবাব দিল না। ইঙ্গিতটা তার খারাপ লাগল।

মুকুন্দ বাবু জিজ্ঞেস করলেন, কী করবেন স্যার?

—দেখি।

—টাকাটা আদায় করতে হলে একটু তাড়াতাড়িই স্টেপ নেওয়া দরকার। তারিখ দেখছেন তো? তামাদি হয়ে যাবে এরপর, তখন আর কিছুই করা যাবে না।

—নালিশ করতে হবে বলছেন?—ক্লান্ত স্বরে প্রশ্ন করল শোভন।

—টাকা না দিলে তো করতেই হবে। তার আগে চিঠি দিন।

—কিন্তু বাবার বন্ধু, আমাকে একটা স্নেহ করেন—

—পাঁচ হাজার টাকা ছেড়ে দেবেন নাকি? মুকুন্দবাবু তীক্ষ্ণভাবে বললেন, ফার্মের অবস্থা তো নিজেও জানেন এমনি এক রকম চলে যাচ্ছে, কিন্তু ক্যাপিটাল বলতে ব্যাঙ্কে বিশেষ কিছুই নেই। ভগবান না করুন—হঠাৎ যদি কোনো রকম একটা ধাক্কা আসে, তখন সামলে নেওয়াই শক্ত হবে। ইন্টারেস্ট নিতে না চান—না-ই নিলেন, কিন্তু এতগুলো টাকা নিশ্চয় এভাবে খয়রাত করা যায় না।

—তা যায় না। তবু কাকাবাবুর সঙ্গে—

—কিছু মনে করবেন না স্যার—মুকুন্দবাবুর গলা আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল: চ্যাটার্জি সাহেবকে আপনার চাইতে আমরা বেশি চিনি। কর্তার কাজ থেকে পনেরো ষোল বছরে উনি যত টাকা নিয়েছেন, তার সবটা যদি উশুল করা যেত, তা হলে ওই জয়ন্তারা রাইস মিল্ নীলেমে উঠত।

—উনি যে আগেকার টাকাগুলো শোধ করেন নি, সে আপনি নিশ্চয় ভাবে জানেন?

মুকুন্দের মুখে কঠিন হাসি ফুটে উঠল একটা: জানিনে, কিন্তু ওঁকে তো চিনি। ওই একটা গুণ আছে ওঁর, হাত চিৎ করতেই জানেন, উপুড় করাটা কখনো শিখলেন না। যাই হোক, এ টাকাটা আদায় করতে হবে। অবশ্য ওঁর খারাপ নয়, একটা রাইস মিল চালাচ্ছেন, ব্যাঙ্কে চালে আছেন, পাঁচ হাজার টাকা কট করে ফেলে দেওয়া ওঁর পক্ষে কিছুই শক্ত হবে না, আমরাও বেঁচে যাব।

—আচ্ছা ভেবে দেখি।

মুকুন্দবাবু উঠলেন। পুরোনো কর্মচারী, শৈলেশ্বরের আমলের মানুষ—বলতে গেলে পোস্টটা তাঁরই হাতে গড়া। কিছুক্ষণ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন শোভনের দিকে তারপর বললেন, কাগজটা যত্ন করে তুলে রাখুন, হারাবেন না।

না-না।

মুকুন্দ চলে গেলে আবার একরাশ তিক্ত বিরক্তির উচ্ছ্বাস এসে মাথার মধ্যে ভেঙে পড়ল শোভনের। এ আর এক নতুন উপদ্রব দেখা দিল। এই ছাণ্ডনোট-টা। এতদিন চোখের আড়ালে ছিল, আরো অনন্তকাল থাকতে পারত, তারপর একদিন একবারেই লুপ্ত হয়ে যেতে পারত। এই পাঁচ হাজার টাকার অস্তিত্বের সংবাদ না জেনেও তার পোস্টটি চলছিল, চলতও। কিন্তু এখন কি টাকাটা ছাড়া যায়!

কেন ছাড়া যায় না! তার বাবা বন্ধুকে বহু টাকা ধার দিয়েছেন, আর ফিরে পাননি, ফিরেও চাননি খুব সম্ভব। তা হলে মিথ্যেই সে কেন একটা অপ্রীতির কুয়াশা আর হাহাকারকে খুলিয়ে তুলবে? কী দরকার?

দরকার বোধ হয় একটু আছে। শেষ জীবনে বাবার নিশ্চয়ই কোথাও খটকা লেগেছিল, নইলে বন্ধুর কাছ থেকে এই ছাণ্ডনোট তিনি কেন নিলেন? টাকাটা নিশ্চয়ই ফেরৎ পেতে চেয়েছিলেন তিনি। সারা জীবনের উচ্ছৃঙ্খল বে-হিসেবী এস ব্যানার্জি শেষ জীবনে যখন আত্মস্থ আর অনুতপ্ত হয়ে উঠেছিলেন, তখন আরো অনেক ভুলের মতো এ-ও তিনি সংশোধন করে নিতে চেয়েছিলেন। শোভন কেন টাকাটা ছেড়ে দেবে।

হঠাৎ মনে পড়ল, সেদিন আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে গোটা কয়েক কথা।

শ্রীধর যেন নিতান্ত আলগা ভাবেই প্রশ্ন করেছিলেন : সব ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছ তো ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, মোটামুটি।

ডেবিট ক্রেডিট্ সমস্তই ?

'খাতা-পত্রে যতটা পেয়েছি।'

'কোনো আউটষ্ট্যাণ্ডিং দেনদার কিংবা পাওনাদার—'

'আজ্ঞে না, সে রকম কিছু বিশেষ চোখে পড়েনি।'

খুব ভালো কথা—'ওই ভাবে প্রসঙ্গটা থামিয়ে দিয়েছিলেন শ্রীধর।

এখন যেন ব্যাপারটার অর্থ বোঝা যাচ্ছে। খুব সম্ভব ওই পাঁচ হাজার টাকার ব্যাপারটাই ঝালিয়ে নিতে চেয়েছিলেন একটু। বুঝতে চেয়েছিলেন, ব্যাপারটা শোভনের আদৌ জানা আছে কিনা।

বিরক্তায়, বিরক্তিতে সমস্ত ঘর কালো হয়ে উঠল শোভনের। এ এক বিশ্রী ঝঞ্ঝাটে পড়া গেল যা হোক। সে যদি টাকাটা ছেড়েও দিতে চায়, মুকুন্দবাবু ছাড়বেন না। এই পোলট্রির তিনি কর্মচারী কিন্তু সব জিনিসটা তাঁর নিজের হাতে তৈরী, শোনা যায়, দিল্লী বা বোম্বাই কোথায় একটা ফার্মে তিনি চাকরি করতেন আগে, আর শৈলেশ্বরকে আইডিয়া তিনি দিয়েছিলেন। পোলট্রির সঙ্গে তাঁর অসীম মমতার সম্পর্ক—একটা হাঁস কিংবা মুরগী মরে গেলেও তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ে। তিনি কিছুতেই ছাড়বেন না। আর যদি না ছাড়েন, তাঁকে বারণ করবার শক্তি শোভনের নেই। স্বয়ং শৈলেশ্বরও যে কোনোদিন তাঁকে বাধা দেননি, এ খবরটাও শোভনের অজানা নয়।

আর তা ছাড়া শ্রীধরকে মুকুন্দ বাবু, বলাই বাবু, কেউই যে দু চক্ষে দেখতে পারেন না, প্রথম দিনেই তো সে তা বুঝতে পেরেছিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলে ক্রীশ্চান ফিরিঙ্গির মেয়ে বিয়ে করে ক্রীশ্চান হয়েছেন—মনের দিক থেকে এটাকেই প্রথমে মেনে নেওয়া শক্ত, বামুনের ছেলে মুরগীর ব্যবসা করলে এখন আর কেউ নাকে সিঁটকোয় না, ব্যাপারটা গা-সওয়া হয়ে গেছে ; অসবর্ণ বিয়েতে গা জ্বালা করলেও শেষ পর্যন্ত মেনে নেওয়া চলে ; কিন্তু শ্রীধর চ্যাটার্জির সবটাই বিজাতীয়। বিশেষ করে গাঁয়ের ভেতর সাহেবী করা, আর টাকা পয়সা সংক্রান্ত অখ্যাতি সব মিলে এখন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে তাঁকে জব্দ করবার সুযোগ পেলে কেউই তা ছাড়তে রাজী নয়।

তার মানে, সোজাসুজি টাকাটা চাইতে হবে এখন। আর না গেলে মামলা।

ইচ্ছে করতে লাগল, সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে পালায় এখান থেকে। এর চাইতে তার আগ্রোই ভালো। সেই সাইকেল আর মোটর পার্টসের ব্যবসা। কী হবে বাংলা দেশের এই নোংরা আবহাওয়ার মধ্যে কলে কাটিয়ে ? সে পালাবে।

কিন্তু চিত্রা। আর ওই অনীতা মেয়েটিকে ঘিরে ঘিরে একটা কৌতূহলের আবরণ। এত সহজেই কি পালানো যাবে এখান থেকে ?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হ্যাণ্ডনোটটা সে ড্রয়ারে ভরে ফেলল।

প্রায় তিন সপ্তাহ কাটল তার পরে।

এর মধ্যে না অশ্বিনী হালদার, না শ্রীধর চ্যাটার্জির দিক থেকে কোনো খবর।

চ্যাটার্জি সাহেব নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারেন, সেটা এমন কিছু অসম্ভব ঘটনা নয়। কিন্তু অশ্বিনী কেন আর আসছেন না ? অনীতার একটা চাকরি বাকরি জুটিয়ে দেবার জন্যে এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, অথচ কুড়ি দিনের মধ্যেও তাঁর আর দেখাই নেই !

আশ্চর্য তো !

একটা কথা থেকে থেকে মনে হয়। সেদিন বিকেলে হঠাৎ তার ঘোষদীঘিতে যাওয়া, অনীতার সঙ্গে দেখা হওয়া, সেই বেহালা বাজানো শুনতে চাওয়ার পরেকার একটা অপ্রত্যাশিত অবস্থা, অনীতার পালানো, তার চলে আসা। সব মিলে একটা যোগসূত্র তৈরী হয়েছে কোনোখানে।

আর তাই-ই সম্ভব।

অনীতার চাকরির জন্যে কি উপযাচক হয়ে এসেছিলেন অশ্বিনী, না—অনীতাই পাঠিয়েছিল তাঁকে ? আর সেই একটি কথা :

'মিথ্যে, আপনি লুকুন—সেইটেই কি সমস্ত গণ্ড-

গোলের কারণ, আর অনীতা কি অশ্বিনীকে বারণ করে দিয়েছে তার কাছে আসতে? বোঝা যাচ্ছে না।

অথচ, অশ্বিনীর সঙ্গে এর মধ্যে তার যে একেবারে দেখা হয়নি, তাও নয়। একদিন বাসে চেপে কোথায় চলেছিলেন, হাত তুলে অভিবাদন জানিয়ে গেলেন। আর একদিন স্টীমারে যেতে যেতে চোখে পড়েছিল, পথের ধারে একজন চাষীর ঝাঁকা নামিয়ে অশ্বিনী ঝুমড়োর দর করছেন।

স্টীমারের আওয়াজে চোখ তুলে তাকিয়ে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'ভালো তো?'

গাড়ীর স্পীড্ থামিয়ে ফেলে ছিল শোভন, ডেকেছিল, আলাপ করবে। কিন্তু ততক্ষণে আবার মাথা নামিয়ে অশ্বিনী ঝুমড়ো পরীক্ষা করছেন। সুতরাং আর দাঁড়ানো চলল না—শোভন এগিয়ে গেল।

সেই রাত্রেই অকারণেই অন্তরঙ্গ হয়ে এসেছিলেন, আবার তার পরেই নিরাসক্তিতে ডুবে গেছেন। অদ্ভুত এই বাংলা দেশের লোক। এদের যত বেশি করে দেখছে, ততই বিস্ময়ে মন ভরে উঠছে তার।

অনেক দিন অন্যমনস্ক ভাবে চলতে চলতে দেখেছে, তার ইচ্ছের বিরুদ্ধেই যেন সাইকেলটা বাঁক নিচ্ছে ঘোষ দীঘির দিকে। দুরন্ত প্রলোভনের উচ্ছ্বাস উঠেছে মনে। চোখের সামনে ফুটেছে সেই বাগানটা—যেখানে বোগেন ভিলিয়া আবীরের মতো লালে লাল। সেই বাড়ীটা—খ্রীষ্টের ছবি, তার বাবার হাতে আঁকা ল্যাণ্ডস্কেপ, একটি সাদা শাড়ী আর সাদা ব্লাউজ পরা রোগা লম্বা মেয়ে—পড়ন্ত বিকেলের আলোয় একা বসে বেহালা বাজাচ্ছিল। বাংলা দেশের গ্রাম—বাঙালীর বাড়ী, অথচ সমস্তটা মিলিয়ে যেন একটা বিদেশী কবিতার মতো। চেনা অচেনার মাঝখানে একটা অপরূপ রোমাঞ্চ, সমস্ত অনুভূতিতে অস্পষ্ট সুরের ঝঙ্কার।

তবু যাওয়া চলেনি।

না যাওয়ার আরো কারণ আছে।

দিনকয়েক আগেও মুকুন্দবাবু জিজ্ঞেস করেছেন: ছাওনোটটার কথা ভাবলেন কিছু!

—না, মানে, এখনো—

মুকুন্দবাবুর চোখের দৃষ্টি শীতল হয়ে এসেছিল; তারিখটা লক্ষ্য করে দেখেছেন তো ভালো করে? বেশী দেরী হলে তামাদি হয়ে যাবে—মনে আছে তো সে কথা?

—মনে আছে আমার।

মুকুন্দবাবু চলে গেছেন, কিন্তু খুসি হয়ে যান নি। তিনি ছাড়বেন না। চ্যাটার্জি সাহেব সম্পর্কে অনেক দিনের অনেক জমা জমে আছে মনের মধ্যে, সুযোগ একবার হাতে যখন এসেছে, কিছুতেই ফসকে যেতে দেবেন না।

শোভন ভাবে, ছাওনোটটাকে ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলে, কিংবা দেশলাই জেলে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। কিন্তু সাহসে কুলোয় না তার। আরো সন্দেহ হয়েছে, টাকাটার কথা আর গোপন নেই এখন। মুকুন্দবাবু যখন কাগজটা পেয়েছেন তখন বলাই বাবুরও অজানা নেই; আর বলাই বাবুর জানার মানেই হল, এতদিনে লোকের মুখে মুখে কথাটা শ্রীধর চ্যাটার্জির কানেও গিয়ে উঠেছে। কারণ বলাই বাবু কথা বলতে ভালোবাসেন—একটু বেশি পরিমাণেই ভালোবাসেন।

তা হলে এই জন্যেই অশ্বিনী আর অন্তরঙ্গতা করতে আসে না।

সেদিনও কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার কী খেয়াল হল। পোস্টাপিসের দিকেই যাচ্ছিল, কী ভেবে ফিরে এল নিজের বসবার ঘরে। মনোহরকে বললে, বলাইবাবুকে ডেকে আনতো একবার।

ডিমের গায়ে নম্বর লিখলেন বলাইবাবু, ডাক শুনে উঠে এলেন লেখার ঘর থেকেই। হাতে তাঁর তখনো কপিয়িং পেন্সিলটা ধরা।

শোভন বললেন, বসুন।

বলাইবাবু একটু আশ্চর্য হলেন। কাছে বসিয়ে কোনো গুরুতর আলোচনার মধ্যে টেনে আনার মতো গুরুত্ব তাঁর নেই—ওটা মুকুন্দবাবুর ব্যাপার। বসলেন, এবং এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন শোভনের দিকে।

ভুরু কুঁচকে মিনিট খানেক চুপ করে রইল শোভন। তারপর:

—চ্যাটার্জি সাহেব, মানে ঘোষদীঘির শ্রীধর চ্যাটার্জির কাছে আমরা কিছু টাকা পাই। জানেন আপনি?

—জানি। মুকুন্দলা কাগজটা আমাকে দেখিয়েছেন।

—আপনি কি ও নিয়ে আলোচনা করেছেন নাকি কারুর সঙ্গে?

বলাইবাবু একটু শঙ্কিত হলেন। শোভনের প্রশ্ন করবার ধরণটা তাঁর ভালো লাগল না।

—না, সে রকম কিছু নয়। তবে দু একজনকে—

—কী বলেছিলেন?

বলাইবাবু একটা ঢোক গিললেন। প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হরিনাথ কিছু বলেছে বুঝি আপনাকে?

—কে হরিনাথ?

—হরিনাথ পাল, জয়তারা মিল্‌সে কাজ করে?

—না, তার কাছে থেকে আমি শুনিনি, তার নামও আপনার মুখে প্রথম জানলুম। —শোভনের মুখে অপ্রীতির ছায়া ছড়াতে লাগল: কী হয়েছে তার সঙ্গে?

বলাইবাবু ঢোক গিললেন আবার: মানে—এমন কিছু নয়। দিন-দশ-বারো আগে হাটে হরিনাথের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ঠাট্টা করে বললে, 'কি মিঞা, মুরগীর ভাও কি রকম?' আমিও পাল্টা ঠাট্টা করে বললুম, 'মুরগীর ভাও ভালোই—আল্লার দোয়ায় একরকম চলছে। তোমাদের সায়েবকে যীশুর নাম করে বোলো, তাঁর কাছে আমাদের যে টাকাটা পাওনা আছে, সেটা পেলে আরো ভালো—

হঠাৎ বিশ্রী রকম একটা ধমক দিয়ে শোভন বলাই-বাবুকে থামিয়ে দিলে।

—কেন বলতে গেলেন এ-সব বাজে কথা? কী দরকার ছিল আপনার?

বলাইবাবু হতভম্বের মতো চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নামিয়ে বললেন, কথাটা যে চেপে রাখতে হবে, সেতো আমাকে বলেন নি।

—এ-ও কি বলবার দরকার আছে নাকি? বয়েস হয়নি আপনার? এটা বুঝতে পারেন না যে কাকাবাবু আমার বাবার বন্ধু? তাঁর সঙ্গে দেনা পাওনার ব্যাপারটা অন্যভাবে ফয়সালা করতে হবে?

তেমনি মাথা নীচু করে বসে রইলেন বলাইবাবু:

—মাপ করবেন স্যার, আমার অন্যায় হয়েছে।

—আচ্ছা, যান আপনি।

সব জিনিসটা পরিষ্কার হয়ে গেছে এবার। নিশ্চয় হরি-নাথ পাল কথাগুলো দশগুণ ফুলিয়ে ফুলিয়ে তুলে দিয়েছে ফ্রীনবের কানে, বাংলা দেশের লোক এ কাজটা খুব ভালো করেই পারে। আর এই জন্যেই দূরে সরে গেছেন অশ্বিনী, তার সম্পর্কে চ্যাটার্জি সাহেবের আর কোনো কৌতূহল নেই। একটা নগ্ন শত্রুতা বোধ হয় ঘনিয়ে আসছে মুখোমুখি। কী কুৎসিত।

অথচ, ওই দলিলটা পাওয়া না গেলে—কী ক্ষতি হত বিশ্বসংসারে? আর ওই সামান্য হাজার পাঁচেক টাকার জন্যে কী আটকে থাকছিল তার পোলট্রি। চুলোয় যাক লক্ষ্মীছাড়া হ্যাণ্ডনোট।

কিন্তু চুলোয় যেতে দেবেন না মুকুন্দবাবু। আর তাঁর বিরুদ্ধে একটা কথা বলবারও শক্তি শোভনের নেই।

কোথায় যেন একটা অন্ধকার ঘনাচ্ছে। দিগন্তের নিকটে কালো মেঘ।

তবু এর মধ্যেও রুপালি রেখা জ্বল জ্বল করে। উর্দু কবিতার কয়েকটা লাইন গুঞ্জন করে মনের সামনে:

"ইস্ ইশক নে নিকম্মা কিয়া মুঝে
কিয়া বরবাদ কিয়া কিয়া—"

এই প্রেম আমাকে নিকম্মা করে দিয়েছে—কী বলব সে আমার কী করেছে!

কিন্তু কার প্রেম?

বাইজীকে জবাব দিয়েছিল: মুঝে ইস্তাজার কর্‌না পড়া হ্যায়। কার জন্যে?

চিত্রার সঙ্গে আরো দু-বার দেখা হয়েছে এর ভেতর একদিন ছিল সেই নিয়ন্ত্রণের পালা। মামার ফেলে স্কুটারটা রেখে একটা ট্যাক্সি নিয়ে গেল দুজনে।

ব্যবসায়ী ভাগ্যবানের বাড়ী। উত্তর কলকাতার ভিড়ের মধ্যেই বাছাই জায়গা। পুবদিকে পার্ক। বাড়ীর সামনে অনেকটা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। সেখানেও লন আছে, ফুলের গাছ আছে, মালী আছে।

কিছুক্ষণ সংকুচিত হয়েছিল শোভন। কলকাতার বাঙালী বড়োলোকের সঙ্গে এই তার প্রথম পরিচয়। বাছাই করা দামী ফার্নিচার, প্রচণ্ড পরিপাটি বসবার ঘর।

এস ব্যানার্জির ছবি নেই, কিন্তু যামিনী রায় আছেন।

দেখা গেল, মামার দুরন্ত খাতির এখানে। ডক্টর ঘোষালকে সবাই খুব ভাল করে চেনে, তার মানে এ বাড়ীতে এর আগেও বার কয়েক তিনি এসে গেছেন। শুধু একটা কথাই শোভন কোনোমতে বুঝতে পারছিল না, এত টাকার যারা মালিক, তাদের মেয়ে হয়েও কেন চিত্রা মামার মেসেই পড়তে যায়! কেন তাঁকে বাড়ীতে এনে পড়ে না—যোগ্যপারিশ্রমিক দেয় না?

প্রচুর খাওয়া দাওয়া, প্রায় উৎসবের আয়োজন। কিন্তু তারই ফাঁকে ফাঁকে আর একটা ছবি ভেসে উঠছিল যেন সেই কালো যোগ্য মেয়েটি। মাথা নিচু করে পরিবেশন করে যাচ্ছে, আর থেকে থেকে ধমকে উঠছেন কাকাবাবু, কী হচ্ছে আনী ড্রাইগুলো আর একটু এগিয়ে দিতে পার না? তুমি একেবারে হোপলেস,—এতদিনেও ম্যানার্স শিখলে না!

চিত্রা বলেছিল, বা-রে, কিছুই খাচ্ছেন না যে! রান্না ভালো হয়নি বুঝি?

—চমৎকার রান্না হয়েছে। কিন্তু মাপ করবেন, আর আমার চলছে না।

খাওয়া—গল্প-হাসি। চিত্রার দুটি ছোট ছোট ভাই-বোনের আবৃত্তি। শোভনের তালের ম্যাজিক। মিসেস্ কুণ্ডুর ঘরে ঘরে তত্ত্বাবধান করা, আর মাঝে মাঝে সস্নেহ চোখে শোভনের দিকে তাকিয়ে থাকা!

—এসো বাবা, সময় পেলেই এসো এখানে। লজ্জার কিছু নেই। ডক্টর ঘোষাল তো আমাদের নিজের লোক।

—আসব।

বেরবার সময় চিত্রা বলেছিল, আবার কবে আসছেন শোভনবাবু?

—আপনাদের রিটার্ন ভিজিটের পর।

রিটার্ন ভিজিট ও পক্ষ থেকে এখনো হয়নি, মিস্টার কুণ্ডু ব্যস্ত মানুষ। কিন্তু চিত্রার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। মামার ওখানেই। কলকাতার কিছু ছাত্রের জন্যে সেবে যখন মিনিট পাঁচেকের জন্যে একবার মামার ঘরে নিতে গিয়েছিল, কী যেন পড়াশুনার আলোচনা চলছিল তখন দুজনের ভেতর।

কলধ্বনি করে সম্ভাষণ জানিয়েছিল চিত্রা।

—বারে, আর গেলেন না তো আপনি?

খুব ঘন ঘন মিস্টার কুণ্ডুর ওখানে যাওয়ার মত সম্পর্কটা যে এখনো গড়ে ওঠেনি, এই কথাটা মনে এলেও মুখে এল না। শোভন জবাব দিয়েছিল আপনারাও তো আর এলেন না।

—আমি তো যেতেই চাই, কিন্তু স্যার যদি রাজী না, না হন্ যাই কী করে?

শোভন বলে ফেলেছিল, বেশ তো একাই চলে আসবেন!

—একা!

—ক্ষতি কী! গাড়ী নিয়ে চলে আসবেন, বড় জোর সোয়া ঘণ্টার রাস্তা।

চিত্রার মুখ রাঙা হয়ে উঠেছিল, মোটা একটা বইয়ের পাতা থেকে চমকে যেন মাথা তুলেছিলেন। আর শোভনের তখন মনে হয়েছিল, কথাটা বলা তার আদৌ উচিত হয়নি। দূর পাড়া গাঁয়ের বাংলোয় সে একা থাকে একটি মহিলা নেই বাড়ীতে—সেখানে কোনো মেয়েকে এইভাবে নিমন্ত্রণ জানানোটা যেমন অন্যায়, তেমনি বিশ্রী।

শোভন উঠে পড়েছিল তখনই।

—মামা, চলি আজ।

—সেকিরে, বসলিনে, চা খাওয়া হল না—

—হবে আর একদিন। চলি আজ—

চিত্রাকেও আর একটা কথা বলল না—সোজা ছুটার বাড়ীর রাস্তায়।

যতক্ষণ আলো থাকে, পথে ভিড় চোখে পড়ে, লেভেল ক্রসিঙে দাঁড়িয়ে যেতে হয়, ততক্ষণ কিছুই মনে হয় না। তারপরেই বাংলা দেশের মাঠ জুড়ে কালো সিল্কের ওড়নার মতো পাতলা অন্ধকার, জলায় ব্যাঙের ডাক, ঝিঁ ঝির শব্দ, অনেকখানি আকাশ ভরা তারা, দূরের চাপ বাঁধা গাছপালার ওপর উল্কা খসে পড়া। তখন শুধু কানের কাছে একটি গুঞ্জন: "মেরে সাপ্ তুম্নে আকর রাহ্ কর দী রোশন"—আমার সঙ্গে সঙ্গে এসে তুমি পথটিকে আলো করে দিলে। আর মনে পড়ে রাইজীর সেই ঠাট্টাটুকু: "আয়েসা খুব্সুরত বৌছোয়ার, আভিতক মহব্বা নেহি আয়ী?"

—"নেহি—লিকন্ মাঁয় তো ইস্তাজ্‌বাব হুঁ—"

অসম্বদ্ধ চিন্তা জেনেও মনটাকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। চিত্রা সামনে এসে দাঁড়ায়। শোভনের মনে হয় বাইজীর অভিশাপ ফলতে শুরু করে দিয়েছে।

না, অন্যায়। এ কখনো চলতে দেওয়া যায় না।

কিন্তু জোর করে কি কেউ ফেরাতে পারে স্রোতকে? আর রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলো জানলা দিয়ে যখন বাগানের যুঁই, রজনীগন্ধার গন্ধ আসে, তখন কি জেগে থাকা স্বপ্নের রেশকে ঠেকানো যায়? ঠেকানো যায় কোনোমতেই?

শুধু একটা অর্থহীন অর্ধচেতনার ঢেউ উঠে মধ্যে মধ্যে স্বপ্নটাকে ঘা দেয়। যেন মনে হয়, বাইরে শব্দ করে একটা সাইকেল এসে থেমেছে, আর তার কাছে এসে হাজির হয়েছেন অশ্বিনী হালদার।

না—অশ্বিনী হালদার নন। কী একটা পাখি টিন্‌টিন্ করে ডেকে চলেছে। কী পাখি, শোভন জানে না বাংলা দেশের সঙ্গে এখনো তার ভালো করে পরিচয় হয়নি।

—আট—

এদিকে মুকুন্দবাবু প্রায় উদ্‌ভ্রান্ত করে তুললেন।

—কী করবেন ওটার?

অন্যমনস্ক শোভনের যেন ঘোর ভাঙে।

—কিসের কথা বলছেন?

—চ্যাটার্জি সাহেবের সেই হ্যাণ্ডনোটটা? এর পরে তামাদি হয়ে যাবে যে।

মুখে আসে হোক তামাদি, চুলোয় যাক পাঁচ হাজার টাকা—কিন্তু মুকুন্দবাবু যেন মূর্তিমান বিবেকের মতো দাঁড়িয়ে থাকেন সামনে। বলাই দাসকে ডেকে এনে ধমক দেওয়া যায়, কিন্তু মুকুন্দ মাইতি সামনে এলেই মনে হয়—কোথায় যেন কী একটা গোপন অপরাধ করে ফেলেছে সে এই ভদ্রলোক এখনি কড়া করে শাসন করে দেবেন তাকে।

শোভন মাথা চুলকোতে থাকে।

—নালিশই তা হলে করব বলছেন?

মুকুন্দবাবু বিরক্ত হন: আগেই নালিশ করছেন কেন? প্রথমে একটা চিঠি লিখে দিন যদি তা থেকে টাকাটা মিটিয়ে দেন, তাহলে তো আর কথাই নেই। যদি কিস্তিতে কিস্তিতে দেন, তাতেও ক্ষতি নেই আমাদের। খোলা চিঠি একখানা লিখে ফেলুন।

—কী চিঠি লিখব?

মুকুন্দবাবুর কপাল কুঁচকে ওঠে: বেশ ভালো করেই লিখবেন—অসুবিধা তো কিছু নেই। টাকা নিয়েছিলেন, ফেরৎ দেবেন। এমন কিছু অভাব তো ওঁর নেই, দিব্যি রাইস মিল চালাচ্ছেন, লরী কিনেছেন, শুনেছি একটা কারও বুক করেছেন।

—হুঁ।

—হুঁ নয়।—মুকুন্দবাবু কঠোর হয়ে উঠতে থাকেন: না এভাবে আর সময় নষ্ট করা যায় না। আপনি যদি না পারেন, আমিই বরং চিঠির মুশাবিদা করে দেব।

শোভন সভয়ে বলে, থাক থাক। যা লিখবার আমিই লিখব এখন।

—তাই লিখুন। কিন্তু দেরী করবেন না।—মুকুন্দবাবু সন্দিগ্ধভাবে শোভনের দিকে চেয়ে থাকেন কিছুক্ষণ: আর যদি নিজে গুছিয়ে লিখতে না পারেন, তা হলে বরং ডক্টর ঘোষালের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

এই যুক্তিটাই বেশ লাগসই মনে হয় শোভনের। চ্যাটার্জি সাহেবের সঙ্গে একটা গোলমেলে মামলা-মোকর্দমা বাধবার আগে বরং মামার কাছ থেকে কিছুটা পরামর্শ নেওয়া ভালো।

সুতরাং আবার ফুটায়—সেই পথ পাড়ি দেওয়া, তারপর কলকাতা।

মামার কী কাজে কলেজ থেকে ফিরতে দেরী হয়েছে, ঘর তালা বন্ধ। ফিরে যাচ্ছিল, এমন সময় এল চাকরটা। বললে, যাচ্ছেন কেন বাবু, চাবি আমার কাছেই আছে। আমি ঘর খুলে দিই, আপনি বসুন।

শোভন একা ঘরে কিছুক্ষণ বসে রইল। খবরের কাগজের পাতা ওল্টালো, কয়েকটা দুর্বোধ্য বইয়ের পাতা খুলে দেখল, তারপর বিরক্ত হয়ে নিজেই স্টোভ ধরে এক পেয়ালা চা করতে বসে গেল।

—জল নে, জল দে, আমার জন্যেও জল দে।

মামা জানলার চাপর রেখে বিছানার ওপর ব্যাগটা ছুড়ে দিলেন।

—তোমার দেরী দেখে সেল্ফ হেল্পে লেগেছি।

—খুব ভালো করছিস।

জামা খুলে খাটের ওপর বসে মামা মিনিট তিনেক জিরিয়ে নিলেন। তারপর বললেন, দাঁড়া, হাত পা ধুয়ে আসি, আর চাকরটাকে জলখাবারের ব্যবস্থা করতে বলি।

শোভন অন্যমনস্ক হয়ে বসে রইল। চিত্রার সঙ্গেই পথেই প্রথম দেখা হয়েছিল বটে, কিন্তু এই ঘরেই তার সঙ্গে সত্যিকারের পরিচয়। মেয়েটি সুন্দরী নয়, কিন্তু আশ্চর্য উজ্জ্বল। পাঞ্জাবী মেয়েদের মতো শক্ত শরীরের বাঁধুনী, এক সময় ছেলেবেলায় সাঁতার কাটত, শোভনকে বলেছিল, আমি হাতে ধরে আপনাকে সাঁতার শিখিয়ে দেব। যেদিন স্নান মিলে ওর পোলটিটা দেখতে গিয়েছিল—সেই দিনটা যেন সোনা হয়ে আছে মনের মধ্যে। সেই ছোট্ট নীল রুমালটি প্রাণে ধরে এখনো ফিরিয়ে দিতে পারেনি, যেন ওর সঙ্গে দিনটিও জারী হয়ে রইল তার ঘরে।

চিত্রাকে কেন এমন অসাধারণ মনে হয়? বাঙ্গালের ওই কালো জুড়লটার জন্যে? তাই হবে হয়তো।

—আরে, ওকি করছিস? তোর চোখের জল যে আকাশের মেঘ হতে চলল।

শোভন লজ্জা পেয়ে জেগে উঠল। কেটলির ভেতরে যেন এঞ্জিনের মতো শব্দ উঠছে, নল দিয়ে যেটা ধোঁয়ার স্রোত পেরিয়ে আসছে, ঢাকনাটা নাচতে শুরু করে দিয়েছে। শোভন স্টোভ নিবিয়ে ফেলল, চা ভিজিয়ে দিল।

খাবারের ঠোঙা হাতে যথানিয়মে চাকরটা পৌঁছে দিয়েছিল। কাপ ধুয়ে সে-ই চা করে দিলে, খাবার সাজিয়ে দিলে, তারপর ঘরের আলোটা জেলে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

চা খেতে খেতে শোভন বললে: মামা, খুব মুস্কিলে পড়ে গেছি। অ্যাডভাইস্ নিতে দৌড়ে এলুম।

—বলে ফ্যাল।

তখন চ্যাটার্জি সাহেবের কাহিনীটা সব শোনাতে হল। সেই হ্যাণ্ডনোটের ব্যাপার, সেই পিতৃবন্ধু, সেই নেমন্তন্ন করে খাওয়ানো। মুকুন্দবাবু আগেও টাকা পয়সা নেওয়া সম্পর্কে যে সময়ও ইঙ্গিত করেছেন, তাও বলতে হল। এমনকি বলাই বাবু সেই দিনকে কী বলেছিলেন তাও মামার অজানা রইল না। শুধু আড়ালে রইল অনীতা, এর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক আছে বলে মনে হল না শোভনের।

মামা একটু চুপ করে থেকে বললেন, তা হলে আর কি! চক্ষুলজ্জার পাট যখন মিটেইছে, তখন চিঠি দে। টাকা না পেলে উকিলের চিঠি।

—কিন্তু হাজার হোক, বাবার বন্ধু—

মামার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। আস্তে আস্তে বললেন, শৈলেশের কোনো বন্ধু থাকতে পারে, এ আমি বিশ্বাসই করি না। সে-রকম চরিত্রের লোকই ছিল না সে।

কিছুদিন আগেও এস ব্যানার্জিকে যে কোনো নিঃসম্পর্ক মানুষের মতোই ঘৃণা করেছে শোভন। হয়তো বেশিই করেছে। কিন্তু তাঁর ছবি, তাঁর বই পত্র, তাঁর অনুতপ্ত চিঠির লাইনগুলো বার বার মনে পড়া, মুকুন্দবাবুর মুখে সেই আপনভোলা মানুষটার কাহিনী, শ্রীধরের সেই উচ্ছ্বাস: ইউ রিমাইণ্ড মী শৈলেন ইন হিজ ইয়ঙ্গার ডেজ—সব মিলিয়ে যেন অনেকখানি কোমল হয়ে এসেছিল শোভন। একটু চুপ করে রইল।

—যদি টাকা না দেন—

—আদায় করতে হবে।

—আবার খানিক বিশ্রী ঝামেলা ঝামেলা—

—সম্পত্তি থাকলেই ঝামেলা থাকে। অ্যাভয়েড করবার জো নেই। তবে—মামা হাসলেন: আমার মনে হয় না, অতটা গড়াবে। তোর মুখে যতটা শুনেছি, তাতে বিস্তর টাকা পয়সা আছে ভদ্রলোকের। চাইলেই দিয়ে দেবেন।

শোভনের মনে পড়ল, মুকুন্দবাবু বলেছিলেন, চ্যাটার্জি সাহেব চিরকাল হাত চিৎ করতেই জানেন, উপুড় করা তাঁর কোনোদিনই অভ্যেস নেই। একটা বিব্রত বিষণ্ণ মন নিয়ে বসে রইল সে।

আরো খানিকটা এলোমেলো গল্পের পর সে উঠে দাঁড়ালো। বললে, তা হলে যাই আজ।

—দাঁড়া। আসল কথাই তোকে বলা হয়নি। ভেরি ইম্পর্টাণ্ট।

শোভন আশ্চর্য হয়ে বসে পড়ল: আবার কী ইম্পর্টাণ্ট কথা তোমার?

মামা কিছুক্ষণ কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন শোভনের দিকে। তারপর বললেন, হোয়াট ডু ইউ থিংক অফ্ দ্যাট গার্ল—আই মীন চিত্রা?

শোভন চমকে উঠল, দুরু দুরু দোলা লাগল বুকের ভেতর। মামা তার অন্ধকার পথ আর নির্জন ঘরের স্বপ্ন কামনার সন্ধান পেয়ে গেছেন নাকি? চুপ করে রইল, সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিতে পারল না।

—কথা বলছিস না কেন রে? হোয়াট্ ডু ইউ থিংক আর ইয়ু? বী ফ্র্যাঙ্ক!

—তা-ভালোই তো।—শোভন ঢোক গিলল: বেশ ভালো মেয়ে। কিন্তু আমাকে এ-কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?

—নিশ্চয় কোনো কারণ আছে। আর একটা কথার জবাব দে।

—বলো।—শোভন শঙ্কিত হয়ে মামার দিকে তাকালো।

—তুই কাস্ট সিস্টেম মানিস?

—কখনো ভেবে দেখিনি।

—তা হলে মানিস না। থাক—বাঁচালি। ও ব্যাপারে আমারও কোনো প্রেজুডিস্ নেই। আচ্ছা, এইবার শেষ কথাটার উত্তর দে। ধর, ব্রাহ্মণ—এমন কোনো ভালো পরিবারের সুন্দরী কালচার্ড মেয়ে বিয়ে করতে তোর আপত্তি আছে?

দুর-দুর বুকটা ধড়াস ধড়াস করতে লাগল এবার। কী বলতে চাইছেন মামা, এসব কথার ভেতর দিয়ে কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছেন তিনি? আর চিত্রার নামটাই বা এর মধ্যে কেন টেনে আনছেন? সব মিলিয়ে একটা যোগাযোগ তৈরী হতেই শোভনের মাথার মধ্যে আগুন ছুটে গেল।

—তুমি কী বলছ মামা?

—যা বলছি, পষ্টই বুঝতে পারছিস না হয়! বল্—বিয়ে করবি কি না?

—তুমি কি আমার জন্যে ঘটকালি শুরু করেছ মামা?

—ওরে বাঙ্কেল, আমি না হলে তোর জন্যে আর কে ঘটকালি করতে যাবে।—মামা আলতো ভাবে শোভনের পিঠে একটা চড় মারলেন: ত্রি সংসারে একটা মামা ছাড়া তোর কেই বা আছে আর!

কথাটা ঠিক। আর মামা এমন করে বললেন যে শোভনের চোখে জল আসতে চাইল।

—তোমার যা খুশি করো। কিন্তু আমার এখন বিয়ে টিয়ের ঝঞ্ঝাটে আদৌ পা বাড়াতে ইচ্ছে নেই।

—তোর ইচ্ছের কি আসে যায়? আমরা যা ভালো বুঝব তাই করব।

—তাই কোরো। আমায় আর জ্বালিয়ো না।—বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এল শোভন।

—আবার কবে আসবি?—পেছন থেকে মামার ডাক ভেসে এল।

—দেখি কবে সময় হয়।

পথে নেমে মন্ত্রমুগ্ধের মতো ঝুঁটিয়ে উঠল শোভন। সব স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। মামা কি সত্যিই পরিষ্কার ইঙ্গিত দিলেন একটা? চিত্রার সঙ্গে তার একটা সেটল্ড ম্যারেজের কথা ভাবছেন মামা? কিন্তু মিষ্টার কুণ্ডু কেন রাজী হবেন? তাঁর অনেক টাকা, মস্ত বড়ো ব্যবসা। তা ছাড়া ওঁরা কি ব্রাহ্মণ? কই সে-রকম তো কিছু মনে হল না।

একটা অনিশ্চয়তা আর উন্মাদনায় দুলতে দুলতে শোভন সাইকেল নিয়ে এগিয়ে চলল।

মাইল-দুই এসে সেই চৌরাস্তার মোড়টায় থেমে গেল সে। এখান থেকেই তার অকলের বাসগুলো ছাড়ে, আরো দু-তিনটে রুটের দিকে যায়। আপাতত সেখানে দারুণ গণ্ডগোল। প্রচুর লোক জড়ো হয়েছে, রাস্তায় সারি সারি নিশ্চল বাস, ড্রাইভার আর কণ্ডাক্টারের দল কোলাহল করছে, পুলিশের একটা ভ্যানও দাঁড়িয়ে।

কলকাতা তাজ্জব জায়গা। কিছু না কিছু একটা লেগেই আছে সব সময়।

ভিড় ঠেলে প্রাইভেট গাড়িগুলো বেরিয়ে যাচ্ছিল,

শোভনও যেতে পারত। কিন্তু ব্যাপারটা জেনে নেওয়ার কৌতূহল সামলাতে পারল না।

—কী হয়েছে দশায় এখানে?

পুলিশের সঙ্গে একজন বাস ড্রাইভারের কী নিয়ে গোলমাল বেধেছিল। সেটা কিছু বেশি দূর গড়ায়। পুলিশের গায়ে নাকি হাত পড়ে। ফলে জন কয়েক ড্রাইভার কণ্ডাক্টারকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এবং এ রুটে আজ আর বাস চলবে না।

বিপন্ন বাস যাত্রীদের দিকে একটা করুণার দৃষ্টি ফেলে শোভন সাইকেলে স্টার্ট দিচ্ছিল, হঠাৎ তার চোখের দৃষ্টি থমকে গেল এক জায়গায়। ল্যাম্প পোস্টের নীচে মেয়েটি দাঁড়িয়ে। এক হাতে ব্যাগ, আর এক হাতে বাদামী কাগজের একটা প্যাকেট। রোগা, লম্বা, কালো চেহারা। পরণে সাদা শাড়ী, সাদা ব্লাউজ, দু-চোখে জলে ডোবা মানুষের আতঙ্ক।

অনীতা!

একবার দ্বিধা করল শোভন, তারপর সাইকেলটা সরিয়ে আনল অনীতার দিকে।

—নমস্কার।

—নমস্কার।—বিহ্বল চোখে প্রতিনমস্কার করল অনীতা, মুখে লজ্জার রং পড়ল।

—চিনতে পারছেন আশা করি।

—কী আশ্চর্য, চিনতে পারব না কেন।—অনীতা চোখ নামালো, চেয়ে রইল নিজের বিবর্ণ পুরোনো জুতোটার দিকে।

—এখানে এ-ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন যে?

—দেখছেন না, কী মুস্কিলে পড়ে গেছি? একটু কাজে এসেছিলুম কলকাতায়—বেরুতে দেরী হল, এখন দেখছি বাসের এই গণ্ডগোল। ফিরব কী করে বুঝতে পারছি না। ক'টা বেজেছে বলুন তো? ট্রেণ পাওয়া যাবে?

হাতের ঘড়িটার দিকে তাকাল শোভন। শেষ ট্রেণটা ছাড়তে পনেরো ষোলো মিনিট দেরী আছে এখনো। কিন্তু বাসে ট্রামে গেলে পঁচিশ মিনিটের আগে কিছুতেই পৌঁছনো যাবে না। এক যদি ট্যাক্সি পাওয়া যায়!

—একটা ট্যাক্সি হলে ধরতে পারেন গাড়ী। কিন্তু পাবেন ট্যাক্সি?

অসম্ভব। কলকাতায় ট্যাক্সি এমনিতেই মরীচিকার মতো সুদূর। তারপর, এখানে এই মুহূর্তে যখন সব জ্যাম হয়ে আছে, তখন ট্যাক্সি ধরা আর চাঁদে হাত বাড়ানোর ভেতর কোনো তফাৎ নেই।

শোভন একবার অনীতার মুখের দিকে চেয়ে দেখল। যেন সমুদ্রে ভাসছে।

—কলকাতায় থাকবার যায়গা আছে কোথাও?

—না।

—চেনা শুনো কেউ?

—বিশেষ নয়।

—তা হলে আর দেরী করবেন না। চটপট চলে আসুন।

—কোথায়?—অনীতার চোখ শিউরে উঠল।

—আমার স্কুটারে। যদি লজ্জা না করে উঠে বসতে পারেন, আমি একটা প্রাণপণ চেষ্টা করে দেখি আপনাকে শেষ ট্রেণটা কোনো মতে ধরিয়ে দিতে পারি কি না।

অনীতা কেঁপে উঠল। শাদা হয়ে গেল মুখ।

—না, সে হয় না। আমি পারব না।

—পারবেন না? তবে সারা রাত থাকুন এখানে দাঁড়িয়ে। আর যদি সাহস করে স্কুটারে উঠে বসতে পারেন, তা হলে এক্ষুনি চলে আসুন। আপনি লজ্জা পাচ্ছেন কেন ট্রেণ আপনার জন্যে বসে থাকবে না।

অনীতা চুপ করে রইল। শোভন স্কুটারে স্টার্ট দিতে দিতে বললে, আমি চললুম তা হলে, নমস্কার।

—একটু দাঁড়ান।

সমুদ্রে যে ডুবছেই, যে কোন একটা ভেলা তার দরকার। সে ভেলায় সাপ ফণা উঁচিয়ে থাকলেও সে নিরুপায়।

—আসবেন?

—কী করব?

—চাপতে পারবেন? পড়ে যাবেন না তো?

অনীতা একটু হাসল: আমি উঠেছি আগে মোটর সাইকেলে। এক আধটু অভ্যেস আছে।

—ভেরিগুড্। চলে আসুন তা হলে।

প্যাকেটটা দিন, স্কুটারের ব্যাগে রেখে দিচ্ছি।

অনীতার পা তবু সরতে চাইল না—মনের ভেতরে তোলপাড় চলছে। শোভন স্টার্ট দিয়ে বললে, তা হলে সত্যিই কি ট্রেনটা ফেল করতে চান আপনি?

—না-না—

স্কুটার ছুটল ষ্টেশনের দিকে। সব অবিশ্বাস্য, স্বপ্নের মতো লাগছে। অনীতা পেছনে বসে আছে যথাসম্ভব স্পর্শ বাঁচিয়ে, তবু তার চুলের গন্ধ আসছে, শাড়ীর ছোঁয়া লাগছে এসে? কী অদ্ভুত ভাবে দু-জন মানুষ এক সঙ্গে এসে মেলে—কত দূর থেকে কত সহজে কাছে এসে যায়।

অনীতা কী ভাবছিল শোভন জানে না, নিজেরও ভাববার সময় বেশি ছিল না। প্রত্যেকটি-মুহূর্ত মূল্যবান এখন। উল্কার মতো ছুটে চলল স্কুটার, এক জায়গায় পুলিশে যেন নম্বরও নিলে মনে হল; তবু ট্রাফিকের আলো মেনে দাঁড়াতে হল বার বার এবং শেষ পর্যন্ত স্কুটার যখন ষ্টেশনে এসে পৌঁছুল, তার দু-মিনিট আগে ট্রেনটা চলে গেছে।

একজন বললে, লাষ্ট ট্রেণ প্রায়ই পাঁচ সাত মিনিট দেরী করে ছাড়ে, আজ একেবারে কাঁটায় কাঁটায়। রেল কোম্পানীর মর্জির ব্যাপার মশাই, যেদিন যা ইচ্ছে করে!

একেই বলে বরাত!

শোভন অনীতার দিকে তাকালো। স্কুটারে ছুটে এসেও সমস্ত মুখে টলটল করছে ঘাম।

বিবর্ণ হয়ে গেছে, ভয়ে চোখের দৃষ্টিটা উদ্‌ভ্রান্ত।

মেয়েটার দিকে তাকিয়ে শোভনের মন করুণায় ভরে গেল।

—কী করবেন এখন?

—জানি না।

—কারো বাড়ীতে থাকতে পারেন না, না?

—সে রকম আমার কেউ নেই।

চিন্তিত হয়ে শোভন দাঁড়িয়ে রইল। তারও তো কেউ চেনা জানা নেই এখানে। মামার মেস আছে, কিন্তু সেখানে কোথায় থাকবে অনীতা? এক চিত্রাদের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া চলে, তাদের ওখানে জায়গাও আছে, কিন্তু না—সে অসম্ভব। সে কথা ভাবাই যায় না। কী বলবে তাদের? কী পরিচয় দেবে অনীতার? কোনো পরিচয় তার নিজেরই তো ভালো করে জানা নেই এখনো।

একটা চুরট ধরিয়ে কিছুক্ষণ বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিলে শোভন। অনীতা চুলের দাগ ধরা আর ছোট ছোট হ্যাণ্ডবিল লাগানো একটা থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল নিথর হয়ে।

শোভন বললে, একটা উপায় হতে পারে। ষ্টেশন-মাষ্টারের সঙ্গে কথা কয়ে যদি ষ্টেশনের ওয়েটিং-রুমে থাকবার একটা ব্যবস্থা করে দিই আপনার জন্যে?

অনীতার ঠোঁট কাঁপতে লাগল: না, সে আমি থাকতে পারব না।

—তাই তো!

—তা ছাড়া আজ রাত্রেই যদি ফিরে না যাই, তা হলে—কথাটা শেষ করল না, একটা অতলস্পর্শ ভয় দুলে উঠল গলার স্বরে।

শোভনের মনে পড়ল অশ্বিনী ডালমিয়ের কথা:

বাঁচো দরকার।

শোভন বললে, তা হলে আসুন। দু-মাইল পথ যে-ভাবে এসেছেন, সেই ভাবেই ত্রিশ মাইল পাড়ি দেওয়া যাক।

পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অনীতা। কপাল বেয়ে দর দর করে ঘাম পড়তে লাগল তার।

শোভন বললে, একটা প্রশ্ন নিশ্চয় আছে। আপনি বলতে গেলে আমাকে এক রকম চেনেনই না। তার ওপর রাত হয়ে গেছে, এক ঘণ্টারও বেশি রাস্তা। আমাকে বিশ্বাস করা আপনার পক্ষে স্বাভাবিক নয়। কিন্তু সাহস করে যদি আসতে পারেন, আমার দিক থেকে যথা সম্ভব—

—কিছু বলবার দরকার নেই। আপনাকে আমি খুব ভালো করে চিনি। বেশি দেখিনি, কিন্তু অনেক শুনেছি। বিশ্বাসের অবিশ্বাসের প্রশ্ন নেই—অশ্বিনী কাকা আপনার দস্তুর মতো ভক্ত।—এক সঙ্গে অনেকগুলো কথা যেন জোর করে বলে ফেলল অনীতা, তারপর শাড়ীর আঁচলে ঘামে ভেজা মুখটা মুছে ফেলল।

—কী করবেন তা হলে ?

—চলুন ।—একটা নিষ্প্রাণ নিরস্ত গলা শোনা গেল : যদি দেখা যায়, বাসের গোলমাল এখনো মেটে নি, তা হলে—

—তা হলে তো কথাই নেই। আসুন

আবার স্টার্ট। সেই ছোটাছে বাঁচিয়ে অনীতার বসে থাকা। বাতাসে চুলের হালকা গন্ধ। উড়ন্ত শাড়ীর আঁচলের ছোঁয়া।

কিন্তু বাস পাওয়া গেল না। সেই সারি সারি নিশ্চল গাড়ী। ছাড়া ছাড়া জনতা। এখনো ড্রাইভার আর কণ্ডাক্টারদের ভেতরে উত্তেজিত আলোচনা এখানে ওখানে। বাসের যন্ত্রাংশের আর বিশেষ দেখা গেল না, অবস্থা বুঝে যে যেমন পারে ব্যবস্থা করে নিয়েছে।

শোভন একবার স্টার্ট থামালো।

—বাস্ আজ আর ছাড়বে না ?

কোনো জবাব এল না। এমন অনেক আকুল প্রশ্নের জবাব দিয়ে ক্লান্ত।

শোভন একবার ফিরে চাইল অনীতার দিকে। স্থির হয়ে বসে আছে—চোখের দৃষ্টি শূন্য। যেন একটা প্রার্থনার মধ্যে মগ্ন হয়ে আছে, যেন শক্তি আর সাহস চাইছে দেবতার কাছে।

—দেবতার দরকার নেই, আমি তোমাকে আশ্রয় দিয়েছি।—মনে মনে উচ্চারণ করল শোভন ? তারপর দ্রুত গতিতে ছুটিয়ে দিলে স্টার্ট।

ভাগ্য—! ভাগ্য দু-জন অচেনা মানুষকে কী আশ্চর্য-ভাবেই মিলিয়ে দেয়।

—নয়—

ভাগ্য মিলিয়ে দেয়। অন্ধকার পথে, দূরের যাত্রায় বিশ্বাস আর নির্ভরতার অপূর্ব আর অবিশ্বাস্য সান্নিধ্যে।

ছুটতে ছুটতে মনে হচ্ছিল, কত কাছে কত দূরের একটি মানুষকে বয়ে নিয়ে চলেছে। একটি লম্বা কালো মেয়ে নয়, রূপসী নয়—বাংলা দেশের, ভারতবর্ষের পথে ঘাটে দেখা চিরকালের চেনা মেয়েদেরই একজন। কোনো বৈশিষ্ট্য নেই—দু'বার তার দিকে ফিরে ফিরে চাইবার মতো কৌতূহল কারো কোনোদিন জাগে না। অথচ শোভন অনুভব করছিল সেই একটি অতি সাধারণ অল্প-শিক্ষিতা মেয়ের মধ্যে একটা দুর্বোধ্য মনকে বয়ে নিয়ে চলেছে সে। তার শাড়ীর ছোঁয়া লাগে, কিন্তু মনটার কোনো সন্ধান মেলে না।

ভীড়, গঞ্জ, বাজার। লেভেল্ ক্রসিং। কখনো গাছপালার কোলে মিশিয়ে আসা রাত, কখনো জলার গন্ধ, কখনো বা মাঠের ওপর একটা পাতলা কালো সিল্কের ওড়নার মতো কাঁপতে থাকা অন্ধকার। আকাশে অল জ্বলে তারার সার।

শ্রীধর বলেছিলেন, আশ্রিতা একটি মেয়ে—তা 'কুক্-ই' বলতে পারো। অশ্বিনীর চোখে আগুন ছুটেছিল সে কথা শুনে। অনেক বছর ধরে তিনি এদের জানেন, এই মেয়েটিকে জানেন। সব কথা তিনি বলতে চান না, শুধু মেয়েটিকে একটুখানি বাঁচার সুযোগ করে দিক শোভন এই টুকু তাঁর নিবেদন। একটা কথা, কিন্তু অনেক কথার ইঙ্গিত তার ভেতরে।

শোভন কত টুকু জানে ? কিছুই নয়। সেই থেমে যাওয়া বেহালা। সেই বিকেলে যেন হঠাৎ অস্বাভাবিক আতঙ্কেই অনীতার ছুটে পালানো।

অনেক কথা। কিন্তু সব একটা বন্ধ দুয়ারের ওপারে থমকে থেমে আছে মনে হয়।

সেই রাত্রে—সেই অদ্ভুত অবিশ্বাস্য রাত্রিতে, মাত্র কয়েকটা কথা হয়েছিল অনীতার সঙ্গে ! একটা পেট্রোল পাম্পে তেল নেবার সময়।

—কলকাতায় বুঝি মার্কেটিঙে গিয়েছিলেন ?

একটু চুপ করে থেকেছিল অনীতা। জবাব দিয়েছিল, সে কিছু নয়। আর কাজ ছিল একটা। ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিলুম।

—ইন্টারভিউ !—আবার অশ্বিনীর কথাগুলো মনে পড়ে গিয়েছিল। অনীতা তা হলে সত্যিই চাকরির চেষ্টা করছে। অথচ, অশ্বিনী তাকে বলে যাওয়ার পর এই প্রায় মাস খানেকের ভেতরে কথাটাকে সে এতটুকু গুরুত্ব দেয় নি। অপরাধীর মতো জিজ্ঞেস করেছিল, কিসের ইন্টারভিউ ?

—একটা বার্সিংয়ের।

—কাকাবাবু আসতে দিলে ?

কথাটা আশাকেই জিজ্ঞেস করা। এই সংশয়টুকু প্রকাশ করবার সুযোগ অশ্বিনীই দিয়েছিলেন তাকে?

অনীতা আর্ত চোখে শোভনের দিকে তাকালো একবার? কতটা সে জানে? কী জানে?

—কাকাবাবুকে জানাইনি—অনীতা আবার মাথা নামিয়ে নিলে: ওঁকে বলেছিলুম, চোখটায় কদিন ধরে জল পড়ছে, মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে, একবার দেখিয়ে আনব। উনি একটা চিঠিও দিয়েছিলেন চেনা ডাক্তারকে।

—চোখ তা হলে সত্যি খারাপ নয়।

জমাট মেঘের ভেতর থেকে আলোর মতো হাসি দেখা দিয়েছিল এক টুকরো: না। মিথ্যে কথা বলেছি।

—সব মিথ্যে অন্যায় হয় না—শোভনও যেন অনেকটা সহজ হতে পেরেছিল এতক্ষণে: তা নার্সিংয়ের খবর কী।

—চল্লিশ জনের সঙ্গে ইন্টারভিউ দিয়ে এলুম।

আশা আছে কিছু?

জানি না।

তেল নেওয়া হয়ে গিয়েছিল, স্কুটার আবার ছুটল। সেই অন্ধকারের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে আবার মনে আসতে লাগল: তুমলে মেরে সাথ আ কর যাহ কী য়োশন—

আর মনে হচ্ছিল, স্কুটারের পেছনে যে বসে আছে সে অনীতা নয়, চিত্রা কুণ্ডু।

গোয়দীঘির মোড়ে যখন পৌঁছুল রাত তখন সাড়ে দশটা। অনীতা বললে, থাক, এইখানেই আমি নামব।

—বলেন কি। অন্ধকার রাস্তা, অনেকটা যেতে হবে যে।

—আমার অভ্যেস আছে।

—ভয় করবে না?

অনীতা পাংশু হাসি হাসল: ভয় আমার আর কাউকে নেই। থাকলে আপনার স্কুটারে চেপে এভাবে আমি কিছুতেই আসতে পারতুম না। আমি চলি। তা ছাড়া বাস থেকে নামলেও তো এ পথ আমায় হাঁটতেই হত।

—সঙ্গী পেতেন তখন। চলুন, আমি হেঁটেই এগিয়ে দিই খানিকটা।

—কিছু দরকার নেই। ওই তো সামনে মিলের আলো দেখা যাচ্ছে। আমি চলি। আপনাকে ধন্যবাদ দেবনা, দেবার কোনো মানে হয় না।

অনীতা দু-পা এগিয়ে গিয়েছিল, শোভন পেছন থেকে ডাকল: শুনুন?

অনীতা দাঁড়িয়ে পড়ল:

—পেছু ডাকলুম বলে কিছু মনে করবেন ধন্যবাদও চাই না। কিন্তু কথা দিন, একদিন বেহালা শোনাবেন আমাকে।

—চেষ্টা করব।—আবার ক্ষীণ রেখায় হাসলো অনীতা, তারপর সাদা একটা ছায়া মূর্তির মতো তরল অন্ধকারে ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে আসতে লাগল। আর শোভন অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থেকে কান পেতে শুনতে লাগল দু-ধারের মাঠ থেকে ঝিঁঝির ঝঙ্কার, রাতচরা পাখির ডাক।

তারপর আবার উল্টো মুখে ঘাড় ফিরে আসা ক্লান্ত উত্তেজিত স্নায়ুর ভেতরে দুটো স্রোতের সংঘর্ষ। মামা কেন বললেন ও-কথা? তুই কাস্ট সিস্টেম মানিস?...ঘর, ব্রাহ্মণ নয়, ব্রাহ্ম—এমন কোন কালচার্ড পরিবারের সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করতে আপত্তি আছে তোর?...হোয়াট ডু ইউ থিংক অফ চিত্রা!"

—কী বলতে চান মামা? কিসের ইঙ্গিত?

একটা অসম্ভব সম্ভাবনায় মাথার ভেতর থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকায়। কেন চিত্রার বাবা রাজী হবেন, শোভনকেই বা পছন্দ করবে কেন চিত্রা? নাকি আর কারো কথা ভাবছেন মামা? তাই সম্ভব। সম্ভব কেন, নিশ্চয়ই তাই।

ভাবতেই শোভনের ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত জ্বালা করে উঠল। কেন এ সব করতে যাচ্ছেন মামা, কে তাকে মাথার দিব্যি দিয়ে বলেছে যে শোভনের জন্য এখুনি তাঁর একটা বিয়ের ব্যবস্থা করা দরকার? বিয়ে না হলে কি শোভনের আর ঘুম হচ্ছে না। না—একটু শক্ত হওয়া দরকার, মামার এসব খ্যাপামি তাকে বন্ধ করতেই হবে।

শোভন উঠে বসলো, ঘরের আলো জ্বালল, একটা চুরুট ধরালো।

শোবার ঘরের দেওয়ালেও এস. ব্যানার্জির ছবি:

কয়েকটা ছবি। একটা মহাভারত থেকে—অর্জুন আর চিত্রাঙ্গদা। স্বরূপা চিত্রাঙ্গদা অভিসারিকার বেশে মালা গেঁথে এনেছে অর্জুনের জন্যে, অবজ্ঞায় মুখ ফিরিয়েছে অর্জুন। মহাভারতে কি এমনি ঘটনা আছে কোথাও? না—রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকেই বিষয়টা সংগ্রহ করা?

চিত্রাঙ্গদা নয়—তার অনীতাকে মনে পড়ল। ছবির ওই উপেক্ষিতা অভিসারিকার সঙ্গে অনীতার চেহারার যেন মিল আছে। বাবা কি অনীতাকে মডেল করে ছবিটা এঁকে ছিলেন। কিন্তু ছবির নীচে বারো বছর আগেকার তারিখ—তখন কত বয়েস ছিল অনীতার! আট—নয়—দশ!

আজকের সন্ধ্যাটা কী আশ্চর্য। এখনো যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না। ত্রিশ মাইল পথ। শাড়ীর চোরা চুলের গন্ধ, শরীরের এক আধটা মৃদু স্পর্শ। এত কাছে—অথচ এত দূরে। সামনে যখন দাঁড়ালো, তখনো একটা দিগন্তের ওপারে সে বাস করছে, তাকে ছোঁয়া যায় না, জানবার উপায় নেই।

বসে বসেই ভোর হয়ে গেল। পোলট্রির মোরগদের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে আচ্ছন্নতা ভেঙে গেল শোভনের। জানলার সামনে এসে দেখল। অনীতার বিষণ্ণ চোখের দৃষ্টির মতো পশ্চিমে শুকতারাটা অস্ত যাচ্ছে।

চ্যাটার্জি সাহেবকে টাকাটার কথাটা লিখতে কিছুতেই মন সরছিল না। অনেকবার ভেবেছে, তাঁর ওখানে নিজেই একবার যাবে, সামনা সামনি কথাটার আভাস দেবে, তারপর—। কিন্তু স্যুটার নিয়ে খোদলীঘির মোড় পর্যন্ত গিয়েও ফিরে এসেছে। হয়তো ভয়টা চ্যাটার্জি সাহেবকেও নয়। অনীতার মুখোমুখি দাঁড়াতেই কেমন সংকোচ হচ্ছে তার।

কী ভাববে অনীতা? টাকার তাগাদা দিতে এসেছে কাবলীওয়ালার মতো।

কিন্তু চ্যাটার্জি সাহেবের এই কুকুরটির সম্পর্কেই বা এত সংকোচ কেন তার। কে এ, যার জন্যে এত লজ্জিত হচ্ছে শোভন? কলকাতায় গিয়ে বিপদে পড়েছিল, সে দয়া করে তাকে স্যুটারে নিয়ে পৌঁছে দিয়েছে। কিন্তু সে জন্যে কেন তার এ-রকম দ্বিধা!

মুকুন্দবাবু ঘরে এলেন। শোভন কুঁকড়ে গেল সঙ্কোচে।

বিরস দৃষ্টিতে তার দিকে একবার তাকিয়ে বিনা সম্ভাষণেই চেয়ার টেনে বসে পড়লেন মুকুন্দ। জড়তাহীন স্পষ্ট স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, টাকার ব্যাপারে কী বললেন ডক্টর ঘোষাল?

—প্রথমে একটা সাধারণ চিঠি দিতে বললেন—অনিন্দ্যাসত্ত্বেও জবাব দিতে হল: পরে দরকার হলে—।

মুকুন্দবাবু বললেন, বেশ, লিখে ফেলুন। আর দেরি করা যায় না।

—আজই?

—এখুনি!

নিজেই প্যাড আর কলমটা সরিয়ে দিলে শোভনের দিকে।

আর উপায় নেই। শোভন একবার কাতর দৃষ্টিতে মুকুন্দবাবুর দিকে চাইল। ভদ্রলোক এবার সস্নেহে হাসি হাসলেন একটু।

—বুঝেছি, খুব ডেলিকেট মনে হচ্ছে। কিন্তু কী করা যায়—এতগুলো টাকা।

—টাকা আমি চাইনা!—মরিয়া হয়ে জবাব দিলে শোভন।

—আপনি না চাইতে পারেন—মুকুন্দবাবুর স্বর শক্ত হয়ে উঠল: টাকাটা কার্মের। ওটা ছাড়া যায় না। আপনার পার্সোনাল লোন হলে কিছুই বলতুম না আমি।

কার্ম। মুকুন্দবাবুর বুকের পাঁজরা। কোনো কথা নেই সেখানে। মুকুন্দবাবু বললেন, ড্রাফট আমি করেই এনেছি, এটা দেখে লিখে ফেলুন।

পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ ফেলে দিলেন টেবিলে।

চালাক লোক, বেশ গুছিয়ে লিখেছেন। সেইটেই এক আধটু শুধরে দিতে হল তাকে। সমস্ত মনটা বিস্বাদ হয়ে গেছে, কিন্তু এ নিয়ে আর কথা বাড়াতে প্রবৃত্তি হচ্ছে না তার।

চিঠিটা নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন মুকুন্দবাবু। বললেন একটা কথা জিজ্ঞেস করব তার!

—বলুন।

—রাগ করবেন না।

—রাগের প্রশ্ন কেন আসছে?

একটু ইতস্তত করলেন মুকুন্দ: আচ্ছা, সেদিন যে আপনি কলকাতা গিয়েছিলেন—

শোভন চমকে উঠল: তা কী হয়েছে?

—মানে ফেরবার সময় একাই এসেছিলেন কি?

শোভন শব্দ করে নড়ে উঠল চেয়ারটায়: অর্থ কী?

—অর্থ কিছুই নয়—মানে একটা আলোচনা কানে এল।

—আলোচনা? কিসের আলোচনা?—শোভনের রক্ত দুলে উঠল, সমস্ত ইন্দ্রিয়টা একই দিকে এগিয়ে আসছে। সেই অনীতাকে লিফট দেওয়া।

মুকুন্দবাবু বললেন, থাক, পরে বলব।

—না, এখুনি বলুন।

কিন্তু বলার সুযোগ পেলেন না মুকুন্দবাবু। বাড়ি কাঁপিয়ে ডাক উঠল: শোভন, এই হতচ্ছাড়া শোভন—

মামার গলা!

শোভন লাফিয়ে উঠল: মামা, এলো-এলো।—সঙ্গে সঙ্গে চোখ চলে গেল বাইরে। না, সেই নতুন গাড়ীটা দাঁড়িয়ে নেই, নীল শাড়ীর আঁচলটা কোথাও নেই, মিষ্টার কুণ্ডুকেও দেখা গেল না।

নিরাশ হয়ে শোভন বললে, একা নাকি?

—খুব মন খারাপ হয়ে গেল তো?—মামা হা হা করে হেসে উঠলেন: হবে, হবে।—ধপ্ করে বসে পড়লেন একটা চেয়ারে: তারপর, খবর কি মাটিতি মশায়? সব ভালো তো?

—আজ্ঞে হাঁ, এক রকম চলছে আপনার আশীর্বাদে। আপনি ভালো? মুকুন্দবাবু বিনীত ভাষিতে জবাব দিলেন।

—আমি সব সময় ভালোই থাকি।

দু-চারটে খুচরো কথার পর মুকুন্দ বিদায় নিলেন। মনোহরকে ডেকে চা আনতে বলে দিয়ে শোভন জিজ্ঞেস করলে: এলে কিসে?

দুড়া কেটে মামা বললেন: কেন, বাসে চাপিলাম, এসে নামিলাম!

—খুব ঘুড়ে আসো দেখছি।

—কেন থাকব না। তোর বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছি যে!

—সেকি!

—বত্রিশ বছর বয়েস হল, অরক্ষণীয় থাকবি নাকি এখনো? লোকে কি বলবে তোকে? আর আমিই বা কী কৈফিয়ৎ দেব সকলের কাছে তাই বল?

—কিন্তু পাত্রীটি কে?—জিজ্ঞেস করতে গিয়েও কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল তার।

—জানবি পরে। আজ রাতে তোর এখানেই থাকব। সব শুনবি।

সন্ধ্যা নামল। আজকে অন্ধকার নয়, চাঁদের একটা উজ্জ্বল টুকরো চোখ মেলেছে আকাশে। জলকা আলোর ঢেউ দুলছে মাঠে, কাঁপছে বাগানের গাছপালায়, রজনীগন্ধার কলিগুলো যেন উন্মুখ হয়ে আছে। সেই বেদী, দু পেয়ালা চা, বাতাস, আর—

—চিত্রা তোকে পছন্দ করে।

—সেকি!

—হুঁ হুঁ, ফিলসফি পড়ালে কী হয়, এখনো পারি এক আধটু। ডিনিটা তো করতে জানি না, সোজা বুঝি বললুম, আমার খাপা ভাগ্নেটাকে এবারে সংসারী করতে চাই। তোমার মতো একটি মেয়ে পেলে বেশ হত। মুখ লাল করে চেয়ে রইল মেঝের দিকে, বললে, 'আমি যাই'। তারপর আমি ওর বাবার কাছে প্রস্তাবটা করে ফেললুম।

শোভন নিথর হয়ে বসে রইল।

—সত্যি কথা বলতে কি, একটু শঙ্কিত হলেন যেন। আস্তে আস্তে বললেন, 'কিন্তু আমরা তো আপনাদের জাত নই, তার ওপর আমার বাবা ব্রাহ্ম হয়েছিলেন।' জবাব দিলুম, 'ও সব আমরা মানি না। কিন্তু আপনি কি ব্রাহ্ম সমাজের বাইরে যাবেন না?' উত্তরে বললেন, 'না, সে রেষ্ট্রিকসন কিছু নেই, তবে আমার স্ত্রীর সঙ্গে একটু কথা কইব। তা ছাড়া মেয়েটা অন্তত গ্রাজুয়েট না হওয়া পর্যন্ত বিয়েটা উচিত হবে কিনা বুঝতে পারছি না। আমি বরং পরে কথা কইব আপনার সঙ্গে।' মনটা খারাপ হল, বুঝতে পারলুম, এ পর্ব এখানেই খতম। এ রকম একটা পাগলামির প্রস্তাব না আনলেই হত,

বিশেষ করে ৩৭। পড়লোক। তারপর কাল দুপুরে ফোনে ফোন এল : 'সন্ধ্যে করে সন্ধ্যার দিকে একবার আসবেন ভীষণ দরকার, কথা আছে।' গেলুম নানা আলোচনা হল, শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়ালো তা এই। মেয়েকে লোকে পছন্দ। এই বাগান এই বাড়ীও তার দারুণ ভালো লেগেছে। কিন্তু মিষ্টার কুণ্ডু বলেছেন, বিয়ের পরে দু'জনকেই ইয়োরোপে পাঠাবেন। ছুই পোলাটি আর ফার্মি পড়ে আসবি, আর চিত্রা যে কোনো একটা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে যাবে।

রূপকথা! একটা ঘোর যেন তৈরী করে তাকে ঘিরে। তার মনের কত কামনা এমন করে কোনোদিন যে সত্যি হয়ে উঠতে পারে, স্বপ্নেও কি কেউ সে কথা ভাবতে পেরেছিল কোনো দিন।

—কিরে, কথা বলছিস না যে?

শোভন ঘুম থেকে জেগে উঠল। অস্পষ্ট গলায় বললে, এখনো যেন ঠিক বুঝতে পারছি না মামা। সমস্ত জিনিসটাই অত্যন্ত আনরিয়াল মনে হচ্ছে আমার।

যা আনরিয়াল তা-ই রিয়াল হয়ে উঠবে।—মামা শব্দ করে ভাগনের পিঠ চাপড়ে দিলেন : চিয়ার আপ মাই বয়, চিয়ার আপ!

শুধু সামনের আকাশে চাঁদটা সকৌতুকে চেয়ে রইল মুখের দিকে। আর বাতাসে একটা গন্ধের ঝলক এসে মুখে পড়ল, মনে হল, সেই রাত্রে কুটারে আসতে আসতে অনীতার মৃদু-সুরভিত স্পর্শ, তার এক একটা আঁচলের ঢেউয়ে।

কিন্তু কী বলেছিলেন মুকুন্দবাবু? কিসের আভাস দিচ্ছিলেন তখন?

চাঁদের ওপর মেঘের ছায়া পড়ল কোথা থেকে।

—দশ—

নানা আলোছায়ার ভাবনা, মনের ভেতর নানা স্বপ্নের আসা যাওয়া। আশ্চর্য, চিত্রা আসছে তার জীবনে; সামান্য দেখা, এতটুকু আলাপ, গভীর পরিচয়ের সুযোগ পর্যন্ত হল না, অথচ মামা সোজাসুজি বিয়ে ঠিক করে ফেললেন। এ যেন বাঙালী পরিবারের চিরকালের ইতিহাস, বিয়ের প্রস্তাব উঠল, পাত্র-পাত্রী পছন্দ হল, এইবার সাত পাকে ঘুরিয়ে দিলেই হয়।

মামা প্রাচীন পন্থী লোক। পূর্বরাগ অনুরাগের গণ্ডগোল বোঝেন না, শুরুতেই বকেয়া মিটিয়ে দিয়েছেন। একেবারে দেনা পাওনার হিসেব পর্যন্ত। তারপরে বিলেতে পাঠাবার বন্দোবস্ত পর্যন্ত হয়ে গেল!

চিত্রা কেন রাজী হল? কী দেখেছে তার ভেতরে?

অথচ নিজের পরিচয় বলতে তো কিছু নেই। শৈলেশ্বর ব্যানার্জি একদা হয়তো জমিদার ছিলেন, কিন্তু তাঁর ইতিহাস তো গৌরবের নয়। আর মা। না—মার কথা সে আর ভাবতেও পারে না, তা হলে তার আর মাথা ঠিক থাকে না।

রূপকথাই বটে।

'আরেগী, মহ্‌বুবা আ জারেগী'—বাঈজী বলেছিল।

বিশ্বাস হতে সাহস হয় না এখনো। মাথার ভেতরটায় কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যায়।

কিন্তু মুকুন্দবাবু কী বলতে চাইছিলেন সেদিন?

জিজ্ঞেস করতে কেমন দ্বিধা হয়। সেই রাত্রিটা। ঝুটারের পেছনে ছায়ার মতো মেয়েটি। তাকে জানা যায় না, বোঝা যায় না, যেন একটা অতল সমুদ্রের ওপারে দাঁড়িয়ে আছে। কী ভাবছিল শোভনের মনে নেই, কিছু ভাবছিল কিনা, তা-ও মনে নেই, সব যেন একটা অপরূপ অনুভূতির মধ্যে ডুবে গিয়েছিল।

অথচ কিসের ইঙ্গিত দিলেন মুকুন্দ মাইতি?

হয়তো সেই রাত্রে কেউ তাদের ঝুটারে আসতে দেখে থাকবে। তাই নিয়ে এক-আধটু গাল-গল্প তৈরি করাও খুব অসম্ভব ব্যাপার নয়। কিন্তু ঠিক কি হয়েছে, কেনই বা মুকুন্দবাবু ওভাবে বলতে বলতে থেমে গেলেন, এই চিন্তাটাই কাঁটা হয়ে বিঁধছে মনের ভেতর।

মনোহর চিঠি নিয়ে এল।

পড়তে পড়তে হৃৎপিণ্ড ধক্ করে উঠল শোভনের।

মামার চিঠি। মাত্র গুটিকয়েক লাইন।

'পরশু, মানে রবিবার সবাই আসছি আবার। খাওয়া-দাওয়ার একটু বিশেষ ব্যবস্থা রাখিস, জানিসই তো এ যাত্রা ব্যাপারটা একটু আলাদা। সামনে সব কথা হবে।'

সবাই কথাটায় নীচে লাল কালির দাগ টানা অর্থটা পরিষ্কার করে দিয়েছেন।

আবার ঝড় উঠল হৃৎপিণ্ডে, বুকে মাতলামি জাগল, তারপর সব মিলিয়ে গেল সেই নেশাভরা স্বপ্নের মধ্যে। 'মেয়ে জিন্দ্‌গী আছেরে মে'—'

মুকুন্দবাবু দরজার সামনে এলেন একবার। শোভন টেরও পেল না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইতস্তত: করলেন ভদ্রলোক, তারপর নিঃশব্দে ফিরে গেলেন আবার। আজও কিছু বলতে চাইছিলেন, কিন্তু বলা হল না।

সেই গাড়িটা এসে থামল। সেই বড়ো গাড়ীটা।

মামা নামলেন, মিষ্টার কুণ্ডু নেমে এলেন। চকিতের জন্যে উৎসুক ব্যাকুল দৃষ্টি একবার ঘুরে গেল শোভনের। না—চিত্রা আসেনি। আজো আসেনি।

শোভনের দৃষ্টি লক্ষ্য করে একটা মৃদু হাসি ফুটে উঠল মামার ঠোঁটের কোণায়। তাঁর চোখের ইঙ্গিত লক্ষ্য কোরে শোভন এগিয়ে গেল মিষ্টার কুণ্ডুর দিকে। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল তাঁর।

সস্নেহে ভদ্রলোক তুলে ধরলেন শোভনকে। বললেন, থাক, থাক। ভালো আছো তো?

মনের দিক থেকে যেন অনেকখানি তৈরি হয়ে এসেছেন। আজ আর আপনি বলবেন না।

শোভন নিঃশব্দে মাথা নাড়ল। মনের ভেতরে নিরাশায় বিষণ্ণতা। 'চিত্রা আসেনি।

—ভেতরে আসুন।

সেই বসবার ঘর। আজ একটু আলাদা করে সাজানো। ফুলদানিতে টাটকা ফুল। মনোহর বুঝি করে কয়েকটা ধূপ জেলে দিয়েছিল, ধূপ আর ফুলের গন্ধে ঘরটা আমন্থর। জানলা-দরজায় নতুন পর্দা, নতুন টেবিলক্লথ। কিন্তু সব আয়োজন যেন ব্যর্থ হয়ে গেছে এমনি মনে হতে লাগল।

তিনজন বসলেন। শোভন মাথা নামিয়ে চেয়ে রইল কার্পেটের দিকে। মনোহর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল চায়ের ব্যবস্থা করতে। মামা আড়চোখে একবার তাকালেন শোভনের দিকে। হেসে বললেন, চিত্রা আজকে কিছুতেই আসতে চাইল না।

আমরাও আর জোর করলুম না।

লজ্জায় আসেনি। কিন্তু কেন এই লজ্জা? পাঞ্জাবী মেয়েদের মতো শক্ত শরীরের গঠন। এককালে নাকি হেডস্যার জন্য তোলপাড় করে সাঁতার দিয়েছে সে। এটুকু নিতে পারল না স্পোর্টসম্যানের মতো?

মিষ্টার কুণ্ডু নীরবে পাইপ টানলেন কিছুক্ষণ। চেয়ে রইলেন শোভনের দিকে, যেন নতুন করে দেখছেন তাকে, বিশ্লেষণ করে বুঝে নিতে চাইছেন আবার। অস্বস্তিতে সর্বাঙ্গ জ্বালা করতে লাগল শোভনের। এভাবে পরীক্ষা দিতে তার ভালো লাগছে না—মনের ভেতর কোথায় যেন বেসুরো হয়ে যাচ্ছে সমস্ত।

মিষ্টার কুণ্ডু গলা পরিষ্কার করে নিলেন একবার। বললেন, তা হলে কাজের কথাটা আলোচনা করে নেওয়া যাক ডক্টর ঘোষাল!

উইডোয়ার গ্রন্থকীট মামা ছেলে মানুষের মতো খুসি হয়ে উঠলেন। যেন কথাটার মধ্যেই মুখিয়ে ছিলেন এতক্ষণ, উৎসাহের সঙ্গে বললেন, নিশ্চয় নিশ্চয়।

মিষ্টার কুণ্ডু অ্যাশ-ট্রেতে পাইপটা ঝাড়লেন কিছুক্ষণ আবার চোখ তুলে চাইলেন শোভনের দিকে।

—শুনেছ বোধ হয়, ডক্টর ঘোষাল আমার সঙ্গে তোমার ম্যারেজ প্রোপোজাল এনেছেন।

শোভন তেমনি মাথা নামিয়ে রইল, জবাব দিল না।

—ডক্টর ঘোষাল আমাদের অত্যন্ত আপনার জন, আমরা সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করি। তাঁর সঙ্গে একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠলে আমার দিক থেকে সেটা খুবই আনন্দের বিষয় হবে। আমি নিজে বিজনেস ম্যান, তোমার মত এক্টারপ্রাইজিং অ্যাকটিভ ছেলে আমার ভালো লাগে। তাছাড়া আমি আমার মেয়ের সঙ্গেও তোমার সম্পর্কে ক্র্যাঙ্কলি আলোচনা করেছি। দেখলুম, তোমার সম্পর্কে তার—একটু থেমে গিয়ে বললেন, শ্রদ্ধা আছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, 'ইজ্‌ নট্‌ ইট্‌ টু আর্লি? এত সহজেই কি কাউকে চেনা যায়?' সে জবাব দিয়েছে: 'ফার্স্ট ইম্প্রেশন মানুষকে ঠকায় না বাবা। তাছাড়া পাঁচ বছর দেখেশুনেও তো শেষ পর্যন্ত ভুল হয়ে যায়।' আমি বললুম, 'রাইট।'

শোভনের বিরক্তি লাগছিল। কী দরকার ছিল এ-সব কথা তাকে শোনাবার। মনের দিক থেকে কি এখনো ঠিক নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি ভদ্রলোক? চিত্রার একটুখানি মোহ আর মায়ার আগ্রহেই কি এতখানি এগিয়ে এসেছেন তিনি? চিত্রাকে নিয়ে শোভন মনে মনে স্বপ্ন গড়ত, বেশ ছিল। কিন্তু কেন সমস্ত জিনিসটাকে মামা এমন কুৎসিতভাবে উদ্ঘাটিত করে দিলেন, কি প্রয়োজন ছিল এইসব স্থূল বৈষয়িকতাকে খুলিয়ে তোলবার?

মনোহর টেবিলে চা আর জলখাবার সাজিয়ে আনল। মিষ্টার কুণ্ডু বললেন, কী সর্বনাশ—এত কেন?

—আরে কুটুম হতে যাচ্ছেন, এখন তো আদর-আপ্যায়ন একটু দরকার। —মামা হা হা করে হেসে উঠলেন, কিন্তু তাঁর হাসিটা শোভনের কানে কুশ্রী ঠেকল। মামা বৈষয়িক নন, সংসার বোঝেন না, কিলসফির পাতা থেকে সোজা জীবনে নেমে আসতে চান। কিন্তু মিষ্টার কুণ্ডু অতোখানি ভাবসর্বস্ব নন: শোভন স্পষ্ট অনুভব করল, ভদ্রলোকের কপালে যেন একটুখানি ছায়া ঘনিয়ে রয়েছে; মামার অনুরোধে আসতে হয়েছে বটে, কিন্তু যাচাই করবার পর্বটা এখনো যেন তাঁর শেষ হয়নি।

বলতে চেয়ে করল, দরকার নেই, চিত্রাকে নিয়ে চলুন ফটারে কিংবা ঘুমভাঙা রাতে যে-স্বপ্ন আমি দেখি, তা-ই আমার সত্য হয়ে থাকুক, তার বেশি কিছুই আমার চাই না। কিন্তু মামার চোখ দুটো যেন আগ্রহে জ্বলজ্বল করছে—যেন এই বিয়েটার ওপরে শোভনের নয়, তাঁরই ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে সমস্ত।

মামা বললেন, নিন—নিন, আগে চা-টা শেষ হোক।

ফিঙার বোলে হাত ধুয়ে চা নিষ্টির সদ্গতি চলল কিছুক্ষণ। মামা সন্দেশের তারিফ করলেন, আরো কেক চেয়ে নিলেন—এত খুসি হয়ে এমন করে খেতে এর আগে কোনোদিন শোভন তাঁকে দেখেনি।

চায়ের পাট শেষ হল। পাইপ ধরিয়ে আবার কথা শুরু করলেন কুণ্ডু।

—পেলটি ইজ্ এ ভেরি থিং। এখন তো তার দারুণ প্রসপেক্ট্। ওর সঙ্গে একটা ডেয়ারী আর পিগারি লার্জ স্কেলে করতে পারলে আর কথাই নেই। এই আলোচনা করে আমরা ঠিক করেছি, নিতে পারি এসব নিয়ে ইতি করবার জন্যে তোমাকে কন্টিনেন্টে পাঠাব। তুমি সায়েন্স-গ্র্যাজুয়েট, সেদিক থেকেও সুবিধে আছে। এখানে তোমার বাবার আমলের বিশ্বাসী কর্মচারীরা আছেন, বছর দুই তাঁরাই ফার্মটাকে চালিয়ে নিতে পারবেন। আর তা ছাড়া আমিও মাঝে মাঝে লোক পাঠাব, তারা এসে দেখাশোনা করে যাবে। নাউ, টেল মী, এ সম্বন্ধে তোমার কী বলবার আছে?

শোভন একটা ক্লান্ত নিঃশ্বাস ফেলল: আমার বলবার কিছুই নেই।

কথাটা কেড়ে নিলেন মামা: হাঁ, হাঁ, ওর যা বলবার আমিই তো সব বলেছি আপনাকে।

পাইপ থেকে একরাশ ধোঁয়া ছড়ালেন মিষ্টার কুণ্ডু: আমি জানি না, আমাদের সমাজ কিংবা আত্মীয়-স্বজন এতে খুসি হবে কিনা। বাট্ মাই ডটারস চয়েস অ্যাণ্ড্ আই লাইক্ ইট। দ্যাট্স্ ফাইনাল।

আবার সেই অনিশ্চয়তা—নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। সমাজ, আত্মীয়স্বজন, অসম আর্থিক অবস্থা, একটাও ভুলতে পারছেন না। শেষ পর্যন্ত সমস্ত জোরটা দিচ্ছেন ওই একটা কথার ওপর: 'মাই ডটারস চয়েস!' তার সঙ্গে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও যেন জুড়ে দিচ্ছেন 'অ্যাণ্ড্ আই লাইক ইট!'

একটা অদ্ভুত বিস্বাদ অনুভূতিতে মনটা তিক্ত হয়ে যাচ্ছে। আলোচনাটা এখানেই থামা উচিত। কারো অনুগ্রহ চায়না শোভন। মনের আকাশেই চিত্রা জ্বলতে থাকুক চিত্রা নক্ষত্রটির মতো—এই সন্দেহ, অবিশ্বাস আর চাপা অসন্তোষের ভেতর দিয়ে সে কোনোদিন তাকে পেতে চায় না। তার চাইতে ছুটির ফটার আর অন্ধকার মাঠই তার ভালো।

বাইরে যেন আর একটা গাড়ী থামার আওয়াজ এল। হয়তো বড় রাস্তায় কোনো চলতি গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে। শোভনের বিস্বাদ মনটাকে আরো তিক্ত করে দিয়ে মামা বলে চললেন, আমি তো আপনাকে বলেছি মিষ্টার কুণ্ডু, আমার ভাগনে খাঁটি সোনা। ওকে জামাই করলে আপনি ঠকবেন না।

যেন দরাদরির চেষ্টা, যেন বাজারে অচল জিনিস

চালাতে চাইছেন এমনি একটা ভাবের ভঙ্গি।

ভাবছিল, আর কতক্ষণ ধৈর্য ধরতে পারবে, এমন সময় ঘরে ঢুকল মনোহর।

—চ্যাটার্জি সাহেব এসেছেন।

—কে? —ঘরের তিনজনেই চমকে উঠলেন একসঙ্গে।

—ঘোষদীঘির চ্যাটার্জি সাহেব।

মিষ্টার কুণ্ডু জিজ্ঞাসু চোখে চাইলেন শোভনের দিকে। শোভন আস্তে আস্তে বললে, বাবার বন্ধু—রিটায়ার্ড সরকারী কর্মচারী। রাইস মিল করেছেন একটা।

মামা বিরক্ত স্বরে বললেন, বুঝেছি, সেই লোকটা। এমন অসময়ে কেন? আর কি সময় পেল না?

শোভন বললে, আসতে বল।

চ্যাটার্জি ঢুকলেন আধমিনিট পরেই। পরনে খাকি চকপাই, গায়ে শাদা শার্ট, মাথায় শোলা হ্যাট, হাতে ছোট একটা বেত। গোল ভারী চেহারা নিয়ে, জুতোর শব্দে সিঁড়ি কাঁপিয়ে উঠে এলেন তিনি।

শোভন দাঁড়িয়ে উঠল: আসুন, আসুন কাকাবাবু। ভালো আছেন?

চ্যাটার্জি সাহেব জবাব দিলেন না। গম্ভীর কালো-মুখে জিজ্ঞেস করলেন: এঁরা কারা?

—আমার মামা, প্রফেসর ডক্টর ঘোষাল। ইনি মিষ্টার পি. কে. কুণ্ডু, বিজ্‌নেসম্যান।

—নমস্কার।

এ পক্ষ থেকেও প্রতিনমস্কার হল।

চ্যাটার্জি সাহেবের ছুটো কিপ্ত চোখ আবার ঘুরে গেল শোভনের দিকে: তোমার সঙ্গে আমার কিছু প্রাইভেট্ কথা আছে। একটু আড়ালে যেতে হবে।

কথার ভঙ্গিতে শোভনের মন চমকে উঠল। পাওনা টাকা চাইবার পরে সে সম্পর্ক যে রক্ষা করতে আসে, তার কথা এ রকম নয়। শোভন শক্ত গলায় বললে, এঁরা আমার আপনার লোক। যা বলবার এঁদের সামনে বলতে পারেন আপনি।

—বলতে পারি তাহলে এঁদের সামনে?—বিচিত্র-ভাবে প্রতিধ্বনি করেন শ্রীধর।

—স্বচ্ছন্দে।

চায়ের বেতটা টেবিলের ওপর ঠুকে চ্যাটার্জি সাহেব বললেন, তা হলে উত্তর দাও। সেদিন—অর্থাৎ গত সোমবার রাত্রে আমার বাড়ীর আশ্রিতা মেয়ে অনীতাকে ফুটারে করে কলকাতা থেকে ঘোষদীঘিতে পৌঁছে দেবার ছলে পথের মধ্যে তাকে তুমি মোলেস্ট করেছ কিনা?

একটা অস্বাভাবিক আর্তনাদ করলেন মামা। মিষ্টার কুণ্ডুর হাতের ধাক্কা লেগে টেবিল থেকে নীচে আছড়ে পড়ল অ্যাসট্রেটা। শোভন চীৎকার করে দাঁড়িয়ে পড়ল চেয়ার ছেড়ে।

—কী বলছেন আপনি?

টেবিলে আর একবার বেত ঠুকে চ্যাটার্জি বললেন, ডিনাই ইট! শৈলেশ্বর ব্যানার্জির ছেলে তুমি—ইট্‌স ইন্ ইয়োর ব্লাড—এ ছাড়া তুমি আর কী করতে পারো?

শোভন কথা বলতে পারল না, শুধু কাঁপতে লাগল থর থর করে। মামা চিৎকার করে উঠলেন: লায়ার—ওল্ড্ গোট্, বেরিয়ে যান এখান থেকে।

চ্যাটার্জি জবাব দিলেন না। শুধু শোভনের দিকে সেই বেতটা তেমনি করে বাড়িয়ে রেখে হিংস্র পাশবিক গলায় বলে চললেন, ডিনাই ইট-ডিনাই ইট।

মামা বললেন, ইউ—ইউ—ইউ—

—দাঁড়ান ডাক্তার ঘোষাল, ডোন্ট্ এক্সাইটেড। ডিনাই ইট্, শোভন! তুমি সেবার রাত্রে কলকাতা থেকে অনীতাকে ফুটারে তুলে—ডাজন্ট ইট্ রিমাইন্ড দিজ্ ল: থার্টি মাইল্‌স?

কে অনীতা?—মামা চিৎকার শোনার মতো যা তা বলে—

—থামো মামা।—পাংশু মুখে শোভন জবাব দিল: হ্যাঁ অনীতা—আপনার বাড়ির সেই মেয়েটিকে ফুটারে তুলে নিয়ে ত্রিশ মাইল পথ পেরিয়ে এসেছিলাম আমি। কারণ সেদিন ট্রেন ছিল না, বাস ছিল না, তার ফেরবার কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু—

কিন্তুর পরের অংশটা মামা আর শুনতে পেলেন না—ধপ করে বসে পড়লেন চেয়ারের ওপর। আর এইবার মিষ্টার কুণ্ডুর হাত থেকে পাইপটাও খসে পড়ল মেজেতে।

(৬৮২ পৃষ্ঠায় দেখুন)

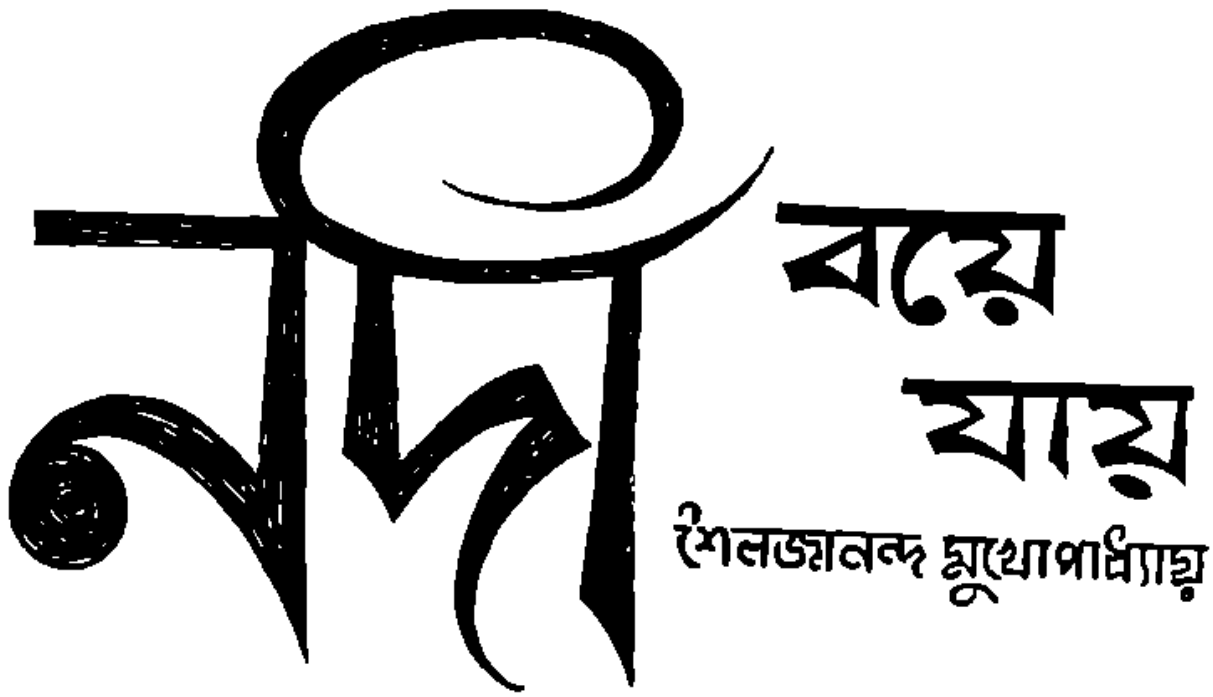

[জগন্নারায়ণ বাবুর খাসকামরা। রাত নটা

ঘরটি ছোট্ট আরাম কেদারায় সাজানো। ডাইনে বাঁয়ে দুটি দরজা, তবুও পর্দা ঝোলানো। পিছন দিকের দেওয়ালে দরজা নেই, দুদিকে দুটি প্রমাণ সাইজের জানালা, তার ওপর পর্দা। প্রকাশ্য স্থানে একটা বড় ডেট্-কার্ড। তার ওপরে কার্ডে তারিখ দেখা যাচ্ছে "২৯শে নভেম্বর"।

ঘরে একা জগন্নারায়ণবাবু। মনে তার একটা অস্ফুট চঞ্চলতা। চেষ্টা সত্ত্বেও স্থির হতে পারছে না। কখনও বসছে, উঠছে, পায়চারি করছে, খবরের কাগজখানা টেনে নিয়ে পড়বার চেষ্টা করে আবার বিরক্তভরে সেটা ছুঁড়ে রাখছে।···

হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। কী যেন ভাবে মনে মনে, সংকল্প স্থির করে। বাঁদিকের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। হাত দিয়ে পর্দাটা সরাতে যেন দ্বিধা জাগে—হাত সরিয়ে নেয়। তারপর যেন বেপরোয়ার মতোই একটানে পর্দাটাকে টেনে একপাশে সরিয়ে দেয়।···

জানালাপথে দৃষ্টি গিয়ে পড়ে ভিতর মহলের দোতলার একটা ঘরের খানিকটা অংশে। ঘরের জানালাটা ভিতর থেকে বন্ধ। কাঁচের পাল্লা। ভিতরে আলো জ্বলছে। জানালার কাছে সিনুয়েট্ সৃষ্টি হয়েছে—একটি নারী দোলা দিচ্ছে একটি দোলনায়।···

একদৃষ্টে সেদিকে চেয়ে থাকে জগন্নারায়ণবাবু।

হঠাৎ দোতলার ঘরে আলো নিভে যায়। জানালা অন্ধকার হয়ে যায়। জানালার পর্দা টেনে দিয়ে জগন্নারায়ণবাবু ফিরে তাকায়। দেখা যায় তার চোখমুখে ফুটে উঠেছে অসহ্য ব্যথা আর দুঃখ।

সহসা কী যেন মনে পড়ে যায় জগন্নারায়ণ বাবুর। পকেট হাতড়ায়—তারপর টেনিল, সোজা ; কী যেন খুঁজেও পাচ্ছে না। খোঁজার সঙ্গে সঙ্গে অস্থিরতা আর বিরক্তি তাঁর বেড়ে চলে। আপনমনেই বলে চলেন—]

জয়। কোথায় গেল?···কোথায়? কোথায় রাখলুম?···
(খুঁজতে খুঁজতে টেবিলের একটা ড্রয়ার টানতেই মুহূর্তে তার সব বিরক্তি দূরে চলে যায়। আস্তে ড্রয়ারের ভিতর থেকে টেনে বার করে একটা ছোট বাক্স—চুরুটের বাক্স। বাক্সশুদ্ধ একটা চুরুট বার করে ধরিয়ে নেয়। পরম পরিতৃপ্তিতে বারকতক ধোঁয়া ছাড়ে।)

জয়। আঃ!

[আবার উঠে দাঁড়ায়। ঘরের আলোটাকে ভীম করে রাখে। জানলা, চুরুটের বাক্সটা চোখে পড়ে যায়। আবার গিয়ে দাঁড়ায় বাইরের জানালায়। পর্দা সরিয়ে দেয়। আবার সিগারেট। জোলো আর লাগছে না। বাতী বসে আছে। সজলনয়না। চোখ মুছছে মাঝে মাঝে।···

এক মুহূর্ত সেদিকে চেয়ে থাকে জয়নারায়ণ।

হঠাৎ অদূরে বেপথু হতে পদশব্দ কানে যেতেই চমকে উঠে জানালার পর্দা টেনে দিয়ে সরে আসে ঘরের মাঝখানে।

ঘরে ঢোকে গৌরমোহন আর উমেশ।]

উমেশ। বসুন—বসুন গৌরমোহন বাবু।

জয়। কেথলে উমেশ?

উমেশ। আজ্ঞে হাঁা, এই তো দোরে আসছি।

জয়। আপনি সব শুনেছেন গৌরমোহন বাবু?

গৌর। হাঁ, উমেশবাবু আমাকে সব কথাই খুলে বলেছেন।

জয়। ঐ আমার এক মেয়ে। ষোল বছরে বিধবা হোল। যতদিন বাঁচবে, আমারই চোখের ওপর কেঁদে কেঁদে বেড়াবে, সে আমি সহ্য করতে পারলো না। বিয়ে যখন ওর আবার দেবো বলেছি, তখন দেবোই। ভয়ানক জেদী মানুষ আমি।

উমেশ। হাঁ, জেদ বটে জয়নারায়ণ বাবুর। শোনা ছিল "গোয়ের গোঁ", তাও তার মানে ওঁর জেদের কাছে। সেবার হোল কী জানেন গৌরমোহন বাবু?

গৌর। কী?

উমেশ। ওঁর করলার খাদে আগুন ধরে গেল। হৈ হৈ ব্যাপার। ম্যানেজার মুখ শুকিয়ে ছুটে এলো।

উনি বললেন—"তার কী, আমি আগুন নিভিয়ে দিচ্ছি"। নামলেন খাদে। কারো সাহায্য নিলেন না। তিনটি বছর ধরে সেই আগুনের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন।

গৌর। নিভলো আগুন?

উমেশ। লাগল! পুরো খাদ জুড়ে গেল সারাটা খাদ। তাও নামলেন। তবু গোঁ ছাড়লেন না। ঐ যে বলেছিলেন—"কারো সাহায্য নেবো না," নিলেন না।

জয়। সে আগুন শেষে সহজ কৌশলেই লাগলেন গৌরমোহন বাবু, লাগলো আমার সংসারেও। সেদিন থেকে পুড়তে সুরু করে গেল, সেই দিনই পুড়লো আমার সংসারও কপাল।

[অতীত স্মৃতিতে জয়নারায়ণ আবার হিংস্র অন্যমনস্ক হয়ে পায়চারি সুরু করে।

হঠাৎ আবার ঘুরে ওঠে]

জয়। ওরটি পাত্র দেখেছি। খুব সুন্দর চেহারা। বিদবা বিয়ে হিন্দু সে করবে না। ছেলে থাকলে তো নয়ই। তাই—

গৌর। মাতৃহীনাকে আমার অনাথ আশ্রমে লুকিয়ে রাখতে চান?

জয়। হাঁ।

গৌর। আপনার মেয়ে কিন্তু খুব কান্নাকাটি করছে, দেখলাম। ওঁর মত নিয়েছেন?

জয়। না, দরকার হবে না।

গৌর। মেয়ে আপনার ছোট নয় জয়নারায়ণ বাবু। মতটা নিলে ভালো করতেন।

জয়। সেটা আমি বুঝবো। মেয়ে আমার। বিয়েও আমি দিচ্ছি। আমার জেদ আপনি জানেন না!

উমেশ। ওরে বাপ, সেবার সেই তিন ওয়াগন কয়লা নিয়ে কী কাণ্ড! এক জনের মাল। আর এক ব্যাটা বনী এসে বলে—"আমার দিন চুক্তুর, দশহাজার দিচ্ছি!" উনি বললেন "কথার খেলাপ আমি করি না, দশ লাখ পেলেও!" কত কান্নাকাটি—

জয়। আঃ, উমেশ! তুমি থামবে?

উমেশ। আজ্ঞে, আপনি আদেশ করলেই থামবো।

জয়। করছি আদেশ।

উমেশ। আজ্ঞে, আমিও থামলুম।

জয়। আপনার মত কী বলুন, গৌরমোহন বাবু! রাজী?

গৌর। আশ্রমটা আমার অনাথ আশ্রম। অনাথদের রাখাই বিধি।

জয়। সব নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে।

গৌর। এ আমার নিজের হাতে গড়া আশ্রম। পথে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম একটি অনাথ শিশুকে। তাই নিয়েই সুরু। আজ হয়েছে তারা অনেকগুলি। পেটও তাই অনেকগুলো, পরণের পোষাকও জোগাতে হয় অনেকগুলির। আর কোনও দান নেই। টাকার জোগাড় আমাকেই করতে হয় দোরে দোরে, পথে পথে ভিক্ষে করে। তাই ভাবছি—

উমেশ। আহাহা, সে কথা আগেই তো আমাদের হয়ে গেছে। পাবেন, টাকা পাবেন।

গৌর। আপনি মহালোক। খরচ নয়, চাঁদা হিসেবে নেবো যা দেবেন।

উমেশ। হেঁ হেঁ হেঁ, টাকা বড় চীজ! টাকায় দুনিয়া বশ হয়, আর তুচ্ছ এক অনাথ আশ্রমের স্বামীজী বশ হবেন না?

গৌর। (আহত কণ্ঠে) উমেশ বাবু!

উমেশ। কী? অমন ফোঁস করে উঠলেন যে?

গৌর। আপনারা অন্য ব্যবস্থা দেখবেন। আমি উঠলাম—(উঠতে যায়)

উমেশ। দ্যাখো কাণ্ড! এতে রাগ করার কী হোল?

জয়। বসুন গৌরমোহন বাবু! আমি কথা বলছি আপনার সঙ্গে।...উমেশ!

উমেশ। আজ্ঞে, সত্যি কথাটা বলেছি বলে—

জয়। কথা তোমায় বলতে মানা করেছিলাম না?

উমেশ। আজ্ঞে, আপনার সঙ্গে কথা তো বলিনি।

জয়। কারো সঙ্গে বলবে না।

উমেশ। যে আজ্ঞে।

জয়। বেশ, আপনার কথাই থাক গৌরমোহন বাবু! "খরচ" বলুন, আর "চাঁদাই বলুন, টাকার দাম তাতে কমে না। বেশ, মাসে মাসে আপনার আশ্রমের জন্য একশো টাকা করেই চাঁদা আমি দেবো।

গৌর। ধন্যবাদ!

উমেশ। এঁচেছে! কী করে একশো টাকা বলে দিলেন? ঐটুকু একটা বাচ্চা—

জয়। আবার?

উমেশ। আজ্ঞে, থাক তবে! আপনার টাকা, ওড়ান-ছড়ান, আমার কী? আপনার মর্জি।

জয়। শুধু একটা কথা, গৌরমোহন বাবু!

গৌর। বলুন।

জয়। অভয়ের মানে আমার নাতির যেন কোনও অযত্ন না হয়।

গৌর। মনে থাকবে কথাটা।

জয়। তাহলে কালই সকালে এসে ওকে নিয়ে যান!

গৌর। কালই?

উমেশ। হাঁ, শুভস্য শীঘ্রম্!

জয়। পরশু বিয়ে। (ডেট-কার্ডের কাছে গিয়ে সেটাকে দেখিয়ে বলে) আজ ২৯শে নভেম্বর। ১লা ডিসেম্বর গোধূলী লগ্নে বিয়ে।

গৌর। বেশ, তাই হবে। আমি উঠি এবার?

জয়। আসুন।

গৌর। নমস্কার।

জয়। নমস্কার।

উমেশ। চলুন, আপনাকে আগিয়ে দিই।

গৌর। কিছু দরকার নেই উমেশ বাবু। একা পথচলার অভ্যাস আমার অনেক দিনের। (প্রস্থান)

জয়। উমেশ!

উমেশ। আজ্ঞে?

জয়। সব ব্যবস্থা তৈরী?

উমেশ। আজ্ঞে, অনুষ্ঠানে কোনও ত্রুটি রাখিনি।

জয়। হুঁ!

উমেশ। কী ভাবছেন অত?

জয়। ভাবছি, এতবড় একটা মিছে কথা বলে বিয়ে দেবো, শেষে যদি সব জানাজানি হয়ে যায়?

উমেশ। কিস্যু হবে না। আর বিয়ের পর দু'একটা ছেলেমেয়ে হয়ে গেলে দেখবেন—তখন আর জানাজানি হলেও কিস্যু হবে না।

জয়। হুঁ! আচ্ছা—চুপিচুপি দেখে এসো তো সরমা

কী করছে? খুব সাবধান! ও যেন টের না পায়।

উমেশ। আজ্ঞে, চামচিকেতেও টের পাবে না।

[প্রস্থান]

চিন্তামগ্নভাবে জয়নারায়ণ আবার পায়চারি সুরু করে। নিঃশব্দে পিছন হতে প্রবেশ করে করুণাময়ী। জয়নারায়ণ টের পায় না।

জয়। কোনও মানে হয় না, শুধু সংস্কার, কীসের ভয়?

করুণা। আমি কিন্তু ভয় পাচ্ছি খুব।

জয়। (চমকে ওঠে) কে? (ঘুরে দাঁড়ায় করুণার দিকে) তুমি, কখন এলে?

করুণা। অনেকক্ষণ।

জয়। কিন্তু তোমার তো এতো শীগ্‌গীর ফেরার কথা নয়?

করুণা। সেটার চেয়ে বড় কথা হোল এই যে এই জন্যেই কি তুমি আমাকে বাপের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছিলে?

জয়। (বিব্রত হয়ে পড়ে। করুণার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে চোখ নামায়) হাঁ।

করুণা। ভাল করে ভেবে দেখছো কী তুমি করতে চাইছো?

জয়। হাঁ।

করুণা। তবু এ-বিয়ে তুমি দেবেই?

জয়। হাঁ।

করুণা। মানবে না আমার মানা?

জয়। মানতে পারবো না। আর এতে সরমার ভালোই হবে। তুমি—তুমিই বা কীরকম মা করুণা? নিজের মেয়েকে ভালবাসো না?

করুণা। তোমার অনেক সাহস। একথা কোনও মাকে জিজ্ঞাসা বোধহয় তুমিই প্রথম করলে।

জয়। তবে কেন ভালো চাওনা তার? ঐটুকু—মেয়ে বিধবা। এই দুনিয়া, আলো-বাতাস-রঙ-আনন্দে ভরপুর দুনিয়া। ও কেন এখানে সর্বহারা, সর্ব-বঞ্চিতা হয়ে থাকবে? কেন? কোন অপরাধে?

করুণা। তাহলে আমায় বিশ্বাস করতে বলছো যে মেয়ের ভালোর জন্যেই আবার তুমি তার বিয়ে দিচ্ছো?

জয়। নিশ্চয়।

করুণা। মিছে কথা।

জয়। করুণা!

করুণা। কাকে বঞ্চনা করছো? আমায়, না নিজের মনকে? ভয় নেই। এখানে বাইরের কেউ নেই যে আসল কথাটা বেফাঁস হয়ে যাবে। যা সত্যি, তা তুমি জানো,—আমিও জানি।

জয়। কী সত্যি? সরমাকে আমি ভালবাসি না? তার ভালো কামনা আমি করি না?

করুণা। পাগল হতে আমার হয়তো আরো কিছু দেরি আছে, রায়। তাই অত বড় অভিযোগ আনবো না বাপের মনে। কিন্তু—সরমার ভালোর জন্যে যতো না এই বিয়ের আয়োজন, তার চেয়ে অনেক বেশি করে চাও তুমি নিজের স্নেহটাকে বজায় রাখতে।

জয়। (চমকে ওঠে) করুণা!

করুণা। (অনুত্তেজিত তীক্ষ্ণ কণ্ঠে) হাঁ! তাই। তোমাকে আমি চিনি, রায়। নিজের ছেলের চেয়ে বড় তোমার কাছে আর কেউ নয়। তোমার সেই ছেলের যূপকাঠে বলি দিচ্ছো তুমি সরমাকে।

জয়। তুমি অনেক এগিয়ে যাচ্ছো, করুণা।

করুণা। তবু অধিকারের সীমা আমি ছাড়াইনি। হাঁ, ছেদ! চিরকাল এই ছেদের ভারেই তুমি চলেছো। এই ছেদের বশেই তুমি কারো মানা না শুনে তেরো বছরে সরমার বিয়ে দিয়েছিলে।

জয়। ভুল করেছিলাম। আজ তাই প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করেছি।

করুণা। সেদিনও কিন্তু বলেছিলে—মেয়ের ভালোর জন্যেই অল্প বয়সে তার বিয়ে দিচ্ছো।

জয়। সেদিন আমার সেই ধারণাই ছিলো।

করুণা। সেদিনও যে-ছেদ ছিলো তোমার, আজো তাই আছে। আর কিছু নয়। শুধু ছেদ।

জয়। (তীব্র প্রতিবাদের চেষ্টায়) না।

করুণা। ঐ ছেদের বশেই তুমি বরাবর সর্বনাশ করে এসেছো—নিজের, আমার, সরমার, সবার!

জয়। (আর্তকণ্ঠে) করুণা!

করুণা। হাঁ, সবার! তোমারই ছেদের বশে আমাদের

প্রথম সন্তান খোকা—আজ বাড়ী ছাড়া।

তুমি তাকে বাড়ী ছাড়া করেছ!

জয়। মিছে কথা! বাপের অমতে বিয়ে করে তোমার উপযুক্ত ছেলে বাড়ী ছেড়েছে।

করুণা। কেন তুমি সবার ওপর নিজের মত খাটাতে যাবে? কেন তুমি তোমার ইচ্ছে মতই ছেলে-মেয়ে দু'জনেরই বিয়ে দিতে চাইবে? কীসের তোমার এত অধিকার?

জয়। আমি তার বাবা। কেন সে জেদ করলো ঐ মেয়েকেই বিয়ে করবে বলে?

করুণা। তুমি ভুলে গিয়েছিলে যে জেদী বাপের ছেলেও জেদী হয়। তোমার রক্ত তারও গায়ে। তোমারই ছেলে সে।

জয়। তার সঙ্গে আর আমার কোনও সম্পর্ক নেই। সে আমার কেউ নয়।

করুণা। কেউই তোমার কেউ নয়। কারো সঙ্গেই তোমার কোনও সম্পর্ক থাকবে না।

[কথা বলতে বলতে উমেশ আসে]

উমেশ। দেখে এলাম—দেখে এলাম যে—(সহসা করুণার দিকে দৃষ্টি পড়তেই) ইস! মা-জননী রয়েছেন! (চলে যাবার উপক্রম করে)

করুণা। উমেশ!

উমেশ। (হাত জোড় করে ফিরে দাঁড়ায়) আজ্ঞে, মা জননী!

করুণা। তুমিও তাহলে এর মধ্যে আছো?

উমেশ। আজ্ঞে, উনি দয়া করে পাশে রেখেছেন।

করুণা। কত টাকা ঘটকালী তোমার?

উমেশ। (জিভ কামড়ে) আজ্ঞে ছি ছি, ওকী কথা বলছেন মা জননী? অনেক নুন খেয়েছি আপনাদের—

করুণা। নিঃস্বার্থভাবে তাই নুনের ইজ্জৎ রাখছো এত্তি করে?

জয়। ওকে কেন মিছে দোষ দিচ্ছো?

করুণা। ওর সামনেই অপমানটুকু বাই বা করলে। কী উমেশ, কথা বলছো না যে?

উমেশ। আজ্ঞে, ভাবছি কথা বলাটা উচিত হবে কিনা?

করুণা। উচিত—অনুচিত থাক। বলো তুমি।

উমেশ। আজ্ঞে মা জননী, ভয়ে বলবো, না নির্ভয়ে?

করুণা। ভনিতা রাখো উমেশ! বলো কী বলবার আছে তোমার?

উমেশ। আজ্ঞে, তাহলে বলেই ফেলি। অপরাধ নেবেন না যেন। মায়ের ওপর ভক্তি আমার আছে—খুব আছে! কিন্তু মায়ের স্বামী যিনি, সম্পর্কে তিনিও তো বড় কেউকেটা নন। তাঁর হুকুম ঠেললে যে মাকেই অপমান করা হয়। সন্তান হয়ে তা করি কী করে মা? তাই মনে করুন—হেঁ হেঁ হেঁ—অপরাধ নেবেন না মা জননী! শ্রীচরণে শত কোটী প্রণাম রইল! [উমেশ চলে যায়]

করুণা। উঃ! সাহস বটে তোমার এই বাহনটির। আমাকে অপমান করার জন্যে তোমরা সবাই দেখছি উঠে পড়ে লেগেছো।

জয়। আমি নই—তুমি। তোমার ঠাঁই সদরে নয়, অন্দরে। তুমি কেন এখানে আমারই সামনে আমাকে অগ্রাহ্য করে উমেশকে ওকথা বলতে গেলে? অপমান তুমি আমাকে করোনি?

করুণা। এ বিয়ে আমি হতে দেবো না।

জয়। বিয়ে আমি দেবোই।

করুণা। বাবা। আমি ওর মা। —অনুরোধ করছি তোমায়।

জয়। আমি ওর বাবা। আমিও তোমায় অনুরোধ করছি, পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াও।

করুণা। যদি না দাঁড়াই?

জয়। স্রোতের মুখে ঐরাবতও ভেসে যায় করুণা।

করুণা। তুমি—তুমি আমায় —ভাসিয়ে দিতে চাও বাবা?

জয়। তোমার খোকা চলে গিয়েছিল। বাধা দিইনি আমি। বাধা আমি কাউকে দেবো না। বাধা কিন্তু আমি মানবোও না। বাধা আপনা হতে সরে যায় ভালোই। নয়তো কাঁটা আমায় তুলে ফেলতেই হবে।

করুণা। পারবে আমাকে তোমার পথ থেকে সরিয়ে ফেলতে? আইনত, ধর্মত, কোনও অধিকারেই তুমি আমায়—

জয়। আইন? আইন আমি কিনে নেবো। আর ধর্ম?

যেটা আমি কর্তব্য বলে মনে করি সেটাই আমার ধর্ম!...(কথার সঙ্গে সঙ্গে টেবিলে ঝুঁকতে দেরু করেছিল চুরুটের বাক্সটা) কোথায় গেল? এইতো এখানে ছিল।...তুমি যাও। সরে দাঁড়াও করুণা। নইলে...আঃ কোথায় গেল।

[করুণা চুরুটের বাক্স বার করলে। জয় চুরুট ধরায়—]

করুণা। টাকা আমারও আছে রায়! আইন যদি আমি কিনি?

জয়। (করুণার সামনে এসে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তীব্র কণ্ঠে চুরুট বার করে) করুণা।

করুণা। (সামনে শুশ্রূষাতে) রায়!

জয়। রায় বংশের কেউ কোন দিন কাউকে ভয় করতে শেখেনি। মেয়েদের তো নয়ই। তুমি যা খুশি করতে পারো। এ বিয়ে আমি দেবোই। যাও— ভেতরে যাও!

করুণা। তুমি বোকা—বোকা, রক্তে বোকা রায়! তোমার ওপর রাগও হয়, মায়াও হয়।

জয়। তুমি যাবে কিনা? করুণা,—এরপরেও আমায় বাধ্য করো না—! যাও—

করুণা। যাচ্ছি! কতো নিচে তুমি নামতে পারো, তা দেখে আমিই লজ্জা পাচ্ছি। মান অপমান-বোধ আজো আমার শেষ হয়ে যায়নি। আর —সহ্যেরও আমার একটা সীমা আছে। (করুণা চলে যায়)

জয়। (জয়নারাণ রাগে গজরাতে থাকে) সাহস! কোথায় পায় অত সাহস আর স্পর্ধা? চিরটাকাল আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে! অনেক সহ্য করেছি! আর নয়!...(চুরুটটা টানতে গিয়ে দেখে—নিভে গেছে। সরোষে সেটাকে আছড়ে ফেলে অবরুদ্ধ আক্রোশে সেটাকে বারবার জুতো দিয়ে পিষতে থাকে। মুখে বলে চলে—)

সাহস। ...স্পর্ধা!...তেজ!...সাহস!...(সহসা কী মনে পড়তেই উচ্চকণ্ঠে ডাকে—)

উমেশ! উমেশ! উ—মে—শ—

[দেখা দেয় নটবর। ছন্নছাড়া হাবভাব। বয়সে জয়নারাণের চেয়ে ক'বছরের ছোট। তান্ত্রিকদের সাজ। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ]

নটবর। উমেশ নেই রায়বাহাদুর! চলে গেছে।

জয়। (সবিস্ময়ে) তুমি! তুমি কখন এলে?

নট। অনেকক্ষণ। করি-ই নিয়ে এলো সঙ্গে করে। এতক্ষণ ধরে হর-পার্বতী সংবাদ শুনছিলাম রায়বাহাদুর।

[হাসতে থাকে। বিচিত্র সেই হাসি। যেন নেকড়ের হাসি—খ্যাকখ্যাক করে—ভয়াল।]

জয়। ও, তাই? তাই এত সাহস আজ করুণার! (নটবর হেসেই চলে)

তুমি—তুমিই মন্ত্রণা দিয়ে ওকে এমন করে তুলেছ।

নট। (হাসতে হাসতে) ভুল হোল রায়বাহাদুর! ওরা মহামায়ার জাত। সলা-পরামর্শের দরকার হয় না। সাহস ওদের এমনিতেই অসীম। শিবের নিন্দের দেহত্যাগও করে, আবার সেই শিবের বুকে চড়ে সেই সেই করে নাচেও! ওরা সব পারে। (হাসতে থাকে)

জয়। থামাও তোমার ও-হাসি! থামাও বলছি—

নট। ভয় পেলেন নাকি রায়বাহাদুর?

জয়। তুমি কেন আবার এসেছ এখানে? আমি মানা করেছিলাম না!

নট। মানা আমি একজনের মানি রায়বাহাদুর! সে আমার ঐ ন্যাংটা বেটি। (হাসতে থাকে)

জয়। কেন তুমি অমন করে আমায় "রায়বাহাদুর" বলে ডাকো?

নট। হাজার হোক—সম্পর্কে ভগ্নিপতি! খাতির করতে হবে না? "রায়সাহেব"-ও বলতে পারতুম। তবে "সাহেব" কথাটা আজ নাকি গালাগাল হয়ে গেছে, তাই "রায়ের" সঙ্গে "সাহেব" না জুড়ে "বাহাদুর" লাগাই। (হাসতে থাকে) ভয় দেখাবেন না রায়বাহাদুর! আমি দূত। অবধ্য!

জয়। দূত!

নট। আজ্ঞে হাঁ। বার্তা এনেছি। নিন—(একটা চিঠি আগিয়ে দেয়)

জয়। কার চিঠি?

নট। মডার্ন মহারাধার!

জয়। (চিঠি পড়ে) "কাঁটা বাধা জোর করে সরাবার দরকার নেই। আপনা হতেই সে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ালো। প্রণাম নিও।—করুণা।"...মানে? করুণা! করুণা,

নট। নেই, রায়বাহাদুর! খাঁচা ফাঁকা।

জয়। নেই? কোথায় গেছে?

নট। সেকালেরই হোক—আর একালের হোক—রাগ করে স্বামীর ভিটে ছেড়ে মহারাধারা যেখানে যায়—বাপের বাড়ি। (হাসতে থাকে)

জয়। করুণা—চলে গেছে!

নট। এতক্ষণ বোধহয় পৌঁছেও গেছে। এবার আমিও আসি রায়বাহাদুর! নমস্কার—।

জয়। নটবর! শোনো! শুনে যাও নটবর!

নট। হুকুমও আমি একজনেরই মানি রায়বাহাদুর! সে আমার ঐ ন্যাংটা বেটি!

[হাসতে হাসতে চলে যায়। কোথা হতে তার হাসি ভেসে আসতে থাকে। অসহ্য মনে হয় জয়নারায়ণের সে-হাসি। কানে হাত চাপা দেয়। হাসি মিলিয়ে যায়।]

জয়। (কণেক পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর) থাক—সবাই থাক। কারো দরকার নেই। আমি জয়নারায়ণ রায়—রায়বাড়ীর জীবন্ত যম—একা থাকবো আমি। কাউকে চাই না, কাউকে নয়।

[বসে পড়ে সোফায়। একটু পরে উঠে দাঁড়ায়। কী যেন সংকল্প আঁটে মনে মনে। চাবি দিয়ে অতি সন্তর্পণে দেরাজ খুলে একটা ফটো বার করে। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে ফটোটার দিকে চেয়ে থাকে। তারপর ফটোটাকেই উদ্দেশ্য করে বলতে থাকে]

জয়। তাড়িয়ে দিয়েছি তোকে? আমি? তুই আমায় ছেড়ে চলে যাসনি? সত্যি করে বল খোকা! বল! তোর জেদটাই বড় হোল? বাপের কথাটা কিছু নয়? তাও—চোখ রাঙালি কেন? কেন একবার মাথা নিচু করে এসে মত চাইলি না? মান যেত তাতে? বেইমান। নেমকহারাম।

[নেপথ্যে একটা জানালা খোলার শব্দ হয়। ত্রস্তে ছবিখানাকে পিছনে লুকিয়ে জয়নারায়ণ ছুটে যায় বাঁয়ের জানালায়। পর্দা সরায়। সেই মুহূর্তে দোতালার খোলা জানালায় দেখা যায় সরমার অশ্রুসজল মুখখানা। চোখোচোখি হতেই ত্রস্তে সে মাথা টেনে নিয়ে জানালা বন্ধ করে দেয়। দোতালার ঘরে আলো নিভে যায়।... যেন কশাহত হয়ে জানালার কাছ হতে সরে আসে জয়নারায়ণ। আপ্রাণ চেষ্টায় আত্মসংবরণে ব্যর্থ হয়ে ফটোখানাকে টেবিলের ওপর আছাড় দিয়ে সে বলে ওঠে—]

জয়। বেইমান! নেমকহারাম! সবাই—সবাই—

[প্রথম দৃশ্যের ইতি আর দ্বিতীয় দৃশ্যের আরম্ভের মাঝে এক মিনিট সময় মঞ্চ অন্ধকার থাকবে। ধ্রুতলয়ে বেজে যাবে সানাই।]

প্রথম অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

[প্রকাশের বাস কামরা।

একটু সেকেলে ধরণে সাজানো। ভারী ভারী আসবাবপত্র—চেয়ার, টেবিল, আলমারী, কৌচ। দেয়ালে বড় বড় অয়েলপেণ্টিং টাঙানো,—পুরুষ ও নারী—চৌধুরী বংশের পূর্বপুরুষীদের প্রতিকৃতি।... একটা ভেট্-কার্ড। তাতে তারিখ দেখা যাচ্ছে—২৯শে জানুয়ারী।

গোধূলি। পিছনের জানালা দিয়ে আকাশের যে অংশটুকু দেখা যাচ্ছে, তা লাল হয়ে উঠেছে অস্তগামী সূর্যাভায়।...

একটা কৌচে বসে আছে প্রকাশ,—অস্থির। পাশেই একান্ত আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে আছে সরমা।]

প্রকাশ। না—না—না! আজ আর কোনও কথা শুনছি না সরমা। এসো—

সরমা। (কুণ্ঠাভরে) না।

প্রকাশ। কেন "না"?

সরমা। আমার—ভীষণ লজ্জা করে।

প্রকাশ। কীসের লজ্জা? তুমি আমার বউ, না পরস্ত্রী? (চমকে ওঠে সরমা) কী—কথা কইছো না যে? বলো—কার বউ তুমি?

সরমা। আপনার।

প্রকাশ। তবে? কেন তুমি এভাবে আমায় কষ্ট দাও সরমা?

সরমা। না—জেনে যদি অপরাধ করে থাকি, আপনি বড়,—ক্ষমা করুন।

প্রকাশ। আর জেনেশুনে যে-অপরাধ করেছ, তার কী হবে?

সরমা। (আবার চমকে ওঠে) এ্যাঁ! কী বলছেন?

প্রকাশ। ঠিকই বলছি। অপরাধ করেছো তুমি—জেনে শুনেই। বুঝতে পারছো—কী অপরাধ?

[সরমা সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে—নিদারুণ বিপন্ন।]

বুঝতে পারছো না কী অপরাধ? (সরমা অত্যন্ত বিপর্যস্তভাবে নেতিবাচক ঘাড় নাড়ে) মিছে কথা! মনের অগোচর পাপ নেই।

সরমা। (থরথর করে কেঁপে ওঠে) পা-প!

প্রকাশ। বলবো? বলে দেবো?

সরমা। (নিদারুণ প্রচেষ্টায় আত্মসংযম করতে করতে) বলুন।

প্রকাশ। কাছে এসো। (সরমা সঙ্কুচিত দ্বিধা-ভরে প্রকাশের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়)। অপরাধ তোমার অনেক। শোনো। এক—তুমি আমায় ভয় পাও। দুই—ডাকলেও কাছে পাইনা তোমায়। তিন—তুমি আমায় ভালবাসো না।

সরমা। না—না—

প্রকাশ। মনে হয় তোমার মনে আমার এতটুকুও ঠাঁই নাই। সেখানে জুড়ে বসে আছে আর কেউ।

সরমা। (আবার চমকে উঠে ত্রস্ত সভয়ে প্রকাশের মুখে হাত চাপা দিয়ে আর্তকণ্ঠে বলে ওঠে) না ওকথা বলবেন না! (প্রকাশ সরমার হাত চেপে ধরে নিজের কাছে টেনে নেয়)

প্রকাশ। সরমা!

সরমা। বলুন।

প্রকাশ। কেন তুমি অমন ঘন-মরা হয়ে থাকো সরমা? কেন তুমি হাসো না, গল্প করো না, জবাব দাও না আমার ভালবাসার? দুদিন অন্তর পালিয়ে যাও তোমার বাপের কাছে। কেন? আমাকে তোমার ভাল লাগে না?

সরমা। লাগে।

প্রকাশ। তবে? না-না, বলো সরমা! আজ আমি শুনবোই। তিন তিনটে মাস কেটে গেছে আমাদের বিয়ের পর। তিনটে মুহূর্তও তোমাকে একান্ত করে পাইনি। কেন তুমি অমন গুমরে বেড়াও?

সরমা। চুপ করে বসে থাকতে ভাল লাগে না।

প্রকাশ। কে বলেছে তোমায় বসে থাকতে? হাসো গল্প করো, গাও! একটা মাস্টার রেখে দিই, গান শেখো।

সরমা। না, গান আমার দ্বারা হবে না।

প্রকাশ। নিশ্চই হবে। ও গলা গানের জন্যই তৈরী হয়েছে।

সরমা। না না, আপনার দুটি পায়ে পড়ি। তার চেয়ে আমায় রান্না বান্না করতে দিন্।

প্রকাশ। পাগল হয়েছ? চৌধুরী বাড়ীর বৌ রান্না করবে, বাসন মাজবে, ঘর ঝাট দেবে? ইম্পসিবল্। আচ্ছা, আমার সঙ্গে গল্প করেই তো তুমি সময় কাটাতে পারো। ভাল লাগে না?

সরমা। লাগে।

প্রকাশ। তবে? (সরমা জবাব দিতে পারে না। চোখ নামায়) চলো তাহলে কাল থেকে রোজ বিকেলে আমরা বজরায় করে গঙ্গায় বেড়াই।

সরমা। না। নৌকোয় আমার ভয় করে।

প্রকাশ। (হেসে ওঠে) সেকী! তাহলে পায়ে হেঁটে বেড়াবো—কেমন?

সরমা। বাবার সঙ্গে যদি কোন দিন দেখা হয়ে যায়, লজ্জায় আমি মরে যাবো।

প্রকাশ। নাঃ, তুমি ভারী সেকেলে সরমা! এতদিন যে তোমার বাবা বিয়ে দেননি,—কী করতে বাড়ীতে? তোমায় দেখতে গিয়ে ভেবে ছিলাম রূপের মতন Smartness ও তোমার আছে। চুপ করে রইলে যে?

সরমা। বেশীরভাগ সময়টাই আমার পাড়াগাঁয়ে কেটেছে। তাই—কিন্তু, ওকথা থাক! বলুন আর রাগ নেই তো?

প্রকাশ। কে বললে নেই? আছে।

সরমা। ক্ষমা করবেন না?

প্রকাশ করতে পারি। এক সর্তে।

সরমা। কী বলুন?

প্রকাশ। প্রথমেই তোমার ওই "আপনি—আজ্ঞে গুলো ছাড়তে হবে।

সরমা। আপনি বড়—তাই—

প্রকাশ। আঃ সরমা! তোমার আমার মাঝে বড় ছোটর কোনও কথা নেই আজ আর। আমরা দুজনেই সমান—এক—তবেই না মিলন হবে সার্থক। বল, ছাড়বে? এক্ষুনি!

সরমা। (হেসে ফেলে) বেশ, তাই হবে।

প্রকাশ। (সোৎফুল্লে) বাঃ বাঃ বাঃ। এই তো হাসি বেরিয়েছে! যেন মেঘের বুকে চকিত বিদ্যুৎ। ইস্—মন হাসি তুমি লুকিয়ে রাখো সরমা? [আরো কাছে টেনে নেয়। গাল টিপে দেয়]

সরমা। এবার হোল?

প্রকাশ। আর একটা কথা।

সরমা। কী?

প্রকাশ। ভালোবাসবে আমায়।

সরমা। বাসি তো।

প্রকাশ। হাই বলো! আরো বাসতে হবে। অনেক অনেক। ডুবিয়ে দেবে আমায় তোমার ভালবাসায়।

সরমা। অত পাবো কোথায়?

প্রকাশ। কেন? আর কোনও ভাগীদার আছে নাকি? (সরমা আবার চমকে ওঠে) রাগ করো না সরমা! এমনিই বলছিলুম। (সরমা কণ্ঠে আত্মসংবরণ করে) রাজী?

সরমা। (চেষ্টাকৃত হাস্যে) একে তাগাদা বলে না ডাকাতি?

প্রকাশ। নিজের ঘরে কেউ ডাকাতি করে না।

সরমা। মাপ করেছ?

প্রকাশ। হাঁ।

সরমা। সন্ধি তাহলে হোল?

প্রকাশ। সন্ধির সর্ত ভঙ্গ হলে আবার যুদ্ধ হবে।

সরমা। আমি আগে থেকেই হার মেনে রাখছি।

প্রকাশ। অপরাধের খেসারত দেবে না সরমা?

সরমা। কী চাই?

প্রকাশ। দেবে?

সরমা। সাধ্যে অবিশ্যি যদি কুলোয়।

প্রকাশ। বেশ দাও তাহলে। (আলিঙ্গনে কাছে টেনে নেয়। ত্রস্তে ছাড়াবার চেষ্টা করে সরমা)

সরমা। আঃ! ছাড়ো! দেখবে যে ওরা! এই ভর সন্ধেবেলা—নাঃ—ছাড়ো—

প্রকাশ। সন্ধে অনেকক্ষণ উৎরে গেছে সরমা। ঐ দেখো—(জানালা দেখায়। সরমা ফিরে চায়। দেখা যায় রাত নেমেছে। কালো আকাশে তারা ফুটেছে)

সরমা। (আয়ত্ত হয়ে) ইস্ এমন করো তুমি! সব কাজ ভুলিয়ে দাও।

প্রকাশ। এমন কি কাজ?

সরমা। বারে, তোমার জলখাবার দিতে হবে না বুঝি? —(প্রস্থানোদ্যত হয়) এখানে আনবো?

প্রকাশ। না, লাইব্রেরীতে পাঠিয়ে দিও। আমি যাচ্ছি সেখানে। কাটা চিঠি লিখতে হবে।

[সরমা আবার প্রস্থানোদ্যত হয়। সহসা কী যেন মনে পড়ায় প্রকাশ ডাকে]

প্রকাশ। ও সরমা, শোনো শোনো! (সরমা ফিরে দাঁড়ায়)

সরমা। কী?

প্রকাশ। এসো না এখানে!

সরমা। (ভয়ে ভয়ে) আবার?

প্রকাশ। (হেসে ওঠে) না-না ভয় নেই। শোন— (সরমা আগিয়ে আসে। প্রকাশ সরমার হাত দুটো ধরে বলে)

প্রকাশ। সেই কঙ্কন জোড়া কোথায় গেল?

সরমা। বড্ড চলচল করতো, তাই খুলে রেখেছি।

প্রকাশ। কোথায়?

সরমা। ঐ আলমারীতে।

প্রকাশ। করেছ কি সরমা। ও হোল চৌধুরী বাড়ীর এয়োতী কঙ্কন। তোমারই মতন এই বংশের আর এক বৌ—আমার প্রপিতামহী সতী হয়েছিলেন—স্বামীর চিতায় জীবন্তে প্রাণ দিয়েছিলেন। ও হোল তারই হাতের কঙ্কন। তারপর থেকে এ বাড়ীর

সব বৌ ঐ কঙ্কন হাতে পরেছেন। (ছবি দেখিয়ে ঐ আমার মা—ঐ ঠাকুমা—সবাই পরেছিলেন। এবার তোমার পালা।

সরমা। (সাতঙ্কে) কিন্তু আমি—আমি—

প্রকাশ। চৌধুরী বাড়ীর দুটো দুনাম লোকের মুখে-মুখে ফেরে। এ-বাড়ীর পুরুষরা ভারত বিখ্যাত জহরৎ-ব্যবসায়ী আর জহুরী। আর আমার সেই প্রপিতামহীর কল্যাণে চৌধুরী-বাড়ীর নাম হয়েছে "সতী-বাড়ী"। সতীনারীর উদাহরণ দিতে হলে লোকে আজো আমার সেই প্রপিতামহীর নাম করে। এ-কঙ্কন হোল এ-বাড়ীর বৌদের—পরম শ্রদ্ধার আর চরম আকাঙ্ক্ষার প্রতীক অলঙ্কার।

(শুনতে শুনতে সরমা ভয়ে, আতঙ্কে বিভ্রান্ত হয়ে ওঠে)

প্রকাশ। খোলো আলমারীটা। (সরমা আলমারী খোলে। প্রকাশ কঙ্কন বার করে সরমার হাতে পরিয়ে দিতে থাকে)

প্রকাশ। অত ভয় পাচ্ছো কেন সরমা?

সরমা। আমি—আমি কি পারবো এ কঙ্কনের মর্যাদা রাখতে?

প্রকাশ। পারবে সরমা! আমার মা পেরেছেন, ঠাকুমা পেরেছেন—তুমিই বা পারবে না কেন?

[সরমা পাথরের মতন দাঁড়িয়ে থাকে। প্রকাশ তার হাতে পরিয়ে দেয় কঙ্কণ। আপনা হতে যেন অবশ দেহে বসে পড়ে সরমা প্রকাশের পায়ের ধুলো নেয়।]

প্রকাশ। আমার নয় সরমা! ওঁদের প্রণাম করো। চৌধুরী-বাড়ীর যত সতী বৌ আশীর্বাদ করবেন নতুন-বৌকে। (প্রকাশ চলে যায়। একটুক্ষণ বিহ্বলে, মুহ্যমান হয়ে বসে থেকে সরমা ছবি গুলোর দিকে চেয়ে বলে ওঠে—)

সরমা। আমায়—আমায় ক্ষমা করো তোমরা! অভিশাপ দিয়ো না! আমি—আমি পারবো না—পারবো না—(লুটিয়ে পড়ে সরমা। দেহটা তার অবরুদ্ধ আবেগে ফুলে ফুলে উঠতে থাকে। মুখ তোলে। চোখ-মুখে ফুটে উঠেছে নিদারুণ বিভীষিকা আর আতঙ্কের চিহ্ন। ঘরে ঢোকে মানদা। হাতে তার একটা ঢাকা দেওয়া গেলাস।)

শরবতের গেলাসটি তুমি নিয়ে যাও।

মানদা। অ দিদিমণি, জামাই দাদার জল খাবার তেনার পড়ার ঘরে দিয়ে এনু গো!

…ওমা, ইকি কাণ্ড! কী হয়েছে গো? (রাখে টেবিলের ওপর)

সরমা। (আর্ত সন্ত্রস্ত কণ্ঠে) মানদা, মানদা! খুলে দেতো এই কঙ্কন জোড়া!

মানদা। ওমা, কেন? এমন সোন্দর কঙ্কন, খুলবে কেনে গো?

সরমা। জ্বালা করছে! ভীষণ জ্বালা করছে হাত দুটো! এবার সর্বাঙ্গে জ্বলতে থাকবে। আঃ, হাঁ করে দেখছিস কী? খোল—শীগ্‌গীর—

[বিস্মিত মানদা কঙ্কন খুলে দেয়]

সরমা। (যেন বিছুটা শান্ত হ… বাঁচলুম। তুই যা 'মানদা'! যা এখন—

মানদা। জামাই দাদার কাছে শরবত নিয়ে যা

সরমা। যাচ্ছি—যাচ্ছি! তুই যা! যা—

মানদা। (অবাক বিস্ময়ে) বুঝিনে দিদি তোমাদের কাণ্ডকারখানা।

[মানদা চলে যায়।

সরমা উঠে দাঁড়িয়ে অতীব সন্তর্পণে আগে চারদিকে লক্ষ্য করে। তারপর আঁচলের চাবি দিয়ে ত্রস্তে আলমারী খুলে কঙ্কন জোড়া রেখে আবার তালা বন্ধ করতে উদ্যত হয়। হঠাৎ যেন কী মনে পড়ে যায় তার। একটু ভাবে। গলার হারের লকেটটাকে নেড়ে চেড়ে দেখে। তারপর ত্রস্তে সেটাকেও খুলে নিয়ে আলমারীতে রেখে চাবি দেয়।

নেপথ্যে পদশব্দ ওঠে। চমকে আবার ঘরের মাঝখানে ফিরে এসে সে শরবতের গেলাস নিয়ে প্রস্থানোদ্যত হয়। তাকতে তাকতে প্রকাশ আবার ঢোকে—]

প্রকাশ। সরমা! সরমা, জানো সরমা, চিঠি লিখতে গিয়ে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল।

সরমা। কী কথা?

প্রকাশ। আজ তোমাদের বাড়ী গিয়েছিলাম যে।

সরমা। আমাদের বাড়ী? হঠাৎ? কখনও তো যাও না।

প্রকাশ। ঐদিক দিয়ে ফিরছিলাম। ভাবলাম—স্বপ্নের মশাইয়ের সঙ্গে দেখাটা করেই যাই।

সরমা। দেখা হোল?

প্রকাশ। না। বেড়াতে বেড়িয়েছিলেন। দেখা হোল একটা পিছনের সঙ্গে। একটা টেলিগ্রাম এনেছিল। আমিই নিলাম সই করে। হ্যাঁ গো, অজয় কার নাম?

সরমা। (চমকে) এ্যাঁ, অজয়! কেন?

প্রকাশ। কোলকাতা থেকে কে এক পৌরোদাস-না-কি-যেন-নাম টেলিগ্রাম করেছে তোমার বাবাকে—মঙ্গলবার রাতে অজয় কোথায় হারিয়ে গেছে—খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

[সরমার হাত থেকে সশব্দে গেলাসটা পড়ে যায়। সে নিজেও টলে পড়ে যাবার উপক্রম হয়।]

প্রকাশ। (সবিস্ময়ে) সরমা! সরমা—

[ছুটে গিয়ে প্রকাশ সরমাকে ধরে ফেলে। সরমা এলিয়ে পড়ে প্রকাশের হাতে।]

প্রথম অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

[জ্ঞানাঞ্জনের বাড়ীর একটা ঘর।

উত্তর সন্ধ্যা। ঘরটি সম্পূর্ণ আধুনিক ধরনে সাজানো। পিছনের জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে অদূরস্থিত গঙ্গার এককালি চিকচিক করছে চন্দ্রালোকে। ডাইনে একটা দরজা। তার ওপর পর্দা-ঝোলানো।

দেওয়ালে দুটি মাত্র ছবি। জ্ঞানাঞ্জনের একখানা ফটো। আর জানালার ঠিক মাথার ওপর বড় একখানা "ম্যাডোনা"।

জানালা আর দরজার মাঝখানে আ-বক্ষ-উচ্চ একটা সুদৃশ্য টিপয়ের ওপর রয়েছে শ্বেত পাথরে-গড়া একটা অজন্তা-রীতির ন-সন্তান-মাতৃমূর্তি।

জানালার পরাদে মাথা ঠেকিয়ে গঙ্গার দিকে চেয়ে আছে মাধবী। গান গাইছে (অথবা, অদূরাগত অদৃশ্য-কণ্ঠের গান শুনছে।)

গানের শেষদিকে ঘরে ঢোকে জ্ঞানাঞ্জন পরণে বিলম্বিত সুট, গলায় স্টেথিসকোপ, হাতে doctor's bag, মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি গোঁফ আর পাইপ, চোখে চশমা. প্রাণ চাঞ্চল্য সত্ত্বেও মুখে চোখে কেমন যেন একটা প্রকাশ্য বিষণ্ণতা।

ঘরে ঢুকে ব্যাগ-স্টেথিসকোপ রাখে টেবিলের ওপর। মাধবী আগিয়ে আসে।]

মাধবী। অনেক দেরি করে এলে।

জ্ঞানাঞ্জন। সরি ডার্লিং! ডাক্তারদের ঘড়ি চলে রুগীর মর্জিমাফিক।

(মাধবী জ্ঞানাঞ্জনের কোট-টাই খুলে নেয়। একটা কৌচে এলিয়ে বসে জ্ঞানাঞ্জন।

জ্ঞান। তারপর? তোমার আজ কী খবর মাধবী?

মাধবী। ভীষণ জ্বালাতন করছে।

জ্ঞান। কে?

মাধবী। কে আবার? ঐ বিচ্ছু!

জ্ঞান। হুঁ! তৈরী থেকো ডার্লিং! ওর জন্যে আরো অনেক জ্বালাতন সইতে হবে তোমায়।

মাধবী। তোমার ঐ এক কথা! ছেলেমানুষ—একটু হৈ চৈ করবে না?

জ্ঞান। মর্নিং শোজ দ্য ডে।

মাধবী। হোক। সে আমি বুঝবো।

জ্ঞান। কিছু বোঝো না তুমি। বুঝলে কেন আমি তোমায় এতো করেও বোঝাতে পারছি না যে পরের ছেলে পথ থেকে কুড়িয়ে এনে ঘরে ঠাঁই দেবার ঝঞ্ঝাট আর দায়িত্ব অনেক। না না, মাধবী, কাজটা ভাল হয়নি তোমার।

মাধবী। খুব ভাল হয়েছে। ঐটুকু ছেলে—দেখলে চোখ জুড়োয়—"মা" বলে এসে গলা জড়িয়ে ধরলো! কিছুতে বুঝবে না যে আমি ওর মা নই। তাকে ফেলে দিতে পারে মানুষে?

জ্ঞান। তোমার আগেও হয়তো—হয়তো কেন, নিশ্চয়ই আরো অনেককে ও অমনি "মা" বলে ডেকেছে। তারা ফেলে দিতে পারলো কী করে?

মাধবী। তুমি কি বলতে চাও, রাস্তার যেকোনও মেয়ের সঙ্গে আমার কোনও তফাৎ নেই?

জান। না। বলতে চাই—এই নিয়ে না ভবিষ্যতে একটা গোলমাল—

মাধবী। কিছু হবে না। আমি সব বুঝতে পেরেছি।

জান। কী বুঝেছ?

মাধবী। ওকে ভগবান আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

জান। হুঁ, ভগবান তাহলে তুমি মানো মাধবী?

মাধবী। বারে, হিন্দুর মেয়ে, হিন্দুর বৌ,—ভগবান মানবো না?

জান। তাহলে একথাটাও বিশ্বাস করো যে সেই আনসীন জেন্টলম্যানের বুদ্ধি বলেও একটা কিছু আছে।

মাধবী। করি বিশ্বাস।

জান। তাহলে একথাটা কেন ভুলে যাও ডার্লিং যে ইচ্ছে থাকলে পরগাছা জন্মিয়ে না দিয়ে তিনি তোমারই কোলে একটা ছেলে দিতে পারতেন।

মাধবী। (আর্তকণ্ঠে) ডাক্তার (পরাহতের মত সে পিছনে সরে যায়। দাঁড়ায় গিয়ে সে ঠিক মাতৃমূর্তিটার পাশে। থরথর করে কাঁপতে থাকে। টিপয়টার ওপর ভর দিয়ে থরথর-কণ্ঠে সে বলে ওঠে—)

তুমি—তুমি আমায় এত বড় কথাটা বলতে পারলে ডাক্তার?

জান। মাধবী! আমি বিজ্ঞানী। সত্যিকথাটা আমাকে মানতেই হয়।

(উঠে গিয়ে দাঁড়ায় মাধবীর কাছে। মাধবী চোখের জল লুকোবার জন্যে মুখ ফিরিয়ে নেয়।)

জান। কেঁদোনা! তোমায় আঘাত আমি দিতে চাইনি। দিতে যে পারি না, তাও তো তুমি জানো। যাও! (পকেট থেকে রুমাল বার করে আগিয়ে দেয় মাধবীর দিকে। রুমালে চোখ মোছে মাধবী।)

মাধবী। তুমি—তুমি একটুও দেখতে পারো না অজয় কে।

জান। অস্বীকার করছি না।

মাধবী। কিন্তু কেন? ঐটুকু ছেলে—কত ক্ষতি তোমার?

জান। এটা রাগের কথা। আমার ছেলে থাকলেও খেতো। তাই তোমার ওকথার জবাব আমি দেবো না।

মাধবী। তবে—কেন তুমি ওকে সইতে পারো না? কী করেছে ও তোমার? কেন তুমি বারবার ঐসব কথা বলে আমায় ব্যথা দাও ডাক্তার?

জান। আমি ডাক্তার, মাধবী। বড় ব্যথা থেকে মানুষকে বাঁচানোর জন্যে ছোট আঘাত আমাকে দিতেই হয়। সারাটা শরীরকে বাঁচাবার জন্যে যেকোনও বিষাক্ত অঙ্গকে অপারেশন করে বাদ দেওয়াই তো আমার পেশা আর সাধনাও।

মাধবী। সোহাই তোমার, ডাক্তার! রুগী তোমার অনেক আছে, অনেক পাবে। আমাকে রেহাই দাও। সারাতে যদি পারবি, দয়া করে আর তাকে মারবার চেষ্টা করো না।

জান। বেশ, তাই হবে। কিন্তু যেদিন ওর বাপ-মা খবর পাবে? সেদিন পারবে ওকে তাদের হাতে তুলে দিতে?

মাধবী। ও বলেছে—অনাথ-আশ্রমে থা

জান। তাতে কী হয়েছে?

মাধবী। (হেসে ফেলে) তুমিও কিছু বোঝো না, ডাক্তার! অনাথ-আশ্রমে যাদের ঠাঁই নিতে হয়, বাপ-মা তাদের থাকে না। এত বোকা তুমি!

জান। শুধু তোমার কাছে।

মাধবী। মিথ্যুক।

জান। নিজেকে কিন্তু আমি মিথ্যে বোঝাই না। হরিণ পেলে—মাংস খাই, চামড়ায় জুতো তৈরী করাই। সোনার হরিণের পিছনেও নিই না, বিশ্বাস করি না।

(নেপথ্যে ভারী কিছু ফেলার দুমদাম শব্দ)

শুনছো?

মাধবী। হঁস! কী যে করি এ দস্যিকে নিয়ে? সব কিছু ভেঙে চুরে তছনছ না করে ছাড়বে না।

জান। অনেক কিছুই ভাংবে ও, তছনছও করবে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

মাধবী। তুমি থামো তো! সবতাতে কথা বলা চাই! ভাঙুক, বেশ করে।

জান। ওকে মাপাধ! খুব ভাঙুক! ফর্দ দিয়ো। আবার নতুন কিনে আনবো।

মাধবী। একদিন এমন মারবো।

জ্ঞান। আমাকে?

মাধবী। যেৎ! ঐ বিচ্ছুকে।

জ্ঞান। মিছে কথা বোলোনা মাধবী! ঐটি তুমি পারবে না।

মাধবী। পারবো না? দেখবে তবে? (প্রস্থানোদ্যত হয়) যোস'—

জ্ঞান। উহুঁহুঁ ও-চেষ্টা করো না।

মাধবী। মারবোই।

জ্ঞান। না।

মাধবী। কেন মারবো না?

জ্ঞান। আমি তাহলে কাকে সামলাবো? কান্না থামাবো কার? ছেলের, না তার মার? (উচ্চকণ্ঠে) আয়া! আ-য়া—

আয়া। (নেপথ্যে) ডাকছেন?

জ্ঞান। অজয়ের দিকে একটু নজর দাওতো! তুমি আর দেওনা কষ্ট করে।

মাধবী। বারণ করছো?

জ্ঞান। হাঁ।

মাধবী। খুব বেঁচে গেল। তুমি বারণ না করলে এমন মারতাম গিয়ে!

জ্ঞান। (আবার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়) ডার্লিং!

মাধবী। তুমি আর ঐ বলে ডেকো না আমায়।

জ্ঞান। সে কি! এতো দিনের অভ্যেস—

মাধবী। অভ্যেস ছাড়তে হবে। ছোট ছেলেরা যা শোনে, তাই বলে। শেষে কোনদিন ঐ বিচ্ছুটাও ঐ বলে ডাকতে সুরু ক'রে দেবে।

জ্ঞান। সত্যিই তো। সেটা তো তাহলে বড় লজ্জার ব্যাপার হবে।

মাধবী। হবেই তো! না ডাক্তার, ওটা বাদ দাও।

জ্ঞান। নাঃ ছেলেটা দেখছি এবার আমায় পথে বসাবে।

মাধবী। হয়েছে! ঐটুকু বাচ্চাকে হিংসে করে না।

জ্ঞান। বেশ, বুকের ব্যথা বুকেই চেপে রাখবো। ভাল কথা, তোমার ঐ বিচ্ছুর জন্যে আজ আমার দফা কিন্তু রফা হয়ে গেছে। তার কী হবে?

মাধবী। কেন? কী হয়েছে?

[জ্ঞানাঞ্জন কোটের পকেট থেকে একটা খেলার রেলগাড়ী বার করে মাধবীর হাতে দেয়। মাধবী প্রথমে বিস্মিত হয়। তারপর তার চোখেমুখে ফুটে ওঠে উচ্ছ্বসিত আনন্দ।]

মাধবী। ডাক্তার!

জ্ঞান। উঁ?

মাধবী। তবে নাকি অজয়কে তুমি ভালবাসো না?

জ্ঞান। না না, এটা শুধু তোমাকে খুশি করার জন্যে! নইলে—আমার বয়ে গেছে—

মাধবী। ধরা পড়ে গেছো ডাক্তার। কার কাছে লুকোবার চেষ্টা করছো?

জ্ঞান। মাধবী!

মাধবী। কী ডাক্তার?

জ্ঞান। অত করে জড়িয়ো না।

মাধবী। ডাক্তার!

জ্ঞান। তুমি জানো কেন আমাদের সন্তান হয়নি?

মাধবী। কেন গো?

জ্ঞান। অভিশাপ আছে আমাদের ওপর।

মাধবী। অভিশাপ? কার?

জ্ঞান। ভুলে গেছো। আমাদেরই মতন আর একটি বাধা আর নাকে—অনেকদিন আগে আমি সন্তানহারা করেছি। একমাত্র ছেলে আমি—বাপমাকে ত্যাগ করে এসেছি।

মাধবী। ডাক্তার!

জ্ঞান। হাঁ তাই। তাই আমাদের সন্তান নেই। হবেও না। নেভার—নেভার—

[কান্না চাপতেই যেন জ্ঞানাঞ্জন পালিয়ে যায়। মাধবী কিছুক্ষণ ব্যথাহত স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর খাতুমূর্তিটাকে আঁকড়ে ধরে নীরব কান্নায় ভেঙে পড়ে।]

প্রথম অঙ্ক

চতুর্থ দৃশ্য।

[জয়নারায়ণের বাসকামরা। সকাল। বাঁয়ের জানালার কাছে বিধবা সরমা দাঁড়িয়ে আছে—উদ্‌ভ্রান্ত। জয়নারায়ণ আর উমেশ।]

জয়। ভাবিসনি মা! খুঁজে পাওয়া যাবেই। তন্ন তন্ন করে চারদিকে খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। ভাবিসনে।

সরমা। ভাবতে আর পারছিও না বাবা।

উমেশ। ভেবো না মা, ভেবো না! যাঁর ভাবনা তিনিই ভাববেন। বেশি ভাবলে শুধু মাথাই বেগড়াবে।

জয়। চেষ্টার তো ত্রুটী করিছি না। আর কি করি বল?

সরমা। আমাকে জিজ্ঞাসা করছো কেন বাবা? যা খুশি কর তোমরা, আমি কিছু জানি না।

জয়। প্রকাশের খবর কী?

সরমা। জানি না।

জয়। চিঠি দেয়নি?

সরমা। দিয়েছে।

জয়। তবে?

সরমা। পড়িনি।

উমেশ। কোথায় চিঠিগুলো মা?

জয়। কেন? সে চিঠি তুমি কী করবে?

উমেশ। পড়ে দেখতাম—বাবাজীর খবরটা কী?

জয়। তুমি পড়বে সেই চিঠি? পাগল না কী!

উমেশ। কিন্তু খবরটাও তো জানা দরকার যে বাবাজী কিছু অঘি করেছেন কি না?—সরমা মা হঠাৎ অমন-ভাবে চলে এলেন—তারপরে আমরা সবাই দশ দশটা দিন কোলকাতায় কাটিয়ে এলাম—বুঝতে পারছেন না? সন্দেহ তো হতেই পারে।

জয়। ঠিক বলেছ উমেশ। এদিকটা তো গণ্ডগোলে মাথাতেই আসেনি।

উমেশ। তা নইলে মনে করুন না কেন, এইতো চার পাঁচ দিন হলো ফিরে এসেছি আমরা, বাবাজীতো কই একটিবারও দেখা করতে এলেন না।

সরমা। এসেছিলেন।

উমেশ। সেকী! কবে?

সরমা। মনে নেই। দুদিন এসেছিলেন। তোমরা তখন ছিলে না।

উমেশ। কিছু বললেন বাবাজী?

সরমা। হাঁ।

জয়। কী বলেছে?

সরমা। মিটে যেতে চাইছিলেন।

জয়। কবে রাত্রি বলেছিস্?

সরমা।

জয়। সে কী?

সরমা। হাঁ।

জয়। প্রকাশ কি কিছু জানতে পেরেছে?

সরমা।

উমেশ। যাক, সবদিকে! একটা দুর্ভাবনা গেল!

সরমা। কিন্তু—লুকোনো আর কদিন থাকবে বাবা?

উমেশ। না না, খুব সাবধান মা সরমা, ঘুণাক্ষরেও যেন কিছু জানতে না পারে।

সরমা। জানুক্। আর আমি পারবো না রাখতে।.....বাবা!

জয়। কী মা?

সরমা। আমার দোষ কি বলতো? আমি তো চাইনি কিছু, বলিনি কিছু, করিনিও। তবু—আমি কেন সইবো এসব?

জয়। সরমা! কী বলছিস্?

সরমা। কিছু চাইনি—কিছু পাইনি। সম্বল ছিল শুধু অভয়। তাও কেন রইল না বাবা?

জয়। তাকে আমি ফিরিয়ে আনবো মা। তোকে আমি কথা দিচ্ছি।

উমেশ। অমন করে ভেঙে পড়োনা মা! আমরা যখন রয়েছি—তখন বিচুলির গাদা থেকে ছুঁচ বার করার মতন তাকে খুঁজে বার করবো।

সরমা। খুঁজে তাকে আর পাওয়া যাবে না।

জয়। কেন বললে পাওয়া যাবে না?

সরমা। কেউ না। তবু—আমি জানি। কেন সে আর ফিরে আসবে না জানো?

জয়। কেন?

সরমা। তোমরা তো তাকে চাওনি বাবা! সে হয়েছিল তোমাদের পথের কাঁটা।

জয়। সরমা!

সরমা। তাকে তোমরা তাড়াতে চেয়েছিলে। তাড়িয়ে দিয়েছিলে এ বাড়ীর একমাত্র বংশধরকে। অতটুকু ছেলে। কোনও ক্ষমতা নেই। বাধা দিতে পারেনি

ছিল শুধু বুক ভরা অভিমান। সেই অভিমান ভরেই পালিয়ে গেল সে। হারিয়ে গেল। পথের কাঁটা তোমাদের আপনা হতেই সরে গেল।

জয়। সরমা! আমি তোর বাবা!

সরমা। জানি বাবা, জানি জানি—তুমি আমার ভালো চাও, ভালোবাসো। তার বাবা ছিলো না। আমি ছিলাম। তার মা! আমি—আমিও কী করে পারলুম বাবা তাকে তাড়িয়ে দিতে? কী করে পারলুম? কী করে—(সজোরে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে পালায়।)

জয়। (অসহায়ের মতন) উমেশ!

উমেশ। আজ্ঞে রায়বাবু!

জয়। একটা সব হচ্ছে বলো তো?

উমেশ। আজ্ঞে, তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হচ্ছে।

জয়। কার ইচ্ছা?

উমেশ। আজ্ঞে, ঐ মাথার ওপর যিনি আছেন।

জয়। মাথার ওপরে যিনি আছেন, তাঁর দেখা পাওয়া যায় না। আমার হাতের কাছে কিন্তু তুমি আছো।

উমেশ। আজ্ঞে, তা আছি। কিন্তু—তাতে হয়েছে কী রায়বাবু?

জয়। অজয়কে যদি খুঁজে না পাই, তোমায় আমি ছাড়বো না।

উমেশ। আজ্ঞে—কী বললেন?

জয়। কথনো যদি মাঝে মাঝে মানুষের কঙ্কাল পাওয়া যেত জানো বোধহয়?

উমেশ। (সভয়ে) আজ্ঞে—জানি।

জয়। দেখেছো?

উমেশ। আজ্ঞে, হাঁ।

জয়। খালে নয়, এবার যদি রায় বাড়ীর আশপাশে কোথায় কঙ্কাল দেখোয়, দেখবে অনেকেই শুধু তুমি ছাড়া।

উমেশ। (সভয়ে) আজ্ঞে, না—না—। আমি কেন—?

জয়। তুমিই আমায় পরামর্শ দিয়েছিলে অজয়কে অনাথ আশ্রমে পাঠাতে।

উমেশ। আজ্ঞে, সেতো আপনাদেরই ভালোর জন্যে—।

জয়। নিজের যদি ভাল চাও—এখুনি কোলকাতায় যাও। খোঁজ তাকে। খুঁজে বার করো।

উমেশ। আজ্ঞে—টাকা?

জয়। নিয়ে যাও। মুঠো তোমায় ভরে দিচ্ছি। খালি হাতে কিন্তু ফিরে যদি এসেছো,—

উমেশ। আজ্ঞে আমি প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করবো।

জয়। নইলে প্রাণটা তোমার এদিকে দিতে হবে। এসো—টাকা নেবে এসো—! এসো—

[জয়নারাণ উমেশকে হাত ধরে টেনে নিয়ে যায়—। একটু পরে অপর দিক দিয়ে প্রকাশ সহ ডাকতে ডাকতে মানদা আসে]

মানদা। দিদিমণি! অ দিদিমণি! ওমা, এইতো দেখার ছেলে! আবার গেল কমনে? তুমি বসো জামাইদাদা। আমি দিদিমণিকে খবরটা দেইগে।

প্রকাশ। মানদা।

মানদা। কিন্তু বলছো জামাইদাদা?

প্রকাশ। হাঁ। মানে—যদি দেখো, মেজাজটা তেমন ভালো নেই, তা হলে না হয় খবর দিয়ে আর দরকার নেই।

মানদা। বুঝিনে জামাইদাদা তোমাদের আজকালকার রীতি। মেজাজ খারাপ বলে সোয়ামী রেহাই দেবে পরিবারকে। সে ছিল নিতের বাপ। "মানি" বলে একটি শুধু চিহ্নুর জানতো। সব কাজ থুয়ে চুড়তে পুড়তে ছুটে ত্যাখুনি এলু তো এলু। নইলে—চুলের ঝুঁটি ধরে—

প্রকাশ। মারতো।

মানদা। সে মার, জামাইদাদা, লোকে চোরকেও মারে না, গরুকেও না। মারতে মারতে হোঁকিয়ে পড়তো। বলতো—"মানি, তামুক সাজ।" সইতে সইতে উঠে তামুক সেজে দিতুম। তুড়ুতুড়ু করে গোটা কতক টান কল্যেই একটুনু চাপা হয়ে উঠে—আবার যায়। এমনি চলতো দুটি পহর।

প্রকাশ। বলো কী মানদা। সত্যি?

মানদা। তুমি ব্যাটাছেলে। নইলে গায়ের কাপড় খুলে দেখাতুম—আজো সক্কালে আমার কালসিটে যেন নীল বড়ি বাটার মতন নেবুড়ে আছে।

প্রকাশ। ইস্। তোমার তো তা হলে বড্ড কষ্ট ছিল মানদা।

আনন্দা। ছেলে আবার না? মুখে পোড়া মিনসে চেহারাকাল ভাগাইলে-পুইতে খেয়েছে গা মরেছে না হাড়ে বাতাস লেগেছে আমার। তবে হাঁ, এও বলি জামাইদাদা—ও না হলে মন্দ। ওরা হলে পুরুষ বলে ভক্তি হবে কেনে গো? আর মানুষটা বটে অনামুষো, সোহাগও করতো এমন যে— (উচ্ছ্বাস চাপতে আনন্দা দ্রুত চলে যায়। প্রকাশ বিস্মিত দৃষ্টিতে কয়েক তার গমন পথের দিকে চেয়ে থাকে। মুখে তার ফুটে ওঠে ঈষৎ স্মিতহাসি। তারপর সে অস্থির ভাবে ঘরময় ছটফট করতে থাকে। পিছন হতে নিঃশব্দে সরমা প্রবেশ করে।)

সরমা। আবার এসেছো?

প্রকাশ। হাঁ সরমা।

সরমা। কেন এলে?

প্রকাশ। রাগ করে গিয়েছিলাম, কিন্তু থাকতে পারলাম না সরমা।

সরমা। লজ্জা করে না তোমার এমনি ভাবে বার বার ছুটে আসতে?

প্রকাশ। করে। তবু—তোমায় ছেড়ে থাকতে পারি না। অথচ আশ্চর্য, তুমি তো বেশ থাকো!

সরমা। (রহস্যময় হাসে) হাঁ, বেশ আছি আমি!

[বিস্ময়ে কৌতূহলে প্রকাশ সরমার মুখের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে।]

কী দেখছো অমন করে?

প্রকাশ। তোমাকে চিনতে পারলাম না সরমা। তুমি এক আশ্চর্য মেয়ে।

সরমা। (আবার হাসে) পারবে গো, একদিন পারবে।

প্রকাশ। সরমা, আর কতদিন থাকবে? চলো এবার।

সরমা। এখন নয়।

প্রকাশ। কাল?

সরমা। না।

প্রকাশ। পরশু?

সরমা। না।

প্রকাশ। তবে কবে—কবে যাবে?

সরমা। জানি না।

প্রকাশ। বেশ, তাহলে আমিও যাবো না।

সরমা। কী করবে?

প্রকাশ। এখানেই থাকবো।

সরমা। না।

প্রকাশ। হাঁ।

সরমা। আমি তাহলে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাবো।

প্রকাশ। দেবে না থাকতে?

সরমা। তুমি নিজের বাড়িতে যাও।

প্রকাশ। তাড়িয়ে দিচ্ছো?

সরমা। অনুরোধ করছি।

প্রকাশ। কিন্তু সরমা, সে বাড়ি আমি থাকতে পারি না।

সরমা। (কঠিন কণ্ঠে) কেন পারো না?

প্রকাশ। তুমি কী আজও এটুকু বুঝতে পারো সরমা যে তোমাকে ছাড়া—

সরমা। (তীক্ষ্ণকণ্ঠে) আমাকে ছাড়া! আমি ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনও মেয়ে নেই? কেমন ধারা পুরুষ তুমি? লজ্জা করে না কাঁদতে? বার বার ফিরিয়ে দিলেও অপমান বোধ হয় না? পৃথিবীতে অনেক মেয়ে আছে। অনেক—অনেক!

প্রকাশ। সরমা।

সরমা। বেছে নিতে পারো না আমার চেয়ে হাজার গুণে ভালো আর কাউকে? তোমার কাঙালপনায় তোমার লজ্জা করে না, আমার করে।

প্রকাশ। ধন্যবাদ সরমা,—লাখো ধন্যবাদ! লজ্জা এবার আমার সত্যিই করছে।

সরমা। তাহলে এখনো দাঁড়িয়ে আছো কেন? যাও—চলে যাও! যাও—

প্রকাশ। যাচ্ছি। একটা কথা বলবো?

সরমা। কী?

প্রকাশ। দরজা আমার খোলাই থাকবে। এরপর কিন্তু যদি কোনদিন যাওয়ার ইচ্ছে হয়, যেতে হবে তোমার নিজেকেই। আমার এই শেষ আসা।

[প্রকাশ চলে যায়। সরমা হঠাৎ যেন, যেন তাকে বাধা দিতে পা'টা এগিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। সামলে নেয় নিজেকে। তারপর সেও দ্রুত পায়ে অন্য দিক দিয়ে চলে যায়।]

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[করুণাময়ীর বাড়ীর একটা ঘর। রাত দুটা। ঘরটা একদিকে চেয়ার-টেবিল প্রভৃতিতে অফিসের মত সাজানো। অন্যদিকে পাশাপাশি দুটো লোহার সিন্দুক। একটার ওপর লেখা আছে "করুণাময়ী এষ্টেট", অন্যটার ওপর শুধু সিঁদুর দিয়ে লেখা "মা"।

টেবিলের ওপর খোলা রয়েছে কটা খেরো-বাঁধানো খাতা। সামনে একটা নড়বড়ে চেয়ারে উবু হয়ে বসে আছে নটবর, কানে কলম গোঁজা—গাঁজা টানছে। সুখটান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে সে বলে ওঠে—]

নট। তারা শিবসুন্দরী মা আমার!

[ঘরে ঢোকে করুণাময়ী। নাকে কাপড় দেয়।]

উঁহুহু! অমন করে ছেসাছেদ্দা করিসনে করি! এ যে মহা পেলাদ রে!

করুণা। কেন যাও ওগুলো নুটুদা? এত করে বারণ করি, তবু—

নট। তুই বারণ করলে কী হবে? এ যে আমার সেই ন্যাংটা বেটির আদেশ রে! (হাসতে থাকে)

করুণা। খবর শুনেছো নুটুদা?

নট। হ্যানে টের পেয়েছি।

করুণা। ওরা নেবে কেলবে এবার আমার মেয়েটাকে নুটুদা!

নট। কেলুক। তাতে তোর কী?

করুণা। সহসা যে আমারই মেয়ে নুটুদা!

নট। কবুভি নেহি! মিছে কথা বলিস নে করি। মাথার ওপর মা আছেন। মহাপাপ হবে! কীসের মেয়ে তোর? রাগ দেখিয়ে দুপদাপিয়ে ঘর ছেড়ে চলে এসেছিস না? যে সম্পত্তির অধিকার ত্যাগ করেছিস, তা আবার তোর হয় কী করে রা?

করুণা। তুমি বুঝবে না নুটুদা এসব কথা।

নট। বুঝি না? খুব বুঝি।

করুণা। কী বোঝো তুমি?

নট। বুঝি, তোরা সেই চিরকেলে মহামায়ার জাত রে।

করুণা। মানে?

নট। মানে—তোদের ওসব ভেজ-কেজ লোক দেখানো ফন্দিবাজী ঝুটো মাল। হিঁদুর মেয়ে—মহামায়ার জাত—পারবি কেন তোরা ওসব। কেন ওসব ঢং করতে গেলি করি?

করুণা। ঢং!

নট। আলবাৎ! স্বামীর ঘর ছাড়লেই হয়ে গেল? ফুরিয়ে গেল সব সম্পর্ক? পাগল না কী!

করুণা। তাই গেছে নুটুদা। ও বাড়ীর সঙ্গে আমার আর কোনও সম্পর্ক নেই।

নট। তাহলে—মেয়ের জন্যে ধড়ফড় করে মরছিস কেন?

করুণা। বোধ হয় সংস্কার। কাটাতে কিছু সময় যাবে।

নট। মলেও যাবে না। সংস্কার? এই সংস্কারেই সেকালের মহামায়া পতিনিন্দা শুনে দেহত্যাগ করেছিল, একালের তুইও করবি।

করুণা। (চমকে ওঠে) নুটুদা! (নটবর হাসতে শুরু করে)

নট। (হাসতে হাসতে) এ হে হে! লজ্জা পেয়েছে গো, লজ্জা পেয়েছে।

করুণা। (মানসিকতা লুকোবার চেষ্টায়) তোমার সঙ্গে কথা বলা ঝকমারী। (পালাতে চায়)

নট। (সহসা কী যেন মনে পড়ায় ডাকে) ওরে ও করি। শোন-শোন—

করুণা। (ফিরে) আবার কী?

নট। আট আনা পয়সা দেতো।

করুণা। কেন?

নট। মহাপেসাদ চড়াতে হবে রে। ভাণ্ডার বাড়ন্ত।

করুণা। আচ্ছা নুটুদা। কতোবার আর তোমায় বলবো বল তো যে অমন ভিখিরীর মতন খালি খালি আট আনা করে পয়সা চেয়ো না। আর টাকাকড়ি তো সব তোমারই কাছে। নিলেই তো পারো যা দরকার।

নট। দরকার তো আমার আট আনা করে যে। বেশি নিলে, বেশি চাইলে ফেলবো। উঁহু ম্যাংটো বেটি তাহলে মহা খাপ্পা হয়ে উঠবে। সংযম চাই। লোভ করলে চলবে না।

করুণা। লোকে কিন্তু বলে—ওটা তোমার শ্বশুর। ভেতরে ভেতরে তুমি আমার এস্টেট থেকে বেশ কিছু—

নট। হাতিয়েছি—কেমন? (হাসতে থাকে) তা যে—ছাড়িয়ে যে আমায়। তোর বিষয় সম্পত্তি তুই ছাখ। আমায় শুধু দরকার মতন আট গণ্ডা করে পয়সা দিস। ব্যস্।

করুণা। প্রমাণ পেলে দেবোই ছাড়িয়ে। দাদা বলে মানবো না।

নট। এ্যাই-এ্যাই ছ্যাখো। প্রমাণ আবার কী রে? চুরি করবো তোকে সাক্ষী রেখে নাকি? ওরে ফরি, যা বটে, তার কিন্তুও বটে।

করুণা। আর কিছু বলবে?

নট। পয়সাটা তাহলে কার নামে খরচ লিখবো?

করুণা। যার নামে লিখছো এতকাল তার নামেই লিখো। আচ্ছা নটুদা, চুরিই যদি করো, তাহলে এতকাল তোমার মাইনেটা না নিয়ে সব জমিয়ে রেখেছো কেন?

নট। মাইনের নজর দিদনে করি। ওসব একসঙ্গে তুলবো। জমুক—আরো জমুক। তা ছাড়া করি একটা কাজ করবো?

করুণা। কী?

নট। মেয়েটাকে তোর কাছে এনে দেবো?

করুণা। ওরা ছাড়বে কেন?

নট। চোকে ধুলো-পড়া দিয়ে উধাও করে আনবো। ও-ম্যাংটা বেটির কপাল একটা মেয়ে গুম করা তোর নটুদার একটু টাসকির ওয়াস্তা।

করুণা। চুরি করে আনবে? কী বলছো তুমি নটুদা?

নট। চুরি হোক, আর ডাকাতি হোক—সেটা আমি বুঝবো। তুই শুধু বলনা একবার।

করুণা। না—না! ওকাজ করো না নটুদা! ধরবে-ধার না! তার চেয়ে— ও ওখানেই থাক!

(দ্রুত চলে যায়। নটবর হাসতে থাকে।)

নট। ভীতু কাঁহাকো! (হঠাৎ হাসি থেমে যায়। সন্তর্পণে চারদিক সে দেখে নেয়। তারপর আরো সন্তর্পণে পাঞ্জার কলকেটা একটা টাঁাকে গোঁজে। চাবি দিয়ে 'করুণাময়ীর এস্টেট' খোলে। কী যেন বার করে টাঁাকে গোঁজে। টেবিলের ড্রয়ার থেকে সন্তর্পণে বার করে লাল কাপড়ের একটা পুঁটলি। চারদিক সন্তর্পণে লক্ষ্য করে এবার "কালী" সিন্দুকটা খুলে তার মধ্যে লুকিয়ে রাখে পুঁটলি-টাকে। দুটো সিন্দুকেই চাবি লাগিয়ে উঠে পড়ায়। নিশ্চিন্তের মতন হাত ঝাড়ে। তারপর হঠাৎ আবার হাসতে সুরু করে। হাসতে হাসতেই বলে ওঠে—]

নট। সে—সে, লুটে সে! এখন দাও আর পাবি না! (দূরে) আমার যে যা তবিল দারী!

[হাসতে হাসতে সে চলে যায়। অন্যদিক দিয়ে সন্তর্পণে ঢোকে উমেশ আর বটুক]

বটুক। দেখলে উমেশ, দেখলে তো?

উমেশ। হাঁ।

বটুক। অমি করে প্রায়ই পুঁটলি বেঁধে এ-সিন্দুকের জিনিষ ও-সিন্দুকে পোরে। ঐ "মা" লেখা সিন্দুকটা ওর নিজের।

উমেশ। খুলে একদিন দেখতে পারো না, কত কী ফাঁক করে রেখেছে ওর মধ্যে?

বটুক। দুটোরই চাবি যে ওর কাছে। প্রাণ গেলেও হাত ছাড়া করে না।

উমেশ। তকে তকে থেকো! চাবি পাও ভালই, নইলে অন্য ব্যবস্থা দেখতে হবে। সে-ভার আমার।

(নেপথ্যে পদশব্দ। দুজনেই চমকে ওঠে। উঁকি দেয়।)

উমেশ। সর্বনাশ! রায়বাবু যে! আমি পাঞ্জাবুর এদিক দিয়ে। তুমি একটু কথাটা কর্তাবাবুর কাণে তুলে দিও। মনে—আগুনটা ছুইয়ে দাও তুমি। তারপর কুলোর বাতাস দিয়ে সেই আগুনে লঙ্কাকাণ্ড বাধাবার ভার আমার! (সন্তর্পণে চলে যায় উমেশ। বটুক ভাল মানুষের মতন খাতাপত্তর নিয়ে বসে। ধরে ঢোকে জয়নারায়ণ। হাতে চুরুটের বাক্স—মুখে ধূমায়িত চুরুট। চিন্তাক্লিষ্ট। বটুক তাকে দেখেও না দেখার ভাণ করে। জয়নারায়ণ একটু

অপেক্ষা করে গলা-খাঁকারি দেয়। সে-শব্দে তার দিকে চেয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠে বটুক।)

বটুক। আরে—আরে! কী ভাগ্যি আমাদের,

জয়। এরা কেউ আছে?

বটুক। আছে—আছে! এখুনি খবর দিচ্ছি! বোসো—বোসো—(বটুক প্রস্থানোদ্যত হয়েও ফিরে দাঁড়ায়।) একটা কথা বলে যাই। চুপিচুপি।

জয়। কী কথা?

বটুক। না, এমন কিছু নয়। বলা হয়ত আমার সাজেও না। দালানা মাইনের সরকার আমি। তবে কিনা—দূর-সম্পর্কের একটা আত্মীয়তা রয়েছে—, ভালবাসি তোমাদের, তাই—

জয়। আসল কথাটা কী?

বটুক। কিছু থাকবে না।

জয়। কী থাকবে না?

বটুক। করুণাময়ীর এই যত বিষয়-সম্পত্তি।

জয়। কেন?

বটুক। ডাইনীর হাতে পো সমর্পণ হয়েছে যে! না—না, অবাক হয়োনো! ডাইনী নয়, ভান। ঐ নোটো গাঙ্গাগোরটা। চুপি চুপি সর্বস্ব ফাঁক করে এস্টেটটাকে একেবারে কোঁপরা করে ছাড়ছে। এই বেলা সাবধান হও বাবাজী! করুণাকে বুঝিয়ে বলো।

জয়। আপনারা বলতে পারেন না?

বটুক। আভাসে-ইঙ্গিতে যতটুকু বলা যায়, বলি বইকি! ফল কিছু হয় না। ও-ব্যাটা পিশাচসিদ্ধ। তুকতাক করেছে করুণাকে। করুণা যে বোঝে না কিছু, তা নয়। বোঝে। করতে পারে না কিছু। ও-ব্যাটা হাতের মুঠোর মধ্যে পুরে ফেলেছে মেয়েটাকে। যেমি নাচায়, তেমি নাচে। যা বোঝায়, তাই বোঝে। চং করে সাধু সেজে থাকে।

জয়। বটে?

বটুক। প্রমাণ আছে আমার কাছে। দেখাতে পারি। ঐ সিন্দুক—বোঝাই করে ফেলেছে দুটোর মালে। আর মেয়েটাও হয়েছে তেমি বোকা! কাজের না হোক—দূর সম্পর্কেরও তো বাবা আমি। আমাকে বিশ্বাস করে না। সব তার ঐ জোচ্চোরটার ওপর। তোমার নামে তো সব লাগায়।

জয়। হুঁ, মাঝে-মাঝে সে-সন্দেহ আমারও হয়।

বটুক। সন্দেহ নয়, এ অতি খাঁটি কথা। তাই বলছি বাবাজী, সময় থাকতে এখনো সাবধান হও! খু—ব সাবধান—(চলে যায় বটুক। অধীর চিত্তাক্রিষ্ট-ভাবে প্রতীক্ষা করতে থাকে জয়নারায়ণ। পিছন হতে কর্ণ পাতরী ডাকে।)

করুণা। অতিথি যে! কতক্ষণ?

জয়। অতিথি?

করুণা। হাঁ গো, আমার নারায়ণ!

জয়। ও, তাহলে আজ তোমার সঙ্গে আমার শুধু ঐ একটাই সম্পর্ক?

করুণা। কোনও সম্পর্কই তো তুমি রাখোনি। আমি তবু মাথা খামিয়ে এটাকে বার করেছি। ওকী! বোস!

জয়। থাক! ভদ্রতার দরকার নেই।

করুণা। অপরাধ হবে যে আমার!

জয়। কাটা গায়ে জল দিলে বাঁচে না করুণা। দুটো কথা তোমায় বলতে চাই। শুনবে?

করুণা। দুশো কথা শুনবো। বলো!

জয়। অজয়ের খবর শুনেছ?

করুণা। তোমরা শোনাওনি। তবু বাতাসেরও কান আছে।

জয়। সরমা অত্যন্ত অধীর হয়ে উঠেছে!

করুণা। স্বাভাবিক। সে মা। অজয় তার সন্তান।

জয়। তুমি যদি একটু সাহায্য করো, তাহলে—

করুণা। কেন?

জয়। তুমি মা। সে তোমার মেয়ে।

করুণা। কথাটা ঠাট্টার মতন শোনাচ্ছে না? আমি তার মা হলে, তার বিয়ের ব্যাপারে আমার কথাটাও থাকতো।

জয়। তুমি তাকে একটু বোঝালে—

করুণা। না।

জয়। যাবে না তুমি তার কাছে একটি বার?

করুণা। অনধিকার-চর্চা আর আমি করবো না।

জয়। যদি—যদি সে একটা কিছু করে বসে?

করুণা। অবাক হবো না।

জয়। তবু কিছু করবে না?

করুণা। করবো। তবে আজ নয়। সময় এলে।

জয়। কী?

করুণা। নালিশ করবো। না—না, চমকে উঠোনা। আদালতে নয়। চেষ্টা করলেও অতটা পারবো না। নালিশ করবো তোমারই কাছে তোমারই মায়ের তোমার স্নেহ আর স্বেচ্ছাচারিতার জন্যে।

জয়। করুণা!

করুণা। আর কী যেন বলবার ছিল?

জয়। ও হাঁ! পারো যদি—ফিরিয়ে নিচ্ছিলো তোমার ঐ গহনাগুলোর ভাইটির হাত থেকে। সর্বস্বসমেত ও তোমাকে ডোবাবে।

করুণা। তার জন্যে তুমি যার করেই আছে, তার আর ডোবার ভাবনা কীসের?

জয়। ও—ও একটা চোর—জোচ্চোর!

করুণা। টাকা চুরি করে? করুক। তবুতো মার কোল থেকে ছেলে মেয়ে চুরি করে না।

জয়। ওরই পরামর্শে তুমি এভাবে আমাকে অগ্রাহ্য করতে শিখেছো। ঐ ছোল যত নষ্টের মূল।

করুণা। না, মূলটা ছোল তোমার ভুল।

জয়। শুনবে না তাহলে তুমি আমার কোনও কথা?

করুণা। জানি—পাপ হবেতো হবে। তবু—পারছি না।

জয়। বেশ, আমিও আজ বলে যাচ্ছি—ফিরে যেতে আর কোনদিন বলবো না। কোনদিন না—

[সরোষে প্রস্থানোদ্যত হয়।]

করুণা। পিছু ডাকছি না। একটু দাঁড়াবে?

জয়। কেন?

করুণা। (আগিয়ে দিয়ে টেবিলের ওপর থেকে চন্দ্রপুটের বাক্সটা তার হাতে তুলে দেয়।)

জয়। (ক্ষণেক করুণার দিকে চেয়ে থেকে) করুণা, তুমি স্বার্থকনাম। সত্যিই তুমি করুণাময়ী।

[জয়নারাণ চলে যায়। করুণা ফিরে এসে বসে। সহসা দুহাতে মুখ চাপা দেয়। কথা বলতে বলতে নটবর আসে।]

নট। করি, অ' করি! আর আটগণ্ডা পয়সা ছেরে। মহাপেসাদ আবার বাড়ন্ত হয়ে গেল!

করুণা। (মুখ থেকে হাত সরিয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে) বেরোও—বেরোও—বেরোও! তুমি আমার শত্তুর! তুমি চোর! তুমি আমার ডোবাবে! তুমি যাও! দূর হও! (কান্না লুকোবার চেষ্টা করে)

[প্রথমটা থেকে অবাক হয়ে যায় নটবর। তারপরই হাসতে সুরু করে।]

নট। (হাসতে হাসতে) বুঝেছি! বুঝেছি! মড়ো শিব মোর থেকে ফিরে গেছে। সেই দুঃখে মহামায়া কেঁদে আকুল! (হাসতে থাকে) তা হবে, যাবো না হয়! আগে আট গণ্ডা পয়সা দে! (হাত পাতে) ধরা পড়ে গেছিস কত্তি! ধরা পড়ে গেছিস! দে—দে ভাই আট আনা—দে—(হাসতে থাকে।)

প্রথম অঙ্ক

ষষ্ঠ দৃশ্য

(শেষরাত। পিয়ার সুসজ্জিত ঘর।

ঢালা বিছানা একপাশে। তাকিয়া হেলান দিয়ে মদ্যপানরত পড়ে আছে প্রকাশ। সামনে তার মদের বোতল আর গোটা কয়েক গেলাস।

পিয়া নৃত্যরতা।

নাচ তার শেষ হয়। পরম বিরক্তিভরে প্রকাশ বলে ওঠে—)

প্রকাশ। নিভিয়ে দাও! ঐ চড়া আলোটাকে নিভিয়ে দাও! সহ্য করতে পারছি না!

[তীব্র আলোটাকে নিভিয়ে দিয়ে পিয়া জ্বেলে দেয় একটা মৃদু নীলাভ আলো। বসে পড়ে সে প্রকাশের কাছে। বিস্রস্ত তার বেশবাস। একদৃষ্টে অপলকে পিয়া চেয়ে থাকে প্রকাশের দিকে। যেন সে মুগ্ধ আত্মহারা হয়ে গেছে। প্রকাশ বিরক্ত হয়ে ওঠে।]

প্রকাশ। (বিরক্ত কণ্ঠে) কী দেখছো?

পিয়া। (মুগ্ধ মদির কণ্ঠে) তোমায়।

প্রকাশ। পুরুষ দেখোনি আগে?

পিয়া। অনেক—অনেক।

প্রকাশ। তবে?

পিয়া। একটা দেখিনি।

প্রকাশ। সত্যি?

পিয়া। সত্যি। কতজনই তো আসে। নিত্যিরাতে। তারা ততক্ষণের—যতক্ষণ থাকে। তুমি এসে দাঁড়ালে। মনে হোল—পরচাওয়া আমার সার্থক হোল এতদিনে। সব পাওয়া বুঝি মিটলো এবার।

প্রকাশ। বাঃ! বেশ বলছো তো! বাহবা! (হেসে ওঠে)

পিয়া। তোমায় চিনি না। তবু তুমি অনেক চেনা,—অনেক অনেক জন্মের। তুমি দূরের নও,—স্বপ্নের, মনের। তুমি পর নও—পরমাত্মীয়। আমার অনেক খানি দিয়ে যেন তোমার সৃষ্টি, কিম্বা তোমার আধ খানায় আমি। তুমি যেন আমার সেই ছেলেবেলার শিব পুজোর সাতরঙা কামনা।

প্রকাশ। আমার আগে আর কতজনকে এই কথাগুলো শুনিয়েছো?

পিয়া। একজনকে।

প্রকাশ। কাকে?

পিয়া। নিজেকে।—যখন ছেলে স্বপ্ন দেখেছি। তোমাকেও বলেছি—যখন ঘুমিয়েছি—অনেক অনেক রাতের স্বপ্নে।

[পিয়া মদের গ্লাস মুখে তোলে। প্রকাশ তার হাত চেপে ধরে]

প্রকাশ। আর খেয়োনা।

পিয়া। (অবুঝের মত) কে—ও?

প্রকাশ। নেশা বেড়ে যাবে।

পিয়া। বাড়ুক। এ-নেশা যেন না ভাঙে। তুমি বাধা দিও না গো!

প্রকাশ। সামলাতে পারবে না তখন।

পিয়া (প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে) এখনই বা পারছি কই? লগ্ন এলো, বর এলো, শুভ দৃষ্টি হোল। বাসর বসেছে। এই রাতটুকুর জন্যে কতো রাত গেছে বৃথা। কত সাজ হয়েছে মিথ্যে। কত আশা গেছে শুখিয়ে। আর কি পারি গো সামলাতে?

[এক চুমুকে গেলাস নিঃশেষ করে। বিরক্তি ভরে প্রকাশ দূরে সরে যায়।]

পিয়া। আচ্ছা, এতোদিন কেন এলে না গো?

প্রকাশ। আমার খুশি।

পিয়া। এলে আমি খুশি হতুম।···আবার আসবে তো?

প্রকাশ। না।

পিয়া। (আব্দার সহকারে) হাঁ, এসো! লক্ষ্মীটি! কাল! রোজ।

প্রকাশ। টাকা আমার অত সস্তা নয়।

পিয়া। দিও না। শুধু দিতে এসো। আমার সব কিছুকে—যা—কিছু আমার আছে। আসবে তো?

প্রকাশ। বেশ মনের মতন করে গুছিয়ে বলতে পারো তো তোমরা! (পিয়া খিল খিল করে হেসে ওঠে) হাসছো যে?

পিয়া। কিছু জানো না তুমি। এসব কথা যে আমাদের শিখতে হয় গো। নিত্যিরাতে দরদার কাছে আওড়াতে হয়। কিন্তু বিশ্বাস করো গো, সে-সবই তোতা—আওড়ানো। এমন সত্যি করে আর কাউকে বলিনি।

প্রকাশ। এর পরেও বিশ্বাস করতে বলছো? তুমি "পিয়া" নও,—"বিম্বপ্রিয়া"।

পিয়া। ইস! ক—তো রাগ! আবার অভিমান! [হেসে ওঠে। প্রকাশ মুখ ফিরিয়ে নেয়। পিয়া হাত দিয়ে প্রকাশের মুখটাকে আবার ফিরিয়ে নেয় নিজের দিকে।]

না:, আমার দিকে দেখো।

প্রকাশ। রূপের দেমাক তোমার খুব, না?

পিয়া। আহা, তাও একটু হবে না? রূপটুকু তো আর কম নয় গো। সব্বাই বলে—এ-তল্লাটে এমনটি আর কারো নেই। সব্বাই আমার রূপের ক—ত—তো সুখ্যাতি করে। শুধু তবিই—

প্রকাশ। আর কত অস্ত্র হানবে?

পিয়া। আর পারো কোথায়? আমার অত সাধের যত ব্রহ্মাস্ত্র সব ভোঁতা হয়ে গেছে তোমার কাছে। দাঁত ছিল, বিষ ছিল, জাতটাও ছিল কালনাগিনীর। এ দুনিয়ায় তোমার মতন বাহাদুর সাপুড়েও যে-ছিল, তাকি আগে জানতুম?

প্রকাশ। এত বাড়তি মেহনতের জন্যে বাড়তি টাকা চাইবে না তো?

পিয়া। (ফুঁসিয়ে ওঠে) টাকা—টাকা! চেয়েছি তোমার কাছে টাকা?

প্রকাশ। না চাইলেও, দিতে তো হবেই।

পিয়া। দিও না! দোহাই তোমার, দিও না টাকা! বড্ড দেখি টাকার দেমাক তোমার।

প্রকাশ। তোমার যেমন রূপের।

পিয়া। কত টাকার মালিক তুমি শুনি?

প্রকাশ। তোমায় কিনে পুরোপুরি তোমার মালিক হতে পারি।

পিয়া। বিনা দামে তোমায় দাসিকানা মেনে নিয়েছি বলেই বুঝি এমন করে অপমান করতে চাও?

প্রকাশ। (অসহ্য বিরক্তিতে গর্জে ওঠে) কে চায় তোমার মালিকানা?

পিয়া। হাজার পুরুষে চেয়েও পায়নি। কেঁদেছে। ভিক্ষে চেয়েছে। বিষ খেয়েছে।

প্রকাশ। আমি বোকা নই তাদের মতন। ভিখিরীও ওতে লোভ নেই। যা চাই, তা যদি দিতে পারতে।

পিয়া। কী চাও?

প্রকাশ। বিস্মৃতি। পারো আমায় ভুলিয়ে দিতে?

পিয়া। কাকে ভুলতে চাও?

প্রকাশ। (ঝলকে ওঠে) তাতে তোমার দরকার?

পিয়া। কী ভুলতে চাও?

প্রকাশ। নিজেকে। বর্তমানকে। পারো?

পিয়া। (মদের গেলাস এগিয়ে দেয়) ধরো।

প্রকাশ। (পিয়ার হাত ঠেলে দেয়) হায় মেয়েছে তোমাদের ও বিস্মরণী-সুধা! আর কিছু আছে?

পিয়া। আমি আছি।

প্রকাশ। ছোলাই-পচাই আমার সয় না। বমি হয়ে যাবে।

পিয়া। বলো কি গো! সুরায় রুচি নেই, সাকীতেও না? কেমন ধারা রসিক তুমি?

প্রকাশ। বেরসিকে তা বুঝবে না।

পিয়া। নাঃ, কোনও আশা নেই তোমার!

প্রকাশ। জানি, তোমরা চিরকালই কেউ নিরাশা, কেউ দুরাশা। (দু'জনেই চুপ করে যায়। যেন কথা খুঁজে পায় না। ঘড়ি দেখে প্রকাশ। বলে—) রাত শেষ হয়ে এলো। ঘুমোও এবার।

পিয়া। তুমি?

প্রকাশ। দেখি চেষ্টা করে। (প্রকাশ একটা তাকিয়া টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ে। পিয়াও তার পাশে শোবার উপক্রম করতেই বাধা দিয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রকাশ বলে ওঠে—)

না—না! এখানে নয়! ঐধারে সরে যাও!

পিয়া। (সকরুণ আবেদনে) কতটুকুই বা বাকী

প্রকাশ। থাকে আমার ভীষণ ঘেন্না। যাও—যাও বলছি—

[পিয়া ফণেক আহত ফণিনীর মত চেয়ে থাকে প্রকাশের দিকে। তারপর চাপা বিদ্রূপ কণ্ঠে ফুঁসিয়ে ওঠে—]

পিয়া। জানোয়ার!

প্রকাশ। মুখোশ কিন্তু তোমারও খসে যাচ্ছে।

পিয়া। (আপ্রাণ চেষ্টায় কান্না চাপতে গুমরে ওঠে) থাকবে না—থাকবে না অত দেমাক!

(কথার সঙ্গে সঙ্গে পিয়া ছিটকে দূরে সরে যায়। গলার হার আর হাতের চুড়িগুলো আক্রোশে টান মেরে খুলে ফেলে সশব্দে একটা দেরাজের মধ্যে বন্ধ করে রাখে। তারপর দুপদাপিয়ে ফিরে এসে বিছানার অন্য প্রান্তে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে পড়ে।)

প্রকাশ। এক গেলাস জল দিতে পারো।

পিয়া। (গর্জে ওঠে) না, পারি না! কারো দাসী বাঁদী নই আমি।

(প্রকাশ চুপ করে শুয়ে থাকে। হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় পিয়া। তীব্র কটাক্ষে একবার প্রকাশকে দেখে নিয়ে দুপদাপিয়ে ঘরের অন্যদিক থেকে এক গেলাস জল এনে গর্জে ওঠে—)

খাও, গেলো! শয়তান!

[নীরবে প্রকাশ গেলাসটা হাতে নিয়ে আলোর দিকে সেটাকে ধরে দেখে।]

পিয়া। ভয় নেই। বিষ মিশিয়ে দিইনি।

প্রকাশ। (জল পান করে গেলাসটা ফিরিয়ে দেয় পিয়ার হাতে।) জিভে এত বিষ থাকতে জলে মেশাবার দরকার কী?

পিয়া। (গর্জে ওঠে) ছোটলোক। ইতর। মিথ্যুক।

দুর্ হ— (গেলাসটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তারপর সরোষে গিয়ে আবার আগেকার মতো শুয়ে পড়ে। দুজনেই নীরব। একটু পরে দূর থেকে ভৈরবী সুরে সানাইয়ের শব্দ ভেসে আসতে থাকে। জানালায় উষার আভাস ফোটে।

সন্তর্পণে উঠে বসে প্রকাশ। চেয়ে দেখে পিয়ার দিকে। পিয়া ঘুমোচ্ছে। পা টিপে টিপে গিয়ে দাঁড়ায় প্রকাশ দেয়ালটার কাছে। বার করে ঘার আর চুন্তি। ব্রাকেটে টাঙানো কোটের ডান পকেট থেকে নোটগুলোকে রেখে দেয়। আবার তাকায় পিয়ার দিকে। নিশ্চিন্ত হয়ে এক গেলাস জল আর একটা তোয়ালে নিয়ে বাথ রুমে ঢুকে যায়।

চকিতে উঠে বসে পিয়া। নিঃশব্দে হাজির হয় সে কোটটার কাছে। বাঁ পকেট থেকে বার করে একতাড়া নোট। তাতে নোটগুলো ব্লাউজের মধ্যে বুকের কাছে লুকিয়ে রেখে আবার এসে শুয়ে পড়ে আগেকার মতো।

প্রকাশ ঘরে ঢোকে। কোটটা গায়ে চড়ায়। ড্রেসিং মিরারের সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ায়। জুতো পায়ে দেয়।

জানালায় প্রভাত সূর্যের নাড়া পড়ে।

প্রকাশ পা বাড়ায় দরজার দিকে।

[পিছন হতে পিয়া কথা বলে ওঠে। প্রকাশ চমকে থমকে দাঁড়ায় দরজার কাছে]

পিয়া। (হাই তুলে) যাচ্ছো?

প্রকাশ। হাঁ।

পিয়া। আবার কবে আসবে?

প্রকাশ। কোনদিন না। আর কিছু বলবে?

পিয়া। একটা কথা।

প্রকাশ। কী?

পিয়া। গয়নাগুলো মেকী—গিল্টির। (প্রকাশ চমকে ওঠে, স্তম্ভিত হয়ে যায়। মুখে কথা জোগায় না।) লজ্জা পেল? তাতো হবারই কথা। ভিক্ষে নিতে তোমার লজ্জা হয়, না গো? দান নিতেও তো মান যায়। হ্যাগো, তোমার সেই অনেক টাকা —যা দিয়ে আমায় কিনতে পারো—তার সবই কি এমিভাবে জোচ্চুরি?

প্রকাশ। (নীরবে গয়নাগুলো বিছানার ওপর ছুঁড়ে দেয়। তারপর স্থির কণ্ঠে বলে—) নোটগুলো খাঁটি নয়, জাল।

পিয়া। জাল!

প্রকাশ। জালে তোমার ঘুইকতলা পড়লো না বলে খুব আপশোষ হচ্ছে তো?

[পিয়া মুখে কিছু বলে না। নোটগুলো বার করে দেয়। প্রকাশ তুলি নেয়]

প্রকাশ। গয়নাগুলো যে গিল্টির—সব মেয়ের মতনই মেকী—তা আমি জানতুম। এক নজরেই চিনেছিলুম।

পিয়া। বড় বাহাদুর জুহুরী তো তুমি।

প্রকাশ। আমার নামটা জানা থাকলে বুঝতে পারতে যে শহরের পাঁচটা সেরা জুহুরীর আর জহরৎ কারবারী মধ্যে আমার নামটাও পড়ে। লোভে পড়ে চুরির কারবার ওগুলো।

পিয়া। তবে?

প্রকাশ। টাকা দিইনি তোমায়। ইচ্ছে ছিল, ওগুলোর বদলে ঐ ডিজাইনের খাঁটি গয়না গড়িয়ে দেবো।

পিয়া। জাল টাকায় খাঁটি সোনা পাওয়া যেতো?

প্রকাশ। টাকাগুলো জাল নয়—আসল। জাল তোমরা নিজেরা। তোমাদের সবটাই মেকী আর মিথ্যে। তাই মিথ্যে কথা বলেই ওগুলো ফেরৎ নিতে হয়েছে।

পিয়া। তা এই মেকী পিয়াকে খাঁটি গয়না গড়িয়ে দেবার সাধ হয়েছিল কেন শুনি।

প্রকাশ। আবো-আলো আবো আঁধারে তোমাকে দেখে চমকে উঠেছিলাম। পথ চলতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। তোমার ডাক শুনে ঘরেও এসে ছিলাম। কেন জানো?

পিয়া। কেন?

প্রকাশ। অন্ধকারে মনে হয়েছিল, তুমি যেন ঠিক তার মতন দেখতে।

পিয়া। কার মতন?

প্রকাশ। যাকে ভুলতে চাই। অনেক বড় বড় মিষ্টি কথা শুনিয়েছ তুমি সারারাত। কিন্তু তুমি—তোমরা সবাই স্বার্থান। সবাই—(চলে যেতে চায় প্রকাশ। পিয়া ডাকে—)

পিয়া। শোনো।

প্রকাশ। (ফিরে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে) আবার কী?

পিয়া। আমার অনেক মিথ্যে কথা তো শুনেছ। আর একটা শুনবে? বিশ্বাস না হয়, কোরো না। শুধু শুনে যাও।

প্রকাশ। কী কথা?

পিয়া। চুরি আমিও করতে চাইনি।

প্রকাশ। তবে?

পিয়া। জানতুম—তুমি আসবে না আর। সে রাত্রে আমার নয়। তাই টাকাগুলো সরিয়ে রেখেছিলুম। অন্ততঃ ওগুলোর খোঁজে এলেও যদি আর একটিবার দেখা পাই।

প্রকাশ। কী সুন্দর যে বানিয়ে বলতে পারো তোমরা। টাকা চাও না! এই কথা আমায় বিশ্বাস করতে হবে। সব নিয়েও তোমাদের তৃপ্তি নেই। দিতে পারো না একটি কোঁটাও। নাও—এই নাও—

[নোটগুলো প্রকাশ সজোরে ছুঁড়ে দেয় পিয়ার দেহের ওপর। দ্রুত পায়ে চলে যায়। নোটগুলো ছড়িয়ে থাকে ঘরে বিছানায়। পিয়া পাথরের মতো বসে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর ভেঙে লুটিয়ে পড়ে নোটগুলোর ওপর।

নেপথ্যে পদশব্দ হয়। চকিতে উঠে বসে পিয়া। চোখ মুছে নোটগুলো কুড়িয়ে নেয়। তারপর নিষ্প্রাণের মতো বিছানায় পড়ে থাকে।

ঘরে ঢোকে মাসী।]

মাসী। পিয়া! ওলো ও পিয়া! ওঠ না লো!

পিয়া। (চোখ খুলে) কে? মাসী?

মাসী। তবু ভাল। আহ্লাদীর আমার খেয়াল হয়েছে। তা তোপর রেতটা তো কাল একজনাকে নিয়েই হুল্লোড় করে কাটালি। বলি ঠেকালে কিছু [illegible] সেই বাঁধা রেট?

পিয়া। এই নাও মাসী! (নোটগুলো মাসীর হাতে তুলে দেয়। মাসী বিস্মিত হয়।)

মাসী। ওমা, এ্যাতগুলো! এ কত লো?

পিয়া। অনেক—অনেক মাসী—অনেক। নিয়ে যাও। গুনে দেখো।

মাসী। তবে তো কাল রেতে রাজপুত্তুর এয়েছিল লো তোর ঘরে।

পিয়া। (সলাজ, সতৃপ্ত হেসে) হাঁ মাসী, আমার স্বপ্নে দেখা রূপকথার রাজপুত্তুর!

মাসী। তোর বাড়-বাড়ন্ত হবে পিয়া! আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, তোর সর্বাঙ্গ একদিন হীরে সোনায় মুড়ে যাবে।

পিয়া। সবই তোমার আশীর্বাদ মাসী! তুমি যখন আছো—

মাসী। আছিই তো। মুঠো ভরে যে আমায় দেবে, তাকে মাথায় তুলে রাখবো না? তুই ভাবিস্‌নে পিয়া। তোকে এমন সব তুকতাক শিখিয়ে যোবো যে—

পিয়া। বলো কী মাসী! এর ওপর আরো? (খিলখিল হাসিতে ভেঙে পড়ে মাসীর গলা ধরে দুলতে দুলতে বলে চলে) সত্যি মাসী, তোমার তুলনা নেই। তুমি সব পারো মাসী। খবরদার, আমাকে দিয়ে ও সব না করিয়ে নিয়ে ছেড়ো না যেন!

মাসী। (বিব্রতভাবে গলা ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে) আঃ! ছাড়্—ছাড়্ পিয়া! পাগল হলি নাকি? খুব নেশা করেছিলি বুঝি রেতে?

পিয়া। (হাসতে হাসতে) হাঁ মাসী! ব-ড়-ডো নেশা! কিছুতে ঘোর কাটছে না।.....

প্রথম অঙ্ক

সপ্তম দৃশ্য।

[প্রকাশের খাসকামরা। বেলা ১০টা।

ক্লান্ত প্রকাশ প্রায় টলতে টলতে ঘরে ঢোকে। কোটটা খুলে অবহেলাভরে একটা চেয়ারের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তারপর অবসন্নের মতন একটা ইজিচেয়ারের ওপর দেহ এলিয়ে দিয়ে নিষ্প্রাণের মতন পড়ে থাকে।

পিছনে দেখা দেয় সরমা। কৌতুকে নেচে ওঠে তার চোখ। পা টিপে টিপে আগিয়ে গিয়ে সে পিছন হতে প্রকাশের চোখ টিপে ধরে।]

প্রকাশ। (সবিস্ময়ে) কে?……কে?……

সরমা। (চোখ ছেড়ে দিয়ে খিল খিল করে হেসে ওঠে) বাব্বাঃ! আধকে উঠ্‌লো দেখো না! নিজের বৌকে চিনতে পারো না, কেমন লোক তুমি?

প্রকাশ। সরমা!……এলে?

সরমা। হাঁ গো হাঁ, এলাম।

প্রকাশ। কেন এলে?

সরমা। ভাবলুম—তুমি রাগ করেছ।

প্রকাশ। আমার রাগের দাম আছে তাহলে?

সরমা। আছে গো আছে, খুব আছে! (আবার হেসে ওঠে। সহসা প্রকাশের মুখের দিকে নজর পড়ায়) কী ব্যাপার গো? রাগ করেছ নাকি?

প্রকাশ। জামা কাপড় ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে এসো, বলছি।

সরমা। (চেয়ারের হাতলে বসে পড়ে) না, এখুনি বলতে হবে। বলো।

প্রকাশ। এখুনি শুনবে?

সরমা। হাঁ। না শুনে আমি—

প্রকাশ। (উঠে দাঁড়ায়) যে-গাড়ীতে এলে, সেটা কি এখনও দরজায় দাঁড়িয়ে আছে?

সরমা। (সবিস্ময়ে) কেন?

প্রকাশ। যা শুনতে চাইছো, তা শোনার পরেই হয়ত তোমাকে এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে।

সরমা। (সশঙ্ক বিস্ময়ে) কী এমন কথা? বলো। দেরি করছো কেন?

প্রকাশ। একাগুই শুনবে?

সরমা। না বাপু, ভাল লাগে না! ছুটে—ছুটে এলুম, ভালো করে এখনো বাড়িতে পা দিইনি, রসিকতা করবার আর সময় পেলে না!

প্রকাশ। সত্যি জবাব দেবে?

সরমা। দেবো, দোবো।

প্রকাশ। "করুণাময়" বলে কাউকে তুমি চেনো? (সরমা চমকে ওঠে। জবাব দিতে পারে না) কী? জবাব দিচ্ছ না যে? চেনো?

সরমা। (আত্মদমন করতে করতে) আসল কথাটা কি, তাই বুঝতে পারছি না।

প্রকাশ। কোলকাতায় যাওয়া হয়েছিল তার সঙ্গেই দেখা করতে বুঝি?

সরমা। (অনেকটা আশ্বস্ত হয়ে হেসে) হাঁ। অনেক-দিন দেখা হয়নি।

প্রকাশ। ভেবেছো, কথাটাকে তুমি হেসেই উড়িয়ে দেবে?

সরমা। উঁহুঁ, সে ইচ্ছে আমার একটুও নেই। আর কিছু জিজ্ঞেস করবে?

প্রকাশ। তার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়নি কেন শুনি?

সরমা। (সহাস্যে) আমরা বড়লোক। সে ছিল গরীব। বিয়ে হলে হয়তো মানাতো না।

প্রকাশ। বিয়ে যখন হোলই না, তখন আজো তার সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে চলেছো কেন?

সরমা। (মুখ টিপে হাসতে হাসতে) এখনও তার সঙ্গে সম্বন্ধ আমার আছে বলতে চাও?

প্রকাশ। হাঁ, নিশ্চয়ই।

সরমা। আমি যদি বলি—তার সঙ্গে সব সম্পর্ক আমার চিরদিনের জন্যে চুকে গেছে?

প্রকাশ। তাহলে তুমি মিথ্যে কথা বলবে।

সরমা। কী হলে বিশ্বাস করবে যে আমার কথা সত্যি?

প্রকাশ। যদি—যদি তুমি ঐ হাতের নোয়া ছুঁয়ে দিব্যি করতে পারো।

সরমা। (নোয়া স্পর্শ করে) তার সঙ্গে সম্পর্ক আমার চিরদিনের জন্যে মুছে গেছে!…হোল? (প্রকাশ জবাব দিতে পারে না। লজ্জিত হয়) এবার আমার একটা কথার জবাব দেবে?

প্রকাশ। কী কথা?

সরমা। পরীক্ষায় পাশ না হলে তুমি কী সত্যিই আমায় তাড়িয়ে দিতে?

প্রকাশ। দিতাম।

সরমা। একটু দয়া হোত না? মায়াও না?

প্রকাশ। হয়তো হতো। তবু আমার স্ত্রী আমার

সঙ্গে প্রতারণা করবে সে আমি কিছুতেই সইতে পারবো না।

সরমা। হঠাৎ ও-নামটার সন্ধান পেলে কোথা থেকে?

প্রকাশ। তা বলবো না।

সরমা। বোলো না। আমিই বলছি। (আলমারি খুলে লকেটটা বার করে আনে) এইটা, কেমন? জ্বলজ্বল্ করছে যে নামটা।

প্রকাশ। ওটা সেই তোমায় দিয়েছিল?

সরমা। হাঁ, উপহার।

প্রকাশ। উপহার! ওঃ! তাহলে তোমাদের খুব ভালবাসা হয়েছিল বলো।

সরমা। ওমা! তা আবার হয়নি! (হেসে ওঠে খিলখিল করে)

প্রকাশ। (বিস্ময়ে) তুমি—তুমি তাহলে—

সরমা। হাঁ, আমি। বোস দিকি এবার। (জোর করে প্রকাশকে চেয়ারে বসিয়ে নিজে সামনে দাঁড়ায়) আমার বাবা বড়লোক, তা বোধহয় জানো?

প্রকাশ। জানি।

সরমা। বাবার কাছে টাকা নিয়ে অনেকে সোনার গয়না বন্ধক রেখে যেতো। সে-সব গয়না কেউ বা ছাড়িয়ে নিয়ে যেতো. কেউবা পারতো না। এই লকেটটাও তেমনি এক তামাদি বন্ধকী জিনিস! এবার বুঝেছো পণ্ডিতমশাই?

প্রকাশ। (হেসে ফেলে) বুঝেছি।

সরমা। (লকেটটা আগিয়ে দিয়ে) নাও, রাখো।

প্রকাশ। না না, তোমার জিনিষ, আমি কেন—

সরমা। না, ও আর আমি পরবো না। নাও। (হাতে গুঁজে দেয়)

প্রকাশ। কঙ্কণটাও আবার খুলে রেখেছো কেন সরমা?

সরমা। খবরদার আর তুমি আমার কোনও গয়নার ব্যাপারে কোনও কথা বলবে না! আমার যখন খুশি পরবো, না হয় পরবো না! থাক কঙ্কণ ওখানে। নিত্যি আমি প্রণাম জানাবো, ব্যস্!

প্রকাশ। দেবীর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

সরমা। এবার নিজের দোষটা স্বীকার করছো তো?

প্রকাশ। (হেসে) না করে আর উপায় কী?

সরমা। উঃ, ধন্য নিষ্ঠুর যাহোক তোমাদের এই পুরুষ জাতটা! মিছিমিছি সন্দেহ করে কী কষ্টটা দিলে বলো তো? সবেমাত্র বাড়িতে ঢুকেছি, একটু সবুরও সইলো না?

প্রকাশ। সরমা!

সরমা। কী?

প্রকাশ। (সরমার হাত ধরে কাছে টেনে) আমায় ক্ষমা করেছ?

সরমা। (হেসে) হয়েছে-হয়েছে!

প্রকাশ। (উঠে পড়ে আরো দূরে গিয়ে বসে) হয়নি সরমা। আমার অপরাধ আরো আছে।

সরমা। আ-রো?

প্রকাশ। হাঁ। ঐ ছবিগুলোর দিকে চেয়ে দেখো সরমা! আমার নমস্য ঊর্ধ্বের পূর্বপুরুষ ওঁরা। ওঁদের সেই সেই নীল রক্ত আমারও শরীরে বইছে। আমার রক্তে আছে ওঁদের সেই দুর্বার স্বেচ্ছাচারীতা আর উচ্ছৃঙ্খলতার উদ্দাম ঢেউ। মাঝে মাঝে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়। বাধা দিয়েছিলাম আমার শিক্ষা আর সংস্কৃতির। কিন্তু সরমা—

সরমা। থামলে কেন? বলো?

প্রকাশ। ভেঙে গেল সে বাঁধ—কাল রাতে। তুমি এলে না সঙ্গে আমার—ফিরিয়ে দিলে। ফুঁপিয়ে উঠলো অভিমানে। ফাঁক পেয়ে ঘুমন্ত জানোয়ার-গুলো জেগে উঠলো মনের মধ্যে। রোষ চেপে গেল। ওঃ সরমা, আমার সর্বাঙ্গে লেগেছে পাঁকের ছোপ! এ আমি কী করেছি?

সরমা! (সরমা গিয়ে ধরে প্রকাশকে। স্নিগ্ধকণ্ঠে বলে) পঙ্কে পাঁক লাগে না গো, পদ্মপাতায় জল দাঁড়ায় না।

প্রকাশ। পারবে তুমি আমায় ক্ষমা করতে সরমা?

সরমা। ছি! আর বোলো না। বসো। (প্রকাশকে চেয়ারে বসায়। নিজে বসে হাতলে। প্রকাশের মাথা পড়ে সরমার বুকের ওপর)

প্রকাশ। তোমার মতন বৌ পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের কথা। কিন্তু—মাঝে মাঝে কী যে তোমার হয় সরমা, সত্যিই বুঝতে পারি না।

সরমা। বুঝতে যদি কোনদিন পারো, বলো—সেদিন তুমি আমায় ক্ষমা করবে?

প্রকাশ। আগে বলো, তুমি আমায় ভালবাসবে? ঠিক এমনি করে?

[প্রকাশ ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে সরমার বুকে। সরমার মুখের দিকে সে চোখ তুলে চাইতে পারে না। সরমা কাঠ হয়ে বসে থাকে। দৃষ্টি অচঞ্চল—সুদূরে নিবদ্ধ। একটা হাত শুধু প্রকাশের চুলগুলোকে নিয়ে খেলা করে চলে]

সরমা। বাসবো!

প্রকাশ। তাহলে আমিও তোমার সব অপরাধ চিরদিন হাসিমুখে ক্ষমা করবো।.....সরমা।

সরমা। চুপ। আর কোনও কথা নয়।...ঘুমোও।

[প্রকাশ অবসন্ন হয়ে পড়ে। আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে অস্ফুটকণ্ঠে বলে চলে বারবার পরম পরিতৃপ্তিতে—]

প্রকাশ। সরমা!... সরমা!... সরমা!...

[সরমা পাথরের মতো একদৃষ্টে সামনের দিকে চেয়ে বসে থাকে। কোনও সাড়া দেয় না। হাতটা শুধু খেলা করতে থাকে প্রকাশের চুলে।]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[প্রকাশের বাসকামরা। রাত ৮টা। বাইরে ঝড় উঠেছে। বাতাসে জানালার পর্দা থেকে উড়ছে। ক্রন্দনরতা সরমা। সৌরমোহন, জয়নারাণ, উমেশ।]

জয়। কী, চুপ করে রইলেন যে? অজয় বেঁচে আছে?

সৌর। কোনও খবরই পাচ্ছি না জয়নারাণ বাবু। এতে আমার কলঙ্কই তো বেশি। চেষ্টার কোনও ত্রুটি করছি না। কাগজে-কাগজে বিজ্ঞাপন, হ্যাণ্ডবিল,—

জয়। তাহলে কী সে উড়ে গেল বলতে চান? দেখতে দেখতে কটা বছর কেটে গেল। আর কবে পাওয়া যাবে সন্ধান? আঃ সরমা, কান্নাটা একটু থামা।

সরমা। আমার অজয়কে খুঁজে এনে দাও! দাও—। কোন কথা শুনতে চাইনা আমি। কিছু চাইনা তোমাদের কাছে। শুধু আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দাও।

জয়। আঃ, আস্তে সরমা! প্রকাশ যদি শুনতে পায়—

উমেশ। আজ্ঞে ঐ একটা গায়ুবল। বাবাজী বাড়ি নেই।

জয়। ফিরতে কতক্ষণ? যদি এর একটি বর্ণও তার কানে যায়—ভাবতে পারো কী হবে?

সরমা। হোক। জানুক। সবাই জানুক। আর আমি সইতে পারছি না। না-না পারবো না!

[পিছনে জানালার পর্দাটা এই সময় কে যেন সরায়। দ্রুত সরে যায় একটা ছায়া। চমকে ওঠে জয়নারাণ।]

জয়। কে?... কে ওখানে? (উমেশ গিয়ে জানালায় উঁকি দেয়। সরমা কাঠ হয়ে ওঠে)

উমেশ। আজ্ঞে, কোথায় কে?

জয়। আমার যেন মনে হোল—কে ওখানে দাঁড়িয়েছিল—হঠাৎ সরে গেল—পর্দাটা নড়ে উঠলো।

উমেশ। আজ্ঞে—ও আপনার মনের ভুল। বাতাসে পর্দা নড়ছে।

জয়। বাতাসে? হবেও বা। আমার এখন সব কিছুতেই ভয়। আর আপনাকেও বলিহারী যাই সৌরমোহনবাবু। আপনি এখানে কেন এলেন?

সৌর। আজ্ঞে, আপনাদের বাড়িতে গিয়ে শুনলাম, আপনারা এখানে এসেছেন? তাই—

জয়। তাই এখানে ছুটে এলেন আবার আমার সর্বনাশ করতে? একবার তো করেছেন সর্বনাশ! আশ মেটেনি?

সৌর। এ তিরস্কার আর অপমান আমার পাওনা জয়নারাণবাবু। বলবার কিছু নেই।

উমেশ। থাক-থাক, আর ন্যাকা কান্না কাঁদতে হবে

না। কিছু বুঝি না আমি, না। কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন ছেলেটাকে?

গৌর। আমি? কী বলছেন?

উমেশ। ঠিকই বলছি। লুকিয়ে রেখেছেন। যতদিন আছে ঘোটাদুটি কিছু হাত যতক্ষণ না আদায় করতে পারছেন—ততক্ষণ তাকে বার করবেন না।

গৌর। আপনার যা খুশি ভাবতে পারেন উমেশবাবু।

সরমা। (ছুটে গিয়ে গৌরমোহনের হাত ধরে) আমি দেবো টাকা। টাকা-গয়না সব। শুধু আমার অজয়কে ফিরিয়ে দিন। আপনার পায়ে ধরছি আমি—

গৌর। তুমি আমায় ভুল বুঝো না মা! এতবড় পাষাণ আমি নই যে মায়ের বুক থেকে ছেলে কেড়ে নিয়ে ব্যবসা করবো। কোথায় যে গেল সে, কেন গেল—আমি নিজেই জানি না।

সরমা। তাহলে! পাবো না আর তাকে কোনদিন?

গৌর। পাবে মা। নিশ্চয়ই পাবে। আমি যাচ্ছি আবার তাকে খুঁজতে।

অজ। হাঁ, তাই যান। খুঁজে তাকে বার করা চাইই। যান—

গৌর। নমস্কার। (গৌরমোহন চলে যায়। অঝোরে কাঁদতে থাকে সরমা।)

অজ। আঃ, থামু থামু সরমা।

সরমা। থামবো না! কেন থামবো? আর কতদিন পারে মানুষ মুখ বুজে থাকতে?

[সশব্দে দরজা খুলে যায়। দ্বারপথে দেখা যায় প্রকাশ দাঁড়িয়ে আছে, তার চোখ জ্বলছে। সবাই সেদিকে ফিরে চায়। সরমার গলা হতে একটা তীব্র ভয়ার্তনাদ বার হয়ে আসে। দৃঢ় পায়ে ঘরে ঢোকে প্রকাশ।]

প্রকাশ। তিনজনকেই এক সঙ্গে পেয়েছি। এইবার বোঝাপড়া।

সরমা। কী হয়েছে তোমার? অমন করছো কেন?

প্রকাশ। (সরমার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়) জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা করছে না তোমার?

অজ। প্রকাশ! প্রকাশ—

প্রকাশ। শাট্‌আপ! যান—বেরিয়ে যান আপনারা। দুজনেই। যান—

[নিঃশব্দে উমেশ আর অজয়নারায়ণ মাথা নীচু করে বার হয়ে যায়।]

প্রকাশ। সরমা। করুণাময় তোমাদের খাতক, না?

সরমা। জেনেছো সবকথা।

প্রকাশ। তোমায় আমি যত ভালবাসতাম সরমা, এখন ঠিক ততখানি তোমায় ঘৃণা করি। আর তোমার ঐ বাবা—

সরমা। সব দোষ আমার। যা বলবে আমায় বলো।

প্রকাশ। বলবার কী কিছু বাকি রেখেছ সরমা? আচ্ছা বলতে পারো সরমা, তুমি কজনার হাত বদলে আমার কাছে এসেছো? (সরমা জবাব দিতে পারে না। ঠক ঠক করে কাঁপে।) চুপ করে রইলে যে? তোমার ঐ বুড়ো বাপ তোমাকে নিয়ে ব্যবসা সুরু করেছিল বুঝি? তাতেই বুঝি বড়লোক? শেষ পর্যন্ত আমার সর্বনাশ করার জন্যে এই বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন বুঝি? ওঃ সরমা। কী দরকার ছিল তার? তুমি—তুমি একবার মুখ ফুটে চাইলেও তো তোমাকে সর্বস্ব দিয়ে দিতে পারতাম। কতজন আছে এমন আড়কাঠি ওর? তুমি একা, না আরো। (সরমাকে ঝাঁকানি দিতে দিতে) চুপ করে কেন? জবাব দাও। দাও জবাব—

সরমা। তুমি থামো। চুপ করো—

প্রকাশ। থামবো। কে থামবে? আমি, না তুমি? (সহসা গিয়ে আলমারী খুলে রিভলবার বার করে) কে থামবে? বলো—কে থামবে?

সরমা। ওকী। রেখে দাও। না না। (ছুটে যায় সরমা প্রকাশের দিকে, কিন্তু তার আগেই প্রকাশ নিজেকে গুলি করে। সরমা চিৎকার করে ওঠে। প্রকাশ পড়ে যায়। সরমা তার পাশে গিয়ে বসে)

সরমা। (আকুল কণ্ঠে) একী করলে তুমি? কী করলে?

প্রকাশ। (যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে) লিখে গেলাম, আমার যা কিছু সব তোমারই রইল। তোমার হারানো ছেলেকে খুঁজে এনো। তোমায়, তোমায় আমি বড় ভালবেসেছিলাম সরমা। বড় ভালবেসে—

[ঢলে পড়ে প্রকাশ। সরমা আর্তনাদ করে ওঠে]

সরমা। বা-বা— (ব্যস্তভাবে ঘরে ঢোকে জয়মাল্যাবণ আর উমেশ)

জয়। একী। একী হোল?

সরমা। (হঠাৎ যেন পাথর হয়ে যায়) তোমার কাণ্ড।

উমেশ। ওরে বাবা, একী কাণ্ড। বেঁচে আছে তো?

সরমা। নেই।

উমেশ। এঁ্যা। সেকী। (ব্যস্তভাবে মানদা ঢোকে)

মানদা। অ' দিদিমণি। এতো হট্টাগোল কেনে গো··· ওমা, ইকি কাণ্ড। এ যে খুনোখুনি গো।

জয়। চুপ।

মানদা। চুপ করবো কী গো? আমার হাতপায় যে খিনখিনি ধরছে গো। ওমা, একী গেরো হোল মা আমার পেটের দায়ে গতর খাটাতে এসে। এখুনি যে প্যাদা পুলিশে জাতগুষ্টিকে বেঁধে নিয়ে যাবে গো।

জয়। (তীব্রকণ্ঠে) মানদা।

মানদা। না বাপু, দাতপাড়া জানিয়ে আমার নামটাকে আর এর মধ্যে জইড়ো না গো।

জয়। খবরদার, টুঁ শব্দ নয়। যাও—মুখ বুজে থাকবে। কোন কথা নয়! অনেক টাকা পাবে। আর মুখ যদি খুলেছ—তাহলে সেই আওয়াজই হবে তোমার গলা থেকে শেষ আওয়াজ। বুঝেছ? যাও! (মানদা সভয়ে পালিয়ে যায়।)

জয়। সরমা।

সরমা। উঁ?

জয়। তুমিও কাউকে কিছু বোলো না। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে, বলবে ঝগড়াঝাঁটি প্রায়ই হোত, আজও হয়েছে। তাতায় একটু গোলমাল ছিল।

সরমা। (নিষ্প্রাণ কণ্ঠে) আচ্ছা।

জয়। অজয়ের কথা, বিয়ের কথা, কিছু বলবে না।

সরমা। (নিষ্প্রাণ) বলবো না।

জয়। এবার যাও! ভেতরে চলে যাও।

সরমা। বলছো যেতে। বেশ! তোমার হুকুম যখন— যাচ্ছি! (নিষ্প্রাণ যন্ত্রের মতন সে চলে যায়)

জয়। উমেশ।

উমেশ। আজ্ঞে?

জয়। লুকিয়ে-লুকিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া যায় না?

উমেশ। আজ্ঞে, লুকিয়ে কেন?

জয়। সোজা আত্মহত্যার ব্যাপার নয়। পুলিশ জানতে পারলে টানাটানি করবে। তাই—

উমেশ। কিন্তু সে-ফুরসৎ পাওয়া গেলে তো। দুটো বাড়ির পরেই থানা। গুলির আওয়াজ কি তারা শুনতে পায়নি ভেবেছেন? হয়ত এতক্ষণ তারা দলবল নিয়ে—(নেপথ্যে ভারী পদশব্দ) অই এলো ওরা!

জয়। খবরদার উমেশ। খুব সাবধান!

[দ্বারের কাছে পুলিশ-সহ দারোগা দেখা দেয়। নেপথ্য হতে কান্না জড়ানো সরমার আর্ত ডাক ভেসে আসে—অজয়! অজয়···]

দ্বিতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

(জ্ঞানাঞ্জনের বাড়ীর পূর্বোক্ত ঘর। রাত ৯টা। টেবিলে একটা ক্রিকেটের ভাঙা ব্যাট-মেরামত-রত জ্ঞানাঞ্জন। দৃশ্যারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যে হতে মাধবীর উচ্চকণ্ঠের ডাক শোনা যায়—"অঞ্জন! অঞ্জন—"। ব্যস্তভাবে তাড়াতাড়ি মাধবীর দৃষ্টিপথ লুকোতে চায় জ্ঞানাঞ্জন। পারে না। ঘরে ঢোকে মাধবী। ধরা পড়ে গিয়ে অপ্রতিভ হাসে জ্ঞানাঞ্জন।)

মাধবী। (হেসে আগিয়ে আসে) ধরা পড়ে গেলে?

জ্ঞান। ধরা পড়ার লজ্জা আছে, না ভাসিং?

মাধবী। আবার? কতবার বলেছি না ও বলে আর ডাকবে না? ছেলে কত বড় হয়েছে দেখতে পাও না?

জ্ঞান। পুরোনো অভ্যেস সব ছাড়িয়ে দিয়ে নিত্যি নতুন অভ্যেস ধরাতে চাও?

মাধবী। আমি আবার কী নতুন অভ্যেস ধরাতে চাইলুম গো?

জ্ঞান। দেখছো না, কী করছি? কম্পাউণ্ড ফ্র্যাকচার! তোমার ছেলে ভেবেছে ডাক্তার যখন ভাঙা হাত-পা জোড়া দিতে পারে, তখন ভাঙা ব্যাটই বা আস্ত করতে পারবে না কেন?

মাধবী। (হেসে ওঠে) ঠিক করেছে! কেমন জব্দ!

জ্ঞান। অত ছেলেমানুষী ডালি'ং—সত্যি, ছেলেমানুষী মাধবী। অসুখ করলে তোমারও তোলা আছে, কান্নাও!

মাধবী। কীসের কান্না? কে অসুখ করবে?

জ্ঞান। তোমার ছেলে। দুহাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে তুমি ওকে বাঁচাবে না ডালি'ং, বাঁধা পড়বে ওরই কাছে আষ্টেপৃষ্ঠে। ভয় পাচ্ছি আমি সেদিনের কথা ভেবে, যেদিন উল্টো পাকে এ-বাঁধন খুলে দিতে হবে। হয়তো—চলতো সইতে পারবে না।

মাধবী। তোমার খালি ঐ এক অলুক্ষণে কথা। ওকে আমি কুড়িয়ে পেয়েছি। ও আমারই থাকবে।

জ্ঞান। ভুল বোল মাধবী! মিথ্যে বললে। ওকে তুমি চুরি করে রেখেছ!

মাধবী। চুরি! কে বললে?

জ্ঞান। বলেছিলে—ওর ঠিকানার হদিশ পেলেই ফিরিয়ে দেবে। ক'টা বছর কেটে গেল। দিলে না কেন?

মাধবী। কাকে দেবো? কোথায় ঠিকানা?

জ্ঞান। ঠিকানা বিজ্ঞাপনে একটা ছিলো।

মাধবী। (চমকে ওঠে) ডাক্তার!

জ্ঞান। এবার তুমি ধরা পড়ে লজ্জা পাচ্ছো, না ডালি'ং?

মাধবী। তুমি জানলে কী করে?

জ্ঞান। সেটা বড় কথা নয়! কথা হচ্ছে, চিরটাকাল এতবড় সত্যিটাকে চাপা দিয়ে রাখবে কী করে?

মাধবী। (জ্ঞানের মুখে হাত চাপা দিয়ে) চুপ—চুপ! ওসব কথা বলোনা। কেউ শুনে ফেলবে।

জ্ঞান। মুখে হাত চাপা দিয়ে সত্যকে কেউ চিরদিন চেপে রাখতে পারেনি ডালি'ং! তুমি পারবে কী করে?

মাধবী। পারবো। এতকাল যখন পেরেছি, শেষ পর্যন্তও পারবো। নইলে আমি বাঁচবো না ডাক্তার! ডাক্তার, কোনদিন তোমার কাছে কিছু চাইনি। আজ আমার একটা ভিক্ষে দেবে?

জ্ঞান। কী?

মাধবী। তুমি কাউকে বোলোনা একথা। বলবে না?

জ্ঞান। নিজে থেকে বলবো না। কথা দিলাম, বাধ্য না হলে বলবো না।

মাধবী। আমাকে দোষ দিচ্ছো ডাক্তার, তুমি নিজে কী করেছো?

জ্ঞান। আমি? আমি কী করেছি?

মাধবী। আমি সব জানি, সব টের পাই। তুমি ওকে ভালবাসো নি?

জ্ঞান। বাড়িতে একটা কুকুর পুষলে মানুষের মায়া পড়ে তার ওপর, আর এতো মানুষ!

মাধবী। হাসপাতালের চুলচুলি বিছানা ছেড়ে কেউ কুকুরের বিছানার দিকে তাকে ঘুরিয়ে শুয়ে থাকে না ডাক্তার। কেন তুমি আজকাল ঠিক ওর ইস্কুল থেকে ফেরবার সময়টিতেই একবার করে বাড়ি ফেরো বলতো? আমার ভাগ্য তো এতো ভোরাপো নয়। ঐটুকু বাচ্চার জন্যে দু'দুটো আলমারি পোষাকে ভরে তুলেছে কে ডাক্তার? কী, কথা বলছো না যে?

জ্ঞান। রোগটা ছোঁয়াচে।

মাধবী। নিজে ডাক্তার হয়ে এতদিনে তা' টের পেলে?

জ্ঞান। টের পেয়েছি অনেকদিন।

মাধবী। সাবধান হতে পারোনি?

জ্ঞান। তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। এ-রোগের টিকের খোঁজ পাইনি। পেলে নিতাম।

মাধবী। তবে আমার দোষ দাও যে বড়?

জ্ঞান। ভুলতে পারি না যে আমাদের ওপর অভিশাপ রয়েছে!

মাধবী। বলোনা—বলোনা ওকথা!

জ্ঞান। কিন্তু—এই যে আমার অদৃষ্ট মাধবী!

মাধবী। তোমার অদৃষ্টে যদি না পাই, আমার অদৃষ্টে পাবো।

জ্ঞান। তোমার অদৃষ্টের সঙ্গে ঐ সীমা মেয়েটাকে আবার জড়াচ্ছো কেন মাধবী? তোমার—আমার দোষে ও কেন শাস্তি পাবে?

মাধবী। ওমা, সীমাকে জড়াতে যাবো কেন? পাড়া-পড়শীর মেয়ে। ওর মা আমার বন্ধু। সীমা অরুণের খেলার সাথী। এর মধ্যে দোষটা কী হোল?

জ্ঞান। খেলার সাথী তোমার ছেলের আরো আছে ডালি'ং! অত মাখামাখি কিন্তু আর কারো সঙ্গে নেই।

মাধবী। ছেলেমানুষ, ভালো লাগে দু'জনারই দুজনকে,—তাই হয়তো—

জ্ঞান। বড় ওরা একদিন হয়ে যাবে। সেদিন এই ছেলেমানুষীই—এই ভালোলাগাই যদি ভালবাসা হয়ে দাঁড়ায়?—

মাধবী। যাঃ! কী যেন তুমি! তাই বুঝি আবার কেউ ভাবে?

জ্ঞান। অন্য কেউ ভাবে কিনা জানিনা। কিন্তু তোমার তো না ভাবার কথা নয় মাধু! তুমি আমি যে ঐ বয়স থেকেই—

মাধবী। হয়েছে—হয়েছে! সে তখন যাহোক দেখা যাবে।

জ্ঞান। যাবে না মাধু! ওর মা তোমার বন্ধু হতে পারেন। কিন্তু—বাপ-মার পরিচয় হীন একটা ছেলের হাতে বন্ধুর মেয়েকে তিনিও চাইবেন না। কী করে সমাজের তখন তোমার ছেলেকে? কী সান্ত্বনা দেবে ঐ সীমাকে?

মাধবী। তুমি থাকবে?

জ্ঞান। জবাব দিয়ে আমায় থামাও মাধবী, যুক্তি দিয়ে থামাও! সবার কথা বাদ দিলেও, তোমার ঐ পাতানো ছেলে বড় হয়ে কী বলে লোকের কাছে নিজের পরিচয় দেবে, তা একবার ভেবে দেখেছো?

মাধবী। কেন? আমাদের নামে পরিচয় দেবে।

জ্ঞান। কেন নেবে সে তোমাদের পরিচয়?

মাধবী। নেবে না?

জ্ঞান। না। চাইবে তোমার কাছে কৈফিয়ৎ। কী কৈফিয়ৎ দেবে ডার্লিং? বলবে—মানুষ নিয়ে পুতুল খেলা খেলেছ তুমি? বলবে—ছেলের শখ মিটিয়েছ পরের ছেলে নিয়ে?

মাধবী। (আকুলকণ্ঠে) ডাক্তার।

জ্ঞান। কোনও অধিকার নেই মাধু! তা তুমি পারো না?

মাধবী। (আর্ত কণ্ঠে) ডাক্তার! থামো। থামো। (কেঁদে ফেলে)

জ্ঞান। বলিনি, কান্না তোমার তোলা আছে?

মাধবী। ডাক্তার, যা বললে—সব সত্যি হবে?

জ্ঞান। হতে পারে।

মাধবী। কী হবে তাহলে ডাক্তার?

জ্ঞান। কীসের কী?

মাধবী। আমার—আমার যে কতো আশা ওকে নিয়ে, কতো স্বপ্ন, কতো সাধ। আর ক'টা বছর বাদে পরীক্ষা দেবে। আমি যে এখন থেকেই ভাবতে পারি না, কী করে ওকে সহরের কলেজে-হোস্টেলে একা পাঠিয়ে দেবো? একটা দিন যাকে ছাড়তে পারি না, তাকে—তাকে কি করে—আমি তাহলে বাঁচবো না ডাক্তার?

জ্ঞান। আমি ডাক্তার। বাঁচিয়ে তোমায় রাখার জন্যে সাধ্যমত চেষ্টা আমি করবো।

মাধবী। কিন্তু—সে বাঁচার দাম কী? যদি সাধই না মিটলো—জীবনে সুখই যদি না এলো—

জ্ঞান। সুখ? আমাদের জীবনে? (হাসতে থাকে)

মাধবী। হাসছো? আমার এ-অবস্থায় হাসতে তুমি পারছো ডাক্তার? তুমি—তুমি কী?

জ্ঞান। ডাক্তার। আমি বিজ্ঞানী ডার্লিং, আমি বস্তুবাদী। স্বপ্ন দেখি, তবে জেগে নয়। তোমার অবস্থায় হাসছি না। হাসছি নিজের অবস্থায়। সুখ! সুখ আমার জীবনে নেই ডার্লিং। তাই সুখ নেই তোমারও জীবনে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

[প্রকাশের ঘর। রাত।

প্রকাশের দেহটাতে কাপড় ঢাকা দেওয়া আছে। পাশে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশ। দারোগা বসে আছে চেয়ারে। হাতে নোট বই—মাঝে মাঝে লিখছে। একপাশে জয়নারায়ণ আর উমেশ। অন্য দিকে দারোগার দিক হতে প্রায় মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সরমা।]

দারোগা। আপনাদের বিবাহিত জীবন কি সুখের ছিল না?

উমেশ। আর বলবেন না মশাই! পাগলাটার সঙ্গে বিয়ে হয়ে অবধি—

দারোগা। (ধমক দিয়ে) আপনি চুপ করুন। আপনাকে জিজ্ঞাসা করিনি।

উমেশ। আজ্ঞে, বুঝতে পারিনি।

দারোগা। বলুন। সুখের ছিল না, না?

সরমা। (মুখ না ফিরিয়েই, নির্বিকার কণ্ঠে) সুখের কেন থাকবে না? বিবাহিত জীবন আমাদের সুখেরই ছিল।

দারোগা। প্রায়ই আপনাদের ঝগড়া হোত?

সরমা। না। প্রায়ই কেন হবে? এক আধদিন হোত। সে কার না হয়? আপনার হয় না?

[কথার সঙ্গে সঙ্গে সে দারোগার দিকে ফিরে দাঁড়ায়। তার মুখের দিকে চেয়ে দারোগা বিস্মিত হয়। চোখে ফেরাতে পারে না।]

জয়। আর কিছু জিজ্ঞাসা করবেন ওকে?

দারোগা। এ্যাঁ? হাঁ।

জয়। কিন্তু দেখছেন তো ওর অবস্থা?

দারোগা। আমি দুঃখিত জয়নারায়ণ বাবু। এটা আমার কাছেও আনন্দের কাজ নয়। But duty is a stern mistress. হাঁ, আজ আপনাদের ঝগড়া হয়েছিল?

সরমা। হয়েছিল।

দারোগা। কী নিয়ে? (সরমা শূন্য দৃষ্টিতে অন্যমনস্কের মতন চেয়ে থাকে) বলুন।

সরমা। এ্যাঁ? কী বলবো?

দারোগা। আজ আপনাদের ঝগড়া হয়েছিল কী নিয়ে?

সরমা। আমার ছেলে অজয়কে নিয়ে। (জয়নারায়ণ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকায় তার দিকে। সরমা মুখে কাপড় চাপা দিয়ে কেঁদে ওঠে)

দারোগা। ছেলে? কোথায় আপনার ছেলে? কাঁদছেন কেন?

সরমা। বারে? কাঁদবোও না? আমার ছেলে গেল। আমার স্বামী গেল। আপনার আর কী? আপনি তো বেশ আছেন। দিন—আমার অজয়কে এনে দিন, আমি চুপ করছি।

দারোগা। (সবিস্ময়ে) কী ব্যাপার মশাই, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না!

জয়। আমিও পারছি না। মেয়েটা হঠাৎ পাগল হয়ে গেল নাকি?

দারোগা। সত্যি কথা বলতে কী, আমারও সন্দেহ হচ্ছে। Dead body আমি স্বয়ং মর্গে পাঠিয়ে দিই।

জয়। মর্গে? কেন?

দারোগা। বেশ। আমার ভালো বলে মনে হচ্ছে না। কেমন যেন খাপছাড়া—সাজানো গোছের। নাঃ আমি আপনাদের সবাইকে থানের দায়ে চালান করে দিই। যা হয়, সেখানে গিয়ে করবেন।

জয়। থানের দায়ে চালান! কী বলছেন আপনি?

উমেশ। (হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে) আমরা হুজুরে কিছু জানিনে হুজুর। আপনি মোবিবতার। আপনি বিচার করে দেখুন। (সরমার অঁচলের চাবি দিয়ে আলমারি খুলে দারোগার অলক্ষ্যে জামাকাপড় বার করতে থাকে)

দারোগা। বেশ তো, ওকথা সেখানে গিয়ে বলবেন। বিচার করবার মালিক আমি নই। (সরমার দিকে দৃষ্টি পড়ায়) ওসব কী করছেন?

সরমা। (মুচকি হেসে) ভাবো আমি আপনার সঙ্গে জেলখানায়। ওরা না জাকুক। কিন্তু আমার অজয়কে খুঁজে দেবেন তো?

দারোগা। হাঁ-হাঁ, দেবো। (জয়নারায়ণকে) উনি কী এই রকমই চিরকাল, না আজই হঠাৎ—

জয়। এই এখুনি দেখছি। ঐটিই আমার একমাত্র মেয়ে! ওর জন্য—(কথা বেধে যায় উদ্গত অশ্রুতে মাথা নিচু করে। দারোগা একটুক্ষণ ভাবে। তারপর সরমাকে বলে)

দারোগা। শুনুন। এখানে আসুন একবার। একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো?

সরমা। বাবা বুঝি বকুনি করে দিলে? করুক। আমি আর কারো কথা শুনবো না। আমি চলেছি।

(কথার সঙ্গে সঙ্গে সে আগিয়ে চলে দারোগার দিকে। আঁচলে বাঁধা-চাবির গোছা তখনও আলমারিতে আটকানো। টান পড়ে) ওমা! আবার পেছু টানে কে গো? (ফিরে দেখে হেসে ওঠে। আঁচল খুলে নিয়ে কাঁধে ফেলে দারোগার কাছে যায়) বলুন।

দারোগা। আচ্ছা, বলুন তো আপনার স্বামীকে কে খুন করেছে? কী তা কথা বলবেন কিন্তু। তা না হলে অন্ধকারে আমি খুঁজে আনতে পারবো না। (সরমা নিরুত্তর) বলুন বলুন—

সরমা। (আর্ত্তাকাতরকণ্ঠে) কী?

দারোগা। কে আপনার স্বামীকে খুন করেছে?

সরমা। কে আবার খুন করবে? করলুম আমি। আমার সঙ্গে বিয়ে না হলে কী এমন করে মরতো ও? নিজের বুকে গুলি মেরে—কতো দুঃখে—উঃ বাবা! (আকুল হয়ে কেঁদে ওঠে)

দারোগা। খুন? (উঠে দাঁড়ায়) থান, লাশ আপনি চালিয়ে দিলেন। আমি লিখে নিয়ে যাচ্ছি।

জয়। (অত্যন্ত ক্রুদ্ধকণ্ঠে) এ উপকার আমার মনে থাকবে। কারো কথা আমি শুনিনি দারোগাবাবু। জোর করে মেয়ের আমি এইখানে বিয়ে দিলাম। তার ফল কী ভোগ দেবেন।

দারোগা। অদৃষ্ট মানতে হয় জয়নারায়ণবাবু। এসবই অদৃষ্টের লেখা। চলো জমাদার—(প্রস্থানোদ্যত হয়)

সরমা। (বাধা দিয়ে) যাবে। বেশ লোক তো আপনি। আমার অসুখকে এনে দেবেন বললেন না?

দারোগা। এঁকে ডাক্তার দেখাবার ব্যবস্থা করুন।

সরমা। (ব্যাকুল চিৎকার করে ওঠে) ডাক্তার দেখালে উনি বাঁচবেন? আপনি বলছেন? না—না—যেতে আপনাকে দেবো না।

জয়। সরমা! ও কী হচ্ছে! (সরমা ধমকে দাঁড়িয়ে পড়ে দারোগা ও জমাদার চলে যায়)

সরমা। (জয়নারায়ণকে নাড়া দিতে দিতে) ও বাবা! দাঁড়িয়ে দেখছো কী? ডাকো ডাক্তার! ও যে বাঁচবে গো! ডাকো ডাক্তার! ডাকো—

জয়। সরমা! সরমা!

উন্মেষ। নারায়ণ! শ্রীমধুসূদন!

সরমা। ডাকো ডাক্তার! ডাকো! ডাকো—

দ্বিতীয় অঙ্ক

চতুর্থ দৃশ্য

[রাত। করুণাময়ীর বাড়ির ঘর। সন্তর্পণে দ্বার-মাঝারি দিন্দুকটা খুলে নটবর খেরোয়-বাঁধা একটি পুঁটুলি তার ভিতরে রাখে। জানালায় অলক্ষ্যে উঁকি দেয় বটুকের মুখ। জানালার-পাল্লায় খট করে একটু শব্দ হয়। চমকে ফিরে তাকায় নটবর। তাড়াতাড়ি সিন্দুক বন্ধ করে সে জানালায় হাজির হয়। চিন্তাগ্রস্ত বলে মনে হয় তাকে। নেপথ্যে হঠাৎ করুণা ও জয়নারায়ণের উত্তেজিত কণ্ঠ শোনা যায়। চকিত সন্তর্পণে ঘর ছেড়ে বার হয়ে যায় নটবর। অন্যদিকে উত্তেজিত কথারত করুণা ও জয়নারায়ণ ঘরে ঢোকে।

করুণা। না—না—না, কোনও কথা শুনতে চাই না! ফিরিয়ে দাও আমার মেয়েকে!

জয়। শান্ত হও করুণা। মেয়ে তোমার ঘরেছে। যেতে না চাও, তাকে এখানে এনে রাখো।

করুণা। কোথায় আমার মেয়ে। কোথায় আমার সেই সরমা। তাকে তুমি রাখোনি। বার বার ছলনা করেছ, ভেঙেছ পাতিব্রত্য। আমার সেই লক্ষ্মীপ্রতিমার বদলে কী তুমি আমায় ফিরিয়ে দিচ্ছো? ও আমি নেবো না। আমার যে-সরমাকে তুমি কেড়ে নিয়েছিলে, তাকে ফিরিয়ে দাও।

জয়। সে-সরমা হারিয়ে গেছে করুণা। কোথায় আর পাবো তাকে?

করুণা। হারায়নি। জেদ করে তুমি হারিয়ে দিয়েছো আমার সরমাকে আর সরমার অজয়কে। একদিন তোমায় বলেছিলাম না যে সময় এলে নালিশ করবো। আজ করছি,—নালিশ করছি আমি তোমারই কাছে তোমারই বিরুদ্ধে দুধেভাতে মানুষ করে সন্তান চুরি করার অপরাধে। তোমরা দুর্দান্ত জমিদার বংশ। অনেক প্রজার অনেক বিচার করেছ, তাতে হাত দিয়েছ অনেকের। আজ নিজের বিচার করো বাবা। রায় দাও।

জয়। (অবসন্নের মতন একটা আরাম কেদারায় বসে

পড়ে) ক্ষতি যদি করেই থাকি কারো, ক্ষতিপূরণ কোথা থেকে করবো করুণা। আজ আমি নিঃস্ব, দেউলে! আমি হেরে গেছি।

করুণা। পাওনাদার তা শুনবে কেন? কালাপাহাড়েরা চিরকালই হারে, শুধু ভাঙ্গে, গড়তে কিছু পারে না। তুমি ভগবানের বিরুদ্ধে জেদ করে বিদ্রোহী হয়েছিলে।

জয়। না। আমি চেয়েছিলাম শুধু, আমার মেয়েকে সুখী করতে। অন্যায় কিছু করিনি।

করুণা। শৈশবে যারা বাপ হারায়, যৌবনে যারা স্বামী হারায়,—সে সবই তাদের অদৃষ্ট, ভগবানের ইচ্ছা। তুমি সেই ভগবানের বিধানকে ডিঙোতে চেয়েছো তোমার ছেলের স্পর্ধায়। পারবে কেন তা? তাই হেরে গেছো। এ তোমারই অন্যায়, তোমারই স্বেচ্ছাচারিতা আর পাপ।

জয়। বলো করুণা, আরো বলো। তোমার কথায় আমি তত ব্যথা পাচ্ছি না করুণা, যত ব্যথা পাচ্ছি অত কাছে থেকেও তুমি আমায় চিনতে পারোনি বলে। আমার শুধু একটা দিকই দেখলে করুণা? দেখতে পেলে না আরও একটা দিক?

করুণা। কী বলতে চাও?

জয়। হয়ত ভগবান তাদের বঞ্চিত করেছেন সত্যিই। কিন্তু সেই বঞ্চনার দুঃখ দূর করার জন্যে মানুষের বুকেও কি তিনি মমতা দেননি? মানুষ কি সেই সবহারা বঞ্চিতদের জন্যে কিছু করবে না? তাদের শুকনো মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করাটা কি অপরাধ? কেন তবে দয়া-দাক্ষিণ্যে-মমতার অস্তিত্ব দিলেন সেই এ ভগবান এই মানুষেরই মনে?

করুণা। এত যদি দয়া তোমার, কেন তবে দয়া করে ফেরৎ দিচ্ছো না তার গচ্ছিত ধনকে? তোমার ঐ জেদ করে হাসি ফোটানোর খেলায় আমার হাসি তুমি কেড়ে নেবে কোন অধিকারে? দাও—ফিরিয়ে দাও আমার মেয়েকে।

জয়। এখনি একটা তাগাদা আমিও তোমার কাছে করতে পারি করুণা। করবো?

করুণা। আমার কাছে? কী নিয়েছি আমি তোমার?

জয়। আমি যদি তোমার মেয়েকে কেড়ে নিয়ে থাকি, তুমি কেড়ে নিয়েছো আমার খোকাকে।

করুণা। (আর্তকণ্ঠে) রায়?

জয়। চমকে উঠলে যে করুণা? মনে পড়ছে না সেদিনের কথাগুলো? আমার প্রথম সন্তান ঐ খোকা—আমার স্বপ্ন, আমার আশা, আমার কল্পনা। ও আমার সৃষ্টি। আমি চেয়েছিলাম আমার সবটুকু দিয়ে ওকে গড়ে তুলতে,—আমি না থাকলেও ওরই মধ্যে নতুন করে বেঁচে থাকতে। কিন্তু তুমি—তুমি ওকে কেড়ে নিয়েছিলে আমার কাছ থেকে।

করুণা। (তীব্র প্রতিবাদে) মিছে কথা!

জয়। বাপের শাসন থেকে তুমি তাকে আড়াল করে রেখেছিলে মায়ের স্নেহ দিয়ে। আমি তাকে গড়তে চেয়েছিলাম দুর্বার, কঠিন করে। তুমি তাকে স্নেহরসে ভিজিয়ে ভিজিয়ে নরম করে তুলেছিলে। আমি চেয়েছিলাম—সে আমার বন্ধু ভাবুক, ভালবাসুক। তুমি শেখালে তাকে আমায় ভয় করতে, এড়িয়ে চলতে।

করুণা। বাপের শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে হলহল মুখে ছেলে এসে দাঁড়াতো মায়ের কাছে এতটুকু স্নেহ আর সান্ত্বনার কাঙাল কামনায়। তা আমি তাকে দিয়েছি। অন্যায় করেছি?

জয়। অন্যায় হোত না যদি না তাতে তুমি গড়তে গিয়ে ভেঙ্গে বসে থাকতে। হাঁ, ভেঙেছো তুমি! দুহাতে ভেঙেছো। ভেঙেছো আমার মন, স্বপ্ন, সাধনা আর সৃষ্টিকে, ভেঙেছো একটা বিরাট সম্ভাবনাকে। ভেঙেছো বাপের সঙ্গে ছেলের সম্পর্ক। তাই—তাই যে ছেলে হয়তো বাপের জন্যে হাসিমুখে প্রাণ দিতে পারতো, সে বিদ্রোহী হয়ে উঠলো! যে ছেলে সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারতো নির্বিকারে, সে পারলো না সামান্য একটা মেয়েকে ছাড়তে। চলে গেল! তুমি-তুমি করুণা, আমার ছেলেকে আমায় দিতে পারলে না, নিজেও ধরে রাখতে পারলে না।

[জয়নারায়ণের কথার মাঝে সভয় দৃষ্টিতে করুণা তার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ক্রমশঃ অবসন্নের মতো আপনা হতেই বসে পড়ে চেয়ারের পাশে ।]

জয় । চুপ করে রইলে কেন করুণা ? জবাব দাও ? দাও খেসারত !

[ঘরে ঢোকে নটবর । হাসতে বলে—]

নট । দুয়ো ! হেরে গেল ! দুয়ো ! (জয়নারায়ণ ফিরে তাকায় তার দিকে । করুণা মাথা নামায়)

জয় । তুমি ! তুমি এখানে কেন এলে ?

নট । (হাসতে হাসতে) শুনতে এলুম কবির লড়াই ! বাহবা বাহবা ! খাসা জমেছে । দেখতে হবে—শিব হারে, না শিবাণী ! লাগাও ! জোরসে লাগাও ! অ করি, থামলি কেন রে ? লজ্জা ? সেকীরে ! অত তেজ সব কোথায় গেল । রায়বাহাদুর ! তাহলে এক তরফাই হোক !

করুণা । (মুখ নামিয়েই, স্তিমিত কণ্ঠে) তুমি যাও নটুদা !

নট । এ্যাই দ্যাখো ! যাবো কী রে ! দেখবো না ! বড় সাধ আমার ! ওঠ—ওঠ, বুকে ওঠ শিবের ! নাচ দেই দেই করে ! হারিয়ে দে—হারিয়ে দে ঐ বুড়ো শিবকে ।

করুণা । তুমি কী পাগল হলে নটুদা ?

নট । (হাসতে হাসতে) শোন কথা ! একটা পাগলী ক্ষেপি আমায় পাগল বলছে । (হাসতে বলে)

জয় । অত করে গাঁজা খেলে এমনি হয় ।

নট । ওটা তো তোমারই পেসাদ বুড়োশিব ! বেশ যা হোক তুমিই ধরলে, আবার তুমিই দোষ দিচ্ছো ? অ বুড়োশিব ! তোমারই বা ছেলে কী গো ! ও শ্যাধা আজ আর নাচবে না । একালের শ্যাধা কিনা পায়ে জুতো পরে নাচতে ভুলে গেছে । তুমি নাচো ! প্রলয় নাচো ! নাচো । বুঝিয়ে দাও একবার ঐ মেয়েটাকে যে তুমিও কম নও ! তোমার পায়ের চাপে ভূমিকম্প হয়, আগুন নাড়াতে আকাশ ভেঙ্গে, তোমার দুটায় জড়ানো কালনাগিনী আর মদন পোড়ে চোখের আগুনে । দেখিয়ে খ করে দাও ওকে ! আমিও দেখি দুচোখ ভরে !

করুণা । তোমার পায়ে কী আমি মাথা খুঁড়বো নটুদা !

নট । উঁহুঁ ! আমার নয় । পায়ে ধর ঐ বুড়ো শিবের তুই কেমন ধারা অন্নপূর্ণে আর জগদ্ধাত্রী রে ? দিন দুনিয়ার সবাই পায় তোর অসীম কৃপা, আর ঐ বুড়োশিব ভিক্ষে চেয়েও মুখ পুড়িয়ে ফেরে ঘরে অন্নপূর্ণের দোর থেকে ? ছি ছি, ওনামে ঘেন্না ধরালি তুই ! পারবিনে তো লড়তে গেলি কেন ?

জয় । আমি যাই করুণা ।

করুণা । না বোসো ।

নট । যাবে কোথায় বুড়োশিব ! ও-ছলনা আমরা বুঝি গো ! কেন মিথ্যে ভাঁওতা দিচ্ছ । তোমাদের ঝগড়া তো ? রাগই যদি সত্যি হবে তোমাদের, তাহলে স্বামীর ভিটে ছেড়ে বাপের বাড়ীতে রাগ করে চলে গিয়ে পতিনিন্দে শুনে গিন্নীই বা দেহত্যাগ করবে কেন, আর সেই খবর পেয়ে বুড়োশিবই বা ছুটে গিয়ে গিন্নির মরা লাশটাকে কাঁধে ফেলে শোকের চোটে বাউরো হয়ে ত্রিভুবন চষে বেড়াবে কেন ? হেঁ হেঁ হেঁ ! বুঝি সব বুঝি ! ওসব তোমাদের ধাপ্পাবাজী ! আমি ওতে ভুলছিনে !

জয় । নটবর !

নট । তোমরা কেউ কম যাওনা ! এ বলে আমায় দ্যাখ, ওবলে আমায় দ্যাখ ! মিটিয়ে নাও বুড়োশিব, মিটিয়ে নাও ! অ করি, আর মান করে বসে থাকিসনিরে ! মিটিয়ে ফ্যাল ! কেন বুড়োটাকে খামকা দুঃখ দিচ্ছিস, আর নিজেও দুঃখু পাচ্ছিস ? মিটিয়ে ফ্যাল—মিটিয়ে ফ্যাল—

[হাসতে হাসতে প্রস্থানোদ্যত হয়েই সহসা ফিরে দাঁড়ায়]

নট । অ করি, আটগণ্ডা পয়সা দে !

করুণা । নেই কাছে ।

নট । সেকীরে । অন্নপূর্ণের আঁচল কাবা ! অ বুড়োশিব ! তাহলে তুমিই দাও বাপু । মহাপেসাদ বাড়াও ।

[জয়নারায়ণ আট আনা পয়সা দেয়]

বাঁচালে ! চলি আমি ! খবর্দার, আর ঝগড়া নয় ! মিটিয়ে ফেলো—মিটিয়ে ফেলো ! (প্রস্থান একটু-ক্ষণ দুজনেই চুপ করে বসে ভাবে । কেউ কারো

দিতে চায়না। সহসা পকেট খুঁজতে সুরু করে জয়নারাণ)

জয়। হাঃ আনিনি! (সরমা নীরবে উঠে গিয়ে একসঙ্গে চুরুট আর দেশলাই এনে দেয়। মাথা নিচু করে বলে)

করুণা। আনিয়ে রেখেছিলুম তোমারই জন্য। (আবার মাথা নিচু করে বসে থাকে। জয়নারাণ চুরুট ধরিয়ে মাথা নিচু করে টানতে থাকে। সহসা একই সময়ে দুজনে মুখে তুলে দুজনের দিকে তাকায়। দেখা যায় দুজনেরই চোখে জল)

করুণা। রায়।

জয়। করুণা। (দুজনেই পরস্পরের চোখের জল মুছিয়ে দিতে যায়)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(রায়বাড়িতে সরমার ঘর। সরমাকে রোগা দেখানো হচ্ছে। সরমার চোখের কোণে কালি, বয়েস বেড়েছে। বয়েস বেড়েছে জয়নারাণ আর উমেশেরও। একদিকে সভয়ে দাঁড়িয়ে মানদা সবকিছু দেখছে। সরমার চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি। আগুন জ্বলছে প্রকাণ্ড একটা ধুনুচিতে। রোকা মাঝে মাঝে তাতে লঙ্কা আর সরষে পোড়াচ্ছে। গন্ধে সবাই নাক চাপা দিচ্ছে। ছটফট করছে সরমা সেই গন্ধে। রোকা সুর করে মন্ত্র আউড়ে চলেছে।)

রোকা। নম সরষে পোড়া, নমো লঙ্কা পোড়া, ছি টিং ছট। ভূতপেরেত বেহদ্দির পাল্লা চটপট। যম ভূতনাথার নয়। (আবার আগুনে লঙ্কা পোড়ায়)

সরমা। (ছটফট করে ওঠে) মাগো, কী পোড়াচ্ছে এরা সব। এর চেয়ে জ্যান্তমানুষ ধরে ধরে পোড়াক না।

রোকা। দেখছেন—দেখছেন বাবু, লঙ্কা পোড়ার গুণ দেখছেন। ছটফট করছে কাঁধের ভূত। রোস, এখন হয়েছে কী।

জয়। উমেশ। (রোকা নানান ভঙ্গিং করে চলে)

উমেশ। আজ্ঞে।

জয়। তোমার কথা শুনেই আমার এই আয়োজন। নিজে আমি বিশ্বাস করি না এসবে। তবে—বানে ভেসেছি, তাই কুটোটাকেও আঁকড়ে ধরছি। ওকে কি সত্যিই ভূতে পেয়েছে।

উমেশ। পেয়েছে। পাঁচপো পেয়েছে।

জয়। কিন্তু কথাবার্তা যা বলছে তাতো—

উমেশ। আজ্ঞে এতো আর ছোটলোক ভূত নয় যে এস্তার মুখ খারাপ করবে। লেখাপড়া জানা ভদ্রলোকের ছেলে প্রকাশ—সে ওসব করতে যাবে কেন। দেখুন না একবার কাণ্ডখানা কী হয়।

জয়। বেশ, দেখাই যাক।

মানদা। বাবু, আমায় ছেড়ে দাও বাপু।

জয়। না।

মানদা। শেষে যদি নিশিপিসির কাঁধ থেকে নেমে আমার কাঁধে চেপে বসে। ওগো বাবা গো।

জয়। চুপ! (রোকা মন্ত্রপাঠ করতে করতে সহসা ধুনুচিটা সরমার নাকের কাছে ধরে। সরমা ছটফট করে ওঠে। তার পরই ধাঁ করে চড় বসিয়ে দেয় রোকার গালে। মানদা ভয়ে চিৎকার করে ওঠে।

সরমা। খবর্দার। কের যদি করেছ—বাবা, দেখছো।

রোকা। দেখছেন মন্ত্রের জোরটা। এবার বাবু এঁর হাত পা গুলো চেপে ধরতে হবে যে।

জয়। কেন।

রোকা। দেখছেন না, কেমন জোর করছে ভূতটা? সহজে কি নামবে? বড় জবরদস্ত পাল্লায় পড়েছেন মালক্ষী। হয় চেপে ধরুন, নয়তো বেঁধে ফেলুন।

উমেশ। মানদা, তুমি ধরনা একটু সরমা মাকে।

মানদা। ওরে বাবা, আমি পারবো নি।

সরমা। কেন, ধরবে কেন আমায়? তোমরা সবাই আমাকে নিয়ে কী করছো বলোতো? আমার কি হয়েছে কী?

রোকা। এই তো ভূত ছেড়ে গেছে বাবু। হেঁ হেঁ, আমার মন্তর বড় খাতা নয়।

সরমা। ও! ভূত ছাড়াতে এসেছ তুমি। আমাকে ভূতে পেয়েছে। (খিলখিল করে হাসতে থাকে)

রোকা। এ্যাঁ! ইকি কাণ্ড। এ বড় ত্যাঁদড় ভূতের পাল্লায় পড়েছি বাবু, ছাড়াতে সময় লাগবে।

[গৌরমোহন আসে]

গৌর। হাঁ বাবা, এ বড় কঠিন ভূত। তুমি পারবে না। তুমি যাও এখান থেকে ওঠো।

রোকা। এ্যাঁ। যাবো।

জয়। আপনি কখন এলেন?

গৌর। এইমাত্র। রোকা ডাকা হয়েছে কী জন্যে?

উমেশ। সরমা যাকে ভূতে-পেয়েছে যে।

গৌর। সে ভূত ছাড়ানো এই রোকার কম্মো নয়। একে যেতে বলুন। ইস, এমন অবস্থা হয়েছে; অথচ আমাকে একটা খবর দেননি। আমি আসছি জয়নারায়ণবাবু।

জয়। কোথায় চললেন?

গৌর ডাক্তার ডাকতে। আমার জানা একজন খুব ভাল ডাক্তার আছেন। তুমি যাও হে।

রোকা। কাজটা ভাল করলেন না বাবু।

জয়। সেটা আমরা বুঝবো। এই যাও তোমার টাকা। (টাকা দেয় রোকাকে। রোকা তার জিনিষ পত্তর গুছোতে থাকে। সরমা একদৃষ্টে চেয়ে থাকে গৌর মোহনের দিকে।)

গৌর। আমাকে তুই চিনতে পেরেছিস মা?

সরমা। (হেসে ঘাড় নাড়ে) হাঁ।

গৌর। আমি কে বল দেখি।

সরমা। কী জানি বাবা, অতশত জানি-টানি না। জেনেই বা কী হবে? কে আমার কী উপকার করবে?

গৌর। অজয়ের কাছে যাবি মা? অজয় যে তোকে খুঁজছে। (সরমা মুচকি মুচকি হাসতে থাকে)

সরমা। বড় চালাক তুমি, না। ঐ বলে আমায় ভুলিয়ে নিয়ে যাও। না বাবা, আর কোথাও যাচ্ছিনে।

গৌর। হুঁঃ, বুঝলাম। আমি চললাম জয়নারায়ণ বাবু ডাক্তারের কাছে। (চলে যায়। মাধবও চলে যায়)

রোকা। বাবু, এই ফাঁকে আর একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবো। (হৈ হৈ করতে করতে নটবর আসে)

নট। রোস—রোস, কে কাকে ধ্যাখে এইবার দেখাচ্ছি। (পাকড়াও করে রোকাকে। কাঁটা হাতে বামদা ঢোকে)

বামদা। ছেড়োনি—ছেড়োনি মামাবাবু ঐ ড্যাকরাকে। মুখ পোড়া। মেয়েটাকে তুমি আধমরা করে ফেলেছে। ভূত ছাড়াচ্ছো। আজ খেংরে যদি তোর ভূত না ছাড়িয়েছি তো আমার নাম বামদাই নয়।

রোকা। মেরে ফেললে। ওগো, মেরে ফেললে আমায়। (নটবর হাসতে হাসতে থাকে।)

জয়। আঃ। কী করছো নটবর। ছেড়ে দাও ওকে।

নট। কেন, ভূত খেলাবে না? ভূত কোথায় ঢুকেছে জানো?

উমেশ। কোথায়। (সরমা খিল খিল করে যেন পরম কৌতুকে হেসে ওঠে)

নট। তোমার আর তোমার ঐ মনিবের কাঁধে। কীরে, কী ভূত নামাবি? ভূত দেখাতে এসেছো আমার ভাগ্নীর কাঁধে? আমি বলে ভূতনাথের সেবাইত, শ্মশানে-মশানে নিত্যি রাতে ভূত-প্রেত নিয়ে আমার কারবার, আমার কাছে মামদোবাজী? রাজপাখীর কাছে দুগগো টুনটুনি। আভি নিকালো। (রোকাকে ছেড়ে দিয়েই আবার ডাকে) এ্যাই—এ্যাই শোন।

রোকা। (ভয়ে ভয়ে অনিচ্ছুকভাবে) আজ্ঞে—

নট। (ধমকে ওঠে) কাছে আয়। (রোকা সভয়ে কাছে এসে দাঁড়ায়)

নট। টাকা পেয়েছিস? কতো?

রোকা। আজ্ঞে, পাঁচটি টাকা।

নট। আট আনা পয়সা বার করতো। ভূতনাথের পেসাদ চড়াতে হবে।

রোকা। আজ্ঞে, এর থেকে আবার—

নট। তোর তো সবটাই লাভ। এ আট আনা তবু সৎকাজে লাগবে। দে—দে,—(রোকা অনিচ্ছায় আট আনা দেয়) যাঃ, এবার পালা। নইলে বামদা আবার তোকে—

বামদা। ওরে আমি ছাড়ছি যে মামাবাবু। ওর পিঠে আজ আমি এই আকাড়া ক্যাঁচা ভুড়োবোই।

তাতে আমার যা হয় হোক। (রোকা সভয়ে পালায়। মানদাও পিছু নেয়) পালাবি কমনে রে মুখপোড়া, পালাবি কমনে? তোরে যদি না আজ খেংরে খাবি খাইয়েছি তো আমার নামে কুকুর পুষিস।

[রোকার পিছুপিছু মানদা চলে যায়। সরমা সকৌতুকে হেসে ওঠে)

নট। (হাসতে হাসতে) বোব—বোব ঠ্যালা। ভূত দেখেছো, পেত্নি দেখোনি? দেখলেন—দেখলেন তো রায়বাহাদুর। ভাবছেন এক, আর হচ্ছে আর এক। সব সেই ন্যাংটা বেটির ইচ্ছে। আপনার ইচ্ছের কিন্যু হয় না।

জয়। বড় দেরিতে টের পাচ্ছি নটবর। ভেবেছিলাম এতে ওর ভাল হবে। কিন্তু এ যে—

জয়। আপনি সেই ন্যাংটা বেটির ওপর টেক্কা দিতে গিয়েছিলেন। বেটি কম খেলোয়াড় নয়। চুলের মুঠি ধরে বুঝিয়ে দিলে—যাই করো আর যাই বলো—তুমি সেই মায়েরই ব্যাটা। জিততে পারবে না। গাছের চেয়ে ফল ভারী হয় না। কিন্তু যান দিকি আপনারা। আমার ভাগ্নীকে আমি দেখছি।

জয়। এসো উমেশ।

উমেশ। আজ্ঞে, সেই ভালো।

নট। উমেশ, এবার তোমার পালা। সবার কাঁধে ভূত চাপাও তুমি। তোমার কাঁধে একদিন আমি চাপবো। খুব হুঁশিয়ার। যাও—ভাগো। (জয়দারোগের সঙ্গে সভয়ে চলে যায়।) কীরে বেটি, তোর খবর কী? খুব রঙ্গই দেখালি যাহোক। তোরা সবাই সমান। (হাসতে থাকে)

সরমা। বাবা।

নট। হাঁরে বেটি, আমি। কী বলছিস?

সরমা। (কাছে আসে নটবরের) সকাল থেকে এরা আমায় কিছু খেতে দেয়নি বাবা। এখন খিদে পেয়েছে।

নট। খাবি? বেশ তো, খা,। (নৈবেদ্যর থালাটা ধরে দেয় সরমাকে) খা—পেটপুরে খা।

সরমা। (সাগ্রহে খেতে থাকে) আচ্ছা বাবা, আমার কী হয়েছে বল তো?

নট। কিন্যু না।

সরমা। তবে কেন মাঝে মাঝে মাথার ভেতরটা কেমন করে ওঠে? মনে হয় যেন কত হিজিবিজি—

নট। পোকা ঢুকেছে।

সরমা। পোকা। ওমাগো, সেকী গো। না—না, বার করে দাও পোকা। দাও—

নট (সতর্কভাবে চারদিক দেখে নিয়ে) বার করবি পোকা?

সরমা। হাঁ।

নট। তাহলে এক কাজ কর। এই মেঝের ওপর মাথা ঠোক। কুটো হোক মাথাটা। পোকা বেরিয়ে যাবে।

সরমা। ঠুকবো?

নট। হাঁ—হাঁ, ঠোক—ঠোক। জোরসে ঠোক। (সরমা পাগলের মত মাথা ঠুকে চলে। সোল্লাসে তাকে উৎসাহ দিয়ে চলে নটবর) ঠোক।…আরো ঠোক।…আরো জোরসে।…হাঁ, ঠোক।…

[মাথা কেটে রক্ত বেরোয় সরমার। হাঁফাতে থাকে।]

সরমা। ও মামা। আর যে পারছি না গো।

নট। খুব পারছিস। ঐ—ঐ তো কুটো হয়েছে। আর একটু বড় করে ক্যাল ঐ কুটোটাকে। সব পোকা কিলবিল করে বেরিয়ে আসবে। ঠোক—ঠোক। (সরমা আবার মাথা ঠুকে চলে। মুখ তার রক্তে ভেসে যায়। চোখ কপালে ওঠে। এলো চুল মুখময় ছড়িয়ে পড়ে। নটবর সোল্লাসে পাগলের মতন নাচতে নাচতে আর হাসতে হাসতে বলে চলে—)

বাহবা। বলিহারী, বলিহারী। তবে নাকি পারবি নে। তোরা যে চামুণ্ডা রে। নিজের মুণ্ডু কেটে নিজের রক্ত কোৎ কোৎ করে গিলিস, আর এটুকু পারবি নে? ঠোক—ঠোক—

সরমা। আর পারছি না বাবা—পারছি না—(জ্ঞানহারা হয়ে লুটিয়ে পড়ে। জ্ঞানাঞ্জন সহ গৌর মোহন আসে। জ্ঞানাঞ্জনের চুলে পাক ধরেছে)

গৌর। আসুন—আসুন ডাক্তারবাবু।

জ্ঞান। এ কী। (দুজনেই তারা বিস্মিত হয়। জ্ঞান গিয়ে বসে সরমার পাশে।)

নট। (নাচতে নাচতে আর হাসতে হাসতে) চামুণ্ডা।

দেখে নাও। এমন সুযোগ আর—পাবে নিজের রক্তে নিজে ভাসছে।

গৌর। ইস্। কী করেছেন। চলুন—(নটবরকে ধরে টানতে টানতে নিয়ে যায়। নটবর—ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে চিৎকার করে বলে চলে—)

না—না, আমায় ছেড়ে দাও। আমি দেখবো। চারুবাবুকে দেখবো। আমার অনেক দিনের সাধ। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—(গৌর মোহন তাকে টেনে নিয়ে চলে যায়।

জ্ঞান সরমাকে পরীক্ষা করে পূজার জায়গা থেকে জল পাত্রটা তুলে এনে সরমার চোখে মুখে জল দিতে উদ্যত হয়। ঠিক সেই সময়ে ডাকতে ডাকতে জয়-নারায়ণ দেবা দেয়—)

জয়। কই, কী হয়েছে? সরমা। সরমা! একি! (চমকে ওঠে জ্ঞান। হাত থেকে তার জলপাত্রটা পড়ে যায়।) ডাক্তারবাবু! ডাক্তারবাবু! (জ্ঞান জবাব দিতে পারে না। তার মধ্যে যেন কী এক দ্বন্দ্ব।) ডাক্তারবাবু!

জ্ঞান। (আত্মদমন করতে করতে) উঁ?

জয়। কথা বলছেন না কেন? তবে কি আমার সরমা—

জ্ঞান। (আত্মদমন করে) উত্তেজিত হবেন না। আমি দেখছি! (গৌরমোহন আসে)

জয়। (জ্ঞানের দিকে চেয়ে) কে?

গৌর। ডাক্তার জে. রায়। মস্তবড় ডাক্তার। এঁর কথাই বলেছিলাম আপনাকে।

জয়। ওঃ! মনে হল—আমি—আমি যেন ওঁকে আগে কোথায় দেখেছি। যেন—

জ্ঞান। (মৃদুহেসে) ডাক্তার মানুষ, কত জায়গায় যেতে হয়। হয়তো কোথাও দেখে থাকবেন।

জয়। তা বটে। তা হতে পারে।

গৌর। রুগীকে কেমন দেখলেন ডাঃ রায়?

জ্ঞান। চলুন। এই মাথা কাটাতেই—

জয়। বাঁচবে না?

জ্ঞান। হয় বাঁচবেন একেবারে সুস্থ হয়ে সমস্ত স্মৃতি-শক্তি ফিরে পেয়ে। নয়তো—

জয়। (আর্তকণ্ঠে ডাঃ রায়!

তৃতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

[জ্ঞানাঞ্জনের বাড়ীর ঘর। অজয় আর সীমা।]

সীমা। ভাল হচ্ছে না কিন্তু অজয়। বলো বলছি, কী হয়েছে তোমার?

অজয়। কিছু হয়নি। তুমি যাও।

সীমা। না বললে কখখনো যাবো না।

অজয়। (কাঁদিয়ে ওঠে) বলছি তো তখন থেকে কিছু হয় নি। তবু সেই এক কথা।

সীমা। মিথ্যুক্—মিথ্যুক্—মিথ্যুক্। ঐ মুখে ইয়া ফোড়া হবে।

অজয়। সীমা।

সীমা। খবর্দার আমার নাম ধরবে না।

অজয়। তুমি যাবে কিনা?

সীমা। তোমার বাড়ি! কাকীমার বাড়ি। কাকীমার কাছে আমি আসি। তুমি ধমকাবার কে?

অজয়। তা হলে আমার কাছে থাকো কেন?

সীমা। চিড়িয়াখানায় লোকে যায় কেন?

অজয়। বেশ, থাকো তুমি। আমিই যাচ্ছি।

সীমা। আমি কিন্তু কাঁদবো এবার। ভীষণ কাঁদবো। কাকীমা এলে বলবো—

অজয়। আমি মেরেছি তোমায়?

সীমা। ইস্। তা আর পারতে হয় না। কিছু বলবো না তো কাকীমা এলে। শুধু কাঁদবো। কাকীমা তো আর বোকা নয়। কি ভাবতেন বুঝতে পারছো মশাই। (খিল খিল করে হেসে ওঠে)

অজয়। (অভিভূতভাবে) সীমা। ওঃ, আমি পারছি না—পারছি না সহ্য করতে এসব। একটুও ভাল লাগছে না।

সীমা। (অভিমানে) এ্যাদ্দিন ভাল লাগতো—আর আজই হঠাৎ—

অজয়। এতদিন আর আজকের দিনে অনেক—অনেক তফাত সীমা।

সীমা। কী তফাত?

অজয়। এতদিন পৃথিবী ছিল আমার চোখে রামধনুর

সাতটা ঘড়ে রাখানো। আজ আমার জন্যে—শুধু আমার জন্যে পৃথিবীর সব আলো নিভে গেছে। কালোয় কালোয় ছেয়ে গেছে আমার সব আকাশ। না না, তুমি বুঝবে না সে কথা। তুমি যাও।

সীমা। অজয়, কী হয়েছে আমায় খুলে বলো? লক্ষ্মীটি। বলো অজয়।

অজয়। পারবো না। সে কথা তোমায় বলা যায় না। তুমি যাও সীমা।

সীমা। তাড়িয়ে দিচ্ছো?

অজয়। হাঁ-হাঁ, তাই। তুমি যাও। আর—আর কখনো এসোনা। কখনো না।

সীমা। (কান্না চাপতে চাপতে অভিমানে) আচ্ছা—আচ্ছা। (দ্রুত ছুটে চলে যায়। অজয়কে অত্যন্ত মন মরা ও অস্থির চিত্ত মনে হতে থাকে। পকেট থেকে ছোট একটা খবরের কাগজের টুকরো বার করে সে সন্তর্পণে পড়তে থাকে। সহসা নেপথ্যে পদশব্দ পেয়ে সে চকিতে কাগজটাকে লুকোবার চেষ্টা করে। ব্যস্তভাবে ঘরে ঢোকে মাধবী। বয়স তারও বেড়েছে।)

মাধবী। অজয়! অজয়। কী হয়েছে রে তোর! কী বলেছিস সীমাকে?

অজয়। যেতে বলেছি।

মাধবী। কেন?

অজয়। আমাকেও যে যেতে হবে।

মাধবী। কোথায় যাবি!

অজয়। জানি না। হয়ত—হয়ত—(সহসা ভেঙে পড়ে) ওঃ। এ কী করেছ তোমরা। কী করেছ।

মাধবী। (সবিস্ময়ে ও অজানা আশঙ্কায়) কী বলছিস্ অজয়! কী করেছি আমরা! বল্। কথা ক—

অজয়। জানো না! এটা কী! (খবরের কাগজের টুকরোটা মাধবীর সামনে ধরে। মাধবী চমকে ওঠে।)

মাধবী। এ তুই কোথায় পেলি অজয়?

অজয়। সে কথা থাক্। আমি কে? বলো, চুপ করে থেকো না। কে আমি? কী আমার পরিচয়?

মাধবী। জানি না। জানতে চাইওনি কোনদিন। যেদিন তোকে কুড়িয়ে পাই, সে দিন থেকেই—তুই অজয় আমাদের ছেলে। আর পরিচয়ে তোর দরকার কী বাবা।

অজয়। কিন্তু—ওতো মিথ্যে পরিচয়—ফাঁকী। আমি জানতে চাই—আসলে আমি কী আর কে।

মাধবী। মিথ্যে ফাঁকী। হাঁরে অজয় এতদিনের সত্য জীবন সত্যি সব আজ মিথ্যে হয়ে গেল। সত্যি হবে ঐ একটুকরো কাগজ? চলে যাবি তাই?

অজয়। যেতে আমায় হবেই।

মাধবী। আর আসবি না?

অজয় না।

মাধবী। যেতে পারবি?

অজয়। বেঁধোনা—দোহাই তোমার, আর আমায় বেঁধোনা।

মাধবী। অনেক বেঁধেছিলুম। এতগুলো বছর ধরে নিত্যদিন চেষ্টা করেছিলুম আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখতে আজ দেখছি সে বাঁধন তোকে বাঁধেনি একটুও, বেঁধেছে আমাকে। নইলে আজ এতক্ষণের মধ্যে একটিবারও তুই আমায় মা ডাকতে পারলি না কেন? বেশ যা! ঠিকানাটা দিয়ে যাস। যা দরকার সেখানেই পাঠিয়ে দেবো।

অজয়। অনেক নিয়েছি তোমাদের। অনেক দেনা তোমাদের কাছে। আর নিতে পারবো না।

মাধবী। নিবিনা?

অজয়। না।

মাধবী। তাহলে? চলবে কী করে তোর?

অজয়। কোড়োপাতা উড়েই চলে। জানে না শুধু কোথায় যাবে?

মাধবী। না, তা হবে না। ওভাবে তোকে আমি যেতে দেবো না।

অজয়। আমি যাবোই।

মাধবী। (আর্ত প্রতিবাদে) না। (ঘরে ঢোকে জানালার)

জান। বাধা দিওনা। যেতে দাও।

মাধবী। কী বলছো তুমি ।

জ্ঞান। নতুন বলছি না। সেই প্রথম দিন থেকে অনেক বার তোমায় একথাটা মনে করিয়ে দিয়েছি। প্রতি বারই তুমি বুঝেও বোঝোনি।

মাধবী। কিন্তু—আমরা কি ওর জন্যে কিছু করিনি? এতদিনের যতকিছু সব এমিভাবে ঘুচে যাবে? যে মা যে বাবা নির্বিকারে ওকে পথে ভাসাতে পারলো তারাই ওর আপন, আর আমরা পর?

জ্ঞান। সে অপরাধে তুমি ওকে বেইমান, নেমকহারাম বলে গালি দিতে পারো, ওকে দিয়ে জোর করে তোমায় মা বলাতে পারোনা।

অজয়। ওসব কথা আমায় মনে করিয়ে দেবেন না। আমায় ছেড়ে দিন।

জ্ঞান। ইরম্যান! এদিকে শোন! (অজয় জ্ঞানের কাছে গিয়ে চোখ নামিয়ে দাঁড়ায়) না না, চোখ তোল।

মাধবী। না না, তুমি কিছু বলো না ওকে!

জ্ঞান। কোন দিন কিছু বলিনি তোমার কথার ওপরে। আজ কিন্তু তোমার অনুরোধ রাখতে পারছিনা। ইরম্যান, তুমি তাহলে যাবেই?

অজয়। হাঁ।

জ্ঞান। কোন মতেই থাকতে পারো না?

অজয়। থাকার কোনও মানে হয়না। আমি যা ছিলাম যেমন ভাবে ছিলাম, তা থাকতে পারবো না। আপনারাও হয়ত পাবেন না আর আপনাদের সে অজয়কে। চলবে শুধু মা-বাবা-ছেলের অভিনয়। ব্যথা তাতে আরো বাড়বে।

জ্ঞান। তোমার ইচ্ছে! কিন্তু কোথাও থেকে যেতে হলে দেনাপাওনার হিসেব মিটিয়ে যেতে হয়। তোমার কাছে আমাদের কিছু পাওনা থাকতে পারে বলে কি তোমার মনে হয়?

অজয়। সে-দেনা শোধ করার সামর্থ আমার নেই।

জ্ঞান। দেনা শোধ না করার শাস্তি আছে জানো বোধ হয়?

অজয়। জানি। কী শাস্তি দেবেন?

জ্ঞান। দেনার দায়ে তোমায় কিনে নিতে পারি। কিন্তু, নেমকহারাম যাত করার সাধ আমার নেই। আমার দেনা শোধ হবে এইতে—(চড় মারে অজয়ের গালে। আর্তনাদ করে ওঠে মাধবী)

মাধবী। কী করলে তুমি? পাগল হলে?

অজয়। আমায় মারবেন?

জ্ঞান। পাওনা শোধ করে দিলাম। নেমক হারাম! বেইমান! ওটা তোমার পাওনা। অনেক আগেই মিটিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। তাহলে আজ হয়ত আর একটা নাটক এখানে অভিনয় হোত না।

মাধবী। হ্যাগো, অমন করে ওকে তুমি মারতে পারলে?

জ্ঞান। ওর বয়েসে আমার বাবা যদি আমাকে অমন একটা চড় মারতেন, তাহলে হয়ত আজ ওকে মারার আমার দরকার হোত না।···তুমি যেতে পারো ইরম্যান।

অজয়। আপনার পাওনা মিটিয়ে নিলেন আমারও কিছু পাওনা ছিল। আমার আসল পরিচয় আপনাকে দিতে বাধ্য।

জ্ঞান। চাইই সে পরিচয়?

অজয়। হাঁ।

মাধবী। অজয়।

জ্ঞান। ঠিকানা রেখে যাও। পাঠিয়ে দেবো।

অজয়। দরকার নেই পাঠাবার। সে পরিচয় না জেনে আমি যাবো না এখান থেকে।

মাধবী। সত্যি? থাকবি তুই অজয়?

অজয়। হ্যাঁ মা! হয়ত আসল পরিচয় পাওয়ায় পরেও থাকতে হবে। যেতে চাওয়ার চেয়ে যাওয়া যে এত শক্ত তা আমি জানতুম না মা।

মাধবী। অজয়। ছিঃ, কাঁদিসনে বাবা! (অজয়কে বুকে টেনে নেয়)

জ্ঞান। তোমার ছেলেকে ভেতরে নিয়ে যাও মাধবী। ডাক্তারের স্ত্রী তুমি। এটা ডাক্তারের বাড়ি। কাট এডটা তুমিই দিতে পারবে। যাও—

মাধবী। যাচ্ছি। পাষাণ কোথাকার। আয় অজয়। (অজয়কে নিয়ে চলে যায়)

জ্ঞান। পাষাণ! (ডান হাতটাকে চোখের সামনে তুলে ধরে। একদৃষ্টে দেখে) পাষাণ (হাতটায় ফুঁ দিতে থাকে। সহসা নিজের গালেই চড় মারে) লাগে।

পাষাণের ন্যাগে নাকি! (নেপথ্যে চেয়ে) কে? সীমা যাচ্ছো?

সীমা। (নেপথ্যে) হাঁ, কাকাবাবু!

জ্ঞান। শোনো একবার। (সীমা আসে)

সীমা। কী বলছেন কাকাবাবু?

জ্ঞান। কাছে এসো। (সীমা কাছে যায়) অজয়কে ভালবাসো? (সীমা লজ্জায় মাথা নামায়) হুঁ, বাসো। দাম দিতে পারবে?

সীমা। কীসের দাম কাকাবাবু?

জ্ঞান। সব পাওয়ার জন্যেই দাম দিতে হয়। ভালবাসার আরো বেশি। কতটুকু ছাড়তে পারো তুমি ওর জন্যে সীমা? ছাড়তে পারো ঘর? ছাড়তে পারো তোমার বাবা মা সবাইকে?

সীমা। কেন?

জ্ঞান। ধরো, অজয় যদি আমার ছেলে না হোত? যদি তোমার বাবা-মা এ-বিয়ে মত না দেন। কাকে রাখবে সীমা? কোনদিকে রাখবে?

সীমা। আপনি বলে দিন কাকাবাবু!

জ্ঞান। পারবে?

সীমা। আপনি আশীর্বাদ করুন। পারবো।

জ্ঞান। হুঁ! তোমাদের বয়স একদিন আমারও ছিল। তুমি পারবে।

সীমা। কাকাবাবু!

জ্ঞান। মাথাণি! (সস্নেহে কাছে টেনে নেয়। মাথায় হাত বুলোয়) অজয় কী করছে?

সীমা। কাঁদছে।

জ্ঞান। বড্ড লেগেছে, না?

সীমা। হাঁ। গায়ে নয়, মনে। ওকে আপনি মেরেছেন কাকাবাবু?

জ্ঞান। হাঁ মা। মেরেছি।

সীমা। মায়া হোল না?

জ্ঞান। পাষাণের দয়ামায়া থাকে না মা।…(চুপিচুপি) মা মণি! একটা কাজ করবে মা?

সীমা। কী কাকাবাবু?

জ্ঞান। এই হাতটায় একটু ফুঁদিয়ে দেবে মা? বড্ড জ্বালা করছে। হাঁ মা, পাষাণের প্রাণ নেই, দয়া নেই, মায়া নেই। তবু হাত আছে। সে হাতে চড় মারে। সে হাত জ্বালাও করে। (সীমা জ্ঞানের হাতে ফুঁ দিয়ে হাত বুলিয়ে দেয়)

জ্ঞান। (পরম তৃপ্তির ভাবে) আঃ। আঃ। আঃ—

তৃতীয় অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

(জয়নারায়ণের খাসকামরা। গোধূলি।

ঘরে আলো জ্বালা নেই। জানালাপথে আকাশের রক্তাভা এসে পড়েছে ঘরে। সেই স্বল্প-আলোকে সিলুয়েটের মতো চিন্তামগ্নভাবে দুহাতের ভারে মাথা রেখে অনড় ভাবে বসে আছে জয়নারায়ণ। জলন্ত চুরুটের আগুন থেকে থেকে দপ দপ করে উঠছে। জুতোর খট খট শব্দ তুলে ডাকতে ডাকতে ঘরে ঢোকে নার্স।

নার্স। ডাঃ রায়! ডাঃ রায়! (আলো জ্বেলে ওঠে ঘরে) আপনি! ডাঃ রায় কোথায়?

জয়। জানিনা।

নার্স। সেকী। এইতো ওঘরে ছিলেন একটু আগে। কোথায় গেলেন? (প্রস্থানোদ্যত হয়)

জয়। সরমা কেমন আছে নার্স?

নার্স। একই রকম।

জয়। জ্ঞান ফেরেনি?

নার্স। না। (চিন্তাক্লিষ্ট ভাবে জানালা ঢোকে) ডাঃ রায়। মনে হচ্ছে এবার হয়ত—পেসেন্টের জ্ঞান ফিরবে। হয়ত ঘন্টা খানেকের মধ্যেই।

জয়। জানি। তুমি যাও। যা বলেছি, তাই করবে। (নার্স চলে যায়)

জয়। কী হবে ডাক্তার রায়?

জ্ঞান। বলেছি তো। জ্ঞান ফিরবে। হয়ত পুরো উন্মাদ হবে, নয়তো সমস্ত স্মৃতিশক্তি নিয়ে। কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা, ওঁকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে এখুনি রক্ত দিতে হবে ওঁর শরীরে। নইলে—

জয়। কোথায় পাবো এখন রক্ত? সুস্থ মানুষ—রক্ত দিয়ে ফেরার পথে এ্যাম্বিউলেন্সে হাসপাতালে শয্যা নেবে, তা কী করে জানবো? এখন যে আবার কাউকে পাঠাবো—

জ্ঞান সে-সময় নেই। জ্ঞান ফিরে আসবে তার আগেই। রক্ত চাই হয় তার আগেই, নয়তো সঙ্গে সঙ্গে।

জয়। আপনি ঠিক জানেন, আমার রক্তে হবে না? আমি ওর বাপ,—

জ্ঞান। আপনার ব্লাড-গ্রেপার। হিতে বিপরীত হতে পারে।

জয়। কী হবে তাহলে? কোথায় পাবো রক্ত? উবেশ-টাও হয়ত এই সময়ে ঐ ভয়েই এলো না।

জ্ঞান। এলেও—কারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে রক্ত আমরা নিতে পারি না। রক্ত ছাড়াও—আরও একটা কথা ভাবছি।

জয়। আবার কী?

জ্ঞান। স্মৃতি যদি ফিরে আসে, ওঁর হারাণো ছেলেকে দেখতে চাইবেন। চাইবেনই। না দেখাতে পারলে আবার হয়ত উন্মাদ হয়ে যেতে পারেন।

জয়। ওঃ, ডাঃ রায়! একী অদৃষ্ট আমার বলুন তো? আমার টাকা আছে—ইচ্ছে আছে। তবু ঠিক যে-দুটো জিনিষের ওপর নির্ভর করছে আমার মেয়ের প্রাণ আর রোগমুক্তি, সেই দুটো জিনিষই এই মুহূর্তে আমার সর্বস্ব দিয়েও পাবো না। কী করি আমি,—কী করি?

জ্ঞান। ওঁর মা কোথায়?

জয়। সে আছে তার বাপের বাড়ীতে। এই খবরে সেও মরণাপন্ন শুনেছি। এখনও আছে কিনা, জানিনা। কী হবে ডাঃ রায়?

জ্ঞান। ভাবছি। আপনি যান। ভেবে কিছু করতে পারবেন না। আপনার প্রেসার রয়েছে। একটা মুমূর্ষুর জায়গায় দুটো করে কোনও লাভ নেই। বিশ্রাম করুন গিয়ে।

জয়। বিশ্রাম! ডাঃ রায়, আপনার সন্তান কটি?

জ্ঞান। নেই।

জয়। তাই আপনি পারলেন এরকম বলতে। আপনি জানেন না ডাঃ রায়, সন্তান যে কী জিনিষ তা যার নেই তাকে বোঝানো যায় না। কতদিন আমি বিশ্রাম পাইনি, কেন পাইনি, কেন পাইনা, তা কেউ জানেনা ডাঃ রায়, কেউ জানতেও চায় না। (প্রস্থান)

[জ্ঞানাঞ্জন কিছুক্ষণ পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর চিন্তাক্লিষ্ট ভাবে বসে পড়ে। মানদা ঘরে ঢোকে। ব্যগ্রকণ্ঠে জ্ঞানাঞ্জন জিজ্ঞাসা করে]

জ্ঞান। এসেছে?

মানদা। কৈ, না তো।

জ্ঞান। আসেনি। কেন আসেনি?

মানদা। ওমা, আমি তা কেমনে জানবো?

জ্ঞান। ও হাঁ, তুমিই বা জানবে কি করে। ঠিক। ভুলে গিয়েছিলাম। তুমি আবার যাও মানদা। এলেই আমায় খবর দেবে। খুব দরকার। যাও।

মানদা। কী জানি বাপু! এটা কি পাগলের আড়ৎ হোল মা? (প্রস্থান)

জ্ঞান। কেন আসছে না। তখন তো খবর পাঠিয়েছি। এখনো এলে হয়ত একটা উপায় হয়। এর পরে হয়ত—ওঃ, কী করি! কী করি!

[সন্তর্পণে নটবর চুকে চাপাকণ্ঠে ডাকে]

নট। ডাক্তার? ও ডাক্তার—

জ্ঞান। (চমকে) কে? (ফিরে তাকায়। নটবর ঠোঁটে আঙ্গুল রেখে বলে—)

নট। শ—শ—শ। আস্তে। আমি বলতে পারি, কোথায় রক্ত পাওয়া যাবে। নেবে?

জ্ঞান। কোথায়?

নট। কাছে এসো। চুপি চুপি বলবো। কানে কানে। (জ্ঞানাঞ্জন দ্বিধাগ্রস্ত হয়। ধমকে ওঠে নটবর) আঃ। ভাবছো কী। এসো। শীগগীর। এসো— (জ্ঞানাঞ্জন কাছে যায়। নটবর তার কানে কানে কী বলে। চমকে—শিউরে ওঠে জ্ঞানাঞ্জন)

জ্ঞান। না—না, তা হয় না।

নট। (ধমকে ওঠে) আলবাৎ হয়।

জ্ঞান। এতে হয়ত প্রাণ যেতে পারে। বিপদ আছে। দায়িত্ব আছে।

নট। সব আমার। তুমি এসো। হাতের বুড়োর উপায় থাকতে মেয়েটা বেঘরে মরে যাবে। কবভি নেই। এসো—(ডাক্তারকে ধরে টানে)

জ্ঞান। না—না, আমি ডাক্তার! এ আমি পারি না।

নট। (বীভৎসকণ্ঠে) আমি তান্ত্রিক। আমি শব

সাধনা করি মশার বুকে বসে অন্ধকার শ্মশানে। লোকে বলে—পিশাচ। রক্ত দেখা আমার খুব অভ্যেস আছে। রক্ত নিতে হবে তোমার। নয়তো রক্ত দর্শন করবো আমি তোমার। একটুও হাত কাঁপবে না। এসো—(টেনে নিয়ে যেতে থাকে)

জ্ঞান। (বাধা দেবার চেষ্টা করতে করতে) না—না—নট। খবরদার ডাক্তার! যদি বাঁচতে চাও, আর রুগীকে বাঁচাতে চাও—এসো আমার সঙ্গে। এসো—

[জ্ঞানাঞ্জনকে টানতে টানতে নিয়ে চলে যায়।]

তৃতীয় অংক

চতুর্থ দৃশ্য।

(জ্ঞানাঞ্জনের বাড়ীর ঘর। সন্ধ্যা। উত্তেজিত অজয় ও সীমা।)

সীমা। ওঃ, "যাবো" বললেই যাবো? যাবে তো যাও না? পায়ে দড়ি বেঁধে কে ধরে রেখেছে?

অজয়। যখন যাবো, কেউ ধরে রাখতে পারবে না।

সীমা। বয়ে গেছে লোকের ধরে রাখতে! লোকে বাঘ ধরে, সিংহী ধরে, হাতি ধরে, গণ্ডার ধরে,। বাঁদরকে লোকে তুড়ি দিয়ে নাচায়।

অজয়। সীমা, সত্যিই কিন্তু তুমি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছো।

সীমা। আর মশাই! থাপ্পড় খেয়ে কাকীমার কাছে কচি খোকার মতন কাঁদতে লজ্জা হয়নি! কাকীমা-টাও তেমি! "অজু আমার! সোনা আমার! মানিক আমার!" (ভেংচে) রামখোকা আমার! গ্রামকেড আমার! মাকাল আমার!

অজয়। মারবো চুলের ঝুঁটি ধরে এমন এক টান—

সীমা। (ভেঙে আসে) মারো না, মারো! এবার যদি কাকাবাবুকে বলে দিই, এ্যায়সা থাপ্পড় মারবে! এঃ, মারতে ভারী বাকী রেখেছেন! কম মার মেরেছো তুমি আমায় সেই ছোট্ট বেলা থেকে! আমি যেন বেওয়ারিশ তাকিয়া! জানি, তোমার পাল্লায় পড়লে কপালে আমার অনেক জলুনি তোলা আছে!

অজয়। কে বলেছে তোমাকে আমার পাল্লায় পড়তে? এত করে বুঝিয়ে বলছি, যাও না, বিয়ের বও না। যেখানে জলুনি নেই, বাধাধ করে তোয়াজ করবে, তেমি কাউকে খুঁজে নাও না।

সীমা। খুঁজতে আমার হবে না মশাই! কাকাবাবু বলেন—এমিতেই কত সোনার চাঁদ, হীরের টুকরো ছেলে আমাকে বিয়ে করতে পারলে ধন্যি হয়ে যাবে! বউ জুটবে না তোমারই,—একটা বেদেনীও না।

অজয়। আমার দরকার নেই! রূপসী রাজকন্যেও চাই না, বেদেনীও চাই না! আমি একা থাকতে চাই!

সীমা। তাহলে সেদিন কেন মিউ মিউ করে খোসামোদ করা হয়েছিল শুনি! "সীমা, থাপ্পড় খেয়ে গালটা রি রি করছে, একটু হাত বুলিয়ে দেবে?"···হাঙা-মুলো কাঁহাকে!

অজয়। ভাল হচ্ছে না কিন্তু সীমা!

সীমা। আর তুমি বড় ভাল কাজ করেছিলে, না! আস্কারে খোকা! বকবে! আর সেবাও নেবে! আবার সেবা নেবার ছল করে একদা পেয়ে পরের সোমত্থ মেয়ের হাতও টেনে ধরবে!

অজয়। কক্ষনো টানিনি তোমার হাত!

সীমা। এ্যাই মিথ্যুক! মিথ্যে কথা বললে কিন্তু ইয়া কোড়া হবে মুখে! আর সেই সেদিন—(নেপথ্যে ডাক শোনা যায়—"বাড়ীতে কে আছেন!")

সীমা। (জিভ কামড়ে) এই রে! কে না কে, শুনে ফেলেছে বোধহয়।

(ক্রুদ্ধ নেত্রে সীমার দিকে চেয়ে অজয় বার হয়ে যায়। সীমাও পা টিপে টিপে সেদিকে গিয়ে সন্তর্পণে কান পেতে শোনার চেষ্টা করে। একটু পরে নেপথ্যে অজয়কে বলতে শোনা যায়—)

অজয়। (নেপথ্যে) আপনি একটু বসুন। আমি এখুনি আসছি!

[ত্রস্তে সীমা সরে এসে ভাল মানুষের মতন ঘর গুছোতে সুরু করে।]

অজয়। (ডাকতে ডাকতে আসে) মা! মা—

সীমা। (সকৌতূহলে) এ্যাই, কী ব্যাপার?

অজয়। তাতে তোমার দরকার! মা! ওমা—

সীমা। (অজয়ের পাশে এসে খোসামুদি করে) লক্ষীটি! ও—সো—না অজয়!

অজয়। জানি না, যাও। মা—। মা—(প্রস্থানোদ্যত হয়। সামনে হতে মাধবী ঢোকে।)

মাধবী। কী রে বাবা, কী! যেন ডাকাত পড়েছে!

অজয়। (একটা চিঠি বার করে দেয়) তোমার চিঠি।

মাধবী। চিঠি। কোত্থেকে এলো?

অজয়। একটি ভদ্রলোক নিয়ে এসেছেন। বাবা পাঠিয়েছেন।

মাধবী। (সবিস্ময়ে ও সশঙ্কে) সেকী! দেখি। (চিঠি পড়ে।)

সীমা। কী খবর কাকীমা?

মাধবী। জানি না মা। বুঝতে পারছি না। লিখছেন—অজয়কে সঙ্গে নিয়ে এখুনি যেতে হবে ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে। বিশেষ দরকার।

অজয়। কোনও কারণ দেননি?

মাধবী। না।

অজয়। কী করবে?

মাধবী। যাবো। চ' অজয়।

সীমা। কাকীমা।

মাধবী। কী সীমা?

সীমা। আমিও যাবো।

অজয়। তুমি? কেন?

সীমা। যাবোই।

মাধবী। হাঁ, যাবে। এসো। চল অজয়। শীগগীর—

(তিনজনেই তাড়াতাড়ি বার হয়ে যায়)

তৃতীয় অঙ্ক

পঞ্চম দৃশ্য

(করুণাময়ীর বাড়ির ঘর। উত্তর সন্ধ্যা। সিন্দুকের কাছে সন্তর্পণে বাগিয়ে যায় বটুক ও উমেশ। বটুকের হাতে একটা বড় চাবি।)

উমেশ। (চাপাকণ্ঠে) খোলো। শীগগীর—

বটুক। (চাপা সশঙ্ক কণ্ঠে) আমি?

উমেশ। হাঁ—হাঁ, তুমি! খোলো। আমি দেখছি এদিকটা। (দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। বটুক সিন্দুক খুলতে যায়। দূরে নেপথ্যে করুণাময়ীর গলা শোনা যায়। চমকে সরে আসে বটুক। আতঙ্কে বলে—)

বটুক। সর্বনাশ! এইবার মরলুম।

উমেশ। ভয় কী?

বটুক। অসুখে শয্যাশায়ী পড়েছিলো। উঠেছে যখন, নিশ্চয়ই সব টের পেয়েছে!

উমেশ। কোনও ভয় নেই। আমি আছি। সব সামলে নেবো।

বটুক। আর সামলানো। বামা হলে কী হয়? ঐ রাঘ বাঘিনী ভাগ্নিটার কাছে এমনিতেই আমি বেসামাল হয়ে পড়ি। আর এখন তো—

উমেশ। চুপ! (সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়ায় বটুক আর উমেশ। ডাকতে ডাকতে করুণাময়ী আসে। তাকে নিদারুণ অসুস্থ ও উত্তেজিত বলে হয়।)

করুণা। নুটুদা! নুটুদা!···নুটুদা কোথায়?

বটুক। জানিনা তো মা। তুমি আবার এই শরীর নিয়ে উঠে এলে কেন?

করুণা। থাকতে পারলুম না। মনে হচ্ছে—সরমার ভীষণ বিপদ! আমায় ডাকছে। কে? উমেশ না?

উমেশ। হাঁ, মা জননী।

করুণা। সরমা কেমন আছে?···কী? চুপ করে কেন? তবে কি—

উমেশ। আছে। তবে—থাকবে কি না—

করুণা। কেন—কেন এতক্ষণ বলোনি আমায় একথা?

উমেশ। আপনার এই অসুখ, তাই—

করুণা। সরমার অসুখ আরো বেশি। আমি যাবো। এখুনি।

বটুক। সে কী মা! পারবে কেন তুমি এখন যেতে?

করুণা। পারব। আমায় পারতেই হবে। সরমা আমায় ডাকছে। আঃ, নুটুদা কোথায় গেল এই সময়ে?

বটুক। সে তো মা কাল থেকেই উধাও!

করুণা। চুলোয় যাক! টাকা চাই আমার। অনেক—অনেক টাকা। সরমাকে বাঁচাতে হবে। সিন্দুক খুলুন।

বটুক। চাবি তো নেই মা!

করুণা। কী হোল?

বটুক। চাবিও নেই, তোমার দাদাটিও নেই। মনে হচ্ছে—

উমেশ। তাল বুকে সিন্দুক হাল্কা করে কেটে পড়েছে।

করুণা। সে কী!

বটুক। কতো করে তোমায় তখন সাবধান করেছিলাম, মা! শুনলে না তো আমার কথা।

করুণা। কাকে—কাকে তবে বিশ্বাস করবো? যাকে বিশ্বাস করছি, সেই বিশ্বাসঘাতকতা করছে। ভাঙ্গুন—সিন্দুক—। এখুনি।

উমেশ। ও—সিন্দুক ভাঙ্গা বিশ্বকর্মারও অসাধ্য যা-জননী। আর ভেঙ্গেই বা কী হবে? রেখেছে কি—আর কিছু?

বটুক। ওর সিন্দুকের চাবিটা কিন্তু ভুলে ফেলে গেছে।

করুণা। কোথায়—সে চাবি?

বটুক। এই যে। (চাবি দেখায়।)

করুণা। খুলুন ঐ সিন্দুক! দেখা যাক—চুরি করে কত কী জমিয়েছে? খুলুন—

[বটুক সিন্দুক খুলতে থাকে।]

উমেশ। ওতেই কি আর কিছু রেখে গেছে! অত কাঁচা ছেলে সে নয়।

করুণা। কোথায় পালাবে? ছেলে তাকে দেবোই।··· খুললো?

উমেশ। হাঁ।

করুণা। বার করুন ভেতরে যা আছে।

(উমেশ একে একে বার করতে থাকে—১। শুকনো বেলপাতা, ফুল, মালা—২। নতুন-পুরোনো অনেকগুলো গাঁজার কলকে—)

উমেশ। আরে, এসব কী।

করুণা। টাকা নেই?

বটুক। কই, পাচ্ছি না তো।

উমেশ। সেই লাল পুটলিগুলো কোথায়? টাকা আছে তাতেই।

বটুক। তাই তো খুঁজছি।

করুণা। তাড়াতাড়ি।···চোর। নেমকহারাম।···

[হঠাৎ বটুক চিৎকার করে ওঠে]

বটুক। পেয়েছি।

উমেশ। কই? কোথায়? (বটুক দুটো লাল পুটলি বার করে) তাহলে ঠকত নিয়ে যেতে পারেনি। সরযূকে। খোলো—খোলো—

(উমেশ আর বটুক তাড়াতাড়ি পুটলি দুটো খুলেই সভয়ে লাফিয়ে সরে যায়।

একটার ভিতর হতে বার হয় একটা মড়ার মাথা। অন্যটায় গোটা কয়েক তান্ত্রিক পান পাত্র—মড়ার মাথার খুলি—। নিদারুণ ভয়ে চোখে হাত চাপা দিয়ে তীব্র আর্তনাদ করে ওঠে করুণাময়ী।)

শেষ দৃশ্য

[জয় নারায়ণের বাড়িতে সরযূর ঘর। রাত। বিছানায় অচৈতন্য সরযূ শুয়ে আছে। পাশে নার্স। জ্ঞানাঞ্জন নাড়ি দেখছে। অদূরে জয়নারায়ণ। পরীক্ষান্তে জ্ঞানাঞ্জন জয়নারায়ণের দিকে চলে আসে।]

জয়। আবার কেন অজ্ঞান হয়ে গেল ডাক্তার রায়?

জ্ঞান। ভয় নেই। এখনি আবার জ্ঞান ফিরে আসবে। হয়ত এখনও বার কয়েক এমনটা হতে পারে।

জয়। আপনার জন্যেই সরযূকে আবার আমি ফিরে পাচ্ছি। কী করে যে আপনার দেনা শোধ করবো

জ্ঞান। দেনাপাওনার হিসেব নিকেশের সময় অনেক পাওয়া যাবে।

জয়। কিন্তু ডাঃ রায়, রক্ত কোথায় পেলেন?

জ্ঞান। জানতে চাইবেন না।

জয়। কেন?

জ্ঞান। জিজ্ঞাসা করবেন না।

জয়। ও-রক্ত কি আপনি দিয়েছেন?

জ্ঞান। অতটা রক্ত দিলে আমাকে বিশ্রাম নিতে হোত। চিকিৎসা করতে পারতাম না।

জয়। তবে কোথায় পেলেন রক্ত? আশ্চর্য!

জ্ঞান। সত্যিই আশ্চর্য। কিন্তু সেকথা থাক। পেসেন্ট ভাল হয়ে উঠছে সেটাই বড় কথা।

জয়। কিন্তু—জ্ঞান ফিরলেই তো ও আবার অজয়কে দেখতে চাইবে।

জ্ঞান। তা চাইবে।

জয়। অজয়কে দেখাতে না পারলে আপনি তো বলছেন—

আবার পাগল হয়ে যেতে পারে।

জয়। তাহলে?

জ্ঞান। উপায় একটা করতেই হবে।

কী করে? আপনি অবিশ্যি তখন ওকে অজয় আসছে বলে সান্ত্বনা দিলেন। ডাক্তার রুগীকে সান্ত্বনা দেবেই। কিন্তু অজয়কে কোথায় পাবেন!

জ্ঞান। একটা কোথায় পেয়েছি তাও তো আপনি জানেন না। তবে তেমনি করেই—

নার্স। ডাঃ রায়, পেসেন্টের জ্ঞান ফিরে আসছে।

জ্ঞান। ঠিক আছে। (সরমার পাশে যায়। সরমার জ্ঞান ফেরে।)

সরমা। (অবুঝের মতন) আমার কী হয়েছে?

জ্ঞান। কিছু না।

সরমা। (সচেতন হয়ে) ও, মনে পড়েছে। আমার অজয়। অজয় কোথায়?

জ্ঞান। আসছে?

সরমা। কখন আসবে?

জ্ঞান। এখুনি আসবে বোনটি। চুপ করে শোও তুমি আমি বলছি—সে আসবে।

সরমা। ডাক্তারবাবু!

জ্ঞান। কী বোনটি?

সরমা। কী যে ভালো—কী যে মিষ্টি আপনাকে লাগছে ডাক্তার বাবু! জানেন, আমার এক দাদা ছিল—আপনার মতন।

জ্ঞান। আমারও একটা ছোট বোন ছিল—ঠিক তোমার মতন। তুমি ঘুমোও।

সরমা। ঘুমোবো। বড্ড ঘুম পাচ্ছে। কিন্তু—আমার অজয় আসবে যে।

জ্ঞান। আমি তো রয়েছি। তখন তোমায় ডেকে দেবো ঘুমোও।

[সরমা চোখ বোজে। জ্ঞানাঞ্জন সরে আসে।]

জয়। ডাক্তার রায়।

জ্ঞান। (চাপাকণ্ঠে) না, এখন ওসব কোনও কথা নয়। সিস্টার, এঁকে একটা সিগার দাও।

জয়। আপনি—আপনি কী করে জানলেন যে সত্যিই একটা সিগার আমার দরকার?

জ্ঞান। ডাক্তারদের অনেককিছুই জানতে হয়।

[নার্স জয়নারায়ণকে বাক্স থেকে একটা চুরুট ও দেশলাই এনে দেয়। পরম তৃপ্তিতে জয়নারায়ণ চুরুট টানতে থাকে। মানদা আসে।]

মানদা। ডাক্তার বাবু।

জ্ঞান। এসেছে।

মানদা। হাঁ গো। তিনজনা।

জ্ঞান। তিনজন। ওঃ, চলো। আমি আসছি এখুনি। সিস্টার, নজর রেখো। এসো মানদা—

[জ্ঞানাঞ্জন ও মানদা চলে যায়।]

সরমা। ডাক্তার বাবু। অজয় এলো।

নার্স। ডাক্তার রায়, আসছেন এখুনি।

সরমা। সেকী! চলে গেলেন? আমার অজয়কে না দিয়েই চলে গেলেন?

নার্স। উঠবেন না। এখুনি আসছেন তিনি।

জয়। সরমা।

সরমা। বাবা, আমার অজয়?

জয়। আসবে মা। ভগবানকে ডাক। আসবে।

[অজয়, মাধবী, সীমা সহ জ্ঞানাঞ্জনের প্রবেশ।]

জয়। এঁরা?

জ্ঞান। বলছি। (অজয়কে) ইয়ংম্যান। বুকে যাও তোমার পাওনা। তোমার বাবা বেঁচে নেই। আর ঐ তোমার মা।

অজয়। আমার মা?

জয়। এই? সেই অতটুকু অজয়—

সরমা। অজয়। অজয় এসেছে। কই, কোথায় অজয়? অ-জ-য়।

জ্ঞান। এই নাও বোনটি—এই তোমার অজয়। (অজয়কে বসিয়ে দেয় সরমার কাছে। সরমা তাকে আঁকড়ে ধরে—মাধবী একা দাঁড়িয়ে প্রাণপণে আত্মসংযম করতে থাকে)

সরমা। অজয়! আমার অজয়। কোথায় গিয়েছিলি বাবা! কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলি?

জ্ঞান। হারাধনি বোনটি। তোমার জিনিষ, আমাদের কাছে গচ্ছিত ছিল। ফিরিয়ে দিলাম।

আর একটা কথা। ছেলে পেয়েছো। আমার অনুরোধ—এই মা-টিকে আমার সঙ্গে নিও।

সরমা। একে?

জ্ঞান। নাম—সীমা। হওয়া উচিত ছিল—অসীমা। রূপের মতন আমার এই মা-টির গুণেরও সীমা নেই। পারো যদি—আমার মাকে—তোমার বৌমা কোরো। ঠকবে না।

[সরমা সীমাকেও কাছে টেনে নেয়। অপলকে দুজনের দিকে চেয়ে থাকে]

সরমা। বাবা।

জয়। কী মা?

সরমা। এসব সত্যি তো? মিলিয়ে যাবে না।

জয়। আমিও তো ঐ কথা ভাবছি মা।

জ্ঞান। সব সত্যি। যেমন তুমি সত্যি, আমি সত্যি, এও তেমি সব সত্যি।

জয়। কিন্তু ডাক্তার রায়, আমি যে কিছুই—

জ্ঞান। বলবো। সব বলবো। (মাধবীর কাছে গিয়ে) ছিঃ। চোখ মোছ।

মাধবী। দুঃখে নয় গো, আনন্দে।

জয়। উনি কে ডাক্তার রায়।

জ্ঞান। আমার স্ত্রী। অতদের—আর এক মা।

[নেপথ্যে ডাক শোনা যায় করুণাময়ীর]

করুণা। (নেপথ্যে) সরমা। সরমা। আমি এসেছি মা।

জ্ঞান। (চমকে ওঠে) কে? কার গলা?

জয়। সরমার মা এসেছে।

জ্ঞান। ওঃ। আমি আসছি—আসছি—(ব্রস্তে পালিয়ে যায়)

[করুণাময়ী আসে]

করুণা। কই? কোথায় আমার সরমা। সরমা।

সরমা। মা।

করুণা। কেমন আছিস মা?

সরমা। আমার কী হয়েছিল মা? (করুণা সরমার কাছে গিয়ে বিস্মিত হয় অজয় আর সীমাকে দেখে)

করুণা। এরা কারা?

সরমা। চিনতে পারছোনা? কী রকম মা তুমি আমার। এ যে তোমার নাতি আর বৌমা।

করুণা। অজয়।

[সোৎকুল্লে চিৎকার করতে করতে নটবর আসে]

নট। বারে বাঃ। খুব ভেল্কী দেখালি যাহোক ন্যাংটা বেটি। বলিহারী যাই তোর লীলাকে।

করুণা। (সরোষে) তুমি? তুমি এখানে?

নট। (হাসতে হাসতে) বাঃ বাঃ বাঃ? কী মানান মানিয়েছেরে? তিন তিনটে পুরুষ—হটকে সরে—গিয়েছিল—হারিয়ে গিয়েছিল? একটি সুতোয় টান দিল যেই না আমার ন্যাংটী বেটি—ব্যস,—(হাসতে থাকে)

করুণা। (তীব্রকণ্ঠে) চোর? নেমকহারাম? আমার সর্বস্বান্ত করেছ তুমি।

জয়। কী করছো? তোমার যে নিজের অসুখ? বোস—

করুণা। নানা, ওকে আমি পুলিশে দেবো। ও চোর—। আমার সর্বস্ব চুরি করেছে?

জয়। চুরি করেছে। (সরোষে নটবরকে ধরে)

নট। (হাসতে হাসতে) চোর। কে চোর নয়? কার

চুরি কে ধরে? (হাসতে হাসতে হঠাৎ আর্তনাদ করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে)

নার্স। এ কী হোল। ডাঃ রায়। ডাঃ রায়? (নটবরের সেবা করে। মাধবী যোগ দেয়)

জ্ঞান। (নেপথ্য হতে বলতে বলতে আসে) কী—কী হোল আবার।···এ কী।

করুণা। (চমকে ওঠে) কে?···কে ···খোকা।

জ্ঞান। না-না-আমি—আমি তো—

করুণা। (ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরে জ্ঞানকে) হাঁ। তুই—তুই আমার খোকা।

জয়। কাকে কী বলছো? উনি তো ডাক্তার।

করুণা। কী রকম বাপ তুমি গো? নিজের ছেলেকে চিনতে পারো না? (জ্ঞানকে নাড়া দিতে দিতে) বল—সত্যি করে বল—তুই আমার খোকা কিনা বল।

জ্ঞান। হাঁ, হাঁ মা। আমি তোমার সেই খোকা।

জয়। খোকা।

সরমা। দাদা।

জ্ঞান। হাঁ। কিন্তু এ তোমরা কী করেছ—? কাকে চোর বলে মেরে ফেলতে বসেছ মা? চোর? ও যদি চোর, তবে সাধু কে? সৎ কে? (জয়নারায়ণকে) জানতে চেয়েছিলেন না, রক্ত কোথায় পেয়েছি? ওঁরই রক্তে সরমা প্রাণ পেয়েছে। আমি নিতে চাইনি। ঐ শরীর। জোর করে দিয়েছেন। রক্ত নিতে বাধ্য করেছেন আমায়।

করুণা। সেকি!

জ্ঞান। হাঁ, তাই।

করুণা। নুটুদা! নুটুদা! (নটবর চোখ খোলে) আমার বাপ—করো নুটুদা!

নট। (দুর্বল হাস্যে) ধ্যেৎ! ওসব ঐ ন্যাংটা বেটির চালবাজী। আট আনা পয়সা দিস কিন্তু। কাল থেকে মহাপেসাদ চড়েনি—! দিবি তো!

করুণা। নুটুদা! (একহাতে নটবর আর অন্য হাতে জ্ঞানকে কাছে টেনে নেয়) আমার খোকা!

[সরমার দুপাশে জয় ও সীমা।]

জয়। ডাক্তার! খোকা! কী রকম যেন হচ্ছে আমার। সব পেয়েছি। তবু কী যেন নেই।

[মাধবী আগিয়ে গিয়ে চুমুট ও দেশলাই দেয় জয়নারায়ণকে]

জয়। (সোৎকণ্ঠে) ওরে, পেয়েছি! পেয়েছি! (সবিস্ময়ে) কিন্তু—তুমি কী করে জানলে মা?

মাধবী। সব জানি বাবা। সব শুনেছি। (জয়নারায়ণকে প্রণাম করে। করুণাময়ীকে প্রণাম করে প্রস্থানোদ্যত হয়)

করুণা। ও কে রে খোকা?

জয়। ছেলে চিনতে পারো, ছেলের বৌকে চিনতে পারো না? তুমিও তো খুব মা!

করুণা। বৌমা!···কোথায় যাচ্ছো মা?

মাধবী। এখানে তো আমার ঠাঁই নেই মা। ছেলে আপনাদের পর হয়ে যেতে পারে।

জয়। কী করছো? ফেরাও ওকে।

করুণা। আমি বললে ফিরবে কেন? অভিমান নেই ওর? তুমি ডেকে ঠাঁই না দিলে তোমার ঘরের লক্ষ্মী ঘরে আসবে কেন?

জয়। বৌমা।

মাধবী। বাবা।

জয়। ক্ষমা করতে যদি নাই পারবে, তবে যা হয়েছিলে কেন বৌমা?

মাধবী। বাবা। (কেঁদে ফেলে)

করুণা। না-না। ক্ষমা কোরো না বৌমা। কখনো ক্ষমা কোরো না। খুব শাস্তি দাও।

[নটবর হঠাৎ হাসতে সুরু করে দেয়।]

—য ব নি কা—

প্রণয় স্বাহা

অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত

আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে।

'এ গানটা তুমি আগে আগে গাইতে না?' অতীন ঠাট্টার সুরে বললে।

'যাও, ভালো লাগে না।' মুখ করল বিনতি।

'ভালো না লাগলেও মেঘের ঘনিমার পানে চেয়ে থাকতে হবে দশদাস।'

'না, না, আমি বলছি, এখুনি, আগে-ভাগেই যাওয়া যায় না হাসপাতাল?'

অস্থির হয়ে উঠল বিনতি: 'এ কি দেওয়া যায় না?'

'কেন এ তো পাপের সন্তান নয়।'

'চাওয়ার বার পাপের সন্তান!' ক্ষুব্ধ স্বর বিনতির: 'যে সন্তান অবাঞ্ছিত তাই পাপের। এ সন্তান তো আমরা চাইনি।'

'না, এর একটা ব্যবস্থা করতে হয়।' গম্ভীর হল বিনতি।

'সেই সনাতন ব্যবস্থা। হাসপাতাল।' হাত-পা ছেড়ে দেওয়া হতাশের মত ভঙ্গি করল অতীন: 'তার তো এখনো দেরি আছে। তার আগে লেডি-ডাক্তার কবার দেখে যাক, বলকারী ওষুধ-পথ্য খাও, উচিত মত বিশ্রাম করো, পকেট ফাঁক হোক—'

'আমাদের চাওয়া না-চাওয়ার যেন সংসারে চলছে।' অতীন একটু বুঝি বা মাতোরি সুর আনল: 'তখন সাবধান হও নি কেন?'

তীব্র কটাক্ষ হানল বিনতি। কে অসাবধান? আমি না তুমি? প্রথম প্রার্থনা কার? কে লোলুপ, কে অসহিষ্ণু!'

দুঃখের মধ্যেও হাসতে চেষ্টা করল অতীন।

'তোমার সেই বার্থ কনট্রোলের শিক্ষিকা বলেছিলেন তোমাকে—'

'তোমার মাথা আর মুণ্ডু—'

কতগুলো কী জিনিস দেখিয়ে বলছিলেন না, এগুলো ব্যবহার করলে উপকার পাবেন।' অতীনের 'উপকার' কথাটায় আপত্তি। 'এ কি একটা ব্যাধি যে ব্যবহারে উপশম—হবে!'

'ব্যাধি ছাড়া আর কী! কিন্তু ব্যাধির চেয়ে ব্যবস্থা কঠিন।' তিক্ত বিরক্তের মত মুখ করল বিনতি।

'তা ছাড়া দেখাই যাচ্ছে নির্ভরযোগ্যও নয়।'

'তুমিই তো তখন হাট করে কিনে আনলে এক গাদা—'

'জানো, আগে আগে এ সব জিনিস বেচাকেনা করলে মজুত রাখলে জেল হয়ে যেত। এখন, কী আইনের খেলা, হরির লুট পড়ে গিয়েছে। ডাইনে-বাঁয়ে এস্তার ছড়াছড়ি! জেল কোথায়, এখন সরকারী সমর্থন। সন্তান তো উঠে যাবেই, বিয়েও বন্ধ হবে।'

'হোক। শুধু যে কটা আছে সে কটা বেঁচে থাক!'

অতীন বিনতির ছুটি। আরেকটি এসেছে মেঘ করে।

বিয়ের পাঁচ বছরেই যখন এই চেহারা তখন সন্তুষ্ট হবার কারণ আছে নিশ্চয়ই। অতীন সরকারী অফিসের সোয়ার গ্রেড ক্লার্ক আর বিনতি স্কুল-মিস্ট্রেস। দুজনের মাইনে একত্র করলেও তেমন কিছু ভদ্রস্থ দেখায় না—তারই থেকে বাড়ি ভাড়া খাই খরচ বুগিয়ে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দীক্ষা দিয়ে মানুষ করা—এ প্রায় অসম্ভব। তারপর আবার আরেকটার উঁকিঝুঁকি। অন্ধকূপের দেয়াল যেন হেঁটে—হেঁটে আরো সরে এসে ঘিরে ধরল বিনতিকে।

না, আর গোঁজামিল নয়, একটা স্থায়ী ব্যবস্থার পথ দেখ।

ভাবি তাই—।

সত্যি বিভিন্নকার এ ছাড়ানো সহ্য হয় না। ভুল হয়ে যায়, মনে থাকে না, আসে ধরে, তখনো যা শৈথিল্য দেখা দেয়।

চলে না বেশি দিন!

হ্যাঁ, স্বাভাবিক করে নাও। প্রকৃতিকে নিয়ে এস।

তা হলেই অপারেশন দরকার।

একজনকে ডাক্তারের শরণ নিতে হয়।

আমিই অপদার্থ, বিনতি বললে, আমাকেই অস্ত্র করা হোক।

'যদি আমার জীবনে পদার্থ কেউ থাকে সে তুমিই।' সপ্রেমে বললে অতীন, 'এখনো চাকরিতে আকস্মিক লিফ্‌টের আশা রাখি। ওপরতলার ঘরে আমাদের আর সুপারিশ কী—ভাড়া ঘরে চাঁদের আলো, পরিহাসের ঘরে সুন্দরী স্ত্রী—'

'আচ্ছা, তিন সন্তানের যে মা তার আর—'

'তিন সন্তান!'

'ঐ হল। একটা তো গোকুলে বাড়ছে।'

'বাড়ুক। ওসব অবান্তর। অবান্তর মানে, এহো বাহ্য। কটা সন্তান, কত মাইনে, কেমন সাজগোজ, এসব গ্রাহ্যের মধ্যেই নয়। রূপ হচ্ছে আরেক বস্তু।' অতীন আবার তাকাল সপ্রেমে: 'যাকে দেখে তার দেহে নয়, যে দেখে তার চোখে। সুতরাং—'

'কী সুতরাং?'

'তোমার উপরে চলবে না ছুরি কাঁচি।' নিজের মনেই হাসল অতীন।

'খুব চলবে। তুমি যে রূপের কথা বলছ,' কালো চোখে ঝিলিক দিল বিনতি: 'তা অপারেশান সত্ত্বেও নিটুট থাকবে।'

'না, না, থাকবে না। গোঁফ বেরুবে।'

'যাঃ—'

'সত্যি, শুনেছি, অপারেশানের পর মেয়েদের নাকি গোঁফ বেরোয়। নাকের নিচে ঠোঁটের উপর কালো রেখা পড়ে, সেটি ক্রমে পুরুষ্ট হতে হতে দিব্যি দুটো কালো গুঁয়োপোকা হয়ে ওঠে।' অতীন আতঙ্কের ভাব করল: 'রক্ষে করো, শেষকালে গুঁফো স্ত্রীর স্বামী হতে পারব না। সমস্ত আশা-ভরসা গন্ উইথ দি উইণ্ড হয়ে যাবে।'

'কী যে বলো মাথামুণ্ডু, ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে যায়।'

'গোঁফ না উঠুক, মুটিয়ে যে যাবে তাতে সন্দেহ নেই। চিবুকে ভাঁজ পড়বে। বঙ্কনীরেখার দুটস্ত দণ্ডটি হয়ে আছে একটা জবরদস্ত কাঠের কুঁদো হয়ে যাবে।' সহানুভূতির সুর আনল অতীন: 'তোমার সন্তান

কেড়ে নেব, সংগে সংগে অপটুকুও কেড়ে নেব এ হতে পারে না।

'তাহলে উপায় কী?'

'উপায় আছে। আমি অপারেশান করাব।'

'তুমি? তুমি একটা পুরুষ মানুষ—'

'হলই বা। তাতে পুরুষত্বের কোনো হানি হবে না। তুমি এসব ব্যাপারে সরকারী প্যামফ্লেট কিছু পড়োনি বুঝি?'

'ইস্কুলে সাপ্তাহিক পরীক্ষার খাতা দেখেই কূল পাই না, একটা গল্পের বই পড়বার সময় নেই, বসে বসে ওসব বাবিশ পড়ি।

'সেই যে কন্ট্রোল ক্লিনিকের দিদিমণি দিয়ে গিয়েছিল তোমাকে—'

'থাক। কিন্তু একটা জলজ্যান্ত পুরুষ ক্লীব হয়ে থাকবে ভাবতেও কি রকম অস্বস্তি বোধ হয়।'

'ক্লীব বলছ কী! হাসপাতাল খুলে দিয়েছে, ফ্রি অপারেশান। পুরো মাইনের ছুটি দিচ্ছে চাইলেই।' অতীন স্বাভাবিক স্বচ্ছতা আনল মুখে: 'এ সুযোগ ছাড়া উচিত হবে না।'

'না, না, তুমি কেন! সে ভারি বিশ্রিরী। আমার স্বামী, সে একটা—না, না, হাতে মাথার ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল বিনতি: 'দরকার নেই।'

'ভীষণ দরকার।' গম্ভীর হল অতীন। নইলে সন্তুষ্টি মারা যাব।'

'আমার তো গোঁফ বেরুবে বললে, কিন্তু তোমার অপারেশানের পর তোমার লেজ গজাবে না?

'গজালে তো ভালোই, লেজ দেখিয়ে প্রমোশান পাব।' হালকা হতে চাইলেও অতীন পারল না হালকা হতে। বললে, 'কে জানে, সাকসেসফুল ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর জন্যে স্টেট আমাদের প্রাইজ দেবে। তা ছাড়া, আসল কথা—'

'কী আসল কথা?'

'আসল কথা রিস্ক। তোমার অপারেশানে বিপদের সম্ভাবনা বেশি, আমার বেলায় নেই বললেই চলে। সেটাই প্রধান বিবেচনা। এটাকে তুমি অগ্রাহ্য করতে পারো না। তাছাড়া—'

ঘাড় উঁচু করল বিনতি।

'তাছাড়া, খরচ। আমার অপারেশনটা ফ্রি, বিনা পয়সায়। আমারটাই নির্ঝঞ্ঝাট। সুতরাং—'

হেঁটে হেঁটে জানলার কাছে গেল অতীন। দরজার কাছে। পাশের ঘরে। অন্ধকারে। তার নিঃসঙ্গ ভাবনার মধ্যে।

যদি বিনতির অপারেশান হয়, ঝগড়ার সময়, ঝগড়া যখন তুমুল হবে, বিনতি এই নিয়ে দারুণ খোঁটা দেবে। স্বার্থপর, ছোটলোক বলবে; বলবে ডাকাত, খুনে। মুখে মাঝে মাঝে লাগাম থাকে না বিনতির, আরো সব মর্মভেদী বান ছুঁড়বে। তারপর চরম কথা বলবে, বলবে, যদি কোনদিন বিবাহছেদের অবস্থা হয় যেন না বাঁধন কেটে বেরিয়ে যেতে পারি। কেননা যে মেয়ের সন্তান ধারণের ক্ষমতা নেই, তার পুনর্বিবাহের আশা নেই তার বিবাহছেদের জোরও নেই।

ঝগড়ার সময় এমনি অনেক সে তর্কের ধুলো ওড়াবে। অতীন টিকতে পারবে না। তার সুখের চেয়ে শান্তি ভালো। তুমি যেমন আছ, তেমনিই থাকো। অপঘাতটা আমার উপরেই হোক।

তাছাড়া বিনতির অনেক বন্ধু। তার পরিচয়ের উষ্ণমণ্ডলে অনেক লোকজন। অপারেশানের পর সে যদি বেপরোয়া হয়ে ওঠে তাকে রুখবে কে? যদি কখনো কোনো মুহূর্তে প্রবঞ্চনায় প্রবৃত্তি হয়, ধরা পড়ার ভয় থাকবে না। সেই ভয়েই আমি বিষ হয়ে যাব। সর্ব সময়ে সে সন্দেহের যন্ত্রণা প্রাণান্তকর।

না, স্ত্রীলোককে একেবারে মুক্তবন্ধ করে দেওয়া নয়।

সুতরাং তুমি যেমন আছ তেমনি থাকো। থাকো তোমার ঝুঁকি নিয়ে, দায়িত্ব নিয়ে মাথার উপরে ঝুলন্ত খড়্গ নিয়ে।

আমিই অকর্মণ্য হয়ে গিয়ে সরকারকে সাহায্য করি!

কত সংকল্প করে, একেকটা শিশু এসে ভেস্তে দেয়।

লাইব্রেরিয়ানশিপ পড়া হল না, না বা এম-এ। মাষ্টারী লাইনে অন্তত বি, টি-টা কে না পাশ করে। বি-এতে অনার্স পেয়ে তবে লাভটা বিশেষ কী হল?

এবারও আবার বাধা।

কত আর মেটারনিটি লিভ চাওয়া যায়! ঘাটোরনীগুলি হাসে। প্রৌঢ়ারা অনুকম্পা করে।

এখন একটা ছেলে এমন একটা যুগে কি ভয়ানক যেতনা যেখানে বহু সন্তানের জননীকে স্টেট প্রাইজ দেয়! এ দেশেও তো এমন অবস্থা একদিন আসতে পারে। কিন্তু আইন তো একটা বাধা। তাকে যে যখন যে রকম মোট বওয়ায় সে তখন সেই রকম মোট বয়।

সবার কাছে বিনতিই অপরাধী। সে তার স্বাস্থ্য বিপন্ন করছে, ঘরের শান্তি ও শৃঙ্খলা বিপন্ন করছে, সংসারের সামান্য আয় নিঙ্কে ছিনতাই করে।

নানা চিন্তায় নাজেহাল। ভিড়-ভর্তি বাস থেকে নামতে গিয়ে পড়ে গেল বিনতি।

ভিতরের লোক নামবার আগেই বাইরের লোক ঠেলে উঠতে চায়, আর গাড়ির রাস্তা কণ্ডাক্টার নামল কি উঠল অত চুলচেরা বিচারে বিভ্রান্ত না হয়ে দিল গাড়ি টেনে। বিনতি দূরে ছিটকে পড়ল।

বাস দাঁড়িয়ে আর কী করবে। নিজের দোষে পড়েছে। অনেক ভাগ্য যে চাকার তলায় পড়েনি। চাকার তলায় পড়লে আর দেখতে হত না। রক্তে ভেসে যেত।

বাসের লোক নামে না, কিন্তু রাস্তার লোক এগিয়ে আসে।

এম্বুলেন্স এসে নিয়ে যায় হাসপাতাল। হাসপাতাল খবর দেয় অতীনকে।

তেমন কিছু চোট পায়নি, ভাঙেনি-মচকায়নি, শুধু যে নতুন কাবাটা রচিত হতে যাচ্ছিল তা ভ্রূণাক্ষরেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে—।

'ভালোই হল। পাপে বর হল।' অতীন বললে, 'রেহাই পেলে।'

'কিন্তু সেই যন্ত্রণা। সেই অর্থব্যয়। সেই স্কুল থেকে ছুটি।' বিনতির কান্নায় যেন অন্য রকম সুর।

'অপারেশান করাতে চেয়েছিল, তাতেও এই কষ্ট এই খরচ এই ছুটি।' প্রায় ধমকে উঠল অতীন: 'বরং এ অঙ্কের উপর দিয়ে গেল। শঙ্কু আর জল ঘোলা করতে পারল না।'

'কিন্তু এ বর্তমানের বা ভবিষ্যতের কোনো দিকেরই অপারেশান নয়।' করুণ মুখে বললে বিনতি, 'এ শুধু ভাগ্যের শাস্তি। আমি চেয়েছিলাম নষ্ট হোক তাই নষ্ট হল। একেবারে না হবার চেয়ে, কিন্তু যখন এলই চলে গেল কেন? শঙ্কু—শঙ্কু তো প্রথমটা নিশ্চয়ই। কিন্তু পরে কত বড় বন্ধু হয়ে যেতে পারে—পরিবারের, রাষ্ট্রের—তার হিসেব কেউ করে না। কোন শুক্তিতে মুক্তো আছে তা কে বলবে?

অতীন সাবধান হল।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি এলেও বিনতিকে ঘেঁসতে দিল না।

না, ব্যাজারটাকে তর্কের অতীত করে রেখে দেওয়া উচিত। যাতে কোনো আর প্রশ্ন না ওঠে; আশার ধূসরতম রেখাটিও মুছে যায়।

বললে, 'আপিস থেকে তিন সপ্তাহ ছুটি দিয়েছে।'

'ছুটি? কেন, বাইরে যাবে নাকি কোথাও? এবার কিন্তু আমিও যাব।'

'না, বাইরে নয়, হাসপাতালে ভর্তি হব।'

'কেন?'

'যাতে তোমাকে আর হাসপাতালে যানে মেটারনিটি হোমে যেতে না হয়।'

শান্তি-সুখেরই কথা, কিন্তু বিনতির মুখখানি কেন কে জানে শুকিয়ে গেল। কিন্তু কোনো উচ্চবাচ্য করবার উপায় নেই। অসিত ও সুমিতাকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার। পুষ্টিকর খাদ্য ও সুশিক্ষা দেওয়া দরকার। দরকার বিনতির নিজের স্বাস্থ্যকে উজ্জ্বল করে রাখা। শঙ্কর দলকে বাড়তে না দেওয়া।

সার না দিয়ে করে কী বিনতি।

হাসপাতালে ভর্তি হল অতীন। পুরো মাইনে পেল ছুটির কদিন। যথারীতি অপারেশান করিয়ে এল।

'এমন কী ব্যাধি আছে যা একজনের সারলে আরো এক জনের সেরে যায়?' যুক্তির আনন্দে লঘু হতে চাইল অতীন।

কিন্তু সে লঘুতায় যোগ দিল না বিনতি। সে যেন গম্ভীর হয়ে গিয়েছে। কি রকম নতুন চোখে দেখছে

অতীনকে। আয়েস করে দেখছে একটু নয়, ক্রম করে দেখছে। চোখ মিলিয়ে দেখছে :

তবু সংসার পরিচ্ছন্ন থাক। দিন-রাত্রি নিষ্কণ্টক হোক।

তবে একবার চলো ঘেঁষে যাই।

'যাবে?' ঢেউ দিয়ে উঠল বিনতি : 'কোথায়?'

'সমুদ্রে।'

অসিত ও সুমিতাসহ অতীন-বিনতি পুরী এল। মেয়াদ অল্প দিনের হোক, অল্প দিনেই সমুদ্রের হাওয়ায় একটা সহজ ঘোর আসবে শরীরে।

আর, পুরীতে, সমুদ্র-পারেই অনিরুদ্ধের সঙ্গে দেখা।

অনিরুদ্ধ যেমন নামে তেমনি চরিত্রে। সব সময়েই অস্থির, অতৃপ্ত। প্রাণোজ্জ্বল।

অতীনের কলেজের বন্ধু, বিয়েতে এসেছিল, আর সেই শেষ দেখা। এখনো সেই তেমনিই আছে। বড় চাকরি দৃঢ় স্বাস্থ্য, যুক্ত জীবন।

'চমৎকার আছ।' অতীন এগিয়ে এসে হাত ধরল।

'তুমিও চমৎকার' অনিরুদ্ধ তাকাল বিনতির দিকে। অসিত সুমিতার দিকে কাঁধের ঝোলানো ক্যামেরা তাক করল : 'দাঁড়াও, ছবি তুলি' ক্লিক করেই সশব্দে হেসে উঠল : 'অতীন যেমন তুমি, তেমনি তুমি, তোমার নাম বিনতি, নাম আমার ঠিক মনে আছে, তেমনি তুমিও তুমি। গোল বস্তুর যেমন গোল ছায়া তেমনি তুমি বস্তুর ছায়া।'

সঙ্কোচ নেই ক্ষুদ্রতা নেই সঙ্কীর্ণতা নেই, অগাধ অগাধ আনন্দে হেসে উঠল অনিরুদ্ধ।

'বিয়ে করোনি এখনো?'

'বিয়ে করলেও অতৃপ্তি, না করলেও অতৃপ্তি। আর অতৃপ্তিই জীবনের প্রতিমূর্তি। কী বলো, ঠিক বলিনি?' বিনতির দিকে তাকাল অনিরুদ্ধ : 'তৃপ্ত হয়েছে কি শুভ্র হয়েছ। শুভ্রতাই মৃত্যু।

'তাহলে বলতে চাও দুটি সন্তানেই তুষ্ট থাকব না?' অতীন বললে লঘু সুরে, 'এক পালে আমদানি করব?'

'মন্দ কী? এক একটি যদি আসে তো আসবে সুমিতাকে আদর করল অনিরুদ্ধ : 'অজ্ঞানপঙ্কজ-মালা। সকলেই এক একটি আনন্দের খনি।'

'আনন্দ না আর কিছু!' অন্নক্ষণেই বিনতিও সহজ

...সমুদ্র শুভ্র নয়, আকাশ শুভ্র নয়।

হয়ে গেল : 'বলতে তো লাগে না, একা আছেন, কোনো ভাবনা-চিন্তা নেই আনন্দ দেখছেন চারদিকে।

ব্যস, অমনি বক্তৃতা সুরু হয়ে গেল অনিরুদ্ধের। দুর্ভাবনা-দুশ্চিন্তাও আনন্দময়, তার মধ্যেও আনন্দকল্পনা আত্মহত্যা করতে গিয়েও মৃত্যুতে আনন্দকল্পনা।

তোমার রোগশোক আনন্দময়, দুঃখদারিদ্র আনন্দময়। যখন তুমি কাঁদো তখন কান্নার মধ্যেও আনন্দের আভাস পাও বলে কাঁদো। দুঃখদারিদ্রের মধ্যেও আনন্দের আভাস আছে বলেই দুঃখ ভোগ করো। আনন্দ ছাড়া কিছু নেই। সর্বত্র আনন্দ।

সর্বত্র ?

সর্বত্র। ঐ গাছ, গাছটা তোমার আনন্দ দিয়ে তৈরী। ঐ পাখীটা যে উড়ে গেল, পাখীটাও তাই। ঐ যে জড় পাথরটা যে দেখছ এটাও আসলে তোমারই আনন্দময় আত্মার জড়মূর্তি। ছেলে মেয়ে স্ত্রীকে আলাদা ভাবছ, আসলে তোমারই আনন্দের টুকরো। আনন্দই একমাত্র সত্তা।

যা তর্ক করছে বিনতিই করছে। শেষকালে সে ক্রুদ্ধ স্বরে বললে, 'তাহলে শুষ্কতাও সুন্দর।'

'শুষ্কতা ! সমুদ্র শুষ্ক নয়, আকাশ শুষ্ক নয়, হৃৎপিণ্ড শুষ্ক নয়।'

'কিন্তু আমি শুষ্ক। আপনার সঙ্গে পারি না তর্কে। এই মুখ বন্ধ করলাম।' হাসল বিনতি।

'তাহলে শুষ্কতাও আনন্দ।' নির্মল রোদে সব কুয়াশা উড়িয়ে দিল অনিরুদ্ধ : 'কিন্তু ওসব কথা থাক। মন্দির দেখেছেন ?'

'দেখেছি—'

'কী রকম দেখেছেন ? চোখে মুখে আনন্দ তো উছলে উঠছে না ?' অনিরুদ্ধ আপত্তি করে উঠল : 'মন্দিরের বিরাটত্বে আর গাম্ভীর্যে বিহ্বল হয়েছেন এমন তো মনে হয় না দেখে ? বরং যেন বিরক্ত হয়েছেন—'

এবার অতীন এল ব্যাখ্যা করতে। বললে, 'দেব মন্দিরের গায়ে ওসব কী অশ্লীল মূর্তি—'

অল্প হেসে স্বামীর কথায় পরিপূর্ণ সায় দিল বিনতি।

'চোখে আনন্দ নিয়ে দেখ দেখবে আনন্দমূর্তি। উদার স্বরে বললে অনিরুদ্ধ।

'কিন্তু দেবমন্দিরে কেন ?' বিনতি বলল।'

'এই দেহও তো দেবমন্দির। পথে বামন বলে আছেন। সে মন্দিরের অভ্যন্তরে পৌঁছুতে হলে অনেক কামনা-বাসনাকে তো অতিক্রম করতে হবে।' চোখমুখ উজ্জ্বল করল অনিরুদ্ধ : 'কামনা-বাসনাকে কি তুমি অশ্লীল বলবে ? এ আর তুমি কী দেখেছ ? চলো কনারকে চলো। পুণ্য পদক্ষেত্রে।'

কনারক যাওয়া হবে এমন কল্পনা। ঘুণাক্ষরেও ছিল না। প্রস্তাবে বিনতি লাফিয়ে উঠল। ট্যাক্সি যোগাড় করবে অনিরুদ্ধ, এ যাত্রায় অতীনরা তার নিমন্ত্রিত অতিথি। না, শিশুরাও বন্ধন নয়, তারাও যাবে।

এই অঢেল ব্যবস্থায় কেনা রাজি হয় ! এত বড় একটা অখণ্ড প্রস্তরস্তব কে না দেখে ? কে সেই সিদ্ধিস্থানের ধুলো না মাথায় নেয় ?

অতীন কিছুটা স্তিমিত, হয়তো বা অধিকারবিচ্যুত, তাই ছেলে মেয়ে সেই আজকাল বেশি দেখছে-শুনছে, তদারক করছে। হোটেলে তার জিম্মায় ছেলেমেয়ে রেখে মাঝে মাঝে একাই বাজারে যাচ্ছে বিনতি, একাই স্নান করছে সমুদ্রে। এখানে, কনারকে, ছেলেমেয়েকে অতীনই সামলাচ্ছে, অত কী আর কোলে করে বওয়া যায়, সে থেমে থাকছে, আর ঘুরে ঘুরে এখানে ওখানে বিনতিকে সবকিছু দেখাচ্ছে অনিরুদ্ধ, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করছে। অতএব শিল্পে স্থাপত্যে স্তম্ভে সৌষ্ঠবে অতীনের আকর্ষণ নেই। কনারক দেখে এসেছি, কলকাতায় গিয়ে অফিসমহলে বলতে পারব এই যথেষ্ট।

তুমি এসব মূর্তি বা কারুকলা দেখে ম্লান হচ্ছ কেন ? এসব জীবনের জয়গান। এসব শক্তির স্তোত্র। রাধা যদি শক্তি না সঞ্চার করে তবে কৃষ্ণ গিরি ধরে কেমন করে ? পাশ্চাত্য শিক্ষিত মন নিয়ে তুমি এর বিচার কোরো না। সুস্থ দার্শনিক দৃষ্টিতে দেখ। সর্ববিধ প্রাণের বিকাশের মূলে পরম প্রেরণা কী ? কাম—মহানন্দ। বাক ও বুদ্ধির মিথুনীভূত রূপই প্রাণ—লিলায়-লীলায় সর্বত্রই এই প্রাণ-বন্দনা। প্রত্যেক জীবে প্রত্যেক জীবাণুতেই এই হর-গৌরী মূর্তি, যুগল মূর্তি রাধাকৃষ্ণের, এই শিব-শক্তির সংযোগ। ব্রহ্ম স্বয়ং 'অকামরত'। কামই প্রথম মুক্ত প্রথম ইচ্ছা। মহাদেবকেও ভস্মীভূত কামকে বাঁচাতে

হয়েছিল, নইলে সৃষ্টি থাকে না। সুতরাং প্রথমেই এই আত্মাশক্তির বোধন প্রয়োজন। কামের পরিণতি যেমন প্রেমে, তেমনি শক্তির পরিণতি মোক্ষে। তেমনি আমাদের যাত্রার পরিণতি মন্দিরে রত্নবেদীতে, হওয়ার পরিণতি দেবত্বে।

তন্ময়ের মত বলছে অনিরুদ্ধ। বলতে-বলতে চলতে চলতে কখনো কী অতীনের চোখের আড়াল হয়ে পড়েছে তারা?

'একা আছি, খুব ভালো আছি, বলছিলে না?' বললে অনিরুদ্ধ, 'একা থাকা, এক হয়ে থাকার জন্যেই তো সাধনা। এদের মূর্তিতে দেখছ পৃথক কিন্তু সত্তায় এরা এক। একই দুই হয়েছে, বহু হয়েছে, বিচিত্র হয়েছে। আসলে সকলেই আমরা একা, সকলেই আবার এক। একবার খাজুরাহো যাবে?'

'ছুটি কই? আর—'

'আমি ব্যবস্থা করব। ওসব কিছু ভাবতে হবে না।'

'যাব।' উচ্ছ্বসিত হল বিনতি: 'ছুটি পেলেই লিখব আপনাকে। দেখবেন যোগাযোগ ছিন্ন করবেন না।'

খাজুরাহোর আগে কাজেরগুলিই দেখে নাও না। ভুবনেশ্বর, মুক্তেশ্বর, রাজারানী সাক্ষীগোপাল। সর্বত্রই লাবণ্য আর পৌরুষের একাত্মতা।

'তুমি লাবণ্য—'এই পর্যন্ত বলেই থামতে হয়েছিল অনিরুদ্ধকে। হঠাৎ অতর্কিতে কাছে এসে পড়েছিল অতীন।

অতীনের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলে বিনতি: 'আর উনি পৌরুষ।'

কিন্তু এ কী হল?

কলকাতায় ফিরে এসে এ কিসের ইঙ্গিত টের পাচ্ছে বিনতি?

এক মাস গেল দু'মাস গেল—এ কী ভয়াবহ! আষাঢ়! প্রলয়ের মেঘ!

কী করে একথা ভাববে অতীনকে। কিছুতেই মেনে নেবে না। নির্ঘাৎ সন্দেহ করবে। কে লোক তাও স্পষ্ট নির্দেশ করে দেবে।

কতবার গিয়েছে ওর সঙ্গে বাজার করতে। সমুদ্রের কোন তীরে সে বাজার তা কে জানে? একবার ওর হোটেলে একা বেড়াতে গিয়ে বৃষ্টির জন্যে আটকা পড়েছিল। আমাকে তো ছেলে মেয়ে বইবার ঠেলাগাড়ি বানিয়েছ। আমি বুঝি বুঝি না কিছু? আমার আর কোনো মূল্য নেই, আকর্ষণ নেই, আমি কচুর হয়ে গিয়েছি, উৎখাত হয়ে গিয়েছি। কিন্তু পঙ্গু যদি বা হই, অন্ধ হইনি এখনো।

বলো কী জবাবদিহি?

পাগলের মত হয়ে গেল বিনতি! আবার বাস থেকে আছাড় খেয়ে পড়তে পারে না রাস্তায়। আবার সব নষ্ট হয়ে যেতে পারে না।

কিন্তু তাতেই বা সন্দেহের থেকে খালাস পাবে কী করে!

আতঙ্কে ঘুরতে ফিরতে লাগল বিনতি। আত্মহত্যা ছাড়া পথ নেই। জঘন্য অপরাধ মাথায় পেতে নেবার আগে আত্মহত্যাই ভালো।

কিন্তু আত্মহত্যাই বা করতে যাবে কেন? সে কী করেছে? বাঁচবার, বাঁচাবার মহৎ আনন্দ থেকে নিজেকে কেন সে বঞ্চিত করবে? কেন সে সন্দেহের থেকে মুক্তি পাবে না।'

পাবে না। পাবে না। মৃত্যুই একমাত্র মুক্তি।

দু'হাটুর মধ্যে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে লাগল বিনতি।

'কাঁদছ কেন?' অতীন তার কাছে এসে দাঁড়াল। বললে, 'আমি ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম। ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখে বললে, অপারেশান আনসাকসেসফুল হয়েছে।'

আনন্দিত চোখে মুখ তুলল বিনতি। অশ্রু ও আনন্দ।

'হ্যাঁগো,

বললেন মা

শিব ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলিত করে বললেন, 'ফ্যাসাদ তোমারই মায়া, মহামায়া। তুমি থাকবে, অথচ তোমার ফ্যাসাদ থাকবে না, এ তো হয় না মহামায়া। যাক, তোমার নবতম ফ্যাসাদটি কী?'

'চিঠি এসেছে।'

'কোথা থেকে? কেউ প্রেমপত্র-টত্র লিখল নাকি?'

'আঃ থামো। আর জ্বালিও না

'কি জানি, যা দিনকাল পড়েছে, হয়তো মহিষাসুরই তোমাকে চিঠি লিখে বসলো। ওর বুকে যা ত্রিশূল বিঁধেছে।'

'ভাববার কিছু নেই। দু'বারই যাও।'

'তাই ভাবছিলুম।' দুর্গার হাসি সারা বিকীর্ণ হোলো।

'ফ্যাসাদ তোমারই লীলা, মহামায়া।' শিব একটু মুচকি হেসে নয়ন নিমীলিত করলেন।

'ছেলেমেয়েদের নিয়েই মুস্কিল। ওরা কি দু'বার যেতে রাজী হবে?'

'আগেই দু'বারের কথা বলে দরকার কী? একবার তো চলে যাও।'

'তুমি যাবে না।'

'ক্ষ্যামা ছাও, অন্নপূর্ণো এই বুড়ো বয়সে আর কি বন্ধুর শ্বশুর বাড়ী যাওয়া যায় না। তাও যদি একটা শালী থাকত।

'মুখে আর কিছু বাধে না। চিঠি এসেছে বাপের বাড়ী থেকে।' মা নথ ঝাড়া দিলেন।

'সে তো বরাবরই এ সময়ে আসে, এবং তোমার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। কবে যেতে লিখেছেন শাশুড়ী ঠাকরুণ?'

'সেখানেই তো ফ্যাসাদ। আমার বাপের বাড়ীর পণ্ডিতেরা ঝগড়া লাগিয়ে দিয়েছে।'

'পণ্ডিতেরা সর্বত্র এক রকম।'

'একদল বলছে—আশ্বিনে আমার যাওয়ার শুভদিন। আর এক দল বলছে—কার্তিকে। ভাবছি কী করি।'

মা সন্তানদের নিয়ে কৈলাশ থেকে নেমে ট্রেণ ধরে হাওড়া ষ্টেশনে এসে পৌঁছলেন।

গাড়ী থামতে না থামতেই লাল কামিজ পরে একদল লোক বিনা অনুমতিতে মা'র জিনিষপত্র বাক্সো-প্যাটরা নিয়ে ছুটল।

মা চীৎকার করে বললেন, 'গেল গেল, সব গেল। ধর, ধর, ধর।'

সন্তানেরা সবাই ছুটল—নায় গণেশ পর্যন্ত।

লাল জামারা জানাল, তাদের সংকল্প শুভ। অন্য কোন লাল-জামা যাতে তাদের ছিনিয়ে নিয়ে না যেতে

পারে তাই এই দ্রুততা।

লাইন দিতে হবে।

'লাইন? কিসের?' মা খেঁকিয়ে উঠলেন।

'ট্যাক্সি। জলদি আইয়ে।'

মা দেখলেন, অন্য সব যাত্রীরা এক একটি লাল-জামার নেতৃত্বে বাবমান। অতএব মাও দৌড়লেন। সন্তানরা আগেই যে ছুটতে আরম্ভ করেছিল, তারা আর থামেনি।

দৌড় প্রতিযোগিতা শেষ হোলো। সবাই থামল। মা দেখলেন, একটা অতি দীর্ঘ সর্পিল রেখা—দণ্ডায়মান মানুষ দিয়ে তৈরী। কুণ্ডলীর ল্যাজ খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ লাল-জামা বলল যে ঐ ল্যাজটাই নাকি দরকার। লাল-জামাই বার করে দিল পুচ্ছাগ্র। লাল-জামার নির্দেশে মা ঐ পুচ্ছাগ্র আশ্রয় করলেন।

মা জিজ্ঞেস করলেন, 'শুধু তো লোকই দেখছি। ট্যাক্সি কোথায়?'

'আয়গা, আয়গা।' বলল লাল-জামা।

মা বললেন, 'এ যে দু' ঘণ্টা লেগে যাবে।'

'নহী, নহী'। তিন-চার ঘণ্টা হোগা।'

'চল, বাসে যাবো।'

'ওখানে ভি লাইন হোবে। আউর এতনা মাল নেহী লেগা।'

'ওখানেও লাইন! খেলে যা।'

হ্যাঁ, ইঁহা বৈঠ যাইয়ে, আউর খানা কুছ খা লিজিয়ে।'

খানা খেয়ে অনেকক্ষণ বসে বসে আরাম করবার পর ট্যাক্সি মিলল। সন্তান-সহ মা উঠতে যাচ্ছিলেন। ট্যাক্সি-ওয়ালা বললে,' চারজনের বেশি নিতে পারব না।' এবং মার নাকের ডগা দিয়ে সে ট্যাক্সি অন্য আর একজন নিয়ে গেল।

'মা বললেন, 'পোড়ারমুখো।'

অগত্যা দুটো ট্যাক্সি করে মা পিত্রালয়ে যাত্রা করলেন। কিন্তু তাতেও নিশ্চিন্তি নেই। মধ্যে রাস্তায় জাম্। একটা মিছিল যাচ্ছে।

'কিসের মিছিল?' শুধোলেন মা।

'স্বর্ণশিল্পীদের।' বলল ড্রাইভার।

কার্তিক বলল, 'হ্যাঁ, কৈলাস-বার্তায় পড়েছিলাম মনে হচ্ছে যে এদেশে খাঁটি সোনা বেআইনী করে খাদ-সোনাকে আইনসঙ্গত করা হয়েছে।'

...জলদি আইয়ে।

গণেশ ট্যাকসিতে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছিল। চোখ বুঁজে থেকেই বলল, 'ওটা সিম্বলিক। খাঁটি মালেই এ দেশে বেআইনী—মানুষ থেকে দুধ পর্যন্ত।'

মা বললেন, 'ওলো লক্ষু, ওলো সরি, তোদের গয়না-গুলো একটু ঢেকে-ঢুকে রাখ।'

লক্ষ্মী বলল, 'যদি ঢেকেই রাখব, তবে আর গয়না পরে দরকার কী?

সরস্বতী বলল, 'ঠিক কথা। কুবের কোম্পানী থেকে যে নতুন ডিজাইনের হারটা করালুম, তা দেখিয়ে যদি মামার বাড়ীর মেয়েদের মাথাই না ঘোরাতে পারলুম, তবে আর এ হার পরে সুখ কী?'

'বাজে কথা বোলো না। ঢেকে রাখো' দিলেন মা।

খানিক দূর এগোতে দেখা গেল, এক দল লোক কৃষ্ণবর্ণের পতাকা হাতে রাস্তার ওপর বিক্ষুব্ধভাবে নৃত্য করছে। বিক্ষোভ-নৃত্যের তালে তালে গানও গাইছে। কীর্তনের মত প্রথমে একজন একটি লাইন বলছে, পরে

বাকীরা সবাই সেইটা উচ্চারণ করছে।

টায় সাময়িক উপাদান কিন্তু বেশি।

একজন গাইছে : 'গো ব্যাক, মা দুর্গা।'

বাকীরা ধুয়ো ধরছে : 'গো ব্যাক, গো ব্যাক।'

মা ইংরেজী বোঝেন না। মহা ফাঁপরে পড়লেন।

সরস্বতী মুখ কালো করে বললে, 'মা, তোমাকে ফিরে যেতে বলছে।'

'কেন রে? আমি কী করলুম।'

এর মধ্যে পুলিশ নৃত্যগীতকারী দলকে ঠেকিয়েছে। পুলিশ অফিসার এসে বলল, 'মা, এরা পণ্ডিত—কার্তিকের পণ্ডিত।'

'তার মানে কী?'

'তোমার কার্তিকে আসা উচিৎ বলে এরা মনে করে। তাই এরা তোমায় চলে যেতে বলছে।'

এর মধ্যে সাদা পতাকা হাতে আর এক দল এসে হাজির। তারাও সাময়িক কীর্তন গাইছে। তবে পদগুলো আলাদা।

তাদের একজন বলছে, 'ওয়েলকাম, মাদার গডেস্।'

'ওয়েলকাম, ওয়েলকাম।'

মা কিছুই বুঝতে পারলেন না। মা-র বাপের বাড়ীর দেশে ইংরেজী না জানলে এত অসুবিধে হয়।

সাদার দল আর কালোর দলে লেগে গেল মারামারি। পাল্লে তাতে এক দলের হতাহতের সংখ্যা অন্য দলের চেয়ে বেশি হয়ে পড়ে, তাই সুবিচারক পুলিশ দু'দলকে সমান পিটিয়ে সমান সংখ্যক হতাহত করে দিল।

মা এসে সাদাদের মণ্ডপে অধিষ্ঠিত হলেন। কালোরা পুরো নন্-কোঅপারেশন করে গেল। স্বয়ং সরকার বাহাদুর কালোর দলে। ছুটিছাটাও পায় নি লোকজন। মা সারাক্ষণ পোজ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। থেকে থেকে পা ব্যথা হয়ে যায়, তবু লোকজনের বিশেষ পাত্তা পাওয়া যায় না। একটি লোক মণ্ডপে ঢুকলে মা কৃতার্থ বিবেচনা করেন নিজেকে—পদব্যথাকারী পোজকে সার্থক মনে করেন। অন্যান্য বার লোকের ভীড়ে মা নাজেহাল থাকেন, এবার বড়ই ফাঁকা। অন্যান্য বার ভীড়ের মধ্যে কে প্রণামের সময় কী প্রার্থনা করে, তিনি তা শোনবারই সময় পান না এবং মনোযোগ দেন না। এবার প্রতিটি লোকের প্রণামকালীন বিড়বিড় তিনি শুনতে লাগলেন।

একজন বললে, 'মা কাচ্চাবাচ্চাদের নিয়ে বড় কষ্টে আছি। সি. ডি. এস্ তুলে নাও মা।'

সি. ডি. এস্ কী? মা বুঝতে পারলেন না। নাঃ, ইংরেজী না শিখলে আর বাপের বাড়ীর কথার কিছুই বোধগম্য হবে না।

আর একজন বললে, 'মা, দয়া করে মাছের দামটা একটু কমিয়ে দাও, মা। গোটা জাতটাকে বিধবা করে দিয়ো না, মা।'

একজন স্ত্রীলোক বললে, 'মা, বাজারে চিনি ছাড়ো মা। আমরা সবাই যেন ডায়বেটিসের রুগী, তুমি যে এমন ব্যাভার সুরু করলে, মা।'

একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন, 'জিনিষপত্রের দাম যখন এতই বাড়িয়েছ মা, তখন আমার ছোট ছেলেটার একটা চাকরি দিয়ে দাও মা। তদ্বীর ছাড়া চাকরি হয় না, কিন্তু হোমরা-চোমরাদের ল্যাজ ছুঁতে পারি না। তাই তোমায় ধরেছি মা। তোমার কাছে তদ্বীর করছি মা।'

মা ডায়বেটিস, তদ্বীর, এ সব শব্দের মানে বুঝতে পারলেন না। কথাগুলো মা-র এ কান দিয়ে ঢুকলো, ও কান দিয়ে বেরোল।

মা খুব বিমর্ষ হয়ে কয়েকটা দিন কাটালেন। উদ্দাম মাইক নেই, উন্মত্ত জনতা নেই, বিসর্জনের দিন নদীর ওপর কোমর দুলিয়ে বোম্বাই নাচ পর্যন্ত হোলো না।

মা বললেন, 'আজই কৈলাসে যাব।'

গিরিরাজ বললেন, 'এক মাসের জন্যে কেন এই যাতায়াতের হাঙ্গামা করবি। এখানে থেকে যা না।'

মা-র মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। বললেন, 'সেখানে বুড়ো মানুষটা একা পড়ে থাকবে।'

'তবে তুই একা যা। ছেলেমেয়েরা থাক।'

'বেশ।' মা তারপর ছেলেমেয়েদের ডেকে নিয়ে বললেন, 'এই এক মাস তোমরা একটা চাকরী-বাকরী কোরো। যা দিনকাল পড়েছে। মামার বাড়ীতে বসে বসে খাওয়াটা ভাল দেখায় না।'

মা কৈলাসে ফিরে গেলেন—একা !

চার ভাইবোন দু'দিন ঘর্মাক্ত কলেবরে চাকরী খুঁজে ক্লান্ত ও ব্যর্থ হোলো।

গিরিরাজ বললেন, 'দাদা রে, দিদি রে, চাকরী পাওয়া কি এতই সহজ !'

'তবে ? তবে কী করতে হবে ?' —উদ্বিগ্ন সমস্বর।

'করতে হবে—তদ্‌বীর।'

'শুনেছি কথাটা যেন কোথায়, কিন্তু—' কুঁড়ি চুলকোতে চুলকোতে বলল গণেশ।

'বালকবালিকাগণ, তোমরা বীরভোগ্যা স্বর্গভূমি থেকে এসেছ, তোমরা আমাদের নতুন শ্লোগান জান না।'

'কী সে শ্লোগান ?' শুধোল কার্তিক।

'তদ্‌বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা।'

'সুন্দর।'

'কী ?'

'ঐ কথাটা, দাদু, আমাদেরও ঐ রকম বীর করে দাও না।'

'সে কি চারটিখানি কথা রে। তার জন্য দস্তুর মত সাধনা করতে হয়।'

'আমরাও করব সাধনা।'

'তা তো না হয় করলি। কিন্তু তদবীর অনেকের ধাতে সয় না।'

'আমাদের সইবে দাদু।' বলল লক্ষ্মী-সরস্বতী।

'দেখা যাক।'

'আমাদের পথ দেখাও, দাদু।'

'আগে এই সব সেরা বীরদের একদিন দেখাই।'

'তাতে লাভ ?' শুধোল লক্ষ্মী।

'প্রেরণা পাবি মহাপুরুষদের দেখলে।'

গিরিরাজ চার নাতি-নাতনীকে নিয়ে একদিন এক মহাপুরুষের কাছে গেলেন। বললেন, 'প্রণাম কর। ইনি একজন তদ্‌মহাবীর।'

সরস্বতী বলল, 'আমরা তো কাউকে প্রণাম করি না। আমরা যে দেবতার বংশধর।'

'ওরে, বংশধরে আজকাল কিছু হয় না রে। আজ কাল ধর্মধর হতে হয়।'

'আমরা তো ধর্মকেই—'

...দাদাকে, দিদিকে, চাকরী পাওয়া কি এতই সহজ।

'আমি সংস্কৃত ধর্মের কথা বলছি না প্রাকৃত ধর্মের কথা বলছি। সংস্কৃত ধর্ম প্রাকৃতে হয়েছেন ধামা।'

'আ।' মস্ত বড় একটি হাঁ করে বলল গণেশ।

গিরিরাজ বললেন, 'তদ্‌মহাবীরজী, এদের আপনি আশীর্বাদ করুন।'

মহাবীরজী একটি হাত বরাভয় দানের ভঙ্গিতে তুলে সুর করে গাইলেন : 'কর তদ্‌বীর, ভজ তদ্‌বীর, হও মহাতদবীর রে।'

সুরটা—'ভজ গৌরাঙ্গ'-এর সুর।

গিরিরাজ বললেন, 'আপনার একটা তাবিজ দয়া করে এদের দান করুন।'

মহাবীরজী একটি তাবিজ তাদের হাতে দিয়ে বললেন, 'প্রত্যহ প্রভাতে এটি ধৌত করে সেই পূত সলিল পান করবে। আর এর মধ্যে একটি কাগজে বীজমন্ত্র লেখা আছে। বাড়ী গিয়ে সেটি পড়ে নেবে এবং প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা সেই মন্ত্র একশো আটবার উচ্চারণ করে ধ্যান করবে। আর মন্ত্রাদেশ অনুযায়ী চলবার চেষ্টা করবে।'

বাড়ী ফিরে ওরা মন্ত্রটি পাঠ করল। মন্ত্র :

নিজের লাইনের শক্তিমান একজনকে প্রথমে গুরু পাকড়াইবে।

তাঁহার সহিত কোন সংঘর্ষজনিত উত্তাপ যাহাতে সৃষ্টি না হইতে পারে, তাহার জন্য সর্বদা উভয়ের সম্পর্কের মধ্যে স্নিগ্ধ স্নেহবিন্দু সিঞ্চন করিবে।

গুরু সর্বদাই ঊর্ধ্বলোকের ব্যক্তি এবং ঊর্ধ্বতর দিকে লক্ষমান। তুমি সর্বদা গুরুর পুচ্ছটি সজোরে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবে। জানিবে, উহাই তোমার স্বর্গলোকের তরণী। তবে জোরে চাপিয়া ধরিবে, নচেৎ গুরুভাইদের শিঙের গুঁতা বা স্বয়ং গুরুর খুরেলা চাঁট খাইয়া পুচ্ছচ্যুত হইয়া অতলে পতিত হইতে পারো। উভয় ক্ষেত্রেই সবিনয় হাস্যের সঙ্গে সব কিছু গ্রহণ করিবে। শিং-ওয়ালা গুরুভাইকে বাগে পাইলে কোৎকা মারিবে। কিন্তু গুরুতর-পুচ্ছ লাভ করিবার আগে পর্যন্ত গুরু-পুচ্ছ কদাপি ছাড়িবে না।

কার্তিক-গণেশ-লক্ষ্মী-সরস্বতী সকলেই তাবিজ ধৌত করে জলপান করতে লাগল। ত্রিসন্ধ্যা এক শো আটবার বীজমন্ত্র জপ করল। মন্ত্রাদেশ অনুযায়ী চলবারও চেষ্টা করল। কিন্তু মামার বাড়ীর লোকেদের মত তাদের মাথা এ ব্যাপারে যথেষ্ট সাফ নয়। সুতরাং তারা কাজকর্মের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সুবিধে করতে পারল না। এই বিদ্যা আয়ত্তের প্রয়াসে ওদের দেহ হতে থাকল শীর্ণ, আর চিত্ত সুখহীন। অবশেষে একদিন তারা কৈলাসে পালিয়ে গিয়ে নিজেদের প্রাণ বাঁচাল।

মা জিজ্ঞেস করলেন, 'কিরে, তোরা আগেই ফিরলি!'

তারা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করল তাদের অভিজ্ঞতা।

মা তাই শুনে দ্রুত পায়ে এলেন শিবের কাছে। বললেন, 'হ্যাগা, একটা কথা বলব, রাখবে?'

'তোমার কোন্ কথাটা না রাখি।'

'যাক্ষে বোকো না, কোন কথাই রাখ না, তুমি তো দেবতাদের মধ্যে আদিদেব, দেবরাজ তোমারই হবার কথা।'

'ইন্দ্র রয়েছে যখন—'

'সে তো অনেক দিন রয়েছে। তারই তো উচিৎ এখন নিজে থেকে ছেড়ে দেওয়া।'

'তা যখন দিচ্ছে না, তখন ওই না হয় থাক।'

'এই জন্যে তোমার সঙ্গে আমার লাগে। একটুও অ্যাম্বিশন্ নেই তোমার। পুরুষ মানুষের অ্যাম্বিশন না থাকলে চলে! হ্যাগা, তুমি একটু চেষ্টা কর না। আমার অনেক দিনের সাধ, তুমি দেবরাজ হবে, আর আমি তোমার পাশে বসব স্বর্গের রাণী হয়ে।'

'কিন্তু সে কী করে হবে?'

'হবে হবে। একটা বিদ্যা চাই।'

'কী বিদ্যা?'

'তদ্ভীব।'

'সে আমি কোথায় পাব?'

'আমার বাপের বাড়ীর দেশে।'

'এই বৃদ্ধ বয়সে আর নতুন কোন বিদ্যায় হাত দেওয়া মুস্কিল।'

'কিছু মুস্কিল নয়। বিদ্যেটা শিখে এসে শুধু ব্রহ্মা আর বিষ্ণু এদের ওপর সেটা প্রয়োগ করবে। ব্যাস, তাহলেই—'

'বেশ তো ভালই আছি। আবার—'

'তুমি আমায় একটুও ভালবাসো না।' মা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। 'আমার একটা সাধ যদি তোমায় দিয়ে মেটে।'

শিব ফাঁপরে পড়ে বললেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা, হবে, থাক।'

'তবে চল।'

'আজই?'

'হ্যাঁ। কার্তিক মাসে যে আমার যাবার কথা আছে।'

মা শিবকে বগল-দাবা করে বেরিয়ে পড়েছেন তাঁকে তদ্ভীবাবীর করে তোলবার জন্য। মা আসছেন।

জীব বিজ্ঞানী লাইসেংকো

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

জড় পদার্থের জৈব পদার্থে রূপান্তরিত হবার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা যদি থাকত, প্রয়োজনের তাগিদে অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে মিলিত হয়ে বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হবার শক্তি না থাকত তাহলে পৃথিবীতে জৈব পদার্থের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ সম্ভব হোত না! জার্মান বৈজ্ঞানিক লাইবিগের তত্ত্ব অনুসারে, "জীবন বস্তুর ঠিক সমবয়সী এবং বস্তুর মতই সে চিরস্থায়ী।"

লাইবিগের এই তত্ত্বের বিরোধিতা করে এঙ্গেলস লিখলেন :—

"অঙ্গারের যৌগিক পদার্থগুলি অঙ্গারের মতই শাশ্বত, লাইবিগের এই ধরণের বক্তব্য সত্য বিনা সন্দেহ।...সেগুলিকে একমাত্র এইদিক থেকে শাশ্বত বলা যেতে পারে যে একই রকমের সংমিশ্রণ, উত্তাপ, চাপ ও বৈদ্যুতিক শক্তির অবস্থায় সেগুলির পুনরুৎপাদন অবশ্যম্ভাবী।...সজীব প্রোটিন যদি অন্যান্য অঙ্গার-যৌগিকের মত চিরস্থায়ী হোত তাহলে সেই প্রোটিনও ক্রমাগত যেমন তার মূল উপাদানগুলির মধ্যে মিলিয়ে যেত ঠিক তেমনি পূর্ববর্তী প্রোটিনের কোন সাহায্য না নিয়ে সেই মূল উপাদানগুলি থেকেই সে আবার নতুন করে জন্ম গ্রহণ করত।... জীবন কোন চিরস্থায়ী তৈরি বীজাণুর মত গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে পরিবাহিত হয় না বস্তুর ক্রম বিকাশের ধারায় যেখানেই উপযোগী ও প্রয়োজনীয় অবস্থার উদ্ভব হয় সেখানেই নতুন করে প্রাণ আত্ম-প্রকাশ করে।"

জীবনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এঙ্গেলস লিখেছেন: "জীবন হচ্ছে প্রোটিন-ঘটিত বস্তুর এমন এক বিশেষ ধরনের অস্তিত্ব যার সার ধর্ম হচ্ছে বাইরের প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে নিয়ন্তর বিপাকীয় আদান প্রদান। সেই বিপাকীয় বিনিময় বন্ধ হলেই প্রোটিনের গঠন ভেঙ্গে গিয়ে জীবনের অবসান ঘটে।"

একমাত্র জৈব বস্তুই জড়ের বুকে প্রাণসঞ্চার করতে পারে। নির্দিষ্ট রাসায়নিক নিয়মের দ্বারা জড় জগত জৈব জগতের সঙ্গে সংযুক্ত। জৈববস্তুর সোনার কাঠির ছোঁয়া না পেলে জড় প্রাণ পেতে পারে না।

জৈব ধর্মের নিয়মকানুন নিছক রাসায়নিক বা ভৌতিক নিয়মকানুন নয় যেমন মানব সমাজের অগ্র-গতির নিয়মাবলী জীবশাস্ত্রীয় নিয়মাবলী নয়। জীব দেহের মধ্যে যে অসংখ্য রাসায়নিক ও ভৌতিক ক্রিয়া-কলাপ চলে সেগুলি বিভিন্ন জ্ঞাত ও অজ্ঞাত নিয়মাবলীর দ্বারা পরিচালিত যে নিয়মগুলি আবার বস্তুর অধীন।

প্রকৃতির প্রত্যেকটি জৈব ও জীবের ব্যাপারের মধ্যে অচ্ছেদ্য বন্ধন আছে। তেমনি বন্ধন আছে বিজ্ঞানের সমস্ত শাখার মধ্যে। আচার্য জগদীশচন্দ্র এই সত্য মনে প্রাণে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি লিখেছেন :—

"বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে নেমে আমি নিজের অজ্ঞাতে পদার্থবিদ্যা ও শরীরশাস্ত্রের পারস্পরিক সীমা রেখায় গা দিয়ে এই ব্যাপার দেখে অবাক হয়ে যাই যে সেই

সীমারেখা যেন মিলিয়ে যাচ্ছে, সেই জায়গায় ক্রমশ প্রকাশ পাচ্ছে জীব ও জড়ের কতকগুলি মিলন বিন্দু। আমি দেখলাম অচেতন পদার্থ মোটেই নিষ্ক্রিয় নয়। মনে হোল ধাতু, উদ্ভিদ সবাই এক সর্বব্যাপী বিশ্ব নিয়মের সূত্রে গাঁথা। তাদের সবাই-এর মধ্যে দেখা দেয় ক্লান্তি ও উত্তেজনা।"

বৈজ্ঞানিকের কর্তব্য হল প্রকৃতির বিভিন্ন ব্যাপারের মধ্যেকার পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য এবং প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র ব্যাপারের মধ্যে যে অবিরোধী ঐক্যতত্ত্ব আছে সেটি উদ্ঘাটন করা। রবীন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক না হয়েও এই ঐক্যতত্ত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে। তাই 'আত্ম পরিচয়ে' তিনি লিখেছেন :—

"অহরহই জীবনকে মৃত্যু নবীন করিতেছে, ভালোকে মন্দ উজ্জ্বল করিতেছে···যখন পরিচয় পাই তখনই রূপের মধ্যে অরূপ, বন্ধনের মধ্যে মুক্তির প্রকাশ আমাদের মধ্যে জাগিয়া ওঠে।"

···"অংকুর এখানে দুই ভাগ হয়ে বাড়তে চলেছে··· এই যে দ্বন্দ্ব—মৃত্যু ও জীবন শক্তি এবং প্রেম, স্বার্থ এবং কল্যাণ···যার সমাধান পরম শান্তি, পরম এক, একথা আমি বার বার বলেছি।"

সুতরাং প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক ঘটনার সার বস্তু উপলব্ধি করতে হলে এই ঐক্যতত্ত্ব উদ্ঘাটন করা চাই।

যে কোনো জীব বা জীবদেহের যে কোন সজীব অণুকণিকার মধ্যে জাতিবিশেষের নিজস্ব জৈব ধর্মগুলি থাকে। ঠিক যেমন বিভিন্ন মূল পদার্থের যোগাযোগের দ্বারা অজৈব জগৎ তৈরি তেমনি বিভিন্ন জীবজাতির যোগাযোগের দ্বারা জৈব জগৎ গড়ে উঠেছে। জৈব জগতের প্রত্যেকটি জাতি হচ্ছে সজীব পদার্থের এক একটি বিশেষ ধর্মসম্পন্ন পরিপ্রকাশ। প্রত্যেকটি জীবাণু, উদ্ভিদ ও জীব তার নিজস্ব জৈব নিয়মাবলীর দ্বারা পরিচালিত। প্রত্যেকটি জাতিকে আবার সেই সঙ্গে জৈব জগতের জীবন ধারণের সাধারণ নিয়মাবলী মেনে চলতে হয়। বংশগতি, প্রকারণ ইত্যাদি অন্য নিয়মগুলি সেই সাধারণ আইনের বশবর্তী। জীবন ধারণের সাধারণ নিয়মগুলিই হচ্ছে ভিত্তি।

গাছপালা, জীবজন্তু এমনকি জীবাণুর দৈহিক গঠনের মধ্যে যে তথাকথিত "উদ্দেশ্য" থাকে তাও এই সাধারণ নিয়মের অধীন। অবশ্য 'উদ্দেশ্য' বলে কোন বিশিষ্ট প্রকৃতির রাজ্যে সেই কারণ উদ্দেশ্যের জন্ম বিবেক ও মননশক্তি থেকে। জল নিচের দিকে গড়ায় কোন উদ্দেশ্যের জোরে নয়, মাধ্যাকর্ষণের জোরে। জড়প্রকৃতির ক্ষেত্রে এইরকম কতকগুলি বিশেষ নিয়ম আছে।

জৈব জগতে অবশ্য বিভিন্ন জীবের গঠনের মধ্যে একটা উদ্দেশ্য লক্ষ্য করা যায়। সেই উদ্দেশ্যটা থাকে—তাদের শারীরক্রিয়ার মধ্যে, একই জাতির জীবগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে, অন্যান্য জাতির সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যে। জাতি বিশেষের জীব বা জীবদেহের যে কোন অংশের এই উদ্দেশ্য মাত্র একটিই যা হচ্ছে সেই জাতির জীবের বংশবৃদ্ধি করা। প্রাকৃতিক জীবন ধারণের যে মূল নিয়মাবলী অন্য সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে সেইগুলিই ছিল চার্ল্‌স্ ডারউইনের গবেষণার প্রধান বিষয়। অবশ্য মলথুসবাদের "অত্যধিক বংশবৃদ্ধি" সম্পর্কিত ভুল তত্ত্ব মেনে নেওয়ার ফলে ডারউইন এই সব নিয়মের সূত্র আবিষ্কার করতে পারেননি। মলথুসবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ডারউইন এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে জীবন সংগ্রামে তারাই বাঁচে যারা বলিষ্ঠ। যাঁরা ডারউইনের এই মত মানেন তাঁরা এই ধরণের যুক্তি দিয়ে থাকেন যে ধরুন একটা বাঁশ বনে হাজার হাজার বাঁশ গাছ আছে যেগুলিতে আছে লক্ষ লক্ষ বীজ। কিন্তু জমি বিশেষে কতটুকুই বা জায়গা আছে যে লক্ষ লক্ষ বীজ থেকে গাছ হয়ে সেখানে বেঁচে বর্ত্তে থাকবে? কাজে কাজেই জোয়ালো গাছগুলো অন্যদের হটিয়ে দিয়ে সেই জায়গা দখল করে নেয়। তার মানে বাঁশ গাছের লক্ষ লক্ষ ভ্রূণের মধ্যে বাঁচবার জন্য যে লড়াই হয় তা থেকে বিজয়ী হয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে করে মাত্র কয়েকশো গাছ।

এই যুক্তি যাঁরা দেন (অর্থাৎ যাঁরা লোকসংখ্যার "অত্যধিক বৃদ্ধির" দোহাই দিয়ে ভূমিসংস্কার এড়িয়ে যেতে চান) তাঁদের প্রশ্ন করা যায় যে বাঁশবনের জায়গাটায় যদি একটি মাত্র বাঁশের বীজ

থাকত তাহলে কি সব জায়গা তার দখলে আসত নাকি জমিটা ঘাসে ছেয়ে যেত? আসলে পাশবনকে হটিয়ে দেবার ক্ষমতা সে বীজের হোত না। ঘাসেদেরই শেষপর্যন্ত জিত হোত। লক্ষ লক্ষ আছে বলেই জায়গাটা ঘাস বন না হয়ে বাঁশবন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বাঁচার প্রতিযোগিতা এক্ষেত্রে বাঁশবীজগুলির মধ্যে হচ্ছে না। হচ্ছে বাঁশবীজ ও ঘাসবীজের মধ্যে অর্থাৎ দুটি জাতির মধ্যে। জৈব জগতে জীবের অস্তিত্বের নিয়মাবলী একই জাতির প্রাণীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বজায় রাখে না কিন্তু একজাতির সঙ্গে অন্য জাতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমর্থন করে। কিন্তু সমর্থন করে কেন?

আগেই বলা হয়েছে যে প্রত্যেক জীবের দৈহিক গঠনের মধ্যে একটা উদ্দেশ্য আছে যা জীবনের সাধারণ নিয়ম মেনে চলে। কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতির দ্বন্দ্বিক বা দ্বৈত চরিত্র অনুসারে প্রত্যেকটি ব্যাপারের একটি পাল্টা ব্যাপার আছে। সুতরাং জীব বিশেষের গঠন ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্য যে উদ্দেশ্যের অধীন তার পাল্টা হচ্ছে বিশের জৈব জগতের সামগ্রিক গঠন ও চরিত্রের অবৈশিষ্ট্য বা সাধারণত্ব। যেমন ধরুন উদ্ভিদভোজীকে মাংসভোজীর হাত থেকে বাঁচানো একটি উদ্দেশ্য। কিন্তু সেই উদ্দেশ্যে মাংসভোজীর কোন স্বার্থ নেই। জৈব জগতের শুধু যে অজৈব জগতের সঙ্গে সম্পর্ক আছে তাই নয় জৈব জগতের মধ্যেও পারস্পরিক সম্পর্ক আছে। প্রত্যেকটি জাতি অন্য জাতিগুলির অস্তিত্ব ভাঙিয়ে নিজের সুবিধা করে নেয়। প্রত্যেকের কাছেই অন্যের অস্তিত্ব প্রয়োজন।

প্রকৃতির দিকে তাকালে দেখা যাবে যে জৈব জগতে জন্মের অনুপাতে ধ্বংস হওয়ার চেয়ে বেঁচে থাকার দৃষ্টান্ত বেশি। জন্মের সংখ্যা যত বেশি হয় তত

সোভিয়েত-কৃষিবিজ্ঞান ভবনে কর্মরত বিজ্ঞানাচার্য লাইসেংকো।

সোভিয়েত উদ্ভিদরক্ষা ভবনে রোগ প্রতিরোধী গমের বীজ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে।

বেশি প্রাণী বেঁচে থাকে অন্য জাতির জীবদের ঠেলে দিয়ে।

প্রকৃতি ও কৃষিক্ষেত্রে সমস্ত জীব ও উদ্ভিদের উদ্ভব হয় ডারউইনের আবিষ্কৃত প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম নির্বাচনের নিয়ম অনুসারে। কিন্তু সেই নিয়ম বিচার করার ক্ষেত্রে দুটি স্বতন্ত্র পরস্পরবিরোধী অভিমত আছে। পাশ্চাত্য জগতের পুরাতনপন্থী বৈজ্ঞানিকরা মেণ্ডেল-মর্গ্যান-ভাইসম্যানবাদে বিশ্বাসী অর্থাৎ ডারউইনের তত্ত্বের ভুল দিকটি মেনে নেন। কিন্তু প্রগতিশীল বৈজ্ঞানিকরা মিচুরিন-লাইসেংকোর বক্তব্য স্বীকার করে নিয়ে কাজ করেন। ডারউইনের প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম নির্বাচন তত্ত্বকে তাঁরা তিন ভাগে ভাগ করে থাকেন :—বংশগত, প্রকারণ, ও উদ্বর্তন। এই তিনটি দিকে গবেষণা করে তাঁরা যে জ্ঞান সংগ্রহ করেন কাজে লাগান তদনুযায়ী। তাঁরা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে প্রকৃতি কোন সচেতন উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত নয়, পরিচালিত কতকগুলি নিয়মের দ্বারা। ধরুন উদ্দেশ্য যদি থাকত তাহলে চাষ বা মুরগী এমন ভিন দেশ কেন যা থেকে বাচ্চা হয় না? আর একটি উদাহরণ হচ্ছে সেই ঘাসপাতি যার বীজ হয় না।

প্রাণীরা যে পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা রাখে এ বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই ক্ষমতা আসে কোথা থেকে? ল্যামার্কপন্থীরা বলেন যে জীব-মাত্রেরই নাকি এই ক্ষমতা সহজাত। কিন্তু লাইসেংকোপন্থীরা মনে করেন যে, প্রত্যেকটি জাতির নিজস্ব জৈব নিয়মাবলীর একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে সেই জাতির প্রাণীর সংখ্যাবৃদ্ধি করা, বংশগত প্রকারণ ক্ষমতা সৃষ্টি করা নয়। যেমন বলা যায় প্রতিকূল পরিবেশে ২৮টি ক্রোমোজোম-বিশিষ্ট শক্ত গমের গাছে কয়েকটি শীষে ৪২টি ক্রোমোজোম বিশিষ্ট নরম গমের দানা তৈরী করা যেতে পারে কারণ সেগুলি সেই পরিবেশের পক্ষে বেশি উপযোগী। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে সেই নরম গম তো আর শক্ত গমের জাতে রইলো না। সে হোল এক নতুন জাতের গম। সুতরাং এক্ষেত্রে এটা বললে ভুল হবে যে শক্ত গম বিশেষ পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে বেঁচে বর্তে রয়ে গেল। আসলে যা ঘটল তা হচ্ছে এই যে অনুপযোগী শক্ত গমের সামনে এমন এক প্রতিদ্বন্দ্বীর উদ্ভব হোল যা সেই অবস্থার সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকতে পারে। এর থেকে আর একটি যে জীব-বৈজ্ঞানিক সত্য স্পষ্ট হয়ে (যা সামাজিক-সত্যও বটে) তা হচ্ছে জীবের সহজাত রক্ষণশীলতার প্রতিরোধ সত্ত্বেও অবস্থার চাপে শেষ পর্যন্ত জীবদের বংশ ও জাতিধর্ম ত্যাগ করা ছাড়া

পরিবর্তন ঘটে না। বংশগত ধর্মগুলি এই পরিবর্তনে বাধা দেয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে বাধা টেঁকে না।

বিজ্ঞানাচার্য লাইসেংকো বলছেন যে, জীবমাত্রই হচ্ছে দুটি পরস্পরবিরোধী বিষয়ের দ্বৈতধর্মী একতা অর্থাৎ দেহ এবং তার জীবন-ধারণের অবস্থার একতা। দেহ হচ্ছে সক্রিয় কিন্তু অবস্থাটা হচ্ছে নিষ্ক্রিয়। পরিবেশের মধ্যে থেকে দেহ তার নিজের প্রয়োজন মত উপাদানগুলি বেছে নেয়। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে জীবের দ্বৈত চরিত্রের সক্রিয় দিকটি পরিবেশের উপযোগী দিকগুলি আত্তীকরণ করে নেয় এবং সক্রিয় দিকটি নিজেকে আত্তীকৃত হতে দেয়। আরো বলা যায় যে এক্ষেত্রে সজীব দেহ জড় পরিবেশ থেকে জীবনের উপাদান সংগ্রহ করে সেগুলিকে জৈব বস্তুতে রূপান্তরিত করে, অজৈব খাদ্যকে রূপান্তরিত করে জৈব প্রোটিনে। তার মানে জড় ও জৈব জগতের মাঝখানে কোনো চীনা প্রাচীর নেই। আচার্য-জগদীশচন্দ্র তাঁর 'অব্যক্ত' শীর্ষক রচনায় এই সত্যই প্রকাশ করেছেন।

লাইসেংকো যবিশস্যকে খরিফ শস্যে রূপান্তরিত করতে গিয়ে দেখেছেন যে পরিবেশের বৈশিষ্ট্যই বংশগতির চরিত্র নির্ধারণ করে এবং বংশগত চরিত্র বিশেষকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য জীব দেহ পরিবেশ থেকে অনুকূল উপাদানগুলি বাছাই করে নিতে পারে।

মানব সমাজে যেমন পুরাতন সমাজ ব্যবস্থার গর্ভেই অনাগত কালের সমাজ ব্যবস্থার ভ্রূণ গজিয়ে ওঠে ঠিক তেমনি নতুন জাতের জীবের প্রথম উদ্ভব হয় পুরানো জীবেরই দেহের মধ্যে যা সেই পুরানোর কাঠামো দেয় বদলে। নতুনের জন্ম পুরাতন থেকে হয় না, হয় পুরাতনের মধ্যে সেই পুরাতনের দেহে বিবর্তন-ধারায় সঞ্চিত সারবস্তু পাথেয় করে নিয়ে। ল্যামার্কপন্থীরা জৈব জগতের অন্তর্নিহিত সারমর্ম বোঝবার চেষ্টা না করে শুধু বাহ্যিক ব্যাপারগুলি দেখেন বলে তাঁদের সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত হয়।

শীতকালীন গমের শীষে সৃষ্টি করা বাসন্তী গমের বীজ

প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম নির্বাচন সম্পর্কে ডারউইনের তত্ত্ব আক্ষরিকভাবে বিচার করলে চলবে না। সেই তত্ত্ব বিচার করতে হবে বংশগতি, প্রকারণ ও উদ্বর্তন এই তিনটি বিষয়ের সম্মিলিত পরিপ্রেক্ষিতে। এই ভাবে কাজ করে প্রাকৃতিক বিবর্তনের নিয়মাবলী আমরা যত বেশি আয়ত্ত করতে পারব ততই বেশি উন্নতি সাধন করতে পারব ডারউইনবাদের। প্রকৃতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করে বিজ্ঞানের কর্তব্য শেষ হতে পারে না। প্রকৃতির নিয়মাবলী আয়ত্ত করে মানুষের প্রয়োজনমত তার রূপান্তর সাধন করা, এই হচ্ছে বিজ্ঞানের ব্রত।

নিজের দেহকে পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা কোনো জীবেরই নেই। কোনো একটি জৈবদেহের মাধ্যমে অজৈব পদার্থবিশেষ

যখন আম একটি জৈবসেহে রূপান্তরিত হয় তখন সেই অজৈব পদার্থের বিশেষত্বগুলি সহ করবার মত গুণের উদ্ভব হয়। লাইসেংকো শরৎকালীন গম থেকে শীত-কালীন গম সৃষ্টি করে নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছেন যে শরৎকালীন নাতিশীতোষ্ণ পরিবেশের মধ্যেই গম দানার মধ্যে শীতকালের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা সহ করবার মত কষ্ট-সহিষ্ণুতা তৈরি হয়ে নতুন শীতসহিষ্ণু গমের উদ্ভব হয় যদিও সেই শরৎকালীন গমের বংশগত চরিত্রে শীত সহ করার ধর্ম কোনদিন ছিল না।

জীবনের দ্বৈতচরিত্র না বুঝলে জৈব জগতের নিয়মগুলি মানুষের কাজে লাগানো সম্ভব নয়। একশো বছর আগে এঙ্গেলস লিখেছিলেন "যে বিজ্ঞান মৃত্যুকে জীবনের এক সার মুহূর্ত বলে স্বীকার করে না তাকে বিজ্ঞান বলা চলে না কারণ জীবনের স্বীকৃতির মধ্যেই বিরাজ করে জীবনের অস্বীকৃতি (negation)। এই হচ্ছে জীবন সম্পর্কে দ্বান্দ্বিক সত্য।" রবীন্দ্রনাথও বলেছেন :—"জীবনকে সত্য বলে জানতে গেলে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার পরিচয় চাই। ...পুরাতন মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আপনার চিরনবীনতা প্রকাশ করে।"

জীবনের দ্বৈতরূপকে স্বীকার করে নিয়ে প্রখ্যাত রুশ জীবশাস্ত্রী বিজ্ঞানাচার্য তিমিরিয়াজেভ তাঁর বস্তুবাদী জ্ঞানের দ্বারা ডারউইনবাদের নির্ভুল তত্ত্বগুলি কৃষিকার্যে প্রয়োগ করে নতুন গুণসম্পন্ন জীবজন্তু ও গাছপালা সৃষ্টি করার পথনির্দেশ করেন। তারপর সোভিয়েত আমলে মিচুরিন ও লাইসেংকো তিমিরিয়াজেভের উত্তরসাধন করে এসেছেন। জৈব জগতের দ্বৈত চরিত্র বিশ্লেষণ করে লাইসেংকো বংশগত ধর্মগুলি কৃত্রিম কৌশলে নিয়মন করতে সক্ষম হয়েছেন এবং সংকর-জাতীয় জীব ও উদ্ভিদের চরিত্রবৈশিষ্ট্যগুলি বাছাই করে কৃষিকার্যে ব্যবহার করছেন। বংশগতিকে ইপ্সামত দিকে পরিচালিত করার কৃতকার্যতা বিজ্ঞানাচার্য লাইসেংকোর এক ঐতিহাসিক অবদান।

এরা নিয়মিত
ব্যবহার করেন
'কিংকা'-র
আণিকা
হেয়ার অয়েল

কিং অ্যাণ্ড কোং
কলিকাতা

কী সুন্দর
ঘন কালো
মসৃণ
কেশগুচ্ছ !

এক : গল্প নয়, স্বপ্ন দুই : এই স্বপ্নের আমি অর্থ বুঝিনি। সকালে উঠেই টুকে রেখেছি।

তাও বলতে পারব না যে, হুবহু। ঘুমে এক রকম দেখায়, জাগরণ আর এক রকম সাজায়।

সকাল কেবল কি শিশিরকেই শুষে নেয়! স্বপ্নকেও কোপরা করে দেয় যে। মনে থাকে মাত্র তাই, যা আমরা মনে রাখতে চাই।

এ হল সেই সব দিনের স্বপ্ন, যে সব দিনে গোটা বেলাটা মেঘমুড়ি দিয়ে কাটায়, বিকেলে ভারী ভারী চোখে ছাই তোলে তখনও গা তোলার নাম নেই। একেবারে সন্ধের মুখে ঝিরঝিরে জলের ঝাপটা দিয়ে ঝরঝরে হতে চায়।

কিন্তু ততক্ষণে কারা সব ঘাম, পায়ে শব্দ করে হাঁটে, আস্তাবলের টিনের চালাটা প্যানপেনে কান্না জুড়ে দেয়, থামে না তো থামেই না। বেতো ঘোড়াপোড়ায় যেটা একটু তেজী সেটা পা ঠুকে ঠুকে ঠমক দেয়।

জানালার পাল্লায় টোকা দিয়ে বয়া বাতাস আস্তে আস্তে শিস দেয় আর কাশে।

সেদিনও সময় বুঝে গলির নীলমনি বাতিটা নিবে গেল পুট করে। একটা গাড়ি চোরের মত এই রাস্তায় ঢুকে ফেঁসে গেল জানান দিয়ে।

টের পেলাম রাতটা পড়েছে অথৈ জলে। সিঁড়িতে বারান্দায় জুতোর শব্দ থপথপে। মাথা সীসের মত নীরেট, সেখানে সুবিধা করতে না পেরে যত ব্যথা-বেদনা সব গাল-গলায় জটলা বাঁধে, ছুঁচলো জ্বর জ্বর ভাব মজ্জা পেশি সব কাবাবের মত গাঁথে।

জল চোঁয়ানো পাইপটা সর-সর ধারায় বৃষ্টির জল সাধ্যমত নিকাশ করছে টের পেলাম। আওয়াজে এক ধরণের এক ঘেয়েমি ছিল। ঘুমের টাউট যে-এক ঘেয়েমি—সেই।

তার পর চক্ষু-কর্ণ ইত্যাদি পঞ্চেন্দ্রিয়, রেনি-ডে'র মজায় পাওয়া ছাত্রদের মত, ইস্কুল পালালে।

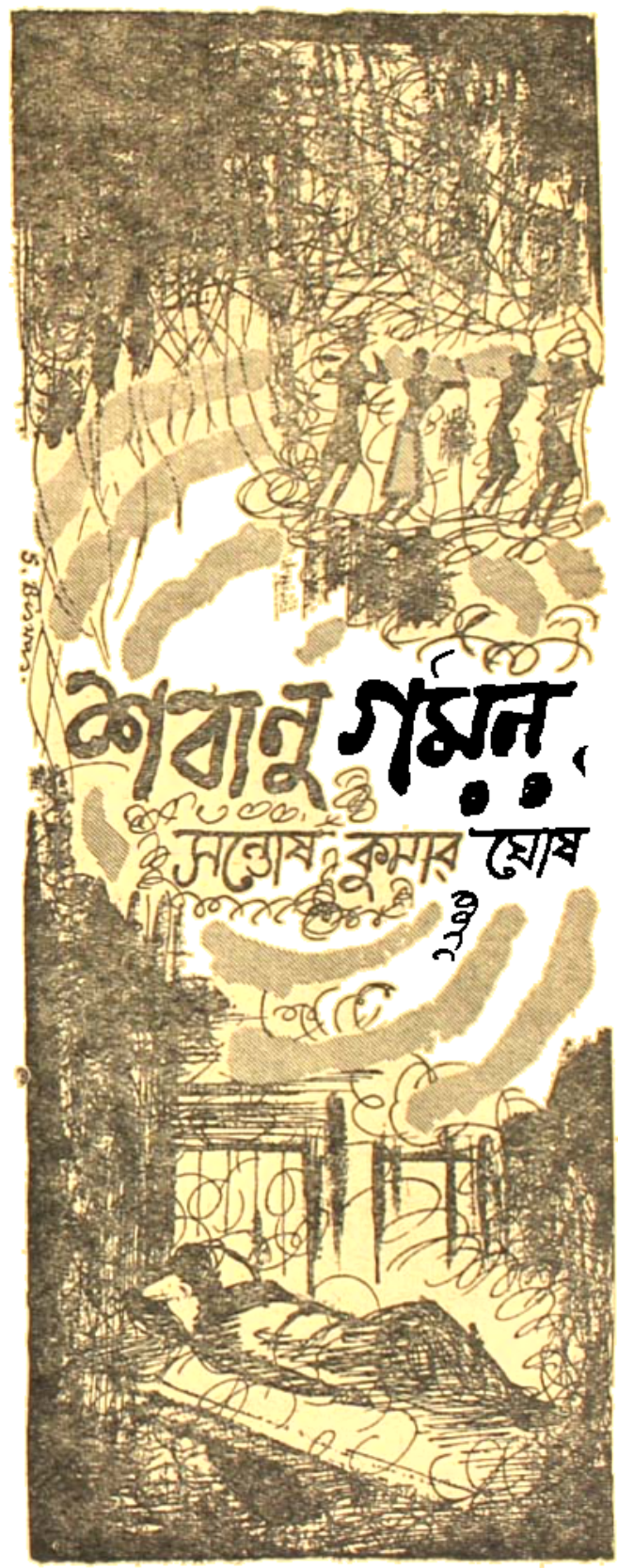

হুড়মুড় করে যে ঘরে ঢুকল সে কে, বলতে পারব আবছায়ায় তার মুখ দেখতে পাইনি।

কখন সে ঢুকল, তা-ও না। কারণ হাতের নাগালে ঘড়ি রাখিনি?

কী করে সে যে ঢুকে পড়ল, তাও আমার বিচার বুদ্ধিতে কুলোল না। সে এসেই আমার মুখ থেকে চাদর টেনে সরিয়েছিল, তার গলা চেনা চেনা তবু সনাক্ত করা যায় না।

বাইরে ঝিনঝিনে জ্যোৎস্না থৈ থৈ করছে, কখন ফুটেছে জানি না। জানালায় প্রলুব্ধ একটা পাল্লা শা-জাহানের 'দিই লাফ, নেব লাফ' ধরণের বাইরে ঝুঁকে কাঁপছে। জানালা কখন খুলেছে জানি না!

যেদিকটা সে দাঁড়িয়েছিল, সেদিকটা অন্ধকার। তাই তাকে দেখতে পাইনি। আমার মুখের চাদরটাই সে শুধু সরিয়েছিল, কপালে হাত দেয়নি, দিলে আমার জ্বর টের পেত, 'চল চল' বলে টানাটানি করত না।

বললাম, 'যাব না। দেখছ না আমি জ্বরে বেহুঁশ।

সে হাসল! তার বিকশিত দাঁত আমি দেখলাম। —বেহুঁশ, তবে কথা বলছ কী করে।

এটা একটা যুক্তি। আমি চুপ করে থেকে উত্তর খুঁজলাম।

সে আবার বলল, চল চল—এবার নিছক অনুরোধ না, একটু ধমক। ওর অদৃশ্যিকু হাত চাদরের তলা দিয়ে চালান করে ও আমার হাত ধরল।

বললাম, খুব ঠাণ্ডা, না? কোনও সাড়াও পাচ্ছি না যেন।

—তোমার মনের ভুল। একদম সেরে গেছ। না-ও এবার ওঠ ওঠ। ওরা সব অপেক্ষা করে আছে।

কারা অপেক্ষা করে আছে, কোথায়, জানতে চাইলাম না। বাকাবার বৃথা হত। তাকেই ভর করে উঠলাম।

বালিশে রাখা মাথাটা বড় একটা সীসের গোলার মত ঠেকছিল, তোলার পর আর ততটা ভারী ঠেকছিল না। পায়েও জোর পেলাম।

বললাম, জামাটা পরে নেব?

সে ঠাট্টা করে উঠল—তুমি আর তোমাতে নেই। কাল পাটভাঙা জামা কাপড় পরে শুয়েছিল—এখনও তা পরাই আছে। এ পোষাকে বিয়ের পিঁড়িতে গিয়েও বসা যায় তা এ-তো শবযাত্রা।

শবযাত্রা?

কার শব, কোথায় যাত্রা সে কিছু ভাঙল না, দরজার ছিটকিনি খুলে অন্ধকার থেকে আরও অন্ধকার সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল।

সদর চৌকাটে তাকে ধরে ফেললাম। কারণ ভিতরে কে বলে দিচ্ছিল, যতক্ষণ এই দেয়ালের গণ্ডিতে আছি, ততক্ষণ তবু আমার একটু যা-বা জোর, বাইরে পা বাড়ালে আর রক্ষা নেই, সম্পূর্ণত ওর ইচ্ছা আর ইঙ্গিতের গ্রাসে গিয়ে পড়ব।

বললাম, কিন্তু এই বৃষ্টিতে—

জবাবে সে ফটাস করে চড় মেরে দরজাটাকে হাঁ করিয়ে দিল। কেমন যেন গলায় বলল, দ্যাখ, তোমার চোখ নেই, বোধ-টোধ সব বিলকুল গেছে। বৃষ্টি থেমেছে সেই কখন, তারপর জ্যোৎস্না ফুটল, যে কাক-চিলগুলো কারনিসে কোথায় আটকা পড়েছিল তারা বাসা খুঁজে খুঁজে ফের ফিরে গেল, সদর রাস্তায় জমে যাওয়া ট্রাম-গুলো গলে গিয়ে ঢঙ ঢঙ আহ্লাদে ডিপোয় ফিরল, আগাড়ে ভাগাড়ে ফুর্তিবাজ ব্যাঙগুলো চুপ করল, তবে তো মর্গা বের করেছি!

—মড়া? বালি কাগজের মত ধবধবে ফ্যাসফেসে গলায় বললাম,—কার?

—দেখতেই পাবে।

সে মুড়ি দিয়ে রাস্তায় নামল, তার দেখাদেখি আমিও দিলাম।

রাস্তার জল সত্যিই নেমে গিয়েছিল, যদিও সান্ধ্য-লোচন খানাখন্দ তখনও ছিল তবু হালকা হাতে তাদের হাওয়া করছিল কেউ, এক্ষুনি জুড়িয়ে যাবে।

জ্যোৎস্না ছিল বটে, কিন্তু এ-ও ঠিক আকাশের মনের ধরণা তখনও কাটেনি। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে মেঘ জমকালো ঘাসপাতি চাঁদের দিকে চেয়ে ফুঁশছিল, কোন্ দলের পেটে যাবে সেই বখরা বাঁটোয়ারার ফয়সালার মাত্র ওয়াস্তা। ভীষণ সংকল্প নিয়ে এক পা দু-পা করে এগিয়ে আসছিল কয়েকটি দল। কত মাঠ আর। চাঁদটার যত হাসি তত কান্না হয়ে গেল বলে।

আমরা যে কোথায় চলেছি কে জানে। লোকটা হন হন পায়ে হাঁটছিল আগে, আমার গিটে গিটে কনকনে ব্যথা, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমি পারব কী করে।

পিছিয়ে পড়েছিলাম।

সরেও পড়া যেত কিন্তু লোকটার পায়ের গোড়ালির সঙ্গে আমার পা যেন সম্মোহনী সুতোয় বাঁধা, পালাব কেমনে।

মিহি থেকে মোটা থেকে মিহি, এক গোলকধাঁধার ছকের ওপর দিয়ে সে আমাকে টেনে নিয়ে চলল।

আলিবাবার গল্পের আমলে ফিরে যাইনি তো। খটকা লাগল, ওই লোকটাই হয়ত বাবা মোস্তাফা।

বা-আ-বা! চেঁচিয়ে তাকে বলতে গেলাম, থামো, হাওয়া উলটো দিকে বইছিল, আমার কথা আমার ঠোঁট থেকে ছিনিয়ে নিয়েই হাওয়া আমারও পিছন দিকে ছুঁড়ে দিল।

খাটিয়া দেখতে পেলাম তখন বড় একটা গাছের ছায়ায় সাদা কালো পাতার ঝালর, খাটিয়ায় একটি দেহ-ভাগ ঢাকা, খাটিয়া ঘিরে অন্তত জন দশ-বারো।

তাদের মাথা নত, বুকের ওপর হাত আড়াআড়ি।

এতক্ষণে দেখতে পেলাম, যে গাছের তলায় ওরা প্রতীক্ষারত, সে-গাছের পাতাও যেন সবগুলি সিক্তজল, এর নামই কি কাঁদুনি উইলো!

আমার পথ প্রদর্শক আমার মনের কথা যেন টের পেয়ে তাকিয়ে বলল, আরে না না, এর নাম শিরিষ। আজ বৃষ্টির জলে ভারী হয়ে আছে।

—আর ওই যে যারা দাঁড়িয়ে ওঁদের মুখের কিসের ছাপ? ভয়ের? ক্লান্তির? শোকের?

সে অদ্ভুত হেসে বলল, এখুনি টের পাবে।

আমি মন্ত্রমোহে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, সে নিষেধ করল। বলল দাঁড়াও। গাছের আড়ালে টেনে নিয়ে গিয়ে বলল, এইটে পর।

পকেট থেকে পাতলা ফ্যাকাশে চামড়ার একটা মুখোস বার করল, পিছনে সরু রেশমি সুতো।

আমার মুখে চামড়াটা সে টানটান বেঁধে দিল, গিঁট দিল ঘাড়ের কাছে। চোখের রইল, আর নাকের গর্তদুটি।

অস্বস্তি হচ্ছিল, ঘাড়ের কাছে কেমন সুড়সুড়ি। বাসী-বাসী একটা গন্ধও যেন।

—এ কিসের মুখোস?

চাপা গলায় সে বলল, শোকের। এখানে এলে পরে নিতে হয়। যেমন অফিসে যাবার সুট আছে, মিটিংয়ে যাবার, শোবার—তেমনিই শোকেরও পোষাক। এবার তুমি তৈরী—এবার চল।

—ওরা, ওরা কারা?

—পরিজন, বন্ধু।

—ওরাও পরেছে?

—প্রায় সবাই। আমিই তো ওদের দিয়েছি।

—এই বুঝি তোমার কাজ?

সে জবাব দিল না।

আবার বললাম, সবাইকেই কি এক মুখোস দাও?

—সবার তো লাগে না। যাদের লাগে, তাদের দিই। সম্পর্কের মাত্রা বুঝে বুঝে। ওদের যেমন সমীচীন ডোজ আছে, মুখোসেরও তাই। বড্ড দেরী হচ্ছে, আবার বুঝি বৃষ্টি নামল, এবার চল।

আমাদের দেখেই ওদের কেউ কেউ হাই তুলে হরিবোল দিল। শীত ছাড়াল ভয় তাড়ালো।

চাঁদটার দশা একটা খেয়ো কয়েৎবেলের মত হয়ে এসেছিল, সেই আলোতেই দেখতে পেলাম ওদের ঘাড়ের কাছে সত্যিই ফিতে বাঁধা, মেয়েদের অন্তর্বাসে অস্পষ্টভাবে যেমন দেখা যায়।

ওদের মুখের দিকে তাকানোর সাহস আমার ছিল না।

শুয়ে পড়ে ওরা খাটিয়া তুলল কর্কশ গলায় আবার হরিবোল দিল, (এই গলাও ওই লোকটার কাছে ধার করা নাকি, ছোট্ট কোন একটা যন্ত্র? দাহ চুকে গেলে ওরা একে একে খুলে সব ফেরত দেবে—মুখের মুখোস, গলার যন্ত্র, সব!)

হাত লাগাব কি লাগাব না ভাবতে ভাবতেই আমি খাটিয়ার পায়া ছুঁয়ে ফেলেছিলাম, তক্ষুণি ওরা সশব্যস্ত

যে উঠল—না-না আপনি
থাকুন, সে

অ-সমাপ্ত রয়ে

কিন্তু তাকে তখনই দেখতে মেয়েটিকে।
সন্ধ্যেবেলের ভিড়ে মিশে ছিল, এখন শরীরে বহন করতে অসঙ্কোচে এগিয়ে দিয়েছে।

পিছিয়ে পড়েছি, সাধ্যমত সঙ্গে সঙ্গে চলেছি তবু আমার আর পলক পড়ে না

শরীরে কাঁধ মেয়েকে ইতিপূর্বে
ওর স্তনোন্নত উর্ধ্বদেহ, শ্রমে ভেজে-পড়া খোঁপা
পড়েছিল, বিস্ময়ের কোন পরিমাপ
এত তো পুরুষ আছে, তবু একে হাত বাড়াতে

কেন—এই প্রশ্ন আমাকে বিধছিল এবং
পরিতাপ, আমি এরও দুঃখ দেখিনি

আকাশ গভীর-গভীর ডাকছে, অতিকায় প্রশান্তির মধ্যেও বিচলিত একটি নাগিনীর মত। ঘোলা-ঘোলা আলো আরো মিইয়ে গিয়ে ছাই-ছাই হয়ে গেল।

আমি সঙ্গেই ছিলাম

যখন বৃষ্টি থামল তখন ওরা আরো ঘন ঘন হরিবোল দিতে থাকল, সেই মেয়েটিও তাতে অস্ফুট গলায় যোগ দিয়েছিল কি আমি বলতে পারব না। আমি দেখছিলাম, তার হাত দুটি তোলাই আছে, একবারও নামেনি। তার ভাঙা খোঁপা জড়িয়ে নেবার অবসর সে পায়নি।

ওদের পা, পিছলাতে থাকল, বৃষ্টি ফোঁটা আরও বড় বড়, তখন ওরা একটা দুটপাতা ঢাকা স্কুলবারান্দার তলায় থাটিয়া রাখল।

নিজেদের মধ্যে কী সব বলাবলি করছিল ওরা,

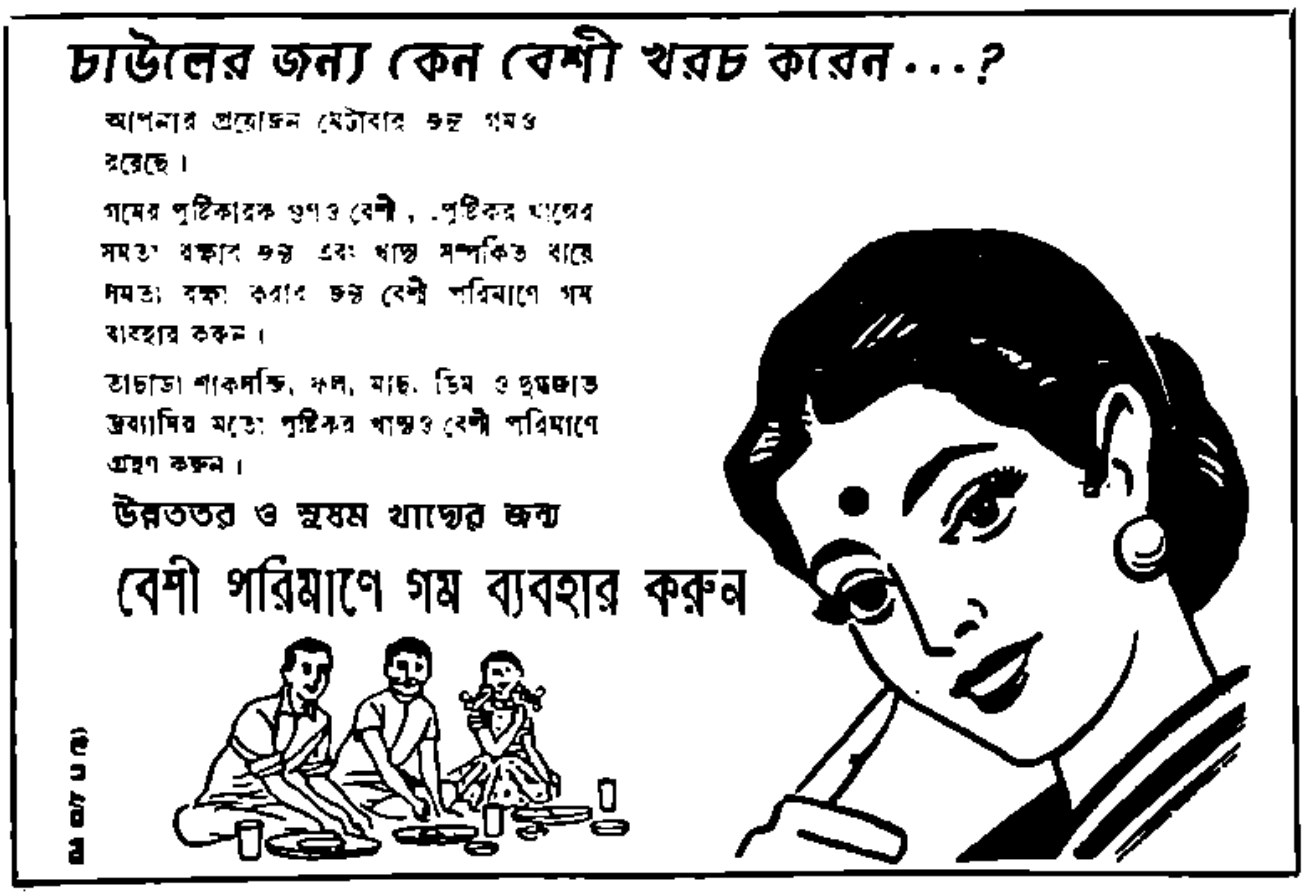

শোকের মুখোস এঁটেও দু'একটা রসিকতা করছিল। সিগারেট ধরাল দু'এক জন, ধোঁয়ায় ধোঁয়াশায় ভরে গেল।

বৃষ্টির জোর কমতেই ওরা আধবোজা চোখে পরস্পরকে ইসারা করল।

—নাও, তোল হে।

—তোল।

তবু লক্ষ্য করে দেখলাম, যারা আগে তুলেছিল, এবার তারা তুলল না, বদলাবদলি হল, পুরনোরা সরে রয়ে গেল একমাত্র ওই মেয়েটি।

ওর ক্লান্তি নেই? ছুটিও না?

শেষ রাতের একটা প্রকাণ্ড ট্রাক লাইট জ্বালিয়ে ছুটে যায়, নিপুণ বঁটিতে কাটা তরমুজের মত নরম অন্ধকার দু'টুকরো হয়ে দু'দিকে গড়িয়ে পড়ে। কাদা ছেটে ঘোলা জল। অন্ধকারের রক্ত। শববাহীরা সরে দাঁড়ায়।

এই বিস্মৃত রাতের আর কতকটা বাকী, লেপা-পোঁছা আকাশে তার নিশানা নেই।

আরও বার কয়েক শাঁ-শাঁ হাওয়া হানা দিল, বৃষ্টি আকুল হয়ে কাঁদল, ওরা দাঁড়াল বারবার। জিরোন আর পালাবদল এক সঙ্গে।

বদল করল না কেবল ওই মেয়েটি যার মুখ আমি দেখিনি, পিছন থেকে একটি সুঠাম দেহাভাস,—অপার্থিব একটি ঊত্তোলিত বাহু।

আড়াআড়ি একটি রাস্তায় তখনও খরস্রোত চল। ওরা সেখানেও শব নামাল। আকাশ তখন আসন্ন প্রসবা।

একজন এগিয়ে গিয়ে পায়ের বুড়ো আঙুল ছুঁইয়ে জল পরখ করে এল। বলল, বাপ্‌রে, কনকনে ঠাণ্ডা।

আর এক জনও গেল, ফিরল। বলল, গলানো আগুন।

একই সঙ্গে দুই—এই কি বৈতরণী!

আর এগোন যাবে না নিশ্চিন্ত জেনে ওরা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়েছিল, সকালের হিম হিম কুয়াশায় কাউকে ভাল দেখা যায় না, খুক খুক কাশি, হালকা হাসাহাসি কানে আসে। কেউ কেউ সিগারেটও ধরিয়েছিল।

একটি পাথরে মাথা রেখে মেয়েটি একা ঠায় বসে। শবাধারে তার হয়ত মাথাও রেখেছিল।

সব ক্রমশ নিঃঝুম, একা সে আর ওই শব, পিছনে, আমি, আমার নিজেরই গায়ে কাঁটা দিতে থাকল। মেয়েটির মুখে কথা নেই, ওই শবও যে শব্দ করবে, এ আশা দুরাশা।

চিনি না, কার শব জানি না, এক বিচিত্র নিয়তি আজ মধ্যরাত্রে আমাকে বিচিত্রতর এক শোক মিছিলের সামিল করে দিয়েছে।

সঙ্কোচ কাটিয়ে আমি আস্তে আস্তে ওর পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ঝুঁয়ে পড়লাম একবার। ওর ঘাড়ের কাছেও কি ফিতে বাঁধা, পাতলা মুখোসের চামড়া মুখে টানটান বাঁধা? না।

স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল।

মেয়েটি চমকে মাথা তুলেছিল, কিন্তু মুখ ফেরায়নি। গ্রীবামূলে কেশরাশি তেমনই খোলচালাই রয়ে গেল।

সে শুধু একবার খুব মৃদু গলায় জিজ্ঞাসা করল—কে?

ইচ্ছা হল গ্রীবামূল স্পর্শ করি। নীরবই রইলাম। বললাম, কেউ নই। যদিও সব শবযাত্রীরা পালা বদল করল তুমি তো একবারও ছুটি নিলে না। তোমার কি ক্লান্তি, ক্লেশ নেই?

'ক্লেশ বহনেরই কি কোন ক্লেশ আছে?' সেই রমণী অন্যদিকে তাকিয়েই বলতে শুরু করেছিল, সহসা মুখ ফেরাল সে। আয়ত দু'টি চোখ সিঁদুরের টিপের প্রভায় আয়ত আয়ত। দৃঢ়, স্পষ্ট কণ্ঠে তাকে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করতে শুনলাম—

এই শব আমাকে সারাক্ষণ বহন যে করতেই হবে। সারাক্ষণ, সারাজীবন।

শেষ দু'টি শব্দ সকালের পাখির মত প্রতিধ্বনির পর প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করে ছড়িয়ে যেতে থাকল।

মুখে আবরণ ছিল না—তাকে চিনলাম।

আর তখনই হাওয়ার মুখবন্ধ সরে গিয়েছিল বলে চিনলাম শবদেহকেও। আমি।

এই স্বপ্নের অর্থোদ্ধার করতে পারিনি।

জলতরঙ্গ

অচ্যুৎ চট্টোপাধ্যায়

ভেবেছি—তোমাকে নিয়ে ঘর বাঁধবো
নিষ্ফলা বন্ধ্যা প্রান্তরের মধ্যিখানে ;
বাউরী বউয়ের মতো
তুমিও যাবে জল আনতে,
গাগ্‌রি মাথায় নিয়ে
মল বাজিয়ে
কোপাইয়ের কূয়া থেকে।

ভেবেছি—তোমাকে নিয়ে ঘর বাঁধবো
ছ-হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ে
কৈজলের কাজী বস্তিতে ;
তুমিও যাবে জল আনতে,
পাহাড়ী মেয়ের মতো
পিঠে কোলানো টুক্‌রিতে
গাগ্‌রি বসিয়ে,
কাঁকন বাজিয়ে
কংকেবংয়ের ঝর্ণা থেকে।

ভেবেছি—তোমাকে নিয়ে ঘর বাঁধবো
পলতায় পলিপড়া গঙ্গার ধারে ;
কোমরে ক'লসী চেপে
পিঠখোলা ঘোমটা দিয়ে
তুমিও যাবে জল আনতে.
ভিন্‌গাঁর বউয়ের মতো
এপথে ওপথে
পায়ের চিহ্ন এঁকে এঁকে।

ভেবেছি—তোমাকে নিয়ে ঘর বাঁধবো
সাঁতসেঁতে চেরাপুঞ্জিতে,
যেখানে কেবল বৃষ্টি, কেবল বৃষ্টি,
কষ্ট নেই একটুও জলের জন্যে,
ঘরে ব'সে ঘড়া ঘড়া জল ভ'রবে
খাসিয়া মেয়ের মতো
বর্ষার জল বারোমেসে।

ভেবেছি অনেক কিছুই ;
আসলেই ভুলে গেছি,
তুমি যে ঘর বেঁধেছ অন্যের সঙ্গে।

মরুতীর্থ

আশা দেবী

সকালের রোদে ঝলমল করছে ছ' নম্বর বাংলো। চারদিকে ঘন অরণ্য আর পাহাড়, পাহাড় আর অরণ্য। মাথার ওপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে উঠছে কী যেন কালো কালো পাখীর ঝাঁক। কখনও রোদ এসে ওদের ডানায় সোনা রঙের ছোঁয়ায় বুলিয়ে দিচ্ছে, কখনও—কুয়াশা নিবিড় এবং গভীর হয়ে ওদের আচ্ছন্ন করে ফিরছে।

এরই মধ্যে অনু আর সুপ্রিয় এসে আশ্রয় নিয়েছে এই বাংলোতে। বাংলোটা সুপ্রিয়ের বন্ধুর,—বড়লোক ওরা, কলকাতায় থাকে। খেয়ালের ঝোঁকে— সঙ্গে পড়ে এই শৈল-নিবাসটি কিনেছিল খুবই সস্তায়। ভেবেছিল হয়তো ছুটি ছাটাতে গিয়ে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করবে। কিন্তু আর হয়ে ওঠে না। সেই কেনার পর থেকেই কিপারই ওর মালিক। কর্ত্তারা কলকাতার ব্যবসা—লোহা লক্কড়ের চাপে পড়ে পিষ্ট হচ্ছেন—ছুটির অবকাশ বিনোদন করা মানেই ছ-হাজার টাকার নীট ক্ষতি। অতএব আজ সাত বছর হলো, ওঁরা যানই না ওখানে। তাই কেউ বেড়াতে গেলে খুশী হন অন্ততঃ বাড়ীটার একটা খবর তো পাওয়া যাবে।

সামনে ফরগেট্‌মি নট আর হাইড্রেনজিয়ার ঝাড়—অসংখ্য ফুলের সমারোহ। আমার সমস্ত মনটা প্রসন্ন হয়ে গেল। অন্তত কিছুদিন স্বামী স্ত্রী নির্জনে থাকতে পারবে, নিজেদের নিজেরা খুব কাছাকাছি পাবে—নিবিড় এবং গভীর করে—যা একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে কখনই হয়ে ওঠে না। বিয়ের পর তাই অনু সুপ্রিয়কে নিয়েই প্রায় জোর করেই চলে এসেছিল। রাগে অভিমানে শাশুড়ী আসবার সময়ও অনুর সঙ্গে কথা বলেন নি, বেশ মনে পড়ছে।

হঠাৎ সামনে একটি বৃদ্ধা থান পরা পায়ে কেডস সু এবং মাথায় কাঁচা পাকা চুল নিয়ে একক নাটকীয় ভঙ্গিতে আবির্ভূত হলেন।

: আপনারা বুঝি ছ'নম্বরে এলেন? ভালই হলো। আজ সাত বছরের মধ্যে তো কখনও বিষ্ণুবাবুদের পায়ের ধুলো পড়েনি। সেই কেনবার সময় এসেছিলেন সেই যা—তবু আপনারা এলেন—ভালই হলেন।—বলে সামনের চেয়ারটায় বসে পড়লেন ভদ্রমহিলা।

: ভাল চলো কিনা জানি না, তবে এখানে এসে অনু একটু আশ্চর্য হলো। বড্ড নির্জন লাগছে,—মনে হচ্ছে দিন কাটবে কী করে।

: সে কি বৌমা, আমি তো আছি—এই আমার বাড়ী। আমাকে এখানকার সবাই মাসীমা বলে। আমি খোঁজ খবর নেব সব সময়।

অনু খুশী হয়ে বললে, : সে তো ভালোই মাসীমা, আপনার ভরসায় তবে রইলাম। আসবেন কিন্তু রোজ একবার করে।

নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই—বলেই মাসীমা উঠে পড়লেন, হাতে যেন একটা কিসের পুঁটলী ছিল সেটাকে তুলে নিয়ে বললেন : যাই মণির কাছে, ওকে আবার আমি নিজে বসে থেকে খাওয়ালে ওর খাওয়া হয় না।—আমার আবার যত ঝামেলা।

মণিবাবু ব্যাচেলর পোষ্টমাষ্টার—পোষ্ট অফিসেই থাকেন। মাসীমা সেই দিকেই চলে গেলেন। এবং যাবার পর হঠাৎ দরজার কাছে একবার দাঁড়ালেন থমকে। তারপর একটা অদ্ভুত দৃষ্টি ফেলে হন হন করে ওপরে উঠে গেলেন। দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল এক বেঁকা ঝাউ কাঠ মাথায় বিপারের স্ত্রী মাইলী। ওর মুখে বাঁকা হাসি।

: মাসীমা বুঝি!—ঠিক জানি আসবেনই।

: কেন, তুমি ওকে চেন নাকি!—অনু ঘর ঝাড়তে ঝাড়তে জিজ্ঞাসা করলো।

: সবাই ওকে চেনে—; আপনিও চিনবেন ধীরে ধীরে বলেই একটা বিচিত্র মুখ ভঙ্গি করে বেরিয়ে গেল মাইলী। আমি চুপ করে খানিকটা বসে রইলাম। কিছুই বুঝতে পারলাম না ওর কথা।

সকালের রোদ এসে পড়েছে। চারদিকে হাই-ড্রেনজিয়ার প্রসন্নতা, মাথার ওপর ঝাউ এর মর্মর।

: এসো অনু, আমরা এখানে বসে চা খাই—সকালের আলোর মতো উজ্জ্বল হয়েই অনু বললে এখানে এসে তোমাকে কতদিন পর "সুপ্রিয়" বলে ডাকছি। ইউ-ভারসিটি ছাড়বার পর আর ও নামে ডাকার সুযোগ হয় নি।—কি যে ভালো লাগছে আমার—

সামনের টেবিলের কাপে ধোঁয়া উঠছিল আর অনু যেন কাছে, অনেক কাছে সরে এসে ছিল—সুপ্রিয়ের। ওর দু'চোখের তারা তখন জল জল করছে আর সেই আলোয় যেন সুপ্রিয় দেখছে ভোরের অশান্ত সমুদ্রের ঢেউ যেন ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে, বুকে তার প্রভাতে সূর্য কিরণে সুচারু পত্রলেখার বিন্যাস।

: এই যে বৌমা, চা খাচ্ছ বুঝি?—মাসীমার সেই কেডস সু সেই পুঁটলি সমেত প্রবেশ।

চকিত হয়ে উঠলো অনু। একটা ছোট ধাক্কা লাগলো। টেবিলে খানিকটা চা-ও ছলকে পড়লো সাদা টেবিল ক্লথটার ওপর। মুখের প্রসন্ন হাসির ওপর যেন কুয়াশা নামলো অনুর।

: বসুন মাসীমা,—নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললো সে।

: চা-কি আমার অপেক্ষায়?—মাসীমা অবস্থাটাকে স্বাভাবিক করতে চেষ্টা করলেন।

: খান—খান, মাইলী আমার আবার করে দেবে।

মাসীমা চা-য়ে চুমুক দিয়ে বললেন : মণিকে খাওয়াতে যাচ্ছি। আমি না গেলে তো ও খাবে না। কি যে মুস্কিল হয়েছে কী বলবো আপনাকে।

: তাহলে যান—উনি হয়তো বেরিয়ে যাবেন।—অনু বললে একবার বাঁকা চোখে সুপ্রিয়ের দিকে তাকিয়ে।

: না, একটু বসি—,তোমাদের দেখে বড্ড ভালো লাগে। মনে হয়—থাক গে মাসীমা খেয়ে যান, কি যেন একটা বলতে চান কিন্তু পারেন না।

: আপনার শ্বশুর বাড়ীর আর কেউ নেই? সুপ্রিয় জিজ্ঞাসা করে : এই নির্জন পাহাড়—এই জঙ্গল—শীতে বরফ পড়ে—এখানে এই বয়েসে কী বুড়ো মানুষের একা থাকা উচিত?

: মাসীমা যেন কেমন থমকে যান। শরীরটা মানুষের বুড়ো হয়, মনের বয়েস বাড়ে না। তাই মাসীমাও ভাবেন যেমন তাঁর জীবনের ঘরেরও কোন খেলা হয়নি তেমনি তাঁর মনেরও কোন বয়স হয়নি হয়তো এখনো মধুকরের জন্য অপেক্ষা করে আছে—এমনি মনের ভ্রান্তি।

বললে : বিয়ে হয়েছিল দশ বছরে—ছাই বিয়ে। তাই বিয়ে বললেও হয়, না বললেও হয়। বাবা-মা মরা ভাগ্নিকে এক রকম বিয়ের করে ছিল মামা। তারপর শ্বশুর ঘর কপালে আর জুটলো না। স্বামী মারা গেলেন

আমি ও পাট চুকিয়ে এসে পড়লাম
কিন্তু ওরা আমায় রাখে
দিলে।

কতদিন আছেন এখানে ?—অনু জিজ্ঞাসা করলে।

: যখন এখানে প্রথম আসি তখন আমার বয়স কুড়ি
সেই থেকে এখানেই আছি কেউ আমাকে
যেতে বলে না,—কেউ চিঠিও দেয় না বেশ আছি
চলে যা করে ? অনু জিজ্ঞাসা করেই লজ্জিত হলো।

কিন্তু মাসীমা এত সহজে মিশেকে মেলে ধরেছেন যে তাঁর কাছে যে কোনো প্রশ্নই করা চলে।

বাড়ীতে মুরগী পুষেছি—তার ডিম বেচি মুরগীও বেচি। আর মাসে পঁচিশ করে টাকা পাঠায় মনু বড়ো ভাড়া তো লাগে না—তাই চলে যায় একলে আমার কাছ থেকে ডিম, মুরগী নিয়ে যাওয়া। কষ্ট করে আসে যেতে হবে না—আমি নিজে না বললেও মনুই আমাকে বলে আসবে যাই যদিকে খবরটা দিয়ে আসি, নইলে আবার ও খুশী না। আমার মাসীমা ধন-ধন করে পাহাড় ভেঙে ওপরে উঠে গেল.— ওঁর কেড্‌স স্থির শব্দ যেন এই মুহূর্তে অনুর কাছে যেন একটা আশ্চর্য অনুসঙ্গ হয়ে আসলো একটা পাহাড়ী ডাকবাংলোয় একবার রাত কাটাতে হয়েছিল দুর্যোগের রাত, অনু আর তাঁর বন্ধু সারা রাত সেই অচেনা ডাক-বাংলোর জানালায় মাথা দিয়ে শুনতে পেয়েছিল ভিজে লেবন ঘাসের ওপর পা ফেলে কেউ চলেছে একটা লেপার্ড,—অমনি ঘুরে—ঘুরে, অমনি ক্লান্ত হয়ে

বিকেলে দুজনে ফিরছিল পোস্ট অফিসের পথ দিয়ে। সুপ্রিয় বললে, চলেন যদি কেন চিঠি আসে
হাতে হাতেই দুজনে গিয়ে হাজির হলো ডাক ঘরে

—এই যে আসুন মিঃ রায়—নমস্কার মিসেস রায়। আপনারা ছ নং বাংলোতে উঠেছেন শুনেছি মাসীমার কাছে—কিন্তু একটুও সময় পাইনি যে যাব। ভালই হলো—মহাস্বপ্নই পরতের কাছে এলেন।—

—ও কি কুকুরটাকে কি খাওয়াচ্ছেন? অতগুলো ছানা—? অনু চমকে উঠলো। এবং ছানার বাটিটা তার বড় চেনা চেনা ঠেকলো যেন।

—কি করবো বলুন, তাই মাসীমার আদায় কুকুরকেই খাওয়াতে হয় কারণ উনি তো শুনবেন না—বারণ করলেও কোজ ছানা দেবেন এনে।

—একি কথা! তবে নাকি উনি না দিলে আপনি নাকি খাবেনই না!—অনু বলে ফেললো।

খাব না! অমনি দয়া করে দেন বুঝি! ওর জন্যে কতি শুনতে হয় না!

সুপ্রিয়ের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই অনু হেসে ফেললে।

আসুন ঘরে বসি—মণিবাবু বললেন। মাইলী, চা কর বাবুদের জন্যে।—বলেই আবার সুরু করলেন: কী আপদ হয়েছে বলুন তো—রাতে দরজায় চাপা দিয়ে যত মুরগীর বাচ্চা ঘরে তাদের দাম দিয়ে আমায় কিনতে হবে। আমার রান্নার লোক আছে তবু ওঁকে মাইনে দিয়ে আমায় রাখতে হবে। কি জ্বালা বলুন তো। ওর জন্যেই আমাকে এখান থেকে ট্রান্সফার নিতে হবে।

এখন তো আমাদের মুরগী দিচ্ছেন—প্রায়ই।

বেশ, ভালোই—আপনাদের ঘাড়ে যদি চাপেন আমি তো বাঁচি। ঘেন্না করে ওঁকে দেখলে। এত বয়স হয়েছে যেন একটুও সোব্রাইটি নেই।—

মণি!—

ওই এলো আপদ।—বলেই মণিবাবু একটা বিরক্তিকর পরিস্থিতি থেকে যেন মুক্ত হতে চাইলেন: বসুন মাসীমা মাইলীই চা করছে। আপনি এঁদের সঙ্গে গল্প করুন।

অনু আর সুপ্রিয় বোকার মতো বসে রইলো। মণিবাবু উঠে গেলেন ঘরের ভেতর চায়ের তদারক করবার জন্যে।

একটুখানি আলুর দম তোমার জন্যে বানিয়ে এনেছি বৌমা—বাড়ীতে না পেয়ে ফিরে গিয়েছিলাম। খাও,—লজ্জা করছো কেন? খাও। ও দিও তোমার যা ইচ্ছে।

স্বামী-স্ত্রী অবাক হয়ে চেয়ে রইলো—কোনো কথা বলতে পারলো না।

যাবার সময় সুপ্রিয় টেবিলের ওপর কৌটোটা রেখেই চলে এলো।

পথে বেরিয়ে অনু বললে: কৌটা দিয়ে এলে না!—

ভুল করে রেখে আসা ছাড়া কোন উপায় ছিল না।

—সমস্ত মুখে থম থমে মেঘ জমেছে সুপ্রিয়ের।

পথে যেতে যেতে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি এলো। আবার চলে গেল। ঘন হয়ে ঘাস নামলো, কেটে গেল, আর আকাশে ঘুরে ঘুরে ফিরতে লাগলো সোয়ালোর দল। এগিয়ে চললো। সামনের তিস্তা ভ্যালিতে কিন্তু মেঘ নেই ওখানে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। তার বিদায়ী শতনরী হার যেন গোধূলির আলোয় অপূর্ব লাগছে। পথের পাশে পাশে অসংখ্য তেইজী এখন ঘুম ঘুম চোখে তাকাচ্ছে পথচারীর দিকে। সন্ধ্যা নেমে আসছে ছ নম্বর বাংলোর ওপর।

দুজনে খুব ঘন হয়ে হাঁটছিল। সন্ধ্যার কুয়াশা কখনও দুজনকে ঢেকে দিচ্ছে কখনও আবার দুজনের হাতে হাত দিয়ে এগিয়ে চলেছে ওরা।

সুপ্রিয় বললে: অনু—হাত দুখানা তোমার কী ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।—হাতের মধ্যে প্রীয় মুঠোখানা শক্ত করে চেপে ধরলো সে।

এই যে বৌমা—আলুর তরকারীটা তোমায় দিতে ভুলে গেছি, তাই নিয়ে এলাম। চলো, যাই তোমাদের সঙ্গে। রাতে আর কী রাঁধবো, চলো আজ তোমার হাতের রান্নাই খাব এখন।—বলেই দুজনের দ্রুত বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার ফাঁকের মধ্যে ঢুকে যেন স্বচ্ছন্দেই সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলেন মাসীমা।

ওদের সঙ্গে খেতে বসে সুরু করলে: তুমি ভারি অগোছাল লোক বৌমা। এ বাড়ীর গিন্নী যদি আমি হতাম তো দেখতে একেবারে ফিটফাট করে রাখতাম ঘর দোর। কোথাও কিছুটি নোংরা থাকতে পারতো না। তার ওপর স্বামীর যত্ন কি কোরে করে তাও তোমাকে দেখিয়ে দিতাম।

অনু অবাক হয়ে মাসীমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। মাসীমা যেন মুহূর্তে বোড়শী হয়ে গেছেন। চোখের মধ্যে এসেছে ওঁর খঞ্জনের চাঞ্চল্য—মুখে যেন একটা কেমন অশোভন লোলুপতা। শরীরের বয়স বাড়ে মনের তো বয়স বাড়ে না। সে চির তরুণ থাকে

তাই মাঝে মাঝে বয়েসের বেড়া ভেঙে সে বেরিয়ে পড়ে জীবনের মুক্তাঙ্গণে। তখন নিজেকে কী ভাবে কে জানে!

কিন্তু যারা দেখে? তাদের সে দৃশ্য অত্যন্ত পীড়াদায়ক বলে বোধ হয়। কিন্তু ওরা তা বোঝে কি? না—বোঝে না।

মাসীমা বললেন: বৌমার তো হাতের রান্না একেবারেই ভালো নয়। সুপ্রিয়বাবুর খেতে নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছে। আজ্ঞা কাল থেকে আমি মুরগীর মাংস রেঁধে পাঠিয়ে দেব।—বলেই মাসীমার চোখ পড়লো পাতের কাছে সুপ্রিয় আলুর তরকারীর ওপর জল ঢেলে দিয়েছে।

একি খেলেন না!—মাসীমা চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

অনু আমি খাই না। বারণ আছে ডাক্তারের।

ডাক্তা খেলেন যে—? মাসীমা বললেন।

ডাক্তার বারণ নেই।—সংক্ষেপে সুপ্রিয় বললে।

ওঃ, বেশ। কাল আমার হাতের মাংস খাওয়াব এখন।

মাসীমা বেরিয়ে গেলেন।

পরদিন সুপ্রিয়র জ্বর এলো। বাইরে নামলো ঝমঝমে বৃষ্টি। এক টানা জ্বর—জ্বর ঝির ঝির। আর বাংলোর টিনের চালের ওপর চললো মেঘমল্লারের আলাপ। অনু মাথার কাছে বসে। কি সে করবে বুঝতে পারছে না। একটা সরকারী ডাক্তারের ডিসপেন্সারী আছে কিন্তু ডাক্তার বাবু মাংপুতে গেছেন কলে। আজকের রাতে ফিরবেন না। মণিবাবু একবার দেখে গেছেন। সারা বেলা ধরে ঝাউ বনের কান্না আর কাকের ডাকে অনুর মাথা ধরে গেছে। তবু সুপ্রিয় কেবল তার হাত ধরে রেখেছে ছোট ছেলের মতো, নড়লে চড়লেই যেন ভয় পাচ্ছে, বলছে: যেও না—অনু, যেও না।

তবু সান্ত্বনা, বৃষ্টিতে মাসীমা আসতে পারেনি। মাইলী দরজায় বসে। সুপ্রিয়র জ্বর দেখে যেন ও-ও খুব ভয় পেয়ে গেছে।

সন্ধ্যা নামছে কালো হয়ে। চোখের জলে ভেজা সজল দৃষ্টি আনত করছে হাইড্রেনজিয়ায়। ঝাউয়ের কান্না সন্ধ্যাকে পূরবীর সুরে সজল করে দিচ্ছে। কুয়াশা ঘন হয়ে নামছে ছ নম্বর বাংলোর ওপর। আর কাচের ভিতর দিয়ে কেমন একটা চাঁদের অস্পষ্ট দৃষ্টি যেন রাতকে আরো কুহেলিকাচ্ছন্ন করে তুলছে। মাইলী টক করে বৈদ্যুতিক আলোটা জেলে দিলো।

আর সেই রাতে মাসীমা সকালে মুরগীর মাংস আনতে পারিনি। কালকের ঝড়ে স্বস্তা চাপা পড়ে অনেক কটাই মরে গেছে। তাই সন্ধ্যায় নিয়ে এলাম। মাসীমার চোখের দৃষ্টিতে অনু যেন আজ কী দেখতে পেলো। চমকে উঠে তিক্ত কণ্ঠে বললে: মরা মুরগীর মাংস বুঝি এনেছেন? ও নিয়ে যান। ওর জন্য, আমার মন ভালো নেই—আমরা কেউ খাব না।

ওমা!—তাকি হয়! নাম করে এনেছি। তেল—ঘি—মশলায় তো খরচ হয়েছে!

সে খরচ আমি দিয়ে দেব এখন।

ওমা, ওমনি করে জলপটি দিতে হয় দাও, আমি দিয়ে দিচ্ছি—। স্বামীর সেবা আমার কাছে শেখো। বলেই মাসীমা সুপ্রিয়র উল্টো দিকে বসে হাত জোর করে সরিয়ে দিয়ে কপালে জল পটি দিতে লাগলো আর অসুস্থ সুপ্রিয় জ্বরের ঘোরে অনু—অনু বলে মাসীমার হাত চেপে ধরলো।

অনুর যেন কি হলো। যেন পাথর হয়ে গেল সে। ওঁর দৃষ্টি—ওঁর ওই সুখের আবেশ ভরা যেন মাথায় আগুন ধরিয়ে দিলো তার! যেন সমস্ত শরীর শিথিল করে দিলো।

কাল মণি বলছিল, সেদিন যখন আপনারা বাংলোয় ফিরছিলেন পেছন থেকে আমাকে ও মিসেস রায় বলেই ডেকে বসলো। আমি তো লজ্জায় বাঁচি না।—

অসুস্থ সুপ্রিয় হঠাৎ ওর হাতটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে একটা ভীষণ আর্ত চিৎকার করে উঠলো। সেই চিৎকারে অনু চমকে উঠলো—মাইলী চমকে উঠলো, আর মাসীমা যেন সমস্ত শরীরে একটা বিদ্যুতের দাহ নিয়ে ছুটে পালাল।

না—আর না। কাল সকাল চারটের গাড়ীতেই কলকাতায় ফিরে যেতে হবে সব ফেলে দিয়ে। দুহাতে সুপ্রিয়কে জড়িয়ে ধরে অনু তারের জন্য রাতের প্রহর গুনতে লাগলো।

'টপ-সিক্রেট'

অরুণ দাশগুপ্ত

বাঙালীকে যদি বলা হয়—একদিকে ভারতের রাজত্ব আর অন্যদিকে দিনদোলা আড্ডা—এদের মধ্যে বেছে নাও তবে বাঙালী কি করবে? আমার মনে হয় বাঙালী রাজত্ব ছেড়ে দেবে। আড্ডা ছাড়া এ যুগের বাঙালীদের বাঁচা অসম্ভব এ যুগের কেন কোন যুগের।

বাঙালীদের নানাভাবে সমালোচনা করা হয়েছে—ভবিষ্যতেও করা হবে। কিন্তু জল বিনা যেমন মাছ বাঁচতে পারে না আড্ডাবিহীন নিঃসঙ্গ অবস্থায় বাঙালীও বাঁচতে পারে না।

বাঙালীকে জব্দ করার কোন অস্ত্র যদি ব্যবহার করতে হয় তবে তা হচ্ছে তাদের আড্ডাগুলো উঠিয়ে দেওয়া। অবশ্য কারো যদি সে বাসনা কল্পনা জেগে থাকে তবে একবার পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

নানান বেড়াজালের মধ্যেও বাঙালী নির্বিবাদে আড্ডা জমিয়ে যাচ্ছে প্রুফেক-এর সঙ্গে টিটে-পত্নীর সহ-আলোকচিত্র থেকে শুরু করে কীলার, কুলমালা—কিছুই বাদ যাচ্ছেনা সে আড্ডার।

সম্প্রতি সমস্ত পরিকল্পনা ছাপিয়ে কামরাজী পরিকল্পনা সারা বিশ্বে আলোড়ন তুলেছে। এ বিষয়ে একদল আড্ডা-বাজ বাঙালী কি ধরনের আলোচনায় মশগুল হয়েছিল তার হুবহু বিবরণ দিতে চাই। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে যদি সচেতন না হন তবে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করাও অধমের উদ্দেশ্য।

সমাজের সর্বস্তরে এবং রাজনৈতিক সমাজেও একদল 'নবকুমার' আছে যারা পরের জন্য কাঠ কুড়োতে গিয়ে চিরকালই বিপাকে পড়ে। এহেন এক নবকুমারের সাক্ষাৎ পেলাম বোস-কেবিনের আড্ডায়। সবাই তাকে অসীম নামে।

রোববার সকাল। খবরের কাগজ উল্টোতেই কামরাজ পরিকল্পনা রূপায়ণের নানা খবরে আমার নব আবিষ্কৃত 'নবকুমার' যেন ইনস্পায়ার্ড হলো।

"হুঁ, এতদিন পরে বুদ্ধি খেলেছে দাদাদের।"

এই বলে চুপ মারতেই পাশ থেকে অসীম বলে উঠলো, 'কামরাজার' কথা বলছিস বুঝি।

কি বললি? কামরাজ! তোদের স্বভাব। এতবড় একটা সিরিয়াস্ ব্যাপার অমনি হাল্কা করে ফেলিস। কে এক অচল-সম্পাদক তো আবার লিখেই বসে আছে কামরাজ না বাংকামরাজ। ব্যাপারটা এত সোজা নয়রে!

আমিও অমনি মান-ইজ্জতের মতো কানদুটো খাড়া করে রইলাম। কারণ কামরাজটা আমারও মগজে ঠিক ঢুকছিল না।

অসীম বললে: ইট্ ইজ্ এ সাইলেন্ট রি

একটা নিঃশব্দ বিদ্রোহ।

কয়েকটি মিলিত কণ্ঠ: কি বললি! নিঃশব্দ বিদ্রোহ!

: হ্যাঁ, ঠিক তাই! আর এর শুরু হয়েছে, যেদিন থেকে কেষ্ট মেননকে অর্ধচন্দ্র দেয়া হয়েছে।

: কেন দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসের ওপর বামপন্থী কংগ্রেসের জন্ম নয় এটা?

অসীমের মুখে তাচ্ছিল্যের ভাব: শিশু, তোরা রাজ-নীতিতে থোকা। Politician Born বাঙালীর মান ভোবালি।

প্রশ্ন: কেন?

অসীম: এ হচ্ছে "আর্য"দের ওপর "অনার্য"দের জয়। সেই হাজার হাজার বছরের নিঃশব্দ বোঝাবুঝি আজও চলছেরে। আজ মোকা বুঝে অনার্যরা টেক্কা দিলো আর্যদের ওপর। অবশ্য আর্যপুত্রকে ওরা হাত করে ফেলেছে।

অন্য সবাই : আর্যপুত্র? সে আবার কে?

অসীম : সে নয় তিনি বল। তিনি হচ্ছেন জহরলাল নেহরু।

: আচ্ছা বেশ বাবা, তা না হয় মানলাম। এখন একটু ঝেড়ে কাশো তো।

অসীম : এইতো, খালি হাল্কা কথা। তোরা বাঙালী মানের অযোগ্য। কোন কিছু সিরিয়াসলি আলোচনা করতে গেলে শুধু খবরের কাগজের বিদ্যেয় চলে না। কিছু 'টপ-সিক্রেট' খবরও জানা চাই।

এই নবকুমার [ওরফে অসীম] কিন্তু প্রায়ই 'টপ-সিক্রেট' বলে এমন সব আজগুবি খবর ছাড়ে যে তা শুনলে পিলে চমকে যায়।

জানিস নেহরুকে ছাঁটাই করার জন্য এক গভীর চক্রান্ত চলছে? আজ নয়রে অনেক আগে থেকে। নেতা তখন তো দুরস্থান। কলকাতা শিল্পপতীদের ষড়যন্ত্র-মূলক এক গোপন বৈঠক বসে। সেখানে ঠিক হয় নেহরু যদি অসুস্থতার জন্য সরে যেতে বাধ্য হন তবে মোরারজীকে প্রধানমন্ত্রী করা হবে।

প্রশ্ন : ভরা হবে মানে একি কারুর মর্জির ওপর নির্ভর করে?

হাঁ, তা করে বইকি। সেই গোপন বৈঠকে এও ঠিক হয় যে পার্লামেন্ট সদস্যদের উপঢৌকন দিয়ে হাত করার ব্যবস্থাও পোক্ত করা হবে।

: উপঢৌকন? মানে ঘুষ!

হ্যাঁ রে বাবা, নগদ টাকা। মাথা প্রতি ২৫ হাজার টাকা। এমন কি টাকাটাও একটা জায়গায় জমা রাখা হয়েছিল।

: এ গোপন চক্রান্তকারীরা মনোনীত করেছিল?

: মোরারজীর আর সেই থেকে মোরারজীর টেম্পো কি। অবশ্য গোল্ড কন্ট্রোল আর শ্রীবাস্তবের ধাক্কায় সে সব এখন তলিয়ে গেছে।

বাস্তবের ধাক্কা বুঝি। শ্রীবাস্তবের আবার কি?

অসীম একটু চুপ করে যেন কি ভেবে নিল। বলল : আরে বাস্‌রে! কলকাতায় থাকিস, আর শ্রীবাস্তব

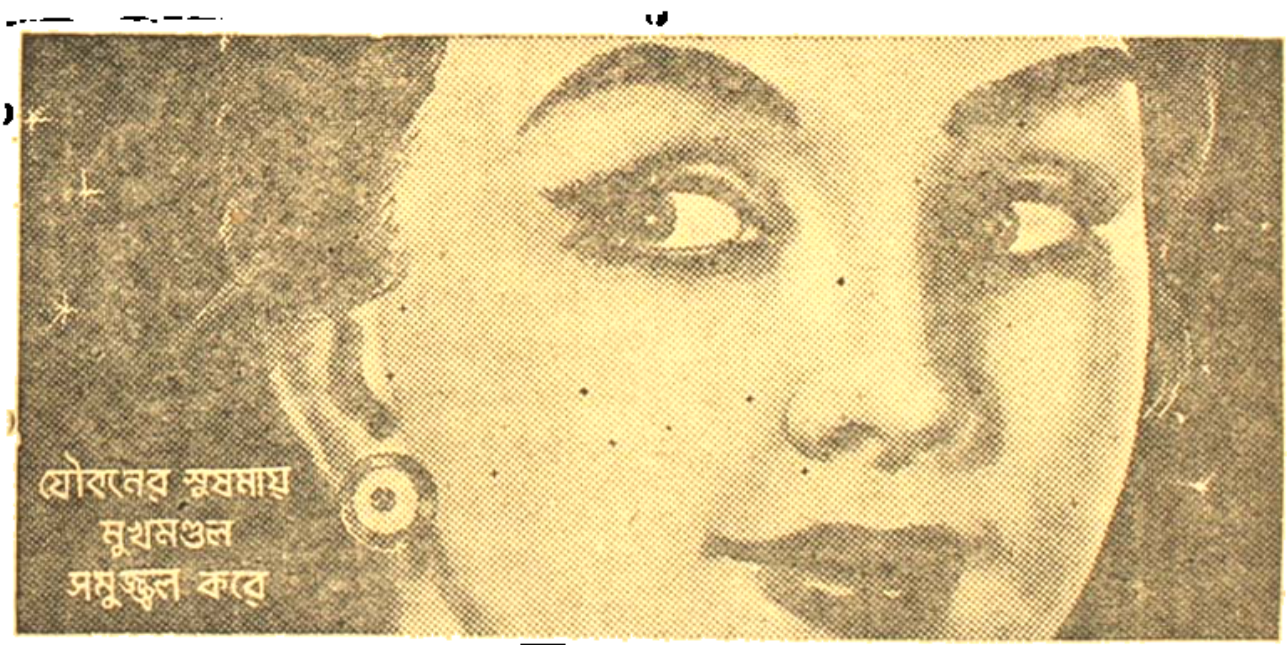

লাবণি

ভ্যানিশিং ও কোল্ড ক্রীম

লাবণি ভ্যানিশিংক্রীম আপনার সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ সাধন ক'রে যৌবনের সুষমা এনে দেয়। সকল মালিন্য দূর ক'রে তদুপরি নবীন কোমল মসৃণ ও লাবণ্যময় করে। পাউডার অক্ষুণ্ণ রাখার পক্ষে বিশেষ সহায়ক।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ

জানিস না? সোনার চোর-চালানীদের কাছে সে সাক্ষাৎ যমদূত। মোরারজী নাকি তার পিঠ চাপড়ে বলে দিয়েছিল কলকাতার চোরাচালানের বাজারে তাণ্ডব আর ত্রাস সৃষ্টি করে। শ্রীবাস্তব তা বাস্তবে পরিণত করার চেষ্টা করে।

: তা নয় বুঝলাম। ভারতের প্রধানমন্ত্রী কে হবে তা কি আজকাল ঠিক হয় ক'লকাতার গোপন বৈঠকে? এত পাণ্ডার ক'লকাতার।

অসীমের মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি: তোরা শুধু নিউজ-পেপারের হেডলাইন-খবর পড়বি। কাজ হাও সাচ্চা খবর ত আর রাখার চেষ্টা করিস না। শোন ক'লকাতার শিল্পপতিরা এমন পলিসনে এসেছিল যে ভারতের ভবিষ্যত প্রধানমন্ত্রী কে হবে তা তারা ঠিক করতে পারে। কিন্তু এখন সে পজিশনটা গেছে। বিলকুল।

গেছে মানে? কার কাছে গেল?

: এখন সেন্টার দক্ষিণ ভারতের কব্জায়। আর্যপুত্র [মানে প্রধানমন্ত্রী] কে থাকবেন তা এখন কামরাজ-ওয়ালাদের হাতে। অর্থাৎ রাম এখন কম্প্লিট্‌লি 'হনুমান' সৈন্যদের হাতের মুঠোয়। ফিনান্স ও সাউথের মুঠোয় টি-টি কে

বোস কেবিনের আড্ডায় রোজই একটা 'ক্লাইমাক্স' হয়। যখন নবকুমার কথার জাল বুনতে বুনতে আর সবার মনোযোগ স্থির করিয়ে দেয় তখনি কেউ একজন চেঁচিয়ে ওঠে, ওহে, এবার 'টপ-সিক্রেটটা ছাড়ো। আর পারা যাচ্ছে না।

এ সময়টাই হয় বড় আকর্ষণীয়। কপ্ কোরে সমস্ত আলোচনা বন্ধ হয়ে যায়। লাই রাইও চা-এর অর্ডার পড়ে। নতুন চারমিনারের প্যাকেট খোলা হয়। বেশ কয়েক টান আর কয়েক চুমুকের পর যখন আসরটা ফাইনাল মোড় হয়ে ওঠে তখনই ছাড়া হয় 'টপ-সিক্রেট'। অসীমের 'টপ-সিক্রেট' ছাড়ার কোন ভঙ্গি বাতিক নেই।

সবাইকে টেক্কা মারার আনন্দে এক অনাবিল হাসিতে মুখ ভরে ওঠে তার। সেদিনও দেখলাম উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো তার চোখমুখ।

: 'টপ-সিক্রেট'! 'টপ-সিক্রেট' হচ্ছে কয়েক মাস পরে আবার নেহরুর বিরুদ্ধে 'নো-কনফিডেন্স' আসছে। এবার আর শুধু পি-এস-পি, জনসঙ্ঘ নয়। এবার কংগ্রেসের ভেতর থেকেই নেহরুর বিরুদ্ধে ভোট দেবার জন্য অনেক কংগ্রেস এম-পি জোগাড় করা হচ্ছে। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেছে। যেমন ছিলো তাকে তাকে। ব্যাস্ সারা সাউথের এম-পি গুলোকে নেহরুর পেছনে রাম/বনী-সৈন্যের মতো সলিড্‌লি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তারা যে কোন অবস্থায় নেহরুর পেছনে আছে বলে শ্রীবাস্তবের শপথ নিয়েছে। তার থেকে জন্ম নিল কামরাজ প্ল্যান। উত্তর ভারত তো এখন ছিন্নভিন্ন। অর্থাৎ দুর্নীতি আর মনান্তরে সাউথ এখন নর্থের ওপর প্রাধান্য নিল। এরপর আরও সারপ্রাইজ আছে। রোদো।

সাধারণত 'টপ-সিক্রেট' হচ্ছে উপসংহার। তারপর আর কথা চলেনা। কথা হয়ও না। শুধু আড্ডা ভঙ্গ হয়। চাঁদা করে বাহাদুর কি তিয়াত্তুর কাপ চায়ের দাম মেটাতে হয়। টেবিলের ওপর 'সরস্বা' তখন চেয়ার তুলতে সুরু করে।

কিন্তু সেদিন ঘটনা এক আকস্মিক মোড় নিলো। আড্ডার একজন নবাগত সদস্য বলে বসল: এতো ভারতীয় বনাম ইংরেজ আর মার্কিনদের মধ্যে ক্ষমতায় লড়াইও হতে পারে। অর্থাৎ প্রো-ব্রিটীশ আর প্রো-আমেরিকানদের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই। নেহরু নিমিত্ত মাত্র।

অসীমের ধৈর্যও অসীম। আড্ডায় নিয়মভঙ্গ করে কোন জবাব দেয়নি। কারণ 'টপ সিক্রেট' ঘোষণার পর আর কোনো কথা কাটাকাটি করা রুল-বিরুদ্ধ। এক আড্ডা-বিরোধী পলিটিক্স।

অসীমকে দেখলাম নবাগত সদস্যের কাঁধে হাত দিয়ে বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। তারপর ফুটপাত ধরে সোজা উত্তরমুখো হাঁটতে লাগলো। অনেকক্ষণ ধরে—অনেক-দূর অবধি।

তারা কি আলোচনা করেছিল তার খবরটা কোন রাজনৈতিক মহলের কর্তৃপক্ষ রাখেন কি? যদি এখনও না রাখেন তবে ওদের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

ব্যাগের পেটটা ফেঁসে যাবার মত হচ্ছিল, তবু গায়ের জোরে সেটাকে চেপে ধরে স্ট্রং চেনটা টেনে টেনে বুধটা বন্ধ করে ফেলল রজনী।

সুবিখ্যাত 'বড়ুয়া টি কোম্পানী'র অবিখ্যাত কর্মচারী রজনী ধর।

জীবনের প্রায় সবটাই যার কেটে এল আসামে উপত্যকার এই অরণ্য ছায়াঘনবিরল বসতি গ্রামপ্রান্তে। ঘুরে ঘুরে

আকাশ মাটি

আশাপূর্ণা দেবী

এক একটা কাঠের আর বাঁশের ঘর—একে এখন গ্রাম আখ্যা দিয়েছে, রজনী যখন প্রথম এসেছিল, তখন গ্রাম জঙ্গলই ছিল। কোম্পানীর কল্যাণে বিজলী বাতি জ্বলেছে, শহর পর্যন্ত গাড়ী চলবার মত রাস্তা হয়েছে, অনেকখানি জায়গা জুড়ে—শেড্ বানিয়েছে কোম্পানী চা ঝাড়াই বাছাই করে প্যাক করবার জন্যে।

এই শেড্ টেড্-গুলই রজনীর জগৎ। দাতকয়েক

এক্সাম পেয়ে দুঃখে বিকারে বাড়ী থেকে ছিটকে এসেছিল, তখন রজনীর বয়েস তেরো চোদ্দর বেশী নয়। বলাবাহুল্য-লেখাপড়ায় ওইখানেই ইতি। সেকালের সে বেপরোয়া পদযাত্রা, আর বিনা টিকিটে রেলযাত্রার মধ্যে কেমন করে যে এই বড়ুয়া টি কোম্পানীর পাকরাও হয়ে উঠল রজনী, সে-এক রহস্যময় ইতিহাস, তবে সেদিনের জীবন থেকে হারিয়ে গেল না রজনী, হারিয়ে যেতে দিল

না নিজেকে। যেই একটু মানুষ হয়ে উঠল অর্থাৎ শেয়ালদায় পৌঁছবার মত ভাড়া যোগাড় করে ফেলতে পারল, এসে হাজির হল শেওড়াফুলিতে তার সেই কাকার বাড়ীতেই।

এ এক রহস্য।

যেখান থেকে 'জীবনে আর কোনদিন ফিরব না' বলে প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়ে গিয়েছিল, প্রথম সেইখানেই এসে ঢুকল রজনী প্রথম 'উপায়ি' হয়ে। আগের টানের কেউ নেই। তবু ওই গৃহত্যাগী কিশোরের অন্তরাত্মা ব্যাকুল হয়ে কেনই যে সেই অনেক মাইল দূরের পলস্তরা খসা ইটের দেয়ালটায় মাথা খুঁড়ে মরতে। কে জানে।

তবু সেই ভাঙা বাড়ীর দরজাটায় এসে দাঁড়াতে অনেকগুলো বছর কেটে গিয়েছিল রজনীর, তেরো থেকে তেইশে এসে পৌঁছেছিল।

ঘোবার প্রচার বর্জিত খাকি শার্ট প্যান্ট পরা, ধূলি-ধূসরিত রুক্ষ চেহারা নিয়ে নিরুদ্দেশ রজনীর যখন বিনা নোটিশে নাটকীয় আবির্ভাব, তখন তার প্রহার কর্তা চির-নিরুদ্দেশলোকে।

দরজা খুলে দিয়েছিল খুড়িই। থান পরা খুড়ি। দরজা খোলার পর থতমত খেয়ে দুপা পিছিয়ে গিয়েছিল দুজনেই। চিনতে পারেনি। তারপর উঠোনে লুটিয়ে লুটিয়ে হাউহাউ করে কাঁদল রজনী—মৃত অননী ধরের জন্যে, খুড়িই সান্ত্বনা দিয়ে ওঠাল শেষ পর্যন্ত।

দিন দশেক থেকেই চলে যেতে হল রজনীকে, কারণ কোম্পানীর বছরে ওই ক'দিনই ছুটি। কিন্তু চলে গিয়েও চলে গেল না রজনী, মাসে মাসে চারটি করে টাকা খুড়ির নামে মনিঅর্ডার করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রাখল শেওড়াফুলির সেই ভাঙা বাড়ীখানায়।

তা এসব অনেকদিনের কথা।

তারপর আরও অনেকবার এসেছে রজনী, খুড়ি স্নেহমমতা করেছে, নিজের এক দূর সম্পর্কের ভাইঝির সঙ্গে বিয়ে দিয়ে সংসারী করে দিয়েছে ভাসুরপোকে, আসাম ছেড়েছুড়ে দিয়ে এসে বাংলাদেশেই একটা কাজ খুঁজে নেবার অনুরোধ জানিয়েছে পই পই করে, অবশেষে ঘরেওছে একদিন।

চিঠি পেয়ে রজনী খুড়ির জন্যেও কেঁদেছে তার কাঠ আর বেত ছাওয়া নীচু নীচু ঘরখানার জন্যে। কিন্তু খুড়ির অনুরোধটা আর রাখা হয়ে উঠল না এ যাবৎ বাংলাদেশে এসে চাকরী করা হ'ল না। ওই বছরে দশদিন।

তার জন্যে দশমাস ধরে দিন গোণে রজনী। আসার আগের দশ রাত্রির ভাল করে ঘুমোতে পারে না। এই প্রৌঢ় রজনী, যার মাথার চুলগুলো সবই টাকের হাতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে, আর বুকের লোমগুলো মাঝে মাঝেই শাদা হাসি হাসছে, সে ও বাড়ী আসার নামে নবযৌবনের উন্মাদনা অনুভব করে।...ইতিমধ্যে যথানিয়মে গুটি চারেক ছেলেমেয়েও হয়েছে রজনীর এবং দুটো চাকরী বাকরী ধরেছে, বড় মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেছে। তা সেই মেয়ের বিয়ের সময় একবার নিয়মের ব্যতিক্রম করে অসময়ে ছুটি নিয়ে এসেছিল রজনী। স্ত্রীকে বলেছিল, 'অন্য কিছু নয় তুমি করিৎকর্মা মানুষ, জানি বিয়ে সুসম্পন্নলেই দিয়ে ফেলতে মেয়ের কিন্তু—শুনেছি কন্যে দানে পৃথিবী দানের ফল হয় তাই এসে পড়লাম।

স্ত্রী সুরবালা তীব্র ভর্ৎসনায় বলেছিল, 'শুধু এই জন্যে?'

রজনী অপ্রতিভ হাসি হেসে বলেছিল, 'আহা বুঝছ না, তুমি তো সবই করছ!'

কথাটা ঠিক। এযাবৎ সবই করে এসেছে সুরবালা। শেওড়াফুলির ওই ভাঙা ইঁটের স্তূপের মধ্যে বসে চার চারটে ছেলেমেয়েকে মানুষ করে তুলেছে, খুড়তুতো ভাশুরের সঙ্গে দেইজীপনা পরে হাঁড়ি বাড়ী ভেন্ন করে নিয়েছে, মেয়ের বিয়ের পাত্তর ঠিক করেছে, আর সুদ খাটানো ব্যবসা করে করে দু'পয়সা হাতেও করেছে।

না করে করবে কি?

কার ওপর ভর করবে সে নিজের ওপর ছাড়া? ভর করবার জন্যে একগাছি তৃণও তো পায়নি জীবনে।

প্রথম প্রথম প্রত্যেকবার যখনি রজনী এসেছে, সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করেছে সুরবালা, মিলনের রাত্রিগুলি প্রায়শঃই মান অভিমান আর অশ্রুজলে কলঙ্কিত হয়েছে, কিন্তু কোথায় নিয়ে যাবে রজনী তরুণী স্ত্রীকে, নবজাত শিশুকে? সে কি নিয়ে যাবার জায়গা?

ব্যাকুল রজনী অনবরত সেই কথাই বোঝাতে চেষ্টা করেছে অবুঝ সুরবালাকে। সেখানে ভয়াবহ পরিবেশের

বর্ণনা করেছে, এবং নিজে সে নেহাৎই পুরুষ বেটাছেলে তাই চিঁকে আছে, এই কথা শুনিয়ে ঈষৎ আত্মপ্রসাদও লাভ করেছে।

ক্রমশঃ সুরবালার সেই অবুঝ আক্ষেপ স্তিমিত হয়ে গেছে, নিভে গেছে, বুড়শাশুড়ী মরবার পর থেকে স্বাধীনতা আর সংসার রসে মজে গেছে যে। তার ধান চাল গরুবাছুর গাছগাছালি হাঁস মাছ সব কিছুর মধ্যে একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী হয়ে বলতে গেলে রীতিমত সুখেই আছে।

বাৎসরিক অতিথি রজনীকে নিজের এই কৃতির দেখাতে পারাও এক বিশেষ সুখ। বুড়শাশুড়ীর ছেলের সংসারে তো হাড়ির হাল, রজনী ঘরের সংসার যে এতটি সম্পন্ন হয়ে উঠেছে তার মূলে তো সুরবালা? নিজে রজনী চিরটা জীবন বাইরেই কাটাল অথচ সংসারটি ফেঁদে ফেলেছে মন্দ নয়। সে সংসারের দায়িত্ব যে এমন সুচারুভাবে পালন করছে সুরবালা—ছেলে দুটো গোল্লুগ্গা হয়নি। মেয়ে দুটো বেহায়া হয়নি। কারুর কাছে অর্থে সামর্থ্যে একদিনের জন্যে প্রত্যাশী হতে হয়নি, এ কী কম বাহাদুরী?

রজনী এসে মুগ্ধ হয়, অবাক হয়, আর একটু যেন অপ্রতিভও হয়।

টাকা সে পাঠায় বটে, নিয়মিতই পাঠায়, কিন্তু সে আর কত? এত স্বচ্ছলতা আসবার কথা নয় তাতে, সেটা হয়েছে সুরবালার নিরলস স্বভাব, প্রখর বুদ্ধি, আর অপরিসীম কর্মক্ষমতার গুণে।

তা কী আর করা?

জীবনের পাশার দান এইভাবেই পড়েছে রজনীর, সেই মতই ঘুঁটি চালছে। তবু···অপ্রতিভ একটু হলেও নিজের সংসারের সেই আতিথ্যের দিনগুলি কী মনোরম। সে যেন রজনীকে সহস্র বাহু বাড়িয়ে টানে।

তাই দশরাত্তির আগে থেকে আর ঘুম আসে না রজনীর। কাঠের মাচার ঘর থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে মাঝ রাত্তিরে, লাঠি ঠুকে ঠুকে ঘুরে বেড়ায় খানিকটা। ধবধবে বিছানা, নরম বালিশ, আর সংসারে পোড় খাওয়া একখানি বুলো মুখ তীব্র আকর্ষণের হাতছানি হেনে উতলা করে তোলে তাকে।

বছরে ওই দশটি দিন ভাল বিছানায় শোয় রজনী, নইলে এখানে? রাম কহো। এ কি বিছানা?

একখানা সস্তা মণিপুরি পেস একটা তেলচিটে টিকিনের বালিশ এই। যতদিন না ছিঁড়ে 'ওয়ার' হয়, তারা না পড়ে জলে, না পড়ে

আর খাওয়া?

সেও না বলাই ভাল।

কাঠের দেওয়ালের গায়ে পেরেকে একটা হাঁড়ি টাঙানো থাকে, তার গায়ে চিরজীবনের কাঠের আগুনের কালি, সেইটা দিনান্তে একবার নামে, ভাত আর মুরগী এক সঙ্গে সেদ্ধ হয় নুন হলুদ লঙ্কার সংমিশ্রণে, ব্যস। রাত্রে রান্নার পাট নেই। সবটা ডুইভার বসির সেখ রুটি বানায়, তার সঙ্গে রুখবার ব্যবস্থা করা আছে।

শরীরের গুং না থাকলে স্রেফ উপোস।

এই জীবন।

এইভাবে আটার বছরের কোঠায় এসে পৌঁছেছে রজনী ঘর।

তাই ছুটির সকালটা পর্যন্ত আর অপেক্ষা করা সম্ভব হয় না। কাজের মেয়াদ ফুরোলে সেই রাত্রেই বেরিয়ে পড়ে। পাঁচটা মোটঘাট নেওয়া কলকাট, ওই একখা ক্যাম্বিসের ব্যাগই রজনীর সম্বল। ওতেই যথা সর্বস্ব। অবশ্য নিজের বলতে আছেই বা কি? দুটো গেঞ্জি কাপড়, একটা পাজামা কি লুঙ্গি এইতো। ব্যাগের পেট যাতে ফেঁসে যাবার জোগাড় তা হচ্ছে চায়ের প্যাকেট। ছুটির সঙ্গে সঙ্গে বোনাস হিসেবে পাঁচ পাউণ্ড চা পাওয়া যায়। এদিক ওদিক করে আরো দু' তিন পাউণ্ড হয়। এর ওপর আছে রজনীর—নিজের হাতে পোঁতা গাছের কমলালেবু।

জায়গাটা আসল বলেই যে লেবুগুলো উচ্চাঙ্গের তা মনে করবার হেতু নেই, তবে সুবিধে এই, গাছটা বারোমেসে। অতএব এই পুজোর ছুটিতে ও গাছের লেবু নিয়ে যায় রজনী, টকটক ছোট ছোট।

ব্যাগটা হাতে বসিরের ডেরায় উঁকি মারে রজনী, বসির দশদিনের মত তোমার 'রুটির ছুটি'।

বসির ফোকলা দাঁতে একগাল হেসে বলে, 'যাও

তাহাব, বিধির হাতের মাছের ঝোলটাই খাসা হাঁস হয়ে আসে।'

এগোয়।

বসিরের একটা নিশ্বাস পড়ে।

তার আর দেশে ফেরার উপায় নেই। দেশে তার নামে ডিক্রি শমন ঝুলছে।...রজনীর দেহটা অদৃশ্য হয়ে যায়, বসির ভাবে ওর ছাওয়াল দুটো নাকি কাজ কারবারের লায়েক হয়ে উঠেছে। কে জানে বসিরের ছেলেটা আছে না মরে গেছে।

রজনী বসিরের জীবন কাহিনী জানে। জানে ও ফেরারী আসামী, তবু তাকে ঘৃণা করে না রজনী। বরং করুণা করে। ভাবে আহা লোকটা ছুটির সময় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। একবার দেশে যেতে পায় না। স্বাদ পায় না স্বর্গ সুখের।

রজনীর হাতের মুঠোয় স্বর্গ আছে।

সেই মুঠো খুলল রজনী।

ব্যাগটা দরজার কাছে নামিয়ে সেকলটা নেড়ে দিয়ে ডাক দিল 'কইরে!'

ব্যাস তারপর স্বর্গ সিংহাসন।

বড় ছেলে সন্দেশ আনতে ছোটে, ছোট ছেলে ডাব কাটতে বসে, ছোট মেয়ে বাতাস করতে শুরু করে, বিয়ে হওয়া বড় মেয়ে, পুজো উপলক্ষে যে এসেছে, সে নিভন্ত উনুনে কাঠ গুঁজতে যায়। আর সুরবালা তার পোড়-খাওয়া বুনো মুখে একটু মধুর হাসি হেসে বলে, 'সেই এক ধারা! চিঠি না দিয়ে আসা!'

রজনী বিহ্বল হাসি হেসে বলে, 'নিজের বাড়ীতে আসবো তার খবর দেওয়ার কী আছে?'

'আহা! অসময়ে এসে এসে এখন যেগুন পোড়া ভাত খাও। 'ঠিক তো থাকে না—'

কথাটা ঠিক।

গুনতিতে দশটা দিন হলেও তিথি নক্ষত্রের ঠিক থাকে না সব সময়।

খেতে বসে সন্তাট রজনী ধর আর একবার বিহ্বল হাসি হাসে।

বলে, 'কী গো খুব যে যেগুনপোড়া আর ভাতের গুণ দেখালে, বলি এ সব কি? এক ঘণ্টার মধ্যে যে খাসির ঝোল বানালে, বুঝতে পারি।'

কথাটা অত্যুক্তি হলেও একেবারে মিথ্যা নয়। কর্মিৎকর্মা সুরবালা বড় মেয়ের সহায়তায় এই এক ঘণ্টার মধ্যেই পাঁচ ব্যঞ্জন দিয়ে ভাত বেড়ে দিয়েছি। অবিশ্যি শুধু ভাত পাবের তৎপরতাই নয়। মনজের তৎপরতাও আছে। বোধ করি সেটাই প্রধান। দুটিকে দুটো উনুনে কাঠ জেলে দিয়ে, আর ভাতের মধ্যে আনাজ পাতি দিয়ে, সেই সেদ্ধ আনাজে তরকারি বানিয়ে পাত সাজিয়ে ফেলেছে সুরবালা। সঙ্গে দিয়েছে ঘরের গরুর দুধের সর আর সরের ঘী, আমসত্ত আর চাঁপা কলা। আমের আচার আর নেবু জারক। মাছের অভাব মিটিয়েছে সুরবালার পোষা ঠাসের ডিম।

এই রাজকীয় আয়োজন নাকি বিনা ব্যবস্থায়।

বসির সেখকে দেখাতে ইচ্ছে করে রজনীর। আর নিজেকে পৃথিবীর সম্রাটের চেয়ে কিছু কম মনে হয় না।

যথারীতি সন্ধ্যার দিকে পড়শীরা দেখা করতে আসে একে একে দুইয়ে দুইয়ে। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক পড়শীরা। কম বয়সীদের অহঙ্কার আছে। তারা যেচে দেখা করতে আসে না। তারা জানে, যে বাইরে থেকে আসে, দেখা করাটা তারই কর্তব্য।

বুড়োদের অহঙ্কারের চেয়ে কৌতূহল প্রবল; তাই তারা এসে আসর জমকায়। বলে, 'তারপর রজনী কি মনস্থ করছ?'

রজনী চকিত হয়ে বলে, 'আ্যা কী বলছেন?'

বলছি, তোমার ছোট ছেলেটিও দু'পয়সা ঘরে আনতে শিখল, বড় ছেলে তো করছেই, আর কেন সেই পাওব বর্জিত জায়গায় পড়ে থাকা? এবার বাড়ী এসে থাক, সংসার ধর্ম কর?'

প্রস্তাবটা যেন একটা মধুর স্বপ্নের মত লাগে রজনীর কাছে। চারিদিকে তাকিয়ে দেখে রজনী। বাড়ীটা সম্প্রতি ঝেড়ে মেরামত করিয়েছে সুরবালা, দেয়ালে দেয়ালে ঠাকুর দেবতা আর মহাপুরুষদের ছবি, চৌকীতে ফর্সা চাদর পাতা। সেই চৌকীতে তাকিয়া ঠেস দিয়ে পাঁচটা ভদ্রলোকের সঙ্গে বসে গল্প করছে রজনী। এই এখন এই সন্ধ্যাবেলা। যখন কাজে থেকে ফিরে বিমিয়ে বসে থাকে রজনী চা টা

তৈরি করে খেতে উঠে
খাওয়াই হয় না।

সন্ধ্যা ফোটা শিউলি ফুলের গন্ধ উঠেছে যেন দিক্ বিদিগন্ত জুড়ে। উঠোনের নিম গাছটার পাতা বাতাসে ঝিরঝির করছে। দাওয়ার ধারে শুক্লা পঞ্চমীর ফালকা জ্যোৎস্না একটা আলোর রেখা টেনে দিয়েছে, আর এই আকাশ বাতাস গাছ মাটি, আর ঘরের দেওয়ালগুলো পর্যন্ত যেন একটা মোহময় স্নেহজাল বিস্তার করে রজনীকে মিনতি জানাচ্ছে, 'থাকো থাকো!

হঠাৎ মনে হয় সত্যিই তো এই স্বর্গলোক ছেড়ে চলে যাবার দরকার কি রজনীর! কী দরকার আর সেই দূর বিদেশে পড়ে থাকবার? এখানে মোটা কাপড়টা তো জুটে যাবে ছেলেদের কল্যাণে। ছেলেদের বড় হওয়ার প্রার্থনা তাহলে করে কেন লোকে?

মোটা ভাত কাপড়ের কথায় হঠাৎ হাসি পেয়ে গেল রজনীর। নিজের সেই দেওয়ালের পেরেকে টাঙানো আজন্মের ভুষোমাখা ছাড়িটার চেহারা মনে পড়ে গেল।

মোটা ভাত কাপড়!

আহা কী সরুতেই থাকে সে!

মাথাটা নেড়ে বলে, 'তাই ভাবছি। আর কেন-ই বা! ভগবান যখন একরকম হাঁড় করিয়ে দিয়েছেন—'

বড় ছেলে ডেলি-প্যাসেঞ্জারী করে। সেই মাত্র ষ্টেশন থেকে ফিরল সে। কথার শেষাংশ শুনে বলে ওঠে, 'আমরাও ঠিক করেছি বাবাকে আর ছাড়া হবে না—'

যেতে নাহি দিব।

যেতে নাহি দিব!

আকাশ বাতাস জলমাটি মানুষ, সবাই বলে উঠছে 'যেতে নাহি দিব।'

রাত্রে সুরবালাও সেই কথাই বলে।

'আর যেতে দিচ্ছি না।'

ছেলেরা বড় হয়েছে, মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, তবু চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে এ ঘরেই শুতে আসে সুরবালা। তিনশো পঞ্চান্ন দিনের উপবাসী চিত্ত থাবার সামনে নিয়ে বসে সংযমের বড়াই করতে পারে না। আর তা ছাড়া দুটো কাজের কথাই বা বলি কখন রাত্রি ছাড়া?

দিনমানে নিজেরই তো একে কাজের অছিলি

...তারপর রজনী কি মনস্থ করছ?

তার ওপর দেশ সুদ্ধ লোকের তো প্রেম উথলে পড়ে 'রজনী রজনী' করে। রজনীও তার প্রতিদান না দিয়ে পারে না। সময়ের জ্ঞান ভুলে অজ্ঞান হয়ে গল্প করে। আর বিদায় বেলায় চারটি করে চায়ের পাতা দেয় কাগজে মুড়ে। 'এদিক ওদিক' থেকে সংগৃহীত চা-গুলোর এই ভাবে সদ্ব্যয় হয়। বিবেকের কাছে খাঁটি থাকে রজনী। নিজে তো খাচ্ছে না।

সুরবালা বলে, 'দেশসুদ্ধ লোককে বিলিয়ে বিলিয়ে খতম করলে, বাড়ীতে আর বোধহয় রইল না?

'রজনী' হা হা করে হেসে ওঠে, তোমার ভাগের পাঁচ প্যাকেটে হাত ঠেকাইনি গো। কত খাবে খাওনা।'

মাজা ঘসা সরস কথার ভঙ্গীর ধার ধারে না কেউ-ই, নিতান্ত সাধারণ রহস্য লেশ বর্জিত কথা, তবু তারই মধ্যে ব্যঞ্জনা থাকে। সুরবালা চোখে কথা কয়, 'আহা আমি যেন কেবল নিজের জন্যেই বলছি।'

রাত্রেও সেই ভাষাটাই ব্যবহার করে সুরবালা, 'আজ,

আমি যেন নিজের জন্যেই বলছি। বলি, এই যে তুমি মানুষটা আজন্ম জঙ্গলেই পড়ে থাকলে, সংসার সুখ কাকে বলে জানলে না, এটা বুঝি লাগে না আমার?'

রজনী সেই নরম বালিশ পাতা ফর্সা বিছানার ওপরে সুরবালার গায়ের ওপর একটা হাত রেখে, রজনীর মুখে মাথায় সুরবালার হাতের নাড়া খালর দেওয়া পাখাটার বাতাস এসে লাগছে, রজনীর সারাজীবনের বঞ্চিত অন্তরাত্মা আশার আশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে আছে রজনীর মুখের দিকে, রজনী বলে ওঠে 'নাঃ আর যাব না, ঠিক করেছি।'

'জয় গুরু, জে মা কালী, বাবা বিশ্বনাথ!' সুরবালা দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বলে, 'তুমি আবার বাঁচালে।' গুরুর কাছে রাতদিন প্রার্থনা করেছি তোমার যাতে সুমতি হয়। বলেছি 'হে গুরু তোমার নামে যেন কলঙ্ক না হয়।'

রজনী সুরবালার খেটে খেটে কাট হয়ে যাওয়া হাত দু'খানা বুকের কাছে এনে, তার পক্ষে যতটা সম্ভব মমতা করুণ স্বরে বলে। সুমতির কথা কি বলছ ভালো বৌ, তোমাদের ছেড়ে এই দেশ ঘর পিতৃপিটে মাতৃভূমি ছেড়ে যে সেই মানুষের অযোগ্য অখাদ্য আয়গায় পড়ে আছি, সে কি সাধ করে? লেখাপড়া শিখিনি যে আপিসে কাজ হবে, যা জুটেছে—

সুরবালা তার গলায় ঘটটা সম্ভব মমতা ফুটিয়ে বলে, 'আ, সে কী আর আমি জানিনা গো? তাই তো এতদিন কথাটি কইনি। কিন্তু এখন যখন ভগবান দিন দিয়েছেন—'

তা' সত্যি! দিন দিয়েছেন ভগবান! দিন দিয়েছেন।

রজনীও ভগবানের এই অপার করুণায় কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হয়।

এবার রজনী স্বাধীন। মুক্ত পক্ষ বিহঙ্গ। যতই ইচ্ছে, বেলায় উঠলাম, যখন ইচ্ছে নাইলাম খেলাম, এর চাইতে সুখ জগতে আর কি আছে?

সকাল বেলা উঠে আরো যেন শতগুণ উজ্জ্বল লাগে। বাতাসে মধু ঝরে! আকাশে বাতাসে দেহে মনে মুক্তির সুর ধ্বনিত হয়। কী সুখ! কী রোমাঞ্চ। কাঠের দেওয়ালের পেরেক থেকে সেই কালো ঝুল হাঁড়িটাকে জীবনে আর পাড়তে হবে না রজনীকে, ধোঁয়ায় ফুঁ পাড়তে হবে না। খিদে আর ঘুম চেপে বরলে বসিরের আস্তানায় গিয়ে উঁকি ঝুঁকি মারতে হবে না, 'কই গো বসির মিঞা হল না কি?' বলে।

এই ঘর ওই উঠোন, ওই ধরনের গোলা, ওই গোয়ালের গরু এই পুত্র কন্যা স্ত্রী সব রজনীর। রজনী সব কিছুর অধীশ্বর। সারা জীবনের বুভুক্ষু বঞ্চিত রজনী ঘর এবার ভোগ করতে পারে এ সব তারিয়ে তারিয়ে।

ওই শ্রীং চেন টানা ব্যাগটা এবার সুরবালাকে দিয়ে দিতে পারে রজনী তার কাজে লাগাতে। ওর মধ্যে নিজের গেঞ্জি আর সুদি কোট আর কাপড় ঠেসে ঠেসে পুরতে হবে না, অলক্ষ্যে চোখের জল মুছতে মুছতে।

হ্যাঁ ঠেসে, এদিক থেকে যাবার সময়ও হয়। সুরবালার প্রেমোপহারে বোঝাই থাকে ব্যাগটা। পরে সেই মুড়ির নাড়ু চিড়ে ভক্তি আমসত্ত নারকেল ছাবা খেতে খেতে মন উদাস হয়ে যায় রজনীর, নিজের জীবনটাকে নিতান্ত ঘৃণ্য মনে হয়।

আজও সেই ফেলে আসা অতীত আর তার পরিবেশটার কথা মনে করে ঘৃণা আসে রজনীর।

যে লোকটা বসির সেখের কুঁড়ের সামনে ময়লা একটা লুঙ্গি পরে দাঁড়িয়ে হাতের তেলোয় রাখা শানকি থেকে শুধু পিঁয়াজের ঝোল দিয়ে রুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে, সে কি রজনী, অবনী ধরের ভাইপো বর্তমান ধর বাড়ীর কর্তা রজনী ধর?

যে এবার থেকে এই বাড়ীতে শুধু একটু থাকবে বলে, ঠাকুর বাড়ীতে ঠাকুর বাড়ীতে পূজো পড়েছে, আর সামনের কোজাগরীতে সিন্নীর আয়োজন হচ্ছে। এত মূল্যবান রজনী?

'বড়ুয়া টি কোম্পানীর প্যাকে বাবু হত বিক্রী রজনী ধর। অথচ এই মূল্যের খবর জানত না রজনী।

ছেলেরা কৃতি হয়েছে, সে কৃতির সুরবালার তা' সত্যি, কিন্তু তারা তো সকলে হৃদয়ের উপচার নিয়ে রজনীর সেবায় লাগার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে?

বড় ছেলে দেবু রোজই বলছে, 'চিরদিন কষ্ট করে এলেন বাবা, এবার একটু স্বস্তি দিতে চাই তাঁকে।' এ স্বস্তির সুখভার রাখবে কোথায় রজনী?

পাড়ায় পাড়ায় রটে বেড়ায় তাই—'চাকরীর মাথায়

ঝাড়ু মারলাম ভাই এবার। অনেক হয়েছে আর না। কী ভাবে যে এতবড় জীবনটা কাটিয়ে এল রজনী ধর! তোমরা যদি দেখতে, তাহলে বলতে, হ্যাঁ। বাহাদুর বটে।'

দিনের পাখী সোনালী ডানায় ভর করে উড়ে চলে।

'বাবা বিজাইন লেটারটা—'

বড় ছেলে মনে করিয়ে দিচ্ছে দু'বেলা।

'হ্যাঁ হ্যাঁ—অবশেষে আসল কথাটা পাড়ে রজনী, 'বিদ্যেসাধ্যি তো বুঝতেই পারছিস বাবা, যাওবা জানতাম গুলে খেয়েছি। তুই যদি খসড়াটা একটু—'

ওঃ হো তাওত বটে!

ছেলে গুছিয়ে গাছিয়ে লিখে দেয়। অস্বাস্থ্যকর জায়গায় থেকে থেকে শরীরটা একেবারে ভেঙে গেছে রজনীর। তাই একান্ত ইচ্ছে বাকী জীবনটা দেশে, নিজের সংসারে কাটায়। অতএব কোম্পানী যদি অনুগ্রহ করে ছুটি দেন রজনীকে। অবশেষে কোম্পানীর দয়া দাক্ষিণ্য বদান্যতা ইত্যাদির উল্লেখ করে নিজের অকৃতজ্ঞতার জন্য ক্ষমা চেয়ে ইতি বসিয়েছে চিঠিতে।

বার দুই শোনার পরও রজনী মুগ্ধ বিস্ময়ে বলে 'আর একবার পড়তো শুনি?'

শান্ত নম্র সৎ ছেলে রজনীর আরো একবার শোনায় আস্তে আস্তে।

আনন্দে চোখে জল আসে রজনীর। গোটা গোটা করে নাম স্বাক্ষর করে বলে, হ্যাঁ। একেই বলে বিদ্যের গুণ! কেমন ভাষাটি হল? সাপও মরল লাঠিও ভাঙল না। কোম্পানীকে তোয়াজ করাও হল অথচ—ওগো শুনলে তুমি চিঠিটা?'

সুরবালা মৃদু হেসে বলে, আর শুনতে হবে না। তোমার বিদ্বান ছেলেকে বক্তব্যর বুদ্ধিটা দিল কে?'

রজনী হাঁ হয়ে তাকিয়ে থাকে।

চিঠিটা পকেটে নিয়ে স্টেশনে রওনা হয় দেবু, কলকাতার বড় পোষ্টাপিসে ফেলাই ভাল, তাড়াতাড়ি যাবে। নয় নয় করে ছুটির দিনগুলো তো সব শেষই হয়ে এল। রজনীর পৌঁছবার জন্যে ধার্য্য তারিখের মধ্যেই যেন চিঠিটা পৌঁছে যায়।

ছোট ছেলে বলে, 'দেখ এখন কোম্পানী ছাড়ে কিনা।'

রজনী উদ্ধত স্বরে বলে, 'ছাড়বে না মানে? একী কেনা চাকর? না মগের মুলুক? আমার যদি আর শরীরে না বয়? আমি যদি চিরদিন দাসত্ব করতে না চাই? ভগবান যখন দিন দিয়েছেন আমায়—'

সুরবালা এই দিন দেওয়া সম্পর্কে মনে মনে ঘাট মেনে তাড়াতাড়ি বলে 'নাও এসো, একটু চা খেয়ে যাও।'

'এই তো খেলাম!'

'তা হোক, তুমি এখন রিটায়ার কর্তা, যা খুসি তাই করবে—' বলে সুরবালা সেই বিশেষ হাসিটি হাসে।

কিন্তু চাটা যেন তেমন ভাল করতে পারেনি সুরবালা। কেমন তেতো তেতো। সবটা খেতে ইচ্ছে হল না। ঠেলে রাখতে হল। রেলের সিটি শোনা যায় বাড়ী থেকে, শব্দে উন্মনা রজনী ভাবে ট্রেন তো ছাড়ল, চিঠিখানা পকেট থেকে পড়ে টড়ে যায়নি তো দেবুর?...তাহলেই তো বিপদ! চিঠিও পৌঁছবে না, রজনীও পৌঁছবে না...পকেট থেকে পড়ে না যাক, চিঠি মারাও তো যায়? যদি তাই হয়?

স্টেশন পর্য্যন্ত গেলেই হতো দেবুর সঙ্গে, আর একটু সাবধান করে দেওয়া যেত।

বেলা যত বাড়ে, চিঠি সম্পর্কে দুর্ভাবনাও তত বাড়ে রজনীর। যদি না পৌঁছয়? কোম্পানী দেখবে ছুটি ফুরিয়ে গেল ধরবাবু এল না। ইস সে যে বড় বিশ্রী হবে।

মনের দুর্ভাবনা বাইরে বেরিয়ে পড়ে।

সুরবালা বলে, 'কেন মাথা খারাপ করছ? বড় পোষ্টাফিসে দেবে বলেছে—'

কিন্তু মাথা যার পুরোপুরি খারাপ হয়ে বসে আছে, তার কী গতি?

বিকেলের দিকে দুর্ভাবনার মাত্রা এতই প্রবল হয়ে ওঠে যে ভাতের জল গলা দিয়ে নামে না রজনীর। হাত পায়ের ঠিক থাকে না, কথা কইতে গলা কাঁপে, এবং শেষ পর্য্যন্ত সেই কাঁপা গলায় বলেই ফেলে কথাটা—

'দেখ ভেবে দেখলাম ও তোমার একখানা চিঠি টুকে বিজাইন দেওয়া ঠিক নয়। একবার ঘুরেই আসি—'

'ঘুরেই আসি।'

সুরবালা বজ্রাহত বনস্পতির মত দাঁড়িয়ে পড়ে বলে, 'কোথায় ঘুরে আসবে ?'

'কোথায় আর ? চিরটা দিন কাটালাম যেখানে।' রজনী বিরক্ত কণ্ঠে বলে, 'বুদ্ধিটা ভুলই হয়েছে। এত-দিনের মনিব, একবার দেখা করে বুঝিয়ে না বলে, এভাবে না, ছি ছি ! খুব খারাপ হয়েছে।'

সুরবালাও বিরক্ত হতে জানে।

সেও তিক্ত কণ্ঠে বলে, 'তা' এক্ষুনি তো যাচ্ছ না ? দেবু আসুক ! সে কি বলে—'

'দেবু আসবে সে কী বলবে তাঁর পিত্যেসে বসে থাকলে ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকবে ?

রজনী সুরবালার এই ছেলেমানুষী কথায় ব্যঙ্গ হাসি হাসে, 'ট্রেন আমার তাকের ? দাও আমার জামাটা কাপড়টা একটু—ওরে কাজল আমার ব্যাগটা কোথায় দেখতো—'

কাজল ব্যাগ এনে গালে হাত দিয়ে বলে, 'বাবা তুমি পাগল নাকি ?'

'এই দেখ ! পাগলের কী দেখলি ?' ব্যাগের চেনটা খুলে ফেলে রজনী।

সুরবালা বজ্রকণ্ঠে বলে, 'দেবু না আসা পর্যন্ত তোমার যাওয়া হবে না।'

পরমুহূর্তেই জ্বলে ওঠে রজনী।

মনে হয় এরা যেন তাকে কোন বিপদে ফেলবার জন্যে ষড়যন্ত্র করছে।

কিন্তু রজনী মুষ্যু হলেও এত মুষ্যু নয় যে ওকে দিয়ে কেউ যা ইচ্ছে করিয়ে নেবে। তাই রুদ্ধ গলায় বলে, 'দেবু আমার গার্জেন নয়।'

ব্যাগের পেটটা ঢিলে আলগা।

চেনটা সহজেই টানা গেল, দাঁড়িয়ে পড়ে রজনী বলে, 'তাহলে চললাম, দেবু এলে বোলো বুঝিয়ে। যেতে আসতে এই পাঁচ ছটা দিন, ব্যস—।

সুরবালা কথা বলে না, কাজল বলে,

'তা' গাড়ীর তো এখনও অনেক ঘণ্টা দেরী, না খেয়ে দেয়ে এভাবে—'

'খাওয়ার জন্যে কি ! খাওয়ার জন্যে কি—, ব্যস্ত রজনী দ্রুত স্বরে বলে, 'কত উপোস পার করে এলাম, এখন এই দামান্য—শেয়ালদা ইষ্টিশনে খেয়ে নেব। অনেক ঘণ্টা তো বলছিস, বলি এখান থেকে বেরিয়ে হাওড়া তার থেকে শেয়ালদা ! তা হোক, ট্রেনে চড়ে বসে যেন মুক্তির নিশ্বাস ফেলে রজনী ! উঃ খুব জোর বেরিয়ে পড়া গেছে। দেবু এসে পড়লে—

বাবা, তুলিয়ে ভালিয়ে কী বাঁধনেই বাঁধছিল। ভাগ্যিস !

এই মাঠ ঘাট ঘর বাড়ী, স্টেশন, সিনেমা বাড়ী, যা এই ক'দিন রজনীকে লক্ষ বাহু মেলে আলিঙ্গন করে রেখেছিল। তাদের বাহু শিথিল হয়ে গেছে। অবাক হয়ে ভাবছে রজনী কোন মন্তর পড়ে ওরা রজনীকে অমন বোকা বানিয়ে ফেলেছিল যে রজনী এমন একটা অবাস্তব কল্পনায় মসগুল হল, অমন এমটা ভয়াবহ দলিলে স্বাক্ষর দিল।

রজনী আর কোনদিন তার সেই আসাম উপত্যকার কাঠের মাচায় ঘরখানায় যাবে না, সেই ঘন সবুজ নিবিড় অরণ্যানীর মাঝখানে ঘুরে বেড়াবে না। এর চাইতে অবাস্তব আর কিছু হতে পারে, মনে হয় না তার।

যাক চিঠিটার আগেই হয়তো পৌঁছে যাবে সে। গিয়েই বরং খোঁজ নেবে পোষ্টাফিসে। নিতান্ত পৌঁছে গিয়ে থাকে। কর্তাদের হাতে পায়ে পড়ে বলবে, 'আর আমার দুষ্টু ছোট ছেলেটা, আমার সই জাল করে এই ভাবে মজা করেছে।

আর শেওড়াফুলিতে ?

তার জন্যে ভাবে না রজনী।

কোম্পানীর চিঠির মুসাবিদা করবার বিদ্যে না থাকলেও ওখানে চিঠি লেখার ভাষা রজনীকে শেখাতে হবে না।

ফ্রেফ লিখে পাঠাবে কোম্পানী কোন মতেই ছাড়তে রাজি নয়, কর্তারা হাতে পায়ে পড়ছেন। রজনী ঘর নইলে নাকি তাঁদের ব্যবসা অচল। অতএব বাধ্য হয়েই আবার জোয়াল কাঁধে নিতে হল। চলে আসার সময় কারুর সঙ্গে দেখা করে আসতে না পারার মন খুঁতই উতলা হচ্ছে—'

একটা বছরের মত তো নিশ্চিন্ত এখন।

কুমারেশ ঘোষ

ভি.আই.পি

[গত ৩০শে আগস্ট '৬৩ বেলা আড়াইটার সময় বালিগঞ্জে ফার্ণ রোডের মোড়ে একটি এগারো বছরের ছেলে একখানি চলন্ত ট্রামের তলায় পড়ে এবং সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যায়, তবে ট্রামটির ফার্ষ্ট ক্লাশের তলায় বহুক্ষণ বন্দী থাকে। দমকল আসে, তবে ট্রাম কোম্পানীর ক্রেন এসে ফার্ষ্ট ক্লাশটিকে উঁচু করে তুলে ধরলে তবেই ছেলেটি উদ্ধার পায়। —যুগান্তর। ৩১-৮-৬৩]

ট্রামের তলায় ছেলেটি একেই বলে রাখে কেষ্ট মারে কে? আর একেই বলে ভাগ্য! সৌভাগ্যও নয়, দুর্ভাগ্যও নয়—স্রেফ ভাগ্য! নইলে ফট্ করে একটা 'খবর' হওয়া গেল! আর কত লোকে ভিড় হয়ে গেছে! এমনি কেটে গেছি তো কত, কেউ দেখেছে চেয়ে!...আপনারা কে মশায়, খাতা-পেন্সিল হাতে উঁকি মারছেন? কী? রিপোর্টার? লিখুন, লিখুন, খবরটা লিখুন। এক জোরালো হেডলাইন দিয়ে ছাপাবেন কিন্তু! তা আপনাদের ক্যামেরাম্যানরা কোথায়? সব V I P-দের পেছনে ঘুরতে নাকি? আরে, মশায়, আমিও তো এখন একজন V I P। ডাকুন তাদের।...কী এসে গেছেন! বেশ, বেশ! দাঁড়ান একটু পোজ দিয়ে—দাঁড়ানো তো যাবে না, শুই। সিনেমা ষ্টারদের মত করে শুই। একটা চিরুনী দিন তো কেউ, চুলটা একটু আঁচড়ে নিই। নেই! কিনেই আনুন না মশায়েরা কেউ! বিনে পয়সায় এমন মজা দেখছেন, আর একটু খরচা করতে পারবেন না? চিড়িয়াখানায় টিকেট কেটে যান না!...এই তো চিরুনী এসে গেছে। থ্যাংকু। দাঁড়ান। হ্যাঁ, এইবার। হ্যাঁ, একটু হাসি-হাসি মুখ করি! মনে হবে—আমি মোটেই ভয় পাইনি। হ্যাঁ নিন, এইবার। হয়েছে? ব্যাস্! এইবার আর একটি তুলুন। আমি পিঠটা উঁচু করে ট্রামটার তলায় ঠেকিয়ে দিই—যেন ট্রামটাকে তোলবার চেষ্টা করছি। ছবিটার তলায় লিখে দেবেন আধুনিক হারকিউলিস না কি বলে তাই। নিন। আরে মশায়, দু' চারটে স্ন্যাপ নিন, যখন মওকাই পাওয়া গেল। আমার এ ছবি তুললে আপনাদের ক্যামেরার লেন্স খারাপ হবে না।...হয়েছে? থ্যাংকু।

হ্যাঁ মশায়রা, মেয়েদের কাউকে দেখছিলে তো। কাছাকাছি থাকলে তাদের শাড়ির নীচেকার পাড় বা স্লিপার দেখতে পেতাম? অন্য সময় তো চেয়েও দেখে না। কেমন ফেলে চলে যায়। এখন তো একবার দেখতে পারতো। বড্ড ভীড়ু ওরা। যাকগে, এক গ্লাস জল—না, না, জল কেন, এক গ্লাস সরবৎ খাওয়ান না কেউ! ঐ সঙ্গে দু'টো রাজভোগও আনবেন। দেখছেন তো কী ভোগ! প্রজাভোগ থাকলে তাই আনতে বলতাম।...কেউ গেলেন নাকি? গেছেন। থ্যাংকস্!

হ্যাঁ মশায়রা, আমাকে উদ্ধার করবার চেষ্টা হচ্ছে নাকি? তা এত তাড়াতাড়ি কিসের? কী দমকল এসেছে। যেতে বলুন, যেতে বলুন। আমি কি পুড়ে গেছি যে দমকল এসেছে! যত সব কী কেন আসবে? ট্রাম কোম্পানী ব্যবস্থা করছে? বরং ট্রাম কোম্পানীর দরজায় দাবী করুন না—এই ছেলেটাকে একটা ওদের অফিসে অফিসারের চাকরি দিতে হবে।... হ্যাঁ, তাতে বুঝতে পারি একটি কাজের কাজ হ'লো।

এনেছেন? শরবৎ এনেছেন? সরবৎ এনেছেন? দিন, গলিয়ে দিন এই চাকার পাশের রডের ভেতর দিয়ে। তা সরবৎটা গেলাসে এনেছেন, তা রাজভোগ দু'টো শালপাতার ঠোঙায় খেলে মানায়? একটা ডিসে আনতে হয় তো? একজন V I P লোক আমি! কোন ভদ্রতাজ্ঞান নেই দেখছি! যাক, শালপাতাই সই। ...আঃ! থ্যাংকু। কী? চা? সরবতের পরে চা? তা আপত্তি নেই। দিন।...আপনি আবার কি এনেছেন? ডাব। তা বেশ। চলতে পারে। মানে, পরের পয়সায় টিংচার আইডিন খেতেও আমার আপত্তি নেই, আর এতো...তা হ'লে বলেই ফেলি। একটু আধটু ধূমপানের

নেশা আছে মশায়। আসুন না এক প্যাকেট সিগ্রেট। তবে গোল্ড-ফ্লেক বা ষ্টেট-এক্সপ্রেস আনবেন। এমনিতে চার-মিনার খেয়ে খেয়ে তো জিবে কড়া প'ড়ে গেছে! এই তালে একটু ভাল-মন্দ···বুঝছেন তো?

কী? আমার পরিচয়? ঠিক, ঠিক। এতক্ষন রিপোর্টার আর কোনদিন আমার জীবনে আসবে কি না সন্দেহ! লিখুন, বেশ গুছিয়ে লিখুন। ডাক নাম খেঁচা। ভাল নাম ধনেশ্বর। শ্রীযুক্ত ধনেশ্বর ঘটক। পিতা ৺লোহারাম ঘটক। দেশ, অতীতে পূর্ব-পাকিস্থান। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে কলকাতা মহানগরীতে। আরো বর্তমানে ট্রামের তলায়। ট্রামের নম্বর লিখে নিতে পারেন। পেশা? ওখানেই তো বিপদে ফেললেন! লিখুন, ধারের কারবার, credit business, তাছাড়া বেকার-সংস্থার সভ্য। মানে, সোজা কথায়, হাত-পাতা। না, না। তাতে লজ্জার কি আছে? বাংলা দেশের ঐতিহ্যই তো হাত পাতা। Donation, charity, চাঁদা—এসব কি মশায়? আর জানেন না দেবাদিদেব মহাদেবই তো অন্নপূর্ণার কাছে হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছেন। আর কে না হাত পাতচে! ভারত হাত পাতচে না আমেরিকা, রাশিয়ার কাছে? সেসব খবর তো আপনারাই বড় বড় অক্ষরে কাগজে লেখেন।···হ্যাঁ, লিখুন, বেশ—সিনেমা আর সিগ্রেট! লেখাপড়া? বর্ণপরিচয়ের যুক্ত অক্ষরের ভয়েই আর নিজেকে ওসব ব্যাপারে যুক্ত রাখিনি। ইংরেজী? আগে লোকে বলতো ঘোড়ার পাতা; এখন গাধার পাতা পর্যন্ত বলতে পারেন।···কী বল্লেন? আবার মুষ্কিলে ফেললেন! ···তা কাছাকাছি তো কোন তরুণী নেই! তবে বলি, না, বলেই বা কি লাভ? ওটা চেপে যাবেন বরং। মেয়েরা তো চেপে যায়, তাতে ক্ষতি কি? কী সারাদিন আমি করি। সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারাদিন আমি যেন ইচ্ছামত চলি। এই ধরুন, সকালে বকে বসি, দুপুরে ভাতের থালার সামনে বসি। পরে বিছানায় শুই। বিকেলে সিনেমার সামনে দাঁড়াই। রাত্রে আবার বকে। আবো আবার বিছানায়।···

হ্যাঁ মশায়রা, এখন কটা বেজেচে? পাঁচটা? ইস, আজ 'মল্লিকা'র 'যৌবন-জ্বালা' ছবি দেখবো ভেবেছিলাম। হলো না দেখচি। বেলা তিনটে থেকে কিউ না দিলে হয় কখনো? এইটাই লস!

কী? ক্রেন এসে গেচে। আর একটু আলো এলে আজ ছবি দেখাটা মাঠে মারা যেত না! ট্রামে চেন বাঁধা হচ্চে? ট্রামটাকে টেনে তুলবে। তার মানে হয়ে গেল। আমার আবু-হোসেনি বাজার হয়ে গেল। এতক্ষণ এই ট্রামের তলাতে থেকেই যেন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিলাম, এবার আবার যে-কে সেই। আর বোধহয় আমার দিকে চেয়েও দেখবেন না কেউ!

এবার ওঠানো হবে ট্রামটি? ওঠাও। যখন সিনেমার টাইমটাই চলে গেল। তখন একটু দেরি করেই এলে হতো ট্রামটা। ট্রাম কোম্পানী তো দেখি লাইন মেরামত করতে দেরি করে আর এবেলাতেই যত তাড়াতাড়ি?

উঠচে? হ্যাঁ উঠচেই তো। এই তো দাঁড়াতে পারচি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই তো। এইতো একদম সোজা হয়ে দাঁড়িয়েচি। ওঃ অনেক লোক তো জমা হয়েছিল!

যাক। কেউ মালা এনেচেন, মালা? আনেন নি? তবে? কী? হাসপাতালে যেতে হবে? গায়ের কাটাকুটির চিকিৎসা দরকার? থামুন মশায়! দেহের ঘায়ে আর মলম লাগিয়ে দরকার নেই। মনের ঘায়ে মলম লাগাতে পারলেন না—একটা চোদ্দ আনার মালা কিনে। একটা মালা দিয়ে কত কিছু মাল আদায় করা যায়, জানেন না আপনারা?

ও সরি, আমার কাছে তো তেমন প্রাপ্তি যোগ নেই, তাই? বেশ, তবে চলুন যাই হাসপাতালে। তা, আমাকে সামনে রেখে একটা মিছিল বার করেই না হয় যাওয়া যাক। সেটাও তো দেখতে মন্দ হবে না? একটা VIP গোছের আবহাওয়া তৈরী হবে।

তাও না? তবে ড্যাম ইট। এম্বুলেন্স ডাকুন। আমি হেঁটে যেতে পারবো না। ভয়ানক কষ্ট হচ্চে! উঃ অসম্ভব যন্ত্রণা! তবে দেহে না মনে, ঠিক বুঝতে পারচিনে!

বাংলা সমালোচনার প্রথম সংকট ও রবীন্দ্রনাথ

আদিত্য ওহ্‌দেদার

বাংলা সাহিত্যে সার্থক সমালোচনার সূত্রপাত করেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁরই হাতে প্রাচীন রসশাস্ত্রের নবরসপ্রক্রিয়া ও তার ছককাটা বৈয়াকরণিক বিশ্লেষণ-পদ্ধতি বাতিল হয়, এবং তার পরিবর্তে সহৃদয়-সংবেদ্য মন ও রসদৃষ্টি দিয়ে সাহিত্যকে ব্যাখ্যা ও বিচার করার কাজ শুরু হয়। এই নূতন আদর্শের মূলে ছিল ইংরেজী শিক্ষা, বঙ্কিম যাকে আত্মস্থ করে বাংলাসাহিত্যক্ষেত্রে তার সফল প্রয়োগ করেন। তাঁর প্রথম সমালোচনা-প্রবন্ধ 'উত্তরচরিতে'ই তাঁর ক্ষমতার পরাকাষ্ঠা দেখতে পাই। 'উত্তরচরিত' আজও খাঁটি সাহিত্য-সমালোচনার অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন।

সমালোচনার মূলে আছে সাহিত্যের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সমালোচকের ধারণা। এই ধারণা যত স্বচ্ছ ও বিশুদ্ধ হবে, সমালোচনাও সেই অনুপাতে সাহিত্য-উপভোগকে প্রশস্ত করবে এবং খাঁটি সাহিত্য সৃষ্টির সহায়ক হবে। আবার সাহিত্য সম্বন্ধে সমালোচকের ধারণা যদি কোনো প্রকারে অন্য বিচারধারা বা চিন্তার মিশ্রণে ঘোলাটে হয়ে ওঠে, তখন উৎপত্তি হয় সমালোচনার সংকট। সংকট, কারণ সে অবস্থায় সমালোচনা আদর্শ-ভ্রষ্ট হয়, এবং সে জন্য তার পক্ষে প্রকৃত সাহিত্য-ব্যাখ্যা ও বিচার সম্ভব হয় না। সমালোচনার এই সংকট, সাহিত্যেরও সংকট। কারণ, আদর্শভ্রষ্ট সমালোচনা সহজেই প্রকৃত সাহিত্য সৃষ্টির অন্তরায় হয়ে ওঠে।

দেখা যায় একই সমালোচক খাঁটি সমালোচনার আদর্শ উপলব্ধি করেও পরে সে আদর্শ থেকে তিনি বিচ্যুত হন। এবং তিনি যদি শক্তিশালী হন, তাহলে তিনি তাঁর আদর্শচ্যুতির দ্বারা বিরাট সংকট সৃষ্টি করতে পারেন।

যেমন বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং। সাহিত্য-দৃষ্টি যখন তাঁর স্বচ্ছ ছিল তখন তিনি বলেছেন, "কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে—কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যেরও গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষ সাধন—চিত্তশুদ্ধি জনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা—কিন্তু নীতিব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও নীতিশিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি

বিধান করেন।...অতএব সৌন্দর্যসৃষ্টিই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।" কিন্তু তাঁর এই স্বচ্ছ সাহিত্য-দৃষ্টিতে ধর্মচিন্তার ছায়া যখন পড়ল, তখন বঙ্কিমচন্দ্র বললেন, "ধর্মের মোহিনী মূর্তির কাছে সাহিত্যের প্রভাব বড় খাটো হইয়া যায়।...সাহিত্যের আলোচনায় সুখ আছে বটে, কিন্তু যে সুখ তোমার উদ্দেশ্য এবং প্রাপ্য হওয়া উচিত, সাহিত্যের সুখ তাহার ক্ষুদ্রাংশ মাত্র।...সাহিত্য যে সত্য ও যে ধর্ম, সমস্ত ধর্মের তাহা এক অংশ মাত্র। অতএব কেবল সাহিত্য নহে, যে মহত্তত্ত্বের অংশ এই সাহিত্যে সেই ধর্মই এইরূপ আলোচনীয় হওয়া উচিত। সাহিত্য ত্যাগ করিও না, কিন্তু সাহিত্যকে নিম্ন সোপান করিয়া ধর্মের মঞ্চে আরোহণ কর।"

সাহিত্যকে এই দৃষ্টিতে দেখলে সাহিত্যের উপভোগ ও আলোচনার অর্থ দাঁড়ায় সাহিত্যের মধ্যে 'মহত্তত্ত্ব' বা ধর্মের প্রকাশ কতখানি ঘটেছে তারই অনুসন্ধান করা। কারণ, এই দৃষ্টির কাছে সাহিত্যের নিজস্ব মূল্য কিছু নেই, সে শুধু ধর্মসাধনের উপায় মাত্র। বাস্তবিক বঙ্কিমের প্রভাবে তখন সাহিত্যকে এই দৃষ্টিতে দেখাটাই বড়ো হয়ে উঠল। কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষসাধন, একথা বঙ্কিমচন্দ্র যখন বলেন তখন ১২৭৯ সাল; তখন তিনি বঙ্গদর্শনের সম্পাদক, তাঁর সাহিত্যকর্মে মধ্যাহ্নসূর্যের তেজ। মহত্তত্ত্বের অংশ, একথা তিনি যখন বলেন তখন ১২৯১ সাল। তখন তাঁর সাহিত্য-জীবনের শেষপর্ব; 'প্রচার' নামক কাগজে অন্তরাল থেকে তিনি সে-সময় ধর্মপ্রচারে ব্যস্ত। কিন্তু তার এই ধর্মাশ্রয় সাহিত্য-দর্শনই তাঁর শিষ্য-মণ্ডলীকে প্রভাবিত করল। তাই দেখা গেল বঙ্কিম-শিষ্যের এক প্রধান অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁর নবজীবন পত্রিকার ভূমিকায় বঙ্গদর্শনের প্রভাব সম্পর্কে লিখেছেন, "পুরাণে, ইতিহাসে—দেবতত্ত্বে, সমাজতত্ত্বে,—কবিত্বে, সাহিত্যে—সর্বত্রই যে স্তরের নীচে স্তর আছে, বঙ্গদর্শন আজি বার বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত তাহাই দেখাইয়াছেন। বঙ্গদর্শনই বুঝাইয়া দিয়াছেন যে...কোরতের মহামনু—পুরাণের নারায়ণ; কর্লাইলের অশ্রান্ত পরিশ্রমই—হিন্দুর প্রকৃত বৈরাগ্য। কবির সাহিত্যের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়া বঙ্গদর্শন দেখাইয়াছেন যে, কুমার সম্ভবের শিব পার্বতী অনন্ত জগতের অনন্তকালের পুরুষ প্রকৃতি: দেখাইয়াছেন যে কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তল একখানি গূঢ় সমাজতত্ত্বের গ্রন্থ: দুষ্মন্ত—কঠোর রাজধর্মের সহিত, দৃঢ় নিবিষ্ট সমাজধর্মের সহিত—মনুষ্যের ব্যক্তিগত প্রকৃতির ঘোরতর সংঘর্ষণ।...বঙ্গদর্শনের এই যুগব্যাপী উপদেশের ফল ফলিয়াছে। এখন আমরা সকল বিষয়েই অন্তঃস্তর দর্শন করিতে ব্যগ্র হইয়াছি।"

কিন্তু এইভাবে বঙ্গদর্শনের গৌরব প্রচার করতে গিয়ে যে তার গৌরব-লাঘব করছেন—একথা বোধহয় তাঁর মতো মনের অবস্থা তখন অন্ধচক্ষুর নয়: তিনি তখন তত্ত্বের মোহে আচ্ছন্ন। তিনি ভুলে গেছেন যে বঙ্গদর্শন সাহিত্যের দ্বারোদ্‌ঘাটন করে তার মধ্যে শুধু তত্ত্ব অন্বেষণ করেনি এমন সাহিত্য-বিচারের আদর্শ বঙ্গদর্শনের ছিল না। বরং কাব্যে সাহিত্য তত্ত্বের প্রাধান্য থাকাটা দোষ বলেই ধরা হয়েছিল। একথার সাক্ষ্য—বঙ্গদর্শন থেকে গৃহীত বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি: "কাব্যের অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ এই যে, উভয়ে উভয়ের প্রতিবিম্ব নিপতিত হয়। অর্থাৎ বহিঃপ্রকৃতির গুণে হৃদয়ের ভাবান্তর ঘটে, এবং মনের অবস্থাবিশেষে বাহ্যদৃশ্য সুখকর বা দুঃখকর বোধ হয়—উভয়ে উভয়ের ছায়া পড়ে। যখন বহিঃপ্রকৃতি বর্ণনীয় তখন অন্তঃপ্রকৃতির সেই ছায়ার সহিত চিত্রিত করাই কাব্যের উদ্দেশ্য। যখন অন্তঃপ্রকৃতি বর্ণনীয় তখন বহিঃপ্রকৃতির ছায়া-সমেত বর্ণনা তাহার উদ্দেশ্য। যিনি ইহা পারেন তিনিই সুকবি। ইহার ব্যতিক্রমে একদিকে ইন্দ্রিয়পরতা, অপর দিকে আধ্যাত্মিকতা দোষ জন্মে। এস্থলে শারীরিক ভোগ শক্তিকেই ইন্দ্রিয়পরতা বলিতেছি না, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে আসক্তিকে ইন্দ্রিয়পরতা বলিতেছি। ইন্দ্রিয়পরতা দোষের উদাহরণ জয়দেব। আধ্যাত্মিকতার উদাহরণ, Wordsworth."

আধ্যাত্মিকতা যদি সাহিত্যের পক্ষে দোষের হয়, তাহলে সাহিত্যের মধ্যে তত্ত্ব অন্বেষণ করা সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য হতে পারে না। সাহিত্যে শুধু আধ্যাত্মিকতা অন্বেষণ করা দুষ্ট সমালোচনারই লক্ষণ। কিন্তু এমন সমালোচনাই কালক্রমে বঙ্কিম-শিষ্যসম্প্রদায়ের একান্ত কাম্য বলে বিবেচিত হল। অক্ষয়চন্দ্র বৃথাই বলেননি,

"এখন আমরা সকল বিষয়েরই অন্তঃস্তর দর্শন করিতে ব্যগ্র হইয়াছি।" অন্তঃস্তরের অর্থ দাঁড়াল গূঢ় তত্ত্ব; সমালোচনার অর্থ, সেই তত্ত্বদর্শন। সমালোচনার এবম্বিধ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বঙ্কিমের প্রধান পণ্ডিত-শিষ্য চন্দ্রনাথ বসু শকুন্তলা-সম্পর্কে লিখলেন, "প্রকৃতি যে জায়া নয়, প্রকৃতির যে একটি স্বাধীন, একটি প্রভাবশালী, একটি বিষম সত্তা অস্তিত্ব আছে, অভিজ্ঞান' শকুন্তলে তাহা উজ্জ্বলতম অক্ষরে লেখা আছে; সেই মহাতত্ত্বই যেন অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রাণ। ফলতঃ অভিজ্ঞানশকুন্তল কাব্যাকারে সাংখ্যদর্শন, ইহাই অভিজ্ঞান-শকুন্তলের অর্থতত্ত্বের চরমসীমা।"

এই সময় যদি এঁরা কেউ 'উত্তরচরিতে'র সমালোচনা করতেন, তাহলে, বলা বাহুল্য, এ নাটকের মধ্যেও খোঁজা হত কোনো গূঢ় তত্ত্ব, কিংবা হিন্দু ষড়দর্শনের কোনো একটি অঙ্গ কিন্তু বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র কি করেছিলেন? তিনি তো উত্তরচরিতে তত্ত্বের 'ত'-ও খোঁজেননি। তিনি সমগ্রদৃষ্টিতে উত্তরচরিতের কাব্যসৌন্দর্য দেখতে পেয়েছিলেন। অবশ্য এইভাবে দেখাকে সুপরিস্ফুট করবার জন্যে প্রথমে তিনি পাঠকের সঙ্গে আনুপূর্বিক নাটক পাঠ করে যেখানে যেখানে তাঁর ভালো লেগেছিল, তা দেখিয়ে দেন; গ্রন্থের প্রত্যেক অংশ পৃথক পৃথক করে পাঠককে বুঝিয়ে দেন। এবং পরিশেষে বলেন, যে তার এই সমালোচনার দ্বারা যদি "একজন পাঠকেরও কাব্যানুরাগ বর্দ্ধিত হয় বা তাঁহার কাব্যরসগ্রাহিনী শক্তির কিঞ্চিন্মাত্র সহায়তা হয়" তাহলেই তিনি তাঁর লেখাটিকে সফল বলে মনে করবেন।

কিন্তু এই রসগ্রাহী সমালোচনার কথা বঙ্কিম শিষ্যবর্গ একেবারে বিস্মৃত হন। তার কারণ, উত্তর কালীন সাহিত্য-জীবনের প্রভাবে তাঁরা বঙ্কিমের কথাই ভুলে যান যে, কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য হল সৌন্দর্য সৃষ্টি। সাহিত্যের এই আদর্শ সামনে থাকলে সমালোচনারও আদর্শ হয় সাহিত্যের সৌন্দর্য অনুভব করা ও তাকে ব্যাখ্যা করা। বঙ্কিম-শিষ্যগণ এই আদর্শ-ভ্রষ্ট হন বলেই তাঁরা কাব্যে সৌন্দর্য উপভোগ করার বদলে তত্ত্ব ও নীতির খোঁজ নিতে প্রয়াসী হন।

॥ ২ ॥

এইভাবে বাংলা সমালোচনা বঙ্কিমের হাতে যেমন পুষ্ট হয়, তেমনি তাঁরই জীবিতকালে সংকটদশায় উপনীত হয়। রবীন্দ্রনাথ তখন তরুণ কবি। অবশ্য কবি হিসেবে খোদ বঙ্কিমের কাছ থেকেই স্বীকৃতি পেয়েছেন। 'প্রচার' পত্রিকায় 'সমালোচনায়' বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গক্রমে তৎকালীন বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ে নামকরা লেখকের একটা তালিকা দেন তাতে লেখা হয়েছিল—"হেমবাবু, রবীন্দ্রবাবু, নবীনবাবুর কবিতা; দ্বিজেন্দ্রবাবু, যোগেন্দ্রবাবুর দর্শনশাস্ত্র; বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস, চন্দ্রবাবুর সমালোচনা, কালী প্রসন্নবাবুর চিন্তা ..।" সুতরাং দেখা যাচ্ছে, তখন রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতি এতটা দাঁড়িয়েছিল যে হেমচন্দ্রের পরেই তাঁর নাম করতে হয়।

তরুণ কবি কাব্য রচনা নিয়েই থাকতে পারতেন, এবং তা বয়সোচিত স্বাভাবিকও ছিল। কিন্তু দেখা গেল তিনি সমালোচনা সম্বন্ধে চিন্তা করছেন—এ বিষয়ে লিখতে শুরু করছেন। ১২৯৪ সালের 'ভারতী' ও 'বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত 'সাহিত্যের উদ্দেশ্য' প্রবন্ধে তাঁকে লিখতে দেখা যায়—"বিষয়ী লোকে বিষয় খুঁজিয়া মরে। লেখা দেখিলেই বলে, বিষয়টা কী? কিন্তু লিখিতে হইলে যে বিষয় চাই-ই এখন কোনো কথা নাই। বিষয় থাকে তো থাক, না থাকে তো নাই থাক, সাহিত্যের তাহাতে কিছু আসে যায় না। বিষয় বিশুদ্ধ সাহিত্যের প্রাণ নহে।" এই ভূমিকার পর সমকালীন সমালোচকেরা সাহিত্য সমালোচনার নামে কী করতে অভ্যস্ত ছিলেন তার উল্লেখ করেছেন।—"আমাদের বঙ্গভাষার সাহিত্য সমালোচকেরা আজকাল লেখা পাইলেই, তাহার উদ্দেশ্য বাহির করিতে চেষ্টা করেন। বোধ করি তাহার প্রধান কারণ এই উদ্দেশ্য ধরিতে না পারিলে তাঁহাদের লিখিবার তেমন সুবিধা হয় না।" সাহিত্যে উদ্দেশ্য খুঁজতে যাবার কোনো অর্থ হয় না, কারণ সাহিত্যের উদ্দেশ্য খুঁজতে নেই। তাঁর ভাষায়, "বিশুদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে উদ্দেশ্য বলিয়া যাহা হাতে ঠেকে তাহা আনুষঙ্গিক। এবং তাহাই ক্ষণস্থায়ী।

যাহার উদ্দেশ্য আছে তাহার অন্য একটা বিশেষ তত্ত্ব-নির্ণয় বা কোনো ঘটনা বর্ণনা যাহার উদ্দেশ্য তাহার দর্শন বিজ্ঞান বা ইতিহাস আর পাঁচো। কিন্তু সাহিত্যের উদ্দেশ্য নাই।"

সাহিত্যের কোনো উদ্দেশ্য নেই কোনো প্রভাব নেই তা নয়। তরুণ কবি জানালেন, "সাহিত্যের প্রভাবে আমরা হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ অনুভব করি, হৃদয়ের প্রসার বৃদ্ধি হয়, হৃদয়ের সহিত হৃদয় খেলাইতে থাকে হৃদয়ের জীবন ও স্বাস্থ্য-সঞ্চার হয়। যুক্তি শৃঙ্খলের দ্বারা মানবের বুদ্ধি ও জ্ঞানের ঐক্যবন্ধন হয়, কিন্তু হৃদয়ে হৃদয়ে বাঁধিবার তেমন চরিম উপায় নাই। সাহিত্য স্বত উৎসারিত হইয়া সেই যোগসাধন করে। সাহিত্য অর্থেই একত্র থাকিবার ভাব—মানবের 'সহিত' থাকিবার ভাব—মানবকে স্পর্শ করা, মানবকে অনুভব করা। সাহিত্যের প্রভাবে হৃদয়ে হৃদয়ে শীতাতপ সঞ্চারিত হয়, বায়ু প্রভাবিত হয়, অনুচক্র ঘিরে, গন্ধ গানে ও কলের হাট বসিয়া যায়। উদ্দেশ্য না থাকিয়া সাহিত্যে এইরূপ সহস্র উদ্দেশ্য সাধিত হয়।"

সাহিত্যের কোনো উদ্দেশ্য নেই, এ কথা জানালেও কবি কিন্তু তাঁর প্রবন্ধের শেষে সাহিত্যকে একটা উদ্দেশ্যের তীরে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁর মতে সাহিত্যের অস্তিত্ব-হেতু হল আনন্দ।" আনন্দই তাহার আদি অন্ত মধ্য। আনন্দই তাহার কারণ এবং আনন্দই তার উদ্দেশ্য।" আসলে উদ্দেশ্য কথাটি কবি প্রয়োগ করেছেন ব্যবহারিক বা প্রয়োজন সাধক অভিপ্রায় অর্থে। আনন্দ এই অভিপ্রায় থেকে মুক্ত। কিন্তু তাই বলে তার কোনো প্রভাব বা কার্যকারিতা নেই, এমন নয়। আনন্দের প্রভাব ও কার্যকারিতা যা সাহিত্যেরও তাই।

দেখা যাচ্ছে তরুণ রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনে বঙ্কিম প্রদত্ত সাহিত্য চিন্তাকেই পুনরুজ্জীবিত করলেন। বাস্তবিক, উত্তরচরিতে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর যে ধারণা ব্যক্ত করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ প্রায় সেই ধারণাকেই নিজের মতো করে ব্যক্ত করলেন।

সাহিত্যের উদ্দেশ্য সৌন্দর্যসৃষ্টি, এবং সাহিত্যের উদ্দেশ্য আনন্দ—এ দুটি কথার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই বললেই চলে। সৌন্দর্য ও আনন্দ, উভয়কেই জানা যায় অনুভবে, তত্ত্ব দিয়ে বোঝা যায় না। তাছাড়া তলিয়ে দেখলে, সৌন্দর্য ও আনন্দ একই বস্তু ঠেকে। যা সুন্দর তাই তো আমাদের আনন্দ দেয়; আবার যা আমাদের আনন্দ দেয় তাকেই তো বলে সুন্দর।

তারপর, বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন কাব্য মনুষ্যচিত্তকে আকৃষ্ট করে। তাঁর ভাষায়, "সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করে, সে কি? সৌন্দর্য; অতএব সৌন্দর্য সৃষ্টিই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথ বললেন, সাহিত্যের প্রভাবে আমরা হৃদয়ে হৃদয়ে যোগ অনুভব করি। দুটি বক্তব্য একই, অর্থাৎ সাহিত্য হৃদয়কে নিয়ে। বঙ্কিম তো অন্য একটি প্রবন্ধে সৃষ্টিই' বলেছিলেন, "কাব্যরসের সামগ্রী মনুষ্যের হৃদয়।"

সাহিত্যের উদ্দেশ্য সৌন্দর্যসৃষ্টি, আনন্দ, তার প্রভাব মানুষের চিত্তে বা হৃদয়ে—সাহিত্য সম্পর্কে এই ধারণা যাঁর হবে তিনি সাহিত্য সমালোচনার নামে সাহিত্যের মধ্যে তত্ত্ব খুঁজবেন না, তিনি প্রকাশ করবেন সাহিত্য তাঁর হৃদয়ে যে ভাব বা আবেদন উদ্রেক করেছে। সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও প্রভাব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তার যে ধারণা ব্যক্ত করলেন তারই বশবর্তী হয়ে কিছুদিন পরে আর একটি প্রবন্ধে, ১২৯৮ সালের 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি চিঠিতে, জানালেন যে "কাব্য সম্বন্ধীয় সত্য বৈজ্ঞানিক সত্য নহে। পাঁচ সাতজন প্রমাণ, তাহার প্রমাণ নহে। হৃদয়ই তাহার প্রমাণ। আমি যতটুকু ঠিক অনুভব করি, ততটুকু সত্য।...বিজ্ঞানের মীমাংসা স্থূল বহির্জগতে; কাব্যের মীমাংসাস্থল নিজের অন্তর ব্যতীত আর কোথাও হইতে পারে না।" সুতরাং কাব্যের আবেদন যে-ভাবে হৃদয়ে ধরা পড়ে তার যথাযথ প্রকাশই হবে, সমালোচনা, তত্ত্বের প্রকাশ নয়। সাহিত্যে তত্ত্ব খোঁজার বিপদ হল এই যে তত্ত্ব বেশিদিন ধোপে টেঁকে না; আজকের নতুন তত্ত্ব কাল নিতান্ত অসার ঠেকে। তখন সমালোচনারও কোনো মূল্য থাকে না। কিন্তু কাব্য সমালোচকের হৃদয়ে যে ভাবের উদ্রেক করে, সেই ভাবে যদি ঠিক ভাব ব্যক্ত হয় তাহলে সেই হৃদয় জাত ভাবের প্রকাশ অন্যের হৃদয় স্পর্শ করার ক্ষমতা সহজে হারায় না। সাহিত্যের উপভোগ-জাত বা রসসম্মত সমালোচনা তাই স্থায়ী হয়। উপরোক্ত 'একটি চিঠি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাই জানালেন, "বিশেষ কাব্য সম্বন্ধে আমি যে কোনো তত্ত্ব কথা লিখি, তাহা কালক্রমে মিথ্যা হইবার কোনো আটক নাই; কিন্তু আমার কেমন লাগিল, তাহা কোনো কালে মিথ্যা হইবার যো নাই।...মনে করুন, আমি যদি প্রমাণ করিয়া দিই যে, কুমারসম্ভব সাংখ্যমতের একটি সুচতুর ব্যাখ্যা, অতএব তাহা একটি শ্রেষ্ঠ কাব্য, তবে তাহা বর্তমানকালের স্বদেশ বৎসল দার্শনিকবর্গের যতই মুখরোচক হোক, সাময়িক ভাব ও মতের পরিবর্তনকালে তাহার কোনো মূল্য থাকিবে না। কিন্তু তাঁহার কাব্যাংশ আমার যে কতখানি ভাল লাগে, আমি যদি ভাল করিয়া ব্যক্ত করিতে পারি, আমি যদি সুন্দর করিয়া বলিতে পারি, আহা কুমারসম্ভব কি সুন্দর, তবে সে কথা কোনোকালে অমূলক হইয়া যাইবে না।"

এমন সমালোচনাই হল সহৃদয় সংবেদ্য—যা কাব্য-রসকে উপভোগ করতে চায়, তার মধ্যে তত্ত্ব খোঁজে না। বঙ্কিমচন্দ্র উদ্ধৃতচিহ্নিত প্রবন্ধে এই ধরণের সমালোচনাই করেছিলেন। কিন্তু পরে তাঁর শিষ্যমণ্ডলী সমালোচনার নামে কাব্যের অন্তঃস্থ দর্শনে ব্যাপৃত হন এবং তার ফলে তত্ত্বান্বেষণের পালা শুরু হয়। 'কুমারসম্ভব সাংখ্যমতের একটি সুচতুর ব্যাখ্যা—রবীন্দ্রনাথের এই কথায় চন্দ্রনাথ বসু—কৃত সমালোচনার প্রতি তাঁর বিদ্রূপ কটাক্ষ লক্ষনীয়। সমালোচনার ক্ষেত্রে চন্দ্রনাথ বসু যে উচ্চাসনে আরূঢ় ছিলেন এবং যে প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করেছিলেন, তা থেকে তিনি অচিরেই বঞ্চিত হলেন—তরুণ রবীন্দ্রনাথ যখন সমালোচনার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। তত্ত্বান্বেষী অন্যান্য বঙ্কিম-শিষ্যগণও নিষ্প্রভ হয়ে গেলেন, তলিয়ে গেলেন। ১৩০০ সালে বঙ্কিমের দেহাবসান ঘটে। তারপর রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্য রচনায় তো বটেই, সমালোচনাতেও অধিতীয় হয়ে উঠলেন। সাধনা ও বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত তাঁর সমালোচনা প্রবন্ধগুলি সেই সাক্ষ্য বহন করেছে। রবীন্দ্রনাথ সেদিন অমন দৃঢ়ভাবে সমালোচনার হাল ধরেছিলেন বলেই বাংলা-সমালোচনার সংকট-মুক্তি অত ত্বরান্বিত হয়েছিল।

সেবিকা

নীহার রঞ্জন গুপ্ত

ইতাৎ প্রথমটায় দেখে চিনতে পারিনি।

আর চিনবই বা কি করে।

সে আজকের কথা নয়। তা খুব কম করে হলেও বছর চোদ্দ ত হবেই। কাজেই দীর্ঘ চোদ্দ বছর পরে দেখে যদি চিনতে না পেরে থাকি অপরাধ কিছু নেই আমার।

তার গলার স্বরটা অবিকল ঠিক তেমনি।

এবং গলার স্বরটা শুনে যে প্রথমটায় ঈষৎ চমকে উঠিনি তাও নয়। কিন্তু সেও ঐ চমকানোই।

বিচিত্র এই গলার স্বরটা শুনে ষোল বছর আগে যেমন বক্তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম আজ চোদ্দ বছর পরেও ঠিক তেমনি গলার স্বরটা শুনে বক্তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। গলার স্বরটা সামান্য একটু যেন খন খনে কিন্তু সেই তীক্ষ্ণতাটুকু বাদ দিলে মনে হবে যেন ঠিক গানের সুরে কেউ কথা বলছে।

কথা নয় গান।

ব্রজেন গুপ্ত না!

হ্যাঁ, কিন্তু তুমি মানে আপনাকে ত চিনতে পারলাম না।

রমেন্দ্র শিকদার।

জবাব এলো পুনরায় ঠিক সেই গানের মত গলায়।

কিন্তু মিথ্যা বলবো না নামটা বলা সত্ত্বেও চিনতে পারিনি। রমেন্দ্র শিকদার—কই সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো

অথচ গলাটা যেন চেনা।

কথা নয় যেন একটু আগে গান গেয়ে উঠলো কেউ।

আবার বললে লোকটা, মনে পড়চে না!

না, মানে—

তা অবিশ্যি মনে না পড়বারই কথা। ষোল বছর আগেকার মফঃস্বলের কলেজে একত্রে বছর দেড়েক পড়েছিলাম—

কৃষ্ণনগর কলেজে কি? সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করি। কারণ কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে বি, এ, পাশ করেছিলাম।

হ্যাঁ, কৃষ্ণনগর কলেজে। মনে পড়েছে—নবদ্বীপ হাইস্কুল থেকে আমি কলেজে এসে ভর্তি হই ফার্স্ট ইয়ারের মাঝামাঝি।

যদিও তবু মনে পড়ছিল না স্পষ্ট করে কিন্তু বললাম, হ্যাঁ—হ্যাঁ—

ইতিমধ্যে আবার ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি নামল।

সকাল থেকেই আকাশটা আজ মেঘলা মেঘলা ছিল। এবং দুপুর থেকেই মধ্যে মধ্যে এক এক পশলা করে বৃষ্টি পড়ছিল।

বেরুবার মুখেও অফিস থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল তবে জোরে নয় ঝির ঝির করে, সেই সঙ্গে থেকে থেকে বাদলার ঠাণ্ডা হাওয়া।

এক সতীর্থকে কলেজ স্কোয়ারে নামিয়ে দিয়ে ফিরতে ফিরতে গাড়ি থেকেই নজরে পড়ল অন্ত ফুটপাতে জনা-দুই লোক অজস্র রজনীগন্ধার ষ্টিক নিয়ে বিক্রী করছে।

ঐ বস্তুটির প্রতি আমার চিরদিনের লোভ এবং একান্ত আমার প্রিয়।

শুধু আমি কেন মানসী আমার স্ত্রীও ভালবাসে।

থাকি দক্ষিণ কলকাতায়, বালীগঞ্জে সেখানে অন্যান্য জিনিষের মত রঙ্গনীগন্ধার টিকগুলোরও একটু দাম বেশী, এ অঞ্চলে নিশ্চয়ই দাম কিছুটা সস্তা হবে।

তাই গাড়ি এ ফুটপাতে পার্ক করে অন্য ফুটপাতে গিয়েছিলাম কিছু রজনীগন্ধার টিক কিনতে।

টিক বালীগঞ্জ থেকে সস্তা দরেই পেলাম।

ডজন চারেক টিক কিনে রাস্তা ক্রস করতে যাবো পাশ থেকে গানের মত কণ্ঠস্বর শোনা গেল : ব্রজেন গুপ্ত না।

হঠাৎ ঐ সময় আবার রমেন্দ্র শিকদার বললে, কিন্তু তোমার গলা শুনে মনে হচ্ছে তুমি বোধ হয় ঠিক এখনো আমাকে চিনতে পারনি।

একটু বিব্রত ভাবেই যেন বক্তার দিকে ভাল করে একবার তাকালাম।

সাধারণ একটা ধুতি—তার উপরে একটা সার্ট—দুটোই ময়লা। রাস্তাটা অবিশ্যি দোকানের আলোয় বেশ আলোকিতই।

হাতে বোলান একটা ক্যামবিশের থলি ও গোটা দুই কাগজের প্যাকেট।

সেই আলোতেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম, রোগাটে লম্বা চেহারা। ভাঙ্গা গাল—গালে দিন দুয়ের অস্তত না কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

নাকটা একটু চ্যাপ্টা।

মাথার চুল ঘন কুঞ্চিত এবং তৈলহীন রুক্ষ।

দরিদ্র না হলেও দেহে চেহারায় ও পোষাক আশাকে একটা সুস্পষ্ট অভাবের ছাপ।

হঠাৎ মনে হলো, অতীতের আলাপ জমানোর অর্থ কিছু ভিক্ষা চাওয়া নয় ত!

কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মুখটা ফিরিয়ে রাস্তার দিকে বৃষ্টি সত্ত্বেও পালিয়ে বাঁচবার জন্য পা বাড়াতে যাচ্ছিলাম কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে রমেন্দ্রর কথায় আবার থমকে দাঁড়াতে বাধ্য হলাম;

ভয় নেই হে! ভিক্ষে চাইব না তোমার কাছে!

গানের মত হলেও কথাটা কানে বাজলো যেন খট্ করে। এবং এও যেন সে মনে করিয়ে দিল অভাব থাকলেও সবাই হাত পাতে না।

ভিক্ষা করাটা অনেকেরই মর্যাদায় বাধে।

রমেন্দ্র অতঃপর হেসে বললে, বুঝতে পারছি হে—তুমি আমায় চিনতে পারনি।

আসা যাও।

রমেন্দ্র আর দাঁড়াল না।

ফুটপাথ ধরেই ভিড়ের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গেল।

আমি কিছুই বলতে পারলাম না।

কয়েকটা মুহূর্ত সেই দিকে চেয়ে দেখে রাস্তা ক্রস করে গাড়িতে গিয়ে উঠে বসে স্টার্ট দিলাম।

বৃষ্টি তখনো ঝরছে।

'চলন্ত গাড়ির উইণ্ডস্ক্রিনের' পরে জমা বৃষ্টির জল ইলেকট্রিক ওয়াইপারে মুছে মুছে চলেছে।

আমি অন্যমনস্কভাবে সেই দিকেই তাকিয়ে থাকি।

ড্রাইভার রাজেন্দ্র গন্তব্যপথে গাড়ি চালিয়ে চলে।

বাড়িতে ফিরে এলাম।

জামা কাপড় ছেড়ে স্নান করে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে হঠাৎ আর্শীর গায়ে প্রতিফলিত পশ্চাতের দেওয়ালে টাংগানো একটা ফটোর প্রতি নজর পড়ল।

ফটোটা কলেজ লাইফের।

বছর পনের আগের ত হবেই।

সেই থেকে রমেন্দ্র শিকদারের কথা এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারিনি। তার সেই কথার ব্যঙ্গটা, ভয় নেই, ভিক্ষা চাইব না তোমার কাছে—যেন অবচেতন মনের মধ্যে কেবলই আনাগোনা করছিল। ভয় নেই, ভিক্ষা চাইব না তোমার কাছে।

চুলটা কোন মতে আঁচড়ে সোজা এগিয়ে গিয়ে ফটোটার সামনে দাঁড়ালাম।

উপরে সন লেখা আছে।

হিসাব করে দেখলাম চোদ্দ বছর আট মাস আগেকার তোলা ছবি।

আই, এস, সি পরীক্ষা দেবার পরই তোলা ফটোটা। কলেজে আই, এস, সি পরীক্ষা আমরা যে সব ছাত্ররা একত্রে দিয়েছিলাম তারাই তুলেছিলাম ফটোটা।

ফটোর নীচে—সবার পরিচয় পর পর নাম লেখা আছে।

নামগুলো পড়তে পড়তে এক জায়গায় চোখটা যেন আটকে গেল : রমেন্দ্র শিকদার।

পিছনের সারিতে যারা দাঁড়িয়ে তাদের মধ্যে প্রথম জনই বাঁয়ে হচ্ছে রমেন্দ্র শিকদার।

সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক কথাই যেন মনে পড়ে যায়।

স্মৃতির উপর থেকে যেন একটা কালো পর্দা উঠে যায়।

স্ত্রী মানসী এসে ঘরে ঢুকল, কি ব্যাপার ওদিকে চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল!

কে! ও মানসী? চমকে প্রশ্ন করি, কিছু বলছিলে?

ব্যাপারটা কি বল ত অফিস থেকে ফেরা অবধি অন্যমনস্ক দেখছি—anything wrong?

না, না—nothing!

কখন থেকে চা নিয়ে বসে আছি—

চল—আসছি।

বেচারী মানসী।

মানসীর দোষ দিই না। আজ আট বছর বিয়ে হয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত আমাদের কোন সন্তানাদি হয় নি।

কাজেই স্বামী স্ত্রী দুজনকেই নিয়ে আমাদের সংসার।

যতক্ষণ অফিসে থাকি মানসী বই পড়ে সেলাই নিয়ে কাটায় এবং অফিস থেকে ফিরে এলে কখনো আমরা এদিক ওদিক বন্ধু বান্ধবদের বাড়িতে যাই, কখনো মার্কেটিং—কখনো সিনেমা থিয়েটার দেখে সময় কাটাতে হয়।

যেদিন ওসব কিছুই হয় না সেদিনটা দুজনে তাস খেলে বা লুডো খেলে কাটাই।

চায়ের টেবিলে বসে চা খেতে খেতেই মনে পড়ে। রমেন্দ্র শিকদারের কথা মনে পড়ে।

নবদ্বীপ হাইস্কুল থেকে এসেছিল রমেন্দ্র।

ফার্স্ট ইয়ারে মাস দুই ক্লাস হয়ে যাবার পর রমেন্দ্র শিকদার এসে আমাদের কলেজে ফার্স্ট ইয়ার আই, এস, সিতে ভর্তি হয়েছিল।

নাদুস নুদুস ছাবলা গোবলা চেহারা।

মাথায় ঘন কুঞ্চিত কেশ। নাকটা একটু ভোঁতা। সামনের দাঁত দুটো একটু উঁচু।

পরিধানে মালকোছা এঁটে ধুতি পরা ও গায়ে সবুজ রংয়ের ছিটের হাফ সার্ট। নজর পড়বার মত চেহারা বা পোষাকে কিছুই ছিল না।

রেজাল্ট ও সাধারণ ফার্স্ট ডিভিসন মাত্র।

তবু নজর পড়েছিল অবিলম্বে সকলেরই ওর পরে দুটি কারণে। প্রথমতঃ কথা বললে মনে হতো ও কথা ত বলছে না, গান গাইছে, এবং দ্বিতীয়তঃ অদ্ভুত বাঁশী বাজাত।

আরো একটা গুণ ছিল সে গুণের অনুশীলন করলে ও হয়ত একজন প্রথম শ্রেণীর গায়িতিক হতে পারত কিন্তু যার অনুশীলন ও কোন দিন করেনি।

অঙ্কে অদ্ভুত মাথা।

অঙ্কের প্রফেসার মিঃ রুদ্র কতদিন আক্ষেপ করেছেন, রমেন্দ্র যদি দিনে আধ ঘণ্টাও মন দিয়ে অঙ্ক করত he could secure record marks.

কিন্তু আধঘণ্টা কেন দশ মিনিটও যে কোন দিনও মন দিয়ে অঙ্ক করেনি।

এত গেল রমেন্দ্রর একটা দিক।

রমেন্দ্রর আর একটা দিক হচ্ছে ইন্দুলেখা চৌধুরী।

আমাদের ফার্স্ট ইয়ার আই, এ-তে দুটি ছাত্রী ছিল। এক ফিলসফীর অধ্যাপক যতীন চৌধুরীর মেয়ে ইন্দুলেখা চৌধুরী, দ্বিতীয় স্থানীয় উকিল মহেন্দ্র সেনের মেয়ে প্রমীলা সেন।

আই, এ হলেও ইন্দুলেখার কম্বিনেশন ছিল সংস্কৃত লজিক ও অঙ্ক।

অঙ্কের জন্যই ইন্দু আমাদের সঙ্গে অঙ্কের ক্লাস একত্রে করত।

ইন্দুলেখা কলেজেরই অধ্যাপকের মেয়ে ছিল একে তার উপরে আবার ভীষণ গম্ভীর প্রকৃতির মেয়ে বলে কেউ আমরা তার সঙ্গে ভাব করবার চেষ্টা দূরে থাক কথা বলবারও কখনো কোন চেষ্টা করিনি।

কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেলাম সাত দিনের মধ্যেই যখন শুনলাম ইন্দুলেখার সঙ্গে রমেন্দ্রর খুব ভাব হয়ে গিয়েছে।

সত্যি কথা বলতে কি কথাটা প্রথমে বিশ্বাস করিনি।

বিশ্বাস করিনি প্রথমটায় অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য বলে এবং দ্বিতীয়তঃ বোধকরি পরাজিতের হিংসায় কমপ্লেক্সে।

আমরা এতদিন পড়েও আলাপ করতে পারলাম না কেউ অথচ রমেন্দ্র এসেই আলাপ করে নিল।

কথাটা প্রথমে শুনেছিলাম সুজিৎ নাগের মুখে।

আমাদের ক্লাসের গেজেট ছিল সুজিৎ নাগ।

বললাম nonsense। ধাপ্পা মারবার আর জায়গা পাসনি।

ধাপ্পা নয় বন্ধু! you can bet।

Bet!

কত।

একটাকা।

বেশ আজই দেখাবো।

কখন!

বিকেলে—কলেজের মাঠে আসিস দেখ্‌বি।

কথাটা বলে সুজিৎ নাগ চলে গেল।

॥ ২ ॥

সুজিৎ নাগ চলে গেলেও কিন্তু কথাটা আমার মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

মন কিছুতেই মানতে চায় না। অসম্ভব। absurd।

ইন্দুলেখা চৌধুরী আমাদের দুটি ছাত্রীর একটি ছাত্রী ছিল বলেই শুধু নয়—ইন্দুলেখা সত্যিই যেন ছিল সেই সংস্কৃত কাব্যের প্রিয়া।

দীঘল পাতলা চেহারা। গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম।

মুখের শ্রী ছাঁদে অপূর্ব কিছু না হলেও অপূর্ব একটা মাধুর্যমণ্ডিত কমনীয়তা ছিল। এবং যে মুখখানি সে সময় কত দিন রাত্রের ঘুমের ব্যাঘাত করেছে।

তরুণ মনকে উদ্বেলিত করেছে।

নিশি জাগিয়েছে।

এবং যার সঙ্গে আলাপ করতে পারলে আমাদের পঁচাত্তর জন ছাত্রের মধ্যে যে কেউ নিজেকে ধন্য ও গর্বিত মনে করত সেই তারই সঙ্গে কিনা আলাপ হলো অবশেষে নবাগত অখ্যাত অজ্ঞাত রমেন্দ্রর।

ধ্যাৎ, সব বাজে—মিথ্যা ধাপ্পা

সুজিৎ নাগের চাল।

কিন্তু মিথ্যা বা চাল যে নয় সেটা প্রমাণ হয়ে গেল পরের দিনই সন্ধ্যার দিকে।

সন্ধ্যারাত। সবে ছয়ত সাড়ে ছয়টা হবে। কলেজের খেলার মাঠ থেকে আড্ডা দিয়ে ফিরছি, আমি সুজিৎ ও পরিতোষ।

কলেজ থেকে যে পথটা বের হয়ে এঁকে বেঁকে সোজা শহরের দিকে চলে গিয়েছে, কলেজ, মাঠের পরে তারই দুদিকে খানিকটা খানিকটা তফাৎ তফাৎ সব প্রফেসারদের কোয়ার্টার। কলেজের পরে প্রথমেই প্রিন্সিপ্যালের কোয়ার্টার।

তারপরই কিছুটা তফাতে ইংরাজীর অধ্যাপক চিন্তাহরণ বাবুর কোয়ার্টার, তারপরই ফিলজফির অধ্যাপক রঙ্গীন চৌধুরীর কোয়ার্টার।

বাংলো প্যাটার্নের সব সামনে বাগানওয়ালা একতলা কোয়ার্টার।

রঙ্গীন চৌধুরীর কোয়ার্টারের সামনে আসতেই সুজিৎ নাগ আমার বাঁ হাতে একটা চিমটি কেটে আমাকে সজাগ করে দিল, এই—

কি চিমটি কাটিস।

বিরক্ত কণ্ঠে আমি প্রতিবাদ জানাই।

ঐ যে—

এতক্ষণে খেয়াল হয়। চেয়ে দেখি অধ্যাপক রঙ্গীন চৌধুরীর গেটের সামনে পাশাপাশি ঘনিষ্ঠভাবে দাঁড়িয়ে রমেন্দ্র ও ইন্দুলেখা।

স্পষ্টই দেখতে পাই ওদের কারণ অদূরেই পথের মিউনিসিপ্যালিটির আলো ওদের গায়ে মাথায় এসে পড়েছে।

আমাদের ওরা দেখতে পেয়েছিল কিনা জানি না। আর দেখতে পেলেও আমাদের দিকে তাদের সে সময় তাকাবার ফুরসুৎ হয়েছিল কি না জানি না।

কিন্তু আমাদের কানে এলো হাসির একটা উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ।

খিল খিল করে হাসচে ইন্দুলেখা। সেই হাসির সঙ্গে হাসি মিলল রমেন্দ্রর।

কি রে বিশ্বাস হলো ত।

সুজিতের কথায় কোন সাড়া দিলাম না।

ঐ ঘটনারই দিন সাতেক বাদে আবার দেখলাম ওদের।

সেদিনটা ছিল দোল পূর্ণিমার রাত।

আকাশে জ্যোৎস্নার প্লাবন বইছে।

হোষ্টেলে ফিরছিলাম হঠাৎ কানে এলো সুমধুর বংশীধ্বনি। এত মিষ্টি বাঁশী জীবনে কখন আমি শুনিনি।

কোথা থেকে বাঁশীর সুর আসচে—দেখি কলেজের মাঠ থেকে।

এগিয়ে গেলাম।

এবং এগিয়ে যেতেই দৃশ্যটা চোখে পড়ল পরিপূর্ণ চন্দ্রালোকে।

মাঠের উপর বসে বাঁশী বাজাচ্ছে রমেন্দ্র আর তার সামনে কমুইয়ের উপর ভর দিয়ে আধ শোয়া অবস্থায় বাঁশী শুনচে ইন্দুলেখা।

তারপর অবিশ্যি ক্রমে আরো জেনেছিলাম ওদের পরস্পরের আলাপের কথা, ঘনিষ্ঠতার কথা। এবং ক্রমশঃ উত্তেজনাটা কমে গিয়ে ব্যাপারটা সাধারণের পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছিল।

কেউ আর তেমন মাথা ঘামাই নি।

ওদিকে নজরও দিই নি।

সবার দৃষ্টি আবার নতুন করে ওদের উপর গিয়ে পড়ল বছর দুই বাদে।

বছর দুই বাদ তখন আমরা সবে ফোর্থ ইয়ারে উঠেছি আকস্মিক একটা সংবাদে আমরা সবাই যেন চমকে উঠলাম।

প্রথমটায় সত্যিই কেউ বিশ্বাস করতে পারিনি।

কিন্তু বিশ্বাস না করলেও ব্যাপারটা যে সত্যি সেটা জানতেও বিলম্ব হলো না।

রমেন্দ্র আর ইন্দুলেখা ওরা নাকি রেজিষ্ট্রী করে বিবাহ করেছে কলকাতায় গিয়ে।

কথাটা প্রথম জানাল আমাদের ক্লাসের গেজেট সুজিৎ নাগ। এবং দেখতে দেখতে কথাটা যেন সমস্ত কলেজময় আগুনের মতই ছড়িয়ে গেল।

সে দিনটা দুজনের একজনকেও কলেজে দেখা গেল না—রমেন্দ্র বা ইন্দুলেখা কাউকেই।

কিন্তু পরের দিন ফার্ষ্ট পিরিয়ডে ইংলিশের ক্লাসে দুজনকেই দেখলাম।

যে যার নিজের সীটে শান্ত হয়ে বসে আছে।

একজন ইন্দুলেখা বসত ফার্ষ্ট বেঞ্চে ও রমেন্দ্র বসত ফিফথ্ বেঞ্চে।

সেদিন মনে আছে কেউ আমরা অধ্যাপকের জুলিয়াস সিজার পড়ান একটি বর্ণও শুনিনি।

কারো কানে আমাদের একটি বর্ণও প্রবেশ করে নি।

ক্লাসের একশ পঞ্চাশ জোড়া চোখই বার বার ঘুরে আড় দৃষ্টিতে একবার রমেন্দ্রর দিকে ও একবার ইন্দুলেখার দিকে তাকাচ্ছিল।

একটা পরমাশ্চর্য ব্যাপার যেন ঘটে গিয়েছে।

পরমাশ্চর্যই বৈকি। আমাদের ছাত্র জীবনে ঐ বোধহয় সর্বপ্রথম এমন একটি ঘটনা ঘটলো যা ইতিপূর্বে আমাদের কল্পনারও অতীত ছিল।

যুক্তি ও চিন্তার বাইরে ছিল।

ওরা দুজনে যেন রাতারাতি সেদিন বিশ্ববিজয়ীর সম্মান লাভ করেছে।

রাতারাতি যেন ওরা বিস্ময় শ্রদ্ধা ও গর্ব আমাদের সকলের জয় করে নিয়েছে।

কত কথাই মনে হয়েছিল সেদিন।

কেমন করে ওরা পারল।

সত্যিই কি ওরা বিয়ে করেছে না মিথ্যা। ক্লাসের গেজেট সুজিত নাগের একটা ভুয়ো সংবাদ মাত্র।

কিন্তু ওরা ত কেউ কারো দিকে ভুলেও তাকাচ্ছে না।

একটুখানি তাকান বা একটুখানি হাসি পরস্পরের পরস্পরের দিকে তাকিয়ে। কই। কিছুই ত নেই।

দুপুরের দিকে লাইব্রেরীর সামনে অধ্যাপক চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হলো।

তাঁর মুখেও ত কোন রকম চিন্তা বা বিষন্নতার আভাষ

দেখলাম না। তবে কি তিনি এখনো পারেন নি।

তাই বা কি করে হবে। কলেজ শুদ্ধ সবাই জেনে গেল আর বাপ হয়ে উনি জানতে পারেন নি এখনো।

না কি ওর মত নিয়েই ওরা বিবাহ করেছে।

হঠাৎ যেন মানসীর ডাকে চমকে উঠলাম, কি হলো সিঙ্গাড়া আর চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

য়্যাঁ—হ্যাঁ—এই যে—বলে একটা সিঙ্গাড়া প্লেট থেকে তুলে নিলাম। কিন্তু পরক্ষণেই আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি।

কলেজ লাইফের রমেন্দ্র শিকদার আর ইন্দুলেখা চৌধুরী মনের সমস্তটা জুড়ে ভেসে ওঠে।

পাশাপাশি একটি ছেলে একটি মেয়ে।

কি হলো। চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল? আবার তাগিদ দেয় মানসী।

তাড়াতাড়ি চায়ের কাপটা ঠোঁটের আগায় তুলে দেখি সত্যিই চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে।

কি ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে নিশ্চয়ই।

হ্যাঁ—

দাও—

ঠাণ্ডা চা-টা ফেলে দিয়ে এক কাপ গরম চা আবার দিল মানসী।

বাইরে আবার ঐ সময় ঝর্ ঝর্ করে বৃষ্টি শুরু হলো।

অধ্যাপক চৌধুরী, মনে পড়লো হঠাৎ, তাঁর একমাত্র কন্যা ইন্দুলেখাকে যে দিন বাড়ি থেকে বের করে দেন সে দিনও ঠিক সন্ধ্যার দিক থেকে এমনি বৃষ্টিই নেমেছিল।

আকাশ যেন ভেঙে পড়েছিল।

তবু এতটুকু দোমনা করেন নি অধ্যাপক চৌধুরী।

মেয়েকে নাকি বলেছিলেন, এখন ত তোমার স্বামীই হয়েছে, এখানে আর নয়। তোমার স্বামীর কাছেই যাও।

ইন্দুলেখাও আর দ্বিরুক্তি করেনি, অনুরোধও জানায়নি।

সোজা সেই বৃষ্টির মধ্যেই বের হয়ে এসে উঠেছিল আমাদের হস্টেলে।

আবার মানসী তাগিদ দেয়, কি ভাবছো বলত সেই তখন থেকে।

না। কিছু নয়ত।

নিশ্চয়ই কিছু ভাবছ।

না, না—কি আবার ভাবব।

চায়ের কাপে আবার চুমুক দিই।

॥ ৩ ॥

মানসীকে এড়াবার জন্যই অতঃপর বলি, চল না মানসী, এমন বর্ষণ-মুখর রাত—একটু সেতার বাজিয়ে শোনাবে চল।

ব্যাপার কি! হঠাৎ সেতার শোনার সখ!

তির্যক দৃষ্টিতে মানসী আমার দিকে তাকায়।

তোমার সেতার বুঝি কখনো আমি শুনি না! মৃদু হেসে প্রত্যুত্তর দিই।

তা শোন নি বললে মিথ্যাই বলা হবে। এই আট বছরে আট দশদিন শুনেছো বৈকি।

মিথ্যা কথা বলো না মানসী। মাত্র আট দিন।

না হয় বার দিন।

বেশ। বেশ—হয়েছে। এখন চলত বাজাবে।

যথা আজ্ঞা দেব। চল—

দুজনে গিয়ে অতঃপর শোবার ঘরে আমি চেয়ারে বসলাম আর মানসী ঘরের কম পাওয়ারের আলোটা জালিয়ে দিয়ে সেতারটা নিয়ে গিয়ে হাঁটু মুড়ে খাটের উপর বসল।

টুং টাং···করতে আলাপ শুরু করে মানসী।

মল্লার বাজাতে শুরু করে।

মল্লারের আলাপ শুনতে শুনতে যেন চমকে উঠি।

এ সুর ত আমার অপরিচিত নয়।

বছর তের আগে ঠিক এমনি আলাপ ধরেছিল বাঁশীতে রমেন্দ্র।

রমেন্দ্র বাঁশীতে মল্লার বাজাচ্ছিল।

সেদিনও ঠিক বাইরে এমনি আষাঢ় বর্ষণ শুরু হয়েছিল। এমনি অবিশ্রান্ত ঝরঝরানীর সুর বাইরে আর ঘরের মধ্যে বসে বাঁশীতে মল্লার বাজাচ্ছিল রমেন্দ্র।

কে যেন ঝম্ ঝম্ শব্দে মৃদঙ্গ বাজিয়ে চলেছে। রুমাঝুম্—রুমা ঝুম।···ঝুম···ঝুম।

হঠাৎ বন্ধ দরজার গায়ে মুহু মুহু করাঘাত শোনা গেল।

অস্থির অশান্ত করাঘাত।

সুজিৎ নাগের ঘরে বসে তারই অনুরোধে বাঁশী বাজাচ্ছিল রমেন্দ্র।

আকস্মিক করাঘাতে তাল ভঙ্গ হওয়ায় বিরক্ত হয়ে সুজিৎই উঠে গিয়ে ঘরের দরজাটা খুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে এক পশলা জলো হাওয়া ও সর্বাঙ্গ ভিজে সপ্ সপ্ করছে ইন্দুলেখা এসে ঝড়ের মত ঘরে ঢুকল।

রমেন।

কে! একি ইন্দু। কি ব্যাপার?

রমেন্দ্র ততক্ষণে বসেছিল উঠে দাঁড়িয়েছে।

আমরা চার পাঁচজন যারা ঘরের মধ্যে ছিলাম তারাও ঘটনার আকস্মিকতায় ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছি।

বাবা এইমাত্র বলছিলেন বাড়িতে নাকি আর আমার জায়গা হবে না।

কথাটা কিন্তু অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠে বললে ইন্দুলেখা। গলায় কোথায়ও উত্তেজনার এতটুকু আভাষ মাত্রও নেই।

কিন্তু তুমি যে একেবারে ভিজে গিয়েছো ইন্দু! রমেন্দ্র বলে।

এতক্ষণে আমরাও যেন ব্যাপারটায় সজাগ হয়ে উঠি। সত্যিই ত ভিজে একেবারে একশা হয়ে গিয়েছে ইন্দুলেখা।

দাঁড়াও—সব শুনব। আগে ভিজে জামা কাপড়গুলো ছেড়ে ফেল।

রমেন্দ্র এগিয়ে গেল তার টিনের বাক্সটার দিকে, খোঁজ করি একটা ধুতি বের করে দেবার জন্য।

আমরা তাড়াতাড়ি সকলে ঘর থেকে বের হয়ে এলাম।

এবং এও বুঝলাম সুজিৎ নাগের কথাটা তাহলে মিথ্যা নয়। সত্যিই। সত্যিই ওরা বিবাহ করেছে।

সেদিন মনে হয়েছিল আর যাই হোক রমেন্দ্র শিকদারের বুকের পাটা আছে, সাহস আছে। অন্ততঃ আমরা পারতাম না।

এও ভেবেছিলাম কি করে অতখানি সাহস হলো রমেন্দ্র শিকদারের।

অতবড় ঝুঁকি সে কোন সাহসে নিল।

বাড়ির অবস্থা ত জানতাম আমরা রমেন্দ্রর।

সাধারণ গৃহস্থ ঘরের ছেলে।

বাপ নবদ্বীপ মিউনিসিপালিটিতে সামান্য মাইনের চাকরি করে। তবে বাড়ি একটা আছে নবদ্বীপ টাউনে এবং জমি জমা কিছু আছে।

রমেন্দ্রর মা নেই। দুই ভাই ওরা—রমেন্দ্রই বড়।

আর ইন্দুই বা রমেন্দ্রর ভিতর কি এমন পেল যে তাকে একেবারে ভালবেসে বিয়ে করে ফেলল রেজিষ্ট্রি করে মা বাপ কাউকে কিছু না জানিয়ে।

সত্যি কথা বলতে কি ব্যাপারটার মধ্যে সেদিন বিস্ময়ের চাইতে হিংসার ভাবটাই যেন বেশী ছিল। নিজের তারুণ্য ও পৌরুষ যেন রমেন্দ্রর কাছে অত্যন্ত ছোট বোধ হচ্ছিল। ক্লাশের আমাদের এতগুলো তরুণের মুখে যেন রমেন্দ্র শিকদার চুনকালী মাখিয়ে দিয়েছিল।

আমরা যেন সবাই হেরে গিয়েছি।

নিদারুণ পরাজয় ঘটেছে আমাদের।

সে রাত্রে সুজিৎ নাগের ঘরটাই ছেড়ে দেওয়া হলো ইন্দুলেখার রাত্রিবাসের জন্য।

সমস্ত হোষ্টেলময় সে কি এক উত্তেজনা।

এক বর্ষামুখর রাত্রে হঠাৎ যেন হোষ্টেলটার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার হয়েছে। ভাগ্যি সে রাত্রে আমাদের হষ্টেল সুপারিনটেনডেন্ট্ জমাদাস বাবু উপস্থিত ছিলেন না।

তিনদিনের ছুটিতে বাড়ি গিয়েছিলেন।

আমরাই সে রাত্রে হষ্টেলের হর্তাকর্তা বিধাতা।

সারাটা রাত ধরে সে কি বৃষ্টি।

বিরামহীন বিশ্রামহীন বৃষ্টি।

যেমন বৃষ্টি, তেমনি এলোমেলো হাওয়া তেমনি শুরু শুরু মেঘের ডাক ও বিদ্যুতের চোখ ঝলসানো আলো।

সাধারণতঃ যে সময়টায় ঘুম ভাঙ্গে সে সময় কারোরই ঘুম ভাঙ্গেনি।

ঘুম ভাঙ্গল সুজিতেরই ডাকে, এই ব্রজেন্দ্র ওঠ—ওঠ—

ধড়পড় করে উঠে বসলাম, কি ব্যাপার?

ওরা চলে গিয়েছে।

কারা আবার চলে গেল?

ঘুমভাঙা চোখে অবাক বিস্ময়ে সুজিতের মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্নটা করি।

রমেন্দ্র আর ইন্দুলেখা।

সে কি।

হ্যাঁ—ঘর খালি আর এই চিঠিটা বিছানার উপর একটা বই চাপা দেওয়া ছিল।

একখানা ভাঁজ করা কাগজ এগিয়ে দিল সুজিৎ আমার দিকে।

পাশের খাটে আমার রুম মেট পরিতোষ ছিল সেও এগিয়ে আসে ততক্ষণে।

বৃষ্টি বোধ হয় শেষ রাতে থেমে গিয়েছিল।

কিন্তু বৃষ্টি থামলেও আকাশের মেঘলা ভাবটা কাটেনি।

সারাটা আকাশ জুড়ে তখনো মেঘের আনাগোনা চলেছে।

ইতিমধ্যে আরো অনেকেই সংবাদটা পেয়ে আমাদের ঘরে এসে কৌতূহলে হাজির হয়।

চিঠির ভাঁজটা খুলে আমিই পড়লাম :

ব্রজেন্দ্র,

আমরা চলে যাচ্ছি।

যাওয়ার আগে তোমাদের জানিয়ে যেতে পারলাম না বলে সত্যিই দুঃখিত। জানিয়ে গেলাম না এই জন্য যে—শেষে তোমরা হয়ত আমাদের যেতে দিতে না। অথচ আমাদেরও আর এখানে থাকা সম্ভবপর নয়।

জীবনে আর দেখা হবে কিনা জানি না।

কিন্তু যদি দেখা নাও হয় তাহলেও তোমাদের ভালবাসার কথা চিরদিন আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করব। তোমরা সকলে আমাদের প্রীতি নিও।

ইতি—তোমাদের রমেন্দ্র ও ইন্দুলেখা।

চিঠিটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ মনে হয়েছিল যেন সব খালি হয়ে গেল।

সমস্ত হস্টেলটাই যেন খালি হয়ে গেল।

সে কি এক বিচিত্র অনুভূতি।

সবাই আছে অথচ যেন কেউ নেই।

সব আছে অথচ কিছুই যেন নেই।

ব্যর্থ এক শূন্যতা ও হাহাকার। তারপর অনেকদিন পর্যন্ত মনটা বিষণ্ণ ছিল।

কিছু ভাল লাগত না।

তারপর যেমনটি হয় ক্রমে সব সয়ে গেল।

আবার আমাদের স্বাভাবিক দৈনন্দিন ছাত্র জীবনের মধ্যে আমরা ডুবে গেলাম।

ভুলে গেলাম যেন আমরা রমেন্দ্র আর ইন্দুলেখাকে।

পুরাণো বইয়ের পাতার মত যেন উল্টে গেলাম পড়া এক কাহিনীকে।

তারও পরে একদিন পাশ করে সেখান থেকে চলে এলাম এম, এ পড়বার জন্য কলকাতায়।

॥ ৪ ॥

চোদ্দ বছর পরে আজ আবার দেখা রমেন্দ্রর সঙ্গে।

জীবনের বাঁকে বাঁকে কবে সেই চোদ্দ বছর আগেকার চেনা একখানি মুখ মুছে গিয়েছিল, হারিয়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ হয়ত তাই আজ সন্ধ্যায় কলেজ ষ্ট্রীটে তাকে দেখে চিনতে পারি নি।

তাছাড়া চোদ্দ বছর পরে কাউকে দেখেও ত চেনা সহজ নয়।

কিন্তু আশ্চর্য!

রমেন্দ্র ঠিক চিনেছিল আমায়।

কেমন করে চিনল সে চোদ্দ বছর পরে আমাকে দেখে। আমি কি এতটুকুও বদলাইনি এই চোদ্দ বছরে।

নিশ্চয়ই বদলেচি। তবে—

হঠাৎ ঐ সময় স্ত্রীর ডাকে সম্বিৎ ফিরে এলো, এবারে কি বাজাবো বলো?

চমকে উঠলাম।

সেতারে মল্লার কখন শেষ হয়ে গিয়েছে জানতে পারি নি।

পাছে ব্যাপারটা জানতে পারলে স্ত্রীর অভিমান হয় তাই বললাম, এবার তোমার যা খুশি বাজাও।

ঘরনী আবার সেতারে সুর তোলে।

আমিও অতীত চিন্তার মধ্যে আবার ডুব দিই।

ঐ ঘটনার পর এক মাস কেটে গিয়েছে।

আরো আট দশ দিন তারপর কলেজ ষ্ট্রিটে গিয়েছি কিন্তু রমেন্দ্রর সঙ্গে দেখা হয়নি।

দেখা হলো এক মাস পরে ডায়মণ্ড থিয়েটারে।

রবিবার থিয়েটারে গিয়েছি স্বপ্নীক।

বন্ধুরই লেখা কি একটা বই হচ্ছিল।

ফার্ষ্ট ড্রপের পর বাইরের লবীতে এসে সবে একটা সিগ্রেট ধরিয়েছি হঠাৎ নজরে পড়লো অল্প দূরে একজন মধ্যবয়েসী ভদ্রলোকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গল্প করছে রমেন্দ্র।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে ডাকলাম, রমেন্দ্র?

কে? আরে ব্রজেন যে! তুমি এখানে?

থিয়েটার দেখতে এসেছি, তুমিও থিয়েটার দেখতে এসেছো নাকি?

মৃদু হাসে রমেন্দ্র।

বলে, না—

তবে এখানে?

এখানে যে চাকরি করি সন্ধ্যার পর।

চাকরি কর এখানে?

এখানকার অর্কেষ্ট্রায় মিউজিক হ্যাণ্ড। মানে বাঁশী বাজাই—

কেমন যেন আশ্চর্য হই।

ইন্দুলেখার স্বামী রমেন্দ্র থিয়েটারে বাঁশী বাজায়।

তারপরই হঠাৎ রমেন্দ্র বলে, এলো না একদিন—

কোথায়?

কেন আমার বাড়িতে। কাছেই থাকি! ওকে তোমার কথা বলছিলাম। আলাপও হবে ওর সঙ্গে।

ও।

অর্থাৎ রমেন্দ্রর স্ত্রী ইন্দুলেখা।

সেই ইন্দুলেখা চৌধুরী।

লোভ জাগে সঙ্গে সঙ্গে মনে। মনে হয় মন্দ কি? একবার দেখলে হয় চোদ্দ বছর আগেকার আমাদের ক্লাশের কুইন ইন্দুলেখা চৌধুরীকে।

চৌধুরী নয় শিকদার।

চোদ্দ বছর পরে কেমন হয়েছে সে দেখলে হয়।

বললাম, বেশত। যাবো। কোথায় তোমার ঠিকানা।

ইতিমধ্যে ড্রপ উঠবার বেল বাজতে শুরু করেছিল ঠিকানাটা নিয়ে চলে গেল স্টেজের দিকে রমেন্দ্র।

এক শনিবার ছুটির পর গিয়ে হাজির হলাম রমেন্দ্রর গৃহে।

গলি গলি ভন্ন গলি। বাড়িটা খুঁজে বের করতেই প্রাণান্ত হয়েছিল।

ভাগ্যে রমেন্দ্র গৃহেই ছিল নচেৎ সমস্ত পরিশ্রমই ব্যর্থ হতো।

ছোট একতলা একটা বাড়ির তিনখানা ঘর নিয়ে থাকে রমেন্দ্র।

ভাল করে দিনের বেলাতেও আলো ঢোকে না।

ছমছমে একটা আলোছায়ার রহস্য যেন বাড়িটার মধ্যে।

আমি নাম ধরে ডাকতেই রমেন্দ্র সাড়া দেয় কে?

আমি হে—

জানালা পথে মুখ বাড়াল রমেন্দ্র, কে? আরে গুপ্ত সাহেব, এসো, এসো—কি সৌভাগ্য আমার—শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যিই তুমি এলে।

বলতে বলতে অভ্যর্থনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে রমেন্দ্র দরজাটা খুলে দিয়ে:

এসো—এসো—

যে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলাম, সেটাই বোধ করি বৈঠকখানা হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

একটি কাঠের তক্তাপোষ পাতা এক ধারে।

অন্য দিকে ছোট একটি টেবিল ও খান দুই চেয়ার।

তুমি আসবে ভাবতেই পারিনি ভাই। আমাদের মত লোকের কুঁড়ে ঘরে তুমি পা দেবে—

থাক। থাক—হয়েছে। বাধা দিলাম আমি, formalities রাখত।

Formalities নয় ভাই। এ তুমি ঠিক বুঝবে না। দাঁড়াও—আমার স্ত্রীকে ডাকি বলেই অনুচ্চ কণ্ঠ গলা তুলে ডাকে। গেলে কোথায়। শুনছো দেখে যাও কে এসেছে আমাদের ভাঙ্গা ঘরে—

থাক। থাক ব্যস্ত হচ্ছো কেন।

ব্যস্ত হচ্ছি যানে। বলি শুনছো! আবার হাঁক পাড়ে রমেন্দ্র।

কে এলো?

বলতে বলতে এক ভদ্রমহিলা ঘরে এসে পা দিলেন।

আওয়াজ পাড়া পেয়ে দরজার দিকে ফিরে তাকিয়ে যেন স্তব্ধ হয়ে গেলাম। অবাক বিস্ময়ে একেবারে থমকে গেলাম।

কে! কে ও!

রোগাটে বেঁটে খাটো একটি ভদ্রমহিলা।

গায়ের রঙ রীতিমত যাকে বলে কালই।

পরিধানে একটি মলিন লাল পাড় তাঁতের শাড়ী। সিঁথিতে ও কপালে সিন্দুর এয়োতির চিহ্ন। হাতে শাঁখা ও দুগাছি করে চুড়ি।

তবে কালো হলেও অপরূপ মুখশ্রী।

যেমন কপাল তেমনি ভ্রু, তেমনি চোখ যেন তুলনা হীন।

ওষ্ঠপ্রান্তে মধুর একটু হাসি।

কে ও—এত ইন্দুলেখা নয়। এর অর্থ কি?

রমেন্দ্রই বলে, আমার স্ত্রী—সাবিত্রী আর ইনি হচ্ছেন আমার একদা ক্লাশ ফ্রেণ্ড বিরাট অফিসার মানুষ এখন ব্রজেন্দ্র গুপ্ত। অর্থাৎ গুপ্ত সাহেব।

নমস্কার।

দুহাত তুলে ভদ্রমহিলা স্মিত হাস্যে নমস্কার জানো আমাকে।

ঘন্টাখানেক ছিলাম তারপর।

কিন্তু কেন যেন সব কেমন সুর কেটে গিয়েছে বলে মনে হচ্ছিল। সুরেলা একটা পরিবেশ যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

দেখলাম রমেন্দ্রর স্ত্রী সাবিত্রীর একটা শিক্ষা আছে, একটা রুচি আছে। কথাবার্তায় কেবল পরিশুদ্ধই নয় মনোমুগ্ধকর।

আসার সময় রমেন্দ্র আমাকে গাড়ি পর্যন্ত বড় রাস্তায় তুলে দিতে এলো যখন তখন প্রশ্নটা আর চেপে রাখতে পারলাম না।

ডাকলাম, রমেন্দ্র?

কি ভাই!

If you don't mind একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।

বুঝেছি কি জিজ্ঞাসা করতে চাও!

বুঝেছো!

হ্যাঁ, ইন্দুলেখার কথা ত।

হ্যাঁ, মানে—

সে ভাই অনেক কথা। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দু'মিনিটে ত সারা যাবে না। আর একদিন সময় হলে শুন।

কিন্তু—

কি?

সে কি তবে—

না। যতদূর জানি বেঁচেই আছে।

তবে—

তবে যা দেখলে তার অর্থ কি তাই না। তার সঙ্গে অনেক দিন আগেই Seperation হয়ে গিয়েছে।

Seperation হয়ে গিয়েছে?

হ্যাঁ—বিয়ের বছর খানেকের মধ্যেই।

Seperation—you mean divorce!

তাই।

সে এখন কোথায়?

কোথায়! এই কলকাতাতেই আছে।

এই কলকাতাতেই।

হ্যাঁ—একটা কলেজের প্রিন্সিপ্যালে বর্তমানে। বলে কলেজের নামটা বললে রমেন্দ্র।

বাড়ি ফিরে এলাম।

কিন্তু মনটা আমার আচ্ছন্ন করে রইলো ইন্দুলেখা ও রমেন্দ্রর দুর্বোধ্য ব্যাপারটা।

ভালবেসে যারা বিবাহ করে সব ছাড়ল তাদের বিবাহের বন্ধনটা এমন একটা পলকা সুতোর মত কেমন করে ছিঁড়ে গেল।

বছর খানেকের মধ্যেই সেপারেশন হয়ে গিয়েছে কথাটা কেবল অসম্ভবই নয় অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়।

কিন্তু কেন হলো শেষ পর্যন্ত সেপারেশন।

মনের অমিল।

মনে মনে ভাবি সেটাই ত স্বাভাবিক

সম্পূর্ণ বিপরীত দুটো সংসারে দুজনে বড় হয়েছে।

পরস্পরের রুচি শিক্ষা কোন কিছুর মধ্যেই ত মিল ছিল না। বিলাত ফেরৎ অধ্যাপক চৌধুরী—তার মেয়ে ইন্দুলেখা আর সামান্য গৃহস্থ ঘরের ছেলে অতি সাধারণ রমেন্দ্র শিকদার।

পরস্পরের মধ্যে যদি শেষ পর্যন্ত মতানৈক্য হয়েই থাকে তাতে আশ্চর্যের কি আছে।

কিন্তু তবু কোন সিদ্ধান্তেই যেন পৌঁছাতে পারি না।

একটা অন্ধকার গোলক ধাঁধার মধ্যে ঘুরতে থাকে মনটা। কোন পথ খুঁজে পাই না।

মনকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি কি হবে রমেন্দ্র আর ইন্দুলেখার অতীত ইতিহাসের পাতাগুলো অনর্থক আজ আবার উল্টে। যা অতীতের গর্ভে গিয়েছে তা অতীতের গর্ভে থাক না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কৌতূহলেই একদিন আবার গিয়ে হাজির হলাম রমেন্দ্রর ওখানে। ওদের ব্যাপারটা না জানতে পারা পর্যন্ত যেন কিছুতেই সুস্থির হতে পারছিলাম না। রমেন্দ্র ত আমাকে দেখে আশ্চর্যই হলো।

সেদিন সে একাই বাড়িতে ছিল তার স্ত্রী তার ছেলে মেয়ে দুটিকে নিয়ে মার কাছে গিয়েছিল—পরের রাত্রে ফিরবার কথা।

বাইরে খাটের উপর একটা লুঙ্গি পরিধানে ও গায়ে একটা ময়লা গেঞ্জী—শুয়ে একটা বাংলা উপন্যাস পড়ছিল।

আমাকে তাড়াতাড়ি চেয়ারটা এগিয়ে দিল, কি সৌভাগ্য, বোস বোস।

বসলাম চেয়ারটায়।

অফিস থেকেই আসছো বোধ হয়।

হ্যাঁ, হঠাৎ ছুটি হয়ে গেল। স্ত্রী গেছে দুদিনের জন্য জামসেদপুর তাই ভাবলাম কোথায় যাওয়া যায়—তোমার এখানেই চলে এলাম।

বেশ করেছো। তবে আমার স্ত্রীও গৃহে নেই। তা চা খাবেত।

চা!

হ্যাঁ—

তা মন্দ কি!

বেল, চায়ের জলটা চাপিয়ে দিয়ে আসি ছিটারে।

রমেন্দ্র ভিতরে চলে গেল।

আমি বসে বসে রমেন্দ্রর ফেলে যাওয়া অর্ধপঠিত উপন্যাসের পাতাগুলো উল্টাতে গিয়ে চমকে উঠলাম; উপন্যাসটা আমারই লেখা।

মনে হলো হঠাৎ ও হয়ত জানে না যে উপন্যাসটা ও পড়ছিল একটু আগে সে উপন্যাসের লেখক ওরই এক-কালের ক্লাশ ফ্রেণ্ড ব্রজেন্দ্র গুপ্ত।

মিনিট কয়েক বাদেই ফিরে এলো রমেন্দ্র।

একটা কথা তোমাকে বলা হয়নি ব্রজেন্দ্র—

কি কথা বলত।

একটা বিড়ি ধরাতে ধরাতে রমেন্দ্র বললে, পরে মনে হয়েছিল তুমি চলে যাবার পর তোমাকে বলা উচিত ছিল আমার—

ভনিতাটা বাদ দিয়ে কথাটা বলত!

আমার স্ত্রীর কথা—

তোমার স্ত্রীর কথা?

হ্যাঁ—মানে সাবিত্রী, আমার স্ত্রী—তোমাদের So called ভদ্র ঘরের মেয়ে নয়—

তবে?

থিয়েটারের এক অভিনেত্রীর মেয়ে—

হঠাৎ সংবাদটায় যেন কেমন মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলি, তাতে কি!

তাতে কিছু বইকি! অনেকে সে জন্য আমার বাড়িতে আসে না।

তোমার বাড়িতে আসে না।

না। থাক সে কথা। তোমাকে তাই কথাটা বলে দিলাম। তবে এও ঠিক ব্রজেন, ভদ্রঘরের মেয়ে না হলেও ওর ভিতরে যে একটা অন্তঃকরণ আছে সেটার তুলনা আমি আজ পর্যন্ত কমই পেয়েছি। কথাটা যে আমি বাড়িয়ে বলছি না, এতটুকু অত্যুক্তি নয় সাবিত্রীর সঙ্গে পরিচয় হলেই বুঝতে পারবে তুমি। তাছাড়া তুমি একজন সাহিত্যিক—

আমি যে সাহিত্যিক তোমাকে কে বললে?

আগে জানতাম না—যেদিন তোমার সঙ্গে থিয়েটারে দেখা হয় সেদিনই। আমার এক বন্ধু কথাটা আমাকে বলে। তার আগের অবিশ্যি তোমার অনেক বই পড়েছি কিন্তু বুঝিনি মনে কল্পনাও করতে পারিনি লেখক ব্রজেন্দ্র গুপ্ত ও তুমি একই ব্যক্তি। আর আজ যে তুমি আবার কেন এসেছো তাও জানি।

মৃদু হেসে বলি, তাও জান?

জানি বৈকি! না হয় থিয়েটারের অর্কেষ্ট্রায় বাঁশীই বাজাই—বি, এটা না হয় পাশই করিনি।

থাক, থাক—ওসব কথা থাক।

থাকবে কেন হে—রমেন্দ্র ও ইন্দুলেখার কথাই ত শোনবার জন্য এসেছো—বলবো। সবই বলব তোমাকে। তবে একটা কথা—

কি বলত!

সব শোনবার পর যদিই কোন কাহিনী লেখ ত একটি কাজ তোমায় করতে হবে।

কি কাজ!

ইন্দুলেখার কথা তুমি লিখতে পার কিন্তু রমেন্দ্র লোকটাকে ইন্দুলেখার সঙ্গে জড়াতে পারবে না।

সে কি হে?

তাই! after all একটা accident কোন কাহিনী হতে পারে না। তা ছাড়া যার উপরে ভিত্তি করে দুজনকে একত্রে গাঁথবে তারই কোন অস্তিত্ব ছিল না তাদের মধ্যে।

কি বলছো রমেন্দ্র?

খুব আশ্চর্য লাগছে ভাই কথাটা শুনে তাই না!

লাগছে বৈকি! তুমি কি বলতে চাও ইন্দুলেখা তোমাকে ভালবাসত না—তুমি তাকে বাসতে না।

আমার কথাত হচ্ছে না—তার কথা হচ্ছে। তার কথাই তোমাকে বলেছি।

বেশ। তাই—বলতে চাও সে তোমাকে ভাল বাসত না!

না।

শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে জবাবটা দেয় রমেন্দ্র।

চেয়ে থাকি রমেন্দ্রর মুখের দিকে।

বোস! চায়ের জল ফুটে গিয়েছে—চা'টা তৈরী করে নিয়ে আসি।

হঠাৎ উঠে ঘর থেকে বের হয়ে গেল রমেন্দ্র।

আমি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম।

॥ ৬ ॥

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতেই রমেন্দ্রর কাহিনী শুনতে থাকি।

রমেন্দ্র বলতে লাগল। মনে পড়ে তোমার ব্রজেন, সেই ঝড় জলের রাতটার কথা।

মনে পড়ে বৈকি। পরদিন ঘুম ভেঙে তোমাদের চিঠি পেলাম।

কৃষ্ণনগর থেকে সোজা ভোরের ট্রেনে কলকাতায় আসি।

কলকাতায়।

হ্যাঁ—কারণ সেই রাত্রেই ইন্দুকে আমি কথা দিয়ে ছিলাম যেমন করে হোক তার পড়ার ব্যবস্থা আমি করে দেবো। অবিশ্যি পারব বলেই কথা দিয়েছিলাম। বাবার কাছ থেকে একটি আধলাও সাহায্য পাবো না এবং বাবা আমাদের রেজিষ্ট্রী বিয়ে মেনে নেবে না প্রাণ থাকতে তাও জানতাম।

তবে?

দিদিমা মরবার সময় আমাকে হাজার পাঁচেক টাকা দিয়ে গিয়েছিল। সেই টাকাটা ব্যাঙ্কে ছিল। কলকাতায় এসে সেই টাকাটা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নিলাম এবং অনেক খুঁজে পেতে একটা আস্তানার জোগাড় করলাম।

চল্লিশ টাকা ভাড়ায় নীচের তলার দুখানা ঘর।

তারপর?

প্রথম রাত্রেই ইন্দুলেখা মাকে সিঁটকে বললে, এই ইন্দুরের খোপের মধ্যে কেউ থাকতে পারে না, এখানে থেকে কেউ পড়াশুনা করতে পারে।

মনে মনে আগেই স্থির করেছিলাম আমি আর পড়াশুনা করব না। চাকরি বাকরিরই একটা যাহোক চেষ্টা করব। ইন্দুর যখন এত পড়ার ইচ্ছা ও পড়ুক। কষ্টে সৃষ্টে আপাততঃ হাতে যা টাকা আছে আমি চালিয়ে নেবো। কিন্তু ইন্দুর কথায় যেন বসে গেলাম।

বললাম, তুমি আমার অবস্থার কথা সবই জান ইন্দু। এর চাইতে আপাততঃ ভাল ব্যবস্থা ত আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়।

তা হোক এখানে আমি থাকতে পারব না।

সারাটা রাত ইন্দু খেল না শুলো না। ঠায় একভাবে জানালার ধারে বসে রইল।

এক সময় সে দুঃখের রাত্রি ভোর হলো।

ভোর হতেই প্রথম কথা বললে ইন্দু, কি করবে একটা ব্যবস্থা কর!

তুমিই বল কি করব? রমেন্দ্র বলে।

তুমি হষ্টেলে থাকবার ব্যবস্থা করে দাও।

হষ্টেলে।

হ্যাঁ, যে কলেজে ভর্তি হলো। সেই হষ্টেলে যাতে থাকতে পারি সেই ব্যবস্থা কর।

রমেন্দ্র কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললে, বেশ। তাই হবে—

রমেন্দ্র সেই ব্যবস্থাই করল।

যে কলেজে ভর্তি হলো ইন্দুলেখা সেই কলেজের হষ্টেলেই সে গিয়ে উঠল।

রমেন্দ্র বাসাটা ছেড়ে দিয়ে একটা মেসে গিয়ে উঠল।

কিন্তু মেসে গিয়ে উঠলেই ত শুধু হবে না।

হাতে মাত্র পাঁচ হাজার টাকা। ইন্দুলেখার পড়ার খরচা চালিয়ে তার নিজেরই বা কয়দিন চলবে ঐ সামান্য টাকায়।

রোজগার তাকে করতেই হবে।

রমেন্দ্র রোজগারের ধান্দায় ঘুরতে লাগল। কিন্তু চাকরির বাজারটা এত সহজ নয় যে ঘুরলেই যাহোক একটা চাকরি মিলে যাবে।

মনটা সত্যিই ভেঙে গিয়েছিল রমেন্দ্রর।

ইন্দুলেখার কাছ থেকে অন্ততঃ ঐ ধরণের ব্যবহারটা সে আদৌ আশা করেনি। প্রচণ্ড একটা অভিমান রমেন্দ্রর মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

ইন্দুলেখার মাসে মাসের খরচের একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা ব্যাঙ্কের সংগে করে দিয়ে রমেন্দ্র দূরে সরে গেল।

একটা বছর দুজনার মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ পর্যন্ত হলো না।

কিন্তু যি, এ পরীক্ষার ফল যেদিন যেরূপ সেদিন ইন্দুলেখার নাম ইংরাজী সাহিত্যে অনার্স লিষ্টের প্রথম দিকে দেখে আনন্দে কতকটা আত্মহারা হয়ে দীর্ঘ এক বছর বাদে তাকে কনগ্র্যাচুলেশন জানাবার জন্য সন্ধ্যার দিকে গিয়ে হাজির হলো ইন্দুলেখার হষ্টেলে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করার পর ইন্দুলেখা এসে ওয়েটিংরুমে প্রবেশ করল।

আজকের ইন্দুলেখা যেন আরো মার্জিত,—আরো ঝকঝকে।

আর রমেন্দ্র এই এক বছরে তার বেশভূষায় ও চেহারায় যেন অনেক বেশী জীর্ণ হয়ে গিয়েছে।

দুজনের মধ্যে একটা আকাশ পাতাল প্রভেদ।

ইন্দুলেখার পরিধানে দামী শাড়ি না হলেও বাজারে শাড়ি। চোখে মুখে প্রসাধনের প্রলেপ।

ভ্রূ কুঁচকে ইন্দুলেখা শুধায়, তুমি হঠাৎ?

এক বছর পরে স্ত্রীর প্রথম সম্ভাষণ স্বামীকে।

এলাম—অমেতা আমতা করে বলে রমেন্দ্র।

তাই ত জিজ্ঞাসা করছি হঠাৎ কি মনে করে?

আর ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোয় রমেন্দ্রর নজরে পড়ল, ইন্দুলেখার সিঁথিতে বা কপালে সিন্দুরের চিহ্ন মাত্রও নেই।

বোবা দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে যেন ইন্দুলেখার মুখের দিকে, সিঁথি ও কপালের দিকে রমেন্দ্র।

ইন্দুলেখাও বোধহয় ব্যাপারটা বুঝতে পারে।

রমেন্দ্রর চাউনীর অর্থটা তার কাছে হয়ত আর অস্পষ্ট থাকে না।

বলে, কি দেখচো অমন করে আমার মুখের দিকে চেয়ে।

মৃদু হেসে রমেন্দ্র বলে। কিছু না—

বুঝতে পেরেচি।

কি?

সিঁদুর মুছে ফেলেছি এই ত?

না, না—তা কেন—

কি যেন বলবার চেষ্টা করে রমেন্দ্র কিন্তু তাকে থামিয়ে দিয়ে ইন্দুলেখা বলে, এখানে থাকতে হলে যে সম্মান টুকু বজায় রাখার প্রয়োজন তাতে করে ঐ সিঁদুর মুছে ফেলা ছাড়া আর আমার পক্ষে অন্য পথ ছিল না বলেই

ছুড়ে ফেলেছি—। তা ছাড়া ওটা এমন কিছু একটা নয়। আবার দিলেই হবে যখন প্রয়োজন হবে।

রমেন্দ্র ঐ সময় উঠে দাঁড়ায়। বলে, আমি তা হলে চলি।

চললে!

হ্যাঁ—

আমি কিন্তু এম, এ পড়বো ভাবছি—

নিশ্চয়ই পড়বে।

হ্যাঁ। এম, এ-টা পাশ করতে পারলে যাহোক একটা চাকরি জুটিয়ে নিতে পারবো। যদি ফার্ষ্ট ক্লাস পাই তবে ত কথাই নেই—

ব্যাঙ্কে যেমন ব্যবস্থা ছিল সেই ব্যবস্থাই থাকবে—তোমার এম, এ পড়ার কোন অসুবিধা হবে না।

আচ্ছা চলি—

কথাটা বলে রমেন্দ্র আর দাঁড়ায় নি।

ওয়েটিং রুম থেকে বের হয়ে এসেছিল।

ঐ শেষ।

আর পরস্পরের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হয় নি।

প্রশ্ন করলাম, তার পর?

তারপর আর কি—যেমন পূর্ববৎ চলছিল তেমনি চলতে লাগল। রমেন্দ্র বলে চলে।

অবশেষে রমেন্দ্র অনেক চেষ্টায় থিয়েটারে বাঁশী বাজাবার চাকরি পেল।

মাইনে বেশী নয় মাত্র সত্তর টাকা।

কিন্তু সামান্য সত্তর টাকায় তার চললেও ইন্দুলেখার খরচ ত চলবে না। তাছাড়া ব্যাঙ্কের টাকাও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

বলে থাকাকালীন সময়ে রমেন্দ্র একটা প্রেসে কম্পোজিটারীর কাজটা হাতে কলমে শিখেছিল—সেই কম্পোজিটারীরই একটা কাজ পেয়ে গেল ভাল একটা প্রেসে।

ষাট টাকা মাইনা।

মোট একশ ত্রিশ হলো।

আরো দুবছর অতিবাহিত হলো—ইন্দুলেখা এম, এ পাশ করল প্রথম শ্রেণী পেল না বটে তবে দ্বিতীয় শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করল।

এমনি সময় একদিন।

॥ ৭ ॥

সন্ধ্যার দিকে থিয়েটারে ঢুকতে যাবে সামনে এসে দাঁড়ালেন তার অধ্যাপক রথীন চৌধুরী।

ইন্দুলেখার বাবা।

অধ্যাপককে চিনতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে নীচু হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম জানায় রমেন্দ্র।

রথীন চৌধুরী বললেন, থাক। থাক—তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল রমেন্দ্র—

বলুন।

একটু সময় নেবে কথাটা—

বেশ তবে কাল আসুন আজ ত সময় নেই।

কাল তুমি আমার ভবানীপুরের বাসায় দুপুরের দিকে একবার আসতে পার না।

দুপুরের দিকে পারব না স্যার—সকাল আটটায় যেতে পারি।

তবে তাই এসো।

যাবো।

রথীন চৌধুরী চলে গেলেন।

দশ পাঁচ ভাবতে ভাবতে রমেন্দ্র থিয়েটারে গিয়ে ঢুকল।

ঐ ঘটনারই কিছুদিন আগে থাকতে অভিনেত্রী সাবিত্রীর সঙ্গে ভাব হয় রমেন্দ্রর।

রমেন্দ্র বুঝতে পারত সাবিত্রী তাকে ভালবাসত কিন্তু রমেন্দ্র কোন দুর্বলতাই প্রকাশ করে নি।

পরের দিন যথামত সকাল আটটায় রথীন চৌধুরীর নির্দিষ্ট বাড়িতে গিয়ে দেখা করল রমেন্দ্র।

অধ্যাপক রথীন চৌধুরী ওকে দেখে এমন ভাবে সাদর আহ্বান জানালেন যে মনে হলো বুঝি ওরই জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করেছিলেন অধ্যাপক ব্যগ্র উৎকণ্ঠায়।

এসো, এসো—রমেন্দ্র বোস।

আজও রমেন্দ্র নীচু হয়ে অধ্যাপকের পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে সামনের একটা খালি চেয়ারে উপবেশন করল।

তারপর উভয়েই স্তব্ধ। কেউ আর কোন কথা বলে না।

অবশেষে রমেন্দ্রই কথা বললে, কি আমার সঙ্গে যেন আপনার কথা ছিল কাল বলছিলেন স্যার।

হাঁ—দেখো কথাটা হচ্ছে বছর তিনেক আগে খোঁকের মাথায় তোমরা দুজনেই যা করে ফেলেছো সে ব্যাপারে সত্যিকথা বলতে কি আমি বিশেষ কিছু মনে করিনি কারণ তোমাদের দুজনেরই তখন বয়স অল্প ভাল মন্দ স্থিরভাবে বোঝারও হয়ত ক্ষমতা ছিল না—

অধ্যাপকের ভনিতাটা আদৌ কেন যেন রমেন্দ্রর ভাল লাগে না।

সে নিঃশব্দে ভ্রূ তুলে তাকায় যেন সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অধ্যাপকের মুখের দিকে। আর ঠিক সেই সময় ঐ ঘর থেকে অন্দরে যাবার মধ্যবর্তী দরজা পথে ঝুলন্ত পর্দাটা একটু দুলে ওঠে ও একখানি চুড়ি পরা হাত চকিতের জন্য নজরে পড়ে।

চকিতের জন্য হলেও হাতের অধিকারিণীকে চিনতে রমেন্দ্রর এতটুকু কষ্ট হয় না সঙ্গে সঙ্গে, পর্দার আড়ালে যে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইন্দুলেখাই বুঝতে পারে রমেন্দ্র।

অধ্যাপক আবার বলছেন তখন, তাই বলছিলাম যা ভুল হয়ে গিয়েছে—

ভুল!

তা ভুল বৈকি। ভুল ছাড়া আর এটাকে কি বলবো বল!

আপনার মেয়েও বোধ হয় তাই বলছে?

ঐ দেখো সে আর অন্য কি বলবে! তাই বলছিলাম—

বলুন। শান্ত কণ্ঠে বলে রমেন্দ্র।

ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি হয়ে যাক।

কি নিষ্পত্তি করতে চান আপনারা বলুন।

Seperation-ত আছেই—এখন একটা divorce হয়ে গেলেই—

ইন্দুলেখা যদি তাই চায়ত তাই হবে তাকে বলবেন।

এই ত যুক্তিপূর্ণ কথা। very good! আমি অবিশ্যি প্রথম থেকেই বলেছিলাম তোমার অমত হবে না। after all অমত হবেই বা কেন। ব্যাপারটা ত অসঙ্গত কিছু নয়।

আচ্ছা আমি তাহলে উঠি।

উঠবে!

হ্যাঁ—

একটু চা—

Thanks! যা করবার আপনারাই করবেন—

কথাটা বলে আর দাঁড়াল না রমেন্দ্র। ঘর থেকে বের হয়ে এলো।

ধীরে ধীরে হন হন করে হেঁটে চলে আর মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্বলতে থাকে।

আশ্চর্য!

এই ইন্দুলেখা। এই তার ভালবাসা।

অতীত দিনের সব স্মৃতি একে একে মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে যেতে থাকে রমেন্দ্রর। টুকরো টুকরো সব স্মৃতি।

যেদিন তারা পরস্পরের কাছাকাছি নিবিড় হয়ে এসেছিল।

মনে পড়ে একটা সন্ধ্যার কথা।

কলেজের মাঠে অন্ধকারে রমেন্দ্র বসে আছে শুয়ে ইন্দুলেখা রমেন্দ্রর উপর মাথাটা রেখে।

রমেন্দ্র বলেছিল, সত্যিই একটা কথা কিন্তু এখনো আমি ভেবে পাই না লেখা।

কি ভেবে পাও না।

আমার মধ্যে ভালবাসার এমন কি পেলে তুমি?

সে তুমি বুঝবে না।

বুঝব না বুঝি।

না।

কেন?

তুমি যে মেয়ে-মানুষ নও। হলে বুঝতে কি দিয়ে তুমি আমাকে এমন নিবিড় আপন করে টেনেছো।

বললেও—বুঝবো না লেখা।

না।

বেশ। তবে বলো না।

আর একদিন।

রমেন্দ্র বলেছিল। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় কি জান ইন্দু।

রমেন্দ্র কখন ইন্দুলেখা ওধু লেখা বা ওধু ইন্দু বলে ডাকত।

কি!

আমাদের এ মিলন চিরস্থায়ী হতে পারে না।

কি বলচো।

ভেবে দেখো আমাদের জন্ম থেকে পরস্পরের সব কিছু আলাদা।—একের সঙ্গে অন্যের আকাশ জমীন ফারাক। তাই বলছিলাম—

তোমার আজকাল কি হয়েছে বলত। যত সব বাজে কথা। অর্থহীন কথা।

আজ যেটা অর্থহীন কথা বলে মনে হচ্ছে লেখা সেটা এক বছর বা ছয় মাস বাদে হয়ত বা নাও হতে পারে। তাই বলছিলাম ক্ষণিক উত্তেজনায় বসে বেশ আমরা কেউ এমন একটা কিছু ভুল না করি যে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে গিয়ে—

বল থামলে কেন?

আমাদের সর্বস্ব না বিকিয়ে যায়।

একটা কথা বলব রমেন্দ্র?

বল।

তুমি কি ভয় পাচ্ছ?

ভয়!

হাঁ, আমার যেন মনে হচ্ছে গোপনে রেজিষ্ট্রী করে বিয়ে করতে তোমার ভয় হচ্ছে।

ভয় নয় লেখা।

নিশ্চয়ই ভয়।

না। আমার কথা আমি ভাবছি না। আমি তোমাকেই আরো ভাল করে আর একবার ব্যাপারটা ভেবে দেখতে বলছি। কারণ—

কারণ?

যা আমরা করতে চাইছি সেটা কিন্তু ছেলেখেলা নয়।

নিশ্চয়ই নয়।

আর একবার রেজিষ্ট্রী অফিসে গিয়ে সে বন্ধন স্বীকার করে নিলে তাকে নাকচ করা আবার কঠিন হবে—

ভয় নেই গো ভয় নেই।

ঠিক বলচো।

হাঁ। আমার life partner নির্বাচনে যে ভুল হয় নি সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

সব কথাই আজ মনে পড়ে রমেন্দ্রর একে একে।

প্রেসে কাজ করতে বসে সব কেবলই গোলমাল হয়ে যায়।

কেবলই একটা কথা ঘুরে ফিরে মনে হয় ইন্দুলেখা আজ ডিভোর্স চাইছে তার কাছ থেকে।

বিয়েটাই তাদের হয়েছে কিন্তু স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক ত একটি দিনের জন্যও তাদের মধ্যে গড়ে ওঠেনি।

আর এও ঠিক ইন্দুলেখা না এগিয়ে এলে রমেন্দ্র কিছুতেই অগ্রসর হতো না।

তবু সে ডিভোর্স চায়।

বোকা। তাই হবে।

কিন্তু মুখে সেটা নিজে না বলে তার বাপকে দিয়ে বলান কেন। এত বড় অপমানটা সে মেনে নিল কি করে?

সেদিন আবার থিয়েটারের দিন ছিল।

সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত প্রেসে কাজ করে থিয়েটারে চলে গেল রমেন্দ্র।

কিন্তু মনের এমন অবস্থা যে সে অর্কেষ্ট্রাতে বাঁশী বাজাতে পারল না। দলের নেতা হরিদাসকে বললে, শরীরটা তার ভাল নয়। বাঁশী সে বাজাতে পারবে না।

হরিদাস রমেন্দ্রকে ভালবাসত। বললে, ঠিক আছে—তোকে বাজাতে হবে না। আমি একরকম করে চালিয়ে নেবো। তুই বাড়ি যা।

রমেন্দ্র কিন্তু বাড়ি গেল না।

মিউজিক হ্যানড্‌সরা যেখানে বসে তারই এক পাশে উংইসএর আড়ালে চুপটি করে একটা টুলের উপর বসে রইল।

কখন এক সময়ে সাবিত্রী এসে পাশে দাঁড়িয়েছে রমেন্দ্র টেরও পায় নি।

সাবিত্রীর ডাকে চমকে ওঠে, এখানে চুপটি করে বসে যে!

এমনি—

চরিদাস বাবু বলছিলেন তোমার শরীরটা নাকি ভাল নেই, কি হয়েছে।

সে রকম কিছু না।

নিশ্চয়ই কিছু—তোমার চোখ মুখই বলছে।

॥ ৮ ॥

রমেন্দ্র কোন সাড়া দেয় না।

সাবিত্রী তখনো কাছে আরো একটু এগিয়ে এসে মিনতি জানায়, বলবে না কি হয়েছে? বল না!

হঠাৎ রমেন্দ্রর মনে হলো ঐ মুহূর্তে পৃথিবীতে তার সাবিত্রীর মত আপনার জন বুঝি আর কেউ নেই।

তাকায় রমেন্দ্র সামনে দণ্ডায়মান সাবিত্রীর মুখের দিকে।

থিয়েটারের এক অভিনেত্রীর জন্ম পরিচয়হীন মেয়ে—এক অভিনেত্রী।

ভদ্র সমাজের কেউ নয়।

ভদ্র শিক্ষা ও কোন দিন পায় নি।

লজ্জাকর ঘৃণ্য পরিবেশে জন্ম ও মানুষ।

আগে এখানে ব্যালেদের সঙ্গে নাচত এখন কিছু দিন হলো ছোটখাটো অভিনয় করছে।

চোখে মুখে রং মেখে হাসে কাঁদে ভালবাসার কথা বলে।

এবং ও যে তার সঙ্গে বেশ কিছুদিন থেকেই ঘনিষ্ট হবার চেষ্টা করছে রমেন্দ্রও সেটা নজরে এড়ায় নি।

কিন্তু কখনো আজকের আগে এমন করে রমেন্দ্র ওর মুখের দিকে তাকায়ওনি। আর তাকালেও থিয়েটারের একজন অভিনেত্রী ব্যতীত কিছুই মনে হয় নি বেশী।

আজ যেন হঠাৎ মনে হলো রমেন্দ্রের মেয়েটা শুধু অভিনেত্রীই নয়।

তার চাইতেও বেশী কিছু।

অভিনেত্রী নয় একটি মেয়ে।

যে মেয়েটি নির্নিমেষে তার দিকে চেয়ে আছে।

কি যেন চায়। কি যেন বলতে চায়।

সাবিত্রী—

কি!

অনেকদিন তুমি তোমাদের বাড়িতে যেতে বলেছো আমাকে তাই না?

বলেছিত! আর তুমি যে কোন দিন যাবে না তাও জানি।

তাও জান!

জানি বৈকি।

কিন্তু যদি যাই—

সত্যি বলছ?

প্রত্যাশায় সাবিত্রীর দুচোখের দৃষ্টি যেন প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে।

সত্যিই বলছি।

বল কবে যাবে?

তুমি বল!

আমি বলব?

হ্যাঁ, তুমিই বল—বলত আজো যেতে পারি।

সত্যি—সত্যি বলছো।

সত্যিই বলছি!

ঠাট্টা করছো না।

না সাবিত্রী, ঠাট্টা নয়—এত বড় সত্যি আমি জীবনে আর কখনো বোধহয় বলিনি।

ঠিক আছে। থিয়েটার শেষ হলে এক সঙ্গে যাবো।

এক সঙ্গে নয়—

তবে?

তুমি ঠিকানাটা বলে দাও—আমি রাত দশটায় যাবো।

রাত দশটায়!

কেন বিশ্বাস হচ্ছে না?

তা নয়—

তবে?

বেশ। তাই যেও আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব।

সাবিত্রী চলে গেল।

পথের সিনে তার এ্যাপিয়ার ছিল।

একটা অন্ধ দুর্বার আকর্ষণ যেন রমেন্দ্রকে টানতে টানতে সুকিয়া ষ্ট্রীটে সাবিত্রীর বাড়িতে নিয়ে গেল।

এবং রাত দশটার কিছু আগেই সে গিয়ে হাজির হলো।

গলির মধ্যে বাড়িটা।

ছোট একটা দোতলা বাড়ির একতলায় খান আড়াই ঘর নিয়ে সাবিত্রী তার মা সুভাষিণী ও একটি ছোট বোন গায়ত্রী থাকে।

কড়া ধরে নাড়াতেই সাবিত্রী দরজা খুলে সাদরে আহ্বান জানাল, এসো—

রমেন্দ্র ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে।

সাবিত্রী বলে, সত্যি আমি বিশ্বাসই করতে পারিনি যে সত্যি সত্যি তুমি শেষ পর্যন্ত আসবে। বোস উঠে বোস ঐ খাটের পরে।

রমেন্দ্র খাটের উপর উঠে বসে বলে, এখন বিশ্বাস হয়েছে ত?

হয়েছে।

বিগতযৌবনা প্রৌঢ়া অভিনেত্রী সুভাষিণী এসে ঘরে ঢোকে।

সুভাষিণীকে আগে কখনো দেখেনি রমেন্দ্র। সুভাষিণী অন্য থিয়েটারে কাজ করত।

সাবিত্রী বলে আমার মা—

রমেন্দ্র সোজা নেমে সুভাষিণীর পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে সুভাষিণী। তার দুচোখে জল এসে যায়।

অশ্রুভেজা কণ্ঠে বলে, বেঁচে থাক বাবা। বেঁচে থাক। মেয়েটা যে তোমাকে কি চোখে দেখেছে। তোমার কথা বলতে একেবারে অজ্ঞান। তা এত রাত করে এলে—চারটি খেয়ে যাবে ত?

রমেন্দ্র বলে, নিশ্চয়ই খেয়ে যাবো মা—তবে তাড়া—

আবার সুভাষিণীর চোখে জল এসে যায়, বলে, তাই খেও—তোরা গল্প কর—বলতে বলতে সুভাষিণী ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

ঘর করে সুভাষিণী রমেন্দ্রকে সামনে বসিয়ে খাওয়ায়।

এবং খেতে খেতে রাত সাড়ে এগারটা বেজে যায়।

সাবিত্রী বলে, অনেক রাত হয়ে গিয়েছে।

হ্যাঁ সাড়ে এগারটা।

একটা কথা বলব—যদি রাগ না কর।

রাগ করব কেন বল?

আজ রাতে মেসে আর নাই বা গেলে।

না সাবিত্রী—আজ আমাকে যেতে দাও আমি আবার আসব।

কবে?

খুব শিগ্‌গিরই!

সাবিত্রী গলায় আঁচল জড়িয়ে রমেন্দ্রর পায়ে নমস্কার করে।

রমেন্দ্র বের হয়ে আসে সাবিত্রীর ঘর থেকে।

মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধান।

সকাল আটটা থেকে রাত সাড়ে এগারটা। মাত্র পনের ঘণ্টা সময়। এর মধ্যেই যেন জীবনটা ওলট পালট হয়ে গেল।

জীবনের একটা দিক ভেঙে একেবারে গুঁড়িয়ে গেল আর অন্য দিকটায় মনে হচ্ছে নতুন পলি মাটি জমা হতে শুরু হয়েছে।

ইন্দুলেখা আর সাবিত্রী।

দুই নারী।

এক ভদ্রবংশের লেখাপড়া জানা মেয়ে অন্যজন এক গণিকার গর্ভজাত নামগোত্র পরিচয়হীনা অভিনেত্রী মেয়ে।

অথচ সাবিত্রীর কাছে আজ যা পেল রমেন্দ্র তার তুলনা কোথায়।

ঘণ্টা কয়েক আগেও যখন মনে হচ্ছিল সর্বস্ব বুঝি তার তলিয়ে গিয়েছে অতল অন্ধকার গহ্বরে তখন কি একবারও স্বপ্নে ভাবতে পেরেছে রমেন্দ্র পরমুহূর্তেই জীবনের পাত্রখানি তার এমনি করে সুধায় কানায় কানায় ভরে উঠবে।

সমস্ত দুঃখ ও লজ্জার এমনি শান্ত পরিসমাপ্তি ঘটবে।

জীবনের অন্ধকারে এমনি করে আলোর ইশারা জাগবে।

ভগবান তুমি আছো। সত্যিই তুমি আছো।

জীবনের যে কেবল একটা দৃশ্যমান দিকই আছে তাই নয়—একটা অদৃশ্য বাঁকও আছে যেখানে জানা ও শোনার বাইরে অনেক কিছু পরমাশ্চর্য ঘটে।

আমাদের চিন্তা ও ভাবনার বাইরে অনেক কিছু ঘটে।

অনেক দুঃসহ দুঃখের ভিতর দিয়ে জীবনের পরমতম প্রাপ্তি ঘটে।

সাবিত্রীর কথা বলতে বলতে আমাকে সেদিন রমেন্দ্র বলেছিল, নচেৎ সাবিত্রীকে আমার জীবনে পেতাম না।

জীবনটা চরম আঘাতে ও বিতৃষ্ণায় যখন দুঃসহ হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছিল সব কিছু মিথ্যা—সব ফাঁকি ঠিক সেই মুহূর্তে সাবিত্রীকে যেন নতুন করে আবিষ্কার করলাম।

॥ ৯ ॥

সাবিত্রী আর রমেন্দ্রর ব্যাপারটা কিন্তু চাপা রইলো না।

থিয়েটারে সবার মধ্যে গুণ গুণ করে ফিরতে লাগল। অবিশ্যি থিয়েটারের জীবনে ব্যাপারটা এমন কিছু একটা নতুনও নয় বিচিত্রও নয়। তবু রমেন্দ্রর সঙ্গে সাবিত্রীর ব্যাপারটা যেন একটু বেখাপ্পাই লাগে সকলের কাছে।

কারণটা অবিশ্যি রমেন্দ্র বুঝেছিল।

সমর রায় বলে একজন সুদর্শন তরুণ অভিনেতার সাবিত্রীর প্রতি নজর ছিল এবং সাবিত্রীকে পাওয়ার জন্য সে যথাসাধ্য করেছে কিন্তু সাবিত্রী ধরা দেয় নি।

ব্যাপারটা জানতে পেরে একটু বিস্মিতই হয়েছিল রমেন্দ্র।

কারণ সমর রায় শুধু যে সুদর্শন অভিনেতাই ছিল তাই নয় কলকাতা শহরে তার খান দুই বাড়ি ছিল এবং ব্যাঙ্কেও কিছু অর্থ ছিল।

সমর রায় অবিবাহিতও ছিল।

তবে সমর রায়কে প্রত্যাখান করে রমেন্দ্রর মত সামান্য একজন মিউজিক ছাণ্ডকে কেন জীবনে সাবিত্রী বেছে নিল কথাটা একদিন জিজ্ঞাসা করবার কৌতূহল দমন করতে পারেনি রমেন্দ্র।

বলেছিল, সমরবাবুকে বাদ দিয়ে তুমি আমাকে বেছে নিলে কেন সাবিত্রী?

সে তুমি বুঝবে না।

না বল! কেন বুঝব না।

আমরা যে মেয়েমানুষ, মেকী যা তা যে আমরা অনায়াসেই চিনে নিতে পারি আমাদের মেয়ে মন দিয়ে।

সমরবাবু মেকী।

নিশ্চয়ই। সেত আমাকে চায়নি।

তবে কি চেয়েছিল।

কেন এই সামান্য কথাটা বোঝ না।

সাবিত্রী।

হ্যাঁ, সে চেয়েছিল আমার এই দেহটা। গণিকার মেয়ে আমি সামান্য গণিকার মতই আমার এই দেহটা সে ভোগ করতে চেয়েছে তার পয়সার জোড়ে। কিন্তু পয়সা দিয়ে যে সব কিছুই পৃথিবীর কেনা যায় না এই কথাটাই ওরা বিশ্বাস করে না।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ, আর বিশ্বাস করেনা বলেই ওরা মেকীটাকে আসল ও খাঁটি বলে চালাতে চায়।

অবাক হয়ে গিয়েছিল সেদিন সাবিত্রীর মত একটি মেয়ের মুখে ঐ ধরণের কথাগুলো শুনে রমেন্দ্র।

বয়স তখন সাবিত্রীর ষোলর বেশী নয়।

সামান্য এক গণিকার ঘরে এতটুকু শিক্ষা দীক্ষারও সুযোগ যার জীবনে ঘটেনি।

তবু রমেন্দ্র জিজ্ঞাসা করেছিল সাবিত্রীকে, আমার সম্পর্কে তোমার ভুল হচ্ছে নাত সাবিত্রী—

মুহূর্তকাল চুপ করে রমেন্দ্রর মুখের দিকে চেয়ে থাকে সাবিত্রী তারপর ধীর শান্ত কণ্ঠে বলে, ভুল আমি করিনি আমি জানি তবু যদি ভুলই হয় শেষ পর্যন্ত তবু জেনো আফশোষ করব না সেজন্য কোনদিনই।

কিন্তু তুমি হয়ত একটা কথা জাননা সাবিত্রী!

কি?

কথাটা তোমাকে কয়েকদিন ধরেই বলবার জন্য চেষ্টা করছিলাম কিন্তু—

অত কিন্তু কেন, বল না কি কথা?

আমি কিন্তু বিবাহিত—

বিবাহিত!

সাবিত্রী যেন থমকে যায়। ফোবা দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে রমেন্দ্রর মুখের দিকে।

হ্যাঁ, বিবাহিত তবে—

তবে?

ব্যাকুলতায় ওর কণ্ঠস্বর যেন ভেঙে পড়ে।

তবে তার সঙ্গে আইনত একটা বিবাহই হয়েছিল বছর তিনেক আগে, তার বেশী কিছু নয়।

কি রকম?

দুজনাই আমরা পরস্পর আলাদা থেকেছি এবং খুব শীঘ্রই ডিভোর্স হয়ে যাবে। সে ডিভোর্স চেয়েছে।

আঃ—সাবিত্রী একটা আরামের নিঃশ্বাস নিয়ে বললে, এখন ত বুঝলে আমি ভুল করিনি।

সাবিত্রী দুহাতে রমেন্দ্রর গলাটা জড়িয়ে ধরে তার বুকে মুখটা গোঁজে।

মাস দেড়েক পরে।

কি জানি কেন শেষ পর্যন্ত ডিভোর্সের ব্যাপারে ইন্দুলেখা ও তার বাপের দিক থেকে কোন সাড়াশব্দই এলো না তারপর আর।

রমেন্দ্র একটু অবাকই হয়।

তারপরই একদিন কাগজে দেখে ইন্দুলেখার ছবি সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে সে বিলাত যাচ্ছে উচ্চশিক্ষার জন্য।

এবং নামও ছাপা হয়েছে ইন্দুলেখা শিকদার।

রমেন্দ্র একটু বিস্মিতই হয় ব্যাপারটায় এবং একবার ভাবে রথীন চৌধুরীর সঙ্গে গিয়ে দেখা করবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত করেনি।

রমেন্দ্র ভেবেছিল ইন্দুলেখার দিক থেকে ডিভোর্সের ব্যাপারটা মিটে গেলে সাবিত্রীকে সে বিয়ে করে সংসার পাতবে কিন্তু ইন্দুলেখা সব যেন গোলমাল করে দিয়ে গেল। এবং ইন্দুলেখার ব্যবহারটাও যেন ঠিক রমেন্দ্রর বোধগম্য হলো না।

যদি সে শেষ পর্যন্ত ডিভোর্সই না করবে ত অমন করে তার বাপকে দিয়ে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলই বা কেন?

এবং এও ত সে স্বচক্ষে দেখে এসেচে সেদিন যখন ওর বাবার সঙ্গে ঘরে বসে রমেন্দ্রর কথাবার্তা হয় তখন পাশের ঘরেই উপস্থিত ছিল ইন্দুলেখা।

আর ইন্দুলেখার ইচ্ছাতেই যে অধ্যাপক রথীন চৌধুরী তার সংগে কথা বলছিল সেটুকু বুঝতে না পারবার মতও ত রমেন্দ্র নির্বোধ নয়।

তবে শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কি হলো।

সাবিত্রীদের গৃহে মধ্যে মধ্যে যেত রমেন্দ্র।

এবং সাবিত্রীর মা সুভাষিণী তার মেয়ের মুখ থেকেই শুনেছিল রমেন্দ্র তার মেয়েকে বিবাহ করবে।

কিন্তু যখন প্রায় মাস দুই চলে গেল অথচ বিবাহ হলো না সুভাষিণীই একদিন তার মেয়েকে তাগিদ দেয়।

তোকে যে বিয়ে করবে বলেছিল সাবি ঐ রমেন্দ্র। কি হলো তার?

সাবিত্রী রমেন্দ্রর পূর্ব স্ত্রীর কথা মাকে কিছুই বলেনি।

সুভাষিণী সে সম্পর্কে কিছুই জানত না।

সাবিত্রী বলে, তুমি ব্যস্ত হচ্ছো কেন মা! যার হাতে বিশ্বাস করে তুমি আমাকে ছেড়ে দিয়েছো সে আর যাই করুক তোমার মেয়েকে অপমান করবে না।

পুরুষ মানুষকে বিশ্বাস করিস নে সাবি।

ওকে বিশ্বাস না করে ত পারব না মা

কতটুকুই বা তোর বয়েস আর কতটুকুই বা দেখেচিস। দেখে দেখে চোখ আমার পঁচে গিয়েছে—

ওকে ভয় করো না মা। আজ পর্যন্ত ও তোমার মেয়ের গায়েও হাত দেয়নি—

সাবি—

এই তোমায় ছুঁয়ে বলচি মা। সত্যিই যদি ওর পায়ে আমি স্থান পাই ত জানব জীবন ধন্য হয়ে গেল।

সেই দিনই রাত্রে এলো রমেন্দ্র সাবিত্রীদের গৃহে।

মাঝখানে দিন কুড়ি আসেনি।

থিয়েটারে অবিশ্যি পরস্পরের সঙ্গে দেখা হয়েছে কিন্তু ও সম্পর্কে কারো কোন কথা হয়নি। তাছাড়া থিয়েটারে কেউ কারো সঙ্গে বিশেষ কোন প্রয়োজন না হলে কথাই বলত না।

ইন্দুলেখার ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত সাবিত্রীকে বলবে কি বলবে না তাই ভাবছিল রমেন্দ্র কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারছিল না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভেবে দেখল সাবিত্রীকে সব তার জানান দরকার।

সাবিত্রী রমেন্দ্রকে অত রাত্রে আসতে দেখে একটু বিস্মিতই হয় কারণ থিয়েটারে উভয়ের দেখা হয়েছিল কিন্তু রমেন্দ্র যে আসবে কিছু বলেনি।

সাবিত্রী শুধায়, কি ব্যাপার—তুমি আসবে ত কিছু তখন বললে না?

না বলিনি কারণ তখনও আসবই যে ঠিক করতে পারিনি হঠাৎ মনে হলো একটা কথা তোমাকে জানান দরকার।

কি কথা?

ইন্দুলেখা বিলেত চলে গিয়েছে—

বিলেত!

হ্যাঁ, আর ডিভোর্স না করেই।

তাহলে।

তাইত বুঝতে পারচি না এখন কি কর্তব্য আমার। আমি এখন কি করি।

তাহলে ?

সে ব্যাপারটাকে এমন করে অনিশ্চয়তার মধ্যে কেন যে ঝুলিয়ে রেখে গেল কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।

তাহলে কি আমাদের বিয়ে হবে না!

আইনের দিক দিয়ে এক স্ত্রী বর্তমান থাকতে ত অন্য বিয়ে হতে পারে না সাবিত্রী। বিশেষ করে আমাদের আবার রেজিষ্ট্রি করে বিয়ে হয়েছিল।

॥ ১০ ॥

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে সাবিত্রীর মুখখানা যেন শুকিয়ে এতটুকু হয়ে যায়।

কয়েকটা মুহূর্ত কোন কথা বলতে পারে না।

খাটের বাজুটা শক্ত মুঠিতে চেপে বসে থাকে।

সাবি

বল ?

সাবিত্রী মুখ তুলল। চোখ দুটি তার তখন ছল্ ছল্ করছে।

এখন তুমিই আমাকে বল কি কর্তব্য আমার

আমি!

হ্যাঁ, তুমিই বল কি করতে পারি আমি!

আমি কেমন করে বলব ? তুমি যা ভাল বোঝ কর। বলতে বলতে সাবিত্রীর দুচোখের কোল বেয়ে দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে নিঃশব্দে।

কাঁদচো কেন সাবিত্রী! বিয়ে আমাদের হোক বা নাই হোক মনের ঈশ্বরকে স্মরণ করে যেদিন মনে মনে তোমাকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করেছি সেই দিন থেকেই জেনো তুমি আমার স্ত্রী তা সে আইন ধর্ম বা সমাজ যাই বলুক না কেন ?

সাবিত্রী ধীরে ধীরে নীচু হয়ে রমেন্দ্রর পায়ের ধুলো নিজেই রমেন্দ্র গভীর স্নেহে তাকে দুহাতে আপন বক্ষের পরে টেনে নিয়ে এই প্রথম তার ওষ্ঠে চুম্বন করল।

সাবিত্রীর সারা শরীর থর থর করে কেঁপে ওঠে।

সাবিত্রী।

উঁ!

এবারে বল আমি কি করি!

আমি কিছু জানি না।

তবে !

তুমি যা বলবে তাই হবে!

সাবি

হ্যাঁ, আমি শুনি শুধু তুমিই আমার স্বামী।

কিন্তু সাবিত্রী

না, আমাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করো না।

কিন্তু সাবিত্রী আমাদের কথাই না হয় ছেড়েই দিলাম আইনত আমাদের বিবাহ না হলে সমাজে সংসারে আমাদের সন্তানদের কি পরিচয় হবে। কি পরিচয় তারা দেবে ?

কেন তোমার সন্তান বলে পরিচয় দেবে!

সেটা তোমার আমার কাছে যত বড়ই হোক তার কোন স্বীকৃতি কেউ দেবে না। তাছাড়া—

কি

লোকে বলবে তুমি আমার স্ত্রী নও রক্ষিতা—

বলুক। কি এসে যায় তাতে। মনে মনে ত জানি তা সত্য নয়।

এসে যায় বৈকি। এসে যায় তাইত আমি কি করবো ভেবে পাচ্ছি না। অথচ তোমাকে এভাবে আর দূরে রেখেও আর আমি থাকতে পারছি না।

আমিও আর পারছি না গো আমিও আর পারছি না।

তাহলে তোমার মাকে সব কথা খুলে বলি না হয়—

তাড়াতাড়ি রমেন্দ্রর মুখে হাত চাপা দিয়ে সাবিত্রী বলে ওঠে, না, না মাকে কোন কথা বলো না। মা কোন কথা এখনও জানে না।

তবে ?

কালীঘাটে গিয়ে আমরা বিয়ে করব।

কিন্তু সে বিয়েত মিথ্যা—

না—দেবতাকে সাক্ষী রেখে পরস্পরকে পরস্পর আমরা স্বামী স্ত্রী বলে গ্রহণ করবো সে কখনো মিথ্যা হতে পারে না—তাই কি সম্ভব। তাহলে যে দেবতাও মিথ্যা।

সাবিত্রী—

হ্যাঁ আইনকেও সাক্ষী মানব না আমরা আইনের স্বীকৃতিও নেব না—সম্মতি নেবো আমাদের মনের—সম্মতি নেবো মন্দিরের দেবতার।

বলতে বলতে রমেন্দ্র থামল।

বাইরে দিনের আলো নিভে গিয়ে ইতিমধ্যে কখন

চারিদিকে সাঁঝের অন্ধকার ঘনিয়ে এসেচে টেরও পাইনি।

বিস্ময়ে যেন স্তব্ধ হয়ে শুনছিলাম রমেন্দ্রর কাহিনী।

এত শুধুমাত্র কাহিনী নয় বিচিত্র এক জীবন নাটক।

বললাম, তারপর।

তারপর?

হাঁ।

থেম না বল?

আর ত কিছু নেই রমেন্দ্রর কথা শেষ হয়ে এসেচে প্রায় বলতে পার।

শেষ পর্যন্ত একদিন ওরা দুজনে মায়ের মন্দিরে গিয়ে দেবতাকে সাক্ষী রেখে পরস্পর পরস্পরকে স্বামী স্ত্রী বলে মেনে নিল।

রমেন্দ্র কম্পিত হস্তে সাবিত্রীর সিঁথিতে সিন্দুর এঁকে দিল।

সাবিত্রী গাঢ় কণ্ঠে বলে এইত আমাদের বিয়ে হয়ে গেল।

কিন্তু আমার মন ভরলো না সাবি।

কেন! ওকথা বলচো কেন?

আমার মন বলচে যেন তোমাকে ফাঁকি দিলাম।

না। ফাঁকি তুমি আমাকে দাওনি। চল আমাদের দিকে সবাই চেয়ে আছে।

ওরা দুজনে মন্দির থেকে বের হয়ে এল।

অনেক কষ্টে ইতিমধ্যে ঘুরে ঘুরে গলির ঐ বাসাটি ভাড়া নিয়েছিল রমেন্দ্র।

সাবিত্রীকে নিয়ে এসে ঐ বাড়িতেই উঠলো।

শুরু হলো তাদের জীবনযাত্রা।

দিন কয়েক বাদেই সাবিত্রী বললে, একটা কথা বলবো তুমি রাগ করবে না?

না। বল—

থিয়েটারের চাকরি ভাবচি আর করবো না।

আমার মনের কথাটাই তুমি বলেচো সাবি। আমি দুদিন থেকে ঐ কথাটিই ভাবচিলাম।

তবে কেন বলনি কেন আমাকে?

মফস্বলীবনের তোমার সামনে রঙিন ভবিষ্যত। কেমন করে বলি

কথাটা রমেন্দ্র মিথ্যা বলেনি।

কারণ বিয়ের মাত্র মাসখানেক আগেই সাবিত্রীকে নতুন বইতে নায়িকার ভূমিকা দিয়ে থিয়েটারের মালিক তার মাহিনা সাড়ে তিনশ টাকা করে দিয়েছিলেন।

এবং তিনি যে ভুল করেন নি থিয়েটারে প্রত্যহ হাউস ফুল ও সাবিত্রীর অভিনয়ের প্রশংসা শুনে শুনেই বোঝা যাচ্ছিল।

সাবিত্রী বলে, ঘরের স্ত্রী ও মঞ্চের অভিনেত্রী ত এক সঙ্গে হওয়া যায় না।

সাবিত্রী—

না। স্ত্রীরও যেমন মর্যাদা থাকে না তেমনি অভিনেত্রীরও জীবনে পূর্ণতা আসে না;

সত্যি সত্যিই অতঃপর সাবিত্রী থিয়েটারের চাকরি ছেড়ে দিল।

থিয়েটারের মালিক অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করলেন আরো মাহিনা বাড়িয়ে দেবেন বললেন কিন্তু সাবিত্রী বললে, না মিত্র মশাই, আমি বিয়ে করেচি সংসার করবো।

কিন্তু এর আগে কি অভিনেত্রীরা বিয়ে করেও অভিনয় করেনি সাবিত্রী—

করবে না কেন, করেচে কিন্তু সত্যিকারের স্ত্রীর মর্যাদা তারা পায়নি। তাছাড়া আমার সন্তানরা জানবে যে তাদের মা অভিনয় করে—মঞ্চে অভিনেত্রী সে আমি চাই না।

কিন্তু এখন ত তোমার সন্তান হয়নি।

নাই হোক তবু অভিনয় আমার দ্বারা আর হবে না।

রমেন্দ্র প্রেসে কাজ করে ও থিয়েটারে বাঁশী বাজিয়ে যা উপার্জন করত, তাইতেই তাদের ছোট সংসার চলে যেতে লাগল।

পাকা গৃহিনী সাবিত্রী।

সে কোনদিন কোন অভাব অভিযোগ জানতে দেয়নি তার স্বামীকে।

দেড় বছর পরে ওদের প্রথম সন্তান গৌতম জন্মাল।

বুদ্ধ পূর্ণিমায় জন্মেছিল বলে ছেলের নাম রাখল রমেন্দ্র গৌতম। গৌতম বুদ্ধকে স্মরণ করে। এবং গৌতমের

যখন ঠিক ছয়মাস বয়েস তখন বিলেত থেকে ফিরে এল উচ্চশিক্ষা শেষ করে ইন্দুলেখা একদিন।

এসেই সে চাকরি পেল।

হঠাৎ ঐ সময় আমি জিজ্ঞাসা করি, ইন্দুলেখার সঙ্গে আর তোমার দেখা হয়নি?

হয়েছিল।

দেখা হয়েছিল।

হ্যাঁ—

কবে?

বিলেত থেকে সে ফিরে আসবার পরই।

কোথায় দেখা হলো?

এই বাড়িতে?

সে এসেছিল?

হ্যাঁ—

ইন্দুলেখাই এসেছিল সত্যি সত্যি।

এবং হঠাৎই এসেছিল এক ছুটির দ্বিপ্রহরে।

সেদিনটা আবার একটা কি পুণ্য যোগ ছিল সকাল বেলাই পাড়ার এক বর্ষিয়সী বিধবা মহিলার সঙ্গে সাবিত্রী গিয়েছিল দক্ষিণেশ্বরে স্নান করে পূজা দিতে।

একাই ছিল গৃহে রমেন্দ্র।

কড়া নড়ে উঠতেই রমেন্দ্র গিয়ে দরজা খুলে দিয়ে থমকে দাঁড়ায়।

সামনেই দাঁড়িয়ে ইন্দুলেখা।

ইন্দুলেখা যে দেশে ফিরে এসেছে কাগজেই সে সংবাদটা পড়েছিল রমেন্দ্র।

রূপ যেন ইন্দুলেখার সর্বাঙ্গে উপচে পড়চে।

আরো সুন্দর হয়েচে সে দেখতে।

॥ ১১ ॥

কি বলবে কি করবে বুঝে উঠতে পারে না রমেন্দ্র।

বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

দরজা জুড়েই দাঁড়িয়ে থাকে—

কি, ঢুকতেও দেবে না নাকি! ইন্দুলেখাই বলে, না—চিনতেই পারচো না।

এসো—

দরজা থেকে সরে দাঁড়াল রমেন্দ্র

ইন্দুলেখা এসে ঘরে ঢুকল কিন্তু ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল।

সামনেই খাটের পরে ওদের বছর দুইয়েকের সন্তান গৌতম ঘুমিয়ে।

ননী দিয়ে গড়া যেন একটি পুতুল।

এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে ইন্দুলেখা গৌতমের দিকে।

তারপর অনেকক্ষণ রমেন্দ্রর দিকে তাকিয়ে বলে, কে?

মৃদু কণ্ঠে রমেন্দ্র বলে, আমার ছেলে গৌতম!

তোমার ছেলে?

পুনরাবৃত্তি করে প্রশ্নটার ইন্দুলেখা।

রমেন্দ্র আবার বলে, হ্যাঁ—

আর ঠিক সেই মুহূর্তে রাঙা পাড় গরদের শাড়ি পরা মাথায় সিন্দুর, পূজা দিয়ে সাবিত্রী এসে ঘরে ঢুকল, একটু দেরী হয়ে গেল—

কথাটা তার শেষ হয় না। ইন্দুলেখার দিকে নজর পড়তেই সে স্বামীর মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায়।

ইন্দুলেখা বলে, আচ্ছা চলি—

ইন্দুলেখা আর একটি কথাও না বলে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

রমেন্দ্র ও সাবিত্রী কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

দরজাটা হা হা করচে খোলা।

অবশেষে সাবিত্রীই বলে, ইন্দুলেখা তাই না?

রমেন্দ্র মৃদু কণ্ঠে বলে, হ্যাঁ—

কতক্ষণ এসেছিল—

মিনিট করেক!

রমেন্দ্র আবার থামল।

গলির গ্যাসের আলোটা জ্বলে ওঠায় আমাদের অন্ধকার ঘরে জানালাপথে খানিকটা আলো এসে পড়ে।

জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর?

আর তারপর কিছু নেই ভাই—

ইন্দুলেখার সঙ্গে আর তোমার দেখা হয়নি?

না।

তোমাদের আইনত ডিভোর্সও হয়নি বোধ হয় আজ পর্যন্ত।

না হয়নি।

আরো মাস দুই পরে।

রমেন্দ্র ও সাবিত্রীর কাহিনীটা লিখছিলাম।

এবং যে পর্যন্ত রমেন্দ্রর মুখে শুনেছিলাম সেই পর্যন্ত এসে আর লিখতে পারিনি।

কলম থামাতে হয়েছিল।

কারণ কি লিখবো অতঃপর কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিলাম না।

একদিন দ্বিপ্রহরে মানসীকে পড়ে শোনালাম।

মানসী যতদূর লিখেছিলাম শুনে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে শুধালে, তারপর?

কি তারপর?

ইন্দুলেখার কি হলো?

জানিনা।

জানিনা বললে লোকে শুনবে কেন?

যদি বে, কি করবো বলো, যা জানিনা তার কি জবাব দিতে পারি? বেশ, তুমিই বল না কি হওয়া উচিত ইন্দুলেখার?

তুমি বল?

আমি অনেক ভেবেছি মানসী কিন্তু ইন্দুলেখার কোন শেষ খুঁজে পাইনি।

তাহলে বলতে চাও তোমার কাহিনীর ঐখানেই শেষ।

উপায় কি?

যাঃ পাঠক তা মানবে কেন? দায়িত্ব বলেও ত একটা তোমার বস্তু আছে।

মিথ্যা বলেনি মানসী।

সত্যি কলম হাতে আছে বলেই যে আমার দায়িত্ব নেই তাত নয়। দায়িত্ব আমার আছে।

কিন্তু সে দায়িত্বই বা পালন করি কি করে?

অনেক ভাবলাম।

ভাবতে ভাবতে মনে হয় একবার ইন্দুলেখার সঙ্গে দেখা করলে কেমন হয়।

এককালে ত সে আমার সহপাঠিনী ছিল।

সেই পরিচয়েইত অনায়াসে গিয়ে যে কোন একদিন দেখা করতে পারি।

আবার মনে হয় তারই বা প্রয়োজন কি?

ইন্দুলেখাকে বাদ দিয়ে কাহিনীটা শেষ হলেই বা কার কতটুকু ক্ষতি।

কিন্তু তবু একদিন গেলাম ইন্দুলেখার সঙ্গে দেখা করতে।

কার্ড পাঠাতেই সে এলো।

প্রথমটায় চিনতে না পারলেও পরিচয় দিতেই চিনতে পারল।

হাত তুলে নমস্কার জানাল।

তারপর এটা ওটা অনেক কথা হলো কিন্তু আসল কথাটাই তুলতে পারলাম না।

ফিরে এলাম।

তারপর অনেকদিন পরে ইন্দুলেখার মুখেই তার কাহিনী শুনেছিলাম।

রমেন্দ্রর মত সে আর এক কাহিনী।

রমেন্দ্রর কাহিনীর সঙ্গে ইচ্ছা করলেই ইন্দুলেখার কাহিনী আমি জুড়ে দিতে পারতাম, কিন্তু পারলাম না।

শুধু রমেন্দ্রর কাহিনীটুকুই বললাম:

রমেন্দ্র ও সাবিত্রীর কাহিনী।

যদি আবার কোনদিন সুযোগ আসে ত ইচ্ছা রইলো ইন্দুলেখার কাহিনী আলাদা করে শোনাবার।

শুধু এইটুকু বলে এই কাহিনীর ইতি করলেই হয়ত হবে, রমেন্দ্র ইন্দুলেখা সম্পর্কে যাই ভাবুক না কেন ইন্দুলেখা ঠিক তা নয়।

সে সাবিত্রী না হতে পারে কিন্তু সেও নারী।

তা যদি না হতো ত বাকী জীবনটার জন্য সে রমেন্দ্রর পদবীটুকুই বয়ে বেড়াত না।

সেদিক দিয়ে রমেন্দ্রকে যে সম্মান সে দিয়েছে তার মূল্যও ত কম নয়।

এবং রমেন্দ্র তবু সাবিত্রীকে পেয়েছিল—ইন্দুলেখা কি পেল।

এ কাহিনী আজ যারা পড়লেন তাদের কাছে তাই এই শেষ অনুরোধটুকুই আমার রইলো, না জেনে না শুনে ইন্দুলেখার সব কথা—তাকে যেন বিচার করবেন না।

—শেষ—

ভূমধ্যসাগরের তীরে

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

এথেন্সে এসে মনে হল ইওরোপের জীবন ধারার দুটো দিক আছে। একদিকে ইওরোপ ঐতিহ্যপ্রাণী, পুরাতনের প্রতি তার অসীম মমত্ব বোধ, অন্যদিকে অতীতের প্রতি সে মমত্বহীন। ইওরোপের এক কোণে অতীতের আরাধনা চলছে, পুরোদমে। সেখানকার দেবমন্দিরে ঘটা করে নিত্য পূজা চলেছে ষোড়শ উপচারে, ঢাক আর কাঁসরের শব্দে, ভক্তের জয়ধ্বনিতে। পুরোহিত সেখানে নিত্য প্রমাণ করতে উদ্যত যে সে দেবতা জাগ্রত। কিন্তু অন্যদিক গৃহদেবতা এখন কুলুঙ্গীর সামগ্রী, বড়জোর যাদুঘরের ঐতিহাসিক উপাদানে। সেখানে ঘন্টা বাজে না, ঢাক ঢোলও না, বাজলেও কণ্ঠে আর জাজ ব্যাণ্ডের শব্দের আড়ালে তা চাপা পড়ে যায়।

এথেন্স শহরে পা দিয়ে তাই যুগপৎ বিস্মিত হলাম, ব্যথিতও। ভেবেছিলাম ইওরোপের প্রাচীনতম নগরীতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হবে। সক্রেটিস, প্লেটো, আরিস্তল, সফোক্লিসের দেশ এথেন্স আমাকে শৈশবকাল থেকে আকর্ষণ করত। এই পথের প্রতিটি ধূলিকণার সঙ্গে মহামানবের পদরেণু জড়ানো। ভেবেছিলাম ভিয়েনা, রোমের মত এথেন্স শহরের প্রতিটি রাজপথে খুঁজে পাব অতীত দিনের ইতিহাসকে।

কিন্তু এথেন্সে এসে মনে হল এলেম নতুন দেশে। নতুনের অর্থ এখানে অর্বাচীন। আধুনিক রাজপথ, আধুনিক দোকানপাট, আধুনিক স্থাপত্যের বৈজয়ন্তী উড়ছে এথেন্স শহরের সর্বত্র। মনে হল আমি যেন বেলগেছে বন কিংবা জুবিলি শহরের কোথাও দাঁড়িয়ে আছি।

অথচ এই তো কয়েক ঘন্টা আগে ছিলাম রোমে। কয়েক হাজার বছরে রোমের বহিরঙ্গের পরিবর্তন হয়ত কিছুটা হয়েছে কিন্তু অন্তরের পরিবর্তন

পারিস, ভিয়েনা লণ্ডন এমনকি কম্যুনিস্ট দেশ প্রাগ ও বুদাপেস্তেও যেমনটি এখনও ওদেশের লোকের গর্বের সামগ্রী। বুদাপেস্তে যে সম্রাটের আমলের বড় বড় প্রাসাদগুলোকে ভেঙে সেখানে আধুনিক ম্যাচবক্স মার্কা টেনামেন্ট তৈরি করা হয়নি, তার কারণ শুধু অর্থাভাব নয়। তার কারণ এরা সেই ইওরোপের লোক, যে ইওরোপে পুরাতনের ওপর মমত্ব বোধের আগুন এখনও ধিকি ধিকি জ্বলছে।

এথেন্সে আমার প্রথম দিনের অভিজ্ঞতার কথা চিরদিন মনে থাকবে। কারণ এথেন্স দর্শনের আগেই হয়ত সেদিন গ্রীসের কোন অখ্যাত জনপদে চিরকালের মত আমাকে হারিয়ে যেতে হত।

রোম থেকে প্লেন ছাড়ল সন্ধ্যা সাতটায়। পাঁচ ঘন্টা লেট। জানা গেল প্যারিসের আকাশ ঢেকে আছে কুয়াশায়। রোম থেকে এথেন্স যাবার পথেও প্রতিকূল আবহাওয়া পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে দৈত্যের মত। তাই দুপুর দুটোর প্লেন ছাড়ল সন্ধ্যা সাতটায়।

ভ্রমণের সময় আমি যানবাহন থাকতে অধিকতর পক্ষপাতী। আবহাওয়া তত্ত্ব, সাজ্জার দর ও রাজনীতি নিয়ে পাশের সহযাত্রীর সঙ্গে আলাপে তখনকার দক্ষতা যাঁদের অসাধারণ তাঁরা আমার প্রণম্য। কিন্তু এই সময়টুকু আমি যা শ্রেয় মনে করি তা অর্ধ শায়িত অবস্থায় বসে বসে স্বপ্ন দেখা।

কিন্তু তন্দ্রা ছুটে গেল এক নিমেষেই। আমাদের প্লেনখানি মোচার খোলার মত দুলছে। থাকে থাকে জিনিষপত্র গড়িয়ে পড়ছে মাটিতে। ভয়ার্ত যাত্রীর

…পার্থিনন : এথেন্স

নিমেষে হতবাক হয়ে গেছেন। দুজন এয়ার হোস্টেস ছুটোছুটি করে অভয় দেবার চেষ্টা করছে ত্রাস্ত যাত্রী-কুলকে।

মাইক্রোফোনে নিনাদিত হল কম্পিত কণ্ঠস্বর : 'যাত্রীরা আসন ছেড়ে উঠবেন না। বেল্ট বেঁধে নিন। কোন ভয় নেই। আমাদের প্লেন দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্যে এয়ার পকেটে পড়ে গেছে। আর ক'মিনিটের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

আমার পার্শ্ববর্তিনীর দিকে তাকালাম। রোম থেকে প্লেন ছাড়ার সময় আলাপ হয়েছিল। গ্রীক কন্যা। লণ্ডনে পড়াশুনা করেন। অবকাশ যাপনের জন্য পিতৃগৃহে চলেছেন। দেখলাম তাঁর সুগৌরব মুখমণ্ডল কাগজের মত শাদা, আঁখি তারায় আসন্ন মৃত্যু বিভীষিকা।

সে ভীতি আমাকেও যে আচ্ছন্ন করেনি তাই নয়। আজ সকালের সংবাদপত্রেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি বিমান দুর্ঘটনার ছবি দেখেছি। প্রকাশিত হয়েছে নিহত যাত্রীদের নাম। কালকের সংবাদপত্রে হয়ত সে তালিকাটি দীর্ঘতর হবে।

: খুব ভয় লাগছে না? শক্তি সঞ্চয় করে এই কথা বলার মধ্যে কিছুটা সময় লাগল। হঠাৎ প্লেনের ভেতর কে যেন কেঁদে উঠল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। মনে হল মৃত্যুর জগতে আমরা সবাই প্রবেশ করেছি। সেখান থেকে ফিরে আসার কোন উপায়ই আর নেই।

সেই মুহূর্তেই সহযাত্রিণী স্থান কাল পাত্র ভুলে আমার কাঁধে তাঁর মুখ ঢাকলেন। অনুমান করলাম তিনি কাঁদছেন। তাঁর মুখটা ধীরে ধীরে তুললাম দুই হাতে। পকেট থেকে রুমাল বার করে মুছিয়ে দিলাম চোখের জল। আশ্চর্য কোথা থেকে আমার সাহস এল। ভয়, ভয়কে দেখে শুধু যে আরও ভীত হয় তা নয়—সে সাহস সঞ্চয় করতেও শেখে।

প্লেন এসে থামল এথেন্সে বিমান বন্দরে। ট্রানজিট লাউঞ্জে দাড়িয়ে ছিল মেরিয়া। আমার গ্রীক বান্ধবী। আমাকে দেখে করমর্দন করল সহাস্যে। বলল : 'তোমার চিঠি পেয়েছিলাম ঠিক সময়ে। পপি আসতে পারল না। কাল সকালে দেখা করবে। এ কী, তুমি এদিক ওদিক তাকাচ্ছ কেন?'

বললাম : মেরিয়া। একটি মেয়েকে খুঁজছি। খুব সুন্দর দেখতে। গায়ে তার ব্লু ক্রক। প্লেনে আমার পাশের সিটে বসেছিল। মেরিয়া বলল : কী ব্যাপার? গ্রীসে আসতে না আসতে প্রেমে পড়লে নাকি? ব্লু ক্রক পরা একটি মেয়েতো এই কিছুক্ষণ আগেই এক ভদ্রলোকের সঙ্গে গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল।

একটি ছোট দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মেরিয়াকে বললাম : চল বাসে ওঠা যাক।

শহর এথেন্স খুব বড় নয়। আশী লক্ষ লোকের দেশের রাজধানী এথেন্স আয়তনে কত আর বড় হতে

পাশে। সমুদ্র আর পাহাড় দিয়ে ঘেরা ছোট্ট শহর এথেন্সকে পর্যটকেরা দুদিনেই ভালবেসে ফেলে।

এথেন্সে সিকাডালি হল কনষ্টিট্যুশান স্কোয়ার। স্কোয়ার অর্থে কলকাতার মত হকার্স কর্ণার নয়। তৃণাচ্ছাদিত আর শাখা পল্লবিত বিরাট পার্ক। সে পার্কের চারিদিকে যে শোভা তা অসংখ্য মর্মর মূর্তির। সে মর্মর মূর্তিগুলির রূপ ও রঙ অতীতের কিন্তু তার রূপতি এ যুগের। পুরাতন ক্লাসিক্যাল রীতির সঙ্গে আধুনিক যুগের চিন্তার সামুজ্য ঘটছে আজকের গ্রীসে।

প্রতিমূর্তির দেশ হল গ্রীস। ঐতিহাসিকেরা বলেন: গ্রীসের হাইমেটাস, আর পেন্টিলিকন পাহাড়ে, নেক্সস আর প্যারস দ্বীপে আছে অফুরন্ত মার্বেল পাথরের সম্পদ, ভূমধ্যসাগরের সূর্যালোক আছে অকৃপণ। তাই ভাস্কর তার ছেনি নিয়ে বসেছেন বিনা দ্বিধায়।

গ্রীক সভ্যতার প্রথম যুগে ভাস্কর্যের প্রাণকেন্দ্র ছিল ক্রীট আর মাইসেনাইয়ান। ভূমধ্যসাগরের এই কলা-বিদ্যার নাম সেদিন 'মিনোয়ান আর্ট'।

সত্যিকারের গ্রুপদী গ্রীক ভাস্কর্যের জন্ম খৃস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে। গ্রীস সেদিন দেবতাকে প্রিয় করেছে তার ভাস্কর্যে। তার দেবতা অমূর্ত নন। তিনি মূর্ত। মানুষের বেশে তিনি অবতীর্ণ। তাঁর মহিমা অপার কিন্তু সবার উপরে তিনি মানুষ।

দ্বিতীয়ত গ্রীস সেদিন সৌন্দর্যের সাধনায় নিয়োজিত। বীর সন্তান চাই। তাই জ্বলে উঠেছে অলিম্পিয়ার অনির্বাণ মশাল শিখা।

সেদিনের গ্রীক ভাস্কর শিল্পের উপাদান খুঁজে পেলেন জাতীয় জীবন থেকে। সৃষ্টি হল দেবতার প্রতিমূর্তি। ক্রীড়াবিদের সুঠাম দেহস্কন্দ বন্দী হয়ে রইল ব্রোঞ্জ আর মার্বেল পাথরে।

সে যুগের শিল্পীর নাম মনে পড়ছে মাইরন (৪৫০ খৃঃ পূর্বাব্দ) যাঁর 'ডিসকাস থ্রোয়ার' মূর্তিটির হাজার হাজার কপি হয়েছে, মনে পড়ছে প্রথম গ্রুপদী ভাস্কর ফিডিয়াসকে (৪৫০ খৃঃ পূর্বাব্দ)। ফিডিয়াস পার্থিনন-এর শিল্পী। বাস্তবতার সঙ্গে কল্পনার এক অপূর্ব সমীকরণ ঘটেছে তাঁর

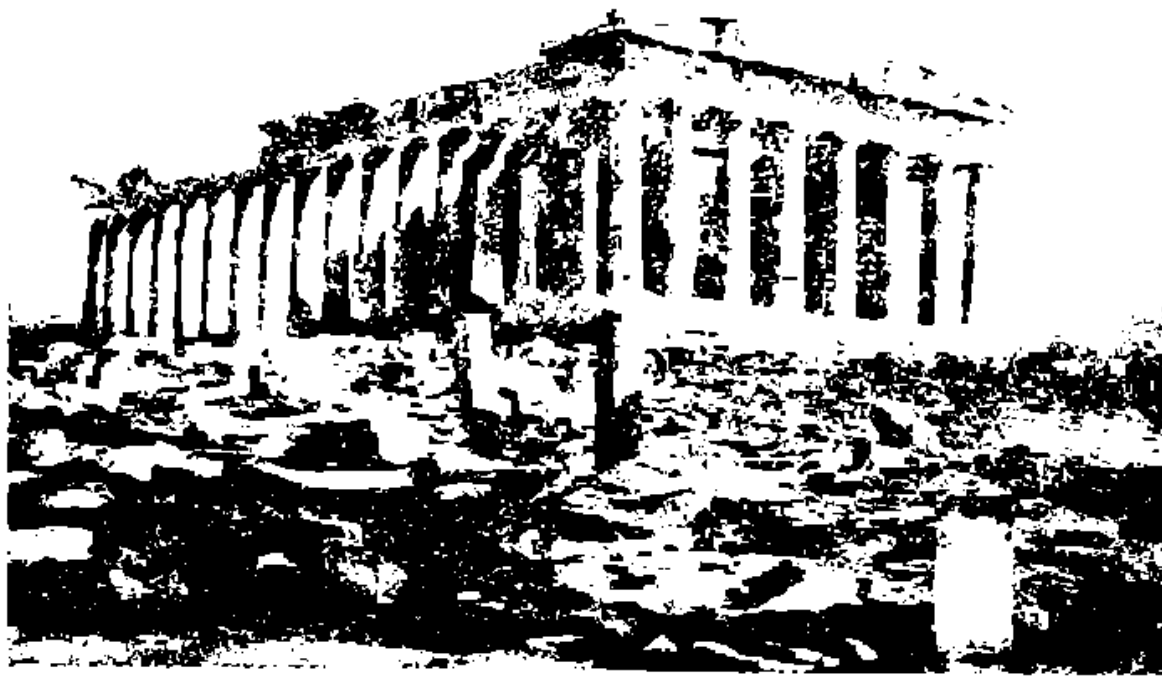

পার্থিনন : এথেন্স

---স্বামীকে বিয়ারের পাত্র এগিয়ে দিচ্ছে গ্রীক চাষী বউ।

চিত্রকলায়। এথেন্সের জাতীয় উৎসবের খণ্ড খণ্ড চিত্রকে পার্থিনন্সের গায়ে অমর করে রেখেছেন এই মহান শিল্পী। ক্লাসিক্যাল যুগের পর হেলেনিক যুগ। আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের (৩৩৬-৩২৩ খৃঃ পূর্বাব্দ) রাজত্ব কাল থেকে গ্রীক শিল্প রীতিতে আবার ঘটেছে পালা বদল। সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্য ভাবে এসেছে বিজিত দেশের প্রভাব। গ্রীক সভ্যতার আলোক রশ্মি এসে পড়েছে এশিয়া মাইনরে এসেছে ভারতবর্ষে।

এবারে শুধু আর দেবমূর্তি নয় শুধু আর ক্রীড়াবিদের পৌরুষ মূর্তিও নয় এবার ভাস্করের মনের রঙ বদলেছে। এবার আর যন্ত্রবৎ নয় সেই সঙ্গে শিল্পীর আপন মনের মাধুরী—আপন কল্পনা। বিখ্যাত ভেনাস ডি মেলো, ডায়ংগল, সাফারিং লাওকুন, ড্রাঙ্কেন উম্যান বিখ্যাত ভাস্কর্যগুলোর জন্মলগ্ন এই যুগ সংক্রান্তিতে।

কনষ্টিট্যুশান স্কোয়ারে যখন এসে পৌঁছলাম তখন স্কোয়ারে নিয়ন আলোর ছটা। মেরিয়া ঠিক করে রেখে ছিল হোটেল। আমাকে ম্যানেজারের হাতে সঁপে দিয়ে সে বিদায় নিল। জানাল পপির সঙ্গে দেখা হবে কাল প্রভাতে। তার হাত ধরে কাল আমার এথেন্স শহর দেখার প্রোগ্রাম।

• •

প্রথমে তাকে চিনতে পারিনি। নিচে থেকে টেলিফোন পেলাম আমার জন্যে এক তরুণী অপেক্ষারতা। দ্রুত পায়ে এসে দাঁড়ালাম লাউঞ্জে।

: চ্যাটার্জী।

: পপি! অবাক হবার পালা আমার। গ্রীক ললনা পপির দেহ লাবণীর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল ওর ভ্রমর কৃষ্ণ কেশদাম। পপির পোষাকী নাম ছিল পেনিলোপি। আমি বললাম আক্রিদিতি।

কিন্তু সেই পপি কি নিষ্ঠুর ভাবে ছেটে ফেলেছে ওর কেশ রাশি। আমাদের শেষ সাক্ষাৎ হয়েছিল ওয়েলসের কারডিকে। মাত্র চার মাস আগেকার কথা। কিন্তু চার মাস পরে এথেন্সের জনারণ্যে আমার এই ভিনদেশী প্রিয় বান্ধবীকে চিনে নিতে পারতাম না।

পপি বলল : বা-রে! অবাক হয়ে কী দেখছ। বললাম : তোমাকে। পপি, একদিন তোমাকে দেখে আমি মহাকাব্যের গ্রীসকে দেখতুম। আজ তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন হাল আমলের কোন মার্কিনী মেয়ের সঙ্গে কথা বলছি।

পপি বলল : সহজ সাধনাই তো সুন্দরের সাধনা।

আমি বললাম : সহজ যে সহজে হওয়া যায়, একথার কোন বড় প্রমাণ নেই। ঘরের পেথম কেটে দিলে ময়ূর সহজ হয়, সুন্দর হয় না। আমাদের দেশেও দেখেছি পোশাকের বাহুল্য-বর্জন করে সুন্দর হবার চেষ্টা চলছে। মানব সভ্যতা যে সহজ হবার নাম করে সহজ হতে ভুলল এটাই আজকের বড় ট্র্যাজেডি।

পপি ক্রুদ্ধ হল না, ক্ষুব্ধও নয়। শুধু মুখ টিপে হেসে বলল : যখন একজন গ্রীকের সঙ্গে আর একজন গ্রীকের দেখা হয়, তখন তারা ছুরেল লড়ে আর যখন একজন গ্রীক ও একজন ইণ্ডিয়ানের দেখা হয় তখন তারা কি করে?

আমি বললাম : খালি তর্ক করে তাই না?

পপি হেসে উঠল।

এথেন্স শহরের মধ্যে যেটুকু দ্রষ্টব্য তা হল আক্রোপলিস আক্রোপলিস শব্দের অর্থ উঁচু নগর। পাহাড়ের ওপর এই সুউচ্চ নগরীই ছিল পুরাতন দিনের এথেন্স।

আক্রোপলিসে ঢুকতে গেলে ঢুকতে হয় পাঁচটি দরজার স্তম্ভ সজ্জিত বিরাট তোরণ দিয়ে। নাম তার প্রপিলন।

প্রপিলনের গায়ে এথেনা নাইক এর মন্দির।

পপি আমাকে নিয়ে এল মন্দিরের চত্বরে। এখান থেকে ঘুরে দেখা যায় অন্তহীন নীলাম্বুরাশি—ভূমধ্য সাগর।

পপি বলল : থেসিউসের গল্প পড়েছ?

বললাম : হ্যাঁ। পাঠ্য পুস্তকের কল্যাণে।

কেমন করে মিনোটারকে হত্যা করেছিল থেসিউস সে বৃত্তান্ত মুখস্তও করতে হয়েছিল একদিন।

পপি বলল : থেসিউস গেলেন সিনোসলে মিনোটারের সঙ্গে মোকাবেলা করতে। বাবাকে বলে গেলেন। যদি বিজয়ী হয়ে ফিরি তাহলে আমার জাহাজে টাঙিয়ে দেব কালোর বদলে শাদা রঙের পাল দূর থেকে তুমি দেখতে পাবে।

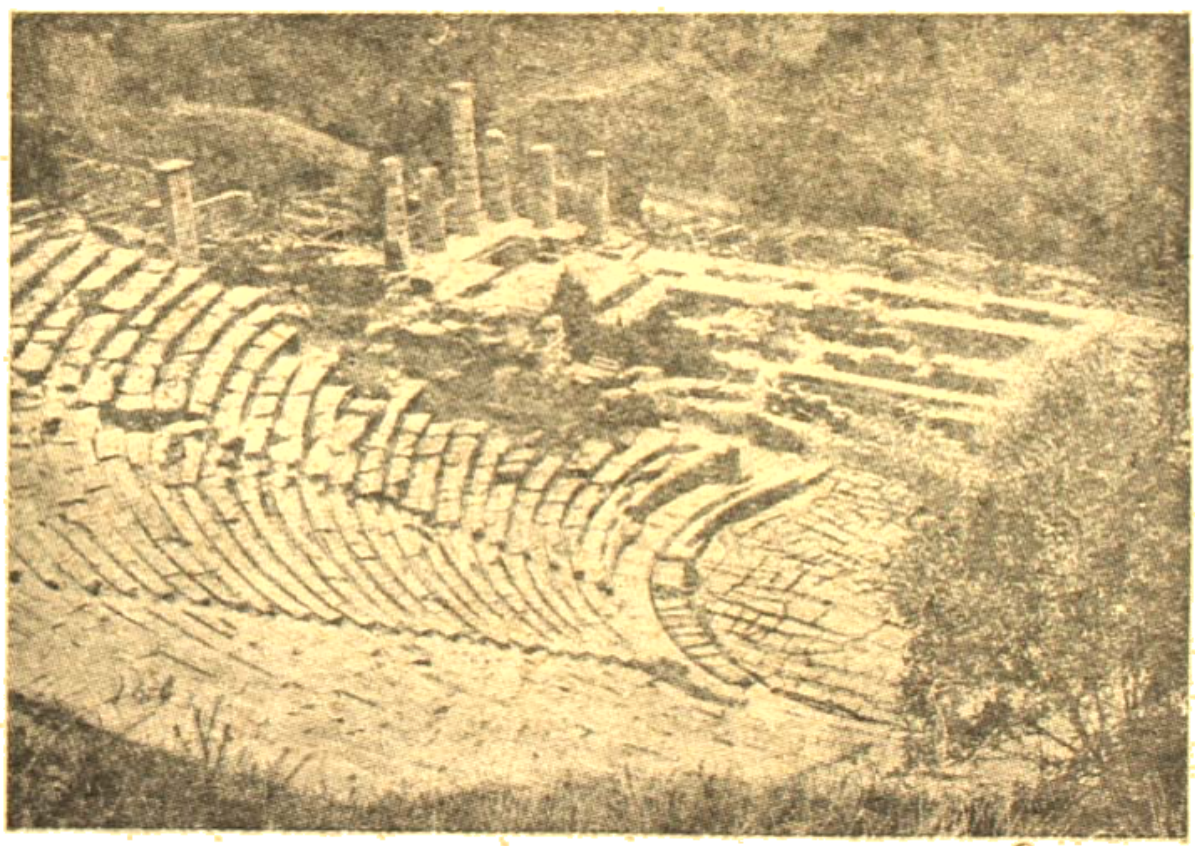

...অ্যাপলো দেবের মন্দির ডেলফি

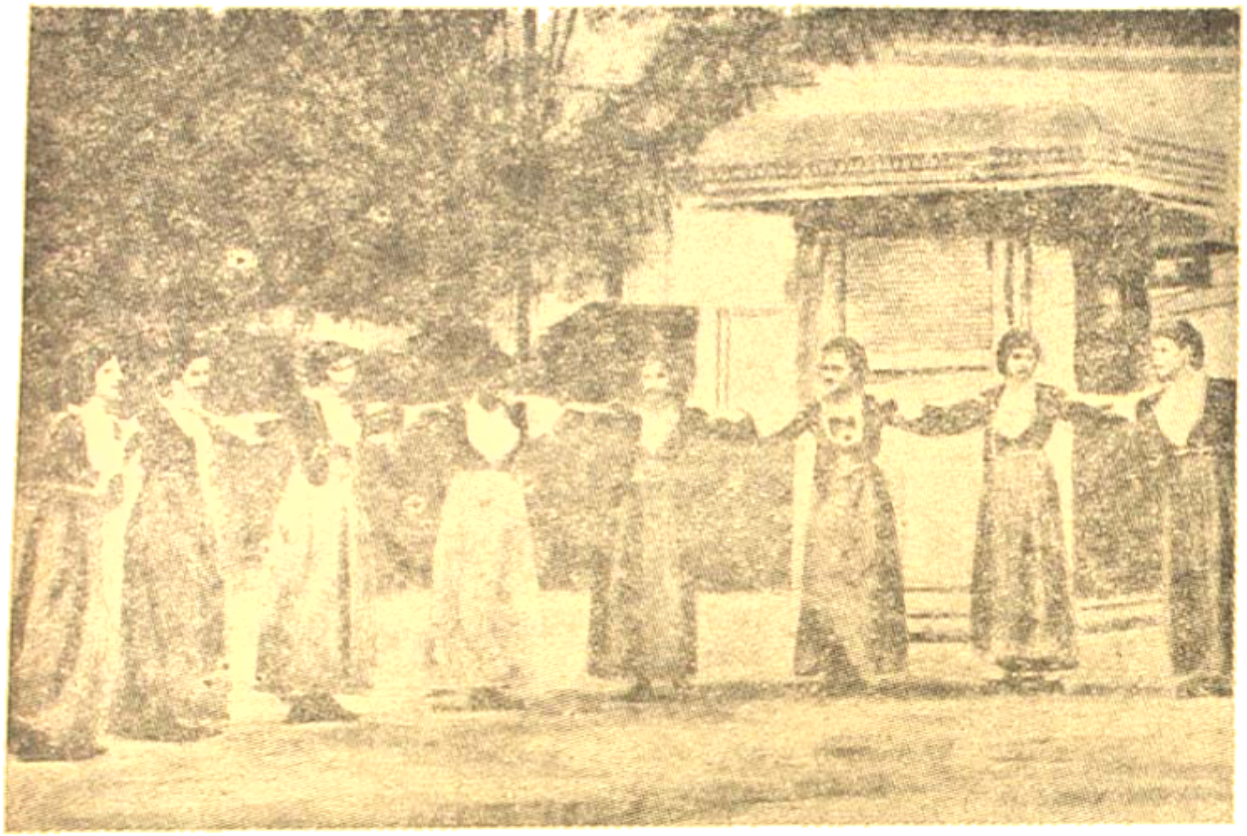

---গ্রীক নৃত্যের একটি বিশেষ ভংগিমা।

বৃদ্ধ পিতা এজিয়ুস আক্রোপলিসের এথেনার মন্দিরে বসে থাকেন। চেয়ে থাকেন সমুদ্রের দিকে। একদিন ফিরে এল থিসিউসের রণতরী মিনোটারকে হত্যা করে ফিরে আসছেন থিসিউস। কিন্তু বিজয়ের আনন্দে শাদা পাল তুলতে ভুলে গেছেন তিনি। বৃদ্ধ এজিয়ুস দেখলেন কালো পাল খাটানো রণতরী এথেন্সের দিকে আসছে এগিয়ে। আক্রোপলিস থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করলেন শোকাতুর পিতা।

এসে দাঁড়ালাম আক্রোপলিসের বিরাট প্রাঙ্গণে। সামনে ৩০ ফুট উঁচু ব্রোঞ্জের প্রতিমূর্তি—এথেন প্রমাকোস। পলি বলল: আজ সূর্য নেই। নয়ত সূর্যালোকে এখনও প্রমাকোসের হেলমেট ঝলমল করে ওঠে। একদিন ছিল যেদিন দূর সমুদ্র থেকে নাবিকেরা দেখতে পেত এথেন্সের অতন্দ্র প্রহরী প্রমাকোস দাঁড়িয়ে আছে।

আক্রোপলিসের আর এক দেব মন্দির পার্থিনন। খৃষ্টপূর্ব ৫০০ শত অব্দে নির্মিত এথেন দেবতার মন্দির। পার্থিননের স্থপতি ইকটিনাস—কিন্তু ভাস্কর ফডিয়াস। যে মহান শিল্পীর কথা আগেই বলেছি।

পার্থেননের দেব সিংহাসন একদা ছিল খৃষ্টানদের অধিকারে। তারপরে এল তুর্কীরা। চিরকালের প্রথামত তারা এই পবিত্র দেবমন্দিরকে পরিণত করল মসজীদে। মসজীদের পাশেই করল অস্ত্রাগার। ধর্ম আর তলোয়ার পার্থিননে রইল পাশাপাশি।

বৃষ্টি পড়ছিল অঝোর ধারায়। পার্থিনন আজ জনবিরল। মাঝে মাঝে দেখা যায় দু' একজন মার্কিনী ট্যুরিস্ট ক্যামেরা কাঁধে করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পলি বলল: অনেকদিন আসিনি আক্রোপলিসে। তোমার দৌলতে আবার আসা হল। সত্যিই তাই। আক্রোপলিসে এথেন্সের মানুষ আজ আর আসে না। পুরাতন এথেন্সকে দৈনন্দিন জীবন থেকে মুছে ফেলে দিয়েছে গ্রীকেরা। তারা ভীড় করে গীর্জায়, তাভার্ণে, সিনেমা হলে, নাচের আসরে, ক্লাবে, আধুনিক যুগের

গ্রীক তরুণ শিক্ষালাভের জন্যে যায় ইংলণ্ডে, সংগতিপরেরা যায় আমেরিকায়। অনেকে যায় রোমে।

গ্রীক ভাস্কর্য সম্পর্কে গবেষণার অধিকতর মাল মশলা আজ বৃটিশ মিউজিয়মে অথবা লুভ্রায়, আজ অ্যারিস্তুতল সম্পর্কে ভাল পড়ানো হয় এথেন্সে নয় অক্সফোর্ডে। গ্রীক ইতিহাসে যাঁদের পাণ্ডিত্য তাঁরা আজ ভূমধ্য সাগরের ওপারের বাসিন্দা।

এথেন্সে এসে ইংরাজী ছাড়া অন্য ভাষা না জানার জন্যে প্রতি পদে পদে চোখে দেখতে হয় না অন্ধকার। কারণ ছাটোর দেশ গ্রীস থেকে এখন একটি ইংরাজী দৈনিক সংবাদপত্র পর্যন্ত প্রকাশিত হয়।

গ্রীসে এখন ইংরাজীর চর্চা চলছে পুরোদমে। প্রতি বছর দলে দলে হাজার হাজার গ্রীক তরুণ তরুণী ইংলণ্ড যাচ্ছে ইংরাজী শিখতে। তাদের কৃচ্ছ্র সাধন অনুকরণীয়। পরের বাড়িতে দাসী বৃত্তি করে তারা সংস্থান করে উদরান্নের। ছ'মাস পর চোস্ত ইংরাজী শিখে তারা দেশে ফিরে আসছে। এছাড়া পথে ঘাটে দোকানে রেষ্টুরেন্টে এখানে যত লোক ইংরাজী জানে একমাত্র জার্মানী ছাড়া কন্টিনেন্টের অন্য কোন দেশে তত ইংরাজী কোন জাতিরই অজানা।

পথে বার হয়ে তাই অসুবিধাই হল না। তবে মুশকিল হল নিজের চেহারাটি নিয়ে। একজন মোটা-মুটি ফর্সা রঙের ভারতীয়ের সঙ্গে একজন গ্রীকের বৈসদৃশ্য খুঁজে পাওয়াই মুশকিল। মূলতঃ উভয়ের কেশদাম যেখানে ভ্রমর কৃষ্ণ। উপরন্তু গ্রীকদের গায়ের রঙে রক্তিমতা নেই মধ্য বা পশ্চিম ইওরোপের মানুষের মত। বরং ভারতীয়দের মত তারা সামান্য পীতাভ। কাজেই রেষ্টুরেন্টে ঢুকলে দোকানী মনে ভাবে আমি তারই দেশোয়ালী ভাই। গ্রীক ভাষার মেনু কার্ডটি

…আক্রোপোলিসে অভিনীত একটি করুণ গ্রীক ট্র্যাজেডির দৃশ্য।

এগিয়ে ধরে। অনেকে গ্রীক ভাষায় আলাপ জমাবার চেষ্টা করে। বহুবার অপ্রস্তুতে পড়েছি পথে। পথিক আমাকে গ্রীক ভাষায় জিজ্ঞাসা করছে পথের নিশানা।

গ্রীকরা ইনহস্পিটাল, আতিথেয়তার আর অতিথিপরায়ণ। অন্তত পপির বাড়িতে ক'দিনে গ্রীসের পারিবারিক জীবনের যে পরিচয় পেয়েছি তাতে আমার এই কথাই মনে হয়েছে।

৮নং এক্সিয়াগোরা ষ্ট্রীটে পপিদের ছোট্ট ফ্ল্যাটে আমাদের বসেছিল সান্ধ্য আসর। পপি, তার মা, মেরিয়া আর ওদের পরিবারের এক তরুণ বন্ধু প্লুটারকাস।

পপিদের ফ্ল্যাটটি সুন্দর ভাবে সাজানো। মেঝেতে পাতা কার্পেট, সুসজ্জিত সোফা সেট। কিন্তু কোন ইংরাজ বোধ হয় গ্রীসে এসে দুদিনেই হাঁফিয়ে উঠবেন। কারণ গ্রীসে টেলিভিশান নেই।

টেলিভিশান নেই তার জন্যে দায়ী গ্রীসের ভৌগলিক প্রকৃতি। পপির মা বললেন: ঈশ্বর যখন এই পৃথিবী তৈরী করবার জন্যে চালনী দিয়ে মাটি চালছিলেন, তখন চালনীর তলাকার ভালো মাটি তিনি ফেলছিলেন নানা দেশে। আর ওপরের কাঁকরগুলো যে দেশে ফেললেন তার নাম হল গ্রীস। গ্রীস তাই বন্ধুর অসমতল। মাঝে মাঝে দিগন্ত আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়। টেলিভিশানের এরিয়ালকে আঙ্কার করে।

প্রসঙ্গটা তুলেছিলাম আমি। বলেছিলাম: পপি, দুহাজার বছর আগে তোমাদের গ্রীসেরই এক দিগ্বিজয়ী সম্রাট আমার দেশে গিয়েছিলেন তরবারি নিয়ে। সেদিন গ্রীস ভারতের বন্ধু হতে চায়নি, প্রভু হতে চেয়েছিল।

মন্তব্যটা ওদের মনে লাগল। প্লুটারকাস বলল: আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয়ের পিছনে মহান উদ্দেশ্য ছিল। গ্রীক সভ্যতার বৈজয়ন্তী ওড়াতে চেয়েছিলেন তিনি।

বললাম: মানলাম সেকথা। কিন্তু সংস্কৃতিকে ছড়িয়ে দেবার একমাত্র মাধ্যম কি তরবারি?

পপি বলল: সে যুগে সেটাই ছিল দেশাচার, দিগ্বিজয় তখন বীরের ধর্ম।

মানতে পারিনি সেকথা। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের ফলে আমরা পেয়েছি গান্ধার শিল্প—শিল্প চেতনার নতুন রূপ, নতুন আদর্শ। কিন্তু তার মূল্য দিতে হয়েছে হাজার হাজার নিরীহ দেশবাসীকে। জনপদ শ্মশানে পরিণত করতে করতে মহাবীর আলেকজাণ্ডার উধার মত ছুটে চলেছিলেন।

মনে পড়ল ম্যাসিডোনিয়ার রাজপ্রাসাদে জন্মিষ্ট হয়েছেন আলেকজাণ্ডার। পিতা ফিলিপ তাড়াতাড়ি চলে গেলেন অ্যারিস্টটলের কাছে। প্রভু এই শিশুকে আপনি আপনার নিজের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলুন।

জানি না অ্যারিস্টটলের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছিল কি না তাঁর জীবনে। হয়ত হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে আমাদের বিশ্বিজয়ের ঐতিহ্য নেই বলেই আমরা এই দেশাচারকে মেনে নিতে পারিনি।

ভোর না হতেই পপি এসে হাজির হল। তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এসে বললাম: দিন যাবে আজি ভাল।

পপি বলল: কাল রাতে কিছু মনে করনি তো আমাদের কথায়। তুমি আবার যা সেন্টিমেন্টাল।

বললাম: তর্কের শেষ নেই জানি কিন্তু অবসান আছে। সেটা হল ভুলে যাওয়া। আর সেন্টিমেন্টাল কথাটাকে আমি গালাগাল মনে করি না, মনে করি কমপ্লিমেন্ট।

পপি বলল: আজ না তোমার ডেলফি যাবার কথা। একটা ভুলতে গিয়ে সব কিছু ভুলে বসে আছ দেখছি।

লজ্জিত হলাম। সত্যিই মনে ছিল না। ডেলফি যাবার বাস ছাড়তে আর মাত্র আধঘণ্টা দেরী।

ডেলফির পথে আমার গ্রীসের গ্রামের সঙ্গে পরিচয় হল। ইওরোপের অনুন্নত দেশগুলির এইটাই হল বৈশিষ্ট্য যে, সে দেশে শহরকে দেখে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা আঁচ করা যাবে না। কলকাতার চৌরঙ্গীতে এলেও যে কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি দেশের প্রকৃত অবস্থার পরিচয় পাবেনই। কারণ সেখানে সাধারণ মানুষের পোষাক পরিচ্ছদ, ভিখারির ভিড়ের কাছে মেট্রোর নিয়ন শোভা নিষ্প্রভ হতে বাধ্য। কিন্তু এথেন্সের ওথোনস ষ্ট্রীসে, আমলিয়াস এভিন্যু, কোলোকোটরিনি স্কোয়ার, সক্রেটিস ষ্ট্রীট, সিন্টাগমা স্কোয়ার, স্টেডিয়াম ষ্ট্রীটে দাঁড়ালে কারুর বোঝার উপায় নেই এদেশের গ্রামের অবস্থা এত শোচনীয়।

ধূলো ভরা পথ পাহাড়ের ফাঁকে জনপদ।

আঙুল দিয়ে পপি দেখাচ্ছে: ওই দেখ ওখানে ১৭ শতাব্দীতে সালানিসের যুদ্ধ হয়েছিল পারস্যের সঙ্গে; বন্দর পার হয়ে আরো পড়ল নতুন শহর—অ্যালুসিস! পাঁচ হাজার বাসিন্দা: আরও দূর দিয়ে আটিকা প্রদেশ থেকে পথ গেল দুভাগে ভাগ হয়ে—একদিকে পথ গেল গেলো পোন্নাসের দিকে, অন্যদিকে গেল ম্যাসিডোনিয়ার দিকে।

ডেলফির পথে পড়ল থেবস। থেবসের রাজা ছিলেন ইডিপাস। আলেকজান্ডারের আক্রমণে একদিন বিধ্বস্ত হয়েছিল এই নগরী।

আক্রমণ আর আক্রমণ। তুর্কীরা গ্রীস শাসন করল বেশ কিছুকাল, হাল আমলে বেশ কিছুদিন শাসন করল ইতালি। ১৯৫০ সাল পর্যন্ত বৃটিশ ফৌজ রইল গ্রীসে। সেদিন নিরঙ্কুশ অরাজকতা।

১৯৪২ সালের কথা। গ্রীসে ফেসিস্ট অধিকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সংগ্রাম গেছে সুরু হয়ে। বামপন্থীদের গুপ্ত সংগঠনের নাম ই, এ, এম,। প্রতিরোধের শক্তি তার দুর্জয়। ১৯৪৩ সালের মধ্যে ই, এ, এম, এর গেরিলা বাহিনী ই, এল, এ, এস, এর হাতে এসে গেল গ্রীসের এক তৃতীয়াংশ অংশ। ই, এ, এম, বামপন্থী দল। দক্ষিণপন্থী দলের নাম এন্ত্র্যাণ্টস,। জেনারেল আরগুস তাদের নেতা তারা চায় রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। দুইদলে এবার বাঁধল লড়াই। সুচতুর বৃটিশ সাহায্য করতে লাগল দক্ষিণ পন্থীদের। ১৯৪৪ সালে গ্রীসে নামল বৃটিশ সৈন্য। গ্রীসের গৃহবিগ্রহ তারা শেষ করতে চায়।

১৯৪৬ সালে বামপন্থী ই, এল, এ, এস, আবার আক্রমণ সুরু করল। গ্রীসে সেদিন বৃটিশদের তাঁবেদার সরকার। রাজতন্ত্র থাকবে কি থাকবে না সে প্রশ্ন তখনও অমীমাংসিত। বামপন্থীরা অস্ত্র পেল যুগোস্লাভিয়া আলবেনিয়া আর বুলগেরিয়া থেকে। কিন্তু কমিনফর্ম থেকে যুগোস্লাভিয়া হল নির্বাসিত। অতএব সরবরাহ গেল বন্ধ হয়ে। বামপন্থী সশস্ত্র আন্দোলনের উপর পড়ল যবনিকা।

১৯৪৬ সালে ফিবারেল আর সোস্যাল ডেমোক্রাট দেয় কোয়ালিশন সরকারের হাতে গ্রীসের কর্তৃত্ব। কিন্তু রাজনৈতিক অনিশ্চিততা কাটল না। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫১ সালের মধ্যে তেরো বার মন্ত্রিসভার রদবদল ঘটল।

গ্রীসে যদিও আজ ফ্যাসিস্ট ন্যাটিকাসে ইউনিয়নের সংখ্যা গরিষ্ঠ সরকার। তবু বছরে যা ফিরে দেন দেবে গ্রীসের ঘাটতি এখন বছরে তিন কোটি বাহান্ন লক্ষ ডলারের মত।

এই ঘাটতি পূরণ হয় মার্কিনী সাহায্যে, কারণ গ্রীস এখন আমেরিকার পাঁটি ছড়ার বাঁধা।

ডেলফির মন্দিরের সামনে এসে থামল বাস একদিন এই মন্দিরে দৈববাণী শোনার জন্যে দলে দলে জড় হত গ্রীসের মানুষ। আজ সে মন্দিরের ভগ্ন দশা।

চারিদিকে পাহাড়ে ঘেরা ডেলফি। কোলোনস এখান থেকে অনেক দূরে। পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়ালে দেখা যাবে নিচের হরিণী ঝরণা। চারো বউ জল আনতে চলেছে কুয়া থেকে। ভেড়ার পাল তাড়িয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরছে রাখাল।

মন্দিরের এক পাথরে আমরা দুজনে বসলাম। ট্যুরিস্টেরা ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। বাস এখন এখানে থামবে কয়েক ঘণ্টা।

পপি বলল আমায়: একদিন গ্রীসের রাজারা পর্যন্ত আসতেন ডেলফির মন্দিরে। যুদ্ধযাত্রার আগে মন্দিরের সামনে থামত ওঁদের রথ। দৈববাণী হত এই যুদ্ধে তাদের জয় হবে না পরাজয়। আজ সেখে সে কণ্ঠ নীরব হয়ে গেছে। আজ আর কেউ আসে না দৈববাণীর প্রত্যাশা নিয়ে।

বললাম: পপি, যদি আজ যদি সে কণ্ঠ তেমন সরব থাকত, তাহলে ঠিক দৈববাণীর কাছে কি প্রশ্ন করতে তুমি?

একটু ভেবে পপি বলল: আজকে একটি মাত্র ভবিষ্যৎই আমার জানবার ছিল, তা মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ।

পপি চুপ করল। আর ডেলফির সেই মন্দিরের দিকে। কোন উত্তরই আজ আসবে না।

(৪৪১ পৃষ্ঠার পর)

—এগার—

কুৎসিত নাটকটার কী কদর্যভাবেই যবনিকা পড়ল।

দুটি মানুষের বিহ্বল বিস্ফারিত চোখের সামনে শোভন কৈফিয়ৎ দিয়েছিল। অনীতাকে সে লিফ্‌ট দিয়েছিল বটে, কিন্তু—

কিন্তুতে চ্যাটার্জি সাহেবকে ভোলান যাবে না। অনীতা নিজে বলেছে, পথের মাঝখানে শোভন তাকে নানা কথায় ভোলাতে চেষ্টা করে নির্জন রাস্তার বিপদ বুঝে নানা কৌশলে তাকে ঠেকিয়ে রাখে অনীতা।

কিন্তু ঘোর দীঘির মোড়ে পৌঁছে স্কুটার থেকে নেমে শোভন তাকে জড়িয়ে ধরে এবং অনীতার চিৎকার—

মিথ্যা! হোয়াইট লাইজ!

হোয়াইট লাইজ? মিলের দু'জন কুলি ছুটে এসেছিল অনীতার চীৎকারে। তারা সাক্ষী দেবে।

মিথ্যে সাক্ষী। বানানো।

কে সত্যি—কে মিথ্যে? তার প্রমাণ কী?

প্রমাণ অনীতাই দেবে।

—একথা নিজে বলেছে সে?—শোভন রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করল।

ইয়েস—নিজেই বলেছে।

এত বড়ো মিথ্যা, এমন বীভৎস কদর্যতা লুকিয়ে থাকতে পারে মানুষের মনে। সেই রোগা কালো মেয়েটি, ছায়ার মতো যে আসে যায়, চলবার সময় যার পায়ে একটুকু শব্দ ওঠে না; একটা করুণ দীনতায় সে নিজের মধ্যে তলিয়ে আছে, যে কখনো কখনো নিজের নিঃসঙ্গ অবসরে বেহালার সুরের মধ্যে হারিয়ে যায়, যাকে দেখে মনে হয়েছিল কাছে থেকেও দূর সমুদ্রের ওপারে যে দাঁড়িয়ে আছে, এমন একটা কুৎসিত অন্ধকার যে ঘরে বেড়াচ্ছে নিজের ভেতর ঘনায়, গ্লানিতে প্রতিবাদ করবার প্রবৃত্তি পর্যন্ত থাকে না।

—এই প্রথম নয়।—আরো বিষ ঢেলে চ্যাটার্জি বলেছিলেন, তার সঙ্গে ইন্টিমেট হওয়ার চেষ্টা তুমি আগেও করেছ। একদিন আমি যখন বাড়ী ছিলুম না, ইউ ওয়েন্ট টু মাই প্রেস, গল্প করেছ তার সঙ্গে, বেহালা শুনতে চেয়েছ। ডিনাই ইট।

নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরেছিল শোভন, চয়তো কেটে রক্তও বেরিয়ে এসেছিল একবিন্দু। শোভন বলেছিল, অস্বীকার আমি করছি না, কিন্তু তার সঙ্গে—

—ইউ আর টু মেকড এ লোফার।—নিষ্ঠুর হাসিতে চ্যাটার্জির মুখ ভরে উঠেছিল: যাই হোক, শৈলেশ ওয়াজ মাই ফ্রেন্ড! তার যত দোষই থাক, আমি তাকে ভালোবাসতুম। তা ছাড়া তোমার বয়েস অল্প—এখনো ফিউচার আছে সামনে, আমি তোমার ক্ষতি করতে চাই

কিন্তু নেক্সট টাইম— ইউ মেক এনি ফারদার অ্যাডভান্স অ্যাণ্ড ইট উইল বি এ পুলিশ কেস!

চ্যাটার্জি বেরিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর নতুন কেনা গাড়ীতে।

কাটা-বেতুন চুপসে যাওয়ার শীর্ণতায় মামা শুধু বলেছিলেন, লোকটা ডেঞ্জারাস্। ওর সমস্ত এ্যালিগেশনই মিথ্যে। কিন্তু কেন তুই লিফ্‌ট দিয়েছিলি ওই মেয়েটাকে? সন্ধ্যের পর তাকে স্কুটারে চড়িয়ে ত্রিশ মাইল নিয়ে আসবার কী দরকার ছিল?

—উনি বিপদে পড়েছিলেন।

—সব বিপন্নকে রক্ষা করবার ভগীরথ দায়িত্ব দিয়ে ঈশ্বর তোমাকে পাঠাননি।—নীমের মতো তিক্ত আর কালো হয়ে উঠেছিল মামার মুখ: তাছাড়া লোকটা যখন বাড়ীতে নেই, তার স্ত্রী নেই সেখানে, তুই কেন গিয়ে গল্প করেছিলি মেয়েটার সঙ্গে?

—চ্যাটার্জি সাহেব মাঝে মাঝে খবর নেবার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন।

মিস্টার কুণ্ডু নীচু হয়ে কুড়িয়ে নিয়েছিলেন পাইপটা। ব্যবসায়ী মানুষ, জীবনে অনেক দেখেছেন, বিচলিত হলেও সেটাকে কাটিয়ে উঠে স্বাভাবিক হতে জানেন। একটু হেসে বলেছিলেন: থাক—যা হবার হয়ে গেছে, নিয়ে আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। এ সব পাড়া গাঁ অঞ্চলে সামান্য একটু ভুল করলেও তার অনেক বেশি খেসারৎ দিতে হয়। এখন এ নিয়ে টানাটানি করলে স্ক্যাণ্ডালই বেড়ে যাবে কেবল।—একটু থেমে বলেছিলেন, আমি বলছিলুম—তরুর বোধহয়, এবার আমার কলকাতায় ফেরা দরকার। অনেকগুলো দরকারী কাজ পড়ে আছে।

মাথা নীচু করে মামা বলেছিলেন, আমাকেও যেতে

ঘরে আপনার সঙ্গে। এখানে আর আমি থাকতে পারছি না। আর—আরও কোন কথা চেপে বলেছিলেন, আমাকে মাপ করবেন মিস্টার মুখুজ্জে। আগে বুঝতে পারলে আপনাকে আজ আমি কষ্ট দিতুম না।

মিস্টার মুখুজ্জে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। আর শোভন বুঝতে পেরেছিল তাঁর দিকে তাকিয়ে। বুঝেছিল, একটা অনিচ্ছার শৃঙ্খল থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছেন। দুশ্চরিত্র শৈলেশ্বর ব্যানার্জির দুর্বৃদ্ধি ছেলের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব, এর পরে আর এক মুহূর্তও বেঁচে রইল না। কিন্তু কী ভাববে চিত্রা?

ওঁরা চলে গিয়েছিলেন। যাওয়ার সময় যেন ভদ্রতার খাতিরেই মামা বলেছিলেন, সামনের সপ্তাহে কলকাতায় আসিস একবার সময় করে।

—আসব।

খুব সন্তর্পণে যা ফুটেছিল মুকুন্দবাবুর মুখেই। কাছে এসে হাত রেখেছিলেন শোভনের কাঁধের ওপর।

আপনি ভালোমানুষ স্যার, বাইরে থেকে এসেছেন, এ দেশের লোককে চেনেন না সাংঘাতিক।

শোভন জবাব দেয়নি

—আপনি মেয়েটাকে সাইকেলে করে বিয়ে এসেছেন, এ নিয়ে খানিকটা কানাঘুষো, হাসাহাসি শুনেছিলুম। কিন্তু জিনিষটাকে যে শেষ পর্যন্ত এইভাবে ওরা দাঁড় করাবে, ভাবাই যায়নি—একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন হয়তো এর জন্যে সব দোষই আমার। টাকাটার জন্যে চিঠি লিখিয়েছিলুম বলেই এইভাবে চ্যাটার্জি সাহেব আপনার মুখ বন্ধ করতে চেয়েছে।

—কিন্তু—কিন্তু—মেয়েটা এমনভাবে মিথ্যে কথা বলতে পারল? উপকারই তো করতে চেয়েছিলুম, তার বদলে—শোভন কথাটা শেষ করতে পারেনি, গলা ধরে এসেছিল তার।

—দুধ খাওয়ালেই তো সাপের জোর বাড়ে স্যার। তখনই সে ফণা তুলে ছোবল দেয়।

—আপনি মন খারাপ করবেন না স্যার, আপনি শক্ত হোন। এ সব কুৎসা নিন্দে দু দিন পরেই লোকে ভুলে যায়। আপনিও ভুলে যেতে পারবেন।

শোভন আরক্ত চোখে একবার চাইল মুকুন্দের দিকে।

—কিন্তু টাকাটা?

মুকুন্দবাবু শীর্ণ স্বরে বললেন, এখন থাক।

—থাকবে কেন? কার্যের টাকা—ন্যায্য পাওনা। উকিলের নোটীশ দিন।—আরক্ত চোখ জ্বলতে লাগল শোভনের: পাওনা টাকার একটা পয়সাও ছাড়া যাবেনা। আপনার করতে হবে ইন্টারেস্ট শুদ্ধ।

—দেখি। তাছাড়ির মাস তিনেক দেরী আছে এখনো।

তাই দেখুন মুকুন্দবাবু তিন মাস সময় আছে—নোটীশ দেবার, মামলা করবার মতো যথেষ্ট সময় আছে হাতে। কিন্তু শোভনের আর উৎসাহ নেই চিত্রার জন্যে তার দুঃখ নেই—ক্ষোভ নেই অসম্ভবের প্রাসাদ শূন্যে গড়ে, শূন্যেই মিলায়। তার জন্যে যেটুকু মনোভঙ্গ তার সবটাই মামার। শোভনের ভাবনা নেই সেজন্যে।

দেওয়ালে ঝোলানো এস ব্যানার্জির ছবি। শিল্পীর উজ্জ্বল মন দীপ্ত হয়ে আছে ছবিগুলোতে, শেলফের কবিতার বইতে, সাজানো বাংলোয়, সুন্দর বাগানে। কিন্তু ভেতরের পাপ যাবে কোথায়? সেই চরিত্রহীন মাতাল লোকটা—দুর্যোগের রাতে স্ত্রী পুত্রকে যে বাড়ী থেকে বার করে দিয়েছিল, তার সেই দুষ্কৃতির কালো স্রোত সব কিছুর ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে দুর্গন্ধ পঙ্কিলতায়! তার হাত থেকে মুক্তি কোথায় শোভনের?

অথচ, কিছুদিনের জন্যে শোভন ভুলতে পেরেছিল। ভুলতে পেরেছিল চাবুকের ঘায়ে ঘায়ে সর্বাঙ্গ জর্জরিত হয়ে গেছে, শাদা পিঠের ওপর সেই কালো কালো সরীসৃপ চিহ্ন গুলোকে। সেই চোখের জলের স্মৃতিগুলো আবছা হয়ে গিয়েছিল তার কাছে।

তারই প্রায়শ্চিত্ত।

সব স্পষ্ট হয়ে গেছে। এ বাড়ীর—এই পোলাট্রির—শৈলেশ্বরের এই সম্পত্তির সে কেউ নয়। এই অভিশাপের মধ্যে আর সে থাকতে পারবে না। তার আগ্রাই ভালো। সেই পুরানো জীবন, সেই সাইকেল আর মোটর পার্টসের ব্যবসা, তার মায়ের স্মৃতি, সেই ঢেউখেলানো দীর্ঘ কালো পথ, দুপাশে মেঘমেদুর অড়হরের ক্ষেত, দুর্গের মতো

পুরনো চরিত্রের বড়ী, সেই ভাঙা মেসজিন, দুই-তোর-ওভালায় ঢোকা হবে যাওয়া পুরনো ঘরের আর পাশের দরজাটা।

সেই ভাঙা

দিন দুই পরে আবার মুকুন্দবাবুকে ডাকল সে

—শুনুন, আমাকে একটু ছুটি নিতে হবে।

মুকুন্দবাবু তাকিয়ে রইলেন তার মুখের দিকে।

—আমি একবার আগ্রায় যাব মাসখানেকের জন্যে। ওখানে আমার একটা ছোট ব্যবসা আছে জানেন বোধ হয়, সেটা একবার দেখে আসা দরকার।

মুকুন্দবাবু বাধা দিলেন না। বললেন, বেশ যান।

মনে মনে ভাবলেন, যাওয়াই ভালো। যে আত্মীয়েরা গোড়া থেকে শত্রুতা করছিল তারা তো আছেই, তা ছাড়া সমস্ত এলাকায় একটা কুৎসার একটা দুর্গন্ধে ভাওর চলছে এখন, কোথাও যেন কান পাতা যায় না। বলাই তো এ নিয়ে কার সঙ্গে হাতাহাতিরই উপক্রম করেছিল। শোভন ঘরে আসুক কিছুদিন। লোকের মুখ একটু বন্ধ হোক—শোভনের মাথা ঠাণ্ডা হোক একটু।

আবার বললেন, বেশ ঘুরেই আসুন। আমরা এ নিয়ের মধ্যে থাকি, আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না।

ভাবনার কিছু নেই শোভনের। এখানে আসবার পর এমন নির্ভার মনা সে কোনো দিন হয়নি।

মুকুন্দবাবু চলে যাওয়ার পর তার মনে পড়ল, আজও ফুলদানিতে কয়েকটা টাটকা ফুল সাজিয়ে দিয়ে গেছে মনোরমা। নিজের ফুল। একটা হিংস্র আক্রোশের বেগ এবার আর কিছুতেই সে রোধ করতে পারল না, ফুলগুলোকে তুলে নিয়ে কুটি কুটি করে ছিঁড়ে বাইরের নর্দমার মধ্যে ফেলে দিয়ে এল।

রাত বাড়ে দেখে। শোভন ভাবছিল, এই দমবন্ধ করা বাড়িতে, রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে কেমন করে কাটানো যায় আর। কাল ভোরেই সে ছুটায় নিয়ে চলে যাবে। তারপর কলকাতায়। গিয়ে উঠবে একটা হোটেলে। সামান্য কিছু টাকা আছে, আর ছুটারটাও একেবারে নতুন—বিক্রী করে দিলে অন্তত হাজার টাকার কাছাকাছি দাম পাওয়া যাবে। তারপর আগ্রা। তারপর—

তারপর সে আর ফিরবে না। শৈলেশ্বরের সম্পত্তি ছাড়াই এতদিন তার চলছিল, এখনো চলে যাবে। যা তার নয়, যার বাইরে সমস্ত শিল্পরুচির আড়ালে ক্লেদ আর গ্লানির একটা অন্ধ তমস, যার ওপর তার মায়ের চোখের জল টপ টপ করে ঝরে পড়েছে তার কোনো দাবি নেই। ও যারা চেয়েছিল, তারাই নিক। শোভন তার মায়ের ছেলে—শৈলেশ্বর ব্যানার্জী তার কেউ নয়।

কী নেওয়া যাবে? একটা ছোট সুটকেস—যা তার সঙ্গে সঙ্গে এনেছিল। তার বেশি কিছুই দরকার নেই তার।

শোভন ভাবছিল ভোরে যেতে হলে এখনই সুটকেসটা গুছিয়ে নেওয়া দরকার, এমন সময় দরজায় টক টক করে টোকা পড়ল কয়েকটা।

—কে?

জবাব এল না, টোকা পড়ল আবার।

নিশ্চয় বলাইবাবু কিংবা মনোহর। মুকুন্দবাবু ডাক দিয়ে আসেন, এত বিধা করেন না। বিরক্তিতে ভ্রূ কুঁচকে উঠল শোভনের। আর কি বিরক্ত করবার সময় পেলনা এত রাত ছাড়া? সব কাজের কথা তো হয়ে গেছে, সে তো জানিয়েই দিয়েছে কাল ভোরেই কলকাতায় চলে যাবে।

বিরক্ত হয়ে দরজা খুলল। সেই গোল করে পাকানো ছাতা। সেই খাকী রঙের পাঞ্জাবী। অধিনী হালদার।

ইচ্ছে করল, ঘাড় ধরে লোকটাকে বাইরে অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কিন্তু নিজেকে সামলে নিলে। বললে, কী চাই আপনার এত রাতে?

মাথা নীচু করে অধিনী বললেন, আপনার সামনে দাঁড়াবার মুখ নেই। কথা কইবার সাহসও নেই। তবু কিছু বলতেই হবে। মিনিট দশেক সময় দেবেন আশা করি?

এই রাত্রে, এই নির্জনতায় একটা নরহত্যা করলে কী হয়? এই লোকটাই তো অনীতার সবচেয়ে বিশ্বস্ত, তার চরিত্রের রক্ষিক। এখনই এর গলা টিপে ধরলে আইনত, ধর্মত কি কোনো অপরাধ হয় কোথাও?

দাঁতে দাঁত চেপে শোভন বললে, আসুন।

অধিনী এলেন। কিছুক্ষণ বসে রইলেন স্থির ঘরে। তারপর ঘোলাটে চোখ তুলে বললেন, বিশ্বাস করবেন একটা কথা? যা ঘটেছে তার জন্যে অনীতা দায়ী কোনো দোষ ছিল না।

—না, সব দোষ আমার।—একটা চুরুট ধরাতে যাচ্ছিল শোভন, তার আগেই সেটাকে নখের ডগায় টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল: কোনো কৈফিয়তের দরকার নেই।

—আপনি রাগ করতে পারেন, করাও উচিত।—কিন্তু অধিনী যেন একবার পাঞ্জাবীর হাতায় চোখ মুছে নিলেন। তবু সব আপনাকে জানানো দরকার। এ সব কথা চ্যাটার্জি সাহেব জোর করে ওকে দিয়ে বলিয়েছেন। ওর না বলে উপায় ছিল না।

—এত বড়ো মিথ্যাটাও না বলে উপায় ছিল না?—

শোভন হাসতে চেষ্টা করল, তার হাসি থেকে করতে লাগল বিধ : উনি বোধ হয় সাহেবের ফৌতদাসী ?

—ঠিক তাই।

—তার মানে ?

অশ্বিনী আবার চুপ করে রইলেন, দেওয়ালের গায়ে দুঃসাহসী ছবির দিকে চোখ পড়তেই অভ্যাসে মাথা নামালেন, তারপর আপন মনের বললেন, জানেন, অনীতা চ্যাটার্জি সাহেবের আপন মেয়ে।

—আপন মেয়ে!—সারপভাবে চমকে উঠল শোভন : কী বলছেন মশাই? উনি নিজে বলেন কুড়—বলেন আশ্রিতা—

অশ্বিনী তিক্তভাবে বললেন, নিজের পাপ ঢাকতে গেলে কী আর বলবেন? একটি অল্প বয়েসী ঝি কাজ করত ওঁর বাড়িতে। তার সঙ্গে ওঁর নেলাবেলার ফল এই মেয়ে। তারপর মেম সাহেব ছেলেমেয়েদের নিয়ে আলাদা হয়ে যান—স্বামীর কাছে আর ফেরেন নি। ব্যাপারটা নিয়ে সরকারী মহলেও গণ্ডগোল হয়েছিল, নানা ধরাধরি করে চাপা দেন সমস্ত।

—তা হলে অনীতা—

—সেই ঝিয়ের মেয়ে। বছর পাঁচেক ছিল ওঁর কাছে ঝিটা, একদিন মেয়েকে ফেলে পালায়। সাহেব তার কী করবেন, আশ্রিতা পরিচয় দিয়েই মেয়েটাকে লালন-পালন করতে থাকেন। লেখাপড়াও শেখান খানিক দূর পর্যন্ত। কিন্তু সারা জীবন বিষ নজরে দেখেছেন, একদিনের জন্যেও মেয়ে বলে স্বীকার করেন নি।

শোভন স্তব্ধ হয়ে গেল। সেই সুদূর দুর্যোগ ঘনটার ওপর একটুকরো আলো যেন পড়ছে এতক্ষণে।

অশ্বিনী বললেন সেখানেই শেষ নয়। ফুলস্ক্যাইনালের আগে অনীতা পড়ল টাইফয়েডে, সেরে উঠল, কিন্তু দু-তিন বছর ধরে কেমন ছাড়া হয়ে রইল, কিছু যেন ভালো করে বুঝতেই পারে না। তার সুযোগ নিলে একজন। সে ওঁরই খুব প্রিয় অল্প বয়েসী অফিসার। বাড়িতে মেয়েছেলে নেই, চ্যাটার্জি সাহেব না থাকলেও আসা যাওয়া করত, মেয়েটাকে বলেছিল বিয়ে করবে। তারপর—

অশ্বিনীর কপাল দিয়ে টপ টপ করে ঘাম পড়তে লাগল : বলতে লজ্জা হচ্ছে, অসুস্থ হাবা মেয়েটা মা-র ভুলটাই করে বসল। অফিসারটি এখন বদলী হয়ে গেছেন, কোথায় এক বড়লোকের মেয়ে বিয়েও করে বসে আছেন। আর এদিকে—

চেয়ারের মধ্যে জমে যেতে লাগল শোভন।

—গণ্ডগোল চ্যাটার্জি সাহেব ভুলতে পারলেন না, কোনো কেলেঙ্কারী উনি মেয়ের এ সব পরিচয়ও চাপা থাকবে না। মেয়েকে নিয়ে কলকাতায় গেলেন, হাসপাতালে দিয়ে কী ব্যবস্থা করলেন, সারতে সারতে লেগে উঠল মেয়েটা। তারপর থেকে অত্যাচারের পালা চলছে উঠেছে। কুৎসিত গাল দিয়ে বলেন, লাথি মেরে তাড়িয়ে দেব—সব ফাঁস করে দেব। কোথায় যাবে? তাই চ্যাটার্জি সাহেবের ভয়ে আপনার সামনেও—

শোভন নিঃশব্দ স্বরে বললে, বুঝেছি।

—ওর অবস্থাটা ভাবুন। ছেলে মানুষ, অসুস্থ, মানুষকে বিশ্বাস করেছিল, তার সাথেই আজ ওকে দিতে হচ্ছে। এখন ও বাঁচতে চায়, পালাতে চায়, এই আশ-পাশ থেকে যে ভাবে হোক বেরিয়ে যেতে চায়। তাই আমি আপনার কাছে ওর জন্যে চাকরির দরবার করতে এসেছিলুম! কিন্তু ঘটনাচক্রে আপনার যে এমন ক্ষতি হয়ে যাবে—

পাঞ্জাবীর আস্তিনে আবার চোখের জল মুছে ফেললেন অশ্বিনী।

বাইরে জ্যোৎস্না নৈঃশব্দ। হাওয়ায় ফুলের গন্ধ। ঝিঁঝির ডাক। সব অবান্তর। চিত্রের রূপকথা শেষ হয়ে গেছে, এখন আর এক কাহিনী।

অশ্বিনী বললেন, কিছু যদি মনে না করেন, একবার অনীতা মা-কে ডেকে আনব কি?

চমকে শোভন বললে, কোথায় তিনি?

—বাইরে দাঁড়িয়ে। ক্ষমা চাইতে এসেছে আপনার কাছে। চ্যাটার্জি সাহেব আজ আবার কলকাতা গেছেন সেই সুযোগেই তো আমরা আসতে পারলুম। ডাকব তাকে?

শোভন বললে, দরকার নেই আমি ক্ষমা করেছি।

—একবার—

ক্লান্ত স্বরে শোভন বললে, মাপ করবেন। লজ্জার মধ্যে যিনি ডুবিয়েই আছেন, নতুন করে তাঁকে আর লজ্জা দেবেন না। তা ছাড়া আমায় এখন একটু বিশ্রাম করতে দিন। কাল ভোর পাঁচটার আগেই বেরিয়ে যেতে হবে আমাকে।

—কোথায় যাবেন?

—আগ্রা।

—কবে ফিরবেন?

—হয়তো এক মাস পরে। হয়তো কোনোদিনই নয়।

* * *

হয়তো কোনোদিনই নয়, সমস্ত রিক্ত হৃদয়ের সেইটেই

(৭৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)

মুখে তার লোধ্র রেণু

প্রিয়দর্শী

প্রথম পরিচ্ছেদ

শরৎকাল।

আকাশে নির্মল মেঘ।

ভৃগুকচ্ছের উপকূল। পশ্চিম সমুদ্রের চারদিক থেকে পোতশ্রেণী আসছে। কত রঙের পাল, যেন শরতের ফুলের কেয়ারি। কোথাও শাদা—ভাঁজে-ভাঁজে শাদা, কোথাও রাঙা ভাঁজে-ভাঁজে রাঙা। কোথাও কুঙ্কুম, কোথাও হরিদ্রা। নীল সবুজ জলের উপর যেন রঙের সমারোহে বেঁধে গেছে।

হেমধরের পরপাত পালের তরণী শ্রেণীর মত কিন্তু একটিও নৌকা নেই। এ দেশের নৌকার মত তাঁর নৌকা বড় বা ভারী নয়। কিন্তু গতি ক্ষিপ্র। এরা ছেলে বলে—নৌকা নয়, ডিঙ্গা। হেমধরও হেসে বললে—'আমার হংসমিথুনা ডিঙ্গা'। সিংহল, যবদ্বীপ, সুবর্ণভূমি প্রভৃতির সঙ্গে বহির্বাণিজ্যে তাঁর মত বড় শ্রেষ্ঠী খুব কমই আছে। নৌকাও তাঁর একটি দুটি নয়। এক এক শ্রেণী বা সঙ্ঘে সাতটি করে পোত—এমন সপ্ত সঙ্ঘ অর্ণবপোত। তার খোলে কত না পণ্য—বারাণসী সাড়ী, পৌণ্ড্রবর্ধনের নীলাম্বরী চীন দেশের চীনাংশুক, সাকেতের মৃগরোমজ রাঙ্কব বস্ত্র, যবদ্বীপের কুম্ভযুক (দারুচিনি), সিংহলের সিন্ধু-মৌক্তিক। লোহিত, মরকত, শিলাজতু, সমুদ্রফেণা, পাট, রেশম, তসর। পারস্যের ঘোড়া আর কলিঙ্গের হাতীও নিয়ে যেতে দ্বিধা করতেন না তিনি।

এ ছাড়াও আর একরকম পণ্যের সমবরাহ করতেন শ্রেষ্ঠী। কিন্তু সে কথা অতি গোপনে, অতি নিভৃতে বলা চলে। সিন্ধু, ওড্র, কলিঙ্গ, কাবেরী পত্তন, তাম্রলিপ্ত—কত দেশের কত সুন্দরীকে তিনি কত না বয়সে দিয়ে এসেছেন। পৌঁছে দিয়েছেন অমাত্যের প্রমোদ কক্ষে, কখন বা রাজার বিলাস-বাসরে। কিন্তু এবার তাঁর উপরে যে কন্যা সংগ্রহের আদেশ ছিল তা বিচিত্র। যখন সেকথা তিনি শুনেছিলেন প্রথমে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল তাঁর মন।

এখনো কানে গমগম করে বাজছে আচার্য ঈশানেশ্বরের উক্তি—"শ্রেষ্ঠী হেমধর, আমাকে বঙ্গদেশীয় একটি গৃহস্থ বালিকা এনে দিতে পারবে—সপ্তমবর্ষীয়া হওয়া চাই।"

বঙ্গদেশ? সপ্তমবর্ষীয়া? গৃহস্থ বালিকা?

"কেন আশ্চর্য"? হেমধর সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিলেন। মনে মনে এই চেষ্টাই করেছিলেন—তিনি বঙ্গীয়, কিন্তু বঙ্গের মহিলাদের তো সুন্দরী খ্যাতি নেই। কাশ্যমীর বা পারসিক, মগধ বা অপরন্তে দেশেই সুন্দরী মেলে। কিন্তু দুরাশের দিকে তাকিয়ে আচার্য যা বলেছেন তা আরো বিস্ময়কর—

"অনেক দিন তো হোল। বহু নর্ত্তক-নর্ত্তকী তৈরী করেছি। সাকেত, উজ্জয়িনী, সিংহল, দক্ষিণাপথ কত দেশের কত মেয়েকেই দেবনর্ত্তকী করলাম। কিন্তু আশা মিটল না। এরা দেবতাকে চায় না মানুষকে চায়। কেন বলতে পার?" আচার্য ঈশানেশ্বর কঠিন ধাতুর মানুষ বলেই বিখ্যাত। তাঁর গলা যেন ঈষৎ কোমল হয়ে গলে গেল।

হেমধর নত মস্তকে কণ্ঠের প্রলম্বিত মোতির মালা দিয়ে ক্রীড়া করতে লাগলেন।

আচার্য গলা পরিষ্কার করে বললেন—

"তাই স্থির করেছি একবার শেষ চেষ্টা করব। শুনেছি বঙ্গের মেয়েরা ললিত কোমলা—হৃদয়ে তাদের করুণার মধু। শুনেছি তারা পতিপরায়ণা—ছায়েবানুগতা। আর মিটি কন্যা নয়—বায়ধোয়া নয়। আর দুলপ্রসব নয়। মহাকালকে আমি আমার জীবনের শেষ নৈবেদ্যটি শুদ্ধ পুষ্পেই দেব। তাতে যেন মলিন দাগ না থাকে। তারপর……

"তারপর কি আচার্য ?"

"বারাণসী যাত্রা করব।"

"কিন্তু···ইতঃস্তত করেছিলেন হেমবর।

"কিন্তু কেন হেমবর ? আমি তো অসম্ভব বস্তু চাই নি। যত মূল্য লাগে আমি দেব।"

"অসম্ভব নয় আচার্য, অপ্রাপ্য। বহুমূল্য বস্তু, অমূল্য।"

"কেন ?"

"আপনি চেয়েছেন সপ্তম বর্ষীয় কন্যা"···

"হ্যাঁ ভরতের নাট্যশাস্ত্র অনুসারে ঠিক মত শরীর বিন্যাস করতে গেলে কোনও অসুবিধা প্রশস্ত। সপ্তম, অষ্টম বড় জোর নবম বর্ষীয়া কন্যা নৃত্য চলতে পারে কিন্তু তারপরে আর নয়।"

"বৃদ্ধবয়সে গৃহে কন্যা চাইলেন কেন ?"

"কারণ আমি চাই অনিন্দিত কন্যা। মহাকালকেই পতি মনে করে নিজেকে উৎসর্গ করে দেবে। অন্যান্য-বর্ষের ভোগে নিজেকে বিচ্ছুরিত করে দেবে না।"

হেমবর ভ্রূ কুঞ্চিত করে চিন্তামগ্ন রইলেন অনেকক্ষণ। আচার্য সান্ধ্যবন্দনার সময় উপস্থিত দেখে উঠলেন। তখন হেমবর বললেন "গুরুদেব চেষ্টার ত্রুটি হবে না। এখন সিন্ধু-গঙ্গা-লোহিত্য নদ পরিক্রমা করে একবার গৌড়-বর্ধন যাব। তারপর তাম্রলিপ্ত তারপর সিংহল। পূর্ব লাগর হয়তো খুব উত্তাল থাকবে। এটা বর্ষার সময় কি না। কিন্তু মহোদধি চির শান্ত। ফিরে আসতে শরৎ কাল হবে। যদি মনোমত কন্যা পাই আপনার কাছে উজ্জয়নীতে নিয়ে আসব।"

"উজ্জয়নী ? না আমি শরৎকালে ভৃগুকচ্ছে এসে তোমার জন্য অপেক্ষা করব। এটি আমার জীবনের শেষ কাজ। তাই সংকল্প এর বড় কাঠিন। কিন্তু বৎস, মায়ের কোলের কন্যা আনবে না, বন্ধ্যানীনা কন্যা আনবে না। যে মায়ের প্রথম সন্তান জীবিত আছে, যার পুত্র আছে, এমন মায়ের কন্যা আনবে।"

"এত বিচার ? গুরুদেব কি মহাকালের বধূ নির্বাচন করছেন ?"

হেমবর পরিহাস করলেন।

"হ্যাঁ, আমার মহাকাল-বধূ।" গুরুদেবও প্রত্যুত্তর হাসলেন। তারপর অভয়-মুদ্রার হাতটি তুলে বললেন,—

"শ্রেষ্ঠী, সর্বকাজে মহাকাল তোমার সহায় হোন।"

• • •

ভৃগুকচ্ছ থেকে পাটলীপুত্র হয়ে হেমবর গৌড়বর্ধনে যেদিন পৌঁছলেন সেদিনই যোগাযোগে ঘটল। নারায়ণ ভট্টের মৃত্যু ঘটেছে পূর্বরাত্রে—নারায়ণ ভট্টের স্ত্রী সীতাদেবীও যাবেন সহমরণে। তাই প্রচণ্ড রোল চলছে। সীতাদেবীর দুই পুত্রকে তাই ভরদের আচার্য গ্রহণ করেছেন। কিন্তু কন্যা দুটিকে কে নেবে ? ব্রাহ্মণকন্যা —বিবাহের বয়সে আছে। সীতাদেবীর প্রতিবেশিনী কমলা ব্রাহ্মণী একটি কন্যার ভার নিতে ইচ্ছুক। এমন সময় হেমবর শ্রেষ্ঠী সেখানে উপস্থিত হলেন। কমলা ব্রাহ্মণীর পাটি ক্ষেত আছে। বছরে একবার করে তাই হেমবর এসে তার হাতে তৈরী বস্ত্র কিনে নিয়ে যান। কমলার হাতে গুড়ের বয়নও বেশ ভাল। আটার মত দিয়ে তিনি এমন এক রেশ গুড় প্রস্তুত করেন যে তার চাহিদা দূর বিদেশেও আছে। কেতকী পত্র দিয়ে সুগন্ধী খলিও তৈরী করেন তিনি। কুসুম, পাতা, উদ্ভিদের সারত্ব কন্যাদের কাছে তার বড় আদর।

বৃত্তান্তটি শুনে হেমবর বললেন "আমি একটি কন্যার ভার নিতে প্রস্তুত আছি।" তাঁর কথা শুনে সীতাদেবী বললেন—"মহাকালের বধূ হবে আমার কন্যা ? এতো তার পূর্বজন্মের সুকৃতির ফল। বাছা, আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধবীকে তুমি নাও। আর বালতীকে কমলা নেবে।"

সপ্তমবর্ষীয়া মাধবীকে নিয়ে সেদিন ভরা বর্ষার পাট ক্ষেতের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে হেমবরের মনে হয়েছিল মহাকালের কি এই ইঙ্গিত ছিল ? তিনি নিজে চক্র-স্বামীর ভক্ত। কিন্তু ঘটনার গতিতে তিনি রোমাঞ্চিত বোধ করছিলেন।

বাণিজ্যে এবার দ্বিগুণ লাভ হোল হেমবরের। নারকেলের বদলে শঙ্খ, এলাচের বদলে মোতি, পাটের বদলে সোনা। তাম্রলিপ্তী বন্দরে এসে হেমবর মাধবীকে পরিয়ে দিল চাঁপা রংয়ের রেশমী বস্ত্র। গলায় ঝুলিয়ে দিল সিংহলী মুক্তোর মালা। মাধবী খুব খুশী। এ কয়দিন তার জলভরা চোখ দুটো কারণে অকারণে ছলছল করেছে। কেন

থেকে মনে পড়ছে নারকেল পাতা ঘেরা উঠানের কথা—কুটির—রক্ত কমলে ভরা তড়াগ—পিতার মৃত্যু—মায়ের দুঃখে। কিন্তু আস্তে আস্তে পূর্ব জন্মের মত সে সবও মিলিয়ে হয়ে আসছে। মাধবীর ভাগ্য বিধাতা বড় দ্রুত তার মনের পটে রঙের তুলিকায় আঁচড় ফেলছেন। মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে পারোর রেখা—ফুটে উঠছে নতুন নতুন ছবি।···এই ভীষণ তরঙ্গশ্রেণী ইন্দ্রনীলময় মণির পাত্রে ঘোলা সমুদ্র—অপর পারে কত না আশ্চর্য দেশ। কোথাও চন্দন গন্ধ—কোথাও গন্ধ কুটির সুবাস। যাত্রি—যাত্রা—নাবিক—তরণিক। সুমাত্রা···যবদ্বীপ··· কল্যাণ। জীবনের বলয় কি বিস্তৃত কি বিচিত্র। নিতান্ত নতুন উত্তেজনা।

শ্রেষ্ঠী তাকে ডাকে "পার্বতী জননী।"

শ্রেষ্ঠীর প্রধান পোতবাহ নকুল তাকে ডাকে "লক্ষ্মী মা গো।"

কত দেশের কত বণিক আসে। তাকে দেখে অবাক হয়।

"শ্রেষ্ঠীর মেয়ে নাকি?"

"আজ্ঞে না। ঈশান ঠাকুরের বরাত।"

"তা ঈশান ঠাকুরের বরাত দেখি খুব ভাল! দিয়ে যাও একে, হাজার সুবর্ণ মূল্য পাবে।"

হাজার না হয় লাখ; লাখ না হয় তো কোটি।

বলিদ্বীপের শ্রেষ্ঠী গোনর্দ তা দিতেও রাজি।

কিন্তু হেমধর রাজি।

"না ভাই তা হয় না। এ বার খোয়ার কন্যা নয়।"

"তবে?"

"ঐ যে বললুম ঈশান ঠাকুরের বরাত। দেবতার নৈবেদ্য।"

বণিকেরা হাসে! ভাবে আর কোথাও অর্থের জোর আছে। আর একদিন এসে দরদাম করতে হবে, রূপ করে ফেলে দিতে হবে লাভার হীরের কণিকা।

কিন্তু তার আগেই নোঙর খুলে দিয়েছে হেমধর। জানে দামে না পোষালে লুট হয়ে যাবে এ মেয়ে। গায়ের রংটি ঘিয়ের মত মসৃণ। বড় বড় চোখ দুটিতে কত কালের বিস্ময় যেন কাজল হয়ে আছে। বাঁশীর মত নাক। গোলাপী পাঁপড়ির মত দুটি ঠোঁট। আঙুরের মত ছোকা ছোকা চুল! গড়নটি বেশ ঝরঝরে। একটি নিটোল ফলের মত। আহা, যখন রসে ভরভর হয়ে উঠবে।

হেমধর ঘুমন্ত মাধবীর দিকে নির্নিমেষে চায়। তাম্রপর্ণী থেকে ভূপুরুক্ক মাত্র সাত দিনের পথ। দক্ষিণ জলনিধি ছাঁড়য়ে পশ্চিম পয়োধি পার হতে আর কত দিনই বা লাগবে? এতো পূর্ব সাগরের মত উত্তরোল নয়। আর ঘণ্টা দুই। বোধহয় তাও নয়।

আহা, তাই যেন হয়।

পঞ্চমীতে অস্তমিত নিশি।

হেমধর মনে মনে বলে।

তার প্রধান নাবিক নকুল অনেকদিনের লোক। লোকে বলে ও নাকি জলের সঙ্গে কথা কয়। ও নাকি জলসিদ্ধ পুরুষ। উপরের হাল থেকে চেঁচিয়ে উঠল, "বরুণ, বরুণ।"

একটা মস্ত ঢেউ পশ্চিম পয়োধির উপর খেলে গেল। হেমধর ছিটকে পড়ল বস্ত্র-বেদী থেকে।

ঘুম ভেঙে মাধবী চেঁচিয়ে উঠলো কেঁদে।

"আরে চুপ চুপ। ওমা কি হোল তোর? কপাল যে রক্তে ভেসে গেল। সর্বনাশ ঘটল বুঝি।

মাধবীর মাথায় হাত দিয়ে বসলেম হেমধর।

ভ্রূ দুটির মধ্যে বিদ্ধ হয়ে গেছে একটি অবশুষ্ক বৈদূর্য খণ্ড। বাইরে তখন ধড়াদড়ি, হাল-পাল নিয়ে চলেছে হৈ হৈ। অনেক পোতশ্রেণী মধ্যে ভিড়োতে হবে তাদের পোতশ্রেণী। হৈ হৈ করছে চারদিক।

শরতের গোড়া বলে ভূপুরুক্কে বাণিজ্যও জমজমাট কোন তরিশ্রেণী চলেছে সিংহলের দিকে কেউ আবার আসছে সিংহল থেকেই। যবদ্বীপগামী পোতগুলি যাত্রা করবে কাল। বলি দ্বীপের নৌকো পরশু। বঙ্গদেশের নৌকোগুলি এসেই ছেড়ে যাবে এক বেলার মধ্যে। কৃষ্ণপক্ষের আগে পৌঁছান চাই যে। সেখানে নাকি মহাকালীর পূজা হয় ভারি ধুমধাম করে।

"মহাকালের পুজো?"

"হ্যাঁ হে মহাকালী।"

"সে আবার কি?"

"আর বল কেন? বঙ্গালদের কথাই পৃথক। ওরা মহাকালের পুজো করে না। করে মহাকাল বন্দু মহাকালীর।"

"হাঃ হাঃ হাঃ।"

"হোঃ হোঃ হোঃ।"

"হেসো না হে। ওতেই নাকি ওদের শক্তি।"

"কি রকম?"

"গ্রামের বাইরে—শ্মশানের মধ্যে—রক্তবস্ত্র পরিধান করে নাকি পুজো হয়।"

"সে কি রকম? মহাযান বৌদ্ধ নাকি?"

"না, না, বৌদ্ধ নয় ওরা। বৌদ্ধদের মত মুণ্ডিত মস্তকও নয়। জটাজুটধারী। তবে উপচারে মদ্য, মাংস, মৎস, মৈথুন, মুদ্রা সবই চলে।"

"বাঃ এটা তো বেশ।"

"এটা বেশ হোল? হ্যা, হ্যা, হ্যা। এ জন্যই তো ওখানে গেলে ব্রাত্য হয় লোকে।"

"ঐ দেখ ওদের প্রধান সাংযাত্রিক হেমদত্ত শ্রেষ্ঠীর পোতশ্রেণী এসেছে। চল, চল দেখি কি এনেছে।"

"কেন? ব্রাত্যের নৌকা দেখতে যাচ্ছ কেন?"

"উন্মাদ নাকি? বাণিজ্যে আবার ব্রাত্য কি?"

"তাহলে বলি, রাম দত্ত, নৌবাণিজ্য তো ঐ বঙ্গালরা ছাড়া কেউ করে না। আমরা তো শুধু স্থলবণিক—সার্থ-বাহ হয়ে গেলাম।"

"কিন্তু আমদানী তো আপনি-আগে ও সব নিয়ে যাই। বিপণিতে বিপণিতে পৌঁছে দেই। সে সব কি আর ওরা পারত হে, চন্দন দাস?"

"তা না পারবার কি আছে? ওরা যদি নক্র, মকর, গ্রাহ, কুম্ভীরের সঙ্গে যুদ্ধ করে—ঝড়, মেঘ, লুণ্ঠায়িত জলপর্বত অতিক্রম করে, দস্যু-খলদের তুচ্ছ করে নৌ-বাণিজ্য বিস্তার করতে পারে তবে····· "

"থাম, থাম। আর আমাদের বুঝি বন্যজন্তু, শ্বাপদ সর্প, স্থলদস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রখর রৌদ্র, তীব্র শিশিরে দুর্বল বা বন্য বলদ চালিয়ে নিয়ে যেতে হয় না?"

রাম দত্ত ততক্ষণে হেমবরের নৌকার দিকে এগিয়ে আসে।

"আর হোক, সাংযাত্রিক।"

"জয় হোক্ সার্থবাহ।"

"খবর কি?"

"সংবাদ শুভ। এবার উত্তম বাণিজ্য হয়েছে।"

"বহুত, বহুত"—চেঁচিয়ে উঠল সকলে। মোহর ছেলা হচ্ছে। রাম দত্ত ততক্ষণে তার ছোট নৌকাটি লাগিয়ে দিয়েছেন হেমবরের পোতের গায়ে। তারপরে উঠে এসেছেন তরণীর গায়ে লাগান সোপান বেয়ে। পেছন পেছন চন্দন দাস।

'উপবেশন করুন, সৌম্য'—হেমদত্ত এগিয়ে দিলেন দুটি গজদন্তখচিত বেদী।

"আপনাকে এত বিশুষ্ক দেখাচ্ছে কেন শ্রেষ্ঠী—?" রাম দত্তের তীক্ষ্ণ চক্ষু হেমবরের আপাত প্রসন্নতাকে ভেদ করে যেন দেখতে পেল।

"সত্য। কিছু চঞ্চল আছি। আমার একটি কন্যা কিঞ্চিৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে।"

"বাণিজ্যে এসেছে শ্রেষ্ঠী কন্যা?" রাম দত্তের চোখ কপালে উঠে গেল। হেম দত্ত একটু ইতঃস্তত করলেন।

"না ঠিক আমার কন্যা নয়।"

"তবে পালিতা কন্যা?"

"তা বলতে পারেন।"

"তাও নয়? তবে কারুর বরাতে বুঝি? একবার দেখতে পাই না?" হেমবর হেসে মাথা নাড়লেন।

"না, না ওসব নয়। বারযোষার ব্যবসা অনেক কাল ছেড়ে দিয়েছি।"

রাম দত্ত বুঝলেন গূঢ় ব্যাপার। আর কথা বাড়ান যাবে না। মুখে বললেন "বড়ই অনুতাপের বিষয়। তবে আপনি যদি একবার রাজবৈদ্য শশিগুপ্তকে দেখান"

শশিগুপ্ত?"

"আজ্ঞে ঐ হোল। আসল নাম মণিগুপ্ত। কিন্তু আমরা বলি শশিগুপ্ত। বাহ্যঃ আসল স্বর্ণমুদ্রা বটে। কথায় বলে,—শ্রেষ্ঠীর মত ঠগী নেই, অমাত্যের মত লোভী নেই কিন্তু বৈদ্যেরা সবই।"

হাঃ হাঃ হাঃ। হেসে উঠলেন হেমবর। তারপর বললেন,—

"অর্থের জন্য ভাবনা করি না।"

তবে আর কি? আপনার একটি লোক দিন আমি

বৈদ্যের গৃহ দেখিয়ে দিচ্ছি। তিনি এখন ভগ্ন কক্ষেই আছেন। জল বণিকদের কাছে স্বর্ণ, মুক্তা কিংবা রত্ন মূল্যে কেনবার জন্য। স্থলবণিকেরা তো আবার স্থলে নিয়ে আসবার জন্য বেশী মূল্য চেয়ে ফেলবে।" হেমধর এবার হাসলেন মা। রাম দত্তের ব্যথা কোথায় তা বুঝলেন। তিনি হাঁক দিলেন, নকুল, নকুল।"

নকুল এসে দাঁড়াল।

"এঁর সঙ্গে গিয়ে বৈদ্যরাজকে নিয়ে এস।"

রাম দত্ত যেতে যেতে ফিরে এলেন,—

"একটি কথা, বৈদ্য এলেই বলবেন তাঁর শিষ্য বসুমিত্রকে যেন একবার নিয়ে আসেন।"

"তিনি কে সৌম্য?"

"একজন তরুণ বৈদ্য। কিন্তু অদ্ভুত তার আয়ুর্বেদে অধিকার। সে যেন কোন জন্মান্তরের সিদ্ধ সাধনার ফল। মনে হয় স্বয়ং অশ্বিনী কুমার বুঝি নেমে এসেছেন। কালে দেখবেন এই তরুণ রাজবৈদ্য হবে।"

"বেশ। তবে তাঁকে সঙ্গে নিয়েই যেন রাজবৈদ্য আসেন।"

অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন হেমধর।

"ধীরে, বন্ধু ধীরে। রাজার বৈদ্য বড় যে সে লোক নয়। নামটি আমি আপনাকে আগেই বলেছি—শশিগুপ্ত। শশিগ্রহকে আগে সন্তুষ্ট রাখতে হয়। সন্তুষ্ট রাখলেও সে মন্দ করবে আর অসন্তুষ্ট হলে তো কথাই নেই। অন্যে তিনি দেখুন। যখন ঔষধের তালিকা দেবেন, তখন বলবেন এগুলি প্রস্তুতের জন্য একজন নিপুন বৈদ্য চাই।'

"বেশ, তাই হবে। নকুল তুমি শীঘ্র যাও, এঁর সঙ্গে বৈদ্যকে নিয়ে এস।"

"চল হে চন্দন দাস। আমরা আবার সন্ধ্যাবেলায় আসব। তখন বাণিজ্যের কথা হবে। অনেক রত্ন আমরাও এনেছি হে শ্রেষ্ঠী। মধুস্পিট, লাক্ষা, কস্তুরী। চামরী গাইয়ের লেজের চামর এনেছি হিমবন্ত প্রদেশ থেকে প্রাগজ্যোতিষপুর থেকে এনেছি কালো মেঘের মত হাতী। তাম্র, অভ্রক এনেছি রগধ থেকে। আছে বস্ত্রধূপ, কস্তোল ফল, আছে বালকদের জন্য কন্দুক, স্ত্রীলোকদের কর্পাসক চোলি।"

"সাধু, সাধু। হস্তীর বিশেষ প্রয়োজন আছে। সিংহলরাজ অশ্ব ও হস্তীর জন্য ভাল দাম দেন। কস্তুরীও কিছু দরকার। অন্যান্যগুলিও কিছু নেব।"

"আমাদেরও নেবার আছে। মরীচ, জীরক, উপকুঞ্চিকা। তুরস্কের সিহল গন্ধ বাদ এনেছ নাকি? জয়নিকারও কিছু প্রয়োজন।"

"সন্ধ্যেবেলায় তবে আসুন।"

অচেতন রাজবীর ললাটে শীতল জলপটি বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ধাত্রী কপিলা বীজন করছে। হেমধর চুপি চুপি প্রশ্ন করলেন—

"এখন কেমন?"

"একটু ভাল। রক্ত বন্ধ হয়েছে। কিন্তু জ্যেষ্ঠী কপাল যে ভাঙল। অপঘাত হলে কি ঈশান ঠাকুর নেবেন?"

"চুপ কর। বৈদ্য আসবেন এখনি। হয়তো ভাল হয়ে যাবে। সবই মহাকালের ইচ্ছা।"

ঘণ্টাখানেক পরে বাইরে সোর উঠল—"বৈদ্য আসছেন, বৈদ্য আসছেন।" হেমধর উঠে দাঁড়ালেন। কপিলা অবগুণ্ঠন টেনে দিল। দ্রুতপাতে প্রবেশ করলেন রাজবৈদ্য শশিগুপ্ত। কৃষ্ণকায় কিঞ্চিৎ স্থূল বপু। পশ্চাতে পশ্চাতে নকুল। তার হাতে একটি পেটিকা। তার পেছনে আর একজন তরুণ। উৎসুক তাঁর চোখের দৃষ্টি। তার পেছনে রাম দত্ত। তাঁর চোখে উদগ্র কৌতূহল। কটাক্ষে বোঝালেন ভাগ্য প্রসন্ন—ইনিই তরুণ বৈদ্য ধন্বন্তরি। বৈদ্য প্রধান প্রথমেই দেখলেন নাড়ী।

মাথা নেড়ে বললেন—"ক্ষীণে বলবতী নাড়ী না নাড়ী প্রাণ ঘাতিকা।"

হেমধরের গলা চিরে আর্তনাদ বেরিয়ে এল—"বাঁচবে না?"

"আহা, স্থিরো ভব। ধৈর্য ধরুন। দেখ তো ধন্বন্তরি, নাড়ী কি ভাবে যাচ্ছে বটকপক্ষীর মত না শশকের মত? সিংহগতি না গজগামী? ভ্রূমধ্যে ওটি কি? শোণিত বিন্দু……

হেমধর বললেন—"না। নৌকা বন্দরে প্রবেশ করবার মুখে বিপদ ঘটেছে। হঠাৎ পশ্চিম সমুদ্রে এমন এক তরঙ্গ উঠল যে রত্নবেদী থেকে আমি ছিটকে পড়লাম।

সঙ্গে সঙ্গে আমার পেটিকা খুলে ঐ বৈদূর্য খণ্ড কন্যার হৃদয়ের নিম্ন ছোল।"

"নাড়ী কি বলে ধন্বন্তরী? অগুরু, চন্দন আর কর্পূর মিশিয়ে ক্ষতস্থানে দেবে না কি? কেমন ধাতু দেখছ পিত্ত-প্রধানা না বায়ুপ্রবলা?"

"নাড়ী ভালই আছে। এখন আগে মণিখণ্ডটি বার করে নিতে হবে।"

ধন্বন্তরি বললেন ধীরে ধীরে।

"বল কি? রক্ত ধারায় যে সব প্লাবিত হয়ে যাবে। আগে বরং স্বাস্থ্যের উন্নতি করে……

"আজ্ঞে না, গুরুদেব। স্বর্ণভাস্মের যে প্রলেপটি আজ তৈরী করেছেন সেটিই এতে কার্যকরী হবে।"

গুরুদেব চোখ মুছে বললেন 'হুঁ'। কারণ তিনি প্রলেপটি তৈরী করেননি। করেছেন ধন্বন্তরি। তবু ত্রুটি তিনি বার করবেনই—"আর তার জন্যে যে জ্বালা হবে তা প্রশমনের উপায়?"

"তার উপায় চরক বলেছেন গুরুদেব। হৈরণ্যবীজের প্রলেপ আর"

"আর"—

"কটাঞ্জনীর সিদ্ধ জল খাওয়ালে সুনিদ্রা হবে। এতে স্নায়ুও স্নিগ্ধ থাকবে।"

"বেশ বেশ। আর প্রিয়ঙ্গু, দারুহরিদ্রা, গুনাগুল, তালিকাপত্র, তিল ও লাজ জলে মিশিয়ে স্নান করিয়ে দেবে।"

মণিগুপ্ত বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন এতগুলো কথা বলে।

"অধিকন্তু ন দোষায়" বলে ধন্বন্তরি মৃদু হাসলেন।

ততক্ষণে হেমগর্ভের নির্দেশে একটি থালকায় শত স্বর্ণ মুদ্রা এনে সামনে ধরেছে নকুল।

মণিগুপ্ত অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন।

"ধন্বন্তরি, তুমি থেকে যাও। কতটি লক্ষ্য কর। কিছু ভয় নেই। ভীত হবার কারণ হলেই আমাকে খবর দেবে।"

হেমগর্ভ সসঙ্কোচে বললেন—"ভন্তু, আপনার কাছে একটু নিবেদন আছে।"

"সঙ্কোচের কারণ নেই" অভয় মুদ্রা তুলে বললেন মণিগুপ্ত।

"কন্যাটি মহাকাল মন্দিরের জন্য উৎসর্গিতা। অঙ্গদোষ যেন না থাকে"…

অভয়মুদ্রা অব্যাহত রেখেই বললেন রাজবৈদ্য—"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এতটুকু চিহ্ন কোথাও থাকবে না।"

ধন্বন্তরি মৃদু আপত্তি করলেন—"একেবারে সেঁধে গেছে। একটি ক্ষুদ্র চিহ্ন থেকে যাবে মনে হয়।"

মণিগুপ্ত ভ্রূকুঞ্চন করলেন—"না, না আবার সেই অগুরু চূর্ণে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

তাঁর দম্ভের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আবার। মনে মনে বললেন "তাই এত গোপনীয়? ঈশান আচার্যের বরাত?"

সব ঠিক হোল। তরুণ বৈদ্য শলাকা দিয়ে বৈদূর্য-খণ্ডটি তুলে নিলেন। ক্ষত মুছে দিলেন প্রলেপ, চূর্ণ—নানা ঔষধীর রস। তার একান্ত শুশ্রূষায় ধীরে ধীরে ক্ষত নিরাময় হোল। কিন্তু ললাটে থেকে গেল একটি ছোট্ট চিহ্ন।

আচার্য ঈশানেশ্বর সব শুনেও দেখতে এলেন। দেখলেন বিশাল চোখ, কুঞ্চিত কেশ, বর্তুল হস্ত, অশ্বত্থ পাতার মত ত্রিকোণ মুখ। আরো দেখলেন—

পা দুখানি যেন আজ পেশী শিল্পীর তৈরী সুগোল যন্ত্র। প্রশস্ত চতুষ্কোণ চরণ।

এইতো শাস্ত্রলক্ষণসম্মত কন্যা।

বিস্তৃত উরু, বর্তুলস্তন, চঞ্চল কটাক্ষ এতো পরে আসবে। আসবেই। মহাপ্রকৃতির যাদুস্পর্শ রোধ করবে কে? আর তার সাহায্যে এই নবনীতের মত দেহকে ধাতুর মত রূঢ় যদি তিনি না দিতে পারেন তবে তিনি বাচ্যাচার্য কিসের?

চতুষ্কোণ চরণ নর্তকীর লক্ষণ।

এতো গুরুদেবের নয় যে ক্ষুদ্র চরণ সুলক্ষণ হবে।

মনে পড়লো তাঁর শ্রেষ্ঠ শিষ্যা বর্তমান নটিমুখ্যা কামাক্ষীর কথা। তার চরণের সঙ্গে এ কন্যাটির চরণের আশ্চর্য মিল। কিন্তু আরো যেন কমনীয়।

"হেমধর, এ কন্যাটিকে আমি নেব।" তাঁর কণ্ঠস্বর মন্থিত হোল। "আচার্যদেব, আমি লজ্জিত। অমলিন পুষ্প আপনি চেয়েছিলেন।"

"এতো অমলিনাই। ওরে, ফুলের পাপড়ী তো ঈষৎ বাঁকা চোরা থাকেই, তাতে কি দোষ থাকে রে?"—আচার্য সস্নেহে মাধবীর কচি অশ্বত্থপাতার মত মুখখানি তুলে ধরলেন। ধনুকের মত টানা টানা দুটি ভুরু যেন কালো রেশমে গাঁথা, মধ্যে একটি ক্ষুদ্র চিহ্ন। কিছুক্ষণ তাকিয়ে আচার্যের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

"ওরে হেমধর, তোর ভাগ্য সুপ্রসন্ন। দ্যাখ, দ্যাখ মহাকাল একে স্বয়ং চিহ্নিত করে দিয়ে দিয়েছেন।"

হেমধর ঝুঁকে পড়ে দেখল সেই তারা চিহ্নটি কবে একটি ছোট্ট ত্রিশূল চিহ্ন হয়ে গেছে। হাল্কা একটি লাল ফুটকির মধ্যে মনে হচ্ছে যেন তৃতীয় নয়ন।

ঈশানেশ্বর প্রসন্ন হাসি হাসলেন—"ত্রিনয়নের আবার ত্রিনয়নী পছন্দ হোল বোধহয়।

গুরুদেবের দিকে তাকিয়ে মাধবীর তৃষ্ণার্ত মনও ভরে উঠেছিল। এ যেন তার হারানো পিতৃদেব। ছোট্ট মাধবী প্রণাম করবার জন্য নত হোল। আচার্য ঈশানেশ্বর প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করলেন,—

"স্বস্তি, স্বস্তি—মহাকাল তোমার সহায় হোন, বৎসে।"

তারপর হেমধরের দিকে তাকিয়ে বললেন—"কল্য প্রভাতে আমরা উজ্জয়িনী যাত্রা করব। দার্ঘবাহু রাম দত্তের গজশ্রেণী এবং উষ্ট্রশ্রেণী সেই সঙ্গে যাত্রা করবে। আজ থেকে একাদশ বৎসর পরে অষ্টাদশী মাধবীকে আমি মহাকাল মন্দিরে নৃত্যাবন্ধে উপস্থিত করব। সে বন্ধে পরীক্ষা শুধু মাধবীরই হবে না, আমারও পরীক্ষা হবে। চল্লিশ বৎসর বয়সে আমি আমার গুরু হরদত্তকে পরাজিত করে আমার শিষ্যা চারু দেক্কাকে নটিমুখ্যা করেছিলাম। তাকে বৈশালীতে পাঠিয়েছিলেন কুমার দেবী। তারপর শিখরিণী—যাকে পাণ্ড্যদেশে কূটনৈতিক কারণে উপহার দেওয়া হয়। তারপর নটি মুখ্যা হয় জয়সেনা; তারপর কাহাক্কী। এরা সকলেই আমার শিষ্যা। চারবার আমি জয়লাভ করেছি। কিন্তু পঞ্চবক্ত্রের শেষ মুখটি আমি প্রসন্ন করে যাব এই আমার শেষ অভিলাষ। বার বার পাঁচবার কোন গুরু জয়লাভ করেননি। আচার্য শিবস্বামী তিনবার জয়লাভ করেন—তাঁর শিষ্য ও আমার গুরু আচার্য হরদত্ত চারবার জয়লাভ করতে পেরেছিলেন। এবার আমার পালা।"

"আচার্যদেব, শুনেছি এবার আপনার শিষ্য কামরাজ্য বন্ধে যোগ দেবেন?"

"শুধু যোগ দেবেন না। তিনি প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব করবেন। তাঁর শিষ্যা বসন্ত-মঞ্জরী নটিমুখ্যা কামাক্ষীর কন্যা। পূর্ব সংস্কার তার আছে। কিন্তু ভয় নাই, বৎস। দেবকৃপা, গুরুকৃপাও পিতৃকৃপায় আমার এমন কিছু সঞ্চয় আছে। কামরাজ তার নাগাল পাবেন। মনে রেখ, বৎস আজ থেকে একাদশ বৎসর পরে বসন্ত ঋতুতে চন্দ্র যেদিন উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্রে যাবেন সেদিন মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের সম্মুখে এই পরীক্ষা হবে।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নৃত্যবন্ধ, নৃত্যবন্ধ, নৃত্যবন্ধ।

দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর ধরে মাধবী শুনে আসছে এই কথাটি। দিনের কর্মে, বিনীতের অবসরে। আজ সেই ব্রতের উদযাপন। এই দ্বাদশবর্ষ ধরে সে একই দিনলিপি অনুসরণ করেছে। ব্রাহ্মমুহূর্তে শিপ্রা নদীতে স্নান—তারপর আচার্যের সঙ্গে মহাকালের ভস্মারতি দর্শন। প্রতিদিন আচার্য তার ললাটে এঁকে দিয়েছেন ভস্ম তিলক। প্রতিদিন আচার্য বলেছেন—কন্যা, দেখ, এই দেবতা তোমার স্বামী, প্রভু, ধাতা।"

তারপর গৃহে ফিরেছেন দুজনে। উজ্জয়িনী তখনো ঘুমে অচেতন। রাত্রির চেলাঞ্চল তখনো জড়ানো তার মুখে। আচার্য প্রাত বন্দনা করতেন। ধীরে ধীরে ভোর হয়ে আসত। স্নানস্নাত, অমল-উত্তরীয়-পরিহিত, মুণ্ডিতা দেবদাসী এসে বসত তার স্থানে। মাধবী হাতে তুলে নিত মঞ্জিরা। মিলিত কণ্ঠে শুরু হোত গুরু বন্দনা। আচার্যের পদধ্বনি শোনা যেত।

শুরু হোত শিক্ষা।

তালী, মুক্তি মুদ্রা, রেচক।

মধ্যাহ্নে আরতির ঘণ্টা বাজত মহাকাল মন্দিরে। আচার্য থেমে যেতেন। একটি দীর্ঘ প্রণামে আলিঙ্গিত

হোত তাঁর দীর্ঘ তনুদৃষ্টি। দেবরাতের ইঙ্গিতে মাধবীও প্রণাম করত। প্রণাম সেরে উঠে দেখত আচার্য ও দেবরাতের প্রণাম তখনো শেষ হয়নি।

প্রতিদিনই লজ্জা পেত সে।

প্রতিদিনই ভাবত আরো নিষ্ঠা আরো ভক্তি দিয়ে পরের প্রণামটি করবে।

আচার্য উঠে বসতেন পদ্মাসনে।

দেবরাত ও মাধবী উভয়ে প্রণাম করত আচার্য কে।

দুজনের মস্তকে হাত রেখে জপ করতেন আচার্য কয়েক মুহূর্ত।

তারপর বিরাম।

এ অনুষ্ঠান নিয়ত হোত। দেবরাত প্রথম দিনেই বলে দিয়েছিল মাধবীকে,—"আচার্যকে প্রণাম না করে কোনদিন কাজ শুরু বা শেষ করবে না। আচার্য যদি ক্রুদ্ধ হন, তিরস্কার করেন তবু প্রণাম করবে।" কথাগুলো প্রাণের মধ্যে গেঁথে নিয়েছেন মাধবী।

ফিরে আসত আপন কক্ষে। ধাত্রী কপিলা বসে আছে। দুপুরের এই কয়েকদণ্ড সময় তার নিজস্ব। চন্দন তেল দিয়ে সর্বাঙ্গ মর্দিত করে দিত কপিলা। কখনো বা বৈদেশবীন আর বল্কুর দিয়ে। ঈষদুষ্ণ জলে স্নান হোত আর একবার।

দিবসের চতুর্থ যামে আসতেন পণ্ডিত ভীমরাজ শাস্ত্রী। তাকে পড়াতেন সংস্কৃত কাব্য, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ। ইদানীং এক নতুন কবির কাব্য গুরুগম্ভীর পড়াচ্ছিলেন। কবির নাম না কি কালিদাস। গদগদ কণ্ঠে ভীমরাজ বলেছিলেন, "বৎসরের আরম্ভে বসন্ত ঋতু। কিন্তু কবি গ্রীষ্ম বর্ণনা দিয়ে শুরু করেছেন। দেখো মাধবী, আগামী কালে গ্রীষ্ম দিয়ে বৎসর শুরু হবে। পত্রিকাকেই কবির কথা শুনতে হবে।"

মাধবী প্রতিবাদ করত।

"যাই বলুন, আচার্য দেব, বাল্মীকির মত কবি কেউ নয়। তাঁর বর্ণনা আর কালিদাসের বর্ণনা?"

উদাহরণ? ভীমরাজ শাস্ত্রী নিমীলিত চোখে প্রশ্ন করতেন তালবৃন্তব্যজন করতে করতে।

মাধবী কেড়ে নিত তাঁর তালবৃন্ত। তারপর নিজেই বিজন করতে করতে বলত,—থাক শরৎ ঋতু। এর বর্ণনায় তিনি বেদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

সচক্রবাকানি স শৈবলানি
কাশৈর্দুকূলৈরিব সংবৃতানি।
স পদ্ম রেখানি সরোচানি
বহন্ মুখানীব নদী মুখানি॥

আর আপনাদের কালিদাস, তিনি কি লিখেছেন?" নিমীলিত নেত্রেই ভীমরাজ শাস্ত্রী আবৃত্তি করে উঠতেন,—

কাশাংশুকা বিরচ পদ্মমনোজ্ঞ বক্ত্রা
সোন্মাদ হংসরবনূপুরনাদরম্যা।
আপক্ক-শালিরুচিরা তনুগাত্রযষ্টিঃ
প্রাপ্তা কাচিদ্বরুচিরব রূপরম্যা॥

মাধবী মুগ্ধ হয়। যদিও বাইরে মানতে চায় না। মুখে বলে,—"আহা, সবই তো বাল্মীকির অনুকরণ।"

"অনুকরণ নয় মাধবী—স্বীকরণ।"

মাধবী হাসে।

কালিদাসের প্রতি ভীমরাজের প্রগাঢ় অনুরক্তি।

অপরাহ্নে কপিলার কাছে শিখতে হোত কবরী রচনা—মালাগ্রন্থনা—গন্ধানুলেপন। কাজল, চন্দন, লাক্ষা দিয়ে সাজিয়ে তুলতে হোত তনুদেহ। ঈশানেশ্বর চলে যেতেন মহাকাল মন্দিরে সন্ধ্যা আরতিকে। সন্ধ্যায় মাধবীর যাওয়া নিষেধ। এখন শুধু দেবদাসীর পালা। তার মহাকাল-প্রিয়া। সে ভাবী বধূ।

সন্ধ্যায় আসত মুদঙ্গী দেবরাত।

প্রভাতের শিক্ষারই অনুশীলন চলত।

দেবরাত ছিল শান্ত রসের মানুষ।

ঈশানেশ্বরের কাছে যে ভর্ৎসনার দ্বিতীয় আবৃত্তি কখনো কখনো ভর্ৎসনায় ভুল হয়ে যেত দেবরাত তা শুধরিয়ে দিতে এই অবসরে। প্রথম দিকে দেবরাত না সহায় হলে মাধবী কি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারত?

না কিছুতেই না।

আরম্ভ, শঙ্খ, বর্ণ, জ্যোতিঃ শরণ, শতপাদা, সহস্রপাদা মন্ত্রঘাট, উদভ্রান্তক— একটি একটি করে মুদ্রা—অঙ্গহার—করণ। সবই তাকে সযত্নে শীলন করিয়েছে দেবরাত।

দেবরাত বসন্তমঞ্জরীরও সহপাঠক। তার মত ধর্মশীল যে উজ্জয়িনীতে দ্বিতীয় নেই। কঠিন শপথ ছিল কামাক্ষী ও কামরাজের এখানের বোল তাল যেন মাধবীকে কখনো শেখান না হয়। শপথ ছিল আচার্য ঈশানেশ্বরেরও। মাধবীর পদবিন্যাসের তিলমাত্র যেন বসন্তমঞ্জরী না জানে। দেবরাত শান্ত সচান বলেছিল,—

'তাই হবে, নটিমুখ্যা।'

'তাই হবে গুরুদেব।'

এক মুহূর্তে কপূর্রে দীপ তুলে নিয়ে শপথ করেছিল সে। মহাকালের প্রদীপ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল ক্ষণকালের নিমিত্ত?

আর মাধবীর কালো ভীরু চোখের দিকে চেয়ে সে কি ভাসে গিয়েছিল তার প্রতিভা?

না, তা তো নয়?

দেবরাতের মাথায় আসত নতুন নতুন ছন্দ। ছান্দসিক সে। দেবরাতও ছিল নতুন শিল্পী। নটি অবসেনার গড়ে পাত্র সে। সে কথা জানতেন না আচার্য ঈশানেশ্বর। জানতেন না নটিমুখ্যা কামাক্ষী। মাধবীও কি জানত? বুঝি না…

সেই বইনাই বলি। মন্ত্রপূত নৃত্য শিখতে গিয়ে ভয়ংকরী হোল মাধবী। ক্রুদ্ধ আচার্য নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন গৃহ থেকে—আর ত্রয়োদশী মাধবী কাঁদায় ভেঙে পড়ল।

সব ভাই আর ভস্ম। মহাকাল, দেবতা—তোমাকে অহর্নিশ পুষ্প দেব ভেবেছিলাম। কিন্তু দিতে হবে ভস্ম। শিপ্রা নদীতে স্নান সেরে ফিরে আসতে আসতে আচার্যের মনে হোল তিনি অন্যায় ক্রোধ করেছেন। মুমুক্ষোপী তাল আয়ত্ত করতে কামাক্ষীর লেগেছিল একমাস। চারুহেসির আরো বেশী। সেখানে মাধবী মাত্র একদিনে সমস্ত তালে নৈপুণ্য দেখাবে কেমন করে? ঈশানেশ্বর বুঝলেন তাঁর অক্ষিরতা। বার্ধক্য ঘনিয়ে আসছে। সম্মুখে মৃত্যু। রাজাদরী যাত্রার জন্য মনটা উতলা হয়ে আছে। অথচ এখনো শিল্প শাসিত হোল না?

স্থির করলেন সমস্ত দিন মহাকাল জপ করে কাটাবেন। সন্ধ্যায় ফিরে এসে দেখলেন কন্যা তখনো দেবরাতের সঙ্গে অভ্যাস করছে।

সাধু, সাধু।

উত্তম, উত্তম।

এক দিনের মধ্যেই সেই কঠিন পরীক্ষায় আয়ত্তে এনেছে সে।

'মহাকাল' মন্দিরে প্রদক্ষিণ করে নিস্তব্ধিলেন শিল্পী।

'শিপ্রা' নিস্তব্ধতাকে মধুর মন্ত্রে মুখরিত করেছিল রাজধানী।

যোগীর মত সুন্দর দেহ ছিল ঈশানেশ্বরের। নিষ্কলুষ বক্ষ—সিংহ কিটি ক্ষীণ—বয়সের দীর্ঘ দেহ। মাধবীর মাথায় কমলমঞ্জরীর কুল দিয়ে তিনি আশীর্বাদ করেছিলেন তার নিরঞ্জন সাধনাকে। সেদিন থেকে অনুমতি দিয়েছিলেন দেবরাতকে,—

"তুমি প্রতি সন্ধ্যায় এসে মাধবীকে চর্চা করাবে

"সন্ধ্যারতিতে যাব না গুরুদেব?"

"না, নৃত্যজীবীদের জন্য কামরাজ আছে। অথবা শার্দুল বাজাবে।"

একটি নতুন অধ্যায় খুলে গেল মাধবীর সামনে। আশ্চর্য ধৈর্যে আর পরম প্রেমে দেবরাত নিবেদন করে দিল তার সঞ্চারগুলি মহাকালকে নয়,—

মহাকাল রহস্যকে।

মাধবী কি বুঝতে পেরেছিল দেবরাতের মনকে?

কিন্তু উভয়ের মধ্যে শিল্প নিষ্ঠার ব্যবধান কোনদিন উঠে যায়নি। দেবরাতের প্রেম দেবরাতকে আরো মহৎ শিল্পী করে তুলেছিল। কতনতুন মুদ্রা—কত নতুন ছন্দ—কত নতুন গতি। ত্রিপদা, চতুষ্পদা, ভ্রামরী চক্র, সর্পকুণ্ডলী, হংসগতি।

ভ্রামরী চক্র শিখিয়ে বলেছিল দেবরাত,—

"এ নাচ কখনো নেচো না।"

"কেন?"

"যদি প্রেমে কোনদিন দুঃখ পাও—যদি তোমার জীবনের মূলমন্ত্রে কোনদিন নাড়া লাগে তবেই এ নাচ নাচবে। নয় তো নয়।"

মাধবী শুনে হেসেছিল তরল কণ্ঠে। তারপর কি একটা কৌতুক করতে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। দেবরাতের চোখে জল। সেই একটি দিন।

দীর্ঘ বারো বছরের মধ্যে আর মনে পড়ে না

পরদিন থেকে দেবরাত আবার শান্ত।

রাত্রিতে আবার কর্পূর চন্দন সুবাসিত জলে স্নান

হবে শুক্লবস্ত্র পরিহিতা মাধবী পরম করতে যেত ধাত্রেয়ীর কাছে।

এই নিয়মটি সে করে এসেছে এতদিন। কোন ছেদ নেই। আজকের চৈত্র সন্ধ্যায় উত্তর কম্পমানী বক্ষস্থিত চন্দ্র তার স্তনের উদ্ভাসন।

মাধবী আজ শিপ্রা নদীতে গেল না।

সন্ধ্যায় শুভলগ্নে বরকে দেখবে বধূ।

তার পূর্বে নয়।

ঘরে রাখা গঙ্গাতীর্থের নীরে স্নান সেরে নিল। আজ তার হৃদয় ক্ষণে ক্ষণে কম্পিত। না জানি কি হবে?

গুরুদেব উত্তরাস্য হয়ে ধ্যান করছেন।

মাধবী প্রণাম করল।

চিরদিনের মত মাধবীর মাথায় হাত রাখলেন গুরুদেব।

চিরদিনের মত আজও বললেন, 'মহাকাল তোমার সহায় হোন।'

চিরদিনের মত দেবব্রাত শুক্ল উত্তরীয়ে অঙ্গ ঢেকে মঙ্গল নিয়ে বলল।

আচার্য বললেন—'আজ আর দেহকে ক্লান্ত কোর না মাধবী।'

'আজ কিছু শিখব না গুরুদেব?'

"বৎসে, প্রফুল্ল চূতাঙ্কুরের মত তীক্ষ্ণ হোক তোমার পদক্ষেপ, সদ্যঃপ্রস্ফুটের মত হোক তোমার অঙ্গহার—সপদ্ম-সলিলের মত হোক তোমার মন্থরাকীর্ণ গতি। তুমি মহাকালের প্রিয়তমা বধূ হও। তোমাকে দেবার আর কিছু নেই।"

•

মহাকাল মন্দিরের শুভ্র পতাকা নীল আকাশে পত্‌-পত্‌ করে উড়ছিল যেন কোন মানস সরোবরগামী মরাল।

পতাকার নীচে শিখর। শিখরে ত্রিশূল।

পাথরের বিশাল মন্দির। তার গায়ে কত না কারুকার্য।

দেব, বিদ্যাধর, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর, পিশাচ, সিদ্ধ, ভূত। লতা পাতা, ফুল, ফল, অশ্ব, হস্তী, তরণী। বিশ্ব নিখিল সেখানে সমাগত। গর্ভগৃহে বৃহৎ অনাদি লিঙ্গ। নিরাভরণ। শুধু মস্তকে একটি যুতুরার ফুল। কোণে একটি বৃহৎ ঘিয়ের প্রদীপ। মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে প্রদক্ষিণ পথ। সম্মুখে মণ্ডপ।

দেবাদিদেবের বাইরে অনেক আয়োজন।

ভেতরে কিছুই নেই। শুধু এক নিরাভরণ মহাসত্ত্ব ত্রিকালের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে দেখছেন জগতের দৃশ্য। মানুষের পাপপুণ্য, সত্য মিথ্যা, সুখ দুঃখ। নির্বেদ, নির্বিকার।

তবু সেই উদাসীন যোগীশ্বরের পায়ে দুর্বল মানুষ মাথা কোটে। তাঁকে ঘিরে উৎসবের আয়োজন সাজায়। যদিও প্রভাতের ভস্মারতির মধ্যে ফুল থাকে না, নৈবেদ্য থাকে না—শুধু থাকে ছাই। সেই অপার অর্পণের মধ্যেই কি থাকে না ইপ্সিত—কিছুই কিছু নয়? নাকি সবই সত্য?

ঘাটমণ্ডপের চারদিকে উজ্জয়িনীর নাগরিকবৃন্দ উদ্বেলিত সমুদ্রের মত ফুলে ফেঁপে উঠছিল। বারবার ভেঙ্গে ভাসিয়ে দিতে চাইছিল চৌরঙ্গরশিক রবিগুপ্তের দণ্ডপাশিক শ্রেণীকে। একদিকে মহামণ্ডলেশ্বরগণের স্থান। মধ্যভাগে পরম মহেশ্বর পরম ভট্টারক পরম ভাগবত মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের আসন। তাঁর দক্ষিণ পার্শ্বে বসবেন মহাপ্রতীহার ভানুগুপ্ত—বাম পার্শ্বে মহাপ্রতীহার ভানুগুপ্ত। জীবগুপ্তের পাশে বসবেন মহাদণ্ডনায়ক বুধগুপ্ত তার পাশে মহাসান্ধিবিগ্রহিক নৃসিংহ গুপ্ত। অন্যপাশে বসবেন মহাবলাধিকৃত হরিষেণ কবি। তারপর যুবরাজ চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁর সহযায়ী বন্ধুবর্গ—কালিদাস, অমরসিংহ, ধন্বন্তরি, ঘটকর্পর, ক্ষপণক, শঙ্কু, বেতাল ভট্ট, বরাহমিহির। আর পাটলি পুত্র থেকে সমাগত সোম দত্তের পুত্র বররুচি। এঁদের অনেকেই এসে গেছেন পূর্বাহ্নে। শুভ্রকুরুবক মালা নিয়ে ক্ষপণক ইতঃস্ততঃ দেখছিলেন বিরস মুখে। তিনি বৌদ্ধ। নৃত্য গীতে তাঁর রুচি নেই। কিন্তু মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত আসছেন। তদুপরি যুবরাজ তাঁর সহযায়ী।

তদুপরি……

এই তদুপরি কথাটা ভেবেই তাঁর বিরস লাগছিল। সব ঘণ্টের সেরা ঐ অমরসিংহ। কি এক অভিধান লিখছে। তার জন্য বুদ্ধি চাই। বুদ্ধি চাই তো সোজা পাটলি পুত্রে চলে যাও। তা না পৃষ্ঠ পোষক করা

চয়েছে কালিদাসকে। বিপদ এই যে অমরসিংহও বৌদ্ধ। আর যদি অমরসিংহ নৃত্য গীতে যোগ দেয় কপণক না দিলে ভাল দেখায় না। সৌজন্যও তো আছে। আসলে সেটাও ঠিক কথা নয়। মহারাজ সমুদ্রগুপ্তকে কপণক মনে মনে একটু ভয় করে চলেন। বড় খর দৃষ্টি তাঁর। মর্মভেদী দৃষ্টি। তার চিত্রভেক বিহারে যে নতুন শুভ্রপ্রভা কেন্দ্রটি খোলা হয়েছে কিন্তু অর্থ সেজন্য দরকার।

নাকাধ্যক্ষ ইন্দ্রগুপ্ত এবং চৌরদ্ধরণিক রবিগুপ্ত ইতঃ ততঃ ঘুরে পর্যবেক্ষণ করছেন ব্যবস্থায় কোন ত্রুটি আছে কিনা। শ্রাবণ দামিনীর মত তিরস্করণীর অন্তরালে সহসা ঝলকিত হয়ে উঠছে নূপুরের লাস্য।

ধরণতরি হঠাৎ এলেন ব্যস্ত সমস্ত ভাবে।

রবিগুপ্ত প্রশ্ন করলেন—"মহারাজ এখনো যাত্রা করেন নি?"

"করেছেন বৈকি। এই এলেন বলে।"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বৃংহিত ধ্বনি শোনা গেল।

দণ্ডপাশিক হরগুপ্ত শ্রেণীবদ্ধ করে দিয়েছে জনতাকে। দূরে দেখা গেল মহারাজ সমুদ্র গুপ্তের শ্বেতছত্র। সহসা জনতা স্তব্ধ হয়ে গেল। ধ্বনিত হয়ে উঠল হরিষেণের প্রশস্তি।

সমুদ্রগুপ্ত সভায় প্রবেশ করলেন।

নিস্তব্ধ পৌরজন সহসা জলোচ্ছ্বাসের মত তরঙ্গিত হল জয়ধ্বনিতে।

তিন তিন বার জয়ধ্বনি জানাল তারা রাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্তকে।

মহারাজ আনত জোড় হস্তে প্রণাম করলেন মহাকালকে। দুটি দীর্ঘবাহু তুলে অভয় মুদ্রায় সমবেত সুধী মণ্ডলীকে জানালেন অভিবাদন। স্বস্তি, স্বস্তি।

রাজা আসন গ্রহন করলেন।

শাল প্রাংশু মহারাজের পেছনে নবশাল তরুর মত সুধীর কুমার চন্দ্রগুপ্ত লাজুক চরণে এসে আসন গ্রহণ করলেন।

তাঁকে চেনা মাত্রই আর একবার উদ্বেলিত হোল জন সমুদ্র। উজ্জয়িনীর জনপ্রিয় কুমার দাঁড়িয়ে উঠে প্রত্যাভিবাদন জানালেন।

চৌরদ্ধরণিক রবিগুপ্তকে রীতিমত বেগ পেতে হোল তা সামলাতে। মহাপ্রতীহার ভানুগুপ্তকে উদ্বিগ্ন হতে হয়ে ছিল কিছুটা। প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা ঠিক মত আয়ত্তাধীন আছে কিনা সে সম্বন্ধে মহা-সান্ধি বিগ্রহিকের ক্রুর জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তাঁকে সহ্য করতেই হয়েছিল কিছুকাল। নৃসিংহগুপ্তকে একটু ভয়ই পেতেন ভানুগুপ্ত। লোকটি যেন কঠিন লোহায় তৈরী। কিই বা এমন বয়স। যুবরাজের প্রায় সমান বয়সী। কিন্তু রাজনীতিতে তাঁর দক্ষতা স্বয়ং সমুদ্র গুপ্তের কাছেও শ্লাঘ্য। অত্যন্ত বলবান—অমিত ভোগী—কঠিন পরিশ্রমী এই তরুণটির প্রতি তাঁর একটা স্নেহ ছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের যশোবৃদ্ধির জন্য সে না পারে এমন কাজ নেই। এমনি বেশ আছে, হাসছে—মৃগয়ায় যাচ্ছে—সৌণ্ডিক বীথিতে গৌড়ী কিনছে হঠাৎ যেন কেমন কঠিন হয়ে উঠতে পারে—চলে যেতে পারে সুদূরে। সহসা শাস্তি দিতে পারে অন্তরঙ্গ জনকেও যদি তাঁর মনে হয় সে রাষ্ট্রের শত্রু। তাঁকে একটু ভয় করে বৈকি। রাজার বড় বেশী প্রিয় পাত্র যে।

ডিণ্ডিম, ডিণ্ডিম, ডিণ্ডিম।

সহসা বেজে উঠল ঘণ্টাশতক।

বীণার ঝঙ্কার, বংশীর সুবির, মৃদঙ্গ ও ঘন করতালের আতোদ্য বেজে উঠল। মহাকালের বন্দনা গানের সঙ্গে তিরস্করণীর আল উঠে যেতে লাগল। মণ্ডপের একপাশে আচার্য ঈশানেশ্বর, মৃদঙ্গীদেবরাত, বেণু, মল্লিরা, ঘণ্টা শ্রেণীর বাদকবৃন্দ। অন্যদিকে গুরু কাবরাজ, মর্দুল ও বাদকের দল।

কে শুরু করবেন?

এই প্রশ্ন উচ্চারিত হোল চারিদিকে।

জনতা ঠেলে এই সময় আবির্ভূত হলেন কালিদাস। চম্পকবন পট্টবস্ত্র ও উত্তরীয় অঙ্গে। কপালে চন্দন তিলক। নবোদ্ভিন্ন কাকপক্ষ। স্বপ্নাবেদুর চোখ।

কুমার চন্দ্রগুপ্ত উঠে দাঁড়ালেন।

'এসো, এসো কালিদাস। এত বিলম্ব কেন?'

কালিদাস? কালিদাস? ইনিই সেই কালিদাস? এঁরই লেখা ঋতুসংহার?

পড়েছি বৈকি। বড় মধুর। সুশ্রুত।

তাকালেন নৃসিংহগুপ্ত। ঝুঁকে পড়লেন মহাধর্মাধ্যক্ষ। মহামন্ত্রী আড়চোখে তাকালেন।

'পিতা,—এই আমার সুহৃদ কালিদাস—ঋতুসংহারের কবি।'

চন্দ্রগুপ্ত কালিদাসকে সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত করলেন এক নিমেষে।

সম্রাট উঠে আলিঙ্গন বদ্ধ করলেন কবিকে।

'সাধু, সাধু। এত তরুণ বয়সে এই আশ্চর্য উদ্যম। কবি তোমার ঋতুসংহার পড়ে এবার যুদ্ধের সময়েও বড় আনন্দ পেয়েছি। মনে হোল শিপ্রাতীরে গ্রীষ্ম সন্ধ্যার কবি স্বয়ই ঋতু-সংহার।'

কালিদাস সলজ্জ নমস্কার জানিয়ে দণ্ডায়মান রইলেন। চন্দ্রগুপ্ত তাঁকে ধরে নিয়ে বসালেন নিজের আসনের একাংশে। পেছন থেকে ঘটকর্পর চেঁচিয়ে উঠলেন,—

"কুমার, মনে রাখবেন ওঁর কাব্যে যমক নেই। আমার কাব্যে থাকবে।"

অমরসিংহ হাসলেন—"ওহে ঘটকর্পর, তোমার যমকই আছে; কাব্য কোথায়?"

"হবে হবে। কাব্যও হবে। আর সে কাব্য কালিদাসকেও ছাড়িয়ে যাবে।"

"আগে হোক তারপর বোল।" ধন্বন্তরি উত্তর দেন।

"কিন্তু পুরস্কার যে ভাই আগে ভাগেই শেষ হয়ে গেল।

ঘটকর্পরের ছলকারুণ্যে সবাই হেসে ওঠেন। এমন কি নৃসিংহ গুপ্তও।

রূপমঞ্চে সবাই অপেক্ষা করে আছেন দেখে মহাধর্মাধ্যক্ষ বুধগুপ্ত বললেন—"আমি বলি নটিনুখ্যা কামাক্ষীর কন্যা শুরু করুন।"

"তুমি কি বল কবি? সমুদ্রগুপ্ত সস্নেহ দৃষ্টিপাত করলেন কালিদাসের দিকে।

কালিদাস সলজ্জ বিনয়ে উত্তর দিলেন—"আচার্যবরের মধ্যে যিনি প্রবীণতর তাঁর কাছেই প্রথম হওয়া সঙ্গত।"

সমুদ্রগুপ্ত সোল্লাসে বললেন—সাধু, সাধু। আচার্য ঈশানেশ্বর আপনি আপনার শিষ্যাকে শুভারম্ভ করতে আদেশ দিন।'

আচার্য ঈশানেশ্বর বললেন "তাই হোক, মহারাজ।"

সূক্ষ্ম রক্তাংশুকে আবৃতা মাধবী এসে মঞ্চে প্রবেশ করল। যেন তরুণী উষা। শুরু হোল শঙ্খ, বর্ণম। আহা, সে যেন রূপ রস স্পর্শ ভরা স্বপ্ন জগত।

তারপর এলেন বসন্ত মঞ্জরী। তিনি যেন দিগঙ্গনার লীলাসঙ্গিনী।

অপরূপ সুরে তালে দেখালেন শঙ্খ, বর্ণম। তুলনাহীন্য। কোথাও কম নেই—বেশী নেই।

জনতা রুদ্ধশ্বাস।

তবে কি এবার দুজন নটিনুখ্যা হবে?

মহাকাল কি একত্রে গ্রহণ করবেন দুটি বধূকে?

কিন্তু তা তো হয় না।

সমুদ্রগুপ্ত বললেন—'এবার তবে মহাজ্যোতিশরণম হোক।'

আচার্য হাসলেন—'তাই হোক।'

কামরাজও মাথা নাড়লেন—'হোক।'

হোল।

মাধবী নাচল। সে নাচ ভক্তির আকুলতায় শোণিম। বসন্ত মঞ্জরী যে নাচ নাচলেন আসরের বড় তা মন্দির। পুরুষের রক্তধারায় আগুন ছুইয়ে গেল যেন নারী সত্তার আর্তি।

● অভিজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসক
● রকমারী ফ্রেম
● বিদেশী লেন্স
● সুলভ মূল্য

স্বাগত জানাই

১৭২এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড
(সাদার্ণ এ্যাভেনিউর মোড়)
কলিকাতা-২৬

জনমত দ্বিধা হয়ে গেল। দ্বিধান্বিত হলেন রাষ্ট্র পুরুষেরাও।

ঈশানেশ্বরের ললাটে ভ্রূকুটি।

কামরাজের মুখে স্পষ্ট অসন্তোষ।

"তুমি কি বিচার কর কবি?' সমুদ্রগুপ্ত তাকালেন কালিদাসের দিকে।

"বিচারক আপনি মহারাজ। আমি সংশ্লেষণ করি বিশ্লেষণ আমার কাজ নয়। তবে আমার মনে হোল একটি কুন্দরবিন্দের স্বল্প অবয়বটি জলন্ত নক্ষত্রের তুল্য।,,

"দুটিই সুন্দর। নয় কি?"

"দুজনকেই পুরস্কৃতা করুন।"

নিশ্চয়।"

কিন্তু নটিমুখ্যা কে হবে?

কে হবে মহাকাল বধূ?

"তাহলে পদম্ নাচতে বলুন মহারাজ। দেখুন ভক্তিমতী কে?"

পদম্ নাচের সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা গেল মাধবীর নৃত্য-দীক্ষা বসন্ত মঞ্জরীর চেয়ে কত গভীর। একটি নাচ ভক্ত সাধিকার আত্মনিবেদন। অন্যটি কেলি কলাবিদ লীলাময়ীর। কিন্তু মহাকাল কি চান আসক্তি না ভক্তি?

আচার্য ঈশানেশ্বরের মুখ হাস্যজ্যোতিতে বিমল-প্রভ।

গুরু কামরাজের মুখ রুদ্ধ ক্রোধে ঈষৎ তাম্রাভ। হার হয়ে গেছে।

তবু হার মানবার লোক নন, নটিমুখ্যা কামাক্ষী। মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত তাঁকে বিশেষ স্নেহ করেন। জনতার ভিড়ের মধ্যে তার সাজান লোকও আছে। তাদেরি একজন উঠে দাঁড়াল,—

"আমরা নটিবরের ত্রিপাদা, চতুষ্পাদা দেখেছি। আর তাঁরা কি দেখাতে পারেন?"

গুরু কামরাজ ইঙ্গিত বুঝলেন। তিনি বলে উঠলেন,—

'আমার শিষ্যা দেখাবে ষটপাদা, শতপাদা সহস্রপাদা।'

গুরু ঈশানেশ্বর শুনেই বুঝলেন—এ রাজনীতি। একবার ভাবলেন এ চাতুরীর প্রতিবাদ করবেন। পদম্ নাচের পর আবার প্রতিযোগিতা কিসের? তাছাড়া এ কি নৃত্য? এতো ব্যায়াম প্রদর্শনী।

কিন্তু দেবরাত তাঁকে চোখের ইশারায় নিষেধ করল।

"কি বলছ দেবরাত? এ তো চাতুর্য।" ক্রুদ্ধ ঈশানেশ্বর গুমরে উঠলেন।

"মাধবী পারবে।" দেবরাতের কণ্ঠে দৃঢ় প্রত্যয়।

ঈশানেশ্বর কিছুতেই স্মরণ করতে পারলেন না এসব পাদভেদ তিনি শিখিয়েছেন কি না। হয়তো শিখিয়েছেন হয়তো নয়। দীর্ঘ দ্বাদশ বছরে পলিত কেশ হয়েছেন তিনি—হয়েছেন আরো জরাজর্জর। তাছাড়া……

তাছাড়া স্মরণাতীত কাল থেকেই পাদভেদের এমন তীব্র প্রতিযোগিতা হয় নি। কারণ এতে নটির কলাবোধ ফোটে না। ফোটে মূঢ়দর্পীর কৃতিত্ব…আর ফোটে নটির ব্যাকরণ জ্ঞান। কিন্তু ব্যাকরণ কি কাব্য?

সহস্রপাদা নৃত্যান্তে স্বেদাক্ত বাষ্পিত কপোল কিন্তু জয়ধ্বনিতে প্রগলভা বসন্ত মঞ্জরী নেপথ্যে প্রস্থান করল। মাধবী এসে দাঁড়ালো তার স্থানে। একটি উত্তরোল তরঙ্গের পাশে এসে দাঁড়ালো একটি পুষ্পের আত্মা। শুরু হোল তার নাচ। সহস্র পাদায় শেষ করেছিল বসন্ত মঞ্জরী। সহস্রপাদা থেকেই শুরু করল মাধবী। এক, দুই, তিন, চতুঃসহস্র।

মনে হোল সারা দ্যুলোক ভূলোক দুলছে—স্বর্গ মর্ত্য অন্তরীক্ষকে পরিক্রমা করছে এক নূপুরধ্বনি। সে ধ্বনি মন্ত্রের মত বলছে, ওঁ, ওঁ, ওঁ।

নাচ শেষ হবার পরেও কয়েক মুহূর্তে জনসঙ্ঘ বুঝল না নটি প্রস্থান করেছে। কানে তখনো বাজছে রেশ ওঁ, ওঁ, ওঁ।

তারপর।

একি সম্ভব?

একি ইন্দ্রজাল?

জয়ধ্বনিতে ফেটে পড়ল লোকপুঞ্জ।

কিন্তু কামাক্ষী একবার বলতে চাইল—মূর্খ—নির্বোধ।

তোরা যাদুতে ভুললি—ভুললি মায়া চাতুর্যে।

কামরাজ নিরস্ত করলেন।

চাতুর্য তো তাঁরাই দেখাতে চেয়েছিলেন।

রাজা ডাকলেন দুই নটিকেই। কম্পিত তনু মাধবীর কাণে গাঁথা আছে আচার্যের বাণী,—

"পুষ্পমাল্য যদি পাও তবে ইহকাল পরকাল তোমার মুক্ত হয়ে গেল বরণে বরমাল্য যদি পাও তবে ইহকালে কোন দুঃখ তোমার থাকবে না। কিন্তু পরকালে? জানি না। প্রার্থনা করি সে সম্মান যেন তোমার না জোটে।"

শবরবেশের মালা পরিয়ে দিলেন সম্রাট মাধবীর কণ্ঠে আর বসন্তমঞ্জরীর কণ্ঠে সিংহলী মুক্তার মালা। কিন্তু পুষ্পমাল্য। এক মুহূর্তে নিখিল জগৎ অন্ধকার হয়ে এল মাধবীর সামনে। দূরাগত ধ্বনির মত সহসা ধ্বনিত হোল গুরুদেবের অভয় বাণী,—"মহাকাল তোমার সহায় হোল বৎসে।" সঙ্গে সঙ্গে শুভ্র যূথীর মালা কণ্ঠে খসে পড়ল।

শুচি সুন্দর।

যৌবন যেন স্নিগ্ধ হয়ে গেল তার স্পর্শে।

মাধবীর স্বপ্ন কি লক্ষ্য করতে চেয়েছিলেন সমুদ্রগুপ্ত? তিনিও তো শিল্পী।

বীণাবাদক।

মধুর হেসে বললেন মাধবীকে—"উজ্জয়িনীর ভুবন স্বরূপা হও।"

আচার্য বললেন—"মহাকালের প্রিয়কারিণী হও।"

বিহ্বল মাধবীর মনে হচ্ছিল সবই স্বপ্ন। শিপ্রানদীর ছোট কুটিরের অন্তরালে যে বেয়েটি দিন কাটিয়েছে ভুবন-বিজয়ী সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত তাকে কি বললেন? উজ্জয়িনীর ভুবন স্বরূপা হও।

এ কি আশীর্বাদ?

এ যে আদেশ।

মাধবীর কল্পনায় রঙতরঙ্গ তুলল সমুদ্রগুপ্তের গাম্ভীর্যে বাঁধা কণ্ঠস্বর। 'সম্রাটের বিশ্বাসের যোগ্য হও—নিজেকে মনে মনে বলল সে।

আচার্য বললেন—"মহারাজ পঞ্চবক্ত্রের শেষ মুখখানি প্রসন্ন করে যাব এই ছিল আমার সঙ্কল্প। তিনি আমার সে প্রার্থনা পূরণ করেছেন।"

কামাক্ষী উঠে দাঁড়ালেন বিবর্ণমুখে—"মহারাজ, আমরা এবার অনুমতি নিয়ে বিদায় চাই।"

মহারাজ বললেন—"এত শীঘ্র যাবে? আহা, এস।"

নৃসিংহ গুপ্তকে সঙ্গে নিয়ে কামাক্ষী ও বসন্ত মঞ্জরী প্রস্থান করল। নৃসিংহ গুপ্ত বীরপুরুষ। পরাজিতা নারীর বেদনা তিনি সইতে পারেন না। সম্রাটেরও সম্ভবতঃ এতে অনুমোদন ছিল। কারণ মহাসন্ধি বিগ্রহিকের এই গমন তিনি লক্ষ্যই করলেন না। কিন্তু আচার্যের ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে এল। ঝড়ের সূচনা যেন। সমুদ্রগুপ্ত কিন্তু বড় প্রসন্ন আজ। তাঁর শিল্পী মন শিল্পবাদে তৃপ্ত হয়েছে। তাই সেদিকে লক্ষ্য না করেই বললেন,—আসন গ্রহণ করুন, আচার্য। উপবেশন কর মাধবী। কুমার চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেই। আর ইনি—ইনিই কবি কালিদাস—সম্প্রতি ঋতুসংহার নামে একটি অমর কাব্য রচনা করেছেন। ওঁর পাশে যিনি বসে আছেন তরুণ হলেও সুবিজ্ঞ চিকিৎসক। ধন্বন্তরি। (মাধবী ও আচার্য চমকিতে তাকালেন তাঁর দিকে। ধন্বন্তরি একটু হাসলেন)। কালে অশ্বিনী কুমারদেরও ছাড়িয়ে যাবেন। এঁরা সবাই আমার পুত্রের বান্ধব। কিন্তু মাধবী, আমার পুত্রের বান্ধবী কেউ নেই। তুমি হতে পারবে?"।

সবাই হেসে উঠলেন। কিন্তু আচার্যের ভ্রূকুঞ্চিত হোল আবার। মাধবী তার বিশাল দুটি নয়নের অপাঙ্গে দেখল মূর্তিমান দেব সেনাপতির মত সুন্দর তরুণ কুমার চন্দ্রগুপ্তকে—কমনীয় নয়ন—প্রশস্ত ললাট। সে মুহূর্তে তার হৃদয়ে ধ্বনিয়ে এল এক পরম আবেগ—এই কি ভালবাসা? মাধবী দেখেনি ঠিক স্বপ্ন মেদুর চোখে এক তরুণ কিশোর তার দিকে উজ্জ্বল নয়নে তাকিয়েছিল। কবি কালিদাস।

আকাশে চন্দ্র তখন পূর্ব ও উত্তরফাল্গুনীর নক্ষত্রের মধ্যবর্তী। শুভলগ্নে শুভ দৃষ্টি হয়ে গেল মাধবীর সেই মুহূর্তে।

আচার্য একটু ভুল করেছিলেন।

সে শুভদৃষ্টি মহাকালের সঙ্গে নয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

একটি নতুন আলোয় যেন দুজনে দেখল দুজনকে।

এক নতুন সুখের তরঙ্গে যেন দুজনে ভেসে গেল অকূলে।

আজো মনে পড়ে নৃত্যাবসের পর-সন্ধ্যায় মহাকাল মন্দিরে যাবার পথে কেমন তৃষিত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন কুমার মাধবীর আন্দোলিকার ঈষৎ খোলা দ্বারের দিকে চেয়ে। অপ্রত্যাশিত এই দর্শনে গুরু গুরু কেঁপে উঠেছিল তার বক্ষ। সেদিন 'উদ্‌ভ্রান্তের মতই পা পড়েছিল নটীর। চিরশান্ত দেবরাত পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছিল তার উপরে। পদক্ষেপই বা পড়েছে কোথায়? তালই বা চলছে কোন দিকে? কিন্তু মাধবী নিরুপায়! মনে মনে বলল—বেশ তো ছিলাম। কেন দেখা হলো তোমার সঙ্গে?"

আর এমন দেখা প্রায়ই ঘটতে লাগল। সেই একটু দেখা নিয়েই রঙে রসে জাল বুনত মাধবী মনে মনে। বিভ্রম দেখে প্রধান সখী মধুরিকা পরিহাস করত। এমন সময় এক বিপদ ঘটল। যাদুকর যোগসিদ্ধির যাদুখেলা দেখতে গিয়েছেন সকলে সহসা একটি কৃষ্ণ কপোত গিয়ে ঠোকর দিল কুমারের চোখের কোণে। বেতাল ভট্ট পাশে না থাকলে কুকারের পদ্ম পলাশ নয়নটি রক্ষা পেত না। দ্রুত কৌশলে তিনি পরাবতটিকে ধরে ফেলে ছিলেন। ধন্য তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতি। কিন্তু কি উদ্বেগই না কাটল মাধবীর একটি দীর্ঘ মাস। যখন পেল বৈদ্যরাজের নির্দেশে রাণী ধ্রুবদেবী স্বয়ং শুশ্রূষা করছেন পুত্রের। তবু মন মানে না। যখন শুনল কুমার সুস্থ হয়েছেন কি আনন্দই না হলো। মন্দির বেদিতে নাচতেই মাধবী লক্ষ্য করল কুমারের কৃশতা মাধবীর উচ্ছ্বাসিত আনন্দ দেখেই বোধ হয় সখী মধুরিকা এসে শুধাল 'ওগো রঙ্গিণী, এত রঙ্গ কেন।'

মুক্তার মত হাসল মাধবী। সকল দেহের আকুল রবকে থামিয়ে রাখবে এমন শক্তি তার কোথায়? মধুরিকার মুখেই শুনল মাধবী সম্রাট ও কুমার ভট্টারক ফিরে যাবেন পাটলিপুত্রে। কথাটা শোনা মাত্র মাধবী বকুল বীথিকার লোহিত বেদীতে বসে পড়লো।

ওমা, তুমি বসে পড়লে যে? তবে বুঝি দেবপুত্রের প্রণয়ে পড়েছ।" মধুরিকা গালে হাত দিল।

চোখের জলে ভেঙে গেল সব আড়াল।

"তবে তো মরেছ।" মধুরিকা বলল।

"মোরিকা, তুই কি একটা উপায় কিছু করবি না?"

"এত কি সহজ?"

মাধবী মনে মনে বলল—'স্বীকার করলুম, সহজ নয়।'

পরদিন মাধবী সুন্দর করে সাজল।

বাতায়নের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখল ওঁরা চলেছেন।

পুষ্প দন্ত হস্তীর পৃষ্ঠে সম্রাট সমুদ্র গুপ্ত, তাঁর পেছনে মেঘবতী-হস্তিনীর পৃষ্ঠে মহাদণ্ডাধিকৃত হরিষেণ কবি। উদয়কালের পৃষ্ঠে মহামন্ত্রী জীবগুপ্ত।

সুপ্রতীকের পৃষ্ঠে মহাধর্মাধ্যক্ষ বুধগুপ্ত। যেন মেঘের পরে মেঘ।

এবার এল অশ্বারোহীর দল।

সবার সম্মুখে সোনার সাজ পরা শ্বেতবর্ণ অশ্বিনীর পৃষ্ঠে দেবপুত্র কুমার ভট্টারক। তাঁর পেছনে একটি ধূসর বর্ণ অশ্বে মহাদণ্ডাধিকরণিক নৃসিংহ গুপ্ত। একটি কৃষ্ণ অশ্বে কবি কালিদাস।

মধুরিকা কিস কিসিয়ে বলল—"কুমারের গায়ে ছুঁড়ে দাও গলার মরকত কণ্ঠী।

কিন্তু লজ্জা এসে বাধা দিল।

মাধবীর মনে হোল 'ধিঃ উপযাচিকা হব?'

জল হংসীর মত তীব্র চীৎকার করে মধুরিকা ততক্ষণে ছুঁড়ে ফেলেছে তার গলার ইন্দ্র নীলমণি।

রাজকুমারের ভগ্ন মুখে সে হার ঠাঁই পায় নি। প্রখর অশ্বক্ষুরে তা গুঁড়ো হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু নৃসিংহগুপ্তের দৃষ্টি এড়ায়নি।

অনেক কাল পরে তিনি দেখিয়ে ছিলেন মাধবীকে সেই গুঁড়োন মণির রেণু রাঙ্গা ধুলোর মিশে কেমন মরুকণ্ঠী রচু ধরে ছিল।

কিন্তু তখন শুধু মাধবী অঝোরে কেঁদেছে। রাতের পর রাত বীণায় বাজিয়েছে মেঘ-মল্লার—পূরবী। সংবাদ আসত কুমার গেছেন তাম্রলিপ্তে—সমতটে—কামরূপে। মাধবী স্বপ্ন দেখত। দিবা স্বপ্নও। আগে গুরুদেবের শত অনুরোধেও চিত্রকলায় অনুরাগ হোত না। এখন সে তাতেই পারদর্শিনী হয়ে উঠল। আঁকল কুমারের একটি পূর্ণ প্রতিকৃতি। মনে হোত তিনি এখানেই আছেন। সন্ধ্যাগুলিকে বানিয়ে তুলত স্বপ্নের মত করে। ধূপের ধোঁয়ায় ধূসর বাসর গৃহে আপন মনেই করত প্রণয়-সম্ভাষণ।

মাধব সেনা।

সম্মুখে পাটলীপুত্রে পৌঁছে সংবাদ। সে সংবাদ নিয়ে এসেছেন। মাধব সেনা সংবাদ আনয়নকারীর কাঁধে রেখে সস্নেহে অভিবাদন চক্রস্বামী বিষ্ণুকে। তারপরে ধীরে ধীরে প্রবেশ করল কন্দুক। কন্দুকটি যেন নটরাজের তৃতীয় ভ্রূমিতে ফেলে সেই কন্দুক লীলায় শিথিলতায়। মাটি ছুঁয়ে উপরে লাফিয়ে উঠল কন্দুক। পদ্মের পাপড়ির মত কুঞ্চিত অধরোষ্ঠ দিয়ে তিনি কঠোর আঘাত করলেন করপৃষ্ঠে প্রবল করে ছুঁড়ে দিলেন উপরে। দুটি পতনের আগেই শূন্যে ধরে ফেললেন। নির্দয় তাকে আকাশে—উড়ে যাবার প্রচণ্ডে থামিয়ে দিলেন তার গতি। দিয়ে ঘাত প্রতিঘাত করতে করতে পার্শ্বে নত হেঁটিকে স্তব্ধ করে রাখলেন শূন্য মাঠে। তারপর? দিকে দিকে কন্দুকটি পাঠিয়ে দিলেন প্রভাস পুরুষ বর্ণের দিকে। সে কি উত্তেজনা। এই গেল সেটি ভানু গুপ্তের দিকে—পরমুহূর্তে বুধ গুপ্তের সম্মুখে যেন স্পর্শ করল—ধরতে না ধরতেই উড়ে গেল। নরসিংহ গুপ্তের চিবুক স্পর্শ করে ফিরে গেল মঞ্চের দিকে। পরিহাস—কৌতুকে ভরে উঠল সভাস্থল। দিকে দিকে মাথা রচনা করে মাধবসেনা শেষ করল তার নৃত্য। তার অনুপম মাধুর্যে উল্লসিত হয়ে উঠলেন দর্শকেরা।

মানি এ চাতুর্য।

কিন্তু অপরূপ চাতুরী।

মাধবী রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করলেন কন্দুক নিয়েই। বসালছে, বিলম্বিত লয়ে, দ্রুত লয়ে। মৃদু মৃদু প্রহার করতে করতে একবার এগিয়ে গিয়ে আবার আচমকা ফিরে সে খেলা চূর্ণপদ মুদ্রা। "সাধু, সাধু।" গর্জাল জনপদবাসী।

লীলায় শিথিলতায় মৃত্তিকায় ফেলে দিলেন সেই

কন্দুক। ভূমি স্পর্শ করবার পূর্বে আদু ভঙ্গ করে হাতের তলদেশ দিয়ে উত্তোলিত করে দিলেন আকাশ মার্গে। শূন্যে অদৃশ্য হবার সঙ্গে সঙ্গে বিহ্বলীর মত ঊর্ধ্ব আকাশে উল্লম্ফন দিয়ে ধরে ফেললেন সেই মণি কন্দুক। মনে হোল তাঁর দৃষ্টির গতিবায় ভীত হয়েই যেন মুঠোর ভিতর ধরা দিল সে।

যাদব সেনার সব কয়টি কৌশল প্রদর্শন করলেন তিনি অনায়াসে। পুনরাবৃত্তিতে বিরক্ত হোল না কেউ। বরং এই নবীনা কিশোরীর প্রৌঢ় কৌশলে বিস্ময় মানল সকলে।

চারিদিকে প্রশংসায় কর্ণা।

'মণ্ডল' ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে মনে হোল একটি নয় শত কন্দুক যেন সৃষ্টি হচ্ছে। 'পঞ্চবিন্দু' করণের সঙ্গে মনে হোল পঞ্চঘূর্ণির মত ছুটে গেল পঞ্চবাণ। তারপর সৃষ্টি হোল ঘূর্ণি গোলক। চারিদিকে যেন কন্দুকের একটি গন্ডী নৃত্য করছে মধ্যে মাধবী। সেই জ্যোতি-বলয় সৃষ্টি করে মাধবী প্রস্থান করলো।

পাটলীপুত্র পৌর সঙ্ঘ তৃপ্ত হোল তাঁর নৃত্যকলায় মাধবসেনা হাতের অঙ্গুরী বিনিময় করে বলল—"তুমি মাধবী আমি মাধবসেনা। একই যবন নাম। দুজনে সখী হলাম কেমন?"

বড় সুখে কাটল মাধবীর কয়েকটা দিন।

দেখতে পেল কুমারকে।

শুনতে পেল কুমার উজ্জয়িনীর কুমারামাত্য হয়ে আসছেন।

এক বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় পট্টমহাদেবী দত্ত দেবীর উপহার জাতি ফুলের গন্ধ মাখা উত্তরীয় নিয়ে স্বয়ং এলেন কুমার।

সেদিন মাধবীর মনে হোল কুমারও তাঁকে ভালবাসে না কি?

উজ্জয়িনী ফিরে এল মাধবী। এর পর থেকে শিপ্রা নদীর তীর হয়ে উঠলো কুমারের ভ্রমণ পথ। শ্বেত আশ্বিনীর পিঠে কুমার—কৃষ্ণ অশ্বের পিঠে কালিদাস। রোজই মাধবী অন্তরাল থেকে ছুঁড়ে দিত এক গাছি ফুলের মালা। কুমারের কণ্ঠে সে মালা দুলতো। কখনো কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে সে মালা কালিদাসের কণ্ঠেও স্থান পেত। সে সব দিনে মধুরিকার তরলিত হাস্যরবের সঙ্গে মুখরিত হয়ে উঠত কবি কণ্ঠের জয়ধ্বনি··· "মাটিমুখ্যার জয় হোক।"

মাধবী তার পূর্বেই লজ্জা পেয়ে প্রস্থান করত।

একদিন এল সৌরিস্ত্রী। পায়ে লাক্ষা দিয়ে আলতা আঁকতে আঁকতে বলে গেল কুমারের অনুরাগের কথা। মাধবী বিস্মিত···"ওমা কি সৌভাগ্য তিনিও আমাকে ভালবাসেন? আমার কথা ভেবে ভেবে প্রহর কাটান? নিদ্রা যেতে পারেন না? কি আশ্চর্য!"

সৌরিস্ত্রী বলল—"সুন্দরী, পৃথিবীতে কত আশ্চর্যই ঘটে। বনের মেয়ে শকুন্তলাও তো রাজরাণী হয়েছিলেন। সেও কি আশ্চর্য নয়?"

সে চলে গেল তার পেটিকা নিয়ে মাধবীর মনে এক অধীর তরঙ্গ তুলে। অসহ্য উদ্বেগে মাধবী বলল—"হে অতনু, একবার কি দেখা হয় না? না কি আমি স্মরহর-বধূ বলে তুমি প্রতিশোধ নিচ্ছ?"

পরিব্রাজিকা জিনরক্ষিতা শেষে একদিন নিয়ে এল সঙ্কেত। সিন্দুর বন্দিতে সূর্য আর চন্দন দিয়ে চাঁদ এঁকে তিথির কথা আঁকা। অর্থাৎ সূর্য চন্দ্র থাকবে না। চোদ্দটি তিলক এঁকে দেখাল কৃষ্ণা চতুর্দশী। মাধবীর কাল কবরীতে কেতকী চাঁপাফুল রাখল। অর্থাৎ কুমার আসবেন অন্ধকার রাতে ফুল ফোটবার সময়ে। কুঙ্কুমের অঙ্গরাগ গায়ে ছড়িয়ে দিয়ে বোঝাল—সঙ্কেত স্থান কেশরকুঞ্জ।

মাধবীর সব আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হোল।

ভাগ্য লক্ষ্মী প্রসন্ন হাতে সবই দান করলেন।

ভীত, কম্পিত পদে মধুরিকার হাত ধরে মাধবী এল উদ্যান ভবনে। মধুরিকা দুচার কথার পর বিদায় নিল। মাধবী ওর হাত ছাড়তে চায় নি। তবু অনাচারিণী 'চন্দন পাখা নিয়ে আসি' এই ছলনায় বিদায় নিল। মাধবীও সঙ্গে সঙ্গে উঠে চলল। কিন্তু সুখ জরজর কম্পিত তনু নিয়ে সে দ্রুত এগোতে পারল না। যাবের কাছে যাবার পূর্বে দেবপুত্র দুহাত প্রসারিত করে

মাধবীর চম্পা কোরকের মত আঙ্গুলে পরিয়ে দিলেন হীরাকাঞ্চনী।

তারপর?

তারপর দিন-রাত্রি, ভাল-মন্দ, কাল-কালেন্দর সব মিলে মিশে এক হয়ে গেল।

শুধু বুকের মধ্যে দুলতে লাগল হীরক দ্যুতির মত সুখের অনুভব।

মশোল চয়ন উৎসবে কুমার পাঠিয়ে দিলেন দুটি সুবৃহৎ কুসুম স্তবক। তার দুটি প্রিয় আনুচরক বল্লভ ও ক্ষেমেশ্বর নিয়ে আসত যত উপহার। দুজনায় মিলে ছিল তারা মাধবীর, বলত—'অপ্সরা'। মাধবী তাদের দুজনাকে ডাকত 'হাহা' আর 'হুহু'। মনোরথ দ্বিতীয়ার দিনে রথ প্রতিযোগিতা দেখতে নরপতি পথে যেত উজ্জয়িনীর নাগরিকবৃন্দ। বিভিন্ন অলিন্দগুলি পূর্ণ হয়ে যেত বাসাধিক কাল থেকে। রথ প্রতিযোগিতায় নৃসিংহ-গুপ্তের সমকক্ষ কেউ ছিল না। কত রকম রথই না তিনি চালাতে পারতেন—স্যন্দন, পুষ্যরথ, কপীরথ, বৈয়াঘ্র। অশ্বারোহী বলেও তাঁর খ্যাতি ছিল। আরব্ধ গতি, রোচিত গতি কত রকমই না। কিন্তু সেবার কুমার নৃসিংহ গুপ্তকে পরাজিত করে জিতে নিলেন জয়বাল্য। সুখে পূর্ণ হয়ে গেল মাধবী।

মহাপ্রতীহারের গৃহে কৌমুদী জাগর উৎসবে কুমার বলে পাঠালেন "আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব।"

কথা ছিল মাধবী কুসুমাকর উদ্যানে অপেক্ষা করবে। সেদিন পূর্ণিমা। চারিদিকে আলো আঁধারের লীলা। কুমারের অপেক্ষায় একা থাকতে মাধবী ভীতা বোধ করছিল। মন্দিরের দ্বারপালকে বলল 'তুমি থাক'। সহসা শোনা গেল রথধ্বনি। অতি দ্রুত ধাবিত হয়ে আসছে। পাশের দুটি দীপস্তম্ভ থেকে দীপ বিচ্ছুরিত হচ্ছে। কুমার এলেন। অবনি তল কোথায় গেল! স্বচ্ছ আলোয় ভরা নীল নিশীথিনী। কুমার ও মাধবী নিক্ষিপ্ত শরের মত তীব্র গতিতে চললেন। জনহীন পথ। পুরবাসীদের অনেকেই গেছে মহাপ্রতীহারের আমন্ত্রণে। শূন্য রাজপথে চ্যুত উল্কার মত উদ্ধাব গতিতে কুমার চলেছেন—পাশে মাধবী। শুধু কানে বাজছে অশ্বক্ষুরধ্বনি। বুকে উচ্ছলিত হচ্ছে প্রিয়া সঙ্গীর উত্তরোল ঢেউ। চোখে ভেসে উঠতে না উঠতে মিলিয়ে যাচ্ছে প্রাসাদের ছায়া—বৃক্ষের রেখা। সেদিন কৌমুদী-জাগর উৎসব রাত্রির শেষ প্রহর পর্যন্ত চলেছিল।

কুমার ও মাধবী ক্রমেই উভয়ের মধ্যে উভয়ে মগ্ন হোল। এত নিবিড় সেই প্রেম যে দুজনের মন বাক্য চিন্তা সব এক হয়ে গেল। হায়, মনোভব কি দুজনের মনকে একত্রে শোষণ করে দিলেন? মাধবীর মনে হোল 'কুমার তো আমার। তাঁর উপর তো আমারি অধিকার।' এমন সময় দেবব্রত এল বারাণসী তীর্থ পরিক্রমা করে। আচার্য ঈশানেশ্বর লিখেছেন,—

"বৎসে!

শেষ পর্যন্ত মানুষের মধ্যেই তুমি মহাকালকে প্রত্যক্ষ করলে? কিন্তু মেনে রেখ এ সুখ ক্ষণকালের। আর সুখের পরেই দুঃখ। এ চক্রের নিবৃত্তি নেই। আমার যাগপ্রস্থ শেষ হোল। এবার সন্ন্যাস। উত্তরা খণ্ডে চলেছি। তোমাদের কাছে—এ জীবনের কাছে আমার মৃত্যু হোল। তবু মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে বলে যাই ভুলো না তুমি মহাকালবধূ। সেই তোমার অচ্যুত স্থান।"

মাধবী নয়ন তুলে তাকাল শিপ্রার দিকে।

অন্ধকারেও নদী তরঙ্গ তুলে চলেছে সাগর অভিমুখে। অভিসারিণী। মঞ্জরিকা বলল—"বার্ধক্যে এ কথা বলা সহজ। কিন্তু ইন্দ্রিয়গম্য এই রূপ জগতের কি দাম নেই? তবে কেন ফুল দেখতে ভালবাসি? কেন মধু, মদিরা, আসব পান করি? কেন চন্দন কর্পূর পুষ্প সারে নিজেকে সাজাই? রূপরসগন্ধের যদি মূল্য থাকে,—স্পর্শের কেন থাকবে না?"

শিপ্রা নদীর দিকে তাকিয়ে থেকেই মাধবী উত্তর দিল,—"মা মোরিকা, তা নয়। আচার্য আমাকে দুঃখ দিতে চান না বলেই সুখের সন্ধানে যেতে নিরস্ত করেছেন। কিন্তু সখী, এতেই যে আমার আনন্দ। যত অস্থায়ী হোক—যত অলীক হোক এতে যে আমি পূর্ণতর হয়ে উঠছি। প্রেমের অনুভূতি আশ্চর্য। এ যে বন্যার মত দুকূল ছাপানো—একে রোধ করি এমন শক্তি যে আমার নেই।" মাধবী তার ঢেউ খেলানো আঙ্গুল কটি দিয়ে মুখ ঢাকল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সেদিনের পর কয়েক বছর কেটে গেছে।

শিপ্রা নদী তীরে নটি মুখ্যার প্রাসাদে এই কয় বছরে মাধবী অনেক দেখেছে, অনেক শিখেছে।

শিখেছে সে বিভিন্ন উৎসবের ব্যবহার।

উদ্যান-গমন বা জল ক্রীড়ায় যে ভাবে যে বেশে চলতে হবে সারস্বত-ভবনের সভায় তা চলবে না। শিমুল উৎসবে শুধু তুলো দিয়ে খেলা আর কদম্ব-উৎসবে কদম্ব গোলক দিয়ে হস্তযুদ্ধ। নবান্ন উৎসবে সবার সঙ্গে মিলে আম কুড়োন আর মদনোৎসবে হারিয়ে যাওয়া নগর প্রান্তের কুঞ্জ বনে।

দর্পণে মুখ দেখতে দেখতে মাধবী স্মিত হাসে। পাঞ্চালাচারানুকরণের দিনে মুখোস উৎসবে এবার তার মুখোসই শ্রেষ্ঠ হয়েছিল। সোমপানকের সভাগুলিও তার সার্থক হয়েছে।

পরিচয় হয়েছে তার বিভিন্ন রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে—মরুমাড়, প্রতিষ্ঠান, ওড্র, কৌশাম্বী, সৌরাষ্ট্র, ভাকাটক, কুন্তল, পাণ্ড্য, পল্লবরাজ্য, লাটদেশ—আরো কত। সে জানে কাকে মিষ্ট ভাষণে এড়িয়ে যেতে হবে—কাকে অপাঙ্গ নয়নে বাঁধতে হবে। কিন্তু সব কঠিন কৌশল সহজ হয়ে গেছে চন্দ্রগুপ্তের প্রেমে।

আজও সকালে দর্পণে মুখ নিরীক্ষণ করতে করতে মাধবী সেই কথাই ভাবছিল। তার চূর্ণ কেশগুলি দুলছিল মলয় পর্বতের চন্দন সুরভিত, মহোদধির জল-কণা স্নিগ্ধ সমীরে। ঈষদোদ্ধত ভ্রূ—অধরে যৌবন গর্বিত হাসি। মাধবী ভাবছিল আজ সন্ধ্যায় চম্পকবন উদ্যানে তার অভিসার। মনে পড়ল পাঞ্চাল অনুকরণের দিনে উর্বশীর মুখোস পরে সে যখন প্রবেশ করেছিল তখন চন্দ্রগুপ্ত কেমন রাক্ষসের মুখোস পরে তাকে হরণ করে নিয়ে এসেছিলেন এই উদ্যানে। মাধবী আপন মনেই হেসে উঠলো। সেই সঙ্গে মনে পড়লো আর একটি তরুণ কিশোরের কথা। কবি কালিদাসের প্রীতি।

হ্যাঁ, তাও তাকে শক্তি দিয়েছে বৈকি।

মাধবী ও কুমারের প্রেমকে কবি অমরত্ব দিয়েছেন তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ—মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে।

ছদ্ম কোপে চন্দ্রগুপ্ত বলেছিলেন—"তুমি মাধবিকাকে মালবিকা করে অমর করে দিলে কবি। আর আমি তোমার সুহৃদ হয়েও স্মরণীয় হলাম না।"

সলজ্জ কালিদাস বলেছিলেন—"বন্ধু, আমার তৃতীয় কাব্য তোমার নামেই নামাঙ্কিত হবে। ঠিক করেছি উর্বশী পুরুরবাকে নিয়ে একটি নাটক লিখব। কিন্তু আমার পুরুরবার নাম হবে বিক্রম। তাই নাম হবে বিক্রমোর্বশী।

তিন জনের মিলিত হাসিতে কুসুমাকর উদ্যান সেদিন গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছিল।

মাধবী সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিল—"এত দ্রুত কি করে লেখ কবি? এত কল্পনা আসে কোথা থেকে?"

কালিদাস স্মিত মুখে বলেছিলেন—"সখী তোমাদের স্পর্শে যদি প্রিয়ঙ্গু বিকশিত হয়, মুখমদে বকুল ফোটে, পদাঘাতে অশোকের সাধ হয়, দৃষ্টিতে মঞ্জরিত হয় তিলফুল—আলিঙ্গনে কুরবক, মদার যদি ফোটে তোমাদের নর্মবাক্যে—পটুহাস্যে চাঁপা—মুখ নিশ্বাসে আমের মুকুল—গানে নমেরু—আর সম্মুখ নৃত্যে কর্ণিকার,—তবে সেই ছড়ানো ফুলগুলি নিয়ে মালা রচনা কি এতই কঠিন?"

আবার তিন জনে হেসে উঠেছিল নিশীথের স্তব্ধতার তরোভঙ্গ করে।

মঞ্জরিকা কিছু চারাগাছ নিয়ে আসছিল।

"অত হাসি কিসের সখী? ওমা, দর্পণে নিজেকে দেখেই এত আনন্দ?"

"না, না, মোরিকে আমি অন্য কথা ভেবে হাসছিলাম।"

"আচ্ছা, জানি গো, জানি। এখন দেখ উদ্যানের পাশে এই পুষ্পমালির চারাগুলি বসাব কি?"

"বসাও। আর দেখ পুন্নাগ তরুর আলবালে কিছু জল সিঞ্চন করা প্রয়োজন। আমি চাই মরুমাল কোবিদারের পাশে একটি শিবক্রম-বিল্ব বসাতে।"

"তাই হবে।"

"দেবরাত এসেছে?"

"এসেছেন।"

মুহূর্তে মাধবী ফিরে এল তার গহন লোকে। নৃত্য

চর্চার মধ্যে এসে নিজেকে খুঁজে পাওয়া—নিজেকে কি প্রেমের মধ্যে? সেও এক আশ্চর্য সঞ্চারিণী অনুভূতি। মাধবীকে যেন ভেঙে চুরে এক নতুন ব্যক্তিত্ব দিচ্ছে। কিন্তু সে ভাঙাচোরায় কোন ব্যথা নেই। আছে এক পরম সুখ। মাধবী একবার গোপনে তার স্তন বৃন্তে মযূরপদিকা চিহ্নগুলি দেখলে। মুখের ও বুকের প্রবাল মণি চিহ্নগুলির উপর গাঢ় চন্দন প্রলেপ দিল। তারপর আত্ম সম্বরণ করে নৃত্য চর্চা শুরু করল। "আজ মল্লযুটি নাচটি অভ্যাস করব।" মাধবী বলল।

দেবরাত নিঃশব্দে মৃদঙ্গটি তুলে নিল।

প্রায় দ্বিপ্রহরে মাধবী তার চর্চা শেষ করল।

বড় ভাল লেগেছে তার আজ নাচতে।

যদিও তার এক দিনলিপি।

ব্রাহ্ম মুহূর্তে স্নান—উষারতিতে নৃত্য। তারপর শিল্প চর্চা। এরপর মহানস থেকে আসবে দ্বিপ্রহরের আহার। মধ্যাহ্ন ভোজন শেষে কোন দিন প্রবাত শয়নে স্বল্প নিদ্রা, (এটির প্রয়োজন আছে সৌন্দর্য চর্চায়), কোন দিন বা চিত্র অঙ্কন।

তারপর?

রবির রশ্মি যখন কোমল হয়ে আসবে অগুরুধূপে তন্দ্রিয়ে নেবে কেশ। অঞ্জন আঁকবে নয়নে—লাক্ষার রাঙাবে অধর—পয়োধরে পত্র লেখা—মৃগমদে আবৃত করবে জঘন। কেতকী রেণু ছড়িয়ে দেবে সারা দেহে। মুখে লোধ্ররেণু।

শুরু হবে মহাকালের মন্দিরে সন্ধ্যা আরাত্রিকের নৃত্য। কিন্তু আজ নৃত্য শেষে লঘু স্বচ্ছ পূর্ণিমার আকাশের মতো জড়িয়ে নেবে শুভ্রাম্বর। বেণীতে দেবে শ্বেতকরবীর মালা। অষ্টমীর চাঁদের মত ললাটে বিন্দু মণি।

আজ যে জ্যোৎস্নাভিসার।

মদন ত্রয়োদশী।

নবযৌবনের প্রবল দশা; এদিকে চৈত্র মাসের রাত্রি যে ছোট।

চাঁপাফুলের গন্ধে সৌরভ মন্থর বাতাস—জ্যোৎস্না দিকে। মৃদু আবেশ মাধবীর গুণ্ঠন খুলে তুলে ধরলেন অবশ পাতার মত মুখখানি। আকণ্ঠ ডুব দিলেন তার কেশপাশে—ছল যৌবন সরসীতে। হতবুদ্ধি হতাশ্বাসা মুখাই কুসুম চূর্ণ ছুঁড়ে দিল রত্ন প্রদীপে।

রাত্রির তৃতীয় যামে মযূরিকা এসে হাত তালি দিল। "অন্ধকার তরল হয়ে এল। কপোতী এবার কপোতের কাছে বিদায় নেও।

অনিচ্ছুক কুমারকে অনেক স্খলিত চুম্বন দিয়ে মাধবী উত্তরীয়ে ঢেকে নিল নিজেকে। কুমার তবু ছাড়তে চান না।

"জান মাধবী আমি পিতাকে লিখেছি তুমিই হবে আমার মহিষী। এজন্য পিতা যদি আমাকে সিংহাসন না দিয়ে রামগুপ্তকে দেন আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই।"

মনে মনে পুলকিত হয়েও মাধবী সামনে জিব কাটে—"ছি, ছি, এটা কি যোগ্য কথা হোল কুমার? সামান্য এক নারীর জন্য সিংহাসন ত্যাগ করবেন আপনি? আমি কি আপনার যোগ্য?

উল্টে বলি আমিই কি তোমার যোগ্য মাধবী? তোমার এত গুণ। চতুষষ্টি কলা তোমার আয়ত্তে। আমার কি তা আছে? বরং তোমার যোগ্য গুণবান কালিদাস। মাধবী তুমি তাকে বরণ করলে না কেন?"

"প্রভু, আপনি আমাকে পরিহাস করছেন?"

"না মাধবী, না। কালিদাস সত্যই আমার বন্ধু। তুমিও আমার প্রিয় সখী। তুমি জান না কালিদাস তোমাকে কতখানি ভালবাসেন।" চন্দ্রগুপ্ত একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন।

মাধবী মাথা নত করে রইলো কিছুকাল। তারপর নত মুখে বলল,—"কুমার, আমার হৃদয়-মন আচ্ছন্ন করে আছে একটি সূর্য্যপ্রভ চরিত্র—আর কোনো আলো সেখানে গিয়ে পৌঁছয় না।"

প্রিয়ে, রাত্রি গত হোল। তুমি এই বার যাও। দেখো আমার পত্রের কথা কাউকে বোল না যেন।

"কালিদাসকেও না?" মাধবীর মুখে চাপা হাসি—চোখে কৌতুক।

"কালিদাস জানে। সে এই নিয়ে 'বিক্রমোর্বশী'

ও পাতার জাল বুনে রেখেছে। মাধবী ও মধুরিকা নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালো কুমারের উদ্যান ভবনে। বীণাবাদনরত কুমার মুগ্ধ চোখে তাকালেন প্রেয়সীর লিখছে। দেখিয়েছে এই চন্দ্রবংশেরই পূর্ব পুরুষ পুরুরবা স্বর্গনটিকে স্ত্রীর সম্মান দিয়েছিলেন। তবে কেন আমরা মিলিত হব না।"

এত দিনে হৃদয়ের পাত্র পূর্ণ হোল।

মাধবী গদ গদ্য কণ্ঠে উত্তর দিল—"আমি আর কি বলব কুমার?"

কুঞ্জের পথ দিয়ে যেতে যেতে মাধবী ও মধুরিকা দেখল অভিসারিকাদের ফুলের মালায় পথকীর্ণ। কোন উপবন থেকে ক্ষরিত হচ্ছে মধু বাক্য—"ওগো সুন্দরী তোমার মুখের ভয়ে চাঁদ মেঘের আড়ালে গেল, কুচের ভয়ে কমল মুদিত হোল, ঘট যে গেল আগুনে।"

কেউ বা বলছেন—"অসিত নয়নে তোমার ভুজ দেখে মৃণাল পঙ্কগামী—নয়ন দেখে হরিণ বনবাসী।"

ঘোমটার অন্তরালে মুখ ঢেকে স্মিত হাস্যে চলছিল দুটি নারী। সহসা পথের থেকে যেন ফুঁড়ে উঠলো এক বৌদ্ধ শ্রমণ।

"কে যায়?"

মধুরিকা উল্টে প্রশ্ন করল—"তুমি কে?"

"কি এত বড় স্পর্দ্ধা অভিসারিণী চর্বিণীর?" গর্জন করে উঠল সেই শ্রমণ। সঙ্গে সঙ্গে দুজন অশ্বারোহী ঘিরে দাঁড়ালো তাদের। মাধবী কম্পিত হোল। মধুরিকাও।

"আপনি কে ভগবন? আমি মধুরিকা।"

"মধুরিকা? সঙ্গে ওটি কে? নটিমুখ্যা নাকি?"

"উপাসক ক্ষপণক?" মধুরিকাও চিনতে পারল।

"হ্যাঁ।" বলেও ক্ষপণক এগিয়ে এসে মাধবীর আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করে নিল। তার মুখে ফুটে উঠল তির্যক হাসি।

"কোথা থেকে আসছ?"

আর গোপন করা বৃথা। মধুরিকা স্পষ্ট উত্তর দিল—"আমরা চম্পকবন উদ্যান থেকে ফিরছি।"

অশ্বারোহিদ্বয় সসম্মানে পথ ছেড়ে দিল।

পরদিন অপর একটি পত্র পাটলিপুত্রে প্রেরিত হোল সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের কাছে।

ঊষা মুহূর্তে উড়ুম্বরের প্রচণ্ড ধ্বনিতে কালিদাসের নিদ্রাভঙ্গ হোল। কালম্ কালম্ মহাকালম্। এত ভোরে এইশব্দ। কোথাও কি শান্তি নেই। কালিদাস বিরক্ত হলেন। কিন্তু মুখরা ভগ্নীনীকে কিছু বলে এই মনোরম প্রভাতটিকে তিক্ত করে তোলবার ইচ্ছে তাঁর ছিল না। শিপ্রায় স্নান সেরে গৃহে ফিরে তিনি তাঁর লেখনী ও পুঁথি নিয়ে বসলেন। সবে লিখেছেন ব্রতধারিনী উশীনরীর রূপ-বর্ণনা,—

সিতাংশুকা মঙ্গলমাত্র ভূষণা পবিত্রমূর্তির্নিয়মেন তাপসী।

ক্রুদ্ধা ভগ্নীনী যবাগূ নিয়ে প্রবেশ করলেন। কালিদাস সভয়ে তাকালেন,—"কি হয়েছে প্রিয়ে?"

"কি হয়েছে? ইক্ষুক্ষেত্রে ঠিক মত চর্বণ হয় নি। ভাণ্ডারে আমলক, জীরক, তামল কিছুই নেই। এ বৎসর শস্যের ভাগও কম পেয়েছি। মুগ, যব, শ্বেত সর্ষিষা, ধান্য—সকলশস্যের প্রায় কিছুই ভাল হয়নি। আমাকে আগ্নি জেলে দাও তাতে প্রবেশ করব।"

"কেন প্রিয়ে? আমি তো রামচন্দ্র নই, তুমিও সীতা দেবী নও।"

"আবার পরিহাস করছ?"

"ক্ষমা কর। কিন্তু এবার উত্তর-বৃষ্টিতে কি কিছুই হয়নি?"

কি করে হবে? তার অধিকাংশ বিলভূমি, বাকিটা দেবমাতৃক। বর্ষণ এবার মোটেই হয়নি। ফলে এক আরক নীবারও মেলে নি। একমাত্র গন্ধাবতী নদীর তীরের ক্ষেত্রটিই কৃষিযোগ্য। কিন্তু আজ পর্যন্ত তুমি এটিকে ব্রহ্মদেয় করে নেও নি। অথচ শুনি যুবরাজ তোমার বান্ধব। হায়, মন্দ ভাগিনী আমি।" কপালে করাঘাত করতে লাগলেন ভগ্নীনী।

"শান্ত হও প্রিয়ে, দেখি কি করতে পারি।" কালিদাস লেখনী ও পুঁথি তুলে রেখে উত্তরীয় গায়ে প্রস্থানোদ্যত হলেন বিরস বদনে।

বহির্গৃহ অভিমুখে যেতে যেতে শুনতে লাগলেন

ভট্টিনীর বিলাপ ও রুষ্ট কণ্ঠের ঝঙ্কার—"সৈন্ধব লবণ না পাই অন্ততঃ অক্ষীব লবণ ও তো দরকার। কর্পূর, কঙ্কোল, লবঙ্গ, জাতী এ সব সুগন্ধি তো বিবাহের দিনেই যা দেখেছিলাম। স্থানিক করণে একবার গিয়ে গন্ধাবতীর ভূমি পত্রটি বদলিয়ে তাম্রপট্ট করে নিও। আর দেব উত্তর ভূক্তির জঙ্গল ভূমিতে সোহলতা লাগাবার ব্যবস্থা কোর। তবু কিছু লাভজনক হবে।"

কালিদাস বহির্দ্বারে পা দিলেন।

ভট্টিনী আর অগ্রসর হতে পারলেন না।

তাঁর সংসারে অনেক কাজ পড়ে আছে।

আসল কথা কালিদাসকে পুঁথি ও লেখনী নিয়ে বসতে দেখলেই ভট্টিনীর ক্রোধ হয়।

সোমলতা? কালিদাসের মনে পড়ল আজ সন্ধ্যায় তো মাধবিকার গৃহে সোমপানক উৎসব। মনটা তার আবার প্রসন্ন হয়ে উঠল। চারিদিকে গ্রীষ্মের তপ্ত পদসঞ্চার। উত্তপ্ত শিখী আলবালের জলের কাছে শুয়ে আছে। হংসগুলি কমলবনের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে। তবু কালিদাস তারি মধ্যে চললেন স্থানিক—করণের উদ্দেশে। মনের মধ্যে মেঘের প্রার্থনা।

"কালিদাস কোথায় চলেছ?"

"কে বরাহ? একবার স্থানিক করণে যাচ্ছি। আমার একটি ভূমিপত্রকে তাম্রপট্টে পরিবর্তন করে নেব।"

"আগে পুস্তপালকে বলেছ?"

"না, তা তো বলিনি।"

"তবে কি করে হবে? আগে অধিকরণের বিশ্বপতিকে জানাতে হবে। তারপর পুস্তপালকে। সেখানে তোমার ক্ষেত্রটি যে গ্রামভুক্ত তার রাজকর্মচারী, ব্রাহ্মণ বর্গ এবং কুটুম্বিকগণ সম্মত হবেন। তবেই না…"

কালিদাস অত্যন্ত বিব্রত বোধ করেন। জমা জমি—হিসেব নিকেশ যে তিনি বোঝেন না তা নয়। তবে এই মুহূর্তে তাঁর মনের মধ্যে প্রিয় প্রসাদন ব্রতা উশীনরীর রূপটি ক্ষণে ক্ষণে ফুটে উঠছিল। এসব তাঁর ভাল লাগছিল না। আঃ প্রভাতের প্রসন্ন মুহূর্তটি বিনষ্ট হয়ে গেল।

বরাহের কিন্তু এসবে ভারী উৎসাহ। জ্যোতিষ আর ভূমিচর্চা এই দুই তার প্রিয় বিষয়। তিনি বিব্রত কালিদাসকে সান্ত্বনা দেন—"তুমি কবি মানুষ। তোমার কি আর এসব মনে থাকে। কোথায় দেবতা গন্ধর্ব কিন্নরী অপ্সরী না একেবারে ধর্ম, দায়, লাভ, প্রয়োগ ভাষা। ভেব না হে, ভেব না। আমি যাচ্ছি। তোমার হয়ে পুস্তপালকে বলে আসব। ঐ যে নাথশর্মা। হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার গৃহিনীর প্রিয় ভৃত্য। তিন দীনারে সেই কুল্যাবাপ ভূমি কিনেছিল। তাই নিয়ে অধিকরণে বিশ্বপতি আর পুস্তপালে কি কলহ। শেষ পর্যন্ত নাথশর্মা কেঁদে এসে পড়ল আমার কাছে। পুস্তপাল শিলাদিত্য আবার আমার ঘনিষ্ট বন্ধু। ঐ জ্যোতিষীর জন্যে হে। তা আমি গিয়ে শেষ পর্যন্ত সব মীমাংসা করে দেই।"।

কালিদাস তবু বিমর্ষ।

"এত বিমর্ষ কেন? বললাম তো ভাববার কিছু নেই।"

"না ভূমির কথা ভাবছি না। এখনই ঠিক গৃহে ফিরে যাওয়া চলবে না।"

"কেন?" বরাহ ভুরু নাচিয়ে বলেন—"ভট্টিনীর সঙ্গে কলহ করেছ বুঝি?"

কালিদাস শুষ্ক হাসি হাসলেন।

"তবে আর কি করবে? একবার শৌণ্ডিক বীথিতে ঘুরে এস।" বরাহ হাসেন।

"প্রভাতে? বাতুল নাকি?" কালিদাসও হাসেন। তারপর বলেন "দেখি একবার অমরসিংহের গৃহে যাই। তার অভিধানটির কদ্দুর…ঐ বৌদ্ধটার কাছে কেন যাও বল দেখি?" বরাহ কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন হয়ে ওঠেন।

"অমর সিংহের মনটা কিন্তু উদার বন্ধু।"

"আমার তো মনে হয় তুমিই উদার চরিত্র।" বলেই হঠাৎ বরাহ এগিয়ে আসেন—"দেখি, দেখি তোমার নাকের দুপাশে ও কিসের রেখা? বুঝেছি দশমহ রাহু। বন্ধু, তোমাকে বিদেশে যেতে হবে রাজকার্যে।"

কালিদাস এতক্ষণে হেসে উঠলেন।

"প্রতাপশালী, শত্রু বিজয়ী, গ্রহাস কর্তা দশমহ রাহু" —বিড়বিড় করে আবৃত্তি করলেন বরাহ মিহির। তারপর বললেন,—"আচ্ছা চলি রোদের উত্তাপ বড় বেড়েছে হে।

কালিদাস কতকটা অন্যমনস্ক ভাবে গৃহে প্রত্যাবর্তন করবার জন্য শিপ্রা নদী তীরস্থ পথটি ধরলেন। কেবলি তার মনের মধ্যে ভেসে উঠতে লাগলো ঘন বর্ষার চিত্ররূপ

—একটি জনহীন পথে চলেছে ঘননীল বসনা অভিসারিকা।

কে এই অভিসারিণী? তাঁর মগ্ন মনের অভ্যন্তর দিয়ে চলেছে? মালবিকা? উর্বশী? মাধবিকা!

হঠাৎ এই প্রখর রৌদ্রে রুদ্ধভবন জনহীন পথে কালিদাস স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

তবে কি তাকে আমিও ভাল বেসেছি?

আমার প্রেম? আমার স্বপ্ন?

আমার কুসুম? আমার মালিনী?

নটিমুখ্যার গৃহে সোমপানক উৎসব।

মধুরিকার নির্দেশে দীর্ঘ মশাল দিয়ে একটি একটি করে দীপ জ্বালিয়ে দিচ্ছিল দাসী। কনক দর্পণে চোখ রেখে মযূরকণ্ঠী কাঁচুলিটি শেষ বারের মত এঁটে নিল মাধবী। সৈবাল-শ্যামল আঁচলটি ঘুরিয়ে নিল বক্ষের উপর দিয়ে। যেন একটি আধফোটা জলনলিনী।

মণিগৃহে একবার পর্যবেক্ষণের জন্য গেল। গৃহের প্রাচীর ঘেঁষে দুটি উপপর্যঙ্কে চিত্রিত শয্যা। শয্যার পাশে বেদী। কক্ষের ঠিক মধ্যস্থলের প্রাচীরে পদ্মাসনস্থিতি একটি বেদী তার উপরে সরস্বতীর মূর্তি। এক দিকে বীণা, মন্দিরা, মৃদঙ্গ, করতাল প্রভৃতি সযত্নে সজ্জিত। একটি চতুষ্কে তাম্বুল, পুষ্পমাল্য, সুরভিত ধূপ। প্রাচীর লগ্ন দীর্ঘ দুটি হস্তীদন্তে প্রলম্বিত দীর্ঘ দুটি পুষ্পমাল্য। এ দুটি নটিমুখ্যা কামাক্ষীকে একদা নৃসিংহ গুপ্ত উপহার দিয়েছিলেন। আর এক কোণে চতুরঙ্গ, অক্ষ, কন্দুক প্রভৃতি ক্রীড়ার সামগ্রী কক্ষের বাইরে অলিন্দ। সোণার পিঞ্জরে শুকসারী। মণিগৃহের তিনদিকে তামরসে পূর্ণ তড়াগ। একদিকে উদ্যান। উদ্যানের পথে বেতে তমালকুঞ্জ। তার শাখায় বস্ত্র ঝুলনা। সুন্দর চিত্রিত বস্ত্রে আবৃত। তার উপরে মালতীলতার সজ্জা।

সুবর্ণ, রৌপ্য, স্ফটিক, চর্মপাত্রে সোমরস, মাধবী, কাদম্বী, গৌড়ী, আসব। মাধবী কোন সুরায় জল মিশিয়ে তৈরী করল ঐরেয়। ইক্ষুরসের সঙ্গে মিশিয়ে প্রস্তুত করল কামোদ্দীপক মৈরেয়। ধবনির্য্যাস কোহল আর ধাতুনির্য্যাস সুরা রাখল অল্প সরিয়ে। এ দুটি তীব্র। মেয়েরা পান করেন না। পুষ্পোদ্ভব মদিরার নাম মাধবী —এটি ললনাদের প্রিয়। সেটিকে এগিয়ে নিয়ে এল সম্মুখে। তার পাশে রাখল স্ফটিক পাত্রগুলি। তুলনায় এই জগলগুলি কিছু লঘু। তাছাড়া কাঁচ পাত্রের মধ্য দিয়ে রক্তবর্ণ সুরা বড় সুন্দর দেখায়। সর্বশেষে মধুরিকার সহযোগে তৈরী করল রতিফল মদ্য। দুধ, গুড়, ইক্ষুরস, কদলী, দ্রাক্ষারস ও পুষ্পমধু মিশিয়ে এই স্বাদু শীতল অল্পোত্তেজক মদিরা প্রস্তুত হোল কেবল কুমার ও তাঁর বান্ধববর্গের জন্য। শুধু তাই নয় বিচিত্র ফলের রসও রাখল সাজিয়ে। যেমন জম্বু রস, বীজপূরের রস, নারিকেল জল।

সহসা আসন্ন ঘটপদের ধ্বনির মত কণ্ঠগুঞ্জরণ শুনে মাধবী তার কৌতুক তরল নেত্রান্ত তুলল। আসছেন, তিনি আসছেন। হাস্য মুকুলিত কুমার চন্দ্রগুপ্ত প্রবেশ করলেন। মস্তকে শুভ্র উষ্ণীষ—গায়ে শুভ্র উত্তরীয়—পরিধানে শুভ্র-ধবল বস্ত্র। গলায় সিংহলী মুক্তার একছড়া হার। কোমরবন্ধে একটি রৌপ্য নির্মিত খোপে তীক্ষ্ণ ব্যাঘ্র নখ। তাঁর পেছনে মহাপ্রতীহার ভানুগুপ্ত, অন্যান্য রাজপুরুষ ও রাষ্ট্রদূতগণ। সবার পেছনে নবরত্নের দল। মাধবী, মধুরিকা, মন্দালিকা প্রভৃতি সখীদের সঙ্গে একত্রে জানালো অভিবাদন।

"পরম ভট্টারক, পরম বৈষ্ণব, পরম সৌগত মহারাজ কুমার উজ্জয়িনীর কুমারামাত্য বিক্রমাদিত্য চন্দ্রগুপ্তের জয় হোক!"

সোনার পিঞ্জরের শুক-সারিকাও প্রতিধ্বনি তুলল 'জয় হোক।' সবাই হেসে উঠলেন।

বিক্রমাদিত্য আজ বড়ই চাপল্য প্রদর্শন করছেন। চতুরঙ্গ খেলায় একবার পরাজিত করলেন মহাপ্রতীহারকে। কিছুক্ষণ বীণা বাজালেন। কিছুক্ষণ বেণু। কালিদাসকে খোঁচা দিলেন, "কই হে কালিদাস, তোমার নাটক কতদূর? উর্বশীর সঙ্গে মিলন হোল রাজার? তোমরা কবিরা বড় কঠিন হৃদয় হে। কতকাল আর বিচ্ছেদ ঘটিয়ে রাখবে?"

কালিদাস সলজ্জ কণ্ঠে বললেন—"হ্যাঁ মিলন হয়েছে। এবার তৃতীয় অঙ্ক লিখতে শুরু করব।"

"হয়েছে? সাধু, সাধু। চক্রস্বামী বিষ্ণুর জয় হোক

তাঁকে তিল-তুলসী দেব। জয় হোক শাক্যমুনি বুদ্ধের তাঁকে দেব দুধ-তণ্ডুল।"

"আর আমার মহাকাল? তিনি বুঝি বাদ রইলেন?" স্ফুরিতাধরা মাধবী প্রশ্ন করলেন।

বিক্রম একটুও অপ্রতিভ হলেন না—"তিনি তো আশুতোষ। বিল্বপত্র ও গঙ্গাজলেই তো তিনি তুষ্ট।"

সবাই হাসলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে সবাই যে যার পছন্দমত সহচর নিয়ে ছোট ছোট গুচ্ছে ভাগ হয়ে গেলেন। কেউ বা বাজাতে লাগলেন বীণা—তার চার পাশে সঙ্গীত-রসিকেরা ভিড় জমাল। কেউ খেলতে লাগলেন অক্ষ তাদের চারপাশে দর্শক তথা মন্ত্রণাদাতারাও জমে গেল। পানীয়ক বেদীতেও ভিড় বড় কম নেই। মযূরিকা, চিত্রসেনা, মন্দালিকা প্রভৃতি সখীরা জগলের পর জগল নিয়ে ভরে দিয়ে যেতে লাগল পানপাত্র। নবরত্নের দল যথারীতি তর্ক বাঁধিয়ে তুলতে বিলম্ব করল না। শঙ্কু, বেতালভট্ট, ক্ষপণক একদিকে, অন্যদিকে কালিদাস, ধন্বন্তরী, অমরসিংহ। ঘটকর্পর দুদিকেই টিকনী কাটছেন। দরকার মত যেদিকে বেশী লোক সেদিকে ঝুঁকে যাবেন। বরাহ চুপচাপ করে কোহল পান করছেন।

এসব তর্কে তাঁর রুচি নেই।

বররুচি এলে তবু জ্যোতিষ প্রসঙ্গে দু-চারটে কথা বলা যেত। সম্প্রতি কালপুরুষের পাশে তিনি একটি নতুন নক্ষত্র আবিষ্কার করেছেন। সুন্দর নীলাভ দ্যুতিময়।

তর্কের মধ্যে মাধবী এসে দাঁড়ালো। মধুকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—'কিসের বিতর্ক?'

শঙ্কু উত্তর দিলেন,—"ভদ্রে, আমাদের বক্তব্য ধর্ম ও মোক্ষের চেয়ে বড় কাম্য মানুষের কিছু নেই। অর্থ তার সেবক মাত্র। আর এই এঁদের মতে মোক্ষ কিছু নয়। অর্থ ও কাম ধরাধামে এই দুটি মাত্র কাম্য বস্তু।"

"সে কি কথা? আমরা ধর্মের কথাও বলেছি বৈকি।" কালিদাস বলে ওঠেন।

"আমার মতে কিন্তু মোক্ষই একমাত্র বস্তু।" মাধবী আচার্য্যের শেখান বাক্য বলে কাকাতুয়ার বুলির মত।

ক্ষপণক তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন মাধবীর দিকে। মাধবী একটু লজ্জিত বোধ করল সেই দৃষ্টির সামনে। মনে পড়ল অভিসারের রজনী। হয়তো উপাসক তাকে মিথ্যাবাদিনী মনে করছে। এমন সময় মযূরিকা উপস্থিত হোল—"আপনি কি পান করবেন উপাসক? মৈরেয় না মাধ্বী?"

"দুগ্ধ।"

"দুগ্ধ?"

বিস্মিত হলেও মযূরিকা হটে যাবার মেয়ে নয়। দুগ্ধই নিয়ে এল সুবর্ণ পাত্রে।

মাধবীর কথাটার প্রাণ ছিল না লক্ষ্য করে ধন্বন্তরি মৃদু হেসে বললেন—"বিদুষী আমার মতে কিন্তু কামনাই মানব জীবনকে সর্বাধিক নিয়ন্ত্রণ করে।"

"অর্থও বড় কম নয়।" অমরসিংহ ধীরে ধীরে কথাগুলি উচ্চারণ করলেন। সম্প্রতি অভিধানের জন্য তাঁর বড়ই অর্থের প্রয়োজন চলেছে। "সাধু, সাধু, আমিও তাই তোমার দলে।" ঘটকর্পর অমরসিংহের গা ঘেঁষে বসল। একটা মুখর হাসির রোল পড়ে গেল।

"কবি, তোমারও কি এই মত?" মাধবী প্রশ্ন করল। কালিদাস মৃদু মৃদু হাসতে থাকেন। জবাব দেন না। মাধবী আবার বলে—"কবি, বলই না।"

"জীবনের এক এক ক্ষেত্রে এক একটির মূল্য অপরিহার্য্য। যৌবনে কাম ও অর্থের মত বস্তু নেই। ধর্ম কিন্তু সব বয়সের।"

"মোক্ষ?"

"সেটা বোধহয় বার্দ্ধক্যে লাগতে পারে। শোভনে, আমার তো এখনো বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয়নি।"

"হয়েছে বৈকি—তোমার এখন মরণ দশা"—গর্জন করে উঠলেন ক্ষপণক। তারপর বিদ্রূপ করে বললেন—"অর্থ আর কাম—পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখং বিবিক্ষু। জলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। অধার্মিকের দল।"

কালিদাস পরিহাস করলেন—যাই যাব। তোমার মত ডাকিনীর সেবা না করে মোহিনীর সেবাই আমার অভিপ্রেত।"

আবার একটা হাসির সোর পড়ে গেল। তারি মধ্যে ক্ষিপ্ত ক্ষপণককে মুষ্টি ছুঁড়তে দেখা গেল।

চন্দ্রগুপ্ত এসে দাঁড়ালেন বসন্ত মঞ্জরীকে নিয়ে।

কামাক্ষীও এসেছেন সঙ্গে। "কি করছ তোমরা? শুধু বিতর্ক করে কাটাবে এমন বাদরী সন্ধ্যা?"

"বিশেষতঃ মাধবী-বিতানে"—ঘটকর্পর টিপ্পনী কাটেন।

"শোভনে, একবার ঐদিকে চলুন—রাষ্ট্রভৃতগণ আপনাদের সঙ্গে আলাপের জন্য উৎকণ্ঠা"—ভানুগুপ্ত এসে কামাক্ষীকে নিবেদন করেন।

শঙ্কু ও ক্ষপণক উঠে দাঁড়াল—"আমরা এবার চলি কুমার।"

"কেন হে এত শীঘ্র কেন?" বিক্রম বিস্মিত।

"ওঁদের ডাকিনী-সিদ্ধির বেলা হয়ে গেছে।" অমরসিংহ বলেন। ক্ষপণক ভ্রুক্ত চোখে তাকাল অমরসিংহের দিকে,—"মারজিৎ বুদ্ধের শিষ্য হয়ে তুমি কি করে সোমপান কর হে?"

"কেন তাতে ক্ষতি কি? মারজিৎ বুদ্ধের উপাসক হয়ে তুমিই বা শঙ্কু-বেতালের সঙ্গে শব-সাধনা কর কি করে?"

"ওটা মহাযানে প্রচলিত আছে।"

"আছে নাকি? বিনয়-ত্রিপিটকে একেবারে সিদ্ধ দেখছি।" অমরসিংহের কণ্ঠে বিদ্রূপ।

কূটনৈতিকদের আসরে কামাক্ষীকে পরিচিত করে বিক্রম আবার ফিরে এসেছেন বন্ধু-চক্রে। তাঁর সঙ্গে চিত্রসেনা আর মন্দালিকার দল। ততক্ষণে পরিণাম চিন্তাহীন ঘটকর্পর টিপ্পনী কেটেছেন,—"এমন সব মোহিনী থাকতে যোগিনীর জন্য এত ব্যাকুল কেন হে ক্ষপণক?"

ক্ষপণক তিক্ত হাসি হাসলেন—"তোমাদের মত অর্থকেই জীবনের সার বলে মনে করি নি তো। ধর্মাধর্মের জ্ঞান কিছু আছে।"

চন্দ্রগুপ্ত ক্ষপণকের উগ্র ধর্মনিষ্ঠার কথা জানতেন। তিনি মধ্যপথে থামিয়ে দিলেন এই কলহ। বললেন,—"স্থিরো ভব। তোমরা যাও ক্ষপণক। ধর্মের প্রয়োজন সবার উপরে। বেতাল তুমিও যাচ্ছ নাকি?" বেতাল ভট্ট এতক্ষণ আপন মনে ধাত্রসুরা পান করছিলেন। রক্তনয়ন দুটি তুলে বললেন—"অনুমতি দিলে যেতে পারি।"

চন্দ্রগুপ্ত হেসে হাত তুলে ইঙ্গিতে অনুমতি দিলেন। শঙ্কু বেতালভট্ট, ক্ষপণক—তিন জনেই প্রস্থান করলেন।

অমরসিংহ উঠলেন উঠবার। ঘটকর্পর হাসলেন,—"তুমিও ডাকিনী সিদ্ধির জন্য চললে নাকি?"

"না। হাঁ, তা বলতে পার বটে। রাত্রির দ্বিতীয় যামে অভিধান ডাকিনীর কাছে না গিয়ে পারি না। ডাকে কি না।" অমরসিংহ হাসতে হাসতে বিদায় নেন।

বরাহমিহির এতক্ষণ ভ্রুকুঞ্চিত করে বসেছিলেন। কিছুক্ষণ আগে বররুচি এসেছে। তার সঙ্গে জ্যোতিষ আলোচনা করছিলেন। বররুচির ইচ্ছে কালিদাসকে দিয়ে একবার তার ব্যাকরণ রচনার কথাটা চন্দ্রগুপ্তকে জানাবেন। অমরসিংহ কেমন অভিধানের জন্য কালিদাসকে দিয়ে অর্থের ব্যবস্থা করে নিল। কিন্তু গতিক সুবিধের নয় বুঝে তিনি এবং বরাহ এবার কুমারের কাছে বিদায় নিলেন।

বিক্রম তাকালেন কালিদাসের দিকে,—

"কবি তুমি?"

"আমি আছি।"

"ঘটকর্পর?"

"আমিও কিছুক্ষণ আছি। আর দণ্ড দুই পরে যাব।"

"ঘটকর্পর?"

"আমি সর্বক্ষণই বিরাজ করব।"

"সর্বঘটে থাকা সাধু সঙ্কল্প।" কালিদাস বলতে সবাই হেসে উঠলেন। সোপানে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ শোনা গেল।

দুজন আয়ুক্তকের সঙ্গে প্রবেশ করলেন নৃসিংহগুপ্ত।

অশ্বখুরোদ্ধত ধূলিরেণু পরিপ্লুত তাঁর ক্লান্ত রূপ দেখেই বোঝা যায় পাটলীপুত্র থেকে তিনি এসেছেন দ্রুতগামী অশ্বে—প্রায় কোন বিশ্রাম না করেই।

"মহাসান্ধিবিগ্রহিক?" বিস্মিত বিক্রম।

"পরমভট্টারক"—নতজানু হয়ে অভিবাদন করে মুদ্রাঙ্কিত পত্রটি দিলেন কুমারের হাতে।

পত্রপাঠের সময় যে সভাগৃহে প্রমোদ বন্ধ হয়ে গেল তা নয়। যথাপূর্ব অলঙ্কারের শিঞ্জিনি—পানপাত্রের টুং টাং—পাশার ঠক্ ঠক্ ও মত্ত হুঙ্কার শোনা যেতেই লাগল। তদুপরি কুমার সভাগৃহের একান্তে ছিলেন। শুধু কালিদাস লক্ষ্য করেছিলেন ক্ষণকালের জন্য কপালের উপর ঘনিয়ে আসা চিন্তার ত্রিবলীরেখা। কিন্তু ধন্য গুপ্তবংশের শিক্ষা ও সংযম। উদগ্রীব সভীদের উদ্দেশ্যে বরাভয় জানিয়ে বললেন—"ভয়ের কিছু নয়।"

"মহাসান্ধিবিগ্রহিক, কি পান করবেন ?"

"কিছু না, পরমভট্টারক। এখন একবার প্রাসাদে যাব। স্নানাদির পূর্বে কিছু নয়।"

"না, অন্তত একটু সোমরস পান করে যান।"

তাঁর ইঙ্গিতে কালিদাস গিয়ে মাধবীকে ডেকে আনল। মাধবীর রূপে আর একবার মুগ্ধ হলেন নৃসিংহগুপ্ত। কিন্তু তিনি চতুর ব্যক্তি। দেবভোগ্যা রমণীর দিকে দৃষ্টিদান বাৎস্যায়ন নিষেধ করেছেন এ তাঁর বেশ মনে আছে।

মাধবী পানপাত্র তুলে দিল তার হাতে। আঙুলে আঙুল ঠেকল যেন বিদ্যুতের চমক। মাধবী চমকে তাকাল নৃসিংহগুপ্তের দিকে। একটা প্রবল রক্তোচ্ছ্বাস নৃসিংহগুপ্তের হৃদয় থেকে উঠে গিয়ে সমস্ত মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ করে তুলল। মাধবী যেন সহসা নৃসিংহগুপ্তের সমগ্র হৃদয়তল দেখতে পেলেন সেই দর্পণে। দেখে সে ঈষৎ কম্পিত হল। পলকে প্রণয়—কিন্তু নিঃশব্দে। চন্দ্রগুপ্ত শুধু লক্ষ্য করলেন একটা অস্বাচ্ছন্দ্য। প্রশ্ন করলেন ;—

"মহাসান্ধিবিগ্রহিকের শরীর কি অসুস্থ ?"

"না কুমার, সোমরসের মাত্রাটা কিছু বেশী।"

রাত্রির তৃতীয় যামে সকলে বিদায় নিতে সুরু করলেন। কুমার কালিদাসকে ছাড়লেন না। সার্থক সন্ধ্যার জন্য মাধবীকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে উভয়ে একত্র রওনা হলেন। চম্পকবন উদ্যান ভবনে রথ এসে থামল। কালিদাস প্রশ্ন করলেন,—"প্রাসাদে যাবেন না কুমার ?"

"কথা আছে। তোমার অসুবিধা নেই তো কবি ?"

"না কুমার, চল।"

ভবনকক্ষে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে কুমারের মুখের প্রশান্ত-শ্রী অন্তর্হিত হোল।

"কি হয়েছে কুমার ?"

"পত্র পাঠ কর।"

"স্বস্তি নিবেদন,

কাশ্মীর-রাজ প্রবরসেন বিতস্তা নদীর উপর এক সেতু নির্মাণ করেছেন। সেতুর উদ্বোধন উৎসবে পাটলীপুত্র পৌরসঙ্ঘ তোমাকে প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছেন। উজ্জয়িনী জনসঙ্ঘ নির্বাচন করেছেন কালিদাসকে। পত্রপাঠ তোমরা দুজনে কাশ্মীর যাত্রা করবে।

কালিদাস মাতৃগুপ্ত নামে পরিচিত করবেন নিজেকে। রাজা প্রবরসেনের একটি কাব্য তাঁকে মার্জনা করতে হবে। তাঁকে তিনি এজন্য রাজমন্ত্রী পদেবৃত করবেন এক বৎসরের জন্য। এই এক বৎসর তুমি মগধের রাষ্ট্রদূত হিসেবে কাশ্মীরে থাকবে। ভিক্ষুগাচার্য মণিগুপ্ত পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। ধন্বন্তরিকে পত্রপাঠ পাটলীপুত্রে আসতে অনুরোধ জানাবে। তাঁকে পরবর্তী রাজবৈদ্য পদেবৃত করা হোল।

মণ্ডলেশ্বর রুদ্রধরের কন্যা ধ্রুবাদেবীর সঙ্গে তোমার পরিণয় পত্র ঠিক হয়ে আছে। তাঁকে অগ্রমহিষী করা হবে এমন স্থির। শত্রু রাজ্যগণ দুর্বল হলেও মথুরায় বসে আছেন। হূণদের আক্রমণ যে কোন মুহূর্তে ঘটতে পারে। এমন অবস্থায় আবার অমাত্যবর্গের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি কোন মতে সঙ্গত হবে না। তথ্যতীত মহাকালবধূ নটি মুখ্যাকে রাজ-ভোগ্যা করা অসঙ্গত হবে। উজ্জয়িনী জনসঙ্ঘে এজন্য বিদ্রোহ সৃষ্টি হতে পারে। সেই মর্মে বৌদ্ধ-সঙ্ঘ থেকে অদ্য একটি পত্র পেয়েছি। সাক্ষাতে এ প্রসঙ্গ আলোচিত হবে।"

কালিদাসের চোখের সামনে অক্ষরগুলো যেন নেচে উঠল। কানে বেজে উঠল বরাহ মিহিরের কণ্ঠ—প্রবাসকর্তা দশনদ্ব রাহু। গবাক্ষের বাইরে তাকালেন কালিদাস। অমাবস্যার রাত্রিতে আকাশভরা তারার কৌতুক কোথায় গেল ? মাড়া কাজলের মত কৃষ্ণমেঘে দিগন্ত অন্ধকার। মধ্যে মধ্যে দন্তুর হাসির মত বিদ্যুত ঝিলিক দিচ্ছে। সভয়ে রাহুর ইষ্টদেবী ছিন্নমস্তার ধ্যান স্মরণ করলেন তিনি।

"এখন উপায় ?" হতবুদ্ধি বিক্রম প্রশ্ন করলেন।

"আমার মনে হয় যাত্রা করাই সঙ্গত। সেতু-উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন হয়ে গেলে কিছু একটা ব্যবস্থা করা যাবে।" কালিদাস ধীরে-ধীরে বললেন।

"কিন্তু বন্ধু মাধবীর কি হবে ?"

"তাকে রাজাজ্ঞার কথা বুঝিয়ে বল। সে নিজেও কি তা অগ্রাহ্য করতে পারত ?"

"আমি পারব না—পারব না কালিদাস। এ তো নির্বাসন দণ্ড। আমি বরং রাজত্ব রামগুপ্তকে ছেড়ে দেব। তিনিই ধ্রুবাদেবীকে বিবাহ করুন। কিন্তু মাধবীকে আমি অগ্রমহিষী করতে চাই সে তো তুমি জান।"

"সে পরের কথা। কাশ্মীরে এখন এক বৎসর নির্বাসন দণ্ড ভোগ করতেই হবে। তারপর ফিরে এসে সম্রাটকে

একবার অনুরোধ জানাতে হবে। তবে বন্ধু, মদনরাজ্যের নিষ্কণ্টক রাজগুরু হতে পারবেন না। হলেও সে পদ রাখতে পারবেন না। জনপদবধূ তাতে বিদ্রোহী হবে। কিন্তু আমি ভাবছি যে এই বৌদ্ধ সঙ্ঘের লেখক ?"

"কে আবার ? ক্ষপণক।" ক্রোধে বিভীষণ রূপ ধরে উঠল বিক্রমের। তারপর সেই রাত্রির ঘটনার অনুপূর্ব তিনি মাধবীর কাছে যা শুনেছিলেন কালিদাসকে বললেন।

কালিদাস স্তব্ধ হয়ে রইলেন। এই মুহূর্তে কোন পথেই তিনি দেখতে পেলেন না। রাত্রির অন্ধকার তরল হয়ে আসছে। তিনি গৃহে ফেরবার জন্য উঠলেন। চন্দ্রগুপ্ত কিন্তু তাঁর সঙ্গ ছাড়লেন না। শোকোচ্ছ্বাসে কণ্ঠ তাঁর উদ্বেল,—"কবি এই সেই চন্দ্রকরন উদ্যান যেখানে মাধবী-কে আমি প্রথম লতাবেষ্টিতক আলিঙ্গনে বদ্ধ করি। দেখ, দেখ আজ যে সরোবরকে তিমির নির্ঝর বলে মনে হচ্ছে গত পক্ষেও তা ছিল চন্দ্রমণির বিগলিত রূপ। এর সোপানে মাথা রেখে কত জলক্রীড়া আমরা করেছি। আহা, এই সেই মালতীলতার স্থলনা। প্রিয় মস্তক বক্ষে ধরে কত দিন শুনেছি এখানে। কবি-বন্ধুর মাধ্যে যার সৌরভ সংবাদ পেতাম কবি চেয়ে দেখ একবার সেই যুথী-কুঞ্জটিকে।

বিচলিত কালিদাস বললেন—'কুমার নিরস্ত হও। পুরুষের ক্রন্দন শোভা পায় না।'

"বন্ধু, পুরুষের ক্রন্দন শোভা পায় না। বিশেষতঃ ক্ষত্রিয় রাজ পুরুষের। কিন্তু আজ একবার আমাকে এই নিশীথের অন্ধকারে ক্রন্দন করতে দাও। কাল সকালেই দেখবে আমি শান্ত স্থিতধী পুরুষ। হায়, পুরুষেরও শোক হয়। হতভাগ্যদের জন্য সংসার সেটুকু স্বাধীনতাও দেয় নি।"

সেই শেষ রাত্রেই কালিদাস প্রদীপ জ্বালিয়ে বিক্রমোর্বশীর চতুর্থ সর্গ লিখতে বসলেন। বিষয়—পুরুরবার উর্বশী বিরহ। রাজৌকির কাব্যে সীতা বিরহ কাতর রামের চিত্রটিও বারবার তাঁর মনে ভেসে উঠছিল। ভূর্জপত্রের বুকের উপর খসখস করে চলতে লাগল তাঁর মরাল পালকের লেখনী,—

রাক্ষস নয়, এ যে নবীন মেঘ।
শরাসন নয়, এ যে ইন্দ্রধনু।
শরধারা নয়, এ যে বৃষ্টিধারা।
কনকনিকষস্নিগ্ধা উর্বশী নয়, এ যে বিদ্যুৎ।

প্রভাত-বালারুণের হেম রেখা এসে কালিদাসের লেখনী স্পর্শ করল। তিনি লেখনী ত্যাগ করলেন। বিক্রমোর্বশীর শেষ অঙ্ক লেখা হয়ে গেছে। এখন অন্য কাজ।

স্নানান্তে মধু ও দুগ্ধ পান করে কালিদাস 'তব অভ্রসর' ভঙ্গীকে জানালেন রাজাজ্ঞা। কালিদাসের মন্ত্রীপদ প্রাপ্তির সংবাদে ভঙ্গী কিয়ৎ প্রসন্না হলেন প্রশ্ন করলেন,—

'যাত্রা কবে ?'

'আজ।'

'আজই ?'

ভঙ্গী চুপ করে গেলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, "তবে তো সমস্যা। অন্ততঃ আমার মাতৃষসাকে আনিয়ে দিন। মাধবর্যাকে বন্ধুর রাত্রির প্রহরার জন্য এখানে থাকতে। বাকি সব চরকরের দিয়ে আমি করিয়ে নেব।"

"মাতৃষসা আবার কেন ? আমি তো বৎসরাধিক কালের বেশী থাকব না।"

ভঙ্গী নয়ন নত করে বললেন—"প্রভু, আমি অন্তর্বত্নী।"

কালিদাস স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

অকস্মাৎ একটি কোমলতার উচ্ছ্বাসে তাঁর মন আর্দ্র হয়ে গেল। "বেশ তাই হবে। মাধবর্যা এখুনি অশ্বারোহনে চলে যাক মাতৃষসার গৃহে। এই নাও অঙ্গ অঙ্গুরী। আমি একবার মাধবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছি।"

"প্রভু, আজ শেষ দিনেও কি আপনি গৃহে থাকবেন না ? নটিমুখ্যার মূল্য কি চিরদিন বর্ষপঞ্জীর চেয়ে অধিক থাকবে ?"

কালিদাস থমকে দাঁড়ালেন।

এ কথা যে এই নারী কোনদিন বলতে পারে তা তিনি চিন্তাও করেন নি। চিরকাল দেখেছেন অতি

কোলের, অতিরপণা এই নারীর আকর্ষণ ছেলে তুমি, স্বর্ণমুদ্রা, যৌবন, সব প্রভৃতি বৈষয়িক সামগ্রী।

তিনি ফিরে দাঁড়ালেন।

অগ্নিগতা অরণির মতই পূতা বলে মনে হচ্ছিল আজ তটিনীকে। "কল্যাণী, তোমার আসন তোমারই। সে যে ধর্মপত্নীর আসন। সেখানে তুমি সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত আছ। তোমার মাতৃত্ব তোমাকে আরো মহিমময়ী করে তুলুক। কিন্তু বিশ্বাস কর রাজাজ্ঞার জন্য মাধবীর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করা প্রয়োজন।

"তাই হোক।"

মাধবী জানত এ ব্রজের আঘাতে তাকে সইতেই হবে। সেই আঘাত নামল। আর সেই আঘাত সে পল। চক্রগুপ্ত শেষ বক্তব্য বলে গেলেন,—"প্রিয়তমে তুমি আমার যৌবনের প্রথম বসন্ত মঞ্জরী—তুমি আমার একমাত্র স্মৃতি। এখন থেকে শুধু কর্তব্য ও গুরুভার রাজকার্য বাকি রইল আমার জীবনে।"

মঞ্চজালে মাধবীর কণ্ঠ রুদ্ধ।

কি বলবে সে এই শেষ পল বিপলে? এই ভয়ানক কঠিন মুহূর্ত মুহূর্তে? মাধবীর পাশে শীতল পাষাণ দুই চুম্বন এঁকে দিয়ে কুমার চলে গেলেন।

মর্মরিকার কাছে ভর দিয়ে মাধবী দাঁড়ালো বাতায়ন পার্শ্বে। কুমারের অশ্ব ক্ষুরধ্বনি মাধবীর হৃদয়ে গুরু হানতে লাগল। বারংবার তিনি পেছন ফিরে দেখতে লাগলেন। তারপর কুমারের দেহ বিদ্যুৎ রেখা। সেই বিদ্যুৎ অদৃশ্য হোল। মাধবী ফিরে তাকালেন কক্ষের দিকে।

শূন্য সমুদ্রগৃহ।

শূন্য শিলাবেদী।

তাঁর মনে হোল এ জন্মের জীবন শেষ হয়ে গেছে।

মাধবী মূর্ছিতা হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

বাহু মর্দিতা ব্রততীর মতো মাধবীকে ধরাতলে লীনা দেখে কালিদাস বুঝলেন সংবাদ জানাবার কিছু নেই। মল্লিকা বিষণ্ণ মুখে বীজন করছিল। সে বলল,—"মূর্ছাই এখন বন্ধুর মতো অসহ্য যন্ত্রণাকে ঢেকে রেখেছে।" চিত্রসেনা ললাটে চিটিয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছিল শীতল জলধারা। কালিদাস মাধবীর পাংশু মুখের দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন। ধীরে ধীরে মোহভাব কেটে মাধবী চোখ মেলল। কবিকে দেখে তার শোক আবার উন্মত্ত হয়ে উঠলো। ধীরত্বতাকে বিখণ্ডিত করে দিল তার সকরুণ ক্রন্দন ধ্বনি। উন্মত্তার মত উত্থিত হয়েই সে বসুধাকে আলিঙ্গন করে পড়ে গেল। শিথিল কেশপাশ ধূলায় জড়িত। কেঁদে উঠল সখীরাও সেই সঙ্গে। বসুধালিঙ্গন, ধূসর স্ত্রী, বিকীর্ণমূর্ধজা প্রিয় সখীর বিলাপে কালিদাসের চোখে নিরেও নামল অশ্রুধারা। প্রিয় বিচ্ছেদের শোক যে এমন বিদীর্ণ করে দেয় তিনি প্রথম প্রত্যক্ষ করলেন। আজ যেন বুঝলেন চক্রবাকীর শোকে কেন রত্নাকরকে বাল্মীকি করেছিল। তিনি তার আপন হাতের উপর তুলে নিলেন মাধবীর হাতখানি। মাধবী তখনো শোক করে চলছে—"এ সংবাদ শোনবার আগেই কেন আমার মৃত্যু হোল না? শোনা মাত্রই কেন মরলাম না? শোনবার পরেও কেন বেঁচে আছি? কবি, প্রকৃতির দিকে চেয়ে দেখ কে কবে প্রিয়কে ছেড়ে দেয়? কৌমুদী শশীর সঙ্গে অস্ত যায়—তড়িৎ মেঘের সঙ্গে সাথী থাকে। তবে কেন আমিও তোমাদের সঙ্গিনী হব না?"

কালিদাস মাধবীর আধফোটা কমলের মত হাতখানি ধরে বললেন—"স্থির হও মালিনী, স্থির হও। এ ভাবে আত্মদহন কোর না। রবির সঙ্গে যখন যেমন মিলিত হয়েছিলেন তোমার সঙ্গেও কুমারের তেমনি মিলন হবে। দেখ, তুমি যে প্রকৃতির উপমা দিলে তার ঊনত্রিশে শশি গ্রীষ্মে প্রচণ্ড সূর্য কিরণে তটিনীর জলরাশি শুকিয়ে যায়—কিন্তু বর্ষায় কি তা পূর্ণ হয় না? বসন্তের ফুল বসন্ত অন্তে ঝরে যায়। কিন্তু আবার তো ফাল্গুনী আসে।"

অশান্ত মাধবী তবু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল কপালে করাঘাত করে—'হায় চাঁদ, হায় চাঁদের কিরণ, হায় চূতমঞ্জরী। কালিদাস বললেন—"কথা দিচ্ছি প্রতি মাসে তোমাকে খোকা পাঠাব। বাল্মীকির চক্রবাকীর মত তোমার বেদনাও সিদ্ধ হবে। এবার একবার প্রসন্ন নয়ন তুলে চাও।"

প্রভাতের শশিলেখার মত ম্লান করুণ হেসে মাধবী

বলল,—"কবি ক্ষমা কর।
যাত্রায় যেন বিঘ্ন সৃষ্টি না করে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পর্বতের উপরে পর্বত—তারো উপরে পর্বত।

এ যেন কোন মেঘলোকে তাঁরা প্রয়াণ করছেন।

কত জ্যোতির্ময়ী ওষধী, কত উজল ঝরা। পত্র পত্র শব্দ মেঘ ভেঙে বেড়াচ্ছে যেন বিলাসিনী সিদ্ধাঙ্গনী। নির্ঝর-নীকর-বাহক কম্পিত দেবদারুর উচ্চ সরল শীর্ষগুলি কি সবুজ। বড় বড় শিলার আর মুড়ার দুর্জয়ত্ব। নয়ের পায়ে নেমে এসেছে কবি লিখার মত। পুরাণ কুহক-যুবতির-বাসরকে মধুর করে তুলেছে লিলাজিত ওষধি। কোথাও বা ঝিটকে আছে দেবদারু পাখীর পক্ষ —অলক্তকের মত রক্তের দাগ উঠে গেছে কোন পক্ষীর শীকারের ইঙ্গিত। কর্ণিকার কুলের সোনালি রং বন-ভূমিকে উজল করেছে বটে কিন্তু কোন পক্ষ হায় বিধাতার পূর্ণ-পরাঙ্মুখ প্রবৃত্তি।

মৃগগুলি ছুটছে। শিরাল মঞ্জরীর রঞ্জকণা বাতাসে উড়ছে। হিমের প্রকোপে এ দেশের কামিনীরা মধু ও কুঙ্কুমের প্রলেপ মেখেছে। পঙ্কজ রেণু গন্ধি জল শুঁড় দিয়ে ছুলে হস্তীরা হস্তিনীকে স্নান করাচ্ছে। হাস্ত ফেন মুখরিত স্বল তরঙ্গে ঢেউ তুলে চলেছে কোন কিশোরী নদী। কালিদাসের মনে পড়ল শিপ্রা নদীর রূপ—সে যেন মাধবীর নির্মল হৃদয়ের মত। কত নদী, গিরি, গিরির তাঁরা অতিক্রম করেছেন। অচ্ছোদ গম্ভীরা নদী—কলহংস শোভিত নির্বিন্ধ্যা—চর্মণ্বতী দশপুর—ব্রহ্মাবর্ত, কুরুক্ষেত্র, কৌঞ্চরন্ধ্র। অবশেষে পঞ্চালধার পর্বতমালা দেখা গেল। বাণপাল থেকে কাশ্মীরকে মনে হোল একখানি দধি পাত্রের থালা। দীর্ঘ একমাস তাঁরা ভ্রমণ করেছেন—রথে, গজে, হয়ে কখনো বা নৌকায়। বেদনা আজ মন ভ্রমণ বৈচিত্র্যে অনেকখানি সান্ত্বনা পেয়েছে। বিচিত্র দেশের বিচিত্র মানুষ আর প্রকৃতির নব নব রূপ লীলায় দুজনেই পেয়েছেন আনন্দ। তবে মানুষে বিক্রমাদিত্যের কৌতূহল আর প্রকৃতিতে কালিদাসের উৎসুকা।

অবশেষে কাশ্মীরে তাঁরা পৌঁছলেন। এক যোজন থেকেই রাজ সমাদর শুরু

অভিনন্দন জানালেন,—

"দেবপুত্র, পরমভাগবত, পরমভট্টারক কুমার গুপ্তের জয় হোক। পরমেশ্বর, পরমত মহী মাহেশ্বরের জয় হোক।

স্বস্তি! স্বস্তি!"

বড় সুন্দর এই দেশ কাশ্মীর। কালিদাসের বড় ভাল লাগছিল। বিশেষতঃ পার্বতীয় স্নিগ্ধ এই দেশ। এখানে তিনি বিশ্রাম লাভে প্রয়াসিত। শুভ-পরশে তৃপ্ত করে তিনি এই দেশকে ধন্য করছেন। অথচ কি পার্বতীয়? এ দেশ দেবতারও প্রিয়। শৈবেশ্বর শিব থাকেন এখানে অমরনাথে উমেশ থাকে। নাগেদেরও প্রিয় এই স্থান। বিশালে বিশিষ্টে যে শালকৃত থেকে পার্বতী বিশল্যকরণী উদ্ধার করে স্নান ইন্দ্রলক্ষ্মীদের প্রিয়। কোটিলার পদ্মপুরে পৌঁছে দেখলেন কুঙ্কুমের ক্ষেত্র। এই সেই কাশ্মীর-রক্ত। পাকা পাকা ফলের মতন। কুঙ্কুমের ক্ষেতে কমলা রঙের ফুল। আক্ষোট, কপিত্থ, বীজপুর, নাগবৃক্ষ, দ্রাক্ষ প্রভৃতি নানা রকমের ফলবৃক্ষ। দেখলেন 'সুপ্রভ' নামে মিষ্টি জলের সরোবর। দর্শনলেন অমরেশ্বর মন্দিরের (অমর নাথ) কাছেও আছে এমন সুন্দর তক্ষক নাগ সৃষ্ট শেষনাগ ও অমিতু-সর। কৌঞ্চদেরও প্রিয় এই স্থান। ধর্মস্থান স্থলের হৈতাটি কি বিশাল। অমরসিংহকে জানাতে হবে। ধর্ম ও আস্থা সর্বত্র ঠিক।

অবশেষে রাজা প্রবরসেনের কীর্তি শ্রীনগরীর দ্বারে তাঁরা পৌঁছলেন। দূরে হরমুখ পর্বত। একটু দূরে ভূতেশের মন্দির। নগরীর মধ্যে গোপকার পর্বতের উপরে আছেন জ্যোতেশ্বর শিব। কালিদাস ইষ্ট দেবতাকে প্রণাম জানালেন।

রাজ সভামধ্যে কুমার ও কালিদাস প্রবেশ করতেই রাজা প্রবরসেন আলিঙ্গন-বদ্ধ করলেন তাঁদের। উৎসব উপলক্ষ্যে এসেছেন অনেকেই, কপিশার রাষ্ট্রভূত, গান্ধারের যুবরাজ, কর্ণাটের বিদুষী রাজমহিষী, সাকেত প্রতিষ্ঠান, কোশলের রাজন্যবর্গ। প্রবরসেন বললেন—আপনাদের

মন্দিরা প্রাসাদ ভবনে থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। নিকটেই। মাত্র এক পক্ষাতি দূরে।"

চন্দ্রগুপ্ত বললেন—"উত্তম, উত্তম। সেতুবন্ধন উৎসব কবে?"

"জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমার দিন।

"তবে তো আর মাত্র এক সপ্তাহ? কালিদাস শুধালেন।

"তাই। তবে আপনাদের রুচিল না গেলে হয়তো দিন পরিবর্তন করতে হতে। কিন্তু আর বিলম্বের প্রয়োজন নেই। নিমন্ত্রিত রাজন্যবর্গরা সকলেই এসে গেছেন। আর দেরী করতে চাই না। হৎসর বৎসর বড় দুঃখ দিয়েছে মহাপদ্ম সরোবরের বন্যা। রক্ত, মাংস ও মানুষের মৃত দেহে মনে হয়েছে বিতস্তা যেন মানুষের পানকের রং ধরেছে। কালান্তকের অট্টহাস্যের মত ধ্বনিত হয়েছে ধানের ক্ষেত। প্রচণ্ড বুভুক্ষায় মানুষ হারিয়েছে তার মনুষ্যত্ব, দয়া, প্রেম, স্নেহ। তাই জল নির্গমি ব্যবস্থা এবার দৃঢ় করা হয়েছে। গ্রামে গ্রামে দেওয়া হয়েছে বাঁধ—রাখা হয়েছে খেয়া। পানীয় জলের জন্য বৃহৎ তড়াগ—দীঘিকা খনিত হয়েছে।"

কাশ্মীরে দুই বন্ধুর দিনগুলি কাটতে লাগল মধুর আলস্যে। কত দেশের কত বিচিত্র মানুষ সমবেত হয়েছে এই উৎসবে। বিচিত্র তাদের বেশভূষা—বিচিত্র আচার। কালিদাস চোখ মেলে দেখছিলেন সেই মানব চরিত্রের রূপ পালা। বিতস্তার সেতু নির্মান উৎসবকে কেন্দ্র করে মহারাজ প্রবরসেন রামচন্দ্রের সেতুবন্ধন কাব্যটি রচনা করেছেন। অবসর কাটে তাঁর সেইটি পরিমার্জনা করে।

উৎসবের দিনটি এল।

পুরনারীরা মঙ্গল কলসে জল ভরে সোপান শ্রেণী ধৌত করে দিলেন। পুষ্পখচিত তোরণের দ্বার দিয়ে রাজা প্রবরসেন, রাণী মহাপ্রভা রাজকুমার যুধিষ্ঠির ও মন্ত্রী মাতৃগুপ্ত প্রবেশ করলেন। পুষ্পবৃষ্টি ও লাজ বর্ষণের মধ্য দিয়ে মহারাজ সেতু পার হলেন। পুরোহিতের মঙ্গল বচন ধ্বনিত হতে লাগল। আকাশে উড়িয়ে দেওয়া হোল এক ঝাঁক হংসবলাকা। গন্ধবারি সিঞ্চিত হোল। নদী স্রোতে ভাসমান হোল একশত পুষ্প শোভিত তরণী। তরণীর মধ্যে নাগরিক ও রাজন্য বৃন্দ। সুন্দরী নায়িকা ও নর্তকীরা মুখরিত করেছেন তাতে। অপূর্ব, অভূতপূর্ব আর পুষ্পাকের পর্বত দেখে বিদূষকবর্গ তৃপ্ত হোল। কিন্তু এমন সুন্দর উল্লাস মুখর দিনেও চন্দ্রগুপ্ত আনমনা হয়ে রইলেন। অগত্যা কালিদাসকেই প্রবরসেনকে যথাযোগ্য সাহচর্য দিতে হোল। সেতুবন্ধ কাব্য আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে কালিদাসের কেবলি মনে হতে লাগল সীতা বিরহী রামচন্দ্রের মত চন্দ্রগুপ্তের বেদনাতুর মুখখানি। দূরে হরমুখ পর্বতের তুষার শুভ্র রজত কান্তিতে সোনার রোদ এসে পড়েছে—মনে হচ্ছে যেন হর পার্বতীর মিলিত রূপ। আহা, এই হিমবন্তকে অবলম্বন করে ইষ্ট পার্বতী পরমেশ্বরকে নিয়ে একটি কাব্য লেখবার তাঁর কত দিনের সাধ। কিন্তু মহানের বেদনা কালিদাসকে আবার আনমনা করে দিল। মনে পড়ল মাতৃবিকাকে কথা দিয়ে এসেছেন প্রতি পক্ষে অন্ততঃ নয়টি শ্লোক পাঠাবেন। আর সময় নেই। জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তি তো শেষ হতে চলল। পরশ আষাঢ়ের প্রথম দিবস। কিন্তু কি কাহিনী এবার অবলম্বন করবেন তিনি? সমদা প্রমদা উর্বশীর মদগর্ব বর্ণনার পর কিরূপ তিনি দেবেন ক্রুদ্ধ নিয়তি-কিরাতের কার্মুকে আহতা মৃগবধূর মত ধূলি লুণ্ঠিতা মাতৃবিকার? তখনি কিছু মনে হোল না তাঁর। সুন্দরী নাগরিকাদের উত্তরোল উল্লাস ধ্বনিতে বার বার খণ্ডিত হয়ে যেতে লাগল তাঁর চিন্তাধারা।

আষাঢ় মাসের প্রথম দিন। এ কয় রাত্রি অমল-ধবল জ্যোৎস্নায় হরমুখের বাসীরূপ দেখতে দেখতে কালিদাস নিদ্রিত হয়ে পড়তেন। কিন্তু আজ একি? মত্ত মাতঙ্গের মত প্রকাণ্ড মেঘে অন্ধকার হয়ে গেছে হরমুখের শুভ্রজ্যোতি। কালিদাস অলিন্দে এসে নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন সেই ঘন জ্যোতি মেঘের দিকে। অকাল সন্ধ্যা কানে বাজছে রাজাজ্ঞার মত মেঘমন্দ্রের গভীর নির্ঘোষে। শীকরসিক বাতাস অপ্রসিক অভিমানিনীর মত বিপুলবেগে চলে যেতে চায় দূরে। একটি বেদীতে বসে চন্দ্রগুপ্ত বীণায় বাজাচ্ছিলেন মেঘ। এই কয় দিনেই কেমন শীর্ণ হয়ে গেছেন তিনি। তাঁর ক্ষীয়মান প্রকোষ্ঠের বলয় খসে পড়েছে স্থানে

থেকে। সহসা বিদ্যুতের মত চমকিত হোল কালিদাসের মনে কুবেরের শাপে নির্বাসিত রামগিরির যক্ষের কথা। রক্ত চন্দন পাত্রে লেখনী ডুবিয়ে তিনি তখুনি রেখে ফেললেন ছন্দ কথা। শ্লোক থেকেই শ্লোক আসে। কত কাল আগে ঔর্ব বধূর মর্মবেদনাকে অমর করে গিয়েছিলেন বাল্মীকি; আবার কত যুগ পরে বন্ধু বধূর ক্ষুব্ধ মর্মের অন্তর্বেদনায় আর এক কবির লেখনী স্পন্দিত হোল। যক্ষরাজ কুবের-প্রতিম সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের রোষে যক্ষের মতই কুমার নির্বাসিত হয়েছেন রামগিরি সদৃশ কান্তমৌনে। অভিশপ্ত যক্ষের মত প্রিয়াবিরহিত কুমারের দিনগুলি কাটছে তারই মনে গুরু বিক্ষোভ তার বক্ষে নিয়ে। কিন্তু তাঁর মন পড়ে আছে সেই অলকা রূপিণী উজ্জয়িনীতে। বন্ধুর যন্ত্রণা যে কালিদাসেরও যন্ত্রণা। সমুদ্রগৃহে ভেসে আসা নিঃসঙ্গিনী মাধবীর রূপটি বার বার ভেসে উঠতে লাগল তাঁর সজল চোখে। বাতাসে ফুটন্ত কুসুমের গন্ধ—এ যেন উজ্জয়িনীর গন্ধাক্তি। মনশ্চক্ষে ভেসে উঠছে হর্ম্যশিখরচুম্বিনী বিরোত উজ্জয়িনীর সূর্য্যরাজি। মাধবী আমার সময় বলেছিল—"দূরে থাকা নিবিড় ফুলের মত তোমারেও আমার প্রাণটুকু আমি রাখব।"

কালিদাস সেই প্রণয় বিধুরাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই গ্রন্থের প্রস্তুতিকে চৈতন্যময় করে তুললেন। শোকের সান্ত্বনা যে প্রকৃতি এ তো তিনি নিজেই হৃদয় দিয়ে বুঝেছেন। বাল্মীকির সীতাদেবীও তো রাবণ-কবলিত হয়ে জড় প্রকৃতিকে চৈতন্যময় ভেবে অনুরূপ শোকাবেগ নিবেদন করেছিল। প্রতিটি উপমার মধ্যে ফুটে উঠছিল মাধবীর রূপশ্রী। কদম্ব ফুলের রোমাঞ্চিত কেশর বর্ণনার মধ্যে ফুটে উঠল না কি প্রিয় মিলনের আনন্দে রোমাঞ্চিত মাধবীর পুলক। উজ্জয়িনীর পুরললনাদের বিদ্যুদ্দাম স্ফুরিত চকিত লোচনের মধ্যে দেখা গেল না কি মাধবীর অসিত নয়নের অপাঙ্গ?

আহা, এই নব জলকণায় স্নিগ্ধ হোক তার বিরহক্ষত। এই মেঘের সমবেদনা সঞ্চারিত হোক তার হৃদয়ে। পাহাড় চূড়ায় স্নান দিক—নদীরা তাকে জল দিক—বন্য তাকে গতি দিক—ফুলেরা অর্ঘ্য—শিখীরা নৃত্যছন্দ।

হয়তো বিরহবিধুরা মাধবী অবসর কাটাচ্ছে সাথের শারিকাকে প্রিয়নাম শিখিয়ে। হয়তো তার সঙ্গিনীরা অন্যমনস্ককে বুঝাই খেলাচ্ছে গুপ্তমাস।

হয়তো সন্ধ্যা যামিকের শেষে আনত হয়ে করছে সে প্রিয় কল্যাণ কামনা। নাকি সে ভূমিলগ্না হয়ে কেঁদে কেঁদে কাটাচ্ছে কাল? কাজলহীন চোখ, তাম্বূলহীন অধর, লাক্ষাহীন চরণ। যেন তোর বেলাকার অসিত পক্ষের শশী রেখা।

হয়তো বীণার সঙ্গে গাইছে ঋতুসংহারের পদাবলী। চোখের জলে ছিঁড়ে যাচ্ছে সেই সুর। একটি একটি করে পদ্ম তুলে রাখছে সম্পুটে কতগুলি বিরহ রাত্রি অতীত হোল তা গুণবার জন্য। কুসুমকে তার মনে হচ্ছে তীক্ষ্ণ শর, চন্দনকে আগুন, মলয় পবনকে অগ্নি শিখা। মনে হচ্ছে নীলপদ্মের মালা নয়—ও ভুজসর্প। অনিশুদ্ধ নয় —ও অশনি সম্পাত। ধৈর্য ধর, ওগো প্রিয়ে ধৈর্য ভিন্ন পথ কোথায়? জীবন চক্রনেমীর মত চলে। তুমি কাতরা হোয়ো না। এই তো মাত্র কটা মাস। তারপর তোমার সব অতৃপ্ত আশা তৃপ্ত হবে—সব অপূর্ণ আকাঙ্খা পূর্ণ হবে—সব অসাধ সিদ্ধ হবে।

প্রতি পক্ষে এমনি সব সুমধুর শ্লোকে কালিদাস পাঠাতেন মাধবীকে। আর চন্দ্রগুপ্ত? তিনি কখনো তাকিয়ে থাকেন মেঘের কোলে যে অভিরাম বলাকা চলেছে তার দিকে। কখনো বন্ধু তুলি দিয়ে নিবিষ্ট চিত্তে আঁকছেন মহাকাল মন্দিরে হরীষক নৃত্য। সঙ্কেত স্থান কেশর বৃক্ষ। দুপাশিত কাশর গৃহে একটি মালিনীর ছবি—যার উত্তোলিত মুষ্টির কুঙ্কুম চূর্ণ যৌবনের প্রদীপ নিবিয়ে দেবে জীবনের মত।

কালিদাস জোর করে নিজেকে ফিরিয়ে আনেন বাস্তব পৃথিবীতে। শেতুবন্ধ কাব্য সমাপন করতে বসেন মাতৃগুপ্ত সেজে। তাঁর-মেঘ বলে এক মহীয়ম কবি সম্প্রতি দিয়ে গেছেন "হরবিজয়ের ত্রিবেণীসঙ্গম" নামে একটি কাব্য। বড় সুন্দর লেখা। একটি ক্ষুদ্র সোনার তরণী তিনি তৈরী করতে নিয়েছেন। নবীন কবিকে উৎসাহিত করেন। নিজ কাব্য শুরু করতে করতে কখন লিখে বসেছেন,—

স্বচ্ছ চাঁদের ছদ্ম আঁচলে মুখ ঢেকেছে সুন্দরী
চকিতা হরিণী তব কটাক্ষ কি করিয়াছে চুরি?
তটিনী তরঙ্গে জাগে তোমার মধুর ছন্দ লীলা

প্রিয়তমের কোলে তোমারি অঙ্গের প্রতিমূর্তি।
তবু কেন অসম্পূর্ণ থেকে যায় মোর চিত্র খানা?
উপমা যে অলঙ্কার ব্যর্থ মানে তোমারে বর্ণিতে।
অন্ধকার মেঘলোকে চকিতে বিদ্যুৎ যাঁকে দেখা,—
তেমনি এস না তুমি আমার এ অন্ধকার চিতে।
অসম্ভব। অসম্ভব। তুমি কোথা? আজ কত দূরে?
বিচ্ছেদের এ বেদনা সহে না, সহে না সখী আর।
নিরাশ নিরাশ বাজে অন্তিমদী বীণা এক সুরে,
উপায় পাই না কিছু, পাঠাইব এ জানাব?
ওই বাল দেখা যায়ে, চুপে চুপে, অন্ধ মেঘে সখী,
তোমার অভিসা সবই, তুল তুল চকমেরীর।
অমাবস্যে আজ হয় কাল যদি পূর্ণিমার রাতি,
প্রবাসের দুঃখ আজ পুনঃ হাসে আসিবে।

পত্র দিয়ে গেল প্রতিহারিণী।
বিক্রম তাকালেন—"কার পত্র মাতৃগুপ্ত?"
"ঘটকর্পরের।"
"তাই নাকি? কি লিখেছে?" বিক্রম সাগ্রহে তাকালেন উজ্জয়িনীর সংবাদের জন্য।
"ঘটকর্পর লিখেছেন আচার্য দিঙ্‌নাগ আমার গ্রন্থগুলির নির্মম সমালোচনা করেছেন তাঁর শিষ্য বর্গের কাছে। কিন্তু শিষ্যদের মধ্যে মিতুল তাঁর সঙ্গে একমত নয়। বয় রুচির বন্ধু পাণিনির এক শিষ্য এ বিষয়ে আমার গ্রন্থাদির উপরে টীকা রচনা করতে চান। কারণ নানা মুনির নানা মত দেখা দিচ্ছে। (এখানে মাতৃগুপ্ত একটু হাসলেন।)

ঘটকর্পর আরো লিখেছে যে মাধবীর কাছে প্রেরিত মেঘদূত পড়ে সেও অনুপ্রাণিত হয়ে প্রাতর্মেঘ কাব্য রচনা করছে। এই সংবাদটি কুমারকে বিশেষ করে জানানো হোক। তার কাব্যে যমক প্রভৃতি যে অলঙ্কার চাতুর্য আছে দুঃখের বিষয় বৈদর্ভী রীতির মেঘদূতে তা নেই। যদিও তার বিষয়বস্তু নিয়ে একটি উত্তম কাব্য হতে পারত। কিন্তু, হায়, নবনীতকে তপ্তে ফেলা হয়েছে; পরব ভূমিতে শস্য বোনা হয়েছে। বৈদর্ভী রীতি আবার রীতি নাকি?

"সাধু,
চন্দ্রগুপ্ত করলেন।
"আর কি সংবাদ?"
"বেতালভট্ট সম্প্রতি
মালোবর্ত্তে গিয়েছেন।"
"সেটা আবার কোথায়?"
"কৌঙ্কণক নামে যে গিরিসঙ্কট আছে সেইটেই।"
"তা ওরূপ নামকরণ কেন হোল?"
"একবা পরশুরাম ও কার্তিকেয় মধ্যে শক্তির পরীক্ষা হয়। তখন কিনা হোল তিনি ক্রৌঞ্চপর্বত ভেদ করতে পারবেন স্বয় তাঁর। পরশুরাম অস্ত্র নিক্ষেপ করে সেইখানে এই বক্র ক্রৌঞ্চদ্বার-মালোবর্ত্ত নামে খ্যাত।"

মাতৃগুপ্ত একটা ধনুর্ধরীর পদ্য বলতেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখ গম্ভীর হোল। বিক্রম লক্ষ্য করলেন বন্ধুর মুখভাব। প্রশ্ন করলেন, "কোন অশুভ সংবাদ?"
"না, ঠিক তা নয়। সম্রাটের উদরে রোগ হয়েছে বলে ধন্বন্তরী চিকিৎসা করছিলেন। এ রোগে পিত্ত ও বায়ু কুপিত হয়। খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করলে তা অন্ত্রিতে নিক্ষিপ্ত বস্তুর মত ছাই হয়ে যায়। শরীরের পুষ্টি হয় না। তাই ভারত বিজয়ী সমুদ্রগুপ্ত আজ আর একহাতে গরুড়ধ্বজ তুলতে পারেন না। অপারোহণে ভীত হন। কিন্তু ভিষক শ্রুতসেন তাঁর সঙ্গে একমত নন। তাঁর মতে সম্রাটের বহুমূত্র রোগ। এই নিয়ে মতদ্বৈধতার সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু শ্রুতসেন বয়সে প্রাচীন সেহেতু হরিষেণ প্রভৃতি মন্ত্রীবর্গ তাঁর পক্ষে। ধন্বন্তরি তরুণ—তদুপরি নতুন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষার পক্ষপাতী। এতে মন্ত্রী বর্গের আস্থা নেই। অবশ্য কুমার যদি বলেন তবে সে পাটলী পুত্রে থাকবে।"

"মাতৃগুপ্ত, আমার এখন প্রহরৈকের চলেছে। আমি যেটাই বলব সেটাই নষ্ট হবে। জান তো নলরাজার কি দশা ঘটেছিল?" চন্দ্রগুপ্ত একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়লেন।

বর্ষার পর শরতে বিতস্তা তার পদ্ম সম্ভার নিয়ে হেসে উঠল। দ্রাক্ষাকুঞ্জে ঝুলে দুলে উঠল মরকত মণির মত দ্রাক্ষাফল। ধীরে ধীরে চন্দ্রগুপ্তের মনও যেন পরিবর্তিত

হতে লাগল। না কোন নারী নয়—রাজকার্য। রাজকার্যেই তিনি ডুবিয়ে দিলেন তাঁর মনকে। দায়িত্বহীন দক্ষিণ নায়ক আর নন। দায়িত্বমান প্রজাশাসকের ভূমিকা নেন তাঁর। কালিদাস অনুভব করলেন চন্দ্রগুপ্ত বিস্মৃত হতে চাইছেন মাধবীকে। তাহলে শেষ করে দেওয়া যাক কাব্যদূত পাঠান। আর কেন? কিন্তু তাতে তাঁর প্রতিজ্ঞা যে ভঙ্গ হবে। যে দূরে আছে তাকে বোঝাবেন কি দিয়ে?

বেদনাতুর চিত্তে কাব্য রচনা করতে বসে দেখলেন অকস্মাৎ তাঁর কাব্য স্রোত তো নদীভূত হয় নি। উৎস যেখানে শুকিয়ে যাচ্ছে-প্রেরণা সেখানে কি করে প্রবাহিত হচ্ছে? কালিদাস নিজের অন্তর-সহনে আর একবার ডুব দিলেন। ভীত বিস্ময়ে দেখলেন সেখানে তাঁর মাধবীর প্রতি আকর্ষণ বিন্দুমাত্র মলিন হয় নি। বিচ্ছেদের কষ্টি পাথরে শাণিত হয়ে তা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে বরং। বুকের বেদনা যে তাঁরই অন্তর্বেদনা বিক্রম যে শুধু উপলক্ষ্য মাত্র এটা বুঝেই তিনি কণ্টকিত হয়ে উঠলেন। একবার মনে হোল বন্ধুকে কি তিনি প্রবঞ্চনা করে এসেছেন এত কাল? না, না, না। মাধবীর হাসির টুকরো, চলার ছন্দ, নাচের ভঙ্গী, বীণার সুর রূপরস গন্ধ মাখায় তাঁকে ভুলিয়েছে কত বার। কিন্তু বন্ধুমাংসের মানুষের দিকে তো লোভের হাত কখনো বাড়ান নি।

হবে।

কবি কালিদাস মহী মাতৃগুপ্তকে ধিক্কার দিলো—"ওহো কূটচাল চেল। অন্তর্দর্পণে দেখ তো স্পষ্ট করে যে প্রেয়সীকে নিয়ে বিলাস করছে তোমার অন্তর, সে কে? কামী যক্ষের কামনা দিয়ে গড়ে তুলেছ কার অবয়ব। লোধ্রপ্রসবরজে পাণ্ডুমি সেই নয়ন সুভগা কি নটিমুখ্যা মাধবিকা নয়?"

না, না, না।

দুটি চারু হস্তে কালিদাস মুখ ঢাকলেন।

মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা।

অন্তর লোক হতে কে বলে উঠল সত্য-সত্য-সত্য।

সেই রাত্রেই গভীর নিশীথে হিমেল হাওয়ায় বিক্রমের কক্ষের প্রদীপ নিভে গেল। বিক্রম ঘুম ভেঙে ডাকলেন,—"কঞ্চুকী? প্রহরী? কে আছ?"

"কুমার, আমি আছি। আমি মাতৃগুপ্ত।"

"এস।"

কক্ষে প্রবেশ করে দীপাধারে দীপ জ্বালিয়ে দিলেন মাতৃগুপ্ত। বিক্রম তন্দ্রাজড়িত স্বরে প্রশ্ন করলেন—"ঘুমোওনি কবি? এখন রাত কত?"

"আর দেড় প্রহর রাত্রি বাকি আছে।"

বিক্রম লাফিয়ে উঠে বসলেন।

"কি করে বুঝলে?"

"আকাশ দেখে।"

"সে কি? তুমি কি ঘুমোও না রাতে? নরসিংহবর্মার হেমন্তের এই রাতে কি কর তুমি?"

"কবিতা লিখি।"

"শোনাও আমাকে।"

"কাল শোনাব, কুমার।"

কালিদাস নিজেকে শাসন করলেন। বন্ধুকৃত্য আমাকে করতেই হবে। মনে মনে স্থির করলেন চন্দ্রগুপ্তের স্মরণ সীমায় জাগিয়ে তুলতে হবে হরশিরশ্চন্দ্র ধৌত উজ্জয়িনীর হর্ম্যরাজি। আর তারি মধ্যে শিপ্রা তটে শঙ্খচক্র শোভিত প্রিয়ার ভবন খানি। অলকা নয়, উজ্জয়িনীকেই আঁকলেন তিনি উত্তর মেঘে। এক বেণী-ধরা রুক্ষকায় নয়,— সে যে বিরহখিন্না বহুকাল পূর্ব মাধবিকা।

উজ্জয়িনী থেকে পুলকিতা মাধবী কবিকে সাদর সম্ভাষণ জানাল,—"কবি, উত্তর মেঘই তোমার কাব্য লোকের অমরাবতী—পূর্ব মেঘ সেই বাঞ্ছিত ত্রিদিবে যাবার সোপান মাত্র। তোমার কাব্য পাঠে যে বিরহিণী কাব্যযাত্রা অলখাগমে বিপুলা হয়ে উঠল। চারি দিকে সাড়া পড়ে গেছে। লেখা হচ্ছে পবন দূত, হংস দূত, পিক দূত, চন্দ্র দূত। কত আর নাম করব?"

চন্দ্রগুপ্তের মনে জেগে উঠল সেই মুখ খানি। চল, চল ফিরে চল সেই স্বপ্নে, সেই সুখের স্বর্গে, সেই নিত্য জ্যোৎস্না, নিত্য চন্দ্রলোকে নিত্য কলাপ বিস্তার করে ময়ূরী যেখানে নৃত্যপরা।

ক্ষোভ করে বিক্রম বললেন—"মাতৃগুপ্ত, কূটনীতি তোমার দখলে নেই।"

"কেন কুমার?"

"তাহলে এমন কোনো ব্যবস্থা করা কেন যাতে কোনোরকম আয়োজন হতে পারে?"

"কুমার, সত্যই কি তুমি ফিরে যেতে চাও?"

"কি বলছ মন্ত্রী?"

"তাহলে বলি এখন পাটলীপুত্রে প্রচণ্ড অসন্তোষ ঘনিয়েছে। রামগুপ্ত ও মহিষী ধ্রুবস্বামিনী এমন এক পরিস্থিতি ঘনিয়ে তুলেছেন যার থেকে মুক্তিলাভ করা কিছু দুরূহ। তবুপরি সম্রাট এখন অসুস্থ। তিলক ভ্রাতৃদের ও ধ্রুবস্বামিনীর কলঙ্কের কথা তুমি শুনেছ। ধ্রুবস্বামিনীকে বিদায় দেবার প্রচণ্ড কারণ তুমি দেখ নি। তা ছাড়া ধ্রুবস্বামিনী কুমারের বিবাহাভিলাষী। এটি উপরন্তু আছেন মহামাত্য ভাস্করগুপ্ত, বলাধিকৃত দেবগুপ্ত, মহাদণ্ডনায়ক হরিষেণ, প্রাক্তন মহাসান্ধিবিগ্রহিক হরিষেণ ও পাটলীপুত্রের মহা প্রতিহার শুদ্রভূতি। এঁরা আপাতত নিরপেক্ষ। তবে কচ্ছপের কন্যা ধ্রুবাদেবীর পাণি গ্রহণ করলে নিঃসন্দেহে এ দলটি তোমার পক্ষ নেবে।

পট্টমহাদেবী দত্তদেবীর ভরসা খুল্ল রামগুপ্তকে ঘিরে মন্ত্রী আছেন—তাঁদের সেতুতে আছেন এক বৌদ্ধ উপদল। এঁরাও ঠিক রামগুপ্তের পক্ষভুক্ত নন। তবে দেখে একটা প্রচণ্ড নৈরাজ্য বোধ হয় এটা তাঁদের ইচ্ছা। রামগুপ্ত যদি কিছুদিন রাজত্ব করেন তবে সকলেই প্রজা বিদ্রোহ ঘটবে। আর তখন……

"তখন?"

"তখনি বৌদ্ধরা নেতৃত্ব লাভ করবে এবং তাদের কাঙ্খিত ব্যক্তিকে রাজপদে অভিষিক্ত করবে। কিন্তু সে তুমি নও বন্ধু। কারণ তুমি বৈষ্ণব।

"আশ্চর্য মগধের রাষ্ট্রদূত পদে থেকেও এত গূঢ় ব্যাপার কিছুই আমি জানতাম না। তুমি কেন আমাকে আগে বল নি?"

"মগধের রাষ্ট্রদূত পদে পাঠিয়েছিলেন তোমাকে সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত। মহামাত্য ভাস্করগুপ্ত পাঠান নি। আর এখন রাজ্য শাসন প্রকৃত পক্ষে করছেন তিনিই। সুতরাং তোমার পদ নাম মাত্রে পর্যবসিত হয়েছে। আর তোমাকে যে জানাই নি তার কারণ সময় হয় নি। মনে আছে সম্রাট লিখেছিলেন এক অনামা বৌদ্ধ লেখক তোমার কবিতার সম্বন্ধে গুচ্ছলিপি পাঠিয়েছিল? সে বিষয়ে এখানে এসে তথ্যানুসন্ধান করবার সুযোগ ঘটেছিল আগে বলে তোমাকে উদ্বিগ্ন করতাম মাত্র।"

"তাহলে আমাদের এখন কি করণীয় কিছু নেই?"

"আছে। এই মাত্র সংবাদ পেলাম হার পর্বতে শাক্যিক নেই ও বুদ্ধের অষ্টম মন্দিরে বেতালভট্ট এসেছেন। নিশ্চয়ই বেতাল এখানে কেন? সন্ধান নিয়ে জানলাম সে একটি নৈশ উপদল সৃষ্টি করছে। যে দলটি নৈশ কলকাকের মহাস্থান দখল প্রয়োজন মত

সমস্ত ভাঙতে যদি এমন একটি দল সৃষ্টি হয় তবে মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে কপণক, শঙ্কু ও বেতালভট্টের নিষেধ মেনে চলতে হবে।"

"কপণক ও শঙ্কু কি আমার বিরোধী মাতৃগুপ্ত?"

মোটেই না। তবে ওরা প্রাধান্য চায় মাত্র। শক্তি দেখালে তুমি ওদের বশীভূত হবে এই ওদের বিশ্বাস। তাছাড়া……

কালিদাস থেমে গেলেন।

"তাছাড়া কি বন্ধু?"

কালিদাস একটু ম্লান হাসি হাসলেন। উত্তর দিলেন না। নিজের প্রসঙ্গ তুলে সামান্য বাজাতে আজো তাঁর লজ্জা হয়। তাছাড়া কূটনীতিজ্ঞ তিনি আজো হন নি। আজো মনে সদসৎ বিচার রেখাটি ধূসর হয়ে যায় নি। কিন্তু তীক্ষ্ণী চন্দ্রগুপ্তের বুঝতে বাকি থাকে না।

"তাছাড়া তোমার প্রতি ঈর্ষ্যা—কি বল? তুমি মন্ত্রী হয়েছ। দেশে বিদেশে কবি নামে তোমার খ্যাতি।"

"অখ্যাতিও কম নেই। দিঙ্‌নাগের মত কর্কট মহিষীও সেদিন পত্র লিখেছেন।"

"কি রকম? কি রকম? বৈদর্ভী রীতি ছাড়া যে কবিতে বরণ করেছে বিদর্ভকুমারী সেখানে কি বলেন?"

"বিতস্তার সেতু বন্ধন উৎসবে তিনিও এসেছিলেন। মহিলা কবি বলে মাতৃ প্রবর সেন তাঁর সঙ্গে কাব্যালোচনা সূত্রে আমার প্রশংসা করেন। তাতে নাকি তিনি বলেন জগতে তিন জন মাত্র কবি আবির্ভূত হয়েছেন, মল্লিনে—পুলিনে—ও যজ্ঞকে।"

"অর্থ ?" বিক্রম উৎসুক হয়ে তাকান।

"এটা বুঝলে না ?"

"না। বুঝিয়ে দাও।"

"প্রথম কবি যিনি মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, উপনিষদের রচয়িতা। যাঁর জন্ম হয় ব্রহ্মার নাভি কমলে। দ্বিতীয় কবি বেদব্যাস যাঁর জন্ম দ্বীপের মধ্যে। আর তৃতীয় কবি বাল্মীকি যাঁর জন্ম বল্মীকে। এঁরাই তিন জন ত্রিভুবনের হিতাহিত উপদেষ্টা। আর বাকি যে সব অর্বাচীন কবি গদ্য পদ্য রচনার চেষ্টা করেন তাদের মস্তকে কর্ণাট রাজমহিষী তাঁর বাম চরণের পদাঘাত দেন।"

"বল কি বন্ধু! কবিদের মস্তক তো অশোক বৃক্ষ নয় যে তাঁর পায়ের পদাঘাতে মঞ্জরিত হয়ে উঠবে। আশ্চর্য পাণ্ডিত্য গর্বিতা এই রমণী।"

বিক্রম কটু বলেন।

কালিদাস তার রক্ত নয়নের দিকে তাকিয়ে মধুর হেসে বললেন,—"কিন্তু সখা ক্রোধ কোর না। তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অসম্মত হলেও আমি তাঁকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম আমার কাব্যাবলী। অতঃপর কাব্যপাঠান্তে তিনি কাল আমাকে ডেকে পাঠান। রত্ন সিংহাসনে বসিয়ে তাঁর বক্তব্যটির নতুন অর্থ করে বল্লেন কর্ণাট রাজমহিষী তাঁদেরই বাম চরণ মস্তকে ধারণ করেন।"

"সাধু। সাধু। আশ্চর্য পাণ্ডিত্য তো। বিক্রমাদিত্য উঠে বসেন।"

"সত্যই তিনি বিদুষী। আমার কাব্যের সুন্দর একটি বিশ্লেষণ করেছেন লিপিতে। প্রশ্ন করেছেন মেঘদূতের মেঘ যদি রামগিরি থেকে উত্তরে অলকায় গিয়ে থাকে তবে লঙ্কা প্রত্যাগত রাম সীতার পুষ্পক রথ যে যে পথে অযোধ্যায় গিয়েছিল বলে মহাকবি বাল্মীকি বর্ণনা করেছেন সেই সেই পথে গেল না কেন ? কেনই বা ভরদ্বাজাশ্রম, গঙ্গাযমুনা সঙ্গম, অযোধ্যাপুরী বর্ণিত হয় নি ?"

"যথার্থ। এ দিকটা তো আমি লক্ষ্য করি নি। কর্ণাট মহিষী ঠিক প্রশ্নই করেছেন। আপন চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছি কিনা তাই তোমার কাব্য এতটা বিশ্লেষণের চোখে দেখি নি। কিন্তু সত্যি কালিদাস এ ভাবে তুমি কেন বর্ণনা করলে না ? তাহলে ব্যাস, বাল্মীকির মত তুমিও কৃতকীর্তি হতে।"

"কুমার, এখনি আদি কবিদ্বয়কে অতিক্রম করে যাব এমন স্পর্দ্ধা আমার নেই। তবে ইচ্ছে রইল যদি কোন দিন সরস্বতী অনুকূলা হন এই পথ-বৃত্তান্ত লিখব।"

"মহিষীকে কি উত্তর দেবে ?"

"এই উত্তরই দেব। তাছাড়াও আর একটি উত্তর আছে।"

"কি ?"

"প্রেমের পথই বক্র।"

বিক্রমাদিত্য উচ্চহাস্য করে উঠলেন। তারপর বললেন,—"না, কবি, তা নয়। তুমি আঁকতে চেয়ে ছিলে কেতকী কুঞ্জে ঘেরা দশার্ণ দেশ—নূপুরবেণী গজের অঙ্গরাগের মত রেবা বেষ্টিত বিন্ধ্যপর্বত—বেত্রবতী নদীর মেখলা পরা বিদিশা নগরী—পদ্মফুলের পরাগ গোলা গন্ধাবতী নদীর তটে উজ্জয়িনী।"

"তাই বটে। সখা সত্য বল—উজ্জয়িনীর তুল্য নগরী কি আছে ? আছে কি অবন্তিপুরীর মত রাজ্য ? কোথায় আছে সাধ্বী নারীর অন্তরের মত প্রসন্নতোয়া গম্ভীরা নদী ? কোথায় আছে আমার কালপ্রিয়নাথের মত মন্দির ? কালেশ্বর যিনি মহাকাল—প্রেমিক যিনি অর্দ্ধনারীশ্বর—নটেশ্বর যিনি নটরাজ".....

কালিদাসের কণ্ঠ গদ গদ হয়ে রুদ্ধ হয়ে গেল।

প্রবাসের বেদনা সেই শূন্যতার মধ্যে ঘন ঘন করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে চন্দ্রগুপ্ত প্রশ্ন করলেন লঘু স্বরে "তাহলে সেই মহাকাল বনে ফেরবার উদ্যোগ কি করছ ?"

"করছি। চেষ্টা করছি। রাজা প্রবরসেনকে বুঝিয়েছি। সেতুবন্ধ কাব্য শোনাও শেষ হয়ে গেছে। আর প্রতি মাসে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ব্যয়ের আবশ্যক কি ? মন্ত্রী মাতৃগুপ্তকে এবার বিদায় দিন। বসন্ত ঋতুর প্রারম্ভেই আমরা বিদায় নেব। তিনি সম্মত হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আরো কথা হয়েছে যে আমরাও একটি উপদল সৃষ্টি করব। শৈব সম্প্রদায় বৈষ্ণব

সম্প্রদায়ের কাজ করবে। অবশ্য উভয়ে উভয়কে করে যেখানে শৈব কেন্দ্র আছে সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হবে বৈষ্ণব কেন্দ্র। আমাদের জ্ঞাপক ধ্বনি হবে 'হরিহর'। স্কন্দগুপ্ত যেমন বৌদ্ধ উপদলের সৃষ্টি করছেন মহাযানীদের নিয়ে— অনন্তসিংহও তেমনি হীনযানীদের নিয়ে একটি দল গঠন করবেন। বোধিরুচি, বুদ্ধভদ্র, উপাসিকা জিনরক্ষিতা এঁরা সবাই চন্দ্র গামী ভদ্র ব্যক্তি। এঁরা কখনই কুমারের বিরোধী হবেন না। ধ্রুবশর্বরি, বরাহ, বরুচি এঁরাও কুমারের প্রতি অনুরক্ত। শৈব উপদলের একটি অংশ বেতালভট্টকে নেতা বলে মানে। তান্ত্রিক বেতাল বরং কুমার চন্দ্রগুপ্তের অনুগামী হবে তবু বৌদ্ধ স্কন্দগুপ্ত বা শৈব শঙ্কুকে নেতা বলে মানবে না।"

"বুঝলাম।" চন্দ্রগুপ্ত বললেন অধোবদনে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রথম বসন্তের এক উষ্ণ মধুর দিনে চন্দ্রগুপ্ত ও কালিদাস পাটলীপুত্র যাত্রা করলেন। বৌদ্ধের রাজ্যে পৌঁছেই সাক্ষাৎ হোল গুপ্তাধ্যক্ষ ত্রিবিক্রমের সঙ্গে। প্রথম সংবাদ তার মুখেই পাওয়া গেল। মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের জীবন সঙ্কট এবং মহিষী ধ্রুবস্বামিনীর হাতে চলে গেছে রত্ন প্রকোষ্ঠের চাবি। দ্রুত অশ্ব চালিয়েও সাত দিন লেগে গেল তাঁদের গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে পৌঁছতে। সেখানে নাকাধ্যক্ষ ইন্দ্রগুপ্তের নির্দেশে তরিক বীটপাল অপেক্ষা করছিল। কুমার এসে খেয়াপারের সন্ধান করতেই সে কুম্ভকারের ছদ্মবেশে এসে উপস্থিত হোল। সঙ্কেতে বুঝিয়ে দিল তিন সপ্তাহ হোল মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত তিরোধান করেছেন।

নিশিবালী রজনী। অন্বেষা নক্ষত্র। নিদারুণ সংবাদ। বীটপাল গল্পের ছলে বলছিল,—"মহারাজ রামগুপ্ত নগর অধিকার করেছেন। বিট রুচিপতি হয়েছে তাঁর মহামন্ত্রী থেকে মহাবলাধিকৃত সবই। দিবারাত্র দুজনে ধান্যরস পান করছেন। প্রাচীন অমাত্যবর্গের অনেকেই তাই বারাণসী যাত্রা করেছেন। তাঁরা বলে গেছেন যে মস্তক একদিন আর্যপট্টের কাছে নত হয়েছিল তা রজকীপুত্রের কাছে নত হয় না। পরম ভট্টারিকা দত্তদেবীর অঙ্গের অলঙ্কার এমন কি পরণের কৌমবস্ত্র পর্যন্ত নরাধম নিয়ে নিয়েছে। তিনি এখন শ্মশানে এক জীর্ণ শিবমন্দিরে আশ্রয় নিয়েছেন। হায়, শ্রীগুপ্তের বংশের আজ কি পরিণতি! হায় মহারাজ ঘটকচ্ছ-গুপ্ত, হায় মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত, হায় লিচ্ছবিদুহিতা কুমার দেবী। তোমরা কি স্বর্গ থেকে দেখছনা?"

কালিদাস কালো জলের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল,—"হে রাজন, তুমি গর্ব কর নি—দানে উপহারে বিধা কর নি—সকলকে সুফল দিয়ে গেছ। বর্ষার মেঘ যেমন জলধারা দেয় নিঃশেষে কিন্তু প্রাচুর্য আনে পৃথিবীতে তেমনি তুমি অনন্যা দিয়েই গেছ। তোমার অনুগ্রহ যখন বুঝেছি তুমি তখন নেই।"

মুহ্যমান হয়েও চন্দ্রগুপ্ত বুঝলেন আর কালক্ষেপ করা সমীচিন হবে না। জননীর একমাত্র ভরসা তিনি। মুখে বললেন,—"বীটপাল, কতক্ষণে পাটলীপুত্রে পৌঁছতে পারব?"

"রাত্রির মধ্যযামে ভাঁটা শেষ হবে। তারপর যাত্রা করব। প্রত্যুষের মধ্যেই আপনাকে পৌঁছে দেব কুমার। আমাদের বত্রিশ দাঁড়ী মাল্লা আছে।"

ঝুপ করে একটা শব্দ হোল নদীর জলে।

"কে যায়?"

"হরিহর।"

"হরিহর।"

কালিদাস অভয় দিলেন।

"আমি মকর।"

"মকর?" চন্দ্রগুপ্ত বিস্মিত হলেন। জননীর প্রিয় এই অনুচরটিকে তিনিও কম স্নেহ করতেন না। প্রশ্ন করলেন,—"উজ্জয়িনী থেকে আসছ? না পাটলীপুত্র থেকে? সংবাদ কি?"

"আজ্ঞে পাটলীপুত্র থেকে। সংবাদ ভাল নয়। ভট্টারক রামগুপ্তের অত্যাচারে পাটলীপুত্র জর্জরিত। অমাত্যবর্গ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। পাটলীপুত্রীক পৌরসঙ্ঘ ও মগধ জনপদসঙ্ঘ কুমার রামগুপ্তকে চায় না। পরমভট্টারিকা দত্তদেবী আমাকে বললেন কুমার যেন এখনি ধ্রুবাদেবীর উদ্ধারে যাত্রা করেন।"

"উদ্ধারে? সৈন্যবাহিনী?"

"আজ্ঞে, মন্ত্রী জীবগুপ্তের নির্দেশে একটি সৈন্যদল আসছে। কাল প্রত্যুষে আমাদের যুদ্ধ—মাতৃভূমি পাটলীপুত্রকে উদ্ধারার্থ।"

সমস্ত রাত্রি ধরে আয়োজন চলল। অতি ভোরে সন্ধ্যের মত নৌবাহিনী ও স্থলবাহিনী চতুর্দিক দিয়ে ঘিরে ধরল পাটলীপুত্র নগরীকে। পণ্যবীথিকাগুলি [illegible] দ্বার রুদ্ধ করে দিল। পথে পথে মুক্ত কৃপাণ হাতে সৈন্যদল। সব থেকে অধিক সংগ্রাম চলেছিল গ্রৈস্রোতদ্বারে। কিন্তু মকরের অসীম নৈপুণ্যে সেখানেও রামগুপ্তের সৈন্যদল পরাজিত হোল। কুমার চন্দ্রগুপ্ত প্রাসাদে প্রবেশ করতেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে প্রহরীদের সমুত্থিত কণ্ঠ জয়ঘোষণা করল—"পরমভট্টারক কুমার চন্দ্রগুপ্তের জয় হোক।"

উজ্জ্বল কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্মিত সভামণ্ডপের মত সমুদ্রগৃহ।

সভাকুট্টিমের একপাশে শুভ্র মর্মরের বেদী।

তার উপরে মণিমুক্তাখচিত সিংহাসন।

সভাগৃহের বাইরে সশস্ত্র প্রতিহার ও ভিতরে মুকবধির অন্তঃপাল। চন্দ্রগুপ্ত একবার শূন্য সিংহাসনের দিকে তাকালেন। তাঁর অন্তরে একবার প্রতিফলিত হোল সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সৌম্য মূর্তি। যেন তিনি শুনতে পেলেন তাঁর বিশ্বস্ত গম্ভীর কণ্ঠ "পুত্র, সাম্রাজ্যকে দ্বিধা বিভক্ত কোর না।"

রাজ্যের প্রধানের মন্ত্রণাসভা শুরু হোল। শুকনাস হরিষেন, দীর্ঘশ্মশ্রু রবিগুপ্ত, নগরপ্রধান ইন্দ্রদাত্তি, নগরশ্রেষ্ঠী জয়নাগ, মহামন্ত্রী জীবগুপ্ত, মহাবলাধিকৃত হলায়ুধবর্মা, মহাসান্ধিবিগ্রহিক নৃসিংহগুপ্ত, গৌরসঙ্ঘের অধিনায়ক জয়কেশী, পরমভট্টারিকা ধ্রুবদেবী একে একে এলেন। মহামন্ত্রী ভাস্করগুপ্ত ও বলাধিকৃত দেবগুপ্ত ধ্রুবস্বামিনীর মোহে ভুলে যে অন্যায় করেছিলেন তারি প্রায়শ্চিত্ত করতে বারাণসী যাত্রা করেছেন। তাঁদের আসন শূন্য রইল। কুমার চন্দ্রগুপ্ত কালিদাস ও বররুচিকে নিয়ে একাসনে উপবেশন করলেন। বররুচি পাটলীপুত্রের অধিবাসী। পূর্বাহ্নে সংবাদ পেয়ে তিনি নদীপুলিনে অপেক্ষা করছিলেন চন্দ্রগুপ্তের জন্য। সবাই একে একে আসন পরিগ্রহণ করবার পর জীবগুপ্ত বললেন,—"মণ্ডলেশ্বরগণ আপনারা এবার রাজ্যশাসক নির্বাচন করুন।"

তখন নৃসিংহগুপ্ত উঠে দাঁড়ালেন,—

"আমি সকলের পক্ষ থেকে কুমার চন্দ্রগুপ্তকে নির্বাচন করতে চাই রাজপদে। বৃদ্ধ রাজা রজকী কন্যার মোহে ভুলে রামগুপ্তকে রাজপদ দেবেন বলে স্বাক্ষর করেছিলেন বটে। কিন্তু সেই ভূর্জপত্র তাঁর যৌবনের ভুল। যদিও সেই আদেশ মত রামগুপ্ত সিংহাসন লাভ করেন। মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যেই তিনি দেখিয়েছেন গরুড়ধ্বজ ধারণের কোন যোগ্যতাই তাঁর নেই। বর্তমান অরাজকতা তার প্রমাণ। ধ্রুবদেবীর পুত্র কুমার ভট্টারি অথবা কুমার চন্দ্রগুপ্ত আর্যপট্টের যোগ্য ব্যক্তি। কিন্তু যেহেতু কুমার ভট্টারি বিন্ধ্যপর্বতে তপস্যায় জীবন কাটাবেন স্থির করেছেন সেহেতু কুমার চন্দ্রগুপ্তই এক্ষেত্রে একমাত্র যোগ্যতম রাজ্যশাসক।"

এই বলে তিনি তাঁর তরবারি কুমার চন্দ্রগুপ্তের পদতলে রেখে দিলেন। একে একে সকলেই তাঁদের তরবারি কুমারের পদতলে রেখে গেল। চন্দ্রগুপ্তের ইঙ্গিতে মকর প্রতিটি তরবারিতে নবরত্নের গরুড় চিহ্ন লাগিয়ে দিতে লাগল। এবার জীবগুপ্ত উঠে দাঁড়ালেন,—

"আপনারা সকলে তরবারি গ্রহণ করুন। যে রাজদণ্ড সমুদ্রগুপ্ত দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ করতে সে মুষ্টি শিথিল হয়ে পড়ছে এ বুঝতে শত্রুদের বিলম্ব হয় নি। মনে রাখবেন মথুরার কণিষ্কের বংশধরেরা আজো পরাক্রমশালী। মথুরা থেকে দ্বারকার মধ্যে সৌরসেন, মালব, লাট ও সৌরাষ্ট্র তাঁরা অধিকার করেছেন। তিনদিক থেকে গুপ্তরাজ্য আক্রান্ত হয়েছে রামগুপ্তের স্বল্পস্থায়ী রাজত্বকালেই। রামগুপ্তের সেনাপতি নয়নাগ নটী চন্দনার ভ্রাতা। তিনি বীণাবাদক—কিন্তু অসি-ধারক নন। অতএব বিনা বাধায় শকগণ দক্ষিণে কৌশাম্বী উত্তরে কান্যকুব্জ অধিকার করে প্রয়াগ পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। শকদের নিষ্ঠুর অত্যাচার ভারতবাসী ভোলে নি। গুপ্ত সাম্রাজ্যের নগরে নগরে আর্তকণ্ঠধ্বনিত হচ্ছে। শত শত আবুক্তক, উপরিক নিত্য সাহায্যের জন্য দ্রুত অশ্বগামী দূতকে পাঠাচ্ছে। কিন্তু মহারাজ রামগুপ্ত ও মহামন্ত্রী রুচিপতি তখন উদ্যান বিহারে রত। নূতন বলাধিকৃত নয়নাগ অদৃশ্য। সীমান্ত রক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। শকরাজ রামগুপ্তকে আদেশ করে পাঠালেন পট্টমহাদেবী ধ্রুবাদেবীকে পদসেবার জন্য মথুরায় পাঠাও। এ অপমান অসহ্য। যে শকরাজ মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের কাছে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকত···

এমন সময় দূত প্রবেশ করে অভিবাদন করল "শকসেনা প্রতিষ্ঠান দুর্গ অধিকার করেছে। প্রয়াগ ও কৌশাম্বী দুই রণক্ষেত্রে তারা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত।"

চন্দ্রগুপ্ত তাকালেন হলায়ুধ বর্মার দিকে। ইঙ্গিত বুঝে হলায়ুধ বর্মা বললেন—"আমরাও প্রস্তুত। এক সহস্র

রণহস্তী, পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী ও দুইলক্ষ পদাতিক সম্পূর্ণ তৈরী আছে। নৌবাহিনীতে আছে দুই হাজার তরিক···

চন্দ্রগুপ্ত বাধা দিয়ে বললেন "না হলায়ুধ, যুদ্ধ নয় কৌশলে কাজ উদ্ধার করতে হবে। নরক্ষয় না করে এটা করতে চাই। তবে সৈন্যবাহিনী যেন সদা প্রস্তুত থাকে। পঞ্চশত শিবিকায় ধ্রুবাদেবী ও তাঁর সহচরীরা যাবেন।

"ধ্রুবাদেবী যাবেন শক শিবিরে?" জীবগুপ্তের মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করল।

"নয় কেন? মহারাজ রামগুপ্ত তো সেই আদেশ দিয়েছিলেন। শকরাজের কাছে তো সে সংবাদ পৌঁছেও গেছে। তাই তিনি অপেক্ষা করে আছেন। নয় তো এত দিনে পাটলীপুত্রও আক্রান্ত হোত, এবং যদি ধ্রুবাদেবীকে সমর্পন করে পাটলীপুত্র রক্ষা করা যায়···টেনে টেনে শেষ বাক্যটি বলছিলেন চন্দ্রগুপ্ত।

জীবগুপ্ত কাঁপতে কাঁপতে উঠলেন—"মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত, আপনি কি পরিহাস করছেন? আমাকে ক্ষমা করুন। কিন্তু সত্যিই আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। এ বিষয়ে আমার মাথাও ঠিক নেই। সত্য করে বলুন ধ্রুবাদেবী কি মথুরা যাবেন?" চন্দ্রগুপ্ত মধুর হাসলেন—"না। তাঁর পরিবর্তে রমণীর বেশে যাব আমরা। আমি, নৃসিংহ গুপ্ত, হলায়ুধ, পুরগুপ্ত। বরুচি থাকবে পট্টমহাদেবী দত্তদেবীর দায়িত্ব নিয়ে। আর কালিদাস? তুমি চলে যাবে উজ্জয়িনীতে। সেখানের সব দায়িত্ব তোমার।"

কালিদাস তখুনি উঠতে যাচ্ছিলেন, বিক্রম বাধা দিলেন, —"অপেক্ষা কর, তোমাকে অন্য নির্দেশ দেবার আছে। কারণ এখন থেকে উজ্জয়িনী আমার রাজধানী হবে—পাটলীপুত্র নয়।" "পাটলীপুত্র নয়?" সমবেত কণ্ঠে আবার ধ্বনিত হোল বিস্ময়। "না। রাজধানী এ ভাবে শত্রু হতে বারংবার অধ্যুষিত হওয়া সঙ্গত নয়। কুশান ও শকদের কাছ থেকে তা দূরে রাখাই বিধেয়। আমাদের প্রচেষ্টা হবে কলিঙ্গ ও দাক্ষিণাত্যকে মিত্র করা। লাট দেশ, ভাকাটক, কাম্বয়, গঙ্গ, পল্লব, পাণ্ড্য—এদের মৈত্রী বন্ধনে যুক্ত করতে হবে। তাহলে আর দুই সীমান্তে যুদ্ধের প্রয়োজন হবে না।

সেই রাত্রেই দূতবেশী মকর শক শিবিরে সংবাদ দিল পুষ্পপুরে বিড়ম্বিত মগধের ধ্রুবাদেবী পঞ্চশত সখী পরিবৃতা হয়ে শকরাজকে পরিচর্যা করতে আসছেন। শকরাজ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে শত শঙ্খ বেজে উঠল।

কালিন্দীর কালোজল বিধৌত রক্তাম নির্মিত শঙ্খ প্রাসাদে মহাসমারোহ। যে গুপ্ত সম্রাটের সম্মুখে বাহী বাহানুবাহী দেবপুত্র শকরাজ সপ্তম বাসুদেব হাতযোড় করে থাকতেন সেই সমুদ্রগুপ্তের পুত্র রামগুপ্তের নবোঢ়া পট্ট মহাদেবীকে দাসীরূপে গ্রহণ করবার জন্য শকরাজ আসন নিলেন। তাঁর বাম পার্শ্বে, দক্ষিণ পার্শ্বে পঞ্চনদ, সেধরসেন, আনর্ত, কুকুর, অকমক, অপরান্ত, প্রভৃতি দেশের শকনেতারা বসলেন। গুপ্ত রাজলক্ষ্মী শক অবরোধে প্রবেশ করবেন এ দৃশ্য সবাই নয়নভরে দেখবেন।

পথে পথে শক বালকেরা ধনুঃশর নিয়ে রামগুপ্তকে ক্রীড়াছলে বধ করছে। পথের দুপাশে শকাঙ্গনারা লাজ পাত্র হাতে দাঁড়িয়ে। তোরণে তোরণে মঙ্গল বাদ্য, পথে পথে গন্ধবারি। এমন সময় এক শক সৈনিক সিংহাসন সম্মুখে অভিবাদন করে বললে, "মহারাজ, পট্ট মহাদেবী ধ্রুবাদেবী শতশত সখীসহ মন্ত্রণাগারে উপস্থিত।"

সুরারঞ্জিত লোচন তুলে শকরাজ বললেন, "তাঁকে এখানে নিয়ে এস।" মাগধী দণ্ডধর তখন সভায় প্রবেশ করে উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করল, "মহারাজাধিরাজ দেবপুত্র কুষাণ পুত্র বাহীবাহানুবাহী শ্রী শ্রী সপ্তম বাসুদেবের জয়। মহারাজ পরমেশ্বর পরম ভট্টারক পরম ভাগবত শ্রীরামগুপ্তের আদেশে পরমেশ্বরী পরম ভট্টারিকা পরম বৈষ্ণবী পট্ট মহাদেবী শ্রীমতী ধ্রুবাদেবী সমুপস্থিত।"

ধ্রুবাদেবী ও তাঁর সখীগণ সভায় প্রবেশ করলেন।

শকরাজের কিন্তু মনে হোল বধূর নয়নের কিছু অভাব আছে। মকরকে প্রশ্ন করলেন,—"দূত, পট্ট মহাদেবী তো বেশ দীর্ঘাঙ্গী।" "আজ্ঞে হ্যাঁ, মহারাজ, পাটলী পুত্রের রমণীরা দীর্ঘাঙ্গীই হয়।"

"বাহু-যুগলে কোমলতার কিছু অভাব দেখছি।"

"আজ্ঞে, মগধ ললনারা বীর প্রসূ।"

"তা বটে। এবার অবগুণ্ঠন মোচন করতে বল।"

বধূ বলে উঠল,—"শকরাজের আদেশ শিরোধার্য।"

ঘোমটা খুলে দাঁড়িয়ে উঠলেন গুপ্তবংশের পঞ্চশত বীর।

হায়, কোথায় ঝলকিত হবে কটাক্ষ—আন্দোলিত হোল তলোয়ার কোথায় বলয়িত হবে মৃণালভুজ—ঘূর্ণিত হোল ব্রজবাহু কোথায় ঝুঞ্জিত হবে কোকিলকণ্ঠ—গর্জিত হোল রণ হুঙ্কার। পরাভূত শকরাজ কোনক্রমে অবরোধে পালিয়ে বাঁচলেন।

* * *

গাছের প্রাসাদের এক স্বস্তিকায় বসেছিলেন কালিদাস। তাঁর দৃষ্টি উত্তরে নিবদ্ধ। ভূর্জবৃক্ষ ও নমেরু শোভিত হিমালয়ের কথাই তিনি ভাবছিলেন। বররুচি প্রবেশ করলেন। কালিদাস ফিরে তাকালেন,—"কে কাত্যায়ণ? বোস। পট্ট মহাদেবী কেমন আছেন?"

"কতকটা সুস্থ। পুত্রের কথা ও কলহদীর্ণ সাম্রাজ্যের কথা ভেবে ভেবে শরীরটাকে পাত্ করে ফেলেছেন। এখন যদি ধ্রুবাদেবীর সঙ্গে বিবাহটা শান্তিতে হয়ে যায় তবে অন্ততঃ অমাত্যবর্গকে এক রাখা যাবে।"

"তা বটে। ধ্রুবা দেবীর সঙ্গে কুমার চন্দ্রগুপ্তের বিবাহ আবশ্যক। এটা বুঝছি। নয়তো আর একটা গৃহযুদ্ধ বেধে উঠতে পারে।" "তাহলে তুমিও একমত? আজকে যখন কুমার তোমার সঙ্গে সন্ধ্যা-বিহারে যাবেন তখন কথাটা একবার বলবে নাকি?" কথাটা মহাদেবী বললেই তো ভাল হয়।"

"হায়। শাস্ত্রানুসারে তিনি এখনো পট্টমহাদেবী; কারণ রামগুপ্ত বা চন্দ্রগুপ্ত এখনো ধর্ম বিবাহ করেন নি। এবং সে হিসেবে তিনি দ্বাদশ প্রধানের মুখ্যা। মহাদেবী বারংবার বলেছেন। কিন্তু কুমার নিরুত্তর। শুনেছি উজ্জয়িনীর নটি মুখ্যার প্রতি কুমারের কিঞ্চিৎ আসক্তি আছে।"

"কিঞ্চিৎ নয়, বিলক্ষণ; আসক্তি নয়, প্রণয়।"

ও। তুমি তো সবই জান। দেখ একবার বলে, রাজ্যটা নিরাপদ করা যায় কি না।"

কালিদাস অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন,—"বেশ বলব।"

"আর একটা কথা। আমার একটা প্রশ্ন……

"পড়েছি। তোমার বার্তিক সূত্রটি এখুনি পড়ছিলাম।"

"না, না, সেটি নয়। উভয়াভিসারিকা বলে একটি একাংক নাটক লিখেছি। আর চারুমতী, মনোবতী ও শতরূপা হরণ নামে তিনটি গদ্যকাব্য। এই নাও। পড়ে দেখ।" বলে বররুচি গ্রন্থগুলি কালিদাসের হাতে দিলেন।

কালিদাস পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে কৌতুক মুখর হলেন,—"তিন তিনটি গদ্য কাব্য লিখে ফেলেছ! তোমার সাহস তো বড় কম নয়। আর্য্যা উপকোশা এজন্য ক্রুদ্ধা হন নি তোমার উপরে?" উপকোশা বররুচির ব্রাহ্মণী। বররুচি কালিদাসের রঙ্গে একটু লজ্জা পেলেন। তাই দেখে কালিদাস বললেন—'পড়ব। নিশ্চয় পড়ব। গদ্য কাব্য বস্তুটি বড় নূতন জিনিষ হে।"

বররুচি বললেন—"কুমারকে বলে আমার একটা ব্যবস্থা করে যাও এবার। শুনেছি পাটলীপুত্র আর রাজধানী থাকবে না।"

"তুমি কি করতে চাও?"

"বাল্মীকি-তাল গ্রামটি যদি আমাকে ব্রহ্মদেয় করে দাও তো বড় ভাল হয়।"

"বলব।"

"সাধু, সাধু। কালিদাস এই জন্যই তুমি কবিশ্রেষ্ঠ। ঘটকর্পরটা কোন কাজের নয় হে। লিখেছে বটে একটা যমক কাব্য 'প্রার্তমেঘ' বলে। কিন্তু সে তো প্রকৃত পক্ষে তোমার মেঘদূতের অনুকরণ বড়। ভাল লিখেছহে মেঘদূত। বড় ভাল। কিছু বৈয়াকরণিক ভুল আছে বটে। তবে নব্য লেখকেরা সবাই তো তাই করছে। রস সিদ্ধির জন্য ব্যাকরণ তো তোমরা মান না হে। তা সিংহ বলেন পরে ওটাই চলিত হবে আর্ষপ্রয়োগ বলে।"

"সিংহ?"

"অমর।"

"ও।" কালিদাস হেসে উঠলেন। এক আভিধানিক অপর আভিধানিককে সহ্য করতে পারেন না এটা তিনি জানতেন।

বররুচি বলেই চলেছেন—"ঘটকর্পরকে বললুম তুমি কালিদাসের সঙ্গে লাগতে যাও কেন হে? ধ্বনি-জ্ঞান তো তোমার বিন্দুমাত্র নেই। কি বলে জান? বলে অলঙ্কার-জ্ঞান তো আছে। তা হোলেই হোল। কাব্য নারীর মতো। তাকে সাজালেই তুষ্টি পাওয়া যায়। কালিদাস কোনদিন ভটিনীকেই অলঙ্কার দিয়ে তুষ্টা করল না তার কাব্য সুন্দরী।"

"হো, হো, হো।" কালিদাস উচ্চহাস্য করে উঠলেন।

"সেই গল্পটি করিয়ে দিন।" বররুচি বললেন।

"কোন গল্প?"

"বাঃ তোমার স্মরণ নেই? সেই যে নন্দিকারণ্যে একদিন ভ্রমণের সময় বিক্রম বলেছিলেন—'বল দেখি সামনের ঐ কাষ্ঠ খণ্ডটিকে ললিত কাব্যে কি ভাবে কোটাবে?' ঘটকর্পর তখুনি বলে উঠল—'শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে। আর তুমি বলেছিলে……'

"নীরস তরুবর পুরত ভাতি।" কালিদাসের মধুর কণ্ঠ সুললিত হয়ে উঠল।

"বাঃ, বাঃ, বাঃ। কালিদাস এই জন্যই তুমি কালিদাস। ভাই সরস্বতী আমার জিহ্বাগ্রে থাকুন। উঠি। মনে রেখ আমার ঐ ব্রহ্মদেয় গ্রামটির কথা।"

বররুচি বিদায় নিলেন।

কালিদাস এতক্ষণ একটা যেন মুখোস পরে ছিলেন। বররুচি বিদায় নিতেই আবার তাঁর বিষণ্ণ ভাব ফিরে এল। তবু তিনি গঙ্গা-বিহারের জন্য প্রস্তুত হয়ে নিলেন।

বর্ষার গঙ্গার জল রক্তিম সর্পিনীর মত সরু সরু করছে। পশ্চিম আকাশে সন্ধ্যাস্তের সমারোহ। উপরে নীচে সর্বত্রই রক্তবর্ণ। কোথাও কুসুম্ভ ফুলের মত অরুণ, কোথাও সিঁদুরের মত লোহিত, কোথাও কবিরের মত গৌরবর্ণ। তারি মাঝে রক্তাক্ত হৃদয়ের মত মেঘচ্ছিন্ন সূর্য। সহসা কালিদাসের দৃষ্টি পথকে অবরোধ করে কালোছায়ার মত দাঁড়ালো বিক্রম। আলোর বিরুদ্ধে বলেই বোধ হয় তাঁকে কৃষ্ণবর্ণ দেখাচ্ছিল।

"সখা?"

"হ্যাঁ, কালিদাস আমি। উপায় কি বলতে পার? রাজকী-কন্যা সর্বদা চক্রান্ত করছেন। রামগুপ্ত নির্বোধ। তা না হলে কবে তাঁকে রাজ্য দিয়ে আমি ও কুমার ভর্তৃহরির মত সাধনা করতে বনে চলে যেতুম। রাজ্য ছিন্ন জর্জর। উত্তর দক্ষিণে শকগণ ক্রমেই প্রবল হচ্ছেন। এদিকে ধরবংশ সাম্রাজ্যের সম্ভ্রান্তম বংশ—কুল মর্যাদায় তাঁরা গুপ্ত বংশের সমতুল্য। আবহমান কাল এই ধরবংশ রোহিতাশ্ব দুর্গে সাম্রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্ত রক্ষা করে এসেছে। তাঁদের খুশী করতে গেলে ধ্রুবস্বামিনীর স্বসা ধ্রুবাদেবীর পাণি গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু……

থাক্ সে কথা। রামচন্দ্রের মত আমাকেও রাজ কর্তব্যের কথাই ভাবতে হবে। এই বোধ হয় বিধি-লিপি। ফাল্গুন মাসে স্বাতী নক্ষত্রস্থিত চন্দ্রে বিবাহ হবে। এ বিবাহ উৎসবের সঙ্গে উজ্জয়িনীতে দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপিত হবে। কাল প্রাতে তোমার জন্য দ্রুতগামী রথ প্রস্তুত থাকবে।

"আমি প্রস্তুত।"

কিন্তু অন্তরে কালিদাস জানেন তিনি প্রস্তুত নন। বসন্তকালে কুসুম ফুটবে, অলি মধুপান করবে, রবি ঠিক সময়ে মীন রাশিতে পদার্পণ করবেন, মাধবীর গৃহ প্রিয় প্রসাদে পূর্ণ হয়ে উঠবে না। কি বলবেন তিনি তাকে? কোন স্তোক বাক্যে ভোলাবেন? বাতায়ন থেকে দেখলেন দ্বাদশ প্রধান একে একে সমুদ্র গৃহে চলেছেন। মহানায়ক মহামন্ত্রী জীবগুপ্ত, মহাবলাধিকৃত হলায়ুধ বর্মা, ধ্রুবাদেবীর ভ্রাতা আণিলীয় মহানায়ক জগদ্ভর, পরমভট্টারিকা দত্ত দেবী এবং নগরাধ্যক্ষ হরিষেণ। আজকের সভার কার্যসূচী মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের বিবাহ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

এক সন্ধ্যায় কালিদাস গিয়ে পৌঁছল মাধবীর ভবনে। মণিকুট্টিমে বসে বীণায় তার পরাজিছল মাধবী। কবিকে দেখে সে তার আয়ত নয়ন দুটি তুলে ধরল। প্রেম, বিশ্বাস, নির্ভরতা। এক মুহূর্ত কালিদাস ভাবলেন। ভাবলেন চলে যাই। নিষ্ঠুর ব্যাধের মত কৌতুককে বিঁধে লাভ কি? কিন্তু ফিরতে পারলেন না। শুক্লবসনা মাধবীকে মনে হোল তপস্বিনী। বিশীর্ণতনু। চুলগুলি কোন ক্রমে বেণীতে বদ্ধ। সুন্দর, শুচি, পবিত্র। তার সেই স্বচ্ছ দীঘির মত চোখের দিকে তাকিয়ে কালিদাস সব বলতে শুরু করলেন। ধীরে ধীরে মাধবীর চোখের পাপড়ী নত হয়ে এল। তিনি অধো-

মুখে তারগুলি নাড়াচাড়া করতে করতে শুনতে লাগলেন।

এক সময়ে বলা শেষ হোল।

কালিদাস তাকালেন মাধবীর মুখের দিকে।

ভেবেছিলেন সে দিনের মত হয়তো সে উচ্ছ্বসিত হবে কান্নায়—হয়তো মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়বে মণিকুট্টিমে। কিন্তু মাধবী কিছুই করল না। তার মুখের রং শুধু বদলে গেল। শুভ্র থেকে রক্তিম—রক্তিম থেকে পাণ্ডু। বীণার তারগুলি আবার শিথিল করে দিল সে। রেখে এল স্বস্থানে। কালিদাস উদ্বিগ্ন হলেন। এর চেয়ে মাধবী যদি উন্মত্তা হোত—যদি আকুল উচ্ছ্বাসে ক্রন্দন করে উঠত—যদি অচেতন হয়ে লুটিয়ে পড়তো ধূলোয় সেও যে ভাল ছিল। রুদ্ধ আবেগে তিনি বললেন,—"মাধবী, কথা দাও আমাকে না বলে সহসা কিছুই করবে না?"

হঠাৎ আঘাত লাগা সর্পিণীর মত মাধবী ফিরে তাকাল "ব্যস্ত হোচ্ছ কেন কবি?"

"তোমার কাছে প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করতে পারার লজ্জা যে আমি রাখতে পারছি না।"

"রাজ কার্য্যের কাছে প্রতিশ্রুতি!" মাধবী হাসল।

কিন্তু সে হাসি কি হাসি?

মহাকবি কালিদাস পর্য্যন্ত মূক হয়ে গেলেন। এক সময়ে ক্লান্ত, পরাজিত কালিদাস বিদায় নিলেন।

উজ্জয়িনীতে একটির পর একটি ঢেউ আলোড়ন তুলছিল।

খবর এল মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত তিরোধান করেছেন।

খবর এল গুপ্তবংশে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে।

খবর এল মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে ধ্রুবাদেবীর পরিণয় নাটকীয় ভাবে সমাপ্ত হয়েছে।

চৈত্র মাস। উজ্জয়িনীতে উদ্যোগ আয়োজন চলেছে ক্ষিপ্র বেগে। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত ও পট্টমহাদেবী ধ্রুবা দেবীর অভিষেক উৎসব এখানে হবে। চম্পকবন উদ্যান ভবনে ফুল, আলো, পুষ্পসারের ছড়াছড়ি। সুবৃহৎ মঞ্চ স্থাপিত হয়েছে। একশত দেবনর্ত্তকী তাতে হল্লীষক নৃত্য দেখাবে। বিদুষী বসন্ত মঞ্জরী দেখাবে বলস্থিকা নৃত্য। কিন্তু নটিস্থ্যা? না। পাটলীপুত্রের নির্দেশিত সূচীতে তাঁর কোন নাম নেই। মাধবী চুপ করে শুনল। মঞ্জরিকা ছুটে এসে বলল—"কি অন্যায় বড়যন্ত্র! তুমি এখনো চুপ করে আছ?" মাধবী ক্লান্ত কণ্ঠে বলল "কি করতে বলিস?"

মঞ্জরিকা জ্বলে উঠল আগুনের মত,—"প্রতিবাদ করতে বলি।"

বিষাক্ত হয়ে গেছে মাধবীর অন্তর। তবু সে গেল একবার রাজ খুল্লতাত মাকাধ্যক্ষ ইন্দ্রগুপ্তের কাছে। বৃদ্ধের স্নেহ ছিল মাধবীর প্রতি। সব শুনে তিনি বললেন—"স্থির থাক।"

কি যে কি হোল জানিনে খবর এল সম্রাজ্ঞীর সম্মানার্থে মাধবীকে একটি একক নৃত্য দেখাতে হবে।

দেবরাতকে মাধবী বলল "ধ্রুবস্ব ঠিক কর।"

"কি নাচ দেখাবে? মধুরারতি?" দেবরাত উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

মধুরারতি নাচের একটি ইতিহাস আছে। এ নাচটি সাধিকার নাচ। দাসিকার নয়। শোনা যায় একমাত্র চারুদেষ্ণা এ নৃত্যটি নাচতে পারতেন। কারণ তিনি জপ, তপ, ব্রতেও দীক্ষিতা ছিলেন। মাধবী একদা সুখের শিখরে উঠে দেবরাতকে বলেছিল 'আমাকে নাচটি শেখাও।' দেবরাত হেসেছিলেন—ও নাচটি আমার আজও জানা নেই। একমাত্র আচার্য্য জানতেন আর……'

"আর কে জানে?"

"কামরাজ।"

"কামরাজ কি করে জানল?"

"ও কি তখন এমন লম্পট ছিল? ও-যখন গুপ্ত-গৃহে থাকত তখন যে কৃচ্ছ্রসাধন ও করেছিল দেখলে অবাক হয়ে যেতে। মানুষের কত পরিবর্তনই না হয়।"

মাধবী হাসল—"আমাকে শেখাবে না সে?"

"বলে দেখব।"

কিন্তু দেবরাতের অপেক্ষা করে নি মাধবী। সেদিন সন্ধ্যায় আরাত্রিকের শেষে কামরাজকে নিজেই নিবেদন করল,—"সৌম্য, মধুরারতি নৃত্য দব নর্ত্তকীরই শেষ আকাঙ্ক্ষা।"

"ভদ্রে, সে কথা সত্য।"

"তার ধারা কি লুপ্ত হয়ে যাবে?"

"কেন এই প্রশ্ন?"

"আপনি কি এই নৃত্যের যোগ্য পাত্রী কাউকে পান নি?"

স্মিত হাসলেন কামরাজ। উত্তর দিলেন না। মাধবী কিন্তু এত অল্পে হতাশ হয় নি। পেতে হলে মূল্য দিতে হবে। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সবই সাধনার ধন। আবার প্রশ্ন করল—"বিদুষী কামাক্ষী কেন এ নৃত্যে ব্রতিনী হন নি?" কামরাজ হাসলেন। বললেন,—"কিসে আর কিসে? কোথায় অপনিরতা চারুদেষ্ণা আর কোথায় মদালসা কামাক্ষী!"

"তবে বসন্ত মঞ্জরী নিশ্চয় এ নৃত্যের যোগ্যা?" বঙ্কিম ভুরু তুলে শুধিয়েছিল মাধবী।

কামরাজ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলেছিলেন,—"না, তার মধ্যেও প্রবৃত্তি আছে। নিবৃত্তি কই?"

তবে কি সৌম্য আমাকে ব্রতিনী করতে পারেন?" মাধবী প্রশ্ন করেছিল। চমকে উঠেছিলেন কামরাজ। শিহরিত স্বরে বলে উঠেছিলেন,—"কালম্, কালম্, মহাকালম্।"

আসবের নেশা টুটিয়ে মাধবীর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন—"ভদ্রে, তুমি কি সত্য করে কাউকে ভালবেসেছ? ভালবেসেছ আত্মা দিয়ে?"

"নিশ্চয়।" মাধবী বলে উঠেছিল তন্মুহূর্তে।

কিন্তু প্রশ্নটা যেন কেমনতর। মনের মধ্যে সব কিছু এলোমেলো হয়ে গেল। সত্যই কি আমি সব ছেড়ে কুমারকে ভালবাসি? না কি শুধুই কামনা? কিন্তু মাধবীর ইতঃস্তত ভাব সুরাসক্ত কামরাজ লক্ষ্য করেন নি। তিনি আবার প্রশ্ন করেছিলেন,—"তুমি দুঃখ পেয়েছ কখনো? সত্যকার দুঃখ? যাতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে শতধা হয়ে যায়?"

মাধবী এবার বিস্মিত হয়েছিল। একি অদ্ভুত সব প্রশ্ন? আমার মত সুখী জগতে কে? তখুনি উত্তর দিয়েছিল—না, নিশ্চয়ই না।" এবার আর দ্বিধা ছিল না। তখন কামরাজ বললেন—"যে শিল্পী প্রেমের আনন্দ ও বেদনা দুই জানে সেই কেবল মধুরোরতি নাচের যোগ্য। বেদনার অগ্নিশুদ্ধি হলে তবেই নর্তকী এ নৃত্যের যোগ্য হয়।" দেবরাতের প্রশ্নের উত্তরে মাধবী বলল—"না, ভ্রামরী গতি।"

দেবরাত শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল।

বাল্যকাল থেকেই সে মাধবীকে জানে। জানে বিতণ্ডায় লাভ নেই। শুধু একবার বলল—"পরিণাম ভেবে দেখেছ?"

"হ্যাঁ।"

"উত্তম।"

এসে পড়ল উৎসবের দিন। পথে পথে আলোকাধার —তার শীর্ষে পুষ্পগুচ্ছ। পথে পথে আতোদ্য বাজছে। কোথাও মুরলীর ঝঙ্কার কোথাও করতালের জগঝম্প। শোভা যাত্রা শুরু হোল। এসেছে সাকেতের পার্বত্য ঘোড়ায় চেপে পার্বত্য অধিবাসী—সমতটের ভল্লধারী সেনা—বৃষ্ণক হাতে চলেছে আভীর দেশীয় মল্লযুদ্ধ। হস্তী পৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠান রাজ, চোল রাজকুমার। অশ্ব পৃষ্ঠে গুপ্তবংশীয় রাজপুরুষগণ। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত ও ধ্রুবাদেবী দুটি শ্বেত অশ্ব পৃষ্ঠে আবির্ভূত হলেন। তাঁদের পেছনে চতুরঙ্গ বাহিনী। উৎসব প্রাঙ্গণে মাধবী এল যথা সময়ে। প্রতি লোমকূপের বেদনাকে জোর করে দমিত করে মাধবী তাণ করছিল সে সহজ, সে ভারমুক্ত। যবনিকার অন্তরাল থেকে সে দেখল সম্রাট পট্টমহাদেবীর পাণিগ্রহণ করে বিভিন্ন রাজন্যবর্গের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। সে শুনতে পেল তাঁর মধুরগম্ভীর কণ্ঠ—উদাত্ত হাসি। তার সমস্ত হৃদয় মথিত করে উঠতে চাইল আকুল আহ্বান—"বিক্রম, বিক্রম, আমার বিক্রম।" পরমুহূর্তে নিজেকে যেন কশাঘাত করল সে "না, না কি বলছি? মহারাজ পরমভাগবত পরমভট্টারক পরমেশ্বর চন্দ্রগুপ্ত। তিনি সম্রাট। আমি? তাঁর পরিচারিকা মাত্র। ওরে অবোধ মন, আজ থেকে এ কথা স্মরণে রাখবি। আর যিনি তোর বিক্রমকে চিরকালের জন্য চুরি করেছেন তিনি পরম শ্রদ্ধেয়া সাম্রাজ্ঞী।"

উৎসব শুরু হোল।

সাম্রাজ্ঞীকে একটি সুবৃহৎ চম্পক-স্তবক দেবার সঙ্গে

(১৩১ পৃষ্ঠায় দেখুন)

(৪৮৮ পৃষ্ঠার পর)

কল্যাণী যেন মারমুখী হয়েছিল। বনমালী কোদাল হাতে বাড়ীর দক্ষিণ দিকে ওদিক চেঁসে বন্ধ করেছে, যাতে বানের জল না ঢুকতে পারে বাগানে।

নমিতাকে ভিজে গলদঘর্ম হয়ে ঢুকতে দেখে ফিরে চাইল কল্যাণী। নমিতা বলে ওঠে।

—বাঁধ ভেঙে গেছে, স্কুল মাঠের কাছে।

পরিতোষবাবুও লাঠি ভর দিয়ে উঠে আসেন। ভীত-ত্রস্ত চেহারা। কল্যাণী যেন চটে উঠেছে। বাঁধ ভাঙার জন্য কল্যাণীই যেন দায়ী এমনি-সুরে জবাব দেয়।

—তা জানতাম, বেশ খুশী হয়েছো দেখছি!

নমিতা চমকে ওঠে। আকাশ বাতাসে তখনও কান্নার রোল উঠেছে, এতগুলো মানুষের চরম বিপর্যয়ে সেও মুহ্যমান।

কল্যাণীর কথার জবাব দিল না, চুপ করে দাঁড়িয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে। মুখে চোখে একটা কাঠিন্য ফুটে ওঠে।

এইবার যেন জবাব দেবে সে।

পরিতোষ বাবু এগিয়ে আসেন, বলে ওঠেন,

—ভিজে গেছিস যে। কাপড়টা বদলে ফেলগে যা।

নমিতা কোন কথা না বলে উপরে চলে গেল। পরিতোষ বাবুর এইটুকু কথাতেই নমিতাকে সরে যেতে দেখে একটু অবাক হয়েছে কল্যাণী। পঙ্গু অথর্ব একটা লোকের কথা মানে নমিতা অথচ তার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল আজ, জবাবই দিত সে। এবং সে জবাব হয়তো কঠিনই হতো।

অসহায় রাগের খানিকটা উছলে পড়ে পরিতোষ বাবুর উপরেই।

পরদিনই সকালে ভক্তর বিমলবাবুর বাড়ীতে গিয়ে হাজির হয়। বাড়ী ঢুকবার মুখেই থমকে দাঁড়াল।

বিমল বাবুর বাড়ীর সামনে—আশপাশের ফাঁকা জায়গায় অনেক লোকজন ছেলে মেয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে। বাজপড়া তালগাছের মত কোন বৃদ্ধ স্তব্ধ হয়ে বসে আছে, বাগানের ওদিকেই নদীর বিস্তার-তার দিকে চোখমেলে বসে কি ভাবছে। ছেলেগুলো কাঁদছে। মলিন কাপড় জামা পরনের শাড়ী, চোখেমুখে কালির দাগ।

কাল রাতে এদের আশ্রয়ের জন্যই গিয়েছিলেন বিমল বাবু পরিতোষ বাবুর কাছে। বাড়ীর দিকে এগিয়ে যায় নমিতা।

ভক্তিচরণ মালকোচা দিয়ে কাপড় পড়ে, মাথায় গামছা বেঁধে বড় কড়াই থেকে সাবু আর কিছু দুধ মিশোচ্ছে বালতিতে ওকে দেখে বলে ওঠে—এসো দিদিমণি, একলা আর পারছিনা। হাত লাগাও দিকি।

পাড়ার অনেকেই হাত লাগিয়েছে। বিজলীও রয়েছে। ওপাশে কতকগুলো লোক খিচুড়ী রাঁধছে বড় বড় তালের গুড় সেদ্ধ হওয়া কড়াইএ।

বিজলীও কাজ পেয়ে গেছে। চারিদিকে ব্যস্তসমস্ত ভাব।

বিমলবাবু একবার এসে সব খোঁজ খবর নিয়েই বেরিয়ে গেলেন। কোথায় রিলিফের নৌকা পাঠাতে হবে, এখনও অনেক গাছের উপর না হয় ভেঙে পড়া ঘরের চালে মানুষ আশ্রয় নিয়ে বসে আছে উদ্ধারের আশায়।

নমিতাকে দেখে বলে ওঠে বিমলবাবু, তুমি থাকবে তা জানতাম, কাজবর্ম দেখে শুনে নাও।

নমিতাও রয়ে গেল ও বাড়ীতেই বিমলবাবু বলেন, তবে বেশী দেরী করোনা তোমার মাসীমা হয়তো কিছু মনে করবেন।

নমিতার মুখ চোখে একটু কাঠিন্য ফুটে ওঠে, কাল রাত্রের সেই ঘটনাটা মনে পড়ে।

মাসীমা এসব ব্যাপারে থাকতে চায়নি।

ওদের গুরু বাড়ীটা একটা ধ্বংসস্তূপের মত পড়ে আছে, এত জায়গা থাকতেও সেখানে হতভাগ্যদের আশ্রয় দেয়নি। নমিতাও এখানে এসে ওদের সঙ্গে কাজ করে কোন অন্যায় করেনি। তাই বলে ওঠে

কোন অন্যায় করিনি, তিনি যা ভাববেন ভাবুন।

বিমলবাবু ওর কণ্ঠস্বরের কাঠিন্যে একটু বিস্মিত হন নমিতা কাজে হাত লাগিয়েছে।

বিমলবাবু অবাক হন।

নমিতা এনেছে তার মায়ের কতকগুলো গহনা। পুরোনো সাবেকী ধরনের আর ওজনেও এ তেমনি ভারী।

বিমলবাবু বাধা দেন ওসব আমি নিতে পারবোনা।

পড়ে আছে, কোনকাজেই লাগছে না। তবু মায়ের নামে দুদিনও ওরা খেতে পাক।

বিমলবাবু মনে মনে সুখী হন।

গীতা খুশিই হয়েছে। জানলার বাইরে চেয়ে থাকে নদীর দিকে। সবুজ ঘাসের সীমানার পরেই নদীর শিথিল বালুচর।

—বাঃ, চার্মিং প্লেস

ইতিমধ্যেই স্নান সেরে কাপড় বদলে বসেছে গীতা। নিখিল পাইপে তামাক পুরে এদিক-ওদিক চাইতে ব্যস্ত হয়ে।

নমিতাকে চা-এর পট আর প্লেটে সন্দেশ বিস্কুট নিয়ে ঢুকতে দেখে নিখিল একটু ফড়াস্বরেই বলে ওঠে, লোনতা কিছু আনতে পারো নি?

নমিতা দরজার কাছ থেকে কথাটা শুনেছে। শুনেই থমকে দাঁড়াল।

কঠিন বাক্যের সুরের মত কথাটা শোনায়

আই সি। গীতা চামচ দিয়ে সন্দেশের একটা টুকরো আলতোভাবে মুখে ফেলতে ফেলতে বলে ওঠে।

দরজার বাইরে চুপ করে এসে দাঁড়াল নমিতা। ওর কথাগুলো তখন কানে বয়েছে। মনে হয় কথাটা সত্যিই। এবাড়ীর যেন কেউ নয় সে। আশ্রিত কোন অসহায় মেয়ে।

বাবার কথা মনে পড়ে। স্নেহময় একটি মানুষ যাকে মনে পড়ে না, কেমন উষ্ণ একটু অনুভূতি মনের মাঝে একটা উদ্বেল ঝড় উঠেছে। সব আলো আর এই মেঘের ছায়া যেন ঝাড়!

হঠাৎ কল্যাণীর ডাকে চমকে ওঠে।

কালিয়াটা ফুটছে উনুনে একটু দেখবে তা নয় এই খানেই দাঁড়িয়ে আছিস। কান পেতে কে কি বলছে সব শোনা চাই—না?

নমিতা যেন লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যাবে, চুপ করে সরে গেল। মনে হয় ওদের কথাই সত্যি—এ বাড়ীর উপর, ওদের উপর ওর দাবী যেন ফুরিয়ে আসছে।

পরিতোষবাবুর ঘরে ঘড়িটা বেজে চলেছে।

দরজা জানলাগুলো বন্ধ। ওই ঘড়ির শব্দটা আবছা অন্ধকারে সময়ের একটু সীমিত চিহ্ন পাব হয়ে বাতাসে মিলিয়ে যায়, বেলা বেড়ে চলে সময় বেড়ে চলেছে।

অনেক সুখ দুঃখের স্পর্শমাখা ওই সময় মহাকালের খণ্ডিত একটি অংশ। পরিতোষ বাবুর জীবনে ওইগুলো দাগ কেটে কেটে চিহ্নিত করেছে জীবনকালকে। কল্যাণী নমিতা নিখিল সবাই এই অবিচ্ছেদকালেরএক একটি ভগ্নাংশ।

নমিতাকে দেখে ওর দিকে চাইলেন তিনি।

—এ ওষুধটা খেয়ে নাও তো কাকীমণি

—তোর কি শরীর খারাপ মা।

নমিতা একটু চমকে ওঠে, ওর মনে একটা হাহাকার যেন সব ছাপিয়ে মুখে ফুটে উঠেছে। সামলে নিয়ে জবাব দেয় নমিতা—কই না তো!

—কে জানে মা। নিজে ভুগে ভুগে সবাইকে রোগী বলেই মনে করি। তবে মনে হয় কি জানিস মা সারা সমাজের প্রতিটি মানুষেরই দেহে না কোক মনে রোগ ধরেছে। ভুগে ভুগে মানুষ জাতটাই যেন মরে যেতে বসেছে। যারা বেঁচে আছে মানুষের মন নিয়ে তারা আজকের দিনে সেমানান—মিসফিট। ওরা কোথায়? নিখিল আর সেই তোলের অভিথিটি!

—বেড়াতে গেছে।

কথা বললেন না পরিতোষবাবু, বৈকালের আলো কমে আসছে। বাগানে নেমেছে থমথমে এক পরিবেশ, পাখীগুলো কলরব করছে।

নমিতা বাগানের ওদিকে নদীর পানে চেয়ে আছে অন্য সময় এখানে নিখিল এলে ওরা দুজনে বের হতো, আজ যেন অজানা ইসারাতেই সবে গেছে সে অনেক দূরে।

এমনি একটা ঝাক তার অগোচরেই যে গড়ে উঠেছিল তা ভাবতেই পারেনি সে।

গীতা আর নিখিল চলেছে নদীর বাঁধের উপর দিয়ে। বাতাস বইছে কাশবনে শন শন সুর তোলে।

ফিকে অন্ধকার নামছে। গীতা নতুন এই পরিবেশে এসে খুশীতে ভরে ওঠে। নিখিলও মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে থাকে নদীর মাঝে জলরেখার পানে।

বালুচরের রুক্ষতা ছাপিয়ে জলের স্পর্শটুকু জেগে রয়েছে—তার জীবনের সব ব্যর্থতার মাঝে গীতা যেন এমনি একটু তৃষ্ণাহরা সজীব মাধুর্য খোঁজে।

পড়াশোনার ভাবনাও ডুবিয়েছে গীতা, জীবনটা তার আগে ছিল কঠোর সংগ্রামমুখর। নমিতাই তাকে যেন কঠিন সংগ্রামমুখর পথে ঠেলে দিয়েছিল তাকে পড়তে হবে, বড় হতে হবে। এই দুশ্চিন্তা সেই কাজের ভিড় থেকে গীতা তাকে হাত ধরে কোন সুর-স্পর্শময় জগতে এনে হাজির করেছে।

এখানে কাজ নেই ভাবনা নেই, ছুটে চলা নেই। আছে শান্তি আর তৃপ্তির উপাদান।

—গীতা।

গীতা ওর দিকে চাইল দুচোখ মেলে, ভীরু সলজ্জ চাহনি এ নয় কামনা সোচ্চায় প্রতিষ্ঠা মাখানো এতে।

পাখী ডাকছে, বাতাসে ভরা বকুল ফুলের সৌরভ কোথায় যেন এসে পড়েছে তারা।

নিখিলের এই পরিবেশ খুব পরিচিত।

হঠাৎ কার ডাকে ফিরে চাইল।

—দিদিমণি!

গীতাও দাঁড়াল আঁধারে এগিয়ে আসে যশোদা বাউরি, ওর হাতে নতুন গাছের লঙ্কাফোটা একগুচ্ছ রঙ্গন ফুল রক্তরাঙ্গা ফুলের তোড়াটা এনেছে যশোদা দিদিমণিকে উপহার দিতে।

ওর কথা ভোলেনি সে, দেখেছে বিপদে আপদে সেই-ই দাঁড়িয়েছে সকলের পাশে সবরকমে সাহায্য করেছে তাকে ও ভোলেনি

—ভালো আছোতো দিদিমণি?

অবছা অন্ধকারে সামনে এসেই নতুন কাকে দেখে থমকে দাঁড়াল যশোদা, 'এ অন্য কোনজন' বিস্মিত হয়েছে সে—নমিতা দিদিমণি আসেনি?

গীতা একটু হকচকিয়ে গেছে, জবাব দেয় নিখিল—না।

সরে গেল যশোদা। গীতা অবাক হয়ে লোকটাকে দেখছে।

নিখিলের মনের সেই সুর যেন চকিতের মধ্যে থেমে গেছে. ওদের জীবনের মাধুর্যটুকু এখানে উপভোগ করার অবকাশ নেই, এখানের প্রতিটি দিন প্রতিটি মুহূর্ত আর একজনের স্মৃতি দিয়ে ভরা।

বিরক্ত হয়ে উঠেছে নিখিল এখানে।

কল্যাণীই কাজটা করিয়েছে। দেখেছে বিড়াল একটি বাড়ীতে উপদ্রব করছে, একে একে বাচ্চাগুলোকে পার করে দিয়ে এসেছে নদীর ওদিকে, পারেনি বাড়ী নিডালটাকে।

আজই সকালে বিড়ালটা গীতার ঘরে ঢুকে নিরাপদে শুয়ে ছিল, বো[illegible]কে সে। ওটা নমিতার ঘর

সুতরাং ওই একটু জায়গাতে তার অবাধ স্বাধীনতা ছিল। তাই অভ্যাস মতই ওখানে শুয়ে ছিল। কিন্তু পরের যে মালিকানা বদলে গেছে জানে না। গীতা ঘরে ঢুকেই অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে, বিড়ালে নাকি তার খুব ভয়, বোধহয় জাত ভাইয়ের ডিলথিরিয়া বোধ হয় হয়েই গেল। চেঁচামেচিতে নিখিল কল্যাণীও এসে ছুটেছে।

নিখিল বলে ওঠে—এইসব নোংরা জাত বাড়ীতে রাখো কি করে?

স্যানিটেশন একটা কথা আছে তো। জানি—কল্যাণীও সায় দেয়।

—আজই সব সাফ করছি। সব জঞ্জাল ফেঁটিয়ে দূর করবে এবাড়ী থেকে। ধাঙড়টাকে ডাকতো সতীশের মা।

কল্যাণী এমনিই একটা বিহিত করতে চায়

করেছেও?

সন্ধ্যা হয়ে গেছে, সারাটা দিন নমিতা কাজে ব্যস্ত ছিল। কাজেও মন লাগে না এতদিন এ বাড়ীতে ভেবেছিল সেই-ই অপরিহার্য একটি প্রাণী আজ নিখিলের জীবনে সে ছাড়া আর কেউ নেই তাই নিখিলকে নিজের মত করে গড়তে চেয়েছিল। পড়াতে চেয়েছিল—ওকে বাসনা করে দিয়েছে নিজের সব কিছুর বিনিময়েও সে একটু ভালবাসা—ভালোলাগা সে চেয়েছিল।

হঠাৎ সব যেন গোলমাল হয়ে গেছে।

কাজ আর কাজ, তাও ভাল লাগে না। গীতার কথাবার্তা-গুলো শুনে মনে মনে জ্বলে উঠেছে, তবু জবাব দিতে পারেনি।

সারাদিন বিড়ালটাকে দেখতে পায় নি নমিতা, খাবার সময় পায়ের কাছে ঘুর ঘুর করে আজ তাও আসে নি। এদিক ওদিক খুঁজেও সাড়া পায় না। কে জানে কোথায় গেছে মুখপুড়ী।

সন্ধ্যার পর বাগানের ওদিককার ঘর থেকে কাঠ খুঁটে বের করতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল নমিতা, বিড়ালটার ঠ্যাংএ দড়ি বাঁধা—বিশ্রী আঘাতে ওকে পিসে থেৎলে মারা হয়েছে নিষ্ঠুর ভাবে।

পুষি, পুষি!

দু একবার ডেকেও সাড়া পায় না, চুপ করে দাঁড়ি নমিতা।

কল্যাণীর ডাক কানে আসে, উনুনে আঁচ পড়ে নি, নমিতার সাড়া না পেয়ে নিজেই এগিয়ে আসে কল্যাণী। এগিয়ে এসে থমকে দাঁড়াল।

—বিড়ালটাকে কে মেরেছে!

কল্যাণী একটু চমকে ওঠে ওর কণ্ঠস্বরের কাঠিন্যে। পরক্ষণেই সামলে নিয়ে বলে—তা কি করে জানবো বাছা। চুরি করে খাওয়া স্বভাব। দিয়েছে কেউ সিটিয়ে। আর যা জ্বালাতন করে গেছে ভালই হয়েছে।

ওদিকে উনুন ধরাতে হবে না! চলদিকি ওরা ফিরে চা জলখাবার খাবে।

নমিতা কল্যাণীর দিকে চেয়ে থাকে স্থির সন্ধানী দৃষ্টিমেলে। বেশ বুঝতে পারে এ ঘটনার জন্য দায়ী কে। মনে মনে আজ নমিতা রেগে উঠেছে। কল্যাণী বলে চলেছে।

—ভাবি তো একটা বিড়াল গেছে—

—আপনি চুপ করুন।

কল্যাণী থেমে যায় ওর ধমকে। নমিতা বলে ওঠে

—কিকে বলুন আঁচ দেবে—আমার শরীর ভাল নেই। ওসব পারবো না।

চলে গেল নমিতা একতলার সেই অন্ধকার ঘরটার দিকে

কল্যাণী গজগজ করতে থাকে। দুধ-কলা দিয়ে কালসাপ পুষেছে তাও বেশ সদর্পে ঘোষণা করতে ছাড়ে না। কদিকাল কিনা—তাই এমনি অহঙ্কার। বেটাছেলেই সম্ভব।

পরিতোষ বাবু এসে হাজির হয়েছেন বাগানে, দূর থেকে সব ঘটনাই দেখেছেন তিনি। কল্যাণীর কথায় বলে ওঠেন।

—ওকথাগুলো বলোনা বড় বৌ, ধর্মে সইবে না। তোমার সংসার এই ছেলের জন্য ও সব দিয়েছে, ওকে আর ঝিয়ের মত নাইবা খাটালে।

—কি বলছ।

—ঠিকই বলছি। অন্ধকার আকাশের তারাগুলোও সিটিয়ে উঠেছে তোমার ওই মিথ্যা কথায়।

ওদিক থেকে একটা গুণ গুণ সুর আসে, গীতা আর নিখিল ফিরছে, ওদের হাতের টর্চের আলো আঁধার ছিটিয়ে পড়েছে এদিও ওদিকে। পরিতোষ বাবু উত্তেজনা থামিয়ে লাঠিতে ভর দিয়ে ঘরের দিকে ফিরছেন।

কিন্তু নমিতার ঘুম আসেনি কেউ তাকে খেতেও ডাকেনি একবার এসেছিল বনমালী। কিন্তু তার কথার দাম কি এবাড়ীতে, তাই অভিমান করেই ওকে ফিরিয়ে দিয়েছে নমিতা।

—রাগ কার উপর করছ সিদিমণি!

বুড়োর কথায় হাসে নমিতা। মলিন বিষণ্ণ একটু হাসি। জবাব দেয়,

—নিজের উপরই করেছি বুড়দা। তাছাড়া খিদে নেই সব খিদে আমার মিটে গেছে।

বনমালী সরে গেল।

একাই বসে আছে নমিতা, জানলার বাইরে বাগানে ফুটেছে মাধবীলতার ফুলগুলো, রাতের আঁধারে জেগে আছে উদাস কান্নার মত তাদের সৌরভটুকু, ব্যাকুল বেদনায় মন গুমরে ওঠে। এ কোন অন্ধকার পুরীতে সে পথ হারিয়ে ফেলেছে।

হঠাৎ আবছা চাঁদের আলোয় দেখে নমিতা বাগানে গীতা আর নিখিল দাঁড়িয়ে আছে। দুজনের চোখে কি যেন স্বপ্নের ঘোর—

নিখিল গীতাকে কাছে টেনে নেয়। গীতাও যেন নিঃসঙ্কোচে নিজেকে সমর্পণ করে ধন্য হতে চায়, পুরিয়ে যেতে চায়। সশব্দে জানলাটা বন্ধ করে সরে এল নমিতার সারা শরীরে একটা ঝড় উঠেছে কাঁপছে সে অসহায় রাগে আর অপমানে।

এখানে পড়ে থাকার আর কোন মানে হয় না। জীবনের সব সুখ আনন্দ আলো এখানে ফুরিয়ে গেছে। বোঝার মত জীবনটাকে শুধু বয়ে যাওয়া। এরা তার সব ছিনিয়ে নিয়েছে, খেংলে যাওয়া বিড়ালটার কথা মনে পড়ে।

ওর সবকিছু ওরা কেড়ে নিয়ে অসহায় প্রাণীর মত মনের সজীবতাটুকুকে খেংলে পিষে রক্তাক্ত করে তুলেছে নিষ্ঠুর ব্যর্থতার আঘাতে স্তব্ধ রাত্রি। একটা পাখীও জেগে নেই।

কানে আসে গোঙানির শব্দ, একটা মানুষ অসহায় যন্ত্রণায় গুমরে কাঁদছে ওই পরিতোষবাবু। এ বাড়ীর নিশ্চুপ অন্ধকারে অন্তরাত্মা কাঁদছে অশেষ যন্ত্রণায়।

— শেষ —

এই শহরে

ক্ষেত্র সিংহ

যাদের তুমি চিনতে, তারাও
হারিয়ে যাবে,
এই শহরে। শহর বড় কঠিন।
মাটিকে সে পাথর করে,
অরণ্যকে কাঠ,
আকাশটাকে ছাদে ঢেকে
ভেজিয়ে দেয় কপাট।
কঠিন শহর।

তোমায় যারা চিনত, তারাও
খোঁজ পাবে না,
এই শহরে। শহর বড় কপট।
কোথায় তুমি লুকিয়ে আছো
বেড়ার পরে বেড়া,
নিজেই তুলে' এখন তুমি
জটিল জালে ঘেরা
কপট শহর।

খোঁজোনি যা তাই হয়ত
হঠাৎ পাবে,
এই শহরে। শহর বড় দরাজ।
কখন কোথায় ভিড়ের মাঝে
একটি অবাক ছোঁয়া।
একটি চাওয়া, চিরকালের
চোখের জলে ধোয়া।
দরাজ শহর।

পাকা বনেদ যতই গাঁথো
নাড়া খাবেই,
এই শহরে। শহর বড় বিধুর।
সব কিছু তার মাপা জোখা
আকাশ মাটি জল
হৃদয় শুধু কোন্ অদেখার
কামনা-বিহ্বল।
বিধুর শহর।

সন্ধ্যানুধ্যান

কৃষ্ণ বসু

কেটেছি বিহ্বল দাগ কতবার সমুদ্রের ধারে
কিছু শাঁখকড়ি ছিল, কিছু বালি আর তিক্ত ফেনা;
কয়েকটি আহত চোখ, মূক আর্তি, স্মৃতি, লতাপাতা
আমাদের লক্ষ্য ছিল। ছিল বুঝি চিরকাল সেই
বালি রোদ হাওয়া জলে জীবনের পবিত্র সংকটে
একটি নিটোল মূর্তি গড়ে তোলা অবিচল তাপে
যে তাপে শস্যের ক্ষয় বীজ থেকে স্পর্ধিত বিস্ময়ে।

কপালের আকীর্ণ গোলাপগুলি ম্লান হয়ে আসে
ঢেউ জাগে, সব চিহ্ন মুছে যায়; যা থাকে সে শুধু
গর্জন, চেতনা, গন্ধ। হে অন্ধ লবণ, তীব্রতায়
জ্বাল যাকে সে প্রদীপ নয়, ঢেউ নয়, ইচ্ছা শুধু—
শূন্য থেকে শূন্যে ধায় অর্থময় অর্থহীনতায়।
তবে পাল তুলে দাও, কাঠামোকে নৌকো করে
নাও তমঃপুঞ্জ, দিব্য দাহ আমাদের সাধনা এখন

সন্ন্যাসী প্রভাত

জগদীশ ভট্টাচার্য

ভোরের আকাশ আজ সন্ন্যাসী,
গৈরিক বসন পরা।
নিঃশব্দ ওষ্ঠাধরে জপ করছে আলোর মন্ত্র॥

আমার মনের আকাশ
প্রাবৃটের ঘনমেঘে সমাচ্ছন্ন।
আমার বুকে ঐশী অসন্তোষের অরুন্তুদ বেদনা।
যা পাইনি
তার জন্যেই হাহাকার উঠছে দশদিকে॥

একদিন ঘরের মায়ায় ধরা দিয়েছিল যাযাবর মন।
শক্ত বাঁধনে বেঁধেছি তাকে—
সাচ্ছল্যে আর স্বাচ্ছন্দ্যে
ভুলিয়ে রেখেছি অন্বেষ-কবোষ্ণ নীড়ের মায়ায়।
আকাশে ওড়ার পাখা ছিল তার;
আসক্তির আফিঙ খাইয়ে পোষ মানিয়েছি
সংসারের পরিমিত খাঁচায়।
অর্থ দিয়েছি, দিয়েছি পরমার্থ;
প্রেম দিয়েছি, দিয়েছি প্রতিষ্ঠা।
তবু তার তৃপ্তি নেই।
বলে:
জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তবু হিয়া জুড়ল না গেল॥

সেই চির-অতৃপ্ত মানসের হাহাকার
রচনা করেছে আমার মনে
ঘনমেঘে অবলুপ্ত প্রাবৃট-আকাশ।
ঝিমঝিম বাদল-বর্ষণে
শুনতে পাচ্ছি বিরহিণী রাধিকার
বীণালগ্ন অলৌকিক কণ্ঠ:
ঈ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥

আমার নিরাসক্ত আজ অপরিতৃপ্ত আসক্তির
বিক্ষুব্ধ মেঘরাগে উদ্দীপিত।
কৈশোরের শ্যামরূপ ধ্যান করছি আমি।
স্মরণ করছি বিস্মৃতিবিলীন মানস-বৃন্দাবনকে।
আর জপ করছি প্রেমের মধুর মন্ত্র॥

বাইরের আকাশ আজ গৈরিকবসন সন্ন্যাসী।
আমার মনের আকাশ
তীব্রিষ্ঠ বাসনার অবিস্মরণীয় বেদনায়
নবজলধরশ্যাম॥

সংবাদ

কৃষ্ণ ধর

আমাদের গৃহে দৈনিক প্রলয় হয়, সংবাদ
দাতারা সে খবর নেয়নি
নিশ্চিত জানি, প্রলয়ের-খবরে বড় ভয়,
আমাদের গৃহে হত্যা নাই, নিজেরাই নিহত
হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি, চৌচির
আয়নায় প্রতিবিম্ব প্রতিবিম্ব
হয় সংবাদদাতারা সে খবর
নেয়নি যেহেতু
প্রলয়ের খবরে বড় ভয়।

আমাদের গৃহে একদিন চোরা হাওয়া
ভীষণ তুরন্ত হয়ে ঢুকেছিল
দক্ষিণের জানালায় ভাঙা শিক, ফুলন্ত কার্নিশ
এসেছিল হাওয়াগুলি অশ্বারোহী
সৈনিকের মতো; জোর করে
বাধা তারে দিইনি আমরা কোনো বার
যেহেতু প্রলয় পয়োধিজলে
ডুবন্ত সংসার।

নিঃসঙ্গতায়

শ্যামসুন্দর দে

অনেক ফুলের মেলা ঘটুক বাগানে
চাইনিতো আমি সেই সমারোহ
সকালে বিকেলে শুধু অন্বেষণে
একটি ফুলের স্বপ্ন চোখে ভাসে
অনেক ফুলের ভার গাছে গাছে
তারপরে পরিণতি মালা;—
মালা হলে দূরে যায় পরিচিতি
অনেক গন্ধের ভিড়ে আপন সুরভি

আমি শুধু খুঁজিয়াছি একটি ফুলের গন্ধ
অজানা অচেনা কত ফোটা ফোটা ফুলে
আমি শুধু চাহিয়াছি সন্ধ্যার সান্দ্র আঁধারে
অনেক তারার ভিড়ে একক দীপ্রতা
কেন এত কৃপণতা শিকড়ে শিকড়ে
একটি ফুলের ভারে এত অসম্মতি
অনেক ফুলের ভিড়ে কেন শুধু
আপন রিক্ততা ঢাকা করুণ প্রয়াসে।
অচেনা সুরভি শুধু বিজন মুহূর্তে
নীরব মনের কথা কয়ে যায়।

একটি রাত্রির

অরুণা মিত্র

বর্ষণ শেষ।
জলতরংগে তবু
থরথরি ওঠে জলমন্দ্রিত সুর
স্পন্দন জাগে
অনাহত রাগিণীতে।
(যেনো) বসন্ত শেষ
বসন্তসেনা তবু
তন্দ্রা-সায়রে বৃথাই আত্মহারা।
(তবে মিছে মালা গাঁথা
বৃথা বসা বেনু বনে ?)
আমিতো জেনেছি
কম্পিত অধরেই
নিষেধের ছলে
মুঠো মুঠো প্রশ্রয়।
আকাশের দেহে
কষাঘাতে বিদ্যুতে
আঁধারের নির্লজ্জ
প্রকাশ রূপ।
জেনেছি তো আমি
বাসক-শয়নে কুলধনু প্রার্থিত
আশা বুকে নিয়ে তাইতো
ত্রিযামা যাপি।
মুক্ত রেখেছি দক্ষিণ বাতায়ন
অসুক না প্রেম হৃদয় পরাণ ব্যাপি।
মুদ্রিত কোরকে
নিদ্রিতা মনোলোভা
ছন্দের মাঝে বন্দীতো কালস্রোত।
চরণে তোমার কিঙ্কিনী বাজে শুনি
চক্ষে তোমার অলক্ষ্য ইংগিত।

শিমুলের ডালে আগুন লেগেছে শুনি
আমি বসে দিন গুনি
কবে—
তোমার আকাশে রামধনু এঁকে দেবো।

অসামান্য চতুর্দশপদী

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

ঈশ্বরের চুক্তিপত্র শর্ত রেখে করেছি স্বাক্ষর
যেন গাঢ় স্বেচ্ছাচারে দীর্ঘমূল ভাবনে বাতাস
বিস্ফারিত করে রাখে বনস্থলী, বৃক্ষের অক্ষর ;
যেন নগ্ন নেচে ওঠে শায়কের শাণিত উল্লাস।

অতিরিক্ত প্রিয় সব কিশোরীর পীবর ফোয়ারা
আসক্ত জলের গন্ধে ফুটেছিলো ; অন্ধকারে কবে
ডেকেছিলো আষাঢ়ের কম্র, নক্ত, নবজলধারা।
ওষ্ঠের গোপনে ছিলো মন্ত্রগুলি···অঙ্গের উৎসবে।

নিস্তেল নগরী থেকে ম্রিয়মান নষ্টের ভিতর
নেমে যায় জ্যোৎস্না, জল···অপরূপ কণ্ঠের কিন্নর।

বক্ষে কোনো ব্যথা নেই, মাত্র সূক্ষ্ম, ঠাণ্ডা এক ঘৃণা
লেগে আছে নির্বচন নরকের বিষের কৌতুকে ;
কি গান বাজাতে ইচ্ছা করেছিলে বিজনে জানিনা—
সব লক্ষ্য করি এই দূরধ্বংসী ধূমল ধনুকে।

(১২৮ পৃষ্ঠার পর)

সঙ্গে সঙ্গে উদ্যানে, কাননে, প্রাসাদে নরপতি-পথে ছড়িয়ে দেওয়া হোল গন্ধবারি। লক্ষ লক্ষ দীপ জ্বলে উঠল মন্দিরে, প্রাসাদে, ভবনে, কুটিরে। আকাশে উত্থিত হোল শত শত আলোর ফুলঝুরি। ছড়িয়ে পড়ল লাল তারা—নীল তারা।

রাত্রির দ্বিতীয় যামে মাধবীর নাচ।

মন্দ খবর আগেই আসে।

শোনা গেল মহারাজ ও মহাদেবী ততক্ষণ থাকবেন না। তাকাটক রাষ্ট্রদূতের ভবনে চলে যাবেন। বিদেশী রাজন্যবর্গ সেখানে সম্রাটকে সম্বর্দ্ধনা জানাবেন। বিষের পাত্র এবার পূর্ণ হোল। মাধবী মনে মনে বলল—"হে মহাকাল, তোমার কাছে পাপ করেছি বলে কত দুঃখ দেবে?" শেষে নৃসিংহগুপ্তকে সে না ডেকে পারল না।

"মহাসান্ধিবিগ্রহিক—আমার নাচ রাত্রির দ্বিতীয় যামে আছে। মহারাজকে সে পর্য্যন্ত এখানে রাখা কি একান্ত অসম্ভব?"

নৃসিংহগুপ্ত চুপ করে রইলেন।

কিন্তু তাঁর ভাবে মাধবী বুঝল এতে অনিচ্ছা নেই তাঁর। মাধবী বলল—"আমার একটি লিপি মহারাজকে পৌঁছে দেবেন?"

"লিপি কোথায়?" নৃসিংহগুপ্ত ছোট্ট একটু উত্তর দিলেন।

মাধবী তখনি মাথার কাঁটা রক্ত চন্দনে ডুবিয়ে একটি পত্র লিখে দিল পিপুল পাতায়।

নৃসিংহগুপ্ত ফিরে এলেন না। নেপথ্যে সন্ধ্যাগৃহে একটি বিমর্ষভাব। অনেক নর্ত্তকীই আর ভাল করে বেশবাস সজ্জা করছেন না। এমন গুঞ্জ গুঞ্জ ও শোনা যাচ্ছে—"মাধবিকার জন্যই আমাদের নাচ সম্রাট দেখলেন না।" দেখা গেল অনেক রাজপুরুষই চঞ্চল হয়ে উঠেছেন তাকাটক ভবনে যাবার জন্য। হস্তীর বৃংহিতধ্বনি শোনা যাচ্ছে। অর্থাৎ সম্রাটের বাহন প্রস্তুত। মাধবী কিন্তু সুন্দর ভাবে বেশ সম্পাদন করল।

সহসা মহাপ্রতীহার ভানুগুপ্ত মঞ্চের সামনে এসে ঘোষণা করলেন,—"সম্রাট ও মহাদেবী দেব নর্ত্তকীদের নৃত্য শেষে তাকাটক ভবনে যাবেন। জনসঙ্ঘ, আপনারা স্থির হয়ে নৃত্য দেখুন।" সহসা সবই পরিবর্তিত হয়ে গেল। নর্ত্তকীরা ছুটে এল সজ্জা সম্পূর্ণ করতে। কেউ কাজলকে আরো ঘন করল। কেউ কেশের উপর ছড়িয়ে দিল কেতকী পরাগ। মেখলার গুটিকাগুলিকে সুস্থস্থ করতে লাগল বা কেউ। কেউ বা মুখে মাখিয়ে দিল লোধ্ররেণু।

মাধবী মঞ্চে প্রবেশ করে স্বীয় ব্যক্তিত্বে জনতার দৃষ্টি তার দিকে আকর্ষণ করে আনল। তার নাচটি ছিল এই,—

হে কমল, তুমি মলয়াবতীর সনে
দুলিছ কিরিছ দিতেছ মধুর রেণু।
আমি লাঞ্ছিত ভ্রমরী অন্তরে
প্রদক্ষিণিয়া ঘুরাই বাজাই বেণু।

মাধবী তার তিক্ত ব্যর্থতার সবটুকু উন্মোচিত করে দিল নাচে। যেখানে কমল ও মলয় সমীরণ প্রেমে ঢল ঢল ঈর্ষ্যাপরা ভ্রমরীর বিষাক্ত হাসিটুকুতে সে ফুটিয়ে তুলল নাটকের তীব্র দ্বন্দ্ব। আবার পরাভূতা ভ্রমরী যেখানে তার বিজয়িনী প্রতিদ্বন্দ্বিনীর সম্মুখে গুঞ্জন করছে সেখানে তার হতাশা যেন গীতি কবিতার মাধুর্য।

অভিনয় তো অভিনয় নয়। সত্য সত্যই মাধবীর ব্যর্থ প্রেমের জ্বালা শুষ্ক কাষ্ঠে স্ফুলিঙ্গের মত অগ্নিবৃষ্টি করছিল। তার নিভৃত প্রেমের চিত্র আজ সকলের সামনে সত্য হয়ে দেখা দিল। তাই ভ্রামরী নাচের প্রতিটি অঙ্গহার সুসন্নিবেশিত হলেও চন্দ্রগুপ্তের কুঞ্চিত মুখে বেদনার রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। দেখতেও তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে—আবার উঠে গেলেও সকলে ক্ষুব্ধ হবে না কি? সবলে তিনি নিজেকে স্থির রেখে মাধবিকার নৈপুণ্য দেখতে লাগলেন।

নাচের বিষাদ রস উৎসবের উল্লোলকে যেন স্তব্ধ করে দিয়েছিল। মনে হোল যেন নীল আকাশে এক খণ্ড জলভরা মেঘ সহসা সূর্য জ্যোতির খরত্বকে কিছুটা স্নিগ্ধ করে দিয়ে কোথায় নিরুদ্দেশ হোল। নাচ শেষ হবার পরেও তাই স্তব্ধ হয়ে রইল সভাতল। তারপর একটি মৃদু গুঞ্জন ধ্বনি শোনা গেল। সেইটেই বাড়তে বাড়তে ক্রমে উচ্চরোল সমুদ্রের তরঙ্গের মত কেটে পড়ল—"সাধু, সাধু", "উত্তম, উত্তম।" কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা বিরুদ্ধ স্রোতও প্রবাহিত হোল—"এ কি নাচ?"

"এতো স্পষ্ট বিদ্রোহ।"

"রাজার সম্মুখেই রাজার সমালোচনা।"

মহাবলাধিকৃত হলায়ুধ বর্মা, মহামন্ত্রী জীবগুপ্ত, প্রাক্তন নটিনুখ্যা কামাক্ষী এরা তো রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি করলেন। অথচ সম্রাট কিছুই মনে করেন নি। তাঁর বিদগ্ধ দৃষ্টি মাধবী নৃত্যের উত্তেজনার মধ্যেও বার বার অনুভব করেছে। তাতে ক্রোধ ছিল না—স্নেহ ছিল। কিন্তু মহামন্ত্রী রীতিমত ক্রুদ্ধ হয়ে সভাগৃহে প্রবেশ করে মহাপ্রতীহারকে মাধবীর সম্মুখেই ভর্ৎসনা করে বললেন,—

"মাধবিকার কাছে কৈফিয়ৎ দাবী কর। অর্থ কি?"

মাধবিকা এগিয়ে এল। ধীর কণ্ঠে সে প্রশ্ন করল,—

"ভদ্র, নাচের পদ কারু কি ভুল হয়েছে?"

"না।"

"মুদ্রা?"

"না।"

"রস পরিবেশন?"

"একটু বেশী হয়ে গেছে",—মহামন্ত্রী ব্যঙ্গ করলেন।

"ঐটুকুই শিল্প সৃষ্টি। সে আপনি বুঝবেন না। যাঁরা বোঝবার তাঁরা বুঝেছেন।"

"দর্পিতা, ধৃষ্টা। তুমি কি বিস্মৃত হয়েছ যে আমি মহামন্ত্রী জীবগুপ্ত?"

"আপনি বিস্মৃত হয়েছেন যে আমিও উজ্জয়িনীর নটি মুখ্যা মাধবিকা।"

মহামন্ত্রী হলায়ুধ বর্মাকে নিয়ে রোষক্ষিপ্ত পদক্ষেপে চলে গেলেন। এতক্ষণ সংগ্রামের পর মাধবী এখন রমণী সুলভ কান্নায় ফেটে পড়তে চাইল। তবু সকলের সামনে তা করার অর্থ পরাভব স্বীকার করা। মাধবীর মনে হোল—"কেন তা করব? আমি তো অপরাধ করিনি। আমি শিল্পী……"

শিল্পী তো মনের ভাব শিল্পেই ফুটিয়ে তুলবে। মহামন্ত্রী কি তাঁর কূটনীতিকে ফুটিয়ে তোলেন না রাজনীতির মাধ্যমে? হলায়ুধ বর্মা কি রণকৌশলে ব্যক্ত করেন না তাঁর শক্তি? তবে?

শিরঃপীড়ার ছল করে মাধবী উৎসব শেষের পূর্বেই গৃহে ফিরে এল। 'ভাকাটক-ভবনে' তারও আমন্ত্রণ ছিল। কিন্তু আদুর পীড়ন আর সে কত সইবে? কতবার সে দেবতার তার বিজন আর তার নেই? মণিকুট্টিমে প্রবেশ করে মাধবী অট্টহাসি হেসে উঠল। শত রোদনের চেয়েও তা ভয়ঙ্কর। শূন্যপ্রাসাদে ঐংতানের মত শতকণ্ঠে বেজে উঠল সেই হাসির হাহাকার। প্রতিধ্বনিত হতে হতে এক সময়ে মিলিয়ে গেল তা দূরান্তে। তারপর ভয়ানক শূন্যতা। কেউ কোথাও নেই। সবাই গেছে উৎসবে। আলোক, মালা, ভোজ্য, সুরার স্রোত বয়ে যাচ্ছে যেখানে উজ্জয়িনীর নাগরিক নাগরিকার জন্য।

মাধবীর ভবনেও জ্বলছে সহস্র দীপ।

সহস্র কেন?

লক্ষ দীপ জ্বলুক।

লক্ষ প্রদীপ, সপ্ত প্রদীপ, নব প্রদীপ। জ্বলে উঠুক দীপবৃক্ষগুলি। ঘৃতের, তিলের, কর্পূরের। জ্বলুক, জ্বলুক, সব জ্বলে যাক। পুঞ্জীভূত জ্বালা আগুনের শিখা হয়ে দীপ্যমান হয়ে নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকুক মহাকালের দিকে। তারপরে সব ভস্ম, সব শেষ।

রক্তাংশুকা মাধবী উন্মত্তার মত মশাল হাতে শূন্য প্রাসাদ কক্ষগুলিকে আলোকময় করে তুলতে লাগল। পদ ধ্বনি। কার পদধ্বনি? কে আসে এই নির্জন নিশীথে ত্যক্ত নটির আলয়ে? একি মনের ভ্রম? নাকি সে উন্মাদ হয়ে যাচ্ছে?

কিন্তু না।

ঐ তো সোপান মূলে কবি কালিদাস।

"কবি!"

"মাধবী!"

ক্রোধে মাধবীর ছোট ভুরু যুগ্ম হোল। বেদনার পিণ্ডটাকে সবলে কণ্ঠের মধ্যে গিলে ফেলে সে দাঁতে দাঁত পিষে বলল,—"কি সৌভাগ্য এতকাল পরে মনে পড়ল? কিন্তু কবি মহারাজ শেষে তোমাকেই চর করে পাঠালেন?"

কালিদাস স্তম্ভিত হলেন। মুখে বললেন,—"কি বলছ মালিনী সখী? তুমি কি পরিহাস করছ?"

"না, কবি। আমি তো ভেবেছি তুমিই আমার সঙ্গে পরিহাস করতে এসেছ।"

আহত বিস্ময়ে কালিদাস তাকিয়ে রইলেন মাধবীর দিকে। এ মাধবী কি সেই মাধবী? ক্ষোভ, ঈর্ষ্যা, বেদনায় মানুষ এমন বিকৃত হয়ে যায়? ধীরে ধীরে তিনি বললেন,—"মালিনী, একি তোমার রূপ? অগ্নিশিখার মত তুমি কি প্রলয় রূপিনী হয়ে উঠেছ?"

মাধবী তাকিয়ে দেখল তার হাতে মশাল। হঠাৎ তার স্মরণ হোল সব কিছু। মশাল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে মণিকুট্টিমের ওপর আছড়ে পড়তে গেল কিন্তু তার পূর্বেই কালিদাস এসে তাকে ধরে ফেলেছে। আর তাঁর হাতের অঙ্গুলিতে টপ টপ করে ঝরতে লাগল মাধবীর উষ্ণ অশ্রু। ফুঁপিয়ে ওঠা মাধবীর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে কালিদাস বললেন,—"ভুল কোর না, মালিনী, ভুল কোর না। পাথরে যদি ঘা মার তবে পাথরের কিছু হবে না সখী। আহত হয়ে শুধু ফিরে আসবে। তার চেয়ে ধৈর্য্য ধরে পথ সন্ধান কর। দেখ দুর্গম স্রোতস্বিনীও এঁকে বেঁকে যায়। তারপর যখন স্রোত বড় হয়, বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডকেও সে তখন অবহেলে ভাসিয়ে নিতে পারে।"

মাধবী চোখ মুছল।

"কবি, ও কথা থাক। আর উপদেশ দিয়ো না। উপদেশে হৃদয়-বেদনা শমিত হয় না।"

"সবই মহাকালে পূর্ণ করে দেবেন।"

"আর যতক্ষণ তা না করছেন? ততক্ষণ? না আমি জীবনের উৎসব থেকে দীপ নিবিয়ে প্রস্থান করব না। জেনে রেখ কবি ব্যর্থ চোখের জলের তিরস্করণী রচনা করে চাঁদ ঢেকার মত আমি অপনিহতা থাকব না। যৌবন দীপাধারের আলো আমি নিবিয়ে দেব না। না, না, না।"

সোপানে আবার পদক্ষেপ শোনা গেল।

মাধবী চকিত হয়ে উঠল—"কে?"

নৃসিংহগুপ্ত দৃঢ় পদক্ষেপে উঠে এলেন।

"মহাসন্ধি বিগ্রহিক? আপনি উৎসবে থাকলেন না?" মাধবিকার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে নৃসিংহগুপ্ত এগিয়ে এল। নিরীক্ষণে কালিদাসের দিকে তাকিয়ে কতকটা স্বগত ভাবে বললেন—"কবিও দেখছি উৎসব ক্ষেত্র ত্যাগ করে এসেছেন। মহারাজ আপনার সন্ধান করছিলেন।"

কালিদাস তাকিয়ে দেখলেন তাঁর সামনে একটি ধেষ্ট লোলুপতা কুক্ষিস্থর ক্ষুধা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু নৃসিংহগুপ্ত বেশী কথার মানুষ নন। মাধবীর দিকে ফিরে তিনি ততক্ষণে অভিবাদন করে বলতে শুরু করেছেন,—"শোভনে, শুনলুম তুমি পীড়িতা। মহারাজ উদ্বিগ্ন হয়ে তাই আমাকে পাঠিয়েছেন। কথাটার সততায় সন্দেহ ছিল। কিন্তু নৃসিংহগুপ্তকে দেখা মাত্রই মাধবীর একটা বৈলক্ষণ্য দেখা গেল। বৈরিণী-সুলভ স্তন পাশ দেখিয়ে ললিত কটাক্ষ করে বিভ্রম নিপুণা নটীর মত সে এমনি ভাবে দাঁড়াল যে কালিদাস বিস্মিত হলেন। তাঁর ঠিক ইচ্ছে ছিল চিত্রশালুলের মত ধূর্ত ও ক্ষিপ্র এই ব্যক্তিটির সান্নিধ্যে মাধবিকা তার সন্তাপিত হৃদয় নিয়ে থাকুক। এখনো যে তার ক্ষোভে-দুঃখে জ্বলছে। অধর থেকে থেকে কেঁপে উঠছে। ধূপায়িত দুঃখ স্বর্গের দিকে উঠছে। কিন্তু মহারাজ সন্ধান করছেন এ কথা শোনবার পর আর থাকা চলে না। তাছাড়া এ কথাও বুঝলেন নৃসিংহগুপ্ত এখুনি যাবেন না। কোন একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে তিনি এসেছেন। কে তাঁকে পাঠাল? রাজা? না মহামন্ত্রী? নিষ্প্রভ কালিদাস বিদায় নিলেন।

কবি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মাধবী অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। বহুবলী, বহু ভাষা রক্ষ, কূটনীতি ও রণকৌশলে সমান পারঙ্গম এই ব্যক্তিটির সঙ্গে একা থাকতে তার কোথায় যেন ঠেকছিল। এতক্ষণ তার ক্ষোভ কি তাকে দিয়ে বৈরিণীর অভিনয় করিয়েছে? নাকি মহামন্ত্রীর রোষ থেকে রক্ষা পাবার প্রবৃত্তিই সহসা নৃসিংহগুপ্তের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল? আজ মনে হোল নৃসিংহগুপ্তের পৌরুষে কোথায় একটা আকর্ষণ ছিল। কোন অন্ধকার গর্ভ থেকে তার আদিম পৌরুষ মাধবীর অন্তরস্থ আদিম নারীকে সবলে টানছে। সেই সোমপানক উৎসবের বিদ্যুৎস্পর্শ! মাধবী কেমন কণ্টকিত হয়ে উঠল। প্রভিন্ন হস্তীর মদগন্ধ যেন বাতাসে ভাসছে। সহসা নৃসিংহগুপ্ত প্রকোষ্ঠের নিষ্ঠুর টেনে নিয়ে গেল মাধবীকে। একটা বিশাল প্রস্তর

পদ্মের তলায় কুসুমের মত পিষ্ট হয়ে যেতে যেতে মাধবী আশ্চর্য্য হয়ে দেখল তার মন বিদ্রোহী হলেও দেহে কি আশ্চর্য সঙ্গত বাজছে। আশ্চর্য হয়ে গেলেন নৃসিংহগুপ্ত ও,—এই পদ্মিনী নারীর মধ্যে বাঘিনীর মত্ততা কোথায় লুকিয়ে ছিল?

কিন্তু তিনি অভিজ্ঞ পুরুষ।

বিক্রমের মত প্রথম প্রণয় তাঁর নয়।

মহাসান্ধিবিগ্রহিক তিনি। গুপ্ত সাম্রাজ্যে এ এক অভিনব পদ। বহু নূতন দেশের সঙ্গে কূট মৈত্রীর জন্য তাঁর আদান প্রদান। বহুদর্শক তিনি। বহু তাঁর যোগাযোগ। নারী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাও তাঁর বিচিত্র। মাধবীকে তিনি এক নূতন রাজ্যের দ্বার খুলে দিলেন।

এতদিন মাধবী ছিল প্রথম প্রণয় ভীরু মুগ্ধা নায়িকা। প্রণয়ীজনের পায়ে সে তার হৃদয়ের সমস্ত আবেদনটুকু সঁপে দিয়েই শান্ত। এক রাত্রে নৃসিংহগুপ্ত তাঁকে দীক্ষিতা করে তুললেন প্রগল্‌ভা নায়িকায়। দেহটি যার আনন্দের সোপান মাত্র।

এতদিন প্রেম ছিল হৃদয়ের ধন। আজ থেকে তা হোল মস্তিষ্কের বস্তু। চিরে চিরে দেখ কে ঐ পুরুষ? পশু, না বুধ, না অশ্ব? তুমি কোন নারী—পদ্মিনী, চিত্রিণী না শঙ্খিণী?

পীড়িত চুম্বনে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে উঠছিল মাধবীর। নখরাঘাতে কণ্ঠে, বক্ষে' জঘনে ফুটে উঠছিল রাত্রিনখ। বিক্রম যেখানে সৃষ্টি করতেন মৃদু আঘাতে প্রবাল মণি। নৃসিংহগুপ্ত সেখানে সৃষ্টি করলেন বরাহচর্চ্চিতক।

কিন্তু কোথায় সেই জলহংসীর মত শীৎকার? এখনো মনে আছে, কুমারের অধরপুরে যে ধ্বনির সঙ্গে গুঁড়িয়ে গিয়েছিল মরকত মণি। রাঙারঙ্গ ও সবুজ মণিরেণুতে মিশে ধরেছিল আশ্চর্য ময়ূরকণ্ঠী বর্ণ। আর নৃসিংহগুপ্তের মন মত্ত হয়ে উঠেছিল অবারণীয় আবেগে। অবাক হয়েছিলেন,—উজ্জয়িনীর মেয়েরা তো এটি জানে না। পরে মনে হয়েছিল, নটিমুখ্যা তো গৃহ বধূ নয়। চৌষট্টিকলাভিজ্ঞা রসবতী বিলাসিনী। তাছাড়া মাধবী গৌড়বঙ্গের মেয়ে। কে না জানে গৌড়ীয় ললনারা ললিতবিহারিণী। কামকেও তাঁরা শিল্প করে তুলতে জানেন। অপরাজ্ঞ বাংলাদেশের মেয়েদের মত ছলনাময়ী নয়—রতি তাঁরা নন।

কিন্তু মাধবীর দেহটাকে দলিত পেষিত করেও নৃসিংহগুপ্ত শুনতে পেলেন না সেই মধোল্লাস।

আর প্রভাতে উৎসব শেষে মধুরিকা ফিরে এসে সাতসকালে মাধবীর দেহটিকে দেখে বিস্মিত হোল। কাল রাত্রের মধুভিখারী ছিল কোন পুরুষ? মাধবীর আশা সে কি মেটাতে পেরেছে?

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

উষারতি।

বিনিদ্র কালিদাস প্রত্যূষেই এসেছিলেন মহাকাল মন্দিরে। তার মনে প্রশ্ন ছিল। কিন্তু রাহুর দন্ত দলনে বিগলিত চাঁদের মত মাধবীর স্বরূপ দেখবার সঙ্গে সঙ্গে তার হৃদয়-ক্ষত থেকে রক্ত ঝরে পড়ল। মায়াবিনী প্রেম নিয়ে তোর এত খেলা? কেন এই অপরা প্রবৃত্তি? একটা তীব্র বিতৃষ্ণায় কালিদাস মন্দির থেকে চলে এলেন। এই স্বৈরিণীকে চিরন্তন বধূর প্রতীক করে তিনি কেন এঁকেছিলেন? হৃদয়ের সবটুকু দিয়ে··· না থাক। আর তবে কি রইল?

সমাধি!

যোগাভ্যাস দ্বারা বৈদান্তিক মুক্তি!

তবে তাই হোক।

অন্তর্মনা হয়ে ফিরে আসছিলেন গৃহের অভিমুখে। এমন সময় পথে দেখা গেল মাথাশর্মা সঙ্গে একজন ব্রাহ্মণ নিয়ে দ্রুত তাঁর দিকে আসছেন। ব্রাহ্মণ অর্থী; কিন্তু দ্বারপাল শুদ্ধ সজ্জায় রত বলে প্রবেশ পাচ্ছে না। কালিদাস শুনে মৃদু হাসলেন,—"আসুন, আমার সঙ্গে। গিয়ে রাজাকে আশীর্বাদ করবেন কিন্তু।"

"নিশ্চয়, বাবা নিশ্চয়। দু হাত তুলে আশীর্বাদ করব।"

"কি আশীর্বাদ করবেন।"

"সেই তো, কি বলব? বাবা, তুমিই বলে দাও। রাজদ্বারে কখনো আসি নি তো আগে।"

"বলবেন—ত্রিপীড়াপরিহারোহস্তু। কেমন?"

"ঠিক বলব, বাবা, ঠিক। গিয়েই দু হাত তুলে বলব ত্রিপরিহারোহস্ত।

"না, না, ভুল হোল। বলবেন ত্রিপীড়াপরিহারোহ'স্ত। অর্থাৎ ত্রিপীড়া যেন আপনার না হয়। ত্রিপীড়া কাকে বলে ?"

"জানিনে তো বাবা। ত্রিপীড়া আবার কি বস্তু ?"

"ত্রিপীড়া মানে—আধিদৈবিক, আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক দুঃখ। বুঝেছেন তো এবার।"

বুঝেছি। তোমার আর কিছু ভাবতে হবে না বাবা। কিন্তু আজই আমার অর্থটা বড় দরকার। পাব তো বাবা ?

"পাবেন। মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের কাছে অর্থী এসে কি ফিরে যায় ?"

সভাগৃহে এক সিংহাসনে চন্দ্রগুপ্ত বসে আছেন। পাশে মন্ত্রী জীবগুপ্ত ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পুরুষবর্গ। না, পাটলীপুত্রের মত সুবৃহৎ সমুদ্রগৃহ এখানে নেই। কি করে হবে ? এই তো প্রথম উজ্জয়িনীকে রাজধানী করা হোল। বরং বেশ একটা ছন্ন ও অন্তরঙ্গ পরিবেশ। তবু ব্রাহ্মণ ভীত হয়ে পড়লেন। চারিদিকে এত দিব্যদ্যুতি। কালিদাস ইশারায় বললেন—'বলুন'।

'কি বলব ? ব্যাকুল চোখে তাকালেন ব্রাহ্মণ।

কাণে কাণে কালিদাস বললেন—"ত্রিপীড়া……

"ব্যস, ব্যস, আর বলতে হবে না।" ব্রাহ্মণ ছুটে গিয়ে দুই হাত তুলে সজোরে বলে উঠলেন—'ত্রিপীড়াস্ত।"

সভাসুদ্ধ সচকিত।

বলে কি ?

কালিদাস সবেগে ব্রাহ্মণকে সরিয়ে দিলেন,—

আসনে বিপ্রপীড়াঽস্ত
শিষ্যপীড়া চ ভোজনে,
শয়নে দার পীড়াঽস্ত
ত্রিপীড়াঽস্তু দিনে দিনে।

সভায় হাসির রোল উঠল।

মহামন্ত্রী জীবগুপ্তের গাম্ভীর্যে পর্যন্ত হাসির ফাটল ধরল। অমরসিংহ হাসতে হাসতে শেষে কাশতে লাগলেন—"বেশ জমিয়েছে কালিদাস। "খুব বাঁচিয়েছে ব্রাহ্মণকে" হেসে বললেন বরুচি। চন্দ্রগুপ্ত খুব খানিকক্ষণ হেসে ভাণ্ডারীকে শত স্বর্ণমুদ্রা দেবার আদেশ করলেন। রাজকার্যে সভা গমগম্। এরি মধ্যে বরুচি একান্তে কালিদাসকে জানালেন,—"শুনেছ তো ঘটকর্পর কি বলেছেন ? যমক কাব্য রচনার শক্তিতে যে তাঁকে অতিক্রম করতে পারবে তাকেই তিনি পা ধোবার জল ঘটে করে এনে দেবেন।"

অমরসিংহ অমনি হাত নেড়ে বলে উঠলেন,—(ভঙ্গীটা ঘটকর্পরবৎ)।

আলম্ব্য বাম্বু স্তবিতঃ করকোশপেয়ং
তাবান্নুরক্ত বর্ষিতা সুরতৈঃ শপেয়ন।
জীয়েয় যেন কবিনা যমকৈঃ পরেণ তস্মৈ
বহেয়মুদকং ঘটকর্পরেণ ॥

"কিন্তু ভাই বল ভাই নারিকেল ফলের রস পান করা কঠিন।"

কালিদাস ও বরুচি উভয়েই হেসে উঠলেন।

সহসা চন্দ্রগুপ্ত প্রশ্ন করলেন,…"কবি, এ বছর রাজ-পারিতোষিক মাত্র দুজন বিদগ্ধ নাগরিককে দেওয়া যাবে বলে কোষাধ্যক্ষ জানাচ্ছেন। কালিদাস একটু হেসে চোখ মুছে বললেন—"আমার মনে হয় সে দুজন এখানেই আছেন।"

"এখানে ?"

"হাঁ, রাজন, অমরকোষ-রচয়িতা অমরসিংহ আর পাণিনি-বৃত্তিকার আচার্য উপবর্ষ শিষ্য বরুচি !"

"তাই লিখে নাও"—চন্দ্রগুপ্ত আদেশ দিলেন কোষাধ্যক্ষকে

কালিদাস বললেন—"ভাল করে লিখে নিন,—পণ্ডিত আদিত্যদাস পুত্র অমরসিংহ এবং আচার্য সোমদত্তের পুত্র বরুচি।"

"আর কালিদাস ?" মহামন্ত্রী শুধালেন সবিস্ময়ে।

"এ বছরে আমার প্রাপ্য কিছু নেই। এখনো তো কিছুই লিখিনি। লেখবার মত কিছু পাচ্ছি না।" কালিদাস সহসা বিমনা হয়ে গেলেন।

চন্দ্রগুপ্ত চোখ টিপলেন—"লেখার খোরাক পাচ্ছ না কি হে ? পাবে, পাবে।

মধ্যপ্রহরের ঘণ্টা বাজল। অমরসিংহ ও বরুচি রাজাকে অভিবাদন করে বিদায় নিলেন। কালিদাস

বরুচির দিকে চেয়ে একটু হাসলেন—"ভট্টিনী উপাকোশাকে বোল ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে।" বরুচি সলজ্জ ভাবে হাসলেন।

"তুমি যাবে না?" অমরসিংহ কালিদাসকে প্রশ্ন করলেন।

চন্দ্রগুপ্ত আবার চোখ টিপলেন—"না, ওঁর একটু শিক্ষার দরকার আছে।"

সভাকক্ষটি নির্জন হয়ে গেল। শুধু দ্বারে মূক অন্তঃপাল। দূরে একজন তাম্বূল-করঙ্ক-বাহিনী সুন্দরী তাম্বূল রচনা করে সোনার থালায় সাজিয়ে রাখছে। অন্য একটি যুবতী নীতল ফলরসের চন্দন হাতে চিত্রার্পিতার মত বসে আছে। বিক্রম মিষ্টি হেসে বললেন,—"চল।"

"কোথায়?"

"অন্তঃপুরে।"

"সহসা?"

পট্টমহাদেবী প্রবন্ধাধিনী তোমাকে দেখতে চেয়েছেন।"

কালিদাস তবু বুদ্ধের মত চেয়ে আছে দেখে বিক্রম বলতে শুরু করলেন,—"কাল ডাকাটক ভবনে যাদুকর হোগসিদ্ধি নানা ইন্দ্রজাল দেখাল। মধুরপুষ্ক ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, "কি দেখতে চান? মধ্যাহ্নে সন্ধ্যা—উদুম্বরের পুষ্প—পশ্চিমের সূর্য?" এই বলে সে দেখাতে লাগল আকাশে কমলাসনা সরস্বতী, চতুর্ভুজ বিষ্ণু, শশাঙ্ক-মৌলী শম্ভু। কিন্তু পট্টমহাদেবীর এতে মনোরঞ্জন হোল না। তিনি বললেন "এ তো নকল বস্তু প্রকৃত তো নয়।" তখন আমি বললুম "সৃষ্টি করতে পারেন এক প্রজাপতি ব্রহ্মা আর কবি।" তাতে তিনি শুধালেন,—"তোমার সভার নবরত্নের কবি কালিদাস কোথায়?"

তাঁকে তো আর বলতে পারিনে তুমি আমারি আদেশে মাধবীর কাছে গেছ।" একটু এদিক ওদিক খোঁজ করে বললুম "লেখা পড়েছ তাঁর?"

মহাদেবী বললেন—"নিশ্চয়। মেঘদূত আমার অতি প্রিয় কাব্য। কিন্তু ওঁর নায়িকাটি কে? ভট্টিনী নাকি?"

"তাই হবে।"

না মহারাজ, আমি স্ত্রীর মন নিয়ে বলতে পারি এ ভট্টিনী নয়। এ নায়িকা স্বকীয়া নয়।

আমার গা কণ্টকিত হোল—হৃদয় উত্তাল হোল। বললুম,—"প্রিয়ে, রাজকার্য নিয়ে থাকি। এত কাব্যালোচনার সময় কোথায়? তুমিই জিজ্ঞেস করে নিও কবিকে।"

কালিদাস মৃদু হাসলেন।

অন্তঃপুরের যবনী প্রতিহারিণী মহারাজকে দেখেই ভল্ল নীচু করল। এই ওদের অভিবাদন প্রথা। অবরোধে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল রেশম বস্ত্রের মৃদু খস খস শব্দ। শোনা গেল নূপুরের নিক্কণ। কোন ঘরে অক্ষক্রীড়া হচ্ছে তারি সোল্লাস ধ্বনি—কোথাও বা বীণার ঝঙ্কার। কোন সুন্দরীঘরে কলহ হচ্ছে,—"বাছা তোমাকে বিবর্ণ করা ছাড়া গতি কি? এত করে বললাম আমের বীজটিকে ঘুঁটে ভিজিয়ে ঘি মাখাবে। গোময় ও হরিণ মাংস মিশিয়ে বপন করবে। বলে গেলাম কুক্কুরকের নই শাখাটিকে ছুরি দিয়ে চেঁছে তাতে ঘি ও পক্ক দেবে—দুধ ও জল ছিটোবে। বুরাহ-মিহির তাই নির্দেশ দিয়ে গেছেন। তা সবই ওলোট পালট করে রেখেছ।

উত্তরে অপরা বলছেন,—

"কি? না হয় ভুল হয়েছে। বীজটিকেই চেঁছে ঘি পক্কে ঘুঁটে জলে রেখেছি আর গাছটির গায়ে দিয়েছি গোময় আর হরিণ মাংস। তাই বলে এত অপমান? তবে আমিও তোমার গায়ের উত্তরাষাঢ়ার পরের নক্ষত্রটি ভেঙে দেব।

"ওলো, মহারাজকে বলে মহাদেবের মাথায় ভুবণে তোকে সাজাব।"

"আমিও অশোক গাছের সাথ দিয়ে তোমার মুখ ভাঙব।"

চন্দ্রগুপ্ত ও কালিদাস হাসতে হাসতে সে স্থান অতিক্রম করে গেলেন। একটি ষোড়শী হাতে তালি বাজাতে বাজাতে আসছিল। মহারাজকে দেখেই জিব বার করে পালাল—"ওমা, মহারাজ যে।" চন্দ্রগুপ্ত তাকেই ডাকলেন—"পুষ্পবেণী"।

"আজ্ঞে মহারাজ"। পুষ্পবেণী নতজানু হয়ে অভিবাদন করল—যেন চিত্রার্পিতবিপণ।

"পট্টমহাদেবীকে সংবাদ দাও"—রাজা হাসি চেপে বললেন।

"যে আজ্ঞে"—তন্মুহূর্তে মর্কটির মত লম্ফ দিয়ে সে ছুটল। চন্দ্রগুপ্ত ও কালিদাস হেসে উঠলেন হো হো করে। পুষ্পবেণী ততক্ষণে ধ্রুবস্বামিনীর প্রকোষ্ঠ দ্বারে দোলকবণ্টা বাজিয়ে দিয়েছে সজোরে। রাজা প্রবেশ করলেন,—"ধ্রুবা, এই যে কালিদাস।"

ধ্রুবস্বামিনী একটি মৃগচর্মের উপর বসেছিলেন। মীহার শুভ্র উত্তরীয়—গৈরিকবর্ণ পরিধেয়—দীর্ঘ এলায়িত চুল ধূপের ধোঁয়ায় শুভ্র হবার ফলে কিছুটা জট বেঁধেছে। একটি শুভ্র শুষ্ক পূজার ফুল যেন। সকাল থেকে যে বিতৃষ্ণা কবির মনে লেগেছিল—যে কারণে শিপ্রার জলেও ধৌত হয় নি এতক্ষণে যেন তা সুচির স্নিগ্ধ হয়ে গেল। চন্দনের মৃদু গন্ধ হাওয়ায় ভাসছে। ধূপের অগুরু সুরভি। পট্টমহাদেবী স্মিত হেসে করজোড়ে একমুঠো চাঁপা ফুল কবির হাতে তুলে দিলেন—যেন গঙ্গার জল তরঙ্গ তুলে গেল।

"সৌম্য, উপবেশন করুন।" ধ্রুবাদেবীর লাজুক কণ্ঠ বেজে উঠল মৃদুঝঙ্কারে। মহার্ঘ স্ফটিক পাত্রে কর্পূর সুবাসিত নারিকেল জল নিয়ে এল শঙ্খপ্রধানা নাগশ্রী। চন্দ্রগুপ্ত তৃপ্তির সঙ্গে নারিকেল জল এক নিশ্বাসে পান করে বললেন,—"তোমার প্রশ্নটি কর এবার।" "আঃ কি যে বলেন আর্যপুত্র।" হাতের পদ্মের পাঁপড়িতে হঠাৎ মনোনিবেশ করে ঈষৎ রক্তিম হয়ে উঠলেন তিনি।

নববধূর এই লজ্জাটুকু পরম উপভোগ করলেন কালিদাস।

চন্দ্রগুপ্ত এবার বন্ধুকে নিয়ে পড়লেন,—"কিন্তু কবি তুমি কি মন্ত্রী হয়ে সব লেখাপড়া ছেড়ে দিলে?"

সঙ্গে সঙ্গে ব্যথিত দুটি চোখ তুললেন ধ্রুবস্বামিনী। সে চাউনি গম্ভীরবতী নদীর জলের মত নির্মল। হস্তীদন্ত খচিত পালঙ্কের উপর বসে আছেন মহারাজ—পায়ের কাছে মৃগচর্মের উপর ধ্রুবস্বামিনী।

কি সুন্দর!

অন্তোবিমুগ্রহণ চতুর চাতকের মত তাকালেন কালিদাস। স্বাতী নক্ষত্রে কি মুক্তা ফল ফলবে? চোখের উপর ভেসে উঠছে উপমার পর উপমা। সহসা বিদ্যুৎজ্যোতির মত ঝলসিত হোল—'পার্বতী পরমেশ্বরৌ'। সঙ্গে সঙ্গে নয়ন পথে উদিত হোল হিমবান হরমুখ পর্বত। এই রাজ দম্পতীকে দেবদম্পতীর রূপকল্পে স্মরণীয় করে রাখলে কেমন হয়?

মুখে বললে—"দেবী, একটি নতুন কাব্য রচনার ইঙ্গিত পাচ্ছি।"

"সাধু, সাধু, কবি, তবে এ কাব্যের নায়িকা হবেন ধ্রুবস্বামিনী।" চন্দ্রগুপ্তের প্রসারিত হাতের চাপড় কালিদাসের পিঠে পড়ল। হাতের পদ্মের পাঁপড়ীতে আবার মনোনিবেশ করলেন দেবী। তাঁর অমুক্ত সম্মতিটুকু হৃদয় দিয়ে বুঝে নিলেন কালিদাস। বললেন,—"দেবী, আপনাকে নায়িকা করবার দুরাশা রাখি না। তবে যে কাব্য আমার মনের মধ্যে গুঞ্জরিত হচ্ছে সে কাব্য আপনারই।"

ধ্রুবস্বামিনী তাঁর নলিন-নয়ন দুটি তুলে বললেন,—"তাহলে আমি কিন্তু প্রথম শুনব সে কাব্য।"

"সাধু, সাধু,। আমি তোমার এ প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করলুম।" চন্দ্রগুপ্ত আবার উচ্ছ্বসিত হলেন।

দ্বিপ্রহরের তীব্র রোদ মাথায় নিয়ে ফিরতে ফিরতে কালিদাসের মনে হোল বহুমণির ছিদ্র তো তিনি পেয়ে গেছেন এবার সূত্র প্রবেশ করালেই তো হয়। উন্মত্তের মত গৃহে প্রবেশ করেই তিনি কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করে দিলেন। ভূর্জপত্রের পর ভূর্জপত্রে ঘর পূর্ণ হয়ে উঠল। ভোজ্য নিয়ে বারবার ফিরে গেলেন ভট্টিনি। কালিদাস আবার মেতে উঠেছেন শব্দের খেলায়। এ খেলার জাল নটিমুখ্যার পানক উৎসবের চেয়েও কঠিন। কপালে করাঘাত হানলেন ভট্টিনী। মনে মনে বললেন,—

"অপ্রতিহত অমিগুলির কোন ব্যবস্থা হোল না। নদীমাতৃক ভূমি আর কতই বা আছে? গাভীগুলির জন্য কিছু শাদল ভূমি প্রয়োজন। অথচ এই তো শঙ্কু বলে গেল অমরসিংহ আর বরুচিকে ব্রহ্মদেয় গ্রাম, পারিতোষিক, রাজবৃত্তি সব পাইয়ে দিয়েছেন কালিদাস। ঘটকর্পর কতকালের বন্ধু। সে পর্যন্ত কপালে করাঘাত করে খেদ করে গেল—'আমার কপালে সবই নিষ্ফল।' অথচ এত দিনের চেনা পরিচয় মানুষটার কি সবই উল্টে।

দেবদ্বারে কান পেতে শুনলেন ভট্টিনী—

কালিদাসের কণ্ঠ বাজছে,—

'অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নগাধিরাজঃ।'

সে আবার কি?

এ দিকে ঘরের শঙ্কু শঙ্কু হয়ে উঠল। অর্থ না জানা বোঝা কঠিন। ভট্টিনী গিয়ে সব খাজ ধরে দিলেন গৃহবলিভুক কপোতগুলির কাছে।

পক্ষের পর পক্ষ কাটল, মাসের পর মাস। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় সর্গ লেখা হয়ে গেল। তাঁর তুলিকায় ফুটে উঠল,—কখনো অরণ্য, কখনো পর্বত—কখনো গেয়ে উঠল কিন্নর মিথুন—কখনো কূজন করে উঠল কোকিল—কপোত। তিনি আঁকলেন স্বর্গের চক্রান্ত—নর্তোর মহিমা। হেমবেত্রহস্ত কঠিন নন্দীর কথায় মুখ-বেঁকানো প্রথার সঙ্গীরা। শিবের নিবাত নিষ্কম্প রূপটি চোখ মুদে ধ্যান করলেন ধ্রুবস্বামিনী।

কিন্তু কি আশ্চর্য, এখনো গেল না ভোলা?

কোন অন্ধকার থেকে উঠে আসে মাধবী?

অশ্রুভরা নেত্রে দাঁড়িয়ে থাকে মালিনী।

সে যে তার অনেক দিনের নায়িকা। মালবিকা, উর্বশী, যক্ষবধূ। এবারের কাব্যে সে কি উপেক্ষিতাই রইবে?

পট্ট মহাদেবীর সখী ধৃষ্টা পুষ্পবেণী সেদিন প্রশ্ন করেছে,—"কবি কাঁদাতে পার?"

কালিদাসও অহঙ্কারের সঙ্গেই উত্তর দিয়েছেন—"পারি দৈবি।"

সেই শপথেরও উত্তর দিতে হবে।

শিপ্রা নদীতে অবগাহন করতে করতেই মাথায় এল। মন্দ কল্পনা নয়। চতুর্থ সর্গে রতি-বিলাপ লিখবেন। মাধবীকে সেই সর্গটি দেবেন শুধু। আর কাজ? মাধবীর মত কেউ কাঁদাতে পারবে? আজ মনে হয় কাশ্মীরে যাত্রার দিনটির কথা। মাধবী তার জীবনের সব কান্না সেদিন উজাড় করে দিয়েছে। হয় তো তাই আজ সেখানে শিলার কাঠিন্য।

রতি বিলাপ শুনে ধ্রুব স্বামিনীর চোখে অশ্রুধারা বইল।

সখীরা চোখ মুছলেন। ধারপার্শ্বে বসে পুষ্প বেণীও কাঁদল।

প্রিয় বিয়োগ ব্যথার অনুভবে কেমন পাণ্ডুর দেখাল সেদিন ধ্রুবা দেবীকে।

কালিদাস মনে মনে লজ্জিত হলেন।

হয়তো এতটা করা ঠিক হোল না।

হয়তো এতে পরিমিতি নষ্ট হোল।

ধ্রুবা দেবী বললেন,—"না, কবি, এ সর্গটি তোমার অমর হয়ে থাকল। পুরুরবার বিলাপে তুমি পুরুষের উক্তি লিখেছ। রতির বিলাপ তেমনি নারীর উক্তি হয়ে থাকুক।"

(৬৮৪ পৃষ্ঠার পর)

শেষ সিদ্ধান্ত। তবু যাওয়ার আগে মনের ভার হালকা হয়ে গেছে অনেকখানি। তার চাইতেও ঢের বড়ো লজ্জা অনেক বড়ো অপমানের মধ্যে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে আর একজন। সেই লম্বা, রোগা, কালো মেয়েটি। সমাজ, মানুষ, স্বাভাবিক জীবনের থেকে অনেক দূরের সমুদ্রের ওপারে সে দাঁড়িয়ে। শোভনের তবু তো মা-র স্মৃতি আছে, আশ্রয় আছে। কিন্তু কি রইল এই মেয়েটির? কিন্তু সে কেন ভাবতে যাবে? কী দায় তার? মামাই ঠিক বলেছিলেন। পৃথিবীর সব মানুষের ভালো করবার বরাত দিয়ে ঈশ্বর তাকে পাঠান নি। আর সে ভাবনার কী দাম যে দিতে হয়, তা-ও জানতে বাকী নেই আর।

পোলট্রির মোরগের ডাকে ভোর। এখনো অন্ধকার পাতায় পাতায় ছলোছলো শিশির। বাগানে সদ্য ফোটা শিউলির গন্ধ। শরৎ আসছে।

মনোহর অনেক আগেই চা আর খাবার তৈরী করতে বসেছিল। শোভন জামা কাপড় পরতে পরতেই নিয়ে এল। সুটকেসটা বেঁধে দিলে সুটকেসটা।

পাঁচটা টাকা তার হাতে গুঁজে দিয়ে সুটার নিয়ে বেরিয়ে পড়ল শোভন। কাতর চোখে মনোহর চেয়ে রইল পথের দিকে। অনেকটা বুঝেছে, কিন্তু সবটা বুঝতে পারেনি।

ফাঁকা পথে তরল অন্ধকার। ঘুমন্ত গ্রাম। শেষ রাত্রির হাওয়া। মুক্তি? মুক্তি ছাড়া আর কী। হঠাৎ চমক লাগল। একটা কালভার্টের পেছন থেকে কে ডাকছে: শোভনবাবু—শোভনবাবু—শোভন থেমে পড়ল। আবছা অন্ধকারে ঊর্ধ্বশ্বাসে একটি মেয়ে ছুটে আসছে তার দিকে। পরনে সাদা শাড়ী, সাদা ব্লাউজ। হাতে ছোট পুঁটলি একটা। অনীতা।

দ্রুত সুটার চালিয়ে পালানো উচিত ছিল, পালানো গেল না। হাঁপাতে হাঁপাতে অনীতা এসে দাঁড়ালো সামনে। মাটিতে বসে পড়ে একখানা পা জড়িয়ে ধরল তার। টপটপ করে চোখের জল পড়তে লাগল।

—কী করছেন—কী করছেন! এই রাস্তার ভেতর—

অনীতা উঠে দাঁড়ালো। মুখের ওপর দিয়ে বন্যার ধারা নামছে তার।

—হোক রাস্তার ভেতর। কাল রাতে ফিরে গিয়েও স্থির থাকতে পারিনি। আবার পালিয়ে এসেছি। জানি, ভোরবেলা এই পথে দিয়েই আপনি যাবেন। তাই কালভার্টের নীচে লুকিয়ে বসেছিলুম। আমায় মাপ করেছেন?

—করেছি বই কি।—কিন্তু আপনি এই অন্ধকারে—কালভার্টের নীচে—

—সাপে কামড়াত, এই তো? কিন্তু সে আমার কাছে কিছু নয়। থাক, আপনি ক্ষমা করেছেন, এইবার নিজের পথ আমার সামনে।

—কোথায় যাবেন?

—জানি না। বোম্বাইতে আর ফিরব না। প্রথম বাস এলে উঠে বসব। তারপর যেদিকে চোখ চলে।—

আঁচলে চোখ মুছল অনীতা: থাক, আপনি যান।

—প্রথম বাস তো সাড়ে পাঁচটা, পৌঁনে ছটায়। এখনো চল্লিশ মিনিট রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবেন?—শোভন স্থির দৃষ্টিতে চাইল অনীতার দিকে: একা?

—একা ছাড়া আমার কে আছে?

একবার ইতস্তত করল শোভন, একজনের জীবনের সব চাইতে বড়ো সমস্যাটার মুখোমুখি হল। তারপর মৃদু গলায় বললে, এক'র কথা পরে ভাবা যাবে। এখন আমার সুটারে উঠে বসুন।

—কী বলছেন আপনি?—অনীতা প্রায় চিৎকার করে উঠল।

—ঠিক বলছি। শোভন তার মুখের দিকে চেয়ে রইল স্থির দৃষ্টিতে। অন্ধকার হালকা হয়ে আসছে—চেনা যায়, ঠিক চেনা যায়। তার মায়ের মতোই আর একজন। আরো দুর্ভাগিনী—আরো অনেক চোখের জলের অতলে ডুবে আছে সে।

শোভন বললে, আসুন।

—এর পরেও?

—এই তো সত্যিকারের সময়। দেরী করবেন না। উঠে পড়ুন লক্ষ্মী মেয়ের মতো।

সুটার ছুটল।

সেই শাড়ীর আঁচল, সেই স্পর্শ, সেই মোহ। এর শেষ কোথায়?

কিন্তু পথ কোথায় শেষ হয়—পথই কি জানে? শোভনের জানবারই বা গরজ? আপাতত কলকাতা। তারপর আবার নতুন পথ শুরু হবে কিনা কে বলতে পারে।

"মেরে জিন্দগী আঁধেরে মে—"

চিত্রা? না—চিত্রা নয়। এবার অনীতা।

— শেষ —

॥ ঘুম ॥

সন্তোষ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্নপূর্ণার এই যে কি কাল রোগে ধরেছে—রাতের পর রাত কেটে যায় কিছুতেই ঘুম আসে না।

বিছানার উপর বসে হাত পাখাটা নিয়ে পাখা করতে করতে বাইরের অন্ধকার আকাশটার দিকে চেয়ে থাকেন; গুনতে থাকেন অজস্র তারাগুলিকে। কিন্তু গোনা কি যায়! চোখ টনটন্ করতে থাকে। মনের শিরাগুলো মনে হয় এক্ষুনি ছিঁড়ে পড়বে। তবুও ঐ ছোট জানলার ভিতর দিয়ে বাইরের ঐ অন্ধকার জগৎটাকে দেখা ছাড়া কিইবা তিনি করবেন!

আজকে আবার বউমা লণ্ঠনটার তেল দেয়নি। এই নিয়ে তিনি বিনুর কাছে কত অনুযোগ অভিযোগ করেছেন। ঐ দু চারদিন বেশ আলো জ্বলে, তারপর থেকে আবার লণ্ঠনের তেল কমতে কমতে দেখা যায় জ্বলছেই না। কতবার তিনি বউমাকে বলেছেন, বরঞ্চ আমাকে খেতে দিও না বা, কিন্তু রাত্রে আমার ঘরে লণ্ঠনটা জ্বালবার ব্যবস্থা রেখো নইলে আমি থাকতে পারিনে। বউমা খাওড়ীর আড়ালে মুখ টিপে বলেছে, 'চং' নে বলেছে, ঘরে বিজলী বাতির অভাব নেই তো মা, এক আধদিন তেল দিতে ভুল হয়ে গেলে অমন হা পিত্যেশ নাই বা করলেন।

কি করে বউমাকে তিনি বোঝাবেন—ঘরে বাইরে এই গাঢ় অন্ধকারের বিভীষিকার মাঝখানে, একটা ছোট্ট আলোর শিখা তাঁর মনে নির্ভয়ে থাকার আশ্বাস এনে দেয়। দেওয়াল হাতড়ে যোতাম টিপ্‌লে আলো জ্বলে সত্যি, কিন্তু তার প্রখরতা তাঁর জীবনের অন্ধকারের অস্তিত্বটাকে আরও বিকট ভাবে প্রকাশ করে দেয়।

একটু তন্দ্রা এসেছিল। হঠাৎ মনে হোতে থাকে, ঘরের ছাতটা নেমে আসছে তাঁর বিছানার দিকে। নামছে—নামছে—নামছে। আর বুঝি থামান গেলনা। মুহূর্তের মধ্যে তাঁর দম্ বন্ধ হয়ে যাবে। বিনু, দাবি, মনু, বিনুর ছেলেরা—কারো সাড়া পাওয়া যাবে না। ভাবতেই বুকের ভেতরটা ছিঁড়ে যেতে থাকে। ধড়মড় করে উঠে বসেন। নিজেকে আশ্বস্ত করে নেন, বেঁচে আছেন

কিনা? তার পাশের চৌকিটায়ে অনু শুয়ে আছে। তার পাশে সাবিত্রী। সাবিত্রীটা আজ কেন জানি ছটফট করছে। মনে হয় ও ঘুমুচ্ছে না। এই অন্ধকারেও দেখতে পান, অনুর ছোট বুকটা ওঠা নামা করছে। পাশের ঘরে বিনুর ছোট ছেলেটা কেঁদে উঠলো: কাঁচা ঘুম ভেঙে যাওয়ায় বউমা রেগে উঠে তাকে একটা চাপড় মারলে: বিনু কি তুমি কি বল্লে—শোনা গেল না। অন্নপূর্ণা একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তিনি বেঁচে আছেন। হাতপাখাটা নিয়ে চালাতে লাগলেন; বাঁশে সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে।

আজ দশ বছর হোলো বিনুর বাবা গত হয়েছেন। কিন্তু অন্নপূর্ণার ঘুম গেছে তারও দুবছর আগে থেকে। আহা কি কষ্টই পেলে লোকটা মরার আগে. দু দুটো বছর ধরে কি যন্ত্রণাই সহ্য করেছে। বালিশের স্তূপে হেলান দিয়ে—টাপানির যন্ত্রণায় ছটফট করেছেন আর বুকুকে আবোল তাবোল বলিয়েছেন।

অনুটা তখন সবে বছরের—অন্নপূর্ণা বিছানায় তার পাশে না শুলে কেঁদে কেটে অস্থির। সাবিত্রীরই বা তখন বয়েস কত? মাত্র বছর বার তের। ঐটুকু মেয়ে কি ঐ দামাল ছেলেকে সামলাতে পারে? বউমা অবিশ্যি সেই বছরেই এসেছে—কিন্তু সেই বা কত করে? ছেলেমানুষ বউ সারাদিন সংসারের ধকল পুইয়ে—একটু তাড়াতাড়িই ঘুমিয়ে পড়ে। আর তাছাড়া বিনুই বা কি ভাববে? তারও তো সাধ আহ্লাদ আছে। নতুন বউ! কিন্তু সংসারের যা অবস্থা তাতে করে আর পুষ্যি বাড়াবার কোন উপায়ই নেই। ঝি চাকর রাখার কথা অন্নপূর্ণা চিন্তাই করতে পারেননি।

গরীবের সংসারে সবই সয়ে যায়। তাই হয়তো ঐ দুধের শিশুটাও আপনি বুঝতে শিখেছিলো যে এখানে হাজার কান্নাকাটি করলেও কোন ফল নেই। তবুও মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরে মোনের কান্নে শুনে—যা ভেবে কি যেন প্রত্যাশা ক'রে না পেয়ে কেঁদে উঠেছে। অন্নপূর্ণা স্বামীর বুকে হাত বুলোতে বুলোতে, সে কান্না শুনে চমকে উঠেছেন—কিন্তু তবু উঠে যেতে পারেননি—পাছে লোকটা ঐ ফাঁকে ফাঁকি দিয়ে জন্মের মত পালিয়ে যায়।

অশ্বিনীবাবু, কিন্তু, তাঁর ঐ হাড় সর্বস্ব শরীরটাকে, তাঁর জীর্ণ ভগ্নাসনটুকুর মায়া ছেড়ে হঠাৎই একদিন সটকে পড়লেন, আর আশ্চর্যের কথা এই যে অন্নপূর্ণা তখনও তাঁর পাশে বসে তার বুকে মালিশ করছিলেন আর মুমূর্ষের চুণবালি-খসা ইট বেরুনো দেওয়ালটার দিকে তাকিয়ে সেটা মেরামতের কথা চিন্তা করছিলেন। খানিকক্ষণ পরে সবাই যখন তাঁকে জীবনের নশ্বরতা সম্বন্ধে সচেতন করে, অশ্বিনীবাবুর দেহটাকে নিয়ে চলে গেল, তিনি ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে পাশের ঘরে অনুকে বুকের মাঝে টেনে নিয়ে মেঝের উপরেই শুয়ে পড়েছিলেন। আর বোধহয় ঘুমিয়েও পড়েছিলেন একনাগাড়ে অনেকক্ষণ।

ঘুম ভেঙেছিল তাঁর তখন, যখন অনু তাঁকে ঠেলে বলছে, 'মা খেতে দাও' অনু তখন সবে চারে পা দিয়েছে। কিন্তু ছোট অনুর ঐ ছোট বুদ্ধিটাই—অন্নপূর্ণার পরবর্তী জীবনে—চোখে ঘুম না আসার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

পৃথিবীর বুকের উপর স্বার্থের হানাহানিতে, অসংখ্য মানুষের রক্তক্ষরণের সংবাদ সবেমাত্র সংবাদপত্রের বুকের উপর প্রকাশ হওয়া বন্ধ হয়েছে আর বিনুর চাকরী গেল। অন্নপূর্ণার ঘুম না আসা রোগটাও আরও বেড়ে গেল। যে ক'মাস বিনুর চাকরী ছিল না, সে ক'মাসে তিনি হারালেন অনেক। গায়ে যা দু-চারটে সোনার চিহ্ন ছিল—সেগুলো তো গেলই—অবশ্য সেজন্য তাঁর বিশেষ দুঃখ নেই, কারণ ওগুলোর প্রয়োজন তাঁর জীবনে অশ্বিনীবাবু চলে যাওয়ার সঙ্গেই ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু শ্বশুরের এই জীর্ণ ভগ্নাসনটুকু মহাজনের হাতে বন্ধক চলে গেল বলেই তাঁর যা দুঃখ। হারিয়েছেন সে ক'মাসে অনেক, সত্যি, কিন্তু পাননি কি কিছুই? পেয়েছিলেন বৈকি! এত দুঃখেও তাঁর হাসি আসে। পেয়েছিলেন বিনু আর বউমার ঐকান্তিক সেবা।

বিনুর বাবা বলতো, বিনু আমার বেঁচে বর্তে থাক, দেখবে আমার অবর্তমানে, ও তোমাদের কোন অভাব অভিযোগ রাখবে না। সত্যি, নির্ভর করার মত ছেলে এই বিনয়। পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান: উন্নতি করার পথে যা কিছু প্রয়োজন, সব আছে এই ছেলের। বছর কয়েক যাবার মধ্যেই ও একটা চাকরী যোগাড় করে নিলে। হোক ১২৫৲ মাইনে; হোক সওদাগরি অপিসের চাকরী।—বড় সাহেবের নজরে পড়লে, অনুর ভবিষ্যতে মাইনে ওর নিশ্চয়ই বাড়বে।

অন্নপূর্ণা ভবিষ্যতের দিনগুলিকে,
রঙিন তুলিতে আরও রঙিন করে তুলেছিলেন।

একশো পঁচিশ টাকা মাইনে!—তা হোক গিয়ে। সংসারে একজন প্রাণীর মুখে দুমুঠো অন্ন তুলে দেওয়ার চিন্তা থেকে অন্নপূর্ণা অব্যাহতি পেলেন। মহাজনের সুদটা হয়তো ও টাকা থেকে দেওয়া চলবে না, কিন্তু সাবি আর অনুর পড়ার খরচটা কিন্তু ঐ থেকেই কোনমতে চালিয়ে নিতে হবে। সাবিটা পড়াশুনায় ভাল, অন্নপূর্ণা বিনুকে বলেছিলেন স্কুলের কর্তৃপক্ষকে ধরে ওর পড়ার খরচটা যেন রেহাই করিয়ে নেয়। অনু একটু বোকা। ঠিক বোকা নয়—ওকেও যদি কেউ দেখিয়ে দেওয়ার লোক থাকতো, ও নিশ্চই বিনুর মত চালাক চতুর হোতো। কিন্তু যা হবার নয়, তা নিয়ে আর চিন্তা করে লাভ কি। অন্নপূর্ণা উপরের দিকে মুখ তুলে, হাতদুটো কপালে ঠেকিয়ে শুধু বলেছিলেন, তুমি আছ, নিশ্চয়ই তুমি আছ, তাই সোমত্ত মেয়ে আর বউএর হাত ধরে, ঘরের বাইরে গিয়ে লোকের কাছে হাত পাততে হয়নি। সে যে কি লজ্জা। বিনুর চাকরী হওয়ার রাতে, অন্নপূর্ণার মনে পড়ে, তিনি যেন ঘুমিয়েছিলেন।

কিন্তু তার পরের দিনই যখন সাবিত্রীর পরীক্ষার ফি আর এতদিনকার মুদির দোকানের বাকি হিসেবের তাগিদ এলো, অন্নপূর্ণা দিনের প্রখর আলোতেও অন্ধকার দেখলেন। অন্নপূর্ণার আবার হাসি এলো। নিজের সঙ্গেই রসিকতা করে জবাবদিহি করলেন, দিনে রাতে যদি প্রভেদই না থাকে—ঘুমুবো কখন?

সেই বিপদের দিনে, একজন, এ বাড়ীতে প্রবেশের পথ খুঁজে নিয়েছিল। রমেশ। পাশের বাড়ীর নীচের তলার ছোট ঘরটায় ভাড়াটে। সংসারে এক বিধবা দিদি ছাড়া তিনকুলে আর কেউ নেই। কায়েতের ছেলে, কিন্তু লেখাপড়া বিশেষ শেখেনি। কোনরকমে ম্যাট্রিকটা পাশ করে কোথায় কোন মোটরের কারখানায় ফিটার কিম্বা মেকানীক্ ঐ রকমই কিছু একটা কাজ নিয়েছে। বাপ-মা মরা ছেলে, ছোটবেলা হতেই দিদির কাছে মানুষ। লোকের বাড়ী রাঁধুনি বৃত্তি করে ভাইকে কোনমতে মানুষ করেছে। অন্নপূর্ণা অবিশ্যি দাঁতে দাঁত ঘষে বলেন, 'মানুষ না ছাই'। রমেশ কাজে ঢোকার পর থেকেই, দিদিকে পরের বাড়ীতে কাজ করা থেকে অব্যাহতি দিয়েছে। অন্নপূর্ণা যে রমেশকে এ বাড়ীতে ঢুকতে দিয়েছিলেন, সে শুধু ঐ কর্তব্য জ্ঞানটুকুর জন্যে, অন্য কোন কারণে নয়।

তা ছেলেটার যত দোষই থাক্, ওদের আপদে বিপদে করেছে অনেক, এ কথা স্বীকার করতে তিনি লজ্জা বোধ করেন না। সাবির পরীক্ষার ফীও ঐ জুগিয়েছিল। অন্নপূর্ণা অবশ্য রমেশকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিয়েছিলেন যে সে এটা ধার হিসেবে দিচ্ছে—বিনুর হাতে টাকা এলেই ওটাকা তাকে ফেরৎ নিতে হবে। বিনু—অবশ্য তাকে বোঝাতে এসেছিল, সে ওরকম দু-চারজন গায়ে পড়া লোক থাকে না, যারা কোন একটা দুর্বলতা বা মোহে পড়ে টাকা ছড়াবার মত অবস্থা না থাকলেও; টাকা ছড়ায়। ওদের কান মুচড়ে টাকা নিলে পুণ্যি বৈ পাপ হয় না। অন্নপূর্ণা সে কথায় কান দেননি, বরঞ্চ ছেলেকে ধমক দিয়েই বলেছিলেন, 'গোঁড়া বামুনের ছেলে হয়ে তুই এমন বেনের মত বুদ্ধি কোত্থেকে পেলি বাবা? ক্ষমতা থাকে খেটে রোজগার করে নিয়ে আয়; পরের ধানের পরে এমন লোভ করিসনি।

সেই রাতেই একটা দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণায় জর্জরিত হয়ে তিনি ছটফট করে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। সবাই জানে তাঁর ঘুম না আসা রোগ, শুধু সাবি বলেছিল, 'বিছানায় একটু শুয়েই দেখ না মা, যদি একবার তন্দ্রার মত আসে। অন্য রাতে যদি বা আসে, সে রাতে যে অন্নপূর্ণার তন্দ্রা আসতো না, এ কথা তিনি ছাড়া আর কে জানতেন? বিনু আপিস থেকে ফিরে আসবার পর, ওর জলখাবারের থালাটা নিয়ে ওর ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ বউমার গলার আওয়াজ পেয়ে দরজার বাইরেই থেমে গেলেন। বউমা বলছে, 'তা বেনেই বলুন আর চাষাই বলুন, তুমি যে না খেয়ে মেয়ে, ঐ টাকা শোধ করবে, সে আমি হতে দেব না। আমাদেরও ভবিষ্যত আছে—এ কথা উনি ভুলে যেতে পারেন, কিন্তু আমি তো পারিনে। কয়েক-মাস পরে তোমারও '। অস্ফুট স্বরে কি যেন বললে বউমা—শোনা গেল না ভাল করে। বিনু, বললে, তাই নাকি? তারপরে দুজনে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো। আর সেই হাসি যেন গরম সীসের মত তাঁর কানের মধ্যে এসে ঢুকতে লাগল। বিনুর দোরগোড়া থেকে ফিরে এলেন

অন্নপূর্ণা। খাবারের থালাটা সাবিত্রীর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন তার ঘরে।

আঃ এতক্ষণে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে একটু। অন্নপূর্ণা হাত পাখাটাকে নামিয়ে রাখলেন। কত রাত হবে এখন কে জানে? পুলিশ-চৌকির ঘণ্টাটা বাজলে বুঝতে পারবেন। একটা উজ্জ্বল তারা আকাশ থেকে ছিটকে পড়ে গেল। খানিকক্ষণের জন্যে সব চিন্তা তাঁর মন থেকে মুছে গেল···।

সাবিত্রীর জল গড়ানোর শব্দে, আবার তিনি নিজের চিন্তায় ফিরে এলেন। আজ যেন মেয়েটার কি হয়েছে। বিনু সন্ধেবেলায় আপিস থেকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলে, 'সাবি ফেরেনি?' বউমা বলে, 'না'। বিনু গম্ভীর হয়ে গেল, কোন কথা বললে না। অনেক রাত তখন, বোধ-হয় দশটা হবে—সাবি ফিরে এল। বউমা বলেছিল রান্নাঘরে খাবার ঢাকা আছে, খেয়ে নিতে। সে খায়নি। বললে, শরীর খারাপ। বলেই অনুর পাশে গিয়ে শুয়ে পড়েছে। অন্নপূর্ণা বেশ অনুভব করেছেন, সাবিত্রী ঘুমোয়নি—শুয়ে এপাশ ওপাশ করছে; তবু কিছু বলেননি বা জিজ্ঞাসা করেননি তাকে। আজকালকার মেয়েদের ধরণ ধারণই আলাদা। যদি কিছু বলতে গেলে—একটা জবাব দিয়ে বসে: তা নইলে আইবুড়ো সোমত্ত মেয়ে রাত দশটায় বাড়ী ফিরলে কোন মায়ে না তাকে শাসন করে!

আর তিনিই কি সাবিকে শাসন করতেন না কখনো? এইতো সেদিনের কথা—বোধহয় বছর তিনেক হবে—যেদিন সাবির পাশের খবর বেরুলো। খবরটা নিয়ে এল রমেশ। শুধু খবরই নিয়ে আসেনি, সঙ্গে করে কতকগুলো খাবারও নিয়ে এসেছিল। এখনো ভাবলেই অন্নপূর্ণার পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত রাগে শির্ শির্ করতে থাকে। তবুও সে রাগ চেপে তিনি মিষ্টি করেই বলেছিলেন, 'মিষ্টি খাওয়াবার কথা তো তোমার নয় বাবা। যে খবর এনেছ তাতে করে—'। কিন্তু কথা শেষ করার আগেই, অনু এসে থাবলা মেরে কয়েকটা মিষ্টি মুঠোর মধ্যে তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলে, কিসের মিষ্টি রমেশদা—দিদির পাশের? অন্নপূর্ণা অনুকে মারতে বাকি রেখেছিলেন। বলেছিলেন, ফেলে দে হতভাগা। মিষ্টি দেখলেই লোভ সামলাতে পারিস না? রমেশ ছোকরা—হাতুড়ির উপর যতখানি কসরত দেখাতে পারে, কথার কসরত অতটা জানে না, বলেই বেরিয়ে গেল সেদিন মাথা চুলকে, মুখ কাঁচুমাচু করে পালিয়েছিল সেখান থেকে। সাবিত্রীকে কষ্ট ছাড়েননি অন্নপূর্ণা। বলেছিলেন, অত চলানি কিসের তোমার বাছা? না হয় পরীক্ষার ফীটাই তোমার জুগিয়েছে—না হয় তোমাদের আপদে বিপদে মাঝে মাঝে দেখেই—কিন্তু তার প্রত্যেকটি পাই-পয়সার হিসেব আমার নখদর্পণে আছে—সময় এলেই কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দেব। 'বুকচুষ যে নিজের জাত গোত্তর, তাহলেও একটা কথা ছিল। এ কোন চাল্ শিখেছ?' সাবিত্রী কোন জবাব দেয়নি। শুধু বড় বড় চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়েছিল। আজকে অন্নপূর্ণা ভাবেন, সেদিন যদি সে জিজ্ঞাসা করতো—টাকাগুলো নেবার বেলায় কি জাত-গোত্তর মিলিয়ে নিয়েছিলে মা? তাহলে সত্যিই কি কিছু বলার থাকতো তাঁর? অন্নপূর্ণা নিজের মনেই হাসলেন।

বিনুর বউ যাই বলুক, অন্নপূর্ণার মনে মনে আশা ছিল, বিনু একদিন, রমেশের ধার শোধ করে দেবেই। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল, ততই আশা তাঁর দুরাশা মনে হতে লাগলো। বিনুটা আজকাল যেন কি এধরণ হয়ে যাচ্ছে। ওর চোখের দিকে তাকাতে পারেন না অন্নপূর্ণা। তাকালেই মনে হয় কি একটা সর্বনেশে আলো খেলে যাচ্ছে তার চোখে। না হয় ওদের আর একটা ছেলেই হবে, তাই বলে এত আত্মসর্বস্ব হয়ে পড়বে কেন তাঁর বিনু? সাবি, অনু কি ওর কেউ নয়? অনুটার জামা প্যাণ্ট ছিঁড়ে গেছে, স্কুলের মাইনে ঠিক সময় জমা পড়ে না। সাবিটার বয়স হয়ে গেছে। এ বয়সে মেয়েরা দু'ছেলের মা হয়ে যায়—বাবাকে ভেবে আর কি হবে।

তবু একটা ছুটির দিনে কথাটা পাড়লেন বিনুর কাছে। বললেন, অনুর স্কুলের মাইনে বাকি পড়ে গেছে দুমাসের। মাষ্টার বলেছে, ওর নাম কেটে দেবে—কি হবে বিনু?

'কি আবার হবে? আমাদের অবস্থার ছেলেপুলেদের যা হয়, তাই হবে'। অন্নপূর্ণা বিস্মিত চোখে বিনুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'ও পড়বে না?' বিনু নিঃসংশয়ে উত্তর দিলে, ও কাজটা সবাই পারে না মা—ওটা সবার জন্যে নয় অন্ততঃ তোমার অনু যে

পারেন না, এ আমি নিশ্চিত জানি। তার চেয়ে আমি বলি কি, ওকে আপনার ভালো চাকরি, আমাদেরও অভাবের সংসারে খানিকটা সাহায্য হবে, ওকে কোন একটা কাজে ঢুকিয়ে দিই।

রাগে ধিক্কারে অন্নপূর্ণা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন—বলেছিলেন, কাল মানে তো কোন হোটেলের চাকর? তোর লজ্জা করল না বিনু এ কথা বলতে—? ঐ দুখের ছেলে—।' কথাটা শেষ করতে পারেননি তিনি চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা গরম জল বেরিয়ে এসেছিল। আজ ভাবেন অন্নপূর্ণা, সেদিন জিজ্ঞাসা করা উচিৎ ছিল বিনুকে, যে, ও কি কখনও স্বপ্নের মাকেও ওর ছেলেকে কোন রেস্তোরেন্টে বা হোটেলে ঢুকিয়ে দেওয়ার কথা চিন্তা করতে পারতো? অন্নপূর্ণার আবার হাসি আসে। মনে মনে বলেন, 'এই হয়তো স্বাভাবিক'। কিন্তু এত কথার পরেও কি ওর সেদিনই বউমাকে নিয়ে বাপমায়ের কাছে যাওয়া উচিৎ হয়েছিল? একটু হেসে নিজের মনের কাছে নিজেই জবাবদিহি করেন, হয়তো এমনই হয়। কিন্তু তবু সে রাতে তাঁর মনে হয়েছিল, গোছা গোছা অন্ধকার, আকাশ থেকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে পড়ে তাঁকে আবৃত করে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করছে। সেই শঙ্কার বিহ্বলতা ছুঁতে পর্যন্ত তিনি পারেননি।

আবার গুমোট চলে উঠেছে। অন্নপূর্ণা ঢক্ ঢক্ করে এক গেলাস জল খেলেন। জল খেতে খেতে আবার হাসি এল তাঁর। পাশের বাড়ীর মৈত্রগিন্নী, একদিন কথায় কথায় তাঁকে বলেছিলেন, বুঝলেন দিদি আইবুড়ো মেয়ে ঘরে থাকলে, গলা দিয়ে জল পর্যন্ত নামতে চায়না। প্রসঙ্গটা অবশ্য হালে তাঁর মেয়ে অনুরূপার বিয়ে দেওয়ার কথা নিয়ে। মেয়ের বিয়ে ভালোয় ভালোয় চুকে যাওয়ায়, মৈত্রগিন্নী এতদিনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পেরেছেন। কিন্তু কথাটা কি সেইজন্যেই পেড়েছিলেন মৈত্রগিন্নী তাঁর কাছে—না তাঁরও ঘরে একটা বয়স্থা বিয়ে না হওয়া মেয়ে রয়েছে অথচ ব্যবস্থা হচ্ছেনা বলেই, খোঁচা দেওয়ার জন্যেই কথাটা উত্থাপন করা? কে জানে! তা সে যে জন্যেই হোক্—অন্নপূর্ণা নাচার। ভগবান তাঁর হাত পা বেঁধে রেখেছেন। সাবিত্রীর দিকে তাকালেন অন্নপূর্ণা। "আহা" গলা দিয়ে একটা সহানুভূতির আসতে চাইছিল, কিন্তু পরমুহূর্তেই দৃষ্টিটা কঠোর হয়ে এল। 'যক্ষরূপে'—যে সর্বনাশের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে এগিয়ে চলেছে তাকে তিনি কি করে বিরত করবেন?

কিন্তু প্রথম প্রথম চেষ্টার ত্রুটী তিনি করেননি। এইতো সেদিনের কথা—বিনু আপিস থেকে এসেই ওঁর ঘরে ঢুকেছিল—যা সে সচারাচর করেনা। অন্নপূর্ণা লক্ষ্য করেছিলেন, উত্তেজনায় তার চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছে। অন্নপূর্ণা তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করার পূর্বেই সে বলেছিল, 'তোমার মেয়েকে সময় থাকতে শাসন কর মা, নইলে বয়ে যেতে ওর আর বেশি দেরি নেই'। "কেন বাবা?" বিনু পূর্বের উত্তপ্ত স্বরেই জবাব দিয়েছিল, 'কেন আবার—? আজ দেখি তোমার আদরের মেয়ে, রমেশের সঙ্গে একা হাঁটতে হাঁটতে ফিরছেন। আর শুধু তাই নয় কথায় কথায় হাসির কি ঘুম'! ক্রোধে, অপমানে অন্নপূর্ণা ধৈর্য্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছিলেন, কিন্তু তবুও বহু কষ্টে নিজেকে সংবরণ করে নিয়েছিলেন তখন। বিনু বেশ অনুভব করেছিল, কি অব্যক্ত যন্ত্রনায় অন্নপূর্ণা জর্জরিত হচ্ছে, তবুও ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার আগে একটা খোঁচা দিতে ছাড়েনি। বলেছিল, 'অবিশ্যি তোমার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে রমেশ মিত্রীকে, তোমার জামাই করতে পার মা। আমার মনে হয় সে হাউণ্ড্রেড পার্সেণ্ট বিশেষ আপত্তি হবে না'। অন্নপূর্ণা এতক্ষণে মুখ খুললেন, আর ভারি মিষ্টি করেই জবাব দিলেন ছেলেকে, 'দেখ বিনু, আমাদের যা অবস্থা, আর তোর যা আয়, তাতে করে তোর বোনকে যে কোন রাজারাজড়ার ঘরে দিতে পারব এমন আশা করিনে বাবা। আমার কোন আপত্তিই হোতোনা ঐ ছেলেটার হাতে সাবিকে সঁপে দিতে, যদি ও আমাদের স্বজাত হোতো'।

বিনু আর কিছু না বলে তখনকার মত ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। অন্নপূর্ণা সেদিন সাবিত্রীকে এমন অপমান করেছিলেন যে সে কাঁদবার পর্যন্ত অবকাশ পায়নি, আর এর পর থেকেই, রমেশের সম্বন্ধে সামান্য যে কৃতজ্ঞতা বোধটুকু মনের অন্তস্তলে বিরাজ করছিল তা উপে গিয়ে একটা বিজাতীয় বিদ্বেষে তাঁর মনটা ভরে উঠেছে।

শুধু রমেশ সম্বন্ধেই নয়, বিনুকেও আজকাল তিনি কেন

জানি সহ্য করতে পারেন না। অথচ বিনু না হলে তাঁদের দুমুঠো অন্নের সংস্থান হওয়াও সম্ভবপর হোতো না। শুধু কি তাই, আরও কত ভাবে সংসারের অবস্থাটাকে সচ্ছল করার প্রয়াস পাচ্ছে সে—এইতো সেদিনের কথা—ভারি সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে বিনু এসে তাঁর কাছে কথাটা পেড়েছিল। বলেছিল, 'মা সংসারের যা অবস্থা আমি একা তো আর পেরে উঠছিলে'। তারপর একটু থেমে বলেছিল, 'সাবির যে বিয়ে দিতে পারব, এমন আশা আমি করিনে। ঘরে বসে বসে ও শরীরে মনে ভেঙে পড়ছে।' একটু ইতস্ততঃ করে তারপর বলেছিল, তার চেয়ে ওকে আমাদের আপিসে ঢুকিয়ে দি। একটা কাজ খালি আছে। তাতে করে ওর নিজের খরচাটাও চলে যাবে: সংসারেও অনেকটা উপকার হবে। একটু থেমে অন্নপূর্ণার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, অবিশ্যি তোমার যদি কোন আপত্তি না থাকে।

অন্নপূর্ণা এ কথা শুনে মনে মনে হেসেছিলেন। নৌকো যে জায়গায় এসে থেমেছে, সেখানে না বলার বা আপত্তি করার কোন প্রশ্নই আসে না। ওদের মতেই মত দিতেই হবে। এ সংসারে মেয়েদের চাকরী করাটা একটা ব্যতিক্রম। এতদিনকার নিয়ম শৃঙ্খলাকে ভেঙে দিয়ে, একটা নূতন ব্যবস্থার প্রবর্তন এটা মেনে নিতে, মনটা বিদ্রোহ করে ওঠে। তবুও তিনি অনুভব করেছেন, একটা নূতন স্রোত আসছে—সেই স্রোতে একদিন না একদিন সবাইকেই গা ভাসাতে হবে। অন্নপূর্ণাও ভাসালেন। বললেন বিনুকে, ওর যা শিক্ষে বুদ্ধি, তাতে যদি কোন ভদ্র চাকরী পায়, তবে তারই ব্যবস্থা কর। এতে আর আমার আপত্তির কি আছে? তবে এমন দুর্দিন যদি কখনও আসে, যখন তোর রোজগারেই সংসার স্বচ্ছলভাবে চলবে, সেদিন কিন্তু ওকে আর চাকরী করতে দেব না বাবা। এ কথার জবাবে বিনু কিছু বলার আগেই বউমা তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিল, হাঁ মা বাবা সত্যনারায়ণের কাছে সেই কামনাই করি দিনরাত। তেমন দিন যদি আসে, সেদিন আপনাকে কিছু বলতে হবে না। আমিই ওকে বলে, ঠাকুরঝির চাকরীতে ইস্তফা দেওয়াব। তার বিয়ের ব্যবস্থা করাও তো আমাদের কর্তব্য। অন্নপূর্ণা ভাবছিলেন সে কথা, কি মিষ্টি করেই বলতে পারে বউমা। সে রাতে খুব সম্ভব, তিনি নির্ঘুম অবস্থায় কাটান্নি।

পরের দিন, সাবি আপিসে গেল বিনুর সঙ্গে তার মুখ দেখে অন্নপূর্ণা বুঝতে পারেননি, সে খুশি না অখুশি হয়েছে। আজকালকার মেয়েদের বোঝা দায়। তবে সেদিন অনেক রাতে, মনে হয়েছিল তাঁর, সাবি কেন ফুলে ফুলে কাঁদছে। তিনি ওকে ডেকেছিলেন, কিন্তু কোন সাড়া পাননি।

কয়েকদিন পরের কথা। সাবি, সবেমাত্র আপিস থেকে ফিরেছে। অমু ওর কাছে গিয়ে আবদার ধরলে, দিদি, বাইনে পেলে কিন্তু আমাকে একজোড়া জুতো কিনে দিতে হবে। আমার স্যান্ডেলটা অনেকদিন ছিঁড়ে গিয়েছে কিন্তু। সাবিত্রী সে কথার জবাব না দিয়ে একটা ম্লান হাসি হেসেছিল। জবাব দিয়েছিল বউমা, সারাদিন পরে ছেলেপুলে আসছে, এইকি তোমার আব্দারের সময় অমুপ?

হয়তো কথাটা ঠিক। কিন্তু কয়েকদিন পরেই যখন দেখলেন যে কয়েকখানা দামি শাড়ী আর জোড়া দুএক সুন্দর জুতো নিয়ে বিনু ফিরে এল সাবির সঙ্গে, তখন অন্নপূর্ণা আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না। একটু রুষ্ট সুরেই জিজ্ঞাসা করলেন, সাবিত্রীকে, এ সব কি? সাবিত্রী সে কথার জবাব না দিয়ে পাশ কাটিয়ে কলঘরে ঢুকেছিল। খুশিতে উদ্ভাসিত মুখে, বিনু উত্তর দিয়েছিল তাঁর প্রশ্নের। 'সাহেবকে বলে' সাবির নামে আগাম টাকা নিয়েছি ওর জামা কাপড়ের জন্যে। "কিন্তু এত টাকা যদি ওর জুতো শাড়ীতেই খরচ হয়ে যায়, তাহলে সংসারের আর কি সাহায্য হবে বাবা?" বিনু এক মুখ হেসে জবাব দিয়েছিল, সে জন্যে তোমার কোন চিন্তা নেই মা। সাহেব বলেছেন, ও টাকা ধীরে ধীরে শোধ করে দিলেই হবে। এমন কি—তেমন তেমন হলে, নাও দিতে হতে পারে। অন্নপূর্ণা কিন্তু সে কথা শুনে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। বিনুর কথাগুলো বারংবার কাণে এসে বাজছিল, তেমন তেমন হলে নাও দিতে হতে পারে!—এ কেমন চাকরী?

অন্নপূর্ণা সেদিন ভালকরে বিনুর চোখ দুটোর পানে তাকিয়ে দেখেছিলেন। চোখ দুটো বড্ড চকচকে। বহুদিন আগে, বিনুর ছোটবেলায়, ওকে নিয়ে একবার চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলেন। খাঁচার মধ্যে বন্ধ করা বাঘ-

তার সুন্দর কুয়ে চোখ দুটোর কথা মনে পড়লে, আজও তিনি শিউরে ওঠেন। সেদিনে বিনুর চাউনিটাও, অন্নপূর্ণার কেন যেন ভাল লাগেনি।

কথাটা স্পষ্ট করে দিয়েছিল বউমা তারপরের ওরা সব আপিসে চলে গেলে। বলেছিল, 'আপনার মেয়ে কিন্তু খুব কাজের মা! এ কদিনেই ও চাটার্জী সাহেবের নজরে পড়ে গেছে। অবিশ্যি ওর চাকরী হওয়াই কঠিন হোত, সেদিন যদি তিনি ওর সঙ্গে গাড়ীতে করে আপিস থেকে ফেরার সময় ঠাকুরঝিকে আমাদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে না দেখতেন।' অন্নপূর্ণা অবশ্য জানতেন যে তাঁর বিনু কিছুদিন ধরে সাহেবের সঙ্গে গাড়ীতেই বাড়ী ফিরছে। সেদিন থেকেই তাঁর মন বিষিয়ে গেছে। মনে মনে কেবল ডেকেছেন সেই অবোধ অজানা ভগবানকে —তিনি তাঁকে এই পঙ্কিল আবর্ত হতে মুক্তি দিতে পারেন। কিন্তু মুক্তি চাইলেই কি পাওয়া যায়? যায় না। যদি যেত তাহলে, এই অপমানের অন্ন, অন্নপূর্ণার গলা দিয়ে কিছুতেই নামতো না। এ যে কতখানি গ্লানি, তা উনি লোককে বোঝাবেন কি করে?

অন্ধকারটা আরও গাঢ় হয়ে আসছে মনে হচ্ছে অন্নপূর্ণার। যে অন্ধকারে নিজের হাতের আঙুলগুলো পর্যন্ত দেখা যায় না। একেই কি সূচীভেদ্য অন্ধকার বলে? কে জানে—অন্নপূর্ণা অতসত জানেন না। কিন্তু এমন অন্ধকারেই বুঝি মানুষ মানুষকে আলিঙ্গন করার জন্য, সব বন্ধন কাটিয়ে অভিসারে বেরুতে পারে। অন্নপূর্ণাও বোধহয়, পথের এই শেষ ইঙ্গিতের জন্যেই, এতকাল অপেক্ষা করেছিলেন। হাসলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত বউমা আর সাবিত্রীই তাঁকে পথের সন্ধান বলে দিলে।

কালকেই তো। হাঁ কালকেই বউমা এসে অন্নপূর্ণার হাতে একটা দশটাকার নোট দিয়ে বললে, 'বাবা সত্যনারাণ মুখ তুলে চেয়েছেন মা।' অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসার দৃষ্টি তুলে তার পানে চাওয়াতে, সে কথাটা পরিষ্কার করে দিলে, 'আমার এত দিনের কামনা অনার্থক হয়নি মা, আপিসে ওঁর খুব বড় একটা প্রোমোশন হয়েছে—প্রায় একশো টাকা মাইনে বেড়েছে।' খুশিতে তার মুখ ঝলমল করছিল। কিন্তু এ খবরটা অন্নপূর্ণার মুখে যে কতখানি কালি ঢেলে দিয়েছিল, তা বোঝবার মত দৃষ্টি কি বউমার ছিল? তিনি টাকাটা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন বউমার হাতে আর বলেছিলেন, 'আমার নারায়ণ আর সত্যনারায়ণ নেই মা: আমার এ পাপ চোখে শুধু তার মিথ্যে রূপটুকুই ধরা পড়ছে। পুজোর ব্যবস্থা তুমিই করোগে বউমা।' বউমাকে কিছু প্রতিবাদ করার অবকাশ না দিয়েই, তিনি সেখান থেকে সরে গিয়েছিলেন

আর কাল রাতেই তো—সাবিত্রী যখন ফিরে এলো রাত তখন ৮টা। হাতে কয়েকখানা জামা প্যান্ট আর এক জোড়া জুতো। অসুকে ডেকে বল্লে, 'তোর'। অসু, আনন্দে ওগুলোকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল—অন্নপূর্ণার সম্মুখেই। অন্নপূর্ণা জানেন না, মানুষকে বিষাক্ত সাপে কামড়ালে, কেমন অনুভূতি হয়। কিন্তু অসুর হাতে ঐ জিনিষগুলো দেখে, তাঁর সারা শরীরে যে যন্ত্রণা প্রকট হয়ে উঠেছিল, সাপের বিষে কি তার চাইতেও বেশি কিছু হয়? অন্নপূর্ণা কখনো বিশ্বাস করেন না সে কথা। তিনি কাউকে কিছু বল্লেন না, শুধু অসুর হাত থেকে নূতন কেনা জামা, প্যান্ট আর জুতোর বাণ্ডিলটা নিয়ে জানলা গলিয়ে বাইরে নর্দমায় ফেলে দিয়ে, ওদের দিকে পিছন ফিরে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়েছিলেন চোখ বুজিয়ে—পাছে অনাথ অসুর এই পেয়ে হারানো চেহারাটা তাঁকে বিচলিত করে তোলে। কালকেই মাঝরাতে কার গুমরে কেঁদে ওঠার শব্দে, চমকে উঠেছিলেন অন্নপূর্ণা। একবার মনে হয়েছিল সাবি। কিন্তু সে কাঁদবে কেন? নিজের বুকে কান পেতে শোনা যায় না, না হলে শোনবার চেষ্টা করতেন নিশ্চয়ই। তাঁর ধারণা তাঁর বুকের ভেতরেই কে যেন গুমরে গুমরে কাঁদছিল।

আর চিন্তা করবেন না অন্নপূর্ণা। শেষ সীমায় তিনি পৌঁছে গেছেন। সম্মুখে অসীম অনন্ত অন্ধকার। ঝাঁপ দিলেই হয়। একবার চারিদিকে তাকিয়ে নেন। ঐ যে অতি পরিচিত পলতরা ভাঙা সম্মুখের দেওয়ালটা তাঁকে বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছে। অদূরে, সীমাহীন আকাশের ঝিকিমিকি তারাগুলো দুষ্টু অসুর মতো দুষ্টুমি ভরা চোখে তাঁর দিকে চেয়ে হেসে বলছে, আর কেন? হঠাৎ নজর পড়লো পশ্চিমের দেওয়ালটার দিকে। একটা কাটল ধরেছে। সত্যি নাকি? কাছে উঠে গিয়ে, অন্ধকারে হাত দিয়ে দেখতে থাকেন অন্নপূর্ণা। হাঁ কাটলই তো। একেবারে মূল থেকে—ভিত্তি থেকে উঠে আসছে উপরের দিকে— একতলা, দোতলা, তিনতলা—একেবারে ছাদ পর্যন্ত।

পারবে না—কেউ পারবে না—এই ফাটলটাকে রোধ করতে। উঃ ঐ সরু ফাটলটা দেখতে দেখতে কি বিরাট আকারই না ধারণ করছে। অন্নপূর্ণা প্রথমটা কৌতুক অনুভব করছিলেন, কিন্তু এবার ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠলেন।

খানিক্ষণের কথা অন্নপূর্ণার আর মনে নেই। যখন তিনি চোখ মেললেন, দেখলেন তাঁর মাথাটাকে কোলে টেনে নিয়ে সাবি পাখার বাতাস করছে। তিনি নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে বল্লেন, সরে যাও, সরে যাও —আমাকে ছুঁয়োনা। তিনি উঠে বসলেন। দেখলেন, সাবিত্রীর বড় বড় চোখ দিয়ে কতকগুলো মুক্তো করে পড়ছে যেন। অনেকদিন—মেয়েটাকে বুকে করেননি—আর আজই তো শেষ—তার অন্যায়ের বিচার আজ নাই বা করলেন। কিন্তু তাকে কাছে টানার আগেই সাবিত্রী তাঁর কোলের মধ্যে মুখখানা লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। অল্পক্ষণ পরে কান্নার বেগটা প্রশমিত হলে, মুখখানা অল্প একটু তুলে বললে, মা, আমায় তুমি ক্ষমা কর। আমি অন্যায় করেছি। অন্নপূর্ণা শিউরে উঠলেন। তিনি জানেন—সে অন্যায় কতবড় অন্যায়—কিন্তু তবুও তাঁর মুখ থেকে তাঁর অজ্ঞাতসারেই বেরিয়ে এলো প্রশ্নটা—'কি অন্যায়?' সাবিত্রী বললে, তোমার অনুমতি না নিয়েই, আমি রমেশকে বিয়ে করে এসেছি আজ। প্রথমটা নিজের কাণকেই বিশ্বাস করতে পারলেন না অন্নপূর্ণা। সন্দেহ নিরসনের জন্যে সাবিত্রীর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। না সন্দেহের আর কোন অবকাশ নেই। সে মুখে কোন চিহ্ন নেই ছলনার আর কপটতার। কিন্তু পরমুহূর্তেই আতঙ্কের একটা বিদ্যুৎ শিহরণ, তাঁর সারা অবয়বকে অসাড় করে দিয়ে গেল। আতঙ্কিত স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর তোর চাকরী?' চোখ মুছতে মুছতে সাবিত্রী জবাব দিলে, 'চাকরী আমি ছেড়ে দিয়েছি মা'। অন্নপূর্ণা চীৎকার করে উঠলেন 'চাকরী ছেড়ে দিয়েছিস্ সত্যি বলছিস্?' 'হাঁ মা সত্যিই বলছি। হয়তো চাকরী আবার করতে হবে, কিন্তু এখানে আর কটা দিন থাকলে যে তোমার সাবিকে খুঁজে পেতেনা মা।' অন্নপূর্ণা তবুও নিঃসংশয় হওয়ার জন্যে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'রমেশকে বলেছিস সব কথা?' লজ্জানত মুখে সাবিত্রী উত্তর দিলে, 'আমার কোন কথা তার অজানা নেই মা।'

অন্নপূর্ণা সাবিত্রীকে তার বুকের মধ্যে টেনে নিলেন। ভুলে গেলেন তিনি যে এ বাড়ীর বহুকালের জীর্ণ নিয়মের বেড়াজাল অতিক্রম করে ও এমন একজনকে বিয়ে করে এসেছে—যার এ গৃহে প্রবেশের পথ তিনি নিজে রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন। তাঁর সারা শরীরে একটা আনন্দের বন্যা বয়ে যেতে লাগলো। আজ অন্নপূর্ণার ঘুম আসবে—নিশ্চিত ঘুম আসবে। কাল হয়তো—বিনু, বউমা মুখ গম্ভীর করবে, সংসারের অভাব অনটন আরও কুৎসিৎ ভাবে প্রকট হয়ে উঠবে, বাকি পাওনার দায়ে নালিশ জানিয়ে মহাজন হয়তো শেষ সম্বল এই ভদ্রাসনটুকু থেকেও তাঁদের বঞ্চিত করবে; কিন্তু তবু, অন্নপূর্ণার আজ দুঃখ নেই। তিনি পেয়ে গেছেন—বেঁচে থাকার আশ্বাস তিনি পেয়ে গেছেন; আর তাঁর লড়নের প্রয়োজন হবে না।

অন্নপূর্ণা অনেকদিন পরে আজ ঘুমিয়ে পড়লেন।

With best compliments of

Shamali Printers

16A, Ramkanai Adhicary Lane, Calcutta-12.

Speciality in :
Printing Books on Higher Mathematics

Book, Job & Colour Printers

(২২২ পৃষ্ঠার পর)

এই সম্মেলনে যা হবার নয়েই, আঞ্চলিক কমিটি ইস্তফা দেন [illegible] সেখ ফোন, সাধুখাঁর খাঁ করে সবাই

এর পরে ইন্দ্রজিৎ মাইতিও নির্বাচনে [illegible] সেক্রেটারি হন আঞ্চলিক কমিটিতে পদস্থ দুজন [illegible] নেমে গেল, যারা আই ফাইভ-এ অথচ অনিল এ অঞ্চলে, পার্টিকে সৃষ্টি করেছিল আস্তে আস্তে, একটু একটু করে গড়ে তুলেছিল

জানকীবাবু পরিষ্কারই বললেন,

কমিটিতে পদস্থ থাকতে পারেন না

শুনেই, নন্দিনীপুর চারে চালেঞ্জেন এবং অনেক পরে আসে আপনারা যদি চান, পরে আপনাদের সামনে আসি প্রয়োপুরি দায়িত্ব করবে আজ

যে-ওর বলেছে, তুমি এতদিন যে-সব কথা বোঝাতে

এসেছেন, পায়ে পায়ে এসেছেন ওর অর্থ এই, আমাদের সমস্ত কিছুকে অনেক পিছিয়ে রেখেছেন উনি নতুন বিশ্বাসে, কাজ করে, আবার [illegible] ফিরে আসুন, আমরা চাই কিন্তু এইদিনের [illegible] করে, ওঁকে এবার আপনাদের সঙ্গে কিছুদিন কাজ করবার সুযোগ দিন।'

আশ্চর্য, অনিল এমনভাবে যা কিছু করে বসে সব শুনল, চোখে আপরাইটার মতো দেখাচ্ছিল। সে স্বীকার করল, নেতাদের এ বৈচারিক অবস্থাটা আমি বুঝতে পারি নি

প্রায়শ্চিত্তের বলল, সাধু, ওঁর কাছে আপনার যাবো একটা বিশ্বাসের অভিনয় আছে কিন্তু আপনাদের যেন বিশ্বাস ফিরে যেতে

দুটো কারণে সব থেকে অবাক হন মহিম কমিটি নির্বাচনের সভাটি হল অনিলের বাড়ীতেই প্রথম কারণ, নীলিমার ব্যবহার সেও অনিলের বিরুদ্ধেই বলল দ্বিতীয়, কমিটিতে মহিমকে রাখা হল এবং মহিমের পক্ষে স্বয়ং আলোক ওকালতি করল,

তারপর কিছুকালের মধ্যেই আঞ্চলিক কমিটি এমন

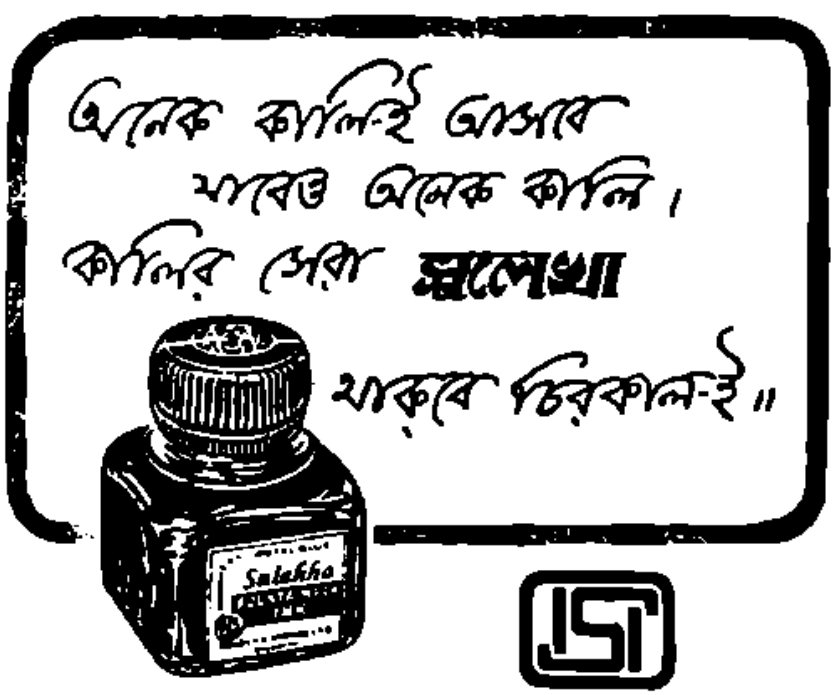

সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে মহিম যেন সিনেমার হয়ে পড়ল পাটির মধ্যে নতুন নতুন ফ্রেন্ড বিন্দু দেখা গেল। তার সকলেই ডিফিকাল্টি টাইপ তারা যেন প্রতি মুহূর্তেই একটা উৎপল বিন্দুর প্রতীক্ষা করছে। আঞ্চলিক কমিটি প্রায় প্রতিদিনই কারখানার ম্যানেজার লেবার অফিসারদের ঘেরাও করার প্রস্তাব দিচ্ছে কিন্তু শ্রমিকদের সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে না

শ্রমিকরা যদি সঙ্গে না থাকে,

লড়াই।

এ কথা একদিন বলল দলে, ছোট কাকাই প্রথম মহিমকে বিদ্রূপ করে বলল, আপনি শ্রমিকদের ঘাড়ে নিজের বোঝাটা চাপাচ্ছেন।

ছোট কাকা আজকাল তাকে মিটিংএ আপনি বলে মহিম বলল, কী রকম।

—আপনি শ্রমিকদের উৎসাহিত করতে পারেননি আপনি একলাই কেন যান নি, আপনার দায়িত্ব নেওয়া উচিত।

—একলা কী ভাবে যেতাম, তা তো বুঝতেই না

—তার মানে আপনি যথেষ্ট সচেতন নন আপনি গিয়ে দেখতেন, সবাই আসে কি না আপনি সকলকে নিয়ে যেতে চাননি আপনি কাপুরুষ

আলোক বলল, ঠিক যেমন হয়ে তাকেই সব কিছু এগিয়ে করতে হয় আপনাকে যদি পুলিশে ধরেও নিয়ে যায়, তবু। সকালের ঝোঁক মরেছে, আপনি ঠিক আপনার কাজ চালিয়ে যাবেন

ওদের গলায় এমন একটা ছেঁক, চোখে এমন তীব্র জ্যোতি, ওদের দিকে তাকিয়ে যেন কিছুতেই প্রতিবাদ করা যায় না ছোট কাকাকে আজকাল ঠিক ইংরেজী ছবির বদি চরিত্রের মতো দেখায় যেন

মুহূর্তেই কোমর থেকে একটা পিস্তলবার বের করে, গুলি করে মেরে ফেলে। আজকাল সে কথায় কথায়, একে 'ভীরুপুক' তাকে 'কাপুরুষ' অমুককে 'কাওয়ার্ড' এই সব বলছে। বাইরের যেকোনো বক্তৃতায় আগুন ছোটে তার গলায়। কিন্তু মহিমের মনে হয়, জনতা একেবারে শীতল। তাদের কোথাও সেই আগুনের আঁচ স্পর্শ করে না।

ঠিক এ সময়েই গভর্নমেন্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করল। মহিম সকালবেলায় কাগজ দেখল, অনেক নেতাই পলাতক, অনেককেই তারা ধরতে পারে নি। আলোক নির্দেশ দিল কয়েকজনকে আণ্ডারগ্রাউণ্ড চলে যাওয়ার। অনিল আর প্রাণতোষ প্রথম। সে নিজেও আত্মগোপন করে চলল। আর মেসেজের পর মেসেজ আসতে লাগল।

মহিমের বাবা বাড়িতে চীৎকার করতে লাগল, 'এবার মহিমও ধরা পড়বে।' সন্তোষ তো ভীষণ ভয় পেল মহিমের জন্যে।

মহিম নিজে খানিকটা ন যযৌ ন তস্থৌ হয়ে রইল। কোনো নির্দেশ নেই তার প্রতি। সুতরাং সে কাজে যেতে লাগল। প্রতি মুহূর্তে সংশয় ঘটলেও, তাকে গ্রেপ্তার করা হল না।

কিন্তু নির্দেশ এল কয়েক দিন পরেই। একদিন রাতে একটি ছেলে এল বন্ধ খামের মধ্যে চিঠি নিয়ে। চিঠি দিয়েই সে চলে গেল। মহিম তাকে ডাকতেই সে বলল, যা আছে সব চিঠিতে. আমার সঙ্গে আপনার কোনো কথা হবে না। এই নির্দেশ আছে।

ছেলেটি পার্টিতে নতুন এসেছে, তা জানত মহিম। চিঠি খুলে দেখল, ছোটকাকা লিখেছে। কয়েকটি নাম জানিয়ে লিখেছে, 'এঁরা সকলেই আপনার পরিচিত, আপনার সহকর্মী। আমি এখন থেকে শুধু 'এস' নাম নিয়ে আপনাকে চিঠি লিখব, তাতেই বুঝবেন আমি লিখছি। যে কোনো চিঠি পাবেন, পড়েই ছিঁড়ে ফেলবেন। এটাও ছিঁড়ে ফেলবেন, আঞ্চলিক কমিটির নির্দেশে

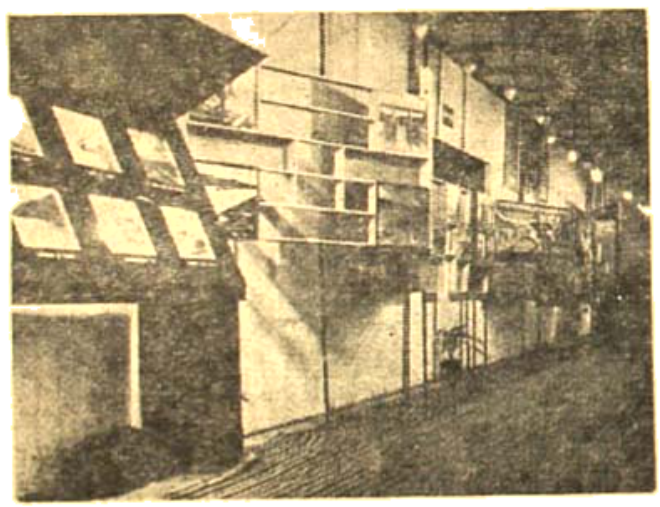

"RABICHITRAM"

DESIGNERS, INTERIOR DECORATORS,
DISPLAY—FILM PRODUCERS

State Trophy Winners

Please, contact Liason Officer at

78, Mahatma Gandhi Road, Calcutta-9

Phone : 34-4828

আপনাকে আমি জানাচ্ছি, সরাসরি পার্টির নামে, পরপর অন্তত তিনটি করে পথ সভার ব্যবস্থা আপনাকে করতে হবে। বাইরে আমাদের যে সব পার্টি সভ্য ও সমর্থকেরা আছেন, তাদের সবাইকে আমাদের নির্দেশ জানাবেন, এবং এক মাত্র সেই পর্যন্তই এই চিঠি আপনার হাতে থাকবে। তারপরে ছিঁড়বেন। পথসভা বা কারখানার ছুটির সময়ে সেই মিটিং, অবশ্যই পার্টির নামে করতে হবে। কোনো দ্বিধা করা চলবে না। যে কোনো আক্রমণই আসুক, পেছুবেন না। আপনাদের রক্ষা করার জন্য আমাদের সশস্ত্র একশন পার্টি আপনাদের কাছে পিঠেই থাকবে। ইতি—।

সমস্ত ব্যাপারটা ভোজবাজীর মতো লাগছে। কিন্তু মহিম ওর বিস্তৃতা নষ্ট করল না। পরদিন গোপন সভা ডেকে সবাইকে চিঠি পড়ে শোনাল। মিটিং ও করল। কিন্তু কোনো সভাই সার্থক হল না। বস্তিতে বস্তিতে বৈঠক করতে লাগল। যতোই নিজের মধ্যে অবিশ্বাস ঘন হয়ে আসতে লাগল, আত্মবিশ্বাস কমে যেতে লাগল, ততোই নিজের প্রতি নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে লাগল মহিম।

একদিন পথ সভায়। একজন বক্তা স্পিনারকে দালালরা আক্রমণ করল। হত্যা করে নর্দমায় ফেলে দিল। নির্দেশ এল, 'প্রতিশোধ নিন।' কিন্তু কার ওপরে? কয়েকজন মিলে মেরেছিল। পার্টির সকল লোকেরা পালিয়ে গিয়েছিল মহিমও একটা দোকানে আশ্রয় নিয়েছিল। কেবল একশ হাত ঘুরে কারা যেন দুটো বোমা ফাটিয়ে চলে গিয়েছিল।

একে একে কয়েকজন গ্রেপ্তার হয়ে গেল। যারা গ্রেপ্তার হল, তারা সকলেই চাকরি করত। পরিবারগুলো অসহায় হয়ে পড়ল। নির্দেশ এল, 'চাঁদা তুলে পরিবার-গুলোকে পালন করুন

কোনো নির্দেশই অমান্য করল না মহিম। কিন্তু সবটাই অর্থহীন মনে হতে লাগল। কারণ জনসাধারণের কাছ থেকে কোনো সাড়া নেই। অথচ ধর্মঘট করবার নোটিশ আসছে। কারখানার গেটে পর্যন্ত বোমা ছোঁড়া হচ্ছে।

একদিন এইভাবে ধর্মঘট করতে গিয়ে, গেটে, সশস্ত্র আক্রমণ করল পার্টি। ভোররাত্রের অন্ধকারে, আলোককে

কপার বই

রাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী

লেখক—**অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর**। 'রাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের অমূল্য অবদান। শিল্পজগৎ-সম্পর্কীয় গভীরতম সত্য, তত্ত্বকথা, রসবোধ ও বিচার-বিশ্লেষক প্রবন্ধগুলির মধ্যেও ঘটেছে অপরূপ সমাবেশ। দাম: **বার টাকা**

নৈরাজ্যবাদ

লেখক—**ডঃ অতীন্দ্রনাথ বসু**। নৈরাজ্যবাদের কল্পনা বহু প্রাচীন। প্রাচীন যুগ থেকে আরম্ভ করে উনিশ শতক পর্যন্ত নৈরাজ্যবাদের বিস্তার এই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য। দাম: **দশ টাকা**

ভারতের শিল্প-বিপ্লব ও রামমোহন

লেখক—**সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর**। ধর্ম, সমাজ এবং দেশের অর্থ নৈতিক সংস্কার প্রভৃতি ব্যাপারে রামমোহনের দূরদৃষ্টি দেশের কল্যাণে সামনে রেখেই ছিল। ভারতের শিল্প-বিপ্লবের সূচনাকালে ভারতপথিক রামমোহনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তাই অনস্বীকার্য। দাম: **ছয় টাকা**

জীবন-জিজ্ঞাসা

লেখক—**আইনস্টাইন**। অনুবাদক—নৈরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ভূমিকা—সত্যেন্দ্রনাথ বসু। মানুষ আইনস্টাইনের পরিচায়ক এই গ্রন্থে তাঁর সাধারণ অভিমত ছাড়াও স্বাধীনতার আকাঙ্খা, ধর্ম ও নীতিবোধ, শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্র এবং পরিবার ইত্যাদি সম্বন্ধে আইনস্টাইনের রচনাবলীর পূর্ণাঙ্গ সংকলন করা হয়েছে। দাম: **আট টাকা**

বাঙালী

লেখক—**প্রবোধচন্দ্র ঘোষ**। বাঙালীর ঐতিহ্য ও ভবিষ্যৎ, বৈশিষ্ট্য ও সমস্যা, সমাজ ও সংস্কৃতি প্রত্যেক ভারতীয়ের কাছেই অনুশীলনের বস্তু। সারা ভারতের পটভূমিতে সেই বিশ্লেষণ ও আলোচনা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। দাম: **ছয় টাকা**

ফরাসীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ

বিভিন্ন ফরাসী বুদ্ধিজীবি লিখিত এবং **পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়** কর্তৃক অনূদিত। মাঁ-জন্ পার্স, আঁদ্রে জিদ্, আঁদ্রে মোরোয়া থেকে শুরু করে প্রায় আধডজন ফরাসী গুণীর চোখে রবীন্দ্রনাথের যে-রূপ ধরা পড়েছে, তারই কয়েকটি এখানে সংকলিত করা হল মূল ফরাসী গ্রন্থ থেকে। দাম: **পাঁচ টাকা**

আমার ঘরের আশেপাশে

লেখক—**ডঃ তারকমোহন দাস**। ভূমিকা—সত্যেন্দ্রনাথ বসু। নিজেদের দেশের ফুল ফল, গাছপালার ওপর এক স্বাভাবিক আন্তরিকতাবোধ মানুষের রক্তের সঙ্গে মিশে আছে। কি তাদের নাম? কি তাদের জীবন-বৈশিষ্ট্য?—সেই কাহিনী পরিবেশনই এই বই-এর মূল লক্ষ্য। দাম: **পাঁচ টাকা**

রূপা

রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী

১৫ বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

বড় বাজারের আধুনিক রুচিসম্মত
তাঁত, সিল্ক ও মিল বস্ত্রের
বিচিত্র সম্ভারে
ব্যানার্জি ব্রাদার্স
২২৫, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

চিনতে অসুবিধে হল মহিমের। মহিম ঈঙ্গিত করল আকে ফরবেকে পেটে সবাই তো মজুর, কাকে যাকে

—ওদের টেরোরাইজ করে দিতে হবে

ভয় দেখিয়ে ধর্মঘট। তার ফল হল, প্রতিশ্রুতি গোলমাল লেগে গেল। সবাই পালাল। ধরা পড়ল কেবল মহিমের ছেলেবেলার বন্ধু। তাকে শ্রমিকেরাই রক্তাক্ত করে রাস্তায় ফেলে দিল। গালাগাল দিল, থুথু দিল। কারণ একটি মেয়ে শ্রমিক বোমার আঘাতে আহত হয়েছিল।

সেইদিনই, কারখানা থেকে মহিমকে গ্রেপ্তার করল, পুলিশ তার অনুরোধ মতো একবার বাড়ি নিয়ে যাওয়া হল কিন্তু তখন বাপ কাকা কেউ বাড়ি নেই। কাকী চীৎকার করে কাঁদতে লাগল। ষোড়শী পুলিশকে শুনিয়ে ঘর থেকে মহিমকে ডাকল, একবারটি এখানে এস।

পুলিশ প্রথমে দ্বিধা করল। একজন অফিসার আগে ঘরটি দেখে এল, বাইরে যাবার আর কোনো দরজা আছে

অপূর্ব সুযোগ

Marconi Fan

বিখ্যাত
মার্কনী ফ্যান
এ.সি./ডি.সি.

(CEILING, TABLE, PEDESTAL & EXHAUST FANS)
নির্ভরযোগ্য সুদৃঢ় আরামপ্রদ বহুল পরীক্ষিত বৈদ্যুতিক পাখা

আজই কিনুন—
সহজ মাসিক কিস্তিতে কিনুন
(কোন অতিরিক্ত মূল্য লাগবে না)

Marconi Fan

Marconi Fan

মার্কনী ইলেকট্রিক করপোরেশন (প্রাঃ) লিঃ
১১৭, কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯।
ফোন : ৩৫-৩০৪৮

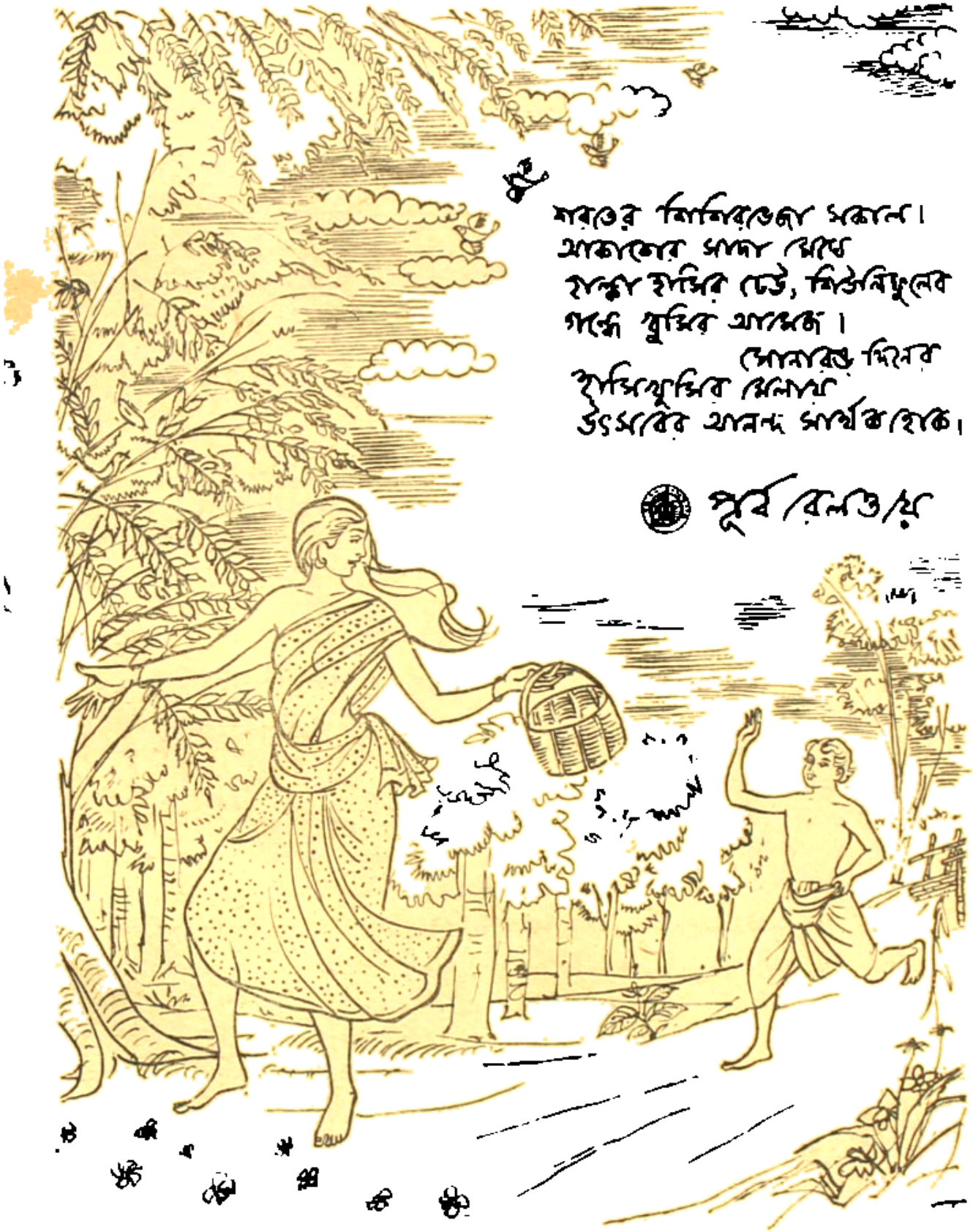
শরতের শিশিরভেজা সকালে।
আকাশের সাদা মেঘে
হাল্কা হাসির ঢেউ, শিউলিফুলের
গন্ধে খুশির আমেজ।
সোনারঙা দিনের
হাসিখুশির মিলনে
উৎসবের আনন্দ সার্থক হোক।
পূর্ব রেলওয়ে

With best compliments from

NISCO

SYMBOL OF NO ERROR INSTRUMENTS

The National Scientific Equipment Co.

22, Nasiruddin Road.

Calcutta-17.

কি না। তারপরে অনুমতি দিল মহিমকে। মহিম ভিতরে গেল।

ঘোড়শী তার দিকে অপলকে চেয়ে রইল। মহিম বলল, কী?

ঘোড়শী নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ল, কিছু না। তোমাকে এরকমটি দেখিনি।

—বাবাকে বলো! খুব রাগ করবে। কিন্তু কী করব।

বলে মহিম যেন একটু দ্বিধায় পড়ল। তারপরে ঘোড়শীর পায়ের দিকে হাত বাড়াল। আশ্চর্য, ঘোড়শী বাধা দিল না। দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল। তার যেন খেয়াল নেই, মহিম তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছে।

দু'বছর বাদে, মহিম জেল থেকে ফিরল। টিলাস এ্যাণ্ড ওয়ার্কাস পার্টির সব বন্দীদেরই ছেড়ে দিচ্ছে আস্তে আস্তে। কারণ, তারা ভুল পথে যাচ্ছিল, এটা তারা নিজেরাই স্বীকার করেছে।

মহিম জেলে থাকতেই শুনেছিল, যাত্রের দিকে প্রায়ই প্রাণতোষ বাড়িতে আসত। ঘোড়শীর একটি ছেলে হয়েছে। ছেলে হবার কয়েকদিন পরেই সে ঘর ছেড়ে যায়।

বাড়ি এসে ঘোড়শীর সামনে যেতে ঘৃণা হয়েছিল প্রথমে মহিমের। কিন্তু ঘোড়শীর দিকে তাকিয়ে সে ঘৃণা পোষণ করতে পারে নি। ঘরে ঢুকে তাকে কেবল বলেছিল, তোমার কাছে আমার কিছু গোপন করার নেই। বিশ্বাস করবে না জানি, প্রাণতোষের হাত থেকে সত্যি বাঁচাতে পারি নি নিজেকে। এ ছেলে তোমার খুড়তুতো ভাই।'

মহিমের ভিতরে যেমন ক্রোধ, তেমনি একটা অপূর্ব শান্ত ধীর ভাবও এসেছে। সে বলল, তা বেশ তো, ক্ষতি কী। তোমার বা ছেলেটার কোনো দোষ দেখি না আমি।

ঘোড়শী আর কথা বলতে পারেনি।

কিন্তু মহিম এ সংবাদও পেয়েছে, প্রাণতোষ একটা স্টেনগানওয়ালা ডাকাতদলের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। আর আলোকে বর্ধমানে একটা বিরাট প্রেস খুলে বসেছে।

মহিম তারপরে গেল অনিলের কাছে। অনিলকে খুঁজতে কিন্তু বাড়ি যেতে হল না। শ্রমিক বস্তিতেই, রাস্তার ধারে তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। অনিল তাকে জড়িয়ে ধরল

মহিম বলল, এখন কী করব অনিল?

অনিল বলল, কী আবার? পার্টির নির্দেশেই আমরা কাজ করব। ভুল রাস্তা ধরা হয়েছিল। কিছু এ্যাডভেঞ্চারিস্ট লোক ঢুকে, অনেক ক্ষতি করে গেছে। সেই সব ক্ষতি পূরণ করতে হবে। আমরা যে কারণে জীবনকে উৎসর্গ করেছি, তা আজ সারা পৃথিবীর মানুষ চায়: মানুষের সুখী জীবন, নিরাপত্তা এবং রাষ্ট্রে তাদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করা, তা হলে আমরা একটা গোটা সুখী মানব সমাজ গড়তে পারব। মানুষ মানুষকে সবই হয় তো দিতে পারে না, আর যা রইল, সে তো আমাদের ব্যক্তি জীবনের পবিত্র অনুশীলন।

কথাগুলো শুনে মনটা ভরল, কিন্তু বুকটা চনচনও করতে লাগল

—শেষ—

বিংশ শতাব্দী

কার্ত্তিক ১৩৭০ (১৮৮৫ শকাব্দ)

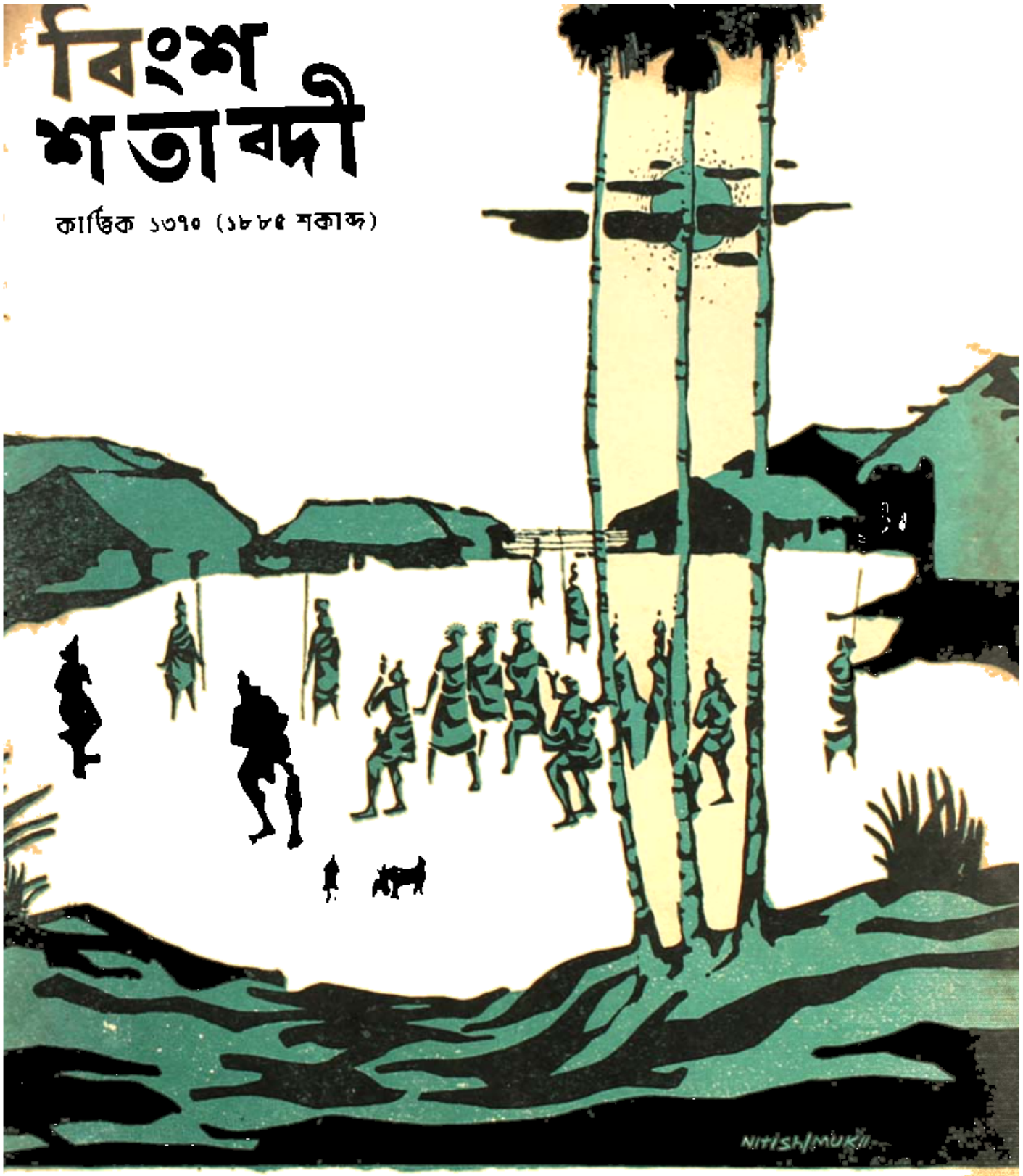

ভারত সরকার

প্রিমিয়াম প্রাইজ বণ্ড ১৯৬৩

উৎসব মুখর দিনগুলির জন্য
শ্রেষ্ঠ উপহার

১৯৬৩ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বিক্রী করা হবে

এখনই কিনুন এবং আগামী বছরে একটা আকর্ষনীয় পুরস্কার পাওয়ার সুযোগ নিন

নিম্নলিখিত অফিসগুলিতে বিশদ বিবরণ পাবেন :—

ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সমস্ত অফিসগুলি
ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার শাখা অফিসগুলি
এবং এর সহযোগী ব্যাঙ্কগুলি
সমস্ত হেড পোষ্ট অফিস এবং
বিভাগীয় সাব পোষ্ট অফিসগুলি

জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা

DAVP/163 (Bengali)

আহারের পর দিনে দু'বার..

সব খাতুতে স্বাস্থ্য লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়

দু' চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্ট (৩ বৎসরের পুরাতন) সেবনে আপনার স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহাদ্রাক্ষারিষ্ট মুসড়ুসকে শক্তিশালী এবং সর্দ্দি, কাসি, শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক ফলপ্রদ। মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্দ্ধক ও বলকারক টনিক। দু'টি ঔষধ একত্র সেবনে আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলব্ধ স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে।

সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান

সাধনা ঔষধালয় • ঢাকা

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্ব্বেদ-আচার্য্য, ৩৬, মোয়াদপা ড়া রোড, কলিকাতা-৩৭

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন), এম,সি,এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

স্বাধীনভাবে কর্মরত স্বর্ণকারগণ

১৯৬৩ সালের ১০ই জানুয়ারীর পূর্ব থেকে তার বেশী সময় যাবত্ আপনি যদি এই রকমভাবে কর্মরত থেকে থাকেন—

আপনি যদি ব্যবসায়ী হিসেবে ইতিমধ্যে লাইসেন্স না নিয়ে থাকেন অথবা বাইরের কর্মী হিসেবে নিযুক্ত না হয়ে থাকেন—

তাহলে আপনি এখন কয়েকটি সর্তে **স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ বিধি** অনুযায়ী **সার্টিফিকেট** পাওয়ার যোগ্য।

এতে আপনি ১৪ ক্যারেটের চাইতেও বিশুদ্ধ সোনার **গলিয়ে** এ **একই বিশুদ্ধতার সম** পরিমাণ গহনা বানাতে পারবেন

সমস্ত পোষ্ট অফিসে অথবা স্থানীয় সার্টিফিকেটের জন্য আবেদনপত্রও পাওয়া যাবে

১ টাকার কেন্দ্রীয় আবগারি রাজস্ব টিকিটসহ যত শিগগীর সম্ভব আপনার আবেদনপত্র পাঠান।

১৯৬৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের পূর্বে অবশ্যই সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে হবে।

আবেদনপত্র পরীক্ষা করে সার্টিফিকেট দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আপনি আপনার ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারেন।

স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ
ভারত সরকার

DA 63,292 (Beng)

স্বপ্নের মোহজাল রচে . .

হিমকল্যাণ

আয়ুর্বেদীয় হিমসিদ্ধ
সুরভিত কেশতৈল।

পামিকোকো

মৃদু সুরভিত
নারিকেল তৈল।

হিমকল্যাণ ক্যাস্টর অয়েল

বৈজ্ঞানিক উপায়ে
পরিশোধিত ও
সুরভিত কেশতৈল।

ভৃঙ্গামলা

ভৃঙ্গরাজ ও আমলা
সহযোগে প্রস্তুত
স্বাস্থ্যকারী
কেশতৈল।

যোজনগন্ধা

বহুগন্ধ
সুরভি নির্য্যাস।

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস্ লিঃ
কলিকাতা-৪

নিত্য ব্যবহারে স্বাস্থ্যকরতায় প্রতিটি অপরিহার্য . .

UPCO

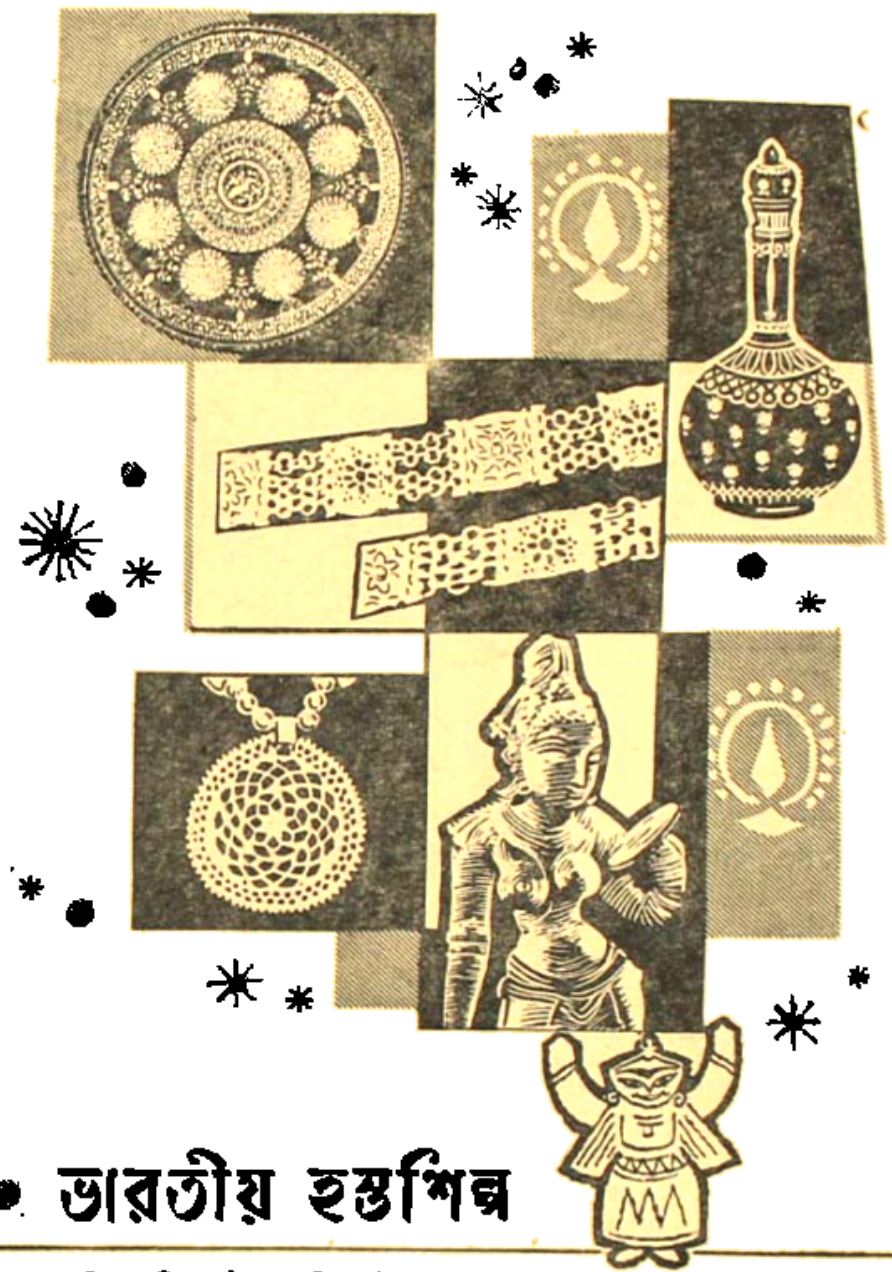

ভারতীয় হস্তশিল্প

…বিশেষ বিশেষ উৎসবগুলিতে উপহার দেওয়ার জন্য হস্তশিল্পজাত নানারকম জিনিস আপনি পছন্দ করতে পারেন…বিশেষ পোষাকের সঙ্গে ব্যবহার করার উপযুক্ত সুচারু স্পষ্ট ও অতি সুন্দর কারুকার্যখচিত অলঙ্কার…সোনা বা রূপার তারে তৈরী অপূর্ব সুন্দর অঙ্গভূষণ—শিল্প সৌন্দর্যে মণ্ডিত ধাতুপাত্র…সোনা অথবা রূপার কাজ করা তামা ও পিতলের পাত্র…সূক্ষ্ম কাজ করা হাতির দাঁতের দ্রব্যাদি…মৃদু স্বাভাবিক সুরভিযুক্ত চন্দনকাঠের দ্রব্যাদি…আবলুস কাঠ এবং পিতল দিয়ে সুচারু নক্সায় তৈরী জিনিসপত্র…কাশ্মীরের নীল, দিল্লীর বা পুরন্দরের কালো রঙের, অসংখ্য রকম নক্সা ও আকারের পাত্রাদি…দেশের কারুশিল্পীগণের তৈরী এই সব দ্রব্যাদির প্রত্যেকটি, শিল্প নিদর্শন হিসেবে অপূর্ব…কারুশিল্পীগণের সুমহান পারম্পরিক ঐতিহ্যে পরিপূর্ণ।

অখিল ভারত হস্তশিল্প বোর্ড, শিল্প অধিদপ্তর, ভারত সরকার DA 63/304 (Beng)

বিংশ শতাব্দী গ্রাহকদের জন্য

প্রতি সংখ্যা 'বিংশ শতাব্দী'র মূল্য ৭৫ নয়া পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা **নয় টাকা (সডাক)** ষাণ্মাসিক **সাড়ে চার টাকা (সডাক)**। প্রতি সংখ্যা 'বিংশ শতাব্দী'র আনুমানিক পৃষ্ঠা সংখ্যা একশ আঠাশ। এছাড়া শারদীয় সংখ্যা ও অন্যান্য বিশেষ সংখ্যাগুলি আয়তনেই নয়, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, চিত্র সর্বদিকেই এই পত্রিকার মান যথেষ্ট উন্নত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া পাঠক ও গ্রাহকবর্গের সুবিধার জন্য আমরা একটা বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। বিংশ শতাব্দীর যাঁরা **বার্ষিক গ্রাহক** কেবল তাঁরাই **অতিরিক্ত মূল্য ছাড়া শারদীয় সংখ্যা** সমেত অন্যান্য বিশেষ সংখ্যাগুলি পাবার অধিকারী।

আষাঢ় মাসে 'বিংশ শতাব্দী'র বর্ষ সুরু ঐ সময় থেকে গ্রাহক হওয়া সুবিধাজনক। কিন্তু গ্রাহকেরা বছরের যে কোন সময় থেকে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হতে পারেন। মণি অর্ডার, চেক বা ক্রশ পোস্টাল অর্ডারে চাঁদা পাঠাতে পারেন। চাঁদা পাঠানোর সময় পরিষ্কার হরফে নাম ও ঠিকানা এবং কোন মাস থেকে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হতে চান তার স্পষ্ট উল্লেখ থাকা দরকার।

'বিংশ শতাব্দী'র গ্রাহক হইবার আবেদন পত্র

কর্মাধ্যক্ষ মহাশয়,

আমাকে.....মাস হইতে 'বিংশ শতাব্দী'র বার্ষিক/ষাণ্মাসিক গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইয়া সডা কার্ড পাঠাইয়া দিবেন আমি এই সঙ্গে নয় টাকা/সাড়ে চার টাকা ক্রশ পোস্টাল অর্ডারে পাঠাইতেছি।

নাম.....

ঠিকানা.....

তারিখ.....

যাঁহারা মনিঅর্ডারে টাকা পাঠাবেন তাঁহারা উপরোক্ত মর্মে কুপনে নাম ঠিকানা ও কোন মাস হইতে গ্রাহক হইতে চান তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিবেন।

পাকিস্তানের ক্রেতারা নিউজ কর্পার, কে. সি. দে রোড, চট্টগ্রাম এবং নুরুল হাসান ৩০, হরিকেশ দাস রোড, ঢাকা—১। এই ঠিকানায় পত্রিকা পাইবেন।

নিবেদক—
প্রচার সচিব।

টাকা পাঠাবার ঠিকানা :—
বিংশ শতাব্দী
২০, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫
ফোন—৫৫-৪৪২৫

সূচীপত্র

বিংশ শতাব্দী
অষ্টম বর্ষ : ৫ম সংখ্যা
কার্তিক ১৮৮৪

লেখক		বিষয়
সম্পাদকীয়	৭৬১	আমাদের কথা
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৬২	প্রশ্ন (উপন্যাস)
আবদুল আজীজ আল্-আমন	৭৭০	"মোসলেম ভারতে"র নজরুল
মৃত্যুঞ্জয় মাইতি	৭৭৫	নতুন জনপদ (উপন্যাস)
অজিত দে	৭৮৫	ডি. এইচ্ লরেন্স ও কয়েকখানি চিঠি (প্রবন্ধ)
সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৯১	সেই অচেনা মানুষটি (উপন্যাস)
অমল ঘোষ	৮০১	ছবির প্রতিচ্ছবি (ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা)
অমল হালদার	৮১২	আর এক মস্তিষ্ক (বিশ্ব-সাহিত্য)
দুর্গা ভট্টাচার্য	৮১৫	কবি জয়দেব ও বাংলা সাহিত্য (প্রবন্ধ)
নারায়ণ চক্রবর্তী	৮১৯	অনুরাগ (গল্প)
প্রলয় সেন	৮২৯	মধ্যবিংশ শতক ও বাংলা ছোটগল্প (প্রবন্ধ)
অমলেন্দু ঘোষ	৮৩৭	ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী প্রণীত 'মধুযামিনী' (সংক্ষেপী)
মলয় দাশগুপ্ত	৮৪৪	একটি ঘটনার বিস্মৃতি (গল্প)
মলয় রায়চৌধুরী	৮৪৯	সেন্ট আমব্রোজে-র সাম্যবাদ (প্রবন্ধ)
কমলকুমার সান্যাল	৮৫৭	শিল্প (প্রবন্ধ)
	৮৫৭	নতুন বই (পুস্তক সমালোচনা)
পরিমল চক্রবর্তী	৮৫৯	মেঘ, তবু মেঘ নয় (কবিতা)
রমেশ্বর হাজরা	৮৫৯	মানসযাত্রী (কবিতা)
শ্রীপদ সেনগুপ্ত	৮৬০	অনন্যা (কবিতা)
চন্দ্রশেখর রায়	৮৬০	নাট্যরূপ (কবিতা)
মণি চৌধুরী	৮৬১	স্পোর্টস কন্ট্রোলবোর্ড না কংগ্রেস সংগঠন (প্রবন্ধ)
অমিত রায়	৮৬১	খেলাধূলা প্রসঙ্গে (খেলাধূলা)
রঞ্জন মজুমদার	৮৬৬	আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রে নবতর দৃষ্টিভঙ্গী (রঙ্গজগৎ)

অঙ্গসজ্জা
নীতিশ মুখোপাধ্যায়

বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ

এখানে যে বিষয়গুলি উল্লেখ করা হচ্ছে তা প্রত্যেক ভিয়েতনাম অধিবাসীর পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি আমাদের ও আমাদের পরিবারের পক্ষে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ, চীনের আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রস্তুতির ওপরে জাতির সমগ্র ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। আমাদের দেশ রক্ষা করতে হবে, আমাদের দেশের জনগণ রক্ষা করতে হবে—কিন্তু তাই বলে আমরা আক্রমণকারীর কাছে নমনীয় হয়ে থাকবো না।

চীনা আক্রমণের ভয়

সত্য কথা হল এই যে আমাদের সীমান্তে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়ে গেছে, চীনফ্যাসিস্টদের আক্রমণের আশঙ্কা এখনও রয়েছে। চীন এখন পর্যন্ত সমগ্রে, প্রায়ের ১৫০০০ বর্গ মাইল স্থল অধিকার করে আছে এবং আমাদের সীমান্তে তাদের সৈন্যসংখ্যা বাড়িয়ে চলেছে। তাইতো যে কোন মুহূর্তে আক্রমণের জন্য আমাদের তৈরী থাকতে হবে। আমাদের মাতৃভূমি থেকে শেষ আক্রমণকারীটিকে পর্যন্ত বিতাড়িত না করে আমরা ক্ষান্ত হবো না। আমরা এই প্রতিজ্ঞার ভঙ্গ করবো।

অত্যন্তপূর্ণ দায়িত্ব

এখন মন্ত্রী ত্রিদণ্ডবাহনে যেকোন সময় জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিল থেকে টাকা তোলার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সর্বস্তরের লোক তাতে বিপুলভাবে সাড়া দেন।

আমরা উৎসর্গ হয়ে পড়ে রয়েছি.....কারখানা.....খনিগুলো রক্ষা করার জন্য যে কোন সময় আপ দেবার জন্যে আমরা প্রস্তুত রয়েছি।

দৃঢ় সঙ্কল্প

আসুন, আমরা দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করি যে, আমাদের দায়িত্বের শুরু হওয়া যে আমরা কেন নিয়েছে তা শুরু না হওয়া পর্যন্ত আমরা শান্ত হবো।

আমাদের যদি আমাদের সন্তানদেরই লেখা শুরুতে আবার হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে আজ কর্ম বলার পরিবারে তবে লাভ কি? আসুন আমরা অর্থদান করি। আমাদের এই নিবেদিত দান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

দান করার পক্ষে তিনটি প্রধান কারণ

১। আপনার নিজের ভবিষ্যৎ এবং আপনার সন্তানদের ভবিষ্যৎ রক্ষা করার জন্য দান করুন।

২। আপনার মাতৃভূমির আজকের অবস্থা রক্ষা করার জন্য দান করুন।

৩। জাতির এবং সমগ্র বিশ্বে শান্তি রক্ষা করার জন্য দান করুন।

এই প্রশ্নগুলি ভেবে দেখুন

কতখানি গভীরে দৃষ্টি দিয়ে আমরা কি নিজেদের মধ্যে বিশ্লেষণ দেখা? আমাদের জন্য অন্যদের প্রাণ দেবে কিন্তু আমরা তাদের সাহায্য করবো? আমরা যে ভালোবাসি, আমরা যে সব কিছুকে ভালবাসি বলে মনে করি, আমাদেরকে হারাবার আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও, আজ আমরা কি স্বার্থপর হয়ে থাকবো? আমরা কি নিজের স্বার্থের চেয়ে জাতির চাইবে, সমাজের চাইতে লোককে, স্বাধীনতার চাইতে পরিবার সুখ সুবিধাকে উচ্চ আসন দেবো?

এগুলি ভেবে দেখুন

জাতীয় প্রস্তুতিতে অংশ গ্রহণ করুন

BMI Pictures

'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'

বিংশ শতাব্দী

কার্তিক
১৮৮৫
অষ্টম বর্ষ
৫ম সংখ্যা

আমাদের কথা

সাহিত্যিকের জীবিকার প্রশ্নটা সব দেশে সমান সমস্যা নয়—কোন কোন দেশে ওটা আদৌ কোন সমস্যাই নয়।

লেখক নাম করা না হলেও, যে ভাষায় লেখকের একখানা বই-এর ভাল বই বলে বাজারে নাম চলে হাজার হাজার কেন লাখ লাখ কপি চু চু করে বিক্রি হয়ে যায়, সেই ভাষার লেখককে স্বভাবতই জীবিকার জন্য চিন্তা করতে হয় না। অথবা যে দেশে প্রতিভার সামান্য পরিচয় দিতে পারলে সরকারই লেখকের জীবিকার ব্যবস্থা করে থাকেন সে দেশেও লেখককে জীবিকার জন্য চিন্তা করতে হয় না।

জীবিকাটা সাহিত্যিকের সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় বাংলা দেশের মতো দেশে। এখানে বিখ্যাত লেখকের নাম করা বই-এর বিক্রিও অন্য দেশের তুলনায় এত কম এবং বিক্রিটাও এত ধীরে সুস্থে হয়ে থাকে যে, চার পাঁচ খানা নাম করা বই লেখার পরেও লেখকের জীবিকার সমস্যাটা ঘোচে না। আর শুধু জীবিকাটুকু মিটলেই লেখককে সন্তুষ্ট থাকতে হবে এমন কোন কথা নেই—লেখকও পাঁচ জনের মত মানুষ তাঁর জীবনেও নানা আশা আকাঙ্খা আছে—সাচ্ছল্য না এলে জীবনের উৎপীড়ন ঘটে এ কথাটাও তার জানা থাকার কথা।

তবু তো বাংলা দেশের লেখকদের সাম্প্রতিককালে অবস্থা কিছু ভাল। লিখে কিছু পয়সা তাদের মেলে। অনেক প্রাদেশিক ভাষার লেখকদের লেখা থেকে এক রকম কিছুই জোটে না।

এদেশে লেখাকে পেশায় পরিণত করতে পারলে, পেশাদার লেখক হিসাবে গণ্য হতে পারলে, লেখক হয়ত জীবিকার সমাধান করে ফেলতে পারেন। কিন্তু এ পথ বড় বিপদজনক পথ। কারণ সাহিত্য সৃষ্টির জন্য লড়াই করতে করতে নাম চলে আত্মবিক্রয়ের সুযোগ, আদর্শ বিক্রয়ের সুযোগ কম বেশী সব সাহিত্যিকের জুটে যায়—জীবিকার প্রয়োজন মেটাতে শিল্পসৃষ্টি প্রায়ই তলিয়ে যায়। স্বেচ্ছায় হোক আর বাধ্য হয়েই হোক শুধু টাকার প্রয়োজনে লিখলে লেখার মান নেমে যেতে বাধ্য।

সাহিত্যকে পেশা করা মাত্র সাহিত্যিক প্রায়ই তার সাহিত্য চর্চার জন্য প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেন।

তাহলে পথ কোথায়? লেখক লিখে অর্থ উপার্জন করবেন না এ কথা বলি না। নিশ্চয়ই করবেন। কিন্তু আদর্শবাদ ও সাহিত্যিকের ধর্মকে বিসর্জন দেবেন না—এটুকু বিবেচনা।

এর জন্য যদি দারিদ্র্য বরণ করতে হয় সে দারিদ্র্যও বরণীয়। বাঙ্গালী কবিই একদিন বলতে পেরেছিলেন—যে জন সেবিবে তোমার চরণ সেই দরিদ্র হবে।

কবি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ দুই ॥

সেই সুরূপা মৃত্যুশয্যায় টি বি হসপিটালে আমাকে স্মরণ করেছে। কেন? আমাকে সে স্মরণ করবে কেন? জীবনে একবার মাত্র পরিচয়। তাকে পরিচয়ই বা বলব কি করে? আমার কাছে নিছক বেচাকেনার কারবারে ক্রেতার মত এসেছিল। সে কারবারে তার সঙ্গে আমার বনেনি, ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। তা নিয়ে কি কিছু বলবার আছে তার? কি বলবে? ডাক্তার বললে—সুরূপা আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য খুব ব্যগ্র।

কেন?

প্রশ্নটা স্বাভাবিক ভাবেই আমার মনকে আলোড়িত করছিল। জীবনে অনেক নারী-পুরুষ নারী বিশেষে লেখকদের আপনার জন ভাবেন। জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এটা জেনেছি। অন্য লেখকদের কাছ থেকেও শুনেছি। পুরুষেরা দেহ চান—হৃদি চান—পত্র লিখে উত্তর চান, দূরে থেকে আলাপ করতে চান, কাছে আসতেও চান। অনেকের কাছে শুনেছি—অনেক লেখকের জীবনী পড়ে পেয়েছি যে এরমধ্যে থেকে প্রেমও হয়েছে। অনেক মেয়ে আজীবন ভালবেসে গেছে। আমার জীবনে আমি এ বিষয়ে একটু সতর্ক। আজ বার্ধক্যের কোঠায় পা দিয়েছি কিন্তু একদিন প্রেমের বয়স ছিল। সে বয়সে আমার সতর্কতা ছিল। তার কারণ আমার নিজের ছিল পরিপূর্ণ সংসার। বিয়ে হয়েছিল ষোল বছর বয়সে স্ত্রীর বয়স ছিল দশ। যখন সাহিত্যক্ষেত্রে আমার প্রতিষ্ঠা হয় তখন আমার বয়স বিয়াল্লিশ স্ত্রীর বয়স ছত্রিশ। বড় ছেলে এম এ পড়ত কুড়ি বছর পার হয়েছে। ছোট বা মেজ আই এস সি পাশ করেছে। বড় মেয়ের বিবাহ দিয়েছি পনের বছরে; বিদ্বান বুদ্ধিমান রূপবান জামাই। ছোট মেয়ে বছর দশেকের। নিজের মনকে নিজেকে শাসন করতে হত না; চারিদিকে পরিবারের স্নেহের জনতা সতর্ক প্রহরীর মত প্রহরা দিত। তাছাড়া আর এক শাসনকর্তা আমার ছিলেন, অভিভাবক ছিলেন—আমার ঈশ্বর, তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে মা আমার দিকে ব্যগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন।

এ সত্ত্বেও মনের মধ্যে স্নেহেরই হোক বা প্রেমেরই হোক ক্ষুধা একটা ছিল। আজ সে ক্ষুধা নেই কিন্তু একদিন ছিল নিশ্চয় ছিল; তাই কোন মুগ্ধ পাঠিকা নিয়মিত পত্রালাপ সুরু করলে দু চার খানা সতর্ক গাম্ভীর্য পূর্ণ পত্রে সাহিত্য জীবন ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্নোত্তরের পর যে মুহূর্তে ব্যক্তি জীবনের দরজায় সে করাঘাত করত—এবং আমি দরজা খুলতাম—সেই মুহূর্তেই তাকে মা বোন বলে সম্বোধন করে একটা এমন সম্পর্ক পাতিয়ে নিতাম যেটার স্নেহ শ্রদ্ধায় শোধন করা দেহ-সম্পর্কহীন ভালবাসার আদান প্রদানে কোন বাধা নেই।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মোহ সম্পর্কটাও আজ উঠিয়ে দিয়েছি। পুরানো কালের দু চারজন বোন আছেন। কখনও কখনও হয়তো তাঁদের দিক থেকেই তাঁরা স্মরণ করেন। নইলে এখন শুধু মা আর কন্যা।

শোভাবাজারে আমার মা আছে অপর্ণা। বরানগরে মেয়ে আছে বুলু। তবুও সে যৌবনকালে সম্পর্ক না পাতানো দু একজনকে পত্র লিখবার সময় এক-আধবার অসতর্ক মুহূর্তে গাঢ় কথা দু চারটে লিখেছি কিনা হলপ করে বলতে পারব না। কিন্তু সুরূপার সঙ্গে কোন পত্রালাপ করিনি। এবং করলেও লিখেছি কিনা এ সন্দেহও করতাম না। কারণ তার সঙ্গে আমার দেখা যখন হয়েছে তখন আমার বয়স বাষট্টি পার হয়ে গেছে।

ঠিক বুঝতে পারলাম না সুরূপা কি সূত্র ধরে বা কি কারণে আমার সঙ্গে মৃত্যু নিশ্চিত জেনে দেখা করতে চেয়েছে। মনে নানা কল্পনা একটার পর একটা এল গেল কিন্তু কোনটাই ঠিক মনের কাছে ঠিক বলে মনে হল না। শুধু একটা কথা মনে কিছুটা সম্ভবপর বলে মনে হল।

হয়তো, মৃত্যুর আগে সে তার জীবনের কথা বলে যাবে। এ আকাঙ্ক্ষা অনেকের মনে আছে ও থাকে। জীবনের দুঃখ বেদনা জানিয়ে যেতে চায়। জীবনে যতকাল বাঁচল ততকাল যারা ভালবাসা পেলে না—স্নেহ পেলে না—সহানুভূতি পেলে না—তাদের অনেকেই চায় নিজের কথা বলে যেতে—উদ্দেশ্য সেটা লেখকের কলমে প্রকাশিত হবে এবং তার মধ্য দিয়ে সমাজ দেশ এবং মানুষকে তিরস্কার করে যাবে। এবং লোক সমাজ দেশ তার জন্য দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলবে বলবে অন্যায় করেছি; পরলোক মানুক বা না মানুক, এই আকাঙ্ক্ষার সময় তার মনে থাকে যে মৃত্যুর পরও তার এতে পরিতৃপ্তি হবে।

অনেক জনের এমন চিঠি আমার কাছে আছে। এই ভাবে দেখা করে মানুষ বড় একটা নিজের কথা বলে যায় না—অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিঠি লিখেই জানায়। তার মধ্যে লেখকের ওই মনটাই অর্থাৎ মনের ওই আকাঙ্ক্ষাটাই বড় হয়ে ওঠে। সে পৃথিবীকে ভালবেসেছে, মানুষকে ভালবেসেছে, দেশকে ভালবেসেছে, বিনিময়ে অল্প কিছুটা ভালবাসা স্নেহ সহানুভূতি চেয়েছে কিন্তু নিষ্ঠুর পৃথিবী নিষ্ঠুর মানুষ তাও তাকে দেয়নি।

আজই গ্রাহক হোন : উপহার লাভ করুন

সোভিয়েত দেশ

(ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীর সচিত্র পাক্ষিক পত্রিকা)

নমুনা সংখ্যার জন্য বিশেষ সুবিধাজনক হার : ১৯৬৩ সালের নভেম্বরে শুরু

ভারতীয় ভাষাসমূহ ও নেপালী ভাষায় সংস্করণ			ইংরাজী সংস্করণ		
হ্রাসপ্রাপ্ত হার	গত বৎসর টাঃ ন. প.	বর্তমান টাঃ ন. প.		গত বৎসর টাঃম.প.	বর্তমান টাঃম.প.
১ বৎসর	৫'০০	৪'০০	১ বৎসর	৬'০০	৫'০০
২ বৎসর	৯'০০	৬'০০	২ বৎসর	১১'০০	৭'৫০
৩ বৎসর	১৩'০০	৮'০০	৩ বৎসর	১৬'০০	১০'০০
প্রতি কপি	'২৫	'২৫	প্রতি কপি	'৪০	'৪০

এক বৎসরে—১৪টি সংখ্যা, দুই বৎসরে—৪০টি সংখ্যা, তিন বৎসরে—৭২টি সংখ্যা।

: ক্যালেণ্ডার উপহার :

গ্রাহক—১ বৎসরের উপহার—১৯৬৪ সালের ক্যালেণ্ডার। গ্রাহক—২ বৎসরের; উপহার—১৯৬৪ ও ১৯৬৫ সালের ক্যালেণ্ডার। গ্রাহক—৩ বৎসরের; উপহার—১৯৬৪, ১৯৬৫ ও ১৯৬৬ সালের ক্যালেণ্ডার।

(যে যে বৎসরের ক্যালেণ্ডার সেই সেই বৎসরে দেওয়া হইবে।)

: পুস্তক উপহার :

গ্রাহক—২ বৎসরের; উপহার—প্রখ্যাত সোভিয়েত সাহিত্যিকগণের ছোট গল্পের সংকলন।

গ্রাহক—৩ বৎসরের; দুইটি পুস্তক : প্রখ্যাত সোভিয়েত সাহিত্যিকগণের লেখা ছোট গল্পের সংকলন ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানের একটি পুস্তক।

আপনি যদি কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট গ্রাহক হন তাহা হইলে ঐ প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে আপনার ক্যালেণ্ডার (১৯৬৪ সালের) ও পুস্তক সংগ্রহ করুন। তাহারা হয় সঙ্গে সঙ্গে অথবা দুই সপ্তাহ পরে উহা আপনাকে দিবে। আপনি যদি সোজাসুজি আমাদের অফিস হইতে গ্রাহক হন তবে অফিস হইতে আপনাকে ঐগুলি পাঠান হইবে।

সোভিয়েত দেশ কার্যালয়

১১১, উড ষ্ট্রীট

কলিকাতা-১৬

জীবনে সে পেয়ে গেল শুধু অবজ্ঞা অবহেলা উপেক্ষা।

অনেক লেখে তবু সে এই শেষকালেও পৃথিবীকে ঘুরে উজাড় করে ভালবাসা দিয়ে যাচ্ছে। চিঠিগুলি সুদীর্ঘ; জীবনের কাহিনী সবই লিখেছে। তবুও এসব নিয়ে লিখতে পারিনি, লেখা যায় না বলেই ধারণা হয়েছে আমার। কারণ প্রায় সব ক্ষেত্রেই জীবনের সব ভালবাসাটা সে নিজের উপর ঢেলে লিখেছে। পৃথিবীকে, মানুষকে ভালবাসার কোন প্রমাণ কোন চিহ্ন বা অভিব্যক্তি তার মধ্যে পাইনি। মনে হয়েছে অনেক কথা ঘুরিয়ে লিখেছে, অনেক কথা লেখেনি গোপন করে গেছে।

দুএকজনের অকপট অভিব্যক্তি পেয়েছি। কিন্তু তাও অসমাপ্ত। যে জীবন বাস্তব যার প্রতি ঘটনাটি অকপট সত্য তার সমাপ্তি কল্পনা করতে গিয়ে পিছিয়ে এসেছি। ভয় হয়েছে। হয়তো অমার্জনীয় অপরাধ করে ফেলব। কারণ এ যুগে জীবন সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে উঠেছে—সে ধারণা বাস্তবে কতটা সত্য তা জানি না, তবে নানান দেশের লেখা পড়ে, নানান মতবাদের প্রভাবে ধারণাটা মনে মনে সত্য হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে লেখক-মনে। গত মহাযুদ্ধের কাল থেকে সে ধারণা বা থিসিস অনুযায়ী মানুষের সততা নাই, মানুষ সৎ নয়—জীবন জীবদেহাশ্রয়ী দেহবাদ এবং লোভ এই দুটোই শ্রেষ্ঠ এবং আসল নিয়ামক। সতী বল লক্ষ্মী বল ধার্মিক বল কর্মী বল সব মানুষই অর্থমূল্যে অর্থাৎ লোভে অভাবে ক্ষোভে আত্মবিক্রয় করে অবলীলাক্রমে। অথচ আমার ঘরে আমার স্ত্রী রয়েছেন কন্যা রয়েছেন পুত্রবধূ রয়েছেন ছেলেরা রয়েছেন। তাঁদের দেখছি অহরহ। শুধু আমিই বা কেন অন্য যাঁরা লেখেন যাঁরা এতেই বিশ্বাস করেন—তাঁরাও ঘর করছেন স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে; অগাধ বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত সুখ-নিদ্রায় রাত্রিযাপন করেন পরম তৃপ্তির সঙ্গে তাঁদের রান্না করা আহার্য দিন দিন পরিপুষ্টিতে শ্রীমান হন; উল্লাসে যাপেন; তাদের নিষ্ঠাকে অসত্য মিথ্যা বলেই তাতে ক্ষুব্ধ হন রুষ্ট হন।

আমাদের গ্রামের গায়ত্রীকে চোখে দেখছি আজীবন। দরিদ্রের কন্যা কালো রঙ হলেও কুশ্রী নয়। বাপ মারা গেল। মেয়ে বিবাহযোগ্যা। মা বহু কষ্টেই বিবাহ দিলেন। কিন্তু পাত্র চরিত্রহীন সে তাকে নিলে না। গায়ত্রী চৌদ্দ বছর বয়স থেকেই গ্রামে পাড়ায় এর বাড়ীতে ঠাকুরের ভোগ রান্না করে, ওর ওর বাড়ীতে জল তুলে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে মা ভাইদের মুখে আহার জুগিয়ে এল। ভাইকে গ্রামের ইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করালে। কিন্তু গায়ত্রীর সতীত্ব সম্পর্কে অতি সন্দেহবাদীও কোন প্রশ্ন করতে পারবে না। তবে হ্যাঁ একটি ক্ষেত্রে গায়ত্রীর নিন্দা করতে পারে আধুনিক যুগের মানুষ। গায়ত্রীর মাথা নত হয়ে আছে সে ভগবানের চরণধূলোর তলে নয়—মানুষের পায়ের দিকে। সে বিনত। নম্রতার মধ্যে দীনতার দৈন্য আছে। তার হাত শুধু আশীর্বাদের জন্যই অঞ্জলিবদ্ধ হয় না—বস্তুর জন্যেই অঞ্জলি পাতে সে। অভাবের তাড়নায় কাঙালপনাটা তাকে আশ্রয় করেছে। তবে সে চায়—কখনও নিজেকে বিক্রী করে না। যে সমাজের বিধি ব্যবস্থায় মানুষকে এমন কাঙাল করে সে সমাজ ভেঙে চুরমার হয়ে যাক। গুঁড়ো হয়ে ধুলো হোক। সে করবে এই মানুষেরাই। সুতরাং মানুষ সব মানুষ লোভে ক্ষোভে অর্থ মূল্যে বিক্রী হয়ে গেল—এ কথা সত্য বললে তার থেকে বড় মিথ্যা আর হতে পারে না গায়ত্রী মাত্র একটা নয়। গায়ত্রী অনেক আছে। সুতরাং এই ধারণা বা থিসিসকে সত্য বলব কি করে। বরং আশঙ্কা হয়—হয় তো বা এই থিসিসটাকে আগামী কালে সত্য করে তুলি আমরাই।

তাই এমন কল্পনাকে প্রশ্রয় দিয়ে যা অসমাপ্ত তাকে সমাপ্ত করতে চাইনে। সুরূপার জীবনে সে যেখানে এসে পড়েছিল এবং তার সম্পর্কে নানানজনের মুখে এই জগতের সংবাদ পরিবেশকদের যাদকতাশ্রিত সংবাদ পরিবেশনের মধ্যে যে সংবাদ পেয়েছি তাতে তার জীবনে উত্তেজনাত্মক বিস্ময়কর অনেক কিছু আছে কিন্তু যারা দারিদ্র্যের মধ্যে অভাবের মধ্যে প্রাণপণে লড়াই করে যায় তাদের সঙ্গে কোন মিল নেই। বড় জোর পাব দুটোর একটা। নিষ্ঠুর ক্ষোভে সে অধঃপতিত স্বামীর কাছ থেকে বিদ্রোহ করে এসে এই পথে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে; যার ফলে অভিনয় শুধু সে পর্দার

বুঝেই করে ফেলে না। নিজের জীবনটাকে অভিনয় করে ফেললে। অথচ কাউকে ভালবেসে তারই প্রয়োচনায় এসে এই ভাবে সব দিয়ে বাইরের জীবনটাকে মিথ্যা করে ভিতরের জীবনে বিচিত্রভাবে সত্যকে পেয়ে গেল।

•

ভাবতে ভাবতেই গিয়ে পৌঁছুলাম হাসপাতালে। ডাক্তার সেন—বয়সে সবে যৌবন পার হয়েছেন—বিদেশী ডিগ্রীধারী বিচক্ষণ চিকিৎসক এবং অমায়িক ভদ্রলোক। আমার জন্যে প্রতীক্ষাই করছিলেন। নইলে সময়টা তাঁর বিশ্রামের সময়। তাঁর নিজের ঘরে বসিয়ে হেসে বললেন—আপনার কষ্ট হল—এই দুপুরে আসতে কিন্তু আমার লাভ হয়েছে। আপনার সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ পেলাম। সৌভাগ্য তো বটেই। অন্য সময়ে এলে আমার নিজের সময় মিলত না।

এ সব কথা সচরাচর অত্যন্ত কর্মাল হয়ে থাকে। কিন্তু ডাঃ সেনের কণ্ঠস্বরে আন্তরিকতার সুস্পষ্ট আভাস ছিল। আমি বিব্রত হলাম বললাম—এ ভাবে বললে লজ্জা পেতে হয়। আলাপ করার সৌভাগ্য বলতে গেলে তো আমারও। আপনার নাম আপনার খ্যাতি তো কম নয়।

তার উত্তরে তিনি নিজেকে আরও বিনীত করতে চাইলেন কিন্তু সে কথা থাক; এ পর্বটা শেষ করেই তাঁকে বললাম—সুরুপা মেয়েটি কি সত্যিই বাঁচবে না? এমন অবস্থা খারাপ হয়ে গেল—অথচ ওর তো অবস্থা খারাপ নয়—সময়ে চিকিৎসা করাতে পারত। এবং করালে তো এ কালে রোগটা সে কালের মত দুঃসাধ্য দুরারোগ্য নয়—ভাল হয়ে যেত। তা করাননি না কি?

ডাক্তার বললেন—ওঁর একটা অপারেশন হয়েছে। সেটা যেন ঠিক স্টাণ্ড করতে পারছেন না। এটা স্ট্যাণ্ড করতে পারলে বেঁচে যাওয়ার কথা। সকালের দিকে যখন আপনাকে ফোন করি—তখন—পর্যন্ত অবস্থা খারাপের দিকেই যাচ্ছিল। সব থেকে বড় কথা ছিল রেস্টলেসনেস। জানেন বিনা জানি না—অপারেশনের পর—একটা সময় পর্যন্ত পেশেণ্ট অজ্ঞান হয়েও থাকে—জ্ঞান হবার উপক্রম হলে আমরা ইনজেকসন দিয়ে পাচ ঘুমে ঘুম পাড়িয়ে রাখি। হাত-পা বাঁধা থাকে। ওঁর সে সময়ের পরও ব্লিডিং হয়েছে; এবং রেস্টলেসনেস। আমরা ভেবেছিলাম হয় তো বাঁচাতে পারব না। তারই মধ্যে বারবার আপনার নাম করছিলেন। এবং—। একটু হাসলেন ডাক্তার।

হেসে বললেন—খ্যাতি আছে সমাদর আছে মানুষের কাছে—এ সব ক্ষেত্রে মরব মরব একটা বাতিক আছে। সেটা মরবার ভয় খানিকটা বটে। কিন্তু তার থেকেও লোকের কাছে সমাদর সহানুভূতির আবদারও বটে। সেইটেই বেশী।

কথাটা হয়তো অনেকটা সত্য। কিন্তু পূর্ণ সত্য নয়। সুরুপা কিস্বা এ্যাকট্রেস, তাদপকে সত্য এবং আমাদের মত খ্যাতিমানদের সম্পর্কেও এটা অনেকটা সত্যও বটে। কিন্তু অনেক সাধারণ এবং মনস্তাত্ত্বিক সন্ধানী অনেকে আছেন তাদের পক্ষে কথাটা সত্য নয়। সে কথা থাক। তর্ক ডাক্তার সেনের সঙ্গে করলাম না,

॥ বিংশ শতাব্দীর নতুন প্রকাশনা ॥

জ্ঞানসুন্দর দে-র

কথা নীরবতা

জীবননিষ্ঠ কবির প্রত্যয়দীপ্ত কবিতার সুষমামণ্ডিত সঙ্কলন। দাম—১·৫০

: প্রাপ্তিস্থান :

বিংশ শতাব্দী : ২০ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৫

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি ॥ সিগনেট বুক শপ

বললাম ওকে তা হলে একটা খবর দিন ; যদি জেগে থাকে—

—খবর দেওয়া আছে। ঘুমুচ্ছে এখন। জাগলেই খবর দেবে আমাকে নার্স। একটু বসতে হবে আপনাকে।

—বসতে হবে ? কতক্ষণ বসতে পারেন ?

—তা একঘণ্টা হতে পারে। আর বেশী হবে না।

—তাহলে ও আরও একটু দূরে হোক না। তারপর আসব।

—না তাহলে হয়তো উত্তেজিত হবেন। চেঁচামিচি করবেন। বলবেন আমাকে জাগালেন না কেন ? জানেন তো এরা এমন আবদেরে হয় ! অশিক্ষিত হত বলবে মানবে না, বলবে ছোড়ো তো ছোড়ো। আমার ছোড়ো অন্য পেশেন্টকে ধমক দিয়ে রাখা যায়, এদের যায় না। লীডার টিডার যা আপনাদের মত যারা হন তাঁরা পার্লামেন্টের মত আমাদেরই হুকুম করেন, মানে দুষ্টু ভাগিতে আইন অমান্য করেন—আর এরা আদুরে ছেলের মত আবদার ধরে আইন ভাঙে—আমাদের চুপ করাতে চায়।

কথাগুলো একান্তভাবে সমঝদেশের জন্যই ডাক্তার সেন বলে যাচ্ছিলেন তা যে-কেউ বুঝতে পারত। এবং তিনি তা গোপন করতেও চাননি। চুপ করে বাইরের দিকে চেয়ে বসে রইলাম। এসেছি যখন তখন সত্যিই কিছুক্ষণের জন্য অপেক্ষা করতে অধীরতা প্রকাশ করে চলে যাওয়ার অর্থ হয় না। আমার আপনার জন হলে পারতাম না।

বাইরের বাড়ী ঘরগুলি দেখছিলাম। আগেও একবার এখানে এসেছি। পরাধীনতার সময় অনেক দৈন্য এবং অভাবের মধ্যে জনসাধারণের বদান্যতায় এবং কয়েকজন আক্রান্ত কর্মী মহাপ্রাণ চিকিৎসকের চেষ্টায় ও প্রাণপাত পরিশ্রমে গড়ে উঠেছিল হাসপাতালটি। বাংলাদেশে একমাত্র এই একটি টি বি হাসপাতাল ছিল। ধীরে ধীরে বড় হয়েছে। তারপর এখন এই স্বাধীন দেশে এর অনেক উন্নতি হয়েছে। নানান দাতার নামাঙ্কিত ওয়ার্ডগুলির নাম পড়ছিলাম। ওদিকে কটেজগুলি দেখা যাচ্ছে।

আমাকে বাইরের বাড়ী ঘরগুলির দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে ডাক্তার বললেন—চলুন না দেখে আসবেন একটু ঘুরে। আগে একবার দুবার এসেছিলেন সেটা শুনেছি। কিন্তু আপনার দেওয়া বইও দেখেছি লাইব্রেরীতে। একবার কবে বিজয়া সম্মেলনীতেও এসেছিলেন, মুখে মুখে কথাটা এখনও বেঁচে আছে। তখন দেখেছিলেন সব ঘুরে ?

—দেখেছিলাম। অবশ্য অনেক ছোট ছিল।

—তাহলে চলুন। একবার ঘুরে দেখুন।

—চলুন।

বেরিয়ে পুরনো সাহেব আমলের ওয়ার্ডটিতে নিয়ে গেলেন ডাক্তার সেন। মনে পড়ে গেল এই ওয়ার্ডে একটি রোগীর কথা। যন্ত্র কষ্ট হচ্ছিল দেখে। বুকের পাঁজরা কেটে অপারেশন হয়েছিল তার হাত পা খাটের সঙ্গে বাঁধা। হাতে বসবার চিউব শিরায় চুকিয়ে রক্ত দেওয়া হচ্ছিল। অজ্ঞান রোগীটির মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙছিল। তারপরে একটা যন্ত্রণা-কাতর শব্দ। আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারিনি। ডাক্তার বাবু যিনি সেদিন সঙ্গে ছিলেন তাঁকে বলেছিলাম—চলুন—ডাক্তারবাবু। চলুন।

চলে শুধু ওই ঘর থেকে যাইনি—আর দেখিনি, দেখতে চাইনি।

—স্যার !

কে পিছন থেকে স্যার বলে ডাকল। ডাক্তার সেন পিছন ফিরে তাকিয়ে একজন হসপিটাল স্টাফকে দেখে বললেন—কি ?

ঘুম ভেঙেছে। নার্স খবর দিতে বললেন।

—ও ! আচ্ছা বলগে—আমরা আসছি। ওঁকে একটু দেখাচ্ছি সব। হয়ে গেলেই যাচ্ছি।

—খুব ব্যস্ত হয়েছেন স্যার। নার্স বললেন—এক্ষুনি আসতে।

—এক্ষুনি আসতে হবে—

আমি বললাম—তাই চলুন।

কটেজের মধ্যে বিছানায় শুয়েছিল সুরুপা। তার

বিছানার পাশে রক্ত দেওয়ার শেডটা এখনও খাড়া হয়েই রয়েছে। ঘণ্টা কয়েক আগে সর্বস্ব রক্ত দিতে হয়েছে। তার ছিল মাথা ভর্তি—সে চুল ক্যাকাশে দেখাচ্ছে। রুক্ষ চুলগুলি অবিন্যস্ত বাতাসে উড়ছে। সরীর শীর্ণ হয়ে গেছে। ঠোঁট দুখানি শুকনো শীরস এবং ঘন্না তামাটে রঙের হয়ে গেছে। চোখ-দুটিতে ঘোর রয়েছে। পাতা যেন থাকতে থাকতে নেমে আসতে চাচ্ছে। কিন্তু চোখের সাদা অংশটা আশ্চর্য দীপ্ত এবং কালো তারা দুটি যেন তরল হয়ে টল টল করছে মনে হচ্ছিল। ঘরের দরজার দিকেই সে তাকিয়েছিল আমার প্রত্যাশায়। আমি ঢুকতেই চোখের পাতা দুটি ক্ষণেকের জন্য ঈষৎ বিস্ফারিত হয়ে উঠল—মনে হল চোখ দুটি জ্বলে উঠল প্রদীপের বাতিসে দেওয়া শিখার মত। মধ্যে মধ্যে ইলেকট্রিক লাইনে হঠাৎ ভোল্টেজ বেড়ে গেলে বাল্বের আলো যেমন উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে তেমনিভাবেই দীপ্ততর হয়ে উঠল মনে হল।

সামনে একখানা চেয়ার রাখা ছিল আমি সেইটেতে গিয়ে বসলাম। সুরূপা শুরু হয়েই আমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে।

আমি বললাম—আমাকে—

সে মৃদু স্বরে বললে—হ্যাঁ ডেকেছি। দেখতে চেয়েছি।

উত্তরে কি বলব খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কেন? এ প্রশ্ন করতে বাধছিল। মনে হচ্ছিল প্রশ্নটা রুঢ় হবে। অবশেষে একটা কথা খুঁজে পেলাম।—বল। তারপরই বললাম—বয়সে তুমি আমার ছোট মেয়ের চেয়েও ছোট। তুমি বললাম—কিন্তু মনে করো না।

একটু হেসে উঠল তার মুখ। সেই হাসি মাখা মুখে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। কি যেন একটা রহস্যের কুয়াশা ওই দৃষ্টির আলোয় আমার মনের মধ্যে ধীরে ধীরে মাথা তুলে উঠতে সুরু হল। এর অর্থ চাতড়ে বেড়াচ্ছিলাম আমি যেন শীতের ভোরে কুয়াশার মধ্যে। শীতের সকালে কুয়াশা জাগে—ধীরে ধীরে গাছ থেকে গাছের তলে যেন যা কিছু চোখের সামনে দৃশ্যমান সব ঢাকা পড়ে যায়—তেমনি ভাবে আমার মনের সব অনুমান ঢাকা পড়ে গেল। এমন কি ওই মেয়েটিও যেন ঢাকা পড়ে যাচ্ছিল।

একটু অসহিষ্ণু হয়েই বললাম—কি বলছ বল?

সে বললে আমার গল্পটা লিখে দিলেন না তো?

খুব মিষ্ট করে বললাম—সংসারে পরের গল্প কি পরে লিখতে পারে? শুনে কি জানা হয়? না—জেনে কি লেখা হয়?

—কল্পনা করে তো লেখেন।

—লিখি। কিন্তু সে কল্পনা নিজের। কল্পনা তখন বাস্তব থেকেও সত্য হয়ে ওঠে। কিন্তু পরের কল্পনা—নিজের করা যায় না।

—আমি মরে গেলে আমার জীবন নিয়ে গল্প বা উপন্যাস কিছু লিখবেন—বলুন।

সহজে হ্যাঁ বলতে পারলাম না। আজ কাল অনেক সিনেমাস্টার নিজের জীবন কথা লিখছেন। তার মধ্যে যা অধিকাংশক্ষেত্রেই দেখি—তাতে কতকগুলো ঘটনাই পাই জীবন পাই নে। এবং তার মধ্যে দিনের আলোর উত্তাপও পাই নে—রাত্রির অন্ধকারের বেদনার্ত স্নিগ্ধস্পর্শও পাইনে। আকাশে নক্ষত্রের ঝিকিমিকিও থাকে না—গাছের তলায় ছায়ার মধ্যে চিরন্তন কালোর আভাসও নেই। থাকে স্টুডিয়োর বা সাজানো ঘরের মধ্যে ঝকঝকে ফ্লাস লাইটের আলো অথবা রাত্রিকালে নীলাভ আলোর কৃত্রিম অন্ধকার। এ নিয়ে লিখবার প্রতিশ্রুতি দিতে মন সায় দিচ্ছিল না। অথচ একটি মরণপথ যাত্রিণীর শেষ অনুরোধ তাই বা উপেক্ষা করি কি করে?

আমার দৃষ্টি চিন্তায়—বাস্তবকে হারিয়ে ফেলেছিল। সুরূপার মুখও আমি দেখছিলাম না।

হঠাৎ সুরূপা বললে—সুতপা বলে একটি ছোট মেয়ে—ভাল অভিনয় করত, খুব প্রগলভা ছিল। নাচত গান করত ভাল। তাকে মনে পড়ে? দশ বছরের সুতপা—পাটনা—

চমকে উঠলাম।—

[ক্রমশঃ]

ক্ষেতেই, কারখানা বা অফিসে যেখানেই আপনি কাজ করুন না কেন, সেই কাজ এমনভাবে করুন যেমনটি এর পূর্বে আর কখনও করেন নি। পূর্বের তুলনায় দ্বিগুণ এমন কি তার চাইতেও কিছু বেশী উৎপাদন করুন। মনে রাখবেন আপনি যত বেশী কাজ করবেন, জাতির প্রতিরক্ষা তত বেশী শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে কাজ করুন

আরও বেশী উৎপাদন, প্রতিরক্ষা আরও শক্তিশালী করার জন্য

DA 63 [illegible]

"মোসলেম ভারতে"র নজরুল

আবদুল আজীজ আল্ আমান

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে হাবিলদার নজরুল সবে-মাত্র ৩২নং কলেজ স্ট্রীটে আস্তানা গেড়েছেন। ক'দিনের মধ্যেই জানতে পারলেন—একটি পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে; নাম "মোসলেম ভারত" সম্পাদক কবি মোজম্মেল হক, পরিচালক আকজালুল হক। স্বয়ং কবি-সম্রাট শান্তিনিকেতন থেকে 'মোসলেম ভারতে'র প্রথম সংখ্যার জন্য লেখা পাঠিয়েছেন। পত্রিকাটি সকল দিক দিয়ে অত্যন্ত রুচিসম্পন্ন করার আয়োজন চলছে। প্রচ্ছদ-পট শিল্পী হচ্ছেন ফ্রান্সের এক আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন শিল্পী Mahammad Racim। সকল প্রচেষ্টা ও আয়োজনের কথা শুনে নজরুল পত্রিকাটির প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। প্রথম সংখ্যার পাণ্ডুলিপি যে দিন প্রেসে দেবার ঠিক হলো সেদিনই পত্রিকাটির কর্ণধার জনাব আকজালুল হক সাহেব এলেন হাবিলদার কবির কাছে। তিনি পত্রিকাটির সঙ্গে ঐকান্তিকভাবে সংশ্লিষ্ট হওয়ার প্রস্তাব দিলেন। বলাবাহুল্য নজরুল অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। শেষে এমন হয়েছিল যে নজরুলকে বাদ দিয়ে "মোসলেম ভারতে"র কল্পনাই করা যেত না। সেকালে কবিসম্রাট যেমন ছিলেন "প্রবাসী"র শ্রেষ্ঠতম লেখক নজরুলও তেমনি ছিলেন "মোসলেম ভারতে"র। হাবিলদার কবির জীবনের সকল শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি "মোসলেম ভারতে"র পৃষ্ঠাতেই আত্মপ্রকাশ করেছে।

করাচির সেনানিবাসে থাকাকালীন "বাঁধন-হারা" পত্রোপন্যাসের অনেকগুলি পত্র রচিত হয়েছিল। কবি এগুলি "মোসলেম ভারতে" মুদ্রণের প্রকাশ করলেন। কিন্তু তখনো উপন্যাসটির নামকরণ ঠিক হয়নি। কবি বললেন "তুফানিয়া" অথবা "বাঁধনহারা" নাম দেওয়া যেতে পারে। শেষে সর্বসম্মতিক্রমে "বাঁধন হারা" নাম ঠিক হ'লো এবং এই নামে পাণ্ডুলিপি প্রেসে দেওয়া হল।

"মোসলেম ভারতে"র প্রথম সংখ্যায় "বাঁধন-হারা" পত্রোপন্যাসের প্রথম কিস্তি ছাড়া কবির অন্য কোনো লেখা প্রকাশিত হয়নি। এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন: নজরুল তখন ছোটগল্পের লেখক হিসেবে পরিচিত কবি হিসেবে নন। এমনকি তিনি যে কবিতা লেখেন এ সংবাদ অনেকেই জানতেন না। এমনকি কবি শাহাদৎ হোসেন সা', আকজালুল হক সাহেবও নন। শাহাদৎ হোসেন সাহেব তখন মাসিক "সওগাতে"র সঙ্গে যুক্ত। লেখার জন্য তিনি এলেন নজরুলের কাছে—৩২নং কলেজ স্ট্রীটে। লেখা চাইতেই নজরুল বললেন, "কী লেখা দেব—গল্প না কবিতা।"

কবিতা লেখেন শুনে শাহাদৎ হোসেন বিস্মিত হয়ে গেলেন। বললেন, "আপনি কবিতাও লেখেন নাকি!"

"বোধন" কবিতাটি সর্বপ্রথম কবির নিকটে দেখে আকজালুল হক সাহেবও বিস্মিত হয়ে প্রায় অনুরূপ উক্তি করেন। এই "বোধন" কবিতাটি রচনার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে। নজরুল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সঙ্গে করে এনেছিলেন অমর কবি হাফিজের একখানি "দিওয়ান"। এই "দিওয়ানে"র একটি গজলের প্রথম

পংক্তি ছিল : "দুঃখকে গুম গণতা বাজ আরেব ব-কিনান গম মখোর"। জনাব মুজফ্ফর আহমদ ও সইনুদ্দীন হোসেন সাহেবের অনুরোধে একদিন সন্ধ্যার বসে কবি এটি অনুবাদ করে ফেলেন। অনূদিত কবিতাটির ছন্দ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিল জননী ভারতবর্ষে"র ছন্দানুযায়ী লিখিত। প্রথম পংক্তিটি এই : "দুঃখ কি ভাই হারানো ইউসুফ কিনানা আবার আসিবে ফিরে।" পরদিন সকালে অনূদিত সমগ্র কবিতাটি পড়ে আকজাল সাহেব এমনই অভিভূত হয়ে পড়েন যে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই কবিতাটি দ্বিতীয় সংখ্যা "মোসলেম ভারত"এ মুদ্রণের জন্য প্রেসে পাঠিয়ে দেন। এই সংখ্যায় নজরুলের আর একটি কবিতা মুদ্রিত হয়—নাম "শাত-ইল-আরব"। প্রথম জীবনে নজরুল যে কটি সাড়া জাগানো কবিতা লেখেন এবং যাদের জন্য তাঁর নাম নিখিল বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে আলোচ্য কবিতাটি তাদের মধ্যে অন্যতম। মুসলিম ঐতিহ্য নিয়ে লেখা এই কবিতাটির ধ্বনি-বৈচিত্র্য ও ছন্দ-মাধুর্য সমকালীন বাংলার অসংখ্য পাঠককে মোহিত করেছিল। এমন কী সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচক অখ্যাত কবির এই কবিতাটি পড়ে এমনই বিমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন যে তিনি সঙ্গে সঙ্গে কবিকে স্বাগত জানিয়ে "মোসলেম ভারতে"র সম্পাদককে একটি সুদীর্ঘ পত্রে লেখেন :—"বহুদিন কবিতা পড়িয়া এত আনন্দ পাই নাই, এমন প্রশংসার আবেগ অনুভব করি নাই।" এই কবিতাটি রচনারও একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে—সেটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :

নজরুলের নিকট "মেসোপটেমিয়া" নামে একটি ইংরাজী বই ছিল। সম্ভবতঃ এ বইটিও তিনি সেনা-নিবাসে থাকাকালীন সংগ্রহ করেছিলেন। যা হোক—এ বইয়ের প্রথমে আর্ট পেপারে একটি অপূর্ব চিত্র মুদ্রিত ছিল। ছবিটি আকজাল সাহেবের খুব পছন্দ হয়েছিল—তিনি প্রথমে কেবলমাত্র এটিকে "মোসলেম ভারতে" মুদ্রণের বাসনা প্রকাশ করেন। কিন্তু পরিচয়হীন কেবলমাত্র একটি সুন্দর ছবি মুদ্রণের সার্থকতা কোথায়? তাই তিনি নজরুলকে এর একটি পরিচয়-লিপি (কবিতা নয়) লিখে দিতে বলেন। কিন্তু নজরুল পরিচয়লিপি লেখার জন্য অনুরুদ্ধ হয়ে সকলকে বিমোহিত করে অতি অল্প সময়ের মধ্যে লিখে ফেলেন একটি সুদীর্ঘ এবং অনবদ্য কবিতা, ধ্বনির কী দ্যোতনা ছন্দের কী দুর্লভ ঐশ্বর্য। নাম—"শাত-ইল-আরব।" কবিতাটি ছাপাও "একজন সৈনিক" ছদ্মনামের আড়ালে নজরুল নিজেই গদ্যের এই পরিচয় লিপিটি লিখে দেন : "টাইগ্রীস" (দিজলা) আর ইউফ্রেটিস (ফোরাত) বসরার অদূরে একজোট হয়ে "সাত ইল আরব" নাম নিয়েছে। তারপর বসরার পাশ দিয়ে বয়ে পারস্য উপসাগরে গিয়ে পড়েছে। এর তীরে তিন মাইল করে' চওড়া খেজুর-কুঞ্জ, তাতে ছোট্ট সহর আর তারই কূলে কূলে আঙুরলতার বিতান, বেদানা আনারের কেয়ারী, এখানে এলেই অনেক পুরানো স্মৃতি জেগে ওঠে আর আপনিই গাইতে ইচ্ছা করে—

শাতিল্-আরব! শাতিল্-আরব!
পূত যুগে যুগে তোমার তীর,
শহীদের সোহু দিলীরের খুন
ঢেলেছে যেখানে আরব বীর।"

এই পরিচয়লিপিও দ্বিতীয় ভারতে" মুদ্রিত হয়।

তৃতীয় (আষাঢ়) সংখ্যায় মুদ্রিত হয় "বাদল প্রাতের শরাব" কবিতাটি। এটিও অবর কবি "হাফিজের ছন্দ ও ভাব" অবলম্বনে রচিত। এই কবিতাটির ছন্দও মোহিত লাল মজুমদারকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট করে। কবিতাটির প্রথমে কয়েকটি অবিস্মরণীয় পংক্তি এই :

বাদলা-কালো স্নিগ্ধা আমার কান্তা এলো ঝিমঝিমিয়ে
বৃষ্টিতে তার বাজল নূপুর পায়জোরেরই শিঞ্জিনী যে।
ফুটলো উষার মুখটি অরুণ, ছাইল বাদল তাম্বু ধারায়;
জমলো আসর বর্ষা-বাসর, দাও সাকী দাও ভর-পিয়ালায়!

চতুর্থ (শ্রাবণ) সংখ্যার প্রথমেই প্রকাশিত হয় কবির সাড়া জাগানো কবিতা 'খেয়াপারের তরণী' আর রূপক গল্প 'বাদল বরিষণে'।

'খেয়াপারের তরণী' কবিতাটি রচনার একটি ইতিহাস আছে—সেটি এখানে উল্লেখ করা গেল। আকজালুল

হক সাহেব "মোসলেম ভারত" পত্রিকাখানির উচ্চমান বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন মত বাংলার সর্বত্র যাতায়াত করেছেন। যেখানে তিনি কোন আদর্শ রুচিপূর্ণ জিনিষের সন্ধান পেয়েছেন সেটি সাদরে পত্রিকাটির জন্য সংগ্রহ করে এনেছেন। একবার তিনি ঢাকায় যান। এখানে বিখ্যাত নওয়াব পরিবারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। এই সময় নওয়াবজাদী মেহেরবানু খানম অঙ্কিত একটি ছবি দেখে তিনি মুগ্ধ হন—ছবিটি তিনি নিজ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য সঙ্গে করে আনেন। শিল্পী নওয়াবজাদী মেহেরবানু খানম হলেন নওয়াব স্যার আহ্‌সানউল্লাহ্‌ বাহাদুরের কন্যা ও নবাব সলিমুল্লাহ্‌ বাহাদুরের ভগ্নী। এঁর স্বামীর নাম খান বাহাদুর খাজা মোহাম্মদ আজম। চিত্রখানি ত্রিবর্ণের —তরঙ্গ-সঙ্কুল সন্ধ্যা-নেঘমুক্ত নদীতে খেয়াপারাপারের দৃশ্য। দু'টি তরণী তরঙ্গ-সঙ্কুল নদীর বুকে ভাসমান —তারা পরপারের যাত্রী। চিত্রে একটি তরণীকে নিমজ্জমান অবস্থায় দেখান হয়েছে কিন্তু অপরটি শত ঝঞ্ঝা ও দুর্যোগ অতিক্রম করে অবলীলাক্রমে যাত্রী পারাপারে ব্যস্ত। প্রথমটি পাপের নৌকা, দ্বিতীয়টি পুণ্যের। এই নৌকার চারটি দাঁড়ের মাথায় আরবী অক্ষরে ইস্‌লাম ধর্মের প্রথম চারজন খালিফার নাম—আবুবকর, উস্‌মান, উমর, আলী—লেখা আছে। হাল ও পালের মধ্যে যথাক্রমে লেখা আছে হজরত মোহাম্মদ ও শাকায়াত। 'শাত্‌-ইল-আরব' চিত্রটির মত এই চিত্রটিও হক সাহেব নজরুলকে দিয়ে একটি পরিচ্ছন্ন লিখে দিতে বলেন। কিন্তু ছবিটি দেখে কবি এমনই অনুপ্রাণিত হয়ে পড়েন যে তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অমর কবিতা খেয়াপারের তরণী লিখে ফেলেন। বহু পাঠিত, বহু প্রশংসিত এই কবিতাটির কোন অংশ আমি আর এখানে উদ্ধৃত করলাম না—কেবল কবিতাটি সম্পর্কে মোহিতলাল মজুমদারের বিশেষ রূপে স্মরণযোগ্য বিবেচনার উদ্ধৃত করলাম : ···'খেয়াপারের তরণী' দীর্ঘ কবিতার ছন্দ সর্বত্র মূলতঃ এক হইলেও, মাত্রা বিন্যাস ও যতির বৈচিত্র্যে প্রত্যেক শ্লোকে ভাবানুযায়ী সুর সৃষ্টি করিয়াছে; ছন্দকে রক্ষা করিয়া তাহার মধ্যে এই যে একটি অবলীলা, স্বাধীন স্ফূর্তি, অবাধ আবেগ, কবি কোথাও তাহাকে হারাইয়া বসেন নাই; ছন্দ যেন ভাবের দাসত্ব করিতেছে—কোনখানে আপন অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে নাই—এই প্রকৃত কবিশক্তির পাঠককে মুগ্ধ করে। কবিতাটি আবৃত্তি করিলেই বোঝা যায় যে, শব্দ ও অর্থগত ভাবের সুর কোনখানে ছন্দের বন্ধনে ব্যাহত হয় নাই। বিস্ময়, ভয়, ভক্তি, সাহস, অটল বিশ্বাস এবং সর্বোপরি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটা ভীষণ গম্ভীর অতিপ্রাকৃত কল্পনার সুর, শব্দ বিন্যাস ও ছন্দ ঝঙ্কারে মূর্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমি একটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিব,—

আবুবকর উস্‌মান উমর আলী-হাইদর
দাঁড়ী যে এ তরণীর নাই ওরে নাই ডর।
কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা
দাঁড়ি মুখে গাহি গান 'লা শরীক আল্লাহ্‌'।

এই শ্লোকে মিল, ভাবানুযায়ী শব্দ-বিন্যাস এবং গভীর গম্ভীরধ্বনি, আকাশে ঘনায়মান মেঘপুঞ্জের প্রলয় ডম্বরু ধ্বনিকে পরাভূত করিয়াছে;—বিশেষ ঐ শেষ

ছত্রের শেষ বাক্য—'লা শরীক আল্লাহ'—যেমন মিল, তেমনি আশ্চর্য প্রয়োগ। ছন্দের অধীন হইয়া এবং চমৎকার মিলের সৃষ্টি করিয়া এই আরবী বাক্য যোজনা বাংলার কবিতায় কি অভিনব ধ্বনি-গাম্ভীর্য লাভ করিয়াছে।"

পঞ্চম (ভাদ্র) সংখ্যায় মুদ্রিত হয় নজরুলের 'কোরবাণী' কবিতাটি। সমকালীন ঘটনার বিচিত্র আবর্ত থেকে নজরুলের অনেকগুলি কবিতার সৃষ্টি হয়েছে। 'খেয়াপারের তরণী' কবিতার উৎস মূলে আমরা লক্ষ্য করেছি—'কোরবাণী' কবিতার পিছনে যে ইতিহাস রয়েছে তা কম কৌতূহলকর নয়।

ইস্‌লাম ধর্মাবলম্বীদের কাছে 'কোরবাণী'র মূল উদ্দেশ্য হল ত্যাগ-শিক্ষা। যা কিছু আপন, যা কিছু প্রিয় তা খোদার নামে উৎসর্গ করতে হলে, সংশয় পঙ্কিল অপবিত্র প্রবৃত্তিকে দমন করতে হবে। তরীকুল আলম নামে একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কোরবাণী অনুষ্ঠানের ঘুনষারাবী ও রক্তপাতের মধ্যে বর্বরযুগের হানাহানি ও বন্যতা দেখতে পান। তাই এ পবিত্র অনুষ্ঠানকে তিনি বর্বর যুগের চিহ্ন বলে অভিহিত করেন। এই মতের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আঘাত হেনে নজরুল লেখেন তাঁর কোরবাণী' কবিতা। এ কবিতার একদিকে আছে যেমন তরীকুল আলমের ভিত্তিহীন মন্তব্যের বিরুদ্ধে তীব্রতার প্রতিবাদ তেমনি অন্য দিকে আছে ইস্‌লামের এই পবিত্র অনুষ্ঠানের প্রতি দৃঢ় সমর্থন।

ষষ্ঠ (আশ্বিন) সংখ্যায় প্রকাশিত হল বৈষ্ণব বেদনায় ভারাক্রান্ত অশ্রুসজল কবিতা 'মোহররম'। আকরমুন্নেসা খাতুন এই কবিতাটি লেখবার জন্য নজরুলকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখেন। নজরুল কিছুক্ষণের মধ্যেই পাশ্ব হতে বরদায় টোকা দেন —একটি সুদীর্ঘ অনবদ্য কবিতা লেখা হয়ে গেছে। কবিতাটি সেকালে অনেকের মুখে মুখেই ফিরত।

সপ্তম (কার্তিক) সংখ্যায় প্রকাশিত হয় কবির একটি বিখ্যাত গান: "বন্ধু আমার! থেকে থেকে কোন সুদূরের নিমন্ত্রণে।" এই গানটি মোহিতলাল মজুমদারের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। এমন কী বহুসময় দেখা গেছে কবি যখন গানটি গাইছেন তখন মোহিত-বাবু আবেগভরে মাথা নেড়ে বার বার চিবুক স্পর্শ করছেন।

অষ্টম (অগ্রহায়ণ) সংখ্যায় মুদ্রিত হয় "কাতেহা-ই-দোয়াজ দহম্" আর হাফিজের গজলের সুদীর্ঘ অনুবাদ। নবম (পৌষ) সংখ্যায় প্রকাশিত হল "জীও জান-ই হাফিজের' অনুবাদ আর শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তার দেওয়া সুরে তাঁরই রচিত নজরুলের "হয়ত তোমার পাব দেখা" মধুর গানটির স্বর-লিপি। দশম (মাঘ) সংখ্যায় প্রথমেই মুদ্রিত হয়েছিল 'নিবেদন বিধুরা' কবিতা। এ ছাড়াও হাফিজের গজল। একাদশ সংখ্যায় মুদ্রিত হয় দুটি গান—'সজনী ও স্নেহ-ভীতু'। বর্ষশেষ সংখ্যায় (ফাল্গুন—চৈত্র) একটি গান "আমার ঘরের পাশ দিয়ে যে চলতো নিত্যই সকাল সাঁঝে" ও তার স্বরলিপি প্রকাশিত হয়।

দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (ভাদ্র, ১৩৩৮) প্রকাশিত হয় "কার বাঁশী বাজল" কবিতা ও একটি গান। দ্বিতীয় সংখ্যায় (আশ্বিন) মুদ্রিত হয় "বারদ দিনে" "দিল্‌-দরদী" ও পলাতকা তিনটি কবিতা, তৃতীয় সংখ্যায় (কার্তিক) প্রকাশিত হয় চির বিখ্যাত কবিতা "বিদ্রোহী" ও "কামালপাশা"। এরপর আরো দুটি সংখ্যা "যোগলের ভারত" প্রকাশিত হয়—কিন্তু তাতে কবির কোন উল্লেখযোগ্য কবিতা মুদ্রিত হয়নি। চতুর্থ (অগ্রহায়ণ) সংখ্যায় মুদ্রিত হয় "কাতেহা-ই দোয়াজ দহম" (তিরোভাব) এবং শেষ পঞ্চম (পৌষ) সংখ্যায় প্রকাশিত হয় "বিজয়িনী" কবিতা।

"যোগলের ভারতে" মুদ্রিত কবির সকল সৃষ্টির সঙ্গে আমরা পরিচিত হলাম। একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাব নজরুলের সুনাম, যশ, প্রতিপত্তি, খ্যাতি সকল কিছুই এই কবিতাগুলির মধ্যে নিহিত। এই কবিতাবলীই তাঁকে বাংলা সাহিত্যে বিশেষরূপে চিহ্নিত করেছে। সুতরাং "যোগলের ভারতে"র মাধ্যমে নিখিল বাংলার সুধীজনের হৃদয়ে কবির প্রতিষ্ঠা—এমন কথা বললে বোধহয় অত্যুক্তি করা হবে না। বাংলা সাহিত্যের আর কোন কবি এত অল্প লিখে (মাত্র গোটা দশেক কবিতা) এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন বিপুল প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেননি। "যোগলের ভারতে"র লেখা-

গুলি পড়েই সমকালীন বাংলার সকল সমালোচক, লেখক পাঠক নতুন প্রদীপ্ত প্রতিভাকে স্বাগত জানাতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিশোর কবির কবিতার ভাব-ভাষা ও ছন্দগত প্রভাব অনেকের মধ্যেই দেখা গেল। "বিদ্রোহী"র ছন্দ অবলম্বন করে সে সময় বিভিন্ন পত্রিকায় এত অসংখ্য কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল যে অন্য কোন কবির কোন কবিতার ছন্দ অবলম্বন করে এমনটি হয়নি। কিশোর কবির প্রতি শুভেচ্ছাবাদ জানিয়ে "অগ্রহায়ণ" সংখ্যা "মোসলেম ভারতে" শ্রীমোহিতলাল মজুমদার নজরুলের "বাদল প্রাতের পরাব"এর ছন্দাবলম্বনে লিখলেন "ক্যাপা" :

শিশুর মত সরল হেসে উঠল ক্যাপা খিলখিলিয়ে,
জ্যোৎস্নালোকের ওষ্ঠ চুমি' রক্তের সাথে দিল মিলিয়ে।...

শান্তিনিকেতন থেকে শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী মহাশয় "সৈনিক কবি কাজী নজরুল ইসলাম সাহেবের প্রতি" এক আবেগময়ী সুদীর্ঘ অভিনন্দন কবিতা লিখে পাঠালেন—কার্তিক সংখ্যা "মোসলেম ভারতে"র পৃষ্ঠায় তা' দেখা গেল :

ছন্দে গানে বাজাও কবি বাজাও প্রাণের গান,
মুছুক বিশ্বজনে দাওগো নূতন প্রাণ।...

কবিকে স্বাগত জানিয়ে শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের লেখা দীর্ঘ পত্রের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, বরোদা রাজ্যের উচ্চপদস্থ দেওয়ান কমিশনার বিশিষ্ট সাহিত্য রসিক মিস্টার সত্যব্রত মুখার্জীও কবিকে অভিনন্দন জানিয়ে এক দীর্ঘ আবেগপূর্ণ পত্র দেন। অভিনন্দন জানিয়েছিলেন আরো অনেকে। মোট কথা "মোসলেম ভারতে"র দুসটাই (নজরুলের প্রথম যুগ) কবিখ্যাতির স্বর্ণযুগ।

"মোসলেম ভারতে"র যুগে কবির আর একটি স্বরূপের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই—'বিজ্ঞাপন লেখক নজরুলে'র স্বরূপ। ডোয়াকিন এণ্ড সন্স বাংলার বিখ্যাত বাদ্যযন্ত্র ব্যবসায়ী। এই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ কিশোর কবিকে তাদের নির্মিত হার্মোনিয়ামের একটি বিজ্ঞাপন লিখে দিতে বলেন—কবি সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হয়ে যান এবং লেখেন আট লাইনের এই মনোরম বিজ্ঞাপন :

কি চান? ভাল হার্মোনী?
কাজ কি গিয়ে—জার্মানী?
আসুন, দেখুন এইখানে
যেই সুরে যেই গানে
গান না কেন, দিবো তাই
মিলবে. আসুন এই হেথাই!
কিনবি কিনু
'ডোয়ার্—কিনু'!

সে সময় পার্কসার্কাস এলাকায় 'বাহাদুর' নামে আর একটি বাদ্য যন্ত্রের প্রতিষ্ঠান ছিল। ডোয়াকিনের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরাও কবির নিকটে ছুটে এলেন। এই অনুরোধ—তাদের প্রতিষ্ঠান নির্মিত 'বাহাদুর' হার্মোনিয়ামের বিজ্ঞাপন লিখে দিতে হবে, কবি এবারেও লিখলেন আটলাইনের কবিতা—'বাহাদুরে'র চমৎকার বিজ্ঞাপন :

মিষ্টি 'বাহা বাহা' সুর
চান ত কিনুন 'বাহাদুর'!
দু'দিন পরে বলবে না কেউ—"দূর-দূর!"
যতই বাজান ততই মধুর মধুর সুর!!
করতে চান কি মনের প্রাণের আহা দূর?
একটিবার ভাই দেখুন তবে 'বাহাদুর!'
যেমন মোহন দেখতে, তেমনি শিরীন ভরাট
বাহা সুর।
কিনুন, কিনুন 'বাহাদুর!!"

এ দুটো বিজ্ঞাপনই "মোসলেম ভারতে"র অনেকগুলি সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল। আমি দ্বিতীয়বর্ষের কার্তিক সংখ্যায় (এই সংখ্যায় "কামালপাশা" ও "বিদ্রোহী" ক বতা একত্রে মুদ্রিত হয়) বিজ্ঞাপন দুটি একত্রে দেখেছি। নজরুল কোন এক "কেশ তৈলে"র ওপর একটি সুন্দর বিজ্ঞাপন লিখেছিলেন—কিন্তু বহু চেষ্টার পরও তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

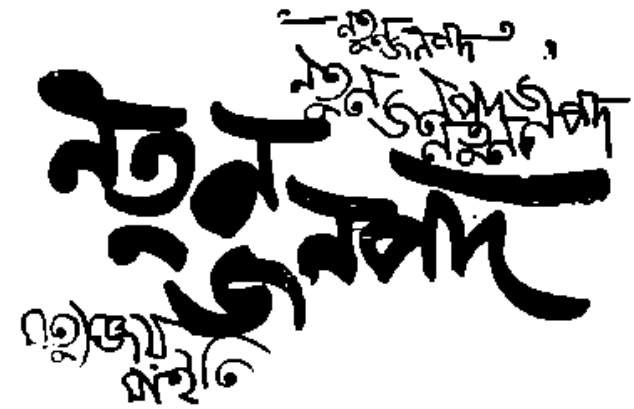

দেখতে দেখতে বিস্তীর্ণ জগতে বদলের পালা শুরু হল। ধানচারা রোয়ার পর কিছুদিন এই চারাগুলো হলদে হয়ে থাকে। নতুন মাটি থেকে চারা রস নিতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। ছিঁড়ে যাওয়া শিকড় কিছুদিন পর্যন্ত নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সময় নেয়। তখন পাতা থেকে রসের সঞ্চার কুরিয়ে আসে, বিবর্ণ হলুদে হয়ে ওঠে সারা মাঠ।

দিন পনের পর আবার সেই নতুন পাতা সবুজ বর্ণে সারা শস্যপ্রান্তর ভরে ওঠে। গাছের গোড়াগুলো মোটা হয়। যৌবনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে চারাগুলো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। খুব সকালে, পাখ পাখালি ডাকলেই গ্রামের চাষীরা উঠে পড়ে। তখনো পথে, যেখানে আল, জমি নিয়ে বা সজনে গাছের ডালাগুলো ছড়িয়ে পড়েছে, সেখানে অন্ধকারগুলো ঠিক কর্পূর হয়ে যায়নি; সেই সময় তারা মাঠের দিকে তাকিয়ে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে কেবল চেয়ে থাকে সেই ধানচারার দিকে, বলে মরবে পালারা মরবে বলেই এত বাড়ন্ত হয়েছে। আসলে মনে মনে খুশি হয়। কিন্তু ধানের বিপদ অনেক। যদি বন্যা হয়? কেলেঘাই নদীর বন্যাকেই ওদের সবচেয়ে ভয় বেশি। এক রাতেই এই বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠ গভীর সাদা ঘোলাটে জলে ডুবে যাবে, এবং সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ প্রাণ সেই জলের তলায়, নিঃশ্বাস না নিতে পেরে মরে যাবে, পচে যাবে। সবুজ মাঠ তখন সমুদ্র হয়ে উঠবে, নৌকো চলবে। নৌকোয় করে লোকে হাটবাজার করতে যাবে, নৌকোয় করে ঝিলিক আসবে সেই সদর থেকে। লোকে জাল ফেলে সেই মাঠে মাছ ধরবে কেলেঘাইয়ের গলদা চিংড়ি। এদেশের লোক তাকে বলে চিংড়ামাছ। তা; সেই মাছ ধরবে কুঁড়ো পুড়িয়ে চার করে। কোথায় কোথায় চার দেওয়া হল, তার চিহ্ন রেখে যাবে এক একটা কাঠি পুঁতে পুঁতে।

অবশ্য সব বছর বন্যা হয় না। যে বছর হয় না, সে বছর আশ্বিন কার্তিক মাসে এই ধান চারার আশ্চর্য সবুজ মাঠ তখনই সমুদ্র হয়ে উঠবে, নৌকো চলবে নৌকোয় করে লোকে হাট বাজার করতে যাবে, নৌকোয় করে ঝিলিক আসবে সেই সদর থেকে। লোকে জাল ফেলে সেই মাঠে মাছ ধরবে। ধরবে কেলেঘাইয়ের গলদা চিংড়ি। এদেশের লোক তাকে বলে চিংড়ামাছ। তা, সেই মাছ ধরবে কুঁড়ো পুড়িয়ে চার করে কোথায় কোথায় চার দেওয়া হল তার চিহ্ন রেখে এক একটা কাঠি পুঁতে পুঁতে।

অবশ্য সব বছর বন্যা হয় না। যে বছর হয় না, সে বছর আশ্বিন কার্তিক মাসে এই ধান চারার আশ্চর্য সবুজ রং আকাশকেও তার মায়ায় ধানচারার তখন, সেই বর্ষণ ক্লিষ্ট শরতের অভ্রস্ত শিশিরে আবার নতুন ধানের জন্মের হিমঘরের দরজা খোলে গাছের পাতা যেখানে গোড়ার দিকে এসে শেষ হয়েছে সেই খানেই নতুন ধানের জন্মভূমি। এদের লোক বলে 'থোড়' এসেছে ধানে। সেই থোড় থেকে সাদা নরম ধানের শিষ বেরয়, সঙ্গে সঙ্গে রক্তের কেশর। ঐ সময় বন্ধ জলে এই কেশর করে যায়, তখন ধান আগড়া হয়ে যায়, অর্থাৎ ধানের ভেতর চাল থাকে না।

সব হয় না, কিছু কিছু হয়। যেগুলিতে 'আগড়া হয় না সেই ধান দেখতে দেখতে পুষ্ট হয়ে ওঠে। তার পর সবুজে রং একদিন ঢাকা পড়ে যায়। পাতার রং হলুদে হয়ে আসে, বীজ অনুসারে ধানের রং লাল হয়, কালো হয়। মাঠে জল শুকিয়ে আসে, আস্তে আস্তে শীত পড়ে, ধানগাছ সুপক্ক শিষগুলি নুয়ে মাতৃত্বের অবদানে খুয়ে পড়ে দিগন্তবিস্তৃত মাঠের মাটিতে।

শস্যের চিরন্তন ইতিহাসের এই বিবর্তন নীলাপুরের চারপাশের জমিতে বেশ এমনি এসেছে। মরা নদীটা

কিছু আগেই যারা হয়েছিল পুল তৈরী হয়ে বসে। পুল তৈরীর কাজ এগিয়ে চলেছে। উঁচু উঁচু থোটা কংক্রীটের থাম তৈরী হয়েছে। জীপে চড়ে ইঞ্জিনিয়ার আসছে, ওভারসিয়ার আসছে লরীতে সিমেন্ট, স্টীলের চাদর বোঝাই হয়ে আসছে। মিস্ত্রীরা ইট সাজিয়ে আগেই অস্থায়ী ঘর তৈরী করে নিয়েছে।

আর পাঁচ মাস্তা হয়ে গেলে যেখানে মাটি খোঁড়া হচ্ছিল এখন তারও কাজ এগিয়ে চলেছে। মাটি যেখানে তার ওপর সোলিং পড়ছে, তার ওপর খোয়া। খোয়া দেবার পর পাঁচ ফেলে রোলার দিয়ে সমান করা হবে রাস্তাটা। দুটো রোলার রাস্তার ধারে একা একা পড়ে থাকে ইটখাইটার কাছে।

সাঁওতাল কুলিদের সংখ্যা কিছু কমে গেছে। তবু এখনও যথেষ্ট আছে। ইটের ভাঁটি যেখানে বসেছিল সেখানে কাজ চলেছে। রোলার যে উত্তর দক্ষিণে চলে গেছে। কুলি কামিনরা ইট বইছে দিনরাত। ঢালাই করে ইটগুলো রাস্তায় চালান দেওয়া হবে। ইট পোড়াবার ভাঁটির অদূরে একটি ছিপি মদের ভাঁটিও বসেছে। সন্ধ্যাবেলায় ভীড় করে কুলিকামিনরা সেই ভাঁটিতে। তার দক্ষিণে রাস্তার ধারে তাঁবুতে থাকে কন্ট্রাক্টার সমুদ্দর সিং। বেশ বড় কন্ট্রাক্টার সিংজী। সম্প্রতি এসেছে এখানে কাজ দেখতে গোটা পাঁচেক লরী খাটছে তার। বাঙালী ম্যানেজার দুজন জোয়ান জোয়ান নেপালী দারোয়ান আর একটা বন্দুক নিয়ে সিংজী কারবার চালাচ্ছে এই সুদূর মফঃস্বলে।

লোকে বলে রাত্রিতে নাকি সিংজীর তাঁবুতে কিছু কুলি কামিনদের ডিউটি থাকে।

মরা নদীটার ধার দিয়ে সেদিন ভোরে প্রাতঃভ্রমণ সেরে সিংজী তাঁবুতে ফিরছিল। নদীর জলের কাছ থেকে কি একটা শব্দ পেয়ে থামল একটু। শব্দটা কাছ থেকেই আসছে। অথচ উঁচু পাড়ের জন্য কিছু চোখে পড়ছে না। সিংজী পাড়ের একটু উঁচু টিপিতে উঠে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখল। হঠাৎ নজরে পড়ল একটি কুলি কামিন নদীতে স্নান করছে। নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে নিঃসংকোচ নদীর অপরীণীয় নৈঃসঙ্গে, আপন অরণ্য যৌবনকে অনাবৃত করে স্নান করছে সে। সিংজী দূরে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকল, ততক্ষণে সে তার আস্তানায় ফিরে যায়।

ধীরে ধীরে স্নান সেরে সিক্ত আঁচলটা বুকে বিছিয়ে নিয়ে নদী পাড় রেখে উপরে উঠে আসছিল কুলিকামিন রূপা মাহাতো। উঁচুতে ওঠার জন্য নিটোল দেহটা সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ছিল তার। আর সেই বিশেষ ভংগীতে শরীরটা আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠছিল রূপার।

উঁচু পাড়টায় উঠে দাঁড়িয়ে তাকাতেই প্রথম তার সিংজীকে চোখে পড়ল। বন্য বর্বর শ্বাপদের মত সিংজীর চোখ দুটো জ্বলছে।

তাড়াতাড়ি নিজেকে ছোট শাড়ীটার যতটুকু পারে আরও আবৃত করার ব্যর্থ চেষ্টা করল সে।

সিংজী তাঁবুতে ফিরে এল। ম্যানেজারকে ডেকে চুপি চুপি নির্দেশ দিল ডেকো কাপড় পরে বিছিয়ে নিয়ে রূপা মাহাতো যেদিকে চলেছে তার দিকে।

সেইদিন সন্ধ্যায় ম্যানেজার এসে কথাটা পাড়ল রূপা মাহাতোর কাছে। 'সিংজীর বাড়ীতে কাজ করতে হবে, তাকে ডিউটীতে যেতে হবে না ইট বইবার কাজ থেকে তার এখন বেশি মাইনে। দুবেলা খাওয়া আর কত কম খাটুনি। এই সকালে বিকালে চায়ের কাপ ডিস ধুয়ে দেওয়া, বাসনপত্র পরিষ্কার করা। বাসন পত্র বলতেই বা কি আর তেমন আছে? সিংজী দুটী ডাল ভাত খায় শুধু।'

রূপা তাকে হটিয়ে দিল, 'যা সে ইট বইবার কাজ করবে। তার দরকার নেই বেশি মাইনে নিয়ে। আর কেন সে সিংজীর বাড়ীতে খাবে? তার মরদ নেই বাড়ীতে'? মরদ অর্থাৎ স্বামী।

রূপা হাঁকিয়ে দিল ম্যানেজারকে।

রাত্রে ইট বইবার কাজ বন্ধ হয়েছে। সারাদিনের ভারী নদীর ক্লান্ত গর্জন-পীড়িত এই পথটা, এখন রাত্রির শান্ত বাতাসে শুয়ে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। কুলি-কামিনদের ঘরগুলোর আলো নিভে গেছে এখন। সিংজী মদের নেশায় ছিল বসল, 'অরুয়া পাকড়ে লে আয়া। ইয়াদ রাখো।'

সিংজী কলকাতার মানুষ। সেখানে নারীপণ্য বিক্রয়ের কেন্দ্রগুলি থেকে সহজে এবং পছন্দমত পণ্য দুর্লভ নয়। কিন্তু নীলাপুর কলকাতা নয়। আর ঝাড়গ্রামের এক সুদূরে শাল গেগুন বন ঘেরা ক্ষুদ্র পল্লীর মানুষগুলো শহরের নারীপণ্য ব্যবসার সংগে পরিচিতও নয়। সেখানে অন্য অরণ্য জীবন।

রূপা, হর মাহাতোর সংগে ছোঁড়া মাদুরের বিছানায় ঘুমিয়ে ছিল, নির্ভয়ে তার বুকের খুব কাছে। রূপা তার স্বামীকে বলেছে সিংজীর প্রস্তাবটা। হর শুনে ক্ষেপে উঠেছিল। তার স্বামীটা জোয়ান, তীর চালানোর ওস্তাদ সে। এই লক্ষ্যভেদ করেই সে রূপাকে জয় করেছিল। পৃথিবীর কাউকে রূপা ভয় করে না, সিংজী ত' দূরের কথা।

হঠাৎ রাত্রির অন্ধকারে একটা চাপা গোঙানি যেন কেটে পড়তে চাইছে। কার একটা শক্ত হাত এসে রূপার মুখটা চেপে ধরেছে। রূপা সজোরে সরিয়ে দিতে যাচ্ছে সেই হাতটা, কিন্তু পারছে না। সারাদিন ইটের বাড়ি বয়ে বয়ে রূপার হাতেও জোর কম নেই। কিন্তু এ হাতটা যেন লোহার তৈরি। রূপা পা দিয়ে জোরে লাথি মারতে চাইল লোকটাকে, কিন্তু লাথিটা পড়ল হর মাহাতোর গায়ে। জেগে উঠল হর মাহাতো। তারপর শুরু একটি মুহূর্ত। বিদ্যুতের মত লাফিয়ে উঠল হর, দৌড়ে গিয়ে তার টাঙ্গিটা কুড়িয়ে নিয়ে এল।

আর সেই অন্ধকারে ইস্পাতের ফলাটা শুধু দুইবার চকচক্ করে উঠল! দ্বিতীয়বার তার রং লাল। হর মাহাতো টাঙ্গি দিয়ে একবার একটা মস্ত চিতাবাঘ মেরেছিল। আজ মরল একটি মানুষ চিতা। অন্য দারোয়ানটা ততক্ষণ পালিয়েছে।

হর মাহাতো একটি ক্রুদ্ধ ষোড়ের মত রাগে তখনও ফুলছে পাথরের কালো দেহটা নিয়ে। রূপা কেঁদে উঠল। 'লোকটা যে মরিয়া গেছে গো।'

মাদুর, মেঝের মাটি সব রক্তে ভিজে গেছে।

'এবার কি হবে গো।' রূপা কাঁদছে।

হর ধমকে উঠল, 'থাম, তুই। তারপর তীর ধনুকটা তুলে নিয়ে অন্ধকারে দৌড়ে বেরিয়ে পড়ল। সব কটাকে শেষ করে আসবে।

রূপা হাতটা ধরে ফেলল হর মাহাতোর। রূপা জানে সিংজীর বিছানায় একটি বন্দুক পড়ে থাকে সব সময়। বন্দুকে ওর বড় ভয়। বড় বড় বাঘ বন্দুকের গুলিতে খতম হয়ে যায়। হরকে সে ছেড়ে দেবে না, না, না, কিছুতেই না। 'চল, আমরা পালিয়ে যাই। এখনি চল গো।

হর শান্ত হল। সাঁতাই লোকটা তার ঘরেই একজন খুন, বড় গুরুতর ব্যাপার।—রূপা বলল, 'হয়ে গেছে। আর দেরী করিস না চল এক্ষণি পালিয়ে যাই।'

হোপলার ঘরের কোন মায়া নাই, কোন বাঁধন নাই। কয়েক দিনের এই কুটিরের জন্য। শুধু বাঁকে ঘরের বিবিধ পত্র তুলে নিলে হয়। হাতে টাঙ্গিটা বাগিয়ে ধরল। কাঁধে তুলে নিল ধনুক। তারপর রূপার হাত ধরে সেই অন্ধকারে নক্ষত্র খচিত আকাশের আলোয় বেরিয়ে পড়ল।

রূপা বলল। 'চল মাঠে মাঠে যাই।' বাঁধা দরী দিয়া লোকটা তাড়া করে।

দারোয়ানটা ফিরে গিয়ে হয় মিতে মিতে বলল, 'এবরম্ খুন হো গিয়া বাবুজী। একদম।'

'ক্যা,? খুন হো গিয়া। একদম? জানে দো শা, লাস বাঁধকে নদীমে ফেক্‌দো।'

সিংজী একশত টাকার নোটটা তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল 'লে যাও।'

আবার ফিরে গেল দারোয়ানটা। যে কাল সন্ধ্যায়ও তার দোস্ত ছিল। আজ শেষ রাত্রে সে নিজে তার টুকরো টুকরো মৃত দেহটি বস্তায় বেঁধে নিয়ে নদীর দিকে চলল। পা কাঁপছে তার। টলে টলে পড়ছে সে। নদীর ধারের উঁচু নীচু পথটায় বার বার হোঁচট্ খাচ্ছে সে। কে যেন ডাকলো মা? দারোয়ানটা দৌড়াল। যত জোরে পারে দৌড়াল সে। তারপর নদীর জলে বস্তাটা ফেলে দিয়ে উঁচু মাটির ঢিপির আড়ালে আড়ালে বরাবর উত্তর দিকে মরা নদীটার পার দিয়ে বাবলা বনটার দিকে দ্রুত দৌড়ে পালাল সে।

দেখতে দেখতে পূব' দিকের অন্ধকারটা ফিকে হতে

আরম্ভ করেছে। মাঠে মাঠে হালকা আলো ছড়িয়ে পড়েছে।

'এ্যাই মাঝো।' রূপা হঠাৎ আবার হর মাঝিতোর হাতে টান দিয়ে আঙুল দিয়ে দূরের কি একটা জিনিস দেখাল।

হর দেখল, দুটো প্রকাণ্ড গোখুরে সাপ উঁচু পাঁচিল পাথরের জঙ্গলের ঘন গাছটার নীচে, এ্যাই চওড়া ফণা তুলে জড়াজড়ি করে খেলছে। তড়িৎগতিতে হর বাঁকটা রেখে কাঁধ থেকে ধনুকটা নামিয়ে নিতে রূপা হাতটা ধরে ফেলল তার বলল, 'ওরা জোড় খাচ্ছে। মারতে নেই গো, ওদের এখন মারতে নেই। চল্ আমরা দূর দিয়ে চলে যাই।'

যেতে যেতে রূপা পেছন ফিরে হাত জোড় করে মাথায় ঠেকাল। এই সাপের জোড় খাওয়া দেখা নাকি ভাগ্যের কথা, বড় সুলক্ষণ আর তাকে কিনা হর তীর মেরে শেষ করে দেবে! ওর মধ্যে খুন চেপে গেছে, ওটা খুনী হয়ে উঠছে।

অনেকক্ষণ পরে মাঠ ছেড়ে এবার ওরা উঁচু পাঁচ রাস্তাটায় পড়ল। নদ ঘাট এসে গেছে, ঐ হলদী নদীটা দেখা যাচ্ছে। ওটা পেরিয়ে গেলেই পাশকুড়া যাওয়ার গাড়ী পাওয়া যাবে। সেখান থেকে ট্রেন। ট্রেনে করে গোয়ালিয়ালাল। রূপা এবার ছাড়ি ছেড়ে বাঁচল। না। সিংজী সরী নিয়ে আর তাড়া করতে পারবে না। এই আনন্দে সে হর মাঝিতোর হাতটা বুকের কাছে আরো জড়িয়ে ধরলো। কি চওড়া কব্জি, কি চওড়া বুক লোকটার। সে আজ খুন করেছে। বৌকে বাঁচাতে গিয়ে, বেশ করেছে। ঠিক করেছে। ভাল করেছে। কেন করবে না! সিংজীকে ম্যানেজারকে, আর তার বাকী দারোয়ানটাকে খুন করলে আজ রূপা আরো খুব, খুব খুশি হত!

পূর্ব দিকের যে আকাশটা বিস্তীর্ণ হলদী নদীর ওপর সারারাত জেগে ছিল, সেই আকাশটায় এখন আলো ভরে আসছে।

রূপা আর হর এসে দাঁড়াল সেই নদীর ধারে। এখনও পুরো খেয়াটা ছাড়ে নি। খেয়ায় লোকজন দেখা যাচ্ছে না। শুধু ওপারে একটা 'বাদ' দাঁড়িয়ে আছে শিরিষ গাছটার নীচে। এখনও শেষ রাত্রির জোয়ার চলেছে। অনেক দূরে একটা নৌকো পাল তুলে সেই জোয়ারে আসনান ঘাটের দিকে চলে যাচ্ছে।

ওস্তাদ মহেন্দ্র অধিকারী সেই ছোট ঘরটার দাওয়ায় বসে অরবিন্দকে নিজের জীবনের কথা শোনাচ্ছিলেন। খুব মন দিয়ে, খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনছিল অরবিন্দ। অরবিন্দের নিজের বাড়ী বিষ্ণুপুরের কাছাকাছি। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গীতজগতের তীর্থস্থান এই বিষ্ণুপুর। অরবিন্দ নিজে অবশ্য গাইতে জানেন না, তবে রাগ-রাগিনী চেনে, বাঁশের বাঁশি বাজাতে পারে একটু।

অরবিন্দ শুনছিল, ওস্তাদজী বলছেন—'সেবার ইসলামপুরের চৌধুরীদের বিয়ে বাড়ীতে জলসা হচ্ছে। কলকাতা থেকে গাইয়ে বাজিয়ে এসেছেন, দেশের ওস্তাদরাও জড় হয়েছে। তখন চৌধুরীদের বাড়ীতে আমার যাতায়াত খুব, ছোটবাবু গান ভালবাসতেন। সব সময় বৈঠকে গোটা তিনেক তানপুরা, পাখোয়াজ, তবলা, হারমোনিয়াম সাজানো থাকত। ফরাস পাতা থাকত সাদা মেঝেতে। বাইরের ওস্তাদরা এসে, সেই খানেই গান হত।'

'বিয়ে বাড়ীতে আসর অবশ্য সেদিন সেখানে বসে নি। কারণ বাড়ীর আত্মীয় স্বজন, চারপাশের গ্রামের লোক সব গান শুনবে কলকাতা থেকে ওস্তাদ আসছে। আসর বসল নাট মন্দিরের সামনের উঠানে। উপরে রঙীন সামিয়ানা, সুন্দর কাজ করা। চারদিকে বড় বড় 'ডেলাইট'। আসর ঝলমল করছে একেবারে। বাবুরা সিল্কের পাঞ্জাবি পরেছেন, আতর আর জর্দা দেওয়া সুগন্ধি পান খেয়ে খেয়ে আসরকে মাতিয়ে তুলেছেন। তার উপর জল ছড়ানো হচ্ছে আসরে।'

ওস্তাদ বললেন, 'একটু চা দিয়ে যাক্ বাবা, তোমাকে।'

'না, না, চা থাক, আপনি বলুন।'

ওস্তাদজী বলে চললেন, 'তা আসর সুরু হতেই রাত প্রায় এসারটা হয়ে গেল। আমি আমার তবলজী হীরুলাল, তানপুরা বাজাবার জন্য একটি ছাত্র, সব আমরা একপাশে বসে আছি। কলকাতার গাইয়ে,

তার বাহার কত। তাল চলনে যেন কাউকেই মানুষ বলে গেরাহ্যি করে না।'

'বাইরের গাইয়েদের আগে গাইতে দিতে হয়। তানপুরা বেঁধে নিয়ে ওদের একজন গান ধরলেন। 'দেশ' রাগ গাচ্ছে। গলাটা একটু কর্কশ। ওই এক ঝিনিস বাবা, কেবল গান শিখলে হয় না, গলা যদি সুরেলা না হয়, তবে সব ওস্তাদি মাটি। সুরেলা গলা হ'ল ভগবানের দান।'

'দেশ'রাগ খাম্বাজ অঙ্গের। বাদী সুর 'রেখাব'। সম্বাদী সুর পঞ্চম। আরোহণে গান্ধার নেবে না, আসার সময় কোমল নিষাদ নিয়ে আসবে। শোন, চালটা এই রকম—'ওস্তাদজী দেশরাগের চালটা একটু শোনালেন।

অরবিন্দ অবাক হয়ে শুনল, ওস্তাদের গলা এখনও কি ভরাট আর সুরেলা!

ওস্তাদজী আবার বলতে লাগলেন, 'আমার কেন যেন আদৌ ভাল লাগছিল না। মনে হচ্ছিল রাগের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল না। গায়ক কেবল তান নিচ্ছেন ফাঁকা তান। সুরের গভীরে যেতে পারছেন না। এ বাবা, সহজে বোঝা যায় না, সাধনা করতে হয়। তারপর গায়কের মুখভঙ্গী বিশ্রী। গায়কের মুখভঙ্গী করতে নেই—সুর সহজে আসবে। এসব মিলে আমার ভাল লাগছিল না।'

যাই হোক প্রায় একঘণ্টা পরে সেই গান থামল।

হাততালি পড়ল আসরে।

ছোটবাবু বললেন, আর একটা হোক্।

কোন ওস্তাদকে একটা গান গাইতে দিতে নাই। গাইয়ে বাজিয়েদের মধ্যে এই হ'ল সহবৎ। আদব-কায়দা।

গায়কটি বললেন, 'তাহলে আপনাদের কেউ তবলা বাজান।' ইংগিতটি হীরুর দিকে।

হীরু আমার দিকে তাকাল।

আমি বললাম, 'বাজাও, উনি যখন বলছেন।'

হীরু তবলাটা আবার বেঁধে নিল।

আবার তানপুরা বাজতে সুরু করছে।

আমার মনে হল, তানপুরা ঠিক বাঁধা নেই। চড়ার 'সা'টা একটু কম বলছে। গায়ককে বললাম বোধহয় একটু নেমে গেছে সা'টা।

আমার দিকে গায়কটি একবার তাকালেন, তা আমরা হলাম গাঁয়ের মানুষ, শহরের মানুষের মত চকচকে নই। তাই বোধ হয় গায়ক গ্রাহ্য করলেন না।

অপমানটা গায়ে মেখে চুপ করে বসে রইলাম আমি।

এবার 'ধ্রুপদী' গাচ্ছে গায়ক।

আলাপ চলছে ত চলছেই।

দীর্ঘ আলাপের জন্য একটু একটু গণ্ডগোল হচ্ছে আসরে।

কতক্ষণ পরে গায়ক গান ধরল। কিন্তু গান ধরেই চালাকি আরম্ভ করল। সাধারণত খেয়াল বা ধ্রুপদ গানে গায়কের সঙ্গে বাজিয়ের সঙ্গে বোঝাপড়া থাকলে ভাল হয়। হীরুর সঙ্গে তা ছিল না। তার উপর হীরুর এই সে'য়ো চেহারা দেখে, গায়কের কিরকম রোখ চেপে গেছে হীরুকে অপদস্থ করবেই।

আমি নড়ে চড়ে বসলাম, রাগে আমার গা' জ্বলছিল। ছোটবাবু আমার মুখের দিকে তাকালেন। বুঝলাম ছোটবাবু বলতে চাইছেন, দেশের সম্মান রাখতে হবে ওস্তাদ। অরবিন্দ একমনে শুনছিল।

ওস্তাদ বলে চলেছেন, 'এসব বাজে ওস্তাদের কাজ। গান, ভগবানের পূজা।

গান আর ওস্তাদী দুটো এক ঝিনিস নয়।'

ইংগিতে হীরুকে চোরাই তেরাইটা দেখিয়ে দিলাম।

হীরু ঠিক ধরল। চাঁটি দিল তবলায়।

তবলাটা আর্তনাদ করে উঠল একবার।

অনেক দরদ দিয়ে শিখিয়েছিলাম হীরুকে। হাতটাও ভাল ছিল।

চাঁটি দিয়েই হীরু দুনে ধরল। খেলুক একটু গাইয়ে, অনেক খেলাত আগে দেখিয়েছেন। কয়েক মিনিট, তারপর হীরু ধরল চৌদুন।

আঙুলগুলো আর দেখা যাচ্ছে না, কেবল শব্দ শুনছি, যেন ঘোড়ার দৌড়ুচ্ছে পাথুরে রাস্তায়।

গাইয়েকেই আমরা বাহবা দিচ্ছি, 'বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা ওস্তাদজী কহিছ'।

এদিকে ওস্তাদজীর অবস্থা কাহিল। হীরুর সংগে

লয় রেখে গাইবে, সে কি চাট্টিখানি কথা।

হীরুর বুক টগবগ করে ফুটছে সারা আসর থম থম করছে, কি হয়, কি হয়?

কিছু নয় মাত্র। তারপর হঠাৎ গান থেমে গেল।

কি হল? কি হল? এর মধ্যে থামার কথা নয়। তাল নেওয়াই হয়নি ভাল মত। এবার আর হাততালি পড়ল না। মুহূর্তে যেন একটা বিষণ্ণ সুর সারা আসরে এই রাত্রির বাতাসের সংগে সংগে ছড়িয়ে পড়ল।

রাত্রি ক্রমশ শেষের দিকে চলেছে। একটু শীত শীত করছে বাতাসে।

সারা আসরের চোখে যেন একটা ঘুমের অলস মধুর অনুভব।

ওদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ ছিলেন, তিনি আমাকে বললেন, 'আপ কৃপা করকে কুছ শুনাইয়ে।' আমি বললাম, 'নেই নেই' আপ গাইয়ে।'

উনি তানপুরাটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন।

অরবিন্দ জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি গাইলেন?'

'সেই আসরের দিকে চেয়ে একবার ভাবলাম, কি গাইব? রাত ভোর হয়নি, তোড়ী চলে যাচ্ছেন। সেই রাত্রি শেষের বাতাসে একটা করুণ সুর ভেসে আসছিল। গুরুই যেন আমায় বললেন, গাও বেটা ভৈরবী গাও। ডেকে নিয়ে তাকে, বিছিয়ে দে, ছড়িয়ে দে গ্রাম আর মাটীর বুকে কান্নার মতো।

'চোখবুজে ভৈরবীর ধ্যান করলাম। প্রণাম করলাম গুরুকে, সারা আসরকে। তানপুরা দিলাম ছাত্রের হাতে। তারপর শুরু উদারায় কোমল ঋষভ থেকে কোমল নিষাদের ওপর দিয়ে সুরে এসে দাঁড়ালাম।' ওদের দলের সেই বৃদ্ধটি আমার কাছে সরে এসে বললেন, বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা।

অরবিন্দের গায়ে রোমাঞ্চ হচ্ছিল। সে স্পর্শ পাচ্ছিল, একটি রাত্রি শেষের আসরের ওপর দিয়ে ভৈরবীর আলাপের কান্নাগুলো, শিশিরের মত পথের ধুলোয় কেবল বিছিয়ে বিছিয়ে পড়েছে।

'প্রায় দেড়ঘণ্টা গাইলাম। সারা আসরে একটুও শব্দ নাই, কেবল সমে আসার সময় সেই বৃদ্ধ ওস্তাদটি ছোটবাবু, আর সামনের একদল ছোড়া ঝুঁকে পড়ে শেষ মুহূর্তের জন্য উদ্বেল হয়ে উঠছিল। বুঝলাম মনের মেশায় পেয়েছে ওদের—সুরের মনের মেশায়।'

আবার সুরে ফিরে এলাম। মনে হল, আমি নিজেই আমার জন্মের ভিটে ছেড়ে কোন দূর দেশে চলে গেছলাম, কত পথ, কত অচেনা নদী, মাঠ, শ্মশান, কবরখানা পেরিয়ে এইমাত্র নিজের এই ভাঙা ঘরে ফিরে এসেছি। এসে দেখলাম যাবার ডাক পড়েছে, আর ফিরে আসতে হবে না। সব আলাপ আর তান নেওয়া শেষ করে, সমে ফিরে যাচ্ছি, ফিরে যাচ্ছি সুরে।'

সেদিন কলেজ থেকে ফিরে, অমল মলির চিঠি পেয়ে অবাক হয়ে গেল। অমলকে মলি অবিলম্বে বাড়ী যেতে বলেছে, তার খুব বিপদ। কিছু টাকাও দরকার। বিপদটা বাধিয়েছে নতুন বি ডি ও রণজিৎ-বাবু। এমন 'টাক-জ্বালানো অফিসার নাকি মলি তার সারা জীবনে দেখেনি। খদ্দরের ধুতি আর সার্ট'পরা এই তরুণ অফিসারটি বিচিত্র ধরনের। জীপের তোয়াক্কা করে না। একটা সাইকেলে সারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ান।

মলির রিপোর্ট' পড়ে বড়বাবুকে তিনি সেদিন বলেছেন, মলি যেন তার সংগে দেখা করে। মলি গত-কাল বি ডি ও'র সংগে দেখা করতে গেছল। মলিকে তিনি যা বলেছেন, তার সার কথা তাকে চলে যেতে হবে এখান থেকে। ওসব ভুয়া রিপোর্ট' লিখে গ্রামের কাজ হবে না। এই ত্রিশ বছরের যুবকটির কাছে যেতে মলির বুক কাঁপছিল। আগের বি ডি ও যিনি ছিলেন, মলির সংগে কথা বলতে পারলে তিনি বেঁচে যেতেন। মলিও কথায়, চোখে, রসের পাত্র ঢেলে দিত কিন্তু এই নতুন বি ডি ও-টি যেন কি রকম।

রণজিৎবাবু মলির রিপোর্ট' বের করে বলেছিলেন, 'বাংলা লিখতে জানেন? বাংলায় রিপোর্ট' লিখবেন। ইংরাজী নিয়েই আমি অবশ্য এম এ পাশ করেছিলাম, তবু ও ভাষাটা এখনও ভাল করে লিখতে পারি না।'

অত্যন্ত আস্তে আস্তে কথাগুলো বলছিলেন, বি ডি ও, কিন্তু প্রত্যেকটি বজ্রের মত কঠিন মনে

হচ্ছিল। বলেছিলেন, 'গ্রামের কাজের জন্য দিনের বারো ঘণ্টা খাটার আপনার দরকার নাই। দিনে চারপাঁচ ঘণ্টা কাজ করলেই চলবে। কিন্তু মনে রাখবেন, মিথ্যা রিপোর্ট লিখবেন না। আমি আপনার গ্রাম দেখতে যাব।'

মলি লিখেছে, 'এই গ্রাম দেখতে আসার আগে তাকে ছুটি নিয়ে কয়েকদিনের জন্য যেতে হবেই। কাজেই চিঠি পেয়ে যেন অমল বাড়ী চলে আসে।'

রুমমেট অতুল জিজ্ঞেস করল, 'কি রে তোর আবার কি হ'ল? বেড়াতে যাবি না?'

অমল বলল, না আমার একটু কাজ আছে।

'সেত দেখছি। চিঠিটা কার রে? মলি সেনগুপ্তার?'

'কি করে জানলি?'

'সিম্পটম দেখে'। দে না কি লিখেছে দেখি। খুব ভাল চিঠি লিখতে পারে, তাই না? এ কি আমার দেশের মেয়ে হয়েছে যে কাপড়ের পুটলি হবে, কথা বলতে গিয়ে চুপসে যাবে?'

অতুল বেড়াতে চলে গেল।

পরের দিন বিকেলে, সেই দোতালার ঘরে অমলের সংগে মলির কথা হচ্ছিল।

মলি বলছিল, 'আমাকে চলে যেতে হবে, নইলে গ্রামের এই চেহারা দেখে, বি ডি ও আমার চাকুরী খেয়ে নেবে। তখন কি হবে অমল বল?'

'ছুটি নেবে বলছ যে।'

'বোধত, টাকা নেই যে।'

'কত টাকা দরকার হবে তোমার।'

'গোটা পঞ্চাশ চাইত অন্ততঃ।'

অমল আশ্বাস দিয়ে বলল, 'সে আমি সংগ্রহ করে দেব।'

'তুমি এ কদিন আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে?'

মলি সুন্দর করে অমলের দিকে তাকিয়ে অমলের হাতটা টেনে নিল।

'চিঠি দেবে?'

আশ্চর্য এই মলি সেনগুপ্তার অযাচিত, উত্তপ্ত স্পর্শ। অমল বিহ্বল হয়ে পড়ছে। উত্তাপ হয়ে উঠছে।

আস্তে আস্তে বিকেল গড়িয়ে পড়ছিল।

বাঁশবনের ছায়া, পথে নামছে। নিমগাছটার পাতা কালো হয়ে আসছে। গাছপালা, পুকুরের জল, ঘরের চাল, আর এই উঠোন ছবির মত স্থির হয়ে আছে।

মলি নিজেকে মুক্ত করল না, নিবিড়তর করল।

'ছেড়ে দাও কেউ দেখবে'—অমল আস্তে আস্তে বলল।

'যা আর একটু থাকো. কতো দিন তোমাকে কাছে পাবো বা।'

'কেউ যদি দেখে ফেলে'—অমল ভীত হয়ে উঠে।

'কেন দেখবে? চল বিছানায় যাই।'

মলি বিছানার বালিশে মাথা দিয়ে গড়িয়ে পড়ল।

অমল দাঁড়িয়ে ছিল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল, মলির সেই উজ্জ্বল চুল, চোখ, আর গাঢ় লালরঙের শাড়িটা, একরাশ লালকুষ্ণচূড়া ফুলের মত বিছানায় ছড়িয়ে আছে।

ভোর হবার আগেই মলি চলে গেছে। এখান থেকে হেঁটে নীলাপুর, নীলাপুর থেকে সাইকেল রিক্সা। তারপর বাস ধরে নরঘাট। তারপর পাঁশকুড়া থেকে ট্রেনে কলকাতা।

কলকাতার শহরতলীতে মধ্যগ্রামের দিকে যেন মলির বাড়ি। ঠিকানা? ঠিকানা কি যেন? মলি অমলের খাতায় ঠিকানাটা লিখে রেখেছে বলেছিল।

অমল খাতাটা তন্ন তন্ন করে খুঁজল, না, ঠিকানা কোথাও নাই।

তাতে কি? মলি গিয়েই চিঠি দেবে, আর টাকা পাঠাবে।

অমল অন্ততঃ সেই আশ্বাসটুকু স্মরণ করে এই সকালবেলায় বেশ খুশি হয়ে উঠল।

ওস্ত দস্তীর শরীর আদৌ ভাল যাচ্ছে না। তবু গ্রামের ছেলেদের আড্ডায় প্রতি সন্ধ্যায় এসে বসেন তিনি। অরবিন্দ আসে রোজ। ওস্তাদ তাঁর সেই ঋষির শরীরটা নিয়ে একবারে মিশিয়ে বসে থাকেন। হ্যারিকেনের আলোয় লম্বা, সাদা চুলগুলো আর ছায়াটা দেয়ালে একটা মৌন ছবি আঁকে শুধু।

কোন দিন বলেন সুরটা দে। না, না, 'দি' সাফ

না, 'বি'তেই সে। হাঁ, আচ্ছা খাদের শত্রু নিবান সুর, শুদ্ধ গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, শুদ্ধ নিষাদস্বরের সুর।' ওস্তাদ আবার ঝিমুতে থাকেন।

তারপর কখন খাদের নিষাদে, ভরাট গলাটা বেজে ওঠে। দূর পেরিয়ে শুদ্ধ গান্ধারে এসে দাঁড়ান তিনি। গলাটা একটুও কাঁপেনা, সমান ওজনে দাঁড়িয়ে থাকে ধীরে ধীরে সেই আন্ধারে অস্পষ্ট আলোয়, চারদিকে বাঁশঝাড়, আমবাগান আর বয়া নদীর ছায়াচ্ছন্নতায় একটি বৈরাগ্যের ভাব হয়।

রাত ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে।

ওপাশের কোপ থেকে ঝিঁঝিঁর একটানা সুর এসে রাত্রিটাকে দুরন্তর করে তোলে।

এমনি করে দিন চলে যাচ্ছিল।

সেদিন অসিতের চিঠিটা নমিতাকে দিয়ে অরবিন্দ দাঁড়িয়ে ছিল।

চিঠিটা পড়ে নমিতা বলল, 'কতদূর যেতে হবে?'

'বেশী নয় মাইল দুই, নদীর ধার দিয়েই রাস্তা।'

অরবিন্দ সাইকেল নিয়ে চলে গেল।

নন্দিতা কথাশুনে ভয় পেল। ওস্তাদ বয়েস্থ অধিকারীর অবস্থা খারাপ। তাঁকে নন্দিতার গান শোনাবেন বলে অসিতদা কথা দিয়েছিলেন। তাই তাদের একুনি যাবার জন্য চিঠি লিখেছেন।

নন্দিতা বলল, 'উনি কতবড় ওস্তাদ ছিলেন, ওঁকে গান শোনাব! তাছাড়া গলা ঠিক নাই।'

উষা বিরক্ত হয়ে বলল, 'তোর গলা আবার কবে ঠিক ছিল? নে, হয়েছে চল।'

বয়া নদীটার ধার দিয়ে, সেই বাবলা বনটা পেরিয়ে ওরা তিনজন দ্রুত চলছিল। নদী ধারের শ্মশান, শিরিষ গাছগুলো, আমবাগান পেরিয়ে পুকুরের পাড় দিয়ে ওরা এসে পৌঁছল, ওস্তাদজীর বাড়ীতে।

নমিতা অসিতকে জিজ্ঞাসা করল, 'কোন আশা নেই?'

'না, আমার তাই মনে হয়।'

নমিতা মৃদু হেসে বলল, 'কিন্তু ডাক্তারদের নাকি একথা বলতে নেই, আশা ছাড়তে নাই রোগীর?

অসিত শান্ত গলায় বলল, 'সবক্ষেত্রে নয়। আমি ওঁকে শান্তিতে যেতে দিতে চাই। ভেতরে চলুন। নন্দিতা, উষা, চল।'

অসিতের কথা শুনে ওস্তাদজী ক্লান্ত চোখ মেলে নন্দিতার দিকে তাকালেন। আর নন্দিতা দেখল— এই সেই ওস্তাদ, বিছানায় শুয়ে আছেন যেন একরাশ শ্বেতপদ্ম।

নন্দিতা কি রকম যন্ত্রমুগ্ধের মত তক্তপোষের নীচে মাটিতে বসে পড়ল। চারদিকে লোকজন ভীড় করে এসেছে।

অসিত, নমিতাদি, উষা সকলে বিছানা ঘিরে আছে।

একধারে কেরোসিনের বাতিটা জ্বলছে শুধু।

নন্দিতা আর ভাবতে পারছে না। এই মৃত্যু উৎসবে তার গান গাইতে কান্না পাচ্ছে। তবু একটা ভজন ধরল সে।

সুর কানে যেতে ওস্তাদজী আবার তাকালেন, দেখলেন নন্দিতাকে।

ঘরের আবহাওয়াটা ক্রমশঃ করুণ হয়ে উঠছে।

ওস্তাদ আবছা আলোর উপরের দিকে দুটি হাত তুলে ধরলেন। দুচোখে অর্থহীন ভাব তখন স্থির হয়ে আসছে।

সারা পৃথিবী ঘুমের ঘরে উঠছে। কেবল নন্দিতা মাথা নীচু করে গাইছে—মত যা, মত যা।

কী আনন্দ ওস্তাদজীর! তিনি গান শুনতে শুনতে চলে যাচ্ছেন। হঠাৎ গান থেমে গেল।

যোগী চলে গেছেন। এই পৃথিবী থেকে অনেক দূরে এই রাত্রির জগৎ পার হয়ে, অন্য কোন আলোকিত জগতের দিকে।

ধীরে ধীরে ঘরের চারপাশে কালো অন্ধকারগুলো ভীড় করে এল। বয়া নদীর তীরে, বাবলা বনে, দূরের মাঠে রাত্রি নিবিড় হচ্ছে ক্রমশঃ।

কবরখানাটা আর দেখা যাচ্ছে না। শুধু সেই অন্ধকারে, সামনের ছোট বেগুন আর লঙ্কা ক্ষেতের এক ধারে শীর্ণ শিউলী গাছটা দেখা যাচ্ছে।

আশ্চর্য! আজ শেষ রাতুর অপরাহ্নে সেই গাছটায় কি করে কয়েকটা ফুল ফুটেছে।

যে মানুষটি একদিন গানটি লাগিয়েছিল, আজ তার চলে যাবার দিনে গানটি তার উদ্দেশে—শেষ নিবেদনের জন্য।

মৃত্যুর মধ্যে কোথায় একটা মাদকতা আছে। যে মাদকতা, যে বাড়ীর লোক মরে, শুধু তাকে নয়, তার চারপাশের মানুষকে কেমন যেন আচ্ছন্ন করে তোলে। সে মাদকতা দুঃখ নয়, বোধ হয় শূন্যতাবোধ। একটা লোক ছিল, তাদের মধ্যে, ভোরে, সন্ধ্যায়, বা বিকালে যাকে উঠানে বা ঘরের দাওয়ায় মাদুর পেতে বসে থাকতে দেখা যেত সে লোকটি নাই। অথচ আর সব আছে, গাছ পালা মাঠ ছোট্ট তরকারীর ক্ষেত, ঘর তানপুরা—সব, শুধু যে জীবনকে ঘিরে এই যৌন পার্থিব বস্তুর সমাবেশ, সে জীবন হারিয়ে গেছে।

ওস্তাদের বাড়ীর সেই মৃত্যু আচ্ছন্ন খণ্ডের ঘরের দাওয়ায় অসিত, নমিতা, উমা, নন্দিতা সব চুপ করে বসে ছিল। অরবিন্দ শরদের সৎকারের আয়োজন করতে গেছে। দূরে নদীর ধার থেকে, এই রাত্রিতে, গাছ কাটার শব্দ ভেসে আসছে। রেখা বাড়ী এসেছিল, বড়দিদি-মণি, উমাদিরা আসছেন শুনে সেও ছোট ভাইকে নিয়ে ওস্তাদের বাড়ীতে চলে এসেছে। পাড়ার সবলোক, বৌঝিরাও এসেছে ওস্তাদকে দেখতে।

অদূরে কয়েকজন লোক জটলা করছে। শব সৎকারের অনেক আয়োজন। বাঁশ কেটে নিয়ে এসে ছোট করে কেটে খাটিয়া তৈরী হচ্ছে। শুকনো কাঠ পাট-কাঠ, সংগ্রহ চলছে। কীর্তনিয়া ডাকতে লোক গেছে।

এই নিরবাক আয়োজনের মধ্যে নদীধারের কাঠ কাটার শব্দটা, এই আচ্ছন্ন রাত্রিটাকে কেমন যেন ভয়ঙ্কর বিশ্রী করে তুলছিলো।

নমিতা এই বিষণ্ণতার মধ্যে, অসিতকে বড় কাছে পেল। একটি অব্যক্ত বেদনা, দুটি মানুষকে অনেক কাছে এনে দিয়েছে, এত কাছে যেন তাকে হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায়। যে অসিত অনেক দূরের, এই মৃত্যুর দুঃখপট সে দূরত্বকে সীমিত করে তুলছে—।

নমিতা এতক্ষণে আস্তে আস্তে বলল, 'অবস্থা কখন থেকে খারাপ হচ্ছিল।'

'বিকেল থেকে। আমি এসে অবশ্য কিছু করিনি। মহেন্দ্রকাকা গান শুনতে চেয়েছিলেন আমি সেটুকুই করেছি।'

নন্দিতা একপাশে চুপ করে বসেছিল। অসিত তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি মনটা খুব খারাপ লাগছে?'

'কেমন লাগছে ঠিক বলতে পারিছি না অসিতদা। মনে হচ্ছে, যিনি গান শুনতে শুনতে গেলেন—কি ভাগ্য নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন।'

ওস্তাদ মহেন্দ্র অধিকারী দর্বারিক সৌভাগ্য নিয়েই জন্মেছিলেন কিন্তু সেই তার, শুধু এই কয়েক কাঠা ভিটে আর এই ছোট্ট ঘরের ঘরটা।

তবু এই ছোট ঘরটা কোন বর্ষণ রাত্রে রাজপ্রসাদ হয়ে উঠত, যখন ওস্তাদের সেই ভরাট গলায় 'দরবারী কানাড়া'র আলাপ করে উঠত, কি আরও পেছ প্রহরের দিকে 'আড়ানা'।

সমস্ত সম্পদ হারিয়ে ওস্তাদ
সব সম্পদে অধিকারী হয়েছিল।

আয়োজন শেষ হয়ে আসছিল। রাত্রিতেই শবদাহ শেষ করতে হবে।

হঠাৎ স্বদেশবাবু উঠোনে এসে দাঁড়ালেন।

নমিতা, উমা, নন্দিতা এগিয়ে গেল তাঁর কাছে।

স্বদেশবাবু বললেন, 'তোমরা সবাই এসে গেছ দেখছি—।' বলতে বলতে তিনি ঘরের ভেতরে গেলেন, একবার খাটের ওপর শোয়ানো মহেন্দ্রকে দেখলেন, আবছা আলোয় সেই শুভ্র জীর্ণ শরীরটা একরাশ পাকা সাদা চুল নিয়ে চোখ বুজে পড়ে আছে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ তিনি।

তারপর তেমনি নিঃশব্দে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

'মহেন্দ্র আমার ছোট তবু সে আগে চলে গেল—'

কথাগুলো স্বদেশবাবু আস্তে আস্তে বললেন, কিন্তু কাকে বললেন বোঝা গেল না।

হয়ত কাউকেই নয়।

নদী ধার থেকে কাঠ কাটার শব্দটা আর আসছে না।

রেখা কোথেকে চার কাপ চা নিয়ে এল।

অরবিন্দ এতক্ষণ শবদাহের আয়োজনের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল।

রেখা, চায়ের কাপটা তার হাতে তুলে দিতে দিতে বলল, 'ইস্ খেয়ে উঠেছেন একেবারে।'

অরবিন্দ কোমরের গামছা দিয়ে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে বলল, 'জান? ওস্তাদ আমাকে খুব ভালবাসতেন।' কত গল্প করতাম দু'জনে এই দাওয়ায় বসে। সে গল্প আর হবে না।

রেখা অরবিন্দের ক্লান্ত, বিষণ্ণ, সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল 'কখন এসেছেন?'

'এসেছি সেই দুপুর থেকে।' তোমাদের স্কুলে দিদিমণিদের ডাকতে গেছলাম

'বিকেলে কিন্তুই কিছু খান নি?'

অরবিন্দ হেসে বলল, 'সময় কোথায়? দেখছ না কত কাজ।'

'তারপর বাসায় ফিরে এত রাত্রে রান্না করবেন?'

অরবিন্দ নিজের হাতে স্টোভে রান্না করে খায়। সত্যি সেই রাত্রে গিয়ে রান্না করে খাওয়াটা তার পক্ষে অসম্ভব।

অরবিন্দ কোন উত্তর দিল না।

'হয়েছে অনেক বাহাদুরি করেছে, রাত্র আর বাসায় গিয়ে কাজ নেই—আমার বাড়ীতেই দয়া করে খাবেন একটু।'

'শবদাহ শেষ হতে কত রাত হবে জান?'

'জানি, ভোর হবে। তাতে আপনার কি? গিয়েই উনান ধরাবেন।' কাপটা নিয়ে রেখা অন্যদিকে চলে গেল।

এই শব সৎকারের আয়োজনের মধ্যে অসিত অপ্রয়োজনীয়। মৃত্যু পর্যন্ত তার দায়িত্ব আছে। শেষ নিঃশ্বাস থাকা পর্যন্ত তাকে লড়তে হয়। তারপর তার কোন কাজ নেই। কত রোগীর বাড়ী থেকে সে লুকিয়ে চলে এসেছে। পাছে তাকে টাকা দিতে হয়। রোগীর বাড়ীর সকলে যখন কাঁদছে ডাক্তারদের কাবুলিওয়ালার মত টাকার জন্য বসে থাকাটাকে, অসিত বড় নিষ্ঠুরতা বলে মনে করে।

কিন্তু মৃতের কাকা কেবল রোগী নয়—সে রাগিণী। যার গলায় কত সুর বেজে উঠত। তাই অসিত কিছুতেই যেতে পারছিল না।

অরবিন্দ আরও অনেকে মিলে, শবদেহ ঘর থেকে বের করে নিয়ে এল।

যে কাঠের খাটিয়া করে রোগীকে শ্মশানঘাটে এনেছিল, ওরা সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে এসে শবদেহের উপর ছড়িয়ে দিয়েছে তখন।

অসিত খাটিয়ার কাঁধ দিতে যাচ্ছিল, নন্দিতা বাধা দিয়ে বলল, 'সেই বিকেল থেকে আছেন, ক্লান্ত লাগছে আপনাকে। নাই বা কাঁধে দিলেন'।

অসিত কথাটা মেনে নিল—তা ছাড়া সে আসলে অভ্যস্ত নয়।

অন্ধকার রাত্রির আকাশটা ভরে উঠল "হরি বোল, হরি বোল" শব্দে।

বহুদিনের বহু স্মৃতির বহু বেদনা, আনন্দের অনুভূতি যে ঘরের হাওয়ায় মিশেছিল, ওস্তাদ সেই ঘর থেকে শেষবারের মত চলে গেলেন।

শব যাত্রীরা শবদেহ কাঁধে নিয়ে উঠোন পেরিয়ে সদর-দ্বারের দিকে চলতে লাগল।

খড় দিয়ে তৈরী মশালের আলোকে দুপাশের বাঁশ বন, পুকুর, মিহগাছ, সজনে গাছ, কিছুক্ষণের জন্য আলোকিত হয়ে উঠছে।

পেছনে কীর্তনিয়ার দল চলছে। খোল করতাল—আর মাঝে মাঝে 'হরি বোল হরি বোল' শব্দ, দূরের মাঠের বুকে ঘুমিয়ে—থাকা প্রকাণ্ড আকাশের নিস্তব্ধতা বার বার ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে।

'চলুন আমাদের সঙ্গে—তার থেকে কি করবেন'? নন্দিতা অসিতকে বলল।

'হাঁ এবার চলে যাব'।

'নন্দিতা কোথায়?'

নন্দিতা কখন ঘরের ভেতরে ঢুকেছে। উহা খুঁজতে গিয়ে দেখল, নন্দিতা ওস্তাদের তানপুরাটার কাছে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তানপুরাটার দুরের তারটা ছেঁড়া।

এ তান পুরায় আর কেউ সুর বাঁধবে না।

—প্রথম অঙ্ক শেষ—

ডি এইচ্ লরেন্স ও কয়েকখানি অপ্রকাশিত চিঠি

অজিত দে

……বাতাস যখন আমার এই বাড়িটার বুকের ওপর আছড়ে পড়ে তখনই বুঝতে পারি আমার ভিতরে যেন কিসের একটি চেতনা জেগে উঠছে; দেহের প্রতিটি বিন্দুতে জাগে এক অদ্ভুত শিহরণ। বুকে দোলা দিয়ে ওঠে বিচিত্র উন্মাদনা, হৃত্তলয়ে সাড়া দেয় জীবনের গান। ……তখনই বুঝতে পারি বসন্তের সমাগম আমার চৈতন্যে বসন্তের আবির্ভাব। এই ক্ষুব্ধ প্রত্যুষে মনে জাগে আমার যেন এই চঞ্চলতা এই আকস্মিকতা, এই অগ্নিময়তা……শুধু বাসনা, শুধু কামনা, শুধু আকাঙ্ক্ষা।"

বয়স যখন মাত্র বিশ বছর তখন কোন এক দয়িতাকে লিখেছিলেন ডি এইচ লরেন্স।

শুভ্র বুদ্বুদের মালা পরিয়ে বিশ্ব প্রকৃতি যে অনন্ত সৌন্দর্যের মহোৎসবে এই বিশ্বভুবনকে জাগিয়ে তোলে সেই পরম লগ্নে লরেন্সের বুকে বেজে ওঠে কোন দূর সুদূরের এক রহস্যময়ী বাঁশীর ডাক। সে বাঁশী তাঁকে পাগল করে তোলে—ঘরে থাকা তাঁর দায় হয়ে উঠে। বদ্ধ ঘরের, পারিপার্শ্বিক পরিবেশের, সামাজিক জীবনের সব বাধা প্রতিবন্ধক তুচ্ছ করে কবি বেরিয়ে পড়েন সেই সুদূরচারিণীর অভিসারে, হৃদয়ে নিয়ে অপরূপ কাব্যের মালা, চোখে নিয়ে নিবিড় ব্যাকুল আবেশ, মালা পরাবেন তাঁর গোপনচারিণীর কণ্ঠে, নিবেদিত হবেন কবি তাঁর মানসসুন্দরীর সঙ্গে একান্ত মিলনে।

ঔপন্যাসিক কবি ডেভিড্ হার্বার্ট লরেন্সের জীবনে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ছিলো একটি বিশিষ্ট বিন্যাস। তরু-পল্লবে, নদী পর্বতে সাজানো প্রকৃতির মধুরকণ্ঠী আঁচলের আড়ালে মরীয়াক্ষীর ব্যাকুল ইসারা তাঁকে আজীবন ঘরে ডাক দিয়ে এসেছে। সে ডাকে সাড়া না দিয়ে তিনি থাকতে পারতেন না এক দণ্ডও।

ফ্রিডা ওয়েকলি প্রথম জীবনে ছিলেন লরেন্সের এক অধ্যাপকের স্ত্রী—পরের জীবনে তিনিই হন শ্রীমতী লরেন্স। স্বামী ফ্রিডার সঙ্গে একবার তিনি বেড়াতে গিয়েছিলেন ইটালীতে। সেখানকার এবং আশপাশের সাগর উপকূলের কুসুমকলির মুক্ত জীবনধারায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর সাহিত্য উপদেষ্টা এডোয়ার্ড গারনেটকে একটি চিঠিতে লিখেছেন:

"…এখানকার সবই যেন অদ্ভুত, সবাই যেন আনন্দে উচ্ছল; দেখে মনে হয় ওরা যেন বহুদূরে অতীতের মানুষ—বর্তমানকালের কোন দায় ধারে না। পুরুষেরা গাইছে গান, নগররক্ষী সৈন্যরা উদ্‌ভ্রান্ত বেড়াচ্ছে মার্চ

করে.—দৈহিক স্বাস্থ্যে, শক্তিসামর্থ্যে ওরা কি সুন্দর আর কি প্রাণোচ্ছল! মেয়েদের চোখে দেখা মাত্রই কেমন যেন আদর করতে ইচ্ছে করে, এই মেয়েদের মত এমন রক্ত পুরুষ্টু শিশুর স্তন আমি কোথাও দেখিনি। ...গাঁয়ের ভিতরটা একটা মৃদু মোলো গন্ধে ভুরভুর করছে সব সময়ে। বাড়ীর উঠোনে, পথের ধারের ছায়ায় বসেই মদ কেনা বেচা করে ওরা। মদ খাওয়ার আলাদা আস্তানাও আছে—একপাশে সারা পরিবারটি নিয়ে বসে খাচ্ছে আর আগুন পোহাচ্ছে, আর এ পাশের চেয়ার টেবিলে বসাবে তোমাকে ওরা মদ দিয়ে। বেঁটে খাটো গোলগাল বাড়ীর কর্তাটি বেশ ভাগদওলা মানুষ—ইটালীর ওই মানুষগুলো সবাই বেশ গুষ্টপুষ্ট বলবান—আর স্ত্রীরও তার তেমনি ঘাড়া গড়ন স্বাস্থ্য—বেশ লাগলো মেয়েটিকে আমার। কর্তা স্ত্রীর কোলের ছেলেটিকে গালটিপে কাতাকুতু দিয়ে আদর করছে, বুড়ো ঠাকুর্দা ছোট্ট মেয়েটাকে ধমকাচ্ছে দুষ্টুমি করার জন্যে আর ঠাকুমা বুড়ি আগুনের কোলটিতে বসে ফোগলা দাঁতে ফিক ফিক করে হাসছে। লাল মদ আমি তো আর লিটারের বেশী খেয়ে ফেললাম। ভারী ভাল লাগলো—সবাইকেই খুব ভাল লাগলো।"

এক সমাজসেবী ত্যাগব্রতী বান্ধবীকে তিনি চিঠি লিখেছিলেন তাঁর প্রাণহীন নিরলস কর্মব্যস্ততার জন্য ধিক্কার দিয়ে—বাধাবন্ধহীন রূপে রসে ভরা আনন্দময় জীবনের পথে পা বাড়াতে উপদেশ দিয়েছিলেন। সেই চিঠির এক জায়গায় লরেন্স বলছেন :

"...তোমাদের মত অনুভূতিশূন্য ভাবাবেগহীন সংস্কারী কাজের লোকরাই হচ্ছে এই পৃথিবীর এক নম্বরের ভাবপ্রবণ।...আমি নই, বরং বলব তুমিই খুব আদিম ভাবাবেগে পুড়ে মরছ। তোমার পছন্দ অপছন্দ সবই অসংস্কৃত, দুর্বিনীত আর অসৌজন্যে ভরা—তবে তোমার অনুরোধ, সমর্থনের ভাষাই সুসংস্কৃত এবং পরিমার্জিত ...মনের সুকুমার অনুরাগ যাদের পুড়িয়ে ছাই করে তারাই হয় এই পৃথিবীর সেরা দুর্ধর্ষ অসংযত আবেগপ্রবণ।...

"হাঁ, রক্ত পুশা পুকনো কাঠির মত মানুষ হয়ো না—আমি চাই তুমি হবে—কি? কিসের মতন? প্রজাপতির স্কুর্তোজ্জ্বল ডেভোনিশটারের মত—অপরূপ সুন্দর টাটকা তাজা রক্তের মত জীবন্ত লাল।... এ জীবন, শুধু একবার কেন, বারবার বহুশত বার ঘরে উপভোগ করে কাটিয়ে দেবার মতই উপযুক্ত সম্পদ—যদি অবশ্য আপন জীবনের সুরটিকে তুমি এই নিখিল বিশ্বের প্রাণতরঙ্গের সঙ্গে ঐকতানে মিলিয়ে নিয়ে চলতে পার। জীবনের সম্পদকে উদার মনে মুক্ত হস্তে তোমার খরচ করে যাওয়াই উচিত।"

লরেন্সের সাহিত্য সৃষ্টি তখন বেশ ভাল ভাবেই চলছে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দি হোয়াইট্ পিকক্' নিয়ে ভুমুল হৈ চৈ আন্দোলন শুরু হয়েছে। আপন জীবন সম্বন্ধে যে আদিপূর্ণ বুভুক্ষায় লরেন্স ছিলেন জর্জরিত তারই এক নির্বাক শৃঙ্খলাহীন প্রতিচ্ছবি এঁকেছিলেন তিনি এই উপন্যাসে। এই আলোকোজ্জ্বল সাহিত্য সৃষ্টির জন্য একটু সুখ্যাতি, একটু ভাল কথা একটু সমর্থন পাবার আশায়—বিশেষ করে যে মা-এর ওপর একান্ত নির্ভরতার যন্ত্রণায় তিনি আজীবন ভুগেছেন—সেই মা-এর অনুমোদন পাবার বাসনায় লরেন্স তাঁর চেয়ে চার বছরের বড় এক পত্র লেখিকার কাছে সভয়ে এক ভিক্ষাপাত্র আবেদন নিয়ে উপস্থিত। ভবিষ্যৎ জীবনে এই মা-র সম্বন্ধে একবার তিনি বলেছিলেন, যে তিনি তাকে ভালবাসেন ঠিক প্রেমিকের মত ('like a lover') :

"প্রচলিত বিনয়-নম্রতা, ব্যবহারিক জীবনের সাধারণ সৌজন্য ইত্যাদিকে যারা ঘৃণার চোখে দেখে বিদ্রূপের বাঁকা হাসি হেসে-শ্রেণীগতভাবে যেহেতু তুমি সেই দলভুক্ত .....তাই আমি অত্যন্ত স্বাভাবিক খোলাখুলি ভাবেই লিখছি—কিন্তু তৈরী থেকো সেটা বেশ রূঢ় ভাষণই হবে।——আমার মনে হচ্ছে আমি যেন মৃত্যু-শীতল এক বরফের গহ্বরের কিনারে এসে দাঁড়িয়ে আছি—আমার আন্তরিক প্রার্থনা তুমি উপন্যাসখানা নিজে একবার পড়ে এবং সমালোচনা করো। আমাকে তুমি ওরই মধ্যে পাবে।...বেশ বুঝতে পাচ্ছি তুমি হাসতে শুরু করেছ, না?—তুমিতো জান, যে ভাবপ্রবণ তরুণ যুবকের ক্ষমতা আছে সান্ত্বনা মাত্রই অথচ দম্ভ

আছে পর্বত প্রমাণ, সেই তরুণ জীবটি কচি লজ্জাবতী লতার মত কি মর্মান্তিক ভাবেই না স্পর্শ কাতর। অতএব বিনতি করছি, খিলখিল করে হেসো না তুমি।··· নিদারুণ ব্যথা, বেদনা, উদ্বেগ আর কিছুটা গর্বও বটে, আমি তোমায় সত্যিই বলছি, আমি যে একটা কতবড় আহাম্মক তা ভাবতেই পারি না। প্রথমেই বলি, এ উপন্যাস আমার ভাবাবেগে ঠাসা।···সমালোচকরা বোধ হয় একেই বলেন, 'ইরটিক নভেল'।··· ···প্রেম প্রেম আর প্রেম পাতায় পাতায় প্রেম ছড়ানো—ভালবাসার সর্বকছু এতে আছে—আর আছে বসন্তের গান—নবযৌবনা তরুণী নায়িকার দল—না, না, কাহিনী বা উপন্যাস কিছুই নেই, দশভাগের নয়ভাগ শুধু গুণবাচক বিশেষণেই ভর্তি ইন্দ্রধনুর রঙীন আলোয় উজ্জ্বল—আরও আছে দুচারটি কাব্যের কথা, কিছু ল্যাটিন, কিছু ফরাসী—সব—সমস্ত কিছু জড়িয়ে উগ্রস্বাদের একটা অদ্ভুত বিচিত্র তরল পানীয়।—হে মহীয়সী, সেই পানপাত্র আমি তোমায় নিবেদন করছি—, তুমি সানুগ্রহে আস্বাদন করে আমায় ধন্য কর। আমার এই গ্রন্থকে তুমি বিরাট একটি শিল্পকর্ম বলে ঘোষণা কর, তা আমি চাই না·····আমি যে এখনও অতো পাগল হইনি সে বিশ্বাস তুমি রাখতে পার; আমি শুধু চাই প্রাণ খুলে তুমি সত্যি কথাটি বলো; বইখানা বেশ স্বচ্ছ উজ্জ্বল আনন্দপ্রদ হয়েছে কিনা, প্রত্যয়ভিত্তিক সম্ভাবনা হোয়েছে কিনা, না সর্বাংশে হোয়েছে তার উল্টো। আমি আঘাত পাব এ কথা ভেবে যেন ভয় পেয়োনা।····· আর কিছু যেন মনে করো না, অনেক কথাই তো বললাম····· যদিও জানি সবই অনধিকার।·····আরও একটা কথা—তুমি যেমন আমায় ডেভিড্ বলে ডাকতে সেই নামেই ডেকো—যে হেতু ঐ নামটিই আমাকে বেশ মানায়, খাপ খায়—আর যে হেতু ঐ নামে ডেকে তুমি স্ব-ইচ্ছাতেই যখন এক বিজ্ঞ অভিজ্ঞ জ্যেষ্ঠের নিরাপদ আসনে উঠে বসেছ, তখন নিশ্চয়ই জানি আমার মত এক কাঁচা তরুণের বাঘঘোরালিপানাগুলো তুমি সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার পক্ক এক মহীয়সী নারীর ক্ষমাসুন্দর ব্যবহারে গ্রহণ করবে। ঐ আসনতো তুমি নিজেই

ডি. এইচ লরেন্স

করে নিয়েছো·· তা, আমি যে এখনও অতি বাচাল অস্বীকার করবো না।··· হ্যাঁ সত্যিই তাই, আমার যাকে ছেড়ে আমি যে কখনো কোথাও একা থাকিনি।"

সাহিত্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে অপর একখানি পত্রে লরেন্সের দরদী মন, আধ্যাত্মিক কল্পনাপ্রবণতা, প্রকৃতিক সৌন্দর্যপ্রিয়তা যেমন স্বপ্রকাশ হয়েছে তেমনি মানবতাবিরোধী একটি ভাবের ইঙ্গিতও ফুটে উঠেছে :

"ফরাসী কৃষক চিত্রকর ব্যাদাঁটিয়েন সেপজ-এর তিনখানি ছবি দেখিয়েছিলুম, অতি ভয়ঙ্কর—বীভৎসতায় সেগুলো আমার নিদ্রাবিহীন রাত্রে যেন তাড়া করে বেড়াতো। কোন কোন মানুষের কাছে জীবন হয়ত সত্যিই ভয়ঙ্কর, সত্যিই বীভৎস—ছবি ক'খানা ফরাসী কৃষক জীবনের ধূসর রেখাচিত্র—না আছে এক কণা আনন্দের আভাস, না আছে এক টুকরো সূর্যালোকের হাসি।·····ওয়েলসের (এইচ-জি) 'টোনো বাঙ্গে' (Tono Bungay) পড়ে এটা শেষ করলুম। ওয়েলস যা লিখেছেন তার মধ্যে এইটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস আর দীর্ঘকালের মধ্যে—ও! সে যে কত দীর্ঘকাল!—আমিও এই একখানা প্রকৃতই শ্রেষ্ঠ বই পড়লুম।

কিন্তু হঠাৎ পড়ে মনটা কেমন যেন দুঃখে বিষাদে একেবারে ভরে গেলো। ওয়েলস তাঁর পাঠকের বুকে যে কি অসহ্য দুঃখের বোঝা চাপিয়ে দেন তা ভগবানই জানেন! ভদ্রলোক অতি ভীষণভাবে দুঃখবাদী। তাহলেও কিন্তু অতি দুঃখের মতোও তিনি উদ্ভাসিত এ পৃথিবীতে সকল কিছুরই শেষফল যে কল্যাণময়—এই তত্ত্ব বিশ্বাসের মূলে তিনি প্রচণ্ড একটা আলোড়ন তুলে দেন পাঠকের মনে।……সত্যকার শিল্পীর মনে যে সংবেদনশীল অতি সূক্ষ্ম দরদী একটি চৈতন্য লুকিয়ে থাকে, ওয়েলসের তাঁর শুধু সেখানে। অতীন্দ্রিয়তায়, ঐশ্বরিক তত্ত্বরাজে তাঁর দৃষ্টি স্বীকৃতি লাভ করে,—তাঁর বিশ্বাস নন্দনতত্ত্ব বা কান্তি বিদ্যার মধ্যেই কিন্তু একটা আছে—কিন্তু সেটা যে কি তা তিনি জানেন না। …তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি সম্বন্ধে অনেক সময় তিনি সুবিচার করেন না।…কোন না কোন এক মুহূর্তে প্রত্যেকেইতো মহৎ হয়ে উঠতে পারে, সুউচ্চ আভিজাত্যে পরীয়ান হয়ে উঠতে পারে —হ্যাঁ সত্যকার আভিজাত্যে—কিন্তু তাঁর সৃষ্ট মানুষগুলির মধ্যে অতি অল্প দু'একজনই মাত্র নিষ্ঠাপূর্ণ আভিজাত্যে মহীয়ান হয়ে উঠেছে; বাকিরা সবই ঐ কুঁয়ে-কাঁপানো বেলুন।"

উপরোক্ত চিঠিখানির বছর পাতেক পরে লেখা অপর একখানি চিঠিতে তিনি সমসাময়িক সাহিত্য স্রষ্টাদের সম্বন্ধে মন্তব্য করছেন :

"……ওদের কাউকেই আর আমি সহ্য করতে পারি না, না রক্তমাংসের শরীরে, না তাদের লেখায়, এই কয়েকের মধ্যেই ওরা যেন কেমন সব কুঁয়িয়ে গেছে… একমাত্র টমাস হার্ডি ছাড়া তাও তিনি আমার সমসাময়িক নয়—, আর কাউকে আমি এক বিন্দুও শ্রদ্ধা করি না। হ্যাঁ, আরও একজন ছিলেন, সোঢ়ার দিকের নরওয়ে—তা তিনিও তো আজকাল সুদূর অতীতেই মিলিয়ে যাচ্ছেন।"

সোনালী রোদে ঝিকমিক করা, কচি সবুজে ভরা বনে-বাগানে ঘুরে বেড়ানো বত্রিশবৎসর বয়সের যুবক লরেন্সের মন তখন বিদ্যুৎ আনন্দোচ্ছ্বাসে ভরপুর। এলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। বিশ্বযুদ্ধ শিল্পীর একান্ত আত্মগত জগত থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে এসে দাঁড় করিয়ে দিলো বড় কঠোর বাস্তবতার দুয়ারে। বিশ্বযুদ্ধ এলো যেন এক ব্যক্তিগত আঘাতের বিস্ফোরণ নিয়ে; বীভৎস কদর্য এই বিশ্বব্যাপী হননযজ্ঞের ত্রাসে কণ্টকিত এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন কবি লরেন্স। অসহনীয় দানবীয় ভীতি সন্ত্রাসের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অবস্থা তাঁর হয়ে দাঁড়ালো বাকশক্তিহীন অপ্রকৃতিস্থের মত।

"যুদ্ধের প্রথম পাঁচটা মাস আমার কেটেছে যেন মৃত মিছিলের কবরখানায়……প্রতিটি মুহূর্ত মৃত, মৃত্যুর মত শীতল, অসাড় ছেঁড়াখোঁড়া জটানো মৃতদেহের মত মর্মান্তিক। সেই বীভৎস ভয়ংকর দিন গুলোর কথা মনে করাও এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা!"

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাথমিক ধাক্কা সহ্য করার পর তাঁর মনে জাগালো গভীর বিষণ্ণ অনুশোচনা—প্রাক-যুদ্ধের সেই শান্ত নিরুপদ্রব জগতটির জন্য, যে পরম রমণীয় কাল শতমাথা খুঁড়ে মরলেও আর ফিরিয়ে আনা যাবে না—সে দিনগুলির জন্য তাঁর মনে জাগলো ব্যাকুল বুভুক্ষা। বহুকালের পুরনো বান্ধবী, জেসফ এম ব্যারীর প্রাক্তন স্ত্রী মেরী ক্যাসানকে লিখিত এক পত্রে লরেন্স ঐকান্তিক এই বুভুক্ষার কথা অতি বিষণ্ণ বিধুর কাব্যের সুরে শুরু করে মানবজাতি সম্বন্ধে তাঁর মরুদুঃসহ মোহভঙ্গের গভীরে নিমজ্জমান হয়েছেন :

"কচি হলুদপাতার সাজানো, সবুজ গাছগাছালির

● অভিজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসক
● রকমারী ফ্রেম
● বিদেশী লেন্স
● সুলভ মূল্য

স্বাগত জানাই

১৭২এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড
(সার্দার্ণ এ্যাভেনিউর মোড়)
কলিকাতা-২৬

ভরা আমাদের সেই চোলেসবেরী কুটীরবাসের দিনগুলির কথা মনে পড়লেই আমি গভীর দুঃখে ভেঙ্গে পড়ি। দুঃখের আগের সেই শান্ত নম্র দিনগুলি ছিলো যেন উদার সৌন্দর্যে ভরা; বাগানে বাগানে ফুললতাপাতার ছিলো অজস্র আয়োজন, নরম রোদের মাধুর্যে ভরা নিরুপদ্রব অপরাহ্নের চায়ের আসরগুলিতে ছিলো কি বিচিত্র শান্তি, তুমি আমি দুজনে কি অনির্বচনীয় বিপুল আনন্দেই না ছিলুম উজ্জ্বল, দুজনের মধ্যে কি গভীর দরদে ভরা অনুকম্পার ছিলো অদৃশ্য বাঁধন, পরস্পরের দেখাশোনা মধুর মিলনের লগ্নগুলি যেন ছিলো ফুলের গন্ধে ভরপুর, অপরূপ সুন্দর সজীব সেই স্মৃতিগুলি আজও প্রায়ই মনে পড়ে……কিন্তু হায়, সেদিন আর নেই! পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ে সমগ্র মানবজাতি সম্বন্ধে আমি বড় হতাশ বড় নিরুদ্যম হয়ে পড়েছি।"

যুদ্ধ চলার সঙ্গে লরেন্সের ক্রমবর্ধমান শোক বিহ্বলতা ও ঘণাক্ষরে অদৃষ্টবাদিতায় রূপান্তরিত হোল। প্রত্যাসন্ন সেই মহাপ্রলয়ের সর্বনাশা দিনটি সম্বন্ধে তিনি যেন এক বাইবেলীয় ভবিষ্যাণী করেছেন স্কটল্যাণ্ডবাসী এক কবি বন্ধুকে লেখা একটি পত্রে:

"শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিনটি এসে পড়ল বলেই আমার বিশ্বাস; যুদ্ধ, নৈসর্গিক বিপর্যয়, অগ্ন্যুপাত —ভগবানই জানেন কি সে। কিন্তু আমি নিশ্চয়ই জানি সেই মহাপ্রলয়ের দিন আসছে; অন্তিম প্রলয়ের প্রাথমিক সূচনা শুরু হয়ে গেছে; আর তার অগ্রগমণের প্রবাহও খুব ধীর নয়।…অগ্নিময় লৌহ বৃষ্টি প্লাবনে পৃথিবী একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বলেই আমার প্রত্যয়। দি রেনবো (The Rainbow—পঞ্চম উপন্যাস) উপন্যাসের মত উদ্যম যৌন লালসায় আর মৃত্যুর তাণ্ডব লীলায় এই সমগ্র সৃষ্টি হবে ক্ষয়। …এরই নাম ইউরোপীয় যুদ্ধ। আমাদের জীবনের স্বাভাবিক পরিসমাপ্তি নয়, আত্মকৃত নিষ্ফল লয়প্রাপ্তিই আমরা বেছে নিয়েছি এই হননমত্ততার তাণ্ডবে।… তবে তাই হোক—এত আমার অপরাধ নয়।"

তবু আষাঢ় মেঘের ঘনান্ধকার প্রান্তে কোথায় যেন এক আশার আলোর রজত রশ্মিরেখা দেখা দেয় মানবতা বিরোধী উদ্ভট উৎকেন্দ্রিক দৃষ্টিকোণে:

"আমি অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত—কিন্তু তবু আশাশীল আশার আলোর অতি সূক্ষ্ম ফীণ একটি রেখা যেন এখনও দেখতে পাচ্ছে।… অবলুপ্তির এই চকিত বিদ্যুত-প্রবাহকে প্রতিহত করতেই হবে—নতুন সভ্যতা, নব্য কৃষ্টির অংকুরোদ্গম পল্লবিত করে তুলতে হবে—যারা বিশ্বে আলোড়িত হবে একটি বিরাট চরম বিপ্লব এবং তারই গর্ভ থেকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে নতুন ঐতিহাসিক যুগের সূর্য। …অপেক্ষা করো, আমরা পাহাড় পর্বত-গুলোকে তুলে মহাসাগরের বুকে ভাসিয়ে দেব।… বাড়ি-ঘর ঐশ্বর্য-সম্পত্তির ওপর গড়া এই বহিরঙ্গ-ভিত্তিক জীবনধারার বিপ্লবাত্মক রূপান্তর সূচিত করে গড়ে তুলতে হবে আত্মাভিত্তিক এক নতুন জীবনাদর্শের ধারা। যুদ্ধ একদিন শেষ হবেই আর তারপরেই ঐ নোংরা পূতিগন্ধময় আস্তাবলগুলোকে ধুয়ে মুছে একেবারে পরিষ্কার করে ফেলতে হবে।…মানবতায় আমি আর তিলার্ধ বিশ্বাস করি না, জনারণ্যের এই বিপুল নাংসপিণ্ডতে আমার আর এতটুকু আস্থা নেই।…এই উন্মত্ত জনতার কবলে পড়ে সব ধ্বংস হয়ে যাবে। এখন চাই শুধু মাত্র বিশুদ্ধ নির্মল মনন-শীলতা, শুচি শুদ্ধ উপলব্ধি…। হায়রে! মানবাত্মার যে শুদ্ধতম চৈতন্য, মানব অস্তিত্বের যে শুদ্ধতম নির্যাস, —মানব কল্যাণে কি এবস্তু বাঁচিয়ে রাখা যায় না? হ্যাঁ, বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। এই উদ্দেশ্য সাধনে প্রয়োজন সাধারণ জনতা থেকে কেন্দ্রাতিগ নিঃসঙ্গতি— সাধারণ মানব সমুদ্রের কলুষস্পর্শহীন, শুদ্ধ এক অখণ্ড চৈতন্য মণ্ডল। তা না হলে নব দিগন্তে উদ্ভাসিত নতুন পৃথিবী ভূমিষ্ঠ হবে না কখনো, কোনদিন। ব্রহ্মচৈতন্য দীক্ষিত হওয়ার যে দুর্জ্ঞেয় রহস্য সেই 'অবাক মনসাগোচর' পবিত্র রহস্য শুদ্ধতা চাই একান্ত ভাবে। আর সেই ব্রত সাধনা করতে হবে একান্ত আত্মগত গোপনীয়তায়, রক্ষা করতে হবে তাকে অনাঘ্রাত শুচিতায়।"

মানুষের পৃথিবী থেকে লরেন্সের জাগতিক অপসরণ খুব শীঘ্রই সেখানে এসে পৌঁছল। মাস

দুবেক পরে এক মার্কিন বন্ধুকে লেখা তাঁর এক চিঠিতে মানবতাবিরোধ সম্বন্ধে তিনি বলছেন :

"মানবধর্মে আমি সম্পূর্ণ বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছি মানবাত্মার শীর্ষচূড়ায় কি দেখতে পাচ্ছি জান? দেখছি উজ্জ্বল জ্যোতির্বলয়ে ঘেরা একখানি 'ডিপ্লেনের ঘাঁটা' সদম্ভায় পুঞ্জিত হচ্ছে।...না, আর নয় মানুষ আর মনুষ্য ধর্মের প্রতি ঘৃণায় আমি মরে যাচ্ছি।... 'নোয়া আর্ক" (Noah's Ark) বলে কোন একটা যদি এই জীবনটাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারতুম তাহলে আমি লক্ষ কোটিবার সশ্রদ্ধ আহ্বান জানাচ্ছি সেই মহাপ্রলয় আসুক! হ্যাঁ আসুক সে।...আজকের এই পৃথিবীতে একমাত্র পবিত্র হচ্ছে মনুষ্য জাতিকে ঘৃণা করা, বাঘ ব্যাঙাচির মত লক্ষ কোটি গুণে বর্ধিষ্ণু এই মানব অস্তিত্বটাকে অতি ঘৃণিত অবজ্ঞায় অস্বীকার করা।"

ভবাবহ যুদ্ধের তাণ্ডব লীলায় পর্যুদস্ত, আজন্ম ব্যাধিগ্রস্ত লরেন্স এক সময় খড়্গ হস্ত হয়ে উঠলেন তাঁর জন্মভূমি ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। ১৯১৫ সালে বৃটেনের প্রেস আইনে তাঁর পঞ্চম উপন্যাস 'দি রেনবো' অশ্লীল বলে ঘোষিত হয়েছিলো। এই সময়ে ইংল্যাণ্ড সম্বন্ধে সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে তিনি চোখ ফেরালেন আমেরিকার দিকে। জীবনের বাকি কটা দিন সেখানেই কাটাবেন একান্ত বাসনা। অপর একখানি পত্রে তাই তিনি বলছেন:

"ইংল্যাণ্ডের আর ভবিষ্যৎ বলে কিছুই রইলো না—শুধু ক্ষয় লয় অবলুপ্তি। সকলের চেয়ে নির্মম লণ্ডনের দুঃখের কারণ হোল: সভ্যতার এই ভগ্নস্তূপ পরে, যুগের এই ক্ষুদ্রিক্ষু অধ্যায়ে জন্মেছি আমি। ...নিনেভে (Nenevch) অথবা প্যালেঙ্কোর (Palenque) মত ইউরোপের নামও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। ইউরোপ বলে আজ আর কিছু নেই, আছে শুধু অতীতের এক বিরাট ভগ্নস্তূপ।...নতুন এক পৃথিবীর আবির্ভাব হচ্ছে আমেরিকার...অতি শীঘ্রই আমি যাচ্ছি - অবশ্য আঙ্কল স্যাম-তন্ত্রে (Uncle Samdom) আমি মোটেই আস্থাশীল নই। সম্ভবপর বলবল ইন্দ্রধনুর ছটায় যদি আবার কোন আকাশ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তবে সে আকাশ ঐ পশ্চিম দুনিয়ারই মাথায় শোভা পাবে। আমি চাই ইউরোপ ত্যাগ, চিরদিনের মত ইংল্যাণ্ড ছেড়ে চলে যেতে—আমি থাকবো গিয়ে আমেরিকায়।... কিন্তু, আমেরিকাবাসী! তোমাদের জ্বালা হচ্ছে তোমরা ইউরোপীয় ভাবধারাটি গ্রহণ করেছ অতি আপনার মত করে, কিন্তু তোমাদের নিজস্ব ঐতিহ্যের কিছু জান না তোমরা। আর আমাদের মত ইউরোপীয়দের মন আমি জানি—তারা তোমাদের দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে মাতব্বরী চালে বলে—'ওরা আজও বর্বরক।' কিন্তু যে হেতু আমি তোমাদের সাহিত্য সত্যিই পড়েছি, আর কয়েকজন আমেরিকাবাসীকে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভাবে জানি বলেই বলছি—'বর্বরকত্বে' তোমরা এতই বয়োজ্যেষ্ঠ যে যৌবনানন্দে উজ্জ্বল এ যুগের প্রাণই হলে তোমরা।"

১৯২২ সালের শেষ পর্বে লরেন্স তাঁর স্ত্রী ফ্রিডাকে সঙ্গে নিয়ে পাকাপাকিভাবে ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করে আমেরিকায় পৌঁছলেন। কিন্তু আশা তাঁর সার্থক হোল না। নিউ মেক্সিকোতে নতুন 'গ্রামনিদ'এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এক নগর পত্তন করার প্রচেষ্টা তিন বছর ধরে করে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়ে আবার তিনি ইংল্যাণ্ডে ফিরে এলেন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের লজ্জা আর অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে। নিউ মেক্সিকোতে থাকাকালীন তাঁর স্বপ্নভঙ্গের সূচনা অতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে এক বন্ধুকে লিখিত পত্রে :

"না, কিছুই আর হৃদয় স্পর্শ করলো না—না, এমন কি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেও আর মুগ্ধ হই না—.....তবে যা হয়েছে বোধ হয় ভালই হোয়েছে আমার বোধশক্তি, বোধ সবই অপচরিত হয়ে গেছে—একমাত্র বুঝতে পারছি কাল (Time) তার আপন অমোঘ রীতিতে সবই যেন দেখে যাচ্ছে, আর আমিও সেই অবলোকনের স্বাক্ষর তাই এই পত্রে রেখে গেলুম।"

অপর একখানি পত্রে আমেরিকা সম্বন্ধে তাঁর অভিমতের চূড়ান্তরূপটি লোহা পেটা হাতুড়ির মত নির্মম কঠোর ভাষায় প্রকাশ করেছেন।

"আঙ্কল্ স্যামের প্রকৃত রূপটি কি শুনবে? যান্ত্রিক বর্বর' স্ফীত পৌরুষের সে এক অশ্লীলতম ব্যাভিচার।"

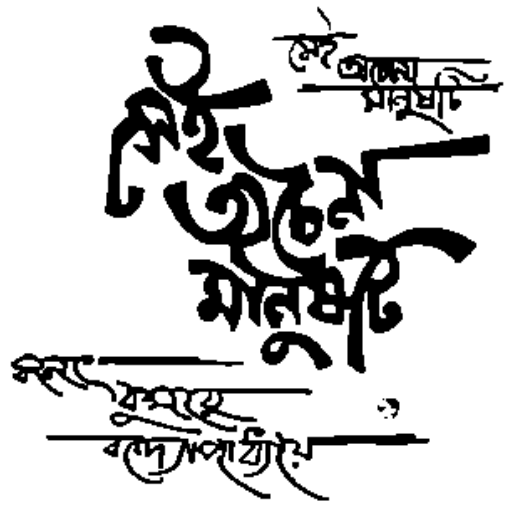

শঙ্কর 'ভাবেছিল উৎপাত ওইখানেই চুকে গেল।

আহা, তা যদি হত!

আঃ, একি হল? গা হাত পা ম্যাজ ম্যাজ করছে কেন?

সে এবারে আড়ামোড়া দিয়ে নিজের দেহের জড়তা ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করলে। শরীর ম্যাজ ম্যাজ করার আর দোষ কি? এইসব বাজে কথা ভাবলে তার ফল তো এমনি হবেই।

সে লাইব্রেরীটী ছেড়ে খাতা পেন্সিল বই নিয়ে বকুলতলায় গিয়ে বসল।

কিছু কাজ যে এখনি করার আছে!

এ গুলো না করলে আসল হাতে কলমের কাজে সে হাত দিতে পারবে না।

সে খাতা পেন্সিল নিয়ে বই খুলে বসল। হাত মন দুইই চলল বেশ কিছুক্ষণ। কিন্তু কখন হাত থেমে গিয়েছে, মন খাতার থেকে বিমুক্ত হয়ে কোথায় পালিয়েছে সে খেয়াল করতে পারেনি।

মন তখন আবার সেই পুরনো ভাবনায় ফিরে গিয়েছে। মন যেন সেই আগের কথাটিই বুকে ধরে তখনও বার বার চীৎকার করছে—আহা, তা যদি হত; আহা, তা যদি হত!

তা যদি হত তা হলে যে যন্ত্রণা সে জীবনে পেয়েছে তা আর পেতে হত না তাকে। সেতো ভালবাসার অপমান নয়। ওসব ফালতু কথায় তার মন পীড়িত হয় না। প্রচণ্ড দাম্ভিক, অহঙ্কারী মানুষ শঙ্কর, সেই মর্মান্তিক আঘাত করে দিয়েছে সে। তার যন্ত্রণায় সে যে আজও মুহূর্তে মুহূর্তে নিজেকে দংশন করে রক্তাক্ত করে তুলছে।

এ যেন নিজের ক্ষতকে আরাম করবার জন্যে সাপের করকরে জিভ দিয়ে চাটার মত। যত চাটবে তত রক্ত ক্ষরণ হবে। সেই রক্ত ক্ষরণের মতই তার মন যেন ওই 'আহা যদি হত' এই কটা কথার করকরে জিভ দিয়ে নিজের মনকে চেটে চলেছে।

তা যদি হত তা হলে বেঁচে যেত সে। তা হয়নি কিন্তু।

ক'দিন পরে আবার ওই পুরনো মোটের রাস্তা ধরে মেয়েটি আবার এসে দাঁড়াল তার কাছে।

সেই বেঞ্চটিই তার বিশ্রামের সময়ের বিহার স্থান

মেয়েটি এসে দাঁড়াতেই সে বেশ আরামে বেঞ্চের পেছনে ঠেস দিয়ে বাদশাহী চালে বললে—কি ব্যাপার? আজ কি খবর?

মেয়েটিকে যে সিরিয়াসলি সে গ্রহণ করেনি এই টুকুই বোধ হয় বুঝিয়ে দিলে সে।

মেয়েটি বললে—এই বেলায় একবার আপনার কাছে, আপনার নোটটা ফেরৎ দিতে।

এবার সোজা হয়ে বসল শঙ্কর কথাটা শুনে। বললে—কি নোট ফেরৎ দেবেন আমাকে?

সেই কাগজ ক'খানি মেয়েটি বাড়িয়ে দিলে তার দিকে। শঙ্কর কিন্তু সেগুলি নেবার জন্যে হাতও বাড়ালে না। হেসে বললে—ও নিয়ে আমি কি করব? ওতো আপনার জন্যেই আমার খাতা থেকে নকল করেছিলাম আমি। ও আপনি রেখে দিন।

—ওতে আমার দরকার নাই। আপনি রেখে দিন বরং।

—ওতে আমারও দরকার নাই। আপনার দরকার না থাকলে ফেলে দিতে পারেন।

তারপর একটু থেমে, তার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে সে বললে—আপনি বোট কেরৎ দেওয়া নিয়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে এলেন নাকি?

মেয়েটি রেগেছে এবার। সে নিরীহের মত বললে—আপনার সঙ্গে ঝগড়া করবো এমন সাহস কি আমার হতে পারে? আপনি কলেজের উজ্জ্বল রত্ন, প্রফেসাররা সবাই আপনাকে ভালবাসে, খাতিরও করে।

এবার চটে উঠল শঙ্কর—কি ব্যাপার বলুন দেখি, আপনি কি ঠাট্টা করছেন আমার সঙ্গে?

—ঠাট্টা? আপনার সঙ্গে ঠাট্টা? আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করতে যাব কেন? আপনি যে আমাদিগকে মানুষই মনে করেন না। ঠাট্টা করলে সে ঠাট্টা আপনি সহ্যও করবেন না।

—আরে, আপনি দেখছি রেগেছেন আমার উপরে।

তার মুখের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে হাসল। এক মুহূর্তে নিজের সমস্ত মনটাই বুঝি বদলে গেল। কেমন একটা মায়া হল তার। নিজে একটু সরে গিয়ে তার বসবার জায়গা করে দিয়ে সে বললে—বসুন। এতক্ষণ তো আমাকেই আপনি 'সেন্স অব হিউমার' নাই বলে অভিযোগ করছিলেন! কিন্তু আপনারই তো দেখছি রসবোধে ঘাটতি আছে। বসুন রাগ করতে হবে না।

বলার সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়েছিল মেয়েটি। কিন্তু তার বলার সঙ্গে সঙ্গে এই বসে পড়াটা ভাল লাগেনি শঙ্করের। মনে হয়েছিল মেয়েটি যদি তার সমস্ত সমাদরকে উপেক্ষা করে, রেগে হন হন করে চলে যেত তা হলেই সব চেয়ে ভাল হত! সব চেয়ে মানান সই হত ব্যাপারটা।

কিন্তু মেয়েটি তখন শুধু বসেই পড়েনি, বসে তার মুখের দিকে সস্মিত মুখে চেয়ে আছে। কিন্তু কি আশ্চর্য, ওর চোখে বোধ হয় জল এসেছিল, এখন সে জলটা মিলিয়ে যাচ্ছে। মিলিয়ে যেতে যেতেও যেন রয়েছে খানিকটা।

তার মায়ার পরিমাণটা বেড়ে গেল দেখে। সে হেসেই বললে—আচ্ছা, আপনি যে আমার ওপর রাগ করেছিলেন তা আমার অপরাধটা কি বলতে পারেন?

সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীজনোচিত জবাব এল—আপনার অপরাধ আছে এ কথা কি বলেছি?

—তবে রাগ করছিলেন কেন আমার ওপরে?

মেয়েটি চুপ করে রইল মাথা নীচু করে।

খোঁড়া পাখিকে ছড়িয়ে আরাম করে আবার বসল শঙ্কর বেঞ্চের পেছনটায় ঠেস দিয়ে। একটি অল্পবয়সী মেয়ে যে তার সামনে বসে আছে এটা যেন খেয়ালই করছে না শঙ্কর। একটি অল্পবয়সী ছেলের সামনে একটি অনাত্মীয়া অল্পবয়সী মেয়ে বসলে স্বাভাবিক ব্যবহারে যে সামান্য আড়ষ্টতা বা সুতীক্ষ্ণ আত্মসচেতনা আসে, আসবার কথা। কিন্তু, শঙ্করের ব্যবহারে তার বাষ্প মাত্র নাই। সে বেশ সহজে পা'টা ছড়িয়ে দিয়ে একটু হেসে বললে—পা'টা একটু ছড়িয়ে বসলাম। টান ধরেছে। খোঁড়া পা তো!

মেয়েটি যেন আঘাত পেলে তার কথা ক'টিতে। মদুপ্রযুক্ত কয়েকটি রেখার আকস্মিক আবির্ভাবে ও অন্তর্ধানে, চোখের দৃষ্টির ব্যথিত আচ্ছন্নতায় সে আঘাতের কাতরতা ফুটে উঠল। একটু হাসবার চেষ্টা করে বললে—আপনার পায়ে যে একটু টান পড়ে চলতে গেলে সেতো সবাই জানে, দেখতে পায় নিজের চোখেই। ওকি আবার নিজের মুখে বলতে হয় নাকি?

মেয়েটির চোখের এক মুহূর্তের বেদনা-কাতর দৃষ্টি, এই কথাগুলির অন্তরালের মনটি শঙ্করকে যে কথা শোনালে তা শুনে তার চুপ করে থাকা উচিত ছিল, হয়তো একটু হাসলেও হাসা চলত। কিন্তু সে সব কিছু গায়ে না মেখে শঙ্কর এক মুহূর্ত চুপ করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ঈষৎ অট্টহাসা করে উঠল।

রৌদ্রের উত্তাপে স্নিগ্ধ ছায়ার প্রত্যাশায় একজোড়া পাখী একটা কাটা ছাঁটা রঙ্গন গাছের কোণের ভিতর বসেছিল গুটিশুটি মেরে। তারা ভয় পেয়ে কিচ কিচ শব্দ করে উড়ে পালাল। শুধু তাই নয়, তার হাসিতে চমকে উঠেছে মেয়েটি। কাতরতার জায়গায় একটি আহত বিস্ময় ফুটে উঠেছে তার মুখে। সে কেমন একরকম করে তাকিয়ে রইল শঙ্করের মুখের দিকে।

শঙ্কর সে সব কিছু গায়ে মাখল না। হাসতে হাসতেই বললে—কি হল, আপনি অমন করে তাকিয়ে রইলেন কেন? উঠেই বা পালালেন কেন?

ছোট্ট করে একটি নিশ্বাস ফেলে মেয়েটি সংক্ষেপে বললে—এবার যাই!

—যাবেন? প্রশ্নটির আড়ালে যেন না যাবার একটি সূক্ষ্ম অনুরোধ প্রচ্ছন্ন রয়েছে যেন।

সেই সূক্ষ্ম গোপন কথাটিই যেন প্রকট হল তার পরের কথায়। সে বললে—এখন তো আপনার কোন ক্লাস নেই! কোথায় যাবেন এখন?

সুনির্মলা হাসল, বললে—না, এখন ক্লাস নেই। কিন্তু তাই বলে কি এই দুপুর রোদে এই পোড়া বেঞ্চ ছাড়া আর যাবার জায়গা নেই?

এবার অপ্রস্তুত হল শঙ্কর। একটু অপ্রতিভভাবে বললে—না তা বলছি না। সে তো এখুনি লাইব্রেরীতে গিয়ে ঠাণ্ডায়, পাখার তলায় গিয়ে বসতে পারেন অনায়াসে। সে এই রোদে পোড়া বেঞ্চে আমার খোঁড়া পায়ের সামনে বসে থাকার চেয়ে অনেক ভদ্র, অনেক আরামের। সে আমি জানি। সে আপনাকে বলতে হবে কেন মুখ ফুটে।

তার কথা শুনে সুনির্মলা বই খাতাগুলো হাতে তার মুখের দিকে কেমন করে চেয়ে রইল। তারপর হাতের বই-খাতাগুলো শব্দ করে শঙ্করের প্রসারিত পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে হাসিমুখে বললে—কই নাবান সরান আপনার খোঁড়া পা।

মেয়েটির আকস্মিক পরিবর্তনে বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে পা সরিয়ে নিলে শঙ্কর। তারপর কোমল কণ্ঠে বললে—বসুন, আমি পা সরিয়ে নিয়েছি।

বসল সুনির্মলা। তার মুখের দিকে সকৌতুকে তাকিয়ে রইল সে।

তারপর বললে—আপনি কতক্ষণ বসে থাকবেন এখানে, এই রোদে?

একটু হাসল শঙ্কর। বললে—থাকব থাকব কিছুক্ষণ। ভ্যানগগ বলে একজন বিখ্যাত শিল্পী ছিলেন।

—জানি।

—জানেন, তাহলে আর কি বলব আপনাকে?

সঙ্গে সঙ্গে সপ্রতিভ হয়ে মেয়েটি বললে—বলুন। আমি শুধু ঐ নামটাই জানি আর কিছু জানি না।

সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহিত হয়ে শঙ্কর সুরু করলে। একটি মধুর হাসি যে মেয়েটির উপর দিয়ে এক মুহূর্তের মধ্যে পার হয়ে গেল সেটি তার নজরে পড়ল না। সে বলতে লাগল—জানেন, ভ্যানগগ একটা দুপুরের ক্ষেতের ছবি এঁকেছিলেন। রৌদ্রে ঝলমলে পাকা গমের ক্ষেত। সেই দুপুরের রোদ্দুরে পোড়া গমের ক্ষেতের ছবি আঁকতে গিয়ে ভ্যানগগ দুপুরবেলা, মাঝমাঠে মাথার টুপি খুলে খোলা মাথায় রৌদ্রের মধ্যে দিনের পর দিনের চুপ করে বসে থাকেন! একদিন একজন অবাক হয়ে তাঁকে বললে—একি এমন করে বসে আছেন কেন? তা ভ্যানগগ কি জবাব দিয়েছিলেন জানেন?

মেয়েটি হেসে ঘাড় নেড়ে বললে—না।

সোৎসাহে শঙ্কর বললে—ভ্যানগগ বললেন—ছবি আঁকতে হবে তো এই সূর্যালোকিত পাকা ক্ষেতের। তাই আলোর উজ্জ্বলতাকে মাথার ভিতর দিয়ে দেহের মধ্যে, মনে মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি।

সোৎসুক মুখে সুনির্মলা তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বললে—তা আপনি বুঝি সেই রকম মাথার ভেতর দিয়ে আলোটা দেহের মধ্যে মনের মধ্যে নিচ্ছেন? আপনি নিয়ে কি করবেন?

—কি জানি কি করব! তবে কিছু একটা করব।

—কি করবেন? অঙ্ক?

—বললাম যে কি জানি কি করব। কি করব তাই কি জানি? লা সেপের নাম শুনেছেন?

এবার বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠল সুনির্মলা, বললে—সে তো?

—ফ্রান্সিস্যাণ্ড লা সেপ একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তখন তাঁর অল্প বয়েস। একজন মুসলমান গণৎকার বালির উপর অঙ্ক কষে প্যারিসে লোকের ভাগ্য গণনা করত। লা সেপের ভাগ্যগুণে সে বলেছিল—বাদি

বিচিত্র কাহিনী বলতে। তুমি খাল কাটবে। লা'লেন পরবর্তী জীবনে খালই কেটেছিলেন। খাল হল দুটো খাল বুঝলেন? কাজেই ব্যবসা কি যায় কি বলব?

খিল খিল করে হেসে উঠল সুনির্মলা, বললে—বাবা, আপনার অহংকার তো কম নয়! আপনি একেবারে গণ্ডার মারতে চান! বাবাঃ!

এবার তার হাসির ছোঁয়াচে হেসে উঠল শঙ্কর, হাসতে হাসতেই বললে ইচ্ছে তো তাই বটে, দেখি কি হয়। আমার গণ্ডার মারার, ভাণ্ডার লুঠ করার কথা। সে শক্তি আর বিশ্বাস দুটোই আছে আমার। তবু কি বলা যায়! কিন্তু—

তার কথা শুনে তার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল সুনির্মলা। এ ছেলেটা বলে কি? এ কি ভীষণ দাম্ভিক আর অসম্ভব প্রয়াসী! তবু যদি পাটা খোঁড়া না হত।

সুনির্মলা একবার আড়চোখে তাকাল তার খোঁড়া পাটার দিকে।

কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছেলেটির। দৃষ্টি যত তীক্ষ্ণ, বুদ্ধি তত শাণিত। তার এক মুহূর্তের চাউনী দেখে তার অর্থ সে সম্পূর্ণ অনুমান করে নিয়েছিল। সে চাপি থামিয়ে একবার ভ্রূকুঞ্চিত করে নিয়ে আবার সহজ, ভান চাপি ছেড়ে বললে—আমার পা'টার দিকে তাকিয়ে বোধহয় ভাবছেন—তবু যদি পাটা খোঁড়া হত। না কি?

ধরা পড়ে গিয়ে হা হা করে উঠল সুনির্মলা, বললে—না গো না, কি ভয়ংকর লোক আপনি। তাই ভেবেছি বুঝি না তাই ভাবতে পারি। ছি, ছি, ছি! আপনার কথাবার্তা বড় বিশ্রী।

যার কাছে!

সহজ ভান চাপিটিতে একটি আশ্চর্য মাধুর্যের ছোঁওয়া লাগল এবার। শঙ্কর বললে—ওর জন্যে লজ্জা পেতে হবে না আপনাকে। ও রকম চাউনি যে এর আগে আমি অনেকের চোখে দেখেছি কি না! তাই আমি বুঝতে পারি।

এবার রাগ করে সুনির্মলা—এটা আপনার ইন-ফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স! আপনার পা খোঁড়া কি না, তাই আপনি ভাবেন সবাই আপনার খোঁড়া পায়ের দিকে তাকিয়ে আছে!

আবার হা হা করে হাসতে লাগল শঙ্কর, বললে—না, না, আপনি পুরো ঠিক বলছেন না। কারণ সচরাচর এমনটিই ঘটে। তবে আমার বেলা এটা সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স।

—কেন?

বুঝতে পারলেন না? আমি আমার খোঁড়া পায়ের জন্যে কি ভাবি জানেন? ভাবি যে আমার পা'টা খোঁড়া বলেই আমার বুদ্ধি এত তীক্ষ্ণ, আমার মন এত স্পর্শকাতর, আমার অনুভূতি এত তীব্র! আমি ভাবি এগুলো আমার খোঁড়া কম্পেনসেশন! আমার পা খোঁড়া বলেই আমি বড় হব, অনেক বড় হব।

সুনির্মলা তার মুখের দিকে অবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। তার মনে হল এর কথার মধ্যে অর্থহীন দম্ভ আছে, অর্থপূর্ণ শক্তির পরিচয় আছে আবার খানিকটা শিশুসুলভ বাহাদুরীও আছে! সে এর তুলনায় কত পরিপক্ক, কত সহজ, কত স্বাভাবিক সাংসারিক বুদ্ধির

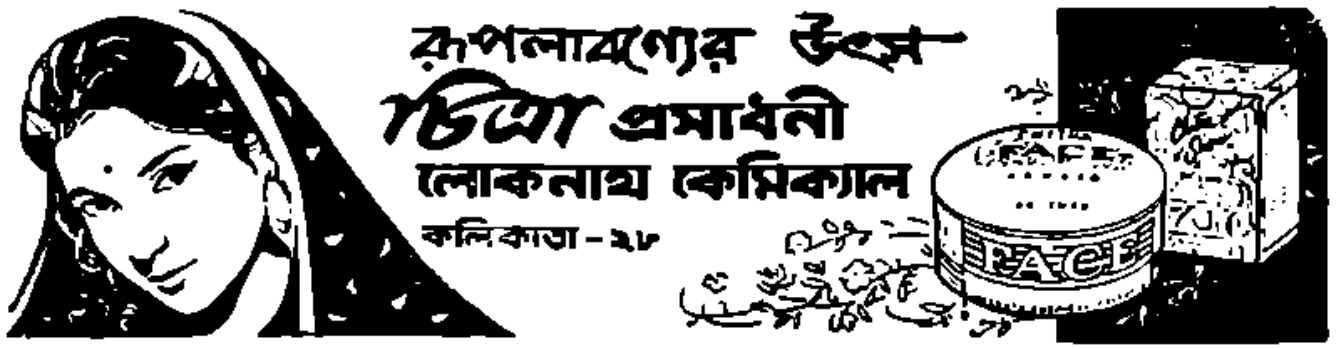

অধিকারিণী। সে হেসে মন মেনে নিয়ে, যেন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে···সে তো বেশ ভালই হবে। আপনি বড় হলে আমাদের সুবিধে হবে!

—আমি বড় হলে আপনার আবার কি সুবিধে হবে?

হেসে সুনির্মলা বলে—হবে না? আমাদের একজন চেনা মানুষ বড় হলে আমাদের সুবিধা হবে না? আচ্ছা তা না হোক—লোককে তো বলতে পারবো এই বড় মানুষটি আমার এককালের চেনা মানুষ।

তার কথাগুলো পরম তৃপ্তিতে চাখতে লাগল শঙ্কর যেন সেই বড়ত্বটা তার অর্জন করা হয়ে গেছে।

তার মুখের দিকেও সুনির্মলাও তাকিয়ে হাসছিল। কেন হাসছিল সেই জানে। তার মনের শিশুসুলভ আকৃতি তাকে মমতাচ্ছন্ন করেছিল না তার এই আত্ম মগ্ন দম্ভ তার মনে সকৌতুক ব্যঙ্গ মন করে তুলেছিল সেই জানে। কিন্তু শঙ্কর তখন এত আত্মমগ্ন যে সুনির্মলার হাসি সে লক্ষ্যও করেনি। যখন লক্ষ্য করলে তখন একটু ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলে—কি হল, হাসছেন যে? আপনার কি মনে হচ্ছে যে আমাকে দিয়েও সব কিছু হবে না? না আমি মিথ্যে বড়াই করছি?

সুনির্মলা তার ধমকের মত প্রশ্নে বিন্দুমাত্র দমল না। সে সমান হেসে বললে—ওসব কিছুই ভাবিনি আমি!

ভুরু তার আরও কুঁচকে উঠল, সে ঝোঁড়া পাটা ঘরাতে ঘরাতে শুধু বললে—তবে?

নিজের মুখের হাসিটিকে আরও সরস, আরও প্রসারিত করে সুনির্মলা বললে—আপনার কাছে একটা বর চাইব ভাবছি।

অবাক হয়ে শঙ্কর বললে—বর? বর কি?

সুনির্মলার মুখটায় যেন একটা লালচে আভা একবার খেলে গেল। সে একবার নিজের ঠোঁটটা কামড়ে ধরল দাঁত দিয়ে। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে সকৌতুক ভ্রূকুটি করে বললে—কি লেখাপড়া করেন আপনি, বর বোঝেন না?

এবার রসিকতাটিকে ঠেলে আরও খানিকটা দিয়ে গিয়ে শঙ্কর বললে—বুঝি, বুঝি, খুব বুঝি। বর একরকম হল সেই পুরাণ-টুরাণের ব্যাপার! ঋষিরা কি দেবতারা প্রাকৃতজনের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে বললেন—বৎস, বরং বৃণু! সেই এক বর! আর এক বর আছে। তার অর্থ হল—

লজ্জিত ভাবে মৃদু ধমক দিয়ে উঠল সুনির্মলা—থাক, সে বরের কথা বলিনি আপনাকে।

—তবে কোন বরের কথা বলছেন? তাকে বিরক্ত করবার জন্যে না বুঝার ভাণ করে শঙ্কর বললে। তারপর হেসে বললে—ও, তাহলে সেই বরং বৃণুর বর চাইছেন আমার কাছে?

—না, কিছু চাইনি আপনার কাছে।

—বুঝেছি, এবার বুঝেছি। বলুন কোন বর চাই আপনার! চাইব মাত্র বলব—বৎসে, বরং বৃণু।

সঙ্গে সঙ্গে আবার নিজের সরলতায় ফিরে এল সুনির্মলা বললে—আমাদের বাড়ী যাবেন একদিন? বলুন যাবেন।

অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল শঙ্কর একটুক্ষণ। তারপর বললে—আপনাদের বাড়ীতে কেন যেতে বলছেন কি দরকার?

—যেতে কিছু বাধা আছে নাকি? একটু অতি মানের ছোঁওয়া মিশিয়ে সুনির্মলা প্রশ্ন করলে।

—না, বাধা কিসের? তবে কি হবে গিয়ে তাই বলছিলাম।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললে—তা যাব। যাব একদিন।

সেই মুহূর্তে ঢং ঢং করে তিনটের ঘণ্টা বেজে ছিল। বইখাতা নিয়ে তার আগে উঠে দাঁড়িয়ে ছিল সুনির্মলা। ক্লাস আছে। বইখাতা হাতে নিয়েও একান্ত আপ্যায়িত হয়ে হেসে সে বললে—খুব ভাল। আমি আজ মা'কে বলব গিয়ে। কাল বিকেলে কলেজের পর চলুন।

আজও কারখানার ঘণ্টা বাজছে—ঢং ঢং!

ক'টা বাজছে? ঘণ্টা বাজবে বাজুক তার কি বয়ে গেল। কিন্তু রোদটা বড় ভাল লাগছে। লাগছে

—২১শে ।

একটা আড্ডামোড়া ;
[illegible] একটা লম্বা হাই তুললে
আজও হেসে মনে পড়ছে সে দিনের কথা
সেই বাড়ীতে প্রথম দিন।
একটা টাঙ্গা চড়ে দুজনে গিয়ে পৌঁছেছিল তাদের
বাড়ীটা দেখে চমক লেগেছিল শঙ্করের।
প্রশ্ন করেছিল—আপনাদের বাড়ী ?
হেসে সে বলেছিল— হাঁ।

কুঁচিয়ে পরা। গায়ে সাদা চিকনের ব্লাউজ। পায়ে চটি। শংকরের নিজের বিধবা মায়ের চেয়ে কত তফাৎ!

সুনির্মলার সঙ্গে শংকর সিঁড়ির কাছে উঠে এল।

ভদ্রমহিলার স্থির দৃষ্টি বদলাল না, কেবল মুখে সামান্য হাসি ফুটে উঠল। যেন মাপ করা অতি পরিমিত হাসি। তিনি মৃদু কণ্ঠে বলল—তুমি উমাশংকর?

আপ্যায়িত হয়ে মুখ তুলে সে বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ!

সঙ্গে সঙ্গে হেঁট হয়ে সে দু হাত বাড়িয়ে দিলে ভদ্রমহিলার পায়ের দিকে। দুটি সোনালী স্ট্র্যাপের বেরের ভিতর লম্বা লম্বা, নিটোল, হলদে রঙের রক্ত প্রান্ত, পাকা কারচার মত আঙুলগুলি বেরিয়ে আছে। সে সেই আঙুলগুলির প্রান্ত ছুঁয়ে প্রণাম করলে।

শুনতে পেলে প্রণাম করতে করতেই, ভদ্রমহিলা যেন বিব্রত হয়ে বলছেন—থাক, থাক, আবার প্রণাম করছ কেন?

প্রণাম করে মুখ তুলে সে দেখলে ভদ্রমহিলা দুই হাত জোড় করে প্রতিনমস্কার করছেন।

দেখে শুনে তার কেমন লাগল যেন! কনিষ্ঠ সে, তাঁর কন্যার সহপাঠী, তার প্রণাম নিতে এত সংকোচ কেন? সে মৃদু হেসে বললে—আপনি সুনির্মলার মা? সুনির্মলা আমার সঙ্গে পড়ে। আমার প্রণাম নেবেন না?

ভদ্রমহিলা যেন একটু অপ্রস্তুত হলেন, বললেন—না তা ঠিক নয়। তবে অনাত্মীয় মানুষের কাছ থেকে প্রণাম নিতে সংকোচ হয়। আর আমার এমন কি যোগ্যতা আছে প্রণাম নেবার?

এ সব শংকরের কাছে বড় বড় কথা। সে আর কথা বাড়াল না, চুপ করে রইল।

সুনির্মলা একবার শংকরের মুখের দিকে আর একবার মায়ের মুখের দিকে তাকাল। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সে কি উত্তর খুঁজল সেই জানে।

তার মা শান্ত স্বরে বললেন—এস, ভেতরে এস।

বারান্দায় উঠে ঘরের ভিতরে যাবার আগে সে একবার বারান্দার চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে। বারান্দায় বেতের চেয়ার তিন চার খানি, সুন্দর পরিপাটি করে একটি বেতের টেবিলের চারিপাশে সাজানো। বারান্দার মাপ করা জায়গার অন্তর অন্তর ফুলের ক্রোটনের আর পাম গাছের টব বসানো।

ভিতরে যেতে গিয়ে শংকর বললে—বাঃ কি সুন্দর করে সাজানো। মনে হচ্ছে এই খানেই বসি।

ভদ্রমহিলা ঘরকে দাঁড়িয়ে গেলেন, বললেন—এই খানে বসতে ইচ্ছে করছে? বেশতো, এইখানেই বস তা হলে! তোমার তো দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে। আর অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ।

তার ইচ্ছা হল বলে—না না আমার বিন্দুমাত্র কষ্ট হয়নি! কিন্তু বলতে পারলে না। চুপ করে রইল সে। কথাগুলো যেন সংকোচে বের হলো না গলা দিয়ে। তার পা যে খোঁড়া এটা সে অস্বীকার করতে পারলে না যখন ভদ্রমহিলা তার খোঁড়া পায়ের ক্লেশের উপরই জোর দিয়ে কথাটা বললেন। তার আরও একটা কথা মনে হল সেই সঙ্গে। যেন ভদ্রমহিলা চান না সে ঘরের ভিতরে গিয়ে বসুক।

ভদ্রমহিলা ততক্ষণে একটা চেয়ার টেনে দিয়েছেন। বললেন—বস।

সে বলার মধ্যে কতটা স্নেহ আর কতটা হুকুম ঠিক বুঝতে পারল না শংকর।

সে বসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রমহিলা আর একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন—মিনু, তুমি ভেতরে যাও। কাপড় চোপড় বদলে এস। কফির জলটাও চড়িয়ে দিও উনুনে। জল হলে আমাকে ডেকো, আমি যাব।

সুনির্মলা একান্ত বাধ্য মেয়ের মত ঘরের ভিতরে চলে গেল।

এই অল্পক্ষণের মধ্যেই শংকর বুঝতে পেরেছে সুনির্মলা এই ভদ্রমহিলার হাতের একটি সুন্দর অপরূপ ঘড়ি। ইনি দম দিয়ে যেমন চালান ও তেমনি চলে। তার এদিক ওদিক হবার কোন উপায় নাই।

ভদ্রমহিলা এবার তার মুখের দিকে চেয়ে আবার প্রশ্ন করলেন—তোমার নামতো উমাশংকর।

ভদ্রমহিলা তার পদবীর উল্লেখ একবারও করলেন না।

এরপর একটু হেসে বললেন—নির্মল তোমার নাম করে বার বার। বলে ভাল ছেলে। তাই তোমাকে দেখবার ইচ্ছে হল। ওকে একবার আমাদের এখানে আসতে বলবার জন্যে বলেছিলাম। তুমি এসে খুব খুশী হয়েছি।

শঙ্করের মনে হল ভদ্রমহিলাও কথাগুলি এরকমে মুখস্ত কথার মত বলে গেলেন।

তারপরই তিনি প্রশ্ন করতে লাগলেন তাকে পাকা উকীলের মত। তার বাড়ীতে কে কে আছে, সংসারে কে কে উপার্জন করে, কত উপার্জন করে, আর কোন আয় আছে কি না, পাশ করে সে কি পড়বে, তারপর কি পড়বে—এইসব প্রশ্ন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। একটি একটি করে। প্রশ্ন করতে কোন দ্বিধা নাই, ব্যস্ততা নাই, সংকোচ নাই। বেশ ধীরে সুস্থে তার সব জেনে নিয়ে সব শেষে প্রশ্ন করলেন—তোমার পায়ে কি হয়েছিল? তুমি তো একটা পা একটু টেনে চল দেখছি।

এমন পরিষ্কার, অসংকোচ, মমতাহীন প্রশ্ন যে চোখ গিলে সব জবাব দিতে হল শঙ্করকে।

এই সময় মুখের মো মুখের উপর মেলাতে মেলাতে বেরিয়ে এল সুনির্মলা। ইতিমধ্যেই তার গা ধোয়া হয়েছে, কাপড় বদলানো হয়েছে, তারপর প্রসাধনও সাঙ্গ করেছে।

সে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—কফির জল হয়ে গিয়েছে মা!

চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে সুনির্মলার মা বললেন—তোমার বাবা উঠেছেন।

—উঠেছেন।

—হরলিক্সের বোতল মিটসেফ থেকে বের করে রেখেছ?

—হ্যাঁ!

ভদ্রমহিলা উঠে চলে গেলেন। তার খালি চেয়ারটায় হোট্ট চপলা শিশুর মতো খুপ করে বসে পড়ল সুনির্মলা। তার দিকে তাকিয়ে সকৌতুকে বললে—কি, মায়ের সঙ্গে আলাপ হল?

এতক্ষণ ধরে মনের মধ্যে যে আড়ষ্টতাটা জমে উঠেছিল সেইটা এবার প্রকাশের পথ পেলে। সে এবার হেসে বললে—হ্যাঁ, হল। কিন্তু আলাপটা হল এক তরফা। তার কথার কেমন রাগের ছোঁয়া লাগল।

সেইটুকু অনুসরণ করে, চোখ বড় বড় করে সে প্রশ্ন করলে—কেন?

সমানভাবে হেসে সে বললে—তা বই কি! তোমার মতো পাকা ব্যারিস্টারের মত আমি দাতপুরুষের খবর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার পেট থেকে কেন, আমাকে প্রায় 'সাইকো-এ্যানালিসিস' করে আমার সব কলসান থেকে বের করে নিলেন! আর আমি যে অন্ধকারে সেই অন্ধকারে!

—মানে?

—মানে খুব সোজা। তোমার মা আমার সব জেনে নিলেন কিন্তু আমি তোমাদের কিছুই জানলাম না।

একটু হেসে নরমভাবে সুনির্মলা বললে—আমাদের সবই জানবে আস্তে আস্তে। অত ব্যস্ত কিসের?

এই সময় সুনির্মলার মা কফির কেটলি, কাপ, ডিস ট্রেতে বসিয়ে বেরিয়ে এলেন। তাঁর পিছনে পিছনে একটি ভদ্রলোক, গায়ে পাঞ্জাবী, পরণে চিলে পায়জামা, পায়ে চটি, খুপ খুপ করে হাঁটতে হাঁটতে বেরিয়ে এলেন।

সুনির্মলা ফিস ফিস করে শঙ্করকে বললে—আমার বাবা। হাইব্লাড প্রেসারের রোগী।

শঙ্কর উঠে দাঁড়াল।

ভদ্রলোক বললেন বস, বস।

শঙ্কর বসল।

সেই বসা আরম্ভ হল শঙ্করের। সুনির্মলা বলেছিল—আমাদের সবই জানবে আস্তে আস্তে। অত ব্যস্ত কিসের? ঠিকই বলেছিল সুনির্মলা। ধীরে ধীরে দিনে দিনে সুনির্মলাদের সবই জানল শঙ্কর। সুনির্মলার বাবা ফুল আর পাতের কারবার করতেন চাকরীর সঙ্গে। মৌখীন ব্যবসা। সহরের বাইরে বাগান ছিল, হট হাউস পর্যন্ত ছিল সেখানে। তাছাড়া ভাল চাকরী করতেন। হঠাৎ হাই ব্লাডপ্রেসারের

ধাক্কার স্টোক হল একবার। সেটা কাটিয়ে উঠতে আবার ধাক্কা, আবার এক স্ট্রোক। তখন চাকরী ছাড়তে হল, ব্যবসাও ছাড়তে হল। সেই সময় সংসারের ডুবন্ত নৌকার হাল ধরলেন তার মা। বাগানটা সর্বপ্রথম বিক্রি করে দিলেন। বাড়ীর মস্ত কম্পাউণ্ডকে পরিণত করলেন বাগানে। সেইখানেই ছ'টা হাউস পর্যন্ত তৈরী করালেন বাড়ীর পিছন দিকে। এখন তিনিই সংসার দেখেন। তিনিই উপার্জন করেন। একটিমাত্র মালী নিয়ে গোটা বাগানটাতে ফুল আর গাছ ফলাচ্ছেন তিনি শারীরিক পরিশ্রম করে। এই ধাক্কায় তাঁর চুলে এরি মধ্যে সাদা ছোপ ধরে গিয়েছে।

সবটা জেনে শঙ্কর মনে মনে অভিভূত হয়ে গিয়ে তাঁকে অন্তরের একান্ত শ্রদ্ধা দিতে গিয়েও দিতে পারে নি। ভদ্রমহিলার কাছে তার আন্তরিক শ্রদ্ধা যেন বেরিয়ে আসতে চায় না। মনে মনে যে শ্রদ্ধা আছে, থাকে সে প্রকাশ করে ধরতে চায় ভদ্রমহিলার সামনে, ভদ্রমহিলার সামনে এসে আর তা প্রকাশিত হয় না। শ্রদ্ধাও থাকে না, আন্তরিক আবেগ কোথায় উবে যায়। সে ওই ভদ্রমহিলার কেমন এক ধরণের স্বভাবের জন্যে। ভদ্রমহিলার স্বভাবের মধ্যে এমন একটা কঠিন, উদাসীন কিছু গোপন আছে যার স্পর্শে তার মনের অমনি অবস্থা ঘটে। অথচ ভাবতে গেলে আজও লজ্জা হয় তার। আজ লজ্জা করেও কথাটা স্বীকার করতে পারছে নিজের কাছে। সে দিন কথাটা মনে ভাবতেও ভয় পেত। ভয় লাগত তার। আজ সব স্তিমিত হয়ে গিয়েছে, আজ সে পৃথিবী কোথায় কতদূরে পড়ে আছে! তাই আজ মাত্র লজ্জাই লাগছে। মধ্যে মধ্যে তখন মনে হত সুনির্মলার চেয়ে সুনির্মলার মাকেই যেন বেশী ভালবাসে। কথাটা তখন মনে হতেই মনকে শাসন করে সভয়ে বলত—ছোঃ, তাই কি হয়। ভদ্রমহিলার আত্মমগ্ন, নিষ্ঠুর, উদাসীন এক সুদূর অস্তিত্বই এই ভাল লাগাটা জাগিয়েছিল তার মনে। ভদ্রমহিলার তুলনায় সুনির্মলাকে কত কাঁচা মনে হত! এক কাঁচা ফল আর একটা রস-পরিপূর্ণ পাকা ফলে যে তফাৎ সেই তফাৎ দুজনের মধ্যে। তফাৎটা ব্যক্তিত্বের। তাঁর সবল, আত্মসচেতন, স্বয়ং সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের কাছে সুনির্মলার মৃদু, নির্ভরশীল অস্তিত্ব অত্যন্ত নিষ্প্রভ মনে হত তার কাছে। ভদ্রমহিলা তাকে কোন দিন উচ্ছ্বসিত সমাদরে অভ্যর্থনা করেন নাই, আবার অবহেলাও করেন নি কোনদিন। তবু তাঁরই আকর্ষণটা বড় ছিল তার কাছে।

তবে সে পরিচয়ের প্রথম দিকের ব্যাপার।

তারপর সে যেন জড়িয়ে গেল ওদের পরিবারের সঙ্গে। জড়াল সুনির্মলার সঙ্গে লেখাপড়ার উপলক্ষ্য করেই। বি, এস, সি, পরীক্ষার কিছুদিন আগে থেকে প্রায় ওদের বাড়ী যেত শঙ্কর। পরীক্ষার মাস দেড়েক আগে একদিন সুনির্মলার মা ওকে বললেন—তুমি এক কাজ করনা শঙ্কর!

—বলুন। একান্ত বাধ্যের মত সে জবাব দিলে।

একটু হেসে তিনি বললেন—বলব? বলতে কিন্তু সঙ্কোচ লাগছে!

তাতেই যেন আরও আপ্যায়িত হয়ে শঙ্কর বললে—দেখুন তো, আমাকে কথা বলবেন তাতে আবার সঙ্কোচ কিসের?

তার এই উৎসাহিত আতিশয্য যেন তিনি গায়েই মাখলেন না। মৃদুস্বরে বললেন—তুমি একটা কাজ কর। তুমি বরং এই পরীক্ষাটা পর্যন্ত আমার এখানে এসে থাক। তাতে নির্মলের পড়াশুনোটাও ভাল করে হবে তুমি থাকলে। আর তোমার শরীরটাও খারাপ হয়ে গিয়েছে। আমার কাছে থাকলে তোমার খাওয়া-দাওয়া সব আমি দেখতে পারব। তোমার শরীরটাও সেরে যাবে।

একটু হেসে তারপর তিনি বলেছিলেন—আমার ডিসিপ্লিন কি রকম কড়া দেখছো তো! শরীর আর মন ভাল রাখবার সবচেয়ে বড় জিনিস হল ডিসিপ্লিন।

এ অনুরোধটা যে একান্ত অপ্রোজন তা সে ভদ্রমহিলার চেয়ে কে বেশী জানত? তবু তিনি অসঙ্কোচে অনুরোধটা করেছিলেন তার কাছে, মুখে সঙ্কোচের কথা বলে। তার বুদ্ধি তখন এমন আচ্ছন্ন হয়েছিল যে এর চেয়ে যুক্তিযুক্ত ও সঙ্গত প্রস্তাব যে আর কিছু হতে পারে

একথাটা ছাড়া আর কিছু আসেইনি তার মনে।

সুনির্মলা এ প্রস্তাবে খুশী হয়েছিল কি অসন্তুষ্ট হয়েছিল একথা শঙ্কর বা সুনির্মলার মা কেউ ভেবে দেখবারই প্রয়োজন বোধ করেননি। কারণ সুনির্মলার কোন অস্তিত্বই নাই তখন। আর তার ইচ্ছা অনিচ্ছার কে পরোয়া করে?

সে রাত্রে শঙ্কর খাতা নোট নিয়ে মহা আনন্দে ও মহাসমারোহেই এসে উঠল সুনির্মলাদের বাড়ীতে। বাংলো ধরনের বাড়ী। সামনে বারান্দা, তারপর হল, হলের দুপাশে দুখানা করে চার খানা ঘর। একদিকের ঘরে থাকেন সুনির্মলার বাবা। তারই পাশের ঘরে জায়গা হল শঙ্করের। ভদ্রমহিলা তার বই খাতাপত্র সব সাজিয়ে দিলেন নিজের হাতে।

তারপর আরম্ভ হল দুজনের একসঙ্গে লেখা-পড়া। পড়ার ব্যবস্থা হল ঘরে চেয়ার টেবিলে। ঠিক ভোর পাঁচটার সময় ভদ্রমহিলা দুজনকে ডেকে তুলে হল ঘরে বসিয়ে দেন। শঙ্কর প্রতিদিনই প্রথম দেখছে ভোর পাঁচটার সময় ভদ্রমহিলার মুখখানি। সেই মুখ দেখেই ঘুম ভেঙেছে তার। তখন তার স্নান হয়ে গিয়েছে। পরিপাটি বেশ, পায়ের স্লিপারের শব্দ চেপে তিনি তার হাত দিয়ে তাকে প্রতিদিন মৃদু চাপা স্বরে ডেকে দিয়েছেন। স্বর মৃদু ও চাপা এই জন্যে যে পাছে তাঁর অসুস্থ স্বামীর ঘুম ভেঙে যায়!

ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময় আধঘণ্টা ভিন্ন আর ফাঁকি দিতেন তিনি দুই পাঠ্যকে। তারপর আটটার সময় কাঁচের গ্লাস ভর্তি দুধ। বারোটার সময় এক সঙ্গে টেবিলে ভাত। বিকেল চারটায় ফাঁকি আর দুখানা বিস্কুট। রাত্রি ন'টার সময় আবার টেবিলে রুটি। সারাদিন উর্ণনাভের মত কাজের জাল বুনে চলতেন। তারই মধ্যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকত ওদের পড়াশুনার উপর। ফাঁকি দিবার কি গল্প করার উপায় থাকত না। খাওয়ার পর ওরা দুজনে পড়ত আর ভদ্রমহিলা অন্য একখানা চেয়ারে বসে থাকতেন। হয় উল বুনতেন নয় বই পড়তেন নয় চিঠিপত্র কি জমা খরচ লিখতেন আপন মনে। একটি শব্দ উচ্চারণ করতেন না। ঠিক বারোটা বাজলে নিজে উঠে পড়ে বলতেন—যাও শোও গিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে আলো নিভিয়ে দিতেন।

বি এস সি পরীক্ষা হয়ে গেল, শঙ্কর ফিরে গেল নিজের বাড়ী। একদিন বেশী তাকে থাকতে দেননি তিনি। পরীক্ষার ফল বের হল—শঙ্কর ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট সুনির্মলা ফার্স্ট ক্লাস থার্ড। অবশ্য নম্বরের তফাৎ অনেক।

তারই কদিন পর সেদিন ওদের বাড়ীর লনে বিকেল বেলা বেড়াতে গিয়ে বসে আছে শঙ্কর, এমন সময় একখানা টাঙা থেকে একটি সুবেশ প্যান্ট পরা ছোকরা নামল নানান জিনিষপত্র নিয়ে।

ভদ্রমহিলা ছুটে গেলেন হাসিমুখে—এস এস পরমেশ এস! কদিনই ভাবছিলাম তোমার জন্যে।

পরমুহূর্তে ফিরে বললেন—এতে কি সো?

সুবেশ ছেলেটি হাসিমুখে বললে—চিংড়ি মাছ। কলকাতার গলদা চিংড়ি। আপনাদের জন্যে নিয়ে এলাম। প্লেনে এলাম তো।

—ওমা, গলদা চিংড়ি। কতদিন খাইনি! ভদ্রমহিলা পাত্রটা হাতে তুলে নিলেন।

বলেই তার দিকে ফিরে হাসিমুখে বললেন—শঙ্কর, তুমি আজ রাত্রে খেয়ে যাবে কেমন?

তারপর তার পরিচয় দিলেন—এ হল পরমেশ। ওঁর বন্ধুর ছেলে। পাটনার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে এবার ফার্স্ট হয়ে পাশ করেছে।

তার মুখের দিকে চাইল শঙ্কর। এক মুহূর্তে চিনতে পেরেছে সে কে।

রাত্রিতে খাবার টেবিলে বসে চিংড়িমাছ তার মুখে রুচল না।

ভদ্রমহিলা বললেন—ওকি, অমন সুন্দর মাছ লোকে পোলাও মাংস ফেলে খায়! তুমি খেলে না? কি ছেলে তুমি!

শঙ্কর হাসল। হাসতে গিয়ে একবার চোখ পড়ল সুনির্মলার চোখে। সে সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলে, সুনির্মলাকে সে ভালবাসে। তার মায়ের কোন অস্তিত্ব নাই তার জীবনে।

(ক্রমশঃ)

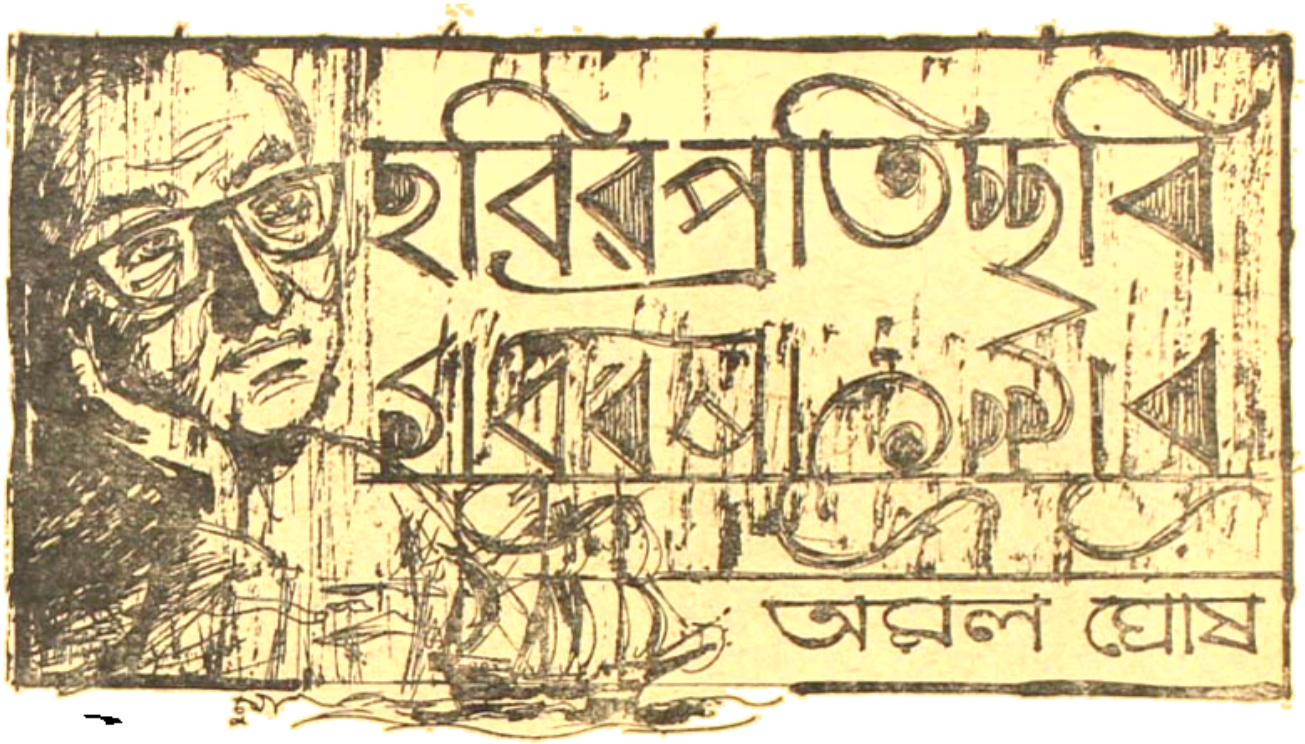

সুপ্রিয়

সমুদ্র !

দীর্ঘকাল চিঠি না লেখার জন্য তুমি আমার উপর রাগ করেছো। হয়তো বিরক্ত হয়েছো। তোমার দোষ কি! দুনিয়া শুদ্ধ সকলেই আমার উপরে রাগ করে রয়েছে যে। সকলেরই বিরক্তি কুড়িয়ে আমি চলেছি। সত্যিই কি সকলের। না, হয়তো সকলের নয়। সংসারে সামান্য দু'চার জনও কী এমন মানুষ নেই, ভুলেও একবার আমার অবস্থাটা বোঝে!

তোমার চিঠি পেয়েছি সেই কবে! উত্তর দিইনি। ভেবেছিলাম উত্তর দিয়ে মাথা বাড়িয়ে আর কী হবে। তারপর আবার ভাবলাম, আমার আবার উত্তর! তাতে কী তোমার মনের আকাশে মেঘ জমবে। আবার ভাবলাম, যার হৃদয়ে স্নেহ-সমুদ্র সকল সময়ে ভরপুর তার কিসের প্রয়োজন মেঘের। আমরা চাতক, মেঘ চাই। সমুদ্র চাইবে কোন দুঃখে!

তাছাড়া অত্যন্ত ঝামেলার মধ্যে ছিলাম। সরস্বতী যেন বিরূপ হয়ে বসেছিলো। কিছুই যেন "দে-অ" নেই তার! না—এক লাইন, না—কবিতা! এমন কী সে যে পৃথিবীর কোনো ত্রিজাতের কোথাও আছে—যে সংবাদটিও না। আশ্চর্য দেবী আমার! চরৎকার বাণীর অধিষ্ঠাত্রী!

মনের অবস্থা শোচনীয় হতে হতে মনটা হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো যেন। সে বলে: স্বপ্নটাকে বিস্মৃত হয়ে কিছু করো। দেখোনা, দেবী তোমাকে ত্যাগ কোরে কোন রাজ্যে পাটরাণী হয়ে বসেন।

তাই, ভাবলি লজ্জা ছেড়ে তোমাকে লিখেই ফেলি এলোমেলো মনের মর্মবাণী। তুমি আমার অবস্থা ভেবে; নিজগুণে, জানি; ক্ষমা কোরে নেবে সবই।

পৃথিবীর মাটিতে কী সব চলছে একালে! যে মাটি সবচেয়ে খাঁটি তার সত্তা নাশ কোরে এখন এক দল মানুষ অন্য গ্রহের পথে পাড়ি জমাতে চাইছে। সেখানেও জীবনের সৌন্দর্যবোধ, মমত্ববোধ, মনুষ্যত্ব সাধনার ভাগাদার চেয়ে স্বার্থপর প্রতিদ্বন্দ্বিতার তাড়নাই ভয়ঙ্কর বেশি। এই হীন স্বার্থপরতা মানুষের অন্তর থেকে কোনদিনই কী দূর হবে—না, রত্নাকর!

তোমার অন্তর-নিঙর্ড় স্নেহ ভরাট সত্তাকে কেই কি চিনবে না? দেখো বন্ধু, আমি বড়ই বোকাবোকা মানুষ। কখন কি যে বলে বসি তার ঠিকঠিকানা নেই। শুধু তুমি নিজগুণে পরম স্নেহ প্রীতি ভালোবাসায় আমায় সিক্ত কোরে বার বার স্মরণ করিয়ে দাও: প্রীতি ভালোবাসাই জগতের শ্রেষ্ঠ জিনিস আর তারই দৌলতে পৃথিবীতে কি না সম্ভব। সেই

ভরসাতে আমার শত বাচালতা, সকল ত্রুটী মার্জনীয়। তুমি আমার প্রীতিপূর্ণ ভালোবাসা নিও। ইতি

তোমারই সমুদ্রপ্রিয়।

পরম কল্যাণীয়

সমুদ্রপ্রিয়।

জীবনের পাথুরে রাস্তায় চলতে চলতে চরণ দুখানি তোমার ক্ষতবিক্ষত হবেই। সেজন্য চলা থামাবে যে-বেকুব, তেমন দলের দলি ত তুমি নও সুচরিতা।

তোমার চিঠি পড়ে মনে হয় তুমি অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতায় শিকার হয়েছো অল্প বয়সেই অনেকবার। যা তোমার অপছন্দ, যাতে তোমার দিল চোট খায় তেমন সব ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটছে পৃথিবীতে—সেই কারণে বিচলিত হবার কী আছে! মানুষের মধ্যে বিচরণে কত চক্ষুলজ্জাহীন বেপরোয়া অমানুষ রয়েছে যাদের চিনতে সময় লাগে। একবার চিনলে মন খুবড়ে ওঠে বিকারে। এই জন্যেই ত তোমার মতন মানুষদের আরো বেশি কোরে মনুষ্যত্বসাধনায় এগিয়ে চলতে হবে বন্ধু! পিছোলে যে চলবে না।

আরেকটি কথা। ভালো মন্দয় মিশিয়ে মানুষ। সবার মধ্যেই অল্প বিস্তর ভালো আছে বৈ কী! এই সনাতন সত্যটাকে স্মরণ রাখলে জীবনে কখনো মনুষ্য-দ্বেষী হবার ইচ্ছে জাগবে না।

তাছাড়া হঠাৎ আঘাত পেলে দমে যাওয়ার চাইতে আঘাতটাকে উপভোগ্য করে তুলবে। দেখবে আঘাত তোমায় আহত কোরতে পারবে না কখনো। জানোই ত মুচোচিত্ত কঠিন আঘাত হানে সরল জীবনে! তা যাই হোক—এবারে আমার সময় অনেক অল্প। তোমাকে ছোট্ট চিঠি না দিয়ে উপায় নেই যে। একেই নানা কাজে ব্যস্ত তায় সেই ডানপিটে দাবাড় ছেলেটা ঘরে বসেছে—তাকে কয়েকদিন একালের ঢাকের বাদ্যি শোনাতে হবে। আশি তা হলে স্নেহাদর নিও।

তোমারই—সমুদ্র।

সুপ্রিয়

সমুদ্র।

ছোট্ট চিঠি পেয়েও খুউ খুশি হয়েছি। তোমার মতন গুণীর সাহচর্যে কতই না আনন্দ।

আমার ঘরের ছোট্ট জানালা থেকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি এখন অদ্ভুত তীব্রতায় ঢাকের বাদ্যি বাজিয়ে চলেছো। তোমার তরুণ অঙ্গুলিগুলি তড়িৎ-গতিতে চালিত হচ্ছে—এত দ্রুত যে—দৃশ্য হয়েও তারা অদৃশ্যসম। শুধু বাদ্যি, বাদ্যি আর বাদ্যি। কেমন লাগছে সেই দামাল ছেলের কানে, সেই জানে। সে হয়ত ভাবছে, সেকালের পৃথিবীটা এত ঢাকের বাদ্যিতে ঠাসা ছিলো না, তাই রক্ষে। এত শত শত বোমারু, এটম চালিত ডুবো জাহাজ ভাগ্যিস ছিলো না। থাকলে যে কী হতো—

একালে অনুষ্ঠানের শত সহস্র আয়োজনে ত্রুটী কোথাও নেই। কেবল অভাব সেকালের সেই ব্যক্তিত্বের।

যা ইচ্ছে ভাবুক তোমার ডানপিটে দামাল ছেলে। আমার শুধু আপসোস হচ্ছে—তার সঙ্গে আলাপ হচ্ছে কবে?

আর কি লিখি। মন যে আমার পড়ে রয়েছে তোমার চিঠির প্রত্যাশায়। তুমি যেমন সুরসিক, তোমার চিঠি পাওয়া মানেই তোমার মুখোমুখি হওয়া ঘটতো নয়! তার আনন্দই আলাদা।

আশা করি তোমার সকল সংবাদ শুভ।

ইতি

তোমারই—সমুদ্রপ্রিয়

কল্যাণীয়,

সমুদ্রপ্রিয়!

তোমাদের কথাতে, 'ঢাকের বাদ্যি থামলে মিঠে।' আমার বাদ্যি থামবে যেই অমনি এলো তোমার সেই দামাল ছেলের সঙ্গে আলাপের আগ্রহলিপি। আমি যেন বেঁচে গেলাম।

তোমার ঘরের ছোট্ট জানলা দিয়ে তুমি আমাকে দেখতে পেয়েছ ঠিকই। কিন্তু তোমার ওই ছোট্ট জানলাটির আড়ালে যে ঘরখানি, সে ঘর যে আমার দেখা হয়নি। তোমার ঘর নিশ্চয় সুন্দর কোরে সাজানো। চমৎকার পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছন্ন। সেখানে সবই আছে। কিন্তু সেই যে তোমাদের কবিগুরু বোলেছেন:

"—যতই গৃহ সাজাই আয়োজনে,
তোমায় ঘরে হয়নি আনা
যেন সে কথা রয় মনে।"

কোথা এই "তোমায়" সম্বোধনটি কোন্ মহত্তমের। জীবন দেবতা-স্বরূপ, বাণীরূপী অব্যক্ত কোন্ কল্প-বিলাসী স্বপ্নশ্রী বুঝি সে।

যাক সে।

সবই বুঝি সংসারে চলে যায়! জোয়ার ভাটায় ভেসে আসে, ভেসে যায় কত শত স্মৃতি বিস্মৃতি চাওয়া পাওয়া, বেদনা আনন্দ, হাসি-কান্না!

কথায় কথায় বাঁক নিয়ে কোন অজানা পথে চলে যাচ্ছি। এসো এবারে আসল কথায় ফেরা যাক্। তোমার সঙ্গে দারাল ছেলের আলাপ জমুক সেই এলিয়ট বীচে যেখানে আকাশের পটে সুরনর্তকী নৃত্যছন্দে এঁকে চলে শ্রীপদ্ম আলপনা। রঙে রঙে চিত্রলেখা মেঘে ঘোমটা খুলে মুখ চায় শ্রেষপ্রহরতের। উদভ্রান্ত বাতাসে সমুদ্রপাখী জীবন অনুরাগের অন্বেষণে অক্লেশে উড়ে চলে মহাশূন্য দিগন্ত সীমায়, বোবা-কান্নায় অসীম জলধি অন্ধমুখরতায় আপটে ধরে একটুকু শান্তি পেতে চায়।

আগামী পরশু আসছ নিশ্চয় এলিয়ট বীচে। ওরই দক্ষিণ পশ্চিম কোণে, ছেলেদের কুঠির পাশটাতে শেয়াল ডাকা চির সবুজ ঝাউবীথির কাছেই যে তরুণ-বিক্ষত ছেলে-ডিঙি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে সেখানে ঘোলো ফলকাল। অপেক্ষায় ক্লান্ত হোয়ো না যেন।

অশেষ স্নেহাদরসহ,

তোমারই—সমুদ্র।

• • •

এলিয়ট বীচ! যাত্রাজের সমুদ্রবেলার সর্বদক্ষিণ সৈকত। একদিকে ছিলো শুধুমাত্র কয়েক ঘর জেলের কলরবে জীবন্ত। এখন কতজনের কলরবে মুখর। এরপর কাতর হবার অবস্থা আসতে কত বাকী আর।.....

দিন দিন মানুষের ভিড়ে নির্জনতার নাভিঃশ্বাস উঠছে সারা পৃথিবীতে। নাভিঃশ্বাস উঠছে একদিনের জনশূন্য সমুদ্র সৈকতে। এলিয়ট বীচের নাভিঃশ্বাস উঠলে পরে ছুটতে হবে নির্জনতার সন্ধানে আরো দূরে।

কাউবীথিতে শেয়ালের ডাক উঠেছে। আকাশে উঁকি দিচ্ছে এককালি চাঁদ। বাঁকা চাঁদ বাঁকা হাসি হাসছে! ওরই স্তিমিত আলোতে ধরা বালুকারাশি প্রাণ পেতে চাইছে। মৃত্যুর পরপার থেকে জীবনের ইসারা ভেসে আসছে ধীরে অতি ধীরে।

এত রাতে আশেপাশে কেউ কোথায় নেই। যাঁরা এসেছিলো সন্ধ্যাসমীরণে জীবনকে চলমল দোলে দুলিয়ে দিতে, যারা এসেছিলো গাড়ির জমক দেখাতে, এসেছিলো যাঁরা বিপ্রলব্ধ মনকে বিপুল সান্ত্বনার ভরে তুলতে তারা সবাই ঘরে ফিরেছে। বিপ্রলব্ধরাও বিষাদন রজনী যাপনের বিফল বেদনা আঙুলে প্রত্যা-বর্তনমুখী হয়েছে অনেকক্ষণ।

শুধু একটি ছোড়া বিলকুল আত্মভুলে কুজন কোরে চলেছে। কাছেই ওই মুখ থুবড়ানো ছেলে-ডিঙির আড়ালটাকে আশ্রয় কোরে।

ওদের বিলক্ষণ ধারণা, কোথাও জনপ্রাণী নেই। বিশ্ব-চরাচরে ওরাই এখন সমগ্র জগৎ জীবন।

চরাচর নিস্তব্ধ! সমুদ্র তরঙ্গ মুখরতা নেও কাল সওয়া এখন। বিশাল বিপুল বিশ্ব যেন বিলীন হয়ে গেছে প্রগাঢ় নিস্তব্ধতায়।

তারই মাঝে বিলসন বিহীন দুটি হৃদয়ের বিরল আচরণ আমার চোখে প্রতিনিয়ত বিস্মিত হচ্ছে। ভাবাচ্ছে ভগবানের আমাকে! ওদের চূর্ণ কথার রেণু উড়ে আসছে। আলোর ঔজ্জ্বল্য কথায় প্রদীপ্ত রেণুগুলি সব।

একজন বলছে, আমার কল্পনা সে শুধু কল্পনাই নয়; অবশ্যম্ভাবী বাস্তব। কি ভাবছি জানো এই মুহূর্তে মহুয়া, তোমাকে বরণ কোরে নেবো স্বর্ণ চাঁপার কণ্ঠহারে। প্রত্যেকটি পাপড়ি হবে তার কনক অনুরাগে রঙিন। আর সৌন্দর্যে কনকচাপার মতন তাজা। তাকে আরো গভীর কোরে তুলবে আনন্দের তপ্ত অশ্রুজলের রেখা.....।

মহুয়া বলে, আমার অন্তর জানে অন্তর্যামী। তবু বলি, মনে ছিলো আশা, তোমার মতন মনের মানুষের ভালোবাসায় বুকে আসবে অমৃত আতঙ্ক। তার জন্ম

শুভকণে শুধু তুমি একটি বার স্নেহাদরে ডাকবে, মধুরা ; বলবে, আমি কাছেই আছি—ভয় করো না……

অন্যকণ্ঠে শুধোকরে : তোমার ব্যগ্র দুটি চোখে আমার আধিকে হারিয়ে ফেলছি যে……মনে হচ্ছে, ভালোবাসা তোমাতেই সৃষ্টির সৌরভ ভাণ্ডার উজাড় কোরে দিয়েছে।

ওগো, আর বলোনা, অত প্রশংসা কী এ কপালে সইবে।……

সবই নিস্তব্ধ। কেবল ফুঁপিয়ে উঠছে একটি শব্দ! আত্মনিষ্ঠ আত্মসংবরের চরম পরাকাষ্ঠার পবিত্র আত্মবেশ —আত্মার কম্পিত আলোক উৎকীর্ণ হচ্ছে ওই সুস্মিত ক্রন্দন শব্দের আধার থেকে। তারই আবেষ্ট উপলব্ধিতে আনন্দবিহ্বল কড় উঠেছে আকাশে বাতাসে!

যথার্থই ঝড়! সমুদ্রে ঝড়। তরঙ্গের দাপাদাপি দূরের জাহাজগুলো ডিগবাজী খাচ্ছে। আমাকে পাচ্ছে না উড়িয়ে নিয়ে যায় সেই সতর্কতায় আমি ছুটতে ছুটতে বালিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেছি। এই-টুকু শুধু জানি। তারপর। সবই অন্ধকার! নিরন্ধ্র অন্ধকার। মরুভূমির মতন হিংস্র আর বেদুইনদের মতন বেপরোয়া!

জ্ঞান হতেই কার করস্পর্শ অনুভব কোরলাম। আস্তে আস্তে চোখ চাইতে দেখি সামনে দাঁড়িয়ে আঠারটি বলবাহার বলবাহার একটি ঝড়।

এ—আমি কোথায়! এ তো……

এলিয়ট বীচ নয়। স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে লম্বানা হেসে বলে ওঠে আঠারটি বলবাহার।

তবে, তবে—?

অত অধৈর্য হবার কি আছে!

এ যে দেখছি, অট্টালিকা!

স্বপ্ন দেখে তাই মনে হচ্ছে বটে, আসলে এটা মৃত্যুপুরী। এইখানে একসময়ে জীবন্ত কবরে শয্যা নিয়ে ছিলো কত শত শত ব্রাইটারে।

ব্রাইটার।

হ্যাঁ মিত্রবর, একসময়ে এই রবার্ট ক্লাইভ থেকে ব্রিটিশ ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারত সাম্রাজ্য প্রতি-ষ্ঠাতাদের অনেকেই ছিলো গোড়ায় ব্রাইটার, তোমাদের ভাষায় যাদের বলা হয় কেরানী—

তাই বলো ; একটু মনের অতলে তলিয়ে আশ্বস্ত হোতে চেষ্টা কোরলাম। ক্লাইভ প্রথমেই মিত্রবর সম্বোধনে আমাকে যে অদৃশ্য সখ্যবন্ধনে বেঁধে ফেললে। না জানি, ওর মতলবটা কী! সত্যি কথা বলতে, ব্রিটিশের বীরখ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে মতলববাজীর কুখ্যাতিটাও ইতিহাসে কম নয়। তাইত আশঙ্কা হয়!

হ্যালো, ক্লাইভ বলে উঠলো, কষ্টটা তোমার কেমন লাগলো—

কেমন কোরে বোলবো বলো, সেই যে এলিয়ট বীচে মুখ থুবড়ে পড়েছিলাম……

অমনি সেই অবস্থাতে উড়িয়ে নিয়ে এলো তোমাকে কড়ে—সোজা এই ফোর্ট সেণ্ট জর্জের ব্যারাকে। যেখানে একদিন আত্মহত্যায় পরিত্রাণ পেতে চেয়ে-ছিলেন এই হতভাগ্য রবার্ট ক্লাইভ! যার আগে পাশে বিবেক শূন্যির আয়োজন পূর্ণ কোরে রেখেছিলো ব্রিটিশ ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তারা জিন, হুইস্কি শেরী, ব্রাণ্ডির নৈবেদ্য সাজিয়ে। তাতেও পাছে যজ্ঞ অপূর্ণ রয়, সেই শঙ্কায় অদূরের ব্লাক টাউন আর "হস হিলে" ফাঁদ পাতাছিলো সাদা সৈনিকদের নিশি অভিসারে প্রমত্ত বিলাস অংকে আত্মদানে পিউরিটান পরাকাষ্ঠার পতাকাকে অবলুণ্ঠিত চরিত্রে অভিসিক্ত করবার!

স্যাঙাল জানানো কায়দার!

যা বলে সুখ পাও বন্ধু! কিন্তু ব্যাপারটা ছিলো সব বলা কওয়ারও সীমানা ছাড়ানো। নইলে আমার মতন ভাগলপুরে মার্কেট ড্রেটনের ধনিয়া ছেলেও কখনো ও পথ না মাড়ায়!

অবিশ্বাস্য!

তা বটে! আমি যে ছিলাম বন্ধু অবরুদ্ধ অবাগত ঝড়। ঝড়, শুধু ঝড়। বইয়ে দিতে চেয়েছিলাম সেই ঝড়ের প্রবাহ ভারত জুড়ে। ঝড়ে ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম পুরানো পৃথিবীটাকে। যার চিহ্নটাকে পাছে ভাবী বিশ্বও না ভুলতে পারে!

শুনতে শুনতে গা শিউরে ওঠে। আমার অবস্থা দেখে মৃদু হেসে ক্লাইভ বলে, ওই বড়ের কাহিনী থাক—এই মুহূর্তে তোমাকে শুধু রোমাঞ্চিক, জীবন কথা শোনাতে আমারও মন চাইছে না যে!

তাহলে?

শোনো আমার আঠারোটি বসন্তের বেদনাগাথা!

শোনাবে শুনি!

হ্যাঁ, শুনেছি, তুমি চমৎকার শ্রোতা। ক্রাশিদ তে সেদিন কথায় কথায় সেই কথাই বলছিলো। তাতেই আমার আগ্রহ আরও বেড়ে গেলো—অনেক কথা খুলে বলতে। মনের গোপন কথা, যাকে তাকে ত আর বলা যায় না। সেজন্য চাই সমঝদার, দরদী শ্রোতা। ক্লাইভ আমার মুখের উপরে চোখ রাখলে।

আর তার কথা শোনবার জন্য আমি উদগ্রীব হয়ে উঠতে লাগলাম মুহূর্তে মুহূর্তে।

নিজের কথা বলতে যেটুকু আপাত বাধা সেটুকু অপসারিত হতে ক্লাইভ বলতে লাগলে: বহুদূরে পেছনে ফেলে আসা দিনগুলির দিকে তাকিয়ে আজ কেবলই মনে হচ্ছে বন্ধু: "জীবনটা একটা বিরাট ঋণের বোঝা। তারই দেনা শোধ কোরে চলেছি ঐতিহাসিক জীবনের স্বাদে বিভোর হয়ে আমরা।

হবে তা। বললাম আমি।

বা-টা নেই এর মধ্যে, দৃঢ়কণ্ঠে বল্লে ক্লাইভ। ভিভেঁজাল সত্য স্বীকৃতিতে "বা" আবার কিসের।

বাপরে! এই সেই ছেলেই বটে—ইতিহাসের মেজাজ-টাকে যে পালটে দিয়েছিলো।

চমকে উঠেছিলাম।

ক্লাইভ সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না না কোরে বোলে চলেছিলো, প্রথম যৌবনে আমারও বন্ধুমহলে যারপর নাই ছিলো—জীবনটা বসন্তের হাওয়া বই তো নয়। বুলবুলির মিঠে বুলির মতই সে জোয়ারের স্রোতে ভাসাতে পারে সহজে, হাসতে পারে অনায়াসে। কার অর্ডার সে মানতে যাবে না। কার কথাতেই বা দেবে কান। খাঁটি বোহেমিয়ান—খোলামকুচি লীলা-খেলার গোপন বেদনা ভোলার দুরন্ত বাসনার মশগুল! তারপর! এলো সে একদিন। পাড়ি জমাতে হলো প্রাচ্যের সমুদ্রপথে। একালের সমুদ্র পথ আর সেকালের সমুদ্রপথে যে আকাশ পাতাল ব্যবধান, সে কথা সবাই জানলেও সেই ব্যবধান অনুধাবন এখনকার দিনে অসম্ভব।

কেন?

সে যে মরণের অভিসার, ক্ষমাহীন মৃত্যু মহোৎসবের অসীম হরিষাতে। মাসের পর মাস সেই অফুরান সমুদ্র যাত্রা, মধ্যে মধ্যে নৌ দস্যুদলের দয়াহীন হানা, কখনো ঝড়ের আক্রমণে জাহাজের নাবিক সংগল নিঃশেষ, কখনো বা মাদ্রাজ পৌঁছাতে পথেই সব শেষ।

তবু কেন আসা?

জীবিকার নেশা, পেটের তাড়না, দুঃসাহসের দিশে-হারা ডাক! আমি যে কেনো এসেছিলাম সে নিজেই জানি না বন্ধু, শুধু জানি, বাবা মা, আত্মীয় স্বজন সকলেই চেয়েছিলো সোনার ভারতে ভাগ্যপটে ছোটটিকে আপদ বিদায় কোরতে। কেবল একটি কুমারী মন চায়নি।

সে মন কোন্ কুমারীর বন্ধু?

স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে ক্লাইভ বেদনাভরে বলে: মার্গারেট! সে এক আশ্চর্য মেয়ে। কতজনে তাকে চেয়েছিলো, কত মনের কামনায় সোনা হয়ে জ্বলেছিলো সে প্রাচ্যের আকাশ ভালে; কিন্তু মার্গারেট মনে মনে যাকে হৃদয় সমর্পণ কোরে বসেছিলো সে যে ভিন্ন ধাঁচের পুরুষ! অথচ ওই আশ্চর্য মেয়েটির মনের কথা নিকটতম আত্মীয়রাও জানতো না। এমন কী আমার ব্যারাকে আমারই কাছাকাছি থাকতো রাইটার এডমণ্ড, সমবয়সী যুবক, মার্গারেটের আপনজন—সেও না।

তার প্রমাণ?

প্রমাণ আছে বই কী, বন্ধু। ক্লাইভ মৃদু হাসতে হাসতে বোলতে আরম্ভ কোরলেন, যথাস্থানে সে প্রমাণ পাবে তার আগে আমাদের রাইটার জীবনটাকে একটু জেনে নাও মিত্রবর।

বেশ; সেই ভালো।

সালের পর তেতাল্লিশ খৃষ্টাব্দ। ক্লাইভ বলে যায়, একদিন আমাদের জাহাজ এসে এসে ভিড়লো মাদ্রাজে।

তার আগেই ব্রিটিশ ও ফরাসীদের সাম্রাজ্য সংরক্ষণ মহাসংগ্রামে লেগে গেছে। পথে প্রাণ হাতে কোরে যারা করেছিলাম; প্রাণ সঙ্গে কোরে এসে পৌঁছানোর জন্যে মহামানবত্রাতা হেরীসাতোর বন্দন বিশ্বকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রবেশ করলাম ফোর্ট সেণ্ট জর্জের ব্যারাক নামক নরকে। একেই মাদ্রাজ গরমের নরকাগার; তার সেকালের সেই অমানুষ জীবনের যোগ্য ব্যারাক। মন মেজাজ প্রথম থেকেই বিঁচড়ে গেছ্‌লো। চাকরী ত ভারি, কোম্পানীর মকলনবিশী—কেরানীগিরি! শুধু হিসাবকষা, আর হিসাব করা কত শত শত প্যাগোডা, তারই যোগ বিয়োগ। অনেক কাজ; মালপত্তর গোনা, হিসাব কষে কষে খতিয়ে খতিয়ে দেখাশোনা—খতিয়ান মেলানো। যার চেয়ে নিষ্কর্মা কাজ ভূ-ভারতে দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ! ওই কাজে কোনো কাজের লোকের মন বসে কখনো। না, ওর দ্বারা কিছু উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি কোনদিন সম্ভব! ওই সব আন প্রোডাকটিভ লেবর তাদের পোষায় যারা দুনিয়াদারের "হা পোষা" পরিবার সৃষ্টিতে সর্বোৎকৃষ্ট!

চমৎকার!

তাই বলো! তোমাকে এ সকল কথা বলাতেও সুখ। কিন্তু বন্ধু, বলতে লাগল ক্লাইভ, তখন যে নিরুপায় অবস্থা আমার। অন্যদের কথা আলাদা। তারা আড়ালে আড়ালে ব্যক্তিগত ব্যাবসা চালায়, কোম্পানীকে কলা দেখিয়ে লুটপাট কোরে খায় আর মদে ও মনোহারী বিলাসিতায় স্বর্গের পথ পরিষ্কার করতে করতে "হা-পোষা" পরিবার বুদ্ধিতে ও-বুদ্ধি মস্তার পরিচয় দিতে থাকে। কাজেই তাদের পায় কে! বলেই গম্ভীর হয়ে যায় রবার্ট ক্লাইভ।

এক সময় গাম্ভীর্য ফেড়ে ফেলে দিয়ে আবার বলে না—যেন স্বগোক্তি কোরে চলে নরক ভরা রাতের ঝড়ো চাদর মুড়ি দিয়ে পুণ্য তাপাংকের অনেক নীচের হিমে রক্ত মাংসের দেহটাকে মুক্ত কোরে যে-কামাল তরুণ ঘুরে বেড়িয়েছে মার্কেট ট্রেটনের পথে ঘাটে; সে কখনো কী জীবনটাকে তিলে তিলে নষ্টামীতে ভ্রষ্ট কোরতে পারে? তার চেয়ে ভয়ংকর শয়তান হওয়াও শ্রেয়, কুখ্যাত দস্যু সর্দার হলেও যা হোক্, মন্দের ভালো! এইখানে একটু জোর দিয়ে হঠাৎ ক্লাইভ বলে ওঠে

কেবলমাত্র

মেট্রিক দৈর্ঘ্যে কেনাকাটা করুন

বর্তমানে সমগ্র দেশে মেট্রিক পদ্ধতির ওজন ও পরিমাপই হ'ল একমাত্র বৈধ পরিমাপ

মীটার অনুযায়ী কয়েকটি সাধারণ পোষাকের দৈর্ঘ্য এখানে দেওয়া হল :

বুশ সার্ট :	১.৮০ মীটার
সার্ট : (পুরো হাতার)	প্রত্যেকটি ২.৭৫ মীটার
কোট :	
ট্রাউজার :	
ব্লাউস :	০.৯০ মীটার

তাড়াতাড়ি কেনাকাটা এবং ন্যায়সঙ্গত লেনদেনের জন্য

মীটারের মাপে কিনুন

DAGV/248

তাই তো বন্ধু, না—পারলাম লুকিয়ে চুরিয়ে ব্যক্তিগত ব্যবসা আদিতে না-পারলাম নিজেকে ভগ্ন ডিঙির পথে পরিচালিত করতে! এমন কি কলম পিষে যান্ত্রিকতা কেরানীর ব্রতেও জীবন সপে দিয়ে চির দৈন্যের ও দগদের জীবনকেও মনে প্রাণে গ্রহণ কোরতে ভোলাম না সক্ষম। সুতরাং···

সুতরাং? প্রশ্ন ধ্বনিত হলো আমারও কণ্ঠে।

সুতরাং জীবনের অতীতকে ভালো কোরে দেখে নিয়ে ভবিষ্যতের আবছায়াহীন ভেবে বর্তমানকে অসহ্য মনে কোরে অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের সকল বন্ধন ছিন্ন কোরতে কৃতসংকল্প হয়ে দূর্গ প্রাচীরের এক কোণে নিজের মাথা লক্ষ্য কোরে পিস্তল বাগিয়ে ধরলাম। মুহূর্তে মধ্যে গর্জে উঠলো পিস্তল। সব শেষ হয়ে গেলো। পড়ে রইলো শুধু একটি রক্তাক্ত নরদেহ, ঠিকানাবিহীন, নাম গোত্র লুপ্ত একজন ভাগ্যহত রাইটারের!···

কয়েক মুহূর্ত কাটলো। আরো কয়েক মুহূর্ত। আরো কিছুক্ষণ! আশ্চর্য! নগণ্য রাইটার রবার্ট ক্লাইভ অক্ষত, তার হাতের পিস্তল লক্ষ্যভ্রষ্ট। আত্মহত্যার সাফল্য প্রচেষ্টা প্রতিহত। কে ঘটালো এমন অঘটন। যেই ঘটাক, তার ইচ্ছা নিশ্চয় অন্যরকম। মন গেলো পালটে। প্রাণ উঠলো নবরূপে ভেসে। চিত্ত হোলো সঞ্জীবিত। অন্তরে কেমন এক অনুভূতি! নতুনতর চেতনা। নবতম আবেশ। নিজেরই বিশ্বাস হতে চায় না। কেমন কোরে এমন হলো। অধৈর্য রবার্ট ক্লাইভ ধীরে ধীরে দৃঢ়তর পণে নিজেকে ফিরে একদিন সপে দিতে চাইলো অভিনব ইতিহাস সৃষ্টিতে!

রাত্রি কত! একটা-দুটো। অথবা তারও বেশি। সে যাইহোক্, কোথাও যে আলোর রেশমাত্র দেখছি না। অথচ রক্তের আস্বাদও আর পাচ্ছি না। ক্লাইভ কলমল কোরে অন্ধকারে জ্বলছে—সেই আলোতেই চলছে আলাপাচারী।

আশেপাশে ঘন গভীর প্রগাঢ় অন্ধকার। অন্ধকারের স্রোতে তলিয়ে গেছে চারপাশ। দশদিকে আঁধারের রাজত্ব। না যেন অরাজকতা!

আমার মনের ভাবখানা আঁচ করেই যেন বলে রবার্ট ক্লাইভ: ইউরোপে জন্মানী ইংরেজ লড়াই, এদেশেও তার প্রতিক্রিয়া—সেই সময়ে ভারতবর্ষ ডুবে আছে এরকম অরাজকতায়। এই সুযোগ। কে মসনদ চালিয়ে, সেই ভাবিকালে বাঁচবে যে চালাবে অসি। তলোয়ারের জোরে সোনার ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনে অগ্রণী হবে যে আগামীতে সেই অমরত্ব লাভ কোরবে; তার নাম লেখা থাকবে স্বর্ণাক্ষরে পৃথিবীর ইতিহাসে। কারণ—ভারতই হবে ভবিষ্যতে বিশ্বের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের মেরুদণ্ড!

মনোকী ক্লাইভ।

সত্যিই তাই বন্ধু! নইলে সারা ইউরোপের রাজন্যবর্গ ভারতবর্ষের রাজার দখলের জন্য সর্বস্ব পণ কোরে মরিয়া হোয়ে উঠবে কেনো? কেনই বা প্রাচ্যের জলপথ আবিষ্কার করবার এত তাগিদ সদা অতীতে তাদের অধীর করে তুলবে। এতদিন যা ছিলো রেশম তুলা, মসলা, মণিমুক্তা গন্ধদ্রব্য, চন্দন সংগ্রহের আগ্রহ মাত্র,—এখন থেকে তাই হবে—সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের পৃথিবীর সেরা শক্তি প্রয়োগের একমাত্র নিদর্শন। আর সেই সম্ভাব্যতীত সংকেতেই আমার হাতছানি দিচ্ছে ঐ ····ঐ—যে জন্মানীদের কামান গর্জন শোনা যাচ্ছে—কৃষ্ণনদীর ওপারে। ও তো কামান গর্জন শুধু নয়, ও যে ইতিহাসের পাতায় একটি নতুন নাম সংযোজনের আগমনী বাজনা। আর সে নামটি কার বলো দেখি বন্ধু? ও কি! অমন হাঁ কোরে আমার দিকে তাকিয়ে রইলে যে, হ্যাঃ হ্যাঃ—সেই নামটি এই চৌকস ডাকপিটে ধূর্তক রবার্ট ক্লাইভের। ওই, ওই আবার কামান গর্জন, কই, কই দেখি পিস্তল। তার আগে একটিবার, মাত্র একটি ক্ষণের জন্য দেখে নেই সেই মুখখানি, যে মুখ আমার চেতনার জাগ্রত চিরন্তন। মার্গারেট, ডার্লিং···—বুকের কাছ থেকে এক মিনিয়েচার বের কোরে প্রগাঢ় চুম্বন এঁকে দিলো মাকেট ড্রেটনের দুর্দান্ত সন্তান রবার্ট ক্লাইভ!···

পরমুহূর্তে তার সে কী অস্বাভাবিক অস্থিরতা! যেন সমস্ত প্রতিরোধ ভেঙে বেরোবার জন্যে তার প্রতি অনু-পরমাণুতে টাইফুন জেগেছে। ঢেউ উঠেছে রক্তে। সে এক অভাবনীয় অতি প্রবল ঢেউ। লক্ষ্য

কোরলে বেশ বোঝা যায়, চারশ্যার চাকা সাধারণ ঘোড়ার মধ্যে থেকে অসাধারণ অদ্ভুত এক জীবনের নবরূপ হচ্ছে। তারই সংকেত ক্ষণপ্রভার অদৃশ্য আলোতে ফুটে উঠছে ক্লাইভের প্রদীপ্ত চোখে মুখে, পরিশ্রমে ঘর্মাক্তকলেবরে। সে দৃশ্য দেখে আমার ত চক্ষুস্থির।

ওই-ওই আমার মুচেমুচু কামান গর্জন। শোনা যাচ্ছে মিরমদন। তার এসে গেছে ইতিহাস হবার।...

মুহূর্তে মধ্যে ক্লাইভ অদৃশ্য হয়ে গেলো।... আমাকে ঘিরে ধরলো পাতাল উজাড় করা করাল অন্ধকার স্রোত।

ওই স্রোতে কতক্ষণ, না কতকাল স্থিতি পাবে কে জানে! আমারই বা কপালে কি ঘটবে? ক্লাইভ— সেই বা কিরবে কবে? শত শত প্রশ্নের তরঙ্গ মনের সমুদ্রে তোলপাড় তুলেই চলেছে।

সে তোলপাড়ের যেন সীমা নেই, শেষ নেই। আদি আছে, অন্ত নেই। রহস্য আছে, রহস্যভঞ্জনের বন্ধন মুক্তি নেই!

অনেকক্ষণ অদ্ভুত ভাবে কাটলো। আশে পাশে যেন স্রোতের নাচন চলছে। নাগিনীর মাথার উপরে পা দিয়ে নাচছে যত প্রেতযোনী। দাঁতগুলো তাদের কলাকার। মুখগুলো কুৎসিৎ—অভ্যাবতার ব্যাভিচারে বীভৎসদৃশ্য। চোখ মেলে দেখবো কী: চোখ বুজলেও যে ওই দৃশ্যাবলীর তাণ্ডব দেখছি। গা ঘিন ঘিন করছে। মাথা ঘুরছে। শরীরের ভেতরটা গুলিয়ে গুলিয়ে উঠছে। অন্নপ্রাশনের অন্ন উঠে আসতে চাইছে ওই দৃশ্যের দৌরাত্মিতে।

এমন মুহূর্তে পর্যন্ত পুরুষ একজন কে এসে দাঁড়ালো আমার সম্মুখে। মুখ দেখে চেনবার উপায় নাই, সারা দেহে প্রেতাত্মার স্পর্শচিহ্ন। গলার স্বর গলিত অন্নকণার মত অস্পষ্ট।

ওরই দিকে তাকিয়েছিলাম বেশ কিছুকাল। ক্রমশঃ ওই মুখ বিকৃতাবস্থা থেকে স্বরূপে রূপান্তরিত হতে হতে এক সময় চেনা গেলো—এ যে সেই ওয়াট্স ক্লাইভ।

আমাকে আবিষ্ট কোরে ক্লাইভ এবারে বললে— করাসীর কবল থেকে পালিয়ে এসেছি।

অ্যাঁ!...

চুপ! চুপ! দেওয়ালেরও কান আছে। ধরতে পারলে আস্ত কবর দেবে ডুপ্লে।

ক্লাইভের কথায় আমার প্রাণপাখী খাঁচা ছাড়া হবার প্রায়। কাজেই এমন চুপই কোরলাম, নিঃশ্বাস পড়তেও দিলাম না।

তখন ক্লাইভ মনের কথাটাই যেন কেড়ে নিয়ে বললে: চলো এখান থেকে ওদের চোখে ধুলো দিয়ে!...

প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে কোথায় যে পৌঁছানোর প্ল্যান তার সে জানে ওই ডান পিটে যুবক ক্লাইভ। আমার কোনো প্ল্যান নেই, শুধু ওর যাত্রা—অনুসরণ করা ছাড়া!

চলতে চলতে বলতে দৌড়োতে দৌড়োতে একটা পুরানো অট্টালিকার মধ্যে ঢুকে পড়া হোলো। সেখানে সৌভাগ্যক্রমে জনপ্রাণীটি ছিলো না। ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলে ক্লাইভ বললে, আর ভয় নেই; করাসীরা ফোর্ট সেণ্ট জর্জ ছেড়ে পণ্ডিচেরীতে ফিরে গেছে।

হঠাৎ ওদের এত সদয় হবার কারণ?

হঠাৎ নয়, বন্ধু! মধ্যে যে কেটে গেছে তিনটি বছর! আর ইউরোপে অষোদের সংগে করাসীদের হয়েছে সন্ধি। সে সন্ধির অন্যতম সর্তানুসারে ফোর্ট সেণ্ট জর্জ এখন আমাদের অর্থাৎ ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীরই।

তোমার কথা রহস্যময় ঠেকছে।

এর চেয়ে বড় রহস্য, করাসী ক্লাইভের করাসীর হাত থেকে পলায়ন; কাডালোরের ফোর্ট সেণ্ট ডেভিডের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগদান আর করাসীদের ঠেঙানোতে দস্তুর মতন বাহাদুরি প্রদর্শন!...

তাই নাকি! আর কিছু?

তেমন কিছু নয় বন্ধু। কেবল স্বেচ্ছাসেবক থেকে বীরত্বের পুরস্কারে সাধারণ পদস্থ অফিসার হওয়ার সৌভাগ্য আর কী! তবে সৌভাগ্য কী দুর্ভাগ্য, সেও সঠিক বলা কঠিন।

তার মানে।

মানে বোলতে গেলে অনেক কথাই বলা চলে। ক্লাইভ ধীর স্থির সংযত কণ্ঠে বোলতে লাগলে : সামান্য ভিক্ষে দিতে গিয়ে একটু বেশি দিয়ে ফেলায় দাতা ভাবে কতই দিলাম, অত না দিলেও চলত—ভিখিরী ভাবে আর কতই বা মিলতো। কিন্তু এমন যদি হয় যে ভবিষ্যতে ওই ভিখিরীর তলোয়ারের জোরেই দাতার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে—সে ক্ষেত্রে ঐ সামান্য পদোন্নতিকে দুর্ভাগ্য যা বলে অন্যায় না হোক্ সত্যের অপলাপ হবে তো নিশ্চয়!

বুঝলাম!

তুমি বুঝবে বড় সহজে বন্ধু, ক্লাইভের কণ্ঠ এখন দৃঢ়, আত্মবিশ্বাসে সম গম কোরছে : তবে কোম্পানীর ভারতবর্ষীয় কর্তারা অত সহজে মোটেই বুঝে উঠতে পারেননি। তাই বাধ্য হয়ে সামান্য—সামরিক পদোন্নতি ছেড়ে আবার ফিরে এলাম কেরানীগিরিতে!

সে কী!

আকাশ থেকে পড়লে যে!

পড়বো না, আমি ত শুনেছি কোম্পানীর বোর্ড অফিসের নথিপত্রে রেকর্ড করা রয়েছে তোমার সম্পর্কে লণ্ডনের কর্তাদের মন্তব্য মনোভাব।

সে মিথ্যা নয়, মিত্রবর। লণ্ডনের বড় কর্তারা নির্দেশ দিয়েছিলেন : "বি সিওর টু এনকারেজ এনসাইন ক্লাইভ ইন হিজ মার্শাল পারসুটস।" আরো প্রতিশ্রুতি ছিলো : "এনকিং টু হিজ মেরিট, এনি ইমপ্রুভমেন্ট হি শ্যাল মেক শ্যাল বি ডিউলি রিগার্ডেড বাই আস।"

তবে আবার মসি ভক্ত করা কেনো!

কেনো? সেই তো আসল কথা। ক্লাইভ প্রদীপ্ত কণ্ঠে বলে ওঠে, এদেশে কোম্পানীর কর্তাদের দৌড় দেখবার জন্য! হঠাৎ ক্লাইভের চোখ দুটি অস্বাভাবিক জ্বলতে লাগলো। চেহারাতে অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা দিলো। মুখের পেশীগুলি ইস্পাতদৃঢ় হয়ে উঠলো। হাতের শিরা সব লৌহ শলাকার মত দেখাতে লাগলো। যেমন কঠিন তেমনি বিস্ময়কর!

কত দিন লেগেছিলো দৌড় দেখাতে?

বেশি দিন নয়। মাত্র বছর খানেক, বলে আর দৃঢ় ওষ্ঠে হাসি টানে ক্লাইভ। দক্ষিণ ভারতের ত্রিচেনপল্লিতে চাঁদা সাহেব আর মহম্মদ আলীতে সিংহাসন নিয়ে লড়াই বাঁধতে না বাঁধতে ফরাসীরা চাঁদা সাহেবের পক্ষ নিয়ে মহম্মদ আলীর লোক ত্রিচিনপল্লীর পর্যন্ত সেখানে যাতায়াতের রাস্তা ছেড়ে দিলে পরে ডাক পড়ল এই রবার্ট ক্লাইভেরই।

কাজেই মসী ছেড়ে পুনরায় অসির আশ্রয়!

ঠিকই বোলেছো বন্ধু! ক্লাইভের মুখেচোখে এবারে হাসি ঠিকরে পড়ছে। তারই আলোতে ঝলকে ঝলকে ঘণি মুক্তোর ঝলমলে আবির্ভাবের মতই সে সোৎসাহে বলে চলেছে : অসির আশ্রয়ে মসী ফেলে ছুটে এলাম যখন আর সেই সর্বনিম্ন কমিশনড্ অফিসার এনসাইন নই তখন : ক্যাপটেন হোয়ে গেলাম রাতারাতি। ক্যাপ্টেন ক্লাইভের কদর হোতে আরম্ভ কোরলো। যে রবার্ট ক্লাইভ একদিন সৈনিক হবার বাসনায় কর্তৃপক্ষের কাছে দরখাস্ত কোরে প্রতীক্ষাতে বর্ষ ও অতিবাহিত কোরেছে; ফরাসীরা যাকে বন্দী কোরে নেহাত দুর্বুদ্ধির পরিচয় দেয়নি সেই ক্লাইভ, ক্যাপটেন ক্লাইভকে এবারে তলোয়ার হাতে কটিবন্ধে পিস্তল এটে অভিযানে বেরোতে হচ্ছে। শুধু অভিযান নয়, ইংরেজ শাসনের মান সম্মান রক্ষা—ও —ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভবিষ্যতে সৃষ্টির মন্ত্র-সাধনাও বটে! কিন্তু প্রবল পরাক্রান্ত ফরাসীদের সঙ্গে লড়তে হলে যে শক্তি চাই, তার সম্বল তখন ইংরেজের নাই বল্লেই হয়।

: সে কী সাংঘাতিক অবস্থা!

: শোচনীয় বল্লেও সব বলা হয় না, বলে ওঠে ক্লাইভ। কিন্তু আমার রক্তে তখন নেশা লেগেছে। ভাগ্যলক্ষ্মী যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। মাথার মধ্যে নতুন মতলব ঘুরছে। এই তো সুযোগ সকলকে তাক লাগিয়ে দেবার এই যে শুভ মুহূর্ত রবার্ট ক্লাইভের সামরিক যোগ্যতা প্রমাণ কোরবার এ সুযোগ হেলায় হারালে তো চলবে না। ত্রিচেনপল্লীতে ফরাসী ও তাদের দোস্ত চাঁদা সাহেবের সৈন্যদলের ধাধা ঘুরিয়ে দিতে হোলে ইংরেজবাহিনী ও মহম্মদ আলীর সৈন্যদলের উপর থেকে চাপ হ্রাস কোরতে হোলে অন্যত্র আঘাত

হেনে শত্রুপক্ষের শক্তিকে বিকেন্দ্রিক কোরে ছড়িয়ে ফেলতে হবে যত শীঘ্র সম্ভব। এ না হয় হোলো সামরিক যুক্তি। কিন্তু অমাত্র আঘাত হানবার জন্য যোদ্ধানদের তো চাই যোগ্যমত সংখ্যায়। তার কী ব্যবস্থা?

প্রশ্নটা কামান দোলার মত ছুঁড়ে দিয়ে পরক্ষণেই লুফে নিলে ক্যাপটেন ক্লাইভ। বলে, কোর্ট সেণ্ট জর্জ উজাড় কোরে পাওয়া গেলো মাত্র দুইশত জন ইংরেজ আর অনেক কষ্টে সংগ্রহ করা হোলো তিনশত জন দক্ষিণী সেপাই। এদের পরিচালনার জন্য ব্যবস্থা হোলো আটজন তরুণ অফিসারের। তারপর বেরিয়ে পড়া গেলো পথে।……

সে কী পথ! অপথকেও হার মানায়। সেই অপথধারা মানানো পথে শোভাযাত্রা চলেছে বিচিত্র রকমের। ঠেলা গাড়ি, টানা গাড়ী, পালকি, ডুলি, গরু, বলদ, ঘোড়া, গাধা, ঘোড়ার পিঠে রসদ সাজা সাজা আর বন্দুকবাহী চলেছে সারে সারে। কামান বসানো বলদে টানা গাড়িগুলো উঁকি ঝুঁকি দিয়ে দেখতে চাইছে গ্রাম্যলোকেরা। মধ্যে মধ্যে পল্লীবধূরাও উৎসুক দৃষ্টি ফেলছে।……

এ তো গেলো একদিক। আরেকদিকে বুটের শব্দের তালে তালে পুনাবলীর পথের বাঁকে বাঁকে গরম বাড়ছে। আটাসাটা পশমী পোষাকের আলিঙ্গনকে ক্রমেই মনে হচ্ছে মরণ আলিঙ্গন। জল তেষ্টার বুকের ছাতি ফেটে যায় যায়। যেই সেই তেষ্টা মেটানোর চেষ্টা, অমনি সর্বনাশ। জল নয় তো যেন মৃত্যুবিষ, তেষ্টা মিটতে না মিটতেই পেটের মধ্যে কেমন কোরে ওঠে। তারপর সেই চরম পর্যায়। পেটের পীড়া, অদৃশ্য শত্রুর অপ্রতিরোধ্য আক্রমণ। দেখতে দেখতে অসহ্য যন্ত্রণায় পেটে হাত দিয়ে বসে পড়া আর মরা। সে দৃশ্য দেখা যায় না—অথচ উপায় নাই। কোথায় চিকিৎসা, কোথায় বা পরিশুদ্ধ জল! কোথায় বিশ্রামের সুযোগ সময়। অতএব সমানে মৃত্যুর সংগে পাল্লা কষতে কষতে মার্চ করে এগিয়ে চলা।……চলতে চলতে পথের দুপাশে ফেলে দেওয়া সহযাত্রী জীবন-হারাদের। সেই নিদারুণ দৃশ্যের পর দৃশ্য দেখা আর মার্চ করা—মনের উপরে তার প্রতিক্রিয়া ও কম নয়! তবুও চলতে হয়। শোনা যায়, সামনে পেছনে শত্রুদের ডাক। সন্ধ্যা হলে মৃত্যুর শিব ইশারা করে থেমে গেছে নীচের। অমনি তাদের ঘিরে নৃত্য আরম্ভ। চারপাশের আবহাওয়ায়—মৃত্যুবিলাসের লীলার মাতন লাগে, প্রেত আঘাতে সুস্থ পরীর ঠক ঠক কোরে কাঁপতে থাকে!—

মরতে মরতে সংখ্যাল্প হোতে হোতে মুষ্টিমেয় ও যৎসামান্য রসদ নিয়ে আরকট পৌঁছেই সেখানকার দুর্গ দখল কোরে ফেললায়। ভাবলায় বুঝি ভাগ্যলক্ষ্মী চির প্রসন্ন হোলো। কিন্তু ভ্রান্ত সে ধারণা।……

কেনো বলো তো?

সে এক আশ্চর্য ইতিহাস বন্ধু; ক্লাইভের কপালে যাদের রেখা রইছিলো—হাত দিয়ে যায় মুছতে মুছতে সে বল্লে, ইংরেজ সৈন্য দেশী সেপাই সংগে সহরে এসেছে—অমনি জিনিস-পত্তর হোলো অগ্নিমূল্য! পথে খাদ্যাখাদ্যের বিভেদ ঘুচে যাওয়ায় যা তা খেয়ে যারা মরেছে তাদের আত্মা স্বর্গে গেছে থাক; তারা গেছলো আরকটে পৌঁছাতে পারলে, অবশিষ্টদের অন্ততপক্ষে খাওয়া দাওয়ার একটা সুরাহা হবে। হোলো ঘোর উল্টো। খাদ্য মিললেও তার দাম দেওয়া অসাধ্য। সুতরাং ভাগ্যের পরিহাস উপভোগ করা ছাড়া গত্যন্তর রইলো না। বলতে বলতে ক্লাইভের মধ্যেকার মানুষটি কেমন যেন কঠিন হোয়ে উঠতে লাগলো। তার সেই পরিবর্তন কথায় তেমন না ফুটলেও চোখে ফুটে উঠলো।

ক্লাইভ বলছিলো, ভাগ্যের চরম পরিহাস তখনও বাকী। সে জন্যেও দীর্ঘদিন অপেক্ষার প্রয়োজন পড়েনি। শিগ্রী একদিন অতর্কিতে চাঁদা সাহেবের সেপাইরা ফরাসী সৈন্যদলের সহযোগে আরকট দুর্গ অবরোধ করে ফেললে। সেই অবরোধ অটুট—অটল। কবে যে তার শেষ হবে, কেউ জানে না, শুধু আমারই মনপ্রাণ জানে, এই অবরোধের প্রাচীর চূর্ণ কোরতে না পারলে সবশেষ! ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্বপ্ন থেকে ক্লাইভের সুখ স্বপ্ন বড়োছোটো কোন বিন্দুরই আর চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট থাকবে না। থাকবে কেবল…

দীর্ঘ দীর্ঘ দীর্ঘ শ্বাস ফেললো ক্লাইভ। কথা শেষ করতে পারলো না!

নিস্তব্ধ নীরবতা। ঘরে ঘরে পড়ছে।

কালের চাকা ঘুরছে। মহাকাল রথের চক্র ঘরঘর নীরবে অতীতে বিলীন হয়ে চলেছে! আবার দরদর ঘাম দেখা দিয়েছে ক্যাপটেন ক্লাইভের কপালে। ঘামে ভিজে উঠেছে তার পুরু পশমী সামরিক ইউনিফর্ম।

অসমাপ্ত কথা শেষ করবার দিকে দৃষ্টি নেই তার অদূরে, বহুদূরে- আরো দূরে বিক্ষিপ্ত প্রোক্ষেপে ওই দৃষ্টি ঘুরে ফিরছে। যাকে বলে শ্যেনদৃষ্টি!

না, না, না—ক্লাইভ চীৎকারে নয় অথচ অপূর্ব দৃঢ়তায় অকস্মাৎ বোলে উঠলো, ও শুধু কল্পনা বিলাস নয় এ না—আরকট দুর্গ ওদের হাতে কখনোই যেতে দেবো না; প্রতিজ্ঞা নিলাম আমি। অমনি লেগে গেলাম রাত্রি জেগে জেগে দুর্গটাকে শক্ত পোক্ত কোরতে। তারা আর চাঁদের আলোতে চালাতে লাগলাম রাজের কাজ। রাজমিস্ত্রী অভাবে নিজেরাই হয়ে গেলাম চটপট রাজ!

সারাদিন মুহূর্মুহু কামানের গোলা বিনিময় হয়, সারারাত ধরে চলে দুর্গ প্রাকার মেরামত, দুর্গ সংস্কার। পালা কোরে রাত জাগা, দিনে লড়াই করার দায়িত্ব নেওয়া, সবই হোলো। কিন্তু শত্রুর অবরোধ ঘুচানো যেন অসম্ভব হোয়ে দাঁড়ালো। এ দিকে আর এক বিপদ! সবচেয়ে দাংঘাতিক, সবচেয়ে দংকটজনক, সবথেকে মারাত্মক—দুর্গের রসদ এলো ফুরিয়ে! সেই সঙ্গে গুলিবারুদের ভাণ্ডারও নিঃশেষ হোতে বসেছে যে। তখনকার সেই মানসিক অবস্থা আমার·····

ক্লাইভের অন্তর যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, এমনি মনে হোলো।

পর মুহূর্তে প্রাণের শেষ ঐশ্বর্য উজাড় কোরে সে বলে উঠলো, তবুও শেষ চেষ্টা। চরম অভিযানের প্রস্তুতি লেগে গেলাম! হয় জয়, নয় জীবনও সমাধি! নিজের হাতে কামান দাগার দায়িত্ব নিলাম তুলে। মরিয়া মরণ! দেখি একবার ভাগ্যলক্ষ্মী বীরের সম্মান রাখে কি-না!

অবরোধের পঞ্চাশতম দিবস সেদিন। গত কয়েক-দিন যাবত দেশীয় সিপাইদের সহৃদয়তায়, তাদেরই আত্ম ত্যাগে ও আত্মদানের ফলে খেয়ে দুর্গের ইংরেজ সৈন্যেরা জীবন ধরে আছে। সে অবস্থাও যে অসহনীয়। হাজার হলেও ইংরেজরাও মানুষ ত!

তাই·····

কয়াদী ও চাঁদা সাহেবের এদেশী সেপাইরা ভেলার কোরে বাকী তলোয়ার আর বল্লমে সজ্জিত হয়ে গভীর পরিখা পথে আরকট দুর্গ আক্রমণের জন্যে এগিয়ে আসছিলো একটু একটু কোরে সেদিন যখন সেই সময়ে কামানটাকে আরো এগিয়ে নিয়ে চুপে চুপে প্রতীক্ষায় রইলাম—আসুক ওরা আরো কাছে! এলোও। তখন কী ওরা জানে, এইবার আরকট দুর্গের অস্ত্রাগার একেবারে শূন্য কোরে কামান নিয়ে মরণ আলিঙ্গনের অসীম বাসনায় অপেক্ষা কোরছে ক্যাপটেন ক্লাইভ! দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ কোরে সে চীৎকার ছেড়ে বলে উঠলো, এই শেষ শয়তান···।

দুরন্ত উত্তেজনার তীব্র প্রকট প্রক্ষেপে সমস্ত কপালটাকে স্বেদ বিমুক্ত কোরে প্রশান্ত প্রকোপে বল্লো ক্যাপটান ক্লাইভ: কোথায় গেলো ভেলা, কোথায় রইলো বাকী তলোয়ার আর বল্লমের শানিত ফলার প্রয়োগ কর্তারা সব? চেয়ে দেখি পরিখার বুকে রাশীকৃত মৃতদেহ ঘুমে ঘামাঘামি কোরে বীভৎস আকারে লৌহপিণ্ডকেও লজ্জা দিচ্ছে!···

ভাগ্যলক্ষ্মী এতদিনে প্রসন্ন হোলো তাহলে···

সে সত্য ঘোষণা কোরতে পারো, বিজয়ন্ত, এখন! এতক্ষণে স্বাভাবিক ভাবে সুস্থ হাসি হাসলো ক্যাপটেন ক্লাইভ। অদূরে গীর্জার ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং কোরে রাতের ঘন্টি বাজালো। রাত এখন তিনটে! কোন প্রচেতার আত্মা অস্থির চিত্তকে সুস্থির করবার জন্য জানলা দিয়ে তারার আলো ছড়িয়ে দিলো। আহা মরি! এ কী ব্যঞ্জনাময় দ্যুতিতে অকস্মাৎ সারা কক্ষ সুন্দর শ্রীতে ঝলমল কোরতে লাগলো!

[চলবে]

আর এক মস্তিষ্ক

অমল হালদার

কবি ভার্জিল বলেছেন, 'আমি আমার ডান হাতকে দেবতা বলে মানি।' কথাটা হঠাৎ অত্যুক্তি বলে মনে হতে পারে। দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অপেক্ষা হাতের মর্যাদা যে অধিক এমন অচেতন ধারণা আমাদের নেই। অথচ বৈজ্ঞানিক বিচারে প্রমাণিত হয়েছে যে, হাত শুধু দৈনন্দিন জীবনে কাজ করবার অত্যাবশ্যক হাতিয়ার নয়; মস্তিষ্কের কাজ করবার ক্ষমতাও হাতের যথেষ্ট পরিমাণ রয়েছে। এই দুটি বিভিন্ন দায়িত্বের মিলন ঘটেছে বলে হাত দেহের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ।

পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ বছরের ভূতাত্ত্বিক-ইতিহাস পর্যালোচনা করে শিলীভূত যে সব প্রাণীর কঙ্কাল পাওয়া গেছে তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতের প্রাণী ভূপৃষ্ঠে বাস করত। লামার্ক ডারুইন প্রভৃতির আবিষ্কৃত বিবর্তনবাদের তথ্য এই ধারণাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। এ পর্যন্ত যে সব প্রমাণ পাওয়া গেছে তা থেকে দেখা যায় সৃষ্টির প্রথম যুগে প্রাণীদের হাত ছিল না। প্রাণীদেহের আকৃতি ক্রমশঃ বিবর্তিত হয়ে উন্নত রূপ লাভ করবার পর হাতের আবির্ভাব ঘটেছে। এখনও নিম্নস্তরের বহু প্রাণীর হাত নেই। হাতের পুরনো কঙ্কাল পরীক্ষা করে পণ্ডিতরা মনে করেন যে, কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। কিন্তু আকৃতিটাই বড় কথা নয়। হাতের পেশী, স্নায়ুজালের বিন্যাস, ইত্যাদি হাতের কার্যকারিতা ও অনুভূতি-প্রবণতাকে বিশেষ রূপে প্রভাবান্বিত করে। কঙ্কাল বিচার করে হাতের এই বৈশিষ্ট্যগুলির রূপান্তর কবে থেকে শুরু হয়েছে বলা যায় না। তবে এ বিষয়ে কোনো ভুল নেই যে, প্রথমে হাত ও পা প্রায় একই কাজ করত। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাণী মানুষের হাত ও পা'র মধ্যে পার্থক্যটা সুস্পষ্ট। অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে এই সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায় না। মানুষের হাতের নিকটতম নমুনা পাওয়া যায় গরিলার হাতে। গরিলার হাতের বুড়ো আঙুল এত ছোট যে, তার জন্য মানুষের হাতের অনেকগুলি সুবিধা থেকে সে বঞ্চিত। অন্যান্য প্রাণীর হাত আঁকড়ে ধরবার অঙ্গ মাত্র; কিন্তু মানুষের হাত শুধু কাজ করবার জন্য নয়; অনুভূতি প্রকাশের এবং অনুভূতি গ্রহণেরও অঙ্গ আমাদের হাত। প্রকৃতপক্ষে হাতকে মানুষের দ্বিতীয় মস্তিষ্ক বলা যেতে পারে।

হাতের সাহায্য ছাড়া আমাদের জীবন অচল। জন্মের পরে শিশু প্রথম তার মুখের ব্যবহার শুরু করে। এরপরে আরম্ভ হয় হাতের ব্যবহার। যতক্ষণ জেগে থাকে কেবল হাত দিয়ে খেলা করে। নিকটে যা কিছু পায় হাত দিয়ে তাদের স্পর্শ করে চেনে নিতে চায়। বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ করবার পূর্বেই শিশু হাতের স্পর্শ

দিয়ে চারপাশের বস্তুগুলির পরিচয় লাভ করে। গান্ধীজী, ফ্রয়েবেল, মন্তেসরি প্রভৃতি যাঁরা শিশুর পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার পদ্ধতি রচনা করেছেন তাঁরাই হাতের ব্যবহারকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতের ব্যবহার না করলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে। জড়বুদ্ধি সম্পন্ন শিশুকে হাতের কাজে আকৃষ্ট করতে পারলে তার বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটে, এটা দেখা গেছে। শিক্ষার কথা বাদ দিলেও হাতের উপকারিতা অন্যান্য ক্ষেত্রেও কম নয়। হাতের কাজ দিয়ে মানসিকব্যাধির রোগীর চিকিৎসা করে সুফল পাওয়া গেছে। মস্তিষ্কের প্রতিটি চিন্তাভাবনা হাতের উপর প্রভাব বিস্তার করে তেমনি হাতের কাজ মস্তিষ্কের উপর ছাপ ফেলে।

সুতরাং উপযুক্ত হাতের কাজ দিয়ে কাউকে আবিষ্ট করতে পারলে তার মন ও মাথা দুইয়েরই উন্নতি হবে। আমাদের প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় হাতিয়ার-গুলি হাতের অনুকরণে নির্মিত হয়েছে। হাতুড়ি মুষ্টিবদ্ধ হাতের প্রতীক। সাঁড়াশি দুই আঙুল দিয়ে চেপে ধরবার অনুকরণ। বড় বড় কলকারখানাতে হাতের অনুকরণে তৈরী বহু যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ দেখা যায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো যন্ত্রই হাতের স্থান অধিকার করতে পারেনি। যেখানে সূক্ষ্ম কাজ এবং শিল্প সৃষ্টির তাগিদ আছে সেখানে কোনো যন্ত্র সাহায্য করতে পারবে না, হাতই একমাত্র ভরসা। আশ্চর্য জগদীশ চন্দ্র আবিষ্কৃত ক্রেস্কোগ্রাফের মতো সূক্ষ্ম যন্ত্র হাতে তৈরী করতে হয়েছে। তেমনি হাত ছাড়া ছবি আঁকার কথা কল্পনা করতে পারি না। তারের যন্ত্রে আঙুলের ছোঁয়া না লাগলে সুরের মায়া ভাল সৃষ্টি করা সম্ভব নয়।

হাত মানুষের দ্বিতীয় মস্তিষ্ক। জ্যোতিষীরা বলেন যে, মস্তিষ্কের উপাদান কিছু পরিমাণে হাতের তালুতে এবং আঙুলের ডগাতে পাওয়া যায়। জীবনের ঘটনাগুলি আমাদের মস্তিষ্কে গভীর দাগ কাটে। আমরা কিছুই ভুলিনা, পুরনো ঘটনার কথা স্মরণ করে মনে সুখ বা দুঃখ জেগে ওঠে। তেমনি ভবিষ্যতের ঘটনার ছায়াও অনেক আগে থেকেই মস্তিষ্কের উপর পড়ে। মস্তিষ্কের সঙ্গে হাতের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ; তাছাড়া মস্তিষ্কের উপাদানও হাতের কিছু পরিমাণ রয়েছে। সুতরাং অতীতের এবং ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর ছায়া হাতের রেখায় ফুটে ওঠে। তাই হাতের রেখা পরীক্ষা করে জীবনের ভূত ভবিষ্যত বলা যায়।

হস্তরেখার তাই ব্যাখ্যা বিজ্ঞানের দ্বারা সম্ভব নয়। কিন্তু হাত যে মানুষের দ্বিতীয় মস্তিষ্কের কাজ

শত্রুকে তুচ্ছ ভাববেন না

বিপুল সংখ্যক চীনাবাহিনী এখনও আমাদের উত্তর সীমান্তে রয়েছে। সতর্ক থাকুন।

আপনাদের শৃঙ্খলাই ভারতের শক্তি

DA-63/F-18

করে তা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় নির্ধারিত হয়েছে। শুধু হাত দিয়ে স্পর্শ করে আমরা অনেক বিষয় সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি। অভিজ্ঞ ব্যক্তি আঙ্গুল দিয়ে পরীক্ষা করে বলতে পারে কাগজটা কত পাউণ্ডের। ইতালীতে প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ টাকার পশমের ব্যবসা হয় শুধু হাতের সাহায্যে শ্রেণীবিচারের উপর নির্ভর করে। চোখের বিচার অপেক্ষা হাতের স্পর্শ অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য। যারা অন্ধ তাদের প্রধান অবলম্বন হাত।

হাতের সাহায্যে তারা লেখাপড়া শেখে এবং বিভিন্ন বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে। হাত অন্ধের চোখের কাজ করে। শুধু চোখ নয়, কানেরও। ব্রুকবরিজ ও অন্ধ হেলেন কেলার তাঁর জীবনীতে বলেছেন যে, বীটোফনের পাইনহুসিফনির স্পর্শ রস তিনি উপভোগ করতে পেরেছেন। বেতার যন্ত্রের উপর হাত রেখে তিনি উপলব্ধি করেছেন সেই অপূর্ব সঙ্গীতের উন্মাদনা। সঙ্গীতের মূর্ছনা এবং রেডিও যন্ত্রের কম্পন স্পর্শানুভূতির সাহায্যে তার অন্তরে প্রবেশ করেছিল। মিস কেলারের বর্ণনা পড়লে সন্দেহ থাকে না যে, তিনি স্বাভাবিকরূপেই সঙ্গীতের রস আস্বাদন করতে পেরেছেন।

বীটোফন ১৮১৯ সালে সম্পূর্ণরূপে বধির হয়ে যান কিন্তু তারপরে মৃত্যু পর্যন্ত (১৮২৭) তিনি অনেক অমর সঙ্গীত রচনা করে গিয়েছেন। সঙ্গীত যন্ত্রের কম্পন হাতের মধ্যে দিয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছেছে এবং তারই অনুভূতির সাহায্যে তিনি রচনা করেছেন নতুন নতুন সুরের মায়াজাল। হাতের সহায়তা ছাড়া বীটোফনের নতুন সঙ্গীত রচনা বধির হবার সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হয়ে যেত। অন্ধ শিল্পীরা যে হাতের স্পর্শানুভূতির উপর নির্ভর করে, কেমন সুন্দর মূর্তি গড়তে পারে তারও অনেক প্রমাণ আছে।

অন্ধ ভাস্কর ক্লাইনহানস-এর ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্তি একটি প্রথমশ্রেণীর শিল্প কীর্তি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। অন্ধের শিল্প সৃষ্টির দৃষ্টান্ত আরও পাওয়া যায়। অনুভূতিপ্রবণ হাতের সহায়তা ছাড়া এই শিল্প রচনা সম্ভব হত না।

চিকিৎসাবিদ্যাতেও হাতের ভূমিকা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। হাতের নাড়ী পরীক্ষা করে অভিজ্ঞ কবিরাজ রোগ নির্ণয় করতে পারেন। তাঁকে অনেক রকম ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করতে হয় না। হাতের গঠন ইত্যাদিও রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করে।

হাত মানুষের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অচ্ছেদ্যরূপে যুক্ত। মনের প্রকাশ হাতের ভঙ্গির মাধ্যমে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়। হাত ও আঙুলের অবস্থান থেকে সংকল্প, ক্রোধ, নিষেধ আহ্বান ইত্যাদি যত সহজে উপলব্ধি করা যায় চোখ বা মুখের ভঙ্গির সাহায্যে ততটা পাওয়া যায় না। বক্তব্য স্পষ্টতর করবার জন্য আমরা কথার সঙ্গে সঙ্গে হাতের অর্থবহ ভঙ্গি করি। হাতের যথার্থ প্রয়োগের উপর অভিনেতার সাফল্য অনেকাংশে নির্ভরশীল। হাত যুক্ত করে, হাত দিয়ে পা ছুঁয়ে, করমর্দন করে আমরা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি অথবা স্বাগত জানাই। রোগীর সেবায় হাতের স্নেহস্পর্শের মূল্য ওষুধের চেয়ে কম নয়। দেবতার পূজায় হাতের কত বিচিত্রভঙ্গি করতে হয়। ভারতীয় নৃত্যে হাতের মুদ্রা অপরিহার্য। মুদ্রা ছাড়া নৃত্য ব্যঞ্জনা হীন হয়ে পড়ে।

হাতের স্পর্শ না করতে পারলে ভালোবাসা বিস্বাদ হয়ে যেত। "কবিরা প্রিয়ার মুখ নিয়ে কত কথা কয়েছে। কিন্তু হাতের মধ্যে প্রাণের কত ইসারা! ভালোবাসার যত কিছু আদর যত কিছু সেবা, হৃদয়ের যত দরদ যত অনির্বচনীয় ভাষা সব যে ওই হাত।" হাত পাওয়াই হৃদয়ের পাসপোর্ট। হাত পেলেই সমগ্র মানুষটিকে পাওয়া হল। তাই পাণিগ্রহণ অর্থই বিবাহ।

সম্প্রতি Geza Revesz রচিত "The Human Hand" নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। পরীর তত্ত্ব জীববিজ্ঞান এবং মনস্তত্ত্বের বিভিন্ন দিক থেকে হাত সম্বন্ধে আগ্রহশীল তাঁরা পড়ে উপকৃত হবেন।

(Publisher : Routledge and kegan paul)

কবি জয়দেব ও বাংলা সাহিত্য

দুর্গা ভট্টাচার্য

যে পঞ্চ রত্নীপের পবিত্র শিখাদ্য প্রাচীন বাংলার সাহিত্য ভারতী চির ভাস্বর—যে সারস্বত পঞ্চরত্ন 'বিদ্যাসুন্দর কুতূহল' কবি গোষ্ঠী লক্ষ্মণ সেনের রাজ-সভার গৌরব-রবি তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম আসন কবি জয়দেবের। ষোড়শ শতকের মহাকবি মাত্রাজীর কণ্ঠে শ্রদ্ধাপ্লুত স্বরে উচ্চারিত হয়েছিল জয়দেবের বন্দনা গান—"জয়দেব কবি নৃপচক্রবর্তী"। এ বন্দনা একবিন্দুও অতিরঞ্জিত নয়। খৃঃ ১২শ ১৩শ শতকে সংস্কৃত সাহিত্যের যখন চরম দুর্দিন, যখন সংস্কৃতকে ভিত্তি করে নানা প্রাদেশিক ভাষার অঙ্কুরোদ্গম হল এবং ফলে সংস্কৃতের প্রাণরস নিঃসৃত হয়ে সে ভাষা ক্ষীণ-জীবী হয়ে পড়তে লাগল, তখন জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দ'ই সেই।

"একটি চন্দ্র অসীম চিত্ত গগনে
চারিদিকে চির যামিনী।"

'গীতগোবিন্দ' যখন তমস সাগরেও বিচ্ছুরিত দীপ্তি অমলা ম'ণি। সেই দীপ্তি যে বাংলাদেশে জাত,—বাঙালী কবির প্রতিভাপ্রসূত—তাই সংস্কৃত সাহিত্য পরিমণ্ডলে বাঙালীর এক বিশেষগৌরব।

'গীতগোবিন্দে'র ভাষা সংস্কৃত। সম্পূর্ণ গ্রন্থখানি সংস্কৃত ভাষামণ্ডিত—তাই জয়দেব বাঙালী কিনা এবং বাঙালী হিসাবে আমাদের গৌরব মুকুটরূপে জয়দেবকে গ্রহণ করা সংগত কিনা এ বিষয়ে বহু বিতর্কের অব-কাশ আছে। কিন্তু জয়দেব যে বাংলারই দুলাল—বাঙালীর হৃদয়ের ধন—বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে যে তাঁর যোগাযোগ অত্যন্ত নিবিড় এবং সর্বোপরি 'গীত-গোবিন্দ' যে পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের পূর্বসূরী তার বহু প্রমাণ দেওয়া যায়।

কবির যাত্রীদেবতা বাংলাদেশের বীরভূমের রাঢ়মাটি অজয় নদীর তীরের কেন্দুবিল্ব' গ্রামখানির 'পরাণ পুতুলি' তিনি। যেদিন এই শিশু চন্দ্রমা ভোজ-দেবের ঘর আলো করে মাতা বামাদেবীর কোলে এলেন সেদিন শুধু বাংলাদেশের এক অখ্যাত গ্রামই নয়—সমগ্র বাংলা সাহিত্যই উজ্জ্বল সম্ভাবনায় দ্যুতিত হয়ে উঠল। যদিও জয়দেবের ভারতব্যাপী প্রভাবের ফলে প্রায় সকল দেশেই বিশেষত উড়িষ্যা-বাসীরা তাঁকে আপনার বলে দাবী করে কিন্তু নানা আভ্যন্তরীণ প্রমাণ সাক্ষ্য দেয় জয়দেব আর কারও নন—তিনি একান্তই আমাদের। বাংলাদেশের শেষ স্বাধীন রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভার পঞ্চরত্নের অন্যতম ছিলেন জয়দেব। তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'সুভাষিতাবলী' নামক শ্লোকসংগ্রহে।

গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ
কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষ্মণ সেনস্য চ।

শুধু 'সুভাষিতাবলী' নয়—'সদুক্তিকর্ণামৃত' এবং 'গীতগোবিন্দ'ও এর উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং জয়দেবের জন্ম ও কর্মগত ঐতিহ্যও যে বাংলাদেশ-প্রসূত তাতে সন্দেহের কিঞ্চিদবকাশও থাকা অনুচিত।

কিন্তু শুধুমাত্র কবিকে দেখে—তাঁর জীবন চরিত বিশ্লেষণ করেই যে প্রমাণ পাওয়া যায় তা প্রকৃষ্ট ও সার্থক পরিচয় নয়। কাব্যেই কবির আসলসংস্কৃতি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "কবিরে পাবে না তার জীবন চরিতে।" স্রষ্টার পরিচয় সৃষ্টিতে। কবিকে সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। প্রজাপতির পরিচয় তাঁর সৃষ্ট প্রাণে।—সৃষ্ট জীবলোকে। কবির পরিচয় তাই তাঁর রসসৃষ্টিতে পাওয়া যায়। এই দৃষ্টি নিয়ে যদি আমরা জয়দেবকে বিচার করি তবে দেখি সংস্কৃতভাষার আবরণে মণ্ডিত গীতগোবিন্দ সম্পূর্ণ বাংলা গ্রন্থ।

কাব্য বিচারে ভাব, ভাষা ও ছন্দের বিচার অপরি-হার্য। গীতগোবিন্দের ভাব যা বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ বাঙালীর ঘরের কাহিনী। গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকই হল :—

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধা মাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ কেলয়ঃ ॥

এর মর্মকথা হল মেঘমেদুর আকাশের নীচে অন্ধকার তমালের বনে কৃষ্ণ ভীত হয়েছেন। অতএব রাধে! তুমি একে ঘরে পৌঁছে দিয়ে এস।—নন্দর এই আদেশে চলিত রাধা যখন কৃষ্ণকে নিয়ে পথে প্রত্যাগমন করছেন তখন "রাধা মাধবয়ের নিভৃত কেলি জয়তু যমুনা তীরে" এখানে রাধা মাধবে' কৃষ্ণের মামী। রাধা-কৃষ্ণের লীলা বর্ণনা হতে সংস্কৃত সাহিত্যে অনেক পাওয়া যায়—কিন্তু এর বিচিত্ররূপে উপস্থাপনা জয়দেবে নূতন। এ কাহিনী কোনো পুরাণ বা ভাগবতে পাওয়া যায় না। একান্তই বাংলাদেশের প্রাকৃত উপাখ্যান। 'গীতগোবিন্দে' এমন অনেক চিত্র পাওয়া যায় যা বাংলার ঘরের অঙ্গনের চিত্র। —কাব্য স্মৃতি সমুজ্জ্বল এমনার শুটপ্রান্তে কখনো "সমাগতো রাজমহন্তমদ্রুমনিঃ—মেঘ মেদুর বর্ণায়, কখনও নবপল্লবের উজ্জ্বল বর্ণনায় বৃন্দাবনের যে অপরূপ রূপৈশ্বর্য তার সঙ্গে বাংলার বর্ষাবসন্তের ছবিটি লীন হয়ে আছে। মনে হয় এ বৃন্দাবনের নয় —এ বাংলারই ছবি। বহুদিন পরে কালের আরেক প্রান্তের কবি রবীন্দ্রনাথ।

'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে'

বা, নীল অঞ্জনে ঘন পুঞ্জ ছায়ায় সম্বৃত অম্বর —হে গম্ভীর!

অথবা 'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মত নাচেরে'—প্রভৃতি কবিতায় যে বর্ষবন্দনা করেছেন অথবা—

"নীল দিগন্তে ঐ ফুলের আগুন লাগল
বনান্তে সৌরভের শিখা জাগল"

কিংবা, "ওরে ভাই, ফাগুন লেগেছে বনে বনে
ডালে ডালে ফুলে ফলে পাতায় পাতায় রে ॥
আড়ালে আড়ালে কোণে কোণে।"

প্রভৃতি গানও কবিতায় যে বসন্তের জয়গান গেয়েছেন তাতে জয়দেবের প্রভাব পরিস্ফুট। জয়দেব যদি বাংলালী না হতেন অথবা বা তার সঙ্গে পরিচয় যোগ না থাকত তবে এমন অপরূপ বাংলার রূপে চিত্র অঙ্কন করা তাঁর সাধ্যাতীত ছিল।

জয়দেব গীতগোবিন্দে বলেছেন—"সন্দর্ভশুদ্ধিং পিরাং জানীতে জয়দেব এব।"—অর্থাৎ জয়দেব কবি শব্দসন্দর্ভ রচনায় সক্ষম। সন্দর্ভ রচনার বাহন হল ভাষা। গীতগোবিন্দের ভাষা সংস্কৃত একথা সত্য এবং আপাতদৃষ্টিতে গীতগোবিন্দ সংস্কৃত গ্রন্থ বলেই প্রতিভাত হয়। কিন্তু বিশ্লেষণরূপে লক্ষ্য করলে দেখা যায় জয়দেবের রচনাকে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের কোনো বিশিষ্ট পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। পূর্বতন সংস্কৃতের ভাব ও ভাষা গ্রন্থটির রচি ও অন্তঃজীবনে এমন বিচিত্ররূপে লাভ করেছে যে তা সমসাময়িক দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের অধিকতর নিকটবর্তী বলে গ্রহণ করা যায়। এমন অনেক শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন যা আদৌ সংস্কৃত নয়। যেমন "খেলতি মম মানসি"—বাক্যের 'খেলতি' শব্দটি সংস্কৃত নয় এটি অর্বাচীন শব্দ। এমন কি অতি অল্প চেষ্টায় অনেক পদ সংস্কৃত থেকে প্রাকৃত এবং প্রাকৃত থেকে সংস্কৃত পরিণত করা যায়। যেমন—

'স্মরতি মন মম কৃত পরিহাসম্'

এই সংস্কৃত পদটি

"স্মরতি মন মম কি অপরিহাসম্।

এরূপ প্রাকৃতে পরিণত করা কঠিন নয়।

শুধু যে ভাষান্তরিত করা তা নয়। গীতগোবিন্দের বহু স্থান একেবারে বাংলার মত। যেমন—

"ধীর সমীরে যমুনা তীরে বসতি বনে বনমালী"

বা "চন্দন চর্চিত নীলকলেবর পীত বসন বনমালী"
কিংবা "রতিসুখ সারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্"
অথবা, কালিয় বিষধর গঞ্জন জনরঞ্জন যদুকুল
নলিন দিনেশ।"

এই পদগুলিকে ভাষান্তরিতকরণ ব্যতীতই বাংলার ধ্বনিঝংকার স্পষ্টতই শ্রুত হয়। একে বাংলা বলে ভুল না করাই অস্বাভাবিক। বরং অক্ষয়কুমার সরকারের মতে,

"চলসখি কুঞ্জং সতিমির পুঞ্জং শীলয় নীল নীচোলং" শুনে মুখে এইরূপ ভাবভঙ্গী দেখিলে একটু হাসি পায়। মনে হয় দূতী বুঝি আপনার উপদেশের গাম্ভীর্য দর্শনের জন্যই অমর্থক অনুস্বার বিসর্গ দিয়া রাধাকে সংস্কৃত করিতেছে।"

কবিতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট ছন্দ। ছন্দ বিচারে কবিতার জাতি ও গোত্র নির্ণীত হয়। যে ছন্দের ঝংকার 'গীতগোবিন্দে' ধ্বনিত হয় তাও সংস্কৃত ছন্দ-সরস্বতীর নূপুরনিক্কন নয়। কান্ত কোমলপদকর্তা জয়দেব কবি প্রায় সমস্ত 'গীতগোবিন্দ'খানাই প্রাকৃত পৈঙ্গলে' উদাহৃত পদ্ধটিকা বা পদ্মাকুলক ছন্দে রচনা করেছেন। পদ্মাকুলক ছন্দের বৈশিষ্ট হল দুটি চরণে শ্লোক,—প্রত্যেক চরণে ২টি পর্ব ও প্রত্যেক পর্বে ৮টি মাত্রা থাকে। যেমন,

মু'হু'র্হু'র' লো'কি'ত' | ম''ণ্ড'ন' লী''লা''
ম'ধু'রি'পু' অ'হ'মি'তি' | ভ''ব'ন' শী''লা''

অনুরূপ ছন্দস্পন্দ চর্যাগীতির "কা আ তরু বর পঞ্চ বি ডাল" এবং শঙ্করাচার্যের নামে প্রচলিত "নলিনী দলগত জলমতি তরলম্" ইত্যাদি জাতীয় পদেও ধ্বনিত হয়।

সংস্কৃত ছন্দে অন্ত্যানুপ্রাস আছে। কিন্তু পাদান্ত মিল নেই। 'গীতগোবিন্দে'র সমস্ত পদাবলী অপভ্রংশ বা প্রাচীন বাংলা কবিতার মতো মিলযুক্ত। যেমন—

মুহুরহু লোকিত মণ্ডন লীলা
মধুরিপু অহমিতি ভাবনশীলা

অয় হ কলয়সি বলাদি মণিভূষণম্
হরিবিরহ দহন বহনেন বহুদূষণম্

সরস বসন্তমপি মলয়জপঙ্কং।
পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কম্॥
দিশি দিশি কিরতি সজল কনজালং
পথম নলিনমিব বিতালত নালম্॥

ইত্যাদি।

বাংলা পদ্যের ছন্দ প্রধানত ২টি। পয়ার ও ত্রিপদী। গীতগোবিন্দে এই দুই ছন্দের পূর্বাভাস সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। পূর্বোদ্ধৃত পদটি পয়ার জাতীয় ছন্দ। আর

পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে
শঙ্কিত ভবদুপধানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নম্
পশ্যতি তব পন্থানম্॥

বা, ত্বয়সি মম জীবনম্ ত্বয়সি মম ভূষণং
ত্বয়সি মম ভব জলধিরত্নম্।
• • •
স্মরগরল খণ্ডনং মমশিরসি মণ্ডনম্
দেহি পদপল্লব মুদারম্॥

এই পদগুলি দ্বিপদী জাতীয়।

সুতরাং গীতগোবিন্দের আঙ্গিক ও রীতি ভাব-রূপ ও রসরূপে বিচার করে একটিমাত্র লক্ষ্যেই উপনীত হওয়া যায়। তা হল জয়দেব বাঙালী—জয়দেবের 'গীত গোবিন্দ' বাংলাসাহিত্যাকাশের নবারুণ দীপ্তি।

জয়দেবী-সাহিত্য আঙ্গিক বা technicএর দিক দিয়ে সংস্কৃত ও তৎকালীন দেশীয় সাহিত্যের সংমিশ্রণ। তাঁর সাহিত্যে এ বিচিত্ররূপের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে দেখা যায় গীতগোবিন্দ এক বিচিত্র যুগে রচিত। তখন প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অন্তোন্মুখ ও অপভ্রংশে বা দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশোন্মুখ অবস্থা। সেইজন্য এই পরিবর্তনযুগে একশ্রেণীর রচনার নিদর্শন পাওয়া যাওয়া যায় যা পুরাতন সংস্কৃত কাব্যের নিয়ম নিগড় দ্বারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রতা লাভ করেনি। ফলে দেশীয় ভাষা ও সাহিত্য পরস্পর জড়িত হয়ে পড়েছিল। জয়দেব মনে করেছিলেন, "দেশিলা ভাষা সর্বজন মিঠ্ঠা" তাই তৎ কালীন দেশীয় ভাষাকে সাহিত্যে আসন দেবার জন্য তাঁর মনে প্রেরণা জাগে। ফলে সংস্কৃত ও দেশীয় ভাষা ও সাহিত্য পরস্পর পরস্পরের সহকার শাখারূপে নড়ে ওঠে। নবোদ্ভিন্ন ও জন সাধারণের মধ্যে ক্রমশঃ বিস্তৃত দেশীয় ভাব ও ভাষার আদর্শকে আত্মসাৎ করে প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যকে পুনরুজ্জীবিত ও নূতনরূপে গঠনের প্রয়াস সর্বত্র দেখা যায়। 'গীত-

গোবিন্দ' সেই প্রচেষ্টার সার্থকতম উদাহরণ।

বাংলা সাহিত্যাকাশে জয়দেব যে গীতি ঝংকারে ঝংকৃত করে তুলেছিলেন তার প্রভাব সুদূর প্রসারী। প্রাচীন যুগ থেকেই এই রস প্রবাহ প্রবাহিত হয়ে মধ্য-যুগের বৈষ্ণব সাহিত্যের মধ্য দিয়ে পরিশ্রুত হয়ে আধুনিককালে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এসে সে সাগরে পরিণত হয়েছে।

প্রাচীন চন্দ্রকাব্যে গীতগোবিন্দের প্রভাব পড়েছে। "শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে" গীতগোবিন্দের ছায়াপাত ঘটেছে। পদাবলীর চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরাম দাস রায়শেখরের পদে রাধাকৃষ্ণের লীলায় যার চূড়ান্ত পরিণতি জয়দেবে তার সার্থক সূচনা। গীতগোবিন্দ-কারকে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের আধ্যাত্মিকজনক আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। পদাবলী ভাবপ্রধান কোনো প্রতীক বা রূপকের আশ্রয়ের ব্যক্তিগত দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার হৃদয়াবেগের অভিব্যক্তি। আর মঙ্গলকাব্য ছিল দেবতার সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ ও বিবিধ ক্রিয়াকলাপের ঘটনাপ্রধান বাস্তব বর্ণনা। 'গীতগোবিন্দে'র মধ্যে এই দুটি ধারার আদি উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়। বাংলায় বর্ণনাত্মক গান ও ভাব-প্রধান মঙ্গলকাব্যাংশও দুর্লভ নয়। মঙ্গলকাব্যের মুকুন্দভট্ট, কাণা হরিদত্ত এবং মাণিকরাম প্রভৃতি কবি গণ জয়দেবের অনতিপরেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। অন্নদা মঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দরের কবি ভারতচন্দ্রের উপর তাঁর শব্দঝঙ্কার ও পদলালিত্যের প্রভাব পড়েছে। যে অনুপ্রাসের ঝঙ্কার জয়দেবের বৈশিষ্ট্য তাই ভারতচন্দ্রকেও বিশিষ্টতা দান করেছে।

আধুনিককালে রবীন্দ্রনাথের উপর জয়দেবের পূর্ণ প্রভাব বিদ্যমান। তিনি নিজেই বলেছেন 'গীতগোবিন্দ' যারা যে কতবার পড়িয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই।" ছন্দশিল্পে বালক রবির প্রকৃত দীক্ষাগুরু কালিদাস ও জয়দেব। রবীন্দ্রনাথের পঞ্চমাত্রিক ছন্দে রচিত—

"গগনের কাজ করি করেছে একি সন্ন্যাসী
বিশ্বময় দিয়েছে তারে ছড়ায়ে।"

"একদা তুমি অঙ্গদরি কিরিতে নব ভুবনে
মরি মরি অনঙ্গ দেবতা।"

অথবা,

"সাগর জলে সিনান করি সজল এলোচুলে
বসিয়া ছিলে উপল উপকূলে।"

এইগুলি জয়দেবের পঞ্চমাত্রিক ছন্দে রচিত,

"যদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদি
হরতিদর তিমিরমতি ঘোরম্।"

পংক্তিগুলির ছন্দস্পন্দের অনুরূপ। মাইকেলও জয়দেবকে বন্দনা করে বলেছেন,—

চল যাই, জয়দেব, গোকুল ভবনে
ভবদঙ্গে, যেথা রঙ্গে তমালের তলে
শিখিপুচ্ছ চূড়াশিরে পীতধড়া গলে
বাজে শ্যাম, বামে রাধা—সৌদামিনী সনে!

সর্বোপরি—গীতিপ্রাণতা বাঙ্গালীর জীবনবেদ—গীতি কবিতার মাধ্যমে বাঙালীর প্রাণস্ফূর্তিলাভ করে। যে রোমান্টিকতার মর্মর মূর্ছনা বাঙ্গালীর প্রাণস্পন্দনে সেই সুরেরই প্রথম সুর মূর্ছিত হয়েছে জয়দেবে। বাঙ্গালীর কোমল হৃদয়ের কোমল মর্ম উৎসারিত হয়েছে জয়দেবে। বাঙ্গলার নীতিকাব্যকে বলা যেতে পারে জয়দেব গোত্রক।

গীতগোবিন্দের আঙ্গিক হল প্রাচীন বাংলার-যাত্রার আঙ্গিক। প্রাচীন বাংলার কৃষ্ণযাত্রা রামযাত্রা প্রভৃতি যাত্রাগানের সঙ্গে গীতগোবিন্দর ঘনিষ্ট যোগ আছে। শুধু তাই, পাঁচালী গানের পূর্বাংগুলী গীতগোবিন্দ বলা যেতে পারে।

অতএব দেখা যাচ্ছে 'গীতগোবিন্দ' তথা জয়দেবের প্রভাব বাংলা সাহিত্যে এত ব্যাপক ও গভীর যে তাকে বাদ দিয়ে কি প্রাচীন আর আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কোনো আলোচনাই পূর্ণ হতে পারে না। জয়দেব তাই বাংলা সাহিত্যের ত্রিবিক্রম।

অনুরাগ

● নারায়ণ চক্রবর্তী

এসপ্ল্যানেডের মোড়ে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে স্টেট বাসটা থামে, ভেতরে হাঁহি না চোকা ব্যবধানে দাঁড়িয়ে আছে জনতা, বাস থামায়, মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি হওয়াটা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা, এ নিয়ে আর মাথা ঘামায় না কেউ। রাজেন কারুর বগলের তলা দিয়ে গলে, কারুর পা মাড়িয়ে দিয়ে, কারুর ঘাড়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে লেডিজ সিটের পাশ কাটিয়ে বহু কষ্টে বাসের জঠর থেকে বেরিয়ে আসে। রাস্তায় পা দিয়ে হাঁফ ছাড়ে, কিন্তু সে পলকের জন্য, পরমুহূর্তে পড়ি কি মরি করে অদূরের মেট্রো সিনেমা লক্ষ্য করে ছুটতে থাকে।

বেনহুর ছবিটা বহুদিন ধরে মেট্রোতে চলছে, বন্ধুবান্ধবদের কাছে ছবিটার খুব প্রশংসা শুনেছে রাজেন কিন্তু সুযোগ আর সময়ের অভাবে দেখা হয়ে ওঠেনি এর আগে। আজ তার ছাত্রী গেছে বকুল তলায় বেড়াতে, এই সুযোগে ছবিখানা দেখে ফেতে উঠতে চায় রাজেন।

কারেন্ট বুকিং স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে কপাল আর ঘাড়ের ঘাম মুছতে মুছতে রাজেন বলে,—একটা সেকেণ্ড ক্লাস প্লিজ—"

বিন্দুমাত্র নির্বিকার বুকিং ক্লার্ক চোখ না তুলেই বলে, "বক্স ছাড়া সব টিকিট শেষ—"

মোক্ষম কথাটি শুনে ক্ষুণ্ণ মনে একটু সরে দাঁড়ায় রাজেন, তার ভাসা ভাসা বড়ো বড়ো চোখ দুটিতে বিরক্তির ছায়া পড়ে, উৎসাহ ও উদ্দীপনার হাওয়ায় ফুলে ওঠা বেলুনের মতো মনে হয় বুকিং ক্লার্কের ছোট্ট কথার আলপিন সুগোল একটি ফুটো করে দিল। মনটা চুপসে একরত্তি হয়ে গেল এক মুহূর্তে।

বসে বসে ছবি দেখার মতো টাকা তার পকেটে নেই।

নিজের চারিদিকে তাকিয়ে দেখে রাজেন। দামি মুক্তোর মত মসৃণ আর ঝিক-ঝিকনের খল খল এর মৃদু শব্দ বাজনায় নরম ঢেউ তুলছে তার চারদিকে। জোড়ায় জোড়ায় বিভিন্ন বয়সের নর-নারী দ্রুত, লঘু চপল ছন্দে প্রেক্ষাগৃহের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে অদূরের দরজা দিয়ে ভেতরে হিমশীতল ঢেউ এসে তার মুখে-চোখে স্নেহ করস্পর্শ বুলিয়ে দেয়।

প্রেক্ষাগৃহের এই শীতল অনুরাগ ভালোই লাগে রাজেনের। ছবিটা না দেখতে পারার আফসোস দ্বিগুণ হয়ে ওঠে।

শেষবারের মতো দেওয়ালগুলি ফেলে আঁটা চিত্ত-হারিণী চিত্রতারকাদের দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে একটা নিশ্বাস ফেলে রাজেন। বেরিয়ে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিয়ে একপাশে সরে না

দাঁড়ালে পেছন থেকে প্রায় ছুটে আসা মেয়েটির সঙ্গে দৈহিক সংঘর্ষ হয়ে যেত তার।

অনিবার্য সংঘাত থেকে একটুর জন্য বেঁচে গিয়ে অপ্রস্তুত মুখে দাঁড়ায় মেয়েটি, বাঁকা চোখে তাকায় রাজেনের মুখে, পরক্ষণেই খুশীর আলোতে দারুণ মুখ উদ্ভাসিত করে তরল সুরে বলে ওঠে,—"ওমা, আপনি!"

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া মেয়েদের মুখের দিকে বড় একটা তাকায় না রাজেন। মেয়েটির কথা শুনে তার মুখে তাকালো সন্ধানে কর্ণী মুখে শ্বেতবিন্দু গুলি বিদ্যুতালোকে মুক্তার মতো ঝক ঝক করছে, চকল চোখ দুটিতে পরিচয়ের গাঢ় ছায়া, আরক্ত রঙ্কিম ওষ্ঠাধরে প্রসন্ন হাসির বিকশিত দীপ্তি।

চেনা মুখ বলেই মনে হল রাজেনের, কিন্তু ঠিক কোথায় যে দেখেছে সঠিক মনে করতে পারলো, তাই চেনার ভাণে একটুখানি হাসি শুধু ফুটে উঠলো ওর মুখে।

প্রশ্ন করে জবাবের জন্য যারা অপেক্ষা করে থাকে এ মেয়েটি সে জাতের নয়, তাই তড়বড় করে বলে ওঠে —"সিনেমা দেখবেন তো? তা এখানে দাঁড়িয়ে কেন? সময় নেই মোটে, দেখছেন না কেমন ছুটতে ছুটতে আসছি! টিকিট কেনা হয়ে গেছে আপনার?"

দিশেহারা রাজেন বলে—"না—"

চট করে কাউন্টারে পৌঁছে যায় মেয়েটি, মৃদু মিহি গলায় বলে,—"বক্স দুটো—"

বটুয়া খুলে দশ টাকার নোট বার করে মসৃণ কাঁচের ওপর দিয়ে এগিয়ে দেয়।

কুড়ি সেকেণ্ডের মধ্যে টিকিট দুটো আর চেঞ্জ হাতে নিয়ে রাজেনের পাশে এসে দাঁড়ায় সে, বলে,—"কই চলুন, ছবি আরম্ভ হবার পর হলে ঢুকতে একদম ভালো লাগে না আমার—"

দামী পাউডার ও সেন্টের একটা অতি সূক্ষ্ম মোলায়েম গন্ধ রাজেনের নাকে এসে লাগে, মেয়েটির পাতলা ঠোঁটের কোণে লুকিয়ে থাকা হাসিটুকু এবার চিমিয়ে দেয় তাকে, নামটাও মনে পড়ে,—শীলা,—হ্যাঁ শীলাই তো এই মেয়েটির নাম……

স্মরণের আলোকরেখা বিস্মৃতির তমসা দূর করে দেয়।

ব্যারিস্টার পূর্ণেন্দু দত্তের মেয়ে সমাপিকাকে গান শেখাতো রাজেন। সেই সমাপিকার বিয়েতে শীলাকে দেখেছিলো সে। এরই পীড়াপীড়িতে কয়েকটা অতিরিক্ত রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতে হয়েছিল তাকে।

হাইপাওয়ার লেন্সের ভেতর দিয়ে এবার সোজাসুজি শীলার মুখের দিকে তাকায় রাজেন, মৃদুকণ্ঠে বলে, "—কেন মিছি মিছি আমার জন্য টিকিট কিনতে গেলেন বলুন তো? আমি কিরেই যাবো ঠিক করে ছিলাম—"

খিল খিল করে হেসে ওঠে শীলা বলে,—"সে কি! এমন একটা মাস্টারপিস ছবি দেখবেন না? আজই যে এর শেষ রজনী তা জানেন না বুঝি?

জানে রাজেন, সবই জানে। এই ক্লাসিক বইখানা দেখবার আগ্রহও তার কারুর চেয়ে কম নয়। তবু এভাবে একজন স্বল্পপরিচিতার পরদায় ছবি দেখতে যাওয়াতে তার সৌরুদ্ধে বাধছিল।

হাসি থামিয়ে শীলা বলে,—"আমি বুঝেছি আপনি কি ভাবছেন। বেশ তো, ছবি থাকতে যদি একান্তই না চান তবে পরে না হয় কড়ার গণ্ডার শোধ করে দেবেন। বাব্বাঃ, আপনাদের পুরুষ মানুষদের আত্মমর্যাদা জ্ঞানের ঠ্যালায় গেলাম একেবারে।

এর পর আর কথা চলে না।

পাশাপাশি হেঁটে এগিয়ে গেল ওরা। যেতে যেতে সঙ্গিনীর বেশভূষা লক্ষ্য করে রাজেন।

শীলার পরণে মুর্শিদাবাদ সিল্কের শাড়ি, গায়ে ব্রোকেডের ব্লাউজ। হাতের চওড়া ঘানতাদা গায়ের রং-এর সঙ্গে প্রায় মিশে গেছে, গলায় চওড়া চিক শাড়ির ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে, কানের ঝুমকো জোড়া দোদুল দুলছে। হাইহিল জুতোয় খুট খুট শব্দ তুলে এগিয়ে চলেছে শীলা আর নিপুণ ছন্দে তার দীর্ঘ সুঠাম তরঙ্গিত দেহ যেন নদীর জলে আলোকরেখার মত নাচছে।

বহু বহুলে রাজেনের সৌন্দর্য খ্যাতি আছে। তার দীঘল চোখের মায়ায় কয়েকটি মেয়ে যে এর আগে বন্দীও না হয়েছে এমন নয় কিন্তু শীলার পাশে তার সে অহঙ্কার যেন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

নিজেদের সিট-এ বসে হাত হাতে শীলা। চেয়ারের নরম পিঠে শরীরটা এলিয়ে দিয়ে অলস ভঙ্গীতে বলে,—যাক সুরু হবার আগেই এসে পড়েছি—"

ডান হাতের ছোট হাত ঘড়িটা চোখের সামনে তুলে দেখে বলে—"সিনেমা সুরু হতে এখনও দশ মিনিট বাকী—"

সিনেমা হলের দেওয়াল থেকে একটা শীতল স্রোত এগিয়ে এসে তাদের ঘিরে ধরে। সেই নিবিড় নিরপ্র শৈত্যের সমুদ্রে তলিয়ে যেতে যেতে কেবল যেন একটা শির শির সুখকারী স্বাদ পায় রাজেন। সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে রাজেনের।

শীলার কথার বিরাম নেই, বিরাম নেই তার উজ্জ্বল চঞ্চল চোখের তারার অবিরাম নৃত্যের। রাজেনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে,—"আচ্ছা আপনি কী বলুন তো? সন্ধ্যাপিকার বিয়ের রাতে কতো গল্প করলেন কতো কথা বললেন, গানের আসরে বসে কতো মজাদার মজাদার গল্প বলে হাসিয়ে মারলেন আমাদের,—আর এখানে এসেঅব্দি একেবারে মৌনী বাবার মতো—"

শীলা কথা আর শেষ হতে পারে না, তার অবরুদ্ধ দমকা হাসির তোড়ে ডুবে যায়। ঘন-পক্ষ চোখের পাতা দুটি ঘন ঘন কাঁপতে থাকে।

মৃদু হাসির হাল্কা ঢেউ খেলে যায় রাজেনের ঠোঁটে, মৃদু স্বরে বলে,—"অনোর এক চেটিয়া ব্যবসায়ে নাক গলানো কি উচিত?"

—"তার মানে? ভুরু তুলে প্রশ্ন-মুখর চোখ দুটো তুলে রাজেনের মুখে তাকিয়ে শীলা বলে।

"মানে আপনার কথার পর কথার এমন নিশ্ছিদ্র ম্যাজিনো লাইন ভেদ করতে পারি এমন হিটলার আমি নই—" ইতিহাসাশ্রিত কথা কটি বলতে পেরে যেন একটু আরাম বোধ করে রাজেন।

একটু কুঁদে উঠে শীলা বলে,—"কী বল্লেন? হিটলার। হিটলার আপনার মতো কথার এমন খেলাপ করতেন না, বুঝলেন?"

"কথার খেলাপ?" অবাক হয়ে রাজেন বলে, এমন অপরাধ কার কাছে করলাম বলুন তো?"

"আমার কাছেই করেছেন",—যেন একটু তপ্ত ঝাঁঝ ফুটে ওঠে শীলার কণ্ঠে—"সন্ধ্যাপিকার বিয়ের দিন আমাদের বাড়ীর ঠিকানা নিয়ে একদিন আসবার প্রতিশ্রুতি দেননি?"

শীলার এ কৈফিয়ৎটুকু বেশ ভালোই লাগে রাজেনের, কিন্তু মনে মনে বিপন্নগ্রস্ত হয়ে পড়ে সে। এমন প্রতিশ্রুতি তো সন্ধ্যালাপিতা কতো জনকেই দেয় সে—পালন করবার দায়িত্ব রইলো না ভেবেই দেয়। অপরপক্ষ থেকে এ নিয়ে কোন অনুযোগ ওঠেনি এর আগে।

বিলম্বিত লয়ের তালের মতো তখনো সমে আসেনি শীলা, আরোহী সুরে বলতে থাকে,—"তারপর পুরো একমাস কেটে গেল, পাত্তাই নেই আপনার। জানেন অন্ততঃ পাঁচদিন সন্ধ্যাপিকার কাছে আপনার খোঁজ নিয়েছি আমি। সে কী ভাবলো বলুন তো?"

রাজেন কি যেন বলতে যায় কিন্তু তার আগেই মুখে ঘোলা সোডার বোতলের মতো ফনফনিয়ে ফেনিয়ে উঠতে থাকে শীলার কথাগুলো,—"একটু ভাল গাইতে পারেন বলে তারি বেয়াক আপনার, না?"

বিপন্ন সুরে রাজেন বলে—"ছি ছি এসব কি বলছেন আপনি? আমি সে ধরনের লোকই নই। মানে ব্যাপার হচ্ছে—"

"থাক আর ব্যাখ্যার দরকার নেই—" মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে শীলা বলে,—"আপনারা শিল্পী বলে আমাদের মতো সাধারণ মেয়ের সঙ্গে মিশতেও চান না—"

এবারে অভিমানের ছিপি শীলার কথার উৎসমুখে ভালো করে চেপে এঁটে বসে। শরীরটার বেঁকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে চুপ করে বসে রইল সে।

মহা ফাঁপরে পড়ল রাজেন, এ অবস্থায় কি করা উচিত, কি বলা উচিত তা সঠিক জানা নেই তার। চলন্তিত লক্ষ্যের অস্পষ্ট পরিষ্কার ভাবে দেখতে পায় সে, কিন্তু শীলার মতো মেয়ের অন্তর্লোক দুর্জ্ঞেয়রহস্যে ঢাকা তার কাছে। তবু, মিষ্টি লাগছিল তার ঝাল ঝাল টক মিষ্টি কথাগুলো এবারে একেবারে পরম মৌন অস্বস্তিতর ঠেকতে থাকে। একবার ইচ্ছা হয় দুঃসাহসীর মতো হাত বাড়িয়ে শীলার মুখখানা নিজের দিকে ফিরিয়ে আনে।

হাত বাড়াবে কি বাড়াবে না ভাবতে ভাবতেই

আবার তার দিকে ঘুরে বসে শীলা। স্থির দৃষ্টিতে রাজেনের চোখে সোজাসুজি তাকিয়ে গাঢ় গলায় বলে,—"কবে যাবেন বলুন—"

শীলার চোখের কালো মণি দুটির ভেতর সিনেমা হলের আলো প্রতিবিম্বিত হতে দেখে রাজেন, নিজের ছবিও তাতে ফুটে উঠেছে কিনা দেখবার আগেই নিজ থেকেই নত হয়ে গেল শীলার লাজুক চোখ।

কুণ্ঠিত স্বরে রাজেন বলে,—"আমার এ কথা শুনে আমাকে কোনোদিন মার্জনা করতে পারবেন কিনা জানি না, কিন্তু সত্যি সত্যিই বলছি, আপনার বাড়ির ঠিকানা লেখা কার্ডখানা আমি হারিয়ে ফেলেছি—"

থরথরে গলায় বলে—"দয়াপিতার কাছে পেতে পারতেন—"

ঘিন ঘিনে সুরে রাজেন বলে,—"ও আবার কি মনে করবে তাই—"

মেয়েরা যদিও বেশীর ভাগ সময়ে যুক্তির ধার ধারে না, তবু শীলা রাজেনের এই কৈফিয়তটাকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারে না, ঈষৎ প্রসন্ন সুরে বলে,—"কিন্তু আমাদের বাড়ীর নম্বরটা এমন কিছু ধুমের পাঁচের সাতের সি বাই ওয়ান পাঁচু যানবাবা বাই লেন নয় যে ও টুকু মনে রাখা চলে না রাজেনবাবু—"

মাথা চুলকে রাজেন বলে,—"ইস্কুলের মাস্টার মশায়রা কোন দিনই আমার স্মৃতি শক্তির প্রশংসা করেন নি শীলা দেবী, বরং অনেক সময়ে মাথার ভেতর একটি অতি পবিত্র দ্রব্য ঠাসা আছে বলে ঘোষণা করতেন,—তাই আমার এই অনিচ্ছাকৃত অপরাধ মার্জনার যোগ্য—"

শীলার মনের মেঘ কেটে যায়, খিল খিল করে হেসে ওঠে সে বলে,—"আপনার মাস্টার মশায়রা মানুষ চিনতেন বলুন!"

হাসি চেপে রাজেন বলে,—"তা আর বলতে।"

শীলা বলে,—"আচ্ছা আমি আপনার মেমারি টেস্ট করেছি, নম্বর মনে না থাকতে পারে, রাস্তাটার নাম বলুন তো—"

রাজেনের মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি ভর করে। কিয়ক্ষণ চিন্তার ভাণ করে বলে,—"ধরেছি একডালিয়া রোড—"

হেসে কুটিপাটি হতে থাকে শীলা, বলে—"হোল না, হোল না—আচ্ছা, ও নাম আপনার মনে এলো কেন বলুন তো? প্রিয়জন কেউ থাকে বুঝি সেখানে?"

"মোটেই না"—তরল সুরে রাজেন বলে,—"প্রিয়জনের প্রিয়জনে এখনো আবদ্ধ নই আমি শীলা দেবী, আপনার কুলের মতো কুটন্ত মুখখানি দেখে ডালিয়ার কথা মনে এলো আমার—"

"যান খালি খালি দুষ্টুমি—" প্রতিবাদী করে মিষ্টি হেসে শীলা বলে,—" থর্ড প্লেস, বুঝলেন মশাই, খাঁটি নাম্বার থর্ড প্লেস—"

এতক্ষণ পরে নিরাপদ বন্দরের তীরভূমি দেখতে পেয়ে রাজেন বলে,—"কী বল্লেন থর্ড প্লেস? একটা উপমা মনে এলো শীলা দেবী?"

শীলা বলে—"কি বলুন তো?"

রাজেন বলে,—"আয়নাটা কাটায় ভরা আর সেই কাঁটা গাছের মাথায় আপনিই একমাত্র ফুটন্ত গোলাপ শীলা দেবী—"

রাজেনের কথায় শীলার বুকে আনন্দের বান ডেকে যায়। তাই গোপন করবার জন্য অন্য দিকে তাকিয়ে বলে,—"যান আপনি খালি খালি ঠাট্টা—"

রাজেন বলে,—"সত্যি কথাগুলো সময় সময় ঠাট্টা বলেই মনে হয় শীলা দেবী—"

এবার গম্ভীর হয়ে শীলা বলে,—"যাই বলুন রাজেন বাবু আপনি ভারি অমডান'—"

"অমডান'? কি করে বুঝলেন?"

"এ যুগের মেয়েদের দেবী বলছেন—"

"কি বলব তবে?"

"দেবী টুকু বাদ দিলেই মানবী শীলা থেকে যায়—"

"যেমন দেবীদের বেলায় সুবিধা আছে, দেবী বললেই চটে যায়, তা তিনি যে স্তরেরই হোন না কেন, মানবীদের বেলায় অনেক ঝঞ্ঝাট। কাকেও মিস, কাকেও মিসেস,—কেউ বা লেডী, মিসেস কে মিস বলে কেলেঙ্কারি—"

"ওঃ, কথাও বানাতে পারেন আপনি, অত শক্তর দরকার নেই, বলবেন—শীলা—"

"আচ্ছা বেশ—কাল বিকেলে আপনার ওখানে যাবো শীলা, আর বেশ কিছুক্ষণ থেকে এতদিন না যাবার

প্রায়শ্চিত্ত করব—"

"সাধে কি আর অভিমান বলেছি আপনাকে—"

"কেন? আবার কী হল?"

"শীলার সঙ্গে আপনি আজ.—এ সব আমার কখনো? ভেতাল বলে মনে হয় না কথাগুলো?"

"তা হয় বটে। মেনে নিলাম তোমার কথা। কিন্তু "তুমি" তো কখনো এত তরফা হয় না শীলা"—

মিনিট খানেকের জন্য স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে শীলা—"তারপর নীচের দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বলে,—"প্রথম আলাপের পক্ষে খুব বেশী হয়ে যাচ্ছে না কি?"

শীলার মৃদুকণ্ঠে যেন চাবুক লুকিয়ে ছিল, সেই আঘাতে চকিত হয়ে ওঠে রাজেন। সত্যি, কখন যেন অন্তরঙ্গতার প্রকোষ্ঠে অনধিকার প্রবেশ করে ফেলেছে ওরা দু'জন। ভুল ধরা পড়বার পর দু'জনেই যেন কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে।

বিউটি শেষ হবার পর হলঘর আলোকিত হয়ে উঠেছিল একবার তারপর তাও নিভে যায়, শুধু ছবি চলতে থাকে।

কিছুক্ষণের জন্য তন্ময় হয়ে ছবি দেখতে থাকে দু'জন। বন্দী যেনজুয়ের ওপর রোমান সৈন্যদের অত্যাচারের দৃশ্য দেখতে দেখতে শিউরে ওঠে শীলা তার হাতখানা রাজেনের ডান হাত মুঠো করে চেপে ধরে।

রাজেনের দুহাতের মাঝে শীলার নরম কোমল হাত আশ্রয় পায়।

আর কোনো কথা বলে না কেউ, শুধু মিলিত করের স্পর্শানুভূতি দু'জনের হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে রাখে।

শো শেষ হয়।

রাস্তায় নেমে একটা নিশ্বাস ফেলে শীলা, বলে—আপনি কোন দিকে যাবেন?

রাজেন বলে—"শ্যামবাজার—"

"একেবারে উল্টো দিকে?"—জল ছেলে শীলা বলে,—"তা হোক চলুন আপনাকে পৌঁছে দি—"

কথা বলতে বলতে দু'জনে চৌরঙ্গীর রাস্তা পার হয়ে কারপার্কের কাছে দাঁড়ায়, কাছেই শীলার মরিস খানা দাঁড়িয়ে ছিল, তার দুয়ার খুলে রাজেনের মুখে তাকায় শীলা।

কারখানা ট্যাঙ্ক লেনের অন্ধকার গলির ভেতর শীলার চকচকে মরিসখানা কল্পনার চোখে দেখে নিয়ে শিউরে উঠে রাজেন। তার আর শীলার মাঝখানে যে দূস্তর ব্যবধান তা অত্যন্ত স্পষ্ট করে দেখা দেয়। এক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে অন্যদিকে তাকিয়ে দ্রুতকণ্ঠে রাজেন বলে,—না থাক, আমি বাসেই বেশ যেতে পারবো—"

অবাক শীলাকে আর একটা কথাও বলবার সুযোগ না দিয়ে হন হন করে আলো আঁধারিতে নিজেকে লোপ করে দেয় রাজেন।

দু'দিনের ভেতরই রাজেন মর্মে মর্মে বুঝতে পারে যে শীলার পারীরিক সান্নিধ্য থেকে নিজেকে যত সহজে বিচ্ছিন্ন করতে পেরেছে শীলার চিন্তাকে সেভাবে বিসর্জন দেওয়া অত সহজ নয়। শীলার রূপ, তার কণ্ঠস্বর তাকে প্রবল বেগে টানে।

তাই দিন তিনেক পরে বেলভুদা করে যে ঠিকানাটা প্রায় জপমালা করে ফেলেছিল তার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে রাজেন।

হালকাগোছের প্রকাণ্ড বাড়ীটার ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করে রাজেন। বাড়ীর তুলনায় নিজেকে খুব ছোট বলে মনে হয় তার।

অপরাহ্নের সূর্য উঁচু বাড়িগুলোর আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে, নির্মেঘ তারাটে আকাশে নীলিমা ফুটি ফুটি করছে, মোড়ের কাছে কৃষ্ণচূড়ার মাথা যেন সন্ধ্যা হোলী খেলে উঠেছে।

ফটকটা খুলে সিঁড়ির মতো সরু লাল সুরকীর পথ বেয়ে গাড়ী বারান্দায় পৌঁছে যায় রাজেন। মরিসখানা দাঁড়িয়েছিল সেখানে রাজেন পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গে নিখুঁত সাহেবী পোষাকপরা একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক সামনের ঘরের দোর খুলে বেরিয়ে এলেন, ধুতি পাঞ্জাবী পরা রাজেনকে দেখেই তাঁর নাকটা উঁচু দিকে উঠে গেল, ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলেন—"কাকে চান আপনি?"

এমন ভাবে শীলার সুকুমল স্বামীর সামনা সামনি পড়ে যাবে তা ভাবতে পারে নি রাজেন, আমতা আমতা করে করে বলে,—"মিস, শীলা দাস্যাল—"

নাম শুনে ভদ্রলোকের দৃষ্টি কোমল হয়ে আসে,

বলেন—ও, তা বেশ ভেতরে যান—"

কাড়ি ছেড়ে দেয়, একজন পাইক থেকে একরাশ ফোড়া ফোটায়েন রাজেনের মুখে চোখে এসে লাগে

দু-পা এগোয় ঠুলে ঘরের ভেতর চোকে রাজেন। ঘরের ভেতরটা ঠাণ্ডা নরম অন্ধকার ঢাকা। চোখে সয়ে গেলে রাজেন বুঝতে পারে যে ঘরটি এ বাড়ীর ড্রইংরুম

মাঝখানে মোটা কার্পেট বিছানো, তার ওপরে একটি কারুকার্য করা গোল টেবিল, চারপাশে আধুনিক ঢংয়ের ভারিক্কি আকারের সোফা সেটটি। দূরে এককোনে একটি শুভ্র রেডিওগ্রাম। ঘর ফাঁকা।

কি করবে, কাকে ডাকবে ভাবছে রাজেন। এদের বড়লোকদের বাড়িতে সে বেশ অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে চিরদিন। আদর কায়দার সামান্য ত্রুটিতে প্রলয় ঘটে যেতে পারে।

বারান্দার ঘাসের চটিতে নরম শব্দ ওঠে, আশা ভরা চোখ নিয়ে দরজার দিকে তাকায় রাজেন শীলাকে কি বলবে তা তালিম দেয় মনে মনে।

পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢোকে একটি যুবতী। ঘরের নরম, নীল, ঠাণ্ডা অন্ধকার যেন বিদ্যুৎ বাহিত হয়ে ওঠে, ভদ্রতা ভুলে তার একদৃষ্টিতে সে দিকে তাকিয়ে থাকে রাজেন।

অপরূপ সুন্দরী বললেও যেন সবটা বলা হয় না এই কলিত-কাঞ্চনাকে। কিনা কিনে পাতলা সাড়িটা যেন কোনো আবরণই রচনা করতে পারে নি এই তরঙ্গিত দেহযষ্টির। এককালে সংস্কৃত পড়েছিল রাজেন, মহাকবি কালীদাসের বহু উপমা ভীড় করে আসে তার মনে।

নাগরাজ কন্যা উলূপীর মতোই বিম্বাধরোষ্ঠী হাসি হেসে যুবতী প্রশ্ন করে,—"আপনি কে? কাকে চান?"

লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে রাজেন বলে,—"আমি রাজেন ভাদুড়ী, শীলার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি—"

রাজেনের কথা শুনে যুবতীর দৃষ্টি তীব্র হয়ে ওঠে, বিদ্যুৎভরা চাহনী দিয়ে রাজেনের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করে বলে—'ও বসুন—"

নিমেষে ভাবে বলতে গিয়ে রাজেন নরম সোফার ভেতর অর্ধেক ঢুকে যায়।

"আমার নাম লীলা, শীলার দিদি,"—রাজেনের পাশে কুশ করে বসে পড়ে লীলা বলে,—"আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি বলে মনে হচ্ছে—"

লীলার গা দিয়ে যেন অবিরাম অগ্নি তরঙ্গ প্রবাহিত হচ্ছে। সোফার হাতলের ধার ঘেঁষে বসে রাজেন বলে —"হয়তো গ্রামোফোন কোম্পানীর বিজ্ঞাপনে আমার ফটো দেখেছেন—"

মিষ্টি হেসে লীলা বলে,—"ও, তাই বলো, তুমি সেই রাজেন!—ওই যাঃ, তুমি বলে ফেললাম, রাগ করলে না তো—"

"না না রাগ করব কেন?—" তাড়াতাড়ি রাজেন বলে "আপনি আমার চেয়ে বয়সে বড়োই হবেন, বিশেষ করে শীলার দিদি আপনি,—"

বয়েসের উল্লেখে লীলা গম্ভীর হয়ে যায়, বলে,—"শীলার সঙ্গে তোমার কদিনের আলাপ?—"

"বেশী দিন—" সন্ত্রস্তভাবে রাজেন বলে,—"এক-দিন আসতে বলেছিল তাই এলাম,—তা শীলা বাড়ীতে আছে কি?"

সে কথার জবাব না দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে লীলা বলে, "দাঁড়াও, আগে তোমার জন্য একটু চায়ের ব্যবস্থা করি—"

যেন একটা চালকা পাখির পালকের মতো ভাসতে ভাসতে বারান্দায় অদৃশ্য হয়ে যায় লীলা।

লীলার আচরণ যেন কেমন অদ্ভুত ঠেকে রাজেনের কাছে।

মেয়ে মহলে রাজেনের গলার চেয়েও তার চেহারার প্রশংসা বেশী। সে জানে যে মেয়েদের হৃদয়ের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতে হলে রূপের প্রবেশ পত্রটি থাকা চাই। তাই আজ সে একটু বিশেষভাবেই বেশভূষা করে এসেছে শীলার কাছে। মাঝখানে তার দিদি এসে দাঁড়াবে তা সে কল্পনা করতে পারেনি। শীলার সঙ্গে একবার দেখা করবার জন্য তার মনটা ছটফট করতে থাকে।

মিনিট পাঁচেক ভেতরেই লীলা ফিরে আসে, তার

পেছন পেছন একটা ট্রের উপরে দুকাপ চা আর বিস্কুট নিয়ে আসে হিমছাম চেহারার এক ছোকরা। গোল টেবিলটার ওপর ট্রে টি নামিয়ে রেখে নিঃশব্দে বিদায় নেয় সে।

রাজেনের পাশে তার গা ঘেঁষে বসে লীলা, লীলায়িত হাতখানা বাড়িয়ে এককাপ চা তুলে নেয়, রাজেনকে বলে,—"চা নাও—"

লীলার হাবভাব ভাল ঠেকে না রাজেনের কাছে, কাঠের মত হয়ে যায় তার শরীর, চুপচাপ চায়ের কাপটি তুলে নিয়ে যন্ত্র চালিতের মতো ঠোঁটের কাছে এগিয়ে নেয়।

চা খেতে খেতে আপাঙ্গে তাকিয়ে লীলা বলে,—"শীলার সঙ্গে আজ আর তোমার দেখা হবে না রাজেন—"

চমকে ওঠে রাজেন,—হাত কেঁপে খানিকটা চা প্লেটে পড়ে যায়, সপ্রশ্ন চোখ দুটো তুলে বলে—"কেন?"

বিচিত্র হাসি হেসে লীলা বলে,—"শীলা আজ তার প্রাণের বন্ধু সুকান্ত নিয়ে গেছে, তোমার নাম করলাম এমনভাবে আমার দিকে তাকালো যেন তোমাকে সে চেনেই না —"

লজ্জা আর অপমানে রাজেনের মুখ চোখ লাল হয়ে ওঠে, মুখের চা বিষের মতো তেতো হয়ে যায়, উঠতে চায় সে কিন্তু উঠতে পারে না লীলা তার ডান হাত দিয়ে রাজেনের উরু চেপে ধরে।

সান্ত্বনার সুরে লীলা বলে,—শীলুটা চিরদিনই অমনি। দেখা হলে এমন ব্যবহার করবে যেন তুমি তার কতো আপনার, আবার চোখের আড়াল হোলেই তোমাকে বেমালুম ভুলে যাবে। ছেলেরা ওর ঘোঁজে আসে আর আমাকেই হাপা সামলাতে হয়।"

প্রথম আঘাতটা ততক্ষণে সামলে নিয়েছে রাজেন, লীলার চোখ দুটো এড়িয়ে মৃদুকণ্ঠে বলে,—"খুব আশ্চর্য তো—"

কথাটা লুফে নিয়ে লীলা বলে,—"আশ্চর্য বলে আশ্চর্য! আমরা ওকে কত বোঝাই, দেখ শীলু, পুরুষ মানুষদের নিয়ে এমন খিস্তুর খেলাটা ভালো নয়, কিন্তু কার কথা কে শোনে। তবে হ্যাঁ, সুকান্তের ওপর ওর একটু দুর্বলতা আছে তা স্বীকার করতেই হবে—দিন নেই রাত নেই সুকান্তকে নিয়ে মেতেই আছে! ভারী বিশ্রী—"

লীলার কথাগুলো রাজেনের কানে বজ্রবর্ষণ করে না। নিজের ওপর ধিক্কার জন্মে যায় তার, একদিনের দিবাস্বপ্নের ছবিগুলো মানসপটে ভেঙে ওঠে, লজ্জায় যেন মাথা কাটা যায় তার।

চট করে রাজেনের হাতটা ধরে ফেলে লীলা, মিষ্টি সুরে বলে—"কেন মিছে মনে মনে কষ্ট পাচ্ছ রাজেন, শীলু না থাক আমি তো আছি, রাতে যদি এসো না, গল্প গাছা করা যাবে। ভালো কথা তোমার ঠিকানাটা দাও তো—"

যে ঠিকানাটা লীলাকে দিতে সেদিন ইতস্ততঃ করে ছিল রাজেন, আজ তাই বিনা দ্বিধায় লীলাকে দিয়ে দেয় অভিভূতের মতো। লীলার রক্তিম ঠোঁটের দুই কোণে তীব্র বিষ্ণুর হাসি পলকের জন্য ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

সে রাতে বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ ঘুম আসে না রাজেনের চোখে। ছলনাময়ী লীলার কথাগুলো যেন বিষ্ণুর ধ্যানের মতো তার সারা শরীরে ফোলতার হুল ফোটানোর জ্বালা ধরিয়ে দেয়, তার দিদি লীলাকে মনে হয় স্বর্গের দেবী।

দিন সাতেক পরে।

দক্ষিণ কলিকাতায় এক গানের জলসায় পর পর অনেকগুলো গান গেয়ে শিল্পীদের জন্য নির্দিষ্ট বিশ্রাম কক্ষে চুপ চাপ বসে ছিল রাজেন। মহিলা শিল্পীরা সবাই গেছে তাই নিরবিল প্রসন্নতায় বেশ আরাম অনুভব করে সে।

একটু পরে উদ্যোক্তাদের একজনের গলা শুনতে পায় দরজার বাইরে,—হ্যাঁ হ্যাঁ—এই ঘরে বিশ্রাম করছেন উনি, যান, ভেতরে চলে যান—"

তাড়াতাড়ি হাত পা গুটিয়ে সভ্য ভব্য হয়ে বসে রাজেন। খোলা দরজার মুখে ছায়া পড়ে, একটু পরেই ঘরে ঢোকে শীলা। ঢুকেই প্রবল অনুযোগের

সুরে বলে ওঠে,—"বাঃ, বেশ লোকত তুমি,—দেখিন সিনেমার অত কথা, অত আলাপ, 'তুমি' বলার জন্য অত অনুরোধ, সবই কি মেকি। একদিনের জন্যও কি আমাদের বাড়ী যেতে পারলে না? আমি এদিকে রোজই ভাবি আজ আসবে, আজ আসবে,—কিন্তু—এ কি! কী হল? অমন করে চেয়ে আছ কেন?"

অবাক রাজেন হাসবে কি কাঁদবে ভেবে পায় না। এমন স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা বলছে শীলা যে তাকে অভিনয় বলে ভাবাও যায় না। শীলার কথাগুলো মনে পড়ে রাজেনের। তার ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ঠোঁট দুটি চিরে বেরিয়ে আসে—"মাপ করবেন, আমার নাম সুকান্ত নয়—"

উৎসাহে উচ্ছল শীলার রক্তিম মুখে যেন কালো ছায়া পড়ে, তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে—"সুকান্ত"? সে আবার কে?

কঠিন সুরে রাজেন বলে,—"আর ন্যাকামী করবেন না শীলা দেবী, সুকান্তকে চেনেন না? কিন্তু আমি চিনি, আমি জানি,—সুকান্ত আপনার দাদার—"

শীলার দুচোখ যেন বিদ্যুৎ বর্ষণ করে—তীব্র সুরে বলে—"ডাহা মিথ্যা কথা। কে তোমাকে বলেছে এ সব?"

এই দৃপ্ত সিংহিনীর সামনে পড়ে হকচকিয়ে যায় রাজেন, তবু জোর করে বলে ওঠে,—"বলেছে আপনার দিদি শীলা—"

কুঁদিয়ে নিবিয়ে দেওয়া দলতের মত কালো হয়ে যায় শীলার মুখ,—অস্ফুট স্বরে বলে—"কী বলে আবার দিদি?

রাজেন বলে,—হ্যাঁ, তা হয়েছে কি? কথাগুলো তো আর মিথ্যে নয়?

দু হাতে মুখ ঢেকে কাছের চেয়ারটায় বসে পড়ে শীলা? তার সারা শরীর দিয়ে একটা কম্পনের ঢেউ বয়ে যায়।

ব্যাকুল হয়ে ওঠে রাজেন। অচেনা ক্লাবের নির্জন ঘরে একজন সুন্দরী তরুণীকে তার সঙ্গে এমন অবস্থায় কেউ দেখলে একটা যা তা ভেবে বসা অসম্ভব নয়। নীচের রেস্তোরাঁ থেকে অবশ্য এখনও গানের মিষ্টি সুর ভেসে আসছে, তবু উদ্যোক্তাদের কারুর এসে পড়াটা বিচিত্র নয়

চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজার কাছে গিয়ে গলা বাড়িয়ে দুদিকে তাকায় রাজেন। লম্বা বারান্দায় জনপ্রাণী নেই। সবাই গেছে নীচে গান শুনতে।

চঞ্চল পায়ে শীলার পাশে গিয়ে দাঁড়ায় রাজেন, শীলার মুখ থেকে তার হাত দুটো জোর করে ছাড়িয়ে নেয়, গরম চোখের জলে তার হাতের আঙ্গুল গুলো ভিজে যায়।

উঠে দাঁড়িয়ে কান্না ভেজা মুখখানা রাজেনের বুকে লুকায় শীলা। দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরে রাজেন। কোথা থেকে কী হয়ে যায়, বেতস পাতার মতো কাঁপতে থাকে বেপথুমতী শীলা।

কিছুক্ষণ পরে মৃদু স্বরে রাজেন বলে—"ছাড়ো, কেউ দেখে ফেলবে—"

রাজেনের আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়ে ছোট রুমাল দিয়ে চোখ মুখ মুছে চেয়ারে বসে শীলা।

বিব্রতভাবে রাজেন বলে,—"বাইরে তোমার এক পরিচয় পাই কিন্তু বাড়িতে তোমার অন্য পরিচয় কেন শীলা?

অন্যমনস্কভাবে কিছুক্ষণ রাজেনের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে শীলা বলে,—"তোমাকে কয়েকটা কথা বলব রাজেন, কিন্তু এখানে নয়, কাল বিকেলে চৌরঙ্গীর অমাতিকে রেস্তোরাঁয় এসো ছটার সময়ে, সেখানে নির্জনে বলব।"

এমন সময়ে নীচে থেকে হাততালির প্রচণ্ড শব্দ ভেসে আসে। অস্পষ্ট কোলাহল আর চেয়ারের শব্দ থেকে রাজেন বুঝতে পারে জলসা শেষ হয়ে গেছে।

চলে যাবার মুখে কালকের নির্জন সাক্ষাতের কথা আবার মনে করে দিয়ে যায় শীলা।

এ রাতেও ভালো ঘুম হয় না রাজেনের বিছানায় ছটফট করতে করতে ভোর হবার প্রতীক্ষা করতে থাকে। তার ধোপদস্ত পাঞ্জাবীর বুকের কাছটাতে শীলার চুলের গন্ধ লেগে আছে, সেটা গা থেকে আর খোলেনি রাজেন। শীলার বুকের উষ্ণ স্পর্শ, তার নরম ঠোঁটের স্বাদ মাতাল করে রাখে রাজেনকে।

ঠিক সন্ধ্যা ছ'টায় অনাহূত রেস্তোঁরার সামনে শীলার মরিসখানা থামে। শাড়ীতে, গহনায় আর রূপে ঝলমল করতে করতে নেমে আসে শীলা, আর সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত পদে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ায় অপেক্ষমান রাজেন।

একটু পরে ছোট্ট কেবিনের নিরালায় দুজনে নিঃসঙ্গ হয়। চায়ে রাজেনের তত্তটা রুচি নেই যতটা আছে শীলার মুখ থেকে তার দিদির বিচিত্র কাহিনী শুনবার।

তার আগ্রহ ব্যাকুল চোখ দুটোর দিকে তাকায় শীলা, ম্লান হাসি ফুটে ওঠে তার মুখে। বলে,—"দিদির সর্বনাশা রূপতো দেখেছো? বিয়ের আগে ওর ওই রূপের জালে কতো ছেলে যে আটকে গিয়েছিল তার ঠিক নেই। ছেলেদের নিয়ে ও একটা একটা নিষ্ঠুর খেলায় মেতে উঠতো। আমি তখন খুব ছোট নই, তাই দিদির এসব অন্যায় দেখে খুব রাগ হতো আমার। মা থাকলে হয়তো এমনটা হোত কিন্তু মা তার চার পাঁচ বছর আগেই মারা গেছেন। বাবা উদাসীন প্রকৃতির মানুষ, নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত। মেয়েরা যে কী করছে না করছে সে দিকে মোটেই খেয়াল রাখতেন না, তাই দিদি অমন উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছিল। শেষটায় ব্যাপার যখন অনেক দূর গড়ালো দিদি এক বাঙ্গালী ছোকরার সঙ্গে হাওয়া হয়ে গেল। ছমাস পরে সব গয়নাগাটি, টাকা পয়সা খুইয়ে, এক দুরারোগ্য ব্যাধিকে সঙ্গে করে নিয়ে দিদি ফিরে এলো বাবা প্রথমটায় খুব রাগারাগি করলেন, তারপর দিদির বিয়ের চেষ্টা করতে লাগলেন। সোসাইটির সবাই দিদির কীর্তি কাহিনী জানতো, তাই সেখানে কারো সঙ্গে দিদির বিয়ের ব্যবস্থা বাবা করতে পারলেন না। শেষকালে মাইথনে এক উদ্বাস্তু ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের সন্ধান পেলেন। সিভিল ইঞ্জিনিয়ার সুকান্ত রায়ের সঙ্গে বিয়ে হল। প্রচুর খরচ করলেন আমার বাবা, দিদিকে বুঝিয়ে বললেন যে, যা হবার তাই হয়ে গেছে। এবার যেন আদর্শ স্ত্রীর মতোই দাম্পত্যজীবন যাপন করে সে।

"জামাইবাবু হীরের টুকরো ছেলে, দিদির আগের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছুই জানতো না, সুতরাং বিশ্বাসে দিদিকে ভালবাসলো। দিদিও বাপ মরে বেশ কাটালো মাইথনে। আমি ও বাবা মাঝে মাঝে যেতাম দিদির সংসার দেখতে।

"কিন্তু স্বভাবকে অতিক্রম করা সহজ নয়। ছমাসের মধ্যেই দিদি আবার 'স্বমূর্তি' ধরলো। ক্লাবে, পার্টিতে নানাজনের সঙ্গে অবাঞ্ছিত মেলামেশায় মেতে উঠলো। জামাইবাবু খুব রেগে উঠতেন, অভিমান করতেন। তাতে দুদিনের জন্য হয়ত ফল হত, কিন্তু তারপর যে-কে সেই। দিদি ধানবাদ থেকে দুরু করে কুলটি, আসানসোল, বার্নপুর যাবতীয় জায়গা চষে বেড়াতো একা একা বাবার দেওয়া মোটর কারটি নিয়ে। বিভিন্ন দিনে তার সঙ্গী হত বিভিন্ন লোক।

"সারা মাইথন দিদির চাপা কুৎসায় ভরে গেল। সবাই জামাইবাবুকে শুনিয়ে শুনিয়ে দিদির বিষয়ে খারাপ কথা বলতো। জামাইবাবু একেবারে পাগলের মতো হয়ে গেলেন।

"আমরা খবর পেয়ে ছুটে গেলাম, বাবা দিদিকে কত বোঝালেন, বোঝালেন পেটের রোগে উঠে চড় মেরে বসলেন। সেই রাতেই আবার দিদি হাওয়া হয়ে গেল।

"লজ্জায় অপমানে জামাইবাবু আত্মহত্যা করলেন।" এতটুকু বলে শীলা থামে। রাজেন লক্ষ্য করে যে তার দুচোখ জলে ভরে উঠেছে দুঃখের এই কাহিনী শুনে রাজেনের মনও সমবেদনায় আর্দ্র হয়ে ওঠে।

আধানীচু করে চামচ দিয়ে প্লেটের ভুক্তাবশেষগুলি আনমনে নাড়তে নাড়তে নিজেকে সামলে নেয় শীলা বলে, কিছুদিন পরে আবার ধূমকেতুর মতো দিদি কলকাতায় এসে হাজির হল। জামাইবাবুকে যে দিদি কতটা গভীরভাবে ভালোবেসেছিল তা আগে আমরা জানতে পারিনি, পারলাম এবারে।

"ফিরে এসেই দুলো পায়ে দিদি আমাকে জড়িয়ে ধরে, হু-হু করে কেঁদে ওঠে বলল,—"আমি বড়ো ভুল করেছি শীলা, ওকে ছাড়া আমি বাঁচব না তুই আমাকে তোর জামাইবাবুর কাছে নিয়ে চল শীলু নইলে ও হয়তো আমার মুখ দেখবে না। ও তোকে

খুব স্নেহ করে, তোর কথা ফেলতে পারবে না—

"নিরুপায় বেদনায় আমার বুকটা যেন মুচড়ে ভেঙ্গে পড়তে চাইলো। স্পষ্টই বুঝলাম যে জামাই বাবুর আত্মহত্যার কথা দিদি এখনো জানে না। এতদিন পরে দিদি তার নারী সত্তা ফিরে পেয়েছে কিন্তু বড্ডো দেরীতে।

"আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে দিদি আমার দুহাত চেপে ধরে বলে উঠলো.—কথা বলছিস না কেন শীলু, তুই কি যাবি নে? বেশ, আমি তবে একা একাই যাবো, যেমন করে পারি ওর ক্ষমা চেয়ে নেব—"

আমার মুখ থেকে একটা আর্তস্বর বেরিয়ে এলো—'কার কাছে যাবে দিদি?'

"ক্যাল ক্যাল করে আমার মুখে তাকিয়ে দিদি বলল—'কেন সে কি মাইথনে নেই?'

"বলতে আমার বুক ফেটে গেল, তবু বললাম, না দিদি, জামাইবাবু মাইথনে নেই, বাংলা দেশে নেই, এই পৃথিবীর কোথাও নেই—"

'কী বলছিস তুই রাক্ষসী,—' বলে চীৎকার করে উঠলো দিদি, তারপর অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

"মাস খানেক বিছানায় পড়ে রইল দিদি, তারপর আস্তে আস্তে শরীরের দিক থেকে সেরে উঠলো বটে, কিন্তু মনের এক নতুন রোগ দেখা দিল।

"আমার কলেজের বন্ধুরা মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করতে আমাদের বাড়ীতে আসতো, তাদের একে একে তাড়ালো দিদি। কোন পুরুষ মানুষকে আমার কাছে ঘেঁষতে দেয় না, নানা কৌশলে তাদের তাড়িয়ে দেয়। আমাকে সহজে একা বার হতে দেয় না। ওর মনে কেমন একটা ধারণা হয়ে যে জামাইবাবু এখনো বেঁচে আছে, আর আমার সঙ্গে গোপনে দেখা করে, আমার কাছে প্রেম নিবেদন করে। এ নিয়ে আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে প্রচণ্ড ঝগড়া করে আমার দিদি। ওর ভয়ে আমার চেনা পরিচিত কোনো ছেলেই আমাদের বাড়ীতে যায় না। নানা ছলা কলায় তাদের ভোলাতে চেষ্টা করে দিদি, আমার সম্বন্ধে নানা অলীক কথা বলে তাদের মন বিষিয়ে দেবার চেষ্টা করে। আমি—আমি—হাঁপিয়ে উঠেছি রাজেন, ও বাড়ীটা আমার কাছে একটা বিভীষিকা—"

নারী চরিত্রের এমন একটা দিক দেখে অবাক হয়ে যায় রাজেন। তার মুখ দিয়ে কোনো কথা বার হয় না।

শীলা বলতে থাকে,—"বাবাও লক্ষ্য করলেন ব্যাপারটা। নানা মনো বৈজ্ঞানিকের কাছে নিয়ে গিয়ে দিদির চিকিৎসা হল, কিন্তু এ রোগ আর সারল না। বাবা নানান জায়গায় আমার বিয়ের ব্যবস্থা করলেন, কিন্তু সোসাইটির কেউ দিদির ইতিহাস জেনে তার ছোট বোনকে বিয়ে করতে সাহসী হল না। সোসাইটির বাইরে নানা জায়গায় সুপাত্রের সন্ধান করলেন বাবা, দিদি প্রত্যেকবার ভাংচি দিয়ে চিঠি লিখে সে সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিতে লাগলো। যে মেয়ের চারিত্রিক-দুর্বলতার চিঠি আগে তাকে বিয়ে করতে এগিয়ে আসবে কোন বর? রাজেন, আমি এই বন্দী দশা থেকে মুক্তি চাই। কিন্তু মুক্তির কোনো উপায় খুঁজে পাই না। আমি তোমাকে অনেক জায়গায় অনেক পার্টিতে দেখেছি, তোমার গান আমাকে মুগ্ধ করেছে, মনে মনে আমি তোমার অনুরাগিনী। তুমি শিল্পী, তুমি আমার মনের ব্যথা নিশ্চয় বুঝবে, আমার দিকে তোমার হাতটা কি বাড়িয়ে দেবে না রাজেন?"

গভীর আবেগে থর থর করে কাঁপতে থাকে শীলার গলা।

উষার আভাষে আকাশ যেমন তিমিরাবরণ থেকে মুক্ত হয়ে স্বচ্ছ হয়ে ওঠে, তেমনি নবজনুরাগের অরুণোদয়ে রাজেনের মনের আকাশ ঝলমলিয়ে ওঠে।

নীরবে তামহাত খানা বাড়িয়ে শীলার হাতের ওপর রাখে রাজেন। আয়ত চোখ দুটি রাজেনের মুখে চায় শীলা। মুক্তার মতো দুটি অশ্রুবিন্দু বিদ্যুতের আলোতে ঝকমক করে।

দুঃখের অশ্রু আনন্দের আকর্ষণে আটকে থাকে পড়তে পারে না।

মধ্যবিংশ শতক ও বাংলা ছোটগল্প

প্রলয় সেন

নিছক কাল-সন তারিখের হিসেবে সাহিত্যের ঘুটিনাটি বিচার করতে বসার চেয়ে ক্লান্তিকর আর কিছুই হতে পারে না। সময়ের সঠিক হিসেব সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার সীমা-পরিসরের মধ্যে সুরক্ষিত, সে বিচার অভ্রান্ত ও সর্ববাদী-সম্মত। কিন্তু শিল্প সাহিত্য যে হেতু বহতা নদীর মত নানা ভাবনা ও প্রয়াসের তরঙ্গভঙ্গে নিয়ত প্রস্তরমান সে কারণে তার দিক পরিবর্তন সরেজমিনে মাপজোক করা প্রায় দুঃসাধ্য। বক্ষ্যমান প্রবন্ধের তাৎপর্য অনুসন্ধানে অত্যুৎসুক কোন পাঠক যদি প্রারম্ভেই কিছু প্রশ্ন করে বসেন, যেমন, (ক) মধ্যপঞ্চাশে বলতে সঠিকভাবে কোন সাল থেকে বাংলা ছোটগল্প নতুন পথে চলতে শুরু করল, বা (খ) পঞ্চাশোত্তর বাংলা ছোটগল্পে কি এমন কিছু যুগান্তকারী লক্ষণ ও বিশেষত্ব ধরা পড়েছে যাতে করে পূর্ববর্তী কল্লোলযুগের উচ্চতর পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরও একালের গল্পকারদের নিয়ে স্বতন্ত্র ও বিশদভাবে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে, অথবা (গ) একালের ছোটগল্প শিল্পপ্রকরণে আঙ্গিকপ্রকর্ষে বা জীবনচিন্তনে এমন কি কোন নবতর দিগন্তের উন্মোচন ঘটিয়েছে যার জন্যে পাঠক সম্প্রদায়কে পূর্বসংস্কার পরিত্যাগ করে নতুন করে তৈরী হবে—তাহলে চট করে সব প্রশ্নের যুতসই উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠবে না। প্রথমত পঞ্চাশোত্তর গল্পকারকদের রচনার সালতামামি আলোচ্য প্রবন্ধের এক্তিয়ারভুক্ত নয়। দ্বিতীয়ত: সব দেশের সমস্ত সৃষ্টির মতই এ ক্ষেত্রেও সন্ধেবেলার প্রদীপজ্বালানোর আগে সকালবেলার শঙ্খ বাজানোর ব্যাপারটি স্মরণ রাখতে হবে। সম্পূর্ণ ঐতিহ্যবিরোধী কালোপাহাড়ী চাল ইতিহাসের কাঁক-ফোকড়ে কচিৎ লক্ষ্য করা গেলেও সাহিত্যে এমন দুর্দৈব ঘটনার নজীর কদাপি মিলবে না। বিশেষ করে বিশ শতকের প্রতিটি দশক সম্পর্কসূত্রে পরস্পরের সঙ্গে এমনভাবে শৃঙ্খলিত যে তাদের পৃথক করে বিচার করতে বসা নির্বুদ্ধিতার সামিল। এ কথা তর্কাতীত যে পঞ্চাশোত্তর বাংলা ছোটগল্পে পূর্বতন কালি-কলম-কল্লোলযুগের প্রভাব নিঃসন্দিগ্ধ। শৈলজানন্দের কয়লাকুঠির গল্প, অচিন্ত্য সেনগুপ্তের গ্রামবাংলার গল্প, প্রেমেন্দ্র মিত্রের অ্যাড-ভেঞ্চার মিশ্রিত রোমান্টিক এবং মনস্তাত্ত্বিক মেজাজের যুগ্মপ্রয়াসে সৃষ্টি সুডৌল অবিস্মরণীয় গল্পগুলি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্মম ও নিস্পৃহ মনস্তত্ত্বপ্রস্রষ্টা অন্তর্ভেদী দৃষ্টিভঙ্গী, আঞ্চলিক আভিজাত্যাভিজাত্যের বলিষ্ঠ জীবনায়ন—এই সব প্রচেষ্টা থেকে স্বাদবৈচিত্র্যে বা আঙ্গিককুশলতায় বাংলা ছোটগল্প খুব বেশী দূরে এগুতে পারেনি। পরন্তু, মধ্যপঞ্চাশের গল্প-কারকদের অধিকাংশই এখনো সৃষ্টিকর্মে নিয়ত, সমালোচক ভবিষ্যদ্রষ্টা বা তত্ত্বধারক নন। এদের অপেক্ষিত পরিণতি সম্পর্কে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করতে যাওয়া হঠকারিতা মাত্র। তবে মোটামুটি এদের এতাবৎ প্রকাশিত রচনাক্রম অনুসরণ করে আমাদের পক্ষে এমনতর সিদ্ধান্তে আসা কষ্টসাধ্য হবে না যে এ কালের রচনায় আমরা এমন সব অভিজ্ঞতা বক্তব্য এবং জীবনচর্যার সাক্ষাৎ পেয়েছি যা প্রচলিতধারার রীতিমত নতুন অভিঘাতের সৃষ্টি করেছে। মোটা-মুটিভাবে উনিশ শ' চল্লিশ থেকে উনিশ শ' পঞ্চাশ-ষাটদশক এই নবতর ধারার ভরাকোটালের সময়। তারপর অবশ্য অতিসাম্প্রতিককালে আরো নবতর পরীক্ষা-

বিংশীকা বাংলা ছোটগল্পকে জটিলতার স্তরে নিয়ে চলেছে। এই জটিল সাম্প্রতিকদের গল্পচেতনার প্রকাশ এখনো প্রচুর বিতর্কের বিষয়। সুতরাং এঁরা আমাদের আলোচনার আওতায় পড়বে না, প্রসঙ্গত এদের কৃতির কথা উল্লেখ করা চলতে পারে। উনিশ শ' চল্লিশ থেকে উনিশ শ' পঞ্চাশ-ষাটের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক সবদিক থেকেই বাংলার ইতিহাসে এক ক্রান্তিকাল। সাহিত্যসংলগ্ন নয় চলচ্চিত্র জীবনের দর্পণ। ফলত একালের তাবৎ ঘটনাবর্তের প্রতিক্রিয়া শিল্পলোককেও যথাযোগ্য আলোড়িত করেছিল এ কথা অনস্বীকার্য। এই সময় বাংলা দেশের সমাজ-জীবনে পর পর এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটে গেছে যার প্রতিতুলনা অতীতে মিলবে না। সন্দেহ নেই, মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা পঞ্চাশের আগেও আমরা প্রত্যক্ষ করেছি এই শতকেরই দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে। কিন্তু এই দুই যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া একরকমের নয়। প্রথম মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা এত তীব্র জরুরী বা সর্বগ্রাসী ছিল না। মিত্রশক্তির অন্তর্ভুক্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যতম বৃহৎ উপনিবেশ হিসেবে যেটুকু প্রতিক্রিয়া হওয়া সম্ভব তার বেশি কিছু হয়নি। সাহিত্যে তার কোন উগ্র তপ্ত অস্থির প্রতিফলন ঘটেনি, প্রভাব এবং প্রতিক্রিয়া যেটুকু ধরা পড়েছিল তা প্রধানতঃ মননলোকে। প্রথম মহাযুদ্ধের নির্মমতা ও ভয়াবহতা পশ্চিমের শিল্পিচৈতন্যে যে কেন্দ্রচ্যুতি এবং অস্থিরতার সৃষ্টি করেছিল সেইসব প্রাক্তন চিন্তা আমাদের বুদ্ধিজীবী মানসে আলোড়ন তুলেছিল। ফ্রয়েড-হ্যাভলক এলিসের দেহাশ্রয়ী মনস্তত্ত্ব, ডারউনের বিবর্তন-বাদ, আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতত্ত্ব, বের্গসঁর eternal flux বা অপরিমেয় গতিতত্ত্ব, এবং সর্বোপরি মার্কসীয় দর্শনোদ্ভূত সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ আমাদের মনো-জগতে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। সে কারণে কল্লোলযুগের সম্পাদকদের আদর্শস্থানীয় ছিলেন লরেন্স, হ্যামসুন, হ্যাক্সলি শিরনিস্কোল্লা, জোয়ান বোয়ার প্রমুখ পাশ্চাত্য কথাসাহিত্যিকেরা। উনিশ শতকীয় নব-জাগৃতির প্রেরণাদীপ্ত সমুন্নত ভাবাবেগ এবং ভাবুকতা যুগোচিত কঠিনত্যের আঘাতে শিথিলভিত্তি হয়ে পড়তে সুরু করেছিল এই পর্যায়ে এমন কি রবীন্দ্রনাথের অমিত ধ্যানময় সাধনার স্রোতও কালপরিবেশে অব্যাহত রইল না। যিনি আজীবন রূপ ও অরূপের মিলনসাধন প্রয়াসী এবং যিনি জীবনকে শতবিভক্ত করে দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে ক্ষয় করার বিপক্ষে একভাবে যুদ্ধ করে এসেছেন তাকেও ('ছেঁড়া ছাতা' এবং 'রাজপুত্রের' বা 'হরিপদ কেরানী' এবং 'আকবর বাদশা'র হৃদয়বেদনার প্রাণান্তকর মিলনের চেষ্টা সত্ত্বেও) হরিপদ কেরাণীর বঞ্চিত জীবনের দুঃখকর পরিণতির জন্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে হয়েছে। যিনি পদ্মাপারে সাজাদপুর শিলাইদহের ছোটখাটো সুখদুঃখে সমুজ্জ্বল মানুষ এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ মোহমেদুর প্রকৃতির অবিভাজ্য সম্পর্ককে একদা আশ্চর্য সংবেদনশীলতার দ্বারা ছোটগল্পের আকারে রূপ দিয়ে বিশ্বজনকে বিমোহিত করেছিলেন তাকেও শেষ বয়সে দুঃপ্রভাবে 'লাবরেটরী'র মত নির্মম গল্প লিখতে হয়েছে। আঁকতে হয়েছে নন্দকিশোরের মত উদ্ভট হৃদয়হীন প্রতিষ্ঠা-প্রয়াসী চরিত্র। তাঁর পাশাপাশি আমরা দেখেছি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীব্র অন্তঃচারিতা যা আমাদের মোহময় পারিবারিক সম্পর্কের ওপর নিষ্ঠুর আঘাত হেনেছে। পেয়েছি তারাশংকরের গল্পে অন্তঃসার-হীন সামন্ততন্ত্রের অসহায় জীবনের আলেখ্য। আর প্রেমেন্দ্র মিত্রর গল্পে জীবন, প্রেম ও মহত্ত্বের কি অপ্রতিরোধ্য মূল্যহীনতাই না প্রকাশ পেয়েছে!

প্রাক্ দ্বিতীয়মহাযুদ্ধকালীন বাংলা ছোটগল্পের এই পরিণত প্রসার সত্ত্বেও তার অন্তঃশান্তি একেবারে নিঃশেষিত হয়ে যায়নি। বরং, কালবিবর্তনে তার মধ্যে বৈচিত্র্য, গভীরতা এবং ক্ষেত্রবিশেষে সমৃদ্ধি ঘটেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে বাংলার সমাজজীবনে যোলো কতকগুলি পরিবর্তন ঘটেছিল এবং তার ফলে আমাদের মানস চেতনায় কিছু নতুনতর ভাবনার উদয় হয়েছিল সন্দেহ নেই। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সামন্ত-তান্ত্রিক কাঠামো জীর্ণ হয়ে পড়ায় মধ্যবিত্তজীবনে জীবিকার প্রশ্ন, গ্রামপরিবেশের দূষিত অবস্থায় ক্রম-চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা দ্রব্যমূল্যের আকস্মিক স্ফীতি ইত্যাদি বহুবিধ সমস্যার দ্বারা তখনকার বাঙালীসমাজ আক্রান্ত হতে চলেছে। কিন্তু এসব পরিবর্তন ইতি-

হাসের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য হলেও বৈপ্লবিক নয়। সেই পরিবর্তন এসেছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে। বস্তুত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং তৎপরবর্তী চাকলাকর ঘটনাপুঞ্জই আমাদের চিরপ্রচলিত চিন্তাবস্তাকে সমূলে উৎপাটিত করেছিল। সাতসকালে ঘুম থেকে উঠে বাজার সারবার পর বেরোদেরে ধীরে সুস্থে পান চিবিয়ে ট্রামে বা বাসে চেপে অফিসে যাওয়া আর সন্ধ্যের আগেভাগে বাড়ী ফিরে সিনেমা থিয়েটারে যাওয়া বা খড়ের মাঠে হাওয়া খাওয়া—নগরজীবনের সেই শিথিল ঢিলে ঢালাইতোলা জীবনযাপন সাইরেনের গগনবিদারী সংকেতধ্বনিতে, ব্ল্যাক আউটের অভিশপ্ত অন্ধকারে, খিদিরপুর ডকিয়ার্ডে জাপানীবোমার বর্ষণে বিবাক্ত হয়ে উঠল। ঘরদোর বিষয় আসর সব ফেলে, মানুষ দলে দলে ছুটলো গাঁয়ের পথে। কিন্তু সেখানেও নিশ্চিন্তি কোথায়। কাঁসাই থেকে কর্ণফুলি, তিস্তা থেকে ব্রহ্মপুত্র নদীর তীর পর্যন্ত সর্বত্র বোমারু বিমানের আনাগোনা। ওদিকে এয়ারক্র্যাফটগানের অবিরাম গর্জনতর্জন আর পাল্টা ছাউনি। যুদ্ধের শেষের দিকটায় শুরু হল মন্বন্তর। চাল তেল কাপড় কেরোসীনের বাজারে আগুন লাগল। শেষরাতে রেশনের দোকানে 'কিউ', লম্বাকুড়ো বরাদ্দ। এক বাংলাদেশেই পঞ্চাশ লক্ষ লোক অনাহারে মারা গেল। দেখতে দেখতে পুরোন মূল্যবোধ বিপর্যয়ের মুখে খড়কুটোর মত অতলে তলিয়ে গেল। মধ্যবিত্তের পেছুটান সংস্কারগুলো চুণ বালির মতো খসে পড়তে শুরু করল। কালোবাজারী ও ভেজালের যুগ শুরু হল, ফাটকার বাজার তেজী হয়ে উঠল, গলিকায় নগরের আনাচকানাচ ছেয়ে গেল। অন্যদিকে, রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও নবপর্যায়ের সূচনা দেখা দিল। গান্ধীজীর নেতৃত্বে যে আপসমূলক আন্দোলন চলছিল বহুকাল ধরে কিছুকাল আগে দেশবন্ধুর নেতৃত্বে ও সুভাষচন্দ্র বসুর সংগঠনায় স্বরাজপার্টির প্রতিষ্ঠায় তার বিরুদ্ধে অসন্তোষ ঘনায়িত হচ্ছিল। রাজনীতিতে ক্রমশ বামপন্থী মনোভাব বৃদ্ধি পাচ্ছিল যুগান্তর ও সন্ত্রাসবাদী দলের প্রভাবে। বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনের সময় সেই ধুমায়িত বাঙালীচেতনা সংগ্রামের পথকেই চূড়ান্ত বলে ধরে নেয়। ধীরে ধীরে বাংলাদেশের রাজনীতিতে বামপন্থী প্রাধান্য পেতে শুরু করে। আজাদ হিন্দ ফৌজের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করেছিলাম। নগর জীবনের জটিলতা এবং দ্রুত শিল্পোন্নয়নের ফলে শ্রেণীচেতনা গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। কলকাতা শহরের আশেপাশে শ্রমিক অসন্তোষ মাঝেমধ্যে ধর্মঘটের আকারে প্রকাশ পেতে লাগল। ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ সালে কুখ্যাত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটিয়ে ইংরেজ এদেশ ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। স্বাধীনতা এল, কিন্তু বাঙালীর ভাগ্যে তার পূর্ণ স্বাদ গ্রহণ করার সুযোগ ঘটল না। বৃটিশ রাজনীতির কলঙ্কিত ভূমিকায় বাংলার হৃৎপিণ্ডকে দুটুকরো করে ফেলা হল। পূর্ববঙ্গের লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল মানুষের আগমন, ক্রমবর্ধমান বেকারী, জীবিকার জন্যে বেপরোয়া ও নিদারুণ সংগ্রাম—এই ভাঙাচোরার মাঝখানে নীতি বোধ আর আপ্তবাক্যের শালগ্রাম শিলা কোথায় চাপা পড়ে গেল। বস্তুত মন্বন্তর শতকের মত এমন আপৎকাল বাংলার ইতিহাসে আর কখনো দেখা যায়নি। মুহুর্মুহু আঘাতে খণ্ডবিখণ্ড রক্তাক্ত বাংলার সমাজ জীবনে এমন যুগান্তকারী ভাঙাগড়া—মূল্যবোধের তড়িৎ পরিবর্তন, কেন্দ্র বিচ্যুত অসহায় পারিবারিক জীবন, প্রেম ও প্রেমাবেগের একান্ত অভাব, আত্মসর্বস্বতা, নীতি হীন লক্ষ্যহীন আপাতিক জীবনযাপনের গ্লানি ইত্যাদি যার কোনো তুলনা নেই। ইতিহাসের এই উচ্ছিন্ন ঘূর্ণাবর্ত থেকে কেউ রেহাই পায়নি, পায়নি একালের ছোটগল্পকারেরা। স্বভাবতঃ এপর্যায়ের ছোটগল্পে এই উত্তেজনা কোলাহল বিবেকহীনতা অস্থিরতা সংশয়াচ্ছন্নতা নিরাশ্রয়তা দ্বার্থহীন ভাষায় প্রকাশলাভ করেছে। আবার অন্যদিকে বামপন্থী মনোভাবের ক্রমবর্ধমান আনুকূল্যে এই বংশের দায় ভাগ থেকে উত্তরিত হবার অভীপ্সাও সোচ্চার হয়ে উঠেছে কিছু কিছু গল্পে। যে নিরপেক্ষ অবিবেকী ন্যাচারালীজমের বীজ রোপিত হয়েছিল অচিন্ত্যপ্রেমেন্দ্রর কল্লোলীয় পরিবেশে তাতে সম্মোহ ছিল, রঙ ছিল, কৌতুককুতূহল ছিল, সে দেখা খানিকটা দূর থেকে। সে দেখায় পিছনের লেখকের হার্দ সহানুভূতি ঘটটা

ছিল তার চেয়ে বেশি ছিল রবীন্দ্র পরিমণ্ডলের সত্য-সুন্দরের মহিমাকে ধূলোবলুণ্ঠিত করার চেষ্টা। একালের লেখকেরা কিন্তু সরাসরি জীবনের পঙ্ককুণ্ডে প্রবেশ করলেন, মহাদেবের মত ছাই ভস্ম মেখে সমকালের মানির অংশীদার হলেন। সুবোধ ঘোষ নরেন্দ্রনাথ মিত্র বা সরোজকুমার রায়চৌধুরীর রচনায় সেই পঙ্কশয্যার হার্দ্য বর্ণনা আছে এবং সে বর্ণনা কৌতুক রস বা অভিনবত্ব কিছু সৃষ্টি করবার মত চটকদারিতার দ্বারা উদ্দীপ্ত নয়, জীবনের গাঢ় অভিজ্ঞতা, বেদনাদিগ্ধ বস্তুনিষ্ঠায় হৃদয়-স্পর্শী হয়ে উঠেছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মনের গহনাঞ্চলে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর সিদ্ধি অবিস্মরণীয়। মানুষের আপাত মোহময় পারস্পরিক সম্পর্কের অন্তরালবর্তী স্বার্থবোধ যৌনসংস্কার বিবেকহীনতা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ইত্যাদি মনস্তত্ত্বিক সত্যালোকে তিনি ছোটগল্পে অবারিত করে দিয়েছিলেন। বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক মনের দ্বারা তিনি জীবনের তাবৎ ঘটনার কার্যকারণের সূক্ষ্ম-পুঙ্খ ব্যাখ্যায় ব্যাপৃত ছিলেন। সে ব্যাখ্যা নিষ্ঠুত অলঙ্ঘ্য এবং সুনিপুণ হলেও সর্বাঙ্গসুন্দর নয় একথা বললে বোধ হয় অনুচিত বলা হবে না। তাঁর সৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে মানুষের 'বস্তাবগত আবেগের জীবন্তা এবং নিরন্ন সত্যের সঙ্গে সংঘর্ষমানজীবনের আলোছায়ার খেলার একান্ত অভাব। সে কারণে শিল্পী হিসেবে তিনি শ্রদ্ধার্হ হলেও তাঁর অপূর্ণতাও আমাদের ক্ষোভকে উদ্রিক্ত করে। শক্তির পরিমাণে সেই গাঢ়তা বর্ণবিরলতা পেয়েছি আমরা একালের জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে। তারাশঙ্করে আমরা মাটি, পৃথিবীর স্বাদ পেয়েছি, দেখেছি অঞ্চলভিত্তিক রক্তমাংসের মানুষের প্রতিটি শ্বাসপ্রশ্বাসের ওঠাপড়া। কিন্তু সে মানুষ সামন্ততন্ত্রের অবসানের চিত্রনে যতটা নিপুণ ও ব্যঞ্জিত, ক্রমোদ্ভিত শ্রেণীচেতনার জীবনচর্যার রূপায়ণে ততটা সার্থক নয়। একালের মনী ভৌমিক এবং সমরেশ বসুর ছোট গল্পে সমাজবিবর্তনের সেই অগ্রবর্তী স্তরটি অধিকতর সার্থকভাবে চিত্রায়িত। একালে আমরা পেয়েছি সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নবেন্দু ঘোষ প্রমুখ গল্প কারদের যারা সমস্ত অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন যাবতীয় নৈরাশ্যিকতা ও বৈকল্য, ক্লান্তি ও অবসাদকে অস্বীকার করে মানুষের সংগ্রামশক্তিকে অতুলনীয় মূল্য দিয়েছেন। এই প্রতিরোধস্পৃহা এবং আশাবাদ কিছুটা পরিমাণে উচ্চকিত নয়ন এবং আবেগতন্তুতার আচ্ছন্ন হতে পারে কিন্তু, এই অস্তিবাদ, এই সবলন্ধ সংগ্রামস্পৃহা, এই তীব্র জীবনাভীপ্সা বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে এক নবতম দিগন্তের উন্মোচন করেছিল সন্দেহ নেই। তাছাড়া, বিমল করের রচনায় আমরা যে স্নিগ্ধ সতর্ক নৈর্ব্যক্তিকতায় লিপিকুশলতা, যে সূক্ষ্ম অনুভূতিচর্চার অবকাশ লক্ষ্য করেছি তা অভূতপূর্ব না হলেও সাধুবাদের অপেক্ষা রাখে।

পদার্থবিদ্যার মত সাহিত্যের গুণগত তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা শ্রেষ্ঠত্বের বিচার প্রশস্ত বলেই মনে করি। সুতরাং মধ্যপঞ্চাশের গল্পকারের জীবনচিত্রনে বা আঙ্গিকপ্রকর্ষে পূর্ববর্তীর তুলনায় কোন কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ সে আলোচনা আলোচ্য প্রবন্ধের আওতায় পড়ে না। বিচার যা তা আপেক্ষিক উৎকর্ষের মাপ-কাঠিতে। তবে একথা বলতে বাধা নেই যে একালের ছোটগল্পে আমরা যে সব নতুনত্বের সন্ধান পেয়েছি তা সদিক থেকেই আকর্ষণীয়। এই প্রেক্ষিতটুকু অনুধাবন করতে না পারলে ষষ্ঠাবিংশ শতকের ছোট গল্পকারদের যোগ্য মূল্যায়ণ অসম্ভব।

মধ্যপঞ্চাশের অগ্রজ গল্পকারদের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য লেখক হলেন সুবোধ ঘোষ। 'ফসিল' গল্পের মারফৎ তিনি পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, এবং প্রথম আবির্ভাবেই জনচিত্ত জয় করে ফেলেন। তিনি অসংখ্য ভাল গল্প লিখেছেন, যার কয়েকটি প্রায় অবিস্মরণীয় বললে বোধ হয় অতিকথন হবে না। তাঁর 'ফসিল', 'অযান্ত্রিক', 'সুখময়', 'গোত্রান্তর', 'শকুন্তলারা', 'পরশুরামের কুঠার', 'বাস্তবধর্ম', 'বৈদেহী' প্রভৃতি গল্পগুলো বাংলা ছোট গল্পের রত্নভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর বানামুখী অভিজ্ঞতা, অভিবাদী জীবনবোধ, সিদ্ধহস্ত, ইতিহাস-

সচেতন মন, আশাবাদআশ্রয়ী মনোভঙ্গি, কখনো গাঢ় কখনো মৃদু কখনো তীক্ষ্ণ কখনো শুদ্ধ ইস্পাতের মত বিচ্ছুরিত গদ্যভঙ্গী ও শব্দঝঙ্কার, তীব্র প্রবহমানতা (racy)—সবমিলিয়ে তাঁর ছোটগল্প আমাদের বিস্মিত করে। 'কসিল' গল্পে খনিগর্ভের প্রহরীরূপী মানুষের আত্মদান রক্তদানের চিত্র এবং সভ্যতার ইতিহাসে এই আত্মত্যাগের মহান প্রতিষ্ঠার প্রতি আলো ফেলা হয়েছে। লেখকের অবহেলিত মানুষের প্রতি সহানুভূতির ভঙ্গিটি বিশেষকরে সাম্প্রতিককালের। নিম্নতর মানুষের প্রতি সহানুভূতি এবং তাদের মর্যাদাদান ব্যাপারটা সাহিত্যে বিশ শতকের গোড়া থেকেই প্রচারিত হচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথের কতিপয় কাব্যনাট্যে, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'ধেধর' প্রভৃতি কবিতায় অবহেলিত মানুষের জন্যে যে মমত্ব প্রকাশ করা হয়েছে তার ভিত্তি প্রধানত মানবপ্রেম (Grossly humanitarian) বিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থদশকে এই সহানুভূতি রুশ বিপ্লব এবং অন্যান্য পাশ্চাত্যদেশসমূহে জনজাগরণের দৃষ্টান্তের দ্বারা উদ্দীপ্ত হওয়ায় তা প্রধানত রোমান্টিকসমাজের। নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার শেষ চার লাইন, আন্তর্জাতিক গানের (International song) অনুবাদ, প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'আমি কবি' কবিতা, শৈলজানন্দের 'কয়লাকুঠির' গল্পগুলি এমনকি রবীন্দ্রনাথের 'ওরা কাজ করে' কবিতা প্রভৃতিতে নিম্নতর মানুষের যে মূল্য দেওয়া হয়েছে তা আবেগমিশ্রিত শ্রদ্ধাবোধেই চালিত। সুবোধ ঘোষের 'কসিল' গল্পে এই নিপীড়িত মানুষ অধিকতর পরিমাণে রক্তমাংসের এবং ইতিহাসের বিশেষ প্রেক্ষিতের চতুঃসীমাবদ্ধ। পরন্তু, এ গল্পের শেষাংশে যে আশাবাদ উচ্চকিত তাও রোমান্টিকতার পর্যায় থেকে দৈনন্দিনের সমতলে নেমে এসেছে, অনেকটা বাস্তবসম্মত শ্লোগানের সামিল হয়েছে, অথচ তা কোথাও শিল্পমর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করেনি। 'সুন্দরম্' গল্পে মর্যাদা-বিলাসী লোলুপ সমাজের বিকৃতরূপে তীক্ষ্ণশ্লেষের মারফৎ সংকুচারিত, এবং যার কেন্দ্রে লেখকের মমত্ববোধ বিস্ফোরণের ইঙ্গিত জুগিয়েছে। 'বুড়ো নাতির মুখ দেখছে'—গল্পান্তে লেখকের শেষতম উক্তিটি এক ব্যঙ্গ-রোষী প্রতিবেশের মধ্য দিয়ে আবার বিষণ্ণ করে ফেলে। 'পরশুরামের কুঠার' গল্পটির বিষয়বিন্যাস এবং পরিণতি কিছুটা নাটকীয় এবং স্বিনদেশী কল্পনার প্রশ্রয় পেলেও লেখকের সংবেদনশীল মনটিকে আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। সমাজের পেশলে মানুষ কিভাবে আত্মসচেতন নিঃশেষ হয়ে গেল এবং শেষ পর্যন্ত সন্তানোপমের কুৎসিত কামনার খোরাক হয়ে উঠল তার মর্মস্পর্শী চিত্র আছে গল্পটিতে। 'বারবধূ' গল্পে অর্থমূল্যে ক্রয়যোগ্য বস্তুমেয়ের সংসার রচনার ইচ্ছা পাঠককে স্পর্শকাতর করে তোলে। সুবোধ ঘোষের সমস্ত রচনার পিছনে একটা কল্যাণময় উদ্দেশ্য আছে, অথচ সেই উদ্দেশ্য বা মোটিভ কোথাও প্রকট হয়ে রসসৌকর্যের ক্ষতি ঘটায়নি।

সুবোধ ঘোষের মত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও ইতিহাস সচেতন এবং জীবনের মহৎ লক্ষ্যে স্থিরপ্রত্যয়ী। তবে মেজাজের দিক থেকে তিনি মূলত রোমান্টিক। তার অনেক গল্প মৃদু মনোরম বা উদ্দাম রোমান্টিক আবেশের জন্য একদা আমাদের দীর্ঘরাত্রির সঙ্গের হয়েছিল। তাঁর গল্পে তারুণ্য প্রস্রবনের মত শতধারায় উৎসারিত। 'ট্রফি' 'ছায়াসঙ্গিনী' এই পর্যায়ের গল্প। কিন্তু গল্পলেখক হিসাবে তাঁর ঐতিহাসিক মূল্য অমাত্র। সমকালিক সঙ্কট ও অবক্ষয় তাঁর আশাবাদী মানসিকতায় তীব্রভাবে লেগেছিল। প্রবোধকুমার সান্যালের 'অপ্সরা' বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নমুনা' গল্প বাদ দিলে সমস্যার পটভূমিকায় তাঁর মত সার্থক গল্প সম্ভবত আর কেউ লিখতে পারেননি। এসব গল্পে আঙ্গিক-শৈথিল্য যা আছে তা সহানুভূতি এবং বক্তব্যের বন্যায় দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রসঙ্গক্রমে তাঁর 'দুঃশাসন' এবং 'পুতুরা' গল্প দুটির আলোচনা করা যেতে পারে। 'দুঃশাসন' গল্পে চোরাকারবারী নীতিভ্রষ্ট অর্থগৃধ্নু দেবীদাসের অস্বাভাবিক মৃত্যুটি তীব্র শ্লেষের মারফৎ উপস্থাপিত। লেখক তার ভীতি, অসাধু নীতিবোধ, হীনমন্যতা ইত্যাদি স্বরূপকে উদ্ঘাটিত করে তাৎকালিক ভাগ্যান্বেষীদের বাজারে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা ব্যবসায়ীদের মূলটি স্পষ্টগ্রাহ্য করে তুলেছেন। গল্পের শেষে বস্ত্র সমস্যার যে বর্ণনা করা হয়েছে তা একাধারে ঐতিহাসিক দলিল এবং লাঞ্ছিত মানুষের

প্রতি সহানুভূতির জলন্ত সাক্ষ্য: 'ঘাটের দিক থেকে একটি ষোড়শী মেয়ে জল নিয়ে আসছিল: মানুষের গলা শুনেই কোথায় মিলিয়ে গেল আবার। আর এক সঙ্গেই চমকে উঠল দেবী দাস আর গৌর দাসের (দেবী দাসের ছোট ভাই) দৃষ্টি, জল জল করে উঠল রক্ত। মেয়েটি সম্পূর্ণ নগ্ন! কোনোখানে একফালি কাপড় নেই—কাপড় পাবার উপায় নেই। যুগের দুঃশাসন নির্লজ্জ পাশব হাতে বস্ত্রহরণ করেছে তার, তার সতেজ লজ্জা, সরস মর্যাদাকে নিষ্ঠুর উপহাসে মেলে দিয়েছে লোলুপ পৃথিবীর সামনে।'

'পুনশ্চরা' গল্পে লেখক অনেকটা প্রকৃতিক। মন্বন্তরের ভয়াবহতা লেখকের সুন্দরপ্রসারী আশাবাদের কাছে হার মেনেছে। গ্রামে মারী মড়ক, সবাই মিলে কালীপুজোর আয়োজন করল—পুনশ্চরা কেটে গিয়ে আবার গ্রামে শান্তি নিশ্চিন্তি এবং স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসবে। শিবা-ভোগের আশায় তর্কারত মশায় দেবীমূর্তির সামনে বসে অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন। কিন্তু শিয়ালের দেখা নেই। গ্রামে মানুষেরই এত হড়াহড়ি যে এই দেবভোগে তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। শেষরাত্রি গভীর রাতে এল শিয়াল নয় ভোমপাড়ার কুখ্যাত পাগলী। গোগ্রাসে শিবাভোগ উদরস্থ করে কৃতিনিবৃত্তি করল। 'কিন্তু দীর্ঘদিনের বুভুক্ষার পরে দেবভোগ্য শিবাভোগ সে সহ্য করতে পারেনি।' পাগলী মারা গেল। কিন্তু এই মৃত্যুতে জীবনের পরমমূল্য নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে না। লেখক বলেন, 'কিন্তু তবু পুনশ্চরা কেটে যাবে। মারী আর মড়কের সমস্ত বিষ চিরকাল ওরাই নীলকণ্ঠের মত পান করে যেন।' দুর্ভাগ্যত এতবড় গল্পকার পরবর্তীকালে কাল্পনিক চমকপ্রধান শব্দঝংকৃত আপাত মনোরম কাহিনীতে মনোনিবেশ করলেন।

বাংলার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মধ্যবিত্ত সমাজের নতুন ভাঙাগড়ার অনুরূপ রূপটি দেখতে পাই নরেন্দ্রনাথ মিত্র এবং সন্তোষকুমার ঘোষের গল্পে। পরিবর্তমান সমস্যার চাপে পড়ে মূল্যবোধগুলো ভেঙেচুরে নতুন চরিত্র নিয়ে পরবর্তীকালের সব কয়জনের গল্পে বুদ্ধ করে ঘুরে ফিরে

এসে দেখা দেবার প্রয়াস এঁদের গল্পে সহজতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। অবশ্য সব গল্পেই যে এঁরা শেষরক্ষা করতে পেরেছেন এ কথা বলা চলে না। ক্ষেত্রবিশেষে বিকৃতি অবসাদ নৈরাশ্য এদের গল্পের বিষয়কে পাণ্ডুর করে তুলেছে, এবং যা তৎকালিক পরিবেশে সর্বতোভাবেই আপত্তিকর নয়। নরেন্দ্রনাথ মিত্রর জন্ম এবং বোধের প্রায় সবটুকুই এই সমাজের সহৃদয়চিত্রনে অক্লান্ত। বিষয়ের দিক থেকে তাঁর গল্পের বৈচিত্র সম্পর্কে পাঠকের মৃদু আপত্তি থাকলেও বিষয়ের গভীরতার বিচারে তাঁর সার্থকতার কথা অস্বীকার চলে না। তিনি সীমিত মধ্যবিত্ত জীবনের নানা চেনা চারাকারের মধ্যেও যে অমের জীবনরসের সন্ধান পেয়েছেন তার মূল্য অপরিসীম। তাঁর প্রীতিস্নিগ্ধ স্পর্শকাতর মন এই ক্ষুদ্রায়ত জীবনস্রোতের গভীর থেকে অমূল্য রত্নরাজি উদ্ধার করেছে। তাঁর গল্পে নিহিত মত নিষ্ঠুর ঘটনাবলম আমাদের প্রচলিত বিশ্বাসে বারবার আঘাত হেনেছে কিন্তু সে আঘাত সাহিত্যিক বিলাস বা আতিশয্য নয়, বাস্তবনিষ্ঠ এবং সহানুভূতি-সঞ্জীবনী। আর্টিস্ট হিসেবেও নরেন্দ্রনাথ মিত্রর জুড়ি মেলা ভার। তিনি অনায়াসে গল্প তৈরী করে ফেলেন, তাঁর বলন-ভঙ্গী যে কোনো গল্প লেখকের কাছে ঈর্ষণীয়। তিনি এত সহজে এত সাবলীলভাবে কোনো সৌরচন্দ্রিকার আশ্রয় ছাড়াই (unconventionally) গল্পের জাল ছড়িয়ে দিয়ে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছন, যার তুলনা দ্বিতীয়-রহিত। প্রসঙ্গত 'কাঠগোলাপ', 'বেহালা', 'একশো বছর', 'টিকিট' প্রভৃতি গল্পগুলোর কথা বলা যেতে পারে। ছিন্নমূল গৃহস্থঘরের আকস্মিক নগর-জীবনের আস্বাদে প্রাথমিকস্তরে ছটফটানি এবং পরে স্থায়ী বেকার হয়ে পড়লে গভীর রাতআঁধি কাগজের ঠোঙা তৈরী করে জীবন-সংগ্রামের মুখোমুখি দাঁড়াবার প্রয়াস আমরা 'কাঠ-গোলাপ' গল্পে প্রত্যক্ষ করেছি। এ গল্পে মধ্যবিত্তের সীমাবদ্ধ তৈরীর রোমান্টিক প্রয়াস এবং সংগ্রামপৃহা উভয়রূপেই আশ্চর্য লিপিকুশলতায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। 'বেহালা' গল্পে অর্থনৈতিক সমস্যায় কণ্ঠাগতপ্রাণ মধ্যবিত্ত জীবনে সঙ্গীতের শিল্পপিপাসা কিভাবে গভীর

বেদনার সঙ্গে অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে তার আন্তরিক চিত্রটি ধরা পড়েছে। 'টিকিট' বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় গল্প। এ গল্পের স্যাটায়ার অতুলনা। নরেন্দ্রনাথ মিত্র'র পর্যবেক্ষণশক্তি, মমত্ববোধ গঢ়ুসঞ্চারী হৃদয়ধর্ম এবং শিল্পপ্রকরণ প্রথমশ্রেণীর। তিনি বহুল প্রসবী না হলে আমাদের অনেক ভালো গল্প উপহার দিতে পারতেন।

সন্তোষকুমার ঘোষের বিষয়ভূমিও ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত জীবন। তাঁর শিল্পসত্তা নরেন্দ্রনাথ মিত্র'র বিপরীত কোটিতে অবস্থিত। তিনি মেজাজে মননে অনুভূতিতে শতকরা একশ' ভাগ নাগরিক। ফলত, মধ্যবিত্ত জীবনের অবক্ষয় অধিকতর নিষ্পৃহতার সঙ্গে চিত্রিত। তাঁর ভঙ্গী মনোরম, বিন্যাসপ্রকরণ চমকপ্রদ, মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার পরিবেশন দক্ষতর পর্যায়ের। তার রচনায় এমন একটা ছৌলুষ আছে যা পাঠককে মুহূর্তমধ্যে অভিভূত করে ফেলে। তাঁর প্রথম দিককার 'কানাকড়ি' থেকে হাল আমলের 'কিশোরীর মন' পর্যন্ত তাবৎ গল্পে মধ্যবিত্তের বাধাহত ভালোবাসার দিকটা দক্ষতা এবং ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে উপস্থাপিত। প্রসঙ্গ ক্রমে 'কিশোরীর মন' গল্পটির আলোচনা করা যেতে পারে। বাড়ীর বড় মেয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে বাবা মার শোক যতটা উজ্জীবিত হওয়া উচিত ছিল মেয়েকে বিয়ে দেবার দুশ্চিন্তার হাত থেকে মুক্ত হবার ভাবনায় তা অনেকটা তিমিত। পরন্তু, ডাকসাইটে ছেলে বিল্টু যখন মরা মেয়ের দুলজোড়া আলগোছে কান থেকে খাড়িয়ে আনল তখন (ছোটমেয়ের জবানিতে) 'চোখ মেলে মা বুঝি একবার দেখলেন, জিনিসটা কী' হাতের মুঠোয় সেটাকে শক্ত করে ধরে সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়লেন'—এর মধ্যে দারিদ্র্যভারে অবনত মাতৃত্বের অসহায়ত্ব কি নিদারুণভাবেই না ফুটে উঠেছে। বস্তুত সন্তোষকুমার ঘোষের যে পরিমাণ গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং কলমের জোর ছিল সাংবাদিকতায় অত্যধিক মনঃসংযোগ না করলে আরো সম্ভাবনাময় হয়ে উঠতে পারত এবিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

শ্রেণী চেতনাকে ও মানুষের অকুণ্ঠ সংগ্রামশক্তিকে অভিনন্দিত করার কষ্টকর প্রয়াস আছে নবেন্দু ঘোষের এবং সমরেশ বসুর ছোটগল্পগুলিতে। নবেন্দু ঘোষের অধিকাংশ গল্পই রাজনৈতিক, আরো সঠিক করে বলতে গেলে মার্কসবাদভিত্তিক। কোনো কোনো রচনায় রাজনৈতিক উগ্রতা একদেশদর্শিতার দ্বারা আক্রান্ত হবার ফলে তাঁর গল্প পাঠকসমাজে যথোচিত স্বীকৃতি পায়নি একথা সত্য। কিন্তু, কিছু গল্পে তিনি এই সংকীর্ণ দৃষ্টি কোণ থেকে আশ্চর্যভাবে মুক্ত হয়েছেন। সেইসব গল্পগুলি নিশ্চিত প্রশংসার অপেক্ষা রাখে। পরন্তু, শিল্পে প্রকরণের দিক থেকেও তাঁর কিছু গল্প, যেমন 'ক্যানিং স্ট্রীট' 'ধানকাণ্ড' আদর্শস্থানীয়। রাজনৈতিক গল্পগুলোর মধ্যে 'আগন্তুক' গল্পটি অবশ্যই স্মর্তব্য। এ ক্ষেত্রে তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী এবং আন্তরিক বিশ্বাস গল্পকে রসোত্তীর্ণ করতে সহায়তা করেছে। সম্প্রতি তিনি বিদেশে আছেন, এবং গল্প লেখা একরকম ছেড়ে দিয়েছেন, সেকারণে আমাদের ক্ষোভের অন্ত নেই।

সমরেশ বসু প্রধানত ঔপন্যাসিক হিসেবেই খ্যাতি অর্জন করেছেন। কিন্তু, গল্প লেখক হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব অনেক উর্ধ্বে। তাঁর গল্পের স্বাদ প্রচলিত ছোটগল্পের স্বাদের চেয়ে ভিন্ন ধরনের। তাঁর গল্পের পাত্রপাত্রীও অনেকাংশে পৃথকশ্রেণীর। শ্রমজীবী মানুষ অবজ্ঞাত সমাজের নানা চরিত্র আশ্চর্য সংবেদনশীলতার ফলে হৃদয়গ্রাহ্য হয়ে উঠেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ সব চরিত্র তৎসংগত পরিবেশের মধ্যে প্রাণবান হয়ে উঠেছে। গল্প রচনায় তিনি স্বাপত্যরীতিতে বিশ্বাসী, ফলে চরিত্রগুলি স্পষ্ট রেখ। সমসাময়িক জীবনের প্রতিও তাঁর অক্লান্ত উৎসাহ। তাঁর জীবন জুড়িয়ে আবাদ আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। তাঁর অসংখ্য ভালো গল্পের মধ্যে 'অকাল বসন্ত', 'আদাব', 'পাড়ি', 'ছেঁড়া-তমসুক', 'বাইরে' ইত্যাদি কত গল্পেরই বা নাম উল্লেখ করবো। প্রসঙ্গত, 'পসারিণী' গল্পটির কথা বলা যেতে পারে। দেশ বিভাগের ফলে জীবিকার জন্যে যে অনিশ্চিত অথচ অনিবার্য সংগ্রাম পূর্ববঙ্গ থেকে আগত শ্রেণীকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল রেলগাড়ীর ফেরিওয়ালাদের প্রতিনিয়ত শঙ্কিত প্রচেষ্টায় তা কিভাবে সহমর্মবোধের মধ্য দিয়ে সংগ্রামমুখী হয়ে উঠল তার

জীবন্ত আলেখ্য আলোচ্য গল্প। 'বাইরে' গল্পের হিমালয়ের এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে এক আধিবাসী হটাৎ-হার (Out law) মানুষের জীবনের প্রতি গভীর অনুরাগ-যোগ্য পটভূমির প্রেক্ষিতে সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। 'হে'রা তমসুক' গল্পে কলকাতার পরবর্তী অঞ্চলে একটি যুবতীর যৌবন বেদনা এবং তার আত্মবঞ্চনাকে কেন্দ্র করে চারটি বেকার দিকভ্রান্ত যুবকের। অন্তরালের যে অন্তর্ভেদী চিত্রন আছে ক্ষণিক মধ্যবিত্ত জীবনের সমাজ অভিঘাতে ছিন্নভিন্ন চেহারাটি তাতে সুস্পষ্ট উঠেছে। গল্পটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অসামান্য।

মধ্য পঞ্চাশের আরো দুজন গল্পকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এবং বিমল করের আলোচনা না করলে প্রবন্ধটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এঁরা দুজনেই শক্তিমান লেখক, শিল্পী হিসাবে এদের কৃতিত্ব ঈর্ষাযোগ্য। বিশেষ করে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সৌন্দর্যবোধ (aesthetic sense) ইন্দ্রিয়চারিতা (Sensuousness), মানুষের লোভ পাপ মহত্ত্ব উন্নতত্তা সমেত তার গোটা অস্তিত্বের প্রতি আলোকপাত করার ক্ষমতা—এ সমস্তই প্রথমশ্রেণীর। তাঁর 'গিরগিটি', 'বনের রাজা', 'দিগম্বরের মৃত্যু', 'সমুদ্র', 'খালাসোল' ও 'টিনের ঘরের চিত্রকর' প্রভৃতি গল্পগুলি তাঁর শিল্পসার্থকের নিদর্শন। একান্তভাবে ঘুণাচিহ্নিত গল্পগুলোর মধ্যে 'বন্ধুসভা' বা 'মঙ্গলগ্রহ' এর সার্থকতা কম নয়। তিনি মানুষের তাবৎ উচ্চাবচ প্রবৃত্তিগুলিকে একমাত্র অনুভূতির সাহায্যে ইন্দ্রিয়ময় করে তোলেন। বস্তুত, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী প্যাগান পর্যায়ের, সুক্ষ্ম ইন্দ্রিয়চারিতাই তাঁর গল্পের বিচার ও সুষমা এবং সম্ভবত একারণেই তাঁর রচনা সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে আটকা পড়ে গেছে। ইন্দ্রিয়েরও গভীরে মানুষের যে এক মহৎ জীবনাবেগ লুকিয়ে আছে তিনি সেই স্তরে এখনো পৌঁছতে পারেননি। পারলে তাঁর স্বার্থকতা অনেকের খ্যাতিকেই ম্লান করে দিতে পারত।

বিমল করের আমি ভক্ত পাঠক। তাঁর রচনার কালোত্তীর্ণ আবেদন আমাদের মুহূর্মুহু চমকিত করে। মনস্তত্ত্বকে কাব্যের সুষমা দিয়ে গাঢ় করে তুলতে তিনি দক্ষ। তাঁর 'আলুবুলতা' 'পালকের পা', 'উত্তিদ', 'সুবাস', 'মাধলাংক', 'বিবাহ', 'পলাতকা', এমনি কি হাল আমলের 'জননী' 'গগনের অসুখ' ইত্যাদি অজস্র গল্প বহুকাল মনে থাকার মত। তাঁর চরিত্রগুলি স্বাবিশেষে খানিকটা নীরক্ত, প্রতিবেশ চিত্রণ প্রয়োজনাতিরিক্ত রোমান্টিক, আপাতদৃষ্টিতে গল্পের বিন্যাস অনেকটা ছকে বাধা (schematic), গদ্যভঙ্গী পরিচ্ছন্ন সাপেক্ষ (Stylised) বলে মনে হলেও, বা তাঁর ছোটগল্পে সমসাময়িকের প্রগাঢ় উপস্থিতি প্রায়েই দুর্লক্ষ্য হলেও, তাঁর কাব্যময়তা, সুক্ষ্ম অনুভূতির মনোরমলীলা আমাদের মুগ্ধ করে।

মধ্যপঞ্চাশের এই পর্যায়ে আমরা আরো অনেক কৃতী লেখকের গল্প পেয়েছি। এদের মধ্যে বিমল মিত্র, সতীনাথ ভাদুড়ী, নবেন্দু ঘোষ, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় প্রভাত দেব সরকার, সমরেশ চৌধুরী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এদের সকলের বিস্তারিত আলোচনা স্বতন্ত্র প্রবন্ধের অপেক্ষা রাখে।

মধ্যপঞ্চাশের প্রাথমিক স্তরের আগুনকাল ধীরে ধীরে উগ্রতা হারিয়ে ফেলছে। সেই অগ্নিকুণ্ডের আগুন নিভে গিয়ে এখন যা আছে তা ধূম। সেই তীব্রতা ও কোলাহল স্তিমিত হয়ে পড়ছে। সেই অভিঘাতে প্রতিক্রিয়া নিঃশেষ হয়ে যায়নি, তা এতকাল বাইরের ঘটনার আবর্তে বেগবান ছিল, এখন অন্তর্মুখী হয়ে নতুন রূপ নিতে চাইছে। স্বভাবতই, এদের পরবর্তী অভিজাতপ্রতিভাকালের ছোটগল্পকার শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, রমিত নন্দী, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, সমরেশ মজুমদার, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রমুখের রচনায় বাইরের ঘটনাভারী উত্তেজনার চেয়ে এই মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া রূপটি ধরা পড়েছে বেশি। তথাপি, মধ্যপঞ্চাশের প্রাথমিকস্তরের গল্পকারদের মধ্যে যে তীব্র জীবনবোধ এবং বৈচিত্র্য দেখেছি তা একাধারে বক্তব্যে এবং শিল্পপ্রকরণে স্মরণীয়। বাংলা ছোটগল্প সাহিত্যের ইতিহাসে এদের প্রচেষ্টার যোগফল্য আবহমান কালের বাঙালীপাঠক দিতে কুণ্ঠা প্রকাশ করবেন না।

ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী প্রণীত "মধুযামিনী"

(সংক্ষেপিত)

শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ

[পরিচিতি]

লেখক—ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী। প্রকাশকাল—১৮৮৪ [বাংলা ১২৯২]; পৃষ্ঠাঙ্ক ৫২। প্রধান চরিত্র—সুন্দরী হিংসনা, এবং বীরকুমার। অপ্রধান চরিত্র—হিংসনার পিতামাতা এবং কুমারের অনুচরবৃন্দ। কাহিনীর সূত্র ও পরিচয়—মহাভারতের বাঙ্গালা প্রদেশের পার্বত্য আদিম অধিবাসী গুপ্ত সম্প্রদায়ের যুবক যুবতীর রোমান্টিক প্রণয়কাহিনী। সুন্দরী যুবতীর সঙ্গে বীর ও সুপুরুষের আকাঙ্ক্ষিত মিলনই—উপন্যাসের উপজীব্য। নামকরণ—'মধুযামিনী' তাৎপর্য : নায়ক নায়িকার বহু আকাঙ্ক্ষিত মিলনরাত্রি।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।। মহাভারতে বাঙ্গালা নামে একটি সুরম্য পর্বতময় প্রদেশ আছে। স্থানটি নদী উপত্যকাময় এবং মধুর সৌন্দর্যপূর্ণ। এই প্রদেশটি বাঙ্গালা, রামগড়, প্রতাপগড়, যুক্তপুর, রাণীপুর, সাজাপুর প্রভৃতি বিভাগে বিভক্ত। কয়েকটি ছোট ছোট গ্রাম আছে এ অঞ্চলে। অসভ্য গুপ্ত জাতিদের আদিম বাসস্থান এই প্রদেশটি। নদীর উত্তরে :অদূরে নদীতীরে নির্জন শালবনের কাছে আরও কয়েকটি অসভ্য আদিম জাতির লোক দেখা যায়। কথিত আছে এই সমস্ত অঞ্চলে পাণ্ডবদের সময় থেকেই দুষ্ট লোকজনের বাস ছিল।

এই রকম ভয়ংকর জায়গায় একদিন সকালে হিংসনা নামে একটি চৌদ্দ বছরের গুপ্তকন্যা হাতে বাঁশী নিয়ে কয়েকটি গরুবাছুর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গুপ্তকন্যারা প্রায়ই সুশ্রী হয়। সুন্দরী হিংসনা সুনীল আকাশের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। কিছুক্ষণ পরে হিংসনা হাতের বাঁশীটি বাজাতে লাগলো মধুর :সুরে। বাঁশীর সুরে মুগ্ধ হয়ে অপরিচিত একটি অল্পবয়স্ক যুবক এসে তার সামনে দাঁড়ালো—হাতে তার তীর ধনুক। হিংসনা লজ্জা পেয়ে গরুগুলোর কাছে সরে গেল। প্রথম লজ্জা ও বিস্ময়ের ভাব কেটে গেলে যুবকটি হিংসনার কাছে গিয়ে তার বাঁশী বাজানোর প্রশংসা করে বাঁশীটি দেখতে চাইলো। হিংসনা সলজ্জভাবে বাঁশিটি যুবকের হাতে দিলো। বাঁশিটি নিয়ে যুবকটিও মধুর সুরে বাঁশি বাজালো। বাঁশি ফেরত দিয়ে যুবক আবার হিংসনার গান শুনতে চাইলে হিংসনা আরেকদিন শোনাবে বললো। যুবকটি আরেকদিন এসে গান শুনবে বলে চলে গেল। তখন থেকেই হিংসনার মন কেমন যেন হয়ে গেল। যুবকের অনুরোধ মতো গান না গাওয়ায় তার মনে অনুশোচনা এলো। কিন্তু হিংসনা যুবককে চিনতে পারলো না। বাড়ি ফিরে হিংসনা অন্যমনস্কভাবে যুবকের কথা ভাবতে ভাবতে বাঁশি বাজাতে লাগলো। প্রতিদিনের নির্দিষ্ট কোন কাজে তার মন বসলো না। হিংসনার মা ও তিনজন সখা হিংসনার এই পরিবর্তন কিছুই বুঝতে পারলো না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। পরদিন হিপ্পনা পরুষোত্তমের বিয়ে সেই পাহাড়ী মাঠটায় এসে দেখলো সেই যুবকটি একাকী একমনে চুপচাপ বসে আছে। লজ্জায় হিপ্পনা আজ আর বাঁশি বাজাতে পারলো না—মনে কি যেন এক বিস্ময়। এমন সময় হিপ্পনার এক সখি অরুণা এসে তাকে নিয়ে ফুল দিয়ে সাজাতে বসলো। কিন্তু হিপ্পনাকে অন্যমনস্ক দেখে কারণ জিজ্ঞাসা করছে আর পরিহাস করছে। অরুণা বলছে হিপ্পনাকে আজ রাজকন্যার মতো দেখাচ্ছে। এমন সময় সেই যুবক তাদের কাছে এগিয়ে এসে অরুণার কথা সমর্থন করে হিপ্পনার রূপের প্রশংসা করতে লাগলো। তারা লজ্জায় পড়লো কিন্তু যুবকের শান্ত সংযত আচরণ ও কথাবার্তা তাদের ভালোই লাগলো। হিপ্পনার প্রতিশ্রুতি মতোই যুবক তার গান শুনতে এসেছে কিন্তু অরুণা থাকায় সে যেন অস্বস্তি বোধ করলো। কি করবে ভেবে পায় না হিপ্পনা। লজ্জায় ইতস্তত করতে করতে অরুণার সঙ্গে হিপ্পনা উঠে যাচ্ছে—এমন সময় যুবক গরুগুলি নিয়ে সঙ্গে আসতে চাইলে সে আরও লজ্জায় পড়লো। হিপ্পনা সবিনয়ে তাকে গরু নিয়ে সঙ্গে আসতে নিষেধ করলে যুবক হিপ্পনার কাছে প্রস্তাব করলো হিপ্পনার অনুমতি পেলে সে তার গরুবাছুর দেখা শোনার কাজে সাহায্য করতে ইচ্ছুক। কারণ গুপ্তজাতির ভিতর অবিবাহিত যুবতীর জন্যে দাসের কাজ করা প্রণয়ের লক্ষণ। যুবকের কথায় হিপ্পনা জানালো সে তার বাবা-মার অনুমতি নেবার চেষ্টা করবে।—এই বলে হিপ্পনা অরুণার সঙ্গে ঘরের দিকে চললো।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ। যুবক চলে গেলে হিপ্পনা হঠাৎ কেঁদে ফেললো। অরুণা কারণ জিজ্ঞাসা করায় হিপ্পনা অভিযোগ করলো—সে কেন যুবককে সঙ্গে আসতে দিলো না। হিপ্পনা তখন বললো—যুবক তারই কথামতো তার গান শুনতেই এসেছিলো। আরও বললো, অরুণা বিরক্ত হওয়াতে হিপ্পনা যুবককে বিদায় দিয়েছে। অরুণা তখন নানা কথায় হিপ্পনার প্রণয়প্রার্থী উদয়গিরির কথা মনে করিয়ে দিলো। পরদিন হিপ্পনা বললো উদয়গিরিকে অরুণা বিয়ে করুক তাতে তার কোন আপত্তি নেই। কেননা, হিপ্পনা এই যুবককেই ভালোবেসেছে। তার বাবা-মার কাছে অবশ্য সে শুনেছে উদয়গিরির সঙ্গেই তার বিয়ে হবে—কিন্তু হিপ্পনা বিয়ের পবিত্রতা বিষয়ে কিছুই বুঝতো না। আজ সে বুঝেছে এবং ঠিক করেছে এই নবীন যুবককেই সে বিয়ে করবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ। বাঙ্গালা প্রদেশে গুপ্তজাতি—রাজগুপ্ত ও রাবণবংশী দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। রাজগুপ্ত উচ্চবর্ণ এবং রাজপুতদের অপভ্রংশ। ব্রাহ্মণদের চেয়ে এদের আচার-বিচারের শুচিতা অনেক বেশি। তাই রাজগুপ্ত সম্প্রদায়ের সম্মানও অনেক বেশি। হিপ্পনা এই রাজগুপ্ত সম্প্রদায়ের কন্যা। এদের গৃহদেবতা ঠাকুরদেব। তা ছাড়া, ঘনশ্যামদেব, নারায়ণদেব, দুর্গা-দেব, মাতাদেবী প্রভৃতি অনেক দেবদেবীর পূজাও হয় বলি দিয়ে। এদের মধ্যে মাতাদেবী বসন্তরোগের এবং ঘনশ্যামদেব শস্যের দেবতা।—রাবণবংশী গুপ্ত সম্প্রদায় গোত্রভেদ ৪০ ভাগে বিভক্ত। এদের মধ্যে অনেকে ভাটের কাজ এবং কর্মকারের কাজ করে জীবিকা-নির্বাহ করে। এরা প্রায়ই অনাচারী, মদ্যপায়ী এবং শ্রমবিমুখ। গুপ্তজাতির কাছে স্ত্রীলোকই সম্পত্তি। কারও কারও ৩।৪টিরও বেশি স্ত্রী আছে। হিন্দুমতে এদের বিয়ে হয় না। সাধারণত এরা আপন বোনের ছেলেমেয়ের সঙ্গে নিজের ছেলেমেয়ের বিয়ে দেয়—কম খরচ ও পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হবে এই আশায়। অবশ্য বয়স্ক মেয়ে তার স্বাধীন ইচ্ছামতো বিয়ে করতে পারে। বর সংগতিহীন হোলে কন্যার বাড়ীতে দাস্য-বৃত্তি করবে। বিয়ের আগে বর কন্যাকে চুক্তি দিয়ে তার সম্মতি নেবে এবং গ্রামের মাতব্বরদের একদিন ভোজে আপ্যায়িত করবে। গুপ্তদের মধ্যে বিধবা বিবাহের প্রচলন আছে। বড়ো ভাইএর মৃত্যুতে ছোট ভাই বড়ো ভাইয়ের বউকে বিয়ে করতে পারে: কিন্তু বড়ো ভাই ছোট ভাইএর মৃত্যুতে তার বিধবাকে বিয়ে করতে

পারবে না।—এই সমস্ত সামাজিক প্রথা অনুসারে হিল্পনার পরে উদয়গিরির অধিকার আছে। উদয়গিরি হিল্পনার পিসতুতো ভাই, এবং তাদের অবস্থাও বেশ ভালো। উদয়গিরির দেওয়া চুক্তিও পরেছে হিল্পনা। সবারই জানা আছে উদয়গিরির সঙ্গে হিল্পনার বিয়ে একরকম পাকা। তাই হিল্পনার সখি অরুণা যখন উদয়গিরির দেওয়া চুক্তি পরার খোঁটা দিলো—তখন সে-কথার ইঙ্গিত বুঝে হিল্পনা সমস্ত চুক্তি খুলে তার গলায় পরিয়ে দিলো। অরুণা মনে মনে খুশি হোল, কারণ উদয়গিরির সঙ্গে তার বিবাহ হোক, এই তার ইচ্ছা। মুখে অরুণা কিছু বললো না কিন্তু সেদিন থেকে সে হিল্পনাকে শেষ করার জন্যে ছায়ার মতো তার পিছনে পিছনে ঘুরতে লাগলো। সরলা হিল্পনা তার কিছুই বুঝতে পারলো না॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ। তিনদিন কেটে গেল। অপরিচিত যুবকটির আর দেখা নেই। হিল্পনার চিন্তার অবধি নেই। একহাতে বাঁশি, অন্য হাতে গুড়নার একপাশ ধরে প্রায় বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে আকাশের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে হিল্পনা। এমন সময় সেই যুবকও সেখানে এসে হাজির। উভয়ে উভয়কে দেখে কেঁদে ফেললো। তারপর কিছুটা শান্ত হয়ে যুবক হিল্পনার সঙ্গে থাকবার অনুমতি ও উপায় জানতে চাইলো। হিল্পনা তার অনুমতি দিয়ে বললো তার পিতাকে কিছু অর্থ দিতে পারলে তাঁর সম্মতি পাওয়া যেতে পারে। যুবক তখন বাঘ শিকার করে অর্থ সংগ্রহ করবে বললো। হিল্পনা কিছুতেই যুবককে বাঘ শিকারে যেতে দিলো না ভয়ে ও ভালোবাসায়। হিল্পনার নির্দেশমতো যুবক একটি গাছের গোড়া খুঁড়ে বারোটি মুক্তো পেল—যুবক তা পণ হিসাবে গ্রহণ করলো। তারপর হিল্পনা সবিনয়ে যুবকের পরিচয় চাইলো। যুবক বললো—তার নাম কুমার। শ্রেষ্ঠ রাজপুত বংশে তার জন্ম, তার একটিমাত্র বোন আছে, তারা পর্বতের ঘন জঙ্গলে বাস করে। —তারপরে হিল্পনা কুমারকে সঙ্গে নিয়ে ঘরের দিকে চললো॥

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। হিল্পনার অনুরোধে ও টাকার লোভে হিল্পনার বাবা মা কুমারকে তাদের বাড়ীতে হিল্পনার কাজে সাহায্যকারী হিসেবে রাখতে রাজী হোল। কিন্তু শর্ত এই যে, কুমার কখনো আলসেমি করতে পারবে না, বা হিল্পনাকে নিয়ে ইচ্ছামতো কোথাও যেতে পারবে না। কুমার তাতেই রাজী হোল, হিল্পনার কাছে থাকবার সুযোগ পেয়ে। হিল্পনাও কুমারকে কাছে পেয়ে তাকে সারাদিন গৃহস্থালীর কাজে তালিম দিতে লাগলো—ভালোবাসা প্রীতির চোখে ধরে দেয়। কুমারও হিল্পনার প্রেমের স্পর্শ পেয়ে ধন্য। খুশি মনে সে নিয়মিত কাজ করতে লাগলো। হিল্পনার বাবা-মা ভাবলো উদয়গিরি একেই হিল্পনা কুমারের কথা ভুলে যাবে। তাই তারা কুমার ও হিল্পনার ঘনিষ্ঠ মেলামেশায় কোন আপত্তি করলো না। এইভাবে দু'সপ্তাহ কেটে গেল। দেখা গেল, হিল্পনা ও কুমার বেশ খুশি মনে কাজ করছে। ক্রমশই তাদের সৌন্দর্য ও শ্রী ফুটে উঠতে লাগলো। তাদের এই প্রেম প্রীতি ও সুখ দেখে হিংসায় অরুণার বুক ফেটে যেতে লাগলো। কিভাবে হিল্পনা ও কুমারকে ধ্বংস করবে—এই চিন্তায় অরুণা দিন দিন বিমর্ষ এবং স্বাস্থ্যও শ্রীহীন হয়ে গেলো। একদিন হিল্পনা অরুণার সঙ্গে বসে কুমারের প্রসঙ্গে আলোচনা করছে এমন সময় উদয়গিরির কাছ থেকে একজন ভাটিয়া এসে একটি কাঠের বাক্স এবং একখানি চিঠি দিল হিল্পনাকে। হিল্পনা বাক্স ও চিঠি তার বাবার কাছে দিলো। চিঠি পড়ে খুশি হয়ে বাক্স তুলে রাখলো নিজেকে এবং খুব খাতির যত্ন করে লোকটিকে খাওয়ালো। অরুণা হতাশ হোল, তার হিংসা দ্বিগুণ বেড়ে গেলো॥

সপ্তম পরিচ্ছেদ। উদয়গিরির পাঠানো বাক্সে কি আছে তা জানবার জন্যে হিল্পনার কোন কৌতূহল নেই। কিন্তু অরুণা ভাবছে যে কাঠের বাক্সে হয়তো নিশ্চয়ই হিল্পনার জন্যে উদয়গিরি কতো সোনা-রুপার গয়না পাঠিয়েছে। ভাবছে আর অরুণা হিংসায় জ্বলে মরছে। যে বাহকটি উদয়গিরির কাছ থেকে এসেছিলো সে

যখন প্রাণের ঘরেই যাচ্ছে সেই সময় অরুণা গিয়ে হিংগনার নতুন প্রণয়ী কুমারের কথা ফাঁস করে দিলো। উদয়গিরির লোক দেখে কুমারও হিংগনাকে পাবার আশা ছেড়ে দিলো। কুমারের মনোভাব জানতে পেরে হিংগনা তাকে বললো উদয়গিরি যতো সোনা-রুপোর গহনা পরুক না কেন—হিংগনা তাকে বিয়ে করবে না, কারণ সে কুমারকেই প্রাণের মতো ভালোবাসে। কুমার শুনে আশ্বস্ত হোল। সে হিংগনাকে একদিন তার বাড়ীতে নিয়ে যেতে চাইল—হিংগনাও আগ্রহের সঙ্গে যেতে রাজী হোল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ। একদিন সকালে গরু নিয়ে হিংগনা ও কুমার মাঠে গেল। বেলা একপ্রহর কেটে গেছে। এমন সময় ঘুরে ঘুরে বনে সুন্দর ফলফল দেখে হিংগনা কুমারকে সঙ্গে নিয়ে আনন্দে লাফালাফি করে সেই ফল পাড়তে লাগলো। এই সময় হিংগনা ও কুমার পরস্পর খুব কাছাকাছি হোল এবং তাদের প্রেম নিবেদন করলো। এমন সময় দুজন সশস্ত্র লোক এসে কুমারের বোনের অসুখের সংবাদ দিল। কুমার হিংগনার কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলো। হিংগনা বিষণ্ণ মনে বাড়ি চললো। তার মা কিন্তু উদয়গিরির সঙ্গে তার বিয়ের কথা বার বার মনে করিয়ে দিলো। আর, সাবধান করে দিলো সে যেন তার কোন কথা অরুণাকে না বলে। হিংগনা জানিয়ে দিলো সে উদয়গিরিকে বিয়ে করে সুখ চায় না—যতো দুঃখই আসুক সে কুমারকে বিয়ে করবেই।

নবম পরিচ্ছেদ। কুমার চলে যাওয়ার পর আজ চতুর্থ দিন। কুমারের কোন খবর নেই। হিংগনা একাকী সেই পাহাড়ের উপর গিয়ে 'কুমার, কুমার' বলে কেঁদে বেড়াচ্ছেন। প্রায় সন্ধ্যার সময় কুমার এসে হিংগনাকে স্নেহচুম্বন দিয়ে তার বোনের অসুখের অবস্থা খারাপ জানিয়ে আবার বিদায় নিয়ে চলে গেল শিগগির ফিরবে বলে। বাড়ি ফিরতেই অরুণা নানাভাবে কুমারের সম্পর্কে ব্যঙ্গ করে তাকে বিব্রত করে তুললো। অরুণা বললো সে উদয়গিরিকে চায়—কিন্তু প্রতিবন্ধক হিংগনা। হিংগনা খুশি হবে অরুণাকে বললো উদয়গিরির প্রতি তার কোন আকর্ষণ নেই।

দশম পরিচ্ছেদ। বাবুকের কাছে হিংগনার নতুন প্রেমিক কুমারের রূপগুণের খবর পেয়ে উদয়গিরি এক সপ্তাহের মধ্যেই দেশে যাত্রা করলো। হিংগনার মন পাবার জন্যে সে আরো কাপড়-গহনা ও অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে বাড়ী এসে পৌঁছুলো। দেশে এবার অজন্মা হওয়ার লোকে ভীত হয়ে পড়েছে। এদিকে কুমারের লোক এসে তার বোনের অসুখের সংবাদ নিয়মিত দিয়ে যায় হিংগনাকে। হিংগনা রোজ পাহাড়ে উঠে সূর্যদেবের কাছে কুমারের বোনের আরোগ্য কামনা করে। অরুণা এই ব্যাপার স্বচক্ষে দেখে মতলব করে গেল ঘণশ্যামদেবের আচার্যের কাছে। অরুণা আচার্যকে গিয়ে বললো—হিংগনা ডাইনী, তার জন্যেই দেশে অজন্মা—আপনি হিংগনাকে ডাইনী বলে প্রচার করে দিন। হিংসাচার ও পাপাচারে পটু হোলেও আচার্য বিনা স্বার্থে দুঃখী ও সচ্চরিত্রা হিংগনাকে ডাইনী বলে প্রচার করে তার ক্ষতি করতে রাজী হোল না। অরুণার বিনীত অনুরোধে পাঁড়ে শেষ পর্যন্ত আচার্য প্রস্তাব করলো অরুণা যদি তাকে দেহ দান করতে রাজী হয় তবে সে একাজ করতে প্রস্তুত। হিংগনার প্রতি আন্তরিক বিদ্বেষবশে অরুণা আচার্যের প্রস্তাবে রাজী হয়ে আচার্যকে দেহ দান করলো।

একাদশ পরিচ্ছেদ। সেদিন সন্ধ্যাবেলা অরুণা আচার্যকে দেহদান করে চলে যাবার পর আচার্যের লোভ আরো বেড়ে গেলো। তারপর অরুণার কথা-মতো আচার্য সেই পাহাড়ের উপরে উঠে দেখলো হিংগনা সূর্যদেবের দিকে তাকিয়ে কিছু প্রার্থনা করছে। হিংগনার রূপে আচার্য মুগ্ধ হোল, মনে মনে সে কামার্ত হয়ে উঠলো। কিন্তু কিছুতেই হিংগনাকে ডাইনী বলতে মন চাইলো না। তবু অরুণার দেহ দান থেকে বঞ্চিত হবার আশংকায় আচার্য হিংগনার

কাছে গিয়ে জানতে চাইলো যে কি প্রার্থনা হিংগনা বললো—সে তার প্রেমিক কুমারের অনুস্বোধনের জন্যে প্রার্থনা করছে, কিন্তু কি প্রার্থনা করছে তা সে বলবে না অন্যের কাছে। আচার্য তৎক্ষণে অধৈর্য হয়ে হিংগনার হাত ধরে তার দিকে সতৃষ্ণভাবে চাইলো সরলা হিংগনা তাকে প্রত্যাখ্যান করলো। আচার্য তাকে পরদিন দুই প্রহরের সময় মন্দিরে আসতে বললো, নইলে হিংগনার বিপদ হবে বলে ভয় দেখালো। আচার্য মন্দিরে ফিরে এলে প্রতিশ্রুতি মতো অরুণা তাকে দেহ দান করে সোজা চলে গেল হিংগনার কাছে তার মন বুঝতে। হিংগনার মুখ থেকে কুমারের কথা ছাড়া আর কিছুই শুনতে পেল না অরুণা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ। পূর্বের প্রতিশ্রুতি মতো উদয়গিরি রাত্রি একপ্রহর পার হোলে বাড়ি এলো। হিংগনার বাবা-মা কুমারের বিষয়ে আগ্রহ না দেখিয়ে খোসমেজাজে তাড়াতাড়ি হিংগনাকে উদয়গিরির হাতে তুলে দিতে চাইলো। এদিকে আচার্যের কথামতো হিংগনা স্বয়ম্ভামদেবের মন্দিরে না যাওয়ায় ক্রুদ্ধ হয়ে আচার্য হিংগনাকে ডাইনী বলে প্রচার করে দিলো। খবর পেয়ে উদয়গিরি হিংগনার বাবা-মাকে নিয়ে আচার্যের কাছে গেল এবং প্রকৃত ব্যাপারও তার প্রতিকারের উপায় জানতে চাইলো। কিন্তু আচার্য অচল অটল ভাবে মিথ্যা বলে দিলো যে হিংগনা ডাইনী—তারপর আচার্য তাদের তাড়াতাড়ি বিদায় করে দিলো। সন্ধ্যার সময় অরুণা এসে আচার্যের কাছে হিংগনার সংবাদ শুনে খুশি হয়ে আচার্যকে দেহদান করে বাড়ি ফিরলো। এদিকে হিংগনাকে ডাইনী বলে কঠোর শাস্তি দেবে লোকে এই ভেবে তার বাবা-মা দুশ্চিন্তার উপায়ন্তর না দেখে হিংগনা ও উদয়গিরিকে বললো রাত থাকতেই পালিয়ে যেতে। হিংগনা কিছুতেই উদয়গিরির সঙ্গে যেতে রাজী হোল না। সে পরদিন সকালে একাকী পালিয়ে সেই পাহাড়ে উঠে 'কুমার' 'কুমার' বলে কেঁদে ফিরলো। কিন্তু কুমারের দেখা পেল না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ। হিংগনা ডাইনী—এই সংবাদ গ্রামের মধ্যে প্রচার হয়ে গেল। গ্রামের লোক তাকে দেখবার জন্যে তার বাড়ীতে ভিড় করলো আর ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে বাড়ি ফিরলো। কুমারের বিরহে আর অপবাদের বোঝা মাথায় নিয়ে দারুণ মনোকষ্টে দিন কাটাতে লাগলো হিংগনা। তিনদিন পর স্বয়ম্ভামদেবের আচার্য গ্রামের প্রধানদের ডেকে সভা করে প্রকাশ্যে হিংগনার শাস্তির বিধান দিলো। এদিকে কুমারের বোনের অসুখ একটু কম থাকায় আজ সে হিংগনার খোঁজে এসেছিল পাহাড়ে। হিংগনার দেখা না পেয়ে কুমার তার বাড়ীর দিকেই যাচ্ছে। পথে একদল লোক হিংগনার অপবাদের বিষয় আলোচনা করছে। তাদের মধ্যে একজন আচার্য ও অরুণার ষড়যন্ত্রের কথাও বলছে—কুমার এ সব শুনলো কিন্তু কিছুই স্পষ্ট বুঝতে পারলো না। হিংগনার শাস্তির কথা শুনে কুমার তখনই বাড়ি ফিরলো এবং তার অনুচরদের মধ্যে দুজনকে নিয়ে স্বয়ম্ভামদেবের মন্দির প্রাঙ্গণে গিয়ে হাজির। সেখানে হিংগনার বিষয়ে আলোচনার জন্যে লোকে লোকারণ্য। কুমার ও তার সঙ্গী দুজন সেখানে সন্ন্যাসীর বেশে একপাশে বসে জপ করতে লাগলো আর, ব্যাপার কোনদিকে গড়ায় সেদিকে খেয়াল রাখলো। একটু পরে কুমার শুনলো, আচার্য বলছে—আগামী কাল হিংগনার শাস্তি হবে; হিংগনার চুল মুড়িয়ে তার সামনের দাঁত ভেঙে তাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে—কারণ তারমধ্যে নাকি ডাইনীর লক্ষন দেখেছে আচার্য। হিংগনার শাস্তির ঘোষণা শুনে গ্রামবাসী যে যার ঘরে ফিরলো। মন্দির প্রাঙ্গণের একপাশে সন্ন্যাসীবেশী কুমারকে দেখে আচার্য তার পরিচয় চাইলো। কথায় কথায় আচার্য সন্ন্যাসীকে রাত্রিতে মন্দিরে থাকবার জন্যে অনুরোধ জানালো। সন্ন্যাসী সক্রোধে বললো—আচার্য অপবিত্র কারণ সে স্ত্রীলোকের কথামতো কাজ করে অন্যায় করেছে। সন্ন্যাসী এই কথা বলে হিংগনার বিরুদ্ধে অরুণা ও আচার্যের ষড়যন্ত্রের প্রতি ইংগিত করলো। সন্ন্যাসীকে চিনতে না পারলেও আচার্য

তার অন্যায় স্বীকার করলো সে সত্যিই এক স্ত্রীলোকের কথামতোই হিপনার বিরুদ্ধে অপবাদ প্রচার করেছে। নির্দোষীর বিরুদ্ধে অপবাদ দেওয়ার শাস্তি অবশ্যই আছে—এই কথা আচার্যকে বলে সন্ন্যাসী বেশী কুমার সেই বেলে হিপনার বাড়ী গিয়ে হাজির হোল। সন্ন্যাসী হিপনার বাবা-মাকে বললো সে হিপনার রক্ষার বিষয়ে চেষ্টা করবে। সন্ন্যাসীর নির্দেশ মতো হিপনার বাবা-মা হিপনাকে সন্ন্যাসীর সামনে নিয়ে এলো। বাবা-মা ও উপস্থিতদিগকে দূরে সরতে বলে সন্ন্যাসী হিপনার কাছে এই অপবাদের বিষয় কিছু জানতে চাইলো। হিপনা যা জানে কোন রকমে বললো। সন্ন্যাসী হিপনার হাত নিয়ে নানা-ভাবে পরীক্ষা করে তার বাবা-মাকে বললো হিপনা নির্দোষ। পরদিন সভায় আচার্যের হাতে হিপনা শাস্তি না পায়, সন্ন্যাসী সে ব্যবস্থা করবে প্রতিশ্রুতি দিল। হিপনার সামনে মনোভাব ও দুঃখবেগ যাতে প্রকাশ হয়ে না পড়ে তাই সন্ন্যাসীবেশী কুমার তাড়া-তাড়ি সেখান থেকে চলে গেল। হিপনাও তার বাবা মাও, যেন নিশ্চিন্ত হোল।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ। পরদিন সকালে ধনশ্যাম মন্দি-রের সামনে লোকে লোকারণ্য। এখনই পরীক্ষা দিতে হবে হিপনাকে সে ডাইনী কি না। আচার্য গত রাত্রিতে সন্ন্যাসীর তিরস্কার শোনা অবধি ভয়ে মুষড়ে পড়েছে। কিন্তু হিপনাকে আগে থেকেই সে ডাইনী বলে প্রচার করে দিয়েছে, এখন আর সে ঘোষণা মিথ্যা নয়, একথা বললেই গ্রামবাসী আচার্যকেই মিথ্যাবাদী বলে শাস্তি দেবে। তাই সে সন্ন্যাসীর সাবধানবাণী সত্ত্বেও নিজের ক্রোধ ও অনুরাগ অবৈধ লাভ লোভে হিপনার শাস্তি বিষয়ে অটল রইলো। পরে যথারীতি বেলে মন্দির থেকে বেরিয়ে আচার্য যথারীতি বসলো তারপর হিপনাকে বিচার সভায় আনবার জন্যে খুব বলিষ্ঠ লোককে পাঠালো। অনাহারে ও চিন্তায় কাতর হিপনা তার বাবাকে ভর করে সভায় হাজির হোল।

তুলনা করবেন না...

তা সব সময়েই হতাশাজনক। বর্তমানে অপ্রচলিত সের ছটাকের সঙ্গে মেট্রিক ওজন ও পরিমাপের তুলনা করাও তেমনি বিরক্তিকর। এতে শুধু আপনার সময় নষ্ট হবে এবং লেনদেনের সময় হয়তো প্রায়ই ঠকবেন।

তাড়াতাড়ি কেনাকাটা ও ন্যায়সঙ্গত লেনদেনের জন্য

মেট্রিক একক ব্যবহার করুন

DA [illegible]

তখন সবাই ভাইনী এসেছে বলে চিৎকার ও হৈচৈ করতে লাগলো। তারপর হিংসনাকে মাছের জাল দিয়ে আটকে ফেলা হোল যাতে সে বিদ্রোহ না করতে পারে। আচার্য ও অরুণার মনে বিবেকের দংশন আরম্ভ হোল —তারাও হিংসনার এই অবস্থায় চিন্তিত হয়ে পড়লো। তবু ক্ষের বলে আচার্য শাস্তির হুকুম দিলো। প্রথা অনুযায়ী তখনই দুজন লোক এসে হিংসনার হাতে দুটি পিপুল পাতা দিলো। হিংসনা তা নিতে অস্বীকার করলো এবং জাল ছিঁড়ে মুক্ত হতে চেষ্টা করলো। এমন সময়ে সেখানে সৈন্য সামন্ত নিয়ে এসে কুমার মন্দির, আচার্য ও গ্রামের মাতব্বরদের ঘিরে ফেললো। সৈন্যসামন্ত ও ঘোড়ার উপর রাজবেশে কুমারকে দেখে হিংসনা ও সবাই বুঝলো এ নিশ্চয়ই রাজপুত্র। কুমারকে দেখে হিংসনা আনন্দে কেঁদে ফেললো। কুমার এসে হিংসনাকে জাল থেকে মুক্ত করলো। তারপর সেখানে জানু পেতে বসলো, মাথা থেকে মুকুট খুলে হিংসনার পায়ের কাছে রাখলো, তারপর সেই মুকুট নিজে হাতে হিংসনার মাথায় পরিয়ে দিয়ে ঘোড়ার উপর তুলে নিলো, এবং নিজের গলা থেকে গজমোতির হার খুলে হিংসনার গলায় পরিয়ে দিলো। সভার লোকেরা হতবাক হয়ে এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখতে লাগলো। তারপর কুমার তার অনুচরদের হুকুম দিলো আচার্য ও গ্রামের কর্তা-ব্যক্তিদের বেঁধে আনতে। হুকুম করামাত্র তাদের বেঁধে আনা হোল। কুমারের ভয়ে আচার্য তখন স্বীকার করলো অরুণার কথামতো সে হিংসনার নামে অপবাদ দিয়েছে। আচার্য অরুণার সমস্ত ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দিলো। আচার্য এবং অরুণা প্রাণভয়ে কাঁপতে লাগলো। কুমার হিংসনার নির্দেশ চাইলে হিংসনা সবাইকেই ক্ষমা করতে বললো। হিংসনার পবিত্রতা ও মহানুভবতা দেখে সবাই তাকে ধন্য ধন্য করতে লাগলো। তখন যে গ্রামবাসীরা হিংসনাকে ডাইনী বলে ঘৃণা করছিল তারাই আবার হিংসনার প্রশংসা করতে লাগলো পঞ্চমুখে। উদয়গিরি বাক্‌বন্ধনমোচন হয়ে ফিরে গেল। গ্রামের প্রধানেরা এখন আচার্য ও অরুণার হাত বেঁধে দেশ থেকে বের করে দেবার ব্যবস্থা করলো। কুমার হিংসনাকে নিয়ে হিংসনার বাড়ি যেতেই আনন্দে সবাই তাদের আন্তরিকভাবে আশীর্বাদ করলো। সন্ধ্যায় কুমার হিংসনাকে ও গরুগুলোকে নিয়ে বনবাস হতে আগের মতো সেই মাঠে চললো কৌতুক করতে। সেই মাঠে গিয়ে তারা পরস্পর মনের কথা বললো। কুমার বললো সে রাস্তায় তার সম্বন্ধে আলোচনা শুনতে পেয়েই হিংসনাকে উদ্ধার করতে পেরেছে। হিংসনা নিজেকে কুমারের অযোগ্য বলে বারবার কুমারের প্রতি তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো। কুমার স্নেহভরে হিংসনাকে আলিঙ্গন করলো।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ। হিংসনার উদ্ধারের পরদিন থেকে কুমার রোজ সন্ধ্যায় এসে তাকে দেখে যায়। এইভাবে দু'সপ্তাহ কাটবার পর একদিন সন্ধ্যায় কুমার হিংসনার বাবা-মার কাছে হিংসনাকে মূল্যবান উপহার দিয়ে হিংসনার সঙ্গে তার বিয়ের প্রস্তাব করলো। হিংসনার বাবা-মা খুশি হয়ে সম্মতি দিলো। চৈত্রমাসের পূর্ণিমা তিথিতে বিয়ের দিন ঠিক হোল। আজ সেই শুভদিন, বসন্তযামিনী। যথাসময়ে মহাসমারোহে ক্ষত্রিয় রাজকুল পদ্ধতিতে কুমার ও হিংসনার বিয়ে হয়ে গেল। হিংসনার আজ আর সুখ ধরে না। হিংসনার বাবা-মা, আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশিরা হিংসনার সুখে সুখী হোল।

পরিশিষ্ট। সুন্দরী, সরলা হিংসনা তার আন্তরিক প্রেমের উপযুক্ত পুরস্কার পেলো। উদয়গিরি কিছুদিন পরে হতাশ হয়ে আবার তার কর্মস্থানে ফিরে গেলো। আচার্য ও অরুণা গ্রাম থেকে বহিষ্কৃত হবার পর লজ্জায় অপমানে সমাজ সংসারহীন হয়ে পাগলের মতো দিন কাটাতে লাগলো। আত্মহত্যা করতে গিয়ে ফিরে এসে অরুণা ভৈরবীর বেশে তীর্থ ভ্রমণে বেরুলো। আর, হিংসনাকে নিয়ে কুমার তার বাড়ি এসে সুখসুখে দিন কাটাতে লাগলো।

একটি ঘটনার বিস্মৃতি • মলয় দাশগুপ্ত

দেয়ালের ক্যালেণ্ডারটি বেশ সুন্দর। এ ঘরে ওই একটি মাত্র ক্যালেণ্ডারই আছে। অধ্যাপক নিবিষ্ট হয়ে তাকিয়ে রইলেন। পিছনে দীর্ঘদেহী রক্তবর্ণ পুরুষ, বর্ণচ্ছটায় সমস্ত পশ্চাদপট উদ্ভাসিত। পদতলে রোরুদ্যমানা নারী। কুন্তী। প্রত্যুত শিশুকে পাশে রেখে কুন্তী কাঁদছে বৈশ্বানরের পায়ে পড়ে। দৃশ্যটি ভাল লাগে অধ্যাপক সুবিমলের। সমস্ত চিত্র ভেদ করে যেন রুদ্ধ হাহাকার আর যন্ত্রণা ছুটে আসতে চায়। সমস্ত হৃদয়ে একটা অনাস্বাদিত রোমাঞ্চ অনুভব করেন অধ্যাপক। সপ্তাহে তিন দিন। সোম, বুধ, শুক্র। অধ্যাপক এ বাড়ীতে পড়ান। এখন সন্ধ্যা। বাইরে ঝিরঝির শব্দ করে কুয়াশা নামছে। জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে ধোঁয়া ঢাকা নীল আকাশে একটি একটি তারা দেখা যায়। অধ্যাপক দেখলেন দূরে দেবদারু গাছের মাথায় ঘন কুয়াশা, রাস্তার ফলওয়ালার সুর চড়িয়ে ডাক আর দূরে প্রত্যাগত এক ঝাঁক দূরন্ত পাখী। ঘরের মধ্যে বিদ্যুৎ বাতি। একটি নিঃসঙ্গ টিকটিকি। পরিষ্কার ঢাকনায় ঢাকা ছোট্ট টেবিল। অধ্যাপক সুবিমল সেন। সপ্তাহে তিনদিন। প্রত্যেক দিনই সুবিমল আসেন, চাকর আলো জেলে বসতে দিয়ে যায়। তারপর দেবী এসে একটু সন্ত্রস্ত হয়ে অন্য চেয়ারটি টেনে বসে। দেবী সুবিমলের ছাত্রী। পুরো নাম দেবদূতী রায়। ওর বাবা ডঃ রায় প্রথম দিন বলেছিলেন, ওর নাম দেবদূতী, ওর ডাক নাম দেবা, বড় হয়ে যায় বলে আমরা দেবী বলে ডাকি।

আজও সুবিমল প্রত্যাশিত হয়ে রইলেন, শান্ত একটি ধীর শিখার মত নিরাভরণা কন্যাটি কখন আসে। বেশ আশ্চর্য হয়ে ভাবেন অধ্যাপক ওর চোখ দুটো এত পরিচিত মনে হয় কেন। একটি ফোলা ফোলা পাতায় ঢাকা তন্দ্রালু চোখ এবং কোন আনন্দের অভিব্যক্তি হলে যা আশ্চর্য তারার মত ঝলমল করে ওঠে। ওর প্রতি আমার এ আকর্ষণ অথবা ওর সুকুমার শৈশব মুখের অনাবিল কোমলতার আমার মনে যে সুগন্ধ অনুভূতির সঞ্চার হয় তাই কি অপত্য স্নেহ। প্রত্যেক সোম, বুধ, শুক্র সন্ধ্যায় দুঘণ্টা সুবিমলের জীবনে একটা উল্লেখ্য পরিবর্তন এনে দেয়। দেবীর

সাহচর্যে পৌঢ় সুবিমল সন্তান বাৎসল্য অনুভব করেন। সুবিমল অন্যমনস্কে টেবিলের বইটা খোলেন। সুবিমল অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন। প্রায় পনর মিনিট বসে আছি, অথচ দেবহূতী এল না। সুবিমল সেন দেওয়ালের ক্যালেণ্ডারে নিবদ্ধ চক্ষু। দেবহূতী আসে না। কুন্তী কাঁদছে, সুর্য প্রথর হাসায় হেসে উঠছে। আর কর্ণ চোখ বুজে স্বপ্ন দেখছে।

'বাবু।'

সুবিমল তাকান। ভৃত্য পরাশর।

'বাবু। দিদিমণি আজ পড়বেন না।'

'কেন রে।'

'দিদিমণির খুব জ্বর। মা বললেন আপনি একটু বসুন।'

'ডাক্তারবাবু কি বাড়ীতেই আছেন।'

'মা—।'

'দেবহূতী কোথায়।' প্রশ্নটা করে লজ্জিত হন সুবিমল। বিব্রত ভাবটা কাটিয়ে তুলবার জন্য বলেন, 'দেবীর কি খুব জ্বর।' পরাশর কোন উত্তর না করে দাঁড়িয়ে থাকে। সুবিমল বইটা বন্ধ করেন, 'চল, একবার দেখে আসি।' পরাশরকে আর কোন অবসর না দিয়ে উঠে দাঁড়ান অধ্যাপক। আমার মনের এ চঞ্চলতা কি স্বাভাবিক। আশ্চর্য, দেবহূতীর অসুস্থতা আজ আমায় এত ব্যস্ত করছে। অধ্যাপকের মনে আর একটি দৃশ্য ছায়া ফেলে। দর্পণে অনেক মুখ প্রতিবিম্বিত হয়ে একটি দৃশ্য, একটি মুখ স্থির হল। অধ্যাপক পরাশরকে অনুসরণ করেন। একটি মুখ, উদ্‌ভ্রান্ত জ্বরতপ্ত বিমর্ষ। একটি জ্বরতপ্ত মুখে ভবিষ্যৎ স্বপ্ন ভাঙার দীর্ঘ বেদনা। মহিম। মহিম গুপ্ত। সুবিমল চমকে উঠে বিরক্ত হন। মন থেকে মৃত বন্ধুর দৃশ্য সরাতে চান। এসব ভাবব কেন। একটি দৃশ্য মুছে যাক। একটি মৃত্যুশয্যা পৃথিবীর জীবনের ভীড়ে হারিয়ে যাক। এবং দেবহূতী আরোগ্য লাভ করুক। অথচ দেবীর জন্য এই যে চাঞ্চল্য, বিশ বছর আগে একটি স্বপ্নময় যুবকের জন্য আমার তেমনি হয়েছিল।

দেবহূতীর ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়ান অধ্যাপক। তীব্র বিক্ষেপে সমস্ত মন আলোড়িত হয়ে থাকে। শুভ্র শয্যায় শুয়ে আছে কন্যা দেবহূতী। মুখের ওপর তপ্ত লাল পর্দা দুলছে। এখন অচেতন। দেবহূতী অচেতন। অধ্যাপক সাবলে নিয়ে নিরুপমাকে দেখলেন। নিরুপমা কাঠের পুতুলের মত অথবা বিদ্যুতাহতা যুবকের মত দাঁড়িয়ে আছে। গভীর বিষাদে ওর মুখ বিপর্যস্ত। নিরুপমা দেখল অধ্যাপক চমকালেন। নিরুপমা বুঝল সুবিমল তাকে চিনতে পেরেছেন। প্রাথমিক বিহ্বলতা কাটিয়ে ওঠে সুবিমল, 'আপনি।'

অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে থাকার পর মাথার মধ্যে যেমন একটা বোবা অনুভূতি সঞ্চারিত হয় নিরুপমার মনেও তেমনি ঝিমু ঝিমু বিষণ্ণতা এল। তারপর সলজ্জ কণ্ঠাজ্জিত হাসি হেসে বলে,—'বসুন।'

সুবিমল বসেন। দেবহূতী অচেতন। মাথার ওপরে ফ্যান। দেয়ালে অনুজ্জ্বল আলো। মিকশ্চার জলপটি আইসব্যাগ। তপ্ত কপাল। উষ্ণ নিশ্বাস। সুবিমল প্রগাঢ় চিন্তায় ডুবে যান। একদিন অকুণ্ঠ লজ্জা আর অসহ্য বেদনা নিয়ে একটি নারী চলে গেছিল। যুবক সুবিমলকে বিবেকের দংশনহত করে যে চলে গেল আজ জীবনে সে পরিপূর্ণ সুখী। দেবহূতীর জ্বর হয়েছে। সদ্যস্নাতা কন্যা। একটি নারী। একটি রোগশয্যা, অথচ এ যেন চিরাগত। যুগে যুগে অনুজ্জ্বল ছায়া ফেলে বহুর নিঃশ্বাসের মধ্যে আসে। তপ্ত নিঃশ্বাসে বিমর্ষ চিন্তার মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। অধ্যাপক চোখ বুজলেন। নিষ্পলক হয়ে দেখছিল নিরুপমা। অধ্যাপক কি তার অস্তিত্ব ভুলে গেছেন। নিরুপমা ভাবল নিঃশব্দে চলে যাই ঘর থেকে। নিরুপমা সহ্য করতে পারছিল না এই পরিস্থিতি। হঠাৎ চোখ মেলে অধ্যাপক বললেন, 'জ্বর কত।' নিরুপমা শুনল এবং বুঝল একটা উত্তর দিতে হবে কিন্তু তথাপি তার ঠোঁট নড়ল না। অধ্যাপক আবার বললেন, 'জ্বর কত।'

'একশ তিন।'

নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে রইল নিরুপমা। দেয়ালে ঘড়ি

রেখে চলে যাইরে শীতের বেলাশে
হাওয়ার বিষম আলো। অধ্যাপক দেবেন্দ্রতীর কপালে
হাত দিলেন দেবেন্দ্রতী চমকাল দেবেন্দ্রতী
অচেতন। জানালার শার্সিতে আঘাত খেয়ে হাওয়া শব্দ
করছে। খাটের পায়া ধরে দেবেন্দ্রতীর দিকে
অধ্যাপক।

'ডাক্তারবাবু কখন আসবেন

'এখুনি বোধ হয়

'ডাক্তারবাবু কি বলেন

'কি জানি।'

'জ্বরটা কোন টাইপের বিনু বলছে না।'

'হ্যাঁ।'

'কি।'

'টাইফয়েডে টার্ন নিতে পারে।'

বিনুদের এবার যেন একটু সহজ হল,
হাল্কা মনে হল নিজেকে।

'আপনার চা—।'

'থাক

অধ্যাপকের উত্তরকে উপেক্ষা করে চলে যায় বিনু-
এখন একাই অধ্যাপক। ঘড়ির পেণ্ডুলামের
জানালার শার্সিতে বাতাসের সংঘাত
আর ফলফলার চিৎকার অধ্যাপকের মস্তিষ্কে মৃদু
আঘাত করে। আর দর্পণে বিভিন্নমুখের ছায়া ফেলে
ফেলে একটি মুখ স্থির হয়।

সেই স্থির উদভ্রান্ত যুবকের মুখ অধ্যাপককে আ
এক পরিচিত জীবনের স্মৃতিতে টেনে আনে।
দিন জরেতথ উক নিঃশ্বাসের শব্দ নিয়ে মৃত্যুকে বরণ
করেছিল যখিন। অধ্যাপক বিচলিত হয়ে ভাবেন মৃত্যুর
চিন্তা কেন। দেয়ালে প্রহরীর মত দেয়াল ঘড়ি। অনু-
ভব.ল ঠাণ্ডা আলো। দেবব্রতু আর দীর্ঘ গাছের
মাথায় দুলছে শীত। অধ্যাপকের চেতনা স্থিরতা
পায়। পর্যায় শায়িতা কন্যা দেবেন্দ্রতী। আস্তে আস্তে
মাথায় হাত রাখেন। আস্তে আস্তে ঘামের মত স্নেহ
গলে যান। সমস্ত শরীরের স্নেহ দিয়ে ভিজিয়ে দিতে চান।

এই কথাটা ভেবে দেখুন

সীমান্তে একজন জওয়ানকে উপযুক্তভাবে
সুসজ্জিত রাখতে দেশের অভ্যন্তরে
৫০ থেকে ১০০ জন ব্যক্তিকে কাজ করতে হয়।

প্রতিরক্ষা অধিকতর শক্তিশালী করার জন্য
দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে কাজ করুন

DAVP 19

মহিমকে এমনি মাথায় হাত বুলিয়েছিল সুবিমল। নিরুপমা দীর্ঘ কান্নার ভেঙে পড়েছিল। মহিমের স্ত্রী নিরুপমা। নিরুপমা কেঁদেছিল। মৃত স্বামীর বক্ষ-লগ্না হয়ে আরো একটি জীবনের অস্তিত্বকে সঙ্গে নিয়ে কেঁদেছিল নিরুপমা। একটি প্রাণোচ্ছল ঘর। ইঁদুরের গন্ধ একটা সম্মোহনী নিষ্টতা ছিটিয়ে। আর মৃত্যুর স্তব্ধতা। শোক। তপ্তশ্বাস। অভিব্যক্তি। সব মিলিয়ে অনাকাংক্ষিত একটি মুহূর্ত সুবিমলকে বিপর্যস্ত করে ফেলেছিল। ক্রন্দসী নিরুপমা। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দুটো একটি যুবকের শব। মৃত যৌবন। অনিশ্চিত জীবন।

মহিম বলেছিল, 'নিরুকে দেখিস।' আমি কেমন বন্যা হয়ে গেছিলুম। নিরুপমার চোখে ঝর্ণাধারার মত অশ্রু। নিরুপমার দেহে দ্বিতীয় প্রাণের অস্তিত্ব আবিষ্কার করে ডাক্তার বলেছিল, বিমলবাবু। আপনার বন্ধুপত্নী, আই মিন মহিমের স্ত্রীর এ অবস্থায় একটু ভাল সাহচর্য আর নার্সিং প্রয়োজন। মহিমের মৃত্যু যে আমার এতটা অসহায় করবে ভাবতে পারিনি। নিরুপমার উপবিষ্টনীর মত বেশের দিকে তাকিয়ে বলেছিলুম 'আপনি এখন কি বলতে চান।

মিশনারী কালারের মত সুন্দর স্বচ্ছ, গাঢ় নীল দৃষ্টি তুলে মৃদুস্বরে বলেছিল, 'আমি কোথায় যাব।

'কোথায় যাবেন।'

দেবহূতী মন্তে উঠল। অধ্যাপক ব্যস্ত হয়ে তাকালেন। সমস্ত চিন্তাগ্রন্থী ছিন্ন করে একটি মাত্র অনুভূতিকে আশ্রয় করল। স্বগতোক্তির মত করে বললেন অধ্যাপক 'দেবী, দেবী, দেবহূতী—।' জ্বরতপ্ত ওষ্ঠাধর একটু ফাঁক হল। অধ্যাপক উঠলেন। ঘরে স্নান থেকে জল নিলেন। কোটা কোটা করে দিলেন দেবহূতীর মুখে। আস্তে লেপ টেনে দিলেন গায়ে। বাতাসে ভর করে অন্ধকার নামছে। বাইরে ঝিঁঝি পোকার ডাক। হাওয়ার সীস। পীজ'ার তীক্ষ্ণ ব্রান ধ্বনি। সুবিমল বসেন। দেবহূতী নড়ল। কিন্তু দেবহূতী অচেতন।

মহিম উত্তেজিত হয়ে বলেছিল, 'সত্যকথা বল।'

'যা মিথ্যা তাকে সত্য বলব কি করে

হঠাৎ এ সংলাপ দুটো এতদিন পরে এমন অসিরূপভাবে মনে আসবার কারণ খুঁজে পেলেন না সুবিমল। অথচ বিশবছর আগে এক দুরন্ত তার চঞ্চল মনের কথা অনিমিভাসেই বলে ফেলেছিল। বর্ষার বৃষ্টি-ছটায় বাতাস আবিল। বাতাস অবনতা এবং দীর্ঘ লম্বা কবিতার ভেজা হাওয়ায় দাঁড়িয়ে সুবিমল বলেছিল, 'যা মিথ্যা তাকে সত্য বলব কেমন করে।' এর অব্যবহিত আগের কথাগুলোতে ঠিক মনে করতে পারছেন না অধ্যাপক অথবা মনের মধ্যে চিন্তার প্রলেপ স্তরে স্তরে আবৃত করে রেখেছে তাকে। সুবিমল ভাবতে চান। বৃষ্টি পড়ছিল। মহিম উত্তেজিত। বৃষ্টির চিরায়ত শব্দ। হাওয়া। মেঘ। কর্কশ বজ্রপাত। বিদ্যুৎ। উত্তেজিত মহিম। 'নিরুপমাকে আমি বিয়ে করব।' সুবিমল কি এর উত্তরে কিছু বলেনি, অথবা কেবল কৌতূহলই ছিল তার। ভরাট গলায় মহিম বলেছিল' 'আমি ওকে বিয়ে করব। মনে মনে কেমন যৌবন উপলব্ধি করছিলাম আমি। অজানা এক যৌবন দারা অনুভূতিতে নাচতে লাগল। মহিমের অসহিষ্ণু গলায় ব্যস্ততা, 'তুই জানিস।'

'না

'সত্যকথা বল।'

'যা মিথ্যা তাকে সত্য বলব কেমন করে।'

এরপর ভ্রূকুঞ্চিত মহিম কি ভাবল। একবার ঘুরে এল সমস্ত কবিতার। হাতে করে বৃষ্টির ফোঁটা ধরল ছেলেমানুষের মত। মুখে আর কপালে হাত বুলাল। তাকাল। দীর্ঘশ্বাস টেনে দ্রুত পালিয়ে যাবার ভঙ্গিতে চলে গেল। সুবিমল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা আবৃত্তি করল। আকাশের মেঘের মধ্যে লাবণ্যর মুখ ভাসল ওকে। মহিম আবার পাশে এসেছে। শ্যামলা মুখে উত্তেজিত স্নায়ুর অবাধ্যতা স্পষ্ট। অস্বাভাবিক জোরে গম্ গম্ করে ওঠে, 'বিমল, তোকে জানানোটা বোধহয় আমার কর্তব্য।' আমি চমকে উঠলুম। সন্ধ্যার ছায়ারা পায়ে পায়ে এগোচ্ছে আর্ত চিৎকার করে উঠল মহিম, 'নিরুকে বিয়ে করব এবং তা এখনই—।'

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল মহিম, মাথার দুপাশের রগ টিপে ধরে অবিরল অশ্রু আর কুৎসিত মানবাত্মার পীড়নের মধ্যে বললে, 'কালে আমার সন্তান ওর—' মহিম নিষ্পাপ শিশুর মত চুকরে উঠল। যেন মহিমের সমস্ত শক্তি ধীরে ধীরে উঠোনের কাদার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। জীবন আর ভালবাসার প্রতি চরমতম বিশ্বাসঘাতকতা করে অনুতাপে জ্বলছে মহিমের আত্মা।

দেবদ্রুতীর দীর্ঘশ্বাসের শব্দ। একটি ঘুমিয়ে পাখার শব্দ। বাইরের রাত এখন কেবল এই সত্য। আর একটি অতীত। একটি মানুষের বিভ্রান্তি—স্মৃতি।

'আমি এখন কোথায় যাব।'

'কোথায় যাবেন।'

আর্তির একটি বিশেষ ক্ষণ এখনও অধ্যাপককে বিব্রত করে। নিরুপমার করুণ ক্রন্দন যুগ যুগ ধরে বাতাসে ঘুরছে। একটা হাহাকার ভরে বাজছে সমস্ত মানুষের সন্দিগ্ধ প্রত্যয়ে। সম্ভাব্য সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল নিরুপমা। আর অনুশোচনার তীব্র কশাঘাতে জর্জরিত হয়েছিল অধ্যাপক। বাবলাকের মত মনে মনে কেঁদেছে, পারেনি নিরুপমার কোন বাধা করতে। সুবিমলের দ্বন্দ্ব বিবেকের কাছে অনেকদিন বাদে একখানি চিঠি এসেছিল। : জীবনে হয়তো একবার পাপ করে ছিলাম। তার শাস্তিও পাচ্ছি। বিমলবাবুর ভালবাসাকে অপমান করেছি, কিন্তু তবু আপনার বন্ধুর স্বপ্ন তারই মেয়েকে বাঁচাতে হবে। তাই বাংলার সমাজ ছাড়িয়ে এখানে কোন রকমে আছি।

ঘড়িতে ন'টা বাজল।

'মিনু চা।' অধ্যাপক চা নিলেন। আর একবার দেবদ্রুতীর কপালে হাত দিয়ে দেখলেন। তারপর নিঃশব্দে চা খেয়ে চললেন। দেশী চিত্রকরের হাতে আঁকা স্থবির চিত্রের মত হয়ে রইল নিরুপমা। সঙ্কোচ লজ্জার ভংগিটি অধ্যাপককে আঘাত করল।

'ডাক্তারবাবু এলেন না।'

সকলের ক্যাকাসে দেখালো নিরুপমাকে।

'উঠি।'

ঘাড় নাড়ল নিরুপমা।

'কাল আবার আসব।'

প্রৌঢ়ার আয়ত দুইচোখে মাতৃত্বের বিদ্যুৎ দেখলেন অধ্যাপক। পা বাড়ালেন। নিরুপমা অনুসরণ করল।

'একটা কথা বলব।'

'বলুন।'

'থাক।'

বাইরে এলেন অধ্যাপক। নিরুপমাও। অধ্যাপক থামলেন।

'বলবেন কিছু।'

নিরুপমা দীর্ঘশ্বাস টেনে বললে, 'ওকে কিছু জানাবেন না।'

'কাকে।'

'দেবীকে।'

কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত পৃথিবী থেমে গেল। কেবল অন্ধকার। দুটি মানুষের স্পন্দিত প্রহর। রাত্রির অন্ধকারে কুণ্ঠিতা মাতা নিরুপমা।

'ও জানে ও তারই, মানে বিল্টু, তপুদের মত ডঃ গুপ্তই ওর বাবা।'

'ও।'

'কথা দিন ওকে জানাবেন না। জানলে আমার কি হবে। আমার শেষ শাস্তির হাত থেকে বাঁচান বিমলবাবু।

'তাছাড়া ওর নিশ্চিন্ত শান্ত সুন্দর ভবিষ্যতের জন্যও ওকে জানান উচিত নয়।

অধ্যাপকের কথায় প্রৌঢ়া নিরুপমা মুড়ো হল। আর শতাব্দীর হাহাকার যেন বস্ত্র গৃহীর মত আশ্রয় করল তাকে।

ঘরে দেবদ্রুতী অচেতন। অধ্যাপক রাস্তায় পা দিয়ে প্রৌঢ় যমনীতে মুক্তির স্বাদ পেলেন।

সেণ্ট আমব্রোজে-র সাম্যবাদ

মলয় রায়চৌধুরী

ক্লাসিকাল চিন্তাবিদগণের মধ্যে প্রিমিটিভ কম্যুনিজম-এর ধননধারা যাঁর রচনায় স্বচ্ছন্দ্রুত, তিনি সেণ্ট আমব্রোজে। যদিও, টেণ্টাটেণ্টবরের কোথাও এতত বিবৃত নেই যে, সাম্য মানুষের আত্মগত অধিকার, স্বর্ণযুগের মতধারাগুলি হতে এবং স্টিক্সপচারের অস্বস্থ জীবনবর্ণনা হতে, তিনি তাঁর ভাবনার ঐকান্তিকতা সংগ্রহের প্রয়াস করেছিলেন। শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদি হতেই যে তাঁর মননশীলতা শুদ্ধ গড়ে উঠেছিল, এমন ধারণা করলে ভুল হবে; এই সমস্ত গ্রন্থের টীকা ও ব্যাখ্যা তাঁকে অনেকাংশে যুক্তির প্রয়োগ এনে দিয়েছে। সৃষ্টি-কর্তা কর্তৃক সমস্ত কিছু সৃষ্ট হয়েছিল তা সমস্ত মানুষের সমান অধিকারভুক্তির মধ্যে থাকবে বলে, এবং ব্যক্তিগত মালিকানা প্রকৃতিবিরোধী।

মনুসাম্যের প্রকৃতিবিরোধী এক সমাজব্যবস্থার সৃষ্টিতে আমব্রোজে চতুরাক মন: তাঁর মতে, মানুষের কোনো এক প্রথম-লোলুপতার প্রাইমা এভারিশিয়া], যার শিকার হয়ে পড়েছিলেন আমাদের কিছু পূর্বপুরুষ, এই সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি। দোষটা সমাজের, না মানুষের নিজের, আমব্রোজে তা সম্পূর্ণ পরিষ্কার করতে পারেননি। অনেক সময়ে তাঁকে দেখা যায় মানুষের মধ্যেকার মনবৈজ্ঞানিক দুর্বলতার ভিতর ওই কারণটিকে খুঁজে বের করতে। সৃষ্টির পঞ্চম দিন সম্পর্কে তাঁর রচনায় আমরা দেখি: Hexaemeron, V, 1, 2 (MPL, XIV, 220):

হায়! মানুষের পূর্বে, ওই প্রলোভনসঙ্কুল জিনিসটি, ধনদৌলতের প্রাচুর্য, যা আমাদের বিলাসিতার জননী, আসার পূর্বে; মানুষের পূর্বে, প্রভূত আনন্দের সমিধ ছিল এখানে। অতএব মানুষকে আকর্ষণ করার এই বস্তুটিকে প্রকৃতির পূর্বেই সৃষ্টি করা হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতি দোষসম্পন্না নয়; সে আমাদের ক্ষুধা নিবৃত্ত করেছে, সে আমাদের কলঙ্কিত করতে চায়নি। সাধারণো ব্যবহৃতব্য বলেই সে আমাদের দিয়েছে এগুলো, যাতে তুমি নিজের সম্পত্তি বলে কোনো বিশেষ সামগ্রীকে ঘোষণা না করতে পারো।

বিসেরো যাকে তাঁর নীতিশাস্ত্রের মাধ্যমে ঘোষণা করতে পারেননি, অথবা তাঁর যুক্তির ভুলে যা সম্ভব

হয়ে উঠেনি, আমব্রোজের তীব্র ও অক্লিদাস মিলিয়েতো রায়ও তাকে ব্যক্ত করতে পেরেছেন। তিনি বলতে পেরেছেন যে, "প্রকৃতির দিক থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কিছুই নেই" এবং মনুষ্য সমাজে সমস্ত কিছুতে অধিকারের সমতা—প্রকৃতি যা সার্বজনীনের জন্যে সৃষ্টি করেছে—তাকে বজায় রাখতে হবে।" এমন একটা মতবাদে পৌঁছে সিসেরো অবশেষে এর প্রতি-বন্ধকতার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। এমনতর দুর্বলতা আমব্রোজে প্রদর্শন করেননি; ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তিভূমি তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন অনধিকার হস্তক্ষেপে বলপূর্বক দখল করার প্রবৃত্তির মধ্যে। উনিশ শতকের ফরাসী বিপ্লবীদের ঘোষণা La proriete c'est le vol-এর আভাস তাঁর রচনার পৃষ্ঠাতেই পাওয়া যাবে।

De officiis ministrorum, 1, XXVIII, 132, 137 (MPL, XVI; 67) :

১৩২ কয়েকজন [দার্শনিক] এমত ভেবেছেন যে ন্যায়তো হল সমানাধিকার, অর্থাৎ সার্বজনীন, সবকিছু সর্বসাধারণের, যা ব্যক্তিগত তাও। কিন্তু এটিও প্রকৃতিগত নয় কেন না প্রকৃতি, জনসাধারণের অধিকারভুক্ত থাকবে বলে সমস্ত উদার করে দিয়েছে। ঈশ্বর বস্তুসমূহকে এমনভাবে তৈরীর হুকুম দিয়েছিলেন যাতে পুষ্টিসাধক জীবিকানির্বাহ সকলের সমানভাবে হয়, এবং পৃথিবী সকলের সমান অধিকারভুক্তিতে থাকে। প্রকৃতি তাই এক সমানাধিকার [এই বস্তু-সমূহে] গড়ে তুললো, লোলুপতা জন্ম দিল ব্যক্তিগত সম্পত্তির···। ১৩৭. এই মহান উৎকর্ষতার কে-ইবা না চাইবে আঁকড়ে থাকতে, যদি না এই মহৎ গুণকে দুর্বল করে দিত সেই প্রথম লোলুপতা? কারণ যতক্ষণ আমরা স্বঐশ্বর্য বৃদ্ধিতে আগ্রহী, অর্থ সংগ্রহে তৎপর, জমিকে স্ব-এক্তিয়ারে আনতে ব্যস্ত, ধনলোলতের জন্যে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত হবার অভিলাষী, আমরা আমাদের থেকে ততক্ষণ ন্যায়কে দূরে সরিয়ে রাখবো এবং হারিয়ে ফেলবো সাধারণ-শুভচেতনার আস্বাদে। কেননা একজন মানুষ কি করে ন্যায়পরায়ণ হতে পারে যদি সে অন্য লোকের প্রয়োজনকে ছিনিয়ে নেয়?

কিন্তু "প্রকৃতির দিক থেকে," অথবা যে অবস্থায় মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, যাতে সবকিছুই সর্ব-সাধারণের হতে পারে, একজন খৃস্টধর্মীর চোখে এমন ধারণা সৃষ্টি করে না যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা মানুষের বর্তমান দুর্দশাবস্থার অবশ্যম্ভাবী অবস্থিতি নয়। এই জন্যে আমব্রোজের কয়েকজন সমালোচককে এমন কথাও বলতে শোনা গেছে যে, তিনি নাকি তাঁর নিজের কালের সমাজে প্রকৃতির এই আদর্শ অবস্থানকে উপস্থাপিত করতে চাননি। যদিও এ-কথা স্বীকার করা চলে যে তিনি ওই আদিম সমাজব্যবস্থার সম্পূর্ণ পুনরাগমনে বিশ্বাস করেননি, তবু, মানুষের মাঝে যে অর্থনৈতিক অসাম্য। তার বিরুদ্ধে জোরাল ঘোষণা করতে কখনও তাঁকে দুর্বলতা প্রকাশ করতে দেখা যায়নি। ধনীর প্রচণ্ড সমালোচনা তাঁর প্রতিটি রচনায় স্ফূর্ত; এই নিন্দার পশ্চাদপটে ছিল এক অদ্ভুত সহবেদনা। সহবেদনা এই জন্যে যে, ধনী কেবল গরীবের আবশ্যকতাগুলিকে লুটে নিয়েই ক্ষান্ত নয়, এর ফলে তার নিজের অশান্তি সে নিজেই ডেকে আনে। এখানে তাঁর একটা উদ্ধৃতি দেওয়া যাক।

De Nabuthe Jezrelita, Ch I, 2, Ch II, 4, Ch III, 11, Ch V, 20 (MPL, XIV, 767-772) :

তোমার বাতুল লোলুপতা আর কত এগিয়ে নিয়ে যাবে ধনী? কেন তুমি প্রকৃতির ভাগাভাগিকে ফেলে রেখে প্রকৃতির সম্পদকে নিজের করে নিতে চাও? পৃথিবী সৃষ্ট হয়েছিল সর্বসাধারণের জন্যে, ধনী এবং গরীব উভয়েরই; কেন তুমি ধনী তাকে তোমার অধিকারজনিত সম্পদ বলে একাই গ্রহণ করতে চাও? প্রকৃতি কোনো ধনীকে জানে না, কারণ সে সকলকেই গরীব করে জন্ম দেয়। বস্ত্রহীনেই আমাদের জন্ম, লৌল্যকাকন ব্যতীত আমাদের লালন-পালন। দিবালোকে সে আমাদের উলঙ্গভাবে জন্ম দেয়, খাদ্য ও পানীয় দেয়; পৃথিবী যা দিয়েছিল তাকে সেই উলঙ্গ-ভাবেই ফিরিয়ে নিয়ে যায়, এমন কি তাদের সম্পত্তিকে ঢাকা দেবার জন্যে সমাধিও খাড়া করে তোলে না। সামান্য একটা মাটির ঢিবি ধনী ও গরীবের জন্যে সমান প্রযোজ্য; এক টুকরো জমি থাকে পূর্বে ধনী কখনও

প্রাধান্য দেয়নি, একদিন তা তাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করে নেয়। জন্মের সময়ে প্রকৃতি আমাদের স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত করে না, মৃত্যুর সময়েও করে না। আমাদের সে সমানভাবে সৃষ্টি করে, সমানভাবে আবদ্ধ করে সমাধির মধ্যে। মৃতকে কে-ইবা আলাদা করে দেখতে পারে? কবর খুলে দেখো, আর, যদি পারো, বলো কে ধনী ছিল···

কিন্তু কেন তুমি ভাবো যে তুমি যখন বেঁচে আছো সমস্ত কিছুর প্রাচুর্য আছে তোমার? ধনী, তুমি জানোনা তুমি কত গরীব···যত তোমার আছে তত তুমি চাও; আর যা কিছুই আয়ত্ত কর না কেন তুমি, সেই পূর্বের মতোই অভাব বোধ কর। লাভের দ্বারা লোলুপতার আগুন আরো বেশী জ্বলে ওঠে, নিভে যায় না·····

সম্পদ নিজে উপভোগের জন্যে তুমি চাওনা, চাও অন্যের উপভোগ করিয়ে দেবার জন্যে। নিজের সুযোগ সুবিধের চেয়ে গরীবকে নষ্ট করে দেওয়াতেই তোমার ব্যস্ততা। তুমি তোমাকে আহত মনে কর যদি কোন গরীব নিজের বলে কিছু রাখে, যাকে তুমি ধনীর প্রাপ্য বলে মনে কর; যা কিছু অন্যের তাকে তুমি নিজের অধিকার থেকে বঞ্চিত বলে মনে কর। কেন তুমি তাইতেই আনন্দ পাও যাতে প্রকৃতির হানি হয়? এই পৃথিবী, যাকে তোমরা কয়েকজন মাত্র ধনী মিলে নিজের করে রাখতে চাও, সৃষ্ট হয়েছিল সমস্ত মানুষের জন্যে। কেবল মাটি নয়, স্বর্গ, বাতাস, সমুদ্র, ধনীরা নিজেদের অধিকারে রাখতে চায়।····· তুমি কি মনে কর স্বর্গের দেবদূতেরা নিজেদের সুখসাচ্ছন্দ্য রেখেছে, যেমন তোমরা পৃথিবীকে ভাগাভাগি করে নাও?·····

তোমার আনন্দ যোগাতে কতজন বিহ্বল হয়! তোমার লোভ ভয়ঙ্কর, মারাত্মক তোমার বিলাসিতা। তোমার শয্যাশোভার আয়তন বৃদ্ধিকল্পে রাজ্য হতে পড়ে মৃত্যুবরণ করতে হয় একজনকে। আরেকজন বৃক্ষ শীর্ষ হতে পতিত হয় কোন বিশেষ ধরনের আহারের খোঁজে গিয়ে, যাতে তুমি তোমার ভোজসভার জন্যে ঠিকমত পানীয় পাও। তোমার টেবুলে যাতে অভাব না হয় তাই মৎস্য ও কিনুকের খোঁজে সমুদ্রে ডুবে যায় অপরজন।·····

তাঁর সমসাময়িক অনেকে এমন কথা বলেছিলেন যে, যারা দরিদ্র তারা তাদের নিজের অবস্থার জন্যে দায়ী নিজেরাই। ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী তাদের ওই অবস্থা। সুতরাং দরিদ্রকে যদি অর্থের ভাগ দেওয়া হয় তাহলে তার দ্বারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধতা করা হবে। আমব্রোজে এই মতধারার বিরুদ্ধতায় মুখরিত নন।

De Nabuthe, VIII, 40 MPL.XIv 778):

তুমি যা বলতে অভ্যস্ত, হয়ত বলবে: ঈশ্বর যাকে দারিদ্র্য দিয়েছেন আমাদের উচিত হবেনা তাকে কিছু দেওয়া। কিন্তু দারিদ্র্যকে ঘৃণা করা হয় না যখন লেখা থাকে: আত্মায় পবিত্র দরিদ্র, কারণ তাদের রাজ্য স্বর্গের।" দরিদ্রের জন্য নয়, ধনীর জন্যেই শাস্ত্র লিখেছে: "পরাকে যে আটকিয়ে রাখে সে অভিশপ্ত।"

সমাজবাদীগণ আধুনিককালেও পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থার যে সমালোচনা করে থাকেন তার একটা ধারা আমব্রোজের চিন্তাকে দেখতে পাওয়া যাবে। অর্থনীতি-বিদগণ আজও স্বীকার করে থাকেন যে, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার প্রতিবন্ধক হল মানুষের অধিকতর অর্থ-লেপ্সা। অবশ্য, শুধু 'একুইজিটিভ' মানুষকেই তিনি সমালোচনা করেননি, সমাজকেও করেছেন। অর্থাৎ সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই যেকোন একটা গলদ থাকতে পারে, তা তাঁর ধারণায় ছিল। বরং ওই সমাজের সমালোচনাতেই তাঁর রচনার বাহুল্য। মানুষের চারিত্রিক দুর্বলতার কথা এসেছে। উৎপাদনকে তিনি দুটি দৃষ্টি-ভঙ্গিতে দেখেছেন—লাভের জন্যে এবং উপভোগের জন্যে প্রথমটি তাঁর মতে, অধিক উৎপাদনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বিক্রেতার উৎসাহ তিনি দেখেছেন, বেশী দাম নেওয়ায়; অর্থাৎ বিক্রয়ার্থে সরবরাহকে সংকুচিত করতেই হয়, আর যদি সম্ভব হয়, একচেটিয়া কারবারের পত্তন হয়। কিন্তু সমাজের ভালো নির্ভর করে যতটুকু উপভোগ করা যাবে তার পূর্ণ উৎপাদনে। সুতরাং আমব্রোজের মতে, সমাজের ভালো মুনাফালোভীর ভালোর ঠিক বিপরীত। তাঁর সময়ে কয়েকটি ক্ষেত্রে

কারবানদের প্রশংসা করেছিল নিশ্চয়ই, বিশেষতঃ সমাজ-ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক মূল্যায়নের প্রশ্নে মানুষের যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল অথবা হয়েছে, আমব্রোজে তার পরিচয় পাননি। আধুনিক যাকে আমরা পুঁজি বলব, তাঁর কালে তা ছিল না বলা চলে। বর্তমান কালের একটি প্রধান সমস্যা শ্রমিক মালিকের সম্পর্কের সামা সম্বন্ধে তাঁর কাছ থেকে আমরা তাই কিছু শুনতে পেলাম না। যদিও তাঁর রচনার কয়েকস্থানে ভাড়া করা শ্রমিকের উল্লেখ পাওয়া যায়, আমব্রোজের মূল বক্তব্য হল দরিদ্র উপভোক্তার, উৎপাদনের আশ্রয়ে দরিদ্র শ্রমিকদের নয়। এই জন্যেই তাঁর মুনাফা বিরোধিতা এবং ওই মুনাফার জন্য দেয় যে উৎপাদন ব্যবস্থা তার সমালোচনা।

হরণ করাকেও আমব্রোজে নিন্দনীয় বলে ঘোষণা করেছিলেন। মুনাফাবাজ ও দুর্বৃত্তের, তাঁর দৃষ্টিতে একই পর্যায়ের। এদের অবলুপ্তিতেই সমাজের শুভ

De Nabuthe, VII, 35, 37 (MPL.XIV776 777

৩৫ লোভী মানুষ সর্বদাই শস্যের আধিক্যে সর্বনাশগ্রস্ত, কারণ যখন সাধারণ মানুষের হাত কম হয়ে যাওয়ায় তার লাভের অংশে টান পড়ে। সাধারণ মানবসমাজের কাছে কেবল উদ্বৃত্তাটুকুরই সৌকর্য; শুধু লোভী মানুষের কাছে বহুগুণ লাভজনক। অধিক বস্তুর চেয়ে দামের আধিক্যেই তার আনন্দ এবং সে সেই সমস্তই পেতে চায় যার একমাত্র সরবরাহকারী সে নিজে, যাতে না আরও অনেকের সঙ্গে তাকে বিক্রয়ের [অর্থাৎ প্রতিযোগিতার] ক্ষেত্রে নামতে হয়। দেখ তাকে !— সর্বদা ভীত যে কখন তার গুদামঘরে উপচে উঠবে আর উদ্বৃত্ত দিয়ে দিতে হবে অভাবগ্রস্তকে এবং ফলে দরিদ্রের একটা সুবিধার সুযোগ ঘটবে।.....

৩৭ কি করবে তুমি যদি তোমার উৎপাদন পণ্যের বস্তুর বাড়তেই থাকে ? যে শস্যগোলা তুমি তৈরী করে রেখেছ সেগুলোকে তুমি ভেঙ্গে ফেলবে, এবং আরও বড়ো দেখে একটা গড়ে তুলবে। ঈশ্বর তোমার

সমস্যাটা বুঝুন

উন্নয়ন এবং প্রতিরক্ষা একই সঙ্গে এগিয়ে চলে। কৃষিক্ষেত্রে ও কারখানায় যত বেশী উৎপাদন করবেন, দেশ তত বেশী শক্তিশালী হবে।

প্রতিরক্ষা অধিকতর শক্তিশালী করার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে কাজ করুন

DA 63/F 17

কলম সুফলা করেছেন যাতে তিনি তোমার লোভকে ঘৃণা ও তিরস্কার করতে পারেন ; তারপর তোমার কোন যুক্তি খাটবে না। কিন্তু তিনি যা অন্যের সুবিধের জন্যে দিয়েছেন তুমি তা তোমার নিজের জন্যে রেখে দাও—না, বরং এ থেকে নিজেকেও বঞ্চিত করো, কারণ অন্যের মধ্যে বিতরণ করলেই একে তুমি ভালোভাবে সঞ্চয় করে রাখতে পারতে।

এ থেকে বোঝা যায় যে, আমব্রোজের মননশীলতা তথাকথিত কয়েকটি মানবিক গুণ যথা ভিক্ষুককে ভিক্ষাদান, ধনীর নিকট হতে কিছু নিয়ে তা দরিদ্রের সেবায় নিয়োগ ইত্যাদি কয়েকটি উদারতায় আবদ্ধরাজ নয়। পরকাল সম্পর্কে একটা সংস্কারগত ধারণা তাঁর মনে থাকলেও, ইহকালীন সমাজব্যবস্থার গলদ দূর করাটাই তাঁর উদ্দেশ্য। এই পৃথিবীর বিতরণ ব্যবস্থায় একটা সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আনায় তিনি বদ্ধপরিকর লেখনী। খৃষ্টধর্মীতার গতানুগতিক উপদেশাত্মক চিন্তনে দরিদ্রকে স্বর্গবাসী মনে করার মোহতেই তিনি শুরু করে যাননি। সমাজে মানুষে মানুষে যে অর্থগত অনৈক্য, তাকে তিনি কখনই স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করে নিতে পারেননি। তাঁর মতে, ওই অসাম্যকে আমরা ন্যায় বলতে পারি না। মানুষের ইতিহাসের আরম্ভ যেমন ভাবে হয়েছিল তার সঙ্গে এর প্রচুর প্রভেদ। একজন ধনী যদি দরিদ্রকে কিছু দেয় তাহলে তার দ্বারা কোন উদারতার প্রমাণ হয়না ; এতদ্বারা সে কেবল ক্ষতিপূরণ করে অথবা প্রকৃত মালিককে তার অধিকার প্রত্যার্পণ করে। কিন্তু পূর্বেকার সেই আদিমসাম্যে কিরে যাওয়া যায় কি করে? আমব্রোজে বলেন যে, মানুষ যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয় তাহলে ফিরে যাওয়া যেতে পারে পূর্বাবস্থায়। কিন্তু তার জন্যে সকলের উচিত হবে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেওয়া, যা অনধিকারভুক্ত তা ফিরিয়ে দেওয়া, নৈতিক চেতনার দ্বারা লোভাতুর মনবৃত্তিকে দমন করা, অন্যের থেকে বেশী অধিকারভুক্ত করার ইচ্ছেকে নষ্ট করা। অর্থাৎ, এমন একটা ধারণায় পৌঁছানো যেতে পারে যে, আমব্রোজের সাম্যবাদ ধনীর ইচ্ছাতে খুব সহজেই আসতে পারে ; সেই জন্যেই ধনীর বিবেককে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন তিনি। তাঁর এই সাম্যবাদে তিনি দেখেছেন যে মানুষকে পূর্ণবার ধাইবেল কথিত এডেন-এর বাগানে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, আমব্রোজের সাম্রাজ্যে চতুর্থ শতকেও তাঁর ওই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করা যেতে পারে, তাঁর নিজের সময়কে সুন্দর ভবিষ্যতে রূপান্তরিত করা চলে, এমন একটা ধারণা তিনি পোষণ করতেন। আমব্রোজে-র মতানুযায়ী সমাজে সাম্য সম্ভব চার্চের প্রভাবের দ্বারা। ধর্মপ্রচারকদের কাজ হবে ধনীকে প্রভাবান্বিত করে একটা এমন ব্যবস্থা করা যাতে যার প্রয়োজন বেশী সে যেন প্রয়োজনানুযায়ী সাহায্য লাভ করে।

তাঁর নিজের সময়কার কিছু মতের দ্বারা আমব্রোজে প্রভাবিত হয়েছিলেন নিশ্চয়ই, অথবা, তাঁর পূর্বজ চিন্তানায়কদের তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। যেহেতু ইতিহাসকে তিনি বিশ্লেষণ করেননি, তাই তাঁর চিন্তনের ধারাটিতে বিজ্ঞানসম্মতভাবে সাম্যবাদ গড়ে উঠতে পারেনি। অসাম্যের প্রতিবাদের পক্ষে তিনি দিশিয়ে ফেলেছেন তদানীন্তন ভাবনা যে, ধনসৌলত মাত্রেই তার মালিকের অপকৃতকারক। দিনাদুদৈনিক আবশ্যকতার চেয়ে বেশী বিত্তসম্পত্তি শুধু বোঝা মাত্র। এই জন্যেই বলা হয় 'বিত্তবান মানুষ', মানুষের-বিত্ত বলা হয় না, অর্থাৎ বিত্তই মানুষকে অধিকারে রাখে, মানুষ স্বাধিকার হারিয়ে ফেলে বিত্তের। দরিদ্রকে সেই বিত্তের অংশ না-দেওয়ার ফলে মানুষ তার ক্রীতদাস হয়ে পড়ে।

বন্ধুসম্বন্ধের বিকল্পার্থে দাস নিপীড়ন এবং শ্রমিকদের মজুরির বিষয়ে আমব্রোজে যা বলেছেন তার কিছু আলোচনা ৩০১ খৃষ্টাব্দের একটি রচনাতে পাওয়া যাবে যার রচয়িতা ভায়োক্লেশিয়ান। ইনি বলেছিলেন যে, লুট করার মনবৃত্তি ও তার ফলে যে-ঐশ্বর্য তা কখনও কমবেনা কারণ যারা সকলে বাণিজ্যবৃত্তিতে লিপ্ত তাদের কাছে ওই আধিক্য একটা লোকসান হয়ে দাঁড়াবে। এই ধরনের লোকেরা, ভায়োক্লেশিয়ান বলেছেন, ঈশ্বরের দানকেও নিজের লভ্যাংশ করে নেয়,

ফলতঃ জনসাধারণের শুভসংগঠনের বিরোধিতা দুষ্কর হয়ে ওঠে। ব্যক্তিগতভাবে তাদের কাছে সমস্ত সমাজকে সন্তুষ্ট করার মতো প্রচুর সম্পদ থাকলেও, তারা অন্যের সম্পত্তি হরণ করার ষড়যন্ত্রে মশগুল, লাভের আর সামলাবার জন্যে ব্যস্ত। ভাগ্যোক্তেপিয়ান ঘোষণা করেছিলেন যে, এই সমস্ত মানুষের লোলুপতা শেষ করে দেওয়াতেই তাঁর আদর্শের রূপায়ণ।

দরিদ্রকে তার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সাবধান করে দিতে ভোলেননি আমব্রোজে। কিন্তু এক্ষেত্রেও তিনি অর্থাধিক্যের ব্যাধি সম্বন্ধে সচেতন করে দিতে চান। একটি আদর্শ সমাজে সকলেরই যথেষ্ট পরিমাণ ব্যবস্থা থাকবে অথচ উদ্বৃত্ত থাকবে না। সমাজের এমনিতর ব্যবস্থাপনায় আমব্রোজের সায়।

Hexaemeron, VIJ 53 (MPL.XIV, 280) :

হে দরিদ্র, তাহলে, লক্ষ্য রেখো, হে ধনী, লক্ষ্য রেখো, দারিদ্র্য এবং সমৃদ্ধি উভয়ের মধ্যেই প্রলুব্ধি নিহিত। এ-কারণেই বিজ্ঞব্যক্তিরা বলে থাকেন : "আমাকে দরিদ্র অথবা সমৃদ্ধি কিছুই দিও না।"...একজন মানুষের প্রয়োজনসাধনের পক্ষে পর্যাপ্ততাই যথেষ্ট। কিন্তু ধনী, যেমন সে তার উদরকে প্রয়োজনের চেয়েও বেশী ভরে নেয় খাদ্যসামগ্রীতে, তেমনি মনকে ভারী করে ফেলে অথথা উদ্বেগ ও চিন্তায়। সুতরাং তারা পর্যাপ্তি ও প্রয়োজনপূরণের ভিক্ষা করে : "পাছে আমি সম্পদশালী মিথ্যেবাদী হয়ে যাই, এবং বলি, কে দেখবার আছে আমাকে : কিংবা পাছে আমি দরিদ্র হয়ে চোর হয়ে যাই, এবং প্রভুর নামে মিথ্যা শপথ করি।" পার্থিব প্রলুব্ধিকে তাই আমাদের এড়িয়ে চলা উচিত, যাতে দরিদ্র না বেপরোয়া হয়ে যায় আর ধনী না হয়ে যায় দুর্বিনীত।

সিনিক এবং তাইক চিন্তন হতে আহরণ করত : আমব্রোজে দরিদ্রের অবস্থার উন্নতি কোনো ইতিহাস-ভিত্তিক উপায়ে করতে পারেননি। দরিদ্রকে তিনি সান্ত্বনা দিয়েছেন ধৈর্যশীল হবার জন্যে। সে নিজেই যে সমস্ত সমাজটার মধ্যে একটা পরিবর্তন আনতে পারে, এমন ধারণা হয়ত তাঁর মধ্যে ছিল, কিন্তু আবেগের ভিত্তি কাটিয়ে, যুক্তির বেড়াজাল ডিঙিয়ে, তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করে তিনি সমর্থন জানাতে পারেননি তাদের নিজেদের হাতে গড়া কোনো অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমাজ বিকাশকে। ধারণাকে তিনি বিপ্লবাত্মক করতে চাননি। অর্থাৎ, আমব্রোজের মননে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা বিকাশলাভ করেছিল মুখ্যত বাইবল-এর প্রভাবে। ঈশ্বরের চোখে যখন সমস্ত মানুষ সমান হতে পারে তখন সমাজের চোখে তাকে সমান করে তোলা একজন ধর্মোপদেশকের অবশ্যকর্তব্য বলে মনে হয়েছিল তাঁর। তাঁর মতে, দারিদ্রের মাধ্যমে মোক্ষলাভ সম্ভব বলে আমরা জানতে পারি। দৈবচরিত্রের প্রভাবকে কাটিয়ে উঠতে পারেননি আমব্রোজে। পাশাপাশি দুটি ভাবধারাকে একই সঙ্গে লক্ষ্য করা যায় :

Hexaemeran, VI (MPL,XVI,279 280

মনে রেখো দরিদ্র, তোমার দেহ যদি মরণশীল হয়, তোমার আত্মা মূল্যবান ও অমর। যদি তোমার অর্থের অভাব হয়, দয়াভাব হয় না; সপরিসর গৃহ অথবা দিগন্ত বিস্তৃত জমি না থাকলেও, তোমার ওপরে স্বর্গ সুবিস্তৃত পৃথিবী মুক্ত। সকলের মধ্যেই সমান সম্পদ প্রদত্ত, এবং যা সমস্ত জগতকে অলংকৃত করেছে তা ধনী ও দরিদ্রের কাছে সমানভাবে মেলে ধরা মহার্ঘ অট্টালিকার চিকন ছাদটি তারকা খচিত স্বর্গমুখ হতেও সুন্দরতর? ধনীর ভূসম্পত্তির বিস্তৃতি কি পৃথিবীর চেয়েও অধিক?

একথা মনে রাখা উচিত যে আমব্রোজে ছিলেন একজন ধর্মোপাসক। সবার ওপরে তাই কোন এক ঐশ্বরিক পরকাল পৃথিবীকেই তিনি স্থান দিতে চান। বর্তমান পৃথিবীতে আমরা যা করে থাকি তার ফলাফল তিনি সেই স্বাশ্বত পৃথিবীতে অনুসন্ধান করতে বলেছেন : eaque oneri cum veniunt magis existimantur quam dispendio cum erogantur.

তাই কি ঠিক?

শিল্প

কমলকুমার সান্যাল

উনবিংশ শতকের প্রায় শেষ পর্যন্ত শিল্পের সংজ্ঞা ছিল "Art is that which produces beauty" এই সংজ্ঞা বহুদেশ ইউরোপে প্রচলিত ছিল। উনবিংশ শতকের শেষদিকে ১৮৯৮ সালে What is Art প্রবন্ধগ্রন্থে টলস্টয় প্রচলিত সংজ্ঞার পরিবর্তে নতুন মত প্রকাশ করেন, তিনি লেখেন—"Art is a human activity consisting is this, that one man consciously by means of certain external signs, hands on to others feelings he has lived through, and that others are injected by these feelings and also experience them" টলস্টয়ের মতবাদ প্রচারিত হওয়ার সাথে অনেকেই অন্তরে অনুভব করলেন জীবনের সত্য ও অভিজ্ঞতা যেমনই হোক শিল্প মাধ্যমে তা পরিবেশন করা চলে। পূর্বে শিল্পের যা বিষয়বস্তু ছিল তার পরিবর্তন আরম্ভ হোল। টলস্টয়ের মতবাদ প্রচারিত হওয়ার পর যে শিল্প সৃষ্টি হোল তা রসিক মনে হোলা দিল। শিল্পীর অভিজ্ঞতাজাত আবেগ-মণ্ডিত শিল্প রসিক মনে সমআবেগ সৃষ্টিতে সক্ষম হোল। এই নবীন শিল্প প্রচেষ্টা নন্দনতত্ত্বে স্বীকৃতি পেল। টলস্টয় মতবাদের সফলতা দেখে বার্নাড শ সমালোচনায় বললেন—'This is the simple truth; the moment it is uttered, whoever is conversant with art recognises in it voice of master.

প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত এবং তার পরে শিল্পজগতে এলেন অনেক প্রতিভাবান শিল্পী। তাঁরা আপন প্রজ্ঞার মাধ্যমে সৃষ্টি করেন 'চতুশৈলী'। বিভিন্ন প্রকার আঙ্গিকের মাধ্যমে রেখা ও রংএর সংমিশ্রণ ঘটালেন। যে আঙ্গিকগুলি চালু হোল কিছুকালের মধ্যেই তাদের মৃত্যু ঘটল। সামাজিক অনগ্রসরতা, মানবতার অপমৃত্যু, প্রাচীন মূল্যবোধের অবলোপ, নতুন মূল্যবোধের অভাব, হতাশা অবিশ্বাস ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ল। যার অনুকরণ দেখা গেল শিল্পকর্মে। ইমপ্রেশনিজম (মনোজ্ঞাবাদ), পয়েন্টালিজম (বিন্দু-বাদ), সিনথেটিজম (প্রতীকবাদ), সিনথেসিজম (সংশ্লেষবাদ), ফাবিজিম (বন্যতাবাদ), কিউবিজিম (ত্রিকোণবাদ) এক্সপ্রেশনিজম (অভিব্যক্তিবাদ), ও ও নুভেরিয়ালিজিম (বাস্তবোত্তরবাদ) ইত্যাদি বাস্তব-বিমুখ ক্ষণিক ইজমগুলি শিল্প জগতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করল। বিমূর্তকরণ শিল্পীমনের দুর্বলতার প্রকাশ এবং বক্তব্য ও বিষয়বস্তুর দৈন্যতা এতে প্রকট হয়ে ওঠে। বিমূর্তকরন প্রবণতা বাস্তব থেকে বিচ্যুত হয়ে ভাববাদকে প্রশ্রয় দিয়ে শিল্পের মূল লক্ষ্যকে অস্বীকার করা শিল্পে

পরস্পর বিরোধী হলেও অনুধাবনের দার্শনিক সমস্যা সাধনের দ্বারাই বৃহৎ শিল্প-সৃষ্টি করা সম্ভবপর আধিপত্যবাদের নিছক শিল্পের মূলনীতির বিরোধী অবশ্য শিল্পে সৌন্দর্যবোধের প্রশ্নও আসেনা আছে! কিন্তু যে সৌন্দর্যবোধ পরিবর্তনশীল। সর্বদেশের, সর্বকালের সর্বমানবের নিকট সৌন্দর্যবোধ সমান নয়। ব্যক্তিমানুষের আপন অন্তরের ধ্যান ধারণার দ্বারা সৌন্দর্যের সত্তা নিরূপিত হয় আবার যে উপলব্ধিও অবশ্যই শর্তাধীন। কারণ—"Beauty them is almost meaningless word if one attempts to attach to it any absolute value. Beauty in work of art is not an inherent quality but an attribute with into it the moment begins to communicate its massage

সামাজিক ও মানবিক সমস্যা থেকে পলায়নপরতা শিল্পের পক্ষে মোটেই শুভ নয়। তাৎক্ষণিকতাকে শৌখিনতার আপন প্রকীয়তার সমুজ্জ্বলে, আপন বৈশিষ্ট্যে চেতনাসমান শিল্পকলা সৃষ্টিই সকলের কাম্য। চৈতন্য দিয়ে দেখা এবং শিল্পে তার প্রতিফলন মূলতঃ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। যে শিল্প অকাট্য বাস্তবকে অনুধাবনে সচেত সমাজবোধের কল্যাণ কামনায় ব্রতী হওয়া নিশ্চয়ই প্রণিধানযোগ্য। জনগণের সাথে শিল্পের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বর্তমান। নীতিবোধ ও নবমূল্যবোধকে শিল্পে স্থান দেওয়া প্রয়োজন। বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি এবং সামাজিক অসাম্য ও অকল্যাণের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য নিত্য সংগ্রামে প্রেরণা দিতে শিল্পকলা জনমানসে আলোড়ন আনতে সক্ষম। বিশ্বের বিবর্তন ও পরিবর্তনের ইতিহাস যে ধরে রাখতে সক্ষম তো বটেই এমনকি বৃহৎ পরিবর্তন সাধনেও শিল্প অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। আইডিয়ার বস্তু-নিষ্ঠতা স্বীকার করে বস্তুর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপনের দ্বারা নতুন ও উচ্চতর মানের শিল্প সৃষ্টি সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর সমাজ, রাষ্ট্র ও মানবজীবনের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনে শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বিপদ সম্পর্কে

সজাগ থাকুন

আমাদের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক
জীবন ধারণ পদ্ধতি বিপদের সম্মুখীন হয়েছে।

ঐক্য ও স্বাধীনতা রক্ষা করুন

DAS3/F 20

নতুন বই

শ্রাবণী। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য।
প্রকাশক—মিত্রালয়,
১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২।
মূল্য বত্রিশ টাকা।

বেতার, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনের যুগে উপন্যাসের আয়ু সম্পর্কিত সংশয় দেখা দিয়েছে। পক্ষে ও বিপক্ষে আলোচনার বিস্তার ঘটেছে। অথচ উপন্যাসের সংজ্ঞা নির্দেশে —'a make belief story written in prose' এর দাবেকী ধারণায় ধরচে ধরেছে এবং যুগ ও জীবনের জটিলতায় উপন্যাস শিল্পকর্ম হিসেবে শুধু বহাল-ই হয়নি, স্বাধিকারও অর্জন করেছে। উপন্যাসের প্রকরণ-গত পরিণতি ও বিজ্ঞানের সম্প্রসারণ পরস্পর সমান্তরাল বস্তুতঃ জীবনকে সবদিক থেকে দেখার মনোভাব বিজ্ঞানভিত্তিক। এবং তা এই ফ্রি-ডাইমেনসনের যুগেই সম্ভব।

বলাই বাহুল্য উপরোক্ত শিরটীকা উপন্যাস আলোচনায় মনে এলো। বর্তমান উপন্যাসটির অবতরণে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য বাঙালী বুদ্ধিজীবী জীবনে নানান সমস্যা, মন ও মননের বিভিন্ন স্তরে অনেক জটিল গ্রন্থি উন্মোচনের প্রয়াস পেয়েছেন। আসলে বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজও সেই সমাজঅন্তর্গত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সামাজিক ও আত্মিক সমস্যা সমূহের প্রাতিস্বিক স্বীকৃত। তাই কাহিনীর উপস্থাপনে লেখক আটপৌরে ঘটনার পাশে ঘুরছে জীবনজিজ্ঞাসার চেতনাকে লিপিকুশলতায় বিধৃত করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠরতা শ্রাবণীর ব্যক্তিত্বে রুচিবোধ ও নীতিনিষ্ঠার পাশাপাশি সতীর্থ অনীতার মানসিক ডেটলিয়াপনা, মেধাবী শ্রীহর্ষের পাশে জীবনের অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতারশাসিত সাংবাদিক বিজয়ব্রত। যদিও এঁরা সবাই মিলে নিটোল নয়, পরি-পরিপূরক তো নয়ই, তবুও এঁরা শুধু কতগুলি বিচ্ছিন্ন, স্বকেন্দ্রিক চরিত্রই নয়—এক ছেঁড়াকাটা মুমূর্ষ সমাজের বিচিত্র আশা আকাঙ্ক্ষা, সুখ দুঃখ ও জীবন-স্রোতের কথাই মনে পড়িয়ে দেয়। এবং এঁরা সবাই বর্তমান শতাব্দীপুষ্ট ও নবজীবনের বাতাসে লালিত।

স্ত্রী শিক্ষার প্রসার, অধুনা, প্রগতির স্মারক নিঃসন্দেহে : কিন্তু অন্ধ প্রাচ্যরতা থেকে আলোক-প্রাপ্তারা নানাবিধ সামাজিক ও মানসিক পিছু টানে ক্লিষ্ট। এবং এও আরেক সমস্যা। লেখক শ্রাবণী চরিত্র রূপায়ণে এমনি এক সমস্যার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আসলে শ্রাবণীর মাসীমা যিনি আশৈশব শ্রাবণীকে পালন করেছেন, এবং আপন মনের প্রণালীতে কন্যাকে প্রতিপালিত করার কামনায় নিষ্ঠাবতী আমাদের একান্নবর্তী পরিবারের কর্তা বা কর্ত্রীকে মনে করিয়ে দেয় যাঁর ছায়ায় অনাদর ব্যক্তিত্ব স্ফ্রিয়মান। এই ব্যক্তি-উত্থানের যুগে বিরোধ তাই অনিবার্য। এবং সমগ্র উপন্যাসে এই বিরোধ লীলায়িত।

বলতে দ্বিধা নেই মালিনীর ন্যায় এমন সমাজচেতক, সংশয়-শঙ্কাদুঃসহ, মরমী চরিত্র বাঙলা উপন্যাসে বিরল। এবং এহেন চরিত্র উপন্যাসটির কেন্দ্রবিন্যুতে ভারসাম্য রক্ষা করা চলেছে। পড়তে পড়তে মনে হয়েছে আমাদের এই নৈরাজ্যের কালে যখন সব মূল্যবোধগুলো ভাঙনের মুখে এবং এক পঙ্গু পশ্চাত্য সাম্রাজ্য-বাদের স্কোটকের ন্যায় প্রতীয়মান, সেইসময়ে মালিনী এক শুভাশুভ প্রতীকি চরিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। তা নাহলে সহপাঠী শ্রীহর্ষের সাথে সামাজিক নৈতিক সুখ দুঃখ ও সাংবাদিক বিজয়ব্রতের প্রতি আকর্ষণের মুহূর্তগুলোয় শ্রাবণীর যে দ্বিধা-সংশয়,

নৈতিক কার্যকরণের বিশ্লেষণী উদ্‌ঘাটনে যা প্রশংসনীয় প্রভাব অর্জন করে। এবং এখানেই দুই চরিত্রের সার্থকতা।

পরিশেষে নিবেদন এই—'শ্রাবণী' উপন্যাসটি সুসংসম্পূর্ণ বলে মনে হয়েছে। অনেক প্রধান চরিত্রের পরিণতি, যা উপন্যাসকারে অনিবার্য, অনুপস্থিত হয়তো লেখকের সংক্ষিপ্ত ভূমিকাটির কথা মনে রাখলে এ প্রশ্নের নিরসন হবে। লেখক জানিয়েছেন—এই গ্রন্থের চরিত্রগুলো তাঁর পরবর্তী অপরাপর উপন্যাসে পরিবেশিত হবার সম্ভাবনা আছে। সেক্ষেত্রে আমরা অপেক্ষায় থাকব যেহেতু শ্রাবণী পাঠে ইতিমধ্যেই আমাদের আগ্রহ জন্মেছে। তাই বর্তমান গ্রন্থখানি সম্পর্কে শেষকথা বলার ইচ্ছের আপাতত: ইস্তাফা দিতে হবে।

—হরি সেন

এক শতাব্দী—রোমকার আবদুল খালেক।

প্রকাশক—বুক সাপ্লাই, ৪০, জিন্দাবাহার ২য় লেন, ঢাকা-১। দাম ৪·০০ টাকা।

বাংলা দেশের সমকালীন ইতিহাসে কজলুল হকের বিশিষ্ট ভূমিকা ও অবদান আছে। তাঁর প্রায় শতাব্দীব্যাপী কর্মজীবন কেবলমাত্র একটি কর্মবহুল ব্যক্তিজীবন নয়, বাংলা দেশের রাজনৈতিক জীবনের কাহিনী অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। রাজনৈতিক জীবনের কত উত্থান পতন, উপর মহলের কত ষোলাজলি, সাম্রাজ্যবাদের অপচেষ্টা এই সবকিছুই মূর্ত হয়ে উঠে কজলুল হকের জীবন অধ্যয়নে।

'এক শতাব্দী' বইটিতে হক সাহেবের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি গদ্যাকারে লেখক উপস্থিত করেছেন। এই ঘটনাবলীর মধ্যে আছে তাঁর বাল্য-জীবন, ছাত্র-জীবন, ওকালতী পরীক্ষা ও বিবাহ, ঢাকা সম্মেলন, লীগ সংহতি রক্ষা প্রেস এ্যাক্টের বিরুদ্ধে, রাউলাট এ্যাক্টের বিরুদ্ধে শিক্ষা বয়কট নীতিপ্রসঙ্গে নবযুগ পত্রিকা প্রকাশ, প্রথম মন্ত্রীত্ব লাভ, সোলটেবিল বৈঠক, পাকিস্তানের পটভূমি, দুক্তস্তের কথা, শাসনতন্ত্র রচনা প্রভৃতি ঘটনা।

হক সাহেবের বিরাট কর্মবহুল জীবনে এই সমস্ত ঘটনা কেবলমাত্র তাঁর ব্যক্তিজীবনের ঘটনা নয় বাংলা দেশের রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাসও। তাঁর সঙ্গে যুক্ত অনেক রাজনৈতিক নেতারও পরিচয় আমরা পাই এই বইটিতে। এ ছাড়াও হক সাহেবের বহু বিবৃতি, বিশেষ করে বাংলার তদানীন্তন লাট চার্চিলের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপের অনুলিপি বইটির মূল্য বাড়িয়েছে। সবশেষে পাকিস্তানের রাজনৈতিক ঘটনাচক্র, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব সেই সঙ্গে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চেতনাবোধের পরিচয়ও আমরা পাই বইটিতে। নানা তথ্যে সমৃদ্ধ বইটির আশা করি সমাদর হবে।

কবি-কিশোর সুকান্ত—অমলাচরণ বসু, সরলা বসু।

প্রকাশক—আনন্দধারা প্রকাশন : ৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম ২·৫০।

বাঙালী এবং বাংলা সাহিত্য পাঠকদের কাছে সুকান্ত ভট্টাচার্যের নাম অপরিচিত নয়। স্বল্পতম জীবনের সীমায় তাঁর সাহিত্যকৃতি কবিতার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান লাভের দাবি করতে পারে। সুকান্তের কবিতায় আমরা দেখি একটি যুগের প্রতিফলন যে-যুগে আছে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও গণ-আন্দোলনের উদ্দাম বন্যা। বাস্তবধর্মী কবিতা রচনায় এক নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত হয়েছে সুকান্তের কবিতায়। যদিও কেউ কেউ রাজনৈতিক প্রচার বলে তাঁর প্রতিভা খর্ব করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সুকান্তর কবিতা বইয়ের ব্যাপক প্রচার প্রমাণিত করে যে তাদের এই প্রচেষ্টা কত মূল্যহীন।

এই কবির ঘরোয়া জীবনের অন্তরঙ্গ বর্ণনা করেছেন লেখক এবং লেখিকা। তাঁরা তাঁদের বক্তব্যে বলেছেন যে, শেষ সাতটা বছর সুকান্তকে অনেকখানি কাছ থেকে দেখার সুযোগ তাদের হয়েছিল। তারই কিছু স্মৃতি কাহিনী নিয়ে এই বই। সুকান্তকে বুঝতে সাহায্য করবে এই ধরনের কিছু চিঠিপত্রও সংযুক্ত বইটিতে। গল্পের আকারে সহজ ও সুললিত ভাষায় বইটি পাঠক দের বিশেষ করে কিশোর পাঠকদের নিশ্চয়ই ভাল লাগবে।

মেঘ, তবু মেঘ নয় | পরিমল চক্রবর্তী

মেঘ, তবু মেঘ নয়। হৃদয়ের শান্তিনিকেতনে
কতোবার সেই স্মৃতি মেঘের নূপুরধ্বনি হয়ে
ভেসে এসে দেহমন কাঁপিয়েছে! শ্রান্ত চেতনার
উপকূলে কতোবার করে গেছে স্নেহের প্রহার
দূরগন্ধা সেই স্মৃতি! তবু আমি দুঃখের বলয়ে
বন্দী হয়ে আছি আজো যৌবনের মুগ্ধ উপবনে।

মনপবনের নৌকো এখন বাইনা আমি আর
সেই দুঃখে; আবেগের মোহনায় ভুলেও যাই না
বাসনার স্রোতে ভেসে! হায়রে, আমার রাত্রিদিন
কী করে কাটাবো বলো। কাকে নিয়ে এই বেদনার
সপ্তসিন্ধু পাড়ি দেবো! যাকে আমি কোথাও পাই না
কী করে শোধাবো বলো আমি তার হৃদয়ের ঋণ!

মেঘ, তবু মেঘ নয়। বিরহের আর্ত পদাবলী
গেয়ে গেয়ে আজো তাই ধুলোরাঙা পথে পথে চলি॥

মানসযাত্রী : ১৯৬২ | রক্তেশ্বর হাজরা

অসংখ্য ফুল ফুটতে ফুটতে হঠাৎ
স্বচ্ছ হাওয়ার কৃপণ স্বভাবে শুকালো,
সেদিন পাখিরা দল বেঁধে যেতে যেতে
দিগন্তপারে তাকিয়ে দেখলো আকাশ
লাল আর ঘন কালোতে লেপটে গেছে।
মানস সরোবরের শরতে প্রতি বছরের
নভোযাত্রীরা বুঝলো কোথাও আশ্বিনে-ঝড়।

অসংখ্য ফুল আধফোটা ফুল, প্রতি বৃক্ষের
শীর্ষ শাখায় পাখিরা বললো—একটি দুটি,
ধোঁয়ায়, বারুদে, বুলেটে অনেক মৃতদেহে
শুভ্র তুষার বিবর্ণ হলো; তবুও ওরা
নীড়মুখী কেউ হয়নি, ওরা জানতো ঝড়ের
সামান্য আয়ু। তারপরই সেই নীলাভ আকাশ
আঁকিড়ে ফুল, শান্ত মানস-তীর্থে শরত।

অনন্যা | শ্রীপদ সেনগুপ্ত

দু হাতে ছড়াও তুমি রৌদ্রালোক সোনা
হৃদয়,তো সমুদ্রের তরঙ্গে প্লাবিত
দুই চোখে আশ্বিনের গভীর দ্যোতনা
দীর্ঘঘন পল্লবের ছায়ায় অদৃত।

কুন্তলে কি বিভ্রমের প্রগাঢ় তিমির
কণ্ঠস্বর দূরান্তের ভেসে আসা গান,
দুই পায়ে মল্লিকার আশ্রয় নিবিড়
বক্ষে দোলে প্রভঞ্জনে কামনার বা

কতশত পরাক্রম যুগে-যুগান্তরে
হে অনন্যা, গ্রীবা ভঙ্গি কটাক্ষে তোমার
প্রবাহিত রক্তস্রোতে, বিষণ্ণ প্রহরে
রাজদণ্ড, রথচক্র সব ছত্রাকার।
এ যৌবন ক্রীতদাস জীবিকার দ্বারে
তুমি কি প্রসন্না হবে আশ্লেষে আমার

নাট্যরূপ | চন্দ্রশেখর রায়

অতঃপর অন্ধকার কথা কয় অর্ধস্পষ্ট স্বরে
দৃশ্যের গভীর হতে। সুরের আগুন জেলে জেলে
উজ্জ্বল আসর হতে বোবা-মন স্পর্শ করে
নবাগত স্থির মুখরতা, পুঞ্জীভূত কথা ঠেলে ঠেলে।
দৃশ্যপট ঘিরে জড় যবনিকা খুলে চরিত্রের ভিড়
বেড়ে যায় অহরহ : কথা দিয়ে কথার প্রকাশ।
সেই কথা গান হয় সুরের জারোকে ফেলে দিয়ে,
'এসরাজ' 'পিয়ানোর' রীডে রীডে আঙুল খেলিয়ে।

পট-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নেমে আসে কৌতূহল, ত্রাস।
সে-সুর মিলিয়ে যায় মনে-মনে—শাণিত অসির
ঝনঝনায়। 'ভিলেনের' মৃত্যুঘটে চলিত প্রথায়।
নায়কের রণ জয়। মেয়েটির শপথ কঠিন
এবার সফল হয় যৌবনের সবুজ সু-দিন।

অন্ধকার নেমে আসে। যবনিকা মনকে কাঁপায়।

স্পোর্টস কন্‌ট্রোল বোর্ড, না কংগ্রেস সংগঠন ?

মণি চৌধুরী

এবারে কলকাতার খেলার মাঠে যে-কয়টি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে—তার মধ্যে "পশ্চিমবঙ্গ স্পোর্টস কন্ট্রোল" বোর্ড অন্যতম। "এই স্পোর্টস কন্ট্রোল" বোর্ড" এবার স্থাপিত হলেও এর নতুনত্ব তেমন নেই। প্রথমত: পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীই এর ভিত্তি স্থাপন করে গিয়েছিলেন কয়েক বৎসর পূর্বে,—দ্বিতীয়ত: স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ডের দাবি এই রাজ্যের ক্রীড়ামোদীদের দীর্ঘ দিনের দাবি; সর্বোপরি এই দাবি ছিল পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলগুলির।

এই স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ড গঠিত হবার পূর্বেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ডের নাম কমিটি গঠন করেছিল—গড়ের মাঠের তিনটি খেলা মাঠের কর্তৃত্ব ঠিকাদার কোম্পানীর হাত হতে নিয়েছিল। এই দাবিও আজকের দাবি ছিল না—এ দাবি ক্রীড়ামোদীদের দীর্ঘ দিনের দাবি; আরো দাবি ছিল কলকাতা মহানগরীতে একটি স্টেডিয়াম। স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ড, ঠিকাদার কোম্পানীর হাত হতে খেলা মাঠের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে ক্রীড়ামোদীদের বড় দাবি—"স্টেডিয়াম" আপাততঃ শিকায় তুলে রাখা হয়েছে।

যে-কোন দেশের জাতীয় জীবনে খেলা-ধুলো হচ্ছে সমাজের প্রধান অঙ্গ। আমাদের দেশেও তাই। খেলা ধুলোকে বাদ দিয়ে সুস্থ সমাজ গড়ে তোলা প্রায় অসম্ভব। তাই যে-দিকেই তাকাই, সে-দিকেই দেখি বিভিন্ন কর্মকাণ্ড এ দিকে চলছে—আর পাশাপাশি চলছে খেলাধুলো; খেলার মান উন্নত করার জন্যে নানাবিধ প্রচেষ্টা। বিভিন্ন দেশের এই প্রচেষ্টার মধ্যে আন্তরিকতার ছাপ, জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হলেও আমাদের দেশে এর নামগন্ধও দেখতে পাওয়া যায় না; যা দেখি সব ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত। ফলে আমাদের দেশের খেলাধুলার কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলো হয়ে উঠেছে এক একটি দুর্নীতির স্তম্ভ। এই স্তম্ভ অপসারণের চেষ্টা যত না হয়েছে, তার চেয়ে বেশি হচ্ছে একে আরো দুর্নীতির পাঁকে ডুবিয়ে দেয়া। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাই এর মধ্যে বেশি করে আমাদের দৃষ্টিতে পড়েছে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন। ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন সম্বন্ধে প্রতি বছর ভূরি ভূরি দুর্নীতির প্রত্যক্ষ অভিযোগ। দৈনিক কাগজে এই অভিযোগ লিখে লিখে স্তূপীকৃত করে তুলেছে কিন্তু প্রতিকার হয়নি—হবেই বা কেমন করে? কে এই দায়িত্ব নেবে? যে নিবে তার বিপদ অনেক আছে। কারণ দুর্নীতি ধরলেই তার জীবনের নানা দিক দিয়ে বিপদ বেড়ে যাবে। এমন কি একবার "চ্যারিটির" টিকিটের (মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল দলের খেলার) কাউন্টার পার্ট একবার পুলিশ কমিশনার-এর (১৯৫৪ সনের) নির্দেশে বন্ধ করে দিয়েছিল। এই বন্ধ করে দিয়ে কাউন্টার পার্ট-এর শেষ পরিণতি কি হয়েছে আজো তা জনগণ জানতে পারেনি। অর্থাৎ যেন চতুর্দিকের শ্যেনদৃষ্টি আর উড়িয়ে দেয়া সম্ভব হবে না—ঠিক সেই সময় আই-এফ-এ'র বেতনভুক্ত সম্পাদক এক নতুন চাল খেললেন—সেই খেলা মাঠে নয়—আই-এফ-এ গভর্নিং বডির সভায় প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষকে আই-এফ-এর সভাপতি বরণ করে। দস্তরমত খেলোয়াড় ভালোই তাই তিনি অন্যদের কাছে (সমগোত্রীয় কর্মকর্তা) "আদর্শ"স্থানীয়। বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তারাও আর চুপ করে থাকতে পারলেন না—পড়ে গেল পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানে কাড়াকাড়ি। যে-কোন কেন্দ্রীয় ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের দিকে তাকাই—সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ।

যে কথা বলছিলাম, পশ্চিমবঙ্গে স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ড গঠিত হয়েছে তা কেনে ক্রীড়ামোদীমাত্রেই আনন্দিত হবেন এতে কোন সন্দেহ নেই।

সন্দেহ নেই এই জন্যে যে পশ্চিমবঙ্গের খেলাধুলো আজ অতলগহ্বরে ডুবতে বসেছে—এই ডুবাডুবির হাত হতে খেলাধুলোকে বাঁচাতে হলে চাই শক্তিশালী একটি-মাত্র কেন্দ্রীয় সংস্থা—তার মাধ্যমেই খেলাধুলো পরিচালনা হবে রাজ্যে। সরকারী প্রচেষ্টায় সবশেষে এই স্পোর্টস

কন্ট্রোল বোর্ড গঠিত হওয়ায় অন্ততঃ সাময়িক হলেও নতুন চেষ্টা শুরু হবে এটা আপাততঃ আশা করা যায়।

এই স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ড রাজ্যের খেলাধুলোর মান বৃদ্ধির জন্যে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন অন্ততঃ আমরা এখন পর্যন্ত তা জানি না। তবে যে-ভাবে এই স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ড গঠিত হয়েছে তাতে এর সুদূরপ্রসারী কাজ-কর্ম সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। ২১ জন সদস্যবিশিষ্ট এই স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ডে কতজন জেলা প্রতিনিধি আছেন? ২১ জন সদস্যের মধ্যে কতজন খেলোয়াড় আছেন? এই বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে একটি রাজনীতি দলের লোক ব্যতীত অপর কোন রাজনীতি দলের লোক কতজন আছেন?

উপরোক্ত তিনটি প্রশ্নের বিচার করে দেখছি। প্রথমতঃ রাজ্য বলতে কি আমরা কলকাতাকেই বুঝি? না বৃহত্তর পশ্চিমবঙ্গে আরো ১৪টি জেলা আছে। এক কলকাতাকে কেন্দ্র করে যদি খেলাধুলো পরিচালনা হয় তা হলে এর উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। মফঃস্বল জেলাগুলোতে যদি খেলাধুলোকে প্রসারিত করতে না পারা যায় তা হলে রাজ্যের খেলাধুলোর মান উন্নত হতে পারে না। যুক্ত বাংলার কথাই ধরা যাক। কলকাতার ফুটবল খেলার মান সে সময় অনেক উঁচুতে ছিল ঠিকই—কিন্তু পাশাপাশি পূর্ব বাংলার জেলাগুলো কি কোন অংশে কম ছিল? ছিল না। ফলে এই সময় কলকাতার এই রাজ্যের খেলোয়াড়দের খাটতি পড়েনি কোন সময়েই।

কাজেই যাদের নিয়ে স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ড গঠিত হয়েছে তাঁরা জেলাগুলোর প্রতি কতটুকু নজর রাখতে পারবেন সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

এই অভিযোগের কোন প্রতিকার হয়নি, যে অভিযোগ ছিল বিভিন্ন ক্রীড়া সংগঠনগুলো পরিচালিত হয় যারা জীবনে কোন দিন কোন খেলায় অংশ নেননি তাদের দিয়ে—অতএব রাজ্যের খেলার মান উন্নত হতে পারে না। স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ড-এর ২১ জন সদস্যের মধ্যে ৬ কিংবা ৭ জন প্রাক্তন খেলোয়াড় রয়েছেন—আর যাঁরা আছেন তাঁরা কে কোন দিন কি খেলেছেন তা রাজ্যের ক্রীড়ামোদীরা জানেন না। এই ৬।৭ জন খেলোয়াড় অবশিষ্ট ২০ জনকে তাঁদের মতামত গ্রহণে সক্ষম হবে? যদি না হন তা হলেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। কারণ খেলোয়াড়দের অভিজ্ঞতা আর যাঁরা খেলেননি তাদের অভিজ্ঞতার সংঘাত অনিবার্য ভাবেই রাজ্যের খেলাধুলোর উন্নতির অন্তরায় সৃষ্টি করবে।

তৃতীয়তঃ এইটি কি আর্টস কন্ট্রোল বোর্ড না কংগ্রেস-এর আর একটি শাখা? ২১ জন সদস্য বিশিষ্ট এই সংস্থায় যাঁরা স্থান পেয়েছেন—তাঁরা কারা? হয় কংগ্রেস এম, এল, এ না হয় গত নির্বাচনে পরাজিত কংগ্রেস প্রার্থী আর না হয় কংগ্রেস সদস্য। অর্থাৎ চৌরঙ্গীর বাড়ীর সঙ্গে যাদের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে তাঁরা ছাড়া আর্টস কন্ট্রোল বোর্ডে কারো স্থান হয়নি। মজার কথা এইখানেই যে দীর্ঘদিন ধরে রাজ্য বিধান সভার বিরোধী দল হতে এই স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ডের দাবি জানিয়ে আসছিলেন শ্রীগণেশ ঘোষ, শ্রীহেমন্ত বসু ও শ্রীযতীন চক্রবর্তী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সেই সময় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী-ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ও এই স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ডের দাবি স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং ডাঃ রায়েরই স্বীকৃতে স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ডই এতো দিনে রূপ নিয়েছে।

অলিম্পিকের শপথবাণীটিতে রয়েছে খেলাধুলোকে রাজনীতির উর্ধ্বে রাখার জন্যে। আর পশ্চিমবঙ্গে গঠিত স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ডটিকে "স্পোর্টস কন্ট্রোলে"র জন্যে না পেয়ে পেয়েছি একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক দলের একটি শাখা।

এই শাখা খেলাধুলোর মান উন্নয়নে যতটা সাহায্য করতে না পারবে তার চেয়ে বেশী সাহায্য হবে কংগ্রেস সংগঠনটির তার নমুনা বেশ কয়েক বছর ধরেই এই রাজ্যে দেখছি।

আমরা ক্রীড়ামোদীরা বলব খেলাধুলোকে রাজনীতির উর্ধ্বে রাখতে, এবং রাজ্যে খেলাধুলোর মানকে উন্নত করার জন্যে চাই সর্বদলীয় স্পোর্টস কন্ট্রোলবোর্ড। সর্বেদলীয় স্পোর্টস কন্ট্রোলবোর্ড ব্যতীত এই রাজ্যের খেলাধুলোর মান উন্নত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ রাজ্যের বেশীর ভাগ লোককে দূরে রেখে রাজনীতির ক্ষেত্রে আর যাইহোক, খেলাধুলোর ক্ষেত্রে এর

সাফল্য অনিবার্যভাবে ব্যাপ্তি করে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

স্মরণীয় ওয়েল, স্মরণীয় তাঁর ইংল্যাণ্ড সফর

শান্ত ও শৃঙ্খলার মহান আদর্শ খেলাধুলো এই মহানগরীকে মুগ্ধ করে বর্তমান বিশ্বের সেরা ক্রিকেট অধিনায়ক ফ্রাঙ্ক ওয়েল সদলবলে ইংল্যাণ্ড সফর এসেছিলেন টেস্ট ক্রিকেট সহ আরো কতগুলো খেলা খেলতে—টেস্ট সিরিজে ওয়েলের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল "ধবধব" জয়ের গৌরব লাভ করেছে ইংল্যাণ্ড দলকে ৩-১ টেস্টে পরাজিত করে, ইংল্যাণ্ড সফরে ওয়েল শুধু ধবধব জয়ই করেননি—কালো শ্বেতবর্ণের বর্ণ-বৈষম্যের বিষের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরকে ভেঙ্গে দিয়েছে। তাই ওয়েস্ট ইণ্ডিজদলের এই সফর শুধু ইংল্যাণ্ড-বাসীকে আকর্ষণীয় খেলায় শুধু মাতিয়ে রাখেনি ওয়েলের অসাধারণ ব্যক্তিত্বও ইংল্যাণ্ডবাসীর মানসপট হতে সহজে মুছে যাবে না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে ক্রিকেট খেলার শ্রেষ্ঠ-ত্বের লড়াই সীমাবদ্ধ রয়েছে, অষ্ট্রেলিয়া, ইংল্যাণ্ড ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের মধ্যে। মহাযুদ্ধের পর ডনব্রাডম্যান এর নেতৃত্বে অষ্ট্রেলিয়ার বিজয় অভিযান, তারপর পিটারের পরিচালনায় ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠত্ব, আর যার ধারে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের চিত্তাকর্ষক খেলা ও ১৯৫১ সালে ইংল্যাণ্ড সফরে সাফল্য এবং ১৯৬০-৬১ সালে ওয়েলের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের অষ্ট্রেলিয়া সফরে অসাধারণ বৈশিষ্ট্য—যা ক্রিকেট ইতিহাসের পাতায় নয়া-নজীর স্থাপিত হয়েছে এটাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরের যুগের অবিস্মরণীয় ঘটনারূপে চিহ্ন রেখেছে।

১৯৬০-৬১ সালে ওয়েলের নেতৃত্বে ইণ্ডিজ দলের অষ্ট্রেলিয়া সফর বিশেষ করে চিত্তাকর্ষক 'টাইটেস্ট' এরপর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল সম্বন্ধে বিশ্বের ক্রিকেট অনু-রাগীদের মন-প্রাণ পড়ে থাকে সেই দলটির খেলার জন্য —ফ্রাঙ্ক ওয়েলের জন্যও তাই ওয়েল ইংল্যাণ্ডে দলে পৌঁছিলে সেখানে যে আনন্দরোল পড়ে যায় তারই বহিঃপ্রকাশ প্রতিটি টেস্ট ক্রিকেট খেলায় দর্শকদের ভীড় হতে পাওয়া যায়। ব্যাপক দর্শকের আগমন ব্যর্থ হয়নি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের আকর্ষণীয় খেলা দেখে। ইংল্যাণ্ডে আজকাল আকর্ষণীয় ক্রিকেট প্রায় মৃত্যুর মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়েছে। ওয়েল ইংল্যাণ্ড মাঠে যে আকর্ষণীয় খেলার নজীর রেখেছেন, তা আজকাল ইংল্যাণ্ডে কদাচিৎ দেখা যায়।

ইংল্যাণ্ড সফরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ফাস্ট বোলার গ্রিফিথের নাম উল্লেখযোগ্য। ব্যাটিং-এ রোজন কানহাই কনরাড হান্ট, বেসিল বুচার ও গারফিল্ড সোবার্স নিজ নিজ উৎকর্ষে স্বাক্ষর রেখেছেন।

আরো উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো সোবার্স চতুর্থ টেস্টে রান করে আউট হন—কিন্তু এই ১০২ রান যোগ করার ফলে ইতিপূর্বে যে ৯ জন টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় চার সহস্রাধিক রানের অধিক করেছিলেন তাঁদের সাথে সোবার্স নিজের নামকে যুক্ত করেছেন। সোবার্সের পূর্বে যারা চার সহস্রের বেশী রান করেছেন তারা হলেন :—হ্যামণ্ড, ব্রাডম্যান, হাটন, কম্পটন, হার্ভে, হবস, সাটক্লিফ, পিটার মে এবং উইকস, ব্রাডম্যান, হার্ভে ও উইকস বাদে ছয়জন হলেন ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়।

এঁদের গড়পড়তা ছিলো হলো :

	টেস্ট	ইনিংস	নট আউট	মোট রান
ওয়ালী হ্যামণ্ড	৮৫	১৪০		৭,২৫১
ডন ব্রাডম্যান	৫২	৮০		৬,৯৯৬
বেসিল হাটন	৭৯	১৩৮		৬,৯৭১
ডেনিস কম্পটন	৭৮			৫,৮০৭
হেনরি হার্ভে	৭৪			৫,৭৪৪
জ্যাকস হবস	৬১		৭	৫,৪০০
এচ সাটক্লিফ	৪৪		৯	৪,৫০৪
পিটার মে	৫১		৯	৪,৪৩৭
এভারটন উইকস	৪৮	৮১	৫	৪৪৪৪

ইংল্যাণ্ড দলের ফাস্ট বোলার ফ্রেডি ট্রুম্যান এখন তাঁর খেলোয়াড়ী জীবনের তুঙ্গে উঠেছেন, তিনি গত অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড সফর শেষ করে টেস্ট ক্রিকেটে নয়া নজীর রেখেছিলেন ২৫০টি উইকেট দখল করে। ট্রুম্যান এখানেই থামেননি—ওয়েস্ট ইণ্ডিজদলের বিরুদ্ধেও ৩৪টি উইকেট দখল করেছেন ৪২৪ রানের বিনিময়ে। অর্থাৎ টেস্ট ক্রিকেট-এ এখন ট্রুম্যান ২৮৪

উইকেটে সবল করে বিশ্ব রেকর্ড করেছেন, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের উইকেট রক্ষক ডেরিক মারের নামও উল্লেখযোগ্য, যার একটি পর্যায়ের খেলায় ২৯ জন ব্যাটসম্যানকে প্যাভেলিয়নে ফিরিয়ে উইকেট রক্ষার বিশ্ব রেকর্ড স্থাপনে সক্ষম হন।

এক নজরে টেস্ট ফলাফল: ওয়েস্ট ইণ্ডিজ: ১ম টেস্টে ১০ উইঃ ধর্ষ টেস্ট ২২১ রানে ও ৫ম টেস্টে ৮উইঃ জয়লাভ করে। ইংল্যাণ্ডদল: তৃতীয় টেস্টে ২১৭ রানে জয়ী হয় এ ১৪ টেস্ট অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

এইটি আমার শেষ টেস্ট খেলা—ওরেল

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ৩৯ বৎসর বয়স্ক অধিনায়ক ফ্রাঙ্ক ওরেল পঞ্চম টেস্ট-এর পর বলেন এইটিই আমার টেস্টম্যাচে বিদায়সূচক খেলা! ওরেল ৫১টি টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলেছেন।

ওরেল বলেন, আমি চমৎকার আন্তঃদ্বীপ খেলা চালিয়ে যাবো:

ভারত সফরে এম সি সি দলের খেলোয়াড়বৃন্দ

লণ্ডন, ২৭শে আগস্ট- ভারত সফরে এম সি সি দলের পনের জন খেলোয়াড়ের নাম আজ এখানে ঘোষণা করা হইয়াছে। কলিন কাউড্রে দলের নেতৃত্ব করবেন। সহ-অধিনায়ক হলেন মাইক স্মিথ। বেস্ট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক ডি জি ক্লার্ক দলের ম্যানেজার হিসাবে ভারতে আসবেন।

নির্বাচিত দলের ব্যাটসম্যানরা সকলেই অভিজ্ঞ খেলোয়াড় এবং সকলেই ইংল্যাণ্ডের পক্ষে খেলেছেন। ভারতের নিষ্প্রভ পিচে তাঁরা যথেষ্ট সংখ্যক রান তুলতে পারবেন বলে মনে হয়।

নির্বাচিত দলে চৌকশ খেলোয়াড় (ব্যাটসম্যান ও বোলার) ব্যারি নাইটসহ চারজন ফাস্ট বোলার আছেন। অপর তিনজন হলেন লার্টার, জোন্স ও প্রাইস। দলে তিনজন স্পিন বোলারের মধ্যে মার্টিমোর ও টিটমাস অফ-স্পিন এবং উইলসন বামহাতী ব্যাটা স্পিন বোলার।

বোলাস এবং এডরিক দলের দুইজন ওপনিং ব্যাটসম্যান। কাউড্রে, শার্প মধ্যভাগে ব্যাটিং-এর শক্তি বৃদ্ধি করবেন। এছাড়া উইকেটরক্ষক কিথ পার্কস টিটমাস, মর্টিমোর এবং ব্যারি নাইট সকলেই কৃতী ব্যাটসম্যান।

দুইজন উইকেট রক্ষকের মধ্যে দলে স্থান লাভের জন্য বিস্তর পার্কসের সঙ্গে সমান পাল্লায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

নির্বাচিত খেলোয়াড়দের মধ্যে জোন্স, প্রাইস, উইলসন এবং বিস্তর এ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের প্রতিনিধিত্ব করেন নাই।

নিম্নে নির্বাচিত খেলোয়াড়দের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল—

কলিন কাউড্রে—অধিনায়ক ৩০ বৎসর, ডাহিনা ব্যাট, ৩৭টি টেস্ট ম্যাচ। মাইক স্মিথ—সহ-অধিনায়ক, বয়স ৩০, ডাহিনা-ব্যাট ২২টি টেস্ট। কেন ব্যারিংটন—(৩২) ডাহিনা ব্যাট-ডাহিনা গুগলী বলও দিয়ে থাকেন। ৪৪টি টেস্ট। ফ্রিমি বিস্তর—(২৭), উইকেট রক্ষক। টেস্টে খেলেন নাই। ব্রায়ান বোলাস—(২৯), ডাহিনা ওপনিং ব্যাট, ২টি টেস্ট। জন এডরিক—(২৬), ন্যাটা ওপনিং ব্যাট, ৩টি টেস্ট। জেফ জোন্স—(২২), ন্যাটা ফাস্ট মিডিয়াম বোলার, নাই। ব্যারি নাইট—(২৪), ডাহিনা ফাস্ট মিডিয়াম বোলার, ডাহিনা ব্যাট, ১২টি টেস্ট। ডেভিড লার্টার—(২) ডাহিনা ফাস্ট বোলার, ৪টি টেস্ট। জন মার্টিমোর—(২০), অফব্রেক বোলার, ডাহিনা ব্যাট, ৪টি টেস্ট। কিথ পার্কস (৩১), উইকেট রক্ষক ডাহিনা ব্যাট, ১১টি টেস্ট। জন প্রাইস—(২৬), ডাহিনা ফাস্ট বোলার, টেস্টে খেলেন নাই। ফিল শার্প—(২৬), ডাহিনা ব্যাট, ৩টি টেস্ট। ফ্রেড টিটমাস—(৩০), অফব্রেক বোলার ডাহিনা ব্যাট, ১৬টি টেস্ট। জন উইলসন—(২৬), লেগ, ন্যাটা বোলার, টেস্টে খেলেন নাই। ম্যানেজার—ডি জি ক্লার্ক।

ফ্রেড ট্রুম্যান ভারতে আসিবেন না জেনে ভারতের ক্রীড়ামোদীরা অবশ্যই দুঃখিত হবেন। এ ছাড়া ইংল্যাণ্ডের বিশিষ্ট খেলোয়াড়দের মধ্যে টেড ডেক্সটার, ব্রায়ান ক্লোজ, ব্রায়ান স্ট্যাথাম টনি লক, টম গ্রেভনী এবং বব বারবার ভারতে আসবেন না।

দলের খেলোয়াড়দের গড় বয়স ২৭। ব্যারিংটন—(৩২) সবজ্যেষ্ঠ এবং জোন্স (২২) সর্বকনিষ্ঠ।

খেলাধূলা প্রসঙ্গে

অমিত রায়

সাম্প্রতিককালে সামগ্রিক বিচারে ভারতীয় খেলাধূলার মান যে বহুলাংশেই নিম্নমুখী একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। বিচার বিশ্লেষণের মাপকাঠিতে যাচাই করলে দেখা যাবে যে প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে নানান প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও খেলাধূলার একটা সাধারণ মান বজায় রাখবার প্রবৃত্তি চলে আসছিল। কারণ বিচারে বর্তমানে তার পক্ষে বা বিপক্ষে যাই রায় দেওয়া হোক না কেন একথা অনস্বীকার্য যে স্বাস্থ্য গঠনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিজনিত মনোভাবের ফলশ্রুতি হিসাবে হকি, ফুটবল ক্রিকেট ব্যতীত শরীরচর্চামূলক বিবিধ খেলাধূলাও যুবসমাজে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। পরাধীনতার হীনমন্য পরিবেশের চাপে পড়েও তখন কিন্তু খেলাধূলার মধ্যে স্বাধীনোত্তরকালের মত দলাদলি এবং নোংরামি এতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। অথচ বর্তমানে বিভিন্ন দিক থেকে সুযোগ সুবিধার অনুকূল পরিবেশ যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে।

আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারতবর্ষ হকিতে দীর্ঘকাল যাবৎ যে সুনাম রক্ষা করে আসছিল তাতে বাধা পড়েছে। ত্রুটিপূর্ণ দল নির্বাচন, অনুশীলনের অভাব, পক্ষপাতিত্বের অনুষ্ঠ আবহাওয়া ভারতীয় হকি দলের অধোগতির অন্যতম প্রধান কারণ বলেই বিশেষজ্ঞগণ রায় দিয়েছেন। অথচ দেশ স্বাধীন হবার পর ভারতে হকির মান উন্নয়নের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও প্রেরণা আসা উচিত ছিল।

এথ্‌লেটিকের ক্ষেত্রেও আমাদের দুর্বলতা কম নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আমেরিকা, রাশিয়া, ইংলণ্ড, জার্মানী প্রভৃতি উন্নত দেশগুলো ছাড়াও এশিয়ার অন্যান্য দেশেতে যে পরিমাণ অগ্রগতি লক্ষ করা গেছে ভারতবর্ষ সেই অনুপাতে পিছিয়ে পড়ে রয়েছে অনেকখানি, তারা দলগত এবং একক ভাবে এবং সরকারী ও বেসরকারী যুগ্ম প্রচেষ্টায় এথ্‌লেটিকের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অতীত রেকর্ড ভঙ্গের যে কৃতিত্বপূর্ণ স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হয়েছে—সেই অনুপাতে ভারতবর্ষ কতখানি কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছে তা বিচার করলেই ব্যাপারটি বোধগম্য হবে। আমাদের গর্ব একটি-দুটি নিয়ে—তাদের গর্ব সবাইকে নিয়ে।

কেন এমন হল—এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই জাগতে পারে। উত্তরে বলা প্রয়োজন যে স্বাধীনোত্তর ভারতে খেলাধূলার ব্যাপারে যে সুযোগ সুবিধা রয়েছে তুলনামূলক বিচারে যত কমই হোক না কেন—তার উপযুক্ত সদ্ব্যবহার আমরা

আজও করতে পারিনি। আর পারিনি বলেই আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় আমাদের হটে আসতে হচ্ছে বার বার। ঘটা করে আমরা খেলাধূলার উন্নয়নের জন্যে কমিটি বসাই—স্পোর্টস কাউন্সিল তৈরী করি—অথচ এইটুকু বুঝতে চাই না যে শরীর চর্চার উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে না পারলে আমাদের সব পরিকল্পনাই আসলে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

পাশ্চাত্য দেশের ফুটবল ক্রিকেটের অত্যাধিক মোহেই আমরা শরীরচর্চার উপযুক্ত ক্ষেত্র এ্যাথলেটিকের গণ্ডী থেকে দূরে সরে যাচ্ছি ক্রমশঃ। অথচ একটু খতিয়ে ভেবে দেখছি না যে, যে পরিমাণ দলগত সংহতি ও নৈপুণ্য থাকলে এ সব খেলায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমান তালে পাল্লা দিতে পারবো তা এখনও আমরা অর্জন করতে পারিনি। দু'একবারের নৈপুণ্যে সামগ্রিকভাবে বিচার করতে গিয়ে নিশ্চয় আমরা এব্যাপারে ভুল করবো না। এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা প্রয়োজন যে আমার বক্তব্যের অর্থ অবশ্যই এই নয় যে সব খেলাধূলার চর্চা ছেড়ে আমরা শুধুই এ্যাথলেটিকস নিয়ে—শরীর চর্চা নিয়ে মেতে থাকবো। বক্তব্য হ'ল এ্যাথলেটিকের প্রতি শরীর চর্চার প্রতি আমাদের অনিচ্ছা আসবে কেন? অলিম্পিক বা এশিয়ান গেমসের প্রতিযোগিতায় যখনআমাদের অবহেলিত এ্যাথলেটিকসকেই অন্যতম প্রধান বিষয় করে আসরে নামতে হয় তখন তার প্রতি সমুচিত দৃষ্টি দিয়ে প্রস্তুত হতে না পারলে জাতীয় সম্মান যে রক্ষা পায় না। শুধু একটি বা দুটি স্বর্ণ বা রৌপ্য পদক লাভ করে আত্মপ্রসাদের গর্বে বুক ফুলিয়ে চলতে পারার মধ্যে চমক আছে নিশ্চয় কিন্তু সাফল্যের সুনিশ্চিত সম্ভাবনা কোথায়। তাই বলছিলাম যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালের পৃথিবীতে ক্রীড়াক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের অগ্রগতির ইতিহাস সামনে রেখে আমাদের কর্তব্য নিরূপণ করা প্রয়োজন। শরীর চর্চায় অতীতে যে সাফল্যের পরিচয় আমরা দিতে পেরেছি—সামান্য হলেও বর্তমানে তাকেই জোরদার করবার জন্যে কোমর বাঁধতে হবে।

আমাদের যুব সমাজে বর্তমানে খেলাধূলার প্রতি যে টুকু আগ্রহ—তাতে হুজুগের মাত্রাই বেশী। সত্যিকারের প্রচেষ্টার অভাব নিশ্চিতভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সত্য বটে যে পাশ্চাত্যদেশে খেলাধূলার ব্যাপারে যে সুন্দর পরিবেশ ও স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে—তা আমাদের দেশে নেই। বিভিন্ন ক্রীড়াক্ষেত্রে "প্রফেসানাল" হবার পদ্ধতি হয়ত তাদের পরোক্ষ উৎসাহ জুগিয়েছে অনেকখানি—এ ব্যবস্থার দোষগুণ বিচার করতে না গিয়ে সাধারণভাবে উপসংহার জানা যেতে পারে যে বিলাসিতার মোহস্পর্শে শরীরচর্চাকে তারা কোনদিনই অবহেলা করেনি বা ছোট ভাবতে শেখেনি।

দলাদলি হয়ত অল্প বিস্তর সব দেশেই আছে কিন্তু জাতীয় স্বার্থের ক্ষেত্রে তারা ব্যক্তিগত পক্ষ জাত, দলাদলির উর্দ্ধে উঠে "জাতীয় সম্মান" রাখার জন্যেই চেষ্টা করে এসেছেন—না আমাদের দেশের ক্রীড়াবিদ ও কর্মকর্তাদের অনেকের কাছেই বোধ হয় এখনও Secondary Consideration" আবার এর সঙ্গে মিশেছে আমাদের উপযুক্ত উৎসাহের অভাব। অর্থ নৈতিক অবস্থা সরকারী প্রচেষ্টার অভাব প্রভৃতি আখ্যা দিয়ে এ যুক্তিকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেও এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে আমরা প্রস্তুত হতে পারিনি। জাতীয়তাবোধের যে সুউচ্চ আদর্শ ও প্রকৃত ক্রীড়া বোধ থেকে ক্রীড়াক্ষেত্রে উৎসাহ সঞ্চার হতে পারে তার অভাব ঘটেছে আমাদের।

পরিশেষে বলা দরকার যে এখনও সময় আছে। উপযুক্ত নিষ্ঠা, শিক্ষা ও সৎ প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা নিশ্চয়ই আমাদের এতদিনের সঞ্চিত দুর্বলতা ও অভাবকে কাটিয়ে উঠতে পারবো। আশা করা যায় যে শুধু এ্যাথলেটিকেই নয়—হকি, ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস প্রভৃতি সবকিছু খেলাধূলাতেই উপযুক্ত উৎসাহ ও প্রেরণা আমাদের প্রাণেতে আশার সঞ্চার করে প্রস্তুত হতে সাহায্য করুক। ক্রীড়া জগতের কর্ণধার ও ক্রীড়াবিদদের কাছে সবিনয় নিবেদন এই যে টোকিওর অলিম্পিক প্রতিযোগিতার আসর লগ্নে তারা যেন সচেষ্ট হন—যাতে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে সাফল্যের গৌরবে ভারত অন্যান্যদেশের সমমর্যাদার দাবী জানাতে পারে।

"আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রে নবতর দৃষ্টিভঙ্গী"

রঞ্জন মজুমদার

যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে কারিগরী শিল্পে যে ব্যাপক উন্নয়নের সূচনা হয়েছে তা আমাদের অতীতের সমগ্র ধ্যানধারণার আমূল পরিবর্তন সাধন করেছে। যান্ত্রিক শিল্প-ব্যবস্থায় এই বিপুল অগ্রসরতা আমাদের দিনগত জীবনধারণের পদ্ধতিরও পরিবর্তন এনেছে। আর সে দিক দিয়ে বর্তমান শতকের অন্যতম শক্তিশালী বিজ্ঞান বিস্ময় "চলচ্চিত্র" ক্ষেত্রের বিস্ময়কর অগ্রগমন আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সর্বাগ্রে পরিলক্ষিত হয়েছে।

বিগত একটি দশকের মধ্যেই চলচ্চিত্রে এক যুগান্তরকারী পরিবর্তন এসেছে। অদ্যকার চলচ্চিত্র বিজ্ঞান ও কলাকৃতির মধ্যেকার এক চমৎকারী সমন্বয়। এর বিজ্ঞান একাধারে একে যেমন নতুন নতুন চেহারা ও মেজাজে চিহ্নিত করেছে তেমনই উন্নয়ন হয়েছে তার সুকুমার শিল্পের বৃহত্তর দিকটি। চলচ্চিত্রের শিল্পগত আত্মা বিভিন্ন স্রষ্টাদের মন মনন ও মানসিকতার মাধ্যমে ছন্দ, লাবণ্য, সুর ও রসরূপের অন্যান্য প্রতিজ্ঞাকে সুচিহ্নিত করেছে।

আজকের চলচ্চিত্রের ধারাটি সামগ্রিক বিচারে এক নবতর এষণায় বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। চলচ্চিত্রীদের এই অনুভূতির শিল্পায়নে এক নতুন প্রবাহের সৃষ্টি হয়েছে দেশে দেশে। এরই মধ্যে সিমপলিজম্, নিউরিয়ালিজম্, ক্ল্যাসিসিজম্, মিষ্টিসিজম্, রোমান্টিসিজম্ এবং সুররিয়ালিজম্ অগ্রাধিকার পেয়েছে। বৈজ্ঞানিক এষণায় প্রাপ্ত সমুদয় ধারা ও রীতিগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ চর্চা চলেছে ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার দেশে দেশে এ ছাড়া আঙ্গিক সমৃদ্ধির চেষ্টাও ব্যাপক হয়ে উঠেছে সেই সাথে। এবং তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে রঙীন ছবি, প্যানারোমিক ও ওয়াইড স্ক্রীন, স্টিরিও সাউণ্ড, থ্রী ডাইমেনশান, সিনেমাস্কোপ, টড্-অ্যাও সেভেনটি মিলিমিটার ও স্মেলোভিসন প্রভৃতি কুশলতার মধ্যে দিয়ে। এক্ষেত্রে বাণিজ্যিক সাফল্যের ঘোপে হয়তো সকলেই টিকছে না, তবুও নবতর চেতনার মধ্যে দিয়ে অন্তকার চলচ্চিত্রের এই যে বিপুল অভিযান, তার অসামান্যতাকে আজ আর অস্বীকার করে চলবার উপায় নেই।

সারা পৃথিবী জুড়ে অধুনা চলচ্চিত্র শিল্পের যে নব মূল্যায়ন আন্দোলন গড়ে উঠেছে তাকে স্বাগত জানানো ছাড়া আজ আর কোন্ উপায়। যে-চলচ্চিত্র একদা নিছক লোকরঞ্জনের সামগ্রি ছিল, আজ তার উপস্থাপনার ব্যতিক্রমে সে-চলচ্চিত্রই পৃথিবীর শুভ বিবেকসম্পন্ন বুদ্ধিজীবীদের কাছে এক চিন্তাশীলতার উপাদান হয়ে উঠেছে। সেই বৃহত্তর আন্দোলনের পটভূমিতে নেতৃস্থানীয় কয়েকজন চিত্রপরিচালকের ছবি দেশে-বিদেশে

আজ দর্শকমনে এক অভাবনীয় আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। কাহিনীর বৈচিত্র্যময় উপাদান, নবতর আঙ্গিকে উপস্থাপনা, গভীর মানবীয়বোধে উদ্বুদ্ধ সমাজসচেতন দৃষ্টিকোণে বিপুল শিল্প-শৈলীসম্মত ট্রিটমেন্ট, পরিমিত নাট্যবোধ এবং কনভেনশনাল রীতিবহির্ভূত আত্ম-প্রকাশনার দ্বারা সজ্জিত চিত্রগুলি দেশ-কালের গণ্ডি অতিক্রান্ত হয়ে এক বিশ্বব্যাপী মানবিক আবেদন পূর্ণতা লাভ করেছে। এই নবরীতি আন্দোলনের পুরোভাগে রয়েছেন জাপানের একিরা কুরোসোয়া। যিনি তাঁর 'রশোমন' ছবির মারফৎ পৃথিবীময় একবাক্যে পরিচিতি লাভ করেছেন। ক্লাসিকধর্মী চিত্র নির্মাতা হচ্ছেন সুইডেনের বিখ্যাত পরিচালক ইংমার বার্জম্যান। তাঁর রূপকধর্মী চিত্র 'সেভেনথ্ সীল' ছবিটি চলচ্চিত্রের জগতে প্রভূত চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছেন। ফ্রান্সের আছেন দু'জন। 'হিরোশিমা মন্-আমুর'-এর স্রষ্টা এ্যালেন রেঁজো ও 'দি কোরহাণ্ড্রেড ব্লোজ'-এর নির্মাতা তরুণতম বিদ্রোহী পরিচালক ফ্রাঁকোয়েস্ ত্রুফো। ইতালীর 'লা দলচে ভিতা'র পরিচালক ফেদেরিকো ফেলেন্টী, 'লা' এ্যাভেন্তুরা' চিত্রের নির্মাতা মাইকেল-এঞ্জেলো এন্তোনিয়নি ও 'রকো এণ্ড হিজ ব্রাদার্স'-এর স্রষ্টা খ্যাতনামা পরিচালক চিত্রনাট্যকার লুচিনো ভিসকন্তি এবং ডি, সিকা রয়েছেন তাঁর নিজ কৃতিত্বে। ইংল্যাণ্ডের 'লুক ব্যাক ইন এ্যাংগার'-এর পরিচালক টনি রিচার্ডসন। বিখ্যাত শিল্পসৃষ্টি "কানাল"-এর নির্মাতা পোল্যাণ্ডের আন্দ্রে ওয়াজদা এবং 'লাইফ্ ইন দি ওয়াটার' চিত্রের খ্যাতনামা পরিচালক রোমান পোলান্স্কা। আর্জেন্টিনার 'সামার স্কিন'-এর পরিচালক লিওপোল্ডো টোরি নেলসন। মেক্সিকার নাজারিন চিত্রের পরিচালক বুনেল। ভারতের পথের পাঁচালী থেকে সুরু করে অভিযান চিত্রের পরিচালক সত্যজিৎ রায় ও অযান্ত্রিক চিত্রের স্রষ্টা ঋত্বিক ঘটক প্রভৃতি তরুণ পরিচালকেরা এ যুগের চলচ্চিত্রকে এমন এক অপূর্ব শিল্পকোণ থেকে নিরিক্ষণ করছেন যে যার অনিবার্য যোগাযোগে সব কিছুকে ছাপিয়ে বর্তমান কাল ও ধর্মের পরিশিলিত অন্তরঙ্গ রূপটি প্রকাশ পাচ্ছে তাঁদের স্ব স্ব শিল্পকর্মে।

পৃথিবীর এই শ্রেষ্ঠতম চিত্রকুশলীদের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেই তাঁদের নিজস্ব ক্ষেত্রে এক একটি স্বকীয় চিন্তাধারায় ভাস্বর হয়ে আছেন। তবুও এঁদের মধ্যে কয়েকজনের গভীর আঁতাত লক্ষিত হয়েছে ইতালীয় স্কুল অব নিউরিয়ালিজম্-এ। তাঁদের চিত্র কর্মে এই বিশেষ প্রয়োগ রীতির পরিচয় পাওয়া গিয়েছে বারংবার। চলচ্চিত্রের সনাতন রীতি বহির্ভূত এই নিউরিয়ালিজম্ ফর্মের উদ্ভাবন যদিও পোস্ট ওয়ার ইতালীতেই—তবুও বর্ণনা বৈচিত্রে আকৃষ্ট হয়ে আরও কয়েকজন পরিচালক সেই সারীতে যোগদান করেন।

তারও অনেক আগে আসে একিরা কারোসোয়ার প্রসঙ্গ। নবতর চিত্র আন্দোলনে তিনি এক অসামান্য প্রতিভা। তাঁর ছবিতে আছে—কুরোসোয়ার ভাষায় যার নাম মানবতাবোধ, আর সংযম, তেমনই অপরিসীম নৈতিকতাবোধ। যে অর্থে 'মরাল ঠুনকো হয়, কুরোসোয়া জীবন দর্শনে সে মরালের কোন স্থান নেই। সামগ্রিকভাবে মানুষের চেতনায় বিন্দু বিন্দু কামনা ও বাসনার সঞ্চার হয়—যা দৈহিক অর্থে অবিভাজ্য এবং যা থেকে নিষ্কৃতি লাভের কোন উপায় নেই তেমনতর হৃদয়াবেগ যদি সেই মানুষকে বিপথগামী করে, অন্তরের অভিপ্সা নষ্ট কামনার আগুনে জ্বলে জ্বলে ব্যক্তি বিশেষ বা সমাজের অমঙ্গল ডেকে আনে তেমনতর নৈতিকতার বিরুদ্ধে কুরোসোয়া তাঁর হাতিয়ার ধরতে চান শিল্পানুগ উপায়ে। রশোমন চিত্রে আমরা বিশ্বব্যাপী মানুষের প্রচ্ছন্ন অন্তর্লোক দর্শন করতে পারি। সত্য এবং মিথ্যার সূক্ষ্ম সীমানাটুকুর মধ্যে অবিরত বিচরণশীল মানুষের হৃদয় যে হৃদয়াবেগে তাড়িত হয়ে সত্য মিথ্যাচারণ করে, পূর্বাহ্নে বলা মুস্কিল। 'রশোমন' চিত্রে বিধৃত হয়েছে তেমনই এক সত্য-মিথ্যাচারের কাহিনী। মানুষের হৃদয়ের ভালোবাসা নামক সুকুমার বৃত্তি ও সেই সাথে আত্মরক্ষার সচেতন পাপাচারের এমনই এক দুঃসহ বিবৃতি যা দর্শককে স্তব্ধ করে দেয়, বিবেকে জ্বালা ধরায় এবং প্রশ্নে প্রশ্নে বিভ্রান্ত করলেও সত্যের পথে চলতে অনুপ্রেরণা দান করে।

প্রাচ্যের এই বিবেকবান চলচ্চিত্র পরিচালক নবতর চলচ্চিত্র আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট আছেন দীর্ঘদিন। প্রবীণতার

প্রশ্ন ওঠে তাঁর সেই অর্থে। ১৯৪২ সালে 'জুডো সাগা' নামে জাপানের এক যুযুৎসু বীরের পারিবারিক জীবন চিত্রায়িত করার পর থেকে এ পর্যন্ত তিনি মোট কুড়িটি ছবি নির্মাণ করেছেন। ১৯৫৪ সালে বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে তিনি তাঁর 'ড্রাঙ্কির' চিত্রের জন্য সে বছরের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর সর্বশেষ চিত্র বর্তমান বছরে যে ছবিটি এখনও ষ্টুডিওতে নির্মাণরত, সেই ছবিটির নাম 'হাই এণ্ড লো'।

এর পরই আসে সুইডেনের খ্যাতনামা পরিচালক ইংগমার বার্গম্যানের নাম। চলচ্চিত্রে যাকে 'মেটাফিজিক্যাল পয়েট' হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। নবতর চিত্র-আন্দোলনে তার অবদান এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করছে। যন্ত্রণাবিদ্ধ মানব হৃদয় আজ মুক্তির অন্বেষণে কাত, সেই যন্ত্রণাবোধের নামান্তর তাঁর চিত্রগুলি। পরিচালনা জীবনের প্রথম দিকে 'ইল্লিসিট ইন্টারলুড' ও 'নেকেড লাইফ' নামক ছবি দুটি তাঁর গভীর দর্শনের সাক্ষী হয়ে আছে। আশ্চর্য পরিমিত নাট্যবোধের মধ্যে দিয়ে তিনি যে মহত্তর জীবনের অনুসন্ধানে আকুল হয়েছেন তারই মর্মবাণী বারংবার ধরা পড়ে গিয়েছে। এর পরের 'এ লেসন ইন লাভ' এবং 'স্মাইলস্ অফ এ সামার নাইট' চিত্রদুটিতে তিনি স্ত্রী ও পুরুষের চিরন্তন প্রেমঘটিত দ্বিধা দ্বন্দ্বের কাহিনীকে বিধৃত করেছেন অসাধারণ মুন্সিয়ানায়। চিত্রগুলির মধ্যে অগ্রাধিকার পেয়েছে তাঁর 'সেভেনথ্ সীল' চিত্রটি। এক অভিনব রূপকের অন্তরালে তিনি মানুষের আত্মাকে স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর প্রয়োগ রীতিটি কার্যক্ষেত্রে যে কেমন স্বতন্ত্র এবং বৈচিত্র্যময় তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'সেভেনথ্ সীল' চিত্রে ডেথ্ ও নাইটের সংলাপের মধ্যে দিয়ে—

Death—Why do you play chess with me ?

Knight—I have my reasons.

Death—That is your privilege.

এখন এই প্রিভিলেজটি হয়তো ইংগমারের মত আর বিশেষ কেউ গ্রহণ করেননি, তবুও শিল্পাচারণের ক্ষেত্রে এই প্রিভিলেজটি শিল্পী মাত্রেই গ্রহণ করতে পারেন। বরং তাতে প্রয়োগের ক্ষেত্রে নির্মাতার আপন বৈশিষ্ট্যগুলি অক্ষতদেহে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। ফলাফল বিচার তারও অনেক পরের প্রশ্ন।

ফরাসী 'নিউ ওয়েভ' চলচ্চিত্র আন্দোলনে ইংগমারের প্রভাব অপরিসীম। 'নিউ ওয়েভ' আন্দোলনে ফ্রান্সের কয়েকজন তরুণ পরিচালক আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁদের মধ্যে ঝুঁফো ও রোঁবে'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৭ সালের মাঝামাঝি প্যারীতে ইংগমার বার্গম্যানের চিত্রগুলির এক ধারাবাহিক প্রদর্শনী হয়। সেই প্রদর্শনীতে দিনের পর দিন অসংখ্য দর্শকসমাগম ইংগমারের জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে। প্রচলিত নীতিবহির্ভূত আঙ্গিক-প্রযুক্ত এই চিত্রগুলি ফরাসী তরুণ চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে অভূতপূর্ব নাড়া দিয়ে বসে সে সময়। ইংগমারের চলচ্চিত্রগুলির শিল্পগত উৎকর্ষতা বিচারে ফ্রান্সের বিশিষ্ট চিত্রসমালোচকগণ তদানীন্তন কনভেনশনাল ফরাসী চলচ্চিত্রকারদের কঠোরভাষায় তিরস্কার করেন। ঘটনায় এক বছরের মধ্যেই তার ফল দেখতে পাওয়া গেল। ১৯৫৮ সালের গোড়ার দিকে ঝুঁফো নিজের চেষ্টায় একটি ইউনিট গঠন করে ছবি নির্মাণের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং খুব অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর প্রথম চিত্র 'কোয়-হাণ্ড্রেড' ব্লোজ' সম্পূর্ণ করে প্রদর্শনের জন্য প্যারীর একটি প্রেক্ষাগৃহে পাঠান। দুর্ভাগ্যবশত ছবিটি আশানুরূপ সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়নি। ঝুঁফো কিন্তু এতে মোটেও বিচলিত না হয়ে পরবর্তী চিত্র নির্মাণের কাজে হাত দেন। এই সময় তিনি প্যারীর বিখ্যাত 'কেহিয়ার্স দ্য সিনেমা' পত্রিকায় জনৈক সমালোচকের কাজ করছিলেন। সেখানে তার সহকর্মী হিসাবে কাজ করতেন ক্লড চ্যাবরল। ঝুঁফো ও চ্যাবরলের যুগ্ম প্রচেষ্টায় 'লা বিউ সার্জ' নামক চিত্রটি নির্মাণ হয়। এই ছবিটির শেষে ঝুঁফো'র ব্যক্তিগত আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে।

ফ্রান্সে 'নিউওয়েভ' আন্দোলন ঝুঁফোর সঙ্গে সঙ্গে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে। বহু তরুণ-পরিচালক ঝুঁফোর অনুসরণে চিত্র নির্মাণে অগ্রসর হন। এই সময় ঝুঁফোর জনৈক সহকারী মার্সেল কামু ব্রাজিল-এর পটভূমিতে 'ব্ল্যাক ওরফিয়াস্' নামে একটি রঙীন চিত্র

নির্মাণ করে প্রভূত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন।

'নিউওয়েভ' আন্দোলনের আর একজন নেতৃস্থানীয় এলেন রেঁনো সে সময় কিছু কিছু প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণে নাম করেছিলেন। তিনি স্থানীয় কিছু ব্যবসাদারকে রাজী করিয়ে মোটা অঙ্কের বেশ কিছু টাকা জোগাড় করে জাপানে চলে যান স্যুটিং করতে। সেই বিশ্ববিখ্যাত চিত্রটির নাম 'হিরোশিমা মন-আমুর'। রিলিজের পর এই ছবিটি নিয়ে বিতর্কের ঝড় উঠে যায় দেশে দেশে। সর্বপ্রকার প্রচলিত রীতি নীতি বহির্ভূত এই চিত্রটির চিত্রায়নের ধারা সম্পূর্ণ পৃথক—নাটকের উপস্থাপনা, আঙ্গিকের প্রয়োগরীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে চিত্রটি এমন এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে যে স্বয়ং রেঁনো পর্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন।

এর এক বছর পরে রেঁনো আবার চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন তাঁর পরবর্তী 'লাস্ট ইয়ার এ্যাট মেরিনবাদ' চিত্রটির মাধ্যমে।

ফ্রান্সের চলচ্চিত্রে 'নিউওয়েভ' আন্দোলনের এই দুই শীর্ষস্থানীয় নেতা তাঁদের ব্যক্তিগত সমাজ চেতনা ও জীবন দর্শনে স্থিত প্রাজ্ঞ অসমসাহসিকতার সঙ্গে যে ধরনের চলচ্চিত্র নির্মাণে অগ্রসর হয়েছিলেন তাতে ঝুঁকি ছিল অসম্ভব রকমের। সুইডেনের ইংগমার তাঁদের সেই ঝুঁকি নিতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন বলে ফ্রান্সের চলচ্চিত্রে আজকের এই বিপুল পরিবর্তন সূচিত হতে পেরেছে। মৃতপ্রায় কমভেনশাল সত্তার আমোদপ্রিয়তা ও 'যৌনগন্ধী' চলচ্চিত্রের বিশাল দেহের উপর নতুন জেনারেশন নব নব চিন্তাধারায় উদ্ভুদ্ধ হয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

পরিচালক ঁ্যু কো'র ভাষায়—'It is necessary to film another thing in another sprit : It is necessary to aband on these expensive, disorderly, insalubrious studios. The Sun costs less than a battery of lights. A borrowed Camera, some cheap film, a friend's apartment, friends to play the parts and above all the faith, the rage of the cinema—the rage to storm the barricade, to use this way of expression—the way of the future, the art of the future.

বক্তব্যের উপস্থাপনায় রেঁনো স্পষ্ট এবং দৃঢ়ভাবেই যা কিছু বলবার বলতে চেষ্টা করেন। চমকপ্রিয়তাকে তিনি তাঁর চিত্রকর্মে অনাবশ্যক বিবেচনা করেন। দক্ষ কুশলীর মত দৃশ্যের পর দৃশ্যগুলিকে সাজিয়ে যান এবং দৃশ্যান্তরের মধ্যে থার্ড সেন্সকে আরোপ করেন। তাঁর চিত্রগুলির মধ্যে বর্তমানের অবক্ষয়ী চেতনার কতকগুলি লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে—মননশীলতার কোন চাতুর্যের আশ্রয় গ্রহণ না করে দ্বিধাহীন ভাবে বক্তব্যগুলি প্রতিষ্ঠা করার দিকে তাঁর নজর সবচেয়ে বেশী প্রখর থাকে। ফ্রান্সের জনৈক শিকপাল সমালোচকের ভাষায় 'He has the skill to say whatever he wants to say on the screen. Unhappily he has nothing, or almost nothing to say. As an artist he lacks humanity, lacks blood. He is out of this world, a man of air. Neverthelese, his work is important. He has shattered the public image of what a film is. He has freed all film creators to remold the cinema nearer to their arts' desire.

বস্তুত ফ্রান্সের চলচ্চিত্রে 'নিউওয়েভ' আন্দোলনই অতীতের প্রথাগত এবং নিয়মানুগ নিষ্ফল ব্যবস্থার হাত থেকে বর্তমান কালের দীপ্তিমান শিল্পপ্রকাশকে মুক্তি দিতে সক্ষম হয়েছে। এখন ইতিহাসই বিচার করবে অতীত ও বর্তমানের এই বিপুল সংঘর্ষের শুভাশুভ দিকগুলি।

সমগ্র পৃথিবীময় আজ যে চলচ্চিত্রে এই বিপুল আলোড়ন পড়ে গেছে, আঙ্গিক অভিনবত্বে সজ্জিত হয়ে নতুন নতুন সৃষ্টিকামী চলচ্চিত্রের ক্রমান্বয় বিকাশ সম্ভব হচ্ছে, তাতে ইতালীর স্থল অফ্ নিওরিয়ালিজমের দানই সর্বাগ্রগণ্য। যুদ্ধ যন্ত্রের অব্যবহিত পরেই ইতালীর চিত্র-নির্মাতারা এক নতুন বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত হয়ে চলচ্চিত্রায়নের ধারার এক আমূল পুণর্বিন্যাস করেন। যুদ্ধের চলতি পটভূমিতে ইতালীতে কিছুদিন চলচ্চিত্র নির্মাণের কাজ একেবারেই স্থগিত ছিল। সাধারণভাবে স্টুডিওগুলিতে

তখন কোন যন্ত্রপাতি ছিল না। যে টুকু অবশিষ্ট ছিল, তা যুদ্ধের তাণ্ডবলীলায় তছনছ হয়ে যায়। ফলে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণার পর সেই বিশৃঙ্খল অবস্থাকে আয়ত্বে আনার জন্য করেকজন কলাকুশলী উৎসাহ দেখালেন। ফল কিন্তু তেমন কিছু ভালো হল না। তখন কিছু কলা-কুশলী ইতঃস্তত নিজেদের চেষ্টায় ক্যামেরা ও আনুসঙ্গিক সামান্য শব্দ ও আলোক সম্পাতের যন্ত্রপাতি জোগাড় করে নেমে পড়লেন প্রকৃত কার্যক্ষেত্রে।

ভিত্তোরিও ডি সিকা'র বিশ্ববিখ্যাত ছবি 'বাই সাইকেল থিফ্' সেই সময়কারই চিত্র। যে চিত্রের রূপ, রস ও মেজাজ এবং প্রকৃতি একেবারেই স্বতন্ত্র। ভাব ব্যঞ্জনায়, কাহিনীর বৈচিত্রময় উপাদানে, ফটোগ্রাফীর ভিন্নতর অনুভূতি পৃথিবীময় দর্শক সমাজকে স্তব্ধ করলো। এই-ভাবে একটি অনন্যসাধারণ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা হলো যে স্টুডিও অভ্যন্তরের কৃত্রিম আলোকসম্পাত, বর্ণাঢ্য সেট-সেটিং, জমকালো পোষাক, গ্ল্যামার উচ্চকিত নায়ক নায়িকা ব্যতিরেকেও জনপ্রিয় চলচ্চিত্র উৎপাদন সম্ভব। আর সেই চলচ্চিত্রের মধ্যে দিয়েই অত্যাচারিত মানুষের দুঃখ, দুর্দশা, গ্লানির অকপট ভঙ্গীতে উপস্থাপিত করা চলে।

ভিত্তোরিও ডি সিকার সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে আরও করেকজন পরিচালক তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। পরবর্তী এক বছরের মধ্যেই লুচিনো ভিসকন্তি, ফেলেনী ও আন্তনিয়নি প্রমুখ নিওরিয়ালিজম আন্দোলনের প্রবক্তা তিনজন এই নবতর মননশীল চলচ্চিত্রের ধারাটিকে পুষ্ট করে তোলেন তাঁদের স্ব-স্ব প্রয়োগ নৈপুণ্যের মাধ্যমে। ১৯৬০ সালে ভিসকন্তি তাঁর 'রক্কো এণ্ড হিজ ব্রাদার্স' চিত্রটির পটভূমিতে নিওরিয়ালিজম চলচ্চিত্র আন্দোলনকে আরও করেক ধাপ এগিয়ে দেন। আন্তনিয়নি এ পর্যন্ত মোট তিনটি চিত্র পরিচালনা করেছেন। প্রত্যেকটি চিত্র তাঁর অপরিসীম বৈশিষ্ট্যের সাক্ষ্যদান করে। নিজস্ব এক স্টাইলে তিনি তাঁর চিত্রগুলির মধ্যে ধীর ও মন্থর পদক্ষেপে চূড়ান্ত উত্তরণের দিকে এগিয়ে গিয়েছেন। এই অভিনব চিত্রশৈলী প্রয়োগের ফলে কখনও তাঁর ক্যামেরাকে স্থির দ্বাদুবৎ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে দীর্ঘক্ষণ, নাটকীয় মুখর চূড়ান্ত মুহূর্তগুলিতে তাঁর পরিকল্পনাগুলি যখন কার্যকরী হতে সুরু করেছে তখনও মনে হয়েছে চিত্রের চরিত্রাভিনেতারা মৃতের শোকযাত্রায় ক্লান্তিকর দীর্ঘপথ মন্থর গতিতে অগ্রসর হয়ে চলেছে তো চলেছেই। আন্তনিয়নের প্রতিটি চিত্রে দেখা গেছে জীবন সম্পর্কে এক আশ্চর্য অকপট গাম্ভীর্য—আড়ম্বরহীন কায়দায় প্রতি দিনই জীবিত হয়ে মৃতকল্প জীবনের স্পন্দন। তাঁর চিত্রের অভিনেতাদের দেখে মনে হবে তারা যেন অকস্মাৎ জীবনের প্রতি স্পৃহা অথবা বেঁচে থাকার অবদমনীয় বাসনা কামনা বোধ। তারা যেন ভালোবাসাহীন প্রেমের মধ্যে ক্রমাগত আবর্তিত হচ্ছে শুধু এই টুকু বাসনা নিয়ে যদি এই পঙ্কিল জীবনে জীবনবোধের এক অকল্পনীয় মুহূর্তে অকস্মাৎ এক হৃদয়াবেগ তাদের হৃদয়ে অগ্নিময় করে তোলে এবং সেই আগুনে পুড়ে খাক হয়ে এই যন্ত্রণাবিদ্ধ ক্লান্তির মন যদি কখনও খাঁটি সোনা হয়ে ওঠে। নিওরিয়া-লিজম কর্মে এই মাত্র তাঁর অবদান।

এরপর আসে ফেদেরিকো ফেলেনী'র নাম। নিওরিয়ালিজম চলচ্চিত্রের ধারাটিকে তিনি আবার তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে কিঞ্চিৎ পরিশোধন করে নিয়েছেন। ১৯৫৩ সাল তিনি 'ভেভিয়েলেনী' চিত্রে প্রচলিত নিয়মানুগ চিত্রায়নের মধ্যে দিয়েই তদানিন্তন সমাজকে ব্যঙ্গ করলেন অপূর্ব মুন্সিয়ানায়। এর পরের বছরই তিনি উপহার দিলেন 'লা স্ট্রাডা'! কাব্যময়ুর এই রোমান্টিক ছবিটি স্বদেশে তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তার কারণ হয়ে ওঠে। বিশ্ববিখ্যাত চার্লি চ্যাপলীনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি আলোচ্য চিত্রটির আখ্যানভাগ রচনা করেছিলেন বটে তবে সেদিকদিয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু করতে পারেন নি। কিন্তু ১৯৬০ সালে 'লা দলচে ভিতা' চিত্রটি তাঁর অতীতের সমগ্র রেকর্ড ভঙ্গ করে তাকে এমনই এক বিপুলতার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেল যা অসাধারণ অর্থেও অকল্পনীয়। যুদ্ধোত্তর মানুষের জীবন সম্পর্কে উপলব্ধি দৈনন্দিন জীবনধারণের যন্ত্রণা ও গ্লানিবোধ, দেশব্যাপী মন্বালিজমের বড়াই অথচ সমাজের সর্বস্তরেই ব্যাভিচারের বন্যা, ক্ষমতাপ্রিয় বড়লোকদের বিলাসে বহুল জীবনযাত্রার অপরিসীমতা সাধারণ মানুষের মধ্যে হতাশা,

নৈরাশ্য, উদ্দেশ্যহীনতা, নগ্ন ও নারীর অস্বাভাবিক প্রেম এবং ভালোবাসা ইত্যাদির সমন্বয়ে রোমের উপর চিত্রায়িত 'লা দলচে ভিতা' সমকালিন ইতালীয় জীবনের এক অভিজ্ঞানস্বরূপ। পর পর সাতটি দিনরাত্রির ঘটনাবলীর অভিজ্ঞতায় পুষ্ট জনৈক সাংবাদিকের দর্শন পরিপ্রেক্ষিতে ছবিটি সমকালিন সমাজের ভয়াবহ করুণ দিকটি উদ্ঘাটন করে দিয়ে পৃথিবীময় এমন এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে যে ভেবেও কিনারা করা যায় না। বিশ্বময় চলচ্চিত্রামোদী বিদগ্ধজন ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আলোচ্য চিত্রটি সম্পর্কে বিতর্কের ঝড় উঠে এবং দেশবিদেশের শিল্প সমালোচকেরা এই সম্পর্কে এমন সব পরস্পরবিরোধী উক্তি করেন যে ক্ষেত্রবিশেষ চিত্রটির উৎকর্ষত সম্পর্কে কিছু স্থির সিদ্ধান্তে বলাও শক্ত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

এই অশান্ত, বর্বর অপ্রকৃতিস্থ এবং অপ্রতিরোধ্য চিত্র নির্মাণের মধ্যে দিয়ে ফেলেন্নী এমন এক সমাজ ও সময়কে তুলে ধরতে চেয়েছেন যা হয়তো আদৌ রূপকথা বা অতিরঞ্জিত গল্পকথা নয়, তবুও জীবনের সামগ্রিক পূর্ণতা সম্পর্কে এই গভীর হতাশাবোধধারা ফেলেন্নী যে কি বোঝাতে চেয়েছেন তা বুঝতে খুব একটা পরিশ্রম হয়নি এবং হয়নি বলেই 'লা দলচে ভিতা' দেখার পরই দর্শক-হৃদয় গভীরভাবে আলোড়িত হয়ে ওঠে।

নিও রিয়ালিষ্টিক শৈলী সম্পর্কে ফেলেন্নীর মন্তব্য এ সম্পর্কে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেনে 'নিওরিয়ালিজম বলতে বুঝি সংস্কারমুক্ত মনে বাস্তবকে দেখা। এবং বিনা বাধায় গতানুগতিক বর্জন করে তার সামনে হাজির হওয়া। পূর্ব নির্ধারিত ধারণার বশবর্তী না হয়ে জীবনের প্রকৃত অবস্থার সম্মুখে অকপটে সংস্কারমুক্ত হৃদয় মেলে দাঁড়ানো। নিওরিয়ালিজম চিত্রকর্মে বাস্তবের ব্যাখ্যা দিতে হবে যুক্তিগ্রাহ্য করে—বর্ণনার প্রাচুর্য পরিহার করে বিশ্লেষনধর্মী হয়ে।'

নিওরিয়ালিজমের ধারা ইউরোপের মধ্যেই আজ আর সীমাবদ্ধ হয়ে নেই। পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে এই নবতর চিত্রশৈলীর ধারাপ্রবাহ। চলচ্চিত্রের ক্রমবিবর্তনে এই মহান বিজ্ঞানসম্মত এষণার উত্তরসূরী আজ আমেরিকার কিছু কিছু তরুণ পরিচালকও। বিগত ১৯৫৭ সালে তরুণ পরিচালক মরিস এঞ্জেল নির্মাণ করেছেন আলোচ্য কর্মে 'ওয়েডিংস এণ্ড বেবীস্' নামক চিত্রটি। তাঁর পথ অনুসরণ করে ১৯৫৯ সালে রবার্ট ক্রাঙ্ক 'পুল মাই ডেইলি' নামে চিত্রটি নির্মাণ করে প্রভূত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছেন। তারপর থেকে ঢেউ এসে আছড়ে পড়েছে একের পর এক। আড়ম্বরপূর্ণ হলিউড প্রোডাক্টকে বাজ করে আমেরিকার নিও-রিয়ালিজমপন্থী তরুণ চলচ্চিত্রীরা একটার পর একটা চিত্র নির্মাণ করে তাক লাগিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কৃতির দেখিয়েছেন যথাক্রমে জন কাসাভেটস তাঁর 'শ্রাডোস্' চিত্রে, সিডনে মায়ার্স তাঁর 'দি ব্রাভেড আই' চিত্রে, শার্লি ক্লার্ক তাঁর 'দি কানেকশান' চিত্রে, রোনাল্ড মিকলে তাঁর 'পানস্ অফ দি টি্স্' চিত্রে, হার্বার্ট ডানস্বা তাঁর 'দি রিট্' চিত্রে এবং রবার্ট ড্রু, গ্রেগ শুকার এবং রিকি লুকক—এই ত্রয়ীর একত্রিত প্রয়োজনায় নির্মিত 'দি চেয়ার' চিত্রের মাধ্যমে।

নিউওয়েভ ও নিওরিয়ালিজম চিত্রকারেরা জানেন তাঁদের ছবি সকলে দেখতে চান না, কারণ জীবন সম্পর্কে বহু মানুষের ধারণা এখনও মধ্যযুগীয় রয়ে গিয়েছে। ধনতান্ত্রিক শ্রেণীব্যবস্থায় মানুষের রুচিকে ক্রমান্বয়ে নিম্নগামী করার ফলে এক বৃহৎ শ্রেণীর দর্শককে তাঁরা এখনও তাঁদের দর্শকে পরিণত করতে পারেননি। কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও এই নবতর শৈলীর চিত্রকারদের আশা ভিন্নপ্রদ। মানুষ সম্পর্কে, দেশ-কাল ও সমাজ সম্পর্কে তাঁদের ধৈর্য অপরিসীম। বিশ্বাসবোধ তাঁদের অক্ষুণ্ণ। ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁরা যে এক শ্রেণীর দর্শককে তাঁদের পৃষ্ঠপোষক করে ফেলতে পেরেছেন তার মধ্যে দিয়েই অদূর ভবিষ্যতটি সম্ভাবনাময় হয়ে আছে। তাঁদের চলচ্চিত্র যেমন আন্তর্জাতিক তাঁদের দর্শকও তেমনই আন্তর্জাতিক। এই নিওরিয়ালিজম ধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে বিভিন্ন দেশে আজ যখন আন্দোলন দানা বাঁধছে তখন আর দ্বিধা থাকে না যে আগামী কালের চলচ্চিত্রে এই নবতর দৃষ্টিভঙ্গিটি বিশ্ব শিল্প সংস্কৃতির জগতে অন্যতম শক্তিশালী সাংস্কৃতিক হাতিয়ার হয়ে উঠবে। বারান্তরে রঙ্গজগতের পৃষ্ঠায় সে সম্বন্ধে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইলো।

লক্ষ্মীবিলাস

জনপ্রিয়তায় শীর্ষস্থানীয়

লক্ষ্মীবিলাস পারফিউমারী [illegible] প্রস্তুত এই অদ্বিতীয় ভেষজ সমন্বিত সুগন্ধি কেশ [illegible] আপনিও ব্যবহার করুন।

লক্ষ্মীবিলাস
কেশ তৈল

ট্রেডমার্ক
"শ্রী ভরত মূর্ত্তি"
বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবেন।

ব্যবহারে ভালো
লক্ষ্মীবিলাস
"স্নো"

ঃ প্রস্তুতকারক ঃ

লক্ষ্মীবিলাস পারফিউমারী প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ২০, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক লিঙ্গাড কার্ড-বোর্ড বক্স ফ্যাক্টরী প্রাইভেট লিঃ ২০, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

বিংশ শতাব্দী

অগ্রহায়ণ ১৩৭৪ (১৮৮৫ শকাব্দ)

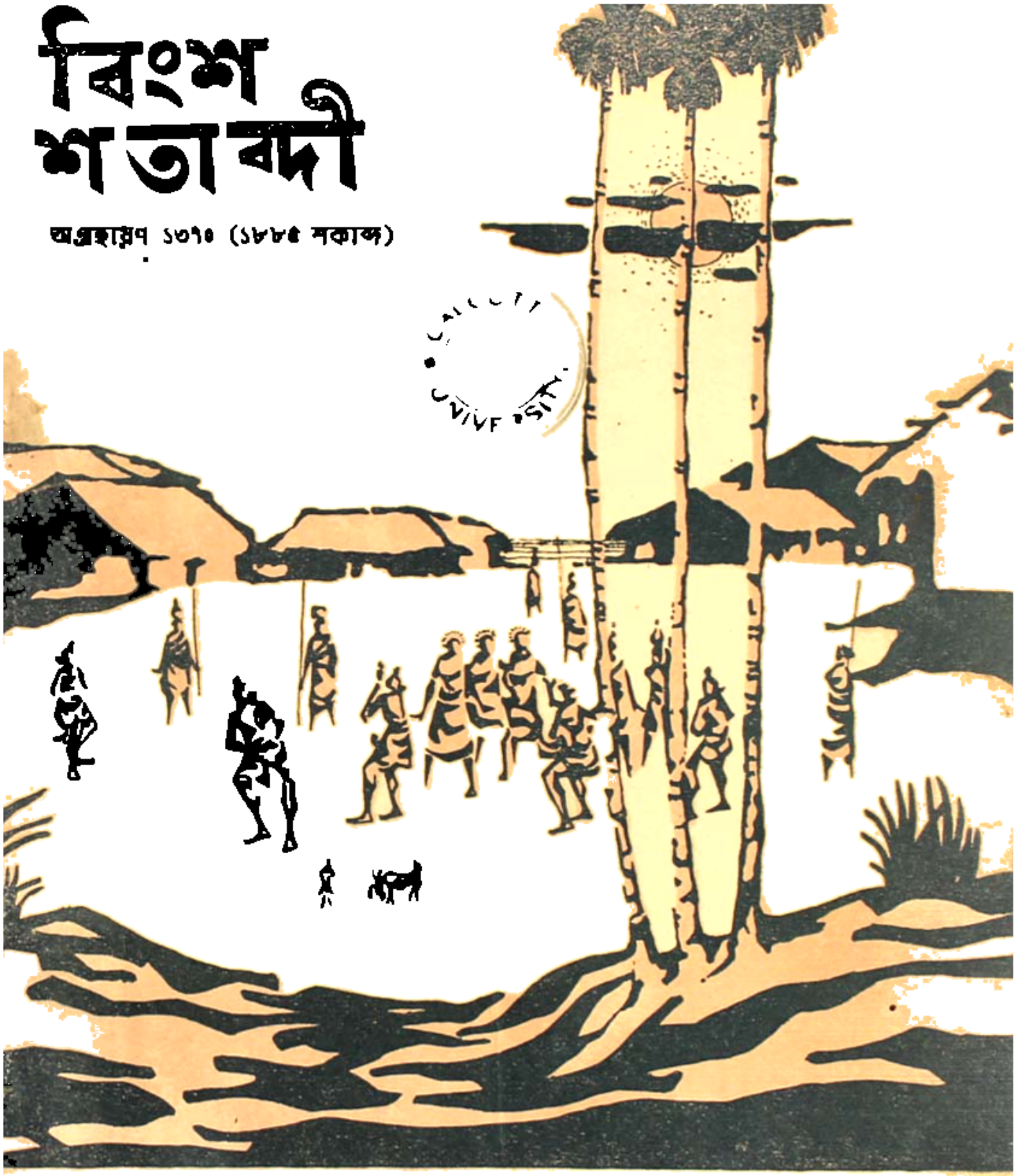

CALCUTTA UNIVERSITY

বোটনা

আপনার সন্তান কি কর নিয়ে মাথা ঘামায়?

না, ঘামায় না। টাকাকড়ির ব্যাপারে পরিবারের সকলেই আপনার ওপর নির্ভর করে। তারা জানে যে তাদের ভবিষ্যতের জন্য আপনিই মাথা ঘামাবেন।

এই বহুবে করবৃদ্ধি ও ঘাটতিমূলক সকল পরিকল্পনার জন্য আপনার মাইনে থেকে যে টাকাটি ধরে আনে, তার পরিমাণটি কম নেই। কিন্তু দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসেবে আপনি জানেন যে জীবন বীমার মত একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ে ধার সংকোচ করা অসম্ভব। পলিসিহোল্ডার হিসেবে প্রিমিয়াম দিতে আপনার জুড়ি নেই। আপনি সব কিছুই করবেন। কিন্তু যদি আপনার জীবন বীমা না করা থাকে, তবে'লে আপনি অবশ্যই এখন একটি পলিসি নেবেন।

মনে রাখবেন, আপনার অবর্তমানে আজ আপনি যদি সংসার চালাতে না পারেন, তবে'লে আপনার অর্থ থেকে সহসা বঞ্চিত হ'লে আপনার পরিবারের লোকের পক্ষে সংসার চালানো কী কষ্টকরই না হবে!

জীবন বীমার কোন বিকল্প নেই

ASP/LIC-Z-4 BEN

আহারের পর দিনে দু'বার..

সব ঋতুতে স্বাস্থ্য লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়

দু' চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) সেবনে আপনার স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহাদ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দ্দি, কাসি, শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক ফলপ্রদ। মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্দ্ধক ও বলকারক টনিক। দু'টি ঔষধ একত্র সেবনে আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলব্ধ স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে।

সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান

সাধনা ঔষধালয় • ঢাকা

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্ব্বেদ-আচার্য্য, ৩৬, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৩৭

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন), এম,সি,এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

ভারতীয় হস্তশিল্প

…বিশেষ বিশেষ উৎসবগুলিতে উপহার দেওয়ার জন্য হস্তশিল্পজাত নানারকম জিনিস আপনি পছন্দ করতে পারেন…বিশেষ পোষাকের সঙ্গে ব্যবহার করার উপযুক্ত সুচারু স্পষ্ট ও অতি সুন্দর কারুকার্যখচিত অলঙ্কার…সোনা বা রূপার তারে তৈরী অপূর্ব্ব সুন্দর অলঙ্করণ—শিল্প সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত ধাতুপাত্র…সোনা অথবা রূপার কাজ করা তামা ও পিতলের পাত্র…সূক্ষ্ম কাজ করা হাতির দাঁতের দ্রব্যাদি…সুন্দর স্বাভাবিক সুরভিযুক্ত চন্দনকাঠের দ্রব্যাদি…আখরোট কাঠ এবং শিং দিয়ে সুচারু নক্সায় তৈরী জিনিসপত্র…জয়পুরের নীল, দিল্লীর বা খুরজার কালো রঙের, অসংখ্য রকম নক্সা ও আকারের পাত্রাদি…দেশের কারুশিল্পীগণের তৈরী এই সব দ্রব্যাদির প্রত্যেকটি, শিল্প নিদর্শন হিসেবে অপূর্ব্ব…কারুশিল্পীগণের সুমহান পারম্পরিক ঐতিহ্যে পরিপূর্ণ।

অখিল ভারত হস্তশিল্প বোর্ড, শিল্প মন্ত্রক, ভারত সরকার DA 63/104 (Beng)

পৃথিবীতে মানুষ যখন প্রথম আসে, তখন হইতেই সে তাহার চারিপার্শ্বের দৃশ্যাবলী অঙ্কন করিয়া রাখিতে সচেষ্ট হয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগে কাষ্ঠফলকের উপর মানুষ কর্তৃক খোদিত ছবি ও লেখার বহু নমুনা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ আবিষ্কার করিয়াছেন।

প্রস্তরযুগে এই অসংস্কৃত সহজাত শিল্পটি সুস্পষ্ট এবং বস্তুতান্ত্রিক হইয়া উঠে, যাহা হইতে ইহা ধারণা করা যাইতে পারে যে, মানুষ খোদাই-শিল্পকারে সেই সময়েই কতকটা ব্যবহারিক জ্ঞানলাভ করিয়াছিল।

সেই যুগে মানুষ তাহার পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন সম্বন্ধে কিছু লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিল কিনা তাহা বুঝা যায় না, এবং আজ পর্যন্ত তাহার কোন প্রমাণও পাওয়া যায় নাই।

আধুনিক যুগে মুদ্রণ-শিল্প যেমন উন্নতি লাভ করিয়াছে তেমনি ইহা তীব্র প্রতিযোগিতারও সম্মুখীন হইয়াছে। এখন কাজ কেবল সুন্দর ও পরিপাটী হইলে চলিবে না, অধিকন্তু কাজ যথা সম্ভব দ্রুত সম্পন্ন করাও চাই।

○ নিখুঁত মুদ্রণ

○ সুন্দর ডিজাইন

○ সত্বর সরবরাহ

লিওনার্ড কার্ড-বোর্ড বক্স ফ্যাক্টরী প্রাইভেট লিঃ

১/১, প্যালিফ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৩ :: ফোন ৫৫-১৮৬১

পরিকল্পনা অনুযায়ী
পরিবার
গঠন করুন

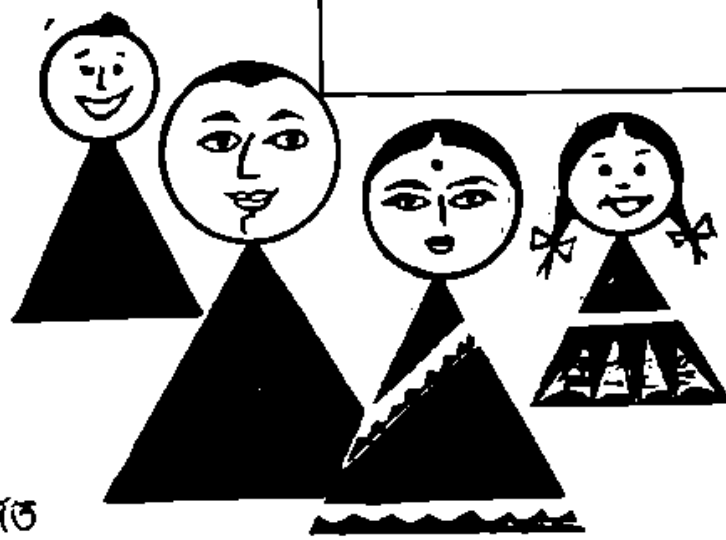

এতে

প্রত্যেকেই অধিকতর সুযোগ সুবিধে পাবে

আপনি কি চান যে

১। আপনার ছেলেমেয়ে স্বাস্থ্যবান হোক ;

২। উপযুক্ত খাদ্য ও শিক্ষা লাভ করুক ;

৩। প্রতিটি শিশুর যতটুকু সুযোগ সুবিধে পাওয়া উচিত এরাও তাদের জীবনে তা লাভ করুক ;

বিবাহিত জীবন সুখী ও সুসমঞ্জস হোক ;

তাহলে নিকটবর্তী

পরিবার
পরিকল্পনা
কেন্দ্রে

বিনামূল্যে

আপনার পরিবারের আকার সীমিত রাখা সম্পর্কে পরামর্শ নিন

বিশুদ্ধ
আয়ুর্ব্বেদীয়
বর্টিকাদি
রসায়ন ঔষধ
ধাতু ভস্ম
ইত্যাদি পাইবার
একমাত্র নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান

ভূদেব আয়ুর্ব্বেদ ভবন

২০, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫
ফোন : ৫৫-৪৪২৫

সূচী পত্র

বিংশ শতাব্দী
অষ্টম বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা
অগ্রহায়ণ ১৮৮৫

লেখক		বিষয়
সম্পাদকীয়	৮৭৩	আমাদের কথা
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৭৪	প্রশ্ন (উপন্যাস)
	৮৮০	স্বামী বিবেকানন্দ : মানবতাবাদী মনীষী (প্রবন্ধ)
	৮৮৩	প্রেসিডেন্ট কেনেডি (জীবনী)
সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৮৮	সেই অচেনা মানুষটি (উপন্যাস)
শীতল ঘোষ	৮৯৭	সাহিত্যে অতিপ্রাকৃত (প্রবন্ধ)
অমল হালদার	৯১০	ঋষি টলস্টয়ের গোপন দলিল (বিশ্ব-সাহিত্য)
সবিতা অধিকারী	৯১৩	নিরাবরণ (গল্প)
অমল ঘোষ	৯১৭	ছবির প্রতিচ্ছবি 'ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা)
জীবনকৃষ্ণ শেঠ	৯২৪	ট্র্যাজেডির ত্রিবিধ ঐক্য (প্রবন্ধ)
মৃত্যুঞ্জয় মাইতি	৯২৭	নতুন জনপদ (উপন্যাস)
অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়	৯৩৩	শ্বেতদ্বীপ সংসদের (চিঠি)
হিমাদ্রি	৯৩৭	ভেট (গল্প)
অমলেন্দু ঘোষ	৯৪১	ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চণ্ডালিনী'(সংক্ষেপিত)
তা·সেন	৯৪৫	লাল রং পলাশ ! ঐতিহাসিক ঘটনা)
মিহির সেন	৯৫৯	বাঙালির আগের কবিতা (কবিতা)
ওয়াল্ট হুইটম্যান	৯৬০	শেষ প্রার্থনা (কবিতা)
রেইন্যার মারিয়া রিল্‌কে	৯৬০	হাতের তালু (কবিতা)
বিশ্ববন্ধু সান্যাল	৯৬১	কর্তব্য (গল্প)
গৌরচন্দ্র চক্রবর্তী	৯৬৬	আধুনিক বাংলা রচনায় প্রেম (প্রবন্ধ)
রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৯৬৯	ব্যক্তিগত দর্পণ (পত্রাবলী)
বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়	৯৭১	অথ মল্ল-মুষ্টিক কথা (খেলাধূলা)
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য	৯৭৭	'ক্ষুধিত পাষাণ' ক্ষুধিত নয় (প্রবন্ধ)
মৃত্যুঞ্জয় মাইতি	৯৮০	অপরাজিত (কবিতা)
হর দত্ত	৯৮০	মালবিকা তোমাকে মনে পড়ল (কবিতা)
মিখাইল সলোখভ	৯৮১	সবজি ক্ষেতের প্রহরী (গল্প)
শান্তনীল দাশ	৯৯১	এখানে অনেক ক্লান্তি (কবিতা)
গোবিন্দ গোস্বামী	৯৯২	ফুলের মৃত্যু (কবিতা)
আবদুল আজীজ আল্-আমন	৯৯৩	সংস্কৃত সবরয় ও নজরুল (প্রবন্ধ)
শক্তি চট্টোপাধ্যায়	৯৯৫	সেদিন আমার হাতে ছিল একতারা (কবিতা)
ব্রততী মজুমদার	৯৯৫	ঠিক তখনই (কবিতা)
অসিতকুমার সরকার	৯৯৬	সাহিত্য ও সমাজ (প্রবন্ধ)
	৯৯৮	বিজ্ঞান বিচিত্রা (বিচিত্রা)

অঙ্গসজ্জা
নীতিশ মুখোপাধ্যায়, দীপ দেব

বিংশ শতাব্দী গ্রাহকদের জন্য

প্রতি সংখ্যা 'বিংশ শতাব্দী'র মূল্য ৭৫ নয়া পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা নয় টাকা (সডাক) ষান্মাষিক সাড়ে চার টাকা (সডাক)। প্রতি সংখ্যা 'বিংশ শতাব্দী'র আনুমানিক পৃষ্ঠা সংখ্যা একশ আঠাশ। এছাড়া শারদীয় সংখ্যা ও অন্যান্য বিশেষ সংখ্যাগুলি আয়তনে যথেষ্ট বর্ধিত হয়ে থাকে। শুধু আয়তনেই নয়, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, চিত্র সর্বদিকেই এই পত্রিকার মান যথেষ্ট উন্নত করা হয়েছে। এছাড়া পাঠক ও গ্রাহকবর্গের সুবিধার জন্য আমরা একটা বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। বিংশ শতাব্দীর যাঁরা বার্ষিক গ্রাহক কেবল তাঁরাই অতিরিক্ত মূল্য ছাড়া শারদীয় সংখ্যা সমেত অন্যান্য বিশেষ সংখ্যাগুলি পাবার অধিকারী।

আষাঢ় মাসে 'বিংশ শতাব্দী'র বর্ষ শুরু। ঐ সময় থেকে গ্রাহক হওয়া সুবিধাজনক। কিন্তু গ্রাহকেরা বছরের যে কোন সময় থেকে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হতে পারেন। মণি অর্ডার, চেক বা ক্রশ পোস্টাল অর্ডারে চাঁদা পাঠাতে পারেন। চাঁদা পাঠানোর সময় পরিষ্কার হরফে নাম ও ঠিকানা এবং কোন মাস থেকে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হতে চান তার স্পষ্ট উল্লেখ থাকা দরকার।

'বিংশ শতাব্দী'র গ্রাহক হইবার আবেদন পত্র

কর্মাধ্যক্ষ মহাশয়,

আগামী.....মাস হইতে 'বিংশ শতাব্দী'র বার্ষিক/ষান্মাষিক গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইয়া সডা কার্ড পাঠাইয়া দিবেন আমি এই সঙ্গে নয় টাকা/সাড়ে চার টাকা ক্রশ পোস্টাল অর্ডারে পাঠাইতেছি।

নাম..... স্বাক্ষর

ঠিকানা.....

তারিখ.....

যাঁহারা মনিঅর্ডারে টাকা পাঠাবেন তাঁহারা উপরোক্ত ফর্মে কুপনে নাম ঠিকানা ও কোন মাস হইতে সডা হইতে চান তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিবেন।

পাকিস্তানের এজেন্সীরা নিউজ এজেন্সী, এস. সি. দে রোড, চট্টগ্রাম এবং নবকুল হালদার ৩০, হৃষিকেশ দাস রোড, ঢাকা—১। এই ঠিকানায় পত্রিকা পাইবেন।

নিবেদক—

প্রচার সচিব।

টাকা পাঠাবার ঠিকানা :—

বিংশ শতাব্দী

২০, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫

ফোন—৫৫-৪৪২৫

'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'

বিংশ শতাব্দী

অগ্রহায়ণ
১৮৮৫
অষ্টম বর্ষ
৬ষ্ঠ সংখ্যা

আমাদের কথা

মানবতার বলি

মানবজাতির অধিকার রক্ষার সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্ট কেনেডি মৃত্যুবরণ করিলেন।

মার্কিন দেশস্থ নিগ্রো সম্প্রদায় তাহাদের জন্মগত অধিকার উদ্ধার করিবার জন্য শ্বেতকায় পশুশক্তির বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম সুরু করিয়াছে মার্কিন প্রেসিডেন্টের তাহা সমর্থন পাইয়াছিল। প্রেসিডেন্ট কেনেডি বুঝিয়াছিলেন মার্কিন শ্বেতকায় সম্প্রদায়ের দুর্নীতি নীতির ফলে বিশ্বে মার্কিন দেশ নিশ্চিন্ত ও সমস্ত প্রকার সম্পদ ও শক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বে নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হইয়াছে। কেনেডি মাত্র ৩ বৎসর কাল নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া তাহার বলিষ্ঠ ও উদার নীতির জন্য সমগ্র বিশ্বকে তিনি নূতন আশার সন্ধান দিয়াছিলেন। সমগ্র বিশ্ব তাঁহার নেতৃত্বের দিকে গভীর আগ্রহে তাকাইয়াছিল।

প্রেসিডেন্ট কেনেডির মৃত্যুতে আজ সমগ্র জাতি বিপন্ন। মার্কিন গণতন্ত্রের মুখোশ খুলিয়া তাহার পশু বৃত্তির নগ্ন রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। আমেরিকার গণতন্ত্র আজ কোন রূপে প্রকাশ পাইবে সমগ্র বিশ্ব আতঙ্ক চিত্তে সে দিকে তাকাইয়া আছে।

যীশু খৃষ্ট হইতে সুরু করিয়া মানবতা রক্ষার দাবী লইয়া যাহারাই সংগ্রাম করিয়াছেন তাঁহারা এই ভাবে মৃত্যু বরণ করিয়া অমর হইয়া রহিয়াছেন। কেনেডিও তাহাদের সমগোত্রীয় হইলেন।

আমেরিকানরা দাবী করিত এবং এখনও করিয়া থাকে যে তাহাদের দেশে গাড়ী রাখিবার স্থান (কার পার্কিং) ব্যতীত অন্য কোন সমস্যা নাই। তাহাদের এ দাবী যে কত অসারশূন্য এই হত্যাকাণ্ড তাহা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছে। আমাদের দেশে অন্নসমস্যা আছে এবং আমরা সে জন্য লজ্জাও অনুভব করি। কিন্তু খোদ মার্কিন মুলুকে যে নিগ্রোরা অন্তঃ অপেক্ষাও অনেক হীন জীবন যাপনে বাধ্য তার জন্য শ্বেতাঙ্গ মার্কিনীদের কোন লজ্জা বোধ নাই। সিভিল রাইট বিল নিগ্রোদের অনেক কিছু দিত না—কিন্তু এই কাগুজে বিলখানিও তাহারা পাস করিতে রাজী নয়—কেনেডি মাত্র এই কারণে নিহত হইলেন।

বর্ণবৈষম্য ও কু-কু-ক্লাক্সের দেশ আমেরিকা নিজেদের সভ্যতার আলোকবর্তিকা বলিয়া মুখরিত হইলে আমাদের কিছু বলিবার নাই। কেনেডির হত্যাকাণ্ড বহির্বিশ্বের নিকট আমেরিকা যুক্ত রাষ্ট্রের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছে।

কবি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ তিন ॥

সুতপা ? পাটনা ? পাটনার সুতপা দশ বছরের ফুটফুটে মেয়েটি। লাজলোজে প্রসাধনে সেই দশ বছর বয়সেই সে প্রায় পটিয়সী হয়ে উঠেছিল। নাচে গানে তখনই সে বাঙালী সমাজে খ্যাতিলাভ করেছিল। আমিই তাকে একদিন বলেছিলাম তোমার নাম সুতপা না হয়ে সুরুপা হওয়া উচিৎ ছিল। সেই নামেই সে নিজেকে পরিচিত করেছে পরবর্তী জীবনে। আশ্চর্য কথাটা আমার মনেই হয়নি। আমি ওকে ভুলেই গিয়েছিলাম।

ভুলে যাবার কোন দোষও নেই—আক্ষেপও নেই সে জন্য। পনের বছর আগে দেখা দশ বছরের মেয়ে—তাকে মনে থাকার কথা নয়। জীবনে রূপ দিয়ে লাস্য দিয়ে হাসা-কটাক্ষ দিয়ে পুরুষের মনে রেখাপাত করবার কোন শক্তিই থাকে না—দশ বছরের মেয়ের। ওখানে নারীর আসল মূলধন পূর্ণ নারীত্ব :—যৌবন— ; অন্তত কৈশোর অতিক্রম করবার অবস্থা না এলে ও মূলধনের উপর অধিকার বর্তায় না।

অতকাল পরে—মনে পড়ানোর মনে পড়েছে। পাটনায় সরকারী চাকুরে ছিলেন—সুতপার বাবা সৌরীন চক্রবর্তী। আপার গ্রেডের ক্লার্ক হয়ে বেহার সেক্রেটেরিয়েটে ঢুকেছিলেন। ওখানে কয়েক পুরুষ ধরেই প্রবাসী। ছাত্র হিসেবে খ্যাতি ছিল ; তরুণ হিসেবে অতি আধুনিক বলত লোকে। প্রবাসী বাঙালীদের ধারায় ইংরিজীর প্রতি অনুরাগের স্রোতটা চিরদিনই খরস্রোতা ; সেটা নিশ্চয়ই চাকরীর জন্য। সে জন্য দোষ তাঁদের নেই। রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববন্দিত হওয়ার পর থেকে তরুণ সমাজ বাংলা সাহিত্যের উপর ঝুঁকেছিল। কিন্তু তার মধ্যেও আধুনিকতম ইংরিজী ও কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের আদর্শ অনুকরণের ঝোঁকটা ছিল প্রবলতর। সৌরীন চক্রবর্তী বি-এ পড়তে পড়তে আধুনিকতম ইংরিজী সাহিত্যের বস্তু পড়ুয়া বলে ছাত্র সমাজে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। স্বাভাবিক ভাবেই বাক হয়ে গিয়েছিল উঁচু বা ওল্টানো। লোকে ব্যঙ্গ করত—কিন্তু মনে মনে একটা সপ্রশংস বিস্ময়ও অনুভব না করে পারত না। ভাবত এবং বলাবলি করত—ছেলেটি জীবনে একটা কেউকেটা হবেই। সৌরীন চক্রবর্তী নিজেও তাই ভাবত। তার বাক্য ছিল বঁড়শীর মত বাঁকা এবং সূচের মত চোখা। উনিশ শো আটত্রিশ উনচল্লিশ সালে—সে মনে মনে নিজেকে শেষের কবিতার অমিট রায়ের কল্পনায় নিবারণ চক্রবর্তী মনে করত। বন্ধুবান্ধবেরা ওই নামটা তাকে দিয়েছিল—সে সেটা সস্মিত হাস্য মুখে টেনে বিনা প্রতিবাদে গ্রহণও করেছিল।

আমার মামার বাড়ী পাটনা। সেখানে শীতের সময় বছরে একবার করে যেতাম। সাহিত্যিক হিসেবে তখন আমার খ্যাতি সদ্য সদ্য হচ্ছে। ছেলেদের মহলে সমাদর পাচ্ছি। আমি সেখানে গেলে ছোট ছোট দলে ছেলেরা আসত। ১৯৩৭।৩৮ সাল—আমারও বয়স তখন চল্লিশ-একচল্লিশ। তরুণদের সঙ্গে মিশতে কষ্টকল্পনা ঘটত না। এ সব কথা আমি ছেলেদের কাছ থেকেই শুনেছিলাম। সৌরীনের সঙ্গে আলাপ তখন হয়নি। সে আসত না। ছেলের দলের পাণ্ডা গুণীন্দ্র আমাকে বলেছিল তারি কথা। শুভেন্দু বলে তরুণ লেখকটি আমার ভক্ত ছিল—সে একদিন বলেছিল—'এখানে একটা দল আছে—তারা আপনাকে গ্রাম্য বলে ;—লাউড বলে।' মধ্যপথে তাকে থামিয়ে দিয়ে গুণী হেসে বলেছিল—ও নিবারণ চক্কোত্তির কথা ছাড়।

—নিবারণ চক্কোত্তি—?

—আমরা নাম দিয়েছি। ওর আসল নাম—সৌরীন চক্কোত্তি।

গুণীর কাছ থেকেই সবিস্তার শুনেছিলাম—সৌরীন চক্কোত্তির কথা। তারপর সৌরীন চক্কোত্তিও একদিন এসেছিল আমার কাছে। কথা খুব বলেনি। প্রায় চুপ চাপ বসে সিগারেট টেনেছিল এবং আমার সঙ্গে অন্যদের কথাগুলিই শুনে গিয়েছিল। বুঝতে আমার বাকী থাকেনি যে, আমার সামনে অন্য ছেলেরা সিগারেট

যায় না কিন্তু ও যাচ্ছে আমাকে অবজ্ঞা করবার জন্য এবং আমার কথাগুলি নীরবে শুনে যাচ্ছে আমাকে তার মনের কাঁটাপাথরে যাচাই করবার জন্য।

তারপর দীর্ঘদিন আর সৌরীনের সংবাদ বিশেষ রাখিনি। কেউ দেয়ওনি। কারণ দেওয়ার মত সংবাদ ছিল না সৌরীনের বা নিবারণ চক্রবর্তীর। বি এ এবং তারপর এম এ পরীক্ষায় পাশের খবরটা তার পরিচিত মহলে উল্টো বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল। অর্থাৎ আদৌ অসাধারণ হয়নি। বুদ্ধি নিছক্তির মধ্যে নিছক্তী না হয় বলা যায় কিন্তু তার বেশী কিছু নয়। এবং নিছক্তির দামও সেকালে গণ্য করার মত ছিল না। সংসারে মানুষের মধ্যে ঈর্ষা বিদ্বেষ সবই আছে অস্বীকার করা যায় না কিন্তু তাকেই সে বড় করে তোলে না; তুললে মানুষ মানুষ হত না। সৌরীন চক্রবর্তীর পরীক্ষার ফলে সমাজে যে উল্টো বিস্ময় সৃষ্টি হয়েছিল তারমধ্যে এই কারণেই উল্লাসের পরিবর্তে বেদনাই অনুভব করেছিল সকলে। কথাটা কেউ কাউকে উৎসাহের সঙ্গে দেয়নি দিতে চায়নি। উনচল্লিশ সালে আমার প্রতিষ্ঠা তখন হয়েছে, তখন আর আমার বছরে বছরে শীতকালে পাটনা যাওয়া ঘটে না। সে সময় গুণীর সঙ্গে সৌরীন কলকাতায় এসে একবার আমার কাছে এসেছিল। সেবার আর সে আমার সামনে সিগারেট খায়নি বা স্বপ্নালু নিরাসক্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আমাকে দেখেনি কি নীরবে কথাবার্তা শুনে যায়নি। কথাবার্তা নিজেই বলেছিল। আমি তাকে আপনি বলে কথা বলতে সে হেসে সবিনয়েই বলেছিল গুণীকে আপনি তুমি বলে কথা বলছেন—আমাকে আপনি বলছেন কেন?

এতে খুশী হওয়া স্বাভাবিক। খুশী হয়েছিলাম। অনেক কথাবার্তা হয়েছিল তার সঙ্গে। আমার লেখা তার ভাল লেগেছে একথা বারবার করে বলেছিল। আলোচনার মধ্যে ব্যক্তিগত কুশল এবং অন্য প্রশ্নও আসে, সেই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—কি করছ এখন?

হেসে বলেছিল—কিছু না।

গুণী বলেছিল বেচারীর বি এ, এম এ পরীক্ষার ফল ভাল হল না। মানে যা expect করেছিল—তেমন কিছুই হল না। কি করবে ভাবছে। আমরা বলছি ও university পরীক্ষার ফল কিছু নয়। তুমি Competitive examination দাও। I. A. S.। তাও বলছে না।

বলেছিলাম—কেন?

সৌরীন হেসে বলেছিল—এটাকে মানতাম না এখন মানি। বলে তান হাতের তর্জনী দিয়ে কপাল স্পর্শ করেছিল।

এরপর কিছু দিন সৌরীনের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠতে চেয়েছিল যেন। কিছু দিন ধরে সে পত্রালাপ চালিয়েছিল। পত্র লিখত নিয়মিত। প্রথম পত্রটা আজও মনে পড়ছে। সম্বোধনে শ্রীচরণেষু, লিখে প্রথম ছত্রেই লিখেছিল—কাকা আমার প্রণাম নেবেন। আমার পত্র পেয়ে কিছুটা বিস্মিত হবেন এবং সম্বোধন ও প্রথম ছত্র পড়ে খুবই বিস্ময় অনুভব করবেন। বিস্ময় আমারও কম হয়নি। লিখবার সময় একটি সানন্দ কৌতুক অনুভব করছি। কলিকাতা থেকে জীবনে বিফলতার হতাশার মধ্যে যখন আপনার কথা মধ্যে মধ্যে আমার মনে হচ্ছিল তখনই হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে আবিষ্কার করলাম যে, আপনি আমি একই বংশোদ্ভূত এবং সম্পর্কে আপনি আমার কাকা হন। অবশ্য তফাৎ অনেক পুরুষের। আমরা ঢাকা বিক্রমপুর থেকে এখানে এসেছি তিনপুরুষ আগে। সেখানে এখনও আমার পিতামহের সহোদরদের বংশাবলী বাস করেন। আমার ঠাকুর্দার ছোট ভাই বেঁচে আছেন-সোত্তর বছর বয়সেও সক্ষম মানুষ। তিনি গয়া কাশী প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণে এসে আমাদের বাড়ীতে উঠেছেন। জন্মেছেন নাইনটিন্থ সেঞ্চুরীতে কিন্তু বাঁচাটা তো পুরো বিংশশতাব্দীতে তবু লোকটি এইটিন্থ সেঞ্চুরীর শেষ ভাগ কিম্বা নাইনটিন্থ সেঞ্চুরীর প্রথমার্ধের লোক। সোঁড়া হিন্দু বঙ্কিম চন্দ্রেরও আগের মানুষ। ইংরিজী জেনেও জানেন না। পড়েন না। ভুলেই গেছেন। সকাল থেকেই ধর্মের আচার আচরণ নিয়ে থাকেন। গায়ে জামা পড়েন না। দারুন শীতেও না। নিজে হাতে রান্না করে খান। তার উনোন

পর্যন্ত রান্না চড়াবার আগে গোবর দিয়ে নিকিয়ে দিতে হয়। আমাদের উনোনেও রান্না করে খাবেন না। আমার মা একটা তোলা উনোন দিয়েছেন। স্নান না করে তিনি শ্বশুরের কোন কিছু ছোঁন না।

শুধু এই নয়, কথায় বার্তায় তাঁর সব সে কাল এবং পরকালু। বাবার সঙ্গে বসে সে কালের কথাই আলোচনা করেন। কৌতুক এবং কৌতূহল বশেই আমি তাঁর কাছে বসে গল্প শুনি। একটা মজা উপলব্ধি করলাম এই যে, মানুষটি বড় শান্ত এবং ভতোধিক শক্ত। সহ্যশক্তি অসীম বলে শোনা যায় কিন্তু দেখা যায় না এঁর মধ্যে সেটা দেখলাম। মুখে একটি প্রসন্ন স্মিত হাসি আছে সেটি শিবের কপালের একফলা চন্দ্র রেখার মত লেগেই আছে তার উদয় বা অস্ত নেই।

এই এঁর কাছে একদিন একটি বিচিত্র জিনিষ দেখলাম। প্রকাণ্ড বড় ম্যাপের মত সাইজের একখানা কাগজ। পুরানো অনেকদিনের জিনিষ, তলায় আটা দিয়ে কাপড় সাঁটা। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বংশ বিবরণী মত বংশ বিবরণী উনি নাম বললেন কুলপঞ্জিকা। কথাটা আমিও শুনেছি কিন্তু মনে ছিল না। জিনিওলজি এবং তার বাংলা প্রতি শব্দ বংশবিবরণী কথাটাই মনে ছিল। বললেন—আমাদের রামেশ্বর চক্রবর্তীর কুলপঞ্জিকা। উনি দেখাচ্ছিলেন বাবাকে। সেই আমাদের গোত্রের আদি ঋষি শাণ্ডিল্য থেকে আরম্ভ। একে একে অন্য শাখাকে বাদ দিয়ে রামেশ্বর-চক্রবর্তীতে এসে তাঁর থেকে গোটা বংশটির একটা পূর্ণ বিবরণ।

বৃদ্ধ এই কর্মটিকে আজীবন না কি নিষ্ঠার সঙ্গে করে আসছেন। শুনলাম সংবাদ রাখতে উনি অনেক টাকার পোস্টেজ খরচ করে থাকেন। রিপ্লাই পোস্টকার্ড পত্র দেন রামেশ্বর চক্রবর্তীর সন্তানদের—। অনুরোধ করেন তাঁদের সন্তানাদির বিবরণ যেন অনুগ্রহ করে জানান। একবার দুবার তিনবারও লেখেন। উত্তর সব ক্ষেত্রে পান না; না পেলেও যাঁরা উত্তর দেন তাঁদের কাছ থেকেও নিরুত্তর জ্ঞাতিদের সংবাদ সংগ্রহ করেন। মধ্যে মধ্যে পরিচিত জ্ঞাতিদের বাড়ী গিয়ে এসেও খবর নিয়ে কুলপঞ্জিকা সম্পূর্ণ করেন।

বিস্তৃত বা বিপুল বিস্তার ব্যাপার। জিওমিট্রিক্যাল প্রগ্রেস থেকেও বিস্তার বেশী। বংশতো এক থেকে দুই দুই থেকে চার নিয়ম মেনে চলে না। আমার ঠাকুর্দার চার ছেলে। আমার বাবার পাঁচ। অবশ্য নিঃসন্তান নিষ্ঠংশও অনেকে হয় কিন্তু তার চেয়ে বংশবৃদ্ধির সংখ্যা বেশী। আমি বিস্ময়ের এবং কৌতূহলের বশে বেশ মন দিয়েই দেখে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ নিচের দিকে একটা নাম দেখে থমকালাম। নামটা আপনার নাম। পাশে লেখা (নবগ্রাম বীরভূম বড় লেখক)। কিছুক্ষণ লেখা শব্দ কয়েকটার দিকে তাকিয়ে থেকে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম ইনি আমাদের বংশের লোক? তিনি বললেন কে? বললাম এইযে! ঝুঁকে পড়ে দেখে বললেন হ্যাঁ গো! ভদ্রলোকের আজও চশমা লাগে না।

তারপর বললেন—এদের সঙ্গেতো বেশী ছাড়াছাড়ি নয় আমাদের। পাঁচ পুরুষ আগে শিব চক্রবর্তী। তার বারো জন সন্তান। চার বিবাহ। তার মধ্যে বাড়িতে যে পত্নী থাকতেন তার তিন পুত্র। এক জন কৃষ্ণচন্দ্র একজন রামচন্দ্র একজন ইন্দ্রচন্দ্র কনিষ্ঠ রাজ চন্দ্র। আমরা কৃষ্ণ চন্দ্রের বংশ। আমার পিতামহ। তিনিই ভিটেতে ছিলেন। রামচন্দ্র কুলীন সন্তান হিসেবে বিবাহ করেছিলেন পাঁচটি। তার মধ্যে নবগ্রাম সরকার জমিদারদের বাড়িতে একটি আর কুল্লা যাইয়ে একটি আর একটি বাঘ ডোলায়। সেও ওই রাঢ় অঞ্চলের। এই তিন শ্বশুর বাড়িতেই তাঁর স্থান ছিল অধিকাংশ সময়। এই নবগ্রামে তাঁর দুই পুত্র। সম্পর্কে আমার তোমার পিতামহের বন্ধুভ্রাত তাঁরা দুই ভাই মাতুলালয়ে বাংলা এবং কারসী পড়ে সে আমলে উকিল হন। জমিদারী জমি পুকুর কিছু মাতামহ দিয়েছিলেন তারপর এঁরা নিজেরা উপার্জন করে বেশ সঙ্গতিপন্ন হয়ে উঠল। এই দুই ভাইয়ের কনিষ্ঠ যিনি তাঁর নাম দীন দয়াল। তাঁর এক পুত্র নাম হরিদাস। হরিদাস সম্পর্কে তা হ'লে আমার দাদা। তোমার বাবার জ্যেঠা বা কাকা হবেন। তাঁর ছেলে ইনি। এখন বড় লেখক

হয়েছেন। সম্পর্কে তোমার বাবার ছোট ভাই। তোমার খুল্লতাত।

সত্য কথা বলতে ভারী আনন্দ হল এবং হয়েছে আমার। যখন আপনি এখানে এলে আপনার সঙ্গে আমি প্রথম দেখা করি তখন অতি আধুনিকতার নামে ইংরিজীয়ানার অহংকারে দৃপ্ত আপনাকে অবজ্ঞা করতে চেয়েছিলাম: সজ্ঞানেই। ঠিক স্বভাব বা অন্যমনস্কতা-বশে নয়। আপনি তা লক্ষ্য করেছিলেন তাও আমি জানি। গুণীদের দু'এক জনের কাছে তা বলেও-ছিলেন তাদের কাছ থেকে সেও শুনেছিলাম। তারপর আপনার হল অভ্যুদয়। স্বীকৃতি পেলেন প্রায় সকল জনের। পরপর পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে আমার ভাঙল অহংকার। এবং সত্য বলব আপনার লেখা ভাল করে পড়ে দেখে ভালও লাগল। ওটা অবশ্য হয় এটা আপনিও মানবেন। যা নতুন যা অভ্যস্ত স্বাদ ও গন্ধের থেকে পৃথক তার স্বাদ গন্ধে অভ্যস্ত না হলে ঠিক তাকে ভাললাগানো যায় না। একদিন একজন অধ্যাপক ভারী ভাল কথা বলেছিলেন। আপনার সম্পর্কে বলতে গিয়েই বলেছিলেন। বলেছিলেন দেখ "অবনীন্দ্র নাথ যখন ইণ্ডিয়ান আর্টের প্রবর্তন করলেন তখন তার সুকুমার রূপটি অতি অল্প লোকের চোখেই ধরা পড়েছিল। অধিকাংশ লোকই তাকে খারাপ বলেছিল তাকে ব্যঙ্গ করেছিল। ক্রমে লোকে দেখে দেখে যখন অভ্যস্ত হল তখন তার রূপকে আবিষ্কার করলে। এঁর সম্পর্কেও ঠিক সেই কথা। আজ যা বলছ যে মত পোষণ কর সেটা হল তোমার এত কালের গল্প উপন্যাসের অভ্যাস যেটা সেটা থেকে তৈরী। ক্রমে অভ্যাস হলে দেখবে যে, মত বদলাবে। তখন সঠিক বিচার করতে পারবে।"

আমার সত্যি সত্যিই তাই ঘটেছিল। বইয়ে পরীক্ষার ব্যর্থতার লজ্জা যতই হোক দম্ভে যতই আঘাত লাগুক আপনার কাছে বিনত বা বিনীত হবার মত মানুষ আমি নই। মত বদলেছিল সেই জন্য সেই কথাটা বলতেই গিয়েছিলাম সেদিন গুণীর সঙ্গে। কিন্তু বিনয় প্রকাশ করেও ঠিক মনের কথাটা বলতে পারে নি। আপনার কাছে ঠিক যেতে পারি নি। আপনিও কি কাছে পৌঁছুবার মনের দরজাটা খুলেছিলেন? মনে হয় খোলেন নি। অন্ততঃ আমি যেন খোলা পাই নি। ভিতর থেকে খিল দেওয়া ছিল না, তবুও মনে ছোট আপনি মন হয় তো ভেজানোই ছিল কিন্তু আমি ওই দেখেই নিরস্ত হয়েছিলাম—সে দরজায় হাত দিই নি। বাইরে থেকেই ফিরে এসেছিলাম। মনে এ নিয়ে একটা বিছু কাঁটার মত খচখচ করছিল। তাই হঠাৎ এই সংবাদ বা তথ্যটা জেনে আনন্দের আর শেষ নেই আমার। আপনি আমার কাকা। আমার জ্ঞাতি এক বংশে আমাদের জন্ম। গৌরবও বোধ করছি মনে মনে। আমার পিতামহটি বললেন—পাঁচ পুরুষ তফাৎ তোমার সঙ্গে এখনও ওঁদের সঙ্গে আমাদের দশরাত্রি অশৌচ হয় শাস্ত্র অনুযায়ী।

অনেক বড় চিঠি হয়ে গেল। মনের আবেগে লিখে ফেললাম। প্রণাম জানাচ্ছি।

ইতি—

প্রণত:

সৌরীন।

•

সুরুপার গল্পে দেখা করতে গিয়ে ওর মুখে ওই সুতপা নাম শুনে সৌরীনের কথাই বেশী ক'রে মনে পড়েছিল। সুতপাকে যতটুকু জানি আর সুরুপাকে যেটুকু সেদিন টিবি হসপিটাল পর্যন্ত দেখেছিলাম—তাতে সৌরীনকেই মনে পড়বার কথা। এবং সুতপার সুরুপা হওয়ার কাহিনী যাই হোক যত বিচিত্র এবং বিস্ময়কর হোক—সৌরীনকে না জানলে না বুঝলে কার্যকারণ ঠিক বোঝা যায় না। কার্যকারণ দূরেই থাক—জীবনে ওটা খুব বড় নয়। বড় যেটা ঘটে সেইটে। সুরুপার কথা যখন লিখতে বসেছি তখন ঘটনা ক্রমানুসারে সাজিয়ে লিখতে গিয়েও সেই ঘটনার টানেও সৌরীন এসে পড়ছে। ফাইল থেকে খুঁজে সৌরীনের চিঠিগুলি বের ক'রে দেখছি। প্রথম চিঠিখানা আগাগোড়াই ভুলে গিয়েছিলাম।

এ পত্রের উত্তর আমিও দিয়েছিলাম। নকল নেই—তবে খুশী হয়েই পত্র দিয়েছিলাম। এরপর সৌরীন

বছর দুয়েক নিয়মিত পত্র লিখেছে। তার মধ্যে সাহিত্যের আলোচনা—সমাজের সমালোচনাই বেশী। কাকা এবং ভাইপোর মধ্যে পত্রালাপ ঠিক নয়—। সম্বোধনে শ্রীচরণেষু থাকলেও—পত্রালাপ প্রকৃতপক্ষে দুই প্রীতিভাজন ব্যক্তির তত্ত্বালোচনার উপর ভিত্তি করে। মধ্যে মধ্যে ব্যক্তিগত খবর থাকত। একবার বহুখানেক পর দেখছি—নিজের ব্যর্থতা সম্পর্কে আক্ষেপ ক'রে পত্র লিখেছিল—জীবনের আশা ভরসা বলতে গেলে নির্মূল হয়ে গেল। আপনাকে জানাইনি—দুটো পরীক্ষা এবার আমি দিয়েছিলাম। খুব খেটে-ছিলামও। কিন্তু দুটোতেই ব্যর্থ হয়ে গেলাম। আই-এ-এসে কেল করেছি। পি সি-এসে খুব নীচে প্লেসে তাতে চাকরী হবে না। এমন কি—সাকেল অফিসারিও ভাগ্যে জুটবে না। ভাবছি এমনটা কেন হল? অথচ পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীদের মধ্যে আলাপ করে নিজে বুঝেছিলাম—তাদের থেকে আমি সব দিক থেকেই শ্রেষ্ঠ। শুধু আমিই ভাবিনি। সব পরীক্ষার্থীরাও ভেবেছিল। কারণ এক হ'তে পারে কপাল—আর একটা হতে পারে—সেটা বললে—পরীক্ষক-দের সম্বন্ধে শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে হয়। কথা যাতা আমি ভাল বলি—সে জানেন—অথচ মৌখিক পরীক্ষাতেই ফেল করেছি শোচনীয়ভাবে। এখন ভাবছি কি করব। বাড়ীতে মা বাপ বিমূঢ় হয়ে উঠছেন আমার ব্যর্থতায়। মধ্যে মধ্যে ভাবছি—ঘর ছেড়ে চলে গিয়ে যা হোক সামান্য একটা কিছু অবলম্বন ক'রে সাহিত্যের কাজ করব। কিন্তু তাতেও ভরসা কোথায়? আমার নিজের মনই নিজেকে ব্যঙ্গ করে বলছে—সেখানেও তুমি ফেল করবে। জিজ্ঞাসা করেকবারই করেছি—কেন—এমন কথা বলছ—যে দেশের জীবনসাধনার শ্রেষ্ঠ পথ হল চ্যাটার্জেটে কাজার পথ, দেশের সাহিত্যে মূল্য নির্ণয় হয় পাঠকের দীর্ঘনিশ্বাসের সংখ্যায় ও দৈর্ঘ্য মাপ করে এবং পাঠিকাদের শ্রদ্ধার বেদনা উদ্গত লোনা চোখের জলের পাউণ্ড বা সের মাপ করে—সে দেশে তুমি কি লিখবে? তোমার লেখা হেতো শুকনো বুদ্ধিবাদের লেখা। যে দেশে বুদ্ধির পরিমাপ মোটামাট একআনা—আধআনা—হয় তো বেশীই বলা হল। সে দেশে ষোল আনা মূল্য দিতে তারা পাবে কোথায়? নবদ্বীপে নিমাই পণ্ডিত ছিলেন ক্ষুরধার বুদ্ধি অগাধ পণ্ডিত কিন্তু তাতে তাঁকে কেউ মানেনি। শেষে ক-উচ্চারণ করতে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে চোখের জলে বুক ভাসালেন—সেই ম্যাজিক হয়ে গেল। নবদ্বীপ তো নবদ্বীপ—বাংলা দেশ লুটিয়ে পড়ল পায়ের তলায় চোখের জলে নবদ্বীপ ভেসে গেল—শান্তিপুরেরও ডুবু ডুবু অবস্থা।"

থাক এ সব কথা। এ সব কথা সম্ভবতঃ আপনার ভাল লাগবে না। আজকে চিঠি শেষ করছি। প্রণাম নেবেন।" প্রণত: সৌরীন।

এর আটমাস পরের চিঠি একখানায় সৌরীনের পরিণতির খবর রয়েছে। মন্তব্যত চিঠি। ছ-সাত পৃষ্ঠা। সংবাদ দুটি। একটি চাকরী—সে আপার ডিভিসন ক্লার্কের চাকরীতে ঢুকেছে এবং সে বিয়ে করেছে। দুটি প্রায় একসঙ্গে। চাকরীতে ঢুকে বিয়ে ক'রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে সংসার পেতেছে।

বিবাহ অসবর্ণ, প্রেম তাদের হয়েছিল, চাকরীর অপেক্ষায় বিবাহ করতে সাহস করছিল না। কিন্তু আর ধৈর্য ধরা সম্ভবপর হয়নি; ওই ক্লার্কশিপ চাকরী নিয়েই বিয়ে করেছে।

লিখেছিল—বাবা মা—ক্ষমা করেননি। তা নিয়ে কোন দুঃস্বপ্ন বা দুর্ভাবনা আমার নেই। অভিসম্পাতে বিশ্বাস করি না। আশীর্বাদেও না। তবে অভিসম্পাত কটু মনে হয় সহ্য করা যায় না। আশীর্বাদ বড় মিষ্টি লাগে। আশীর্বাদ করবেন আপনি—এ আশা আমি করি।

আশীর্বাদ আমি করেছিলাম। এরপর দু-চারখানা পত্র সে লিখেছিল—তারপর লেখা বন্ধ করেছিল। আমিও উদ্বিগ্ন হইনি। সংসারের নিয়মে যেমন ভুলে যায় তেমনিই ভুলে গিয়েছিলাম। উনিশশো একচল্লিশের কথা।

এর এগারো বছর পর—১৯৫২ সালে পাটনা গেলাম। এ এগারো বছর পাটনা যাইনি। ১৯৫২ সালে পাটনা গিয়ে দেখলাম—সুতপাকে। দশবছরের সুতপা।

ক্রমশঃ

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ মানবতাবাদী ও মনীষী

মহামনীষী ও দার্শনিক স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবর্ষপূর্তির উৎসব খুব ব্যাপকভাবে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে পালিত হচ্ছে।

এই উপলক্ষে সোভিয়েত পত্রপত্রিকাগুলিতে ভারতের এই মহান সন্তানের কর্মজীবন, রচনাবলী ও চিন্তাধারা সম্পর্কে বহু উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বিবেকানন্দজন্মশতবার্ষিকী যাতে যথোপযুক্ত ভাবে পালিত হয়, তার জন্যে মিখিল-সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদমি গত ডিসেম্বর মাসের গোড়ার দিকেই এক কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি কর্তৃক গৃহীত কার্যসূচীর মধ্যে একটি প্রধান কাজ হল স্বামী বিবেকানন্দের নির্বাচিত বক্তৃতা ও রচনাবলীর এক খণ্ড অনুবাদ প্রকাশ করা। এর জন্যে যে সম্পাদন সমকমিটি গঠিত হয়েছে, তাতে আছেন বিশিষ্ট কয়েকজন ভারতবিদ, বাংলা ভাষাবিদ ও অনুবাদক। বিবেকানন্দ রচনাবলীর এই খণ্ড সংস্করণ প্রকাশের কাজ ইতিমধ্যে বেশ কিছুটা এগিয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দ

বিবেকানন্দ সম্পর্কে অনেকগুলি জনসভা ছাড়াও বিজ্ঞান আকাদমির ইন্‌স্টিট্যুট অফ দি পিপ্‌লস অফ এশিয়া (এশিয়ার জাতিসমূহ সম্পর্কে অনুশীলন কেন্দ্র) এবং ইন্‌স্টিট্যুট অফ ফিলসফি র (দর্শন বিভাগ) যুক্ত উদ্যোগে বিবেকানন্দের জন্মশতবর্ষপূর্তি পালন করার জন্যে গত ২১শে জানুয়ারী যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়, তা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বিবেকানন্দের দার্শনিক চিন্তাধারা, তাঁর অক্লান্ত কর্মজীবন স্বদেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মুক্তির জন্যে আর মূঢ় আচার-বিচারের সংস্কার থেকে দেশের মানুষের নৈতিক মুক্তির জন্যে তাঁর অশ্রান্ত সংগ্রাম, জনশিক্ষা সম্পর্কে তাঁর নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি সম্পর্কে কতকগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ এই সভায় পঠিত ও আলোচিত হয়।

এই অধিবেশনের উদ্বোধন করেন বিজ্ঞান আকাদমির উপসভাপতি অধ্যাপক পি এন ফেদোসিয়েভ। স্বামীজীর মানবতাবাদী ও বস্তুমুখী দৃষ্টিভঙ্গী এবং দেশপ্রেমিক হিসেবে দেশের মানুষের রাজনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির জন্যে তাঁর ক্ষান্তিহীন সংগ্রামের

ওপরেই ফেদোসিয়েভ প্রধানত জোর দেন তাঁর আলোচনায়। তিনি বলেন : স্বামী বিবেকানন্দের রাজনৈতিক-সামাজিক চিন্তাধারা, শক্তিসাধনার লক্ষ্যে দেশবাসীদের উদ্বুদ্ধ করার জন্যে তাঁর প্রচারকার্য এবং শিক্ষা সংস্কার সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারা ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে এক ঐতিহাসিক প্রেরণা জুগিয়েছিল। বিবেকানন্দের রচনা বক্তৃতা ও পত্রাবলী থেকে বহু উদ্ধৃতি দিয়ে ফেদোসিয়েভ বলেন : বিবেকানন্দ তাঁর শিষ্যদের, শ্রোতাদের, ভক্তদের বারবার বলেছেন—আগে ওদের (দেশের দরিদ্র বেহনতী মানুষদের) পেট ভরে দুবেলা খেতে দে, ওরা প্রাণে বাঁচুক ; তারপর ওদের কাছে গিয়ে ধর্ম ব্যাখ্যা করিস ; ক্ষুধার যে অধিষ্ঠিত নারায়ণ। —বিবেকানন্দের এই "দেবা-ধর্ম" শুধুই একটা নৈতিক আদর্শ নয় ; দেশের মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে, দেশবাসীর বৈষয়িক সামাজিক উন্নতি সাধনের সঙ্গে তিনি এই দেবাধর্মকে যুক্ত করেছিলেন। "বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর !"—এই হল বিবেকানন্দের একটি মূল বাণী : মানুষের জন্যে কাজ করলেই ঈশ্বরসাধনা করা হয় এবং দেশের জন্যে —অর্থাৎ দেশের মানুষের জন্যে—অসংখ্য কাজ করবার আছে : শিক্ষা বিস্তারের কাজ, সব নির্বিশেষে দেশের মানুষদের দেহে মনে শক্তি করে তোলার কাজ।—প্রধানতঃ এই আদর্শ নিয়েই তিনি রামকৃষ্ণ মিশন (পরবর্তীকালে "রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মিশন") গড়ে তোলেন অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে।

বাংলাভাষাবিদ ও ভারতের সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতাবাসের ভূতপূর্ব সংস্কৃতি-সচিব ই ফেদোসিয়েভ "বিবেকানন্দের সমাজচিন্তা" নামে যে নিবন্ধ পাঠ করেন, তার মূল বক্তব্য ছিল : বিবেকানন্দের যখন আবির্ভাব, তখন সারা ভারতে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ এক প্রবল আন্দোলনের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। স্নাতকস্তরের গ্রহণ করার অনেক আগেই ছাত্রাবস্থায় নরেন্দ্রনাথ দত্তকে এই

স্বাধীনতা বিপন্ন, আপনার সমস্ত শক্তি দিয়ে তা রক্ষা করুন

—জওহরলাল নেহেরু

দেশরক্ষার জন্য অবিরাম সতর্কতা প্রয়োজন

আজ আমরা বাইরের যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছি তা একদিনেই শেষ হবেনা। এই বিপদ যতদিন থাকতে পারে। কাজেই জাতিকে সব সময়ের জন্য সতর্ক থাকতে হবে। এই কাজে আত্মপ্রসাদের স্থান নেই, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সর্বতোভাবে শক্তিশালী করার জন্য আমাদের প্রচেষ্টাকে একটুও শিথিল করা চলবে না।

দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে কাজ করুন

জাতীয় মুক্তি আন্দোলন গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল; তাই তিনি সন্ন্যাসী হয়েও সমাজ থেকে, দেশের মানুষ আর মুক্তিসংগ্রাম থেকে নিজেকে সরিয়ে নেননি; অধ্যাত্মসাধনার সঙ্গে তিনি দৈনিকব্রতকে যুক্ত করেছিলেন; বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের সন্তানরা তাঁকে প্রেরণা জুগিয়েছিলেন বলে মনে হয়। বিবেকানন্দ "শূদ্র বিদ্রোহের" কথা বারবার বলেছেন এবং সমকালীন ভারতীয় মনীষীদের মধ্যে তিনিই প্রথম নিজেকে সমাজতন্ত্রী "সোশ্যালিস্ট" বলে ঘোষণা করেন। সমস্ত মানুষের সমান অধিকার, সর্বজাতির মধ্যে মৈত্রী আর সামাজিক ন্যায়বিচারের একজন অগ্রগণ্য প্রবক্তা ছিলেন তিনি।

বিবেকানন্দের "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" এবং অন্যান্য রচনা থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়ে প্রখ্যাত সোভিয়েত দার্শনিক এ লিংহান তাঁর নিবন্ধে বলেন: শিকাগোর ধর্মমহাসম্মেলনে গিয়ে সে দেশের বিপুল ধনসমৃদ্ধি লক্ষ্য করে বিবেকানন্দ নিজের দেশের জনসাধারণের দারিদ্র ও শোষণ যন্ত্রণার দিকে। আমেরিকা-ইওরোপের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন, তাদের সহায়তা পাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তাঁর সে আশা ভঙ্গ হয়। পশ্চিমী দেশগুলির দুরন্ত প্রাণ প্রাচুর্যের এবং শক্তি ও উদ্যমের তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেন; কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি ধনগর্বিত ও বিত্তকেন্দ্রীক পাশ্চাত্য সভ্যতার কুৎসিত দিকগুলিরও তীব্র সমালোচনা করেন। বিবেকানন্দ তাঁর বহু রচনায় বলেন—লোভ, শোষণ আর অত্যাচারের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছে এদের এই সমৃদ্ধি আর বিপুল শক্তি—যে শক্তি আর সমৃদ্ধি কেন্দ্রীভূত মুষ্টিমেয় ধনী লোকের হাতে; মুনাফার জন্যে এরা যেকোনো পাপকে আশ্রয় করতে পারে; প্রচণ্ড বলশালী হয়ে উঠে এরা দুনিয়াকে রক্তের সমুদ্রে ভাসিয়ে দিতে পারে। সেই সঙ্গে, স্বামীজী আফ্রিকার দেশে নিগ্রোদের ওপরে নিদারুণ অত্যাচার আর সামাজিক অবিচার দেখে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের ওপরে আস্থা হারিয়েছিলেন। এদের কাছ থেকে স্বদেশের মুক্তি সংগ্রামে সহায়তা পাওয়া সম্ভব নয় বুঝেই তিনি দেশের মানুষের স্বাবলম্বী হতে বলেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন আত্মশক্তিতে নির্ভরশীল তাঁর দেশের মানুষরা আত্মা নিয়ে উঠে দাঁড়াক; পরমুখাপেক্ষী হয়ে স্বাধীনতা অর্জন করা যায় না।

কিন্তু তাই বলে জাতি হিসেবে ভারত যে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পারে না, বিশ্বের সর্বজাতির এক মহামানব-পরিবারে ভারতকে তার যথাযোগ্য দায়িত্ব নিয়ে অন্তর্ভুক্ত হতে হবে—এ কথাও বিবেকানন্দ বলেছেন। বিবেকানন্দের এই বিশ্ববীক্ষা ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন এন আনিকেইফ তাঁর নিবন্ধে। পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশের নিপীড়িত মানুষ একদিন না একদিন মাথা তুলে দাঁড়িয়ে স্বাধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে; তার মধ্যে থাকবে ভারতের মানুষরাও। ইওরোপ-আমেরিকার সমকালীন শ্রমিক-আন্দোলনের প্রবল জোয়ারের তাৎপর্যকে বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেছিলেন। সেই সঙ্গে, তিনি পশ্চিমী মনীষী ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্বমৈত্রীর আন্দোলনকেও উপলব্ধি করেছিলেন। এবং এই তিনটি আন্দোলন—উপনিবেশবাদের শৃঙ্খল ভাঙার জন্যে দেশে দেশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন শ্রমিক—আন্দোলন আর চিন্তানায়কদের মধ্যে বিশ্বমৈত্রী আন্দোলন—যে মূলতঃ একসূত্রে গাঁথা, সে কথা সম্ভবত ভারতীয় মনীষীদের মধ্যে বিবেকানন্দই প্রথম অনুভব করেন ও বলেন।

বিবেকানন্দের সাহিত্যপ্রতিভা ও কবিত্বশক্তির সম্পর্কে "বিবেকানন্দ ও ভারতীয় সাহিত্য" নামে এক সুন্দর নিবন্ধপাঠ করেন শ্যামলাদাস ভারতবিদ ইরেভ্‌গেনি চেলিশেভ। বিবেকানন্দের রচনার তীক্ষ্ণতা ও উজ্জ্বলতা তিনি উদাহরণের মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট করে তোলেন।

মস্কোর ভারতীয় রাষ্ট্রদূতাবাসের কাউন্সেলর সেক্রেটারী শ্রী এন বি ভৈরন "বিবেকানন্দ ও ভারতের নবজাগরণ" সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

প্রেসিডেন্ট কেনেডি

যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬ বৎসর বয়স্ক প্রেসিডেন্ট জন ফিটজেরাল্ড কেনেডি একটি খোলা মোটর গাড়িতে করিয়া টেক্সাসের অন্তর্গত ডালাসের শহরাঞ্চল অভিমুখে যাইবার সময় আততায়ীর গুলীতে মারাত্মকভাবে আহত হন।

প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে মৃত ডালাসের পার্কল্যাণ্ড হাসপাতালে লইয়া আসা হয়। তাঁহার মস্তক রক্তাক্ত ছিল। প্রায় এক ঘণ্টা পরে তাঁহার প্রাণ রক্ষার সমস্ত ঐকান্তিক প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া দিয়া ভারতীয় সময় রাত্রি সাড়ে ১২টা প্রেসিডেন্টের মৃত্যু ঘটে।

১৯৬০ সালে নভেম্বর মাসের নির্বাচনে জয়লাভ করিয়া মিঃ কেনেডি ১৯৬১ সালের জানুয়ারী মাসে প্রেসিডেন্টের কার্যভার গ্রহণ করেন। আমেরিকার ইতিহাসে বয়ঃকনিষ্ঠ যে কয়জন প্রেসিডেন্টের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন তিনি তাঁহাদের অন্যতম।

জন ফিটজেরাল্ড কেনেডি নিম্নোক্ত উক্তির মধ্য দিয়া তাঁহার জীবন দর্শন ব্যক্ত করিয়াছেন :

"মানুষ যাহা সম্পাদন করা কর্তব্য বলিয়া মনে করিবে শত বাধা, শত বিপদ ও চাপ সত্ত্বেও ব্যক্তিগত ঝুঁকি লইয়াও তাহাকে তাহা করিতে হইবে এবং ইহাই মানুষের সমস্ত নীতির মূল কথা।"

তাঁহার সমগ্র জীবনে, যুদ্ধকালে তাঁহার কার্যকলাপের মধ্যে, তাঁহার রাজনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যাপারে, এমন কি তাঁহার মৃত্যুর দিনেও তাঁহার এই জীবনদর্শনের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

জন কেনেডি ১৯১৭ সালের ২৯শে মে ম্যাসাচুসেটসের ব্রুকলিনে জন্মগ্রহণ করেন। মাতাপিতার নয়টি সন্তানের মধ্যে তিনি দ্বিতীয় সন্তান। তাঁহার পিতা জোসেফ পি কেনেডি গ্রেট বৃটেনে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ছিলেন। তাঁহার পিতামহ ও পিতামহী উভয়েই ম্যাসাচুসেটসের রাজনীতিতে বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৪৭ সালে আয়র্লাণ্ডে আলুর দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তাহারা সেখান হইতে পলায়ন করিয়া যুক্তরাষ্ট্রে আসিয়াছিলেন।

জন কেনেডির বড় ভাই জোসেফ রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য সর্বদাই উৎসুক ছিলেন। যুদ্ধের সময় ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করিবার সময় জোসেফের মৃত্যু হইলে তাঁহার স্মৃতিই জনকে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিতে অনুপ্রাণিত করে।

২৩ বৎসর বয়সে জন কেনেডি ম্যাসাচুসেটসের একটি বিশেষ নির্বাচনে জয়লাভ করিয়া প্রতিনিধি সভার সদস্য হন। প্রতিনিধি সভার তিনবার সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি সেনেটের সদস্য পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং ১৯৫২ সালে নির্বাচিত হন।

তাঁহার একমাত্র রাজনৈতিক পরাজয় ঘটে ১৯৪৬ সালে। ঐ বছর তিনি ডাইস প্রেসিডেন্ট পদের জন্য নির্বাচনে প্রার্থী দাঁড়াইবার মানসে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মনোনয়ন লাভের চেষ্টা করেন, কিন্তু সেদ পর্যন্ত বিফল হন।

তাহার চার বৎসর পরে তিনি ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মনোনীত প্রার্থী হিসাবে প্রেসিডেন্ট পদের জন্য নির্বাচনে দাঁড়ান এবং ব্যাপক ভাবে নির্বাচনী প্রচার অভিযান পরিচালনা করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের ৩৩তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

১৯৬১ সালের ২০শে জানুয়ারী অভিষেক ভাষণে প্রেসিডেন্ট কেনেডি "মানব জাতির সাধারণ শত্রু ব্যাধি, দারিদ্র্য, উৎপীড়ন ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য" দেশবাসী ও বিশ্ববাসীকে আবেদন জানান।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট কেনেডি পৃথিবীর উন্নতিশীল রাষ্ট্রগুলিকে সাহায্য করিবার জন্য "উন্নয়নের দশ বছর" নামক এক কর্মসূচী গ্রহণ করেন। মার্কিন শান্তি বাহিনী পরিকল্পনার সূচনাও তিনিই করিয়া ছিলেন। বর্তমানে এই বাহিনীর কর্মীরা পৃথিবীর নানা দেশে কাজ করিতেছেন।

প্রেসিডেন্ট কেনেডি তাঁহার শাসন কালে যুক্তরাষ্ট্র বা আমেরিকার কোন মিত্র রাষ্ট্রের স্বার্থ বিসর্জন না দিয়াও সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে ঘন কদাকদি হ্রাস করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

বিশ্বে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেসিডেন্ট

কেনেডি বরাবরই চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহার একটি বড় নিরপেক্ষ পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা নিষেধ করিবার জন্য তাঁহার নিরলস প্রচেষ্টা। ঐ প্রচেষ্টার ফলেই আবহমণ্ডলে, স্থলে এবং জলের নীচে পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি স্বাক্ষরের কয়েক দিন আগে ১০ই জুন প্রেসিডেন্ট কেনেডি ওয়াশিংটনে আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ভাষণ দেন। ঐ ভাষণে তিনি ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসান, স্বাধীন পৃথিবী ও কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বোঝাপড়ার মনোভাব কিছুটা প্রসারের এবং পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা নিষিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে একটা মতৈক্যে উপনীত হইবার জন্য আর একবার চেষ্টার জন্য আবেদন জানান। মিঃ কেনেডি বিশ্ববাসীর নিকট আবেদন করেন, শান্তি এবং যুদ্ধ সম্পর্কে তাহাদের মনোভাব কি তাহা যেন আর একবার তাহারা যাচাই করেন, এবং যুদ্ধে ও তাহার ফলে মানব জাতির ধ্বংস অনিবার্য এই ধারা বর্জন করেন। তিনি বলেন, মানব জাতিকে বিশ্বাস করিতে হইবে যে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

ঐ ভাষণেই মিঃ কেনেডি বলিয়া ছিলেন, মানব জাতি আজ যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন, সে সকল মানুষের সৃষ্ট এবং মানুষই তাহার সমাধান করিতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদে দুই বছর দশমাস কাজ করিয়া গিয়াছেন পরলোকগত জন এফ, কেনেডি। তাঁহার ব্যক্তিগত আদর্শ এবং দেশের আদর্শ সম্পর্কে তিনি বহুবার বহু স্মরণীয় উক্তি করিয়া গিয়াছেন। এখানে সে সবের কয়েকটি উল্লেখ করা যাইতেছে:

"আমার আমেরিকাবাসী ভ্রাতৃবর্গ, আপনাদের জন্য আপনাদের দেশ কি করিতে পারে সেই প্রশ্ন না করিয়া আপনারা দেশের জন্য কি করিতে পারেন তাহাই জিজ্ঞাসা করুন।

"বিশ্ববাসী নাগরিকবৃন্দ, আমেরিকা আপনাদের জন্য কি করিবে এই প্রশ্ন না করিয়া, সমগ্র মানবজাতির স্বাধীনতার জন্য আমরা সকলে মিলিত ভাবে কি করিতে পারি, ইহাই আপনাদের জিজ্ঞাস্য হউক। (১৯৬১ সালের ২০শে জানুয়ারী প্রদত্ত অভিষেক ভাষণ।)

কোনও ব্যক্তি, কোনও রাষ্ট্র অথবা কোনও শাসন পদ্ধতিরই বিরুদ্ধে আমরা নই—যদি তাহারা স্বাধীনতার প্রতিকূলে না দাঁড়ায়। (কংগ্রেসের উদ্দেশ্য বাণী, ১৯৬১ সালের ২৪শে মে)।

"ভয়ংকরের সঙ্গে একটা সন্ধি স্থাপন করা যাউক, শান্তির আশীর্বাণীর জন্য আমাদের প্রার্থনা নিবেদিত হউক। বিশ্বশান্তি বজায় রাখিবার যোগ্য আন্তর্জাতিক শক্তি যখন আমরা গড়িয়া তুলিতে পারিব, তখন কোনও একক রাষ্ট্রের যুদ্ধ বাধাইবার ক্ষমতা বিনষ্ট করিবার প্রয়াসেও, চলুন আমরা সকলে মিলিত হই।" (রাষ্ট্রসংঘে বক্তৃতা, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬১)।

যুক্তিসঙ্গত এই শতবার্ষিকীর বৎসরে ন্যায় বিচার এই দাবীই আমাদের কাছে করিবে যে, স্বাধীনতার আশীর্বাদ যেন আমেরিকাবাসী এবং তাহাদের সন্তান সন্ততিদের সকলের জন্যই সুনিশ্চিতভাবে অবধারিত থাকে। কেবল অর্থনৈতিক সাফল্য, আন্তর্জাতিক কূটনীতি এবং আভ্যন্তরীণ শান্ত অবস্থার জাতির এই দাবী নহে, যে হেতু ইহা সত্যাশ্রিত, সেই হেতু।" (নাগরিক অধিকার সম্পর্কে কংগ্রেসে পঠিত বাণী ১৯শে জুন, ১৯৬৩)।

১৯৬১ সালের ২০শে জানুয়ারী যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদে অভিষিক্ত হইবার পর জন কিট্‌জেরাল্ড কেনেডি যে আদর্শ ও মূলনীতি গুলি ঘোষণা করে ছিলেন জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সমস্ত শক্তি ও সামর্থ দিয়ে সেই আদর্শকে রূপায়িত করবার প্রয়াস পেয়েছেন তিনি, চেষ্টা করেছেন সেই মূলনীতিগুলিকে অনুসরণ করতে।

স্বাধীনতাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য, তাকে সার্থক করে তুলতে আমেরিকা সমস্ত রকমের বোঝা বহন করবে, সমর্থন করবে মিত্রদের এবং বিরোধিতা করবে শত্রুদের—এই কথাগুলি প্রেসিডেন্ট কেনেডি সেই অভিষেক দিবসে ঘোষণা করেছিলেন। অত্যাচার, দারিদ্র, রোগব্যাধি এবং যুদ্ধ—সমগ্র মানবজাতির শত্রু এরা। এদের নিধন করবার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে আপন দেশবাসীদের উদ্দেশ করে বলেছিলেন —"দেশ আপনাদের জন্য কি করবে সে প্রশ্ন করবেন

মৃত্যুহীন প্রাণ

মানবদরদী কেনেডি

না—আপনি দেশের জন্য কি করছেন সেই প্রশ্ন করুন নিজেকে।"

শুক্রবার টেকসাসে প্রদত্ত তাঁর শেষ বক্তৃতায় প্রেসিডেন্ট তাঁর আদর্শ রূপায়ণের জন্য দেশবাসীর সমর্থনের অনুরোধ জানিয়েছিলেন, আবেদন জানিয়েছিলেন তাঁর বিশেষ কর্মসূচীগুলি সমর্থন করতে।

ফোর্ট ওয়ার্থে তাঁর জন্য একটি মাত্র অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। বহু অধিবাসীরই হয়ত সেই অনুষ্ঠানে যাবার সুযোগ হত না। তাই প্রেসিডেন্ট প্রত্যুষে বেরিয়ে গিয়েছিলেন হোটেল থেকে, বক্তৃতা করেছিলেন নাগরিকদের এক জমায়েতে। ফিরি ফিরি বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র এবং সমগ্র পৃথিবীর নিরাপত্তা বিধানই হল আমেরিকার সামরিক লক্ষ্য। তিনি আরও বলেছিলেন যে, সমস্ত পৃথিবীতে যুক্তরাষ্ট্রের যে দায়িত্ব রয়েছে তা পালন করবার জন্য আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাদের বিতব্যয়ী হতে হবে।

এর অল্প কিছু পরে তাঁর হোটেলে এক জনতার জমায়েত হয়েছিল। সেখানে তিনি বলেছিলেন যে, বর্তমান দুনিয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক ও অশান্ত, তাঁর কার্যকালের তিনবছরের মধ্যে লাওস, বার্লিন ও কিউবাতে তিনবার যে রকম পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে আবারও সে রকম ঘটনার অবতারণা হতে পারে। তিনি আরও বলেছিলেন যে, সামরিক শক্তিসামর্থ বজায় রাখার জন্য জনসাধারণকে ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, "আমাদের জীবন স্বচ্ছন্দে কেটে যাবে একথা কেউই আশা করে না। এই দশক কেন এই শতাব্দীতেও এরকম হবে বলে মনে হয় না।"

গত তিন বছর ধরে কিটজেরাল্ড কেনেডির জীবন খুব স্বচ্ছন্দে কাটেনি। সরকারী কাজকর্ম তাঁর জীবনকে সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত করেছিল, স্ত্রী এবং দুটি শিশু সন্তানের সঙ্গে একান্তে কাটাবার সময় অত্যন্ত সামান্যই পেয়েছেন তিনি। সরকারী জীবনের দৈনন্দিন কর্মসূচী সমাপনান্তে পরামর্শদাতা ও উপদেষ্টাদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নানাবিষয়ে আলাপ আলোচনা করেছেন। এমনকি কখনও সখনও যখন ক্যাম্প ডেভিড হাউণ্টেন রিট্রিট, কিংবা হায়ানিস পোর্ট, অথবা পাম বীচে সপ্তাহ শেষের দুটোদিন কাটাতে গিয়েছেন তখনও তাকে দেখা গিয়েছে বক্তৃতা রচনা করতে, কর্মচারীদের সঙ্গে কাজকর্ম নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে, অথবা কাজ কর্ম নিয়ে আসা অতিথিদের সঙ্গে আলোচনা করতে দেখা গিয়েছে। অথচ অবসর তিনি সামান্যই পেয়েছেন।

দেশের মুখ্য প্রশাসক, সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং রাষ্ট্র প্রধান হিসাবে তিনি সংবিধান সম্মত তাঁর যাবতীয় ক্ষমতা ব্যাপকতম ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ আইন রচনার ক্ষেত্রে স্বীয় দায়িত্ব পালন করেছেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে আপন কর্তব্য সম্পাদন করেছেন।

শুক্রবার আততায়ীর গুলিতে তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হবার পূর্ব পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট তাঁর আদর্শকে কার্যকর করবার জন্য সর্বতোভাবে প্রয়াস পেয়েছেন। সমস্ত দেশবাসীর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করবার জন্য তিনি বলিষ্ঠভাবে নাগরিক অধিকার বিষয়ক কার্য-সূচীকে রূপায়িত করবার চেষ্টা করেছেন, অর্থনীতির ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রকে আরও শক্তিশালী করবার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়েছেন।

গত জুনমাসে আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে প্রদত্ত বক্তৃতায় তিনি আংশিক পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধ করণ চুক্তির ভিত্তি স্থাপন করেন। "শান্তির উদ্দেশ্যে কাজ করার জন্য বিশ্বের জাতিগুলির কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, "এই শান্তি হবে প্রকৃত শান্তি, মানুষের জীবন যাত্রাকে সুন্দর করে তোলে, যা মানুষও রাষ্ট্রসমূহকে সমৃদ্ধি ও আশার পথে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে এবং নিজেদের সন্তানদের জীবন সুন্দরতর করে গড়ে তুলবে……।"

কয়েক সপ্তাহ পর ফ্রাঙ্কফার্টে তিনি এক বক্তৃতায় আতলান্তিক সোষ্ঠির ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির কার্যকর সহযোগিতার মধ্য দিয়ে প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তুলবার আহ্বান জানান। পরদিন কমিউনিস্ট সৃষ্টি বার্লিনের প্রাচীরের কাছে ৩০০০০ বার্লিনের অধিবাসীর এক সভায় তিনি বলেন যে, বার্লিনের স্বাধীনতা নিয়েই

হস্ত থাকলে চলবে না তাদের, দেখতে হবে ঐ প্রাচীরের পরপারে যেখানে কমিউনিস্ট শক্তি ব্যর্থতার পর্যবসিত হয়েছে, অপেক্ষা করতে হবে সেই মহালয়ের যখন সমগ্র মানবজাতির জন্য নায় ও সত্যতাশ্রিত প্রতিষ্ঠিত হবে।

আয়ার্ল্যাণ্ডে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রসংঘের আওতার মধ্যে কাজ করবার জন্য ক্ষুদ্ররাষ্ট্রগুলির যে দায়িত্ব রয়েছে তার উল্লেখ করেন।

তারপর সেপ্টেম্বরে রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন। প্রেসিডেন্ট সেখানে তুলে ধরলেন নিরস্ত্রীকরণ কর্মসূচী, পুনরায় ব্যক্ত করলেন বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় তাঁর আন্তরিক আগ্রহ, বললেন, আংশিক পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তিকে শুরু করে এগিয়ে চলতে হবে বিশ্বশান্তি স্থাপনের পথে।

এ বছর শরৎকালে তিনি সমগ্র দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন, জনসাধারণকে আহ্বান জানিয়েছেন তাঁর কর্মসূচী সমর্থন করতে, প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন স্বদেশে প্রত্যেকের সমান সুযোগ থাকা কতখানি প্রয়োজন, কতখানি গুরুত্বপূর্ণ বিদেশকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন করবার।

কত দ্রুতভালে যে তিনি কাজ করতেন তার পরিচয় মিলবে শেষ এক সপ্তাহের কাজকর্ম পর্যালোচনা করলে। মৃত্যুর আগের শুক্রবার তিনি নিউইয়র্কে আমেরিকার বৃহত্তম শ্রমিক সংগঠনে এক সম্মেলনে বক্তৃতা করতে গিয়েছিলেন। পরদিন গেলেন ফ্লোরিডার কেপকেনাভেরালে। চন্দ্রে অবতরণ কর্মসূচীর কাজ কর্ম বিষয়ে রিপোর্ট শুনলেন তিনি। তারপর মহা উৎসাহ নিয়ে দেখে এলেন একটি স্যাটার্ন দি ১ রকেট। ঐ সময়ই তিনি ঘোষণা করেছিলেন মাসখানেকের পর ঐ রকেটি মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হবে।

সোমবার তিনি গেলেন স্ট্রাইক কম্যাণ্ডের সদর দপ্তর পরিদর্শনে এখান থেকে যে-কোন সময় পৃথিবীর যে-কোন প্রান্তে শান্তি রক্ষা অথবা সংঘর্ষ প্রতিরোধের জন্য সৈন্য পাঠান যায়। পরে টম্পা এবং বিমানে মীচে বক্তৃতা—বক্তব্য ছিল, স্বদেশে ও বিদেশে সর্বত্রই শক্তিধর হতে হবে, সমান সুযোগের ব্যবস্থা করতে হবে সর্বত্র, সকলের জন্যে।

পরের দুদিন মুক্তশক্তি ও শুক্রবার ছিলেন টেক্সাসে। সেখানেও পর পর বক্তৃতা দিয়েছেন, যেতে হয়েছে, নানা জায়গায়।

এই রকমই ছিল তাঁর কর্মব্যস্ততা। গাড়ীতে যেতে যেতেও সরকারী কাজ করেছেন প্রেসিডেন্ট। তবু কিন্তু তাঁর মনের সজীবতা নষ্ট হয়নি, সব কিছুতেই তাঁর সমান আগ্রহ, মেজাজ প্রফুল্ল সর্বদাই।

শুক্রবার সকালে ফোর্ট ওয়ার্থ থেকে বিমানে ডালাস যাবার পথে প্রেসিডেন্ট দুপুরের বক্তৃতাটি পড়ে নেন। তাঁর ঐ বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল নিরাপত্তার ব্যাপারে সামরিক শক্তিবৃদ্ধি, বিদেশে সামরিক ও বৈদেশিক সাহায্য দিতে থাকার প্রয়োজনীয়তা এবং মহাকাশের ক্ষেত্রে ও বিজ্ঞানে যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্য। সর্বোপরি তাঁর বক্তব্য ছিল যে, যুক্তরাষ্ট্র কখনই আক্রমণাত্মক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শক্তি প্রয়োগ করবে না, শান্তির স্বার্থেই শুধু এর প্রয়োগ ঘটবে।

ডালাসের জন্য যে বক্তৃতাটি তিনি রচনা করে ছিলেন তাঁর শেষ অনুচ্ছেদটিতে সুন্দর ভাবে তাঁর আদর্শ ব্যক্ত হয়েছে। তিনি লিখে ছিলেন, "আমরা এই দেশের বর্তমান বাসিন্দারা, বিশ্ব স্বাধীনতার প্রাকারে প্রহরারত—আমরা যেচে এ দায়িত্ব তত না নিয়েছি, নিয়তির বিধান তার চেয়ে বেশী কার্যকরী হয়েছে এ ক্ষেত্রে। এ কারণ আমরা প্রার্থনা করি যেন এই শক্তি ও দায়িত্ব বহনের যোগ্য হতে পারি, সংগত ও বিবেচিত ভাবে এই শক্তি ব্যবহার করতে পারি এবং প্রাচীন কালে প্রার্থনাকারীরা যেমন বলতেন পৃথিবী শান্তিময় হোক, মানুষের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হোক, আমরা যেন আমাদের এই আমলে সর্বকালের জন্য সেই রকম ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারি। এই হবে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য—এবং এই মহান উদ্দেশ্যই হবে আমাদের শক্তির ভিত্তি। একারণ নির্দেশিত হয়েছে সেই প্রাচীনকালে (বাইবেলের উদ্ধৃতি): ঈশ্বর যদি নগর রক্ষা না করেন, তাহলে প্রহরীর জাগা বৃথাই হবে।

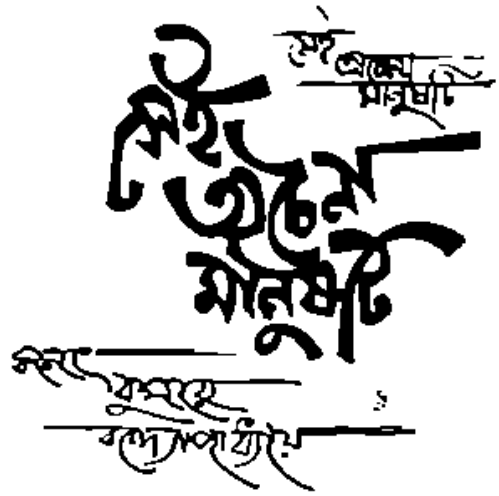

পরেশ একদিন থেকেই পরদিন চলে গেল। সেও কেমন করে মুছে গেল তার স্মৃতি থেকে।

তারপর এম এস সি ক্লাস!

সে কি সমারোহের দিন! অন্তত তার পক্ষে সে কি সমারোহের কাল! বি এস সি পরীক্ষায় একটি বিশেষ বিষয়ে সে যে বুৎপত্তি ও কৃতিত্ব দেখিয়েছিল তার প্রশংসায় তার অধ্যাপক হলেন উচ্ছ্বসিত-ভাবে মুখর। শুধু তাই নয়, প্র্যাকটিক্যালে তার মত পরিচ্ছন্ন হাতও না কি সচরাচর দেখা যায় না! শুধু কি তাই! একজন অল্পবয়স্ক অধ্যাপক একদিন তাকে একা পেয়ে রসিকতা করে বলেছিলেন—তুমিতো সোজা লোক নও হে!

নানানভাবে প্রশংসা ও সম্মান পাওয়া তখন অভ্যাস হয়ে গিয়েছে তার। সে একটু হেসে বললে—কেন স্যার?

তরুণ অধ্যাপক একটু হেসে বলেছিলেন—কেন জিজ্ঞাসা করছ? তুমি এমনিতে পা টেনে চল, তোমার নর্মাল স্পীড আর দশজনের চেয়ে খানিকটা কম বটে, কিন্তু আসলে তোমার স্পীড তোমার আশপাশের মানুষদের চেয়ে অনেকটা বেশী। তা না হলে তুমি তোমার সঙ্গে এক গাধাবোট জুড়েও একেবারে ম্যাস অব ওয়ারের স্পীডে এ্যাটলান্টিক পার হয়ে গেলে! তোমার ফার্স্ট ক্লাস থার্ড বাহুদীর একটা পেপার আমি দেখেছি। মোটেও ব্রাইট নয়। তবে লেগেছে খুব। সে ছিল আমার খাতায়।

শঙ্কর লজ্জিতভাবে চুপ করে রইল হাসিমুখে।

অধ্যাপক এবার একটু গম্ভীর হয়ে বললেন—এবার গাধাবোট টাধা ছাড়, বুঝলে! নইলে ম্যাস-অব-ওয়ারই হও আর টাইটানিকই হও, সঙ্গে গাধাবোট বাঁধা থাকলে স্পীড কমে যাবেই। আর জান, জ্ঞানের পথ দুর্গম, সেখানে মানুষের যাত্রা এক; একক যাত্রী সে সেখানে। সেখানে লগ্গী নাই হে। ও চেষ্টা ক'রো না। তোমারই ক্ষতি হবে, ওরও কিছু লাভ হবে না!

শঙ্কর হঠাৎ বলে ফেললে—কেন স্যার, আমার কুরীরা তো দুজনে রিসার্চ করেছিলেন। তাতে সাকসেসফুলও হয়েছিলেন।

অধ্যাপক তার মুখের দিকে বিচিত্র দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন—তুমি কি ওকে বিয়ে করছ না কি? দাট ইজ্ উইদিন টু আর্লি! ছোট্ট গো দাট ওয়ে! তাতে তোমার ক্ষতি হবে।

শঙ্কর সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল—না, না, স্যার, সে রকম কিছু নয়। সে রকম প্ল্যান আমার নাই।

বলতে বলতে সে পালিয়ে বাঁচল।

সুবিমলও অমনি ধারার প্রশ্নে বিব্রত হতে লাগল। অধ্যাপকরা তাকে বোধ হয় বিশেষ কিছু বলেননি সে স্ত্রীলোক বলে। কিন্তু বান্ধবীদের কাছ থেকে সে পরিত্রাণ পাবে কি করে? তাদের সরল ও সকৌতুক রসিকতায় অস্থির হয়ে সে একদিন কাঁদো কাঁদো মুখে নিজের দুঃখ নিবেদন করলে শঙ্করের কাছে। তাকে একা পেয়েই সে সকরুণ মুখে বললে—তুমি আমায় এ কি বিপদে ফেলেছ বল দেখি?

তার ভাবভঙ্গি দেখে অবাক হয়ে শঙ্কর বললে—কি বিপদে ফেললাম তোমাকে?

মুখ ভার করে লজ্জার সঙ্গে সে বললে—জানি না যাও!

—আস্তে মা তা বলছ কি করে? বিপদটা কি বল দেখি!

এবার রেগে গিয়ে কথাটা বন্দুকের গুলির মত বের করে দিলে—সবাই বলছে আমি তোমার সাধারণ বোট। তুমি আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছ। আবার একজন বললে—তুমি আর আমি নাকি কুরী কাপলস্ হতে যাচ্ছি।

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে শঙ্কর বিস্মিতভাবে বললে—তাতে দোষ কি হল? ভাল কথাই তো বলেছে। খারাপ তো কিছু বলেনি।

এবার ধরণীর মত কাঁদো কাঁদো হয়ে সুমিত্রা বললে—ব্যাপারটা তুমি বুঝছ না কিম্বা বুঝেও না বুঝার ভান করে জ্বালাচ্ছ আমাকে। তুমি বুঝছ না ওরা কি বলছে?

বঙ্গবাসী শঙ্করের রাগ হয়ে গেল। রেগে বললে—কি বলছে তা কি করে বুঝাব তুমি না বললে?

—বুঝতে পারছ না? ওরা বলছে তুমি আমাকে বিয়ে করবে!

হাসতে লাগল শঙ্কর। হাসতে হাসতে শঙ্কর বললে তাতে কি খারাপ হল? ভালই তো বলেছে! আমি তোমাকে বিয়ে করব এটা তো এমন কিছু খারাপ কথা নয়!

সুমিত্রা কোন উত্তর দিলে না। বিরসমুখে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

—কি হল? তার মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনটার চেহারা বুঝে নিয়ে, শঙ্কর হেসে বললে আরে ওরা বললেই তো আর বিয়ে করা হয়ে যাচ্ছে না, তুমি বিয়েও করছ না আমাকে। তাতে এত চঞ্চল হবার কি আছে?

—সে-তুমি বুঝবে না! বলে ছুটে চলে গেল সুমিত্রা।

। ছয়।

কিন্তু বড্ড শীত শীত করছে।

গায়ের চাদরখানা গায়ে ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে সে গায়ের পুঁটিটার কাছে গিয়ে, পুঁটিতেই ঠেস দিয়ে বসল চুপ করে। লাগছে রোদটা এখন ভোরবা হয়ে গায়ের সোয়াতেই এসে গিয়েছে।

আর কি মুস্কিল, শীত শীত শুধু নয়, ঘুমে যেন দুচোখ জড়িয়ে আসছে। এই অবেলায় আবার ঘুম আসে কেন?

উঠে যাবে নাকি ঘরে? উঠে গিয়ে শোবে বিছানায়? সেই লোকটাকে ডাকবে না কি গলা ছেড়ে?

চীৎকার করে ডাকার কথা মনে হতেই ইচ্ছা হতে লাগল চীৎকার করে একখানা গান জুড়ে দেয়। তা হলে কি হবে? রাজ্যের যত কাক এ পাড়ার আছে সব এসে হাজির হয়ে যাবে এক মুহূর্তে। ব্যাটারা ভাববে সে ওদের খেতে ডাকছে।

কথাটা মনে হতেই আপন মনে হা হা করে হাসতে লাগল সে। সে অনেক হাসি। যেন মনের মধ্যে যত হাসি চাপা ছিল সব বেরিয়ে আসতে লাগল গলকে গলকে।

হাসতে হাসতেই, কৌতুক রসভরের মধ্যেই হাতের বই আর খাতা টেনে নিয়ে বালিশের মত মাটিতে রেখে তাতেই মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল সে।

তার অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল বোধ হয়।

• • •

ঘুম যখন ভাঙল তখন অনেক রাত্রি।

ঘুম ভাঙল, কিন্তু তখনও এত ঘুম দুই চোখের পাতায় লেগে আছে যে সে চোখ মেলতে পারছে না। পাশ ফিরতে গিয়ে সর্বাঙ্গে অনুভব করলে কি নিদারুণ ব্যাথা!

কিন্তু—কিন্তু—? সে ঘুমোবার আগের সময়টার স্মৃতিকে মনের মধ্যে জাগরূক করার চেষ্টা করছে। সে তো ঘুমিয়েছিল বকুলতলায় বালির ওপরে। এখন তো সে শুয়ে আছে বিছানায়, বেশ খাসা নরম বিছানায়। তা হলে রামদুলালের সেই বন্ধুটা তাকে কোলে করে তুলে এনে তার বিছানায় শুইয়ে দিয়েছে।

চোখ দুটো তার খুলেছে তৎক্ষণে।

তার আচ্ছন্ন দৃষ্টির সামনে ঘরের চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। দেওয়ালের এক কোণে একটা ড্রেসিং টেবল-ওয়ালা আয়না। আর এক কোণে আলনা-ঢাকা একটা কি যেন। কি ওটা? একটু ঘাড় তুলে একবার দেখবার চেষ্টা করলে সে। কিন্তু এক মুহূর্ত দেখেই

সে ক্লান্ত হয়ে উঠল। মাথাটা, পিঠটা যেন ব্যথায় ভেঙে যেতে চায়! সে শুয়ে পড়ল বালিশে মাথা রেখে। ওটা একটা অর্গান, টেবল্-অর্গান! সেখানে এক অপরিচিতা মহিলার মস্ত বড় একখানা ফোটো। এক মুহূর্ত তাকিয়ে দেখলে সে, কিন্তু চিনতে পারলে না কার ছবি!

তার ঘরখানা এই ক' ঘণ্টার মধ্যে এতটা বদলে গেল? কে এত সব বদলাল? তা কার দায়? তা হলে? তা হলে এ অন্য ঘর? কার ঘর? এ কোথায় শুয়ে আছে সে?

কিছুই বুঝতে পারছে না সে। তা হলে ব্যাপারটা কি? সে কোথায় আর তার গায়েই বা এত ব্যথা যন্ত্রণা কিসের?

কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। দরজায় পর্দা ফেলা। ডাকতে হলে ডাকবেই বা কাকে?

হঠাৎ মনে ডাকারই বা দরকার কি? বিকেলে যেমন জোর গলায় গান গাইবার ইচ্ছা হয়েছিল তেমনি গান গাইলেই এখনি যে যেখানে আছে ছুটে আসবে; না এসে যাবার উপায় থাকবে না। কথাটা মনে হতেই হাসি এল তার। সে হাসতে লাগল হা-হা হা-হা করে।

হাসির ফল ফলল। ঘরের বাইরে পায়ের শব্দ উঠতে লাগল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে পর্দা ঠেলে একটি মানুষ এসে দাঁড়াল ঘরের দরজায়।

খাটের উপর থেকেই নজর পড়ল শঙ্করের মানুষটির মুখের উপর। আরে এতো মুকুন্দবাবু! বেঁটে দেহটির গোল মাথাটির নীচে দাড়ি।

মুকুন্দবাবু দরজা থেকে ছুটে এসে দাঁড়ালেন বিছানার কাছে। কিছুক্ষণ থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে, ঝুঁকে, ঔৎসুক্য কণ্ঠস্বরে বললেন—আরে চেতনা হয়েছে দেখছি! তা অমন করে হাসছ কেন? এঁ্যা? বল কি তোমার?

মুকুন্দবাবুর চোখে চোখ পড়তেই তার হাসি থেমে গেল। আবার যন্ত্রণাটা ফিরে এসে ভাকে। সে তাঁর মুখের দিকে ক্লিষ্টভাবে তাকিয়ে রইল কয়েকটি মুহূর্ত।

মুকুন্দবাবুর মুখখানা আরও ঝুঁকে পড়ল তার মুখের উপর। পরম স্নেহে প্রশ্ন করলেন—কি কষ্ট হচ্ছে শঙ্কর?

—সারা গায়ে ব্যাথা। যন্ত্রণা! কিন্তু, কিন্তু—

—কিন্তু কি?

—কিন্তু আমি আপনার এখানে এলাম কি করে?

মুকুন্দবাবু তার সহজভাবে কথাবার্তা বলা দেখে খানিকটা নিশ্চিন্ত হলেন বোধহয়। হতেই তাঁর স্বভাবের মধ্য থেকে নির্মল, শিশুসুলভ, আক্রমণোদ্যত, আপাত ক্রুদ্ধ ভঙ্গিটি অনুবর্তিত হল। বেশ জোর দিয়ে বললেন—বল না, তুমিই বল না, এখানে এলে কি করে?

অসহায়ভাবে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে একটু হেসে বললে—তা তো আমি জানি না বলেই আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি।

যেন অনেকখানি হেসে মুকুন্দবাবু বললেন—তাই জিজ্ঞাসা করছ! খুব ছেলে যে তুমি! আমি তো বিকেল বেলা সোজা বাড়ী চলে এসেছি। এসার পর কাপড় জামা ছেড়ে হাত মুখ ধুতে ঢুকেছি এমন সময় শুনতে পেলাম কেমন বাজছে। ভাবলাম বাজছে বাজুক। ফোনের বাজনা থেমে গেল। বুঝলাম অলি-মা গিয়ে ফোন ধরলে। ফোন ধরেই মেয়েটা আমাকে ব্যাকুল ভাবে ডাকছে—ও বাবা, তাড়াতাড়ি এস। পড়ি কি মরি করে তো ছুটে বেরিয়ে এলাম বাথরুম থেকে। অলি বলছে—বাবা, তোমাদের শঙ্করবাবু, কারখানার ভেতরে বেকুল গাছের তলায়-জ্ঞানে-অজ্ঞানে পড়ে আছেন। কি কাণ্ড! তখনই অলির সঙ্গে পরামর্শ করে সেই জিপে হাত-পায়েই ছুটলাম কারখানায় আবার গাড়ী নিয়ে। অলি-বুদ্ধি দিলে—তুমি ওঁকে আমাদের এখানে নিয়ে এস। আমি ওঁর জন্যে আলাদা ঘর, বিছানা সব ঠিক করে রাখি ইতিমধ্যে। গিয়ে দেখি সে এক কাণ্ড! তুমি গাছতলায় বইখাতার মাথা দিয়ে জ্ঞানে-অজ্ঞানে মাটির ওপর, আর সেই বকুল ঝরোয়াগটা তোমার পাশে উবু হয়ে। আমি তো গিয়েই ওকে ধমাধম দিতে লাগলাম। বললাম—তুমি তো আচ্ছা লোক হে! একটা বাচ্চা মেয়েকে, মাটি থেকে

তোলনি ওকে? তা বেচারা আমাকে কতুপ দূরে বললে—হায় বাবুকো বহুত্ ডরতা হুজুর! হম উনকো ছুঁয়েসে হামকো মারেগা বাবু! দেখিয়ে না উনকো কুত্তা, উ বৈঠা হ্যায়, উ বাবুকে বদন্ (দেহ) চাটতা হ্যায় তো বাবু কুছ্ বোলে গা নহি, বাকি হম হাথ লাগোগেসে কি উ সমঝা যায়ে গা, হমকো মারেগা! দেখলাম তোমার সেই ঠ্যাং-ভাঙা কুকুরটাও বসে আছে কাছে। তা তারপর তো দুজনে ধরাধরি করে তোমাকে গাড়ীতে তুললাম। তোমার ঠ্যাং ভাঙা কুকুরটাও গাড়ীর কাছ পর্যন্ত এল সঙ্গে সঙ্গে। গাড়ীর কাছে দাঁড়িয়ে তোমার দিকে চেয়ে সেকি নাকল সজলচক্ষু। দারোয়ানকে বললাম—এবার কুকুরটাকে দালানে দিয়ে দরজা ভালো বন্ধ করে দাও। সেই তোমাকে এনে ফেলেছি। তারপর চল্লিশ কেন, প্রায় আঠাশ ত্রিশ ঘণ্টা পার হয়ে গেল। এই এতক্ষণে চেতন হল তোমার!

শেষ কথাটা শুনতে শুনতে বিস্ময়ে চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল শঙ্করের। সে আটাশ ঘণ্টা অজ্ঞান হয়ে ছিল জ্বরের ঘোরে? আরে বাপ! কি হয়েছে কি তার? কিন্তু?

হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে গেল। সে সন্ত্রস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—আমার বই আর খাতা? সেগুলো কি ওইখানে ফেলে দিয়ে এসেছেন না কি?

তাকে হাসতে হাসতে থামতে দিয়ে মুকুন্দবাবু বললেন—না হে না, সে ফেলে আসি নি। নিয়েই এসেছি। আমি ডেভিড কি ক্যারাডে না হতে পারি, আমি তো মুকুন্দ, তাতে তো সন্দেহ নেই।

—আমার বইখাতাগুলো দিন না আমাকে? ছোট ছেলের মত আবদারের সুরে বললে শঙ্কর।

অবাক হয়ে মুকুন্দবাবু বললেন—এই জ্বরে তুমি বইখাতা নিয়ে কি করবে কি?

—এমনই। কিছুই করব আমার কাছে থাকবে।

—কাছে থাকবে? তাতে তোমার মনের শান্তি হবে? তা বেশ! তা সে সব তো বাপু, আমি রাখিনি। রেখেছে অলি। তাকে বলব'খন ওগুলো তোমার বালিশের পাশে রাখবার জন্যে। সে এখন আমাদের রান্তিরের খাবার তৈরী করছে।

চুপ করে গেল শঙ্কর। কিন্তু বেশ উদখুস করতে লাগল বিছানায়।

—কি হল তোমার? কি কষ্ট হচ্ছে?

—সমস্ত শরীরে ব্যথা। সারা গা জ্বলছে, মুখের ভিতর থেকে গলা পর্যন্ত সব শুকনো।

—জল খাবে? জল দোব?

—না। কিন্তু আমার বইখাতাগুলো যদি হারিয়ে যায়। ওতে রিটারের প্ল্যান করা আছে।

মুকুন্দবাবু একটু বিরক্ত হলেন। বললেন—কি মুস্কিল, তুমি যে অবুঝ বাচ্চার মত করছ হে! বলছি কিছু হারায়নি, সব ঠিক আছে, সব যত্ন করে রেখেছে অলি! সে আনুক, এসে দেবে।

শঙ্কর নাছোড়বান্দা। সে তিক্ত বিব্রত মুখে বললে—কিন্তু যদি হারিয়ে যায় আমি আর তৈরী করতে পারব না। অনেক কষ্টে তৈরী করেছি আমি প্ল্যানটা!

মুকুন্দবাবুকে উঠতে হল বিরক্তি হয়ে। যেন একটি অবোধ শিশুর আবদারে বিরক্তি হয়ে সেটা পরিপূরণের জন্য উঠলেন তিনি বিরক্ত হয়ে। দরজার কাছে গিয়ে, পরদা সরিয়ে ডাকলেন—অলি, ওরা অলি, শুনছিস?

সাড়া এল দূর থেকে—কি বলছ বাবা?

—একবার আসবি মা?

—যাই বাবা!

অলি এসে দরজার কাছে দাঁড়াল—কি বলছ?

অসহায়ভাবে মুকুন্দবাবু বললেন—শঙ্কর ওর সেই বই খাতাগুলো চাইছে!

বিরক্তমুখে অলি বললে—কোন্ বই খাতা?

কথাটা বিছানা থেকেও শুনতে পেলে শঙ্কর। গভীর উৎকণ্ঠায় চীৎকার করে বললে—দেখলেন তো, দেখলেন, আমি আপনাকে বলেছিলাম। এখন উনি জিজ্ঞাসা করছেন কোন্ বইখাতা। সে সব তা হলে আমার জাহান্নামে গিয়েছে।

মুকুন্দবাবুর ধারাবাহক অবস্থা। তিনি দু'পক্ষের দ্বারাই মধ্যস্থলে তাড়িত। কিন্তু তিনি কিছু বলবার আগেই

অলকা এসেই ঘরে ঢুকল। তার বিছানার পাশে ভ্রূকুঞ্চিত করে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল—কি চাই কি আপনার ?

শঙ্করও রেগে উঠেছে। চটে উঠে বললে—কি আর আমার চাওয়া থোওয়া আছে যা চাইব ! চাইছি আমার বই আর খাতা ! সেগুলো আমার ফিরে আসার সময় আমার কাছে ছিল।

অলকা রাগ করে বললে—সে গুলো আছে, আমার কাছেই আছে ! সেগুলো নিয়ে তো আর এখুনি আপনি আঁক কষতে বসছেন না ! আপনার জ্বর ছাড়ুক, তখন দেব।

শঙ্কর আপত্তি করে কি বলতে যাচ্ছিল আবার। কিন্তু তাকে সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিয়ে অলকা বললে—এই রাত্রে কথায় কথায় সময় নষ্ট করবার জন্যে আপনি আর বাবা আমাকে ডাকলেন। অথচ জানেন রান্নার লোক পালিয়ে গিয়েছে। আমাকে রান্না করতে হচ্ছে। বাবা ঠিক সাড়ে ন'টায় খান। আর আপনার অসুখ করে আছে, আপনাকেও যা খেতে দেবার তা তো দুপুর রাত্তিরে দিলে চলবে না ! আমি খাবার করতে করতে উঠে এসেছি ! আপনাদের ছেলেমানুষিতে যোগ দেবার আমার সময়ও নেই মনও নেই।

নিজের রূঢ় বাক্যের কি প্রতিক্রিয়া হল তাও দেখবার সময় হল না অলকার। সে হন হন করে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

মুকুন্দবাবু চুপ করে দাড়িতে হাত বুলোতে লাগলেন। শঙ্করও চুপ করে চোখ বন্ধ করলে।

চোখ বন্ধ করতেই আবার এক আচ্ছন্নতায় তার সমস্ত চেতনা ধীরে ধীরে ছেয়ে ফেললে।

আবার এক সময় বার বার নিজের নামে ডাক শুনে চোখ খুললে শঙ্কর। বড় ক্লেশে কাতরাতে কাতরাতে পানা পুকুরের পানা সরিয়ে ডুব দিবার মত নিজের আচ্ছন্নতার জড়তার মধ্য থেকে জেগে উঠল কোনক্রমে চাইল চোখ মেলে।

দেখলে চোখের আচ্ছন্ন দৃষ্টিটির সামনে একটি মেয়ের মুখ ঝুঁকে তাকে দেখছে, তারই দিকে তাকিয়ে আছে।

কে তাকিয়ে আছে ? চিনতে পারছে না শঙ্কর। কে ?

মুখটা বিকৃত করে বললে—কি ?

—থার্মোমিটার দেব। দাঁ করুন।

শঙ্কর হাঁ করেই রইল।

মেয়েটি বুঝলে মুখের মধ্যে টেম্পারেচার নেওয়া যাবে না। একটু সঙ্কোচ কাটিয়ে সে তার সার্টের বোতাম খুলে বগলে থার্মোমিটার দিলে !

জ্বর একশো চারের উপরে।

মুকুন্দবাবু শুনে ভয় পেয়ে গেলেন। কিন্তু অলকার ভয় নেই। বেশ সহজে শঙ্করের মুখের উপর ঝুঁকে আবার বললে—এইবার একটু খান। হরলিক্স্।

তারপর তাকে আস্তে আস্তে সমস্ত পথ্যটুকু খাইয়ে, জল দিয়ে মুখ ধুয়ে মুছিয়ে দিলে।

সাহায্য করবার জন্যে বুড়ো চাকর দাঁড়িয়েছিল তার পাশে। সে বললে মৃদুস্বরে—দিদিমণি, বাবুর মুখের চেহারাটা কেমন দেখেছ ?

একটা বৈলক্ষণ্য তারও নজরে পড়েছিল, কিন্তু সেটা দেখে মন চঞ্চল হয়নি। এবার সে প্রশ্ন করলে—কি হয়েছে মুখে ?

—মুখ খানা কেমন জায়গায় জায়গায় ফুলো ফুলো লাগছে। আর কেমন থম থম করছে !

মুকুন্দবাবু সরে এসে দাঁড়িয়েছেন তাদের কাছে। দেখতে দেখতে বললেন—তাই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু কেন বল দেখি ?

—কি জানি ! বলে অলকা চুপ করে গেল।

ভয় পেয়ে গিয়েছে।

চাকরটি বহু দিনের পুরনো লোক। সে মৃদু স্বরে বললে—ওঁর স্বর শুনেই বাবু ওকে সোজা বাড়ীতে নিয়ে এলেন। একবার বিচার করলেন না। আমার তো দেখে মনে হচ্ছে বসন্ত হবে ওঁর। একেবারে জাত বসন্ত। সে দিক দিয়ে—

—কি সেদিক দিয়ে। মুকুন্দবাবু বিবর্ণমুখে প্রশ্ন করলেন।

হাসপাতাল পাঠালেই বোধ হয় সব চেয়ে ভাল হত।

মুকুন্দবাবু একবার এর থেকে ওর মুখের দিকে চাইতে লাগলেন। তারপর শেষে মেয়ের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

অলকা মৃদু কঠিন স্বরে বললে—তা কি করে হয় বাবা? আবিশ্যি তুমি চাইলে—

মুকুন্দবাবু সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন—না, না, সে কি কথা! আমি তা চাইব কেন? ওকে ভালবাসি, তার ওপর কেউ নেই ওর সংসারে। ওকে আদর করে বাড়ীতে এনে কি আবার হাসপাতালে পাঠাতে পারি? কিন্তু—

দীর্ঘায়িত 'কিন্তুর' মধ্যে আর একটা সংশয় প্রকাশ করলেন মুকুন্দবাবু।

অলকা তাঁর মুখের দিকে তাকাল।

মুকুন্দবাবু বললেন—কিন্তু ওর দেখাশোনা কে করবে মা? যদি বলতই হয় তা হলে ওর শুশ্রূষা করার লোক চাই তো!

অলকা হাসল, বললে—লোক আর কোথায় পাবে তুমি? আমিই সেবা করব!

মুকুন্দবাবু চুপ করে রইলেন। তাঁর মনে হচ্ছে তিনি যে পরিমাণ স্নেহ প্রকাশ করছেন তার চেয়েও বেশী স্নেহ যেন অনভ্যস্তভাবে প্রকাশিত হচ্ছে অলকার ব্যবহারে। যেটা তাঁর কাছে মনে হচ্ছে যেন অশোভন তার এই অকুণ্ঠ স্নেহ প্রকাশের পথ বেয়ে যেন আরও একটা প্রচ্ছন্ন অর্থ প্রকটিত হচ্ছে।

তবু তিনি চুপ করে গেলেন।

অলকা নিঃশ্বাস ফেলে বললে—ওসব ভেবে আর করবে কি? বাড়ীতে না এনে তখন যদি সোজা হাসপাতালে দিয়ে আসতে তা হলে কথা ছিল। এখন তো আর হাসপাতালে পাঠাতে পারছ না! যা হবার তাই হবে। চল, তুমি খাবে চল।

চাকরটাকে মুকুন্দবাবু বললেন—তুই একটুক্ষণ থাক বাবা। দিদিমণি এলে তবে যাবি।

একটু পরে আবার আচ্ছন্ন চোখ খুলে শঙ্কর বললে—জল।

সামান্য একটু জল খেয়ে সে আবার পাশ ফিরে শুলো।

সমস্ত দেহের মধ্যে স্নায়ুতন্ত্রী সব ক্লিষ্ট ও কাতর হয়ে পড়েছে প্রদাহে। সেই নিদারুণ যন্ত্রণা। সুস্থ সবল জীবনের বিগত স্মৃতিগুলো এই জ্বরোত্তাপের যন্ত্রণায় ভাঙাচোরা ও কাতর ক্লিষ্ট চেহারা নিয়ে দেখা দিচ্ছে। কেবল মনে আসছে একটা ছবি। সুনির্মলা আর শতদল বা পরমেশ, কি যেন ওর নাম, ওরা দুজনে তাকে তুলে নিয়েছিল একখানা নৌকায়। সেই নৌকো থেকে যেন ওকে ঠেলে জলে ফেলে দিলে। শীতে কাঁপতে কাঁপতে, ভিজে গিয়ে আবার সাঁতার কেটে যদি বা নৌকায় গিয়ে উঠল কোনক্রমে তখন আবার ঠেলে দিলে ওকে জলের মধ্যে। এবার সুনির্মলা পা দিয়ে ওর মুখে যেন ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দিলে। জলে ডুবে যেতেও ও দেখলে সুনির্মলা ওর দুটোয় সুগোল পা'টা উদ্যত করে রেখেছে আঘাত করবার জন্যে।

কি বিশ্রী, কি বিশ্রী, কি কুৎসিত! আঃ, আঃ! জলটাও কি ঠাণ্ডা! সে সজোরে জল ঠেলে উঠল। ডুবে যাচ্ছিল, মরে যাচ্ছিল সে ঠাণ্ডায়!

চাকরটা তাকে ঠেলে ধরলে। ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করলে—কি হল বাবু?

—আঃ কি শীত, কি ঠাণ্ডা! বলে কাঁপতে কাঁপতে সে আবার চোখ বন্ধ করলে।

চাকর আর একখানা লেপ নিয়ে এসে চাপিয়ে দিলে তার উপর। তারপর আবার ঠেলে ধরলে।

কিছুক্ষণ পর অলকা ঘরে এসে বললে—যাও তুমি, তোমার খাবার চাপা দেওয়া আছে। খাওয়া হয়ে গেলে এক কুঁজো জল দিয়ে যেও।

তারপর শঙ্করের বিছানার পাশে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে গিয়ে বসল সে চুপ করে।

এ ঘরখানায় আগে তার ভাই থাকত। সে মারা গিয়েছে আজ বছর কয়েক আগে। তার বাবা যে শঙ্করকে এত ভালবাসে তার কারণও তাই। সেই মরা ছেলের স্নেহটা ওকে দিচ্ছে ঢেলে। এ কথাটা বাবাও

কোনদিন বলেনি তাকে, তবু সে বুঝতে পারে। সেও এ নিয়ে কোন দিন বাবার সঙ্গে কথা বলেনি। কিন্তু বাবার অসুখ বিসুখকে বড্ড ভয়। সেই ভয়ের জন্যই শঙ্করকে হাসপাতালে দেবার কথাটা সে তার মনে এক বার উঁকি মেরেছিল এটাও ঠিক। দাদা আর বা অল্প কিছুদিনের মধ্যে বাবা গিয়ে বাবার স্বভাবটায় কেমন রোগ সম্পর্কে একটা ভয় ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়েছে। আবার বাবার চরিত্রের ভয়ই তার চরিত্রে সাহস করে ঢেকেছে নিজের। সে বুঝেছে ভয় করলে তার চলবে না। সে যদি ভয় করে এই মানুষটিকে তাহলে আর রক্ষা করা যাবে না। সে বেশ মনে মনে বোঝে তার সাহসে নির্ভর করেই বাবার যত আস্ফালন।

আজ কিন্তু তারও ভয় লাগছে।

যদি সত্যি সত্যি ওর বসন্ত বের হয়। তা হলে?

সে নিজের মনটাকে শক্ত করবার চেষ্টা করতে লাগল। হয়তো হবে, কি আর করার আছে! যা হয় হবে। কিই বা হবে!

চেয়ারটায় বসে থাকতে থাকতে ঢুলুনি আসতে লাগল।

সে মেঝেতে একটা বিছানা করে ফেললে। শুধু সতরঞ্চি আর বালিশ।

তারপর পরম আরামে শুয়ে পড়ল।

শঙ্করের কাতরানিতে তার ঘুম ভেঙে গেল ভোর বেলা।

শঙ্কর কাতরে কাতরে জল চাইছে।

সে ধড়মড় করে উঠে জলের গ্লাস তুলে ধরলে তার ঠোঁটের কাছে।

শঙ্করটা যেন অবোধ শিশু একটি। তার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ক্লিষ্ট দৃষ্টিতে যথাসম্ভব বিরক্তি মিশিয়ে বললে—কখন থেকে ডাকছি, জল চাইছি শুনতে পাচ্ছ না?

তার এই অনুযোগে একটু বিব্রত হয়ে অলকা বললে—ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। নিন জল নিন।

তার মুখে জল ঢেলে দিতে দিতে অকস্মাৎ নজরে পড়ল অলকার, শঙ্করের চিবুকের উপর এবং কপালে সটি ফোস্কার মত কি উঠেছে; জলভর্তি হয়ে টলটল করছে।

তার বুকটা ধড়াস করে উঠল। বসন্ত হল তাহলে।

শঙ্করকে জল খাইয়ে, তাকে শান্ত করে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মুকুন্দবাবুর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বার কয়েক ডাকলে—বাবা! বাবাগো! বাবা!

চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে এলেন মুকুন্দবাবু—কি হল বা?

—শঙ্করবাবুর গায়ে বসন্ত বেরিয়েছে বাবা।

মুকুন্দবাবু শুকনো মুখে চুপ করে রইলেন। অলকা লক্ষ্য করলে তার পা দুখানা যেন কাঁপছে ভয়ে।

সেটা লক্ষ্য না করার ভান করে সে বললে—তুমি কিছু ভেবো না বাবা! আমার ওপর ভরসা রাখ আমি ওকে ঠিক সারিয়ে তুলব। তুমি বরং শুয়ে পড়। এখনও সকাল হতে দেরী আছে। তুমি বরং একটা রান্নার লোক জোগাড় করার ব্যবস্থা কর। তা হলেই ঠিক হবে।

সে মনে জোর করে আবার এসে ঢুকল শঙ্করের ঘরে।

শঙ্কর তখন জেগেছে আবার। তাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই প্রশ্ন করলে—কোথায় গিয়েছিলে তুমি?

—বাবার কাছে।

একান্ত শিশুর মত আবদারের ভঙ্গিতে বললে—আমার জ্বরটা এবার কমে আসছে। একবার থার্মোমিটার দেবে?

—দোব।

থার্মোমিটারে জ্বর দেখছে অলকা, শঙ্কর তাকে প্রশ্ন করলে—আচ্ছা আমার কি হয়েছে বলতো?

—জ্বর হয়েছে। আবার কি! সকাল বেলা ডাক্তারবাবু এসে দেখুন তখন বোঝা যাবে।

—দেখ জ্বরটা কমে এলে কি হয় আমার সারা গায়ে ব্যথাটা কিন্তু একদম কমেনি।

তাকে সান্ত্বনা দিয়ে অলকা বললে—জ্বরটা ছাড়লেই ব্যথা চলে যাবে। ওর জন্যে কিছু ভাবতে হবে না।

এই সামান্য সান্ত্বনায় এই আত্মীয়স্বজনহীন, রোগার্ত তরুণীটির বুকের ভিতরের ঘনতার পাত্রটি যেন উথলে

উঠল। সে ছল ছল চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একখানা হাত দিয়ে অলকার একখানি হাত চেপে ধরে বললে—এই দেখ, ঘাড়ের কাছটায় হাত দাও ; দেখ কি ব্যথা করছে। ফুলেছে বোধহয়, আবার জ্বালাও করছে।

এই রকমভাবে আকস্মিক একখানা হাত ওর হাতে আটকে যাওয়ায় খানিকটা বিব্রত হয়ে পড়ল অলকা। কিন্তু তার বিন্দুমাত্র প্রকাশ না করে সস্নেহে সে তার ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। হাত বুলিয়ে দিতে দিতে অনুভব করতে চেষ্টা করলে ঘাড়েও বসন্তের গুটি বেরিয়েছে কিনা। এই সামান্য সেবাটুকু করতে গিয়ে তার চোখেও জল এসে পড়েছে। আহা বেচারী, জীবনে স্নেহ পায় নাই, মমতা পায় নাই, আজ সামান্য একটু সেবা ও মমতার জন্যে ওর সমস্ত চিত্তটি লালায়িত হয়ে উঠেছে।

সে বসে আস্তে আস্তে ওর ঘাড়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। আর ছোট শিশু যেমন করে ভীত হলে আশ্রয় ও স্নেহের আকাঙ্ক্ষায় যেমন মায়ের হাত সজোরে চেপে ধরে রাখে তেমনিভাবেই শঙ্কর অলকার একখানা হাত চেপে ধরে রইল।

তার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে অলকার বিব্রত লজ্জা গেল, সঙ্কোচ গেল। সে পরম স্নেহে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

এমনি করে কাটল একটা মাস।

পরের দিন সকালেই ডাক্তার এলেন। তিনি আর নতুন কি বলবেন? বসন্ত তো হয়েইছে। তারপর দু তিন চার দিন ধরে গুটি বের হয়ে তার সমস্ত দেহকে আচ্ছন্ন করে দিলে। জ্বর কমল, পরে ছেড়েও গেল বটে কিন্তু তার আরম্ভায় এল জ্বালা। বিষম জ্বালা। নিরপায়ের বাতাস আর তাই দিয়ে গায়ে বুলানো। কে করবে? করবার মধ্যে তো একটি মানুষ, অলকা।

অলকার লজ্জা থাকল না শঙ্করের কাছে।

মা যেমন করে দুষ্ট ছেলের সেবা করে তেমনি করে সেবা করতে হয় শঙ্করকে। ঘায়ের মুখে চন্দনের প্রলেপ দিতে হয়। উঠিয়ে বাথরুমে নিয়ে যেতে হয়। খাওয়াতে হয়। বাকী কিছু থাকল না।

এমনি করে একটা মাস কাটল।

এই এক মাস দুরন্ত শিশুর মত অলকার উপর দৌরাত্ম্য ও অবহেলনা করেছে শঙ্কর। সময় নেই অসময় নেই তখন সে চীৎকার করে বাড়ী মাথায় করেছে। যন্ত্রণার ও আক্ষেপের চীৎকার—বাবা গো, মা গো, মরে গেলাম গো! ও মা!

সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাজ ফেলে ছুটে আসতে হয়েছে অলকাকে।

—কি, কি হয়েছে কি? অলকা সক্রোধে বলেছে কখনও।

তার রাগ ও বিরক্তি দেখে শঙ্করও অধিকতর বিরক্ত হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে গিয়েছে।

—কি হয়েছে বলবেন তো? অলকা বিরক্ত হয়ে আবার প্রশ্ন করেছে।

—কিছুই হয়নি।

—তবে চেঁচাচ্ছিলেন কেন? মা বাবা ডাক তুলে?

—আমি কি তোমাকে ডাকছিলাম? তুমি আমার মা না বাবা? আমি তো আমার বাবাকে আর মাকে ডাকছিলাম।

—তাঁরা থাকলে তো আসতেন! তাঁরা আর আসবেন কোথা থেকে? তাদের তো খেয়ে বসে আছেন! এখন কি দরকার বলুন। আমি কাজ করতে করতে ছুটে এসেছি চীৎকার শুনে।

কোমল শান্তভাবে বলার কাজ হল। শঙ্কর আদুরে ছেলের মত বললে—ডান পাটা বড় জ্বালা করছে। দেখবে একবার।

দেখতে হল অলকাকে। একটা ঘায়ের ফোস্কা শুকিয়ে মাংসি উঠেছে। কাপড়ের খোঁচ লেগে সেটা ব্যথা ও যন্ত্রণা দিচ্ছে। সেটি কাঁচি দিয়ে কেটে সেখানে চন্দন লাগিয়ে তবে ছুটি হল অলকার।

মধ্যে মধ্যে ডাক শুনেই হোক বা এমনিতে অলকা ওর কাছে এসে দাঁড়ায়। মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করে—কেমন আছেন?

বিরসমুখে শঙ্কর বলে—জ্বাল
বেড়ে যাচ্ছে।

অলকা মৃদু হেসে তার মাথায় চুলে হাত বুলিয়ে দেয়, বলে—বড় কষ্টের অসুখ। কষ্ট তো হবেই।

শঙ্করের বিরস মুখ অনুকম্পায় আরো বিরস হয়ে উঠে। বলে—তুমি তো বলে দিলে কষ্টের অসুখ, কষ্ট তো হবেই। তোমার নিজের হলে বুঝতে পারতে!

এবার অলকা হাসিতে ভেঙে পড়ে। বলে—যা বলেছেন। আপনার না হয়ে আমার হলে যে বেঁচে যেতাম এটা আপনাকে বুঝাই কি করে। আমার হলে আমাকে তো আপনার জন্যে এত ছুটোছুটি করতে হত না। জ্বালা-যন্ত্রণা যাই হোক, চুপ করে শুয়ে থাকতে পেতাম।

তার হাসিতে বিরক্ত হয়ে শঙ্কর বলে—হ্যাঁ, হলে বুঝতে! তখন এই হাসি হাসতে তুমি! এই যে বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি যে কত ভাবছি।

অলকা হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়িয়ে বলে—আমার যদি হয় তখন দেখবেন। এখন তো চুপ করে শুয়ে থাকুন। আপনার খাবার নিয়ে আসি।

উঠে যেতে গিয়ে বাধা পায় অলকা। তার একখানা হাত চেপে ধরেছে শঙ্কর। বলে—না, আমার খিদে পায়নি এখন। পরে খাব। তুমি বস আমার কাছে।

দুই চোখ দিয়ে তাকে লেহে শাসন করে অলকা বলে—হাত ছাড়ুন, ছেড়ে দিন। ছিঃ, অমনি করে কি আমার হাত ধরতে আছে। বাবা কি চাকর-বাকর দেখলে কি ভাববে?

সঙ্গে সঙ্গে হাত ছেড়ে দেয় শঙ্কর। তার মুখের দিকে বিচিত্র এক অপরাধের ও অভিমানের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। কোন কথা বলে না।

অলকা তবু যায় না। সেখান থেকে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে—আপনি বয়সে বাড়লে কি হবে, এখনও আপনার মনটা ছেলেমানুষ আছে! দাঁড়ান, আপনার খাবার নিয়ে আসি।

বলে চলে যায় ঘর থেকে।

এই নিয়েই তার বাবার সঙ্গে একদিন সামান্য কথা—কথান্তর হয়ে গেল।

একদিন রাত্রিতে খেতে বসে মধুসূদনবাবু গম্ভীরভাবে বললেন—অলি, তোমাকে একটা কথা বলব আজ।

—বল বাবা! একান্ত সহজভাবে বললে অলকা।

—আমি বুঝেছি তোমাকে বাধ্য হয়েই শঙ্করের সেবা করতে হচ্ছে। কিন্তু মা, ও অল্পবয়সী ছোকরা। ওর সঙ্গে বেশী মাখামাখি নাই বা করলে!

অলকা বাপের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে তারপর আস্তে আস্তে বললে—কি বেশী মাখামাখি দেখলে বাবা?

মধুসূদনবাবু স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর চোখ নামিয়ে নিলেন। এর কি উত্তর দেবেন তিনি? পুরানো চাকর এই মাখামাখি সম্পর্কে একটু ইঙ্গিত দিয়েছে তাঁকে। কিন্তু সে কথা তিনি মেয়েকে খুলে বলবেন কি ক'রে? সে বড় লজ্জার কথা।

মেয়ে কিন্তু সোজা দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বললে—বাবা, গরীব দুঃখীকে তো তুমিও এর আগে দয়া-মায়া করেছ! এও তো তেমনি এক অনাথ, আত্মীয়-হীন দুঃখী। ওকে তুমিই নিয়ে এলে অসুখ দেখে। তুমি যদি নিজে সেবা করতে তা হলে তো এ সব কথা আজ তোমাকে বলতে হত না। আর গরীব দুঃখীকে সেবা করার মানে কি তার সঙ্গে মাখামাখি করা বাবা? বেশ, তুমি যদি বল আমি আর ওর কাছ দিয়ে যাব না। হয় তুমি কাজকর্ম ছেড়ে ওর সেবা কর, নয় তোমার চাকর সেবা করুক। তা হলে আর আমার ওর কাছ দিয়ে যাবার দরকার হবে না।

কঠিন কথাগুলি যথাস্থানেই বিঁধল মধুসূদনবাবুর। পত্নীহীন প্রৌঢ় ভদ্রলোকের বুকের ভিতরটা তাঁর দুঃ দুঃ করে উঠল। তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন—না, না, মা, তা বলিনি। তবে অল্পবয়সী ছেলে তো! সেই জন্যে তোকে সাবধান করছি মা! আজ যদি তোর মা থাকত এসব কথা আমাকে বলতে হত না—বলতে বলতে তাঁর গলা ধরে এল।

সাহিত্যে অতিপ্রাকৃত

শীতল ঘোষ

অতিপ্রাকৃত বর্ণনা ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন সাহিত্যে অতিপ্রাকৃতের বর্ণনা অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে। Anglo-Saxon যুগে যে সমস্ত সাহিত্য সৃষ্ট হয়েছে তার অনেকখানি স্থান অধিকার করেছে অতিপ্রাকৃত। Bewulf কাব্যে যে অতিপ্রাকৃতের বর্ণনা করেছে তাও প্রাচীন সাহিত্যে অনন্য। চসারের কাব্যেও এই অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা দেখা যায়। কিন্তু এই সমস্ত কাব্যে অতিপ্রাকৃতের বর্ণনা শিল্প চমৎকারিত্বের সার্থকতা বহন করেনি। ষোড়শ শতাব্দীতে সেক্সপীয়রের নাটকগুলিতে অতিপ্রাকৃত বর্ণনায় ত্রুটীহীন কলা কৌশল লক্ষ্য করা যায়। অতিপ্রাকৃত ঘটনার উপস্থাপনা ও বর্ণনার নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে তাঁর নাটকে। "Mid-Summer Night's Dream," "The Tempest," "Mac beth" "Hamlet" প্রভৃতি নাটকে অতিপ্রাকৃতের বর্ণনা, "a type of dramatic creation"—নাটকীয় সৃষ্টি। সেক্সপীয়র দক্ষ শিল্পীর মত অতিপ্রাকৃত ঘটনাগুলিকে প্রাকৃতের উপাদান দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। কোলরীজের ভাষায় "It tends to produce the sense of reality" অতিপ্রাকৃত বর্ণনার ক্ষেত্রে শুধু ভাব ও কল্পনার সমন্বিতি নয়, কবিচিত্তের সহজ উদ্ভাস ও বাস্তব পরিবেশ রচনার গৌরব সমন্বিত লক্ষ্য করা যায়। "It was bitter cold and they were sick at heart"—"and not a mouse stirring." নিস্তব্ধ নিশুত রজনীর ভয়াল চিত্রগুলি পাঠকের মনে জাগিয়ে তোলে শিহরণ। দুর্গের অভ্যন্তরের মধ্যরাত্রির সুগভীর নিস্তব্ধ রহস্যময়তাকে করে তোলে জীবন্ত। মধ্যযুগের বাস্তব প্রতিবেশ রচনায় সেক্সপীয়র সার্থক শিল্পী।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ অধ্যায় এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইংরাজী সাহিত্যের জন্ম ভূমিতে রোমান্টিকতার প্লাবন,—রোমান্টিক ইতিহাসের স্বর্ণ যুগ। সেই যুগের সাহিত্যের দিগচক্রবালে দিগ্‌বধূর আহ্বানী অঙ্গুলীর সংকেত। ষোড়শ শতাব্দীতে নবজাগরণের ফলে কবির চিত্তসীমা প্রসার লাভ করেছিল। এই যুগে প্রকৃতির সঙ্গে কবি বা শিল্পীর অন্তরের মিলনতীর্থে সন্তপদী গমন সম্পন্ন হয়নি। অর্থাৎ প্রকৃতির জন্য কবির অন্তরের হাহাকার শোনা যায়নি। "প্রতি অংগ লাগি মোর প্রতি অংগ কাঁদে।" তাই প্রকৃতির অন্তর্নিহিত রহস্যের ও রূপের মেশায় কবি বা শিল্পী দিশেহারা হননি। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে কবির নিকট মানবজীবন হতে না সত্য হোলো, সত্য হোলো প্রকৃতি। প্রকৃতির স্বর্গলোকের রহস্যের সন্ধানে, রহস্যাবৃত আত্মার আবিষ্কারে অন্তরের সঙ্গে অন্তরের মিলনের ব্যগ্র ব্যাকুলতায় যাত্রা সুরু হোলো রোমান্টিক কবিদলের। আর এই যাত্রাপথের যাঁরা প্রথম যাত্রী তাঁরা হলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরীজ। একথা অনস্বীকার্য যে কোলরীজ সেক্সপীয়রের ভাবশিষ্য। প্রকৃতির অতিসূক্ষ্ম অলৌকিক রহস্যময় জগতের সন্ধান পেয়েছেন তিনি সেক্সপীয়রের কাব্যের

অন্তর্লোক থেকে। কোলরীজ আত্মভাবমুক্ত প্রকৃতির কবি নন, আত্মের রঙ কল্পনার বস্তুর স্বরূপকে তিনি ম্লান করে দেননি। তাঁর মেজাজ ছিল নাট্যকারের অর্থাৎ তিনি ছিলেন 'dramatic poet' এবং কাব্যের লক্ষ্য সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস "The willing suspension of disbelief is all—important."

শেক্সপীয়ারের কাব্যের সোনার কাঠির স্পর্শ কোলরীজের কল্পনার রাজহংস পক্ষকে উন্মুক্ত করেছিল, এবং কোলরীজের কাব্য সত্যের পথ নির্দেশ করেছিল। শেক্সপীয়ারের কাব্যের এই বিশেষ অংশটিকে সত্যমূল্য দিয়েই কোলরীজের কাব্য সাধনা সুরু হয়েছিল।

তাই ক্রীষ্টাবেল কাব্যের প্রথমেই কবি যে রহস্যলোকের বর্ণনা করেছেন ও মধ্য যুগের রূপ প্রাকারের প্রতিবেশ রচনা করেছেন তা শেক্সপীয়ারের পূর্বে বর্ণিত ঘটনার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। "Ancient Mariner" এ সমুদ্রবক্ষে নাবীকের ও অপরীরীদের সঞ্চারণা কথোপকথন, ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতির সঙ্গে "Mid-Summer Night's Dream" ও "Tempest" এর বিশেষ বিশেষ ঘটনার সাদৃশ্য দেখা যায়। এমন কি পরিবেশকে সত্যবিভ্রম করে তোলার কলাকৌশলও শেক্সপীয়ারের অনুরূপ। শেক্সপীয়ার তাঁর কাব্যে সৃষ্টি করেছেন, "feeling of reality in unreality" কোলরীজ তাঁর কাব্যে এই কাব্যসত্যকেই রূপায়িত করেছেন। তাই কোলরীজ তাঁর কল্পনা কাব্য সত্য ও আঙ্গিক রচনায় শেক্সপীয়ারের মন্ত্র শিষ্য।

১৭৯৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে Lyrical Ballad এর আত্মপ্রকাশ যদিও বিপুল সমাদর লাভ করেনি, তবুও পরবর্তীকালে এই কাব্যগ্রন্থটি একটি সমগ্র যুগের উচ্চবিনার রূপে স্বীকৃত হয়েছে। কাব্যগ্রন্থটির রূপায়ণে ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরীজ এই দুই কবির শিল্পকর্ম প্রকাশ পেয়েছে। স্বভাবতই সেই রোমান্টিক যুগেরই পটভূমে ওয়ার্ডসওয়ার্থের যেমন নিজস্ব দান আছে সেই তুলনায় কোলরীজের দানও নিতান্ত কম নয়। ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরীজের মিলিত সৃষ্টিই সে কথা প্রমাণ করে। এবং লিরিক্যাল ব্যালাডের পরিকল্পনার মধ্যেই সে কথা আরও সুস্পষ্ট। কোলরীজ তাঁর Biographia Literariaতে বলেছেন, "During the first year that Mr. Wordsworth and I were neighbours, our conversation turned frequently on the two cardinal points of poetry, the power of exciting the sympathy of the readers by a faithful adherence to the truth of nature and the power of giving the interest of novelty by the modifying colours of imagination. These are the poetry of nature. The thought suggested itself that a series of poem might be composed of two thoughts. In the one the incidents and agents were, to be in part at least, supernatural; and the interest aimed at was to consist in the interesting of the affections by the dramatic truth of such emotions as would naturally accompany such situations, supposing them real···For the second class the subjects were to be chosen from ordinary life the characters and incidents were to be such as will be found in every village and its vicinity where there is a meditative and feeling mind to seek after them when they present themselves, in this idea originated the plan of the Lyrical Ballad.

সুতরাং লিরিক্যাল ব্যালাডে দুই ধরনের কাব্যরূপ থাকবে। একটির বিষয়বস্তু বাস্তব জগতের অতি ঘরোয়া বস্তুকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হবে অপরটির বিষয়বস্তু অতি-প্রাকৃত ঘটনাকে বিস্তৃত করবে। সুভাবতই ওয়ার্ডসওয়ার্থ অতি পরিচিত জীবনের মধ্যে, প্রকৃতির অসীম রহস্যঘেরা জীবনের মধ্যে আত্মা প্রেরণ করলেন। অন্যদিকে কোলরীজ সুদূর অতীতের বীরত্ব কাহিনীকে অবলম্বন করে দুঃসাহসিক অভিযান সুরু করলেন। অতীতের অস্পষ্ট রহস্যঘেরা কুহেলির মধ্যে যে জীবন তাকে পরিচিত বা familiar করে তুলবার জন্যই কোলরীজের সাধনা সুরু হোল, যা

অস্পষ্ট তাকে স্পষ্ট ; যা অতি-প্রাকৃত যা অলৌকিক তাকে লৌকিক : যা অবিশ্বাস্য তাকে বিশ্বাস্য করে তোলবার জন্যেই কোলরীজ কাব্য সরস্বতীর সংসর্গে সাধনায় মত্ত হলেন। একদিকে কোলরীজের রোমান্টিক মানস সুদূরের পানে উৎকণ্ঠিত, অপরিচিত মেরুপ্রদেশের তুষার-লোকে যাত্রা অন্যদিকে মধ্যযুগীয় জীবন যাত্রার মধ্যে যে সংস্কার ছিল, তার যথাযথ রূপদান। উনবিংশ শতাব্দীতে সমস্ত রোমান্টিক কবির নিকট মধ্যযুগ ছিল রোমান্সের উৎস। মধ্যযুগের জীবন রহস্য, ভীতি ও মর্মকথা হোল রোমান্সের জগৎ। মধ্যযুগের কতগুলো সংস্কার ছিল সহজ সরল ও অকৃত্রিম। এই সকল সংস্কার প্রবণতা ও ভাববৈশিষ্ট্য আধুনিক কবিদের প্রেরণার ছিল অফুরন্ত উৎস। মধ্য যুগের জীবনযাত্রা ছিল উচ্চসুরে বাঁধা। রণ-উন্মাদনা দুঃসাহসিক অভিযান, নিভাজরী প্রেম ও ভালবাসা মধ্যযুগের জীবনযাত্রার শিরায় শিরায় উষ্ণ শোনিত প্রবাহমান ছিল। তাই মধ্যযুগীয় জীবনযাত্রার মধ্যে রোমান্সের ছিল প্রচুর উপাদান। তাই রোমান্টিসিজমের নেশা উনিশ শতকের রোমান্টিক কবির দৃষ্টিকে করেছিল মোহমুক্ত।

স্বভাবতই কোলরীজের সাধনা যেমন কঠিন তেমনি দুরূহ। এবং দুরূহ কাজে তিনি সফল হয়েছেন। কোলরীজের অতিপ্রাকৃত বর্ণনায় যে সূক্ষ্ম অথচ (flawless) ত্রুটিহীন দক্ষতা দেখিয়েছেন তা অসাধারণ। কারণ এই ব্যাপারে তাঁর আন্তরিকতা ছিল প্রবল এবং কোলরীজের এই সূক্ষ্ম সাধনায় কোথাও ফাঁক ছিল না। কোন এক সমালোচকের মতে, "Coleridge does not use the spells of medivealism as so many stage properties, he absorbs them into himself and they reappear rarely distilled and inextricably blended with the poits exquisite perceptation of the mysteries that surrounded the commou place things of every day life." মধ্যযুগের বর্ণনায় তিনি কাল্পনিক। অতি প্রাকৃতের বর্ণনায় তিনি একক ও অদ্বিতীয়। তিনি কীটসের মত তৈলচিত্রকর নন, তিনি skater. লাইনের পর লাইন তিনি মধ্যযুগের ছবি আঁকতে বসেন না। কয়েকটা রেখার টানেই তিনি মধ্যযুগীয় পরিবেশটিকে মূর্ত করে তোলেন। তিনি বিদগ্ধ চিত্রশিল্পী। তাঁর চিত্রে কোথাও জোরতা রং ধরে নি বরং এত মসৃন অথচ অত্যন্ত উজ্জ্বল। পরিবেশ রচনায় দক্ষশিল্পীর মত তিনি অনেকখানি আভাসে ইঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন। এই যে প্রচ্ছন্ন আভাস এবং ইঙ্গিত, এটাই কোলরীজের পরিবেশ রচনাকে সার্থকতায় ভরে তুলেছে। তিনি কেবলমাত্র মধ্যযুগীয় জীবনের চিত্র আঁকতে বসেননি, শুধু মাত্র অতিপ্রাকৃত বর্ণনায় সমগ্র কাব্যটিকে ভারাক্রান্ত করে তোলেননি, তিনি মানবজীবনের একটি নিগূঢ় সত্যের বাণীকেও আবিষ্কার করেছেন, কবির বাণী সেখানে সার্থক হয়ে উঠেছে। "It is not only that he elimenates form supernaturalism the crude material horrors then popular with Ramantic Schools :—he also gives it a psychological foundation."

কোলরীজ Ancient Mariner, christabel এবং Kubla Khan প্রতিভার মধ্যাহ্ন আকাশে বসে রচনা করেছেন। তাঁর সাহিত্য কর্মের ও কবিতার সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটেছে এই তিনটি কাব্যের মধ্যেই। শুধু তাই নয় রোমান্টিক জগতের দীপ্তাকাশে এই তিনটি কাব্য স্বতন্ত্র মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। কোলরীজ সোনার ফসল তুলেছেন মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে। কিন্তু রোমান্টিক যুগ যুগের গঠনে ওয়ার্ডসওয়ার্থের যেমন দান আছে তেমনি আছে কোলরীজের। কোলরীজ মধ্যযুগীয় জীবনের চিত্রাঙ্কনে একটি শিশুসুলভ দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। সেই দৃষ্টির মধ্যে ছিল যাদু। যাদুকরের যাদুকরী দৃষ্টি কোলরীজের প্রতিভার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কোন সমালোচকের মতে, "The essential Coleridge is the magic image of the magic child." তাই কোলরীজের কল্পনার জগৎ ছিল বিশাল। সেই সীমাহীন কল্পনার উচ্চগ্রামে একটা সীমিত জীবনের ছবিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর প্রাণের প্রবল পিপাসাই তাঁকে বিশ্বের বিশাল আয়োজনের সভায় আমন্ত্রণ করেছিল। শিশুর মত বিশ্বগ্রাসী কল্পনা

আর জিজ্ঞাসা নিয়ে তিনি প্রকৃতিরাজ্যে বিচরণ করেছেন। Charles Lamb এর কথায় বলা যায়, "He had a hunger for eternity."

কোলরীজ ছিলেন আত্মসচেতন কবি। দার্শনিক কবির কাছে জগৎ ও জীবনটা কেবল মাত্র ঘনীভূত রহস্যের কল্পনা বলে মনে হয়নি. নিজের দার্শনিক প্রতীতি দিয়ে যুক্তির মাধ্যমে দেখতে চেয়েছেন। জার্মান দার্শনিক কাণ্টের মতবাদ সম্ভবতঃ কোলরীজকে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু কোলরীজ নিজের মত করেই তাকে প্রকাশ করেছেন। কোলরীজের এই যুক্তি আর বিশ্বাস ছিল অনুভূতে পরিশোধিত। তাই, "Coleridge at his best is both philosopher and poet: he must see infinity in a grain of sand, simultaneously actually." কিন্তু কোলরীজ মিষ্টিক ছিলেন না। কারণ কোলরীজের মন মিষ্টিসিজমের বিরোধী। চিন্তাশীল, দার্শনিক কোলরীজের পক্ষে পুরোপুরি মিষ্টিক হওয়া অসম্ভব ছিল। যদিও কোথাও কোথাও মনে হয়েছে কোলরীজ মিষ্টিক হয়ে উঠেছেন তবুও কোলরীজ মিষ্টিসিজমের কুয়াশা, কাটিয়ে অরূপ আলোকের বন্যা এনে দিয়েছেন. "All knowledge rests on the coincidence of an object with subject." কল্পনা কেবলমাত্র নিছক কল্পনা নয়, তার সঙ্গে willing এর সমাবেশ ঘটেছে আর অনুভবসম্যতার স্পর্শে সে হয়ে উঠেছে যাদুকরী।

তাই কোলরীজ এই বিশ্বসৃষ্টির অন্তর্লোকের মর্মকথা কেবলমাত্র কান পেতে শোনেননি, তিনি দুই আঁখি দিয়ে সেই রহস্যের বিশালতাকে দেখেছেন, অর্থাৎ চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করেছেন তিনি। পৃথিবীর নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে তিনি ঐক্যের সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন। সেই ঐক্যের ভিত্তিতে শ্রবণ এবং দর্শনের মিলন ঘটেছে কোলরীজের কাব্যে। তাই কোলরীজের বাণী, "oh! what a life is the eye! what a strange and inscrutable essence."

কোলরীজের কাব্য তাই চিত্রধর্মী। যেমন কান পেতে শুনেছেন বেদুইনের বন্যবিষোষ ধ্বনি তেমনি দু'চোখ মেলে দেখেছেন বিশাল সমুদ্রের অপরূপ সৌন্দর্য। পরিবেশ রচনায় কোলরীজ নিপুণ শিল্পী। কোলরীজ যখন বর্ণনার পর বর্ণনা করেন, সেই বর্ণনায় কোথাও কোন ফাঁক থাকে না। তিনি একদিকে বর্ণক, অন্যদিকে শ্রোতা। তাই কোলরীজ কেবলমাত্র কাল্পনিক ছিলেন না, ক্ল্যাসিক্যাল মনন নিষ্ঠতাই তাঁর কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

'Ancient Mariner' কাব্য রচনার পরিকল্পনাতে কোলরীজ জীবন সমালোচনার পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। জ্ঞান পিপাসার অদম্য জিজ্ঞাসাই কবি-কল্পনার বাতায়ন পথকে উন্মুক্ত করেছিল। জীবন রূপের চিত্রাঙ্কণে কবিকে মরুপথ বিহঙ্গের মত সুদূরের পিয়াসী করে তুলেছিল। Ancient Mariner কাব্যে অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক ঘটনার পরিবেশ রচনা করেছেন জ্ঞানগোচর পরিদৃশ্যমান জগতের বাইরে। যেখানে প্রকৃতির অসীম রহস্য জমাট বেঁধে আছে সে জগৎ কল্পনার জগৎ। সেই জগতে তিনি পাঠককে নিয়ে গেছেন। প্রকৃতির অদীমতার রাজত্বে অবিশ্বাস্য ঘটনাও বিশ্বাসের অনির্বাণ দীপশিখার মত জ্বলতে থাকে। সেখানে প্রশ্ন নেই আছে নিগূঢ় অন্তরের বিস্ময়বোধ ও রহস্যের জগতজোড়া ব্যাকুলতা। তাই বিরাট তরঙ্গের তুষার কুহেলী ঘেরা প্রদেশ, জীবনের সেই দুর্যোগের শিয়রে Albatross-এর আবির্ভাব, প্রকৃতির 'পবিত্র আত্মা' বিহঙ্গের নির্মম পরিণতি ও পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড, নাবিকদের জীবনে এনেছে দুঃখদাহন, দুঃসহ অভিশাপ। সেই দুঃসহ অভিশাপের ক্রিয়া নিঃসঙ্গ সমুদ্রের বুকে সুরু হয়েছে। সুরু হয়েছে বিশ্বপ্রকৃতির বেদনার নির্মম প্রতিশোধের মধ্য দিয়ে। শেষ হয়েছে পুনরায় প্রকৃতির পবিত্র আলোকের স্পর্শে, অন্তরের বিশুদ্ধতায়, জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ ধনে,

> He prayeth best, who loveth best
> All things both great and small,
> For the dear God who loveth us
> He made and loveth all.

কোলরীজ একদিকে যেমন জীবন সমালোচনা করেছেন অন্যদিকে তেমনি প্রকৃতির অদ্ভুত রাজত্বে জীবনের জীবন্তরূপকে ফুটিয়ে তুলেছেন। সৃষ্টি এবং সৃষ্টির

যাদুদণ্ডের স্পর্শে সমগ্র পরিবেশ এবং ঘটনা অপার্থিব চেতনার সীমার মধ্যে অবগুণ্ঠন গ্রহণ করেছে। এইখানেই কোলরীজ সার্থক। আর সার্থকতার রূপ ফুটে উঠেছে chrislable কবিতাটির মধ্যে। chrislable কবিতাটির মধ্যে তিনি মধ্যযুগীয় জীবনের রূপকে ফুটিয়ে তুলেছেন। সুদূর অতীতের জীবনযাত্রার মধ্যে তিনি পাঠককে নিয়ে গেছেন। মধ্যযুগীয় জীবনচিত্রের বর্ণনায় কোলরীজ দক্ষ শিল্পীর মত রেখার টানে স্পষ্ট করে তুলেছেন।

ক্রীস্টাবেলের রজনী অভিসারের পূর্বেই রাত্রির দ্বিতীয় যামে দুর্গপ্রকারের বাইরে অকস্মাৎ নেকড়ের আর্তনাদ, মৃত্যুর ঘণ্টাধ্বনির মত গীর্জার ঘড়ির বক্ষ-স্পন্দিত ঢং ঢং আওয়াজ, বোরগের ভৌতিক কর্কশ ডাক, ভয়ালদন্ত কুকুরের চাপা গর্জন, নীরব নিস্তব্ধ রাত্রির বুক চিরে সমস্ত পরিবেশটিকে ভয়াতুর করে তোলে। শহর থেকে দূরে সুদূর বিস্তৃত পল্লীর পাষাণঘেরা জনবিরল প্রাসাদের মধ্যরাত্রের পরিবেশটিকে ভীতির রাজত্বে পরিণত করে। আমাদের সহজাত সংস্কার মনের ভীতির বাতাবরণে কোলরীজ মধ্যযুগীয় স্তব্ধ রাত্রির বর্ণনাকে জীবন্ত করে তুলেছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগিয়ে দেন আর ভীতিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেন।

"Is the night chilly dark ?
The night is chilly but not dark."

কোলরীজের এই কৌশল অনবদ্য। ক্যাসলের অনতিদূরে আবছা জ্যোৎস্নালোকে, আলো-আঁধারির ছায়ালোকে বৃদ্ধ ওক গাছটা যেন ভূতের মত দাঁড়িয়ে থাকে। তারই তলে প্রার্থনারতা ক্রীস্টাবেল অকস্মাৎ চাপাকণ্ঠের আর্তনাদ শুনে সচকিত হয়ে ওঠে। কিন্তু কবি প্রশ্ন করেন, "Is it the wind that moaneth bleak." অথবা, "What she sees there ?" তখন পাঠকের মুগ্ধ হৃদয়ে মন বিস্ময়ে বুকের কাঁপন যায় বেড়ে, হয় দ্রুততর। তাই কোলরীজের বর্ণনার মধ্যে যে Subtleness এবং fineness দেখা যায় এমনটি আর কোথাও দেখা যায় না।

এই কাব্যে শুভ্র অশুভের দ্বন্দ্বটি সুন্দরভাবে কবি বর্ণনা করেছেন। আমাদের জীবনের আশেপাশে যে ছদ্মবেশিনী অমঙ্গলরূপিনী ডাকিনীর দল ঘুরে বেড়ায়, Geraldine যেন সেই ডাকিনীর প্রতীক। মানুষের বিশ্বাস এইসব অপদেবতার আবির্ভাব ঘটে রাত্রির দ্বিতীয় যামে। কোলরীজ মানুষের সেই বিশ্বাসের বেদীমূলে ডাকিনী জিরালডাইনকে মধ্যরাত্রের পরিবেশে স্থাপন করেছেন। ক্রীস্টাবেলের জীবনের চারিদিক ঘিরে আসন্ন বিপদের পটভূমিকায় তাকে বর্ণনা করেছেন। জিরালডাইনের দৃষ্টির মধ্যে একটা ভৌতিক ক্রূরতা, বিশ্বাসে একটা বিষাক্ত বাষ্প, ব্যবহারে একটা ভৌতিক পৈচাশিকতা পাঠকের মনকে ভীতিবিহ্বল করে তোলে। কিন্তু নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক শিশুর মতো সরল, ফুলের মতো কোমল, জলের মতো স্বচ্ছ, পূজার ধূপের মতো পবিত্র যাদের মন তাদের চারপাশে ঘিরে থাকে একটা অপ্রত্যক্ষ আশীর্বাদ যার ফলে বাস্তব জগতের মঙ্গলময় শক্তি, শুভ শক্তির জয়ধ্বনি ঘোষণা করা হয়েছে এই কাব্যে ;

"That saints will aid if man will call
For the blue sky bends over all."

Khubla Khan কবির স্বপ্নালোকের রোমান্টিক কল্পনার ও সুষমার সৌন্দর্যময় প্রকাশ। প্রকৃতির বহু হিরণ্ময়রূপের অন্তরালে, প্রকৃতির সুষমময় পরিবেশের মধ্যেও Khuba যেন অতীতের আদিম যুদ্ধের মন্ত্রধ্বনিকেই কান পেতে শুনতে পায়। এক জায়গায়—'A vision in dream a fragment." কবির স্বপ্নচিত্তে কল্পনার বেগবান উচ্ছ্বাসে সংযত রূপ।

প্রকৃতি প্রেম কোলরীজকে অদেখা অজানা প্রদেশে আহ্বান করেছিল। প্রকৃতির বহিরঙ্গ রূপের সৌন্দর্যে কোলরীজ মুগ্ধ। এই মোহমুগ্ধতা কোলরীজকে প্রকৃতির সান্নিধ্যলাভের জন্য ব্যাকুল করে তুলতো। প্রকৃতিকে তিনি জীবনের প্রেরণাদাত্রীরূপে গ্রহণ করেছেন। প্রকৃতির প্রাণের আলোকে কবিচিত্ত আলোকিত তাই কবি বলেছেন,

"O Lady ! we receive but what we give
And in our life alone does nature live."

অবসাদ আর অবসন্নতা যখন চিত্তকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে তখন প্রকৃতি-ই জীবনের রসকল্প লোককে করেছে উদ্বোধিত। দিয়েছে জীবনে অমর প্রেম।

প্রকৃতির রহস্যের উদ্‌ঘাটনে কবি যাত্রা করেছেন অতি-প্রাকৃতের জগতে।

(বাংলা সাহিত্যে অতি প্রাকৃত বর্ণনা অনেকখানি স্থান অধিকার করেছে। প্রাচীন সাহিত্যের ভটপ্রান্ত দেবতার জয়গানে মুখরিত। বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কালের পূর্ব পর্যন্ত দেব মাহাত্ম্য ও দেবতার কাহিনী রূপ নিয়েছে। আর সেইসব দেবতা সমাজে নিজেদের স্থান অধিকার করতে গিয়ে নানা অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত ঘটনার মধ্যে মানুষকে টেনে এনেছে। মঙ্গল কাব্য-গুলোর মধ্যে এই অতিপ্রাকৃতের বর্ণনা একটা বিরাট অংশ জুড়ে আছে। সেই যুগের কবিদল খুব একটা কবিত্বের অধিকারী ছিলেন না। বরং কিছুটা স্থূল। সূক্ষ্ম কবি কল্পনার বশবর্তী হয়ে তাঁরা কাব্য রচনা করেননি। তাই অতিপ্রাকৃত বর্ণনা কোথাও সূক্ষ্ম না হয়ে একেবারে স্থূল হয়ে পড়েছে। মনসামঙ্গল কাব্যে মনসার নানা অলৌকিক কাহিনী আমাদের চিত্তকে অসাড় করে দেয়, বোধশক্তিকে করে আচ্ছন্ন, সচেতন করে না। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে চণ্ডীর সোধিকাদানের কল্পনা, বিরাট মহানন্দী সংঘের শোভা-যাত্রা, ধনপতি সদাগর ও শ্রীমন্তের সাগরবক্ষে "কমলে কামিনী" বর্ণন ও চণ্ডীর সিংহল রাজের সহিত যুদ্ধ আমাদের প্রচলিত জীবনধারার ভগবদ্‌ভক্তিকে উজ্জ্বল মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করলেও, সাহিত্যের বিশ্লেষণ মণ্ডলের ক্ষেত্রে যেন অনেকখানি রসঘন হয়ে ওঠে। মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে অলৌকিকতা কাব্যের আর্টের কোন গুণ নয়। অলৌকিকতা এইসব কাব্যের প্রাণ। তবে অলৌকিকতা অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে এই সমস্ত কাব্যে। কারণ কবিরা মনেপ্রাণে দেবতার অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করতেন, বিশ্বাস করতেন বলেই আন্তরিকতার সঙ্গে তার বর্ণনা করেছেন।

আধুনিক কালেও এই অতিপ্রাকৃত বর্ণনা একেবারে লুপ্ত হয়নি। বরং অতিপ্রাকৃত বর্ণনাও সাহিত্যের বা Art-এর একটা গুণ বলে স্বীকৃত হয়েছে। আধুনিক সাহিত্যে পাশ্চাত্যের সোনার কাঠি স্পর্শে নবজাগরণ ঘটেছে। আধুনিক সাহিত্য তার পোষাক-পরিচ্ছদ, ধ্যান ধারণা সবকিছুতে পালটে ফেলেছে। আধুনিক কালের কথাসাহিত্যে আর নাটকে অতিপ্রাকৃত বর্ণনা অনেকখানি স্থান অধিকার করেছে। বিশেষ করে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালীর ভাবজীবন যেখানে হিন্দুধর্মের প্রবল স্রোতে প্রবাহিত হয়েছে সেখানে অতিপ্রাকৃত ঘটনা প্রাধান্য লাভ করেছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে একদিকে নবজাগরণ, অন্যদিকে Revivalism একদিকে নবতম সৃষ্টির প্রেরণা, অন্যদিকে প্রাচীন ও অতীতের প্রতি একটা মোহ। এই সময়ের সামাজিক নাটক আর উপন্যাসগুলির মধ্যে অতি-প্রাকৃতের কোন প্রাধান্য নেই, কিন্তু যেখানেই পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে উপন্যাস আর নাটক সৃষ্ট হয়েছে, সেখানেই অতিপ্রাকৃতের স্রোতে তাঁরা ভেসে গেছেন। কোথাও তাঁরা সংযম মেনে চলতে পারেন নি; অনেক ক্ষেত্রে এই অতিপ্রাকৃত ঘটনার সমাবেশ নাটকের গতিকে করেছে শৈথিল্যাক্রান্ত, তার রূপপরিণতির ক্ষেত্রে হয়ে উঠেছে বাধা। মাইকেল মধুসূদনের নাটকে অতিপ্রাকৃতের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু অতি-প্রাকৃত নাটকে কোথাও পরিণতির ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ হয়ে ওঠেনি। কারণ মাইকেল মধুসূদনের সাবলীলতা বোধ ছিল। অতিপ্রাকৃতের প্রয়োজন সীমা ছাড়িয়ে যায় নি। মাইকেল মধুসূদন চিরকালই গ্রীক্ সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। পদ্মাবতী, মায়াকানন, প্রভৃতি নাটকে বিরূপায় মানবের দৈবের নিকট আত্মসমর্পণ ঘটেছে। কিন্তু গিরীশচন্দ্র ঘোষের ও ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদের নাটকে অতিপ্রাকৃতের বাহুল্য দেখা যায়। পৌরাণিক নাটকগুলিতে দেবমহিমা বা দেবতার অলৌকিক কাহিনী বর্ণনা ছাড়া নতুন কিছু হয়ে ওঠে নি। বৈষ্ণব ভক্তি প্রেম ভক্তির বন্যায়, অতিপ্রাকৃতের প্লাবনে নাটকীয় গতির পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে একথা বলতে বাধা নেই; শেক্সপীয়রের নাটকে যে অতি-প্রাকৃতের সমাবেশ নেই এমন নয়। কিন্তু অতিপ্রাকৃত বর্ণনায় শেক্সপীয়র দক্ষ শিল্পী। ম্যাকবেথ নাটকে অতিপ্রাকৃত দিয়ে শুরু অতিপ্রাকৃতে শেষ। কিন্তু ম্যাকবেথ চরিত্রের বিকাশের ক্ষেত্রে অতিপ্রাকৃত প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেনি। বরং ট্রাজিক পরিণতির ক্ষেত্রে অতিপ্রাকৃত সাহায্যই করেছে। কিন্তু গিরীশ

চন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলিতে সেই দক্ষতার অভাব। ক্ষীরোদপ্রসাদ যেন সামঞ্জস্যহীন।

উপন্যাসের ক্ষেত্রে অবশ্য বঙ্কিম চন্দ্র স্বাধীনী। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে অতিপ্রাকৃতের বাহুল্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র আত্মসচেতন শিল্পী। তিনি উপন্যাসের গতি ও পরিণতি সম্পর্কে দৃষ্টি রেখেই কাহিনী গঠন ও চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। কাহিনীর গতিবেগ ও চরিত্র সৃষ্টির সার্থকতায় যেখানে যতটুকু অতিপ্রাকৃত বর্ণনার ও ঘটনার প্রয়োজন আছে, ততটুকুই তিনি অতি কৌশলে প্রয়োগ করেছেন। যা সহজ সরল স্বাভাবিক বা সম্ভাব্যতানুসারী, যা কাহিনীর পক্ষে সামঞ্জস্যপূর্ণ সেটুকুই তিনি বর্ণনা করেছেন। মাত্রাতিরিক্ত কোথাও কিছু ঘটেনি। 'সীতারাম' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র অতিপ্রাকৃতের অপূর্ব সামঞ্জস্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন। জয়ন্তীর মধ্যে অলৌকিকত্ব প্রচুর পরিমাণে থাকলেও আমাদের সমাজের আচারবিধি ও গৃহী জীবনের পটভূমিকায় তা বেশ মানিয়ে গেছে। জয়ন্তীর অলৌকিকত্ব তার বিচার দুটোই বাস্তব প্রধান হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্র চরম পরীক্ষার জয়ন্তী অলৌকিক মহিমার মর্যাদাকে রক্ষা করেছেন। সীতারাম উপন্যাসে জয়ন্তীর ভূমিকা ও গুরুদেবের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ অবাস্তবতার গভীর নৈরাশ্যে পরিণত হয়নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় অধিকাংশ উপন্যাসেই অতিপ্রাকৃত ঘটনাগুলি কাহিনীর অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে প্রতিভাত হয়েছে। অতিপ্রাকৃত সাহিত্যের বা Art এর একটা গুণ, তার প্রয়োগও Artistic হওয়া প্রয়োজন। বঙ্কিম চন্দ্রের সেই Artistic প্রয়োগ নৈপুণ্যের অভাব হয়েছে। স্কট পরিপূর্ণভাবে রম্যরূপীয় জীবনাচরণের কবি। "Scott had a very keen eye for the picturesque features of ancient buildings and of their situation and surroundings."

সেই অতিপ্রাকৃতালক্ষ মনে স্কট কল্পনার রঙে স্পষ্ট করে তুলেছেন রম্যরূপীয় জীবন চিত্র। স্কট নিপুণ শিল্পী। বঙ্কিমচন্দ্রে অতিপ্রাকৃত কেবলমাত্র বিচ্ছিন্ন অতিপ্রাকৃত। কোন এক বিদগ্ধ সমালোচকের মতে, "শেক্সপীয়রের নাটকের কাহাহীন ছায়াগুলির মত বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যেও অতিপ্রাকৃত স্বীকৃত।"

রবীন্দ্রনাথও অতিপ্রাকৃত বর্ণনার পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। বাঙালী জীবনের কতকগুলি সহজ সংস্কার ও বিশ্বাসকেই তিনি গল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। ভৌতিক বিশ্বাস বাঙালী জীবনের সহজাত সংস্কার যা রক্তে মাংসে জড়ানো সংস্কার। এই সমস্ত সংস্কারের প্রতি আমাদের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। এই সংস্কার এত প্রবল যে তার যুক্তি তর্কের অবকাশ রাখে না। যত অলৌকিকত্ব থাক না কেন তা স্বীকার করতে বাধা নেই। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ অতি সহজেই মানব মনের সংস্কারকে কয়েকটি গল্পে অদ্ভুত ভাবে রূপায়িত করেছেন। "ক্ষুধিত পাষাণ", "মণিহারা", "মণিহারা" "কঙ্কাল", গুপ্তধন, "জীবিত ও মৃত" ইত্যাদি গল্পে এই বিশ্বাস ও সংস্কারকে শিল্পকলায় রূপায়িত করেছেন "ক্ষুধিত পাষাণ" গল্পটি সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ। এই গল্পটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অতিপ্রাকৃত বর্ণনার সমস্ত কলা কৌশল দেখিয়েছেন এবং অতিপ্রাকৃত রচনার ক্ষেত্রে বিপ্লবতাও দেখাবার চেষ্টা করেছেন। কতকগুলি গল্প অবশ্য ভৌতিক বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। বর্ণনার চাতুর্যে ও রচনার সমৃদ্ধিতে সেই গল্পগুলি মানবিক আবেদনে পরিপুষ্ট। এই মানবিক আবেদন যদি অনুপস্থিত থাকতো তা হলে গল্পগুলির কোন মূল্য থাকতো না।

অবশ্য অতিপ্রাকৃত বর্ণনার ক্ষেত্রে একটা কথা পরিষ্কার বুঝে নেওয়া প্রয়োজন যে অতিপ্রাকৃত কেবল মাত্র তার সীমাটুকুর মধ্যে আবর্তিত হবে না। পরিবর্তে প্রাকৃত জীবনের সঙ্গে গড়ে তুলবে সমন্বয়। এই সমন্বয় সাধনের অভাব যেখানে ঘটবে সেখানে অতিপ্রাকৃত কেবলমাত্র ভৌতিক বিশ্বাসেই পরিণত হবে, মানব মনের রহস্যের সন্ধান ব্যর্থ হবে। এবং তা আয়াসসাধ্য। রবীন্দ্রনাথ 'মণিহারা' গল্পের মধ্যে মণি মলিকার বিয়োগে স্বামী ফণিভূষণের বিরহ বিধুর হৃদয়ের আত্যন্তিক দুঃখের ও মৃত্যু রহস্যের প্রবল জিজ্ঞাসার নিপুণ পরিণতি দেখান হয়েছে। ফণিভূষণ মৃত্যুর রহস্য জানতে চায়। সে মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটন করতে গিয়েই মৃত্যুর কবলে আত্মদান করেছে।

ফণিভূষণ একাগ্রচিত্তে স্ত্রী মণিমালিকার ধ্যান করেছে, কিন্তু তার সামনে রাতের অন্ধকারে তিনি উপস্থিত হলেন তিনি একটি কঙ্কাল। গল্পটির মধ্যে যেখা যায় সেটা বুদ্ধিদীপ্ত কলা-কৌশলের নিদর্শনক্ষমা প্রজ্ঞার অনুপস্থিতি চোখে পড়ে। কারণ পুরোটি বর্ণনা যা সহজ সরল স্বাভাবিক, ততটুকুই তিনি কাহিনীর সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছেন। দেবী চৌধুরাণী, আনন্দমঠ, ইন্দিরা প্রভৃতি উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র অতি-প্রাকৃত ও অলৌকিক ঘটনাকে অবলম্বন করেছেন। কাহিনীর অনেকখানি স্থান অধিকার করে আছে এই সমস্ত অলৌকিক ঘটনা। কিন্তু এই অলৌকিক কাহিনীতে লৌকিকতার স্পর্শ যেন অনুভব করা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনার সঙ্গে যেন যাত্রা লাগিয়েছে। 'দেবী চৌধুরাণী'তে প্রফুল্লর মৃত্যু সংবাদ সেই কথাই প্রমাণ করে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়, "সাধারণতঃ প্রাকৃতিক ঘটনাই অতিপ্রাকৃতের স্পর্শে অলৌকিকে রূপান্তরিত হয়। ইহার বিপরীত রকমের পরিবর্তন বড় একটা হয় না। সাধারণ রোগে মৃত্যু অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের দ্বারা দৈবিক ঘটনাতে রূপান্তরিত হইতে পারে। কিন্তু দৈবিক ঘটনা যে লোকমুখে প্রচারিত হইতে হইতে অতিপ্রাকৃত অংশ বর্জন করিয়া স্বাভাবিক মৃত্যুতে রূপান্তরিত হইয়ে, তাহা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না।"

আনন্দমঠের মধ্যেও অতিপ্রাকৃত ঘটনার সন্নিবেশ বা মূল প্রধান অংশরূপে স্বীকৃত। অলৌকিক কীর্তিকলাপও আনন্দমঠে প্রচুর। আনন্দমঠেও এই অলৌকিকত্বের রাজত্ব কিছুটা বিদগ্ধে ও দায়িত্বজ্ঞানহীন। ইন্দিরার সরলমনস্কতার অতিপ্রাকৃতের প্রতি যে প্রবণতা তা অনেকটা স্বাভাবিক। সরলমনস্কতার প্রবৃত্তির মধ্য একটা অন্ধসংস্কারের গ্রাম্য রমণীর আধিপত্যকেই লক্ষ্য করা যায়। যাহা হউক অতিপ্রাকৃত সৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র কোন সচেতন সৃষ্টির কৌশল অবলম্বন করেননি। কল্পনার ও রোমান্সের আতিশয্যে Objectivity কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

কিন্তু মধ্যযুগীয় জীবনের পরিবেশ রচনায় কোলরীজ যেমন কয়েকটি রেখার টানে তা ফুটিয়ে তুলতে পারেন, বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে তার কিছুটা অভাব। এমন কি মধ্যযুগের জীবনযাত্রা সম্বন্ধেও বঙ্কিমচন্দ্রের অভিজ্ঞতা ছিল না গভীর। ফলের মধ্যে যে অভিজ্ঞতা ছিল ব্যাপক, রোমান্সের কল্পনায় যা রসে উঠেছে স্বচ্ছ, বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনায় তা কিছুটা ক্ষুণ্ণ। তাছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের অভিজ্ঞতার পরিধি বড় নয়। তিনি তাঁর উপন্যাসের মধ্যে মধ্যযুগীয় জীবনের খুঁটিনাটির বর্ণনা করেননি। পরন্তু মধ্যযুগের সেই উপাদানও বঙ্কিমচন্দ্রের সুমুখে ছিল না। তাই অনুভূতির ক্ষেত্রে, চিত্রাংকনের ক্ষেত্রে তা অনেকটা আপন্ন হয়েই মধ্যে সভাকার ঘনীভূত রহস্যময়তা গড়ে উঠেছিল কিন্তু কংকালের আবির্ভাবে সেই রসটুকু নষ্ট হয়ে গেল। অর্থাৎ সত্য পরিবেশটির মধ্যে যে অতিন্দ্রীয় ভয়াবহ শিহরণ জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল যে অশরীরিণীর পদসঞ্চার সত্য পরিবেশকে কঠিন তুষার শীতল ভীতির রাজ্যে পরিণত করেছিল, নদীর ঘাট থেকে সুরু করে ধীরে ধীরে শয়নকক্ষের অভ্যন্তরে অনুসঞ্চারিণীর গতিবিধি এবং অলংকার ও আভরণের কম কম শব্দ সমস্ত ব্যাপারটিকে রহস্যঘন করে তুলেছিল অকস্মাৎ কংকালরেখিনী রূপে তার আবির্ভাব এবং কংকালের অদ্ভুত ইঙ্গিতে নদীস্রোতের মধ্যে ভগ্নোদ্যমী ফণিভূষণের মৃত্যু অনেকটা স্থূল বলেই মনে হয়। ও যেন চিরাচরিত কাহিনীর অতি স্থূল পরিণতি। কোন সূক্ষ্ম কারুকার্য বা শিল্পকলার পরিচয় এখানে পাওয়া যায় না। গল্পটির মধ্যে সংকেত বিকীর্ণিত অনিশ্চয়তা কোথাও নেই। নিশ্চিত মৃত্যুর মধ্যে জীবনকে উৎসর্গ করেই ফণিভূষণকে মূল্য দিতে হয়েছে মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটন করতে গিয়ে। ফণিভূষণের পক্ষে এই নির্মম পরিণতির প্রয়োজন ছিল কি না তাহাই জিজ্ঞাসা। অতিপ্রাকৃত ঘটনার রসপরিণতিও এখানে সার্থক হয়ে ওঠেনি।

এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে যে 'ক্ষুধিত পাষাণ' রচনার ক্ষেত্রে কোলরীজের প্রভাব অনেক বেশি ভাবে পড়েছিল। অর্থাৎ কোলরীজ এবং কীটসের মধ্যযুগীয় অতীত-চারণাই রবীন্দ্রনাথকে অতীতের পথে আহ্বান করেছিল। 'ক্ষুধিত পাষাণে'র মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রায় আড়াইশত

বৎসর পূর্বের সুন্দর নদীর তটপ্রান্তে নির্জন পাহাড়ের নীচে দিব্যতীর্থ বা যাদুদের ভোগবিলাস কক্ষ ধূলিধূসরিত প্রাসাদের বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই বর্ণনার মধ্যে সেই প্রাচীন অট্টালিকার অভ্যন্তরের চিত্র কোথাও সুস্পষ্টরূপে ফুটে ওঠেনি। এমন কি শতবৎসর প্রাসাদের সুগভীর বিজনতা তেমন ভাবঘন পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে নি। কীটসের Eve of st. Agnes যথার্থ প্রেমের কাব্য নয়। কিন্তু এই কাব্যেও কীটস ভুলত্রুটি সত্ত্বেও একটা মধ্যযুগীয় পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, বর্ণাঢ্য এবং বর্ণালীঘন করে তুলেছেন। এক দারুণ শীতের রাতে যখন Beadsman-এর আঙুলগুলো কনকনে ঠাণ্ডায় হয়েছে অসাড়, বিশ্বাসও যখন বনবাসে পরিণত, বাইরে শীতের আঘাতে যখন নিশাচর পেচক আর খরগোশগুলোও জর্জরিত, সেই পরিবেশ রচনায় কীটস দক্ষতা দেখিয়েছেন। দক্ষতা দেখিয়েছেন যখন তিনি chapel-এর অভ্যন্তরে যাবতীয় পরিবারে নাইট ও রমণীদের মর্মরমূর্তিগুলিকে জীবন্ত করে তুলেছেন। এমন কি কার্নিশের বর্ণনাও সেই সূক্ষ্ম sensousness-এর পরিচয় বহন করে যখন দেখি, মর্মরখচিত দেবদূত যাদের অনিমীলিত আঁখির চিরকালীন বিস্ময় যাদের শিরোপরি ভর করে আছে সেই কার্নিশ, আর যাদের সমস্ত কেশদাম ছড়িয়ে পড়েছে শিহরনে, স্বর্ণখচিত ডানাগুলো আড়াআড়িভাবে বুকের মাঝে স্থাপিত, তখন মধ্যযুগীয় চ্যাপেলের বর্ণনার কারুকার্যে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। অপূর্ব চিত্র সমন্বিত বাতায়ন পথের বর্ণনা আরও সুন্দর আরও বর্ণময়। সুদূর অতীত যেন কাছে এসে ধরা দেয়। এইখানেই কীটসের সঙ্গে স্কটের সমধর্মিতা। স্কটও মধ্যযুগের জীবনাচরণের বর্ণনা করেছেন মধ্যযুগের কোলাহল মুখরিত উৎসবের মণ্ডপ, নিজালয়ে প্রেম, রনোন্মত্ত সভা রাজসভার চোখ ঝলসানো বর্ণবৈচিত্র্য, পোষাক পরিচ্ছদের বিলাস বৈভব, অভিজাত গৃহের ললনা, নাইট ও সেনানীদের কাহিনী, কিন্তু মধ্যযুগের অন্তরের বাণীকে তিনি আবিষ্কার করতে পারেননি। মধ্যযুগের বহিরঙ্গ রূপের চিত্রাঙ্কনে তিনি দক্ষ শিল্পী। কিন্তু কোলরীজ যে একটি রেখার টানে শুধু মধ্যযুগ নয়, মধ্যযুগের সমস্ত আত্মাকে সজীব করতে পারেন। এই spiritual element এর অধিকারী কীটস বা স্কট কেউ ছিলেন না। যেমন ছিলেন না রবীন্দ্রনাথ। তাই কুহিত পাষাণের পরিবেশ রচনায় তিনি না পেরেছেন সেই যুগের প্রাসাদের নির্মুত ছবি আঁকতে, না পেরেছেন অতিপ্রাকৃতের একটা ভীতচকিত শিহরণ জাগিয়ে তুলতে। তিনি কুহিত পাষাণের মধ্যে আড়াই শত বৎসর পূর্বেকার বিলাসতরঙ্গ মুখরিত প্রাসাদের জীবনকে যেমন বর্ণনা করতে বা জীবনের চিত্র আঁকতে পারেন নি, তেমনি তিনি আড়াই শত বৎসর পরে সুলতানগঞ্জ তীরবর্তী ভগ্ন প্রাসাদের নির্জন পরিবেশকেও সজীব করে তুলতে পারেননি। সমযাত্রীটিকেও তিনি কোলরীজের Ancient Mariner এর মত একটা অস্পষ্ট কুহেলিকায় করে তুলতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "আমাদের এই সহযাত্রীটির সহিত কোন এক রকমের অলৌকিক ব্যাপারের যোগ আছে। ট্রেনের কামরার প্রথম দর্শনে ও কথাবার্তার সহযাত্রীটিকে একটু ছিটগ্রস্ত বলে ভ্রম হতে পারে কিন্তু অলৌকিকত্বের ছোঁয়াচ কোথাও নেই। কিন্তু বুকের দীর্ঘ শ্মশ্রু কোঠরাগত তীক্ষ্ণ দীপ্ত আঁখি, কংকালসার রুগ্ন হস্ত ancient mariner এর আবির্ভাব ভূত দেখার মতো বিবাহযাত্রীদের চমকিত করে, পরিবেশ রচনায় এই সূক্ষ্ম স্পর্শটুকুই যথেষ্ট। রবীন্দ্রনাথে এটুকু স্পর্শও যেন অসহ্য।

রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রাকৃতের বর্ণনায় প্রাকৃতের মাটির গন্ধ কোথাও নেই। কেবল বাতাসে বাতাসে সে ভেসে বেড়ায়। সেই মায়াময়ীদের পদচারণা মাটির বুকে নয়, অমর্তলোকে। "বাতাসে যেমন করিয়া গন্ধ উড়াইয়া লইয়া যায়" তেমনি করে অতিপ্রাকৃতের সমস্ত গন্ধটুকু বাতাসেই ভেসে বেড়ায়। কীটসও বাতাসে ডানা মেলেছেন কিন্তু মাঝে মাঝে মৃত্তিকার ধূলি অঙ্গে লেপন করেছেন। মধ্যযুগের জীবনকে তিনি বাস্তবতার ছায়াসঙ্গিনী করেছেন, আর রবীন্দ্রনাথ মধ্যযুগের জীবনকে করেছেন অবাস্তবতার স্বপনচারিণী। কীটসের কাছে যা মর্তলোক, রবীন্দ্রনাথের কাছে তা স্বপ্নলোক। একজন মর্তের বাজারে মধ্যযুগকে স্থান করে দিয়েছেন, আর একজন স্বপ্নের বাজারে মধ্যযুগের স্থান করে

দিয়েছেন অর্থাৎ মধ্যযুগে চাঁর কাছে সুন্দর স্বপ্নময়। অতিপ্রাকৃত একটি বিশেষ ধন। প্রাকৃতের রূপবন্ধনে আবিষ্ট করে যে চিরন্তনতা লাভ করে, লাভ করে অসামান্যতা। কোলরীজ মধ্যযুগের সংস্কারকে কেন্দ্র করে অতিপ্রাকৃত কাহিনী গড়ে তুলেছেন, অর্থাৎ মধ্য যুগের সংস্কার আর বিশ্বাস যাই হোক প্রকৃতির আর মানব জীবনের মধ্যে কল্যাণ ও মঙ্গলময় পরিবেশকে খুঁজিয়ে তোলার জন্য যে সমস্ত রহস্যময়ী অতিপ্রাণের ছায়ামূর্তি খুঁজে বেড়ায় তাদের শক্তিকে পরাভূত করে কল্যাণময়ী শক্তির বিজয় বার্তা ঘোষণা করেছেন প্রেমের কবি কীট্স। নিশীথ রাত্রির অন্ধকারে রাক্ষসী জিয়ালডাইনের শক্তির প্রকাশ, দিবালোকে সেই শক্তি নিষ্প্রভ। কল্যাণময়ী প্রেমের জয় চিরকালের, ক্রিস্টাবেলের আত্যন্তিক প্রেমের জয় সুনিশ্চিত। প্রেমের প্রতীক Albatrossকে যে দস্যুরা মেরেছিল, জিয়ালডাইনের মতো ডাইনীরা যে হত্যা করেছিল সেই প্রাচীন নাবিক প্রায়শ্চিত্তের মধ্য দিয়ে জীবনের অমর প্রেমকে লাভ করে ধন্য হয়েছে অন্যত্র। এইখানেই বাস্তবতার রসটুকু নিষ্কাষণ করে তার নির্যাসটুকুকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে অতিপ্রাকৃতের লাবণ্যবিলাসে। কোলরীজ মধ্যযুগের এক ইংল্যান্ডের ক্যাসেলের বর্ণনা করেছেন। দীপহীন বা জনহীন নয়; সর্বত্রই নীরব-নিঃস্পন্দ-নিথর। কীটসও উৎসব মুখরিত ক্যাসেলের বর্ণনা করেছেন, স্টাও অন্ধকূপে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সুরুতেই দীপহীন জনমানবহীন পর্বতের তলদেশে একটি পরিত্যক্ত প্রাসাদের কয়েক রজনীর অন্ধকূপে কথা বা কাহিনীর বর্ণনা করেছেন। বর্ণনা করেছেন করুণ সুরে কোয়ারার জল, শৈত্যের সুর, বৃক্ষপত্রের নিক্কণ, নির্ঝরের আলাপ ইত্যাদি যা প্রেতলোকের রাত্রিনী সৃষ্টি করতেই সক্ষম। কারুকার্য বা বর্ণনার বর্ণচ্ছটা এখানে অনুপস্থিত।

Ancient Mariner সম্বন্ধে কোন এক সমালোচক বলেছেন, "Perhaps the greatest achivement of the poem is the simle realistic force of its narrative. To acheive this was of course, Coleridge's main object. He had undertaken to "transfer from our inward nature a human interest and a semblance of truth sufficient to procure from this shadows of imagination that willing suspension of disbelief for the moment which constitutes poetic truth." আর poetic truth বলতে তিনি imagination কেই বুঝেছিলেন। আর এই কল্পনার উৎস কোন প্রকৃতিজগৎ। প্রকৃতির রহস্যময়তা আর কবির কল্পলোকের রহস্যময়তার মিলন ঘটেছে এখানে। আবার ঘটেছে কাব্যের মধ্যে, "It is easier to undertake the plan than to perform it and much easier to perform it in prose than in verse." সর্বশেষে ঘটনার পরিস্থিতি, গতি ও প্রকৃতি নিষ্করুণ প্রকৃতির বুকে মানবের কর্তব্যকর্মের নির্মমতা ও রুক্ষতা, প্রেমের জ্যোতির্ময় আলোকে বিশ্বাসঘাতকতা, Ancient Marinerকে সার্থক করেছে। "In the poem the mothod of relating nature to the moral world is not by dim anologies, nor in the shape of formal similies, but by the poets heart and intellect being intimate by combined." কোলরীজের আরও সূক্ষ্ম, আরও সুন্দর, আরও মহৎ। ক্রীস্টাবেলের মধ্যে অতিপ্রাকৃত লোকের সমুন্নত বিকাশ ঘটেছে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কুহকিত পাষাণের মধ্যে অতি-প্রাকৃতের বর্ণনাকে কোথাও এত রসাল করে তুলতে পারেননি। তার কারণ রবীন্দ্রনাথ শৈতিকবি। একটি সুরের পরশলহরী কবিচিত্তকে ব্যাকুল করেছিল, সেই ব্যাকুলতা চিত্ত চির অতৃপ্ত রয়ে গেল, আর সেই বন্ধনের হাত থেকে কোন মুক্তি নেই। "আমার ঈশ্বরের কি কোন পথ নেই?" শেষপর্যন্ত ঈশ্বরের পথ মেলেনি। অর্থাৎ পাষাণের কুহকিত আত্মার মর্মন্তুদ হাহাকার যত না কবিকে ব্যথিত করেছে, তার চেয়ে বেশি আকর্ষণ করেছে বন্ধুবেষ্টিত সমাজের মধ্যবর্তিনী তরুণী ঈশ্বরীবালার অন্তরের বেদনাবিধুর হাহাকার। তরুণী ঈশ্বরীর চিরঅতৃপ্ত বেদনা কবির অন্তরের বেদনা। কবির কল্পনা তাই দিবসবিজনীর সাহায্য প্রার্থে উপনীত। সাহায্য মধ্যপ্রাচ্যের তরুণী ঈশ্বরীবালার মর্মজ্বালা।

নববিকশিত সৌন্দর্যের ব্যর্থ পরিণতি, রক্ত কলুষিত পুংপ্রকৃতির নিষ্ঠুর মৃত্যু কবি কল্পনার শিরায় শিরায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। কবির কল্পনার কল্পলোকে তরুণী ইরানীর নববিকাশিত যৌবন সদ্যাচ্ছন্ন রূপ সৌন্দর্যই এখানে সত্য, কবির মনোভূমিই এখানে সত্য, যত না সত্য ভীম পাগল প্রাচীরের আঁধারের বিভীষিকা। এই বিভীষিকার রূপ মেহের আলির কণ্ঠেই ফুটে ওঠে, "সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়।" অর্থাৎ বিশ্বের সব কিছুই ঝুট বা মিথ্যা কেবল কবির কল্পনা ছাড়া। এই কল্পনাই চিরসত্য, চির শাশ্বত চিরকালীন। প্রাসাদের পাষাণ ভিত্তির আর অন্ধকারের গোরের ভিতর থেকে যে ক্রন্দন তা কবির অন্তরের ক্রন্দন, "তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাও— নিষ্ফল স্বপ্নের সমস্ত দ্বার ভাঙিয়া ফেলিয়া তুমি আমাকে ঘোড়ায় তুলিয়া তোমার বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া, বনের ভিতর দিয়া, পাহাড়ের উপর দিয়া, নদী পার হইয়া তোমাদের সূর্যালোকিত ঘরের মধ্যে আমাকে লইয়া যাও, আমাকে উদ্ধার কর।" শুধু কল্পনার বিলাস, শুধু স্বপ্নময় মরালোকে বিশ্বজীবনের সঙ্গে মিলনের জন্য মর্মের হাহাকার। এখানে তরুণী ইরানীবালা কেবলমাত্র কল্পনা। আর কল্পনার কুহকে বা মায়ায় যিনি বন্ধ হয়েছেন তিনিই মেহের আলির মতো পাগল হয়েছেন, উদ্ধারের আর পথ পান নি। তাই সংযাত্রীর আকুল প্রার্থনা, "হে রহিম, যে পতঙ্গ তোমাকে ফেলিয়া পালাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, সে আবার মরিবার জন্য আসিয়াছে। এবার তাহাকে মার্জনা করো, তাহার দুই পক্ষ দগ্ধ করিয়া দাও, ভস্মসাৎ করিয়া ফেলো।" শ্রীপ্রমথ নাথ বিশী মহাশয়ের ভাষায় "মোহন তুলির সাহায্যে কবি আমাদের মনকে এমন কল্পনার স্বর্গে উত্তোলন করেন যেখানে সাংসারিক দুঃখ দুঃখ নাই এবং সেই সঙ্গে গা ছম ছম ভাব যা রক্ত মাংসকে অবলম্বন করিয়া বিরাজ করে তাহাও নাই। অর্থাৎ, "The wiling suspension of disbelief" মুহূর্তের জন্য বিশ্বাসে বা Poetic truth-এ পরিণত না হয়ে "সব ঝুট হ্যায়"এ পরিণত। শুধু কল্পনার অতিস্থায়ী উচ্চলোকের সুরই ধ্বনিত হয়। অতি প্রাকৃতের রসপরিণতি অপেক্ষা কল্পনার বা স্বপ্নলোকের নিবিড় সৌন্দর্যানুভূতিই এখানে প্রবল। কীটসের "La Belle Dame Sons Marcb" কাব্যের ছলনাময়ী কল্পনা সুন্দরীর আচার আচরণ যেন তরুণী ইরানী-বালার চরিত্রের উপর রেখাপাত করেছে বলেই মনে হয়। মেহের আলি যেন এই কীটসের কাব্যের Pole king এবং যে নিষ্ঠুরা সুন্দরীর নির্দয় মোহের কারাগারে বন্দী পাগল। অবশ্য কীটসের এই বর্ণনায় যে সূক্ষ্ম পেলবতা আছে রবীন্দ্রনাথে তা যেন অনেকটা স্থূল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই কল্পনাকুশলতা ও কল্পনার বিলাস সাহিত্যে অপূর্ব ও অনবদ্য। কল্পনার সঙ্গীতময় সুর 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের নিবিড় মাধুর্যকে অপরূপ করে তুলেছে। অতিপ্রাকৃত জগতের আকর্ষণ আমাদের যত না মুগ্ধ করে, কবির নিবিড় ভাব কল্পনার ঐশ্বর্য মুগ্ধ করে ততোধিক। তাই 'ক্ষুধিত পাষাণে' কবির সমুন্নত কল্পনার বিকাশ ঘটেছে পূর্ণমাত্রায় এবং তা সার্থক। "ক্ষুধিত পাষাণ"কে ছোট গল্প না বলে গদ্যকাব্য বলাই শ্রেয়।

'মাস্টার সাহেব' গল্পটিতে কবি কিছুটা অতিপ্রাকৃত বর্ণনায় সফল হয়েছেন মনে হয়। কারণ অলৌকিক ঘটনাকে তিনি প্রকৃত ও বাস্তব পরিবেশের মধ্যে রূপ দিতে পেরেছেন। একটা অজানা শিহরণ, একটা অদৃশ্য শক্তির উপস্থিতি ও তার ক্রিয়াকলাপ বর্ণনায় কবি অনেকখানি সূক্ষ্মতা দেখিয়েছেন, 'মণিহারা' গল্পের মতো স্থূল হয়ে যায়নি। কলিকাতা মহানগরী। দিনের বেলায় জীবন্ত মানুষের মহামেলা, আর গভীর রাতে সেখানে অদৃশ্য আত্মার পদচারণা সমস্ত মহানগরীটাকে মহাশ্মশানে পরিণত করে। এমনি এক নির্জন রাত দুপুরের ফেরত রোডে ঘোড়ার গাড়ীতে পানমত্ত মজুমদার, গ্যাসের মিটমিটে আলো, পথের পাশে অন্ধকারে ভূতের মত গাছ, গাড়ীর সামনে চক্ষু নাই, অথচ একটা চাহনি," সমস্ত পরিবেশটিকে অতিপ্রাকৃতের ছায়াময়ী রাজ্যে পরিণত করেছে। মজুমদারের ভাষায়, "তবে এ কি শুধু স্বপ্ন?" সান্যালের ভাষায়, "এ শুধু স্বপ্ন নহে," এই গল্পের অতিপ্রাকৃতের বর্ণনায় তিনি যে willing suspension of disbelief-কে বিশ্বাসে পরিণত

করতে সক্ষম হয়েছেন এবং realistic setting-এর উপর প্রতিষ্ঠিত বলেই সার্থক হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের 'কঙ্কাল', 'জীবিত ও মৃত', 'সুপ্রভাত' প্রভৃতি গল্পে অতিপ্রাকৃতের ছায়া নেই। গল্পগুলির মধ্যে অতিপ্রাকৃতের উপাদানও অনুপস্থিত। গল্পগুলি কেবলমাত্র আমাদের সহজ ধারণা সংস্কার বা বিশ্বাসকেই কিছুটা নাড়া দেয়। এ ছাড়া গল্পের মধ্যে অতিপ্রাকৃত বর্ণনার কলাকৌশল এমনি যে spirituul Element টুকুও নেই।

অতিপ্রাকৃত বর্ণনায় বিভূতিভূষণ দক্ষ শিল্পী না হলে শিল্পগত কলাকৌশলকে তিনি বিশুদ্ধভাবে প্রয়োগ করেছেন। এবং তা সম্ভব হয়েছে যে হেতু তিনি প্রকৃতির নির্জন রাজ্যের বাসিন্দা। বিভূতিভূষণ প্রকৃতির নির্জন রূপ ও সৌন্দর্য সম্ভোগের কবি। অবশ্য আদিমের গূঢ় চেতনার অবশিষ্ট রস নিয়ে তিনি অরণ্যক জীবনের সৌন্দর্যকে অবলোকন করেছেন। তাঁর ধ্যানরসজ্ঞা প্রকৃতি রাজ্যের রহস্যময়তাকে উদ্ঘাটন করতে চায়নি; উপভোগ করতে চেয়েছে। তাই বিভূতিভূষণ দ্রষ্টা। তিনি ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতো প্রকৃতির আধ্যাত্মিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হননি, আবার কীটসের মতো নিছক সৌন্দর্য সম্ভোগের রূপময়তার কবিও তিনি নন। রবীন্দ্রনাথের মতো জীবন ও প্রকৃতিকে মিলিয়ে জীবনের সত্যরূপকে তিনি দেখেন নি। আসলে তাঁর দৃষ্টিতে আদিম রহস্যের অঞ্জন মাখানো। জীবনকে জানার কোন প্রচেষ্টা নেই, অতিদূরে সৌন্দর্যালোকের ধ্যান বিহার করার কোন বাসনা নেই। প্রকৃতির নির্জন ও গ্রাম রূপের চেতনায় বন্ধনহীন উদ্দামতা নেই। প্রকৃতির অতিসুন্দরলোকের অধিবাসীও তিনি নন। প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্য বিভূতিভূষণের অন্তরে জেগেছে প্রাণের পিপাসা। আর সেই পিপাসার্ত মন নিয়ে বিভূতিভূষণ প্রকৃতির বিশাল আয়োজনকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দেখেছেন, উপভোগ করেছেন। তাই বন্য প্রকৃতির প্যাগ সমারোহ; তার অন্তরলোকের সহজ সরল রহস্যময়তা, আদ্যজীবন, শান্ত নদী তীরে, কাশবন সুনীল অম্বর, কণ্টক পরিপূর্ণ কোপ জঙ্গল ও লতা গুল্ম, নদী প্রান্তে প্রাচীন বট, ভগ্ন মন্দির, দিগন্তবিলীন কাঁচা মাটির রাস্তা বিভূতিভূষণের চিত্তে গভীর ছায়ালোক সৃষ্টি করেছে।

বিশ্ব প্রকৃতির অখণ্ড সত্তাকে বিভূতিভূষণ অনুভব করেছেন। কেবল কল্পনার আর জগত জোড়া বিস্ময়ের বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে দেখেছেন বিশ্বপ্রকৃতির রহস্যময়তা। এই অনুভূতির ক্ষেত্রে কোন বুদ্ধির বা মস্তিষ্কের নিপুণ কলাকৌশল নেই, নেই অলস কল্পনার বিকলাঙ্গ চিত্ররূপ, নেই সচেতন মনের ঘষামাজা শিল্পকর্ম, বিভূতিভূষণ প্রকৃতির সত্যরূপের পূজারী, যা দেখেছেন তাকেই অন্তর থেকে প্রকাশ করেছেন, যা দেখেননি তাকে কল্পনা দিয়ে রঙ্গিন করেননি। তাই প্রকৃতি রাজ্যের মানব সন্তানগুলি একেবারে আদিম অকৃত্রিম। কল্পনা দিয়ে সৃষ্টি করতে গিয়ে কোথাও তিনি তাদের জীবনকে কৃত্রিম করে তোলেননি। এই সহজ সরল উলঙ্গ দৃষ্টি দিয়ে প্রকৃতিকে দেখেছেন বলেই বিভূতিভূষণ মানব চরিত্রগুলিতে এত স্বাভাবিক করে তুলেছেন। মানব সন্তানগুলি প্রকৃতির অন্তরের স্নিগ্ধ দীপালোকে প্রাণময় হয়ে উঠেছে। বিভূতিভূষণ প্রকৃতি রাজ্যের সঙ্গীহীন অধিবাসী। প্রকৃতি চেতনার ক্ষেত্রে তিনি একক। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী, কীটসের থেকেও বিভিন্ন, আপন স্বাতন্ত্রে ভাস্বর।

বিভূতিভূষণের পল্লী প্রকৃতি ও অরণ্য প্রকৃতির বর্ণনায় কোথাও বিশেষ পার্থক্য নেই। পল্লী প্রকৃতি বর্ণনায় রোমান্সরসের যেটুকু অভাব ঘটেছে, অরণ্য প্রকৃতির বর্ণনায় সেটুকু তিনি গভীর করে তুলেছেন। আর এই অরণ্যের নিভৃত নির্জন রূপের নীরবতা বিভূতিভূষণকে মোহমুগ্ধ করেছিল। তারই ফলে বিশ্বপ্রকৃতির অখণ্ড রূপের প্রকাশে কোথাও কোন দ্বিধা বা সংশয় ছিল না। "এই বর্বর রুক্ষ বন্য প্রকৃতি আমাকে তার স্বাধীনতা ও মুক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছে।" প্রকৃতির ঐকতান স্রোতে নানা গান, নানা সুর নানা রকমের জীবনের সমাবেশ, কত ফুল কত অপরিচিত তরুলতা, কত অজানা কুল, কত ধরু-সিরি নদী, কত অপার্থিব জীবের মেলা এক অখণ্ড চিত্রময়ী রূপে

ফুটিয়ে তুলেছেন বিভূতিভূষণ। আর এই বিশেষ বসতি পাহাড় জঙ্গল সমাজের তাৎক্ষণ নির্জন প্রকৃতি পরিবেশের মধ্যে অতিপ্রাকৃত বর্ণনাকে তিনি সহজ, সরল ও স্বাভাবিক করে তুলেছেন। প্রকৃতির অসীম রহস্যে ঘেরা জগতে সবই সম্ভব।

অতিপ্রাকৃত বর্ণনায় বিভূতিভূষণ-এর নিপুণতা কলাকৌশল যত না আছে, আছে স্বাভাবিক বর্ণনার সহজতর রূপ। অতিপ্রাকৃত পরিবেশ রচনায় বন্য প্রকৃতিই সহায়তা করেছে অনেকখানি। লৌকিক বিশ্বাস আর সংস্কার যাই থাকুক না কেন আসলে তাঁর অতি-প্রাকৃত কাহিনী বর্ণনার কৌশল অপূর্ব। "আরণ্যক" উপন্যাসে বিভূতিভূষণ বোমাইকুরু জঙ্গলের অলৌ-কিক কাহিনী বর্ণনা করেছেন। "গল্পটা বেশ আষাঢ়ে গোছের বটে"। কিন্তু গল্পটা বলতে গিয়ে বিভূতি-ভূষণ বোমাইবুরু জঙ্গলের নির্জন প্রান্তরকে বেছে নিয়েছেন। বোমাইবুরু জঙ্গল লোকবসতি শূন্য। বাঘ আর বন্য শূকরের গতিবিধি রাতের অন্ধকারে যায় বেড়ে। পাহাড়ের উপর বটগাছটা বিভীষিকার রাজত্ব সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে থাকে। ঐ বটতলায় জ্যোৎস্না রাতে অপ্সরাসী সুন্দরী মেয়েরা হাত ধরাধরি করে নাচে। জীন পরীদের এই রাজত্বে আমীন সাহেবের উপস্থিতি। গভীর রাতে কুকুরের ছদ্মবেশে জীন পরীদের আগমন। আমীন সাহেবের উন্মাদ অবস্থা এমন কি বৃদ্ধ ইজারাদারের তরুণ পুত্রের মর্মান্তিক মৃত্যু সমস্ত পরিবেশটাকে ভয়াবহ করে তোলে। প্রকৃতিরানী এখানে যেন রূপকথার রাজত্বের রাক্ষসী রানীর মত। বাস্তবতার সঙ্গে অতি-প্রাকৃতের চমৎকার মিলনের দৃষ্টান্তস্বরূপ। প্রকৃতি রাজত্বের নির্জন বিভীষিকা ও ভয়ের পরিণতি কি ভয়ংকর। বৃদ্ধ ইজারাদারের মৃত পুত্রের দেহে কোনরূপ আঘাতের চিহ্ন নেই। মুখে তার ভীষণ ভয় আর আতংকের চিহ্ন। বনজঙ্গলে ভীত আতংকিত জীবনের করুণ পরিণতি বাস্তব বোধকে ক্ষুণ্ণ করে না, বরং বাস্তব রসকে উদ্দীপিত করে। ঐ পরিবেশের মধ্যে বৃদ্ধের পুত্রের মৃত্যু যেন বাস্তব সত্য হয়েই ফুটে উঠেছে। লেখক উপসংহারে বলেছেন, "সেই সোনার রাজ্যে মানুষের অনধিকার প্রবেশ তাহারা পছন্দ করে নাই, সুযোগ পাইলেই প্রতিহিংসা লইতে ছাড়িবে না।" বৃদ্ধ ইজারাদার তরুণ পুত্রের অন্তরে এক অজানা ভীতির সাহায্যে মনু সৃষ্টি করে প্রকৃতির প্রতিহিংসার বলিরূপে পুত্রকে উৎসর্গ করেছে। এই বাস্তব সত্য ও লৌকিক বিশ্বাসকেই বিভূতিভূষণ বর্ণনায় জীবন্ত করে তুলেছেন। একটানা বর্ণনা হয়, যাকে মাঝে সংশয়ের জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তুলেছেন। অতিপ্রাকৃতের শিহরণ মনকে বেশ নাড়া দেয়। বিভূতিভূষণ এখানে সার্থক। এই গল্পটি বর্ণনার মধ্যে তাঁর সচেতন শিল্পী মনই কাজ করেছে। কল্পনার বিলাস অপেক্ষা সত্যের নিখুঁত চিত্রাঙ্কনে অধিক যত্নবান হয়েছেন বিভূতিভূষণ। যা অলৌকিক তা অলৌকিক থেকে যায়নি। অলৌকিক রূপকে প্রকৃতির অতিপ্রাকৃত কাহিনীকে বাস্তবিক রূপ দিয়েছেন।

"অভিশপ্ত" গল্পের মধ্যে বাংলার মধ্যযুগের চিত্রাংকন করতে গিয়ে বিভূতিভূষণ অরণ্যসংকুল জনমানবহীন সুন্দরবনের একটি স্তব্ধ নিশীথ রাত্রির ভীষণতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। আর সেই নির্জন নিশীথে একটি প্রাচীন ভগ্ন প্রাসাদের ভগ্নস্তূপের মধ্য থেকে প্রেতলোকের বীভৎস আর্তনাদ বিভীষিকার রাজত্ব সৃষ্টি করে, পাঠকের মনে জাগিয়ে তোলে অতিপ্রাকৃতের শিহরণ। মনকে করে তোলে ভীত-বিহ্বল। অতিপ্রাকৃত এখানে নিছক অতিপ্রাকৃত হয়ে ওঠেনি, প্রাকৃতের মাঝখানে গড়ে তুলেছেন তার মায়াপুরী।

সর্বশেষে এই কথাই বলতে হয় যে কোলরীজের কাছে 'অতিপ্রাকৃত' ছিল একটা "poetic truth," কিন্তু অন্যান্য কবিদের কাছে তা আত্মপ্রত্যয়ের রূপ নিয়ে সাহিত্যে দেখা দেয়নি। অর্থাৎ অতিপ্রাকৃত এঁদের কাছে poetic truth বলে স্বীকৃতি লাভ করেনি। তাই রচনার ক্ষেত্রে একটা গভীর প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। আর কোলরীজের সচেতন মনের মণিকোঠায় প্রকৃতি ছিল নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতো অনির্বাণ। তাই প্রকৃতির রহস্যের রাজত্বে কোলরীজ ধ্যানমগ্নের ঋষি।

ঋষি টলস্টয় ঃ গোপন দলিল

অমল হালদার

তিপ্পান্ন বছর পূর্বে টলস্টয় পরলোক গমন করেছেন। জীবিতকালেই তাঁর নাম পৃথিবীর সকল দেশের শিক্ষিত সমাজে ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি যে অসাধারণ স্রষ্টা ছিলেন শুধু তাই নয়; অনেকের নিকট তিনি ঋষির মর্যাদা লাভ করেছিলেন। শেষ জীবনে টলস্টয় সাহিত্য অপেক্ষা মানব কল্যাণমূলক আদর্শের উপর বেশী জোর দিয়েছিলেন। যে আদর্শের কথা তিনি প্রচার করেছেন নিজের জীবনে শেষ বয়সে তা পালন করতে গিয়ে স্ত্রীর থেকে পেলেন প্রবল বাধা। এই বাধার সঙ্গে সংগ্রাম শুরু করে তাঁর জীবন অশান্তিতে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। দেশ বিদেশে সর্বত্র যখন তিনি শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত তখন স্ত্রীর সঙ্গে তাঁকে নিরন্তর সংগ্রাম করতে হয়েছে নিজের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য।

টলস্টয়ের শেষ জীবনের মানসিক অবস্থার অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যাবে তাঁর মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বের দিনলিপি থেকে। ১৯১০ সালের জুলাই মাসে টলস্টয় একটি নতুন দিনলিপি আরম্ভ করেন। দিনলিপির প্রথমেই তিনি লিখেছেন: "এটি শুধু আমার জন্য"। অন্য দিন লিপিতে গোপনীয়তা ছিল না। কিন্তু এই নতুন দিনলিপিটি সকলের জন্য নয়।

এই গোপন দিনলিপির সর্বশেষ দিনের বক্তব্য এই। পরিণামের কথা না ভেবে কর্তব্য বলে যা মনে হবে তা করে যাবে। টলস্টয় এই নীতি কার্যে পরিণত করতে গিয়েই সংঘাত সৃষ্টি করেছেন। কয়েক মাস পূর্বে তাঁর এক ভক্ত পাঠক তাঁকে জীবনের কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। কিয়েভ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সেরিওজা ঐ বছর ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁকে লিখেছিল: মানবকল্যাণে আপনার জীবন উৎসর্গ করুন। এই শেষ কাজটি আপনার এখনো বাকী রয়েছে। আত্মীয়স্বজন এবং নিঃস্ব ব্যক্তিদের মধ্যে আপনার সকল সম্পত্তি বিতরণ করে দিয়ে সম্পর্কহীন অবস্থায় ভিক্ষা করতে করতে গ্রামে ও নগরে ঘুরে ঘুরে বাণী প্রচার করুন।

একজন ভক্তের পক্ষে বিরাশি বছরের বৃদ্ধ গুরুকে এ ভাবে সর্বস্ব ত্যাগ করে পথে পথে ভিক্ষা করে বেড়াবার প্ররোচনা দেওয়া সত্যি বিস্ময়কর। কিন্তু টলস্টয় এই প্রস্তাবকে অবান্তর বলে উড়িয়ে দেন নি। যে আদর্শ তিনি এতদিন প্রচার করেছেন, তা নিজের জীবনে অনুসরণ করতে পারেননি বলে তাঁর মন ক্ষোভে ছিল। শুধু ক্ষোভ নয়, একটা তীব্র অপরাধবোধ সর্বদা তাঁকে পীড়িত করত। তিনি নিজে যে সব 'অপরাধ' করেছেন, তাদের কথা প্রকাশ করতে তাঁর দ্বিধা ছিল না। বিভিন্ন আত্মচরিতমূলক রচনায় এবং শেষাংশে গল্প উপন্যাসে লেখকের অপরাধবোধের সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখা যায়। "কনফেশানে" টলস্টয় যে রূপ অসঙ্কোচ নিজের জীবনের গোপনতম কথা প্রকাশ করেছেন তার তুলনা বিশ্বসাহিত্যে বেশী নেই। তিনি নিজেকে

অভিযুক্ত করেছেন অহংকার, ইচ্ছাভিলাষ, জুয়া খেলা, কালোবাজারি (যুদ্ধে ভোগ দিয়ে) নরহত্যা প্রভৃতির অপরাধে। সেই সময় তিনি দেখিয়েছেন সমাজই এই সব অপরাধে অভিযুক্ত হতে পারে।

কারণ সমাজ শুধু যে নীরবে এই সব অপরাধ সহ্য করে তাই নয়। সমাজের সমর্থনও আছে। যুদ্ধকে বীরত্ব ও স্বাদেশিকতার নাম দিয়ে এবং যৌন লিপ্সাকে প্রেমের গৌরব দিয়ে সমাজ সমর্থন করে। শেষ জীবনে টলস্টয় যৌন লিপ্সার বিরুদ্ধে প্রবল অভিমত প্রকাশ করেছেন। সন্তানের জন্ম দেওয়াও তাঁর কাছে পাপ বলে মনে হয়েছিল। এই পাপ বন্ধ করার জন্য সৃষ্টির ধ্বংসও ছিল তাঁর কাম্য। টলস্টয়ের শেষ জীবনের প্রবল নীতিবোধের অতিশয্য মনে করা আশ্চর্য নয়। হয়ত তাঁকে এ জন্য বিকৃত মস্তিষ্ক প্রমাণ করে উপেক্ষা করবার কথা ওঠাও বিচিত্র ছিল না। কিন্তু দরিদ্র ও নিপীড়িত জনসাধারণের প্রতি গভীর সহানুভূতি এবং আদর্শের প্রতি অবিচল থাকার জন্য বিরুদ্ধবাদীরা তাঁকে শ্রদ্ধার আসন থেকে টলাতে পারেনি। নিজের আদর্শের সমর্থনে তিনি যে সব প্রচারমূলক রচনা লিখেছিলেন, সেগুলি হয় বিদেশে ছাপা হয় অথবা দেশেই ছাপা হয়ে বে-আইনী ভাবে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হত। টলস্টয়ের অনেক ভক্ত এইজন্য শাস্তি ভোগ করেছে। কিন্তু টলস্টয়ের শ্রদ্ধার আসন জন চিত্তে এমন দৃঢ় ছিল যে, সরকার তাঁর বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে সাহস করেননি। তবে অর্থডক্স চার্চ থেকে তাঁকে বিতাড়িত করেছিলেন।

১৮৬২ খৃস্টাব্দে চৌত্রিশ বছর বয়সে টলস্টয় বিয়ে করেন। তাঁর স্ত্রী সোফিয়া আন্দ্রীভনার বয়স ছিল আঠারো। বিয়ের কিছুদিন পরে টলস্টয় স্ত্রীকে গোপন ডিনলিপিটি পড়তে দেন। তাঁর কুমার জীবনের অনেক প্রেমের কাহিনী এবং পতিতালয়ের অভিজ্ঞতা ডিন-লিপিতে লেখা ছিল। সোফিয়ার প্রথম প্রেমের স্বপ্ন স্বামীর এই নতুন পরিচয় পেয়ে ভেঙ্গে যায়। বিয়ের পর থেকে টলস্টয়ের উচ্ছৃঙ্খল জীবনে ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসতে শুরু করে। ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত "ক্রুয়েৎজার সোনাটায়" বিবাহ স্থায়ী স্ত্রীর যৌন মিলন এবং সন্তানের

তুলনা করবেন না...

তা সব সময়েই হতাশাজনক। বর্তমানে অপ্রচলিত সের ছটাকের সঙ্গে মেট্রিক ওজন ও পরিমাপের তুলনা করাও তেমনি বিরক্তিকর। এতে শুধু আপনার সময় নষ্ট হবে এবং লেনদেনের সময় হয়তো প্রায়ই ঠকবেন।

তাড়াতাড়ি কেনাকাটা ও ন্যায়সঙ্গত লেনদেনের জন্য

মেট্রিক একক ব্যবহার করুন

জন্য দেওয়া লেখকের নিকট আতঙ্কের কারণ হয়েছে দেখতে পাই।

সোফিয়া তথাপি স্বামীর সঙ্গে মোটামুটি সুখের জীবনেই কাটিয়েছে। তেরোটি সন্তানের জননী; স্বামীর খ্যাতিতে সে গৌরবান্বিত; বই থেকে ও জমিদারী থেকে আয় হয় প্রচুর। আয়ের সবটা নিজেরা ব্যয় করেন না; দরিদ্রের সেবা দিনচর্যার অন্তর্গত হয়ে গেছে।

টলস্টয় বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ আদর্শবাদের অনুরক্ত হয়ে পড়তে লাগলেন। সন্তান, সংসার স্ত্রী ও সম্পত্তির প্রতি আকর্ষণ শিথিল হয়ে এল। আদর্শকে জীবনে রূপায়িত করবার জন্য তিনি অধীর হয়ে উঠলেন। সোফিয়ার পক্ষে স্বামীর মহৎ আদর্শ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলা সম্ভব নয়। টলস্টয় বরাবরই সম্পত্তির মালিকানার বিরোধী ছিলেন। সমাজের অব্যবস্থার ফলেই কেউ কেউ সমাজের এক বৃহৎ অংশকে বঞ্চিত করে সম্পত্তির অধিকারী হয়, টলস্টয় এই বঞ্চনাকে ঘৃণা করতেন। শুধু জমিদারী নয় তাঁর বইয়ের আয় ভোগ করতেও দ্বিধাবোধ হত। ১৮৮৩ সালে টলস্টয় তাঁর সকল সম্পত্তি স্ত্রীকে লিখে দান। ১৮৮১ সালের পূর্বে রচিত প্রবন্ধাবলীর স্বত্বও আন্দ্রীভানকে দেওয়া হল। ১৮৮১ সালের পরবর্তী রচনা যে কেউ ছাপিয়ে প্রচার করতে পারে বলে তিনি ঘোষণা করলেন।

আদর্শের জন্য দুহাতে সম্পত্তি বিলিয়ে দেবার এই উন্মাদনা আন্দ্রীভনার ভালো লাগেনি। সন্তানদের ভবিষ্যৎ ভেবে সে রীতিমত ভীত হয়ে উঠল। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই নিয়ে প্রায়ই কলহ হত। স্বদেশে ও বিদেশে টলস্টয় প্রচুর আসনে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ঘরে শান্তি নেই। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক তাঁদের মধ্যে অনেক দিনই শেষ হয়েছে। আন্দ্রীভনা সংসারের কর্ত্রী হিসাবে ছেলেমেয়েদের স্বার্থরক্ষার জন্য স্বামীর সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তার বেজায় হয়েছে খিটখিটে হিস্টিরিয়ার আক্রমণও হয় মাঝে মাঝে। এদিকে স্ত্রীর নামে সম্পত্তি হস্তান্তর করে টলস্টয়েরও তৃপ্তি নেই। অনেকে সমালোচনা করতে লাগল তিনি তো সম্পত্তি ত্যাগ করেন নি স্ত্রীকে দিয়েছেন এবং পরিবারে বাস করে সম্পত্তি ভোগ করছেন।

এই সমালোচনা একেবারে অস্বীকার করা চলে না। তাই টলস্টয় সর্বদাই বেদনা অনুভব করতেন। টলস্টয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু চেরৎকভ এই বেদনার সুযোগ নিয়ে ক্রমাগত তাঁকে প্ররোচিত করতে লাগল সমস্ত সম্পত্তি জনসাধারণকে তুলে দিতে। তাহলেই টলস্টয়ের জীবনের শিক্ষা ও আদর্শের মর্যাদা রক্ষিত হবে। সত্যনিষ্ঠ হতে হলে এ ছাড়া উপায় নেই। আদর্শের সঙ্গে জীবনের মিলন ঘটাবার ক্রমাগত তাগিদের ফলে চেরৎকভের পরামর্শ অনুসারে টলস্টয় গোপনে এক দলিল রচনা করে সকল সম্পত্তি জনসাধারণকে দান করলেন। পাছে দলিলের কথা কেউ জেনে ফেলে সেই জন্য বাড়ী থেকে অনেক দূরে বনের মধ্যে বসে দলিল লেখা হল। আন্দ্রীভনা একটা ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়েছিল। প্রকৃত ঘটনা জানবার জন্য তার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। আড়ি পেতে স্বামীর সঙ্গে অন্য লোকের আলাপ আলোচনা শুনতে চেষ্টা করতো। স্বামীর কাগজ পত্র লুকিয়ে দেখতে গিয়ে একদিন ধরা পড়ে গেল।

এরই পরিণাম স্বরূপ ১৯১০ সালের ২৭শে অক্টোবর তিনি রাত্রিতে বাড়ী থেকে পালিয়ে যান। আস্তাপভো স্টেশনে পৌঁছে টলস্টয় অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেখানকার স্টেশন মাস্টার তাঁকে সযত্নে নিজের বাসায় নিয়ে আসেন। খবর পেয়ে আন্দ্রীভনা ২রা নভেম্বর এসে পৌঁছেছিল আস্তাপভো; কিন্তু পাচঁদিন তাকে স্বামীর কাছে যেতে দেওয়া হয়নি। যখন অনুমতি পাওয়া গেল তখন টলস্টয় অচৈতন্য; এক ঘণ্টা পরে তাঁর মৃত্যু হয়।

টলস্টয়ের গোপন দিনলিপি থেকে তাঁর শেষ জীবনের মর্মান্তিক মানসিক দ্বন্দ্বের একটি অসম্পূর্ণ ছবি পাওয়া যায়। তাঁর লাস্ট ডাইরিস সম্পাদনা করে বের করেছেন Leon Stilman এই সঠিক সংস্করণটি টলস্টয়-প্রেমিকদের নিকট সমাদৃত হবে।

দিবাস্বপ্ন ● সবিতা অধিকারী

থালাবাসনের থালাদুটো হাত থেকে পড়ে গিয়ে চুরমার হয়ে গেলো, ছুটে বেরিয়ে গেল স্নেহলতা ঘরের বাইরে। আর সেইক্ষণে পুষ্পাও 'মা' বলে একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে পংখাদুর হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

অকাল-বৈধব্য পীড়িতা স্নেহলতা। আজ থেকে বারো বছর আগে সার্কুলার রোডের উপর দোতলা বাসের তলায় চাপা পড়ে প্রাণ হারায় ওর স্বামী অরুণাংশু, সওদাগরী অফিসের কেরানী। ঠিক মনে আছে স্নেহলতার। সকালে খেতে বসে অরুণাংশু বলে: লতা, থিয়েটারে আজ 'পরিনীতা' শেষ হয়ে যাচ্ছে। চলো, আজ 'ইভিনিং'-এ দেখে আসি।

লতা অরুণাংশুর প্রস্তাব এড়িয়ে গিয়ে বলে: এখন মাসের শেষ, সোটা ইলিশ কেন নিয়ে এলে বলোতো?

মুচকিয়ে হেসে অরুণাংশু উত্তর দেয়: সামনেই মাসের পয়লা, তাই 'রিস্ক' নিলাম আর কি। তারপর থাকের খানিকটা ভেঙ্গে মুখে নিয়ে বলে: যাই বলো, প্রতি বছরই তোমার হাতের ইলিশের পাথুরী খাই, কিন্তু এ বছর সবথেকে ভাল রান্না হয়েছে, কি বলো? স্নেহলতার খুশী-খুশী মুখখানি দেখবার জন্যে অরুণাংশু একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে।

কিন্তু স্নেহলতা কৃত্রিম গাম্ভীর্যে বলে: এই একই কথা গত ছ'বছর শুনে আসছি তোমার মুখে, আবার দাহনের বছরও শুনবো, কি বলো?

চোখাচোখি হতেই হেসে উঠে দুজনে, দেখাদেখি আট বছরের ছোট্ট মেয়ে পুষ্পাও।

অফিসে বেরোবার আগে স্নেহলতাকে আর একবার মনে করিয়ে দেয় অরুণাংশু, বলে: আমি হয়তো একটু আগেই ফিরবো, কিন্তু তুমি 'রেডি' হয়ে থেকো লক্ষ্মীটি।

স্নেহলতাও প্রাত্যহিক নিয়মে স্বামীর পায়ের ধুলো নিয়ে বলে: হ্যাঁ গো হ্যাঁ, মনে থাকবে।

সিনেমা হাউস পর্যন্ত হেঁটেই যায় অরুণাংশু। তাড়াতাড়ি বেলাদিয়ের তিনখানা টিকিট কিনে পকেটে রাখতে রাখতেই রাস্তায় পা বাড়ায় বাস ধরবার জন্যে। ধুলভ-যাত্রী বোঝাই চলন্ত বাসে উঠতে গিয়ে হঠাৎ পা

পিছলে পড়ে যায় রাস্তায় উপর. পেছনের চাকাটা অবহেলায় মাড়িয়ে দেয় ওকে। একটা আর্তনাদ বেরিয়ে আসে ওর মুখ থেকে। তারপর ধীরে ধীরে কুয়াশার কালোপর্দা কে যেন বিছিয়ে দেয় ওর চোখের উপরে।

সেদিন সমর সরকার যখন কড়া নাড়বার আওয়াজ পেয়ে স্নেহলতা ছুটে এসে দরজা খুলেই সামনে থাকে দেখেছিলো সে হাসপাতালের লোক। চিঠিখানা হাতে পেয়েই এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলে সবটা, তারপর কোনও কথা না বলে পুথার হাত ধরে বেরিয়ে পড়ে হাসপাতালের পথে। পুথা বলে: মা, বাবা এলো না, আমরা একলাই সিনেমায় যাবো?

স্নেহলতার মনের মধ্যে বয়ে চলেছে প্রবল ঘূর্ণিঝড়, যাওয়া উড়ে গেছে সেই ঝড়ো হাওয়ায়। পুথার হাতে মৃদু টান দিয়ে বলে: চুপ কর পুথু।

হাসপাতালে জ্ঞান এসেছিলো অরুণাংশুর। একটু দেরী আর একটা কথার জন্যেই, বোধকরি, অপেক্ষা করছিলো সে। নির্বাক স্নেহলতা এসে দাঁড়ায় 'বেডের' পাশটিতে. একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে অরুণাংশুর দিকে। অরুণাংশু ওর একটি হাত নিজের হাতে টেনে নিতে চায়. কিন্তু পারে না। অমনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে স্নেহলতা। অরুণাংশু বলে: তুমি কাঁদছো লতা? তুমি কাঁদলে পুথুও কাঁদবে। ছিঃ, কাঁদে না।

স্নেহলতার তপ্তঅশ্রু একবিন্দু করে পড়েছিলো অরুণাংশুর ব্যাণ্ডেজবাঁধা হাতের উপরে. টের পায়নি কেউ। পর মিনে অরুণাংশু আবার বলে: লতা, পুথুকে কোলে নাও।

পুথাকে কোলে তুলে নেয় স্নেহলতা। আবার জ্ঞান হারায় অরুণাংশু। ডাক্তারদের সব চেষ্টাকে উপহাস করে সন্ধ্যের পর চলে গেলো সে। যাওয়ার আগে ঠোঁটদুটো একবার কেঁপে উঠেছিলো তার. হয়তো স্নেহলতাকে কিছু বলার ইচ্ছে ছিলো।

স্নেহলতা টিকিটগুলো ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলো

কেনাকাটা

মেট্রিক দৈর্ঘ্যে কেনাকাটা করুন

বর্তমানে সমগ্র দেশে মেট্রিক পদ্ধতির ওজন ও পরিমাপই হ'ল একমাত্র বৈধ পরিমাপ

মীটার অনুযায়ী কয়েকটি সাধারণ পোষাকের দৈর্ঘ্য এখানে দেওয়া হল:

ঝুল সার্ট:	১.৮৫ মীটার
সার্ট: (পুরো হাতার)	প্রত্যেকটি ২.৭৫ মীটার
কোট:	
ট্রাউজার:	
ব্লাউস:	০.৯০ মীটার

তাড়াতাড়ি কেনাকাটা এবং ন্যায়সঙ্গত লেনদেনের জন্য

মীটারের মাপে কিনুন

DA 68/246

বাড়ীতে, স্মৃতিচিহ্ন রাখবে বলে।

নিঃসহায় স্নেহলতার এখানে-ওখানে কেটে গেছে বেশ কিছুদিন, কিন্তু ওদের স্থায়ী ভরণপোষণের ভার বইতে কেউ রাজী হয়নি। বৈমাত্রেয় ভাই বুদ্ধের উপরেই একদিন জানিয়ে দেয় তার অক্ষমতা, বলে: দিদি, এতদিন নিজের চোখে আমার অবস্থা তো দেখলেই, বরং তোমার মামার কাছে যাও, তারা বড়োমানুষ, একটা হিল্লে কিছু নিশ্চয় করবেন। পুতু তোমার কথাই বয়, পুতুরও লেখাপড়ার একটা ব্যবস্থা করতে হবেতো। উত্তরের আশায় আর দাঁড়ায়নি সে, চলে গিয়েছিলো আস্তে আস্তে।

আর সেইদিনই মেয়ের হাত ধরে বেরিয়ে এসেছিলো স্নেহলতা।

ইচ্ছে ছিলো না, কিন্তু অনন্যোপায় হয়ে মামার সামনে এসে দাঁড়াতে হয়েছিলো সেদিন, যুদ্ধের সময়ে ব্যবসায় কালোবাজারি করে মামারা এখন গাড়ী বাড়ির মালিক। কিন্তু এই অসহায়াদের ভার নিজেদের কাঁধে স্বেচ্ছায় তুলে নিতে তারা অক্ষম। কিছুদিন যাদেই মামীদের মুখের ভাষা স্নেহলতার অসহ্য হয়ে উঠায় একদিন মামাদের অজান্তেই আবার অচেনা-অজানা পথে পা বাড়ায়।

দিন সবার জীবনে আসে আবার যায়ও। স্নেহলতার দিন কেটেছে তবে কখনও অর্ধাশনে, কখনও অনশনে। পালছেঁড়া-তীর না পাওয়া তরণীর মত যখন একদিক থেকে আর একদিকে অবিরাম চলেছে ভেসে ঠিক তখনই কাজটা পেয়ে গেলো ও। অকূলে কূল পাওয়ার মতই। আত্মসম্মানের টানা-পোড়েনে একটা দিন কেটে গেছে ওর। অবাধ্য মনটাকে শান্ত করেছে এই ভেবে যে দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন তুলে দিতে পারবে পুতুর মুখে, তার পুতু বাঁচবে, বড় হবে, মানুষ হবে।

ধনী ব্যারিস্টার মিস্টার সেন। আকাশচুম্বী অট্টালিকার পাঁজরে পাঁজরে পদার ও প্রতিপত্তি। স্ত্রী সহশীলা আর একমাত্র সন্তান পরমাণু—এদের নিয়েই সংসার। আর আছে মালী, চাকর, ড্রাইভার, ঝি, কুকুর। এরমি সংসারে দু'বেলা গিয়ে রান্না আর জলখাবার তৈরীর কাজ স্নেহলতার। বাকী সারাদিন-রাত দুটি। নিজের ছোট্ট ঘরখানিতে ফিরে একেবারে স্বাধীনভাবে নিজের কাজে ব্যস্ত থাকা। এই ফাঁকে চলে পুতাকে বাঁধুনি করার গুরুদায়িত্ব পালন।

দিনে দিনে নিজেকে সহজ করে নেয় স্নেহলতা।

পুতা 'ফ্রক' ছেড়ে শাড়ীর আড়ালে আসে। স্কুলের ছোট্ট গণ্ডী পেরিয়ে আসে কলেজের বিরাট হলঘরে, আশা আর আকাঙ্ক্ষায় ভরা বুক নিয়ে। দেহে তখন বসন্তের ছোঁয়াচ লেগেছে তার। কাঁচা সোনার রং, আকর্ণবিস্তৃত দুটি নয়নে স্বভাব-মধুর নির্লিপ্ততা কামনার রঙ্গে রাঙ্গা দু'টি অধর, কপোলের উপর নুয়ে পড়া কোঁকড়ানো একরাশ চুল, অবিভক্ত ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে দক্ষিণ পার্শ্বেঁষা ছোট্ট একটি তিল আর নিটোল স্বাস্থ্যে উজ্জ্বল যৌবনা সুন্দরী পুতা।

আর পরমাণু সেন। সবাই ডাকে পরম। কি মিষ্টি নাম। একটা অজানা মোহ যেন জড়িয়ে আছে নামটার অঙ্গে অঙ্গে, নামের সাথে সাথে দেহেও। প্রথম দর্শনেই যা' চোখে পড়ে তাহলো তার দীর্ঘ দেহ, প্রশস্ত বক্ষ, উন্নত-উন্নত ললাটের উপর ঝুঁকে পড়া কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ, বিস্ফারিত দুটি চোখে অনাড়ম্বর আসক্তির অভিব্যক্তি।

এই পরমের ঘর জয় করে সেখানে অধিষ্ঠিতা হতে কে না চায়? চেষ্টা করেছে অনীতা, সাবনা, মল্লিকা, নূপুর এরা সবাই। কিন্তু পারেনি কেউ। পুতা পেরেছে, প্রথম আলাপে কলেজের 'রিডিং-রুমে'। একমনে একখানা 'শঙ্কিকের' বই থেকে 'কোটেশন' লিখছিলো পুতা এমন সময় পরম ঢুকলো ওই বইখানার খোঁজে। বইখানা পুতার হাতে দেখে বাধ্য হয়েই অপেক্ষা করতে হয় তাকে। অনেকটা সময় বসে থাকবার পর বিরক্ত—হ্যাঁ, বিরক্ত হয়েই জিজ্ঞেস করে: আপনার দেরী হবে?

পুতা ওর দিকে না তাকিয়েই উত্তর দেয়:

সরি আপনার দরকার আছে কি?

: দরকার, কই না! আপনার সরি?

: তবে! একমনে 'কোটেশন' নিতে থাকে পুতা।

কিছুক্ষণ কোন উত্তর না পেয়ে আবার জিজ্ঞেস করে : তবে কিসের দেরী ?

: বইখানা একবার দরকার ছিলো তাই ।

: দেখছেন না ? কোটেশন বিচ্ছি ।

হতাশ সুরে পরম বলে : আচ্ছা ! তবে আজ থাক। বলেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় সে ।

ততক্ষণে খাতার উপর থেকে মুখ তোলে পুথা । মিলন হয় চারচোখের । সংকুচিতা হয় পুথা, সে ভাবতেই পারেনি কথা বলছে পরমের সংগে । পরক্ষণেই সহজ হয়ে বলে : বাঃ ! উঠলেন যে ?

পরমের আজ যেন ভাল লাগে পুথাকে। বুঝতে পারে না ওর চলে যাওয়া বা থাকায় পুথার কি লাভ বা ক্ষতি । তবু বলে : মানে ?

দুষ্টুমিতে ভরা হাসি হেসে পুথা বলে : মানে এমন কিছুই না ।

পরম অবাক হয় । পুথার এই অযাচিত কৌতুকে নিজেকে পুলকিত বোধ করে সে । হঠাৎ বলে বসে : যদি ধরে গিয়ে থাকে আসুন না আমাদের বাড়ী । বলেই লজ্জিত হয়ে পড়ে । কানের মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করে উঠে যেন ।

পুথা সশব্দে বইখানা বন্ধ করে অত্যন্ত সহজ সুরে বলে : চলুন, কিন্তু কেন বলুন তো ?

পরম উত্তর দেয় : লজিকের ওপর একটা 'ডিসকাসন' হতো আর কি ।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় পুথা । ঝুলী-ঝুলী দুটো যেন হাওয়ায় ভেসে উড়ে যায় 'রিডিং-রুম' থেকে ।

এই স্বল্প-সময়ের আসা-যাওয়া করে যে প্রাত্যহিক রূপ নিয়েছে, পুথা বুঝতে পারেনি । মিসেস্ সেনের যেন ও—ও একজন । সেনেরা দুজনেই ওকে খুব স্নেহ করেন, ভালবাসেন । এমন কি, মিসেস্ সেনের মনে ওকে পুত্রবধূ করবার একটা বাসনাও জেগে উঠে কখনও কখনও । সেন সংসারে পুথার একদিনের অনুপস্থিতি ওদের চিন্তার কারণ হয়ে উঠে । তাই কলেজ ছুটির পর ওকে আসতেই হয় পরমের সংগে । কলেজে পুথা হয়ে ওঠে আর সবাইকের ঈর্ষার কারণ ।

দিনে দিনে পরম নিজেকে হারিয়ে ফেলে পুথার মধ্যে । পুথাও পরমকে ছাড়া নিজের অস্তিত্ব কল্পনা করতে পারে না কোনমতেই । কিন্তু পুথার মনের কাঁটা ওদের ব্যবধান—আকাশ আর পাতাল ।

রোজকার মতই আজও এসেছে পুথা পরমের সংগে কলেজ ছুটির পর । হাতে হাত দিয়ে তরতর করে সিঁড়িবেয়ে উঠে এসেছে উপরে, পরমের ঘরে । একথা-সেকথার পর পরম ওর দুটি হাত নিজের হাতের মধ্যে শক্ত করে চেপে ধরে বলে : পুথু, মায়ের কি ইচ্ছে জানো ?

: না বললে কি করে জানবো বলো ? কি ?

একটু এগিয়ে আসে পরম পুথার কাছে, বলে : মা'র ইচ্ছে, পরীক্ষা হ'য়ে গেলেই আমার মা তোমার মা'র কাছে তার এই দুষ্টু ছেলের জন্যে ভিক্ষে চাইবেন ।

চমকে উঠে পুথা । বলে : ভিক্ষে ! কি ? আকাশ-পাতালের ব্যবধানটায় নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চায় আজ ।

পরম তা' বুঝতে পারে না, বলে : তোমাকে ।

পুথা নিজের মুখটাকে লুকিয়ে ফেলে পরমের বিশাল বুকে, যেন একটা নিভৃত আশ্রয় চায় সে ।

ঝন্‌ঝন্ করে চুরমার হয়ে গেলো খাবারভরা প্লেট-গুলো । চমকে উঠলো ওরা দুজনেই । স্নেহলতার হাতদুটো থরথর করে কেঁপে উঠেছে পুথাকে দেখে, মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠেছে হঠাৎ ; হাত থেকে পড়ে গেছে সব । চাকর ছুটি নিয়েছে তাই স্নেহলতা নিজেই এসেছিল দাদাবাবুর খাবার পৌঁছে দিতে । কিন্তু এ-কি দেখলো সে ! তবে কি স্বপ্ন ! না-না-না, তা' হয় না, কিছুতেই না । ছুটে বেরিয়ে গেল স্নেহলতা ঘরের বাইরে । আর সেইক্ষণে পুথাও 'মা' বলে একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে পরমের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে ।

এই বারোবছর কি শুধু স্বপ্নই দেখেছে স্নেহলতা ? আর পুথা-পরমও ?

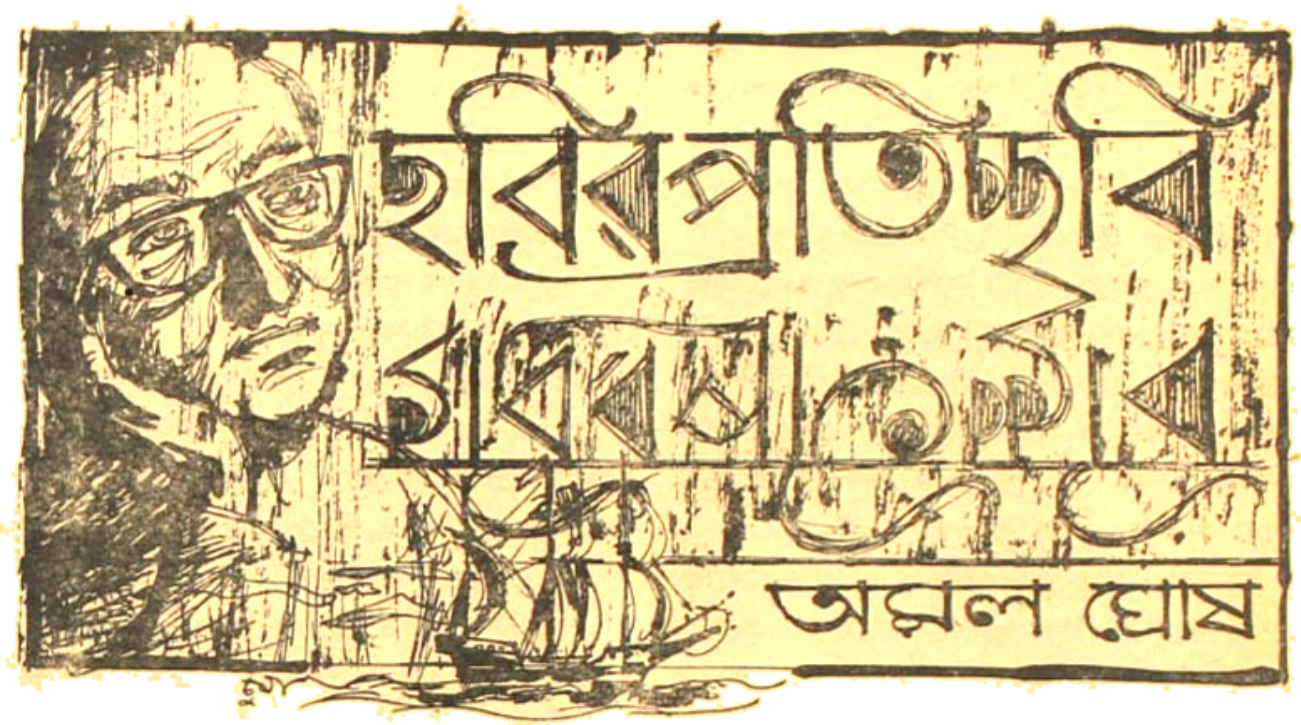

বিনা দ্বিধায় ইচ্ছে কোরে তাকিয়ে ছিলাম ক্যাপ্টেন ক্লাইভের দিকে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলাম এক তারুণ্যের নায়ককে। তার মধ্যে কি যে খুঁজছিলাম, তা জানা নেই। কাজেই মুখোমুখি দৃষ্টি বিনিময়ে সে যখন বল্লো, অমন কোরে কি দেখছো—তখন একটু চমকে উঠেছিলাম। সে ভাব তার লক্ষ্য যে এড়ালো না, সে বুঝতে পারলাম রবার্ট ক্লাইভের পরের কথাতেই : আমাকে দেখতে কী তেমন কুৎসিৎ দেখায়!

না, কখনোই নয়।

তাহলে অস্বস্তিকর কিছু নেই এইভাবে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখায়! তাছাড়া, দেখো, ভালো কোরেই দেখে যাও বন্ধু, আমাদের ছোকরা রবার্ট ক্লাইভকে। কে জানে ক্যাপ্টেন ক্লাইভকে ভবিষ্যতে আর দেখতে তেমন পাবে কিনা! পেলেও ভিড় ঠেলতে হোতে পারে কিংবা···

ক্লাইভ মুচকি হেসে একটু থামতেই বোললাম—কিংবা?

এমনও তো হতে পারে, আমার্ী ক্লাইভ ক্যাপ্টেন ক্লাইভের মতন সাধারণ মানুষ থাকবে না। ইতিহাসের রথটাকে সে সারথী হয়ে এত দ্রুত চালিয়ে নিয়ে যাবে যে সকলেই সবিস্ময়ে তাকে দেখতে চাইবে; দর্শন প্রার্থনায় অত্যাগ্র ব্যাকুলতা প্রকাশ না কোরে পারবে না। অনেকেই তখন প্রতীক্ষায় থাকতে হবে।

সেই কথাই শুধু ভাবছি!

সহসা ক্যাপ্টেন ক্লাইভের কী যেন হোলো। সে মনোজ্ঞ কণ্ঠে পরিবর্তিত সুরে বলে উঠলো, রেখে দাও তোমার ভাবনা। এসো এই স্তিমিত আলোতে কালাতীত সমারোহ যে বস্তুতে তারই সন্ধান করা যাক।

সে আবার কী?

সেই ত অমৃত! এই অমৃতের মুখোমুখি না হোলে জীবনটাই যে ব্যর্থ!

তবে তাই হোক!

ক্লাইভকে এতক্ষণে আরো উল্লসিত দেখছে। সে সোৎসাহে বোলে ওঠে, বন্ধু আমার যৌবনের অমৃত পিপাসার মধুরূপিনী এখনো শোনাইনি। যে বহু-মুখী জীবন স্রোত তলে তলে তোমাদের কথায়—"কল্পস্রোতে" একমুখীন হয়ে একটি মুখকেই কেবল স্মরণ কোরে এসেছে, আপদে-বিপদে, দুদিনে-দুর্দিনে সেই মুখখানিকে মিনিয়েচোরে ধরে রেখে দিলেও মনের কথা তো প্রতিচ্ছবিতে বেটে না, মিত্রবর!

আশ্চর্য তোমার অনুরাগ বন্ধু!

তোমার মনোজ্ঞ মন্তব্য শুনে আনন্দ পেলাম,

ক্লাইভ সাহেবে বলতে লাগলো ; তার কথাই ভেবেছি হ্যাঁরাকে. পথে ঘাটে, আরকটের দীর্ঘ অবরোধের দিনেও মাদ্রাজে এসে পৌঁছানো থেকে কত কত সকাল সন্ধ্যা কেটেছে কোর্ট সেন্ট জর্জে। প্রাচীরে চড়ে সমুদ্রকে চোখ মেলে দিয়েছি যতদূর দৃষ্টি যায়, জল, শুধু জল। অথৈ জলের ছলছল, শুধু শূন্যতার নিদারুণ হাহাকার। তারও ওপারে সে রয়েছে। যদি দূরের পালতোলা জাহাজে তার চিঠি আসে! সহজ একটা প্যাকেটে কিছু, তার হাতের স্পর্শ-ধন্য জিনিস। কিংবা একখানি নতুন ছবি।.....

সময় বয়ে গেছে অলস ধারায়। মন পবনের প্রান্তি এসেছে সমুদ্রকে উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে ঘরে ফিরতে। রাত্রি নিশীথে সমুদ্র হাওয়াতে ভেসে আসা শীত-লতাকে মনে হয়েছে তখন ; তারই প্রতীক্ষাপ্রান্ত চুম্বন। .....মাসের পর মাস বিগত হোলে পরে একদিন জাহাজ এসে ভিড়লো অদূরে সমুদ্র তীরে। ছুটতে ছুটতে দুর্গের সবাই এসে হাজির। কেউ হাসছে, এবারে একজন নারী আসছে। লণ্ডনে যারা অপাংক্তেয়-মাদ্রাজের পথে তারাই মোহনীয় রুপসী সুন্দরী। কেউ বলছে শুধু কোরেছে, এ যাত্রায় তার ভাগ্যে রুপোর মত চকচকে, সোনার মত জলজলে নর্তকী একজন জুটবেই। সে নাকি স্বপ্ন দেখেছে—এক জাহাজ বোঝাই কেবল নর্তকী আর নর্তকী! চারদিকে আলোর আলো করে রঙে রঙে রঙিন হোয়ে, জানুর উপরে সারারাত শুধু হৈঃ হৈঃ মাচ, কেবল মাচ! কেউ মনের উল্লাস মুক্ত কোরতে শিষ দিচ্ছে। কেউ বা চোখ ছানাবড়া কোরে চেয়ে আছে জাহাজটা শূন্য দিলে ফেলবার ক্ষণিকের চোখপুলোর দিকে।.....

জাহাজ ভিড়ছে অদূরে। মাল এসেছে ব্রিটেন থেকে।

এসেছে চিঠিপত্তর বিস্তর। দুচারটি মেয়ে মানুষও। বিয়াট আনাড়ংগ নিয়ে অনেকে ফিরেছে দুর্গে। কেউ কেউ বাউণ্ডুলে বোলেই মেয়েমানুষের শেষ্ঠ ফিরেছে। মেয়েরাও যেন ওদেরই চায়, বিশেষভাবে পছন্দ করে। আমার না আছে চিঠি, না আছে মনের মতন দ্রষ্টব্য কিছু। তাই চোখ বেঁধন করে! "ধুক ধুক ধুক," করে—এধারে করতে থাকে টন টন। কোথায় অনুরাগ কম্পন! দুদীর্ঘ সমুদ্র পারে ফিরে যেতেই প্রাণ উচাটন। কিন্তু কেরা ত যুদ্ধের কথা নয়।

একালের কথা শুনছিলাম সেদিন সমুদ্রের মুখে। এখন মাদ্রাজ থেকে মেলবোর্ন, লণ্ডন, ওয়াশিংটন যেতে পারা যায় সামান্য কয়েক দিনের জাহাজযাত্রায়; আকাশ পথে এক রাত্রিতে যানুষ একালে নক্ষত্রলোকে পাড়ি জমাতে চায়—চন্দ্র বৃহস্পতি শনি মংগল সবই প্রায় হাতের নাগালে তার। আর সেকালে চার থেকে আটমাসে জাহাজ পৌঁছাতো মাদ্রাজ থেকে লণ্ডনে। পথের বিপদ যা এড়াতে পারলে কোন দিনই পৌঁছাতো না আবার। সুতরাং লণ্ডন ফিরতে চাইলেই হোলো না। তা ছাড়া একালে কত কোম্পানীর কত রকমের, কত আরামের জাহাজ চলে। সেকালে আমাদের একমাত্র সম্বল ছিলো সেই বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জাহাজই। তাই শুধু বুকচাপা হাহাকার, নিরুদ্ধ বেদনার হায়! হায়! আর মনে মনে মানসীর ধ্যান-জ্ঞানই শেষ পুঁজি হয়ে দাঁড়ালো।.....

অতঃপর এলো যুদ্ধ। ফরাসী-ইংরেজের সাম্রাজ্য স্থাপনের জীবন মরণ সংগ্রামে আরকট যুদ্ধে ফরাসীদের শেষ আশার অকাল সমাধি রচনা কোরে যাদ্রাজে কোর্ট সেন্ট জর্জ দুর্গে ফিরে এলাম। পদোন্নতি হোলো। কিন্তু মনের ক্ষুধা মেটাবোর সাধ্য ছিলো না কোনো পদোন্নতিরই। বরং মাদ্রাজের গরম আর গরম মাথা পাগল কোরতেই কেবল বাকী রাখলো।

বন্ধু এডমণ্ড তো যথার্থই আমার পদোন্নতিতে। সে ভেবেই পায় না, মানুষের আর কী-ই বা চাই! একদিন মার্গারেটের বিনিয়েচার গোপনে চুম্বন কোরতে দেখে সে তো হেসেই খুন। তা অবশ্যি তার পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু নয়। সে যে ছিলো একেই অতি অল্পে সন্তুষ্ট প্রকৃতির। তাছাড়া মার্গারেটকে মনে কোরতো তারই মতন এক সামান্য কুমারী। তাই ওই সাধারণ মেয়ে যে অসাধারণ হোয়ে এই দুঃসাহসী বরাট ক্লাইভকে মন দিয়ে বোসে আছে—সে সত্য অনুধাবন করা দূরে থাক, আমার রক্তরাগ চুম্বনের দুর্লভ উপহাস কোরে উঠেছিলো—"তুমিও মজেছো!"

সে গেলো অনেক দিন আগের কথা। ক্রমে ক্রমে

একজন একদিন পরম বন্ধু হোয়ে উঠলো আবার। তারও ইচ্ছে হোলো মার্গারেটের সঙ্গে বন্ধুত্বের বিনিময় হোলে মনোরম হয়। সৌভাগ্যই বোলতে হবে—কি বলো! মৃদু মৃদু হাসতে লাগলো রবার্ট ক্লাইভ!

হাসি থামিয়ে এক সময় রীতিমত গম্ভীর হোয়ে সে বল্লো, সে কালটা যে কী ছিলো, এখন কল্পনাতে আনতে পারবে না কেউ। লণ্ডন থেকে মাদ্রাজ আসবার বিপদসংকুল পথে কে পাঠাবে ভালো ঘরের কনেদের। শিক্ষিত কুমারীরা আসতেই বা চাইবে কোন্ দুঃখে। এই পরমপ্রধান ভারতের মাদ্রাজে রাইটারদের অবস্থাই বা এখন কী উৎসাহব্যঞ্জক যে,কোনো কুমারী "হ্যাপি লাইফে"র প্রত্যাশায় তাদের কাউকে বরণ কতে ব্যাকুল হবে? আমার কথাই ধরো না কেনো, ক্লাইভ বলে চল্লো—সামান্য সিটনস বলতে আহারের জন্য বরাদ্দ যৎসামান্য অর্থপ্রাপ্তির অঙ্গীকারে রাইটার হোয়েছিলাম—আর দশজন রাইটারেরই মতন। তার উপরি ছিলো বিনিভাড়ায় মাদ্রেয়াজ বাসাবাড়ী, চাকর আর কম দুলো কোম্পানীর আমদানী বিলেতি মদের ব্যবস্থা। চুরি, ছোচ্চুরি, অসৎ পন্থায় অর্থ উপার্জন কিংবা গোপন ব্যবসায়ে পকেট স্ফীত না কোরলে সেই আমলে কোনো রাইটারই পরিবার প্রতিপালন স্বচ্ছলভাবে কতে কখনোই সক্ষম হোতো না। কাজেই···

তার কথার বাধা দিয়ে প্রশ্ন কোরলাম—তবে যে ইংল্যাণ্ডে সবাই বোলতে এককালে রাইটারদেরই বোঝাতো!

সে এই ক্লাইভের লর্ড ক্লাইভ হওয়ার পর থেকে বন্ধু, প্রাকপর্ব থেকে নয়! সত্যি কথা বোলতে কী, প্রকৃত-রবার্ট ক্লাইভ প্রথম রাইটার থাকে "সবার" বলে সেকালে ইংরেজরা জানত। সেও আমার মাদ্রাজের জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ের ঘটনা! সে আরেক মানুষের কাহিনী ভিন্নতর! এই প্রেম-পাগল যুবক ক্লাইভের সঙ্গে সেই চার্ণকের কলকাতা উদ্ধারের আর সিরাজউদ্দৌলা বিপাকের নায়ক ক্লাইভের অনেক ব্যবধান!

মানুষ বুঝি অত ঘন ঘন বদলায়?

দুনিয়া বদলায় তার আর মানুষ, সহজ কণ্ঠে উত্তর করে ক্লাইভ। সেই উত্তরের জের টেনে বলে, কেউ বা বদলাতে বাধ্য হয় দুনিয়ার তাগাদায়: কেউ বা বদলায় আবার নিজের তাগিদেই। তাছাড়া জীবনটা কখনো অনড় অটল পাথর। পাথরও ক্ষয় অবশ্য হয়। সে থাক;—জীবন চলে নদীর স্রোতের মতন চলমান প্রবাহে। প্রত্যহ নতুন তার রূপ, নতুন তার রূপান্তরিত স্বরূপ। তাই ত বন্ধু বলেছিলাম, মাদ্রাজের ক্লাইভ, যুবক বদমেজাজী রবার্ট ক্লাইভের রূপ ও স্বরূপান্তর হয়েছিলো তার চার্ণকের কলকাতা পুনরুদ্ধারের সংবাদে।·····

আর রূপান্তর কার না হয়েছে? তোমাদের যথা-ঐতিহাসিক মহান সম্রাট অশোকের হয়নি?

হয়েছিলো। তিনি হয়েছিলেন চণ্ডাশোক থেকে ধর্মাশোক। এইখানে মহত্তর পার্থক্য।

ক্লাইভ হঠাৎ আমার অন্তরকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে ভেদ কোরে দেখে নিতে চাইলো। এমনভাবে তাকালো, অন্তত অস্বস্তি অনুভব কোরতে লাগলাম। এমনভাবে "ও" তাকাতে পারে—কল্পনাতেও আসিনি। ব্যথা কেমন কোরতে লাগলো।

ক্লাইভ সেটা লক্ষ্য কোরেই চোখ নামিয়ে নিলো। তারপর চোখমুখ নিজের হাতে ঢেকে কিছুকাল আশ্চর্য ভঙ্গীতে স্থির হোয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। পরে হঠাৎ সজোরে নিজেরই হাতে চোখমুখ মুছে কেমন যেন মনের ভাবটাকে ঘটিয়ে দিয়ে বল্লো, ক্লাইভের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাও সম্রাট অশোকের কালে হোলে সেও ধর্মবিজয়ের ঘোষিত হোক্-না-হোক পলাশীর চেয়ে বেশি গোলা-গুলির অপব্যবহার কোরতো না নিশ্চয়, তবে কি না দুটো যুগই যে আলাদা। এক এক যুগের দাবীও যে পৃথক পৃথক বন্ধুবর! তা না হলে—তোমাদের এখানে গণতন্ত্র আর সমাজতন্ত্রবাদীরা সমানে এটম-হাইড্রোজেন-নাইট্রোজেন বোমার লীলাখেলায় কেমন কোরে মাততে পারে, কেমন কোরেই বা তারা মহা-সমারোহে সেরা সম্মর্দনা লাভ কোরে একে অন্যের মুণ্ডপাতে গলাকাটাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লেগে যায়! আবার সন্ধি কোরতেও উদগ্রীব হয়!

ভাববার কথা বটে।

থাক্‌গে বন্ধু, ওসব পলিটিক্সে মাথা ঘামিয়ে কি হবে যেতে উঠে। তার চেয়ে "যার কাজ তারই সাজে" নীতি অনুসারে এসো স্মৃতিমন্থনে।

স্বদেশও ভাবিনি ক্লাইভ এত শীঘ্রি অমন স্মৃতি উদ্বেলক ও লোকরঞ্জক আলোচনায় ইতি টানবে।

রাত্রির আকাশে এখন অসংখ্য তারা। ওরা চলেছে উদয়তীর্থের অভিসারে। আর ক্লাইভ বলছে তার প্রিয়া মিলন প্রত্যাশার নিশীথ ইতিবৃত্ত। সেও কী বলতে চাইছে—শেষ নিশীথের ভরাট অন্ধকার আগামী প্রত্যুষেরই আলোকোজ্জ্বল ইঙ্গিত!

এক আকাশ তারার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ক্লাইভ বল্লো—মাদ্রাজের আকাশ বড় সুন্দর। এমন জ্যোতির্ময় আকাশ কত রাত্রিতে দারুণ দুঃখে নির্জনের প্রস্তর প্রলেপ লাগিয়ে মনকে শান্তি দিয়েছে—প্রাণের পাষাণ ভারকে কোরেছে লঘু! মনের মনে তখন অন্য চিন্তা এসেছে। ধীরে অতি ধীরে অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে উদ্দেশ্য লক্ষ্য রেখে এগিয়ে চলতে হবে। ভগ্নহৃদয়, ওষ্ঠাগত প্রাণ কোলে তো চলবে না। মিলবে না মনোমত লক্ষ্য। ব্যাকুল বাসনাকেও সাধতে হবে কঠিন সংযমে। সুকঠোর সাধনাতে পেতে হবে প্রেয়সীকে।

মধ্যে মধ্যে খবর আসে: ইংল্যাণ্ডে চেষ্টা চলছে কিছু কিছু ভদ্র কুমারীকে মাদ্রাজে পাঠাবার। আরেকটি করাসী ও করাসীদের দোস্ত চাঁদা সাহেবের সেপাইদের পরাজয় সংবাদে ভারতবর্ষের প্রবাসী ইংরেজদের জাতিচ্যুতির আশঙ্কা একরকম চলে গেছে। সামান্য রাইটার থেকে ব্রবার্ট ক্লাইভ ক্যাপটেন হোয়ে ইংরেজ জাতের জান মান বাঁচিয়ে দেওয়াতে রাইটাররাও সমাজে পাংক্তেয় হোতে চলেছে। এই সময় মার্গারেট যদি বুদ্ধি কোরে মাদ্রাজে পাড়ি জমায়।...

কল্পনায় বিভোর হোয়ে যাই উদাস নয়নে ক্লাইভের কোন প্রজন্ম প্রেরণায় সংকেত শোভায় দীপ্তি:—তাই তার কথাতেও আবেগের স্রাবণ: লণ্ডন থেকে মাদ্রাজ। জল বিতরল সমুদ্র পথ। পথে জলদস্যুর ভয়। কুমারী কন্যাদের লুটে নিয়ে দাসব্যবসায়ীদের কাছে ওরা বেচে দিয়ে বেশ মোটা আয় পায়। তারপর.....সে শিউরে ওঠে! যদি মার্গারেটের জায়গা হয় কোনো হারেমে ...না, না, সে হোতেই পারে না।.....

অস্থিরভাবে মুষ্টিবদ্ধ হাত ছুঁড়তে থাকে ক্লাইভ। পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, আমাদের ব্রিটিশ জাহাজে জলদস্যুদের হানা দেবার দুঃসাহস আর হবে না। জলশক্তিতেও ব্রিটিশ হতে চলেছে সমাগরা পৃথিবীর দেরা। স্পেনকে সায়েস্তা কোরে ছেড়েছে। পর্তুগীজদের ক্ষমতাকে সীমিত কোরে করাসীদের সচকিত শিক্ষা দিয়েছে। এর পরেও কোনদেশের জলদস্যুর দুঃসাহস হবে—ব্রিটিশ কুমারীদের অংগস্পর্শ কোরবার! সে—স্বপ্নেই শুধু সম্ভব!..... বোলতে বোলতে উৎফুল্ল হোয়ে উঠলো ক্লাইভ! তারপর স্বগোক্তির স্বরে বোলতে লাগলো:

এখন তো আর সেই স্পানীশ আর্মাডার দিন নেই। তার দর্পচূর্ণ কোরে ছেড়েছে আগেই ব্রিটেনের নৌবীরেরা। ড্রেক সেই কবে জলপথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ কোরে এসেছে। নতুন পৃথিবীর বুকের উপরে অদূর ভবিষ্যতে যারা স্বর্গসৃষ্টিতে উদ্যম হোয়ে উঠবে তারাও সেখানে পেঁছে গেছে ব্রিটেন থেকে।

এই ভারতবর্ষেও ব্রিটিশের মান সম্মান, প্রভাব প্রতিপত্তি সকল বিদেশী জাতির উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত—এই তো শুভমুহূর্তে এই ভূখণ্ডে ব্রিটিশ কুমারীদেরও প্রাধান্য বিস্তারের! এই মনোরম্য ক্ষণে কুমারী মার্গারেট জাহাজে চেপে আসলে কে ঠেকায় তাকে!.....

কিন্তু.....

কিন্তু আবার কেনো?

কে তাকে আনাবে! কুমারী মার্গারেট এমনিতে আসবে কেমন কোরে। বিনা আমন্ত্রণে বর খুঁজতে আসার আমল তখন আসেনি। তাতেই পরম "কিন্তুর" উৎস নিহিত বহু! অবশ্য.....ক্লাইভ একটু থামলো কি যেন ভাবতে লাগলো। ভাবতে ভাবতে ভাবনার কূলকিনারা পেল কী-না, সেটা সহজে বোঝা গেল না।.....

আমি আর কি করবো, আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলাম। অনেকক্ষণ। তারার খেলায় সেই আকাশকে দেখতে দেখতে তন্ময় হোয়ে যেতে চাইলাম। এমন সময় ক্লাইভের কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙলো।

অবশ্য এতক্ষণ ছিলো। কুমারী মার্গারেটের আপনার জন আর ছিলেন—মিসেস এলিজাবেথ, কুমারী মার্গারেটের পিসি হোতেন তিনি। ভদ্রমহিলাকে যথেষ্ট মানমানতা করতাম আমি। সম্ভ্রমোচিত আন্তরিক সম্ভ্রমে আনত হোয়ে সপ্রশংস বিনীত নয়নে যখন মুখ তুলে তাকালাম সহৃদয়তায় বিগলিত না হোয়ে পারতেন না তিনি। তাছাড়া ভাইঝির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর পুরুষের ভাগ্যে একদৃষ্টে অঙ্কিত হোক—এ নিশ্চয় চাইতেন মিসেস এলিজাবেথ। কিন্তু, তাই বলে রাইটার রবার্ট ক্লাইভের প্রতি প্রথম প্রথম তেমন স্নেহদৃষ্টি তাঁর পড়েনি। ক্রমে সেই রবার্ট ক্লাইভ একদিন যখন কোর্ট সেন্ট জর্জের ডিপুটি গ্যারিসন্ (?) ভূ পদে বহাল হলো, নাম কাটতে লাগলো কোম্পানীর মূলকেন্দ্রে, লণ্ডনের সোসাইটিতে পর্যন্ত. তখনকার কথা একেবারেই আলাদা। এডওয়ার্ড ও মিসেস এলিজাবেথ রীতিমত উৎসাহে ও সাগ্রহে মন্ত্রণা আঁটতে আরম্ভ না কোরে আর কী পারে না! পারে না এই আমি (?) হাতছাড়া হোয়ে যায়—সেই আশংকায় বুদ্ধিমতী পিসি ও সেই মুহূর্তে মার্গারেটকে মাদ্রাজ আসতে পারলে ছাড়েন না।..... কিন্তু সমুদ্র সমুহ বাধা! কী কোরবেন আর! সুতরাং অধিক অস্থিরতায় ঘন ঘন চিঠির তাগাদা দিতে উঠে পড়ে লেগে যান! দুর্ভাগ্যক্রমে সে চিঠিও সেকালে "হোমে" পৌঁছাতে যা অস্বাভাবিক দেরী কোরে দেয় সে কহতব্য নয়। তবে সৌভাগ্যক্রমে ঘন ঘন জাহাজ বোঝাই কুমারী মার্গারেটরা ও যে মাদ্রাজে আসে না, সেইও সান্ত্বনা পিসির!

ঢং ঢং ঢং ঢং। পাশের গীর্জার চারটে বাজলো। ঘন্টির আওয়াজ তরঙ্গে তরঙ্গে ভেসে বেড়াতে লাগলো চারপাশের আকাশে। তারাগুলো মিটমিটে ওরা একটু কোরে উস্কে দিতে লাগলো আকাশ প্রদীপের আলোগুলো সলতেকে। ঝিকমিক কোরে উঠলো দশদিক।

রবার্ট ক্লাইভ কি যেন ভাবছিলো! নিশ্চয়ই তার বাগ্‌দত্তা বধূর কথাই। সে আসবে অবশ্যই। এ বিশ্বাস ক্লাইভের আজ রাতের সব চেয়ে বড় বিশ্বাস। তার নিজের জন, আত্মীয় স্বজন যে যেখানে রয়েছে—সকলেই রবার্ট ক্লাইভকে এখন পরমাকাঙ্ক্ষিত পাত্ররূপে গণ্য কোরেছে—এ একরকম ধ্রুব সত্য। শুধু সমস্যা কতদিনে কুমারী মার্গারেটের কায়ার ছায়া দেখতে পাওয়া যাবে কোর্ট সেন্ট জর্জের অদূরের জাহাজ ঘাটায়। তারপর ওই কায়া যতই এগিয়ে আসতে থাকবে—ছায়া ততই হবে অপসারিত। রক্তমাংসের প্রাণোচ্ছল কুমারী, নারী ও মানবীরূপে আপন সত্তায় ও স্বকীয় মহিমায় ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে থাকবে কোর্ট সেন্ট জর্জের প্রাচীর তোরণদ্বারের অভিমুখে। তারপর এক সময় দুর্গের লৌহ কপাট কড়াৎ কড়াৎ কড়াৎ কোরে খোলার শব্দ উঠবে জেগে। ক্লাইভ এডমন্ড মিসেস এলিজাবেথকে সঙ্গে নিয়ে দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ কোরবে কুমারী মার্গারেট। ব্যারাকগুলোর যে দুর্দশা—দেখে কী না জানি ভাববে সে। কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নেবে তার প্রিয়তম আর সেই সামান্য রাইটার নয়, সে যে এখন এ দুর্গের তত্ত্বাবধায়ক। ডিপুটি গ্যারিসন্ (?) ভূ! বলতে যায় না—এর আগেই ইয়েল সাহেবের এক রাইটার সামান্য কয়েক বছর

কাজ কোরে অতি সামান্য হাইটার থেকে কেউ সেণ্ট জেম্‌সের গভর্ণর পর্য্যন্ত হয়েছিলেন। কত হাজার হাজার টাকা কোরেছিলেন। কত দান তার। কত নাম হয়েছিলো। এখন যে আরো বিরাট ব্যূহ। আরো কতশক্তি ব্রিটিশ রাজত্বের। এরপর ফ্রাইড যে গভর্ণর হবে না—সেই বা কে বোলতে পারে হলপ কোরে! চক্‌চক্‌ কোরে উঠলো বুঝি কুমারী মার্গারেটের অদ্ভুত চোখ দুটি!

এতক্ষণে ফ্রাইডেরও হুঁশ হোলো। সে বল্লো, নিজের কথা ভাবি না। ভাবি—মার্গারেট সুইটহার্ট আমার, ডার্লিং আমার! কত কষ্ট হবে তোমার, সমুদ্রপথে পাড়ি জমাতে। অবশ্য ফ্রাইডের ভাবীবন্ধু শুনলে তোমার ভাবনার কিছু থাকবে না। শুধু এজ্বার জাহাজে চড়ে বসতে পারলেই হোলো। হ্যাঃ বন্ধু,……সেদিন সংবাদ পেলাম এজমণ্টকে লেখা চিঠিতে—সে পরের জাহাজে রওয়ানা হচ্ছে! চিঠি খানি বুকে নিয়ে পকেটে পুরলাম। ছুটে এলাম আবাসে। সেখানে চাকরদের ভাগিয়ে দিয়ে মনের আনন্দে চুম্বন এঁকে দিলাম অজস্র আবেগ উজাড় কোরে—ওরে মার্গারেটের চিঠি। হোক না—এজমণ্টকে লেখা! তার পর থেকে ঘুম পালালো। তবু চমৎকার লাগতে লাগলো! নিজের কাছে নিজেকে কত যেন প্রিয় মনে হোলো। আস্বাদ কোরতে চাইলাম মার্গারেট সুইট-ডার্লিং কী কী চাইবে। কোন রঙটি তার নয়নে লাগবে ভালো। সকালে কোন পোষাকে আমাকে সে পছন্দ কোরবে। ডান্সিতে কোন্‌ সরাব তার প্রিয় হোতে পারে। পঞ্চমকণ্ঠে কেমন পানপাত্র তার মনোমত? রাতের কাজে কোন কোন জিনিস চাই মনের অমনে? জাহাজে প্রথম রাত্রিতে সে কী ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়বে। ঘুম তার আসবে তো! জাহাজের কাছাকাছি জাহাজে পৌঁছাবার মুখে প্রথম তার কাকে দেখতে ইচ্ছে কোরবে? হয়তো মনে মনে, তার ঘায়াল প্রেমিক সুইট ফ্রাইড এখনও কী তেমনটি আছে—না কেবল নিজের প্রতিষ্ঠার জেল্লাতে ঝলমলাচ্ছে। আসলে সত্ত কিছু ভাবতেই পারবে না প্রবল উত্তেজনায়। জিলেবোরা হয়ে গড়বে। কিংবা অসাবধানতায় ফেলে ফেলবে তার মনটাকে। এমনি কত শত সরল ভাবনায় রাত ভোর করে দিতে লাগলাম বিভোর।

চমৎকার, আরো বলো তোমার পূর্বরাগের ব্যাপার বন্ধু!

হ্যাঃ। সে রাতেও ভাবছিলাম মার্গারেটের কথা। উৎসাহে অস্থির হোয়েই ভাবছিলাম। উত্তেজনায় কাঁপছিলাম ঠিক সেই পরিবার বুকে দৈন্যাক্রান্ত জেলাটাকে জাহাজ বোঝাই উড়িয়ে দেবার সময়কার উত্তেজনার মতন। ভাবতে ভাবতে ব্যতিব্যস্ত হোয়ে উঠেছিলাম—আর দেরী কত তাহাজ আসবার! সমুদ্রের হাওয়াতে মার্গারেটের মন কেমন কোরছে নিশ্চয়! ঢেউয়ের জন্যে সে কী ব্যাকুল হোয়ে উঠেছে! আমিও যে লণ্ডনে ছুটির দরখাস্ত কোরে রেখেছি। একেবারে ডোভারে হোয়ে ফিরবো।…

কিন্তু জাহাজ যদি পথ ভুল করে! আকাশের নক্ষত্র দেখে পথ চেনা। নক্ষত্র নিরীক্ষণে সামান্য ত্রুটি ঘটলেই জাহাজ পথ ভুলতে বাধ্য। তাছাড়া ক্যাপটেন কতটা অভিজ্ঞ হবে—কেই বা জানে। অনভিজ্ঞ ক্যাপটেন আনাড়ি হাতে জাহাজ চালালে তো অহেতুক দেরী হবেই!…সমুদ্রে ঝড় যদি ওঠে? তাহলে চরেছে। জিনিস-পত্তর, বাক্স-পেটিরা, হোচকা, বিছানা; জাহাজের আলমারি, ড্রয়ারপত্তর সবই একাকার হোয়ে গলা পানিতে যাবে। তখন কী অবস্থা যে হবে মার্গারেটের। এক বিন্দু জলই পাবে না, আর চা কিংবা মদ তো স্বপ্ন বিলাস! ঝড়ে, সাইক্লোনে, হ্যারিকেনে জাহাজ ডুবিও তো হোতে পারে। না, না—ভগবান কিন্তু অতটা নিষ্ঠুর কিছুতেই হবেন না!…

সেই রাত যখন ভোর হব-হব—এমন সময় সবাই ছুটতে লাগলো সমুদ্রের দিকে। এজমণ্ট এসে দরজায় ধাক্কা দিয়ে আমাকে তুলে দিলো। ডিনেস এলিজাবেথ ষ্টীমশিপ কনের পিনিসটি নেমে এলেন। চমৎকার লেগেছিলেন তিনি।……ছুটতে ছুটতে আমরা তিনজনে জাহাজ ঘাটে যখন পৌঁছালাম—তখনও জাহাজ অদৃশ্য!

যতদূরে চোখ যায়, নীল জলের অসীম বিস্তার আর তারই বুকে কাছে দূরে জাহাজে জেলে ডিঙির মেলা।

ভোরের ম্লান আলোতে গর্জাতে গর্জাতে ঢেউ ছুটে আসছে—অবোধ শিশুদের মতন। তটরেখার বালুকা-রাশি যেন ওদের মায়ের আঁচল।

অন্যান্যবার আমি অন্যাদের দেখেছি। বেশী কাছ থেকে দূরে কোরে ঠেলেছি ওদের অন্তহীন অধীরতা দেখে। আজ ওরা ভাকিয়ে হাসছে বুঝি আমাকে লক্ষ্য করে। আমার লুকানো অন্তরে আর্ত কোমল অধীরতা সকলের কাছে জানাজানি হোতে বাকী নেই। ওরা তাই ধৈর্য হারিয়ে হাসছে আর আমি বুক ঠুক ঠুক ভাবখানাকে চেপে রাখতে গিয়ে নিজেকে কী ঘায়াতে বসেছি! আশ্চর্য জাহাজখানা আসতে এত দেরী কোরছে কেন। পীপিগর আসতে ওর কী বাইবেল অশুদ্ধ হোয়ে যাচ্ছে। আজ সত্যিই অসম্ভব দেরী কোরছে জাহাজ আসতে।···এতো দেরী আমাকে অস্থির না কোরে ছাড়বে না দেখছি।

এমন সময়ে এজমণ্ড যেন চীৎকারের সংগে বলে উঠলো, ওই যে পাল দেখা যাচ্ছে।

খুশিতে বুকটা আমার দুলে উঠলো। মনটা উঠলো উৎসবপিয়ে। চোখ দুটো ভাগর হয়ে চেয়ে রইলো পালের উদ্দেশ্যে।

হঠাৎ কানে এলো, কে বোলছে, ভাবখানা দ্যাখো না—আহ্লাদে আটখানা।

কাকে উদ্দেশ্য করে বলা সে জানতে বাকী রইলো না। আহ্লাদে আমার মনে মনে নাচ লেগেছে—ওই জাহাজে মার্গারেট আসছে, ডিয়ার, ডার্লিং, সুইটহার্ট!···

ওই, ওই যে নোঙর তুলিয়ে দিলো। ওই তো নোঙর ফেললো। দূরের কলক ভুলে সমুদ্রের সুনীল বুকের অতলে নেমে গেলো নোঙরটা। সমুদ্র হেসে খুন। হাসির ঢেউ নিয়ে নিজে নিজেই সে খেলছে। ওরও বড় ভালো লেগেছে মার্গারেট এসেছে জাহাজে। ও যে এই ক্লাইভের বুকের ভাষা বুঝতে পারছে। মনের কথা শুনতে শুনতে তালে তালে নাচছে।·····

জাহাজ ঘাটে ভেড়ানো হোয়ে গেছে। পৃথিবীর সব পালটাচ্ছে। দিনের আলো ঝলমল কোরে আশ্চর্য রূপে আরো ফুটে উঠতে উৎসুক।

আমার চোখে যেন চোখ পড়লো মার্গারেটের—ওর চাহনিতে একটিমাত্র বক্তব্য ছিলো—ডার্লিং, আই লাভ ইউ!·····কত দরদ ওই দুটি চোখে!

এদিকেও ভোর হোয়ে আসছিলো। আশে-পাশের কুলগাছগুলোতে কুল পরীরা উঁকি ঝুঁকি দিতে লেগে গেছলো। সুবাসে তাদের মাতাল মন! একবার ঘোরগ ডাকলো। ডাক শোনা গেলো নাম না জানা পাখীরও।

আকাশ আনন্দময় শান্ত। বাতাস মধুময়! সুবাসরা সুপ্রভাতের আগমনী—আলপনা আঁকিতে ব্যস্ত দিগবধূরা। অনিন্দ্য নিবৃত্তিচিত্তে নির্ভুতে রবার্ট ক্লাইভ তাকিয়ে আছে সেন্ট মেরিস চার্চের চূড়ার দিকে। এইখানে কোন্ রহস্যনিয়ন্তা তার জন্যে প্রতীক্ষা কোরছে অনিবার্য আগামীর জীবন-যাত্রাকে সার-অসারের নানা গর্ভাংকে জড়িয়ে দিতে।

আমার দিকে একসময় ফিরে তাকায় ক্লাইভ। একটু ক্ষণ চুপ কোরে শুধু তাকিয়েই রইলো। পরমুহূর্তে খুব ঘনিষ্ঠ কণ্ঠে বল্লো: যাঁহারা হাঁচে ঢলা খাস খৃষ্টান রীতিতে দাতের শত তিপান্ন খৃষ্টাব্দের আঠারই ফেব্রুয়ারীতে কুমারী মার্গারেটের সংগে এই কোর্ট সেন্ট জর্জের ফিউঅ্যা(র্)ড্ রবার্ট ক্লাইভের বিবাহবন্ধন রেজেস্ট্রী হোলো ওই সেন্ট মেরিস গীর্জাতে। রেভারেণ্ড ক্যাথরিসিয়াস দিলেন সেই ঐতিহাসিক বিবাহ!···

ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং। সেন্ট মেরিস চার্চের ঘড়িতে পাঁচটা বাজলো। ভোর হোলো! অর্জন ক্লাইভের প্রত্যাবর্তনের তাড়া উঠলো!

আমি বোললাম, সে কী! এত শীগ্‌গির! অন্তত ব্যস্ততা জাহাজের রক্তিমরাগের আভাসটা দিয়ে যাও।

তাড়াতাড়িতে সে বল্লে, তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। শুধু পুর্ণতর পরিচয়। পুর্ণতর দৃষ্টি আর পুর্ণতর অন্তরঙ্গতা—অনাবশ্যক আবেগে অকস্মাৎ গলাটা তাঁর কেঁপে উঠলো।

সুপ্রভাতের আজ প্রকাশ হয়ে দুয়ারের বলমলে কোরে তুললো!

[চলবে]

ট্র্যাজেডির ত্রিবিধ ঐক্য

জীবনকৃষ্ণ শেঠ

গ্রীক ট্র্যাজেডির কায়া নির্মাণে সুদৃঢ় সংহতি লক্ষণীয়। অস্তিশিনদ্ধ এর গঠন। সংহত এবং স্বল্পাবয়ব অথচ কথাবস্তুর মধ্যে এর সামগ্রিক প্রকাশ। বহুপ্রসারিত বিস্তার বা বৈচিত্র্য এর নেই। The principle which underlies the structure of the greek tragedies is the desire for intensity rather than variety of impression. (Unity of structure-- ch V. The Tragic Drama of the Greek—Page 337.)

এই সুদৃঢ় সংহতি রক্ষা করতে গেলে ত্রিবিধ ঐক্যের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল : স্থানৈক্য, কালৈক্য অর্থাৎ দেশকালের অবিচ্ছিন্ন ধারা এবং নাটকের কর্মগত ঐক্য বা সংহতি। কালসংহতি নিয়ে আরিস্ততল কী বলেছেন দেখা যাক। কথাটা উঠেছে মহাকাব্যের সঙ্গে নাটকের দৈর্ঘ্যগত পার্থক্য নিয়ে। They differ again in their length ; for tragedy endeavours as far as possible to confine itself to a single revolution of the Sun or lent slightly to exceed this limit ; whereas the epic action has no limits of time, আপাতদৃষ্টিতে সূর্য ২৪ ঘণ্টায় একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। নাটকের ঘটনা-প্রবাহ এই কালপরিধির বা কিছু বেশি সময়ের মধ্যে নিবদ্ধ থাকবে। মহাকাব্যে কালের কোনো পরিধি নেই। যে কোনো মহাকাব্যে কাল বিস্তৃত দীর্ঘায়ত রূপ চোখে পড়ে। নাটকের ক্ষেত্রে কিন্তু কালসংহতির প্রশ্ন অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। যে কোরাস থেকে গ্রীক ট্র্যাজেডির উদ্ভব সেখানে কালগত নীতির এমন বাধ্যবাধকতা ছিল না। কিন্তু নাটকীয়তার বিকাশ এবং বিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কালসংহতির প্রশ্ন এসে পড়লো। কালের ধারা অবচ্ছিন্ন হলে ঘটনাপ্রবাহের সংহতি নষ্ট হয়, ফলে দর্শকের চিত্তবিক্ষেপ ঘটে। গ্রীক ট্র্যাজেডির রচয়িতৃগণ মোটামুটিভাবে এই নীতি মেনে নিয়েছেন। তবে ব্যতিক্রমও আছে। এস্‌কাইলাসের The Agamemnon এবং The Eumenides-এ এই নীতির ব্যত্যয় ঘটেছে। The Eumenide প্রথম ও শেষ দৃশ্যের মধ্যে কয়েক মাস অথবা বৎসর ঘুরে গেছে। The Agamenon নাটকে ট্রয়নগরীর পতনে এবং এ্যাগামেমননের প্রত্যাবর্তনের মধ্যে স্পষ্টতঃ কতটা সময় যা জানতে পারলেও অনেকখানি সময়ই কেটে গেছে। পরবর্তীকালে সফোক্লিসের ট্র্যাজেডিতে কালসংহতি দৃঢ়ভাবে রক্ষিত হলেও কোথাও ব্যতিক্রম নেই এমন কথা বলা যাবে না। তাঁর The Trachiniae এবং ইউরিপাইডিসের The

Supplices-এর এ-নীতি মেনে চলা হয়নি। এর জন্য নাটকের শিল্পগুণ খুব ক্ষুণ্ন হয়েছে এমন কথা বলা যায় না।

কাল সংহতির ইতরবিশেষে নাটকের উৎকর্ষ যে ক্ষুণ্ন হয় না তার প্রমাণ আছে জগতের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার সেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডিতে। সেখানে এ নীতি ভংগ করাই নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুতঃ এ নীতি এতই কৃত্রিম ও বাহ্য ব্যাপার যে একে ভংগ করাই বিধেয়। গ্রীক ট্র্যাজেডিতে এ-নীতি রক্ষা করা সম্ভব ছিল হয়তো প্রয়োজনও ছিল। সেখানে চরম এবং পরম নাটকীয় সংকটকে উপস্থাপিত করা হোতো। ঘটনাবিরল স্বল্প-কায় তার পরিসর। পঞ্চাংক নাটকের তৃতীয় অংক যেখানে ঘটনা তুঙ্গী অর্থাৎ শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছেছে গ্রীক ট্র্যাজেডি তারই রূপায়ণ. তাই কালসংহতির প্রশ্ন সেখানে সংগতভাবেই এসে পড়েছে। আসল কথা ভাবসংহতি রক্ষা আর সেইজন্যই কালসংহতির প্রশ্ন আসে। কিন্তু তাই বলে এ বিধান অপরিহার্য নয়।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে রোম্যান্টিক ট্র্যাজেডিতে এবিধান ভংগ করাই নীতি। রোম্যান্টিক ট্র্যাজেডির অন্যতম প্রধান লক্ষণ চরিত্রের বিকাশ ও বিবৃদ্ধি (character in growth) ২৪ ঘণ্টা কালব্যাপ্তির মধ্যে এই বিকাশ ও বিবৃদ্ধি অথবা পরিবর্তন কতখানি সম্ভব? এ পরিবর্তন দীর্ঘকাল সাপেক্ষ। ম্যাকবেথ, ওথেলো অথবা রাজা লীয়রের কথা ধরা যাক। সূচনায় আমরা এঁদের যে চরিত্ররূপ দেখি পরিণামে তার সম্পূর্ণ ঘটেছে। এর জন্য যেমন প্রয়োজন বিচিত্র অভিজ্ঞতা তেমনই প্রয়োজন কালের ব্যাপকতা। মহাকবি গ্যেটের ফাউস্টের কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তার কালব্যাপ্তি কি শিল্প মহিমাকে খণ্ডিত করেছে?

বাংলা নাটক সাধারণতঃ পঞ্চাংক এবং রোম্যান্টিক পর্যায়ে পড়ে। এখানে কালসংহতির প্রশ্ন নেই। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি নাটকে (যেমন ডাকঘর, মালিনী, রক্তকরবী) কালসংহতি রক্ষা করা হয়েছে, কিন্তু তা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আবদ্ধ নয়। অন্যত্র অর্থাৎ রাজা ও রাণী, বিসর্জন, এবং তপতী প্রভৃতি নাটকে কালের ব্যাপ্তিই লক্ষণীয়।

আবিশ্যিক দেশসংহতি অর্থাৎ স্থানগত ঐক্যের কথা বলেননি। যদিও গ্রীক ট্র্যাজেডিতে সাধারণভাবে এই সংহতি রক্ষা করা হয়েছে। বস্তুতঃ গ্রীক নাটকের বিশেষ পরিবেশে এই বিধানের প্রয়োজন ছিল। নাট্যমঞ্চে কোরাসের নিরবচ্ছিন্ন উপস্থিতি ছিল এবং কোনো যবনিকা ছিল না এমন অবস্থায় স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘটনার ব্যাপ্তি সম্ভবপর নয়। একই কোরাসের দল একবার এথেন্স—পরক্ষণেই থীব্‌সে আবার তারপরেই স্পার্টাতে যথাসময়ে উপস্থিত থাকবেন—এমন ব্যাপার শুধু কৃত্রিম নয় হাস্যকরও বটে। তবে ব্যতিক্রম যে একেবারেই নেই তা নয়। The Eumenides নাটকে ঘটনাবর্ত ডেল্‌ফি থেকে এথেন্সে এবং The Ajax-এ শিবির থেকে সমুদ্র তীরে স্থানান্তরিত হয়েছে। পরবর্তী কালের সমালোচকবৃন্দের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও এই বিধান শিথিল হয়েছিল। সেক্সপীয়রীয় নাটকে কাল-সংহতির শৈথিল্যের কথা পূর্বেই বলেছি। স্থান-সংহতিও সেখানে রক্ষিত হয়নি—প্রয়োজনও ছিল না। তাতে করে নাটকের শিল্প গুণ ক্ষুণ্ন হয়েছে এমন কথা বলা যাবে না। স্থান-সংহতির কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক :—The Persians নাটকের স্থান হচ্ছে সুসা প্রদেশে জারেকসাসের রাজপ্রাসাদের সম্মুখ ভাগে। The Agamemnon নাটকে একটি মাত্র দৃশ্য স্থান আরগোস-স্থিত আট্রিডাই এর প্রাসাদ সম্মুখে অথবা এ্যান্টগোনে নাটকে থীবসস্থিত ক্যাডমাসের প্রাসাদের পুরোভাগে ইত্যাদি। নাটকের সমস্ত ঘটনা এই রকম একটি মাত্র স্থানেই আবদ্ধ।

বাংলা নাটক রোম্যান্টিক নাট্যকলার আদর্শে গঠিত। কালৈক্যের বালাই তার নেই আর দেশগত ঐক্য সম্বন্ধে যথেচ্ছ নীতি সেখানে অনুসৃত। রবীন্দ্র-নাথের কয়েকটি নাটকে স্থান সংহতি রক্ষিত হয়েছে। ডাকঘর, রক্তকরবী, মুক্তধারার স্থান সংহতি। দৃশ্যান্তর ঘটেছে, কিন্তু স্থানান্তর ঘটেনি। রক্তকরবীতে যক্ষপুরীর রাজপ্রাসাদের জালের আবরণ নাটকের একটি মাত্র দৃশ্য। সেই আবরণের বহির্ভাগে সমস্ত ঘটনা ঘটছে।

আসল কথা ভাবসংহতি। দেশগত বা কালগত সংহতি অনেকটাই বাহ্য ব্যাপার। থাকে থাক, যা

থাকলেও ক্ষতি নেই। শিল্প দৃষ্টিতে তা অপরিহার্য নয়। যা অপরিহার্য তা হলো ঘটনা সংহতি অর্থাৎ ঘটনার ঐক্যীভবন (Unity of action) প্রয়োজনাতিরিক্ত কোনো কিছুই সেখানে থাকবে না। গ্রীক নাট্যকলায় যথাসম্ভব এ নীতি পরিগৃহীত। যে কোনো শিল্পই সঞ্জীব সত্তা এবং নাটকও তাই। সেই জন্য সঞ্জীব সত্তার মতই তা অবশ্য সংগ্রথিত প্রকাশিত। ঘটনাগত সংহতি ব্যতীত এই সঞ্জীবতা খণ্ডিত হয়। শিল্পের ক্ষেত্রে তা যার ছক। এই প্রসঙ্গে পরিমিতিবোধের কথা এসে পড়ে।১ শিল্পোৎকর্ষ বিধানে অতিনির্দিষ্ট সুপরিমিতি দরকার; তাতে করে শিল্প বন্ধন চয়ে ওঠে। আবার জীববিদ্যায় দেখা যায় যে জীবাণুর অন্তর্নিহিত গতিশক্তি (Kinetic energy) রূপে রূপে আপনাতে আপনি বিকশিত হয়ে ওঠে—তা স্বয়ম্ভু। শিল্পও স্বয়ম্ভু—এ গড়ে ওঠে, একে গড়ে তোলা যায় না। এর রূপ এর নিজের সৃষ্টি।

প্রসঙ্গতঃ কথাবস্তুর ঐক্যের বা সংহতির কথা (Unity of plot) আলোচনা করা যেতে পারে। আরিস্ততলের কথাই উদ্ধৃত করি :—

The Unity of a plot does not consist as some suppose, in its having one man as its subject. An infinity of things befall that one man; some of which it is impossible to reduce to unity; and in like manner there are many actions of one man which cannot be made to from one action (ch. 8. The Art of Poetry —By Water Page. 41) অর্থাৎ একজনের জীবনে অসংখ্য ঘটনা ঘটতে পারে অথবা একই ব্যক্তি অসংখ্য কর্মসাধন করতে পারেন কিন্তু সব ঘটনা বা কর্মকে কখনও ঐক্যে বিধৃত করা সম্ভব নয়। তাই কথা-বস্তুতে উপকাহিনী বা শাখা কাহিনী সংযুক্ত না করাই বিধেয়। অবশ্য মহাকাব্যের অতিবিস্তৃত পরিসরে তা গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু নাট্যকলায় তা পরিত্যাজ্য। তাই কিং লীয়রের মত নাটককেও নাটকরূপে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হয়নি। তার গঠন-রীতিতে নাটক অপেক্ষা মহাকাব্যের আংগিক সুস্পষ্ট।

রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' নাটক এই দোষ থেকে মুক্ত নয়। কুমার ও ইলার কাহিনী সেখানে ঘটনার সহজ ও স্বাভাবিক গতিকে ব্যাহত করেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলি :—"এই নাট্যভূমিতে রয়েছে লিরিকের প্রাবল্য, তাতে নাটককে করেছে দুর্বল। এ হয়েছে কাব্যের জলাভূমি। ঐ লিরিকের টানে এর মধ্যে প্রবেশ করেছে ইলা ও কুমারের উপসর্গ। সেটা শোচনীয়রূপে অসংগত।"

শুধু নাটকের ক্ষেত্রে নয় যে কোনো শিল্পের ব্যাপারেই এই সংহতির প্রশ্ন আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের দুটি বিখ্যাত কবিতার কথা বলা যায়—'এবার ফিরাও মোরে' এবং 'শাজাহান'। দুটি কবিতার আত্মাই খিন্নখণ্ডিত। বিশেষ করে 'শাজাহান' কবিতার'। 'ভুলি নাই ভুলি নাই প্রিয়া' এই কবিতাংশ পর্যন্ত যে ভাবমণ্ডল পরিসৃজিত তা খণ্ডিত হয়ে গেল, আকস্মিকভাবে সেখানে সুরু হলো—"মিথ্যে কথা কে বলে যে ভোল নাই কে বলে যে খোলো নাই স্মৃতির পিঞ্জর দ্বার।" এই দার্শনিক তত্ত্ব কাব্যের রসাত্মাকে খণ্ডিত করে দিয়েছে। আরিস্ততলের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রসঙ্গ শেষ করি :—The truth is that, just as in the other imitative arts one imitation is always of one thing, so in poetry, the story as an imitation of one action, a complete whole, with its several incidents so closely connected that the transposal or withdrawal of any of them will disjoin and dislocate the whole."

---

১. আর্টের প্রধান তত্ত্ব তার পরিমিতি। কেননা রূপকে সুব্যক্ত করাই তার কাজ। বিধিত সীমার দ্বারা রূপ সত্য হয়। সেই সীমাকে ছাড়িয়ে অতিকৃতিই বিকৃতি। [পারস্যে: রবীন্দ্র রচনাবলী, পৃঃ ৭৮৭।]
সুবিধিত সীমাস্থি বিধেই আর্টের পরিণতি। ঐ পৃঃ ৭৮৭।

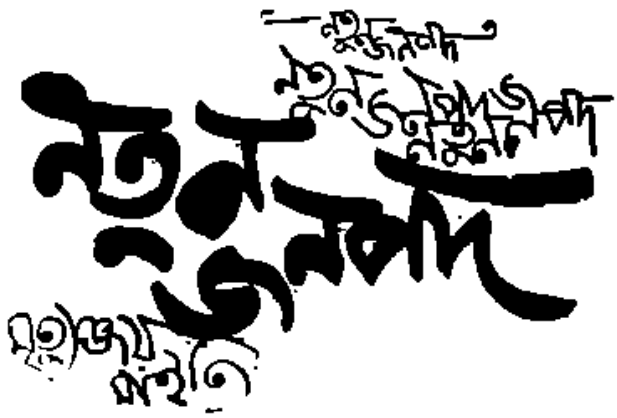

১২।

সেদিন শনিবার। বিডিও অফিসের কাজ শেষ করে অরবিন্দ বিকেল নাগাদ গ্রামে ফিরে যাচ্ছিল। ওস্তাদ মহেন্দ্র চক্রবর্তীর মৃত্যুর কয়েকদিন সে বিশেষ কোন কাজ করেনি। ইতিমধ্যে গ্রামের যে আড্ডাটা বেশ জমে উঠেছিল হঠাৎ তাতে ভাঙন ধরেছে। আড্ডাতে ওস্তাদ এসে বসতেন, এইটাই একটা আনন্দ ছিল, আস্বাদ ছিল তাদের কাছে। গ্রামের ছেলেরা এক আধটু গাইতে পারে। কীর্তন গায় একটি ছেলে। অরবিন্দ নিজে রবীন্দ্রনাথের দু' একটি বাউল গান গাইতে পারে। তাই সে শিখিয়েছে আড্ডার ছেলেদের। ওরা যখন 'গ্রামছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ' গাইত, তখন অরবিন্দ এই সংসে তার বাঁশের বাঁশিটা নিয়ে বসত। এখন সেই ভাঙা আসরের আবহাওয়ায় ওস্তাদের সেই ছবিটা কেবল অরবিন্দের মনে ভেসে ওঠে।

ধরা নদীর তীর ছেড়ে দিয়ে অরবিন্দ গ্রামের মধ্যে ঢুকল। গ্রামের আঁকা বাঁকা পথগুলো এখন আর তার অচেনা নয়। সেই প্রকাণ্ড 'অজনি' গাছটা চোখে পড়ল অরবিন্দের। সেদিন রেখাকে জিজ্ঞেস করেছিল অরবিন্দ, গাছটার নাম কি। জানি দিদি বলেছিল। আচ্ছা, পথেইত ওদের বাড়ী পড়ে।

যেতে যেতে সেই জমিটা চোখে পড়ল অরবিন্দের, যে জমিটায় সে কিছু চারা রুয়েছিল। এখন খুব সুন্দর ধান হয়েছে, পাশের অন্য জমিগুলোর চাইতে অনেক ভাল। সবুজ সবুজ পাতাগুলো দেখতে দেখতে চোখ তৃপ্তিতে ভরে ওঠে। অরবিন্দ দাঁড়িয়ে রইল জমিটার ধারে। এই ক্ষেত, এই ধান তাকে টানছে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না তার। কী করে যেন এই ক্ষেতের সংসে, একটি স্নিগ্ধ কুমারীর নীরব স্মৃতিটুকু হয়ে মিশে গেছে তার কাছে।

জমিটা রেখার বাবার।

'নমস্কার বাবু'।

অরবিন্দ ফিরে তাকিয়ে দেখল, রেখার বাবা সদয় দাস তার দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে।

'ও আপনি, কখন এলেন।'

'এই আসছি বাবু। এসে দেখি, আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জমি দেখছেন।'

'এই জমিতে আমি ধান চারা রুয়েছিলাম, আর সেই জাপানী প্রথায় চাষটা দেখিয়ে দিয়েছিলাম, মনে আছে? তাই যেতে যেতে ভাবলাম, চাষটা কেমন হয়েছে একবার দেখে আসি।'

সদয় জমির দিকে তাকিয়ে বলল, 'ধান খুব ভাল হয়েছে। আমি রোজ দেখি। শালার ধানগুলা মরবে, মরবে বলেই এত বাড়ন্ত হয়েছে।'

অরবিন্দ বলল, 'না, না, মরবে কেন?'

'মরবে না? ধানের অনেক বিপদ, পোকা লাগতে পারে।'

'পোকা? পোকা লাগলেই আমাকে বলবেন। এক রকম পাউডার পাওয়া যায়, তা দেব। ছড়িয়ে দেবেন।

তাতেও না গেলে সদর থেকে লোক আনিয়ে ঔষধ স্প্রে করাবে।'

'সে আবার কৈ।' সদর জিজ্ঞেস করল।

'একদল লোক আছে তারা ঔষধ ছড়ায়, এই হোলির দিনে রং ছড়ানোর মত, ওতে পোকা মরবেই।'

'পোকা না হয় মরল কিন্তু বন্যা? বন্যা যদি হয়, কেলেঘাইর বন্যা। সে আপনি দেখেননি। সব জ্যান্ত পচে সাক হয়ে যাবে, পুকুরের মাছ পালাবে, মাটির ঘর পড়ে যাবে, গাছপালা সব মরে দেশ শ্মশান হয়ে যাবে।'

অরবিন্দ বলল, 'বন্যা হলে অবশ্য করার কি আছে! তবে দেশে যাতে বন্যা না হয়, তার জন্য অনেক কাজ হচ্ছে। কত ইঞ্জিনিয়ার লেগে গেছে। আর বাঁধে ফাটল দেখা দিলেই বালির বস্তা দিয়ে আটকানো হবে। দেশে বন্যা যাতে না হয়, তার জন্য নানান খোঁজ খবর, মাপ জোক, তদারক চলছে।'

সদর বলল, 'চলছে। চলুক। বন্যা অবশ্য অনেক দিন হয়নি। এ অঞ্চলের দুজন কংগ্রেস নেতা সেবার খুব জোর লড়াই করলেন সরকারের সঙ্গে। তা এ এক কায়েম্যার ব্যাপার। নদীর বাঁধ দু রকমের, এক হল সরকারের বাঁধ, আর এক হল জমিদারের বাঁধ। আবার জমিদারের বাঁধ সরকারের বাঁধ থেকে নিচু করে রাখতে হবে। সেবার কৃষ্ণ বাবু বলে গিয়েছিলেন মিটিঙে, সরকার যা করতে পারে করুক, বন্যা হলেই সব বাঁধ আমরা কেটে দেব, জল একেবারে সমুদ্রে গিয়ে পড়ুক। কোনো বাঁধে যেন জল না আটকায়।'

একজন শ্রোতা বলে উঠল, 'সরকারের বাঁধে যে বন্দুক হাতে পুলিশ থাকে গো।'

কৃষ্ণবাবু বললেন, ঐ বন্দুকের ভয়টি আমাদের কাটিয়ে উঠতে হবে। আমরাই আগে বন্দুকের সামনে যাব আপনারা শুধু কোদাল নিয়ে পেছনে থাকবেন। এই হাজার বিঘার জমির ধান, পচে নষ্ট হয়ে যাবে, ঘর বাড়ী পড়ে যাবে, লোকে না খেয়ে মরবে, ম্যালেরিয়া, কলেরায় লোক ধ্বংস হয়ে যাবে এ আমরা আর সহ্য করব না। তার জন্য যা হয় হোক যে বিপদ আসে আসুক। সব বিপদ আমরা মাথা পেতে নোব।'

অরবিন্দ এতক্ষণে জিজ্ঞেস করল, 'তা আর বন্যা হয়নি?'

'বন্যা একবার হয়েছিল বটে, এদিকে নয়।' সদর বলে উঠল, 'চলুন, বলতে বলতে যাই। আপনার কাজ নেই ত?'

'না, না, আপনি বলুন, এখন আমার কাজ নেই, অফিস থেকে এলাম।'

সদর বলতে বলতে বাড়ীর দিকে এগুতে লাগল, 'বন্যা হয়েছিল সেই ১৯৪২ সালে, সপ্তমী পুজোর দিন রাতে। সাইক্লোন। সমুদ্রের বাঁধ ভেঙ্গে গ্রামের পর গ্রাম সাফ করে দিল! এক রাতের মধ্যে কাঁথি, রামনগর, সমুদ্র-ধারের গ্রামের লোক, গরু বাছুর, সব ঘরে ভেসে গেল। তোরে দেখলে মনে হবে না যে, সেখানে মানুষ, ঘরবাড়ী ছিল। কেবল মড়াগুলো বাঁধের পাশে এসে জমেছে। শুধু দু একটি বড় বড় গাছ দাঁড়িয়ে, আর সেই সব পাতাশূন্য গাছে দু একজন লোক। সব শ্মশান শ্মশান হয়ে গেছল। হায়, হায়, সে সব কী দিন গেছে?

অরবিন্দ তখন ছোট। তবু ১৯৪২ সালের কাঁথির সাইক্লোনের কথা মনে আছে তার। মহাপ্রলয় হয়েছিল। অরবিন্দ শুনেছিল, সেই সময় শ্যামাপ্রসাদ এসেছিলেন কাঁথি। বিয়াল্লিশের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে কংগ্রেস নেতারা সব জেলে। কাঁথির এই চরম দুর্দিনে হঠাৎ শ্যামাপ্রসাদ এসে পৌঁছলেন কাঁথিতে। কাঁথি কোর্টের খুব উঁচু ছাদটার উপর দাঁড়িয়ে দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। দক্ষিণ দিকেই সমুদ্র। তাকিয়ে দেখলেন কেবল শ্মশান, লোকালয়ের চিহ্নহীন, কেবল জলপ্লাবিত বিস্তীর্ণ প্রান্তর। মানুষ আর গরু বাছুরের মৃতদেহ স্তূপীকৃত হয়ে উঠছে বালিয়াড়ির ধারে। পচন উঠছে, পচা গন্ধ আসছে মৃতদেহের।

মৃত্যু-বিস্তীর্ণ ধ্বংস স্তূপের পাশে এসে দাঁড়ালেন শ্যামাপ্রসাদ। কোর্টের সেই উঁচু ছাদটার উপর দাঁড়িয়ে দূর সমুদ্রের ধ্বংসলীলার দিকে তাকিয়ে, তাঁর চোখে জল এসেছিল। শুধু এক মুহূর্ত, তারপর গর্জন করে উঠলেন শ্যামাপ্রসাদ, সেই প্রচণ্ড ভরাট গলায় ইংরাজীতে বলে উঠলেন, সকাল থেকে ভীষণ ঝড় শুরু হয়েছিল,

রাত্রে প্রলয় হয়। তখন আপনি, আপনি কোথায় ছিলেন? কোথায় ছিল আপনার পুলিশ কোর্স? আজ পর্যন্ত কেন এক মুঠো ত্রিলিফ দেওয়া হয় নি একজন লোককেও উদ্ধার করা হয় নি। কেন? কেন?

গলাটা শুকিয়ে উঠেছিল এস, ডি, ওর।

'আই নো', 'আই নো ইট'—আবার ব্যাঘ্র শাবক গর্জন করে উঠেছিলেন। সেই প্রলয় রাত্রের রাত্রিটা এস, ডি. ও. কেবল ঘর খেয়েই কাটিয়ে দিয়েছে। মানবতার নামে একটি প্রাণ রক্ষার চেষ্টাও করেননি। ভোরের সেই আধারে শুধু এগিয়ে এসেছিল আমেরিকান সৈন্যেরা। যাদের যা কিছু খাবার ছিল, শহরের বাসিন্দাদের উপর অসহায়ের হওয়া লোকের মধ্যে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েছিল তারা। বড় বড় গাছ পড়ে শহরের পথ ঘাট বন্ধ হয়ে গেছল। ডিনামাইট দিয়ে গাছগুলো সরিয়ে আমেরিকান সৈন্যেরাই আবার রাস্তাটাকে যাতায়াতযোগ্য করেছিল, ড্যামেজের বাঁধাটা ভেঙ্গে গেছল, তারাই বাঁধল সেই বাঁধটা।

টেলিগ্রাম ভেসে এল ডি, এম, খনি সাহেবের কাছ থেকে, একটি মিষ্ঠুর টেলিগ্রাম—ইংরাজ সভ্যতার একটা দলিল, 'মিডনাপুর ইজ দি প্লেস অব রিবেলস—লেট দেম ডাই।'

মরুক মরুক ওরা, ওরা সরকারকে বড্ড জ্বালায়। ওরা থানা ভাঙে, পুল ভাঙে, পোস্টাফিস, পুড়িয়ে দেয়, থানা পুড়িয়ে দেয়, সরকারী অফিসারকে বন্দী করে রাখে, ওরা স্বাধীনতা চায়, বৃটিশ সরকার বেঁচে থাকতে নিজেদের সরকার গঠন করে। অতবড় স্পর্দ্ধা সারা ভারতবর্ষের কোন জেলার হয়নি। বড় হয়েছে, দুর্ভিক্ষ হবে, মহামারী হবে, ইংরাজ সরকারের কিছু করার নাই; ওরা মরুক, মরুক, 'লেট দেম ডাই।'

অরবিন্দ আর সদয় এখন হুগলীর উঠোনে প্রকাণ্ড মিমগাছটার কাছে এসে পৌঁচেছে।

বাবা আর অরবিন্দদাকে আসতে দেখে, রেখা দাওয়ার একটা মাদুর পেতে দিল।

'তুমি কবে এলে?' রেখাকে অরবিন্দ জিজ্ঞেস করল।

'আজ এসেছি।'

'পড়াশোনা ভাল হচ্ছে?'

রেখা মাথা নেড়ে জানাল, পড়াশোনা ভালই হচ্ছে তার।

অনেক দিন পরে রেখাকে দেখে ভাল লাগছে অরবিন্দের। এই ক'দিনে যেন সে আরও মার্জিত সুন্দর হয়েছে। মসৃণ দীঘল কিবুনি করে তার কালো বাঁকানো দীর্ঘ চুলগুলো বেঁধেছে। রেখার মধ্যে আগে যে জড়তাটুকু ছিল, নীলাপুর গার্লস স্কুলে আবার ভর্তি হবার পর এখন আর তা নেই।

রেখা অরবিন্দকে বলল, 'কি খাবেন? চা না সরবত?'

সদয় বলে উঠল, 'আরে, আগে পা ধুতে জল দে, কলকাতা থেকে এলেন।'

অরবিন্দ চমকে উঠল, 'না, না, জল লাগবে না।' তারপর রেখার দিকে তাকিয়ে বলল, 'পুকুর ঘাটটা কোথায় তাই দেখিয়ে দাও না।'

'ঘাটটা ভাল না, বড় পিছল। তার চেয়ে আমি জল এনে দিচ্ছি।'

এক বালতি জল এনে, রেখা দাওয়ার একটা চৌকি পেতে দিল। একটা পরিষ্কার গামছা এনে রাখল তার উপর।

অরবিন্দ কেবল অবাক হয়ে দেখছিল। এ এক অপূর্ব আতিথেয়তা এ অঞ্চলের, অতিথিকে পা ধোবার জল দিয়ে তাকে যেন দেবতার মত পূজা করে এরা। অরবিন্দ খুব সংকোচের সঙ্গে চৌকিতে গিয়ে বসল।

কিন্তু বিপদ হল, যুগপৎ এক হাতে জল ঢালা আর এক হাতে পা ধোয়া নিয়ে। এক কঠিন 'জিমনাসটিক্স্।' রেখা হাসতে হাসতে এগিয়ে এল, 'দিন্, জলটা আমি ঢেলে দিচ্ছি। বাবা, পা ধুতে গিয়েই যেমে সারা।'

'হবে না? তোমাদের এইভাবে পা ধোয়া যা, আর সার্কাসে দড়ির ওপর খেলা দেখানও তা।'

রেখা হাসতে হাসতে, গামছাটা এগিয়ে দিল, 'পা'টা মুছে নিন।'

পা ধুয়ে, মুছে অরবিন্দ দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে উঠল। সে যেন ফুটবলের এক ফাইনাল খেলায় কোন ভাবে শেষ মুহূর্তে এক গোলে জিত হয়ে এসেছে।

রেখা দুটো বাটিতে করে মুড়ি, গুড় আর কলা রেখে গেল।

অরবিন্দ

ছেড়ে হবে ?'

সদয় বাড়িটা তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে তার কলা-পুলো হাসতে হাসতে বলল, 'এই চাট্টি মুড়ি খাইতে এত ভয় ? এখন ছোটান বন্ধ। নিন বাবু, আরম্ভ করেন।'

অরবিন্দ বেখাকে বলল, 'মাও কিন্তু তুলে নাও

'না, নিতে হবে না' বেলা সদয়কে দিয়ে উঠল, মাস্টারমশাই পর এলেন, আর এই কটা মুড়ি খেতে পারবেন না।'

এই সম্পর্কটুকু অরবিন্দের বড় ভাল লাগল। তার বিস্মৃতির চারদেওয়ালে, যেখানে সেই ছোটবেলার কোন স্মৃতি নেই, সেখানে বেলার এই স্নেহের অযাচিত স্পর্শটুকু অরবিন্দকে মুগ্ধ করে তুলল।

এক সময় অরবিন্দ বলল, 'কেষ্টর মামার কথা বলে-ছিলেন। আর একটু বলুন না

সময় অবশ্য বলবার পক্ষে বেশি হয়ে যায়। খেতে খেতে সে আবার শুরু করল, 'তা সে সাইক্লোনে দারুণ ঝড়ের প্রায় সব শেষ করে গেল। দাদার কাছে একজন সৈনা ছিল। কিন্তু এখন তার চিহ্নমাত্র নাই, সব সাফ্। পরদিন থেকে সৈন্যেরা জল ভেঙে ছুটল তাদের কাছে। কিন্তু কোথায় কে ? সব ভাসিয়ে নিয়ে বালিহাড়িতে ঠেকিয়েছে। খুঁজতে খুঁজতে মড়াগুলো পাওয়া গেল। তারপর যেখানটায় তবু ছিল, সেখানে বালি সরিয়ে কবর খুঁড়ল তারা, খুঁড়ে তার ভেতর মড়াগুলো ফেলে দিল, দিয়ে আবার বালি চাপা দিল। তারপর সেই কবরের ওপর কিগুলো পুঁতে দিল।'

অরবিন্দ বলল, রুদ্ধ শ্বাস করে দিল।

'হবে, হবে এখনো তো সমুদ্রের মাঝে আপনি দেখতে পাবেন

অরবিন্দ বলে উঠল 'না, না, আমি সাইক্লোনের কথা শুনতে চাচ্ছি না। আমি এই দেশের নদীর প্লাবনের কথা বলছি। আপনি কতগুলো বন্যা দেখেছেন ?'

সদয় একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'তা ধরুন তিনটে বন্যা দেখেছি। কেলেঘাইয়ের বন্যা, যার দৌলতে কলার বন্যা, আর আংড়ঙ্গে বন্যা। জল নিকাশী না থাকলে, বেশি বৃষ্টির জল বেরতে না পেরে যে বন্যা হয়, তাকে বলে আপজলে বন্যা তা বন্যা হলে বড় দুঃখ লোকের। এই বাট ঘাট তখন জলে জলময়। দেখলে সমুদ্র বলে মনে হবে। এখান থেকে মংগলা মাড়োর ঘাট যাবেন যান, সোজা নৌকায় চলে যান।'

সদয় একটু থেমে আবার বলতে আরম্ভ করল, 'বন্যা হলে কিন্তু অনেক ঘটনা ঘটে যেবার বাংচৌকায় জলার বন্যায় অনেকগুলো মাথা গেল।'

অরবিন্দ চমকে উঠে জিজ্ঞেস করে

মানে খুন হল ? খুন হল কেন ?'

'খুন হল বাংচৌকার বাঁধ কাটানো নিয়ে জলার ভেতরেও গ্রাম, ঘরবাড়ী আছে লোকের চাষ বাস হয়। জল বেশি হলেই আগে সেখানের সব ডুবে যায়। দারা জলাটি সমুদ্রের মত থৈ থৈ করে। লোকের ঘর বাড়ী ঘর পড়ে যেতে আরম্ভ করে। তখন সব দল বেঁধে নৌকা করে বাঁধ কাটতে আসে। বাঁধ কেটে দিলেই জল বেরিয়ে এদিকে বন্যা হয়, তখন ওরা বাঁচে। সে তখন এক লড়াইয়ের ব্যাপার।

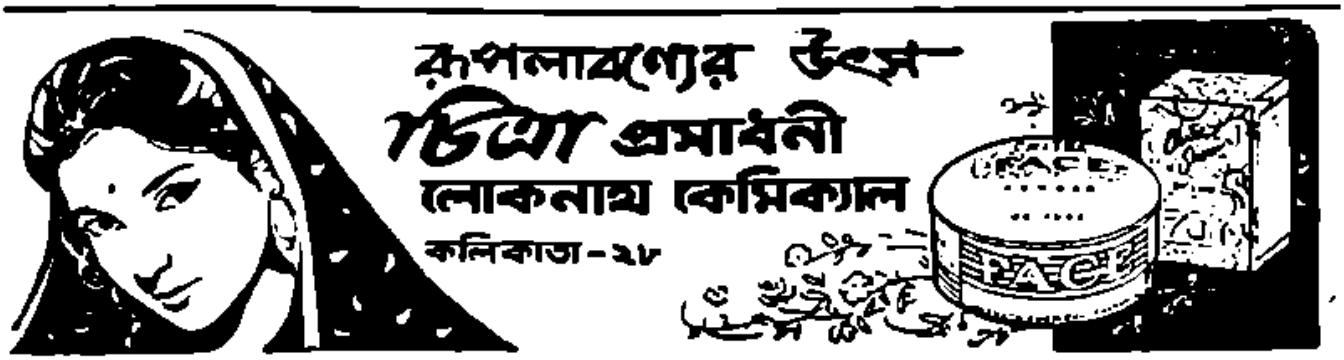

সদরের বুড়ি খাওয়া শেষ হয়ে গেছিল। একটি ছেলে এসে তামাক দিয়ে গেল।

উঠোনে এতক্ষণে অন্ধকার নেমে গেছে। নিমগাছটার পাতাগুলো সে অন্ধকারে আর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না।

সদর আবার বলতে আরম্ভ করল, 'সে তখন লড়াই ব্যাপার। গাঁয়ের সব জোয়ান ছোকরাকে রাত জেগে বাঁধ পাহারা দিতে হয়। হাতে লাঠি, বল্লম, চৌকিদার। চৌকিদার কি জানেন? লম্বা বাঁশের মাথায় ত্রিশূলের মত লোহার বঁড়শি থাকে, খুব ধারাল, ছুঁড়ে দিতে হয়। লাগলে একেবারে বুকের এফোঁড় ওফোঁড়। তা তখন ঐ সব অস্ত্র নিয়ে বাঁধ পাহারা দিতে হয়। দু একটি বন্দুক, টর্চ লাইটও থাকে।'

'সেবার বারচৌকার জলায় প্রবল বন্যা হয়েছে। চারপাশের গ্রাম থেকে লোকজন পাহারা দিতে গেছে। জলার ভেতরে লোকেরাও দুদিন চেষ্টা করেছে বাঁধ কাটানোর জন্য। কিন্তু পারেনি। এপারের লোক খুব সজাগ হয়ে আছে। দূরে কোনরকম একটু নৌকার শব্দ হলেই অমনি সারা জলার পাড়ে চীৎকার শুরু হয়ে যায়।'

'ওদের মধ্যে এক বুড়ো ছিল, বুদ্ধিটা সেই বাতলে দিল।

তারপর দিন অমাবস্যার রাত্রি। বৃষ্টি হচ্ছে না, তবে মেঘ খুব ঘন কালো ঘম্ ঘম্ করছে। একটা নৌকা নিয়ে এগিয়ে গেল একদল লোক। কিন্তু বাঁধের কাছে গেল না শুধু দূরে দাঁড়িয়ে রইল, ডোবা বটগাছটার কাছে, যেন এক্ষুনি ওরা বাঁধ কাটতেই নামবে।

জলার বাঁধের চারদিকের পাহারাওয়ালারা সেইখানেই জড়ো হল। রাত তখন দু প্রহর শেষ হয়ে গেছে। এমন সময় খবর পাওয়া গেল দক্ষিণে রামজালির ঘরের একটু দূরে দুটো নৌকো করে প্রায় ত্রিশজন লোক ছুটে এসে বাঁধ কাটতে লেগেছে। টাপাটপ কোদালের কোপ মারছে বাঁধে। একে নবীন বাঁধ জলের চাপে ভেঙে পড়ার মত ছিল। তার উপর কাটান পড়েছে। দশ মিনিটের মধ্যেই বাঁধ শেষ হয়ে যাবার কথা।

সদর আবার আরম্ভ করল, 'জেলেপাড়ার কয়েকজন টহলে বসে তাস খেলছিল। হাঁ, 'টহ' হল, খড়ের খুব ছোট্ট নিচু ঘর, মাঠ ঘরার সময় রাতে লোক থাকে, পাহারা দেয় যাতে কেউ মাছ চুরি না করে।

তা, বাঁধ কাটানোর শব্দ শুনেই তাস ফেলে দিয়ে লাফিয়ে উঠল চারজন। একজন মস্ত জোয়ান আর লাঠিয়াল ছিল। নাম বসন্ত। তবে যে পালা, বলে বসন্ত লাঠি নিয়ে দিলে দুলাফ। পড়ল একেবারে বাঁধ কাটানোর কাছে। ওদেরও চারজন পাহারা ছিল। ওরা বাঁধ কাটানো লোকের সঙ্গে এসেছে। বলা যায় না, কখন কি ঘটে। তা বাবু, একা বসন্তই চারজনকে চিট করে মারল লাঠি একজনের মাথায়। মাথাটি ফেটে চৌচির, হাতের কোদাল হাতে থেকে গেল। রক্তে লাল হল জলার বাঁধের কাদা, মাটি।

হঠাৎ চক্ষের নিমেষে কে অন্ধকার থেকে একটি চৌকিদার ছুঁড়ল। বসন্ত ঠেকাতে পারল না, চৌকিদারটা বুকে সেঁধে গেল একেবারে এপার ওপার।

এতক্ষণে খবরটা ছড়িয়ে পড়ছে,—বসন্তের সংগীদের চীৎকারে। দক্ষিণের বাঁধটাই কাটান হয়ে গেল। এখানে নৌকা রেখে সবলোককে ধোঁকা দিয়েছে জলার ভেতরের লোকেরা।

হৈ, হৈ, করে লাঠি সোটা নিয়ে সবছুটে চলল দক্ষিণে রামজালির ঘরের দিকে। ততক্ষণে বাঁধ ভেঙ্গে গিয়ে পড়েছে বাঁধের ওপারে গড়ের ভেতর, প্রলয় গর্জন ছড়িয়ে পড়ছে আকাশে।

দুটো নৌকার লোক তখন বসন্তকে চৌকিদার শুদ্ধ টেনে নিয়ে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে বারচৌকার ভিতরে। অন্ধকারের মধ্যে চলে যায় যায়···,

এমন সময় দূর থেকে দড়াম্ দড়াম্ দড়াম,—। তিন বার বন্দুকের আওয়াজ হল। সেই পালিয়ে যাওয়া নৌকা লক্ষ্য করে এপারের গ্রামের জানা বাবুর হাতের রাইফেলটা গর্জন করে উঠল। তিনবার অন্ধকারটা জ্বলে উঠল শুধু। একটি, তারপর আর একটি—দুটো লোক নৌকায় গড়িয়ে পড়ল। আর উঠল না।'

মরা আর আহত লোকগুলোকে টেনে নিয়ে নৌকাটা দ্রুত পালিয়ে গেল রাইফেলের সীমানার বাইরে। তারপর আর কিছু নাই শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। সেই অন্ধকারে বারচৌকা জলার জল কেবল ঘম ঘম করছে।'

গলাটা থামিয়ে সবার মুখগুলো একবার দেখল।

না, কখন আশপাশে গিয়ে জুটেছে কেউ।

অরবিন্দ জিজ্ঞেস করল 'বন্যার সময় সব বছর এমনি খুন মারামারি হত?' 'হাঁ, প্রায় সব বছর। তবে সে বছর একটু বেশি, চারটে মাথা গেল। তা এসব মাথা গেলে লোকে মামলা মোকদ্দমা করে না। কারণ লোকত দুপক্ষের রয়েছে। জেল হক, ফাঁসি হক দু'পক্ষের লোকেরই হবে। তার চেয়ে লাশগুলোকে গুম করে করে দেওয়াই ভাল। গর্ত করে মাটিতে পুঁতে তার উপর কলা গাছ লাগিয়ে দাও, পুলিশের বাবা টের পাবে না।"

তারপর একদিন যখন ফাল্গুন মাসের বার চৌকোর জল শুকিয়ে আসবে। আর সেই বন্যার পলিমাটি পড়া মাটিতে কুমড়া, উচ্ছে, বেগুন নামান রবি শস্য অপর্যাপ্ত ফলবে। ততদিন আবার জলার ভেতরের আর বাইরের গ্রামের লোকের মধ্যে যাতায়াত সুরু হয়েছে। আসরের জল শুকিয়ে তখন শুকনো মাঠ। পাশে চলার রাস্তাটা তার ওপর দিয়ে সেই রামজালির ঘরের কাছ থেকে উত্তরে অর্ধশি. পাথরঘাটা পর্যন্ত চলে গেছে। কেবল যার ছেলে মরল, যা যার স্বামী মরল, তারাই শুধু ভুলল না ধাপ্পার কথাটা। বন্যাদের শুকনো কাঁকা মিঠুর যে জলাটা কেবল দূরে অনেক দূরে বি বি··· করছে তার দিকে তাকিয়ে তারাই কেবল কাঁদে চোখের জলে বুকের কাপড় ভাসায়।

কখন বৃষ্টি নেমেছিল। গল্প শুনতে শুনতে সে দিকে খেয়াল ছিল না অরবিন্দের। অরবিন্দের মনে হল, গল্প কেন? এ যে ইতিহাস, অলিখিত ইতিহাস কত অজানা জনপদের, প্রান্তরের যে ইতিহাস কোনো দিন কেউ লেখেনি, লিখবে না। এমনি জলার আবার বন্যার সময় এক পুরুষ বা দু'পুরুষ, নতুন লড়াইর প্রস্তুতির সময় এই কাহিনী ঘুরে ঘুরে ফিরবে, কথাটা আবার যেন অশরীরী রূপ নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াবে কিছুদিন—সেবার ধাপ্পার সময় চারটে মাথা গেছে ত, কি সেবার ওদের বন্দুক ছিল, এবার এরাও বন্দুক এনেছে, কি সাঁওতাল এনেছে তীর চালাবে।

তারপর। তারপর ধাপ্পা শেষ হবে একদিন বা হঠাৎ পাহাড়পুরের খালে টান পড়ায় জল সরে গেলে সকলেই ভুলে যাবে সে কাহিনী। গ্রামের বুড়ো যারা এই ধাপ্পা দেখেছিল, বা যারা মুখে মুখে এই কাহিনীকে আগামী কালের জন্য রেখে যাচ্ছিল, তাদের সংখ্যা একদিন কমতে কমতে একেবারে শেষ হয়ে যাবে। কোনদিন কোন ঐতিহাসিক এই ইতিহাস লিখবে না—যদিও এই ইতিহাস সাধারণ মানুষের ইতিহাস তাদের জীবনের সুখ দুঃখ হাসি কান্নার ইতিহাস।

ছাতাটা নিয়ে অরবিন্দ উঠতে যাচ্ছিল, রেখা বেরিয়ে এসে বলল, 'মা আজ যেতে না বলছে। রাস্তাটা খুব খারাপ, বৃষ্টি হচ্ছে, আর রাতও হয়েছে।'

অরবিন্দ লজ্জিত হল। সত্যি সে খুব অন্যায় করেছে। এত রাত পর্যন্ত কারুর বাড়ীতে বসে গল্প করলে তারা ত খেতে বলবেই।

'কি হল কি ভাবছেন ওত?'

'না, রেখা আমি চলে যাই। এখন বেশি রাত কি?'

'হয়েছে অনেক রাত হয়েছে, দিন ছাতাটা দিন।'

রেখা অরবিন্দের হাত থেকে ছাতাটা নিতে নিতে বলল, 'এই বৃষ্টির রাত সাপ খোপ বেরে, এখন উনি চললেন বাসায়।'

অরবিন্দ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

খাওয়া শেষ করে অরবিন্দ শুকপোতের বিছানায় এসে বসেছে। রেখা পান নিয়ে এল। ঘরের মধ্যে টিম্ টিম্ করে একটা হ্যারিকেন বাতি জ্বলছে। চারধার রাত নিঝুম হয়ে আসছে।

আস্তে আস্তে রেখা বলল, 'সে দিন এলেন যা কেন? আমাদের কষ্ট হবে বলে? আমাদের কষ্ট ভাবতে হবে না। এখন শুয়ে পড়ুন আমি ধনারিটা লেপের তলায় গুঁজে দিই।

রেখা সুন্দর করে ধনারিটা গুঁজে দিতে দিতে মাথার কাছে এল, কি ভেবে চুপ করে একটু দাঁড়াল। অরবিন্দ কিছু বুঝতে পারল না কেন সে দাঁড়াল, শুধু কী এক পরম তৃষ্ণায় সেই অপরূপ অন্ধকারে নিঃশব্দে রেখার ঠাণ্ডা হাতটা তুলে নিয়ে নিজের কপালে রাখল।

(ক্রমশঃ

শ্বেতদ্বীপ সমাচার

অখিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়

১৯৫৯ সালের আগস্ট মাসে অনেক ক্ষোভ নিয়ে লণ্ডনে এসেছিলাম। সেই বারের লণ্ডনে দেখতে পাই কত কথা আর কাহিনীর কত ঘটনা আর দৃশ্যের বিচিত্র সমারোহ : লণ্ডনে দায়া কন্টিনেন্ট আর মার্কিনবাসীদের ভিড়, লণ্ডনের ক্রমকৃষ্ণায়মান রূপ, আফ্রিকার বিয়ো, ওয়েস্ট ইণ্ডিস, জ্যামাইকা, নাইজেরিয়া, ঘানা, সোমালি, সিয়েরা লিয়ন, ক্যারিবিয়ার নর-নারীদের কিলবিল মিছিল আর লণ্ডনে ভারতীয় চাকুরে, ভারতীয় ব্যবসায়ী আর ভারতীয় ছাত্র। এই দেশে অধ্যয়নরত ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের কথা লিখতে গেলে পাতার পর পাতা ভরে ভারতের ছায়াছবি তুলে ধরতে হয়। কত নামের আর বিষয়ের কাহিনী গুচ্ছ গুচ্ছ কথার ভাঁজে ভাঁজে গুছিয়ে আনিয়ে লিখতে হয়। লণ্ডনে ট্রাফালগার স্কোয়ারে উত্তোল উত্তাল প্রস্তরণের ধারাটিতে জল-পাখিরা গিজ গিজ করছে বলে ভাবছি, "বিংশ শতাব্দীর পাঠক-পাঠিকাদের জন্য লণ্ডনের সব কথা ও কাহিনী ধীরে ধীরে লিখবো। ১৯৫৯ সালে লণ্ডনে আসি, দেশে ফিরে যাই ১৯৬০ সালের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে। আবার লণ্ডনে ফিরে এলাম ১৯৬৩ সালের আগস্টে, এসে দেখি লণ্ডনের সেই পূর্ব-দৃশ্য পূর্ব ছাদের আভায় আরো রঙিন হয়ে উঠেছে, আরো বেশী ঝলকাঝলমী যুবক লণ্ডন, আকাশে আগেরই মতো ঘরা সূর্য, মেঘের ক মো কখনো চাকা থাকে ঘন ধূসরাভ আবৃত মহানগর স্বপ্নের জাল বুনে রেখেছে সর্বত্র। নিয়ন লাইটে উজ্জ্বল শহর দৃশ্য-ভরঙ্গে চঞ্চল। আকাশে সূর্যের বিদায় ঘোষণা নেই, সন্ধ্যার রক্তরাগ কখনো চোখে পড়ে না, দিনের উজ্জ্বল বৈভব রাত্রির দেবতাকে কখনো বিদায় আরতি জানিয়ে যায় না—

• •

বাংলাদেশে বাঙালীর প্রধান খাদ্য ভাত, বাংলার বাইরে ভাত ও রুটি দুই ই সমানভাবে উল্লেখযোগ্য খাদ্যবস্তু। ইয়োরোপের সর্বত্র প্রধানতম খাদ্য রুটি, নানান আকারের নানান রঙের রুটি। আমাদের দেশের পৌষ পার্বণের মতো ব্রিটেনেও হয়ে থাকে নানা উৎসব, লণ্ডন শহরে দেখা যায় রুটি তৈরির বিচিত্র প্রকরণ ও

পদ্ধতির নানা প্রদর্শনী। নানা আকারের রুটি তৈরির কারখানা এদেশে এখন একটি উচ্চ পর্যায়ের কারুশিল্প হয়ে উঠেছে। গত শনিবার লণ্ডনের গ্রীক স্ট্রীটের একটি বিখ্যাত দোকানে বিভিন্ন ধরনের রুটির সুন্দর এক প্রদর্শনী হয়—এদেশের অধিবাসীরা একে বলে হারভেস্ট ফেস্টিভ্যাল ডিসপ্লে। গত ১৯৫১ সাল থেকে প্রতি বছরের সেপ্টেম্বরে এই ধরনের রুটি প্রদর্শনী হয়ে আসছে। রুটি তৈরিতে সুনিপুণ এক কারিগর ট্রেভর জোনস্ ১৯৫১ সাল থেকে এই জাতীয় প্রদর্শনীর চর্চা সুরু করেন। গ্রীক স্ট্রীটের এই রুটির দোকানের নিজস্ব বেকারীতে রুটি তৈরি হয় বিরাট আকারের কারখানায় জিনিস তৈরি করার মতো অত্যন্ত ব্যাপকভাবে, সুবিপুল পরিমাণে। ফরাসীদের প্রিয় বেটন ব্রেড, ইংরেজদের ডিনার টেবিলের উপযোগী মুচমুচে মুড়মুড়ে রোল করা রুটি হাজারে হাজারে লাখে লাখে দিনরাতই এখানে তৈরি হচ্ছে। সম্প্রতি যে রুটি প্রদর্শনী হয়ে গেল তা'তে যে সকল বিভিন্ন আকারের ও বিচিত্র স্বাদের রুটি রাখা হয়েছিল, তাদের নামের বাহার দেখবার মত। নানা ঐতিহাসিক ঘটনা আর ইয়োরোপের বিভিন্ন জাতির নিজস্ব রুচি ও সংস্কারের সঙ্গে এই সব নাম বিজড়িত। প্রদর্শনীতে পেশ করা কতকগুলো রুটির নাম হ'ল নিম্নরূপ—ব্লুমার বোট, ব্রানস্উইক, বান, চোলা, কব, কটেজ, কোবার্গ, ক্রিসেন্ট, ক্রাউন, ক্রাম্বি, ডেমিস, ডেভনশায়ার, স্কচ্ ব্যাপ, স্যাণ্ডউইচ, সিসটার ব্রিক, টিন, টী, ভিয়েনা, উইণ্ডসর, হোলহীল ইত্যাদি ইত্যাদি।

• •

আর্ন হোয়াইল লার্ন (পড়তে পড়তে রোজগার), কথাটা শুনতে পাই আমাদের দেশে যেখানে সেখানে, লেখা রয়েছে দেখতে পাই সরকারী পোস্টারে, ইস্তাহারে, নানান জাতের প্রচার পুস্তিকায়। আমাদের দেশের বিদ্যার্থী ছেলেমেয়েরা উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে রীতিমত রোজগারও করতে পারেন। রোজগার তাঁরা করেছেন বইকি, আজকাল অনেক ছেলেমেয়েই তো দিনে

চাকুরী রাত্রিতে কলেজের ক্লাশ করে থাকেন। কলেজের নাইট শিফ্‌ট, রাত্রিতে মোটিং ক্লাশ টিউটোরিয়েল ক্লাশ ক্রমশঃই আরো বেশী ক'রে চালু হয়ে উঠছে। কিন্তু এদেশে শিক্ষার্থীদের টাকা জোগাড়ের বিলি ব্যবস্থা আরো বেশী জবাটি ধরনের, আরো বেশী পাকাপোক্ত। শুধুমাত্র উচ্চতর মানের পড়ুয়াদেরই নয়, একেবারে প্রাথমিক বা উচ্চ প্রাথমিক বা অন্য পর্যায়ের শিক্ষার্থী যারা নয়-দশ থেকে চোদ্দ-পনেরো বছর পর্যন্ত যাদের বয়স, তারাও এ দেশের স্কুল ছুটির সময়ে টাকা রোজগারের সুযোগ পায়, এই সুযোগ সাধারণতঃ তারা পায় চাষীদের ফার্ম হাউসে। একটি নির্দিষ্ট এলাকার ক্ষেত থেকে আর এক ক্ষেত খামারে এ দেশের চাষীরা আসা-যাওয়া করেন হেলিকপ্টারে চড়ে, ক্ষেতে বীজ ছড়ানো হয় খুবই হাল্কা উড়োজাহাজ থেকে: তাকেই এদেশের কৃষি খামারগুলোতে কাজের ব্যবস্থাও অভিনব ধরনের, বিজ্ঞানসম্মত, শৃঙ্খলাবদ্ধ, সুষ্ঠু ব্যবস্থা। ক্ষেত থেকে তুলে আনা পাকা ফসল বাছাই সলাই করা, বিভিন্ন শ্রেণী অনুযায়ী সঠিক বীজ সাজানো, ভালো মন্দ মাকারি নানা জাতের শস্যবীজ আলাদা আলাদা করে ভাগ করে রাখা ইত্যাদি নানা কাজে ব্রিটেনের পল্লীর চাষীদের সাহায্য করে এ দেশের বিদ্যার্থীরা। জুনের শেষ সপ্তাহ থেকে দেড় হয়ে পড়ো তিনমাস এক নাগাড়ে স্কুলের ছুটি, টানা তিন মাস ধরে রোজগার করে অনেক কিশোর ছাত্র ছাত্রী। লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিলের এক হিসেবে দেখা যায় শুধুমাত্র একটি জিলাতে—আগষ্ট মাসের ১২ তারিখে স্কুল ছুটির সময়ে কাজ চাই বলে যতগুলো নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে, তাদের মধ্যে কিশোর বয়সের ছাত্রদের সংখ্যা ৬৯৬৭ আর ছাত্রীদের সংখ্যা ৭৫৫৩। গ্রীষ্মের মরশুমে খামারের কাজ সেরে এই সব ছেলেমেয়েরা যখন শহরে ফেরে, তখন তাদের পকেট ভর্তি শেলি-শিলিঙের সঙ্গে যে মোটা গদ্দ জড়িয়ে থাকে, তার দামও ছোটেই কম নয়।

• •

যে কোন ধরনের সাধারণ রোগ হলেও, সামান্য একটু অসুস্থতার জন্যও লণ্ডনের বাসিন্দারা নার্সিং হোমে আসেন। লণ্ডনবাসী যে-কোন বয়স্ক লোক, বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা হলে তো কথাই নেই, কখনো কোন অবস্থাতেই নিজের অসুস্থতার সময়ে বাড়ির অন্যান্যদের একটুও বিরক্ত করতে চান না, তাঁরা চান আসেন নার্সিং হোমে। কয়েক সপ্তাহ নার্সিং হোমে থেকে শরীর সারিয়ে আবার ঘরে ফিরে যান। যাঁদের শরীর আর সারে না, নার্সিং হোমের ভালো চিকিৎসা সত্ত্বেও রোগ আরো বাড়তে থাকে, তাঁরা রোগে ভুগে ভুগে হয়তো নার্সিং হোমেই মারা যান: মরণাপন্ন রোগির সময়ে রোগীর নিকট আত্মীয় স্বজন এমন কি নিজের ছেলে মেয়েরা পর্যন্ত হয়তো এক দিন বা এক বেলার জন্যও রোগীকে দেখতে আসেন না, কিন্তু ঠিক এসে উপস্থিত হন রোগীর মৃত্যুর সময়ে বা মৃত্যুর পরে, রোগীর টাকাকড়ি, সম্পত্তি, জায়গা জমি, কি আছে না আছে তার বিলি-ব্যবস্থার জন্য। অবশ্য, বৃদ্ধ রোগীকে পরিবারের লোকেরা নার্সিং হোমে পাঠিয়ে দেন সুচিকিৎসার জন্য তো বটেই, সেই সঙ্গে রোগীর ওষুধ পথ্য সেবা শুশ্রূষার জন্য কোনও রকম ঝামেলায় ঝুলতে পোহাতে হবে না তার জন্যও বটে। এ দেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মিঃ এনোক পাওয়েল সম্প্রতি নার্সিং হোমগুলোর নিয়ম কানুন, প্রশাসন ও পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কে নতুন আইনের প্রবর্তন করেছেন—দি নার্সিং হোমস্ এ্যাক্ট অব্ ১৯৫৩। নতুনভাবে প্রবর্তিত এই আইনের ধারায় বলা হয়েছে যে অসহায়, পঙ্গু, বৃদ্ধ লোকদের সেবা শুশ্রূষার জন্য সেবাসদনগুলো যে-ভাবে পরিচালিত হয়, লণ্ডনের নার্সিং হোমগুলোর কাজও অবিকল সেইভাবে চালাতে হবে। একদিকে হাসপাতালের নিয়মনিষ্ঠা, অন্যদিকে বাড়ির মতো অন্তরঙ্গ সেবাযত্ন প্রতিটি নার্সিংহোমে অবশ্যই থাকবে: স্বাস্থ্যসম্মত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নার্সিংহোমের রান্নাঘরে, ওয়ার্ডে অবসর কক্ষে বিচক্ষণ ডাক্তার ও নার্সদের সতর্ক প্রহরায় সারাক্ষণ থাকবে অব্যাহত। নার্সিং হোমের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র, পথ্য, পানীয়, খাদ্য অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে সময়ে রাখা থাকবে: তা ছাড়া রান্নার বাসন, কেৎলী, প্যান, ডেকচী, চামচ, ছুরি কাঁটা আর ওষুধ পথ্য খাওয়ানোর গ্লাস,

সোনালী-পিঙ্গল. নেই. ঘোল জাগ লাবাক্স চকচকে ঝকঝকে ফিটফাট ছিমছাম করে রাখার আদৌ ব্যবস্থা অবশ্যই অক্ষুণ্ণ থাকবে।

* * *

গুড় গুড় কোথায় পাই
শীত বসন্ত দুটি ভাই
বর্ষা আসল, গ্রীষ্ম গত
রাজকন্যের গ্রীষ্ম হরত,
ফুলের ক্ষেতের ঘোলাটা-ঢুল
রাগী-রাগীর চক্ষুশূল!

নিটোল মাংসোল পরিপাটি হর ঋতু এদেশের এরা তখনো চোখে দেখেনি। এ্যাডোবামি শীত আর একটু-বসন্ত এই সোনা দুখানি ঋতু ওদের। মাঝখানে শুধু এককালি চলচে কাগজের মত একটুকরো হেমন্ত। বর্ষা দারা বছরময় ছড়ানো। শীতে টিপটিপ ঝরে ঝরে, বসন্তে ঝির ঝির বয় বয়। জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বরের কোন কোন কলমলে ঝরঝরে দিনে হঠাৎ করেক ঘণ্টার জন্য পরতের সাদা রেখে তেলা চোখে পড়ে আকাশে।

আটমাস ধরে জমিয়ে রাজত্ব করার পর, শীত যখন ছোটভাই বসন্ত-র হাতে রাজ্যপাট ছেড়ে একটু ঝিমিয়ে নেয়, তখন এদের ছুটির দিন। দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে এরা তখন বেরিয়ে পড়ে রোদ মাখতে আলো চাখতে মেঘ দেখতে।

পার্কে পার্কে ডাল-পালা গাছগুলো সবুজ পাতায় ছেয়ে যায়, বসন্তশ্রী ফুলের রঙে চারিদিক আলো হয়ে ওঠে, ছুটতে থাকে রকম রকম উৎসবের তরঙ্গ। একদিকে ঝমুলকপি-বটমপুঁটি নতুন আলো-ভেটকি হাট অন্যদিকে ঘাটে-পারে-বাটকে-সিমেমার-সিমেমার-লম্বে-লম্বে-চিত্র প্রদর্শনীতে শীতের কলকাতা যা, বসন্তের লন্ডনও অনেকটা তাই।

সারা বছর ধরে এরা পাউণ্ড জমায় বসন্তের এই সপ্তাহটিতে কয়েক সপ্তাহ বাইরে বেরিয়ে আসার জন্যে, অধ্যাপক, ডাক্তার, অফিসের চাকুরে, হোটেলের ওয়েটার, ক্লীনিটার, পোর্টার, বাড়ির মেট—সবাই যায় বসন্তের এই সপ্তাহটিতে কয়েক সপ্তাহের জন্য বাইরে: ছুটি কাটাতে কে-কোথায় গেল আত্মীয় পরিজন বন্ধু বান্ধব পরিচিতদের কাছে তা একটা গল্পের এবং গর্বের বস্তু। রাজকুমারী মার্গারেট ছুটিতে বেড়াতে গিয়েছিলেন গ্রীস, সেখানকার সরকারী আমন্ত্রণ পেয়ে। আর্ম্স্ট্রং অবশ্যই সঙ্গে ছিলেন। বেড়ানোর ব্যবস্থা যে রাজকীয় হয়েছিল, তাতে আর সন্দেহ কি; কিন্তু গত সেপ্টেম্বর মাসের ১৭ই তারিখে রোদে-পোড়া মুখ রাজকুমারী স্বামীসহ দেশের মাটিতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি ছোট্ট ঘটনা ঘটল। আকাশে বংকে রোদে পুড়িয়ে তামাটে করা এদেশী বন্দুকসেনাদের প্রধানতম প্রদানন। কয়েক সপ্তাহ আগে চাইল্ড পার্কে এক তরুণী গরম তামার পাত গায়ে মুখে ছোঁকা দিয়ে আশপাশের জনতার কৌতূহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বিমান থেকে নেমে রাজকুমারী অভ্যর্থনার রক্তগোলাপগুচ্ছটি হাতে নিয়ে স্বামীর সঙ্গে রোনস্ রয়েসে গিয়ে উঠলেন। আর্ম্স্ট্রং দড়বাচড়ে স্টিয়ারিং ধরলেন। এমন সময় গোলাপ, পুঞ্জ থেকে বোঁ করে বেরিয়ে এল—ভ্রমর নয়, একটি বোলতা।

* *

ব্রিটেনের বিদ্যুৎ সরবরাহ বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা গত সেপ্টেম্বর মাসে একটি ঘোষণায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, আসছে-শীতে সমস্ত ব্রিটেনেই বিদ্যুতের সরবরাহ যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়ে দেওয়া হবে, শুধু তাই নয়, কোন কোন অঞ্চলে বিদ্যুতের সরবরাহ সাময়িকভাবে বন্ধও করে দেওয়া হতে পারে। কর্মকর্তাটি কি সম্প্রতি কলকাতায় গিয়েছিলেন?

* * * *

ব্রিটেনের যুদ্ধসচিব (সেক্রেটারী অব্ স্টেট ফর ওয়ার) মিঃ ঘোসেফ গডবার সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন যে, এ দেশের তরুণেরা নাকি সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য মোটেই আর এগিয়ে আসছে না। সৈনিক জীবনের লোভনীয় সুখ-সুবিধা এবং অমন্ত সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ তাদের নাকি আর তেমন করে আকর্ষণ করে না। ন্যাড়া বেলতলায় আর কবার যাবে?

ভেট

হিমাদ্রি

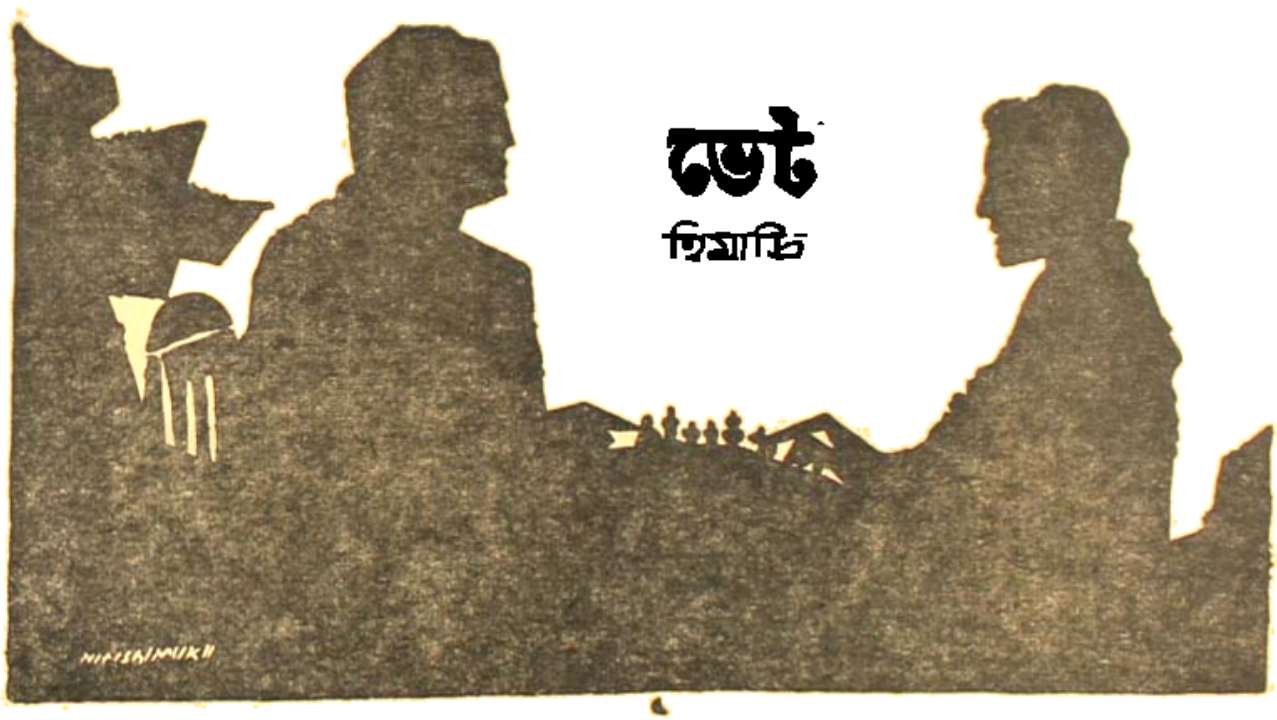

দুই বন্ধুতে রাত খেলছিলো।

রাত তখন প্রায় ন'টা হবে। মাঘমাসের রাত। দিল্লীর কাশ্মীরে শীতে দুই বন্ধু সেন আর রায় রাত খেলছিলো কম্বল মুড়ি দিয়ে বিছানায় বসে। বাকীরা সরকারী চাকুরে দু'জনেই। অফিসের পদবী ঘরে ডাকা-ডাকিটা বাড়িতেও চলে গেছে। সেন ও রায় পদবীর আড়ালে আসল নামগুলো গা-ঢাকা দিয়েছে। এই বাড়িতে, বিনয়নগরের এই মেসবাড়িতে, আরো অনেকজন বসু, রায়চৌধুরী, চক্রবর্তী, ভট্টাচার্য আছে। সব কজনই অবিবাহিত। সেই জন্যেই একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে মেসবানিয়ে থাকা।

জোড়া না পেলেও অন্য বাসিন্দাদের এই বাড়িতে উপস্থিতির সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। ভট্টাচার্য যে ঘরে আছে তার প্রমাণ দিচ্ছে একটা সেতারের বোল। বসুর সব তবলায়। তার ভেলাই-এর শব্দ আসছে এই ঘরেও। রায়চৌধুরীর ঘরে রোজ রাতে তাদের আসর বসে। জমাটি আড্ডা সেখানেই। মাঝে মাঝে পাউনোগ্রাফের তর্কা-তর্কির শব্দও আসছে। এমন রোজ রাতেই হয়। বিনয় নগরের এই মেসবাড়িতে এলে এই দৃশ্যগুলি এক এক ঘরে দেখা যাবেই। এই ধারা চলবে রাত দশটা পর্যন্ত। পরে আহার ও নিদ্রা। পরের দিনের প্রস্তুতির প্রথম পর্ব।

• • •

সেন রায়ের একটা ঘোড়ে তুলে নিতে গেল গজ চেলে, রায় মাথা নেড়ে দেখালে, ঠিক হোচ্ছে না। এমন ভুল শুধরে দেওয়া উভয় তরফেই চলে। চাল ফেরৎ নিয়ে সেন ঘোড়া দিয়ে আর একটা ঘোড়ে তুলে নিতে যেতেই রায় সমানভাগতে হাতা মেরে দেখালে, ঠিক হোচ্ছে না। আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। সেন চাল ফেরৎ নিয়ে যখন অন্য একটা ঘোড়ে তুলে নিতে যেতেই সেনের হাতটা খপ করে ধরে ফেলে রায়।

সেন বোকা-চোখে রায়ের দিকে চেয়ে থাকে।

রায় বলে, 'জীবনে একই ভুল ক'বার কোরবে?

সেন বলে, 'মেকাণ্ডটা ঠিক নেই আজ।'

রায় সেকথা জানে। সেনের অনেক জুনিয়র দু'জন টপ্‌টপ্‌ ডিগ্রিতে লিফ্‌ট পেয়ে গেল অফিসে। শুধু সেনই নয়, অনেকেই অবাক হোয়েছে। সেনেরই চান্স ছিলো প্রথম। কিন্তু ঘটনা একবার নয়, দুবার ঘটলো। তিনবার বা বারবার যে ঘটবে না, তাই বা কে বোলতে পারে।

মুষড়ে পড়েছে সেন।

রায় বলে, 'বুঝেছো সেন,

চান্সে ভুল করেছো কি মাত্র!

সেন বলে, 'বুঝি কিন্তু, আমি যে নিরুপায়, রায়।

'নিরুপায়! ঐ কথাটা বোকাদের অভিধানে বিদেয় করা আছে। তুমি একটু নড়ে দিলেই পাও না, একটা শক্ত ঐ ত্রিনটে বোড়েকে আইকে রেখেছে? ঐ সামান্য একটা বোড়েকে হটাতে পার, এমন শক্তির সমাবেশ তুমি করনি।'

'দেখতো দেখতেই পাচ্ছি।'

'দেখা তিন্ন পাচ্ছ! তা যদি পেতে এমন ঘুমন্তে পড়তে না।'

'কি কোরতে বল তুমি?'

'আমি বলি, লড়ক' দৃষ্টি রেখে বুদ্ধি খেলাতে—বুদ্ধির লড়াই চলুক।'

সেন না বুঝে ভঙ্গিতে কম্বল মুড়ি দিয়ে গুটিশুটি হোয়ে বসে চেয়ে থাকে তার রুম-মেট ও সহকর্মী রায়ের বুদ্ধিদীপ্ত উৎফুল্ল মুখের দিকে রায়ও কম্বল ভালো করে জড়িয়ে বসে। এবার সে একটা সিগারেট বন্ধুকে দিয়ে নিজে একটা ধরায়। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে ধূমপান চলে। রায় বলে, 'একজন অধস্তন অফিসার কি দিয়ে তার বসকে ঘুষ কোরতে পারে, সেন? সেন উত্তর

এই কথাটা
ভেবে দেখুন
সীমান্তে একজন জওয়ানকে উপযুক্তভাবে
সুসজ্জিত রাখতে দেশের অভ্যন্তরে
৫০ থেকে ১০০ জন ব্যক্তিকে কাজ করতে হয়।
প্রতিরক্ষা অধিকতর শক্তিশালী করার জন্য
দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে কাজ করুন
• ৪৯ ৩৮

দেবার আগেই রায় আবার বলে, 'তুমি বোলবে, বিদ্যে বুদ্ধি কর্মক্ষমতা এর অর্থ। না, না, আজকে আর অর্থের কথা শুনে কেউ চমকায় না! তুমিও অমন হাঁ কোরে চেয়ে থেকো না, সেন।'

সেন বলে, 'মুখেরইতো রাজত্ব এটা।

রায় হাসে, বলে, 'বন্ধু ধীরে! তুমি টাকা দিয়েও কিছু কোরে উঠতে পারবে না। বিদ্যে-বুদ্ধি কর্ম-ক্ষমতা দিয়ে যে পারলে না, সেটাতো দেখাই গেল।'

সেন আচমকা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'সেই জন্যই তো বোললাম, আমি নিরুপায়।'

জোরে জোরে মাথা নাড়ে রায়; মাক মুখ দিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বলে, 'আমি মানতে রাজী নয়।'

অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তিন সপ্তাহের ছুটি পেল সেন।

সেন যেতে যাবে। যাত্রার পূর্ব রাত্রে- রায়-সেনের আলোচনা চললো গভীর রাত্রি পর্যন্ত। পরের দিনের তুফানে সেন কোলকাতা রওনা হোয়ে গেল: কাজ বাড়লো রায়ের। অফিসের ছুটির পর সাইকেল সহেত রায়কে দেখা যেতে লাগলো দিল্লীর বিভিন্ন অঞ্চলে।

চোদ্দ দিনের মাথায় সেন ফিরলো।

একা নয়। সঙ্গে একটি তরুণী বধূ। স্টেশনে ছিল রায়। সেখান থেকে সরাসরি সে নবদম্পতিকে হাজির কোরলে করোলবাগের এক ভাড়া বাড়িতে। রায় পূর্ব থেকেই সংসার সাজিয়ে রেখেছিলো। সেন-দম্পতি নতুন সংসারে প্রবেশ কোরলে।

যাবার সময় রায় মন্তব্য কোরে গেল, 'সংগ্রহটি তোমার চমৎকার!'

অফিসে কথাটা চাপা রইলো না। সেন বিয়ে কোরে কী কি দিয়েছে! বাঙালী, অবাঙালী সব বন্ধুরাই ধরে বসলে, খাওয়াতে হবে। শুধু খাওয়া নয় বৌও দেখাতে হবে।

রায়ই এক রবিবারে সব ব্যবস্থা কোরে দিলে।

বন্ধুরা এল। পারুল তাদের গান শোনালে। ম্যাচ দেখালে। নিজের হাতে খাবার পরিবেশন কোরলে। কারো মুখে কথা নেই। সেনের স্ত্রী ভাগ্যে সকলেই যেন ঈর্ষান্বিত! নিমন্ত্রিতদের মধ্যে সেনের অবাঙালী বন্ধুও ছিলেন। সেন সাগ্রহে পারুলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় কোরে দিলে। সেনের বন্ধু পারুলের যৌবনপুষ্ট পাতলা ছিপছিপে সুন্দর দেহটির দিকে অপলকে চেয়ে থেকে একটি ভালো অঙ্কের চেক প্রেজেন্ট কোরে গেলেন।

রায় হাসলে।

সেন দম্পতির সংসার চলে। সংসার চালায় ঠাকুর চাকরে। সেন টাকা যোগায়। সেন গৃহিনী প্রসাধন ও ভ্রমণ নিয়েই থাকে। নিত্য নতুন সাজ। নিত্য নতুন বন্ধু বান্ধবী। অল্প দিনেই সেন পত্নীর রূপের খ্যাতি বহুজনের মুখে মুখে ফেরে। সেনের সুখের সংসার। অফিসের অনেক বন্ধুই অনেক বেশী সুজন হোয়ে পড়ছে। সময় বেশ কাটছে।

সেন কিছু দাবা খেলতে আসে মাঝে মাঝে রায়ের কাছে। অনেক দিনের অভ্যাস। অনেক কথার, অনেক আলোচনার স্মৃতি জড়ানো এই ঘেরা বাড়ি। সেন সময় পেলেই রায়ের সঙ্গে দাবা খেলতে আসে। এখন চালে ভুল হয় কমই। মাঝে মাঝে রায়ের মত দক্ষ খেলোয়াড়ও কোণঠাসা হয়ে পড়ে।

রায় হাসিমুখে বলে, 'সাবাস! এইতো চাই। জীবনটাতো বুদ্ধির লড়াই।'

একদিন বস্ সেনকে নিজের কামরায় ডাকলেন।

সেন দাঁড়িয়ে ছিলো, বসতে বোললেন। কিছুটা কাজের মধ্যে ব্যস্ত থেকেই বস্ বলেন, 'আই এ্যাম সরি, সেন। ত্রিলোক সিং আর চমনলাল তোমাকে সুপারসিড করায় আমি সত্যিই দুঃখিত, সেন। কথা দিচ্ছি, খুব শীগগিরই এর বিহিত আমি কোরবো।

সেন কৃতজ্ঞের ভঙ্গিতে বেরিয়ে এলো।

সেই রাত্রে দাবা খেলায় প্রথম হারিয়ে দিলে রায়কে।

রায় আনন্দে জড়িয়ে ধরলে সেনকে!

ঠিক দু'মাস পরেই সেনের প্রমোশন্ হোল।

সেন সুইটজারল্যাণ্ডের বোর্ড সভ্যদের মোটর চড়ায় কামাই নেই। সেন দরাজ হাতে পারুলের প্রসাধন ও বেশভূষা যোগায়। লোকে মনে মনে তারিফ করে এদের সুখী জীবনকে।

পরের মাসে সেন একমাসের ছুটির দরখাস্ত কোরলে।

দরখাস্ত হাতে নিয়ে বস্ ডেকে পাঠালেন সেনকে।

'এত লম্বা ছুটি কি কোরবে সেন?'

'স্যর, স্ত্রীর শরীর ভাল যাচ্ছে না। এই সময়ে একা রাখতে সাহস পাচ্ছি না।'

'ট্রাবলটা কি তোমার স্ত্রীর?'

'সী ইজ এক্সপেক্টিং।'

বস কয়েক মুহূর্ত সেনের মুখের দিকে তীব্রভাবে চেয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কি দেখে নিয়ে ছুটির দরখাস্ত সই কোরে দিয়ে বলেন, 'দেখো ওভার স্টে করো না যেন।'

সেন একান্ত কৃতজ্ঞের ভঙ্গিতে বলে, 'মনে থাকবে স্যর।'

পারুলকে তার আস্তানায় পৌঁছে দিলে সেন।

ঠিক তিন মাস পূর্বে একদিন রাত্রে সেন এইখান থেকেই পারুলকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলো। পারুলের সমস্ত জিনিস পত্র সোহপায় কোরে ঘুরিয়ে দিলে সেন। তার নিজের লাগেজ একটি মাত্র ছোট সুটকেস। সেই সুটকেস খুলে সেন এক তাড়া নোট বার কোরে নিলে।

সামনা সামনি দাঁড়ালো সেন পারুলের।

সেন বলে, এই নিন্ আপনার তিন মাসের কণ্ট্রাক্টের সেই হাজার টাকা।'

পারুল নোটের বাণ্ডিলটা নেয়। সেনের মুখের দিকে চেয়ে বলে, 'টাকার চেয়েও অনেক বড় জিনিষের সন্ধান পেয়েছি আমি আপনার সংসারে এই তিন মাসের অভিনীত-জীবনে। আজ আমার মন-প্রাণ ঐ রকম একটা সংসারেই বাঁচতে চাইছে। কিন্তু সেতো হবার নয়।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, সযত্নে আঁচল দিয়ে পারুল সেনকে প্রণাম করে।

'এবার তবে চলি।'

'একটু দাঁড়ান। জানি, আপনার মত মানুষ একান্ত নিরুপায় না হোলে এমন নোংরা জায়গায় আসবেন না। যখন কোলকাতায় আসবেন, যদি একবার কোরে আসেন।'

'কেনো?'

পারুল সেনের মুখের দিকে চেয়ে বলে, 'আপনার সংযম আমায় অবাক কোরেছে! কিন্তু চাইবো না। শুধু একটি প্রণাম করার অধিকার চাই।'

অবাক বিস্ময়ে সেন পারুলের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। গত তিন মাস সে পারুলকে দেখেছে বহুবার, বহু ভঙ্গিমায়। কিন্তু আজকের পারুলই যেন অপূর্ব!

সেন বলে, 'বেশ, করো দিলাম।'

এক মাস পরে সেন ফিরে এলো।

উদভ্রান্ত চেহারা; বিভ্রান্ত ভাবভঙ্গি। সেনের স্ত্রী মারা গেছে। অনেকেই সহানুভূতি জানালে। অনেকেই পক্ষ মুখে পারুলের রূপ গুণের সুখ্যাতি করলে। সেন মাথা নীচু কোরে শুনে গেল সব, বোললে না কিছুই। অনেকেই বুঝলে ব্যথা সেখানে গভীর, নীরবতা সেখানে অপরিহার্য। ভিড় ক্রমে ক্রমে পাতলা হোয়ে এলো। বাঁচি ছেড়ে বাঁচলে সেন।

সন্ধ্যায় এলো রায়।

সেন বলে, 'খবর কি?'

রায় বলে, 'মাতৃ'!

সেন অবাক হয়, 'মাতৃ?'

রায় বলে, 'হ্যাঁ, সিফিলিস!'

ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "চণ্ডালিনী"

(সংক্ষেপিত)

শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ

[পরিচিতি]

লেখক—ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; প্রকাশকাল—১৮৭০ [বাংলা ১২৭৭] ; পৃষ্ঠাঙ্ক ৭৬। প্রধান চরিত্র—চণ্ডালিনী ও তার পালক কৃষক দম্পতি। অপ্রধান চরিত্র—চণ্ডালিনীর স্বামী প্রিয়দর্শন ; চন্দ্রপ্রভা, চন্দ্রকান্ত ও চপলা। কাহিনীর সূত্র ও পরিচয়—বাংলা ১২৪০ সালের বন্যায় ভেসে আসা নিরাশ্রয় একটি বালিকার আশ্রয় পাওয়ার ও জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কাহিনীই—উপন্যাসের অবলম্বন। অপত্য স্নেহ এই উপন্যাসের প্রায় সমগ্র অংশ জুড়ে আছে। নামকরণ—নায়িকা 'চণ্ডালিনী'র নামে। ভাষা সাধু।

ভাসা কন্যা। চল্লিশ সালের বন্যায় বাংলার প্রায় সমস্ত দক্ষিণ অঞ্চল একাকার। পথ ঘাটের চিহ্ন নেই। চারিদিকে মরা জীবজন্তুর মৃতদেহ ভাসছে। গ্রামের মাটির বাড়িগুলির কোন চিহ্নও নেই। একটি গ্রামের উঁচু পোতার কয়েকখানি ঘর তখনও কোন রকমে টিঁকে আছে। এরই মধ্যে একখানি ঘরের মালিক অবস্থাপন্ন চাষী ভজহরি। চিন্তামগ্ন ভজহরি হঠাৎ এক সময় দেখলো তারও উঠোনে বন্যার জল ঢুকছে। এমন সময় তার স্ত্রী বানের জলে ভেসে আসা একটি মৃৎভাণ্ড হাঁড়ি দেখতে পেয়ে তা ধরলো। ঢাকা খুলে দেখে হাঁড়ির মধ্যে পরমাসুন্দরী একটি কন্যা। অকস্মাৎ সন্তান-রত্ন লাভ তারা সৌভাগ্যের বিষয় বলে মনে করলো। কারণ সবকটি সন্তানই অকালে মারা গেছে তাই এই শিশুটির মধ্য দিয়েই এখন তাদের যতো ভাবনা। মেয়েটির খাবার জন্যে একটি দুগ্ধবতী ছাগী আনলো।

বাল্যলীলা। শুক্ল কাহিনীর ধরে মেয়েটি দিন দিন যেন ডাঁটপুঁই হয়ে উঠতে লাগলো। শৈশবেই মাতা-পিতা তাকে ত্যাগ করেছে তাই মেয়েটির নাম রাখা হোল চণ্ডালিনী। মেয়েটি কারা কাকে বলে জানে না। সব সময় তার হাসি মুখ। তাই প্রতিবেশিরা সবাই মেয়েটিকে ভালোবাসে।

চাষী হলেও ভজহরি কিছু লেখাপড়া জানতো এবং তার স্বভাবটি ছিল ভদ্র। পাড়ার অনেকগুলি ছেলে তার কাছে লেখাপড়া শিখতো। ভজহরির একটি পাঠশালা ছিল। স্থানীয় ছেলে-মেয়েরা সেই পাঠশালায় পড়তো। মেয়েদের লেখাপড়া করতে দেখে অনেকে সমালোচনা করতো। তবে ভজহরি ছিল সৎ ও পরোপকারী। তাই সে এসব সমালোচনায় কান দিত না। ভজহরি চণ্ডালিনীকে লেখাপড়া শেখাতে আরম্ভ করলো। রূপে গুণে এবং বিদ্যাশিক্ষায় চণ্ডালিনী

সহপাঠীদের ছাড়িয়ে গেল সহজেই। বর্তমান পালক পিতামাতার প্রতিও চণ্ডালিনী যথেষ্ট ভক্তিমতী। সহবয়সী মেয়েদের সুখদুঃখে সে ছিল প্রকৃত বান্ধবী। আর, চণ্ডালিনীর সঙ্গে একপাতে বসে না খেলে পিতামাতা কারোরই খাওয়া হোত না। চণ্ডালিনী যে বনের জলে ভেসে আসা মেয়ে, সে কথা ভজহরি বা তার স্ত্রী কেউই তাকে জানতে দেয়নি। চণ্ডালিনীও আপন পিতামাতা জ্ঞানে ভজহরি ও তার স্ত্রীকে ভক্তিশ্রদ্ধা করতো এবং ভালোবাসতো।—[প্রথম স্তবক]।

আঁধারে আলোক। চণ্ডালিনী এখন রূপে গুণে পূর্ণ যুবতী। যৌবনকালের অহংকার স্বাভাবিক হোলেও চণ্ডালিনী ছিল শান্ত ও সংযত চরিত্র। একদিন ভজহরি কোন কাজে গ্রামান্তরে গেছে। সঙ্গিনীদের অনুরোধে চণ্ডালিনী বাবার কাছে অনুমতি নিয়ে তাদের সঙ্গে বেড়াতে গেল। গল্প করতে করতে পথে চলেছে। এমন সময় তারা এক বনের সামনে গিয়ে হাজির হোল। বনের সামনে এসে তারা ভীত হয়ে পড়লো। তাদের গল্প বন্ধ হয়ে গেল। ক্রমে অন্ধকার হয়ে এলো। এমন সময় একদল বুনো মহিষ তাদের তাড়া করলো। ভয়ে তারা দল ছাড়া হয়ে যে যেদিকে পারলো ছুটলো। কেউ কারোর খবর জানে না। চণ্ডালিনী আর চপলা নামে একটি মেয়ে এরা দুজনে গভীর বনের মধ্যে এসে পড়েছিল। চপলার সঙ্গে চণ্ডালিনীর ছিল গভীর ভালোবাসা। চপলাও বনের জলে ভেসে এসেছিল পাঁচ বছর বয়সের সময়। অস্পষ্ট একটা স্মৃতি থাকলেও চপলা তার অতীত ইতিহাস কিছুই জানে না। কেউই তাকে বলেনি। এরা দুজনে তাই কখনো পরস্পরকে ছেড়ে থাকতো না। চণ্ডালিনীর বাবা-মাও চপলাকে ভালোবাসতো।

যাই হোক, বনে ক্রমে সন্ধ্যা পার হয়ে রাত্রি অন্ধকার হয়ে এলো। বাবা-মার কথা মনে করে চণ্ডালিনী দুঃখ করতে লাগলো চপলা তাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে। চণ্ডালিনী কোন রকমে শান্ত না হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লো। এমন সময় তারা দূরে আলো দেখে সেইদিকে ছুটলো কাছেপিঠে একটু দূরে থেকে তারা দেখলো দু'জন সন্ন্যাসী আগুন জ্বালিয়ে হোম করছে। তাদের দেখে সন্ন্যাসী দু'জনের ধ্যানভঙ্গ হোল সন্ন্যাসীরা তাদের পরিচয় জানতে চাইলো। এই কথাবার্তার সময় সন্ন্যাসীদের একপাশে অসংখ্য নরকপাল দেখতে পেলো চপলা। কিন্তু চণ্ডালিনী ভয় পাবে বলে কিছুই বললো না, মনের ভাব গোপন করে রাখলো।

ভ্রাতৃ মিলন। সন্ন্যাসী দু'জনের যে এতক্ষণ কথা বলেনি সে চণ্ডালিনী ও চপলাকে নিকটে নদী থেকে স্নান সেরে আসতে বললো। সন্ন্যাসীদের কাছাকাছি নরকপাল দেখে তারা ভয়ে আর কথা না বাড়িয়ে স্নান করতে চললো। পথে দেখা হোল চন্দ্রকান্ত ও চন্দ্রপ্রভা নামক দুটি বালকের সঙ্গে। তারাও সন্ন্যাসীদের কবলে পড়েছে এবং নিদেশ মতো স্নান করতে এসেছে নদীতে। দুই দল প্রথম দর্শনে পরস্পরের প্রতি বিস্মিতভাবে চেয়ে রইলো। বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেলে চন্দ্রকান্ত ও চন্দ্রপ্রভা—চপলা ও চণ্ডালিনীকে আপন সহোদরা বোন বলে চিনতে পারলো। তখন আনন্দে চার ভাইবোনের দু'চোখ বেয়ে জল গড়াতে লাগলো। এই অভাবিত মিলনকে তারা পরম সৌভাগ্য বলে মনে করলো।

আহ্লাদে বিষ সঞ্চার। স্নান সেরে চার ভাইবোনে সন্ন্যাসীদের কাছে গিয়ে হাজির। ভয়ে তারা মুষড়ে পড়লো। সন্ন্যাসী দু'জন ছিল অংগিরাজের লোক। তারা চন্দ্রপ্রভার বাবার ঘোর শত্রু ছিল। এখন তাদের মনে সেই বিদ্বেষ ভাব ফিরেছে। তাই তারা চন্দ্রপ্রভার পিতার বংশ সমূলে ধ্বংস করার চেষ্টায় নানা ফন্দি ফিকির এঁটে বেড়াচ্ছে। আজ তারা অভাবনীয়ভাবে চন্দ্রপ্রভাদের চার ভাইবোনকে একসঙ্গে হাতের মুঠোয় পেয়েছে। সেই আনন্দে সন্ন্যাসী দু'জন আজ রাত্রে তাদের বিভীষিকাময় হত্যাকাণ্ড থেকে বিরত হোল। তারা আজ রাত্রের মতো ভালো খাইয়ে দাইয়ে ভালো বিছানায় শুতে দিলো। কিন্তু আজকের রাত তাদের কাছে কালরাত্রি।—[২য় স্তবক]।

অপর সদাচার। বনে আসার কিছুদিন আগে গ্রিয়দর্শন নামে এক যুবকের সঙ্গে চণ্ডালিনীর দেখা হয়। প্রথম দর্শনেই চণ্ডালিনী গ্রিয়দর্শনের রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়।

তার সমস্ত মন অধিকার করে আছে বন্ধুবর প্রিয়দর্শন। প্রিয়দর্শনেরও সমস্ত মন জুড়ে আছে চণ্ডালিনী। নদীঘাটে স্নান করতে গিয়েই তাদের দেখা হয়। এখন এই বৎসরে এইসব কথা চণ্ডালিনীর মনে হোতে লাগলো। তারা সবাই দুশ্চিন্তায় ঘুমিয়ে পড়লো। এদিকে, পরদিন ভোরবেলায় সন্ন্যাসী দুজন কোথায় যেন বেরিয়ে গেল। যাবার সময় তারা বন্দীদের পাহারাতে বারণ করে সাবধানে থাকতে বলে চলে গেল। তখন চার ভাইবোনে পালাবার উপায় নিয়ে আলোচনা করতে লাগলো।

প্রভাত। এদিকে চণ্ডালিনীর বর্তমান বাবা মা জয়হরি ও তার স্ত্রী মেয়েকে না দেখে পাগলের মতো হোলেন। চারিদিকে খোঁজাখুঁজি হোল। কিন্তু কেউ কোন সংবাদ দিতে পারলে না। যার এইরকম দুঃখের সহবাসবন্ধু একমাত্র সন্তান হারিয়েছে একমাত্র তিনিই জয়হরির দুঃখ বুঝতে পারবেন।—[৩য় তরঙ্গ]।

পাপবন্ধ। সন্ন্যাসীরা ছেলেমেয়ে চারটিকে ঘরে আটকে রেখে হাজির হোল গিয়ে—চণ্ডালিনী যার রূপে মুগ্ধ হয়েছে—সেই প্রিয়দর্শনের বাবার কাছে এই ঘটনা বলতে। প্রিয়দর্শনের বাবা ছিলেন জমিদার এবং এই শয়তান সন্ন্যাসী দুজনের আশ্রয়দাতা। তাঁরই নির্দেশে এরা সমস্ত অপকর্ম করে বেড়ায়। সন্ন্যাসীরা তাঁর বাড়ি গিয়ে দেখা পেল না। জমিদার তখন কোন একটি কাজে বাইরে গিয়েছিলেন। জমিদারের উপযুক্ত পুত্র প্রিয়দর্শনের আজ মনটা ভালো ছিল না। তাই সন্ন্যাসীদের কাছে কিছু জিজ্ঞাসা না করে তার প্রণয়ীর উদ্দেশে চিঠি লিখতে বসলেন। চিঠি লিখে মনের ভার কিছুটা কমলো। তারপর সন্ন্যাসীদের ডেকে খবর জিজ্ঞেস করলেন। পিতার কাছে যা আনন্দ-সংবাদ ছোত, ছেলের কাছে তা দুঃখের। তাদের মুখে বন্দী চার ভাইবোনের খবর পেয়ে কোমল হৃদয় প্রিয়দর্শন মনে অত্যন্ত আঘাত পেলেন। কিন্তু মুখে বললেন সন্ন্যাসীদের তিনি একটু পরেই পাবেন। সন্ন্যাসীরা খুশি মনে চলে গেল। প্রিয়দর্শনের ডান চোখ নেচে উঠলো। তিনি মনে করলেন, আজ তাঁর কোন প্রিয়বস্তু লাভ হবে। বন্দীরা এখনও পর্যন্ত পালাবার কোন ব্যবস্থা করতে পারেনি। যে ঘরে তারা বন্দী অবস্থায় আটক ছিল সেই ঘরে তরবারি আছে দেখে চন্দ্রপ্রভা ও চন্দ্রকান্ত উৎসাহিত হয়ে উঠলো। ভাবলো তরবারির আঘাতে সন্ন্যাসী দুজনকে তারা ঘায়েল করতে পারবে। ভাইবোনের সাহস দেখে চণ্ডালিনী ও চপলাও উৎসাহ বোধ করতে লাগলো। এমন সময় হঠাৎ সন্ন্যাসী দুজন এসে তাদের বেঁধে ফেললো।

কণ্ঠকোদ্ধার। বন্দিনী অবস্থায় বাবা-মার কথা মনে করে চণ্ডালিনী কাঁদতে লাগলো। চপলারও মনে ভয় ভয় ভাব ছিল। কিন্তু চন্দ্রপ্রভা ও চন্দ্রকান্ত এরা দুজনে এই বিপদে কিছুমাত্র ভয় পায়নি। তাদের দুই ভাইয়ের সঙ্গে প্রিয়দর্শনের রীতিমতো বন্ধুত্ব ছিল। তাই প্রিয়দর্শনের অজ্ঞানতেই তার বাবা চন্দ্রকান্ত ও চন্দ্রপ্রভার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করেন। সন্ন্যাসী দুজন প্রিয়দর্শনের কোমল স্বভাব, এবং তার বাবার কঠোর স্বভাবের কথা জানতো। তাই, চন্দ্রকান্ত ও চন্দ্রপ্রভাকে শেষ করে ফেলবার জন্যে —তাদের জমিদারের নির্দেশমতে কাজ করে তাঁকে খুশি করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। তাদের হাতিকাঠে আটকে ফেলা হোল। এক সন্ন্যাসী বলির গলায় ছড়ি ধরে আছে। অপর সন্ন্যাসী সবেমাত্র বলি দিতে খড়্গ তুলেছে। এমন সময় বন্ধুবৎসল 'প্রিয়দর্শন সেই জমিতে এসে হাজির হোলেন। এবং তৎক্ষণাৎ তরবারি দিয়ে সেই বলোদ্যত সন্ন্যাসীর মাথা কেটে দুখানা করলেন। কণ্টক দূর হোল প্রিয়দর্শনের কাছে ভাইবোনেরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো। কিন্তু চণ্ডালিনীর মুখভাবে কৃতজ্ঞতা ছাড়া আরও কিছু প্রকাশ পেল। তা প্রণয়েরই নামান্তর।

ছাদিল। প্রিয়দর্শন তার পিতার এই অন্যায় আচরণের জন্যে বন্ধুদের কাছে অনুতাপ প্রকাশ করলো। চন্দ্রকান্ত ও চন্দ্রপ্রভার পিতার বৈষয়িক ব্যাপারে মনান্তর-বশতই প্রিয়দর্শনের পিতা চন্দ্রকান্ত ও চন্দ্রপ্রভাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রিয়দর্শনের বন্ধুপ্রীতি ও উপস্থিত বুদ্ধির ফলে চন্দ্রকান্তরা এ যাত্রা বেঁচে গেল। চন্দ্রকান্ত ও চন্দ্রপ্রভার সঙ্গে কথাবার্তার পর প্রিয়দর্শন চপলাকে উপলক্ষ্য করে চণ্ডালিনীর সঙ্গে কথা বলতে

চেষ্টা করলো। এই সুযোগে প্রিয়দর্শন তার মনোভাব প্রকাশ করে লেখা একখানি চিঠি চণ্ডালিনীর হাতে। চণ্ডালিনী চিঠি পড়ে সলজ্জ সম্মতি প্রকাশ করলো।

—[৭ম তরঙ্গ]।

বসন্ত প্রদোষ। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। চারিদিকে বসন্তের আনন্দ। এমন সময়ে একটি পুরুষ এবং স্ত্রী-লোক বিলাপ করতে করতে ছুটে আসছিল—সেখানে সন্ন্যাসীদের হাতে মৃত অসংখ্য বালক-বালিকার মরদেহ স্তূপাকার করেছিল। স্ত্রীলোকটি উন্মাদিনীর মতো "আমার বাছা কোথায় রে" বলে হায় হায় করছিল। সঙ্গের লোক তাকে ধরে রাখতে পারছে না। এই কান্নাকাটি শুনে প্রিয়দর্শন তাদের পরিচয় নেবার জন্যে এগিয়ে এলো। চণ্ডালিনীকে দেখামাত্রই স্ত্রী-লোকটি তাকে আবেগে জড়িয়ে ধরে মা-মা বলে কাঁদতে লাগলো। এই স্ত্রীলোকটি আর কেউ নয়—চণ্ডালিনীর পালিকা মাতা, ভদ্রহরির স্ত্রী। আর, সঙ্গে আছে ভদ্রহরি, এবং তার দু'জন পরমাত্মীয় প্রতিবেশি। এই প্রতিবেশি দু'জনের মধ্যে একজন চণ্ডালার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী। এক কাঠুরিয়ার মুখে চণ্ডালিনীর এইরকম দুর্দশার খবর পেয়ে সে-ই ভদ্রহরি ও তার স্ত্রীকে এখানে নিয়ে এসেছে চণ্ডালিনীকে ফিরে পাবার আশায়।

সন্তান হারাইয়া সন্তান লাভ। সকলের পরস্পর সাক্ষাৎ ও পরিচয় হওয়ায় সবারই মনে এই অভূতপূর্ব আনন্দ হোল। চণ্ডালিনীর মুখে হাসি ফুটলো। ভদ্রহরি-চন্দ্রকান্ত, চন্দ্রপ্রভা, প্রিয়দর্শন প্রভৃতি সবার কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো এবং কৃতজ্ঞতাবশে তার কুটিরে নিমন্ত্রণ জানালো। প্রিয়দর্শন প্রভৃতি সে নিমন্ত্রণ আন্তরিকতাবে গ্রহণ করলো এবং তখনই সবাইকে সঙ্গে নিয়ে ভদ্রহরি তার বাড়ির দিকে চললো। হারামণি ফিরে পেয়ে তার আনন্দ আজ আর ধরে না। তাদের আগমনে গ্রামের সমস্ত লোকও আনন্দে যোগ দিলো। ভদ্রহরির খাতির যত্ন এবং অনুরোধে প্রিয়-দর্শন সেখানে কিছুদিন থাকতে বাধ্য হোল। আর, এক চণ্ডালিনীর পরিবর্তে ভদ্রহরির স্ত্রী চন্দ্রপ্রভা, চন্দ্রকান্ত, চপলা প্রভৃতি চার সন্তান পেলো। তার আনন্দই আজ সবার উপরে। প্রিয়দর্শন এবং চণ্ডালিনীর পরিণয় অবিলম্বে হোক—এই আশায় গ্রামবাসীরাও অধীর হয়ে উঠলো।—[৪র্থ তরঙ্গ]।

উদ্‌বাহ। উদ্‌বাহ বা বিবাহ মানুষের নতুন জীবন। মৃত্যুভয় যেমন মানুষের মনকে বিষাদ-গ্রস্ত করে তোলে বিবাহ তেমন মানুষের মনে আনন্দের সঞ্চার করে। প্রণয় ও পরিণয় প্রায় একই জিনিস। দুয়েতেই ভালোবাসা আছে। পরিণয় দম্পতির মনে স্থায়ী হয়, আর, প্রণয় বন্ধুত্বের বন্ধন করে। প্রকৃতপক্ষে, পরিণয় ও প্রণয় নর-নারীর মনকে বিশুদ্ধ করে, একথা সর্বজনবিদিত।

কাল কুটিল। চণ্ডালিনী ও প্রিয়দর্শনের মধ্যে আন্তরিক প্রণয়ভাব লক্ষ্য করে দিন দেখে শুভলগ্নে তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করলেন ভদ্রহরি। গ্রামবাসীর আনন্দ আর ধরে না। একই সঙ্গে চপলারও বিয়ে হোল তার প্রণয়ীর সঙ্গে। ভদ্রহরি তার সাধ্যমতো বিবাহে খরচ করেছে এবং আমোদ আহ্লাদের ব্যবস্থা করেছিল। এই বিবাহের কিছুদিন পরেই প্রিয়দর্শনের পিতার মৃত্যু হোল। প্রিয়দর্শন শোকে কাতর হোলেও সুশংস ও পাপাচারের আধার পিতার মৃত্যুতে লোকান্তরের হাত থেকে মুক্তি পেল। প্রিয়দর্শনের পিতা যাদের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে হস্তগত করেছিলেন প্রিয়দর্শন তার সমস্তই তাদের ফিরিয়ে দিলে। চন্দ্রকান্ত ও চন্দ্রপ্রভার পিতার সম্পত্তি ফিরিয়ে দিলেন। প্রিয়দর্শনের এই ব্যবহারে দেশবাসী এবং আত্মীয় কুটুম্ব সকলেই সন্তুষ্ট। প্রিয়-দর্শনের দুই বোনের সঙ্গে চণ্ডালিনীর দুইভাই চন্দ্রকান্ত ও চন্দ্রপ্রভার বিয়ে হোল। আনন্দ ও সৌভাগ্যের যেন সীমা পরিসীমা নেই। পবিত্র প্রণয়ের সুখ জগতে দুর্লভ। চণ্ডালিনী ও প্রিয়দর্শন এই দুর্লভ প্রেমের অধিকারী। চণ্ডালিনী ও প্রিয়দর্শন সকলের আন্তরিক আশীর্বাদ লাভ করে মহাসুখে দিন যাপন করতে লাগলো।—[৬ষ্ঠ তরঙ্গ]

শৌলরং পলাশ

অবশেষে বহু দিনের আকাঙ্ক্ষিত সে বৃহস্পতিবার এলো। আমরা অবাক বিস্ময়ে চোখ মেলে তাকালাম। অভিনন্দন জানালাম সকাল দুপুরকে। বাহাত্তর একুশে ফেব্রুয়ারীকে।

ঢাকা শহর আজ আশ্চর্য রকমের। মৃত্যুর মত স্থির, শান্ত। অথচ আমরা জানি কি ভয়ঙ্কর ভাবে বিস্ফোরিত হতে প্রস্তুত হয়েছে সে। আজ আগুন সূর্যের আলোয়, আমাদের শ্বাসে, রক্তে, আবহাওয়ায়।

আমরা লক্ষ্য করলাম। রক্ত আমাদেরকে ডাকে। পূর্ব বাংলা জেগে উঠছে। এবার আর সে থামবে না। না, কখনও থামবে না।

মনে পড়লো, কালকের কথা। সারাদিন ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে মুখে মুখে আজকের হরতালের কথা ঘোষণা করতে গিয়ে ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান বলেছিল, কি কন সা'ব, আমরা পারমু না?

ওর সে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর আমি এখনও শুনতে পাচ্ছি স্পষ্ট। আর দেখতে পাচ্ছি সে দু'চোখের ঘনিষ্ঠ আত্মমনের ঝিলিক। দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় আকুঞ্চিত ধারণ-শেষ ভাঁজে ভাঁজে।

আর একজন বলেছিল, আপনারা থাকবাবেন না সা'ব, আমরা আছি আপনাগো সাথে সাথে।

কতটুকু আশ্বাস আছে সে কথার মাঝে!

আর সবচেয়ে অবাক হতে হয়েছিল সে ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানকে দেখে সেই সারাদিন ধরে আমাদেরকে নিয়ে বেড়িয়েছে ঢাকা সহরের অলিতে গলিতে। আর সন্ধ্যার কিছু পরে পয়সা দিতে গিয়েই বললো, না সা'ব পয়সা নিমু না। ওইটা রাইখ্যা দ্যান। আমি ছান্দা দিলাম।

অবাক হয়েছিলাম। দিন এনে দিন খায় যারা, তাদের এ বিলাসিতা করা কেন! পেট কেন শুনবে সে কথা। ঘোড়ার চারা আসবে কোত্থেকে!

বলেছিলাম, না, তা হয় না। তোমার ভাড়া তুমি নিয়ে যাও। চাঁদা তোমাকে দিতে হবে না।

কি যে কন সা'ব। ওইটা আমি নিমু না কিছুতেই। শুধু আপনারা লড়বেন, আর আমরা লড়বো না! আইজ যে এত কথা কইলাম, কাইল আপনাগো লগে কি দিয়া কথা কইমো!

অবাক হয়েছিলাম আরও বেশী। শুধু আমি নই, আমরা নই, সামান্য এ ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান পর্যন্ত ভালবাসে বাংলা ভাষাকে। সে যে তার বাংলা ভাষা, মায়ের ভাষা। রক্তে যে তারই ছন্দ।

তাই তো আজ প্রশ্ন জেগেছে পদ্মার উদার বুকে নৌকো ভাসিয়ে দিয়ে কি গান গাইবে মাঝি! মায়ের পেট থেকে বেরিয়ে কোন ভাষায় কেঁদে উঠবে সদ্যজাত শিশু! কোন সুরে গান গেয়ে মা ঘুম পাড়াবেন শিশুকে।

এ দেশ আমার। এ ভাষা আমার। এ যে আমার মাতৃভাষা। আমি যে ভালবাসি এ দেশকে।

মনে পড়ছে আবু সাঈদের কথা। ঠিকই আমি

চিনতে পারি নি আমার দেশের লোকদেরকে। ভুলেই গিয়েছিলাম, সূর্য সেন, ক্ষুদিরাম, বীরকাশিম, বীরমদন, মোহনলাল, তীতুমীরের কথা।

: দেখেছো, শহরটা কেমন নিস্তেজ আর নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। আমি বললাম।

: হ্যাঁ। তবে নিস্তেজ নয়। কেটে পড়বার প্রস্তুতি। হোসেন বললো।

আমি চুপ করলাম।

: আজ সব চমৎকার। সমস্ত কিছুই চমৎকার। রিক্সা-ওয়ালারা আজ রিক্সা চালাবে না। মোটর ড্রাইভিংদের এ্যাসোসিয়েশন থেকে ওরাও প্রস্তাব নিয়েছে ধর্মঘট করবার। দোকান পাটও সব বন্ধ। হোসেন এক নিমেষে বলে উঠলো।

না, সব বন্ধ হয় নি। শুনলাম, জায়গায় জায়গায় নাকি দু'একটা করে দোকান খুলেছে লোকে। আমি জবাব দিলাম।

: দোকান খুলেছে! অসম্ভব, আমি বিশ্বাসই করি না সে কথা। আজকের এমনি দিনে দোকান কেউ খুলে রাখতে পারে না কখনও। হোসেন বললো।

: বেশী ঠিক কথাই বলেছে হোসেন। তুই অসম্ভব বলে উড়িয়ে দিতে পারিস। সরকার থেকে উস্কানি পেয়ে জন কয়েক অবাঙ্গালীরা দোকান খোলা রেখেছে। ওদেরকে শুধু বোঝানো হয়েছে। মাতৃভাষার অপমান যেমন তুমি আমি সইতে পারি না, তেমনি পারে না অন্য কেউই। আমরা প্রত্যেকেই চাই আমাদের নিজেদের মাতৃভাষা মর্যাদা পাক। ওদেরকে জানানো হয়েছে বাংলা হলে আর উর্দু থাকবে না। ওরা কথা বলবে কি করে! ধর্ম পাকিস্তানি গান গাইবেন না কিসে! ভয় দেখিয়েছে, বাংলা হলে বাঙ্গালীরা এ দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে সমস্ত অবাঙ্গালীদেরকে। আবু সাঈদ বললো।

: এ অন্যায়। আমরা তো তেমন কথা বলি নি কখনও। আমি প্রতিবাদ করলাম।

: ন্যায় অন্যায়ের কথা তুলে কি হবে! আমরা সে কথা বলি নি সত্য, তবুও তাদেরকে বোঝানো হয়েছে। ভয় দেখানো হয়েছে। এটাই ন্যায়। সরকারের এটাই নীতি। কিছু সংখ্যক লোককে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে না পারলে তো আর উদ্দেশ্য সফল হবে না ওদের কোনদিন। আমাদের দাবীকে বাস্তবায়িত করতে হলে, এমনি পথ তো নিতেই হবে।

: এত অত্যাচার অবিচারও কি আমাদেরকে চুপ করে সয়ে যেতে হবে!

: অত্যাচার অবিচার আবার কোথায় দেখলে। এ তো সবে শুরু। এখনই চীৎকার করে উঠলে, এর পরের ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন তুমি হবে কি করে। আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে। শান্ত ভাবে চালিয়ে যেতে হবে আমাদের সংগ্রাম। মনে রেখো, এর চেয়েও অনেক বড় বড় অত্যাচার অবিচার আসবে আমাদের ওপর। তবুও আমাদেরকে এগুতে হবে। নইলে আমরা মরে যাবো। একটি জাতি চিরদিনের জন্য শেষ হয়ে যাবে। আজ তুমি নও, আমি নই, শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রত্যেকের মনেই জমাট বেঁধে উঠেছে চরম ঘৃণা আর ত্রাস। তবুও দেখো কত শান্ত হয়ে সয়ে আছি আমরা। আবু সাঈদ বললো।

সকাল সূর্যের আলোয় হেসে উঠলো মিটফোর্ড রোড। শ্বাস পড়লো স্বস্তির। বিরাট কর্মব্যস্ততার পেলো বিরতি। আজ কোন লোক নেই পথে। নেই কোন যানবাহন। আজ সব যেন মৃত। পাথরের গায়ে খোদাই করা নক্সা।

আর্মেনিয়ান চার্চের মাথার ওপরের বিরাট ক্রস মাথা তুলে তাকালো। আজ লোক নেই কেন পথে। একটা রিক্সা কিংবা বাসও তো অন্ততঃ যেতে পারতো এ নিথর স্তব্ধতাকে খান খান করে ভেঙ্গে দিয়ে। তার চোখে অবাক বিস্ময়। বহুদিন পরে এ আজ তার নতুন অনুভূতি। ছেচল্লিশের সে ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার পর এমন স্তব্ধ হতে দেখেনি সে আর ঢাকার রাজপথকে কোনদিন। হ্যাঁ, আরও একবার দেখেছিল সে। সে প্রায় শ' বছরের আগে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সময়ে। সেই আঠার শ' আটাত্তর সিপাহী বিদ্রোহের সময়।

হিম ভেজা ঘাসের ওপর সূর্যরশ্মির চাকচিক্য। সে চাকচিক্য আজ আমাদের চোখে, বুকের উচ্ছলতায় উদ্ভাসিত।

পথে পথে পুলিশ। নিশ্চল। নিশ্চুপ। ওদের খাকির বেলবেটে সূর্য-আলো প্রতিফলিত। হাতে ঝকঝকে ইস্পাতের সঙ্গীন, রাইফেল, তেল চকচকে লাঠি।

হোস্টেল থেকে আমরা বেরিয়ে এলাম। আমি, আবু সাঈদ আর হোসেন।

বাতাসের সুরে প্রায় ফিসফিসিয়ে উঠলাম, দেখেছো তো কত পুলিশ! আমাদের কি হবে?

কি আবার হবে! আমরা এগিয়ে যাবো। ওরাও তো বাংলায় কথা বলে। পারবে কি ওরা কখনও নিজেদের মায়ের ভাষায় এমনি করে অপমৃত্যু হতে দেখতে। ওরা কি আর জেগে উঠবে না মনে করেছো।

আবু সাঈদের স্বরে গভীর আশ্বাস।

বললাম তাতেও যদি কিছু না হয়!

হোসেন বললো, আমরা কেটে পড়বো তাহলে। ইতিহাসের সৃষ্টি করবো আমরা।

: পাগল। এত সহজে কি আর কেটে পড়লে চলবে। সাড়ে চার কোটি জনতার মাঝেও তো এরা। এরাও তো আমাদের মতই মানুষ। এদের অনুভূতি আছে। বাংলাকে শুধু আমরাই নয়, এরাও ভালবাসে বলেই তো আজও বেঁচে আছে। এদেরকে জাগাতে হবে।

সে যেন কত দূর দেশ থেকে কথা বলে উঠলো আবু সাঈদ।

: এতেও যদি কিছু না হয়? আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম।

হবে, নিশ্চয়ই হবে। আমরা যখন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবো, মনে করো এরা কি তখনও পারবে এমনি নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে। না, তা পারবে না কখনই। এরাও তখন দল বেঁধে ছুটে আসবে। আমাদের স্বরে স্বর মিলিয়ে গর্জে উঠবে, রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই। এদেরকে ভুল বুঝো না, ভুল করবে তাহলে। এরাও চায় বাংলা ভাষা বেঁচে থাক। আমরা বেঁচে থাকি। ওরা প্রার্থনা জানায়। কিন্তু, পেটের চিন্তায় কর্তব্য ভাষা পেতে নেয়। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে এক বুক ব্যাথা নিয়ে নির্বিকার। নইলে কি আর দেখতে পাচ্ছো না ওদের চোখেও কত আশা, উদ্দীপনা। আমরা যে সবাই বাঙালী। যে ডাকে আমাদেরকে।

হেঁটে হেঁটে হাসপাতালের গেটের সামনে এসে দাঁড়ালাম আমরা।

একজন সরে এলো। ফিসফিসিয়ে বললো, কি বলেন, আমরা আজ জিতবোই। দেখছেন না, সরকার কি রকম ঘাবড়ে গিয়ে পুলিশ আর আই, বি-তে ছেয়ে ফেলেছে সম্পূর্ণ শহরটা।

: হ্যাঁ ভাই, আমরা জিতবোই। আবু সাঈদ বললো।

হিমাংশু বললো, এক শ' চুয়াল্লিশ ভেঙ্গে আমরা মিছিল করে বেরুবো কি করে?

সালেক যেন হতাশ হলো একটু।

: আজ কি মিছিল বেরুবে না তাহলে!

: বেরুবে, নিশ্চয়ই বেরুবে। আমরা এখান থেকে যাবো বিশ্ববিদ্যালয়ে। তারপর সেখানে গিয়ে সব ঠিক করবো। আবু সাঈদ বললো।

: কি ঠিক করবি, আমরা এক শ' চুয়াল্লিশ ভেঙ্গে ফেলবো! হোসেন বললো।

আমি ফিরে তাকালাম। অনেক কয়েক জোড়া চোখ স্থির হলো ওর ওপর এসে।

: না, এত সকালে আমরা এক শ' চুয়াল্লিশ ভাঙ্গবো না। সবাই মিলে আগে আলোচনা করে নিতে হবে আমাদেরকে।

: তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত আমরা যাবো কি করে? অন্য আর একজন জিজ্ঞেস করলো।

: ভেঙ্গে ভেঙ্গে। বিশ্ববিদ্যালয়ে আগে আমাদেরকে পৌঁছুতেই হবে। আপাততঃ তাই দল বেঁধে বা মিছিল করে যাওয়া সম্ভব হবে না আমাদের।

: আমরা কি তাহলে এক শ' চুয়াল্লিশ ভাঙ্গবো না? হিমাংশু আবার বললো।

: সে কথা এখন কি করে বলতে পারি! আমরাই তো আর সব নই। বিশ্ববিদ্যালয়ে চলুন, সেখানেই সব ঠিক করবেন আপনারা।

গেটের পাশের পুলিশ অফিসারটি খুব রাগ করে তেড়ে এলো। আপনারা এখানে ভিড় করবেন না।

আর কাউকে যাওয়াও দিতে পারবেন না।

: হ্যা, হ্যা, আপনারা ইয়াহে হই হাইয়ে। পুলিশটা বোধ হয় মোয়াজ্জেম হবে।

: না, বাবা আমরা কাউকেও দেবো না। তবে আজ আউট ডোরে যুশীও আসবে না একটিও।

পিছন থেকে কে যেন একজন চাপা স্বরে বলে উঠলো।

আগুন ঝরা চোখে সেদিকে তাকালো পুলিশ অফিসারটি।

আমাদেরকে অভিনন্দন জানিয়ে সূর্য উঠে আসছে ধীরে ধীরে। হাসছে অবাক আকাশ, পৃথিবী।

পুলিশ ভর্তি একটা ট্রাক রাস্তা দিয়ে চলে গেল। যাবার সময় অনেক ক্রোধ জ্বলন্ত দৃষ্টি ছুঁড়ে মারলো আমাদের দিকে। সূর্যের আলোয় ঝক্ ঝক্ করে জ্বলে উঠলো ওদের রাইফেলের ডগায় লাগানো ইস্পাতের সঙ্গীন।

ট্রাকটা কালো পথ পেরিয়ে চলে গেল। পেছনে জেগে উঠলো ধুলোয় ভরা আকাশ।

আমাদের ভিড় বাড়ছে ক্রমশঃ। সমস্ত বস্তি থেকে নারী-পুরুষেরা এসে একত্রিত হচ্ছে ধীরে ধীরে।

: বেলা তো প্রায় দশটা বাজলো। আমরা রওনা দেবো কখন? সারওয়ার এক সময় জিজ্ঞেস করলো।

তার পাশেরজন উত্তর দিল, কে জানে।

কাছে সরে এলো সারওয়ার। বললো, আমাদের কি যেতে দেরী আছে এখনও?

: না। সকলে এসে পৌঁছালেই আমরা রওনা দেবো। হোসেন বললো।

আবু সাঈদ কাছে সরে এলো। বললো, না, আর দেরী করে লাভ নেই। সারওয়ার, তোমরা এগোও। দেখো, চারজনের বেশী যেন কোন দলে না থাকো তোমরা।

: আর তোমরা?

: আমরাও যাচ্ছি। ততক্ষণে দেখি, আরও কারুর বাকী আছে নাকি আসতে। কেউ এলেই, তাদেরকে নিয়ে রওনা দিচ্ছি আমরা। তোমরা রওনা হাওগে এখন।

ছোট্ট ছোট্ট দল করে ওরা সবাই নিঃশব্দে এগিয়ে চললো ডি, সি, রায় রোডের দিকে।

আবু সাঈদ আবার বললো, রেজা, তোমরাও যাও ওদের সঙ্গে সঙ্গে। হোসেন, দেখিস, রাস্তার মাঝে ওরা আবার কোন রকমের স্লোগান দিয়ে না বসে।

: আর তুমি! তুমি কখন আসছো? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

: এই আর একটু পরেই যাচ্ছি আমি। তোমরা রওনা হও।

আমি আর হোসেন চলে এলাম।

ডি, সি, রায় রোড ধরে বেচুরাম দেউরীর ভেতর দিয়ে আমরা এক সময় এসে পৌঁছালাম সেন্ট্রাল জেলের সামনে, স্যার নাজিমুদ্দিন রোডে।

একজন বললো, আমরা কিন্তু খুব স্লিভ করে এগিয়ে চলেছি। কোন হাঙ্গামা বাঁধতে পারে ভয়ংকর এতে।

: হ্যা, আমাদের আর একটু সাবলা সাবলা হয়ে চলা উচিত।

আমি আর হোসেন সকলের শেষে।

নির্বাক নাজিমুদ্দিন রোডের ওপর বিক্ষিপ্ত ভাবে অনেক করেক জোড়া পদশব্দ তুলে আমরা এগিয়ে চলেছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের ফুলার রোডের পাশে কুঁচকুড়া গাছগুলোতে থোকা থোকা লাল ফুল ফুটেছে অনেক। ফুলার রোড সেজে উঠেছে অপরূপ রূপে। বিরাট বড় বড় গাছের মাথায় শুধু লাল, অজস্র লাল ফুল। বসন্তের ভারে নবরূপ নিয়েছে পৃথিবী। 'ফাগুন, এবার সাজাও মোরে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ওই দূরের মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ও মাথার শিমুল গাছটাতেও অনেক ফুল, লাল রঙের। ফাল্গুনের রং আমরাও মেখেছি সারা অঙ্গে। রোডের তাতে খুব লাল করে এগিয়ে চলেছি ছোট্ট ছোট্ট অসংখ্য দলে। তামাটে মুখের মিছিল পথে পথে।

অথচ, এই ফাল্গুনকে কতই না কামনা করেছি আমরা। প্রতিটি শুভ্র সময়েই আমরা কামনা জানিয়েছি বসন্তের জন্যে। এবার একটি ফাল্গুন, একটি বসন্ত পেরিয়ে যাচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি। অথচ তার কিছুই উপলব্ধি করতে পারছি না আমরা।

একজন বলে উঠলো, সত্যি, কুলার রোডের রূপটাই বদলে দিয়েছে কালাগুনে।

অন্য জন বললো, হ্যাঁ। কালাগুনে তো মাসের রাজা, আর বসন্তের জীবন। যুগে যুগে তাই তো কবিরা লিখে গেছেন শুধু বসন্তের কথা, কালাগুনের কথা।

: হ্যাঁ, তা যা বলেছো। বসন্ত আছে বলেই তো আমাদের দেশে এত কবি। প্রথমজন আবার বললো।

: হুঁ। ভাবাই যদি না থাকলো, তবে কালাগুনের রূপই বা দেখবি কি করে, আর এত কবিই বা আসবে কোত্থেকে? অন্য আর একজন ফুঁসে উঠলো পাশ থেকে।

ফিরে তাকালাম। বেশী দূরে নয়। আমাদের সামান্য একটু দূরেই কথা বলছে ওরা। মজহারুল হক, প্রশান্ত সেনগুপ্ত মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী।

অনেকেই এসে গেছি আমরা। আরও আসছে। পিঁপড়ের সারির মত ছোট ছোট দল বেঁধে আসছে তো আসছেই। এগিয়ে আসছে অসংখ্য মেয়ে-পুরুষ। ছাত্র-ছাত্রী। আমরা সবাই আছি। কাল যারা ডাক্তার হবো, হবো অধ্যাপক, ইঞ্জিনিয়ার, ওভারসিয়ার, জুট টেকনোলজিস্ট, স্পেশিয়ালিস্ট, কেমিস্ট, এগ্রিকালচারিস্ট, কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, সাংবাদিক, খ্যাতনামা রাজনীতিবিদ, উকিল, ম্যাজিস্ট্রেট, সেক্রেটারী, এ্যাটাচী, দূত, মন্ত্রী,—সবাই আছি। আর আছে ক্লাশ টু থি,-ফোরে যারা পড়ে, তারাও। আমরা ভাবীকালের নায়ক-নায়িকারা সব এসে একত্রিত হচ্ছি ধীরে ধীরে। এসে ঘিরে বসছি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের সেই আম গাছের নীচে।

নতুন যৌবন এসেছে সেই কালাগুনে বুড়ো আম গাছে আবার। ছোট ছোট গুটি আমে ভরে গেছে ডালগুলো, আর নুয়ে পড়েছে ভারে।

একদিকে জমা হয়ে বসে আছে অসংখ্য মেয়ে। রুবী আর আজুঁবান্দ তো রয়েছেই।

আমাদেরকে দেখে কাছে চলে এলো আজুঁবান্দ।

: আরে কই! আসেনি ও এখনও?

: হাসপাতালে আছে ও। আসবে হয়তো এই একটু পি।

: ও। হ্যাঁ, কোন গণ্ডগোল তো হয়নি আপনাদের ওখানে?

গণ্ডগোল আবার কিসের হবে!

: না, এই বলুন, জোর করে কেউ ঢুকতে যায়নি তো?

: উহুঁ, ওসব বালাই নেই আমাদের। যাবে কে জোর করে ঢুকতে? আমাদের হাসপাতালের আউটডোরে রুগী পর্যন্ত আজ আসেনি একজনও। কিন্তু, কেন?

: এমনি। আপনাদের ওখানে তো অনেক অবাঙ্গালী আছে কি-না, তাই জিজ্ঞেস করলাম।

: হ্যাঁ, তা আছে বটে। তবে তাতে কি হয়েছে। ওদেরকে আমরা সব বুঝিয়ে দিয়েছি। ওরা আমাদের সঙ্গে সায় জানিয়েছে উস্কানি দিয়েও ওদের কেউ আর সরাতে পারবে না কোনদিনই।

: বেশ ভালই করেছেন আপনারা।

আজুঁবান্দ আবার সেই ভিড়ে গিয়ে বসলো।

আবার অনেকক্ষণ সময় গড়িয়ে গড়িয়ে চললো। আমরা সবাই হেঁট শুতঃ বসে আছি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। কুলার রোডে কালাগুনের মহা সমারোহ। নীচে পুলিশ, সৈন্য,গোয়েন্দা। ঘন ঘন ট্রাক ছুটে চলেছে। ট্রাকের ওপর সৈন্য। তাদের পুরু গোঁফের নীচে হাসি। হাতে রাইফেল।

এদিক ইতস্তত: কিছুটা সময় ঘুরে ঘুরে বেড়ালাম। ধীরে ধীরে এক সময় ওপাশে সরে গেলাম। রুবী উঠে এসে কাছাকাছি দাঁড়ালো।

বললো, আজ কিন্তু আমরা দু'জনে পাশাপাশি থাকবো, কেমন।

হাসলাম। কেন?

: কেন জানি না বাপু। কেন জানি আমার আজ ভয় করছে খুব। এমন ভয় লাগছে কেন বলো তো?

: ভয় করবার কি আছে! কিছু হবে না আমাদের। আমি সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলাম।

: যদি কিছু হয়! আমার কিন্তু অসম্ভব ভয় করছে। তুমি আমার পাশে পাশে না থাকলে, ভয়ে আমি মরেই যাবো। তুমি থেকো, লক্ষীটি।

: আচ্ছা, থাকবো।

: হ্যাঁ, থেকো। তুমি পাশে থাকলে আমার ভয়

করবে না কিছুতেই। ঘরতেও আমার ভাল লাগবে।

আরও বেশ কিছু সংখ্যক লোক এলো। ওদের পেছে এক সময় আবু সাঈদও এসে পৌঁছাল।

: আমরা সব এসে গেছি?

: হ্যাঁ। মনে হয়, কেউ বাকী নেই আমাদের। আমি বললাম।

: সবাই তো প্রায় এসে গেছে। কিন্তু, সভার কাজ শুরু করছে না এখনও, আশ্চর্য! কটা বাজে তোমার ঘড়িতে?

ঘড়ির দিকে তাকালাম। বারোটা বাজে প্রায়।

: ওহ্, অনেক বেলা হয়ে গেছে।

এক দিকে আমরা দু'জনে গিয়ে বসলাম।

: হোসেন কোথায়?

: ওই তো হোসেন, মেডিক্যাল কলেজের লতিফ ভাইয়ের আর জগন্নাথ কলেজের হুমায়ুন সাহেবের সঙ্গে বসে কি যেন আলাপ করছে।

সেদিকে আঙুল তুলে আমি দেখালাম।

: তোমার যে বড় দেরী হয়ে গেল আসতে?

আমি আবার কথা বলে উঠলাম।

: আমার! পাহাবাদেরকে পাঠিয়ে দেবার পর হোস্টেলে গিয়েছিলাম একটু। আর গিয়েই দেখলাম এক্সপ্রেস চিঠি এসেছে আমার। আমার তাই দেরী হলো একটু।

: এক্সপ্রেস চিঠি! কে লিখেছেন?

: কেন? একটু থামিক নীরব থেকে আবার বললাম, বাড়িতে যেতে লিখেছেন বোধ হয়।

: হুঁ, ও এক কারণেই তো আছে। সে কথাই একেবারে এক্সপ্রেস চিঠিতে জানিয়েছেন মা। লিখেছেন, শীতের পরে তো আসতে চেয়েছিল আবু। কই এলি না তো। সেই শীত পেরিয়ে ফাল্গুন এলো। এবার চলে আয় আবু। তোকে দেখবার জন্য মনটা আমার কাঁদছে শুধু।

: ঠিকই তো লিখেছেন মা। তোমাকে দেখবার জন্য তো তাঁর প্রাণ কাঁদবেই। কবে যাচ্ছো তাহলে?

: দুর ছাই, এখন কি আর এমনি গণ্ডগোলের মধ্যে বাড়ি যাওয়া যায় নাকি! হাঙ্গামাটা মিটে গেলেই বাড়ি যাবো। গতিক অনেক দিন হয়ে গেল বাড়িতে যাওয়া হয়নি।

আমরা আবার চুপ করে গেলাম।

থেকে থেকে দমকা হাওয়া বয়ে চলেছে। সে হাওয়ার কৃষ্ণচূড়ার থোকা থোকা ফুল কাঁপছে থরো থরো, ছড়িয়ে পড়ছে নীচের মাটিতে, পথে।

আমরা সবাই অপেক্ষা করছি পাকভাবে। মাঝে মাঝে ছোট্ট ছোট্ট কথার ঢেউ উঠছে সামান্য। ফিস-ফিসিয়ে কথা বলছে কেউ কেউ। অসংখ্য লোকে ছেয়ে গেছে সম্পূর্ণ মাঠটা। এসেছে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, সাংবাদিক, দোকানদার, ডাক্তার, অধ্যাপক, ফিরিওয়ালা, —সবাই।

ফাল্গুনের আকাশে আজ কত আগুন। আমরা সবাই ঘামছি। আগুন জ্বলছে বাতাসের হল্কায়, শরীরে, মনে।

এক সময় সভার কাজ শুরু হলো। একজন বললো, সরকার আজ তার চরম দমন নীতি চালিয়ে আমাদের মুখ বন্ধ করে দিতে চলেছে সাড়ে চারকোটি জনতার দাবী। তবুও আমরা আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যাবো। আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাবো শান্তিপূর্ণভাবে। কোন গণ্ডগোলের সৃষ্টি হলে, আমাদের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে।.....

: আমরা কি করবো তাহলে? একপাশ থেকে আওয়ামী বলে উঠলো।

: আমরা আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যাবো। তবে এক পা চুয়ান্নিশ আগবো না।

: তোমার অমন মিষ্টি কথা শুনতে আসি নি আমরা। এক পাশ থেকে একজন চেঁচিয়ে উঠলো।

: বিশ্বাসঘাতক। দাঁতে দাঁত চেপে আর্তনাদ করে উঠলো ঢাকা কলেজের ছাত্র নবীন।

একদিক থেকে একটি স্কুলের ছাত্র চেঁচিয়ে উঠলো, ঘুষি ছুঁড়ে মারো ওর মুখে।

: ঘুঃ। কিছুটা ঘুষি ছুঁড়ে মারলো পলিটেকনিক্যাল স্কুলের ছাত্র শাহ আলম।

: আমরা ফিরবো না কিছুতেই।

উত্তেজনায় প্রত্যেকের মুখ চকচকে। চোয়ালগুলো শক্ত হয়ে এসেছে।

: আমরা জানতে চাই কি করবো আমরা?

: আজ এক শ' চুয়াল্লিশ ভাল্লা মাথে একটি ভাষার শেষ হয়ে যাওয়া। একটি লাশীর শেষ হয়ে যাওয়া। আমাদের আন্দোলন তাহলে ব্যর্থ হয়ে যাবে।

: বন্ধুগণ, বন্ধুগণ·····

: দালাল এসেছে। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের আকবরালুল চেঁচিয়ে উঠলো।

হাঁ।, হাঁ।, দালাল এসেছে। চেঁচিয়ে উঠলো বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুর সাবেব।

: শান্তি দাও ওকে।

: কেন, ঠিকই তো বলেছে।

: এই যে আর একটা দালাল।

: শেম্, শেম্।

ক্রুদ্ধ চীৎকার আর বিদ্রূপে থেমে গেল বক্তার আওয়াজ। যিনি বক্তৃতা করছিলেন, তিনি বেরিয়ে গেলেন। সঙ্গে চলে গেল আরও পঁচিশ-ত্রিশ জন ছাত্র।

: তোমাদের আন্দোলন সফল হবে না।

: থুঃ।

: বেইমান আর বিশ্বাস ঘাতকের দল।

: থুথু ছুঁড়ে মারো ওদের মুখে।

: মুসলিম লীগের পোষা দালাল ব্যাটারা সব।

: শেম্, শেম্।

: আমরা জানতে চাই, কি করবো আমরা এখন?

: হাঁ।, হাঁ।, কি করবো আমরা?

আবু সাঈদ ছুটে গেল সভাপতির দিকে। অনেকেই তাকালো ওর দিকে। আমরা অবাক হলাম।

সভাপতির পাশে দাঁড়িয়ে আবু সাঈদ চীৎকার করে উঠলো, এক শ' চুয়াল্লিশ আমরা ভাঙ্গবোই। এক শ' চুয়াল্লিশ যা ভাঙ্গলে আজ থেকে একটা ভাষার, একটা জাতির মৃত্যু হবে। সরকারের এ দমন নীতির কাছে কোনক্রমেই বশ্যতা স্বীকার করা চলবে না।

: সাবাস ভাই।

: সত্যি, দুধের ছেলে। একজন মন্তব্য করলো পাশে।

: হাঁ।, হাঁ।, এই আমরা চাই।

: এক শ' চুয়াল্লিশ আমরা ভাঙ্গবো সভা। তাই বলে আমরা প্রকাশ্য মিছিল করবো না, এক শ' চুয়াল্লিশ বিরোধী কোন কাজও করবো না প্রকাশ্য ভাবে।

: তবে!

এ ওর দিকে মুখ চাওয়া চাওয়ি করলো অবাক হয়ে।

: কিন্তু, এসেম্বলী চাউসে আজ আমাদেরকে যে যেতেই হবে সকলকে বলে যেতে। একজন বলে উঠলো।

: হাঁ।, এক শ' চুয়াল্লিশ আমরা প্রকাশ্য ভাবে ভাঙ্গবো না। অথচ, এসেম্বলীতেও যাবো আমরা সবাই। তারও পথ আছে। দশ জনী মিছিল করে করে আমরা এগিয়ে যাবো। সেখানে গিয়ে আমরা জানাবো আমাদের দাবী,—মাতৃ ভাষা বাংলা একমাত্র দাবী। আবু সাঈদ আবার বলে উঠলো।

: হাঁ।, হাঁ।, দশ জনী মিছিল করেই আমরা এগিয়ে যাবো।

: চলো, চলো, এসেম্বলী চলো।

: আওয়াজ তোলো, রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই।

: সরকারী দমন নীতি চলবে না।

: সকল ভাষার সমান মর্যাদা দিতে হবে।

: আমাদের দাবী মানতে হবে।

ধাক্কাধাক্কি পড়ে গেছে আগে যাবার জন্য। সবাই চায় আগে যেতে। ভীড় বাড়ছে ক্রমশঃ।

ছুটে এসেছে মেয়েদের দল। আমরা যাবো আগে।

এতক্ষণ যেন আত্মগোপন করে ছিল সালাম চৌধুরী। এবার ঘুরে গেলো সামনে। চাপা স্বরে চেঁচিয়ে উঠলো, আপনারা এমনি ধাক্কাধাক্কি করবেন না। শান্ত হয়ে কাজ করুন।

: আরে মাতব্বর, তুই! অবাক হলাম আমি।

: হাঁ।, আমি। ছোট করে জানালো মিটফোর্ড হাসপাতালের সার্জেন ডাঃ মাহবুব।

ও ছুটে গেল সে 'ডাক।

প্রথম দশ জনী মিছিল তৈরী হয়ে গেল। আওয়াজ তুললো। রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের বাইরে আসতেই প্রেকতার করলো। কতকগুলো ফুরোর্ড হারেনা মুহূর্তের মধ্যে

ছিনিয়ে নিল ওদেরকে। উঠিয়ে নিল পুলিশ

দ্বিতীয় দল জন্মী মিছিল তৈরী হলো। আওয়াজ উঠলো, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। গেটের বাইরে আসতেই গ্রেফতার হলো। পুলিশ ভ্যানে ওদেরকেও উঠানো হলো।

বন্দী ভর্তি দুটো পুলিশ ভ্যান ছুটে চলে গেল লালবাগ থানার দিকে।

দলে দলে ছাত্র ছাত্রী বেরুচ্ছে। বন্দী হচ্ছে। লোক উঠিয়ে পুলিশ ভ্যান চলে যাচ্ছে। ঘুরে ঘুরে এসে থামছে খালি ভ্যান।

: শুনছিল, অনেক মেয়েকে পরের দিকে ওরা আর থানায় নিয়ে যায়নি।

: তবে!

: ওদেরকে হাইপাওয়ের দিকে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে ছিল। ওরা আবার বাসে করে ফিরে এসেছে।

: খুব ভালই করেছে। আবার ধরুক ওদেরকে। নিয়ে যাক জেলে। দেখি না কত জায়গা আছে ওদের জেলে? কতজনকে আর ধরতে পারবে ওরা। ওপাশ থেকে অন্যজন বেশ বলিষ্ঠ স্বরেই জবাব দিল।

মিছিলের পর মিছিল করে লোক বেরুচ্ছে তো বেরুচ্ছেই। আওয়াজ উঠছে দিকে দিকে।

: হ্যাঁ, হ্যাঁ, আওয়াজ তোলো, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।

: রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।

লোকগুলো সব যেন কি। ভয় পায় না কিছুতেই। খোঁচা খাওয়া গোখুরে সাপের মত ফুঁসছে সব। মরিয়া হয়ে ছোবল তুলছে দ্বিগুণ উৎসাহে। মনে পড়ছে আবু সাঈদের কথা। আমার দুর্বলতা দেখে একদিন বলেছিল, এই একটি মৃত্যু বা বন্দী আরও লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণে আগুন জ্বালিয়ে দেবে। সমর্থন জানিয়ে যে চুপ করে বসে আছে নিশ্চিন্তে, সেও সেদিন ছুটে আসবে সবার সাথে।

: দেখি, আর কতজনকে ওরা জেলে রাখতে পারবে?

: আমরা এখনে অনেক আছি। সাড়ে চার কোটি।

: আমরা ভয় খাই না। সরকারের এ ধরন নীতির কাছে কিছুতেই হারমানতে পারবো না আমরা।

: হ্যাঁ, হ্যাঁ, আওয়াজ তোলো, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।

: রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।

: রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।

পুলিশ ভ্যান আর ট্রাক থেকে ওরাও আওয়াজ তুলেছে। রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।

অনেক মুষ্টিবদ্ধ হাত ঘন ঘন উঠে আসছে বাতাসে।

ব্যারিকেড দিয়ে গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে পুলিশ আর সৈন্য।

: আমরা ডরাই না।

কাড়াকাড়ি চলছে এগিয়ে যাবার। একটি ছ'সাত বছরের ছেলে বলে উঠলো, এবার আমি যাবোই। ওর আনন্দ বা কৌতূহল নেই। রয়েছে জমাট পুঞ্জিভূত ঘৃণা। আপোষহীন সংগ্রাম।

: হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলো।

দল জন্মী করে মিছিল। গ্রেফতার। আওয়াজ। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মত হুঙ্কার। রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই।

ওড়না আর শাড়ির আঁচল উড়িয়ে এগিয়ে গেল এক দল মেয়ে। রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই।

গেটের বাইরে আসতেই লুফে নিল পুলিশেরা। ট্রাকে উঠলো। তোমরাও এসো। আওয়াজ তোলো, রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই।

মনে পড়লো বার্নসের সেই কথা 'লিবার্টি'স ইন্ এভরী ব্লো। লেট আস্ ডু অর ডাই।'

দেখলাম, আকাশের দিকে বলিষ্ঠ মুঠো তুলে ধরে আজন্মনাদ চেঁচিয়ে চলেছে। রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই। পুলিশ ভ্যানে উঠে ওর স্বর যেন আরও অনেক বেশী জোরালো হয়েছে। 'দ্যা ট্রি অব লিবার্টি' গ্রোজ্ অফলি হোয়েন ওয়াটার্ড' বাই দ্যা ব্লাড অব টিরেন্টস।'

আমরা এখনও অনেক পিছে। কাড়াকাড়ি করে আগে যাবার দলে ধাক্কায় আমরা কখনও এগোচ্ছি, কখনও পিছোচ্ছি আবার।

আবু সাঈদের মুখে এবার আরও লাল হলো। অপরিসীম ঘৃণায় চোখ দুটো জ্বলে উঠলো। সে চোখের

মাঝে দাউ দাউ করছে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ।

আজ বাতাসে আগুন। আগুন শ্বাসে, শীত দুপুরের ছোঁয়ার ভাতে।

বুম্। বুম্। বু-উ-উ-ম্।

একটা নয়। অনেক কয়েকটা শব্দ হলো পর পর। ধোঁয়ায় ছেয়ে যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের আকাশ। টিয়ার গ্যাস ছাড়ছে পুলিশেরা। শুধু বাইরে নয়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনের ভেতরেও। সংঘর্ষ।

খক্ খক্ খক্। সবাই একটানা কাশছে। পানি চাই, পানি। কিন্তু, কোথায় পানি। জানি, পানি না পেলে এ টিয়ার গ্যাসের বিষে বিষাক্ত হয়ে যাবো আমরা!

আম গাছের অঘন সবুজ পাতাগুলো ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ঘোলা রং-এ পরিবর্তিত হলো শুধু।

কে একজন রুমাল ভিজিয়ে এনে দিল। সে রুমালও এক সময় আমাদের হাতে হাতে ফিরে চলে গেল না জানি কোন আর একদিকে।

অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে ঘোলাটে দৃষ্টি। ধোঁয়াটে আকাশ।

পানি চাই, পানি!

সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। কাশছে খক্ খক্ করে। আর এক ফোঁটা পানির আশায় চোখ বন্ধ করে ছুটো ছুটি করে বেড়াচ্ছে গোটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গন জুড়ে।

ইস্, ড্রেনেও পানি নেই আজ!

সম্পূর্ণ ঢাকা শহরের আকাশে আজ ধোঁয়া, শুধু ধোঁয়া, ধোঁয়ার কুণ্ডলি।

কাশছে সবাই। খক্ খক্ খক্। ঘোলাটে চোখ দিয়ে ঝরছে অশ্রু।

একজন সেই অশ্রু দিয়ে ভিজিয়ে নিল রুমালের এক কোণ।

পাশের ছোট্ট ডোবার মত পুকুরটার দিকে দৌড়ে চলেছে সবাই। দৌড়াচ্ছি আমিও। অসম্ভব জ্বালা করছে চোখ দুটো। দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে। কোথায় পানি! একটু আগে আমার সামনে দেখে ছিলাম রুবীকে। এখন ওকে দেখছি না। আশে পাশে কোথাও। কোথায় গেল! ঘোলাটে চোখে ধোঁয়ার পাহাড় শুধু।

আবার কখন যে পাশে এসে রুবী দাঁড়িয়েছে টের পাইনি। হাপাচ্ছে ও। শাড়ির আঁচলের এক প্রান্ত চোখে চেপে ধরে অন্য প্রান্তটি এগিয়ে দিয়ে বললো, নাও। এটি চোখে চেপে ধরো। নইলে সে কাছে টিয়ার গ্যাসে ছাড়ছে ওরা।

: রুবী! ওর শাড়ির ভেজা আঁচল দিয়ে চোখ ঢাকলাম।

: বুঝেছি দা, মীরাটা গেল কোথায়?

: মীরাও এসেছিল নাকি তোমার সঙ্গে।

: হ্যা, একটু আগেও তো ছিল ও প্রায় আমার কাছাকাছি।

সামান্য এক ফোঁটা পানির জন্যে কুকুরের মত এসে জট বেঁধেছি পুকুরের পাড়ে। কিন্তু, নিস্তার নেই তবুও। টিয়ার গ্যাস আর টিয়ার বোম ছাড়ছে তো ছাড়ছেই। সে বোম কারুর কারুর মাথায় লেগে কিনকি দিয়ে রক্ত ছুটেছে। থেকে থেকে আর্তনাদ উঠছে চতুর্দিক থেকে। নিরস্ত্র ছাত্র ছাত্রী আর সশস্ত্র বাহিনী সে এক অপূর্ব সংঘাত। বাতাসের ওপর ভর করে আসছে বিষাক্ত সব ধোঁয়া। গ্যাস।

ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছে সবাই। অসহ্য। প্রতিকার চাই এর। উত্তেজনায় চক চক করছে চোখ। ইস্পাতের মত কঠিন চোয়াল। হাতগুলো সব কঠোর হয়ে আসছে।

কে যেন চেঁচিয়ে উঠলো, এখানে নয়। যেমন করেই হোক এসেম্বলী হাউসে যেতে হবে আমাদেরকে। বেশী দেরী আর নেই আমাদের। চলুন।

: হ্যাঁ, হ্যাঁ, এসেম্বলীতে আমাদেরকে যেতেই হবে।

: হ্যা চলুন যাই।

কাঁদছে সবাই। অসহ্য যন্ত্রণা। বুকটা যেন ফেটে যাচ্ছে। শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে ভীষণ।

অমন কষ্টের মাঝেও হাসি পেল জ্যাকারসন্ সাহেবের কথা ভেবে। ভদ্রলোক নেহাৎ মাতাল। নইলে কি করে বলতে পেরেছিলেন তিনি অমন কথা। "জাস্ট গড্ হু সেভ্ আস্ লাইক, সেভ্ আস্ লিবার্টি" এ্যাট এ্যা সেম টাইম।' কিন্তু, কোথায় আমাদের সে স্বাধীনতা! জ্যাকারসন সাহেবকে আজ যদি ঠিক এই মুহূর্তে হাতের কাছে পেতাম—। উত্তেজনায় শক্ত হয়ে আসছে

হাতের মাংসপেশীগুলো ।

: হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলো । বলো, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই ।

: রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই ।

ধুপ্‌ধুপ্‌ গুলির শব্দ হচ্ছে । ঘোলাটে চোখে সূর্য নেই তবুও । কৃষ্ণচূড়ার সে লাল লাল থোকা ফুলগুলোই বা গেল কোথায় ! আর সে পলাশ !

আমরা দৌড়ে চলেছি পশ্চিম-উত্তর কোণে । দৌড়াতে পারছে না, পিছিয়ে পড়ে পুলিশের হাতে বন্দী হচ্ছে তারা । আমরাও দৌড়ে চললাম । বুবী ঠিক আমার আগে পাশে ।

আমাদের আগে যারা ছুটছিল, তারা আরও এগিয়ে গেল । জানি, ওদের কেউ কেউ যাবে মেডিক্যাল কলেজের বাঁদিকের রাস্তার হোস্টেলের কোণে, আর কিছু সংখ্যক এসেম্বলী হাউসের সামনে দিয়ে চলে যাবে সেই আহ্‌সানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সামনে । আসলে, এ দুটো পথ দিয়েই তো সমস্ত মন্ত্রী আর এম. এল. এ-রা আসবে এসেম্বলী হাউসে আজকের অধিবেশনে ।

কিন্তু, আমরা আর দৌড়াতে পারলাম না । আবার টিয়ার বোম ফেটে পড়ছে আগে পাশে, চতুর্দিকে । বিষাক্ত ধোঁয়ায় ছেয়ে যাচ্ছে চারদিক আবার ।

কাঁপতে কাঁপতে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ভেতরে এসে ঢুকলাম আমরা ।

এ ভিড়ের মাঝে আবু সাঈদ আর হোসেন যে কোথায় হারিয়ে গেছে, জানি না । বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণেও ওদেরকে দেখিনি শেষের দিকে । শুধু দৌড়ে বেরিয়ে আসবার সময় সে তো শুধু এক ঝলকের জন্য দেখেছিলাম হোসেনকে । আমাদের বেশ সামনে দিয়ে ছুটে চলেছে । কাঁপছে । আর বাওয়ার হাত মুঠো বেঁধে ছুঁড়ে যাচ্ছে আর চেঁচিয়ে উঠছে, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই ।

বাতাসে বাতাসে শুধু বিষাক্ত গ্যাস । আমরা কাঁপছি । হাসপাতালের সমস্ত মুমূর্ষু রুগীরাও হয়তো উঠে বসেছে বিছানার ওপরে । ওরাও হয়তো কাঁপছে । ধুকছে । বিষাক্ত গ্যাস ভেতরে ঢুকে বিষ ঢেলে দিচ্ছে ওদের শরীরে । অসহ্য যন্ত্রণায় বুক চেপে ধরে ওরা শুধু কাঁপছে । ওদের চোখের কোলে এসে জমাট বেঁধে উঠছে মৃত্যু এখন, ধীরে ধীরে । পাগলের মত ছুটে চলেছে ডাক্তার, নার্স, ওয়ার্ড বয়, সবাই ।

গেল, গেল, সব গেল । একটা রুগীও বাঁচবে না আজ ।

একজন ডাক্তার মুখে ভেজা রুমাল চেপে ছুটে চলে গেলেন । আমাদেরকে দেখে তীর্থংকারে তাকালেন তিনি । তার চোখে অবাক বিস্ময় । এত অত্যাচার মুখ বুজে আমরা সয়ে যাচ্ছি কি করে ! আমরা কি মানুষ !

চোখের সামনে মৃত্যু যন্ত্রণায় ধুকছে সমস্ত রুগী । অথচ, আমরা দাঁড়িয়ে আছি নিশ্চুপ, এখনও ।

: হাসপাতালেও এমন জঘন্য অত্যাচার ওরা চালাবে ?

: আমরা সইবো না ।

: হ্যাঁ আমরা সহ্য করবো না কিছুতেই ।

: হ্যাঁ, বলো, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই ।

হাসপাতালের করিডোর সে ভয়ঙ্কর হুংকারে কেঁপে কেঁপে উঠলো ।

যন্ত্রণায় বুক ছিঁড়ে যাচ্ছে । রুবীর শাড়ির আঁচলের প্রান্তদেশ তখনও মুখে চোখের ওপর জড়িয়ে নিয়ে চেঁচিয়ে চলেছি আমরা । রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই ।

বেলা পড়ে আসছে । গেটের পাশের শিমুল গাছটার ঘুমের ছায়া পড়েছে প্রকাণ্ড ।

: ওই যে মন্ত্রী আর এম এল এ-রা আসছে এসেম্বলী বলে । বলো, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই ।

: রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই ।

ধোঁয়াটে হাওয়া কেঁপে উঠলো । পুলিশ ব্যারিকেড করে সামনে দাঁড়ালো ।

: সরে যাও, সরে যাও ।

আমরা যেন সব ক্রুদ্ধ নেকড়ের দল ।

: রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই ।

মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের কোণের এক ব্যাঙ্কে মাইক্রোফোন লাগান হয়েছে সকলের অজান্তে । এখন সে মাইক্রোফোন থেকে আওয়াজ উঠেছে, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই ।

আবু সাঈদকে এবার দেখতে পেলাম । শাহাবুদ্দীন এক প্রান্ত ভিজিয়ে নিয়ে চোখে চেপে ধরে চেঁচাচ্ছে,

রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।

: চার্জ।

কার যেন কড়া আদেশের পর গর্জনের মত ভেসে এলো।

তেল চকচকে লাঠি নিয়ে এগিয়ে এলো একদল পুলিশ। ওরাও বাঙ্গালী, বাংলা যে ওদের মুখের ভাষা, মায়ের ভাষা। কি যাদে ডাকাবে ওরা যে বাংলা মাকে। কোন যে সুর ঝঙ্কার তুলবে মনের অতলান্ত থেকে।

রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। আমরা চীৎকার করে উঠলাম।

পুলিশগুলোর যেন কি হলো। একবার এ ওর দিকে তাকালো দ্রুত। তারপর মুহূর্তে হাতের লাঠি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো। আমাদের স্বরে স্বর মিলিয়ে যেন গর্জে উঠলো, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।

: রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।

: হারামীর দল। বেইমান।

: শুয়োর কা বাচ্চা।

আবার একদল পুলিশ এলো। বৃষ্টির ছাটের মত পড়তে লাগলো লাঠি। আমরা পিছিয়ে এলাম। আর ওদের সে লাঠির ঘায়ে এক একজন মাটিতে পড়ে গিয়ে আর্তনাদ করে উঠছে।

পা হড়কে পড়ে গেল ডাঃ মাহমুদ। মাথাটা ওর কেটে গেছে লাঠির ঘায়ে। কিলবিল দিয়ে রক্ত ছুটছে। আর ওর শরীরের ওপর একদল পুলিশ লাফিয়ে পড়লো ভেতাল্লিশের মন্বন্তরের ক্ষুধার্ত পশুর মত।

আমরা আবার চেঁচিয়ে উঠলুম, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।

: পুলিশ জুলুম চলবে না।

: ধ্বংস নীতি ছাড়তে হবে।

অনেকেই ক্রুদ্ধ হলো। রাগে ফেটে পড়লো। ইস এত অত্যাচার!

: মারো শালাদের।

: হ্যাঁ, হ্যাঁ, মারো শালাদের।

: না, না, আমরা হটবো কিন্তু ধরবো না। পুলিশের সঙ্গে গণ্ডগোল করে অযথা আমাদের কোন লাভ নাই। কে যেন একজন বলে উঠলো।

মাথার ওপর দিয়ে এসে পড়ছে অজস্র লাঠি। আমরা পিছে হটে আসছি শুধু।

হঠাৎ আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো রুবী। লাঠির ঘায়ে ওর মাথার খুলিটাই ভেঙ্গে গেছে যেন। রক্ত ঝরে পড়ছে মুখ গাল বেয়ে, মাটিতে, সবুজ ঘাসের ওপরে, লাল লাল তাজা রক্ত।

ওকে টেনে নিয়ে সরে এলাম। ঘাড়ে তুলে নিয়ে ছুটে এলাম এমারজেন্সিতে। অনেক মানুষের ভিড় সেখানে। আমাকে দেখেই জন করেক ডাক্তার আর ড্রেসার ছুটে এলো।

: কি হয়েছে, কি হয়েছে।

: না, সামান্য আঘাত।

: শেষে মেয়েদের ওপরেও হাত তুললো ওরা।

: আশ্চর্য, তবুও আমরা বসে আছি! চলো।

ইতঃস্তত: স্বর ভেসে এলো।

অনেকে ছুটে বেরিয়েও গেল ঠিক সেই মুহূর্তে।

টেবিলের ওপর রুবীকে শুইয়ে দিয়ে আমিও ছুটে এলাম। উত্তেজনায় কপালের পাশের রগদুটো আমার নাচছে টিব টিব করে। ঘন ঘন সংকুচিত হয়ে আসছে শরীরের মাংসপেশী।

পুলিশের সঙ্গে না পেরে, ঢিল ছুঁড়ে যাচ্ছে সবাই। প্রত্যেকের ঘোলাটে চোখের মাঝেই যেন প্রতিহিংসার আগুন দপ্ দপ্ করে জ্বলছে।

হয়তো এরই নাম পরাধীনতা। আমি ঠিক জানি না।

তাই আমিও যোগ দিলাম ওদের সবার সঙ্গে। বৃষ্টির মত আমরা ঢিল ছুঁড়ছি এলোপাথাড়ি। সে ঢিল কাকে গিয়ে লাগছে, জানি না। মারছি তবুও। মনে পড়ছে আবু সাইদের কথা। বলেছিল, বিপ্লব করতে গেলে শুরু হতে হয়। জীবন দিতে হয়। তার জন্য প্রয়োজন বিরাট আত্মত্যাগের। মনে রেখো ইংরাজীতে একটা কথা আছে, ভু য়ু থিঙ্ক র‍্যাট রেভ্যোলিউশনস্ আর মেড উইথ রোজ ওয়াটার?

আমি বিশ্বাস করি সে কথা। তাই তো আজ মরীয়া হয়ে লেগেছি। আজ আর ভ্রূক্ষেপ করি না আমি। যত বিপদ আসে আসুক, ভয় পাই না।

আবু মাসুদকে ধরে নিয়ে গেছে। আহত ডাঃ মাহমুদকেও হয়তো এতক্ষণে নিয়ে চালান গেছে লালবাগ থানায়। ঘুরন্ত পুলিশের বর্বরতার লাঠির ঘায়ে আহত হয়ে ফুটপাতে পড়ে। টিয়ার বোম মাথায় লেগে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জ্ঞান হারিয়ে পড়েছিল বিমলেন্দু বড়ুয়া। হোসেনের খবর পাচ্ছি না অনেকক্ষণ ধরে। আবু সাইদও নেই আশে পাশে। পাথরে চোখ মেলে আমি সব দেখেছি। প্রত্যক্ষ করেছি। সব অনুভূতি মন থেকে মুছে ফেলে দিয়েছি। আজ তাই কিছুতেই ডরাই না আমি। 'লেট আস্ ডু অর ডাই।'

সবাকে ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছি। আর এগুতে পারছে না পুলিশেরা। কেমন জব্দ। নিরস্ত্র ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে হার মেনেছে সশস্ত্র বাহিনী। টিয়ার বোম ফেটে পড়েছে আমার চারদিকে। ধাঃ ধাঃ ধাঃ। আমি ডরাই না। ঢিল ছুঁড়তে ছুঁড়তে হাতে কোস্কা পড়ে গেছে। হাতের তেলো দুটো জ্বলছে কি ভীষণ। পুলিশ ব্যারিকেড ভেঙ্গে গেছে সে অনেক আগে। বাতাসে বাতাসে ভেসে আসছে সে শুধু বিষাক্ত ধোঁয়া।

: চলো, এসেম্বলীতেই যাই আমরা।

কাশতে কাশতে কোস্কা পড়া হাত নিয়ে আমরা ছুটে চলেছি। ধৈর্য ভেঙ্গে গেছে। তবুও আপ্রাণ চেঁচিয়ে উঠছি, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। পুলিশ জুলুম চলবে না। দমন নীতি ছাড়তে হবে। আমাদের দাবী মানতে হবে।

পূর্ব বাংলা এসেম্বলী বাউন্ডের চারিদিকে মেসিনগান ঘিরে দাঁড়িয়ে সব সৈনিকরা। মেসিনগানের নলগুলো সূর্যের আলোয় চকচক করে জ্বলছে। তাকিয়ে আছে ঠিক আমাদের দিকে যেন।

আমরা থমকে দাঁড়ালাম।

: রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।

: পুলিশ জুলুম চলবে না।

: এম-এল-এরা বেরিয়ে এসো।

: সশস্ত্র পথ ছেড়ে দাও।

: দমন নীতি চলবে না।

: রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।

বিস্ফোরণে ভরে গেছে সারা নভ-প্রাণ। ছুটে জ্বলছে আগুন। আগ্নেয়গিরির গলন্ত লাভার মত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে চাইছে সে বিস্ফোরণ হে আগুন।

হঠাৎ মেসিনগানগুলোর অমন কণ্ঠস্বরকে পুলিশ ধরা মুখ থেকে ছড়িয়ে পড়লো আগুন। শব্দ চললো অনেক কয়েকটা। মুহূর্তে ছায়া-নাট্যের একটি দৃশ্য সুরু হলো যেন কখন একান্ত অপোচরে।

হঠাৎ ভয় পেয়ে বিহ্বল হয়ে যাওয়া পশুর মত আমরা সরে এলাম। স্তব্ধ। অবাক হয়ে। সবাই কেঁপে উঠলো যেন একটু।

: ও কিছু না, ফাঁকা আওয়াজ। কে যেন একজন নিষ্প্রভ গলায় বললো।

: না, না, ওই যে মরেছে কয়েকজন। দেখছো না রক্তের বন্যা বয়ে চলেছে। রাস্তার ওপরে। আঙ্গুল তুলে একজন দেখালো দূরে।

: ও কিছু না। ভয় দেখাচ্ছে শুধু।

: না, না, ডাল ভেঙ্গে পলাশ ফুল ছড়িয়ে পড়েছে পথে। কে যেন নিজেকে নিজে সান্ত্বনা দিতে চাইলো।

ছুরীর ছোট বোন মীরা কখন যেন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আমার শার্টের কোণ ধরে টেনে বললো, ভয় পেয়েছেন? আমি কিন্তু ভয় পাইনি। কতজনকে আর মারতে পারবে ওরা। বলুন, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।

: রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।

আবার শব্দ হলো। এক রাউণ্ড গুলি হলো। শীসের গুলি আগুন হয়ে ছড়িয়ে দিল আরও অনেক অনেক পলাশ ফুল। লাল লাল পলাশ ফুলের মালা পরলো ফুলার রোড।

আবু সাইদ দৌড়ে চলে গেল কলেজ হোস্টেলের ব্যারাকের দিকে।

: আবু সাইদ, সাইদ?

পাশ দিয়ে অনেকে আহতদের টেনে নিয়ে চলেছে এমারজেন্সির দিকে।

: না, না, কিছুই হয়নি। আমরা ঠিক আছি।

টুকরো টুকরো কথা বাতাসে।

আমরা আরও অনেকখানি পিছিয়ে এসেছি।

মাইক্রোফোনে এবার আবু সাইদের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। বন্ধুগণ, আমাদের স্বৈরাচারী সরকারের

ধর্মঘটার ভয় পেয়ে পিছোবেন না। আপনারা এগিয়ে চলুন। বলিষ্ঠ আওয়াজ তুলুন, রাষ্ট্রভাষা বাংলা……

আবার গুলির শব্দ হলো। আবু সাঈদের কথা শেষ হলো না। কি হলো, কি হলো!

মাইক্রোফোন থেকে এবার অন্য আরেকজনের স্বর ভেসে এলো। ভাইসব, আবার একটি প্রাণ গেল। এই নিয়ে ন'জন প্রাণ দিল আর আহত হয়েছে অসংখ্য। আমরা তবুও ভয়াই না। চলুন আমরা এগিয়ে যাই। আওয়াজ তুলুন, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।

: রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।

কে প্রাণ দিল? আবু সাঈদ! অসম্ভব। আমি ছুটে যেতে চাইলাম। আবার শব্দ হলো। এবার ঝাঁকে ঝাঁকে। প্রচুর লোক আহত হচ্ছে। মরছে। আমরা হটে আসছি, ক্রমে ক্রমে। ছুটে চলেছি পেছনের দিকে।

আমরা সব কেপে ওঠা পশুর দল। এবার ভয় পেয়ে হতচকিত হয়ে পালাচ্ছি। সামনে, পাশে, পেছনে, চারদিকে শুধু মৃত্যু, আর্ত-চীৎকার, গুলির আওয়াজ, কুদার রোডে হোস্টেলের ব্যারাকে রক্তের আলপনা, আর আমাদের সম্মিলিত হুংকার। আমরা বেঁচে নেই। না, না—আমরা যেন সব শব, প্রেতাত্মা। মৃত্যু নেই আমাদের।

হাসপাতালের ভেতর দিয়ে আমার ফিরে এলাম এমারজেন্সিতে।

: আবু সাঈদকে দেখেছেন? এই একটু আগেও মাইকে ঘোষণা করছিল ও!

: আবু সাঈদ! চেনেন নাকি ওনাকে?

: হ্যাঁ, হ্যাঁ ও আমার রুমমেট। একই রুমে থাকি আমরা।

: বড্ড তেজ ছিল ওনার। কে একজন মন্তব্য করলো।

: দুঃখ করো না। এই নিয়ে আমরা ন'জনকে হারালাম।

কেঁপে উঠলাম। ফিরে তাকালাম। কিন্তু, কেউই বলতে পারলো না আবু সাঈদ কোথায়।

: শালারা সব লাশ সরাচ্ছে। একজন দাঁতে দাঁত ঘষে গর্জে উঠলো।

: দেখেছেন আপনি? আবু সাঈদকে দেখেছেন কেউ? মাথা নত করে ওরা সরে গেল।

: দেখেননি কেউ।

বাইরে তখনও বৃষ্টির হাটের মত গুলি চলছে। ধরাধরি করে আহতদেরকে নিয়ে আসছে অনেকেই। আবু সাঈদ নেই। বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছে আমার। অথচ, ছিল এই তো সামান্য একটু আগেও। সর্বশেষ মাইক্রোফোনে স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিলাম ওর কণ্ঠস্বর। অথচ, ও এখন কোথায়! কত দূরে। কোথায় গেল ওর সে কথা,

'লাইফ ইজ প্রিসাস! লাইফ ইজ আনেস্ট।

এ্যাণ্ড দ্যা ব্রেভ ইজ নট হিজ ইউনস গোল।'

কিন্তু, সে মৃত্যুর দিকেই তো এ জীবনকে ঠেলে দিচ্ছি আমরা সবাই।

আবু সাঈদ, সাঈদ!

মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের ব্যারাকে ব্যারাকে পতাকার মত উড়ছে শহীদের রক্তে রাঙা কাপড়। মাইক্রোফোনে ঘোষণা চলেছে তাদের নাম। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি সে সব কথা।

: বরকত আলী। আব্দুল জব্বার। আব্দুস সালাম। রফিক উদ্দিন আহম্মদ। আবু সাঈদ।……

আবু সাঈদ! আমি কেঁদে ফেললাম। অসম্ভব অসহায় মনে হলো নিজেকে ঠিক এই মুহূর্তে।

হোসেন হয়তো এতক্ষণ এমারজেন্সির ওদিকেই কোথাও ছিল। ওর হাতের আলপনা আর মেডিক্যাল বোনের ভেতর দিয়ে ব্লেড বেরিয়ে গেছে। হাতে তাই ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

আমার পাশে ধীর পায়ে এসে দাঁড়ালো হোসেন। ধীরে ধীরে আমার কাঁধে হাত বুলালো ও।

চমকে ফিরে তাকালাম।

: হোসেন। ওর কাঁধে মুখ লুকিয়ে: আমি কেঁদে ফেললাম।

: ছিঃ! কেঁদো না। আমরা তো এখনও বেঁচে আছি।

: কিন্তু, আবু সাঈদ!

: শুধু আবু সাঈদ নয়। আমাদের ন্যায্য দাবীর কথা জানাতে গিয়ে অনেকেই শহীদ হয়েছেন। বরকত

আলী, আব্দুল জব্বার, রফিকউদ্দিন, আব্দুস সালাম, আরও অনেকে। কত জনের জন্য আর তুমি কাঁদতে পারবে একা ?

: ছোসেন। আমি আর ও ভেঙ্গে পড়লাম কান্নায়।

ছোসেনের স্বর কাঁপছে। দু'চোখ ছলোছলো। বললো, পাগল, দুঃখ কি আর আমার লাগছে না ! কিন্তু কি করবো ? দুঃখ করলে তো চলবে না। আমার দিকেই দেখো না। কই, আমি তো কাঁদছি না। আবু সাইদ নেই। সোল্ডার জয়েন্টে বুলেট লেগে লাইলীর ডান বাহুটাই উড়ে গেছে। ও হয়তো বাঁচবে না। আজকের রাতটুকুও হয়তো টিকবে না। তবুও আমি কাঁদছি না। কি হবে শুধু দুঃখ করে। আমরা এগিয়ে যাবো। আমাদেরকে এগিয়ে যেতেই হবে। আমাদের অধিকারের মর্যাদা আদায় করে নিতেই হবে। আমরা আজও বেঁচে আছি। উঠো, একটু ধৈর্য ধরো। ভেবে দেখো, আমাদের সামনে কত কাজ বাকি এখনও। কি জবাব দেবে নিজেকে, নিজের দেশবাসীকে, দেশকে।

: হ্যাঁ, আমরা বেঁচে আছি। ধৈর্য ধরবো বৈকি আমরা।

: হ্যাঁ, ধৈর্য ধরো। শুধু এক আবু সাইদ নয়, অনেক আবু সাইদকেই আমরা আজ হারিয়েছি। হয়তো আরও অনেককে হারাবো। তাতে কি হয়েছে। আমরা আবু সাইদ হবো ! এক আবু সাইদকে হারিয়ে পূর্ব বাংলার মাঠে চার কোটি আবু সাইদের দেখা পাবে। আমরা সে আশা নিয়েই বেঁচে থাকবো।

: কিন্তু, আমি যে বিশ্বাসই করতে পারছি না আবু সাইদ নেই !

: কে বললো, আবু সাইদ নেই ! এই তো এতগুলো আবু সাইদ আমরা বেঁচে রয়েছি। তুমি, আমি, আমরা সবাই তো শহীদ আবু সাইদ, আব্দুল জব্বার, বরকত আলী, আব্দুল সালাম, রফিকউদ্দিন। তুমি বিশ্বাস করো।

: আমরা আবু সাইদ !

: হ্যাঁ, আমরা আবু সাইদ। আমরা সবাই আবু সাইদ, আব্দুল জব্বার, বরকত আলী, রফিকউদ্দিন।

ছোসেনের কথাই ঠিক। আজ থেকে ঠিক পূর্ব বাংলার ঘরে ঘরে মাঠে চার কোটি আবু সাইদ, জব্বার, বরকত, সালাম, রফিকউদ্দিন। তাঁদের শপথে আজ আমরাও শপথ নেবো। পলাশ ঢাকা নীল চোখে বিদ্যুৎ খেলে যাবে। হাত জমাট হবে। রক্তে উঠবে ঝঙ্কার। আমরা এগিয়ে যাবো। লাল লাল কৃষ্ণচূড়া আর পলাশ ফুল থাকবে রাস্তার ওপরে। পথে ছিন্ন ভেজা ঘাসের ডগায়, শিশির সিক্ত মাটিতে দু'হাতে আমরা ছড়াবো আবির। রঙ খেলবো। 'কাপুস, এবার জলদাও আসুন।' 'জলদাও মোরে লক্ষ পলাশ করে।'

আমরা বেঁচে আছি। মাঠে চার কোটি জনতা আবু সাইদ হয়ে বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবে। তোমাদের ও পাঁচের ফলা আমাদেরকে মারতে পারে নি। লক্ষ প্রাণ হয়ে আমরা আজও বেঁচে আছি। মা, মা, তুমি আর কেঁদো না, আমরা তো রয়েছি এখনও। চলে পড়া সূর্য, তুমি দেখো, নতুন করে আশীর্বাদ জানাও। তোমার রঙে রাঙিয়ে দাও চাকার আকাশ। পলাশ আর কৃষ্ণচূড়া, তোমরা ছড়িয়ে পড়ো পথে পথে, অভিনন্দন জানাও। বসন্ত, এবার যা, আবার এসো তুমি, তোমায় আমরা উপভোগ করবো তখন।*

---

* যাহার একুশে ফেব্রুয়ারী তারিখে পূর্ব বাংলার ক'জন তরুণকালের নায়কেরা নিজেদের প্রাণ দিয়েও প্রতিষ্ঠা করেছিল নিজেদের মাতৃ ভাষার, বাংলা ভাষার দাবীকে। পূর্ব বাংলার ইতিহাসে তাই একুশে ফেব্রুয়ারী অমর, চিরস্মরণীয়। সেই ঐতিহাসিক আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখা সর্বপ্রথম উপন্যাস "লাল রং পলাশ।" লেখকের সেই অপ্রকাশিত উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি থেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ এ পরিচ্ছেদ উদ্ধৃত করা হলো।

[আকবরের পরবর্তী মুগল বাদশাহদের অধিকাংশেরই ইতিহাস সুরা নারী ও আনুষঙ্গিক বিলাসের ঘনঘোর-চারের ইতিহাস। কিন্তু তারই ভেতর যে দু'একজনের কাব্য শিল্প বা সংগীতানুরাগের সন্ধান পাওয়া যায়, দিল্লীর হতভাগ্য শেষ মুগল বাদশাহ "আবুজফর সিরাজুদ্দিন আবুজফর বাহাদুর শাহ" এর নাম তার মধ্যে অন্যতম। বাহাদুর শাহ জীবনে এত অগুন্তি কবিতা লিখে গিয়াছেন যা অন্তত সংখ্যার দিক দিয়ে ভাবতে গেলেও অবাক না হয়ে পারা যায় না। তাঁর "কুলীয়াত" অর্থাৎ সম্পূর্ণ কবিতা সংগ্রহকে একটি কবিতার সমুদ্র বলে মনে হয়। তাঁর রচিত গজল এক সময় লোকের মুখে মুখে ঘুরে বেড়াত। নিজের কবিতার রচয়িতায় তিনি নিজ নাম "জফর" ই তখনুস হিসেবে ব্যবহার করেছেন। মতবাদের দিক দিয়ে তিনি "তসৌফ" বা সুফী সাধনার অনুরাগী ছিলেন মনে হয়। অবশ্য মাঝে মাঝে তাঁর কবিতায় "রিন্দ" মতেরও ছাপ আছে। রিন্দরা মুসলিম আনুষ্ঠানিক ধর্ম-বিধানের কোন ধার ধারত না। এই ভাগ্যহত বাদশাহ শেষ বয়সে বিদেশে নির্বাসিত থাকা কালে ১৮২৬ খৃঃ রেঙ্গুনে মারা যান।]

বাহাদুর শাহের কবিতা

আমার পীত কপোলে মাখা বসন্তের ফাগ,
আমার রক্তই বসন্তের রঙের গুনবীন।
সরাব ভরা মানিক জলা পাত্রাধার কই !
বসন্তের কুসুম মধু ঋতুর প্রেমে লীন।
খবর কিছু রাখিস নাকি বসন্তের সাকী ?

আবার এল বসন্ত যে ভরে নে সুরাধার ;
মিলন লাগি আসবে প্রিয়া ফাগুন মধু মাসে
কাটাই তাই প্রতীক্ষাতে বসন্তের ; তার।
রক্ত রাঙা রূপসী ঐ বাসন্তীর বেশে
সেজেছে, আরো বসন্তের বেড়েছে সম্মান।
ও কুমকুম আননে তোর কেনরে মিছে স্বেদ ?
সরমে দেখ বসন্তের নিভেছে মুখখান।
মালঞ্চের প্রাঙ্গনের ও নয় 'নর্গিস,'
'জফর' ওর চোখের নীলে বসন্তের বিষ !
কে যেন জ্বালিয়ে দিয়েছিল সেই শান্ত প্রদীপখানি
মৃত্যুর পর আমাকে স্মরিয়া নীরব সমাধি পরে।
দুঃখের ভারী দীর্ঘশ্বাস নিভিয়ে দিয়েছে হায়,
সে প্রদীপ শিখা সন্ধ্যা মুখেই তমসার অন্তরে।

অনুবাদক : মিহির সেন

আমেরিকান কবিতা

শেষ প্রার্থনা | ওয়াল্ট হুইটম্যান

অস্থিনে নম্রতার সঙ্গে
সুদৃঢ় দুর্গের দেয়াল হতে
সুনির্মিত তালার আলিঙ্গন হতে,
কিংবা বন্ধ দরোজার নিরাপত্তা হতে
আমায় বাতাসে গন্ধের মতো ভেসে যেতে দাও।

আমায় নিঃশব্দে ক্রমশঃ
এগিয়ে যেতে দাও।
কোমলতার চাবি দিয়ে
আমি তালা খুলব।
একটু ফিসফিসানির সঙ্গে, হে চেতনা,
তোমার দরোজাও উন্মুক্ত করে দেব।

খুব আস্তে আস্তে করো—
অধৈর্য হয়ে পড়োনা।
(তোমার কি অমোঘ দাবি,
হে নশ্বর শরীর। হে প্রেম,
তোমার কি আশ্চর্য প্রভাব।)

অনু :—সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

জার্মান কবিতা

হাতের তালু | রেইন্তার ম্যারিয়া রিল্‌কে

হাতের তালু। তল হাঁটে না, কেবল অনুভব।
ওপর পর্যন্ত বেঁকেছে এবং কাঁচের মধ্যে
প্রতিবিম্ব পড়ে স্বর্গের উচ্চরেখাগুলো,
যা নিজেরাই গতিশীল।
এ জলের ওপর বেড়াতে শিখেছে
যখন গ্রহণ করে কুয়োর থেকে,
ঝরনার ওপর চলে আর সমস্ত পথে রূপান্তরশীল।
অন্য হাতে প্রবেশ করে,
নিজের মত দৃশ্যচরে বাঁকে।
পর্যটন—প্রমাণ আর সমাপ্তির ভেতর—তাসের
পূর্ণকরে আবিষ্টভাবে।

অনু :- তাপস গুপ্ত

সিন্ধুর বুকে আকাশও নেমেছে ভেঙে। অদূরে বিরক্তিতে মুখখানা বেঁকে যায় বিজেনের। মনে মনে কি একটা গালাগাল দিয়ে ওঠে। শিক্ষার অভিমানের প্রতিবন্ধকতায় স্পষ্ট উচ্চারণ করতে পারে না গালাগালটা। তাছাড়া ফাঁসীর থানার একজন পুলিশ রয়েছে সঙ্গে। তার সামনেই—না, পুলিশসুলভ বাঁধন-ছাড়া-মুখ এখনও হতে পারেনি সে। তাই নিঃশব্দে গালাগালটা নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়েই দেয়। পায়ের জুতো ডুবিয়ে কল্ কল্ ক'রে বয়ে যাচ্ছে কাদাগোলা জল। গ্রাম্য রাস্তা। স্বল্প বৃষ্টিতে পেছল, অধিক বৃষ্টিতে হয় কাদা। জুতোসুদ্ধ পা পেছে যাচ্ছে জলের নীচে কাদার ভেতরে। টেনে তুলেছে যখন, বাইরেটাই নয় শুধু, ভিতরটাও তার পংকময়। ওজন হয়েছে চতুর্গুণ। প্রতি পদক্ষেপে একটা বিশ্রী রকমের ক্যাচ্ ক্যাচ্ শব্দ। ফুলপ্যান্ট গুটিয়ে প্রায় হাফ-প্যান্ট করেছে। তাও থাকছে না ঠিক। জলে ভিজে এক-একটাদিক গিয়েছে নেমে, সৃষ্টি করছে পরম অস্বস্তি। থানার দারোগাসাহেবের দেওয়া বর্ষাতিটা পেয়ে শুধু বেঁচেছে। কিন্তু ধারা যেন আজ তাকেও মানতে চাইছে না। কাঁধের কাছের কোন ফাঁক দিয়ে কিছুটা জল গিয়ে ঢুকেছে জামার ভেতরে। শির শির ক'রে নামছে শিরদাঁড়া বেয়ে। পুলিশটির হাতের টর্চটা মাঝে মাঝে একবার ক'রে জ্বলে। কেন জ্বলে আর কেনইবা নেভে? জ্বালিয়ে রাখা ভালো। দেখে শুনে ভালভাবে পাটিকে বিছিয়ে দিতে হবে কালার ভেতরে গেড়ে যাওয়ার জন্যে। বিড় বিড় ক'রে ওঠে বিজেন—আর এই চাকরী ভদ্রলোকে করে? হঠাৎ পথপ্রদর্শক সেপাইটি ঝপাৎ ক'রে ঘাড়া সমান জলের ভেতরে গিয়ে পড়ে। থমকে দাঁড়িয়ে যায় বিজেন।

কি হ'ল?

একটা খাল ছিল সামনে। জলে ডুবে গিয়েছে।

অতি দুঃখে হেসে ফেলে বিজেন। আপন মনেই বলে ওঠে—তা না হ'লে আর ষোল আনা পুরবে কি ক'রে!

উপায় নেই। পেরুতেই হবে খাল। পা টিপে টিপে জলের ভেতরে নেমে পড়ে সেও। উষ্ণতা নেই একটুও, বরফ শৈত্য অধিক। নিষ্তাপ আজ্ঞাবাহ কর্মচারীর মত।

খাল থেকে উঠে কিছুটা এগিয়েই বলে ওঠে সেপাইটি—আর বেশি দূরে নয় সামনে।

কথাটি কানে যেতেই সুরে বাঁধা পড়ে মন। সঙ্গে

দেখেই ওপর-ওয়ালা পুলিশ দেখাতে বলে ওঠে বিজেন —অফর পালের বাড়ির কাছাকাছি কোন ও বাড়িতে যেতে হবে একবার।

একথাটা থানার দারোগা অসিতবাবুর দারবান বাণী অনুযায়ীই বলে সে। তিনিই বলেছিলেন—হুট্ করে বাড়িতে গিয়ে ওঠা ঠিক হবে না। বদ্ধিষ্ণু লোক। নিশ্চয় হয়ে না গেলে গোলমাল হতে পারে।

হতেই পারে গোলমাল। বিজেন নিজেও ভেক সন্দেহের ওপরে নির্ভর করেই ছুটে এসেছে, এতদূর। কিন্তু ও ছাড়া আর করবার ছিলই বা কি? একবার দুবার নয়, কয়েকবারই তো ছুটে গিয়েছে হাসপাতালে, যদি কোন ও সূত্রপায়। কিন্তু প্রতিবারই হতাশ হয়ে ফিরে আসতেই হয়েছে তাকে। শেষে একদিন হঠাৎই এক রকম মনে পড়েছিল কথাটা। আর তখনি আবার ছুটে গিয়েছিল হাসপাতালে। বেলে তো এই এক সূত্রেই মিলবে, আর নয়ত কিছুতেই নয়।

আরও কিছুটা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায় পুলিশটি। অন্ধকারের ভেতরে আবছায়া মত একটি বাড়ি দেখিয়ে বলে—ঐ হল নম্বর পালের বাড়ি। এর পরে একটা বাগান, বাগানের শেষে দাসেদের বাড়ি।

ধারে কাছে আর বাড়ি নেই? জিজ্ঞাসা করে বিজেন।

না স্যার।

তা হলে চল দাসেদের বাড়িতেই যেতে হবে।

আবার এগিয়ে চলে তারা। বৃষ্টির প্রকোপটা একটু কমেছে বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু সর্বাঙ্গে দাঁত সেঁতে ভাবের অস্বস্তি। কি কুক্ষণেই যে কলকাতা থেকে রওনা হয়েছিল, তাই ভাবে বিজেন। শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছুবার আগেই আকাশের গুড়ু গুড়ু ডাক সুরু। স্টেশনে নামতে না নামতেই ঝির ঝিরনি। আর স্থানীয় থানায় গিয়ে যখন পৌঁছুল তখন ঝম্ ঝম্ করে বরতে আরম্ভ করেছে। তাও অসিতবাবু দয়া করে বর্ষাতিটা দিয়েছিলেন বলে রক্ষা, নইলে হয়ত পেয়াল ভেজা হয়ে ফিরে যেতে হত তাকে। ফলে আর একদিন পোহাতে হত এই দুর্ভোগ।

পালেদের বাড়ি পিছনে ফেলে এগিয়েই চলেছিল তারা, এমন সময় বাড়িটার বারান্দার ওপর থেকে কে যেন হাঁক দেয়—কোথায়?

আমরা, পুলিশের উত্তর দেয় সঙ্গী পুলিশটি।

পুলিশের লোক এত রাতে? কোথাও কিছু ঘটেছে নাকি? বলেই আহ্বান জানায় লোকটি—আসুন, আসুন, ওপরে উঠে আসুন। অগত্যা এগিয়ে যেতেই হয় তাদের সে দিকে। গিয়ে বারান্দায় উঠতেই অন্ধকার লক্ষ্য করে হাঁক দেয় লোকটি—ওরে, বারান্দায় একটা লণ্ঠন আর দুটো টুল দিয়ে যা।

থাক্, টুলের দরকার হবে না। বলে বাইরের দিকটা একবার দেখে নিয়ে বলেন বিজেন—বৃষ্টিটা বোধহয় ধরে এল, না? অর্থাৎ কষ্টের কালের শেষ।

লোকটি সায় দিতে পারে না সে কথায়। বলে, কষ্টের আর শেষ আছে? আমরা ভাবি বুঝি এই শেষ, কিন্তু পরেই দেখা যায় একটা লেজুড় বেরে উঠেছে। এই দেখুন না, ছেলে হবে না হবে না করে যদি বা একটা হল, তা বৌকে নিয়ে এখন টানাটানি। ডাক্তারকে ডেকে আনতে পাঠিয়েছি। সেই জন্যেই তো বসে আছি বারান্দায়। তা কি ব্যাপার—

অন্ধকারের বুকে চিরে বিদ্যুতের চমকানি একটা। পুলিশটি বোধহয় ভয় পায় ঐ চমকানিকে। একটু দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ায়।

হঠাৎ খারাপ হল কেন? পড়ে টড়ে—জিজ্ঞাসা করে বিজেন।

না, না, পড়ে টড়ে যায় নি। বিজেনের প্রশ্ন শেষ হওয়ার আগেই বলে ওঠে মানুষটি—বলে তো যে বাঁকি দেখেছিল।

বাক্, পুরো অবিশ্বাসীর কণ্ঠ বিজেনের, গ্রাম দেশের আঁতুড়ে বাঁকি লাগবে কি করে?

তা হলে বলি শুনুন, বলেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে লোকটি, কিন্তু একটা টুল না হলে যে—

থাক্ থাক্, টুল লাগবে না, আপন ব্যস্ততায় ব্যস্ততা বাড়িয়ে লোকটির ব্যস্ততা থামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে বিজেন,—তাছাড়া বসতেও অসুবিধা। দেখছেন তো জামা প্যাণ্টের অবস্থা।

তা সত্যি, লোকটিও যেমন নেয় বিজেনের কথা, কদিন থেকেই মুখ তার করে ছিল। আজ একেবারে ডুকরে কেঁদে উঠেছে। তবে আর ধরে বলে মনে হচ্ছে না। হ্যাঁ, বলছিলাম, আবার পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে আসে লোকটি, দিন চৌদ্দ আগে একটু কুই কুই ব্যথা উঠতেই গরুর গাড়ি করে গিয়াখালা। সেখানে থেকে ধাত্রী হাসপাতালে নিয়ে গেলাম আমার স্ত্রীকে। তা তারা লোক ভাল, দেখে শুনে বলল—এত বয়সে প্রথম সন্তান, আপনি বরঞ্চ কলকাতায় নিয়ে যান। সেখানে বড় বড় ডাক্তার আছেন। তা বুঝলেন তো, আমারও মনের ভয়। ট্যাক্সি করে কলকাতাতেই নিয়ে গেলাম।

এই পর্যন্ত বলেই থেমে গেল লোকটি। কিন্তু থামলে চলবে না। আরও কিছু জানার আছে বিজেনের। প্রায় পিঠোপিঠিই প্রশ্ন করে সে—তা অসুখ হয়ে পড়লেন কেন?

এতক্ষণে বুঝি কিছু সন্দেহ করে মানুষটি। প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলে—কোথায় যাবেন বলছিলেন। বৃষ্টিটা ধরেছে এবারে। এই সময়ে যেতে সুবিধে হবে।

হ্যাঁ, যাব বৈকি। মুহূর্তে কঠিন হয়ে ওঠে বিজেনের পুলিসী মন। কর্তব্যের সামনে দাঁড়িয়ে দুর্বলতা প্রকাশ করা যায় না। গম্ভীর গলায় বলে—হ্যাঁ, যাব বৈকি। কিন্তু আপনার নামটা জিজ্ঞাসা করলে অন্যায় হবে কি?

নাম, নকরচন্দ্র পাল।

এবারে আমার প্রশ্নের জবাব দিন, এই মাসের দশ তারিখে আপনার স্ত্রীর একটি ছেলে হয়?

হ্যাঁ, মিইয়ে গিয়েছে যেন মানুষটি ঐ একটি মাত্র প্রশ্নেই, কিন্তু আপনারা—

বলছি। বাইশ তারিখে খালাস পান তিনি।

হ্যাঁ, একটা ঢোক গিলে আবার বলে নকর পাল, কিন্তু—

কিন্তু পরে হচ্ছে। অসুখ হলেন কি করে আপনার স্ত্রী তাই বলুন।

বললামতো খাঁকি লেগেছিল।

খাঁকি তো আর এমনি লাগে না, কারণ থাকে।

তারপর নিজেই তার যুক্তি সংগত কারণটি বলতে থাকে—ওঁর খালাস পাওয়ার দিন আপনি ট্যাক্সি নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন গাড়ি বারান্দায়। আর সেই সময়ে আপনার স্ত্রী শিশুটিকে কোলে নিয়ে ছুটতে ছুটতে সিঁড়ি বেয়ে দোতালা থেকে নেমে আসেন। তারপর হুড়মুড় করে ঢুকে পড়েন ট্যাক্সিতে বলুন ঠিক কিনা।

নকর পাল যেন আর তার ভেতরে নেই। নিঃশেষে উপে গিয়েছে তার সেকাল। দুহাত জড়িয়ে ধরে বিজেনের হাত দুখানা। কি যেন সে বলতে চায় অথচ বলা যাচ্ছেনা কিছুতেই। বলা আসছে না তার।

ঠিক এমনি ভাবেই হাত জড়িয়ে ধরেছিলেন আশুবাবুর স্ত্রীও। কান্না জড়ান গলায় বলতে গিয়েছিলেন অনেক কিছুই। কিন্তু পরিস্থিতিটা তেমন ভালো লাগেনি আশুবাবুর। যতবড় বিপদই হক তাই বলে একজন পুলিশের লোকের হাত জড়িয়ে ধরা—একটু গম্ভীরভাবেই বলে উঠেছিলেন তিনি তোমার বলার হয়েছে, এবারে ভেতরে যাও, আমাকে বলতে দাও সব। কথাটি শেষ করে পিছন ফিরে তাকিয়েছিলেন দরজার দিকে। পাঁচছটি ছেলেমেয়ে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে দরজার কাছে। ওদের দেখে যেন আরও জ্বলে ওঠেন আশুবাবু। বিড়বিড় করে বলেন, এক একটা জন্মার আমাকে জ্বালিয়ে পুড়ে মারতে। তারপরই জোর ধমক দিয়ে ওঠেন—যা, সরে যা সব। ঐ একটি কথাতেই গুটি গুটি সরে পড়ে তারা। দেখে মনে হয় বিজেনের যে কথা না শোনবার অভিজ্ঞতা তারা যথেষ্টই সঞ্চয় করেছে। যাই হক, ছেলেমেয়েরা...এবং তাদের যা চলে যেতেই আবার আসল কথায় ফিরে আসেন আশুবাবু। নূতন কিছু নয়। যা বিজেন হাসপাতাল থেকে শুনে এসেছে তারই পুনরাবৃত্তি। বলতে অনেক প্রয়োজনীয় কথা থেকে যাচ্ছে বাদ। আর বহু অপ্রয়োজনীয় কথার হচ্ছে পুনরুক্তি। অথচ সময় নষ্ট। উঠবে উঠবে ভাবছে বিজেন এমন সময় বারান্দার ওপর থেকে কিশোর গলায় চীৎকার শোনা যায়।

সঙ্গে সঙ্গে আর একজন দোসরের। আশুবাবুর ঘুষের

দিকে অপাঙ্গে একবার তাকিয়ে নেবেছিল বিজেন। বেশ কঠিন হয়ে উঠেছে তার মুখ চোখের ভাব দেখেই বোঝা যায় ওদের ব্যবহারে তিনি অসন্তুষ্ট।

বিজেনের এসব নিয়ে কোন মাথা ব্যথা নেই।

পড়েছিল সে একটি নাইলনের পোষ্টের সহায়তা জানিয়ে।

বিশ্বাস করুন, আমি—আরও জোরে বিজেনের হাতদুটি চেপে ধরে নকর পাল।

বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়, অনুসন্ধানের ক্ষেত্র থেকে বর্তমানে ছিটকে আসে বিজেন, কথা হচ্ছে, জড়িয়ে পড়েছেন আপনারা দুজনেই।

কথাটা শুনে শুনে মেরে যায় নকর পাল।

কিছুক্ষণ আর কোন কথাই বলতে পারে না। আশান্বিত হয়ে ওঠে বিজেন। তাহলে ঠিক রাস্তা ধরেই এগিয়ে এসেছে সে। খুশি হয়ে ওঠে নিজের কৃতিত্বে। ইস্ কয়টি দিন ধরে কি চিমসিদই খেতে হয়েছে তাকে। যতই চেষ্টা করছিল ততই মনে হচ্ছিল সে যেন ঘরদুয়ির মাঝখানে রাস্তা খুঁজে বেড়াচ্ছে। এতক্ষণে সন্দেহের ভাবটা কেটে যাওয়ায় বেশ ঝরঝরে মনে হয় নিজেকে। কিন্তু তখুনি আবার আর এক চিন্তা এসে দাঁড়ায় মনে এর শরের পুলো নকর পালের সাথে তার একান্ত দরকার। কিন্তু সে সাহস কি পাওয়া যাবে? নকর পালের মুখখানি দেখে কিছুটা অনুমান করবার চেষ্টা করে বিজেন। দেখা যায় না কিছুই রাতের অন্ধকারের ঘনত্ব বাড়িয়েছে বেশকা আকাশ। পালঘরায় একটা লণ্ঠন আর দুটো টুল দিয়ে যেতে বলেছিল অনেকক্ষণ পূর্বে, তাও দিয়ে যায়নি কেউ। ফলে শুধু তাকিয়ে থাকাই হয় নকর পালের মুখের দিকে, জানা যায় না কিছুই। এবারে তাহলে কিভাবে এগুবে ভাবছে বিজেন। এমন সময় লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায় নকর পাল। স্থান কাল পাত্র ভুলে চিৎকার করে ওঠে সে—ঐ মাগীই আমাকে ফেলে পাঠাবে। বলেই ধড়মড় করে ঘরের ভেতরে ঢুকে যায় সে।

পরিস্থিতটার জন্যে ঠিক প্রস্তুতি ছিল না বিজেন। তাই প্রথমটায় একটু হকচকিয়েই যায় সে। কিন্তু সন্দেহের পুলিশটি যেন বলে, অন্য রাস্তা দিয়ে পালাবে

বিপদ সম্পর্কে

সজাগ থাকুন

আমাদের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক
জীবন ধারণ পদ্ধতি বিপদের সম্মুখীন হয়েছে।

ঐক্য ও স্বাধীনতা রক্ষা করুন

DAGV F 29

যাত্ত স্যার, তখুনি আবার চিন্তার স্থিরতা ফিরে আসে তার। বলে, না পালাবে না। পালাবার উপায় নেই। বলতে বলতেই উৎকীর্ণ হয়ে ওঠে দুজনে। বাড়ির ভেতরে কে যেন চীৎকার করে কেঁদে উঠল। স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর। সঙ্গে সঙ্গে নফর পালের প্রচণ্ড হুমকানি। কিন্তু তাতেও কান্না থামলনা স্ত্রীলোকটির। একটানা কেঁদেই চলেছে। পুলিশটিকে টর্চটা জ্বালতে বলে হাতঘড়িটা দেখে নিলেন। সাড়ে সাতটা বাজে। এখনও রওনা দিতে পারলে শেষ ট্রেনটা ধরা যেতে পারে। তা কি সম্ভব হবে? না হলেও পুলিশী কঠোরতা দেখাবার এখানে কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হচ্ছে না। বুভুক্ষা আর স্বভাব এক নয়। স্বভাব দোষী হলে এতক্ষণ এখানে দাঁড়াতই না সে। কাঁপিয়ে পড়ত শিকারই কুকুরের মত। এক আই আর লিখত আই ঘটি বেঁধে, যাতে কোনও ফাঁক দিয়ে না বেরিয়ে যেতে পারে আসামী।

এই যে হুজুর।

চমকে ফিরে দাঁড়ায় বিজেন। দরজার মুখে এসে নফর পাল। দুহাতে সুন্দর একটি কাঁথা দিয়ে জড়ান শিশু। আর এক পা এগিয়ে বারান্দার ওপরে এসে দাঁড়ায় নফর পাল। কাঁপছে থর থর করে। উত্তেজনা, ব্যথা, ভয়, সমস্ত একসঙ্গে মিশে যোচড়াচ্ছে তার স্নায়ু গুলোকে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে নিজের হাতে শিশুটিকে তুলে নেয় বিজেন। আর ভারমুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে পাল। বোঝে বিজেন, কিন্তু বোঝাতে পারে না। এতবড় নিঃস্বতার ব্যথা সামান্য দুটি প্রবোধবাক্যের কাজল দিয়ে মুছে দেবার চেষ্টা করা শুধু বাতুলতা নয়, নির্মমতা বটে।

আমরা আসি তাহলে নফরবাবু।

কথাটা কানে যেতেই বিজেনের হাত দুখানা জড়িয়ে ধরে নফর পাল। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে তার মুখের দিকে। ডুবন্ত মানুষের আকুল আকুতি সে দৃষ্টিতে। বোঝে বিজেন। বুঝেই বলে—আমি আমার আপ্রাণ চেষ্টা করব নফরবাবু। বিশ্বাস রাখবেন।

শিশুটিকে বর্ষাতির ভেতরে ভালভাবে ঢেকে চুকে বিয়ে বারান্দা থেকে নেমে পড়ে সে। পিছনে কোন প্রকোষ্ঠে তখনও কাঁপিয়ে চলেছে একটি বুভুক্ষু মাতৃহৃদয়।

পরদিন রিপোর্ট লিখতে বসে বিজেন। লিখে চলে —ঘটনাচক্রে গ্রাম্য স্ত্রীলোক সরলীবালা। হাসপাতালে থাকা অবস্থাতেই হাতের টিকিট খুলে নেবার অর্থ যে কি, তা জানে না। হাসপাতালের কেউ বা বাড়ির লোক, কেউই জানায়নি তাকে তার শিশুটির মৃত্যুর কথা। তাই খালাস পেল যেদিন, নিঃশঙ্ক চিত্তে গিয়ে ঢুকল শিশুদের ঘরে। দরজার বাইরে বসে ছিলুচ্ছিল একটি আয়া। সেও খেয়াল করেনি কিছু। শিশুদের ঘরে ঢুকে প্রথমেই যে শিশুটি চোখে পড়েছে তারও হাতে একইপ্রকার নম্বরী টিকিট দেখে সে পরম নিশ্চিন্তে আপন সন্তান ভেবেই কোলে তুলে নিয়েছে সে। সরলীবালার স্বামী নফর চন্দ্র পাল নিজে স্ত্রীকে হাসপাতাল থেকে আনতে গেলে হয়ত এ গোলমালটি হত না। কিন্তু স্ত্রীর কান্নাকাটির ভয়েই নিজে যায়নি, পাঠিয়েছিলেন একটি অল্প বয়স্ক কর্মচারীকে। এ ধরনের কোন ঘটনা যে ঘটতে পারে তা ভাবতেও পারেন নি নফর পাল। তাই পূর্বাহ্নে কর্মচারীটিকে সাবধান করে দেবার কথা মনেও আসেনি তাঁর। কার্যকারণ এবং পরিস্থিতি বিবেচনা করে দেখা যায়, এ ধরনের একটি ঘটনা ঘটে যাওয়া খুব অসম্ভব নয়।

যাই হ'ক, যখনই সরলীবালা জানতে পারলে যে এ শিশু তার নয় তখনই চোখের জলে বুক ভাসিয়েও তুলে দিয়েছে তাকে আমার হাতে। প্রসূতির অবস্থা খুব ভাল নয়। নফর চন্দ্র পাল তাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকায় যথাসময়ে থানায় খবর দিয়ে ভুলটি সংশোধন করে নেবারও সময় পায়নি।

রিপোর্টের শেষে নিজ মন্তব্য যোগ করে বিজেন। হাসপাতাল থেকে আশুবাবুর স্ত্রীর সদ্যোজাত সন্তানটিকে অপহরণ করেছে বটে সরলীবালা কিন্তু দোষী তাকে বলা যায় না।

লেখার নিচে লম্বা একটা টান দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বিজেন। বুকের ওপরকার পাষাণ চাপাটা এতক্ষণে একটু হাল্কা মনে হচ্ছে।

আধুনিক বাংলা রচনায় প্রেম

গৌরচন্দ্র চক্রবর্তী

বর্তমান বাংলা রচনায় সকল প্রকার সুরুচি ও মাধুর্য বর্জিত হয়ে প্রেম কেবলমাত্র নর ও নারীর অসহিষ্ণু মিলন আকাঙ্ক্ষার শুধু একটিমাত্র ক্ষুদ্র বিন্দুতে আত্মপ্রকাশে যেন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

আর যেন তর সয় না।

যেমন করেই হোক নায়ক-নায়িকাকে সম্ভব-অসম্ভব শোভন-অশোভন, যে কোন স্থানে হাজির করে জোর করে প্রেম নিবেদন করাতে অনেক লেখক একেবারে অস্থির হয়ে পড়ছেন। অথচ মানুষের জীবনে প্রেম জিনিসটা অমন পাত্রাধ মেলের বেগে বেয়ে এসে উপস্থিত হয় কি না, হলেও সেটা প্রেম কিনা, সেকথা সকলে যে একেবারে না বোঝেন, তা নয়, তবে পাঠক সমাজকে তাঁরা বুঝতে দিতে চান না বলে মনে হয়। হঠাৎ প্রেমের চমকদার কাহিনী দিয়ে তাঁরা আমাদের ধাপ্পা দিতে চান। পাঠকের যে এতে মন ভরে না, সে কথা লেখক বোঝেন। কারণ, তাঁর নিজেরই এতে মন ভরে না, ভরতে পারে না। লেখক হলেও তিনিওতো একজন পাঠক নিজেই। তিনিও তো সময় পেলে এবং সে সময় কাটাবার জন্যে কিছু কিছু পড়েন। অতএব তাঁর নিজের না-বুঝতে পারার কোন কথা নেই। বুঝেও তিনি আমাদের এই ফাঁকি দিতে চান। দিয়ে যান। কারণ তার বেশি কিছু দেবার ক্ষমতা তাঁর থাকে না। তাই শুধু ফাঁকি দেন। লেখকের মনেও এর বেদনা বড় কম বাজে না। কিন্তু তিনি নিরুপায়। আর, পাঠক কেন সব বুঝেও এই ফাঁকি সহ্য করে, কেন মেনে নেয়, সে কথা পরে বলছি।

এই ধরনের প্রেমের কাহিনীতে তাঁরা যতবড় আদর্শবাদের বুলি নায়ক নায়িকার ঘাড় ধরে মুখ দিয়ে বলাতে বাধ্য করুন না কেন, মানুষের মন ছুঁয়ে যেতে সে কিছুতেই পারবে না। তাই আজকাল কোন রচনায় নায়ক নায়িকা পূর্ণ চরিত্র হয়ে ফুটে ওঠে না, মনে সামান্য দাগও কাটে না। তাই আমরা শুধু নায়ক নায়িকাদেরই নয়, গল্পটা পর্যন্ত ভুলে যাই একেবারে।

প্রেম জীবজগতের আদি সূত্র।

জীবনের প্রথম সঙ্গীত।

সর্বোত্তম অনুভূতি।

তারই ওপর নির্ভর করে আছে বিশ্বসংসারের এত কিছু ভাল।

প্রেম কেবল অস্থির মিলন আকাঙ্ক্ষায় ধেয়া নৌকা নয়। এর প্রকৃত স্বাদ যে একবার পেয়েছে তার কাছে অন্য সকল কামনা বাসনা লোভ একেবারে তুচ্ছ। এর স্বাদ যে পেয়েছে, সে প্রেমাস্পদকে অস্থির হয়ে শুধু উচ্ছ্বাস জানাতে অশোভনভাবে হোটেলের কেবিনে অথবা নির্জন লেকে গঙ্গার ধারে ছুটে যাবে না। প্রেম তার ভাষার কোয়ারায় ছুটবে না। জীবনের গতির মধ্যেই অথবা তার পরিসমাপ্তির মধ্যেই সে প্রেম সকল মাধুর্যে পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠবে। সে নায়ক নায়িকার প্রেমে লেখক এই গভীরতা এই দরদ এনে দিতে অক্ষম, সে নায়ক-নায়িকা চরিত্র হয়ে উঠতে পারে না। সেখানে তাদের মুখে গোটা গোটা মেদুর ওয়রবৈরায় নতুন করে ঢেলে দিলেও তারা প্রেমের চরিত্র হয়ে পূর্ণতা লাভ করতে কিছুতেই পারবে না।

কোন্ প্রেম স্বর্গীয়, আর কোন প্রেম পার্থিব,

অথবা নায়কীয়, সে বিচার আমাদের নয়। সে বিচার প্রেমিকের। কিন্তু সে প্রেম, রাধা-কৃষ্ণের সম্বন্ধ কি না সে সত্তা প্রকাশ পাবে চরিত্রে। প্রেমিক-প্রেমিকা সত্তা কারের স্মরণীয় সার্থক চরিত্র হয়ে উঠল কিনা সেইটাই বিচার্য।

লিখলেই লেখক হওয়া যায়, কিন্তু শিল্পী হতে গেলে শুধু লেখক হলেই চলে না। যে ডিটেকটিভ লেখে সেও তো লেখক। কিন্তু সে শিল্পী নয়। শিল্পী ছাড়া অপর কেউ চরিত্রকে অবিস্মরণীয় করে গড়তে পারে না।

বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র বিভূতিভূষণের হাতে প্রেমের স্পর্শে যে সব চরিত্র অমর হয়ে আছে, যার যারা আমরা তারাশঙ্কর, সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গাঙ্গুলী, নরেন্দ্র মিত্রের মধ্যে কিছুটা পাই, সে অবিনশ্বর প্রেমের স্পর্শ বর্তমান বাংলা রচনার ক্রমশই মিলিয়ে আসছে। ম্লান হয়ে আসছে। এখন এসেছে সম্পূর্ণ অস্থিরতা। প্রেম প্রকাশের অবান্তর অশোভন ব্যাকুলতা। তাই নায়ক-নায়িকা অবিস্মরণীয় চরিত্র হয়ে আমাদের মনে আর বেঁচে থাকার মত প্রাণশক্তি পাচ্ছে না।

তারা যেন কাগজের ফুলে কাঁচা রং।

সামান্য হাওয়ার স্পর্শে তারা বিবর্ণ। বিলুপ্ত।

কিন্তু আমরা কি আজো ভুলতে পেরেছি সেই সাবেক কালের পল্লী সমাজের রমা ও রমেশ কে? মহিম কে? পল্লীসমাজ ও গৃহদাহ দুখানি উপন্যাসের কোথায় তারা মুখোমুখি প্রেমোজ্জ্বাসের বন্যা বহাল? তবু কেন তারা এমন স্থায়ী আসন করে নিলে আমাদের প্রেমজ্ঞানের মধ্যে?

কারণ, সেসব চরিত্র সৃষ্টি করেছে শিল্পীর নিপুণ হাতে। রচনার লেখকের হাতে নয়।

সে সব মহৎ শিল্পীর দৃষ্টি, দরদী হৃদয়, প্রতিভা,—সবকিছুই আজকের রচনা লেখকদের কল্পনাতীত।

কিন্তু তবুও আমি লিখব।

আমিও লেখক হব। শিল্পী আমি হই বা না হই, আমার রচনা পড়ে বাহবা আমাকে দিতেই হবে, কারণ আমার ওরুক বইয়ের কমলা, তরুক বইয়ের কমলা, তাদের নাগরকে না পেয়ে আত্মহত্যা করেছে। আমার কমলা কমলার দল নির্দিধায় আমার কলমের আঘাতে টুপটাপ আত্মহত্যা করতে পারল, আর তোমরা আমায় একটু বৌদ্ধিক সাবাস দিতে পারবে না?

আবেদন এই।

অনেকে বলবেন, বর্তমান বাংলা সমাজ যেমন অস্থির, অমিশ্চিত, 'সাহিত্যে চরিত্র' ঠিক তেমনি রূপ পাচ্ছে।

আমি বলব,—না।

শরৎবাবুর সমসাময়িক কোন লেখক কি রাজলক্ষ্মীর মত—অথবা চন্দ্রমুখীর মত কোন নারীর সংস্পর্শে আসেননি? অত কেন? রাজলক্ষ্মীর কাছে শ্রীকান্ত আর চন্দ্রমুখীর কাছে দেবদাসের আগে কি অন্য কোন পুরুষ গিয়ে আর ফিরে আসেনি? তাঁরা ইচ্ছে করলেই কি চরিত্র দুটিকে এমনি অমর করে চিরস্মরণীয় করে রেখে যেতে পারতেন?

না। পারতেন না।

মহৎ শিল্পীর দরদী দৃষ্টি ছাড়া অবয়বান্বিত লাঞ্ছিত উপদ্রুত মানুষের মাঝে চরিত্রের সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়। প্রতিভা ভিন্ন সে চরিত্রকে অবিস্মরণীয় করে আঁকাও সম্ভব নয়।

সমাজের অনিশ্চয়তার কথা?

তাহলে শেষত, শরৎ জন্মাতেন না। রবীন্দ্রনাথ জন্মাতেন না।

সমাজের চরম মুহূর্তেই প্রতিভার জন্মদাত্রী।

সমাজের অন্যায় অপরাধ অব্যবস্থা ইত্যাদিই তো তাঁদের বিষয়বস্তু ছিল। শরৎচন্দ্রের যুগেও কি তাই ছিল না? তবে অব্যবস্থার রূপ বদলায় যুগে যুগে। এই মাত্র। তাই বলে রচনা কি সাহিত্য হতে পারবে না?

বর্তমানের বাংলা রচনা পড়ুন। দেখবেন সর্বত্র যেন ছেলে আর মেয়ে প্রেম করবার জন্যে বইমহ ছুটোছুটি দাপাদাপি করে মরছে। সবাই কিরণময়ী হয়ে জাহাজের মধ্যে দিবাকরকে রসগোল্লার হাঁড়িটা সমেত একেবারে কোলের কাছটিতে পেতে চায়!

কিন্তু তেমন করে পেতে পারছে কৈ? প্রশ্ন তো এইখানে। যখন আর সবকিছু বাদ দিয়ে কেবল ছুটতে ছুটতে জীবনের দরজা বন্ধ করবার জন্যে

আঁকু পাঁকু করে বেড়ে, তখন প্রেম করছ বলে সাধী করতে কিছুতেই তোমরা পার না। চতুরালীর বড়মানুষ হতে তোমায় স্থান দিচ্ছে অনেকে, তাই বলে সাহিত্যে প্রেমের আসন দাবী করলে আগামী কাল তোমার কথা মনে করে লজ্জায় মুখ ঢাকা দেবে। আর কিছু না।

আজকের নাটক-নভেলিকারা জীবনের সত্যকে অস্বীকার করে, পারিপার্শ্ব ভিন্নে, লেখাগুলিকে তৈরী করে যেন শুধু যৌবনে প্রেম ঘটাবার জন্যেই বইয়ের পাতায় এসে হঠাৎ হাজির হয়। প্রেম কি এতই সোজা? গোটা জীবনটাই যে প্রেম দিয়ে গড়া। কুল থেকে তার কুলকে পৃথক করে, তার সৌন্দর্য সৌরভকে বিচ্ছিন্ন করে ফুলকে বাঁচিয়ে রাখা কি সম্ভব?

লেখক বন্ধুদের কাছে আমার বিনতি। তাঁরা দয়া করে পাঠক সমাজের মধ্যে নেমে আসুন। শুনুন তাঁদের বর্তমান রচনার সাধারণ সমালোচনা।

তাঁরা হয়ত বলবেন,—তবে আমাদের বই কাটে কি করে?

উত্তরে বলব,—আপনারাই যে 'কেলের কাণ্টো।'

আমাদের এক অভিভাবক ছাত্রাবস্থায় আমাদের পাঠে অমনোযোগী হতে দেখলে বলতেন 'শেষে কি কেলের কাণ্টো ধরবি?' অর্থাৎ কেলের কাণ্ট ধরবি?

তখন কথাটা বুঝতাম না।

বড় হয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন, যার তোর ক্লাসের সবাই পাশ করে তোকে ছেড়ে ওপর ক্লাসে চলে গেল। তুই-ই একমাত্র ফেল। তখন তুই কেলের কাণ্টো ছাড়া আর কি? আর তো কেউ ফেল করে তোকে ঠাট্টা দিতে পারল না।

এঁরাও ঠিক তাই।

আর কিছু ভাল জিনিষ পায় না বলেই পাঠক আপনার বই কেনে। আরেকদল কেনেন সময় কাটাবার উদ্দেশ্যে।

প্রথমশ্রেণীদের শুনুন। শুনতে পাবেন পাঠকেরা কি বলছেন। নতুন বই আনবার সময় লাইব্রেরিগুলিতে কি সমস্যা দেখা দেয়, চাক্ষুষ দেখুন ঘুরে ঘুরে।

"—কি আর করা যায়? নতুন স্টকতো কিছু আসতেই হবে।"

তখন তাক পড়ে কেলের কাণ্টোদের। তাই বইগুলি কাটে।

তাও কি কাটে তা আপনারাও বোঝেন। সকলেই বোঝে।

কিন্তু সত্যিকারের একখানা ভাল সাহিত্যগ্রন্থ নিয়ে দেখুন। মানুষ মাথায় তুলে নেবে। বুকে জড়িয়ে ধরবে আপনাকে, পায়ে পড়ে প্রণাম জানাবে। তা পাচ্ছে না, পারছে না বলে পাঠক সমাজের আন্তরিক দুঃখের চরম অভিব্যক্তির কথাটা ভেবে দেখুন।

তবে বর্তমান বাংলা রচনার লেখকদের পাঠকসমাজ এত শ্রদ্ধা কেন করে?

সেটা লেখার গুণে নয়। সাহিত্যের প্রতি মানুষের সহজাত অকপট মমতার জন্যেই। মানুষ খোঁজে মন। তার কিছুটা পেলেও সে ধন্য ধন্য করে। কম পেলে দুঃখ পায়। কিন্তু অপমান করে না। শাস্তি দেয় না।

তাই বলে হাল্কা রচনা লেখা হবে না কেন?

নিশ্চয়ই হবে। যত হাল্কাই হোক, তবু তার মধ্যে মানুষ খুঁজবে মন। দেখতে চাইবে প্রাণের প্রতিষ্ঠা।

বাঙ্গালীর আজ সর্বস্ব যেতে বসেছে। চারিদিক থেকে মার খেতে খেতে সে সর্বস্বান্ত হয়ে পথে নেমে এসেছে। কেবল সেকালের সাহিত্য গর্ব নিয়ে আর আমরা কালের প্রহারকে প্রতিরোধ করতে পারছি না। একথা কত বড় সত্য, তা প্রত্যেক বাঙ্গালী মর্মে মর্মে বুঝেছে। বঙ্কিম-রবীন্দ্র শরতের যুগে মানুষই ছিল তাঁদের কালজয়ী সাহিত্যের উপাদান। এখনো মানুষ আছে। মানুষ থাকবে। মানুষের প্রতি গভীর প্রেমই ছিল সেই সব মহৎ শিল্পীদের প্রধান প্রেরণার উৎস। তাই তাঁদের আঁকা চরিত্র আজো জীবন্ত। অম্লান। আমাদের অস্তিত্বকে রক্ষা করতে হলে সমস্ত প্রাণমন দিয়ে আমাদের সাহিত্যকে সবল ও সুন্দর করে গড়তে হবে।

আমরা সেই প্রেমের দৃষ্টি অনুভূতি আজ সম্পূর্ণ হারিয়ে বসেছি। সাহিত্য প্রেমের রাজ্যে তাই আমদানী করেছি কেবল দৈহিক বিলসনের অস্থিরতা। জীবন সম্পর্ক বর্জিত অসুন্দর কামনার উন্মত্ত ব্যাভিচার।

সুন্দর প্রেমের অভাবে আজকের রচনা তাই—সত্যিকারের সাহিত্য হয়ে উঠতে পারছে না।

ব্যাক্তিগত দর্পণ

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অধ্যাত্মবাদী গীতিকার লুডভিগ্ ভন্-বিটোফেনের ব্যক্তিত্বের পরিচয় শুধু যে তাঁর সঙ্গীতের মধ্যেই প্রতিফলিত তাই নয়—শ্রোতাকে ধ্বনির জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এক অপরিচিত জগতে প্রবেশ করাইবার ক্ষমতা তাঁর ছিল। বিটোফেনের শিল্পী জীবনের ক্রমপরিণতি ঘটেছে তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে। তাঁর জীবনের প্রথম ভাগ কেটেছে আত্ম-অভিব্যক্তির স্বার্থানুভবের মাধ্যমে। এরপর যতই দিন এগিয়েছে ততই মনে হয়েছে তাঁর ব্যক্তিত্বে কোথায় যেন একাধিক সংকট বাধা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। সেই সংকটের অনুধাবনাই তাঁর Heligenstadt Testament রচনার প্রধান কারণ। বিটোফেনের জীবনের তৃতীয় স্তর শুরু হয়েছে Hamer Klaver Sonata রচনার সময় থেকে। তাঁর এই সুর রচনার মধ্যে স্বার্থত্যাগ ও আত্মদানের ইঙ্গিত ধ্বনিত।

তাঁর জীবনের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের মধ্যে যে একসূত্রতা লক্ষ্য করা যায়, তৃতীয় স্তরে তা অনুপস্থিত। সেই কারণে তাঁর তৃতীয় পর্যায় বা Third period-এ আত্মপ্রত্যয়ের এক মহান রূপ প্রতিফলিত—সংগীতের মাধ্যমে বিশ্ব-মানব সমাজকে তিনি শান্তির নবদিগন্তের সন্ধান দিতে চেষ্টা করেছেন। সেই শান্তি, বলাবাহুল্য আধ্যাত্মিক শান্তি। এই পর্যায়ে বিটোফেন মানব-প্রেমিক। তিনি মানব-সমাজকে কল্যাণের সংঘবদ্ধের চাবিকাঠির সন্ধান দিয়েছেন। তিনি নিজের সুখকে বড় করে দেখেননি, আর তারই ফলে নিদারুণ ট্রাজিডির নির্মম আস্বাদ তিনি হাসি মুখে বরণ করেছেন।

বিটোফেনের রচনাগুলি প্রভাবিত হয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের দ্বারা। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন নিদারুণ অসুখী, কানে শুনতে পেতেন না ভালোভাবে এবং সে কারণে নিজেকে অত্যন্ত নিঃসঙ্গ

মনে করতেন। তাঁর জীবনের কথা জানতে হলে বিভিন্ন অনুরাগীদের কাছে লেখা তাঁর চিঠিপত্রগুলি পড়া বিশেষ প্রয়োজন।

সম্প্রতি এমিলি এডারসন্ অনেক পরিশ্রমের পর বিটোফেনের পত্রাবলী সংগ্রহ করে এবং সেগুলির সম্পাদনা করে The letters of Beethoven নামে সংকলিত করেছেন। এই সংকলনটি পড়লে বোঝা যায় বিটোফেনের জীবনে ট্রাজিডি কী গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলো। সেগুলি পড়লে বোঝা যায় পুরুষ বন্ধুদের কারও প্রতি তিনি ছিলেন উচ্ছ্বাস প্রবণ, আবার কারও প্রতি আকর্ষণহীন। অবশ্য যাদের সঙ্গে তিনি কাজ করতেন তাদের কাছে লেখা চিঠির সংখ্যা খুব কম।

বিটোফেন তাঁর নারী বন্ধুদের কাছে যেসব চিঠি লিখেছেন সেগুলি পড়লে যৌবনের রক্তঝঙ্কার অনুভব করা যায়, সেগুলিতে পত্র লেখকের হৃদয়োৎসারিত দেখেছআবেগ, অনুরাগমণ্ডিত উক্তির উষ্ণতায় নিভেঁজাল পরিপূর্ণ। আভিজাত্য সম্প্রদায়ের মহিলাদের প্রতি তাঁর ছিল সুগভীর আকর্ষণ। একথা নিঃসংশয়ে স্বীকার করতেই হবে যে সঙ্গীত পিপাসু সমাজের ওপরতলার মানুষদের কাছে বিটোফেনের ছিল লক্ষ্যণীয় সমাদর। থেরেসে মালফাতি এবং হাউসের সোফেলানই জেসীয়ে-নামে দুজন নারীকে তিনি ভালবেসেছিলেন। কিন্তু তাদের কাউকেই স্ত্রী হিসেবে পান নি তিনি। যদিও অনেকের ধারনা যে সোফেলাইনের দ্বিতীয় বিবাহের তৃতীয় সন্তানটি বিটোফেনের।

রমলীকুলের কাছে লেখা তাঁর পত্রাবলীতে আছে যৌবনের আবেগ—বহু বহু রুক্ষ তিক্ত হৃদয়ে বিটোফেন কামনা করেছেন এক ফোঁটা তৃষ্ণার জল, দুটি গভীর কালো চোখের কামনার্ত আহ্বান এবং উষ্ণ ওষ্ঠের মৃদু-স্পর্শ। চিঠিগুলির ওপর কান পাতলে তাই যেন মনে হয় প্রেমের ঝঙ্কার আর প্রীতিরসের উদ্বেলতা সত্যই যেন কানে এসে আছড়ে পড়ছে। এদের মধ্যেই হয়ত বা কেউ "Eternally beloved"—

১৮০১ খৃস্টাব্দে ক্রাংস ভেগেলারকে বিটোফেন যে চিঠিটি লিখেছিলেন তাতে তাঁর আত্ম বিশ্লেষণের কিসার সুস্পষ্ট। জীবনে পেয়েছেন আর কী পাননি—তারই মূল্যায়ণ তার পাতায় পাতায়। সেই মূল্যবান চিঠির একাংশ তুলে ধরলেই বক্তব্যের যথার্থ্য ফুটে উঠবে। বিটোফেন লিখছেন—

'You will find me as happy as I am fated to be on this earth; not unhappy—I will steze fate by the throat; I shall certainly not bent and crush me completely.'...

বিটোফেনের চিঠিপত্র পড়লে বোঝা যাবে তাঁর জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল খামখেয়ালীপনা, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা এবং অত্যাচার স্পৃহা। তিনি এক ধরনের আত্মনিগ্রহে নিপীড়িত হচ্ছিলেন এবং তার ফলে সঙ্গীতের পূজারী এই ব্যক্তিটিকে পারিবারিক কলহ নিয়ে বেশীর ভাগ সময় মাথা ঘামাতে হয়েছে। তাঁর জীবনের এই জাতীয় বিড়ম্বিত পরিবেশই তাঁর জীবন-ধারণ করার আশার মূলে কুঠারাঘাত করেছে।

বিটোফেনের চিঠিপত্রের মধ্যে এমন একজন মানুষের ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, যাঁর জীবনে সকল মাধুরী অন্তর্হিত হয়েছিলো, যাঁর জীবনে করুণার পুণ্য পরশ-ধারার আবির্ভাব ঘটেনি। বিটোফেনের চিঠিপত্রগুলির মধ্যে তাঁর জীবনের ইতিহাস পাওয়া যাবে, পাওয়া যাবে তাঁর রুক্ষ ধূসর দিনযাপনের, তিক্ত বেদনার্ত প্রাণ ধারণের গ্লানির ব্যর্থতার কাহিনী।

● অভিজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসক
● রকমারী ফ্রেম
● বিদেশী লেন্স্
● সুলভ মূল্য

স্বাগত জানাই

১৭২এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড
(সাদার্ণ এ্যাভেনিউর মোড়)
কলিকাতা-২৬

খেলাধূলা

অথ মল্ল-মুষ্টিক কথা

বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়

মল্ল-মুষ্টিক সংঘর্ষ পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই বহুবার হয়ে গেছে এবং অধিকাংশ স্থলেই মল্লরা জয়লাভ করেছে। কিন্তু আমাদের দেশে এ ধরনের মল্ল-মুষ্টিক লড়াই খুব বেশী হয়নি। তাই মল্ল-মুষ্টিকের লড়াই-এর ফলাফল সম্বন্ধেও সঠিক কারুর ধারণা নেই। বরং বেশীর ভাগ লোকেরই ধারণা যে, মল্ল-এর সাথে মুষ্টিকের লড়াই হলে মুষ্টিকরা নিশ্চিৎ জয়লাভ করবে। কিন্তু এ ধারণা সত্যি নয়। প্রাচীন গ্রীসদেশে খৃষ্ট জন্মেরও আগে আনুষ্ঠানিকভাবে মল্ল-মুষ্টিক সংঘর্ষ অনেকবার হয়ে গেছে। সে সব লড়াইতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মুষ্টিকরা শোচনীয়ভাবে মল্লদের কাছে পরাস্ত হয়েছে। সবচেয়ে আকর্ষণীয় লড়াই হয়েছিল প্রাচীন অলিম্পিক বক্সিং চ্যাম্পিয়ান্ ক্রুগাস্ (KREUGAS) বনাম অলিম্পিক রেস্টলিং চ্যাম্পিয়ান ডিওকসেনস্ (DEOXENOS) -এর লড়াইটি। এই লড়াইটি 'নিমিয়ান্-প্রাধান্য' উপলক্ষ করে হয়েছিল। 'নিমিয়ান প্রতিযোগিতা' সেকালে অলিম্পিক প্রতিযোগিতারই সমতুল্য ছিল। অতএব একথা বলাই বাহুল্য যে, এটা ছিল ক্রীড়াজগতে এক ঐতিহাসিক সংঘর্ষ, যাতে ক্রুগাস এবং ডিওকসেনস-এর মাধ্যমে পরোক্ষভাবে মল্ল ও মুষ্টিক নেমেছিল। লড়াইটি ছিল ক্রীড়াজগতের শ্রেষ্ঠ সম্মানের জন্যে এবং এই যুদ্ধের ফলাফলের ওপর নির্ভর করছিল—এই সম্মান মল্লের কবলিতই থাকবে, কিংবা মুষ্টিকের করায়ত্ত হবে। জাতিতে অবশ্য উভয়েই ছিলেন গ্রীক। লড়াই-এর সূচনাতেই ক্রুগাস ক্ষিপ্ত কুকুরের মত ডিওকসেনস-এর ওপর আক্রমণ চালায়। সেদিন ক্রুগাস-এর চেহারা দেখে দর্শকেরা শিউরে ওঠেন। সমস্ত চোখে মুখে এক হিংস্র পশুর আক্রমণের অভিব্যক্তি—শিরায় শিরায় রক্তের তাণ্ডব—পেশীগুলি যেন জয়োল্লাসের উন্মাদনায় ফুলছে। লড়াই সুরু হতেই ক্রুগাস ঝাঁপিয়ে পড়েন বাঘের মতন। ভীষণতম এক একটি মুষ্ট্যাঘাত কুস্তিগীরের চোখে মুখে পড়তে থাকে আর তিনি যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠতে থাকেন। কিন্তু রেহাই নেই, আক্রমণের পর আক্রমণ, আঘাতের পর আঘাত। 'নিমিয়ান প্রাধান্য' অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে ক্রুগাস্ সুরু থেকেই তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করে লড়াই আরম্ভ করেন। কিন্তু ডিওকসেনস্-ও তখন জয়লাভের নেশায় উন্মাদ। বিপক্ষের

আক্রমণ সুকৌশলে প্রতিহত করে কয়েক মিনিট পরেই 'বডিহোল্ড' প্যাঁচের সাহায্যে ডিওকসেনস্ ক্রুগাস-কে শূন্যে তুলে এক আছাড় মারেন এবং অতি সহজেই মাটিতে মিলিয়ে দেন। ছেড়ে দিতেই ক্রুগাস উঠে আবার ডিওকসেনস্-কে আক্রমণ করবার আগেই ডিওকসেনস্ তড়িৎবেগে প্রায় আড়াই শ' পাউণ্ড ওজনের ক্রুগাসকে দুহাতে ধরে একেবারে মাথার ওপরে তুলে সজোরে মাটিতে ফেলেন। সাংঘাতিকভাবে জখম হয়ে ক্রুগাস অতিকষ্টে উঠে দাঁড়ালেন বটে, কিন্তু তখন তাঁর কাঁধ, ঠোঁট, চিবুক বেয়ে প্রবল রক্তধারা বইছিল। তখন তিনি দস্তুরমতো টলছিলেন—তাঁর শক্তি ও দম তখন প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছিল। আহত বাঘের মতন ডিওকসেনস্ তখন সত্য সত্যই উত্তেজিত হয়েছিলেন। তাই ক্রুগাস টলতে টলতে উঠে দাঁড়াবার সাথে সাথেই ডিওকসেনস তাঁকে আবদ্ধ দিয়ে ধরে আবার শূন্যে তুলে ভীষণ বেগে আছাড় দিলেন। তখনি তাঁর অচৈতন্য দেহ লুটিয়ে পড়ে সংগ্রাম-ক্ষেত্রের মাটির পরে। ক্রুগাস-এর চেতনা আর ফিরে এলো না। যখন তাঁর অচৈতন্য দেহ স্ট্রেচারে করে চিকিৎসালয়ে নিয়ে যাওয়া হল, তার আগেই তাঁর প্রাণবায়ু নিঃশেষ হয়ে গেছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে প্রাচীন গ্রীক আমল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত কুস্তিগীরেরা সর্বত্রই শক্তির খেলায় মুষ্টিকদের ওপর ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রাচীন গ্রীসের অলিম্পিক প্রতিযোগিতার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, মাত্র দুবার দুজন অলিম্পিক বিজয়ী মুষ্টিক মুষ্টিযুদ্ধে এবং প্যানক্রাসন (Pancratium) লড়াই-এ একই অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় মল্লদের ওপর টেক্কা মেরেছেন। বিশ্ব বিশ্রুত মুষ্টি-যোদ্ধাদের মধ্যে যে দুজন মুষ্টিক সবচেয়ে অবিস্মরণীয় ইতিহাস রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে একজন হলেন থেসদেশীয় বীর থিয়াগিনী বা থিয়াগেনেস (Theagenes), আর একজন স্পার্টার বীর স্ট্রিটোমাকাস (Czeitomachus)। অথচ এক অলিম্পিক প্রাঙ্গণেই প্যানক্রাটিয়াম্ প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত লড়াইতে সাতজন কুস্তিগীর মুষ্টিকের বিপক্ষে লড়াই করে বিজয়মুকুট লাভ করেছেন।

মল্ল-মুষ্টিক সংঘর্ষে সাধারণতঃ মুষ্টিকরা মল্লদের 'ফ্লাইং-মেয়ার' (Flying-mare), 'লেগ্-হোল্ড' (Leg-blod), 'টো-হোল্ড' (Toe-hold), 'স্ট্র্যাংগুলু-হোল্ড' (Strangle-hold), 'হেড্-লক্' (Head-lock) ও 'কিকিং' (Kicking) এই কয়টি মারাত্মক প্যাঁচে কাবু হতেন। সবচেয়ে ক্ষতিকারক ছিল পেছন দিকে আঙুল ধরে মচ্‌কানো। এই শেষোক্ত প্যাঁচের ভয়ে অনেক মুষ্টিকই মল্লদের ভয়ের চোখে দেখতেন। এমন কি লড়াইতে ভয়ে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে পরাজয় মেনে নিতেন। মল্ল-মুষ্টিক সংঘর্ষে মল্লরা মুষ্টিকদের আঙুল মুচ্‌ড়ে এমন নির্মমভাবে ভেঙে দিতেন যে, অনেক মুষ্টিককেই অন্ধের মতন মুষ্টিযুদ্ধ ছেড়ে দিতে হত। যতক্ষণ না মুষ্টিক যন্ত্রণায় শিশুর মতন কেঁদে ফেলতো, কিংবা তাঁর হাত বা আঙুল যতক্ষণ না ভেঙে যেতো, ততক্ষণ মল্ল তাঁর বিপক্ষের আঙুল ছাড়তো না।

ক্রাটোনার মিলো (Milo)-ও তাঁর মল্ল-জীবনে কোনদিন পরাস্ত হননি। তিনিও অনেক মুষ্টিককে পরাস্ত করেছেন। মিলোর উপস্থিতিতে ৬টি অলিম্পিক ক্রীড়ার কোনটিতেই 'পেন্টাথলন' (Pentathlon) প্রতিযোগিতায় মুষ্টিকরা মল্লের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেননি। যদিও মিলো ছিলেন একাধারে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান কুস্তিগীর ও মুষ্টিক। 'কণ্ঠরোধ' (Strangle-hold) প্যাঁচে অমোঘ নৈপুণ্য অর্জন করার জন্যে ইভান্ লিউইস্ ও এড্‌ওয়ার্ড লিউইস্ উভয়েরই নামের সাথে 'স্ট্র্যাংলোর' শব্দটি যুক্ত হয়ে আছে। ইভান্ ও এড্‌ওয়ার্ড উভয়েই জাতিতে জার্মান এবং উভয়েই আমেরিকার জন্মে সে-দেশেরই জল-বায়ুতে মানুষ হয়েছেন। তবে এই সাংঘাতিক প্যাঁচের অপপ্রয়োগে যিনি সবচেয়ে কুখ্যাতি অর্জন করেছেন, তিনি হলেন অবিস্মরণীয় গ্রীক-মল্ল সোসট্রাটস্ (Sostratos)। ইনি ১০৪ পূর্ব, ১০৪ পূর্ব ও ১০৬ পূর্ব এই তিনটি অলিম্পিক ক্রীড়ায় (খৃস্টপূর্ব ৩৬৪-৩৪৬ সাল) 'প্যানক্রাটিয়াম' ও 'পেন্টাথলন' প্রতিযোগিতায় 'সর্বজয়ী' আখ্যা লাভ

করেছিলেন। এই ১২ বছরে তিনি নাকি অগণিতবার চ্যাম্পিয়ান্ ও জন মুষ্টিককে পরাস্ত করেন। গ্রীক মল্ল আর্কাসিয়ান্ (Archacian)-ও তিনবার মল্ল-মুষ্টিক সংঘর্ষে মুষ্টিককে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করে তিনবারই জয়ী হন। ইনি মারা গেলেও মুষ্টিকের লড়াই করে রিংএর মধ্যেই। ক্রীড়াঙ্গনেই তিনি তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অবশ্য মুষ্টিকের সাথে লড়াই করে তিনি পরাস্ত হননি, মল্ল-মুষ্টিক সংঘর্ষে আর্কাসিয়ান্-ই তাঁকে পুরস্কার স্বরূপ 'অলিভ্-মুকুট' লাভ করেন। 'অলিভ্-মুকুট' মাথায় পরে তিনি আর সংগ্রাম-ক্ষেত্র ত্যাগ করে যেতে পারেননি। লড়াই-এর মারাত্মক-আঘাতে ও জয়ের আনন্দেই তিনি মারা যান।

বিশ্ববিশ্রুত নিগ্রো-বীর জো লুইস্ র‍্যাগ্নো যখন তাঁর গৌরবোজ্জ্বল জীবনে ৬২টি বিখ্যাত লড়াইতে অবতীর্ণ হয়ে ৫২টি লড়াইতেই নক-আউটে জয়ী হয়ে চলেছেন, তখন অনেককেই বলতে শোনা গেছে যে, জো-লুই-এর মতন মুষ্টিকের সাথে গায়ের জোরে বা শক্তির-খেলায় কোন মল্লের তুলনাই হতে পারে না। তাদের ধারণা লুই যে-কোন মল্লের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। কিন্তু এ ধারণা সত্যি নয়। লুই তাঁর মুষ্টিক-জীবনে প্রথম হেভি-ওয়েটে 'বিশ্বপ্রাধান্য' লাভ করেন ইটালীর 'জগজ্জয়ী' মুষ্টিক হয়েও মল্ল-মুষ্টিক সংঘর্ষ বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে একবার বলেছিলেন: "মল্লের সাথে মুষ্টিকের কোন তুলনাই হতে পারে না। লুই-এর কাছে মুষ্টি-যুদ্ধে হেরে গেলেও আমি নিশ্চিত জানি, মল্ল-মুষ্টিক সংঘর্ষে মল্ল হিসাবে আমি জো-লুইকে অতি সহজেই পরাস্ত করতে পারবো।"

যতদূর জানা গেছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় আইরিশ্ মল্ল উইলিয়াম্ মাল্ডুন্ (William Muldoon)-ও একবার একজন খ্যাতনামা মুষ্টিকের লড়াই-এর সাধ করেক মিনিটের মধ্যেই মিটিয়ে দিয়েছিলেন। সে-লড়াই-এর প্রধান উদ্যোক্তা ও বিচারক নাকি ছিলেন স্বয়ং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি এব্রাহাম্ লিঙ্কন (Abraham Lincoln)।

বাঙালী মল্লবীরদের মধ্যে প্রথম যিনি এই গৌরবের অধিকারী হয়েছিলেন, তিনি হলেন ব্যান্ডেলীর শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯০২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এল্‌মো (Elmo) নামে মস্ত জোয়ান এক সাহেব মুষ্টিক ভারত সফরে আসেন। সাথে বিশ্ববিশ্রুত জার্মান বলী ইউকেন্ স্যাণ্ডোও এসেছিলেন। কলকাতার গড়ের মাঠে এল্‌মোর সাথে শক্তি-পরীক্ষা দেবার জন্যে এগিয়ে এলেন বাংলার তরুণ-বীর শ্যামাকান্ত। এল্‌মো ছিলেন সে-সময় ইউরোপের খ্যাতনামা মুষ্টিকদের মধ্যে একজন। আর শ্যামাকান্ত বলী হিসাবে ভারতশ্রেষ্ঠ হলেও মল্ল হিসেবে তাঁর মান ছিল অনেক নীচে। এ হেন বিষম লড়াইতে মাত্র তিন মিনিট খেলার পর শ্যামাকান্ত এল্‌মো-কে এমন এক আছাড় মারলেন (কেউ কেউ বলেন ধাক্কা মেরেছিলেন) যে, মিনিট পনেরো এল্‌মোর চৈতন্যই হয়নি। হোয়াইট্ বনাম ব্ল্যাক্-এর শক্তির লড়াইতে বাঙালীর মান-সম্ভ্রম এমনভাবে তুলে ধরায় বিশাল জনতার জয়োল্লাসে শ্যামাকান্তের জয়-জয়কার পড়ে গেল। কিন্তু সাহেব মেম্বরা এতে চটে গেল। তাঁরা চেঁচিয়ে প্রতিবাদ জানালো। শ্যামকান্ত তার উত্তরে ইংরেজীতে বলেন: "কেলে দিয়েছি, সে ধাক্কাটা উনি সহ্য করতে পারবেন বলেই। পাছে মল্ল-ঘাতক হই, এই অখ্যাতিটা এড়াবার জন্যেই বেশী জোর দিইনি।" সাহেবেরা বলেন—মুষ্টি-যুদ্ধে আছাড় মারা বা ধাক্কামারা বে-আইনী। আর অবশিষ্টরা বলেন—এটা ত' দাদা-কালোর শক্তির লড়াই, মুষ্টি-যুদ্ধও নয়, মল্লযুদ্ধও নয়। শক্তির লড়াইতে শক্তিতে ও কৌশলে যে জিতবে, সেই জয়ী। কথাটা খুবই সত্যি। উদ্যোক্তারাও আগে থেকে কিছুই ঘোষণা করেননি। শ্যামাকান্ত ও এল্‌মোর লড়াইতে দর্শক হিসেবে সেদিন স্যাণ্ডো নিজে উপস্থিত ছিলেন।

বর্তমান শতকে যতগুলি মল্ল মুষ্টিক সংঘর্ষ হয়ে গেছে, তার মধ্যে সব চেয়ে বেশী আলোড়ন তুলেছিল আমেরিকা জুড়ে ১৯০১ সালে। সেদিনকার লড়াই এর দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে একজন ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হেভিওয়েট মল্ল ফ্র্যাংক অ্যাল্‌বার্ট গচ্ আর একজন ছিলেন অষ্ট্রেলিয়ার হেভি-ওয়েট মুষ্টিক ফ্রান্সিস্

প্যাট্রিক্ স্ল্যাভিন্। লড়াইটি হয়েছিল উত্তর আমেরিকার আলাস্কা দেশের ডাওসন্ সিটির 'নিউ-ল্যন্ড' থিয়েটারে ১৯০১ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর। মল্ল মুষ্টিক লড়াইতে স্থির হল তিন মিনিট করে দুজনের পর এক মিনিট করে বিশ্রাম দিতে হবে। এবং জয় পরাজয় নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চলতে থাকবে।

আমেরিকার নানা প্রান্ত থেকে কুস্তিপ্রিয় ও মুষ্টি যুদ্ধ প্রিয় দর্শক, খ্যাত অখ্যাত বহু মল্ল ও মুষ্টিক, এমন কি অন্যান্য দেশ থেকেও অনেক ক্রীড়ানুরাগী মল্ল মুষ্টিকের এই আকর্ষণীয় লড়াই দেখতে ডাওসন্ সিটিতে সমবেত হয়েছিলেন। গচ্ তখনো কুস্তিগীর হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন নি। বয়সেও তিনি স্ল্যাভিন্ এর চেয়ে অনেক ছোট ছিলেন। স্ল্যাভিন্ তখন অষ্ট্রেলিয়া ভূ-খণ্ডের চ্যাম্পিয়ান্ মুষ্টিক এবং ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকাতেও অনেকগুলি বড় বড় লড়াইতে জয়ী হয়ে সুনাম অর্জন করেছিলেন। অষ্ট্রেলিয়ান্ মুষ্টিকদের মধ্যে তাঁর মতন সুঠাম দেহী মুষ্টিক আজো পর্যন্ত আর কেউ জন্মান নি।

লড়াই সুরু হবার সাথে সাথে স্ল্যাভিন্ তাঁর কোণ থেকে ছুটে এসে তড়িৎ বেগে গচ্ এর মুখে ঘুসির পর ঘুসি চালাতে থাকেন। অতিরিক্ত মুষ্টিক স্ল্যাভিন্ এর তীব্র ও ক্ষিপ্র সেই আক্রমণ অমিত শক্তি সম্পন্ন এক একটি মুষ্টাঘাত গচ্কে বিচলিত করে তোলে। গচ্ অবসাদ অনুভব করতে থাকেন। অন্য দিকে স্ল্যাভিন এর আক্রমণও হয় তীব্র থেকে তীব্রতর। ডান হাত বা হাত যে হাতে যখনই সুযোগ পাচ্ছেন সেই হাতে ভীষণতর আঘাত হানছেন। গচ্ দিশেহারা হয়ে রক্তের চারিদিকে ছুটতে থাকেন। এ ভাবে এক তরফা আক্রমণ ধারা চলতে থাকে চতুর্থ চক্র পর্যন্ত। গচ্-এর পা তখন টলতে থাকে। চোখের সামনে আঁধারের কালো পর্দা নামতে থাকে। এক একটি ব্রহ্মমুষ্টির আঘাতে গচ্ এর সারাটা মুখ তখন ফুলে উঠেছে। নাক, মুখ ও কান কেটে রক্ত করতে থাকে। এলোমেলো ঘুঁসির আঘাতে একটি চোখে তখন গচ্ সরষে ফুল দেখেছেন। অতিকষ্টে আত্মরক্ষা করে গচ্ চতুর্থ চক্রেও পরাজয় এড়িয়ে রইলেন। অষ্ট্রেলিয়ান্ মুষ্টিক স্ল্যাভিন্ এর চেহারা দেখে দর্শকেরাও শিউরে ওঠেন। সমস্ত চোখে মুখে তাঁর এক হিংস্র দুর্বার আক্রমণের অভিব্যক্তি —শিরায় শিরায় রক্তের তাণ্ডব। গচ্ এর দুরবস্থা দেখে তখন গচ্ নিশ্চিত পরাজিত হবেন, এই ধারণাই অধিকাংশ লোকের বদ্ধমূল হয়। কিন্তু হার্কিম যুবক পঞ্চম চক্রের ঘণ্টা পড়া মাত্র স্ল্যাভিন্-এর আক্রমণকে সম্পূর্ণ আগ্রহ্য করে তাঁকে ঠেলে এক কোণে নিয়ে গেলেন। তারপর দুই হাতে তাঁকে একেবারে মাথার ওপর তুলে এমন জোরে দর্শকদের দিকে ছুঁড়ে ফেললেন যে, স্ল্যাভিন্ মঞ্চ থেকে প্রায় ১৫ গজ দূরে গিয়ে পড়লেন। আছাড়ের চোটে তিনি এমন সাংঘাতিক ভাবে জখম হলেন যে, মঞ্চে কোনক্রমে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে এলেন সত্য, কিন্তু আর লড়তে পারলেন না। লড়াই এর নিয়ম অনুসারে বে-আইনী ভাবে আঘাত দেবার অপরাধে যদ্যপিও গচ্ এর বিরুদ্ধে স্ল্যাভিনকেই জয়ী বলে ঘোষণা করলেন। গচ্ জয়ী হয়েও একটু ভুলের জন্যে পরাজিত বলে গণ্য হলেন। কিন্তু পরাজিত হয়েও মল্ল মুষ্টিক এই লড়াইতেই গচ্ রাতারাতি শুধু আলাস্কার কেন, সারা উত্তর আমেরিকায় প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেলেন। মুষ্টির পক্ষের লোকেরাও বুঝল যে, মুষ্টিকের তুলনায় মল্ল কত বড় শক্তিমান। দেহে কত শক্তি থাকলে ঐ রকম বেদম মার খেয়ে ২০০ পাউণ্ড ওজনের একজন মুষ্টিককে তার চেয়ে কম ওজনের একজন মল্ল প্রায় ১৫ গজ দূরে ছুঁড়ে ফেলতে পারেন। পরে স্ল্যাভিন্ নিজেও গচ্ এর শক্তি ও কৌশলের খুব প্রশংসা করেছেন। পরবর্তী কালে গচ্ বহুবার বলেছেন যে, বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান্ যে কোন হেভি-ওয়েট মুষ্টিককে একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর কুস্তিগীর অনায়াসে পরাস্ত করবার ক্ষমতা রাখে।

বিশ্ববিখ্যাত জাপানী যুযুৎসুবিদ্ ও মল্ল 'সাদা কাজু উয়েশিবা'ও একবার মল্ল-মুষ্টিক সংঘর্ষে মেতেছিলেন। মল্ল মহলে তিনি 'রাকু' (Ruku) নামেই পরিচিত ছিলেন। সে লড়াইতে তিনি অপ্রয়াসেই মুষ্টিকের খেল্ খতম করেছিলেন। খেলার আগে অনেকেরই ধারণা ছিল যে, মুষ্টিকের ব্রহ্মমুষ্টির বিপক্ষে রাকুর 'যুযুৎসু' (Ju-jutsu) বা 'জুডো' (Judo) পাঁচ্

তেমন কার্যকরী হবে না। কিন্তু অবাক কাণ্ড দেখা গেল মুষ্টিকের একটি মাত্র মুষ্ট্যাঘাত রাকুস দেহের লাগার আগেই কোন এক অযোষ পাঁচে মুষ্টিক ভূপাতিত হয়েছেন।

১৯৫০ সালের ১ই ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় কলকাতার স্টোর থিয়েটারে একটি উল্লেখযোগ্য মল্ল মুষ্টিক লড়াই হয়েছিল। এই লড়াইতে একদিকে ছিলেন প্রাচ্যের চ্যাম্পিয়ান মুষ্টিক ক্র্যাংকু মেলিনা, আর অন্যদিকে ছিলেন ভারতের যুক্ত প্রদেশের খাতনামা কুস্তিগীর প্রিন্স রক্কি।

ক্র্যাংকু মেলিনো ছিলেন চীন, জাপান, সুমাত্রা, বোর্নিও, জাভা, সেলিবিস, ফরমোসা, শ্যাম, মলয়, ফিলিপাইন প্রভৃতি পূর্ব এশিয়ার 'সর্বজয়ী' মুষ্টিবীর। ১৯২৯ সালেও তিনি একবার ভারত সফরে এসে এদেশের বহু বহু অনেক মুষ্টিককে পরাস্ত করেছিলেন। অনেকের মতে নিগ্রো মুষ্টিক গান্স জোট্স জ্যাক্স ও রক্ষিণ ভারতের আর্থার জোরেক্স ভিন্ন মেলিনোর যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী এদেশে তেমন ছিলেন না। আর প্রিন্স রক্কি ছিলেন আগ্রার অধিবাসী। যদিও তিনি তার আগেই মল্ল হিসেবে আমেরিকা সফর করে সুনাম অর্জন করেছিলেন কিন্তু ভারতীয় মল্ল-মহলে তখনো তিনি তেমন প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারেননি।

প্রিন্স রক্কি ও মেলিনোর লড়াই-এর আগে অনেকেরই ধারণা ছিল, মল্ল-মুষ্টিক এই নতুন ধরনের বিশেষ লড়াইটি বেশ আকর্ষণীয় ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হবে। এই আশায় প্রতিযোগিতার পরিচালকরাও ৫ মিনিটের ৫ রাউণ্ড লড়াই হবার কথা আগে থেকেই ঘোষণা করেছিলেন। বেশ কিছুদিন আগে থেকেই এই লড়াই-এর প্রচার চলেছিল এবং তার ফলে ইংরেজ-মহল থেকেও বহু উৎসাহী দর্শক স্টোর থিয়েটারে সমবেত হয়েছিলেন, এমন কি রাজপুরুষদের মধ্য থেকেও অনেকে এই লড়াই দেখতে এসেছিলেন। অতিরিক্ত আসনের ব্যবস্থা করেও সকলকে আসন দেওয়া যায়নি। কিন্তু এত আয়োজন, এত প্রচার, এত আড়ম্বর—সকল রকম উৎসাহ ও উত্তেজনা শেষ হয়ে গেল কয়েক মিনিটের মধ্যে।

লড়াই সুরু হবার ঘণ্টার আওয়াজ হওয়া মাত্রই মেলিনো ও রক্কি নিজ নিজ কোণ থেকে এগিয়ে এসে সেলামী নিলেন এবং কয়েক পা পিছিয়ে উভয়ে উভয়কেই আক্রমণ করবার জন্যে নিজ নিজ কায়দায় ও বিশেষ ভঙ্গিতে পায়তাড়া দিতে থাকেন। মুষ্টিক তাঁর দুহাতের মুষ্টি বাগিয়ে সুযোগের অপেক্ষায় চক্রাকারে এমনভাবে ঘুরতে লাগলেন যে, যাতে যেকোন হাতের একটি ঘুসিতে ধাতে মাটিতে ফেলতে পারেন। আর রক্কিও হাতের দুটি ধারা এমনভাবে বাগিয়ে ঘুরতে লাগলেন যাতে মেলিনোর আক্রমণ প্রতিহত ও সেই সাথে কুস্তির পাঁচে মুষ্টিককে ভূপাতিত করতে পারেন। এমনভাবে পায়তাড়া করতে করতেই মিনিট দেড়েক কেটে গেল। শেষে মেলিনো যে মুহূর্তে তাঁর প্রথম মুষ্ট্যাঘাতটি রক্কির প্রতি হানলেন, সেই মুহূর্তেই রক্কি মেলিনোর হাত-ধারা ধরে চোখের পলকে 'ধরিপট' পাঁচে মেলিনোকে এক আছাড়েই ভূপতিত করে আশ্চর্যান দেখিয়ে ছিলেন। প্রথম চক্রের পাঁচ মিনিটের লড়াই দেড় মিনিটেই শেষ হয়ে গেল। ইউরোপীয়ানরা ও মুষ্টিকের পক্ষের দর্শকেরা এতে বিশেষভাবে আপত্তি জানালেন। ভারতীয় মতে একবার চিৎ করলেই জয় পরাজয় নিষ্পত্তি হয়ে যায় বটে; কিন্তু তাঁদের মতে এ অন্যায় 'Best of Three' এই নীতি অনুসারে যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারিত হওয়া উচিত। মুষ্টিক তো তাঁর ক্ষমতা দেখাবার কোন সুযোগই পাননি। অতএব আবার লড়াই হওয়া উচিত। শেষে পরিচালকরা রক্কিকে আর একবার লড়তে অনুরোধ জানালে রক্কি বিনা প্রতিবাদে হাসি মুখে লড়তে রাজী হলেন। পরিচালকরা তখন আবার দু'রাউণ্ড খেলার কথা ঘোষণা করলেন। কিন্তু একারের লড়াই সুরু হবার সাথে সাথেই উৎসাহী দর্শকরা আবার হতাশ হয়ে গেলেন। রক্কি প্রথম চক্রেই মেলিনোর হিম্মৎ বুঝতে পেরেছিলেন। সম্ভবতঃ ইচ্ছে করেই খেলাটিকে একটু আকর্ষণীয় করবার জন্যে নিজে আক্রমণ না করে মেলিনোকেই আক্রমণের সুযোগ দিলেন। এবারও মেলিনো ঘুসি ছোড়ার সাথে সাথে মুষ্টিকের হাতটি ধরে 'ধরিপট' বা 'বোরীপাট' (কতকটা ইউরোপীয় 'Arm grip shoulder

throw' প্যাঁচের মতন) প্যাঁচের লড়াইয়ে দ্বিতীয়বার মুষ্টিক মেলিনোকে ঘুঁষিয়ে আছাড় মারলেন কিন্তু মেলিনো সাথে সাথে উঠে পুনরায় রক্তের বেগে এসে রঞ্জির ওপর পড়লেন। রঞ্জিও সেই মুহূর্তেই 'দো হাত্তি চাক' প্যাঁচ লাগিয়ে মেলিনোকে মাটিতে আবার আছাড় মারলেন; কিন্তু চিৎ করলেন না রঞ্জি কিন্তু ইচ্ছে করলেই মেলিনোকে দুবারই চিৎ করে খেলায় নিষ্পত্তি করতে পারতেন। কিন্তু খেলাটিকে দীর্ঘ স্থায়ী ও উপভোগ্য করবার জন্যেই তিনি তা করেননি। এরপর মেলিনো না উঠতেই রঞ্জি তাঁকে একটা হ্যাঁচকা টানে দূরে ছিটকে ফেলে দিলেন। এদিকে তো মেলিনোর তখন অবস্থা কাহিল। পরপর তিনবার আছাড় খাবার পর তাঁর সমস্ত উৎসাহ তখন উবে গেছে। তিনি তখন সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়েছেন। মুষ্টিযুদ্ধের দর্শকদের মুখ দিয়েও একটা উৎসাহবাণী উচ্চারিত হচ্ছিল না। মল্লমুষ্টিক সংঘর্ষের ফলাফল তখন তাদের কাছে আর অস্পষ্ট নেই। তাদের মুখেও আর কথাটি নেই। এবার কিন্তু মেলিনো নিজে আর আক্রমণ করলেন না, আক্রমণ ঠেকাবার জন্যে দূরে দূরে সভয়ে পায়তাড়া করতে লাগলেন। মেলিনোর পরাজিত মনোভাব দেখে বিরক্ত হয়ে শ্বেতাঙ্গ দর্শকরা পর্যন্ত লজ্জিত ও বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন: 'মরদের মতো লড়ো।' কিন্তু কে কার কথা শোনে? মেলিনোর তখন উভয় সঙ্কট। লড়তে গেলে রঞ্জিকে ভয়, না লড়লেও দর্শকদের ভয়। রঞ্জিও তখন আর কালক্ষেপ করলেন না। মেলিনোর আক্রমণের অপেক্ষায় না থেকে নিজেই বাঘের মতো থাবলা দিয়ে মেলিনোকে ধরে আবার শূন্যে তুললেন এবং মুহূর্তের মধ্যেই আছাড় দিয়ে চিৎ করে দিলেন এবং সঙ্গেও রঞ্জিকেই বিজয়ী বলে ঘোষণা করলেন। মল্ল-মুষ্টিক সংঘর্ষ অনেক দেশে অনেকবার হয়ে গেছে সত্য; কিন্তু কোন কুস্তিগীরই মুষ্টিককে রঞ্জির মতন আক্রমণের এত সুযোগ দিয়ে পরাস্ত করেননি।

মল্ল মুষ্টিক লড়াইটা একটু নতুন ধরনের ঠিকই। কারণ উভয় পক্ষের গতি ও প্রকৃতি ভিন্নমুখী। মল্ল মুষ্টিকের মুষ্ট্যাঘাতের কোন কৌশল জানে না। আবার মুষ্টিকও কুস্তির কায়দা কানুন বা প্যাঁচ কিছুই জানে না। মুষ্টিক কুস্তিগীরকে পরাস্ত করবে তার মুষ্টির জোরে; আবার কুস্তিগীর মুষ্টিকের মুষ্ট্যাঘাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে কুস্তির প্যাঁচে মুষ্টিককে ভূপাতিত করবে। এ যেন কতকটা বাঘে মানুষে লড়াইয়ের মতন। এ ধরনের জমকালো 'গ্ল্যাডিয়েটরিয় কুস্তি' আধুনিককালে কম হলেও এ পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শতগুলি হয়ে গেছে; তাতেও কুস্তিগিররাই জয়ী হয়েছেন।

প্রাচীন গ্রীসদেশীয় 'প্যানক্রেটিয়াস'-কুস্তিতে মুষ্টিককে গ্লোভস (Gloves) বা সেসটাস (Cestus) ব্যবহার করতে দেওয়া হত না। উভয়কেই খালি হাতে লড়াই করতে হত। ফলে অনেক মুষ্টিক কুস্তিগীরের শক্ত মাথায় মুষ্ট্যাঘাত করে নিজেই নিজের কব্জি ভেঙেছেন। আবার মুষ্টিকের দস্তানার আঘাতে লড়াই করবার আগেই অনেক কুস্তিগীরের মাথা কেটে যেতো বলে আইন করে মল্ল মুষ্টিক লড়াইতে মুষ্টিককে দস্তানা পরতে দেওয়া হত না।

মুষ্টিকের চেয়ে কুস্তিগীরের সহ্যশক্তিও অনেক বেশী। তা না হলে মুষ্টিকের যে মুষ্ট্যাঘাতে মুষ্টিকের মাথা ঘুরে যায়, সেই বজ্র-মুষ্টির আঘাত হজম করেও কুস্তিগীর মুষ্টিককে আক্রমণ করে ভূপাতিত করেন কি করে? অস্ট্রেলিয়ান্ মুষ্টিক স্ল্যাভিন্ যেদিন বেপরোয়াভাবে গচ্-এর চোখে মুখে মুষ্ট্যাঘাত চালিয়ে যাচ্ছিলেন, আর গচ্ তা যে-ভাবে সহ্য করছিলেন, তা দেখে সেদিন সবাই হতবাক্ হয়ে গিয়েছিলেন। স্ল্যাভিন্ নিজেও কম বিস্মিত হননি। তাইতো তিনি পরে সাংবাদিকদের কাছে বলেছিলেন: "...আমি ভেবেই পাচ্ছি না, যে-আঘাতে দক্ষ মুষ্টিকও নক-আউট হতেন, তা একজন অখ্যাত মল্ল সহ্য করলেন কি করে?"

নিরপেক্ষ মন নিয়ে বিচার করলে এ-কথা স্বীকার করতেই হবে যে, মুষ্টিক, ব্যায়ামবীর ভারোত্তলক আর কুস্তিগীর; এদের মধ্যে প্রকৃত শক্তির কাজে ও খেলায় কুস্তিগীররাই সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠতম।

'ক্ষুধিত পাষাণ' ক্ষুধিত নয়

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

ক্ষুধা জীবনের ধর্ম, জড়ের নয়। প্রাণের ক্ষুধা আছে, পাষাণের নেই। পাষাণের ক্ষুধা প্রাকৃত নয়, অতি-প্রাকৃত জগতেই সম্ভব। তাই 'ক্ষুধিত পাষাণ' নাম শুনে অতিপ্রাকৃত জগতের কথা সম্পাদকারণেই মনে আসবে। সেই সঙ্গে আরও একটি প্রশ্ন মনে আসতে পারে। এই অতিপ্রাকৃত পরিবেশ লেখক কিভাবে গড়ে তুলেছেন? অতিপ্রাকৃত ঘটনাকে সরাসরি স্বীকার করে? এ প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে 'ক্ষুধিত পাষাণ' এবং সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য অতিপ্রাকৃত গল্পের রচনারীতি ও বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ পাঁচটি অতিপ্রাকৃত গল্প লিখেছেন। এই গল্প পাঁচটি হল 'কঙ্কাল', 'নিশীথে' 'ক্ষুধিত-পাষাণ', 'মণিহারা', ও 'মাস্টারমশায়'। লক্ষ্য করবার বিষয়, গল্পগুলোর কোনোটিতেই সরাসরিভাবে অতি-প্রাকৃত ঘটনার অবতারণা করা হয়নি। গল্প বলতে বলতে হঠাৎ অতীত দিনের ঘটানো ঘটনার উপর আলোক-সম্পাত করা হয়েছে; এবং এ কাজ এমন এক একজন ব্যক্তিকে দিয়ে করানো হয়েছে, যাদের ঠিক প্রকৃতিস্থ বলা যায় না। 'কঙ্কাল' গল্পে গল্পকার নিজেকে বুদ্ধি ও যুক্তির অসমতলে দাঁড় করিয়ে স্বগতোক্তি করেছেন, "নিশ্চয় বুদ্ধিতে পারিলাম সমস্তই আমার উষ্ণ মস্তিষ্কের কল্পনা"। 'নিশীথে' গল্পে অতিপ্রাকৃত কাহিনীর বর্ণনা করেছেন মনোজ ও অদৃষ্ট জমিদার দক্ষিণাচরণবাবু। 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর গল্পকার এমন একজন সবজান্তা প্রকৃতির লোক, যাঁকে দেখলেই মনে হয়, বিশ্ববিধাতা তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে সকল কাজ করে থাকেন। 'মণিহারা'র বর্ণনাকার চক্ষুরোগে-গ্রস্ত, জীর্ণ-শীর্ণ স্কুল মাস্টারকে দেখে 'ইংরেজ কবি কোলরিজের দুষ্ট প্রাচীন নাবিকের কথা মনে পড়ে'। 'মাস্টার মশায়' গল্পটি মূল কাহিনীর সঙ্গে জড়িত কোনো ব্যক্তি বর্ণনা করেননি বটে, কিন্তু এখানেও যে ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে অতিপ্রাকৃত ঘটনার জাল বোনা হয়েছে, তিনি "একটু হস্তরেখা অবতার" ছিলেন। অতএব, দেখা যাচ্ছে, কয়েকজন অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ অতিপ্রাকৃত গল্প রচনা করেছেন।

এবার দেখা যাক 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর গল্পকার, রবীন্দ্রের সেই তুলার ব্যাপারে আনাড়ী কিভাবে তার অতিপ্রাকৃত অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছে। গল্পের সূত্রপাতেই দেখি, পদ্মা নদীর তীরবর্তী পরিত্যক্ত ও নিভৃত রাজপ্রাসাদের প্রভাব প্রথম যেদিন তিনি সচেতন ভাবে অনুভব করেন, সেদিনের অভিজ্ঞতার বর্ণনা। কিন্তু সেই অত্যাশ্চর্য বর্ণনার পর মুহূর্তেই তিনি

তার অভিজ্ঞতা অসংগত ও লঘু প্রতিপন্ন করেছেন.

"তখন আমার বড় আশঙ্কা হইল যে, হয়ত বা তিনি নির্জন পাইয়া কবিতা দেবী আমার ঘাড়ে আসিয়া ভর করিবেন।"

এখানে লক্ষণীয় হল এই গল্পকার নিজেকে এভাবে যুক্তির অন্তরালে রাখার ফলে একদিকে যেমন বাস্তব জগতের সঙ্গে যোগসূত্রটি অটুট আছে, অপর দিকে তেমনি অতিপ্রাকৃত ঘটনাও অক্ষুণ্ণ আছে। অক্ষুণ্ণ আছে, বলছি এজন্যে যে, নিজের অভিজ্ঞতাকে লঘু প্রতিপন্ন করার পূর্বেই মানসলোক আশ্রয়কারী তার অতিপ্রাকৃত অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন। এর ফলে, গল্পকারের এই স্বীকৃতিতে অতীন্দ্রিয় জগতের অভিঘাতে পাঠকমন মুহূর্তের জন্যে আহত হলেও গল্পের রসগ্রহণে কোনো বাধা জন্মে না। বরং বাস্তবভিত্তিক এই স্বীকৃতির কথা সহজেই ভুলে গিয়ে পাঠক পরবর্তী ঘটনার জন্যে উৎকণ্ঠিতচিত্তে অপেক্ষা করে পরবর্তী ঘটনায় দেখি, এক পরমাশ্চর্যে অতি-প্রাকৃত ঘটনার মায়াজালের মধ্যে বর্ণীচের তুলার মানসলোক আশ্রয়কারী জড়িয়ে পড়েছেন। কিন্তু এখানেও লক্ষ্য করবার হল এই যে, তিনি নিজে কিছু দেখতে পাচ্ছেন না, সবই অনুভব করছেন।

কোথাও কিছু দেখতে পাইয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম। শরীর একপ্রকার আবেশে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। যেন বহুদিবসের লুপ্তবিশ্বাস আশঙ্কা ও আতঙ্কের মধু গন্ধ আমার নাসার মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল।"

এই অনুচ্ছেদে ইন্দ্রিয়তন্ত্রী বর্ণনার পর গল্পকার আবার বাস্তব জগতে ফিরে এলেন এবং আবার পূর্বের অভিজ্ঞতাকে লঘু প্রতিপন্ন করলেন।

"তখন আবার আমার পূর্বস্মৃতির অদ্ভুত মোহ স্মরণ করিয়া কেরোসিন-প্রদীপ্ত ক্যাম্পটেবিলের আলো ঘরের চারিদিক লইয়া সকৌতুকে হাসিতে লাগিলেন।"

আত্মানুসন্ধিনীর অনুসরণে 'শতরঞ্জ-প্রকোষ্ঠের, প্রকাণ্ড শূন্যতার' প্রাসাদে নৈশ অভিসারকেও গল্পকার মুহূর্তে একটা মোহ স্বপ্নজাল বলে প্রতিপন্ন করতে চাইলেন।

"সহসা একটা বিকট চীৎকার শুনিয়া চমকিয়া দেখিলাম, আমার সেই ক্যাম্পখাটের উপরে ধর্মাক্ত-কলেবরে বসিয়া আছি।"

গল্পটির পরবর্তী পর্বে প্রাসাদটির প্রতি এক দুর্বোধ্য আকর্ষণে মানসলোক আশ্রয়কারীকে ক্রমশঃ ঘিরে

শত্রুকে তুচ্ছ ভাববেন না

বিপুল সংখ্যক চীনাবাহিনী এখনও আমাদের উত্তর সীমান্তে রয়েছে। সতর্ক থাকুন।

আপনাদের শৃঙ্খলাই ভারতের শক্তি

DA-63/F-18

ধরছে। অবশ্য পূর্ব থেকেই এর প্রস্তুতি সুরু হয়েছিল। গল্পকারের ভাষায়,

"সপ্তাহখানেক না যাইতেই বাড়ীটার এক অপূর্ব নেশা আমাকে ক্রমশঃ আকর্ষণ করিয়া ধরিতে লাগিল।"

বাড়ীটির প্রতি এই ক্রমবর্ধমান আকর্ষণের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি গল্পটির সুরু থেকেই গড়ে তোলা হয়েছে। এই ভিত্তির উপকরণ জুগিয়েছে বাড়ীটির অতীত ইতিহাসের ঐশ্বর্যময় ও বিলাসমলিন কাহিনী এবং পরিবেশ-রচনার আশ্চর্য শিল্পনৈপুণ্য। নির্জন পাহাড়ের নীচে উপলখচিত সুস্থা নদীর তীরে 'পাথর-বাঁধানো দেড়শত সোপানময় অত্যুচ্চ ঘাটের উপরে একটি শ্বেত প্রস্তরের প্রাসাদ' একাকী দাঁড়িয়ে আছে—নিকটে কোথাও লোকালয় নেই। প্রায় আড়াইশত বৎসর পূর্বে দ্বিতীয় শা-জামুদ ভোগবিলাসের জন্য প্রাসাদটি এই নির্জন-স্থানে নির্মাণ করিয়েছিলেন। একদিন এখানে ছিল ঐশ্বর্যের দীপ্ত জীবনের স্পন্দন। কিন্তু আজ সে সব কিছুই নেই। এই তো গেল বাড়ীর পরিবেশ ও ইতিহাস। এ ছাড়া এ বাড়ীতে রাত্রিযাপনের ব্যাপারে বৃদ্ধ কেয়ারী কর্মির যে নিষেধোক্তি ও ভৃত্যদের আতঙ্কও অতি-প্রাকৃত পরিবেশ রচনায় সাহায্য করেছে। তাই যখন গল্পকারকে বলতে শুনি,

"সন্ধ্যার পরে আমি একটা নেশার জালের মধ্যে বিহ্বলভাবে জড়াইয়া পড়িতাম। শত শত বৎসর পূর্বেকার কোনো-এক অলিখিত ইতিহাসের অন্তর্গত আর-একটা অপূর্ব ব্যক্তি হইয়া উঠিতাম,"

অথবা যখন তিনি বলেন,—

"তাহার পর অন্ধকার যতই ঘনীভূত হইত ততই কী-যে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতে থাকিত তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। ঠিক যেন একটা চমৎকার গল্পের কতকগুলি ছিন্ন অংশ বসন্তের আকস্মিক বাতাসে এই বৃহৎ প্রাসাদের বিচিত্র ঘর-গুলির মধ্যে উড়িয়া বেড়াইত। খানিকটা দূর পর্যন্ত পাওয়া যাইত তাহার পরে আর শেষ দেখা যাইত না,"—

তখন কথাগুলোতে আমরা অতিপ্রাকৃতের শিহরণ অনুভব করলেও একেবারে অলীক বা অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়ে দিতে পারি না। আমাদের মনে হয়, বিগত দিনের কামনা-বাসনার সাক্ষী এক পরিত্যক্ত রাজপ্রাসাদে একলা বসবাসকারী কোনো ব্যক্তির পক্ষে চিত্ত-বিভ্রম-জাত এ ধরণের কল্পনা স্বাভাবিক সৃষ্টি বলা হয়েছে। আবছায়া গল্পকারের প্রতিবিম্বের পাশে সেই তরুণীর ছায়ার কথা পর্যন্ত বলা হয়েছে। কিন্তু সেই তরুণীকে কেন্দ্র করে গল্পকার তার মানসিক অবস্থার যে বর্ণনা দিয়েছেন তা'তে এমন ঘটনাও অস্বাভাবিক নয়। গল্পকার বলেছেন,

"সে আমাকে পাগল করিয়া দিয়েছিল। আমি তাহারই অভিসারে মায়াপুরীর মধ্যে গলিতে গলিতে কক্ষে কক্ষে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছি।"

এই মায়াজালের মধ্যে পড়ে গল্পকার যখন সেই নির্জন রাজপ্রাসাদে অভিভূতের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তখন হঠাৎ মেহের আলির, "তফাত যাও, তফাত যাও। সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়" চীৎকার একদিকে যেমন বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে তাকে সচেতন করে তুললো, অপর দিকে তেমনি প্রাকৃত জগতের সঙ্গে গল্পটির যোগসূত্র ছিন্ন করল। 'মেঘাচ্ছন্ন অমাবস্যার রাত্রে' 'নিকষকৃষ্ণ অন্ধকারের মধ্যে' তুলার বাণ্ডিল আদায়কারী যখন সেই ইরানী রমণীর বুকফাটা আর্তনাদ ও মর্মভেদী হাহাকার অনুভব করছিলেন তখনও তা'তে ছেদ টানল মেহের আলির চীৎকার 'তফাত যাও, তফাত যাও।' মেহের আলির অতীত অভিজ্ঞতার ইঙ্গিত দিয়ে লেখক একদিকে যেমন অতিপ্রাকৃত পরিবেশে জটিলতা ও মোহ-রচনা করেছেন, অপরদিকে তেমনি গল্পের মাঝে মাঝে তার চীৎকারের উল্লেখ করে অতিপ্রাকৃতের স্বপ্নময় জগৎ থেকে গল্পটিকে বাস্তব জগতে ফিরিয়ে এনেছেন। অতএব, দেখা যাচ্ছে, এ গল্পে রবীন্দ্রনাথ বাস্তব জগতের গল্পে যোগসূত্রে অক্ষুণ্ণ রেখে এবং সম্পূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিতে অতিপ্রাকৃত পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। তাই বলা চলে, ক্ষুধিত পাষাণ'এর পাষাণ সত্যই ক্ষুধিত নয়।

অপরাজিত | মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

বিদ্রোহী ঝড়ের দিনে ভূলুণ্ঠিত পলাশেরা সব।
সুন্দরের আয়োজনে এই ক্ষতি মিথ্যে কলরব
সারা প্রকৃতির
যখন বাগান কোণে একটি রজনীগন্ধা পরিপূর্ণ, স্থির।

আমাদের চারপাশে গন্ধহীন উজ্জ্বল পলাশ,
পোড়া, বন্ধ্যা মাটি,
শূন্যগর্ভ মানুষেরা ঠাঁমে-কাচা নিখুঁত মসৃণ
সূক্ষ্ম পরিপাটি।
নেতৃত্বের চিত্র ছাখো, ক্রূর, ক্লিন্ন, বিষাক্ত ভেজাল,
সমাজের চারপাশে পেতে রাখে দুর্নীতির জাল
ঘৃণ্য গলি, ঘুঁজি,
কেননা এগুলি তার রাজনীতি চোরা ব্যবসার
একমাত্র পুঁজি।
এদের হুংকারে,
মানবতা লজ্জা-নত আকাশের শেষ অন্ধকারে।

মাঝে মাঝে মনে হ'ত এইসব পলাশের দেশে
আমি পরাজিত,
কারণ আমার কণ্ঠ ক্ষীণশ্রুত, আমি বিত্তহীন,
রিক্ত, অনাদৃত।
পলাশের উজ্জ্বলতা, অহংকার প্রভুত্বের ভাষা
আমার জগতে পাব, এ-যে করুণ প্রত্যাশা,
অথচ এ অধিকার ছেড়ে দিলে সমস্ত পৃথিবী,
উপেক্ষার কণ্ঠে বলে 'মূর্খ তুই—কী আছে কী দিবি।

একটি পরম সত্য উচ্চারিত আমার আকাশে
উদার কঠিন,
আমি সঙ্গীহীন কবি, তবু আমি দুর্জয়, নির্ভয়
আমি মৃত্যুহীন।

এ বন্ধ্যা মাটির দেশে যেখানে অরণ্যে শুধু
পলাশের ভীড়,
তখন উঠোন কোণে, চেয়ে ছাখো, একটি রজনীগন্ধা
পরিপূর্ণ, স্থির ॥

মালবিকা তোমাকে মনে পড়ল | হর বসু

আজকে শ্রাবণে কেন বড়ো বেশী মনে পড়ে তোমাকে
কৃষ্ণচূড়া এখনও তো বুকের রক্ত দিয়ে
আকাশে অঞ্জলি পাতে,
বাতাসের স্বননে শুনি অস্পষ্ট তোমার নাম :
মালবিকা জীবাশ্ম হ'য়ে ঘিরে আছে দ্বীপকে।

প্রেম জানি হৃদয়কে এনে দেয় হৃদয়ের তীরে
রূপ জানি বহ্নি হয়ে জ্বালায় কামনা,
ভালোবাসা নীড় হয়ে ঝড়ের সংকেত শুনে কাঁদে,
মালবিকা অশ্রু হয়ে হারিয়ে গেছে অপ্রেমের ভিড়ে।

শ্রাবণ আকাশে কেন মেঘ আসে যায়,
কৃষ্ণচূড়া অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ে প্রাণের সবুজে,
রাত্রির আকাশ ভরে খদ্যোতের নীলাভ আলোয়,
মালবিকার রাত্রি কাঁদে শব্দহীন, তারার বেদনায়।

তোমার সে কালো চুল শ্রাবণের মেঘ হয়ে করুক নর্তন
চোখের আকাশ হ'তে ঝরুক অঝোর বৃষ্টি রাত্রিদিন,
ঘাসের সবুজ বুক কেঁপে যাক হাসির কঠিন শব্দে,
মালবিকা অন্তরে বয়ে নিয়ে আসুক অনেক শ্রাবণ।

সবজি ক্ষেতের প্রহরী

● মিখাইল সালোখভ

মোড়লের কাছ থেকে ফিরে আসার পর থেকেই বাবাকে খুশি খুশি দেখাচ্ছে। মনে হয় বাবা যেন একটা কিছু পেয়েছেন। তাই আজ খুশির বান ডেকেছে। ঘন কালো ভ্রূতে হাসি আটকে আছে। চাপা হাসিতে উদ্ভাসিত হয়েছে কাটা কাটা ঠোঁট। বাবার এমন হাসি খুশী মেজাজ বহুকাল দেখেনি মিটকা। যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর থেকেই সেই যে বাবার মুখ কালো হল, মেজাজ তিরিক্ষে হল, তা আর গেল না। বাবার হাতে মার খেতে খেতে নাজেহাল হয়ে পড়ল ছোদ্দ বছরের ছেলে মিটকা। আজ বহুকাল পরে বাবা খুশী মেজাজে দাড়িতে হাত বোলাচ্ছে। এতকাল মেঘ জমে ছিল বাবার মুখে। মেঘ কেটে রোদ্দুর উঁকি দিচ্ছে এখন। মিটকাকে আসতে দেখে বাবা খুশি হয়ে বলে উঠল, "ওরে হাঁদা গোবিন্দ, যা বাগান থেকে মাকে ডেকে আন, খেলোনের সময় হল।"

বাড়ির সবাই খেতে বসেছে। দেবীমূর্তির কাছে দাঁড়িয়ে আছে বাবা। বেঞ্চির এক কোণে হাত চেপে দাঁড়িয়ে আছে মা। উনুনটা মায়ের খুব কাছেই। পাশাপাশি বসেছে দুই ভাই মিটকা আর কিওদর। কিওদর বড়, মিটকা ছোট। খাওয়া শেষ হবার পর বাবা তার দাড়ি আঁচড়ে দু'ভাগে বিনুনী করে ছেলে বলে উঠল, "তাক তাদাকে অভিনন্দন জানানো উচিত তোমাদের। আজ আমি মহকুমা কোর্ট বাশীলের কমাণ্ডার হলাম।"

হাসিতে বাবার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বাবা বললে, "জার্মান যুদ্ধে মেডেল পেয়েছিলাম। তা একেবারে মাঠে মারা যাই নি। আমি যে সেনাবাহিনীতে অফিসার ছিলাম, আমি যে যুদ্ধের সময় লড়াই করেছি, এ সব কথা লোকে কমাণ্ডার ভুলে যান নি"।

বাবার খুশি খুশি মুখে অকস্মাৎ এক ঝলক রক্ত

হলকে উঠল। চোখ দুটো জ্বলে উঠল।

কিওরের দিকে তাকিয়ে বাবা বলে উঠলেন, "মাথা গুঁজে পড়ে আছিস কেন? তোর বাবা আজ খুশি। এই দেখে তোর বুক জ্বলছে নাকি? কিরে? শোন, কিওর, ভাবছ আমি কিছুই দেখি না, বুঝি না, তাই না? কিসের জন্যে তুই চাষীদের সঙ্গে ঘুর ঘুর করে বেড়াস? জানিস, হারামজাদা, তোরই জন্যে মোড়ল দু'বুড়ো শুনিয়ে দিল। মোড়ল বললে, আমিদিন পিওত্রভিচ, গ্রামপঞ্চে কমরেডের মান সম্মান বজায় রাখার চেষ্টা কর। কিন্তু তোমার আদুরে ছেলে যে দিনে দিনে বেয়াড়া হয়ে উঠছে! সে দিকে নজর দিয়েছ? তোমার ছেলে বলশেভিকদের সঙ্গে মাখামাখি করছে। খুবই দুঃখের কথা। ছেলের বয়স মাত্র বিশ বছর। ভুসবে··· ছেলেটা ভুসবে। সত্যি, হারামজাদা, সত্যি তুই ওই চাষা ভুসোদের সঙ্গে মাখামাখি করছিস?"

"করছি।"

মিটকার বুক ঠাণ্ডা হয়ে এল। মিটকা ভাবল কিওর এবার বাবার হাতে মার খেয়ে মরবে। বাবা কিন্তু মারল না। টেবিলের ওপর ঝুঁকে হাতের মুঠো পাকিয়ে সর্পে উঠল বাবা, "লালফৌজের তল্পীদার, তুই জানিস আমরা কালই তোদের সবাইকে জলে পুরব? জানিস তোদের ওই দর্পি ইগরকা আর কামার স্তোমভকে কালই গুলি করে মারব?"

বিবর্ণ মুখে কিওর বললে, "জানতাম না। এখন জানলাম।"

কিওরের গলা কিন্তু একটুও কাঁপল না। মিটকা দাদার দিকে একবার তাকাল।

ব্যাপার সুবিধের নয় দেখে মিটকা আর কিওরকে আগলাতে আসছিল মা। কিন্তু মায়ের ওঠার আগেই বাবা পিতলের একটা ভারী মগ নিয়ে ছুঁড়ে মারল। মগের হাতলটা এসে লাগল কিওরের ঠিক চোখের নিচেই। অঝোরে রক্ত ঝরতে লাগল। কথা না বলে কিওর হাত দিয়ে চোখটা চেপে ধরল। রক্তে চোখ ডুবে গেছে। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না কিওর। মা এসে কিওরের মাথায় হাত রাখল। কাঁদল। বাবা কিন্তু কোন কথা না বলে এক ধাক্কায় বেঞ্চিটা ঘাটিতে ফেলে দিয়ে দরজার খিল বন্ধ করে দিল।

ছেলেরা নিয়ে সারা বিকেল কেটে গেল মার। কিন্তু মাই ভাজা আর রুটি তৈরি করে একটা ব্যাগের মধ্যে রেখে মা কিওরের একরাশ ছেঁড়া জামা কাপড় সেলাই করতে বসল। মা যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

সন্ধ্যার পর বাবা মহকুমা প্রশাসনিক অফিস থেকে ফিরে এসে সোজা বিছানায় শুয়ে পড়ল। বাবা জামা কাপড় বদলাল না। খাওয়ার কথাও বলল না। কাঠের মেঝের বাড়ি। হাঁটা-হাঁটি করলে মেঝে মড় মড় করে। কিওর তাই পা টিপে টিপে খুব সাবধানে ভাঁড়ার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। একটা জিন ও লাগাম নিয়ে উঠোনে এল।

"মিটকা, এদিকে আয়।"

বাছুরগুলো গোয়ালে চেঁচাচ্ছিল মিটকা। ডাক শুনে কাজ ফেলে মিটকা এসে দাঁড়াল দাদার কাছে। হাবভাব দেখে মিটকার সন্দেহ হল দাদা হয়ত পালিয়ে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। শুনছে ডন নদীর ওপারে আছে বলশেভিকরা। তাই নদীর ওপারে আকাশ যেন আগুনের তাতে গমগম করে। মাঝে মাঝে আসে বন্দুকের আওয়াজ।

মিটকার দিকে না তাকিয়ে কিওর জিজ্ঞাসা করল, "ঘোড়ার আস্তাবলে কি চাবি দেওয়া হয়ে গেছে মিটকা?"

"হ্যাঁ,·····কেন?"

"ওমনি।" একটু চুপ করে থাকল মিটকা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শিষ দিতে দিতে অকস্মাৎ থেমে গিয়ে আচমকা বলতে আরম্ভ করল কিওর, "চাবিটা বাবার বালিশের তলায়।·····ঠিক মাথার কাছেই।·····যা, নিয়ে আয়।·····আমি পালাব।"

"কোথায়?"

"লাল ফৌজে যোগ দেব। তুই একেবারে ছেলে মানুষ।·····তুই এখন ঠিক বুঝতে পারবি না কোন পক্ষ ঠিক আর কোন পক্ষ অন্যায়।···আমি ওদের সঙ্গে যোগ দেব। প্রত্যেক গরীব চাষী জমি পাক, সবাই সমান হোক, গরীব থাকবে না, বড়লোক কেউ

থাকবে না,—এর জন্যে আমি লড়াই করতে যাব।

মিটকার মাথায় হাত রেখে কথা বলছিল কিওরা। হঠাৎ মাথা থেকে হাত তুলে নিয়ে কিওরা বলে উঠল, "সে চাবিটা নিয়ে আয়।"

বিনা দ্বিধায় উত্তর দিল মিটকা, "যাচ্ছি।"

কিওরার দিকে একবার তাকিয়ে অদৃশ্য হল মিটকা।

সবচেয়ে ভাল, ঘরে থাক বাবা। ঘরটা আলো-আঁধারি। সিলিং এর ওপর মাছি ভন্‌ভন্‌ করছে। দরজাটা খুলে দাওলটা ধরে থাকল। পাছে দরজার পাল্লা এসে সজোরে লাগে। তাই আস্তে আস্তে নিজের হাতে বন্ধ করে দিয়ে পা টিপে বাবার কাছে এল।

বিছানায় ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছে বাবা। মাথাটা বালিশের ওপর। একটা হাত পকেটে। অন্য হাতটা বিছানা থেকে মাটির ওপর এলিয়ে পড়েছে। লম্বা সিগারেটের আগুনে হলদাভ হওয়া একটা আঙুল এসে ছুঁয়েছে মেঝে। শ্বাস বন্ধ করে মিটকা বাবার বিছানার কাছে এগিয়ে গেল। একটু দাঁড়িয়ে শুনল বাবার নাক ডাকার আওয়াজ। নিরেট স্তব্ধতা। বাবা চিৎ হয়ে শুয়ে। বিনুনি করা দাড়ি। আধ বোজা চোখ। হা করা মুখ। কড়া মদের গন্ধ। গলা থেকে মাঝে মাঝে ঘড় ঘড়ে আওয়াজ।

বালিশের দিকে হাত বাড়াল মিটকা। তার বুক খুব জোরে ধকধক করছে।

সমস্ত রক্ত যেন মাথার দিকে ঠেলে উঠছে। কান ঝাঁ ঝাঁ করছে তার। মিটকা প্রথমে তেল চিটচিটে বালিশের তলায় একটা আঙুল ঢুকিয়ে দিল, তারপর আর একটা। চাবির স্পর্শ পেয়েছে মিটকা। কেমন যেন একটু পিছিল, একটু ঠাণ্ডা চাবির গোছা তার আঙুলে ঠেকল। কিন্তু হঠাৎ তার বাবা জেগে উঠে মিটকার হাত চেপে ধরে বলে উঠল, "এই শয়তান কি চুরি করছিস? মজা দেখাচ্ছি জানোয়ার।"

"বাবা! বাবা! চুরি করছি না। ঘোড়ার আস্তাবলের চাবি নিচ্ছি।...তোমার ঘুম ভেঙে যাবে বলে...।"

কোলা কোলা চোখ দিয়ে মিটকার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল "কেন? চাবির কি দরকার?"

"ঘোড়াগুলো দাপাদাপি করছে তাই..."

"তা ও কথা প্রথমে বলিস নি কেন?"

বালিশের তলা থেকে চাবির গোছা বার করে মেঝের ওপর ছুঁড়ে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল বাবা। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস কানে এল। তারপর আবার নাক ডাকার শব্দ।

বাবার ঘর থেকে দৌড়ে মিটকা এল কিওরের কাছে। কিওরা তখন হাউনির তলায় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিল। চাবিটা দাদার হাতে গুঁজে দিয়ে মিটকা বললে, "ক্রোম ঘোড়াটা নেবে।"

"আচ্ছা টাট্টু।"

দাদার সঙ্গে সঙ্গে মিটকাও আস্তাবলের ভেতর থেকে উঠে এল একটা দীর্ঘশ্বাস। মিটকা বললে, "কিওরা, বাবা যদি আমাকে মারে?"

কথার উত্তর দিল না কিওরা। বাচ্চা টাট্টুকে গোয়াল থেকে বার করে আস্তে আস্তে জিন পরাল। রেকাবিতে পা রাখতে তার যেন অনেকক্ষণ সময় কেটে গেল। তারপর জিনের ওপর বসে একটু নীচু হয়ে ফিস ফিস করে বললে, "সহ্য করিস মিটকা। আমরা চিরকাল কুকুরের মতো কাটাব না মিটকা। কিন্তু বাবাকে বলিস, সে যদি আর মায়ের ওপর হাত তোলে তবে ফিরে এসে আমি আর রক্ষে রাখব না।"

বাড়ির বেড়া পার হয়ে গেল কিওরা। বহুদূরে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত সে। বেড়ার ওপর ঝুঁকে পড়ে দাদাকে দেখতে থাকল সে। কিওরা যাচ্ছে। জলে ঝাপসা হয়ে ওঠে এল মিটকার চোখ। কান্না বন্ধ করার জন্য দুই হাতে গলা চেপে ধরল মিটকা।

॥ ২ ॥

বাবার নাক তখনও ডাকছে। ভোর ভোর উঠে গোয়ালের দরজা খুলে ঘোড়া বার করে জল নদীর দিকে চলে গেল মিটকা। ঘোড়াকে জল খাওয়াতে হবে স্নান করাতে হবে। চক খড়ি পাথরের পথ শুকিয়ে খট খট করছে। খুরের চাপে সাদা সাদা ধুলো উড়ছে। নদীর ধারের দিকে চলে গেল মিটকা। ঘোড়া থেকে

নাবল। গা থেকে জামা কাপড় খুলে ফেললো সে।" অকালে শিশির ঝরে ঝরে পড়ছে মিটকার সর্বাংগে। নদীর চরের ওপর দাঁড়িয়ে থাকল মিটকা। নদীর ওপার থেকে গর্জন আসছে। বহু দূরের গর্জন। নদীর ঢেউ এর সংগে পাল্লা দিয়ে গড়িয়ে আসছে। চরের ওপর দাঁড়িয়ে মিটকা সেই বহুদূর থেকে আসা গর্জনের দিকে কান পাতল। তারপর চরের ওপর ডিগবাজী খেয়ে গড়িয়ে পড়ল মিটকা। ভাবে লীলায় দিয়ে অনেক দূরে চলে গেল। নদীর ঠাণ্ডা জলে হাত পা অবশ হয়ে আসছে তার। মিটকা তবু ভাবছে: কি করে এতক্ষণে নিশ্চয়ই বলশেভিকদের ছেড়ে দেয়েছে। এইবার সে লাল ফৌজ হবে।

পরক্ষণেই বাড়ির কথা মনে পড়ল তার। বাবার মুখ ভেসে উঠল। সব আনন্দ মুছে গেল মিটকার। একটা ফুলকির মত আনন্দ একবার দপ করে জ্বলে উঠেছিল। বাবার কথা মনে পড়তেই সেই ফুলকি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। ঝুপঝাপ করে ঘোড়ার পিঠে চড়ে আবার ঘরের দিকে ফিরল মিটকা।

পথে যেতে মিটকা ভাবতে থাকল: আমিও কি করে মত বলশেভিকদের দলে যেতে পারি! কিভাবে বলে বলশেভিকরা আমাদের পক্ষে। নদীর ওপারে আছে ওরা। বাবা যদি মারে তবে বাবার নাক কাটিয়ে দিয়ে আমিও ওই বলশেভিকদের দলে চলে যাব।

বাড়ির দারদার কাছে এসে ঘোড়া থেকে নেমে লাগামটা নিয়ে মিটকা ঘরের মধ্যে চলে গেল।

"ছোট টাট্টুটাকে নাইতে নিলে এলি না কেন?"

মা পাথরের মূর্তির মত উনুনের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। মিটকা মায়ের দিকে একবার তাকাল।

"আভাবলে নেই।"

"তবে গেল কোথায়?

"জানি না।"

বাবার ঘরে ধস ধস আওয়াজ উঠল। বাবা জুতো পরছে। উনুনের পাশ দিয়ে বাবা ভাঁড়ারের দিকে গেল। ঘুর ঘুর চোখে তাকাল। জিন নেই।

দরজা ধরে গর্জন করে উঠল বাবা, "জিন কোথায় গেল?"

ছোট বেলার মত মিটকা বাবের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। "ছাদে ঘরে ঢুকল। চামড়ার চাবুক হাতে নিয়ে বাবা এসে দাঁড়াল রান্নাঘরে।

"আর হাতে চাবি দিয়েছিলি?"

মিটকা আর বাবার মাঝখানে এসে দাঁড়াল মা।

"ওর গায়ে হাত তুলবে না। হাত তুলেছ না..... তোমার ছেলে কি গোলামের ছেলে?"

"সরে যা ঢাকরবাকরানী। কোথা গেল ছোঁড়া?" এক ধাক্কায় মাকে সরিয়ে দিয়ে মিটকাকে মেঝের ওপর পাড়ির ফেলল বাবা। মেপে মেপে অবিচলভাবে মিটকাকে লাথি মারতে লাগল সে। অনেকক্ষণ ধরেই লাথি মেরে গেল বাবা। আস্তে আস্তে ক্ষীণ হতে থাকল মিটকার গোঙানি। কিছুক্ষণ পরে তাও আর শোনা গেল না।

ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে থাকল বন্দুকের আওয়াজ। রোজ খুব ভোরে উঠে মিটকা গরু বাছুর চরাতে যায়। মাঠে গরুবাছুর ছেড়ে দিয়ে বসে থাকে মিলের ধারে। আজও তাই করল মিটকা। বাতাস বইছে টিনের চালের পাশ দিয়ে বাতাস শন্ শন্ করে ভেসে যাচ্ছে। লোহার পাত গুলো বাতাসের ধাক্কায় কাঁপছে। মাঝে মাঝে বাতাস গর্জন করে উঠছে। কেঁপে উঠছে সমস্ত মিল। আর এই শব্দের সংগে ভেসে আসছে দূর থেকে আসা বন্দুকের আওয়াজ।

বন্দুকের গম্ভীর আন্দোলিত আন্দোলিত আওয়াজ আস্তে আস্তে মিশে গেল বরফুমার প্রান্তসীমার গ্রামে। ভোর হওয়ার আগে নীলচে হয়ে উঠেছে আকাশ। কার্তুজ, বোমা, কাটাতার বোঝাই গাড়ি রোজ রোজ গ্রামের ভিতর দিয়ে যায় ডনের দিকে। মিটকা বসে দেখে।

কিরঘিজ পথে গাড়ি বোঝাই হয়ে আসে আহত কসাক। ছোকে যাওয়া মুখে প্রায় কসাকদের নামিয়ে দেয় পার্কে, বরফুমার প্রশাসনিক অফিসের সামনে। রোগন মুখোশী তাদের চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। টুকরো মেঘ ওদের সিগারেটের টুকরো, রক্ত ভেজা ব্যাণ্ডেজ, রক্তের

ছোপ লাগা তুলো। কান পেতে শোনে আহত কসাক-দের আর্তনাদ. দেখে তাদের চোখের জল, শোনে ভারী ভারী ভাঙা গলার শাপান্ত।

বাবার দৃষ্টি এড়িয়ে চলতে চায় মিটকা।

খাওয়া দাওয়ার পর মাছ ধরার সরঞ্জাম নিয়ে মিটকা নদীর ধারে গিয়ে বসে। নদীর পুলের ওপর দিয়ে যায় ঘোড়সওয়ার সৈন্য, মেশিনগান টানতে টানতে যায় দু' চাকার গাড়ী, হেঁটে যায় পদাতিক। মিটকা বসে বসে দেখে। অন্ধকার হলে মিটকা ঘরে ফিরে আসে। একদল লাল ফৌজকে টেনে আনা হল গ্রামের মধ্যে। তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। তারা মাথানীচু করে দল বেঁধে হেঁটে এল। গায়ের জামা কাপড় ময়লা, জরাজীর্ণ। পায়ে জুতো নেই। কারো মাথে আছে লম্বা কোট। কসাক মেয়েরা ঘর থেকে ছুটে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। চলমান লাল ফৌজের গায়ে থুথু ছিটিয়ে অসভ্য ভাষায় গালাগালি দেয়। হো হো করে হেসে ওঠে তাদের সহযাত্রী কসাক সৈন্য। এই বন্দীদলের পিছনে হেঁটে হেঁটে এল মিটকা। বন্দীদের পায়ের চাপে রাস্তার ধুলো উড়ছে। মিটকার নাকে চোখে ধুলো ঢোকে। খক খক করে কেশে ওঠে মিটকা। উত্তেগে উত্তেজনায় ঠকঠক করে ওঠে মিটকার বুক। দ্রুত তালে নিশ্বাস নেয়, হাত মুঠো করে ফেলে নিজের অজান্তে। প্রত্যেক বন্দীর মুখের দিকে তাকায় মিটকা। তাদের চোখের নীচে কালির গাঢ় ছোপ পড়েছে। দাড়ি গোঁফ কামানো। মিটকা সেই মুখগুলোর দিকে তাকায়, এই বুঝি ভেসে ওঠে তার দাদা কিওদরের মুখ।

পার্কের ধারে বর্ষাগোলার পাশে বন্দীদের আসতে বলা হল। আগে সারা মহকুমার ফসল জমা হত এই গোলায়। প্রশাসনিক অফিসের বারান্দায় এসে দাঁড়াল মিটকার বাবা। বাঁ হাত দিয়ে তলোয়ারের হাতল ধরে আছে বাবা।

বাবা হুকুম দিল, "টুপি নামাও।"

আস্তে আস্তে মাথা থেকে টুপি নামাল বন্দী লাল ফৌজ। মাথায় তাদের ঝাঁকড়া চুল। মাথা নীচু করে থাকল বন্দীরা। মাঝে মাঝে পরস্পরকে ফিসফাস করে এ ওকে কিছু বললে।

পরক্ষণেই পরিচিত কণ্ঠের গর্জন শোনা গেল, "দু লাইনে দাঁড়াও, জলদি। বলশেভিক শূয়ার।"

আচমকা বন্দীদের গায়ের খসখসে শব্দ কানে এল। ওদের ডানদিকে প্রশাসনিক অফিস। ওরা সে দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছে।

"ডান দিক থেকে গোনো···এক···দুই···"

ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলা। কাঁকড়া চুলে ভর্তি। মাথা ঘুরছে নিজেদের সংখ্যা বলছে। ওদের দিকে তাকাতে কান্নায় মিটকার গলা ভারী হয়ে এল। এরা সবাই এদেশের মানুষ ; তবু এরা যেন বিজাতীয়। সেই ব্যবহার তারা এখানে পাচ্ছে। বন্দীদের অসহনীয় অবস্থায় আর্দ্র হল মিটকার মন। একটা যন্ত্রনা তাকে পীড়িত করছে। মনে হচ্ছে কেউ যেন তার গায় আগুনের ছ্যাঁকা দিয়ে যাচ্ছে। বমি আসছে মিটকার।

"শেডের ভিতর যাও···জলদি···জলদি···।"

একে একে সবাই শেডের মধ্যে যাচ্ছে। ছোট্ট দরজা ওদের যেন গিলে খাচ্ছে। পিছনের বন্দীটা মাথায় খাট। পায়ে আঘাত পেয়েছে বোধ হয়। ঠিকমত দাঁড়াতে পারছে না। টলে পড়ছে। মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। তলোয়ারের বাঁট দিয়ে বন্দীর মাথায় একটা ঠক্কর দিল মিটকার বাবা। লোকটা হাটিতে পড়ে যাচ্ছিল। কোনক্রমে টাল সামলে দৌড়ে শেডের মধ্যে ঢুকে গেল সে। পার্কে হাসির হুল্লোড় উঠল। উচ্ছৃংখল কণ্ঠস্বর কানে এল। মেয়েরা খিল খিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ল। কিন্তু মিটকার গলা থেকে বেরিয়ে এল কান্না। গাঢ়, গম্ভীর, ভাঙা ভাঙ্গা আওয়াজ মিটকা দুইহাতে মুখ ঢাকল। উচ্ছ্বসিত জনতার ভিড় থেকে পালিয়ে গেল মিটকা।

। ৪ ।

রান্না করছিল মিটকার মা। খুবই ব্যস্ত। মিটকা মায়ের কাছে গুটি গুটি হয়ে বসে, "মা, প্যাপ্পি তৈরি কর মা। আমি বন্দীদের খেতে দিয়ে যাব।···মা বন্দীদের···"

মিটকা মায়ের মুখের দিকে একবারও তাকাল না।

ফলে ভর্তি ভর্তি ঘরে এল মায়ের চোখ।

"কয়র। নিয়ে যাস। কি জানি হয়ত ওই দলের মধ্যে আছে কিওনর। হয়ত ওদের মতই কষ্ট পাচ্ছে সে। বন্দী বলে কি আর তাদের মা বাপ থাকতে নেই! হয়ত আমার মত তারাও কেঁদে কেঁদে বালিশ ভেজাচ্ছে। যাস, নিয়ে যাস খোকা।

"বাবা যদি দেখতে পায়?"

"ভগবান রক্ষে করুন! সন্ধ্যের সময় দিয়ে যাস খোকা। কসাকরা ত পাহারায় থাকবে। ওদের হাতে দিয়ে দিস। ওরাই বন্দীদের দিয়ে দেবে।"

হিংসে করেই সূর্য যেন আজ ডুবে যেতে পড়িমসি করছে। মিটকা যে অধৈর্য হয়ে পড়ছে সে দিকে তার বিন্দুমাত্র খেয়াল নেই। অথচ সন্ধ্যে না হওয়া অবধি তাকে চুপ করে বসে থাকতে হবে। মোরা না হলে কিছুই করতে পারবে না সে। বাধ্য হয়ে চুপ থাকল মিটকা। সন্ধ্যে হল। মিটকা পার্কের মধ্যে ঢুকল। কাঁটা তারের বেড়ার ফাঁক দিয়ে সিরসিটির মত বুকে হেঁটে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল সে। এক পকেটে খাবার পুরে ছেলে ধরে অন্য আর একটা হাতের সাহায্যে এগিয়ে যাচ্ছে মিটকা।

"কে যায়? থাম। না হলে গুলি করব।"

"আমি……বন্দীদের জন্যে খাবার এনেছি।"

"কে তুই? বন্দুকের কুঁদো দিয়ে মাথা গুঁড়িয়ে দেব শয়তান! আর, এদিকে আয়। তোর কপালে মরণ নাচছে। তা ভিন্ন অন্ধকারে কেউ। এদিকে আসে! খাবার আনবি ত বেলা থাকতে থাকতে আনতে পারিস নি!, দিনের বেলা সময় হল না তোর!"

"যাব যাব প্রকোফিচ! মনে হচ্ছে এ আমাদের কমাণ্ডারের ছেলে। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।"

"কি রে বাপের নাম কি তোর?—অসিসিনপ্রিত্রস্তিচ?"

"হ্যাঁ।"

"এই রাতে খাবার নিয়ে কে পাঠাল তোকে! তোর বাবা?"

"না। কেউ পাঠায় নি। আমি নিজে এনেছি।"

কসাক দুজনে মিটকার কাছে গেল। ওদের মধ্যে যার বয়স বেশি, যার একমুখ দাড়ি, সে মিটকার কানটা আচ্ছা করে মলে দিয়ে উঠল, বন্দীদের জন্যে খাবার আনতে হয়—এ শিক্ষা কে তোকে দেখাল শুনতাম? ওরা আমাদের জাত শত্রু, এ জ্ঞান তোর হল না জানোয়ার? তা যদি বাপকে এখন বলে দি তোর কি অবস্থা হবে জানিস? তোকে কি বলবে জানিস?"

"যাব যাব প্রকোফিচ। কটা লোক দাঁতে দাঁত কাটতে পারবে তবু! এর জন্যে শাস্তি কি হবে! থাক না। থাক দে, দে, আমার হাতে দে। আমিই তাদের দেবো'খন।"

"কি করছিস! কমাণ্ডার যদি জানতে পারে? সর্বনাশ হবে। আর কি বুঝবি? বিয়ে থা' হয়নি। সংসার ধর্ম নেই। তোর আর কি! মরতে আমিই মরব শালা! খোদ লড়াই-এর জায়গায় পাঠাবে হয়ত। এই দোষের জন্যে ওরা আচ্ছা করে ধাতানি দিয়ে লড়াই করতে পাঠায়।"

"তুই ভয়েই মরলি শালা! যা' যা! এই খোকা, পোলি কোথায়? দে' আমার হাতে দে। আমি তোর ওই বন্দীদের হাতে দেব।"

মিটকা খাবারের পুটলিটা কসাকের হাতে দেবার জন্যে এগিয়ে গেল। মিটকার হাত থেকে খাবার নেওয়ার জন্য ঝুঁকে পড়ল সেই কসাক প্রহরী।

মিটকার কানে কানে ফিসফাস করে বললে, "আমি বৃহস্পতি আর শুক্রবারে এখানে ডিউটি দি! তখন আসিস।"

প্রত্যেক বৃহস্পতি ও শুক্রবারে সন্ধ্যার অন্ধকারে মিটকা পার্কে গিয়ে খাবার পৌঁছে দিয়ে আসে। কাঁটা-তারে আটকে যেতে পারে, তাই মিটকা হাতাসুদ্ধি দিয়ে পাচিলের কাছে গিয়ে প্রহরীর হাতে খাবারের পুটলি দিয়ে আসে। ফেরার সময় ঠিক ওভাবে কাঁটা তারের বেড়া পার হয় মিটকা।

(৫)

প্রতিদিন সূর্য ওঠে। আকাশ হয়ে ওঠে প্রতিদিনই সোনালি চাঁদোয়া। প্রতিদিন একদল বন্দী লাল ফৌজকে নদী পার করে নিয়ে যাওয়া হয় ভেসে। তখনও লেগে থাকে সকালের কুয়াশা। ধীর পায়ে এগিয়ে যায় বন্দী লাল ফৌজ। সঙ্গে যায় কদাক সৈন্য। রাইফেলের গুলির শব্দ ওঠে। বাতাসে ভর করে আসে গুলির আওয়াজ। শোনে গ্রামের লোক। এই ভাবে রাইফেল আর বন্দুকের গুলিতে শেষ হয়ে যায় বন্দী। একদিন দেখা গেল বন্দীদের সঙ্গে যাচ্ছে মেশিনগানের দু'চাকার গাড়ি। কড় কড় করে আওয়াজ উঠছে তার। গাড়ির সীটে বসে রিয়াজে গোলন্দাজ। গাড়োয়ানের মুখে সিগারেট; ধোঁয়া উঠছে। বিতাস্ত অলসভাবে গাড়োয়ান লাগাম ধরে টানল। ঢিলে তালে চলতে চলতে হঠাৎ ছুটতে আরম্ভ করল ঘোড়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও। মেশিনগানের অনাবৃত কল গাড়ির তালে উঁচু নিচু হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন অতিকায় এক জন্তু রোমন্থনে মগ্ন। চাবুক চালাল গাড়োয়ান। মুখ দিয়ে ফেনা ওগরাতে ওগরাতে চলল ঘোড়া। উষর জমির ওপর দ্রুতবেগে ছুটছে গাড়ি। ধাক্কা খেয়ে গোলন্দাজ পরস্পরের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। আর আধ ঘণ্টা পরে এই মেশিনগান থেকে বার হবে শুকনো আওয়াজ। তারপর গাড়ি যাবে কদাকদের বাড়ি।

একদিন বৃহস্পতিবারে মিটকার বাবা মিটকাকে বললে, "কি তুই আলসে হয়ে থাকিস। কাজ করতে পারিস না? যা, আজ রাতে ওই বেটে রঙের ঘোড়াটাকে একটু দৌড় করিয়ে আন। দেখিস কারো খেতে যেন যায় না। খবরদার। কারো খেতে যদি যায় তবে তোর হাড় গুঁড়ো করে ছাড়ব।"

বেটে রঙের ঘোড়াটাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি করতে করতে মিটকা মায়ের কানে কানে বললে "আজ খাবারটা তুমিই নিয়ে যেও মা। পাহারাদারের হাতে দিও।

গ্রামের আরও দু' পাঁচজন ছেলের সঙ্গে মিটকাও কদাক ঘোড়লের খেত পার হয়ে অনাবাদী জমির দিকে চলে গেল। সন্ধ্যে গুঁড়ি গুঁড়ি আগে বাড়ি ফিরে এল মিটকা। বাড়ির পেটের দরজা খুলে ঘোড়ার মুখ থেকে লাগাম খুলে দিল মিটকা। সারারাত পেট ভরে সবুজ ঘাস খেয়ে পেটটা ঢাউস করে ফুলেছে ঘোড়া। মিটকা আদর করে ঘোড়ার পেটে দুটো থাপ্পড় মেরে ঘরের ভিতর চলে গেল। রান্না ঘরে ঢুকে খাবার সময় মেঝে আর দেওয়ালের গায় রক্তের ছোপ দেখল মিটকা। উনুনের ধারে সাদা মতন কি একটা পড়ে আছে। তার চার পাশে এক থান রক্ত। সারা ঘর থেকে আসছে সোঁয়ানি। মিটকা ঘরের ভিতর এল। মেঝের ওপর শুয়ে আছে মা। মাথার কাছে রক্তের চাওড়। মায়ের চুলের গোছা পড়েছে রক্তের ওপর। রক্তাক্ত থ্যাৎলানো মুখ; মা তাকিয়ে মিটকাকে দেখতে পেয়ে আবার কাতরাতে আরম্ভ করল। মায়ের শরীর কয়েকবার দুলে উঠল, কিন্তু মুখ দিয়ে কথা সরল না তার। ফুলে ওঠা ঠোঁটের কিনারে মায়ের জিভ কয়েকবার বেরাই পড়ে উঠল। চোখ দুটো ঠেলে উঠল পাতলের মত। মুখ দিয়ে কোনক্রমে শব্দ কটা গড়িয়ে আসতে থাকল, "মি···মি···টিয়া···টিয়া···টিয়া।"

মনে হল মা যেন একবার হেসে উঠল।

মিটকা গেছে মায়ের পাশে বসে একবার চুমু দিল হাতে। কালো রক্তে ছাপিয়ে উঠল মায়ের মুখ। মায়ের মাথাটা জড়িয়ে ধরল মিটকা। তার হাতে লাগল রক্ত আর সাদা সাদা কি একটা জিনিষ···মেঝের ওপর পড়ে আছে বাবার পিস্তল। পিস্তলের বাট রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে।

কি করে যে ঘর থেকে পালিয়ে এসে মিটকা তা সে নিজেও না। কাঁকর বেড়ার পাশে এসে মুখ থুবড়ে পড়ল সে। পাশের বাড়ি থেকে একজন চিৎকার করে বলে উঠল, "পালা, মিটকা, পালা! যে দিকে পারিস পালিয়ে যা। তোর মা বন্দীদের জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছিল তোর বাবা ধরে ফেলেছে। তোর বাবা তোর মাকে গুলি করে মেরেছে। তোকেও মারবে বলেছে। পালা!"

। ৬ ।

গাঁয়ের বাইরে এক সবজি বাগানের চৌকিদারের কাজ পেয়েছে মিটকা। মাসখানেক হল সে এই কাজই করেছে। পাহাড়ের ঠিক মাথায় একটা ঝুপড়ি তৈরি করে থাকে মিটকা। পাহাড়ের চূড়োয় বসে ভূমের দূরে সাদা চর দেখতে পায় সে। ওপাশে কবর; অজস্র ঢিপি দেখা যাচ্ছে। সবজি বাগানের চৌকিদারের কাজ পেতে কম বেগ পেতে হয়নি মিটাকাকে।

আপত্তি তুলে কসাকরা বলেছে, "ও ত আমিনিসিয়ের ব্যাটা। ওর মত লোক দিয়ে কি হবে। এখন বলছে ও সত্যি সত্যি সবজি বাগান পাহারা দেবে। ওর এক ভাই লাল ফৌজের সঙ্গে আছে। ওর মা, ওই বাগী, বন্দীদের খাবার খাইয়ে তোয়াজ করে। তাই ওকে চৌকিদার করে না রেখে মেরে ফেলা ভাল।"

"মারবে কেন? মেরে কি হবে বুড়ো কর্তা। ছেলেটা বলছে সে সত্যি সত্যি বাগানি চৌকি দেবে। যদি দেয়, ভাল। দু' একটুকরো রুটি ছুঁড়ে দিও। যদি না দাও তবে এমনই না খেয়ে শুকিয়ে মরবে। মারতে যাবে কেন শুধু শুধু।"

"না খেতে দেব না। শুকিয়ে মরুক।"

"আপত্তি সত্ত্বেও মোড়লের কথায় সবজি বাগানের চৌকিদার হল মিটকা। একজন লোক তাদের রাখতেই হবে। তবে গ্রামের কাউকে রাখা ভাল। ওকে এক পয়সা মজুরী দিতে হবে। পেট ভাতা থাকবে। সারা গরম কালটা পাহারা দেবে। এ ত ষোল আনার আঠারো আনাই লাভ।

সেবু আর সরবতী সেবুতে পাক ধরেছে। ফলতে হয়েছে ফল। দুধের আলোধ পেকে উঠেছে দিন দিন। মিটকা আপন মনে সবজির বাগানের আলের ওপর

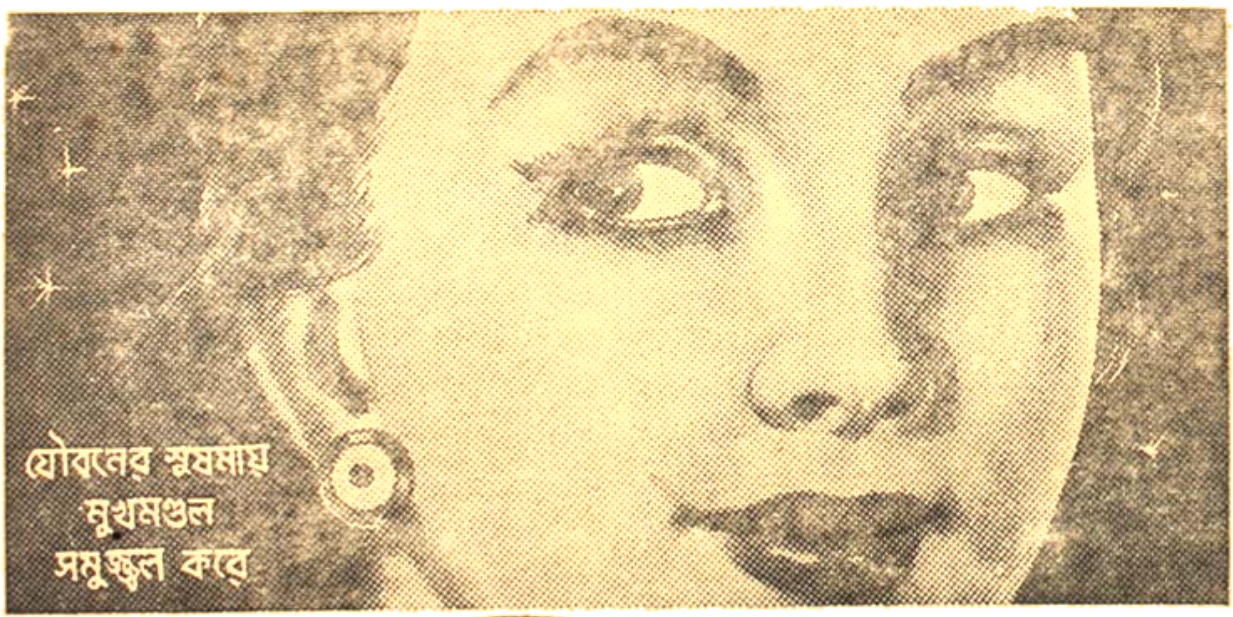

লাবণি

ভ্যানিশিং ও কোল্ড ক্রীম

লাবণি ভ্যানিশিং ক্রীম আপনার সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ সাধন ক'রে যৌবনের সুষমা এনে দেয়। সকল মালিন্য দূর ক'রে তনুশ্রী নবীন কোমল মসৃণ ও লাবণ্যময় করে। পাউডার অম্লান রাখার পক্ষে বিশেষ সহায়ক।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ

ঘুরে বেড়ায়। খেতে গরু ঢুকলে তাড়িয়ে দেয়। মাঝে মাঝে টিন বাজায়। রাতে ঝুপড়িতে থাকে সে! সকাল হলে বাইরে আসে। রোদ উঠলে ঝুপড়ির পাশে আগাছার ওপর শুয়ে ডনের দিকে তাকিয়ে থাকে। কানে আসে গুলির শব্দ। চোখের কুলে কুলে জল ভরে আসে মিটকার। তবু সে তাকিয়ে থাকে।

এই পাহাড়, এখানে সবজি খেত। সবজি খেতের ওপাশে সাদা সাদা বড়ি মাটি রঙের পাথরের ওপারে ছোট খাল, খালের ওপারে সাপের মত পথ। গরম কালে বড় বোঝাই গাড়ি চলে কসাকদের। তখনই প্রাণ পায় পথ। আবার এই পথ দিয়ে এসেছে বন্দী লাল ফৌজ। এই পথ দিয়ে গেছে ওরা ওই খালের ওপারে। ওখানে গুলি করে মারা হয়েছে তাদের। রাতে ঘুম হয় না মিটকার। গুলির শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। গুলির শব্দ উঠে পাহাড়ের নিচে, খেতের ওদিকে, উইলো গাছের কোপে। গুলির শব্দে ঘুম হয় না মিটকার। কুকুর তখন ডেকে ওঠে। গরম কালের খটখটে পথে ওঠে বহু মানুষের পায়ের শব্দ মাঝে মাঝে শোনা যায় সাজোয়া গাড়ির আওয়াজ। অন্ধকারে জ্বলে ওঠে সিগারেটের আগুন আর চাপা কথার ফিসফিসানি। মিটকা কান পেতে শোনে। মিটকা একদিন ওই পথ ধরে ছোট খাল পার হয়ে কিছুদূর এগিয়ে গেল। পথের ওদিকে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। আর নদীর ঠিক তলায়, পাথুরে মাটিতে, কবরের চিহ্ন মাত্র নেই। বন্দী মৃত লাল-ফৌজদের আর কোন স্বাক্ষর নেই। বন্যার জলে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে সব। কেবল মিটকা দেখতে পেল কোপের ভিতর থেকে একটা পা ঝুলছে। শুকিয়ে গিয়েছে চামড়া। গরম কালের হাওয়ার ভেসে আসছে মৃত মানুষের পচা গন্ধ। এর পর মিটকা আর কোনদিন সেই পথে যায় নি।

একদিন খুব ভোরে একদল মানুষ গ্রাম থেকে বার হল। এত ভোরে তারা কখন বার হয় না। মিটকা বাইরে এসে দেখল। মাঝখানে লালফৌজের কয়েক জনকে রেখে একদল কসাক ওদের গোল করে ঘিরে ধরে এগিয়ে যাচ্ছে। সূর্য উঠছে না। আকাশটা যেন আপসা উজ্জ্বলতায় আবিল হয়ে রয়েছে। এই সব অন্যায় কাজ দেখতে হবে বলে যেন আজ সূর্য উঠতে এত দেরী করছে। বাগান আর গাছের মাথা কালো হয়ে উঠেছে একরাশ কাকের পাখায়। মনে হয় ওখানে যেন ছায়া ফেলেছে বর্ষার মেঘ। সবজি বাগানে থমথম করছে স্তব্ধতা। অকস্মাৎ একটা চিৎকার কানে আসে মিটকার। তারপর গুলির শব্দ। পরপর গুলির শব্দ।

ঝুপড়ি থেকে বার হয়ে মিটকা ছুটতে ছুটতে উঠল পাহাড়ের চূড়ায়। মিটকা দেখল শুকনো খাল বেয়ে পালাচ্ছে বন্দী লালফৌজেরা। ঘাটি গেড়ে বসে গুলি ছুঁড়ে যাচ্ছে কসাকেরা। দু' একজন কসাক তলোয়ার খুলে তাড়া করেছে পলাতক বন্দীদের।

ভুতিন শুরুতায় গুলির শব্দ ঘণ্টা আওয়াজের মত লাগছে।

হুমড়ি খেয়ে পড়ল একজন বন্দী। দুই হাত দিয়ে পতনটা কোন মতে রুখল। তারপর লাফ মেরে আবার দৌড়াতে থাকল সে। কসাকরা তাকে তাড়া করছে। ধরে ফেলল··· প্রায়···ধরে ফেলেছে···প্রায়।

অর্ধবৃত্ত হয়ে ঝলসে উঠলো তলোয়ার। পলাতকের মাথা নেমে এল।

মিটকার চোখের ওপর অন্ধকার হয়ে এল পৃথিবী। খুব বমি-বমি লাগছে তার।

রাতে তিন জন ঘোড়সওয়ার এল ঝুপড়ির কাছে। "এই চৌকিদার! বাইরে এস একবার।"

মিটকা বাইরে এল।

"লম্বা কোট পরে তিন জন লোককে দৌড়তে দেখেছ? দেখেছ নাকি?"

"কই, না তো।"

"মিথ্যে কথা বলিস নে হারামজাদা। মিথ্যে বললে টের পাবে বাছাধন।"

"সত্যি বলছি···আমি কিছুই দেখিনি।"

"বাজে সময় নষ্ট করে লাভ নেই! বরং খাল বেয়ে ওই ফিসিনভ জঙ্গলের দিকে যাওয়া যাক। জঙ্গলটা

'ওরে ফেলে একেবারে ছেঁকে তুলব। যাবে কোথায় শয়তানের দল।"

"চল।"

সারা রাত জেগে থাকল মিটকা। ঘুম এল না একেবারে। পুব দিকে অবিশ্রান্ত বজ্রঘাত হচ্ছে। আকাশ ছেয়ে রয়েছে নিরেট কালো পাথর। আলোর ঝলকানিতে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে মিটকার। তারপর বৃষ্টি নামল।

ঠিক ভোর বেলায় কুঁড়ির পাশেই কার আর্তনাদ শুনে ঘুম ভেঙে গেল মিটকার।

না উঠে কান খাড়া করে থাকল মিটকা। ভয়ে তার সর্বাঙ্গ অবশ; যেন পক্ষাঘাত হয়েছে! পাতার খস-খসানি কানে এল; তারপর আবার গোঙানি।

"কে? কে ওখানে?"

"বাইরে এস। দয়া কর। বাইরে এস একবার।"

টলতে টলতে বাইরে এল মিটকা। কুঁড়ির পিছন দিকে একজন লোক পড়ে আছে।

"কে তুমি?"

"আমাকে ওদের হাতে তুলে দিও না···আমাকে রক্ষে কর···কালকে গুলি করে মারতে এনেছিল আমাকে আমি পালিয়ে ছিলাম···কসাকেরা হন্যে হয়ে আমাকে খুঁজছে। পাঁচটা জখম হল···।"

কিছু বলতে গেল মিটকা। পারল না। কিসে যেন তার ঠোঁট একেবারে আটকে গিয়েছে। মাটির ওপর ঝুপ করে বসে পড়ল মিটকা। হামাগুড়ি দিয়ে একটু এগিয়ে লোকটার হাত পা জড়িয়ে ধরল মিটকা।

"কিওদর···দাদা···আমার দাদা"

সূর্যমুখীর শুকনো ডাঁটি কেটে পাহাড় করল মিটকা। বাগান থেকে ডাঁটি টেনে টেনে কুঁড়ির মধ্যে এনে এক জায়গায় বিছিয়ে দিল। শুকনো ডাঁটির ওপর কিওদরকে শুইয়ে তার ওপর সূর্যমুখীর ডাঁটি আর আগাছা চাপা দিয়ে বাগানে চলে গেল মিটকা।

সারাদিন সবজি বাগান পাহারা দিল মিটকা। সারাদিন সবুজ খেতের সীমানা থেকে নড়ল না।

কিন্তু মিটকার মন পড়ে আছে দাদার কাছে। ছটফট করছে সে। দাদার মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে থাকার জন্যে দাদার মুখ থেকে সুখ দুঃখের বিচিত্র গল্প শোনার জন্যে সারাদিন আইটাই করল মিটকা। হঠাৎ নিস্তব্ধতা এসেছে সে। অন্ধকার নামলেই মিটকা দাদার পায়ে শক্ত করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে পরিচিত ঘুর পথ দিয়ে দাদাকে নিয়ে হাজির হবে ডনের চরে। কেউ টের পাবে না আর। সাঁতার দিয়ে পার হবে ডন। ওরা যোগ দেবে ওপারের লোকজনের সঙ্গে যারা ন্যায়ের জন্যে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। যারা গরীব কৃষকদের জমির জন্যে লড়াই করছে ওরা যোগ দেবে তাদেরই দলে। সারাদিন ধরে ঘোড়ার চড়ে ঘুরপাক খেলো কসাকরা। জল খাওয়ার জন্যে দু'দুবার এল কুঁড়িতে। সন্ধ্যা হয় হয়। মিটকা দেখল দূরের বালি ঢিপি থেকে আট-জন ঘোড়সওয়ার নেমে আসছে। মনে হচ্ছে তারা খুবই ক্লান্ত। তাই নিজেদের ছেড়ে দিয়েছে ঘোড়ার মর্জিতে। আস্তে আস্তে হোঁচট খেতে খেতে আসছে ঘোড়াগুলো। মিটকা দেখল ওরা আসছে তার এই কুঁড়ির দিকেই। ঘোড়সওয়ারের দিকে একবার তাকি-য়েই মিটকা চিনতে পারল।

চাপা গলায় কিওদরকে বললে, "মড়ার মত পড়ে থাক। নড়াচড়া করো না। সবজি খেত পার হয়ে এক জন ঘোড়সওয়ার এদিকেই আসছে।

সূর্যমুখীর ডাঁটির তলা থেকে কিওদরের জড়ানো কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "অন্য ঘোড়সওয়ারা কোথায়? তারা কি এর জন্যে দাঁড়িয়ে আছে, না গ্রামের দিকে গেল?"

"ওরা ত গ্রামের দিকে গেল দেখছি। পাহাড়ের তলা দিয়ে যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে না আর। চুপ।"

রেকাবির ওপর দাঁড়িয়ে চাবুক ঘোরাতে ঘোরাতে আসছে কসাক ঘোড়সওয়ার। তার ঘোড়া ঘেমে নেয়ে উঠেছে।

ঘোড়সওয়ারকে দেখে বিবর্ণ হয়ে গেল মিটকা। খুব চাপা গলায় বললে, "দাদা—এ যে বাবা আসছে!"

বাবার লালচে দাড়ি বেয়ে ঘাম ঝরছে। নীলচে হয়ে উঠছে মুখ। ঝুপড়ির কাছে এসে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ল বাবা।

মিটকার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, কিওরা কোথায়? বাবার লাল জবাফুলের মত চোখ মিটকার মুখের ওপর নিবদ্ধ। বাবার কদাকার পোষাক থেকে আসছে নেপথলিনের গন্ধ।

"কাল রাতে সে কি তোর কাছে ছিল?"

"না।"

"তবে এই রক্তের দাগ এল কি করে? ঝুপড়িতে এখানে রক্ত এল কি করে?"

মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ে পড়ল বাবা। ঘাড়ের কাছে মাংস ফুলে উঠেছে তার।

"ঝুপড়ির ভিতরে চল।"

ঝুপড়ির ভিতরে এল ওরা। প্রথমে মিটকার বাবা তার পিছনে পিছনে ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া মিটকা।

"এই শয়তান সত্যি বল! বল এখানে কিওরকে লুকিয়ে রেখেছিস কি না! তোদের দু'জনকেই শেষ করব আমি।"

"এখানে সে নেই···এখানে···আমি জানি না।"

ওখানে, ওই শুকনো ডালপালার তলায় কি?

"আমি ওখানে ঘুমাই।"

"দেখা যাক।"

ডালপালার স্তূপের কাছে গিয়ে গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে বসে বাবা প্রথমে শুকনো লতাপাতা তারপর সূর্যমুখীর ডাল এক এক করে বার করতে থাকল।

বাবার ঠিক পিছনে গিয়ে দাড়াল মিটকা। কদাকার পোষাক বাবার গায়ে আঁট হয়ে বসেছে।

কিছুক্ষণ পরে ভারী গলায় বাবা বলে উঠল, "এ কি!"

ঘুসর পাতার নীচে কিওরের পায়ের পাতা দেখা যাচ্ছে। ডান হাত দিয়ে বাবা পিস্তলটা টেনে বার করল। একবার দুলে উঠল মিটকা। ঝুপড়ির দেওয়ালের গায়ে ছিল তার কুড়ুল। একলাফে কুড়ুলটা টেনে নিয়ে পাগলের মত মিটকা তার বাবার গলায় লক্ষ্যে একটা কোপ বসিয়ে দিল।

বাবার দেহ লতাপাতা দিয়ে ঢেকে ওরা বার হয়ে পড়ল। শুষ্ক খালের মধ্য দিয়ে, ঝড়ে পড়া গাছের নিচে দিয়ে, কাঁটা গাছের ঘন ঝোপের ভেতর ঘাসগুড়ি দিয়ে ওরা পথ করে এগিয়ে গেল। পাঁচ মাইল পথ পার হল তারা। পাঁচ মাইলের পরে ডন নদী যেখানে হঠাৎ যেন উঁচু পাহাড়ের গায়ে লাফ দিয়ে উঠতে চেষ্টা করছে, ঠিক সেখানে, চরের ওপর তারা শুয়ে পড়ল। বালির ওপর পড়ে থাকল ওরা। রাতে হিম হয়েছে জল। কিওর কাতরাচ্ছে।

ওদের শ্রম সার্থক হয়েছে। ওরা বালির ওপর শুয়ে আছে।

"এবার যাওয়া দরকার কিওর। আর কতক্ষণ জিরাবো?"

ওরা জলে নামল। শুধু চোখ আর তাদের হাত মুখ পিঠের ওপর ঝলকাতে থাকল। ওরা জলের ভেতর হাত চালিয়ে দিয়েছে। আর বিশ্বাস পেয়েছে। দৃঢ়ভাবে সাঁতার কাটছে।

পায়ের নীচে মাটির স্পর্শ পেল ওরা। রাত্রির অন্ধকারে নিবিড়তর হয়েছে ওপাশের অরণ্য। ওরা তাড়াতাড়ি জল থেকে উঠলো।

আলো ফুটছে। নিকটে পাওয়া গেল বন্দুকের আওয়াজ। পূর্বদিকে রক্তাভ আভা ছড়িয়ে পড়ছে। ভোর হচ্ছে।*

---

* অনুবাদ—রায় বসু

এখানে অনেক ক্লান্তি | শান্তশীল দাশ

এখানে অনেক ক্লান্তি : মাঝে মাঝে মনে হয় যেন
কোথাও অনেক দূরে, নিঃশব্দ নির্জন কোনখানে
চলে যাই একেবারে ছেড়ে দিয়ে এই কোলাহল
পরিকীর্ণ বাসভূমি—অশান্ত অসহ্য এ জীবন।

সারাদিন কী অজস্র চিৎকার আর চঞ্চলতা
চারিধারে অর্থহীন : এতটুকু মেলে না বিশ্রাম
কোনখানে, শুধু ক্লান্তি-অবসাদে ভরা দেহ মন
অসহ্য এ, মুক্তি চাই, মুক্তি চাই এ জীবন হতে।

তারপর কোনো এক ছায়াভরা নীলাভ নির্জনে
প্রসন্ন প্রকৃতি সাথে মিলেমিশে আদিমকালের
মত সেই স্বেচ্ছাচর সহজ সরল দিনগুলি—
ডাক দেয়, আজো এই পাষাণের বুক চিরে শুনি।

শুনি আর হাহাকার জেগে ওঠে অশান্ত হৃদয়ে ;
সব ফেলে ছুটে যেতে চায় মন—একটুও আর
ভাললাগেনাকো এই অসহায় মরুর জীবন।
মরুভূমি—সেখানেও মাঝে মাঝে আছে ওয়েশিস্।

বাঁধা যে নানান ডোরে ; আশা শুধু আশা মাত্র সার,
পুরবে না কোনোদিন ; এ যন্ত্রণা বিংশ শতাব্দীর
সইতেই হবে এই বুকে নিয়ে এ পাষাণ ভার ;
এ পাষাণ নামবে না, এ পাষাণ সভ্যতার দান।

ফুলের মৃত্যু | গোবিন্দ গোস্বামী

শব্দগুলো ঝরে গেল যন্ত্রণার উৎস হয়ে বুঝি
প্রেমকে যেহেতু
ফুলের মৃত্যুর বুকে মুখ ঢেকে খুঁজি ;
অশ্রুর সমুদ্রে হাঁটে বয়সের সেতু।

অন্ধকারে বশীভূত স্মৃতি
নিবেদিত যক্ষের গুহায়
অন্তহীন ব্যাপ্ত কালে নিঃস্ব পরিমিতি
বোধে, অসহায়॥

সংস্কৃতি সমন্বয় ও নজরুল

আবদুল আজীজ আল্-আমান

যদি কেউ মন্তব্য করেন যে বর্তমানে কম বেশী সকল সাহিত্যিক হয় 'অতি হিন্দু' নয় 'অতি মুসলমান' হয়ে পড়েছে তা হলে সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবাদ উঠবে। প্রতিবাদ ওঠা ভাল। উঠলেই বুঝতে হবে আমাদের মধ্যে শুভ চেতনার অপমৃত্যু এখনো হয়নি। কিন্তু জটিল তর্কের ভিতর না গিয়ে স্বচ্ছ দৃষ্টিতে আপনার নিজস্ব মনের চিন্তা-ভাবনার গতিবিধি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এই মতবাদের বিপক্ষে বলিষ্ঠ প্রতিবাদের ক্ষমতা হয়তো আমাদের অনেকেরই নেই। আমি যখন গল্প লিখব তখন জোর করে আল্লা, আল্লা, এশার নামাজ, ওজুর পানি বসাব অথবা মীরার সাথে সলিমের বিয়ে দেবার চেষ্টা করব আর আপনি যখন গল্প লিখবেন তখন চেককাটা বিচিত্রবর্ণ লুঙ্গি পরা দাড়িওয়ালা আবদুর রহমান নিশ্চই অপরের গাট কাটবে। বিগত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যে কি কাল ব্যাধি দিয়ে গেল!

আমাদের এই গড্ডলিকা প্রবাহে এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম নজরুল। তাঁর সৃষ্টির সর্বত্র একটি দুর্লভ কণ্ঠ নতুন সুরে কথা কয়েছে। তাঁর সমগ্র সৃষ্টির কোথাও এমন একটি পংক্তি আবিষ্কার করা যাবে না যেটি সাম্প্রদায়িকতার উত্তেজনার জন্য। হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতি বিনিময়ে তিনিই ছিলেন সত্যিকারের সার্থক কারবারি।

বিগত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নজরুলের কণ্ঠ নীরব ছিল কিন্তু ১৯২৬ সালের সমর নজরুলকে আমরা দেখেছি। গল্পে-গানে কবিতায়-প্রবন্ধে তিনি এ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তীব্র জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন।

রাজরাজেশ্বরী মিছিল উপলক্ষ্যে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ৬ষ্ঠ এপ্রিল মোতাবেক ১৩৩২ সালের ১৯শে চৈত্র শুক্রবার বেলা ৩টা হতে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক সূত্রপাত হয়। এ দাঙ্গা কেবল কলকাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি— বাংলার অলিতে গলিতে ছড়িয়ে পড়ে তার আবহাওয়াকে দূষিত করে তুলেছিল। নজরুল তখন কৃষ্ণনগরের চাঁদ সড়কে বসবাস করছিলেন। এই অশান্ত আবহাওয়ার ১৯২৬ সালের কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন বসল কৃষ্ণনগরে—সভাপতি কবি যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। দাঙ্গার বিষাক্ত আবহাওয়ার আন্তরিক দুঃখিত হ'য়ে নজরুল লিখলেন তাঁর বিখ্যাত কোরাস গানি "কাণ্ডারী হুঁশিয়ার।" উদ্বোধন সংগীত হিসেবে নজরুল নিজেই গাইলেন গানটি। ১৯২৬ সালের ২৬শে আগষ্ট মোতাবেক ১৩৩৩ সালের ১লা ভাদ্র তারিখের "গণবাণী"তে

দাঙ্গা হ'ল নজরুলের বিখ্যাত প্রবন্ধ 'মন্দির ও মসজিদ'। তা'তে কবি লিখলেন : "'মারো শালা যবনদের।' 'মারো শালা কাফেরদের। আবার হিন্দু-মুসলমানী কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে। প্রথমে মাথা ফাটাফাটি আরম্ভ হইয়া গেল।" ১০-৪-১৯২৬ তারিখে কুমিল্লা থেকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়কে লিখলেন,—"আমি এবার কলকাতায় গিয়েছিলুম—আল্লা আর ভগবানের মারামারির দরুণ তোমার কাছে যেতে পারিনি।" এই সময়ে কবি তাঁর বিখ্যাত কবিতা "হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ" রচনা করেন। এ কবিতাটিতে শাশ্বত ভাষায় এই ঘৃণ্য দাঙ্গার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষিত হ'য়েছে। প্রথম স্তবক এই :

"মাভৈঃ! মাভৈঃ!" এতদিনে বুঝি ভারতে জাগিল প্রাণ
সজীব হইয়া উঠিয়াছে আজ শ্মশান গোর স্থান।
ছিল যারা চির-মরণ-আহত,
উঠিয়াছে জাগি বাধা-জাগ্রত,
যাদের আসার ধ্বনিয়াছে অসি, অস্ত্রম চোখে বাণ!
জেগেছে ভারত, ধ্বনিয়াছে লাঠি হিন্দু মুসলমান!

১৯২৬ সালে বুটেনে সাধারণ ধর্মঘট শুরু হ'য়েছিল। কর্তৃপক্ষগণ সেই ধর্মঘট নিয়ে দারুণ ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছিলেন। পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা লাভের বুঝি এই বড় সুযোগ। বর্ধমান হ'তে প্রকাশিত ১৩৩৩ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'শক্তি' পত্রিকায় নজরুল একটা কবিতা লিখলেন—'যা শত্রু পরে পরে'। কবিতাটি ১৯২৬ সালের ১২ই অক্টোবর মোতাবেক ১৩৩৩ সালের ২৫শে আশ্বিন তারিখের 'নবযুগ'-তে পুনর্মুদ্রিত হল। এ কবিতাতেও আমরা দেখতে পেলাম কবি হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার কথা ভুলতে পারেননি :

ঘর সামলে নে এই বেলা তোরা
ওরে ও হিন্দু-মুসলেমিন
আল্লা ও হরি পালিয়ে যাবে না,
সুযোগ পালালে মেলা কঠিন!
ধর্ম কলহ রাখ দু'দিন॥

১৯২৬ সালে শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের "অগ্রদূত" পত্রিকায় প্রকাশিত হয় "পথের দিশা" কবিতা। এ কবিতাতেও কবি অমাবস্যা অন্ধকার হ'তে মুক্তির পথ খুঁজেছেন। ঢাকার দাঙ্গার বিরুদ্ধে কবি দু'টি গান লিখলেন—গান দু'টি মৃণালকান্তি ঘোষ ও আব্বাসউদ্দীন আহমদ মৈত কণ্ঠে "মেগাফোন"-এ রেকর্ড করলেন। প্রথম পিঠে "হিন্দু আর মুসলিম মোরা দুই সহোদর ভাই" আর দ্বিতীয় পিঠে "ভারতের দুই নয়নতারা হিন্দু-মুসলমান"। সরকারের প্রচার দফতরেও তিনি একটি গান লিখলেন : "ও ভাই হিন্দু-মুসলমান, ভুল পথে চলি দোঁহারে দু'জনে কোরো নাকো অপমান।" এ গানটিও রেকর্ড করলেন আব্বাসউদ্দীন আহমদ। হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে এ সময় একটি কবিকাও লিখেছিলেন কাজী সাহেব—সেটির রেকর্ডিং-এ কণ্ঠ দিলেন সাইদ সিদ্দিকী ও বিপিন গুপ্ত।

এইভাবে দেখা যায় কবি তাঁর সমগ্র প্রাণ-মন দিয়ে দাঙ্গা রোধের চেষ্টা করেছেন। কেবল ১৯২৬ সাল নয়—কবি তাঁর সমগ্র জীবনাচরণ দিয়ে হিন্দু-মুসলিম উভয়ের হাত মেলাবার চেষ্টা করেছেন, তাঁর সমগ্র জীবন-তপস্যা দিয়ে উভয় সংস্কৃতিকে এক মোহনায় মেলাতে চেয়েছেন। ছেলেদের নাম রেখেছেন অরিন্দম খালেদ, কৃষ্ণ মোহাম্মদ। একদিকে রচনা করেছেন শ্যামা সংগীত অন্যদিকে ইসলামী। শেষ জীবনে তিনি হ'য়েছিলেন একজন চরম কালী উপাসক।

আবহাওয়া আজ অনেক শান্ত। ভুল বোঝাবুঝি আর অভিজ্ঞতা যথেষ্ট হ'য়েছে। এ দেশের সাহিত্যিকেরা যখন নির্বিকারচিত্তে বসে তখন ওদেশের নওজোয়ানেরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করছে বুলেটের সামনে—এবং সেটা উর্দুর জন্যে নয়। গালভরা কথা আকাশচারী স্বপ্ন ওদের উপবাসী মনের খোরাক জোগাতে পারেনি। সে শিক্ষা আমাদের নিতে হ'বে। বিলম্বে উভয় পক্ষের ক্ষতির পরিমাণ বাড়বে। পুরোধা এগিয়ে আসুন। দুই সংস্কৃতি মিলনের গাঁটছড়া বাঁধুক।

আমরা চাই নতুন 'শকুন্তলা' নতুন 'মুগল কাকা' এসে আমাদের কাঁদিয়ে আকুল করে দিয়ে যাক্। তার জন্যে 'আবদুর রহমানের' দরকার হবে কি?

সেদিন আমার হাতে ছিলো একতারা

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

সেদিন আমার হাতে ছিলো একতারা
সেদিন একাদিক্রম নদীর তীর ধরে
হেঁটে গিয়েছিলাম আমি
যেখানে সমস্ত দিনের শুরু হয়
সেখান পর্যন্ত হেঁটে গিয়েছিলাম আমি
যেখানে সমস্ত দিনের শেষ হয়
সেখান পর্যন্ত হেঁটে গিয়েছিলাম আমি
পৃথিবীর ঠিক কিনার ধরে চাঁদের দেশে
হামাগুড়ি দিয়ে উঠে গিয়েছিলাম।
সেখান থেকে সবই দেখা যায়,
কেবল দেখা যায় না তোমাকে
অথচ তোমায় সকলের চেয়ে উঁচুতে উঠে দেখে আসার
কৌতূহল হয়েছিলো আমার
কৌতূহল হয়েছিলো আমার
তোমায় অনেকদিন নিচে থেকে দেখেছি বলে
তোমায় মুখোমুখি দেখেছি আমি অনেকদিন
তোমার সঙ্গে পাশাপাশি হেঁটে গিয়েছি আমি
তোমার কাছ থেকে প্লাটফর্মে
বিদায় নিয়েছি আমি অনেকদিন
তোমার পদতল হাতে নিয়েছি আমি টেবিলের তলায়
তোমার আপৎকালের পরাধীনতা নিয়ে
মর্মান্তিক আস্ফালন করেছি আমি অনেক
তোমার কাছে থেকে, তোমার দূরে থেকে
দুজনেই সর্বান্তঃকরণ ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেছি কতই
তুমি যখন মিহিজামে গিয়েছিলে,
আমি গিয়েছিলাম মুঙ্গের
এমনভাবে অপ্রমাণ করার চেষ্টা করেছি কতই
দুজনের প্রমত্ত ঐক্যিকতা
সেদিন আমার হাতে ছিলো একতারা
সেদিন একাদিক্রম নদীর তীর ধরে
হেঁটে গিয়েছিলাম আমি
পৃথিবীর ঠিক কিনারা ধরে চাঁদের দেশে
হামাগুড়ি দিয়ে উঠে গিয়েছিলাম
সেখান থেকে সবই দেখা যায়,
কেবল দেখা যায় না তোমাকে
অথচ তোমায় সকলের চেয়ে উঁচুতে উঠে দেখে আসার
কৌতূহল হয়েছিলো আমার।

ঠিক তখনই

প্রতিভা মুখোপাধ্যায়

আমি তখনও ছিলাম সুপ্ত।
বিরাট সমুদ্রের সাদা ফেনার মতো।
বিপুলতার ছোঁয়া
সূর্য এসে জানালো আশ্বাস,
যেন এক অনবদ্য রেখায়—
মেঘপরী নেমে এল পাশে

আমি তখনও ছিলাম সুপ্ত।
পুরানো হলুদ খবরের কাগজ
দুই চোখ ভরে দেখে
খুঁজে পাওয়া গেল না কিছুই।
ক্লান্ত চোখ ফিরে গেল বুঝি,
বৃথা শ্রম অপ্রসন্ন মন।

আমি তখনও ছিলাম সুপ্ত।
তুমি এসে দাঁড়ালে কাছে,
কম্পিত ওষ্ঠে কী যেন কথা,
এবং আমার মুমূর্ষু চোখে
খুঁজে দেখ কোনো ভাষা
আর ঠিক তখনই, আমি
ফিরে পাই আমার প্রত্যয়।

সাহিত্য ও সমাজ

অসিতকুমার সরকার

অসংখ্য মানুষের জীবন লইয়া সমাজের সংগঠন। এই যে সমাজ এবং মানুষের জীবন, ইহাদের উভয়কে ভিত্তি করিয়াই সাহিত্য সৃষ্টি লাভ করে। এক কথায় সমাজ, সাহিত্য সৃষ্টির উপকরণ। তবু পল্লী সাহিত্যিকার সামাজিক জীব, সমাজবদ্ধ মানুষের সুখদুঃখ, আশা-নিরাশা হাসি-অশ্রু সাহিত্যস্রষ্টার সামাজিক মনকে আলোড়িত না করিয়া পারে না। জগতের অমর সাহিত্য সৃষ্টি লৌকিক জীবনের সুদৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সমাজ হইতেই সাহিত্য তাহার প্রাণরস আহরণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, প্রত্যক্ষত সমাজের বিশেষ কোন উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যই সাহিত্যের সৃষ্টি নয়।

সমাজ সাহিত্যের উপকরণ অর্থাৎ উপায়, লক্ষ্য নহে। উপায়কে উদ্দেশ্য বলিয়া ধরিলেই সাহিত্য বিচারে নানা ভুলভ্রান্তি দেখা দিবার সম্ভাবনা। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে বাঙ্গালী-জীবনের নানা সমস্যা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে; এবং শরৎচন্দ্রকে আমরা শুধু উপন্যাস শিল্পী হিসাবে তাহাকে সমাজ-সংস্কারকও বলিয়া থাকি। তথাপি কেহ যদি বলেন যে শরৎচন্দ্র সমাজকল্যাণের জন্য অর্থাৎ সমাজের বিবিধ সমস্যা সমাধানের জন্যই উপন্যাস রচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন, তাহা হইলে আমরা বলিব ওকথা মিথ্যা। আসল কথা, বাঙ্গালীর সুখদুঃখ, আনন্দবেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক মনকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল ও তাহারই প্রেরণায় তিনি সাহিত্য রচনায় স্বকীয় প্রতিভাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। সমাজ এখানে উপায়, উদ্দেশ্য হইতেছে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক মনের আনন্দ বেদনার প্রকাশ।

বহু জীবনকে সমাজ বাহিরের দিক হইতে এক করে, আর সাহিত্য মানসিক ভাবে বহু হৃদয়কে নিবিড় এক ঐক্যানুভূতির বাঁধা বাঁধিয়া দেয়। সাহিত্য আর কিছুই নহে ইহাকে আমরা মানব সমাজের মানস সমাজ বলিয়া আখ্যা দিতে পারি। বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, মানবমৈত্রীক্ষেত্রে সমাজ অপেক্ষা সাহিত্য বহুগুণে অগ্রগামী। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন

মানুষের মধ্যে আচার ব্যবহার ও রাজনীতিগত অন্তর্ভ তারতম্য আছে। এইসব কারণেই সকলদেশের মানব সমাজ, বিশ্বসমাজে পর্যবসিত হইতে পারে নাই। কিন্তু সাহিত্য শূন্যচারী জ্যোতির্ময় বিহঙ্গের মত দেশগত, জাতিগতও সমাজগত যাবতীয় কৃত্রিম ব্যবধানকে অনায়াসে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

যাহা মানুষের উপদেশ বাক্য হয় নাই যোবেল সমিতির বিতরণেও যাহা সার্থক হইয়া ওঠে নাই, সাহিত্য অতি অবলীলাক্রমে তাহা করিয়া ফেলিয়াছে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, সাহিত্যের ভিত্তিমূলে রহিয়াছে সমাজ এবং অগণিত অপরিমেয় জীবনের সমাবেশ।

ভারতবর্ষের কালিদাসের রচনা পড়িয়া জার্মান কবি গ্যেটে উচ্ছ্বসিত হইয়াছেন। এবং বাঙ্গালী—কবি ইংল্যাণ্ডের সেক্সপিয়রকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন "ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি" ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি মানুষের সমাজ এবং চিরন্তন মানুষের বিস্তৃতির উপরই সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা। দেশ বা জাতির দিক হইতে যত পার্থক্যই বিদ্যমান থাকুক না কেন, মৌলিকভাবে সমস্ত মানুষের হৃদয়বৃত্তিই এক। দেশে দেশে মানুষেরা একভাবে ভালবাসে, আনন্দিত হয়, এক ভাবেই বেদনার অশ্রুমোচন করিয়া থাকে। হৃদয়ের ক্ষেত্রে মানুষের বর্ণভেদ নাই, ধর্মভেদ নাই, জাতিগত ভেদ নাই, প্রাচ্য প্রাশ্চাত্ত্যের ব্যবধান নাই। সাহিত্যের মধ্যেই নিখিল ব্যাপি। মানব হৃদয়ের যথার্থ মিলন।

সাহিত্যের জীবন আছে, মানব প্রকৃতি আছে, কিন্তু তবুও সাহিত্য ইহাদের কাহারো অনুকরণ নহে। কোন আর্টই প্রকৃতির অনুকরণ করে না। কেননা, আর্ট এবং প্রকৃতির মধ্যে বিভিন্নতা আছে বলিয়াই আমরা এই দুইটি বস্তুকে পৃথক নামে অভিহিত করিয়া থাকি। এই বিশ্বপ্রকৃতি বিরাট, মানব প্রকৃতিও বিশাল। শিল্পী ইহাদের যত অল্পাংশকেই সাহিত্যে রূপায়িত ও রসায়িত করিয়া তোলেন। বাস্তবে যাহা আমরা দেখি তাহা যথাযথ ভাবে সাহিত্যে প্রতিফলিত হয় না। সাহিত্য কখনও বাস্তবের ফটোগ্রাফ নহে। তাহাই যদি হইত তবে সংবাদপত্রের সঙ্গে সাহিত্য শিল্পের কোন পার্থক্য থাকিত না। প্রত্যেক সার্থক সাহিত্য সৃষ্টির অন্তরালে থাকে সাহিত্যিকের বিশেষ প্রতিভা, তাহার মনের দৃষ্টি, ভাব কল্পনা।

সমাজের রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য ধারার মধ্যেও পরিবর্তন সূচিত হয়। বাংলা সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও একথার সত্যতা উপলব্ধি করা যায়। বঙ্কিম যুগে সাহিত্য সৃষ্টি আর অতি আধুনিক কালের সাহিত্য সৃষ্টি এক নয়—এক হওয়াও সম্ভব নয়। কেননা, বঙ্কিমের সমাজকে আমরা আজ বহুদূরে অতিক্রম করিয়া চলিয়া আসিয়াছি। সমাজের প্রভাব সাহিত্যে থাকিতে বাধ্য, কিন্তু ইহাতে কাহারও যেন ধারণা না জন্মায় যে সমাজ এবং সামাজিকতাকে প্রকাশ করাই বুঝি সাহিত্যের লক্ষ্য। আগেই বলা হইয়াছে যে, সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য হইল সাহিত্যিকের রূপসৃষ্টি ও রসসৃষ্টি করা। সমাজ সাহিত্যের উপলক্ষ্য কিম্বা উপাদান মাত্র।

॥ বিংশ শতাব্দীর নতুন প্রকাশনা ॥

শ্যামসুন্দর দে র

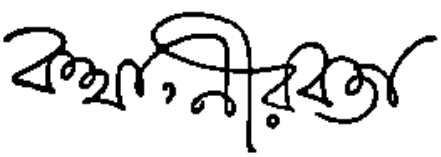

জীবনিষ্ঠ কবির প্রত্যয়দীপ্ত কবিতার

সুমনোনীত সংকলন। দাম—১'৫০

: প্রাপ্তিস্থান

বিংশ শতাব্দী : ২০ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৫

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি ॥ সিগনেট বুক শপ

● বিজ্ঞান বিচিত্রা ●

কর্ণিয়া সংরক্ষণের অভিনব পন্থা

ডাবলিন ট্রিনিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আলপাতাদে বিশেষ পদ্ধতিতে অক্ষিগোলকের স্বচ্ছ আবরণ বা কর্ণিয়াকে বহু সপ্তাহ ধরে এমন কি কয়েকমাস পর্যন্ত রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। কিছুদিন আগেও এই সকল কর্ণিয়া মৃত ব্যক্তির দেহ থেকে সংগ্রহ করার পর ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে ব্যবহার না করলে এদের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যেত।

চোখের মণির সামনে স্বচ্ছ টিস্যুর বা কর্ণিয়ার কোন অংশ গুরুতর রোগের জন্য নষ্ট হয়ে গেলে বা কুৎসিত হয়ে গেলে দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। মৃত ব্যক্তির কর্ণিয়ার কোন অংশ কেটে নিয়ে সেখানে জুড়ে দেওয়া হয়, রোগী দৃষ্টি ফিরে পায়।

ঐ হাসপাতালের চিকিৎসকেরা দেখেছেন যে, কর্ণিয়াকে গ্লিসারিনের ভিতর তিন ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখার পর কাজে প্রয়োগ করে বিশেষ ফল পাওয়া গিয়েছে। তাঁদের ধারণা সম্পূর্ণ সুস্থ কর্ণিয়াকে অনির্দিষ্টকালের জন্য সংরক্ষিত করা যেতে পারে।

চিকিৎসার জন্য চোখের ভিতরকার চলচ্চিত্র গ্রহণ

বিশেষভাবে নির্মিত কনট্যাক্ট লেন্স এবং মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে চোখের ভিতরকার রঙীন চলচ্চিত্র তুলে গ্লকোমা নামক দুরারোগ্য চক্ষুরোগ বিষয়ে বর্তমানে গবেষণা চালানো হচ্ছে। (কনট্যাক্ট লেন্স অক্ষিগোলকের উপর সেটে লাগান হয়) এই রোগের পরিণতি হল অন্ধ। অক্ষির অভ্যন্তরস্থ স্নায়ুর উপর চাপের সঙ্গে এই রোগের কি যোগাযোগ তা বিশ্লেষণ করা হচ্ছে এই চলচ্চিত্রের সাহায্যে। লন এঞ্জেলসস্থ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল স্কুলে এই পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। স্কুলের অক্ষি সংগ্রহশালায় কিছিদধিক আড়াইশতটি চক্ষু সংরক্ষিত আছে। প্রায় পাঁচশত ব্যক্তি এই সংগ্রহশালায় চক্ষুদান করতে এগিয়ে এসেছিলেন। তাদের মৃত্যুর পর চক্ষুগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হচ্ছিল। বিজ্ঞানীরা লক্ষ করেন যে, মৃত্যুর পর চক্ষুর মধ্যে যে পরিবর্তন অনুবীক্ষণযন্ত্রে ধরা পড়ে এবং জীবদ্দশায় দৃষ্টিশক্তিতে যে পরিবর্তন ঘটে এই দুইয়ের মধ্যে একটা সম্পর্ক রয়েছে। এভাবে রঙীন চলচ্চিত্র তুলে চোখ কোলা চোখের টিউমার প্রভৃতি অক্ষিরোগ সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করা যাবে। এই সমস্ত চলচ্চিত্র অক্ষিরোগ চিকিৎসা সম্পর্কে শিক্ষণের কাজেও ব্যবহৃত করা যাবে।

হেমোফিলিয়া রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার

হেমোফিলিয়া এক মারাত্মকব্যাধি। এ ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সর্বদাই শঙ্কার মধ্যে থাকতে হয়। এরোগের রীতি হল একবার রক্তপাত শুরু হলে তা আর বন্ধ হয় না, কারণ তাদের রক্ত স্বভাবধর্মে ঠিকমত জমাট বাঁধে না। এর ফলে, দেহে অস্ত্রোপচারের নিতান্ত প্রয়োজন দেখা দিলে তাদের জীবনে দুরূহ সমস্যার সৃষ্টি হয়। আবার হেমোফিলিয়া রোগীদের মধ্যে প্রায়শই একটি উপসর্গ দেখা দেয়, তাতে পা বিকৃত হয়ে যায় তাদের। তখন কিন্তু অস্ত্রোপচার ছাড়া পা ঠিক করবার অন্যপন্থা থাকে না। ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জনরা সম্প্রতি অস্ত্রোপচার করে এরকম কয়েকজন রোগীর পা ঠিক করে দিয়েছেন। অস্ত্রোপচারকালে সার্জনরা এই সমস্ত রোগীর শিরায় মানবদেহজাত ফিবরিনোজেন ইঞ্জেকশন করেছেন এবং এই উপাদানের কল্যাণে তাদের রক্ত সময়মত জমাট হয়ে রক্ত করণ বন্ধ হয়েছে। ফিবরিনোজেনে প্রচুর পরিমাণে এ এইচ জি বা অ্যান্টিহিমোলাইটিক গ্লোবুলিন থাকে এই উপাদানটিই রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে রক্তের জমাট বাঁধার সমস্যার সুরাহা করে দেয়। হেমোফিলিয়ার রোগীদের পা বিকৃত হবার কারণ পায়ের মধ্যে রক্তক্ষরণ। একবারে প্রচুর রক্তক্ষরণ বা বারবার অল্প অল্প রক্তক্ষরণের ফলে পায়ের এই অবস্থা হয়। তখন আরামের জন্য রোগীরা পায়ের আঙ্গুলে ভর দিয়ে চলে। এই অবস্থার সুরাহা করতে না পারলে হাঁটু বা গোড়ালির বিষম ক্ষতি হয়। কিন্তু রক্তক্ষরণ জনিত সমস্যার দরুণ এতদিন চিকিৎসা সম্ভব হত না। ফিবরিনোজেন ইঞ্জেকশন দিয়ে ফ্লোরিডার সার্জনরা কয়েকজনের পায়ে সার্থকভাবে অস্ত্রোপচার করেছেন।

লক্ষ্মীবিলাস

জনপ্রিয়তায় শীর্ষস্থানীয়

লক্ষ্মীবিলাস পারফিউমারী কর্তৃক প্রস্তুত এই অদ্বিতীয় ভেষজ সমন্বিত সুগন্ধি কেশ তৈল আপনিও ব্যবহার করুন।

লক্ষ্মীবিলাস
কেশ তৈল

ট্রেডমার্ক
"শ্রী ভরত মূর্ত্তি"
বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবেন।

ব্যবহারে ভালো
লক্ষ্মীবিলাস
"স্নো"

: প্রস্তুতকারক :

লক্ষ্মীবিলাস পারফিউমারী প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা

09 JAN 1964

শ্রীশৈলেশ্বর মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ২০, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক শিল্পী কার্ড-বোর্ড বক্স ম্যানুফ্যাকচারিং প্রাইভেট লিঃ, ২০, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।
শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত।